

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

□□ সতর্কতা: এই বইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (২ খণ্ড)

(এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি)

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অরজিনাল বই ডাউনলোড : [link](#)

বিনীত সতর্কতা: এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি, তাই এতে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আকিদা বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল বই যাচাই করার অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ রইল। এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার পাঠকের নিজের। যদি যাচাই করে বা বুঝে-শুনে পড়া সম্ভব না হয়, তবে বইটি না পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

□□ পাঠকের প্রতি সতর্কতা

এই অনুবাদটি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর শব্দচয়ন, বাক্য গঠন কিংবা ভাবানুবাদে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অসংগতি থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

বইটি পড়া শুরু করার আগে দয়া করে মনে এই বিষয়টি গেঁথে নিন যে— “আমি বইটি কেবল জানার ও শেখার উদ্দেশ্যে পড়ছি। পড়ার সময় কোনো কথায় সন্দেহ বা খটকা লাগলে, তা আমি যাচাই না করে গ্রহণ করব না।”

বিশেষ করে আকিদা, ফতোয়া বা স্পর্শকাতর কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই অনুবাদের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করবেন না। যেকোনো আমল বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অবশ্যই মূল বই মিলিয়ে দেখবেন অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হবেন।

এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া যেকোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার একান্তই পাঠকের। তাই বিনীত অনুরোধ, নিজে যাচাই-বাছাই করে পড়ার মানসিকতা থাকলেই কেবল বইটি অধ্যয়ন করবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

৩৫ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি

- ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের তাহকীক ও তাখরীজের মূলনীতি
- মতপার্থক্যের যুগ, হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত, জঙ্গ জামাল, জঙ্গ সিফফীন
- হযরত হাসান (রা.)-এর খিলাফত, আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত, ইয়াজিদে যুগ, হযরত হুসাইন (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবারের (রা.)-এর সংগ্রাম, কারবালার ট্র্যাজেডি ও হাররার ট্র্যাজেডি
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবারের (রা.)-এর খিলাফত ও শাহাদাত
- ফিতনার যুগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা
- প্রথম হিজরি শতাব্দীতে উম্মাহর ইলমী ও আখলাকী তরবিয়তকারী প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবয়ীগণের পরিচিতি
- গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের উত্তর

অভিষেক

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ডাক্তার আবদুর রাজ্জাক ইসকান্দার সাহেব

সংকলন

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

উস্তাদ, ইসলামী ইতিহাস, জামিয়া আল-রশীদ করাচি

আল-মানহাল পাবলিশার্স

তারিখ উম্মতে মুসলিম

- ঐতিহাসিক বর্ণনার তাহকীক ও তাখরীজের মূলনীতি
- জঙ্গ জামাল, জঙ্গ সিফফীন, কারবালার ট্র্যাজেডি, হাররার ট্র্যাজেডি, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত
- ফিতনার যুগ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল
- গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের উত্তর

দ্বিতীয় খণ্ড

তাহকীক:

মুয়াররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদাজিল্লাহ

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-৬, গুলিস্তান-ই-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

তাক্বারীয (অভিমতসমূহ)

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জামিআ উলুম ইসলামিয়া

(ইউনিভার্সিটি অফ ইসলামিক সায়েন্সেস)

আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী টাউন

করাচী - পাকিস্তান।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আশ্বিয়ায়ী
ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাসীন।

আম্মা বা’দ:

প্রথাগত জ্ঞানসমূহের মধ্যে ইলমুত তারীখ (ইতিহাস শাস্ত্র) এমন একটি বিষয় যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং এর ওপর নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিও বেশ কঠিন। এর দুটি মৌলিক কারণ রয়েছে: এক. ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে সাধারণত সেই সতর্কতা ও নির্ভরযোগ্যতার সনদ (সূত্র) অনুপস্থিত থাকে যা হাদীস শাস্ত্রের বর্ণনার ক্ষেত্রে অর্জিত হয়। দুই. ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব অনেক বেশি সংরক্ষিত থাকে। তাই বাহবিচারহীনভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে নির্ভরযোগ্যতা ও প্রমাণের স্তরে রেখে চিন্তা-ভাবনা করা সাধারণত চিন্তাগত বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য ইতিহাসের একজন ছাত্রের জন্য ইতিহাস অধ্যয়নের পূর্বে অন্তত তিনটি বিষয় খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি:

- ইতিহাস অধ্যয়নের পূর্বে এমন কিছু ইতিহাসের মূলনীতির প্রয়োজন যাতে উম্মতে মুসলিমার স্বীকৃত চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিগুলোর বর্ণনা থাকে; যাকে আপনি ইতিহাসের মৌলিক নীতি ও প্রয়োজনীয় আদব হিসেবেও অভিহিত করতে পারেন।
- ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহের পাশাপাশি লেখকের মেজাজ ও ঝোঁক এবং তার বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কেও অবগত থাকা উচিত।
- অনেক সময় বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের কাছেও প্রসিদ্ধ উৎসসমূহের মাধ্যমে অনেক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা চলে আসে, এই নতুন ঐতিহাসিক উৎসগুলোর সঠিক ও বৈধতা উভয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড ও স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি থাকাও জরুরি।

ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য এই প্রশংসনীয় মানদণ্ড অনুযায়ী মৌলিক ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর ওপর সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত কিতাব খুব কমই পাওয়া যায়। তবে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ যে, তাওফীকপ্রাপ্ত আহলে ইলমদের থেকে কোনো সময় খালি থাকে না। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়ায় “তারীখে উম্মতে মুসলিমা” নামে একটি সংকলন আমাদের সামনে এসেছে, যাতে উপরোক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অধিকন্তু (যতটুকু আমি দেখেছি), এই সংকলনটি চিন্তা ও ঝোঁকের ক্ষেত্রে ভারসাম্য, বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা, উত্তম দলিল উপস্থাপন, সুন্দর বিন্যাস এবং বর্ণনার শৈলীর দিক থেকে নির্ধারিত ও মানসম্মত একটি প্রচেষ্টা। আশা করা যায় এই সংকলনটি সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের জন্য ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং একে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

ওয়াসাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাসীন।

ফাঙ্কাত আস-সালাম

(স্বাক্ষর)

(মাওলানা ডক্টর) আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার

মুহতামিম, জামিআ উলুম ইসলামিয়া আল্লামা বিনুরী টাউন করাচী

প্রশংসাসমূহ | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

হযরত মাওলানা ডক্টর মনজুর আহমদ মেঙ্গল সাহেব

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালাতু আলা নাবিয়্যিহি

আম্মা বাদ!

নিশ্চিতভাবে আজ মুসলিম উম্মাহ বাহ্যিক আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে অত্যন্ত ভয়াবহ এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং দিন দিন মুক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। যার সবচেয়ে বড় কারণ একদিকে যেমন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ব্যবহারিক দূরত্ব, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের পূর্বসূরিদের বীরত্বগাথা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাও বটে। যা কোনো বড় দুর্ঘটনা এবং দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধির চেয়ে কম নয়।

তদুপরি, যদি কোনো ব্যক্তি ইতিহাস চর্চায় আগ্রহ রাখেনও, তবে তাকে এমন ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয় যা তাদের মনে পূর্বসূরিদের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প তৈরি করে। আর এই তথাকথিত ইসলামী ইতিহাস ইসলামের প্রতিরক্ষার পরিবর্তে ইসলামের দুর্গে ফাটল ধরানোর কাজ করে, বরং এর চেয়েও বড় কথা হলো (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামী ইতিহাসে এমন সব মনগড়া ইসরাঈলী বর্ণনা রয়েছে যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এমনকি এসব বর্ণনায় আশ্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালামের মতো নিষ্পাপ সত্তাগণও নিরাপদ থাকেননি।

এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসের সাথে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে আমরা জানতে পারি উম্মাহর ওপর পরিস্থিতির কঠোরতা ও অবনতি, বাহ্যিক আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, পারস্পরিক অনৈক্য এবং ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। আর এসবের সাথে সাথে এই সবকিছুর প্রতিকার ও সমাধানের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে এবং এ বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরিদের কর্মপন্থা কী ছিল—তাও জানা যায়। আর এটি কেবল ইসলামের সেই ইতিহাসের মাধ্যমেই সম্ভব যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত।

যার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (মাদাজিল্লুহম), উস্তাদ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, জামিয়াতুর রশীদ করাচি—যিনি বেশ কিছু কিতাবের লেখকও বটে—তিনি মাশাআল্লাহ অনেক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করেছেন, যা ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে এবং বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে প্রশংসার দাবিদার।

আল্লাহ তাআলা জনাবের এই প্রচেষ্টাকে উভয় জগতে মুক্তি ও উন্নতির মাধ্যম বানান এবং পাঠকদের জন্য ব্যাপক উপকারের কারণ করুন।

মনজুর আহমদ

অভিমন্যুসমূহ মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমা’-এর জন্য কাব্যিক অভিমন্যু

পক্ষ থেকে: শায়েরে ইসলাম, হযরত আসার জৌনপুরী মাদাজিল্লুল আলী

প্রচেষ্টা, সংকল্প ও দৃঢ়তার দ্বার যখন উন্মোচিত হলো

একজন ইতিহাসবিদ পুনরায় প্রাণপণ কোমর বাঁধলেন

সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে এক অমূল্য উপহার দিয়ে গেলেন

কাগজ ও কলম নিজেরাই অবাক হয়ে রইল, কী আর বলব

চিত্তার উড্ডয়ন মঙ্গলের উচ্চতায় পৌঁছে গেল

তর্কের কাঁটাগুলো হার মেনে অস্ত্র ত্যাগ করল

অতীতদের স্মৃতির শহর এমনভাবে সাজিয়ে রাখলেন

একনিষ্ঠ বান্দার প্রতি মাওলা মেহেরবান হলেন।

বহরের পর বছর করা পরিশ্রম অবশেষে মহিমার সাথে সার্থকতা পেল।

সেই যুবক এমন যে বৃদ্ধদের থেকেও বাজি জিতে নিলেন।

এমন এক কীর্তি সমাপ্তি পেল, কী আর বলব।

যখন তিনি ইতিহাসের পাখির ওপর কলম ধরলেন।

এভাবেই ইসমাইল ইলমের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিলেন।

যেন মুসলমানদের সামনে একটি আয়না এনে রাখলেন।

প্রশংসাসমূহ | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

যাতে সমস্ত ঈমানদারগণ নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়

কীভাবে মুশকিলগুলো সহজ হয়ে যায় তা দেখে নিন

সাইয়েদুল আবরার ﷺ কীভাবে কষ্ট সহ্য করেছেন

আমার সরকার ﷺ কীভাবে দ্বীনের পতাকা উড়িয়েছেন

কোন অন্ধকারে হেদায়েতের প্রদীপগুলো প্রজ্বলিত হয়েছে

সাহাবীগণ কীভাবে রক্ত দিয়ে দ্বীনের বাগানকে সিঁধিত করেছেন

একদিকে সুরাইয়া নক্ষত্রের উচ্চতার এক বিদ্বিত দৃশ্য

অন্যদিকে পাতালের এক প্রাণঘাতী কণ্টকাকীর্ণ বন

একদিকে আত্মত্যাগ, তাকওয়া এবং ভ্রাতৃত্বের এক দৃষ্টান্ত

অন্যদিকে গোঁড়ামি, লোভ এবং সম্পদের মোহ

প্রথম শ্রেণী দুনিয়া ও দ্বীনের নেয়ামতের হকদার

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো কেন্দ্র ও অক্ষ নেই

হে খোদা! প্রভাব সৃষ্টিকারী আর্তনাদে প্রভাবের দরজা খুলে দাও

জীবিত থাকতেই যেন প্রভাব সৃষ্টিকারী স্বপ্ন দ্রুত বাস্তবায়িত হয়

ইসলামের শৌর্য-বীর্যের সেই স্বর্ণযুগ আবার দেখাও

দুনিয়াতে আবার যেন তোমার নামের ডঙ্কা বেজে ওঠে

ইসমাইল রায়হানের এই প্রচেষ্টাকে হে খোদা কবুল করো

ইখলাসের এই কুঁড়িকে হে খুলদে বারীনের ফুল বানিয়ে দাও

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

সূচিপত্র

জরুরি নিবেদন ৩০

প্রস্তাবনা ৩২

চিহ্ন ও সংকেত এবং তথ্যসূত্র যাচাইয়ের জন্য নির্দেশিকা ৪০

ইতিহাস অধ্যয়ন এবং গবেষণা ও পর্যালোচনার মূলনীতি ৪১

অতীতের ঐতিহাসিকদের রচনামূল্যের ওপর এক নজর ৪২

ইলমে হাদিস ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য ৪৩

অতীতের উলামায়ে কেরাম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মতো সহীহ মুসনাদ ইতিহাস

সংকলন করেননি কেন? ৪৩

ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের সতর্ক প্রচেষ্টা ৪৫

ঘটনার যৌক্তিক বিন্যাস ৪৬

সংবাদের ছয়টি মৌলিক প্রশ্ন ৪৬

যৌক্তিক সংযোগের জন্য দুর্বল উপাদান অপরিহার্য ছিল ৪৭

ইতিহাসে কি বানোয়াট উপাদান বিদ্যমান নেই? ৪৮

বর্ণনা উদ্ধৃত করার অর্থ কি সেগুলোকে নিজের আকিদা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া? ৪৯

ইবনে জারীর তাবারীর বক্তব্য ৫১

আল্লামা ইবনুল আসীর জাযারীর বক্তব্য ৫১

হাফেজ ইবনে কাসীরের বক্তব্য ৫২

দুর্বল বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা কোন শর্তের অধীনে ছিল? ৫৩

পথভ্রষ্ট ফেরকাগুলোর বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মানদণ্ড ৫৩

দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করা বা সেগুলোর ওপর আমল করার বিধান? ৫৪

মুহাদিসগণের পরিভাষাগুলো বোঝার প্রয়োজনীয়তা ৫৪

সাহাবী ও তাবয়ীদের যুগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের রচনামূল্যের সঠিক

ছিল না ভুল? ৫৫

একটি বর্ণনা একাধিক লেখকের উদ্ধৃত করা কি তার নির্ভরযোগ্যতার দলিল? ৫৬

যদি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর থেকে কোনো ঘটনা বর্ণনা

করেন, তবে কি তা নির্ভরযোগ্য হবে? ৫৭

হাফেজ ইবনে কাসীর এবং আল্লামা ইবনে খালদুন সমস্ত সন্দেহজনক বর্ণনার ওপর মন্তব্য

করেননি কেন? ৫৮

ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর দ্বিধার ভিত্তি নেই, তবে সেগুলোতে সহীহ ও যঈফ (দুর্বল)

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কী? ৫৮

মুশাজরাতের বর্ণনা, সাহাবীদের মর্যাদা এবং গবেষণামূলক পদ্ধতি ৬০

সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষিত ৬১

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কুরআনী চিত্র ৬২

নবীদের ইসমত এবং আদালাতে সাহাবার মধ্যে পার্থক্য ৬৪

সাহাবায়ে কেরাম কি ইসমত লাভ করেছেন? ৬৪

আদালাতে সাহাবার অর্থ ৬৫

আদালাতে সাহাবা সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহের নিরসন ৬৭

বর্ণনা গ্রহণ বা বর্জনের মূলনীতি ৬৯

বর্ণনাকারীর থিকাহ (নির্ভরযোগ্যতা) ও দুর্বলতা যাচাই করা কেন জরুরি? ৭১

সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি ৭২

অতীতের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এত সতর্কতা অবলম্বন না করলে আমরা কেন করব? ৭৩

ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো কীভাবে যাচাই-বাছাই করা হবে? ৭৩

বর্ণনার স্তরসমূহ: সহীহ, হাসান, যঈফ ৭৪

যঈফ বর্ণনার দুর্বলতা কখন দূর হতে পারে এবং কখন পারে না? ৭৫

সহীহ ও যঈফ বর্ণনার পার্থক্যের ফলাফল কী হবে? ৭৫

সাহাবীর সমালোচনা সম্বলিত সহীহ সনদের বর্ণনাগুলো কি গ্রহণ করা হবে কি না? ৭৫

উসূলে দিরায়াত বলতে কী বোঝায়? ৭৭

যঈফ বর্ণনা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা ৭৮

সমমানের শক্তিশালী পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি ৭৯

নিরঙ্কুশ শিয়া ও নাসিবী বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মর্যাদা ৮০

গবেষণার এই ইনসাফপূর্ণ মূলনীতিগুলো সবার জন্য অপরিহার্য ৮০

কয়েকজন বিখ্যাত যঈফ ও সিকাহ বর্ণনাকারী: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৮১

হাদিস সংকলকদের ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো ৮৬

ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ রহ. ৮৬

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম আস-সানআনী রহ. ৮৭

ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহ. ৮৭

ইমাম হাকেম রহ. এবং ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনী রহ.-এর ওপর রাফয-এর অভিযোগ ৮৭

রাফেযী ও শিয়াদের মধ্যে পার্থক্য, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর ব্যাখ্যা ৯০

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতবিরোধ (মুশাজরাত) বাদ দেওয়া কেন সম্ভব হয়নি? ৯২

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতবিরোধের ব্যাপারে নীরব থাকার নির্দেশ এবং আলোচনার সুযোগ ৯২

বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপদ্ধতি ৯৩

সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ এবং ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি ৯৪

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত ৯৫

প্রথম অধ্যায়: খিলাফতে রাশেদাহ (মতবিরোধের যুগ) ৯৮

ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের গোপন পর্যায় ১০০

আব্দুল্লাহ বিন সাবা ১০১

নতুন আকিদা প্রচার ১০২

ফিতনার কেন্দ্রসমূহ ১০২

হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নীতির পার্থক্য এবং এর প্রভাব ১০৩

সাবায়ী অভিযান এবং ইসলামী আমিরদের চরিত্র হনন ১০৭

ওয়ালিদ বিন উকবা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনা ১০৮

সরাসরি খলিফার চরিত্র হনন ১১১

শামে আব্দুল্লাহ বিন সাবা ১১১

সাবায়ী আন্দোলনের উপাদানসমূহ ১১২

হযরত আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আচরণ ১১৩

মিশরে ইবনে সাবার প্রভাব ১১৪

৩৩ হিজরীর সূচনা: নতুন ঘটনাবলী ১১৪

ইরাকে ইবনে সাবা ১১৫

৩৪ হিজরী: যখন ষড়যন্ত্রকারী উপাদানগুলো প্রকাশ্যে আসে ১১৬

হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা ১১৬

প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের সাথে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শ ১১৭

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

প্রোপাগান্ডা এবং তিনটি মিথ্যা অভিযোগ ১১৮

ইবনে সাবার নতুন খেলা ১১৮

হযরত উসমান (রা.)-এর তদন্তকারী দল ১১৯

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আশঙ্কা এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মদিনাবাসীদের প্রতি শুভকামনা ১১৯

আকাবির সাহাবায়ে কেরামের জামাতের ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপন্থা ১২০

সাবায়ীদের পরিকল্পনা ১২৩

অভিযোগের তালিকাসহ সাবায়ী কাফেলা মদিনায় ১২৩

হযরত উসমান (রা.) জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় ১২৪

সাবায়ী জামাতের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ ১২৯

জাল চিঠি ১২৯

সাবায়ী কাফেলাসমূহের রওয়ানা হওয়া ১২৯

মদিনায় সাবায়ী কাফেলাসমূহের আগমন: প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা ১৩০

মদিনার বাইরে সাহাবায়ে কেরামের পাহারা ১৩১

বিদ্রোহীদের সাথে আকাবির সাহাবায়ে কেরামের পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ ১৩১

কাফেলাসমূহের প্রত্যাবর্তন ১৩২

ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় দিক: জাল চিঠি এবং বিদ্রোহীদের পুনরায় আক্রমণ ১৩৩

বিদ্রোহীরা মসজিদে নববীতে ১৩৫

অবরোধ ১৩৫

বিদ্রোহীদের দাবি কেন মানা হয়নি? ১৩৬

তলোয়ার না তোলার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়েছিল? ১৩৬

অন্যান্য শহরের মুসলমানদের অস্থিরতা এবং সাবায়ীদের ভুল সংবাদ পরিবেশন ১৩৭

খাবার ও পানি বন্ধ করা, হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রচেষ্টা ১৩৭

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পক্ষ থেকে হযরত উসমান (রা.)-কে সাহায্যের প্রচেষ্টা ১৩৭

তৃতীয় খলিফার নিজের জীবনের চেয়ে হজের ব্যবস্থাপনার চিন্তা বেশি ছিল ১৩৮

মদিনার কিছু আকাবির শহর ছেড়ে চলে যান ১৩৮

হযরত জুবায়ের (রা.)-এর বার্তা ১৩৯

সংশোধনমূলক ভাষণ ১৩৯

ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের তৃতীয় দিক: শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা ১৪১

হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিনিধিত্বের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত এবং শেষ বার্তা ১৪১

শেষ দিন: শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমাপ্তি ১৪২

হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) সবার শেষে উসমান (রা.)-এর বাড়ি থেকে বের হন ১৪৩

মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং কিছু দাঙ্গাকারীর অনুশোচনা ১৪৩

সাবায়ীদের ঘাতক আক্রমণ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মজলুম শাহাদাত ১৪৫

জানাজার নামাজ ও দাফন ১৪৬

দাফন চলাকালীন অলৌকিক ঘটনা (কারামত) ১৪৭

এই মর্মান্তিক ঘটনায় আকাবিরদের প্রতিক্রিয়া ১৪৭

কায়সারের আকস্মিক আক্রমণ এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্য ১৪৯

হত্যাকারী কারা ছিল? ১৫০

ঘাতক আক্রমণের নেতৃত্ব কে দিয়েছিল? ১৫১

আবদুল্লাহ বিন সাবার অস্তিত্ব কি একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা? ১৫২

সীরাতে উসমান (রা.)-এর কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ১৫৪

গভর্নরদের অপসারণের অটল সিদ্ধান্তসমূহ ১৫৪

প্রয়োজন অনুযায়ী শাস্তিও প্রদান করতেন ১৫৪

মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণে বাধা দানকারীদের শাস্তি ১৫৫

মদিনাবাসীদের সতর্কীকরণ ১৫৬

বাকশক্তির প্রখরতা ১৫৬

সাদাতদের প্রতি অসম্মান সহ্য করতেন না ১৫৬

পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত থাকতেন ১৫৬

অনাচার দূর করার চিন্তা ১৫৭

বার্ধক্য সত্ত্বেও দুর্বল ও অসহায় ছিলেন না ১৫৭

উচ্চ মনোবল ১৫৭

খিলাফত হযরত আলী বিন আবি তালিব রা. ১৫৮

হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি ১৫৯

হযরত আলী রা.-ই খিলাফতের একমাত্র হকদার কেন? ১৬০

হযরত আলী রা.-এর খিলাফতের বায়আত কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ১৬২

বায়আত এবং প্রথম খুতবা ১৬২

কিসাস-এ-উসমান রা.-এর মাসআলা ১৬৩

নতুন বছর ৩৬ হিজরি ১৬৪

বিদ্রোহীদের থেকে বায়আত কেন নিলেন? ১৬৬

উসমানের হত্যাকারীদের পাকড়াও করতে বিলম্বের কারণ: বিদ্রোহীদের পাঁচটি শ্রেণী ১৬৭

কিসাসের দাবিতে হযরত তালহা ও জুবায়ের, আয়েশা সিদ্দিকা এবং মুয়াবিয়া রা.-এর চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? ১৬৯

সাহাবায়ে কিরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেন কেন? ১৬৯

আদালতি কার্যক্রমে জটিলতা ১৭০

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ১৭১

কিসাস-এ-উসমান সংক্রান্ত সাহাবায়ে কিরামের চারটি শ্রেণী ১৭২

হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রা.-এর অস্থিরতা এবং হযরত আলী রা.-এর পরামর্শ ১৭৪

দাঙ্গাকারী ও মাওয়ালিদের মদিনা থেকে বহিষ্কার ১৭৪

হযরত তালহা ও জুবায়ের রা.-এর ইরাক থেকে সৈন্য ডাকার পরামর্শ ১৭৫

ইরাকে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? ১৭৫

হযরত আলী রা. বিদ্রোহীদের কেন পদমর্যাদা দিলেন? ১৭৬

হযরত উসমান রা.-এর আমিলদের কেন বরখাস্ত করলেন? ১৭৬

ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর চাল সফল ১৭৮

হযরত তালহা ও জুবায়ের রা.-এর হযরত আলী রা.-এর সাথে কথোপকথন এবং উমরাহ সফরের অনুমতি ১৭৮

শামবাসীদের থেকে বায়আত নেওয়ার আরেকটি প্রচেষ্টা ১৭৯

হযরত আলী রা.-এর শাম যাত্রা স্থগিত, ইরাক যাওয়ার সিদ্ধান্ত ১৮১

জঙ্গে জামাল এবং এর পটভূমি ১৮২

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বসরায় ১৮২

বসরার চূড়ান্ত যুদ্ধ: সাবায়ীদের থেকে প্রতিশোধ ১৮৫

হযরত আলী রা.-এর কুফার দিকে যাত্রা ১৮৮

কুফাবাসীদের নামে হযরত আলী রা.-এর মকতুব ১৮৯

হযরত আলী রা.-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ১৮৯

জনবল হ্রাসের কারণ ১৯০

হযরত জুবায়ের রা.-এর সন্ধিপ্রিয়তা ১৯০

কুফার ফকীহগণ অভ্যর্থনা জানানেন ১৯০

রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে বিমুখ সাহাবীগণ ১৯১

হযরত আলী রা.-এর যু-কারে অবস্থান ১৯৩

কুফার জামে মসজিদে পরামর্শ সভা ১৯৩

আম্মার বিন ইয়াসির রা.-এর ভাষণ ১৯৫

কুফাবাসী আমীরুল মুমিনীন-এর খিদমতে ১৯৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

হযরত আলী (রা.) বসরার অধিবাসীদের সাথে পাওয়ার জন্য সচেষ্টি ১৯৫

হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-এর প্রতিবাদ ১৯৬

হযরত কা'কা বিন আমর (রা.)-এর সফল দূতিয়ালি ১৯৬

হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে সাবায়ীদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা ১৯৭

ইবনে সাবার গোপন পরামর্শ এবং নতুন ষড়যন্ত্র ১৯৮

বসরার লঙ্করে আবেগপ্রবণ ও স্বার্থান্বেষী লোক ১৯৯

একটি সন্দেহ এবং তার উত্তর ১৯৯

হযরত আলী (রা.) কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত ২০০

বড়দের পারস্পরিক সাক্ষাৎ এবং সন্ধির ঘোষণা ২০০

জঙ্গ জামাল

সহীহ সনদের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহ ২০১

ঐতিহাসিক বিবরণ ২০১

হযরত জুবায়ের (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন ২০২

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর শাহাদাত ২০৩

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হাওদায় ২০৩

যুদ্ধের সমাপ্তি ২০৫

আহলে জামালের সাথে হযরত আলী (রা.)-এর আচরণ ২০৬

যুদ্ধের তারিখ, সময়কাল এবং নিহতদের সতর্ক সংখ্যা ২০৭

যুদ্ধের পরবর্তী দুঃখ ও শোকের বহিঃপ্রকাশ ২০৮

হযরত আলী (রা.)-এর মুখে হযরত তালহা (রা.) এবং তাঁর সাহেবজাদা মুহাম্মদের প্রশংসা ২০৮

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর মুখে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর প্রশংসা ও গুণগান ২০৯

যায়েদ বিন সুহান কে? ২০৯

হযরত জুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর শাহাদাত ২১০

হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ২১০

উম্মুল মুমিনীনের প্রত্যাবর্তন এবং হযরত আলী (রা.)-এর উত্তম আচরণ ২১১

ইজতিহাদী মতপার্থক্য ২১২

হযরত আলী (রা.)-এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং নতুন বিন্যাস ২১৩

সাবায়ীদের পলায়ন ২১৩

জঙ্গ জামালের পরবর্তী প্রভাব ২১৪

জঙ্গ জামালের পরেও সাবায়ীদের কেন আলাদা করা হয়নি? ২১৪

সমস্যার দুটি রূপ এবং হযরত আলী (রা.)-এর বিরতি ২১৫

হযরত আলী (রা.) এবং আহলে শামের বিরোধের কারণ ২১৬

আহলে শামের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্যসমূহ ২১৬

আহলে শামের অবস্থান ২১৭

সন্দেহ নিরসনের জন্য হযরত আলী (রা.)-এর প্রস্তাব ২১৮

সন্ধি স্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ ২১৮

উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী লোকসমূহ ২১৯

আবু মুসলিম খাওলানী (রা.)-এর দূতিয়ালি ২১৯

রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহারের এখতিয়ার ২২০

শামে সৈন্য অভিযানের প্রস্তুতি এবং বাহিনীর বিন্যাস ২২০

শামে সৈন্য অভিযানের উদ্দেশ্য ২২১

ইরাকবাসী এবং শামবাসীদের মেজাজ ও প্রশিক্ষণের পার্থক্য ২২১

উভয় লঙ্করের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য ২২২

ফোরাত নদী থেকে সিফফীন পর্যন্ত ২২২

জঙ্গ সিফফীন ২২৪

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

পানি বন্ধের বাস্তবতা ২২৪

রণক্ষেত্রে সমঝোতার প্রচেষ্টা ২২৫

যুদ্ধের সূচনা ২২৬

আলাবি বাহিনীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২২৬

শাহি বাহিনীর নেতৃত্ব ২২৮

যুদ্ধের দৃশ্য ২২৮

যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিবর্গ ২২৯

উভয় পক্ষের মধ্যে মহত্ব ও সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ২৩০

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দয়াদ্রুতা ২৩০

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত ২৩১

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কে হত্যা করেছে? ২৩২

লাইলাতুল হারীর ২৩৪

যুদ্ধের সমাপ্তি ২৩৫

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে বিরোধী পক্ষের ধর্মীয় অবস্থান ২৩৫

স্বপ্নে সুসংবাদ ২৩৬

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য ও নিহতের সংখ্যা ২৩৭

লাইলাতুল হারীরের পর উভয় পক্ষের মানসিক অবস্থা ২৩৭

আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে ফয়সালার প্রস্তাব ২৩৮

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন? ২৩৯

বিশৃঙ্খলাকারীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির বিরোধিতা ২৩৯

সহীহ বুখারীর বর্ণনা ২৪১

হযরত সাহল বিন হুнайফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রভাবশালী ভাষণ ২৪১

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কি যুদ্ধবিরতি অস্বীকার করছিলেন? ২৪২

খারেজিয়াত: খারেজিদের নেপথ্যে কে ছিল? ২৪৩

তাহকীমের জন্য সালিশ নিযুক্ত করা ২৪৪

হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচনের কারণ ২৪৫

হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করার কারণ ২৪৬

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফায় প্রত্যাবর্তন ২৪৬

তাহকীমের জন্য চুক্তিপত্র ২৪৭

আলোচনার সাফল্যের জন্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গুরুত্ব প্রদান ২৪৮

যুদ্ধবিরতি চুক্তির ইতিবাচক প্রভাব, দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে বিভেদ ২৪৮

বহিরাগত শক্তির ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা ২৪৯

তাহকীমের ঘটনা: কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল!! ২৫০

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন তাহকীমের মজলিসে উপস্থিত হননি? ২৫০

তাহকীমের মজলিসে কী আলোচনা হয়েছিল? ২৫১

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশের কারণসমূহ ২৫২

আলোচনার শেষ পর্যায় ২৫৩

চূড়ান্ত ঘোষণা: তাহকীম মজলিসের পর উভয় পক্ষের অবস্থান ২৫৫

ভুল বর্ণনাগুলো কীভাবে প্রসিদ্ধ হলো? ২৫৫

প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম ঘটনার তদন্ত করেছেন! ২৫৬

হাকামাইন এবং কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত বা সার্বভৌম সরকারের মধ্যে পার্থক্য ২৫৬

সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বায়ত্তশাসিত সরকার ২৫৭

সীমান্ত সংঘর্ষ ২৫৮

মিশর ইস্যু ২৬১

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

মিসরের ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রথম আক্রমণ এবং মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার হত্যা ২৬২

মিসরে কায়েস বিন সাদ (রা.)-এর গভর্নর নিযুক্ত হওয়া ২৬২

আশতার নাখয়ীর মিসর যাত্রা এবং আকস্মিক মৃত্যু ২৬৩

সৈয়দনা মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক মিসর দখল এবং মুহাম্মদ বিন আবি বকরের হত্যা ২৬৩

মিসর দখলের প্রভাব ২৬৫

উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি ২৬৬

শামবাসীদের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর নীতি ২৬৬

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসক হওয়ার ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর উপলব্ধি এবং তাঁর প্রতি উদারতা ২৬৭

সীমান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার চুক্তি ২৬৮

আমীরুল মুমিনীন এবং আমীরে শাম ২৬৯

রোম সম্রাটের হুমকি এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জবাব ২৬৯

ইসলামী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির ভিত্তি ২৭০

হযরত আলী (রা.)-এর ফিকহী মতামতের ওপর ইজমা ২৭১

বিদ্রোহীদের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর অভিমত ২৭৩

ইজমার ফলাফল ২৭৩

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাঁর শাসনকালে হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদের সাথে একমত ছিলেন ২৭৫

খারেজীদের সাথে দ্বন্দ্ব ২৭৬

হারুরায় খারেজীরা ২৭৬

খারেজীদের খণ্ডন: হযরত আলী (রা.)-এর প্রাক্তন যুক্তিপ্রদর্শন পদ্ধতি ২৭৭

খারেজীদের সাথে চুক্তি ২৭৭

কুফায় খারেজীরা ২৭৮

তাহকীমের স্লোগানের দাঁতভাঙা জবাব ২৭৯

শাসকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর বাণী ২৭৯

হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি খারেজীদের অভদ্রতা ২৭৯

খারেজীদের দাওয়াত এবং জনগণের মগজ ধোলাই ২৮০

কুফা থেকে খারেজীদের গোপনে প্রস্থান ২৮০

খারেজীদের রক্তপাত ২৮১

খারেজীদের হাতে আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব (রা.)-এর শাহাদাত ২৮১

খারেজীদের প্রতি শেষ সতর্কবার্তা ২৮৩

খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান ২৮৪

খারেজীদের সাথে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর মুনাজারা (বিতর্ক) ২৮৫

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ ২৮৮

অদ্ভুত আকৃতির মানুষের সন্ধান ২৮৮

জামাল, সিফফিন এবং নাহরাওয়ানের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ২৮৯

হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যপন্থা অবলম্বন ২৯০

ইরাকবাসী এবং শামবাসী উভয়ই ধর্মপ্রাণ ছিলেন ২৯০

আকিদা সংশোধন ২৯১

প্রকাশ্যে কুফরি লিপ্ত সাবায়ীদের মৃত্যুদণ্ড ২৯৩

শিরকি প্রথা এবং বিদআত প্রতিরোধ ২৯৪

আপনজনদের প্রতি অভিযোগ ২৯৪

মতভেদ বা বিভেদের প্রতি ঘৃণা ২৯৫

স্থিতিশীলতার প্রচেষ্টা এবং বিজয়সমূহ ২৯৬

হযরত আলী (রা.)-এর প্রাদেশিক গভর্নরগণ ২৯৬

পারস্য, কিরমান এবং পাহাড়ি অঞ্চলের অভিযানসমূহ ২৯৭

মজদ অভিযান ২৯৭

নিশাপুর অভিযান ২৯৭

বন্দী রাজকুমারীর সম্মান ২৯৭

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضى الله عنه-এর ছাত্রদের হযরত আলী رضى الله عنه-এর

পতাকাতলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ২৯৮

মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ২৯৮

বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে অগ্রযাত্রা ২৯৮

কান্দাবিল ও কিকানের অভিযান ২৯৯

অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে খ্রিস্টানদের ভূমিকা ২৯৯

খিররিত বিন রশিদের ষড়যন্ত্রসমূহ ২৯৯

খিররিত বিন রশিদের বিরুদ্ধে অভিযান ২৯৯

শাহাদাতের ট্র্যাজেডি

দুনিয়া বিমুখতা ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ৩০১

খারেজীদের হত্যার ষড়যন্ত্র তৈরি করা ৩০১

আব্দুর রহমান বিন মুলজিম ও শাবিব বিন বাজরা ৩০২

ঘাতক আক্রমণ ও শাহাদাত ৩০২

আক্রমণকারীর সাথে সদাচরণের তাকিদ ৩০৩

শেষ অসিয়ত ৩০৩

শাহাদাত ও দাফন ৩০৪

সীরাতে আলভীর কিছু উজ্জ্বল দিক

হযরত হাসান رضى الله عنه-এর শোকগাথা ভাষণ ও স্থলাভিষিক্ত হওয়া ৩০৪

হযরত আলী رضى الله عنه-এর শাহাদাতে হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর প্রতিক্রিয়া ৩০৫

হাফেজ ইবনে হাজার رحمه الله-এর ভাষায় একটি সন্দেহের নিরসন ৩০৭

হযরত আলী رضى الله عنه কি একজন ব্যর্থ শাসক ছিলেন? ৩০৭

শাসকের প্রকৃত সফলতা কী? ৩০৮

উম্মতের সওয়াদে আজমের বিপরীতে ফেরকাবন্দী

চরমপন্থী শিয়ানে আলীর তিন প্রকার ৩০৯

মারওয়ানি ও নাসিবিদের পরিচয় ৩১১

ফেরকাবন্দীর সূচনা কীভাবে হলো? হাফেজ জাহাবী رحمه الله-এর ব্যাখ্যা ৩১৩

মারওয়ানি ও নাসিবিদের পরিচয় ৩১৪

ফেরকাবন্দীর সূচনা কীভাবে হলো? হাফেজ জাহাবী رحمه الله-এর ব্যাখ্যা ৩১৬

রাফেজি ও নাসিবিদের বর্ণনাকারী ও বর্ণনা গ্রহণের অদ্ভুত মানহাজ ৩১৭

আব্দুল্লাহ বিন সাবার পরিণতি কী হয়েছিল? ৩১৮

ইতিহাসের শিক্ষা ৩১৯

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ছিল শরীয়ত পূর্ণতার জন্য ৩২৩

তাকভীনি হিকমতসমূহ - কুরআন ও সুন্নাহর ওপর বিশ্বাসের পরীক্ষা ৩২৪

ইফকের ঘটনাও কি একটি পরীক্ষা ছিল? ৩২৪

পারস্পরিক মতবিরোধে কিসের পরীক্ষা ছিল? ৩২৫

দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ৩২৫

পারস্পরিক মতবিরোধ একদিক থেকে ক্ষতিকর এবং অন্যদিক থেকে উপকারী ছিল ৩২৬

খাঁটি ও ভেজাল পৃথক হয়ে গেল ৩২৬

উম্মতে মুসলিমাহর অভ্যন্তরীণ কাঠামো মজবুত হলো ৩২৬

সাহাবায়ে কেরামের বিরোধ কি “رُحَمَاءُ يَنْهَمُ”-এর পরিপন্থী? ৩২৭

সৈয়্যদনা মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর ইজতিহাদি ভুলের বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী

رحمه الله-এর মালফুজ ৩২৮

রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সময় উপযুক্ত কর্মপন্থা? ৩২৮

অপ্রয়োজনে সাহাবাদের মতবিরোধের আলোচনা পরিহার করার শিক্ষা ৩৩০

অন্যান্য জাতির ধর্মীয় লড়াইয়ের সাথে সাহাবাদের মতবিরোধের তুলনা ৩৩২

خلافت راشدہ کا اختتامی دور (খিলাফতে রাশেদার শেষ যুগ)

হযরত হাসান বিন আলী رضى الله عنه-এর খিলাফত ৩৩৪

কি হযরত হাসান رضى الله عنه সন্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন? ৩৩৬

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

হযরত হাসান (রা.)-এর নীতিপরায়ণতা এবং ইবনে মুলজামের হত্যা ৩৩৬

হযরত হাসান (রা.)-এর সন্ধি ঘোষণা এবং ফিতনাবাজদের বিরোধিতা ৩৩৭

ইরাকবাসীর প্রতি হযরত হাসান (রা.)-এর ভাষণ এবং ফিতনাবাজদের ধৃষ্টতা ৩৩৭

হযরত হাসান (রা.)-এর ওপর প্রাণঘাতী হামলা ৩৩৮

হযরত হাসান (রা.) কেন সাথে লস্কর নিয়ে গিয়েছিলেন? ৩৩৮

“সহীহ বুখারী”-তে সন্ধির ঘটনা ৩৩৯

সন্ধি ঘোষণায় আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর অংশগ্রহণ ৩৪১

খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তি ৩৪২

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রথম ভাষণ ৩৪২

মদীনাবাসীদের বায়আত ৩৪৪

হযরত হাসান (রা.)-এর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার রক্ষা ৩৪৫

কায়েস বিন সাদ (রা.)-এর বায়আত ৩৪৬

হাসনাইন কারিমাইন (রা.)-এর ইরাক থেকে বিদায় এবং শেষ কথোপকথন ৩৪৭

হাসনাইন কারিমাইন (রা.)-এর মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান ৩৪৭

হাসনাইন কারিমাইনের প্রতি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আচরণ ৩৪৮

হযরত হাসান (রা.)-এর চরিত্র হননের অভিযান ৩৪৮

হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তেকাল ৩৪৯

খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কিত ইসলামী আকিদা ৩৫০

খিলাফতে রাশেদার শ্রেষ্ঠত্বের কারণসমূহ ৩৫১

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদিসে দেহলভী-র বাণী ৩৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়: হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর যুগ ৩৫৩

বংশ পরিচয় এবং প্রাথমিক অবস্থা ৩৫৪

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ৩৫৪

আপনার ওপর সাহাবায়ে কিরামের আস্তা ৩৫৫

খিলাফতের যুগের সূচনা ৩৫৬

চরমপন্থীদের ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া ৩৫৬

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর লক্ষ্যসমূহ ৩৫৮

১. শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা ৩৫৯

উপদেশের ওপর তাৎক্ষণিক আমল ৩৫৯

কিসাস সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন ৩৫৯

২. আরব নেতৃত্বের পুনর্গঠন ৩৬২

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ৩৬২

আরব নেতৃত্বের সংগঠনের সাথে বর্তমান আরব জাতীয়তাবাদের পার্থক্য ৩৬২

বনু উমাইয়ার একাধিপত্য: একটি অনিবার্য পরিস্থিতি ৩৬৩

৩. আলম-ই-ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং নতুন বিজয়সমূহ ৩৬৪

উপমহাদেশে জিহাদ ৩৬৫

বান্নু ও লাহোর অভিযানসমূহ ৩৬৫

কাইকান (কীরথর পর্বতমালা)-এর দ্বিতীয় অভিযান ৩৬৫

খোরাসান অভিযানসমূহ ৩৬৭

আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-এর নেতৃত্বে কাবুল জিহাদ ৩৬৭

সিলাহ বিন আশইয়াম-এর মুজাহাদা ৩৬৭

দুই আরব মুজাহিদ শত্রুদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন ৩৬৮

কাবুলের উপত্যকায় ৩৬৯

রণক্ষেত্রে ফিকহ ও হাদিসের শিক্ষা ৩৬৯

মানজানিক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) এর ব্যবহার ৩৭০

চূড়ান্ত যুদ্ধ ৩৭০

মুজাহিদদের সততা ৩৭০

কাবুলের বন্দী শিশুরা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন ৩৭১

কান্দাহার বিজয় ৩৭১

আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-এর ইন্তেকাল ৩৭১

নতুন বিশৃঙ্খলা ও তার প্রতিকার ৩৭১

ঘোর ও রাবিলের বিজয় ৩৭২

মধ্য এশিয়ায় বিজয়াভিযানের সূচনা ৩৭৩

আমুর দরিয়ার ওপারে ৩৭৩

বুখারার রানীর জুতো ফেলে পলায়ন ৩৭৩

হযরত সাঈদ বিন উসমান গনি বুখারা ও সমরকন্দের বিজয়ী ৩৭৪

কুসাম বিন আব্বাস (রা.)-এর শাহাদাত ৩৭৫

আফ্রিকার অভিযানসমূহ ৩৭৬

উকবা বিন নাফে (রহ.)-এর বিজয়সমূহ ৩৭৬

আমর বিন আস (রা.)-এর ইন্তেকাল ৩৭৬

মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-এর জিহাদ ৩৭৮

সুস বিজয় ৩৭৮

আফ্রিকায় প্রথম ইসলামী সেনানিবাস, কায়রোয়ান শহর নির্মাণ ৩৮০

হিংস্র প্রাণীরা জঙ্গল খালি করে দিল ৩৮১

আবু মুহাজির দিনার ও হাসান বিন নুমানের বিজয়সমূহ ৩৮২

রোমান সাম্রাজ্য ও মুসলিম বিশ্ব ৩৮২

চুক্তি ভঙ্গকারীদের সাথেও অঙ্গীকার পূরণ ৩৮৩

রোমানদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ ৩৮৩

শীতকালীন অভিযানসমূহ ৩৮৩

গ্রীষ্মকালীন কার্যক্রমসমূহ ৩৮৪

হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি (রা.)-এর শীতকালীন অভিযান ৩৮৪

কনস্টান্টিনোপলে প্রথম আক্রমণ ৩৮৫

কনস্টান্টিনোপল বাহিনীর কার্যক্রম ৩৮৬

এশিয়া মাইনরের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়সমূহ ৩৮৮

ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহ দখলের অভিযানসমূহ ৩৮৯

হযরত উমর ফারুক ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কেন চীন ৩৯০

এবং আবিসিনিয়ায় আক্রমণ করেননি? ৩৯০

হাদিসে সিরিয়াবাসীদের জিহাদের উল্লেখ ৩৯০

এই যুদ্ধগুলো কি দস্যুবৃত্তি ছিল? ৩৯১

কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ৩৯১

শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ৩৯৩

কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ৩৯৪

শর্তা বিভাগ (পুলিশ) ৩৯৪

বিবেকের স্বাধীনতা ৩৯৪

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও আধুনিক রূপ দান ৩৯৫

দিওয়ানুল খাতাম: সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের বিভাগ ৩৯৫

জারাসা: নিরাপত্তা বিভাগ ৩৯৫

হিজাবা: খলিফার সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের দায়িত্ব ৩৯৬

উন্নয়নমূলক ও নির্মাণাধীন কীর্তিসমূহ ৩৯৬

বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন ৩৯৮

কুফায় খারেজিদের বিদ্রোহসমূহ ৩৯৮

সাবায়ী গোষ্ঠীর তৎপরতা ৩৯৯

বসরা ও কুফায় জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের নিয়োগ ৪০০

জিয়াদের সংস্কার ও কীর্তিসমূহ ৪০০

তারিখে উম্মতে মুসলিমা - খণ্ড ২

১৫

খিলাফতে আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা ৪০২

হুজর বিন আদি (রা.)-এর সমস্যা ৪০৩

ঘটনার প্রেক্ষাপট ৪০৪

শান্তি স্থাপনে অনীহা ৪০৪

হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে পত্রিনিময় ৪০৫

ফিতনাবাজ লোকদের চক্রের প্রভাব ৪০৬

প্রতিবাদ আন্দোলনের সূচনা ৪০৬

কুফায় জিয়াদের নিয়োগ এবং হুজর বিন আদি (রা.)-এর সাথে আচরণ ৪০৬

কুফায় জিয়াদের প্রথম ভাষণ এবং হযরত হুজর (রা.)-এর অসন্তুষ্টির মূল কারণ ৪০৭

জিয়াদের পক্ষ থেকে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা ও বুঝানো ৪০৮

জিয়াদের বসরা গমন এবং কুফার পরিস্থিতির পরিবর্তন ৪০৮

হযরত হুজর (রা.)-এর প্রতিবাদ এবং জিয়াদের জরুরি ভিত্তিতে কুফায় প্রত্যাবর্তন ৪০৯

৪০৯

আলোচনার শেষ চেষ্টা ৪১০

হুজর বিন আদি (রা.)-কে গ্রেপ্তারের কার্যক্রম ৪১০

হযরত হুজর (রা.)-এর গ্রেপ্তার এবং অভিযোগনামা প্রস্তুতকরণ ৪১১

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মামলাটি বিবেচনা করা ৪১১

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ৪১২

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সুপারিশনামা ৪১৩

আবু মিখনাফের অবিশ্বাস্য বর্ণনাগুলো ৪১৩

হযরত হুজর (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে সাহাবী ও তাবয়ীগণের প্রতিক্রিয়া ৪১৩

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দুঃখ ও অনুশোচনা ৪১৪

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর অসন্তুষ্টি এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ক্ষমা প্রার্থনা ৪১৫

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার (উলি আহদি) ৪১৭

ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী বানানোর কারণসমূহ ৪১৯

ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আপত্তি ৪২০

ইয়াজিদের বাইয়াত থেকে মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্নতা ৪২১

বাইয়াত থেকে বিরত থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দলিলসমূহ ৪২১

আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল ৪২৩

আমর বিন হাজম (রা.)-এর ভিন্নমত, উপদেশ এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উত্তর ৪২৩

ইরাকের কুশলী ব্যক্তিত্ব আহনাফ বিন কায়েসের মতামত ৪২৪

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার এবং জমহুর ওলামাদের মাযহাব (অভিমত) ৪২৪

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে ইয়াজিদের যোগ্যতা.....! ৪২৫

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দোয়া ও ইস্তিখারা ৪২৬

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার, একটি পরীক্ষামূলক ঘটনা (টেস্ট কেস) ৪২৭

এই যুগের দুটি বড় দুর্ঘটনা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ইন্তেকালের ঘটনা ৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর ইন্তেকালের ঘটনা ৪২৯

উম্মতের স্বার্থে ইয়াজিদের প্রতি হযরত মুয়াবিয়ার ওসিয়ত ৪২৯

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শেষ দিনগুলো এবং ইন্তেকাল ৪৩১

হাদিসের কিতাবসমূহ এবং সীরাতে মুয়াবিয়া (রা.) ৪৩৩

মন্দ কাজ ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা ৪৩৩

ফ্যাশন, কৃত্রিমতা এবং লোকদেখানো আড়ম্বর প্রতিরোধ ৪৩৩

দ্বীনকে আসল রূপে টিকিয়ে রাখার জজবা (আবেগ) ৪৩৪

মানব জীবনের মূল্য ও মর্যাদা ৪৩৪

অ-ইসলামী রীতিনীতি থেকে পরিহার ৪৩৪

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস - দ্বিতীয় খণ্ড

তোষামোদকারীদের প্রতিরোধ ৪৩৫

সত্য কথা বলায় উৎসাহ প্রদান - বিবেকের স্বাধীনতা ৪৩৫

অনাড়ম্বর জীবনযাপন ৪৩৬

শরীয়তের খুঁটিনাটি, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি খেয়াল রাখা ৪৩৭

সুন্নাত প্রচারের উদ্দীপনা ৪৩৭

বিশেষ দিনগুলোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও পরিমিতিবোধ ৪৩৭

ছাত্রসুলভ আবেগ ৪৩৮

দ্বীনি মাসআলাসমূহের গবেষণা ৪৩৮

ইলমি ও ফিকহি দক্ষতা এবং আপনার ইলমের ওপর বিশিষ্ট সাহায্যে কেরামের আস্ত্রা ৪৩৮

আল্লাহর হৃদুদ কায়েম করা, রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব ৪৩৯

খিলাফতের গুরুত্ব ৪৩৯

উপদলীয় কোন্দলের প্রতিকার, শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা ৪৩৯

সাহায্যে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা ৪৩৯

জিহাদ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা ৪৪০

হাদিস বর্ণনায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পদ্ধতি ৪৪০

জাল বর্ণনা প্রতিরোধ এবং এর ওপর তিরস্কার ৪৪১

মিথ্যা বর্ণনা চেনার মানদণ্ড ৪৪১

জাল বর্ণনাকারী ও মুর্থ ওয়ায়েজদের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা ৪৪১

এই ভুল ধারণার খণ্ডন যে অভ্যন্তরীণ সংশোধনই যথেষ্ট ৪৪২

উলামা, তলাবা ও মুয়াজ্জিনদের উৎসাহ প্রদান ৪৪২

দুনিয়ার প্রতি অনীহা, আখিরাতে চিন্তা ও নববী প্রেম ৪৪২

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং বাকস্বাধীনতা ৪৪৩

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালের প্রকৃত মর্যাদা ৪৪৬

পরিবর্তনের একটি বড় কারণ ৪৪৬

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগকে খিলাফতে রাশিদাহর অন্তর্ভুক্ত কেন করা হয় না? ৪৪৭

খিলাফতে রাশিদাহ এবং খিলাফতে মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আকাবির উলামায়ে কেরামের বাণীসমূহ ৪৪৮

ইতিহাসের শিক্ষা ৪৫০

সাহায্যে কেরামের ইতিহাস... গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির এক ঝলক ৪৫৪

তৃতীয় অধ্যায়: ফিতনার যুগ

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ থেকে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত ৪৬১

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার শাসনকাল ৪৬২

ইয়াজিদের প্রথম খুতবা ৪৬২

বায়াতের জন্য দূতদের প্রেরণ ৪৬২

হযরত হুসাইন (রা.) কেন ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করেননি? ৪৬৩

হযরত হুসাইন (রা.) কি বিদ্রোহ করতে উদ্যত ছিলেন? ৪৬৩

ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল ৪৬৩

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর এবং হুসাইন বিন আলী (রা.)-এর মদিনা ত্যাগ ৪৬৪

মদিনা ত্যাগের পূর্বে হুসাইন বিন আলী (রা.)-এর সাথে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সাক্ষাৎ ৪৬৫

হযরত হুসাইন (রা.)-এর আন্দোলনের প্রকৃত প্রেক্ষাপট ৪৬৫

মদিনা মুনাওয়ারায় ধরপাকড়, ওয়ালিদ বিন উতবার অপসারণ এবং আমর বিন সাঈদের নিয়োগ ৪৬৭

হযরত হুসাইন (রা.) কেন ইরাক যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন? ৪৬৮

অধিকাংশ আকাবির কেন ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন? ৪৬৯

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) ইয়াজিদের বায়াত সম্পর্কে কী বলেছিলেন? ৪৭০

ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কি শিথিলতা প্রদর্শন করা হচ্ছিল? ৪৭১

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর নামে ইয়াজিদের পত্র ৪৭১

ইরাকবাসীর চিঠিপত্র ৪৭২

৬০ হিজরির কুফাবাসী ৪৭৩

ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী কী করাতে চেয়েছিল? ৪৭৩

হযরত হুসাইন রা.-কে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর পরামর্শ ৪৭৪

মুসলিম বিন আকীলের কুফা অভিমুখে যাত্রা ৪৭৪

মুসলিম বিন আকীলের প্রতি নুমান বিন বশীর রা.-এর আচরণ ৪৭৫

মুসলিম বিন আকীলের সন্তোষজনক বার্তা এবং হযরত হুসাইন রা.-এর সফরের সংকল্প ৪৭৫

কুফার পরিস্থিতির পরিবর্তন: উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নিয়োগ ৪৭৬

মুসলিম বিন আকীলের হত্যাকাণ্ড ৪৭৬

সাহাবায়ে কেরাম রা. কুফা যেতে নিষেধ করেছিলেন ৪৭৭

নিষেধ করা সত্ত্বেও হযরত হুসাইন রা. কেন থামলেন না? ৪৭৮

চিঠিপত্র সাথে কেন নিলেন? ৪৭৮

হযরত হুসাইন রা.-এর যাত্রার সংবাদ ইয়াজিদের নিকট পৌঁছানো এবং মারওয়ানের ইবনে যিয়াদকে চিঠি ৪৭৯

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নামে ইয়াজিদের চিঠি ৪৭৯

ইয়াজিদের বার্তার ওপর মন্তব্য ৪৮০

হযরত হুসাইন রা.-কে বেখবর রাখার জন্য উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ৪৮০

হযরত হুসাইন রা. ফিরে যেতে রাজি হওয়া এবং মুসলিম বিন আকীলের ভাইদের এগিয়ে যাওয়ার জেদ ৪৮০

হু র বিন ইয়াজিদের পরামর্শ, হযরত হুসাইন রা.-এর দামেস্ক যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং এর কারণসমূহ ৪৮১

ইবনে যিয়াদ কী চেয়েছিল এবং কেন? ৪৮২

উমর বিন সা’দের কারবালা অভিমুখে যাত্রা ৪৮৩

কারবালার হত্যাকাণ্ড ৪৮৪

হযরত হুসাইন রা. কর্তৃক কুফার বাহিনীকে তিনটি বিকল্প প্রদান ৪৮৪

কেন আত্মসমর্পণ করলেন না? ৪৮৫

যুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো? ৪৮৬

হযরত হুসাইন রা.-এর অবমাননা ৪৮৬

সাহেবজাদা আবদুল্লাহর শাহাদাত এবং যুদ্ধের সূচনা ৪৮৭

কুফাবাসীদের সাহসহীনতা ৪৮৭

হযরত হুসাইন রা.-এর শাহাদাত ৪৮৮

কারবালার শহীদগণ ৪৮৮

হত্যাকারীর দম্ভোক্তিপূর্ণ কবিতা ৪৮৯

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে পবিত্র মস্তক ৪৮৯

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকট سٔادٔا (সৈয়দ পরিবার)-এর কাফেলা ৪৮৯

হযরত যয়নুল আবেদীন এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ ৪৯০

ইয়াজিদের দরবারে سٔادٔا (সৈয়দ পরিবার)-এর কাফেলা ৪৯০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে কী জবাব দেবে? ৪৯২

কারবালা ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী কে? ৪৯৩

কুফাবাসী ৪৯৩

হযরত হুসাইন রা.-এর বিরুদ্ধে আক্রমণে শরিক শিয়ানে আলী ৪৯৪

উমর বিন সা’দ ৪৯৫

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ ৪৯৬

কারবালা ট্র্যাজেডি এবং ইয়াজিদের ভূমিকা ৪৯৬

সমস্যার সমাধান কী ছিল? ৪৯৮

কারবালা ট্র্যাজেডি... ইতিহাসের শিক্ষা ৪৯৯

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা.-এর বাণী ৫০০

হিসসা দুয়াম

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রা)-এর সত্য কথা এবং ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বাধা
..... ৫০০

ইয়াজিদের আমলের অভিযানসমূহ

ইউরোপ আক্রমণ স্থগিত ৫০১

আফ্রিকায় উকবা বিন নারি-র বিজয়সমূহ ৫০১

আফ্রিকায় বিদ্রোহ ৫০২

খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার অভিযানসমূহ ৫০৫

একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় ৫০৫

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ৫০৬

ইয়াজিদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ

মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধি দল ইয়াজিদের কাছে ৫০৬

মদিনাবাসীরা কেন বিদ্রোহ করেছিল এবং উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এতে কেন শরিক হয়নি? ৫০৭

বিদ্রোহ সম্পর্কে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ)-এর অভিমত ৫০৭

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর সতর্ক অবস্থান ৫০৮

বিদ্রোহের সূচনা ৫১০

জঙ্গে হাররা

সাহাবী ও তাবয়ীদের পরামর্শের প্রতি ইয়াজিদের অনীহা ৫১০

উমাইয়া আমীরগণও মদিনা আক্রমণে অসম্মত, উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের স্পষ্ট জবাব
..... ৫১২

ভয়াবহ যুদ্ধ, আবদুল্লাহ বিন হানজালা (রা)-এর আত্মত্যাগ ৫১৩

মদিনার শহীদদের সংখ্যা ৫১৩

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম ৫১৩

মুহাজিরদের মধ্যে প্রসিদ্ধ শহীদগণ ৫১৫

আনসারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ শহীদগণ ৫১৬

মদিনাবাসীদের ওপর শামী বাহিনীর জুলুম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শহরে লুটতরাজ ৫১৮

শামী সৈন্যরা কি কাফের ছিল? ৫২০

মুসলিম বিন উকবা কর্তৃক জোরপূর্বক বায়আত গ্রহণ ৫২১

উম্মে সালামা (রা) কর্তৃক ইয়াজিদের বায়আতকে “গোমরাহীর বায়আত” ঘোষণা ৫২১

শামী বাহিনী কি ইজ্জত লুণ্ঠন করেছিল? ৫২২

হাররার ঘটনার ওপর হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর প্রতিক্রিয়া ৫২৩

হাররার ঘটনার ওপর ইয়াজিদের প্রতিক্রিয়া ৫২৩

জুলুম, কুফর নাকি মুনাফেকি ৫২৪

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা) এবং ইয়াজিদ

আমর বিন সাঈদের মক্কা অভিযান ৫২৬

হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা)-এর ব্যক্তিত্বের নেতিবাচক চিত্রায়ন? ৫২৭

ইয়াজিদের প্রস্তাব ৫২৭

ইয়াজিদের শপথ ৫২৮

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা) কেন আপস করতে রাজি হননি? ৫২৯

মক্কার হারামের ওপর শামী বাহিনীর আক্রমণ ৫৩০

মক্কায় মুনজির বিন জুবায়ের (রা)-এর আগমন এবং শ্রদ্ধেয় মাতার সাথে সাক্ষাৎ ৫৩০

মুনজির বিন জুবায়ের (রা)-এর বীরত্ব ও শাহাদাত ৫৩১

হুসাইন বিন নুমাইরের অবরোধ কঠোর থেকে কঠোরতর হওয়া ৫৩১

মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা) এবং মুসআব বিন আবদুর রহমান (রা)-এর শাহাদাত
৫৩২

কাবা শরীফে অগ্নিসংযোগ ৫৩২

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যু ৫৩৩

ইয়াজিদের অবস্থা - আলোচনার সারসংক্ষেপ ৫৩৪

ইয়াজিদ সম্পর্কে পূর্বসূরিদের মতামত ৫৩৬

ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত ৫৩৭

মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ ৫৩৯

মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং হুসাইন বিন নুমাইরের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ৫৪০

হুসাইন বিন নুমাইরের প্রস্তাব এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের দূরদর্শিতা ৫৪১

আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের সাথে সম্পর্কিত হিশাম কালবীর কল্পকাহিনী ৫৪২

আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসের দুঃখ প্রকাশ ও সতর্কবাণী ৫৪৩

খিলাফত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ৫৪৪

মানাকিব আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ৫৪৫

জন্ম ও শৈশব ৫৪৫

সাহসিকতা ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ৫৪৬

হযরত আয়েশা সিদ্দিকার আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের প্রতি ভালোবাসা ৫৪৭

জুহদ ও ইবাদত ৫৪৭

ইলমি ও প্রশাসনিক উৎকর্ষতা ৫৪৮

চিন্তার মুহূর্ত ৫৪৯

৬৪ হিজরির বিপজ্জনক রাজনৈতিক সংকট ৫৫১

উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ নিজেই বায়াত নিতে শুরু করল ৫৫১

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের কেন খলিফা হলেন? ৫৫৩

মুসলিম বিশ্বে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ৫৫৪

শামের অধিকাংশ আমিরের আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের হাতে বায়াত ৫৫৪

উম্মাহর ঐক্যকে হিন্মভিন্নকারী রাজনীতি ৫৫৫

গোঁড়ামির আগুন ৫৫৬

আয়মান আল-আসাদির প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতা ৫৫৭

দাহহাক বিন কায়েস এবং মারওয়ান মুখোমুখি ৫৫৭

“জাবিয়া”র পরামর্শ ৫৫৮

মারজ রাহিতের যুদ্ধ ৫৫৯

পরাজয়ের কারণসমূহ ৫৬০

মারজ রাহিতের যুদ্ধের ওপর মন্তব্য ৫৬১

বনু উমাইয়া আমীরগণ কিসের ভিত্তিতে বিদ্রোহী হয়েছিল? ৫৬২

আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের খিলাফত শরয়ী ছিল ৫৬২

আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের চরিত্র হননের অভিযান ৫৬২

কৌশলবিদদের পরিবর্তে তলোয়ারধারীদের ওপর নির্ভরতা, একটি ভুল নীতি ৫৬৩

রাজনৈতিক গোঁড়ামির ব্যাধি এবং পরবর্তী যুগের ওপর এর প্রভাব ৫৬৫

শাম ও মিসরের ওপর মারওয়ানের দখল ৫৬৬

হিজাজে মারওয়ানের বাহিনীর পরাজয় ৫৬৭

মারওয়ানের মৃত্যু ৫৬৭

মুখতার সাকারফী কাজ্জাব ৫৬৯

তাওয়াবীন আন্দোলন ৫৭০

মুখতার তাওয়াবীনদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ৫৭১

তাওয়াবীনদের পরিণতি ৫৭১

পরাজয়ের কারণসমূহ ৫৭২

মুখতার ডানা মেলতে শুরু করে ৫৭৩

মুখতার সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ-এর উক্তি ৫৭৩

অলৌকিক চেয়ার ৫৭৪

হুসাইনের হত্যাকারীদের পরিণতি ৫৭৫

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর সাথে মুখতারের পত্রালাপ ৫৭৫

সিরিয়ায় মুখতারের আক্রমণ এবং উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের হত্যা ৫৭৬

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর এবং মুখতারের মধ্যে উত্তেজনা ৫৭৭

দামেস্কের নতুন শাসক - আবদুল মালিক ৫৭৮

মুখতারের ব্যর্থ চাল, হিজাজে আবদুল মালিকের ব্যর্থ আক্রমণ ৫৭৮

বসরা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা ৫৭৮

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহকে ব্যবহারে ব্যর্থতা ৫৭৯

মুখতারের নবুওয়াতের দাবি ৫৮০

মুখতার এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতা ৫৮১

মুখতারকে কেন “কাজ্জাব” বলা হতো? ৫৮১

ইরাকে মুসআব বিন জুবাইর-এর গভর্নর নিযুক্ত হওয়া ৫৮২

মাজারের চূড়ান্ত যুদ্ধ ৫৮২

ইব্রাহিম এবং মুসআব ৫৮৪

خوارج کی شورش (খারেজীদের বিদ্রোহ) ৫৮৫

আরব উপদ্বীপে খারেজীগণ ৫৮৫

ইরাকী খারেজীদের বিদ্রোহ ৫৮৬

তাউনে জারিফ ৫৮৭

আমর বিন সাঈদের হত্যা ৫৮৭

খুরাসানের অবস্থা ৫৮৮

আবদুল মালিক এবং মুসআব বিন জুবাইরের দ্বন্দ্ব ৫৮৮

ইরাকী আমিরদের সাথে আবদুল মালিকের আঁতাত ৫৮৯

ইরাকী আমিররা বিক্রি হয়ে গেল ৫৮৯

ইরাকে আবদুল মালিকের চূড়ান্ত আক্রমণ ৫৯০

মুসআবের শাহাদাত ৫৯১

কুফার কাসরে ইমারত, মস্তক প্রদর্শনী কেন্দ্র ৫৯৩

মুসআব বিন জুবাইর-এর পরাজয়ের কারণসমূহ ৫৯৩

বিজয়ের পর ইরাকে আবদুল মালিকের নতুন ব্যবস্থা ৫৯৪

মুসআব-এর শাহাদাত উপলক্ষে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ৫৯৪

আবদুল মালিকের হিজাজে হস্তক্ষেপ ৫৯৬

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আবির্ভাব ৫৯৬

মক্কা অবরোধ ৫৯৮

অবরুদ্ধদের অনাহারে ভোগান্তি ৬০০

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর একা হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ ৬০১

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর কি ভুলের ওপর ছিলেন নাকি দৃঢ় সংকল্পের ওপর? ৬০২

শাহাদাতের প্রস্তুতি ৬০৩

শেষ রাত ৬০৩

সম্মানিত মাতার সাথে শেষ সাক্ষাৎ এবং আসমা বিনতে আবি বকর-এর ঐতিহাসিক বাণী

..... ৬০৪

হারামে শেষ সালাত, সালাতের মুস্তাহাবসমূহের পূর্ণ খেয়াল রাখা ৬০৫

প্রাণ উৎসর্গকারীদের প্রতি শেষ ভাষণ ৬০৬

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর শেষ যুদ্ধ ৬০৬

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর অতুলনীয় বীরত্ব ৬০৭

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর শাহাদাত ৬০৮

মক্কা মুয়াজ্জামায় হাহাকার ৬১০

লাশের সাথে হাজ্জাজের নির্মম আচরণ ৬১০

হাজ্জাজের অভদ্রতা এবং আবু বকর সিদ্দিক-এর কন্যার অতুলনীয় সত্যবাদিতা ৬১১

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর-এর ধৈর্য এবং ইন্তেকাল ৬১২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (সপ্তম খণ্ড)

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া ৬১২

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর লাশ, জানাজা ও কাফন ছাড়াই ফেলে রাখা হয়েছিল
..... ৬১৩

উরওয়া বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে আবদুল মালিকের সাক্ষাৎ ৬১৩

এক মাস পর আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর দাফন ৬১৪

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং মুসআব বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতে বিশ্ব
মুসলিমের দুঃখ ও শোক ৬১৪

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) ছিলেন সত্য খলিফা, হাজ্জাজ ও তার দল ছিল বিদ্রোহী
..... ৬১৭

মক্কাবাসীদের প্রতি হাজ্জাজের ভাষণ ৬১৮

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাসনামলের ওপর এক নজর ৬১৯

মহান কীর্তি: ইব্রাহিমি ভিত্তির ওপর কাবা পুনর্নির্মাণ ৬১৯

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর ওপর কৃপণতার অপবাদের বাস্তবতা ৬২০

জুবায়েরি খিলাফতের পতনের কারণসমূহ ৬২১

উম্মাহর গর্বিত সম্পদ ৬২২

সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং পরবর্তী রাজনীতির তুলনা ৬২৩

ইস্তিনাসের মূলনীতি: সন্তুষ্টি ও আগ্রহ ৬২৪

শুরায়িয়াত (পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা) ৬২৫

খিলাফতে রাশিদাহ-তে ৬২৫

শুরায়িয়াত থেকে ব্যক্তিগত রাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা ৬২৫

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাধ্যবাধকতা ৬২৬

ইমারাতুস সিবইয়ান (বালকদের শাসন) ৬২৯

৭০ হিজরির ফিতনাসমূহের প্রতি হাদিসে ইঙ্গিত ৬৩১

ইমারাতুস সিবইয়ান-এ আবু বারযাহ আসলামি (রা.)-এর অবমাননা ৬৩২

আইজ বিন আমর (রা.)-এর অবমাননা ৬৩২

আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.)-এর সাথে ইবনে জিয়াদের আচরণ ৬৩২

ইয়াজিদ থেকে মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ পর্যন্ত ৬৩৩

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং উমাইয়া আমিরদের সংঘাত ৬৩৪

রাজনৈতিক বিবাদ ও গৃহযুদ্ধের মূল কারণ ৬৩৫

সাহাবায়ে কেরামের যুগে এত বেশি গৃহযুদ্ধ কেন হয়েছিল? ৬৩৭

সাহাবায়ে কেরামের যুগের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সারসংক্ষেপ ৬৪১

সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস, ফিতনার যুগের এক ঝলক ৬৪৩

চতুর্থ অংশ

প্রথম হিজরি শতাব্দীতে উম্মাহর স্তম্ভসমূহ ৬৪৮

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ৬৫১

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) ৬৫৫

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) ৬৬০

ফিতনার যুগ এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ৬৬৬

হযরত আলী এবং হযরত হাসান (রা.)-এর যুগে ৬৬৭

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নিকট সুশাসনের মানদণ্ড ৬৬৮

হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে ৬৬৯

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার (উলি আহদি) সম্পর্কে আপনার অভিমত ৬৭০

ইয়াজিদের যুগে ৬৭১

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং বনু উমাইয়ার সংঘাতের যুগে ৬৭২

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) ৬৭৪

ওআইস বিন আমির আল-কারনি (রা.) ৬৭৮

আহনাফ বিন কায়স (রহ.) ৬৮০

কাজী শুরাইহ বিন আল-হারিস রহ. ৬৮৪

পঞ্চম অধ্যায়: সংশয় নিরসন

গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন

হযরত উসমান গনি রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত সংশয়সমূহ ৬৯২

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে সরকারি কর্মকর্তাগণ কে ছিলেন? ৬৯২

হযরত উসমান গনি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মকর্তাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা ৬৯২

সাহাবায়ে কেরাম কি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উসকে দিয়েছিলেন? ৬৯৬

স্বজনপ্রীতির অভিযোগের খণ্ডনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ৭০০

ওয়ালিদ বিন উকবা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও কেন গভর্নর বানানো হয়েছিল? ৭০১

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কি প্রবীণ সাহাবীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন? ৭০২

আম্মার বিন ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মারধর করার প্রকৃত ঘটনা ৭০৩

সাহাবায়ে কেরাম এবং হযরত উসমান গনি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে কি উত্তেজনা বিরাজ করছিল? ৭০৪

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরোধী এবং হত্যার ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন? ৭০৪

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কি হত্যায় শরিক ছিলেন? ৭০৫

রাসূলের হাওয়ারী হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু কি ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন? ৭০৭

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু কি বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? ৭০৮

তারিখুল খুলাফা এবং তারিখু দামেশক-এর কিছু বর্ণনার ওপর আলোচনা ৭১২

তারিখু দামেশক-এর আরেকটি বর্ণনার জবাব ৭১৫

ফিতনার বীজ কি হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বপন করেছিলেন? ৭১৫

আমর বিন আল-হামিক রাযিয়াল্লাহু আনহু কি হত্যায় জড়িত ছিলেন কি না? ৭২০

আবদুর রহমান বিন উদাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু কি হত্যা বা বিদ্রোহে শরিক ছিলেন? ৭২১

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: ফিতনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে কোনো সাহাবীর ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। ৭২১

মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং মুহাম্মদ বিন আবু হুজাইফা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে কেন ছিলেন? ৭২২

তৃতীয় খলিফাকে বাকিতে দাফন করার সময় কি কোনো হাস্পাস হয়েছিল? ৭২৩

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পেছনে কি আসলে অনারবদের হাত ছিল? ৭২৪

বিদ্রোহে লিপ্ত ব্যক্তিদের কি কাফের গণ্য করা হবে? ৭২৫

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা ৭২৬

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ ৭২৭

মা-এ হাওয়াব-এর বর্ণনার বাস্তবতা কী? ৭২৯

কায়েস বিন আবি হাযেম-এর নির্ভরযোগ্যতার ওপর আপত্তি ৭৩২

জঙ্গ জামাল বা উটের যুদ্ধে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতিপক্ষ দলের অবস্থান কী ছিল? ৭৩৪

হিসসা দুউম (দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত তালহা, যুবাইর এবং আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.)-এর সুউচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বিচ্যুতি ঘটল? ৭৩৫

জঙ্গ জামালে কি হযরত যুবাইর (রাযি.) যুদ্ধ শুরু করেছিলেন? ৭৩৭

হযরত আলী কেন ইবনে জারমুজকে হত্যা করাননি? ৭৩৮

হযরত আয়েশা (রাযি.) কি উসমান বিন হানিফ (রাযি.)-এর দাড়ি উপড়ে ফেলেছিলেন? ৭৩৮

ইমাম শাবী-র এই উক্তি কি সঠিক যে জঙ্গ জামালে মাত্র চারজন সাহাবী শরিক ছিলেন? ৭৩৯

আহলে জামাল এবং আহলে শামের পদক্ষেপসমূহকে কেন গুনাহ ও নাফরমানি বলা যাবে না? ৭৩৯

জামাল যুদ্ধের একটি নতুন ব্যাখ্যা ৭৪৪

জঙ্গ সফফীন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

হযরত আলী (রাযি.) কি নিরুপায় ছিলেন নাকি ইখতিয়ারসম্পন্ন? ৭৪৮

আলী (রাযি.)-এর লস্করে দশ হাজার সাবায়ীর কিছা এবং তার জবাব ৭৫০

হাদিস ও ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক একটি অনুমানমূলক মতের খণ্ডন ৭৫৯

হযরত আলী (রাযি.)-এর লস্কর কি কেবল উসমান (রাযি.)-এর হত্যাকারীদের নিয়ে গঠিত ছিল? ৭৬১

আম্মার বিন ইয়াসির (রাযি.)-এর হাদিস সম্পর্কে কিছু সংশয় ৭৬৩

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর তাবিল সম্পর্কে উম্মতের উলামায়ে কেরামের মতামত ৭৬৫

হাদিসের শব্দ “আন-নাকিবাতু আনিত ত্বরীক”-এর ভিত্তিতে জমহুরের মাযহাবের ওপর আপত্তি ৭৬৮

বুখারীর শব্দ “ইয়াদউহম ইলাল জান্নতি ওয়া ইয়াদউনাহু ইলান নার”-এর ওপর আপত্তি ৭৬৯

আল-মারিকাহ, আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ এবং খারেজীদের লক্ষ্যবস্তু কে? ৭৭০

“আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ”-তে “আলিফ লাম” নিয়ে একটি আপত্তি ৭৭৩

“আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ”-এর অর্থ কি “কিসাস তলবকারী দল” নেওয়া যেতে পারে? ৭৭৫

হযরত আলী (রাযি.)-এর নাম থেকে আমীরুল মুমিনীন শব্দ মুছে ফেলার ওপর কেন জোর দেওয়া হয়েছিল? ৭৭৭

সিফফীনে যুদ্ধবিরতি এবং তাহকীম ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের মর্যাদা? ৭৭৯

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.)-এর হযরত আলী (রাযি.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া প্রমাণিত কি না? ৭৮০

মুজতাহিদ এবং বাগী-র মর্যাদা কীভাবে একত্রিত হলো? ৭৮২

হযরত আলী (রাযি.) কেন আগে যুদ্ধ পরিহার করেননি? ৭৮৩

খলিফাকে অপসারিত করার দাবি না থাকলে খুরুজ-এর প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে? ৭৮৫

বুগাত-এর একটি শায সংজ্ঞার ওপর আলোচনা ৭৮৬

আসলাফগণ সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের আকিদা রাখা সত্ত্বেও কেন কিছু সাহাবীর ওপর খুরুজ-এর প্রয়োগ করেছেন? ৭৮৯

আকাবিরগণ মুশাজারাতি সাহাবা সম্পর্কে নীরব থাকার নির্দেশ দিয়ে কেন এই আলোচনায় প্রবেশ করেন? ৭৯৭

যাদের শেষ পরিণাম জানা আছে তারা কি যাদের শেষ পরিণাম অজানা তাদের ওপর কোনো হুকুম লাগাতে পারে? ৮০০

উভয় পক্ষ কেন মুসীব নয়? ৮০২

কেন এমন বলা যাবে না যে কোনো একটি অজানা দল মুসীব হবে? ৮০৩

পরবর্তীদের কে এই অধিকার দিয়েছে যে কোনো সাহাবীকে সঠিক এবং কাউকে ভুল বলবেন? ৮০৫

আহলে সুন্নাহের উলামাদের ব্যাখ্যার মধ্যে বৈপরীত্য কেন? ৮০৬

প্রকাশ্য বিদ্রোহ, রূপক বিদ্রোহ নাকি প্রকৃত বিদ্রোহ? ৮০৭

আম্মারের হাদিস যদি সহীহ হতো তবে সেই সময়ই কেন ঐক্য হয়ে গেল না? ৮০৮

আম্মারের হাদিস যদি সহীহ হয় তবে আহলে শাম কেন নিজেদের ভুল স্বীকার করেনি? ৮০৯

আম্মারের হাদিস সহীহ হলে অধিকাংশ সাহাবী কেন নিরপেক্ষ ছিলেন? ৮১৩

আম্মারের হাদিস সহীহ হলে হযরত আলী (রা.) সুস্পষ্ট দলিল থাকা সত্ত্বেও কেন যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করেছিলেন? ৮১৬

পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট আলী (রা.)-এর সঠিক হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল কিন্তু

সমসাময়িক হাজার হাজার তাবয়ীদের নিকট নয়, এটা কীভাবে? ৮১৬

মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে একজনের সঠিক হওয়া এবং অন্যজনের ভুল হওয়াকে কেন নিশ্চিত মনে করা হয়? ৮১৮

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী (মাদাজিল্লাহ)-এর অত্যন্ত দরকারী গবেষণা ৮২০

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণীসমূহ ৮২১

খিলাফতে রাশেদা ও প্রতিশ্রুত খিলাফত সম্পর্কিত কিছু সংশয় ৮২২

আল্লামা ইবনে খালদুন ও অন্যান্যরা কি খিলাফতে রাশেদাকে চার খলিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ

মনে করতেন না? ৮২২

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একটি দলিলের জবাব ৮২৫

অন্যান্য শাসক সাহাবীগণ যদি খলিফায়ে রাশেদ হন তবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কেন খলিফায়ে রাশেদ নন? ৮২৭

হযরত হাসান বিন আলী (রা.) সম্পর্কিত সংশয়সমূহ ৮৩০

হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত হাসান (রা.)-এর সন্ধির ব্যাপারে হযরত হুসাইন (রা.)-এর অবস্থান কী ছিল? ৮৩০

হযরত হাসান (রা.) কেন সম্পদের শর্ত দিয়েছিলেন? ৮৩১

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে করা ওয়াদা পূরণ করেননি? ৮৩১

হযরত হাসান (রা.) কি অধিক পরিমাণে তালাক দিতেন? ৮৩২

হযরত হাসান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে কি আমীর মুয়াবিয়া (রা.) এবং ইয়াজিদের হাত ছিল? ৮৩৫

হত্যাকাণ্ডে কি জা'দা বিনতে আশ'আস জড়িত ছিলেন? ৮৩৭

হযরত হাসান (রা.)-এর হত্যাকারী কে ছিল? ৮৪০

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি হযরত হাসান (রা.)-এর মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছিলেন? ৮৪১

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কিত সংশয়সমূহ ৮৪২

অভিযোগসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা ৮৪৩

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ক্ষমতা কি অবৈধ ছিল? ৮৪৪

খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত হওয়ার অর্থ কী? ৮৪৬

ত্রিশ বছর বলতে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াত' বোঝানো হয়েছে ৮৪৭

“আল-খিলাফাতু সালাসুনা সানাহ” (খিলাফত ত্রিশ বছর) হাদিসটি সমালোচকদের দৃষ্টিতে ৮৪৭

বারোজন খলিফার হাদিস ৮৪৭

“সুম্মা তাকুনু মুলকান” (অতঃপর রাজতন্ত্র হবে)-এর অর্থ কী? ৮৪৮

“মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ”-এর একটি বর্ণনার ওপর আপত্তি এবং তার জবাব ৮৫০

প্রতিনিধিদের আইনের উর্ধ্বে রাখার অভিযোগ? ৮৫২

ইবনে গাইলানের জুলুমের ঘটনা ৮৫২

যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের জুলুমের হাকিকত ৮৫৪

সামুরা বিন জুনদুব রাদিআল্লাহু আনহুর জুলুমের হাকিকত কী? ৮৫৫

হযরত মুগীরা বিন শু'বা রাদিআল্লাহু আনহুর ওপর বিলাসিতা ও পাপাচারের অভিযোগ ৮৫৭

সাহাবায়ে কেরামের শিরশ্ছেদ করার আপত্তি ৮৫৮

আম্মার বিন ইয়াসির রাদিআল্লাহু আনহুর শিরশ্ছেদ করার হাকিকত ৮৫৮

আমর বিন আল-হামিক রাদিআল্লাহু আনহুর শিরশ্ছেদ করার হাকিকত ৮৫৯

হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু কি আমর বিন আল-হামিক রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন? ৮৬০

আমর বিন আল-হামিক রাদিআল্লাহু আনহুর শাহাদাত এবং শিরশ্ছেদ করার আসল কারণ? নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় ৮৬১

এটি কি প্রথম মন্তক ছিল? ৮৬১

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কার মন্তক বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল? ৮৬৩

আমিনা বিনতে শারীদের ওপর জুলুমের উপাখ্যান ৮৬৪

হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর ওপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিষ প্রয়োগ করার অভিযোগ ৮৬৬

আশতার নাখরীকে বিষ প্রয়োগ করা ৮৬৭

আবদুর রহমান বিন খালিদ রাদিআল্লাহু আনহুকে বিষ প্রয়োগ করার হাকিকত ৮৬৭

হযরত হুজর বিন আদি রাদিআল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্নাবলী ৮৬৮

হযরত হুজর বিন আদি রাদিআল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আবু মিখনাফের মিথ্যা বর্ণনাগুলো ৮৬৯

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর ওপর গালিগালাজের প্রচারণা ৮৭১

হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর খিলাফতে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর ওপর গালিগালাজ ৮৭৩

মারওয়ান বিন আল-হাকামের গালিগালাজ করা প্রমাণিত কি না? ৮৭৪

মারওয়ানের পক্ষে আহলে বাইতকে গালিগালাজ করা কি যুক্তিসঙ্গতভাবে অসম্ভব? ৮৭৬

হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর সকল গভর্নর কি গালিগালাজ করতেন? ৮৭৭

হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু কি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর ওপর গালিগালাজ করতেন? ৮৭৮

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা ৮৭৮

মুসলিম শরীফের বর্ণনার যথাযথ ব্যাখ্যা ৮৮০

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যা ৮৮১

আবু যর দামেশকীর দিকে নিসবতকৃত ইবারতের জবাব ৮৮১

মুগীরা বিন শু'বা রাদিআল্লাহু আনহুকে গালিগালাজের নির্দেশ দেওয়ার বর্ণনা ৮৮২

সুনানে ইবনে মাজাহ-তে হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর ওপর গালিগালাজের বর্ণনার জবাব ৮৮৬

সুনানে আবু দাউদের বর্ণনা থেকে গালিগালাজের সপক্ষে দলিল এবং এর জবাব ৮৮৮

মুগীরা বিন শু'বা রাদিআল্লাহু আনহু কি গালিগালাজ করতেন? ৮৯০

মুগীরা বিন শু'বা রাদিআল্লাহু আনহুর ওপর গালিগালাজের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ ৮৯১

আবদুল্লাহ বিন জালিম থেকে বর্ণিত গালিগালাজের বর্ণনাগুলো ৮৯২

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের দুটি বর্ণনা, একটি প্রসিদ্ধ আপত্তির জবাব ৮৯৮

উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা'র বর্ণনা এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর কর্মকর্তাদের ওপর আলী রাদিআল্লাহু আনহুর অবমাননার অভিযোগ ৯০৪

মিস্বরে বসে অবমাননা করা কি খারেজীদের কাজ ছিল? ৯০৬

আলোচনার সারসংক্ষেপ ৯০৭

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

সহিহ ও জয়িফ বর্ণনার পার্থক্য না করে যারা বিতর্ক করেন তাদের প্রতি প্রশ্ন ৯০৮

বংশ ও গালিগালাজ সংক্রান্ত বর্ণনা, একটি অনুমানমূলক দলিল ও তার জবাব ৯০৮

গালিগালাজের হাকিকত, আলোচনার সারসংক্ষেপ ৯১০

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি রাজনৈতিক স্বার্থে জিয়াদের বংশ পরিবর্তন
করিয়েছিলেন? ৯১২

নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিবেচনাযোগ্য দিকসমূহ ৯১৮

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি আর্থিক দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিলেন? ৯১৯

হাকাম বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উবল-এর গনিমতের মালের ঘটনা ৯১৯

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদারতা ৯২২

হাকাম বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর জন্য কি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
দায়ী ছিলেন? ৯২৩

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি সরকারি মাল ব্যক্তিগত কাজে খরচ করতেন?
৯২৩

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এত দান-অনুদান কোথা থেকে দিতেন? ৯২৬

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণ
করেননি? ৯২৯

শরিয়ত পরিবর্তন এবং বিদআত প্রচারের অভিযোগ ৯৩১

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নামে প্রচলিত ওসিয়তের হাকিকত ৯৩৩

ইয়াজিদের উলি আহদি (উত্তরাধিকার) সংক্রান্ত আপত্তিগুলো ৯৩৬

ইয়াজিদের উলি আহদি-এর আন্দোলন কি ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে ছিল?
৯৩৬

“আল-কামিল ফিত তারিখ”-এর সনদবিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা ৯৩৮

হযরত মুয়াবিয়া এবং মুগিরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কি উম্মতকে ফিতনায়
ফেলেছিলেন? ৯৩৮

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি ইয়াজিদের উলি আহদি-এর জন্য ঘুষ দিতেন?
৯৩৯

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি ইয়াজিদের বায়াতের জন্য জোরজবরদস্তি
করেছিলেন? ৯৪৩

আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কি হুমকি দেওয়া হয়েছিল?
৯৪৫

ইয়াজিদের ভুল কাজের দায়িত্ব কি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর বর্তায়?
..... ৯৪৬

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এবং কারবালার ঘটনা ৯৪৮

শুরুতে ইয়াজিদের বায়াত থেকে বিরত থাকা এবং শেষে সমঝোতায় রাজি হওয়ার কারণ?
..... ৯৫০

ষাটজন কুফিবাসীর উপাখ্যান এবং কারবালার ঘটনা অস্বীকার ৯৫০

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শুরুতে কেন আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেননি?
৯৫২

দলবদ্ধ হয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা কি জায়েজ? ৯৫২

কারবালায় যুদ্ধের সূচনা কি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে হয়েছিল?
..... ৯৫৩

ইয়াজিদের হাতে পবিত্র মস্তকের অবমাননা কি প্রমাণিত নাকি নয়? ৯৫৪

ইয়াজিদ এবং কায়সারের শহর (কনস্টান্টিনোপল) সংক্রান্ত হাদিস ৯৫৬

আল্লামা কাসতালানির ভুল উদ্ধৃতি ৯৬০

ইয়াজিদের শাসনভারের ওপর এক অদ্ভুত যুক্তি ৯৬৩

মোল্লা আলী কারীর ওপর ইয়াজিদকে সমর্থনের অভিযোগ ৯৬৬

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা খণ্ড ২

ইয়াজিদের পক্ষাবলম্বনে আল্লামা ইবনুল আরাবির ভিত্তিহীন দলিল ৯৬৭

ইয়াজিদের অনুশোচনা প্রকাশ বা হত্যার নির্দেশ না দেওয়া কি দায়মুক্ত হওয়ার দলিল?
..... ৯৬৮

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রক্ত কি মাফ ছিল? ৯৬৯

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর কি পানি বন্ধ করা হয়েছিল? ৯৭০

যখন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীরা শিয়া ছিল, তবে ইয়াজিদ এবং ইবনে জিয়াদের ওপর কেন অভিযোগ? ৯৭১

শিয়ানে আলী সরকারি বাহিনীতে কীভাবে এল? ৯৭৩

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কি কুফার শিয়ানে আলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না?
..... ৯৭৩

কারবালায় লড়াইকারী বাহিনী কুফার ছিল নাকি দামেস্কের? ৯৭৪

ইয়াজিদের সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তুলনা ৯৭৫

ইয়াজিদ কি কান্নাকাটি করে দায়মুক্ত হয়ে যাননি? ৯৭৬

ইয়াজিদ এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বায়আতের মধ্যে সাদৃশ্যের সন্দেহ এবং ইসলামী শাসননীতির ওপর এক নজর ৯৭৬

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রচেষ্টা কোন দিক থেকে প্রশংসনীয়? ৯৮১

মজলিসে শুরার নির্ধারণ কীভাবে করা হবে? ৯৮২

ইয়াজিদকে কি মুজতাহিদ মানা যায় না? ৯৮৩

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খুরুজ (বিদ্রোহ)-এর জন্য প্রস্তুত হিসেবে প্রকাশকারী বর্ণনাগুলোর প্রামাণিক মর্যাদা কী? ৯৮৫

ইয়াজিদ এবং হাদিস বর্ণনা ৯৮৮

ইয়াজিদের হাদিস জ্ঞান, মুহাদিসগণের জবানিতে ৯৮৯

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দৃষ্টিতে ইয়াজিদের মর্যাদা ৯৯৫

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ‘কিতাবুয যুহদ’-এ কি ইয়াজিদের বর্ণনা আছে?
..... ৯৯৬

‘আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব’-এ কি ইয়াজিদের বর্ণনা আছে? ৯৯৭

উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে কি মন্দ কাজগুলো বাতিল হয়ে যায়? ৯৯৮

ইয়াজিদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার একটি বিতর্কিত দলিল ৯৯৯

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামের পাঁচজন রাবী ১০০০

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর আপত্তিসমূহের পর্যালোচনা
..... ১০০১

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত রাজনৈতিক ভুলসমূহ
১০০১

সেই বর্ণনাগুলো যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ানকে মদিনা থেকে বের করেননি ১০০৩

ফলাফল ১০০৫

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিপরীতে কি সাহাবীগণও ছিলেন?
১০০৬

ব্যখ্যার ভিত্তিতে খুরুজ (বিদ্রোহ) থেকে গুনাহ বা ফাসেক হওয়া আবশ্যিক হয় না
১০০৬

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু কি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন? ১০০৬
কিছু সাহাবী কেন আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়আত হননি?
..... ১০০৭

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য কি হাদিসে হুঁশিয়ারি ছিল? ১০১০
হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট কি ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহী এবং উমাইয়া শাসকগণ সঠিক পথে ছিলেন? ১০১১

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতামতগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করার দলিল কী? ১০১৭

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ভুলকারী মনে করতেন? ১০২০

অষ্টম খণ্ড

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) সম্পর্কে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতামত ১০২০

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) প্রথম চার মাসে ইবনে যুবাইর (রা.)-এর নিকট কেন বায়াত হননি? ১০২২

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) কি খুতবা থেকে নবী করীম (সা.)-এর নাম বাদ দিয়েছিলেন?
..... ১০২৩

মারওয়ান বিন আল-হাকামের সাহাবিয়াত এবং চরিত্রের ওপর প্রশ্নাবলি ১০২৬

সাহাবী চেনার উপায়সমূহ ১০২৯

হাফেজ ইবনে হাজার কি মারওয়ানকে সাহাবী মনে করতেন? ১০২৯

ইমাম বুখারী মারওয়ানের নামের সাথে রাযিয়াল্লাহু আনহু লিখেছেন ১০৩১

মারওয়ানের পিতা হাকাম বিন আবিল আস-এর চরিত্র কেমন ছিল? ১০৩২

হযরত তালহা (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে মারওয়ানের অংশ ১০৩৩

মারওয়ানের ভুলগুলোকে কি ইজতিহাদী বলা যেতে পারে? ১০৩৫

মারওয়ান যদি মন্দ লোক হতেন তবে বুখারী ও মুয়াত্তায় তার বর্ণনা কেন আছে?
১০৩৬

মারওয়ানের বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজারের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য
১০৩৯

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা ১০৪০

মারওয়ান সম্পর্কে শাহ আবদুল আজিজ মুহাদিসে দেহলভী (রহ.)-এর মতামত
১০৪০

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শেষ কিছু কথা ১০৪২

অতীতের ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে শিক্ষা ১০৪৫

কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর ১০৪৬

উম্মাহর ইতিহাসে পতন কেন বেশি? ১০৪৬

উত্থান ও পতনের সাতটি স্বাভাবিক পর্যায় ১০৪৭

বিস্তৃতি এবং কেন্দ্রের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য ১০৪৯

উত্থান ও পতনের স্বাভাবিক ও মহাজাগতিক নিয়মের আলোকে উন্মত্তে মুহাম্মদীর অবস্থান
..... ১০৫০

পরিকল্পনা, আন্দোলন, রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জিনগত বৈশিষ্ট্য ১০৫২

আল্লাহর তাকভীনি ব্যবস্থা বোঝা জরুরি ১০৫৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

“তারিখে উম্মতে মুসলিমা”-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এক নজরে

- সীরাতে নববী এবং সীরাতে সাহাবা সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য উপাদান থেকে মুক্ত।
- হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রথম বিস্তারিত উর্দু ইতিহাস।
- প্রথম খণ্ডে ইতিহাস বিজ্ঞানের পরিচিতি ও মূলনীতি সম্বলিত ভূমিকা।
- দ্বিতীয় খণ্ডে ইতিহাসের গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের নিয়ম-কানুন সম্বলিত একটি পুস্তিকা।
- ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুযায়ী গবেষণা ও যাচাই-বাছাই।
- মাগাযী এবং মতপার্থক্যপূর্ণ বর্ণনাসমূহের ওপর হাদীসের শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত দরকারী ব্যাখ্যামূলক আলোচনা।
- ইলমুর রিজালের আলোকে বর্ণনাসমূহের সনদের পর্যালোচনা এবং রাবীদের নিয়ে আলোচনা।
- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সম্মিলিত আকিদা ও মতাদর্শের সমর্থনে যথাস্থানে শক্তিশালী যৌক্তিক ও উদ্ধৃতিমূলক প্রমাণাদি।
- বিভিন্ন ফেরকার উদ্ভব সম্পর্কে গবেষণা এবং তাদের ভুল আকিদা ও মতাদর্শের ওপর নীতিগত সমালোচনা।
- সন্দেহজনক ঘটনাবলির সনদ ও মতন, বর্ণনা ও যুক্তির নিরিখে বিশ্লেষণ।
- দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে।
- ইসলামী ইতিহাসের সকল বড় যুদ্ধ ও সংঘাতের বিস্তারিত আলোচনা।
- ঘটনাবলি বিশেষ করে সীরাত ও মাগাযীর সঠিক সময় নির্ধারণ এবং ঈসায়ী ক্যালেন্ডারের সাথে এর সামঞ্জস্য বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা।
- মূল, প্রাচীনতম এবং নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের যথাসম্ভব গুরুত্বারোপ।
- প্রতিটি কথা পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্সসহ।
- গর্বিত মুসলিম খলিফা, সুলতান এবং বরেন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাতিল ফেরকা, সেকুলার ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচারের দালিলিক খণ্ডন।
- ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর যথাস্থানে উল্লেখ।
- বিভিন্ন যুগে ইলমী, সংস্কারমূলক ও জাতীয় খিদমত আঞ্জামদানকারী মহান ব্যক্তিত্বদের বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা।
- কঠিন শব্দ পরিহার করে সাবলীল ও সহজবোধ্য উর্দু ইবারত।
- পাঠকদের ধরে রাখার মতো আকর্ষণীয় লিখনশৈলী।
- টীকাসমূহে উলামা ও ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত দরকারী ইলমী আলোচনা।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জরুরি নিবেদন

এই পৃষ্ঠাগুলো সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি মূলনীতি মনে গেঁথে নিন:

১. কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে কোনো ব্যক্তিই যেন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ইসলামী আকিদা থেকে বিচ্যুত কোনো মত বা ধারণা পোষণ না করে। যদি কেউ এমনটি করে, তবে আমরা তা থেকে মুক্ত।
২. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সেই আকিদাই পোষণ করা আবশ্যিক যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আসলাফ (পূর্বসূরিগণ) গ্রহণ করেছেন এবং যার বিস্তারিত বিবরণ আল-ফিকহুল আকবার, আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়াহ, শারহু আকাইদিন নাসাফিয়াহ এবং আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ-এর মতো আকিদার কিতাবসমূহে বিদ্যমান।
৩. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মর্যাদা কেবল ঐতিহাসিক তথ্যেরই, আকিদার নয়। ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য হলো অতীতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। ইতিহাস হিসেবে এখানেও ঘটনাবলি বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাই।
৪. আমরা সেই সন্দেহজনক বিষয়গুলোর হাকিকতও সামনে আনতে চাই যা দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীরা সাহাবায়ে কেরামের দিকে নিসবত (আরোপ) করেছে। মতপার্থক্যের ইতিহাসে আমাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা এটাই যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোকে সামনে আনা হোক এবং দুর্বল বা জাল বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হোক। আমরা জমহুর ওলামায়ে কেরামের সেই অবস্থানের সমর্থনে সচেষ্ট যা আকিদার কিতাবসমূহে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে।
৫. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে জমহুর উম্মতে মুসলিমাহর আকিদা হলো এই যে:
 - নবীগণের পর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, তারপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব আল-ফারুক, তারপর হযরত উসমান ইবনে আফফান যুন-নুরাইন, তারপর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। [১]
 - আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর ফজিলত এবং সমগ্র উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রথম খলিফা মানি, তারপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, তারপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, তারপর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। এরাই হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং হিদায়াতের ইমামগণ।
 - আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসি। তাঁদের কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং কারো...

[১] আল-ফিকহুল আকবার লিল ইমাম আবি হানিফা, পৃ. ৪১, ত. মাকতাবাতুন নুমান।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

...থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করি। আমরা ঐসব লোকদের ঘৃণা করি যারা সাহাবীদের ঘৃণা করে এবং যারা তাদের আলোচনা কল্যাণ ছাড়া অন্যভাবে করে। আমরা সাহাবীদের আলোচনা কেবল কল্যাণের সাথেই করি। তাদের ভালোবাসা হলো দ্বীন, ঈমান ও নেকি এবং তাদের প্রতি ঘৃণা হলো কুফর, নিফাক ও অবাধ্যতা। [১]

- সাহাবীদের মধ্যে নিম্নতম স্তরের একজন ব্যক্তিও ঐ গোষ্ঠী থেকে উত্তম যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেনি। যদি এই লোকেরা অনেক বেশি আমল নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়, তবুও ঐসব ব্যক্তিবর্গই শ্রেষ্ঠ হবেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁকে দেখেছেন ও শুনেছেন, কারণ তাদের তাবেরীদের ওপর সাহচর্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে, যদিও (পরবর্তীকালের লোকেরা) সব ধরনের নেক আমল করুক না কেন। [২]
- আহলে সুন্নাত রাফেযীদের পথ থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে যারা সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের গালিগালাজ করে, তারা নাসিবীদের পথ থেকেও সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে যারা আহলে বাইতকে কথা বা কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয়। আহলে সুন্নাত সাহাবীদের মধ্যকার মতবিরোধের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং বলে যে, তাদের মন্দ দিক সম্বলিত বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু তো মিথ্যা, কিছুতে কমবেশি করা হয়েছে এবং সেগুলোর আসল রূপ বদলে দেওয়া হয়েছে। যেখানে এই ধরনের সহীহ বর্ণনার সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে ঐ ব্যক্তিবর্গ ওজরের অধিকারী ছিলেন। তারা হয় মুজতাহিদ মুসিব ছিলেন অথবা মুজতাহিদ মুখতি ছিলেন।

এই সমস্ত কথা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত এই আকিদা পোষণ করে না যে, সাহাবীগণ কবির বা সগির গুনাহ থেকে মাসুম ছিলেন, বরং সামগ্রিকভাবে তাদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল এবং তাদের জন্য এমন সব মর্যাদা ও ফজিলত রয়েছে যে, তাদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তা তাদের মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেছে। এমনকি সাহাবীদের এমন সব মন্দ কাজও ক্ষমাযোগ্য যা পরবর্তীকালের লোকদের জন্য ক্ষমাযোগ্য নয়, কারণ তাদের কাছে মন্দ কাজ মিটিয়ে দেওয়ার মতো এমন সব নেকি রয়েছে যা পরবর্তীকালের লোকদের কাছে নেই। নবী আকরাম ﷺ-এর বাণী তাদের জন্য প্রমাণিত যে, তারা হলো খাইরুল কুরুন এবং তাদের এক মুদ সদকা করা পরবর্তীকালের লোকদের ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সদকা করার চেয়েও উত্তম।

যে ব্যক্তি ইলম ও দূরদর্শিতার সাথে তাদের সীরাত এবং তাদের ওপর আল্লাহর ইহসান ও ফজিলতসমূহ দেখবে, সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তারা আশ্বিয়ায়ে কেরামের পর সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন, না তাদের মতো কেউ হয়েছে আর না কেউ হবে। তারা ছিলেন এই উম্মতের নির্যাস ও সারবস্তু যাদের আল্লাহ সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছেন এবং তাদের ওপর ইনআম করেছেন। [৩]

- সাহাবীদের মধ্যে যেসব বিবাদ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর জন্য ব্যাখ্যা ও কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাদের গালিগালাজ করা এবং তাদের ওপর বিদ্রূপ করা যদি এমন হয় যা অকাট্য দলিলের পরিপন্থী, তবে এমন বিদ্রূপ কুফর হবে যেমন হযরত আয়েশা رضی الله عنها-এর ওপর অপবাদ। অন্যথায় তা বিদআত ও ফিসক হবে। [৪]

[১] আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়াহ লিল ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবি, পৃ. ৮১, ত. আল-মাকতাব আল-ইসলামি

[২] উসুলুস সুন্নাহ লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, পৃ. ৩৯, ৪০

[৩] আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, পৃ. ১১৯, ১২০

[৪] শারহ আকাইদ নাসাফি, পৃ. ৩৭২, ৩৭৩, ত. আল-বুশরা

দ্বিতীয় অংশ | তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুখবন্ধ

এটি একটি তিক্ত সত্য যে, গত কয়েক দশক ধরে আমাদের ইতিহাস পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে চলছে। বিশেষ করে সাহাবা কেরামকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানোর জন্য প্রাচ্যবিদদের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বশক্তির সহযোগিতায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পেছনে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। এগুলোতে কর্মরত স্কলারদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এবং সব ধরনের সম্পদ তাদের জন্য সহজলভ্য। এই উপকরণগুলো প্রকাশের পেছনেও অটল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

সাহাবা কেরাম এবং ইসলামী ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে এক ধরনের সাহিত্য তো এমন যা উস্কানিমূলক ভঙ্গিতে লিখে অলিগলিতে বিতরণ করা হয়। কিন্তু এ ছাড়াও গম্ভীর ও গবেষণামূলক ঢঙেও এই কাজ হচ্ছে। প্রাচীন ও আধুনিক বইয়ের উদ্ধৃতিতে ভরপুর বইগুলো বাজারে ক্রমাগত আসছে এবং প্রতিটি ভাষায় সেগুলোর অনুবাদ হচ্ছে। ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করলে আপনি এই ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে তথ্য সরবরাহকারী অসংখ্য ওয়েবসাইট খুঁজে পাবেন। মানুষ এসবের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আমি একজন সচেতন মুসলমানের অনুভূতি উদ্ধৃত করছি যা তিনি হযরত মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী মাদাজিল্লাহুল আলীর খেদমতে লিখেছিলেন:

“প্রাচীন ইসলামী ইতিহাসের ভাণ্ডার কোনো বিস্ময়ের চেয়ে কম নয়... ওলামায়ে কেরাম এদিকে মনোযোগ দেননি যে, কুরআন ও সুন্নাহ এবং আসারে সালাফের বিশেষজ্ঞ আলেমদের একটি বোর্ড গঠন করে মতপার্থক্যপূর্ণ বর্ণনাগুলোর ওপর গবেষণা করতেন, এবং অন্তত আহলে সুন্নাতে এমন একটি প্রাথমিক ইতিহাস পেত, যাতে আকাবির সাহাবা এবং খাইরুল কুরুন-এর একটি সুন্দর ও সর্বসম্মত চিত্র ফুটে উঠত। এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু করতে পারেন? অন্যথায় হতে পারে আগামী প্রজন্মগুলো অন্যান্য ধর্মই নয় বরং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের ইতিহাসকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বসম্মত হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামী ইতিহাসের পুরো ভাণ্ডারকে মতপার্থক্য ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ দেখে ইসলাম বিরোধী মিশনারিদের প্রোপাগান্ডায় পড়ে মুহাম্মদ আরবি ﷺ-এর মহান সত্তা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কটুক্তি করতে শুরু করবে। আউযুবিল্লাহি মিন শাররি যালিক।”

হযরত মাওসুফ এর জবাবে লিখেছিলেন:

“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইতিহাসকে এভাবে যাচাই-বাছাই করে সংকলন করা অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু আজ আমরা যে যুগে...”

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

“...অতিক্রম করছে, এতে কাজ অসংখ্য, মানুষ কম। কোনো ব্যক্তি কী কী কাজ সম্পন্ন করবে... চেষ্টা করব যেন বন্ধুদের এই দিকে মনোযোগী করি।” [১]

এই চিঠি চার দশক আগের। সেই সময়ে উম্মতের দরদিরা যে আশঙ্কার কথা প্রকাশ করছিলেন, বর্তমানে তা অনেক বেশি তীব্রতার সাথে সামনে চলে এসেছে এবং এমন গবেষণামূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে যা পূর্বসূরিদের ইলমি মানহাজের মুতাবেক হয় এবং যাতে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি (ইফরাত ও তাফরিত) থেকে বেঁচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়। এই কারণেই লেখক তাঁর আকাবির, শিক্ষক এবং বুজুর্গদের থেকে বহুবার শুনেছেন যে, ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণের কাজ উম্মতের জিন্মায় বাকি রয়ে গেছে; এই ময়দানে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি হতে পারেনি। অন্যদিকে গবেষণার নামে মুক্তমনা লোকেরা যে কাজ শুরু করেছে, তা নিজেই একটি নতুন ফিতনায় পরিণত হয়েছে। আমাদের আকাবিরগণও এই পরিস্থিতির কথা অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করতেন। তাই মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব (রহ.) অত্যন্ত দরদমাখা ভঙ্গিতে লিখেছেন:

“কোনো দ্বীনি বা দুনিয়াবি প্রয়োজন ছাড়াই বড় বড় ব্যক্তিত্বদের অবাধ সমালোচনা ও পর্যালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানোকে একটি ইলমি খিদমত এবং গবেষক হওয়ার লক্ষণ মনে করা হতে শুরু করেছে। উম্মতের পূর্বসূরি এবং দ্বীনের ইমামদের ওপর তো এই জুলুমের চর্চা অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল, এখন তা বাড়তে বাড়তে সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। নিজেদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত দাবিদার অনেক কলম সৈনিক নিজেদের রিসার্চ, তাহকিক এবং ইলমি শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এটাই সাব্যস্ত করে নিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মহান ব্যক্তিত্বদের ওপর সমালোচনা ও পর্যালোচনার চর্চা করা হোক। কিছু লোক একদিকে হযরত মুয়াবিয়া [রা.] এবং তাঁর পুত্র ইয়াজিদদের সমর্থন ও সহযোগিতার নাম নিয়ে হযরত আলী কাররামাল্লাহ্ ওয়াজহাহ্ এবং তাঁর সন্তানাদি বরং পুরো বনি হাশিমকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ফেলেছেন এবং এতে সাহাবায়ে কেরামের আদব ও সম্মান তো দূরের কথা, ইসলামের ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রাজ্ঞ সমালোচনার সকল নিয়ম-নীতি ও সীমাও লঙ্ঘন করেছেন। এর বিপরীতে অন্য কিছু লোক যখন কলম ধরেছেন, তখন হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত উসমান গনি [রা.] ও তাঁদের সাথীদের ওপর একইভাবে সমালোচনা ও পর্যালোচনার পথ বেছে নিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা যারা দ্বীনি জ্ঞান ও দ্বীনি আদব সম্পর্কে অনবহিত এবং ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত নতুন সভ্যতার অনুরাগী, তারা এই উভয় পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাদের মজলিসগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কটুক্তি ও সমালোচনার ভাষা দীর্ঘ হতে শুরু করেছে।” [২]

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি সম্বলিত উপকরণের জবাবে উলামায়ে রাসিখিন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সঠিক আকিদার ব্যাখ্যা, রাফেজি ও নাসিবি মতবাদের খণ্ডন এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট পৃথক পৃথক বিষয়ে গবেষণামূলক কাজে কোনো কমতি করেননি।

এই সমস্ত ইলমি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসসহ বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ও গবেষণামূলক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বাকি রয়েছে। অতএব, আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করছি যে, আমাদের আকাবিরদের ইচ্ছা অনুযায়ী গবেষণার মূলনীতি অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরামের প্রামাণ্য ইতিহাস উম্মতের সামনে পেশ করি। পাঠকদের কাছে এর কবুলিয়তের জন্য দোয়া প্রার্থী।

[১] ফাতাওয়া উসমানি, মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি: ১৮০/১

[২] মাকাম-এ-সাহাবা, পৃ. ১০০৯, তাবা আদাতুল মাআরিফ করাচি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

‘তারিখ উম্মতে মুসলিমা’র প্রথম খণ্ডে আপনি পড়েছেন যে, কুফর ও শিরকের ঘোর অন্ধকারের মাঝে কীভাবে ইসলামের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং কীভাবে সত্য জাহেলিয়াতের অন্ধকার চিরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল। কত প্রতিকূল পরিবেশে নবী উম্মি ফিদাহ আবি ওয়া উম্মি ﷺ ইসলামের দাওয়াত শুরু করেছিলেন এবং কীভাবে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ, যাদের সাহায্যে কেরাম বলা হয়, তাঁর ﷺ চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁকে ﷺ মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হলে মদিনার আনসারগণ তাঁকে ﷺ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। মদিনায় প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদের ধারা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে পুরো আরবে তাওহীদের বাণী প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মক্কা বিজয় হলো। লাত ও উজ্জা ভেঙে ফেলা হলো এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ইসলামের অনুসারীরা জাজিরাতুল আরব থেকে বেরিয়ে কায়সার ও কিসরার স্বৈরাচারী শাসনের মোকাবিলা করেন এবং শতাব্দীকাল ধরে জুলুম ও নির্যাতনের শিকলে বন্দি মানবতাকে মুক্তি দিয়ে তাদের ললাটকে প্রকৃত মাবুদের সামনে অবনত করার স্বাধীনতা দান করেন। এভাবে কয়েক দশকের মধ্যে ঈমান ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, এক পবিত্র সভ্যতা এবং এক সর্বোত্তম সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, যার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত মানবতা গর্ব করতে থাকবে।

‘তারিখ উম্মতে মুসলিমা’র ‘প্রথম খণ্ডে’ আমরা সেই যুগের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি।

এখন ‘তারিখ উম্মতে মুসলিমা’র ‘দ্বিতীয় খণ্ড’ আপনার সামনে রয়েছে, যা পাঁচটি অধ্যায়ের ওপর مشتمل:

প্রথম অধ্যায় মতপার্থক্যের যুগের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে। এতে বলা হয়েছে যে, বিজয়ের চরম শিখরে পৌঁছানোর পর কীভাবে পরিবর্তনের এক যুগ শুরু হলো। মুসলিম বিশ্বে কীভাবে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। অভ্যন্তরীণ ফিতনাগুলো কেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এটি ছিল উম্মতের ইতিহাসে ফিতনার প্রথম যুগ, যার সময়কাল ৩৪ হিজরি থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত প্রায় পৌনে সাত বছর। আপাতদৃষ্টিতে ফিতনার সূচনা ৩৪ হিজরিতে হয়েছিল, কিন্তু এর শিকড় আগেই গেড়ে বসেছিল। এই ফিতনার ফলে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়, যা পুরো উম্মতকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালেও ফিতনাবাজ গোষ্ঠীগুলো সক্রিয় ছিল। এই সময়ে আমাদের ইতিহাসে জঙ্গ জামাল এবং জঙ্গ সিফফিনের মতো আরও দুটি বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে, যাতে আমরা প্রথমবারের মতো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে তলোয়ার চলতে দেখি।

এই দ্বন্দ্ব তিনটি দল ছিল: এক. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দল। দুই. তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণকারী সাহাবা ও তাবেয়িগণের দল। এবং তিন. সেই সব অশুভ শক্তির দল যারা পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এটি ছিল হাঙ্গামার যুগ। এমন পরিস্থিতিতে প্রকৃত খবরের চেয়ে গুজবের প্রভাব অনেক বেশি থাকে, যা সাধারণত সমাজবিরোধী চক্র ছড়িয়ে থাকে। ফলে এই যুগ সম্পর্কেও অনেক গুজব ও মিথ্যা বর্ণনা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এমন অনেক বিষয় পরবর্তীতে ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। এর মধ্যে কিছু বর্ণনা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার দ্বন্দ্বের এক অবাস্তব ও বিকৃত রূপ তুলে ধরে। তাই জরুরি ছিল যে, এই যুগকে...

অসাধারণ গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখা উচিত এবং আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের আলোকে সন্দেহজনক বর্ণনাগুলো যাচাই করা উচিত। এই কারণে এই অংশটি মাত্র কয়েক বছরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়েও বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। সহীহ বর্ণনা অনুসন্ধান, যযীফ বর্ণনার যাচাই-বাছাই, বর্ণনাকারীদের অবস্থা তদন্ত এবং শর্তানুযায়ী দিরায়াত শাস্ত্রের প্রয়োগের কারণে এমনটি হওয়া অনিবার্য ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় খুলাফায়ে রাশেদার সমাপ্তি এবং সাধারণ খিলাফতের সূচনা থেকে শুরু হয়। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত হাসান (রা.) হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-কে খিলাফত সোপর্দ করেন। এর ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং বিজয়ের ধারা পুনরায় শুরু হয় যা বিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই অংশে সেই বিশ বছরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সময়ে ব্যর্থতার সন্মুখীন হওয়া ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে তাদের প্রতিশোধমূলক প্রোপাগান্ডার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব জাল বর্ণনা ছড়িয়ে দিয়েছিল যা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। আমরা মুসলমানদের ঈমানি ও ইলমি প্রয়োজন মনে করি যে, তাদের সামনে ছবির আসল রূপ তুলে ধরা হোক এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালকে সহীহ বর্ণনার আলোকে সামনে আনা হোক এবং ভুল বর্ণনাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা হোক। ফলে এই প্রচেষ্টায় বিশ বছরের এই দ্বিতীয় পর্যায়টিও কলেবরের দিক থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এটি পাঠ করে আপনি আপনার ঈমান ও বিশ্বাসে নতুন সজীবতা অনুভব করবেন। ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় অধ্যায় সেই ফিতনার যুগের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে যা ইয়াজিদের সিংহাসন আরোহণ থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত সময়কালকে পরিবেষ্টন করে আছে। ৬০ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা, ওয়াকিয়া-এ-হাররা এবং মদিনা ও মক্কার ওপর উমাইয়া বাহিনীর আক্রমণসহ অনেক নাজুক আলোচনা সামনে আসে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যেও অনেক যযীফ ও বানোয়াট বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখান থেকে সহীহ উপাদান নির্বাচন করতে এবং সত্য অনুসন্ধান করতে দীর্ঘ সময় ও অসাধারণ পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় সেই সব খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে গঠিত যারা প্রথম হিজরি শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর জন্য ইলমি, ঈমানি, ফিকরি এবং নৈতিক ক্ষেত্রে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায় “সন্দেহ নিরসন” শিরোনামে সংকলন করা হয়েছে। যেহেতু মতপার্থক্যের যুগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে অসংখ্য সংশয় ও প্রশ্ন বিদ্যমান, তাই সেই যুগের সঠিক অবস্থা বর্ণনা করার পাশাপাশি এ জাতীয় সন্দেহ ও সংশয় নিরসন করাও জরুরি ছিল। ফলে মূল পাঠ এবং টীকাতেও এর প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে এবং শেষে এই স্বতন্ত্র অধ্যায়টি স্থাপন করে সেই প্রয়োজনটিও পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

আমাদের এই প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি হলো ‘ইলমে আসমাউর রিজাল’ এবং ‘কাওয়ায়েদে জারহ ওয়া তাদীল’। এই শত শত পৃষ্ঠা সেই ব্যক্তির জন্য অর্থহীন হবে যে উম্মতে মুসলিমার ‘ইলমে আসমাউর রিজাল’কে সন্দেহজনক মনে করে। আমরা ‘আসমাউর রিজাল’ এর গবেষণায় যদিও ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইজলী, ইমাম উকায়লী, মুহাম্মদ বিন সাদ, ইবনে আবি হাতিম, ইবনে হিব্বান, ইবনে জাওয়াই এবং ইবনে আদী এবং ইমাম মিশযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতো প্রথম সারির সমালোচকদের থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হয়েছি, তবে আমাদের বেশি নির্ভরতা হাফেজ যাহাবী এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতামতের ওপর, যারা পূর্ববর্তী আলেমদের মতামত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করার পাশাপাশি সেগুলোর সারসংক্ষেপও পেশ করেছেন। কোনো রাবীর ব্যাপারে মতভেদের ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা এই দুই ব্যক্তিত্বের গবেষণার ওপরই সবচেয়ে বেশি আস্থা রেখে আসছেন।

জারহ ওয়া তাদীলের নিয়মনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য কিতাব ছাড়াও হাফেজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ‘নুখবাতুল ফিকার’, ইমাম সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ‘তাদরীবুর রাবী’, মাওলানা আব্দুল হাই লখনভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ‘আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল’ এবং মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ‘কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস’কে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে।

বিশেষ ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট মূলনীতির ক্ষেত্রে মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম সাখাতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ‘আল-ইলান বিত-তাওবীখ’ এবং আল্লামা কাফীজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর রিসালা ‘আল-মুখতাসার ফী ইলমিত তারিখ’ থেকে বেশি উপকৃত হওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক উপাদান বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত হাদীসের কিতাবসমূহ এবং দ্বিতীয়ত ইতিহাসের কিতাবসমূহ থেকে সাহায্য নিয়েছি। হাদীস ভাণ্ডারের মধ্যে আমরা সিহাহ সিভাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বার ‘মুসান্নাফ’, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, মুস্তাদরাকে হাকেম এবং ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মামের ‘মুসান্নাফ’ সহ পূর্ববর্তীদের প্রতিটি লভ্য উৎস থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হয়েছি।

একইভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী ইতিহাসের প্রতিটি প্রাচীন উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম খলিফা ইবনে খাইয়াত, মুহাম্মদ বিন সাদ, ইবনে জারীর তাবারী এবং ইবনে আবি খাইসামার মতো পূর্ববর্তীদের বর্ণনার ওপর ভরসা করা হয়েছে যারা সমালোচক হিসেবেও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পর আল্লামা বালায়ুরী, আল্লামা ইবনে জাওয়াই, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার, ইবনুল আসীর আল-জাযারী, হাফেজ যাহাবী, হাফেজ ইবনে কাসীর, আল্লামা ইবনে খালদুন, হাফেজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কিতাবসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া হয়েছে। নাজুক বিষয়গুলোতে সনদ ও মতন (মূল পাঠ) যাচাই-বাছাই করার যথাসম্ভব পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সব গবেষণামূলক কিতাবসমূহ যাতে সনদের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা স্পষ্ট করা হয়েছে, সেগুলো বিশেষভাবে দেখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ডক্টর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ গাব্বান গাবনী এর ‘ফিতনাতু মাকতালি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ডক্টর মুহাম্মদ বিন তাহের আল-বারযাঞ্জী এবং ডক্টর মুহাম্মদ গনী হাসান হাল্লাক এর ‘সহীহ তারিখুত তাবারী’ থেকে অনেক সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তারিখুত তাবারীর বর্ণনাসমূহের সনদভিত্তিক গবেষণায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরই ওপর আস্থা রাখা হয়েছে। একইভাবে হাদীসের সনদের ব্যাপারে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, ডক্টর শুআইব আল-আরনাউত এবং ডক্টর আহমদ মুহাম্মদ শাকের এর গবেষণামূলক কাজকেও সামনে রাখা হয়েছে। যদিও কিছু কিছু স্থানে এই ব্যক্তিবর্গের মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণের অবকাশও অনুভূত হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাত থেকে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাত পর্যন্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টির...

দাবি করে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদ (মুশাজারাতে সাহাবা) এবং আমাদের ইতিহাসের অনেক নাজুক বিতর্ক এই যুগেই আসে। এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ফেরকার ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে এবং এই মতপার্থক্য থেকেই ফেরকাবাজির সূচনা হয়েছে। এজন্য হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন:

“পুরো উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পরিচয়, তাঁদের মর্যাদা এবং তাঁদের মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক মতপার্থক্যের ফয়সালা কোনো সাধারণ ঐতিহাসিক বিষয় নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় তো ইলমে হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমনটি হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ‘ইসাবা’-এর ভূমিকায় এবং হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (রহ.) ‘ইস্তিআব’-এর ভূমিকায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মর্যাদা, পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও স্তর এবং তাঁদের মধ্যে সংঘটিত মতপার্থক্যের ফয়সালাকে উম্মতের ওলামায়ে কেরাম আকিদার বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ইসলামী আকিদার সকল কিতাবে একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে লিখেছেন। এমন একটি বিষয় যা ইসলামী আকিদার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যে বিষয়ের ভিত্তিতে অনেক ইসলামী ফেরকার বিভাজন হয়েছে, তার ফয়সালার জন্য এটিও স্পষ্ট যে, কুরআন ও সুন্নাহর নস এবং ইজমায়ে উম্মতের মতো শরয়ী দলীল প্রয়োজন। এ সম্পর্কে যদি কোনো রেওয়ায়েত থেকে দলীল গ্রহণ করতে হয়, তবে তাকে মুহাদিসসুলভ সমালোচনার মূলনীতিতে যাচাই করে নেওয়া ওয়াজিব। একে ঐতিহাসিক বর্ণনার মধ্যে খোঁজা এবং সেগুলোর ওপর নির্ভর করা নীতিগত ও মৌলিক ভুল, সেই ইতিহাসগুলো যতই বড় নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদিসগণের লেখা হোক না কেন। সেগুলোর কারিগরি অবস্থান ঐতিহাসিকই, যাতে সহীহ ও যযীফ রেওয়ায়েতসমূহ একত্রিত করে দেওয়ার দস্তুর রয়েছে।” [১]

যেহেতু লেখকের উদ্দেশ্য ইতিহাসের সংস্কার (তানকীহ), তাই ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে উপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকলীদী (অন্ধ অনুসরণমূলক) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। মুহাদিসগণের সমালোচনার মূলনীতি অনুযায়ী শত শত রেওয়ায়েত যাচাই করা হয়েছে এবং রাবীদের অবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং এই প্রচেষ্টায় নিজের পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। আল্লাহ জালা শানুহ-এর অনুগ্রহ ও করুণা প্রতিটি ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করেছে। তাঁরই তাওফীকে ইলমী ও ফিকরী কঠোর পরিশ্রমের পর লেখক এই মরুভূমি পাড়ি দিয়েছেন।

এই কদম নিজে ওঠে না, উঠানো হয়।

নিকট অতীতে কিছু গবেষক ‘দিফায়ে সাহাবায়ে কেরাম’ শিরোনামে ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের ওপর গবেষণামূলক কাজের চেষ্টা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরক্ষা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, কিন্তু আমাদের এবং ওই ব্যক্তিদের মানহাজের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মানহাজ পূর্বসূরিদের (আসলাফ) থেকে বিমুখ করে ‘ইনকারে হাদীস’-এর দিকে নিয়ে যায়। তাঁদের মানহাজের সারকথা হলো চারটি পয়েন্ট:

- ১. এমন প্রতিটি রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করা হবে যা আমাদের মনে কোনো সংশয় বা দ্বিধা সৃষ্টি করে। চাই সেই রেওয়ায়েত সনদের দিক থেকে সহীহ হোক বা যযীফ, ইতিহাসের ভাণ্ডারে থাকুক বা হাদীসের ভাণ্ডারে।

[১] মাকামে সাহাবা, পৃ. ২৯

২. এই ধরনের বর্ণনার বর্ণনাকারী ঐতিহাসিক বা মুহাদ্দিসগণকে কোনো পথভ্রষ্ট ফেরকার হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩. আসমাউর রিজাল বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে কারো সেই বিরল (শায) মতটিও গ্রহণ করা হবে যা আমাদের নির্ধারিত মতাদর্শের অনুকূলে হবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেও প্রত্যাখ্যান করা হবে।

৪. উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেরামের ইজমাই (ঐক্যবদ্ধ) মতাদর্শকে চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না। নিজের নতুন গবেষণাকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। এই মানহাজ পুরোপুরি উগ্রতা ও গোঁড়ামির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। গবেষণার সঠিক মানহাজ সেটিই যা জমহুর ওলামা এবং আসলাফে উম্মতের ছিল। এই মানহাজের চারটি মৌলিক মূলনীতি রয়েছে:

- যেসব আসলাফের আমানতদারি, বিশ্বস্ততা এবং ইলমি মাকাম সাধারণভাবে স্বীকৃত এবং যাদের কিতাবসমূহ থেকে উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেরাম উপকৃত হয়ে আসছেন, তাদেরকে সহীহ আকিদা সম্পন্ন, আমীন, দিয়ানতদার এবং উম্মতের মুহসিন হিসেবেই গণ্য করা হবে।
- আসলাফগণ মাসুম আনিল খাতা নন, তাদের থেকে ইলমি বিচ্যুতি ঘটতে পারত, তাই তাদের সাথে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। কোনো সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত মানদণ্ডের ওপরও সমালোচনা করা যেতে পারে। কোনো বক্তব্য, যুক্তি বা গবেষণাকে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। তবে তাদের ঈমানকে সন্দেহজনক মনে করা বা তাদেরকে পথভ্রষ্ট ফেরকাগুলোর হাতিয়ার মনে করা অনেক বড় বাড়াবাড়ি।
- যেসব মতাদর্শের ওপর প্রথম যুগগুলো থেকে উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেরামের ঐক্য ও ইজমা চলে আসছে, সেখানে মতপার্থক্যের কোনো অবকাশ নেই। “গবেষণা”র নামে এ ধরনের মতপার্থক্য সর্বদা কোনো নতুন ফেরকা গঠনের পূর্বাভাস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
- বর্ণনা গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে উসূলে হাদীস এবং ইতিহাস শাস্ত্রের সকল দিক সামনে রাখা হবে। কেবল মানসিক দ্বিধা বা কোনো সংশয় সৃষ্টি হওয়া কোনো বর্ণনাকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট নয়। (যদি এই মানদণ্ড রাখা হয় তবে অনেক সহীহ মারফু হাদীসও প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কারণ ইলমের স্বল্পতা বা বুঝের অভাবের কারণে সেখানেও দ্বিধা সৃষ্টি হতে পারে।)

আমরা ইতিহাস শাস্ত্রের মূলনীতির আলোচনা এবং এরপর ইতিহাসের গবেষণার সময় ইনশাআল্লাহ এই চারটি পয়েন্টের সীমানার মধ্যেই থাকব।

□□□

“তারিখে উম্মতে মুসলিমা”র দ্বিতীয় খণ্ড যা বর্তমানে পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে, তা ২০১২ সালে শুরু করা হয়েছিল। বিরতি দিয়ে দিয়ে এই কাজ চলতে থাকে এবং পাঁচ বছর পর ২০১৭ সালের শেষের দিকে এর সমাপ্তি ঘটে।

এই সময়ে আকাবির ও উস্তাদ এবং ইলম অন্বেষী বন্ধুদের সাথে পরামর্শের ধারাও অব্যাহত ছিল। এরই মধ্যে লেখককে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল হজ্জের ফরজ আদায় করার তৌফিক দান করেন, সেখানে এই কাজের সমাপ্তি ও কবুলিয়তের জন্য প্রাণভরে দোয়া করেছি। হারামে মক্কায় আমার মুহসিন হযরত মুফতি আব্দুর রহীম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম (প্রধান, জামিয়াতুর রশীদ করাচি)-এর কাছ থেকে ঐতিহাসিক গবেষণার মানহাজ এবং উসূল ও নিয়ম-কানূনের ব্যাপারে পরামর্শ ও উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মিলেছে। হযরত মুফতি মুহাম্মদ জরীন সাহেব (প্রধান, দারুল ইফতা জামিয়াতুর রশীদ) কাজের মানহাজ সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, উসূলুর রিওয়ায়াহ সম্পর্কে অত্যন্ত দরকারী উৎসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পূর্ণ উৎসাহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ এই আকাবিরদের ছায়া আমাদের মাথার ওপর কায়েম রাখুন।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় অংশ

রোজনামা ইসলামের পুরনো কর্মী এবং আমার বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ আশিক এলাহীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, যিনি অত্যন্ত একাগ্রতা, গুরুত্ব এবং পরিশ্রমের সাথে প্রথম অংশের সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় অংশের অধিকাংশের কম্পোজ করেছেন। ইদারা উলুমুল কুরআনের উস্তাদ জনাব হামিদ মাহমুদ সাহেব অত্যন্ত অল্প সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কম্পোজ করে দিয়েছেন। মুফতি আব্দুল খালেক সাহেব সংশোধন ও পরিমার্জনে অত্যন্ত গভীর দৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছেন। আমি ‘আল-মানহাল’-এর ডিরেক্টর জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আলতাফ মেমন, ভাই হামিদ আলী খোখর এবং ‘ইদারা আন-নূর’ করাচির ম্যানেজার মাওলানা মুহাম্মদ আলীর প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞ, যাদের পূর্ণাঙ্গ ও আন্তরিক সহযোগিতায় এই প্রচেষ্টা জনসমক্ষে আসছে। আল্লাহ তাআলা এই সকল ব্যক্তিদের দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, যাদের যেকোনো ধরনের সহযোগিতা এই নেক কাজে शामिल ছিল।

প্রথম অংশের শুরুতে ‘ইলমে তারিখ’-এর পরিচিতির ওপর লেখকের একটি পুস্তিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানেও শুরুতে বর্ণনাসমূহের তাহকীক ও তানকীহ-এর পদ্ধতি বোঝানোর জন্য একটি প্রবন্ধ পেশ করা হচ্ছে। এতে সেই নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা হয়েছে যা আমাদের পরবর্তী সকল ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

১৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরি, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

rehanbhai@gmail.com

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

চিহ্ন ও সংকেত এবং উদ্ধৃতি দেখার জন্য নির্দেশিকা

- □ ম মুতাওয়াফ্ফী, মুতাওয়াফ্ফা (মৃত্যুর তারিখ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য) [১]
- □ ত তরজমা (জীবনবৃত্তান্ত)
- □ ৩/১২২ খণ্ড নম্বর তিন, পৃষ্ঠা নম্বর ১২২ (চিহ্ন / এর ডান দিকে খণ্ড নম্বর, বাম দিকে পৃষ্ঠা নম্বর)
- □ স পৃষ্ঠা নম্বর
- □ হ হাদিস নম্বর, বর্ণনা নম্বর
- □ ত মুদ্রণালয় / প্রকাশক
- □ তথ তাখরিজ
- □ ত তাহকিক

সতর্কবার্তা

১. অনেক স্থানে একসাথে দুই বা ততোধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি সাধারণত এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যাতে পাঠকদের কাছে যেটি সহজলভ্য হয়, তারা সেটি দেখে নিতে পারেন। তবে কখনো কখনো প্রয়োজনের খাতিরেও একাধিক উৎসের উদ্ধৃতি একসাথে দেওয়া হয়েছে যে, ঘটনার অংশগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিছু এক উৎসে এবং কিছু অন্য উৎসে রয়েছে। তাই যদি কোনো পাঠক উদ্ধৃত একটি উৎসে মূল পাঠে উপস্থাপিত পূর্ণ ঘটনাটি না পান, তবে বাকি উৎসগুলোও দেখে নেওয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ সামান্য পরিশ্রমে পুরো ঘটনাটি একইভাবে সামনে চলে আসবে।

২. চেষ্টা করা হয়েছে যেন উদ্ধৃতির জন্য নতুন, তাহকিককৃত এবং অধিক প্রচলিত সংস্করণগুলো সামনে রাখা হয়। শেষে ‘কিতাবিয়াত’ (গ্রন্থপঞ্জি) থেকে জানা যাবে কোন মুদ্রণালয়ের সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠকরা যদি সেই মুদ্রণালয়ের সংস্করণ দেখেন, তবে ইনশাআল্লাহ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি দ্রুত পেয়ে যাবেন। তবে কখনো কখনো একই মুদ্রণালয়ের কোনো নতুন সংস্করণে দুই-চার পৃষ্ঠার কমবেশি হয়ে থাকে, তাই পাঠকরা যদি উদ্ধৃত পৃষ্ঠায় কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি না পান, তবে দুই-চার পৃষ্ঠা আগে-পিছেও দেখে নেবেন।

৩. যদি সংস্করণের পার্থক্যের কারণে কোনো ঘটনা উদ্ধৃত খণ্ড ও পৃষ্ঠায় না পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে তা হিজরি সনের অধীনে অথবা সরকার ও শাসকদের আলোচনার অধীনে তালাশ করা যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ ব্যর্থ হবেন না।

[১] এই শব্দটি মুতাওয়াফ্ফা এবং মুতাওয়াফ্ফী (ফা-এর ফাতহাহ বা কাসরাহ সহ) উভয়ভাবেই পড়া সঠিক।

(আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মাত তারিখ লিশামসুদ্দিন আস-সাখাভী, পৃ. ৮৫, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ বৈরুত)

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

ইতিহাস অধ্যয়ন এবং গবেষণা ও পর্যালোচনার মূলনীতি

সন্দেহজনক বর্ণনাগুলোর গবেষণা ও পর্যালোচনা কোন নিয়ম ও মূলনীতির অধীনে হওয়া
উচিত?

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অতীতের ঐতিহাসিকদের সংকলন পদ্ধতির ওপর এক নজর

কিছু মানুষ অভিযোগ করেন যে, ইতিহাস পড়ার সময় মাঝে মাঝে এমন মনে হয় যেন সাহাবায়ে কেরাম (নাউযুবিল্লাহ) অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, দুনিয়ালোভী এবং মন্দ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এই ধারণার ফলে মানুষ হয় সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিমুখ হয়ে যায় অথবা ইতিহাস গ্রন্থসমূহ থেকে। লেখক এই সমস্যার মূল কারণগুলো সম্পর্কে কিছু আরজ করতে চান। এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি চারটি কারণে সৃষ্টি হয়:

১. প্রথম কারণ হলো নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি এবং ঈমানি দুর্বলতা, যা আজকাল সাধারণ বিষয়। একটি ঘটনা তার নিজ স্থানে ইতিবাচক হয়, কিন্তু মানুষ যদি তাকে ভুল কোণ থেকে দেখে তবে নেতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করে। অর্ধেক গ্লাস পানিকে যদি ইতিবাচক কোণ থেকে দেখা হয় তবে বলা হবে, “আলহামদুলিল্লাহ! অর্ধেক গ্লাস পানি পাওয়া যাচ্ছে।” নেতিবাচক কোণ থেকে দেখলে বলা হবে, “আফসোস! অর্ধেক গ্লাস খালি।”

২. দ্বিতীয় কারণ হলো ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যার (তাউইল) যোগ্যতা না থাকা। সঠিক ব্যাখ্যা কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি ইলমে আকাইদ ও কালাম, ফিকহ, হাদিস এবং হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ বিস্তারিত ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। একটি ঘটনার অন্যান্য দিকগুলো স্পষ্ট করার জন্য তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বর্ণনাগুলোও তার নজরে থাকে। প্রত্যেকের অধ্যয়ন এত ব্যাপক হয় না, তাই তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বর্ণনার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন না।

৩. ইতিহাসের সাথে বড় সমস্যা হলো এর ‘উন্মাহাতুল কুতুব’ (মৌলিক উৎসসমূহ) ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরহ) থেকে বঞ্চিত, তাই কোনো বিভ্রান্তি দূর করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। হাদিস ভাঙারেও প্রশ্নবিদ্ধ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু হাদিসের কিতাবসমূহের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে যার মাধ্যমে সেই বিভ্রান্তিগুলো দূর করা যায়। ইতিহাসে আমাদের এই সুযোগ নেই।

৪. ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে দুর্বল, সন্দেহজনক এবং প্রশ্নবিদ্ধ উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। যখন হযরত উসমান গনি (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন মুনাফিক শ্রেণির লোকেরা এমন সব মিথ্যা খবর রটানো শুরু করে যার মাধ্যমে বিবাদে লিপ্ত সাহাবায়ে কেরামের উভয় দলের চরিত্র হনন করা হয়। এ ধরনের খবরগুলো মুখে মুখে ছড়াতে থাকে। যারা কোনো এক দলের পক্ষে চরমপন্থী ছিল, তারা সওয়াবের কাজ মনে করে এই অভিযানে অংশ নেয়। যেহেতু এটি এমন এক যুগ ছিল যখন সব ধরনের বর্ণনা সংগ্রহ করা হচ্ছিল, তাই এই গণ্ডিতে অনেক দুর্বল, সন্দেহজনক এবং জাল বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ এই বর্ণনাগুলোকে পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য হিসেবে পূর্ণ আমানতদারিতার সাথে হুবহু বর্ণনা করে দিয়েছেন। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি যে, দুর্বল বর্ণনাকে আকিদার ভিত্তি বানানো যায় না। কিন্তু কিছু মানুষ এই মূলনীতি উপেক্ষা করে এই বর্ণনাগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে কেউ রাফেজি মতাদর্শের দিকে এবং কেউ নাসিবি মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অথচ জমহুর ওলামায়ে কেরাম দুর্বল বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার সুযোগ রাখা সত্ত্বেও সেগুলো থেকে এমন কোনো দলিল গ্রহণ করা জায়েজ মনে করেন না যা সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতার (আদালত) পরিপন্থী হয়।

ইলমে হাদিস ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য

বিজ্ঞজনরা জানেন যে, মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীরা হাদিসের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কারসাজি দেখিয়েছে এবং হাজার হাজার স্বরচিত বর্ণনা প্রসিদ্ধ করেছে। কিন্তু ইলমে হাদিসের ক্ষেত্রে হাদিস বিশারদগণ বছরের পর বছর পরিশ্রমের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা পৃথক করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই এবং অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে এতটা সূক্ষ্মতার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। বরং মূলনীতিবিদ আলেমগণ এই শর্তে সেগুলো বর্ণনা করার সুযোগ রেখেছেন যে, সেগুলো থেকে কোনো আকিদা বা শরয়ী বিধানের দলিল গ্রহণ করা যাবে না। এমতাবস্থায় সেগুলোর দুর্বলতা বা দুর্বলতার পর্যায় চিহ্নিত করে বর্ণনা করাও জরুরি মনে করা হয়নি। [১]

তবে জারাহ ও তাদিল শাস্ত্রের ইমামগণ বর্ণনাকারীদের যে ভাণ্ডার রেখে গেছেন এবং মূলনীতিবিদ আলেমগণ বর্ণনার মান নির্ধারণের জন্য যে নিয়মাবলি নির্ধারণ করেছেন, তার ভিত্তিতে সহিহ, হাসান, জয়িফ, মুনকার এবং জাল বর্ণনাগুলোকে আজও চেনা সম্ভব। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান প্রতিটি বর্ণনার সনদ দেখে আজও সেই বর্ণনাগুলো যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে।

সিরাতে নববী, সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এবং ইতিহাসের অধিকাংশ কিতাবে বেশিরভাগ উপাদান এমন সব দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত পাওয়া যাবে যারা “আখবারি” বা ঐতিহাসিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সিরাত, সিরাত ইবনে হিশাম, ওয়াকিদির ফুতুহুল শাম, বালায়ুরির ফুতুহুল বুলদান, মুহাম্মদ বিন সা’দের আত-তাবাকাতুল কুবরা এবং বালায়ুরির আনসাবুল আশরাফ দেখে নিন। এগুলোর অধিকাংশ উপাদানই দুর্বল সনদবিশিষ্ট। বর্ণনাকারীগণও প্রায় একই ধরনের, অর্থাৎ: আবু মুখনাফ, সাইফ বিন উমর, হিশাম কালবি, মুহাম্মদ বিন সাইব কালবি প্রমুখ। বর্ণনার বিষয়বস্তুও প্রায় একই রকম। সহিহ, হাসান, জয়িফ, আপত্তিজনক বা বর্জনীয় উপাদান এ সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলেমদের নিকট এ সব থেকে উপকৃত হওয়া খুবই সাধারণ বিষয়।

তাদের পরে ইমাম তাবারির মতো ফকিহ-এর তারিখুর রসুল ওয়াল মুলুক, ইবনে হিব্বানের মতো সমালোচকের সিরাতুন নবী, আল্লামা ইবনুল জাওজির মতো মুহাদ্দিসের আল-মুনতামাম, ইবনুল আসির আল-জাযারির মতো দূরদর্শী ঐতিহাসিকের আল-কামিল, হাফেজ যাহাবির মতো জারাহ ও তাদিলের ইমামের তারিখুল ইসলাম এবং হাফেজ ইবনে কাসিরের মতো গবেষকের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া দেখে নিন। এ সবগুলোতে উপস্থাপিত অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপাদানই দুর্বল সনদবিশিষ্ট।

অতীতের আলেমগণ সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের মতো সহিহ সনদবিশিষ্ট ইতিহাস সংকলন করেননি কেন?

এখন প্রশ্ন হলো, অতীতের মহান আলেমগণ হাদিসের সহিহ সংকলনসমূহ: সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের মতো “সহিহ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা” সম্বলিত ইতিহাস কেন সংকলন করেননি?

কথা হলো, ইতিহাস হলো দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এবং সাধারণ তথ্যের (জেনারেল নলেজ) সমষ্টির অপর নাম, যার জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্রের ওপর জেদ ধরা অনেক সময় মূল উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত করে দেয়। কোনো একদিনের সংবাদ সংগ্রহ করাও শুধুমাত্র সহিহ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে হওয়া খুবই কঠিন। দৈবক্রমে এমনটা হতে পারে যে আপনার প্রয়োজনীয় সংবাদটি...

[১] মুহাদ্দিসগণ এবং অন্যদের নিকট মওজু (জাল) ব্যতীত জয়িফ (দুর্বল) বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদে শিথিলতা প্রদর্শন করা এবং তার দুর্বলতা বর্ণনা না করেই তা বর্ণনা করা জায়েজ, যদি তা মহান আল্লাহর গুণাবলি এবং হালাল-হারামের মতো বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়। (তাদরীবুর রাবী: ১/৩৫০, ত: দারুল হিজরাহ)

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমাহ

এর প্রত্যক্ষদর্শী এবং মধ্যস্থতাকারীও যদি নেক সীরাত, বুদ্ধিমান, আমানতদার এবং নির্ভরযোগ্য হন—কিন্তু সবসময় এমনটি হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোনো যুগেই এমনটি সম্ভব ছিল না। আপনি যদি চার পৃষ্ঠার একটি দৈনিক পত্রিকা বের করতে চান এবং সাথে আপনার এই আকাঙ্ক্ষাও থাকে যে এতে একজন সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর পরিবেশন করবেন, তবে আপনাকে সংবাদদাতাদের অর্থাৎ রিপোর্টারদের এবং সংবাদ সরবরাহকারী মাধ্যমগুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে। যদি আপনি এই শর্তারোপ করেন যে খবর প্রেরণকারী ফাসেক ও ফুজুর থেকে মুক্ত, বা-শরআ, কোনো মাদরাসার ফাজিল, কোনো খানকাহর সাথে সম্পৃক্ত বা অন্তত তাবলীগে তিন চিল্লা লাগানো হতে হবে, তবে আপনার হাতে মাদরাসার জলসা, সংশোধনমূলক বিবৃতি এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির জানাজার নামাজের মতো কিছু খবর ছাড়া আর কিছুই আসবে না।

স্বাভাবিক কথা হলো যে পরিবেশের খবর হবে, আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও সেই পরিবেশেরই পাবেন। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, উলামা ও ওলামা, মুহাদিসীন ও মুফাসসিরীনদের সার্কোলে সালেহীনদের আধিক্য থাকে। এখান থেকে খবরের বর্ণনাকারীরা আদিল এবং নির্ভরযোগ্য হবেন। তবে বাহ্যত এই খবরগুলো হালাল-হারামের বিধান, নেক কাজের ফজিলত, গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কিতই হবে। বড়জোর আপনি কিছু বুজুর্গদের কিছু অবস্থা, কিছু অভিজ্ঞতা এবং কিছু মামুলাতের খবর সর্বোত্তম সনদে পেয়ে যাবেন।

কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দ, সেনাবাহিনী, পুলিশ, রাজনীতি, যুদ্ধক্ষেত্র এবং বাজার থেকে শুরু করে দুনিয়ার যেকোনো ক্ষেত্রে আপনি আমানত ও দিয়ানতের বিচারে সাধারণ মানুষই পাবেন। এই মানুষগুলো আমীনও হতে পারে, খাইনও হতে পারে; সত্যবাদীও হতে পারে আবার মিথ্যাবাদীও হতে পারে; ভুলোমনা এবং ভ্রান্ত ধারণার শিকারও হতে পারে আবার অতিরঞ্জনকারীও হতে পারে। এই পরিস্থিতি সব যুগেই বিদ্যমান। যদিও আমরা বলতে পারি যে খাইরুল্ল কুরানে নেকির প্রচলন বেশি ছিল, তবে আপনি দেখতে পারেন যে মুহাদিসীনগণ সেই যুগেও সাহাবীদের ব্যতীত অন্য কারো কথা চোখ বন্ধ করে মেনে নেননি।

দুনিয়ার সাধারণ খবরগুলো সাধারণ মানুষের মাধ্যমেই ছড়ায়, সাধারণ মানুষই এগুলো আগে জানে এবং আগে পৌঁছে দেয়। গ্রামের আনন্দ বা শোকের খবর সবার আগে নাপিত জানতে পারে অথবা যারা তার কাছে বসে থাকে সেই অবসরপ্রাপ্ত লোকেরা। অপরাধমূলক ঘটনার তথ্য প্রথমে অপরাধী এবং গুণ্ডাদের কাছে থাকে, দ্বিতীয় নম্বরে পুলিশ এবং তারপর আদালত বা হাসপাতালে আসা-যাওয়া করা লোকেরা তা জানতে পারে। সাধারণ শহরবাসী সন্ধ্যাবেলা কোনো টিভি দেখে বা পরের দিন খবরের কাগজের মাধ্যমে জানতে পারে যে কী ঘটেছিল। অথচ আমানত ও দিয়ানতের বিচারে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যারা গবেষণা, শিক্ষা, উম্মতের সংশোধন বা খিদমতে খালকের মতো কাজে মগ্ন থাকেন, তারা প্রায়ই এই ধরনের খবর সম্পর্কে বেখবর থাকেন বা দেরিতে জানতে পারেন।

মোদদাকথা, এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় যে দুনিয়াবি অবস্থার খবর সাধারণ মানুষের মাধ্যমে বর্ণিত হয়। এজন্য এদের সনদ স্বভাবতই দুর্বল হয়ে থাকে। যখন আমাদের দুনিয়াবি বিষয়ের সাথে কাজ পড়ে, তখন এই খবরগুলোর ওপর বিশ্বাস করতেই হয়, যদি না তা অসম্ভব কোনো বিষয় হয়। প্রতিটি সংবাদপত্রকে প্রতিদিন ডজন ডজন এমন সংবাদ সংস্থা থেকে খবর সংগ্রহ করে পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে হয় যাদের রিপোর্টারদের সম্পর্কে এটিও জানা থাকে না যে তারা মুসলমান কি না। সুতরাং দুনিয়াবি খবরের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য এবং...

তারীখে উন্মতে মুসলিমা

অষ্টম

নেককার লোকদের মাধ্যম বানানো তো পছন্দনীয়, কিন্তু প্রতিটি খবরে এই মানদণ্ড বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। (যদিও আজকের যুগে সব ধরনের দ্রুত যোগাযোগ মাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে) প্রাচীন যুগেও এর গুরুত্ব কতটুকু ছিল এবং তা কতটুকু কষ্টসাধ্য ছিল? নিজের সমস্যাগুলো দিয়ে এর আন্দাজ করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে পূর্ববর্তীদের সতর্ক প্রচেষ্টা

এমন নয় যে উলামায়ে রাসেখীন নির্ভরযোগ্য ও সতর্ক পন্থায় সংবাদ সংগ্রহে গাফেল ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে অনেক বুজুর্গ এ ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন ইমাম বুখারীর উস্তাদ খলিফা বিন খইয়াত রহ.-এর ‘তারীখে খলিফা বিন খইয়াত’ এই পর্যায়ে পড়ে। এরপর স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. রিজাল শাস্ত্রের ওপর ‘আত-তারীখুল কবীর’ এবং ‘আত-তারীখুল আওসাত’ সংকলন করেন। খলিফা বিন খইয়াত হিজরী সনের হিসেবে ঘটনাবলী লিখেছেন। ইমাম বুখারী ব্যক্তিদের নামের ক্রমানুসারে ঘটনাবলী সংগ্রহ করেছেন। এই একই কাজ মুহাদিস ইবনে আবি শায়বা রহ.-ও করেছেন।

খলিফা বিন খইয়াত উত্তম সনদের বর্ণনাগুলো আনার চেষ্টা করায় আড়াই শতাব্দীর ইতিহাসের কেবল সারসংক্ষেপই পেশ করতে পেরেছেন। এত দীর্ঘ ইতিহাস সাড়ে চারশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এক বছরের ঘটনাবলী বড়জোর দেড় পৃষ্ঠা। আপনি যদি এতে কাদেসিয়ার যুদ্ধের কাহিনী দেখেন তবে তা মাত্র এক পৃষ্ঠা পাবেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধ মাত্র অর্ধেক পৃষ্ঠা। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ঘটনা মাত্র দুই-তিন লাইনে। দুই শতাব্দীর সিদিকী ও ফারুকী যুগের মহান বিজয়সমূহ যা ওয়াকিদীর ‘ফুতুহুল শাম’-এ সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত, তারীখে খলিফায় তা মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও খলিফা বিন খইয়াত যয়ীফ বর্ণনা নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তার ইতিহাসে যয়ীফ উপাদানও রয়েছে।

এখন এই বিষয়ের দ্বিতীয় দিকটি দেখুন। তারীখে খলিফা বিন খইয়াত সনদের দিক থেকে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তারীখে তাবারী বা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মতো জনপ্রিয় হতে পারেনি। এতে ঘটনার কারণ, প্রেক্ষাপট, পরবর্তী প্রভাব ও অন্যান্য দিকগুলোর ওপর খুব বেশি আলোকপাত করা হয়নি, যা উপাদান হিসেবে অসম্পূর্ণ। এটি পড়লে মানুষ অপূর্ণতা অনুভব করে। এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, যদি খবরের সাথে সংশ্লিষ্ট ‘কী, কেন, কীভাবে, কে, কোথায় এবং কখন’-এর মতো ছয়টি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান না হয় তবে অতৃপ্তি থেকেই যায়। ইবনে আবি শায়বা রহ. খলিফা বিন খইয়াতের অর্ধ শতাব্দী পর নিজের ‘আত-তারীখুল কবীর’ পেশ করেন, কিন্তু এতেও ঘটনাবলী তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান পায়নি। যেমন এতে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা সাত পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে, অথচ বদর যুদ্ধের ঘটনা এক পৃষ্ঠাও পূর্ণ নয়। এর কারণ ছিল এই যে, তিনি এ বিষয়ে নিজের উস্তাদদের থেকে উত্তম সনদের মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই পেয়েছিলেন।

ইমাম বুখারী রহ.-এর ‘আত-তারীখুল কবীর’ এবং ‘আত-তারীখুল আওসাত’-এর লক্ষ্যও এটি ছিল না যে ঘটনাবলীর অধিক থেকে অধিকতর খুঁটিনাটি সামনে আনা হবে। বরং লক্ষ্য ছিল সতর্কতার সাথে রাবীদের অবস্থা সংগ্রহ করা। তা সত্ত্বেও তিনি সর্বত্র সহীহ সনদের শর্ত বজায় রাখতে পারেননি। তবে রিজাল শাস্ত্রের বিচারে ‘আত-তারীখুল কবীর’ একটি উত্তম উৎস।

মর্যাদা রাখে কিন্তু আপনি যদি ইসলামী ইতিহাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন ইরান ও সিরিয়া বিজয় বা হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার মূলে যেতে চান, তবে আপনি শত শত পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করেও হয়তো অপরিাপ্ত উপাদান পাবেন।

কিন্তু এতে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শানে কোনো ঘাটতি আসে না। কারণ যেখানে উচ্চমান নির্ধারণ করা হয়, সেখানে নির্বাচন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সর্বোত্তম অংশগুলো সংগৃহীত হয় এবং অনেক কিছু বর্জন করতে হয়।

এই সমস্যা শুধু ইতিহাসেই নয় বরং হাদীসেও দেখা দিয়েছে। সহীহ বুখারীতে ৭২৭৫টি বর্ণনা রয়েছে। এর নাম অর্থাৎ “আল-জামি আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি” এর সহীহ বর্ণনা এবং সংক্ষিপ্ততার প্রতি নির্দেশ করে। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিস সহীহ বর্ণনার সাথে যয়ীফ বর্ণনাও সংগ্রহ করেছেন। যেমন মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-এ সাড়ে সাতাশ হাজার এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ও মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বায় প্রায় ৩৮ হাজার বর্ণনা রয়েছে। এমন আরও ডজন ডজন হাদীসের কিতাব রয়েছে যেখানে যয়ীফ বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে আছে। সুতরাং ইতিহাসে কেন এত যয়ীফ বর্ণনা রয়েছে—এই আপত্তি কোনো অর্থ রাখে না। (এই কথাটি ভুলে যাবেন না যে, যয়ীফ মানে ‘ভুল’ নয়)।

ইতিহাসে যেখানে নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ওপর নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে ‘তারিখে খলিফা’-র মতো সংক্ষিপ্ত কিতাব সামনে এসেছে। কিন্তু যখন এই কিতাবগুলো অতীত সম্পর্কে জানার জন্য অপরিাপ্ত মনে হয়েছে, তখন যয়ীফ বর্ণনাগুলোও সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ যদি আমাদের কাছে ফুতুহুল বুলদান, তারিখে তাবারী, আত-তাবাকাতুল কুবরা এবং আনসাবুল আশরাফের মতো কিতাবগুলো (যেগুলোতে সহীহ ও যয়ীফ উপাদান একত্রিত আছে) না থাকত, তবে আমাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কঠিন নয় বরং অসম্ভব হয়ে পড়ত।

ঘটনার যৌক্তিক বিন্যাস

ইতিহাস গ্রন্থে যয়ীফ বর্ণনা সংগ্রহের একটি বড় কারণ ছিল ‘খবরিয়াত’ (সংবাদযোগ্যতা)-এর চাহিদা পূরণ করা। প্রতিদিন প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত যা ‘খবর’-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়, তাদের সমষ্টিকে ‘আখবার’ বলা হয়। কিছুকাল পর ‘আখবার’-এর সংকলন থেকে ইতিহাস বিন্যস্ত করা হয়। ইতিহাস যদি ‘খবরিয়াত’-এর চাহিদা পূরণ না করে, তবে তাকে ইতিহাস বলা যায় না। যেমন যদি কোনো তথ্য ‘খবর’-এর মানদণ্ডে না পড়ে, তবে তাকে ‘আখবার’-এর সৌন্দর্য হিসেবে গণ্য করা হয় না। যদি কোনো দোকানদার বলে যে ‘আজ আমি দোকান খুলেছি’, তবে এটি কোনো খবর হবে না। কিন্তু যদি এই খবর পাওয়া যায় যে ‘প্রধানমন্ত্রী অ্যাসেসম্বলির অধিবেশনে যোগ দেননি’, তবে এটি একটি ‘খবর’ হিসেবে গণ্য হবে।

খবরিয়াতের ছয়টি মৌলিক প্রশ্ন

‘খবরিয়াত’-এর প্রথম শর্ত হলো কথাটি ‘উল্লেখযোগ্য’ হওয়া। ‘খবরিয়াত’-এর মানদণ্ড ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাবি করে: কী, কেন, কীভাবে, কোথায়, কে, কখন।

অর্থাৎ:

১. কী হয়েছে?

২. কেন হয়েছে?

৩. কীভাবে হয়েছে?

৪. কোথায় হয়েছে?

৫. কে করেছে?

৬. কখন হয়েছে?

‘কী হয়েছে’-এর উত্তরে কোনো উল্লেখযোগ্য কথা থাকা উচিত। পাঠক বা শ্রোতার কাছে কোনো নতুন কথা জানা থাকা উচিত।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা [অংশ দ্বিতীয়]

যদি এটি বলা হয় যে “মাহমুদ গজনভী সোমনাথ জয় করেছেন”, তবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কথা; কিন্তু এটি বলা যে “সোমনাথের দুর্গ মাটির উপরে নির্মিত ছিল”, তা উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ এটি তো সবারই জানা।

“কেন হলো” এবং “কীভাবে হলো”-এর উত্তর থেকে যৌক্তিক যোগসূত্র জানা যায়। বর্ণনার মূলনীতির অধীনে ঘটনার যৌক্তিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং তা প্রমাণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ মুসাঐবুল আসবাব এই মহাবিশ্বকে কার্যকারণ জগতের রূপ দিয়েছেন। বিরল ক্ষেত্রগুলো বাদ দিলে এটি নির্ধারিত যে, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি ঘটনা তার পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার প্রভাব এবং তারপর সেই ঘটনাটি নিজেই পরবর্তী কোনো ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর ঘটনাবলী, পরিস্থিতি এবং বিপ্লবসমূহ যতটা অসাধারণ হয়, সেগুলোর কারণ ও উৎস হিসেবে কাজ করা ঘটনাবলীও ততটাই অসাধারণ হয়ে থাকে। যেমন গমের বীজ থেকে আমের গাছ জন্মাতে পারে না, তেমনি মুদি দোকান খোলার মাধ্যমে দেশের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে যায় না। ঘটনাবলীর মধ্যকার এই পারস্পরিক সামঞ্জস্যকে “যৌক্তিক যোগসূত্র” বলা হয়, যা বিবেচনা না করে কোনো ইতিহাস পূর্ণ হতে পারে না এবং তা ফলপ্রসূও হয় না। ইতিহাস তো দূরের কথা, কোনো ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীও যদি এই যৌক্তিক যোগসূত্র থেকে মুক্ত হয়, তবে তা একটি ধাঁধায় পরিণত হবে। কয়েক লাইনের এই ঘটনাটি যদি এই যোগসূত্র থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তা উপদেশ ও শিক্ষার পরিবর্তে পাঠক বা শ্রোতার জন্য মানসিক উদ্বেগের কারণ হবে। উদাহরণস্বরূপ, আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্পর্কে কেউ লিখল:

“আলমগীর একজন বিখ্যাত মুঘল শাসক ছিলেন। আলমগীরের শাসনামলে মারাঠা সর্দার শিবাজী বিদ্রোহী হন। তারপর অনুগত হয়ে দরবারে আসেন, তারপর পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে পালিয়ে যান। আলমগীর মারাঠাদের শক্তি চূর্ণ করে দেন।”

এখন এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে “কেন” এবং “কীভাবে”-এর কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়। যেমন: শিবাজী কেন বিদ্রোহী হলেন? তারপর তিনি কীভাবে অনুগত হলেন? পুনরায় কেন বিদ্রোহী হলেন?

যৌক্তিক যোগসূত্রে সেই বিষয়গুলো সামনে আনা জরুরি হয় যা আগে থেকে প্রকাশ্য নয় অথবা যেগুলোকে উপেক্ষা করলে ঘটনার যোগসূত্র প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, উপরোক্ত অনুচ্ছেদে “আলমগীর একজন বিখ্যাত মুঘল শাসক ছিলেন” থেকে কোনো প্রশ্ন তৈরি হয় না। কিন্তু এই প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মারাঠাদের শক্তি “কেন” চূর্ণ করা হলো? উত্তর স্পষ্ট যে তারা বিদ্রোহী ছিল, তাদের দমন করা জরুরি ছিল।

যৌক্তিক যোগসূত্রের জন্য দুর্বল উপাদানও অপরিহার্য ছিল।

শুরুর দিকের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের বর্ণনাগুলোকে শুধুমাত্র সংগ্রহ করার কাজ করেছিলেন, যেখানে পরবর্তীকালে আসা ঐতিহাসিকগণ যেমন ইবনুল আসীর এবং আল্লামা ইবনে খালদুন যৌক্তিক যোগসূত্রের প্রতি খেয়াল রেখেছেন। যার ফলে ঘটনার পারস্পরিক ধারাবাহিকতা সহজেই বোঝা যায়। যৌক্তিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্যভাবে দুর্বল বর্ণনা থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়। দুর্বল বর্ণনা থেকে তথ্য গ্রহণের শর্তাবলী বর্ণনার মূলনীতিতে পাওয়া যায় (সামনে এর আলোচনা আসছে), এবং ঐতিহাসিকগণ সাধারণত সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তবে কিছু ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদের অবকাশ রয়েছে।

ইতিহাসে কি জাল উপাদান বিদ্যমান নেই?

কিছু লোকের ধারণা এই যে, “হাদিসের ক্ষেত্রে সহিহ ও জয়িফ, মুনকার বা মাওজু-এর অনুসন্ধান করা এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা সঠিক, কিন্তু ইতিহাসে এর মোটেও প্রয়োজন নেই।”

এই ধারণা তখনই সঠিক বলে গণ্য হতে পারত যদি এটি প্রমাণিত হতো যে, বর্ণনা তৈরির কাজ কেবল আকাইদ, সুনান, আহকাম এবং আদব ইত্যাদির বর্ণনার ক্ষেত্রে হয়েছে, ইতিহাসে নয়। বাস্তবতা হলো, যখন জাল বর্ণনা তৈরির ধারা শুরু হয়, তখন এর প্রাথমিক যুগে এমন কোনো পার্থক্য করা হয়নি যে বর্ণনাগুলো কেবল আকাইদ, আহকাম এবং সুনানের ক্ষেত্রে তৈরি করা হবে, সিরাত ও ইতিহাসে নয়। বাস্তবতা হলো, বাতিল ফেরকাগুলোর বর্ণনাকারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে মনগড়া বর্ণনা তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে। বর্ণনা তৈরির এই ধারা হিজরি প্রথম শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল এবং চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অব্যাহত ছিল। জালিয়াতরা যেভাবে ইসলামি আকাইদ, সুনান ও আহকামের বিপরীতে জাল আকাইদ ও আহকাম প্রচার করার চেষ্টা করেছে, ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও নিজেদের মনগড়া বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করেছে যাতে পরবর্তী প্রজন্মকে সাহাবি এবং তাঁদের প্রতি অনুরাগী জমহুর মুসলিমদের সম্পর্কে সন্দিহান করে নিজেদের ফেরকার প্রতি সহানুভূতিশীল করা যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে যখন ইমাম মালিক, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ি, ইমাম তহাবি এবং অন্যান্য আইম্মাহ (রহিমাহুমুল্লাহ) সহিহ ও জয়িফ বর্ণনাগুলোকে পৃথক করার কাজ শুরু করেন, তখন তাঁদের কাছে আকাইদ, সুনান, আহকাম ও আদবের গুরুত্ব বেশি ছিল যাতে মূল দ্বীনের দলিলসমূহ সুবিন্যস্ত আকারে সংরক্ষিত থাকে। এই যুগেই কিছু ব্যক্তি সিরাত, মাগাজি এবং সাহাবিদের মানাকিব ও ফজিলত শিরোনামে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনাও সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু সেগুলোর সনদের ওপর মুহাদিসসুলভ আলোচনা করেননি। কারণ এই মূলনীতি সবার জানা ছিল যে, এ ধরনের বর্ণনা থেকে ইসলামি আকাইদ ও আহকামের বিরুদ্ধে কোনো দলিল পেশ করা জায়েজই নয়। এখন যদি কেউ এর অর্থ এমন গ্রহণ করে যে, ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর এজন্যই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে সেগুলো আকাইদ ও আহকামের জন্যও যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণযোগ্য, তবে তা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে যখন হাদিস ও ইতিহাসের সংকলনসমূহ প্রকাশ্যে আসেনি, তখনই ইয়াহইয়া ইবনে মাইন, ইবনে আবি হাতিম, ইবনে হিব্বান এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর মতো আইম্মাহ-এ জারহ ও তাদিল এমন বর্ণনার ভিত্তিতে কত বর্ণনাকারীকে জয়িফ, মুনকার এবং কাজ্জাব সাব্যস্ত করেছিলেন যারা ঐতিহাসিক বর্ণনায় সাহাবিদের দোষত্রুটি এবং অন্যান্য অদ্ভুত বিষয় বর্ণনা করত। এই ব্যক্তিবর্গ এমন বর্ণনাকারীদের খুব ভালোভাবেই চিনতেন, তাই তাদের সম্পর্কে এই ইমামদের মতামত সাধারণত কঠোর দেখা যায়। কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন উন্মত যেন তাদের বর্ণনা থেকে সতর্ক থাকে। কিন্তু যেহেতু ঐতিহাসিকদের লক্ষ্য আকাইদ বা আহকামের দলিল সংগ্রহ করা ছিল না, তাই তাঁরা এমন অনেক বর্ণনাকারীর ঐতিহাসিক বর্ণনা কোনো হুকুম লাগানো ছাড়াই নকল করে দিয়েছেন, যার ফলে ইতিহাসে এমন বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যেগুলোকে মুহাদিসসুলভ মূলনীতির সাথে দিরায়াতের অধীনে যাচাই-বাছাই করা হলে সেগুলো অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হবে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করার অর্থ কি সেগুলোকে নিজের আকিদা হিসেবে গণ্য করা?

কিছু লোকের ধারণা হলো, যখন বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যেমন: তারিখে তাবারীর সংকলক ইবনে জারীর তাবারী, আল-কামিল ফিত তারিখের লেখক ইবনে আসীর জাযারী, তারিখে ইসলামের লেখক হাফেজ যাহাবী এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া বিন্যাসকারী হাফেজ ইবনে কাসীরও দুর্বল বর্ণনাকারীদের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, এবং সেগুলোর মধ্যে অনেক বর্ণনা বাহ্যিকভাবে সাহাবীদের সমালোচনায় কলুষিত, তবে এটি এই কথার প্রমাণ যে এই ঐতিহাসিকগণও এই আকিদাই পোষণ করতেন যে সাহাবায়ে কেরাম আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ছিলেন না এবং ঐতিহাসিকগণ এটি প্রমাণ করার জন্যই এই বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের মতে এই বর্ণনাগুলো এবং এগুলোর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য ছিল, পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম অনির্ভরযোগ্য এবং নিচু চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

এটি একটি বড় ভুল ধারণা। এই ব্যক্তিবর্গ এই বর্ণনাগুলোকে শুধুমাত্র কারিগরি (ফননি) দিক থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং এগুলোর অধিকাংশ বর্ণনার সঠিক ব্যাখ্যা ঠিক সেভাবেই হতে পারে যেভাবে সেইসব হাদিসের হতে পারে যেগুলোতে কোনো বিষয় আপত্তিকর। ব্যাখ্যাকে (তাওয়িল) আমরা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বলতে পারি। একই ব্যক্তির একটি ঘটনা তার প্রশংসাকারীদের কাছে কীর্তি হবে, আবার তার বিরোধীরা সেটির জন্য তার নিন্দা করবে। [১]

অধিকাংশ বর্ণনা যেগুলোকে বাহ্যিকভাবে সাহাবীদের সমালোচনা বলে মনে করা হয়, সেগুলো এই পর্যায়েই। এই ধরনের বর্ণনা শুধু ইতিহাসের কিতাবেই নয় বরং হাদিসের কিতাবেও রয়েছে। তবে এই ধরনের বর্ণনা ঐতিহাসিক হোক বা হাদিস ভিত্তিক, সহীহ হোক বা যযীফ, সাহাবীদের আদালত (ন্যায়পরায়ণতা)-এর আকিদার পরিপন্থী নয়। যদি দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে নেওয়া হয় তবে সেগুলোর ওপর কোনো বিশেষ সংশয় বাকি থাকবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রশাসনিক পরিচালনাগত বিচ্যুতি, ইজতিহাদী ভুল অথবা দুঃখ-বেদনা বা রাগের মতো কোনো সাময়িক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

আসল সমস্যা হলো, হাদিস ভিত্তিক বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারীদের পূর্ণাঙ্গ সেবা পাওয়া গেছে, এছাড়া গবেষকগণও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যামূলক নোট লিখে দিয়েছেন, তাই সেখানে কোনো দ্বিধা থাকে না। ইতিহাসের কিতাবগুলোতে এই ধরনের ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা থাকে না, যার ফলে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। যদিও এই ঐতিহাসিকগণ এই ধরনের কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করে কখনোই তা থেকে এই আকিদা বা ফলাফল বের করেননি যে সাহাবায়ে কেরাম (নাউযুবিল্লাহ) মন্দ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এই মূলনীতি আমরা একেবারে শুরুতেই স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, সাহাবীদের সম্পর্কে আকিদা জানার জন্য আকিদার কিতাবসমূহের দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হয়। দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর মর্যাদা কেবল সাধারণ তথ্যের মতো। এগুলো থেকে আমাদের আসলাফগণ (পূর্বসূরীরা) কখনোই কোনো আকিদা গ্রহণ করেননি এবং আজও তা করা জায়েজ হতে পারে না। সাহাবীদের চরিত্র এবং পারস্পরিক মতবিরোধের (মাশাজারাতে সাহাবা) আলোচনায় যদি ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে সামনে রেখে কোনো দলিল পেশ করা হয়, তবে তার আগে সেই বর্ণনাগুলোর সনদগত অবস্থান মুহাদিসসুলভ পদ্ধতিতে যাচাই করা জরুরি হবে এবং সহীহ ও সকীম (ত্রুটিযুক্ত)-এর পার্থক্য অবশ্যই করতে হবে।

আসলাফদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা ইতিহাসের কিতাবও সংকলন করেছেন এবং আকিদার বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন: হাফেজ যাহাবী, হাফেজ ইবনে কাসীর, ইমাম সুয়ুতী এবং ইমাম তাবারী রহ.। তাঁদের আকিদা সেটিই যা তাঁদের নিজেদের সংকলিত আকিদার কিতাবসমূহে রয়েছে।

[১] উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তান সৃষ্টিকে পাকিস্তানের জনগণ, মুহাম্মদ আলী Jinnah এবং তাঁর সঙ্গীদের একটি কীর্তি মনে করা হয়, কিন্তু ভারতীয় নাগরিকরা ধর্ম নির্বিশেষে একে একটি অনেক বড় ষড়যন্ত্র মনে করে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দেখা যায় তবে তা কুরআন ও সুন্নাহ এবং জমহুর মুসলিমদের ইজমার অবিকল অনুরূপ।

[১]

হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহির উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টি এভাবে স্পষ্ট করেছেন:

“ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি হাদীস ও তাফসীরের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং অনেক বড় ও সুপরিচিত সমালোচক, বর্ণনার ক্ষেত্রে সমালোচনা ও গবেষণা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ। কিন্তু যখন এই মহান ব্যক্তিই ইতিহাস গ্রন্থ ‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ লিখেন, তখন সমালোচনার সেই মান বজায় থাকে না।”

এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মরহুম হযরত মুফতি সাহেব বলেন:

“ইতিহাস শাস্ত্রে এই সমালোচকগণও এটাই সমীচীন মনে করেছেন যে, কোনো ঘটনা সম্পর্কে যত বর্ণনা পাওয়া যায় সব একত্র করে দেওয়া হোক এবং সেগুলোর ওপর জরাহ-তাদীল (সমালোচনা ও মূল্যায়ন) এবং পর্যালোচনা ও মন্তব্য করার বিষয়টি বিজ্ঞজনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হোক। আর এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির আকস্মিক ভুল নয়, বরং ইতিহাস শাস্ত্রে এই শাস্ত্রের সকল ইমামদের সুচিন্তিত পদ্ধতি এটাই যে, ইতিহাস শাস্ত্রে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাগুলো সমালোচনা ছাড়াই উল্লেখ করা কোনো দোষের বিষয় নয়। কারণ তাঁরা জানেন যে, এই বর্ণনাগুলো দ্বারা দ্বীনের আকিদা ও শরীয়তের বিধান প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং শিক্ষা গ্রহণ, উপদেশ এবং জাতিসমূহের পরিচিতি লাভের উপকারিতা অর্জন করা উদ্দেশ্য। সেগুলো এভাবেও হতে পারে। আর যদি কোনো ব্যক্তি এই ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো থেকে এমন কোনো বিষয়ে দলিল পেশ করতে চায় যার সম্পর্ক ইসলামী আকিদা বা আমলী বিধানের সাথে, তবে এটি তার নিজের দায়িত্ব যে সে বর্ণনার সমালোচনা এবং বর্ণনাকারীদের ওপর জরাহ-তাদীল-এর সেই নীতিমালা অনুসরণ করবে যা হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ও জরুরি; এটি ছাড়া তার দলিল পেশ করা বৈধ নয়। আর এ কথা বলা যে, কোনো বড় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং হাদীসের ইমামের ইতিহাস গ্রন্থে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ আছে, তাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না।”

এই বিষয়টি এই উদাহরণ থেকে বুঝুন যে, উম্মতের মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা চিকিৎসা শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন, যেমন ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর কিছু ব্যক্তির চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর রচিত গ্রন্থও বিদ্যমান রয়েছে। এই ব্যক্তিবর্গ যদি কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রের বইয়ে বিভিন্ন জিনিসের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে এটি লিখেন যে, মদে অমুক অমুক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রয়েছে, শূকরের গোশত, চামড়া ও পশমে অমুক অমুক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রয়েছে; এরপর কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্রের বইয়ে তাঁদের কথা দেখে এই জিনিসগুলোকে বৈধ ঘোষণা করতে শুরু করে এবং দলিল হিসেবে এটি বলে যে, অমুক ইমাম বা আলেম তাঁর বইয়ে লিখেছেন এবং সেখানে এর হারাম হওয়ার কথা উল্লেখও করেননি, তবে কি তার এই দলিল পেশ করা সঠিক হবে? [২]

হযরত মুফতি আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই চমৎকার আলোচনা থেকে এটি ভালোভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐতিহাসিকগণ কেন বর্ণনার বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতার ফয়সালা প্রদান করেননি। এটিও প্রকাশ পেল যে, কোনো ঐতিহাসিক বা মুহাদ্দিসের কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করা এই কথার প্রমাণ নয় যে, তাঁরা সেই বর্ণনাকে কোনো ইসলামী আকিদার পরিপন্থী অর্থেও দলিলযোগ্য মনে করবেন। এই বিষয়টি খোদ সেই আলেমদের

[১] উদাহরণস্বরূপ আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম তাবারীর ‘সারীহুস সুন্নাহ’, হাফেজ যাহাবীর ‘আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল’ এবং ইমাম সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘হাকীকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহ’ দেখুন। এই কিতাবগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত আকিদা ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু এই ইমাম তাবারীর ‘তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক’, হাফেজ যাহাবীর ‘তারীখুল ইসলাম’ এবং ইমাম সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘তারীখুল খুলাফা’-তে দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনাও রয়েছে। যদি প্রতিটি বর্ণনা তাঁদের আকিদার মুখপাত্র হতো, তবে আকিদার ক্ষেত্রে তাঁরা কেন জমহুর মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করতেন?

[২] মাকামে সাহাবা, পৃ. ২৭, ২৮

বিবৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ তিনজন আলেমের বক্তব্য লক্ষ্য করুন যাঁরা হাদীস ও ইতিহাসে সমান পারদর্শী ছিলেন:

ইবনে জারীর তাবারীর বক্তব্য

ইবনে জারীর তাবারী মহান মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ইতিহাসে তাঁর লক্ষ্য ছিল কেবল বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করা। তিনি প্রতিটি বর্ণনার সনদ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে বিজ্ঞজনরা নিজেরাই তা যাচাই করতে পারেন। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) স্বয়ং তাঁর কিতাব সম্পর্কে বলেন:

“পাঠকগণ জেনে নিন যে, এই কিতাবে আমি যে বিষয়বস্তুই উল্লেখ করছি বা যা কিছু লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাতে আমার ভরসা কেবল সেই সংবাদগুলোর ওপর যা আমি উল্লেখ করব এবং সেই বর্ণনাগুলোর ওপর যা আমি তাদের বর্ণনাকারীদের সনদসহ বর্ণনা করব। এতে সেই অংশ খুবই কম যা যুক্তি ও স্বজ্ঞাত অনুমানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে; কারণ অতীতের অবস্থা আমরা না সচক্ষে দেখেছি, না আমরা সেই যুগ পেয়েছি। সেই অবস্থাগুলোর জ্ঞান আমাদের কেবল বর্ণনাকারী ও রাবীদের বর্ণিত সংবাদগুলোর মাধ্যমেই হতে পারে, যুক্তি ও স্বজ্ঞাত নিদর্শনের মাধ্যমে নয়। সুতরাং যদি আমার এই কিতাবে এমন কোনো বর্ণনা থাকে যা পাঠক অদ্ভুত মনে করেন অথবা শ্রোতা অপছন্দ করেন কারণ তার সঠিক হওয়ার কোনো যুক্তি বুঝে আসছে না, তবে এমন ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, এই ধরনের বর্ণনা আমাদের উদ্ভাবন নয়, বরং তা পূর্ববর্তী যুগের বর্ণনাকারীদের থেকে আমাদের কাছে এভাবেই পৌঁছেছে। আমরা তা সেভাবেই পেশ করেছি যেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।” [১]

ইবনে জারীরের এই বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় জানা যায়: এক হলো তিনি বর্ণনাগুলো হুবহু নকল করেছেন। দ্বিতীয়ত, এতে এটাও বিবেচনা করেননি যে যুক্তির বিচারে কোনো ঘটনা এভাবে ঘটা সম্ভব ছিল কি না। তিনি এ ধরনের সন্দেহজনক ঘটনাগুলো বর্ণনা করা সত্ত্বেও এর দায়ভার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীদের ওপর চাপিয়েছেন এবং নিজেকে কেবল একজন মধ্যবর্তী মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছেন যিনি অতীতের লোকদের বক্তব্যগুলো সামনে পৌঁছে দিচ্ছেন। সঠিক বা ভুলের ফয়সালা তিনি পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল আসীর জাযারীর বক্তব্য

ইবনুল আসীর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সংকলন ‘আল-কামিল ফিত তারিখ’-এ তাবারীর বর্ণনাগুলো থেকে সনদ এবং পুনরাবৃত্ত বর্ণনাগুলো বাদ দিয়ে একত্রিত করেছেন। দুর্বল বর্ণনাকারীদের অনেক সমালোচনামূলক বিষয়বস্তু এতেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইবনুল আসীর আল-জাযারী যেখানে তাঁর রচনার প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করেন, সেখানে তিনি এই বিষয়বস্তুর তাহকীক বা এর বিশুদ্ধতার দায়ভার নেওয়ার কোনো উল্লেখ করেননি, বরং পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে তিনি অধিকাংশ বিষয়বস্তু তাবারী থেকে নিয়েছেন এবং তা সুবিন্যস্তভাবে নকল করেছেন।

আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) বলেন:

“আমি তাবারীর ইতিহাস দিয়ে শুরু করেছি, কারণ এটিই এমন কিতাব যার সবাই হাওয়ালা দেয় এবং এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং আমি এর সমস্ত (বছরের) ঘটনাবলী গ্রহণ করেছি। কোনো বছরের...”

[১] তারিখুত তাবারী: ১/৮

কোনো অবস্থাতেই হস্তক্ষেপ করেননি। তবে তাবারী একই ঘটনার অনেকগুলো বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার মধ্যে প্রতিটি বর্ণনা পূর্ববর্তী বর্ণনার মতোই, কেবল সামান্য কম বা বেশি রয়েছে। তাই আমি তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনাটি গ্রহণ করেছি এবং তা উদ্ধৃত করেছি। এরপর অন্যান্য বর্ণনা থেকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এতে অন্তর্ভুক্ত করেছি যা এই (পূর্ণাঙ্গ) বর্ণনায় ছিল না। আমি প্রতিটি বিষয়কে তার নিজ স্থানে বসিয়ে দিয়েছি। ফলে সেই ঘটনার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়, যা আলাদা আলাদা সনদে বর্ণিত ছিল, একটি সুশৃঙ্খল ধারায় চলে এসেছে যেমনটি আপনি দেখতে পাবেন। এর থেকে অবসর হওয়ার পর আমি অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদদের থেকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি যা তাবারীর ইতিহাসে ছিল না এবং প্রতিটি বিষয়কে তার নিজ স্থানে রেখে দিয়েছি।“ [১]

এ থেকে জানা গেল যে, ইবনুল আসীর মূলত তাবারীর বর্ণনাগুলোই উদ্ধৃত করেছেন। বর্ণনার পুনরাবৃত্তি এবং সনদ বাদ দিয়ে তিনি ঘটনাগুলোকে সুসংবদ্ধ করেছেন। তবে তিনি এই বর্ণনাগুলোর বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি তাবারীর বর্ণনার সনদগুলো যাচাই করে সঠিক ও ভুলকে আলাদা করার কোনো দাবি করেননি। এর সাথে তিনি নিজেই বলছেন যে, তিনি এমন অনেক বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা তাবারীতে নেই।

যেহেতু আল্লামা ইবনুল আসীর এই বর্ণনাগুলোর জন্য অন্য কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি দেননি, তাই এগুলোর সনদ খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। যদি কোনো বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর কোনো বর্ণনা দুর্বল বা বানোয়াট সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য হবে।

হাফেজ ইবনে কাসীরের বর্ণনা:

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সমালোচক এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেও এই ধারণা সঠিক নয় যে, তিনি যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা নিশ্চিতভাবেই সহীহ সনদে হবে, কারণ খোদ হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এমন দাবি করেননি। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর রচনার পদ্ধতি বোঝা জরুরি। তাঁর লক্ষ্য কেবল সহীহ বর্ণনাগুলো বর্ণনা করা ছিল না। বরং তিনি মূলত ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনাগুলোই পেশ করেছেন। এর মধ্যে এমন বর্ণনাও রয়েছে যা যযীফ বা সমালোচনার যোগ্য। এর পাশাপাশি তিনি হাদীস ও ইতিহাসের অন্যান্য সংকলন থেকে পাওয়া নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোও উদ্ধৃত করেছেন, যা ঘটনার এক ভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরে। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এভাবে অত্যন্ত সততার সাথে উভয় পক্ষের দলিলগুলো একত্রিত করেছেন যাতে ন্যায্যনিষ্ঠ পাঠকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

যদিও হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর চেষ্টা এটাই ছিল যে সন্দেহজনক ও বানোয়াট বর্ণনাগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করা হোক, তবুও তিনি সব জায়গায় এটি স্পষ্ট করেননি যে এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নাকি যযীফ। অনেক স্থানে তিনি যযীফ বর্ণনাগুলো কোনো মন্তব্য ছাড়াই উদ্ধৃত করেছেন। যেমন কারবালার ঘটনায় তিনি আবু মিখনাফের বর্ণনাগুলো অনেক পৃষ্ঠা পর্যন্ত উদ্ধৃত করে গেছেন, কিন্তু কোথাও এর দুর্বলতা উল্লেখ করেননি।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ইবনুল আসীর আল-জাযারী: ১/৭।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — সপ্তম খণ্ড

অবশ্যই কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার শেষে তিনি নিজেই বলেন:

“আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তার কিছু অংশ সন্দেহজনক। যদি ইবনে জারীর তাবারীর মতো হাফেজ ও ইমামগণ এটি বর্ণনা না করতেন, তবে আমিও এটি বর্ণনা করতাম না। এর অধিকাংশ অংশ আবু মুখনাফ থেকে বর্ণিত, যে শিয়া ছিল এবং ইমামদের নিকট ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল। কিন্তু যেহেতু সে একজন ইতিহাসবিদ (আখবারী) এবং ঘটনাবলী সংরক্ষণকারী ছিল এবং তার কাছে এমন অনেক কথা ছিল যা অন্যদের কাছে পাওয়া যায় না, তাই পরবর্তীকালের অনেক লেখক এই কাহিনীর ক্ষেত্রে তার বর্ণনাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্রহণ করে নিয়েছেন।” [১]

মোদাকথা হলো, কোনো বর্ণনা ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর বা অন্যান্য বুজুর্গদের ইতিহাসে থাকা মানেই তা সহীহ সনদের অধিকারী এবং দলিল হওয়ার প্রমাণ নয় যে, তা থেকে কোনো আকিদা গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হবে। হ্যাঁ, যদি এই বুজুর্গগণ নিজেরা বলেন যে এই বর্ণনাটি সহীহ এবং আমাদের নিকট এর দ্বারা এই মাসআলাটি প্রমাণিত হচ্ছে, তবে বিষয়টি ভিন্ন। কিন্তু যদি তারা বর্ণনাটি কেবল উদ্ধৃত করে থাকেন, তবে কোনো মাসআলা আলোচনার সময় সেটিকে সনদ ও মতন (মূল পাঠ) উভয় দিক থেকে যাচাই করা হবে। তখনই কেবল সেটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দুর্বল বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা কোন শর্তের অধীনে ছিল?

কিছু লোক মনে করেন যে, “প্রাচীন আলেমদের মাজরুহ (সমালোচিত), বিদআতী ও সন্দেহজনক রাবীদের (বর্ণনাকারী) থেকে তথ্য নেওয়া এবং দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করা কোনো শর্তের অনুসারী ছিল না; বরং এটি ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে কম বুঝা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা সুচিন্তিত ইসলাম-বিদ্বেষ, যার কারণে তারা সব ধরনের রাবীর কাছ থেকে সব ধরনের তথ্য বর্ণনা করে গেছেন।” অথচ বিষয়টি মোটেও তেমন ছিল না। এই মহান ব্যক্তিদের নিকট কিছু মূলনীতি নির্ধারিত ছিল, যার আলোকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই ধরনের বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করা, পড়া এবং সতর্কতার সাথে সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছিল। উসূলে হাদীসের আলেমগণ এই শর্তগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

পথভ্রষ্ট ফেরকার বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মানদণ্ড:

হাফেজ ইবনে হাজার রহঃ বিদআতী ও পথভ্রষ্ট ফেরকার বর্ণনাকারীদের বর্ণনা গ্রহণ বা বর্জনের শর্তাবলী এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এমন ব্যক্তির বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে যে শরীয়তের এমন কোনো মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত) বিষয় অস্বীকার করে যা দ্বীনের অংশ হিসেবে অকাট্যভাবে পরিচিত, অথবা যে এর বিপরীত কাজ করে। (অর্থাৎ এমন কোনো বিষয়কে প্রমাণিত মনে করে যা শরীয়ত অনুযায়ী অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ)।” [২]

এর অর্থ হলো, এমন বর্ণনাকারী যে বিদআতী কিন্তু তার পথভ্রষ্টতা কুফরের পর্যায়ে পৌঁছায়নি, তবে তার বর্ণনা গ্রহণ করা যেতে পারে। শর্ত হলো, সেই বর্ণনায় এমন কোনো مواد (তথ্য/উপাদান) থাকতে পারবে না যা ওই বিদআতী বর্ণনাকারীর ভুল মতাদর্শকে সমর্থন করে। যদি কোনো বর্ণনাকারী বিদআত বা ভ্রান্ত আকিদায় লিপ্ত থাকে এবং সাথে সাথে তার বর্ণনায় ইসলামী আকিদা ও মতাদর্শের পরিপন্থী...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/২৭৬, ২৭৭।

[২] والمعتد ان الذى ترد رواية من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه - (৪)।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

কোনো কথা থাকে, তবে এই সম্ভাবনা তৈরি হয় যে সে এমন সব কথা নিজে তৈরি করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এমন অবস্থায় সেই বর্ণনাটি অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। [১]

যঈফ বর্ণনা উদ্ধৃত করা বা তার ওপর আমল করার বিধান কী?

যঈফ বর্ণনা সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন তৈরি হয়:

১. এটি উদ্ধৃত করা কেমন?

২. এর ওপর আমল করা কেমন?

আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) ‘তাদরীবুর রাবী’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যার সারকথা হলো:

যঈফ বর্ণনা উদ্ধৃত করা জায়েজ, শর্ত হলো তার দুর্বলতা যেন এত বেশি না হয় যে তার ওপর ‘মাওযু’ (জাল) হওয়ার হুকুম আরোপিত হয়।

যঈফ বর্ণনার ওপর আমল করাও দুটি শর্তের সাথে জায়েজ:

- এই বর্ণনায় ইসলামী আকিদার পরিপন্থী কোনো কথা না থাকে। (সুতরাং যদি যঈফ বর্ণনায় আল্লাহর গুণাবলি, নবীদের মাসুম হওয়া বা সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির পরিপন্থী কোনো কথা থাকে, তবে তা বর্জন করা হবে।)
- এতে ইসলামের সুনির্ধারিত বিধানের (হালাল ও হারাম) পরিপন্থী কোনো কথা না থাকে।

[২]

মুহাদিসগণের পরিভাষা বোঝার প্রয়োজনীয়তা:

কোনো বর্ণনাকে ‘সহীহ’ বা ‘হাসান’ ঘোষণা করা অনেক বড় দায়িত্ব। একইভাবে কোনো বর্ণনাকে ‘যঈফ’ বা ‘মাওযু’ অর্থাৎ জাল ও বানোয়াট হওয়ার হুকুম দেওয়াও কোনো সাধারণ বিষয় নয়, বরং এটি ইলমে হাদিসের বিশেষজ্ঞদের কাজ।

কিছু লোক জারহ ও তাদীল (সমালোচনা ও প্রশংসা) এর কিতাব খুলে বসেন কিন্তু হাদিসের মূলনীতি সম্পর্কে অবগত নন, তাই কোনো বর্ণনা সম্পর্কে জারহ ও তাদীলের ইমামগণের মতামত যেমন: ‘লা ইয়াসিহু’ (সহীহ নয়), ‘লা ইয়াসবুত’ (প্রমাণিত নয়) ইত্যাদি দেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যে এই বর্ণনাটি বানোয়াট। এর চেয়েও বড় কথা হলো, কোনো রাবী (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে ‘যঈফ, ওয়াহু, গায়রে সিকাহ, শিয়ী, লাইসা বিশাই’ এর মতো জারহ বা সমালোচনামূলক শব্দ দেখে নিজের পক্ষ থেকে এটি স্থির করে নেন যে তার সমস্ত বর্ণনা পুরোপুরি বানোয়াটই হবে। কিছু লোক তো এখানে এমন কারিশমা দেখান যে, কোনো ব্যক্তিত্বের বর্ণনা এবং তার ইলমী খিদমতকে কলমের এক খোঁচায় বাতিল করার জন্য তার সম্পর্কে দুই-চারজন ব্যক্তির জারহ বা সমালোচনাকে তো খুব জোরেশোরে পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু তার সম্পর্কে বড় বড় ইমামগণের তাদীল বা প্রশংসার ডজন ডজন উক্তিকে বেমালুম হজম করে যান। [৩]

[১] অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে সেই ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যে তার বিদআতের দিকে আহ্বানকারী নয়, তবে যদি সে এমন কিছু বর্ণনা করে যা তার বিদআতকে শক্তিশালী করে তবে তা অগ্রাহ্য করা হবে। (নুখবাতুল ফিকার, ইবনে হাজার আসকালানী, পৃ. ৩)

[২] তাদরীবুর রাবী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী: ৩৫০/১, ত. দারু তাইয়েবা।

[৩] একটি গোষ্ঠী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে এই নীতিই অবলম্বন করে আছে। কিছু মেহেরবান হাদিসের মুজিজাস্বরূপ খাদেম ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী, তাফসীর ও তারিখের প্রথম সংকলক ইমাম তাবারী, সীরাতের প্রথম লেখক মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সান’ানীর মতো উচ্চপদস্থ মুহাদিসগণের সাথেও একই আচরণ করেছেন। আসলে উসূলে হাদিস একটি অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান। কয়েকটি পরিভাষা পড়ে নিজেকে এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মনে করা এবং পূর্বসূরীদের গবেষণার ওপর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমালোচনা করা সম্পূর্ণ ভুল।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা — প্রথম খণ্ড

এই ধরনের ব্যক্তির যখন ‘গবেষণা’ করতে বসেন, তখন মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অদ্ভুত সব কারিশমা দেখান। কারো কাছে হানাফি ফিকহের শত শত দলিলসমূহ দুর্বল এমনকি জাল মনে হয়। কারো কাছে তাফসিরের একটি বড় অংশ কিচ্ছা-কাহিনী মনে হয়। কারো কাছে সীরাত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ বর্ণনা উপকথা বলে গণ্য হয় এবং কেউ কেউ ইসলামের ইতিহাসের মৌলিক উৎসগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়ার যোগ্য মনে করেন। আফসোস! এই ব্যক্তির যদি উপমহাদেশের মহান ফকিহ আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (রহ.)-এর এই বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করতেন:

“মুহাদিসগণ যখন বলেন যে এই হাদিসটি যঈফ, তখন তাদের উদ্দেশ্য থাকে যে আমাদের সামনে সহীহ হওয়ার শর্তাবলি প্রকাশ পায়নি। এর অর্থ এই নয় যে, সেই বর্ণনাটি বাস্তবে মিথ্যা। কারণ এটি সম্ভব যে একজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী সত্য বর্ণনা করছে এবং প্রচুর ভুলকারী ব্যক্তি সঠিক কথা বর্ণনা করছে। অধিকাংশ আলেমদের বক্তব্য এটাই।” [১]

তিনি আরও বলেন:

“মুহাদিসগণ অনেক সময় বলেন: ‘লা ইয়াসিহ্, ওয়া লা ইয়াসবুতু’ (এটি সহীহ নয় এবং প্রমাণিত নয়)। যাদের (বর্ণনার মূলনীতি সম্পর্কে) জ্ঞান নেই, তারা এর দ্বারা বুঝে বসেন যে প্রতিটি বর্ণনাই বানোয়াট বা যঈফ। অথচ এই ধারণা মুহাদিসগণের পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তাদের স্পষ্ট বক্তব্য সম্পর্কে অনবহিত থাকার ফল। মোল্লা আলী হারী ‘তায়কিরাতুল মাওয়ুআত’-এ লিখেছেন যে, ‘কোনো কথা প্রমাণিত না হওয়ার দ্বারা সেটি বানোয়াট হওয়া আবশ্যিক হয়ে যায় না’।”

এছাড়া অন্য জায়গায় তিনি বলেন:

“বর্ণনা সহীহ না হওয়ার দ্বারা এটি আবশ্যিক হয় না যে সেটি বানোয়াট হবে।” [২]

সাহাবী ও তাবেরীদের যুগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের সংকলন পদ্ধতি সঠিক ছিল না ভুল?

আমরা ঐতিহাসিক বর্ণনা উপস্থাপনের প্রাচীন পদ্ধতির নিন্দা করা এবং আসলাফদের দোষারোপ করাকে সঠিক মনে করি না। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের ওপর কোনো অপবাদ দেওয়া বর্ণনার মূলনীতি না বোঝারই ফল। যদি কেউ ঐতিহাসিক গবেষণার গুরুত্ব বোঝার সময় আসলাফদের প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে, তবে আমরা তার ভুল ধারণা দূর করতে চাই। অবশ্য বর্তমান যুগে অর্পিত দায়িত্বকেও উপেক্ষা করা যায় না, যার অনুভূতি আমরা অন্যদেরও দিতে চাই।

আসলাফ এবং আমাদের আকাবিরদের মধ্যে কারো এই দাবি ছিল না যে ইতিহাসের কিতাব থেকে আকিদা গ্রহণ করা হবে, আর না তারা এটি বলতেন যে ইতিহাসের প্রতিটি বর্ণনা প্রতিটি ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, আর না কেউ এটি বলতেন যে ইতিহাসে যঈফ ও মাওয়ু বর্ণনা নেই। এই বাস্তবতা তার নিজ স্থানে অটল যে সেগুলোতে সহীহ, যঈফ এবং কিছু মাওয়ু বর্ণনা মিশ্রিত রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ তাদের বর্ণনাগুলোকে মুহাদিসগণের পদ্ধতিতে নিজ নিজ সনদ বা সূত্রের পরম্পরার সাথে পেশ করেছেন, যার মাধ্যমে বিজ্ঞ আলেমগণ সহীহ, হাসান এবং যঈফ শনাক্ত করতে পারেন। এই কারণেই ইতিহাসের কিতাবসমূহের অধিকাংশ উপাদানকে জারহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞগণ নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করে আসছেন।

[১] আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল লি-আবীল হাসানাত আব্দুল হাই লখনভী, পৃ. ১৮৯

[২] আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল, পৃ. ১৯১

এটা স্বীকৃত যে আকিদা, আহকাম ও সুন্নাহর আলোচনায় যয়ীফ (দুর্বল) বর্ণনাগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে উসূলে হাদীস বিশারদগণ সেই সব যয়ীফ বর্ণনাকেও অগ্রহণযোগ্য বলেছেন যা ইসলামী আকিদার পরিপন্থী, বিদআতকে সমর্থন করে এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যয়ীফ উপাদান সব জায়গায় সব সময় বর্জনীয়। কিছু ব্যক্তির এই ধারণা যে যয়ীফ বর্ণনাগুলোকে পুরোপুরি বর্জন করা উচিত, তা আপাতদৃষ্টিতে যতই সতর্কতামূলক মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এটি একটি চরমপন্থী আচরণ; কারণ এর ফলে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের একটি বড় অংশ পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। আমলের ফযীলত, সাহাবায়ে কেরামের বিজয়গাথা, তাঁদের ফযীলত ও মর্যাদা এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বিশাল ভাণ্ডার থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে ফযীলত ও মর্যাদা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে গ্রহণ করা হয়, তেমনি ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও যয়ীফ বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য হয়। হাফেজ ইবনে কাসীর, হাফেজ যাহাবী, হাফেজ ইবনে হাজার, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিমের মতো সতর্ক ও সমালোচক ব্যক্তিবর্গও এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় খুঁজে পাননি। মধ্যপন্থা এটাই যে, যয়ীফ বর্ণনাগুলো থেকে মূলনীতির অধীনে ফায়দা হাসিল করা হবে।

একটি বর্ণনাকে একাধিক লেখকের উদ্ধৃত করা কি তার নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ?

তবে এর অর্থ এটাও নয় যে, যয়ীফ বর্ণনাগুলোকে সব জায়গায় নিশ্চিত স্তরের মর্যাদা দেওয়া হবে। কিছু মানুষের ধারণা যে, এক-আধ জায়গায় বর্ণিত যয়ীফ বর্ণনা সন্দেহজনক হতে পারে, কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা যদি অনেকগুলো বইয়ে উদ্ধৃত হয় বা খুব প্রসিদ্ধ হয়, তবে তা নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য স্তরের মর্যাদা লাভ করে।

এটিও একটি ভাসাভাসা চিন্তা। ঐতিহাসিক বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না যে তা ডজনখানেক বইয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। কোনো সংবাদপত্রের খবর বা থানায় দায়ের করা রিপোর্টের মতো, কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনার নির্ভরযোগ্য বা সন্দেহজনক হওয়া এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যে, এর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কারা ছিলেন? কতজন ছিলেন? এবং তাঁদের থেকে যারা বর্ণনা করেছেন তারা কেমন লোক ছিলেন? এরপর সেই বর্ণনাকারীদের থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত মধ্যবর্তী সূত্রগুলো কি শক্তিশালী ছিল নাকি তাদের মধ্যে কোনো সূত্র দুর্বলও ছিল?

এই বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখা উচিত যে, কোনো সংবাদ বর্ণনাকারীদের ধারাটি একটি শিকলের কড়িগুলোর মতো। শিকলের প্রতিটি কড়ি মজবুত হওয়া জরুরি। যদি একটি কড়িও দুর্বল হয়, তবে পুরো শিকলটিই অকেজো হয়ে যাবে। একইভাবে শুরুতে, শেষে বা মাঝখানে কোনো রাবী (বর্ণনাকারী) দুর্বল হওয়ার কারণে পুরো সংবাদের মর্যাদা দুর্বল হয়ে যায়।

যদি কোনো ঘটনা শুরুতে একজন দুর্বল সাক্ষী বর্ণনা করে থাকেন, তারপর তার থেকে তিনজন ব্যক্তি তা বর্ণনা করে নিজেদের বইয়ে লিখে থাকেন এবং পরবর্তীতে শত শত আলেম ও গুণী ব্যক্তি তা উদ্ধৃত করেন, তবে এভাবে একে অপরের থেকে বর্ণনা করে যাওয়ার ফলে মূল ঘটনার সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো শক্তির সৃষ্টি হয় না। যদি শুরুর বর্ণনাকারীরা দুর্বল হন, তবে ঘটনাটি দুর্বল হিসেবেই প্রমাণিত হবে।

এর উদাহরণ এমন যে, কোনো ব্যক্তি একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দেখে বলল যে, এটি অমুক মন্ত্রী সাহেবের কাজ। এই কথাটি দশজন লোক শুনল। সেই দশজনের থেকে শুনে পঞ্চাশজন আলোচক এই বিষয়ে নিন্দামূলক বক্তব্য দিয়ে ফেললেন। এতে মন্ত্রী সাহেবের অপরাধী হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল না। একজন সাধারণ মানুষের কাছে এই কথাটি নিশ্চিত মনে হলেও জ্ঞানতাত্ত্বিক...

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমাহ্ | দ্বিতীয় খণ্ড

মিজানে এই বিষয়টি প্রমাণের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। যদি কোনো আদালতে এই মামলা পেশ করা হয়, তবে উজির সাহেবের বিরুদ্ধে ওই দশজন ব্যক্তি এবং পঞ্চাশজন পর্যবেক্ষকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। সাক্ষ্যের জন্য কেবল সেই প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে তলব করা হবে। যদি সে নির্ভরযোগ্য হয় এবং নিজের বক্তব্যের কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে উজির সাহেবকে অপরাধী গণ্য করা হবে, অন্যথায় নয়।

জাল বর্ণনার ক্ষেত্রে এমনটি প্রচুর ঘটে থাকে যে, ঘটনাটি একজন অবিশ্বস্ত রাবি থেকে বর্ণিত হয়; সেই রাবি এটি নিজে তৈরি করে অথবা মূল বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে শোনায়ে। এভাবে সে সামনে আরও অনেক বর্ণনাকারী তৈরি করে নেয়। এই বর্ণনাকারীদের থেকে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণ করে নেন, কারণ সেই ঘটনায় যে বিবরণ থাকে তা তারা অন্য কোথাও পান না। ধীরে ধীরে এই বিষয়টিকে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হয়, অথচ এর ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল থাকে।

□□□

যদি একজন যঈফ রাবি অনেক থিকাহ রাবিদের থেকে ঘটনা বর্ণনা করে, তবে কি তা নির্ভরযোগ্য হবে?

একটি প্রশ্ন এই যে, যদি কোনো রাবি নিজে যঈফ হয় কিন্তু তার উস্তাদগণ থিকাহ হন যাদের থেকে সে এই বর্ণনাটি নকল করছে, তবে কি এমন বর্ণনা শক্তিশালী হিসেবে গণ্য হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরও নেতিবাচক। এমন সনদ দুর্বল হিসেবে গণ্য হবে। যেমন মাঝখানে দুর্বল কড়া থাকা শিকল দুর্বল হিসেবে গণ্য হয়। একে উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বুঝুন যে, কোথাও খুনের কোনো ঘটনা ঘটল। এর কয়েক বছর পর কোনো ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য দিল যে, আমাকে অমুক অমুক বুজুর্গ বলেছিলেন যে তারা এই খুনটি স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং খুনি ছিল অমুক অমুক। তবে এই সাক্ষ্যকে সেই বুজুর্গদের সাক্ষ্যের সমতুল্য মনে করা হবে না, কারণ এটি পুরোপুরি সম্ভব যে এই ব্যক্তি তাদের দিকে মিথ্যা আরোপ করছে। হ্যাঁ, যদি সেই বুজুর্গরা নিজে এসে সাক্ষ্য দিতে পারেন তবে তাকে শক্তিশালী সাক্ষ্য মানা হবে। যদি তারা ইন্তেকাল করে থাকেন তবে এই ব্যক্তির কথাকে সেই বুজুর্গদের বক্তব্য হিসেবে মানা হবে না। সুতরাং যঈফ রাবি যদি থিকাহ রাবিদের নাম নিয়ে কোনো বর্ণনা শোনায়ে, তবে তা সন্দেহজনকই গণ্য হবে।

এখানে এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিন যে, জালিয়াত রাবিরা অনেক সময় কোনো ঘটনা তৈরি করে তার সনদও নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে নেয়। কখনো কখনো একটি জাল ঘটনার অনেকগুলো সনদ বানিয়ে নেয় যাতে বড় বড় থিকাহ রাবিদের নাম থাকে; এভাবে তারা প্রকাশ করে যে আমার কাছে অমুক, অমুক এবং অমুক বুজুর্গ এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিসগণ এমন বর্ণনা চেনার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন, তা হলো গভীরভাবে দেখা যে এই ঘটনাটি সেই বুজুর্গদের থেকে এই যঈফ রাবি ছাড়া তাদের অন্য ছাত্ররাও বর্ণনা করেছে কি না। আর যদি বর্ণনা করে থাকে তবে কি একই শব্দে নাকি ভিন্ন শব্দে, এবং শব্দের এই পার্থক্য কি সামান্য নাকি অস্বাভাবিক। যদি এই ঘটনাটি সেই বুজুর্গদের থেকে অন্যান্য থিকাহ ছাত্ররাও বর্ণনা করে থাকে এবং একই ঢঙে, তবে এই যঈফ রাবির বক্তব্যকেও মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু যদি সনদে নাম তো বড় বড় বুজুর্গদের থাকে, কিন্তু সেই বুজুর্গদের থেকে সারা বিশ্বে কেবল এই একজন যঈফ রাবিই এই কথাটি বর্ণনা করে থাকে, তবে...

এই বিষয়টিকে সন্দেহজনক মনে করা হবে। এর দ্বারা কোনো দলিল পেশ করার সুযোগ থাকবে না।

যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয়, তবে আবু মুখনাফ এবং নাসর বিন মুজাহিমের মতো মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের সনদে আপনি এই দুর্বলতা জায়গায় জায়গায় দেখতে পাবেন। এই কারণেই মুহাদিসগণ তাদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতেন না।

হাফিজ ইবনে কাসীর এবং আল্লামা ইবনে খালদুন কেন সমস্ত সন্দেহজনক বর্ণনার ওপর মন্তব্য করেননি?

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) এবং আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.)-এর মতো গবেষকগণ অনেক জায়গায় ঐতিহাসিক বর্ণনার সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করেছেন এবং রেওয়ায়েত ও দিরায়াতের মূলনীতি ব্যবহার করে এমন অনেক দুর্বল উপকরণের ওপর জেরা করেছেন, যেগুলোকে মানুষ চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করতে শুরু করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তিবর্গ অনেক স্থানে সন্দেহজনক ও দুর্বল উপকরণকে উপেক্ষা করেছেন। তবে কি এই ব্যক্তিবর্গ সেই উপকরণের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না?

আসল কথা হলো, প্রতিটি যুগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা থাকে যা সেই সময়ের সমাজে আলোচিত হতে থাকে এবং সেই সমস্যাগুলো সম্পর্কে ভুল ধারণা খুব সাধারণ হয়ে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই একজন গবেষক সেই সাধারণ ভুল ধারণাগুলো দূর করাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। আমাদের কর্মপদ্ধতিও এমনই হয়। আমরা আমাদের সামনে প্রতিদিন কতই না ভুল হতে দেখি, কিন্তু আমরা আমাদের প্রবন্ধ, আলোচনা, খুতবা এবং বক্তৃতা ও বিবৃতিতে সেই বিষয়গুলোকেই তুলে ধরি যেগুলোতে বেশি মানুষ লিপ্ত থাকে। একইভাবে হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) এবং আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ তাঁদের যুগে ইতিহাসের যেসব ভুল ধারণা দূর করেছেন, সেই যুগে সেগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ের বিষয়গুলো ভিন্ন। আজ সাহাবীদের সাথে সম্পর্কিত ইতিহাসের প্রতিটি তুচ্ছ বর্ণনা নিয়ে তা থেকে বিভিন্ন ধরনের দলিল পেশ করা হচ্ছে। তাই এই বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, এগুলো কি আসলেই দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য কি না, তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর যদি দ্বীনের ভিত্তি না থাকে, তবে সেগুলোর মধ্যে সহীহ ও যঈফ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা কী?

কেউ বলতে পারেন যে, যখন ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে আমাদের দ্বীন ও ঈমান এবং আকীদা ও আহকামের কোনো সম্পর্ক নেই, তখন আমরা সেগুলোতে কেন গবেষণা ও অনুসন্ধান করব? এর আসলে প্রয়োজনীয়তা কী?

এ বিষয়ে আরজ এই যে, আজকাল ইতিহাসের ছাত্রের জন্য এটি যাই হোক জরুরি। আজকাল যে ব্যক্তি ইতিহাস অধ্যয়ন করে, এটি তার জন্য আহকামের নয়, বরং ঈমানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যদি সে সহীহ ও যঈফ বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে না পারে, তবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তার মন সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়ে পড়ে, যার ফলাফল এমনও হতে পারে যে সে এই মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। যেহেতু সাহাবীগণই রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং উম্মতের মাঝখানে সেই প্রথম যোগসূত্র যার মাধ্যমে উম্মতের কাছে দ্বীন পৌঁছেছে। তাই তাঁদের প্রতি আস্থাহীনতা এবং তাঁদের ওপর সমালোচনা করার ফলাফল পুরো দ্বীন সম্পর্কে কুধারণা এবং ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার রূপ নিতে পারে। অতএব, ইতিহাসের সেই অংশ যা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণনা করে (যা প্রায় ১০০ হিজরি পর্যন্ত), তা ঠিক সেই সতর্কতা ও যাচাই-বাছাইয়ের সাথে পড়া উচিত যেমনটি হাদীস পড়া হয়।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাদিসগণের নিজস্ব পরিভাষায় সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজকেও ‘হাদিস’ বা ‘আসার’-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। তাঁদের কথা, কাজ এবং সমর্থনকে শরয়ী দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারণেই তাঁদের মানদণ্ড বারবার যাচাই ও পরীক্ষা করা হয়েছে।

তাহলে কি এটা জরুরি নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত সেই বর্ণনাগুলোকেও পূর্ণ সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে দেখা হবে যেগুলোর সম্পর্ক সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের আমানত ও বিশ্বস্ততার সাথে গিয়ে মিলেছে? যদি একজন সাহাবীর দিকে নিসবতকৃত কোনো কথা আহকামের (বিধানের) ক্ষেত্রে এই কারণে গ্রহণ করা না হয় যে, মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী সন্দেহভাজন মনে হচ্ছে, তবে এমন বর্ণনাকেও কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া হুবহু গ্রহণ করা যাবে না যা স্বয়ং সাহাবীর ন্যায়পরায়ণতা ও দ্বীনদারীকে প্রভাবিত করছে এবং তার বর্ণনাকারী দুর্বল বা সন্দেহভাজন।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব (দা.বা.) বলেছেন:

“ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের বর্ণিত সেই ঘটনাগুলোকেও বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া হবে যেগুলোর প্রভাব আকিদা বা আহকামের ওপর পড়ে। কোনো কথা কেবল ‘ঐতিহাসিক’ হওয়ার ফয়সালা শুধু এই কথার ওপর ভিত্তি করে করা যায় না যে, তা কোনো ইতিহাসের কিতাবে লেখা আছে। বরং যদি ইতিহাসের কিতাবগুলোতে আকিদা ও আহকাম সম্পর্কিত কোনো বিষয় আসে, তবে তা যাচাই করার জন্য অবশ্যই সেই নীতিগুলোই ব্যবহার করতে হবে, যা আকিদা ও আহকাম উদ্ধাবনের জন্য নির্ধারিত।”

বাস্তবতা হলো, কিছু বর্ণনাকারীর ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম যে এ কথা বলেছেন যে, ‘তাদের বর্ণনা আহকামের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত এবং সীরাত ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য’, এর দ্বারা সীরাত ও ইতিহাসের সেই ঘটনাগুলো উদ্দেশ্য যেগুলোর দ্বারা আকিদা ও আহকামের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। কোন যুদ্ধ কোন সনে হয়েছে? তাতে কতজন লোক অংশগ্রহণ করেছিল? তার নেতৃত্ব কে দিয়েছিল? তাতে কার জয় আর কার পরাজয় হয়েছিল? স্পষ্টতই এগুলো এবং এ জাতীয় অন্যান্য ঘটনা এমন যে, এগুলোর দ্বারা আকিদা ও আহকামের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। ফলে এসব ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকেও মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদ (মুশাজারাতে সাহাবা) এবং সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতা সংক্রান্ত সেই মাসআলাগুলো যা বিশুদ্ধ আকিদার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যেগুলোর ভিত্তিতে ইসলামে অনেক ফেরকা বা দলের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ওই বর্ণনাকারীদের বর্ণনা কোনোভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। উপরোক্ত মাসআলাগুলোর ফয়সালা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার মজবুত দলিলের মাধ্যমেই হতে পারে।” [১]

তিনি আরও বলেন:

“আহলে সুন্নাতের লেখা আকিদা ও ইলমুল কালামের সমস্ত কিতাব পড়ে দেখুন, সেগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে একমত দেখা যাবে যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশ পাওয়া বিশুদ্ধ আকিদার বিষয় এবং এর প্রমাণ দুর্বল, মাজরুহ, মুনকাতি বা সনদবিহীন ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে হতে পারে না। বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে এই মূলনীতির অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।” [২]

[১] হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা ১৩৫।

[২] হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা ১৩৯।

মুশাজারাতে সাহাবা সংক্রান্ত বর্ণনা, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এবং গবেষণামূলক পদ্ধতি

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের একাদশ বর্ষে (৩৪ হিজরি) মুসলিম বিশ্ব ফিতনার যুগে প্রবেশ করে, যা অন্তত ছয়-সাত বছর স্থায়ী ছিল। এর প্রাথমিক দুই বছরে হযরত উসমান গনি (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন প্রকাশ্যে আসে, যার হোতারা শেষ পর্যন্ত মদিনা মুনাওয়ারায় রাসূলের জামাতার রক্তে হাত রঞ্জিত করে। এরপর চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে কিছু রাজনৈতিক ও ইজতিহাদি মতপার্থক্য দেখা দেয়, যা কিছু ভুল বোঝাবুঝি, কিছু বিচ্যুতি এবং কিছু অশুভ উপাদানের অপতৎপরতার কারণে যুদ্ধে রূপ নেয়। এই যুদ্ধগুলো নিঃসন্দেহে সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু কিছু পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনাকারী এই ঘটনাগুলোকে ভুল রঙে উপস্থাপন করেছেন, যেমনটি হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দামাত বারাকাতুহম) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:

“হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সাবায়ী প্রোপাগান্ডার প্রভাবে সাহাবায়ে কেরামের ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপের ধারা অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল এবং এই প্রোপাগান্ডার প্রভাবে মুশাজারাতে সাহাবা (সাহাবীদের পারস্পরিক বিবাদ)-এর সময়ের ইতিহাসও সংরক্ষিত থাকতে পারেনি।” [১]

সাবায়ী প্রোপাগান্ডা মূলত ছিল একটি দুধারী তলোয়ার। এটি একদিকে যেমন হযরত উসমান, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতো অনেক বড় মাপের সাহাবীর বিরুদ্ধে বানোয়াট বর্ণনা তৈরি করেছিল, তেমনি অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে এই মানসিকতাও ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণকারী অধিকাংশ লোকই ছিল উসমানের হত্যাকারী অর্থাৎ আমাদের সাবায়ী গোষ্ঠীর লোক; হযরত আলী (রা.)-এর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য সাবায়ীদের কারণেই ছিল; হযরত আলী (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে উসমানের হত্যাকারীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল; হযরত আলী (রা.) এই সাবায়ীদের কথা অনুযায়ী চলতেন; সুতরাং এই লোকেরাই ছিল হযরত আলী (রা.)-এর আসল দল এবং এরাই ছিল প্রকৃত মুমিন।

সাবায়ীরা এই বর্ণনাগুলো প্রথমত এজন্য তৈরি করেছিল যাতে তারা নিজেদের দলকে হযরত আলী (রা.)-এর দল এবং নিজেদের গোষ্ঠীকে সত্যপন্থী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের বড় উদ্দেশ্য ছিল সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর কটাক্ষ করা, যাতে মানুষ মনে করে যে হযরত আলী (রা.) খলিফায়ে বারহাক হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নয় বরং সংখ্যালঘু অংশ তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিল। এই ধরনের বানোয়াট বর্ণনার মাধ্যমে সাবায়ী গোষ্ঠী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর দুনিয়াপ্রীতি এবং সত্য থেকে বিমুখ হওয়ার অপবাদ দিতে চেয়েছিল। [২]

[১] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা, পৃ. ১৩৯

[২] নাসেবিয়াত গবেষণার ছদ্মবেশে, মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী (রহ.), পৃ. ২৪৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

এই সাবায়ী প্রোপাগান্ডার একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রভাব এই ছিল যে, যারা হযরত উসমান, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর পক্ষাবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, তারা প্রকৃতপক্ষে এটি ধরে নিয়েছিলেন যে হযরত আলী (রা.)-এর ক্ষমতা সাবায়ীদের কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত সন্দেহজনক ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি এ পর্যন্ত বলতে শুরু করেন যে আলী (রা.) একজন দুনিয়াপূজারী শাসক ছিলেন, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যই ছিলেন না, ফলে তাঁর যুগে যত হত্যা ও যুদ্ধ হয়েছে, তার সমস্ত দায়ভার তাঁরই ওপর। [১]

এভাবে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষাবলম্বন করার প্রচেষ্টায় এই লোকেরা ভুল পথে পরিচালিত হন। সাবায়ীদের অনুসারীরা তো সরাসরি সাবায়ী মতাদর্শে প্রভাবিত ছিল, অন্যদিকে এই লোকেরা পরোক্ষভাবে সাবায়ী মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সাহাবী সঙ্গীদের ওপর কেবল সমালোচনা করতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বর্ণনায় কাটছাঁট, সংযোজন এবং অতিরঞ্জন করতে শুরু করে। এভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনার একটি বড় অংশ এমন এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিণত হয়েছে যেখানে প্রবেশ করে কারো পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের যুগের এই ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা না পাওয়ার কারণে মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জন্ম নেয়, যার উত্তর অনেক সময় না মেলায় কেবল সাহাবায়ে কিরামের ওপরই নয় বরং ইসলাম ধর্মের ওপরও আস্থা টলমল করতে শুরু করে। এজন্য ফিতনার যুগ সম্পর্কিত বর্ণনার গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। যার প্রথম পদক্ষেপ হলো ইতিহাসের সঠিক ও ভুল উপাদানগুলোকে আলাদা করা এবং পরস্পরবিরোধী বর্ণনার মধ্য থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতিগুলো ভালোভাবে বুঝে নেওয়া।

সাহাবায়ে কিরাম মাহফুজ (সুরক্ষিত):

ইসলামী আকিদা অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম মাসুম (নিষ্পাপ) নন, তবে অবশ্যই মাহফুজ (সুরক্ষিত)। “মাহফুজ” মানে এই নয় যে কোনো সাহাবীর দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হতে পারে না। এটি হলো “ইসমত” (নিষ্পাপতা) যা কেবল নবীগণের বৈশিষ্ট্য। মাহফুজ-এর অর্থ হলো:

- যদি সাহাবায়ে কিরামের দ্বারা কোনো ভুল হয়েও থাকে, তবে আখেরাতে তারা পাকড়াও থেকে সুরক্ষিত, কারণ তারা অত্যন্ত দ্রুত তওবা ও ইস্তিগফারকারী ছিলেন।
- দুনিয়াতে তারা বিদ্রূপ ও সমালোচনা থেকে সুরক্ষিত। কারো এই অধিকার নেই যে কোনো সাহাবীকে কোনো ভুল বা গুনাহের কারণে মন্দ বলবে বা খারাপ মনে করবে। যদি সহীহ সনদে কোনো সাহাবীর কোনো পদস্থলন প্রমাণিত হয়, তবে উলামায়ে ইসলাম সেই বর্ণনা অস্বীকার করেন না। কিছু সাহাবীর শরাব পান বা চুরি বা কবির গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কথা সহীহ হাদীসে রয়েছে। কিছু সাহাবীর শাসকের বিরুদ্ধে “বিদ্রোহ” (খুরুজ) সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এগুলো অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এই বর্ণনাগুলো সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত:

[১] নাওয়াসিবরা (যারা আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে) তাঁকে গালি দেয় যে তিনি দুনিয়ালোভী জালেম ছিলেন এবং নিজের জন্য খিলাফত চেয়েছিলেন, আর এর জন্য তলোয়ার চালিয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাঁর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৫৯/২)। “এবং তাদের জন্য (অর্থাৎ নাওয়াসিবদের জন্য) এই বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা করা হয়েছে যেমন জাহিজের কিতাবুল উরুবা, এবং একদল লোক মুয়াবিয়ার ফজিলতে অনেক বানোয়াট হাদীস নবী (সা.)-এর নামে বর্ণনা করেছে, যার সবই মিথ্যা এবং তাদের কাছে এই বিষয়ে দীর্ঘ যুক্তি রয়েছে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩০০/৩)

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমাহ

১. খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারা, উম্মাহাতুল মুমিনীন, সাদাত এবং প্রথম সারির সাহাবীদের সম্পর্কে এমন কোনো সহীহ সনদের বর্ণনা কোথাও উল্লেখ নেই।

২. যদি এমন কোনো বর্ণনা পাওয়াও যায়, তবে তাতে সাধারণত ব্যাখ্যার পূর্ণ অবকাশ থাকে। পূর্বাপর বিষয় বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, বর্ণনার উদ্দেশ্য তা নয় যা বাহ্যিক শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে।

৩. কিছু ঘটনায় যা ঘটনা পাঠকারীর কাছে ভুল মনে হয়, তা মূলত সাহাবীর ইজতিহাদ ছিল; অর্থাৎ তিনি নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যদিও জমহুর সাহাবী ও তাবয়ীদের নিকট তা ভুল ছিল।

৪. কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ছিল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। যদি তা ফলাফলের দিক থেকে ফলপ্রসূ প্রমাণিত না হয়, তবে তাকে বড়জোর কৌশল বা ব্যবস্থাপনার ভুল বলা যেতে পারে। এর দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হওয়া আবশ্যিক হয় না।

৫. কিছু সাহাবীর ব্যাপারে কিছু বিচ্যুতি বা কিছু গুনাহের কিছু সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলোর সংখ্যা খুবই কম।

৬. এটিও সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলা এই মহান ব্যক্তিদের থেকে প্রকাশ পাওয়া ভুলগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই পবিত্র আত্মাদের তরবিয়ত এমন ছাঁচে হয়েছিল যে, তাদের দ্বারা কোনো ভুল সংঘটিত হবে আর তারা তার জন্য তওবা করবেন না—এমনটা অসম্ভব।

৭. এই ভুলগুলো সংঘটিত হওয়ার পেছনে আল্লাহর তাকভীনি (সৃষ্টিগত) হিকমতও কার্যকর ছিল। একটি বড় হিকমত ছিল এই যে, ‘মাকামে ইসমত’ (নিষ্পাপত্ব) এবং ‘মাকামে হেফাজত’ (সুরক্ষিত অবস্থা)-এর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আরেকটি হিকমত ছিল শরয়ী বিধানের শিক্ষা এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ। শরয়ী দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কোনো বিধানের বাস্তব নমুনা তখনই সামনে আসা সম্ভব ছিল, যখন কোনো উম্মতীর দ্বারা দণ্ডযোগ্য কোনো কাজ সংঘটিত হতো। আল্লাহর হিকমতে বালেগা (সুগভীর প্রজ্ঞা) সাহাবীদের জীবনে এমন কিছু নমুনাও তৈরি করে দিয়েছেন যাতে দণ্ডবিধি কার্যকর হয় এবং শরিয়ত সব দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে।

৮. এই মহান ব্যক্তির এমন ভুলের আগেও মনোনীত ছিলেন, আর তা সংঘটিত হওয়ার পরেও তেমনি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র রয়ে গেছেন। তওবা, ইস্তিগফার এবং শরয়ী দণ্ডের মাধ্যমে তারা কেবল ক্ষমাই পাননি, বরং তাদের মর্যাদা আগের চেয়েও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সমস্ত আলোচনা সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত বিচ্যুতিসমূহ সম্পর্কে। এগুলোর কারণেও সাহাবায়ে কেরামের মহান মর্যাদা ও শানে কোনো ঘাটতি আসতে পারে না। সীরাত ও চরিত্রের দিক থেকে এই মহান ব্যক্তির সর্বাবস্থায় অত্যন্ত সত্যবাদী, আত্মত্যাগী, মুখলিস, পবিত্র এবং আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন, যেমনটি কুরআন মজিদ স্থানে স্থানে ঘোষণা করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কুরআনী চিত্র:

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে ইসলামী আকিদার ভিত্তি কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীসের ওপর, যেগুলোর সত্যতা সন্দেহাতীত। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান, ইখলাস, আখলাক এবং চরিত্র সম্পর্কে কুরআন মজিদের বর্ণনা হলো:

“আর যারা তাঁর (রাসূল ﷺ-এর) সাথে আছে, তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু।” [১]

[১] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

খণ্ড দ্বিতীয়

[১] **أُولَئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ** “ওরাই তো সুপথপ্রাপ্ত।”

[২] **أُولَئِكَ الَّذِينَ اٰمَنَ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوٰی** “এরাই তারা, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন।”

[৩] **حَقَّ اٰوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ** “এরাই প্রকৃত মুমিন।”

[৪] **وَيُحِبُّهُمُ اللّٰهُ** “আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে।”

[৫] **فَضَلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُوْنَ** “তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।”

অর্থাৎ তাদের দৌড়ঝাঁপ ও সমস্ত কর্মকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এই গুণাবলির অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম থেকে যদি কখনো মানবিক দুর্বলতার কারণে কোনো গুনাহ বা ভুল-ত্রুটি হয়েও যেত, তবে তারা খুব দ্রুত তওবা ও ইস্তিগফারকারী ছিলেন। [৬] আল্লাহ তওবা ও ইস্তিগফার, মহান নেক আমল এবং দ্বীনের জন্য কুরবানির কারণে তাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

[৭] **لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ** “আমি অবশ্যই তাদের গুনাহসমূহ তাদের থেকে দূর করে দেব।”

[৮] **وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ** “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।”

[৯] **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ** “আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।”

এই **نصوص** (নসূস)-এর আলোকে সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র অত্যন্ত চমৎকার, উজ্জ্বল এবং ঈর্ষণীয় মনে হয়। যদি কিছু হাদিস বা কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনায় এর বিপরীত অনুভূত হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, এই বর্ণনাগুলো মানবিক দুর্বলতার কারণে সংঘটিত ভুল-ত্রুটি বা ইজতিহাদি ফয়সালা কিংবা কোনো হিকমতের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

[১] সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৭

[২] সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৩

[৩] সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত: ৫৩

[৪] সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত: ৫৩

[৫] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯

[৬] যেমনটি ঈমানদারদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: **﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾** “আর তারা সেই সব লোক, যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; আর আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা করে ফেলেছে, জেনে-বুঝে তাতে অটল থাকে না।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫)

[৭] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫

[৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৫

[৯] সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৮

আম্বিয়াদের ইসসাত এবং সাহাবায়ে কেরামের আদলতের মধ্যে পার্থক্য:

জমহুর মুসলিমগণ আম্বিয়া কেরামের ইসসাত এবং সাহাবায়ে কেরামের আদলতের প্রবক্তা। আম্বিয়া কেরাম মাসুম এবং সাহাবায়ে কেরাম আদিল।

আম্বিয়াদের ইসসাতের ব্যাখ্যায় হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) এভাবে বলেন:

“গবেষণা এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের ইসসাত সমস্ত গুনাহ থেকে আকলি ও নাকলি ভাবে প্রমাণিত। আইন্মায়ে আরবা এবং জমহুর উম্মত এই বিষয়ে একমত যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সমস্ত ছোট-বড় গুনাহ থেকে মাসুম ও সংরক্ষিত থাকেন।”

তিনি আরও বলেন:

“তবে কুরআন কারীমের অনেক আয়াতে একাধিক নবী সম্পর্কে এমন কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি তিরস্কারও হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাহিনীও এর অন্তর্ভুক্ত। উম্মতের ঐকমত্য অনুযায়ী এই জাতীয় ঘটনাগুলোর সারমর্ম হলো, কোনো ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভুল ও বিস্মৃতির কারণে সেগুলো সংঘটিত হয়েছে; কোনো পয়গম্বর জেনেশুনে আল্লাহ তাআলার কোনো হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। ভুলটি ইজতিহাদী হয়ে থাকে অথবা ভুল ও বিস্মৃতির কারণে ক্ষমাযোগ্য হয়, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় গুনাহ বলা যায় না। আর এই ভুল ও বিস্মৃতি তাঁদের থেকে এমন সব কাজে হতে পারে না যেগুলোর সম্পর্ক তাবলীগী দায়িত্ব, শিক্ষা দান এবং শরীয়ত প্রবর্তনের সাথে; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজ ও আচরণের ক্ষেত্রে এমন ভুল ও বিস্মৃতি হতে পারে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলার নিকট আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ, তাই বড়দের পক্ষ থেকে সামান্য ভুল হলেও তা অনেক বড় ভুল হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারণে কুরআন মাজীদে এই জাতীয় ঘটনাগুলোকে নাফরমানি ও গুনাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর ওপর তিরস্কারও করা হয়েছে, যদিও প্রকৃত বিচারে সেগুলো গুনাহ নয়।” [১]

কি সাহাবায়ে কেরাম ইসসাত প্রাপ্ত?

জমহুর মুসলিমগণ সাহাবায়ে কেরামকে আদিল মনে করেন, মাসুম নয়। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন:

“যে কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর কারো জন্য ইসসাতের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী।” [২]

[১] মাআরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী উসমানী (রহ.): ১/১৯৫।

- স্মরণীয় যে, এক শ্রেণীর মতে আম্বিয়াদের ইসসাতের অর্থ হলো তাঁরা নবুওয়াতের আগে ও পরে সমস্ত কবির গুনাহ থেকে সংরক্ষিত; একইভাবে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে সগিরা গুনাহও লিপ্ত হন না, তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের থেকে সগিরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে, কিন্তু তাঁরা তাতে অটল থাকেন না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ তাঁদের সতর্ক করে তাওবার তাওফিক দান করা হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “জমহুর বলেন: তাঁরা সেগুলোর ওপর অটল থাকা থেকে মাসুম, আর এমতাবস্থায় তাঁদের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তা তাঁদের পূর্ণতারই পরিচায়ক, কেননা আমল শেষ পরিণতির ওপর নির্ভরশীল।” এরপর তিনি বলেন: “জমহুর যে মত গ্রহণ করেছেন, কিতাব ও সুন্নাহর দলিলসমূহ সেটিরই নির্দেশ দেয়, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার এই বাণীও রয়েছে: ‘আর আদম তার রবের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো।’ (সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১২১)”
- তবে হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন যে, উল্লিখিত ইবারতে যে সকল গবেষকদের মত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাঁদের মতে আম্বিয়া কেরামের দিকে যে সকল গুনাহের নিসবত করা হয়েছে, সেগুলো আসলে সগিরা গুনাহও ছিল না বরং তা ছিল ইজতিহাদী ভুল বা মতের ভুল অথবা আকস্মিক বিচ্যুতি যাকে ভুল-ভ্রান্তি বলা যেতে পারে।
- “আল-ফিকহুল আকবার”-এ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইবারতও এই মতকে সমর্থন করে। তিনি বলেন: “আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ওয়াস সালাম সকলেই সগিরা, কবির, কুফর এবং অশ্লীলতা থেকে পবিত্র, তবে তাঁদের থেকে কিছু বিচ্যুতি ও ভুল সংঘটিত হয়েছে।” (আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৩৭)

[২] “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর যে কেউ কারো জন্য ইসসাতের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী।” (আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃ. ৪৭)

অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের ‘ইসমত’ (নিষ্পাপতা)-কে যদি এই অর্থে নেওয়া হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কোনো ভুলের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না, তবে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সঠিক। সকল উলামায়ে কেরামের নিকট উম্মতে মুহাম্মাদিয়া বাতিলের ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে সংরক্ষিত। অর্থাৎ এর দলিল এই যে, তারা কখনো গোমরাহির ওপর ইজমা (ঐক্যমত) করতে পারেন না। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের কোনো ভুল বিষয়ের ওপর ঐক্যমত পোষণ করা আদপেই সম্ভব ছিল না। এই কারণেই জমহুর উলামায়ে উম্মতের নিকট ইজমা একটি অকাট্য শরয়ী দলিল। ইজমা হুজ্জত হওয়ার দলিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)। [১]

উল্লিখিত অর্থ থেকে সরে গিয়ে জমহুর উলামায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের (ব্যক্তিগত) ইসমতের প্রবক্তা নন। এটি সাহাবায়ে কেরামের সম্মানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন, যা থেকে জমহুর উলামায়ে কেরাম নিষেধ করেছেন। [২] সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এই ধারণা করা যে, কোনো সাহাবী থেকে কখনো কোনো সগীরা বা কবীরা গুনাহ হতেই পারে না, প্রকৃতপক্ষে এটি তাদেরকে ইসমতের মাকামে আসীন করা। অথচ ইসমত বা নিষ্পাপতা কেবল আশ্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য। [৩]

কিছু লোক অতিভক্তির কারণে মনে করেন যে, কোনো সাহাবী থেকে কখনো কোনো ইজতিহাদী ভুল এমনকি যৎসামান্য ভুলও হতে পারে না। ফলে যদি কোনো সহীহ রেওয়ায়েতে কোনো সাহাবীর কোনো ভুল, বিচ্যুতি, মানবিক চাহিদা বা অনিচ্ছাকৃত অবস্থার কথা সামনে আসে, তবে তারা দ্বিধাহীনভাবে সেই রেওয়ায়েত অস্বীকার করে বসেন। অথচ দুঃখ, রাগ, ভয়, বিস্মৃতি এবং ভুলের মতো মানবিক অবস্থা ও অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতির সম্মুখীন আশ্বিয়ায়ে কেরামও হয়েছেন। এমনকি আশ্বিয়ায়ে কেরাম থেকেও কিছু ‘গাইরে মানসূস’ (ওহী দ্বারা নির্ধারিত নয় এমন) বিষয়ে ইজতিহাদী ভুল সংঘটিত হয়েছে; তবে পার্থক্য এই যে, ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটি জরুরি যে, ‘আদালতে সাহাবা’-এর সেই অর্থই মনে রাখা উচিত যা জমহুর উলামায়ে ইসলামের নিকট স্বীকৃত।

আদালতে সাহাবার অর্থ:

ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীদের পরিভাষায় ‘আদালত’ এমন একটি গুণ, যা হাদীসের রাবীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে থাকা জরুরি। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যেমন বিচারকের সামনে কোনো মামলায় সাক্ষ্য প্রদানকারীর ‘আদিল’ (ন্যায়পরায়ণ) হওয়া জরুরি, তেমনি হাদীসকে সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য এই শর্তারোপ করা হয়েছে।

[১] “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে গোমরাহির ওপর একত্রিত করবেন না এবং জামাআতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে... এবং যে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলো।” ইমাম তিরমিযী বলেন: আহলে ইলমের নিকট জামাআত বলতে আহলে ফিকহ, আহলে ইলম এবং আহলে হাদীস উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ আহলে ইলমের নিকট জামাআত বলতে ফুকাহা, উলামা ও মুহাদ্দিসীদের জামাআত উদ্দেশ্য)। (সুনানে তিরমিযী, বাবু মা জাতা ফি লুজুমিল জামাআহ, সনদ সহীহ)। হাকেম ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সনদে এটি বর্ণনা করেছেন: “আল্লাহর হাত জামাআতের ওপর।” (আল-মুস্তাদরাক, হা: ৩৯৮ এবং ইমাম বগতী শারহুস সুন্নাহ ১/২১৫-এ এটি বর্ণনা করেছেন)।

[২] “আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের ভালোবাসি এবং তাদের কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি না।” (আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া, পৃ: ৮১)।

[৩] ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী এই মাসআলায় দলিল পেশ করে বলেন: “এর দলিল হলো খুলাফায়ে রাশেদীনের এই স্বীকৃতি যে তারা নিষ্পাপ নন... যেমন আবু বকর (রা.) বলেন: যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো, আর যদি আমি আল্লাহর নাফরমানি করি তবে তোমাদের ওপর আমার আনুগত্য নেই... এবং উমর (রা.) বলেন: আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে আমার দোষগুলো আমাকে উপহার দেয় (অবহিত করে)।” (তামহীদুল আওয়য়িল ওয়া তালখীসুল দালায়েল: ১/৪৬৭, তবা: মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকফিয়াহ)। খুলাফায়ে রাশেদীনের এই স্বীকৃতি যে তারা নিষ্পাপ নন... আবু বকর (রা.) বলেন: আমার আনুগত্য করো যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করি, যখন আমি আল্লাহর নাফরমানি করব তখন তোমাদের ওপর আমার আনুগত্য নেই... এবং উমর (রা.) বলেন: আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে আমার দোষগুলো আমাকে উপহার দেয়। (হযরত উমর (রা.) বিভিন্ন সময়ে এ কথা বলতেন যে, “যদি আলী না থাকতেন তবে উমর ধ্বংস হয়ে যেত”)।

বলা হয়েছে যে রাবীকে (বর্ণনাকারী) আদিল (ন্যায়পরায়ণ) হতে হবে। ফাসিকের (পাপাচারী) বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। [১]

আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) এর অর্থ হলো রাবী বিবেকবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম এবং ফিসক (পাপাচার) এর কারণসমূহ ও আভিজাত্য পরিপন্থী কাজ থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তি হবেন।

[২]

আদালতের গুণ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ বলেন: “দুইজন আদিল ব্যক্তির সাক্ষ্য অথবা (উত্তম) সুখ্যাতির মাধ্যমে আদালত সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং আহলে ইলমদের (বিদ্বানদের) মধ্যে যার আদালত প্রসিদ্ধ এবং যার আদিল হওয়ার প্রশংসা ব্যাপক, তবে তা-ই যথেষ্ট।” [৩]

সাহাবায়ে কেরামের আমানত ও দিয়ানত (বিশ্বস্ততা), পবিত্রতা ও পরহেযগারী, হিদায়াত এবং মহত্ত্ব ও আভিজাত্যের সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআন মাজীদে স্থানে স্থানে বর্ণিত হয়েছে, তাই এখানে অন্য কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। [৪]

[১] রাবীর ক্ষেত্রে আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) শর্ত করা হয়েছে যেমন সাক্ষীর ক্ষেত্রে করা হয়... (আল-মাওযুআতুল ফিকহিয়াহ)।

[২] আস-সাখাভী বলেন: ফিসক গ্রহণযোগ্যতার পথে অন্তরায়... (ফাতহুল মুগীস)।

[৩] “আদালত হলো রাবী প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম, বিবেকবান হওয়া এবং ফিসক ও মুরুওয়াত (আভিজাত্য) পরিপন্থী বিষয় থেকে মুক্ত থাকা...” (আল-মানহালুর রাভী)।

ফিসক বলতে কী বোঝায়? এ বিষয়ে ইমাম শামসুদ্দীন আস-সাখাভী বলেন: “وهي ارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة” (আল-গায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ: ১/১১৯) অর্থাৎ কবির গুনাহ করা অথবা সগিরা গুনাহের ওপর অটল থাকা হলো ফিসক।

মুরুওয়াত (আভিজাত্য) পরিপন্থী কাজ কী কী? মোল্লা আলী কারী বলেন: “كالبول في الطريق، وصحبة الارذال وامثال ذلك، ومجملها الاحتراز عما يذم عرفا” অর্থাৎ রাস্তায় প্রস্রাব করা, নিচ প্রকৃতির লোকদের সাথে চলাফেরা করা এবং এই জাতীয় কাজ। সারকথা হলো, মুরুওয়াত মানে এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা যা লোকসমাজে নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়। (শারহ নুখবাতিল ফিকার, মোল্লা আলী কারী আল-হারাভী: ৪৩৮)।

[৪] “দুইজন আদিল ব্যক্তির সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে অথবা প্রসিদ্ধির মাধ্যমে আদালত সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আহলে ইলমদের মধ্যে যার আদালত প্রসিদ্ধ এবং যার প্রশংসা ব্যাপক, তা-ই যথেষ্ট।” (আত-তাকরীব ওয়াত-তায়সীর লিন-নববী)।

[৫] সুতরাং যদি হাদীস বা ইতিহাসের সহীহ বর্ণনা দ্বারা কোনো কোনো সাহাবীর কিছু ভুলত্রুটি প্রমাণিতও হয়, তবুও তাদের আদালত ও আভিজাত্যের ওপর কোনো প্রশ্ন আসে না। তারা কখনোই ফাসিক সাব্যস্ত হন না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ভুলগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে সেই ভুলগুলোর ব্যাখ্যা সম্ভব নয় যেমন: কোনো কোনো সাহাবীর মদ পান বা চুরি ইত্যাদি, সেখানেও কুরআন মাজীদার আয়াত এবং হাদীসে সাহাবীদের জন্য বর্ণিত সাধারণ মর্যাদা ও সুসংবাদসমূহের প্রেক্ষিতে এটাই বিশ্বাস করা হবে যে, তাদের তওবা ও ক্ষমা নিশ্চিত। তাই তারা ভুল বা গুনাহের আগেও আদিল ছিলেন এবং পরেও আদিল রয়েছেন। আল্লামা সালাহুদ্দীন দামেশকী আল-আলাঈ লেখেন: “পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, সকল সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর আদালত সাব্যস্ত। এটিই তাদের মূল ভিত্তি যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাদের কেউ জেনে-বুঝে এমন কাজ করেছেন যা ফিসক সাব্যস্ত করে। আর আল্লাহর শ্রুতিরূপে যে, তাদের কারো থেকে এমন কিছু স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং যার সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত, তার আদালত নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন নেই এবং তাদের পরবর্তী লোকদের মতো এ বিষয়ে তদন্তেরও প্রয়োজন নেই।” (আত-তাহকীকু মুনিফুর রুতবাহ লিমান সাবাতা লাহ শারীফুস সোহবাহ, পৃ. ৬০)।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব সাহাবীদের আদালতের সঠিক মর্ম এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: “সাহাবায়ে কেরাম মাসুম (নিষ্পাপ) ছিলেন না, আবার ফাসিকও ছিলেন না। হতে পারে যে, তাদের কারো থেকে কখনো মানবিক দুর্বলতার কারণে কোনো বিচ্যুতি বা গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সতর্ক করার পর তারা তওবা করে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই তারা সেই ভুলগুলোর কারণে ফাসিক হননি। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, কোনো সাহাবী গুনাহকে নিজের নীতি বানিয়ে নিয়েছিলেন, যার কারণে তাকে ফাসিক সাব্যস্ত করা যেতে পারে।” (হযরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১৩০)।

আদালতে সাহাবা সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশয়ের জবাব

প্রথম সংশয়:

কিছু লোক এই সংশয়ে পতিত হয়েছে যে, আদালতে সাহাবা (সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা)-এর অর্থ কেবল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন। সাধারণ জীবনে তাদের আদিল (ন্যায়পরায়ণ), মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া জরুরি নয়; বরং তারা ফাসেকও হতে পারতেন, কারণ তারা মাসুম আনিল খাতা (ভুলত্রুটিমুক্ত) ছিলেন না। এই ব্যক্তিবর্গ এ প্রসঙ্গে আকাইদ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কিতাবসমূহের কিছু ইবারতও পেশ করে থাকেন [১]।

এই সংশয়ের জবাব হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব-এর ভাষায় পেশ করা হচ্ছে:

“ফকীহ ও মুহাদিসগণের ব্যাখ্যায় ‘আদল’ ও ‘আদালত’-এর তাফসীরের সারকথা হলো, মুসলমানকে আকেল (বিচক্ষণ), বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে এবং কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে, কোনো সগীরা গুনাহের ওপর অটল থাকা যাবে না এবং অনেক সগীরা গুনাহে অভ্যস্ত হওয়া যাবে না। এটাই ‘তাকওয়া’-এর শরয়ী অর্থ, যার বিপরীত হলো ‘ফিসক’। যে ব্যক্তির আদালতকে বাতিল গণ্য করা হবে, শরয়ী পরিভাষায় তাকে ফাসেক বলা হবে। যেসব ব্যক্তিবর্গ থেকে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ‘উদুল’ (ন্যায়পরায়ণ) হওয়ার ওপর উম্মতের ইজমা বর্ণিত হয়েছে, তাদের নিজস্ব ইবারতসমূহ থেকেও ‘আদল’ ও ‘আদালত’-এর এই তাফসীরই জানা যায় [২]।”

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব আরও বলেন:

“কিছু উলামা যারা ইসমত (নিষ্পাপতা) না থাকা এবং আদালতের ব্যাপকতার মধ্যকার বৈপরীত্য থেকে বাঁচার জন্য আদালতের সংজ্ঞায় এই সংশোধনী দিয়েছেন যে, এখানে ‘আদালত’ দ্বারা সমস্ত গুণাবলী ও আমলের আদালত উদ্দেশ্য নয়, বরং কেবল বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা না বলার আদালত উদ্দেশ্য—এটি ভাষা ও শরীয়তের ওপর একটি বাড়াবাড়ি, যার কোনো প্রয়োজন ও কারণ নেই। আর ঐসব হযরতদের দৃষ্টিতেও এই সংশোধনীর অর্থ কখনোই এই নয় যে, তারা এর মাধ্যমে কোনো সাহাবীকে নিজের আমল ও চরিত্রের দিক থেকে...”

[১] ঐসব হযরতদের পেশকৃত কিছু ইবারত হলো: অধিকাংশ সালাফ এবং খালাফ সাহাবীদের আদালতের ওপর একমত, তাই তাদের বর্ণনা ও সাক্ষ্যের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হবে না, কেবল তাদের মধ্য থেকে যাদের ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে তারা ব্যতীত। আর তাদের আমল সে অনুযায়ী হবে। সুতরাং তাদের ‘উদুল’ (ন্যায়পরায়ণ) বলার উদ্দেশ্য তাদের জন্য ইসমত (নিষ্পাপতা) সাব্যস্ত করা বা তাদের থেকে গুনাহ হওয়া অসম্ভব হওয়া নয়, বরং তাদের আদালতের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হবে না। (আল-ইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির; শরহ নুখবাতিল ফিকার, ২/২১৩; আল্লামা আব্দুল রউফ আল-মুনাত্তী)।

কিন্তু আদালতের নামকরণের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, তাই বিশ্বাস রাখা উচিত যে আদল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তিনি মুমিন হলেও তার মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, তবে এটি আদালত, ঈমান ও বেলায়েতের পরিপন্থী নয়। (সুবুলুস সালাম, আল্লামা মাহমুদ আলুসী: ৩৯৩/১)।

নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আদিল, কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের আদিল সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের প্রশংসা করেছেন। আর আদালতের অর্থ হলো তারা তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে এবং যা তারা বর্ণনা করেন ও শরীয়ত থেকে যা কিছু পৌঁছান তাতে আদিল। আর তাদের কারো থেকে ইজতিহাদগত কারণে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, তা তাদের আদালতের ক্ষতি করে না এবং আল্লাহ তাআলা তাদের যে প্রশংসা করেছেন তা বাতিল করে না। (শরহুত তাহাবিয়াহ, শায়খ সালেহ বিন আব্দুল আজিজ আল-শায়খ: ৬২৩/১)।

আদালতের অর্থ এই নয় যে তাদের থেকে কোনো ভুল, বিচ্যুতি বা এই জাতীয় কিছু প্রকাশ পাবে না, বরং এর অর্থ হলো দ্বীন বর্ণনার ক্ষেত্রে আদালত। (মুজমাল উসুলু আহলিস সুন্নাহ, শায়খ নাসের আব্দুল কারীম আল-আকল: ১৩/১)।

[২] মাকামে সাহাবা, পৃষ্ঠা ৬০, সংক্ষেপে।

...মর্যাদা থেকে সাকিতুল আদালাত বা ফাসিক সাব্যস্ত করতে চান। অন্যান্য স্থানে তাদের নিজেদের বক্তব্যই একে নাকচ করে দেয়। [১]

দ্বিতীয় সংশয়:

ইসলামের আলেমদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ করতে গিয়ে কিছু লোক বলেন যে, একদিকে মুসলমানদের এই আকিদাও রয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম মাসুম ছিলেন না, তাদের দ্বারা কবিরা ও সগিরা সব ধরনের গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব এবং কিছু সাহাবীর দ্বারা তা হয়েছেও; সাথে সাথে এই আকিদাও রয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ‘আদল’ (ন্যায়পরায়ণ)। আর ‘আদিল’ এর অর্থ সকলের নিকট এই যে, যে ব্যক্তি কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় না এবং সগিরা গুনাহের ওপর অটল থাকে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তির দ্বারা কবিরা গুনাহ সংঘটিত হওয়া বা সগিরা গুনাহের ওপর অটল থাকা প্রমাণিত হবে, তার ‘আদল’ গুণটি শেষ হয়ে যাবে এবং সে ফাসিক বলে গণ্য হবে। এই অবস্থানটি স্পষ্টত স্ববিরোধিতার ওপর ভিত্তি করে যে, সকল সাহাবী আদিলও হবেন, আবার তাদের দ্বারা কবিরা ও সগিরা গুনাহ সংঘটিত হওয়া অর্থাৎ ফাসিক সম্ভব বরং কারো কারো ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হবে, তবুও তাদের মধ্যে কেউ ফাসিক হবেন না। এই স্ববিরোধী অবস্থানকে সঠিক আকিদা কীভাবে বলা যেতে পারে?

এই সংশয়ের উত্তরও হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব (রহ.)-এর ভাষায় পেশ করা হলো: [২]

“জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট এর উত্তর হলো, সাহাবায়ে কেরাম থেকে যদিও কোনো বড় কবিরা গুনাহও সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছেও, কিন্তু তাদের এবং উম্মতের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, কবিরা গুনাহ ইত্যাদির কারণে যে কোনো ব্যক্তি সাকিতুল আদালাত বা ফাসিক হয়ে যায়, এখন তার প্রতিকার তওবার মাধ্যমে হতে পারে। যে ব্যক্তি তওবা করে নিল অথবা কোনো মাধ্যমে এটি জানা গেল যে তার হাসনাতের (নেক আমল) কারণে আল্লাহ তার এই গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, সে পুনরায় ‘আদিল’ এবং ‘মুত্তাকি’ বলে গণ্য হবে। আর যে তওবা করেনি, তাকে সাকিতুল আদালাত ফাসিক সাব্যস্ত করা হবে।”

“এখন তওবার বিষয়ে উম্মতের সাধারণ ব্যক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, উম্মতের সাধারণ ব্যক্তিদের ব্যাপারে এই নিশ্চয়তা নেই যে তারা তওবা করেছে কি করেনি? আর না এটি জানা আছে যে তার হাসনাত সকল সাইয়্যিআতের (গুনাহ) কাফফারা হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে যতক্ষণ তওবার প্রমাণ না পাওয়া যাবে অথবা কোনো মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার বিষয়টি জানা না যাবে, ততক্ষণ তাদের সাকিতুল আদালাত ফাসিকই সাব্যস্ত করা হবে। না তাদের শাহাদাত (সাক্ষ্য) গ্রহণযোগ্য হবে, না অন্যান্য বিষয়ে তাদের ওপর নির্ভর করা হবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের বিষয়টি এমন নয়। প্রথমত, তাদের অবস্থা সম্পর্কে যারা জানেন তারা জানেন যে তারা গুনাহ থেকে কতটুকু ভয় পেতেন এবং বেঁচে থাকতেন। আর কখনো কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে তার তওবা শুধু মৌখিকভাবে করার ওপরই ক্ষান্ত হতেন না, বরং কেউ নিজেকে বড় থেকে বড় শাস্তির জন্য পেশ করে দিতেন, কেউ নিজেকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতেন, যতক্ষণ তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হতেন ততক্ষণ তাদের সবার হতো না।”

[১] মাকামে সাহাবা, পৃ. ৫৬

[২] এই সংশয়টিও হযরত আল্লামা উদ্ধৃত করেছেন যা আমরা কিছুটা সহজবোধ্য করে পেশ করেছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা অনেক মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রেখেছে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস - দ্বিতীয় খণ্ড

সাহাবায়ে কেরামের এই খোদাভীতি ও আল্লাহভীতির দাবি হলো, যেসব মহান ব্যক্তি তওবা করার কথা প্রকাশ করেননি, তাদের সম্পর্কেও আমাদের এই সুধারণা পোষণ করা উচিত যে, তারা অবশ্যই তওবা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাদের নেক আমল ও পূর্ববর্তী মহান খেদমতসমূহ এতই বিশাল ও ভারী যে, সেগুলোর তুলনায় সারা জীবনের দু-একটি গুনাহ মহান আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী মাফ হয়ে যাওয়া উচিত। সেই ওয়াদা হলো:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

(নিশ্চয়ই নেক কাজসমূহ মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়)।

এমনকি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কোনো স্পষ্ট দলিল ছাড়াই এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখা বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে আমাদের এটি কেবল ধারণা নয়, বরং কুরআন কারীম বারবার এই ধারণার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ বিশেষ জামাতের জন্য এর ঘোষণা করে দিয়েছে, কখনো সাহাবায়ে কেরাম সাবেকীন ও আখেরীনের জন্য সাধারণ ঘোষণা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর সন্তুষ্ট। [১]

রেওয়ায়েত গ্রহণ বা বর্জন করার নীতিমালা

রেওয়ায়েত গ্রহণ বা বর্জন করার নীতিমালা ও নিয়মাবলি জানা অত্যন্ত জরুরি। এগুলো বিবেচনা না করার কারণে অনেক বড় বড় বুদ্ধিজীবীও অন্ধ অনুকরণের শিকার হয়েছেন। সাধারণ কর্মপন্থা এই যে, কোনো সুদৃঢ় মূলনীতি বা মানদণ্ড গ্রহণ না করেই বিভিন্ন রেওয়ায়েত পড়ে সামগ্রিকভাবে যে প্রভাব পড়ে, তাকেই সঠিক অবস্থান, গবেষণা ও বাস্তবতা বলে নাম দেওয়া হয়েছে... এই দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে যে, বর্ণনার রাবী বা বর্ণনাকারী কারা? তাদের নির্ভরযোগ্যতা বা দুর্বলতার মান কী? তাদের বর্ণনা কি নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়? কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সাথে কি সাংঘর্ষিক নয়? এই বর্ণনা থেকে কি আকিদাগত দলিল পেশ করা যায় কি না?

এই পরিস্থিতি একদল লোককে সাহাবায়ে কেরামের দোষ-ত্রুটি সম্বলিত বর্ণনাগুলো অন্ধভাবে নকল করতে এবং তাদের ন্যায়পরায়ণতার (আদালত) বিরুদ্ধে দলিল পেশ করতে প্ররোচিত করেছে এবং এই পদ্ধতিকে ইনসাফপ্রিয়তা ও পক্ষপাতহীন চিন্তাধারা নাম দেওয়া হয়েছে। এই দলটি ‘উসূলে রেওয়ায়েত’ (বর্ণনার মূলনীতি)-কে তো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে এবং ‘দেওয়াত’ (বিচক্ষণতা)-এর ক্ষেত্রে কেবল এই বিষয়টি নজরে রেখেছে যে, যা কিছু ‘সম্ভাবনা’-র গণ্ডিতে থাকে, তাকে যেন বর্জনযোগ্য মনে না করা হয়। গুরুত্বের সাথে চিন্তা করলে দেখা যায়, এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অনৈসলামিক এবং গবেষণা-বহির্ভূত, যা কোনো মূলনীতি বা নিয়মের অনুসারী নয়। এতে সবকিছু মানুষের নিজস্ব প্রজ্ঞা, ঝোঁক ও রুচির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, সে যে ধরনের বর্ণনা ইচ্ছা গ্রহণ করবে আর যে বর্ণনা ইচ্ছা বর্জন করবে।

রইল ‘সম্ভাবনার গণ্ডি’র কথা, তো কখনো কখনো সম্ভাবনার গণ্ডিতেও রেওয়ায়েতগুলো একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। এখন কাকে মানা হবে আর কাকে বর্জন করা হবে? কোনো ঐতিহাসিক বা গবেষক কি কেবল নিজের রুচি বা পক্ষপাতের ভিত্তিতে এর ফয়সালা করার অধিকার রাখেন?

[১] মাকামে সাহাবা, পৃষ্ঠা ৫৫ থেকে ৫৮।

দ্বিতীয় অংশ | তারিখ উন্মতে মুসলিমা

যেমন, একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং একে নিজের কৃতিত্ব বলে ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি বলছে যে, এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত শোকাহত হলেন এবং বেদনাদায়ক কবিতা পাঠ করলেন। এখন যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রথম বর্ণনাটিকে শুধুমাত্র এই কারণে গ্রহণ করে নেয় যে তা সম্ভবপর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তবে এই কাজকে কি গবেষণা বলা হবে নাকি অহেতুক শত্রুতা!!

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (মাদাজিল্লুহুল আলি) ঐতিহাসিক তথ্যের গবেষণার বিষয়ে যে নীতিগত কথা লিখেছেন তা প্রাধান্যযোগ্য। হযরত বলেন:

“ইতিহাস শাস্ত্রের ওপর আমাদের কাছে যে কিতাবসমূহের ভাণ্ডার রয়েছে, তাতে একই ঘটনা সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। আর ইতিহাসে বর্ণনার যাচাই-বাছাই এবং জরাজ ও তাদিল (সমালোচনা ও বিশ্লেষণ)-এর সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি যা হাদিসের ক্ষেত্রে মুহাদিসগণ অবলম্বন করেছেন। এর ফলাফল এই যে, ইতিহাসের কিতাবসমূহে সব ধরনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, সঠিকও আবার ভুলও। কোনো বিষয়ের বাস্তবসম্মত গবেষণা করতে হলে এটি জরুরি যে, এই ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ থেকে শুধুমাত্র সেই বর্ণনাগুলোর ওপর আস্থা রাখা হবে যা রেওয়ায়েত (বর্ণনা) এবং দেওয়াত (যুক্তি ও বিচার)-এর মূলনীতিতে উত্তীর্ণ হয়। যদি কোনো আলেম যার জরাজ ও তাদিলের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তিনি যদি এই বর্ণনাগুলোকে সেই মূলনীতি অনুযায়ী যাচাই করেন, তবে সন্দেহ ও সংশয়ের একটি বড় অংশ সেখানেই শেষ হয়ে যায়। এর কারণ হলো, হযরত উসমান (রা.)-এর শেষ সময়ে আব্দুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্রে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার দুটি বড় উদ্দেশ্য ছিল: এক, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা এবং দুই, মিথ্যা বর্ণনা ছড়িয়ে দেওয়া। ফলে তারা সমাজে অসংখ্য ভুল ও ভিত্তিহীন কিছা-কাহিনী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মুহাদিসগণ পূর্ণ একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসসমূহকে তো এই সাবায়ি আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সত্য-মিথ্যা আলাদা করে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সেই সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি এবং কিতাবসমূহে সেই বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ হতে থাকে যা ছিল নিছক সাবায়ি প্রোপাগান্ডার ফসল।

তবে সতর্ক ঐতিহাসিকগণ অন্তত এতটুকু করেছেন যে, প্রতিটি বর্ণনার সনদ লিখে দিয়েছেন এবং এখন সত্য অনুসন্ধানকারীদের জন্য এই পথ খোলা রয়েছে যে, তারা ইলমে আসমাউর রিজাল-এর সাহায্যে সেই বর্ণনাগুলোর গবেষণা করবেন। আর যেসব বর্ণনার ব্যাপারে এটি প্রমাণিত হবে যে তা সাবায়ি আন্দোলনের কোনো ব্যক্তির বর্ণনা করা, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে সেগুলোর ওপর আস্থা রাখা যাবে না। কেননা সাহাবায়ে কেরামের ফযিলত ও মর্যাদা এবং আল্লাহর নিকট নবীদের পর তাঁদের উন্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হওয়া কুরআন কারিম এবং সুন্নতে রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এই সাবায়ি প্রোপাগান্ডার প্রতি কর্ণপাত করে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনাসমূহকে সামান্যতম প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

আহলে সুন্নাহের যে আকিদা রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতবিরোধের গবেষণায় লিপ্ত হওয়া সঠিক নয়, বরং এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন...”

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

করা হোক, এটি কোনো তিক্ত সত্য থেকে পলায়ন নয়, বরং এর কারণ এটাই যে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে সঠিক ও ভুল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা প্রতিটি মানুষের কাজ নয়। তাই যে ব্যক্তি জারাহ ও তাদিল-এর মূলনীতি সম্পর্কে অনবহিত থেকে এই বর্ণনাসমূহ পড়বে, সে কখনোই কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না। সহিহ বর্ণনাসমূহে মুশাজারাতে সাহাবা সংক্রান্ত যে উপাদান এসেছে, তা সামনে রেখে আহলে সুন্নাতের সমস্ত কেন্দ্রীয় উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এই আকিদা গ্রহণ করেছেন যে, যদিও সিফফিন ও জামালের যুদ্ধে হক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিল, কিন্তু তাঁর বিপরীতে হযরত আয়েশা, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের অবস্থানও পুরোপুরি ভিত্তিহীন ছিল না। এই ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সাথে শরয়ি দলিল রাখতেন এবং তাঁদের থেকে যে ভুল প্রকাশ পেয়েছে তা ছিল নিছক ইজতিহাদি প্রকৃতির।

[১]

রাবীর নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা যাচাই করা কেন জরুরি?

কোনো ব্যক্তিত্ব বা কোনো ঘটনা সম্পর্কে সংবাদদাতাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের ফয়সালা করা প্রতিটি যুগে একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো ঘটনা সম্পর্কে কয়েকজন সংবাদদাতা আলাদা আলাদা এবং পরস্পরবিরোধী চিত্র তুলে ধরেন, তবে কোনো একজনের কথা মেনে নেওয়া নিঃসন্দেহে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভব যে কেউ এই সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তিদের গণনা করাকে যথেষ্ট মনে করবেন, অর্থাৎ যদি দুইজন ব্যক্তি ঘটনার এক রূপ বর্ণনা করেন এবং চারজন ব্যক্তি তা থেকে আলাদা, তবে চারজন ব্যক্তির কথা মেনে নেওয়া হোক। কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে প্রশ্ন এই যে, কেবল ব্যক্তিদের গণনা করাই কি যথেষ্ট? সংবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিদের ভদ্রতা, সততা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি কি দেখা হবে না, যা কোনো ঘটনার সঠিক ও সত্যায়িত সংবাদ পৌঁছানোর জন্য মৌলিক বিষয়? লক্ষ্য করুন! যদি একটি সংবাদ দুইজন পুরনো ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক বর্ণনা করেন যাদের ভদ্রতা ও সততা সন্দেহাতীত এবং তাঁদের সংবাদের বিপরীতে পাঁচ-ছয়জন এমন সংবাদদাতা যাদের নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর আঙুল তোলা হয়েছে, অন্য কোনো কাহিনী বর্ণনা করেন, তবে কার কথা মানা হবে? স্পষ্ট যে, পুরনো, অভিজ্ঞ এবং ভদ্রতা ও সততার অধিকারী সংবাদদাতাদের কথার ওপরই আস্তা রাখা হবে। তাঁদের প্রত্যাখ্যানকারী দুর্বল চরিত্রের অধিকারী সাংবাদিকদের সংবাদকে অন্তত অবশ্যই সন্দেহজনক মনে করা হবে। এই উদাহরণ যেভাবে বর্তমানকালের বিবাদসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, একইভাবে অতীতের ঘটনাবলির ক্ষেত্রেও এই মানদণ্ডকে উপেক্ষা করা যায় না।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি মাদাজিল্লুহুল আলি এই বিষয়ে মূলনীতিমূলক কথা এভাবে পেশ করেন:

“বিবেকের স্বাভাবিক দাবি হলো, যে ব্যক্তির জীবনে সামগ্রিকভাবে কল্যাণ প্রবল থাকে, তাঁর ওপর কোনো কবির গুনাহের অপবাদ ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বলে গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না তা মজবুত ও শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।” [২]

সুতরাং যদি কয়েকজন সিকাহ, চরিত্রবান ও বিশ্বস্ত রাবী কোনো ব্যক্তিত্ব বা কোনো ঘটনার এক ধরনের চিত্রায়ন করেন এবং অন্যদিকে অনেক দুর্বল চরিত্রের রাবী এর বিপরীতে চিত্র তুলে ধরেন, তবে বুদ্ধি-বিবেচনা এবং ইলমি ও গবেষণামূলক কর্মপদ্ধতির...

[১] ফাতাওয়া উসমানি: ১/১৭৬, ১৭৭

[২] হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আওর তারিখি হাকায়িক, পৃ: ১৩২, ১৩৩

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

প্রথম খুতবা

দাবি হলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের কথাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সুতরাং সাহায্যে কেলাম সম্পর্কে ইতিহাস অধ্যয়ন করার সময় আমাদের দেখতে হবে যে, কোন কথাটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে এবং কোনটি দুর্বল বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে।

হাইসিয়াতে উরফি (সামাজিক মর্যাদা)-র বিষয়টি:

এই বিষয়ে এক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করুন। বর্ণনার পার্থক্যের এই বিষয়টি তখন আরও নাজুক হয়ে পড়ে যখন আলোচনা এমন কোনো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে হয় যিনি সমাজে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চরিত্র ও অভ্যাস, সম্পর্ক, পূর্ববর্তী সেবা, লেনদেন, পেশাগত জীবন এবং অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে সমাজে একটি বিশেষ চরিত্রের অধিকারী মনে করা হয়; যদি ভালো দিকটি প্রবল হয় তবে তাকে ভালো বলে গণ্য করা হয়। তাদের এই খ্যাতি ও সুনাম তাদের আইনি অধিকারে পরিণত হয় যাকে “হাইসিয়াতে উরফি” নাম দেওয়া হয়। বিশ্বের আইন এই কথা স্বীকার করে যে, কারো হাইসিয়াতে উরফি ক্ষুণ্ণ করা একটি অপরাধ।

উদাহরণস্বরূপ, একজন স্কুল শিক্ষক সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য পরিচিত। তার নিজ পরিমণ্ডলে তার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়াই তার বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ তোলে, তবে সেই স্কুল শিক্ষক বা তার আইনজীবীর অধিকার থাকবে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করার এবং তাকে আদালতে তলব করার। যদি অভিযোগকারী সেখানেও প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে মানহানির গুরুতর শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে। হাইসিয়াতে উরফি নিরাপদ রাখার অধিকার প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানিগুলোরও রয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্টকারী ব্যক্তি আদালতে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা জরিমানার দণ্ড পেতে পারে। মৃত ব্যক্তিদের হাইসিয়াতে উরফিকেও আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়। কারো মৃত বাবা-দাদাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা জেল খাটার কারণ হতে পারে।

বিবেচনা ও ন্যায়পরায়ণতার দাবি অনুযায়ী, বর্তমান সমাজে বসবাসকারীদের যেমন হাইসিয়াতে উরফির অধিকার রয়েছে, এই অধিকার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের জন্যও সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে। ইতিহাসে যে সকল সম্মানিত, প্রখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব অতিবাহিত হয়েছেন, ন্যায়বিচার হলো তাদের সুপরিচিত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণকারী বিষয়বস্তুকে একটি অপ্রমাণিত অভিযোগের চেয়ে বেশি কিছু মনে না করা। হ্যাঁ, যদি সেই অভিযোগের সপক্ষে এমন কোনো প্রমাণ থাকে যা কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে, তবে তা ভিন্ন কথা। তা ছাড়া সেই বর্ণনার মর্যাদা একটি অভিযোগের চেয়ে বেশি হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা খুলাফায়ে সালাসাকে জবরদখলকারী হিসেবে উপস্থাপন করে, কিছু বর্ণনা হযরত আলী আল-মুরতাজা [রা.] -কে উসমান গনি [রা.] -এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে জানায়, আবার কিছু বর্ণনা হযরত মুয়াবিয়া [রা.] -কে মুনাফিক হিসেবে বিশ্বাস করাতে চায়। তো এমন সব ক্ষেত্রে কি এই ভেবে চোখ বন্ধ করে নেওয়া হবে যে, সম্ভাবনার জগতে এই সবকিছুই হতে পারে? এমন সংবাদ কি অভিযোগ এবং মানহানির পর্যায়ে পড়বে না? ন্যায়বিচারের কথা এটাই হবে যে, যেসব মহান ব্যক্তিদের হাইসিয়াতে উরফি সম্মান, মর্যাদা ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের সম্পর্কে...

[১] বুহস ফি তারিখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, ডক্টর আকরাম জিয়া উমারি, পৃষ্ঠা ২১১।

[২] হাফেজ জাহাবি বলেন: মূলত গুণাবলির আধিক্যই বিবেচ্য। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০/৩৬, ত রিসালাহ)।

নেতিবাচক সংবাদগুলোর অবশ্যই যাচাই-বাছাই করা উচিত এবং সংবাদদাতার অবস্থা ও চরিত্রের পর্যালোচনা অবশ্যই করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষণার সুযোগ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন সব বর্ণনা যা মহান ব্যক্তিত্বদের সুপরিচিত খ্যাতির পরিপন্থী, সেগুলোকে কেবল একটি অভিযোগ হিসেবেই গণ্য করা উচিত। যেভাবে আমরা আমাদের চলমান সমাজে কোনো সম্মানিত ব্যক্তিত্বের চরিত্র হননকারী প্রতিটি আওয়াজকে “নির্ভরযোগ্য সংবাদ” মনে করে মেনে নেওয়ার বোকামি করি না, ঠিক তেমনি অতীতের মহান ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কেও আমাদের প্রতিটি নিম্নমানের বর্ণনার ওপর বিশ্বাস করা উচিত নয়। জ্ঞানীদের জন্য এমন সংবাদ এবং সংবাদদাতার যাচাই-বাছাই করা জরুরি হবে। নিশ্চিতভাবেই এটি কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক, গবেষণামূলক এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণ হবে না যে, আমরা সংবাদদাতাদের এবং বর্ণনাকারীদের এমন সব অভিযোগ আরোপ করতে দেখেও তাদের ঘরোয়া তল্লাশি না করি।

অতীতের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এত সতর্কতা অবলম্বন করেননি, তাহলে আমরা কেন করব?

কিছু লোক মনে করেন যে, অতীতের ঐতিহাসিকগণ সাহাবীদের ব্যাপারে এতটা সংবেদনশীল আচরণ করেননি, তারা তাদের দোষ-ত্রুটি সম্বলিত দুর্বল বর্ণনাগুলোও উদ্ধৃত করতেন, তা সত্ত্বেও তাদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং সাহাবীদের প্রতি ভক্তিতে কোনো আঁচ আসত না। তাহলে আজ এত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন কী?

আসল কথা হলো, বর্তমান যুগে প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামের শত্রুরা সাহাবীদের বিরুদ্ধে জ্ঞানতাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রচারণার ময়দানে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিবেশ তৈরি করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা। এটি কেবল কয়েকটি আংশিক ঘটনার বিষয় নয় যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি। এটি আকিদা ও ঈমানের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। যদি এই আংশিক ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা না হতো, তবে সম্ভবত আমাদেরও তখন এমন বর্ণনার ওপর গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হতো না। কিন্তু বর্তমানে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক ময়দানে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান বিবাদীর মতো, যাদের ওপর প্রতিপক্ষ পক্ষ অভিযোগের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। এই অভিযোগগুলোর জন্য পেশকৃত প্রমাণের ওপর জেরা না করা প্রতিপক্ষের দাবি মেনে নেওয়ারই নামান্তর। পাড়া-মহল্লার সাময়িক ও অস্থায়ী ঝগড়ায় যদি কেউ কাউকে কাপুরুষ, খিয়ানতকারী বা ঘুষখোর বলে দেয়, তবে তা গ্রাহ্য করা হয় না। কিন্তু যখন এই অপবাদ আদালতে হয় এবং কোনো দাবি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়, তখন বাদীর প্রতিটি বাক্য এবং দলিলের ওপর জেরা করা হয়।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতাকে আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, তাই একে ক্ষুণ্ণকারী উপকরণগুলো যাচাই করা এবং এর মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই যে, আমরা এই প্রচেষ্টায় এমন বাড়াবাড়িকেও নাজায়েজ মনে করি যার পেছনে অবচেতনভাবে “আদালতে সাহাবা”র পরিবর্তে “ইসমতে সাহাবা”র মানসিকতা কাজ করে এবং যা মুহাদ্দিসিন, ফুকাহা এবং সালাফদের ওপর থেকে আস্তা নষ্ট করে মানুষকে হাদিস অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায়।

ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো কীভাবে যাচাই করা হবে?

সংবাদদাতাদের এবং বর্ণনাকারীদের মানদণ্ড পর্যালোচনার বিষয়টিকে ইলমে জারাহ ওয়া তাদিল, ফান্নে রিজাল এবং ইলমুল আসনাদ বলা হয়। এই শাস্ত্রে দেখা হয় যে, কোনো বর্ণনা কতটি মাধ্যম থেকে, কোন কোন লোকের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতিটি ব্যক্তির জ্ঞান, বিশ্বস্ততা, তাকওয়া এবং স্মরণশক্তির পর্যালোচনা করা হয়। এটিও দেখা হয় যে, মাঝখানে কোনো যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে কি না। এভাবে...

বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে কোনো বর্ণনার (রেওয়ায়েত) দৃঢ়তা বা দুর্বলতা নির্ধারণ এবং এর স্তরবিন্যাস করা হয়।

ইলমে রিজাল বা বর্ণনাকারী শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তখন দেখা দেয় যখন হাদিস সংকলনের কাজ একটি পর্যায় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছিল। সেই সময় মুহাদিসগণ লক্ষ্য করেন যে, হাদিসের ভাঙারে অনেক দুর্বল বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাই হাদিসের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা সঠিকভাবে পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, যাতে জানা যায় কোন বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য (মুস্তানিদ) এবং কোনটি অনির্ভরযোগ্য। এই ব্যক্তিবর্গ বর্ণনাকারীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের ওপর আস্তা বা অনাস্তা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করেছেন। উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ‘সিকাহ’ বা ‘সাবত’, মধ্যম পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের ‘সদুক’ বা ‘সালিহ’, এবং অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ‘মাতরুক’, ‘হালিক’ ও ‘তালিফ’ বলা হতো। চরম পর্যায়ের অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা ‘কাযযাব’ ও ‘দাজ্জাল’ নামে অভিহিত হতেন। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদদের এই মতামতগুলো দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী থেকে সপ্তম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সংকলনে জমা হতে থাকে, যেখানে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে হাজার হাজার বর্ণনাকারীর পরিচিতি ও অবস্থা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোর সাহায্যে যেকোনো হাদিস বা ঐতিহাসিক বর্ণনার সনদ (সূত্র) যাচাই করে তার নির্ভরযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।

বর্ণনার স্তরসমূহ: সহিহ, হাসান, যয়িফ:

- সহিহ: যে বর্ণনার সকল বর্ণনাকারী সিকাহ, আমানতদার, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও সতর্ক হন, সনদ নিরবচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) হয় এবং তাতে কোনো ইল্লত (গোপন ত্রুটি) ও শুযুয (অস্বাভাবিকতা) না থাকে, তাকে ‘সহিহ’ স্তর প্রদান করা হয়। এটি শক্তির দিক থেকে প্রথম স্তরে থাকে।
- হাসান: মানদণ্ডের দিক থেকে যে বর্ণনা সহিহ-এর চেয়ে নিম্নমানের এবং যয়িফ-এর চেয়ে উন্নত, তাকে ‘হাসান’ বলা হয়।
- যয়িফ: যদি বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয় অথবা তার আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা সন্দেহজনক হয় কিংবা সে বিদআত ও ভ্রান্ত আকিদায় লিপ্ত হয়, তবে তার বর্ণিত বর্ণনাকে ‘যয়িফ’ বলা হয়। (একাধিক সূত্র থাকার কারণে যয়িফ ‘হাসান লি-গাইরিহি’ এবং হাসান ‘সহিহ লি-গাইরিহি’ হয়ে যায়।) পরবর্তীতে যয়িফ বর্ণনার অনেক প্রকারভেদ রয়েছে... যেমন: মুনকার, মুনকাতি, মাওয়ু।
- মুনকার: যদি দুর্বলতা এই কারণে হয় যে, মতন (মূল পাঠ)-এ এমন কোনো অদ্ভুত বা বিরল কথা রয়েছে যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের মতনের পরিপন্থী, তবে এমন যয়িফ বর্ণনাকে ‘মুনকার’ বলা হয়।
- মুনকাতি: যদি দুর্বলতা এই কারণে হয় যে, বর্ণনাকারীদের পরম্পরা পূর্ণাঙ্গ নয় বরং কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তবে এমন বর্ণনাকে ‘মুরসাল’ বা ‘মুনকাতি’ বলা হয়। [১]
- মাওয়ু: যদি সনদে কোনো কাযযাব বা মিথ্যা রচনাকারী বর্ণনাকারী থাকে এবং এই বর্ণনার মতনও নিশ্চিত ও অকাট্য সংবাদের পরিপন্থী হয়, তবে এমন বর্ণনাকে ‘মাওয়ু’ অর্থাৎ জাল হিসেবে গণ্য করা হয়। এমন বর্ণনা একেবারেই অনির্ভরযোগ্য। [২]

[১] মুরসাল ও মুনকাতি-এর সংজ্ঞায় অনেক উক্তি রয়েছে, সহজবোধ্য মত হলো যাতে উভয়কে অভিন্ন বলা হয়েছে। “আল-মুনকাতি মিসলুল মুরসাল ওয়া কিলাহমা শামিলানি লি-কুন্নি মা লা ইয়াত্তাসিলু ইসনাদুহু” (আত-তাকয়িদ ওয়াল ইযাহ শারহ মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ: ১/৮০)

[২] কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস, মাওলানা যফর আহমদ উসমানি, পৃ. ৭৮ থেকে ৮১... মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সনদে কাযযাব বর্ণনাকারীর উপস্থিতিতেই বর্ণনা ‘জাল’ প্রমাণিত হয় না যতক্ষণ না অন্যান্য আলামত ও লক্ষণ পাওয়া যায়। তবে একে অত্যন্ত যয়িফ অবশ্যই গণ্য করা হবে। (শারহুন নুখবাহ ওয়াদ যিকরা লিল ইরাকি: ১/৩৭০)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

যঈফ (দুর্বল) বর্ণনার দুর্বলতা কখন দূর হতে পারে এবং কখন নয়?

যদি কোনো বর্ণনা এই কারণে যঈফ হয় যে, তার বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল অথবা তার সনদ বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি) ছিল, কিংবা তাতে কোনো বর্ণনাকারী অজ্ঞাত (মাজহুল) ছিল, তবে যদি এমন যঈফ বর্ণনা অন্য কোনো যঈফ বর্ণনার মাধ্যমে সমর্থন পায়, তবে তার দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে “হাসান লি-গাইরিহি” এর স্তরে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিন্তু যদি কোনো বর্ণনা এই কারণে যঈফ সাব্যস্ত হয় যে, তার বর্ণনাকারী ফাসিক, ফাজির বা মিথ্যাবাদী (কাযযাব) ছিল, তবে এই ধরনের বর্ণনা একই ধরনের অন্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার সাহায্যে শক্তিশালী হবে না, বরং তার দুর্বলতা বহাল থাকবে। [১]

সহীহ ও যঈফ বর্ণনার পার্থক্যের ফলাফল কী হবে?

সংক্ষেপে, বর্ণনাকারীদের অবস্থা হলো সেই মানদণ্ড যার মাধ্যমে বর্ণনার স্তরসমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই নির্ধারণের পর বিষয়বস্তুর মতভেদ ও বিরোধের ক্ষেত্রে কোন বর্ণনা গ্রহণ করা হবে এবং কোনটি প্রত্যাখ্যান করা হবে তা সহজ হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষের বিবেক এটাই বলবে যে, উত্তম বর্ণনাকে (সহীহ) গ্রহণ করা উচিত এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক দুর্বল (যঈফ) বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এর বিপরীতে সহীহকে প্রত্যাখ্যান করে যঈফকে গ্রহণ করা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাজ হতে পারে না।

যদি সহীহ ও সাকিম (ত্রুটিপূর্ণ) বর্ণনার পার্থক্য বজায় রাখার বিষয়টি মূলনীতি হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তবে অধিকাংশ মতভেদ আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে। কারণ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে যে সকল আপত্তিকর বর্ণনা রয়েছে সেগুলো যদি আমরা গণনা করি, তবে সেগুলোর মধ্যে সনদ অনুযায়ী সহীহ বা হাসান বর্ণনা খুব কমই পাওয়া যাবে। অধিকাংশ বর্ণনাই যঈফ প্রমাণিত হবে। সেগুলোর কোনো না কোনো বর্ণনাকারী অনির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হবে। কারো কারো ওপর মিথ্যাচার ও হাদীস জাল করার অভিযোগ থাকবে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বিদআতী, পথভ্রষ্ট এবং রাফেযী হবে। সুতরাং মতন (মূল পাঠ) ও সনদের দুর্বলতার কারণে সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের বিষয়ে সেগুলোর মাধ্যমে দলিল পেশ করা আপনা-আপনিই অযোগ্য হয়ে পড়বে।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (দা.বা.) বলেন:

“মূলনীতি হলো, এমন প্রতিটি যঈফ বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে যার দ্বারা কোনো সাহাবীর সত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, চাই তা ইতিহাসের বর্ণনা হোক বা হাদীসের।” [২]

সাহাবীর সমালোচনা সম্বলিত সহীহ সনদের বর্ণনাগুলো কি গ্রহণ করা হবে কি না?

সাহাবীর সমালোচনা সম্বলিত বর্ণনাগুলো যদি মজবুত সনদে (সহীহ বা হাসান) প্রমাণিত হয়, তবে সেগুলো গ্রহণ করা হবে কি না—এ বিষয়ে কথা হলো:

- এমন বর্ণনাগুলো প্রত্যাখ্যান করা হবে না, সেগুলোর শব্দাবলী গ্রহণ করা হবে, তবে অন্যান্য সহীহ বর্ণনার আলোকে সেগুলোর উপযুক্ত অর্থ বোঝার চেষ্টা করা হবে যাকে “তাউইল” (ব্যখ্যা) বলা হয়।

তাউইল দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, কোনো বর্ণনা থেকে জোরপূর্বক যেকোনো একটি অর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবে, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে...

[১] মুসতলাহুল হাদীস, মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন, পৃ. ৯, মাকতাবাতুল ইলম।

[২] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আগুর তারিখী হাকায়িক, পৃ. ৪৩-এর টীকা।

হচ্ছে যে, বর্ণনার শব্দগুলোতে যে অর্থের অবকাশ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও উপযুক্ত অর্থ তালাশ করা হোক। [১]

যদি কোনো সহীহ বর্ণনার শব্দে অন্য কোনো অর্থের অবকাশ না থাকে এবং অর্থও স্পষ্ট হয়, তবে দেখা হবে যে তা অন্য কোনো সহীহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক কি না অথবা মুহাদিসগণ একে মুআল্লাল (অর্থাৎ কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটির কারণে অগ্রহণযোগ্য) সাব্যস্ত করেছেন কি না। অন্য কোনো অধিকতর সহীহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া বা মুআল্লাল হওয়ার ক্ষেত্রেও বর্ণনাটি গবেষণার যোগ্য হবে।

এভাবে সনদ ও মতনের আরও যাচাই-বাছাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চিন্তাভাবনা এবং বর্ণনার মূলনীতি সামনে রেখে বর্ণনাটি গ্রহণ বা বর্জন করা হবে। (উসূলে দিরায়াতের ব্যাখ্যা সামনে আসছে)।

যদি কোনো সহীহ বর্ণনার শব্দে অন্য কোনো অর্থের অবকাশ না থাকে এবং তার অর্থ অন্য কোনো সহীহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিকও না হয়, আর তা ত্রুটিমুক্তও হয়, তবে সাহাবীর ভুল মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও অন্যান্য দলিলের প্রেক্ষিতে সাহাবীকে মন্দ বলা যাবে না এবং তাঁর মর্যাদাহানিও করা যাবে না। যথাসম্ভব ভুলকে ভুল বা ইজতিহাদী ভুল হিসেবে গণ্য করা হবে। এমনকি যদি তা স্পষ্ট গুনাহও হয়, তবে তাকে মানবিক পদস্থলন হিসেবে গণ্য করা হবে। [২]

যেমন কিছু অনির্ভরযোগ্য সহীহ বর্ণনায় কিছু সাহাবীর মদ্যপান বা ব্যভিচার বা ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এই বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করা যায় না কারণ ইসলামী আকিদা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম মাসুম নন, তাঁদের থেকে ভুল হওয়া সম্ভব। তবে তাঁদের এই পদস্থলনের পেছনে কিছু হিকমতও লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন কিছু হিকমত এই ছিল যে:

- সাহাবী ও নবীর মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হতে পারে যে নবী মাসুম এবং সাহাবী মাসুম নন।
- কিছু শরয়ী মাসআলা যেমন: কিসাস, মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচার ও বিদ্রোহের শাস্তির বিধান ইত্যাদি কার্যকর হতে পারে।

যাই হোক, সাহাবায়ে কেরাম উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ। তাঁদের ভুলগুলো কুরআনের আয়াত ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ (আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন)-এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদে তাঁদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ শোনানো হয়েছে—﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾

[১] আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী লিখেন: “ওয়াজিব হলো যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের পদস্থলন সম্পর্কে কিছু শুনবে, সে যেন তা নিয়ে গবেষণা না করা পর্যন্ত এবং তা কেবল কোনো কিতাবে দেখে বা কারো থেকে শুনেই কারো দিকে তা নিসবত (আরোপ) না করে। বরং তার জন্য আবশ্যিক হলো যে সে এর সত্যতা যাচাই করবে যতক্ষণ না তা কারো দিকে নিসবত করা সহীহ প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় ওয়াজিব হলো যে সে তাঁদের জন্য সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও সঠিক পথ তালাশ করবে; কারণ তাঁরা (সাহাবীগণ) এরই যোগ্য।” (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা: ৬২১/২)

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন: “কারো জন্য এটা জায়েজ নয় যে তাঁদের মধ্যে যা ঘটেছে তা উল্লেখ করে তাঁদের কারো মর্যাদাহানি বা দোষারোপের দলিল হিসেবে পেশ করবে এবং এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তাঁদের সমালোচনা করবে বা তাঁদের প্রতি ঘৃণা ছড়াবে এবং এ জাতীয় অন্যান্য ফাসাদ সৃষ্টি করবে।” (তাতহীরুল জানান, পৃ. ২৫)

[২] কাইফা নাকরাউ তারিখুল আল ওয়াল আসহাব, আব্দুল কারীম বিন খালিদ আল-হারবী, পৃ. ৩৫, তিবায়াতু দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ।

উসূলে দিরায়াত বলতে কী বোঝায়?

দিরায়াত-এর অর্থ হলো বর্ণনায় উপস্থাপিত ঘটনার যৌক্তিক সম্ভাবনার আলোকে পর্যালোচনা করা, যাতে জানা যায় যে এতে কোনো অতিরঞ্জন বা বিভ্রমের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কি না। দিরায়াত-এর মাধ্যমে শক্তিশালী প্রমাণিত বর্ণনাকে সনদের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্য বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, উসূলে দিরায়াত ফকীহগণের উসূলে কিয়াসের মতো। বিজ্ঞজনরা জানেন যে, অনেক সময় বিধান সংক্রান্ত সहीহ বর্ণনার মধ্যেও বৈপরীত্য দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সहीহ বর্ণনার একটি সংকলন বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার পর ওয়ুর নির্দেশ দিয়েছেন। সहीহ বর্ণনার অন্য একটি সংকলন বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একে জরুরি মনে করেননি। এমন পরিস্থিতিতে ফকীহগণ কিয়াসের সাহায্য নিয়ে বর্ণনার কোনো একটি সংকলনকে প্রাধান্য দেন। যেহেতু আগুনে রান্না করা জিনিস ব্যবহারের ফলে ওয়ু ভেঙে যাওয়া কিয়াসের পরিপন্থী, তাই ফকীহগণ বর্ণনার দ্বিতীয় সংকলনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একইভাবে উসূলে দিরায়াত-এ পরস্পরবিরোধী বর্ণনার যৌক্তিক পর্যালোচনা করে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

উদাহরণস্বরূপ দুটি বর্ণনা দেখুন যা সনদ, শক্তি ও দুর্বলতার দিক থেকে সমান (উভয়ই যরীফ), কিন্তু সেগুলোর মূল পাঠ (মতন) পরস্পরবিরোধী:

১. তাবারীর একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) খুশি হয়েছিলেন এবং গর্বভরে বলেছিলেন: “আমি আল্লাহর এমন এক বান্দা যে ওয়াদিয়ে সিবা-তে অবস্থানকালেও উসমানকে হত্যা করেছি।” তিনি আরও বলেছিলেন: “আমি যখন কোনো ক্ষত খুঁজি, তখন তা ছিঁড়ে ফেলি।” (অর্থাৎ এই সব কিছু আমারই করা।)

২. তাবারীর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে যে: হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) অত্যন্ত শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাতুর কবিতা পাঠ করেন এবং বলেন: “যুদ্ধ অবশ্যই হবে। যে ক্ষত খুঁড়েছে সে তা ছিঁড়েই ছাড়বে।”

এই দুটি পরস্পরবিরোধী বর্ণনাকে দিরায়াত-এর আলোকে দেখলে প্রথম বর্ণনার মতনটি বানোয়াট হওয়া স্পষ্ট; কারণ যদি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-ই হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি নিজে কীভাবে নিজের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলেন? ষড়যন্ত্রকারীরা তো যথাসম্ভব নিজেদের গোপন রাখে, তারা এমন নির্বোধ হয় না যে অন্যদের সামনে নিজের ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে বেড়াবে। দ্বিতীয় বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য এবং বুদ্ধি ও কিয়াসের অনুকূল; কারণ যে ঘটনায় সাধারণ মুসলমানরাও শোকাহত হয়েছিল এবং যা পড়ে আজও তারা ব্যথিত হয়, সেই সময়ের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া একজন সাহাবীর কেন তাতে দুঃখ হবে না?

এভাবে উসূলে দিরায়াত-এর আলোকে আমরা বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক থেকে সমান শক্তির অধিকারী দুটি পরস্পরবিরোধী বর্ণনার মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে পারি। অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনাটিকে বর্ণনাকারীর বিভ্রম বা অন্য কোনো ত্রুটির ওপর আরোপ করা যেতে পারে।

উসূলে দিরায়াত-এর প্রবর্তক আল্লামা ইবনে খালদুন এর ব্যাখ্যায় বলেন:

“যদি খবরে কেবল বর্ণনার ওপর নির্ভর করা হয় এবং অভ্যাসের মূলনীতি, রাজনীতির নিয়মাবলী, সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক...”

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

পরিস্থিতিকে মানদণ্ড বানানো না হলে, এবং বিদ্যমানকে অবিদ্যমানের ওপর এবং উপস্থিতকে অনুপস্থিতের ওপর কিয়াস (অনুমান) না করা হলে অনেক ভুলভ্রান্তি, বিচ্যুতি এবং সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। [১]

দুর্বল (যঈফ) বর্ণনা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, যঈফ বা সহীহ হওয়া মুহাদিসগণের পরিভাষা এবং দুর্বল বর্ণনাগুলো দুর্বলতার বিচারে কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। কিছু বর্জনীয় এবং কিছু গ্রহণযোগ্য হয়। দুর্বল বর্ণনার এই কারিগরি অবস্থান না বুঝে ইতিহাসের সঠিক যাচাই-বাছাই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মনে রাখা উচিত:

- কোনো দুর্বল বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা তখন জরুরি হবে যখন তাতে মহান আল্লাহর গুণাবলি, নবীদের নিষ্পাপতা (ইসমত), সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) বা কোনো শরয়ি বিধানের পরিপন্থী কিছু থাকবে। [২]
- যদি দুর্বল বর্ণনায় উল্লিখিত ত্রুটি না থাকে, তবুও তাকে যৌক্তিক প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে, তবে এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করাটা হবে ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয়। এটি গ্রহণ বা বর্জন করা গবেষকের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল। মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.) (আকিদা ও আহকাম ব্যতীত) সাধারণ সংবাদসমূহে দুর্বল বর্ণনা গ্রহণ বা সহ্য করার বিষয়ে বলেন:

“সহ্য করা’র অর্থ এখানেও এই নয় যে, এই বর্ণনাগুলো অধ্যয়ন করার সময় সমালোচনা ও পর্যালোচনার সমস্ত মূলনীতিতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে, বরং এর অর্থ হলো শুধুমাত্র বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার ভিত্তিতে আমরা এই বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করব না। সুতরাং যদি অন্য কোনো দলিল এর বিপক্ষে পাওয়া যায়, তবে এই বর্ণনাগুলো মেনে নেওয়ার ব্যাপারে জেদ করা হবে না।” [৩]

- যদি দুর্বল বর্ণনায় কোনো মহান ব্যক্তিত্বের কোনো ইজতিহাদি ভুল, ব্যবস্থাপনা ও কৌশলের কোনো বিচ্যুতি বা মানবীয় স্বভাবজাত কোনো বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা জরুরি নয়। যদি ঐতিহাসিক ঘটনার যৌক্তিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বা অন্য কোনো প্রয়োজনে এই বর্ণনাটি গ্রহণ করতে চান, তবে সঠিক ব্যাখ্যার (তাউইল) সাথে তা গ্রহণ করতে পারেন।
- এটা জরুরি নয় যে দুর্বল বর্ণনার বিষয়বস্তু সবসময় মিথ্যা হবে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের সমর্থন পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। [৪]
- যদি সহীহ বর্ণনা দ্বারা কোনো বিষয় সংক্ষেপে প্রমাণিত হয় এবং কিছু দুর্বল বর্ণনায় সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ থাকে, তবে সেই দুর্বল বর্ণনাগুলোকে একটি প্রমাণিত পাঠের বিস্তারিত বিবরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন জঙ্গ জামাল, জঙ্গ সিফফিন বা কারবালার ঘটনা সম্পর্কিত কিছু বিষয় সহীহ বর্ণনায় রয়েছে। কিছু দুর্বল বর্ণনায় সেই প্রমাণিত বিষয়গুলোরই বিস্তারিত বিবরণ এসেছে যা দ্বীনের মূলনীতি বা সহীহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলো গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা: ১৩/১

[২] আল-মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ লিল-কাফিয়াজি, পৃ. ৭১

[৩] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং ঐতিহাসিক সত্যতা, পৃ. ১৩৫-এর পাদটীকা

[৪] কেননা দুর্বল বর্ণনাকারী সবসময় মিথ্যা বলে না বা ভুল করে না, তাই অনেক সময় তার বর্ণনা গ্রহণ করা হয় যখন তা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়, যেমনটি উসুলে হাদিসে নির্ধারিত হয়েছে। (তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম, মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী: ৫০১/২)

উপাদানের সনদগতভাবে দুর্বল হওয়া এক কথা আর আপত্তিকর বা অবমাননাকর হওয়া অন্য কথা। হাদিস ও ইতিহাসের কিতাবসমূহে দুর্বল উপাদান প্রচুর রয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে, সেই সমস্ত উপাদান অগ্রহণযোগ্য বা ধুষ্টতাপূর্ণ।

সমমানের পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি:

আমরা ইতিপূর্বেই স্পষ্ট করেছি যে, সহিহ বর্ণনার বিপরীতে থাকা দুর্বল বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে না। এখন এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কখনো কখনো একই ঘটনায় দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় যা শক্তি ও দুর্বলতার দিক থেকেও সমান হয়। উভয়টিই সহিহ সনদের হয় অথবা উভয়টিই দুর্বল হয়। সনদগত দিক থেকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। এই সমস্যাটি তখন আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন একটি ঘটনায় সমমানের কিছু বর্ণনা কোনো সাহাবির চরিত্রকে ইতিবাচক হিসেবে প্রকাশ করে এবং সমমানেরই কিছু বর্ণনা সেই একই ঘটনায় ওই সাহাবির চরিত্রকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে। সুতরাং, একই বিষয়ে সমমানের পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহের মধ্যে আমরা কোনটি গ্রহণ করব এবং কোনটি বর্জন করব?

আপাতদৃষ্টিতে এই মতপার্থক্য নিরসনের চারটি পদ্ধতি হতে পারে:

- ১. একটি হলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের বর্ণনাকেই মেনে নেওয়া। একই ঘটনায় একই সাথে দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য মেনে নিয়ে চলা; এই পদ্ধতির অযৌক্তিকতা একেবারেই স্পষ্ট। কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কোনো বিষয়েই এমনটি করতে পারেন না।
- ২. দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হতে পারে উভয় ধরনের বর্ণনাকেই বর্জন করা। তবে এটি একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হবে। কারণ দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে অবশ্যই একটি সঠিক এবং একটি ভুল হবে। উভয়কে বর্জন করা একটি গুরুতর বিষয় থেকে কেবল দায়মুক্ত হওয়ার নামান্তর।
- ৩. তৃতীয় পদ্ধতিটি হতে পারে যে, যে বর্ণনাটি সাহাবিদের সম্পর্কে কুরআনি চিত্রের পরিপন্থী অর্থাৎ সাহাবিদের চরিত্রকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে সেটিকে মেনে নেওয়া এবং যা কুরআন মাজিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে সাহাবিদের উত্তম গুণাবলির পক্ষে যায় সেটিকে বর্জন করা। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না কারণ তারা কুরআনের সত্যতার ওপর ঈমান রাখে। কোনো পরিমিত মেজাজের অমুসলিমও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা পছন্দ করবেন না, কারণ কুরআনি জ্ঞানের পরিপন্থতাকে অমুসলিমরাও স্বীকার করে আসছে। এই পদ্ধতি কেবল সেই ব্যক্তিই অবলম্বন করবে যার কোনো বিশেষ কারণে সাহাবা কিরামের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে।
- ৪. চতুর্থ পদ্ধতিটি হলো যে বর্ণনাটি কুরআন মাজিদের অনুকূল হবে অর্থাৎ রাসূলের সাহাবিদের কুরআনি চিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে সেটিকে গ্রহণ করা এবং যে বর্ণনাটি এর পরিপন্থী হবে সেটিকে বর্জন করা।

যদি চিন্তা করা হয় তবে এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে সহজ, স্পষ্ট এবং বুদ্ধি ও বিবেকের নিকটতর। কারণ এর মাধ্যমে আলোচিত সকল সমস্যার একটি সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। যেখানে অন্যান্য পদ্ধতিগুলো পক্ষপাতিত্ব বা অজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিগুলো কোনো সমাধানে পৌঁছানোর পরিবর্তে সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। পদ্ধতি (৪) শ্রেষ্ঠ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই যে, একে কুরআন মাজিদ সমর্থন করে যা এমন একটি কিতাব...

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

যার বিষয়বস্তুর সত্যতা অমুসলিমরাও স্বীকার করেছে। হাজার হাজার বড় বড় অমুসলিম চিন্তাবিদ কুরআন মাজীদকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার না করলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে একে একটি অত্যন্ত সংরক্ষিত দলিল হিসেবে মেনে নিয়েছেন, যাতে একটি অক্ষরেরও কমবেশি হয়নি। তাই কুরআন মাজীদকে সমর্থনকারী ঐতিহাসিক উপাদানের এমন এক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে যা এর বিরোধী বর্ণনাগুলোর নেই।

নিরঙ্কুশ শিয়া ও নাসিবী বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মর্যাদা:

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেই বর্ণনাকারীরা যাদেরকে নিরঙ্কুশ শিয়া বা নিরঙ্কুশ নাসিবী বলা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে না তো চরমপন্থী (গালি), গোঁড়া (মুতাআসসিব), রাফেযী, মিথ্যাবাদী (কাযযাব) বা দাজ্জাল হওয়ার কোনো স্পষ্ট সমালোচনা পাওয়া যায়, আর না তাদের নির্ভরযোগ্যতার (তাদীল) কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়। হতে পারে তারা কেবল হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর হযরত আলী (রা.)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার কারণে বা তাফযীলি তাশায়্যু-এর কারণে শিয়া হিসেবে পরিচিত। এটাও সম্ভব যে তারা রাফেযী ও মিথ্যাবাদী। আবার এটাও হতে পারে যে তারা হযরত আলী (রা.)-কে গালি দেওয়া নাসিবী অথবা এটাও সম্ভব যে তারা কেবল রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে আহলে শামের সমমনা।

সংবাদ ও ঘটনাবলি অনুসন্ধানের নিয়ম-নীতির আলোকে দেখা হলে, এই ব্যক্তিদের বর্ণনা সাহায্যে কেরামের বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহজনক বলে গণ্য হবে, বিশেষ করে যখন বর্ণনাকারীর শিয়া হওয়ার অন্যান্য আলামতও বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো বর্ণনা বা প্রমাণের মাধ্যমে তা সমর্থিত না হবে, ততক্ষণ সেই বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হবে না।

মুহাদিসগণের এই মূলনীতি আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো বিদআতির বর্ণনা যখন তার বিদআতের সমর্থনে হয়, তখন তা গ্রহণ করা হবে না। কারণ প্রবল সম্ভাবনা থাকে যে সে গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে কাজ করছে, দুর্বল বিষয়কে যাচাই ছাড়াই বর্ণনা করছে অথবা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলছে, কিংবা সঠিক বিষয়ের সাথে কিছু মিশ্রণ ঘটিয়ে দিচ্ছে। এই সন্দেহ তখনই সৃষ্টি হয় যখন কোনো এক দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি অন্য দলের বড়দের বিরুদ্ধে কোনো নেতিবাচক ও বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করে।

এই মূলনীতি অনুযায়ী হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধী রাজনৈতিক ও আদর্শিক গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত বর্ণনাকারী বা নাসিবী বর্ণনাকারীদের সেই বর্ণনাগুলোও সন্দেহজনক হবে যাতে হযরত আলী (রা.), সাদাতে কেরাম অথবা বনু উমাইয়ার বিপরীতে আসা সাহায্যে কেরামের (যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রা.) মর্যাদাহানির দিক থাকে, বিশেষ করে যখন সেই বর্ণনা সন্দেহজনক হওয়ার অন্যান্য আলামতও বিদ্যমান থাকে।

গবেষণার এই ন্যায়সঙ্গত মূলনীতি সবার জন্য অপরিহার্য:

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, এই মূলনীতিগুলো কি কোনো বিশেষ চিন্তাধারার জন্য কার্যকর নাকি সবার জন্য সমানভাবে উপকারী? উত্তর হলো, এই ন্যায়সঙ্গত মূলনীতিগুলো প্রকৃতপক্ষে সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে গবেষণায় সাহায্য করবে যারা ন্যায়বিচার পছন্দ করেন—কেবল শিয়া ও নাসিবী ব্যক্তিরাই নয়, বরং অমুসলিমদেরও এই মূলনীতিগুলোর যৌক্তিক গুরুত্ব অনুভব করা উচিত। এই বিষয়টি প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে...

ঐতিহাসিক বর্ণনা চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি এটি মেনে নেওয়া হয় যে ঐতিহাসিকদের প্রতিটি বর্ণনা ব্যাখ্যা ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণযোগ্য, তা সনদের দিক থেকে দুর্বল হোক বা তাতে সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র হনন করা হোক, তবে ঐতিহাসিক বর্ণনার এই জঙ্গলে হযরত আলী, হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) এবং বনু হাশিম ও অন্যান্য সম্মানিত সাদাতদের সম্পর্কেও অদ্ভুত, অপ্রীতিকর এমনকি অবমাননাকর বর্ণনা পাওয়া যাবে, তবে কি সেগুলোকেও হুবহু মেনে নেওয়া হবে?

কয়েকজন বিখ্যাত দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাজার হাজার। তাদের সবাইকে চেনা উচ্চপর্যায়ের সমালোচক আলেমদের পক্ষেই সম্ভব। তবে ইলমে রিজালের সাথে কিছুটা পরিচিতি তৈরির জন্য এখানে এমন এগারোজন বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে, যাদের থেকে সাহাবায়ে কেরামের যুগ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বর্ণনার এক বিশাল ভাণ্ডার বর্ণিত হয়েছে:

- ১. লুত বিন ইয়াহইয়া আবু মুখনাফ (মৃ: ১৫৭ হি.)
- ২. মুহাম্মদ বিন সাযিব আল-কালবি (মৃ: ১৪৬ হি.)
- ৩. হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন সাযিব আল-কালবি (মৃ: ২০৪ হি.)
- ৪. মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদী (মৃ: ২০৭ হি.)
- ৫. উমর ইবনে শাববাহ (মৃ: ২৬২ হি.)
- ৬. ইবনে শিহাব আজ-জুহরি (মৃ: ১২৪ হি.)
- ৭. আবুল হাসান আল-মাদায়িনি (মৃ: ২২৫ হি.)
- ৮. মুহাম্মদ বিন সাদ (মৃ: ২৩০ হি.)
- ৯. খলিফা বিন খাইয়াত (মৃ: ২৩০ হি.)
- ১০. মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃ: ১৫১ হি.)
- ১১. সাইফ বিন উমর (মৃ: ১৮০ হি.)

চারজন সবচেয়ে দুর্বল বর্ণনাকারী:

এদের মধ্যে শুরুর চারজন বর্ণনাকারী: আবু মুখনাফ, ইবনে সাযিব কালবি, হিশাম কালবি এবং ওয়াকিদী অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে গণ্য হন। তাদের দুর্বলতা এই পর্যায় পর্যন্ত যে, তাদের বর্ণনা জাল করা এবং অকাতরে মিথ্যা বর্ণনা করার (ওয়াজ' ও কাযিব) সাথে জড়িত বলে মনে করা হয়। এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে তিনজন তো আইন্মায়ে জারাহ ও তাদিলের নিকট কটুর শিয়া ও রাফেজি, অর্থাৎ: আবু মুখনাফ, মুহাম্মদ বিন সাযিব কালবি এবং হিশাম কালবি... ওয়াকিদিকে আইন্মায়ে জারাহ ও তাদিলের অধিকাংশ মুহাদিস হাদিসের ক্ষেত্রে অযোগ্য এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেকটা নির্ভরযোগ্য মনে করেন। তবে ওয়াকিদীর অনেক বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরামের ওপর এমন সব অপবাদ রয়েছে যার ব্যাখ্যা...

কঠিন। ওয়াকিদির কিছু বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনারও পরিপন্থী।

এখন আপনি এই চারজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে আইন্মায়ের জারহ ও তাদিলের বক্তব্যসমূহ লক্ষ্য করুন!

•

১. আবু মিখনাফ লুত বিন ইয়াহইয়া: (মৃত্যু ১৫৭ হিজরি)

তার সম্পর্কে ইবনে আদি রহ. বলেন:

“শিয়ি, মুহতারিক, সাহিবে আখবারুহ্ম।” (চরমপন্থী শিয়া এবং তাদের সংবাদ পরিবেশক।)

হাফেজ জাহাবি রহ. বলেন:

“লা ইউসাকু বিহি।” (তার ওপর নির্ভর করা যায় না।)

ইবনে মাজিন রহ. এর বক্তব্য হলো:

“লাইসা বিশাই।” (তার কোনো গুরুত্ব নেই।) [১]

•

২. মুহাম্মদ বিন সাযিব কালবি (মৃত্যু ১৪৬ হিজরি)

তার সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন:

“মুত্তাহাম বিল কাযিব ওয়া রুমিয়া বির্ রাফয।” (তার বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে, রাফেযি হওয়ার অভিযোগও রয়েছে।) [২]

•

৩. হিশাম বিন মুহাম্মদ কালবি: (মৃত্যু ২০৪ হিজরি)

তার সম্পর্কে ইবনে আসাকির রহ. বলেন:

“রাফেযি লাইসা বিসিকা।” (রাফেযি, নির্ভরযোগ্য নয়।)

আল্লামা জাহাবি রহ. বলেন:

“লা ইউসাকু বিহি।” (তার ওপর আস্থা রাখা যায় না।) [৩]

•

৪. মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি (মৃত্যু ২০৭ হিজরি)

দ্বিতীয় হিজরি শতকের ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার কিতাব ও রিসালাসমূহে কার্যকর ও দরকারী উপাদানও প্রচুর রয়েছে, কিন্তু ওয়াকিদি বর্ণনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো মানদণ্ড বজায় রাখেননি, তাই তার সংগৃহীত উপাদানে অনেক অদ্ভুত ও আজগুবি কিছা এবং জাল বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। [৪] এই অগ্রহণযোগ্য উপাদানের...

[১] মিজানুল ইতিদাল লিজ জাহাবি: ৩/৪১৯

[২] তাকরিবুত তাহযিব, ইবনে হাজার আসকালানি, অনুবাদ নম্বর: ৫৯০১

[৩] মিজানুল ইতিদাল: ৩/৩০৩; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৯/৩৬২, ত. আর-রিসালা

[৪] ওয়াকিদির কিতাবসমূহের মানও ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। যেমন আল-মাগাজি, যা ওয়াকিদির সবচেয়ে বিশাল রচনা এবং তিন বড় খণ্ডে সমাপ্ত, তা উচ্চমানের মনে হয়। এর অধিকাংশ উপাদান হাদিস ও সিরাতের অন্যান্য উৎস থেকে বরং সহিহাইন-এর বর্ণনার অনুরূপ। পক্ষান্তরে কিছু কিতাব যেমন আল-জামাল, কিতাব সিফফিন যা বিবাদ-বিসংবাদ সংক্রান্ত, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের এবং প্রচুর সন্দেহজনক উপাদানে কলুষিত। তাই কিছু গবেষক যেমন আল্লামা যিরিকলির মতে, এই কিতাবগুলো ওয়াকিদির দিকে সম্বন্ধ করাই ভুল। তবে কিতাবুল মাগাজি এবং তাবাকাতে ইবনে সাদে বর্ণিত ওয়াকিদির বর্ণনাগুলো ওয়াকিদির দিকে সম্বন্ধ করা নিঃসন্দেহে সঠিক।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — সপ্তম খণ্ড

প্রচুর্য দেখে আইন্মায়ে জারহ ও তাদীল ওয়াকিদী সম্পর্কে কঠোর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

[১]

এই মতামতগুলো সামনে রেখে হাফিজ যাহাবী উপসংহার হিসেবে বলেন:

“استقر الاجماع على وهن الواقدي” (ওয়াকিদীর দুর্বলতার ওপর সকলের ঐক্যমত রয়েছে)।

[২]

স্মরণীয় যে, তারিখ তাবারী, তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং আনসাবুল আশরাফের মতো ‘ঐতিহাসিক বিশ্বকোষ’গুলোতে মুহাম্মদ কালবী, হিশাম কালবী, আবু মিখনাফ এবং ওয়াকিদী থেকে শত শত বর্ণনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলোই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অপবাদমূলক। শিয়া, নাসিবী, খারেজী এবং প্রাচ্যবিদরা এই বর্ণনাগুলো বিশেষভাবে উপস্থাপন করে আসছেন। বর্তমানে ইতিহাসের যেসব শিক্ষার্থী গবেষণার পরিবর্তে ভাসাভাসা অধ্যয়নের ওপর নির্ভর করে, তারা প্রায়শই এই চার ব্যক্তির (আবু মিখনাফ এবং ওয়াকিদী) বর্ণনার কারণে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে, অথচ সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতার (আদালাত) বিরুদ্ধে এই দুর্বল বর্ণনাগুলো নীতিগতভাবে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বাকি সাতজন রাবীর অবস্থা:

এখন বাকি সাতজন রাবী সম্পর্কে আসহাবে জারহ ও তাদীলের মতামত লক্ষ্য করুন:

৫. উমর বিন শাব্বাহ (মৃত্যু ২৬২ হিজরী)

উমর বিন শাব্বাহ ১৭৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় ৯০ বছর বয়স পেয়ে ২৬২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে এই এগারোজন রাবীর মধ্যে তিনিই সবার শেষে মৃত্যুবরণকারী। তিনি ইমাম ইবনে মাজাহর উস্তাদদের (শুযুখ) অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন: ‘সিকাহ’ (নির্ভরযোগ্য)। খতীব বাগদাদীর বক্তব্যও এটাই। ইবনে হিব্বানও তাঁকে ‘সিকাত’ (নির্ভরযোগ্যদের) মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে আবি হাতিম বলেন: ‘সাদুক’ (সত্যবাদী)।

[১] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন: “هو كذاب يقلب الاحاديث” (সে মিথ্যাবাদী, হাদীস ওলটপালট করে দেয়)। ইবনে মাজিন বলেন: “ليس بشئ” (নির্ভরযোগ্য নয়), (তার বর্ণনা লেখা উচিত নয়)। ইমাম নাসাঈ বলেন: “وضع الاحاديث” (সে বর্ণনা জাল করত)। ইমাম বুখারী বলেন: “متروك” (পরিত্যাজ্য)। ইমাম দারাকুতনী বলেন: “فيه ضعف” (তার মধ্যে দুর্বলতা আছে)। ইবনে আদীর বক্তব্য ছিল: “احاديثه غير محفوظة” (তার বর্ণনাগুলো সংরক্ষিত নয়)। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হলো: “كتب الواقدي كذب” (ওয়াকিদীর কিতাবসমূহ মিথ্যা)। (মিযানুল ইতিদাল: ৩/ ৬৬২-৬৬৩)।

তবে এর সাথে এটিও মনে রাখা জরুরি যে, ওয়াকিদীর প্রতিটি বর্ণনাকে চোখ বন্ধ করে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করাও কোনো ইনসাফের কথা নয়। সীরাত এবং সাহাবী ও তাবেরীদের ইতিহাসে ওয়াকিদীর বর্ণনাগুলো বড় বড় ইমামগণ গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মুসনাদে সীরাত ও মাগাযী সংগ্রান্ত একটি পূর্ণ অধ্যায় ওয়াকিদীর বর্ণিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত। শুধু তাই নয়, বরং আহকামের ক্ষেত্রেও ইমাম শাফেয়ী ওয়াকিদীর কিছু বর্ণনা থেকে উপকৃত হয়েছেন। (মুসনাদুশ শাফেয়ী, বাব ওমান কিতাবিস সিয়্যার আলা সিয়্যারিল ওয়াকিদী, পৃ. ৪৫৩)। একইভাবে ইমাম তাহাবী হাদীস ও ফিকহের অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা সমাধানের ক্ষেত্রে ওয়াকিদীর বক্তব্যসমূহকে সহায়ক (তাওয়াবে) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (শারহু মাআনিল আসার, খণ্ড: ২; শারহু মুশকিলিল আসার, খণ্ড: ৪, পৃ: ১৩৮, ২১৯, ৩৩৮)।

ওয়াকিদীর ওপর যেমন জারহ (সমালোচনা) আছে, তেমনি তাদীল (প্রশংসা)ও করা হয়েছে। হাফিজ যাহাবী ওয়াকিদী সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করে বলেন:

“ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازی وإيام الصحابة وأخبارهم.”

“এই সমস্ত কথা সত্ত্বেও মাগাযী এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসে ওয়াকিদীকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/ ৩৫৫, তাবা’তুর রিসালাহ)। পুরো আলোচনার সারকথা হলো, ওয়াকিদীকে একজন যযীফ (দুর্বল) রাবী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাঁর বর্ণনা থেকে নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে উপকৃত হওয়া যেতে পারে। যযীফ রাবীদের বর্ণনা কোন শর্তে গ্রহণ করা হবে এবং কোন অবস্থায় প্রত্যাখ্যান করা হবে? এ বিষয়ে আমরা প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংক্ষেপে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[২] তাহযীবুত তাহযীব: ৭/ ৩৬০; আল-জারহ ওয়াত তাদীল: ৬/ ২২, তাহযীবুল কামাল: ২১/ ৩৯০।

৬. ইমাম ইবনে শিহাব আল-জুহরি রহ. (মৃত্যু: ১২৪ হি.)

ইবনে শিহাব আল-জুহরি প্রথম দিকের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জন্ম ৫৮ হিজরিতে। তিনি সুন্নাহ ও ইতিহাসের বড় ইমাম এবং হাফেজদের মধ্যে গণ্য হন। সুন্নাহর এক বিশাল ভাণ্ডার তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমও তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিছু ব্যক্তি তাঁর সমালোচনা করেছেন, তবে জমহুর (অধিকাংশ) তাঁকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মনে করেন। [১]

তবে তাঁর কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, তিনি তাঁর জন্মের (৫৮ হি.) আগের অনেক ঘটনা সরাসরি বর্ণনা করেন, যেমন: সিরাতে নববী, খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগ, জঙ্গ জামাল, সিফফিন এবং হাকাম-এর ঘটনাবলি। ইমাম জুহরি রহ. অনেক সময় সেই বর্ণনাকারীর উল্লেখ করেন না যার থেকে তিনি শুনেছেন। মুহাদিসগণের মূলনীতি অনুযায়ী এ ধরনের বর্ণনাকে ‘মুরসাল’ বা ‘মুনকাতি’ বলা হয় এবং এর সনদের মর্যাদা দুর্বল হয়ে যায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি বর্ণনায় অধিকাংশ দুর্বল বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য হয়, কিন্তু যদি কোনো দুর্বল বর্ণনায় অদ্ভুত বা বিবেকবিরোধী কিছু অনুভূত হয়, তবে তার ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যায় না। ইমাম জুহরি রহ.-এর কিছু বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কেও কিছু অদ্ভুত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না যে, ইমাম জুহরি রহ. যখন এই ঘটনাগুলো নিজে দেখেননি, তখন তিনি কার থেকে শুনে এগুলো বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজে বিষয়টি স্পষ্ট করেননি, তাই বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। এভাবে সনদ মুরসাল বা মুনকাতি হয়ে যায় এবং এতে কিছুটা দুর্বলতা অবশ্যই সৃষ্টি হয়। [২]

এ কারণেই বিখ্যাত মুহাদিস ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান রহ. বলতেন: “জুহরির মুরসাল বর্ণনা বাতাসের মতো।” [২]

৭. আবুল হাসান আল-মাদায়িনি, আলী বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু: ২২৫ হি.)

ইবনে মাজিন রহ. তাঁকে “সিকাহ” (নির্ভরযোগ্য) বলেন, হাফেজ জাহাবি রহ. তাঁকে “আল-মুহাফিজ, আস-সাদিক, সাদুক” বলে স্মরণ করেন। [৩] ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর তাঁর ডজনখানেক পুস্তিকা ছিল, কিন্তু সেগুলো এখন প্রায় বিলুপ্ত।

[১] আল-জাহাবি বলেন: ইমাম, আল্লামা, তাঁর সময়ের হাফেজ। (সিয়ার আলামুন নুবালা: ৫/৩২৬)

[২] ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান জুহরি ও কাতাদাহ-এর মুরসাল বর্ণনাকে কিছুই মনে করতেন না এবং বলতেন: এটি বাতাসের সমতুল্য। (আল-জাহাবি ওয়াত তাদিল: ১/৪২৬)

এখানে একটি বিষয় বুঝে নেওয়া উচিত যে, ইবনে শিহাব আল-জুহরি থেকে বর্ণিত সুন্নাহ ও আহকামের বর্ণনার মতো তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্ণনাও নির্ভরযোগ্য, যদিও সেগুলো মুরসাল হয়। আমরা কেবল সেই বর্ণনাগুলো নিয়ে চিন্তা করি যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা পাওয়া যায়। সনদের দুর্বলতা ও সমালোচনার কারণে বিষয়টি তখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া পূর্বসূরিগণ ইমাম জুহরির কিছু সহিহ ও মুত্তাসিল বর্ণনাকেও ভুল ধারণা হিসেবে গণ্য করেছেন যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন, ইমাম জুহরি থেকে বর্ণিত হযরত আলী রা.-এর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হাতে বায়আত হতে ছয় মাস বিলম্ব করার বিষয়টি সহিহ বুখারিতে মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। (বাব গাজওয়ায়ে খায়বার, হাদিস নম্বর: ৪২৩০)। কিন্তু গবেষকগণ একে বর্ণনাকারীর ভুল ধারণা হিসেবে গণ্য করেছেন। (ফাতহুল বারী: ৭/৪৯৫, আল-মা’রিফাহ)। কারণ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী রা. তৎক্ষণাৎ বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। (আন আবি সাঈদ আল-খুদরি রা., মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৫; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৪৩)। যা-ই হোক, ইবনে শিহাব আল-জুহরির সাধারণ বর্ণনার ওপর (বিশেষ করে যা মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণিত) সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কিছু লোক এই বিষয়ে এতটাই চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন যে, ইবনে শিহাবকে শিয়া আখ্যা দিয়ে তাঁর এমন কিছু বর্ণনাও প্রত্যাখ্যান করেছেন যা ইমাম বুখারি পেশ করেছেন। যেমন- হাদিসে কিরতাস, যাতে হযরত উমর রা.-এর উক্তি: “আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট” বর্ণিত হয়েছে। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৪)। এই ধরনের “গবেষণা”কে হাদিস অস্বীকারের প্রথম পদক্ষেপ মনে করা উচিত।

[৩] সিয়ার আলামুন নুবালা: ১০/৪০১... নোট: আবুল হাসান আল-মাদায়িনি আলী বিন حنفی (মৃত্যু ২০৪ হি.) যিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং আবু বকর বিন আবি শায়বার উস্তাদ, তিনি ভিন্ন এক ব্যক্তিত্ব।

(৮) মুহাম্মদ বিন সাদ (রহ.) (মৃ: ২৩০ হি.)

তাকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মনে করা হয়েছে। হাফেজ যাহাবী (রহ.) তার পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে “আল-হাফেজ, আল-আল্লামাহ, আল-হুজ্জাহ” উপাধিতে স্মরণ করেছেন এবং ইবনে আবি হাতিমের বরাতে তাকে “সদুক” (সত্যবাদী) বলেছেন। [১]

সীরাতে নববী এবং সাহাবী ও তাবেরীদের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তার বিশ্ববিখ্যাত সংকলন “আত-তাবাকাতুল কুবরা” ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস, যা থেকে পরবর্তী সকল সীরাতকার ও ঐতিহাসিক উপকৃত হয়েছেন। যদিও সাধারণত বলা হয় যে তার বর্ণনার অধিকাংশ অংশ ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত, তবে বিষয়টি এমন নয়। তিনি ষাটজন মাশায়েখের কাছ থেকে বর্ণনা নকল করেছেন। সুতরাং ওয়াকিদিকে বাদ দিয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে তার বর্ণনা গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। তবে যেসব বর্ণনা তিনি ওয়াকিদি থেকে নিয়েছেন, সেগুলো সনদের দুর্বলতার কারণে অন্তত পর্যালোচনার দাবি রাখে।

(৯) খলিফা বিন খাইয়াত (রহ.) (মৃ: ২৪০ হি.)

তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী, অনেক যাচাই-বাছাই করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহীহ বা হাসান সনদে বর্ণনা নিয়ে আসেন। ইবনে আদি (রহ.) বলেন: “সদুক, মুতাইকিজুর রুওয়াত।” (সত্যবাদী এবং সতর্ক বর্ণনাকারী।)

হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন: “তার থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে সাতটিরও বেশি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী এবং সীরাত, ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের ইমাম।” [২]

(১০) মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) (মৃ: ১৫১ হি.)

মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ওপর ইমাম মালিক (রহ.) এবং ইমাম দারাকুতনী (রহ.) কঠোর সমালোচনা (জারাহ) করেছেন, কিন্তু জমহুর মুহাদিসগণ তাকে সীরাত ও ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। ইবনে হিব্বান তার উল্লেখ “আস-সিকাত” গ্রন্থে করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাকে “সদুক” এবং হাফেজ যাহাবী তাকে “সালিহুল হাদিস” হিসেবে অভিহিত করেছেন। [৩]

(১১) সাইফ বিন উমর (মৃ: ১৮০ হি.)

ইবনে আদি (রহ.) তার হাদিসকে মুনকার এবং আবু হাতিম (রহ.) তাকে মাতরুক (পরিত্যক্ত) বর্ণনাকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন, কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাইফ বিন উমরের সেই ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো যা মুনকার এবং সাহাবীদের প্রতি কটাক্ষ থেকে মুক্ত, সেগুলো গ্রহণযোগ্য। [৪]

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) সাইফ বিন উমর সম্পর্কে আইন্মায়ে জারাহ ও তাদিলের আলোচনার সারসংক্ষেপ এভাবে বের করেছেন: “যয়ীফ ফিল হাদিস, উমদাতুন ফিত তারিখ।” (হাদিসে দুর্বল এবং ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য।) [৫]

[১] সিয়র আলামুন নুবালা: ১০/ ২৬৫, ত. আর-রিসালাহ

[২] সিয়র আলামুন নুবালা: ১১/ ৩৫৩, ত. আর-রিসালাহ

[৩] তাকরিবুত তাহজিব, তর: ৫৭২৫; মিজানুল ইতিদাল: ৩/ ৪৬৯

[৪] মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং সাইফ বিন উমর উভয়ই বিতর্কিত, কিন্তু দুর্বলতা সত্ত্বেও তাদের বর্ণনার অধিকাংশ অংশ সহীহ হাদিস এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা গ্রহণযোগ্য। তবে যেসব বর্ণনা আশ্বিয়াদের মাসুম হওয়া (নিষ্পাপতা), সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে, সেগুলো প্রত্যাখ্যান করা হবে।

[৫] তাকরিবুত তাহজিব, তর: ২৭২৪

এই কারণেই ইবনে আসাকির, আল্লামা যাহাবী এবং ইবনে খালদুন (রহ.)-এর মতো গবেষকগণ সাইফ বিন উমরের অধিকাংশ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। যদিও সাইফ বিন উমরের কিছু বর্ণনার কিছু অংশ সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী হওয়ার কারণে আপত্তিকর, তবে অধিকাংশ বর্ণনা ‘মাশাজারাতে সাহাবা’ (সাহাবীদের মধ্যকার মতপার্থক্য) অধ্যায়ে কেবল সাহাবায়ে কেরামের পক্ষই সমর্থন করে না, বরং জালিয়াত সংবাদদাতাদের ভেজাল বর্ণনার মুখোশও উন্মোচন করে। এই বর্ণনাগুলোই আবদুল্লাহ বিন সাবার মুখোশ উন্মোচন করে মুনাফিকদের কারসাজিগুলো প্রকাশ করে দেয়।

শিয়া এবং প্রাচ্যবিদরা সাইফ বিন উমরের বর্ণনাগুলোকে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ সাইয়্যিদুনা উসমান (রা.)-এর যুগ থেকে মাশাজারাতে সাহাবার সময়কাল পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাইফ ইবনে উমর সত্যনিষ্ঠার হক আদায় করেছেন। ওয়াকিদী এবং সাইফের বর্ণনাগুলো অনেক জায়গায় একে অপরের বিরোধী বলে মনে হয়। সাইফ বিন উমরের বর্ণনাগুলো বলে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে যে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল, তার পেছনে ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল। এর বিপরীতে ওয়াকিদীর বর্ণনাগুলো বলে যে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মূল ভূমিকা ছিল হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর। এখন এই দুই বর্ণনাকারীর এই দুটি কাহিনীর মধ্যে অবশ্যই একটি সত্য এবং অন্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখন সাইফকে সত্যবাদী মানবেন নাকি ওয়াকিদীকে? আমাদের কাছে সত্য যাচাই করার আসমানি মানদণ্ড কুরআন মাজীদ বিদ্যমান রয়েছে; দেখে নেওয়া উচিত যে কোন বর্ণনাগুলো কুরআন কারীমের সেই সব আয়াতের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ যা সাহাবায়ে কেরামের শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুসান্নিফিনে হাদীসের ঐতিহাসিক বর্ণনা

সীরাতে নববী এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাধ্যমে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিত্বও রয়েছেন যাদের হাদীস সংকলনগুলোতে ইতিহাস ও সীরাতেরও বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। তাদের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে সমগ্র উম্মত একমত। তাদের ছাড়াও তিন জন মুহাদ্দিস: আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, আবদুর রাজ্জাক সানআনী এবং হাকেম নিশাপুরী (রহ.)-এর কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা আহাদীসে নববী এবং আছারে সাহাবার বিশাল সংকলন পেশ করেছেন, যা থেকে সকল যুগের ইসলামী উলামায়ে কেরাম পূর্ণ ফায়দা হাসিল করেছেন। নিচে এই তিনজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা হলো:

(১) ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (রহ.):

আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (রহ.) সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন: “ইমাম, জলীলুল কদর, হাফেজদের সরদার, মহান মর্যাদাবান, কিতাবসমূহের সংকলক... তিনি বয়স, জন্ম এবং মুখস্থ শক্তিতে আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ এবং আলী বিন মাদীনীসহ সমসাময়িক ছিলেন।” [১]

ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ওয়াকী বিন জাররাহ এবং সুফিয়ান বিন উয়াইনার মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতো ইলমের পাহাড় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাঁকে...

[১] “আল-ইমাম, আল-আলাম, সাইয়্যিদুল হাফেজ, সাহিবুল কুতুবিল কিবার... ওয়াহুয়া মিন আক্বরানি আহমাদ বিন হাম্বল, ওয়া ইসহাক বিন রাহওয়াইহ ওয়া আলী বিন আল-মাদীনী ফিস সিন্নি ওয়াল মাওলিদি ওয়াল হিফজ।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১২২/১১, ত. আর-রিসালাহ)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

“সদুক” (সত্যবাদী) হিসেবে গণ্য করতেন। আল্লামা ইজলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে সিকাহ এবং হাফিজে হাদিস বলতেন। আল্লামা আবু উবাইদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: “হাদিস চারজন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাবী আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ, সবচেয়ে বড় ফকিহ আহমদ ইবনে হাম্বল, সবচেয়ে বেশি বর্ণনা সংগ্রহকারী ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং সবচেয়ে বড় আলেম আলী ইবনুল মাদিনী।” [১]

তাঁর হাদিস সংকলন “মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ” হাদিসের প্রাচীনতম এবং বিশালতম সংকলনগুলোর একটি, যাতে প্রায় ৩৮ হাজার বর্ণনা রয়েছে। সুন্নতে নববী এবং আসারুস সাহাবার এই বিশাল ভাণ্ডারে প্রতিটি বিষয়ে প্রচুর এবং উপকারী বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। [২]

(২) ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম আস-সানআনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের লেখক ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে ইয়েমেনের সবচেয়ে বড় মুহাদিস এবং সিকাহ রাবী ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আলী ইবনুল মাদিনী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো ইমামগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং ফিকহ শাস্ত্রেও তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। [৩] হাফেজ যাহাবীর মতে: “আহাদুল আলামিস সিকাত” এবং হাফেজ ইবনে হাজারের মতে: “আহাদু আইম্মাতিল আলামিল হুফফাজ” ছিলেন। [৪]

(৩) ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি:

মুস্তাদরাক হাকেমের লেখক ইমাম হাকেম নিশাপুরী চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর মহান মুহাদিসদের একজন ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁর উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। আবুল কাসেম কুশায়রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ছাত্র ছিলেন। [৫]

ইমাম হাকেম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর রাফযের অভিযোগ:

স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, বর্তমানে কিছু লোক ইমাম হাকেম এবং ইমাম আব্দুর রাজ্জাককে দ্বিধাহীনভাবে “শিয়া” এমনকি রাফেযী পর্যন্ত বলে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা এর ওপর উম্মতের “ইজমা” আছে বলেও দাবি করেন এবং এই মিথ্যা দাবিও করেন যে, “হাফেজ যাহাবী” এবং হাফেজ ইবনে হাজারও এই দুই ব্যক্তিকে রাফেযী বলেছেন এবং হাকেম সম্পর্কে তো এই পর্যন্ত লিখেছেন: “রাফেযী খবীস।”

কিন্তু এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হাফেজ যাহাবী এবং হাফেজ ইবনে হাজার এই দুই বুজুর্গের কারো ওপর কখনোই এমন অভিযোগ আনেননি, বরং অন্যদের অভিযোগ উল্লেখ করে তা খণ্ডন করেছেন এবং এই মহান ব্যক্তিদের নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ যাহাবী ইমাম হাকেমের আলোচনা এভাবে শুরু করেন: “আল-ইমাম, আল-হাফিজ, আন-নাকিদ, আল-আল্লামাহ, শায়খুল মুহাদিসীন।” [৬]

87

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১১/১২৩, তাবা আর-রিসালাহ।

[২] লেখক “মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ”-এর শেষ খণ্ড থেকে বেশি উপকৃত হয়েছেন যেখানে জস্বে জামাল, জস্বে সিফফিন এবং খারেজীদের সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। আমি বর্ণনা নম্বর উল্লেখ করেছি কিন্তু পাণ্ডুলিপির পার্থক্যের কারণে যদি তথ্য খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়, তবে অধিকাংশ কাঙ্ক্ষিত বর্ণনা শেষ খণ্ডের শেষ অধ্যায়গুলোতে পাওয়া যাবে।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫২৩, তাবা আর-রিসালাহ।

[৪] মিজানুল ইতিদাল: ২/৬০৯, লিসানুল মিজান: ৭/২৮৭।

[৫] তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী: ২৮/২৩, শেষাংশ: মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিশাপুরী। মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁরই সমনাম ও সমস্থানের আবু আহমদ হাকেম নিশাপুরী (মৃত্যু ৩৭৮ হিজরি) ও অতিবাহিত হয়েছেন যাকে “হাকমে কবীর” বলা হয়। তাঁর কিতাব “শিআরু আসহাবিল হাদিস”, “আওয়ালী মালিক” এবং “ফাওয়াইদু আবি আহমদ আল-হাকেম” প্রসিদ্ধ। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৬/৪০-৪৭)।

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৭/১৬২।

দ্বিতীয় অংশ | তারিখ উম্মতে মুসলিম

হাফেজ যাহাবী (রহ.) ‘তাযকিরাতুল হুফফাজ’-এ হাকেম-এর নির্ভরযোগ্যতা সংক্রান্ত আইন্মায়ে জারহ ওয়াত তাদীল-এর উক্তিগুলো উদ্ধৃত করার পর খতিব আবু বকরের উক্তি: ‘কান ইয়ামিলু ইলাত তাশাইয়ু’ (তিনি শিয়া মতবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন), এরপর আবু ইসমাইল আনসারীর জারহ: ‘রাফেযী খবীস’ এবং এরপর ইবনে তাহেরের মতামত: ‘কান শাদীদুত তাআসসুব লিশ-শিয়া ফিল বাতিন ওয়া কানা ইয়ুজহিরুস সুনান’ (তিনি গোপনে শিয়াদের প্রতি অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং প্রকাশ্যে সুনান প্রকাশ করতেন) উদ্ধৃত তো করেছেন, কিন্তু এই অভিযোগগুলো তিনি কখনোই গ্রহণ করেননি বরং এগুলোকে কঠোরতা হিসেবে গণ্য করে বলেন:

আম্মা ইনহিরায়ুহু আন খুসুম আলি ফাযাহির, আম্মা আমরুশ শাইখাইন ফামুয়াযযিম লাহুমা বিকুল্লি হাল। ফাহুয়া শিয়ীযুন লা রাফেযীযুন।

(হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধীদের প্রতি হাকেম-এর অসন্তুষ্টি তো স্পষ্ট, কিন্তু যেখানে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর প্রসঙ্গ আসে, তিনি সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্মান করতেন। সুতরাং তিনি শিয়া ছিলেন, রাফেযী নন।) [১]

‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’-তে তিনি বলেন: ‘কাল্লা লাইসা হুয়া রাফেযীয়ান বাল ইয়াতশাইয়ু’ (তিনি রাফেযী কখনোই ছিলেন না বরং শিয়া ছিলেন।) আবু সাদ মালিনী নামক একজন আলেম দাবি করেছিলেন যে, মুস্তাদরাক-এ এমন কোনো বর্ণনা নেই যা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী। হাফেজ যাহাবী (রহ.) আবু সাদের প্রতিবাদ করে বলেন: “এটি জেদ এবং বাড়াবাড়ি। আবু সাদের এই মর্যাদা নেই যে তিনি এর ফয়সালা করতে পারেন।”

এরপর মুস্তাদরাক হাকেম সম্পর্কে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মতামত দিয়ে বলেন:

“এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বুখারী ও মুসলিম অথবা উভয়ের কোনো একজনের শর্ত অনুযায়ী, যদিও সনদে সূক্ষ্ম ও প্রভাবশালী ত্রুটিও রয়েছে; এক-চতুর্থাংশ হাসান এবং উত্তম সনদবিশিষ্ট; বাকিগুলো মুনকার এবং অদ্ভুত বর্ণনা, যার মধ্যে প্রায় একশটি জাল (মাওজু) রয়েছে যা আমি আলাদা একটি পুস্তিকায় জমা করেছি। যা-ই হোক, মুস্তাদরাক একটি দরকারী কিতাব যার একটি সারসংক্ষেপও আমি তৈরি করেছি।” [২]

হাফেজ যাহাবী (রহ.) এই অভিযোগকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন:

“আল্লাহর কসম! আব্বাস তার কসমের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে খুব খারাপ কথা বলেছে, এমন শাইখুল ইসলাম এবং সমকালীন মুহাদ্দিসের ওপর অভিযোগ এনেছে।”

এখন হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর মতামত লক্ষ্য করুন, তিনি ইমাম হাকেম (রহ.)-এর পরিচয় এভাবে দেন: ‘ইমাম সাদুক’। এরপর তাঁর ওপর আনীত অভিযোগগুলো খণ্ডন করে বলেন: “আল্লাহ ইনসাফ পছন্দ করেন, এই ব্যক্তি রাফেযী নন বরং কেবল শিয়া ছিলেন।” [৩]

এরপর বলেন: “হাকেম-এর শান এর চেয়ে অনেক উচ্চ এবং মহান যে তাঁকে দুর্বল (যয়ীফ) রাবীদের মধ্যে গণ্য করা হবে।” [৪]

একইভাবে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহ.), যাঁর কুনিয়াত ‘আবু বকর’-ই তাঁর সঠিক আকিদাহ সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ, তাঁকে রাফেযী মনে করা অনেক বড় বাড়াবাড়ি। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (রহ.)-এর মর্যাদা এমন ছিল যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মাঈন এবং আলী বিন মাদীনী (রহ.)-এর মতো হাদিস বিশারদগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) তাঁকে কেবল ‘শিয়ী’ মনে করেন এবং তাঁর পক্ষ সমর্থনও করেন।

[১] তাযকিরাতুল হুফফাজ: ৩/ ১৭৫, ১৬৬ তাবা আল-ইলমিয়াহ

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৭/ ১৭৪, ১৭৫ তাবা আর-রিসালাহ

[৩] “ইম্নাল্লাহা ইউহিব্বুল ইনসাফ, মার রাজ্জলু বি-রাফেযীয়িন বাল শিয়ীযুন ফাকাত।” লিসানুল মিজান: ৫/ ২৩৩ (শিয়ী এবং রাফেযীর পার্থক্য সামনে আসছে।)

[৪] “ওয়াল হাকেমু আজাল্লু কাদরান ওয়া আ’যামু খাতরান ওয়া আকবারু যিকরান মিন আন ইউযকারা ফিদ দুয়াফা।” (লিসানুল মিজান: ৫/ ২৩৩)

তারিখ উম্মত মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

এক আলেম আব্বাস বিন আব্দুল আজিম ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহ.-এর চরিত্র হনন করতে গিয়ে লিখেছিলেন:

“আল্লাহর কসম! আব্দুর রাজ্জাক মিথ্যাবাদী এবং ওয়াকিদী তার চেয়েও বেশি সত্যবাদী।”

হাফেজ যাহাবী রহ. এই অভিযোগকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন:

“আল্লাহর কসম! আব্বাস তার কসমে মিথ্যা বলেছেন। তিনি শায়খুল ইসলাম এবং মুহাদ্দিসে আসরের ওপর এমন অপবাদ দিয়েছেন যার সপক্ষে সিহাহ-এর সকল সংকলক দলিল গ্রহণ করেছেন। যদিও আব্দুর রাজ্জাকের কিছু ভুল ও ধারণা রয়েছে এবং অন্য কিছু মুহাদ্দিস তার চেয়েও বেশি পারদর্শী, কিন্তু তার ওপর মিথ্যার অপবাদ দেওয়া এবং ওয়াকিদীকে (যাকে পরিত্যক্ত হওয়ার ব্যাপারে হাফেজদের ইজমা রয়েছে) তার ওপর প্রাধান্য দেওয়া এমন একটি বক্তব্য যা নিশ্চিতভাবে ইজমার পরিপন্থী।” [১]

কিছু লোক আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মামের রাফেজি হওয়ার সপক্ষে এই দলিল দেন যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর আলোচনা শুনতে পছন্দ করতেন না এবং বলতেন: “আমাদের মজলিসকে আবু সুফিয়ানের ছেলের আলোচনা দিয়ে কলুষিত করো না।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সম্পর্কে এই কথাটি শুধুমাত্র মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াজিদ বসরী নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, যে অজ্ঞাত (মাজহুল)। এই একটি বর্ণনা ছাড়া এর আর কোনো নাম-নিশানা পাওয়া যায় না। [২]

স্বয়ং ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহ. তার ‘মুসান্নাফ’-এ হযরত মুয়াবিয়া রা. থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার ছাত্রদের মাধ্যমে উম্মত পর্যন্ত হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর ইলমি ফয়েজ পৌঁছে দিচ্ছেন। তাই এটা মানতেই হবে যে মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াজিদের এই বর্ণনাটি মিথ্যা। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও আব্দুর রাজ্জাককে তাশাইয়ু-এর অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত বলে স্বীকার করেছেন। যখন তার সাহেবজাদা তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “আব্দুর রাজ্জাক কি তাশাইয়ু-তে অতিরঞ্জন করতেন?”

ইমাম আহমদ জবাব দিলেন: “আমি তার থেকে এমন কিছু শুনি নি। ইঁ্যা, তিনি খবর এবং ঘটনাবলি পছন্দ করতেন।” [৩]

শিয়া এবং রাফেজির মধ্যে পার্থক্য:

শিয়া ঐসব লোকদের বলা হতো যারা হযরত আলী রা. এবং আহলে বাইতের রাজনৈতিক সমর্থক, ভক্ত ও প্রশংসাকারী ছিলেন।

পক্ষান্তরে রাফেজি শব্দটি ঐসব শিয়াদের ওপর প্রয়োগ করা হয় যারা হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর রা.-এর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করে। [৪]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫৭১, ৫৬২, ত. আর-রিসালাহ।

[২] সম্ভব যে এটি মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াজিদ আসানি (মৃত্যু ২৩৬ হিজরি) যিনি যঈফ, বরং কিছু জারহ ও তাদিল ইমাম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। (তারিখ বাগদাদ: ১/৪৫৩, ত. আল-গারবিয়া)। ‘সিন’ বসরার একটি গ্রামের নাম যার দূরত্ব এক মাইল। (তাওজিহুল মুশতাবাহ: ৫/৩২৬)। সম্ভব যে এই সম্পর্কের কারণে তাকে বসরীও বলা হয়।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/৬৩, ১৬৫, ত. আর-রিসালাহ।

[৪] লুগাতে শিয়া-এর সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে: ‘আশ-শিয়া কওমুন ইউওয়ালুনা আলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আহলা বাইতিহি।’ “শিয়া ঐ দল যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশধরদের ভালোবাসে এবং তাদের সমর্থন করে।” (লিসানুল আরব: ৮/১৮৯)।

‘ওয়া কদ গালাবা হাজাল ইসমু আলা কুল্লি মান ইয়াতাওয়াল্লা আলিয়্যান ওয়া আহলা বাইতিহি হাত্তা সরা লাহম ইসমান খাসসা।’ “এই নামের প্রয়োগ ঐ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর হতে লাগল যারা হযরত আলী রা. এবং আহলে বাইতের অনুসারী ছিল। এমনকি এটি তাদের একটি বিশেষ নাম হয়ে গেল।” (উসুলু মাজহাবিশ শিয়া আল-ইমামিয়াহ আল-ইসনা আশারিয়াহ আরদুন ওয়া নাকদুন, ড. নাসির বিন আব্দুল্লাহ আল-কিফারি: ১/৩১)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ‘শিয়াহ’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছেন:

“পূর্ববর্তীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী শিয়াহ হওয়ার অর্থ হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.) সঠিক পথে ছিলেন এবং তাঁর বিরোধীরা ভুলের ওপর ছিল, আর হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-কে সমস্ত সাহাবীর ওপর শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান মনে করা।” [১]

এই একই কথা সমস্ত মহান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম লিখেছেন। অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক আলেম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ‘মিনহাজুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে লিখেছেন:

“হযরত আলী (রা.)-এর শিয়াহ ছিলেন সেই সকল সাথী যারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে তাঁর (আলী রা.) চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। (জমহুর মুসলিমিন বা সাধারণ মুসলিমদের সাথে তাঁদের) মতপার্থক্য কেবল এই বিষয়ে ছিল যে, তাঁরা হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। সেই সময়ে ইমামি বা রাফেজি বলে কেউ ছিল না।” [২]

রাফেজি ও শিয়াহর মধ্যে পার্থক্য, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদিসে দেহলভীর ব্যাখ্যা:

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদিসে দেহলভী (রহ.) ‘শিয়াহ’ ও ‘রাফেজি’র মধ্যে পার্থক্যের অত্যন্ত চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার সারমর্ম হলো এই যে, আলীর সেই অনুসারীরা যারা হযরত আলী (রা.)-এর মতাদর্শের ওপর অক্ষরে অক্ষরে আমল করতেন, তাঁরা শিয়াহ-এ-উলা (প্রথম স্তরের শিয়া) নামে পরিচিত ছিলেন। জমহুর মুসলিমিন...

[১] ফাততশাইয়ু ফি উরফিল মুতাকাদিমিন হুয়া ইতিকাদু তাফদিলি আলিয়্যিন আলা উসমানা ওয়া আন্না আলিয়ান কানা মুসিবান ফি হুরুব্বিহি ওয়া আন্না মুখালিফাহ মুখতিউন মাতা তাকদিমিশ শাইখাইনি ওয়া তাফদিলিহিমা। (তাহজিবুত তাহজিব: ১/৯৪)

একটি চমৎকার ঘটনা:

এক ব্যক্তি যিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ভুল মনে করতেন এবং একই সাথে আহলে সুন্নাতের প্রকৃত মুখপাত্র হওয়ার দাবিদার ছিলেন। এই দলেরই এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন: “হযরত আলী (রা.)-কে যুদ্ধবিগ্রহে সঠিক এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে ভুল মনে করা শিয়াদের আকিদা, আহলে সুন্নাতের আকিদা নয়।” লেখক তার এই কথার জবাবে অত্যন্ত জোরালোভাবে বললেন: “তাহজিবুত তাহজিব”-এ হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন: “ফাততশাইয়ু ফি উরফিল মুতাকাদিমিন হুয়া ইতিকাদু তাফদিলি আলিয়্যিন আলা উসমানা ওয়া আন্না আলিয়ান কানা মুসিবান ফি হুরুব্বিহি ওয়া আন্না মুখালিফাহ মুখতিউন...”

লেখক জিজ্ঞেস করলেন: “আপনার মতে এই সংজ্ঞার প্রতিটি অংশ কি আহলে সুন্নাতের আকিদার পরিপন্থী নাকি বিশেষ কোনো অংশ?”

তিনি বলতে লাগলেন: “যেহেতু এটি শিয়াদের আকিদা, তাই এটি আহলে সুন্নাতের আকিদা হতে পারে না। তাই এটি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের আকিদার পরিপন্থী।” আমি তাকে “তাহজিবুত তাহজিব” বের করে দেখালাম: “আপনি এর পরের শব্দগুলোও পড়ুন।” তিনি পড়লেন: “মাতা তাকদিমিশ শাইখাইনি ওয়া তাফদিলিহিমা... আহলে সুন্নাত হওয়ার জন্য কি এই অংশটুকুতেও কোনো দ্বিমত থাকবে? নাকি কেউ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ পাঠ করার পর তাকে আহলে সুন্নাত হওয়ার জন্য নিজের জন্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অস্বীকার করা জরুরি হবে??”

তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তখন লেখক বললেন: “যেভাবে এই সংজ্ঞায় ‘মাতা তাকদিমিশ শাইখাইনি ওয়া তাফদিলিহিমা’ অংশটি আহলে সুন্নাত ও শিয়াহ-এ-মুতাকাদিমিন (পূর্ববর্তী শিয়া) উভয়ের নিকট সর্বসম্মত, ঠিক তেমনি ‘আন্না আলিয়ান কানা মুসিবান ফি হুরুব্বিহি ওয়া আন্না মুখালিফাহ মুখতিউন’ অংশটিও উভয়ের নিকট সর্বসম্মত। যার প্রমাণ আহলে সুন্নাতের ডজন ডজন কিতাবে বিদ্যমান। মতপার্থক্য কেবল ‘তাফদিলি আলিয়্যিন আলা উসমান’ (উসমানের ওপর আলীর শ্রেষ্ঠত্ব) বিষয়ে।” এরপর লেখক তাকে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর এই বক্তব্য দেখালেন: “ওয়া ফি কাওলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: তাকতুলু আন্নারানিল ফিয়াতুল বাগাতি... দালালাতুন ওয়াদিহাতুন আলা আন্না আলিয়ান ওয়া মান মাতাহ কানু আলাল হাক্কি ওয়া আন্না মান কাতলাহম কানু মুখতিয়িনা ফি তাওয়িলিহিম...” (ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী: ৭/২১৯, দারুল মা’রিফাহ)। এরপর লেখক বললেন: “যে আকিদাকে আপনি শিয়াদের আকিদা বলছেন, খোদ হাফেজ ইবনে হাজার একে আহলে সুন্নাতের আকিদা হিসেবে সাব্যস্ত করছেন।”

শুধু তাই নয়, হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর আরও একটি ইবারত (উদ্ধৃতি) দেখালাম: “ওয়া ফি হাজাল হাদিসি আলামুন মিন আলামিন নুবুওয়াতি ওয়া ফাদিলাতুন জাহিরতুন লি আলিয়্যিন ওয়া আন্নারিন ওয়া রাদুন আলার নাওয়াসিবিল যা-ইমিনা আন্না আলিয়ান লাম ইয়াকুন মুসিবান ফি হুরুব্বিহি।” (এই হাদিসে নবুওয়াতের নিদর্শন এবং আলী ও আন্নার (রা.)-এর সুস্পষ্ট ফজিলত রয়েছে এবং সেই নাওয়াসিবদের দাঁতভাঙ্গা জবাব রয়েছে যারা মনে করে যে হযরত আলী (রা.) তাঁর যুদ্ধগুলোতে সঠিক পথে ছিলেন না)। (ফাতহুল বারী: ১/৫৩৩)

সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় এই বলতে বলতে বিদায় নিলেন: “আজ জানা গেল যে হাফেজ ইবনে হাজারও ভেতর থেকে শিয়া ছিলেন।”

[২] ওয়া কানাতুশ শিয়াতু আসহাবু আলিয়্যিন ইউকাদিমুনা আলাইহি আবা বাকরিন ওয়া উমারা, ওয়া ইন্নামা কানান নিজাউ ফি তাকদিমিহি আলা উসমানা ওয়া লাম ইয়াকুন হীনা-ইজিন ইউসাম্মা আহাদুন ইমামান ওয়া লা রাফিদিয়ান। (মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ লি ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি: ২/৯৬, তাবা আল-জামিআতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ)

তাদের সাথে তাদের মতপার্থক্য কেবল এই বিষয়ে ছিল যে, জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) এর নিকট হযরত উসমান হযরত আলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে শিয়ায়ে উলা (প্রাথমিক শিয়াগণ) হযরত আলীকে হযরত উসমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। এটি একটি শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত (ফুরুয়ি) বিবাদ ছিল যা জমহুরের নিকট এমন ছিল না যে এর কারণে শিয়ায়ে উলা-কে পথভ্রষ্ট বা বিদআতি আখ্যা দেওয়া হবে। বরং তাদেরকে আহলে সুন্নাতেই একটি দল মনে করা হতো। [১]

সেই যুগে এমন কিছু শিয়াও ছিল যারা হযরত আলীকে সমস্ত সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন কিন্তু খুলাফায়ে সালাসা (প্রথম তিন খলিফা) সহ সকলের সম্মান করতেন এবং কোনো সাহাবীর প্রতি তাবাররা (গালিগালাজ বা বিরাগভাজন হওয়া) জায়েজ মনে করতেন না। তাদেরকে শিয়ায়ে তাফজিলিয়া বলা হতো। শ্রেষ্ঠত্বের (তাফজিল) মাসআলা ছাড়া শিয়ায়ে উলার সাথে তাদের কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু যখন রাফেজিরা নিজেদের শিয়া বলে পরিচয় দিতে শুরু করল, তখন শিয়ানে উলা এবং শিয়ায়ে তাফজিলিয়াও আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাআত উপাধি গ্রহণ করল যাতে মানুষের বিভ্রান্তি না হয়। শাহ সাহেব বলেন:

“ইতিহাসের প্রাচীন কিতাবসমূহে আহলে সুন্নাতে বড় বড় ইমামদের জন্য যে এই শব্দগুলো: ‘ফুলানুন মিনাশ শিয়া’ (অমুক শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত) বর্ণিত হয়েছে, তা নিজ স্থানে সঠিক। কারণ পূর্বে এমন ব্যক্তিদের জন্য এটিই উপাধি ছিল... এতে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এই ব্যক্তিবর্গ উল্লিখিত শিয়াদের মতো মোটেও ছিলেন না। হযরত আলীর সাহচর্যের কারণে তারা ‘হাইয়ানে আলী’ (আলীর অনুসারী) নামে অভিহিত হতেন।” [২]

অন্য কথায় আমরা বলতে পারি যে, শিয়া একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ এবং রাফেজি বিশেষ। প্রত্যেক রাফেজিই শিয়া, কিন্তু প্রত্যেক শিয়া রাফেজি নয়। বর্তমানে শিয়াদের মধ্যে রাফেজি বেশি, পক্ষান্তরে প্রথম যুগে রাফেজি কম ছিল এবং সাধারণ শিয়া বেশি ছিল। সুতরাং যদি জারাহ ও তাদিল (হাদিস বিশারদ) এর ইমামগণ হাকেম বা আব্দুর রাজ্জাককে ‘শিয়ি’ বলেও থাকেন, তবে তার অর্থ বর্তমানের ইসনা আশারি বা ইসমাইলি ধরনের শিয়া নয়। সেই সময় এক বিশাল জনগোষ্ঠী কেবল হযরত আলীকে হযরত উসমান অপেক্ষা উত্তম মনে করার কারণে শিয়া নামে পরিচিত ছিল। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক এবং ইমাম হাকেমের তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ) এর চেয়ে বেশি ছিল না। অতএব জমহুর ওলামাদের মতে ইমাম হাকেম এবং ইমাম আব্দুর রাজ্জাক শিয়ি হওয়া সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) হিসেবে গণ্য হয়েছেন। সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমের মধ্যেও একাধিক শিয়া বর্ণনাকারী পাওয়া যাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য হন। [৩]

[১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “هذه المسئلة بعثة عثمان وعلى ليست من الاصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنة.” “এই মাসআলা অর্থাৎ হযরত উসমান এবং হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্বের মাসআলাটি সেই সকল মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় যার বিরোধিতাকারীকে জমহুর আহলে সুন্নাতে নিকট পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়া হয়।” (আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়া, পৃ. ৭১, ত. আদওয়াউস সালাফ)

[২] তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া (উর্দু), পৃ. ৩৯, ৪০

[৩] উদাহরণস্বরূপ সহিহ বুখারিতে সালামাহ বিন কুহাইল-এর ৫টি, আউফ বিন আবি জামিলা-এর ৪টি এবং উবাইদুল্লাহ বিন মুসা-এর ৩৩টি বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া ইমাম বুখারি আব্দুল আজিজ বিন সিয়াহ, ইয়াহইয়া বিন ইয়ালা কুফি এবং আব্দুল মালিক বিন আমিন থেকেও দু-একটি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এই সকল ব্যক্তি শিয়া বর্ণনাকারী ছিলেন। একইভাবে সহিহ মুসলিমে সালামাহ বিন কুহাইল-এর ১৯টি, হিশাম বিন সাদ-এর ৮টি, জাফর বিন সুলাইমান-এর ১৩টি এবং উবাইদুল্লাহ বিন মুসা-এর ২৩টি বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া ইমাম মুসলিম সুলাইমান বিন কারম, আলী বিন যাইদ বিন জাদআন, আউফ বিন আবি জামিলা, আব্দুল আজিজ বিন সিয়াহ এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়ালা কুফি থেকেও কোথাও কোথাও বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এরা সবাই শিয়া বর্ণনাকারী অথবা তাদের ওপর তাশাইয়ু-এর অভিযোগ রয়েছে। অন্যান্য হাদিসের কিতাবসমূহে (মুয়াত্তা ইমাম মালিক ব্যতীত) শিয়া বর্ণনাকারীদের অনুপাত এর চেয়ে অনেক বেশি।

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদসমূহ বাদ দেওয়া কেন সম্ভব হয়নি?

জঙ্গ জামাল এবং জঙ্গ সিফফিন আমাদের ইতিহাসের দুটি অত্যন্ত নাজুক অধ্যায়। এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিগুলো একটি কণ্টকাকীর্ণ ও ঘন জঙ্গলের মতো, যেখানে না জানি কত মানুষ পথ হারিয়ে ফেলেছে। একদল লোক নাসর বিন মুজাহিম এবং আবু মুখনাফের মতো অবিশ্বাস্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকেও নিশ্চিত মনে করে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। অন্য দল চরমপন্থায় গিয়ে বিবাদসমূহকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। অথচ মূল ঘটনাগুলো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ও হাদিস সংক্রান্ত উপাদান দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামের ফকিহগণ বিদ্রোহের মতো রাজনৈতিক বিষয়গুলোর বিধান এই ঘটনাগুলো সম্বলিত সহিহ বর্ণনা থেকেই গ্রহণ করেছেন।

তা সত্ত্বেও এই কথাটি নিজের জায়গায় সঠিক যে, সাধারণ মানুষের সামনে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদের আলোচনা বর্জন করাই উত্তম। যদি সম্ভব হতো তবে লেখকও এই অধ্যায়টি এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে এখানে তার সুযোগ নেই:

(১) যখন একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হচ্ছে, তখন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো একটি গল্পের মতো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে। একটি অনুচ্ছেদও যদি বাদ পড়ে যায়, তবে কাহিনী অপূর্ণ থেকে যায়। এই কারণেই হাফেজ জাহাবি এবং হাফেজ ইবনে কাসিরের মতো সতর্ক আলেমগণও তাঁদের ইতিহাসে বিবাদের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

(২) বর্তমান যুগে এই ঘটনাগুলো মিডিয়া বিশেষ করে ইন্টারনেটে ক্রমাগত আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যদি আমরা ইতিহাস গবেষণা করার সময় বিবাদের অধ্যায়টি বাদ দিই, তবে অসংখ্য মানুষ যারা আগে থেকেই এই বিষয়গুলোতে সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার, তারা মনে করে বসবে যে এই ঘটনাগুলো অবগণীয় মাত্রায় জঘন্য। তাই ইতিহাস লেখার সময় এই বিষয়গুলো ছেড়ে দেওয়া সেই সব মানুষের সন্দেহ ও সংশয়কে আরও দৃঢ় করে দেবে যারা এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন।

(৩) ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরক্ষা, তাঁদের সম্পর্কে ছড়ানো সন্দেহ দূর করা, ভুল ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো প্রত্যাখ্যান করা এবং সন্দেহজনক বিষয়গুলোর প্রকৃত রূপ সামনে আনা। এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা ইতিহাসের এই সময়কালকে বাদ না দিয়ে বরং যাচাই-বাছাই করে সত্যকে সামনে নিয়ে আসব। এমন পরিস্থিতিতে বিবাদের আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সাহাবায়ে কেরামের বিবাদ সম্পর্কে নীরব থাকার বিধান এবং আলোচনার সুযোগ:

সাহাবায়ে কেরামের বিবাদ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করার শরয়ি দলিল এবং আকাবিরদের বাণী লেখকের সামনেও রয়েছে এবং আফসোস যদি এই আলোচনা থেকে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ থাকত। কিন্তু যেখানে একটি ধারাবাহিক ইতিহাসে এই আলোচনা অনিবার্য, সেখানে বর্তমান পরিস্থিতিতে এর ওপর আলোচনার শরয়ি সুযোগও তৈরি হয়; বরং যেসব বুজুর্গদের ইঙ্গিতে লেখক এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মতে বর্তমানে এই কাজটি অনিবার্য। যদিও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই বিষয়টি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, যেমনটি হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বৈধতা এবং এর নাজুকতা উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন:

“অবশ্য কিছু লোক রাফেজি, খারেজি এবং মুনাফিকদের প্রচারিত বর্ণনা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ভুল ধারণা...”

...দূর করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ (মুশাজারাতে সাহাবা) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা নিজ স্থানে সঠিক, কিন্তু তবুও এটি একটি দুঃখজনক পদক্ষেপ যেখান থেকে সহিহ-সালামত বের হয়ে আসা সহজ কাজ নয়।“

এরপর কয়েক পৃষ্ঠা পর উক্ত মহোদয় এই আলোচনার সঠিক পদ্ধতি পেশ করে বলেন:

“যদি আজকেও বুদ্ধি ও ইনসাফ বলে কিছু থেকে থাকে, তবে একটি কাজ করে দেখুন যে, সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং তাদের মধ্যকার যুদ্ধগুলোতে যারা অগ্রণী ছিলেন—হযরত আলী কাররামালাহ ওয়াজহাহ, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত তালহা ও জুবায়ের, হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ—এই মহান ব্যক্তিদের অবস্থা এবং একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তব্যসমূহ হাদিসের কিতাবগুলোতেও হাদিস বর্ণনার মূলনীতির ভিত্তিতে যাচাই করে সংকলিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে, আবার এই ব্যক্তিদেরই কিছু অবস্থা ও বক্তব্য ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহেও এসেছে। এই উভয় প্রকারের বর্ণনাগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে পড়ে নিজেদের অন্তর ও মস্তিষ্কের পর্যালোচনা করুন যে, হাদিস শাস্ত্রে আসা বর্ণনাগুলো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কী প্রভাব ফেলে? আর ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো এর বিপরীতে কী প্রভাব রেখে যায়? সামান্য তুলনা করে দেখলে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, হাদিসে সংকলিত বর্ণনাগুলো থেকে যদি কোনো সাহাবীর কোনো বাড়াবাড়ি বা বিচ্যুতি জানাও যায়, তবে তার সামগ্রিক প্রভাব কখনোই এমন হয় না যে তাদের ব্যক্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ ও অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ে; পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো এমন যে, সেগুলো পড়ে একজন মানুষ উভয় পক্ষকে অথবা অন্তত এক পক্ষকে ভুলকারী, ক্ষমতালেভী এবং ক্ষমতার জন্যই যুদ্ধকারী সাব্যস্ত করবে।” [১]

বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপদ্ধতি:

আকাবিরদের (পূর্বসূরিদের) দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধের এই নাজুক আলোচনায় আমাদের পদ্ধতি এটাই থাকবে। প্রথমত, আমরা হাদিসের ভাণ্ডার থেকে সাহায্য নেব। দ্বিতীয়ত, হাদিসের ভাণ্ডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইতিহাসের সহিহ ও হাসান বর্ণনাগুলো থেকে। তৃতীয় পর্যায়ে, সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যয়িফ (দুর্বল) বর্ণনাগুলো থেকে। যেসব খুঁটিনাটি বিষয় হাদিসের ভাণ্ডার বা সহিহ ঐতিহাসিক বর্ণনায় নেই, কেবল যয়িফ বর্ণনায় পাওয়া যায়, সেগুলো আমরা কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করব; তাও এই শর্তে যে, সেগুলো যেন কুরআন ও হাদিসের মূলনীতি এবং কোনো সহিহ বর্ণনার খুঁটিনাটি বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কুরআন, হাদিস এবং সহিহ ঐতিহাসিক বর্ণনার বিরোধী যয়িফ বর্ণনাগুলোকে আমরা পুরোপুরি বর্জন করব। কেবল আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসের দাবিই নয়, বরং গবেষণা ও ইনসাফের দাবিও এটাই। মনে রাখবেন যে, পরস্পরবিরোধী বর্ণনার সমস্যার একটি সমাধান এটাও হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে যা বর্ণিত হয়েছে কেবল সেটুকুই মানা হোক, বর্ণনার মতভেদ থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা হোক। এই মহান ব্যক্তিদের অবস্থা ও ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দেওয়া হোক। অর্থাৎ এই বিষয়ে কোনো কিছু ভাবা, পড়া বা গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা হোক। একজন সাধারণ মানুষের জন্য অবশ্যই এই পদ্ধতিটি নিরাপত্তার অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু স্পষ্টতই আলেম সমাজ, বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্ররা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। অতএব, আলেমদের জন্য সমস্যার প্রকৃত সমাধান এটাই হতে পারে যে, পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলোর মধ্য থেকে সেই অংশটুকু গ্রহণ করা হবে...

[১] মাকামে সাহাবা, পৃ. ১০৭-১০৯

যা কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে সাহাবায়ে কেরামের বিজয়াভিযান পর্যন্ত লেখক বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রশস্ততা অবলম্বন করেছিলেন। তাবারী, আল-কামিল, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া এবং প্রতিটি প্রচলিত কিতাব থেকে সুযোগ অনুযায়ী উপাদান গ্রহণ করা হয়েছিল। কারণ এই বিজয়গুলো এমন এক জীবন্ত বাস্তবতা যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, এগুলোর কল্যাণেই পৃথিবীর এক বিশাল অংশে মুসলমানরা বসবাস করছে। এগুলোর খুঁটিনাটি বিবরণ দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকেও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন আমরা ফিতনার যুগ এবং সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতভেদের (মুশাজারাতে সাহাবা) সময়ের পাতা উল্টাতে শুরু করেছি, যেখানে মুনাফিক এবং সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রও স্থানে স্থানে কার্যকর দেখা যাবে। লেখকের পূর্ণ চেষ্টা থাকবে যেন ইনসাফ, সততা এবং সঠিক প্রমাণের সাথে এই ষড়যন্ত্রগুলোর উপর থেকেও পর্দা উন্মোচন করা হয়। বিতর্কিত বিষয়গুলোতে বর্ণনার বিশুদ্ধতার (সিহহাত) বাধ্যবাধকতা থাকবে। আংশিক ঘটনাপ্রবাহে বর্ণনার দুর্বলতা গ্রহণযোগ্য হবে। হাফেজ যাহাবী মুস্তাদরাকে হাকেম-এর ওপর টীকা লিখে এর অনেক বর্ণনার সহীহ বা যঈফ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আমরা মুস্তাদরাক থেকে যে উপাদান গ্রহণ করব, তা হাফেজ যাহাবীর টীকা দেখেই গ্রহণ করব। যেখানে সন্দেহ হবে, সেখানে বর্ণনার মূলনীতি অনুযায়ী সনদের যাচাই-বাছাই করব। [১] এই পদ্ধতিটি সেই প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যার বর্ণনাকারীরা এর সহীহ, হাসান বা যঈফ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেননি।

মুশাজারা এবং ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি:

মুশাজারার (সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতভেদ) স্পর্শকাতর আলোচনাকে সাধারণত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা হয়েছে এবং এই বিষয়গুলো যা মূলত আকিদা, শরীয়ত এবং বিচারব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ছিল, সংকলিত ইসলামী ফিকহী ভাণ্ডারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা হয়নি। অথচ যদি ফিকহী ভাণ্ডার এবং ফকীহদের বক্তব্য সামনে রেখে এই বিষয়গুলো দেখা হয়, তবে দুটি উপকার হয়:

- কিছু জটিল ও বিতর্কিত বিচার্য বিষয় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেগুলোতে দ্বিতীয় কোনো মতের অবকাশ থাকে না।
- কিছু এমন দুর্বল বর্ণনার অতিরঞ্জন বা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়, যার মাধ্যমে কিছু খুলাফায়ে রাশেদীন বা কিছু সাহাবীর নেতিবাচক চিত্রায়ন করা হয়।

মনে রাখতে হবে যে, ফিকহ শাস্ত্রের সংকলিত ভাণ্ডারে যদিও ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকে, তবে প্রাথমিক ও মৌলিক উৎসগুলোর সংকলন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতেই সম্পন্ন হয়েছিল। বিশেষ করে হানাফী ফিকহের সেই মৌলিক কাজ যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) করে গেছেন, তা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পূর্ণ হয়েছিল। এই আইনামায়ে মুজতাহিদীন বড় বড় তাবেয়ীদের থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। মুশাজারার যে বর্ণনাগুলো তাঁদের কাছে পৌঁছেছে এবং তাঁরা একটি ফিকহী আমানত হিসেবে সামনে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

আমরা এই বিষয়গুলোতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আল-ফিকহুল আবসাত, আল-ফিকহুল আকবার এবং কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)...

[১] শায়খ জাফর আহমদ থানভী (রহ.) ‘কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদীস’-এ ইবনে সালাহ থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন: “যখন (হাকেম) কোনো হাদীসকে সহীহ বলেন এবং আমরা নির্ভরযোগ্য অন্য কারো থেকে এর সহীহ বা যঈফ হওয়ার কোনো বক্তব্য পাই না, তখন আমরা একে হাসান বলে গণ্য করি, যদি না এতে এমন কোনো ত্রুটি প্রকাশ পায় যা একে যঈফ সাব্যস্ত করে। সংক্ষেপিত... আমি বলি: হাফেজ যাহাবী আমাদের এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি যে বর্ণনার ওপর একমত হয়েছেন তা ‘সহীহ’, আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন এবং কোনো মন্তব্য করেননি, তা ইবনে সালাহ-এর বক্তব্য অনুযায়ী ‘হাসান’।” (পৃষ্ঠা: ৭১)

‘আস-সিয়ার আল-সাগীর’ এবং শামসুল আইন্মাহ সারাখসী (রহ.)-এর ‘আল-মাবসূত’-কে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে।

মুশাজারাত (মতপার্থক্য)-এর ক্ষেত্রে এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে হয় সংকলিত ইসলামী ফিকহকে সঠিক মানতে হয় অথবা ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে। এমন ক্ষেত্রে আমরা চার কারণে ফিকহী বর্ণনাগুলোকেই প্রাধান্য দেব:

- ইসলামী ফিকহ অস্বীকার করা শরীয়ত অস্বীকার করার সমতুল্য, যেখানে ঐতিহাসিক বর্ণনা (বিশেষ করে যখন সেগুলো দুর্বল হয়) অস্বীকার করলে কোনো দ্বীনি বা দুনিয়াবী ক্ষতি হয় না।
- ফিকহ সংকলন ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ (তাবারী ইত্যাদি) থেকে আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। তাই ফিকহী বর্ণনার সনদ উচ্চতর।
- ফিকহী সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তি হলো কুরআন মাজীদ, আহাদীস অথবা আসার-এ-সাহাবা, যেগুলোর সনদ নিরবচ্ছিন্ন ও মজবুত। পক্ষান্তরে ইতিহাসে যয়ীফ (দুর্বল) ও মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।
- ইসলামী ফিকহের গবেষণামূলক পদ্ধতি ইতিহাসের তুলনায় অনেক উন্নত।

ঐতিহাসিক গবেষণায় ভুল থেকে বাঁচার জন্য এটি জরুরি যে, সংকলিত ফিকহের সাথে সাংঘর্ষিক ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে সংশয়পূর্ণ মনে করা হবে। সম্ভব হলে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা হবে, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিমত:

মহান ঐতিহাসিক হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) মুশাজারাত সম্পর্কে যা লিখেছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

“প্রয়োজন হলো অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সেই মতপার্থক্যগুলো অধ্যয়ন করা যা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল এবং যেগুলোর মধ্যে কিছু মতপার্থক্য এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে যুদ্ধের উপক্রম হয়েছিল। যেসব লোক এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হয়, তাদের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করে কোনো হুকুম লাগিয়ে দেওয়া এবং নির্দিধায় তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ, দুনিয়াপুজারী, পদ ও সম্পদের লোভী এবং কুচক্রী বলা মোটেও সমীচীন নয়। এটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দাবি, সেইসাথে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে এই ঘটনাগুলোর ইতিবাচক বিশ্লেষণ করা উচিত। যারা সরাসরি সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং যুদ্ধের উপক্রম হয়েছিল, তাদের চারপাশের যে জটিল পরিস্থিতি ছিল, যে ধরনের সমাজের সাথে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল, সেই পরিবেশকে পুরোপুরি অধ্যয়ন না করে এবং কিছু বাস্তব সত্যের বিপরীতে কোনো কথা স্থির করে নেওয়া সঠিক নয়। আমরা দেখি যে, নিকট অতীতের ঘটনাগুলো বুঝতেও ভুল হয়ে যায়; [১] কারণ আমরা পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ আন্দাজ করতে পারি না।”

[১] উদাহরণ হিসেবে নিকট অতীতের কিছু বিষয় এখনো সন্দেহ ও সংশয়ের ঘেরাটোপে রয়েছে এবং সেগুলোর ওপর পরস্পরবিরোধী মন্তব্য বিদ্যমান। তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা, মিশরের জামাল আবদুন নাসের, পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেনারেল জিয়াউল হক, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, লিবিয়ার গাদ্দাফি—এদের প্রত্যেকের সমর্থক ও বিরোধী উভয়ই বিদ্যমান। একজন শাসকের ক্ষেত্রে একজনের দৃষ্টিতে তিনি একজন ফেরেশতা এবং অন্যের দৃষ্টিতে কাফেরের এজেন্ট। সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-এর যুদ্ধ, পূর্ব পাকিস্তানের পতন, হাশিমপুরার হত্যাকাণ্ড, জেনারেল জিয়াউল হকের বিমান দুর্ঘটনা, বেনজীর ভুট্টোর হত্যাকাণ্ড, অ্যাবোটাবাদ অপারেশন এবং ওসামা বিন লাদেন... এমন কতই না ঘটনা আমাদের সামনে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যেগুলোর প্রতিটি আজও রহস্যময় ও অমীমাংসিত।

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

খিশতে আউয়াল

করতে পারেন, তাই সেই যুগের ঘটনাবলী যার ওপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং যা আমাদের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সংঘটিত হয়েছে, সেই সময়ের চালিকাশক্তি কী ছিল, এবং যে ব্যক্তির সেগুলোর সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাদের জন্য কী আহ্বান ও আবেগ ছিল, যতক্ষণ না এগুলোকে ভালোভাবে বোঝা যাবে, তাদের উদ্দেশ্য, পরিস্থিতির সঠিক প্রেক্ষাপট, স্বয়ং তাদের ধর্মীয় প্রবণতা, পূর্ববর্তী খিদমত—এই সবগুলোকে একত্রে রেখে এবং একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত না করা পর্যন্ত ইনসাফ ও ন্যায্যের পথ পাওয়া কঠিন হবে। [১]

লেখকের যথাসম্ভব এই চেষ্টাই রয়েছে যে, উল্লিখিত সমস্ত দিক সামনে রেখে ইতিহাসের অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা হোক এবং সত্যকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ণ সতর্কতার সাথে সুন্দর বিন্যাস ও সহজবোধ্য ঢঙে উপস্থাপন করা হোক। ঐতিহাসিকদের নিছক অন্ধ অনুসরণ না করে বরং প্রতিটি বিষয়কে রেওয়ায়েত ও দেওয়াতের মূলনীতির ভিত্তিতে যাচাই করা হোক।

এই মানহাজ অবলম্বন করার কারণে লেখক অনেক স্থানে পূর্ববর্তী আলেমদের বর্ণনার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অনেক জায়গায় ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় মোটেও সন্তুষ্টি হওয়া যায়নি। অনুসন্ধান এবং তাহকিক ও তফতিশের সহজাত উপাদান উদ্ধৃদ্ধ করতে থাকে যে, এই বিষয়ে আরও গবেষণা করা হোক। ফলে প্রতিটি সম্ভাব্য দিক এবং প্রতিটি সম্ভাব্য ইলমি উৎস গ্রহণ করে বিষয়টি দেখা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত একটি পরিপক্ক ও স্পষ্ট হাকিকত সামনে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে মনে একদম নতুন একটি দিক এসেছে এবং ঐতিহাসিক, হাদিস ও ফিকহি রেওয়ায়েতগুলো আরও দেখার মাধ্যমে তার সমর্থন পাওয়া গেছে এবং পরিশেষে সেই দিকটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে।

যদিও লেখক নিজেকে একজন নগণ্য তালিবে ইলম মনে করেন এবং বুজুর্গদের ইলম ও আমলের সামনে একজন নিঃস্ব ফকিরের মর্যাদা রাখেন। তবুও যে “প্রসেস” অবলম্বন করে এই প্রচেষ্টা আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে এবং যার গুরুত্ব যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, লেখক তা মেনে চলতে বাধ্য। এই কারণে কিছু স্থানে এমন কিছু “সাহসিকতা”ও হয়েছে যা হয়তো কিছু বন্ধুর কাছে অপ্রীতিকর মনে হতে পারে, তবে লেখকের অপারগতা তাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

কিছু বিষয়ে লেখকের গবেষণার প্রাথমিক যুগে আসলাফদের সম্মিলিত মতামতও সন্দেহজনক মনে হয়েছে এবং রেওয়ায়েতগুলোর তাহকিক করতে করতে আসলাফদের সাথে তীব্র মতভেদের প্রবণতা তৈরি হতে থাকে। আসলাফদের থেকে ভিন্ন মত পোষণকারী আধুনিক গবেষকদের বইপত্রও অনেক জায়গায় প্রভাবিত করেছে। লেখক এই সময়ে মাহমুদ আব্বাসি, মাওলানা মওদুদী এবং মাওলানা ইসহাক সিন্দিলভি থেকে শুরু করে মাওলানা আতিকুর রহমান সম্বলি এবং মাওলানা বশির আহমদ হামিদ হিসারি পর্যন্ত ডজন ডজন লেখকের বই অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সাথে পড়েছেন। আরব বিশ্বে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে এই বিষয়গুলোর ওপর যা লেখা হয়েছে, তা একটি আলাদা কুতুবখানা। যথাসম্ভব সেগুলোও যাচাই-বাছাই করেছি। বিশেষ করে কাসাসে উসমান-এর বিষয়, হাদিসে ফিয়াতুল বাঘিয়া, কারবালার ঘটনা, ইয়াজিদের চরিত্র এবং খিলাফতে রাশেদার প্রয়োগের মাসআলাগুলোতে লেখকের বিচরণ ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। শিয়াদের ইতিহাস, সাবায়ি ফিতনার হাকিকত, হাদিস ও ইতিহাসের ওপর শিয়া মতবাদের প্রভাব, পথভ্রষ্ট দলগুলোর বিকাশের বিভিন্ন দিকও অত্যন্ত গভীরভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। আহলে তাশাইয়্যু-এর খণ্ডনে লেখা...

[১] আল-মুরতাজা, পৃ. ২৪৩, ২৪৪

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

উপসংহার

বইগুলো বিশেষভাবে বিস্তারিতভাবে পড়েছি কিন্তু কোনো কিছুই অন্ধ অনুসারী হয়ে দেখিনি। প্রতিটি চিন্তাধারার দলিল সামনে রেখে সেগুলোর ওপর চিন্তা-গবেষণা করেছি। কোনো স্থানেই শেষ খুঁটি গেড়ে বসিনি এবং বিশেষ করে যে বিষয়গুলো আসলাফদের ইজমা বা ঐক্যবদ্ধ মতামতের বাইরে ছিল, সেখানে এই সম্ভাবনা অবশ্যই মাথায় রেখেছি যে হতে পারে আসলাফদের সমর্থনে অন্য কোনো শক্তিশালী দলিল রয়েছে যা আমার কাছে পৌঁছায়নি। মোটকথা, তথ্য অনুসন্ধান এবং গবেষণা ও অধ্যয়নের সফর অব্যাহত ছিল। এই সফর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই এই বই শুরু হয়েছে।

সব ধরনের সম্ভাব্য সতর্কতা সত্ত্বেও এই দাবি করছি না যে এই কাজ পূর্ণাঙ্গ এবং এই বিষয়বস্তুগুলোই শেষ কথা। লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে কোথাও খিয়ানত করার দুঃসাহস দেখাননি, কিন্তু মানুষ যেমন নিজে অপূর্ণ, তেমনি এই কাজও ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। তাই আহলে ইলমদের পক্ষ থেকে সংশোধন ও নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা সবসময় থাকবে। আমি এই প্রচেষ্টার কোনো বিষয়কেই চূড়ান্ত মর্যাদা দিচ্ছি না, কেবল জমহুর মুসলিমিনের সেই ইজমাভিত্তিক আকিদা ও মতাদর্শগুলো ছাড়া যা আকিদা ও কালাম শাস্ত্রের কিতাবসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়গুলোকে স্পর্শ না করে আহলে ইলমদের লেখকের যেকোনো ইবারত, যেকোনো মতামত বা যেকোনো বিশ্লেষণের সাথে দ্বিমত পোষণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। লেখকের লিখনশৈলীতেও সংশোধন ও পরিমার্জনের সুযোগ থাকতে পারে। অনেক সময় কম্পোজ এবং গ্রুফ রিডিংয়ের ভুলও প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি করতে পারে। এমন যেকোনো সংশোধনমূলক দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী পাঠকদের, বিশেষ করে আহলে ইলমদের মতামতকে স্বাগত জানানো হবে। যদি কেউ ইলমি মূলনীতি অনুযায়ী সংশোধন ও উন্নতির জন্য ভিন্নমত পোষণ করেন বা পরামর্শ দেন, তবে তা হবে তাঁর অনুগ্রহ। কিন্তু যদি কেউ কোনো বিষয়ে কেবল তর্কের খাতিরে তর্কের পরিবেশ তৈরি করতে চান, তবে আমরা তেমন কোনো পরিবেশের অংশ হওয়া থেকে বিরত থাকব।

আল্লাহর শানে গাফফারি ও দস্তগিরির কাছে আশা রাখি যে, সেই দয়াময় আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমা করবেন এবং এই নশ্বর জীবনেই ভুল সংশোধনের তাওফিক দান করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে চিন্তা ও দর্শনে ইফরাত ও তাফরিত থেকে হিফাজত করুন এবং জমহুর মুসলিমিনের অবস্থান অনুযায়ী ঈমান ও আকিদার ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন

ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা হাবিবিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আহলে বাইতিহি আজমাইন

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

(rehanbhai@gmail.com)

শুক্রবার, ২৩ মহররম ১৪৩৭ হিজরি

৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

খিলাফতে রাশিদাহ

মতবিরোধের যুগ

৩২ হিজরী থেকে ৪০ হিজরী

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

আমার চোখের সামনে জীবনের রহস্যগুলো উন্মোচিত

জীবনের সংগ্রাম আমাকে হতাশ করতে পারে না

দুঃখের এই সাময়িক দৃশ্য আমাকে কখন ভয় দেখাতে পারে

আমার নিজের মিল্লাতের ভাগ্যের ওপর আমার আস্থা আছে

হতাশার উপাদান থেকে আমার দিনকাল মুক্ত

রণক্ষেত্রের উদ্দীপনা আমাকে পূর্ণ বিজয়ের সংবাদ দিচ্ছে

মরহুম ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল

ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের ভূগর্ভস্থ যুগ

২৮ হিজরী ৩৩ হিজরী

প্রথম অংশে মুসলমানদের বিজয় এবং সমৃদ্ধির যে ঈর্ষণীয় পরিবেশ দেখানো হয়েছে, তা সিদ্দীকে আকবর (রা.) এবং উমর ফারুক (রা.)-এর যুগ থেকে হযরত উসমান গনী (রা.)-এর খিলাফতের একাদশ বছর পর্যন্ত একইভাবে বজায় ছিল। এই চব্বিশ বছর ছিল ইসলামী খিলাফতের চরম উন্নতির যুগ, চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল এবং বিজয়ের ধারাও অব্যাহত ছিল। সাধারণ মানুষ ছিল সমৃদ্ধ এবং আমীরগণ ছিলেন আমানতদার। উম্মত ঐক্যবদ্ধ ছিল, কোথাও কোনো হাঙ্গামা ছিল না। হযরত উসমান (রা.) নিজে শেষ পর্যন্ত একজন অত্যন্ত আদর্শ শাসকের ভূমিকা পালন করেছিলেন... তবে শেষ বছরগুলোতে কিছু দুষ্কৃতকারী তাঁর সরকার পতনের জন্য আগ্রাণ চেষ্টা শুরু করে যা শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর মজলুম শাহাদাতের বেদনাদায়ক ঘটনার কারণ হয়, এটি সেই ফিতনা ছিল যার ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসসমূহে করা হয়েছিল... এবং এটি ছিল সেই মোড় যেখান থেকে উম্মত অভ্যন্তরীণ ফিতনার যুগে প্রবেশ করছিল।

তাওহীদের সর্বজনীন জয়জয়কার, শিরকের মূলোৎপাটন, আল্লাহ তায়ালায় বিধানের বাস্তবায়ন এবং ইসলামের বিজয় শয়তানের এক চোখও সহ্য হচ্ছিল না। সে মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করার জন্য হাজার হাজার বছর ধরে যে মেহনত ও চেষ্টা করেছিল, তা বৃথা যেতে দেখে এখন সে ছটফট করছিল। সে ইসলামের বাগানকে উজাড় করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কীভাবে? ইসলামি বিশ্বের বাইরে মন্দের যে শক্তিগুলো ছিল তারা তাওহীদের সন্তানদের কাছে পরাজিত হয়েছিল এবং ইসলামি বিশ্বের সীমানার ভেতরে মানুষ ইবলিসের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করেছিল! এখন শয়তান কী-ই বা করত। সে নিজে তো সামনে এসে মোকাবিলা করার ছিল না!! তার অভ্যাস তো সব সময় অন্যদের ব্যবহার করারই ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে কিছু লোক শয়তানের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল যারা ইসলামী খিলাফতের প্রজা তো ছিল কিন্তু তাদের অন্তর গোত্রীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়নি। তারা ইসলামের প্রতাপ দেখে দমে গিয়েছিল এবং কালিমাও পড়ে নিয়েছিল কিন্তু মুহাজির ও আনসার এবং কুরাইশদের উন্নতিতে তারা তীব্র ঈর্ষা অনুভব করত। ইসলামী খিলাফতকে তারা আল্লাহর বিধান হিসেবে নয় বরং কুরাইশদের রাজতন্ত্রের রূপে দেখত, তাদের জন্য এটি বেশি আনন্দের কারণ হতে পারত যে কোনোভাবে ইসলামী খিলাফত সম্পদহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ুক। এবং এর পরিবর্তে তাদের আপনজনদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হোক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশই করেনি। এই মিশ্রিত দলে আরবও ছিল এবং অনারবও। ইহুদিও ছিল এবং খ্রিস্টানও। এরাই ছিল সেই লোক যারা ভবিষ্যতে ইসলাম...

...এর শিকড় কাটার জন্য শয়তানের অনুচরদের ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত ছিল।

যেভাবে মাটির নিচে লুকানো বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় অজানা থাকে, ঠিক সেভাবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের সূচনা কখন হয়েছিল। তবে আমরা ধারণা করতে পারি যে, যে আন্দোলন ৩৪ হিজরিতে একটি কাঁটায়ুক্ত ঝোপের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, তার বীজ হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের আগেই বপন করা হয়েছিল। আজ যোগাযোগ ও যাতায়াতের দ্রুততম মাধ্যমের উপস্থিতিতেও এ ধরনের আন্দোলন প্রকাশ্যে আসার আগে আট-দশ বছর সময় নেয়, সেই প্রাচীন যুগে কোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনের লালন-পালনে বিশ-পঁচিশ বছর লেগে যাওয়া একেবারেই যুক্তিযুক্ত। এর বিপরীতে এই কথাটি একেবারেই অগভীর যে, বিদ্রোহী দলটি হযরত উসমান (রা.)-এর শেষ কয়েক বছরে হঠাৎ জন্ম নিয়েছে, রাতারাতি নিজের শিকড় দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এত দ্রুত আত্মপ্রকাশ করেছে যে কেবল খলিফাকে শহীদ করতেই সফল হয়নি বরং এর পরেও কয়েক দশক ধরে ইসলামের খলিফাদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে ছিল। যেহেতু বিদ্রোহী দলগুলোর সর্দার এবং আসল মাস্টারমাইন্ড ব্যক্তির সর্বদা পর্দার আড়ালে কাজ করে, তাই এই ষড়যন্ত্রকারী দলের আসল নেতৃত্বও আত্মগোপনে ও অজ্ঞাত ছিল। আমরা এই আন্দোলনের প্রলোভনে পড়া সাধারণ নাগরিক ও গ্রামবাসীদের বিদ্রোহী, ফাসাদি, বিশৃঙ্খলাকারী এবং দাঙ্গাকারী হিসেবে স্মরণ করব, আর সেই অদৃশ্য ব্যক্তিদের “ষড়যন্ত্রকারী উপাদান” বলব। মনে রাখতে হবে যে, এই অবয়বগুলো কোনো কল্পনার সৃষ্টি নয় বরং বাস্তবে এমন লোকদের অস্তিত্ব ছিল। এজন্য তাদের মধ্যে একজনের নাম দৃঢ়তার সাথে নেওয়া যেতে পারে। তিনি হলেন আবদুল্লাহ বিন সাবা। [১]

عبدالله بن سبا

হযরত উসমান গনি (রা.) খলিফা হওয়ার কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল যখন ইয়েমেনের রাজধানী সানআর এক কুচকুচে কালো ইহুদি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং আবদুল্লাহ বিন সাবা নামে তার পরিচিতি ঘটে। ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার পর ইবনে সাবা কোনো সাহাবীর খিদমতে সময় কাটায়নি। সে ইয়েমেন থেকে তার অভিযান শুরু করে এবং কয়েক বছরের মধ্যে হিজাজ, কুফা, বসরা ও সিরিয়া পর্যন্ত সফর করে ফেলে। সে বুজুর্গির লেবাস ধারণ করে প্রসিদ্ধ হয়। এজন্য নিজেকে এমন একজন সংস্কারক হিসেবে পেশ করে যে সৎকাজের আদেশ দিত এবং গুনাহ থেকে নিষেধ করত। [২]

যেভাবে পল হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ভালোবাসা ভিত্তিক আকিদা প্রকাশ করে খ্রিস্টানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, ঠিক সেভাবে ইবনে সাবাও একই কৌশল অবলম্বন করে মূর্খদের মধ্যে ধর্মীয় নেতার মর্যাদা লাভ করে। সরলমনা অনেক মানুষ তাকেই ইসলামের সবচেয়ে বড় শিক্ষক ও মুর্শিদ মনে করতে শুরু করে।

ইহুদিদের এই অনুচর জানত যে মুসলমানদের উন্নতির রহস্য তাদের ঐক্যের মধ্যে নিহিত এবং এই ঐক্য সাহাবায়ে কেরামের প্রতি উম্মতের ভক্তি ও ভালোবাসা, সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইসলামের খলিফাদের ওপর তাদের অবিচল আস্থার কারণে সুসংহত। তাই সে মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আস্থাহীন করতে এবং খিলাফতের পদটিকেই বিতর্কিত করার চেষ্টা শুরু করে দেয়।

[১] তারিখ দামেশক: ৯/৫/২৯ থেকে ৯১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ২৬৩/২

নতুন আকিদাহর প্রচার:

ইবনে সাবা তার মতাদর্শ প্রচারের সূচনা করেন নবী করীম ﷺ-এর প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিতভাবে ঈসা (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অতএব তিনি অবশ্যই দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। [১]

এই মনগড়া আকিদাহর স্বপক্ষে সে এই আয়াতটি পাঠ করত: “নিশ্চয়ই যিনি আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি আপনাকে অবশ্যই আপনার গন্তব্যে ফিরিয়ে আনবেন।” [২]

এই আয়াতটি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা থেকে হিজরতের সময় নাযিল হয়েছিল, তা জানাচ্ছিল যে আল্লাহ আপনাকে ﷺ এই শহরে সম্মানের সাথে ফিরিয়ে আনবেন, কিন্তু তাফসীর সম্পর্কে অনবহিত লোকেরা আয়াতের সেই অর্থই মেনে নিত যা ইবনে সাবা তাদের বলত। [৩]

ইবনে সাবার পরবর্তী সবক ছিল এই: “প্রত্যেক নবীর একজন ওসী অর্থাৎ উত্তরসূরি থাকে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওসী হলেন হযরত আলী (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন খাতামুল আশিয়া এবং আলী (রা.) হলেন খাতামুল আওসিয়া।” [৪]

পরবর্তী পর্যায়ে সে তার সমমনা লোকদের হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়ে বলত:

“তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওসিয়ত কার্যকর হতে দেয় না এবং নবীর ওসিয়তকৃত ব্যক্তির হক আত্মসাৎ করে নিজে উম্মতের বিষয়াবলির মালিক হয়ে বসে।”

যখন এই নির্বোধ লোকেরা হযরত উসমান (রা.)-কে খিলাফতের জবরদখলকারী মনে করতে শুরু করল, তখন সে তাদের উত্তেজিত করে বলত: “নবীর ওসীর উপস্থিতিতে উসমান অন্যায়ভাবে খিলাফত দখল করে আছে, এখন এই আন্দোলন নিয়ে জেগে ওঠো এবং তৎপর হও।” [৫]

ফিতনার কেন্দ্রসমূহ:

ইসলামী সমাজে জন্ম নেওয়া এই প্রথম রাজনৈতিক ও আদর্শিক ফিতনার প্রকাশ্য কেন্দ্র ছিল তিনটি শহর: কুফা, বসরা এবং মিসরের রাজধানী ফুসতাত। এই শহরগুলো আবাদ হওয়ার প্রায় বিশ বছর হয়েছিল। বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের লোক হিজরত করে এখানে এসেছিল এবং একটি মিশ্র সমাজ গড়ে উঠেছিল। আবার এই শহরগুলো বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল, তাই সব সময় সব ধরনের মানুষের যাতায়াত লেগে থাকত। বাণিজ্যের কারণে এই তিনটি শহর খুব দ্রুত জনবহুল হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত যে, নতুন শহরগুলোতে যেখানে মিশ্র ও ঘনবসতি থাকে এবং বাণিজ্যিক তৎপরতা চলতে থাকে, সেখানে অনেক জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়; সেখানে অপরাধী চক্র বা কোনো আন্দোলনের কর্মীদের এসে আস্তানা গাড়া এবং নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়। কুফা, বসরা ও ফুসতাত ছিল এমনই নতুন শহর যেখানে ফিতনাবাজরা শেকড় গাড়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

কুফা ও বসরা সম্পর্কে এই বিষয়টি স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর আমলেই যখন এই শহরগুলো প্রাথমিক বিকাশের স্তরে ছিল, তখনই এখানকার লোকদের মধ্যে শাসকদের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছিল।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/১৬৩

[২] সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৫

[৩] তারীখুত তাবারী: ৩/৩৩০

[৪] তারীখুত তাবারী: ৩/৩৩০

[৫] তারীখুত তাবারী: ৩/৩৩১

হযরত উমর (রা.) এই বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বসরায় হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে নিয়োগ দেওয়ার সময় বলেছিলেন: “আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় দায়িত্বশীল বানিয়ে পাঠাচ্ছি যেখানে শয়তান ডিম পেড়েছে এবং বাচ্চা বের হয়ে এসেছে।” [১] বসরার অবস্থাও কুফার মতোই ছিল। যার জনসংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কুফাবাসীরা তাদের শাসকদের পরিবর্তন করতে থাকত। হযরত উমর (রা.) তাঁর শাসনামলে এই চিন্তায় অস্থির থাকতেন যে, সেখানে এক লক্ষ লোক রয়েছে যারা কোনো আমীরের ওপরই সন্তুষ্ট নয়। [২]

ফারুকী যুগে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও কুফার গভর্নর ছিলেন, যিনি আশারায় মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁকেও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। কিছু লোক হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করেছিল যে, তিনি সঠিকভাবে সালাত পড়ান না। [৩] এক ব্যক্তি তো এমনকি এই পর্যন্ত বলে ফেলেছিল: “না আপনি ইনসাফ করেন, না সমানভাবে মাল বণ্টন করেন, আর না জিহাদ করেন।” [৪]

হযরত উমর (রা.) সাদ (রা.)-এর পরিবর্তে কোমল স্বভাবের হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে কুফায় নিয়োগ দিয়েছিলেন, কিন্তু কুফাবাসীরা রাজনৈতিক চাপের কারণে তাঁকে দুর্বল মনে করে সরিয়ে দিয়েছিল। হযরত উমর (রা.) বিচলিত হয়ে বলেছিলেন: “আমি এই লোকদের ওপর কোনো শক্তিশালী শাসক নিয়োগ করলে তারা তার বদনাম করে। আর কোনো কোমল ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে তারা তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে।” [৫]

এই তিনটি শহর ছাড়াও চতুর্থ আরেকটি শহরও অবচেতনভাবে ফিতনার কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল। এটি ছিল দামেস্ক শহর। এই শহরটি মেজাজ ও গঠনের দিক থেকে প্রথম তিনটি কেন্দ্র থেকে ভিন্ন একটি প্রাচীন শহর ছিল। এটি ছিল আরবের শক্তিশালী পরিবার বনু উমাইয়ার একটি সামরিক কেন্দ্র। এখানে বসবাসকারী লোকেরা সুশৃঙ্খল, সাহসী এবং তাদের আমীরদের প্রতি অনুগত ছিল। তাদের মাঝে স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা সম্ভব ছিল না। তাই ইবনে সাবার জন্য দামেস্কের ক্ষেত্রে নীতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, যা ছিল অত্যন্ত গোপনীয়তা এবং অত্যন্ত ধীরগতির ওপর ভিত্তি করে। এই কারণেই হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের শেষ পর্যন্ত এখানে কিছুই হয়নি।

যাই হোক, এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহী ও কেন্দ্রবিমুখ উপাদানগুলো পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগেই গোপনে কাজ শুরু করে দিয়েছিল এবং কুফা ও বসরার মতো শহরগুলোতে এর প্রভাব তখনই দেখা দিতে শুরু করেছিল।

হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর নীতিতে পার্থক্য এবং এর প্রভাব:

সাধারণত ঐতিহাসিকরা লেখেন যে, হযরত উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর সীরাতে ওপর চলেছিলেন কিন্তু এরপর বদলে গিয়েছিলেন। এই পরিবর্তনকে এই অর্থে নেওয়া হয় যে, ছয় বছর পর (নাউযুবিল্লাহ) জুলুম-অত্যাচার, অসাধুতা এবং খিয়ানত যুক্ত হয়েছিল যার ফলে জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। কিছু লোক এর ঠিক উল্টোটা বলেন যে, তিল পরিমাণও পরিবর্তন হয়নি।

এই দুই মতের মধ্যে প্রথমটি সম্পূর্ণ ভুল এবং ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট কথার ওপর ভিত্তি করে। আর দ্বিতীয় মতের ক্ষেত্রে কথা হলো, তা এই অর্থে...

[১] তারিখুত তাবারী, ৪/২০৩, ৭১

[২] তারিখুত তাবারী, সন ২২ হিজরী, ২/১৬৩ থেকে ১৬৬

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৭৫৫, বাবু উজুবি আল-কিরাআতি লিল-ইমামি ওয়াল-মামুম

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৭৫৫, বাবু উজুবি আল-কিরাআতি লিল-ইমামি ওয়াল-মামুম

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ: ৩৭২। এরপর মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল যিনি হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বহাল ছিলেন।

এটি সঠিক যে হযরত উসমান (রা.) প্রথম ছয় বছরের মতো শেষ ছয় বছরেও একজন ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার, দেশ ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শরয়ী বিধান ও জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছিলেন।

তবে এটিও একটি বাস্তবতা যে, ২৭ হিজরি থেকে ২৯ হিজরি পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের দৃশ্যপটে একটি পরিবর্তন এসেছিল যার বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, সেই যুগে ইসলামি বিশ্বে আটটি প্রদেশ ছিল:

- জাজিরাতুল আরবে: মক্কা, মদিনা, ইয়ামেন এবং বাহরাইন।
- পূর্বে: কুফা এবং বসরা।
- পশ্চিমে: দামেস্ক এবং মিসর।

মদিনাসহ জাজিরাতুল আরবের কোনো প্রদেশ অর্থাৎ মক্কা, ইয়ামেন, বাহরাইনে কোনো সামরিক ছাউনি স্থাপিত ছিল না। এখানকার গভর্নরদের কাছে কেবল প্রশাসনিক বিষয়াদি থাকত। সামরিক ছাউনিগুলো ছিল দামেস্ক, মিসর, কুফা এবং বসরা। আয়তন, আয় এবং জনসংখ্যার দিক থেকেও এগুলোই ছিল বড় প্রদেশ। দেশের সামরিক শক্তিও এই চার প্রদেশের গভর্নরদের কাছেই থাকত।

২৭ হিজরি পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন ছিল যে, এই চারটি বড় প্রদেশের মধ্যে দুটির গভর্নর ছিলেন হযরত উসমান (রা.)-এর আত্মীয়। অর্থাৎ সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং কুফায় হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)। পক্ষান্তরে বাকি দুটি প্রদেশের গভর্নর ছিলেন অন্যান্য গোত্রের। অর্থাৎ বসরায় আবু মুসা আশআরি (রা.) এবং মিসরে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)।

২৭ হিজরিতে হযরত উসমান (রা.) মিসর থেকে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে অপসারিত করে তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। ২৯ হিজরিতে বসরা থেকে আবু মুসা আশআরি (রা.)-কেও সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর স্থলে নিজের মামাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-কে নিযুক্ত করেন।

এই নিয়োগগুলোর পেছনে কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থ ছিল না, তবে এটি বলা যেতে পারে যে হযরত উসমান (রা.)-এর স্বভাবে কোমলতা, উদারতা এবং সৌজন্যবোধ অনেক বেশি ছিল, তাই তিনি সিলাহ রেহমি বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সাধারণ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে স্বতন্ত্র ছিলেন। এই সিলাহ রেহমির আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি আগেও এমন এক-দুটি কাজ করেছিলেন যা নিঃসন্দেহে বৈধ বরং একদিক থেকে প্রশংসনীয় ছিল কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলোকে অদ্ভুত মনে করেছিল। [১] এছাড়া তিনি নিজের পরিবার ও গোত্রের অভাবী লোকদের নিজের পকেট থেকে মুক্তহস্তে বড় বড় অনুদান দিতেন। তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি তিনি তাদের সমাজে উন্নতি ও সম্মানও দিতে চাইতেন এবং তাদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য যুবকদের পদ দিয়ে তাদের মাধ্যমে উম্মতের সেবা নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন।

[১] উদাহরণস্বরূপ তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাতিবও ছিলেন, যখন তিনি মুরতাদ হয়ে মক্কার মুশরিকদের সাথে গিয়ে যোগ দেন তখন তাঁর এই কাজে কেবল সাধারণ সাহাবীগণই নন বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমা থেকে আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহকে বাদ দেন এবং তাঁর রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ ঘোষণা করেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাঁকে আশ্রয় দেন। এরপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নিয়ে আসেন এবং বলেন: আবদুল্লাহর বায়আত গ্রহণ করুন। আপনি (সা.) তিনবার ভ্রক্ষেপ করলেন না। এরপর বায়আত গ্রহণ করলেন কিন্তু সাহাবীদের বললেন: তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল না যে আমাকে তাঁর বায়আত গ্রহণে বিরত থাকতে দেখে তাঁকে হত্যা করে ফেলত? সাহাবীগণ আরজ করলেন: আমরা কীভাবে জানব আপনার মনে কী আছে, আপনি যদি চোখ দিয়ে ইশারা করতেন। আপনি (সা.) বললেন: কোনো নবীর জন্য এটি শোভনীয় নয় যে তিনি চোখের ইশারায় প্রতারণা করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৩৫৯, বাব: মুরতাদের বিধান অনুচ্ছেদ, সহীহ সনদে)। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ক্ষমা করে দেন। (সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৩৫৮, হাসান সনদে)। তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে অত্যন্ত ভালো মুসলমান হিসেবে প্রমাণিত হন। (সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৩, ত আল-রিসালাহ)। একইভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর চাচা হাকাম বিন আসকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো কারণে নির্বাসিত করেছিলেন, হযরত উসমান (রা.) নিজের... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

এই প্রেক্ষাপটে, নিজের আত্মীয়দের প্রাধান্য দেওয়ার কোনো সচেতন বা সুচিন্তিত প্রচেষ্টা ছাড়াই গভর্নরদের পরিবর্তন করতে করতে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর দৃশ্যপট এমন হয়ে দাঁড়ায়:

- ১. মদিনা মুনাওয়ারা: এটি খিলাফতের কেন্দ্র ছিল, এখান থেকেই পুরো মুসলিম বিশ্বে নির্দেশ জারি করা হতো। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এখান থেকেই হতো। এখানে খিলাফতের দিওয়ান পরিচালনার দায়িত্ব উমাইয়া যুবক মারওয়ান বিন হাকামের হাতে ছিল। [১]
- ২. দামেস্ক: এখান থেকে পুরো সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্ডান এবং এশিয়া মাইনর পরিচালনা করা হতো। পূর্ববর্তী আমল থেকেই এখানকার গভর্নর ছিলেন হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.), যিনি উমাইয়া ছিলেন। [২]
- ৩. মিশর: এখান থেকে পুরো আফ্রিকার ব্যবস্থাপনা করা হতো। ২৭ হিজরিতে এখানে আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়, যিনি আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা.)-এর দুধভাই ছিলেন। [৩]
- ৪. বসরা: এখান থেকে পুরো ইরান, পারস্য উপসাগর এবং খোরাসানের ব্যবস্থা পরিচালনা করা হতো। ২৯ হিজরিতে এখানে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়, যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর মামাতো ভাই ছিলেন। [৪]
- ৫. কুফা: এখান থেকে ইরাক এবং আল-জাজিরা নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ২৫ হিজরি থেকে ২৯ হিজরি পর্যন্ত এখানে ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) গভর্নর ছিলেন। [৫] ২৯ হিজরিতে তাঁর স্থলে সাঈদ বিন আস (রা.)-কে আনা হয়। তিনি ৩৪ হিজরি পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই উমাইয়া ছিলেন। [৬]

এভাবে দেশের চারটি বড় প্রদেশের গভর্নর পদ এবং কেন্দ্রের মন্ত্রণালয় একই পরিবারের সদস্যদের হাতে চলে আসে। যেহেতু হযরত উসমান (রা.) নিজেও উমাইয়া ছিলেন, তাই অজ্ঞ লোকদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হতে থাকে যে, তিনি জাতীয় কল্যাণের জন্য নয়, বরং নিজের পরিবারকে প্রভাবশালী করার জন্য এই নিয়োগগুলো দিয়েছেন। যদিও এটি ছিল সম্পূর্ণ কুধারণা এবং অত্যন্ত ভুল চিন্তা, কিন্তু মানুষকে এমন সব কথায় বিশ্বাস করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব ছিল না। হযরত উসমান (রা.)-এর শেষ ছয় বছরে যদি সত্যিই কোনো পরিবর্তন এসে থাকে, তবে তা ছিল এটাই এবং এই পর্যন্তই। যেহেতু এটি বৈধতার সীমার মধ্যেই ছিল, তাই প্রবীণ সাহাবীগণও (রা.) এর ওপর...

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা: ...খিলাফতের আমলে তাঁদের ফিরিয়ে আনেন এবং এক লক্ষ (দিরহাম বা দিনার) উপহারও দেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪০৮, ত. আর-রিসালাহ) এরপর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় আরও যা করেন তা হলো, তাঁর ছেলে মারওয়ানকে নিজের কাতিব এবং বিশেষ সহকারী বানিয়ে নেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪৭৭, ত. আর-রিসালাহ) যেহেতু কিছু মুসলমানের দৃষ্টিতে তাঁরা তখনও তিরস্কৃত ছিলেন, তাই এই বিষয়টি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অংশ করে নেওয়া হয়। আপনার পক্ষ থেকে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আর্থিক অনুগ্রহকেও এমনভাবে দেখা হয় যেন আপনি সরকারি সম্পদ থেকে এই দান-খয়রাত করছেন। এই অভিযোগগুলোর উত্তর সামনে বিস্তারিতভাবে আসছে।

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৯। [২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৮।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৮... আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.) এর আগে উচ্চ মিশরের আমিল ছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৩৩, ত. আর-রিসালাহ)

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৮, তাঁর আগে পারস্যের গভর্নর আলাদা হতো এবং বসরার আলাদা। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) দীর্ঘ সময় উভয় প্রদেশের গভর্নর ছিলেন।

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৮। ওয়ালিদ বিন উকবা এর আগে আল-জাজিরার আরব অঞ্চলে যেখানে বনু তাগলিব বাস করত, সদকা আদায়কারী কর্মকর্তা ছিলেন। (তাজহিবুত তাজহিব: ১১/১৪২, ত. দাফিগাত্য)

[৬] সাঈদ বিন আস রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় ৯ বছরের ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩১, ত. সাদির) তিনি এতই ভদ্র, বুদ্ধিমান এবং যোগ্য যুবক ছিলেন যে, কারো কারো মতে তিনি খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪৪৫, ত. আর-রিসালাহ)

তারিখ উম্মতে মুসলিম

খামোশি অবলম্বন করলেন। যদি বিষয়টি বৈধতার সীমা অতিক্রম করত, তবে তারা অবশ্যই তা সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন।

এটি ছিল পরিস্থিতির একটি সন্তোষজনক দিক। কিন্তু এর পাশাপাশি অন্য দিকটি, যা নিশ্চিতভাবেই উদ্বেগজনক ছিল, তা হলো সাবায়ী গোষ্ঠী যারা এ পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিল, তারা এই এক-দুটি বিষয়ের সাথে শত শত কিচ্ছা-কাহিনী মিশিয়ে মুসলমানদের মধ্যে লড়াই বাধানোর জন্য একটি নিয়মিত আন্দোলন গড়ে তোলার বাহানা পেয়ে গেল। কল্যাণ ও বরকতের সেই যুগে কোনো বিদ্রোহই কেবল ভিত্তিহীন কথার মাধ্যমে দানা বাঁধতে পারত না। এটি একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিষয় যে, প্রতিটি সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য কিছু না কিছু উস্কানিমূলক প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয়, যা বাড়িয়ে বলে তারা মানুষকে উত্তেজিত করে। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের ষষ্ঠ বছরে সাবায়ীরাও এমন একটি বিষয় খুঁজে পেল যা তারা তাদের কাহিনীর সূচনা বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করল। এখানে আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর দূরদর্শিতা ও অসাধারণ পরিণামদর্শিতার আন্দাজ করতে পারি। যেভাবে তারা অন্যান্য গুণাবলি ও মর্যাদায় হযরত উসমান (রা.) সহ তাদের সকল উত্তরসূরিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তেমনিভাবে তারা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায়ও অনেক এগিয়ে ছিলেন।

তাদের কর্মপদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এটিও ছিল যে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং স্বগোত্রীয় ব্যক্তিদের যথাসম্ভব উচ্চপদ ও বড় দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা। উদ্দেশ্য ছিল যাতে কোনো কুচক্রী এই ভুল ধারণা ছড়ানোর সুযোগ না পায় যে, খিলাফতের ওপর একটি পরিবারের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-কে বিশেষভাবে এই নসিহত করেছিলেন যে, যদি তোমাদের খলিফা বানানো হয়, তবে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে মানুষের শাসক বানিও না। [১]

কিন্তু হযরত উসমান (রা.) মনে করতেন যে, যদি নিজের আত্মীয়দের পদ দেওয়া দেশ ও জাতির জন্য উপকারী হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর অসিয়ত কোনো শরয়ি বিধান ছিল না যে তা যে কোনো অবস্থায় মানা ওয়াজিব হতো। তাই হযরত উসমান (রা.) প্রশাসনিক প্রয়োজনে কিছু আত্মীয়কে উচ্চপদও দিয়েছিলেন। এটি কোনোভাবেই ধারণা করা যায় না যে, তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি অবহেলা এবং উম্মতের সাথে খেয়ানত করে এমনটি করেছেন। তিনি যা করেছেন, সরকার প্রধান হিসেবে তিনি তাকেই জাতীয় স্বার্থে সঠিক মনে করতেন। আবার সেই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রজাদের কোনো অভিযোগও ছিল না। সাধারণ পরিস্থিতিতে কারো পক্ষে সুযোগ ছিল না যে এই মহান ব্যক্তিদের পরিবার বা গোত্র নিয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে।

[১] আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে সহিহ মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন: “হে উসমান! যদি তোমাকে মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তুমি বনু আবি মুআইতকে মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিও না।” ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হারিস ইবনে আবি উসামা (মৃ. ২৮২ হি.) এটি মুত্তাসিল সনদ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদুল হারিস মাআ বুগইয়াতুল বাহিস আন যাওয়াইদিল মুসনাদিল হারিস: ২/৬২৩) এবং ইবনে আবি শায়বা তাঁর মুসান্নাফে (হাদিস: ৩৭০৭১ সহিহ সনদে আলী ইবনুল হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়াহ থেকে) বর্ণনা করেছেন।

তহাবি-র বর্ণনায় রয়েছে: “হে উসমান! যদি তোমাকে মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তুমি বনু আবি মুআইতকে মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিও না। আর হে আলী! যদি তোমাকে মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তুমি বনু হাশিমকে মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিও না।” (শরহ মুশকিলিল আসার, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩৯৫৬, ত ত রিসালাহ)।

(তহাবি-র ইবারতের অনুবাদ): “হে উসমান! যদি তোমাকে মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তুমি বনু আবি মুআইতের সন্তানদের মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিও না। আর হে আলী! যদি তোমাকে মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তুমি বনু হাশিম সন্তানদের মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিও না।”

তারিখ উম্মতে মুসলিমাহ — দ্বিতীয় খণ্ড

কিন্তু বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি আগে থেকেই ফিতনা সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত ছিল, তাই তারা এই প্রেক্ষাপটে মিথ্যা কথা ছড়িয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য যা কিছু করেছিল তার বর্ণনা এখন বিস্তারিতভাবে আসছে।

সাবায়ী অভিযান এবং ইসলামী আমিরদের চরিত্রহনন

বিদ্রোহী সাবায়ী আন্দোলন শিকড় গেড়েছিল। খিলাফতকে দুর্বল বরং ছিন্নভিন্ন করা এবং মুসলমানদের আপসে লড়িয়ে দেওয়া ছিল এর লক্ষ্য। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমিরদের সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর আত্মীয়তাকে এই দুর্ভাগারা তাদের জঘন্য প্রোপাগান্ডার অজুহাত বানিয়ে নিয়েছিল।

তারা প্রথমত এই কথাটি ছড়িয়ে দিল যে, হযরত উসমান (রা.) নাউযুবিল্লাহ স্বজনপ্রীতি করছেন, আপনজনদের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন এবং অন্যদের বঞ্চিত করছেন। এর পাশাপাশি তারা এটিও প্রচার করল যে, নিজের আত্মীয়দের সামনে আনার জন্য প্রবীণ সাহাবীদের বরখাস্ত করে বড় ধরনের অন্যায় করা হয়েছে। অনেক সময় একটি কথা সম্পূর্ণ সত্য হয় কিন্তু তা দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হয়। এটি সত্য ছিল যে তরুণদের সামনে আনা হয়েছিল যার ফলে অনিবার্যভাবে প্রবীণরা পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। [১]

কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে, এই তরুণ সাহাবায়ে কেলাম যদি যোগ্য হতেন তবে তাদের পদ দেওয়ায় বড় কী ক্ষতি ছিল। [২]

ধরা যাক আমিরদের কিছু ভুল বা জনঅভিযোগের দু-চারটি অভিযোগ যদি সত্য বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবে হযরত উসমান (রা.)-এর বারো বছরের দীর্ঘ শাসনামলে লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শাসনে দু-একটি এমন ঘটনা ঘটে যাওয়া নিজের মধ্যে কোনো গুরুত্ব রাখে না। যদি সাবায়ী আন্দোলন তাদের চরিত্রহনন করে পরিবেশ নষ্ট না করত, তবে দেশে অবশ্যই শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকত এবং মানুষ কল্যাণ ও বরকতের সাথে সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। তাদের এতে কোনো মাথাব্যথা থাকত না যে তাদের ওপর শাসনকারী আমির কোন বংশের বা কোন গোত্রের। এটি মানুষের স্বভাব যে প্রতিটি মানুষ তার প্রয়োজনীয় অধিকার নিয়ে চিন্তিত থাকে। যদি সেই অধিকার সে অন্য কোনো বংশ বা অন্য কোনো জাতির শাসকের কাছ থেকেও পায় তবে সে সন্তুষ্ট থাকে, আর যদি অধিকার হরণ নিজের পরিবারের লোকদের মাধ্যমেও হয় তবে সে তা সহ্য করে না। সুতরাং এমন সময়ে যখন হযরত উসমান (রা.) বাছাই করে যোগ্য ও কর্মঠ ব্যক্তিদের তাদের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন, তখন সাধারণ মানুষের প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকতে পারত না; বরং খোদ এমন কিছু প্রবীণ সাহাবী যাদের স্থলাভিষিক্ত তরুণদের করা হয়েছিল, তাদের পক্ষ থেকে নিজেদের বদলির ব্যাপারে প্রশংসাসূচক বাক্য বর্ণিত আছে। যখন আবু মুসা আশআরী (রা.) সংবাদ পেলেন যে তার পরিবর্তে বসরার ওপর আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-এর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বসরার অধিবাসীদের বললেন: “তোমাদের কাছে এমন এক যুবক আসছে যে দাদী ও ফুফুদের দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চবংশীয়।” (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৬১)

কিন্তু আফসোস যে, সাবায়ীরা শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করার জন্য সামান্য বিষয়গুলোকে এমনভাবে বাড়িয়ে চড়িয়ে উপস্থাপন করল যে অনেক মানুষ তাদের প্রতারণায় পা দিল এবং একটি বিদ্রোহী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হলো।

(১) হযরত উসমান (রা.)-এর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রয়োজনের ভিত্তিতে আত্মীয়দের পদ দেওয়ার শরয়ী অবকাশও স্পষ্ট হয়ে গেল। যদি তিনি সব অবস্থাতেই হযরত উমর (রা.)-এর নীতি অনুসরণ করতেন যা অত্যন্ত তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে ছিল, তবে সম্ভবত এটি একটি স্থায়ী নিয়মে পরিণত হতো এবং কোনো দ্বীনদার শাসক অনিবার্য পরিস্থিতিতেও তার আত্মীয়দের মেধা থেকে উপকৃত হতে পারতেন না।

(২) কুফার গভর্নর হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) আশারায় মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যেখানে তার স্থলাভিষিক্ত ওয়ালিদ বিন উকবা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী অর্থাৎ শেষ সারির সাহাবী ছিলেন। (সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩/৩১৩, আল-ইসাবাহ ফি তাময়যিস সাহাবাহ: ৬/৩৮২, ত. ইলমিয়াহ)। ওয়ালিদ বিন উকবার পর আসা সাঈদ বিন আস (রা.)-ও অল্পবয়সী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩১, ত. সাদির)। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর স্থলে নিযুক্ত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-ও একবার মুরতাদ হওয়ার কারণে ভালো সুখ্যাতি রাখতেন না। অবশ্য মক্কা বিজয়ের সময় পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ইন্তিকামাত (অটলতা) লাভ করেছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ, মুজামুস সাহাবাহ, আত-তাবাকাতুর রাবিআহ: ১/৩৯, ৪)। আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর স্থলে বসরার ওপর আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল যিনি ২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ (২৯ হিজরিতে) গভর্নর হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ২৫ বছর। (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৩/২৫৮, ত. তাদমুরী ২১/৫১৬, ত. বাশার)।

(৩) সত্য এই যে, এই তরুণ সাহাবীরা নেতৃত্বের সেই সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক গুণাবলীতে পুরোপুরি সজ্জিত ছিলেন যেগুলোর জন্য বনু উমাইয়া আরবের অন্যান্য গোত্র থেকে স্বতন্ত্র বিবেচিত হতো। যদি সাহাবীদের স্তরবিন্যাস এবং ইতিহাসের কিতাবগুলো খুলে দেখা হয়, তবে ঐতিহাসিকরা তাদের সবাইকে দানশীল, সাহসী, ভদ্র, দূরদর্শী এবং ন্যায্যপরায়ণ হিসেবে গণ্য করেছেন। ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর ওপর আরোপিত সেই অভিযোগ যা সামনে আসছে তা ছাড়া, তাদের কারো কোনো দোষ কোনো দুর্বল বর্ণনা থেকেও উপস্থাপন করা কঠিন। আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-এর সাথে অতীতে যা হয়েছে তা হয়েছে, “আল-ইসলামু ইয়াহদিমু মা কানা কাবলাহু” (ইসলাম পূর্বের সবকিছু মিটিয়ে দেয়)-এর পর এখন তাকেও কোনো বিষয়ে লজ্জিত করা যেত না।

ইতিহাস থেকেও এটি প্রমাণিত যে, হযরত উসমান [রা.] সেই তরুণ সাহাবীদের সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন যারা প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির [রা.]-কে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন, যিনি খোরাসানে যে বিজয় অর্জন করেছিলেন তা ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়। একইভাবে আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ [রা.] মিসর ও আফ্রিকার আয়ে অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন এবং জিহাদের ধারাকেও বেশ এগিয়ে নিয়েছিলেন, যার একটি উদাহরণ হলো ‘গাযওয়া যাতুস সাওয়ারি’ [১]।

কিন্তু অনিষ্টকামী লোকেরা এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলোকে নেতিবাচক রূপ দিয়ে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর সংকল্প করেছিল। তাই আবদুল্লাহ বিন সাবা তার আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই কর্মপন্থা পেশ করেছিল:

“কাজের সূচনা করো উসমানের গভর্নরদের চরিত্র হননের মাধ্যমে, পাশাপাশি মানুষকে নেক কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের তালকিন করো যাতে তোমরা তাদের মন জয় করতে পারো। এরপর তাদেরকে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার দাওয়াত দাও” [২]।

যেহেতু এই মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত আলী [রা.]-কে ‘ওসি’ মনে করত, তাই তাদের বিবেক এই ভেবে সন্তুষ্ট ছিল যে তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। তাদের প্রাথমিক প্রোপাগান্ডা কেবল এই পর্যন্তই ছিল যে, তরুণ আমিরদের নিয়োগকে একটি পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য এবং অন্য গোত্রগুলোর শোষণ হিসেবে অভিহিত করে মানুষকে হযরত উসমান [রা.] এবং তাঁর আমিরদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা। সেটিও ছিল একটি মানবিক সমাজ। তাই কেবল সাধারণ মানুষই নয়, বরং হযরত উসমান [রা.]-এর কোলে লালিত-পালিত হওয়া মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.]-এর সাহেবজাদা মুহাম্মদও এই ফিতনার কবলে পড়ে হযরত উসমান [রা.]-এর কঠোর সমালোচকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান [৩]।

ওয়ালিদ বিন উকবা [রা.]-এর ঘটনা

এই দিনগুলোতে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা হযরত উসমান [রা.]-এর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরি করার জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গণ্য করেছিল। ঘটনাটি ছিল এই যে, হযরত উসমান [রা.]-এর দুধভাই ওয়ালিদ বিন উকবা [রা.], যিনি কুফার গভর্নর ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ আনা হয়। ঐতিহাসিকরা একমত যে, হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা [রা.] তাঁর উত্তম ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর ঘরের কোনো দরজা ছিল না—যেকোনো সময় যে কেউ তাঁর কাছে গিয়ে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করতে পারত [৪]।

তাঁর পক্ষ থেকে মদ্যপান করা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আজও এই প্রশ্ন জাগে যে, তিনি কি সত্যিই এই পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন? নাকি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল যা এতটাই নিপুণ ছিল যে সেই যুগের বড় বড় সাহাবীরাও তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেমনটি সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে শরয়ি সাক্ষ্য (যা কেবল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরাই দিতে পারেন) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[১] এই বিজয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ তারিখ খলিফা এবং তারিখ তাবারিতে ২৭ হিজরি থেকে ৩৩ হিজরির ঘটনাবলিতে দেখা যেতে পারে।

[২] তারিখ তাবারী: ৪/৩৪১।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিয়-যাহাবী: ৩/৬০২; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ত. আর-রিসালা।

[৪] তারিখ তাবারী: ৪/২৮৫।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

ছিল এবং তাদের ওপর শরয়ী হদও কার্যকর করা হয়েছিল। [১]

তবে এই বর্ণনাগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, হযরত উসমান (রা.) শুরুতে এই অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সম্ভবত তিনি বিষয়টি তদন্ত করছিলেন, যার ফলে শাস্তি কার্যকর করতে বিলম্ব হয়েছিল এবং মানুষের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়েছিল যে হয়তো ইনসাফের দাবি পূরণ হবে না। অথচ হযরত উসমান (রা.)-এর উদ্দেশ্য মোটেও এমন ছিল না যে শরয়ী হুকুম এড়িয়ে যাওয়া হবে। [২]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৯৬ (বাব মানাকিব উসমান রা.), হা: ৩৮৮২ (বাব হিজরাতুল হাবাশা); সহীহ মুসলিম, হা: ২৫৫৩, কিতাবুল হুদুদ। ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর ওপর হদ কার্যকর করা সংক্রান্ত সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পরবর্তী টীকায় পেশ করা হচ্ছে।

[২] বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে: উবাইদুল্লাহ বিন আদি বিন থিয়ার বলেন যে, মিসওয়্যার বিন মাখরামা এবং আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদু ইয়াগুস আমাকে বললেন: “আপনার মামা উসমানের সাথে তাঁর (চাচাতো) ভাই ওয়ালিদ সম্পর্কে কথা বলতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? কারণ মানুষ সেই কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু বলছে যা সে করেছে।” অতঃপর হযরত উসমান (রা.) যখন সালাতের জন্য বের হলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি বললাম: “আপনার কাছে আমার একটি কাজ আছে, তা হলো একটি হিতাকাঙ্ক্ষী কথা।” তিনি বললেন: “হে যুবক! আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।” অতঃপর আমি লোকদের কাছে ফিরে গেলাম। যখন আমি সালাত আদায় করলাম, তখন মিসওয়্যার বিন মাখরামা এবং ইবনে আবদু ইয়াগুসের কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাদের কাছে আমার ও হযরত উসমান (রা.)-এর কথোপকথন বর্ণনা করলাম। তাঁরা দুজনেই বললেন: “আপনি আপনার ওপর অপিত দায়িত্ব পালন করেছেন।” আমি তখনও তাঁদের কাছে বসে ছিলাম যে হঠাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর দূত (ডাকার জন্য) চলে এল। ওই দুই ব্যক্তি বললেন: “আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলে দিলেন।” (অর্থাৎ তাঁদের দুজনের ধারণা হলো যে হযরত উসমান রা. তাঁকে ডেকে ধমক দেবেন। অথচ হযরত উসমান রা.-এর চরিত্র এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ছিল।)

অতঃপর আমি হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন: “তোমার সেই হিতাকাঙ্ক্ষী কথাটি কী যার কথা তুমি এইমাত্র উল্লেখ করেছিলে?” আমি কালিমা শাহাদাত পাঠ করলাম। তারপর বললাম: “আল্লাহ সুবহানাছ মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্যসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। আপনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং তাঁদের ওপর ঈমান এনেছেন। আপনি প্রথম দুটি হিজরত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সীরাত দেখেছেন, কিন্তু মানুষ ওয়ালিদের ব্যাপারে (আপনার দ্বিধার কারণে) অনেক কিছু বলছে। আপনার ওপর আবশ্যক হলো আপনি তার ওপর হদ কার্যকর করুন।” হযরত উসমান (রা.) বলতে লাগলেন: “ভাতিজা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছ?” আমি বললাম: “না, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে শিক্ষা পর্দার অন্তরালে থাকা কুমারী মেয়ে পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা আমার কাছেও পৌঁছেছে।”

হযরত উসমান (রা.) কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন এবং বললেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্যসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াত কবুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি। আর যেমনটি তুমি বললে, প্রথম দুটি হিজরতও করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য দ্বারা ধন্য হয়েছি, তাঁর কাছে বায়আতও করেছি। সুতরাং আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশের অবাধ্যতা করিনি এবং তাঁর সাথে কোনো প্রতারণাও করিনি, এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁর ওফাত দান করা পর্যন্ত। এরপর আবু বকর (রা.) খলিফা হলেন। আমি তাঁর আদেশেরও কখনো অবাধ্যতা করিনি এবং তাঁর সাথে কোনো প্রতারণা করিনি। এরপর উমর (রা.) খলিফা হলেন। আমি তাঁর আদেশেরও কখনো অবাধ্যতা করিনি এবং তাঁর সাথে কোনো প্রতারণা করিনি। তাহলে যখন আমাকে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, তখন কি আমার ওপর তোমাদের সেই অধিকার থাকবে না যা ওই ব্যক্তিদের ওপর আমার ছিল?”

আমি বললাম: “কেন থাকবে না।” তিনি বললেন: “তাহলে সেই কথাগুলোর কী যৌক্তিকতা থাকে যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছাতে থাকে? তবে তুমি ওয়ালিদের যে অবস্থার কথা উল্লেখ করেছ, ইনশাআল্লাহ আমরা এই বিষয়ে হকের ওপরই অটল থাকব।” অতঃপর তিনি ওয়ালিদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করালেন। হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যেন বেত্রাঘাত করেন এবং হযরত আলী (রা.) নিজেই বেত্রাঘাত করতেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৩৮৭২, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুল হাবাশা)

সহীহ বুখারীর এই বর্ণনা থেকে সেই পরিবেশের আন্দাজ করা যায় যা তখন বিরাজ করছিল। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) খুব ভালোভাবেই অনুভব করছিলেন যে তাঁর নিজের ঘনিষ্ঠ লোকেরাও সাধারণ পরিবেশ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত এবং তাঁকে স্বজনপ্রীতি পরায়ণ মনে করে তাঁর ওপর সমালোচনা করতে প্রস্তুত। এজন্যই তিনি প্রথমে তাঁর ভাগ্নের কথা শোনা নিরর্থক মনে করেছিলেন, কিন্তু দ্রুতই তাঁর সত্যনিষ্ঠা এবং আত্ম-সমালোচনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল যে তিনি হিতাকাঙ্ক্ষার শিরোনামে বলা প্রতিটি কথা শুনে নেবেন। এরপর এই কথোপকথনের সময় হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিটি শব্দ থেকে এটি ফুটে উঠছিল যে তিনি নিজের ব্যাপারে মানুষের অহেতুক আস্থাহীনতায় অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন এবং চাচ্ছিলেন যে তাঁর প্রতি ঠিক তেমনই আনুগত্য করা হোক যেমনটি পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি করা হতো। নিঃসন্দেহে হযরত উসমান (রা.) এই প্রত্যাশায় হকের ওপরই ছিলেন।

সহীহ মুসলিমে আছে: হসাইন বিন আল-মুনযির বলেন যে, আমি হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলাম যখন তাঁর কাছে ওয়ালিদ বিন উকবা-কে আনা হলো, যে ফজরের সালাত দুই রাকাত পড়িয়ে বলতে লাগল: “তোমাদের কি আরও পড়িয়ে দেব?” এর ওপর তার বিরুদ্ধে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল হামরান যে সাক্ষ্য দিল যে ওয়ালিদ বিন উকবা মদ পান করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে আমি তাকে (মদ) বমি করতে দেখেছি। তখন হযরত উসমান (রা.) বলতে লাগলেন: “সে মদ পান না করলে বমি করত না।” এরপর বললেন: “হে আলী! দাঁড়াও, তাকে বেত্রাঘাত করো।” হযরত আলী (রা.) বললেন: “হে হাসান! দাঁড়াও... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)”

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

হযরত উসমান (রা.) শরয়ী সাক্ষ্য দেখে রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং নিজের বৈমাত্রেয় ভাইকে শাস্তি প্রদান করেন এবং সাথে সাথেই তাকে বরখাস্ত করে হযরত সাঈদ বিন আস (রা.)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই ঘটনা ২৯ বা ৩০ হিজরীর। [১]

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকার অবশিষ্টাংশ]: “তাদেরকে বেত্রাঘাত করো।” তারা তাকে বেত্রাঘাত করতে শুরু করল। তিনি বললেন: “এর নাম কি তপ্ত হচ্ছে যেখান থেকে এর গন্ধ আসছে।” যেন তিনি সেই কথার ওপর অটল ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন: “হে আবদুল্লাহ বিন জাফর! দাঁড়াও, তাকে বেত্রাঘাত করো।” অতঃপর তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতে লাগলেন এবং হযরত আলী (রা.) গুনতে থাকলেন। যখন চল্লিশটি পূর্ণ হলো, তখন তিনি বললেন: “থামো।” তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-ও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং হযরত ওমর (রা.) আশিটি করেছেন। প্রতিটিই সুন্নত, তবে আমার কাছে এটিই (চল্লিশ) বেশি পছন্দনীয়।” (সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৩৫৩, কিতাবুল হুদুদ, বাব হাদিল খামর, ত: দারুল জিল)।

দ্রষ্টব্য: সহীহ মুসলিমের এই হাদীস অনুযায়ী হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে মদ্যপানের অপরাধে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। ইমাম শাফেয়ীরও এটাই অভিমত। তবে ইমামদের মতে যদি শাসক চান তবে শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাতও করতে পারেন। হানাফী, মালেকী এবং আসলী ফকীহদের মতে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে, যেমনটি হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে ইজমা হয়েছিল। (ফাতহুল কাদির লি ইবনিল হমাম: ৫/৩১১, ৩১২) যেহেতু এটি একটি বিশুদ্ধ ফিকহী আলোচনা, তাই বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহ শাস্ত্রের দিকে রুজু করা উচিত।

ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর ওপর অপবাদের তদন্ত একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে:

যেহেতু এই ঘটনা হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান, তাই একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে এর দলিল অনুযায়ী সহীহ বুখারী ও মুসলিম বরং সমস্ত কুতুবে সিভাহর ঐ সকল বর্ণনা প্রত্যাখ্যানযোগ্য যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবায়ে কেরামের ওপর হুদুদ প্রয়োগের কথা উল্লেখ আছে। কারণ যদি আমরা পরবর্তী যুগেও এমন কোনো ভুল অসম্ভব মনে করি, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে এর সম্ভাবনা কীভাবে থাকতে পারে? কিন্তু যদি জমহুর ওলামাদের অনুসরণ করে এটি মেনে নেওয়া হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে মানবিক দুর্বলতার কারণে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছিল, তবে এটি মেনে নিতে কোনো বাধা থাকে না যে পরবর্তী যুগেও এমন বিচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল। এটি চিন্তা করাও ভুল হবে যে হযরত উসমান (রা.) হযরত ওয়ালিদ বিন উকবার ওপর হদ জারি করেছিলেন কারণ তিনি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। এর চেয়ে বেশি বরণ্য সাহাবীদের ওপর অপবাদ দেওয়া হবে।

তবে ইমাম তাবারী যে বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন তা ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। যার সারমর্ম হলো আবু যয়নাব, আবু মুয়াত্তিব এবং জন্দব নামক তিন ব্যক্তির একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এবং তারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল যারা নিজেদের শত্রুতা মেটাতে এবং ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে বরখাস্ত করার জন্য এই খেলা খেলেছিল। এই লোকদের মধ্যে ওবাসদের কেউ কেউ ছিল যাদেরকে ইতিপূর্বে হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) কিসাস হিসেবে হত্যা করেছিলেন। কারণ তারা ইবনে তুবাইসান নামক এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার পর তাদের পরিবারের লোকেরা প্রতিশোধ নেওয়ার দাবি তুলেছিল যে হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা শরীয়ত বিরোধী কাজ করেছেন। (ইবনে সাবা-এর পক্ষ থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর আমলদারদের চরিত্র হননের যে অভিযান শুরু হয়েছিল, কোনো সন্দেহ নেই যে তার কর্মীরা এই দাবিকে প্রচার করতে পূর্ণ অংশ নিয়েছিল।)

হযরত উসমান (রা.) অভিযোগ শুনে হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে মদীনায় ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিছু লোক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দেয়। ওয়ালিদ (রা.) নিজের পবিত্রতা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং আরজ করেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! এরা আমার শত্রু এবং জেদী লোক, এদের কথায় বিশ্বাস করবেন না।” কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বললেন: “এই সাজা আমি আপনাকে কোনো অপবাদের কারণে দিচ্ছি না, বরং আমাদের কাছে যে সাক্ষ্য এসেছে তার ভিত্তিতে কথা পৌঁছে গেছে। এরপর যদি বাস্তবে কোনো বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না এবং যার ওপর জুলুম হবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিদান সংরক্ষিত থাকবে।” (তারিখে তাবারী: ৩/২৬৫)। এরপর তিনি হযরত ওয়ালিদ (রা.)-কে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন, যেমনটি সহীহায়নের বর্ণনায় এসেছে।

এখানে এই প্রশ্ন অবশ্যই জাগে যে তাবারীর বর্ণনা যদি দুর্বল হয় তবে সহীহায়নের বর্ণনাকে কীভাবে সঠিক বলা হবে? হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.) এর বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন, যার সারমর্ম হলো সহীহ বর্ণনাগুলো থেকে কেবল এটি প্রমাণিত হয় যে ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার ওপর হদ জারি করা হয়েছিল। এটি প্রমাণিত হয় না যে বাস্তবেও তিনি মদ্যপান করেছিলেন। বিচারক প্রকাশ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন। এর দ্বারা এটি আবশ্যিক হয় না যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও অপরাধী। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ রয়েছে: “হতে পারে তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যজনের চেয়ে বেশি বাকপটু।” (তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম, কিতাবুল হুদুদ: ২/৪৯৮ থেকে ৫০১)।

বর্তমান পৃষ্ঠার পাদটীকা:

[১] ‘তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত’-এ এটি ২৯ হিজরীর ঘটনা বলা হয়েছে, যেখানে ইমাম তাবারী এবং ইমাম ইবনুল আসীর একে ৩০ হিজরীর ঘটনার অধীনে উল্লেখ করেছেন।

মনে হয় যে হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর ওপর অপবাদ দেওয়ার ঘটনা ২৯ হিজরীর শেষের দিকে শুরু হয়েছিল। এরপর তাদের অভিযোগ নিয়ে মদীনায় পৌঁছানো, তাদের সাক্ষ্য প্রদান, হদ জারি করা এবং তাকে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া ৩০ হিজরীর শুরুতে সম্পন্ন হয়েছিল। এজন্যই ইবনে কাসীর একে ৩০ হিজরীর ঘটনার অধীনে উল্লেখ করেছেন।

সরাসরি খলিফার চরিত্র হনন:

হযরত উসমান (রা.) শরীয়তের সামনে নিকটাত্মীয়দের সম্পর্ককে উপেক্ষা করে নিজের চাচাতো ভাইয়ের ওপর হৃদ কার্যকর করেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সকলকে সন্তুষ্ট করেন। যারা তাঁর ওপর স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলত তারাও চুপ হয়ে গেল। কারণ স্বজনপ্রীতিপরায়ণ শাসকরা এমন সুযোগে সাংবিধানিক বিধিবিধানকে পাশ কাটিয়ে যেকোনোভাবে আপনজনদের বাঁচিয়ে নেয়।

হিংসুকরা এখন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের পরিবর্তে সরাসরি হযরত উসমান (রা.)-এর চরিত্র হননের কোনো বাহানা খুঁজতে লাগল। কিছুদিন পর (৩০ হিজরিতে) হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) তাবারস্তান অঞ্চলে জিহাদ করতে যান। এই সফরে তিনি লোকদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে কিরাত করতে দেখেন। তিনি ফিরে এসে কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই বিষয়ে চিন্তিত করেন এবং এরপর মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে হযরত উসমান (রা.)-কে এই পরিস্থিতির পরিণতির দিকে মনোযোগী করেন। হযরত উসমান (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে উম্মতকে কুরআন মাজীদে একটি লিখনরীতির (رسم الخط) ওপর ঐক্যবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মাসহাফ আনানো হলো যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে সংকলিত হয়েছিল এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এর অনুলিপি তৈরি করে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হলো এবং সরকারি তত্ত্বাবধানে তৈরি করা সত্যায়িত কপিগুলো ছাড়া কালামুল্লাহর বাকি সমস্ত কপি ধ্বংস করে দেওয়া হলো। চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তির এই পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী একে কুরআনের অবমাননার সমর্থক বলে অভিহিত করে এবং একে একটি জঘন্য অপরাধের রূপ দিয়ে হযরত উসমান (রা.)-কে প্রাণভরে গালিগালাজ করে। কিন্তু সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এই বিষয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে একমত ছিলেন। হযরত আলী (রা.) স্বয়ং বলতেন:

“উসমান এই কাজটি আমাদের সমর্থনেই করেছেন, যদি এই বিষয়টি আমার ওপর ন্যস্ত হতো তবে আমিও হযরত উসমানেরই অনুসরণ করতাম।” [১]

এভাবে এই প্রোপাগান্ডাও তখন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো।

عبدالله بن سبا شام میں (আবদুল্লাহ বিন সাবা শামে):

এই সময়ে ইবনে সাবা ফিতনাকে ডানা মেলার সুযোগ দিতে শামে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে সে চেষ্টা করল যেন সৈয়দনা মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে এবং এই প্রতিবাদের সূচনা স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে হয়, যাতে তার দিকে কারো নজর না যায়।

সে শামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করল। হযরত আবু দারদা (রা.) তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন: “তুই কে? আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় তুই এখনো ইহুদিই রয়ে গেছিস।”

এরপর ইবনে সাবা উবাদাহ বিন সামিত (রা.)-কে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি একটি দুষ্ট লোক। তিনি তাকে ধরে সৈয়দনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দিলেন কারণ তার দুষ্টমির কোনো প্রকাশ্য প্রমাণ বিদ্যমান ছিল না। [২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩০ হিজরির আলোচনা। তারিখুত তাবারী: ৩/২৮৩, ২৮৩। দৃশ্যত ইবনে সাবা শামে কোনো সফলতা পায়নি কিন্তু পরবর্তীতে শামে যেভাবে কেন্দ্রবিমুখতা ছড়িয়ে পড়েছিল তা থেকে বোঝা যায় যে, ইবনে সাবা সেখানে গোপনে “তাশাইয়ু”-এর প্রতিক্রিয়ায় “উসমানিয়াত”-এর আবেগ উসকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

সাবায়ী আন্দোলনের উপাদানসমূহ:

সাবায়ী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের অবস্থার গভীর বিশ্লেষণ এটিই নির্দেশ করে যে, এই আন্দোলনের উপাদানসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

- কিছু লোক ছিল আন্দোলনের মূল পরিকল্পনাকারী। এরা ছিল সেই সব ইহুদি যারা শুরু থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে কেবল আব্দুল্লাহ বিন সাবার নাম পাওয়া যায়। [১]
- দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিল তারা যাদের স্বভাব ছিল বিদ্রোহী। এই লোকেরা মূলত সেই সব আরব গোত্রের ছিল যারা কুরাইশদের নেতৃত্বের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে শুরু করেছিল। [২]
- তৃতীয় প্রকারের লোক ছিল তারা যারা ধর্মপরায়ণতার অহংকার ও দন্ডের শিকার ছিল। তাদের মধ্যে সমালোচনার প্রবণতা ছিল অনেক বেশি, তাই এই লোকেরা পরবর্তীতে এই আন্দোলন থেকে পৃথক হয়ে “খাওয়ারিজ” নামে পরিচিতি লাভ করে। [৩]
- আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ প্রকারের লোক ছিল তারা যাদেরকে সরকার কোনো অপরাধের কারণে শাস্তি দিয়েছিল। এখন তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। [৪]
- পঞ্চম প্রকারের লোক ছিল তারা যারা সম্পদের লোভী ছিল। সরকারি কোষাগারে কর বাবদ জমা হওয়া অর্থ নিজেদের কজায় নেওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল ছিল। [৫]
- কিছু ছিল সেই সব যুবক যারা পছন্দসই পদ না পাওয়ার কারণে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।
- বাকিরা ছিল সাধারণ সহজ-সরল মানুষ যারা যেকোনো ডাকেই সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, গোলাম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত বিশেষ সদস্যদের “সাবায়ী” বা “সাবইয়্যাহ” বলা হতো। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে “সাবইয়্যাহ” শব্দটি তাবারী এবং অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। [৬]

সাবায়ী ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাই বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে কিছু সাহাবীর ভালোবাসায় অতিরঞ্জন এবং কিছু সাহাবীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষে লিপ্ত করা হচ্ছিল। সাবায়ী অভিযানের প্রভাব কেবল রাফয-এর রূপেই প্রকাশ পায়নি বরং পরবর্তী যুগে সিরিয়া, ইরাক এবং বাহরাইনের কিছু শহরে বনু হাশিম ও সাদাতদের প্রতি ঘৃণার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল—

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩১৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/৩২৬, ৩২৭

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪/৩১৮

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বাবু মা যুকিরা ফিল খাওয়ারিজ

[৫] তারিখুত তাবারী: ৪/৩২৩

[৬] মূল শব্দটি হলো “সাবইয়্যাহ”। যদিও কিছু স্থানে “সাবায়ী” শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৬/৩১৩, ত-আর রুশদ।
উদুতেও “সাবায়ী” ব্যবহৃত হয়। এই মুনাফিকী আন্দোলন সম্পর্কে আরও জানতে নিচের উদ্ধৃতিগুলো দেখুন:

• আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল, সাইফ বিন উমর, পৃ. ৮৯, ৯০, ১০৩, ১১৬, ১৫৮

• আখবারুদ দাওলাতিল আক্বাসিয়াহ, পৃ. ১০৫; আল-মআরিফ লি ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারী, পৃ. ৬২২, ৬২৩

• তারিখুত তাবারী: ৪/৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৩, ৫১২, ৫৩১, ৫৩৩; ৫/১৯৩, ২৭২; ৬/৮৩; ৭/২৫, ৩২৫

• আল-মুনতায়াম, ইবনুল জাওযী: ৫/৭৭, ৮১, ৮৯, ৯৩, ৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৪, ১২/৩৮, ৩০, ১৩/২৫০

• তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/২০৩, ২০৫; ২/৬১৭; ৩/৬১৮, ৬২১

(যা কোথাও নাসিবিয়াত এবং কোথাও খারিজিয়াতের রূপ ধারণ করেছিল) তাও ছিল সাবায়ী ষড়যন্ত্রেরই পরোক্ষ ফল।

হযরত উসমান (রা.)-এর হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-এর সাথে আচরণ:

এই বছর (৩০ হিজরিতে) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বরকতময় আংটিটি, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং উমর (রা.)-এর হাত ঘুরে হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে এসেছিল, তা মদিনা মুনাওয়ারা থেকে দুই মাইল (প্রায় সোয়া তিন কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত মসজিদে কুব্বার কূপ “বি’রে আরিস”-এ পড়ে হারিয়ে যায়। এর নিখোঁজ হওয়ায় হযরত উসমান (রা.) এবং মুসলমানগণ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, একে কোনো বিপদ ও ফিতনার পূর্বাভাস মনে করা হচ্ছিল। [১]

এই সময়ে সিরিয়ায় হযরত আবু যর গিফারী (রা.) তাঁর দরবেশসুলভ স্বভাবের কারণে মানুষের ওপর জোর দিচ্ছিলেন যে তারা যেন তাদের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এই পরিস্থিতির কারণে সমাজে এক ধরনের অস্বস্তি সৃষ্টি হতে শুরু করে। ভয় ছিল যে কোথাও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের উপক্রম না হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে এই পরিস্থিতির কথা অবহিত করেন। উসমান (রা.) একদিকে আবু যর (রা.)-কে চিঠি লিখে বললেন যে তিনি যেন মদিনায় চলে আসেন। সেই সাথে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে লিখলেন:

“ফিতনার শিকড় দৃশ্যমান হয়েছে, তা শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়বে, তুমি এই ক্ষতকে খুঁচিও না। শুধু যতটুকু সম্ভব সাধারণ মানুষকে সামলে রাখো এবং নিজেকেও। হ্যাঁ, আবু যরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে পথপ্রদর্শক এবং সফরের সরঞ্জাম দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।” [২]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নির্দেশ পালন করলেন। হযরত আবু যর (রা.) মদিনায় চলে এলেন। হযরত উসমান (রা.) চেয়েছিলেন হযরত আবু যর (রা.) তাঁর কাছে মদিনাতেই থাকুন, কিন্তু হযরত আবু যর (রা.) শহর থেকে দূরে “রাবজাহ” নামক খেজুর বাগানে বসবাস করা পছন্দ করলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁকে উটের একটি পাল এবং দুইজন গোলাম দিয়ে দিলেন যাতে তাঁর জীবনযাপন ভালোভাবে চলে। [৩]

এভাবে হযরত উসমান (রা.) একটি উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একদিকে সিরিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের আশঙ্কা দূর করে দিলেন, অন্যদিকে একজন মহান সাহাবীর সম্মান ও মর্যাদাতেও কোনো কমতি হতে দিলেন না। [৪]

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী এই কথাটিও রটাতে শুরু করল যে হযরত উসমান (রা.) একজন মহান সাহাবীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। [৫]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩০ হিজরির অধীনে।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ১৪০৬, কিতাবুয যাকাত, বাব মা আদা যাকাতাহ্; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩০৬১০, ত: আর-রুশদ।

একটি ভুল ধারণার নিরসন: সাইফ বিন উমরের দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, হযরত আবু যর গিফারী (রা.) আব্দুল্লাহ বিন সাবার প্ররোচনায় পড়ে মানুষকে যুহদ ও কানায়াতের (দুনিয়াবিমুখতা ও অল্লেতুষ্টির) শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। এই বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে কিছু ঐতিহাসিক দাবি করেছেন যে হযরত আবু যর (রা.)-এর ফতোয়া ও দর্শন ইবনে সাবা থেকে গৃহীত ছিল, কিন্তু এই কথাটি সঠিক নয়। হযরত আবু যর (রা.) অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আলেম ও ফাজিল সাহাবী ছিলেন। তাঁকে কোনো পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কথায় প্ররোচিত হয়ে ভুল ফতোয়া প্রদানকারী হিসেবে পরিচিত করা একটি মিথ্যা অপবাদ। সাইফ বিন উমরের দুর্বল বর্ণনাগুলোর এত ওজন নেই যে একজন সাহাবীর ওপর জেরা (সমালোচনা) করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু যর (রা.)-এর যুহদ ও কানায়াতের ওপর জোর দেওয়া ছিল শরীয়তের বিশেষ বিধানকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার কারণে। এই কারণেই তাঁর কিছু মতামত স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল, তবে তিনি তাঁর ইজতিহাদের কারণে এতে অপারগ ছিলেন।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪/৪৮৩; সহীহ বুখারী, হা: ১৪০৬, কিতাবুয যাকাত, বাব মা আদা যাকাতাহ্ ফালাইসা বিকানয।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৪/৪৮৫।

এবং তাদের নির্বাসিত করালেন। (এই অভিযোগ আজ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।)

মিসরে ইবনে সাবার প্রভাব:

৩১ হিজরি সনে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী মিসরেও সক্রিয় ছিল। এখানে রটানো হয়েছিল যে, হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ (রা.)-এর প্রতি মানুষ অসন্তুষ্ট। কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে এই প্রোপাগান্ডা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেননি। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা এবং মুহাম্মদ বিন আবি বকরের মতো উচ্চবংশীয় ব্যক্তিরও ছিলেন।

৩২ হিজরি সনে ভূমধ্যসাগরে ‘জাতুস সাওয়ারি’-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় মুজাহিদরা মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা এবং মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা দেখতে পান। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে, তারা হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি এতটাই বীতশ্রদ্ধ যে, তাঁর নিযুক্ত আমির আবদুল্লাহ বিন সাদের অধীনে যুদ্ধ করা পছন্দ করছেন না। [১]

৩৩ হিজরির শুরু: নতুন ঘটনাবলি:

৩৩ হিজরি এমন অবস্থায় শুরু হয়েছিল যে, ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ভেতরে ভেতরে নীরবে কাজ করে যাচ্ছিল, বিশেষ করে কুফা ও বসরায় তাদের তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল। কুফার গভর্নর ছিলেন হযরত সাঈদ বিন আস (রা.) এবং বসরার গভর্নর ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)।

৩৩ হিজরি সনে কুফা ও বসরায় এমন দুটি ঘটনা ঘটে যে, কর্তৃপক্ষকে অস্বাভাবিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

প্রথম ঘটনাটি কুফায় ঘটে। সেখানে শহরের গভর্নর হযরত সাঈদ বিন আস (রা.)-এর মজলিসে কয়েকজন আরব নাগরিক এক যুবককে শুধুমাত্র এই কারণে মারধর করে যে, সে কর্তৃপক্ষের প্রশংসায় কিছু কথা বলেছিল। এই উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড এমন ছিল যে তা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে এই লোকদের সংশোধনের জন্য হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর কাছে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.) তাদের সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে তাদের মেহমানদের মতো আপ্যায়ন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মূলত এই লোকেরা হীনম্মন্যতা ও হিংসার রোগে আক্রান্ত, তারা কুরাইশদের নেতৃত্বের প্রতি ঈর্ষান্বিত। তিনি তাদের নরমভাবে বোঝানোর পর বললেন:

“ঠিক আছে, যা চাও করো কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত ত্যাগ করো না। আল্লাহর নাফরমানি ছাড়া তোমাদের প্রতিটি কথা সহ্য করা হবে।”

সেই সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে তাদের সম্পর্কে লিখে পাঠালেন:

“এরা নির্বোধ লোক, ন্যায় ও ইনসাফ দেখে তারা বিরক্ত হয়ে গেছে।” [২]

এই সময়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রা.), যিনি হিমসের গভর্নর ছিলেন, এই লোকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং কঠোর তিরস্কার করেন। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চাইলে হযরত...

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/২৯৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/৩১৮ থেকে ৩২১, ৩২৮

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা | খণ্ড দ্বিতীয়

আব্দুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদের মুক্ত করে দিলেন। [১]

ইবনে সাবা ইরাকে:

কোনো গোষ্ঠী তাদের অসভ্যতা থেকে তওবা করলে ন্যায়পরায়ণ শাসকদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচার ব্যর্থ হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন সাবা এতে অত্যন্ত বিরক্ত হলো এবং নিজে বসরায় পৌঁছে গোপনে মগজ ধোলাই শুরু করল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির (রা.) সংবাদ পেয়ে আব্দুল্লাহ বিন সাবাকে হেফাজতে নিলেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। সে নানা কথা বানিয়ে নিজের সাফাই পেশ করল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির (রা.) তাকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

ইবনে সাবা এবার কুফায় পৌঁছাল। সে সেখানে নতুন প্রতিনিধি তৈরি করছিল, এমন সময় শহরের শাসক হযরত সাঈদ বিন আস (রা.) তার উপস্থিতির কথা জানতে পারলেন। তিনিও তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করলেন। কঠোর ব্যবস্থা এই কারণে নেওয়া হয়নি যে, সেটি ছিল ন্যায়ের যুগ; আদালতে প্রমাণ পেশ করা ছাড়া কাউকে কখনোই শাস্তি দেওয়া হতো না।

ইবনে সাবা মিশরে ফিরে এসে কুফা ও বসরার সমর্থকদের সাথে গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদান অব্যাহত রাখল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত উসমান (রা.)-এর গভর্নরদের বদনাম করে তাদের অপসারিত করা এবং খিলাফতকে বিতর্কিত করে তোলা। [২]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩২১, ৩২৪

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩২৬, ৩২৭

৩৪ হিজরি: যখন ষড়যন্ত্রকারী শক্তিগুলো প্রকাশ্যে এল

৩৪ হিজরি শুরু হলে কুফার অনিষ্টকারী গোষ্ঠী তাদের শাসক হযরত সাঈদ বিন আল-আস رضى الله عنه-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল। শহরের শাসক হযরত সাঈদ বিন আল-আস رضى الله عنه হযরত উসমান رضى الله عنه-এর সাথে পরামর্শের জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়েছিলেন। এই সময়ে স্থানীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা হযরত উসমান رضى الله عنه-এর কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের একটি দল নিজেদের দাবি নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, পশ্চিমধ্যে ফিরে আসার সময় সাঈদ বিন আল-আস رضى الله عنه-এর সাথে তাদের দেখা হয়। কুফি দলটি বলল: “আল্লাহর কসম! আমাদের এই তলোয়ারগুলো থাকতে সাঈদ কুফায় প্রবেশ করতে পারবে না।” হযরত সাঈদ বিন আল-আস رضى الله عنه কুফিবাহিনীদের পথরোধে অনড় দেখে বললেন: “এই কাজের জন্য আমিরুল মুমিনিনের কাছে একজন এবং আমার কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠানোই যথেষ্ট ছিল।” এই বলে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে গেলেন এবং আমিরুল মুমিনিনকে সমস্ত পরিস্থিতি জানালেন। হযরত উসমান رضى الله عنه আপোসের পথ বেছে নিলেন এবং আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী হযরত সাঈদ বিন আল-আস رضى الله عنه-এর পরিবর্তে হযরত আবু মুসা আশআরি رضى الله عنه-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। [১]

প্রাণঘাতী হামলার ব্যর্থ চেষ্টা:

এই সময়ে কুমাইল বিন জিয়াদ নামক এক কুফি মদিনায় পৌঁছাল [২] এবং পোশাকে খঞ্জর লুকিয়ে হযরত উসমান رضى الله عنه-এর ওপর হামলার জন্য এগিয়ে এল, কিন্তু হযরত উসমান رضى الله عنه তার চেহারা দেখে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন এবং ধাক্কা দিয়ে তার হামলা ব্যর্থ করে দিলেন। লোকজন জড়ো হয়ে গেল। কুমাইল কসম খেয়ে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যের কথা অস্বীকার করল। লোকজন বলতে লাগল: “আমরা তার তল্লাশি নেব।” কিন্তু লজ্জা ও আভিজাত্যের মূর্ত প্রতীক (হযরত উসমান) বললেন: “আমি চাই না যে সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হোক,” এরপর এই বলে তাকে ছেড়ে দিলেন:

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৪/৩৩৫, ৩৩৬। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ৩৩ হিজরির ঘটনাবলীতে ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই বছর সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে চিঠি লিখে দাওয়াত দিয়েছিলেন যে, যদি জিহাদ করতে হয় তবে আমাদের এখানে এসে করো। (অর্থাৎ উম্মতকে হযরত উসমান رضى الله عنه-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল)। এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই চিঠিগুলোর বাস্তবতা সামনে আসবে। মনে রাখবেন যে, ওয়াকিদীর মতো দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনা রাসুলের সাহাবীদের ওপর অপবাদের ক্ষেত্রে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

[২] ইমাম বুখারী কুমাইল বিন জিয়াদকে হযরত আলী رضى الله عنه থেকে বর্ণনা গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (আত-তারিখ আল-কাবীর: ৭/২৩৩)। মুসনাদে আহমাদ এবং মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় তার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা বেশিরভাগ হযরত আলী এবং হযরত আবু হুরায়রা رضى الله عنهما থেকে বর্ণিত। এ থেকে বোঝা যায় যে, কুমাইল এই ঘটনার পর তওবা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে হযরত আলী رضى الله عنه-এর সাহচর্য তাকে নেককার বানিয়েছিল, সম্ভবত এই কারণেই মাদায়িনী তাকে কুফার ইবাদতগুজারদের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে সাদ, ইবনে হিব্বান, আজলি এবং ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মনে করেছেন। তবে কুমাইলের ওপর কঠোর সমালোচনাও হয়েছে। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আশ্শার তাকে ‘রাফেজি’ এবং ‘বিপদসমূহের একটি বিপদ’ বলে অভিহিত করেছেন। (তাহজিব আল-কামাল: ২৩/৩১৯)।

“তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাদের মহা প্রতিদান দেবেন, আর যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন।” [১]

হযরত উসমান (রা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ:

সেই দিনগুলোতে হযরত উসমান (রা.) ইসলামী বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য তাঁর গভর্নরদের মদিনা মুনাওয়ারায় তলব করেছিলেন। পরামর্শ সভায় সবার ঐকমত্য ছিল যে, একটি গোষ্ঠী হীন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে এবং সাধারণ সহজ-সরল মানুষকে উত্তেজিত করছে। পরামর্শ সভায় কোনো গভর্নরই হযরত উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ বা আচরণের সমালোচনা করেননি। কেবল হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কিছুটা সমালোচনা করেছিলেন, তবে নির্জনে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, যারা সরকারের বিরোধী তারা যেন আমার সামনে তাদের মনের কথা খুলে বলে এবং তাদের সংশোধন করা যায়।

বসরার গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) বলেছিলেন:

“লোকদের জিহাদে ব্যস্ত রাখুন যাতে তারা অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ না পায়।”

সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর মতামত দিয়েছিলেন: “আপনি সেনাবাহিনীর প্রধানদের দিয়ে কাজ নিন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। সিরিয়াবাসীদের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।”

মিশরের গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন সাদ (রা.) পরামর্শ দিয়েছিলেন: “লোকদের ওপর প্রচুর খরচ করে তাদের সহানুভূতি অর্জন করুন।”

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর পরামর্শ ছিল: “রোগের মূল কেটে ফেলা উচিত; অর্থাৎ যারা জনগণকে উত্তেজিত করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, বাকিরা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।”

হযরত উসমান (রা.) এই মতামত শুনে বলেছিলেন:

“যদি অন্য কোনো আশঙ্কা না থাকত, তবে এটাই করা উচিত ছিল।”

আসলে হযরত উসমান (রা.) জানতেন যে, যখন সরকারের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তখন প্রমাণ এবং নিশ্চিত সাক্ষ্যের সেই মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না যা আদালত ও আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং সব ধরনের গোয়েন্দা ও গোপন তথ্যের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নিতে হয়। যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, অপরাধীদের সাথে সাথে অনেক নির্দোষ মানুষও এর কবলে পড়ে যায়। এভাবে সহিংসতা, নির্যাতন এবং আইনবহির্ভূত পদক্ষেপ অরাজকতার জন্ম দেয়। এই দিকগুলো বিবেচনা করে আমিরুল মুমিনীন কোনো কঠোর পদক্ষেপের অনুমতি দেননি এবং গভর্নরদের এই সমর্থন দিয়ে বিদায় করেছিলেন যে, লোকদের জিহাদে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হোক।

এই নীতি অনুযায়ী, সেই বছর কুফা থেকে বিশিষ্ট সেনাপতিরা সেনাবাহিনী নিয়ে সব দিকে বেরিয়ে পড়েন। কুফায় খুব কম সংখ্যক সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। তাই শহরটি সবার থেকে শূন্য মনে হচ্ছিল। [২]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩০৩, রেওয়ায়েত: সাইফ

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৩১

প্রোপাগান্ডা এবং তিনটি মিথ্যা অভিযোগ

মুনাফিকরা ইসলামী সমাজে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরি করার জন্য তিনটি অভিযোগ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ করে দিয়েছিল:

- তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।
- তিনি উহুদ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
- তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেননি।

এই সংশয়গুলোর খণ্ডনে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ও ফাজিল সাহাবীর দলিলভিত্তিক উত্তর সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর এই অভিযোগগুলো আরোপ করল, তখন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) স্পষ্ট করে দিলেন যে, হযরত উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশেই বদরের যুদ্ধে সাথে ছিলেন না; তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহেবজাদী (তাঁর স্ত্রী) হযরত রুকাইয়্যাহ (রা.)-এর সেবা-শুশ্রূষার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের কারণে সেখানে অবস্থান করা তাঁর জন্য আবশ্যিক হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সমান গণীমতের মাল থেকে অংশও দিয়েছিলেন।

উহুদ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) ব্যাখ্যা করেন যে, এই ভুলের ক্ষমার ঘোষণা স্বয়ং কুরআন মাজীদ করে দিয়েছে, তাই এ নিয়ে কারো আপত্তি করার কোনো অধিকার থাকে না। [১]

আর বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ না করার বিষয়টি হলো মূখ্যতার নিকৃষ্টতম উদাহরণ, কারণ বাইয়াতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিতই হয়েছিল হযরত উসমান (রা.)-এর খাতিরে। কুরাইশরা তাঁকে নজরবন্দি করে রেখেছিল এবং তাঁর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, যার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে বাইয়াত নিয়েছিলেন যে, আমরা উসমানের রক্তের বদলা নিয়ে ছাড়ব। হযরত উসমান (রা.)-এর হাতের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের হাত রেখেছিলেন।

ইবনে সাবার নতুন খেলা

পরবর্তী পর্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন সাবার গোষ্ঠী “মিডিয়া ক্যাম্পেইন” চালাল। প্রতিটি শহরের ষড়যন্ত্রকারীরা অন্য শহরের লোকদের নামে মিথ্যা চিঠি লিখল, যাতে সরকারের জুলুম-নির্যাতন এবং জনগণের মজলুমিয়তের কল্পকাহিনী ছিল।

সরকারের বাড়াবাড়ির এই কল্পকাহিনীগুলো এমন তীব্রতা ও নিপুণতার সাথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিটি শহরের মানুষ এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হলো যে, আমাদের এলাকা ছাড়া বাকি মুসলিম বিশ্বে জুলুম-অত্যাচারের বাজার গরম হয়ে আছে। যেহেতু এটি ছিল নিছক প্রোপাগান্ডা, তাই কোনো প্রদেশ বা শহরের মানুষ নিজেরা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বাড়াবাড়ির তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, কিন্তু প্রত্যেকেই এটি কল্পনা করছিল যে, দেশের বাকি অংশে ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে আছে। [২]

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৯৮, ফাযাইলুস সাহাবা, বাব মানাকিবে উসমান (রা.); সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৭০৬... এটি মহান আল্লাহর বাণী “وَلَدَّ عَفَا” (আর অবশ্যই তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন) (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৫২)-এর দিকে ইঙ্গিত।

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৩১

হযরত উসমান (রা.)-এর তদন্ত দল:

এই গুজবগুলো মদিনাবাসীদের কানে পৌঁছালে হযরত উসমান (রা.) এর ব্যাখ্যা চাইলেন। তিনি এগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন: “সব জায়গায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান।” অধিকতর সন্তুষ্টির জন্য হযরত উসমান (রা.) সাহাবায়ে কেরামের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন এবং প্রতিটি প্রদেশের অবস্থা তদন্ত করার জন্য তাদের পাঠালেন। এই ব্যক্তিবর্গ প্রতিটি প্রদেশে গিয়ে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে স্থানীয় কর্মকর্তাদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন এবং ফিরে এসে জানানলেন: “আমরা খারাপ কিছু দেখিনি, কারো কোনো অভিযোগ নেই।” [১]

এই সময়ে হযরত উসমান (রা.)-এর গভর্নরগণও তদন্ত করে জানিয়ে দিলেন যে কোন শহরে কোন কোন লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী। সে অনুযায়ী মিশর থেকে আবদুল্লাহ বিন সাদ (রা.) লিখে পাঠালেন যে এখানকার ফিতনার মূল হোতা হলো আবদুল্লাহ বিন সাবা, খালিদ বিন মুলজাম, সুদান বিন হামরান এবং কিনানা বিন বাশার। [২]

হযরত উসমান (রা.) কেবল তদন্ত দলের রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করেননি, বরং পুরো ইসলামি বিশ্বে ঘোষণা করে দিলেন যে, “এই বছর (৩৩ হিজরি) হজের সময় সেই সমস্ত লোক আমার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করুক যাদের আমার বা আমার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ আছে। এরপর তারা চাইলে প্রতিশোধ নিতে পারে অথবা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারে।”

যখন এই ঘোষণা ইসলামি বিশ্বের অলিতে-গলিতে শোনানো হলো, তখন যারা আগে থেকেই হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর কর্মকর্তাদের ন্যায়বিচারের অনুরাগী ছিল, তারা কেঁদে ফেলল এবং হযরত উসমান (রা.)-এর জন্য দোয়া করতে লাগল।

হযরত উসমান (রা.) এই সময়ে কর্মকর্তাদের বারবার তাগিদ দিতে থাকলেন: “তোমরা সাধারণ মানুষের খেয়াল রেখো, তাদের অধিকার আদায় করতে থাকো। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হুকুম নষ্ট হয় তবে চুপ থেকো না।” [৩]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আশঙ্কা এবং মদিনাবাসীদের প্রতি হযরত উসমান (রা.)-এর শুভকামনা:

ভবিষ্যতের বিপদ আঁচ করতে পেরে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে আবেদন করলেন যেন তিনি সিরিয়ায় চলে আসেন। হযরত উসমান (রা.) বললেন: “আমি কোনো মূল্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারি না, চাই আমার গর্দান কেটে যাক।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আরজ করলেন:

“আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছি যারা মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করে আপনাকে রক্ষা করবে।”

তিনি বললেন: “আমি বাহিনীর খাদ্য ও রসদপত্রের খরচের কারণে মদিনাবাসীদের কষ্ট দিতে চাই না, যারা মুহাজিরদের আশ্রয় দিয়েছিল এবং সাহায্য করেছিল।”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৩১

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৩১... এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে হযরত উসমান (রা.)-এর শেষ বছরগুলোতে আবদুল্লাহ বিন সাবা মিশরে অবস্থান করছিল।

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৩৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “আমি আপনার ব্যাপারে আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছি।”

তিনি বললেন: **حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** [১]

এটি হযরত উসমান গনি (রা.)-এর দূরদর্শিতা ছিল যে, তিনি শুরু থেকেই মদিনা মুনাওয়ারার মুসলমানদের অধিকারের বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে কাজ করেছিলেন। তিনি (রা.) ভালোভাবেই জানতেন যে, সেনাবাহিনীর উপস্থিতির অর্থ হলো একটি স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপন করা, যেখানে সেনাবাহিনীর স্বার্থই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং নাগরিকদের অধিকার গৌণ হয়ে পড়ে। হযরত উসমান (রা.) মদিনাবাসীদের এই কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি সেনাবাহিনী তলব করার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

□□□

আকাবির সাহাবায়ে কেরামের জামাতের ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপন্থা

যেমনটি বলা হয়েছে যে, সাবায়ী গোষ্ঠী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ছড়ানোর জন্য হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর আমীরদের বদনাম করার কাজে অত্যন্ত তীব্রভাবে লিপ্ত ছিল, যাকে সাধারণ সচেতন মুসলমানরা গভীর উদ্বেগের সাথে দেখছিলেন। এর পাশাপাশি সিরিয়ার (শাম) জনগণকে বনু হাশিম এবং সাদাতদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণায় লিপ্ত করার অভিযানও চলছিল। [২]

সিরিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে উমাইয়া আমীরদের শাসন চলে আসছিল এবং বনু উমাইয়ার শত শত পরিবার তাদের মাওয়ালি এবং খাদেমসহ এখানকার শহর ও সেনানিবাসগুলোতে বসবাস করছিল। আরবদের এই পরিবারটি ছিল অত্যন্ত লড়াকু এবং রাজনীতি সচেতন। সাধারণ মানুষও তাদের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সাবায়ী আন্দোলন সিরিয়ায় ভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করেছিল। মনে হয় অনিষ্টের বীজ তখনই বপন করা হয়েছিল যখন আবদুল্লাহ বিন সাবা সিরিয়ায় ছিল। এই অনিষ্টকর অভিযানের অধীনে বনু হাশিমের চরিত্র হনন করা হয়েছিল এবং হযরত উসমান (রা.) ও তাঁর কর্মচারী এবং উমাইয়া আমীরদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় অতিরঞ্জনের পাঠ পড়ানো হয়েছিল। এছাড়াও কিছু শহরে হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-কে খলিফা বানানোর সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল। [৩]

এগুলো ছিল সাবায়ী আন্দোলনের প্রাথমিক প্রভাব যা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছিল। যেমন কোনো ভুল জিনিস শরীরে প্রবেশ করে প্রতিক্রিয়া...

[১] তারিখ আল-তাবারী, ৩৫ হিজরীর অধীনে, অধ্যায়: রজুউল হাদিস ইলা হাদিসে সাইফ আন শুয়ুখিহি।

[২] যাই হোক, ফিতনাবাজ লোকেরা পরবর্তী যুগে কেবল হযরত উসমান (রা.) নয় বরং বনু উমাইয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং এই আবেগ পক্ষপাতের এমন রূপ ধারণ করেছিল যে ইয়াজিদ এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি ভালোবাসাও ধীন ও ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য হতে লাগল, যেখানে হযরত আলী, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন (রা.)-কে তাদের ধারণায় তিরস্কারের যোগ্য, গাদ্দার বা অন্তত অযোগ্য ও নির্বোধ বলা হতে লাগল। যেহেতু এই মানসিকতার সূচনা হযরত উসমান (রা.)-এর সমর্থন ও প্রতিরক্ষার শিরোনামে হয়েছিল, তাই এই গোষ্ঠী “উসমানী” নামে পরিচিতি লাভ করে। উসমানী গোষ্ঠীর মধ্যেও দুটি প্রকার ছিল: একদল যারা হযরত আলী (রা.)-এর অবমাননা থেকে বিরত থাকতেন, তবে তাঁকে মুজতাহিদ খতি (ভুলকারী গবেষক) হিসেবে গণ্য করতেন। তাদের মধ্যে কিছু হাদিস বর্ণনাকারীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আসমাউর রিজাল-এর কিতাবসমূহে এমন কিছু ব্যক্তির বর্ণনায় তাঁদের “উসমানী” বলা হয়েছে, যা এক প্রকারের জারহ (সমালোচনা) হিসেবে গণ্য হয়। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল অত্যন্ত উগ্র যারা হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ ও তিরস্কার করত। এই লোকেরা নাসিবী বা মারওয়ানী নামে পরিচিত ছিল এবং এদের অধিকাংশ ছিল সিরিয়ার অধিবাসী। একইভাবে হযরত আলী (রা.)-এর ভালোবাসায় যারা সীমার মধ্যে অটল ছিলেন তারা শিয়ানে আলী নামে পরিচিত হন, তাদের মধ্যে কুফার নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উম্মতের ওলামায়ে কেরাম তাঁদের নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সাবায়ীয়াতের শিকার হয়েছিল তারা তিন খলিফাকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। এই লোকেরা রাফেজী নামে পরিচিত হয় এবং উম্মতের ওলামায়ে কেরাম তাঁদের পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য করেছেন।

[৩] আন্মা আহলুল বাসরাতি ফালাহুম কানু ইয়াশতাহনা তালহাতা ওয়া আন্মা আহলুল কুফাতি ফালাহুম কানু ইয়াশতাহনা জুবাইরা। (তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৪৯)

অনুরূপভাবে, মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া নেতিবাচক চিন্তাগুলোও নেতিবাচক আবেগ জাগিয়ে তোলে। মন্দের শক্তির লক্ষ্য ছিল একটিই, অর্থাৎ ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে গোত্রীয় গোঁড়ামিকে জাগিয়ে তোলা, যার বহিঃপ্রকাশ আলাদা আলাদা মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির রঙে প্রকাশ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে অহংকার ও গর্বের সেই মেজাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যা ইসলাম কখনোই পছন্দ করেনি। [১] অনেক সহজ-সরল, আবেগপ্রবণ এবং সাহসী যুবক নিজ নিজ প্রদেশকে নিজেদের তলোয়ারের অবদান এবং পারিবারিক জায়গির মনে করতে শুরু করেছিল [২] এবং নিজ গোত্রকে আরবের সমস্ত গোত্রের ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করে মুহাজির ও আনসারদের শাসনকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। [৩]

যদি বলা হয় যে, ইসলামী চেতনা যে গোত্রীয় গোঁড়ামিকে অবদমিত করেছিল, সাবায়ী মতবাদ অবচেতনভাবে সেটিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছিল, তবে তা ভুল হবে না। কোনো কোনো অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করল যে, খিলাফত বনু হাশিমের পাওয়া উচিত। কোনো কোনো প্রদেশের মানুষ হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকে এমন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল যে, বনু উমাইয়ার খিলাফত তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল এবং তারা মনে করতে লাগল যে, খিলাফত বনু উমাইয়া থেকে বের করে অন্য কোনো বংশে নিয়ে যাওয়া উচিত। এগুলো ছিল মুসলিম সমাজে সাবায়ী আন্দোলনের প্রাথমিক প্রভাব। সামনে এগিয়ে তারা যে ফিতনা সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল এর চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ বছরগুলোতে একদিকে সাবায়ী আন্দোলন হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর গভর্নরদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ঘোষণা করছিল এবং তাঁদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছিল, যার কোনো ভিত্তি ছিল না। অন্যদিকে, এর প্রতিক্রিয়ায় কিছু লোক এই অবস্থান গ্রহণ করেছিল যে, শাসন ব্যবস্থায় কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই।

[১] গোত্রীয় গর্বের উদাহরণের জন্য দেখুন: মুফাদ্দাল বিন মুহাম্মদ আল-দাব্বি (মৃত্যু ১৭৮ হিজরি) রচিত ‘আল-মুফাদ্দালিয়াত’, যা প্রাক-ইসলামী যুগের কবিতার প্রাচীনতম সংকলন হিসেবে বিবেচিত।

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৩৩; আল-আশতারের উক্তি: “তাদের ধারণা যে, এই জনপদ আমাদের তলোয়ারের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।”

[৩] আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে এই ফিতনার কারণগুলোর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ‘বাব বাদউল ইনতিকাদ আলা উসমান (রা.)’ (উসমান (রা.)-এর ওপর সমালোচনার সূত্রপাত অধ্যায়)-এর অধীনে লিখেছেন:

“যখন বিজয়গুলো সম্পন্ন হলো এবং শাসনব্যবস্থা পূর্ণতা পেল এবং আরব গোত্রগুলো একে অপরের সাথে বসরা, কুফা, সিরিয়া ও মিশরে বসতি স্থাপন করল। মুহাজির ও আনসাররা তাদের নেতৃত্ব ও আদব-কায়দার কারণে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছিল। আরবের বাকি গোত্রগুলো যেমন বনি বকর বিন ওয়ায়েল, আব্দুল কায়েস, বনি আসাদ, তামীম ও কুদাআ ইত্যাদি যারা এই মর্যাদায় অংশীদার ছিল না, তারা বিজয়ের ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কারণে নিজেদের মনে মনে (বিজয়ীদের) সমকক্ষ ভাবতে শুরু করল। তারা সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না এবং সেই অবস্থা ভুলে গিয়েছিল যখন ওহী নাজিল হতো এবং ফেরেশতার সাহায্য করতে আসত। যখন এই ভালোবাসা ও ভক্তি কিছুটা শিথিল হয়ে গেল এবং অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত হলো, তখন জাহিলিয়াতের সেই পুরনো গোত্রীয় চেতনা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং তারা মুহাজির ও আনসারদের (কুরাইশ ও অন্যদের) শাসনকে অপছন্দ করতে শুরু করল এবং তাদের মন তাদের থেকে বিমুখ হয়ে গেল।” (তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৫৮৭)

মনে করিয়ে দেওয়াও যেন গাদ্দারির সমতুল্য এবং হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আপত্তি উত্থাপনকারী গর্দান মারার যোগ্য। [১]

এমন পরিস্থিতিতে মদিনা মুনাওয়ারার বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা হযরত উসমান (রা.)-এর ফজিলত ও মর্যাদা স্বীকার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগগুলোও খণ্ডন করেছেন, তবে সেই সাথে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের সুযোগ থাকার বিষয়টিও মেনে নিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁরা এই দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং সমঝোতার কোনো উত্তম পথ বেরিয়ে আসে। যেসব ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মদিনার বড় বড় সাহাবী বিশেষ করে হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট বরং তাঁর শত্রু ছিলেন, তাতে অনেক অতিরঞ্জন রয়েছে এবং প্রমাণিত বিষয় কেবল এতটুকুই যে, এই মহান ব্যক্তিদের মনে আশঙ্কা ছিল যে উচ্চপদগুলোতে কোনো একটি গোত্রের আধিপত্যের কারণে জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। আর যখন সত্যিই ভুল বোঝাবুঝির পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করল, তখন এই মহান ব্যক্তিগণ আমিরুল মুমিনীনকে নেক পরামর্শ দিলেন। এই সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কও হয়েছে, মতপার্থক্যের পর্যায়েও পৌঁছেছে এবং মানুষ হওয়ার কারণে কখনো কখনো কিছু কটু বাক্য বিনিময়ও হয়েছে, কিন্তু এই সবকিছুই ছিল একে অপরের প্রতি ইখলাস ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে। ফলে অল্প সময় পরেই তাঁরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেন। [২] এই মহান ব্যক্তিদের কথা শুনে হযরত উসমান (রা.) মানুষকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাতে এসব বিষয়েও নমনীয়তা অবলম্বন করেন। মোটকথা, এই সমস্ত বিষয়ে মদিনার বড় বড় সাহাবী হযরত উসমান (রা.)-এর সাহায্যকারী ছিলেন। যেমনটি সামনে পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে আসছে।

[১] এই পরিস্থিতি কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও নিজের কবলে নিয়ে নিয়েছিল, যার চিহ্ন কেবল ইতিহাসেই নয় বরং হাদিসের ভাণ্ডারেও রয়েছে। যেমন: আবুল গাদিয়া জুহানি (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী সাহাবী) মসজিদে কুবাতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে শুনে বললেন যে, আমি যদি সাহায্যকারী পেতাম তবে তাঁকে (আম্মার রা.-কে) হত্যা করে ফেলতাম। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/২৬০, তবা সাদির। আফফান বিন মুসলিম আন রাবিয়াহ বিন জুবায়ের) এই বর্ণনার সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এছাড়াও এর সমর্থক বর্ণনাও রয়েছে। (দেখুন: তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/২৬০ তবা সাদির, আন আফফান বিন মুসলিম আন হাম্মাদ বিন সালামাহ আন আবি حفص আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হা: ৫১৫৮ সনদ সহিহ; আল-মুজামুল আওসাত, হা: ৯২৫২)

একইভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধিতায় আশতার নাখয়ি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল (যার বিস্তারিত সামনে আসছে)। এই ব্যক্তি সম্পর্কে জারাহ ও তাদিলের ইমামদের অভিমত হলো: “মালিক বিন আশতার নাখয়ি কুফি, তাবেয়ি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)” (আস-সিকাত লিল ইজলি: ১/৪১৭)। ইবনে হিব্বানও তাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। (আস-সিকাত, হা: ৫৩৩৮)। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: “দ্বিতীয় স্তরের নির্ভরযোগ্য” (তাজিলুল মানফায়াহ, নং: ৬৪২৯)। এই ধরনের অংশগ্রহণকারীরা কথার ওপর অটল থাকা সত্ত্বেও ভুল বোঝাবুঝি, আবেগপ্রবণতা, আন্তরিক জোশ বা এক পর্যায়ে পদমর্যাদার মোহের কারণে ভুল পথে চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সারিতে মারওয়ান বিন হাকাম এমনই এক উদাহরণ যাকে একদিকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী মানা হয়েছে এবং অন্যদিকে আশতার নাখয়ির মতো কিছু অত্যন্ত ভুল কাজে লিপ্ত দেখা যায়।

[২] ইমাম আবু বকর খাল্লাল (রহ.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে এই বিষয়ে কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। একটি বর্ণনায় হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) বলেন যে, আমি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-কে দেখেছি যে তাঁরা একে অপরকে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দুজনেই একে অপরের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এই একই ঘটনা অন্য একটি সনদে হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যার শেষে রয়েছে যে, (তর্ক-বিতর্কের পর) দুজনেই একে অপরের হাত এমনভাবে ধরলেন যেন তাঁরা একই বাবা-মায়ের সন্তান।

সাঈদ বিন মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ও উসমানকে দেখেছি... তাঁদের একজন অপরজনকে বলতে কোনো কিছুই বাকি রাখেননি... অতঃপর তাঁরা সেখান থেকে সরেননি যতক্ষণ না তাঁরা আপস করেছেন এবং প্রত্যেকেই তাঁর সঙ্গীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন (আস-সুন্নাহ লি আবি বকর আল-খাল্লাল, হা: ৫১৫, তবা দারুন্ রাইয়াহ)। আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণিত... যখন জোহরের নামাজ পড়লাম তখন তাঁদের একজন অপরজনের হাত ধরে প্রবেশ করলেন যেন তাঁরা সহোদর ভাই অর্থাৎ উসমান ও আলী, আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন (আস-সুন্নাহ লি আবি বকর আল-খাল্লাল, হা: ৫১৬)।

সাবায়ীদের পরিকল্পনা

আলামতসমূহ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ৩৫ হিজরিতে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী উম্মাহর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি এবং খিলাফতকে ছিন্নভিন্ন করার পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছিল। এই পরিকল্পনার চারটি দিক ছিল, যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ইরাক ও মিসরের লোক যারা বনু হাশিমের প্রতি বেশি অনুরাগী, তাদের ব্যবহার করে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এমন এক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, যাতে মদিনার তিন বিশিষ্ট সাহাবী: হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত জুবায়ের (রা.)-ও জড়িয়ে পড়েন। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে খিলাফতের দাবিদার বানিয়ে উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হবে।
- যদি তা সম্ভব না হয়, তবে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছ থেকে জোরপূর্বক পদত্যাগ আদায় করা হবে। খিলাফতের মসনদ খালি হতেই মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা দখল করার চেষ্টা করবেন, এই সুযোগে মতানৈক্যকে পুঁজি করে গৃহযুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করা হবে।
- যদি হযরত উসমান (রা.) পদত্যাগ না করেন, তবে তাকে হত্যা করে এর দায় হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, আমর ইবনুল আস এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা.) সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর চাপিয়ে এমন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে উম্মাহর দৃষ্টিতে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েন এবং মুহাজির ও আনসারগণ কোনো একজন খলিফার ওপর একমত হতে না পারেন। ফলে মুসলমানদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।
- এরপরও যদি মুহাজির ও আনসারগণ কোনো ব্যক্তিত্বের ওপর একমত হয়ে যান, তবে এই অপপ্রচার চালানো হবে যে, এই ব্যক্তিই ক্ষমতা দখলের জন্য পূর্ববর্তী খলিফাকে হত্যা করিয়েছে। এই কথাটি এমনভাবে রটানো হবে যাতে পূর্ববর্তী খলিফার অনুসারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা কোনোভাবেই নতুন খলিফার ওপর আস্তা রাখতে না পারে এবং যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল খাড়া হয়ে যাবে।

সাবায়ী কাফেলা অভিযোগের তালিকা নিয়ে মদিনায়

ফিতনার স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করতে এবং ধ্বংসাত্মক পরিবেশকে উসকে দিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, একটি প্রতিনিধি দলকে এই সব অভিযোগ ও অনুযোগসহ হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট পাঠানো হবে, যা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিনিধি দল ফিরে এসে প্রচার করবে যে, হযরত উসমান (রা.) নিজের বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু নিজের পথ পরিহার করতে রাজি নন। এভাবে খলিফার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা হবে। ৩৫ হিজরির রজব মাসে সাবায়ীদের একটি কাফেলা মিসর থেকে রওনা হলো। মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা.) তাদের এই তৎপরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে লিখে পাঠালেন যে, এই লোকেরা আপনাকে অপসারিত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। [১]

হযরত উসমান (রা.) এই লোকদের মসজিদে নববীতে প্রকাশ্যে আলোচনার সুযোগ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে...

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৫৭

হযরত উসমান (রা.)-কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বিদ্রোহ করার অপরাধে হত্যা করা হোক, কিন্তু হযরত উসমান (রা.) অভিযোগকারীদের সন্দেহের অবকাশ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দেননি, বরং নিজেই জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়ানো পছন্দ করলেন। [১]

হযরত উসমান (রা.) জবাবদিহিতার কাঠগড়ায়:

হযরত উসমান (রা.) কুরআন মাজীদে একটি কপি আনিয়ে সামনে রাখলেন, প্রতিনিধি দলের অভিযোগগুলো শুনলেন এবং প্রতিটি কথার স্পষ্ট জবাব দিলেন। দুষ্কৃতকারীরা প্রতিটি প্রশ্নের সাথে বিদ্রূপের সুরে বলত: “আল্লাহ কি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন নাকি আপনি আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করছেন?” কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সন্তোষজনক জবাব দিতেন এবং এরপর বলতেন: “আর কোনো কথা থাকলে বলো।” [২]

আলোচনার বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করলে জানা যায় যে, এটি ছিল একটি উন্মুক্ত আদালত যেখানে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন শহরের লোকদের ডাকা হয়েছিল। যে যা চেয়েছে প্রশ্ন করেছে। হযরত উসমান (রা.)-এর জবাবে সাবায়ীরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ মন খুলে তাঁর সত্যতা স্বীকার করেছিল। এই মজলিসে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছিল:

- (১) আপত্তিকারীরা বলল: আপনি “বাকি” এর চারণভূমিকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে সেটিকে “হিমা” (নিষিদ্ধ এলাকা) ঘোষণা করেছেন এবং সাধারণ মানুষকে তা থেকে উপকৃত হতে দিচ্ছেন না, অথচ রাসূল (সা.)-এর ইরশাদ হলো: “লা হিমা ইল্লা লিল্লাহি ওয়া লিরাসুলিহি” (আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাড়া আর কারো এমন সীমানা নির্ধারণের অধিকার নেই)।

হযরত উসমান (রা.) জবাবে বললেন: “আল্লাহর কসম! এই ধারা আমি শুরু করিনি বরং আগে থেকেই চলে আসছে। আমার আগে হযরত উমর (রা.) সদকার উটগুলোর জন্য চারণভূমি নির্দিষ্ট করেছিলেন। যখন আমি শাসনভার পেলাম তখন সদকার উটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই আমি উটের আধিক্যের কারণে চারণভূমির আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছি।” [৩]

এর অর্থ হলো, “লা হিমা ইল্লা লিল্লাহি ওয়া লিরাসুলিহি” হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন গোত্রপতিরা নিজেদের পশু চরানোর জন্য বন-জঙ্গল দখল করে নেয়। এই হাদীসে “লিল্লাহি ওয়া লিরাসুলিহি” থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যদি মুসলমানদের প্রধান সরকারি সম্পদ ও গবাদি পশুর হেফাজতের জন্য বন-জঙ্গল নির্দিষ্ট করে দেন তবে তা কোনো অন্যায় কাজ নয়। এই কারণেই রাসূল (সা.) নিজে চারণভূমি নির্দিষ্ট করেছিলেন, এরপর হযরত উমর ফারুক (রা.) সেগুলোর আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। এই পদক্ষেপ বায়তুল মাল এবং সরকারি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত পশুদের উত্তম লালন-পালনের জন্য জরুরি ছিল। হযরত উসমান (রা.) এই ধারাকে আরও উন্নত করেছিলেন কারণ বায়তুল মালে সদকা ইত্যাদির উটের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। একইভাবে মুজাহিদদের জন্য ঘোড়ারও অধিক প্রয়োজন ছিল। [৪] সুতরাং সরকারি চারণভূমিগুলোর উন্নয়ন করা একটি কৃতিত্ব ছিল, অপরাধ নয়। আর এই উন্নয়ন হযরত উসমান (রা.)-এর ব্যক্তিগত গবাদি পশুর ছিল না, বরং সরকারি সম্পদের ছিল।

[১] তারিখুত তাবারী: ৩৪৫/৪

[২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১০৮, ১০৯

[৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১০৯; তারিখুত তাবারী: ৩৭৭/৪

[৪] আখরাজাহ্ আহমাদ বিসানাদিন সহীহ, ফি ফাযায়িলিস সাহাবা, হা: ৭৬৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

ব্যক্তিগত পশুদের ব্যাপারে হযরত উসমান (রা.) ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন:

“খিলাফতের পূর্বে সমগ্র আরবে আমার চেয়ে বেশি গবাদি পশুর মালিক আর কেউ ছিল না। আজ আমার কাছে কেবল একটি ছাগল এবং হজের জন্য দুটি উট রয়েছে।” অর্থাৎ বাকি সব তিনি সদকা, খয়রাত ও দান-খয়রাতে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। [১]

.

২. দ্বিতীয় আপত্তি এই করা হয়েছিল যে, কুরআন মাজীদের অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি ছিল, আপনি সেগুলো নষ্ট করে একটি পাণ্ডুলিপি প্রচলিত করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) জবাবে বললেন: “কুরআন এক, এটি এক সত্তার পক্ষ থেকে এসেছে, আমি এ ব্যাপারে যা করেছি তা সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতেই ছিল।” [২]

তিনি আরও বলেন: “হযরত হুযাইফা (রা.)-এর পরামর্শে আমি এমনটি করতে সম্মত হয়েছিলাম যাতে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তেমন মতভেদ সৃষ্টি না হয় যেমনটি আহলে কিতাবদের মধ্যে হয়েছিল।” [৩]

.

৩. এই আপত্তিও করা হয়েছিল যে, আপনি হজের সময় মিনায় জোহর, আসর এবং এশা চার রাকাত করে পড়ানো শুরু করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আবু বকর ও উমর (রা.) মুসাফিরদের মতো দুই রাকাত করে (কসর) পড়াতেন। [৪]

হযরত উসমান (রা.) জবাবে বললেন:

“মক্কায় আমার ঘর আছে, পরিবার-পরিজন আছে, তাই আমি সেখানে (মুকিম হিসেবে) পূর্ণ নামাজ পড়ি।” [৫]

.

৪. পরবর্তী আপত্তি এই করা হয়েছিল যে, হাকাম বিন আস-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) শহর থেকে বহিষ্কার করেছিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর জীবদ্দশায় তার ফিরে আসার অনুমতি মেলেনি। আপনি কেন তাকে মদিনায় ফিরিয়ে আনলেন?

হযরত উসমান (রা.) জবাবে বললেন: “হাকাম বিন আস-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে তায়েফে পাঠিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন (অর্থাৎ ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন), তবে কি আমি সঠিক কাজ করিনি?”

সবাই বলল: “অবশ্যই সঠিক করেছেন।” [৬]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৭৭।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৬৬।

[৩] তারিখ আল-মদিনা, উমর বিন শাব্বাহ: ৩/১১১২, জেদ্দা সংস্করণ... এর সমর্থনে হযরত আলী (রা.) বলেছেন: “এটি সাহাবীদের একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল।” “আমি খলিফা হলেও তাই করতাম।” (তারিখ আল-মদিনা, উমর বিন শাব্বাহ: ৩/৯৯৫, তারিখ আল-তাবারী: ৫/১১১৩, ফাতহুল বারী: ৮/৯, দারুল মা'রিফাহ সংস্করণ)।

রহি এই কথা যে, কুরআন মাজীদের পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, এ ব্যাপারে উলামা ও ফুকাহাদের ঐকমত্য চলে আসছে যে, যদি এটি কুরআন মাজীদকে বিকৃতি থেকে বাঁচাতে এবং এর সুরক্ষার জন্য হয় তবে তা নিঃসন্দেহে জায়েজ। হ্যাঁ, যদি অবজ্ঞা ও ঘৃণার উদ্দেশ্যে হয় তবে তা কুফরি। হযরত উসমান (রা.) সরকারিভাবে অনির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলো নষ্ট করার নির্দেশ কুরআনের সুরক্ষার জন্যই দিয়েছিলেন। খোদা নাখাস্তা যদি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকত তবে হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন এবং হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর মতো জলীলুল কদর সাহাবীগণ কেন তাকে সমর্থন করতেন? মোদ্বাকথা, এটি হযরত উসমান (রা.)-এর অনেক বড় একটি অবদান ছিল। আপনি এই ফয়সালা সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত রায়ে করেছিলেন যাতে উম্মতে মুহাম্মদী ইহুদি ও নাসারাদের মতো আসমানি কিতাবের শব্দাবলি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হয়। (ফাতহুল বারী: ৯/১৮)

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৬৬, ৩৭৭... মূলত হজ করে ফিরে যাওয়া গ্রামবাসী এবং নওমুসলিমদের মধ্যে এই ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ছিল যে, জোহর, আসর এবং এশার ফরজ নামাজ সব অবস্থায় দুই রাকাত। এক গ্রামবাসী হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে বলে ফেলল: “যখন থেকে আপনাকে (মিনায়) দুই রাকাত পড়তে দেখেছি, আমি সবসময় দুই রাকাত নামাজই পড়ি।” (ফাতহুল বারী: ২/৫৭১) এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য হযরত উসমান (রা.) সেখানে চার রাকাত পূর্ণ নামাজ পড়ানো শুরু করেন এবং এর পদ্ধতি হিসেবে তিনি মক্কা মোকাররমায় বিবাহ করেন এবং ঘরও স্থাপন করেন। এভাবে তিনি সেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুকিম বা স্থায়ী বাসিন্দার হুকুমে চলে আসেন।

[৫] এই বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো, হযরত উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সুপারিশ করে হাকাম বিন আস-এর নির্বাসনের সাজা একটি নির্দিষ্ট সময় পর মাফ (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

৫) তারপর এই আপত্তি তোলা হলো যে, আপনি যুবকদের বড় বড় পদে নিয়োগ দিয়েছেন এবং প্রবীণ সাহাবীদের বরখাস্ত করেছেন। [১]

ইবনে কুতাইবার বর্ণনা অনুযায়ী ঐ লোকেরা বলেছিল যে, আপনি আপনার অনভিজ্ঞ কুরাইশ আত্মীয়দের গভর্নর বানিয়েছেন। [২]

এই অভিযোগের জবাবে হযরত উসমান (রা.) নিজের পক্ষ থেকে সাফাই পেশ করে বলেছিলেন:

“আমি কেবল যোগ্য, বুদ্ধিমান এবং পছন্দনীয় যুবকদেরই পদে নিয়োগ দিয়েছি। যাদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে তাদের শহরের অধিবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

তাছাড়া যুবকদের আমির বানানোর প্রথা তো আগে থেকেই চলে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কি উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে আমির নিযুক্ত করেননি?”

উপস্থিত সাধারণ মানুষ বলল: “একেবারে ঠিক। এই লোকেরা এমন সব আপত্তি তুলছে যা তারা প্রমাণ করতে পারবে না।” [৩]

তারপরও হযরত উসমান (রা.) বললেন: “তোমরা প্রতিটি শহরের মানুষ দাঁড়িয়ে বলো যে, তোমরা কাকে গভর্নর হিসেবে পছন্দ করো, আমি তাকেই গভর্নর বানিয়ে দেব। আর যাকে তোমরা অপছন্দ করো, তাকে আমি বরখাস্ত করে দেব।”

বসরাবাসী বলল: “আমরা আবদুল্লাহ বিন আমিরের ওপর সন্তুষ্ট আছি।”

সিরিয়াবাসী বলল: “আমরা মুয়াবিয়ার ওপর সন্তুষ্ট আছি।”

মিশরবাসী বলল: “আবদুল্লাহ বিন আবি সারহকে বরখাস্ত করে আমার বিন আসকে নিযুক্ত করুন।” [৪]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ) ...করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সাধারণ মানুষের ইলমে তা ছিল না। হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি, কিন্তু হযরত উসমান (রা.) যখন ক্ষমতা পেলেন তখন তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করে তাকে আর কষ্টে থাকতে দেননি। তাছাড়া হাকাম বিন আসের নির্বাসন কোনো স্থায়ী দণ্ড ছিল না। মক্কা থেকে যাকে বের করে দেওয়া হতো তাকে মদিনায় থাকার অনুমতি দেওয়া হতো না। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে হাকাম বিন আসকে মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তবে এই শাস্তির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ দুই বছর, পাঁচ বছর বা দশ বছর হয়। হযরত উসমানের খেলাফত পর্যন্ত পনেরো বছর পার হয়ে গিয়েছিল। এখন সাজা খতম হওয়াটাই ছিল ইনসাফের দাবি।

<বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা>

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৩৭... তারিখ আল-মদিনা, উমর বিন শাব্বাহ: ৩/১১১৩, তাবা জাদা।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৩৭... তারপর আপনি বড় বড় সাহাবীদের মধ্য থেকে যাদের বরখাস্ত করেছিলেন তার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। মুগীরা বিন শু'বাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কারণ হযরত উমর (রা.)-এর অসিয়ত ছিল যে তাকে যেন বসিয়ে রাখা না হয় বরং হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে কুফার গভর্নর বানানো হয়। (আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৪৫৩) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে বরখাস্ত করার কারণ ছিল ঋণের একটি বিষয়। হযরত সা'দ বায়তুল মাল থেকে ঋণ নিয়েছিলেন যা তিনি ফেরত দিতে পারছিলেন না। হযরত উসমান জনগণের সম্পদ রক্ষার জন্য তাকে বরখাস্ত করেন। (তারিখ আল-তাবারী, খণ্ড: ৫, পৃ: ২৫) হযরত আমর বিন আসকে কেবল এজন্য মিশর থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কারণ মিশরের মতো বিশাল দেশ থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় হচ্ছিল না। হযরত উসমান আবদুল্লাহ বিন আবি সারহকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তো রাজস্ব বাড়তে শুরু করল। (তারিখ আল-ইয়াকুবী, খণ্ড: ২, পৃ: ১৭২) যুবকদের পদ দেওয়ার বিষয়টি হলো, আসলে পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাই ছিল মানদণ্ড যা হযরত উসমান অবশ্যই বিবেচনা করেছিলেন।

এই সব কথার পাশাপাশি বয়সের বিষয়টিও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে গিয়ে সরকারি কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। বর্তমান যুগে ষাট বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়। হযরত উসমান যাদের বরখাস্ত করেছিলেন তাদের অধিকাংশের বয়স ছিল ষাট বছরের বেশি। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ যখন বায়তুল মালের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হন তখন তার বয়স ছিল ৩২ হিজরিতে এবং তিনি ঐ বছরই ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ষাটের উপরে। (উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসির জাযারি: ৩/৩৮১, তাবা আল-ইলমিয়াহ) আমর বিন আসের বয়স ৭০ বছর হয়ে গিয়েছিল। (আল-ইসাবাহ: ৪/৫৪০-এর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উমর ফারুক হযরত আমর বিন আস থেকে সাত বছরের বড় ছিলেন যিনি ২৩ হিজরিতে ৫৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এভাবে আমর বিন আসের বয়স তখন ৬৫ বছর ছিল এবং ৩২ হিজরিতে বরখাস্তের সময় তার বয়স ৭৪ বছর হয়)।

কেবল সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের বরখাস্ত কম বয়সে হয়েছিল। ৫৬ হিজরিতে ৮২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/১২৩, তাবা আল-রিসালাহ) এই হিসেবে ৩৫ হিজরিতে বরখাস্তের সময় তার বয়স ছিল ৫৯ বছর।

[৩] তারিখ আল-মদিনা, উমর বিন শাব্বাহ: ৩/১১১৩, তাবা জাদা বাসনাদ ও রিজালুহ সিকাত ইল্লা শাইখুহুম লাকিন ওয়াদ্বাকাহ ইবনে হিব্বান।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৬. এই আপত্তিও করা হয়েছিল যে, আপনি মিশরের গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-কে আফ্রিকার গনীমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগের এক পঞ্চমাংশ (চার শতাংশ) কেন পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন।

জবাবে তৃতীয় খলীফা বললেন: “তাকে গনীমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগের এক পঞ্চমাংশ (চার শতাংশ) দেওয়া হয়েছিল কারণ আফ্রিকার অভিযানের আগে তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এটি কোনো স্থায়ী নিয়ম ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-ও এই ধরনের পুরস্কার দিতেন। যাই হোক, যখন সৈন্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করল, তখন আমি (তাদের মন রক্ষার জন্য) সেই পুরস্কার ফেরত নিয়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম, যদিও তাদের কোনো হক ছিল না।” [১]

৭. এই হাস্যকর অভিযোগও করা হয়েছিল যে, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসেন এবং তাদের পুরস্কার দেন।

হযরত উসমান (রা.) জবাব দিলেন:

“পরিবারের সদস্যদের অবশ্যই ভালোবাসি কিন্তু কারো ওপর জুলুম করি না। যেখানে তাদের পুরস্কার দেওয়ার প্রশ্ন আসে, তা আমি আমার নিজের পকেট থেকে দিই। বাইতুল মাল যা সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ, তা আমি নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য হালাল মনে করি না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর সময় থেকেই নিজের সম্পদ থেকে দান করে আসছি। যৌবনে যখন এই অবস্থা ছিল, এখন যখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি, তখন কেন কৃপণতা করব?” [২]

৮. অভিযোগের তালিকায় এটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, শহরবাসীদের ওপর বোঝা এবং ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.) জবাব দিলেন:

“যে এই অভিযোগ করে, আমি তাকে সেই শহরের ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করছি, সে যাক এবং সেই শহরের ট্যাক্স আদায় করুক। আমার কাছে তো উৎপাদনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছাড়া আর কিছুই আসে না। এর মধ্যে আমি নিজের জন্য এক পয়সাও হালাল মনে করি না। বণ্টনের সমস্ত ক্ষমতা অন্য মুসলমানদের হাতে রয়েছে, তারাই এই সম্পদ জনগণের ওপর খরচ করে। আমি নিজের খরচের জন্য এর থেকে কিছুই নিই না। আমি নিজের উপার্জনের ওপর নির্ভর করি।” [৩]

৯. এটিও বলা হয়েছিল যে, আপনি (বনু উমাইয়া ছাড়াও) কিছু ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে জমি দান করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) ব্যাখ্যা দিলেন:

“এটি মুহাজির ও আনসারদের সেই সব জমির বিষয় যা বিজয়ের পর তারা পেয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক তো সেই সব জমিতেই বসতি স্থাপন করেছিল, আর কিছু লোক তাদের ঘরে ফিরে এসেছিল। আমি তাদের পরামর্শে সেই সব জমি যা তাদের মালিকানায় অবশিষ্ট ছিল, সেখানকার আরব জমিদারদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। মূল্য এখানে তাদের হাতে তুলে দিয়েছি, এখন যা কিছু...”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৭১

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৩৭, ৩৩৮

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৩৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

“তা তাদের কাছেই আছে, আমি নিজের জন্য কিছুই রাখিনি।” [১]

(১১) একটি আপত্তি এই করা হয়েছিল যে, আপনি সরকারি সম্পদ থেকে মারওয়ান বিন আল-হাকামকে পনেরো হাজার এবং আবদুল্লাহ বিন খালিদকে পঞ্চাশ হাজারের অনুদান দিয়েছেন। (তারা উভয়ই উমাইয়া ছিলেন, তাই আপনার (রা.) ওপর আপত্তি করা হয়েছিল) আপনি (রা.) স্পষ্ট করে বললেন যে, এই অনুদানগুলো আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে দিয়েছি, তাও এই কারণে যে এই লোকগুলো দরিদ্র। আপনি বললেন: “আমার মনে হয় আমার এই অধিকার আছে (যে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে অনুদান দেব) কিন্তু তবুও যদি আপনারা একে ভুল মনে করেন তবে আমাকে বাধা দেবেন। আমার মতামত আপনাদের মতামতের অনুগত।”

আপনার উত্তর শুনে সবাই সন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং বলল: “আপনি ঠিক করেছেন, ভালো করেছেন।” [২]

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার পর হযরত উসমান (রা.) এই দুষ্কৃতকারীদের অবস্থা সংশোধনের সুযোগ দিয়ে ফিরে যেতে দিলেন, যদিও সাধারণ মানুষ জেদ করছিল যে বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ তাদের হত্যা করা হোক। [৩]

[১] তারিখ আত-তাবারী, ৩/৩৪৮

নোট: ইমাম তাবারী এই স্থানেই উল্লেখ করেছেন যে, একটি অভিযোগ ছিল বনু উমাইয়াকে জমি ও সম্পদ দেওয়ার। সাথে সাথে এই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, শেষ বয়সে হযরত উসমান (রা.) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার (সিলাহ রেহমি) চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পদ ছিল অচেন, আপনি তা বনু উমাইয়ার মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করে দিয়েছিলেন যে নিজের সন্তানদেরও গোত্রের সাধারণ সদস্যদের সমান অংশ দিয়েছিলেন, কোনো বৈষম্য করেননি। এটি কোনো আপত্তিজনক বিষয় নয় বরং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণের একটি চমৎকার উদাহরণ ছিল।

[২] তারিখ আত-তাবারী, ৩/৩৪৫

[৩] তারিখ আত-তাবারী, ৩/৩৪৮

সবায়ী জামাতের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ

হযরত উসমান (রা.) বিশৃঙ্খলাকারীদের আলোচনার সুযোগ দিয়ে সন্ধি ও সমঝোতার সাথে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই নরম ও সম্মানজনক আচরণের পরেও এই লোকেরা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়নি। তারা রটিয়ে দিল যে, হযরত উসমান (রা.) সবার সামনে নিজের ওপর লাগানো অভিযোগগুলো স্বীকার করে নিয়েছেন, যার ফলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত; কিন্তু তিনি তওবাও করছেন না এবং পদ থেকেও ইস্তফা দিচ্ছেন না। এর পাশাপাশি দলের লোকদের মনে এই কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, খলিফা বার্বক্যের কারণে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন। তাঁর থেকে শাসনভার নিয়ে কোনো যোগ্যতম সাহাবীর হাতে তুলে দেওয়া হলে তাতেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। [১]

জাল চিঠি:

এর পরপরই বিদ্রোহীরা মদিনা মুনাওয়ারার বিশিষ্ট সাহাবীগণ: হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের (রা.) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর পক্ষ থেকে জাল চিঠি তৈরি করে রাতারাতি কুফা, বসরা এবং মিসরের মতো বড় শহরগুলোতে ছড়িয়ে দিল। যাতে বিশিষ্ট সাহাবীদের পক্ষ থেকে জনগণকে এই আহ্বান জানানো হয়েছিল যে, যদি তারা জিহাদ করতে চায় তবে তারা যেন প্রতিবাদী আন্দোলনের অংশ হয়ে মদিনা তাইয়েবায় চলে আসে এবং শাসন পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় তাদের সাথে যোগ দেয়। [২]

সবায়ী কাফেলাসমূহের যাত্রা:

এখন বিপ্লবীরা মদিনা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। একটি কাফেলা কুফায়, একটি বসরায় এবং একটি মিসরে গঠন করা হলো। কেন্দ্রীয় নেতাদের মনে কার্যক্রমের পূর্ণ নকশা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তারা তাদের বিশেষ লোকদের সামনেও কেবল এইটুকু প্রকাশ করেছিল: “আমরা হাজীদের বেশে বের হব এবং মদিনায় পৌঁছাব, উসমানকে ঘেরাও করে তাঁকে পদচ্যুত করব, যদি তিনি না মানেন তবে তাঁকে হত্যা করব।” [৩]

কিন্তু তখনো ষড়যন্ত্রের প্রথম দিকের কাজ চলছিল। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ ও সংহত খিলাফতকে নস্যাত করার জন্য ক্ষমতার...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ২৭৫ থেকে ২৭৭

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ২৭৭

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/ ৩৩৬। হযরত উসমান (রা.) বেখবর হয়ে বসে ছিলেন না, বরং তাঁর পাঠানো দুই জন গোয়েন্দা বিদ্রোহীদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের পরিকল্পনার খবর নিয়ে এসেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এই সংবাদ শুনে সেই পথদ্রষ্টদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেছিলেন। (তারিখুত তাবারী: ৩/ ৩৩৬)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা, দ্বিতীয় খণ্ড

একাধিক দাবিদার দাঁড় করানো—এর জন্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বসরার বিদ্রোহীদের মধ্যে হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.), কুফাবাসীদের মধ্যে হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.) এবং মিশরবাসীদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) অধিক জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে বসরার লোকদের এই বোঝানো হয়েছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-কে অপসারিত করে হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.)-কে খলিফা বানানো হবে। কুফার কাফেলাকে এই লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তারা গিয়ে হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁকে খলিফা নির্বাচন করবে। মিশরীয়দের তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ঠিক এভাবেই বলা হয়েছিল যে, হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হবে। [১]

প্রকৃতপক্ষে মদিনা মুনাওয়ারায় সিনিয়র সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে ব্যক্তিগত মতপার্থক্য ছিল, তার খবর বাইরেও পৌঁছে গিয়েছিল। যেভাবে আজ অনেক মানুষ সাহাবায়ে কেরামের এই বিষয়গুলোকে পারস্পরিক শত্রুতা হিসেবে গণ্য করে, সে সময়ও অনেক মানুষ তাই মনে করেছিল। কিছু লোক যখন এই তথ্য পেল, তখন তারা মনে করল যে মদিনার অধিবাসী ও এই বড় বড় ব্যক্তিবর্গ হযরত উসমান (রা.)-এর নেতৃত্ব এবং বনু উমাইয়ার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত। যখন এই খবরগুলো সাবায়ীদের কাছে পৌঁছাল, তখন তারা আশা করতে শুরু করল যে মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বর্তমান খলিফার মসনদ উল্টে দিতে তাদের সাথে যোগ দেবেন। যদিও তাদের এই প্রত্যাশা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে কুফা, বসরা ও মিশর থেকে এই কাফেলাগুলো রওনা হলো। প্রতিটি কাফেলায় প্রায় এক হাজার করে লোক ছিল। [২] এমনটি ছিল না যে হযরত উসমান গনি (রা.)-এর গভর্নরগণ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। কুফায় যখন হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যারা বের হয়েছে তাদের পরিণতি কী হবে? তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই বললেন: “আল্লাহর কসম! এই লোকেরা তাঁকে হত্যা করে ছাড়বে, তারপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং আল্লাহর কসম! তারা তাঁর হত্যাকারী হবে।” [৩]

সাবায়ী কাফেলাগুলোর মদিনায় আগমন: প্রথম দফার চেষ্টা ব্যর্থ:

মদিনা মুনাওয়ারা ইসলামী শহরগুলোর মাঝখানে অবস্থিত ছিল, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কাফেরদের কোনো সীমান্ত ছিল না, তাই এখানে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না। ফলে মদিনায় সেনাবাহিনী ছিল কেবল নামমাত্র। শাওয়ালের শেষ দিকে হাজীদের বেশে ফিতনাবাজদের তিনটি কাফেলা মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আটচল্লিশ মাইল (সাড়ে ৭৭ কিলোমিটার) দূরে এসে থামল। সাধারণ কর্মীদের এখানে থামিয়ে রেখে বিশেষ কিছু লোক সামনে এগিয়ে গেল।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষকে এই বোঝানো হয়েছিল যে, মদিনায় একটি জালেম সরকার চেপে বসেছে, যার কারণে খোদ সাহাবায়ে কেরামও অতিষ্ঠ। এই ধারণা বজায় রাখার জন্য এটি জরুরি ছিল যে, যতক্ষণ সম্ভব নিজের লোকদের মদিনার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখা এবং পরে প্রয়োজনে হঠাৎ উত্তেজিত করে সামনে নিয়ে আসা।

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৫০

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৩৮, ৩৩৯

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৮৬৬৭, ত: আর-রুশদ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — ২য় খণ্ড

বিশেষ লোকেরা সামনে গিয়ে তাবু ফেলল। তাদের মধ্যে মিসরীয়রা ওয়াদি ঘিল মারওয়া, বসরার লোকেরা ওয়াদি ঘি খাশাব এবং কুফার লোকেরা ওয়াদি আউস-এ অবস্থান করল। এরপর কাফেলার নেতারা বিশেষ সঙ্গীদের নিয়ে মদিনায় প্রবেশ করল। যখন তারা উম্মাহাতুল মুমিনীন, হযরত আলী এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করল, তখন প্রত্যেকেই তাদের আন্দোলনের প্রতি অসন্তুষ্ট পেল। ফিতনাকারীরা পরিস্থিতির নাজুকতা দেখে হযরত উসমান (রা.)-এর পদচ্যুতির দাবি করার পরিবর্তে শুধু এতটুকু বলল: “আমরা কিছু গভর্নরকে পদচ্যুত করার দাবি নিয়ে এসেছি।” কিন্তু জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাদের পাত্তা দিলেন না। [১]

মদিনার বাইরে সাহাবায়ে কেরামের পাহারা:

হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরি করার জন্য তাদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ব্যক্তিবর্গ মদিনার বাইরে আলাদা আলাদা দলের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন; কারণ তারা হযরত উসমান (রা.)-এর নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা.)-কে, হযরত যুবায়ের (রা.) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে এবং একইভাবে হযরত তালহা (রা.) তাঁর দুই পুত্রকে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যেন তাঁরা হযরত উসমান (রা.)-এর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সতর্ক থাকেন। [২]

হযরত উসমান (রা.) নিজেও মদিনার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে গাফেল ছিলেন না, আপনি হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীরা একটি দল ঘি খাশাব-এর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। [৩] এই কারণে বিদ্রোহীরা সেই সময় শক্তি প্রয়োগ করে শহরে প্রবেশ করার সাহস করতে পারেনি।

বিদ্রোহীদের সাথে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের আলাদা আলাদা সাক্ষাৎ:

মিসরীয় বিদ্রোহীদের প্রধানরা এখন হযরত আলী (রা.)-এর খিদমতে হাজির হলো যিনি মদিনার বাইরে সামরিক দলসহ উপস্থিত ছিলেন। বিদ্রোহীরা প্রস্তাব দিল যে তারা তাঁকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত। হযরত আলী (রা.) তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন: “নেককার লোকেরা জানে যে ঘি মারওয়া এবং ঘি খাশাব-এ অবস্থানকারী কাফেলাগুলোর ওপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জবান থেকে লানত করা হয়েছে।” [৪]

বসরার নেতারা হযরত তালহা (রা.)-এর কাছে একই প্রস্তাব নিয়ে পৌঁছাল, কিন্তু তারা ঠিক একই উত্তর পেল। কুফার বিদ্রোহী সরদাররা হযরত যুবায়ের (রা.)-এর পক্ষ থেকে হুবহু একই উত্তর পেল। [৫]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৫০

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৫০

[৩] তারিখ দিমাশক লি ইবনে আসাকির: ৩৯/৩২২, তরজমা উসমান (রা.), ত. দারুল ফিকর

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৫০

মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর জ্ঞান, সহজাত সতর্কতা ও সাবধানতা এবং নিজেদের ঈমানি দূরদর্শিতার কারণে প্রবীণ সাহাবীগণ ষড়যন্ত্রের জালে পা দেননি এবং উম্মতকে তিন টুকরো করার সাবায়ী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

প্রবীণ সাহাবীগণের ধমক ও শাসনের পর এই লোকেরা নরম হয়ে গেল। হযরত উসমান হযরত আলী-কে তাদের পূর্ণ আশ্বস্ত করার জন্য পাঠালেন। হযরত আলী তাদের আশ্বস্ত করে বললেন:

“তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অধিকার দেওয়া হবে।”

কাফেলার সাধারণ মানুষগুলো ছিল সহজ-সরল যাদেরকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল: “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং আমীরুল মুমিনীনের প্রতিনিধি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কথা বলছেন, এটি গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।” [১]

বিষয়টি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করার জন্য হযরত উসমান নিজে মদীনার বাইরের একটি জনপদে এসে এই লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। [২] কুরআন মাজীদ খোলা হলো... বিদ্রোহী নেতারা বিভিন্ন আয়াত পাঠ করে তৃতীয় খলীফার কিছু পদক্ষেপের ওপর আপত্তি করতে থাকল এবং হযরত উসমান প্রতিটি কথার সন্তোষজনক উত্তর দিতে থাকলেন। [৩]

বিদ্রোহীরাও হযরত উসমান-এর পদচ্যুতির দাবি থেকে সরে এসে কেবল গভর্নরদের পরিবর্তনের বিষয়ে সম্মত হয়েছিল, ফলে হযরত উসমান তাদের প্রস্তাব দিলেন:

“আপনারা যে আমিলকে পছন্দ করবেন আমি তাকেই নিয়োগ দেব, আর যাকে অপছন্দ করবেন তাকে সরিয়ে দেব।” [৪]

বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে তারা বিশৃঙ্খলা ছড়াবে না এবং যতক্ষণ সরকার নিজের অঙ্গীকারে অটল থাকবে তারাও উম্মতের মূলধারায় शामिल থাকবে। এই লোকেরা সানন্দে এই কথাগুলো মেনে নিল। [৫]

মিশরবাসীদের তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন আবু বকর-এর গভর্নর হওয়ার নিয়োগপত্রও লিখে দেওয়া হয়েছিল। [৬]

এই চুক্তি ১লা ফিলকদ ৩৫ হিজরীতে হয়েছিল। [৭]

কাফেলাসমূহের প্রত্যাবর্তন:

চুক্তির খবর পেয়ে ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য শহরগুলোতে স্বস্তির ঢেউ বয়ে গেল এবং উদ্বেগের শিকার মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। [৮] বিদ্রোহের আগুন আপাতদৃষ্টিতে নিভে গেল এবং বিদ্রোহী আন্দোলনের কর্মীরা নিজ নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হতে লাগল। তবে মালিক বিন আশতার নাখয়ী এবং হাকীম বিন জাবালা কোনো অজ্ঞাত কারণে মদীনা মুনাওয়ারাহতেই রয়ে গেল। [৯]

[১] তারিখ দামেশক: ৩৯/৩২৮, অনুবাদ: উসমান।

[২] তিনি তাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং মদীনার বাইরের একটি গ্রামে অবস্থান করলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৬৯০, ত: আর-রুশদ)

[৩] তারিখ খলীফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৬৯

[৪] তিনি বললেন: প্রত্যেক শহরের অধিবাসীরা যেন দাঁড়ায় এবং তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে চায়, আমি তাকেই তাদের ওপর নিয়োগ দেব এবং যাকে তারা অপছন্দ করে তাকে সরিয়ে দেব। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৬৯১)

[৫] তারিখ খলীফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১২৮

[৬] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ১০/২৮১

[৭] তারিখ খলীফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৬৮ রেওয়ায়েত মাদায়িনী

[৮] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৫৭, কিতাবুল জামাল

[৯] তারিখ আত-তবারী: ৩/৪৭৫ আন মুহাম্মদ বিন আমর

ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় দিক: জাল চিঠি এবং বিদ্রোহীদের পুনরায় আক্রমণ:

যদি এই অস্থিরতা স্বাভাবিক হতো, তবে এই ঐক্যমত্য চুক্তির পর তা শেষ হয়ে যেত, কিন্তু বিশৃঙ্খলার আসল লাগাম ছিল সেই ধূর্তদের হাতে যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা কোনো না কোনো অজুহাতে ফিতনার আগুন নিভতে দেবে না। [১]

মিশরে ফিরে যাওয়া কাফেলাটি পথেই ছিল যখন কিছু দূরে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল, সে তাদের দেখে দৌড়ে পালাল, আবার কাছে এল এবং পুনরায় পালিয়ে গেল। কাফেলার লোকদের সন্দেহ হলো, তারা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলল এবং জিজ্ঞেস করল: “তুমি কে?” সে বলল: “আমি আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নরের দূত।” তল্লাশি নেওয়া হলে হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে লেখা একটি লিপি পাওয়া গেল যাতে মিশরের গভর্নরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন এই কাফেলা সেখানে পৌঁছাবে তখন তাদের ছেড়ে না দিয়ে হত্যা করা হয়। [২]

কাফেলার লোকেরা এই লেখা দেখে রাগে অস্থির হয়ে পড়ল। তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে তারা এত দ্রুত মদিনায় ফিরে এল যে স্থানীয় লোকেরা অবাক ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। এবার কাফেলার কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা হয়নি। সকল বিদ্রোহী শহরে ঢুকে পড়ল। [৩]

বসরা ও কুফায় চলে যাওয়া লোকেরাও ফিরে এল এবং এই বিদ্রোহী কার্যকলাপে শরিক হলো। শহরের রাস্তা ও মোড়গুলোতে দখল নিয়ে তারা শহরবাসীকে অসহায় করে দিল। এরপর কিছু বিদ্রোহী হযরত আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলল: “আপনি উসমানের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে যান।”

হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত বিরক্তির সাথে বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে দেব না।”

তারা বলল: “তাহলে আপনি আমাদের সেই চিঠিগুলো কেন লিখেছিলেন (যাতে বিপ্লবের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল)?”

হযরত আলী (রা.) বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কোনো চিঠি লিখিনি।” এ কথা শুনে সাধারণ বিদ্রোহীরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলতে লাগল: “আরে! তোমরা এই ব্যক্তির জন্য লড়াই করছ, আর সে এর জন্য রাগ করছে।” [৪]

আসলে সাধারণ বিদ্রোহীরা জানত না যে সাহাবীদের পক্ষ থেকে বিপ্লবের দাওয়াত সম্বলিত চিঠিগুলো ছিল জাল।

কুফাবাসীরা হযরত যুবাইর (রা.)-কে এবং বসরার লোকেরা হযরত তালহা (রা.)-কে একই কথা বলেছিল। সাহাবীরা বিদ্রোহীদের এও বলেছিলেন: “অন্য কাফেলায় থাকা তোমাদের সাথীদের অবস্থা তোমরা কীভাবে জানতে পারলে? তোমরা তো আলাদা আলাদা পথে রওনা হয়েছিলে, তোমাদের মধ্যে অনেক দিনের দূরত্ব ছিল। যাই হোক না কেন, এটি আগে থেকেই নির্ধারিত ষড়যন্ত্র।” [৫]

এখন বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল: “আপনি আমাদের সম্পর্কে এই চিঠিতে কী লিখেছেন?” হযরত উসমান (রা.) সোজাসুজি ও নীতিগত কথা বললেন: “দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করো: হয় দুজন মুসলিম সাক্ষী নিয়ে এসো যারা সাক্ষ্য দেবে যে আমি এই চিঠি লিখেছি বা লিখিয়েছি, অথবা আমার কাছ থেকে আল্লাহর কসম নাও যে আমি এটি লিখিনি এবং লিখিয়েছিও না।”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৫০

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৬৯; আল-তারিখ আল-মদিনা ইবনে শাব্বাহ: ৩/১১৩৯।

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৫১

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৫৫

[৫] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৫১

...হয়, না আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি; কারণ জাল মোহরও লাগানো যেতে পারে।“

বিদ্রোহীরা কোনো শরয়ী সাক্ষ্য পেশ করতে পারেনি, আর না তারা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শপথ নিতে প্রস্তুত ছিল। চরমপন্থী চিন্তাধারার সাথে তাদের একটাই বুলি ছিল, “তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।” [১]

বিদ্রোহীদের এও দাবি ছিল যে, যদি এটি আপনার চিঠি না হয়, তবে এটি মারওয়ানের কাজ। তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করা হোক। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতও এটাই ছিল যে, এই ষড়যন্ত্র মারওয়ান করেছে। কিন্তু হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আশঙ্কা ছিল যে, এই উত্তেজিত লোকেরা মারওয়ানকে হত্যাই না করে ফেলে, তাই তিনি মারওয়ানকে তাদের হাতে সোপর্দ করেননি। [২]

বিখ্যাত আছে যে, চিঠি বহনকারী ব্যক্তি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো গোলাম ছিল যাকে তাঁর কাতিব মারওয়ান পাঠিয়েছিল, কিন্তু সঠিক কথা হলো হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো গোলাম এই ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি। ষড়যন্ত্রকারীরা মিথ্যাভাবে এটি...

[১] তারিখ খলিফা, পৃ. ১৬৯ [২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৭৩

গোপন চিঠির ষড়যন্ত্রের অপরাধী কি মারওয়ান ছিল?

বিখ্যাত আছে যে, গোপন চিঠির ষড়যন্ত্র হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাতিব মারওয়ান করেছিল, কিন্তু প্রশ্ন হলো মারওয়ান কি বুঝতে পারেনি যে এই কাজ ধরা পড়লে তা কতটা ব্যয়বহুল হবে যার ফলে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে এবং সরকার পতন হতে পারে। মারওয়ান এর থেকে কী অর্জন করতে পারত? এভাবে তো তার বর্তমান পদ এমনকি জীবনও ঝুঁকিতে পড়তে পারত।

প্রকৃত কথা হলো হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মারওয়ান উভয়ই এই অভিযোগ থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের নির্দোষ হওয়া এবং চিঠিটি জাল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ হলো এই যে, চিঠির প্রাপক আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই সময় মিশরে ছিলেনই না, বরং মিশরীয় বিদ্রোহীদের রওনা হওয়ার পর তিনিও তাদের পেছনে মিশর থেকে বের হয়ে সিরিয়া ও হিজাজের সীমান্তের কাছে আয়লা-তে পৌঁছেছিলেন যাতে প্রয়োজন পড়লে মদিনায় পৌঁছে যেতে পারেন। প্রয়োজন না হলে মিশরে ফিরে যাবেন। নিচের ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিগুলো তা প্রমাণ করে:

“লাম আম্মা আব্দুল্লাহ বিন সাদ খরাজা ইলা উসমান ফি আসারিল মিসরিয়িন... (তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৭৮, আল-ওয়াকিদী থেকে)”

“আব্দুল্লাহ বিন সাদ মিশরীয়দের পেছনে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে রওনা হলেন এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আসার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং আব্দুল্লাহ বিন সাদ যখন আয়লা পৌঁছালেন তখন জানতে পারলেন যে মিশরীয়রা ফিরে গিয়ে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে।”

“ফা খরাজা আব্দুল্লাহ বিন সাদ মিন মিসর ফা নাজালা আলা লাখম... (তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫৩৬, আবু মিখনাফ থেকে)”

“আব্দুল্লাহ বিন সাদ মিশর থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিনের লাখম এলাকায় অবস্থান করেন এবং অপেক্ষা করছিলেন যে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে কী ঘটে।”

“কানা আব্দুল্লাহ বিন সাদ আল-কুরাশি আমারাহু উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আলা মিসর... (তারিখ আল-মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৪/১১৫৩)”

“আব্দুল্লাহ বিন সাদ কুরাশিকে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মিশরের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। যখন লোকেরা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর আপত্তি তুলল তখন তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে রওনা হলেন। (তার অনুপস্থিতিতে ইবনে আবি হুজাইফা মিশরের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং আব্দুল্লাহ বিন সাদ মিশরের দিকে ফিরে আসার সময় বিদ্রোহীদের পাহারার কারণে সামনে এগোতে পারেননি।) ফলে তিনি আসকালানের দিকে চলে যান এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের সময় আসকালানেই ছিলেন।”

মিশরের গভর্নরের নিজ প্রদেশে না থাকা একটি সরকারি খবর ছিল যা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মারওয়ান (যিনি সরকারি চিঠিপত্র, হিসাব-নিকাশ এবং দাপ্তরিক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন) অবগত ছিলেন। সুতরাং এই প্রশ্নই ওঠে না যে তারা আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহ-এর নামে এই বার্তা পাঠাবেন যে কাফেলা মিশরে পৌঁছালে তুমি তাদের হত্যা করে দিও; কারণ তারা তো জানতেন যে প্রাপক মিশর থেকে বাইরে চলে এসেছেন। এই বার্তা যে-ই তৈরি করুক না কেন, সে এমন কেউ ছিল যে এই সরকারি গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না। প্রবল ধারণা এই যে, হাকিম বিন জাবালাহ যে কাফেলা রওনা হওয়া সত্ত্বেও মদিনায় পেছনে রয়ে গিয়েছিল, সে-ই জাল চিঠির এই খেলা খেলেছিল। আশতার নাখয়ি-এর ওপরও সন্দেহ হতে পারে কিন্তু কম, কারণ তার স্বভাবে ষড়যন্ত্রের চেয়ে বোকামি, উত্তেজনা এবং কঠোর শাস্তির প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাই বেশি ধারণা এই যে, এই কাজ হাকিম বিন জাবালাহ-ই করেছে যাকে কিছু বর্ণনায় ‘লিসসুন মিন লusus আবদিল কয়েস’ অর্থাৎ আবদিল কয়েসের চোর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। (তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৩৫)

প্রচার করে দেওয়া হলো যে, তাদের গোলাম ধরা পড়েছে। [১]

বিদ্রোহীরা মসজিদে নববীতে:

বিদ্রোহীরা কয়েক দিন পর্যন্ত মদিনায় দাপিয়ে বেড়াল। মদিনার লোকজন ফিতনার ভয়ে ঘরে বসে রইল। হযরত উসমান এই সময়ে মসজিদে নববীতে সালাত পড়াতে থাকলেন। জুমার দিন এলে তিনি মিম্বরে খুতবা দিলেন। এই সময়ে বিদ্রোহীরা হাঙ্গামা শুরু করল এবং হযরত উসমান-এর ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করল। তিনি আহত হলেন এবং মূর্ছা গেলেন, সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে তুলে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য এলেন এবং এই পরিস্থিতির ওপর চরম উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। [২]

অবরোধ:

প্রথমে বিদ্রোহীরা তাঁর সালাত পড়ানো এবং খুতবা দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। এরপর জামাতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ বন্ধ করে দিল, এবং তারপর কিছু দিন পর হযরত উসমান-এর বাড়ি অবরোধ করে ফেলল। [৩]

বিদ্রোহীদের দাবি ছিল যে, হযরত উসমান খিলাফত থেকে পদত্যাগ করবেন। হযরত উসমান-এর এই বিষয়ে প্রথম এবং শেষ সিদ্ধান্ত ছিল এই: “আমি সেই জামা খুলব না যা আল্লাহ তাআলা আমাকে পরিয়েছেন।” মূলত রাসূলুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে জোরালো অসিয়ত ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হলে তা থেকে যেন সরে না দাঁড়ান। [৪]

রাসূলুল্লাহ-এর পবিত্র বাণী ছিল: “হে উসমান! যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দিন এই পদ দান করেন, এরপর মুনাফিকরা চায় যে আল্লাহ তোমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা খুলে ফেলো, তবে তুমি তা খুলো না।” নবুওয়াতের জবান থেকে এই বাণী তাকিদ হিসেবে তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। [৫]

[১] যদি সত্যিই এমন হতো তবে তারা সেই গোলামকে মদিনাবাসীদের সামনে পেশ করত। যদি হযরত উসমান তাকে পাঠিয়ে থাকতেন তবে বিদ্রোহীরা তাকে জনসমক্ষে হাজির করে নিজেদের দাবি প্রমাণ করতে পারত। চিঠির আসল বা নকল হওয়ার চেয়েও বড় প্রমাণ হযরত উসমান-এর সাক্ষ্য হতে পারত কিন্তু ঐতিহাসিক রেকর্ড অনুযায়ী সেই ব্যক্তিকে কখনো পেশ করা হয়নি। গভীরভাবে চিন্তা করলে এটি পরিষ্কার দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্রের মূল কুশীলবরা আগে থেকেই জাল মোহর তৈরি করে রেখেছিল। এর মাধ্যমে তারা জাল চিঠি তৈরি করল এবং নিজেরই এক ব্যক্তিকে ভাড়া করে কাফেলার সামনে হাজির হতে বলল। সে যেভাবে মিশরীয় কাফেলার পাশ দিয়ে গেল এবং আবার পালিয়ে গেল, তা থেকেই ষড়যন্ত্র পরিষ্কার বোঝা যায়। অন্যথায় পাশ দিয়ে যাওয়া এবং পালিয়ে গিয়ে অন্যদের সন্দেহে ফেলার কী প্রয়োজন ছিল? একইভাবে কাফেলার জিজ্ঞেস করার পর তৎক্ষণাৎ বলে দেওয়া যে, “আমি মিশরের গভর্নরের কাছে খলিফার দূত হিসেবে যাচ্ছি”, খুবই আশ্চর্যজনক ছিল। যদি সে সত্যিই খলিফার বিশ্বস্ত ও গোপন বার্তা নিয়ে যেত তবে নিজের পরিচয় গোপন রাখত। মনে রাখা দরকার যে, ওয়াকিদির বর্ণনায় এই ব্যক্তিকে হযরত উসমান-এর গোলাম হিসেবে জাহির করা হয়েছে এবং তার নাম আবু আল-আওয়ার বিন সুফিয়ান আসলামি বলা হয়েছে, অথচ এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবু আল-আওয়ার বিন সুফিয়ান আসলামি কোনো গোলাম ছিলেন না, বরং বনু সুলাইমের অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সেই সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন যারা হযরত উমর ফারুক-এর যুগে ফাহল ও দামেস্ক বিজয়ে শরিক ছিলেন এবং পরে হযরত মুয়াবিয়া-এর সেনাপতি ছিলেন। (আল-ইসবাহ: ৩/৫২৯-৫৩০, আল-আহমিয়াহ)

[২] তালবিহ আত-তাবারী: ৩/৩৫৩

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৩৩৮

[৪] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৭০৫, অধ্যায়: হযরত উসমান-এর মর্যাদা, আল-আলবানী বলেছেন: সহীহ।

[৫] হে উসমান, যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দিন এই বিষয়ের (খিলাফতের) দায়িত্ব দেন, আর মুনাফিকরা চায় যে তুমি সেই জামা খুলে ফেলো যা আল্লাহ তোমাকে পরিয়েছেন, তবে তুমি তা খুলো না। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। (সুনান ইবনে মাজাহ, হা: ১১২, আল-আলবানী বলেছেন: সহীহ)। এই সহীহ হাদিসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, হযরত উসমান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হোতারা সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন না, বরং এর প্রবর্তক ছিল মুনাফিক শ্রেণির লোক। কারণ রাসূলুল্লাহ-এর জবানে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাদের “আল-মুনাফিকুন” (মুনাফিকরা) বলা হয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই কারণেই যখন আশতার নাখয়ী হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে খিলাফত থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন দামাদে মুস্তফা (সা.) বললেন: “আল্লাহ আমাকে যে জামা পরিয়েছেন, আমি তা খুলব না। যদি আমার ঘাড়ও কেটে ফেলা হয় তবে তা আমার কাছে পছন্দনীয়, কিন্তু আমি এটা মেনে নিতে পারি না যে উম্মতের এমন অবস্থা করে যাব যে তারা একে অপরের ওপর আক্রমণকারী হবে।”

আশতার দাবি না মানলে প্রকাশ্যে যুদ্ধের হুমকি দেন। আপনি বললেন: “যদি তোমরা এমনটি করো, তবে ভবিষ্যতে কখনো একে অপরের সাথে ভালোবাসা রাখতে পারবে না, কখনো সবাই একসাথে সালাত আদায় করতে পারবে না, কখনো একত্রে জিহাদ করতে পারবে না।” [১]

বিদ্রোহীদের দাবি কেন মানা হয়নি?

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে এই ফিতনার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কেও অবহিত করেছিলেন যার শেষ পরিণতি ছিল আপনার শাহাদাত। আর এই কথা যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন খিলাফত না ছাড়ার ব্যাপারে এত কঠোর তাকিদ দিয়েছিলেন—তার কারণ ছিল এই যে, যে দলটি আপনার অপসারণের দাবি করছিল, তারা কোনোভাবেই উম্মতের জনমতের প্রতিনিধি ছিল না। তারা কেবল উম্মতের মধ্যে লড়াই বাধাতে চেয়েছিল। যদি হযরত উসমান (রা.) এমন একটি দলের দাবিতে খিলাফত ছেড়ে দিতেন যারা উম্মতের সঠিক প্রতিনিধি ছিল না, তবে কিয়ামত পর্যন্ত এটি একটি রীতিতে পরিণত হতো যে, যখনই কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসক বা দ্বীনদার আর্মীর নিচু স্তরের লোকদের বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হতেন, তাকে পদত্যাগ করতে হতো। এই কারণেই হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-ও বিদ্রোহীদের দাবি না মানার মতের ওপর অটল থাকার পরামর্শ দেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে আরজ করেন: “যদি আপনি খিলাফত ছেড়ে দেন, তবে আপনি কি দুনিয়াতে চিরকাল থাকবেন? আর যদি আপনি খিলাফত না ছাড়েন, তবে কি এই লোকেরা আপনাকে হত্যা করা ছাড়া আর বেশি কিছু করতে পারবে? আমি এমন কোনো অবকাশ দেখি না যে আপনি সেই জামাটি খুলে ফেলবেন যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে পরিয়েছেন। যদি আপনি এমনটি করেন তবে একটি রীতি চালু হয়ে যাবে যে, যখনই কোনো দল তাদের খলিফা বা আর্মীরকে পছন্দ করবে না, তারা তাকে অপসারিত করে দেবে।” [২]

হযরত উসমান (রা.) কেন তলোয়ার না তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

হযরত উসমান (রা.)-এর জন্য আরও কঠিন পরীক্ষা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার তোলার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন লোকেরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পদক্ষেপের অনুমতি চাইল, তখন আপনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। সুতরাং আমি নিজের জীবনকে সেটির ওপর অটল রেখে ধৈর্য ধারণ করব।” [৩]

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) যুদ্ধের জন্য পীড়াপীড়ি করলে তৃতীয় খলিফা বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে এমন প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না যে উম্মতের রক্ত ঝরাবে।” [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৭১, ৩৭২, ইয়াকুব বিন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত।

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/৬৬, ত' সাদির, সহীহ সনদে; তারিখুল মদীনা লি ইবনে শাব্বাহ, ৩/১২২৬; তারিখে খলীফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭০।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৪২৫৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: ১১৩, সহীহ সনদে।

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩৮১।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, কাব বিন মালিক এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, অনুমতি দিলে শত্রুদের তাড়িয়ে দেবেন। তিনি (হযরত উসমান রা.) বললেন: “আমার এর মোটেও প্রয়োজন নেই।” [১]

নিষেধ করার দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, হযরত উসমান (রা.) তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর শহরকে রক্তপাতের স্থানে পরিণত করতে চাননি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ ছিল: “মদিনা একটি সম্মানিত ভূমি; এর গাছ কাটা যাবে না এবং এতে কোনো ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা যাবে না। যে ব্যক্তি এতে ফিতনা সৃষ্টি করবে, তার ওপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতা এবং সকল মানুষের লানত।” [২]

অন্যান্য শহরের মুসলমানদের অস্থিরতা এবং সাবায়ীদের ভুল সংবাদ পরিবেশন:

খলিফার অবরোধের খবর যখন বিভিন্ন শহরে পৌঁছাল, তখন মুসলমানরা মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। কিছু লোক এই অভিযানের জন্য বেরিয়েও পড়েছিল। [৩] এরই মধ্যে খবর এল যে, বিষয়টি সমঝোতা ও মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান হয়ে গেছে। বিশৃঙ্খলাকারীরা কুফা, বসরা এবং সিরিয়ায় ভুল সংবাদ পৌঁছাতে সফল হয়েছিল। তারা মদিনার সঠিক পরিস্থিতি ওইসব শহরের অনুগত মুসলমানদের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি। ফলে শান্তি ফিরে আসার খবর পেয়ে মানুষ সফরের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। [৪]

খাদ্য ও পানি বন্ধ করা, হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রচেষ্টা:

গরম তীব্র হলে বিদ্রোহীরা অবরোধের কঠোরতাও বাড়িয়ে দিল এবং হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরে খাদ্যদ্রব্য ও পানি নেওয়ার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করল। প্রথমে হযরত আলী (রা.) কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিতেন, কিন্তু পরে বিদ্রোহীরা সেগুলোও বন্ধ করে দিল। ফলে হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরে পানাহারের মজুদ শেষ হতে লাগল। হযরত আলী (রা.) যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি বিদ্রোহীদের বললেন: “তোমাদের এই আচরণ মুসলমানদের মতোও নয়, কাফেরদের মতোও নয়। রোমান ও ইরানি বন্দীদেরও পানাহার করানো হয়। এই ব্যক্তি তোমাদের কী ক্ষতি করেছেন যে তোমরা তাঁকে অবরোধ করে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ?”

কিন্তু এই আহ্বান অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হলো। হযরত আলী (রা.) হতাশ হয়ে ফিরে আসার সময় নিজের পাগড়ি খুলে হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরে ছুঁড়ে দিলেন, যাতে তাঁরা জানতে পারেন যে আলী (রা.) এসেছিলেন কিন্তু কিছু করতে পারেননি। [৫]

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পক্ষ থেকে হযরত উসমান (রা.)-কে সাহায্যের প্রচেষ্টা:

একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) একটি খচ্চরের ওপর পানাহারের সামগ্রী নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরের দিকে আসলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মিণীর মর্যাদার প্রতিও ভ্রক্ষেপ করল না; তারা তাঁর সাথে অভদ্রতা করল, সামগ্রী ছিনিয়ে নিল এবং খচ্চরটিকে এমনভাবে আঘাত করে তাড়িয়ে দিল যে উম্মুল মুমিনীন পড়ে গিয়ে আহত হলেন। [৬]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৭০, ত. সাদর; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ: ৩৭০৮২; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৩।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ১৮৬৭, কিতাবুল হজ, বাব হারামুল মদিনা।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৫১, ৩৫২; আত-তারিখুল আওসাত: ১/২২, ত. দারুন্ রাযী, ফিহি “ফাজাআ বি-নাসরি উসমান”।

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৫৭, ত. আল-ওয়াফা।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৬।

[৬] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৬।

হযরত উসমান (রা.) অবরোধের বাকি দিনগুলো অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করেন। আপনার প্রতিবেশী হযরত উমর বিন হাযম (রা.) অত্যন্ত গোপনে নিজের ঘর থেকে আপনার কাছে সামান্য কিছু পানাহার পাঠিয়ে দিতেন, যার মাধ্যমে কোনোমতে দিন কাটছিল। [১] একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)-ও হযরত উসমান (রা.)-এর সাহায্যের জন্য বের হয়েছিলেন, কিন্তু পথেই আশতার নাখয়ি তাঁর সওয়ারিকে আঘাত করে ফিরিয়ে দেয়। [২]

একদিন আশতার নাখয়ি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর কাছে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ব্যাপারে মতামত জানতে চাইল। তিনি কঠোর স্বরে বললেন: “মাআযাল্লাহ! আমি মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করার এবং তাদের খলিফাকে হত্যা করার এবং হারামকে হালাল করার অনুমতি কীভাবে দিতে পারি।” [৩]

তৃতীয় খলিফার নিজের জীবনের চেয়ে হজের ব্যবস্থাপনার চিন্তা:

হজের দিনগুলো এসে গিয়েছিল। হযরত উসমান গনি (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি হাজীদের কাফেলার নেতৃত্ব দিয়ে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি আরজ করলেন: “আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম, এই দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমার কাছে হজের চেয়েও উত্তম।” কিন্তু তৃতীয় খলিফা কসম দিয়ে তাঁকে এই নির্দেশ পালনের কথা বললেন যাতে হজের মহান ইসলামী রুকন যথারীতি পূর্ণ গুরুত্বের সাথে আদায় হয়। [৪]

মদিনার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির শহর ত্যাগ:

হজের জন্য কাফেলা প্রস্তুত হলে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-ও কাফেলার সাথে হজে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কারণ বিদ্রোহীদের আধিপত্যের পর আপনার মনে তীব্র আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই দুষ্কৃতিকারীরা হযরত উসমান (রা.)-এর পর উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরও লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা এবং সাফিয়া (রা.)-এর প্রকাশ্যে অবমাননার পর এই আশঙ্কা মোটেও ভিত্তিহীন ছিল না। [৫] হযরত তালহা (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে নিজেদের ঘরে আবদ্ধ হয়ে যান। [৬]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতো রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞও এই সংকটের চাপ সহ্য করতে পারেননি এবং তীব্র অনুশোচনার সাথে শহর থেকে রওনা হতে লাগলেন। রওনা হওয়ার পূর্বে তিনি শহরবাসীদের সম্বোধন করে বললেন:

“হে মদিনাবাসী! যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছে এবং তার সামনে উসমান (রা.) নিহত হন, তবে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে নিমজ্জিত করবেন। অতএব, যে ব্যক্তি উসমানকে সাহায্য করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন এখানে না থাকে।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৭

[২] মুসনাদ ইবনুল জাদ: ১/৩৯০ সহীহ সনদে

[৩] তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৩/১২৪৫, ১২২৪; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৬ সহীহ সনদে। সম্ভবত উম্মুল মুমিনীনের এই কঠোর সুরের প্রভাব ছিল যে, আশতারসহ অনেক বিদ্রোহী হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৭/৪৭৭ সহীহ সনদে, ত ত আল-রুশদ)

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৭

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৬

[৬] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৬, ৩৮৭

এই কথা বলে তিনি তাঁর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে মদিনা ছেড়ে ফিলিস্তিনে চলে গেলেন। হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরও অনেক লোক একইভাবে শহর ছেড়ে চলে গেলেন। [১]

হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মদিনার বাইরে চলে গেলেন; বিদ্রোহীরা তাঁকে তাদের আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রচার করছিল। সম্ভবত হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে সেই দুর্ভাগাদের থেকে দূরে গিয়ে তাদের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। [২]

হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বার্তা:

মদিনার উপকণ্ঠে বনু আমর বিন আউফ একটি বড় গোত্র ছিল যারা হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতিরক্ষায় নিজেদের সেবা পেশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ফলে হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বার্তা পাঠালেন:

“আমি আপনার অনুগত, আপনি চাইলে আপনার বাড়িতে আপনার সাথে থাকতে পারি এবং ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গ দিতে পারি। আপনি বললে আমি এখন যেখানে আছি সেখানেই অবস্থান করব। বনু আমর বিন আউফ-এর লোকেরা পরামর্শ করেছে যে তারা এখানে আমার কাছে সমবেত হবে। আমি যা বলব তারা তা-ই করবে।”

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের উত্তর দিলেন যে তাঁরা যেন সেখানেই অবস্থান করেন এবং বনু আমর বিন আউফ-এর প্রতিশ্রুতি পূরণের অপেক্ষা করেন, সম্ভবত আল্লাহ তাদের মাধ্যমে এই বিবাদের অবসান ঘটাবেন। [৩]

সংশোধনমূলক ভাষণ:

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সময়ে পূর্ণ সহমর্মিতার সাথে চেষ্টা করেছিলেন যেন দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে যারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে এই বিদ্রোহে শরিক হয়েছে তারা তওবা করে ফিরে আসে। তিনি বাড়ির ওপরতলায় দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, যাতে বললেন: “আমি তোমাদের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জানো না যে আমিই রুমাহ কুপ ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করেছিলাম?”

সবাই বলল: “জি হ্যাঁ।”

তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “তা সত্ত্বেও তোমরা কেন আমার জন্য এর পানি বন্ধ করে রেখেছ?”

তারপর বললেন: “তোমাদের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জানো না যে আমিই চারপাশের জমি ক্রয় করে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেছিলাম? ... বলো, আমি ছাড়া আর কাউকে চেনো কি, যাকে এর আগে মসজিদে নামাজ পড়তে বাধা দেওয়া হয়েছে?”

এই কথাগুলো এমন কম্পন সৃষ্টিকারী ছিল যে খোদ বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে কিছু লোক বলতে লাগল:

“আমাদের আমিরুল মুমিনীন-এর ওপর চড়াও হওয়া উচিত নয়, তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিত।” [৪]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫৫৮, আন সাইফ

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৯২

[৩] তারিখ দামেশক: ৩৯/৩৭৩, তরজমা: উসমান, আন মুসআব বিন আবদুল্লাহ বি-সানাদ হাসান

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

তৃতীয় খলিফা সত্য ও মিথ্যাকে দুই আর দুই চারের মতো স্পষ্ট করার জন্য আরও বললেন:

“আমি তোমাদের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি জানো না যে একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন... হঠাৎ পাহাড় কাঁপতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ

পদাঘাত করে বললেন: স্থির হও... তোমার উপরে নবী, সিদ্দিক এবং শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই। সেদিন আমি তাঁর সাথেই ছিলাম।” এই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাসূলের জামাতা বিদ্রোহীদের কাছে স্পষ্ট করে দিলেন যে, যদি তিনি নিহত হন তবে তিনি শহীদ হবেন, যার অর্থ হলো হত্যাকারীরা হবে বাতিলপন্থী ও জালিম।

এরপর তিনি ﷺ বললেন: “আমি তোমাদের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি জানো না যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়আতে রিদওয়ানের দিন, যখন তিনি আমাকে মক্কার মুশরিকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন নিজের হাত সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটি উসমানের হাত।”

এরপর বললেন: “আমি তোমাদের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাবুক যুদ্ধের অভাব-অনটনের সময় বলেননি: কে আছে যে আল্লাহর পথে কবুলযোগ্য দান করবে... তখন আমি অর্ধেক লশকর বা বাহিনীর রসদ সরবরাহ করেছিলাম...”

তিনি ﷺ প্রতিটি কথা শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন। বিদ্রোহী এবং মদিনাবাসীদের মধ্য থেকে অনেক ব্যক্তি তাঁর প্রতিটি কথার সত্যতা নিশ্চিত করতে থাকলেন। [১]

সেই দিনগুলোতে তিনি এক পর্যায়ে এটিও বলেছিলেন:

“তোমরা আমাকে কোন অপরাধে হত্যা করবে? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি যে, একজন মুসলমানকে হত্যা করা কেবল তিনটি ক্ষেত্রেই বৈধ: যখন সে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, অথবা সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, অথবা সে মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহর কসম! আমি জাহেলিয়াতের যুগেও কখনো ব্যভিচার করিনি এবং ইসলামেও নয়। আমি কাউকে হত্যাও করিনি যে আমার থেকে কিসাস নেওয়া হবে। যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি, কখনো দ্বীন থেকে বিমুখ হইনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাহলে এই লোকেরা কেন আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে।” [২]

[১] মুসনাদে আহমদ, হা: ৪৪০

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/২৯২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের তৃতীয় দিক: শাহাদাতের বিয়োগান্তক ঘটনা

হজ্জের দিনগুলোর পর মদিনায় খবর আসতে শুরু করল যে হাজীরা ফিরে আসছেন। [১]

এই খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল যে কুফা, বসরা এবং সিরিয়া থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনী আসছে। [২]

বিদ্রোহীরা খলিফার কাছ থেকে পদত্যাগ আদায় করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। তাই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার তৃতীয় দিকটি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। স্থির হলো যে, বাড়িতে হঠাৎ হামলা চালিয়ে হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করে দেওয়া হবে। [৩]

আশতার নাখয়ীর মতো প্রথম সারির বিদ্রোহীও ষড়যন্ত্রের এই ভয়াবহ অংশের সাথে একমত ছিল না। সে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-কে পাঠিয়ে হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর ঘর থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্য বিদ্রোহী নেতারা আশতারকে ধমক দিল এবং এই কৌশল সফল হতে দিল না। [৪]

হযরত উসমান (রা.) শেষ দিনগুলোতে একদিন ওপরের তলা থেকে উঁকি দিয়ে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো ভাষণ দেন, যাতে তিনি বলেন: “আল্লাহর কসম! তোমরা যদি আমাকে হত্যা করো, তবে আর কখনো একত্রে সালাত আদায় করতে পারবে না, কখনো মিলেমিশে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবে না, তোমরা মতভেদের চরম শিখরে পৌঁছে একে অপরের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে।” এই বলে তিনি এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের ভেতর ঢুকিয়ে দেখালেন। [৫]

শেষ খুতবায় তিনি লোকদের বললেন:

“হে মদিনাবাসী! তোমাদেরকে আল্লাহর সোপর্দ করছি এবং দুআ করছি যে, আল্লাহ যেন আমার পর তোমাদেরকে উত্তম শাসন দান করেন।” [৬]

হযরত আলী (রা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত এবং শেষ বার্তা:

এই শেষ দিনগুলোতে হযরত উসমান (রা.) বলতেন:

“হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত লাভ করা আমার কাছে অন্য কারো খলিফা হওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।” [৭]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৮

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৫, সাইফ থেকে বর্ণিত

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৮, সাইফ থেকে বর্ণিত

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩২৭০৯, ত আল-রুশদ; আল-হাফিয ফাতহুল বারীতে এর সনদকে সহীহ বলেছেন: ১৩/৫৭, ৫৮, ত আল-মা'রিফাহ

[৫] তারিখ দিমাশক: ৩৯/৩৫১, ৩৫২, জীবনী: উসমান বিন আফফান

[৬] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৫

[৭] ولان يليها ابن ابى طالب احب الى من ان يلى غيره (তারিখ আল-মদিনাহ লি-ইবনে শাব্বাহ: ৩/১২০৬)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

একদিন হযরত উসমান [রা.] উসামা বিন যায়েদ [রা.]-এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের নিকট একটি বার্তা পাঠালেন:

“আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আমানতদার ও উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজের হাত গুটিয়ে রাখে, কিন্তু আমার ঘরে সমবেত কিছু লোক নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চায়। আমি তাদের রক্ত ঝরানো পছন্দ করি না। আপনারা হযরত আলী [রা.]-এর নিকট যান এবং তাঁকে বলুন যে, মানুষের বিষয়টি এখন আপনার ওপর ন্যস্ত। আল্লাহ তাআলা আপনার অন্তরে যা ঢেলে দেন আপনি তাই করুন। এরপর যুবাইর [রা.] ও তালহা [রা.]-এর নিকট যান এবং তাঁদেরকেও এই কথা জানিয়ে দিন।”

উসামা বিন যায়েদ [রা.] ও অন্যান্য সাহাবীগণ হযরত উসমান [রা.]-এর এই অভিমত পছন্দ করলেন এবং হযরত আলী [রা.]-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, কিন্তু তাঁর ঘরের বাইরে ভিড় ছিল এবং হযরত আলী [রা.] দরজা বন্ধ করে বসে ছিলেন; তাই সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। এরপর এই ব্যক্তিবর্গ হযরত যুবাইর [রা.]-এর নিকট গেলেন। তিনি এই অভিমত শুনে বললেন:

“আমীরুল মুমিনীন ইনসাফের কথা বলেছেন।”

এখন এই ব্যক্তিবর্গ হযরত তালহা [রা.]-এর নিকট গেলেন। তিনি হযরত উসমান [রা.]-এর এই বার্তা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। [১]

আখেরি দিন: শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমাপ্তি:

১৮ই ফিলহজ হযরত উসমান [রা.] রোজা রেখেছিলেন, সেদিন তিনি বিশজন গোলাম আজাদ করেন। অভ্যাসের বিপরীতে পায়জামা আনিয়ে পরিধান করলেন যাতে হামলার শিকার হওয়ার সময় সতর উন্মুক্ত না হয়ে যায়, এরপর তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন।

[২] গত রাতে তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর ঘিয়ারত লাভ করেছিলেন। তিনি [সা.] বলছিলেন: “উসমান! ইফতার আমাদের সাথে করো।” [৩]

সেই সময় ঘরের দরজায় সাহাবী ও তাবিঈদের একটি জামাত রাসূলের জামাতার হিফাযতের জন্য জীবন বাজি রেখে প্রস্তুত ছিল, যাদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা, হযরত হাসান ও হযরত হসাইন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হযরত সাঈদ বিন আস [রা.] এবং মুহাম্মদ বিন তালহা ও মারওয়ান বিন হাকামের মতো সাহসী ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর [রা.] দ্বিগুণ বর্ম পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্রোহীরা হযরত উসমান [রা.]-কে শহীদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা ঘরের দরজায় হামলা চালালে এই ব্যক্তিবর্গ জোরালো প্রতিরোধ করেন, এভাবে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায়। [৪]

[১] তারিখুল মদিনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ৩/১২০৪, ১২০৫; পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে ধারণা করা হয় যে, এটি হযরত উসমান [রা.]-এর শাহাদাতের একদিন আগে অর্থাৎ ১৭ই ফিলহজের ঘটনা। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ যে, “তারিখুল মদিনা”-র এই উভয় বর্ণনা বিশেষভাবে মনে রাখবেন; কারণ এর মাধ্যমে আকাবির সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। এটি সাবায়ীদের ভিত্তিহীন অভিযোগ যা খণ্ডন হয়ে যায় যে, হযরত আলী [রা.] হযরত উসমান [রা.]-এর হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছিলেন অথবা এই সময়ে নির্দয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। যদি সত্যিই এমন হতো তবে হযরত উসমান [রা.] হযরত আলী [রা.]-এর ওপর এত ভরসা কেন করতেন যে খিলাফতের জন্য তাঁর ওপরই দৃষ্টি পড়ত। একইভাবে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে রাফেযীদের এই দাবিও ভুল প্রমাণিত হয় যে, আকাবির সাহাবীগণ একে অপরের শত্রু ছিলেন এবং তাঁদের ক্ষমতার লালসার কারণে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছিল। (নাউয়ুবিল্লাহ)

[২] রাওয়াহ আহমাদ, ফাযাইলুস সাহাবাহ, হা: ৮০৯, ত. আর-রিসালাহ

[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ লিল-হাইসামি, হা: ১২০০৬, ত. আল-কুদসি; আত-তাবাকাত ইবনে সাদ, ৩/৭৩ ত. দার সাদির, এই বর্ণনাটি আল-হিলইয়ার পাণ্ডুলিপিতে মুদ্রণ থেকে বাদ পড়ে গেছে।

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৩, ১৭৪

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমাহ - দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত তালহা (রা.)-ও সেই সময় বর্ম পরিহিত অবস্থায় আমিরুল মুমিনিনের প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে পৌঁছে যান এবং তীর ছুড়তে শুরু করেন। [১]

কিন্তু এরই মধ্যে হযরত উসমান (রা.) তাঁর সমর্থকদের কসম দিয়ে দরজা খুলে দিতে বলেন যাতে সবাই ভেতরে আসতে পারে। ফলে এই ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন এবং বাড়ির ফটক বন্ধ করে দেন। [২] হযরত উসমান (রা.) তখন তাঁর রক্ষীদের চূড়ান্তভাবে বলে দিলেন যে তারা যেন পাহারাদারি শেষ করে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যায়। তিনি (রা.) এটি স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন যে, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব আল্লাহ ও রাসুলের আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছেন; এটি কোনো রাজতন্ত্র নয় যার জন্য বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য সম্পদ ও পুঁজি লুকিয়ে রাখা হয় এবং নিজের স্বার্থে সাধারণ মানুষের রক্ত নির্ধিধায় ঝরানো হয়। তিনি তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে বলেন:

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার নির্দেশ পালন করা জরুরি মনে করো, সে যেন তার হাত গুটিয়ে নেয় এবং অস্ত্র রেখে দেয়।” [৩]

হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) সবার শেষে দার-এ-উসমান (উসমানের বাড়ি) থেকে বের হন।

নির্দেশ পালনার্থে সবাই চলে গেলেন কিন্তু হযরত হাসান (রা.) উঠলেন না। তিনি (রা.) কুরআন আনিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এরই মধ্যে হযরত উসমান (রা.) বললেন: “আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি যে তুমি চলে যাও।” এরপর তিনি দুই ব্যক্তিকে ডেকে বায়তুল মালের হেফাজতের দায়িত্ব তাদের ওপর সোপর্দ করলেন। [৪] যেন এই শেষ সময়েও তাঁর উম্মতের হকের চিন্তা ছিল।

তিনি একে একে সবাইকে পাহারা থেকে সরিয়ে দিলেন। হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) সবার শেষে বের হলেন। [৫] সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ শেষ মুহূর্তে বাড়ির হেফাজত কেবল এজন্যই ত্যাগ করেছিলেন যে তারা তাঁর নির্দেশের অনুগত ছিলেন, অন্যথায় তারা জানপ্রাণ দিয়ে মরতে প্রস্তুত ছিলেন। [৬]

তিনি (রা.) বাড়ির পুরুষদের অংশে একাকী তিলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। অন্দরমহলে পরিবার-পরিজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। [৭] প্রাসাদের দরজা খোলা ছিল, যে কেউ ভেতরে আসতে পারত। [৮]

মুহাম্মদ বিন আবি বকর এবং কিছু দাস্গাকারীর অনুশোচনা:

বিদ্রোহীরা যখন পথ পরিষ্কার দেখল, তখন কুতায়রা নামক এক ব্যক্তিকে বাড়ির ভেতরের অবস্থা দেখার জন্য পাঠাল। সে নেকড়ের মতো পা টিপে টিপে ভেতরে গেল এবং উঁকি দিয়ে দেখল যে কোনো পাহারা নেই। [৯]

[১] আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি তালহাকে দার-এর (বাড়ির) যুদ্ধের দিন দেখেছি যে তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন এবং তাঁর বর্মের নিচ থেকে সাদা কাপড় দেখা যাচ্ছিল। (তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৩/১১৬৯)

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৮

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৩

[৪] তারিখুত তাবারী: ২/৩৯২, ৩৯৩, সাইফ বিন ওমরের বর্ণনা

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৩

[৬] এটি অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, দেখুন: তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/৭০, সাদির; তারিখে দামেশক: ৩৯/৩৯৯, ৪০০

[৭] উসমান (রা.) দরজা খুলে দিলেন এবং নিজের সামনে কুরআন রাখলেন। (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৪; তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৩ সহিহ সনদে)

[৮] তারা দরজা খুলে দিল এবং উপরে উঠে বাড়িতে প্রবেশ করল এবং উসমান (রা.)-কে শহীদ করল। (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৩)

[৯] অতঃপর এক ব্যক্তি নেকড়ের মতো এল এবং দরজা দিয়ে উঁকি দিল। (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৪; তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩/৭৩; তারিখুত তাবারী: ৩/৪২৭)

অংশ ২ | তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এখন বিদ্রোহীরা নিশ্চিত হয়ে হযরত উসমান [রা.] কে শহীদ করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাল। সে ছিল সেই সব নির্বোধ লোকদের একজন যারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিল। তার হঠাৎ আক্রমণ করার সাহস হলো না, শুধু এতটুকু বলতে পারল: “আপনি খিলাফত ছেড়ে দিন। আমরা আপনাকে কিছুই বলব না।”

তিনি বললেন: “আমি আল্লাহ তাআলার দানকৃত জামা কীভাবে খুলতে পারি? আমি এই অবস্থাতেই থাকব যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা সৌভাগ্যবানদের সম্মানিত এবং দুর্ভাগাদের লাঞ্ছিত করে দেখান।”

সেই ব্যক্তি কেঁপে উঠল এবং বাইরে গিয়ে বলতে লাগল: “তঁাকে হত্যা করা আমাদের জন্য হালাল নয়।” [১]

অন্য এক ব্যক্তি এল। তিনি [রা.] তাকে বললেন: “আমার ও তোমার মাঝে আল্লাহর এই কালাম (কুরআন) বিদ্যমান।” সেই ব্যক্তির বিবেকেও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। সেও ইতস্তত করল এবং বাইরে চলে গেল। [২]

বিদ্রোহীরা একের পর এক লোক পাঠাতে লাগল কিন্তু প্রত্যেকেই লজ্জিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.] এর পুত্র মুহাম্মদ বিন আবি বকরও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি [রা.] তাকে বললেন: “তোমার এই রাগ ও ক্ষোভ কি আল্লাহর দানের বিরুদ্ধে নয়? (যে তিনি কেন আমাকে খিলাফত দান করেছেন?) আমি তোমার কোন অপরাধ করেছি, এছাড়া যে হক নিয়ে হকদারকে দিয়েছি?” [৩] এরপর বললেন: “তুমি আমার হত্যাকারী হতে পারো না।” [৪]

একটি বর্ণনায় আছে যে, মুহাম্মদ বিন আবি বকর তাঁর দাড়ি মোবারক ধরলে তিনি বললেন: “তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করছ যা তোমার পিতা দেখলে কখনো পছন্দ করতেন না।” [৫]

মুহাম্মদ বিন আবি বকর এটি শুনে কেঁপে উঠলেন এবং অনুশোচনায় নিজের মুখ কাপড়ে ঢেকে বাইরে চলে গেলেন এবং বিদ্রোহীদেরও ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিতে লাগলেন। কিন্তু হত্যায় উদ্যত লোকেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। [৬]

মোটকথা, হযরত উসমান [রা.] এর এই হিকমতের কারণে, অজ্ঞতাবশত এই আন্দোলনের অংশ হওয়া অনেক লোক সরে দাঁড়াল এবং তওবা করতে দেখা গেল। তখন ষড়যন্ত্রের মূল হোতারা এবং চরম দুর্ভাগা ব্যক্তিরা দেরি না করে তাদের জঘন্য পরিকল্পনা নিজেরাই বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিল।

[১] তারিখ আত-তবারী: ৩/৩৯১

[২] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ১৭৩

[৩] তারিখ আত-তবারী: ৩/৩৯১

[৪] উসমান তাকে বললেন: “হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি আমার হত্যাকারী নও” (আল-ইসতিয়াব: ৩/১০৪২)

[৫] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ১৭৩

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/২০২; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, বিনত লাদমরি, ৩/৩৫৩, ৩৫৫, উসামার মুক্তদাসী রাবতাহ থেকে বর্ণিত।

নোট: এখানে এটি মনে রাখা উচিত যে, আজকালকার সাধারণ উর্দু ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে যে, হত্যাকারীরা মুহাম্মদ বিন আবি বকরের নেতৃত্বে ছিল এবং আমার বিন হাজম [রা.] এর বাড়ির সংলগ্ন দেয়াল বা “খাওখা” (বড় জানালা) উপরে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এই বর্ণনাগুলো হয় ওয়াকিদির যা তারিখ আত-তবারীতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর দুর্বলতা স্পষ্ট। এছাড়া এটি সাঈদ বিন মুসাইয়িবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত একটি দীর্ঘ বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে, যাকে মুহাদ্দিসগণ বানোয়াট সাব্যস্ত করেছেন। (আল-কামিল ফি দুয়াফাউর রিজাল: ৭/২৮৮)। কিন্তু প্রথমে আল্লামা ইবনে আসাকির এটি তারিখ দিমাশকে এবং সেখান থেকে আল্লামা সুয়ুতী এটি “তারিখুল খুলাফা”-তে উদ্ধৃত করেছেন। “তারিখুল খুলাফা” সংক্ষিপ্ততা ও সুন্দর বিন্যাসের কারণে জনপ্রিয় হয়ে যায় এবং এর অনুবাদও হয়ে যায়, ফলে পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ একে একটি চূড়ান্ত সত্য মনে করে আরও খ্যাতি দান করেছেন।

সাবায়ীদের খুনি আক্রমণ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মজলুম শাহাদাত:

এই লোকেরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমিরুল মুমিনীন ঘরের পুরুষদের অংশে একইভাবে আল্লাহর সাথে লীন হয়ে, নিজের জীবনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে সামনে কুরআন মাজিদ রেখে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন। বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে রুমান নামক এক ব্যক্তি লোহার একটি ভারী লাঠি দিয়ে আঘাত করল। [১] আবদুর রহমান বিন আফিকিও লোহার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল। [২]

এরপর এক ব্যক্তি যাকে ‘আল-মাউতুল আসওয়াদ’ বলা হতো, সামনে এগিয়ে এল এবং পুরো শক্তি দিয়ে আপনার গলা টিপে ধরল। আপনি ছটফট করতে লাগলেন, এদিকে সে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে আপনার ওপর আঘাত করল, রক্তের ছিটে কুরআন মাজিদের ওপর পড়ল এবং আয়াত ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ লাল হয়ে গেল। [৩]

এক হতভাগা বর্শা দিয়ে আঘাত করল, আপনার পবিত্র জবান থেকে বের হলো: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ সাথে সাথেই রক্তের ধারা উপচে পড়ল। [৪]

ঘরের নারীদের অংশ পর্যন্ত এই হট্টগলের আওয়াজ পৌঁছালে মহীয়সী স্ত্রী হযরত নাইলা এবং আপনার কন্যারা আপনাকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করতে করতে দৌড়ে চলে এলেন। [৫]

হযরত নাইলা আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন এবং বাঁচানোর জন্য আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। [৬] তখন সুদান বিন হামরান নামক এক জালিম তলোয়ার উঁচিয়ে সামনে বাড়ল, হযরত নাইলা তলোয়ারের ধার ধরার চেষ্টা করলে তাঁর আঙুলগুলো কেটে গেল। [৭]

মিসরের এক ব্যক্তি তলোয়ারের আগা আপনার বুকের ওপর রেখে নিজের পুরো ওজন তার ওপর দিয়ে দিল। তলোয়ার শরীর ভেদ করে এপার-ওপার হয়ে গেল এবং পয়গম্বরের জামাতা, তৃতীয় খলিফা, যুন-নুরাইন সাইয়িদুনা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ থেকে বিদায় নিল। [৮]

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

১৮ই জিলহজ ৩৫ হিজরির সূর্যাস্তের ঠিক আগের সময় ছিল, সরওয়ারে দো আলম (সা.)-এর সাথে ইফতার করা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল।

এই সবকিছু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। এই সময়ের মধ্যে হযরত উসমান (রা.)-এর কিছু গোলাম, যাদেরকে তিনি সেদিন এই শর্তে মুক্ত করে দিয়েছিলেন যে তারা অস্ত্র না তোলার ওয়াদা করবে, দৌড়ে এই দিকে চলে এল। তাদের মধ্য থেকে এক গোলাম...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩১৮ ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৯১

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৪, ১৭৫

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩১০ ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৯৩

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩১৮

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩১৮

[৮] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৯৩

সুদান বিন হুমরান তলোয়ারের আঘাত করল এবং তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং দ্বিতীয় গোলাম কুতায়রা নামক বিদ্রোহীকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিল। তৃতীয় ব্যক্তি কুলসুম বিন তাজিব নামক জালিমকে হত্যা করল, যে হযরত নায়লার সাথে হাতাহাতি ও গালিগালাজ করছিল। [১] এরপর তাদের মধ্য থেকে দুই গোলাম সেখানেই বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.), হযরত হাসান (রা.) এবং মারওয়ান বিন হাকাম হট্টগোলের শব্দ শুনে ঘরে ফিরে এলেন এবং বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করে গুরুতর আহত হলেন। পরে মদিনার লোকেরা এই তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল। [২] বিদ্রোহীরা ঘরের প্রতিটি জিনিস লুট করল, এমনকি খালাবাসনও ছাড়ল না। এরপর তারা বাইতুল মালের দিকে ধাবিত হলো এবং সেটিও লুট করে নিল। তাদের এই হীন চরিত্রই সাক্ষী ছিল যে তারা দুনিয়াপুজারী ও ফিতনাবাজ লোক। [৩]

নামাযে জানাযা ও দাফন:

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের খবর বনের আগুনের মতো মদিনা মুনাওয়ারায় ছড়িয়ে পড়ল। সেই রাতেই হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.), হযরত কাব বিন মালিক (রা.) এবং সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম দলে দলে হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য মদিনা মুনাওয়ারার নারী ও শিশুরাও শহরের জানাযাগাহে সমবেত হলো। [৪]

জানাযায় বিলম্বের কারণ ছিল শেষবারের মতো দেখার জন্য মানুষের ভিড়। জানাযা কসরে উসমানের মধ্যে রাখা হয়েছিল এবং মানুষ দলে দলে ভেতরে গিয়ে যিয়ারত করছিল। এক হতভাগা বিদ্রোহী প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে হযরত উসমান (রা.)-কে অবশ্যই আঘাত করবে। সে জানাযার খাটিয়ার কাছে এসে পবিত্র চেহারার ওপর হাত বাড়াতে চাইল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার হাত অবশ হয়ে গেল। [৫]

শহীদকে গোসল দেওয়া হয়নি, পরিহিত কাপড়ই কাফন হিসেবে গণ্য করা হলো। জানাযার খাটিয়া আনা হলো। মারওয়ান বিন হাকাম জানাযার নামায পড়ালেন। এরপর জানাযা বাকী কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। লজ্জা ও হায়ার এই সূর্য বাকী-এ-পাকের মাটিতে আত্মগোপন করল। [৬]

এটা নিশ্চিত যে শাহাদাতের সময় মদিনায় হযরত উসমান (রা.)-এর সমর্থক সাহাবী ও তাবয়ীগণ বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন, যারা তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতেন। তাদের হাত থামিয়ে রাখার কারণ ছিল হযরত উসমান (রা.)-এর কসম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওসিয়তের প্রতি তাঁর আনুগত্য। বিদ্রোহীরা মদিনা মুনাওয়ারার ওপর এমনভাবে দখলদার ছিল না যে...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৯১

[২] আল-ইসতিয়াব: ৩/১০৪৬; ইবনে হিশাম, দারুল জীল বৈরুত; ফিতনা মাকতাল উসমান লি-ডক্টর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ গাবান আস-সুভহী: ১/২০৫

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৯১

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪১৩

[৫] তারিখ দিমাশক: ৩৯/৩৫৮, তরজমা: উসমান (রা.)

[৬] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪১৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — প্রথম খণ্ড

সাহাবীগণ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর সমর্থকরা একেবারেই নিরুপায় ছিলেন। তাই দুর্বল বর্ণনায় বর্ণিত এই কথাগুলো সন্দেহজনক যে, জানাজা দাফনহীন অবস্থায় পড়ে ছিল, মাত্র কয়েকজন লোক জানাজা পড়েছেন এবং গোপনে কোনো এক কোণে দাফন করে দিয়েছেন। তবে এটা স্পষ্ট যে, ফিতনা, হাঙ্গামা এবং ভয়ের পরিবেশের কারণে জানাজায় তত বেশি লোক শরীক হতে পারেননি যত বেশি লোক শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় শরীক হতেন। এই দুর্বল বর্ণনাগুলোকে যদি মেনে নেওয়া হয় তবে তা এই পরিমাণেই ধরা হবে।

দাফনের সময়কার কারামত:

হযরত উসমান (রা.)-কে বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। দাফনে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি আবু হাবীশ বর্ণনা করেন যে, আমরা আমাদের পেছনে একটি বিশাল জনসমাবেশ আসতে দেখলাম, আমরা ঘাবড়ে গেলাম তখন আওয়াজ এলো:

“ঘাবড়াবেন না, আমরা আপনাদের সাথে শরীক হতে এসেছি।”

এরা ছিলেন ফেরেশতা যারা জানাজা এবং দাফনে শরীক হয়েছিলেন। [১]

এই বিয়োগান্তক ঘটনায় বড়দের প্রতিক্রিয়া:

হযরত উসমান (রা.) সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী বিরাশি বছর বয়সে অত্যন্ত মজলুম অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন যে, প্রতিটি মুসলমানের অন্তর দুঃখে ফেটে যাচ্ছিল। হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন: “হে আল্লাহ! আমি তোমার সামনে উসমানের রক্ত থেকে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করছি, আমি তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে এর জন্য প্ররোচিতও করিনি।” [২]

তিনি আরও বলেছিলেন: “যেদিন উসমান শহীদ হলেন সেদিন আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। আমি নিজেকে অপরিচিত মনে করতে লাগলাম।” [৩]

হযরত যুবাইর (রা.) ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করলেন এবং বললেন: “হে আল্লাহ! হযরত উসমানের ওপর রহমত নাযিল করো এবং তার রক্তের বদলা নাও।” ঠিক একই প্রতিক্রিয়া হযরত তালহা (রা.)-ও ব্যক্ত করেছিলেন।

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেছিলেন:

“হে আল্লাহ! এদেরকে অনুশোচনায় লিপ্ত করো এবং তারপর পাকড়াও করো।” [৪]

হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) এই দুর্ঘটনার ওপর বলেছিলেন: “ইসলাম একটি মজবুত দুর্গের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল কিন্তু এই লোকেরা হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করে এই দুর্গে এমন ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না।”

বদরী সাহাবী হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী (রা.) বলেছিলেন: “আল্লাহর কসম! এখন আমি মৃত্যু পর্যন্ত হাসব না।” [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/১৯১

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৮০, ত. সাদির; তারিখ দিমাশক: ৩৯/৪৭২, তরজমা: উসমান বিন আফফান (রা.)

[৩] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৪৫২৭, সনদ সহীহ

[৪] তারিখ তাবারী: ৩/৩৯২

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৮১, ত. সাদির

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল (রা.) বলতেন:

“উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ট্র্যাজেডিতে যদি ওহুদ পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, তবে তা যথার্থই হতো।” [১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সামনে যখনই হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের কথা আসত, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠতেন:

“হায়! হায়!” এবং এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন। [২]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

“যে ব্যক্তি উসমান (রা.) সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছে, তার ওপর আল্লাহর লানত।” [৩]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মদিনায় বিদ্রোহীদের আগমনে অসহায়ত্ব ও শোকাতুর অবস্থায় ফিলিস্তিনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে যখন তাঁর কাছে এই খবর পৌঁছাল, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিৎকার করে উঠলেন: “ওয়া উসমানাহ!” (হায় উসমান!)।

এরপর তিনি এই শোকাতুর কবিতাগুলো পাঠ করলেন:

ইয়া লাহফা নাফসি আলা মালিকিন... ওয়া হাল ইয়াসরিফুল লাহফু হাফযাল কাদার

আনজু মিনাল হাররি আওদি বিহি... ফাআ’যিরুহুম আম বি ক্বাওমি সুকার

“হায়, মালিকের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাস ও বিলাপ কি তাকদীরকে বদলে দিতে পারে? আমি কি এভাবে তাদের (যুদ্ধের) উত্তাপ থেকে বাঁচাতে পারতাম? আমি কি ওই লোকদের ক্ষমাযোগ্য মনে করব নাকি ভাবব যে আমার কণ্ঠে নেশায় আচ্ছন্ন ছিল?”

এরপর বললেন: “আল্লাহ উসমানের ওপর রহম করুন এবং তাঁকে ক্ষমা করুন।”

সেই সাথে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

“এখন তো যুদ্ধ হবেই, কেন হবে না, এমনকি যবের একটি দানাও একে ছিঁড়ে ফেলবে।” [৪]

এর অর্থ ছিল, যে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী এই ফিতনার সূচনা করেছে, তারা ভবিষ্যতে মুসলমানদের একটি বিধিবদ্ধ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে।

পুরো ইসলামি বিশ্বে তখন শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। মানুষ অঝোরে কাঁদছিল এবং হযরত উসমান (রা.)-এর গুণাবলি স্মরণ করছিল। বসরায় বসবাসকারী একজন সাহাবী কুলাইব জারমি (রা.) বলেন:

“হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার খবরে আমি মুরূব্বিদের যেভাবে কাঁদতে দেখেছি, তেমনটি আর কাউকে কাঁদতে দেখিনি এবং এর কোনো নজিরও দেখিনি। মানুষ এমনভাবে কাঁদছিল যে তাদের দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গিয়েছিল।” [৫]

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৮৬২, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিব সাঈদ বিন যায়েদ।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৮১, ত. সাদর।

[৩] আত-তারিখুল কাবীর লিল ইমাম আল-বুখারী: ১/৩৬, ত. দাক্ষিণাত্য, বি-হাওয়ালা মাহমুদ খলিল।

[৪] তারিখুত তাবারী: ২/৫৫৯।

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৫৭, কিতাবুল জামাল, ত. আর-রশাদ।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

কায়সারের আকস্মিক আক্রমণ এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্য:

এই সময়ে যখন মুসলমানরা খেলাফতের কেন্দ্রে এক তীব্র সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন রোম সম্রাট কায়সার, কনস্টানটাইন স্বয়ং ইসলামি বিশ্বের সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। এক হাজার যুদ্ধজাহাজ নিয়ে তিনি ফিলিস্তিনের উপকূলে অবতরণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আল্লাহর গায়েবি সাহায্য সামুদ্রিক ঝড় ও প্রবল বাতাসের আকারে নাজিল হয়, যা শত্রুবাহিনীকে তছনছ করে দেয়। কায়সার প্রাণ বাঁচিয়ে কোনোমতে সিসিলিতে পৌঁছান, যেখানে তার নিজের দরবারীরাই তাকে সেনাবাহিনীর ধ্বংসের জন্য দায়ী করে গোসলখানায় হত্যা করে।

রোমানরা যদি এই আসমানি দুর্যোগের শিকার না হতো, তবে তীব্র আশঙ্কা ছিল যে, বিশৃঙ্খলার এই অবস্থায় কুফরের আক্রমণে ইসলামি বিশ্বের ওপর কেয়ামত নেমে আসত।

[১]

এই পরিস্থিতিতে কায়সারের এত বিশাল বাহিনী নিয়ে স্বয়ং ইসলামি বিশ্বের ওপর আক্রমণ করা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। এটি আলাদা কথা যে ঐতিহাসিকরা একে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই আক্রমণ অনেকগুলো প্রশ্ন জন্ম দেয়। যেমন: কায়সার কি জানতেন যে মুসলমানরা কোন রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে? মদিনায় অশান্তির সর্বোচ্চ সময়কাল ছিল চল্লিশ দিন, এত অল্প সময়ের মধ্যে কায়সারের কাছে খবরও পৌঁছে গেল এবং তিনি বাহিনী প্রস্তুত করে দুই-তিন মাসের পথ পাড়ি দিয়ে চলেও এলেন, এটি কীভাবে সম্ভব? যদি তার আগে থেকেই ধারণা বা জানা থাকত যে মুসলমানদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সংকট তৈরি হতে যাচ্ছে, তবে কি এর থেকে এই সম্ভাবনা তৈরি হয় না যে, ইসলামি বিশ্বের এই রাজনৈতিক সংকটের পেছনে স্বয়ং কায়সারেরও হাত ছিল? অর্থাৎ তিনি পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্রকারী শক্তির সাথে সহযোগিতা করছিলেন।

এই বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো যে, এত বড় আন্দোলন বিশাল আর্থিক সহায়তা ছাড়া চলতে পারে না। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এটি জানা সম্ভব হয়নি যে বিদ্রোহীদের আর্থিক ব্যয় কোথা থেকে মেটানো হতো, কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরে এক গোপন অভিযানের সময় একজন খ্রিস্টান গোয়েন্দাকে গ্রেপ্তার করেন, যার কাছ থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিনার (আজকালকার প্রায় দুই খর্ব ষাট আরব রূপি) উদ্ধার করা হয়। এই অর্থ তাকে রোম সম্রাট কায়সার সরবরাহ করেছিলেন। [২] এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিদেশি শক্তিগুলো অর্থ সরবরাহ করছিল এবং তাও ছিল অপারিসীম। যাতে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের দ্বীন ও ঈমান কেনা যায়।

কায়সারের এই আক্রমণের একটি বিশেষ দিক হলো তিনি নিজে সেনাবাহিনীর সাথে ছিলেন। সাধারণ অভিযানে বাদশাহ নিজে নেতৃত্ব দেন না। তিনি কেবল কোনো অসাধারণ বিজয় বা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যই বের হন। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, কায়সারের সেই সময় কোনো বড় বিজয়ের পূর্ণ আশা ছিল। এত বেশি আশাবাদী হওয়ার কারণ এটি ছাড়া আর কী হতে পারত যে, মুসলমানরা তখন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল এবং হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই সংকটের খবরগুলো চেপে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও কায়সার এর সমস্ত বিস্তারিত জানতেন, যার কারণ কেবল এটাই হতে পারে যে তিনি স্বয়ং ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের সাথে যোগাযোগে ছিলেন।

[১] তারিখুত তারাবী: ৩/৪৪১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৬২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

এই সম্ভাবনাগুলোর ওপর চিন্তা করলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুরা একই সময়ে দ্বিমুখী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারী উপাদানগুলো ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং কায়সার এই সময়ে সীমান্তে সৈন্য নিয়ে এসেছিল। ইসলাম আল্লাহর সংরক্ষিত। তিনি তাঁর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীন রক্ষার জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর হুকুম হলে কায়সারের বিশাল নৌবহর সামুদ্রিক তুফানের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইসলামের প্রদীপ সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে দেওয়ার ইবলিস ও তার অনুসারীদের আকাঙ্ক্ষা তাদের হৃদয়ের কাঁটা হয়েই থেকে যায়।

হত্যাকারী কারা ছিল?

এ কথা তো স্পষ্ট যে, হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদকারীরা সাধারণ বিদ্রোহী ছিল না, বরং তারা ছিল এমন লোক যাদের অন্তর পাথরের চেয়েও বেশি শক্ত ছিল। এ কথাও প্রমাণিত যে, হত্যার জন্য আক্রমণকারী ছিল অনেক ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণকারীদের অধিকাংশ ব্যক্তির পরিচয়, গোত্র, বাসস্থান ইত্যাদির কোনো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক ও বর্ণনাকারীরা এ বিষয়ে নীরব। আসলে এ ব্যাপারে বর্ণনাগুলো এতই ভিন্ন যে তার কোনো সীমা নেই। এমন মনে হয় যে, হত্যার পরপরই সাবায়ী গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে কাল্পনিক ঘটনা এবং অপরিচিত নামগুলোর বর্ণনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে সত্য পুরোপুরি লুকিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ওয়াকিদির বর্ণনা সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, যা সনদ ও মতন (পাঠ্য) উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত দুর্বল। এতে তিন ব্যক্তির নাম নেওয়া হয়েছে:

১. কিনানা বিন বিশর তুজিব

২. সুদান বিন হুমরান

৩. আমর বিন আল-হামিক

ওয়াকিদির বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথমে কিনানা বিন বিশর লোহার একটি ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। এরপর সুদান প্রাণঘাতী আঘাত করেছিল এবং সবশেষে আমর বিন আল-হামিক বুকে নয়টি আঘাত করেছিল।

মনে রাখবেন, আমর বিন আল-হামিক (রা.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। ওয়াকিদির এই দুর্বল বর্ণনা এবং আবু মাখনাফ কাযযাবের একটি বর্ণনা ছাড়া অন্য কোথাও আমর বিন আল-হামিক (রা.)-এর হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় শরিক থাকার কথা উল্লেখ নেই। [১] এ জাতীয় ভ্রান্ত বর্ণনা দ্বারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় কোনো সাহাবীর অংশগ্রহণ কখনোই প্রমাণিত হতে পারে না। সুতরাং হযরত আমর বিন আল-হামিক (রা.)-কে হত্যাকারীদের মধ্যে গণ্য করা নিছক অপবাদ।

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৫/২৬৫।

ঘাতক হামলার নেতৃত্ব কে দিয়েছিল?

হযরত উসমান (রা.)-এর ঘাতকদের মধ্যে অত্যন্ত রহস্যময় এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যাকে ‘আল-মাউত আল-আসওয়াদ’ (কালো মৃত্যু) বলা হতো। সম্ভবত এটি তার ছদ্মনাম ছিল যা তার নিষ্ঠুরতা ও কঠোর হৃদয়ের কারণে দেওয়া হয়েছিল। তবে বাস্তবে সে কে ছিল? এর চূড়ান্ত অনুসন্ধান সম্ভব নয়। তবে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। এতটুকু কথা নিশ্চিত যে:

- সে মিশর থেকে আসা একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি ছিল যে ঘাতক হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং শাহাদাতের পর উভয় হাত তুলে কাজ সম্পন্ন করার ঘোষণা দিয়েছিল। [১]
- তার দুটি উপাধি ছিল— ‘আল-মাউত আল-আসওয়াদ’ অর্থাৎ কালো মৃত্যু এবং ‘জাবলা’ অর্থাৎ কালো মানুষ। [২]
- তার বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনী সাদুস-এর সাথে। [৩]

এখন যদি চিন্তা করি তবে এই বিস্ময়কর বিষয়টি সামনে আসে যে, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের আলামত মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ বিন সাবার ওপর প্রযোজ্য হয়। সে গায়ের রঙের দিক থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ছিল। [৪] সে সময় সে মিশরেই ছিল। [৫] তার কুনিয়াত (উপনাম) ছিল ‘ইবনুল সাওদা’ (কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার পুত্র)। [৬] এই শব্দটি ঘাতকের উপাধি ‘আল-মাউত আল-আসওয়াদ’-এর সাথে মিলে যায়।

ঘাতকের একটি উপাধি ছিল ‘জাবলা’, এই নাম ইয়েমেনের ইহুদিরা রাখত। [৭] আর আবদুল্লাহ বিন সাবাও ইয়েমেনের ইহুদি ছিল। আবার এই সত্যটিও সামনে রাখুন যে, বনী সাদুস ইয়েমেনি গোত্র কাহলান বিন সাবার বংশধর ছিল। [৮] আর আবদুল্লাহ বিন সাবাও ইয়েমেনি ছিল। এ থেকেও ইবনে সাবার দিকেই সূত্র পাওয়া যায়।

সবাই জানেন যে, হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি উস্কানি ছড়িয়েছিল এবং তাঁর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণকারী ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবা। একজন বিদেশি এজেন্টই এমন পাষণ্ড ও দয়াহীন হতে পারে যে, সে একজন বিরাশি বছর বয়সী বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করে ফেলবে। হত্যার জন্য পাঠানো অন্য লোকেরা ভেতরে এসে লজ্জিত হচ্ছিল এবং চুপচাপ ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবায়ীরা হাঙ্গামার সময় নেপথ্যে ছিল। তবে এটা স্পষ্ট যে সে হাত গুটিয়ে বসে ছিল না বরং সে তার খেলা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে খেলছিল, অন্যদের সামনে রেখে। হতে পারে সে...

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৮৩, ত: সাদির আন কিনানা মাওলা সাফিয়া (রা.); তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৬; আনিল হাসান আল-বাসরি।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৩; রিওয়ায়াত আবি সাঈদ।

[৩] আল-তারিখ আল-কাবীর ইমাম বুখারী: ৭/২৩৭; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৮৩, ত: সাদির।

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৩; সনদ সহীহ।

[৫] “আন য়ায়েদ বিন ওয়াহাব আন আলী... (তারিখ দিমাশক: ৩৯/৭)”।

[৬] “ফালাম ইয়াফজাউহুম ইল্লা কিতাবুম মিন আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারহ... (তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৪২)”।

[৭] আল-হামাউয়ি ইয়েমেনের স্থানসমূহের বর্ণনায় জাবলা ও যু-জাবলা উল্লেখ করেছেন... (মুজামুল বুলদান: ২/১০৬)।

[৮] “আম্মা আলী ফাহ্য়া আদাদ বিন য়ায়েদ বিন কাহলান বিন সাবা... (আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/১০২)”।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত উসমান (রা.)-কে শুরুতে অন্যদের হাতে হত্যা করানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যখন দেখা গেল যে এই ফেরেশতা স্বভাবের ও নুরানী চেহারার মহান ব্যক্তির ওপর কারো হাত উঠছে না, তখন কি অসম্ভব যে সে নিজেই তার কয়েকজন অত্যন্ত হতভাগ্য সঙ্গীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং এই ঘাতক অভিযান নিজেই সম্পন্ন করল। তার জন্য এই অভিযানে নিজের আসল নাম গোপন রাখা এবং অন্য কোনো উপাধি গ্রহণ করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না। হতে পারে এজন্যই হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঐতিহাসিক বর্ণনায় তার নাম আসতে পারেনি, তবে অনেক সূত্র সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়।

কি আবদুল্লাহ বিন সাবা-র অস্তিত্ব একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা?

বর্তমান যুগে প্রাচ্যবিদ, ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ এবং শিয়া ঐতিহাসিকদের অধিকাংশ ইবনে সাবার অস্তিত্ব অস্বীকার করছে। তাদের সবচেয়ে বড় দলিল হলো ইবনে সাবার উল্লেখ কেবল সাইফ বিন ওমরের বর্ণনায় পাওয়া যায়, যিনি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। অথচ এই কথাটি ভুল। ইবনে সাবার উল্লেখ ইতিহাসের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোতেও রয়েছে। দেখুন:

- ১. হাফেজ ইবনে হাজার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে এবং সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর সামনে আবদুল্লাহ বিন সাবার কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, “এই খবর কালো কলু থেকে আমার কী প্রয়োজন?” [১]
- ২. ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) আবদুল্লাহ বিন সাবাকে দেশান্তর করেছিলেন এবং তার অনুসারীদের, যারা “সাবায়িয়া” নামে পরিচিত ছিল, পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। [২]
- ৩. হযরত আলী (রা.) যখন জানতে পারলেন যে ইবনে সাবা তাকে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে, তখন তিনি তাকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার চাইলেন। [৩]
- ৪. ইবনে আসাকির ইমাম শাবী থেকে, যিনি ২০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বর্ণনা করেন যে, যারা সর্বপ্রথম মিথ্যার প্রচার করেছিল তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন সাবা অন্যতম। এটি একটি হাসান বর্ণনা। [৪]
- ৫. শিয়া আলেমদের ইবনে সাবার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিরর্থক, কারণ শত শত বছর আগে তাদের বড় বড় আলেমরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আহলে তাশাইয়ু-র ইমাম আল্লামা সাদ বিন আবদুল্লাহ আল-কুন্মী (মৃত্যু ২৯৯ হিজরি) লিখেছেন: “আবদুল্লাহ বিন সাবা প্রথম ব্যক্তি, যে হযরত আলীর ইমামত এবং দুনিয়াতে তার প্রত্যাবর্তনের আকিদা পেশ করেছিল।” [৫]

[১] লিসানুল মিজান: ৩/২৯০।

[২] তারিখু দামেশক: ৩/২৯, তরজমা: আবদুল্লাহ বিন সাবা।

[৩] তারিখু দামেশক: ৯/২৯, তরজমা: আবদুল্লাহ বিন সাবা।

[৪] তারিখু দামেশক: ৭/২৯, তরজমা: আবদুল্লাহ বিন সাবা।

[৫] আল-মাকালাত ওয়াল ফিরাক, পৃষ্ঠা ২০, মাতবা হায়দারি তেহরান।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

(৬) শিয়াদের নিকট রিজাল শাস্ত্রের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রিজাল আল-কাশশি’, যা চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন উমর আল-কাশশি লিখেছেন, তাতে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে:

“আবদুল্লাহ বিন সাবা একজন ইহুদি ছিল, সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। যখন সে ইহুদি ছিল, তখন সে ইউশা বিন নুনকে হযরত মুসা (আ.)-এর ওয়াসি (স্থলাভিষিক্ত) বলত। ইসলাম গ্রহণ করার পর সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা.)-এর জন্য একই আকিদা পেশ করে। সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে হযরত আলীর ইমামত আবশ্যিক হওয়ার প্রচার চালায়, তাঁর শত্রুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, তাঁর বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচন করে এবং তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে।” [১]

(৭) তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর শিয়া আলেম নওবাখতির বর্ণনা হলো:

“আবদুল্লাহ বিন সাবা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা আবু বকর, উমর, উসমান এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর চরিত্র হনন করেছিল।” [২]

মোটকথা, আহলে সুন্নাত এবং আহলে তাশাইয়্যু (শিয়া) উভয়ের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ আবদুল্লাহ বিন সাবার অপকর্মের সাক্ষী। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তবে তাকে সুন্নি ও শিয়াদের সমস্ত ইতিহাস থেকে পুরোপুরি সরে আসতে হবে।

[১] রিজাল আল-কাশশি, পৃষ্ঠা ১০৮, ১০৯

[২] ফিরাকুশ শিয়া, পৃষ্ঠা ৩৩, মাকতাবা হায়দারিয়া, নাজাফ

উসমান (রা.)-এর সীরাতের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক

সাধারণত মনে করা হয় যে, হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাদাসিধে মানুষ ছিলেন; তাঁর মধ্যে চতুরতা, বিচক্ষণতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার মতো গুণাবলি ছিল না। তিনি ভুলত্রুটির জন্য কাউকে বাধা দেওয়ার বা শাসন করার সাহস রাখতেন না, কর্মকর্তাদের সতর্ক করতে ঘাবড়ে যেতেন, তাঁদের কাছে নতি স্বীকার করতেন। যে তাঁকে যেভাবে বোঝাত, তিনি তা-ই মেনে নিতেন। যার ফলে শাসনব্যবস্থার লাগাম টিলে হয়ে যায় এবং ফিতনাবাজরা তাদের খেলা পুরোপুরি খেলার সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু এই ধারণা হযরত উসমান (রা.)-এর ব্যক্তিত্বের ভাসাভাসা পর্যালোচনা এবং প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করারই ফল।

যদি তৃতীয় খলিফা (রা.)-এর চরিত্রের গভীর অধ্যয়ন করা হয়, তবে প্রমাণিত হবে যে, তাঁর নম্রতা এবং ক্ষমা ও সহনশীলতার বিষয়টি ছিল কেবল তাঁর নিজের সত্তা পর্যন্ত। তাঁর লজ্জা ও হায়া ছিল স্বভাবজাত, কিন্তু তা বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রবল ছিল না। প্রশাসনিক ও শরয়ী বিষয়ে তিনি কখনোই অনিয়ম বরদাশত করতেন না... কোনো বড় থেকে বড় ব্যক্তিত্বের প্রভাবও তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলতে পারত না... যখন কোনো সমস্যা বা বিষয় তাঁর কাছে ধর্মীয় কিংবা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, তখন তিনি এ ব্যাপারে কারও অসন্তুষ্টির পরোয়া করতেন না... বরং অনেক সময় বিষয়টি খুব সামান্য মনে হতো, কিন্তু তিনি এর পরিণাম সঠিকভাবে আঁচ করে তাৎক্ষণিক নির্দেশ জারি করে দিতেন। তাঁর নীতি ছিল কোমলতার, কিন্তু এই কোমলতা ছিল রেশমি সুতার মতো মজবুত।

গভর্নরদের অপসারণের অটল সিদ্ধান্তসমূহ:

যখন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মতো উচ্চমর্যাদার সাহাবীর কুফার শাসনক্ষমতায় বহাল থাকা কোনো কারণে সতর্কতার পরিপন্থী মনে হলো, তখন তিনি তাঁকে অবিলম্বে অপসারণ করলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও মহত্বের প্রতি ভ্রক্ষেপ করেননি, বরং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। [১] হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে বসরা এবং আমর ইবনুল আস (রা.)-কে মিসরের শাসনক্ষমতা থেকে অপসারণ করার সময় তিনি এই মহান ব্যক্তিদের বুজুর্গি ও পদমর্যাদায় প্রভাবিত হননি। মুসলমানদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে কোনো দ্বিধা ছাড়াই তিনি এই পরিবর্তনগুলো সম্পন্ন করেন।

প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সাজাও কার্যকর করতেন:

দুষ্কৃতকারী ও ফিতনাবাজদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি (রা.) অধীনস্থ কর্মকর্তাদের অবশ্যই সতর্কতা ও ক্ষমার নির্দেশ দিতেন, যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিপথগামী হওয়া লোকদের ওপর অতিরিক্ত কঠোর শাস্তি কার্যকর না হয়ে যায় অথবা নিরপরাধ ব্যক্তির এ কবলে না পড়ে।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সন ৩৫ হিজরি।

...আসা পর্যন্ত নয়, তবে যখন কারো অনিষ্ট ও ফাসাদ প্রমাণিত হতো, তখন আপনি ইসলামী আইন ও শরীয়ত অনুযায়ী দণ্ডবিধি ও শাস্তি কার্যকর করতে দেরি করতেন না। ফলে আপনার আদেশে যায়ী নামক কবিকে শরীফদের নিন্দা করার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। [১] কুফার বেশ কিছু দাঙ্গাবাজকে শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। [২]

মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণে বাধা দানকারীদের শাস্তি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদুল হারামের কোনো সীমানা প্রাচীর ছিল না। চারদিকে ঘরবাড়ি ছিল, যেগুলোর পেছনের দেয়াল মসজিদকে ঘিরে রেখেছিল। মসজিদে প্রবেশের জন্য দরজা ছিল যা গলিতে গিয়ে খুলত। হজের দিনগুলোতে গলিগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যেত এবং অনেক সমস্যা হতো। সমস্যার একমাত্র সমাধান এটাই ছিল যে, চারপাশের ঘরবাড়িগুলো অধিগ্রহণ করা হোক, মালিকরা রাজি থাকুক বা না থাকুক। কারণ মসজিদুল হারামের সংকীর্ণতার কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চরম কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিল যার অন্য কোনো বিকল্প সমাধান ছিল না, অথচ স্থানীয় লোকজন অন্য কোথাও থাকতে পারত। ফলে হযরত উমর (রা.) মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ শুরু করেন। যাদের ঘরবাড়ি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ছিল, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেউ কেউ ঘর বিক্রি করতে অস্বীকার করে। যেহেতু এটি একটি জাতীয় ও সামষ্টিক প্রকল্প ছিল, তাই তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে ক্ষতিপূরণ পেশ করা হয়, কিন্তু তারা অসন্তুষ্টির কারণে টাকা নিতে অস্বীকার করে। হযরত উমর (রা.) এই টাকা “খাজানাতুল কাবা”-তে জমা করে দেন যা কাবার ব্যয়ের একটি বিশেষ তহবিল ছিল। পরবর্তীতে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা নমনীয় হয় এবং মূল্য নিতে চাইলে তাদের “খাজানাতুল কাবা” থেকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। এই সম্প্রসারণে মসজিদ এবং এর চারপাশের পরিবেশ প্রশস্ত করা হয় এবং মসজিদের চারপাশে প্রায় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু একটি সীমানা প্রাচীরও নির্মাণ করা হয়। [৩]

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে দর্শনার্থীদের আধিক্যের কারণে এই সম্প্রসারণও সংকীর্ণ হতে শুরু করলে ২৬ হিজরিতে হযরত উসমান (রা.) চারপাশের আরও ঘরবাড়ি কিনে মসজিদ সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। এবারও কিছু লোক ঘরবাড়ির মূল্য গ্রহণ করে এবং কিছু লোক যেকোনো মূল্যে ঘর দিতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঘরবাড়িগুলো জোরপূর্বক মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা এর প্রতিবাদ করলে হযরত উসমান (রা.) বলেন: “তোমাদেরকে আমার কোমলতা প্রতিবাদ করতে প্ররোচিত করেছে। এই একই কাজ হযরত উমর (রা.) করেছিলেন কিন্তু তখন কেউ একজনও শোরগোল করেনি।” যেহেতু ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারণের প্রয়োজন হতে পারত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু লোকের হট্টগোল করার সম্ভাবনা ছিল, তাই আপনি এই জাতীয় প্রকল্পগুলোতে বাধা দেওয়ার প্রবণতা ভাঙার জন্য প্রতিবাদকারীদের শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন এবং তাদের কারাগারে পাঠান। পরবর্তীতে মক্কার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির সুপারিশে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৩

[২] তারিখুত তাবারী, ৩৩ হিজরি; আল-কামিল, ৩৩ হিজরি

[৩] তারিখুল মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মসজিদুল হারাম লি ইবনি যিয়া আল-হানাফী (মৃ. ৮৫৪ হি.) পৃ. ১৫১, ত. আল-ইলমিয়াহ; ওয়া যাকারাহুল বুখারী মুখতাসারান (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৮৩০, বাবু বুনিয়ানিল কাবা)

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৫৯

মদিনাবাসীদের সতর্কীকরণ:

মদিনা মুনাওয়ারায় কিছু নাগরিকের সীমানা অতিক্রম করার খবর পেয়ে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন: “হে মদিনাবাসী! তোমরা ইসলামের ভিত্তি, তোমরা যদি বিগড়ে যাও তবে সবাই বিগড়ে যাবে, আর তোমরা যদি ঠিক থাকো তবে সবাই ঠিক থাকবে। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো, এখন থেকে তোমাদের মধ্যে কারো বিশৃঙ্খলার খবর পেলে আমি তাকে শহর থেকে বহিস্কার করে দেব।” ফলশ্রুতিতে এর পর যে কেউ অশালীন কাজে লিপ্ত হতো, তিনি তাকে শহর থেকে বহিস্কার করে দিতেন। [১]

বাকশক্তি:

যেখানে বাকশক্তি এবং যুক্তি ও বর্ণনার প্রশ্ন আসে, তার আন্দাজ আপনার সেই বাণীসমূহ, বিতর্ক এবং ভাষণগুলো থেকে লাগানো যেতে পারে যা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে, যার প্রতিটি অক্ষর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আপনি কোনো নির্বাক দরবেশ ছিলেন না... হ্যাঁ, এতটুকু কথা সত্য যে আপনি অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন এবং সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথা বলতেন। জনৈক ব্যক্তি আলোচনার সময় চাপ সৃষ্টি করল যে আপনি শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিন নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন, তখন আপনি বললেন: “আল্লাহর কসম! আমার গর্দান কেটে ফেলা হোক, এটি আমার কাছে অধিক প্রিয় এর পরিবর্তে যে আমি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে হাতাহাতি ও বিবাদ সৃষ্টি হতে দেখি।” [২]

সাদাতদের প্রতি অসম্মান সহ্য করতেন না:

আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী এবং বিশেষ করে সাদাতদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন এবং এ ব্যাপারে কোনো শিথিলতা সহ্য করতেন না... জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর সাথে অভদ্রতা করলে হযরত উসমান (রা.) তাকে শাস্তি দিলেন এবং প্রহার করলেন। লোকেরা এই কঠোরতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) যাদের সম্মান করতেন, আমি তাদের সম্মানের ক্ষেত্রে শিথিলতার সুযোগ কীভাবে দিতে পারি।” [৩]

পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত থাকতেন:

জনগণের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকার আন্দাজ এখান থেকে লাগানো যেতে পারে যে, কুফায় কাব বিন যিল হাবাকাহ তাই নামক এক ব্যক্তি জাদু-টোনা এবং নিম্নমানের জাদুকরী কাজ করতে শুরু করলে তখন হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে গভর্নর ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর কাছে একটি পত্র পৌঁছাল যে, এই ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো, অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি দাও। হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) নির্দেশ অনুযায়ী অপরাধীকে ধরে তদন্তের পর শাস্তি দিলেন। কুফার লোকেরা অবাক হতো যে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে এমন ছোট ছোট খবরের সংবাদ কীভাবে পৌঁছায়। [৪]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৯৯, আন সাইফ

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭০

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩০০, আন সাইফ

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩০১, ৩০২

গর্হিত কাজ নির্মূলের চিন্তা

নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা গর্হিত কাজ ও মন্দ বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি সতর্ক থাকতেন এবং সেগুলো নির্মূল করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করতেন। বিজয়াভিযানসমূহের কারণে মদিনাবাসীদের ধন-সম্পদ ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেলে কিছু লোক অনর্থক কাজে লিপ্ত হতে শুরু করে। ফলে কিছু লোক কবুতর উড়ানো এবং গুলতি দিয়ে লক্ষ্যভেদের খেলায় মগ্ন হয়ে পড়ে। কিছু লোক এমন নাবীজ পান করতে শুরু করে যাতে নেশা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। হযরত উসমান (রা.) এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেন যেন সে লাঠি নিয়ে শহরে টহল দেয় এবং এ জাতীয় মন্দ কাজগুলোতে বাধা প্রদান করে। [১]

বার্ধক্য সত্ত্বেও দুর্বল ও অসহায় ছিলেন না

বার্ধক্য সত্ত্বেও তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য এমন ছিল যে, শেষ সময় পর্যন্ত নফল সালাতে কুরআন মাজীদের দীর্ঘ সূরাসমূহ তিলাওয়াত করতেন। দীর্ঘ কিয়াম করতেন এবং রোজা রাখতেন। [২]

উচ্চসাহস

তাঁর উচ্চসাহস ছিল কল্পনাতিত, সব অবস্থায় তিনি হৃদয়ের প্রশান্তি ও প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ থাকতেন। যখন সংবাদদাতারা তাঁকে খবর দিল যে, বিদ্রোহীরা মদিনায় প্রবেশ করে আপনাকে পদচ্যুত বা হত্যা করার চেষ্টা করবে, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হেসে দিলেন। অতঃপর সেই ফিতনাবাজদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করলেন। [৩]

অথচ এমন পরিস্থিতিতে বড় বড় মানুষের ঘাম ছুটে যায় এবং মুখ দিয়ে বদদোয়া ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। শেষ সময়ে রক্তপিপাসু শত্রুদের অপেক্ষায় দরজা খোলা রেখে একাকী তিলাওয়াতে মগ্ন থাকা আপনার ঈমানি শক্তি, অবিচলতা ও দৃঢ়তা এবং খালেক ও মালিকের সাথে জান ও দিলের গভীর সম্পর্কের পরিচয় দেয়। রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরযাহু।

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৩৯৮, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৩৮৮।

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৩৪৬।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় অংশ

হযরত আলী বিন আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকাল

যিলহজ ৩৫ হিজরী থেকে রমজান ৪০ হিজরী

মে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জানুয়ারি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতির ওপর এক নজর

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের ফলে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্র কেঁপে উঠেছিল। এই মহান ট্র্যাজেডি প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, মুসলমানদের ঐক্য এবং মিল্লাতের ভিত্তি চরম বিপদের মুখে। তারা সেই মহান ফিতনার কবলে পড়ে গিয়েছিল যার সম্পর্কে একাধিক হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এটি ছিল মুসলমানদের সারিতে প্রথম অনৈক্য, যা তাদের সর্বসম্মত, ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার খলিফা এবং তাঁর সঙ্গীদের চরিত্র হননের ফলে দেখতে হয়েছিল।

এই বাস্তবতা তার নিজ স্থানে অটল যে, মিসর ও মদিনা মুনাওয়ারা ছাড়া বাকি শহরগুলোতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। অভ্যন্তরীণভাবে কোনো সাধারণ বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল না এবং কোনো বিদেশি শক্তিও মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারত না। কিন্তু আসল বিপজ্জনক ও গুরুতর সমস্যা ছিল এই যে, খোদ মুসলমানদের ভেতরেই ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যদিও তৃতীয় খলিফার বাড়ি ঘেরাও করা এবং পদত্যাগের দাবি জানানো দলটি ছিল ছোট, কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে এই আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের যদি সময়মতো সামলানো না যায়, তবে তাদের এই দ্বিতীয় প্রজন্ম চিন্তার বক্রতা, পথভ্রষ্টতা এবং সত্য পথ থেকে বিমুখ হওয়ার শিকার হতে পারে। এটিও প্রমাণিত হয়েছিল যে, একটি আদর্শ সমাজ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সমাজের মতোই মানুষের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই মানবিক দুর্বলতা বিদ্যমান এবং যদি কোনো অনিষ্টকারী গোষ্ঠী চায় তবে তাদের মধ্যেও উস্কানি ও বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।

বিদ্রোহীদের এই আন্দোলনে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করা বলে দিচ্ছিল যে, অন্যান্য মানব সমাজের মতো ইসলামি সমাজেও সংস্কার, বিপ্লব, অধিকার, পুনর্জাগরণ এবং ন্যায়ের শ্রেষ্ঠত্বের স্লোগান দিয়ে মানুষকে সেই পর্যায় পর্যন্ত অবশ্যই কর্মতৎপর করা যেতে পারে যাতে সমাজে সবসময় অস্থিরতা বিরাজ করে, সরকার স্থিতিশীল হতে না পারে এবং শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় না থাকে। এটিও বাস্তবতা ছিল যে, যারা এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের মধ্যে কুখ্যাত ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের পাশাপাশি নেককার ও সজ্জন ব্যক্তিরও शामिल ছিলেন, যাদেরকে আন্দোলনের সুনাম বৃদ্ধির জন্য সামনে রাখা হয়েছিল এবং যারা নিছক অজ্ঞতা ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন।

বিদ্রোহীদের হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদ করার পর কেবল তাঁর ঘর নয় বরং বায়তুল মাল থেকে মুসলমানদের সামষ্টিক...

সম্পদ লুণ্ঠন করা এই কথারই প্রকাশ্য প্রমাণ ছিল যে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) এবং প্রতিশোধ গ্রহণ। [১] এখন যেহেতু এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হয়ে গিয়েছিল, তারা বুঝতে পারছিল না যে তারা কী করবে? তাদের যেভাবেই হোক নিজেদের সমাজ, নিজেদের এলাকা এবং নিজেদের গোত্রীয় ব্যবস্থায় ফিরে গিয়ে কুফা, বসরা এবং মিসরের মানুষের সামনে জবাবদিহি করতে হতো যে, তারা কোন বিপ্লব ঘটাতে গিয়েছিল এবং কী করে ফিরে এল।

সাধারণ বিদ্রোহীদের অবস্থা তো এমন ছিল যে তারা পেরেশান, লজ্জিত এবং অস্থির ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রের হোতাদের উদ্দেশ্য লুণ্ঠন এবং প্রতিশোধ ছিল না, বরং উম্মাহর মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া ছিল। তাই তারা তাদের অনুসারীদের তিনটি দলকে আলাদা আলাদা দিকে সক্রিয় করে দিল যাতে তারা মদিনায় উপস্থিত তিনজন প্রবীণতম সাহাবীকে আবারও ক্ষমতার মসনদে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, যাতে কোনোভাবে নতুন সংঘাত শুরু হয়। এখন বসরার বিদ্রোহীরা হযরত তালহা (রা.)-এর কাছে, কুফাবাসীরা হযরত জুবাইর (রা.)-এর কাছে এবং মিসরের লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে খলিফা হওয়ার আবেদন করতে লাগল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই সাফ অস্বীকার করে দিলেন। বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং এরপর হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাতে বায়আত হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তারাও রাজি হলেন না। [২]

এভাবে ষড়যন্ত্রকারী হোতাদের চাল আবারও ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বড়দের মধ্যে কেউই খিলাফতের আকাঙ্ক্ষী নন।

হযরত আলী (রা.)-ই খিলাফতের একমাত্র হকদার কেন?

ইসলামের কেন্দ্রবিন্দুকে বাঁচাতে এবং ইসলামী ঐক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে বড় বড় সাহাবীগণ তৎপর হয়ে উঠলেন এবং তারা হযরত আলী (রা.)-কে খলিফা বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মদিনার বাকি নাগরিকরাও এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। তবে সাবায়ী প্রচারমাধ্যমগুলো জাল চিঠির মাধ্যমে যেসব বড়দের বিদ্রোহী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রচার করেছিল, তাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর নামও ছিল। সম্ভবত ষড়যন্ত্রকারী হোতারা ঠিক করে রেখেছিল যে, তাদের মধ্যে যে-ই খিলাফতের মসনদে বসবে, তার বিরুদ্ধেই এই অপপ্রচার চালানো হবে যে, সেই সাবেক খলিফাকে হত্যা করিয়ে নিজের জন্য ক্ষমতার পথ পরিষ্কার করেছে। হযরত আলী (রা.)-এরও এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা ছিল, তাই তিনি খিলাফতের পদ গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলেন।

তবে উম্মাহর মধ্যে সেই সময় হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার কোনো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা এবং বিচক্ষণতায় কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একই ঘরে থাকতেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর প্রতি যে বিশেষ ভালোবাসা ছিল, তার প্রকাশ প্রায়ই নবুওয়াতের বাণী থেকে হতো। এক পর্যায়ে তিনি ইরশাদ করেন: “আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু।” [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৩২ সাইফ থেকে বর্ণিত

[৩] মান কুনতু মাওলাহ ফা-আলিউন মাওলাহ। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এটি বর্ণনা করেছেন, হা: ৬৪১... এই বর্ণনাটি “হাদিসে গাদীরে খুম” নামে পরিচিত। ইমাম তিরমিযী একে হাসান এবং ইমাম তহাবী একে সহীহ বলেছেন। ইমাম আবু বকর বিন আবি শাইবা তাঁর “মুসান্নাফ”-এ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল “ফাযায়িলুস সাহাবা” এবং তাঁর মুসনাদে, ইমাম নাসাঈ “আস-সুনানুল কুবরা”-তে, ইমাম তাবারানী তাঁর তিনটি মুজাম-এ, আবু ইয়াল্লা মাওসিলি এবং ইমাম বাযযার তাঁদের মুসনাদসমূহে এবং ইবনে হাজার “ইতহাফুল মাহারা”-তে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাফেযীরা একে ইমামতের আকিদার ভিত্তি বানায় যা সম্পূর্ণ ভুল, তবে এই ভুল যুক্তির খণ্ডনের পদ্ধতি এটি নয় যে বর্ণনাটিকেই অস্বীকার করা হবে। ইমাম আবু জাফর তহাবী এই হাদিসের ওপর অত্যন্ত গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বর্ণনাটিকে সহীহ ঘোষণা করে এর সেই অর্থ স্পষ্ট করেছেন যা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি এবং বিবেকের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। (শারহ মুশকিলিল আসার: ৫/১৮, তাবা আর-রিসালাহ)

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

অংশ: দ্বিতীয়

এক পর্যায়ে তাঁকে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে: “আনতা মিনী ওয়া আনা মিনকা” (তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে) [১]

একদা ইরশাদ করেছেন: “আলী আমার এবং আমি তাঁর” [২]

একবার ইরশাদ করেছেন: “আলী, তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই” [৩]

রবুবিয়াতের দরবার থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আগত ফিতনাগুলোর প্রেক্ষাপটে এটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এটিও ইরশাদ করেছিলেন:

“আলীর সাথে প্রত্যেক মুমিন মহব্বত করবে এবং কেবল মুনাফিকই তাঁর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে” [৪]

দামাদে মুস্তফার ইলমী মাকাম বা জ্ঞানগত অবস্থানের আন্দাজ এখান থেকে করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনকি এ পর্যন্ত ইরশাদ করেছেন:

“আমি হিকমতের ঘর এবং আলী তার দরজা” [৫]

শম’য়ে রিসালাতের সাথে এমন গভীর সম্পর্কের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জীবনের দিন-রাত হযরত আলী (রা.)-এর সামনে খোলা বইয়ের মতো ছিল। আপনি সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে অত্যন্ত প্রিয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। সরওয়ারে কায়েনাত ﷺ-এর কন্যা সাইয়িদা ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)-এর সাথে আপনার বিবাহ হওয়া নববী পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছিল।

হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সমস্ত গাযওয়া বা যুদ্ধে নিজের আত্মোৎসর্গের প্রমাণ পেশ করেছিলেন। গাযওয়ায়ে তাবুকের সময় নবী আকরাম ﷺ-এর নায়েব বা প্রতিনিধি হিসেবে মদিনা মুনাওয়ারার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় হযরত আলী (রা.)-এর বয়স ছিল প্রায় তেত্রিশ (৩৩) বছর এবং তিনি একজন তলোয়ারধারী সৈনিকের চেয়েও একজন চিন্তাবিদ, নেতা, উপদেষ্টা ও উজিরের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান গনি (রা.)-এর খিলাফতকালের পঁচিশ বছরে আপনি মদিনা মুনাওয়ারায় আইওয়ানে খিলাফতের কেন্দ্রীয় শুরার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত উমর (রা.) খলিফা নির্বাচনের জন্য যে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছিলেন, তার সিদ্ধান্ত ছিল দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে একজনকে খিলাফত প্রদান করা। একজন হযরত উসমান (রা.), অন্যজন হযরত আলী (রা.)। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হযরত উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে হয়েছিল। তাঁর শাহাদাতের পর এখন নিঃসন্দেহে হযরত আলী (রা.)-ই খিলাফতের হকদার ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের হযরত উসমান (রা.)-এর শেষ দিনগুলোতে পাঠানো এই পয়গামও মনে ছিল যে: “হযরত আলী (রা.)-কে বলুন যে, মানুষের বিষয় এখন আপনার হাওলায়। আপনি তাই করুন যা আল্লাহ তাআলা আপনার অন্তরে ঢেলে দেন” [৬]

হযরত উসমান (রা.) শেষ দিনগুলোতে এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর নিকট খিলাফতের পদের জন্য সবার চেয়ে...

(১) সহীহ বুখারী, হা: ৪২৫১, কিতাবুল মাগাযী (২) সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৭১৯

(২) সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৭২০

(৩) সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৯, কিতাবুল ঈমান; সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৭৩৬

(৪) “আনা দারুল হিকমতি ওয়া আলিয়ুনে বাবুহা” (তিরমিযী এটি আবওয়াবুল মানাকিবে বর্ণনা করেছেন)

এবং এক বর্ণনায় রয়েছে “আনা মাদীনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়ুনে বাবুহা” (আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তবারানী: ১১/২৫)

(৫) তারীখুল মদীনা লি-ইবনে শাক্বাহ: ৪/১২০৪, ১২০৫

সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত আলী (রা.)। [১]

হযরত আলী (রা.)-এর এই মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বিবেচনা করে মদীনার অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার তাঁকেই খলিফা বানাতে চেয়েছিলেন। সাধারণ বিদ্রোহীরাও এখন তাঁর আশ্রয়ে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। তাদের দলটি মদীনা মুনাওয়ারায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এই যোগ্য ছিল না যে, নিজেদের ইচ্ছামতো কাউকে খলিফা বানিয়ে দেবে। সিদ্ধান্ত কেবল জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মতামতের ভিত্তিতেই হতে পারত।

হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতের বায়আত কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

অবশেষে হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-সহ মুহাজির ও আনসারগণ হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আসলেন এবং আবারও এই দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.) আপনার বায়আতের প্রস্তাব পেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা বারবার বলছিলেন: “হে আবুল হাসান! আসুন, আমরা আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করি।” [২]

অবশেষে হযরত আলী (রা.) তাঁদের পীড়াপীড়ি দেখে খোলা মনে বললেন: “তোমরা চাইলে আমার কাছে বায়আত হতে পারো, আর চাইলে আমি তোমাদের মধ্য থেকে কারো কাছে বায়আত হতে পারি।” তাঁরা উভয়েই বললেন: “আমরা আপনার কাছেই বায়আত হচ্ছি।” [৩]

এই দুই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম বায়আত গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৪]

বায়আত এবং প্রথম খুতবা:

উম্মতের মুরুব্বীদের অনুরোধ এবং মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ২৪শে জিলহজ ৩৫ হিজরিতে হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.) মসজিদে নববীতে মিম্বরে রাসূলে আসীন হয়ে এই মহান দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। [৫] তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন:

[১] ওলান ইয়ালিহা ইবনু আবি তালিব আহাব্বু ইলাইয়া মিন আন ইয়ালিয়া গাইরাছ। (তারিখুল মদীনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ৩/২০৬)

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৪২৭ আবু বশির থেকে; ৩/৪২৯ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া থেকে; ৩/৪২৯ ইবনে সিরীন থেকে।

[৩] ইন শি’তুমা ফাবায়ি’তুনি ওয়া ইন শি’তুমা বায়ি’তু আহাদাকুমা ফাকাল্লা বাল নুবায়ি’উকা। (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৯৭৭০ যুহরী পর্যন্ত সহীহ সনদে, তবা আল-মাজলিসুল ইলমী)

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৪২৮ আমর ইবনে শাব্বাহ থেকে।

কিছু বর্ণনায় এই দুই জ্যেষ্ঠ সাহাবীর বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি বা জোরপূর্বক বায়আতের কথা উল্লেখ আছে। (তারিখুত তাবারী, হাসান আল-হায়ালী ও আবু মিখনাফ থেকে: ৩/৪২৯; যুহরী থেকে জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি সূত্রে: ৩/৪৩০; সারী থেকে: ৩/৪৩৩; আল-হারিস আল-ওয়ালী থেকে: ৪/৪৩৫, ৪৩৫)

কিন্তু এই সকল বর্ণনা সনদের দিক থেকে দুর্বল এবং মতন (মূল পাঠ)-এর দিক থেকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)। কোনটি আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত, আবার কোনটি কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি বা অন্য কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে। আমরা সনদের বিচারে উত্তম বর্ণনাগুলো গ্রহণ করেছি যেগুলোতে কোনো প্রকার জবরদস্তিহীন বায়আতের কথা উল্লেখ আছে।

মূল পাঠে উল্লিখিত বর্ণনাগুলো ছাড়াও আরও সহীহ বর্ণনা রয়েছে, যেমন হযরত আলী (রা.)-এর নিজের বক্তব্য সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে:

“ইন্না তালহাতা ওয়াজ জুবাইরা বায়আ’ ত্বায়িঈনা গাইরা মুকরাহীন।”

“নিশ্চয়ই তালহা এবং জুবায়ের অনুগত হয়ে কোনো প্রকার জবরদস্তি ছাড়াই বায়আত করেছেন।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৭৯৯, তবা আর-রুশদ)

এই একই বর্ণনা হাসান সনদের সাথেও বর্ণিত হয়েছে। (তারিখুল মদীনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ৩/১২৭৫)

“মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ”-এর একটি বর্ণনায় হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-সহ একাধিক ব্যক্তির বায়আত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে: “বায়আ’উ আনহা ত্বায়িঈনা গাইরা মুকরাহীন।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৭০৯, তবা আর-রুশদ) হাফেজ ইবনে হাজার এর সনদকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। (ফাতহুল বারী: ১৩/৫৩)

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৪২৭, ৪২৮ জাফর থেকে।

“হে লোকসকল! আমি তোমাদের এই দায়িত্ব গ্রহণ করা পছন্দ করতাম না, কিন্তু তোমরা আমাকে নির্বাচিত না করে মানলে না। জেনে রেখো যে, তোমাদের ছাড়া কোনো বিষয়ে আমার কোনো ইখতিয়ার নেই। হ্যাঁ, তোমাদের (বায়তুল মালের) সম্পদের চাবিকাঠি আমার হাতে থাকবে। তবে এটা মনে রেখো যে, তোমাদের অনুমতি ছাড়া আমি তা থেকে একটি দিরহামও নিতে পারব না। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট?”

সবাই বলল: “আমরা সন্তুষ্ট।” তখন তিনি (সা.) মানুষের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করলেন। [১]

উসমান (রা.)-এর কিসাসের সমস্যা:

সাধারণ চিন্তাধারা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.)-এর উচিত ছিল সবার আগে সেই ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যারা বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর সামনে সেই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল স্বয়ং ইসলাম ধর্মের সুরক্ষা। আপনার দূরদর্শী দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিল যে, খোদ ইসলাম ধর্মের সঠিক পরিচয়ই হুমকির মুখে রয়েছে, কারণ ইসলামের পরিচিতি, এর সনদ এবং এর পরিচয় হলো আসহাবে রাসূল। আর সেই সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, খোদ আসহাবে রাসূল (সা.)-এর কেবল ইখলাস ও চরিত্রই নয়, বরং তাদের কারো কারো ঈমান সম্পর্কেও সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় খলিফাকে সাবায়ি গোষ্ঠী ‘কাফের’ পর্যন্ত প্রচার করে দিয়েছিল (যেমনটি এই গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত কিছু শিয়া ঐতিহাসিক এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন)।

এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি জরুরি কাজ ছিল আসহাবে রাসূলের ইসলামের জন্য মৌলিক ও ভিত্তিগত অবস্থানকে ক্ষুণ্ণ হতে না দেওয়া। এই বিষয়টিই এর আগে সাইয়েয়েদনা হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে ছিল। ফলে তিনি গালিগালাজ থেকে শুরু করে ধারালো অস্ত্রের আঘাত পর্যন্ত সহ্য করে নিয়েছেন, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাউকে এই ভুল ধারণা ছড়ানোর সুযোগ দেননি যে, নবীর প্রতিনিধি মুসলমানদের রক্তে হাত রাঙিয়েছেন। [২] এই বিষয়টিই এর আগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমলেও ছিল যে, আপনি আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিফাক, ইসলাম বিদ্বেষ এবং গাদ্দারি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকা এবং অসংখ্য তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে তার শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দেননি যাতে ইসলামি মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্ববাসী কোনো ভুল ধারণায় না পড়ে এবং বলেছিলেন: “পাছে মানুষ এ কথা না বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদ তার সঙ্গীদেরও হত্যা করিয়ে দেয়।” [৩]

হযরত উসমান (রা.) এই সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝেছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-ও এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। এজন্যই তিনি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল অবস্থার সংশোধন এবং সময়ের দাবি পূরণের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আত্মরক্ষা। হযরত আলী (রা.)-এর চেষ্টা ছিল যেন বড় বড় সাহাবী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন কোনো কাজ না করে বসেন যা শরীয়তের গণ্ডির বাইরে চলে যায় অথবা যা আরও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং দুনিয়া মনে করে যে মুসলমানরা ক্ষমতার...

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩২৮

[২] মুসনাদে আহমাদ: ৪৮১

[৩] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব মা ইয়ানহা আন দাওয়াতিল জাহিলিয়ায়্যাহ।

...গৃহযুদ্ধ, মতভেদ এবং বিবাদে লিপ্ত রয়েছে, বরং এই সময়ে সকল কালিমা পাঠকারী যেন এক সারিতে এক অবস্থানের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি ﷺ জানতেন যে, যারা সাধারণ বিষয়গুলোকে শান্তির অবস্থায়ও তুফানে পরিণত করে দেয়, তারা ফিতনার অবস্থায় কী না করতে পারে। তাই আপনার নিকট জরুরি ছিল যে, সবার আগে ‘প্রতিরক্ষা ও স্থিতিশীলতা’ নিশ্চিত করা হোক, যার জন্য শান্তির অবস্থা ও প্রশান্তির পরিবেশ কায়েম করা ছিল শর্ত। অর্থাৎ এটি জরুরি ছিল যে, প্রথমে উম্মতের হৃদয়গুলোকে জোড়া লাগানো হোক, মুসলমানের অধিকার, কালিমার মর্যাদা এবং একে অপরের প্রতি সম্মানবোধ স্বরণ করিয়ে দেওয়া হোক, সবাইকে নিজের মূল অর্থাৎ কুরআন মাজীদে বার্তার দিকে ফিরে আসার উৎসাহ দেওয়া হোক। অতঃপর বায়আতের পর আপনি ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন:

“আল্লাহ তাঁর কিতাবকে হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছেন যা কল্যাণ ও অকল্যাণকে স্পষ্ট করে দেয়। অতএব কল্যাণকে গ্রহণ করো, অকল্যাণকে বর্জন করো। আল্লাহ যেসব জিনিসের পবিত্রতা ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে মুসলমানের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি। মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। হ্যাঁ, এটি ভিন্ন কথা যে দ্বীন ও শরীয়তের চাহিদার প্রেক্ষিতে কোনো মুসলমানের জবাবদিহিতা করা হবে। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হালাল নয়, যতক্ষণ না শরীয়ত অনুযায়ী তার ওপর শাস্তি ওয়াজিব হয়। আল্লাহর বান্দাদের এবং তাদের জন্মভূমির অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এমনকি পশু এবং জমিনের অধিকার সম্পর্কেও তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” [১]

এই হৃদয়স্পর্শী ও হিকমতপূর্ণ ভাষণ অজ্ঞতাবশত বিদ্রোহী আন্দোলনের অংশ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় ভুলের ওপর আঘাত হেনেছিল। মুসলমানের মর্যাদার তোয়াক্কা না করা এবং ঈমানদারদের কষ্ট দেওয়া এই পুরো ফাসাদের প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা যাচ্ছিল। হযরত আলী রা এটি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সংস্কারের স্লোগান দেওয়া যেকোনো আন্দোলনের জাল ও ভিত্তিহীন হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তা বান্দার অধিকারকে উপেক্ষা করে।

নতুন বছর ৩৬ হিজরী

নতুন বছর ৩৬ হিজরী শুরু হলে মদীনা মুনাওয়ারায় পরিস্থিতি এই দিক থেকে অনুকূল মনে হচ্ছিল যে, শুধু সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এবং মদীনার অধিবাসীগণই নয়, বরং বিদ্রোহীরাও হযরত আলী রা-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত আলী রা-এর সামনে এমন কঠিন পরীক্ষা ছিল যার সম্মুখীন তাঁর আগে কোনো খলিফাকে হতে হয়নি। তিনজন খুলাফায়ে রাশেদীন শান্তি ও ঐক্যের অবস্থায় নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এখানে খোদ রাজধানী বা দারুল খিলাফতের শান্তি লুণ্ঠিত হয়েছিল, খলিফাকে শহীদ করা হয়েছিল এবং মুসলমানদের ঐক্যের বন্ধনগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। মোদাকথা, এই খিলাফত ফুলের শয্যা ছিল না, বরং ছিল এক কণ্টকাকীর্ণ পথ।

হযরত আলী রা-এর খিলাফত নিঃসন্দেহে শুরার মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। মদীনায় উপস্থিত সমস্ত প্রবীণ মুহাজির ও আনসারগণ বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ববর্তী তিনজন খলিফার খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য মদীনার অধিবাসীদের বায়আতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল, একইভাবে...

[১] তারিখ আত-তবারী: ৩/৩৩৬, সাইফ থেকে।

এখনও এটাই যথেষ্ট ছিল । ফলে আলভী খিলাফত (আলী রা.-এর খিলাফত), তিন খলিফার খিলাফতের মতোই শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল । দূর-দূরান্তের শহরবাসীদের জন্যও এখন হযরত আলী রা.-কে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল ।

[১]

[১] যদিও হযরত মুয়াবিয়া রা. এবং তাঁর সিরীয় সঙ্গীরা বায়আত করেননি, তবে হযরত আলী রা.-এর খিলাফতের যোগ্যতার ব্যাপারে তাঁদেরও কোনো অস্বীকার ছিল না, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে । খিলাফতের কেন্দ্র মদীনায়ে প্রায় সকল সাহাবী বায়আত করেছিলেন, এজন্যই হযরত আলী রা.-এর বায়আত জমহুর উলামাদের নিকট ইজমাস্ (সর্বসম্মত) । আকাইদ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে এমনই লেখা আছে । (আল-ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ, ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী, পৃ. ৭৮; আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, ইমাম গাযালী, পৃ. ১৫৩; আল-ইতিকাদ লিল বায়হাকী, পৃ. ৩৫৩, ৩৭০)

আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী লিখেছেন: নিশ্চয়ই তিন ইমামের পর খিলাফতের হকদার হলেন ইমামুল মুরতাজা ও অলিয়ুল মুজতবা আলী বিন আবি তালিব, তাঁর ওপর আহলে হাল ওয়াল আকদ-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে, যেমন তালহা, যুবাইর, আবু মুসা, ইবনে আব্বাস, খুযাইমা বিন সাবিত, আবু হাইসাম বিন তাইয়িহান, মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আশ্মার বিন ইয়াসির । (আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকা: ১/৩২৯, ত ত রিসালাহ)

পারস্পরিক মারওয়ানী গোষ্ঠীর লোকেরা হযরত আলী রা.-এর বায়আতকে ইজমাস্ বলে মানতে অস্বীকার করে, দলীলে তারা এমন কিছু রেওয়ায়েত পেশ করে যাতে কিছু সাহাবীর বায়আত থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ আছে । একটি রেওয়ায়েতে হযরত হাসসান বিন সাবিত, হযরত কাব বিন মালিক, হযরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হযরত নুমান বিন বশীর, হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত, হযরত রাফে বিন খাদীজ, হযরত ফাযালা বিন উবাইদ এবং কাব বিন উজরা রা.-কে বায়আত থেকে বিমুখ দেখানো হয়েছে । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪২৯, ৪৩০) কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি যঈফ; কারণ এর একজন রাবী শায়খ সিন বিন হাশিম একেবারেই মাজহুল ।

একটি রেওয়ায়েতে কুদামা বিন মাজউন এবং আব্দুল্লাহ বিন সালামকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩০) কিন্তু এটি একজন মাজহুল ব্যক্তি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাই এর সনদ যঈফ ।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে উসামা বিন য়ায়েদ, হযরত সুহাইব রুমী, আইয়ুব বিন য়ায়েদ এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা.-কেও ঐসব লোকদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে যারা হযরত আলী রা.-এর বায়আতকে জবরদস্তিমূলক মনে করতেন । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪৬৬, ৪৬৭) কিন্তু এটি সাইফ বিন উমরের যঈফ রেওয়ায়েত ।

আরও একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত তালহা রা. বলেছেন, আমি এমন অবস্থায় বায়আত করেছি যে তলোয়ার আমার মাথার ওপর ছিল । এই একই রেওয়ায়েতে বায়আত না করা ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং হযরত সালামা বিন ওয়াকশ রা.-এর নামও রয়েছে । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩০, ৪৩১) কিন্তু এর রাবী হলো ওয়াকিদী যার দুর্বলতা স্পষ্ট । এছাড়া রাফেযীদের থেকে বর্ণিত এমন রেওয়ায়েত প্রচুর রয়েছে । রাফেযীরা এগুলো এজন্যই তৈরি করেছিল যাতে তারা সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশের ওপর এই অপবাদ দিতে পারে যে, তারা হযরত আলী রা.-এর বায়আত থেকে বিরত থাকার অপরাধী ছিলেন । অন্যদিকে মারওয়ানীদের অভ্যাস হলো যে, সাবায়ী রেওয়ায়েতসমূহে আহলে বাইতের দুর্বলতার সামান্যতম দিক পেলেও তারা সেটাকে নিজেদের ঈমান বানিয়ে নেয় । ব্যাস, এই জাল রেওয়ায়েতগুলোকেই তারা হযরত আলী রা.-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দলীল হিসেবে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে । অথচ মিথ্যাবাদী রাফেযীদের রেওয়ায়েতের আর কী বিশ্বাসযোগ্যতা আছে!

সহীহ রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, জমহুর আহলে মদীনা মুহাজির ও আনসারগণ বায়আত করেছিলেন । عن محمد بن الحنفية، دخل المهاجرون والانصار । মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ থেকে বর্ণিত যে, মুহাজির ও আনসারগণ আসলেন এবং হযরত আলী রা.-এর বায়আত সম্পন্ন হলো । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪২৭)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেন: মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ বলেন, আমি হযরত আলী রা.-এর সাথে ছিলাম এবং হযরত উসমান রা. অবরুদ্ধ ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল: ‘আমীরুল মুমিনীনকে হত্যা করা হতে পারে ।’ তারপর অন্য একজন এসে বলল: ‘আমীরুল মুমিনীন এই মুহুর্তেই শহীদ হচ্ছেন ।’ হযরত আলী রা. এটি শুনে উঠে দাঁড়ালেন । আমি বিপদ অনুভব করে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলাম কিন্তু তিনি বললেন: ‘ছেড়ে দাও, তোমার মা না থাকুক ।’ এই বলে তিনি হযরত উসমান রা.-এর বাড়িতে পৌঁছালেন কিন্তু তিনি ততক্ষণে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন । হযরত আলী রা. নিজের বাড়িতে ফিরে আসলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন । লোকেরা এসে দরজায় কড়া নাড়ল এবং ভেতরে প্রবেশ করে বলল: ‘সেই মহান ব্যক্তি তো শহীদ হয়ে গেছেন, মানুষের জন্য একজন খলিফা হওয়া জরুরি । আমরা আপনার চেয়ে বেশি এর হকদার কাউকে জানি না ।’ হযরত আলী রা. বললেন: ‘আমাকে খলিফা বানানোর ইচ্ছা করো না । আমি তোমাদের জন্য শাসক হওয়ার চেয়ে উযীর হিসেবেই ভালো ।’ লোকেরা বলল: ‘না, আল্লাহর কসম! আমরা আপনার চেয়ে উত্তম কাউকে জানি না ।’ হযরত আলী রা. বললেন: ‘যদি তোমরা না-ই মানো, তবে আমার বায়আত গোপনে হবে না বরং আমি মসজিদে যাব, যে চায় আমার বায়আত করতে পারে ।’ অতঃপর তিনি মসজিদে গেলেন এবং লোকেরা তাঁর বায়আত করল । (ফাযায়েলুস সাহাবাহ: ২/৫৩৪)

ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত: حتى اذا قتل عثمان رضى الله عنه بايع الناس على بن ابي طالب । এমনকি যখন উসমান রা. শহীদ হলেন, তখন লোকেরা আলী বিন আবি তালিবের বায়আত করল । (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ২০৭৭০, সহীহ মুরসাল সনদে)

ইমাম খাল্লাল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন: اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به واجتمعوا عليه । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন । (আস-সুন্নাহ: ২/৪১৩)

আবু মা’শারের রেওয়ায়েত হলো: فبايعه العامة । অতঃপর সাধারণ মানুষ তাঁর বায়আত করল । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩৩)

আবুল হারিস থেকে বর্ণিত: فقال الجمهور: على بن ابي طالب نحن به راضون । অতঃপর জমহুর বলল: আলী বিন আবি তালিব, আমরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩৩)

সাইফ বিন উমর থেকে বর্ণিত: فبايع الناس كلهم । অতঃপর সকল মানুষ বায়আত করল । (তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩৫)

ইমাম বায়হাকী তাঁর সনদসহ বর্ণনা করেছেন: فبايعه الناس ولم يعدلوا به طلبة ولا الزبير । অতঃপর লোকেরা তাঁর বায়আত করল এবং তারা তালহা ও যুবাইরকে তাঁর সমকক্ষ মনে করেনি । (আল-ইতিকাদ, পৃ. ১৭০)——(বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

বিদ্রোহীদের থেকে কেন বায়আত নেওয়া হয়েছিল?

হযরত আলী (রা.)-এর বিদ্রোহীদের থেকে বায়আত নেওয়া কেবল রাজনৈতিক কৌশল ছিল না, বরং কুরআন মাজীদেদে শিক্ষাও এটাই ছিল:

“إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”

(হ্যাঁ, তারা ব্যতীত যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগেই তওবা করে নেয়। তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) [১]

এতে নির্দেশনা রয়েছে যে, যদি কোনো ফাসাদ সৃষ্টিকারী দল পরাভূত হওয়ার আগেই অস্ত্র সমর্পণ করে শাসকের আনুগত্য গ্রহণ করে, তবে তারা ক্ষমার যোগ্য।

মদিনায় ফাসাদ বিস্তারকারী লোকদের অধিকাংশ বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না এবং কেবল অজ্ঞতা বা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় চলে এসেছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজ নিজ অঞ্চলের প্রধান ছিল যাদের পেছনে গোত্র ও পরিবারগুলোর বড় সমর্থন ছিল। যদি তাদের বায়আত গ্রহণ না করা হতো, তবে প্রথমত এটি আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন হতো। দ্বিতীয়ত, এমন পরিস্থিতিতে এই লোকেরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিরোধের পথ বেছে নিত। আর এভাবে একজনের পরিবর্তে অনেক বিদ্রোহী দল অস্তিত্বে আসত এবং সেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত যা ঠেকানোর জন্য হযরত উসমান (রা.) নিজের জীবন দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর এই অবস্থান যে, সাধারণ বিদ্রোহীরা বায়আত করে খিলাফতের কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করবে, তা ছিল হুবহু শরয়ী বিধান ও হিকমতের ওপর ভিত্তি করে। বায়আতের পর সেই খলিফা যার ওপর সবাই আস্থা প্রকাশ করেছেন, তিনি যদি আসল অপরাধীদের শাস্তি দিতেন তবে কারো আপত্তি করার অধিকার থাকত না।

হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.) উভয়েই শরয়ী দলিলের আলোকে ইসলামী রাজনীতিতে একটি সীমার মধ্যে বিরোধী দলের কর্মকাণ্ড সহ্য করার প্রবক্তা ছিলেন। হযরত আলী (রা.) আরও যা করেছিলেন তা হলো, তাদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং...

তাবাকাত ইবনে সাদ-এ আছে: “বায়আত তালহাতু ওয়ায যুবাইরু ওয়া সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস ওয়া সাঈদ বিন আমর বিন নুফাইল ওয়া আম্মার বিন ইয়াসির ওয়া উসামা বিন যাইদ ওয়া সাহল বিন হনাইফ ওয়া আবু আইয়ুব আল-আনসারী ওয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ ওয়া যাইদ বিন সাবিত ওয়া খুযাইমাহ বিন সাবিত ওয়া জামিউ মান কানা বিল মদিনাতি মিন আসহাবি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম” (৩/৩১, ত. সাদির)।

এগুলোর মধ্যে শেষ দিকের কয়েকটি বর্ণনার সনদে দুর্বলতা রয়েছে, তবে শুরুতে উল্লিখিত সহীহ বর্ণনাগুলো থেকে প্রাপ্ত সমর্থন এই দুর্বলতা দূর করে দেয়। ইয়া, এটি সত্য যে অনেক সাহাবী বায়আত করার পরও রাজনৈতিক বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন; তাদের এই সিদ্ধান্ত ফিতনার সময় নির্জনে থাকার নির্দেশনা সম্বলিত কিছু নববী ফরমান থেকে গৃহীত ছিল। তাদের যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাকে বায়আত অস্বীকার হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

[১] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৪।

শাওকানী বলেন: “এটি এমন ব্যক্তির বিধান নয় যে কোনো গুনাহ করেছে, বরং এটি তার জন্য যার গুনাহ হলো বান্দাদের রক্ত ও সম্পদের ওপর সীমালঙ্ঘন করা।” (তাফসীর ফাতহুল কাদীর: ২/৪১)।

ওয়াহবাহ আল-যুহইলী বলেন: “এই আয়াতটি ইসলাম অনুসারীদের মধ্য থেকে সেই সব যোদ্ধাদের (মুহারিবীন) সম্পর্কে যারা মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া বা তাদের হত্যা করা অথবা তাদের আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।” (আত-তাফসীর আল-ওয়াসীত: ১/৪৫৩)।

তারিখ-এ-মিল্লাত-এ-মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

মালিক বিন আশতার নাখয়ীর মতো কিছু ব্যক্তিকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদও প্রদান করেছিলেন। এই উদারতা ছিল ইসলামী রাজনীতি এবং খিলাফতে রাশেদার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা সভ্যতার দাবিদার বর্তমান বিশ্বে আজও বিরল।

উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের পাকড়াও করতে বিলম্বের কারণ: বিদ্রোহীদের পাঁচটি ধরণ:

এটি নিশ্চিত যে, হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন, বাকিরা অবরোধ ও হাঙ্গামায় শরিক ছিল। বায়আত সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের সকলকে শাস্তি দেওয়া হযরত আলী (রা.)-এর ফিকহী দৃষ্টিতে ভুল অথবা অন্ততপক্ষে বিবেচনার দাবি রাখে এমন একটি বিষয় ছিল।

মূলত হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যক্তির ছিল পাঁচ ধরণের:

- কিছু লোক সর্বদা পর্দার আড়ালে থাকত এবং কোনো প্রমাণ বা চিহ্ন রেখে যেত না, যেমন আব্দুল্লাহ বিন সাবা। প্রমাণ ও চিহ্ন ছাড়া এমন ব্যক্তিদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া যেত?
- কিছু লোক ভুলবশত হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল, যেমন হযরত মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং আব্দুর রহমান বিন উদাইস (রা.)। হযরত আলী (রা.) তাদের নির্দোষিতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন; তাই নিছক গুজবের ভিত্তিতে তিনি কেন তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করবেন?
- কিছু হত্যাকারী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল, যেমন কুলসুম বিন তিজিব, সুদান বিন হামরান এবং কুতাইরা বিন হামরান। [১]
- যে হত্যাকারীরা বেঁচে গিয়েছিল, তারা পালিয়ে গিয়েছিল। বহু বছর পর জানা যায় যে, তারা সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে লুকিয়ে ছিল, যেখানে হযরত আলী (রা.)-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন তো তাদের সামান্যতম চিহ্নও ছিল না। [২]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮৯, ৩৯২।

[২] (তাদের মধ্যে একজন তাঁর ঘাড়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করল এবং অন্যজন তলোয়ার নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে তারা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করল, এরপর তারা সবাই পালিয়ে গেল। তারা রাতে সফর করত এবং দিনে আত্মগোপন করত। এভাবে তারা মিশর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলে পৌঁছে একটি গুহায় লুকিয়ে থাকল। সেই অঞ্চলের এক ব্যক্তি তার গাধা নিয়ে সেখানে এল। গাধার নাকে একটি মাছি ঢুকে পড়লে গাধাটি ছুটতে শুরু করল এবং তাদের গুহায় ঢুকে পড়ল। গাধার মালিক তাকে খুঁজতে গিয়ে তাদের দেখে ফেলল এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিযুক্ত কর্মকর্তার কাছে গিয়ে খবর দিল। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদের গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।)

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৭/৬৯১, আর-রুশদ প্রকাশনী, সহীহ বা হাসান সনদে, এর বর্ণনাকারীগণ বুখারীর বর্ণনাকারী, কেবল জুহাইম আল-ফিহরি ব্যতীত, তবে ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন)।

এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন: “নিশ্চয়ই হযরত উসমান (রা.)-কে কেবল একটি ছোট বিদ্রোহী দল হত্যা করেছিল।”

এরপর ইমাম ইবনে তাইমিয়া হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এবং মূল অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর জবানিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) বলতেন: হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের ওপর লানত হোক, তারা লোকালয়ের বাইরে থেকে চোরদের মতো তাঁর ওপর চড়াও হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের কঠোরভাবে ধ্বংস করেছেন। তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারা তারকার ছায়ায় (অর্থাৎ রাতে) পালিয়ে গিয়েছিল।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২৯৬)।

প্রাচীন ইতিহাসবিদদের মধ্যে এই বর্ণনাটি আবু বকর ইবনুল আনবারী (মৃত্যু ৩২৮ হিজরী) ইমাম ফাররা থেকে বর্ণনা করেছেন। (আল-আদদাদ, পৃষ্ঠা ৪৩৪)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) স্বয়ং হযরত উসমান (রা.)-এর পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর এই বর্ণনা অন্যান্য সহীহ বর্ণনার পূর্ণ সমর্থন করে, যাতে উল্লেখ আছে যে, কিছু হত্যাকারী ঠিক সেই সময়েই হযরত উসমান (রা.)-এর অনুগতদের হাতে নিহত হয়েছিল এবং কিছু বেঁচে পালিয়ে গিয়েছিল এবং দূরবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল।

(৫) বাকি লোকগুলো ছিল কেবল দাঙ্গাকারী, হত্যাকারী নয়। তারা বিদ্রোহে অবশ্যই শরীক ছিল, কিন্তু এখন তারা নতুন খলিফার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিল।

হযরত আলী (রা.)-এর নিকট তাদের ওপর তাৎক্ষণিক কিসাস কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। [১]

এজন্য হযরত আলী (রা.) একটি ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠিত হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে জাতীয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন।

[১] হযরত আলী (রা.)-এর এই ফিকহি মতামতের উল্লেখ উচ্চমর্যাদার মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং মুতাকাল্লিমদের আলোচনায় পাওয়া যায়। ইমাম নাসাফী (রহ.) লিখেছেন:

“والباغي اذا انقاد لامام اهل العدل لا يؤاخذ بما سبق منه من اتلاف اموال اهل العدل وسفك دمائهم وجرح ابدانهم، فلم يجب عليه قتلهم ولا دفعهم الى الطالب”
 “আর বিদ্রোহী যখন ন্যায়পরায়ণ ইমামের অনুগত হয়ে যায়, তখন তার পূর্ববর্তী কৃতকর্ম যেমন ন্যায়পরায়ণ লোকদের সম্পদ নষ্ট করা, রক্তপাত করা এবং শারীরিক আঘাত করার জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। সুতরাং তাদের হত্যা করা বা দাবিদারদের নিকট সোপর্দ করা ওয়াজিব হবে না।” (আল-ইতিমাদ শারহুল উমদাহ ফি আকীদাতিল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত, পৃ: ৫০৩)

একই গবেষণা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) ‘কুররাতুল আইনাইন ফি তাফদিলিশ শায়খাইন’-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই আত্মপক্ষ সমর্থনের দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন:

“طعنوا فيه بانه ما اقام القصاص على قتلة عثمان رضي الله عنه، وهذا ظلم فادح في امامته. والجواب: ان شرط وجوب القصاص تخلف باختلاف الاجتهادات فلعلمه لم يؤد اجتهاده الى كونهم موصوفين بالشرائط الموجبة للقصاص”

“লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর ওপর এই আপত্তি তুলেছিল যে, তিনি উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের ওপর কিসাস কার্যকর করেননি, যা তাঁর ইমামতের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর অবিচার ছিল। এর উত্তর হলো: কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি ইজতিহাদের পার্থক্যের কারণে অনুপস্থিত ছিল। সম্ভবত হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদে এটি প্রমাণিত হয়নি যে, ওই ব্যক্তির কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলির অধিকারী ছিল।” (মআলিম উসুলুদ্দীন, পৃ: ১৫২)

অনুরূপভাবে আল্লামা সা’দুদ্দীন তাফতাজানী (রহ.) লিখেছেন: “ورغب علي رضي الله تعالى عنه... عن قصاص القتلة لشوكتهم او لانهم عنده بغاة، والباغي لا يؤاخذ”
 “...بما اتلف من الدم والمال عند البعض”

“হযরত আলী (রা.) হত্যাকারীদের কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন তাদের শক্তির কারণে অথবা এজন্য যে, তারা তাঁর নিকট বিদ্রোহী (বাগি) ছিল। আর কিছু মুজতাহিদের মতে, বিদ্রোহীর কৃত রক্তপাত বা সম্পদ বিনষ্টের জন্য তাকে পাকড়াও করা হয় না।” (শারহুল মাকাসিদ: ৩/৫৩১, ত: ইশাআতুল ইসলাম পেশোয়ার। এখন থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটি কেবল একটি মায়হাব বা মত নয়, বরং এটি একটি ফিকহি মূলনীতি, যার ওপর ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহ প্রতিষ্ঠিত।)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের সন্ধানে ইরাকে গমন এবং হযরত আলী (রা.)-এর সাথে আলোচনার কথা উল্লেখ করে হযরত আলী (রা.)-এর এই অবস্থানকে এভাবে স্পষ্ট করেছেন:

“فراسلوه في ذلك فإني ان يدفعهم اليهم الا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه”

“অতঃপর তারা এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) তাদেরকে (বিদ্রোহীদের) তাদের হাতে সোপর্দ করতে অস্বীকার করলেন যতক্ষণ না রক্তের উত্তরাধিকারীর পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপিত হয় এবং যারা সরাসরি এতে লিপ্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়।” (ফাতহুল বারী: ১৩/২১৬)

উস্তাযে আলী কদর হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী (রহ.) (যাঁর কাছ থেকে লেখক উপকৃত হয়েছেন) লিখেছেন:

“এর আসল কারণ হলো এই মাসআলার শরয়ী রূপ এই যে, প্রকৃত হত্যাকারী জানা ছিল না যাদের ওপর কিসাস কার্যকর হতো। বাকিরা ছিল বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহী যখন আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।” (বা-সুবহে তাহকীক কে ভেস মে, পৃ: ৪১১)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.) লিখেছেন: “হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদেরকে হত্যাকারী মনে করতেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর দৃষ্টিতে তারা ছিল বিদ্রোহী। বিদ্রোহী যদি অস্ত্র ত্যাগ করে তবে বিদ্রোহের সময় কৃত কাজের জন্য কিসাস বা জরিমানা নেই।” (আকাইদুল ইসলাম, পৃ: ১৬৭)

হযরত মাওলানা সৈয়দ হামিদ মিয়া (রহ.) তাঁর নিবন্ধগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার সারমর্মও এটাই। (মাসিক আল-ওয়ালিদ লাহোর: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬)

উপযুক্ত হবে যে, বিদ্রোহীদের অপরাধের ক্ষমার শরয়ী হিকমতও জেনে নেওয়া যাক। হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) এ বিষয়ে লিখেছেন:

“এই ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম)-এর হিকমত হলো এই যে, একদিকে ডাকাত (এবং একইভাবে বিদ্রোহী)-এর শাস্তিতে এই কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, পুরো দলের মধ্য থেকে কোনো একজনের অপরাধের কারণে পুরো দলকে দায়ী করা হয়। তাই অন্যদিকে এই ইস্তিসনার মাধ্যমে বিষয়টি সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি তওবা করে নেয় তবে শাস্তিও মার্ফ হয়ে যাবে। এছাড়া এতে একটি রাজনৈতিক হিকমতও রয়েছে যে, একটি শক্তির ওপর সর্বদা বিজয় লাভ করা সহজ নয়। তাই তাদের জন্য তওবার দরজা খোলা রাখা হয়েছে যাতে তারা তওবার দিকে ধাবিত হয়। তাছাড়া এতে এই হিকমতও রয়েছে যে, হত্যা নিজে একটি অত্যন্ত কঠিন শাস্তি, ইসলামি আইনের লক্ষ্য হলো এটি যেন কম হয়।” (মআরিফুল কুরআন: ৩/১২৩-১২৪)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

কিসাস দাবির ক্ষেত্রে হযরত তালহা ও জুবাইর, আয়েশা সিদ্দিকা এবং মুয়াবিয়া এর ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

অন্যদিকে হযরত তালহা ও জুবাইর, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া এবং তাঁদের সাথীরা এই রায় কায়েম করেছিলেন যে, মদিনা মুনাওয়ারায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং উসমানের ঘর ঘেরাওকারী সকল ব্যক্তিকে বিদ্রোহ, হত্যা এবং হত্যায় সহায়তার অপরাধে অপরাধী এবং কিসাস হিসেবে তাদের সকলকে হত্যা করা ওয়াজিব। [১]

এটি ছিল এই মহান ব্যক্তিদের ইজতিহাদি রায়, যাকে হযরত আলী সেই সময়েও সঠিক গবেষণার পরিপন্থী মনে করতেন। যদিও কয়েক বছর পর এ বিষয়ে সঠিক শরয়ি কর্মপন্থা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (ঐক্যমত) হয়ে গিয়েছিল। তবে এর আগে এই ফিকহি মতভেদ রাজনৈতিক বিরোধের কারণ হয়ে ছিল। [২]

সাহাবায়ে কেরাম কেন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন?

এই মাসআলায় সাহাবায়ে কেরামের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা অহেতুক ছিল না, বরং এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল:

- (১) উসমানের কিসাস একটি জটিল মাসআলা ছিল। এখানে ইচ্ছাকৃত হত্যা (কতলে আমদ) এবং বিদ্রোহের বিষয়টি একে অপরের সাথে মিশে গিয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে এটি বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল যে, বিদ্রোহের সীমা কতটুকু ছিল এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান কোন কোন কাজের ওপর প্রযোজ্য হবে?

[১] সামনের সকল ঘটনা সাক্ষী যে, তাঁদের অবস্থান এটাই ছিল। এই অবস্থান কিছু শরয়ি দলিল থেকে গৃহীত ছিল, যেমন: لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لا كهم الله في النار “যদি আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা মিলে একজন মুমিনকে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তাদের সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” (সুনান তিরমিজি, আবওয়াবুদ দিয়াত)। যখন বসরায় হযরত তালহা ও জুবাইর এর মোকাবিলা হাকিম বিন জাবালার সাতশ সমর্থকের সাথে হলো, তখন কি তাঁরা তাদের সকলকে উসমানের হত্যাকারী এবং কিসাসের যোগ্য মনে করছিলেন? এজন্যই তাঁরা এই দোয়ামূলক শব্দগুলো বলেছিলেন: الحمد لله الذي جمع لنا ثارنا من اهل البصرة، اللهم لا تبق منهم احدا، واهلك منهم احدا، ولا تدع منهم احدا الا قتلهم “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বসরার অধিবাসীদের মধ্য থেকে আমাদের হত্যাকারীদের একত্রিত করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! তাদের একজনকে বাকি রেখো না, তাদের ধ্বংস করো এবং তাদের কাউকেও ছেড়ে দিও না যতক্ষণ না তাদের হত্যা করা হয়।” (তারিখুত তবারি ৩/৪৭০, ৪৭১)। যদিও এই লড়াই ছিল আত্মরক্ষামূলক অর্থাৎ হামলার সূচনা হাকিম বিন জাবালা করেছিল, তাই এই মহান ব্যক্তিদের কাছে লড়াই করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, তবে তাঁদের এই কথাগুলো প্রকাশ করে যে, তাঁরা ওই সকল লোককে শাস্তির যোগ্য মনে করতেন। তাছাড়া যখন অপরাধীরা নিজেরাই উঠে এসে লড়াই করতে বাধ্য করল, তখন এই মহান ব্যক্তির একে কিসাসের সর্বোত্তম সুযোগ মনে করে নতুন করে জোরেশোরে যুদ্ধ করলেন যাতে ওই সাতশ জনের মধ্যে দু-একজনই বেঁচে ফিরতে পারে। বাকি সবাই নিহত হলো। এরপর হযরত তালহা ও জুবাইর ঘোষণা করালেন: “الا من كان فيهم من قبائلكم احد من غزا المدينة فليأتنا بهم” “সাবধান! তোমাদের গোত্রগুলোর মধ্যে যারা মদিনায় আক্রমণ করতে গিয়েছিল, তাদের আমাদের কাছে নিয়ে এসো।” এই ঘোষণার পর এমন লোকদের যারা বিশৃঙ্খলায় অংশগ্রহণের জন্য মদিনায় গিয়েছিল, বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হলো এবং হত্যা করা হলো। বর্ণনার শব্দগুলো হলো: “فجئ بهم كما يجاء بالكلاب فقتلوا” “তাদেরকে কুকুরের মতো টেনে আনা হলো এবং হত্যা করা হলো।” (তারিখুত তবারি ৩/৪৭২)। এরপর এই সফলতার সুসংবাদ পত্রের মাধ্যমে লিখে পাঠানো হলো: “استصل قتل امير المؤمنين فخرجوا الى مضاجعهم فلم يفلت منهم مخبر الا خرفوص بن زهير” (তবারি ৩/৪৭২)। “আমিরুল মুমিনীনের হত্যাকারীদের নির্মূল করা হয়েছে, তারা তাদের কবরে চলে গেছে, তাদের মধ্য থেকে খরফুস বিন জুহাইর ছাড়া সংবাদ দেওয়ার মতো কেউ রক্ষা পায়নি।” এই ধারাবাহিক বর্ণনাটি যদিও দুর্বল বর্ণনাকারী সাইফ-এর, তবে এর মূল বক্তব্যের শক্তিশালী সমর্থনকারী দলিল বিদ্যমান রয়েছে। (দেখুন: তবারি ৩/৩৬৯ থেকে ৪৭২, ইবনুল আসির, তারিখ খলিফা বিন খায়য়াত পৃ. ১৮৩, ইবনে সিনান বিন সালামাহ)।

[২] মনে রাখতে হবে যে, সামনেও যেখানে “উসমানের হত্যাকারীগণ” শব্দটি আসবে, তার অর্থ এই হবে না যে তাদের প্রত্যেকে সরাসরি হত্যায় জড়িত ছিল। সেই যুগে “উসমানের হত্যাকারীগণ” তাদের জন্য একটি পরিভাষা হয়ে গিয়েছিল যারা মদিনার বিশৃঙ্খলায় शामिल ছিল। সম্ভবত এই কারণেই হযরত তালহা ও জুবাইর, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা এবং আমির মুয়াবিয়া পূর্ববর্তী সকল বিদ্রোহীকে কিসাস হিসেবে ওয়াজিবুল কতল (হত্যার যোগ্য) মনে করে তাদের সকলকে “কাতলায়ে আমিরুল মুমিনীন” (আমিরুল মুমিনীনের হত্যাকারী) নামে স্মরণ করতেন। এভাবে এই পুরো দলটি যারা মদিনায় হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী আড়াই-তিন হাজার ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল, “উসমানের হত্যাকারীগণ” নামে পরিচিতি লাভ করে। এতে প্রকৃত হত্যাকারী তো দুই-চারজনই ছিল, অধিকাংশ ছিল তাদের সাহায্যকারী, সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। এই বাস্তবতা হযরত তালহা ও জুবাইর, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা এবং আমির মুয়াবিয়া এরও জানা ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি হত্যায় शामिल নয়, তবে তাঁরা পুরো বিদ্রোহী জামাতের ওপর এটি প্রয়োগ করছিলেন। কিছু নস (দলিল) দেখে তাঁরা এটাই মনে করতেন যে, কোনো ব্যক্তিকে হত্যায় সহায়তাকারী সকল ব্যক্তির ওপরই কিসাস কার্যকর হবে, চাই সে প্রাণঘাতী আঘাতকারী না-ও হোক। ফুকাহায়ে ইসলামের মধ্যে একটি রায় এটিও রয়েছে। (المدنية) الحجة على اهل المدينة ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান: ৩/২০৪, ২০৫, বাবু কিসাস ফিল কতল, ত. আলমুল কুতুব)।

(২) মতপার্থক্যের দ্বিতীয় বড় কারণ ছিল এ বিষয়ে কোনো পূর্ববর্তী নজির না থাকা। মুফতি, কাজী এবং বিচারকগণ ভালো করেই জানেন যে, যখনই কোনো ফতোয়া চাওয়া হয় বা কোনো মামলা সামনে আসে, তখন তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি স্বস্তির বিষয় হয় যদি সেই সমস্যার মতো কোনো পূর্ববর্তী ফতোয়া বা ফয়সালা সামনে থাকে। এতে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে এবং ফয়সালা শোনাতেও সময় কম লাগে। কিন্তু যদি বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হয়, তবে মুফতি, কাজী এবং বিচারকদের জন্য বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরেও ভুল মতামত পোষণ করতে পারেন—এটি অসম্ভব কিছু নয়। এখানেও পরিস্থিতি এমনই ছিল।

(৩) তৃতীয় কারণটি ছিল এই যে, সাহাবায়ে কেরামের একটি বিশাল অংশ আবেগের উত্তাল তরঙ্গে নিমজ্জিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত যে হৃদয়বিদারকভাবে হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে গিয়ে আজও কলম থমকে যায় এবং পাষাণ হৃদয়েও অশ্রু ঝরে। সেই সব মানুষের কী অবস্থা হবে যারা অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিল সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসার মতো। এই ঘটনাটি তাদের জীবনে এমনভাবে এসেছিল যে তাদের ধৈর্যের সমস্ত বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল।

কিন্তু হযরত আলী (রা.) সমস্যার নাজুকতা ও জটিলতা বিবেচনা করে আবেগকে সম্পূর্ণ একপাশে রেখে অত্যন্ত ধৈর্য ও গান্ধীর্যের সাথে শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে চিন্তা করছিলেন। বিচারিক বিষয়ে শরীয়তের শিক্ষা এটাই। নবীজি (সা.)-এর ইরশাদ হলো: “لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان” (কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা না করেন)। [১]

সুতরাং কিসাসে উসমানের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) সঠিক মতামত প্রতিষ্ঠায় কেন সফল হলেন, কারণ তিনি ইলম, ফিকাহ এবং ইজতিহাদের পাশাপাশি ধৈর্য ও সহনশীলতার পথও আঁকড়ে ধরেছিলেন।

বিচারিক কার্যক্রমে জটিলতা:

যেখানে এই নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ করা সহজ ছিল না, সেখানে বিচারিক কার্যক্রমের পর্যায়েটি ছিল আরও জটিল। হযরত আলী (রা.) ঘাতকদের কাছ থেকে কিসাস নেওয়ার দায়িত্ব কখনোই ভুলে যাননি, তবে এই কাজটি নিম্নোক্ত কারণে কঠিন ছিল:

- ১. হযরত উসমান (রা.)-এর ঘাতকদের মধ্যে কয়েকজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল। [২] বাকি অপরাধীরা যারা সিরিয়া ও মিশরের ছিল, তারা ঘটনার পর অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গিয়েছিল। [৩] এখন ঘাতকদের মধ্যে এমন কেউ হযরত আলী (রা.)-এর আওতায় ছিল না যাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে শনাক্তকরণের জন্য পেশ করা যেত।
- ২. ঘাতকদের শনাক্তকরণ, গ্রেফতার এবং শাস্তি কার্যকর করার জন্য শরয়ী সাক্ষ্য প্রয়োজন ছিল। হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কেবল হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী হযরত নায়লা (রা.) অথবা তাঁর গোলামরা থাকতে পারতেন। কারণ শাহাদাতের সময় কেবল এই ব্যক্তিরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গোলামরা লড়াই করতে করতে তাদের মনিবের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং হযরত নায়লা (রা.) হামলার সময় হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, ফলে মারাত্মক আঘাতের কারণে তিনি শনাক্ত করতে অক্ষম ছিলেন। হযরত আলী (রা.) যখন তাদের কাছে ঘাতকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ...

[১] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৩৫৮৯, কিতাবুল আকদিয়া, বাবুল কাজী ইয়াকদি ওয়া হুয়া গাদবান।

[২] তারিখে তাবারী: ৪/৩৯১।

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৬৯১ হাসান সনদে, হিলয়াতুর রুশদ।

...তো তারা তাদের নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। শুধু এতটুকু বললেন যে, ‘মুহাম্মদ বিন আবি বকর খুনিদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন।’ [১]

অর্থাৎ সাক্ষীদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)-এর গোলাম কিনানা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তার জবানবন্দি শুধু এটাই প্রকাশ করছিল যে, খুনি মুহাম্মদ বিন আবি বকর নন, বরং একজন কৃষ্ণাঙ্গ মিশরীয় ব্যক্তি ছিল যার নাম ছিল হামার। [২]

এই জবানবন্দি থেকে একদিকে যেমন মুহাম্মদ বিন আবি বকরের নির্দোষিতা প্রমাণিত হচ্ছিল, অন্যদিকে প্রকৃত খুনি আরও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, কারণ হামার নামক কোনো ব্যক্তি সেখানে ছিল না। যে নামগুলো নেওয়া হচ্ছিল সেগুলো প্রসিদ্ধ তো হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওই ব্যক্তিদের ব্যাপারে শরয়ী সাক্ষ্য ছিল অনুপস্থিত।

এটাও সম্ভব যে খুনিরা নেকাব পরে ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তাই শনাক্ত করা কঠিন হচ্ছিল। এটাও হতে পারে যে হামার ইত্যাদি রূপক নাম ছিল, আসল নাম অন্য কিছু ছিল। এটাও হতে পারে যে খুনিরা অন্য লোকদের নামে নিজেদের নাম রেখেছিল যাতে ঘটনার পর ওই নির্দোষ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং কোনো সূত্র হাতে না আসে।

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে ইসলামী রাজনীতির এই নীতি চলে আসছিল যে, অপরাধীর ওপর যতই সন্দেহ থাকুক না কেন, তাকে নির্যাতনের মাধ্যমে অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করা যাবে না এবং বিচারবহির্ভূত প্রতিশোধ ও শাস্তির লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে না। যদিও এই নীতি অনুসরণের কারণে খোদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মুনাফিকদের থেকে এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামকে গাদ্দারদের হাতে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু শরীয়তের আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে সর্বদা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। হযরত আলী (রা.) যদি চাইতেন তবে নির্যাতন করে কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তির থেকে অপরাধ স্বীকার করিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি শরীয়তের অনুসরণ করতে গিয়ে এই পথ অবলম্বন করেননি। এটি সাহাবায়ে কেরামের যুগের ইসলামী রাজনীতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যার সমকক্ষতা হয়তো কোনো হীন ও নিচুতম সভ্যতাও করতে পারবে না।

৪. মদিনা সামরিক ছাউনি হওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিল না, তাই এখানে সেনাবাহিনী রাখা হতো না এবং এই কারণেই হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধের সময় প্রতিরক্ষার জন্য কয়েকশ’র বেশি সশস্ত্র ব্যক্তি ছিল না এবং এখনও তাদের সংখ্যায় কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। হযরত আলী (রা.)-এর কাছে ওই কয়েকশ ব্যক্তি নিয়ে মদিনায় নিশ্চিতভাবে এমন শক্তি ছিল না যে তিনি উসমানের খুনিদের ফিতনা দমন করতে পারতেন।

৫. যদি তর্কের খাতিরে হযরত আলী (রা.) দুই-চারজন ব্যক্তিকে ধরে কিসাস হিসেবে হত্যাও করে ফেলতেন, তবে তা নিরর্থক হতো কারণ কিসাস দাবিদার মুসলমানরা অবরোধে শরিক সকল ব্যক্তিকেই শাস্তির যোগ্য মনে করতেন, তারা এইটুকু পদক্ষেপে মোটেও সন্তুষ্ট হতেন না।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যা:

এই ধরনের পদক্ষেপ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও কঠিন ছিল। এই ধরনের কোনো তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের ফলে চারটি বড় ক্ষতি হতো:

১. হযরত আলী (রা.)-এর দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যা ও বিদ্রোহের সমন্বয়ে গঠিত এই বিষয়টি ছিল একটি বিচার্য ও নাজুক সমস্যা। এতে শরয়ী দলিলের আরও অনুসন্ধান এবং উম্মতের ফতোয়া প্রদানের যোগ্য ব্যক্তিদের ইজমার প্রয়োজন ছিল। যদি কোনো দ্বিধা ছাড়াই সকল বিদ্রোহীদের হত্যা করে দেওয়া হতো...

[১] তারিখুল ইসলাম লিখ যাহাবী: ৩/৩৬০, ত. তাদমুরী, সাঈদ ইবনুল মুসায্যিব থেকে... এটি একটি দীর্ঘ, প্রসিদ্ধ কিন্তু যয়ীফ বর্ণনার এমন একটি অংশ যা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে আমরা গ্রহণ করেছি, অন্যথায় এই বর্ণনার অনেক অংশ সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অপবাদে কলুষিত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। এই বর্ণনার সন্দেহজনক অংশগুলো নিয়ে আমরা শেষে “সন্দেহ নিরসন” শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করব।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৫

যেত তবে শরয়ী সীমা লঙঘনের আশঙ্কা ছিল।

- ২. যারা এইমাত্র বাইয়াত গ্রহণ করে কোনোমতে শান্ত হয়েছিল, তারা গোত্রীয় পক্ষপাতের আবেগে এসে তাদের এই অপরাধী সাথীদের ওপর শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করত, যার ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেত এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতো।
- ৩. সেই সময়ে প্রাক্তন বিদ্রোহীদের মধ্যে আশতার নাখয়ী-র কুফায়, হাকিম বিন জাবালাহ-র বসরায় এবং মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফা-র মিশরে অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাদের মধ্যে কিছু সর্দার হযরত আলী (রা.)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়েছিল, তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা বা রাজনীতির ময়দান থেকে তাদের বিতাড়িত করা এত সহজ ছিল না। এই প্রচেষ্টায় স্বয়ং খিলাফতের মসনদও উল্টে যেতে পারত এবং পুরো মুসলিম বিশ্ব এক নতুন সংকটের মুখে পড়তে পারত।
- ৪. দ্রুত কিসাস গ্রহণ করা হলে অন্যদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে অস্ত্র ধারণকারী কিছু ব্যক্তি অবশ্যই বিচারিক প্রক্রিয়ার আওতায় আসত, কিন্তু ফিতনা সৃষ্টিকারী মূল অপরাধীরা আরও বেশি আত্মগোপনে চলে যেত এবং পরবর্তীতে অন্য কোনো রূপে বিশৃঙ্খলা ছড়াত।

মোটকথা, হযরত উসমান (রা.)-এর কিসাসের ক্ষেত্রে তাড়াছড়ো করা কেবল শরয়ী ও আইনি সতর্কতার পরিপন্থী এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিপজ্জনকই ছিল না, বরং এমনটি করা স্বয়ং মজলুম শহীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যেরও পরিপন্থী হতো। তাই হযরত আলী (রা.) চেয়েছিলেন কিসাস এমন সময়ে এবং এমন পরিবেশে গ্রহণ করা হোক যখন মূল অপরাধীদের আত্মগোপন করার কোনো সুযোগ না থাকে এবং সরকারি বিচারিক সিদ্ধান্তের সামনে কারও অস্বীকার করার সাহস না হয়। হযরত আলী (রা.) মানবীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, এ জাতীয় আন্দোলন, বিপ্লব এবং জোশ-খরোশের লক্ষ্যহীন প্রদর্শনীগুলোর উত্তেজনা সাময়িক হয়। এই সময়ে যদি অপর পক্ষ আবেগপ্রবণ আচরণে প্রজ্ঞার পরিপন্থী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে ফিতনাবাজ গোষ্ঠী সেই পদক্ষেপকে নতুন অজুহাত বানিয়ে আরও অনিষ্ট ছড়াতে শুরু করে। কিন্তু যদি বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা হয়, তবে অবুঝ জনসাধারণের সাময়িক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায় এবং অন্তঃসারশূন্য স্লোগানের ওপর সমবেত হওয়া লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন অবস্থার অপেক্ষা করে তাদের ওপর হাত দেওয়া সহজও হয় এবং এতে জননিরাপত্তা বজায় থাকার নিশ্চয়তাও বেশি থাকে।

উসমানের কিসাস সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চারটি দল:

হযরত আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের ক্ষেত্রে তখন সেই অবস্থাই ছিল যা নবীজির ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ছিল। বাকি সবাই আবেগে বিহ্বল ছিলেন, যেখানে হযরত আলী (রা.) শক্ত পাহাড়ের মতো অটল ছিলেন। তিনি আবেগের উর্ধ্বে উঠে শরীয়ত, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার লাগাম ধরে রেখেছিলেন; তাঁর কর্মপন্থা সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে ছিল। অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া ছিল আবেগের তীব্রতায় ভরা, তাই তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর কর্মপন্থা বুঝতে পারেননি।

অতঃপর তাঁদের মধ্য থেকে এক দল হযরত আলী (রা.)-এর কথা মেনে নিলেন, এক দল বাইয়াত গ্রহণ করে নির্জনতা অবলম্বন করলেন, এক দল বাইয়াত গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইনসাফের জন্য সশস্ত্র পথ বেছে নিলেন এবং এক দল বাইয়াত স্থগিত রাখলেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরামের চারটি দল তৈরি হলো। প্রত্যেকেই উম্মাহর কল্যাণকামী ও মুখলিস ছিলেন। কারও সামনে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

১. প্রথম দল ছিল হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর নীতির সাথে পূর্ণ একমত পোষণকারী ব্যক্তিবর্গ, যারা কিসাসের গুরুত্ব স্বীকার করতেন কিন্তু এর আগে কিসাসের বিষয়টি পূর্ণ তদন্ত, সরকারের স্থিতিশীলতা এবং মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে অপরিহার্য মনে করতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আশ্মার বিন ইয়াসির, হযরত উসমান বিন হানিফ, হযরত সাহল বিন হানিফ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন এবং হযরত কাকা বিন আমর (রা.) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২. দ্বিতীয় দল ছিল সেই সব ব্যক্তিবর্গ যারা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের অভিমত ছিল যে, হযরত আলী (রা.)-এর উচিত অবিলম্বে সমস্ত বিদ্রোহীদের কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করা। আর যদি তিনি এতে অপারগ হন তবে আমরা নিজেরাই অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। এটি হযরত তালহা, হযরত যুবাইর এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর অভিমত ছিল।

৩. তৃতীয় দলের নিকট হযরত উসমান (রা.)-এর কিসাস বায়আতের চেয়েও অগ্রগণ্য ছিল। তাঁদের মতে সমস্ত বিদ্রোহীদের কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করা ছাড়া হযরত আলী (রা.)-এর নিজের অবস্থানই সন্দেহজনক ছিল। তাই তাঁদের দাবি ছিল যে, হযরত আলী (রা.) কিসাস গ্রহণ করলে তবেই তাঁর হাতে বায়আত করা হবে, অন্যথায় নয়। এটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং সিরিয়াবাসীদের অভিমত ছিল।

৪. চতুর্থ দল ছিল তারা যারা মুসলমানদের পারস্পরিক রাজনৈতিক বিবাদ ও ফিতনা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যাতে তাদের জিহ্বা ও হাত দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেওয়ার উপক্রম না হয়। আশারায় মুবাশশারার মধ্য থেকে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), এছাড়া হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং উসামা বিন যায়েদ (রা.) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী এই অভিমত পোষণ করতেন। [১]

এই ব্যক্তিবর্গের সামনে ফিতনা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই হাদীসগুলো ছিল যাতে এমন পরিস্থিতিতে নীরবতা ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর মতো প্রখ্যাত তলোয়ারধারী সেই দিনগুলোতে নিজের তলোয়ার ভেঙে মদীনা থেকে দূরে “রাবযা” নামক পল্লীতে তারু খাটিয়ে নির্জনবাস শুরু করেছিলেন। যদি কেউ তাঁকে গিয়ে লোকদের বোঝানোর কথা বলত, তবে তিনি বলতেন: “নবী করীম (সা.) আমাকে বলেছিলেন যে, যখন বিভেদ, ফিতনা ও মতপার্থক্য দেখা দেবে তখন নিজের তলোয়ার ভেঙে ফেলবে, ধনুকের ছিলা কেটে ফেলবে এবং ঘরে বসে থাকবে, আমি তাই করেছি।” [২]

[১] এছাড়া হযরত সুহাইব রুমী, হযরত আবু মুসা আশআরী, হযরত হাসান বিন সাবিত, হযরত বুরাইদা বিন হাসীব, হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা, হযরত খুজাইমা বিন আবদুল্লাহ, হযরত সালামা বিন আকওয়া, হযরত কা'ব বিন মালিক, হযরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, হযরত মুয়াবিয়া বিন খাদীজ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হযরত নুমান বিন বশীর, হযরত যায়েদ বিন সাবিত, হযরত রাফে বিন খাদীজ, হযরত ফাদালা বিন উবাইদ, হযরত আবু বারযা এবং হযরত কা'ব বিন আজরা (রা.) রাজনৈতিক সংঘাত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের অধিকাংশ শেষ জীবন পর্যন্ত এই নীতির ওপর অটল ছিলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা বায়আতও করেননি। সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় অবস্থানকারী অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কার্যত তাঁকে সাহায্য করেননি। (আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃ. ১৫০) এমন কিছু লোকও ছিল যারা বায়আত করেনি।

তবে এর সাথে সাথে হাদীসের বহু বর্ণনা সাক্ষী যে, বায়আতে বিরত থাকা বা নির্জনবাস অবলম্বনকারী ব্যক্তিবর্গ পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.)-এর অভিমতকে সঠিক মনে করেছেন এবং নিজেদের ভুলের কথা স্বীকার করেছেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) পরবর্তীতে বলতেন: “আল্লাহর কসম! আমি একটি রায়ের ওপর ছিলাম যাতে আমি ভুল করেছি।” (মুসতাদরাক হাকেম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৪৬০১) একইভাবে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-ও নিজের অবস্থানকে ভুল মনে করে শেষ জীবনে এর জন্য আফসোস করতেন যা প্রমাণিত। “মা আসী আলা শাইয়িন ইল্লা আরী লাম উকাতিল মাতা আলী আল-ফিয়াতাল বাঘিয়া।” (মুসতাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃ. ৫৩৬)

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬০২৯।

দ্বিতীয় খণ্ড | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

যেহেতু ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে সাধারণত অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের উল্লেখ থাকে না, তাই হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর প্রবীণ সাহাবীদের এই দলটির উল্লেখ বিরল হয়ে পড়ে, যদিও এই ব্যক্তিবর্গ এর পরেও বহু বছর জীবিত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো ইলমি ব্যস্ততা, জিকির-আজকার, ইবাদত এবং দ্বীনি খিদমতে। এই কারণেই হাদীস ও ফিকহের ভাণ্ডারে তাঁদের নাম জীবিত রয়েছে। এটিই আল্লাহর ইচ্ছা যে, একটি দল শরীয়ত সংরক্ষণের জন্য নিবেদিত থাকবে এবং এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.)-এর অস্থিরতা এবং হযরত আলী (রা.)-এর পরামর্শ:

মদীনার প্রবীণ সাহাবীগণ, বিশেষ করে হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.), হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও কিসাসের (প্রতিশোধ) বিষয়ে অত্যন্ত অস্থির ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁর বাধ্যবাধকতাগুলো বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আসলেন এবং বিদ্রোহীদের অবাধে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। আমীরুল মুমিনীন বিজ্ঞোচিত ভঙ্গিতে বললেন: “দেখুন! এরা সেই সব লোক যাদের সাথে সাধারণ মানুষের গোলাম ও বেদুঈনরাও যোগ দিয়েছে এবং তারা আপনাদেরকে সেভাবেই নিয়ন্ত্রণে রেখেছে যেভাবে তারা চেয়েছে। বলুন তো, আপনারা যা দাবি করছেন তার ওপর কি আপনাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে?”

উভয় ব্যক্তিই নেতিবাচক উত্তর দিলেন। আমীরুল মুমিনীন তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি এর একটি সমাধান দেখতে পাচ্ছি, যা ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখতে পাবেন।”

হযরত আলী (রা.) ইঙ্গিত দিয়ে বললেন: “এই কিসাসের বিষয়টি যদি এখনই তোলা হয়, তবে মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিছু লোক আপনাদের মতের অনুসারী হবে, কিছু লোক বিরোধিতা করবে এবং কিছু লোক আপনাদের সাথেও থাকবে না আবার বিরোধীদের সাথেও থাকবে না। মানুষকে শান্ত হতে দিন এবং অন্তরগুলোকে স্থির হতে দিন।” [১]

এর অর্থ ছিল এই যে, পরিস্থিতি এখন উত্তাল, মানুষের কান নতুন নতুন খবরের অপেক্ষায় রয়েছে। এমন অবস্থায় যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে ফিতনাবাজরা আগের মতোই গুজব ছড়াবে এবং প্রোপাগান্ডা ও কারসাজির মাধ্যমে ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে ফিতনা সৃষ্টি করা এত সহজ হবে না। ইতিহাস সাক্ষী যে, আমীরুল মুমিনীনের এই আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

দাঙ্গাকারী ও মাওয়ালীদের মদীনা থেকে বহিষ্কার:

মদীনা মুনাওয়ারায় সমবেত ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাধারণ গ্রাম্য লোক, মুর্থ এবং গোলাম ছিল যারা ফাসাদ সৃষ্টি ও লুটপাটের আশায় মদীনায় এসেছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য হযরত আলী (রা.) তাদের অবিলম্বে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের কারো ওপর কোনো ব্যক্তিগত অপরাধ আরোপ করেননি, যাতে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায় এবং তাদের দলবদ্ধতা ভেঙে যায়। ফলে তাদের একটি বড় অংশ নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেল। কুফা, বসরা ও মিসরের বিদ্রোহীরাও অধিকাংশ ফিরে গেল। মদীনায় কেবল সাবায়ীদের একটি দল রয়ে গেল, যারা সাদাতদের নেতৃত্বের বিশেষ দাবিদার ছিল। [২]

[১] তারিখ আল-তবারী: ৩/৪৭৭, সায়িফ থেকে বর্ণিত।

[২] তারিখ আল-তবারী: ৩/৪৩৮, সায়িফ থেকে বর্ণিত।

হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর ইরাক থেকে সৈন্য ডাকার পরামর্শ:

এই দিনগুলোতে হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরামর্শও করেন। হযরত তালহা বসরা থেকে এবং হযরত যুবাইর (রা.) কুফা থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন যাতে সেখান থেকে সৈন্য এনে খিলাফতের আসনকে মজবুত করা যায় এবং ফিতনাকারীদের ভীত করা যায়। হযরত আলী (রা.) অনুমতি দেননি, শুধু এতটুকু বললেন: “আমি ভেবে বলব।” [১]

আসলে কুফা ও বসরা থেকে সাময়িকভাবে সৈন্য তলব করা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট সমস্যার সমাধান ছিল না। যদি মদিনায় স্থায়ী সৈন্য রাখা হতো তবে এই শহরটি একটি সামরিক ছাউনিতে পরিণত হতো। এভাবে মদিনায় সৈন্যদের প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার জন্য অনেক বিধিনিষেধ ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এই কারণেই হযরত উসমান (রা.) মদিনায় রাজকীয় সৈন্য মোতায়েন করার ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এই একই বাস্তবতা হযরত আলী (রা.)-এর সামনেও ছিল।

ইরাকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হলো?

হযরত আলী (রা.) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মদিনায় সৈন্য রাখার পরিবর্তে কোনো সামরিক কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করে সেটাকেই রাজধানী বানানো উপযুক্ত। এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা ছিল ইরাক যেখানে বসরা ও কুফা নামক দুটি কেন্দ্র কাছাকাছি ছিল।

ইরাকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই চিন্তাও কাজ করছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন যেন পুনরায় না ঘটে। ভবিষ্যতে যদি কোনো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং মদিনায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তবে যেন এই পবিত্র শহরের পবিত্রতা পুনরায় ক্ষুণ্ণ না হয়। এই শহরের পবিত্রতা, মর্যাদা ও সম্মানের দাবি ছিল একে সম্পূর্ণভাবে একটি “ধর্মীয় কেন্দ্র” হিসেবে রাখা হোক এবং একে রাজনৈতিক বিষয়াদি থেকে আলাদা করে দেওয়া হোক, যা যেকোনো সময় যুদ্ধ ও বিবাদের রূপ ধারণ করতে পারে।

এই সিদ্ধান্তে এই হিকমতও ছিল যে, দূরবর্তী রণাঙ্গনগুলোতে ইসলামী বাহিনী গঠন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হবে। একটি বিশ্বব্যাপী খিলাফতের রাজনৈতিক কাঠামো এবং শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য মদিনার মতো মরুবেষ্টিত ও বিচ্ছিন্ন স্থানের পরিবর্তে কুফার মতো সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা নিশ্চিতভাবেই বেশি উপকারী ছিল। তবে কুফায় স্থানান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য হযরত আলী (রা.) উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। [২]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩৮, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[২] এই সম্ভাবনা দেওয়া যেতে পারে যে, হযরত আলী (রা.)-কে কুফায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আমীর যেমন আশতার নাখয়ি এবং সাবায়ীদের পরামর্শের প্রভাবও থাকতে পারে, কিন্তু লেখকের কাছে এর প্রমাণে কোনো সহীহ বর্ণনা পৌঁছেনি। কেবল একটি যয়ীফ (দুর্বল) বর্ণনা রয়েছে যাতে হযরত হাসান (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন: *فلا كنت نهاك عن هذا المسير، فليكن على ذلك فلا وفلا*। “আমি আপনাকে এই সফর থেকে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু আপনার রায়ের ওপর অমুক অমুক ব্যক্তি প্রবল হয়ে গেছে।” (মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৫৫)। কিন্তু এই বর্ণনায় সাহাবীদের ওপর অনেক অপবাদ রয়েছে। হাফেজ যাহাবী (রহ.) এর বর্ণনাকারী বাশার বিন মুসাকে “ওয়াহ” (অত্যন্ত দুর্বল) সাব্যস্ত করেছেন। হযরত আলী (রা.)-এর হিকমত ও প্রজ্ঞা কোনো দলিলের মুখাপেক্ষী নয়; সাবায়ীদের একটি ক্ষুদ্র দলের ইশারায় হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সাথে থাকা শত শত মর্যাদাবান সাহাবী ও তাবয়ীদের পরিচালিত হওয়া একটি অবিশ্বাস্য বিষয়। কুফা যেখানে হযরত আলী (রা.) যাচ্ছিলেন, সেখানে সাবায়ী দলের লোক অবশ্যই ছিল কিন্তু তারা ছিল সংখ্যালঘু। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মক্কা ও মদিনা সাহাবী ও তাবয়ীদের কেন্দ্র ছিল। কুফার ফিতনা কুফায় হয়নি; কুফাবাসীদের প্রশংসা হযরত আলী (রা.)-এর সেই পত্রেও পাওয়া যায় যা সামনে মূল পাঠে উদ্ধৃত করা হবে, যা থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে হযরত আলী (রা.) নিজের সিদ্ধান্তেই সেখানে যাচ্ছিলেন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত আলী (রা) বিদ্রোহীদের কেন পদমর্যাদা দিয়েছিলেন?

হযরত আলী (রা) এটাও চেয়েছিলেন যে, যারা মদিনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল, তারা যেন কোনো গোলযোগের অংশ হতে না পারে। এর একমাত্র উপায় হতে পারত তাদের জাতীয় ধারার সাথে সম্পৃক্ত রাখা, শরয়ী সীমা পর্যন্ত তাদের অতীতকে উপেক্ষা করা, তাদের বিভিন্ন অভিযানে শরিক করা এবং দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের ওপর আস্থা প্রকাশ করা। আমরা হযরত আলী (রা)-কে প্রতিটি অভিযানে এই কৌশলের ওপর অটল থাকার জোরালো প্রমাণ পাই।

হযরত উসমান (রা)-এর আমলদের (গভর্নরদের) কেন বরখাস্ত করা হয়েছিল?

হযরত আলী মুরতজা (রা)-এর সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হযরত উসমান গনি (রা)-এর আমলের শাসকদের বরখাস্ত করা নাকি বহাল রাখা। এ বিষয়ে হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা) আপনাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন: “আপনি হযরত মুয়াবিয়া, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির এবং হযরত উসমান গনি (রা)-এর অন্যান্য গভর্নরদের তাদের পদে বহাল থাকতে দিন। যখন তারা এবং তাদের সেনাবাহিনী আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে এবং বায়আতের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে, তখন আপনি চাইলে তাদের পরিবর্তন করবেন, আর চাইলে বহাল রাখবেন।” হযরত আলী (রা) তখনও অস্বীকার বা স্বীকার কোনোটিই করেননি। শুধু বললেন: “আমি ভেবে দেখব।”

পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-ও একই ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা) তা গ্রহণ করেননি। [১]

হযরত মুগীরা (রা)-এর পরামর্শ নিজ জায়গায় সম্পূর্ণ সঠিক এবং কৌশলগত ছিল, কারণ কোনো প্রতিষ্ঠানে এমন হয় না যে নতুন প্রধান আসার সাথে সাথেই পূর্ববর্তী সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা) তাদের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্তের নিম্নলিখিত কারণগুলো বোঝা যায়:

- প্রতিটি সরকারের মতো খিলাফতে রাশেদাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও জনশক্তি এবং জনআস্থার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে সেই সব লোকদের আস্থা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ছিল যারা প্রথমবারের মতো বনু হাশিমের হাতে ক্ষমতা আসায় আনন্দিত ছিল। তাদের মধ্যে এমন কিছু সর্দারও ছিল যারা হযরত উসমান (রা)-এর গভর্নরদের কাছ থেকে পদগুলো নিজেরা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, কারণ তারা তাদের ধন-সম্পদ ও পদের লালসা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

হযরত আলী (রা) তাদের চালগুলো বুঝতেন কিন্তু অসচেতনতার ছাপ দিতে চাননি। তাই আপনি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন যে, হযরত উসমান (রা)-এর আমলদের বরখাস্ত করে তাদের স্থলে অন্য সাহাবীদের নিযুক্ত করলেন। এভাবে গোত্রীয় সর্দাররাও এক পর্যায়ে সন্তুষ্ট হলো যে তাদের কথা মানা হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি শাসনব্যবস্থা সাহাবীদের হাতেই থাকল এবং তা তাকওয়া ও আমানতদারির ওপর প্রতিষ্ঠিত রইল। [২]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৮... মুগীরা বিন শুবা (রা) এরপর কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করেই নিজ দেশে চলে যান। তাহকীমের ঘটনার পর তিনি শামে পৌঁছে সেখানকার সরকারে যোগ দেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/৩৫৮; কায়স বিন সাদ (রা); সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৩/২৯; মুগীরা বিন শুবা (রা))।

[২] হযরত আলী (রা) আবু মুসা আশআরী (রা)-কে কিছুকাল কুফায় বহাল রাখেন। (আনসাব আল-আশরাফ: ২/৩৩০) জঙ্গ জামালের আগে কারজাহ বিন কাব আনসারী (রা)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। জঙ্গ সিফফীনের আগে এই দায়িত্ব আবু মাসউদ আনসারী (রা)-কে অর্পণ করেন... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার হাশিয়ায়)।

(২) আপনি হযরত উসমান (রা.)-এর গভর্নরদের পক্ষ থেকে এই আশঙ্কা করছিলেন যে, তারা পূর্ববর্তী খলিফার প্রতি তাদের অসাধারণ ভালোবাসা এবং তাঁর বেদনাদায়ক শাহাদাতের কারণে অসহনীয় দুঃখ ও শোকের বশবর্তী হয়ে কোনো আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত বা হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বসেন, যার ফলে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘিত হয় অথবা তারা অপরাধীদের আশ্রয়দাতা হয়ে যান বরং অপরাধীদের আরও প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

(৩) দুষ্কৃতকারীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে হযরত আলী (রা.)-এর পূর্ণ হাত রয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নররা যারা ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিলেন, তারা এই গুজব দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেননি। [১] এমন পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.) নিশ্চিত ছিলেন যে, পূর্ববর্তী সরকারের গভর্নরদের ওপর আস্থা রাখা সম্ভব হবে না এবং শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই আপনি সিরিয়া ও ইরাকের বর্তমান সকল গভর্নরকে বরখাস্ত করার আদেশ জারি করে সেই সব লোকদের নিযুক্ত করলেন যাদের ওপর আপনার আস্থা ছিল। এতে পূর্ববর্তী গভর্নরদেরও পরীক্ষা হয়ে যেত যে তারা আপনার অনুগত কি না। যদি তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতো, তবে তাদের রদবদল করে দায়িত্ব দেওয়া যেত।

কিন্তু আপনার আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হলো। গভর্নরদের বরখাস্তের আদেশ পৌঁছানোর আগেই সিরিয়া, মিশর ও ইরাকে গুজবের বাজার গরম হয়ে গিয়েছিল। অনেক লোক বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে হযরত আলী (রা.)-ই হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষক ও নেতা এবং মদিনায় যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তা তাঁরই ইশারায় হয়েছে। সেই দিনগুলোতে এই গুজবের তীব্রতা কতটা ছিল, তার আন্দাজ কেবল এ থেকেই করা যায় যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), যিনি মক্কায় ছিলেন, এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে হযরত উসমান (রা.)-কে অবরোধকারী মিশরীয়রা হত্যা করে ফেলেছে (অথচ বাস্তবতা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত)। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এই সংবাদে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তবে কিছুক্ষণ পর তিনি অন্য সূত্রের মাধ্যমে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের খবর পেলেন। তখন উম্মুল মুমিনীন (রা.) বললেন: “আশ্চর্য লোক সে, নিহতের ওপর হত্যাকারী হওয়ার অপবাদ দিচ্ছে।” [২]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ) — যে খালিদ বিন আস (রা.)-এর স্থলে প্রথমে আবু কাতাদা আনসারী (রা.) এবং পরে উসমান বিন আব্বাস (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইয়েমেনে সুমামাহ বিন আদি (রা.)-এর স্থলে ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ওমরা বিন আব্দুল্লাহ বিন আমের (রা.)-কে বরখাস্ত করে হানান বিন হানিফ (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যাকে জঙ্গ জামালের পর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল।

(তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০১, ২০০)

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের স্থলে আপনি অন্যদের নিযুক্ত করেছিলেন, যাদের মধ্যে একদল লোক ছিল যারা পদ ও মর্যাদার লোভী এবং উদ্দেশ্য হাসিলে তৎপর ছিল। আশতার নাখয়ী শেষ পর্যন্ত আশা করেছিল যে অন্তত কুফার গভর্নরশিপ সে পাবে, কিন্তু যখন হযরত আলী (রা.) সেখানেও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে নিযুক্ত করলেন, তখন আশতার নাখয়ী ভরা মজলিসে এক বিদ্রোহী হুসির সাথে বলল: “আমরা জানি না কেন আমরা সেই বৃদ্ধকে মদিনায় হত্যা করলাম?” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৭, পৃ. ৪৭৭, ৪৭৮, তরিকুল ইরশাদ) অর্থাৎ এই অকৃতজ্ঞ দলটি অন্যায়ভাবে রক্তপাত করেছিল এবং তাদের হাতে কিছুই আসেনি।

(বর্তমান পৃষ্ঠার পাদটীকা)

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩৩, ইবনে সাবা... ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: الشام انه شارك في دم عثمان. “নিশ্চয়ই কিছু লোক সিরিয়াবাসীদের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তিনি উসমানের রক্তে (হত্যাকাণ্ডে) শরিক ছিলেন।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৩০৭) কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এই দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে হাজ্জাজ বিন খুজাইমাহ নামক এক ব্যক্তি ছিল, যে মদিনা থেকে সিরিয়ায় গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে এই কবিতা পাঠ করেছিল: هم قتلوا شيخكم بغير الكذب. (নিশ্চয়ই তোমার চাচাতো ভাই আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানরা... তারাই তোমাদের বৃদ্ধকে হত্যা করেছে, এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।) (আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৫৫)

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৩৯, আমর বিন শাব্বাহ ও সাইফ বিন উমর থেকে।

ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর চাল সফল:

গুজব রটনাকারীরা ছিল সেই সব লোক যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিভক্তির মধ্যেই নিজেদের সাফল্য দেখতে পেত। [১] তারা বিষয়টিকে বাড়িয়ে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাতে এবং খিলাফতকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিল। এ পর্যন্ত বড় বড় সাহাবীগণ এ ধরনের প্রতিটি চাল ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং উম্মত কোনো বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর রক্তের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারী উপাদানগুলো এমন একটি অজুহাত পেয়ে গেল যার সম্পর্কে উস্কানিমূলক গুজব ছড়িয়ে তারা মুসলমানদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াতে সফল হয়ে গেল। ইরাক, সিরিয়া এবং মিশরের সাহাবী ও তাবিঈগণ নিজেদের মর্যাদা ও অবস্থান সত্ত্বেও অদৃশ্যের জ্ঞানী (আলীমুল গায়ব) ছিলেন না যে দূরে বসে সব জায়গার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। ফলে সেখানে সন্দেহ ও সংশয়ের পরিবেশ তৈরি হলো এবং এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত হলো যে, হযরত আলী (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তাঁর ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আস্থা রাখা যায় না যতক্ষণ না তিনি উসমান হত্যার ব্যাপারে নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ পেশ করেন। আর এই প্রমাণ কেবল এভাবেই দেওয়া সম্ভব যে তিনি যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

এর ফল এই দাঁড়ালো যে, হযরত আলী (রা) কর্তৃক প্রেরিত কর্মকর্তাদের সিরিয়া ও কুফা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হলো। অন্যদিকে মিশরের নতুন গভর্নর হযরত কায়স বিন সাদ (রা) কিছু অসুবিধার পর সেখানে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলেন, কারণ কিছু লোক তাঁর সমর্থক ছিল এবং কিছু বিরোধী। হযরত উসমান বিন হুнайফ (রা) কোনো বাধা ছাড়াই বসরায় পৌঁছে শাসনভার গ্রহণ করেন, তবে এখানেও জনমত ছিল দ্বিধাবিভক্ত। [২]

হযরত তালহা ও জুবাইর (রা)-এর হযরত আলী (রা)-এর সাথে আলোচনা এবং উমরাহ সফরের অনুমতি:

হযরত আলী (রা) এই অবস্থা দেখে হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন:

“আমি যে বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছিলাম তা সামনে চলে এসেছে। ফিতনার উদাহরণ আগুনের মতো, একে যত উস্কানি দেওয়া হয় ততই তা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।”

এর অর্থ ছিল কেন্দ্র থেকে মানুষকে বিমুখ করার যে আশঙ্কা ছিল, তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কিসাস (প্রতিশোধ) নেওয়ার কোনো তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা ফিতনার আগুনকে আরও উস্কে দেওয়ার নামান্তর হবে। কিন্তু হযরত তালহা ও জুবাইর (রা) সন্তুষ্ট হতে পারলেন না এবং আপনার কাছে এই সমস্যাটি নিজেদের মতো করে সমাধান করার অনুমতি চাইতে লাগলেন। হযরত আলী (রা) বললেন:

“যতক্ষণ সম্ভব হবে আমি এ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করব। হ্যাঁ, যদি কোনো উপায় না থাকে তবে দাগ দেওয়া (কঠোর ব্যবস্থা) হলো শেষ চিকিৎসা।” [৩]

সবশেষে হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা) উমরাহ সফরের অনুমতি চাইলে আপনি (রা) তাঁদের বাধা দিলেন না। [৪]

[১] পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্দেশ করে যে ষড়যন্ত্রকারী উপাদানগুলো সিরিয়াতেও সক্রিয় ছিল এবং সম্ভবত ইবনে সাবা সিরিয়ায় কিছুটা ভিন্ন রূপের বীজ বপন করছিল। তবে ষড়যন্ত্রকারী ও ফিতনাবাজ লোকেরা হযরত আলী (রা) সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগগুলোকে এমনভাবে প্রচার করেছিল এবং সিরিয়াবাসীদের তাঁর ওপর আস্থা রাখা থেকে বিরত রেখে যুদ্ধংদেহী করে তুলেছিল।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/২৪২, সূত্র: সাইফ।

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৩৩, সূত্র: সাইফ। হযরত আলী (রা)-এর এই কথাগুলোর মধ্যে এই ইঙ্গিত ছিল যে, শরয়ী আইনে যতটুকু নমনীয়তা থাকবে তা দেওয়া হবে, কিন্তু যেখানে শরয়ী অবকাশ শেষ হয়ে যাবে সেখানে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৩৩, সূত্র: সাইফ।

সিরিয়াবাসীদের থেকে বায়াত গ্রহণের আরও একটি প্রচেষ্টা:

এই সময়ে হযরত আলী (রা.) দূত পাঠিয়ে সিরিয়াবাসীদের থেকে বায়াত গ্রহণের আরও একটি প্রচেষ্টা চালান। তারা জবাবে যে খামটি পাঠিয়েছিল তাতে একটি সাদা কাগজ ছিল, যা এই ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে তারা কোনো বিষয়েই উদ্যোগ নিতে চায় না। তাদের দূত হযরত আলী (রা.)-কে জানান যে, সিরিয়াবাসীরা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার কিসাস (প্রতিশোধ) দাবি করছে। দূতের শব্দগুলো ছিল: “আমি ষাট হাজার মানুষকে হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তমাখা জামার পাশে কাঁদতে রেখে এসেছি, যারা শহীদের রক্তের বদলা নেওয়ার দাবি করছে।” [১]

দূতের কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট ছিল যে, সিরিয়ায় হযরত আলী (রা.) উসমানের হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার গুজবটি দৃঢ় বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। তাই হযরত আলী (রা.) তখনই নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে এই জঘন্য অপরাধ থেকে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করেন এবং বলেন: “হে আল্লাহ! আমি তোমার সামনে উসমানের রক্ত থেকে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করছি।” [২]

কিন্তু সিরিয়াবাসীদের সান্ত্বনা হলো না। সেখানে এক আবেগঘন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তমাখা জামা এবং হযরত নায়লা (রা.)-এর কাটা আঙুলগুলো দামেস্কের জামে মসজিদে বুলিয়ে রাখা হয়েছিল এবং মানুষ হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তলোয়ার শান দিচ্ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পূর্ণ আন্তরিকতা এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতির সাথে এটি মনে করতেন যে, উসমানের হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে উম্মত তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। তিনি এই বিষয়ে নিজের দায়িত্ব বেশি অনুভব করতেন, প্রথমত এই কারণে যে তিনি মজলুম শহীদের নিকটাত্মীয় এবং বনু উমাইয়ার পারিবারিক প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, নিজের কাছে থাকা শক্তি ও সামর্থ্যের কারণে তিনি অনুভব করতেন যে, যদি হযরত আলী (রা.) কিসাস গ্রহণ না করেন, তবে যে মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে, তাদের উচিত এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা। [৩]

মক্কা মুকাররমায়ও প্রায় একই রকম পরিস্থিতি ছিল, যেখানে হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.) পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে উসমানের হত্যাকারীদের দমনের জন্য পরামর্শ করছিলেন। তারা হযরত আলী (রা.)-এর নীরবতা ও দ্বিধাগ্রস্ত কৌশলের সাথে একমত ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল যে, যত দেরি হবে, অপরাধীরা তত হাতের বাইরে চলে যাবে। গুজব রটনাকারীরা এই মহান ব্যক্তিদের সামনে এই গুজবও ছড়িয়েছিল যে, হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিলেন। [৪] এমন পরিস্থিতিতে এই ব্যক্তিদের জন্য কিসাসের বিষয়টি হযরত আলী (রা.)-এর ওপর ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৩৩, ৩৩৪

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৪৩, সাযিফ থেকে বর্ণিত

[৩] কিছু লোক শিয়া বর্ণনাকারী সুলাইম ইবনে কায়েসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, হযরত উসমান (রা.)-এর বড় সাহেবজাদা আবান ইবনে উসমানও সিরিয়াবাসীদের সাথে ছিলেন। (কিতাব সুলাইম ইবনে কায়েস আল-হিলালী: ৪৩৮) এই উদ্ধৃতিকে ক্ষতিকর ও আক্রমণাত্মক আপত্তি হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে, তবে স্বয়ং সুলাইম ইবনে কায়েস এবং তার বইয়ের কোনো গুরুত্ব নেই। রাফেজিরা সুলাইম ইবনে কায়েসকে প্রথম হিজরি শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত তাবেয়ী হিসেবে উপস্থাপন করে এবং তার বইকে প্রথম ইসলামি বই হিসেবে গণ্য করে, যদিও সুলাইম ইবনে কায়েস নামের কোনো ব্যক্তির উল্লেখ তাবেয়ী এমনকি তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। তার বইটি নিশ্চিতভাবেই রাফেজিরা অনেক পরে জাল করেছে, যার প্রমাণ হলো এতে হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর ওপর প্রকাশ্য তাবাররা (নিন্দা) রয়েছে যা শিয়াদের মধ্যে তৃতীয়-চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে প্রচলিত হয়েছিল। প্রথম হিজরি শতাব্দীতে হাতেগোনা কয়েকজন সাবায়ী গোপনে এমনটি করত।

[৪] কিছু লোক তাদের সামনে এমন চিত্র তুলে ধরেছিল যে আলী উসমানের হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিলেন। (আল-ইতিকাদ লিল-বায়হাকী, পৃ. ৪৭১)

দ্বিতীয় অংশ | তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এই মহান ব্যক্তিদের জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর মজলুমানা শাহাদাত এমন এক তীব্র আঘাত ছিল যা সহ্য করা পাহাড়ের পক্ষও সম্ভব ছিল না। হযরত উসমান (রা.)-এর অবরোধের সময় তারা তাঁর যথাযথ সাহায্য করতে পারেননি। সম্ভবত সেই সময়ের পরিস্থিতির উত্তাল তরঙ্গে তাদের পক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং বিশেষ করে হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে হাত গুটিয়ে রাখার নির্দেশের পর তারা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু এখন তারা তীব্র অনুশোচনা বোধ করছিলেন যে, তারা হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিরক্ষায় কিছুই করতে পারেননি।

হযরত তালহা (রা.) বলতেন: “আমরা উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে (বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) নীরবতা অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু এখন জরুরি যে আমরা কঠোরতা অবলম্বন করি।” [১] কখনো বলতেন: “উসমান (রা.)-এর বিষয়ের সমাধানের পথ তাঁর কিসাসের চেষ্টায় আমার রক্ত ঝরানো ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারছি না।” [২]

কখনো বলতেন: “হে আল্লাহ! আমার শরীরের সমস্ত রক্ত কি উসমানের এক ফোঁটা রক্তের বদলা হতে পারবে?” [৩]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর অবস্থাও একই ছিল, যিনি হজ থেকে ফেরার পথে মদিনা যাওয়ার সময় হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের খবর পেয়েছিলেন। তিনি মক্কায় ফিরে এসেছিলেন এবং এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। তিনি হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর চিন্তা ও পরিকল্পনায় শরিক হলেন এবং মসজিদে হারামের চত্বরে পর্দা টাঙিয়ে মুসলমানদের সমাবেশে ভাষণ দিলেন, যাতে উসমানের হত্যাকারীদের তীব্র সমালোচনা করে বললেন:

“যখন এই লোকদের কাছে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত ও দলিল রইল না, তখন তারা প্রকাশ্যে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হলো এবং উসমান (রা.)-এর রক্ত ঝরিয়ে দিল, মদিনার হারামের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করল, অবৈধ লুটতরাজ চালাল এবং জিলহজ মাসের মতো সম্মানিত মাসের অবমাননা করল। আল্লাহর কসম! তাদের মতো লোকে যদি সারা পৃথিবী ভরে যায়, তবুও উসমান (রা.)-এর একটি আঙুল তাদের চেয়ে উত্তম। নাজাতের পথ এটাই যে, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দাও।” [৪]

এই প্রভাবশালী ভাষণ মক্কা মুকাররমায় কিসাসের আন্দোলনকে শক্তিশালী করল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক, আর মূল নেতা ছিলেন হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)। হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কুফা বা বসরায় গিয়ে সেখানে নিজেদের ভক্ত ও সমমনা সাথীদের একত্রিত করা হবে। [৫]

এই মহান ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য ছিল জনমত গঠন এবং সামরিক সংহতির মাধ্যমে এমন এক পরিবেশ তৈরি করা যাতে ফিতনাবাজদের মনোবল ভেঙে যায় এবং জালেমদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়। যদিও এই ধরনের সংগ্রামে কোনো পর্যায়ে...

[১] من المبالغة (মুসাম্মাফ ইবনে আব্বা শায়বাহ, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৬৮১; মাসির আয়েশা ওয়া আলী ওয়া তালহা ওয়া যুবাইর; সহিহ সনদে, তাবারানি; ইবনে জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তালহা (রা.) বলেছেন: আল্লাহ উসমানের পক্ষ থেকে লোকদের ফিরিয়ে দেননি, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের থেকে তাঁর হক আদায় না করে ছাড়বেন না। (তারিখুত তাবারী: ৩/৫০৫, সহিহ সনদে); ইমাম যাহাবী বলেন: যারা উসমানের ব্যাপারে অবহেলা করেছিল এবং পরে লজ্জিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৫১, তাবারানি)।

[২] كان مني في امر عثمان ... (মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫৬৯৫, সহিহ সনদে)।

[৩] আনবাবুল আওয়াম বিন হাওশাব বলেন, তালহা (রা.) বলেছেন: হে আল্লাহ! আমার সমস্ত রক্ত কি উসমানের এক ফোঁটা রক্তের বদলা হতে পারবে? (তারিখুল মদিনা, ইবনে শাব্বাহ: ৩/১১৬৯)।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৩৮, ৩৩৯, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৪৯, ৩৫০, সাইফ থেকে বর্ণিত।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

সরকারের সাথে সংঘর্ষের উপক্রম হওয়া মোটেও অসম্ভব ছিল না, তবে হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.) যথাসম্ভব সরকারের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তখনও হযরত আলী (রা.)-কে মুসলমানদের শরয়ী আমির মনে করতেন এবং অন্যদেরও তা করতে তাকিদ দিচ্ছিলেন। বসরার প্রধান আহনাফ বিন কায়েস যখন হযরত তালহা, হযরত যুবাইর এবং তারপর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন: “আমি কার কাছে বায়াত হব?” তখন তাঁরা তিনজনই একই উত্তর দিলেন: “আলী (রা.)-এর কাছে।” [১]

মক্কায় সাঈদ বিন আল-আস, ওয়ালিদ বিন উকবা, ইয়েমেনের প্রাক্তন গভর্নর ইয়া'লী বিন উমাইয়া এবং বসরার প্রাক্তন গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) এই কর্মপদ্ধতির ওপর একমত হলেন। এবং এই কাফেলা, যাতে ছয়শ লোক ছিল, মক্কা থেকে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। [২]

হযরত আলী (রা.)-এর সিরিয়া যাত্রা স্থগিত, ইরাক যাওয়ার সিদ্ধান্ত:

হযরত আলী (রা.) সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের বিরোধিতাকেও উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সৈন্য সমাবেশের কোনো বিশেষ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়নি এবং যাত্রায় বিলম্ব হতে থাকে, এমনকি মক্কা থেকে হযরত তালহা, হযরত যুবাইর এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বসরার দিকে যাত্রার খবর আসে। [৩]

হযরত আলী (রা.) এই খবর শুনে হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-কে ধাওয়া করে তাঁদের থামানোর ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সিরিয়ার পরিবর্তে মক্কাগামী মহাসড়কের দিকে রওনা হন। সঙ্গীরা তাঁকে এই পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। হযরত হাসান (রা.)-ও তাঁর আশঙ্কা ব্যক্ত করেন এবং পরামর্শ দেন যে, হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-কে উসমানের হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নিতে দেওয়া হোক। [৪]

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন: “আমিরুল মুমিনীন! এখান থেকে যাবেন না; আপনি যদি চলে যান, তবে মুসলমানদের শাসক আর কখনোই এখানে ফিরে আসবে না।” কিন্তু হযরত আলী (রা.) কারো কথা শুনলেন না। [৫]

মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে তিনি মক্কাগামী মহাসড়কের তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) দূরে ‘রাবদা’ নামক স্থানে অবস্থান করেন। পাঁচ বা চৌদ্দ দিন পর যখন জানতে পারলেন যে কাফেলা বসরার দিকে চলে গেছে, তখন তিনি সরাসরি কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) তাঁর আশঙ্কার গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও কুফায় যাওয়াকেই উত্তম মনে করলেন। [৬] কারণ ইরাকের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মদিনায় বসে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। মক্কা থেকে গমনকারী কাফেলা সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর হিকমতে আমলী (কৌশল) ছিল:

“এই ব্যক্তির যদি এই পথ অবলম্বন করে, তবে মুসলমানদের ব্যবস্থা তখনই হয়ে যাবে।” [৭]

[১] তারিখ তাবারী: ৪/৪৩৯; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩০৬২৯ সংক্ষিপ্ত মতন ও সহীহ সনদসহ, আল-আরশাদ। দ্রষ্টব্য: আমরা মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বার মাকতাবাতুর রুশদ-এর নতুন সংস্করণ ব্যবহার করছি যা সাত খণ্ডে সমাপ্ত, তবে এই স্থানে মূল পাণ্ডুলিপিতে কিছু শব্দ অস্পষ্ট ছিল, তাই পাঠকদের এখানে পনের খণ্ডের ‘দারুস সালাফিয়া’-এর পুরাতন সংস্করণ দেখা উচিত যাতে এই বর্ণনাটি ১১/৯০, ১১৮-তে রয়েছে।

[২] তারিখ তাবারী: ৪/৪৩৯, ৪৫০, ৪৫২।

[৩] তারিখ তাবারী: ৪/৪৫৫ সাইফ থেকে।

[৪] তারিখ তাবারী: ৪/৪৫৫ সাইফ থেকে।

[৫] তারিখ তাবারী: ৪/৪৫৬/৩ সাইফ থেকে।

[৬] তারিখ তাবারী: ৪/৪৫৯, ৪৬০ সাইফ থেকে।

[৭] ইন ফালাউ হাযা ফাকাদ ইনকাতাআ নিযামুল মুসলিমীন (তারিখ তাবারী: ৪/৪৩৬ সাইফ থেকে)।

জঙ্গ জামাল এবং এর প্রেক্ষাপট

হযরত যুবাইর এবং হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা যদিও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সরকার খতম করার জন্য ছিল না, বরং ইনসাফ হাসিলের জন্য ছিল এবং তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা পূর্ণ নেক নিয়ত এবং ঈমানি জযবার ওপর ভিত্তি করে ছিল। হযরত আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এরও হযরত যুবাইর এবং হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ইখলাসের ওপর বিশ্বাস ছিল এবং তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থানও তিনি কখনোই বিস্মৃত হতে পারতেন না। এই মহান ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর আন্তরিক মহব্বত ও ভালোবাসা কোনো অংশেই কম ছিল না। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে, ইনসাফ হাসিলের জন্য একটি শহরকে কেন্দ্র বানিয়ে সশস্ত্র শক্তি জমা করা এবং অপরাধীদেরকে নিজ উদ্যোগে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারি ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং উম্মাহর ঐক্যে আঘাত হানার কারণ হতে পারত। তিনি চেয়েছিলেন যে, এই মহান ব্যক্তিদেরকে নিজের সাথে शामिल করে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বসরায়:

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাফেলা বসরার নিকটবর্তী “খাফীর” নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিল। ধারণা করা হয় যে, আপনি ৩৬ হিজরির মহররম মাসের শেষ দশকে সফর শুরু করেছিলেন। আপনি ৭৬০ মাইল (৩৮ মানজিল বা ১২২৩ কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করে রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে বসরার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছান। ২৬ দিন আলাপ-আলোচনা ও মধ্যস্থতায় অতিবাহিত করেন, প্রথমে বসরার নীতিনির্ধারকদের (আরবাব-ই হাল ও আকদ) নামে পত্র লিখে তাঁদেরকে নিজের সংকল্প ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন যাতে তাঁরা কোনো ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত না থাকেন। বসরার গভর্নর হযরত উসমান বিন হুнайফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবুল আসওয়াদ দুয়াইলিকে উম্মুল মুমিনীন-এর নিকট পাঠান। [১] উম্মুল মুমিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁদের সাথে যে কথোপকথন করেন তার প্রতিটি অক্ষর থেকে ইখলাস, কল্যাণকামিতা এবং দরদ প্রকাশ পায়। তিনি বলেন:

“আমার মতো কোনো নারী কোনো গোপন উদ্দেশ্যে সফর করে না, আর না নিজের সন্তানদের কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখা যায়। শহরের বখাটে লোক এবং গোত্রগুলোর ভবঘুরে দলগুলো মদিনাতুর রাসূল-এর ওপর চড়াও হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিশাপের যোগ্য হয়েছে, অতঃপর মুসলমানদের শাসককে কোনো অপরাধ ও কারণ ছাড়াই শহীদ করেছে, তাঁদের অন্যায়ভাবে রক্ত ঝরিয়েছে, মাল লুট করেছে। তারা মানুষের ঘরে এমনভাবে অবস্থান করছিল যে মানুষ তাদের অবস্থানে অতিষ্ঠ, পেরেশান এবং বিপদে ছিল, না তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে পারছিল, না তাদের নিরাপত্তা ছিল। পরিশেষে আমি মুসলমানদেরকে জানাতে বেরিয়েছি যে, এই দুষ্কৃতকারীরা কী বিপর্যয় ঘটিয়েছে এবং আমাদের পেছনে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা এবং এখন মানুষের”

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৬১, ৩৬২ আন সাইফ

অবস্থা সংশোধনের জন্য কী করা উচিত।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ [১]

(তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত বা সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার পরামর্শ ভালো)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এসব করবে, তাকে আমরা শীঘ্রই মহা পুরস্কার দান করব।)

আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী, জাতির সংশোধনের জন্য দাঁড়িয়েছি। তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছি এবং তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি, গুনাহ থেকে বিরত রাখছি এবং তা নির্মূল করার জন্য উৎসাহিত করছি। [২]

বসরার সেই প্রতিনিধিরা হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর (রা.)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের অবস্থান জানার পর, তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। উভয় মহান ব্যক্তির উত্তর ছিল:

“যদি হযরত আলী (রা.) আমাদের এবং উসমানের হত্যাকারীদের মাঝে অন্তরায় না হন, তবে আমরা আমাদের বায়আতের ওপর অটল আছি।” [৩]

এদিকে হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর (রা.)-এর অবস্থান শোনার জন্য সাধারণ মানুষের এক বিশাল জনশ্রোত শহরের বাইরে বেরিয়ে আসে। মক্কার কাফেলা যে ময়দানে অবস্থান করছিল সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এখানে হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর (রা.) আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন এবং পরিশেষে বলেন: “মজলুম খলিফার হত্যার প্রতিশোধ (কিসাস) নেওয়া আল্লাহর নির্ধারিত বিধানসমূহের (হুদুদ) মধ্যে একটি বিধান। এটি কায়েম করলে আপনাদের ব্যবস্থা পুনর্বহাল হবে; এটি ত্যাগ করলে আপনাদের শক্তি ও ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং কোনো শাসনব্যবস্থাই অবশিষ্ট থাকবে না।”

পরিশেষে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন:

“লোকেরা হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ করত এবং তাঁর কর্মকর্তাদের চরিত্র হনন করত। তারা মদিনায় এসে আমাদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত। আমরা যাচাই-বাছাই করে উসমান (রা.)-কে নির্দোষ, নেককার এবং অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে পেয়েছি এবং ওই লোকদেরকে দুশ্চরিত্র ও মিথ্যাবাদী হিসেবে জানতে পেরেছি। যখন ওই লোকেরা বিপুল শক্তি অর্জন করল, তখন খলিফার ঘর ঘেরাও করে অন্যায়ভাবে তাঁকে হত্যা করল। এখন যে কাজটি করা জরুরি এবং এ ছাড়া অন্য কিছু করা সমীচীন নয়, তা হলো উসমানের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা এবং আল্লাহর কিতাবের বিধান কায়েম করা।” [৪]

এই ভাষণগুলোর জবাবে বসরার অধিবাসীদের এক বিশাল অংশ তাঁদের সমর্থনের ঘোষণা দেয়। শহরের সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠে। বসরার গভর্নর উসমান বিন হুনাইফের পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবে একটি দল এই বলে তাঁর সাথে রয়ে যায় যে, তালহা এবং যুবাইর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত করার পর এমন আন্দোলন চালানোর অধিকার রাখেন না।

[১] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৪

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৬১, ৩৬২, সাইফ থেকে বর্ণিত

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৬২, সাইফ থেকে বর্ণিত

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৬৩, ৩৬৪, সাইফ থেকে বর্ণিত

হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর বিরোধিতা কারীদের মধ্যে অনেক নেককার ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন যারা এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন যে, খলিফার আনুগত্য করা আবশ্যিক এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ভুল।

কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা সেই সাবায়ীদেরও ছিল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধী আন্দোলনের অংশ ছিল। হযরত উসমান (রা.)-কে অবরোধকারীদের মধ্যে একটি দল বসরা থেকে গিয়েছিল যার প্রধান ছিল হাকীম বিন জাবালা এবং হুরকুস বিন যুহাইর। হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত করার পর এই লোকেরা বসরায় ফিরে এসেছিল এবং এখানে অহেতুক উস্কানি দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছিল। এই লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর বিরুদ্ধে কটুক্তি করে এই ধারণা দিচ্ছিল যে, হযরত আলী (রা.)-এর অনুগত কেবল আমরাই। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, হাকীম বিন জাবালা এই ধরনের লোকদের একত্রিত করে হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। [১]

এই দুশ্চরিত্ররা এমনকি এই আত্মফালনও করল যে, তারা নাউযুবিল্লাহ উম্মুল মুমিনীনকে জিম্মি করবে। [২]

বসরার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই অশালীন কথা সহ্য করতে পারলেন না এবং প্রতিবাদ করে বললেন: “তোমরা কি খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করেও সন্তুষ্ট নও? এখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানিত স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরছ? কেবল এই কারণে যে তিনি তোমাদের হকের আদেশ দিচ্ছেন, শুধু এই জন্য তোমরা তাঁকে এবং বড় বড় সাহাবীদের হত্যা করতে চাও?” কিন্তু এই পাষণ্ড হৃদয়ের লোকদের ওপর এসব কথার কোনো প্রভাব পড়ল না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নামে পাঠানো তাঁর পত্রে এই পরিস্থিতির চিত্র এভাবে তুলে ধরেন: “সৎ লোকেরা আমাদের দাওয়াত কবুল করল কিন্তু যাদের মধ্যে কল্যাণের কোনো লেশমাত্র ছিল না, তারা অস্ত্র নিয়ে আমাদের মুখোমুখি হলো এবং বলতে লাগল: আমরা তোমাদেরকেও উসমানের পেছনে পাঠিয়ে দেব। তারা চেয়েছিল যে আল্লাহ তাআলার হৃদুদকে আরও অকার্যকর করে রাখতে। তারা শত্রুতা প্রদর্শন করে আমাদের কাফের আখ্যা দিল এবং আমাদের সম্পর্কে অশালীন কথা বলল। যখন আমরা বললাম: **اللَّيْلُ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ** বলল। তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তাদের আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হচ্ছে যাতে তা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়, অতঃপর তাদের একদল অবজ্ঞার সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক আমার কথায় বিশ্বাস করল এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ শুরু হলো। আমরা তাদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এই আচরণ সত্ত্বেও তাদের প্রথম দলটি আমার সাথীদের ওপর অস্ত্র ধরা থেকে বিরত থাকল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের চাল তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিলেন, আমরা ছাব্বিশ দিন পর্যন্ত তাদের আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর হৃদুদ কায়েমের দাওয়াত দিতে থাকলাম কিন্তু তারা অস্বীকারই করল। [৪]”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৬৬

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৭১

[৩] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ২৩

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৭৪

বসরার চূড়ান্ত যুদ্ধ: সাবায়ীদের থেকে প্রতিশোধ

হাকীম বিন জাবালাহ-এর মতো সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রের কারণে ২৩ এবং ২৫ রবিউস সানি ৩৬ হিজরিতে বসরার মক্কা কাফেলা এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা একে অপরের মুখোমুখি হয়। উসমানের হত্যাকারী এবং সাবায়ীদের পাশাপাশি বনী আব্দুল কায়েস এবং বনী রাবিয়ার কিছু লোকও না বুঝে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সাথে যোগ দিয়েছিল। [১]

প্রথমে হাকীম বিন জাবালাহ তার অশ্বারোহীদের নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বাসস্থানের দিকে রওনা হয়, যা বসরার জনবসতিতে মসজিদের কাছে ছিল। মক্কা কাফেলা অশ্বারোহীদের আক্রমণ করতে দেখল এবং শুধু তাই নয়, বরং বর্শা ও তলোয়ারও চালানো হলো। কিন্তু হাকীম বিন জাবালাহ তার অশ্বারোহীদের উত্তেজিত করে সামনে এগিয়ে নিতে থাকল। সে উম্মুল মুমিনীন-এর জানবাজদের কেবল আত্মরক্ষায় সীমাবদ্ধ দেখে উপহাস করে চিৎকার করে বলল:

“আজ কুরাইশরা তাদের ভীৰুতা ও রাগের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।”

এভাবে সে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর জানবাজদের উত্তেজিত করে খোলা ময়দানে যুদ্ধে নামাতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এই সংরক্ষিত অবস্থান বজায় রাখল। জামে মসজিদের পাশের গলিতে সংঘর্ষ চলতে থাকল এবং পাথরও নিক্ষেপ করা হলো। শত্রু এগিয়ে আসার জন্য জোর দিতে থাকল। [২]

উম্মুল মুমিনীন কুফাবাসীদের নামে তার এক পত্রে লিখেছেন:

“ভোরবেলা তারা আক্রমণ করল যাতে আমাকে এবং আমার সাথীদের হত্যা করতে পারে। তারা আমার বাসস্থানের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল। তাদের সাথে একজন নেতা ছিল যে আমাকে গালি দিচ্ছিল। কিন্তু আমার দরজায় তারা কিছু লোককে প্রস্তুত পেল, এখন যুদ্ধের ঢাকা ঘুরল এবং মুসলমানদের তাদের ঘিরে ফেলা ও মারধর করা শুরু হলো।” [৩]

এই আকস্মিক কিন্তু ব্যর্থ আক্রমণের পর এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বসরায় উপস্থিত সাবায়ীরা উম্মুল মুমিনীন এবং তার সাথীদের প্রাণের পেছনে লেগে আছে এবং সুযোগ পেলেই তারা পুনরায় আক্রমণ করবে যা আরও সুসংগঠিত ও ভয়াবহ হবে। তাই সেই রাতেই হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.) স্থানীয় লোকদের পরামর্শে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে সরকারি শস্য গুদামের কাছে তাবু ফেললেন, যেখানে সামনে খোলা ময়দান ছিল। সারা রাত তারা সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকলেন এবং শহর থেকে উম্মুল মুমিনীন-এর জানবাজরা এসে কাতারে शामिल হতে থাকল। [৪]

হাকীম বিন জাবালাহ-এর চারপাশে উসমানের হত্যাকারীদের দল ছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের ভবঘুরে ও দুষ্কৃতকারী লোক জমা হয়েছিল। তারা সবাই জানত যে যদি তারা শক্তি প্রদর্শন না করে তবে বসরায় তাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। [৫]

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৪৭০, আন সাইফ

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৪৬৭

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৪৬৭

[৪] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৪৭৩

[৫] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৪৭০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় দিন সকালে হাকীম বিন জাবালা সাবায়ী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে বর্শা হাতে বের হলো। সে উম্মুল মুমিনীনের শানে প্রকাশ্যে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ গালিগালাজ করছিল যা শুনে যে কেউ কঁপে উঠত। এক ব্যক্তি তা সহ্য করতে না পেরে সামনে এসে হুংকার দিল: “কাকে গালি দিচ্ছ?” হাকীম বিন জাবালা বর্শার আঘাতে তাকে মেরে ফেলল।

এবার আব্দুল কায়েস গোত্রের এক নারী তার ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তায় অতিষ্ঠ হয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল: “ওরে নাপাক মহিলার সন্তান! তুই কি মুসলমানদের মাকে গালি দিচ্ছিস? তুই তো নিজেই গালির যোগ্য।” হাকীম বিন জাবালা তাকেও বর্শার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করল। তার ধারণা ছিল যে, এই সন্ত্রাস প্রদর্শনের মাধ্যমে সে ঐ লোকদের আতঙ্কিত করে ফেলবে যারা হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর-এর কাতারে জমা হয়েছিল। কিন্তু তার এই নিষ্ঠুর আচরণের কারণে তার নিজের গোত্র আব্দুল কায়েসের অনেক লোক, যারা তার দলে ছিল, অসন্তুষ্ট হয়ে তার সঙ্গ ছেড়ে দিল। তারা বলছিল: “আল্লাহ তোমার থেকে প্রতিশোধ নেবেন।” [১]

যেহেতু সাবায়ীদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মুসলমান কেবল গভর্নর উসমান বিন হুнайফ-এর সমর্থনের খাতিরে এই লড়াইয়ে शामिल হয়েছিল, তাই শুরুতে মক্কার কাফেলা সতর্ক ভঙ্গি অবলম্বন করল। উম্মুল মুমিনীন জানবাজদের নির্দেশ দিলেন: “যে তোমাদের সাথে লড়বে, কেবল তার সাথেই লড়ো।” এই শুনে জানবাজরা ঘোষণা করল: “যে ব্যক্তি উসমানের হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে হাত গুটিয়ে নিক, আমরা কেবল ঐ হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই, আমরা নিজেরা লড়াই শুরু করব না।” [২]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা মুসলমানদের রক্তপাত থেকে বাঁচাতে ক্রমাগত ঘোষণা দিচ্ছিলেন যেন সাধারণ মানুষ হাত গুটিয়ে নেয়। কিন্তু হাকীম বিন জাবালার দল একটি কথাও শুনল না। তাদের এই একগুঁয়েমি হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর-কে সুযোগ করে দিল যেন তারা প্রকাশ্যে জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন। তারা দুআ করলেন:

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বসরার অধিবাসীদের মধ্য থেকে আমাদের প্রতিশোধের পাত্রদের (শত্রুদের) একত্রিত করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! তাদের মধ্য থেকে আজ কাউকে বাকি রাখবেন না, তাদের থেকে কিসাস নিন এবং তাদের হত্যা করুন।” [৩]

এবার উম্মুল মুমিনীনের জানবাজরা পূর্ণ শক্তিতে পাল্টা আক্রমণ করল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকল। উসমানের হত্যাকারীদের চারজন সর্দার ছিল: হাকীম বিন জাবালা, যুরাইহ বিন আব্বাদ, ইবনুল মুহাওবিশ এবং হারকুস বিন যুহাইর যারা নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। মক্কার কাফেলা থেকে হযরত তালহা হাকীমের সাথে, হযরত যুবাইর যুরাইহের সাথে, আব্দুর রহমান বিন আত্তাব ইবনুল মুহাওবিশের সাথে এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আল-হারিস হারকুসের দলের মোকাবিলা করলেন।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৭৪, সাইফ থেকে।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৭০, সাইফ থেকে।

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৭০।

হাকীম তিনশ সাবায়ীকে নিয়ে হযরত তালহা-এর সামনে এল। তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের-কে তার মোকাবিলায় পাঠালেন। তিনি তাঁর জানবাজদের নিয়ে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন যে, প্রতিপক্ষের লাশের স্তুপ জমে যেতে লাগল। হাকীম বিন জাবালার ভাই রা'ল, ছেলে আশরাফ এবং এক সাবায়ী নেতা হানজালা নিহত হল। স্বয়ং হাকীমের পা কেটে গেল এবং সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পাশ দিয়ে যাওয়া এক মুজাহিদ তাকে বললেন: “হে খবীস! আল্লাহর প্রতিশোধের স্বাদ গ্রহণ কর।” কিছুক্ষণ পর জখীম নামক এক মুজাহিদ আঘাত করে তার মাথা উড়িয়ে দিলেন। [১]

মক্কা কাফেলা থেকে কেবল একজন সাহাবী হযরত মুজাশে বিন মাসউদ শহীদ হলেন। [২]

শস্য গুদামের ময়দান শত্রুদের লাশে ভরে গেল। যারীহ-ও তার দলবলসহ নিহত হল, কেবল সাবায়ী নেতা গাওস বিন জুহাইর তার কয়েকজন সঙ্গীসহ জীবিত পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। [৩] অবশিষ্ট লোকেরা ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিল। হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের-ও অহেতুক রক্তপাত অপছন্দ করতেন, তাই প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। [৪]

যুদ্ধ এই চুক্তিতে শেষ হল যে, হুদুদুল্লাহ জারি করা হবে, উসমানের হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ বাধা সৃষ্টি করবে না। [৫]

এটাও স্থির করা হয়েছিল যে, বসরার দারুল আমারা (গভর্নর হাউস), জামে মসজিদ এবং বায়তুল মাল হযরত আলী-এর মনোনীত গভর্নর হযরত উসমান বিন হুনাইফ-এর তত্ত্বাবধানে থাকবে। মক্কা কাফেলার বসরার যেকোনো স্থানে অবস্থানের অধিকার থাকবে। হযরত আলী-এর আগমন পর্যন্ত উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্যে যেকোনো ধরনের উত্তেজনা ও সংঘাত এড়িয়ে চলবে। [৬]

যে সাবায়ীরা এখনও বেঁচে এদিক-ওদিক লুকিয়ে ছিল, শহরবাসী তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল, তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এখন কেউ প্রস্তুত ছিল না। [৭] হযরত তালহা ও হযরত জুবায়ের বসরায় ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, যদি কোনো গোত্রে এমন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, যারা মদীনায় হত্যা ও লুণ্ঠনে জড়িত ছিল, তবে তাদের আমাদের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া হোক। কুখ্যাত ফিতনাবাজদের নাম লিখে প্রচার করা হল। ফলে বসরার অধিবাসীরা অনেক ব্যক্তিকে কুকুরের মতো টেনে নিয়ে এল, যাদেরকে হযরত উসমান-এর হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। [৮]

এই বিজয় এবং ফিতনাবাজদের শিক্ষণীয় পরিণামে ঈমানদারদের অন্তর শীতল হল। হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের সুসংবাদ সম্বলিত পত্রসমূহ ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করলেন। যাতে লেখা ছিল:

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৭১

[২] তারিখে খলীফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৮৩

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৭১

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৬৬, সায়িফ থেকে বর্ণিত

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৭৩

[৬] তারিখে খলীফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৮৩

[৭] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৭৩

[৮] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৭৪

“আমরা যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সকল স্তরে আল্লাহর কিতাবের বিধান বাস্তবায়নের জন্য বের হয়েছি। বসরার নেককার ও সম্মানিত ব্যক্তির। এই উদ্দেশ্যে আমাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন, পক্ষান্তরে দুষ্কৃতকারী ও বখাটেঁরা বিরোধিতা করেছে এবং অস্ত্র ধারণ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের মুসলমানদের পথে ফিরে আসার বারবার সুযোগ দিয়েছেন, যখন তাদের কাছে কোনো অজুহাত ও ওজর অবশিষ্ট থাকল না তখন হযরত উসমান গনি (রা.)-এর হত্যাকারীরা ফিরে গেল এবং নিজেরাই নিজেদের বধ্যভূমির দিকে চলে এল। তাদের মধ্যে হরকুস বিন জুহাইর ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারেনি। আল্লাহ পাক তার থেকেও প্রতিশোধ নেবেন। আমরা আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি যে আপনারাও আমাদের মতো দাঁড়িয়ে যান যাতে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় আমাদের কাছে ক্ষমার কোনো অজুহাত থাকে এবং আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে থাকতে পারি।” [১]

বসরার পরিস্থিতি এখন মক্কার কাফেলার নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে একটি উদ্বেগ বাকি ছিল, তা হলো যুদ্ধ থেকে বেঁচে যাওয়া হরকুস বিন জুহাইর যার সম্পর্ক ছিল বনু সা’দ গোত্রের সাথে, সে নিজের গোত্রকে জাহেলি গোত্রপ্রীতির উস্কানি দিতে সফল হয়েছিল। একইভাবে হাকিম বিন জাবালার গোত্র আবদুল কায়েসের অনেক লোক বসরা যুদ্ধে নিজেদের লোকদের নিহত হওয়ার ঘটনায় উত্তেজিত ছিল, যদিও আগে তারা খুদামুল মুমিনীনদের অবস্থানের সমর্থন করছিল কিন্তু এখন তাদের কিছু গোত্রীয় লোক নিজেদের অবাধ্যতার শাস্তি পাওয়ায় তাদের গোত্রীয় অভিজাত্যবোধ জেগে উঠল। তারা বসরা ছেড়ে চলে গেল। [২]

হযরত আলী (রা.) কুফার দিকে যাত্রা:

যেমনটি আমরা স্পষ্ট করেছি যে হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.) আগেই কুফাকে নিজের কেন্দ্র বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই আপনার ইরাক যাওয়া অনিবার্য ছিল। এছাড়া আপনার এই বিষয়ে তীব্র আশঙ্কা ছিল যে কিসাসের গণআন্দোলনের হাতে এমন লোকও যেন শাস্তির কবলে না পড়ে যারা শরীয়ত অনুযায়ী নিরাপদ। এই লোকেরা চাই পূর্ববর্তী সময়ে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল কিন্তু বায়আতের পর ইসলামী সরকারের নাগরিক হিসেবে তারা সকল অধিকার লাভ করেছিল। যদি তারা অমুসলিমও হতো, তবুও তাদের জান ও মালের হেফাজত করা হযরত আলী (রা.)-এর ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় পুরো মুসলিম বিশ্ব এক বড় গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হতে পারত। তাই হযরত আলী (রা.)-কে মদিনা থেকে বের হয়ে ইরাক যাওয়ার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যাতে সেখানকার সকল বিষয় সাংবিধানিক গণ্ডির মধ্যে আনা যায়। সাধারণ ধারণা এটাই ছিল যে আপনি হযরত তালহা এবং হযরত জুবাইর (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি আপনার বিশেষ সাথীদের বলছিলেন যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য মোটেও নয়, রিফায়া বিন রাফে (রা.) যখন সফরের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন তখন বললেন: “আমাদের নিয়ত ও ইচ্ছা কেবল সংশোধনের।”

জিজ্ঞাসা করলেন “যদি তারা না মানে তবে?”

বললেন: “আমরা তাদের অপারগ মনে করে ছেড়ে দেব, তাদের অধিকার তাদের দিয়ে দেব, নিজেরা ধৈর্য ধারণ করব।”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৭২

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৭২

জিজ্ঞাসা করা হলো: “যদি তারা এতেও রাজি না হয় তবে?”

তিনি বললেন: “আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কিছু বলব না যতক্ষণ না তারা আমাদের উত্যক্ত করবে।”

জিজ্ঞাসা করা হলো: “যদি তারা আমাদের না ছাড়ে তবে?” তিনি বললেন: “আমরা কেবল তাদের থেকে আত্মরক্ষা করব।” [১]

এ থেকে স্পষ্ট যে, হযরত আলী (রা.) যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়া চেয়েছিলেন।

আহলে কুফার নামে হযরত আলী (রা.)-এর পত্র:

হযরত আলী (রা.) কুফাকে রাজধানী করার ইচ্ছা এবারই প্রথম প্রকাশ করলেন এবং বললেন: “কুফাবাসী আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, সেখানে আরবদের সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন।” এরপর তিনি (রা.) কুফাবাসীদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলেন: “আমি তোমাদের মাঝে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আমি তোমাদের ভালোবাসা, আল্লাহভীতি এবং রাসূলের প্রতি অনুরাগ সম্পর্কে অবগত। যে আমার কাছে এসে সহযোগিতা করবে সে তার দায়িত্ব পালন করবে। তোমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সাহায্যকারী ও সহযোগী হয়ে যাও। আমাদের হাত শক্তিশালী করো। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল সংশোধন যাতে উম্মত পুনরায় ভাই ভাই হয়ে যায়।” [২]

হযরত আলী (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ:

হযরত আলী (রা.) এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা কেবল সাদাতদের প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে উগ্রতার কারণে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে, তাদের যেন কুরআন মাজীদ ও সুন্নতে রাসূলের নির্দেশিত মধ্যপন্থার পথে ফিরিয়ে আনা যায় এবং মুসলমানদের এক উম্মত ও এক পরিবার হওয়ার বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। সফর শুরুর পূর্বে তিনি (রা.) একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা আজও ফিরকাবন্দী থেকে মুক্তির পথ দেখায়। তিনি (রা.) বললেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ আমাদের ইসলামের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন এবং এর বদৌলতে আমাদের উচ্চমর্যাদা দিয়েছেন এবং আমাদের লাঞ্ছনা, সংখ্যাস্বল্পতা, পারস্পরিক হিংসা ও শত্রুতার যুগ থেকে বের করে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন মানুষ এই অবস্থায় কায়েম ছিল। ইসলামই ছিল তাদের দ্বীন এবং কিতাবুল্লাহ ছিল তাদের পথপ্রদর্শক, কিন্তু এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে এমন লোকদের হাতে দুর্ঘটনা ঘটল যাদের শয়তান প্ররোচিত করেছিল যাতে এই উম্মতের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া যায়। মনে রেখো, এই উম্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে যেমন পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। যা হতে যাচ্ছে তার অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিঃসন্দেহে যা হওয়ার তা হয়েই থাকবে। শুনে রাখো! এই উম্মত শীঘ্রই তিয়াত্তর (৭৩) দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম দল হবে সেটি যারা নিজেদের আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করবে, কিন্তু আমার আমলের অনুসরণ করবে না। আমি নিঃসন্দেহে এমন লোকদের দেখেছি, চিনেছি। অতএব তোমরা তোমাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো...”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৯১, সাযিফ থেকে বর্ণিত।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৪৭৭।

ধরো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত মুবারকের ওপর চলো, তাঁর সুনাতকে গ্রহণ করো, কুরআন মাজীদে যে কথা বুঝতে না পারো তা ছেড়ে দাও, যে জিনিসের সাথে কুরআন থাকে তা গ্রহণ করো, আর যা সে প্রত্যাখ্যান করে তা বর্জন করো। আল্লাহকে রব, মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল, ইসলামকে দীন এবং কুরআন মাজীদকে পথপ্রদর্শক ও নেতা মেনে সন্তুষ্ট থাকো। [১]

এই স্মরণীয় ভাষণের পর ৩০ রবিউস সানি ৩৬ হিজরিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কুফার সফর শুরু করেন। [২]

জনবল কম হওয়ার কারণ:

মদীনা থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে কোনো লস্কর প্রস্তুত হয়নি। মাত্র সাতশত ষাট (৭৬০) জন ব্যক্তি ছিলেন। [৩] কারণ এই ছিল যে, এই সফরে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল, অথচ হিজাজবাসীদের অধিকাংশ কোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অংশ নিতে প্রস্তুত ছিল না এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়আত হওয়া সত্ত্বেও নিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দিচ্ছিল। এই কারণেই উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলে পাঠিয়েছিলেন: “আপনি যদি সিংহের চোয়ালের মধ্যেও থাকতেন তবে আমি আপনার সাথে থাকাই পছন্দ করতাম, কিন্তু এই বিবাদের ক্ষেত্রে আমার এই মত নেই।” [৪]

হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সন্ধিপ্রিয়তা:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন বসরার কোনো এক সর্দার হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এই পরামর্শ দিলেন যে, এখনই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পথে মাত্র এক হাজার অশ্বারোহীর মাধ্যমে থামানো সম্ভব, কেন এমনটা করা হচ্ছে না? হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে উত্তর দিলেন: “যুদ্ধের কলাকৌশল আমরা ভালো করেই জানি, কিন্তু এখানে আমরা দাঈ হিসেবে এসেছি। এটি এমন এক বিবাদ যার অতীতে কোনো নজির নেই। আমাদের আশা আছে সন্ধি হয়ে যাবে, তুমি ধৈর্য ধরো।” [৫]

এই ঘটনা থেকে আকাবির সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতা এবং সন্ধিপ্রিয়তার মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

কুফার ফকীহগণ অভ্যর্থনা জানালেন:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কুফায় পৌঁছালেন, তখন চার হাজার ফকীহ, যারা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছাত্র ছিলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে খুশি হয়ে বললেন:

رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ، قَدْ مَلَآ هَذِهِ الْقَرْيَةَ عِلْمًا وَفَتْهًا

“আল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি এই জনপদকে ইলম ও ফিকহ দ্বারা পূর্ণ করে গেছেন।” [৬]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৭০

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৭৩ থেকে ৪৭৮, সায়িফ থেকে বর্ণিত

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৮০

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৭১১০, কিতাবুল ফিতান, বাব কওলুন নবী ﷺ লিল হাসান ইব্রাহীম সাইয়িদ

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৯৫

[৬] আল-মাবসূত লিস-সারখাসী: ১৬/৬৮, তবা দারুল মা’রিফাহ বৈরুত... এবং আয-জাফর মুকাদ্দিমা “নাসবুর রায়াহ” মাতবুআহ দারুল হাদীস কায়রো

রাজনৈতিক সংঘাত থেকে বিরত থাকা সাহাবীগণ:

আমীরুল মুমিনীন আলী আল-মুরতাজা (রা.) কুফার নিকটবর্তী ‘যী কার’ নামক স্থানে অবস্থান করে কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আমীর এবং সেনাপতিদের এই বিষয়ে সম্মত করার চেষ্টা করেন যে, তারা যেন এই কঠিন মুহূর্তে, যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একটি উদ্বিগ্ন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, সরকারের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেন এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সরকারি কর্মপন্থাকে সমর্থন করেন। হযরত আলী (রা.) কুফার নতুন গভর্নর হিসেবে হযরত কারাযাহ বিন কাব আনসারী (রা.)-কে নিযুক্ত করেন এবং সেই সাথে নিজের কিছু প্রতিনিধিকেও কুফায় পাঠান যাতে তারা নাগরিকদের সহযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে হযরত আন্নার বিন ইয়াসির, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হযরত হাসান বিন আলী (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [১]

হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিনিধি দলের এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; কারণ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যারা হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থনে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, তারা অন্য দলের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কটু কথা বলা থেকে বিরত হচ্ছিলেন না, যার ফলে সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হচ্ছিল। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, কুফার নেতৃবৃন্দ ভয় পাচ্ছিলেন পাছে মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে না যায়। ইরাকে এমন অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন যারা সাধারণ মানুষকে এই বিবাদ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা.) এবং আহনাফ বিন কাইস (রহ.)-এর হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই বিষয়ে তীব্র দ্বিধা ছিল। ইমরান বিন হুসাইন (রা.) বসরার জামে মসজিদে ঘোষণা করতে থাকেন যে, কোনো পাহাড়ে গিয়ে ছাগল ও ভেড়া চরানো উভয় দলের কারো বিরুদ্ধে হাত তোলার চেয়ে উত্তম। [২]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৮২, ৫০২, ৫০৩

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫০৩, ৫০৪

এই ব্যক্তিবর্গ সেই সকল হাদীসের আলোকে বিবাদ থেকে দূরে থাকছিলেন যেগুলোতে কোনো মুসলমানকে হত্যার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। এছাড়া অনেক হাদীসে ফিতনার সময় নির্জনবাসের নির্দেশও রয়েছে, তবে এর পাশাপাশি এখানে এটিও মনে রাখা উচিত যে, হযরত আলী (রা.)-এর সামনেও নিশ্চয়ই এই হাদীসগুলো ছিল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি হাদীসের অন্য একটি প্রকারের ওপর অধিক গভীর ছিল। তাঁর সামনে সেই হাদীসগুলোও ছিল যেগুলোতে ফিতনার সময় নির্জনবাসের কথা এই শর্তের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই সময় মুসলমানদের কোনো ইমাম থাকবে না। যেমন হযরত হুয়াইফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সামনে ফিতনার যুগের কথা উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এমন সময়ের জন্য আপনার নির্দেশনা কী? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: *تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَامَهُمْ* (মুসলমানদের জামাত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে)। হযরত হুয়াইফা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: “যদি মুসলমানদের কোনো জামাত না থাকে এবং কোনো ইমামও না থাকে, তবে কী করা হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: *فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّ تَعْضَ بَاصِلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَدْرُكَكَ*” (তবে সেই সকল দল থেকে আলাদা হয়ে যাবে, যদিও তোমাকে কোনো গাছের শিকড় দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকতে হয়। যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু আসে এবং তুমি এই অবস্থায় থাকো)।

(সহীহ বুখারী, হা: ৩৬০৬, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ)

এই ধরনের বর্ণনার ভিত্তিতে হযরত আলী (রা.) মনে করতেন যে, যেহেতু বর্তমানে মুসলমানদের খলীফা বিদ্যমান আছেন, তাই তাদের উচিত খিলাফতের প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এবং এর সহায়ক হওয়া। কোনো কোনো ফকীহ যে লিখেছেন ফিতনার সময় নির্জনবাসী হওয়া উচিত, তার উদ্দেশ্যও এটাই। আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন:

وما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه انه اذا وقعت الفتنة بين المسلمين فينبغي ان يعتزل الفتنة ويلزم بيته، محمول على وقت خاص وهو ان لا يكون امام يدعوهم الى القتال، واما اذا كان فدعاه يفرض عليه الاجابة لما ذكرنا

“ইমাম আবু হানীফা থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হয় তখন মানুষের উচিত সেই ফিতনা থেকে দূরে থাকা এবং নিজ ঘরে অবস্থান করা, এটি একটি বিশেষ সময়ের ওপর নির্ভরশীল। তা হলো যখন এমন কোনো ইমাম না থাকে যে যুদ্ধের দিকে আহ্বান করছে। আর যখন ইমাম আহ্বান করে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া ফরজ হয়ে যায়, যার দলীলসমূহ আমরা উল্লেখ করেছি।” (বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতীবিশ শারায়ে: ৭/১৪০, প্রকাশনী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ)

ইতিহাসে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমরান বিন হুসাইন (রা.) তাঁর এক ভক্ত হুজাইর বিন রাবীকে বললেন: “যাও এবং তোমার গোত্রের লোকদের এই ফিতনায় লিপ্ত হতে নিষেধ করো।”

তিনি বললেন: “আমি গোত্রের একজন সাধারণ মানুষ, কোনো নেতা নই।”

তিনি বললেন: “যাও, আমার পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দাও।”

ইমরান বিন হুসাইন (রা.) বলতেন:

“আমি যদি কোনো পাহাড়ের বারনার ধারে একজন কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী গোলাম মেষপালক হতাম এবং ওই অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো, তবে তা আমার জন্য উভয় দলের কোনো একটির দিকে তীর নিক্ষেপ করার চেয়ে উত্তম হতো, চাই তা লক্ষ্যভেদী হোক বা না হোক।” [১]

অনুরূপভাবে হযরত আহনাফ বিন কাইস (রা.), যিনি ছয় হাজার যোদ্ধার নেতা ছিলেন, তিনিও তাঁর দলবল নিয়ে বসরা থেকে ছয় মাইল (সাড়ে নয় কিলোমিটার) দূরে উভয় দল থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। [২] কারণ দুই সশস্ত্র দলের মুখোমুখি হওয়ার পর বড়দের সতর্কতা ও সন্ধির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। [৩]

বসরার অধিবাসীরা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর আদেশে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা.) যখন তাঁদের উভয় দল থেকে পৃথক থাকার আহ্বান জানালেন, তখন বসরার অধিবাসীরা তাঁর কথা মানতে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করল। তাঁদের মুরাব্বির বললেন: “আমরা কোনো অবস্থাতেই উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর সম্মানকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না।” [৪]

যাই হোক, হযরত আলী (রা.) জনশক্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সিলসিলায় তাঁর পক্ষ থেকে কুফায় প্রেরিত প্রতিনিধি দলের কার্যক্রমের বিবরণ সহীহ বুখারী ও ইতিহাসের কিতাবসমূহের আলোকে পেশ করা হচ্ছে।

[১] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১০৫/১৮।

[২] তারিখুত তাবারী: ৪৯৮/৪।

[৩] সহীহ বুখারীর এই হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য: আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা জঙ্গ জামালের দিনগুলোতে আমাকে একটি বাণীর মাধ্যমে উপকৃত করেছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছিলাম, যখন আমি প্রায় জঙ্গ জামালের সাথীদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন: “সেই জাতি কখনোই সফল হবে না যারা তাদের বিষয়াবলি কোনো নারীর হাতে সোপর্দ করে।”

হযরত আবু বাকরা (রা.) বলেন যে, জঙ্গ জামালের সময় যখন আমি আসহাবে জামাল (হযরত তালহা ও যুবায়ের রা.)-এর সাথে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম, তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে একটি বাক্যের মাধ্যমে উপকৃত করেছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে, পারস্যের অধিবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন: “সেই জাতি কখনোই সফল হতে পারে না যারা তাদের বিষয়াবলি কোনো নারীর হাতে সোপর্দ করে।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর: ৪৪২৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব কিতাবুন নবী (সা.) ইলা কিসরা)

আহনাফ বিন কাইস (রা.)-কে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও হযরত আবু বাকরা (রা.)-এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আহনাফ বিন কাইস (রা.) নিজেই বলেন: আমি হযরত আলী (রা.)-এর সাহায্যের জন্য যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে হযরত আবু বাকরা (রা.)-এর সাথে আমার দেখা হলো এবং তিনি জঙ্গ জামালের ফিতনা সম্পর্কে হাদীস শুনিয়া আমাকে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত রাখলেন: “যখন দুই মুসলিম তাদের তলোয়ার নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৮৮, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআহ)

তবে ইমাম নববী (রা.) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এটি সেই রণক্ষেত্রের জন্য যা কোনো ব্যাখ্যা (তা’বীল) ছাড়াই পার্থিব বিপদের জন্য হয়। সাহাবায়ে কেরাম এই সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত নন। আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো এই যে, এই মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে। তাঁরা মুজতাহিদ ও ব্যাখ্যাকারী ছিলেন। গুনাহ করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। (শরহে মুসলিম লিন-নববী, কিতাবুল ফিতান)

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫০৩/৪, সনদ সহীহ; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩৮৮/৩, বাসনাদে হাসান, ত. সাফির।

হজরত আলী (রা.)-এর প্রতিনিধি দল কুফায়:

হজরত আলী (রা.) হজরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে কুফাবাসীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি সাধারণ মানুষকে খেলাফতের সাথে থাকার জন্য প্রস্তুত করেন। হজরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) ইসলামের একদম শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারী একজন প্রবীণ মুহাজির সাহাবী ছিলেন। হজুর (সা.)-এর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যে, তিনি শয়তানের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। [১]

তিনি আরও বলেছিলেন: “আম্মারকে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, সে সেটিই গ্রহণ করবে যা অধিক হেদায়েতপূর্ণ।” [২]

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) সেখানে পৌঁছালেন। হজরত আবু মাসউদ এবং হজরত আবু মুসা আশআরী (রা.), যারা কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে আসলেন। পারস্পরিক কথাবার্তা শুরু হলে হজরত আবু মাসউদ (রা.) হজরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে বললেন: “আমি আপনার সাথীদের মধ্যে যে কারো সম্পর্কে কথা বলতে পারি কিন্তু আপনার সম্পর্কে নয়। আপনি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমি আপনাকে এমন কোনো কাজ করতে দেখিনি যা আমার কাছে এই বিষয়ে আপনার তাড়াহড়োর চেয়ে বেশি অপ্রীতিকর।”

হজরত আম্মার (রা.) জবাবে বললেন: “আপনি এবং আপনার সাথী (আবু মুসা আশআরী রা.) যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমার কাছেও আপনাদের কোনো কাজ এই বিষয়ে আপনাদের শিথিলতার চেয়ে বেশি অপ্রীতিকর মনে হয়নি।”

কথাবার্তার সমাপ্তি মনোরম পরিবেশে হলো। হজরত আবু মাসউদ (রা.), যিনি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন, এই দুই বন্ধুকে চমৎকার পোশাক পরিধান করালেন। জুমার নামাজের সমাবেশে এই ব্যক্তিবর্গ জামে মসজিদে গমন করলেন। [৩]

জামে মসজিদ কুফায় পরামর্শ সভা:

জামে মসজিদে পৌঁছে হাসান বিন আলী (রা.) মিস্বরের সবচেয়ে উপরের ধাপে বসলেন এবং আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) তাঁর নিচে বসলেন। মানুষ তাঁদের চারপাশে সমবেত হলো। [৪]

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রথমে কুফার প্রাক্তন গভর্নর আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে বললেন যাতে তিনি সাধারণ মানুষকে হজরত আলী (রা.)-এর সাথে থাকার জন্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু আবু মুসা আশআরী (রা.) দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি না বলে পারলেন না:

“হে লোকসকল! এটি এমন এক ফিতনা যাতে কিছুই শোনা যায় না। সুতরাং এতে যে ঘুমিয়ে আছে সে জাগ্রত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।”

হজরত আলী (রা.)-এর একজন সমর্থক প্রবীণ ব্যক্তি জায়েদ বিন সুহান যখন উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা রা.)-এর বের হওয়ার বিষয়ে আপত্তি করলেন, তখন শাব্বা বিন রাবি নামক এক কুফি নেতা বললেন: “তিনি তো আল্লাহর নির্দেশে উম্মতের সংশোধনের কাজ করছেন।”

[১] আল্লাজি আজরাহুল্লাহ আলা লিসানি নাবিয়্যিহি মিনাশ শাইতানি ইয়ানি আম্মার বিন ইয়াসির। (সহীহ বুখারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫২৮, কিতাবুল ইস্তিযান, বাব মান আলকা লাহ উইসাদাহ)

[২] সুনানে তিরমিজি, হা: ৩৭৯৯ সনদ সহীহ

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৭১০০, কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুন তামুজু কাল বাহর

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৭১০২, কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুন তামুজু কাল বাহর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

মজলিসে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলো এবং বিভিন্ন কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে লাগল।

শোরগোল শুরু হলে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বলতে লাগলেন:

“হে লোকসকল! ফিতনা যখন আসে তখন তা সংশয় ও সন্দেহে ফেলে দেয়; হ্যাঁ, যখন তা চলে যায় তখন তার হাকিকত স্পষ্ট হয়। এই ফিতনা এমন যে, একজন যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এতে গতকালের শিশুর মতো। আল্লাহ আমাদের ওপর আমাদের ভাইদের রক্ত ও সম্পদ হারাম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তলোয়ারগুলো খাপে রাখো এবং নিজ নিজ ঘরে বসে থাকো; আমার নসিহত মানলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই শান্তিতে থাকবে।”

যায়েদ বিন সুহান (রা.) পুনরায় জোরেশোরে হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থন করলেন এবং হযরত তালহা ও যুবায়ের (রা.)-এর বিরোধিতা করাকে আবশ্যিক সাব্যস্ত করে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে বললেন:

“আপনি যেভাবে ফোরাত নদীর গতিপথ পরিবর্তন করতে পারেন না, তেমনি আপনি যা চান তা-ও করতে পারবেন না।”

এরপর সমবেতদের উদ্দেশ্যে বললেন: “হে লোকসকল! সবাই একত্রিত হয়ে আমীরুল মুমিনীনের কাছে চলো।”

পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগেই কুফার সেনাপতি কা’কা বিন আমর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বিজ্ঞোচিত ভঙ্গিতে বললেন:

“কথা তো সেটাই যা আমীর আবু মুসা আশআরী বলেছেন; হায়! যদি নিজের মতো করার কোনো পথ পাওয়া যেত। বাকি যায়েদ বিন সুহানের কথার কোনো গুরুত্ব নেই। আসল বিষয় হলো, একটি সরকার থাকা জরুরি যা মানুষকে সুসংগঠিত করবে, জালেমকে প্রতিহত করবে এবং মজলুমকে সাহায্য করবে। এর জন্য হযরত আলী (রা.) শাসক নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর ডাক হলো ইনসাফের ডাক। তিনি সংশোধনের দাওয়াত দিচ্ছেন, অতএব এই বিষয়ে পূর্ণ দূরদর্শিতার সাথে কদম বাড়ান।” [১]

যায়েদ বিন সুহানের কটু কথার বিপরীতে হযরত কা’কা বিন আমর (রা.)-এর মার্জিত কথার ইতিবাচক প্রভাব সমবেতদের ওপর পড়ল এবং কেউ এর বিরোধিতা করল না। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য হযরত হাসান (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

“আমীরুল মুমিনীনের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমাদের ভাইদের কাছে চলো। এই কাজের জন্য লোক তো পাওয়া যাবেই, কিন্তু বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরূপে যদি সাথে দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তবে ফলাফল ভালো হবে।”

এই সময়ে আশতার নাখয়ী আবারও নেতিবাচকভাবে মানুষের আবেগ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ শুরু করলেন, যা সহ্য করতে না পেরে একজন মুরূবি হযরত মাকতা বিন হাইসাম আমেরী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন: “আল্লাহর কসম! আমরা এটা সহ্য করব না যে আমাদের মুরূবিদের মন্দভাবে স্মরণ করা হবে।”

এতে হযরত হাসান (রা.) তৎক্ষণাৎ সমর্থন জানিয়ে বললেন: “মুরূবি সত্য বলেছেন।”

এ কথা শুনে সবাই শান্ত হয়ে গেল। এরপর হজর বিন আদি (রা.) এবং আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-ও ভাষণ দিলেন। [২]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৮২, ৩৮৩

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৩৮৫, সাযিফ থেকে বর্ণিত

আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর ভাষণ:

আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) তাঁর ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতি এবং উম্মুল মুমিনীন-এর মর্যাদার ওপর আলোকপাত করে বলেন:

“নিশ্চয়ই আমাদের মা আয়েশা (রা.) বসরায় চলে গেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের নবী (সা.)-এর স্ত্রী, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করছেন যে, এই পরিস্থিতিতে তোমরা (শরয়ী খলিফা হযরত) আলীর আনুগত্য করো নাকি তাঁর।” [১]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর আদব ও সম্মান পুরোপুরি বজায় রেখে কুফাবাসীদের হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করছিলেন এবং একে একটি ইজতিহাদী মাসআলা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করছিলেন যে, মানুষ এই পরিস্থিতিতে নিজেদের আবেগ দেখে চলবে নাকি শরয়ী বিধানকে।

এই আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর সামনেই কেউ উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর বিরুদ্ধে কিছু বললে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন:

“দূর হও, দুশ্চরিত্র, ঘেউ ঘেউ করা ব্যক্তি। তুই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা শ্রদ্ধেয় স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছিস।” [২]

কুফাবাসী আমীরুল মুমিনীনের খিদমতে:

হাসান বিন আলী এবং আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) কুফাবাসীদের হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হন এবং নয় হাজার লোক নিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পৌঁছান। [৩]

এই বাহিনীতে আটশ আনসারী এবং চারশ বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য লাভকারী সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৪]

হযরত আলী (রা.) মুসলমানদের এই বিশাল জনসমাবেশের সামনে নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে একটি ভাষণ দেন যাতে তিনি বলেন: “হে কুফাবাসী! আমি তোমাদের এজন্য ডেকেছি যাতে তোমরা আমাদের সাথে আমাদের বসরার ভাইদের কাছে চলো। যদি তারা নিজেদের মত থেকে ফিরে আসে তবে আমরা এটাই চাই। যদি তারা না মানে তবুও আমরা তাদের সাথে নম্র আচরণ করব। আমরা সেই প্রতিটি পথ অবলম্বন করব যাতে সন্ধি ও কল্যাণ থাকে।” [৫]

হযরত আলী (রা.) আহলে বসরাকে সাথে নেওয়ার প্রচেষ্টায়:

হযরত আলী (রা.) চাচ্ছিলেন যে এখন নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই লোকদের সাথে নিয়ে আহলে বসরার বাহিনীকে সাথে মেলাবেন, এবং মুসলমানদের এই জনশক্তি ও চিন্তাশক্তি মিলিত হয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু প্রথমে হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-এর পক্ষ থেকে খলিফার পরিকল্পনার ওপর পূর্ণ আস্থার প্রকাশ জরুরি ছিল। অন্যথায় বিষয়টি সেখানেই থেকে যেত এবং কয়েক কদম সাথে চলার পর একটি

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৭১০০, কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুন তামুজু কাল বাহর; হা: ৩৭৭২, কিতাবুল মানাকিব, বাব ফাদলু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৮৩, ত. আর-রুশদ।

[২] সুনান তিরমিযী, হা: ৩৮৮৮, আবওয়াবুল মানাকিব, বাব ফাদলু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪/৪৮৫ — এটিই সঠিক বক্তব্য। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী বাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল বারো হাজার। (তারিখুত তাবারী, ৪/৫০৫ যুহরী পর্যন্ত সহীহ সনদে)।

[৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৮৩, সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে হাসান সনদে।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৪/৪৮৭।

গন্তব্যের এই দুই দল আবার আলাদা আলাদা পথে চলে যেত।

হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর দ্বিধা:

এই সময়ে হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-ও কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে তাদের কৌশল সফল হচ্ছে না। হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দিনগুলোতে বলতেন: “এটি সেই ফিতনা যার সম্পর্কে আমাদের বলা হতো।”

কেউ একজন বললেন: “আপনি একে ফিতনাও বলছেন আবার এতে যুদ্ধও করছেন।”

তিনি বললেন: “আসলে আমরা অনেক চিন্তা করি কিন্তু কোনো সমাধান বুঝে আসে না। এখন পর্যন্ত এমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইনি। আগে প্রতিটি অভিযানে আমরা আগে থেকেই জানতাম যে এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কোথায় রাখতে হবে, কিন্তু এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না যে আমরা সামনে এগোচ্ছি নাকি পেছনে?” [১]

এই দ্বিধা এই কারণে ছিল যে, এই ব্যক্তিবর্গ ফিকহ এবং ইজতিহাদে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমকক্ষ ছিলেন না। এগুলো ছিল বিচার ও রাজনীতির সূক্ষ্ম বিষয় যাতে সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছিল। এই কারণেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো দ্বিধা ছাড়াই শরয়ী দলিল, নিজের ইজতিহাদ এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বারবার দ্বিধার শিকার হচ্ছিলেন।

হযরত কা’কা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সফল কূটনীতি:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত কা’কা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কূটনৈতিক দক্ষতা আঁচ করতে পেরে এবং উম্মতের প্রতি তার শুভাকাঙ্ক্ষার সঠিক মূল্যায়ন করে তাকে হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন এবং বললেন: “তাদেরকে ভালোবাসা ও ঐক্যের দাওয়াত দাও এবং বিভেদের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করো।”

হযরত কা’কা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আরজ করলেন: “আম্মাজান! আপনি কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?”

তিনি বললেন: “বৎস! মানুষের সংশোধন ও নির্দেশনার জন্য।”

হযরত কা’কা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করে হযরত তালহা এবং জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কেও মজলিসে উপস্থিত হওয়ার দাওয়াত দিলেন এবং তাদের বললেন: “উম্মুল মুমিনীন তার আগমনের উদ্দেশ্য মানুষের সংশোধন বলছেন। আপনারা কি এই বিষয়ে তার সাথে একমত নাকি ভিন্নমত পোষণ করেন?”

উভয়ই বললেন: “আমরা একমত।”

হযরত কা’কা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “তাহলে এই সংশোধনের বাস্তব রূপ কী হতে পারে?”

উভয়ই বললেন: “হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের পাকড়াও করা। এই বিষয়টিকে পেছনে ফেলে রাখা কুরআন মাজীদ পরিত্যাগ করার সমতুল্য, এটি সমাধান করা কুরআনী হুকুমকে জীবিত করা।”

[১] তারিখ আল-তবারী: ৩/৪৮৬।

হযরত কাকা বিন আমর (রা.) স্পষ্টভাবে বললেন: “আপনারা বসরার উসমান হত্যাকারীদের হত্যা করেছেন, কিন্তু আপনারা তাদের মধ্য থেকে ছয়শ জনকে মারলে ছয় হাজার লোক আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। পালিয়ে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি হুরকুস বিন জুহাইরের সমর্থনে ছয় হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা এই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন, তবে আপনারা নিজেরাই কিসাসের বিষয়টিকে পেছনে ফেলে দেওয়া ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। আর যদি আপনারা তার সমর্থকদের সাথেও যুদ্ধ করেন, তবে যে গৃহযুদ্ধ থেকে উন্মতকে বাঁচানোর জন্য আপনারা বের হয়েছেন, আপনারাই তাতে জড়িয়ে পড়বেন।” [১]

এগুলো ছিল সেই তিক্ত বাস্তবতা, যা হযরত তালহা, হযরত জুবাইর এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নিজেও অনুভব করছিলেন। তাই হযরত কাকা বিন আমর (রা.)-এর এই বাস্তবতা উন্মোচনকারী মন্তব্য শুনে উম্মুল মুমিনীন জিজ্ঞাসা করলেন:

“আপনিই বলুন, আপনি কী বলেন?”

তিনি বললেন: “আমি মনে করি এই সমস্যার সমাধান হলো পরিস্থিতি শান্ত হতে দেওয়া। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিতনাবাজদের মধ্যে ফাটল ধরবে। আপনারা যদি বায়আত গ্রহণ করেন তবে এটি কল্যাণের লক্ষণ এবং রহমতের সুসংবাদ হবে, হযরত উসমান (রা.)-এর কিসাস নেওয়া সম্ভব হবে। যদি আপনারা একমত না হন, তবে হযরত উসমান (রা.)-এর রক্ত বৃথা যাবে। এই বিষয়টি কোনো সাধারণ মামলা নয়, এটি কোনো একজন ব্যক্তির হত্যা নয় যাকে কোনো একজন ব্যক্তি, একটি দল বা একটি গোত্র হত্যা করেছে।”

উম্মুল মুমিনীন এবং হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.) কথার গুরুত্ব অনুধাবন করে এর সাথে পুরোপুরি একমত হলেন এবং বললেন: “যদি হযরত আলী আসেন এবং তিনিও একই মত পোষণ করেন, তবে কথা ঠিক হয়ে যাবে।”

কাকা বিন আমর (রা.) ফিরে গিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে অবহিত করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। [২]

হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে সাবায়ীদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা:

বসরাবাসীদের সাথে সন্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল এখন বিষয়গুলো মিটে যাবে। হযরত আলী (রা.) অনুভব করলেন যে, এখন মুখলিস লোকদের কোনো ভুল বোঝাবুঝিতে এবং বখাটেদের কোনো খুশফাহমিতে (ভ্রান্ত ধারণা) রাখা ঠিক নয়। এই সময়ে বসরার লোকেরা এসে কুফাবাসীদের সাথে মিলিত হচ্ছিল এবং ঐক্য ও সংহতির একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

এই প্রাণবন্ত পরিবেশে হযরত আলী (রা.) সাধারণ সমাবেশে অকপট ভাষণ দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন:

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৮, ৩৮৯

এই মহোদয়দের মতে, কেবল খলিফাকে মারাত্মক আঘাত করে হত্যাকারীরাই মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য ছিল না, বরং হত্যাকারী দলের সমর্থক, সহানুভূতিশীল এবং সাহায্যকারীদের ওপরও কিসাস প্রযোজ্য ছিল। এই কারণেই বসরায় সেই সমস্ত লোকদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল যারা বিদ্রোহের জন্য মদিনায় গিয়েছিল, তারা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে শরিক থাকুক বা না থাকুক। হযরত কাকা (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি হত্যাকারীদের সাহায্যকারীদের কাছ থেকেও কিসাস নেওয়া শরীয়তসম্মতভাবে ওয়াজিব মানা হয়, তবে এখন এই দলের নতুন সাহায্যকারীদের ওপরও কিসাস প্রযোজ্য হওয়া উচিত, যাদের সংখ্যা হাজার হাজার থেকে লাখে পৌঁছেছে। আর যদি এখানে থামা এবং চিন্তা করার অবকাশ থাকে, তবে হযরত আলী (রা.)-এর জন্য এই অবকাশ থাকবে না কেন? সুতরাং এটি প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী আল-মুরতজা (রা.) নিজেই হযরত কাকা (রা.)-কে দূত বানানোর সময় এমন জোরালো যুক্তি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অন্যথায় কাকা (রা.) নিজে ইলম ও ফজিলতে আশারা মুবাশশারা এবং উম্মুল মুমিনীনের সমকক্ষ ছিলেন না। হ্যাঁ, কথা বলার ধরণ এবং সাহিত্যিক দক্ষতায় তিনি নিঃসন্দেহে ঈষণীয় ছিলেন।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৯

“যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তার জন্য দায়ী ছিল সেই সব লোক যারা দুনিয়াপুজারী ছিল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু বান্দার পাওয়া শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করত। তারা ব্যবস্থা ও বিষয়াবলিকে উল্টে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফয়সালা পূর্ণকারী। তিনি যা চান সেই বিপদ এসেই থাকে। যা-ই হোক, আমি আগামীকাল (বসরাবাসীদের কাছে) যাচ্ছি। তোমরা সবাই চলো, হ্যাঁ! তবে যারা হযরত উসমান-এর বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল, তারা যেন কিছুতেই আমার সাথে না চলে, এমন নির্বোধ লোকেরা নিজেদেরকে আমার থেকে আলাদা মনে করুক।” [১]

হযরত আলী-এর এই ঘোষণায় যেখানে মুখলিস মুসলমানদের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে গেল, সেখানে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী হতভম্ব হয়ে গেল।

ইবনে সাবার গোপন পরামর্শ ও নতুন ষড়যন্ত্র:

আবদুল্লাহ বিন সাবা যে লঙ্করে উপস্থিত ছিল, সে তার দলের অন্যান্য নেতাদের সাথে সাথে সাথে পরামর্শে বসল। [২] তারা সবাই নিজেদের বাঁচার উপায় নিয়ে ভাবতে লাগল। একজন বলল: “আলী এসব কী বলছেন? আল্লাহর কসম! উসমানের কিসাস দাবিদারদের মধ্যে তিনি কুরআন মাজীদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং আমলকারী মানুষ, তোমরা শুনেছ তিনি কী বলে গেছেন। এখন কেবল তারাই তাঁর সাথে যাবে যারা উসমানের কিসাস দাবি করে। যখন সবাই আমাদের লক্ষ্যবস্তু বানাবে, তখন আমরা অল্প কজন মানুষের কী দশা হবে?”

দ্বিতীয়জন বিরক্ত হয়ে বলল: “তালহা ও যুবাইর আমাদের সম্পর্কে কী ভাবেন তা আমরা আগে থেকেই জানতাম, কিন্তু আলীর মত সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। আল্লাহর কসম! আমাদের ব্যাপারে তাদের সবার মত একই, যদি আলী তাদের সাথে সন্ধি করেন তবে সেই সন্ধি হবে আমাদের রক্ত ঝরানোর শর্তে। সুতরাং এখন এমন করি যে আলীকেও উসমানের কাছে পাঠিয়ে দিই।”

আবদুল্লাহ বিন সাবা প্রতিবাদ করে বলল: “একেবারে ভুল! আলীকে হত্যা করলে তার বদলে আমরা সবাই মারা যাব। তোমরা এখানে মাত্র পাঁচিশ বা ছাব্বিশ শ। ওদিকে তালহা ও যুবাইর পাঁচ হাজারের সাথে উপস্থিত আছেন। তাদের উদ্দেশ্যই হলো তোমাদের হত্যা করা। আমরা তাদের সাথে লড়াই করার শক্তি রাখি না।”

উলবা বিন হাইসাম বলতে লাগল: “কোনো দূরবর্তী ভূখণ্ডের দিকে পালিয়ে চলো যেখানে আমরা অন্যদের সাথে মিলে নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে পারি।”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৪৯৩

[২] আবদুল্লাহ বিন সাবার গোপন পরামর্শের এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে যঈফ। এই প্রশ্নও জাগে যে, শেষ পর্যন্ত এত গোপন পরামর্শের খবর বর্ণনাকারীর কাছে কীভাবে পৌঁছাল? কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণত ঐতিহাসিকগণ এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন; কারণ এরপর যা কিছু ঘটেছে তা এই ধরনের কোনো পরিকল্পনারই সত্যতা নিশ্চিত করে। হতে পারে এই দলের কোনো ব্যক্তি তওবা করে পরে এই কথা বর্ণনাকারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে তাবারীর এই যঈফ বর্ণনায় হযরত আদী বিন হাতিম-এর উল্লেখও আছে যা সম্পূর্ণ ভুল। আদী বিন হাতিম-এর সাবায়ী গোষ্ঠীর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, বরং হযরত আদী বিন হাতিম তো সাবায়ীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কুফা ছেড়ে এজন্যই কারকিসিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন যে কুফায় এই ধরনের লোকেরা হযরত উসমান-এর প্রতি কট্টক্ৰি করত। (তারিখ বাগদাদ: ১/২০৪) যেহেতু সনদে যঈফ বর্ণনাকারী বিদ্যমান তাই তাদেরই কেউ আদী বিন হাতিম-এর নামও জুড়ে দিয়ে থাকতে পারে। এই গোপন পরামর্শে আশতার নাখয়ীর নামও আসে, সনদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এটিও পর্যালোচনার দাবি রাখে কারণ জরাহ ও তাদীল-এর অধিকাংশ আলেম আশতার নাখয়ীকে সিকাহ বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। নিঃসন্দেহে সে একজন জেদি মানুষ ছিল কিন্তু আবদুল্লাহ বিন সাবার সাথে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনায় তার শরিক হওয়া কঠিন মনে হয়। যদি সে আবদুল্লাহ বিন সাবার এতই ঘনিষ্ঠ ঘাঁটি হতো তবে হযরত আলী তাকে গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর সেনাপতিত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতেন না। তাই এটা খুবই সম্ভব যে উল্লিখিত বর্ণনায় কোনো সাবায়ী বর্ণনাকারীই আশতার নাখয়ীর নাম জুড়ে দিয়েছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিজেদের সমমনা হিসেবে জাহির করা সাবায়ীদের একটি বিশেষ কৌশল।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুল্লাহ বিন সাবা তৎক্ষণাৎ বলল: “একেবারে ফালতু মত। এমন করলে মানুষ তোমাদের ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে দেবে।”

শুরাইহ বিন আউফি পরামর্শ দিয়ে বলল: “যে কাজ দ্রুত করতে হবে তাতে দেরি করো না, আমরা মানুষের চোখে নিকৃষ্টতম অবস্থায় আছি। জানা নেই এই লোকেরা কাল পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর আমাদের সাথে কী করবে।”

সালিম বিন সা’লাবা বলল: “এখন তো এটাই করতে হবে যে, মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের ওপর তলোয়ার চালাতে হবে যাতে তাদের সমস্ত বিষয় তলোয়ারের ধার দিয়ে মীমাংসা করা যায়।” ইবনে সাবা খুশি হয়ে বলল: “এই তো কাজের কথা।”

তারপর সে ফয়সালা শোনা: “মানুষের সাথে মিশে থাকাতেই নিরাপত্তা রয়েছে। যখন মানুষ নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করবে তখন হঠাৎ যুদ্ধ শুরু করে দাও। তাদের চিন্তা-ভাবনা করার জন্য শান্তিতে বসে থাকার সুযোগই দিও না, তখন মানুষের জন্য যুদ্ধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। এর ফলে আলী, জুবাইর, তালহা এবং তাদের সমমনা লোকদের এমন পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগই আসবে না যা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।” এই প্রস্তাবে সবাই একমত হলো এবং পরিকল্পনা করে ছড়িয়ে পড়ল। [১]

বসরার লঙ্করে আবেগপ্রবণ ও স্বার্থান্বেষী লোক:

কিছু আবেগপ্রবণ ও স্বার্থান্বেষী লোক হযরত তালহা ও জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চারপাশেও সমবেত ছিল যাদের উদ্দেশ্য ছিল হাঙ্গামা সৃষ্টি করা, যুদ্ধ উসকে দেওয়া এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা। একদিন হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন লোকদের হট্টগোলে অতিষ্ঠ হয়ে চুপ থাকার নির্দেশ দিলেন। যখন মানুষ থামল না, তখন তিনি দুঃখ ও আক্ষেপ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে বললেন:

“আফসোস শত আফসোস! এই লোকেরা তো লোভী মাছি এবং আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পতঙ্গের মতো।” [২]

এই ধরনের লোকেরাই উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণ হয়েছিল।

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাবায়ীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ইবনে সাবা এবং তার অনুচরদের পরবর্তী ষড়যন্ত্র দেখে আজ এই চিন্তা অবশ্যই আসে যে, যদি আমিরুল মুমিনীন তার মনের ভাব আরও কয়েকদিন গোপন রাখতেন তবে কী ক্ষতি হতো? এই ঘোষণার ফলে তো সাবায়ীরা সতর্ক হয়ে গেল। যদি হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং তাদের সমর্থকদের সাথে পূর্ণ মিলনের পর এই ঘোষণা হতো তবে কী লোকসান হতো?

এর উত্তর হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে জনসমাবেশে এমন ঘোষণা দেওয়া ছাড়া ঐক্য ও সংহতির সাধারণ পরিবেশ তৈরি হওয়া খুবই কঠিন ছিল। বসরার অধিবাসীরা এমন সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর আস্থা রাখতে পারছিল না। সমস্যাটি আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মতভেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মুসলমানদের দুটি বড় দলের মতপার্থক্য পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এখন যদি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন ঘোষণা না করতেন, তবে জনমতের চাপ হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা...

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৪৯৩, ৪৯৪

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৮২

হযরত আলী (রা.)-কে সন্ধিতে সম্মত হতে দেখা

হযরত আলী (রা.) কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত:

কাকা বিন আমর (রা.)-এর দূতিয়ালির মাধ্যমে সমঝোতার আশা দৃঢ় হয়েছিল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ধি বা ঐক্য তখনও হয়নি। বিষয়গুলো চূড়ান্ত করার জন্য হযরত আলী (রা.) কুফা থেকে রওনা হলেন এবং জমাদিউল আখিরা মাসে বসরার সামনে পৌঁছে গেলেন। [১]

সঠিক মতানুসারে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে নয় হাজার সাতশ (৯৭০০) ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সাহেবজাদা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) বলেন: “আমরা মদিনা থেকে সাতশ লোক রওনা হয়েছিলাম, কুফা থেকে সাত হাজার লোক আমাদের সাথে যোগ দেন। পথে চারপাশ থেকে আরও দুই হাজার লোক শামিল হন, যাদের অধিকাংশ বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।” [২]

উভয় দল যখন মুখোমুখি হলো, তখন হযরত আলী (রা.) হযরত জুবায়ের (রা.)-কে ডেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি একদিন অন্যায়ভাবে হযরত আলী (রা.)-এর মোকাবিলায় আসবেন। হযরত জুবায়ের (রা.)-এর হাদিসটি মনে পড়ে গেল, ফলে তিনি এই অভিযান ছেড়ে দেওয়ার কসম খেলেন এবং সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। [৩]

তাঁর সাহেবজাদা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) যখন জানতে পারলেন, তখন আরজ করলেন: “আপনি তো আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। আপনার উদ্দেশ্য হলো সংস্কার। তাই এখানেই অবস্থান করুন। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে উভয় দলকে ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন।”

তিনি বললেন: “আমি কসম খেয়েছি যে তাদের মোকাবিলা করব না।”

সাহেবজাদা উম্মাহর সংস্কারের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে পরামর্শ দিলেন: “কসমের কাফফারা হিসেবে একজন গোলাম আজাদ করে দিন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করুন যতক্ষণ না মুসলমানদের মধ্যে (ব্যবহারিকভাবে) ঐক্য (ও সংহতি) প্রতিষ্ঠিত হয়।”

হযরত জুবায়ের (রা.)-এর কাছে এই পরামর্শ পছন্দ হলো এবং তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। [৪] উভয় দল মুখোমুখি ছাউনি ফেলল। উভয় পক্ষ থেকে মুসলমানরা একে অপরের তাঁবুতে এসে মেলামেশা করতে শুরু করল। [৫]

আকাবিরদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ এবং সন্ধির ঘোষণা:

হযরত আলী (রা.) অবিলম্বে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে পাঠিয়ে তালহা ও জুবায়ের (রা.)-দ্বয়ের কাছে জানতে চাইলেন: “এমন কি কোনো বিষয় আছে যা আমার খিলাফতের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে, যেমন কোনো ফয়সালায় অবিচার বা ভাতা প্রদানে অধিকার হরণের অভিযোগ অথবা অন্য কিছু?”

তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন: “এগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ও নেই।” [৬]

এখন উভয় শিবিরের মাঝখানে একটি বড় তাঁবু খাটানো হলো যেখানে হযরত তালহা ও হযরত জুবায়ের (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)—

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৫০৬

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৫০৫, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া থেকে হাসান সনদে... দুর্বল বর্ণনাগুলোতে এই সংখ্যা অতিরঞ্জিতভাবে অনেক বেশি।

[৩] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা: ৫৫৭৩, ইমাম যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

[৪] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা: ৫৫৮৫

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৫০৬

[৬] ফাযায়েলুস সাহাবা লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ১০১৫, হাসান সনদে, ত আর-রিসালাহ।

পারস্পরিক সাক্ষাতের জন্য এই ব্যক্তিবর্গ তিন দিন পর্যন্ত সেই তাঁবুতে মিলিত হতেন এবং পরামর্শ করতেন। তারা আপসে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কোনো যুদ্ধ হবে না এবং সন্ধি ও সমঝোতার মাধ্যমে যৌথ কর্মপন্থা অবলম্বন করে নিজেদের শরয়ী দায়িত্বসমূহ পালন করা হবে। [১]

সন্ধি ও ঐক্যের ঘোষণা হওয়ার ফলে উভয় দলের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল, কিন্তু এই সময়ে একটি ফাসাদী (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) গোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, যদি শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় থাকে তবে তারা কোথাও টিকতে পারবে না।

ফলে তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক অত্যন্ত গোপনে রাতের অন্ধকারে হযরত আলী [রা.] -এর লশকর থেকে বের হয়ে হযরত তালহা [রা.] এবং হযরত যুবাইর [রা.] -এর শিবিরের দিকে চলে গেল। যেহেতু উভয় পক্ষ থেকে তখন কারো যাতায়াতে কোনো বাধা ছিল না, তাই তাদের জন্য অন্য শিবিরে প্রবেশ করা মোটেও কঠিন ছিল না। [২]

X X X

জঙ্গ জামাল

এর পরদিন হঠাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, যদিও এর কোনো আলামত ছিল না। এই লড়াইকে জঙ্গ জামাল বলা হয়। কারণ এই সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রা.] একটি উটের ওপর সওয়ার ছিলেন, যার চারপাশেই যুদ্ধের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি ছিল।

সহীহ সনদের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহ:

লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণের আগে এতটুকু জেনে নেওয়া উচিত যে, এই বিষয়ে হাদীসের সহীহ বর্ণনাগুলো থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়:

- হযরত আলী [রা.] যুদ্ধ থেকে যথাসম্ভব বিরত ছিলেন, এমনকি হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর [রা.] -এর লশকরের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা হয়। [৩]
- হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর [রা.] -এর নির্দেশে যুদ্ধ শুরু হওয়া প্রমাণিত নয়, বরং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুযায়ী সন্ধির পরিবেশ বজায় ছিল, এমনতাবস্থায় হঠাৎ উভয় লশকরের কিছু যুবক বের হয়ে একে অপরকে গালি দিল, তারপর তীর চলা শুরু হলো। উভয় লশকরের গোলামরাও তাদের সাথে যোগ দিল এবং নির্বোধ লোকেরাও লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। [৪]
- আসল লড়াই জাওয়ালের (দুপুর) সময় শুরু হয়েছিল এবং বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় হযরত আলী [রা.] -ও ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন, যার পর উভয় পক্ষের মধ্যে নেজা (বল্লম) ও তলোয়ারের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। [৫]

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৭৭, তবাকাতুল কুবরা, তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫০৬।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫০৬ আন সাইফ।

[৩] শরহ মাতানী আল-আসার লিত-তাহাবী, হা: ৫১১৩, কিতাবুস সিয়র, এই বর্ণনাটি শাহিদ ইবনে য়ায়েদ বিন ওয়াহাব থেকে বর্ণিত যিনি হযরত আলী [রা.] -এর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৫৭ সহীহ সনদে, এই বর্ণনাটি শাহিদ আবান আসিম বিন কুলাইব থেকে বর্ণিত যিনি হযরত আলী [রা.] -এর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, দেখুন: তারিখ আল-তাবারী: ৩/৪৯২ আন আসিম বিন কুলাইব।

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৭৭ সহীহ সনদে, আবু উমর থেকে বর্ণিত যিনি হযরত আলী [রা.] -এর বড় সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বর্ণনার শব্দগুলো অর্থাৎ উত্তম পুরুষ বহুবচন রূপ প্রমাণ করে যে তিনি যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

যুদ্ধটি সংক্ষিপ্ত ছিল, যোহর থেকে আসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। সূর্যাস্তের আগেই তা শেষ হয়ে যায়। [১]

ঐতিহাসিক বিবরণ:

ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, বসরা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত সাবায়ীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আলী-র শিবিরের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। অন্যদিকে হযরত আলী-র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত সাবায়ীরা হযরত তালহা ও যুবাইর-এর সমর্থকদের ওপর আক্রমণ করে এবং অনবরত তীর বর্ষণ করতে থাকে। প্রত্যেকেই মনে করল যে, অপর পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে হঠাৎ আক্রমণ করে দিয়েছে। ফলে উভয় দলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছলছুল পড়ে গেল। [২]

হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর হাঙ্গামা শুরু হতে দেখে কারণ জানতে চাইলে তাদের বলা হলো: “কুফাবাসীরা আক্রমণ করে দিয়েছে।”

প্রকৃতপক্ষে সাবায়ী গোষ্ঠী ভুল তথ্য ছড়ানোর পরিকল্পনাও করে রেখেছিল। তারা হযরত আলী-র কাছেও একজন লোক নিযুক্ত করে রেখেছিল যাতে সে তাকে ভুল সংবাদ দেয়। ফলে যখন হাঙ্গামার শব্দ শুনে হযরত আলী বিষয়টি জানতে চাইলেন, তখন তাকেও জবাবে শুনতে হলো: “বসরাবাসীরা হঠাৎ আমাদের ওপর নৈশকালীন আক্রমণ (শবখুন) করেছে।”

তা সত্ত্বেও হযরত আলী সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন: “হে লোকসকল! তোমাদের হাত থামাও।” [৩]

কিন্তু যে তলোয়ারগুলো খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেগুলো আর থামল না।

উভয় পক্ষের বুদ্ধিমান লোকেরা সতর্কতা অবলম্বন করছিলেন। হযরত যুবাইর হযরত আম্মার বিন ইয়াসির-এর বর্শার নাগালে চলে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান?”

আম্মার বিন ইয়াসির বললেন: “না, আপনি চলে যান।” [৪]

মোটকথা, এভাবে অনেক মানুষ হাত গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সাবায়ী, ফাসাদী, বেদুইন এবং উত্তেজিত লোকেরা উভয় পক্ষেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তাই বাধ্য হয়ে অনেক মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করতে হচ্ছিল। [৫]

হযরত যুবাইর-এর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়া:

হযরত যুবাইর লড়াই বাড়তে দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে, প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তার হাতে কোনো মুসলমানের রক্ত ঝরা অসম্ভব নয়। তিনি তার পুত্র...

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, খণ্ড: ৭/৩৭৮৩৩, বাব মাসিরে আয়েশা ওয়া আলী ওয়া তালহা ওয়া যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আন য়ায়েদ বিন ওয়াহাব, হা: ৩৭৭৫৭, সহীহ সনদে। এই বর্ণনাটি একজন প্রত্যক্ষদর্শী আসিম বিন কুলাইব থেকেও বর্ণিত, যিনি হযরত আলী-র সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ত: আর-রুশদ।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৫০৬, ৫০৭ আন সাইফ। এই বর্ণনায় সাবায়ীদের ভোরবেলা লড়াই ছড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তবে এর সঠিক বর্ণনাগুলোর সাথে সমন্বয় হতে পারে যা আমরা সামনে পেশ করব।

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৫০৭ আন সাইফ।

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৫১২ আন উমর বিন শাব্বাহ।

[৫] তারিখ আল-তাবারী: ৪/৫০৭ আন সাইফ, এতে রয়েছে “ওয়াল মাদিনাতু লা ইয়াফতারু আশইয়া”।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-কে ডেকে বললেন: “বেটা! আজ নিহত হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি হয় জালিম হবে অথবা মজলুম, আমার বিশ্বাস যে আমি মজলুম হিসেবে নিহত হব।” এ কথা বলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে চলে গেলেন। [১]

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর শাহাদাত:

যুদ্ধের শুরুতেই হযরত তালহা (রা.)-কে একটি তীর এসে লাগে, যার জখমে তিনি শাহাদাতের সুখা পান করেন। [২]

সে সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ বা আটান্ন বছর। [৩]

ইমাম বায়হাকী (রহ.) ‘আল-ইতিকাদ’-এ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত তালহা (রা.) যখন তীরবিদ্ধ হন, তখন প্রাণবায়ু বের হওয়ার আগে তিনি আলভী (আলী রা.-এর পক্ষের) বাহিনীর এক ব্যক্তির হাতে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে পুনরায় বায়াত গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.)-কে যখন এই সংবাদ দেওয়া হলো, তখন তিনি তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বললেন: “আল্লাহর এটাই মঞ্জুর ছিল যে, তিনি আমার বায়াত নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবেন।”

একইভাবে যখন তিনি সংবাদ পেলেন যে হযরত যুবায়ের (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেছেন, তখন তিনি বললেন:

“আল্লাহর কসম! তিনি ভীৰুতার কারণে ফিরে যাননি, বরং তওবা করে ফিরে গেছেন।” [৪]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে:

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে, বসরার লোকালয়ে অবস্থান করছিলেন। বসরার কাজী কাব বিন সুর (রা.) এসে তাঁকে এই বিয়োগান্তক ঘটনার সংবাদ দিলেন এবং বললেন:

“আপনি নিজে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের তলোয়ার কোষবদ্ধ করার নির্দেশ দিন, সম্ভবত আল্লাহ আপনার উসিলায় সন্ধির তাওফিক দেবেন।” [৫]

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩১২৯, কিতাবুল জিহাদ, বাব বারাকাতুল গাজী ফি মালিহি। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এই বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেন: হযরত যুবায়ের (রা.) যখন যুদ্ধের তীব্রতা দেখলেন এবং অনুভব করলেন যে লোকেরা যুদ্ধ না করে আলাদা হবে না, তখন তিনি বললেন: “আমি মজলুম হিসেবে নিহত হব।” এজন্য তিনি যুদ্ধ না করার সংকল্প করেছিলেন। (উমদাতুল কারী: ১৫/৫১, তাবা’ ইহয়াউত তুরাস)। মনে রাখা দরকার যে, কিছু দুর্বল বর্ণনায় বলা হয়েছে যে যুদ্ধের সময় হযরত যুবায়ের (রা.)-কে কেউ একজন বলেছিল যে আমাদের বিন ইয়াসির (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীতে আছেন, হযরত যুবায়ের (রা.) হঠাৎ এই তথ্য জানতে পেরে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দেন। এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ আমাদের বিন ইয়াসির (রা.)-এর হযরত আলী (রা.)-এর বিশিষ্ট সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আগে থেকেই জানা ছিল।

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৩৪, সাযিফ থেকে বর্ণিত।

[৩] একাধিক বর্ণনায় রয়েছে যে হযরত তালহা (রা.)-এর ওপর মারওয়ান তীর নিক্ষেপ করেছিল; কারণ তার সন্দেহ ছিল যে তিনিই হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের মধ্যে শরীক ছিলেন। মারওয়ান বিন হাকাম জঙ্গে জামালের দিন বলেছিল। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৬৬৬৩ ইসনাদ সহীহ, তাবা’ আর-রুশদ)। সবচেয়ে বড় কথা হলো, উসমান (রা.)-এর হত্যার উস্কানিতে शामिल মশহুর তাবেরী কায়েস বিন আবি হায়েম নিজের চোখে দেখা বর্ণনা পেশ করেছেন যে, মারওয়ান বিন হাকামই সেদিন হযরত তালহা (রা.)-কে তীর মেরেছিল। ইবনে সাদ, তাবারানী এবং হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাইসামী এর সম্পর্কে বলেন: এর বর্ণনাকারীরা সহীহ-এর বর্ণনাকারী। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা: ১৫৮২৩)। হাফেজ ইবনে হাজারও একে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবাহ: ৩/৪৩৩, তাবা’ আল-ইলমিয়াহ)। হাফেজ ইবনে কাসীরও একে মশহুর উক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন, তবে এর সাথে সাথে এই কথাকেও ‘আকরাব’ (নিকটতর) বলেছেন যে তীরটি কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি নিক্ষেপ করেছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৪৭)। হাফেজ ইবনে কাসীরের দ্বিতীয় উক্তি ‘আকরাব’ কেন বিতর্কিত? কারণ এর বর্ণনাকারী সাযিফ বিন উমর অগ্রহণযোগ্য। (আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল: পৃ. ১১৫; তারিখুত তাবারী: ৪/৫০৮)। খলিফা বিন খাইয়াতও এই দ্বিতীয় উক্তিটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা অস্পষ্ট, যেখানে প্রথম উক্তির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (তারিখ খলিফা: পৃ. ১৮১)।

[৪] ফাতহুল বারী: ৭/৮২।

[৫] আল-ইতিকাদ লিল বায়হাকী, পৃ. ৩৭১।

উম্মুল মুমিনীন (রা.) নিজের জীবনকে বিপন্ন করে উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন এবং হযরত কাবকে কুরআন মাজীদের একটি কপি দিয়ে বললেন: “আপনি আল্লাহর কিতাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং মানুষকে এর দিকে আহ্বান জানান।”

কাব বিন সুর কুরআন কারীমের পাতাগুলো খুলে সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি কুরআন মাজীদের নির্দেশে সন্ধি করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন, এমন সময় সাবায়ীরা নির্বিচারে তীর বর্ষণ করে তাঁকে হত্যা করে ফেলল। [১] এরপর উম্মুল মুমিনীনের ওপর তীরের বৃষ্টি শুরু হলো। [২] আপনি উটের ওপর হাওদায় উপবিষ্ট ছিলেন। হাওদার চারপাশে সতর্কতামূলক বর্ম ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবুও বিপদ ছিল চরম। [৩]

উম্মুল মুমিনীন নিজের জীবনের কথা ভুলে গিয়ে তখনও যুদ্ধ বিরতির উপদেশ দিয়ে চিৎকার করে বলছিলেন: “আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো হে আমার সন্তানেরা! হিসাব-নিকাশের দিনের কথা স্মরণ করো।”

কিন্তু লোকজন আক্রমণ থেকে বিরত হলো না, তখন উম্মুল মুমিনীন হাত তুলে উসমানের হত্যাকারী এবং তাদের সমর্থকদের জন্য বদদোয়া করতে শুরু করলেন। আপনার সমর্থকরা এই আহ্বানে উচ্চস্বরে আমীন বলছিলেন।

হযরত আলী (রা.) এই আওয়াজ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এই গুপ্তন কিসের?”

লোকজন জানাল যে, উম্মুল মুমিনীন এবং তাঁর সমর্থকরা উসমানের হত্যাকারী এবং তাদের সঙ্গীদের ওপর লানত দিচ্ছেন। হযরত আলী (রা.) এটি শুনে নিজেও আওয়াজ দিলেন: “হে আল্লাহ! উসমানের হত্যাকারী এবং হত্যাকারীদের সমর্থকদের ওপর লানত বর্ষণ করুন।” [৪]

এই সময়ে যুদ্ধের পরিধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ ময়দানের সেই অংশে চলছিল যেখানে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আক্রমণকারীরা রক্ষীদের কাছ থেকে উটের লাগাম ছিনিয়ে নিয়ে উম্মুল মুমিনীনকে নিজেদের কবজায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু উম্মুল মুমিনীনের চারপাশে পতঙ্গের মতো আত্মোৎসর্গকারী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অভাব ছিল না।

উম্মুল মুমিনীন তখনও যুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছিলেন। হযরত তালহা (রা.)-এর তরুণ পুত্র মুহাম্মদ উটের লাগাম ধরে জিজ্ঞেস করলেন: “আম্মাজান! কী নির্দেশ?” বললেন: “আদমের দুই পুত্রের মধ্যে নেককার পুত্রটির মতো হয়ে যাও।”

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ বিন তালহা লোকজনকে উম্মুল মুমিনীনের ওপর সরাসরি আক্রমণ করতে দেখে কীভাবে সরে যেতে পারতেন, তিনি পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ‘হা-মীম লা ইউনসারুন’ স্লোগান দিয়ে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। [৫]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৮৫; তারিখ আত-তবারী: ৩/৫১৩

[২] তারিখ আত-তবারী: ৩/৫১৩

[৩] তারিখ আত-তবারী: ৩/৫০৭

[৪] তারিখ আত-তবারী: ৩/৫১৩, ৫১৪... এখানে যেন এই সংশয় না জাগে যে, “হযরত আলী (রা.) উসমানের হত্যাকারীদের সাথেও রেখেছিলেন আবার তাদের ওপর লানতও দিচ্ছিলেন, এটি কি কোনো দ্বিমুখী নীতি ছিল নাকি তিনি অপরাধীদের সামনে অসহায় ছিলেন।” আসলে এটি ছিল কাজা (বিচারিক) এবং দিয়ানাত (ধর্মীয়/নৈতিক)-এর পার্থক্য। মূল হত্যাকারীরা তো যেকোনো অবস্থাতেই লানতযোগ্য এবং কিসাসযোগ্য ছিল, যদিও তাদের সমর্থকরা বায়আত করার মাধ্যমে বিচারিক দিক থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল, তবুও তারা যদি মন থেকে তওবা না করে থাকে তবে দিয়ানাত বা ধর্মীয় বিচারে তারা অভিশপ্ত, তিরস্কারযোগ্য এবং লানতযোগ্য ছিল।

খাসুমাত: কাজা (বিচারিক) বলতে কোনো বিষয়ের সেই রূপকে বোঝায় যা বাহ্যিক দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়। শাসক বা বিচারক এরই ভিত্তিতে কোনো ফয়সালা করতে পারেন। দিয়ানাত বলতে কোনো বিষয়ের সেই রূপকে বোঝায় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে প্রমাণিত অথবা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে, যদিও তার কোনো বিচারিক প্রমাণ নেই। আখিরাতে ফয়সালা এই অবস্থার ভিত্তিতেই হবে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে দেখে নিন।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৬৬

তাদের পর হযরত আবদুর রহমান বিন আত্তাব এবং তারপর হযরত আসওয়াদ বিন আবুল বাখতারি লাগাম ধরলেন এবং আহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন জখমে জর্জরিত হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) দৌড়ে এসে লাগাম ধরলেন। ততক্ষণে তিনি সাঁইত্রিশটি আঘাত পেয়েছিলেন। এমন সময় মালিক বিন আশতার নাখয়ীর সাথে তাঁর মোকাবিলা হলো। দুজনেই একে অপরের ওপর বাঁপিয়ে পড়লেন এবং লড়তে লড়তে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। উভয়ের সমর্থকরা এগিয়ে এসে তাঁদের টেনে নিয়ে গেল। মারওয়ান বিন আল-হাকামও এই যুদ্ধে উম্মুল মুমিনীনকে রক্ষা করতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন। [১]

বনু বকর বিন ওয়াইল, বনু নাজিয়া এবং বনু দ্বাব্বা গোত্রের বীররা দ্রুত এগিয়ে এসে উটের লাগাম ধরতে থাকলেন। যে-ই এই দায়িত্ব নিতেন, আক্রমণকারীরা তাঁর হাতে আঘাত করে কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিত, তারপর তাঁকে হত্যা করত। এভাবে একে একে সত্তর জন ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর সুরক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। [২]

উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর প্রতিরক্ষায় বনু দ্বাব্বার নেতা বসরার প্রাক্তন কাজী ইবনে ইয়াসরিবি অসাধারণ বীরত্বের প্রমাণ দেন। তিনি উম্মুল মুমিনীনের উটের সামনে ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। তাঁর ওপর হিন্দ বিন আমর মুরাদি এবং তারপর ইলবা বিন হাইসাম আক্রমণ করেন; কাজী ইবনে ইয়াসরিবি উভয়কেই একের পর এক ধরাশায়ী করেন। [৩]

হযরত আলী (রা.) যুদ্ধের তীব্রতা দেখলেন যে মাথাগুলো কাঁধ থেকে গড়িয়ে পড়ছে, তখন তিনি অস্থির হয়ে হযরত হাসান (রা.)-কে বললেন: “আজকের পর আর কোন কল্যাণের আশা করা যেতে পারে।” তিনি বললেন: “আমি আপনাকে শুরুতেই এ থেকে নিষেধ করেছিলাম।” [৪]

যুদ্ধের সমাপ্তি

এই সময়ে হযরত কা’কা বিন আমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে পরামর্শ দিলেন যে, কোনোভাবে উম্মুল মুমিনীনের উটটিকে ফেলে দেওয়া হোক, কারণ বসরার অধিবাসীরা এখন কেবল উম্মুল মুমিনীনের প্রতিরক্ষার জন্যই লড়ছে। হযরত আলী (রা.) এই প্রস্তাব পছন্দ করলেন। হযরত কা’কা বিন আমর (রা.) বুজাইর বিন দুলজাহ নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন, যিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর দলে থাকা তাঁর ভাই আমর বিন দুলজাহকে ডাকলেন। তিনি কাছে এলে এই ব্যক্তির নিজেদের জন্য নিরাপত্তা লাভের জন্য... [৫]

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৫১৯

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৫৩০

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৩৬, ২৬৩

[৪] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৫২৯, ৫৩০ — কাজী ইয়াসরিবি তখন এই রণসঙ্গীত (রাজাঘ) পাঠ করছিলেন:

المَوْتُ أَحَلَّ عِندَنَا مِنَ الْعَسَلِ ... نَحْنُ بَنُو ضَبَّةٍ أَصْحَابُ الْجَلِ
نَحْنُ بَنُو الْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلَ ... نَعَى ابْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الْأَسَلِ
رُدُّوا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَجَلْ

অনুবাদ: মৃত্যু আমাদের কাছে মধুর চেয়েও মিষ্টি, আমরা অর্থাৎ বনু দ্বাব্বা হচ্ছি উষ্ট্র যুদ্ধের (জামাল) সাথী। আমরা মৃত্যুর সন্তান যখন মৃত্যু নেমে আসে, আমরা বর্শার ফলায় হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিই। আমাদের শায়খকে (হযরত উসমান রা.) আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও, তবেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। (আনসাবুল আশরাফ: ৩/২৪২)

[৫] আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হা: ৫৫৯৮

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমা

উটের কাছে পৌঁছানোর পর হযরত কা'কা (রা.) এই ঘোষণা দিতে দিতে সামনে এগিয়ে গেলেন যে, তোমাদের সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। ফলে বসরার অধিবাসীরাও হাত গুটিয়ে নিল। [১] হযরত কা'কা (রা.)-এর সাথে আবদুল্লাহ বিন বদিলও ছিলেন। তিনি হাওদার কাছে গিয়ে ডাক দিলেন: “উম্মুল মুমিনীন! আপনি হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের দিন আমাকে নিজে বলেছিলেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর দামান আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম! তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা বিচ্যুতি আসেনি।” উম্মুল মুমিনীন চুপ রইলেন।

তখন আবদুল্লাহ বিন বদিল বললেন: “উটের পা কেটে ফেলো।” তাঁর সঙ্গীরা নির্দেশ পালন করল। [২] মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং আবদুল্লাহ বিন বদিল হাওদাটি পড়ে যাওয়ার আগেই সামলে নিলেন এবং তা উঠিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। [৩] তিনি উম্মুল মুমিনীনকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে হাওদা থেকে বের করে একটি তাঁবুতে স্থানান্তরিত করলেন। এরপর তিনি নিজে আসলেন এবং উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর কুশলাদি জানতে চাইলেন। সেই সাথে আরজ করলেন: “আম্মাজান! আল্লাহ আমাদেরও ক্ষমা করুন এবং আপনাকেও।” উম্মুল মুমিনীনও জবাবে বললেন: “আল্লাহ আমাদের এবং আপনার মাগফিরাত দান করুন।” [৪]

এই যুদ্ধ যা আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছিল... তা ছিল একটি হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগুনের মতো যা নিমিষেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল।

আহলে জামালের প্রতি হযরত আলী (রা.)-এর আচরণ:

হযরত আলী (রা.) যুদ্ধের শেষে একজন দয়ালু এবং আল্লাহভীরু শাসকের ভূমিকা পালন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, কোনো আহত ব্যক্তিকে যেন হত্যা না করা হয়, কোনো পলায়নপর ব্যক্তিকে যেন ধাওয়া না করা হয়, আর যে অস্ত্র ত্যাগ করবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

মারওয়ান বিন হাকামের বর্ণনা হলো যে, আমি হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে অধিক দয়ালু বিজয়ী আর কাউকে দেখিনি। জঙ্গে জামালে যখন আমরা পরাজিত হলাম, তখন তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করল: “পলায়নপর ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না, আহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হবে না।” [৫]

তিনি (রা.) সকল নিহত ব্যক্তিকে সমান মর্যাদা দিলেন এবং তাঁদের জানাজার নামাজ পড়ালেন। [৬] প্রতিপক্ষের আসবাবপত্রকে গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য করেননি, বরং হারানো সম্পদের মর্যাদা দিয়ে বললেন যে, যার যা কিছু আছে, সে যেন চিহ্ন বলে তা নিয়ে যায়। [৭]

চরমপন্থী লোকদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) বসরার অধিবাসীদের সম্পদ লুণ্ঠনের অনুমতি দেননি। কেউ এ বিষয়ে আপত্তি তুলে বলল: “যাদের রক্ত হালাল, তাদের সম্পদ আমাদের জন্য হারাম কেন?” এতে হযরত আলী (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন: “কে আছে যে নিজের মা উম্মুল মুমিনীনকে নিজের অংশে নিতে চায়?” [৮]

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৫২৭

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৮৩১, ত: আর-রুশদ

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৮৩১, ত: আর-রুশদ

[৪] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৩৩

[৫] কিতাবুল উম্ম লিল ইমাম শাফেয়ী: ৪/২২৯, ত: আল-মা'রিফাহ, এবং এভাবেই আবদ খাইর থেকে বর্ণিত (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৯০)

[৬] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৩৮

[৭] তিনি বললেন: হে কানবার, যে যা চিনতে পারবে সে যেন তা নিয়ে নেয়। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৮৪৩, হা: ৩৭৮১৬, ত: আর-রুশদ)

সবার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আওয়াজ উঁচু হলো: “সুবহানাল্লাহ! তিনি তো আমাদের মা।”

এরপর আর কেউ এই দাবি পুনরাবৃত্তি করার সাহস করেনি। [১]

যুদ্ধের তারিখ, সময়কাল এবং নিহতদের সতর্ক সংখ্যা:

সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধ জোহর থেকে আসরের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত হাঙ্গামা খতম হয়ে গিয়েছিল। [২]

যুদ্ধের তারিখ ১০ জমাদিউল আখিরা ৩৬ হিজরি বলা হয়। [৩]

নিহতদের সংখ্যার ব্যাপারে বর্ণনাকারীরা অত্যন্ত অতিরঞ্জন করেছেন। এই বিষয়ে নিচের বক্তব্যগুলো প্রসিদ্ধ:

১. কেউ কেউ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত সংখ্যা বলেছেন, এই সংখ্যা সহিহ বর্ণনায় উল্লিখিত উভয় বাহিনীর মোট সংখ্যার চেয়েও বেশি। কারণ সতর্ক বর্ণনা অনুযায়ী উভয় পক্ষের লোক মিলিয়েও পনেরো হাজারের কম ছিল।

হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.)-এর সাথীদের সংখ্যা ছিল নয় হাজার সাতশ। [৪]

হযরত জুবাইর (রা.)-এর সাথীদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। [৫] এভাবে উভয় বাহিনীর মোট সংখ্যা পনেরো হাজারের কম হয়। তাহলে নিহতদের সংখ্যা বিশ-পঁচিশ হাজার কীভাবে হতে পারে?

সঠিক কথা হলো উভয় পক্ষের মোট নিহতদের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি। কুফাবাসীদের মধ্যে নিহত ছিল পাঁচশ এবং বসরার অধিবাসীদের মধ্যে আড়াই হাজার। [৬]

নিহতদের সংখ্যা বিশ-পঁচিশ হাজার না হওয়ার সম্ভাবনা কয়েকটি কারণে আরও জোরালো হয়:

১. এটি ছিল প্রচণ্ড শীতের মৌসুম, সৌর তারিখ ছিল ৫ই ডিসেম্বর, দিন ছিল ছোট। আসল লড়াই জোহরের পর শুরু হয়েছিল এবং সূর্যাস্তের আগে অর্থাৎ প্রায় পাঁচটার মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের সময়কাল ছিল প্রায় তিন ঘণ্টা।

২. অধিকাংশ লোক কোনো জোশ বা আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং নিজেকে বাঁচানোর জন্য লড়ছিল।

৩. লড়াইয়ের পর কোনো আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়নি, আর কারো পিছু নেওয়া হয়নি।

৪. রোম ও পারস্যের সাথে বড় বড় যুদ্ধেও বিশ-পঁচিশ হাজার মুসলমান শহীদ হননি, যদিও তারা পূর্ণ জোশ ও...

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৮০, হা: ৩৭৮৩৩, ত: আর-রুশদ

[২] তাদের লড়াই জোহরের নামাজের পর হয়েছিল, আর সূর্য ডোবার আগেই উটের চারপাশে এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না যে চোখের পলক ফেলবে তাদের মধ্য থেকে যারা তাকে রক্ষা করছিল। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৮৩৩)

অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় ফজরের সময় সাবায়ীদের আক্রমণ এবং আহলে জামালের আত্মরক্ষার কথা উল্লেখ আছে। সম্ভব এভাবে হতে পারে যে লড়াইয়ের দুটি পর্যায় ছিল: প্রথম পর্যায়ে শেষ রাতে সাবায়ীদের উস্কানি শুরু হয়। বিচ্ছিন্ন আক্রমণ হয়। বিচ্ছিন্নভাবে খবর ছড়িয়ে পড়ে, এখানে সেখানে ব্যক্তিগত সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। তীরন্দাজিও শুরু হয়। জোহর পর্যন্ত উভয় পক্ষ লড়াইয়ের জন্য কোমর বেঁধে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায় এবং তীব্র লড়াই জোহরের পর হয় যখন উম্মুল মুমিনীন যুদ্ধ থামানোর জন্য উপস্থিত হন কিন্তু মানুষ বেরোয়া হয়ে যায় এবং উটের চারপাশে লাশের স্তুপ জমে যায়।

[৩] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৫৮০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৪৬

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৫০৫ হাসান সনদে

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৯৩

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৮৬

...উদ্যমের সাথে লড়া যুদ্ধগুলো ছিল।

(৫) যুদ্ধটি অসংগঠিতভাবে লড়া হয়েছিল কারণ বসরার অধিবাসীদের নেতা হযরত তালহা (রা.) শুরুতেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত যুবাইর (রা.)-ও দ্রুতই ময়দান থেকে সরে গিয়েছিলেন। অতএব, একটি অনিয়মিত যুদ্ধে এত বেশি রক্তপাত হওয়া এবং এত বেশি লাশ পড়া, তাও মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে, তা কল্পনাযুক্ত।

যুদ্ধের পরবর্তী শোক ও দুঃখ:

যুদ্ধের পর উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এই রক্তপাতের জন্য আফসোস করতে থাকেন। তিনি বলতেন:

“হায়! আমি যদি বিশ বছর আগেই মারা যেতাম।” [১]

এদিকে হযরত আলী (রা.)-ও অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। কাব বিন সুর (রা.)-এর লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি থেমে গেলেন এবং বললেন:

“আল্লাহর কসম! আমি জানি যে তুমি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ইনসাফের ফয়সালা করতে।” [২]

হযরত আলী (রা.)-এর জবানীতে হযরত তালহা (রা.) এবং তাঁর সাহেবজাদা মুহাম্মাদের প্রশংসা:

হযরত তালহা (রা.)-এর লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, সওয়ারি থেকে নেমে পড়লেন, তাঁকে নিজের কোলে তুলে নিলেন, দাড়ি ও মুখমণ্ডল থেকে মাটি পরিষ্কার করলেন এবং বললেন:

“হে আবু মুহাম্মাদ! আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তোমাকে খোলা আকাশের নিচে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। হে আল্লাহ! আমার ধ্বংস ও নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ফরিয়াদ তোমার কাছেই করছি। আল্লাহর কসম! আমার পছন্দ ছিল যে আমি বিশ বছর আগেই মারা যেতাম।” [৩]

তিনি এই উপলক্ষে এই অশ্রুসিক্ত কবিতাগুলো পাঠ করেন:

فَتَّى كَانَ يُدْنِيهِ الْغَنَى مِنْ صَدِيقِهِ ... إِذَا مَا هُوَ اسْتَغْنَى وَ يُبْعِدُهُ الْفَقْرُ
كَأَنَّ الثَّرِيَّاءَ عَلَّقَتْ مِنْ جَبِينِهِ ... وَفِي خَدِّهِ الشَّعْرَى وَفِي الْآخِرِ الْبَدْرُ

“তিনি এমন এক যুবক ছিলেন যে, সচ্ছলতা তাঁকে তাঁর বন্ধুর নিকটবর্তী করত, অথচ তিনি বন্ধুর প্রতি উদাসীন থাকতেন এবং দারিদ্র্যের কারণে দূরত্ব বজায় রাখতেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর কপালে যেন ছায়াপথ রয়েছে। তাঁর এক গাল শি’রা নক্ষত্রের মতো এবং অন্যটি পূর্ণিমার চাঁদের মতো।” [৪]

যুদ্ধে হযরত তালহা (রা.)-এর সাহেবজাদা হযরত মুহাম্মাদ বিন তালহা (ওরফে সাজ্জাদ) (রা.)-ও শহীদ হন। হযরত আলী (রা.) তাঁর লাশ দেখে অনিচ্ছাকৃতভাবে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পাঠ করেন। এরপর বললেন: “আল্লাহর কসম! তুমি একজন নেক ও সৎ যুবক ছিলে।”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫৩৭

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫২৮ সহীহ সনদে

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৯২, ত: আল-রুশদ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৭৩ এবং আল-হাইসামি এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এর সনদ হাসান (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা: ১৩৮৩৩)

[৪] আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হা: ৫৬০০

এই কথা বলে তিনি তাঁর লাশের পাশেই বসে পড়লেন এবং তাঁর ﷺ চেহারায় দুঃখ ও শোকের ছাপ স্পষ্ট ছিল। [১]

হযরত তালহা (রা.) বসরায় বড় বড় জায়গিরের মালিক ছিলেন। হযরত আলী (রা.) নিরাপত্তার খাতিরে সেগুলো নিজের হেফাজতে নিয়ে নেন। কিছুকাল পর তাঁর পুত্র ইমরান বিন তালহা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি এই সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন এবং বলেন: “আমাদের উদ্দেশ্য এগুলো দখল করা ছিল না, বরং এই ভয়ে আমি এগুলো আগলে রেখেছিলাম যাতে অন্য কেউ দখল করে না নেয়।” [২]

তিনি আরও বলেন: “আমি আশা করি যে আমি, তালহা এবং জুবাইর সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব যাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: ‘আর আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষ দূর করে দেব, তারা ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে আসীন হবে’।” [৩]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর মুখে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর প্রশংসা ও গুণগান:

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-ও হযরত আলী (রা.)-এর সাথীদের ব্যাপারে অত্যন্ত উদারতা প্রদর্শন করেছেন। আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) যখন তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন উম্মুল মুমিনীন বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি জানি যে তুমি সর্বদা সত্য কথা বলো।” তিনি বললেন: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আপনার মুখ দিয়ে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ালেন।” [৪]

যায়েদ বিন সুহান কে?

হযরত আলী (রা.)-এর সহযাত্রীদের মধ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর মতো সাহাবায়ে কেরাম ছাড়াও বড় বড় তাবেয়ীগণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। যায়েদ বিন সুহান এবং সাইহান বিন সুহান নামক দুই ভাই, যারা হযরত আলী (রা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যুদ্ধের চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর রক্ষীদের হাতে নিহত হন। [৫]

জঙ্গ জামালে (উটের যুদ্ধ) যারা লড়াই করেছেন এবং শহীদ হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নেককার লোক, যারা নিজেদের সত্যের ওপর মনে করে শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে লড়াই করছিলেন। তবে ইঁ্যা, সাবায়ীরা যাদের নিয়ত ছিল বাতিল ও অপবিত্র, তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং নিজেদের কর্মফল ভোগ করেছে।

[১] মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৫৬০৮; তারিখ দামেশক: ৩৩/৫০৬।

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৮২২৭, তাবা আর-রুশদ; ফাযায়েলুস সাহাবা লি-আহমদ বিন হাম্বল, হা: ১২৯৫; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১/৩৯।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৫৩৬।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/৫৩০।

[৫] হযরত যায়েদ বিন সুহান গুজবে প্রভাবিত হয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর গভর্নরদের ওপর আপত্তি তোলার কারণে তাঁকে শহর থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল। জঙ্গ জামালে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন। নাসিবীগণ তাঁকে ধর্মহীন সাবায়ী ও মুনাফিক বলে থাকে। এটি ভারসাম্য ও ইনসাফের পরিপন্থী। জারহ ও তাদীল (হাদিস বিশারদ)-দের ইমামদের মতে, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে একজন উচ্চমর্যাদার তাবেয়ী ছিলেন। (আল-ইসাবাহ: ২/৫৩২, তাবা আল-ইলমিয়াহ; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৫২৫, তাবা আর-রিসালাহ)। এটি ভিন্ন কথা যে, ইসনা আশারিয়া (শিয়া) সম্প্রদায় তাঁকে নিজেদের মতাদর্শী বলে দাবি করে এবং তাঁদের ‘রিজাল’ (বর্ণনাকারী)-দের মধ্যে গণ্য করে। কিন্তু এটি তাদের পুরনো কৌশল যে, তারা সাহাবা, তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীদের মধ্য থেকে শত শত নেককার ব্যক্তিত্বকে নিজেদের ইমাম এবং নিজেদের ধর্মের বর্ণনাকারী ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উপস্থাপন করে, যাতে মানুষ মনে করে যে এত বড় বড় ব্যক্তিত্ব যখন ইসনা আশারিয়া ছিলেন, তবে এটাই হয়তো সত্য ধর্ম হবে। এখন আহলে সুন্নাত যদি সত্যিই এই ধরনের ব্যক্তিত্বদের রাফেখী মনে করে ঘৃণা করতে শুরু করে, তবে এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে।

হযরত জুবাইর বিন আল-আওয়াম (রা.)-এর শাহাদাত:

হযরত জুবাইর (রা.) যুদ্ধের ময়দান থেকে বের হয়ে মদিনার পথে রওনা হলেন। এক দুর্ভাগা সৈন্য আমর বিন জুরমুজ তাকে অনুসরণ করতে লাগল এবং ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে কাছে পৌঁছে বর্শা দিয়ে আঘাত করল যার ফলে হযরত জুবাইর (রা.) ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। হযরত জুবাইর (রা.) তৎক্ষণাৎ সামলে নিলেন এবং পাল্টা আক্রমণ করলেন। ইতিমধ্যে আমর বিন জুরমুজের বাকি সঙ্গীরাও পৌঁছে গেল। সবাই মিলে রাসুলের হাওয়ারিকে (একনিষ্ঠ সহচর) শহীদ করে দিল। [১]

আমর বিন জুরমুজ তার কঠোর হৃদয়ের আরও প্রমাণ দিয়ে হযরত জুবাইর (রা.)-এর মস্তক নিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর খিদমতে হাজির হলো। হযরত আলী (রা.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন: “সাফিয়ার পুত্রকে হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও।” [২] তারপর বললেন: “প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারি (خاص جائر - বিশেষ উৎসর্গকৃত প্রাণ) থাকে আর আমার এবং রাসুলুল্লাহর হাওয়ারি ছিলেন জুবাইর।” [৩]

আমর বিন জুরমুজ হযরত জুবাইর (রা.)-এর তলোয়ারও সাথে নিয়ে এসেছিল। সেটি দেখে তিনি বললেন:

“আল্লাহর কসম! এই তলোয়ার কতবার রাসুলুল্লাহর চেহারা থেকে দুঃখ ও কষ্টের চিহ্ন দূর করেছে।” [৪]

হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা:

যুদ্ধের পর হযরত আলী আল-মুরতজা (রা.) উম্মুল মুমিনীন (রা.) এবং তার কাফেলার লোকদের, যাদের মধ্যে আহত ব্যক্তিরও ছিল, বসরায় অবস্থান করালেন এবং তাদের দেখাশোনা করতে থাকলেন। উম্মুল মুমিনীন শহরের সবচেয়ে চমৎকার প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন যা আবদুল্লাহ বিন খালাফের ছিল। [৫] এই সময়ে আমিরুল মুমিনীন (রা.) জানতে পারলেন যে দুই ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর শানে অবমাননাকর কথা বলছে। আপনি তাদের গ্রেফতার করালেন এবং কাপড় খুলে উলঙ্গ পিঠে একশ করে বেত্রাঘাত করালেন। [৬]

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩০৬২৯; খণ্ড: ৭/৪৯৮, ত. আল-মুরশিদ

[২] ফাযায়েলুস সাহাবা লি আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ১১২৪; কানযুল উম্মাল, হা: ৩৬৬১৫

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৮২, ৩৮৩

ইবনে জুরমুজের পরিণতি: একটি বর্ণনা অনুযায়ী, ইবনে জুরমুজ হযরত আলী (রা.)-এর ধমক শোনার পর সেই মুহূর্তেই পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। (থিকাত ইবনে হিব্বান: ২/২৮৩) তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, সে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল। সেই যুগে সে নিজেকে কিসাসের জন্য পেশ করেছিল কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) তাকে হত্যা করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তার জীবন হযরত জুবাইর (রা.)-এর জুতার ফিতার সমানও নয়। এতে ইবনে জুরমুজ অপমানিত বোধ করে এবং আত্মহত্যা করে। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৩/৫০৮, ত. তাদমুরি; ৬/৮৭০, ত. বাশার) সম্ভবত হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) কিসাস নিতে এই কারণে অস্বীকার করেছিলেন যে হযরত জুবাইর (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড একদিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল কিন্তু অন্যদিক থেকে তা যুদ্ধেরই অংশ ছিল এবং ইবনে জুরমুজ তাকে ধাওয়া করার অবস্থায় হত্যা করেছিল যা যুদ্ধের ময়দানে হত্যার মতো ছিল। এই কারণেই হযরত আলী (রা.)-ও কেবল ধমক দিয়েছিলেন এবং তার ওপর কিসাস কার্যকর করেননি। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন অথবা সম্ভবত তিনি ইবনে জুরমুজকে তার দাবির সাথে সাথে হত্যা করতে চাননি, তাই তিনি এমন উত্তর তৈরি করেছিলেন যাতে সে অপরাধবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায় এবং গর্বের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার ধারণা ছিল না যে সে অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করবে। যাই হোক, এই কাজ তার জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে দিল যার সুসংবাদ হযরত আলী (রা.) শুনিয়েছিলেন।

নোট: আমর বিন জুরমুজকে উমাইর বিন জুরমুজও লেখা হয়েছে। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১১২, ত. সাদির)

[৪] তারিখ তাবারী: ৩/৫৩৯

[৫] তারিখ তাবারী: ৩/৫৪০

উম্মুল মুমিনীন-এর প্রত্যাবর্তন এবং হযরত আলী (রা.)-এর উত্তম আচরণ:

হযরত আলী (রা.) উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাঁর প্রস্থানের পূর্বে তিনি তাঁর সওয়ারি, সফরের সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করেন। বসরার সম্মানিত ঘরানার চল্লিশজন নারীকে উম্মুল মুমিনীন-এর সম্মানে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে পাঠান। [১]

হযরত আলী (রা.)-এর এই আচরণ মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বিশেষ নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে ছিল। তিনি (সা.) তাঁকে সম্বোধন করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: “অচিরেই তোমার এবং আয়েশা সিদ্দীকার মধ্যে কিছু মতবিরোধ হবে।” হযরত আলী (রা.) চিন্তিত হয়ে আরজ করেছিলেন: “হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো এটা আমার দুর্ভাগ্য হবে।” রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিয়েছিলেন: “না, তবে যখন এমন হবে, তখন আয়েশাকে তাঁর নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিও।” [২]

হযরত আলী (রা.) এই ওসিয়ত পূর্ণরূপে পালন করেন। প্রস্থানের পূর্বে তিনি নিজেই উম্মুল মুমিনীন-এর খিদমতে উপস্থিত হন। উম্মুল মুমিনীন (রা.) এই উপলক্ষে উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন: “আমার ছেলেরা! অতীতে আমার এবং আলীর মধ্যে এর চেয়ে বেশি কোনো সমস্যা ছিল না, যা একজন নারী এবং তার দেবর বা স্বশুরবাড়ির লোকদের মধ্যে হয়ে থাকে। আমার দৃষ্টিতে আলী সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।”

হযরত আলী (রা.)-ও এই উপলক্ষে বলেন: “হে লোকসকল! উম্মুল মুমিনীন সত্য বলেছেন এবং ভালো বলেছেন। আমার এবং তাঁর মধ্যে এই ছোটখাটো বিষয় ছাড়া আর কোনো ক্ষোভ নেই। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতেও তোমাদের নবী (সা.)-এর স্ত্রী।”

এর পর উম্মুল মুমিনীন-এর কাফেলা যখন রওনা হলো, তখন হযরত আলী (রা.) কয়েক মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সাথে চললেন। এরপর সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর সাহেবজাদা হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে এক মঞ্জিল (ষোল মাইল, পৌনে ২৬ কিলোমিটার) পর্যন্ত সাথে যাওয়ার নির্দেশ দেন। [৩]

উম্মুল মুমিনীন-এর কাফেলা প্রথমে মক্কায় পৌঁছায়। আপনি ৩৬ হিজরির হজ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর মদিনা মুনাওয়ারায় নিজ গৃহে ফিরে যান। [৪] এই দুর্ঘটনার প্রভাব তাঁর ওপর শেষ পর্যন্ত ছিল। যখনই জঙ্গ জামালের কথা মনে পড়ত, যেখানে মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্তপাত হয়েছিল, তিনি এত কাঁদতেন যে তাঁর ওড়না ভিজে যেত এবং বলতেন: “হায়! আমি যদি বিস্মৃত হয়ে যেতাম।” [৫]

জঙ্গ জামালের নিহতদের কথা যখন আলোচনা হতো, তখন আপনি সবার জন্য রহমতের দোয়া করতেন। হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-এর সাথে জায়েদ বিন সুহানের জন্যও কল্যাণের দোয়া করতেন, অথচ তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন। কেউ অবাক হয়ে বলল: “তারা একে অপরকে হত্যা করছিল অথচ আপনি তাদের সবার জন্য রহমতের দোয়া করছেন? আল্লাহ কি তাদের সবাইকে একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না?” উম্মুল মুমিনীন (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন: “তুমি কি জানো না যে আল্লাহ তাআলা...”

[১] তারিখ আল-তবারী: ৫৪৪/৪

[২] মুসনাদে আহমদ, হা: ১৬১/৬; শরহ মুশকিলিল আসার লিত-তাহাবী, হা: ৫৬১২; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তবারানী: ৩৩২/১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ... বর্ণনা করেছেন আহমদ, আল-বায়হার এবং তাবারানী এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৩] তারিখ আল-তবারী: ৫৪৪/৪

[৪] তারিখ আল-তবারী: ৫৪৪/৪

[৫] আল-মুনতযাম লি ইবনিল জাওযী: ৯৫/৫

রহমত কত বিশাল। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। [১]

হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর শাহাদাত এবং উম্মুল মুমিনীন-এর নির্জনবাসের সাথে সাথে এই আন্দোলনও সমাপ্ত হলো যার মূল উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের সংস্কার, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী উপাদানগুলো একে রক্তপাত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ছাড়ল। এই আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীনের মতো রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা, হযরত সাঈদ বিন আস, হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রাযিআল্লাহু আনহুম) এরপর হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর যুগে সংঘটিত রাজনৈতিক বিবাদগুলোতে কোনো অংশ নেননি।

ইজতিহাদী মতপার্থক্য:

এখানে এটি মনে রাখা উচিত যে, এই সমস্ত মতপার্থক্য ছিল একটি ফিকহী ও ইজতিহাদী বিরোধ, ক্ষমতা ও শাসনের লড়াই নয়। নিঃসন্দেহে হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর পদক্ষেপগুলোতে সঠিক ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও তাঁদের মতামতে মুজতাহিদ ছিলেন। সেই যুগে ইসলামী আইন সেভাবে সংকলিত ছিল না যেভাবে দেড়-দুই শতাব্দী পরে হয়েছিল। সাধারণত সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের স্মৃতিতে থাকা হাদীসগুলো থেকে অর্থ গ্রহণ করে আমল করতেন। এমতাবস্থায় কিছু নতুন রাজনৈতিক ও বিচারিক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল না। আবার এই বিষয়টি এমন ছিল যার আগে কোনো নজির ছিল না। কোনো পূর্ববর্তী ফতোয়া বা আদালতের ফয়সালা সামনে ছিল না। এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরামের দুটি দল নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমস্যাটি দেখেছিলেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন, যা নিশ্চিতভাবেই ইজতিহাদ ছিল। সুতরাং তালহা ও যুবায়ের (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর ভুলকেও ফিসক বা গুনাহ নয় বরং ইজতিহাদী ভুল হিসেবে গণ্য করা হবে, যার জন্য পরকালে কোনো জবাবদিহি নেই বরং সওয়াব রয়েছে।

এটি বলা সঠিক নয় যে, এই ব্যক্তিবর্গের কাছে ইজতিহাদের কোনো দলিল ছিল না। এমন অনেক বর্ণনা তাঁদের দলিল হতে পারত যাতে জালেমকে জুলুম থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [২] এই কারণেই হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-ও এই ব্যক্তিবর্গের ইজতিহাদী মতামতের দিকটি উপেক্ষা করতেন না এবং এই কারণেই যখন তিনি কাউকে এই ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কোনো উস্কানিমূলক কথা বলতে শুনতেন, তখন নিষেধ করতেন এবং বলতেন: “এমন বলো না। তারা মনে করেছে যে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং আমরা মনে করি যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা পরস্পর যুদ্ধ করেছি।” [৩]

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল ইমাম বায়হাকী, খণ্ড: ৮ / ১৬৭; মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক মা’আ জামে’ মা’মার বিন রাশিদ, হা: ২০৫৬৩।

[২] উদাহরণস্বরূপ: “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখে তবে সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়” (সহীহ মুসলিম, হা: ১৮৬, কিতাবুল ঈমান, বাবুন নাহয়ি আনিল মুনকার, ত: দারুল জীল)। তোমার ভাইকে সাহায্য করো সে জালেম হোক বা মজলুম... তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখো বা বাধা দাও। (সহীহ বুখারী, হা: ২৪৪৪, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গাসব)।

[৩] “তোমরা বলো না, তারা তো এমন এক কণ্ডম যারা মনে করেছে যে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং আমরা মনে করেছি যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা যুদ্ধ করেছি।” (তা’জিমু কদরিস সালাত, ইবনে নাসর আল-মারওয়াযী পৃ: ৪৯৩, খণ্ড: ২, ৪৯৪; মিনহাজ্জুস সুন্নাহ লি ইবনে তাইমিয়া: ২৪৫/৫)। এবং সফফিনে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উক্তিও একই অর্থ বহন করে, তিনি বলেন: “আমাদের দ্বীন এক, আমাদের কিবলা এক এবং আমাদের দাওয়াত এক, কিন্তু এক কণ্ডম আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।” (তা’জিমু কদরিস সালাত, বর্ণনা নম্বর: ৫৯৯)। এবং এক বর্ণনায় আছে: আবু বখতারী থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে জঙ্গ জামালের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো: “তারা কি মুশরিক?” তিনি বললেন: “তারা শিরক থেকে পলায়ন করেছে।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “তারা কি মুনাফিক?” তিনি বললেন: “মুনাফিকরা তো আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।” তবে তারা কী? তিনি বললেন: “আমাদের ভাই যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৬৯৩, ত: আর-রুশদ; আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, খণ্ড: ১৬৭১৩)। এবং এক বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে জঙ্গ জামালের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন: “আমাদের ভাই যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, আর তারা ফিরে এসেছে এবং আমরা তাদের থেকে তা গ্রহণ করেছি।” (আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৬৭৫৩)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (মাদাজিল্লুহুল আলি) এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন:

“হযরত আলী (রা.)-এর এই বাণীসমূহ থেকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং তাঁর নিকটও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাঁর বিরোধ ছিল ইজতিহাদি বিরোধ। তিনি কেবল এই কারণে তাঁদের ফাসেক মনে করতেন না বরং তাঁদের সম্পর্কে কল্যাণকর কথা ছাড়া অন্য কিছু বলতে রাজি ছিলেন না।” [১]

জঙ্গ জামাল এবং সফফীন সম্পর্কে হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেবের নিম্নোক্ত ইবারতটিও বারবার পড়ার যোগ্য:

“বাস্তবতা হলো এই যে, সাহাবায়ে কেরামদের এই পারস্পরিক লড়াইগুলো ক্ষমতার জন্য ছিল না এবং তাঁদের বিরোধ বর্তমান যুগের রাজনৈতিক দলগুলোর মতো ছিল না; বরং উভয় পক্ষই দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব চেয়েছিলেন। প্রত্যেকেরই একে অপরের সাথে বিবাদ ছিল দ্বীনের হেফাজতের জন্য, এবং তাঁরা নিজেরাও একে অপরের সম্পর্কে এটাই জানতেন ও বুঝতেন যে, তাঁদের অবস্থান সততাপূর্ণ ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে। ফলে প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের রায় এবং ইজতিহাদকে ভুল মনে করত কিন্তু কাউকে ফাসেক সাব্যস্ত করত না।” [২]

হযরত আলী (রা.)-এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং নতুন বিন্যাস:

হযরত আলী (রা.) বেশ কিছু দিন বসরা এবং এর আশপাশের প্রশাসনিক বিষয়গুলো নতুন করে সুসংগঠিত করতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মানুষের কাছ থেকে এই শর্তে বায়আত গ্রহণ করেন যে, তারা যুদ্ধ ও শান্তিতে ইসলামী খিলাফতের অনুগত থাকবে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকবে। বসরার সমস্ত লোক বায়আতে শরিক হয়; হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-এর পতাকাতলে লড়াইকারী ব্যক্তির, যাদের মধ্যে আহতরাও ছিল, কোনো দ্বিধা ছাড়াই বায়আতে অংশগ্রহণ করে। [৩]

হযরত আলী (রা.) পরামর্শের পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে বসরার আমির এবং জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানকে (যিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন) বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। [৪]

আপনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাঁচশ করে (দিরহাম) বণ্টন করে সবার মন জয় করে নেন, যদিও সাবায়ি গোষ্ঠী এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং হযরত আলী (রা.)-কে কটাক্ষ করে, কিন্তু আপনি তাতে কণ্ঠপাত করেননি। [৫]

সাবায়িদের পলায়ন:

সাবায়িরা অসন্তোষ প্রকাশ করে হযরত আলী (রা.)-এর আগেই বসরা থেকে চলে যায়।

হযরত আলী (রা.) এই আশঙ্কায় যে...

[১] হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ২৩২

[২] হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ২৩৩

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৩১

[৪] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৩৩

[৫] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৩১

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

তারা যেন অন্য কোনো স্থানেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের পিছু নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পুনরায় প্রকাশ্যে আসার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে। [১]

মনে হয় যে, তারা অসন্তুষ্টির কেবল একটি অজুহাত তৈরি করেছিল; আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলী থেকে দূরে থাকা, যাতে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো তাৎক্ষণিক ধরপাকড় শুরু হলে আগেভাগেই নিজেদের রক্ষা করা যায়। কিন্তু হযরত আলী কোনো তাড়াহুড়োমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তায় ছিলেন না, বরং প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিচ্ছিলেন।

জঙ্গ জামালের পরবর্তী প্রভাব:

জঙ্গ জামাল যদিও একটি সাময়িক দুর্ঘটনা ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে এর প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। হযরত আলী, যিনি যেকোনো উপায়ে খিলাফতে রাশেদার মর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, এই ট্র্যাজেডিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে বসরার শত শত লোক হযরত আলীর নেতৃত্বাধীন কুফী বাহিনীর হাতে নিহত ও আহত হয়েছিল। এই লোকদের পরিবারগুলো হযরত আলীকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি দায়ী মনে না করলেও এবং বাহ্যত তাঁর সামনে আনুগত্য প্রকাশ করলেও, এটা অত্যন্ত কঠিন ছিল যে তারা এখন হযরত আলীকে সেই একাগ্রতা ও দৃঢ়তার সাথে সমর্থন দেবে, যেভাবে কিসাসে উসমানের আন্দোলনের উৎসাহী কর্মীরা তাদের নেতাদের সমর্থন দিচ্ছিল।

হযরত আলীর কাছে উপলব্ধ অধিকাংশ সৈন্য কুফা ও বসরার সেনানিবাসগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। পরবর্তী দিনগুলোতে কিছু চূড়ান্ত মুহূর্তে এই বাহিনীর নিরুৎসাহ এবং প্রতিপক্ষের সারিতে সংহতির একটি বড় কারণ ছিল এই জঙ্গ জামালের ক্ষত, যা ইরাকি সৈন্যদের একটি বড় অংশকে খিলাফতের পতাকাতলে লড়াই করা থেকে বিরত রাখত এবং সিরিয়াবাসীদের তাদের বিরুদ্ধে উসকে দিত।

জঙ্গ জামালের পরেও সাবায়ীদের কেন আলাদা করা হয়নি?

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, হযরত আলী, যিনি জঙ্গ জামালের আগে সাবায়ীদের আলাদা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধের পর তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা কেন নেননি? শেষ পর্যন্ত কেন?

এর একটি কারণ ছিল এই যে, এই পদক্ষেপের জন্য যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল, জঙ্গ জামালের পর তা অর্জিত হয়নি; বরং এর পরপরই হযরত আলীকে সিরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, হযরত উসমানের প্রকৃত হত্যাকারী ছিল হাতেগোনা কয়েকজন লোক, যাদের তদন্ত ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে তিনি অবশ্যই চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর চারপাশে সমবেত হওয়া প্রাক্তন বিদ্রোহীরা ছিল মূলত অবুঝ সাধারণ মানুষ, যারা হযরত উসমানের বিরোধিতা এবং সাম্যের অতিরঞ্জিত সমর্থনের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করেছিল। হযরত আলী তাড়াহুড়ো করে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাননি যার ফলে তাদের মধ্যে শরয়িভাবে নিরপরাধ ব্যক্তিরাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৩৪

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

সমস্যার দুটি রূপ এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থান:

এটি তো স্পষ্ট ছিল যে, কোনো গোষ্ঠীর সশস্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেত্রে শাসক তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারেন, কিন্তু যারা বিদ্রোহ ত্যাগ করে শাসকের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করে, তাদের ব্যাপারে কী বিধান হবে?

এই বিষয়ে সমস্যার দুটি রূপ ছিল:

(১) একটি এই যে, অস্ত্র সমর্পণকারী গোষ্ঠীটি ন্যায়পরায়ণ, মুতাকী এবং মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা কোনো ব্যাখ্যার (তাবিল) ভিত্তিতে সশস্ত্র শক্তি সঞ্চয় করেছে। এখানে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে বিষয়টি একদম পরিষ্কার ছিল যে, অস্ত্র সমর্পণের পর তারা সবাই নিরাপদ থাকবে। এই কারণেই তিনি জঙ্গ জামালের পর যুদ্ধরত পক্ষের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন।

(২) সমস্যার দ্বিতীয় রূপটি ছিল এই যে, বিদ্রোহে লিপ্ত ব্যক্তির মুজতাহিদ নয় বরং ফাসাদ সৃষ্টিকারী (মফসিদ), যেমন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা। এমন লোকদের ব্যাপারে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে এমন কোনো শরয়ি দলিল ছিল না যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের বিধান ভিন্ন হবে এবং অস্ত্র সমর্পণের পরেও তাদের ওপর শাস্তি কার্যকর হবে। তাই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে, অস্ত্র সমর্পণের পর এমন লোকেরাও নিরাপদ ছিল। (পরবর্তীতে এই বিষয়ে সমস্ত সাহাবী এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।)

সম্ভবত এই কারণেই তিনি সাবায়ীদের বিষয়ে বিলম্ব করছিলেন এবং চাচ্ছিলেন যে, যদি তাঁর মতের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোনো শরয়ি দলিল থাকে তবে তা যেন সামনে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোনো শরয়ি দলিল সামনে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গোষ্ঠীকে—যারা প্রতিনিয়ত বনু হাশিমের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার সংকল্প প্রকাশ করে—নিজেদের সাথে আবদ্ধ রেখে অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা যায়।

যাই হোক, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কিসাস গ্রহণের দায়িত্ব ভুলে যাননি, তবে তিনি চাচ্ছিলেন যে, যদি শরয়িভাবে তাদের ওপর শাস্তি ধার্য হয়, তবে তা কার্যকর করার পূর্বে বিষয়টি সামষ্টিকভাবে স্থির করে নেওয়া হোক। তাঁর কৌশলটি তাড়াহড়োর ছিল না, বরং তা ছিল সমস্যার অনুসন্ধান, দূরদর্শিতা এবং সতর্কতামূলক; তাই তিনি জঙ্গ জামালের পরেও সাবায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

□□□

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত আলী (রা.) এবং আহলে শামের বিরোধের কারণসমূহ

জঙ্গ জামালের বেদনাদায়ক ফলাফল, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-এর আন্দোলন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর সন্ধি ও সমঝোতা আহলে শামের মতামতের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। সেখানে ভুল রঙে খবর ও গুজবের রাজত্ব ছিল। কিছু লোক মনে করছিল যে হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহী লোকদের হাতে জিম্মি এবং নিজে কিছু করতে অক্ষম। কিছু লোক এর চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে এই বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত এবং অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক আর তাঁর খিলাফত এই অনিষ্টকারী গোষ্ঠীর শক্তির ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে শামের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্যসমূহ:

শামের পরিবেশকে এতটা উত্তেজনাপূর্ণ করার পেছনে অনিষ্টকারীদের বড় হাত ছিল, যারা সেখানে কসম খেয়ে ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন: “কিছু লোক আহলে শামের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে শরিক ছিলেন। এই বিষয়টিই আহলে শামকে হযরত আলী (রা.)-এর বাইয়াত ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, কারণ তারা এই বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে হযরত আলী (রা.) একজন জালিম এবং তিনি উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে শরিক ছিলেন আর তিনি খুনিদের আশ্রয় দিয়েছেন কারণ তিনি ওই হত্যাকাণ্ডে অপরাধীদের সাথে ছিলেন।” [১]

যদিও এই সন্দেহগুলোর বিপরীতে হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমতাস্বতন্ত্র শাসক এবং হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আহলে শামের ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়া কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল না, যার তিনটি বড় কারণ ছিল:

- উসমান গনী (রা.)-এর শাহাদাতের অস্বাভাবিক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি পরিবেশে এক আবেগঘন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, এটা স্বাভাবিক যে এমন পরিস্থিতিতে কিছু গম্ভীর সত্য দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় এবং কিছু সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসের রূপ ধারণ করে।
- আহলে শাম সেই স্থান থেকে অনেক দূরে ছিল যেখানে ফিতনা সংঘটিত হয়েছিল। বর্তমান যুগে যোগাযোগের সব ধরনের মাধ্যম সহজলভ্য এবং পশ্চিমে বসে থাকা ব্যক্তিও প্রাচ্যের অবস্থা সরাসরি স্ক্রিনে দেখে নেয়, তবুও ঘটনাস্থলে উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়। এমনকি একই শহরের কোনো মহল্লায় ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও যাকে...

[১] নিশ্চয়ই একদল লোক আহলে শামের সামনে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তিনি উসমানের রক্তে শরিক ছিলেন এবং এটিই তাদের তাঁর বাইয়াত ত্যাগ করার দিকে আহ্বান করেছিল যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি একজন জালিম এবং তিনি উসমানের হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি উসমানের হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন কারণ তিনি তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তাদের সহযোগী ছিলেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ: ২০৬/৩)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - খণ্ড ২

গভীরতা থেকে এলাকার মানুষই জানে এবং বোঝে, অন্যরা তা থেকে অক্ষম থাকে। [১] সুতরাং মদিনায় সংঘটিত বিশৃঙ্খলা এবং ইরাক ও শামের লোকদের সে সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝিতে পড়া মোটেও অসম্ভব ছিল না এবং এমনটিই হয়েছিল।

- শাহাদাতে উসমান এবং জঙ্গ জামাল থেকে ফায়দা হাসিল করে অনিষ্টকারী উপাদানগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে গোঁড়ামি উসকে দিয়েছিল। যদিও সেখানে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের নিয়ত নিঃসন্দেহে সন্দেহাতীত ছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যে গোঁড়ামি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। [২] এই পরিস্থিতি সমঝোতা ও বোঝাপড়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

আহলে শামের অবস্থান:

আহলে শাম হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত অথবা হত্যাকারীদের আশ্রয়দাতা মনে করার কারণে তাঁর হাতে বায়আত হতে অস্বীকার করেছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর ফজিলত ও মর্যাদা অস্বীকার করতেন না, কিন্তু এই আন্দোলনের নেতা হিসেবে তাঁর দাবি ছিল যে, হযরত আলী (রা.) যেন হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের বদলা নেওয়ার মাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন এবং হত্যাকারী গোষ্ঠীকে আহলে শামের হাতে সোপর্দ করেন। এটি ছাড়া আহলে শামের আস্থা অর্জন করা সম্ভব ছিল না এবং তাঁর খেলাফতও সুসংহত মনে করা যেত না, বরং তাঁকে সেই গোষ্ঠীর নেতা হিসেবেই দেখা হচ্ছিল যারা পূর্ববর্তী খলিফাকে শহীদ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দাবি ছিল যে, প্রথমে ‘কিসাসে উসমান’-এর আবশ্যিক শর্ত পূরণ করা হোক, তারপর আমাদের বায়আতের জন্য আহ্বান জানানো হোক। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) স্পষ্টভাবে বলতেন:

“আলী (রা.)-এর সাথে আমার লড়াই কেবল হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের বিষয়ে।” [৩]

কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর দৃষ্টিতে আহলে শামের এই আশঙ্কাগুলো ছিল ভিত্তিহীন এবং বিষয়টি ছিল এই যে, আহলে শাম তাঁর হাতে বায়আত হয়ে খেলাফতকে শক্তিশালী করবে, তারপর তাঁর ইজতিহাদি মত অনুযায়ী বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও গবেষণার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে, যার ফলে শরয়ী আইনের আওতায় থেকে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়ে যাবে। [৪] কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে খুলাফায়ে রাশেদীনের বিশিষ্ট গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, সেখানে হযরত আলী (রা.)-এর একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য: “وَأَقْضَاهُمْ عَلَيَّ” (তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক হলেন আলী) বর্ণনা করেছেন। [৫] অর্থাৎ বিচারিক বিষয়ে হযরত আলী (রা.) সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁরা এই বিশ্বাস রাখতেন যে তাঁর ইজতিহাদ গ্রহণ করা হবে। এই কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) হযরত আলী (রা.)-এর হাতে আহলে শামের বায়আত না হওয়াকে...

[১] যেমনটি নবী (সা.) বলেছেন: “ليس الخير كالمعينة” (সংবাদ প্রত্যক্ষদর্শীর মতো নয়)। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর: ২৪৪৭) অর্থাৎ চোখে দেখা আর কানে শোনার মান সমান হয় না। আরবি প্রবাদ আছে: “صاحب البيت ادري بما فيه” (ঘরের মালিকই ঘরের ভেতরের খবর বেশি জানে)।

[২] কিছু অনিষ্টকারী গোষ্ঠী পরবর্তীতে ‘মারওয়ানি’ নামে পরিচিত হয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লেখেন: “হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে মারওয়ানি এবং অন্যান্য একদল লোক ছিল যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিল।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩৯৯/৩)

[৩] “قال معاوية: ما فالتت عليا الا في امر عثمان” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদিস: ৩০৫৫২, সনদ হাসান, ত ত জহদ)।

[৪] উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেরামের অবস্থান হলো এই যে, এই বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইজতিহাদি ভুল ছিল এবং হযরত আলী (রা.)-এর রায় সঠিক ছিল।

[৫] আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু আবু বকর, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর উমর, সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল উসমান এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক আলী বিন আবি তালিব।” (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৫৪, সনদ সহীহ)।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ভুল আখ্যায়িত করে তিনি লিখেছেন:

“বরং যদি হযরত আলী (রা.)-এর উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকত, আর ধরে নেওয়া হয় যে তিনি এই ওয়াজিব দায়িত্বটি কোনো ব্যাখ্যার কারণে হোক বা গুনাহ করার মাধ্যমে হোক বর্জন করেছিলেন, তবুও এই পরিস্থিতি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হওয়া উচিত ছিল না। বরং সব অবস্থাতেই হযরত আলী (রা.)-এর বায়আত গ্রহণ করা, বায়আত বর্জন করার তুলনায় দ্বীনি কল্যাণের জন্য অধিক উপযুক্ত, মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিক আনুগত্যের কাজ হতো। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তোমাদের থেকে তিনটি বিষয় চান; এক হলো তোমরা তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর এই যে তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ করো না। আর এই যে তোমরা তোমাদের শাসকদের কল্যাণ কামনা করো।”

সহীহ হাদীসে ইহাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: “একজন মুসলমান ব্যক্তির ওপর আবশ্যিক হলো সে (শাসকদের কথা) শুনবে এবং আনুগত্য করবে, চাই তা সচ্ছলতা হোক বা অসচ্ছলতা, খুশি হোক বা অপছন্দনীয় এবং চাই তার ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হোক, যতক্ষণ না তাকে গুনাহের আদেশ দেওয়া হয়। যখন গুনাহের আদেশ দেওয়া হবে, তখন আর শোনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না।” [১]

সন্দেহ নিরসনের জন্য হযরত আলী (রা.)-এর প্রস্তাব:

যা-ই হোক, যখন সিরিয়াবাসীদের সন্দেহ দূর হলো না, তখন তা নিরসনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা হিসেবে হযরত আলী (রা.) কুফার জামে মসজিদের মিস্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন: “হে বনু উমাইয়া! যে চায় সে আমাকে হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে কসম করিয়ে নিক যে, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করিনি এবং এতে অংশগ্রহণও করিনি।” [২]

তবুও বনু উমাইয়া এই কসমের ওপরও বিশ্বাস করেনি।

সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ:

সিরিয়াতেও অনেক প্রভাবশালী সাহাবী নিরপেক্ষ ছিলেন। হযরত আলী (রা.) যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন যেন তাদেরকে নিজের সাথে যুক্ত করা যায়। ফলে তিনি আশআছ বিন কায়েস এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.)-এর কাছে পাঠালেন, যিনি নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সিরিয়া ও ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকা কারকিসিয়ায় বসবাস করতেন। হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিনিধি দল তাঁকে বলল: “আমীরুল মুমিনীন আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলছেন যে, আল্লাহ আপনার অন্তরে ভালো কথা ঢেলে দিয়েছেন যে আপনি মুয়াবিয়া (রা.) থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। আমার কাছে আপনার সেই মর্যাদা রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে দিয়েছিলেন।”

হযরত জারীর (রা.) উত্তরে বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন যেন আমি সেখানকার লোকদের সাথে যুদ্ধ করি এবং...”

[১] “বরং যদি তিনি উসমানের হত্যাকারীদের হত্যা করতে সক্ষম হতেন এবং মনে করা হতো যে তিনি ওয়াজিব বর্জন করেছেন, চাই তা ব্যাখ্যার কারণে হোক বা গুনাহের কারণে, তবে তা জামাআতকে বিভক্ত করার এবং তাঁর বায়আত থেকে বিরত থাকার কারণ হতো না। বরং সব অবস্থাতেই তাঁর বায়আত গ্রহণ করা দ্বীনের ক্ষেত্রে অধিক সংশোধনমূলক, মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী এবং বায়আত বর্জন করার চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিক আনুগত্যের কাজ হতো।” (মিনহাজ্জুস সুন্নাহ: ৪/৩১১)। এরপর আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) সেই সব নব্বী বাণী পেশ করেছেন যেগুলোতে নাফরমানি ছাড়া সব অবস্থায় শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[২] তারিখু দামেশক: ৩৯/৩৫১, জীবনী: উসমান বিন আফফান।

তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর দাওয়াত দিই, এই কালিমা পাঠ করলে তাদের জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যাবে, এখন আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-তে বিশ্বাসী কারো সাথে যুদ্ধ করব না।“ হযরত জারীর (রা.)-এর উত্তর শুনে আশআছ বিন কায়েস এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) ফিরে আসলেন। [১]

তবে কিছু দিন পর হযরত জারীর (রা.) উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার আলোচনার উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আসলেন। হযরত আলী (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বায়াতের দাওয়াত দিয়ে হযরত জারীর (রা.)-কে নিজের দূত হিসেবে সিরিয়ায় পাঠালেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। [২]

উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী লোক:

কিছু লোক এই সময়ে উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করছিল। আশতার নাখয়ী হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর দূতিয়ালি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর হযরত জারীর এবং হযরত আলী (রা.)-কে কটাক্ষ করেন এবং নিজে সিরিয়া গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে কথা বলার সংকল্প ব্যক্ত করেন। সে বলল: “আমীরুল মুমিনীন যদি আমাকে সিরিয়ায় পাঠাতেন তবে আমি মুয়াবিয়ার সামনে নির্বাক থাকতাম না, আমি তার জ্ঞান হারিয়ে দিতাম।” তারপর হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা.)-কে বলল: “যদি আমীরুল মুমিনীন আমার কথা মানতেন তবে তোমাদের মতো লোকদের ততক্ষণ পর্যন্ত কারাগারে বন্দী রাখা উচিত ছিল যতক্ষণ না এই বিবাদ মিটে যায়।”

আশতার নাখয়ীর মতো লোকদের অভদ্রতায় অসন্তুষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত হযরত জারীর (রা.) সিরিয়ায় চলে যান এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে যোগ দেন। [৩] যদিও এটি প্রমাণিত নয় যে তিনি উভয় পক্ষের কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

আবু মুসলিম খাওলানী (রা.)-এর দূতিয়ালি:

কিছু মুরাব্বি তখনও হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ফলে আবু মুসলিম খাওলানী (রা.) একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দরবারে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন:

“আপনি হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধিতা কেন করছেন? তিনি কি আপনার সমমর্যাদার?”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “একেবারেই না, আল্লাহর কসম! আমি জানি যে নিঃসন্দেহে তিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং খিলাফতের জন্য আমার চেয়ে বেশি হকদার। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে হযরত উসমান (রা.) মজলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন? সুতরাং আপনি হযরত আলীর কাছে গিয়ে বলুন যে তিনি যেন উসমানের হত্যাকারীদের আমার হাতে সোপর্দ করে দেন। আমি তার অনুগত হয়ে যাব।” [৪]

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রা.)-এর প্রতিনিধি দল হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই দাবি নিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর সামনে বিদ্যমান শরয়ী দলিল এবং বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই দাবি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এজন্য...

[১] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২/৩৩৩

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওযী: ৫/৯৭

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৫৬২

[৪] তারিখু দামেশক: ৫৯/১৩২; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/১৩০, ত-রিসালাহ, আবু মুসলিম খাওলানী থেকে বর্ণিত, আর এই সনদকে ইবনে হাজার হাসান বলেছেন, তিনি বলেন: বুখারীর অন্যতম উস্তাদ আবু বকর ইয়াহইয়া বিন সুলাইমান আল-জুফী কিতাবু সিফফীন-এ আবু মুসলিম খাওলানী থেকে উত্তম সনদে এটি বর্ণনা করেছেন (ফাতহুল বারী: ১৩/৮৬) এবং আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারী এটি অন্যভাবে উল্লেখ করেছেন (আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৬২, ত-দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবি)

বিষয়টি আগের মতোই রয়ে গেল। [১]

রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহারের এখতিয়ার:

হযরত আলী (রা.)-এর মনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং সিরিয়ার অন্যান্য সাহাবী ও তাবেরীদের সদিচ্ছা, উত্তম চরিত্র এবং উচ্চতর যোগ্যতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সিরিয়া থেকে আপনার পাঠানো গভর্নরদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে খেলাফতের কেন্দ্রের কোনো কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রশাসনিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সমস্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে হযরত আলী (রা.)-কে সিরিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। [২]

হযরত আলী (রা.) নিজের এই এখতিয়ারের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলতেন: “যদি কেউ হযরত আবু বকর (রা.)-এর বায়আত ভঙ্গ করত তবে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করতাম এবং যদি কেউ হযরত উমর (রা.)-এর বায়আত ভঙ্গ করত তবে আমরা তার বিরুদ্ধেও লড়াই করতাম।” [৩]

আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরি বলেন:

“হযরত আলী (রা.)-এর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ এই কারণে ছিল না যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বায়আত থেকে বিরত ছিলেন। কারণ তাঁর জন্য সেই সুযোগ ছিল যা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এবং অন্যদের (বায়আত না করা ব্যক্তিদের) জন্য ছিল। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ এই জন্য ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশসমূহ সমগ্র সিরিয়া ভূখণ্ডে কার্যকর হতে বাধা দিয়েছিলেন। অথচ হযরত আলী (রা.) ছিলেন খলিফা, যাঁর আনুগত্য ছিল ওয়াজিব। সুতরাং (হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে যুদ্ধের) এই বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর অভিমত সঠিক ছিল।” [৪]

সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি এবং বাহিনী বিন্যাস:

হযরত আলী (রা.) কুফায় একটি বাহিনী গঠন করেন যা জঙ্গ জামালে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর চেয়ে অনেক বড় ছিল; কারণ বসরা ও কুফা ছাড়াও মাদায়েন ও মোসেলের গোত্রগুলোও এখন বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। [৫] হযরত আহনাফ বিন কায়েস (রা.)-ও যিনি জঙ্গ জামাল

[১] তারিখ দামেশক: ৫৯/১২২, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১৩০, ত আল-রিসালাহ।

[২] ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন: “জমহুর আহলে সুন্নাত হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধকারীদের সঠিক মনে করেন, কারণ তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুসারী: ‘আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়...’ আয়াতটি, এতে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে। আর এটি প্রমাণিত যে যারা আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা ছিল বিদ্রোহী। এই সঠিক মতের পাশাপাশি তারা এ বিষয়ে একমত যে এদের কাউকেই নিন্দা করা যাবে না, বরং তারা বলেন যে তারা ইজতিহাদ করেছিলেন এবং ভুল করেছিলেন।” (ফাতহুল বারী: ১৩/৪৬৭, কিতাবুল ফিতান, ত দারুল মা’রিফাহ)।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: “এই বর্ণনাগুলো স্পষ্ট যে হযরত আলী (রা.)-ই সঠিক ও সত্যের ওপর ছিলেন।” (শরহে সহীহ মুসলিম: কিতাবুজ জাকাত, বাব ইতাউল মুআল্লাফাহ)। ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন: “মুসলিম উলামাদের নিকট এটি স্থিরকৃত এবং দ্বীনি দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে হযরত আলী (রা.) ছিলেন ইমাম, আর যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে সে বিদ্রোহী।” (আহকামুল কুরআন, সূরা হুজুরাত)।

[৩] যদি আবু বকরের বায়আত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কেউ তা ভঙ্গ করত তবে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করতাম, আর যদি উমরের বায়আত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কেউ তা ভঙ্গ করত তবে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করতাম। (আল-ইতিয়াদ লিল বায়হাকী, পৃ. ৩৭১, ত দারুল আ ফাক)।

[৪] আলী (রা.) তাঁর সাথে বায়আত না করার কারণে যুদ্ধ করেননি, কারণ তাঁর জন্য সেই অবকাশ ছিল যা ইবনে উমর ও অন্যদের জন্য ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন সমগ্র সিরিয়া ভূখণ্ডে তাঁর নির্দেশ কার্যকর করতে বাধা দেওয়ার কারণে, অথচ তিনি ছিলেন ইমাম যাঁর আনুগত্য ওয়াজিব, তাই আলী (রা.) এই বিষয়ে সঠিক ছিলেন। (আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল: খণ্ড ৪, পৃ. ১২৪)।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৫৬৩।

তারিখ-ই-মিল্লাত-ই-মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

...এর সময় নিরপেক্ষ ছিলেন, তারা এবার তাদের সৈন্যদের সাথে সহযাত্রী ছিলেন। [১]

নাখঈ গোত্র, আশতার নাখঈ শুরুতে সিফফিনে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং নিজের গোত্রকেও সন্দেহের মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর দলবলসহ লস্করে যোগ দেন এবং অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়। [২]

সিরিয়া অভিযানের উদ্দেশ্য:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র উদ্দেশ্য যুদ্ধ ছিল না বরং রাষ্ট্রকে একত্রিত করা এবং উন্মতকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল। বিশাল বাহিনী সংগ্রহের অর্থ এই ছিল না যে সিরিয়াবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, বরং এতে এই হিকমত নিহিত ছিল যেন প্রতিপক্ষের ওপর যুদ্ধের আগেই চাপ সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধ ছাড়াই অথবা সামান্য লড়াইয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান হয়ে যায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐক্য ও সংহতির আহ্বানকারী ছিলেন, যেমনটি তাঁর প্রতিনিধি হযরত আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু লস্কর রওনা হওয়ার সময় কুফার জামে মসজিদে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

“হে লোকসকল! (এই অভিযানের জন্য) বেরিয়ে পড়ো। যে বের হবে, সে নিরাপদ থাকবে। আমরা একে কল্যাণের মাধ্যম মনে করি যে, আল্লাহ উন্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাদের মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসার বন্ধন জুড়ে দিন।” [৩]

ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মেজাজ ও প্রশিক্ষণের পার্থক্য, ইরাকিদের স্বভাবজাত প্রকৃতি

একই দ্বীন ও শরীয়তের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইরাকি ও সিরীয় লস্করে অন্তর্ভুক্ত সৈন্য, সাধারণ সেনা কর্মকর্তা এবং গোত্রীয় প্রধানদের মেজাজ ও প্রকৃতিতে বড় ধরনের পার্থক্য ছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র অনুসারী বেশিরভাগই ছিলেন তারা যারা আরবের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় বসবাস করতেন, যাদের গোত্রগুলো শুরু থেকেই স্বাধীনচেতা ও স্বায়ত্তশাসিত ছিল। এর ওপর বাড়তি বিষয় ছিল এই যে, দীর্ঘ সময় ধরে তাদের ওপর ইরানি রাজতন্ত্রের ছায়া ছিল, যা আকিদা ও আদর্শ থেকে শুরু করে রাজনীতি এবং তাহজিব ও তামাদুন পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা, বৈচিত্র্য এবং স্বৈচ্ছাচারিতার শিকার ছিল। এই সালতানাতের শেষ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর অত্যন্ত অরাজকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল এবং শাসকদের ক্রমাগত পরিবর্তন, বিদ্রোহ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র জনগণকে সামষ্টিক শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যস্ত করে তুলেছিল। এরপর হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-র যুগে এখানে বিশেষ করে কুফা ও বসরায় পূর্ব আরবের এমন সব লোক এসে বসতি স্থাপন করে যাদের পূর্বপুরুষরা উন্মুক্ত, বাধাহীন ও স্বাধীন পরিবেশে অভ্যস্ত ছিল।

যদিও ইসলামি আকিদা ও শরীয়ত প্রবর্তন কুফা, বসরা ও এর আশপাশের এলাকাকে কুফর, শিরক, অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রেখেছিল, কিন্তু এখানকার প্রাচীন বাসিন্দা এবং নবাগত আরবদের প্রকৃতিতে নির্ভীকতা ও বীরত্বের গুণের পাশাপাশি অবাধ্যতা একইভাবে বিদ্যমান ছিল। এর সাথে সাথে বেশ কয়েক বছর ধরে এই এলাকায় সাবায়ি গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল যারা কিছু লোককে গোপনে ভ্রান্ত আকিদাসম্পন্ন করে তুলেছিল এবং অনেককে সরকারের আনুগত্য এবং বড়দের আদব ও সম্মানের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। এ ধরনের লোক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র লস্করেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের উপস্থিতিতে সব সময় বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টির...

[১] আনসাবুল আশরাফ লিল বালাজুরি: ২৯৫/২, ত. দারুল ফিকর

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৭৮৩ হাসান সনদে, ত. আর-রুশদ

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫৬৮/৪

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৮৪৭, ত. আর-রুশদ

বিপদ মাথার ওপর ছিল। এ ধরনের লোকদের কারণে কোনো একটি কর্মপন্থার ওপর লশকর বা বাহিনীর একমত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। এ ধরনের লোকদের নেতৃত্ব দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ।

শামবাসীদের মেজাজ:

অন্যদিকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অধীনে শামের এলাকাটি শত শত বছর ধরে রোম সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল, যা তাদের বিশ্বাসগত ও আমলি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে একটি সফল সাম্রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। এটি জয় করার পর এখানে বসতি স্থাপনকারী মুসলমানরাও বেশিরভাগই আরবের পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলের গোত্রভুক্ত ছিল, যারা শুরু থেকেই তুলনামূলকভাবে সভ্য ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। এরপর শামে গত চব্বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বনু উমাইয়ার একটি পরিবারই প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছিল। হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর পর তাঁর ছোট ভাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এখানকার গভর্নর হিসেবে চলে আসছিলেন। এখানে তাঁর শাসন ও রাজনীতির বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত সদাচারী, বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। বনু উমাইয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক গুণাবলির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। তিনি উত্তম আচরণ, দান-দক্ষিণা এবং পুরস্কার ও সম্মানের মাধ্যমে মানুষকে সন্তুষ্ট রাখতেন। এসব কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনী আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধের এক চমৎকার কাঠামোতে গড়ে উঠেছিল।

উভয় বাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য:

উভয় বাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের অবস্থার মধ্যেও স্পষ্ট পার্থক্য ছিল, যা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। হযরত আলী (রা.) কুফায় বাহিনী প্রস্তুত করার সময় শেষবারের মতো সতর্ক করার জন্য শামে নিজের দূত পাঠান, যিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সতর্ক করেন যে হযরত আলী (রা.) সসৈন্যে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নামাজের পর মসজিদে সাধারণ সমাবেশে এই পরিস্থিতি বর্ণনা করে তাদের মতামত চাইলেন। সবাই মাথা নিচু করে রইল, কেবল একজন আমির বললেন: “আপনার যা রায় আমাদেরও তাই, আপনি আদেশ দিন, আমাদের কাজ হলো আনুগত্য করা।” এটি শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও বাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন।

দূত এটি দেখে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে ফিরে এলেন। তিনিও নামাজের পর মসজিদে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং শামবাসীদের যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর জানিয়ে মতামত চাইলেন। এটি শোনামাত্রই প্রত্যেকে চিৎকার করতে লাগল: “হে আমিরুল মুমিনিন! এমন করুন, হে আমিরুল মুমিনিন! তেমন করুন।” শোরগোলের কারণে কারো একটি কথাও বোঝা যাচ্ছিল না। হযরত আলী (রা.) এটি দেখে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে পড়তে মিস্বর থেকে নিচে নেমে এলেন। [১]

ফোরাত নদী থেকে সিফফিন পর্যন্ত:

হযরত আলী (রা.) পরামর্শের পর নিজেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কুফায় হযরত আবু মাসউদ (রা.)-কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করে প্রায় সাতশ মাইল (১১২৭ কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করে ফোরাত নদীর তীরে...

[১] তারিখু দিমাশক: ১/৩৯১, তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৩/৫৩১, ৫৩২, তাবারি: ৬/৩০৪, ৩০৫, বাশার।

পৌঁছে গেলেন, যা সিরিয়ার সীমান্ত বলে মনে করা হতো। [১]

হযরত আলী তাঁর সেনাবাহিনী ও রসদপত্রসহ রাক্কা নামক স্থান থেকে নদী পার হলেন [২] এবং ৩৬ হিজরীর যিলহজ মাসের শুরুর দিনগুলোতে সেনাবাহিনীর সাথে ফোরাত নদীর ওপারে সিফফিনে পৌঁছে গেলেন। [৩] সিরীয় বাহিনী আগে থেকেই সেখানে তাবু গেড়ে অবস্থান করছিল। [৪]

পরিস্থিতির আবর্তন এবং নিজ নিজ অবস্থানের ওপর অটল বিশ্বাস ইসলামের এই দুই মহান নেতাকে সশস্ত্র বাহিনীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

X X X

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫৬৩ থেকে ৫৬৬

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৫৬৬

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৯৭

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৩

নোট: রাফেযীরা হযরত আলীকে তাদের নেতা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এমন অনেক গুজব ছড়িয়েছিল (যা জাল বর্ণনার আকারে ইতিহাসেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে), যা থেকে মনে হয় যে সৈন্যরা হযরত আলীকে খলিফা বানিয়েছিল। সাহাবার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তো তাদের থেকে আলাদা ছিল। সৈন্যরা তাঁর চারপাশে প্রভাবশালী ছিল, তাঁর বাহিনীতেও তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং সিরিয়া আক্রমণও তাদের কথাতেই হয়েছিল। অন্যদিকে মারওয়ানী ব্যক্তির যেহেতু রাফেযীদের এমন প্রতিটি বর্ণনাকেই ঈমানের অংশ মনে করে যাতে হযরত আলীর দিকটি দুর্বল মনে হয়, তাই তারা সেই বর্ণনাগুলো থেকে দলিল পেশ করে বলে যে হযরত আলীর বাহিনীতে সাবায়ীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তারাই সিরিয়া আক্রমণ করেছিল, সিফফিনেও অধিকাংশ সাবায়ীই নিহত হয়েছিল এবং সিরিয়াবাসীরা যথাযথভাবেই তাদের হত্যা করেছিল। মারওয়ানী চিন্তাধারায় প্রভাবিত কিছু ‘আধুনিক গবেষক’ আহলে সুন্নাতকে সম্ভ্রান্ত রাখার জন্য এও বলে থাকেন যে হযরত আলী নিজে এবং তাঁর সাথী সাহাবা তো কেবল সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাথে সাথে গিয়েছিলেন।

এই দাবিগুলো কতটা ভিত্তিহীন, সে বিষয়ে আমরা শেষে ‘সন্দেহ নিরসন অধ্যায়’-এ বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে আহলে সুন্নাতের মাযহাব দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর নয় বরং সুন্নতে নববীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুন্নতে মুতাহহারা বলে যে যুদ্ধে উভয় পক্ষেই নেককার লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। নবী করীম (সা.)-এর বাণী হলো:

“ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না দুটি বিশাল দল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের দাবি হবে এক, তাদের মাঝখান থেকে একটি বিদ্রোহী দল বের হবে, যাদেরকে উভয় দলের মধ্যে হকের অধিক নিকটবর্তী দলটি হত্যা করবে।” (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ১৮৬৫৮)

“মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সময় একটি বিদ্রোহী দল বের হবে, যাদেরকে উভয় দলের মধ্যে হকের অধিক নিকটবর্তী দলটি হত্যা করবে।” (সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২৫০০, সুনান আবু দাউদ, খণ্ড: ৪৬৬৭)

এই হাদিসগুলোর ভিত্তিতে আহলে সুন্নাতের ইজমা হলো যে সিফফিনে উভয় পক্ষই নেককার এবং সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। এই কারণেই হযরত আলী সিফফিনে নিহতদের সম্পর্কে বলেছিলেন: “আমাদের নিহতরা এবং তাদের নিহতরা জান্নাতি।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা হা: ৩৮৮৪৭ এর সারসংক্ষেপ)

যদি মারওয়ানীদের সমমনা ‘আধুনিক গবেষকদের’ এই ধারণা সঠিক হতো যে সিরিয়া আক্রমণ সাবায়ীরা করেছিল, তবে হযরত আলী এভাবে বলতেন: “আমাদের নিহতরা জান্নাতি এবং তাদের নিহতরা জাহান্নামী।”

দুষ্কৃতকারী এবং মুনাফিকদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, তারা তো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধগুলোতেও যেত। কিন্তু তার মানে এই ছিল না যে আমরা তাদেরই নিয়ে যাচ্ছিলাম। অথচ সিফফিনে তারা এতই নগণ্য ছিল যে নববী ফরমানগুলোতে তাদের ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করার প্রয়োজনও মনে করা হয়নি।

জঙ্গ-এ-সিফফিন

সিফফিনের ময়দানে উভয় বাহিনী দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে মুখোমুখি অবস্থান করছিল। নিয়মিত যুদ্ধের আগে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষও হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের নামকরা সেনাপতিদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের কথাও বর্ণিত আছে। তবে এটি অনুমান করা যায় যে, বর্ণনাকারীরা বর্ণনার ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। [১]

পানি বন্ধ করার হাকিকত:

এর একটি উদাহরণ হলো সেই সব বর্ণনা যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া হযরত আলী-এর বাহিনীর জন্য পানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ইরাকি বাহিনীকে অনেক প্রচেষ্টা ও রক্তক্ষয়ের পর পানির নাগাল পেতে হয়েছিল। [২] অথচ সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার হাকিকত কেবল এতটুকুই ছিল যে, উভয় পক্ষ পানির কোনো নিকটবর্তী খালকে নিজ নিজ সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। [৩] বরং বিশুদ্ধতম বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, সেখানে কোনো বড় সংঘর্ষ হয়নি, বরং হযরত মুয়াবিয়া-এর সৈন্যরা সেই স্থানে আগে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই তারা নিজেদের অধিকার দাবি করছিল। যখন হযরত আলী-এর প্রতিনিধি জায়গা দেওয়ার দাবি জানালেন, তখন হযরত মুয়াবিয়া সানন্দে অনুমতি দিয়ে দিলেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

“আবু সালত সুলাইম আল-হাদরামি (সিফফিনে হযরত মুয়াবিয়া-এর একজন সৈন্য) বর্ণনা করেন যে, আমরা আহলে ইরাক এবং পানির মাঝখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালাম। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এলেন, তিনি ছিলেন আশআস বিন কায়েস। তিনি উচ্চস্বরে বললেন: ‘মুয়াবিয়া আল্লাহকে ভয় করুন, উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। ভাবুন, যদি আপনারা ইরাকিদের হত্যা করেন তবে তাদের সন্তানদের দায়িত্ব কে নেবে? আর তর্কের খাতিরে যদি আমরা আপনাদের সবাইকে হত্যা করি তবে আপনাদের পরিবার-পরিজনের আশ্রয় কে হবে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا** (যদি মুমিনদের দুই দল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও)’।” [৪]

[১] জঙ্গ-এ-সিফফিনের বিস্তারিত বিবরণের অধিকাংশ উপাদান দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। আমরা এই ঘটনাটি সেই সব বিস্তারিত বিবরণ বাদ দিয়ে পেশ করছি যা যাচাই-বাছাই ছাড়াই বর্ণিত হয়ে আসছে এবং যাতে স্থানে স্থানে সাহাবী-দের ওপর অপবাদ দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে যেন হাদিসের ভাণ্ডার থেকে বেশি উপকৃত হওয়া যায় এবং সহিহ বর্ণনাগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে যেসব বিষয় কেবল সংবাদ পরিবেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন যুদ্ধের তারিখ, অবস্থান ইত্যাদি, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিছু অংশ দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীদের থেকেও গ্রহণ করেছি।

[২] ওয়াকআতু সিফফিন, নাসর বিন মুজাহিম, পৃষ্ঠা ১৬৬ থেকে ১৮৭, তাবা দারুল জিল।

[৩] সিফফিনের স্থানে এখন “তাহানা আবি হুরায়রা” নামক একটি জনপদ আবাদ আছে যেখানে এখনও নদী থেকে একটি খাল আসে। (মাকাল আব্দুল কাদির রাইহাবি, আল-হাওলিয়াত আল-আরাবিয়্যাহ আস-সুরিয়াহ, ১৯৬৯ খ্রি.) সম্ভবত এই খালের পানি পানের স্থান নিয়ে উভয় পক্ষের কিছু সৈন্যের মধ্যে বিরোধ হয়েছিল।

[৪] সূরা আল-হজুরাত, আয়াত: ৯।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “আপনারা কী চান?” তারা বললেন: “আমাদের জন্য পানির রাস্তা ছেড়ে দিন।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আবুল আওয়ারকে বললেন: “আমাদের ভাইদের জন্য পানির রাস্তা ছেড়ে দাও।” [১]

জানা গেল যে, পানি নেওয়ার জায়গার অধিকার নিয়ে মতভেদ হয়েছিল কিন্তু তলোয়ার চালানোর উপক্রম হয়নি।

সিফফিনের ঘটনায় দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীরা এমন অনেক ঘটনা প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ করেছে যাতে অতিরঞ্জন ও পক্ষপাতের দিকটি ফুটে ওঠে। কিছু বর্ণনা হযরত আলী (রা.)-কে এমন একজন কঠোর শাসক হিসেবে উপস্থাপন করে যিনি বিরোধী পক্ষকে বেঈমান মনে করে যেকোনো মূল্যে যুদ্ধ চান। কিছু বর্ণনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে এমন একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী হিসেবে সামনে আনে যিনি মুনাফিক হিসেবে মুসলিম হয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এ ধরনের বর্ণনা অবশ্যই বর্জনীয়। [২]

রণক্ষেত্রে সমঝোতার প্রচেষ্টা:

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এই সত্য প্রমাণিত যে, জঙ্গ জামালের মতো জঙ্গ সিফফিনের সময়ও উভয় পক্ষ থেকে সমঝোতার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং আলোচনার ধারা চলতে থাকে। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) ইবনে দিজাইলের সূত্রে বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সিফফিনের ময়দানে ইরাক ও শামের লস্করে অন্তর্ভুক্ত ক্বারীগণ, যাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, তারা নিজেদের আলাদা ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। [৩] তাদের মধ্যে হযরত উবাইদাহ সালমানী, হযরত আলকামা বিন কায়েস, হযরত আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ এবং হযরত আমের বিন আবদে কায়েস (রা.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ক্বারীগণ উভয় পক্ষের মধ্যে দূতীয়ালির কাজ নিজেদের জিন্মায় নিয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে তারা উভয় পক্ষের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করছিলেন।

এই দূতীয়ালির সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলে পাঠালেন যে, আমি হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের বদলা নিতে বের হয়েছি। হযরত আলী (রা.) জবাবে বলে পাঠালেন যে, এই রক্তে আমার কোনো অংশ নেই। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জেদ করতে থাকলেন যে, হযরত আলী (রা.) এই দাবির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উসমানের হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। [৪]

হযরত আলী (রা.) দাওয়াত দিতে থাকলেন যে, মুহাজির ও আনসারগণ যখন আমার বায়াত গ্রহণ করেছেন, তখন আহলে শামদেরও তাদের অনুসরণ করা উচিত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলে পাঠাতেন যে, মুহাজির ও আনসার তো আমাদের সাথেও আছেন যারা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এখন পর্যন্ত বায়াত হননি। মোটকথা, ক্বারীগণের মধ্যস্থতায় এই আলাপ-আলোচনা চলছিল।

[১] তারিখ দামেশক: ৯/ ১৩৭, ১৩৮; জিকর ইসনাদিহি ফিল জারহি ওয়াত তা’দীল লি ইবনে আবি হাতিম: ৩/ ২১২।

[২] যদিও এটি জরুরি নয় যে প্রতিটি দুর্বল বর্ণনার প্রতিটি অংশই বাস্তব বিরোধী হবে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের সমর্থনে সেগুলো গ্রহণ করার অবকাশ অবশ্যই আছে, কিন্তু আমরা চরম সতর্কতার খাতিরে এ ধরনের বিস্তারিত বিবরণ পুরোপুরি বর্জন করছি।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ৫০৬ - এরা সেই ক্বারী নন যারা পরবর্তীতে খারেজী হয়েছিলেন যাদের কথা সামনে আসবে। এরা ছিলেন শান্তিপ্ৰিয় ক্বারী ফকীহ এবং খারেজীদের থেকে আলাদা ছিলেন।

[৪] হযরত আলী (রা.)-এর কাছে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই দাবি পূরণ না করার যুক্তিসঙ্গত ও শক্তিশালী কারণ ছিল যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ‘বিদ্রোহীদের থেকে বায়াত কেন নেওয়া হলো?’, ‘উসমানের হত্যাকারীদের পাকড়াও করতে বিলম্বের কারণ’, ‘আদালতি কার্যক্রমে জটিলতা’ এবং ‘প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যা’ শিরোনামের অধীনে এসেছে। এছাড়াও ‘আসবাব ও শুবুহাত’ অধ্যায়ে ‘হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল’ শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা দেখা যেতে পারে।

ক্বারীগণের দ্বিতীয় কাজ ছিল এই যে, যখনই উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি হতো, তারা তৎক্ষণাৎ মাঝখানে চলে আসতেন এবং উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। ফিলহজ মাসের শুরু থেকে সফর মাস পর্যন্ত উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান করছিল এবং এই দুই মাসে পঁচাশি (৮৫) বার মানুষ বিশৃঙ্খল অবস্থায় একে অপরের দিকে ধাবিত হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই ক্বারীগণের এই দলটি, যাদের মধ্যে হযরত আলী-র সাথীগণও ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া-র অনুসারীগণও ছিলেন, মধ্যস্থতা করে বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। [১]

যুদ্ধের সূচনা

সন্ধির এই সমস্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর অবশেষে মঙ্গলবার, ৭ সফর, ৩৭ হিজরিতে উভয় বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হয়। [২] হযরত আলী-র এখানেও তাঁর সারিবদ্ধ বাহিনীকে এই নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন আক্রমণে আগে না বাড়ে। আপনি যুদ্ধের প্রতিটি সংঘর্ষের আগে বাহিনীকে এই ভাষণ দিতেন:

“ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ শুরু করে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র শুকরিয়া যে তোমরা হকের ওপর আছো এবং তোমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা না হওয়া তোমাদের হকের ওপর থাকার দ্বিতীয় দলিল। যখন তোমরা যুদ্ধ করে তাদের পিছু হটিয়ে দেবে, তখন কোনো পলায়নকারীকে হত্যা করবে না। কোনো আহতের ওপর আক্রমণ করবে না এবং কোনো নিহতের লাশের অবমাননা করবে না। যদি তোমরা প্রতিপক্ষের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যাও, তবে তাদের তাঁবুর পর্দা ছিঁড়বে না। অনুমতি ছাড়া সেগুলোতে প্রবেশ করবে না। তাদের মালামালের মধ্য থেকে সেই বস্তু ছাড়া কিছুই নেবে না যা তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পাবে। নারীদের কোনো প্রকার কষ্ট দেবে না, চাই তারা তোমাদের অপমান করুক অথবা তোমাদের সরদার ও নেক লোকদের গালিগালাজ করুক, কারণ নারীরা দেহ ও মনের দিক থেকে দুর্বল হয়।” [৩]

সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধ তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। [৪] এই দিনগুলোতে উভয় পক্ষ পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং অত্যন্ত তীব্রভাবে তলোয়ার চলতে থাকে।

আলাবী বাহিনীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

উভয় বাহিনীতেই সাহাবী ও তাবয়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। তবে হযরত আলী-র বাহিনীকে এই দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত ছিল যে এতে...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ৫০৬, ৫০৭... এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, উম্মতের একটি নেক ও সৎ আলেম ও ফাযেল শ্রেণী জঙ্গ জামালের মতো এখানেও পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য সক্রিয় ছিল। এটাও স্পষ্ট যে, জঙ্গ জামালের মতো এই সুযোগেও চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে হঠাৎ যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল, সম্ভবত এই কারণেই ক্বারীগণ ত্রিশ হাজারের বিশাল সংখ্যায় উভয় বাহিনীর মাঝখানে তাঁবু গেড়েছিলেন যাতে পরিস্থিতি বিগড়ে গেলে সামাল দেওয়া যায়। যেসব যয়ীফ বর্ণনায় এই সময়ে নব্বইটি লড়াই হওয়া এবং প্রতিদিন লাশের স্তুপ জমার কথা উল্লেখ আছে, সেগুলো অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। প্রকৃত অবস্থা সম্ভবত সেটাই ছিল যা এই বর্ণনায় আছে যে, হাস্‌মা বা সামান্য সংঘর্ষ শুরু হতেই মধ্যস্থতা করে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া হতো।

[২] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ১৯১

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৫/ ১০, ১১, তিনি বললেন: “তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তারা শুরু করে, কেননা আল্লাহর প্রশংসায় তোমরা হকের ওপর আছো এবং তাদের শুরু করা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করা তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে আরেকটি দলিল।” যদিও এই বর্ণনাটি অত্যন্ত যয়ীফ, তবে সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে যে, আমীরুল মুমিনীনের এই নির্দেশই জঙ্গ জামালে ছিল। (শারহ মাআনিল আসার, খণ্ড: ২, পৃ: ৫১১, কিতাবুস সিয়্যার) এবং এটাই হানাফী ফকীহগণের প্রসিদ্ধ অভিমত যে, বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণে আগে বাড়া উচিত নয়। (হিদায়া, বাবুল বুগাত)

[৪] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ১৯১

এতে অনেক বদরী সাহাবীও ছিলেন [১] এবং বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য লাভকারী অনেক মুরুব্বিও ছিলেন। [২] আলভী (আলী রা.-এর) লশকরে কাতারবন্দীর বিন্যাস এমন ছিল যে, পতাকাবাহী ছিলেন হাশিম বিন উতবা রাদিয়াল্লাহু আনহু। ডান বাহু আশআস বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বাম বাহু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কমান্ডে ছিল। [৩] আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু অশ্বারোহী বাহিনীর এবং সুলাইমান বিন সুরদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন।

[১] আসহাবে বদরের মধ্যে প্রসিদ্ধ নামগুলো হলো: আবু আইয়ুব আনসারী (তারিখে ইসলাম যাহাবী: ৩/৩৪০), আবু আল-হাইসাম আল-তাইয়িহান, আবু লাইলা আনসারী, আবু রাফে আনসারী, সাহল বিন হুনাইফ, আম্মার বিন ইয়াসির ও খুজাইমা বিন সাবিত (তারিখে ইসলাম যাহাবী: ৩/৫৩৫), আবুল হাইসাম আনসারী (আল-ইসাবাহ: ৭/৩৭৬; তারিখে ইসলাম: ৩/৫৮৫), আসীদ বিন সালাবা আনসারী (উসদুল গাবাহ: ১/৩২০), সাবিত বিন উবাইদ (উসদুল গাবাহ: ১/৩১৮), আবু উমরা আনসারী বশীর বিন আমর, যিনি এই যুদ্ধে শহীদ হন। (তারিখে ইসলাম: ৩/৫৮৫, তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/৮৪৫)।

অন্যান্য বদরী সাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নামগুলো হলো: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন জাফর, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, হাসনাইন কারিমাইন, খুজাইমা বিন সাবিত, সুলাইমান বিন আমর, সাহল বিন সাদ, কাইস বিন সাদ বিন উবাদাহ, আবু কাতাদা আনসারী, আদী বিন হাতেম, আশআস বিন কায়েস (তারিখে ইসলাম, যাহাবী: ৩/৫৩৫), আমর বিন আল-হামাক, খুজাইমা বিন আদী (তারিখে খলিফা, পৃ. ১৯৩, ১৯৫), আসওয়াদ বিন রাবিয়াহ (আল-ইসাবাহ: ১/৩২৮), সুলাইমান বিন আমর (তারিখে তাবারী: ১১/৫২৩), আবু আল-তুফাইল (তারিখে আওসাত: ১/৪৭), জুবাইর বিন মুতয়িম, আবু মাসউদ আনসারী (আল-ইসতিয়াব: ১/২৭৭), জাবালা বিন আমর আনসারী (তারিখে ইসলাম যাহাবী: ৩/২৮৩), রাবিয়াহ বিন কায়েস (তারিখে ইবনে ইউনুস: ১/৩১৭), য়ায়েদ বিন আরকাম (আল-ইসাবাহ: ২/৩৮৯), আব্দুর রহমান বিন আবজী (তারিখে খলিফা, পৃ. ১৭৬), আব্দুল্লাহ বিন আবি তালহা, আনাস বিন মালিকের ভাই শরীক বিন জামাল (তহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ১/২৪৭), ফাকেহ বিন সাদ আনসারী আল-খাজরাজী (আল-ইসাবাহ: ৫/২৯৮), আব্দুল্লাহ বিন হুদাইল বিন ওয়ারাকা, যিনি এই লড়াইয়ে শহীদ হন। (তাকরীবুত তাহজীব, পৃ. ৩২৬), সাদ বিন আল-হারিস বিন সামাহ, যিনি এই লড়াইয়ে শহীদ হন। (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/৫০৮), মুসলিম বিন আশা, যিনি এই লড়াইয়ে শহীদ হন। (তহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ৮৯/২)।

[২] লশকরে আলভীতে বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য লাভকারী মুরুব্বিদের সংখ্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়:

আব্দুর রহমান বিন আবজী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমাদের সাথে বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী আটশ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে আম্মার বিন ইয়াসিরও ছিলেন, তাদের মধ্যে তেষট্টি জন শহীদ হন।” (তারিখে খলিফা, পৃ. ১৯২)

সনদ হলো: আব্দুস সালাম বিন হারব, ইয়াযীদ বিন আব্দুর রহমান (আবু খালিদ আল-দালানী), জাফর বিন আবি আল-মুগীরা, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান বিন আবজী। আব্দুস সালাম বিন হারব বুখারী ও মুসলিমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইয়াযীদ বিন আব্দুর রহমান সত্যবাদী, জাফর বিন আবি আল-মুগীরা সত্যবাদী এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমানও নির্ভরযোগ্য, আর আব্দুর রহমান বিন আবজী সাহাবী। সুতরাং এই সনদটি শক্তিশালী এবং সহীহ। তবে এখানে একটি দ্বিতীয় বর্ণনা এর বিপরীত রয়েছে, যাতে ইমাম ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“ফিতনা (যুদ্ধ) শুরু হলো অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের সংখ্যা দশ হাজার ছিল, তাদের মধ্যে একশ জনও এতে শরীক হননি, বরং তাদের সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্তও পৌঁছায়নি।” (আস-সুন্নাহ লিল-খাল্লাল, খণ্ড: ৩, পৃ. ৪২৮)

এই বর্ণনাকে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সবচেয়ে সহীহ সনদ বলেছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি পর্যালোচনার দাবি রাখে; কারণ ইমাম ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিফফিনের যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না। ইবনে সাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি মুত্তাসিল সনদের সাথে আনাস বিন সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ বিন সীরীন ৩৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/১৯৩), অর্থাৎ যখন সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন তিনি দুই-চার বছরের শিশু ছিলেন, তাই এই বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে আব্দুর রহমান বিন আবজী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তাই চাক্ষুষ দেখা বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই অনুমানের ওপর প্রাধান্য পাবে।

কিছু লোক বাইয়াতে রিদওয়ানের ৮০০ সাহাবীর সিফফিনে শরীক হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন; এর কারণ হলো তারা সাহাবীদের আলাদা আলাদা জীবনীতে যখন দেখেন যে সেখানে তাদের সিফফিনে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ নেই, তখন তারা মনে করেন যে তারা শরীক ছিলেন না। অথচ এটি কোনো জোরালো দলিল নয়। এজন্যই এই সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, ইবনে আবজী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনার কোনো বর্ণনাকারী সংখ্যা বর্ণনায় ভুল করেছেন। ইয়াযীদ বিন আব্দুর রহমানের ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার “সত্যবাদী কিন্তু অনেক ভুল করেন” বলে মন্তব্য করেছেন। (তাকরীবুত তাহজীব, পৃ. ৬০৯)

এই আপত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও এটি অনস্বীকার্য যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বড় সংখ্যক সাহাবী ছিলেন, যাদের মধ্যে বদরী এবং আসহাবে বাইয়াতে রিদওয়ানও ছিলেন। অন্যদিকে শামী লশকরে সাহাবীদের সংখ্যা ও মর্যাদা কম ছিল। যাই হোক, এটি স্পষ্ট যে সাহাবীদের আনুপাতিক হার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকেই বেশি ছিল। যেখানে তাবেয়ীদের সম্পর্ক, তা উভয় দিকেই হাজার হাজার ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

[৩] লশকরে আলভীতে প্রসিদ্ধ কিছু তাবেয়ী: আহনাফ বিন কায়েস, রিফাহ বিন শাদ্দাদ, হারিস বিন মুররা, সাসাআ বিন সুহান, জুহাইর বিন মুনজির (তারিখে খলিফা, পৃ. ১৯২, ১৯৫), আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (সিকাত লি ইবনে হিব্বান: ৩/৪০০), সাঈদ বিন কায়েস (আল-ইসাবাহ: ৩/৩৯২), সুওয়াইদ বিন গাফালা (ইবনে সাদ: ৬/৬৮), আব্দুর রহমান বিন খিরাশ আল-আনসারী (আল-ইসাবাহ: ৩/৪৫৩), আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা (ইবনে সাদ: ৬/৮৩৫), হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছাত্র এবং ইমাম আসেম কুফীর উস্তাদ শেখ আল-কুররা আব্দুল্লাহ বিন হাবীব আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী (তারিখে তাবারী: ৩/১০), আব্দুল্লাহ বিন যুরীর গাফেকী (ইবনে সাদ: ৫/৫১০), আমর বিন শারাহবিল আবু মাইসারা কুফী (তারিখ ইবনে আবি খাইসামা, আল-সফর আল-সানি: ৩/১৭২), মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/৯৪), হাশিম বিন উতবা (তাবারী: ১১/২৬৫), ফি আল-দিন আল-মুদিল, হাশিম বিন উতবা, যিনি এই লড়াইয়ে শহীদ হন। (তারিখে দামেশক: ৩/৪৭৩)।

[৪] তারিখে খলিফা বিন খয়্যাত, পৃ. ১৯৩।

আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.) কুরাইশদের আমির ছিলেন। আমর বিন আল-হামিক, আদি বিন হাতিম, হুজর বিন আদি এবং জারিয়া বিন কুদামা (রা.) ছাড়াও রিফায়া বিন শাদ্দাদ, হারিস বিন মুররাহ, আহনাফ বিন কায়েস এবং সা’সা’ বিন সুহান (রা.) বিভিন্ন গোত্রের নেতা ছিলেন। [১]

আশতার নাখরীর কাছে মাজহিজ গোত্রের কমান্ড ছিল। [২]

শামী লশকর বা সিরীয় বাহিনীর নেতৃত্ব:

অন্যদিকে সিরীয় বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন আবদুর রহমান বিন খালিদ (রা.)। অশ্বারোহী বাহিনীর আমির ছিলেন উবাইদুল্লাহ বিন উমর (রা.)। ডান বাহু আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রা.) এবং বাম বাহু হাবিব বিন মাসলামা (রা.)-এর কমান্ডে ছিল। এ ছাড়াও আবুল আওয়ার সুলামি, যুল কালা হিময়ারি, মাসলামা বিন মুখাল্লাদ এবং বুসর বিন আরতাহ (রা.) পৃথক পৃথক দলের আমির ছিলেন। [৩]

যুদ্ধের দৃশ্য:

উভয় বাহিনী যখন মুখোমুখি হতো এবং প্রথম সারির বীর যোদ্ধারা একে অপরের মোকাবিলা করত, তখন বর্শাগুলো একে অপরের সাথে গেঁথে যেত। বর্শার আধিক্য এমন ছিল যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে সেগুলোর ওপর দিয়ে চলাফেরাও সম্ভব ছিল। [৪] হযরত আলী (রা.) নিজে বহুবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর বিখ্যাত তলোয়ার যুলফিকার এত জোরে ও তেজে চালিয়েছিলেন যে তা বেঁকে গিয়েছিল। [৫] যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এমন ছিল যে, সৈন্যদের আধিক্যের কারণে উভয় পক্ষের সারির শেষ প্রান্ত দেখা যেত না। উভয় পক্ষ থেকে একই সাথে তাকবীরের ধ্বনি এবং কালিমা তাইয়েবার আওয়াজ بلند হতো, যার ফলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠত। [৬]

[১] তারিখ খলিফা, পৃ. ১৯৩, ১৯৫ হাসান সনদে। [২] তারিখ খলিফা, পৃ. ১৯৫। [৩] তারিখ খলিফা পৃ. ১৯৫, ১৯৬ হাসান সনদে।

সিরীয় বাহিনীর কিছু সাহাবায়ে কেরামের নাম নিম্নরূপ:

আমর বিন হাজম (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ১৭৭), দাহহাক বিন কায়েস আল-ফিহরি (আল-ইসাবাহ: ৩/ ৪২৯), আমর বিন আল-আস (আসাদুল গাবাহ: ৩/ ৩৩২), আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (আসাদুল গাবাহ: ৩/ ৩৩৫), মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩/ ৪২৩), আবদুর রহমান বিন খালিদ, হাবিব বিন মাসলামা, বুসর বিন আরতাহ, আবুল আওয়ার সুলামি (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ১৯৫), উবাইদুল্লাহ বিন উমর বিন আল-খাত্তাব, যিনি এই যুদ্ধে শহীদ হন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৭, পৃ: ৮৫৮, হাদিস: ৩৭৮৫৮; আল-ইসাবাহ: ৪/ ৩৭১), উবাদাহ বিন আউফি (মুখতাসার তারিখ দামেশক: ১১/ ৩০১), আবু আদ-দারদা (মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ২৩/ ৩১৩), হামল বিন সাদানাহ (আল-ইসাবাহ: ২/ ১০৮), যুল কালা আল-হিময়ারি (আল-ইসাবাহ: ৩/ ৩৫৬), যুল কিল্লা বিন আমর (আল-ইসাবাহ: ৩/ ৪৬৯), শুরাহবিল বিন সিমত (আল-ইসাবাহ: ৩/ ৩৬৬), আমর বিন সুফিয়ান (আল-ইসাবাহ: ৪/ ৫২৩), ইয়াযিদ বিন আসাদ (আল-ইসাবাহ: ৬/ ৫০৬), হাওশাব যুল জুলমাহ আল-হিময়ারি (আল-ইসতিয়াব: ১/ ৩৬০)।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলতেন: আমি সিফফিনের যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনেক সাহাবীর সাথে ছিলাম। (আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, খণ্ড: ৫, পৃ: ৫০০)।

সিরীয় বাহিনীর কিছু তাবেরী হলেন: আবদুর রহমান আল-কায়নি, আব্বাস বিন সাদ আত-তাঈ, তরীফ বিন আল-হাসহাস, হাসসান বিন বখ্তাল, মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ বিন হাওয়াই আস-সাকসাকি, ইয়াযিদ বিন হামরাহ, হুনাইশ বিন বদল আশ-শারিক আল-কিনানি, মুখারিক বিন আল-হারিস, নায়েল বিন কায়েস আল-জুয়ামি, মালিক বিন ইয়াযিদ আল-আনাসি (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ১৯৫, ১৯৬), যুরআহ বিন হারিস, হাওশাব যুল জুলমাহ, তরীফ বিন হাম্মাস (তারিখ খলিফা, পৃ: ১৯৫), হারিস বিন আবদাহ আল-আযদি (আল-ইসাবাহ: ৩/ ১৩৫), সালমান বিন যাম্মার (আল-ইসাবাহ: ৬/ ৩৩৫), কুরায়েব বিন সাবাহ। হযরত আলী (রা.)-এর হাতে দ্বৈরথ যুদ্ধে এরা নিহত হন। (আল-ইসাবাহ: ৫/ ৪৯৭)।

রাফেখীরা তাদের কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর ওপর এই অপবাদ দেয় যে, তিনি বলতেন: নামাজ হযরত আলী (রা.)-এর পেছনে পড়া এবং খাবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে খাওয়া বেশি তৃপ্তিদায়ক। এটি একটি নিছক গল্প। আবু হুরায়রা (রা.) এই যুদ্ধে উপস্থিতই ছিলেন না। (আদ-দাওউল লামি আল-মুবীন, পৃ: ১৩১)। একইভাবে রাফেখীরা আকিল বিন আবি তালিব (রা.)-এর ব্যাপারেও এই গল্প তৈরি করেছে যে তিনি সিরীয়দের সাথে ছিলেন। এটিও একটি বানোয়াট কাহিনী। আহলে সুন্নাতের উৎসগুলো থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, আকিল (রা.) এক পর্যায়ে রাগান্বিত হয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে অনেক সম্মান করেছিলেন। কিন্তু হযরত আকিল (রা.) সেখানেও হযরত আলী (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব খুব ভালোভাবে বর্ণনা করেছিলেন। (সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩/ ১০০)।

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হাদিস: ৩৭৮৩৯, তিবাতুর রুশদ।

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হাদিস: ৩৭৮৫৮ হাসান সনদে, তিবাতুর রুশদ।

[৬] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/ ৮১ আবু আল-আলিয়া থেকে।

উভয় পক্ষের বীরদের মধ্যে সাহাবী এবং প্রবীণ তাবয়ীগণ বিপুল সংখ্যায় ছিলেন, যারা পার্থিব লাভের চিন্তার উর্ধ্বে উঠে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত লাভ এবং ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে ওয়াইস করনী (রা.)-এর মতো বুজুর্গ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি এই যুদ্ধে আক্রমণ করতে গিয়ে শহীদ হন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.) ‘সায়্যিদুত তাবয়ীন’ (তাবয়ীদের সরদার) উপাধি দান করেছিলেন। [১]

তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফিকহী উত্তরাধিকারের আমানতদার আলকামা ইবনে কায়েস (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি ইবরাহিম নাখয়ী (রা.) বলতেন যে, আমাদের উস্তাদ রণক্ষেত্রে নেমে তাঁর তলোয়ার পূর্ণ শক্তিতে ব্যবহার করেছিলেন। [২]

এটি ছিল জুন মাস, কিন্তু ইরাকি বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বদরী সাহাবী আবু আমরা আনসারী (রা.) এই অবস্থাতেও নফল রোজা রাখছিলেন। একদিন গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গোলামকে বললেন: “আমার ওপর পানি ছিটিয়ে দাও।”

এরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করলেন যা দুর্বলতার কারণে বেশি দূরে গেল না। এটি দেখে তিনি বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করবে, তা লক্ষ্যভেদী হোক বা না হোক, এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তাকে একটি নূর (আলো) দান করা হবে।”

আবু আমরা আনসারী (রা.) সেদিন সন্ধ্যার আগেই শহীদ হয়ে যান। [৩]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে সতর্কতা অবলম্বনকারীগণ:

তবে কিছু লোক এমনও ছিলেন যারা ঠিক শেষ মুহূর্তে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান এবং কারো রক্তে হাত রঞ্জিত করা থেকে বিরত থাকতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসেন। [৪] হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনীর অন্যতম স্তম্ভ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলতে ইতস্তত করছিলেন। [৫] তিনি সিফফিনে এই অঙ্গীকার নিয়ে এসেছিলেন যে, যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁর পিতা হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করে তাঁকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। [৬] যুদ্ধের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) প্রকাশ্যে বলতেন: “সিফফিনের সাথে আমার কী সম্পর্ক! মুসলমানদের সাথে লড়াই করার আমার কী প্রয়োজন! কতই না ভালো হতো যদি আমি এর দশ বছর আগেই মারা যেতাম।” [৭]

[১] মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৫২৭৮, যাহাবী এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।

[২] “আলকামা সিফফিনের দিন ফিরে আসেন এবং আলীর সাথে তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত করেন।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৮৪৮০, ৩৮৮৬৯, তাবা’ আর-রুশদ) এর সনদ মুত্তাসিল ও সহীহ। বর্ণনাকারীগণ হলেন: আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আমাশ, মুসলিম আল-বাতিন (মুসলিম ইবনে ইমরান) এবং আবুল বাখতারী; এই বর্ণনাকারীদের সকলেই নির্ভরযোগ্য। এটি মনে রাখা উচিত যে, যুদ্ধ তো যুদ্ধই, তা ফুল দিয়ে নয় বরং তলোয়ার দিয়েই লড়াই হয়। তাই উল্লিখিত কিছু বিবরণ যদি দুর্বল সনদেও বর্ণিত হয়, তবে তাতে যৌক্তিকভাবে বা শরয়ীভাবে কোনো অসম্ভাব্যতা নেই।

[৩] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩৮১/২২, মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৫৬৮৯।

[৪] আবু আল-আলিয়া বলেন: যখন আলী ও মুয়াবিয়ার সময়কাল ছিল, তখন আমি একজন যুবক ছিলাম, সুস্বাদু খাবারের চেয়ে যুদ্ধ করা আমার কাছে বেশি প্রিয় ছিল। তাই আমি উত্তম সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাদের কাছে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম দুটি কাতার (সারি), যাদের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছিল না। যখন এক পক্ষ তাকবীর দিচ্ছিল, অন্য পক্ষও তাকবীর দিচ্ছিল; যখন এক পক্ষ তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করছিল, অন্য পক্ষও তাহলীল পাঠ করছিল। তিনি বলেন, তখন আমি নিজের মনে চিন্তা করলাম এবং বললাম, এই দুই দলের মধ্যে কাকে আমি কাফের বলব আর কাকে মুমিন বলব? আর কে আমাকে এর জন্য বাধ্য করেছে? সুতরাং আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত শান্ত হইনি এবং তাদের ত্যাগ করেছি। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৮১/৭, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০৯/৩)।

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২৬৬/৪, ২৬৭, তাবা’ সাদির।

[৬] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৫৩৮।

[৭] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২৬৬/৪, ২৬৭, তাবা’ সাদির।

বস্তুত অনেক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, [১] তা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা ময়দানে অটল ছিলেন এবং যুদ্ধ চলতে থাকে।

উভয় পক্ষের মধ্যে মহানুভবতা ও সততার উচ্চতর দৃষ্টান্ত:

সিফফিনের যুদ্ধ ইতিহাসের এই দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যুদ্ধ ছিল যে, এতে হত্যা ও লড়াইয়ের ভয়াবহতার পাশাপাশি উভয় পক্ষ থেকে নৈতিকতা, সৌজন্যবোধ, মহানুভবতা এবং উদারতার সর্বোত্তম উদাহরণ সামনে আসছিল। ফিতনাবাজ সাবায়ী এবং চরমপন্থীদের একটি দল ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠরা ছিলেন পূর্ণ ঈমানদার। এটি বনু উমাইয়া বা বনু হাশিমের যুদ্ধ ছিল না বরং এটি ছিল আদর্শের যুদ্ধ। এটি ছিল বিশ্ব ইতিহাসে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে লড়াই কোনো নিয়মিত যুদ্ধের প্রথম উদাহরণ যাতে যুদ্ধের নিয়মাবলির পূর্ণ অনুসরণ এবং বিরোধী পক্ষের সাথে মার্জিত আচরণের ব্যাপারে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর এমনটি হবেই না কেন যখন উভয় পক্ষের নেতৃত্ব ছিল প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের হাতে যাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ। ফলে তলোয়ার খাপে ভরার সাথে সাথেই তাদের ভাই ভাই মনে হতো, তারা একই জায়গা থেকে পানি পান করতেন, মনোমালিন্য থাকা সত্ত্বেও কেউ অন্য কাউকে সামান্য কষ্টও দিতেন না। একে অপরের কোনো জিনিস পাওয়া গেলে তা আমানত মনে করে হেফাজত করতেন এবং তা ফেরত দেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করতেন। [২]

হযরত আলী [রা.] -এর অবস্থা এমন ছিল যে, যুদ্ধের হাঙ্গামা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ [সা.] -এর সুন্নাতসমূহের পূর্ণ খেয়াল রাখতেন, এমনকি রাতে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার তসবিহ পাঠ করার যে নিয়ম ছিল, তাও নষ্ট হতে দেননি। [৩]

জঙ্গ জামালের মতো এখানেও উভয় পক্ষ কোনো আহতের প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করত না, কোনো পলায়নপর ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করত না এবং কোনো মৃতদেহ থেকে অস্ত্র ও আসবাবপত্র খুলে নিত না। [৪]

হযরত আলী [রা.] -এর দয়া ও করুণা:

হযরত আলী [রা.] -এর কাছে সিরিয়াবাসীদের কোনো সৈন্যকে বন্দি করে আনা হলে তিনি বলতেন: “আমি তোমাকে কখনোই হত্যা করব না, আমি রাব্বুল আলামীন আল্লাহকে ভয় করি।” আপনি এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতেন যে সে পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না এবং তাকে চার দিরহাম দিয়ে বিদায় করতেন। [৫]

যুদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও হযরত আলী [রা.] -এর হৃদয়ের বিশালতা এমন ছিল যে, তাঁর সামনে কেউ আওয়াজ দিল: “হে আল্লাহ! সিরিয়াবাসীদের ওপর লানত বর্ষণ করুন।” হযরত আলী [রা.] তৎক্ষণাৎ নিষেধ করলেন এবং বললেন:

[১] আবু হাফসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী [রা.] -এর বড় সাহেবজাদা হাসান [রা.] লঙ্করে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কার্যত যুদ্ধে শরিক হননি। (তাবারী, ৫/১৯)
 আবু হাফসের বর্ণনা মতেই এক পর্যায়ে হযরত আলী [রা.] -এর প্রখ্যাত পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়ার বিপরীতে হযরত মুয়াবিয়া [রা.] -এর পক্ষ থেকে হযরত উমর ফারুক [রা.] -এর পুত্র উবায়দুল্লাহ বিন উমর [রা.] বের হলেন। হযরত আলী [রা.] তাদের উভয়কে একে অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরতে দেখে নিজের সওয়ারিকে তাড়া দিয়ে নিজের সাহেবজাদার কাছে গেলেন এবং তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর উবায়দুল্লাহ বিন উমর [রা.] -কে বললেন: “আমি তোমার সামনে আছি, লড়তে হলে আমার সাথে লড়াই।” তিনি উত্তর দিলেন: “আমি আপনার সাথে লড়ার কোনো প্রয়োজন মনে করি না।” এই বলে তিনি ফিরে গেলেন। (তারিখে তাবারী: ৫/১২-১৩)
 [২] তারিখে তাবারী: ৪/৫৭১, এটি আবু হাফসের সাক্ষ্য।
 [৩] শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী: ২/১২০, ত. মাকতাবাতুর রুশদ
 [৪] মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ২৬৬০
 [৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৮৫৯, ৩৭৮৬১, ত. রুশদ

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

“শামবাসীদের মন্দ বলো না। তাদের মধ্যে আবদাল (উচ্চমর্যাদার ওলীগণ) বিদ্যমান রয়েছেন।” [১]

হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী রাতের বেলা তাঁকে দেখা যেত যে, তিনি শামবাসীদের শিবিরের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তাঁর মুখে এই শব্দগুলো উচ্চারিত হচ্ছে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِهَمْ (হে আল্লাহ! আমাকেও ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকেও।) [২]

যখন যুদ্ধের সময় পানাহার, বিশ্রাম, শহীদদের দাফন এবং জানাজার নামাজের জন্য বিরতি হতো, তখন উভয় পক্ষের লোকেরা একে অপরের কাছে আসা-যাওয়া করত এবং কোনো সংকোচ ছাড়াই মেলামেশা করত। [৩] উভয় পক্ষেই নামাজের পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হতো। উভয় লক্ষরের শিবিরে আজান ধ্বনিত হতো, একামত হতো এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা হতো। [৪] হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অফিসারদের পেছনে নামাজ আদায় করতেন। হযরত আলী (রা.) উদার মনে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। [৫] হযরত আন্মার বিন ইয়াসির (রা.) শহীদ হলে উভয় বাহিনী তাঁর জানাজার নামাজ পড়েছিল। [৬] এটি ছিল আভিজাত্য, নৈতিকতা এবং কালিমা পাঠকারীদের সম্মানের এমন এক উদাহরণ যা “মানবতার সম্মান”-এর অন্তঃসারশূন্য স্লোগান দেওয়া এবং মানবাধিকারের ঢোল পেটানো পশ্চিমা বিশ্ব আজও পেশ করতে অক্ষম।

হযরত আন্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর শাহাদাত:

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে হযরত আন্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে, যিনি ইরাকি লক্ষরের নেতৃস্থানীয় এবং ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দিকের হাতেগোনা কয়েকজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, বয়স ছিল ৯৩ বছর। [৭]

নিজের অবস্থানের সঠিকতার ওপর তাঁর এতটাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বলছিলেন:

“আল্লাহর কসম! যদি শামবাসীরা আমাদের মারতে মারতে কোহ-ই-হাজরের চূড়া পর্যন্তও হটিয়ে দেয়, তবুও আমি নিজের হকের ওপর থাকা এবং বিরোধীদের ভুলের ওপর থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকব।” [৮]

কিন্তু এই অবস্থান সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে নিজের মতোই মুসলমান মনে করতেন। چنانچہ যখন কোনো ব্যক্তি বলল: “শামবাসীরা কাফের হয়ে গেছে”, তখন হযরত আন্মার (রা.) তা খণ্ডন করে বললেন: “আমাদের এবং তাদের রাসূল এক, কিবলা এক, কিন্তু তারা ফিতনার শিকার হয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। যতক্ষণ তারা ফিরে না আসে, ততক্ষণ আমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যিক।” [৯]

ভারসাম্যের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে যে, যুদ্ধের ময়দানেও প্রতিপক্ষের ব্যাপারে ইনসাফের কথা বলা হচ্ছে।

যুদ্ধের তৃতীয় সন্ধ্যায় আন্মার (রা.) ইফতারের জন্য দুধ চাইলেন এবং বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, তোমার শেষ জিনিস...”

[১] ইতহাফুল খাইরাহ: ৭/৩৫৬, ত. দারুল ওয়াতান; মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক মা জামে মা'মার বিন রাশিদ, খ: ২০৩৫৫, ত. আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান
[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খ: ৭/৮৬৫, ত. আর-রুশদ
[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ লি-নুরুদ্দীন আল-হাইসামি, খ: ১২০৩৮
[৪] হযরত আস-সালাতু ফা-আযযানা ওয়া আযযানু ওয়া আকামনা ওয়া আকামু, ফাসাল্লাইনা ওয়া সাব্বু। (সুনানে সাঈদ বিন মানসুর: ২/৩৯৭, ত. দারুস সালাফিয়াহ)
[৫] বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব লি-কামালুদ্দীন ইবনুল আদিম: ১/২০২, ত. দারুল ফিকর
[৬] তারিখু দিমাশক: ১০/৩৬০, ত. দারুল ফিকর
[৭] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১/৩২৬, ত. আর-রিসালাহ
[৮] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খ: ৩৭৮৩০, ত. আর-রুশদ; মাজমাউয যাওয়াইদ, খ: ১৫৬০১
[৯] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খ: ৩৭৮৩১; মুসনাদে আবি দাউদ আত-তায়ালিসি, খ: ৬৭৮; মুসনাদে আহমাদ, খ: ১৮৮৮৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, খ: ৭০৮০

তারিখ উম্মত মুসলিমাহ

“দুনিয়াতে তুমি সর্বশেষ যা পান করবে, তা হবে এক ঢোক দুধ।” ইফতার করে তিনি যুদ্ধে শরিক হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। [১]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে কে হত্যা করেছিল?

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে সিরীয় বাহিনীর এক বিখ্যাত ব্যক্তি আবুল গাদিয়া আল-জুহানি হত্যা করেছিলেন। [২] এ কারণে সিরীয় বাহিনীর সেনাপতি আমর বিন আস (রা.)-ও স্বীকার করতেন যে, হযরত আম্মার (রা.)-কে আমাদের বাহিনীই হত্যা করেছে। ইমাম নাসায়ি সহিহ সনদে বর্ণনা করেন যে, একবার আমর বিন আস (রা.) বলতে লাগলেন: “আমি মনে করি না যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যাকে ভালোবেসেছেন, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।” লোকেরা বলতে লাগল: “আমাদের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকেও ভালোবাসতেন এবং আপনাকে অফিসার নিযুক্ত করতেন।” আমর বিন আস (রা.) বলতে লাগলেন: “আল্লাহ ভালো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ভালোবাসতেন নাকি আমার মন রক্ষা করতেন, তবে আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে অবশ্যই ভালোবাসতেন।” লোকেরা জিজ্ঞেস করল: “তিনি কে?” আমর বিন আস (রা.) বললেন: “আম্মার বিন ইয়াসির।” লোকেরা বলল: “তাকে তো সিফফিনে আপনারাই হত্যা করেছেন।” আমর বিন আস (রা.) বললেন: “নিশ্চয়ই, আল্লাহর কসম আমরাই তাঁকে হত্যা করেছি।” [৩]

[১] আল-আহাদ ওয়াল মাসানি লি ইবনে আবি আসিম, হা: ২৭২; মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ১৮৩৯৩; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/২৫৭, ত: সাদির।

[২] এই বিষয়টি সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। আবুল গাদিয়া (এবং বলা হয় আবু গাদিয়া)-র নিজস্ব বক্তব্য হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে: “আমরা আম্মার বিন ইয়াসিরকে আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করতাম। সিফফিনের দিন তিনি প্রথম দলের সাথে পদব্রজে এগিয়ে আসছিলেন, যখন তিনি দুই সারির মাঝখানে আসলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর হাঁটুতে বর্শা মারল, তিনি পড়ে গেলে তাঁর শিরস্ত্রাণ সরে গেল, আমি আঘাত করলাম তো দেখলাম সেটি আম্মারের মাথা ছিল।” (আল-মুজামুল কাবির তাবারানি: ২২/৩৬৩, এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হা: ৮২২২, হাইসামি বলেন এর বর্ণনাকারীগণ সহিহ বুখারীর বর্ণনাকারী; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা: ৫৬৫৮, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)।

যদি আম্মার হত্যার দায় সঙ্গীদের ওপর চাপানোর সামান্যতম সুযোগ থাকত তবে আমরা মোটেও তা থেকে বিরত থাকতাম না, কিন্তু সহিহ সনদে আবুল গাদিয়ার নিজস্ব স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উভয়েই একমত যে হত্যাকারী ছিলেন আবুল গাদিয়া। ইমাম মুসলিম বলেন: আবুল গাদিয়া ইয়াসার বিন সাবু, আম্মারের হত্যাকারী, তিনি সাহাবী ছিলেন। (আল-কুনা ওয়াল আসমা: ২/৬৬৯) ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবুল গাদিয়া যখন সিরীয় নেতাদের সাথে দেখা করতে আসতেন তখন তারা তাঁর পরিচয় এভাবে দিতেন: “আম্মারের হত্যাকারী দরজায়।” (আত-তারিখুল আওসাত: খণ্ড ২, পৃ ৭৮) ইমাম দারাকুতনি বলেন: আবুল গাদিয়া ইয়াসার বিন সাবু, তিনি সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তিনি সিফফিনে হযরত আম্মার (রা.)-কে হত্যা করেন। (সুয়ালাতুস সুলামি দারাকুতনি: ৩৪৬; আল-মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ: ৩/১৯৩) সকল মুহাদ্দিস এবং ঐতিহাসিকদের ঐক্যমত এটাই। হাফেজ ইবনে হাজার, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার, ইবনুল আসির আল-জাযারি এবং হাফেজ যাহাবি (রহ.) এটাই লিখেছেন। (আল-ইসাবাহ: ৭/৪৫৮ ত: ইলমিয়াহ; আল-ইসতিয়াব ৩/৪২৫; আসাদুল গাবাহ ৬/২৩১; সিয়রু আলামিন নুবালা ২/৫৩৪ ত: রিসালাহ)।

এ কারণেই ইমাম বুখারী ও ইমাম নববী থেকে শুরু করে শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী পর্যন্ত সকলেই সিরীয়দের আম্মারের হত্যাকারী হিসেবে স্বীকার করে “তাকতুলুকাল ফিয়াতুল বাজিয়াহ” (তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে) হাদিসের আলোকে হযরত আলী (রা.)-কে মুজতাহিদ মুসিব (সঠিক ইজতিহাদকারী) এবং সিরীয়দের মুজতাহিদ মুখতি (ভুল ইজতিহাদকারী) হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করেছেন। (দ্রষ্টব্য: শরহে মুসলিম নববী: ১৮/৩০, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআহ; ফাতহুল বারী ১৩/৮৫, কিতাবুল ফিতান; উমদাতুল কারী ২৩/১৯২; মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল ফাদাইল, বাবু মোজেজাত; আনোয়ারে বারী শরহে হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ.: ৩/১৬৭, ১৬৭)।

শাইখ মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি বলেন: “এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি প্রকাশ্য মুজেজা রয়েছে যেখানে তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন যে আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে, এবং বাস্তবে তাই ঘটেছে। আর তাকে এমন এক দল হত্যা করেছে যারা সত্য ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে এটি স্বীকৃত যে তিনি সিফফিনে নিহত হন এবং তিনি আলী (রা.)-এর দলে ছিলেন। এটি এই বিষয়ের স্পষ্টতম দলিল যে আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে যুদ্ধে সত্য ও সঠিক পথে ছিলেন, যদিও মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর সাথীগণ (রা.) তাঁদের ইজতিহাদে অপারগ (ক্ষমার যোগ্য) ছিলেন।” (তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম শরহে সহিহ মুসলিম: ৬/২৬০)।

[৩] সুনানে নাসায়ি আল-কুবরা, হা: ৮২১৬, মূল পাঠ: “তারা বলল: তবে তো তিনি সিফফিনের দিন আপনাদের হাতেই নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আমরাই তাঁকে হত্যা করেছি।” (বর্ণনাকারীগণ: আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন মিসওয়ার বিন মাখরামা, মুয়াজ বিন হিশাম আদ-দাস্তয়ায়ী, আব্দুল্লাহ বিন আউন বিন আরতবান, হাসান বসরী। তারা সকলেই বুখারী ও মুসলিমের সর্বসম্মত বর্ণনাকারী।) এই একই বর্ণনা ইবনে সাদ অন্য সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন: “আমি আল্লাহর কসম তাঁকে হত্যা করেছি...” আল্লাহর কসম অবশ্যই আমরা তাঁকে হত্যা করেছি।“ (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/২৬৩, ত: সাদির)।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

আম্মার (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ ছিল: “তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” (তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে)। [১] সুতরাং তাঁর শাহাদাতের পর ঐসব লোকদের মনেও সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধা রইল না যারা এ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। এভাবে ইরাকীদের পক্ষ থেকে আক্রমণে অস্বাভাবিক তীব্রতা চলে এল। খুজাইমা বিন সাবিত (রা.) তলোয়ার খাপে ভরে রেখেছিলেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এই হাদীস শুনেছিলেন, তাই তিনি বলছিলেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত আম্মার নিহত না হবেন, আমি লড়াই না।” আম্মার (রা.) নিহত হলে তিনিও তলোয়ার বের করলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। [২]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর লশকর বা বাহিনীর জন্যও একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে গেল এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সিরীয় বাহিনী ত্যাগ করে হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীতে যোগ দিলেন, যাদের মধ্যে হযরত জুবাইদ বিন আব্দুল খাওলানী (রা.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মুক্ত করা গোলাম হযরত হানি (রা.) উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [৩]

হযরত আমর বিন হাযম (রা.) তৎক্ষণাৎ এসে এই সংবাদ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে দিলেন। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের খবরের পাশাপাশি “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” সম্পর্কিত হাদীসটির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যা প্রমাণ করছিল যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর ইজতিহাদে হকের ওপর আছেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ভুলের ওপর। [৪] কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমরা “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া”-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারি না, আমরা তো হযরত উসমান (রা.)-এর কিসাসের জন্য লড়াই। সম্ভবত তাঁর সামনে ঐ হাদীসটি ছিল যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন: “তাঁর পদতলে (অর্থাৎ তাঁর পরে) একটি ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং সেই সময় তাঁর অনুসারীরা হিদায়াতের ওপর থাকবে।” [৫]

ফলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে বললেন: “আ-ওয়া নাহনু কাতালনাহ? ইন্নামা কাতালাহ আলিয়্যুন ওয়া আসহাবুহ জাউ বিহি হান্না আলকউহ বাইনা রিমাহিনা” (আমরা কি আম্মারকে হত্যা করেছি? তাকে তো হযরত আলী এবং তাঁর সাথীরা হত্যা করিয়েছে যারা তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্শার সামনে ঠেলে দিয়েছে)।

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫০৬, কিতাবুল ফিতান, বাব লা তাকুমুস সাআহ...; সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৮০০, বাব মানাকিব আম্মার (রা.)। হযরত আম্মার (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি সহীহ। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ, হযরত উসমান বিন আফফান, আবু সাঈদ খুদরী, আমর বিন হাযম, আনাস বিন মালিক, আমর ইবনুল আস এবং আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) সহ সাহাবায়ে কিরামের একটি বড় জামাত থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। উলামায়ে কিরাম একে মুতাওয়াতির হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও একে সহীহ বলেছেন। আল-হাদীস সাবাতুন সহীহ। (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/১৮৪) ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন তারা এই হাদীসের কারণেই জানতে পেরেছিলেন যে আম্মার (রা.) হকের ওপর এবং হক জামাতের সাথে আছেন। (তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিল ইমাম আন-নববী: ৩৮/২) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর প্রথম দিকে মত ছিল যে “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” হাদীসটির কোনো সহীহ সনদ নেই। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল: ৪৬৩/২) কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন: ফাহয়্যা আল-আমরু মিন তাসহিহিহি বি-মা’না ইমাম আহমদ কা আখরি কওল ইস হাদীস কো সহীহ করার দেনা হয়। (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪১৩/৩) মনে রাখা দরকার যে হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সাথীদেরকে আম্মার (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের আগে থেকেই সিরিয়াবাসীরা বিদ্রোহী মনে করত না; কারণ বিদ্রোহীর শরয়ী সংজ্ঞা তাদের ওপর পুরোপুরি প্রযোজ্য ছিল না। (সন্দেহ থাকলে বা ব্যাখ্যার অবকাশ থাকলে শরয়ী হুকুম জারি করা যায় না)। তবে আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পর এই বিষয়টি অনেক মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন।

[২] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৮৫/৩; মুসনাদে আহমদ, হা: ২১১৮৪, ২৩১৮৭; বাসনাদে সহীহ; মাজমাউয যাওয়াইদ: ৫০২/৯; আল-ইসাবাহ: ৫০২/২।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২৫৩/৩।

[৪] মুসনাদে আবি ইয়াল্লা, হা: ৭২৭৫; বাসনাদে সহীহ; মুসনাদে আহমদ, হা: ৭৭৮৮; বাসনাদে সহীহ।

[৫] মুসনাদে আহমদ, হা: ৮০৬৮; বাসনাদে সহীহ; আল-আহাদ ওয়াল মাসানী লি-ইবনে আবি আসিম, হা: ১২৮১।

“আমাদের বর্শার নাগালে ফেলে দিল।” [১]

স্পষ্টতই হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে সঠিক ছিল না, তবে এর মাধ্যমে হযরত আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের ব্যাপারে তাঁর এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর তীব্র অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। [২] এটি উল্লেখযোগ্য যে, একবার হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বলেছিলেন: “আমি এই অসুস্থতায় মারা যাব না। আমার হাবীব (সা.) আমাকে বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যু হবে দুটি মুমিন দলের মধ্যে নিহত হওয়ার মাধ্যমে।” [৩] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিফফিনে যুদ্ধরত উভয় পক্ষই যাই হোক না কেন ঈমানদার ও মুখলিস ছিল।

লাইলাতুল হারীর:

মঙ্গলবার ৭ সফর থেকে বৃহস্পতিবার ৯ সফর পর্যন্ত তিন দিন উভয় বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের শক্তির মহড়া দিতে থাকে। এই সময়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়। উভয় পক্ষই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা চাচ্ছিল, তাই হযরত আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও লড়াই থামেনি। সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত যুদ্ধের হাঙ্গামা চলতে থাকে। ক্লান্ত সৈন্যদের প্রচণ্ড হাঁপানো, একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করা এবং অধিক পরিমাণে শ্লোগান দেওয়ার কারণে ইতিহাসে এই রাতটি ‘লাইলাতুল হারীর’ নামে স্মরণীয় হয়ে আছে, যার অর্থ হলো গর্জন ও চিৎকার-চৈচামেচির রাত। [৪]

হযরত আলী (রা.) এই রাতে মাগরিবের সালাত ‘সালাতুল খওফ’-এর পদ্ধতিতে আদায় করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি সুন্নতের বাস্তব অনুশীলন করান। [৫] হযরত আলী (রা.) যুদ্ধের তীব্রতার কারণে তাঁর মাসনুন ওজিফাগুলো সময়মতো আদায় করতে পারেননি, তবে রাতের শেষ প্রহরে সুযোগ পাওয়ামাত্রই তিনি জিকিরের এই রুটিন সম্পন্ন করে নেন।

[৬]

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৭৭৭৮; মুহাক্কিক শুয়াইব আল-আরনাউত বলেন: এর সনদ সহীহ এবং হাকেম এটি আল-মুস্তাদরাক (হা: ২৬৬৩) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন: “এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী।” আর এটি উসুলবিদদের নিকট সবচেয়ে সহীহ সনদ।

[২] সম্ভবত এই অস্থিরতার কারণেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেই দূরবর্তী সম্ভাবনাটি পেশ করেছিলেন যার কোনো অবকাশ ছিল না। কারো কারো মতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইঙ্গিত ছিল সাবায়ীদের দিকে যে, আলী (রা.) তাদের সাথে নিয়ে এসেছেন এবং তারাই হত্যাকারী। তারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই শব্দগুলো পেশ করেন: “ইল্লামা কাতালাহুজ্জাজিনা জাউ বিহি” অর্থাৎ “তারাই তাকে হত্যা করেছে যারা তাকে নিয়ে এসেছে।” (মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৩৯৯)। কিন্তু প্রথমত, এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে সেই বর্ণনার চেয়ে নিম্নমানের যাতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর স্পষ্ট শব্দ: “ইল্লামা কাতালাহু আলিয্বুনে ওয়া আসহাবুহু” বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বর্ণনার শুরুতে বর্ণনাকারী নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে, এই কথাগুলো সিফফিন থেকে ফেরার পথে বলা হয়েছিল, যখন কি না প্রথম স্পষ্ট শব্দ সংবলিত বর্ণনায় বর্ণনাকারীর এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পরপরই এই কথাগুলো বলা হয়েছিল। সুতরাং আসল শব্দ সেগুলোই যা আগে বলা হয়েছিল যাতে হযরত আলী (রা.)-এর নাম স্পষ্টভাবে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অস্পষ্ট শব্দগুলোতেও সাবায়ী উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ হত্যাকারী কোনো গোপন লোক ছিল না বরং সুপরিচিত শামী অফিসার আবু গাদিয়া অর্থাৎ হাম্মাদ বিন সালামাহ ছিল এবং তার সাবায়ী হওয়া কোনোভাবেই প্রমাণিত নয়, বরং তিনি তো কিসাসে উসমানের আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের একজন ছিলেন। সুতরাং এই অস্পষ্ট শব্দগুলোকে পূর্ববর্তী স্পষ্ট শব্দের ওপরই প্রয়োগ করা হবে।

[৩] লা তামুতু ইল্লা বাইনা ফিয়াতাইনি মুমিনাইনি। (আত-তারিখুল আওসাত, ইমাম বুখারী: ১/৭৯, ত: দারুল ওয়াযী)

[৪] লিসানুল আরব: ৫/২৬০; ফাতহুল বারী, আত-তাকবীর ওয়াত-তাসবীহ ইনদান নাম: ১১/৪৩৩

[৫] আন্না আলিযান সল্লাল মাগরিবা সলাতাল খওফি লাইলাতাল হারীর। (আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ৬০০৮, বাবুদ দালীল আলা সুবুতি সলাতিল খওফ)

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ৫৩৬২, কিতাবুন নাফাকাত, বাবু খাদিমিল মারআহ; এবং সহীহ মুসলিমে রয়েছে: আলী (রা.) বলেন: নবী (সা.)-এর নিকট থেকে এটি শোনার পর আমি কখনো তা ত্যাগ করিনি। জিজ্ঞেস করা হলো: সিফফিনের রাতেও কি নয়? তিনি বললেন: সিফফিনের রাতেও নয়। (হা: ২৭২৭)। এবং মুসনাদে হুমাইদীতে রয়েছে: সিফফিনের রাতেও নয়, আমি রাতের শেষ প্রহরে তা স্মরণ করে আদায় করেছিলাম। (হা: ২৩, ত: দারুস সাফা)

যুদ্ধের সমাপ্তি

যেমনটি আমরা বলেছি যে, হযরত আলী-এর আসল উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের ঐক্য এবং সৈন্য পরিচালনা সত্ত্বেও প্রথম লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে মানানো। এই প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ধারণা ছিল যে, সিরিয়াবাসীরা সামান্য প্রতিরোধের পর অস্ত্র সমর্পণ করবে। কিন্তু যুদ্ধের অস্বাভাবিক তীব্রতা দেখার পর হযরত আলী নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে বললেন: “যদি আমি জানতাম যে বিষয়টি এই পর্যন্ত গড়াবে, তবে আমি কুফা থেকে কখনোই বের হতাম না।” [১]

লাইলাতুল হারীরের শেষ প্রহরে নিহত ও আহতদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তলোয়ারগুলো ভেঙে গিয়েছিল এবং বল্লমগুলো দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। সৈন্যরা ক্লান্তিতে চুরমার হয়ে লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়ছিল। এভাবে যুদ্ধ থেমে গেল। [২]

হযরত আলী বিধিবদ্ধ বিরতির জন্য সিরীয় সেনাপতি হযরত আমর ইবনুল আস-এর কাছে বার্তা পাঠালেন: “নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে, যুদ্ধ বন্ধ করে নিহতদের দাফন করা উচিত।”

হযরত আমর ইবনুল আস ইতিবাচক উত্তর দিলেন। এরপর উভয় পক্ষ একে অপরের সাথে মিশে গেল। [৩] এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি রাতের শেষ অংশে হয়েছিল। সকালে উভয় পক্ষ তলোয়ার খাপবদ্ধ করে একে অপরের কাছে আসছিল এবং নিজ নিজ আহত ও নিহতদের খুঁজে নিয়ে যাচ্ছিল। [৪]

সাহাবীদের দৃষ্টিতে বিরোধী পক্ষের ধর্মীয় অবস্থান

আমর ইবনুল আস সেই পরিখার কিনারে বসে ছিলেন যেখানে লাশ দাফন করা হচ্ছিল। হযরত আলী-এর বাহিনীর এক ব্যক্তির লাশ দাফনের জন্য আনা হলে হযরত আমর ইবনুল আস কেঁদে ফেললেন এবং বললেন: “এই ব্যক্তি বড় মুজাহিদ ছিল। কত মানুষ যারা আল্লাহর বিধানের ওপর কঠোরভাবে আমলকারী ছিল, তারা মারা গেল।” [৫]

নিহতদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সামগ্রিক অভিমত ছিল এই যে, তারা জান্নাতী, চাই তারা যে কাতারেই থাকুক না কেন। হযরত আলী যুদ্ধবিরতি হওয়ার পর নিহতদের দেখতে বের হলেন, তখন তিনি নিজের এবং হযরত মুয়াবিয়া-এর নিহত সৈন্যদের জন্য সমানভাবে...

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খ: ৩৭৮৫২, ত: আর-রুশদ

[২] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৮৮

[৩] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ২/৩২৮, ত: দারুল ফিকর

কিছু লোক মনে করেন যে, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ইরাকি বাহিনীর সিরিয়াবাসীদের ওপর প্রবল হওয়ার বর্ণনাগুলো নিছক কল্পনা, কারণ এগুলো আবু মুখনাফ থেকে বর্ণিত। আবু মুখনাফের বর্ণনাগুলো আমাদের কাছেও গুরুত্বহীন, তবে এটি সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, যুদ্ধবিরতির সময় হযরত আলী-এর বাহিনী পরাজিত অবস্থায় ছিল, যা হযরত আলী নিজেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস-এর সামনে স্বীকার করেছিলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৮৭৩, বাব মা জিকরা ফি সিফফিন, সহীহ মুত্তাসিল সনদে, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, ত: আর-রুশদ)

অবশ্য আবু মুখনাফের বর্ণনায় বর্ণিত এই বিষয়টি সত্যিই কল্পনাপ্রসূত যে, আশতার নাখয়ি বাহিনীকে নিয়ে প্রতিপক্ষকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলেন এবং ঠিক সেই যুদ্ধের অবস্থায় হঠাৎ হযরত আলী জোরালো নির্দেশ দিয়ে তাকে থামিয়ে দেন। কারণ দিনাওয়ারি এবং বালাজুরির ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো (যা মূল পাঠে পেশ করা হয়েছে) জানায় যে, লাইলাতুল হারীরের শেষ অংশে বিরতি দেওয়া হয়েছিল এবং পরের দিন সেই বিরতির সময় অর্থাৎ পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সন্ধির আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

[৪] আল-আখবারুত তিওয়াল, আবু হানিফা দিনাওয়ারি: পৃ. ১৮৮

[৫] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ২/৩২৮, ত: দারুল ফিকর

রহমতের দোয়া হিসেবে। কেউ জিজ্ঞেস করল: “আপনি তাদের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল সাব্যস্ত করেছেন, আবার তাদের জন্য রহমতের দোয়া করছেন।” তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের নিহত হওয়াকে তাদের গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দিয়েছেন।” [১]

আশতার নাখয়ি শামী বাহিনীর নিহতদের মধ্যে হাবিস ইয়ামানি নামক এক ব্যক্তিকে দেখে ইনা লিল্লাহ পড়লেন। হযরত আলী (রা.) কারণ জিজ্ঞেস করলে আশতার বললেন: “আমি তাকে মুমিন মনে করতাম, কিন্তু আজ সে গোমরাহির ওপর মারা গেল।”

হযরত আলী (রা.) উত্তর দিলেন: “সে এখনও মুমিনই আছে।” [২]

এরপর বললেন: “আমাদের মধ্য থেকে এবং তাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী ছিল, সে মুক্তি পেয়ে গেছে।” [৩]

আরও বললেন: “আমাদের এবং তাদের নিহতরা জান্নাতি, বিষয়ের সমস্ত দায়ভার আমার এবং মুয়াবিয়ার ওপর বর্তায়।” [৪]

কেউ শামীদের সম্পর্কে কটু কথা বলতে শুরু করলে হযরত আলী (রা.) বললেন: “এমন বলো না! তারা মনে করেছে যে আমরা বিদ্রোহ করেছি এবং আমরা মনে করি যে তারা বিদ্রোহ করেছে। ফলে আমরা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করেছি।” [৫]

যুদ্ধের সময়ও প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এমন আবেগহীন ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা থেকে হযরত আলী (রা.)-এর অপরিসীম উদারতা প্রকাশ পায়। এমন ন্যায়সঙ্গত কথা একজন খলিফায়ে রাশেদেরই শান অনুযায়ী ছিল।

স্বপ্নে সুসংবাদ:

স্বপ্নেও উভয় জামাতের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। একজন তাবেয়ি স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করছেন, সামনে একটি তাবু লাগানো আছে। জিজ্ঞেস করলেন এটি কার? উত্তর এল ‘জুল কালা’ এবং ‘হাওশাব’-এর (যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে शामिल হয়ে সিফফিনে নিহত হয়েছিলেন)।

স্বপ্নদ্রষ্টা জিজ্ঞেস করলেন: “আম্মার বিন ইয়াসির এবং তাঁর সাথীরা (হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর নিহতরা) কোথায়?”

উত্তর এল “তোমাদের সামনে (অর্থাৎ জান্নাতে আরও উচ্চ মাকামে)।”

জিজ্ঞেস করলেন: “এটি কীভাবে হলো? এই ব্যক্তিরা তো আপসে একে অপরকে হত্যা করছিল (অর্থাৎ যে পক্ষ হকের ওপর ছিল তাদের জান্নাতি এবং অন্য পক্ষকে জাহান্নামি হওয়া উচিত ছিল!) উত্তর এল: “যখন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল, তখন তাঁকে প্রশস্ত ক্ষমাশীল হিসেবে পেল।” [৬]

[১] জামেউল আহাদিস, খণ্ড: ৩৩৩৩; কানজুল উম্মাল, হা: ৩১৭১৫

[২] জামেউল আহাদিস, খণ্ড: ৩৩৮৬; কানজুল উম্মাল, হা: ৩১৭১১

[৩] জামেউল আহাদিস, খণ্ড: ৩৩৮৬; কানজুল উম্মাল, হা: ৩১৭০৭

[৪] সিফফিনের যুদ্ধের নিহতদের সম্পর্কে আলীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “আমাদের নিহতরা এবং তাদের নিহতরা জান্নাতে এবং বিষয়টি আমার ও মুয়াবিয়ার দিকে ফিরে আসে।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৮৮০৭, তবা আর-রুশদ)

[৫] “তারা কেবল এমন এক কওম যারা ধারণা করেছে যে আমরা তাদের ওপর বিদ্রোহ করেছি, আর আমরা ধারণা করেছি যে তারা আমাদের ওপর বিদ্রোহ করেছে, ফলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করেছি।” (তাযিমু কদরিস সালাত লি-মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযি, পৃ: ২৯৪ হিজরি বর্ণনা নং: ৫৯৩; তারিখু দামেশক: ৩৩৩/১; বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব: ৩০০/১) এবং এর সমার্থক আম্মার বিন ইয়াসিরের উক্তি সিফফিনে নিহতদের সম্পর্কে, তিনি বলেন: “আমাদের দ্বীন এক, আমাদের কিবলা এক এবং আমাদের দাওয়াত এক, কিন্তু এক কওম আমাদের ওপর বিদ্রোহ করেছে ফলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করেছি।” (তাযিমু কদরিস সালাত লিল মারওয়াযি, হা: ৫৯১)

[৬] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৮৮৩৩, তবা আর-রুশদ

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য ও নিহতের সংখ্যা:

সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ইরাকি সৈন্য ছিল এক লক্ষ [১], যাদের মধ্যে অনেক বদরী এবং বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীও ছিলেন। [২] সিরীয় সৈন্যদের সংখ্যা সত্তর হাজারের কম ছিল না। [৩] যুদ্ধের সময় শাহাদাত বরণকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সত্তর (৭০) হাজার [৪], যার মধ্যে ৪৫ হাজার সিরীয় এবং ২৫ হাজার ইরাকি ছিল। [৫]

লাইলাতুল হারীরের পর উভয় পক্ষের মানসিক অবস্থা:

লাইলাতুল হারীরে হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়েছিল যাতে নিহতদের দাফন করা যায়। পরদিন সকালে উভয় পক্ষই মানসিক অস্থিরতার শিকার ছিল। ইরাকি বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কম ছিল না, যার ফলে অনেক ইরাকি অফিসার ও আমীরদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্যদিকে সিরীয় বাহিনীর অবস্থা ছিল আরও বেশি উদ্বেগজনক। যুদ্ধ যদি আরও একদিন চলত, তবে হয়তো যুদ্ধের ফয়সালা ইরাকবাসীদের পক্ষে হয়ে যেত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়াও আনিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ইরাকিরা সিরীয় বাহিনীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল না, অথচ সিরীয় নেতৃত্ব ইরাকি বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিল যে, আমি ইরাকিদের অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় রেখে আসছি। [৬]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৩। মাসউদী-এর বর্ণনা অনুযায়ী ৯০ হাজার, তবে এটি দুর্বল বর্ণনা। (মুরুজুয যাহাব: ৩/১২০, ত. আল-জামিআতুল লুবনানিয়া)

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৬। তবে বদরী সাহাবীদের সংখ্যা সম্পর্কে ইমাম শাবী-এর উক্তিকে ইমাম ইবনে কাসীর খণ্ডন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে আবু বকর বিন হারিস (রা.)-এর পর কোনো বদরী সাহাবী এতে শরীক হননি। (আস-সুন্নাহ লিল-খলাল, বর্ণনা নম্বর: ৪৬৭, সনদ সহীহ)

কিন্তু এই উক্তিকে হাফেজ যাহাবী খণ্ডন করে বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমাদের বিন ইয়াসির এবং ইমাম আলীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/২২১, ত. আর-রিসালাহ)

মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী মত হলো, হযরত আলী (রা.)-এর সাথে অনেক সাহাবী অবশ্যই ছিলেন, যদিও তাদের সংখ্যা কয়েকশ ছিল না। ইমাম তাবারী ‘নিশ্চয়ই হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যারা ছিলেন’ শিরোনামে একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন যারা জঙ্গ জামাল ও সিফফিনে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন, যাদের মধ্যে কিছু বদরী সাহাবীও ছিলেন। যদিও সিরীয় বাহিনীতে কোনো বদরী সাহাবী ছিলেন না। শুধুমাত্র উবাদাহ বিন সামিত (রা.)-এর সিরীয় বাহিনীতে থাকার কথা কিছু লোক বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাবাকাত, মুজামুস সাহাবাহ, আসমাউর রিজাল এবং ইতিহাসের কিতাবসমূহ থেকে এর কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর বয়ান থেকে স্পষ্ট হয়।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৩। মাসউদী-এর মতে সিরীয় সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৮৫ হাজার। তবে এটি দুর্বল মত। (মুরুজুয যাহাব: ৩/১২১)

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৮৮৬০, ত. আর-রশিদ; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৩, আন ইবনে সিরীন মুরসালান বাসানাদিন হাসান।

[৫] তারিখ খলিফা, পৃ. ১৯৩, আন আবদুর রহমান বিন আবযা (রা.)... মাসউদী নিহতের সংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার উল্লেখ করেছেন যা অতিরঞ্জিত। (মুরুজুয যাহাব: ৩/১২৩) ইমাম তাবারী তার নিজস্ব সনদে একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকি বাহিনীতে এক লক্ষ বিশ হাজার লোক ছিল যাদের মধ্যে ৪০ হাজার নিহত হয়, আর সিরীয় বাহিনীতে ৬০ হাজার লোক ছিল যাদের মধ্যে ২০ হাজার নিহত হয়। এভাবে মোট নিহতের সংখ্যা ৬০ হাজার হয়। (দালাইলুন নুবুওয়াহ: ৬/৪১৯, ত. আল-ইলমিয়াহ)

[৬] আসিম বিন কুলাইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি মসজিদ থেকে বের হলাম যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে সালিশি বিষয়ে লোক এসেছিল... তখন ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন: তোমরা কি জানো যে সিরীয়রা ফিকির ও চিন্তায় মগ্ন ছিল, যখন তোমাদের জখম ও কষ্ট তাদের ব্যথিত করেছিল এবং তারা তোমাদের ফোঁরাত নদী থেকে পানি পান করতে বাধা দিয়েছিল। আর আমাকে মুয়াবিয়া (রা.) সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি তার ঘোড়াটি প্রস্তুত রেখেছিলেন যাতে পালিয়ে যেতে পারেন, যদি না তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এসে বলত: ইরাকবাসীরা মক্কার পলায়মান লোকদের মতো অস্থির হয়ে পড়েছে। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ: ১৫/৮৬-৮৭, ত. আর-রশিদ)

উভয় পক্ষের এই অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত রেওয়ায়েতটি যদিও মুরসাল, কিন্তু এর সনদ শক্তিশালী। এতে ইয়াহইয়া বিন আদম, ইবনে উয়াইনাহ, আসিম বিন কুলাইব এবং কুলাইব বিন শিহাব রয়েছে। এরা সবাই নির্ভরযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন আদম বুখারী ও মুসলিমের রাবী এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫২২-৫২৩, ত. আর-রিসালাহ)

ইবনে উয়াইনাহ (সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ) হিজাজের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং বুখারী ও মুসলিমের রাবী। তিনি হাফেজ ও হুজ্জাত। (তাকরীবুত তাহযীব, তরজমা: ২৪৫১)

আসিম বিন কুলাইব আস-সাওদী-এর রাবী, ইমাম বুখারী তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাকে সালেহ ও সদুক বলা হয়েছে। (তাকরীবুত তাহযীব, তরজমা: ৩০৫৬) তার পিতা কুলাইব তাবিসীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সদুক মনে করা হয়। (তাকরীবুত তাহযীব, তরজমা: ৫৬৬০)

এমনিতে এই প্রত্যাশা করা কঠিন ছিল যে, ইরাকবাসী বিজয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও সন্ধিতে সম্মত হবে। কিন্তু যেহেতু রাজকীয় নেতৃত্ব ইরাকবাসীদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিল এবং তারা নিজের অবস্থাও তাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিল, তাই তাদের মধ্যে সন্ধির পথ খুলে যাওয়ার প্রবল আশা তৈরি হলো। সন্ধির প্রস্তাব পাঠানোর আগে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আরও সতর্কতা অবলম্বন করলেন যে, তিনি নিজের বাহিনীকে—যাদের নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল—পিছনে সরিয়ে নিয়ে একটি পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করলেন। [১]

আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে ফয়সালার প্রস্তাব:

এখন জরুরি মনে করা হলো যে, সমস্যাটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হোক এবং ফয়সালার ভিত্তি শরিয়তে মুহাম্মদিয়ার ওপর রাখা হোক। যেহেতু শরিয়তের ভিত্তি হলো কুরআন মাজিদ, তাই একে ‘আল্লাহর কিতাব’-এর দিকে আহ্বানের শিরোনাম দেওয়া হলো যাতে উভয় পক্ষের মুসলমানরা কুরআন করিমের প্রতি ঈমানি ও আবেগীয় সম্পর্কের কারণে যুদ্ধবিরতিতে সহজেই প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে পরামর্শ দিয়ে বললেন: “কুরআন মাজিদের একটি কপি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে তাঁকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান জানান, তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন না।”

এক ব্যক্তি এই প্রস্তাব নিয়ে হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন: “আমাদের এবং আপনার মাঝে আল্লাহর এই কিতাব (সমস্যার ফয়সালা করার জন্য) বিদ্যমান রয়েছে।”

তারপর সেই ব্যক্তি এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

“আপনি কি তাদের দেখেননি যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদের আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যাতে তা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে, এরপরও তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা উপেক্ষা করে।” [২]

হযরত আলী (রা.) ইতিবাচক উত্তর দিয়ে বললেন: “হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি তো এই প্রস্তাব সবার আগে গ্রহণকারী। আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে।” [৩]

[১] ইবনে নুমাইর বলেন, আমাদের কাছে আব্দুল আজিজ বিন সিয়াহ বর্ণনা করেছেন, তিনি হাবিব বিন আবি সাবিত থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন: “যখন সিফফিনে শামের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটল, তখন মুয়াবিয়া ও তাঁর সঙ্গীরা একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। তখন আমর ইবনুল আস বললেন: আলীর কাছে কুরআন পাঠিয়ে দিন।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৯১৩, সহিহ সনদে, ত-আর রুশদ)। বর্ণনাকারীদের অবস্থা: ইবনে নুমাইর (আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর, মৃ. ১৯৯ হি.) উচ্চস্তরের নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারী (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১১/৩৫৫, ত-আর রিসালাহ)। আব্দুল আজিজ বিন সিয়াহ (মৃ. ১৫০ হি.) বুখারি ও মুসলিমের সত্যবাদী (সাদুক) বর্ণনাকারী (তাহজিবুল কামাল: ১৮/১৩৫, ১৩৬)। হাবিব বিন আবি সাবিত (মৃ. ১১৯ হি.) বুখারি ও মুসলিমের উচ্চস্তরের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/২৮৮, ত-আর রিসালাহ)। আবু ওয়ায়েল (শাকিক বিন সালামাহ, মৃ. ৮২ হি.) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, চার খলিফায়ে রাশেদিনের ছাত্র (তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ২/৯৩২, ত-বিশার)।

[২] সূরা আল ইমরান, আয়াত: ২৩... আয়াতটি শোনানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কুরআনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কাউকে যেন এই আয়াতের সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত হতে না হয়।

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৯১৩, ত-আর রুশদ; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৫৯৭৫; তাফসিরুন নাসায়ি: ২/৩০৬, সহিহ সনদে। সহিহ বুখারিতেও এই বর্ণনার কিছু অংশ রয়েছে, হা: ৩১৮৯, বাব গাজওয়ায়ে হুদায়বিয়া।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত আলী (রা.) কেন আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন?

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) কেন আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন? আর যদি সন্ধিই করতে হতো, তবে আগে যুদ্ধের ওপর কেন জোর দিয়েছিলেন? আসলে এর দুটি কারণ ছিল:

- জনশক্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইরাকি বাহিনীর অনেক সেনাপতি ও সৈন্যকে অস্থির ও যুদ্ধবিমুখ করে তুলেছিল। তাই হযরত আলী (রা.) ইরাকি বাহিনীর মধ্যে অনৈক্যের লক্ষণ দেখে তাদের তিরস্কার করে বলছিলেন: “আফসোস! তোমাদের পরিবর্তে যদি আমার সাথে বনু ফিরাসের মাত্র এক হাজার লোক থাকত।” [১]
- হযরত আলী (রা.) শরীয়ত অনুযায়ী তলোয়ার ব্যবহারকে কেবল অপরিহার্য সীমা পর্যন্তই বৈধ মনে করতেন। যেহেতু এখন সিরিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে কুরআনের ফয়সালা মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছিল, তাই হযরত আলী (রা.) এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন।

যুদ্ধবিরতির এই আলোচনার কথা আবু মখনাফ তার পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তার বর্ণনা হলো:

(ইরাকি সেনাপতি) আশআছ বিন কায়েস হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এসে বললেন: “আমার অভিমত হলো, কুরআনের বিধান অনুযায়ী চলার যে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তাতে সবাই সম্মত ও খুশি। আপনি চাইলে আমি মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে তার উদ্দেশ্য জেনে আসতে পারি যাতে তার প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করা যায়।”

হযরত আলী (রা.) বললেন: “যদি তোমার এটাই অভিমত হয়, তবে গিয়ে তার কাছ থেকে জেনে নাও।”

আশআছ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: “মুয়াবিয়া! আপনি কুরআন কেন পেশ করেছেন?”

তিনি বললেন: “যাতে আমরা এবং আপনারা সেই বিধান অনুযায়ী চলি যা আল্লাহ তাতে দিয়েছেন। আপনারা এমন একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করুন যার ওপর আপনারা সম্মত, আর আমরাও একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করব। উভয় পক্ষের জন্য এটি আবশ্যিক হবে যে, তারা আল্লাহর কিতাবে যা পাবে সে অনুযায়ী আমল করবে এবং তা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হবে না। এই দুইজন যা ফয়সালা করবেন, উভয় পক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।”

আশআছ বললেন: “এটি ইনসাফের কথা।” এবং তিনি হযরত আলী (রা.)-কে অবহিত করলেন। হযরত আলী (রা.) তার সঙ্গীদের বললেন: “আমরা এই বিষয়টি মঞ্জুর করলাম, আমরা সম্মত।” [২]

মফসাদিন (ফিতনাবাজদের) পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির বিরোধিতা:

কিন্তু ইরাকি বাহিনীর যেসব লোকের ধারণা ছিল যে তারা আরও একদিন যুদ্ধ করলে বিজয় লাভ করতে পারবে, তারা যুদ্ধবিরতির পক্ষে ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মুখলিস (নিষ্ঠাবান) এবং কেউ কেউ ছিল একটি মতামতের পর্যায়ে। নিজের বাহিনীর ক্লান্তিবোধ...

[১] এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত: হাসান ইবনে আবি হানিফা থেকে মুসা ইবনে আবি কাসির থেকে আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু মুসা (রা.)-কে তার হিকমত সম্পর্কে বলেছিলেন: (আরবি উদ্ধৃতি)। (কিতাবুল আসার, আল-লাফজি আবি ইউসুফ, পৃ. ৯২৯, দারুল ইলমিয়াহ)। ফিরাছ বিন গানাম জাহেলিয়াত যুগের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন যার বংশধররা বনু ফিরাছ নামে পরিচিত এবং তারা বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। (মুজামু শুআরাইল আরব, পৃ. ১৮৬২)।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩। আবু মখনাফের এই বর্ণনা ছাড়াও যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত এই সমস্ত বর্ণনা সহীহ হাদীস ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে পেশ করা হয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

তাদেরও এই ধারণা ছিল এবং হযরত আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞা ও ফিকহী গভীরতা সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না, তাই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তে মাথা নত করতে প্রস্তুত ছিল। [১]

তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল নিছক দাঙ্গাবাজ এবং তারা চাইত যুদ্ধের আগুন আরও তীব্র হোক এবং মুসলমানরা যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ুক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও ছিল যারা মদীনা মুনাওয়ারায় ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল যে, যুদ্ধবিরতির পর শান্তির পরিবেশে তাদের বিরুদ্ধে কোনো যৌথ বা সর্বসম্মত বিচারিক সিদ্ধান্ত না হয়ে যায়। তাই এই লোকেরা তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধবিরতিতে বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করে। আবু মুখনাফও স্বীকার করেছেন যে, যুদ্ধবিরতির বিরোধিতায় সেই লোকেরাই অগ্রণী ছিল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরিক ছিল।

উদাহরণগুলো লক্ষ্য করুন:

- আশতার নাখয়ি, যিনি সেই সময় অগ্রগামী দলের সেনাপতি ছিলেন, হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি উত্তর পাঠান যে, “এটি যুদ্ধ থামানোর সময় নয়, আমরা বিজয়ী হতে চলেছি।” যখন হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে তাকে জোর দিয়ে নির্দেশ পাঠানো হলো যে যুদ্ধবিরতি করা হোক, তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বাকি লোকদেরও উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশ মানার জন্য তাদের খুব গালমন্দ করেন। [২]
- যাই হোক, যখন হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি হয়ে গেল এবং যুদ্ধবিরতির খসড়া লেখা হতে লাগল, তখন আশতার নাখয়ি এতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেন: “আমি যদি এই দলিলে স্বাক্ষর করি তবে আল্লাহ যেন আমার ডান হাত সুস্থ না রাখেন। আমি কি আমার রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপর নেই এবং আমি কি আমার শত্রুর গোমরাহির ব্যাপারে নিশ্চিত নই? হায়! যদি তোমরা এই জুলুমের ওপর একমত না হতে তবে বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করত।” [৩]

এটি শুনে যুদ্ধবিরতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আশআস বিন কায়েস (রা.) বললেন: “আল্লাহর কসম! তুমি না কোনো বিজয় দেখেছ আর না কোনো জুলুম। আমাদের সাথে চলো, আমাদের সাথে তোমার কোনো শত্রুতা নেই।”

আশতার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন: “শত্রুতা কেন থাকবে না, আমি তোমাদের সাথে দুনিয়ার জন্য দুনিয়ার খাতিরে এবং আখেরাতের জন্য আখেরাতের খাতিরে শত্রুতা পোষণ করি। আল্লাহ আমার এই তলোয়ারের মাধ্যমে অনেক মানুষের রক্ত ঝরিয়েছেন, তারা তোমার চেয়ে উত্তম ছিল, আমি তোমার রক্তকেও হারাম মনে করি না।” এটি শুনে হযরত আশআস বিন কায়েস (রা.) রাগে ফেটে পড়লেন। [৪]

[১] যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) খারেজীদের বলেছিলেন: তোমরা কি জানো যে শামের অধিবাসীরা যখন (কুরআনকে) ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল তখন তারা তা অপছন্দ করেছিল এবং অস্বীকার করেছিল... শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন: সুতরাং তোমরা উম্মতের রক্ত নিয়ে দুই ব্যক্তিকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করেছ অথচ আল্লাহ তায়ালা পাখিদের ব্যাপারেও দুই ব্যক্তিকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করেছেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪৮৩, সনদ সহীহ, তাহকীক: আল-ওয়াসি)।

[২] তারিখ তাবারী: ৫/৭, আবু মুখনাফ থেকে।

[৩] তারিখ তাবারী: ৫/৩৯, আবু মুখনাফ থেকে।

[৪] তারিখ তাবারী: ৫/৫৩, ৫৫, আবু মুখনাফ থেকে।

এখানে এই সন্দেহ করা উচিত নয় যে, হযরত আলী (রা.) কেন এই ধরনের বদমেজাজি লোকদের সহ্য করছিলেন? কারণ এই ধরনের লোক হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দলেও ছিল, তিনিও তাদের সহ্য করছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্যেও কিছু মুনাফিক এসে বসত এবং মুসলমানরা তাদের অভদ্রতা সহ্য করত ও এড়িয়ে চলত।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

এর পর হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে হযরত আশআছ বিন কায়েস (রা) যুদ্ধবিরতির খসড়া নিয়ে ফৌজের বিভিন্ন দলের কাছে পৌঁছালে বনু তামীমের এক সরদার উরওয়াহ বিন উদাইয়্যাহ তা মানতে অস্বীকার করার পাশাপাশি “লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ” স্লোগান দিয়ে হযরত আশআছ (রা)-এর ঘোড়াকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। [১]

এই তিনটি উদাহরণ কেবল সমর্থনের উদ্দেশ্যে দুর্বল বর্ণনা থেকে পেশ করা হয়েছে, যা থেকে জানা যায় যে ইরাকি লশকরে কিছু ফিতনাবাজ লোক বিদ্যমান ছিল যারা যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত হযরত আলী (রা)-এর ফয়সালা মানতে প্রস্তুত ছিল না।

সহীহ বুখারীর বর্ণনা:

এখন আবারও সহীহ বর্ণনাগুলোতে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ফিতনাবাজদের আপত্তি এবং প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের বুঝানোর দৃশ্য লক্ষ্য করুন। সিফফীন যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হযরত আবু ওয়ায়েল (রহ) বলেন:

“যখন হযরত আলী (রা) (হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রস্তাবের জবাবে) বললেন: ‘হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কিতাবের ওপর আমল করার অধিক যোগ্য।’ তখন সেই ক্বারী সাহেবরা সামনে এগিয়ে এলেন যারা পরবর্তীতে খারেজী হয়েছিল। সেই সময় তাদের ক্বারী সাহেব বলা হতো। তাদের তলোয়ারগুলো তাদের কাঁধে ছিল। তারা বলতে লাগল: ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা এই কওমের (সিরিয়াবাসীদের) ব্যাপারে কিসের অপেক্ষা করছি? কেন আমরা আমাদের তলোয়ারগুলো কোষমুক্ত করে তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের এবং তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন?’”

এ কথা শুনে হযরত সাহল বিন হনাইফ (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (তাদের এই স্বীয় মতামতের প্রবণতা থেকে বিরত রেখে) বলতে লাগলেন: “হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের রায় বা মতামতকে সন্দেহযুক্ত মনে করো (অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধান্তের ওপর সন্দেহ পোষণ করো)। আমার হৃদয়বিয়ার দিনটির কথা মনে আছে।” [২]

হযরত সাহল বিন হনাইফ (রা)-এর প্রভাবশালী ভাষণ:

এরপর হযরত সাহল বিন হনাইফ (রা) জানালেন যে, হৃদয়বিয়ার দিন যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু জানদাল (রা)-কে কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন কিছু সাহাবীর মনে সংশয় জেগেছিল যে আমরা যদি হকের ওপর থাকি তবে এই আপস ও হীনতা কেন? কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হলো যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিদ্ধান্তেই কল্যাণ ছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে না পারলেও সেই কথার ওপরই আমল করেছিলেন যা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন। [৩]

হযরত সাহল বিন হনাইফ (রা) বললেন: “আবু জানদালের ঘটনার দিন আমার নিজের অবস্থার কথা মনে আছে। যদি আমি সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফয়সালা পরিবর্তন করতে পারতাম তবে অবশ্যই করতাম, কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অধিক ভালো জানেন।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৫৫/৫, আন আবি মিখনাফ।

[২] মুসনাদে আহমাদ: ১৫৯৭৫, সনদ সহীহ; তাফসীরে নাসায়ী: ৩০৬/২।

[৩] মুসনাদে আহমাদ: ১৫৯৭৫; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ: ৩৭৯১৩, সনদ সহীহ; তাফসীরে নাসায়ী: ৩০৬/২।

তারপর সাহল বিন হুнайফ (রা.) বর্তমান পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লোকদের বললেন:

“বর্তমান বিবাদের আগে সবসময় এমনটাই হয়েছে যে, যখনই কোনো ভয়াবহ বিষয়ের জন্য আমরা আমাদের কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়েছি, তখন তলোয়ারগুলো আমাদের জন্য পথ সুগম করে আমাদের পরিচিত গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে।” [১]

এর অর্থ ছিল বর্তমান বিবাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই তলোয়ারের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের ওপর জেদ করবেন না।

হযরত সাহল বিন হুнайফ (রা.)-এর ভাষণের পর হযরত আলী (রা.) এই বলে যুদ্ধবিরতি কবুল করলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا فَتْحٌ

(হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধবিরতি একটি বিজয়।) [২]

কিন্তু অনিষ্টকারীরা তো বিভেদ সৃষ্টির বাহানা খুঁজছিল। তারা বড়দের বোঝানোয় কণ্ঠপাত করল না। এভাবে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তিতে যে গোষ্ঠীটির উদ্ভব হলো, তারা “খারেজী” নামে পরিচিত হলো।

এই লোকেরা “لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ” স্লোগান দিয়ে উভয় বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গেল।

কি হযরত আলী (রা.) যুদ্ধবিরতি অস্বীকার করছিলেন?

কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত মুয়াবিয়া এবং আমার ইবনুল আস (রা.) ধোঁকা দেওয়ার জন্য যুদ্ধবিরতি করেছিলেন। যদি বর্ণনার সারমর্ম শুধু এতটুকু বোঝা হয় যে, সিরীয় বাহিনী নিজেদের বাঁচানোর জন্য সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিল, তবে এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে যুদ্ধে প্রতিটি পক্ষই শোচনীয় পরাজয় থেকে বাঁচতে চায়। কিন্তু কিছু বর্ণনায় এই বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন সিরীয় সাহাবীগণ মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার জন্য কুরআন মাজীদকে সামনে আনার নাটক করেছেন। এই বর্ণনাগুলোতেই হযরত আলী (রা.)-এর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি একে কেবল সিরীয়দের ধূর্ততা গণ্য করাই নয়, বরং সিরীয় নেতাদের মুনাফিক হিসেবে আখ্যা দেওয়ার কথাও উল্লেখ আছে। এই বর্ণনাগুলো সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং মতন (মূল পাঠ)-এর দিক থেকে অস্থিরতা ও আপত্তিকর বিষয়ে ভরপুর। এর মধ্যে কিছু বর্ণনা আবু মুখনাফের মতো মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীর তৈরি করা, বাকি বর্ণনাগুলোতেও এই ধরনের দুর্বলতম বর্ণনাকারী বিদ্যমান। কোনো সহীহ বর্ণনা এই দুর্বল বর্ণনাগুলোর সমর্থনে নেই। [৩]

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩১৮৯, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতিল হদাইবিয়্যাহ।

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, হা: ৩৭৯১৩, ত: আর-রুশদ।

[৩] দুর্বল সনদে এই ঘটনাটি অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যেমন: (১) ইবনে শিহাব আয-যুহরী আন সুলাইমান বিন ইউনুস। (তাবারী: ৫/৫৬, ৫৭) (২) আবু মুখনাফের বর্ণনা (তাবারী: ৫/৪৮ থেকে ৫৬) (৩) روايت ابن عقده (আনসাবুল আশরাফ, বালায়ুরী: ৩/৩৪৪) (৪) روايت مسعودی (মুরুজুয যাহাব: ৩/১৩৮, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬)।

এগুলোর সনদের অবস্থা দেখলে দেখা যায় যে, ইবনে শিহাব যুহরীর বর্ণনার সনদে একজন বর্ণনাকারী সুলাইমান বিন ইউনুস বিন ইয়াযীদ অজ্ঞাত পরিচয় (মাজহুলুল হাল)। আবু মুখনাফের বানোয়াট বর্ণনাকারী হওয়ার বিষয়টি কারো অজানা নয়। আনসাবুল আশরাফের বর্ণনার বর্ণনাকারী হলো ইবনে উকদাহ, যাকে জারাহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞদের নিকট পরিত্যক্ত এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। (তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ: ৪৬৭৭; মাওসুআতু আকওয়ালিদ দারাকুতনী: ৪/২২; আল-কামিল ফি দুয়াফাউর রিজাল: ৯/১৩৯) মাসউদী শিয়ী-র দুর্বলতাও স্পষ্ট। মোটকথা, এই বর্ণনাগুলোর সনদগত কোনো মর্যাদা নেই। মতনের দিক থেকে এগুলো এজন্য অগ্রহণযোগ্য যে, এতে দাবি করা হয়েছে হযরত মুয়াবিয়া এবং আমার ইবনুল আস (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে প্রতারিত করার জন্য বর্ষার মাথায় কুরআন মাজীদ তুলে ধরে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) তাদের চাল বুঝে ফেলেছিলেন এবং বাহিনীকে নিষেধ করেছিলেন যেন তারা সিরীয় নেতৃত্বের প্রতারণায় পা না দেয় এবং (আবু মুখনাফের বক্তব্য অনুযায়ী) হযরত আলী (রা.) বাহিনীকে হযরত মুয়াবিয়া, হযরত আমার ইবনুল আস এবং তাদের সঙ্গীদের সম্পর্কে বুঝিয়েছিলেন: “ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعرف بهم منكم، قد صحبتهم أطفالاً وصحبهم رجالاً فكلوا شر أطفال وشر رجال” (তারা ধীন বা কুরআনের অনুসারী নয়, আমি তাদের সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি, আমি তাদের শৈশবেও দেখেছি এবং বড় হওয়ার পরও দেখেছি, তারা নিকৃষ্ট শিশু এবং নিকৃষ্ট পুরুষ ছিল)। (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

শিয়াহদের নির্ভরযোগ্য উৎস ‘নাহজুল বালাগা’-তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সংক্রান্ত হযরত আলী [রা.] -এর একটি সার্কুলার উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা থেকে হযরত আলী [রা.] -এর যুদ্ধবিরতিতে সম্মতির পাশাপাশি হযরত আলী [রা.] এবং মুয়াবিয়া [রা.] উভয়ের নাম, ধর্ম ও আদর্শ এক হওয়া এবং সমস্ত সংঘাতের মূল ভিত্তি কেবল উসমানের কিসাস গ্রহণের পদ্ধতির ব্যাপারে মতপার্থক্য হওয়াও প্রমাণিত হয়।

মুরাসলাটি নিম্নরূপ:

“আমাদের বিষয়টি এভাবে শুরু হয়েছিল যে, আমরা সিরিয়াবাসীদের সাথে ময়দানে একত্রিত হলাম। এটা স্পষ্ট যে, আমাদের এবং তাদের রব এক, নবী এক, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের এবং তাদের দাওয়াত এক। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর রাসুলের সত্যতা স্বীকারের ক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলাম না, আর তারাও আমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল না। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তা হলো উসমানের রক্ত (হত্যাকাণ্ড)। আমরা তা থেকে মুক্ত। আমরা এর এই সমাধান পেশ করেছিলাম যে, আজ যে উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, তার সাময়িক সমাধান হলো যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দেওয়া এবং মানুষের আবেগ প্রশমিত হতে দেওয়া। যখন শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল হবে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হবে, তখন আমরা এত শক্তিশালী হব যে কিসাসের হককে তার যথাযথ স্থানে পৌঁছে দিতে পারব। কিন্তু তারা বলল যে, এর সমাধান কেবল যুদ্ধ। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, যুদ্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং শিকড় গেড়ে বসল, আগুনের শিখা দাউদাউ করে জ্বলে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেল। যখন সবাই দেখল যে লড়াই উভয় পক্ষকে দাঁত দিয়ে কামড়াতে শুরু করেছে এবং তাদের ওপর থাবা বসিয়েছে, তখন তারা আমার কথা মানতে রাজি হলো। আমিও তাদের কথা মেনে নিলাম এবং দ্রুত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।” [১]

হার-জিত: খারেজীদের নেপথ্যে কে ছিল?

যখনই হযরত আলী [রা.] এবং হযরত মুয়াবিয়া [রা.] -এর মধ্যে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ঐক্যমত হলো, হঠাৎ অনেক লোক বিরোধিতার তুফান খাড়া করে দিল এবং একযোগে ‘লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ’ (আল্লাহর বিধান ছাড়া কোনো বিধান নেই) স্লোগান দিয়ে আলাদা হয়ে গেল। হযরত আলী [রা.]...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ)... (এই লোকেরা দ্বীনদারও নয়, কুরআনের অনুসারীও নয়; আমি তাদের সাথে শৈশব ও যৌবন কাটিয়েছি। তারা শৈশব ও যৌবনে নিকৃষ্টতম লোক ছিল।) কিন্তু সেনাবাহিনীর লোকেরা সিরিয়াবাসীদের আবেগপ্রবণ বৈশালের শিকার হলো এবং তলোয়ার খাপবদ্ধ করল, যার ফলে হযরত আলী [রা.] -ও সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। আমরা এই দুর্বল বর্ণনাগুলোকে পুরোপুরি বর্জন করেছি, কারণ এগুলোর সনদ (সূত্র) এবং মতন (মূল পাঠ) উভয়ই সন্দেহজনক। বিশেষ করে হযরত আলী [রা.] -এর শাহী নেতৃত্ব সম্পর্কে কুরচিপির্ণ শব্দগুলো নিঃসন্দেহে জালিয়াত বর্ণনাকারীদের সংযোজন। সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আলী [রা.] -এর মনে তাদের দ্বীন ও ঈমান বরং ইখলাসের ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ ছিল না। এই কারণেই তিনি বিরোধী পক্ষের নিহতদেরও জামাতী বলছিলেন।

উপরোক্ত দুর্বল বর্ণনাগুলোর এই অংশটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে যে, যুদ্ধ থামানোর জন্য কুরআন মাজীদ বর্শার মাথায় উত্তোলন করা হয়েছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আব্দুর রহমান বিন আবযা [রা.] থেকে বর্ণিত একটি হাসান এবং মুত্তাসিল আসনাদ (সংযুক্ত সূত্র) বর্ণনাও এর সমর্থন করে: ‘শহিদনা মা’আ আলিয়্যিন সামানা মিআতিন ফাকাতালু ইয়াওমাল আরবা’আয়ি ওয়া ইয়াওমাল খামিসি ওয়া ইয়াওমাল জুমু’আতি ওয়া লাইলাতাস সাবতি, সুম্মা রুফিয়াতিল মাসাহিফু ওয়া দা’আউ ইলাস সুলহি।’ ‘আমরা আটশ লোক হযরত আলীর সাথে শরিক ছিলাম; বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে, তারপর কুরআনের কপিগুলো উত্তোলন করা হয় এবং সন্ধির আহ্বান জানানো হয়।’ (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৪)

যৌক্তিকভাবেও এতে অসম্ভব কিছু নেই যে, হাজার হাজার মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগী করার জন্য কুরআন মাজীদের এক বা একাধিক কপি এমনভাবে উঁচিয়ে সামনে আনা হয়েছে যাতে সবাই দ্রুত তা দেখতে পায় এবং সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে। বাকি যুদ্ধবিরতির আলোচনা নিঃসন্দেহে সেভাবেই হয়েছে যেমনটি আমরা সহীহ বর্ণনার বরাতে মূল পাঠে উল্লেখ করেছি।

যেহেতু আবু মুখনাফ প্রমুখের বর্ণনাগুলো দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি বুখারী ও মুসনাদে আহমদের সহীহ বর্ণনাগুলোর পরিপন্থী, তাই সেগুলো বর্জন করাই মূলনীতির দাবি।

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা: [১] নাহজুল বালাগা, সাইয়েদ শরীফ রাযী, মুরাসলা: ৫৮, তুবিতাল মাতবাতাতুল আদাবিয়ায়্যহ বৈরুত।

অংশ দুই | তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত মুয়াবিয়া এবং সমস্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ কেবল কোনো আকস্মিক ভুল বোঝাবুঝির ফল বলে মনে হয় না। এর পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, যে অনিষ্টকারী লোকেরা জঙ্গে জামালে সামান্য সুযোগ পেয়ে নিজেদের রক্ষার জন্য উভয় পক্ষকে লড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিল, তারা সিমফিনেও কোনো নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুঁদ ছিল। অর্থাৎ তারা এর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল যে, যদি ঐক্য ও সংহতির পথ সুগম করার মতো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে তাকে দ্বীন ও ঈমান বিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে প্রচার করে মানুষকে প্ররোচিত করা হবে এবং তাদের আলাদা করে হযরত আলীর বিরুদ্ধে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলে দেওয়া হবে।

ইতিহাসে স্পষ্ট যে, যখনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলো, চরমপন্থীরা প্রচার করে দিল যে হযরত আলী আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিচ্ছেন। অনেক নির্বোধ লোক চিন্তাভাবনা না করেই তা বিশ্বাস করে নিল, তাদের “লা হকমা ইল্লা লিল্লাহ” (সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই) এর একটি সুন্দর স্লোগানও দেওয়া হয়েছিল, যা অগভীর চিন্তার অধিকারী হাজার হাজার মানুষকে সত্যে পৌঁছানো থেকে বঞ্চিত করে দিল এবং তারা এই ফয়সালার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠল। যা মুসলমানদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম ছিল, ফলস্বরূপ আলাদা হয়ে যাওয়া এই লোকেরা “খারেজি” নামে পরিচিত হলো, তাদের এই বিচ্ছিন্নতার পেছনে এই পরিকল্পনাই কার্যকর ছিল যে অনিষ্টকারীরা নিজেদের নিরাপদ রাখতে এবং খেলাফতে রাশেদাকে দুর্বল করতে চেয়েছিল।

আমরা খারেজিদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক লোককে দেখতে পাই যারা হযরত উসমানের যুগ থেকে সাবায়ী আন্দোলনের হোতা ছিল, যাদের মধ্যে হরকুস বিন জুহাইর এবং আব্দুল্লাহ বিন আল-কাওয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অনেক আলামত নির্দেশ করে যে, যুদ্ধবিরতির পর অনেক সাবায়ী, বিশেষ করে তারা যারা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আন্দোলনে শরিক ছিল এবং হযরত মুয়াবিয়ার কাছে কাম্য ছিল, তারা ইরাকি লস্কর থেকে সরে গিয়ে খারেজিদের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং ইরাকি লস্করে সাবায়ীদের চিহ্ন আরও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। [১]

সালিশির জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ

হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যকার পারস্পরিক মতভেদের কারণ দূর করার জন্য এটি স্থির হলো যে, উভয় পক্ষ নিজেদের একজন করে “হাকাম” বা সালিশ (ফয়সালা করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি) নিযুক্ত করবে। উভয় সালিশ একত্রে বসবেন এবং উম্মতের মধ্যকার মতভেদের কারণ দূর করবেন, ভবিষ্যৎ ও স্থায়ী শান্তির কোনো পথ বের করবেন। তাদের ফয়সালা কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী এবং উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে হবে যা উভয় পক্ষ গ্রহণ করবে।

হযরত আলীর লস্করে অন্তর্ভুক্ত অনিষ্টকারী গোষ্ঠী চেয়েছিল যে আশতার নাখয়ীকে সালিশ বানানো হোক, এই শ্রেণির আবু হানিফের মতো লোকেরা পরবর্তীতে এটি প্রচার করেছিল যে এই ইচ্ছা স্বয়ং হযরত আলীর ছিল, [২] এই কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এমনটি কীভাবে হতে পারত যখন উভয় পক্ষ আগেই এটি স্থির করে নিয়েছিল যে, প্রত্যেক পক্ষ নিজের পক্ষ থেকে এমন সালিশ পেশ করবে যার ওপর...

[১] খারেজিদের সাথে হযরত আলীর সংঘর্ষের আলোচনা পরে করা হবে।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৫১/৩

যাতে অপর পক্ষও আশ্বস্ত হতে পারে। আশতার নাখরীর ওপর তো হযরত আলী [রা.] -এর একনিষ্ঠ সেনাপতিদেরও আস্থা ছিল না, এজন্য ইরাকি সেনাপতি আশআছ বিন কায়েস [রা.] -এর এই উপলক্ষে বলা এই বাক্যটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছে: “هَلْ سَعَرَ الْأَرْضَ إِلَّا” (জমিনে যুদ্ধের আগুন তো আশতারই প্রজ্বলিত করেছে)। [১]

আশআছ বিন কায়েস [রা.] আরও বলেছিলেন: “আশতার তো এটাই চায় যে আমরা একে অপরের ওপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি।” [২]

সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী [রা.] এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রা.] -কেও বাদ দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে হযরত আবু মুসা আশআরী [রা.] -কে নির্বাচিত করেন এবং তাঁকে ফয়সালার পূর্ণ ইখতিয়ার প্রদান করে এমনকি এ পর্যন্ত বলেছিলেন: “أَحْكَمْ وَلَوْ بِحَزِّ عُنُقِي” (তুমি ফয়সালা করে দিও, চাই আমার ঘাড় কাটা পড়ুক)। [৩]

হযরত আবু মুসা আশআরী [রা.] -কে নির্বাচনের কারণ:

আবু মুসা [রা.] -কে নির্বাচনের কারণ ছিল এই যে, তিনি বয়স, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায়ও বিশিষ্ট ছিলেন এবং সেই সাথে রাজনৈতিক বিবাদগুলোতে নিরপেক্ষ থাকার কারণে তিনি উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তাঁর মেধা, দূরদর্শিতা, জ্ঞান ও মর্যাদা এবং বিচক্ষণতার কারণে রাসূলুল্লাহ [সা.] তাঁকে জুবাইদ ও আদনের আমিল নিযুক্ত করেছিলেন। [৪]

এরপর সৈয়দনা উমর ফারুক [রা.] এবং সৈয়দনা উসমান গনী [রা.] -এর যুগেও তিনি বসরা ও কোফায় গভর্নর ও কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; স্পষ্টতই এত বড় পদগুলোতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভূষিত ব্যক্তিই আসীন হতে পারেন। হযরত আলী [রা.] -এর শূরার আকাবিরগণও (বড়রা) এই নির্বাচনে সম্মুখীন ছিলেন, ফলে যখন হযরত আহনাফ বিন কায়েস [রা.] হযরত আলী [রা.] -কে পরামর্শ দিয়ে বললেন: “আপনি গ্রামীণ এলাকার একজন নরম মনের মানুষকে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর পরিবর্তে আমাকে পাঠিয়ে দিন তবে আমি বিষয়টি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী মীমাংসা করতে পারব।” তখন জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রা.] তৎক্ষণাৎ বললেন: “আহনাফ! আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা আমাদের বিষয়গুলো তোমার চেয়ে ভালো বুঝি।” [৫] [৬]

পরিতাপের বিষয় যে, বানোয়াট শিয়া বর্ণনাগুলোতে এমন একজন আলেম ও ফাজিল সাহাবীকে (নাউযুবিল্লাহ) ‘মুগাফফাল’ (নির্বোধ) হিসেবে প্রসিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া আবু মুখনাফ এবং নাসর বিন মুজাহিমের বর্ণনাগুলোতে এই মিথ্যা দাবিও রয়েছে যে, হযরত আলী [রা.] হযরত আবু মুসা আশআরী [রা.] -এর ওপর আস্থা রাখতেন না বরং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রা.] -কে নিজের প্রতিনিধি বানাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইরাকি লস্করের উদ্ধত আমিরদের পীড়াপীড়ির কারণে তিনি হযরত আবু মুসা আশআরী [রা.] -কে এই ইখতিয়ার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। [৭]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৫১

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৫১

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৫১

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৮৫৩ সহীহ সনদে; কিতাবুল আসার লিল কাযী আবি ইউসুফ, বর্ণনা নম্বর: ৯২৯, ত. ইলমিয়াহ

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ১৭৯

[৬] আনসাবুল আশরাফ: ২/৩৩০ হাসান সনদে, ত. দারুল ফিকর

[৭] ওয়াকআতু সফফীন, নাসর বিন মুজাহিম, পৃ: ৫৬১; তারিখুত তাবারী: ৫/৫১

এই বর্ণনাগুলো সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে এবং সহীহ বর্ণনাগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিয়োগের কারণ:

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে সালিশি (তাহকীম) বিষয়ের জন্য হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্ভরযোগ্য ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল-এ তাকেই আমীর বানিয়েছিলেন। [১] শিয়া বর্ণনাকারীরা তাকে লোভী ও দুনিয়াপূজারী হিসেবে প্রচার করার আশ্রয় চেষ্টা করেছে, অথচ তার সম্পর্কে ইরশাদে নববী হলো: “আমর ইবনুল আস কুরাইশদের নেককারদের (সালেহীন) অন্তর্ভুক্ত।” [২]

একবার নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি জিহাদী অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং বলেন: “আমর! আমি তোমাকে একটি অভিযানে পাঠাতে চাই, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখবেন এবং গনীমতের মালও দান করবেন, তারপর আমরাও তোমাকে তা থেকে সম্পদ দেব।” তিনি আরজ করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধন-সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করিনি, বরং আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আপনার সাহচর্যই আমার উদ্দেশ্য।” আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আমর! নেককার মানুষের জন্য পবিত্র সম্পদ উত্তম।” [৩]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং আখিরাতে প্রত্যাশী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নেককার মানুষ মনে করতেন। পরিতাপের বিষয় যে, বানোয়াট বর্ণনাকারীরা যেখানে হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অল্পবুদ্ধি ও অযোগ্য প্রমাণ করার মতো বর্ণনা তৈরি করেছে, সেখানে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অত্যন্ত ধূর্ত ও প্রতারক ব্যক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টাও করেছে। অথচ এই দুই মহান ব্যক্তিকে পুরো উম্মতের আকাবিরদের পক্ষ থেকে পারস্পরিক ঐক্যের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করাই প্রমাণ করে যে, এই ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত যোগ্য ও মুখলিস ছিলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুফায় প্রত্যাবর্তন:

সিফফীনের যুদ্ধ, আলোচনা এবং অন্যান্য অভিযান ও বিষয়াদি থেকে অবসর হয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ১২ রজব ৩৭ হিজরীতে নিজ রাজধানী কুফায় ফিরে আসেন। এর আগে কুফায় দীর্ঘ অবস্থানের সুযোগ মেলেনি। এখন আপনাকে কিছুটা অবসর দেখে লোকেরা বলল: “আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কাসরে ইমারত (প্রাসাদে) অবস্থান করবেন?” বললেন: “না! কারণ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটি অপছন্দ করতেন।” [৪]

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ৬৪৩/২

[২] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু

[৩] তারিখু দামেশক: ১৪২/৪৬

[৪] আল-আখবারুত তিওয়াল: পৃ. ১৫২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

তাহকীমের জন্য চুক্তিপত্র

যুদ্ধবিরতির এক সপ্তাহ পর ১৭ সফর ৩৭ হিজরিতে হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়:

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

“এটি আলী বিন আবি তালিব, মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান এবং তাদের সাথীদের মধ্যকার চুক্তিপত্র, যা কিতাব ও সুন্নাহর বিধানের ওপর সম্মতির ভিত্তিতে করা হয়েছে:

- হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফয়সালা সমস্ত ইরাকবাসীর ওপর এবং হযরত মুয়াবিয়া-এর ফয়সালা সমস্ত সিরিয়াবাসীর ওপর কার্যকর বলে গণ্য হবে, তারা উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত।
- হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর সমর্থকরা আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে (সমস্যার ফয়সালা করার জন্য) হাকাম (সালিশকারী) নিযুক্ত করতে সম্মত হয়েছেন।
- উভয় হাকাম শপথ গ্রহণ করবেন যে, তারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন এবং যে বিষয়ের বিধান আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যাবে না, তা রাসূলের সুন্নাহর মধ্যে তালাশ করবেন।
- উভয় প্রতিনিধি এবং তাদের পরিবার-পরিজনের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। আলাপ-আলোচনা অব্যাহত থাকবে।
- উভয় হাকাম ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী কোনো স্থান নির্ধারণ করবেন।
- ফয়সালার জন্য রমজান মাসের শেষ পর্যন্ত সময় নির্ধারিত হয়েছে... তবে উভয় হাকাম চাইলে এর আগের বা পরের সময়ও নির্ধারণ করতে পারেন।
- এই সময়ের মধ্যে মানুষের জান, মাল, পরিবার-পরিজন এবং সন্তানসন্ততি—সবই নিরাপদ থাকবে। অস্ত্র সংবরণ করা হবে এবং রাস্তাঘাট উন্মুক্ত থাকবে।“

এই চুক্তিপত্রে হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ থেকে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর, হযরত আশআস বিন কায়েস, হযরত সাহল বিন হুнайফ, হযরত রাফে বিন খাদিজ এবং হযরত উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) স্বাক্ষর করেন।

...এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত হাবিব বিন মাসলামা ফিহরি, হযরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) স্বাক্ষর করেন। [১]

আলোচনার সাফল্যের জন্য হযরত আলী (রা.)-এর গুরুত্বারোপ:

এই দলিলের শুরুতে হযরত আলী (রা.)-এর নামের সাথে ‘আমীরুল মুমিনীন’ লেখা হয়েছিল, কিন্তু যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে তা মুছে ফেলার জন্য জেদ করা হলো, তখন হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত উদারতার সাথে তার পরিবর্তে ‘আলী বিন আবি তালিব’ লিখিয়ে নেওয়ার ওপরই সন্তুষ্ট থাকলেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত আলী (রা.) আলোচনা সফল করার ব্যাপারে কতটা আন্তরিক ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি দ্বিতীয় পক্ষের আইনি আপত্তিগুলোকে কোনো ‘ডেডলক’ বা অচলাবস্থার কারণ হতে দিতে চাননি। [২]

এই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে হযরত আলী (রা.) সালিশকারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন: “তোমরা উভয়ে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবে; কুরআন যা জীবিত করতে বলেছে তা জীবিত করবে এবং কুরআন যা নিষেধ করেছে তা মিটিয়ে দেবে।” [৩]

যুদ্ধবিরতি চুক্তির ইতিবাচক প্রভাব, দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে বিভেদ:

আল্লাহর কিতাবের ওপর সালিশির এই সিদ্ধান্ত সবার জন্য সন্তোষজনক ছিল। ইরাক ও সিরিয়ার সেনাবাহিনী নিজ নিজ ছাউনিতে ফিরে গেল। হযরত আলী (রা.) তাঁর রাজধানী কুফায় এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর কেন্দ্র দামেস্কে ফিরে গেলেন। মুসলিম বিশ্বে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরায় ফিরে এল। এর বিপরীতে খোদ দুষ্কৃতিকারী মহলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং দুঃখ ও অনুশোচনায় তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। খোদ শিয়া ঐতিহাসিক আবু হানিফার বর্ণনা অনুযায়ী, যখন এই লোকেরা আলী (রা.)-এর বাহিনীর সাথে সফফিনে যাচ্ছিল, তখন তারা একে অপরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী ছিল, কিন্তু যখন সালিশির ঘটনা ঘটল, তখন ফেরার পথে তারা সবাই একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং একে অপরকে গালিগালাজ করছিল। [৪]

স্পষ্টতই, এই ঝগড়াটে ও বিবাদকারী লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর চারপাশে থাকা সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ ছিলেন না, বরং এরা ছিল সেই সব ফিতনাবাজ লোক যারা বিভিন্ন স্বার্থ ও লাভের লোভে একত্রিত হয়ে ইসলামী খিলাফতকে দুর্বল এবং মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। যখন তাদের স্বার্থ হাসিল হলো না, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই হতাশা ও অস্থিরতার শিকার হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো।

এই মহলের চিন্তাধারায় প্রভাবিত চিন্তাবিদগণ আজও হযরত আলী (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের ওপর ক্ষুব্ধ এবং একে প্রজ্ঞার পরিপন্থী মনে করেন। কিছু লোক একে হযরত আলী (রা.)-এর সরলতা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর চাতুর্যের ফল বলে অভিহিত করেন।

[১] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৯৩ থেকে ১৯৬; আনসাবুল আশরাফ: ২/৩৩৩ থেকে ৩৩৬; তারিখুত তাবারী: ৫/৫৪, ৫৫, আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

[২] মুসনাদে আহমাদ: ৩১৮৫; তারিখুত তাবারী: ৫/৫৩, আলী বিন মুসলিম থেকে হিব্বান বিন হিলাল, মুবারক বিন ফাদালা, হাসান এবং আহনাফ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত।

[৩] আলী (রা.) বলেন: যদি তোমরা আল্লাহর কিতাবে যা আছে সে অনুযায়ী ফয়সালা করো, তবে কুরআন যা জীবিত করেছে তা জীবিত করো এবং কুরআন যা মৃত করেছে তা মৃত করো। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৭, পৃ. ৪৮৫, আল-রুশদ সংস্করণ)

[৪] তারা আলীর সাথে সফফিনের দিকে বের হয়েছিল যখন তারা একে অপরের সহযোগী ও প্রিয় ছিল, কিন্তু সেখান থেকে তারা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষী ও শত্রু হয়ে ফিরল। তারা সফফিনে তাদের ছাউনি ত্যাগ করেনি যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সালিশি ছড়িয়ে পড়ল এবং তারা ফেরার পথে পুরোটা সময় একে অপরকে গালিগালাজ করছিল এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করছিল। (তারিখুত তাবারী: ৫/৬৩)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ দ্বিতীয়)

যদিও হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া এবং প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের সালিশি চুক্তিতে একমত হওয়া এই বরকতময় আয়াতেরই অনুসরণ ছিল:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

(যদি মুমিনদের দুই দল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।) [১]

এর মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত ছিল। কুরআন মাজীদ তো যুদ্ধরত কাফিরদের পক্ষ থেকে আসা সন্ধির প্রস্তাবও গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ুন।) [২]

কিন্তু আফসোস যে, দুষ্কৃতিকারীরা এটাও সহ্য করতে পারল না যে হযরত আলী তাঁর কালিমা পাঠকারী মুসলমান ভাইদের সাথে সন্ধি করে নিন।

বহিঃশক্তির ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা:

জঙ্গ জামাল এবং জঙ্গ সিফফিনে মুসলমানদের একে অপরের সাথে লড়াই করতে দেখে তাগুতি শক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বকে নতুন ক্ষত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। পারস্য ও ইরানের অনেক বিজিত অঞ্চলের অমুসলিমরা হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দিল এবং কিছু অঞ্চলের মানুষ মুরতাদ হয়ে গেল।

এই বিদ্রোহগুলো দমন করার জন্য হযরত আলী তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানকে পাঠালেন, যিনি হযরত মুয়াবিয়ার বৈমাত্রের ভাই ছিলেন। তিনি গিয়ে দ্রুত বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দিলেন এবং ওই অঞ্চলগুলোতে ইসলামের পতাকা পুনরায় উত্তোলন করলেন। [৩]

এভাবে তাগুতি শক্তিগুলো তাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকায় মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগল।

[১] সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯

[২] সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬১

[৩] তারিখ আত-তাবারী, ৫/১৩৭

তাহকিমের ঘটনা: কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল!!

হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে মীমাংসার জন্য হযরত আবু মুসা আশআরী এবং হযরত আমর ইবনুল আস সিফফিনের যুদ্ধের আট মাস পর রমজান ৩৭ হিজরিতে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্ত “আযরুহ”-এর নিকট দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন যাতে উম্মতের দুই দলের মধ্যকার বিরোধের সমাধান খুঁজে বের করা যায়। যে সমাবেশে এই আলোচনা হয়েছিল তাকে “মজলিসে তাহকিম” বলা হয় এবং এই দুই ব্যক্তিকে হাকামাইন বলা হয়। [১]

হযরত আলী কেন তাহকিমের মজলিসে উপস্থিত হননি?

হযরত মুয়াবিয়া তাহকিমের জন্য সিরিয়া থেকে ইরাকের সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু হযরত আলী যাননি। কারণ ছিল এই যে, তাঁর নতুন বিরোধী খারেজীরা বড় ধরনের বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। যদি তিনি একদিনের জন্যও কুফা থেকে অনুপস্থিত হতেন, তবে এই ফিতনাবাজ লোকেরা ইসলামী খিলাফতের তখত উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করত। নিচের বর্ণনাটি এই পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে:

“যখন রমজান ৩৭ হিজরির চাঁদ উদিত হলো, তখন হযরত মুয়াবিয়া চারশ লোক নিয়ে দামেস্ক থেকে বের হলেন এবং দুমাতুল জান্দাল পৌঁছালেন এবং ইয়াজিদ বিন হুর আল-আবসিকে হযরত আলীর কাছে কুফায় পাঠিয়ে নিজের আগমনের সংবাদ দিলেন এবং চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে আসার দাওয়াত দিলেন। ইয়াজিদ বিন হুর হযরত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এই সমাবেশে অংশগ্রহণের অনুরোধ করলেন এবং বললেন: “আপনার উপস্থিতি এই বিষয়টি মীমাংসা হওয়া, যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ফিতনার আগুন নেভানোর কারণ হবে।” হযরত আলী বললেন: “ইবনে হুর! আমি এই লোকদের শ্বাস চেপে ধরে বসে আছি। আমি যদি এদের ছেড়ে এখান থেকে চলে যাই, তবে এই শহরে সিরিয়াবাসীদের সাথে যুদ্ধের চেয়েও বড় ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। আমি আমার পরিবর্তে আবু মুসাকে পাঠাচ্ছি। মানুষ তাঁর নিয়োগে সন্তুষ্ট। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকেও পাঠাচ্ছি। তিনি আমার প্রতিনিধি। যে বিষয় তাঁর সামনে আসবে তা যেন আমার সামনেই আসবে।”

তারপর তিনি বসরা থেকে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে ডাকলেন, একইভাবে আবু মুসা আশআরীকেও ডাকলেন এবং তাঁদের অশ্বারোহীদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে কুফায় অবস্থান করলেন। [২]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/২৭

[২] আনসাবুল আশরাফ: ২/৩৩৬, আল-মাদায়িনী থেকে বর্ণিত, তিনি আবুল ফজল আত-তানুখি থেকে, তিনি মায়মুন বিন মেহরান থেকে, তিনি উমর বিন আব্দুল আজিজ থেকে, তাবা দারুল ফিকর।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

এই সমাবেশে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি দলে চারশ অশ্বারোহী ছিল, যাদের নেতা ছিলেন হযরত শুরাইহ ইবনে হানি (রা.); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রতিনিধি দলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইমাম ছিলেন।

অন্যদিকে সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকেও চারশ ব্যক্তি এসেছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) তালিকার শীর্ষে ছিলেন। নিরপেক্ষ সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, মুগীরা ইবনে শুবা, আবদুর রহমান ইবনে আবদ ইয়াগুস, হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারিস এবং হযরত আবু জাহম ইবনে হুযাইফা (রা.)-ও শরিক ছিলেন। [১]

সালিশি মজলিসে কী আলোচনা হয়েছিল?

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোতে এই সমাবেশের আলাপ-আলোচনার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। বিস্তারিত কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেনি। অন্যদিকে দুর্বল বর্ণনাকারীরা মূল ঘটনাকে ভিত্তিহীন গল্পের ধুলোয় ঢেকে দিয়ে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, হযরত আমর ইবনুল আস এবং হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি এবং শেষ পর্যন্ত এক চরম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মজলিস শেষ হয়। এই বর্ণনাকারীরা সালিশির ঘটনায় মধ্যস্থতাকারীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উসমানের (রা.) কিসাসের পরিবর্তে খিলাফতের হকদার কে তা নিয়ে বিতর্ক করতে দেখিয়েছে। যদিও এটি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে খিলাফতের বিষয়টিও আলোচনার অধীনে এসেছিল এবং এই পদটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করার বিষয়েও চিন্তা করা হয়েছিল, তবে এটি অসম্ভব যে সালিশিকারীদের পুরো আলোচনায় মূল বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, বর্ণনাকারীরা আলোচনার আসল ও কেন্দ্রীয় বিতর্কের বেশিরভাগ অংশ বাদ দিয়ে তার স্থলে কাল্পনিক কথা অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

সালিশি মজলিসের আসল উদ্দেশ্য ছিল উম্মতে মুসলিমাকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং যেহেতু এই ঐক্য উসমানের (রা.) কিসাস কার্যকর করার সর্বসম্মত ফিকহি পদ্ধতি নির্ধারণের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাই সালিশির মূল বিষয়বস্তু এটাই ছিল যে, কীভাবে হযরত আলী (রা.)-এর বায়াত এবং উসমানের (রা.) হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো কর্মপন্থা সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা যায়। যদিও এই আলোচনার বিবরণ কোনো সহীহ বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়নি, তবে আমরা ধারণা করি যে, কথাবার্তা শুরুতে এই বিন্দুর চারপাশেই আবর্তিত হয়েছিল যে কীভাবে কিসাস নেওয়া হবে। উসমানের (রা.) কিসাসের বিষয়টিই হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকে সিরিয়াবাসীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। সিরিয়াবাসীরা হযরত আলী (রা.)-এর ওপর হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগ আরোপ করছিল এবং তাদের মতে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর আবশ্যিক ছিল যে, এই অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য সমস্ত বিদ্রোহীদের কিসাস হিসেবে হত্যা করা অথবা তাদের সিরীয় নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ করা। যতক্ষণ তিনি তা না করতেন, তাঁর সমস্ত মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থান ছিল বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকের মতো, তাই তাঁকে শরয়ী শাসক হিসেবে গণ্য করা সম্ভব ছিল না।

হযরত আলী (রা.)-এর সামনে যে সাংবিধানিক, ফিকহি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো ছিল, আবু মুসা আশআরী (রা.) নিশ্চয়ই সেগুলো যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। যা-ই হোক, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) যদি জ্ঞান ও ফিকহ শাস্ত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, তবে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কূটনৈতিক দক্ষতা এবং যুক্তি ও তর্কের ক্ষেত্রে নিজের উপমা নিজেই ছিলেন। তাই কেউ কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০ / ৫৭০, ৫৭১; তারিখুত তাবারী: ৫ / ৬৭ থেকে ৭১

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সিরিয়ার এক বিশাল সংখ্যক মানুষের এই বিশ্বাস ছিল যে, হযরত আলী (রা.) ক্ষমতার স্বার্থে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করিয়েছেন। [১] এই ভিত্তিতেই সিফফিনে সিরিয়াবাসীরা ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তলোয়ার কোষমুক্ত করা বৈধ মনে করেছিল। তাদের এই মানসিকতার কারণে তারা হযরত আলী (রা.)-এর বায়াত গ্রহণের জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিল না, অথচ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। মোটকথা, কিসাসের (প্রতিশোধ) বিষয়টি হযরত আলী (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও খিলাফতকে সিরিয়াবাসীদের কাছে বিতর্কিত বরং অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। সালিশগণও (হাকামাইন) এই সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পাননি।

এমন পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ খিলাফত পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সালিশগণ অন্য একটি দিক নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। তা হলো এমন কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করা যার সিদ্ধান্ত সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হবে। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) মুসলিম বিশ্বের এমন এক প্রিয় ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার ওপর উম্মতের ঐক্যের আশা করা যেত। তাই হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বললেন:

“لَا أَرَى لِهَذَا الْأَمْرِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ” (আমি এই কাজের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর ছাড়া আর কাউকে দেখছি না।)

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-ও এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে তার ইচ্ছা ছিল যে, যদি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচিত করা হয়, তবে তিনি যেন স্বেচ্ছায় তা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে হস্তান্তর করে দেন। [২] যাই হোক, আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এতে কোনো আগ্রহ দেখাননি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন:

“وَلَا أُعْطِي وَلَا أُقْبَلُهَا إِلَّا عَنْ رِضَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ”

(এই পদ আমাকে দেওয়া যেতে পারে না এবং আমিও তা গ্রহণ করতে পারি না, যতক্ষণ না মুসলিম উম্মাহ এতে সন্তুষ্ট হয়।)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণসমূহ:

সম্ভবত কারো মনে হতে পারে যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তবে উম্মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু আমরা যদি নিম্নলিখিত তথ্যগুলো বিবেচনা করি তবে দেখা যাবে যে তার সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল:

[১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: “নিশ্চয়ই নাওয়াসিবরা সিরিয়াবাসীদের সামনে হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, তিনি উসমান (রা.)-এর রক্তে শরিক ছিলেন এবং এটি ছিল অন্যতম বড় গুনাহ যার কারণে তারা তার বায়াত ত্যাগ করেছিল।” সিরিয়ার লোকেরা সিরিয়াবাসীদের সামনে হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত। এই বিষয়টিই তাদের হযরত আলী (রা.)-এর বায়াত ত্যাগ করতে প্ররোচিত করেছিল। (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/৩০৬)

[২] এই ঘটনাটি দুটি নির্ভরযোগ্য সনদ এবং একটি হাসান বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম সহীহ বর্ণনায় আছে যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত ইবনে উমর (রা.)-কে বলেছিলেন: “إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُبَايِعَكَ” (আমাদের অভিমত হলো আমরা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করি।) একই বর্ণনায় আছে: “فَهَلْ لَكَ عَلَى أَنْ نُعْطِيكَ مَالًا” (আপনার কি এতে সম্মতি আছে যে আমরা আপনাকে সম্পদ দেব এবং খিলাফত তার জন্য ছেড়ে দেব যে আপনার চেয়ে এর প্রতি বেশি আগ্রহী?)

সনদ: বালাজুরি বলেন, আমাকে আহমদ বিন ইবরাহিম আদ-দাওরাকী বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবু খাইসামা বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ওয়াহাব ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা (জারীর বিন হাযিম) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমি ইয়ালা বিন হাকীমকে নাফে থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। (আনসাবুল আশরাফ: ২/৩৩৫, ত. দারুল ফিকর বৈরুত)

দ্বিতীয় সহীহ বর্ণনায় আছে যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত ইবনে উমর (রা.)-কে বলেছিলেন: “مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ صَرَفْتَهَا إِلَيْكَ؟” (আমি যদি এটি আপনার দিকে ঘুরিয়ে দিই তবে আপনি আমাকে কী দেবেন?) (আনসাবুল আশরাফ: ৩/৩৩৫) এই উভয় বর্ণনার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)।

তৃতীয় বর্ণনায় আছে: আবু মুসা বললেন: আমি এই কাজের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর ছাড়া আর কাউকে দেখছি না, তখন আমর ইবনে উমরকে বললেন: আমরা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। আবু মুসা (রা.) বললেন: আমি এই বিষয়ের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর ছাড়া কাউকে উপযুক্ত মনে করি না, ফলে আমর ইবনুল আস (রা.) (ইবনে উমর রা.-কে) বললেন: আমরা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। (হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/২৯৩, ত. আস-সাআদাহ)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — ২য় খণ্ড

এটি প্রমাণিত যে, উভয় পক্ষের মূল বিরোধ খেলাফতের অধিকার নিয়ে ছিল না, বরং কিসাস (রক্তপণ) নিয়ে ছিল। হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه হযরত আলী رضى الله عنه-কে তৎক্ষণাৎ খলিফা হিসেবে না মানা সত্ত্বেও (সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী) তাঁকে খেলাফতের যোগ্য অবশ্যই স্বীকার করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন যে, তাঁর সাথে আমার কোনো বিবাদ নেই, তিনি আমার চেয়ে বড় আলেম এবং অধিক মর্যাদাবান। [১]

তাঁর বক্তব্য ছিল: ‘আলী, উসমানের হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন, আমি আনুগত্যের মাথা নত করে দেব।’ [২]

এখন আব্দুল্লাহ বিন উমর رضى الله عنه খলিফা হতেন তবুও কোনো পার্থক্য হতো না; কারণ ফিকহী জটিলতার কারণে উসমান رضى الله عنه-এর কিসাসের ব্যাপারে সম্ভবত তিনিও হযরত আলী رضى الله عنه-এর অনুসৃত পথ থেকে ভিন্ন কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারতেন না। ফলে সিরিয়াবাসীদের সেই আপত্তি তখনও বহাল থাকত।

عمر بن الخطاب আমর ইবনুল আস رضى الله عنه-এর প্রস্তাব থেকে এটি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, সিরিয়াবাসী হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه ব্যতীত অন্য কাউকে পছন্দ করে না। এমন পরিস্থিতিতে নতুন কোনো ব্যক্তির সর্বসম্মত খলিফা হওয়া সম্ভব ছিল না, বরং এই আশঙ্কা ছিল যে, নতুন ব্যক্তির মনোনয়নের ফলে উভয় পক্ষের অনেক মানুষ আরও আপত্তি তুলবে, ফলে বিশৃঙ্খলা দূর হওয়ার পরিবর্তে আরও বৃদ্ধি পাবে। উম্মত দুই ভাগের পরিবর্তে তিন বা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

عبدالله بن عمر স্বভাবগতভাবেও রাজনৈতিক বিষয়াদি থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পছন্দ করতেন।

জানতেন যে হযরত আলী رضى الله عنه-এর খেলাফত সত্য ও সঠিক, তাঁর সম্পর্কে ছড়ানো সন্দেহ ও সংশয়গুলো ভুল, তিনি খলিফায়ে রাশেদ এবং বাস্তবে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো নেতা উম্মত পেতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া কোনোভাবেই বরকত, রহমত বা উম্মতের ঐক্যের কারণ হতে পারত না।

আলোচনার শেষ পর্যায়

হাকামায় আলোচনার ধারা একটি বন্ধ গলিতে পৌঁছে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতি হাকামাইন (দুই সালিশকারী)-এর জন্য যেমন কষ্টদায়ক ছিল, তেমনি অন্যান্য উপস্থিতদের জন্যও। কারণ প্রত্যেকেই উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে চাইতেন যে উম্মতের এই দুটি নেক দল, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আকাবির সাহাবায়ে কেরাম, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখন তারা এই তিক্ত সত্যটি মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন যে, উম্মতের মধ্যে বর্তমানে ঐক্য সম্ভব নয়। এই নতুন পরিস্থিতিতে আকাবিরদের যেভাবেই হোক এটি নির্ধারণ করতে হতো যে, এখন উভয় পক্ষের অবস্থান কী হবে? [১]

স্পষ্টতই যুদ্ধবিরতির কারণে উভয় পক্ষ আর যুদ্ধরত ছিল না, কিন্তু যে ঐক্যের আশা করা হচ্ছিল বর্তমানে তারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ফলে এই প্রশ্নটি আপনাআপনিই তৈরি হচ্ছিল যে, ভবিষ্যতে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অবস্থান কী হবে? এই প্রশ্নটি এই শব্দগুলোতে মীমাংসা করার দায়িত্ব হাকামাইনের ছিল। যেহেতু হযরত আবু মুসা আশআরী رضى الله عنه ইলমী দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন, তাই হযরত আমর ইবনুল আস رضى الله عنه শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই জানতে চাইলেন:

[১] তারিখ দামেশক: ৫৯/৩০২ এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১৪০ এবং এই সনদটি উত্তম, ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী: ১৩/৮৬।

[২] পূর্বোক্ত সূত্র।

م؟ ا ترى في هذا الامر؟ (আপনি এই বিষয়ে কী বলেন?)

জবাবে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থান স্পষ্ট করে বললেন:

“أرى أنه من النفر الذين توفي رسول الله وهو عنهم راضٍ”

“হযরত আলী আমার জ্ঞান অনুযায়ী সেই মহান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।” (অর্থাৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিল যে, যখন নবী করীম (সা.) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তবে আপনিও যদি নিঃশর্তভাবে হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন তবে তা উত্তম হবে।)

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এই জবাব কতটা মজবুত, দলিলভিত্তিক এবং লা-জওয়াব ছিল তা যে কেউ অনুমান করতে পারেন।

এখন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বিষয়টির দ্বিতীয় দিকটি স্পষ্ট করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন:

فأين تجعّلني أنا ومعاوية؟ (তাহলে এই অবস্থায় আপনি আমাকে এবং মুয়াবিয়াকে কোন অবস্থানে রাখছেন?)

(অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের অবস্থানে অটল থাকি তবে আমাদের এবং হযরত আলী (রা.)-এর সম্পর্কের ধরন কী হবে? আমরা কি বিদ্রোহী এবং যুদ্ধরত দল হিসেবে গণ্য হব নাকি একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হব?)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) এই মুহূর্তে কেবল শরয়ী দলিল এবং বাস্তব সত্য সম্পর্কে সচেতন একজন বিজ্ঞ ফকীহ-এর ভূমিকা পালন করেননি বরং একজন দক্ষ কূটনীতিক হওয়ার প্রমাণও দিয়েছেন। তিনি একদিকে খলীফায়ে রাশেদ-এর উচ্চ মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষকেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করেননি। সেই সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাঁর অত্যন্ত পরিমিত এবং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দগুলো ছিল নিম্নরূপ:

[১] “إِنْ يَسْتَعِنْ بِكَ ففِيكَ مَعُونَةٌ وَإِنْ يَسْتَعِنْ عَنْكَ فَطَالَ مَا اسْتَغْنَى أَمْرُ اللَّهِ عَنْكَ”

“যদি হযরত আলী তোমাদের কাছে সহযোগিতা চান তবে তোমাদের মধ্যে সহযোগিতার সক্ষমতা রয়েছে। আর যদি তিনি তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকেন তবে (তাতে কোনো সমস্যা নেই) দীর্ঘ সময় (অর্থাৎ তোমাদের ইসলাম গ্রহণের আগে) আল্লাহর দ্বীনের কাজ তোমাদের ছাড়াই চলছিল।”

[১] তারিখ দামেশক: ৪৫/৪৬১, তরজমা আমর ইবনুল আস (রা.)।

ইমাম বুখারী (রহ.)-ও এই বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (তারিখুল কবীর: ৩৯৮/৫)

এই বর্ণনাটি হযরত আলী (রা.)-এর দূত হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে আলোচনার প্রেক্ষাপটে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) একে ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। (আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃ. ১৮০) তবে আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) এটি স্পষ্ট করেননি যে তিনি ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর কোন কিতাব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আরাবী (রহ.)-এর ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে তিনি কোনো ভুল উদ্ধৃতি দেবেন না, তাই আশা করা যায় যে এই বর্ণনাটি ইমাম দারাকুতনী (রহ.) অবশ্যই উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে এটিও সত্য যে ইমাম দারাকুতনী (রহ.) তাঁর উচ্চ মর্যাদা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনুযায়ী এই বর্ণনাটি কোনো মজবুত সনদেই বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর বিদ্যমান কিতাবসমূহে এখন পর্যন্ত এই বর্ণনাটি পাওয়া যায়নি। সম্ভব যে ইবনুল আরাবী (রহ.) যে কিতাব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন তা এখনও অপ্রকাশিত বা পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে কখনো তা পাওয়া যাবে এবং এই বর্ণনার মজবুত ভিত্তি সামনে আসবে।

তারিখ দামেশক-এও এই বর্ণনাটি রয়েছে, তবে দীর্ঘ হওয়ার কারণে মাঝখানের কিছু বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে তা যয়ীফ হবে, কিন্তু তবুও বর্ণনার শব্দগুলো অন্যান্য যয়ীফ বর্ণনার ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ মজলিসে হাকামাইনকে একটি তামাশার মতো শুরু হতে এবং একটি হট্টগলের মাধ্যমে শেষ হতে দেখানো হয়েছে। অথচ শরীয়তের শুরু থেকেই এটি চলে আসছে যে যেখানে সনদের বিচারে সমান পর্যায়ের বর্ণনার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, সেখানে আমরা সেই বর্ণনাকেই অগ্রাধিকার দেই যা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মজলিসে তাহকিমের পর উভয় পক্ষের অবস্থান:

চূড়ান্ত ঘোষণা:

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর এই শব্দগুলো যেন তাহকিম বা সালিশি মজলিসের সংক্ষিপ্ত ঘোষণা ছিল, যাতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নীরব সমর্থন ছিল। এর সারকথা ছিল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিতর্কিত সমস্যার সমাধান না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষ দুটি আলাদা আলাদা অঞ্চলে ক্ষমতাসীন থাকবে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধরন ভবিষ্যতের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।

এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণার পর উভয় পক্ষ কোনো প্রকার হাঙ্গামা ছাড়াই দুমাতুল জান্দাল থেকে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যান। [১]

ডক্টর আকরাম জিয়া উমরী তাহকিম বা সালিশি নিস্বফল হওয়ার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন:

“তাহকিম নিস্বফল হওয়ার কারণ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল না, বরং এর কারণ ছিল বিরোধের সমাধান কঠিন হওয়া এবং উভয় পক্ষের নিজ নিজ পূর্ববর্তী অবস্থানে অটল থাকা।” [২]

ভুল বর্ণনাগুলো কীভাবে প্রসিদ্ধ হলো?

ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী উভয় পক্ষের মতভেদ বজায় থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘোষণার মোটেও প্রত্যাশা করেনি। তাই ক্ষোভে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। তারা তাদের সমস্ত দুঃখ ও রাগের ঝাল হযরত আবু মুসা আশআরী এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মেটাল।

এই অভিযানের অধীনে ছড়িয়ে পড়া বর্ণনাগুলোর সারসংক্ষেপ হলো এই যে, হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিনিধি হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) ছিলেন একজন সরলমনা মানুষ, পক্ষান্তরে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতিনিধি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ছিলেন একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ব্যক্তি। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কথায় হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) জনসমক্ষে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে পদচ্যুত করার ঘোষণা দেন, যার পর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) প্রতারণা করে অপ্রত্যাশিতভাবে এই ঘোষণা দেন যে, হযরত আলী (রা.)-কে তো তাঁর নিজের প্রতিনিধিই পদচ্যুত করেছেন কিন্তু আমি মুয়াবিয়া (রা.)-কে বহাল রাখছি। এই প্রতারণার কারণে সেখানে উপস্থিত সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে পারস্পরিক অভিশাপ, গালিগালাজ ও মারামারি হয় এবং উভয় পক্ষের অন্তর ঘৃণা ও শত্রুতায় ভরে যায়। [৩]

[১] খলিফা বিন খাইয়াত তাহকিমের আলোচনার উল্লেখ না করে ফলাফল হিসেবে এটাই বর্ণনা করেন: “উভয় সালিশি কোনো বিষয়ে একমত হতে পারেননি এবং মানুষ পৃথক হয়ে গেল...” (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৩)

[২] আসর-এ-খিলাফতে রাশিদাহ, ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমরী, পৃ. ৪৬৪

[৩] তারিখ আত-তবারী: ৫/৭০, ৭১... এই বর্ণনাগুলোর অবিস্মৃত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এগুলোর অধিকাংশ সূত্রের শেষ প্রান্ত আবু মুখনাফ-এর কাছে গিয়ে মিলেছে, যার মিথ্যাচারিতা সুস্পষ্ট। হ্যাঁ, তবারীতে কিছু বর্ণনা ইমাম ইবনে শিহাব জুহরী-এর মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে, যিনি নিজে নিঃসন্দেহে হাদিসের ইমাম, কিন্তু ইমাম জুহরী এই ঘটনাটি নিজে প্রত্যক্ষ করেননি, তাই তাঁর এই বর্ণনাটি ‘মুরসাল’ এবং এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুরসাল যথেষ্ট নয় যেমনটি উসূলবিদদের নিকট নির্ধারিত। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে বর্ণিত: জুহরীর মুরসাল কিছুই নয়। (আল-মারাসিল লি-ইবনে আবি হাতিম, পৃ. ৩)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা | দ্বিতীয় খণ্ড

আকাবির সাহাবায়ে কিরাম ঘটনার তদন্ত করেছেন!

এই মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিধ্বনি আকাবির সাহাবায়ে কিরাম এবং মহান তাবেয়ীগণ পর্যন্তও পৌঁছেছিল, ফলে তাঁরা যখন এর তদন্ত করলেন তখন জানতে পারলেন যে, তাহকিমের (সালিশি) মজলিসে এমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

সুতরাং হযরত আলী (রা.)-এর সহচর হযরত হুসাইন ইবনে মুনযির (রা.) বলেন:

“আমি আমার ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: ‘আমাকে সেই ফয়সালা সম্পর্কে অবহিত করুন যার দায়িত্ব আপনাকে এবং আবু মুসা আশআরীকে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা এই বিষয়ে কী স্থির করেছিলেন?’ হযরত আমার ইবনুল আস (রা.) বললেন: ‘এই বিষয়ে মানুষের যা বলার ছিল, তারা তা বলেছে, কিন্তু আল্লাহর কসম! বিষয়টি সেভাবে ঘটেনি যেভাবে মানুষ বলেছে।’” [১]

জানা গেল যে, উম্মতের আকাবিরগণ মিথ্যা অপপ্রচারের খণ্ডন করেছিলেন। তাছাড়া তাঁদের কারো কাছ থেকে তাহকিমের ঘটনা সম্পর্কে এমন কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত হয়নি যা উল্লিখিত ধরনের সন্দেহজনক বর্ণনাগুলোকে সমর্থন করে।

হাকামাইন এবং কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত বা সার্বভৌম সরকারের মধ্যে পার্থক্য:

মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিরোধ দূর করার প্রাথমিক ও মানসম্মত পদ্ধতি হলো বিরোধপূর্ণ বিষয়টি কোনো নিরপেক্ষ এবং কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত বা ক্ষমতাবান সার্বভৌম সরকারের সামনে পেশ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ইসলামি বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ আদালত ছিল কেবল খলিফার, এবং আইনি ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর চেয়ে উচ্চতর কোনো মর্যাদা ছিল না। এখন যেহেতু এখানে স্বয়ং খলিফায়ে রাশেদকেই একটি পক্ষ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর চেয়ে উচ্চতর কোনো দরবার বা কার্যকর শক্তি ছিলই না যেখানে মামলাটি পেশ করা যেত, তাই এমন মানসম্মত পদ্ধতিতে মীমাংসার কোনো প্রশ্নই আসত না যার মাধ্যমে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হতে পারত।

[১] এরপর তিনি নিজের এবং আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর মধ্যকার কথোপকথন উল্লেখ করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। তারিখ দামেশক, ৪৬/১৭৫, জীবনী: আমার ইবনুল আস; আত-তারিখুল কাবীর, ইমাম বুখারী, ৫/৩৯৮। মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাহকিমে অসদাচরণের বিষয়ে পেশকৃত সাহাবায়ে কিরামের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বর্ণনাগুলো সনদের দিক থেকে তুলনামূলক কম দুর্বল, সেগুলো হলো তিনটি:

- মা’মার আনিল যুহরী: হাভা ইখতালাফা ওয়াসতাব্বা (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, পৃ: ৪৭৭)। কিন্তু এটি যুহরী থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত, আর নাজুক বিষয়ে যুহরীর মুরসাল দলিলযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান যুহরীর মুরসালকে কিছুই মনে করতেন না এবং বলতেন: এটি বাতাসের মতো। (আল-জারহ ওয়াত তা’দীল: ১/৩৪৬)

[২] যুহরী আন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমার ইবনে হাযম-এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা: যাতে রয়েছে “ওয়াকানা যালিকা মাকীদাতান মিন আমার ইবনিল আস”। (তারিখ দামেশক, ৫৯/১৭১) কিন্তু এর সনদে আবু বকর ইবনে আবি সাবরা রয়েছে যার বিরুদ্ধে হাদিস জাল করার অভিযোগ আছে। (তহযীবুত তহযীব: ১২/২৮, ২৯) আবার এতে ওয়াকিদীও আছে যে মাতরুক (পরিত্যক্ত)।

[৩] আন আমার ইবনুল হাকাম: লাম্মাত তাকান নাসু বি-দুমাতিল জান্দাল (তারিখ দামেশক: ৪৬/১৭২)। প্রথমত বর্ণনাটি মুরসাল। তারপর এর সনদেও আবু বকর ইবনে আবি সাবরার মতো মিথ্যুক রাবী রয়েছে এবং ওয়াকিদী ও ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি ফারওয়া রয়েছে যারা মাতরুক। সংক্ষেপে, যখন এই ঘটনাগুলোর জন্য পেশকৃত তুলনামূলক ভালো বর্ণনাগুলোও দুর্বল, তখন বাকি বর্ণনাগুলোর কী অবস্থা হবে। এরপর নাসর ইবনে মুযাহিম রাফেযীর সেই বর্ণনাগুলোর তো কোনো গুরুত্বই থাকে না যা “ওয়াকআতু সফফীন”-এ পেশ করা হয়েছে।

যুক্তিগতভাবে, বর্ণনাগতভাবে এবং প্রথাগতভাবে এটি প্রমাণিত যে, এমন অনিবার্য পরিস্থিতিতে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর পক্ষ থেকে মীমাংসাকারী প্রতিনিধি পাঠানো হয় যারা মিলেমিশে পক্ষগুলোর জন্য সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার চেষ্টা করেন। তাদের কাজ হলো নিজের অবস্থান বোঝানো, অন্যের অবস্থান বোঝা এবং সমস্যার কোনো উপযুক্ত সমাধান বের করা। এখানেও পরিস্থিতি এমনই ছিল। সুতরাং অনিবার্য পরিস্থিতিতে তাহকিম পদ্ধতিই অবলম্বন করা যেত এবং তাই করা হয়েছিল। কিন্তু সালিশ বা হাকামাইনদের প্রকৃত মর্যাদা কেবল এতটুকুই যে, তারা সন্ধির পদ্ধতি প্রস্তাব করার অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হন। এই প্রচেষ্টায় এমন সম্ভাবনাও থাকে যে, তারা কোনো সমাধানে একমত হতে পারবেন না। আর ভাগ্যের লিখন যে এখানে এমনটাই ঘটেছে। তাই কোনো ব্যক্তি হাকামাইনদের কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্ন আদালতের সাথে তুলনা করে এই আপত্তি যেন না করেন যে, শেষ পর্যন্ত হাকামাইনদের একত্রে বসা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান কেন হলো না।

শামে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা:

তাহকিম নিষ্ফল হওয়ার ফলে, ইরাক ও শাম এক পতাকাতলে আসার সম্ভাবনা দৃশ্যত শেষ হয়ে গেল। অতএব দুই মাস পর ফিলকদ ৩৭ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত একজন শাসক হিসেবে শামবাসীদের থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিজের আনুষ্ঠানিক সরকার ঘোষণা করেন। [১]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯২; তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি: ৩/৫৫২, তাদমুরি।

সীমান্ত সংঘর্ষ

সিফফিনের যুদ্ধের পরেও মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা যা হিজাজ, ইয়েমেন, ইরাক, পারস্য এবং খোরাসান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, খিলাফতে রাশেদার পতাকাতলে ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন কেবল একটি প্রদেশ অর্থাৎ সিরিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সিরিয়ার পশ্চিমে মিশর এবং এর অধীনস্থ সমগ্র আফ্রিকাও খিলাফতে রাশেদার অধীনে ছিল।

সফর ৩৭ হিজরিতে সিফফিনের যুদ্ধের পর যে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, তা রমজান ৩৭ হিজরিতে সালিশি (তাহকিম) সভা পর্যন্ত বহাল ছিল। এই সভায় উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। কেবল আলোচনার মাধ্যমে একে অপরের মনোভাব এবং সন্ধির সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছিল। আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর শেষ কথাগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, তারা সিরিয়াবাসীদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ সমঝোতামূলক সম্পর্কের পথ খোলা রাখবেন। জিলকদ ৩৭ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়ায় নিজের সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এরপর নয় মাস পর্যন্ত রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নীরবতা বিরাজ করছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি এবং সন্ধির কোনো আলোচনাও হয়নি।

ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের কাছে এটি গোপন নয় যে, যখনই কোনো যুদ্ধ শেষ হয়, তখন শান্তির সময় হঠাৎ করে চলে আসে না এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন অবিলম্বে কোনো দৃঢ় ইতিবাচক স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং কিছু সময় এমন অতিবাহিত হয় যাতে সংঘর্ষ চলতে থাকে, প্রত্যেকে একে অপরের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যাচাই করে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন ধরণ বোঝে এবং তারপর নিজের কৌশল নির্ধারণ করে। যেহেতু ইসলামী ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি প্রথমবার সৃষ্টি হয়েছিল, তাই উভয় পক্ষের সন্ধির কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে বেশ সময় লেগেছিল। তাছাড়া সিফফিনের যুদ্ধে ইরাকিদের হাতে নিহত সিরীয় সৈন্যদের গোত্রগুলোর ক্ষোভ নিশ্চিতভাবেই এত দ্রুত প্রশমিত হওয়ার ছিল না, তাই সিরিয়ায় জনমত ইরাকি সরকারের বিরুদ্ধে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। সিরিয়াবাসীরা ইরাকিদের তুলনায় নিজেদের মজলুম মনে করত। [১]

[১] এই রক্তপাতের প্রভাব কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। এই বিশিষ্ট ব্যক্তির হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করতেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসতেনও না। সাওর বিন ইয়াজিদ হিমসি (৮০ হি. - ১৫৩ হি.) যিনি বংশগতভাবে একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, যাঁর বিরুদ্ধে নাসিবিয়াতের অভিযোগও রয়েছে। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি কি হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করেন? তিনি বললেন: ‘আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে কখনো মন্দ বলিনি।’ তবে তিনি স্পষ্টভাবে বলতেন যে, আমি তাঁকে ভালোবাসি না; কারণ তিনি সিফফিনে আমাদের গোত্রের একটি দলকে হত্যা করেছেন। قال: لا أحبه لأنه قتل من قومي يوم صفين جماعة)। সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৮০, ৮১) সাওর বিন ইয়াজিদ সিরীয় মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা থেকে বিরত থাকতেন, যে মজলিসে এমন কথা হতো তিনি সেখানে এক কোণে বসে থাকতেন। তাঁর সমসাময়িকরা এই কারণে তাঁকে খুব বিরক্ত করত। (তারিখ ইবনে মাসীন: ৩/৩৩৪, মারকাজুল বাহসুল ইলমি) তবে সাউরের পিতা সিফফিনে নিহত হয়েছিলেন, তাই তিনি এই শোকের কারণে এতটুকু অবশ্যই বলতেন: আমি এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করি না যে আমার দাদাকে হত্যা করেছে। (كان جد ثور) ابن يزيد قد شهد صفين مع معاوية وقتل يومئذ فكان ثور اذا ذكر عليا قال لا احب رجلا قتل جدي)। তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/৪৬৭, টীকা)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাবান মনে করা সত্ত্বেও নিজের পূর্ববর্তী অবস্থানে অটল ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তি ছিল না এবং প্রত্যেকেই অপর পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করত। এজন্য হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর অধীনস্থ এলাকাগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা জরুরি মনে করতেন। ফলে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর অধীনস্থ এলাকাগুলোতে আক্রমণ ও সীমান্ত লঙ্ঘনের একটি ধারা শুরু করেন, যা প্রায় দুই বছর যাবত চলতে থাকে। এরই মধ্যে তাঁর বাহিনী মিশর দখল করে নেয়, যার উল্লেখ সামনে আসছে। এই সংঘাতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- ৩৮ হিজরির শাবান মাসে হযরত আলী (রা.) কুফা ও বসরার বাহিনী নিয়ে খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হন [১]। বসরায় গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-ও হযরত আলী (রা.)-এর সাথে চলে যান এবং শহরটি সৈন্যশূন্য হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে বসরায় অবস্থানরত উসমানি আন্দোলনের কর্মীরা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বসরা দখলের আমন্ত্রণ জানায়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আবদুল্লাহ বিন উমর আল-হাদরামির নেতৃত্বে সেখানে একটি দল পাঠান। বসরার নায়েব গভর্নর যিয়াদ নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যান এবং খারেজিদের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যস্ত হযরত আলী (রা.)-কে এই বিপদের সংবাদ দেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি জারিয়া বিন কুদামাহ-কে বসরায় পাঠান। রাজকীয় আক্রমণকারীরা বসরার ‘দার সুনবিল’ নামক একটি ইমারতে অবস্থান করছিল। জারিয়া বিন কুদামাহ তাদের ঘেরাও করেন এবং আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। তারা রাজি না হলে ইমারতটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে সমস্ত আক্রমণকারী পুড়ে মারা যায় [২]।
- ৩৯ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইরাকের সীমান্তবর্তী শহর ‘আইনুত তামর’ দখলের জন্য দুই হাজার লোক পাঠান। স্থানীয় লোকজন সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং রাজকীয় বাহিনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় [৩]।
- এই বছরই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আনবার ও মাদায়েনে আক্রমণের জন্য ছয় হাজার লোক পাঠান। এই বাহিনী লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফিরে যায়। হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে সাঈদ বিন কায়েস তাদের পিছু ধাওয়া করেন, কিন্তু তারা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল [৪]।
- এই বছরই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আবদুল্লাহ বিন মাসআদাহ আল-ফাজারিকে সতেরোশ সৈন্য দিয়ে জাজিরাতুল আরবে পাঠান, যাতে তিনি প্রথমে তায়মা এবং পরে মক্কা ও মদিনার লোকদের অনুগত করেন। হযরত আলী (রা.) তাদের প্রতিরোধের জন্য মুসাইয়িব ইবনে নাজাবাহ আল-ফাজারিকে পাঠান। তিনি তায়মায় রাজকীয় বাহিনীর নাগাল পান। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রাজকীয় বাহিনী পিছু হটে একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। যখন তারা আর কোনো উপায় দেখল না, তখন প্রাণভিক্ষা চাইল। মুসাইয়িব ইবনে নাজাবাহ (রা.) কোমলতা প্রদর্শন করে তাদের সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন [৫]।

[১] খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ সামনে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আসছে।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৬, ১৯৭; তারিখুল ইসলাম লিফ-যাহাবি: ৩/৫৮৭, সন ৩৮ হি.; তারিখুত তাবারী: ৫/১১০। এর জন্য একটি সহিহ বর্ণনা রয়েছে আবদুর রহমান ইবনে আবি বাকরা থেকে তাঁর পিতা আবু বাকরা (রা.) সূত্রে, যাতে আছে... “যখন ইবনে আল-হাদরামির দিন ছিল, জারিয়া বিন কুদামাহ তাকে পুড়িয়ে মারেন। আমি বললাম: আবু বাকরাকে উঁকি দিয়ে দেখতে দেখলাম।” (সহিহ বুখারি, হা: ৭০৪৮, কিতাবুল ফিতান, পরিচ্ছেদ: তাঁর বাণী ‘অচিরেই এমন ফিতনা আসবে যা থেকে বসে থাকা ব্যক্তি...’)।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩৩।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩৩।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩৫।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

৫. এই বছর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দাহহাক বিন কায়েস (রা.)-কে তিন হাজার সৈন্যের সাথে ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকা ওয়াকিসা এবং সালাবিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হুজর বিন আদি (রা.) চার হাজার লোক নিয়ে সীমান্তের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে যান এবং তাদমুর-এর কাছে আক্রমণকারীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। [১]

৬. ৩৬ হিজরী থেকে ৩৮ হিজরী পর্যন্ত হজের মৌসুমে উভয় পক্ষ থেকে প্রত্যেকেই মক্কা ও মদীনার ব্যবস্থাপনা সামলানোর চেষ্টা করত। যার বাহিনী আগে পৌঁছে যেত, সেই আর্মীয়ে হজ নিযুক্ত করত। এই টানাপোড়েনে মানুষ সমস্যায় পড়ত। তাই উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্য থেকে উম্মে সালামা (রা.) এবং উম্মে হাবীবা (রা.) নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বললেন:

“আমরা হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে চিঠি লিখব যে, তারা যেন এই বাহিনীগুলোকে স্থগিত রাখেন যা মানুষকে আতঙ্কিত করে, যতক্ষণ না উম্মত আপনাদের মধ্যে কোনো একজনের ওপর একমত হয়।”

উম্মে হাবীবা (রা.) তার ভাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে এবং উম্মে সালামা (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন। কুরাইশ ও আনসারদের কিছু ব্যক্তিকে দূত বানিয়ে উভয় পক্ষের কাছে চিঠি পাঠানো হলো। ফলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হজের আর্মীর হওয়ার দাবি থেকে সরে আসতে রাজি হলেন। হযরত আলী (রা.)-ও রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু হযরত হাসান (রা.) একে সন্ধির পরিপন্থী মনে করে বাধা দেন। [২] সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, হজের আর্মীর হওয়া শুরু থেকেই খলিফার হক ছিল, তা ত্যাগ করাকে খেলাফত থেকে অপসারণ হিসেবে গণ্য করা যেত এবং এতে খেলাফতের পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারত।

৭. ৩৯ হিজরীতে হজের মৌসুমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াযীদ বিন শাজারাহ (রা.)-কে হজের ব্যবস্থাপনা সামলানোর জন্য হিজাজে পাঠান। কিন্তু সেখানে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আর্মীয়ে হজ হযরত কুসাম বিন আব্বাস (রা.) তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান। অবশেষে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর প্রচেষ্টায় এই বিষয়টি আপস-মীমাংসার মাধ্যমে এভাবে নিষ্পত্তি হয় যে, হজের আর্মীর হওয়ার দায়িত্ব শায়বা বিন উসমান (রা.)-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। [৩]

৮. ৪০ হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তার সেনাপতি বুসর বিন আরতাতকে একটি বিশাল বাহিনীর সাথে ইয়েমেন ও হিজাজ অভিযানের জন্য পাঠান। এই বাহিনী হিজাজবাসীদের বশীভূত করার পর ইয়েমেন পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং হযরত আলী (রা.)-এর গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে বিতাড়িত করে ইয়েমেন দখল করে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পর হযরত আলী (রা.)-এর সেনাপতি জারিয়া বিন কুদামা (রা.) একটি নতুন বাহিনী নিয়ে এলে শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবিলা করতে না পেরে তারা ইয়েমেন ও হিজাজ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত যথারীতি ইয়েমেনের শাসক হিসেবে বহাল থাকেন। [৪]

[১] তারিখ তাবারী: ১৩৬/৫

[২] মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড: ৫, পৃ: ৪৭৭, আন যুহরী, ইসনাদুহ মুরসাল ওয়া রিজালুহ সিকাত ইলাল যুহরী, ত ত আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ১৯৪। [৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ১৯৪; আত-তারিখুল আওসাত লিল বুখারী: ১১৫, ৮৯/১, ত ত দারুল ওয়াহী।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এই ঘটনাগুলো এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসের বইগুলোতে এই ঘটনাগুলোর অনেক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, যা আমরা এখানে উল্লেখ করিনি কারণ সেগুলোর অধিকাংশ বর্ণনাকারী দুর্বল, যাদের মধ্যে আবু মিখনাফও রয়েছেন। তাই এটা সম্ভব যে, সেই বর্ণনায় ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয়ে অতিরঞ্জন বা জালিয়াতি করা হয়েছে।

মিসরের সমস্যা

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সফফিনের যুদ্ধের পর এই শরয়ী দলিলের অধীনে যে, তাঁর নিকট ইরাকি সরকার ছিল অসাংবিধানিক যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল, বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু তিনি মোটেও সফল হননি। দেড় বছর পর ৩৮ হিজরিতে তিনি প্রথমবারের মতো মিসর দখলের মাধ্যমে নিজের রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির সুযোগ পান। [১]

মিসরে সাইয়্যিদুনা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত খুব একটা সুসংহত ছিল না, কারণ ভৌগোলিক দিক থেকে মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সাথে যুক্ত ছিল এবং সেখানে সিরিয়াবাসীদের মোকাবিলায় নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী রাখা কঠিন ছিল। তাছাড়া সেখানে উসমানি আন্দোলনের লোকেরাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত ছিল যারা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বায়আত হতে প্রস্তুত ছিল না। এই সংকটময় পরিস্থিতির কারণে তিন বছরের মধ্যে মিসরে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর তিনজন গভর্নর: মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা, কায়েস বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আশতার নাখয়ী একের পর এক নিযুক্ত হন।

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসর দখল করা এজন্য জরুরি মনে করতেন যে, সাইয়্যিদুনা উসমান গনি রাযিয়াল্লাহু আনহুর শেষ যুগে মিসর দুষ্কৃতকারীদের আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ফিতনাকারীদের বড় কাফেলা মিসর থেকেই মদিনায় গিয়েছিল। সে সময় হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মিসরের গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা রোধ করার জন্য তিনি ৩৫ হিজরির শেষ দিকে উকবা বিন মালিককে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে মিসর থেকে বের হন। তাঁর প্রস্থানের পরপরই বিদ্রোহী আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা রাজধানী ফুসতাত দখল করে উকবা বিন মালিককে বের করে দেন। ইবনে আবি সারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিলিস্তিনে পৌঁছেছিলেন যখন পেছনের বিদ্রোহের খবর পান। তিনি ফিরে আসেন কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁকে মিসরের সীমান্তে আটকে দেয়। এরপর তিনি আসকালানে চলে যান। সেখানে তিনি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের খবর পান। তিনি সেখানেই নির্জনবাস গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পর সেখানেই ইন্তেকাল করেন। [২]

[১] এই যুগের ঐতিহাসিক বর্ণনায় যেখানে মিসরের উল্লেখ আসে, সেখানে এর দ্বারা সেই শহর উদ্দেশ্য যা প্রাচীন মিসরের ফেরাউনি রাজধানী “ব্যাবিলন”-এর সামনে সাইয়্যিদুনা আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে আবাদ করা হয়েছিল যার নাম ছিল ফুসতাত। পরবর্তীতে এই ফুসতাতই মিসরের রাজধানী হয়। শত শত বছর পর যখন কায়রো আবাদ হয়, তখন এই ফুসতাত কায়রোর একটি মহল্লায় পরিণত হয়, যেখানে হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্মিত মসজিদ এখনও বিদ্যমান।

[২] তারিখ ইবনে ইউনুস আল-মিসরি (মৃত্যু ৩৪৭ হি.): ১/ ৭০, ৩৪১, ত. আল-ইলমিয়াহ।

মিসরে ইবনে আবি সারাহর প্রতিনিধির নাম উকবা বিন আমের উল্লেখ করা হয়েছে যা একটি ভুল এবং সঠিক হলো উকবা বিন মালিক যেমনটি আল-লাইবি তারিখুল ইসলাম: ১০২/৩-এ মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। আরও দেখুন: তারিখুল মদিনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ১১৫৩/৩, তারিখুত তাবারী: ৫৩২/৪।

কিছু বর্ণনাকারীর এই বক্তব্য সঠিক নয় যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা মিসর দখল করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর লালন-পালন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন কিন্তু তিনি বড় হয়ে কোনো যোগ্যতা ছাড়াই পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অভিজ্ঞ করার জন্য মিসরে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেখানে ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিসরের গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধী হয়ে যান এবং যখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যের জন্য বের হন, তখন মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা রাজধানী দখল করে নেন।

হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মিসরে প্রথম আক্রমণ এবং মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার হত্যাকাণ্ড:

এই সময়ে মদিনা মুনাওয়ারায় হজরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যেভাবে অন্যান্য বিদ্রোহীদের থেকে বায়আত গ্রহণ করে তাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক কৌশলের কারণে মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফাকেও মিসরের গভর্নর পদে বহাল রাখেন। কিন্তু এই পরিস্থিতি হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জন্য সহনীয় ছিল না, কারণ তিনি হজরত উসমান (রা.)-এর বিরোধীদের যেকোনো মূল্যে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি হজরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে সাথে নিয়ে মিসরের সীমান্ত ‘আরিশ’-এ গিয়ে পৌঁছান। প্রতিপক্ষের অগ্রযাত্রার খবর শুনে মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফাও সীমান্তে পৌঁছে আরিশ দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেন। রাজকীয় বাহিনী দুর্গটি অবরোধ করে এমন পাথর নিক্ষেপ শুরু করে যে মিসরীয় বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এরপর মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফাকে তার সঙ্গীদেরসহ হত্যা করা হয়। আরিশের পর নীল নদ পর্যন্ত মরুভূমি এলাকা ছিল এবং ফুসতাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অসাধারণ। তাই রাজকীয় সেনাপতিরা আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করেননি এবং ফিরে যান। [১]

মিসরে কায়স বিন সাদ (রা.)-এর গভর্নর নিয়োগ:

মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার হত্যার খবর শুনে হজরত আলী (রা.) হজরত কায়স বিন সাদ (রা.)-কে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি মিসরে গিয়ে জনগণের কাছ থেকে হজরত আলী (রা.)-এর জন্য বায়আত গ্রহণ করেন, কিন্তু ‘খারবাতা’ নামক একটি অঞ্চলের দশ হাজার মানুষ ঘোষণা দেয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হজরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার না হবে, ততক্ষণ তারা বায়আত স্বগিত রাখবে। তাদের মধ্যে হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ এবং হজরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.) উল্লেখযোগ্য ছিলেন। কায়স বিন সাদ (রা.) বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তাদের বায়আত স্বগিত রাখেন এবং কোনো কঠোরতা প্রদর্শন করেননি। [২]

সাবায়ি গোষ্ঠী মিসরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু হজরত কায়স বিন সাদ (রা.)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কৌশলের কারণে তাদের এই ইচ্ছা পূরণ হতে পারছিল না। ফলে তারা হজরত আলী (রা.) এবং হজরত কায়স বিন সাদ (রা.)-এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র শুরু করে। হজরত কায়স বিন সাদ (রা.) ‘খারবাতা’-র অধিবাসীদের বায়আত না করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সাবায়ি গোষ্ঠী একে কেন্দ্রের সাথে কায়স বিন সাদ (রা.)-এর বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে। এভাবে তারা হজরত আলী (রা.)-কে কায়স বিন সাদ (রা.)-এর প্রতি সন্দিহান করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা চেয়েছিল যে কোনোভাবে তাদের পছন্দের নেতা আশতার নাখয়িকে সেখানকার শাসক বানিয়ে দেওয়া হোক। [৩]

[১] এটি ৩৬ হিজরির ঘটনা যখন হজরত আলী (রা.) ইরাকে জঙ্গ জামালের মতো সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন। (তারিখ তাবারী: ৫/১০৬) মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার হত্যার এই ঘটনাটি যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে, তবে অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ইবনে ইউনুস আল-মিসরি (মৃত্যু ৩৪৭ হি.) একে ৩৬ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। (তারিখ ইবনে ইউনুস: ১/২৪১) হিশাম কালবির বর্ণনা এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যেখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার হত্যাকাণ্ড হজরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মিসর দখলের পর অর্থাৎ ৩৮ হিজরিতে হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্দেশ করে যে কালবির বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। ৩৬ হিজরিই সঠিক। (তারিখ তাবারী: ৫/১০৬)

[২] তারিখ তাবারী: ৪/৫৪৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৮৭

[৩] তারিখ তাবারী: ৪/৫৫২

আশতার নাখয়ীর মিসর যাত্রা এবং আকস্মিক মৃত্যু:

এটি দেখে হযরত আলী (রা.)-এর যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.)-এর মনে একটি কথা এল এবং তিনি অত্যন্ত জোরাজুরির সাথে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আরজ করলেন: “আপনি আশতারকে মিসরে পাঠিয়েই দিন। যদি সে মিসর সামলে নিতে পারে তবে আপনার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আর যদি না পারে, তবে আপনি তার থেকে মুক্তি পাবেন।” আশতার নাখয়ীর উগ্র মেজাজ এবং একগুঁয়েমিতে হযরত আলী (রা.)-ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনিও আশতারকে মিসরে পাঠানোই শ্রেয় মনে করলেন, ফলে কায়েস ইবনে সাদ (রা.)-কে মিসরের শাসনভার থেকে অপসারিত করে আশতারকে গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [১] আশতার মিসরের সীমান্তে কুলজুম উপকূল পর্যন্ত পৌঁছালে সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। আপ্যায়নকারীরা তাকে মধুর শরবত পান করাল যার পর হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটে। [২]

হযরত আলী (রা.) সংবাদ পেয়ে বললেন: “لَيْدَيْنِ وَالْفَمِ” (মুখ খুবড়ে পড়ে মারা গেল)। [৩]

কিছু লোক হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে আশতারের মৃত্যুর সাথে জড়িত বলে দাবি করেছেন, কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই।

সৈয়দনা মুয়াবিয়া (রা.)-এর মিসর দখল এবং মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের হত্যাকাণ্ড: আশতার নাখয়ীর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে মিসরের গভর্নর করে পাঠান। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর অতীতে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধী গোষ্ঠীর অগ্রভাগে ছিলেন, তাই তার সুনাম ভালো ছিল না, ফলে তাদের সম্ভ্রষ্ট করতে...

[১] এই পুরো ঘটনাটি আবু উমর মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আল-কিন্দি (মৃত্যু ৩৫০ হিজরি) সহিহ ও মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন: আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি যখনই চাইতাম যে আলী (রা.) আমাকে কোনো বিষয়ে বাধা না দেন, তখন আমি জাফরের দোহাই দিতাম। আমি তাকে বললাম: আমি আপনাকে জাফরের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আশতারকে মিসরে পাঠিয়ে দিন। যদি সে জয়ী হয় তবে তো আপনার পছন্দমতোই হলো, আর না হলে আপনি তার থেকে মুক্তি পাবেন। সুফিয়ান বলেন, তিনি (আলী রা.) তার ওপর বিরক্ত ছিলেন এবং তাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করতেন। তিনি বললেন, যদি সে না থাকত, এবং তাকে পাঠিয়ে দিলেন। (কিতাবুল উলাত: ২১/১)

[২] কিতাবুল উলাত: ২১/১; তারিখুত তাবারী: ৫৫৩/৩

[৩] কিতাবুল উলাত: ২১/১

নোট: “লিল ইয়াদাইনি ওয়াল ফামি” একটি বদদোয়ামূলক বাক্য, তাই এর বিপরীতে নাসর ইবনে মুজাহিম রাফেযীর সেই বর্ণনাটি পরিত্যক্ত হবে যাতে আশতারের মৃত্যুতে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে দোয়া ও প্রশংসামূলক বাক্য: “লিল্লাহি মালিকুন লাও কানা জামলান” ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। (কিতাবুল উলাত: ২২/১; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৩, তাবা আর-রিসালাহ)

আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে আশতার নাখয়ীর উল্লেখ:

আশতারের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং বদমেজাজের কথা আগে কয়েক জায়গায় এসেছে, তবে তা সত্ত্বেও জারহ ও তাদিলের ইমামগণ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মনে করেছেন। (আস-সিকাত লিল ইজলি: ৪১/১; আস-সিকাত লি ইবনে হিব্বান: ৫২৩/৮; তা’জিলুল মানফায়াহ: ৬৪২৯)

তবে বাস্তবতা হলো এই যে, সে সাবায়ীদের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিল এবং সে ভ্রান্ত আকিদার ছিল না, তবে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসায় বাড়াবাড়ির (গুলু) কারণে তার বিরোধীদের ঘোর শত্রু ছিল। এই বাড়াবাড়ি স্বয়ং হযরত আলী (রা.)-এর কাছেও অপছন্দনীয় ছিল কারণ এতে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল, তাই তাকে নিজের থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হাফেজ জাহাবী (রহ.) লিখেছেন: “তার নাম ছিল مالک بن الحارث (মালিক ইবনুল হারিস)। সে নাখয় গোত্রের একজন অত্যন্ত সম্মানিত সর্দার ছিল। সে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত خالد بن وليد (খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) (রা.) থেকে বর্ণনা করত। সে ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল যাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে উস্কানিদাতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে তাদের দিকে ফিতনায় গিয়েছিল এবং অনিষ্ট ছড়িয়েছিল। এবং সে ছিল অত্যন্ত তুচ্ছ ও শোরগোলকারী। সে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই সুযোগে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।” হাফেজ জাহাবী (রহ.) আরও লিখেছেন: “আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ আল-মুরাদি বলেন: উমর (রা.) আশতারকে দেখেছিলেন, আমি কাছেই ছিলাম। তিনি তাকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখলেন এবং তারপর তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন: এর কারণে মুসলমানদের ওপর একটি বিপদের দিন আসবে।” (তারিখুল ইসলাম ৩৩১/৩, অনুবাদক) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার থেকে বর্ণনা নিতে নিষেধ করতেন। (ইকমালু তাহজিবিল কামাল: ৩৫/১১)

প্রকৃতপক্ষে আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে আশতার নাখয়ীর অবস্থান মারওয়ান ইবনুল হাকামের মতো লোকদের মতো যাদের মধ্যে গুণাবলীও ছিল আবার ত্রুটিও ছিল, তাই একদল তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন এবং অন্যদল অনির্ভরযোগ্য। হযরত আলী (রা.) তার মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু তার সামরিক দক্ষতা এবং তার গোত্রের জনবলকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, সেই সাথে ওইসব লোকদের নেতিবাচক প্রবণতা এবং উগ্র চিন্তাধারার সংশোধনও উদ্দেশ্য ছিল যারা তাশাইয়ু থেকে এগিয়ে গিয়ে রাফযের রূপ ধারণ করছিল। এটি হযরত আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক ও দাওয়াতি কৌশল ছিল যা নিঃসন্দেহে শরয়ী সীমার ভেতরে ছিল, তাই আশতারকে সাথে রাখার কারণে তার ওপর কোনো অভিযোগ আনা যায় না।

...করতে গিয়ে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। তিনি মিসরে পৌঁছে খিরবিতার অধিবাসীদের বায়আত গ্রহণের জন্য এক মাসের সময় দিলেন এবং যখন তারা তাদের নিরপেক্ষ অবস্থানে অটল থাকল, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। এটি ৩৮ হিজরির ঘটনা। এই পদক্ষেপের ফলে মিসরের পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। [১]

দশ হাজার যোদ্ধা যারা হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ এবং মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রা.)-এর কমান্ডে ছিল, তারা মুহাম্মদ বিন আবি বকর দ্বারা ভীত না হয়ে মোকাবিলার জন্য অটল থাকল। এই সমর্থকদের সাথে নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মিসর দখলের সর্বোত্তম সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে একটি বাহিনী দিয়ে মিসরে পাঠালেন। মুহাম্মদ বিন আবি বকরের জন্য একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুই ফ্রন্টে লড়াই করা কঠিন হয়ে পড়ল। শীঘ্রই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) তাদের পরাজিত করে মিসর দখল করে নিলেন। [২]

মুহাম্মদ বিন আবি বকর এই সংঘর্ষে গ্রেফতার হন এবং তাকে হত্যা করা হয়। এটি ৩৮ হিজরির ঘটনা। [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৫৮

[২] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯২, ১৯৩

[৩] তারিখু খলিফা, পৃ. ১৯৩ সহীহ সনদসহ

মুহাম্মদ বিন আবি বকরের হত্যার বর্ণনার যে বিস্তারিত বিবরণ আবু মুখনাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাতে এও রয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে একটি মৃত গাধার পেটে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, এতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) শোকাহত হয়ে হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে আজীবন অভিশাপ ও বদদোয়া দিতে থাকেন। (তারিখুত তাবারী: ৫/১০৪, ১০৫) মিসরে সিরিয়াবাসীদের আক্রমণ করে দখল করা এবং মুহাম্মদ বিন আবি বকরের হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর নিজের ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডে শোকাহত হওয়াও স্বাভাবিক বিষয়। তবে আবু মুখনাফের বর্ণনার প্রতিটি অংশ নির্ভরযোগ্য হতে পারে না, বরং কিছু বক্তব্য বিশেষ করে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর দিকে অভিশাপ ও বদদোয়ার সম্পৃক্ততা নিশ্চিতভাবেই একটি ভুল সংযোজন। একইভাবে মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে মৃত গাধার পেটে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলাও অতিরঞ্জিত মনে হয়।

মুহাম্মদ বিন আবি বকরের অবস্থার ওপর এক নজর

মুহাম্মদ বিন আবি বকর একজন নেক, সৎ এবং ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আসমা বিনতে উমাইস (রা.), যাঁর প্রথম বিবাহ জাফর বিন আবি তালিব (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। যাঁর থেকে মুহাম্মদ বিন জাফর জন্মগ্রহণ করেন। জাফর (রা.) মৃত্যুর যুদ্ধে শহীদ হলে আসমা (রা.)-এর দ্বিতীয় বিবাহ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে হয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪৮১) বিদায় হজের সফরে তাঁর ঘরে মুহাম্মদ বিন আবি বকরের জন্ম হয়। এই শিশুটি দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় নুরে নবুওয়াতের সামান্য ঝলক দেখার সৌভাগ্য লাভ করে। মুহাম্মদ বিন আবি বকরের বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর, তখন পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইন্তেকাল করেন। এরপর আসমা বিনতে উমাইস (রা.)-এর বিবাহ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হয় এবং এই দুই এতিম শিশু মুহাম্মদ বিন জাফর ও মুহাম্মদ বিন আবি বকর তাঁর ঘরে লালিত-পালিত হতে থাকেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-ও তাঁদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

দুঃখের বিষয় যে, এমন নেক পরিবারের এই যুবক দুষ্কৃতকারীদের প্ররোচনায় পড়ে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরিক হয়ে যান। তবে শেষ মুহুর্তে ফিরে আসার (তওবা করার) তাওফিক হয়ে যায়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী, প্রাণঘাতী হামলায় মুহাম্মদ বিন আবি বকর একেবারেই জড়িত ছিলেন না। (আল-ইসতিয়াব: ৩/১৩৬৬, ১৩৬৭)

হযরত আলী (রা.)-এর তাঁকে নিজের সাথে রাখা এবং পদ প্রদান করাও এই কথার প্রমাণ যে, তিনি হত্যার অপরাধী ছিলেন না। তবে বিদ্রোহের গুরুতর অপরাধে তিনি অবশ্যই শরিক ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেও শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হন। হাফেজ যাহাবী এই পরিণতির ওপর এভাবে মন্তব্য করেন: ‘عسى القتل خيراً لهم ونحيصاً’ (আশা করা যায় যে, নিহত হওয়া তাদের জন্য কল্যাণ এবং গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে।) (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪৮১, ত. আর-রিসালাহ)

কাসেম বিন মুহাম্মদ

মুহাম্মদ বিন আবি বকরের শাহাদাতের পর তাঁর এতিম ছেলে কাসেমকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) লালন-পালন করেন, যার ফলে এই কাসেম বিন মুহাম্মদ মদীনার প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহদের মধ্যে গণ্য হন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন: ‘وكان افضل اهل زمانه’ (তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন)। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল হজ, বাবুত তীব বা’দা রাময়িল জিমার) আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) বলতেন: আমি এই যুবকের চেয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি। ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন: কাসেম এই উম্মতের ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তহযীবুল কামাল: ২৩/৪৪০) কাসেম বিন মুহাম্মদ (রহ.) সাধারণত সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এই দোয়া করতেন: ‘اللهم اغفر لي ذنبي ذنبه في عثمان’ “হে আল্লাহ! হযরত উসমান সম্পর্কে আমার পিতার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।” (ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ইবনে খাল্লিকান: ৪/৫৯, ত. দার সাদির)

কাসেম বিন মুহাম্মদ হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর কিছু অবস্থা উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর খিলাফতের প্রসঙ্গে আসবে।

হযরত আলী (রা.) তাদের হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং বললেন: “আমি তাদের সন্তান মনে করতাম। তারা ভাইও ছিল এবং ভাতিজাও। আল্লাহর কাছে আশা করি যে তিনি সবরের প্রতিদান দেবেন।” [১]

মিসর দখলের প্রভাব:

মিসরের ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দখলদারিত্ব আলভী খিলাফতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি ছিল, কারণ এর ফলে একটি বিশাল এলাকা হযরত আলী (রা.)-এর দখল থেকে বেরিয়ে যায় এবং শামী শাসন আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তবে অন্যদিকে এই পদক্ষেপ স্থানীয় মুসলমানদের জন্য শান্তির কারণ হয়েছিল, কারণ সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছিল এবং গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির অবসান ঘটেছিল। এমনিতে মিসর স্থলপথে শামের সাথে যুক্ত ছিল, উভয়ের প্রতিরক্ষার দৃঢ়তা এক হাতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজের শাসনের স্থিতিশীলতার জন্য মিসরকে শামের সাথে যুক্ত করা জরুরি মনে করতেন। ফলে তিনি তাই করলেন। মিসর দখলের পর তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলকে ভালোভাবে সামলানোর সক্ষমতা রাখেন।

এই যুগে রোমানরা মিসরে গোপনে হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল এবং সেখানে সাবায়ী গোষ্ঠীও একইভাবে বিস্তার লাভ করছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) সেখানে ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা দূর করেন এবং বিদেশি এজেন্টদের খুঁজে বের করে তাদের প্রতিরোধ করেন। ফলে এই ধরপাকড়ে এমন এক কিবতিও ধরা পড়ে যে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে চিঠি লিখে মুসলমানদের দুর্বলতা ও গোপন বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করত। তার কাছ থেকে যে সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছিল তা ছিল এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিনার (প্রায় ১২৫ বিলিয়ন রুপি), যা সরকারের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। [২]

একজন সাধারণ মানুষের কাছে এত সম্পদ বিদেশি অনুদানেরই কারিশমা হতে পারে, যাতে সে এর মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের বিবেক ও ঈমান কেনাবেচা করতে পারে এবং ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।

[১] মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুয়াইম আল-আসফাহানি: ১৬৮/১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৬২/১০

দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি

মিশরের ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দখল এবং সীমান্ত সংঘর্ষ সত্ত্বেও সিরিয়াবাসীদের প্রতি হযরত আলী (রা.)-এর উদারতা ও কোমলতা পূর্বের মতোই অটুট ছিল। এটা প্রমাণিত নয় যে, হযরত আলী (রা.) পুনরায় সিরিয়ার দিকে সৈন্য পরিচালনার সংকল্প করেছিলেন, যদিও জাজিরাতুল আরবে সিরিয়াবাসীদের আক্রমণ এবং মিশরের ওপর তাদের দখলদারিত্ব একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করার জন্য শক্তিশালী যৌক্তিক কারণ হতে পারত।

হযরত আলী (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার এই রহস্য সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে, শাসনের অর্থ হলো দেশের ওপর এমন নিয়ন্ত্রণ যাতে নির্দেশাবলি কার্যকর করা ক্ষমতার মধ্যে থাকে। যেখানে এই ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায়, সেখানে শাসনও আর অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং যদি কোনো গোষ্ঠী অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী হয়ে তাদের অধিকৃত সীমানার মধ্যে সরকারি নির্দেশাবলি কার্যকর করার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে তলোয়ারের জোরে ব্যর্থ করে দেয় এবং এই বিষয়টি দীর্ঘায়িত হতে থাকে, তবে এমন পরিস্থিতিতে বিষয়টি বিদ্রোহ থেকে সরে গিয়ে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যেতে শুরু করে; সরকার ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর পরিবর্তে এটি দুটি রাষ্ট্র এবং দুই শাসকের দ্বন্দ্বে বিষয়ে পরিণত হয়। অতএব, যদি দ্বিতীয় পক্ষ ন্যায়পরায়ণ ও মুত্তাকী হয়, তবে তাদের সাথে অকারণে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। তবে নিজের বর্তমান সীমানা রক্ষা করা যে কোনো অবস্থাতেই শাসকের দায়িত্ব থাকবে।

সিরিয়াবাসীদের সাথে হযরত আলী (রা.)-এর পলিসির রূপরেখা:

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই বছরগুলোতে হযরত আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিম্নোক্ত নীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়:

- হযরত আলী (রা.) মিশরের ওপর সিরিয়াবাসীদের দখলের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাননি কারণ সেই এলাকাটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর সামর্থ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল।
- হযরত আলী (রা.) সিরিয়ার ওপর পুনরায় আক্রমণের চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন কারণ বিষয়টি ন্যায়পরায়ণদের একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যাচ্ছিল।
- হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি এবং সীমান্ত সংঘর্ষ চলতেই থাকত। হযরত আলী (রা.) নিজের সীমানা রক্ষা করেছেন এবং সিরিয়াবাসীদের হস্তক্ষেপকে কোথাও সফল হতে দেননি।
- হযরত আলী (রা.) চাইলে সিরিয়াবাসীদের সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে পারতেন, কিন্তু সিমফিনে হওয়া অস্বাভাবিক জনবল ক্ষয়ক্ষতিতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন, যেমনটি যুদ্ধের সময়ও তিনি এই যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করেছিলেন। [১]

হযরত আলী (রা.) এমন কোনো ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি করতে চাননি। তাই তাঁর আচরণ ধৈর্য ও সহনশীলতার ওপর ভিত্তি করে ছিল।

[১] আমি যদি জানতাম যে বিষয়টি এমন হবে, তবে আমি কুফা থেকে বের হতাম না। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৮৫২)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এমন মনে হয় যে, হযরত আলী (রা.)-এর দূরদর্শী দৃষ্টি, অসাধারণ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং পরিণামদর্শিতার মাধ্যমে সিফফীন থেকে ফেরার সময়ই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী বিশ্বে দুটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসক হওয়ার সম্ভাবনা এবং এর প্রতি উদারতা:

হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ঈমান ও ইখলাস, চরিত্র ও সীরাত এবং তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। সিফফীন পরবর্তী আলামতগুলো বলে দিচ্ছিল যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সমান্তরাল শাসন ক্ষমতা থেকে নিজে থেকে সরে দাঁড়াবেন না এবং সন্ধি ও সমঝোতাকে অগ্রাধিকার দেবেন। যেন হযরত আলী (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইজতিহাদী ভুলকে ক্ষমাযোগ্য মনে করেছিলেন।

কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর অনুগত ও একনিষ্ঠ সমর্থকদের দৃষ্টিভঙ্গি এই পর্যায়ের প্রশস্ত ও উদার ছিল না। কারণ সিফফীনে তাদের হাজার হাজার প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধব সিরিয়াবাসীদের হাতে নিহত হয়েছিল। এটা স্বাভাবিক ছিল যে, এই শোকের ক্ষত এত দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার নয়। হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত পন্থায় তাঁর সঙ্গীদের মনে প্রলেপ দেওয়ার এবং তাদের চিন্তাধারায় নমনীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে এমন সব কথা বলতে শুরু করেন যা তিনি আগে কখনো বলেননি। তিনি বলতেন:

“মুয়াবিয়ার শাসনকে অপছন্দ করো না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি মুয়াবিয়া তোমাদের মধ্য থেকে চলে যান, তবে তোমরা দেখবে যে মানুষের মাথাগুলো কাঁধ থেকে হনযাল (মাকাল) ফলের মতো ঝরে পড়ছে।” [১]

হযরত আলী (রা.)-এর এই বক্তব্য কোনো সাধারণ কথা ছিল না, বরং তা ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও পরিণামদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সিরিয়ায় গোত্রীয় গোঁড়ামি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সত্ত্বেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সেখানে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর পরে তাঁর মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও ধৈর্য আর কেউ প্রদর্শন করতে পারবে না। ফলে তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরও তীব্র হতে পারে। তিনি এটাও অনুভব করেছিলেন যে, ইরাকবাসীদের স্বভাবজাত বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের বিপরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়াবাসীদের যেভাবে সুসংগঠিত করেছেন, তার ফলাফল সাধারণত বিজয়ের রূপেই প্রকাশ পায়। অতএব, ভবিষ্যতে এই উম্মতের ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। হযরত আলী (রা.) তাঁর সঙ্গীদের মানসিকতা এমনভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন যাতে কখনো যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে তারা যেন একে নিজেদের জেদের বিষয় না বানিয়ে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে মেনে নিয়ে পরিস্থিতির সাথে সমঝোতা করে নেয়।

[১] সনদ সহীহ এবং শব্দগুলো আল-খাল্লাল-এর: “লা তাকরাহু ইমারাতা মুয়াবিয়া; ফাওয়াল্লাহী নাফসী বিয়াদিহী লা-ইন ফাকাদতুমুহ লা-তানযুরুনা ইলাল জামাজিমি তুদাহরাউ আন কাওয়াহিলিহা কা-আলাহাল হনযাল।” (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৮৩; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস: ৩২৮৫৩; আত-তারীখ লি-দিমাশক: ১৫১/৫৯)।

দ্বিতীয় খণ্ড | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মজলিসে তাহকিম (সালিশি সভা) নিশ্ফল হওয়ার পর জিলকদ ৩৭ হিজরিতে সিরিয়াবাসী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে সিরিয়ার স্থায়ী শাসক হিসেবে বায়আত গ্রহণ করে। [১] এর ফলে সিরিয়া একটি পৃথক রাষ্ট্র ও সরকার হিসেবে আরও স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

অন্যদিকে হযরত আলী (রা.) জনমত এবং সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে এমন একটি চুক্তির জন্য প্রস্তুত করছিলেন যা উভয় রাষ্ট্রের জন্য স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা দেয়। যারা সিরিয়া আক্রমণের জন্য পীড়াপীড়ি করছিল, হযরত আলী (রা.) তাদের অভিমতকে খারেজিদের বাধার কারণ হিসেবে অভিহিত করে প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি বলতেন: “তোমরা কি সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবে এবং তোমাদের শত্রুগণকে তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের ওপর ছেড়ে যাবে?” [২]

সীমানা সম্মানের চুক্তি:

যদিও হযরত আলী (রা.)-এর এই কোমলতা ও সহনশীলতার জবাবে সিরিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছিল, এমনকি হযরত আলী (রা.)-এর বরকতময় জীবনের শেষ বছর ৪০ হিজরিতে বুসর বিন আবি আরতাত (রা.)-এর নেতৃত্বে সিরীয় বাহিনী হিজাজ থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত তাড়ব চালিয়েছিল, তবুও হযরত আলী (রা.) কেবল নিজের এলাকা রক্ষা এবং সিরীয় বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। এর কিছুদিন পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে নিম্নোক্ত বার্তা পৌঁছায়:

“আম্মা বা’দ! আপনি যদি পছন্দ করেন তবে ইরাক আপনার কাছে থাকুক এবং সিরিয়া আমার কাছে থাকুক, যাতে উম্মতের মধ্যে তলোয়ার চালানো বন্ধ হয় এবং মুসলমানদের রক্তপাত না ঘটে।” [৩]

দাবি ছিল এই যে, উভয় পক্ষ একে অপরের সীমানায় হস্তক্ষেপ করবে না। যার কাছে যে এলাকা আছে, তা তারই থাকবে। হযরত আলী (রা.) সফফিনের যুদ্ধের পর থেকেই এই ব্যবহারিক প্রস্তাব ওপর আমল করছিলেন এবং তখন পর্যন্ত তিনি সিরিয়া সীমান্তে কোনো বাহিনী পাঠাননি।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯২, পাঠ: “সিরিয়াবাসী জিলকদ ৩৭ হিজরিতে মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে।” ইমাম যাহাবীও এটি বর্ণনা করেছেন: “সিরিয়াবাসী জিলকদ ৩৭ হিজরিতে মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে এবং কেউ কেউ বলেন ৩৮ হিজরিতে। খলিফা ও অন্যান্যরা বলেছেন যে তারা জিলকদ ৩৭ হিজরিতে বায়আত গ্রহণ করেছে এবং এটিই সঠিক, কারণ এটি তাহকিম (সালিশি) থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হয়েছিল।” (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৩/৫৫৩; পালমিরা)। দ্রষ্টব্য: এই ইবারতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৩৭ হিজরিতেই নিজের খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইবনে আবদুল বার তাবারী থেকে একটি হাসান বর্ণনার বরাতে লিখেছেন যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর ৪০ হিজরিতে নিজের খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাটি হলো: “৪০ হিজরি: এই বছর মুয়াবিয়া (রা.) ইলিয়াতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন... এবং এর আগে তাকে সিরিয়ায় আমির বলে ডাকা হতো। আবু মুসহির সাঈদ বিন আবদুল আজিজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে আলী (রা.)-কে ইরাকে আমিরুল মুমিনীন বলা হতো এবং মুয়াবিয়া (রা.)-কে সিরিয়ায় আমির বলা হতো, যখন আলী (রা.) শহীদ হলেন তখন মুয়াবিয়া (রা.)-কে আমিরুল মুমিনীন বলে ডাকা শুরু হয়।” (তারিখুত তাবারী: ৫/১৬১)। সঠিক কথা হলো হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৩৭ হিজরিতে নিরঙ্কুশ শাসনের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন (যাকে কিছু লোক খিলাফত হিসেবে অভিহিত করেছেন), সেই সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইরাকের খিলাফত থেকে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য কেবল ‘আমির’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং ‘আমিরুল মুমিনীন’ হওয়ার দাবি হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর করেছিলেন।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫১২, অধ্যায়: খারেজিদের হত্যার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান, দারুল জীল। আবু মিখনাফ কিছু জাল বর্ণনা পেশ করে দাবি করেছেন যে হযরত আলী (রা.) সিরিয়া আক্রমণের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু খারেজিদের ফিতনার কারণে তিনি প্রথমে অভ্যন্তরীণ বিপদের দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হন। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, যেমনটি সহীহ মুসলিমের সহীহ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়। এখান থেকে এটিও আন্দাজ করা যায় যে রাফেযী বর্ণনাকারীরা কীভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে থাকে।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩০, যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ থেকে।

যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই কৌশলটি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন হযরত আলী (রা.) তা সানন্দে গ্রহণ করলেন। এভাবে সীমান্ত সন্মানের একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। হযরত আলী (রা.) তাঁর অঞ্চলের রাজস্ব গ্রহণ করতে থাকলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর অঞ্চলের উৎপাদন নিজ অঞ্চলেই ব্যয় করতে থাকলেন। [১] হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের শেষ মাসগুলোতে উভয় দিকে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় কোনো সংঘর্ষ হয়নি।

আমীরুল মুমিনীন ও আমীরে শাম:

এই যুগে শামের সবচেয়ে বড় আলিম হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আজিজ তানুখী (রহ.) এই দুটি সমান্তরাল ইসলামী সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত শব্দে এভাবে বর্ণনা করেন:

“ইরাকে হযরত আলী (রা.)-কে আমীরুল মুমিনীন বলা হতো এবং শামে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে (শুধুমাত্র) ‘আমীর’ বলা হতো। যখন হযরত আলী (রা.) শহীদ হলেন, তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করা শুরু হয়।” [২]

কায়সারের রোমের হুমকি এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জবাব:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিজ জায়গায় ছিল, কিন্তু ইসলামের কল্যাণ, মঙ্গল এবং প্রতিরক্ষাকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে উভয় মহোদয় একমত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য যে, কায়সারের রোম মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিল। যখন সে দেখল যে ইসলামী রাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তখন সে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে শামের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তাকে একটি হুমকি সম্বলিত পত্র লিখলেন, যাতে লেখা ছিল:

“হে অভিশপ্ত! যদি তুমি ফিরে না যাও, তবে আল্লাহর কসম! আমি এবং আমার চাচাতো ভাই আলী তোমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব, আমরা তোমাকে তোমার সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে বের করে দেব এবং জমিনের প্রশস্ততাকে তোমার জন্য সংকীর্ণ করে দেব।”

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/১৩০, যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। এই চুক্তির কথা কেবল একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন এবং তাবারী ছাড়া অন্য কোনো ঐতিহাসিক এটি উল্লেখ করেননি। তাবারীর বর্ণনাটিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, যা থেকে এটি স্পষ্ট নয় যে বুসর বিন আবি আরতাত (রা.)-এর বাহিনী হঠাৎ কেন সন্ধি করল? এই প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কারণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়:

- হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে সফল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে শামের অধিবাসীরা আর আক্রমণের কথা ভাবেনি।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর উচ্চ চরিত্র ও উদারতায় প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিলেন।
- শামের জনগণের মতামত গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

একটি প্রশ্ন এও যে, এটি কোন মাসে হয়েছিল? ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৪০ হিজরীতে বুসর বিন আবি আরতাত (রা.)-কে হিজাজ ও ইয়েমেনের অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। বাহিনী ইয়েমেনে কিছুকাল অবস্থান করেছিল এবং এরপর হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে শামে ফিরে গিয়েছিল। এই পুরো আসা-যাওয়া, অবস্থান এবং বিজিত অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে তিন মাস সময় লেগে থাকবে। যদি বছরের শুরু অর্থাৎ মহররমের শুরু ধরা হয়, তবে শামী বাহিনীর প্রত্যাবর্তন রবিউল আউয়ালে শুরু হয়ে থাকবে। এরপর দূতদের আসা-যাওয়া এবং চিঠিপত্রের জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল, তারপর চুক্তিপত্র তৈরি হতে আরও দেড় মাস সময় লেগে থাকবে। অর্থাৎ চুক্তিটি জমাদিউল উলা বা তার পরে হয়েছিল। এভাবে আমরা বলতে পারি যে হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের শেষ চার-পাঁচ মাস গৃহযুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৬/১৬১।

রোমের সম্রাট এই চিঠি পড়ে কেঁপে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, বিজাতীয়দের মোকাবিলায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে এখনও সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো অটল। ফলে তিনি অবিলম্বে হযরত মুয়াবিয়া-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ ফিরে গেলেন। [১]

ইসলামী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির ভিত্তি:

হযরত আলী শেষ পর্যন্ত হযরত মুয়াবিয়া-এর ব্যাপারে আপোষমূলক নীতিতে অটল ছিলেন। তাঁর এই বরকতময় ফিকহী সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য খিলাফতের জন্য এই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে যে, যদি কোনো অঞ্চলের কোনো মুসলিম শাসক খিলাফতের কর্তাব্যক্তিদের সাথে মতপার্থক্যের কারণে আলাদা হয়ে স্বাধীন সরকার গঠন করেন, তবে খলিফার ওপর এটি ওয়াজিব নয় যে তিনি যেকোনো মূল্যে তাঁর সাথে যুদ্ধ করবেন। যদি মুসলমানদের কল্যাণ এতেই নিহিত থাকে যে তাঁর স্বাধীন অবস্থানকে একটি বাস্তব সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয় এবং হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করা হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

আব্বাসীয় খিলাফত এবং উসমানীয় খিলাফতের যুগে অধিকাংশ স্বাধীন মুসলিম সুলতান এই শরয়ী সুযোগের অধীনেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আব্বাসীয় ও উসমানীয় আমলের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আনুগত্য সাধারণত খিলাফতের কেন্দ্রের সাথেই বজায় থাকত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তিও সম্পাদিত হতো। পরিস্থিতি তখনই খারাপ হতো যখন মুসলিম শাসকরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন।

যদি একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেল প্রতিষ্ঠানের অধীনে ঐক্য ও সংহতির রূপ বজায় রেখে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহর ন্যায়সঙ্গত মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করে এবং প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, তবে কেবল রাষ্ট্রের সংখ্যাধিক্য মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো বড় সংকটের কারণ হতে পারে না। হ্যাঁ, যেসব শাসক খিলাফতের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় অথবা যেসব রাষ্ট্র নিজেদের ভুল মতাদর্শ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে, প্রতিবেশীদের সীমানা লঙ্ঘন করতে, নিরপরাধ মানুষের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাতে এবং শরয়ী সীমারেখা পদদলিত করতে লিপ্ত হয়, তাদের বিষয়টি ভিন্ন। তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা জরুরি।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩০০, অনুবাদ: মুয়াবিয়া

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

হযরত আলী রা.-এর ফিকহি মতামতের ওপর ইজমা

বলা হয়েছে যে, হযরত উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা ঘরে প্রবেশ করে খুনি হিসেবে কাজ করেছিল। অন্যরা ছিল যারা কেবল হাঙ্গামায় শরিক হয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল অজ্ঞ এবং আবেগপ্রবণ লোক যারা প্ররোচনায় পড়ে বিশৃঙ্খলায় যোগ দিয়েছিল। প্রকৃত খুনি ছিল অল্প কয়েকজন। এই অপরাধীরা হযরত আলী রা. সহ সমস্ত সাহাবীর নিকট কিসাসের যোগ্য ছিল। তারা হযরত আলী রা.-এর বলয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং ঘটনার পরপরই দূর-দূরান্তের এলাকায় পালিয়ে আত্মগোপন করেছিল। এখন বিবাদপূর্ণ বিষয়টি ছিল সেই বিদ্রোহীদের নিয়ে যারা খুনে শরিক ছিল না এবং বায়আত গ্রহণ করে হযরত আলী রা.-এর বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ফিকহি এবং প্রশাসনিক মতপার্থক্যও ছিল।

আহলে জামাল এবং আহলে শামের দাবি ছিল যে, তাদের সবার কাছ থেকে কিসাস নেওয়া জরুরি। হযরত আলী রা.-এর সামনে যে শরয়ী দলিল ছিল তা থেকে প্রমাণিত হতো যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র ত্যাগ করার পর নিরাপদ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ডাকাত ও বিদ্রোহীদের সম্পর্কে কুরআনের সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল ও নির্দেশ হলো:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“তবে যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগে তওবা করে, জেনে রেখো যে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [১]

একদা হারিসা বিন বদর নামক এক বিদ্রোহী ধরা পড়ার আগেই আত্মসমর্পণ করলে হযরত আলী রা. তাকে নিরাপত্তা দেন এবং এই আয়াতটি পাঠ করেন। [২]

এমনটি মনে হয় যে, হযরত আলী রা.-এর নিকট নিরাপত্তার এই বিধান সব ধরনের বিদ্রোহীদের জন্য ছিল। তবে সতর্কতামূলকভাবে আপনি দেখতে চাইবেন যে, এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় কি না যার মাধ্যমে নিরাপত্তার এই বিধানটি কেবল সেই বিদ্রোহীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণিত হয় যারা মুজতাহিদ এবং মুতাওয়িল (ব্যখ্যাকারী) ছিল, সব ধরনের বিদ্রোহীদের জন্য নয়। সম্ভবত এই কারণেই আপনারা কিসাসের বিষয়ে ধৈর্য ও প্রশাসনিক সতর্কতার তাগিদ দিচ্ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি হযরত উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের ওপর কোনো শাস্তি কার্যকর করেননি।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে, সিফফিনের যুদ্ধ এবং তাহকিম (সালিশি) পর্যন্ত আহলে শামের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত লোকদের কাছ থেকে কিসাস নেওয়ার দাবি অব্যাহত ছিল যারা মদিনায় হাঙ্গামা করতে গিয়েছিল। হযরত আলী রা. বা তাঁর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কখনোই এই অবস্থান পেশ করা হয়নি যে শরিয়তে এর কোনো অবকাশ নেই।

[১] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৪

[২] তাফসীরে তাবারী (তাফসীর জামিউল বয়ান): ৩৯৩/৮

বিদ্রোহীদের সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর মতামতের ওপর ইজমার ফলাফল:

এই ইজমা থেকে এটি প্রমাণিত হলো যে, মদিনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের থেকে হযরত আলী (রা.)-এর কিসাস গ্রহণ না করা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল এবং শরীয়ত অনুযায়ীও তাঁর ওপর আবশ্যিক ছিল যে, তিনি এই সমস্যার চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার আগ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকেন। আর আমিরুল মুমিনীন তা-ই করেছিলেন। এটি কেবল রাজনৈতিক কৌশলের দাবি ছিল না বরং দ্বীনি, শরয়ী এবং ইলমি দায়িত্বও এটাই ছিল।

যেহেতু হযরত আলী (রা.) বিচারিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন, তাই এটি বলা সঠিক হবে যে, এই ইজমা ও ইজতিহাদের প্রধান তিনিই ছিলেন। আর যেহেতু হযরত আলী (রা.)-এর আমল এই ইজমার আগে থেকেই সতর্কতামূলক দিকটি সামনে রেখে কিসাস বিলম্বিত করার ওপর ভিত্তি করে চলে আসছিল, তাই এটি বলা সঠিক হবে যে, তাঁর মতামত শুরু থেকেই এই দিকেই যাচ্ছিল যে, সব ধরনের বিদ্রোহী অস্ত্র সমর্পণের পর নিরাপদ হয়ে যায়, তবে এর অনুমোদনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রয়োজন ছিল যার জন্য পরিস্থিতির শান্ত হওয়া এবং আবেগ প্রশমিত হওয়া জরুরি ছিল। কারণ আবেগের অবস্থায় সঠিক ফতোয়া জারি হতে পারে না।

এটিও সম্ভাবনা আছে যে, হযরত আলী (রা.) ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অ-মুজতাহিদ বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নিজের মতামতের ওপর শুরু থেকেই পুরোপুরি আশ্বস্ত ছিলেন, তবে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো এই কথা শোনার ও মানার সক্ষমতা নেই। এখনই বিষয়টি স্পষ্ট করলে কথা বেড়ে যাবে এবং উত্তেজিত জনগণ শরয়ী দলিলসমূহ না বুঝে এই ধরনের সিদ্ধান্তকে কিসাসে উসমান-এর আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মনে করে নেবে। হতে পারে হযরত আলী (রা.) এই কারণেই পরিস্থিতির শান্ত হওয়ার এবং আবেগ প্রশমিত হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন।

যাই হোক, পরিশেষে হযরত আলী (রা.)-এর এই ফিকহি মতামত এবং সতর্কতামূলক পদক্ষেপের সবাই প্রকাশ্যে অনুমোদন দিয়ে দিলেন যা আপনি মদিনা মুনাওয়ারায় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রথম দিন থেকেই কার্যত গ্রহণ করেছিলেন এবং যার কারণে আপনার নিকট কিসাসযোগ্য কেবল তারাই ছিল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করেছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাঁর শাসনকালে হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদের সাথে একমত:

ঐতিহাসিক দিক থেকে এটি প্রমাণিত যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাঁর শাসনকালে এই ইজমাভিত্তিক সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিলেন। কারণ যখন তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তিনিও হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদ হুবহু অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর বিশ বছরের শাসনামলে কেবল দুই-চারজন এমন ব্যক্তির থেকে কিসাস নিয়েছিলেন যারা সরাসরি হযরত উসমান (রা.)-এর অন্যায় হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। এর কারণ এটি ছাড়া আর কী হতে পারে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের হত্যা করার শরয়ী অবকাশ এখন তিনিও মানতেন না।

এই কারণেই হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িত দুই বিখ্যাত ব্যক্তি: উমাইর আদ-দাবি ৭৫ হিজরি পর্যন্ত এবং কুমাইল বিন জিয়াদ ৮৩ হিজরি পর্যন্ত ইরাকে জীবিত ছিলেন। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের নিজের বিবেচনায় হত্যা করেন। [১]

[১] তারিখ আত-তবারী: ৬ / ২০৭, ২০৮, ৩৬৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

এটা স্পষ্ট যে, হাজ্জাজ না হযরত আলী (রাযি.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, আর না এই মহান ব্যক্তিগণ ন্যায়বিচার ও শরীয়ত অনুসরণে কারো চেয়ে কম ছিলেন। তাই হযরত আলী (রাযি.) যা করেছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) পরবর্তীতে যা গ্রহণ করেছিলেন, সেটিই ছিল শরয়ী পদ্ধতি। সুতরাং হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর দাবি গ্রহণ না করা এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার মূল কারণ ছিল শরয়ী। আর তা হলো এই যে, অধিকাংশ বিদ্রোহী সরাসরি পূর্ববর্তী খলিফার হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না। তাছাড়া তারা বায়আত গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ নাগরিকে পরিণত হয়েছিল, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের ওপর কিসাসের শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। যদিও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, শক্তির অভাব, সংহতির অভাব এবং পরিস্থিতির অস্থিরতাও অবশ্যই প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু যদি এই বিষয়গুলোকেই বিলম্বের আসল কারণ হিসেবে গণ্য করে শরয়ী বাধ্যবাধকতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়, তবে হযরত আলী (রাযি.)-এর ওপর খুনি ও অপরাধীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি রাখার যে মিথ্যা অভিযোগ রয়েছে, তা পুরোপুরি দূর হয় না। এই সংশয় কোনো না কোনো কোণে থেকেই যায় যে, যে শাসক সিরিয়াবাসী এবং নাহরাওয়ানবাসীদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে পেরেছিলেন, তিনি কেন দুই-তিন হাজার ব্যক্তিকে তলোয়ারের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেন না।

খারিজিদের সাথে সংঘাত

খারিজিরা মূলত এমন একদল লোক ছিল যারা শরীয়ত পালনে কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিল এবং নিজেদের ইবাদত ও রিয়াযতের (সাধনা) অহংকারে লিপ্ত ছিল। তাদের দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মর্যাদাও সাধারণ মানুষের চেয়ে খুব বেশি উঁচুতে ছিল না। তারা কুরআন কারীমের আক্ষরিক অর্থের ওপর হুবহু আমল করাকেই সর্বোচ্চ দ্বীনদারি মনে করত। তাদের মনে এক মুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা আসত না যে, কুরআন কারীমের অর্থ তাদের বুঝের বাইরেও হতে পারে। তাদের স্ববিরুদ্ধ বিধানের সূক্ষ্মতাগুলো বুঝতে অক্ষম ছিল।

খারিজিদের মধ্যে সাধারণত উদ্যমী, আবেগপ্রবণ এবং কঠোর মেজাজের লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। খারিজিদের কিছু নেতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যও পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজেদের বেয়াদবির কারণে কোনো ফয়েজ লাভ করতে পারেননি। একবার তাদের এক নেতা ‘যুল খুওয়াইসিরা’ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে উপস্থিত ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিতদের মধ্যে অর্থ বণ্টন করছিলেন। এই হতভাগা আপত্তি তুলে বলল: “আল্লাহকে ভয় করুন, ইনসাফের সাথে কাজ করুন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: “আমি যদি ইনসাফ না করি তবে আর কে করবে?” হযরত উমর (রা.) অনুমতি চাইলেন যে এই বেয়াদবের শিরশ্ছেদ করা হোক, কিন্তু আপনি ﷺ নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন: “তার এমন কিছু সঙ্গী হবে যাদের নামাজ ও রোজা দেখে তোমাদের নিজেদের নামাজ ও রোজা তুচ্ছ মনে হবে, কিন্তু তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।” [১]

খারিজিদের কিছু নেতা এমন ছিলেন যাদের আগে কোনো ফিতনার সাথে সম্পর্ক ছিল না, যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব এবং উরওয়া বিন উযাইয়্যাহ। [২] তাদের কিছু প্রধান ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তওবা করেছিলেন, যেমন শাবাস বিন রাবঈ। [৩] কিছু ছিল কউর সাবায়ী, যেমন হারকুস বিন যুহাইর এবং আব্দুল্লাহ বিন আল-কাওয়া। খারিজিদের মধ্যে সাবায়ীয়াতের প্রভাবের একটি প্রমাণ এটিও ছিল যে, তারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে গালিগালাজ করত। [৪]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৩৪৪, কিতাবুত তাওহীদ, বাব কওলুহ তাআলা: তা’রুজুল মালাইকা; সহীহ মুসলিম, হা: ২৫০৫, বাব যিকরুল খওয়ারিজ। ঐতিহাসিকদের মতে হারকুস বিন যুহাইরই ছিল যুল খুওয়াইসিরা, যে প্রথমে সাবায়ী এবং পরবর্তীতে খারিজিদের সর্দার হয়েছিল। (আল-ইসাবাহ: ২/৩৩৩; উসদুল গাবাহ: ১/১৩১)

[২] তারিখুত তাবারী, ৫/৫৫; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯২।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৮৩, ৩৮৪; আল-আ’লাম লি খায়রুদ্দিন আয-যিরিকলী, ৩/১৫৩; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৩।

[৪] আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন আল-কাওয়া এবং শাবাস বিন রাবঈ ও তাদের সাথে কিছু লোক সিফফীন থেকে কুফায় আল্লাহর সাহায্যের পর আলী (রা.) থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল যখন তিনি তাদের আবু বকর ও উমর (রা.)-কে গালি দেওয়ার কারণে তিরস্কার করেছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৪৭০২)

খ্যাজদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিছু লোক তারাই ছিল যারা জঙ্গ জামালের পর উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিদ্দা আয়েশা সিদ্দিকা এবং তাঁর সাথীদের বন্দী করার ব্যাপারে জেদ ধরে বলছিল:

“যাদের রক্ত আমাদের জন্য হালাল, তাদের সম্পদ এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানরা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ কেন?” [১]

হযরত উসমান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহেও এই লোকেরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম-এর সামনে খ্যাজদের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন: “আমি তাদের বলেছিলাম হযরত উসমানকে হত্যা করো না, কিন্তু তারা শোনেনি।” [২]

এই লোকেরা হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া-এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ও সন্ধিকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের কাফের ঘোষণা করতে শুরু করেছিল। [৩]

নিজেদের মতাদর্শের ওপর তারা এতটাই অটল ছিল যে, তারা ভিন্নমত পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ মনে করত। [৪]

এ পর্যন্ত মুসলমানদের স্লোগান ছিল তাকবীর। খ্যাজরা ‘লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া আর কারো সার্বভৌমত্ব নেই)-কে স্লোগান বানিয়ে নিল। একে ‘নারায়ে তাহকীম’ বলা হতো। [৫]

এই স্লোগান সর্বপ্রথম খারেজী সর্দার উরওয়াহ বিন উযাইনাহ সিফফীনের ময়দানে যুদ্ধবিরতির সময় দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে এটাই তাদের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। [৬]

হারুরায় খ্যাজ:

হযরত আলী আল-মুরতাজা যখন সিফফীন থেকে রওনা হলেন, তখন খ্যাজরা যারা এ পর্যন্ত লস্করে অন্তর্ভুক্ত ছিল, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুক-এর শানে অশোভন কথাবার্তা শুরু করে দিল। হযরত আলী তা সহ্য করতে পারলেন না এবং কঠোরভাবে এই লোকদের কটু কথার সমালোচনা করলেন। এতে খারেজীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বাকি লস্কর থেকে আলাদা হয়ে গেল। [৭]

এই দুই কাফেলা আলাদা আলাদা চলতে থাকল, যখন হযরত আলী কুফায় প্রবেশ করলেন তখন খ্যাজরা শহর থেকে দূরে ‘হারুরা’ নামক স্থানে আস্তানা গাড়ল। [৮]

তাদের সংখ্যা ছিল আট হাজার। তারা এই প্রচার করছিল যে, হযরত আলী আল্লাহর দ্বীনে মানুষের সার্বভৌমত্ব কবুল করে নিয়েছেন, অথচ সার্বভৌমত্ব তো কেবল আল্লাহরই। তিনি ছাড়া আর কারো অধিকার নেই যে কোনো বিষয়ে কোনো ফয়সালা দেয়।

[১] আন মাইসারা আল-মাহি জামিলা বলেন: খ্যাজরা প্রথম যে দিন কথা বলেছিল তা ছিল জঙ্গ জামালের দিন, তারা বলেছিল: আমাদের জন্য তাদের রক্ত হালাল করা হলো আর তাদের সন্তান ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম করা হলো কেন? (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৩৭৭৫৭, ত: আর-রুশদ)

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৩৭৩৯২, ত: আর-রুশদ

[৩] তারিখুত তাবারী, ৫/২৩, ৬৫

[৪] তারা মানুষের মধ্যে দীর্ঘ সালাত আদায়কারী এবং অধিক সিয়াম পালনকারী ছিল, কিন্তু যখন তারা পুল (সেতু) পার হতো তখন রক্ত প্রবাহিত করত (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৩৭৯০৩, ত: আর-রুশদ)

[৫] হারুরিয়াহ যখন বের হলো এবং তিনি হযরত আলী বিন আবি তালিব-এর সাথে ছিলেন, তারা বলল: লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ। (সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৬৭)

[৬] তারিখুত তাবারী, ৫/৫৫

[৭] আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, খণ্ড: ২৬০২

[৮] তারিখুত তাবারী, ৫/৭৩, ৭৪

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

খারেজীদের খণ্ডন: হযরত আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি প্রদানের পদ্ধতি:

হযরত আলী (রা.) তাদের প্রোপাগান্ডা খণ্ডন করার জন্য ঘোষণা করলেন যে, লোকেরা যেন কুরআনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর কাছে জমা হয়। তারপর তিনি (রা.) নিজে কুরআনের একটি বড় পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে তাতে হাত রাখলেন এবং আওয়াজ দিলেন:

“হে পবিত্র কালাম! মানুষের সাথে কথা বলো।”

লোকেরা অবাক হয়ে বলতে লাগল: “হে আমিরুল মুমিনীন! এটি তো কাগজ ও কালির সমষ্টি, আপনি এর কাছে কী চাচ্ছেন?”

তিনি (রা.) বললেন: “বিদ্রোহীদের এবং আমার মধ্যকার ফয়সালাও আল্লাহর কিতাবে রয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

[১] وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

(যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তবে পুরুষের পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং নারীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। যদি তারা উভয়েই মীমাংসা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল করে দেবেন।)”)

“তাহলে কি উম্মতে মুহাম্মাদীর রক্তের বিষয়টি একজন পুরুষ ও নারীর বিষয়ের চেয়েও কম গুরুত্ব রাখে!!”

লোকেরা আশ্বস্ত হলো যে, হযরত আলী (রা.) সালিশির (তাহকিম) সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবার তিনি (রা.) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে খারেজীদের সাথে কথা বলার জন্য পাঠালেন। খারেজীদের একজন নেতা আব্দুল্লাহ বিন আল-কাওয়া তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের স্বাগত জানালেন এবং তাঁদের কথা শুনতে রাজি হলেন। তিন দিন ধরে আলোচনা ও বিতর্ক চলল, কিন্তু তারা মানল না। [২]

হযরত আলী (রা.)-এর আরও কিছু দূতও গেলেন, কিন্তু খারেজীরা অভদ্রতা করল এবং দূতের সওয়ারিকে আহত করে দিল। [৩]

যখন এই লোকেরা কোনোভাবেই আশ্বস্ত হলো না, তখন হযরত আলী (রা.) নিজে সেখানে গেলেন এবং তাদের বোঝালেন। [৪]

খারেজীদের সাথে চুক্তি:

হযরত আলী (রা.) তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তি করলেন যে, যদি তারা সরকারের অনুগত থাকে তবে:

- ১. তাদের মসজিদে আসতে এবং ইবাদত করতে বাধা দেওয়া হবে না।
- ২. গনিমতের মাল এবং বায়তুল মাল থেকে তাদের অংশ দেওয়া হবে।
- ৩. তাদের বিরুদ্ধে আগে যুদ্ধ শুরু করা হবে না।

এই চুক্তি অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) ইসলামী সমাজে একটি শান্তিপূর্ণ বিরোধী দলের (অপজিশন) অস্তিত্বের সুযোগ রাখলেন এবং তাদের নাগরিক অধিকার স্বীকার করে নিলেন। [৫]

[১] সূরা আন-নিসা: ৩৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৫৬৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৫৬, সনদ সহীহ।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৯১

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হাদিস: ৩৭৯০০, ত. আর-রশীদ

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হাদিস: ৩৭৯৩০, ত. আর-রশীদ

অধিকাংশ খারিজি বিদ্রোহের জেদ ত্যাগ করে তাদের সাথে কুফায় চলে এল। [১] এটি ১লা শাওয়াল ৩৭ হিজরির ঘটনা। [২]

তবে চার হাজার খারিজি এর পরেও নিজেদের জেদে অটল রইল।

যেহেতু একটি সশস্ত্র দলের দেশের সীমানার মধ্যে এভাবে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো সব অবস্থাতেই বিপদের কারণ ছিল এবং আশঙ্কা ছিল যে, এই লোকেরা নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের জন্য শক্তির নেশায় দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট না করে, তাই হযরত আলী (রা.) তাদের কাছে এই বার্তা পাঠালেন: “আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তোমরা অন্যায়ভাবে রক্তপাত করবে না, হত্যাকারীদের লুট করবে না, কোনো জিম্মির ওপর জুলুম করবে না; যদি এর মধ্যে কোনো একটি কাজও করো, তবে প্রকাশ্য যুদ্ধ হবে।” [৩]

কুফায় খারিজিরা:

কুফায় ফিরে আসার পরেও খারিজিরা শান্ত থাকেনি। তারা কেবল সাথে থাকার ব্যাপারে একমত হয়েছিল, আদর্শ পরিবর্তন করেনি। তাদের এই ভুল ধারণাও হয়েছিল যে, হযরত আলী (রা.) তাদের অবস্থান মেনে নিয়েছেন। ফলে কুফায় ফিরে আসতেই তারা রটিয়ে দিল যে, তারা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পুনরায় এজন্য ফিরে এসেছে যে, তিনি নিজের কুফর থেকে তওবা করেছেন। এক ব্যক্তি এসে হযরত আলী (রা.)-কে সরাসরি জিজ্ঞেস করল:

“লোকেরা বলছে যে আপনি আপনার কুফর থেকে ফিরে এসেছেন?”

হযরত আলী (রা.) এই গুজব খণ্ডন করার জন্য সেদিনই জোহরের নামাজের সময় লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, যাতে খারিজিদের কঠোর সমালোচনা করলেন। মসজিদে উপস্থিত খারিজিরা তা সহ্য করতে পারল না এবং হট্টগোল শুরু করে দিল। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিজের কানে আঙুল দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সামনে এল এবং চিৎকার করে এই আয়াত পাঠ করতে লাগল:

[৪] وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(আর অবশ্যই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।)

হযরত আলী (রা.)-ও জবাবে আয়াত পাঠ করলেন:

[৫] فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

(অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।) [৬]

[১] মুসাম্মাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৩৭৯০০, কিতাবুল জামাল, বাব জিকর ফিল খওয়ারিজ, আন আবি জারিন বিসানাদিন হাসান; তারিখুত তাবারী: ৫/৭৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৯০

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৫৬৯; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৫৬

[৪] সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫

[৫] সূরা আর-রুম, আয়াত: ৬০

[৬] মুসাম্মাফ ইবনে আবি শায়বা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৭৯৩১, ৩৭৯০০, ত আর-রুশদ; তারিখুত তাবারী: ৫/৩৭ বিসানাদিন হাসান

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তাহকিমের স্লোগানের অকাট্য জবাব:

হযরত আলী (রা.) খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালে খারিজিরা তাহকিমের স্লোগান দিতে দিতে বলতে লাগল: “আলী! তুমি আল্লাহর দ্বীনে মানুষকে শরিক করে ফেলেছ।” তারপর স্লোগান দিল: “লা হুকমু ইল্লা লিল্লাহ” (আল্লাহর বিধান ছাড়া আর কোনো বিধান নেই)।

হযরত আলী (রা.) জবাবে বললেন: “হঁ্যা, হঁ্যা, লা হুকমু ইল্লা লিল্লাহ। তবে এটি এমন একটি সত্য কথা যার মাধ্যমে বাতিল উদ্দেশ্য করা হচ্ছে।”

(এটি সত্য কথা যা থেকে বাতিল অর্থ নেওয়া হচ্ছে।) আল্লাহর ফয়সালা তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। [১]

শাসকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর বাণী:

খারিজিরা শাসনব্যবস্থা বা শাসকের প্রবক্তা ছিল না। তাদের মতে, এটি আল্লাহর সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামী সাম্যের পরিপন্থী ছিল। হযরত আলী (রা.) এই ধারণার খণ্ডন করে বললেন:

“এই লোকেরা বলে যে কোনো সরকার থাকা উচিত নয়, অথচ মানুষের জন্য একজন শাসক থাকা জরুরি, সে নেককার হোক বা ফাসেক। যাতে তার শাসনামলে মুমিন তার আমল করতে পারে এবং কাফের তার মতো করে সুবিধা ভোগ করতে পারে।” [২]

লোকেরা বলতে লাগল: “নেককার শাসকের কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু ফাসেক শাসকের মানে কী?”

তিনি বললেন: “তার শাসনের কারণে তোমাদের রাস্তাঘাট তো খোলা থাকবে, বাজার তো সচল থাকবে।” [৩]

খারিজিরা কয়েক দিন কুফায় সৈয়দনা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে অবস্থান করল, এই সময়ে তারা চেষ্টা করেছিল যেন হযরত আলী (রা.)-কে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাজি করানো যায়, কিন্তু হযরত আলী (রা.) তা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন। [৪]

খারিজিদের হযরত আলী (রা.)-এর সাথে অভদ্রতা:

একবার খারিজিদের সর্দার তারকুস বিন জুহাইর এবং জুরআহ বিন বুর্জ তাঁর (রা.) কাছে এল। তারকুস বলল: “নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করুন এবং আমাদের সাথে শত্রুর দিকে অগ্রসর হোন যাতে আমরা তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে পারি যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হই।”

হযরত আলী (রা.) বললেন: “আমাদের এবং তাদের মধ্যে লিখিত চুক্তি হয়ে গেছে, আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

(আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন তোমরা অঙ্গীকার করো।)

তারকুস বলল: “কিন্তু এই চুক্তি তো গুনাহ, এ থেকে আপনার তওবা করা উচিত।”

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৭৯৩০; তারিখ তাবারী: ৫/৯১

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৭৯০৭

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৭৯৩১

[৪] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ২/৩৩৮, ত. দারুল ফিকর

হযরত আলী বললেন: “এটি কোনো গুনাহ নয়।”

যুরআহ বিন বুর্জ বললেন: “সাবধান আলী! আল্লাহর কসম! যদি আপনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে বান্দাদের ফয়সালার ইখতিয়ার দেওয়া থেকে বিরত না হন, তবে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার সাথে লড়াই করব।”

হযরত আলী বললেন: “হতভাগা! আমার মনে হয় তুই এমনভাবে মরবি যে ঝড় তোর টুকরোগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাবে।”

সে বলল: “আমিও পছন্দ করি যে এমনই হোক।” [১]

খারেজীদের দাওয়াত এবং জনগণের মানসিকতা তৈরি:

যখন খারেজীরা দেখল যে হযরত আলী কোনোভাবেই তাদের মতাদর্শ ও সংকল্পের সাথে একমত হতে প্রস্তুত নন, তখন তারা চূড়ান্তভাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। একটি সমান্তরাল শক্তি হওয়ার জন্য জরুরি ছিল শহর থেকে বের হয়ে এমন জায়গায় কেন্দ্র তৈরি করা যেখানে সরকারি প্রভাব-প্রতিপত্তি কম থাকে। এখন পর্যন্ত তাদের কোনো নিয়মিত আমিরও নিযুক্ত হয়নি কারণ তারা নিজেরা “হুকুমত” এবং “হাকিম”-এর ধারণাকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্লোগান দিত। কিন্তু এখন যখন সংগঠনকে সক্রিয় করার লক্ষ্য সামনে এল, তখন নিয়ম-কানুন তৈরি এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ক্ষমতাধর আমিরের প্রয়োজনীয়তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারল। তাই অনেক বাদানুবাদের পর আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাবকে আমির বানানো হলো। এটি ১০ শাওয়াল ৩৭ হিজরির ঘটনা। [২]

জামাতের নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ ঘোষণা করে বলা হলো:

“আমাদের লক্ষ্য হবে দুনিয়াবাসীদের দ্বারা দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর আনুগত্য করানো... মানুষ নফসের খাহেশাতের অনুসরণ করেছে এবং কিতাবুল্লাহর হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ঈমানদারদের ওপর ফরজ। এখন তাদের মাথার খুলিতে তলোয়ার চালান... যদি আপনারা সফল হন এবং আল্লাহর আনুগত্য করা হতে থাকে তবে এটাই আপনাদের লক্ষ্য এবং আল্লাহ মহান প্রতিদান দেবেন, আর যদি আপনারা নিহত হন তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে।”

সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে মাদায়েনের নিকটবর্তী “জুখা” খালের ওপারে সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করা হবে এবং আশপাশের শহর ও জনপদ থেকে জনশক্তি সংগ্রহ করে সরকারের সাথে খোলা ময়দানে মোকাবিলা করা হবে। [৩]

খারেজীদের কুফা থেকে গোপনে প্রস্থান:

অধিকাংশ খারেজী কুফার বিভিন্ন মহল্লায় বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছিল। একসাথে বের হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি ধরপাকড় ছাড়াও গোত্রীয় বাধার আশঙ্কা ছিল, তাই তারা একজন-দুজন করে শহর থেকে বের হতে লাগল। সেই সাথে বিভিন্ন শহরে চিঠি এবং দাওয়াতনামাও ছড়িয়ে দিল যে হকের বিজয়ের জন্য আমাদের সাথে দিন। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ৫৭৭, ৫৭৮

[২] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ৩/ ৩৫৯, ৩৬০, দারুল ফিকর সংস্করণ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ৫৮০, ৫৮১

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ৫৮১

খারিজি যাদের সংখ্যা হযরত আলী থেকে আলাদা হওয়ার সময় আট হাজার ছিল, বাড়তে বাড়তে ষোল হাজারে পৌঁছে গেল। [১] এটি এমন এক ফিতনা ছিল যাতে কেবল তারাই অবিচল থাকতে পারত যাদের পূর্বসূরিদের (আসলাফ) ওপর আস্থা ছিল, অন্যথায় বড় বড় ইবাদতকারী ও সংসারবিরাগীদের (জাহিদ) ঝাঁক খারিজিদের দিকে হচ্ছিল।

একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন তাবেরী আবু আল-আলিয়া জিয়াদ বলতেন: “আমার ওপর আল্লাহর এমন দুটি নেয়ামত রয়েছে যে আমি বুঝতে পারি না কোনটি বেশি বড়: একটি হলো আল্লাহ তাআলা ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিয়েছেন, দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ খারিজি হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন।” [২]

খারিজিদের রক্তপাত:

খারিজিরা ‘জোখা’ নদীর ওপারে সামরিক ছাউনি স্থাপনের পর আশপাশে লুটতরাজের তুফান বইয়ে দিল। একদিকে তারা এতটাই পরহেজগার ছিল যে কারও একটি দানাও তার অনুমতি ছাড়া নিত না, অন্যদিকে তারা এতটাই নির্ভীক ছিল যে যারা তাদের অবস্থান ও মতাদর্শের সাথে দ্বিমত পোষণ করত তাদের রক্ত ঝরাতেও দ্বিধাবোধ করত না। [৩]

খারিজিদের হাতে আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব-এর শাহাদাত:

বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামে তারা খাব্বাব বিন আল-আরাত-এর বিদ্বান ও গুণী পুত্র আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব-কে ধরে ফেলল এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে জিজ্ঞেস করল: “তুমি কে?”

তিনি বললেন: “আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব, রাসূলুল্লাহ-এর সাহাবীর পুত্র।”

খারিজিদের আমির বলল: “সম্ভবত আমরা আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি।” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, সত্যিই।”

খারিজিরা বলল: “আপনার ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু আপনি রাসূলুল্লাহ-এর কোনো একটি হাদিস শুনিয়ে দিন যা আপনি আপনার পিতার কাছ থেকে শুনেন।”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ, আমি আমার পিতার কাছ থেকে এই হাদিসটি শুনছি যে রাসূলুল্লাহ-এর ইরশাদ হলো: এমন একটি ফিতনা আসতে যাচ্ছে যাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি সচল ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে আর সচল ব্যক্তি দোজখের আগুনে জ্বলবে, যখন এই ফিতনায় লিপ্ত লোকদের মুখোমুখি হবে তখন আল্লাহর মুক্তল বান্দা হয়ে যেও, ঘাতক হয়ো না।” [৪]

খারিজিরা বলতে লাগল: হ্যাঁ, আমরা এই হাদিসটিই জানতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আপনি হযরত আবু বকর ও উমর সম্পর্কে কী বলেন?

তিনি জবাবে প্রশংসামূলক বাক্য বললে তারা বলল: “আচ্ছা, হযরত উসমানের প্রাথমিক শাসনকাল এবং তাঁর শাসনের শেষ সময় সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৫৭৮

[২] মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হা: ১৮৬৬৭, বাব মা জাআ ফিল খাওয়ারিজ, ত: আল-মজলিস আল-ইলমি পাকিস্তান

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৮২, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৮৮৭, ত: আর-রুশদ

[৪] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/৫৯, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৮৯৬, ত: আর-রুশদ, মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, বর্ণনা নম্বর: ১৮৫৭৮, ত: আল-মজলিস আল-ইলমি পাকিস্তান

হযরত আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব (রা.) উত্তর দিলেন: “তিনি শুরুতেও সত্যের ওপর ছিলেন এবং শেষেও।”

তারা বলল: “আচ্ছা, আলী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তাহকিম (সালিশি)-এর আগে তিনি কেমন ছিলেন এবং পরে কেমন আছেন?”

তিনি বললেন: “তিনি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অধিক অবগত, দ্বীনের ব্যাপারে অধিক সতর্ক এবং তা অধিক বাস্তবায়নকারী।”

খারেজীরা এ কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তারা বলতে লাগল: “আরে! তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছ, তুমি ব্যক্তিদের নামকে মানদণ্ড বানিয়েছ এবং তাদের কাজকে উপেক্ষা করেছ। আল্লাহর কসম! আমরা তোমাকে এমনভাবে হত্যা করব যেভাবে আজ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করা হয়নি।” [১]

এখন এই হতভাগারা তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে ধরে খালের পাড়ে নিয়ে চলল। এই সময়ের মধ্যে দুটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল:

একটি হলো, পাশ দিয়ে কোনো এক অমুসলিম নাগরিকের একটি শূকর যাচ্ছিল এবং এক খারেজী তলোয়ারের আঘাতে সেটিকে হত্যা করে ফেলল। এটি দেখে তার সঙ্গীরা রাগে অস্থির হয়ে গেল এবং বলতে লাগল: “অমুসলিম নাগরিকদের শূকর কেন হত্যা করলে?” [২]

শূকরের মালিক এলে খারেজীরা মূল্য পরিশোধ করে তার অভিযোগ দূর করে দিল। [৩] এটি দেখে হযরত আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব (রা.) তাদের কাছ থেকে কিছুটা মানবিকতার আশা করলেন এবং তিনি বললেন:

“আমি কি তোমাদের বলব যে, এই শূকরের চেয়ে কার গুরুত্ব বেশি?”

খারেজীরা বলল: “কার?”

তিনি বললেন: “আমার। আমি কখনো সালাত কাযা করিনি, কখনো কোনো গুনাহ করিনি।” [৪]

খারেজীরা নির্বাক রইল। সামনে এগিয়ে গেলে খালের পাড়ে একটি খেজুর গাছ দেখা গেল। রাসূলের সাহাবীর সন্তানকে তার সাথে বেঁধে দেওয়া হলো। এই সময়ে এক খারেজী সেই গাছ থেকে পড়ে থাকা একটি খেজুর তুলে মুখে দিল। এটি দেখে অন্য খারেজীরা তার ওপর চড়াও হলো এবং বলল: “তুমি জিম্মির খেজুর কেন নিলে, মূল্য পরিশোধ না করে একে কীভাবে হালাল মনে করলে?” তাকে মুখ থেকে খেজুরটি ফেলে দিতে হলো। [৫]

গাছের সাথে বাঁধা হযরত আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব (রা.) এই দৃশ্য দেখে বলে উঠলেন:

“যদি তোমরা সত্যিই এমন পরহেজগার হও যেমনটা আমি তোমাদের দেখলাম, তবে এরপর তোমাদের থেকে আমার আর কোনো ভয় নেই।”

মগর খারেজীদের সংকল্প বদলায়নি, তারা সামনে এগিয়ে গেল, তাঁকে ধরে খালের পাড়ে শোয়াল এবং পশুর মতো যবেহ করে দিল! রক্তের ধারা উপচে খালে গিয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণ সেখানে রক্তের একটি বৃত্ত তৈরি হয়ে রইল।

এবার তারা সেই মহিলার দিকে ধাবিত হলো। তিনি চিৎকার করে বললেন: “তোমরা কি আল্লাহকে ভয় পাও না? আমি তো একজন নারী।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৭ হিজরি, জিকর কিতালিল খাওয়ারিজ

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৮৯৩, ত. আর-রুশদ

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৮২

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৯২৩, ত. আর-রুশদ

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৯২৩, ত. আর-রুশদ

কিন্তু সেই জালিমরা পেট চিরে তাকেও মেরে ফেলল। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) এবং তাঁর স্ত্রীর প্রবাহিত রক্তে খালের পাড় লাল হয়ে গেল। জালিমরা তাদের লাশ আগুনে নিক্ষেপ করল।

আবদুল কায়েস গোত্রের একজন খারিজি, যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মর্মান্বিত হলো। সে তাদের সঙ্গ ছেড়ে চুপচাপ পালিয়ে গেল এবং মানুষকে এই ঘটনা শোনা। [১]

খারিজিদের প্রতি শেষ সতর্কবার্তা

সৈয়দুনা হযরত আলী (রা.) এখন পর্যন্ত খারিজিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন কারণ কারো আদর্শিক মতপার্থক্য সামরিক অভিযানের বৈধ কারণ হতে পারে না। যখন তাঁকে খারিজিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রক্তপাত, ডাকাতি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমনটি করা হবে না।” [২]

কিন্তু এখন খারিজিরা কার্যত মুসলমানদের রক্তে হাত রাঙাতে শুরু করেছিল, যা প্রতিরোধের জন্য সশস্ত্র অভিযান জরুরি ছিল। হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.) যুদ্ধ ঘোষণার আগে খারিজিদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে মুসলমানদের রক্তে জড়িত ব্যক্তিদের হস্তান্তরের দাবি জানান যাতে তাদের থেকে কিসাস নেওয়া যায়। খারিজিরা তা প্রত্যাখ্যান করে উত্তর দিল: “হত্যা আমরা সবাই শরিক, আমরা কীভাবে কিসাস দেব?”

হযরত আলী (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কি সবাই তাদের হত্যা করেছ?”

উত্তর এল: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

হযরত আলী (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “আল্লাহ আকবার,” এখন তিনি (রা.) খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। [৩]

[১] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ১৮৫৭৮, ত. আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৩৭৮৯৬; তারিখ তাবারী, ৫/৮১, ৮২, লুত বিন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত; আল-কামিল ফিত তারিখ, পৃ. ৩৭৭, জিকর কিতালিল খাওয়ারিজ; আসাদুল গাবাহ: ৩/১০১, জীবনী: আবদুল্লাহ বিন খাবাব।

[২] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নম্বর: ১৮৫৭৩, বাব কিতালুল হারুরা, ত. আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান।

[৩] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ১৮৫৭৮, ত. আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৩৭৮৯৩, ৩৭৯৩৩, ত. আর-রুশদ।
এখানে কিছু লোকের আপত্তি হলো যে, হযরত আলী (রা.) একজন আবদুল্লাহ বিন খাবাবের বদলে খারিজিদের পুরো দলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের বদলে সমস্ত বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হননি। যদি এক ব্যক্তির বদলে পুরো দলকে হত্যা করা জায়েজ হয়, তবে হত্যাকারীদের পুরো দলকে কেন শাস্তি দেওয়া হলো না এবং কেন এক ব্যক্তির হত্যার বদলে পুরো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলো?

এর উত্তর হলো, হযরত আলী (রা.) এবং জমহুর ফুকাহাদের মাযহাব হলো যে, এক ব্যক্তির হত্যায় জড়িত সকল ব্যক্তিকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বিষয়টি ছিল মৌলিক ও স্পষ্টভাবেই ভিন্ন। তারা হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর বিজয়ী হওয়ার আগে অস্ত্র নামিয়ে রেখেছিল, তাই আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী: “তবে যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগে তওবা করে, জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৪) তাদের ওপর কিসাস প্রয়োগ করা হয়নি। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না, তাই তাদের থেকে কিসাস নেওয়া জায়েজ ছিল না। পক্ষান্তরে খারিজিদের বিষয়টি ছিল ভিন্ন। তারা সবাই তলোয়ার নিয়ে বের হয়েছিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের অবস্থা এই আয়াতের শরয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল: “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।” (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৩)। এ কারণেই তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান:

হযরত আলী (রা.)-এর সিরিয়ার দিক থেকে এই সান্ত্বনা ছিল যে, সেখানে সমান্তরাল হলেও একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, যা শরীয়ত বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সঠিক আকিদাপন্থী। কিন্তু খাওয়ারিজদের বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই লোকেরা নিরপরাধ মানুষের রক্ত অকাতরে ঝরিয়ে নিজেদের জন্য অবকাশের সুযোগ শেষ করে ফেলেছিল। বাহ্যিক ইবাদত ও রিয়াযতের পাশাপাশি তাদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার কারণে ইসলামের নাম কলঙ্কিত হচ্ছিল। এই খাওয়ারিজদের মধ্যেই হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী অনেক লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি; বিচার বিভাগীয়ভাবে তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা শরীয়ত বিরোধী হতো। কিন্তু এখন সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ত হালাল করে নিয়েছিল।

কিছু লোকের মনে এই সন্দেহ ছিল যে, এমন ইবাদতকারী ও পরহেযগার লোকদের সাথে যুদ্ধ করা কীভাবে জায়েজ হতে পারে? কিছু লোক যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সরকারকে সহ্য করতে পারছিল না, তারা ভাবছিল যে হযরত আলী (রা.) কেন একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে উপেক্ষা করছেন, তিনি কেন সিরিয়া আক্রমণ করছেন না? হযরত আলী (রা.) তাঁর বিভিন্ন ভাষণে এই সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি খাওয়ারিজদের সাথে অবিলম্বে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে বলেন:

“এই লোকেরা অন্যায়ভাবে রক্ত ঝরিয়েছে, মানুষের জীবিকার ওপর ডাকাতি করেছে। এরা তোমাদের নিকটবর্তী শত্রু। যদি তোমরা অন্য কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে যাও, তবে আশঙ্কা আছে যে এই খাওয়ারিজরা তোমাদের পেছন থেকে আক্রমণ করবে।” [১]

এরপর হযরত আলী (রা.) খাওয়ারিজদের বাহ্যিক দরবেশির পর্দা উন্মোচন করে বলেন:

“আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক জামাত আত্মপ্রকাশ করবে যাদের তিলাওয়াতের সামনে তোমাদের তিলাওয়াত কিছুই হবে না, তোমাদের সালাত তাদের সালাতের সামনে গুরুত্বহীন হবে, তোমাদের রোজা তাদের রোজার তুলনায় ম্লান হয়ে যাবে। এই লোকেরা কুরআন মাজীদ পাঠ করার সময় একে নিজেদের পক্ষে মনে করবে, অথচ তা হবে তাদের বিরুদ্ধে দলিল। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়।” [২]

হযরত আলী (রা.) আরও বলেন: “আল্লাহর কসম! যদি তাদের মোকাবিলাকারী সৈন্যদের জানা থাকত যে নবী করীম (সা.)-এর জবান থেকে তাদের জন্য কী কী সুসংবাদের ওয়াদা করা হয়েছে, তবে তারা এই অভিযানে অংশ নিতে সামান্যতম অবহেলা করত না।”

এরপর হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে শোনা এমন একটি বিশেষ নিদর্শনের কথা বলেন, যার উপস্থিতিতে এই বিশ্বাস দৃঢ় হতো যে হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনগুলো দ্বারা এই খারিজি ফেরকাই উদ্দেশ্য। তিনি হাদীসের শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করেন:

“তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যার বাহু আছে কিন্তু কবজি নেই, বাহুর শেষে স্তনের মতো একটি বস্তু আছে যার ওপর সাদা চুল গজিয়েছে।”

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৭০৬, সহীহ সনদে; সহীহ মুসলিম, হা: ২৫১৬, বাবুতাহরীয আলা কিতালিল খাওয়ারিজ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৯২/১০

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫০৫, বাবু যিকরিল খাওয়ারিজ

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা - খণ্ড ২

ভরপুর ইয়াকিনের সাথে বললেন: “আল্লাহর কসম! আমার আশা আছে যে এরা সেই কওমই হবে... সুতরাং আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা হও।” [১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর খারেজীদের সাথে মুনাজারা:

খারেজীদের লশকরে চব্বিশ হাজার লোক शामिल হয়ে গিয়েছিল। এর আগে যে সাইয়েদেনা হযরত আলী (রা.) তাদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু করতেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর কাছে তাদের লশকরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। এতে এই হিকমতও ছিল যে যদি এভাবে কিছু লোক আলাদা হয়ে যায় তবে বাকিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া তুলনামূলক সহজ হবে। হযরত আলী (রা.) বললেন: “ভয় হচ্ছে যে তারা আপনার কোনো ক্ষতি না করে ফেলে।” [২]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বললেন: “ইনশাআল্লাহ তাআলা, এমনটি কখনোই হবে না।”

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) নিজের সবচেয়ে ভালো ইয়ামানি জোড়া পরলেন এবং তপ্ত দুপুরে একা খারেজীদের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে সব জায়গায় সিজদার চিহ্নে সুশোভিত কপাল দেখা যাচ্ছিল। তারা তাকে খোশ আমদেদ জানিয়ে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন: “আমি এজন্য এসেছি যাতে তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের অবস্থান বর্ণনা করতে পারি, কারণ তারা ঐসব ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল, তোমরাই এর মর্ম ভালো বোঝো।”

এ কথা শুনে খারেজীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল, কেউ বলছিল: “তাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।” কিন্তু অন্যরা বলল: “অবশ্যই তাদের কথা শোনা হবে।”

যখন তারা চুপ হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বললেন: “আমাকে বলুন যে আপনাদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা (আলী রা.)-এর মধ্যে কী ভুল দেখা যাচ্ছে?”

তারা বলল: “তাদের তিনটি ভুল আছে।” আপনি (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “সেগুলো কী?”

তারা বলল: “প্রথমটি হলো তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে ফয়সালাকারী বানিয়েছেন... অথচ আল্লাহর ইরশাদ হলো: ‘ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ’ (হুকুম বা শাসন কেবল আল্লাহরই)।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “দ্বিতীয় ভুলটি কোনটি?”

তারা বলল: “আলী (রা.) হযরত আয়েশা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ তো করেছেন কিন্তু কাউকে বন্দী করার অনুমতি দেননি বা গনীমতের মাল লুট করেননি। যদি তারা প্রতিপক্ষ কাফের হতো তবে (পশুর মতো) তাদের মাল ও আসবাবপত্র লুট করাও হালাল ছিল। আর যদি তারা ঈমানদার হতো তবে আলী (রা.)-এর জন্য তাদের রক্ত ঝরানোও নাজায়েজ ছিল।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “আর কিছু!!”

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫১৬, বাব আত-তাহরীজ আলা কিতালিল খাওয়ারিজ।

[২] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ১৮৬৭৮, ত: আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান। আল-ইসনাদ হাসান, আব্দুর রাজ্জাক সিকাহ, ইকরামা বিন আম্মার সাদুক ইয়াহলিত, আবু যামিল আল-হানফী সাদুক।

তারা বলল: “আলী (রা.) কেন নিজের নাম থেকে আমিরুল মুমিনীন শব্দটি মুছে ফেললেন?

[১] তিনি যদি আমিরুল মুমিনীন না হন, তবে তিনি তো আমিরুল কাফিরীনই হবেন।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাদের তিনটি আপত্তিই শান্ত মনে শোনার পর বললেন:

“বলুন তো, আমি যদি আল্লাহর সত্য কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ থেকে আপনাদের সামনে এমন কিছু কথা পেশ করি যা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না, তবে কি আপনারা আপনাদের অবস্থান থেকে সরে আসবেন?”

তারা বলল: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথম আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে বললেন:

“আপনারা বলেছেন যে, আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে বান্দাদের ফয়সালা করার অধিকার দেওয়া ভুল ছিল। তবে আমাকে বলুন, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কুরআন মাজীদে ইহরাম অবস্থায় স্থলভাগের শিকার সম্পর্কে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ...

‘হে ঈমানদারগণ! ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করে, তবে তার বিনিময় হবে অনুরূপ একটি গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায্যপরায়ণ ব্যক্তি... (যে ফিদিয়া হিসেবে কী এবং কতটুকু দেওয়া হবে)।’ [২]

এবং আল্লাহ তাআলা স্ত্রী ও স্বামীর (বিবাদ) সম্পর্কে বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

‘যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তবে পুরুষের পরিবার থেকে একজন প্রতিনিধি এবং নারীর পরিবার থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠাও।’ [৩]“

[১] মীমাংসাকারীদের সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা.)-এর নামের সাথে ‘আমিরুল মুমিনীন’ লেখা হয়েছিল, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আপত্তির কারণে তা মুছে ফেলা হয়; কারণ হযরত আলী (রা.)-এর জন্য ‘আমিরুল মুমিনীন’ শব্দ ব্যবহার করা সিরিয়াবাসীদের অবস্থানের পরিপন্থী ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দাবির প্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.) খসড়া থেকে ‘আমিরুল মুমিনীন’ মুছে ফেলেন; কারণ হযরত আলী (রা.)-এর মনে ছিল যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কাফিররা খসড়া থেকে ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দটি মুছে ‘মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ’ লেখার জন্য জেদ ধরেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তা মেনে নিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন: ‘হে আলী! এটি মুছে দাও। হে আল্লাহ! তুমি জানো যে আমি তোমার রাসূল। এটি মুছে দিয়ে এভাবে লিখে দাও: এটি সেই দলিল যার ওপর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সন্ধি করেছেন।’ (মুস্তাদরাক হাকিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৮; তারিখ-এ-তাবারী ৫/৫৪, ৫৫ ইত্যাদি)। যখন হযরত আলী (রা.) একইভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর দাবিতে খসড়া থেকে ‘আমিরুল মুমিনীন’ শব্দটি মুছে দিলেন, তখন খারেজীরা এই অযৌক্তিক আপত্তি শুরু করল যে, আলী বিন আবি তালিব তো নিজেই আমিরুল মুমিনীন পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

[২] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৯৫

[৩] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৫

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

এখন আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, মানুষের জানমালের সুরক্ষা এবং তাদের মধ্যে সন্ধি ও মীমাংসার গুরুত্ব বেশি, নাকি একটি খরগোশের প্রাণের, যার মূল্য চার দিরহাম?

তারা বলল: “আল্লাহর কসম! মানুষের জানমালের সুরক্ষা এবং তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।”

এভাবে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের জানমাল সুরক্ষিত রাখার জন্য হযরত আলী (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে সালিশ নিযুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে কোনো ভুল করেননি। ইবনে আব্বাস (রা.) নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন:

“বলুন, আমি কি এই আপত্তি দূর করতে পেরেছি?”

তারা বলল: “জি হ্যাঁ, অবশ্যই।”

এখন তিনি (রা.) বললেন: “রইল এই কথা যে, হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ তো করেছেন কিন্তু কাউকে বন্দি করেননি এবং সম্পদ লুণ্ঠন করেননি; তবে তোমরা বলো, তোমরা কি তোমাদের মা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে বন্দি করতে? তাঁর ব্যাপারে কি তোমরা তা-ই হালাল মনে করতে যা অন্য কারো ব্যাপারে হালাল মনে করো? যদি তোমরা এমনটা মনে করো তবে তোমরা কাফির; কারণ কুরআন মাজীদে আছে:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“তোমাদের মায়ের তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।” [১]

আর যদি তোমরা বলো যে আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-কে মা বলে মানিই না, তবুও তোমরা কুফরি করবে, কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

“নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ এবং নবীর স্ত্রীগণ তাদের মা।” [২]

এখন তোমরা দুটি গোমরাহির মাঝে ঝুলে আছ। যাকে চাও পছন্দ করে নাও।”

খারেজীরা হতভম্ব হয়ে এই কথাগুলো শুনছিল।

তিনি বললেন: “আমি কি এই আপত্তি দূর করেছি কি না?”

তারা বলল: “জি, অবশ্যই!”

বললেন: “আচ্ছা, এখন রইল হযরত আলী (রা.)-এর চুক্তিনামায় নিজের নামের সাথে ‘আমীরুল মুমিনীন’ শব্দ মুছে ফেলার বিষয়টি! তবে দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হৃদয়বিয়ার সময় কুরাইশদের পারস্পরিক লিখিত চুক্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন... এবং এভাবে লিখিয়েছিলেন... এটি সেই ফয়সালা যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ করেছেন। এতে কুরাইশরা বলতে লাগল: যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে মানতামই তবে আপনাকে বায়তুল্লাহ থেকে কখনোই বাধা দিতাম না, আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না... এখানে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ লিখুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: হে আলী! এখানে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ লিখে দাও। তবে লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তো হযরত আলী (রা.)-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (তিনি বিরোধী পক্ষের আপত্তির কারণে চুক্তি থেকে...

[১] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৩

[২] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬

রিসালাতের পদের উল্লেখ বাদ দেওয়া হলে, হযরত আলী (রা.) খেলাফতের পদের উল্লেখ ছেড়ে দিয়ে কী গুনাহ করেছেন?”

এই উদাহরণ দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “বলুন, আমি কি এই আপত্তি দূর করেছি?”

তারা বলল: “জি, অবশ্যই।”

খারেজীদের অধিকাংশ অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে তাদের বিশাল জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। তাদের মধ্য থেকে বিশ হাজার লোক (যারা মূলত পরে যোগ দিয়েছিল) সেখান থেকে চলে গেল, কেবল চার হাজার লোক পেছনে রয়ে গেল। [১]

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ

নাহরাওয়ানের শিবিরের এখন কেবল সেই খারেজীরাই রয়ে গিয়েছিল যারা নিজেদের আকিদার জন্য মরতে বা মারতে প্রস্তুত ছিল। তারা তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল-রাসিবি-র নেতৃত্বে নিজেদের আস্তানা থেকে বের হয়ে খালের ওপর নির্মিত “দিজজান” নামক সেতুর ওপারে চলে এল। [২]

খারেজীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আর কোনো আলোচনা হবে না, তলোয়ারই দুই দলের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। [৩]

তবে হযরত আলী (রা.) একের পর এক তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের বোঝানোর আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা মানল না এবং শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রা.)-এর দূতকেই হত্যা করে ফেলল। তখন হযরত আলী (রা.) বাহিনীকে আক্রমণের অনুমতি দিলেন। [৪]

দুই বাহিনী যখন কাছাকাছি এল, তখন আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব নির্দেশ দিল: “বল্লমগুলো ফেলে দাও এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করো।”

এদিকে হযরত আলী (রা.)-এর অশ্বারোহীরা বল্লম উঁচিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খারেজীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করল কিন্তু শীঘ্রই তাদের শক্তি ভেঙে পড়ল এবং প্রায় সবাই সেখানে নিহত হলো। হযরত আলী (রা.)-এর সাথীদের মধ্য থেকে কেবল দুইজন ব্যক্তি শহীদ হলেন। [৫]

নিহত খারেজীদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে মদিনা মুনাওয়ারায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক এই ফিতনার মূল হোতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন হারকুস বিন জুহাইর। এভাবে হযরত আলী (রা.) এই সৌভাগ্যও লাভ করলেন যে, তাঁর ধারালো তলোয়ার শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে নাহরাওয়ানের ময়দানে এমন অনেক হতভাগাকেও নির্মূল করে দিল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টিতে অগ্রণী ছিল।

অদ্ভুত গড়নের মানুষের সন্ধান

যুদ্ধের হট্টগোল থামতেই হযরত আলী (রা.) ঘোষণা করলেন: “হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের এমন এক দল সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন যারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর লক্ষ্যভেদ করে বেরিয়ে যায়। এই দলের একটি নিদর্শন তিনি এই বলেছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ...

[১] মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১৮৬, বাব মা জাআ ফিল হারুরিয়্যাহ ওয়া রিজালুহ সিকাত, ত. আল-মাজলিস আল-ইলমি পাকিস্তান।

[২] আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৮৫১; ইমাম নববী ইমাম নাসায়ীর বর্ণনার বরাতে এই সেতুর নাম “বুরজুওয়ান” উল্লেখ করেছেন (শরহে সহীহ মুসলিম, নববী: ৭/১৭২) যেখানে নাসায়ীতে এই নাম “দিজজান”। আল্লাহই ভালো জানেন কোনটি সঠিক?

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৮৯৮, ত. আর-রুশদ।

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৯২৭, ত. আর-রুশদ।

[৫] সহীহ মুসলিম, বর্ণনা নম্বর: ২৫১৬, বাব তাহরীজ আলা কতলিল খওয়ারিজ।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

...ব্যক্তি হবে যার কব্জি স্তনের মতো ফোলা হবে, তাকে খুঁজে বের করো—সে তাদের মধ্যেই হবে।“ [১]

আপনি আরও বলেছিলেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে খবর দিয়েছিলেন যে সে আমার সাথে মোকাবিলায় নিহত হবে। [২]

লোকেরা তাকে তালাশ করল কিন্তু কোনো কাজ হলো না, তখন কিছু নির্বোধের মুখ থেকে বেরিয়ে এল: “ইবনে আবি তালিব আমাদের ভাইদের ব্যাপারে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত আমরা এই নিরপরাধদের হত্যা করে ফেললাম।” [৩]

এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) কাঁদতে লাগলেন, তারপর বললেন: “তাকে তালাশ করো! আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকে মিথ্যা কথা বলা হয়নি।” লোকেরা পুনরায় তালাশ করল কিন্তু এমন কোনো লোক পাওয়া গেল না। অবশেষে আপনি নিজের সাদা খচ্চরটি আনালেন এবং নিজেই সেই ব্যক্তির লাশ তালাশ করতে লাগলেন। [৪]

নহরের কিনারায় একটি গর্তে খেজুর গাছের নিচে লাশের স্তুপ হয়ে ছিল। হযরত আলী (রা.) সেখানে নিজেই লাশগুলো উল্টাতে লাগলেন, অবশেষে তাদের মধ্য থেকে সেই অদ্ভুত আকৃতির ব্যক্তির লাশ বেরিয়ে এল, যাকে দেখামাত্রই হযরত আলী (রা.) তাকবীরের ধ্বনি উচ্চ করলেন এবং বললেন: “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।” [৫]

লোকদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তারা নিজেদের এই যুদ্ধে সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। [৬]

জঙ্গ জামাল, সিফফীন এবং নহরওয়ানের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য:

জঙ্গ জামাল এবং সিফফীনের বিপরীতে এখানে হযরত আলী (রা.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছিলেন যে আমাদের নিহতরা জান্নাতে এবং তাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। [৭] যেখানে সিফফীনের শেষে আপনি বলেছিলেন:

“قَتَلْنَا وَقَتَّلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ” (আমাদের নিহতরা এবং তাদের নিহতরা জান্নাতে যাবে।) [৮]

খারেজীদের সাথে এই যুদ্ধ শাবান মাস ৩৮ হিজরীতে হয়েছিল। [৯] এটি শীতকাল ছিল।

[১০] সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) এই অভিযানের পর কুফায় ফিরে যান এবং ঘোষণা করেন যে এই বছর আর কোনো সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে না। [১১]

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৭৪।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৩০৩ বরাতে মুসনাদে বাজ্জার।

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নম্বর: ৩৭৯১৩, ত আল-রশিদ।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৩০৩ বরাতে মুসনাদে বাজ্জার।

[৫] আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানী, হা: ৭৬৬৬, ১৫৩।

[৬] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নম্বর: ৩৭৯১৩; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২০২; সহীহ সনদে; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৩০৩।

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৩০৩ বরাতে মুসনাদে বাজ্জার।

[৮] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নম্বর: ৩৮৮০৩, ত আল-রশিদ।

[৯] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ: ১৯৪।

[১০] যালিক ফি ইয়াউমি শাত (আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮৫১) ঈসায়ী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি ৬৫৯ সাল ছিল।

[১১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নম্বর: ৩৭৯১৩, সহীহ সনদে।

নোট: কিছু যয়ীফ বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, জঙ্গ নহরওয়ানের পর হযরত আলী (রা.) সিরিয়া আক্রমণের ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু আপনার সাথীরা সাথে দেয়নি। তবে উপরে উল্লেখিত সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে হযরত আলী (রা.) খারেজীদের ওপর বিজয় লাভের পর সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাননি। তাই এই যয়ীফ বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত আলী (রা.)-এর পরিমিত মেজাজ:

হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর পরিমিত মেজাজ এমন ছিল যে, তিনি খারেজীদের মতো রক্তপিপাসু শত্রুদেরও কাফের বা মুনাফিক আখ্যা দেননি। কেউ জিজ্ঞেস করল: “এরা কি মুশরিক ছিল?” তিনি বললেন: “শিরক থেকেই তো তারা পালিয়েছিল।”

জিজ্ঞেস করা হলো: “তাহলে কি তাদের মুনাফিক মনে করা হবে?”

তিনি বললেন: “মুনাফিকরা তো আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।” (অথচ খারেজীরা জিকির ও ইবাদতে অগ্রগণ্য ছিল)।

প্রশ্ন হলো: “তাহলে তাদের কী মনে করা হবে?” তিনি বললেন: “এরা আমাদের ভাই যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।” [১]

এভাবে একবার এক ব্যক্তি খারেজীদের গালি দিতে শুরু করল তাঁকে খুশি করার জন্য, তখন হযরত আলী (রা.) বললেন: “এসব লোকদের গালি দিও না। হ্যাঁ, তারা যদি ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে তাদের সাথে লড়াই করো।” [২]

ইরাকবাসী ও শামবাসী উভয়ই ঈমানদার ও দ্বীনদার:

খারেজীদের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর এই পদক্ষেপ তাঁর খলিফা হওয়ার সত্যতার এক বড় দলিল ছিল, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী রয়েছে: “কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না যতক্ষণ না মুসলমানদের দুটি বড় দল পরস্পরের সাথে লড়াই করবে যাদের দাবি একই হবে; তাদের মাঝখান থেকে একটি পথভ্রষ্ট দল বের হবে যাদেরকে সেই দুই দলের মধ্যে হকের অধিক নিকটবর্তী দলটি হত্যা করবে।” [৩]

এই বর্ণনা থেকে যেখানে সাইয়্যিদুনা আলী বিন আবি তালিব (রা.)-এর জামাত এবং বিতর্কিত বিষয়গুলোতে তাঁর ইজতিহাদের সঠিকতা প্রমাণিত হয়, সেখানে সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.) এবং তাঁর জামাতের পূর্ণ ঈমান ও তাকওয়াও প্রকাশ পায়, কারণ বর্ণনায় উভয় দলকে হকের ওপর অর্থাৎ দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে। হ্যাঁ, হযরত আলী (রা.)-কে “হকের অধিক নিকটবর্তী” বলে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এর অর্থ হলো হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জামাতও দ্বীনদার ছিল।

এই হাদিস থেকে ইহাও স্পষ্ট হয় যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উভয়ের উদ্দেশ্য একই ছিল, অর্থাৎ হককে সমুন্নত করা। তবে ফিকহি ও ইজতিহাদি মতপার্থক্য এবং ফিতনাবাজদের ছড়ানো ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাঁরা একমত হতে পারেননি।

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদিস নম্বর: ৩৭৯৩২, সনদ হাসান, দারুল রুশদ।

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদিস নম্বর: ৩৭৯০৬, দারুল রুশদ।

মনে রাখা দরকার যে, খারেজীদের বিদআতকে ইজতিহাদি ভুল বলা যাবে না; এটি ছিল চরম পথভ্রষ্টতা। কারণ ইজতিহাদি ভুলের প্রয়োগ এমন লোকদের ক্ষেত্রে হয় যারা ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছেছেন। হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হযরত আয়েশা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেই অবস্থানে ছিলেন, যেখানে খারেজীরা ছিল স্পষ্ট পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোক।

[৩] তামরুন্নাহ মারিকাতুন ইনদা ফুরকাতিন মিনাল মুসলিমিনা ইয়াকতুলুহা আওলাত-তায়েফাতাইনি বিল হাক্ক (সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৫০, বাবু জিকরিল খারেজ; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৬৬৭)। “লা তাকুমুস সাআতু হান্না তাকতাতিল ফিআতানি আজি মাতানি দাওয়াহুমা ওয়াহিদাতুন, তামরুন্নাহ বাইনাহুমা মারিকাতুন ইয়াকতুলুহা আওলা আত-তায়েফাতাইনি বিল হাক্ক” (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নম্বর: ১৮৬৫৮, আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান)।

মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসগুলোকে ‘বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই’ এবং ‘খারেজীদের সাথে লড়াই’ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এবং ব্যাখ্যাকারগণ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, উভয় দলই মুসলিম ও মুমিন ছিল এবং উভয়ই মুজতাহিদ ছিল; যদিও ইজতিহাদে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য অবশ্যই ছিল।

আকিদা সংস্কার

খারেজীদের দমনের পর হযরত আলী (রা.) কুফায় আগমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দুই বছর সেখানেই অতিবাহিত করেন। তাঁর নিকট এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল উম্মতের ঈমানি, আকিদাগত, ইলমি এবং নৈতিক তরবিয়ত।

হযরত আলী (রা.) ঐসব নির্বোধ বন্ধুদের প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেন যারা আব্দুল্লাহ বিন সাবার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল। এই লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর শানে অতিরঞ্জন করত, তাঁকে সমস্ত মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আশ্বিয়ায়ে কেরামের মতো মাসুম মনে করত। কিছু ব্যক্তি তো তাঁকে আল্লাহর সমকক্ষ করতে শুরু করেছিল। ইবনে সাবা হযরত আলী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওসি হওয়ার মতবাদ প্রচার করেছিল যা পরবর্তীতে শিয়াদের ইমামত আকিদায় পরিণত হয়। এর ভিত্তিতে হযরত আলী (রা.)-ই ছিলেন নবীর নায়েব, ওয়ারিশ এবং বৈধ শাসক এবং তাঁর পরে ইমামত ও শাসন ক্ষমতা কেবল তাঁর সন্তানদের মধ্যেই চলতে পারত, বাকি সকল খলিফা ছিলেন জবরদখলকারী। হযরত আলী (রা.) এই গোমরাহির প্রতিবাদ করে একবার বলেছিলেন:

“হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ (সা.) এই শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের কোনো ওসিয়ত করেননি, বরং আমরা নিজেরাই নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি সঠিক পথে চললেন এবং দৃঢ়পদ থাকলেন। এরপর তিনি তাঁর মতামতের ভিত্তিতে উমর ফারুক (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করলেন, তিনিও দৃঢ়পদ ও সঠিক পথে থাকলেন ফলে দ্বীন উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেল। এরপর এখন এমন সব লোক এসেছে যারা এই দুনিয়ার প্রত্যাশী।” [১]

এক পর্যায়ে তিনি (রা.) বললেন:

“একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং ইরশাদ করলেন: ‘তোমার একটি বিষয় ঈসা ইবনে মারইয়ামের মতো; ইহুদিরা তো তাঁর প্রতি এতটাই বিদ্বেষ পোষণ করেছিল যে তাঁর মায়ের ওপর অপবাদ আরোপ করেছিল এবং নাসারারা তাঁর প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে এমন এক মর্যাদায় বসিয়েছিল যা তাঁর ছিল না (অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলেছিল)।’”

এই হাদিস শুনিয়ে তিনি (রা.) বললেন:

“হে লোকসকল! মনোযোগ দিয়ে শোনো! আমার ব্যাপারে চরমপন্থার কারণে দুই ধরনের লোক পথভ্রষ্ট হবে: এক, সেই ভালোবাসা ও প্রশংসা পোষণকারী লোক যারা আমার এমন প্রশংসা ও গুণগান করবে যা আমার জন্য সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, সেই ঘৃণা পোষণকারী লোক যাদের শত্রুতা তাদের আমার ওপর অপবাদ আরোপ করতে প্ররোচিত করবে।”

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২২৩ হাসান সনদে, ত আল-ইলমিয়াহ।

মনে রেখো! আমি নবী নই, আর আমার ওপর ওহীও অবতীর্ণ হয় না। আমি কেবল আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহর ওপর আমল করি; সুতরাং আমি আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী তোমাদের যে নির্দেশ দেব, তা পালন করা তোমাদের জন্য আবশ্যিক, চাই তোমরা তা পছন্দ করো বা অপছন্দ করো। [১]

মুর্থ ভক্তদের মাঝে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে যা দুনিয়ার আর কাউকে দেওয়া হয়নি। আপনি এর প্রতিবাদ করে বলতেন:

“আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং হাদীসের এই পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমরা তোমাদের পড়ে শুনাই।” [২]

সাবায়ীরা রটিয়ে দিয়েছিল যে, আপনি (রা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর বিরোধী ছিলেন। আপনি (রা.) এই ধরনের ভুল ধারণার প্রতি নিজের অসন্তুষ্টি স্পষ্টভাবে এভাবে প্রকাশ করেছেন:

“আল্লাহর পানাহ যে, আমি এই বুজুর্গদের ব্যাপারে সুধারণা ছাড়া অন্য কোনো কথা অন্তরে পোষণ করব।” [৩]

শুধু তাই নয়, বরং আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন:

“সাবধান! যদি আমার কাছে খবর আসে যে, কেউ আমাকে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে, তবে আমি তাকে ততগুলো বেত্রাঘাত করব যতগুলো মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে করা হয়।” (অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত যা হদ্দে কাযফে নির্ধারিত রয়েছে) [৪]

ভ্রান্ত বিশ্বাস ছড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবার, কিন্তু এই ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ রাখত না। একবার হযরত আলী (রা.) সাক্ষী পেয়ে গেলেন যে, সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ফারুক (রা.)-কে গালিগালাজ করছে। আপনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং হত্যা করতে চাইলেন, কিন্তু সঙ্গীরা ক্ষমা করে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তখন আপনি (রা.) বললেন:

“ঠিক আছে, তবে আমি যেখানে থাকব সে যেন সেখানে কিছুতেই থাকতে না পারে।” [৫]

আবদুল্লাহ বিন সাবা নজরে চলে এসেছিল। সে চাইল কোনো শাস্তির শিকার হওয়ার আগেই নিজে কোনো হাঙ্গামাপূর্ণ কাজ করে ফেলতে। লক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এর আগেই সে কিছু বিশেষ মুরিদকে এই পর্যায় পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল যে, তারা কেবল হযরত আলী (রা.)-কে খোদা, স্রষ্টা এবং সর্বশক্তিমান মানতে শুরু করেনি, বরং এই আকিদা ঘোষণা করে নিহত হওয়াকে শাহাদাতে উজমা (মহা শাহাদাত) মনে করত।

হযরত আলী (রা.) একদিন খুতবা দেওয়ার জন্য মিসরে উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ আবদুল্লাহ বিন সাবা দাঁড়িয়ে গেল এবং চিৎকার করে বলল:

“জনাব! আপনি দাব্বাতুল আরদ (অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন হিসেবে বের হওয়া প্রাণী)।”

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩৭৭

[২] আল্লাহর কসম, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং এই সহীফা (পাণ্ডুলিপি) ছাড়া এমন কোনো কিতাব নেই যা আমরা তোমাদের পড়ে শুনাই। (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৮৩, সহীহ সনদে)

[৩] লিসানুল মিজান: ৩/২৯০, সহীহ সনদে

[৪] আমি এমন কাউকে পাই না যে আমাকে আবু বকর ও উমরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, তবে আমি তাকে অপবাদ দানকারীর হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করব। (তালবীহ ও ফাতক: ৩০/৩৮৩)

[৫] তারিখে দামেশক: ৯/২৯, জীবনী: আবদুল্লাহ বিন সাবা।

হযরত আলী (রা.) চুপ থাকলেন, তখন সে বলল: “হুজুর! আপনি বাদশাহ।”

হযরত আলী (রা.) বিরক্ত হয়ে বললেন: “আল্লাহকে ভয় করো!”

কিন্তু আবদুল্লাহ বিন সাবা বলেই চলল: “আপনিই সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন, আপনিই রিজিক বণ্টন করেন।”

হযরত আলী (রা.) আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু মজলিসে উপস্থিত তার মুরিদরা একত্রিত হয়ে হাঙ্গামা শুরু করল। হযরত আলী (রা.)-

এর হিতাকাঙ্ক্ষীরা বললেন:

“যদি আপনি তাকে এখানে জনবসতির মধ্যে হত্যা করান, তবে তার ভক্তরা বিদ্রোহ করে বসবে।”

এ কথা শুনে তিনি (রা.) বললেন: “হে লোকসকল! তোমরা কি আমাকে এই কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে বাধ্য মনে করছ না, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে? যদি এই আশঙ্কা না থাকত যে, একটি দল তার কিসাসের দাবি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাবে, তবে আমি এমন লোকদের (লাশের) স্তুপ লাগিয়ে দিতাম।”

এই ঘোষণা ও ব্যাখ্যার পর তিনি (রা.) ইবনে সাবাকে শহর থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন, ফলে তাকে মাদায়েনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [১]

প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত সাবায়ীদের মৃত্যুদণ্ড:

এই ঘটনার কিছুদিন পর ইবনে সাবার কিছু অনুসারী মসজিদের দরজায় স্লোগান দিতে লাগল। হযরত আলী (রা.) তাদের ডেকে ধমক দিলেন এবং বললেন: “তোমরা ধ্বংস হও, তোমাদের উদ্দেশ্য কী?”

তারা বলল: “আপনি আমাদের রব, আপনি আমাদের খালেক এবং রাজেক।”

হযরত আলী (রা.) বললেন: “দূর হও, আমি আলী বিন আবি তালিব। আমার বাবা সুপরিচিত, আমার মা সুপরিচিত। আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচাতো ভাই।” কিন্তু তারা আগের মতোই সেই আকিদায় অটল থাকল।

তিনি বললেন: “তোমাদের সর্বনাশ হোক, আমি তোমাদের মতোই একজন বান্দা, তোমাদের মতোই পানাহার করি। যদি আমি আল্লাহর আনুগত্য করি তবে তিনি চাইলে আমাকে সওয়াব দেবেন, আর যদি আমি তাঁর নাফরমানি করি তবে আমি তাঁর আজাবের ভয় করি। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ফিরে এসো।”

কিন্তু এই সব নসিহত বৃথা গেল। তিনি (রা.) তাদের সংশোধনের জন্য আরও দুই দিন সময় দিলেন, কিন্তু তারা না মানলে তিনি (রা.) বললেন: “এখন আমি তোমাদের নিকৃষ্টতম উপায়ে হত্যা করব।”

এ কথা বলে তিনি (রা.) কুফার জামে মসজিদ এবং তাঁর বাসভবনের মাঝখানে গভীর পরিখা খনন করে তাতে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন, তারপর সেই মুরতাদদের ধরে ওই আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। [২]

[১] তারিখ দামেশক: ৫/২৯, জীবনী: আবদুল্লাহ বিন সাবা, হাসান সনদে।

[২] তারিখ দামেশক: ৫/২৯, জীবনী: আবদুল্লাহ বিন সাবা; সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৯২২, কিতাব ইস্তিতাবাতুল মুরতাদিন, বাব হকমুল মুরতাদ। ইবনে হাজার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: “নিশ্চয়ই আলী এক সম্প্রদায়কে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন যারা ছিল সাবায়ী, আবদুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী এবং তারা দাবি করত যে আলী তাদের রব।” (ফাতহুল বারী: ১২/২৯২-২৯৩)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

জিন্দিকি ও ইরতিদাদের এই চরম রূপকে, যেখানে একজন মানুষকে খোদা ও মাবুদ বানিয়ে দেওয়া হয়, হযরত আলী (রা.) দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর ইজতিহাদি ফয়সালা, যাতে তিনি নিজ অবস্থানে সঠিক ছিলেন। [১]

শিরকপূর্ণ রসম ও বিদআতের পথ রুদ্ধ করা:

হযরত আলী (রা.) শিরক, বিদআত এবং আদর্শিক বিচ্যুতি বা বক্রতার প্রতিটি পথ রুদ্ধ করার জন্য উপদেশ ও নসিহতের ধারা অব্যাহত রাখেন। শিরক ও বিদআত নির্মূল করার জন্য তিনি কবর উঁচু করার প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন, যা কিছু মূর্খ লোক নতুন করে শুরু করেছিল। এটাও জানা গিয়েছিল যে, কিছু লোক জিন্দিকি ছিল, যারা ইসলামের দাবি করা এবং মুসলমানদের মতো সমস্ত অধিকার ভোগ করা সত্ত্বেও গোপনে ঘরে মূর্তিপূজা করত।

তিনি হযরত আবুল হাইয়াজ আসাদি (রা.) এবং অন্য কিছু সঙ্গীকে এই অভিযানে নিযুক্ত করে বলেছিলেন:

“আমি তোমাদের সেই কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দিয়েছিলেন। তা হলো, কোনো মূর্তি দেখলে তা ভেঙে ফেলবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখলে তা মাটির সমান করে দেবে।” [২]

এভাবে মূর্তি ভাঙা এবং উঁচু কবরগুলো সমান করার মাধ্যমে শিরকের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। একইভাবে মূর্তিপূজারি জিন্দিকদেরও ধরা হয়েছিল এবং যখন তারা তওবা করেনি, তখন তাদের হত্যা করা হয়েছিল। [৩]

আপনজনদের থেকে অভিযোগ:

তাঁর বাহিনী এবং তাঁর চারপাশে সমবেত হওয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশ লোক ছিল ইরাক ও পারস্যের। যদিও তাদের মধ্যে নেককার, সৎ, সাহসী এবং ত্যাগী কর্মীবাহিনীও ছিল, কিন্তু সিরিয়াবাসীদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ তাদের ক্লান্ত করে দিয়েছিল এবং তাদের অনেকে নিজেদের সীমান্ত রক্ষা থেকেও পিছুটান দিচ্ছিল। এর বিপরীতে কিছু লোক এমন ছিল যারা অত্যন্ত চরমপন্থী ছিল এবং তারা তাঁর সেই বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপগুলোকে, যাতে রাজনৈতিক নমনীয়তা ছিল, বেদ্বীনি ও মুনাফেকি বলে অভিহিত করত। খারেজি মতবাদ এবং সাবায়ি মতবাদ এই চরমপন্থার কারণেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

হযরত আলী (রা.)-এর কিছু খুতবা ও বাণীতে এমন লোকদের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পায়, যারা মৌখিকভাবে রাসূলের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির দাবি করত, কিন্তু বাস্তবে আনুগত্য প্রদর্শন এবং তাঁর রণকৌশলের ওপর ভরসা করতে প্রস্তুত ছিল না। তিনি চাইলে তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি ও কঠোরতা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

[১] যদিও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইজতিহাদ অনুযায়ী এই শাস্তি সঠিক ছিল না, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ হলো: ‘লা তুআজ্জিবু বিআযাবিল্লাহ’ (আল্লাহর শাস্তি দিয়ে কাউকে শাস্তি দিও না)। (সহীহ বুখারী: ৬৯২২)। এছাড়া একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু কাফেরকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে নিষেধ করে হত্যার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, আগুনের শাস্তি দেওয়া কেবল আল্লাহর জন্যই শোভা পায়। (সহীহ বুখারী, হা: ৩০১৬)। আল্লামা আইনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-সহ সাহাবীদের একটি বড় জামাত থেকে হযরত আলী (রা.)-এর অনুরূপ আমল সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধ করাটা ‘তানজিহি’ (অপছন্দনীয়তা) অর্থে ধরা হবে। (উমদাতুল কারী: ১৪/২৬৩-২৬৪)। ইয়াহইয়া হাফেজ ইবনে হাজারও এটি লিখেছেন। (ফাতহুল বারী: ১২/২৭১)।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৪৮৭

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, রেওয়ায়াত নম্বর: ৩৩১৫৩, ২৯০০৩, ত. আর-রুশদ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ দ্বিতীয়)

আপনি বলতেন: “আমি খুব ভালো করেই জানি তোমাদের সংশোধন কীভাবে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সংশোধনের জন্য নিজেকে নষ্ট করতে পারব না।” [১]

আপনি আরও বলতেন:

“মানুষ তাদের শাসকদের জুলুমকে ভয় পায়, কিন্তু আমার অবস্থা এই যে, আমি আমার প্রজাদের জুলুমকে ভয় পাই।” [২]

৩৯ হিজরিতে যখন সিরিয়াবাসীরা সীমান্তে আক্রমণ করল, তখন হযরত আলী (রা.) মানুষকে সীমান্ত রক্ষার উৎসাহ দিয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা তাঁর অনুভূতির প্রতিফলন।

আপনি সেই খুতবায় বলেছিলেন:

“হে কুফাবাসী! যখন তোমরা শোনো যে সিরিয়ার অগ্রবর্তী বাহিনীর কোনো দল আক্রমণ করে তোমাদের কোনো শহরের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, তখন তোমাদের প্রত্যেকে ভয়ে নিজের ঘরে এমনভাবে ঢুকে পড়ো যেমন গুইসাপ বিপদের সময় গর্তে বা বিজু তার গর্তে লুকিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি ধোঁকায় আছে যাকে তোমরা ধোঁকা দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে চায়, তার উদাহরণ এমন যেন কেউ ভাঙা তীর ছুঁড়ল। তোমাদের মধ্যে এমন কোনো স্বাধীন পুরুষ নেই যে কারো ফরিয়াদ শুনবে। না তোমাদের মধ্যে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য ভাই আছে যার সাহায্যের ওপর ভরসা করা যায়।” [৩]

মতভেদ থেকে ঘৃণা:

হযরত আলী (রা.)-এর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে উম্মত ঐক্যবদ্ধ ও একমত হোক এবং মুসলমানরা সব ধরনের মতভেদ থেকে নিরাপদ থাকুক। এজন্য তাঁর চেষ্টা এটাই থাকত যে যথাসম্ভব এমন কথা বলা হোক যার ওপর সবার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি অনিবার্য পর্যায়ে না পৌঁছাত, আপনি মতভেদ করতেন না। অন্যদের তাদের ইজতিহাদি মতামতের ওপর চলতে দিতেন। নিজের পূর্বসূরি তিন খলিফার অনুসরণকে নাজাতের পথ এবং ঐক্যের মাধ্যম মনে করতেন। আপনি ফিকহ ও ইজতিহাদবিদদের বলতেন:

“তোমরা ফয়সালা করতে থাকো, যেমন আগে করতে, যতক্ষণ না মানুষ একটি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় অথবা আমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি যেমন আমার আগে আমার সঙ্গীরা ইন্তেকাল করেছেন।” [৪]

[১] নিশ্চয়ই আমি জানি কিসে তোমাদের সংশোধন হবে এবং তোমাদের বক্রতা সোজা হবে, কিন্তু আমি নিজের ক্ষতি করে তোমাদের সংশোধন করতে চাই না।

(নাহজুল বালাগাহ: ১/৫৩, আল-মাতবাতুল আদাবিয়্যাহ বৈরুত)

[২] জাতিসমূহ তাদের শাসকদের জুলুমকে ভয় পায়, আর আমি আমার প্রজাদের জুলুমকে ভয় পাচ্ছি। (নাহজুল বালাগাহ: ১/৯১, আল-মাতবাতুল আদাবিয়্যাহ বৈরুত, ১৮৮৫ খ্রি.)

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩৪, সন ৯ হিজরি।

[৪] উবাইদাহ থেকে বর্ণিত, আলী (রা.) বলেন, তোমরা সেভাবেই ফয়সালা করতে থাকো যেভাবে আগে করতে, কেননা আমি মতভেদ অপছন্দ করি, যতক্ষণ না মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় অথবা আমি সেভাবে মৃত্যুবরণ করি যেভাবে আমার সঙ্গীরা মৃত্যুবরণ করেছেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৭০৭৩, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিব আলী রা.)

স্থায়িত্বের প্রচেষ্টা এবং বিজয়সমূহ

সাধারণত ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এমন মনে হয় যে, হযরত আলী (রা.)-এর পুরো সময়কাল হাঙ্গামা, ফাসাদ এবং ফিতনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল, অথচ এই ধারণাটি ঢালাওভাবে সঠিক নয়। সাইয়্যিদুনা হযরত আলী (রা.)-এর যুগে ইসলামী বিশ্বে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ অবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তারই ছিল।

এই সময়ে বড় অভিযান মাত্র তিনটিই হয়েছিল, যাতে হযরত আলী (রা.)-কে নিজে বের হতে হয়েছিল, অর্থাৎ জামাল, সিফফিন এবং নাহরাওয়ান। জামাল একটি সাময়িক হাঙ্গামা ছিল, এর সফরে দেড়-দুই মাস সময় লেগেছিল এবং যুদ্ধটি ছিল আকস্মিক যা একদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সিফফিনের অভিযানে আপনার প্রায় চার মাস সময় ব্যয় হয়েছিল, যেখানে নাহরাওয়ানের অভিযানে কয়েক দিন লেগেছিল এবং যুদ্ধ কয়েক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়নি। এই কয়েক মাস বাদে সাধারণ অবস্থা স্বাভাবিক ছিল; এমন ছিল না যে ডাকাতরা রাত-দিন কাফেলা লুট করছে, বিদেশি আক্রমণকারীরা প্রতিনিয়ত সীমান্ত অতিক্রম করছে এবং মানুষ নিজেদের ঘরে অনিরাপদ হয়ে পড়েছে।

পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের মতোই এই যুগেও সীমান্ত পাহারা দেওয়া, কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করা, অধিকৃত এলাকাগুলোতে বিদ্রোহ দমন এবং ইসলামের শান-শওক ও প্রভাব বজায় রাখার ধারা অব্যাহত ছিল। এটি ভিন্ন কথা যে, অন্যান্য বড় বড় ঘটনার শোরগোলে এই দিকগুলো খুব একটা ফুটে ওঠেনি। খেলাফতে ইসলামিয়া বিভক্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হিজাজ, ইরাক, ইরান, খোরাসান এবং প্রাচ্যের বিশাল এলাকা আপনার অধীনে ছিল এবং আপনার মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রস্তুত ছিল। [১]

হযরত আলী (রা.)-এর প্রাদেশিক গভর্নরগণ:

শাসন ব্যবস্থায় হযরত আলী (রা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং তাঁর ভাই উবাইদুল্লাহ (রা.) ও কুতসাম (রা.)-এর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বসরার গভর্নর ছিলেন। উবাইদুল্লাহ (রা.) ইয়েমেনের এবং কুতসাম (রা.) হিজাজের, যেখানে খোরাসানের বিশাল ও বিস্তৃত প্রদেশ আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। [২] এঁরা ছাড়াও আরও কয়েক ডজন বিশিষ্ট সাহাবী এবং অসংখ্য তাবয়ী আপনার গভর্নর ছিলেন।

[১] এখানে এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, কিছু লোক কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই লিখে দিয়েছেন যে, শেষ বছরগুলোতে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে শুধু কুফা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা অবশিষ্ট ছিল। এই দাবি ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী। শাম (সিরিয়া) এবং মিসর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পরও হিজাজ, পবিত্র মক্কা-মদিনা, ইয়েমেন, ইরাক, জাজিরা, ইরান, খোরাসান এবং বেলুচিস্তানসহ ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা হযরত আলী (রা.)-এর অধীনে ছিল। কুতুবুল হাদিস ও তারিখ (হাদিস ও ইতিহাসের কিতাবসমূহ) দেখলে এবং বিশেষ করে গভর্নরদের তালিকা পর্যালোচনা করলে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এর বিপরীতে কোনো দলিল নেই। এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩২।

পারস্য, কিরমান এবং পাহাড়ি অঞ্চলের অভিযানসমূহ:

হযরত আলী (রা.)-এর অনুগতদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ভাই শারিক বিন যিয়াদের নামও উল্লেখযোগ্য ছিল। সিরিয়াবাসীদের সাথে হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধের দিনগুলোতে পারস্য ও কিরমানবাসী যখন কর দিতে অস্বীকার করল, তখন হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান চার হাজার সৈন্য নিয়ে এই অভিযানে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। একইভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের কিছু গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করে কর দিতে অস্বীকার করলে হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে বসরার শাসক হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস (রা.) গিয়ে তাদের দমন করেন। [১]

মার্ভের অভিযান:

জঙ্গ জামালের পর (৩৬ হিজরি) মার্ভের পারস্য বংশোদ্ভূত শাসক মাহ্‌ইয়াহ হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং নিয়োগপত্র প্রার্থনা করেন। তিনি ওই অঞ্চলের কৃষক ও প্রধানদের নামে একটি পত্র লিখে দেন যাতে উল্লেখ ছিল যে, মাহ্‌ইয়াহকে ইসলামি খিলাফতের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়েছে। কিছুদিন পর মার্ভের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। হযরত আলী (রা.) খুলাইদ বিন কুররাহ (ইবনে তারিফ ইয়ারবুয়ি)-কে সেখানে পাঠান, যিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। [২]

নিশাপুরের অভিযান:

জঙ্গ সিফফিন থেকে হযরত আলী (রা.)-এর প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর (৩৭ হিজরি) অগ্নিপূজকরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; কারণ কিসরার বংশের এক রাজকন্যা কাবুল থেকে খোরাসানের গুরুত্বপূর্ণ শহর নিশাপুরে চলে এসেছিল এবং অগ্নিপূজকরা তার চারপাশে সমবেত হয়েছিল। হযরত আলী (রা.)-এর সেনাপতি খুলাইদ বিন কাস অবিলম্বে গিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন, আর রাজকন্যা বন্দি হন। [৩]

বন্দি রাজকন্যার সম্মাননা:

রাজকন্যাকে কোনো প্রকার কষ্ট না দিয়ে কুফায় আনা হলো। হযরত আলী (রা.) বললেন: “তুমি কি আমার ছেলে হাসানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পছন্দ করবে?” তিনি বললেন: “আমি এমন কাউকে বিবাহ করব না যে অন্য কারো অধীনে থাকে।” হযরত আলী (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করলেন কিন্তু তিনি বললেন: “আমি কেবল আপনার সাথে বিবাহে রাজি আছি।” হযরত আলী (রা.) অস্বীকার করে বললেন: “আমি তো বয়োবৃদ্ধ।”

[১] তারিখ তাবারী: ৫/১৩৭, ১৩৮।

[২] তারিখ তাবারী: ৩/৫৫৮।

[৩] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৫৩, ১৫৪।

রাজকুমারী অন্য কারো সাথে বিবাহে সম্মত হলেন না। এটি দেখে উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন পারসিক বলতে লাগলেন:

“আমিরুল মুমিনিন! আমি তার আত্মীয়, এই মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন।”

হযরত আলী [রা.] বললেন: “এই মেয়ে তার সিদ্ধান্তের মালিক নিজেই।”

তারপর রাজকুমারীকে এই কথা বলে সম্মানের সাথে বিদায় করে দিলেন:

“যেখানে ইচ্ছা চলে যাও, যাকে খুশি বিবাহ করো। তোমার কোনো ক্ষতি হতে পারবে না।” [১]

হযরত আলী [রা.]-এর পতাকাতলে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রা.]-এর ছাত্রদের মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রা.]-এর ছাত্ররা হযরত আলী [রা.]-এর বিশেষ অনুসারী ছিলেন। তারা সিরিয়াবাসীদের (আহলে শাম) সাথে যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন না এবং অন্য কোনো রণাঙ্গনে নিজেদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাদের যেন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের অগ্রজ হযরত উবাইদাহ সালমানী [রা.] হযরত আলীর কাছে আরজ করলেন:

“আমিরুল মুমিনিন! আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও আমাদের এই (সিরিয়াবাসীদের সাথে) যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে। অন্যদিকে আপনার এবং মুসলমানদের জন্য মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও অপরিহার্য। অতএব আপনি আমাদের কাফেরদের সীমান্তে মোতায়েন করে দিন যাতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে পারি।”

হযরত আলী [রা.] রাবী বিন খুসাইমকে আমির নিযুক্ত করে এই ব্যক্তিদের কাজভিন এবং ‘রে’-এর সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন, এই বাহিনীর যাত্রার জন্য বিশেষভাবে পতাকা তৈরি করা হয়েছিল। [২]

মুর্তাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ:

ইসলামী খিলাফতের একটি অঞ্চলের মানুষ মুর্তাদ হয়ে তাদের পৈতৃক ধর্ম খ্রিস্টধর্ম পুনরায় গ্রহণ করে। হযরত আলী [রা.] হযরত মাকিল বিন কায়েস [রা.]-কে পাঠালেন, যিনি প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সেই মুর্তাদদের ওপর বিজয় লাভ করেন এবং তাদের অনেককে বন্দি করেন। [৩]

বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে অগ্রযাত্রা:

৩৯ হিজরির শুরুতে হযরত আলী [রা.]-এর পক্ষ থেকে বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে আরও অগ্রযাত্রা হয়; কারণ হযরত উমর [রা.]-এর সময় পর্যন্ত মাকরান অঞ্চল বিজয় হয়ে গিয়েছিল। এরপর ছিল ‘কান্দাবিল’ অঞ্চল। এলাকায় পানি ও খাদ্যের অভাব এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে হযরত উমর [রা.] পরবর্তী অগ্রযাত্রা স্থগিত করেছিলেন। [৪] হযরত আলী [রা.]-ও...

[১] আল-আখবারত তিওয়াল, পৃ. ১৫৩, ১৫৪

[২] আল-আখবারত তিওয়াল, পৃ. ২৬৫ ... এই ঘটনাটি সিফফিনের যুদ্ধের পরের বলে মনে হয়; কারণ সিফফিনের যুদ্ধে উবাইদাহ সালমানী এবং ইবনে মাসউদের অন্যান্য ছাত্ররা উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির চেষ্টা করছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৫০৫)

[৩] শারহু মাআনিল আসার লিত-তহাবী, হা: ৫১১৩, কিতাবুস সিয়্যার, বাবু ইয়াকুনুর রাজুলু বিহি মুসলিমান

[৪] উয়ুনুল আখবার লি ইবনে কুতাইবা: ২/২১৭, ত. আল-ইলমিয়াহ; তারিখুত তাবারী: ৩/১৮২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

নিজের খিলাফতকালে দুই দশকের বিরতির পর তিনি এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যান।

কানদাবিল ও কাইকান অভিযান:

হযরত আলী-এর নির্দেশে হারিস বিন মুররা আল-আবদি মাকরান থেকে এগিয়ে গিয়ে ‘কানদাবিল’-এর সীমানায় প্রবেশ করেন এবং কাইকানের পাহাড়গুলোতে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। তারা বিজয় লাভ করেন। তাদের পাঠানো গনিমতের মাল যখন কুফায় পৌঁছাল, তখন তা এত বেশি ছিল যে একদিনেই এক হাজার গোলাম বণ্টন করা হলো। হারিস এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় শত্রু একটি গিরিপথে অবরোধ করে তাদের ঘিরে ফেলে। হারিস তার সঙ্গীদেরসহ যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। [১]

অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে নাসারাদের ভূমিকা:

হযরত উসমান গনি-এর শাহাদাত থেকে শুরু করে হযরত আলী আল-মুরতাজা-এর সময়কাল পর্যন্ত অনেক ফিতনার নেপথ্যে স্থানীয় নাসারাদের হাতও ছিল। এই লোকেরা বেশিরভাগই ইরাক ও সিরিয়ার আরবের সাথে সংযুক্ত সীমান্তগুলোতে বসবাস করত। তাদের কিছু ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি বিদেশি খ্রিস্টান শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি খিলাফত এবং মুসলিম ঐক্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনে অংশ নিত এবং এ ধরনের প্রতিটি দলকে সাহায্য করত।

খুরীত বিন রাশিদের ষড়যন্ত্রসমূহ:

এই প্রসঙ্গে খুরীত বিন রাশিদের উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ, যে বনু নাজিয়া গোত্রের প্রধান ছিল এবং জঙ্গ জামাল থেকে জঙ্গ নাহরাওয়ান পর্যন্ত হযরত আলী-এর সাথে ছিল। কিন্তু এরপর ৩৮ হিজরিতে সে হঠাৎ হযরত আলী-এর ওপর ধর্মহীনতা ও মিছাত বিক্রির অভিযোগ এনে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। সে মুসাইলামা কাযযাবের মতো অত্যন্ত ধূর্ত রাজনীতিবিদ ছিল, প্রত্যেকের সাথে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলত। খারেজিদের বলত যে, হযরত আলী তাহকিমকে সঠিক মেনে নিয়ে নাজায়েয কাজ করেছেন। সাধারণ মুসলমানদের বলত যে, আমি হযরত আলী-এর ফয়সালাগুলো মানি। হযরত উসমান-এর শহীদ ও মজলুম হওয়ার কথাও স্বীকার করত। যারা সরকারের বিদ্রোহী হয়ে কর দেওয়া বন্ধ করত, তাদেরও সে বাহবা দিত এবং যারা মুরতাদ হয়ে যেত তাদেরও উৎসাহিত করত।

[২]

খুরীত বিন রাশিদের বিরুদ্ধে অভিযান:

হযরত আলী এবং খুরীত বিন রাশিদের মধ্যে দীর্ঘ পত্রালাপ চলতে থাকে কিন্তু কোনো ফলাফল আসেনি। ইরাক এবং পারস্য উপসাগরের...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭, ত ত আল-হিলাল।

ভূগোলে আগ্রহী আমাদের বন্ধু শ্রদ্ধেয় আদনানুল হক (সৌদি আরব প্রবাসী)-এর গবেষণা অনুযায়ী ‘কাইকান’ এবং ‘কানদাবিল’ বলতে বেলুচিস্তানের সেই এলাকাগুলোকে বোঝায় যা সিন্ধুর সাথে লেগে আছে। এখান থেকে ‘কিরখার’ পর্বতমালা শুরু হয়ে সিন্ধুর সীমানায় গিয়ে মিশেছে। সেই যুগে এই পাহাড়ি অঞ্চলকে ‘কাইকান’ বলা হতো। পরবর্তীতে এটি ‘খুজদার’ নামে পরিচিত হয়। কানদাবিলের বর্তমান নাম ‘ঝাল মাগসি’। বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটটি দেখুন:

www.balochistan.gov

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/১২৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

খ্রিস্টানরা তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে গেল। তার কওম বনু নাজিয়ার অধিকাংশ লোক যারা খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলামে প্রবেশ করেছিল, তারা পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে গেল। আহওয়াজের অনারব গোত্রগুলোও তার চারপাশে একত্রিত হলো, এছাড়া চোর ও ডাকাতদের দলও তার সাথে এসে যোগ দিল। [১] অবশেষে হযরত আলী (রা.) হযরত মাকিল বিন সিনান (রা.)-কে একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে তার দমনের জন্য পাঠালেন। [২]

এই যুদ্ধে হযরত আবু তুফাইল (রা.)-ও ছিলেন, [৩] তিনি এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন:

“আমি সেই বাহিনীতে ছিলাম যাকে হযরত আলী (রা.) বনু নাজিয়ার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। যখন আমরা সেই লোকদের কাছে পৌঁছালাম, তখন দেখলাম যে তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের আমির একটি দলকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমরা কারা?’ তারা বলল: ‘আমরা খ্রিস্টান ছিলাম, তারপর মুসলমান হয়েছি এবং এখনও ইসলামের ওপর কায়েম আছি।’ আমির বললেন: ‘তোমরা একপাশে হয়ে যাও।’ তারপর দ্বিতীয় দলকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমরা কারা?’ তারা বলল: ‘আমরা খ্রিস্টান ছিলাম এবং এখনও খ্রিস্টধর্মের ওপর অটল আছি।’ আমির তৃতীয় দলকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তোমরা কারা?’ তারা বলল: ‘আমরা খ্রিস্টান ছিলাম, তারপর মুসলমান হয়েছি, এরপর আমরা দেখলাম যে খ্রিস্টধর্মের চেয়ে উত্তম কোনো দীন নেই, তাই আমরা পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে গেছি।’”

আমির বললেন: ‘ইসলাম গ্রহণ করো।’ তারা অস্বীকার করল। এর ওপর আমির তার সাথীদের বললেন:

“আমি তিনবার মাথায় হাত বুলাব। (যখন তৃতীয়বার হাত বুলাব তখন) তোমরা আক্রমণ করে দিও।”

অতঃপর মুসলমানরা তেমনই করল, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করল এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করে নিল। [৪]

এই লড়াই ছিল অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যাতে শত্রুদের সর্দার খুরীত বিন রাশিদ পালিয়ে আত্মগোপন করল এবং তার সাথে একত্রিত হওয়া অবশিষ্ট দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। [৫]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১২২ থেকে ১২৬

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩২

[৩] তার নাম আমির বিন ওয়াসিলা। সমস্ত সাহাবীর পরে ১০০ হিজরী বা ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ২৯০০৮; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৬৮৯৫

এই বর্ণনার পর ইমাম বায়হাকী ইমাম শাফেয়ীর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন: *لقد قتل من لم يزل على النصرانية و من ارتد* (হযরত আলী (রা.) সেই লোকদের সাথেও জিহাদ করেছেন যারা খ্রিস্টধর্মের ওপর অটল ছিল এবং তাদের সাথেও যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।)

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩২

শাহাদাতের বিয়োগান্তক ঘটনা

সাইয়্যিদুনা হযরত আলী (রা.) এখন তেষটি (৬৩) বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি যে পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের শাসনভার লাভ করেছিলেন, তা ছিল তাঁর ফিকহী প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাওয়াঙ্কুল এবং ইখলাসের এক বিরাট পরীক্ষা। হযরত আলী (রা.) আল্লাহ তাআলার দানকৃত তাওফীকের মাধ্যমে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে এই কঠিনতম পরীক্ষাগুলো অতিক্রম করেছিলেন।

৪০ হিজরি সনের দিনগুলো দ্রুত অতিবাহিত হচ্ছিল, সাইয়্যিদুনা হযরত আলী (রা.) অনুভব করছিলেন যে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজে ফাসাদের উপাদান অবশিষ্ট রয়েছে এবং খোদ তাঁর অনুসারীদের মধ্যেই এমন লোক বিদ্যমান যারা শরীয়তের ওপর তাঁর দৃঢ়তা, ব্যক্তিগত স্বার্থের বারবার কোরবানি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি তাঁর উদারতায় অসন্তুষ্ট। ইরাক ও পারস্যে বসবাসকারী এই গোষ্ঠী কায়সার ও কিসরার মতো জাঁকজমকপূর্ণ শাসকদের দ্বারাই প্রভাবিত হতো এবং হযরত আলী (রা.)-এর সাদাসিধে জীবন ও অনাড়ম্বরতা তাদের দৃষ্টিতে একটি ত্রুটি ছিল। আপনার এই অনুভূতিও ছিল যে অভ্যন্তরীণ শত্রুরা আপনার সন্ধানে রয়েছে এবং যেকোনো সময় প্রাণঘাতী হামলা করতে পারে।

এই দিনগুলোতে বনু মুরাদের এক ব্যক্তি আপনাকে অবহিত করে বলল: “আপনার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করুন, বনু মুরাদের কিছু লোক আপনাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে।” আপনি (রা.) প্রশান্তির সাথে উত্তর দিলেন: “প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন হেফাযতকারী ফেরেশতা থাকে, যারা তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, কিন্তু যখন তকদীরের লিখন চলে আসে তখন তারা উভয়ই আলাদা হয়ে যায়, নিঃসন্দেহে মৃত্যু নিজেই একটি শক্তিশালী ঢাল।” [১]

দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা:

হযরত আলী (রা.) আগেও দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নির্লিপ্ত ছিলেন। এখন এই নশ্বর জগতের প্রতি আরও বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে খুতবা দেওয়ার সময় বললেন: “হে আল্লাহ! আমি এই লোকদের প্রতি বিরক্ত হয়ে গেছি এবং তারাও আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে গেছে। আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তারাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমাকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে আরাম দাও এবং তাদেরকে আমার থেকে মুক্ত করে স্বস্তি দাও।”

তারপর নিজের দাড়িতে হাত রেখে বললেন: “তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তিকে কেউ কি বাধা দেবে না যে সে আমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত করে দেবে।” [২]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩৪, ত. সাদির

[২] মুসাম্মাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ১৮৬৭০ সহীহ সনদে, ত. আল-মজলিসুল ইলমি পাকিস্তান

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

সেই দিনগুলোতে উপদেষ্টারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে আপনি আপনার উত্তরসূরি নিযুক্ত করুন, কিন্তু আপনি বলেছিলেন: “না, বরং আমি তোমাদেরকে সেভাবেই ছেড়ে যাব যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ (কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি নিযুক্ত না করেই উম্মতকে) ছেড়ে গিয়েছিলেন।”

সঙ্গীরা ভয় পাচ্ছিলেন যে এভাবে আরও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাই তারা আরজ করলেন: “এই অবস্থায় আপনি আপনার রবের কাছে গেলে কী জবাব দেবেন?”

তিনি বললেন: “আমি এটাই বলব, হে আমার রব! আপনি যতক্ষণ উপযুক্ত মনে করেছেন আমাকে এই লোকদের মাঝে রেখেছেন, তারপর যখন আপনি আমাকে তুলে নিয়েছেন তখন আপনিই তাদের দায়িত্বশীল, আপনি চাইলে তাদের সংশোধন করে দিন অথবা চাইলে বিপথগামী হতে দিন।” [১]

খারেজীরা হত্যার ষড়যন্ত্র তৈরি করে:

নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) খারেজীদের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, কিন্তু খারেজী মানসিকতার অনেক লোক মুসলিম সমাজে বিদ্যমান ছিল যারা হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে আসীন সাহাবীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করত। তাদের মতে, এই বড় বড় সাহাবীরাই সমস্ত গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিলেন এবং তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমেই ইসলামী সমাজকে নিরাপদ করা সম্ভব ছিল। তাদের তিন ব্যক্তি: আবদুর রহমান বিন মুলজাম মুরাদী, বারাক বিন আবদুল্লাহ তামীমী এবং আমর বিন বকর এই বিষয়ে একমত হলো যে, ইসলামী রাজনীতির তিন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে একই সময়ে শহীদ করে দেওয়া হবে।

তারা তাদের তলোয়ারগুলোকে বিষাক্ত করল এবং ১৭ই রমজানুল মুবারক এই তিন মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বের ওপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নিল। আবদুর রহমান বিন মুলজাম কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হলো যাতে হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করতে পারে। বারাক বিন আবদুল্লাহ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর হামলার জন্য সিরিয়ার দিকে বেরিয়ে পড়ল এবং আমর বিন বকর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে খতম করার জন্য মিসরের পথ ধরল। [২]

১৭ই রমজানুল মুবারকের সকালে তারা তিনজনই নিজ নিজ লক্ষ্যের ওপর হামলা করল, সাইয়েদেনা আমীর মুয়াবিয়া (রা.) আহত হলেন কিন্তু বেঁচে গেলেন। হামলাকারী ধরা পড়ল এবং তাকে হত্যা করা হলো। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) সেই দিন অসুস্থতার কারণে হযরত খারিজা বিন হুজাফা (রা.)-কে ফজরের নামাজ পড়াতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমর বিন বকরের বিষাক্ত তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন, এখানেও ঘাতককে ধরে হত্যা করা হলো। [৩]

আবদুর রহমান বিন মুলজাম এবং শাবীব বিন নাজরাহ:

আবদুর রহমান বিন মুলজামকে খলিফাতুল মুসলিমীনের ওপর হামলা করতে হতো। আবদুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ইবাদতগুজার এবং পরহেজগার মানুষ ছিল, কুরআন মাজীদের হাফেজ ও ক্বারী ছিল কিন্তু পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট হয়ে খারেজীদের সক্রিয় কর্মী হয়ে গিয়েছিল। [৪]

হযরত আলী (রা.)-কে হত্যা করার সংকল্প করে সে সরাসরি কুফায় পৌঁছাল। সেখানে শাবীব বিন নাজরাহ নামক অন্য এক খারেজীকেও সাথে মিলিয়ে নিল।

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১০৬৮ সহীহ সনদে।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/২৩, মুসা বিন উসমান থেকে বর্ণিত।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩১।

[৪] আল-ওয়াকী বিল-ওয়াফায়াত: ৩/১৮, ত: দার সাদির।

নোট: আবদুর রহমান বিন মুলজামের সম্পর্ক ছিল ইয়ামেনী গোত্র হিমইয়ারের শাখা বনু মুরাদের সাথে।

সতেরো রমজানুল মুবারকের রাত ছিল জুমার রাত। দুজনেই মসজিদে সাইয়্যিদুনা আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর অপেক্ষায় ওত পেতে বসে রইল। [১]

ঘাতক হামলা ও শাহাদাত

আমিরুল মুমিনীন সাইয়্যিদুনা আলী আল-মুরতাজা (রা.) সাহরি শেষ করে ফজরের নামাজের জন্য শেষ রাতের অন্ধকারে মসজিদে আসলেন। জানুয়ারি মাস ছিল। কুফায় প্রচণ্ড শীত পড়ছিল। তিনি অভ্যাসমত মানুষকে নামাজের জন্য ডাকতে ডাকতে আসছিলেন, তাঁর ঠোঁটে এই ধ্বনি ছিল: “আস-সালাত... আস-সালাত...”

তিনি মসজিদের চৌকাঠে পৌঁছেছিলেন এমন সময় আবদুর রহমান ও শুবাইব তলোয়ার নিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে এল এবং তাহকিমের স্লোগান দিল: “ইন্নিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ...”

তারপর চিৎকার করে বলল: “শাসনকর্তৃত্ব কেবল আল্লাহরই, হে আলী! না তোমার, না তোমার সাথীদের।”

এ কথা বলে প্রথমে শুবাইব তলোয়ার চালাল কিন্তু হযরত আলী (রা.) বেঁচে গেলেন। ইতিমধ্যে অন্য দিক থেকে আবদুর রহমান মাথায় সজোরে আঘাত করল, তলোয়ার কপালে ঢুকে গেল, তিনি (রা.) রক্তাক্ত হয়ে গেলেন।

তিনি (রা.) এই অবস্থাতেই আওয়াজ দিলেন: “এরা যেন পালাতে না পারে।”

লোকজন দৌড়ে এলে আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম ও শুবাইব তাদের ওপর আক্রমণ করল যাতে পথ করে বেরিয়ে যেতে পারে। শুবাইব তো পালিয়ে গেল, তবে ইবনে মুলজাম ধরা পড়ল।

হযরত আলী (রা.) তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: “তোমাকে কোন জিনিস এই কাজে প্ররোচিত করল?”

সে এই প্রশ্ন উপেক্ষা করে গর্বের সাথে বলল: “হাজার (দিরহাম) দিয়ে তলোয়ার কিনে তাতে হাজারের বিষ মাখিয়েছি। চল্লিশ দিন ধরে এই তলোয়ার শান দিয়েছি এবং দোয়া করেছি যেন এর দ্বারা নিকৃষ্টতম মানুষ নিহত হয়। যদি পুরো শহরের মানুষ এর আঘাতের নিচে আসত, তবে আল্লাহর কসম! তাদের একজনও বাঁচত না।” [২]

হামলাকারীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ

লোকজন এই হতভাগাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু হযরত আলী (রা.) তার বিচার স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: “একে খেতে দাও, পান করতে দাও, নরম বিছানা দাও, বন্দিদশায় ভালো অবস্থায় রাখো। যদি আমি বেঁচে যাই তবে চাইলে মাফ করে দেব, চাইলে প্রতিশোধ নেব। আর যদি আমি মারা যাই তবে তোমরা একে তলোয়ারের মাত্র একটি আঘাতে হত্যা করবে, তার লাশের কোনো ক্ষতি করবে না, আমি কাল আল্লাহর দরবারে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।” [৩]

বিষাক্ত তলোয়ারের জখম থেকে পুরো শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ছিল এবং তাঁর (রা.) বেঁচে থাকার আশা আর ছিল না।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/১৪৩; এবং আল-হাকিম এতে তাঁর সনদে কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন: আমিরুল মুমিনীন আলী (রা.)-এর শাহাদাতের আলোচনা, ৩/৫৩।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৫/১৪৪, ১৪৬।

[৩] আস-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাকী, হা: ১৬০৫৯; তাহযীব আল-আসার লিত-তাবারী, ৩/৫৭, ত. আল-মাদানী; তারিখ আল-তাবারী: ৩/৯৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৪৬৯১।

শেষ অসিয়ত:

শেষ সময়ে সন্তানদেরকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন, বললেন:

“হাসান! আমি তোমাকে এবং আমার সকল সন্তানকে আল্লাহকে ভয় করতে থাকার অসিয়ত করছি। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর অবিচল থেকে... আল্লাহর রশিকে শত্রুভাবে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখো... এতিমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো... প্রতিবেশীদের খেয়াল রেখো, কুরআন মাজীদে ওপর আমল করার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে চেষ্টা করো... সালাতের অত্যন্ত গুরুত্ব দিও কারণ এটি তোমাদের নবী ﷺ-এর শেষ অসিয়ত ছিল... আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করতে থেকে... জাকাত আদায় করো কারণ এটি রবের ক্রোধকে প্রশমিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মর্যাদা রক্ষা করো কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ব্যাপারে এই তাকিদই দিয়েছেন। ফকির, মিসকিন, গোলাম ও দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। মানুষের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বলো, সৎ কাজের আদেশ দিতে থাকো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো, নেক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ বা শত্রুতার কাজে সাথে থেকে না।” [১]

শেষ সময়ে আপনার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলেন: “যদি আপনি শহীদ হয়ে যান তবে কি আমরা হাসান (রা.)-এর বায়আত গ্রহণ করব?” হযরত আলী (রা.) উত্তরে বললেন: “আমি এর আদেশও দিচ্ছি না, আবার নিষেধও করছি না।” [২]

শাহাদাত ও দাফন:

এরপর আপনি ﷺ অনবরত “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” জিকির করতে থাকলেন যতক্ষণ না রুহ নশ্বর দেহ থেকে বিদায় নিল। তখনও ১৭ রমজানুল মোবারকের সূর্য উদিত হয়নি যে, ঈমান ও একিন, ইলম ও হিকমত, জিহাদ ও রাজনীতি এবং বীরত্ব ও সংকল্পের এই জগত আলোকিতকারী সূর্য দুনিয়াকে অন্ধকারে রেখে চলে গেল।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দাফন দারুল আমারা ভবনের ভেতরেই করা হয়েছিল, কারণ আশঙ্কা ছিল যে খারেজীরা সুযোগ পেয়ে কোথাও লাশের অবমাননা না করে। [৩] জানাজার সালাত সাহেবজাদা সৈয়দনা হাসান (রা.) পড়িয়েছিলেন। [৪] খিলাফতের মেয়াদ ছিল চার বছর নয় মাস। [৫] রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরদাহু।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৪৭, ১৪৮

[২] লা আমিরুকুম ওয়া লা আনহাকুম (তারিখুত তাবারী: ৫/১৪৬, ১৪৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৫)

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৫১, ১৫২

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৯৯

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/১৫৩

সীরাতে আলভীর কিছু উজ্জ্বল দিক

হযরত আলী (রা.)-এর মহান সত্তা অসংখ্য গুণাবলির আধার ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি সুনতের ওপর আমল করতেন; প্রজাপালন, পরহেজগারী এবং খোদাভীতিতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী তিন খুলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। তিনি প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করতেন। অধিক পরিমাণে রোজা রাখতেন। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা তাঁর প্রিয় কাজ ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অনুরোধে তাঁর এক সঙ্গী হযরত আলীর সীরাতের চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন:

“তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী, শক্তি ছিল অত্যন্ত মজবুত, তিনি সোজাসাপ্টা ও পরিষ্কার কথা বলতেন। ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করতেন... তাঁর সত্তা থেকে ইলমের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতো। দুনিয়া এবং এর চাকচিক্য থেকে তিনি বিমুখ ছিলেন। রাতের অন্ধকার তাঁর কাছে ভালো লাগত। আল্লাহর কসম! রাতের ইবাদতে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরত... দীর্ঘ সময় চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকতেন, নিজের হাতের তালু উল্টে নিজের সাথে কথা বলতেন... সাধারণ জীর্ণ পোশাক পরিধান করতেন এবং সাধারণ মানুষের মতো খাবার খেতেন... কিন্তু তাঁর গান্ধীর্যের কারণে আমাদের তাঁর সামনে কথা বলার সাহস হতো না... হাসলে দাঁতগুলো সাদা মুক্তার মালার মতো ঝকঝক করত, দীনদারদের সম্মান করতেন, গরীবদের ভালোবাসতেন। কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিও তাঁর কাছে অন্যায় কাজে সমর্থনের আশা করতে পারত না এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি তাঁর ইনসাফ থেকে নিরাশ হতো না। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাঁর রাতের কিছু দৃশ্য দেখেছি, রাত যখন তার কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, তারকারাজি ডুবে যাচ্ছে এবং সাইয়েদনা আলী মসজিদের মেহরাবে নিজের দাড়ি হাত দিয়ে ধরে একজন ব্যথিত মানুষের মতো কাঁদছেন, এভাবে ছটফট করছেন যেন তাঁকে কোনো সাপ বা বিছু দংশন করেছে। আমার কানে আজও তাঁর সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বলছিলেন: হে দুনিয়া! তুই কি আমাকে প্রলুব্ধ করতে চাস? তুই কি আমার সাথে খুনসুটি করছিস? আমার থেকে কি কোনো প্রত্যাশা রাখিস? যা, অন্য কাউকে ধোঁকা দে। আমি তোকে তিন তালুক দিয়ে দিয়েছি, যার পর পুনরায় সম্পর্কের কোনো অবকাশ নেই... তোর আয়ু সংক্ষিপ্ত... তোর সফলতা তুচ্ছ, তোর বিপদসমূহ অত্যন্ত ভয়াবহ। হায়! পাথেয় কত সামান্য, সফর কত দীর্ঘ এবং পথ কত নির্জন!!”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এটি শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। [১]

[১] সিফাতুস সাফওয়াহ লি-ইবনিল জাওয়যী: ১২২/১

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

একবার এক গভর্নর আপনার কাছে উপস্থিত হলেন, খাবারের সময় হলে আপনি মাটির একটি হাঁড়ি আনালেন যাতে শুধু ছাতু ছিল, আপনি পানি মিশিয়ে নিজে খেলেন এবং গভর্নরকেও খাওয়ালেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে বললেন:

“আমিরুল মুমিনিন! আপনি ইরাকে বসবাস করেও এই খাবার খান, অথচ এখানকার সাধারণ মানুষের খাবার এর চেয়ে অনেক উন্নত?”

তিনি বললেন: “আমি পছন্দ করি না যে আমার পেটে হালাল ছাড়া অন্য কিছু যাক।” [১]

ইলমি শান এমন ছিল যে বড় বড় সাহাবায়ে কেলাম আপনার ফতোয়ার ওপর নির্ভর করতেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর কাছে কেউ মোজার ওপর মাসেহ করার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন: “হযরত আলীর কাছে জিজ্ঞাসা করো, তিনি এই বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জানেন কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সফরে যেতেন।” [২]

হযরত উমর (রা.) নিজে অনেক বড় ফকিহ হওয়া সত্ত্বেও বলতেন: “আমাদের মধ্যে আলী সবচেয়ে ভালো বিচারক।” [৩]

হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ফতোয়ার জন্য হযরত আলী (রা.)-এর ওপর নির্ভর করতেন, چنانچه এক ব্যক্তি এসে কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন: “হযরত আলীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, তিনি বেশি জানেন।” [৪]

হযরত আলী (রা.) কঠিন বিষয়গুলোকে উদাহরণ এবং গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন। কবিতা এবং আরবি কাহিনীর একটি বড় ভাণ্ডার আপনার স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। পূর্ববর্তী খলিফাদের কথা অত্যন্ত আদরের সাথে স্মরণ করতেন এবং তাঁদের বিদায়ে দুঃখ প্রকাশ করতেন। একবার আপনি জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, কিছু লোক হট্টগোল শুরু করল। আপনি ঘরে ফিরে সাথীদের বললেন: “বাস্তবে আমাকে সেদিনই খেয়ে ফেলা হয়েছে, যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছিল।”

মানুষের বিস্ময় দেখে আপনি কথা এগিয়ে নিয়ে বললেন:

“কোনো এক জঙ্গলে তিনটি ষাঁড় ছিল: একটি সাদা, একটি লাল এবং একটি কালো। তিনটির মধ্যে খুব মিল ছিল। একটি সিংহ তাদের ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করত কিন্তু তিনজনে মিলে তাকে তাড়িয়ে দিত। অবশেষে একদিন সিংহ লাল এবং কালো ষাঁড়কে বলল: ‘এই জঙ্গলে আমাদের ঝগড়ার কারণ এই সাদা ষাঁড়টি, সে দেখতে আমাদের মতো নয় এবং আমাকে তার থেকে স্বস্তি পেতে দাও। আমি তাকে খেয়ে ফেলব এবং তারপর আমরা এই জঙ্গলে মিলেমিশে থাকব কারণ আমার গায়ের রঙ এবং তোমাদের গায়ের রঙ মিলে যায়।’ অতঃপর সিংহ সাদা ষাঁড়টির ওপর আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলল। এর কিছুকাল পর সে অন্য দুটি ষাঁড়ের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করল কিন্তু তারা দুজনে মিলে তাকে তাড়িয়ে দিল। অবশেষে একদিন সে লাল ষাঁড়কে বলল: ‘এই জঙ্গলে আমাদের ঝগড়ার মূল ভিত্তি এই কালো ষাঁড়টি। তুমি তার সঙ্গ ছেড়ে দাও যাতে আমি তাকে খেয়ে ফেলি। তারপর আমরা মিলেমিশে থাকব যে...’”

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৮২, ত. আস-সাআদাহ

[২] মুসনাদে আহমদ, হা: ৯৩৬, মুসনাদে আলী (রা.)

[৩] “আকদানা আলী” (সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৮১, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ক্বাওলিহি: মা নানসাখ মিন আয়াতিন)

[৪] ফাযায়িলুস সাহাবা লি-আহমদ বিন হাম্বল, হা: ১১৫৩

“আমাদের এবং তোমাদের রঙ একই।”

লাল ষাঁড়টি কালো ষাঁড়টির সঙ্গে ছেড়ে দিল তো সিংহ তাকে গিলে ফেলল। তারপর যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন সিংহ শান্তিতে থাকল। কিন্তু একদিন সে লাল ষাঁড়কে আক্রমণ করতে এল... লাল ষাঁড় বলল: “তুমিও কি আমাকে খাবে?” সিংহ বলল: “হ্যাঁ।” লাল ষাঁড় বলল: “ঠিক আছে, আমাকে আগে তিনবার ঘোষণা করার সুযোগ দাও।” সিংহ বলল: “করো।” লাল ষাঁড় চিৎকার করে বলল: “শুনে রাখো! আমাকে সেই দিনই খেয়ে ফেলা হয়েছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছিল।”

এই কাহিনী শুনিয়ে হযরত আলী (রা.) বললেন:

“আমি সেই দিন থেকেই দুর্বল হয়ে গিয়েছি যেদিন হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল।” [১]

হযরত হাসান (রা.)-এর শোকবার্তা ও স্থলাভিষিক্ত হওয়া:

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পরের দিন সাইয়েদনা হাসান (রা.) জনসমাবেশে একটি ভাষণ দেন যাতে তিনি বলেন:

“হে লোকসকল! আজ তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি বিদায় নিয়েছেন যিনি জ্ঞানে পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীরা তাঁর মাকাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না... নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই তাঁকে কোনো ঝাণ্ডা দিয়ে পাঠাতেন, তিনি বিজয়ী হয়েই ফিরে আসতেন। তিনি এই দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন যে তাঁর কাছে সোনাও ছিল না, রূপাও ছিল না... হ্যাঁ, সাতশ দিরহাম ছিল, যা তিনি তাঁর গৃহপরিচারকদের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন।” [২]

প্রসিদ্ধ আছে যে হযরত আলী (রা.) নিজেই হযরত হাসান (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু এই দাবির কোনো প্রমাণ নেই। সীরাত ও ইতিহাসের সকল কিতাবই বলে যে হযরত আলী (রা.) এই ফয়সালা উম্মতের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের খবর পেলেন, তখন তিনি অব্যোহাৎ কাঁদতে লাগলেন এবং ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করে বললেন:

“হে লোকসকল! আজ জ্ঞান, ফযীলত এবং কল্যাণ অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে।” তাঁর স্ত্রী বললেন: “আপনি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন, আর এখন কাঁদছেন?” তিনি বললেন: “তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি জানো আজ কত জ্ঞান ও ফযীলতের সম্পদ হারিয়ে গিয়েছে?” [৩]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর ফযীলত ও মর্যাদা স্বীকার করতেন এবং চতুর্থ খলীফা সম্পর্কে তাঁর মতামত তেমন ছিল না যেমনটি সিরিয়ার চরমপন্থীরা বা নাসিবীরা দাবি করত। কিছু লোক এই ধরনের কথাকে নিছক পলিসি এবং রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে এটি কোনো জাগতিক রাজনীতিবিদের বিষয় নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের বিষয়। তাঁদের ইখলাস ও একনিষ্ঠতার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে যা কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের ওপর মন্তব্যকে সেই নৈতিক মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত যা...

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৭৯৩৩।

[২] ফায়াইলুস সাহাবা লি-আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড ২: ৯২২, সনদ সহীহ।

[৩] “ওয়াইলাকা মা তাদরিনা মা যা হাবা মিন ইলমিহি ওয়া ফাযলিহি।” (তারিখে দামেশক: ৪২/৫৮৩) এর সনদ যযীফ কিন্তু বাবুল মানাকিবে বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলে এতে আশ্চর্যের কিছু থাকে না। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর দ্বন্দ্বের পেছনে সেই ভুল তথ্য ও মিথ্যা সাক্ষ্যগুলোর বড় ভূমিকা ছিল, যা দুষ্কৃতকারীরা সিরিয়ায় ছড়িয়েছিল। সেগুলো আজও দুর্বল সনদের সাথে ইতিহাসের বইগুলোতে বিদ্যমান এবং নাসিবির আজও সেগুলোর ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

এটিও মনে রাখা উচিত যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অবস্থান ছিল সিরিয়াবাসীদের রাজনৈতিক নেতার মতো এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্ভূত বিষয়গুলো অত্যন্ত নাজুক, জটিল ও বহুমুখী হয়ে থাকে। মানুষ অনেক ভেবেচিন্তে এক দিক থেকে সঠিক রায় কয়েম করে, কিন্তু অন্য দিক থেকে তার প্রভাব নেতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সময় রাজনীতিবিদরা তাদের মতামতে পুরোপুরি স্বাধীন থাকেন না, বরং উদ্ভূত গুরুতর পরিস্থিতি, বিশেষ করে সংকটের সময়কার অবস্থা প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সিদ্ধান্তের পরিধিকে সংকুচিত করতে থাকে। তিনি জনমত বিবেচনা করতে বাধ্য হন। তাকে জনআবেগের ঢেউ এবং পার্শ্বচরদের মতামতের কাছে পরাভূত হওয়ার উপক্রমও হতে হয়। অনেক সময় তাকে নিজের ব্যক্তিগত মতামত বা স্বভাবজাত প্রবণতাকে একেবারে একপাশে সরিয়ে রাখতে হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, সিরিয়ার জনগণ ও সেনাবাহিনী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইশারাকেও আদেশের মর্যাদা দিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তার চারপাশের পরিবেশ, আমিরদের মতামত এবং জনআকাঙ্ক্ষাকে মোটেও উপেক্ষা করতে পারতেন না। তাছাড়া উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের শোক এবং হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে প্রাপ্ত মিথ্যা সাক্ষ্যগুলো তাকেও একটি আবেগপ্রবণ পরিস্থিতির সম্মুখীন করে রেখেছিল। ভুল বোঝাবুঝির সত্য-আচ্ছাদিত পরিবেশ, দুষ্কৃতকারীদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং চরমপন্থীদের ভারসাম্যহীন মতামত তাকে আমিরুল মুমিনীনের সাথে যুদ্ধাবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই দিকগুলো সামনে রাখা হলে, হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তার যুদ্ধ এবং সেই সাথে তার ফযিলত ও গুণাবলির স্বীকৃতি মোটেও বোধগম্যতার বাইরে থাকে না। তিনি যা কিছু করেছেন, তা দ্বীন ও ঈমানের দাবি মনে করে, কিসাসের কুরআনি হুকুম বাস্তবায়নের জন্য করেছেন। এটি ভিন্ন কথা যে, তার এই ইজতিহাদে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

একটি সন্দেহ এবং হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর ভাষায় তার জবাব:

যদি হাদিসের রেওয়ায়েতগুলোতে ফযিলত ও গুণাবলির অধ্যায়গুলো দেখা হয়, তবে হযরত আলী (রা.)-এর গুণাবলির (শ্রেষ্ঠত্বের নয়) রেওয়ায়েতগুলো সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এমনকি শাইখাইন হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর ফযিলতের রেওয়ায়েত থেকেও বেশি অনুভূত হবে। এতে কিছু লোক এই ধোঁকায় পড়ে যায় যে, হযরত আলী (রা.) শাইখাইনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ শাইখাইনের ফযিলত ও গুণাবলির রেওয়ায়েত কম হওয়া এবং হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে এ জাতীয় রেওয়ায়েতের আধিক্যের একটি বিশেষ কারণ ছিল, যার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন:

“সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারো ব্যাপারে মজবুত সনদের সাথে এত বেশি হাদিস বর্ণিত হয়নি, যত বেশি হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি শেষে ছিলেন এবং তার যুগে মতভেদ দেখা দিয়েছিল এবং বিদ্রোহীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধীদের খণ্ডন করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম...”

হযরত আলী (রা.)-এর এই গুণাবলী বা মানাকিব সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত ছিল। ফলে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। তবে তাদের মধ্যে বিদআতি কম ছিল। তারপর হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যা হওয়ার ছিল তা-ই হলো। ফলে একটি দল প্রকাশ পেল যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করল। এরপর বিষয়টি আরও জটিল হয়ে গেল। এই লোকেরা তাঁর সমালোচনা করতে লাগল এবং মিস্রর থেকে তাঁর ওপর লানত করতে লাগল। আর খারেজীরাও তাদের বিদ্বেষের কারণে এই লোকদের সাথে যোগ দিল এবং আরও বাড়াবাড়ি করে হযরত আলী (রা.)-কে কাফের বলতে লাগল এবং হযরত উসমান (রা.)-কেও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করল।

এভাবে হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল: আহলে সুন্নাত, বিদআতি খারেজী এবং ঐ সকল লোক যারা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল অর্থাৎ বনু উমাইয়া এবং তাদের অনুসারী (যাদের মধ্যে নাসেবী দলও ছিল)। ফলে আহলে সুন্নাত হযরত আলী (রা.)-এর ফযীলত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল, এই কারণেই তাঁর ফযীলত বর্ণনাকারীরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল কারণ তাঁর বিরোধীরাও সংখ্যায় অনেক ছিল। অন্যথায় বাস্তবে খুলাফায়ে আরবাতা-এর প্রত্যেকের ফযীলত এত বেশি যে, যদি সেগুলোকে ইনসাফের পাল্লায় ওজন করা হয় তবে আহলে সুন্নাতের আকিদা থেকে বিচ্যুত কোনো কথা প্রমাণিত হবে না। [১]

কি হযরত আলী (রা.) একজন ব্যর্থ শাসক ছিলেন?

হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে একটি গোষ্ঠী মনে করে যে, তাঁর খিলাফতের যুগ ছিল ব্যর্থতার এবং তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন, তিনি উসমানের হত্যাকারীদের কাছ থেকে কিসাস নিতে পারেননি এবং উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। কিন্তু এটি একটি সম্পূর্ণ ভাসাভাসা বিশ্লেষণ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সামনে সমস্যা কেবল উসমানের কিসাস নেওয়াই ছিল না, বরং পুরো শরীয়ত এবং খিলাফতে রাশেদার অস্তিত্ব রক্ষা করা ছিল, যা ষড়যন্ত্রকারী অপশক্তিগুলো ধ্বংস করার জন্য তৎপর ছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত সিরিয়া ও ইরাকের অনেক লোক তাদের প্ররোচনায় পা দিয়েছিল, ফলে সাবায়ী ষড়যন্ত্রগুলো সফল হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) সর্বোত্তম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অবলম্বন করে ইসলামবিদ্বেষী গোপন শক্তিসহ সব ধরনের অনিষ্টকারী শক্তির অত্যন্ত বিচক্ষণতা, বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেন এবং তাদের ক্রমশ দুর্বল করে দেন। সাবায়ীদের সশস্ত্র ও বিদ্রোহী দলগুলোকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে রক্তস্নাত করে হাজার হাজার এমন দুর্ভাগাদের শেষ করে দেন। তারা যদি বেঁচে থাকত তবে হয়তো পুরো উম্মতকে অন্য কোনো পথে পরিচালিত করত।

[১] সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে সহীহ সনদে যত বেশি ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা অন্য কারো ব্যাপারে হয়নি। এর কারণ হলো তাঁর যুগে মতভেদ ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এটি তাঁর ফযীলত প্রচারের কারণ হয়েছিল কারণ সাহাবী এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে তাঁর বিরোধীরা সংখ্যায় অনেক ছিল। কিন্তু বিদআতি দল, তারপর আলীর সাথে যা হওয়ার ছিল তা-ই হলো, ফলে অন্য একটি দল আবির্ভূত হলো যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করল, এরপর বিষয়টি তীব্রতর হলো এবং তারা তাঁর সমালোচনা করল এবং মিস্ররগুলোতে তাঁর ওপর লানত করল। খারেজীরা তাদের বিদ্বেষের কারণে তাদের সাথে যোগ দিল এবং আরও বাড়াবাড়ি করে তাঁকে কাফের বলল। এর মধ্যে উসমানের ব্যাপারে তাদের অবস্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল: আহলে সুন্নাত, বিদআতি খারেজী এবং বনু উমাইয়া ও তাদের অনুসারীদের মধ্য থেকে তাঁর সাথে যুদ্ধকারীরা। ফলে আহলে সুন্নাত সেই ফযীলতগুলো প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল যা বিরোধীরা অস্বীকার করত। অন্যথায় প্রকৃত বিষয় হলো চারজনের প্রত্যেকেরই এমন ফযীলত রয়েছে যে, যদি ইনসাফের সাথে বিচার করা হয় তবে তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না। (ফাতহুল বারী: ৭/৭১)

অংশ ২ | তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এটা সত্য যে আপনার (রা.) যুগে উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের যথাসময়ে আদালতের কাঠগড়ায় এনে তাদের বিচার করা সম্ভব হয়নি, তবে এটা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে আপনি (রা.) কিসাসের বিষয়টি পরিত্যাগ করে হত্যাকারীদের নিজের চারপাশে একত্রিত করে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত এমন কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না যে সে হযরত আলী (রা.)-এর লশকরে ছিল।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরা ছিল পাঁচ প্রকার:

- ১. কিছু আব্দুল্লাহ বিন সাবার মতো পর্দার আড়ালে ছিল যাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ বা সূত্র ছিল না। প্রমাণ ছাড়া তাদের ওপর কীভাবে শাস্তি কার্যকর করা যেত? [১]
- ২. কিছু লোক আমর বিন আল-হামাক (রা.)-এর মতো ভুলভাবে হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। [২]
- ৩. কিছু হত্যাকারী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল, যেমন সুদান বিন হামরান, কুলসুম বিন তুজীব এবং কুতায়রা। [৩]
- ৪. কিছু হত্যাকারী জীবিত ছিল কিন্তু পলাতক ছিল, তারা সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে আত্মগোপন করে ছিল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের কোনো খবরও ছিল না। সেখানে হযরত আলী (রা.)-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও ছিল না, বরং খুব শীঘ্রই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেটিকে নিজের শাসনাধীন করে নেন। তাই মিশরের উসমান হত্যাকারীদের বিষয়টি আর হযরত আলী (রা.)-এর দায়িত্বে থাকেনি। [৪]
- সম্ভব যে কিছু হত্যাকারী বসরা ও কুফারও ছিল, কিন্তু তাদের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। হতে পারে তাদের মধ্যে কেউ হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে বসরার যুদ্ধে নিহত হয়ে নিজেদের পরিণামে পৌঁছে গেছে [৫] এবং কিছু অপরাধী খারেজীদের সাথে যোগ দিয়ে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। যা-ই হোক, হযরত আলী (রা.)-এর লশকরে বরং সমগ্র রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেও এমন কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি, যে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযুক্ত হিসেবে নামজাদ ছিল, কোনো যয়ীফ (দুর্বল) রেওয়ায়েতেও বর্ণিত হয়নি।
- ৫. পঞ্চম প্রকারের লোকেরা ছিল সাধারণ দাঙ্গাবাজ। তাদের মধ্যে সাবায়ীরাও ছিল এবং অন্যান্য মূর্খরাও। এরা সরাসরি হত্যাকারী ছিল না। গোঁড়ামি বা বোকামির কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শরিক হয়েছিল, কিন্তু পরে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করে শরীয়ত অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল। সিরিয়াবাসীরা তাদের সবাইকে কিসাসের যোগ্য মনে করত, তাই তারা হযরত আলী (রা.)-কে অভিযুক্ত করতে থাকে। অথচ তাদের সাথে রাখার কারণে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর শরীয়ত অনুযায়ী কোনো অভিযোগ আসতে পারে না।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সতর্কতার খাতিরে আপনি (রা.) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাবায়ীদের গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নাহরাওয়ানে তাদের সামরিক শক্তিকে নির্মূল করার পর আপনি দ্বিধাহীনভাবে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করে দেন এবং ইবনে সাবাসহ সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসী লোকদের থেকে প্রকাশ্যে বিমুখতা প্রকাশ করেন। তাদের বিরত থাকার জন্য বারবার তাকিদ দেন। কিছু ক্ষেত্রে এমন যিন্দিক ও ধর্মত্যাগীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও প্রদান করেন।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩/৩৮৯, ৩৯২

[২] মিশরীয় দলের মধ্যে কিনানা বিন বিশর হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ ৩/৩৭, ৭১) মিশর দখলের পর (সম্ভবত ৩৮ হিজরিতে) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আদেশে ফিলিস্তিনের গভর্নর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। (তারিখ দিমাশক: ৫০/২৫৯, ২৬০; আল-ইসাবাহ: ৫/৪৮৬; আল-আলাম লিয়-যিরিকলী: ৫/২৩৩)

[৩] শুধুমাত্র গাওস বিন যি-হায়র বেঁচে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেও পরে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হয়।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

একজন শাসকের প্রকৃত সাফল্য কী?

এই কথাটি যে, কেন হযরত আলী (রা.) সাবায়ি এবং খারিজিদের পুরোপুরি নির্মূল করতে পারলেন না এবং কেন তাদের অনিষ্টতা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকল? আসলে হযরত আলী (রা.) বা অন্য কোনো নেতার কাছ থেকে এমন আশা পোষণ করা একটি অসম্ভব কাজের প্রত্যাশা করার সমতুল্য। সাবায়িবাদ হোক বা খারিজি মতবাদ, এগুলো সবই আদর্শিক ফিতনার রূপ যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। বিশ্বের প্রতিটি সমাজে এ ধরনের সংগঠন বা আন্দোলন প্রতিটি যুগে বিদ্যমান ছিল। এগুলো থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া ঠিক তেমনি কঠিন যেমন গমের মধ্যে পোকা ধরা রোধ করা। যেখানে ক্ষেত আছে সেখানে কিছু ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ অবশ্যই থাকবে। এই বিষয়গুলোকে কখনো কখনো একটি সীমা পর্যন্ত সহ্যও করতে হয়। যেখানে শীতল ছায়া থাকে সেখানে কিছুটা দূরত্বে কড়া রোদও থাকে এবং গোলাপ তার কোমলতা ও সুস্বাস্যতা সত্ত্বেও কাঁটার মাঝেই দৃশ্যমান হয়।

একজন শাসকের জন্য প্রকৃত সাফল্য হলো এই যে, তিনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সংবিধান ও আইনের অনুসারী হবেন, দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য সচেষ্ট থাকবেন, প্রজাদের অধিকার আদায় করবেন এবং বিরোধীদের ব্যাপারেও সংবিধান লঙ্ঘন করবেন না।

সাইয়্যিদুনা হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.) শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে রাজনীতি বা যুদ্ধে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা কম ছিল না... কিন্তু যেখানে সাধারণ মানুষের কাছে এই সাফল্যের গ্রাফ বাড়ানোর জন্য শরীয়ত, রাসূলের আদর্শ এবং ইসলামী সংবিধানের গণ্ডির বাইরে পা রাখার মধ্যে কৌশল বা কল্যাণ দেখা যেত, সেখানে আপনি (রা.) সেই কৌশল ত্যাগ করে শরীয়তের আনুগত্য করাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এই বিষয়টি আইন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোক বা এর গুরুত্ব না বোঝা লোকদের দৃষ্টিতে হয়তো নিম্নমানের রাজনীতি হতে পারে, কিন্তু একজন আদর্শ শাসকের জন্য এটাই সাফল্যের চরম শিখর। বাস্তবতা তো এই যে, হযরত আলী (রা.) শরীয়তের আইন ও সংবিধানের আনুগত্য করে এবং বিজয়ের কিছু সুযোগ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েও যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সেই অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে কোনো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর শাসকও এর চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করতে পারতেন না।

যদি কেউ বলে যে, আপনি (রা.) উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি, তবে আমরা বলব যে এর দায়ভার আপনার ওপর নয়, বরং তাদের ওপর যারা ফিতনা ও ফাসাদ ছড়ানোর কাজে সক্রিয় ছিল। আপনার ওপর যতটুকু চেষ্টা ও প্রচেষ্টার দায়িত্ব ছিল, তা আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। উম্মতকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা সত্ত্বেও আপনি (রা.) ঐক্যের ভিত্তি অর্থাৎ সঠিক আকিদা এবং শরীয়তকে অবশ্যই রক্ষা করেছেন।

আপনি একদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আদর্শিক ও বিশ্বাসগত যুদ্ধের প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেছেন এবং অন্যদিকে সাবায়ি ভাইদের সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আপনি উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেননি। একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছাড়া সমগ্র মুসলিম বিশ্বে মানুষের আকিদা এবং মাযহাব ও পথ সেটাই ছিল যা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আকাবির সাহাবায়ে কেরামের ছিল।

হযরত আলী (রা.) ধর্ম ও মাযহাবের জন্য পূর্ববর্তী খলিফাদের মানদণ্ড বানিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে নিজের পূর্বসূরি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা.)-কে যারা ভালোবাসতেন এবং যারা তাঁদের ঘৃণা করতেন, তাদের মধ্যে একটি পার্থক্যরেখা আপনার (রা.) যুগে টানা হয়েছিল এবং আপনি বিভিন্ন সময়ে নিজেকে সেই পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রশংসাকারী হিসেবে ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আপনি কাদের সাথে আছেন।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

...এবং সত্যের অনুসারী কারা। সুতরাং সিরিয়াবাসীরা রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আকিদাগতভাবে আপনার থেকে আলাদা ছিল না। রাজনৈতিক অনৈক্যের পরেও মাসলাক ও মাশরাবের ক্ষেত্রে আপনি রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা, হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁদের সঙ্গীদের দুনিয়া ও আখেরাতের বিচারে নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। ফলে জঙ্গ জামালের সমস্ত নিহতদের জানাজার নামাজ আপনি নিজেই পড়িয়েছেন। সিফফিনের শহীদদের সম্পর্কে বলেছেন: কাতলানা ওয়া কাতলাহুম ফিল জান্নাহ। “আমাদের এবং তাদের নিহতরা জান্নাতে রয়েছে।” [১]

আকিদা ও আদর্শের ব্যাপারে আপনার রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দ্ব্যর্থহীন কৌশলের ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, কয়েক বছর আলাদা থাকার পরেও পুরো মুসলিম বিশ্ব একই সত্য দ্বীনের মূল রূপের অনুসারী ছিল এবং আপনার পরে শীঘ্রই সমস্ত মুসলমান আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল এবং তাদের সওয়াদে আজমের মধ্যে কোনো আদর্শিক বিভেদ দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি।

এই আলোচনা আমরা আল্লামা ইবনে খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহির অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত মন্তব্যের মাধ্যমে শেষ করছি:

“যখন হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মধ্যে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, যা ছিল আসাবিয়্যাতের অনিবার্য ফল, তখন তাতেও সাহায্যে কেরামের কর্মপন্থা ছিল সত্য ও ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে বা বাতিলকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কিংবা ঘৃণা ও শত্রুতার কারণে ছিল না, যেমনটি বেয়াদব ও বিভ্রান্ত লোকেরা ধারণা করে থাকে এবং ধর্মহীন ও নাস্তিক লোকেরাও একই মত পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে সত্যের ব্যাপারে তাঁদের ইজতিহাদ ভিন্ন ছিল। নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী প্রত্যেকে অন্যকে ভুলের ওপর মনে করতেন এবং তাঁরা সত্যের জন্যই লড়াই করতেন। যদিও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইজতিহাদ সঠিক এবং হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইজতিহাদ ভুল ছিল। তবুও যুদ্ধের ক্ষেত্রে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বাতিলের সংকল্প নিয়ে অটল ছিলেন না, বরং সত্যের নিয়তেই অটল ছিলেন। সেই সময়ের সাধারণ মুসলমানদের অবস্থাও এমনই ছিল যে, নিজ নিজ রায় অনুযায়ী সবাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বাতিলের দিকে কারো কোনো ঝোঁক ছিল না। পার্থক্য শুধু এতটুকু ছিল যে, কারো ইজতিহাদ সঠিক ছিল আর কারো ভুল। আর মুজতাহিদ ভুলের ওপরও সওয়াব পান।” [২]

[১] মুসান্নাফ ইবনে আব্বি শায়বা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৭৮৮০

[২] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, অধ্যায়: ৩, পরিচ্ছেদ: ২৮

তারিখ মিল্লাতে মুসাল্লামা - দ্বিতীয় খণ্ড

উম্মতের সওয়াদে আযমের বিপরীতে ফেরকাবন্দী

উম্মতের সওয়াদে আযমের বিপরীতে ইরাক ও শামে কিছু চরমপন্থী উপাদান যাই হোক বিদ্যমান ছিল। আহলে শামের চরমপন্থী গোষ্ঠী হযরত আলী (রা.) এবং সাদাতদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। আহলে ইরাকের কিছু লোক শামী সাহাবীদের পথভ্রষ্ট ও বেদ্বীন বলত, কেউ কেউ কথা আরও বাড়িয়ে খুলাফায়ে সালাসাকেও (প্রথম তিন খলিফা) অভিযুক্ত করা শুরু করে দিল। এই বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা ছিল ফেরকাবন্দীর ভিত্তি।

শুরুতে হযরত আলী (রা.)-এর সমস্ত অনুসারীদের ‘শীয়ানে আলী’ বলা হতো, তবে এটি কোনো আলাদা ফেরকা ছিল না বরং একটি রাজনৈতিক দল ছিল যারা হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারী ছিল। হাদীসসমূহে হযরত আলী (রা.)-এর ফযীলত ও মর্যাদার আধিক্য দেখে তাদের মধ্যে কারো কারো ধারণা ছিল যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যে একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া কঠিন। কেউ কেউ বলতেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা বেশি, তাই তিনি হযরত উসমান (রা.) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ একটি বিশাল সংখ্যা হযরত আলী (রা.)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, যেমনটি জমহুর ওলামায়ে ইসলামের অভিমত। এই দলের অধিকাংশ লোক সেই সঠিক আকিদা ও মতাদর্শের সাথে যুক্ত ছিলেন যার শিক্ষা হযরত আলী (রা.) সর্বদা কথা ও কাজের মাধ্যমে দিয়ে গেছেন। এই আকিদাই ছিল নিরপেক্ষ সাহাবী ও তাবেরীদের।

যেভাবে ঐ সকল সাহাবী ও তাবেরীদের যারা হযরত আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক সমর্থক ছিলেন, ‘শীয়ানে আলী’ বলা হতো, তেমনিভাবে ঐ সকল সাহাবী ও তাবেরীদের যারা কিসাসে উসমানের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, ‘শীয়ানে উসমান’, ‘উসমানী’ বা ‘শীয়ানে মুয়াবিয়া’ বলা হতে লাগল। যেভাবে শীয়ানে আলীর মধ্যে সাহাবী ও বড় বড় তাবেরীদের আকিদা, ঈমান ও তাকওয়া সন্দেহাতীত, তেমনিভাবে উসমানী ব্যক্তিদের মধ্য থেকেও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীনে এযাম কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক আকিদার অনুসারী ছিলেন।

[১]

শীয়ানে আলী এবং শীয়ানে উসমানের অধিকাংশ ব্যক্তি পরবর্তীতেও আকিদাগত ও আদর্শিকভাবে একইভাবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুগত ছিলেন এবং পূর্ববর্তী মতপার্থক্যকে একটি যথাযথ স্থানে রেখে একে অপরকে সম্মান করতে থাকেন। উভয় গোষ্ঠীর এই ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের সাথে নিরপেক্ষ গোষ্ঠী মিলে জমহুর মুসলিমদের যে দল গঠিত হয় তা ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত’ নামে পরিচিত হতে লাগল।

কিন্তু কিছু লোক এই সরল পথ (সিরাতে মুস্তাকিম) থেকে বিচ্যুত হয়ে সওয়াদে আযম থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল। এটা স্পষ্ট যে, সিরাতে মুস্তাকিম থেকে প্রাথমিক বিচ্যুতি সামান্যই হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা বেড়ে বড় গোমরাহীর রূপ ধারণ করে। শীয়ানে আলী এবং শীয়ানে উসমানের মধ্য থেকে চরমপন্থী লোকদের সাথেও এমনটিই হয়েছে।

‘শীয়ানে আলী’র মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল ঐ সকল ভ্রান্ত আকিদার লোকদেরও ছিল যারা আব্দুল্লাহ বিন সাবার জাদুর শিকার হয়েছিল। এই ভ্রান্ত আকিদার শিয়াদের...

[১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “তারা ছিল শীয়ায়ে উলার (প্রাথমিক শিয়া) একটি দল যারা উসমানের ওপর আলীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিত, তবে শীয়ায়ে উলার কাউকেই আবু বকর ও উমরের ওপর আলীকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি। বরং শীয়ায়ে উলার সাধারণ মানুষ যারা আলীকে ভালোবাসতেন, তারা তাঁর ওপর আবু বকর ও উমরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। তবে তাদের মধ্যে একটি দল ছিল যারা উসমানের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিত। ফিতনার সময় মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল: শীয়ায়ে উসমানিয়া এবং শীয়ায়ে আলভিয়া। আলীর পক্ষে যুদ্ধকারী সকলেই যে তাঁকে উসমানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন তা নয়, বরং তাদের মধ্যে অনেকেই উসমানকে তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন, যেমনটি অন্যান্য আহলে সুন্নাতের অভিমত।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/১৮৫)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

নিজেদের আলাদা করার জন্য, সঠিক আকিদাবিশিষ্ট ‘শিয়ানে আলী’কে ‘শিয়া মুখলিসীন’, ‘শিয়া মুতাকাদিমীন’ বা ‘শিয়ায়ে উলা’ বলা হতে লাগল, যাদের মধ্যে অনেক সাহাবী, জলীলুল কদর তাবেয়ী এবং অসংখ্য তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই শিয়া মুখলিসীন হযরত হাসান (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে বায়াত হলেন; এভাবে মুসলমানরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। শিয়া মুখলিসীন দ্বীনি ও সংশোধনমূলক কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই উলামা ও মুহাদিসগণের মধ্যে তাদের বড় সংখ্যা পাওয়া যায়।

চরমপন্থী শিয়ানে আলীর তিন প্রকার:

চরমপন্থী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ধীরে ধীরে উম্মতের মূলধারা থেকে আলাদা হয়ে গেল। এতে তিন ধরনের লোক ছিল:

(১) সামান্য চরমপন্থী: এরা হযরত আলী (রা.)-কে সমস্ত সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত কিন্তু কোনো সাহাবীকে গালিগালাজ করত না। এরা ‘তাফজিলিয়া’ নামে পরিচিত। শিয়াদের জায়েদী ফেরকা এরই অন্তর্ভুক্ত।

(২) পথভ্রষ্ট: এরা হযরত আলী (রা.)-কে শ্রেষ্ঠ মনে করার পাশাপাশি হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা.)-কে জালেম ও জবরদখলকারী সাব্যস্ত করত। এরা ইবনে সাবার অনুসারী ছিল তাই এদের ‘সাবায়িয়া’ বলা হতো। এরা সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ করত, তাই এদের ‘তাবাররাই’ও বলা হতো। পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশকারী শিয়া ফেরকা যেমন: ইছনা আশারিয়া, ইসমাইলিয়া ইত্যাদি এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) চরম ভ্রান্ত আকিদাবিশিষ্ট: এরা হযরত আলী (রা.)-কে খোদা, খালেক এবং রাজেক বলত। এরা আব্দুল্লাহ বিন সাবার বিশেষ মুরিদ ছিল। এদের ‘শিয়া গুলাত’ বলা হতো। মস্ত মালং ধরনের রাফেজিরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

যখন পথভ্রষ্ট শিয়াদের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন ‘শিয়া মুখলিসীন’ নিজেদের আলাদা পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ লকব গ্রহণ করল।

শিয়া তাফজিলিয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। [১]

মারওয়ানি ও নাসিবিদের পরিচিতি:

উসমানীদের মধ্য থেকেও কিছু চরমপন্থী ও সংকীর্ণমনা লোক উম্মতের মূলধারা থেকে আলাদা হয়ে গেল। তারা কিসাসে উসমান আন্দোলনের বিরোধী বা এর সাথে সম্পর্কহীন প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানকে সন্দেহজনক মনে করতে শুরু করল এবং এর মধ্যে হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর কাতারে থাকা জলীলুল কদর সাহাবীদেরও কোনো তোয়াক্কা করল না।

যেহেতু হযরত আলী (রা.)-কে জালেম ও জবরদখলকারী প্রমাণ করার জন্য প্রোপাগান্ডার প্রয়োজন ছিল, তাই হযরত আলী (রা.) এবং বনু হাশিমের সমালোচনা ও অবমাননা এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এই গোষ্ঠী ‘নাসিবি’ বা ‘মারওয়ানি’ নামে পরিচিতি পেল। [২]

কিছু উমাইয়া ও হাশেমি মুরাব্বি পারস্পরিক সম্মান, উপহার বিনিময়, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং সুন্দর মিলনের মাধ্যমে এই সংকীর্ণতা ও চরমপন্থার পরিবেশ দূর করার চেষ্টা করতে থাকলেন, কিন্তু যেভাবে ইরাকের...

[১] মুখতাসার আত-তুহফা আল-ইছনা আশারিয়া, পৃষ্ঠা ২০৩।

[২] যেভাবে হযরত আলী (রা.) নিজের চারপাশে আশতার নাখয়ীর মতো চরমপন্থীদের সহ্য করছিলেন, তেমনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও এমন চরমপন্থীদের সাথে নিয়ে চলছিলেন যারা হযরত আলী (রা.)-কে জালেম ও জবরদখলকারী মনে করত।

উগ্রপন্থী দল, বনু উমাইয়ার ঘোর বিরোধী ছিল। একইভাবে আহলে শামের একটি কটর দল হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সমর্থকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। [১] এটি একটি প্রকাশ্য বিষয় যে, যখন দুটি দলের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত হয়, তখন উভয় পক্ষের উগ্রপন্থীরা বিরোধী নেতৃত্বের ব্যাপারে নেতিবাচক কথা প্রচার করে এবং তাদের যে কোনোভাবে কলঙ্কিত করে নিজেদের দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। কিছু লোক নিজেরাই কথা বানিয়ে নেয়, কেউ কেউ বড়ই ইখলাস ও খুশু-খুযুর সাথে সেগুলো ছড়িয়ে দেয় এবং অনেক মানুষ এই ভিত্তিহীন কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে নেয়। খুব কম লোক এমন থাকে যারা রাজনৈতিক মতভেদকে তার নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং সত্য কথা ছাড়া অন্য কোনো কথার প্রভাব গ্রহণ করে না।

সুতরাং আহলে ইরাক এবং আহলে শামের সংঘাতকে উসকে দেওয়ার জন্য এমন লোক পরবর্তী দশকগুলোতেও পুরোপুরি সক্রিয় ছিল। এই সময়ে শিয়া ও মারওয়ানি বর্ণনাকারীদের প্রচারিত অনেক মনগড়া ও অতিরঞ্জিত কথা পরবর্তী প্রজন্মের বর্ণনার ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

[১] শিয়া ও নাসেবি একটি আলাদা দল। অধিকাংশ মানুষ তা জানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিরও তাদের চিনতে পারেন না এবং তাদের শিয়া বিরোধী লেখা পড়ে কেবল তাদের ভক্তই হয়ে যান না, বরং তাদের সাহায্যে কেরামের সত্যিকারের আশেক ও সর্বোত্তম দ্বীনদার মনে করে বসেন। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তীতে যখন তাদের লেখায় বা বক্তব্যে বনু হাশেম ও সাদাতে কেরামের অবমাননা করা হয়, তখন সেটিও হজম করে নেন। কারণ তারা একে সাহায্যে কেরামের প্রতিরক্ষার একটি দিক মনে করেন।

নাসেবিদের পরিচয় এবং ইসলামি সমাজে তাদের উত্থান ও প্রসারের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর “মিনহাজুস সুন্নাহ” অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী। যদিও “মিনহাজুস সুন্নাহ” রাফেজিদের খণ্ডনে লেখা হয়েছিল এবং এতে যেখানেই নাসেবিদের উল্লেখ এসেছে, তা প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে এবং মূলত রাফেজিদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য নাসেবিদের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তবুও এর মাধ্যমে নাসেবিদের স্বরূপ ভালোভাবে ফুটে ওঠে। এখানে “মিনহাজুস সুন্নাহ” থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে:

- “বনু উমাইয়ার অনুসারীদের মধ্যে একদল ছিল যারা আলীকে গালি দিত এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, তারা ছিল উসমানি শিয়া।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৩৬৬)
- “অতঃপর এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই লোকেরা নাসেবিয়াতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত ছিল এবং তারা উসমানি শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/৩৯০)
- “নাসেবির হলো তারা যারা বলে যে, তিনি (আলী) জালিম ছিলেন, দুনিয়া অশ্বেষণকারী ছিলেন এবং তিনি নিজের জন্য খিলাফত চেয়েছিলেন এবং এর জন্য তলোয়ার চালিয়েছেন এবং এর ওপর মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছেন যতক্ষণ না তিনি একাকী হয়ে পড়েন এবং তাঁর সাথীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাঁর ওপর তাঁর শত্রুরা বিজয়ী হয়। তারা হযরত আলীকে ফাসেক সাব্যস্ত করে যে তিনি জালিম এবং দুনিয়া অশ্বেষণকারী ছিলেন, তিনি নিজের জন্য খিলাফত চেয়েছিলেন এবং এর জন্য তলোয়ার চালিয়েছেন এবং এর ফলে হাজার হাজার মুসলমান নিহত হয়েছে, এমনকি তিনি যখন হুকুমত সামলাতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তাঁর সাথীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাঁর ওপর তাঁর শত্রুরা বিজয়ী হয় তখন তাঁকে হত্যা করা হয়।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৫৯)
- “নাসেবিদের জন্য কিছু কিতাবও লেখা হয়েছে যেমন জাহেজের কিতাব আল-মারওয়ানিয়াহ। আর একদল হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফজিলতে জাল হাদিস তৈরি করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা নকল করেছে যার সবই মিথ্যা। এই বিষয়ে নাসেবিদের অনেক দীর্ঘদলিল রয়েছে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৩০০)

শেখ সালেহ বিন আব্দুল আজিজ “আকিদায়ে তাহাবিয়া”-এর ব্যাখ্যায় নাসেবিয়াতের ব্যাখ্যা খুব সুন্দরভাবে করেছেন। তিনি বলেন:

“নাসেবি হলো তারা যারা সাহায্যে কেরামের সাথে শত্রুতাকে আকিদা বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ শিয়াদের বিপরীতে যারা শিয়াদের প্রশংসা করে, আপনি দেখবেন তারা তাদের প্রশংসা করে যারা তাদের সাহায্য করে, আর আপনি দেখবেন যে শিয়া হযরত আলী (রা.)-এর প্রশংসা করে তো নাসেবির হযরত আলীকে শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু বানায় এবং তারা হযরত হোসাইন (রা.)-এর সাথে শত্রুতার জন্য হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং ইয়াজিদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে।” (আল-ইতহাফ আস-সাইল বিমা ফিল তাহাবিয়া মিনাল মাসাইল: পৃষ্ঠা ১৩)

হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী (রহ.) উপমহাদেশে নাসেবিয়াতের ফেতনার খণ্ডনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, যা নাসেবিয়াতের স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়। সকল পাঠকের জন্য মাওলানা মরহুমের কিতাব “হাদিসে কারবালা কা পাস মানজার”, “ইয়াজিদ কি শখসিয়াত আহলে সুন্নাত কি নজর মে” এবং “নাসেবিয়াত তাহকিক কে ভেস মে” অধ্যয়ন করা অবশ্যই উচিত।

...এতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাল বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রচার ও প্রসারে সেই চরমপন্থী শিয়াদের বড় ভূমিকা ছিল যারা রাফয-এর (প্রত্যাখ্যান) সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এক পর্যায় পর্যন্ত মারওয়ানি গোষ্ঠীর লোকেরাও এই একই কাজ করতে থাকে। এই কারণেই যেভাবে জারহ ও তাদিল-এর ইমামগণ শিয়া বর্ণনাকারীদের একটি বিশাল দলকে যঈফ, মাতরুক এবং কাযযাব হিসেবে গণ্য করেছেন, তেমনিভাবে মারওয়ানি বা নাসিবিদের মধ্য থেকেও অনেককে অনির্ভরযোগ্য এবং মাজরুহ হিসেবে গণ্য করেছেন। [১]

দল উপদলের সূচনা কীভাবে হলো? হাফেজ যাহাবী-র ব্যাখ্যা:

হাফেজ যাহাবী এই যুগে দল উপদলের সূচনার কারণগুলো এভাবে বর্ণনা করেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজের পেছনে এমন বহু লোক রেখে গিয়েছিলেন যারা তাকে ভালোবাসত এবং এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি (গুলু) করত এবং তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিত। হয় এজন্য যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দয়া, মহানুভবতা এবং দান-দক্ষিণার সাথে তাদের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন, অথবা এজন্য যে, এই লোকেরা সিরিয়ায় তার ভালোবাসার পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিল। একইভাবে তাদের সন্তানরাও এই পরিবেশেই বেড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে সাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দল ছিল, পক্ষান্তরে তাবীয়ীন এবং গুণীজনদের একটি বিশাল দল ছিল। এই লোকেরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে থেকে ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং নাসব (বিদ্বেষ)-এর ভিত্তিতে তাদের বেড়ে ওঠা হয়েছিল। আমরা আবেগ-উচ্ছ্বাসের অনুসরণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। একইভাবে খারেজীদের বাদ দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনী এবং তার প্রজাদের বেড়ে ওঠা হয়েছিল হযরত আলী (রা.)-কে ভালোবাসা, তার পক্ষে দাঁড়ানো, তার বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এবং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ওপর ভিত্তি করে। তাদের মধ্যে কিছু লোক শিয়া মতবাদে বাড়াবাড়িও (গুলু) গ্রহণ করেছিল। হে আল্লাহ! সেই লোকদের অবস্থা কী হবে যারা এমন এক দেশে বেড়ে উঠেছে যেখানে তারা (নিজ নিজ দেশে হযরত আলী (রা.) বা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতি) ভালোবাসা বা ঘৃণায় বাড়াবাড়ি করা লোক ছাড়া আর কাউকে দেখেনি? এমতাবস্থায় ইনসাফ ও ভারসাম্যের অস্তিত্ব...”

[১] শিয়া বর্ণনাকারীদের মধ্যে আমাদের আশ্রয় (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৪৮৩০), ইবরাহীম বিন আল-হাকাম (মীযানুল ইতিদাল: ১/৭১), আবদুর রহমান বিন মালিক বিন মিগওয়াল (মীযানুল ইতিদাল: ৩/৫৮২), উমর বিন শামির আল-জু'ফী (মীযানুল ইতিদাল: ৩/২৬৮) এবং ইয়াহইয়া বিন মিহরান (মীযানুল ইতিদাল: ৩/৩২৩)-এর মতো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যাদের মিথ্যাবাদী এবং পরিত্যক্ত বলা হয়েছে। নাসিবিদের ওপরও জারহ করা হয়েছে যার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

- উসমান বিন খালিদ বিন উমর আল-উমাবী: মাতরুক। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৪৩৬৩)
- সাঈদ বিন মাসলামা আল-উমাবী: যঈফ। (আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন লিন-নাসায়ী: ১/৫৩, তাবা দারুল ওয়াঈ)
- সিলাত বিন দীনার আল-আযদি: মাতরুক নাসিবি। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ২৯৩৭)
- আওয়ানা বিন আল-হাকাম: তিনি উসমানী ছিলেন এবং বনু উমাইয়ার পক্ষে বর্ণনা জাল করতেন। (লিসানুল মীযান: ৪/৩৮৬, মাতবাআ নিযামিয়া হিন্দ)

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর নাসিবি বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যাদের নাসিব হওয়া সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়েছে, যেমন:

- খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাসরী: লাজযুরী কিন্তু তিনি নাসিবি। (মীযানুল ইতিদাল: ১/৬৩৩)
- আবদুল্লাহ বিন শাকীক: বসরী সিকাহ, কিন্তু তার মধ্যে নাসব ছিল। (মীযানুল ইতিদাল: ২/৩৩৯)
- আবু কিলাবা আল-বসরী: সিকাহ, আল-ইজলী তার সম্পর্কে বলেছেন যে তার মধ্যে সামান্য নাসব ছিল। (তাকরীবুত তাহযীব নং: ৩৩৩৩)

যেমনটি শিয়া বর্ণনাকারীদের মধ্যেও সদুক এবং সিকাহ বিদ্যমান রয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে দেখা গেলে জালিয়াতির অনুপাত শিয়া (রাফেযী) বর্ণনাকারীদের মধ্যে নাসিবিদের তুলনায় অনেক বেশি।

কোথায় হতে পারে? আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমাদের এমন এক যুগে সৃষ্টি করেছেন যাতে সত্য প্রকাশ পেয়েছে এবং উভয় পক্ষের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। আমরা উভয় পক্ষের প্রত্যেকের দলিলসমূহ জানি এবং (হাকিকত বা বাস্তবতা) দেখে নিয়েছি। সুতরাং আমরা তাদের ওজরগ্রস্ত মনে করি এবং (তাদের জন্য) ইস্তিগফার করি। আমরা মধ্যপন্থা পছন্দ করি। আমরা বিদ্রোহীদের কাজকেও কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা এমন কোনো ভুল যা ইনশাআল্লাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে—তার ওপর ভিত্তি করে তাদের জন্য রহমতের দোয়া করি। আমরা ঠিক তেমনই বলি যেমনটি আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন:

“হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা ঈমানে আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না।” [১]

আমরা ঐ সকল মহান ব্যক্তিদের প্রতিও সন্তুষ্ট যারা উভয় পক্ষ থেকে পৃথক ছিলেন, যেমন: সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, ইবনে উমর, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ, সাঈদ বিন য়ায়েদ এবং আরও অনেকে। আমরা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া খারেজিদের থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করি যারা হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং উভয় পক্ষকে কাফের আখ্যা দিয়েছিল। [২]

রিজাল এবং রেওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাফেজি ও নাসিবিদের অদ্ভুত মানহাজ:

রিজাল এবং রেওয়ায়েত গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রেও রাফেজি ও নাসিবিদের নিজস্ব একটি মানহাজ রয়েছে যার ভিত্তি নিছক গোঁড়ামির ওপর। রাফেজিদের মানহাজে রাবী বা রেওয়ায়েতের গ্রহণযোগ্যতার আসল মানদণ্ড হলো “রাফয”। যদি কোনো রাবী খুলাফায়ে সালাসা-এর ওপর কটাক্ষ করে, তবে সে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য, চাই সে ইলম, স্মৃতিশক্তি, আমানতদারি ও সত্যবাদিতায় যতই নিম্নমানের হোক না কেন এবং চাই সে কذاب ও দাজ্জাল হিসেবেই পরিচিত হোক না কেন।

অন্যদিকে নাসিবিদের নিকট রাবীর গ্রহণযোগ্যতার আসল মানদণ্ড হলো “নাসিবিয়াত”। যদি কোনো রাবী—চাই সে বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারীই হোক না কেন—তার থেকে যদি ইয়াজিদ, মারওয়ান বা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রমুখের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বর্ণিত দেখা যায়, তবে সে তাদের নিকট অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং এই লোকেরা তাকে সিকাহ বা সাদুক থেকে নামিয়ে যয়িফ, কذاب, শিয়া এমনকি রাফেজি প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এর বিপরীতে যদি কোনো যয়িফ ও মাতরুক এমনকি আবু মুখনাফের মতো কذابও কোথাও ইয়াজিদ বা হাজ্জাজের পক্ষে অথবা হযরত হাসান ও হুসাইন কিংবা হযরত আলী-এর বিরুদ্ধে কিছু বর্ণনা করে থাকে, তবে এই লোকেরা সেই বর্ণনার ওপর অপ্রত্যাশিত নেয়ামতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একে বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনার ওপরও প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। আলহামদুলিল্লাহ! জমহুর উলামায়ে কেরাম ইফরাত ও তাফরিত-এর এই উভয় পথ পরিহার করে মধ্যপন্থী মূলনীতির আলোকে রিজাল ও রেওয়ায়েত গ্রহণ বা বর্জন করেন।

[১] সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/১২৮, ত আল-রিসালাহ

আবদুল্লাহ বিন সাবার পরিণাম কী হয়েছিল?

আবদুল্লাহ বিন সাবা সম্পর্কে একটি ধারণা এই যে, সে ঐ সকল নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা হযরত আলী (রা.)-কে শ্রষ্টা ও রিযিকদাতা বলছিল এবং হযরত আলী (রা.) তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, যেমনটি সহীহ বুখারী ও সুনান আবু দাউদে রয়েছে। [১]

কিন্তু সহীহ বুখারী ও সুনান আবু দাউদের এই বর্ণনাগুলোতে আবদুল্লাহ বিন সাবার নাম উল্লেখ নেই, শুধু এতটুকু আছে যে হযরত আলী (রা.) কিছু যিনদীককে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিছু লোক অনুমান করে বলেন যে, ইবনে সাবা তাদের মধ্যেই ছিল।

অন্যদিকে শিয়াদের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইবনে সাবা হযরত আলী (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় জীবিত ছিল এবং মাদায়েনে ছিল (যেখানে তাকে নির্বাসিত করে পাঠানো হয়েছিল)। শাহাদাতের সংবাদ পাওয়ার পর সে সংবাদদাতাকে বলেছিল:

كَذَبْتَ إِنْ جِئْتَنَا بِدِمَاغِهِ بِسَبْعِينَ صُرَّةً وَأَقْتِ عَلَى قَتْلِهِ سَبْعِينَ عَدْلًا مَا صَدَّقْنَاكَ، لَعَلَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَمْ يُقْتَلْ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَمْلِكَ الْأَرْضَ-

(তুমি মিথ্যা বলছ। যদি তুমি সত্তরটি থলিতে করে তার মগজ আমাদের কাছে নিয়ে আসো এবং তার হত্যার সত্তরজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীও পেশ করো, তবুও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না। কারণ আমরা জানি যে তিনি মারা যাননি এবং নিহত হননি, আর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মরবেন না যতক্ষণ না পুরো পৃথিবীর মালিক হন।) [২]

ধারণা এটাই যে, আবদুল্লাহ বিন সাবা হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত জীবিত ছিল। যেহেতু সে পর্দার আড়ালে থেকে ষড়যন্ত্রকারী মাস্টারমাইন্ড ছিল, তাই কেউ জানতে পারেনি যে সে কখন এবং কোথায় মারা গেছে। এই কারণেই ইতিহাস তার পরিণাম সম্পর্কে নীরব।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৬৯২২, কিতাবুস তিতাবাতিল মুরতাদীন, বাবু হুকমিল মুরতাদ; সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৩৫১, কিতাবুল হুদুদ, বাবু হুকমি ফী মান ইরতাদা; লিসানুল মিজান: ৩/২৮৯।

[২] ফিরাকুশ শিয়া, হাসান বিন মুসা নওবাখতী (মৃ. ৩১০ হিজরী), পৃ. ২৩। ইবনে সাবার এই দাবির পেছনে ইহুদিদের সেই আকিদার ছাপ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যার অনুযায়ী একদিন মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে তার অনুসারীদের জন্য সারা পৃথিবী জয় করবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ইতিহাসের শিক্ষা

হযরত উসমান (রা.)-এর জীবনে একজন দয়ালু, আল্লাহভীরু এবং জনবান্ধব শাসকের সর্বোত্তম নমুনা পাওয়া যায়। তাঁর সীরাত অধ্যয়ন করা সেই প্রত্যেক নেতা ও শাসকের জন্য অবশ্যই জরুরি যারা নিজেদের আখেরাত নিয়ে চিন্তিত।

হযরত উসমান (রা.) জীবনযাপন ও তমুদুনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নীতিকে শিথিল করে আজিমত ও রুখসত এবং বৈধ ও অবৈধের সীমানা স্পষ্ট করেছেন। এভাবে সভ্যতা ও তমুদুনের ক্ষেত্রে সেই মধ্যপন্থা সামনে এসেছে যার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা চলতে পারে।

হযরত উসমান (রা.) বিরোধী দলের অস্তিত্বকে সহ্য করে ইসলামী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তিনি ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিরোধী দল যতক্ষণ পর্যন্ত সশস্ত্র হয়ে বিদ্রোহ না করে, বরং কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং সমালোচনা ও আপত্তির সীমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তাদের ছাড় দেওয়া উচিত। তাদের প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানানো উচিত নয়।

হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলের অন্তঃসারশূন্য অভিযোগগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন প্রকাশ্য মজলিসে এবং প্রতিটি কথার জবাব দিয়েছেন। একজন সফল ও প্রজাবৎসল শাসকের চরিত্র এমনই হয়।

হযরত উসমান (রা.) ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিরোধী মুসলমানদের রক্তে হাত রাঙানো এবং মদিনা মুনাওয়ারার অবমাননায় শরিক হওয়া থেকে নিজেকে এবং অন্য মুসলমানদের যথাসম্ভব বাঁচিয়েছেন। এই নীতির ওপর অটল থাকতে গিয়ে নিজের প্রাণ চলে যাওয়ারও পরোয়া করেননি। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতা হাতে আসামাত্রই মুসলিম রক্তে নির্দ্বিধায় হাত রাঙানো শাসকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের এই অধ্যায়টি চিন্তার খোরাক জোগায়।

হযরত আলী (রা.)-ও সমাজে বিরোধী দলের অস্তিত্বের সুযোগ রেখেছেন এই শর্তে যে, তারা শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না। এই ভিত্তিতেই আপনি বিদ্রোহীদের বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, খারেজীদের অবকাশ দিতে থেকেছেন; কিন্তু যখন তারা রক্তপাতে লিপ্ত হলো, তখন আপনি তাদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

জঙ্গ জামাল এবং সফফীন ছিল মুসলমানদের ইতিহাসের প্রাথমিক দুটি বড় ট্র্যাজেডি, গুরুতর দুর্ঘটনা এবং অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু কুদরতে ইলাহী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং এই যুদ্ধগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের এমন কাজ নিয়েছেন যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব ছিল না। এই মতভেদ ও বিবাদের কারণে রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলমানদের মানসিক পরিপক্বতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তা সম্ভবত ভৌগোলিক বিজয়ের অনেক দরজা খোলার মাধ্যমেও নসিব হতো না।

এই যুদ্ধগুলোতে বিরোধীদের সাথে আচরণের ধরন ফিকহী মাসআলাসমূহের জন্য দলিল সরবরাহ করেছে। বিদ্রোহীদের সম্পর্কিত অধিকাংশ ফিকহী...

বিধানসমূহ হযরত আলী (রা.)-এর সীরাত থেকেই নেওয়া হয়েছে। আইন্মায়ে মুজতাহিদীন বিবাদসমূহকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন যে, এগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য কর্মপন্থা কী রয়েছে। ফলে তাঁরা এই বর্ণনাগুলো থেকে ডজন ডজন বিধান আহরণ করেছেন। [১]

এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন: “যদি লড়াইয়ের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর আদর্শ সামনে না থাকত, তবে কেউ জানতে পারত না যে মুসলমানদের সাথে লড়াই সংক্রান্ত বিধানসমূহ কী।” [২]

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলতেন:

“মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত অনুসরণ করেছে। মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সীরাত অনুসরণ করেছে এবং বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।” [৩]

সিফফীনের যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাতের সত্যতার এক বিরাট প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছিলেন: “কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে মুসলমানদের এমন দুটি দল আপসে লড়াই করবে যাদের দাবি (অর্থাৎ দ্বীন) একই হবে।” [৪]

হাদীস বিশারদদের মতে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য হলো সিফফীনে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ। এমন সত্য সংবাদ নবী ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

[১] এ জাতীয় বক্তব্য অসংখ্য। সম্ভবত ফিকহের এমন কোনো বড় কিতাব নেই যা এ থেকে খালি। এখানে হানাফী, শাফিঈ, হাম্বলী এবং মালিকী ফিকহ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

ফিকহে হানাফী: “তাদের সন্তানদের বন্দী করা হবে না, তাদের সম্পদ বণ্টন করা হবে না... জঙ্গ জামালের দিন হযরত আলী (রা.)-এর ঘোষণা ছিল: পলায়নকারীকে পিছু ধাওয়া করা হবে না, কোনো আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না এবং কোনো সম্পদ নেওয়া হবে না।” (হিদায়া, কিতাবুস সিয়্যার, বাবুল বুঘাত)

“প্রয়োজন সাপেক্ষে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই... যখন তাদের কোনো দল থাকবে না তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ নয়... ইমাম যদি মুসলমানদের কল্যাণে তাদের সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করেন তবে তা করতে পারেন। হযরত আলী (রা.) থেকে বসরার দিন (জঙ্গ জামাল) এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।” (আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা: ১৫২/৩)

ফিকহে শাফিঈ: “ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন: সিফফীন ও মুয়াবিয়ার যুদ্ধের দিনগুলোতে আলী (রা.)-এর যুদ্ধ ছিল ন্যায়সঙ্গত... তিনি মুয়াবিয়ার সাহীদের সম্পর্কে বলতেন: তারা আমাদের ভাই।” (আল-উম্মু লিশ-শাফিঈ: ২২৩/৪)

ফিকহে হাম্বলী: “সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। যেমন আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এবং আলী (রা.) জঙ্গ জামাল, সিফফীন ও নাহরাওয়ানের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।” (আল-মুগনী লি ইবনে কুদামা: ৫২৩/৩)

“ইমামের উচিত বিদ্রোহীদের কাছে দূত পাঠানো এবং তাদের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা... জঙ্গ জামালের আগে বসরার অধিবাসীদের সাথে হযরত আলী (রা.)-এর আচরণ থেকে এটিই প্রমাণিত।” (কাশশাফুল কিনা: ১৬২/৬)

ফিকহে মালিকী: “চতুর্থত: যারা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ... যেমন সিফফীন ও জঙ্গ জামালের দিন পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করা হয়নি এবং আহতদের হত্যা করা হয়নি।” (আয-যাখীর লি আহমাদ বিন ইদ্রিস আল-কারাফী: ৭/১২; আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা: ৪২/১০)

[২] হিলয়াতুত তলাব: ৩০২/১।

[৩] “মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে গ্রহণ করেছে... এবং বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের পদ্ধতি আলী বিন আবি তালিব (রা.) থেকে গ্রহণ করেছে।” (আল-হাভী আল-কাবীর লিল মাওয়ারদী, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ৫৫০)

[৪] “ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না দুটি বড় দল আপসে লড়াই করবে, যাদের মধ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ হবে এবং তাদের উভয়ের দাবি হবে এক।” (সহীহ বুখারী, হা: ৭১২১, কিতাবুল ফিতান; সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৮)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - ২য় খণ্ড

জমহুর উলামায়ে ইসলাম জঙ্গ জামাল এবং সিফফিনে হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-কে মুজতাহিদ মুসিব (সঠিক সিদ্ধান্তকারী) এবং প্রতিপক্ষকে মুজতাহিদ মুখতি (ভুল সিদ্ধান্তকারী) হিসেবে গণ্য করে আসছেন; কারণ:

- হযরত আলী (রা.) শরয়ী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুসলমানদের সকল দলের ওপর তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল।
- হাদীসের এমন কিছু সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান ছিল যা থেকে হযরত আলী (রা.)-এর সত্যের ওপর থাকা স্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন:
- হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ ছিল: “একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।” [১]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) জঙ্গ জামাল এবং জঙ্গ সিফফিন উভয় যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন এবং জঙ্গ সিফফিনে তাঁর পতাকাতলে শহীদ হন।

- সহীহ হাদীসসমূহে সত্যের নিকটবর্তী দলের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, তারাই খারেজীদের পরাজিত করবে। [২]

জঙ্গ নাহরাওয়ানের পর এই হাদীসটিও হযরত আলী (রা.)-এর সত্যতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য এই দলিলগুলোই যথেষ্ট ছিল, তবে এ ছাড়াও কিছু আলামত এর সমর্থক হয়ে ওঠে, যেমন:

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর কাছে সিরিয়ার একজন কাজী (বিচারক) আসলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর সাথে বিচারকার্যের আদব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সেই কাজী সাহেব যখন চলে যেতে লাগলেন, তখন হঠাৎ তাঁর কিছু মনে পড়ল। তিনি ফিরে এসে বলতে লাগলেন:

“আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, সূর্য এবং চন্দ্র একে অপরের সাথে যুদ্ধ করছে এবং উভয়ের সাথেই নক্ষত্রদের বাহিনী রয়েছে।” হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কার সাথে ছিলে?” কাজী সাহেব বললেন: “সূর্যের বিপক্ষে চন্দ্রের সাথে।” হযরত উমর (রা.) বললেন: “নাউযুবিল্লাহ” (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই), তারপর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

“وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً” [৩]

.. (আর আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি, অতঃপর রাতের নিদর্শনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল) [৩]

একথা বলে হযরত উমর (রা.) বললেন: “চলে যাও! আল্লাহর কসম, তুমি ভবিষ্যতে কখনো আমার অধীনে কোনো পদে থাকবে না।”

পরবর্তীতে এই কাজী সাহেব জঙ্গ সিফফিনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন। [৪]

[১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ৭/৫০৬, কিতাবুল ফিতান, বাবু লা তাকুমুস সাআহ; সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৮০৭, বাবু মানাকিবে আম্মার (রা.)।

[২] মুসনাদে হুমাইদী, হা: ২৬৬; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি, হা: ২২৭৯; সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ৭/৩৫০, দারুল জীল।

[৩] আল-ইসরা, আয়াত: ১২।

[৪] মুসনাদুল ফারুক লিল হাফিজ ইবনে কাসীর: ২/৫৩৮; মুসান্নাফ ইবনে আবু শায়বাহ, খণ্ড: ৩০৭০৫।

এই বর্ণনার ওপর যেন এই আপত্তি না ওঠে যে, হযরত উমর (রা.) যদি কাজীকে বরখাস্ত করে থাকেন, তবে তার আগে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সিরিয়ার গভর্নরের পদ থেকে কেন বরখাস্ত করলেন না। প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণনায় এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, হযরত উমর (রা.) জানতেন যে সিফফিনের যুদ্ধ হবে এবং কাদের মধ্যে হবে। তিনি শুধু এতটুকু বুঝেছিলেন যে, এই কাজী সাহেব কোনো এক সময় কোনো ভুল দলের সাথে शामिल হয়ে সঠিক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তাই হযরত উমর (রা.) ‘নাউযুবিল্লাহ’ বলেছেন এবং সতর্কতা হিসেবে তাঁকে বরখাস্ত করেছেন। এটিও মনে রাখা উচিত যে, বর্ণনার সনদে দুর্বলতা রয়েছে। যদি কেউ এটিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে, তবুও জমহুর আহলে সুন্নাতের মাযহাবের দৃঢ়তায় কোনো পার্থক্য আসে না। এই বর্ণনাটি কেবল একটি প্রমাণিত বিষয়ের সমর্থনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এর মনেও এক সময় হযরত আলী রা.-এর সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। [১] একবার তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, আমি হজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বসে আছি, হযরত আবু বকর ও উমর রা.-ও সেখানে উপস্থিত আছেন। এমন সময় হযরত আলী রা. এবং হযরত মুয়াবিয়া রা.-কে আনা হলো। উভয়কে একটি দরজার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ হযরত আলী রা. বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন: “কাবার রবের কসম! আমার পক্ষে ফয়সালা হয়ে গেছে।” পেছনে পেছনে হযরত মুয়াবিয়া রা.-ও বাইরে এলেন এবং বললেন: “কাবার রবের কসম! আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” [২]

সারকথা হলো, উল্লিখিত সহীহ হাদীসসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর এবং আরও কিছু শক্তিশালী প্রমাণ একত্রিত হওয়ার কারণে কিছুকাল পর জমহুর উম্মতের মাঝে এই বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে হযরত আলী রা. ছিলেন মুজতাহিদ মুসিব (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মুজতাহিদ)। এই বিষয়টিও মীমাংসিত হয়ে গেল যে, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের এবং হযরত মুয়াবিয়া রা. প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সংশোধনের জন্য সচেষ্টিত ছিলেন এবং তারা মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তারা গুনাহগার নন বরং মুজতাহিদ মুখতি (ভুলকারী মুজতাহিদ), আর মুজতাহিদের ভুল ক্ষমাযোগ্য, বরং ইজতিহাদের কারণে তিনি একটি সওয়াবও পেয়ে থাকেন।

পরবর্তীকালের কোনো রাজনৈতিক বিবাদ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট দল নিয়ে কোনো হাদীস নেই, তাই পুরো বিষয়টি নিজের অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা এবং তথ্যের ওপর নির্ভর করে, যা আমরা যতই পূর্ণাঙ্গ মনে করি না কেন, তা কোনো না কোনো দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

সুতরাং এটি জরুরি যে, যতটুকু সম্ভব তাকওয়াবান এবং চরিত্রবান ব্যক্তিদের, বিশেষ করে আকাবির ও আসলাফদের (পূর্বসূরিদের) সিদ্ধান্তসমূহকে সদিচ্ছার ওপর এবং তাদের পদক্ষেপসমূহকে জাতীয় কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে বিবেচনা করা উচিত। যদি তাদের কোনো স্পষ্ট ভুলও নজরে আসে, তবুও তার কারণে তাদের ওপর নিন্দা ও সমালোচনা করা উচিত নয়। যদি মন্তব্য করা জরুরি হয়, তবে তা মার্জিত ভাষায় করা উচিত এবং যতটুকু সম্ভব হুসনে জন (সুধারণা)-এর সুযোগ দেওয়া উচিত।

হযরত আলী রা. তাঁর সমস্ত গুণাবলি, মহত্ত্ব এবং শান-শওকত সত্ত্বেও সর্বোপরি একজন মানুষ ছিলেন। তিনি একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর ঈমান, আমল, আখলাক এবং চরিত্র আমাদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি নিজে সর্বদা এক আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন এবং তাঁর কাছেই চাইতেন। তাঁর কাছেই চাওয়ার মৌখিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা দিতেন। তিনি নিজে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কষ্টের শিকার হয়েছেন। দারিদ্র্য ও অনাহারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি আল্লাহর বান্দা ছিলেন যিনি মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন এবং অবশেষে মাটিতেই দাফন হয়েছেন। অবিনশ্বর সত্তা কেবল এক আল্লাহর। সমস্যা দূর করার ক্ষমতা কেবল সেই সত্তারই, যিনি অনাদি ও অনন্ত। দোয়া শোনা, বিপদ থেকে উদ্ধার করা এবং বিপদে সাহায্য করা কেবল তাঁরই সাজে। আমাদের উচিত তাঁর অনুসরণ করে প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং তাঁর সত্য দ্বীনের ওপর অটল থাকা।

[১] এটি সেই সময়ের কথা যখন তিনি কিশোর ছিলেন এবং মদিনায় পড়াশোনা করতেন, সেই সময়ে তিনি উমাইয়াদের রীতি অনুযায়ী হযরত আলী রা.-এর সমালোচনাও করতেন। অবশেষে মদিনায় তাঁকে হাদীস পড়ানো একজন উস্তাদ যখন তাঁকে বোঝালেন, তখন তিনি তওবা করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/১১৭) স্বপ্নের এই ঘটনাটি সম্ভবত তওবা করার পরের।

[২] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনুল জাওজি, পৃ. ২৮৫। সনদের দিক থেকে এই বর্ণনার ওপর আলোচনা হতে পারে, তবে এটি মূল দলিলের পরিবর্তে সমর্থন হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ যদি এই স্বপ্ন না দেখতেন বা এই বর্ণনাটি না থাকত অথবা কেউ যদি এই বর্ণনাটিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানও করত, তবুও বিষয়টি একইভাবে প্রমাণিত থাকত।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা, দ্বিতীয় খণ্ড

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধ ছিল শরীয়ত পূর্ণ করার জন্য:

হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী **قدس سره** “শরীয়ত ও তরিকতের অবিচ্ছেদ্যতা” (Shariat-o-Tariqat ka Talazum) এর শুরুর দিকে এবং “আল-ইতিদাল ফি মারাতিবির রিজাল” (Al-I’tidal fi Maratib-ir-Rijal) এর শেষ অধ্যায়ে “সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধ” (Mushajrat-e-Sahaba) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল তারা যেন এই অধ্যায়গুলো অবশ্যই অধ্যয়ন করেন। লেখক এখানে সেগুলোর সারমর্ম নিজের ভাষায় পেশ করছেন:

“সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ‘পারস্পরিক বিরোধ’ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত পূর্ণ করার জন্যই ঘটানো হয়েছিল। কারণ কোনো আইন ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা পায় না যতক্ষণ না তা বাস্তবায়ন করা হয়। আইন বাস্তবায়নের পরেই এর ব্যবহারিক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তা মানুষের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকর। শরীয়তের বিধানসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই সেগুলো উপকারী হওয়া একজন মুসলমানের জন্য নিশ্চিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ যতক্ষণ এর বাস্তবায়নের প্রভাব না দেখে ততক্ষণ তারা আশ্বস্ত হতে পারে না। তাই আল্লাহ দুনিয়াবাসীর সামনে সব ধরনের শরীয়তি বিধানের ব্যবহারিক নমুনা সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। এই শরীয়তি বিধানসমূহ চার প্রকার:

- (১) এক প্রকার হলো সেগুলো যা করে দেখানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান সত্তার শান অনুযায়ী ছিল। যেমন সালাত, সাওম, হজ, জাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা এই কাজগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে করিয়েছেন, যাতে উম্মত সরাসরি পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে ব্যবহারিক নমুনা পায়।

- (২) দ্বিতীয় প্রকারের বিধানগুলো এমন ভুলত্রুটি সম্পর্কিত ছিল যা নবুওয়াতের সত্তা থেকে প্রকাশ পাওয়া নবীগণের নিষ্পাপতার (ইসমত) পরিপন্থী ছিল না। যেমন সালাতে ভুল হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহ ওয়াজিব হওয়া, সালাত কাজা হয়ে যাওয়া। এই ধরনের বিধানগুলোর পূর্ণতাও স্বয়ং নবুওয়াতের সত্তার মাধ্যমে করানো হয়েছে এবং এর জন্য মাঝে মাঝে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভুল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক-আধ বার ঘুমের আধিক্যের কারণে ফজর সালাত কাজা করিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে উম্মত স্বয়ং পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন থেকে এই ধরনের মাসআলাগুলোর শরীয়তি বিধান জানতে পারে।

- (৩) তৃতীয় প্রকারের বিধানগুলো শরীয়তি দণ্ডবিধি সম্পর্কিত ছিল, যেমন মদ্যপান, চুরি এবং ব্যভিচারের শাস্তি। যেহেতু পয়গম্বরের সত্তা নিষ্পাপ হয়, তাই এই ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা থেকে সম্ভবই ছিল না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এই কাজগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কিছু অখ্যাত সাহাবীর মাধ্যমে করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের ওপর শরীয়তি দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়েছে। দুনিয়ার সামনে ব্যবহারিক নমুনা চলে এসেছে যে, সুনতে নববীয়াহ-তে এই ধরনের অপরাধের জন্য এই শাস্তি নির্ধারিত।

এই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেরা অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর তকদির ও ইচ্ছায় তাদের মাধ্যমে এই কাজগুলো করানো হয়েছে যাতে শরীয়তের বিধানগুলো কেবল মৌখিক ও লিখিতই না থাকে বরং সেগুলোর ব্যবহারিক প্রমাণও বিদ্যমান থাকে, যাতে শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

- (৪) চতুর্থ প্রকারের শরীয়তি বিধানগুলো হলো সেগুলো যেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যুগ উপযুক্ত ছিল না। কারণ এই বিধানগুলো ফিতনা-ফ্যাসাদ, মতভেদ এবং গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত। ইসলামে এই সমস্যাগুলোর সমাধান এবং এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যুগের শান অনুযায়ী এটা সমীচীন ছিল না যে সেই যুগে এই ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে। তাই এই বিধানগুলোর ব্যবহারিক বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরের সময়কে নির্ধারণ করেছেন এবং তাও তখন যখন ইসলাম পৃথিবীতে বিজয়ী ও সুসংহত...

দ্বিতীয় অংশ - মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

হয়ে যায়, যাতে অভ্যন্তরীণ ফিতনার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এমন দুর্বল না হয়ে পড়ে যে বহিঃশক্তিগুলো এর ওপর চড়াও হয়। আল্লাহর তাকদীরের এই ফয়সালা অনুযায়ী, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে এই মতভেদগুলো দেখা দেয়, যার মাধ্যমে সময় সময় ফিতনা সংক্রান্ত সমস্ত শরয়ী বিধানের বাস্তব নমুনা সামনে আসতে থাকে। এই বিধানগুলো বাস্তবায়নের প্রভাবও দুনিয়ার সামনে চলে আসে যে, শীঘ্রই মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং ইসলামী বিজয় ও উত্থানের যুগ আবারও শুরু হয়।

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সেই সত্যিকারে আশেক যারা শরীয়তের পূর্ণতার জন্য যেখানে পদে পদে জান ও মালের কুরবানী দিয়েছেন, সেখানে নিজেদের সম্মানকেও আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণতার জন্য পেশ করে দিয়েছেন।

যদি শরীয়তের পূর্ণতার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা তাদের দ্বারা কোনো ভুল বা কোনো অপরাধ সংঘটিত করায় যার শাস্তিস্বরূপ তাদের কারো হাত কাটা হয়, কাউকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং কাউকে পাথর নিক্ষেপ (রজম) করা হয়, তবে তারা নিজেদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পাশাপাশি তাকদীরের এই ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকেন। তারা এই অভিযোগ করেন না যে, আমাদের মতো নবীর প্রিয়ভাজনদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং জনসমক্ষে অপমান করা হচ্ছে। বরং তারা এই অপমানেও ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা রাখেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পঁচিশ বছর পর, একে অপরের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এই আশেকরাই আল্লাহর তাকদীরের সামনে নিরুপায় হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং হাজার হাজার সংখ্যায় নিহত হন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি কেবল রক্তপাত, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এখানে ফিতনা ও গৃহযুদ্ধের অবস্থার শরয়ী বিধানের প্রয়োগ করে দেখাতে চেয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম এই আঘাতগুলোও সহ্য করে নেন। জান ও মালের সাথে সাথে সম্মান ও খ্যাতির কুরবানীও দেন এবং আল্লাহর তাকদীরে লেখা এত বড় দুর্ঘটনায়ও সন্তুষ্ট থাকেন। সমালোচনাকারীরা পারস্পরিক বিবাদে (মুশাজারাতে) তলোয়ার চালানো এবং লাশ পড়া দেখেছে এবং সাহাবায়ে কেরামকে দুনিয়ালোভী ও স্বার্থান্বেষী মনে করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহওয়ালারা এই ঘটনাগুলোর পেছনে আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছাকে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সেই আকিদাই পোষণ করেছেন যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু।

তাকভীনি হিকমতসমূহ: কুরআন ও সুন্নাহর ওপর বিশ্বাসের পরীক্ষা:

যদি তাকভীনি হিকমতগুলোকে উপেক্ষা করে ‘মুশাজারাতে’র (পারস্পরিক বিবাদ) দিকে তাকানো হয়, তবে এগুলো কেবল বিপদ ও মুসিবত মনে হবে, কিন্তু তাকভীনি হিকমতগুলো সামনে থাকলে এগুলোর মধ্যেও আল্লাহর বিশেষ রহমতের প্রকাশ অনুভূত হবে।

একটি হিকমত এই ছিল যে, মুমিনদের ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যাক। কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের পরীক্ষা হয়ে যাক যে, এই ঘটনাগুলো দেখার বা জানার পর তারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সেই আকিদাই রাখবে যা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে, নাকি ফিতনাবাজ ও পথভ্রষ্ট লোকদের কথায় প্ররোচিত হয়ে নিজেদের কোনো মতামত গড়ে নেবে।

ইফকের ঘটনাও কি একটি পরীক্ষা ছিল?

লক্ষ্য করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনে ‘ইফকের ঘটনা’র রূপে একটি তুফান এসেছিল যা প্রকৃতপক্ষে...

এই ঘটনাটি এই বিষয়ের পরীক্ষা ছিল যে ‘কুরআনের সত্যতা’র ওপর ঈমান মজবুত কি না। কেউ ভাবতে পারে যে, এই ঘটনাটি না ঘটলে খুব ভালো হতো, কারণ এই ঘটনার মাধ্যমে কুচক্রী লোকেরা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার একটি সুযোগ পেয়ে গেল। যদি এই সফরটি না হতো, অথবা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এই সফরে না যেতেন অথবা অন্তত তাঁর হারটি না হারাতো এবং তিনি কাফেলার সাথেই চলে আসতেন, তবে কারো কথা বলার সাহস হতো না। কিন্তু এটি আমাদের চিন্তা হতে পারে। আল্লাহ জানতেন কী হওয়া উত্তম। সুতরাং তাই হয়েছে যা তাঁর নিকট উত্তম ছিল। যদিও বাহ্যিকভাবে ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআন মজিদে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে পুরো দুটি রুকু নাযিল হয়েছে। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সামনে থাকবে। এই আয়াতগুলো মেনে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানদারদের ওপর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর মহানুভবতা, সতীত্ব এবং সত্যতার স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যিক হয়ে গেছে। এটি একটি পরীক্ষা ছিল এবং এখনও আছে। অনেক মানুষ এখনও তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে এই পরীক্ষায় ব্যর্থ এবং তারা সেই সব মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে যা মুনাফিকরা ছড়িয়েছিল। তাদের হাশর তাদের সাথেই হবে।

বিবাদসমূহে কিসের পরীক্ষা ছিল?

জঙ্গ জামাল এবং সিফফিনও এমনই দুটি পরীক্ষা ছিল। নিঃসন্দেহে এখানে শুধু তীব্র মতভেদই হয়নি বরং যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এই ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সামনে থাকবে। ইফকের ঘটনার চেয়ে এখানে দ্বিগুণ পরীক্ষা রয়েছে। ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, আয়াত থেকে জানা সম্ভব নয় যে এই ঘটনার বাস্তবতা কী? কে সঠিক এবং কে ভুল। তবে সহীহ হাদীসসমূহে সঠিক দলের নিদর্শনসমূহ বলে দেওয়া হয়েছিল।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা:

এখন এখানে প্রথম পরীক্ষা হলো, এই হাদীসগুলোকে ছবছ মেনে নিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সঠিকতা এবং দ্বিতীয় পক্ষের ভুলকে স্বীকার করা হবে কি না, নাকি এই হাদীসগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং অহেতুক ব্যাখ্যা করে নিজের ব্যক্তিগত মতামতের ওপর জোর দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা হলো, হযরত আলী (রা.)-এর সঠিকতা মানার পাশাপাশি দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মতামত গ্রহণ করা হবে, অর্থাৎ তাঁদের ইজতিহাদের মর্যাদা এবং সাহচর্যের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে, নাকি তাঁদেরকে নিন্দা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু বানানো হবে অথবা তার চেয়েও বড় কথা তাঁদের ঈমানকেই অস্বীকার করা হবে। ব্যক্তিগত মতামত এবং স্বভাবজাত ঝোঁকের পেছনে দৌড়ানো অথবা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মধ্যপন্থা ও ইনসাফের পথ অবলম্বন করার এই পরীক্ষাও আজ পর্যন্ত একইভাবে বিদ্যমান। যারা কুরআন ও সুন্নাহর সমস্ত দলীল এবং সেগুলোর প্রতিটি দিক সামনে রেখে এবং সহীহ হাদীসসমূহে দূরভিসন্ধিমূলক ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থেকে মধ্যপন্থী মতামত পোষণ করেন, তারা এবং তাদের অনুসারীরা এই পরীক্ষায় পুরোপুরি সফল। এর বাইরে যারা চরমপন্থা অবলম্বন করে সুন্নাহ মুতাহহারার দলীলসমূহ থেকে...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

...যে পর্যন্ত সে উদাসীনতা প্রদর্শন করে, অথবা সেগুলোর যতটা ভুল ব্যাখ্যা করে, সে এই পরীক্ষায় ততটাই ব্যর্থ।

বিবাদসমূহ একদিক থেকে ক্ষতিকর এবং অন্যদিক থেকে উপকারী ছিল:

বিবাদসমূহের মতো বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো যদিও একদিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল, কিন্তু এর অন্য দিকটি হলো আল্লাহর সুনিপুণ হিকমতের অধীনে এগুলোর সংঘটিত হওয়ার মধ্যে উম্মতের টিকে থাকা এবং স্থিতিশীলতার উপকরণ নিহিত ছিল। যদি বলা হয় যে, এই দুর্ঘটনাগুলো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর উম্মতে মুসলিমার বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্য সংঘটিত হয়েছিল, তবে তা সঠিক হবে। পরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষ পরিশীলিত ও মজবুত হয়। পরীক্ষার মাধ্যমেই ভালো ও মন্দ পৃথক হয়। পরীক্ষাই খাঁটি ও ভেজালের পরিচয় করিয়ে দেয়। পরীক্ষার পর ব্যক্তিত্ব থেকে মরিচা দূর হয়ে যায় এবং চুল্লি থেকে বেরিয়ে সোনা খাঁটি সোনায় পরিণত হয়।

খাঁটি ও ভেজাল পৃথক হয়ে গেল:

এই পরীক্ষাগুলো সংশয়ে পড়ার অভ্যস্ত, মুনাফিক এবং বিকৃত মস্তিষ্কের লোকদের উম্মতে মুসলিমার মূলধারা থেকে পৃথক করে দিয়েছে। তারা কোনো ফিরকার রূপে মূলধারা থেকে আলাদা হয়ে প্রকাশ্য হয়ে গেল। যদি এই মরিচা এবং এই দূষিত পদার্থ উম্মতে মুসলিমার অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকত, তবে তা অভ্যন্তরীণভাবে আরও বেশি ক্ষতিকর প্রমাণিত হতো।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

(আল্লাহ এমন করতে পারেন না যে, তিনি মুমিনদের সেই অবস্থায় ছেড়ে রাখবেন যে অবস্থায় তোমরা বর্তমানে আছ, যতক্ষণ না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করে দেন।) [১]

উম্মতে মুসলিমার অভ্যন্তরীণ কাঠামো মজবুত হয়ে গেল:

এই ঘটনাগুলো জাতির জন্য সামষ্টিক ধাক্কা ও আঘাত ছিল, কিন্তু এমন ধাক্কা ও আঘাতের মাধ্যমেই জাতিগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামো মজবুত হয়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝুন। কিছুকাল আগে শিশুদের জন্য মাটিতে খেলা এবং মাটি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মনে করা হতো, কিন্তু এখন আধুনিক চিকিৎসা গবেষণা বলছে যে, যেসব শিশু মাটিতে খেলে বড় হয় এবং মাটি খায়, পরিণত বয়সে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মাটির সাথে যেসব জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে, সেগুলো শরীরকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জীবাণুর সাথে অভ্যস্ত করে তোলে, ফলে সাধারণ ধরনের ক্ষতিকর বিষয়গুলো মানুষকে প্রভাবিত করে না। এর বিপরীতে যেসব শিশু জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তারা জীবনের বাস্তব ময়দানে নেমে বাইরের পরিবেশের সামান্য ঝাপটায় সর্দি, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে যেসব শিশুর লালন-পালন অত্যন্ত আদর-সোহাগে হয় এবং তাদের শীত-গরম থেকে সবভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারা বড় হয়ে সামান্য ঠান্ডা বা সামান্য গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে; অথচ শৈশবে শীত-গরমের মোকাবিলা করা শিশুরা বড় হয়ে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হয়।

[১] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৭৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

উম্মতে মুসলিমাও তাদের প্রাথমিক যুগে যে কঠোরতা সহ্য করেছে এবং যে আঘাত সয়েছে, তা তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার দৃঢ়তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই চৌদ্দ শতাব্দী অতিবাহিত হওয়া এবং হাজারো বিপদের ঝড়ের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও উম্মতে মুসলিমা কেবল টিকেই নেই, বরং দিন দিন এর পরিধি বেড়েই চলেছে।

□□□

সাহাবায়ে কেরামের বিবাদ কি ‘রুহামাউ বাইনাহুম’-এর পরিপন্থী নয়?

কিছু লোক বলে থাকেন যে, সাহাবায়ে কেরামের বিবাদ ও মতপার্থক্য কুরআনের ‘রুহামাউ বাইনাহুম’-এর পরিপন্থী। কুরআন মাজীদ তো বলে যে তারা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়, অথচ ইতিহাসে বর্ণিত এই ঘটনাগুলো এর বিপরীত। তাই যে ইতিহাসে এ ধরনের বিবাদের উল্লেখ আছে, তা নদীতে বিসর্জন দেওয়া উচিত।

কিন্তু প্রথমত এই দাবিই ভুল যে, এ ধরনের ঘটনা কেবল ইতিহাসেই আছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য ও অসন্তুষ্টির ঘটনা তো হাদীসের কিতাবসমূহেও রয়েছে। সাধারণ সাহাবীদের মধ্যে নয়, উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যেও কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো যার উদাহরণ হাদীসের প্রত্যেক ছাত্রই জানে। শুধু তাই নয়, বরং খুলাফায়ে রাশেদীনেরও পারস্পরিক মনোমালিন্যের এক-দুটি ঘটনা পাওয়া যাবে। স্বয়ং নবী আকরাম ﷺ-এর উম্মাহাতুল মুমিনীনদের কারো কারো ওপর অসন্তুষ্টি হওয়া এবং ঈলা পর্যন্ত করা প্রমাণিত। কিন্তু এর কোনোটিকেই ভালোবাসা ও হৃদয়তার পরিপন্থী বলা যাবে না।

নিজেদের মধ্যে কখনো কখনো মনোমালিন্য ও বাদানুবাদ হওয়া ভালোবাসা ও মহব্বতের মোটেও পরিপন্থী নয়। এমন কোন ঘর আছে যেখানে বাবা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী এবং ভাই-বোনদের মধ্যে কখনো তিক্ততা ও অসন্তুষ্টি হয়নি? কিন্তু এতে এই সম্পর্কগুলোর ওপর কোনো আঁচ আসে না। একইভাবে বন্ধুদের মধ্যে, এমনকি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও মতপার্থক্য, এমনকি কখনো কখনো মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে যেখানে বুদ্ধিমান ও মুক্তমনা মানুষ থাকে, সেখানে মতপার্থক্য হওয়া অনিবার্য। সাহাবায়ে কেরামের পরিবেশও ছিল অত্যন্ত সাবলীল। কেউ কারো অন্ধ অনুসারী বা অন্ধ অনুকরণকারী ছিলেন না। যে যেটিকে সঠিক মনে করতেন, শুভাকাঙ্ক্ষার আবেগের সাথে তা স্পষ্টভাবে বলতেন। আমরা যদি আমাদের পরিবারের সদস্য, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এ ধরনের ঘটনাকে ভালোবাসার পরিপন্থী মনে না করি, তবে কী কারণে কেবল সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোকে এমন দৃষ্টিতে দেখা হয় যেন তারা একে অপরের জানী দুশমন ছিলেন?

সাহাবায়ে কেরামের অন্তর ছিল নিষ্পাপ শিশুদের মতো পবিত্র। শিশুরা যেমন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কিছুক্ষণ পরেই হাসি-খুশিতে খেলতে শুরু করে, তেমনি সাহাবীগণও কোনো সাময়িক মনোমালিন্যের পর দ্রুতই মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেন। এছাড়া তাদের অনেক মতপার্থক্য ছিল নিছক ইলমী ও ফিকহী প্রকৃতির, যা সর্বদা আলেম ও প্রজ্ঞাবানদের প্রতিটি স্তরে হয়ে থাকে।

এক-দুটি বিষয়ে যদি তাদের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হয়ে থাকে, তবে তাও কুরআন মাজীদে বর্ণিত তাদের গুণের পরিপন্থী নয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম যেখানে ‘রুহামাউ বাইনাহুম’ ছিলেন, সেখানে তাদের একটি গুণ ‘লা ইয়াখাফুনা ফী ল্লাহি লাওমাতা লায়িম’-ও ছিল। যে যেটিকে শরয়ী বিধান মনে করতেন, তা পালন করার জন্য জান দিতে এবং জান নিতেও প্রস্তুত ছিলেন। যার...

ঈমানি গায়রত থেকে মুসা (আ.) তাঁর ভাই হারুন (আ.)-এর দাড়ি ধরেছিলেন এবং যে আবেগে ইবরাহিম (আ.) ইসমাইল (আ.)-এর গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন, সেই একই আবেগে সাহাবায়ে কেরাম জামাল ও সিফফিনে জখম খেয়েছিলেন। যেভাবে মুসা, হারুন, ইবরাহিম ও ইসমাইল (আলাইহিমুস সালাম)-এর এই ঘটনাগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারে না, আর না এগুলোকে কোনো মন্দ আবেগের ওপর চাপানো যেতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের মুশাজারাত (পারস্পরিক মতবিরোধ) অস্বীকার করা নিরর্থক এবং সেগুলোকে ভুল অর্থে গ্রহণ করা পথভ্রষ্টতা। যেভাবে এই বাস্তবতাগুলো নবীদের ইসমাত (নিষ্পাপতা)-এর পরিপন্থী নয়, ঠিক তেমনিভাবে এই মতবিরোধগুলো সাহাবায়ে কেরামের আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা)-এর সাথে মোটেও সাংঘর্ষিক নয়। শর্ত হলো, দেখার চোখ যেন রুগ্ন না হয়।

সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইজতিহাদি ভুলের বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর মালফূয:

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ঘটনার বিষয়ে জনৈক ব্যক্তি, যিনি কিছুটা অল্পশিক্ষিত ছিলেন, এক মৌলভী সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই কাজের মর্যাদা কী? মৌলভী সাহেব বললেন: ভাই, মুয়াবিয়া (রা.)-এর এটি একটি ইজতিহাদি ভুল ছিল এবং এ কারণে বিষয়টি সামান্য। (হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন: আমাদের বুজুর্গদের আকিদাও এটাই)। এ কথা শুনে সেই ব্যক্তি বললেন: যে স্তরের মানুষ, তাঁর ভুলও সেই স্তরেরই হবে, তাই এই ভুলের ওপর কঠোর সমালোচনা হওয়া উচিত। মৌলভী সাহেব বললেন: আরে! একজন সাহাবীর জন্য কি এটি কম শাস্তি যে, আমাদের মতো অযোগ্যরা তাঁর সম্পর্কে এই ফয়সালা দিচ্ছি যে তিনি ভুল করেছেন? অন্যথায় আমাদের কী মর্যাদা ছিল? আমরা অপবিত্র আর তিনি সাহাবী। (হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন: সত্যিই এক চমৎকার ও বিস্ময়কর উত্তর)। [১]

রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সময় উপযুক্ত কর্মপন্থা কী?

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলো সর্বদা বহুমুখী হয়ে থাকে। রাজনীতি ঘরের হোক বা মহল্লার, প্রদেশের হোক বা দেশের, এতে যেকোনো বিষয়ে মানুষের রায়, পরামর্শ এবং সিদ্ধান্তে ভুলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কোনো ব্যক্তি এই নিশ্চয়তার সাথে মত দিতে পারে না যে, এর ফলাফল ঠিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হবে, আর না কেউ পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যে, এর প্রতিক্রিয়া ঠিক তেমনই হবে যেমনটি আমরা চাই। যেকোনো সিদ্ধান্তের সময় আমাদের কাছে শতভাগ সঠিক তথ্য থাকে না। না আমরা অন্যদের চিন্তা-ভাবনা, ঝোঁক ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি জানি, আর না আমরা আমাদের নিজেদের পদক্ষেপের ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।

রাজনৈতিক দায়িত্ব এবং জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য একজন মানুষ কেবল এটাই করতে পারে যে, সে নিজের নিয়ত সৎ রাখবে, স্বার্থপরতা ও ব্যক্তি স্বার্থ থেকে দূরে থাকবে, জাতির কল্যাণের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করবে এবং আল্লাহর শরীয়ত ও নৈতিক সীমার মধ্যে থেকে সময় ও পরিস্থিতির বিচারে সবচেয়ে উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করবে।

[১] মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত থানভী: ১/৩২০, মালফূয নম্বর: ১৭।

করে, এতটুকু করার মাধ্যমে নেতা নিজের দায়িত্ব থেকে আল্লাহ তাআলার নিকটও দায়মুক্ত হয়ে যান এবং বান্দাদের নিকটও। ভবিষ্যতে যদি এই পদক্ষেপের ফলাফল পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে নেতিবাচক হয়, তবে নেতার ওপর নৈতিক দিক থেকেও কোনো অভিযোগ আনা যাবে না এবং শরয়ী দিক থেকেও নয়, যতক্ষণ না তিনি নিজের পক্ষ থেকে ইখলাস, সদিচ্ছা, চিন্তা-গবেষণা এবং সতর্কতার দাবিগুলো পূরণ করে থাকেন।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে উভয় পক্ষ নিষ্ঠাবান এবং জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। এই চিন্তাগত মতপার্থক্য বেড়ে গিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপও ধারণ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির জন্য এটি ফয়সালা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে কে হকের ওপর আছে আর কে বাতিলের ওপর। কেউ বলতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলার নিকট কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। এমতাবস্থায় মানুষকে দুটি ইখতিয়ার (বিকল্প) দেওয়া হয়েছে: যদি তার নিকট বিষয়টি জটিল মনে হয়, তবে সে আলাদা থাকবে। আর যদি কারো পক্ষাবলম্বন করার মধ্যে জাতীয় কল্যাণের আশা থাকে এবং তার অবস্থান সঠিক মনে হয়, তবে তার সাথে থাকবে। যখন রাজনৈতিক সংঘাত মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে হয়, তখন ফয়সালা করা কঠিন হয় না, কারণ আকিদাগত পার্থক্য নিজেই হক ও বাতিলকে স্পষ্ট করে দেয়। একইভাবে যদি দুশ্চরিত্র ও নেককার অথবা জালেম ও মজলুমের মধ্যে সংঘাত হয়, তখনও ফয়সালা করা খুব একটা কঠিন হয় না। কিন্তু যদি রাজনৈতিক মতপার্থক্যকারী দলগুলোর উভয় দিকেই আকিদা এবং আখলাক ও চরিত্রের মান সমান হয়, তবে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। কিন্তু এ জাতীয় বিষয়গুলো থেকে চোখ বন্ধ করে রাখাও সম্ভব নয়; এগুলো স্বাভাবিক বিষয় যা সমাজে সর্বদা দেখা দেয় এবং দিতেই থাকবে।

একটি প্রশ্ন এই সংঘাতের সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের বা এই সংঘাতের যুগে বিদ্যমান লোকদের সামনে আসে, আর একটি প্রশ্ন পরবর্তী প্রজন্মের বা সংঘাতের সাথে সম্পর্কহীন লোকদের সামনে আসে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে এই প্রশ্ন থাকে যে, এই রাজনৈতিক বিবাদে তারা কার পক্ষ নেবে? পরবর্তীদের এই দ্বিধা থাকে যে, তারা এই দলগুলো এবং ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে কী মতামত পোষণ করবে? জঙ্গ জামাল ও সিফফীন সংশ্লিষ্ট সাহাবী ও তাবয়ীদের ভূমিকা এ বিষয়ে আমাদের সন্তোষজনক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

পক্ষাবলম্বনের ক্ষেত্রে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যদি বিষয়টি আমাদের নিকট জটিল মনে হয়, অথবা আমাদের নিকট এতে মেধা ও শ্রম ব্যয় করা জাতির জন্য কল্যাণকর না হয়, তবে আমরা এই বিষয়গুলো থেকে আলাদা থাকব। যদি আগে কোনো দলে অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকি, তবে এখন বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করব; যেমনটি হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) করেছিলেন এবং যেমনটি হযরত জুবায়ের (রা.) জঙ্গ জামালের সময় আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিন্তু যদি কোনো একটি রাজনৈতিক দলের প্রবল সদিচ্ছা, আখলাক ও চরিত্র, ইশতেহার এবং দাওয়াতের ওপর আমাদের আস্থা থাকে এবং আমরা মনে করি যে শরয়ী দিক থেকেও তার পক্ষাবলম্বন করা সঠিক এবং এতে জাতির কল্যাণ রয়েছে, তবে আমরা সেই জামাতের সহযাত্রী হব। যেমন সাহাবীদের এক বিশাল অংশ সাইয়েদুনা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন এবং যেমন অনেক ব্যক্তিবর্গ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এবং অনেক লোক হযরত তালহা ও হযরত জুবায়ের (রা.)-এর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, কোনো ফেরেশতা এসে বলে দেবে না যে কে হকের ওপর আছে। এর ভিত্তি হলো শরয়ী দলীলসমূহের বিশ্লেষণ এবং চিন্তা-গবেষণার সক্ষমতার ওপর; সে অনুযায়ীই ফয়সালা করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি রাজনৈতিক বিবাদ থেকে দূরে থাকা ব্যক্তিদের বা পরবর্তীদের সামনে আসে যে, এই বিরোধী ও যুদ্ধরত দলগুলোর ব্যাপারে কী মতামত রাখা উচিত যারা বাহ্যিকভাবে চরিত্রবান, জাতি ও দেশপ্রেমিক এবং শরীয়ত মেনে চলা বলে মনে হয়? জঙ্গ জামাল এবং সিফফিনের পর্যালোচনা বলে যে, মহান ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আদব ও সম্মান বজায় রাখা উচিত। ইসলামী আইন পরিবর্তন করা বা গোপন করা জায়েজ নয়, তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইলমি আলোচনায় কোনো এক পক্ষকে সঠিক বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটি বোঝার ও বোঝানোর জন্য আকলি ও নাকলি দলিল পেশ করাও আলেমদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। তবে এটি প্রয়োজনের সীমার মধ্যে থাকা উচিত। অন্তর থেকে প্রতিটি পক্ষকে সম্মান করা উচিত, তাদের সেই আবেগকে সালাম জানানো উচিত যে তারা যে অবস্থানকে সত্য মনে করেছেন তার ওপর অটল থেকেছেন, তাদের খোদাভীতি, জাতীয় সহানুভূতি, পরহেজগারি এবং শরাফত ও সততার ওপর আঙুল তুলে নিজের জিহ্বা ও কলমকে কলুষিত করা উচিত নয়।

অপ্রয়োজনে মুশাজারা সংক্রান্ত আলোচনা পরিহারের শিক্ষা:

সাহাবায়ে কেরামের মুশাজারা এমন কোনো প্রিয় শখ নয় যে একে অপ্রয়োজনে ঘাঁটাঘাঁটি করা হবে। বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামের দোষ খোঁজার নিয়তে এতে চিন্তা-ভাবনা করা তো ঈমান ধ্বংস করার নামান্তর। এই কারণেই আসলাফ মুশাজারার ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)-কে সঠিক মনে করা এবং তাঁর সাথে যুদ্ধকারীদের ভুল মনে করার আকিদা রাখা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে এই মাসআলাগুলোতে আলোচনা করতে নিষেধ করতেন। যেমন ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন:

“হাসান বসরী (রহ.)-কে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

‘قتال شهدہ اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبناء، وعلوا وجهلنا، واجمعوا فاتبعنا، واختلفوا’
‘أفوقفنا

এটি এমন এক যুদ্ধ ছিল যাতে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। তাঁরা (সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে) জানতেন এবং আমরা জানি না। (যেসব বিষয়ে) তাঁরা ইজমা করেছেন সেগুলোতে আমরা তাঁদের অনুসরণ করি এবং (যেসব বিষয়ে) তাঁরা মতভেদ করেছেন সেগুলোতে আমরাও বিরত থাকি।” [১]

x x x

মুতাকাল্লিমে ইসলাম ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী (রহ.)-এর একটি রচনার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিও প্রণিধানযোগ্য:

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: ‘মুশাজারা সম্পর্কে আপনি কী বলেন?’

তিনি বললেন: তাই যা আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

‘رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا’

(আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না।)” [২]

[১] তাফসীরে কুরতুবী: ১৬/৩২২, সূরা আল-হুজুরাত

[২] সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

(একই প্রশ্ন) হযরত জাফর সাদিক রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন:

“আমি তাই বলি যা আল্লাহ বলেছেন:

يَسْأَلُ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْ

(তাদের জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে, আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।)” [১]

এবং কিছু লোক এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“(এই বুজুর্গদের) একটি দল ছিল যারা গত হয়ে গেছে, তাদের কাজ তাদের সামনে আসবে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের সামনে আসবে এবং তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।” [২]

এবং হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন:

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ يَدَيَّ مِنْهَا، أَفَلَا أَطَهَّرُ مِنْهَا لِسَانِي؟

(এগুলো সেই রক্ত যা থেকে আল্লাহ আমার হাতকে পবিত্র রেখেছেন, তবে কি আমি আমার জিহ্বাকে তা থেকে পবিত্র রাখব না?)

অতঃপর বললেন:

.مِثْلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ الْعَيُونِ، وَدَوَاءُ الْعَيُونِ تَرْكُ مَسْهَا

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের উদাহরণ চোখের মতো, চোখের চিকিৎসা হলো তাতে হাত না লাগানো। [৩]

যেসব সাহাবী থেকে ইজতিহাদী ভুল হয়েছে, তাদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা নাজায়েজ। তাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সর্বাবস্থায় আবশ্যিক। নিচের ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য।

ইমাম আবু যুরআহ আল-রাজীরা কাছে এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগল: “মুয়াবিয়ার প্রতি আমার বিদ্বেষ আছে।” আবু যুরআহ আল-রাজী জিজ্ঞাসা করলেন: “কেন?” সে বলল: “কারণ তিনি হযরত আলীর সাথে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করেছেন।” আবু যুরআহ আল-রাজী বললেন:

”رَبُّ مُعَاوِيَةَ رَبُّ رَحِيمٍ، وَخَصْمُ مُعَاوِيَةَ خَصْمٌ كَرِيمٌ، فَمَا دُخُولُكَ بَيْنَهُمَا“

মুয়াবিয়ার রব অত্যন্ত দয়ালু রব। মুয়াবিয়ার প্রতিপক্ষ ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব প্রতিপক্ষ।

সুতরাং তুমি তাদের মাঝে কেন হস্তক্ষেপ করছ? [৪]

[১] সূরা হুহা, আয়াত: ৫২

[২] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৪

[৩] আল-ইতিদাল লি-আবি বকর আল-বাকিলানি, পৃ. ৬৬, আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়া মিসর

[৪] ফাতহুল বারী: ৭/৮৬; তারিখু দামেশক: ৫৯/১৩১

মুশাজারাতে সাহাবার সাথে অন্যান্য জাতির ধর্মীয় যুদ্ধের তুলনা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধের (মুশাজারাতে সাহাবা) সঠিক রূপরেখা আমরা সাধ্যমতো আপনাদের সামনে পেশ করেছি। আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছি যে, এটি এমন কোনো ইতিহাস নয় যার জন্য আমাদের অন্য জাতিগুলোর সামনে লজ্জিত হতে হবে বা হীনম্মন্যতায় ভুগতে হবে।

অন্যান্য জাতির ধর্মীয় নেতারা ধর্মের নামে যে যুদ্ধগুলো শুরু করেছিলেন তার বিবরণ এতটাই ভয়াবহ যে মানুষের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট দলগুলোর ধর্মীয় নেতারা যখন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, তখন মানবতা মাটির নিচে দাফন হয়ে গেল। গির্জার তথাকথিত “পবিত্র পিতারা” তাদের “বিরোধে” যে গণহত্যা চালিয়েছিলেন, তার বিবরণ ইউরোপের ইতিহাসে পড়ুন। আপাতত মাওলানা মানাজির আহসান গিলানির কলম থেকে তার একটি ঝলক পেশ করা হলো:

“এই সিলসিলায় কোন কোন শহরে গণহত্যার ঘটনা কতবার ঘটেছে এবং গণহত্যার এই ঘটনাগুলোতে কত প্রাণ ঝরেছে, তার তালিকা ইউরোপের বিস্তারিত ইতিহাসগুলোতে পাওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সের বিখ্যাত হাস্পামা যা ‘বার্থোলোমিউ’ হাস্পামা নামে পরিচিত, বলা হয় যে নয় দিন পর্যন্ত প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীদের গণহত্যার নির্দেশ জারি ছিল। লেখা আছে যে, গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে গির্জার ক্যাথলিক নেকড়েরা জীবিত শিশুদের বের করত এবং কুকুরের সামনে ফেলে দিয়ে তাদের ছিঁড়ে ফেলার ও খাওয়ার দৃশ্য দেখত; প্যারিসের সিন নদীর পানি নিহতদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সারকথা হলো, এই সংঘাতের ধারায় অনুমান করা হয়েছে যে, যারা নিহত হয়েছে, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে অথবা অন্য উপায়ে যাদের হত্যা বা জবেহ করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা ছিয়াশি লক্ষ থেকে এক কোটি পর্যন্ত পৌঁছায়।” [১]

শুধু ইউরোপের ওপরই কেন সীমাবদ্ধ থাকবে! হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধসহ বিশ্বের এমন কোনো জাতি নেই যাদের ধর্মীয় ইতিহাস অত্যন্ত ভয়াবহ ও লোমহর্ষক অত্যাচারে পরিপূর্ণ নয়।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর একটি বড় অংশ তাদের ধর্মীয় নেতা এমনকি তাদের দেবতাদের পারস্পরিক যুদ্ধ, রক্তপাত, নীচতা...

[১] দাঞ্জালি ফিতনার প্রধান রূপরেখা, মাওলানা মানাজির আহসান গিলানি মরহুম, পৃ. ৮৯, ত. আল-মিজান। বিস্তারিত নিচের ইংরেজি উৎসগুলোতে দেখুন:

The History of Protestantism by Rev. J.A. Wylie

The Massacre of Ulster Protestants in 1641

(Christopher Marlowe) “Massacre at Paris”

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

...কাহিনী এবং কিছু স্থানে লজ্জাজনক লালসার কাহিনীতে ভরপুর। রামায়ণ থেকে মহাভারত পর্যন্ত পুরো কাহিনী দেখে নিন, স্থানে স্থানে যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত দেখা যাবে। পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধের মতো ঘটনা যত্রতত্র পাওয়া যাবে। ভাইকে ভাইয়ের সাথে এবং পিতাকে পুত্রের সাথে যুদ্ধরত দেখা যাবে।

কিন্তু হিন্দুদের অবস্থা এই যে, তারা তাদের এই ধর্মগুরুদের কেবল সম্মানই করে না, বরং তাদেরকে দেবতার মর্যাদা দিয়ে তাদের পূজা করে। যদিও স্বয়ং সেক্যুলার হিন্দু গবেষকদের মতে এই লোকেরা ছিল রাজা, পণ্ডিত এবং পূজারী, কিন্তু তাদের ভক্তরা তাদের জীবনবৃত্তান্তে অলৌকিক কাহিনী এবং অতিরঞ্জিত বিষয় যোগ করে তাদেরকে ‘খোদা’র আসনে বসিয়ে দিয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কারো কারো বর্ণিত অবস্থা নিচু স্তরের মানুষের মতো, এমনকি তাদের চেয়েও অধম।

আমরা এটা বলছি না যে, আল্লাহ না করুন আমরা মুসলমানরা আমাদের বুজুর্গদের শানে এই ধরনের অতিরঞ্জন করি। কিন্তু হিন্দুদের তাদের নিচু স্তরের ধর্মগুরুদের প্রতি অন্ধ ভক্তি দেখে সেই মুসলমানদের অবশ্যই আত্মমর্যাদাবোধ ও লজ্জা হওয়া উচিত, যারা জামাল ও সিরাজিনের মতো দুই-তিনটি যুদ্ধ দেখে নিজেদের ইতিহাসকে কলঙ্কজনক মনে করতে শুরু করে এবং সীমা এই যে, তারা সেই বুজুর্গদের সমালোচনায় লিপ্ত হয় যাদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্বশুর, তো কেউ জামাতা। কেউ সম্মানিতা স্ত্রী, তো কেউ কলিজার টুকরা। কেউ রক্ষক, তো কেউ কাতিবে ওহী। কেউ খাস খাদেম, তো কেউ খাস ছাত্র। কেউ রিসালাতের রাজদার, তো কেউ আমীনুল উম্মত। আফসোস যে, হৃদয়ে এতটুকু প্রশস্ততাও নেই যে, এমন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং এই সর্বোচ্চ স্তরের মহান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কারো কারো দু-একটি ভুলত্রুটিকে উপেক্ষা করে তাদের সবার প্রতি সম্মানের অনুভূতি বজায় রাখা যায়।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তিকাল

হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর খেলাফত

যদিও হযরত আলী (রা.) কোনো উত্তরসূরি নিযুক্ত করে যাননি, তবে তাঁর শাহাদাতের পর মুসলিম বিশ্বে তাঁর সাহেবজাদা হযরত হাসান (রা.)-এর চেয়ে অধিক বরকতময় ও উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিত্ব আর কেউ ছিলেন না। হুজুর (সা.) তাঁর এই দৌহিত্রকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, অনেক ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: “হে আল্লাহ! আমি হাসানকে ভালোবাসি, সুতরাং আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং তাকেও ভালোবাসুন যে হাসানকে ভালোবাসে।” [১]

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বলতেন যে: হযরত হাসান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। [২]

উম্মতের হাদি বরহক হুজুর (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও মনে ছিল:

“আমার এই ছেলেটি সরদার। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেবেন।” [৩]

ফলে কুফার বড় বড় ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাশা ছিল যে, হযরত হাসান (রা.)-এর খেলাফত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বরকতময় প্রমাণিত হবে, তাই তারা হযরত হাসান (রা.)-এর বায়আতের ব্যাপারে অবিলম্বে একমত হয়ে গেলেন। হযরত হাসান (রা.) তাদের অনুরোধে প্রথমে নীরবতা অবলম্বন করেন, কিন্তু পরে উম্মতের কল্যাণ বিবেচনা করে তাদের বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করেন। সর্বপ্রথম হযরত কায়েস বিন সাদ বিন উবাদাহ (রা.) বায়আত করেন, যিনি কুফার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। [৪]

হযরত হাসান (রা.) খেলাফত গ্রহণের পর যে প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন, তার প্রতিটি শব্দ থেকে স্পষ্ট ছিল যে, তিনি মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং ক্ষমতার জন্য রক্তপাত ঘটাতে কঠোরভাবে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেন:

“হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর লোকেরা মাদায়েনে হযরত হাসান (রা.)-এর কাছে সমবেত হলে হযরত হাসান (রা.) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। তারপর বললেন: “যা কিছু হওয়ার আছে, তা অতি নিকটে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর ফয়সালা কার্যকর হয়েই থাকবে, যদিও লোকেরা তা অপছন্দ করে। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি উপকার ও অপকার সাধনকারী কাজের মধ্যে পার্থক্য বুঝেছি, তখন থেকে আমার কাছে এটি মোটেও পছন্দনীয় নয় যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের সরিষা পরিমাণ এমন কোনো কাজের দায়িত্বশীল হই যাতে কারো এক ফোঁটা রক্তও ঝরে।” [৫]

[১] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৯৮, সহীহ সনদে।

[২] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৫৩, কিতাবুল মানাকিব, বাব সিফাতুন নবী (সা.)।

[৩] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৭০, কিতাবুস সুলহ, বাব কওলুন নবী (সা.) লিল হাসান বিন আলী ইম্মা ইবনি হাজা সাইয়্যিদ।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩১।

[৫] ফাযায়েলুস সাহাবা লি-আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৯২, ত-আর রিসালাহ।

কি হযরত হাসান (রা.) কি ভয় পেয়ে সন্ধি করেছিলেন?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর ইলিয়া (বাইতুল মুকাদ্দাস)-এ সিরিয়াবাসীদের কাছ থেকে নিজের খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং এখন তাঁকে “আমীরুল মুমিনীন” বলা হতে লাগল। [১]

মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে এটি ছিল একটি নতুন পরিবর্তন, কারণ হযরত আলী (রা.)-এর জীবদ্দশায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতের দাবি করেননি, বরং তিনি কেবল “আমীর” হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

খিলাফতের দুইজন দাবিদারের উপস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ খিলাফত পুনপ্রতিষ্ঠার তিনটি পথ ছিল:

- হয়তো তাঁরা হযরত হাসান (রা.)-এর বায়আত গ্রহণ করে নিতেন।
- সিরিয়াবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে তাঁদেরকে একটি খিলাফতের অধীনে আনার চেষ্টা করা হতো।
- খিলাফতের পদ ত্যাগ করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে খলিফা মেনে নেওয়া হতো।

সিরিয়াবাসীদের যদি বায়আত গ্রহণ করতেই হতো, তবে তারা হযরত আলী (রা.)-এরই বায়আত গ্রহণ করত, তাই প্রথম পথটি তো সম্ভবই ছিল না। এখন হযরত হাসান (রা.)-এর জন্য এটি ছিল এক বড় পরীক্ষা যে, তিনি এই নাজুক সময়ে কী সিদ্ধান্ত নেন। এমন পরিস্থিতিতে হযরত হাসান (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি নিজের ক্ষমতা বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করবেন না। এই সিদ্ধান্তে কোনো দুর্বলতা বা ভীর্ণতার অবকাশ ছিল না। সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত হাসান (রা.) পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। যেসব বর্ণনা এটি প্রকাশ করে যে, হযরত হাসান (রা.) নিজের বাহিনীর দুর্বলতা ও অবাধ্যতায় হতাশ হয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেগুলো যয়ীফ (দুর্বল) বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। হুঁয়া, হযরত হাসান (রা.)-এর বাহিনীতে কিছু আবেগপ্রবণ লোক অবশ্যই ছিল যারা সিরিয়াবাসীদের সাথে সন্ধি পছন্দ করত না, কিন্তু এই লোকেরা পরিস্থিতির ওপর প্রভাবশালী ছিল না। অধিকাংশ লোক হযরত হাসান (রা.)-এর একনিষ্ঠ অনুগতই ছিল, যাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ।

হযরত হাসান (রা.) শুরুতে নিজের কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করেননি যাতে হঠাৎ কোনো বিরোধী কণ্ঠস্বর উচ্চকিত না হয়, বরং সতর্কতা হিসেবে বায়আত গ্রহণের সময় আপনি মানুষের কাছ থেকে এই শর্ত নিলেন: “তোমরা আমার কথা শুনবে ও মানবে, আমি যার সাথে সন্ধি করব তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে, আর আমি যার সাথে যুদ্ধ করব তোমরাও তার সাথে যুদ্ধ করবে।”

ইরাকি সৈন্যদের সেই দল যারা সিরিয়াবাসীদের সাথে সন্ধির পক্ষে ছিল না, বায়আতের এই শব্দগুলোতে বেশ ইতস্তত বোধ করল এবং বলতে লাগল: “হযরত হাসান আমাদের মনের মতো লোক নন, তিনি তো যুদ্ধই চান না।” [২]

হযরত হাসান (রা.)-এর আদর্শবাদিতা এবং ইবনে মুলজামের হত্যা:

হযরত আলী (রা.)-এর হত্যাকারী আবদুর রহমান বিন মুলজামকে শাস্তির জন্য সামনে আনা হলো। সে হযরত হাসান (রা.)-কে বলল: “হাসান! আপনি কি একটি প্রস্তাব বিবেচনা করবেন? আল্লাহর কসম! আমি যখনই আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছি, তা পূরণ করে...”

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬১, দুটি দুর্বল সনদে বর্ণিত কিন্তু এর কিছু অংশ এমন রয়েছে যা এর বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেয়।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৩।

ছেড়েছি, আমি হাতিমে কাবায় আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে আমি আলী এবং মুয়াবিয়া উভয়কে অবশ্যই হত্যা করব অথবা নিজে মারা যাব। এখন যদি আপনি পছন্দ করেন তবে আমাকে সুযোগ দিন যে আমি মুয়াবিয়াকে হত্যা করি, তারপর যদি আমি বেঁচে ফিরি তবে এসে নিজেকে আপনার হাতে সোপর্দ করব।“ হযরত হাসান (রা.) অস্বীকার করে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করলেন, ফলে তাকে হত্যা করা হলো। [১]

হযরত হাসান (রা.)-এর সন্ধি ঘোষণা এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিরোধিতা:

এই সময়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে দাওয়াত দিলেন যে তিনি যেন তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং যা চান দাবি পেশ করেন। হযরত হাসান (রা.) এতে সম্মত হলেন এবং নিজের চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.)-কে বললেন:

“আমি কিছু ভেবেছি এবং চাই যে আপনি এতে আমার সাথে থাকুন।”

আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.) বললেন: “বলুন, কী ভেবেছেন?”

তিনি বললেন: “আমি মদিনায় চলে যাব এবং শাসনভার মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করব। হাঙ্গামা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে এবং অনেক রক্ত ঝরেছে।”

আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.) পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন: “আল্লাহ আপনাকে পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।”

এখন হযরত হাসান (রা.) হযরত হুসাইন (রা.)-কে ডেকে নিজের মত জানালেন। তিনি শুরুতে দ্বিমত পোষণ করলেন কিন্তু হযরত হাসান (রা.) তাকে বোঝাতে থাকলেন এবং দলীল দিয়ে তাকে রাজি করালেন। হযরত হুসাইন (রা.)-ও এতে সম্মত হলেন। [২]

হযরত হাসান (রা.)-এর আহলে ইরাকের প্রতি ভাষণ এবং দুষ্কৃতিকারীদের অভদ্রতা:

কিছু দিন পর হযরত হাসান (রা.) আহলে ইরাককে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে ঐক্যের জন্য প্রস্তুত করতে ‘সাবাহ’ নামক স্থানে জমা করলেন এবং সাধারণ সভায় ভাষণ দিলেন। তিনি অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে বললেন:

“আমি তোমাদের হকে তেমনই হিতাকাঙ্ক্ষী যেমন নিজের জন্য। আমি একটি বিষয় স্থির করেছি। তোমরা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করো না। নিঃসন্দেহে উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিভক্তির চেয়ে অনেক উত্তম।” [৩]

তারপর বললেন: “পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আজ আমার এবং আমার ভাইয়ের চেয়ে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে কোনো নবীর নাতি হয়। তবুও আমার রায় এই যে তোমরা মুয়াবিয়ার ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও।” [৪]

[১] তারিখ তাবারী, ৫/১৩৮, ১৪০। কিছু বর্ণনায় এসেছে যে হযরত আলী (রা.)-এর ওয়ারিশরা প্রতিশোধের জোশে তাঁর অসিয়তের বিরুদ্ধে ঘাতকের হাত-পা কেটে ফেলেছিলেন, চোখ উপড়ে ফেলেছিলেন, তারপর তাকে হত্যা করে শেষে লাশ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনার সনদ দুর্বল। মুতাওয়াতির ও সহীহ বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত যে তাকে শুধু হত্যা করা হয়েছিল।

[২] আল-ইসাবাহ, ২/৭৫; তারিখ দামেশক, ১৩/২৭০, তরজমা হাসান বিন আলী (রা.), সনদ সহীহ।

[৩] তারিখ তাবারী, ৫/১৫৮; আন-নাসায়ি বিন রাশিদ, আল-জাওহরাতুল তুহফা, পৃষ্ঠা ২১।

[৪] ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত যে হাসান বিন আলী (রা.) বলেছেন: “যদি তোমরা জাবুস থেকে জাবিলক পর্যন্ত তালাশ করো তবে আমার এবং আমার ভাই ছাড়া এমন কোনো ব্যক্তিকে পাবে না যার দাদা নবী ছিলেন। আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করব এবং মুসলমানদের রক্ত রক্ষা করব।” (মাজমাউয যাওয়াইদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৬৭৩, সনদ সহীহ; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, রেওয়ায়েত নম্বর: ১২৯১১)।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

আপনি কেবল ঐকমত্যের কথা বলেছিলেন, অমনি আশেপাশে উপস্থিত অনেক লোক, যাদের মধ্যে খারেজি ও সাবায়ি প্রবণতা ছিল, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং বলল: “হাসানও তার পিতার মতো কাফের হয়ে গেছে।” তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কেউ কাঁধ থেকে চাদর টেনে নিল। কেউ পায়ের নিচ থেকে জায়নামাজ টেনে নিল, কেউ তাঁবুতে হামলা করে মালামাল লুট করল, এমনকি আপনার পায়ের নিচ থেকে গালিচাও টেনে নিয়ে গেল। [১]

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর প্রাণঘাতী হামলা:

কিছু দিন পর হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদায়েন যাচ্ছিলেন। পথে এক জায়গায় নামাজ পড়ছিলেন, তখন সেই দুষ্কৃতকারীদের মধ্য থেকে কেউ খঞ্জর দিয়ে আপনার ওপর হামলা করল। আকস্মিক হামলায় আপনার উরুতে জখম হলো। অনুগতরা হামলাকারীকে ধরে হত্যা করল। আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদায়েনের কাসরে আবইয়াজে (সাদা প্রাসাদ) অবস্থান নিলেন। জখমের চিকিৎসা করা হলো এবং আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু সুস্থ হয়ে উঠলেন। [২]

এই জালিমরা হাত তোলার এই সুযোগগুলো এ কারণে পেয়েছিল যে, সাইয়্যিদুনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার মতো পাহারার ব্যবস্থা করতেন না। বিষয়টি এমন মোটেও ছিল না যে, আপনার একনিষ্ঠ সাথীরা, যারা সংখ্যায় হাজার হাজার ছিল, তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল। সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাণঘাতী হামলা বা মালামাল লুট হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী খলিফা ছিলেন। [৩]

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন?

কিছু দিন পর হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ইরাক থেকে শামের দিকে রওনা হলেন। [৪] সাধারণ ধারণা হলো যে, সেনাবাহিনী শামে হামলার জন্য যাচ্ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু চেয়েছিলেন যে, সেই সমস্ত লোক যারা তাঁর সাথে সন্ধি ও যুদ্ধের বিষয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে, তারা একবার একত্রিত হোক এবং তিনি তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের এক বিশাল সমাবেশে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে এই সত্যটি প্রমাণিত হয়:

- (১) ইমাম যুহরি থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না। [৫]

[১] তারিখ আল-তাবারী ৫৯/৫, আন ইসমাইল বিন রাশিদ; আল-আখবার আল-তিওয়াল, পৃ. ২১০।

[২] আল-মু'জাম আল-কবীর লিত-তাবারানি ৭৩/৩, মক্কা সংস্করণ, পৃ. তরজমা; তারিখ আল-তাবারী ১২২/৫; আল-আখবার আল-তিওয়াল, পৃ. ২১০।

[৩] কিছু দুর্বল বর্ণনায় আছে যে, হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাঠানো উবায়দুল্লাহ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে এসে এই গুজব ছড়িয়েছিলেন যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তো সন্ধি করতে চান; তখন এটি শুনে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথীরা তাঁর ওপর হামলা করে। (আল-আখবার আল-তিওয়াল, পৃ. ২১৭; তারিখ আল-তাবারী ১৫৯/৫)।

কিছু বর্ণনায় এই ধারণাও দেওয়া হয়েছে যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু একেবারে নিরুপায় হয়ে গিয়েছিলেন, পুরো সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর জন্য কোনো আশ্রয়স্থল অবশিষ্ট ছিল না। এই ধরনের কথা সম্ভবত এজন্যই তৈরি করা হয়েছে যাতে এই ধারণা দেওয়া যায় যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু সন্ধিতে রাজি ছিলেন না, কেবল দুর্বলতার কারণে সন্ধি করেছেন। এই বর্ণনাগুলো সনদের দিক থেকে অনেক দুর্বল কিচ্ছা এবং বুখারীর সহিহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিকও বটে।

[৪] সহিহ আল-বুখারী, হা. ২৭০৪, কিতাবুস সুলহ, বাব কাওলুন নবী ﷺ লিল হাসান বিন আলী ইন্না ইবনি হাজা সাইয়্যিদুন।

[৫] ওয়া কাজা ফিল হাসান লি ইবনিল ফাদাল; তারিখ আল-তাবারী ৫৮/৫।

তারিখ-এ মিল্লাত-এ মুসলিমা — দ্বিতীয় অংশ

২. হযরত হাসান (রা.) বায়আত গ্রহণের শুরুতেই এই শর্ত দিয়েছিলেন যে, “আমি যার সাথে সন্ধি করব, তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে।” [১] বায়আতের শব্দাবলীতে এই শর্তটি এই কারণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যে, হযরত হাসান (রা.) শুরু থেকেই সন্ধি করার আগ্রহী ছিলেন।

৩. বায়আতের সময় সেনাবাহিনীর কিছু আমীর এই শব্দগুলো বলতে চেয়েছিলেন: “আমরা আপনার কাছে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং বিদ্রোহীদের (শামবাসী) বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকারে বায়আত করছি।” কিন্তু হযরত হাসান (রা.) এই শব্দগুলো প্রত্যাখ্যান করে এই শব্দগুলো বলিয়েছিলেন: “আলা কিতাবিল্লাহি ওয়া সুন্নাতি নাবিয়্যিহি” (আল্লাহর কিতাব এবং নববী সুন্নাহর অনুসরণের ওপর বায়আত করছি)। এরপর তিনি বললেন: “কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ সমস্ত শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে।”

৪. হযরত হাসান (রা.) তাঁর একজন সেনাপতিকে এই কারণেই বরখাস্ত করেছিলেন যে, তিনি শামের ওপর আক্রমণের জন্য জেদ ধরছিলেন। আপনি তাঁর পরিবর্তে হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। [২]

৫. হযরত হাসান (রা.)-এর একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে শামের দিকে যাওয়া এবং এরপর সেখানে তৎক্ষণাৎ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করে নেওয়া নিজেই এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, এই সৈন্য পরিচালনা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ছিল না। অন্যথায় এত বড় শক্তির সাথে শামে আক্রমণ করতে আপনার কীসের ভয় থাকতে পারত।

৬. সহীহ বুখারীর বর্ণনায় স্বয়ং হযরত হাসান (রা.)-এর বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তিনি মুসলিম উম্মাহকে আরও রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বলেছিলেন: “ইন্না হাযিহিল উম্মাতা কদ আ-সাত ফী দিমা-ইহা” “নিঃসন্দেহে এই উম্মত নিজের রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়েছে।” [৩] স্পষ্ট যে, হযরত হাসান (রা.) উম্মতের পারস্পরিক রক্তপাতের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সেই সময়েও অবগত ছিলেন যখন আপনি কুফা থেকে সৈন্য নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। তাই নিশ্চিতভাবেই আপনি সন্ধির সিদ্ধান্ত কুফাতেই করে ফেলেছিলেন।

সন্ধির ঘটনা “সহীহ বুখারী”-তে:

এই উদ্দেশ্যের যথাযথ পূর্ণতার জন্য আপনি চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খিলাফতের ষষ্ঠ মাসে আপনি নিঃস্ব অবস্থায় নয়, বরং পুরো বাহিনীসহ শামের সীমান্তে যান। এমন মনে হয় যে, সেই সময় পর্যন্ত শামের নেতাদের হযরত হাসান (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কোনো ধারণা ছিল না। তাই এত বড় বাহিনী দেখে তারা বিচলিত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ এড়ানোর জন্য আলোচনার উদ্যোগ নেন, যার পরামর্শ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে:

[১] তারিখুত তাবারী, ৫: ১৬৩

[২] তারিখুত তাবারী, ৫: ১৫৮

[৩] তারিখুত তাবারী, ৫: ১৮৩, যুহরী থেকে বর্ণিত

[৪] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩: পৃষ্ঠা ৩০, কিতাবুস সুলহ, বাব: নবী (সা.)-এর বাণী ‘হাসান ইবনে আলী আমার এই সন্তান একজন সাইয়েদ’।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

হযরত হাসান (রা.) যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে পৌঁছালেন, তখন আমার ইবনুল আস (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বললেন: “আমি এমন এক বাহিনী দেখেছি যারা তাদের প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না।” হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “হে আমার! যদি এই বাহিনী ওই বাহিনীকে হত্যা করে এবং ওই বাহিনী এই বাহিনীকে হত্যা করে, তবে সাধারণ মানুষের দেখাশোনা কে করবে? কে নারী ও শিশুদের খেয়াল রাখবে? কে তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে?”

এ কথা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কুরাইশের বনু আবদে শামস গোত্রের দুই (বিশিষ্ট) ব্যক্তিকে ডাকলেন: হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)। তিনি তাঁদের বললেন: “আপনারা উভয়ে হযরত হাসান (রা.)-এর কাছে যান, তাঁকে (সন্ধির) প্রস্তাব দিন, তাঁর সাথে কথা বলুন এবং (মীমাংসার) অনুরোধ করুন।” তাঁরা উভয়ে হযরত হাসান (রা.)-এর কাছে এলেন এবং কথা বলে মীমাংসার অনুরোধ করলেন। হযরত হাসান (রা.) তাঁদের দুজনকে বললেন:

“আমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর (যারা দানশীলতা ও মহানুভবতার জন্য পরিচিত)। আর আমরা এই (দুনিয়ার) ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য থেকে (অনেক কিছু) ব্যয় করে ফেলেছি (অর্থাৎ মানুষকে আমাদের দানশীলতায় অভ্যস্ত করে তুলেছি, এছাড়া নিঃসন্দেহে এই উম্মতের মধ্যে অনেক রক্তপাত হয়েছে)।” (এই রক্তপাত বন্ধ করা জরুরি এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের জন্য এটি আবশ্যিক যে আমরা মুক্তহস্তে ব্যয় করতে থাকি, যাতে বিরোধী পক্ষের মুখও বন্ধ থাকে এবং মানুষ শান্তির সুফল পেয়ে খুশি থাকে।)

সিরিয়ার দূতরা বললেন: “জি হ্যাঁ! হযরত মুয়াবিয়া আপনাকে (এত দান ও সম্পদ) দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন এবং আপনার কাছে সন্ধির অনুরোধ করছেন।” হযরত হাসান (রা.) (এই লোকদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং আরও নিশ্চিত হওয়ার পর) বললেন: “তাহলে এই প্রস্তাব পূরণ করার জিম্মাদারি কে নেবে?” উভয় ব্যক্তি বললেন: “আমরা এর জিম্মাদার।”

এরপর হযরত হাসান (রা.) আরও একটি জিনিসের দাবি করলেন (যাতে সন্ধির বিনিময়ে সেটিরও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়)। উভয় ব্যক্তি সেটিরও জিম্মাদারি দিলেন। ফলে হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করে নিলেন। [১]

হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধিতে মালের শর্ত এজন্য দিয়েছিলেন যে, মানুষ তাদের প্রয়োজন নিয়ে তাঁর কাছে আসত; এছাড়া তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ধির বিরোধীও ছিল। তাদের সমুদ্র রাখার জন্য ইনাম ও ইকরামের (পুরস্কার ও সম্মাননা) ধারা অব্যাহত রাখা জরুরি ছিল। এই কল্যাণের জন্য হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছ থেকে বড় অংকের অর্থ ও ভাতা চালু করাতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

[১] সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭০, কিতাবুস সুলহ, বাব: কওলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিল হাসান ইবনে আলী ইম্মা ইবনি হাযা সাইয়্যিদ।

ছিলেন, ফলে সন্ধি হয়ে গেল। সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী ‘দারাবজারদ’ নামক এলাকার খাজনা স্থায়ী আয়ের জন্য তাঁর নামে করে দেন। এছাড়া কুফার বায়তুল মালের সমস্ত অর্থ পঁচিশ লক্ষ তাঁর নিকট হস্তান্তর করেন। [১]

দুর্বল ও সনদবিহীন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সন্ধির শর্তাবলী পূরণ করেননি। এটি সম্পূর্ণ ভুল। [২]

সন্ধি ঘোষণায় আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর অংশগ্রহণ:

এরপর কুফা থেকে কিছুটা দূরে সিরিয়াগামী মহাসড়কে অবস্থিত ‘নাখাইলা’ নামক জনপদে একটি সমাবেশের আয়োজন করে সন্ধির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) প্রথমে মনঃকষ্টের কারণে এই সমাবেশে शामिल হচ্ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তীতে তিনিও মদীনা থেকে তামরীফ আনেন। প্রথমে তাঁর দুঃখ ছিল যে, এই সিদ্ধান্তে তাঁর পরামর্শ নেওয়া জরুরি মনে করা হয়নি। তাই তিনি তাঁর বোন সাইয়েদা হাফসা (রা.)-কে বললেন: “আপনি কি দেখেছেন মানুষ কী করছে! তারা এই বিষয়ে আমাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি।”

হযরত হাফসা (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন: “আপনার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, আপনি এই সন্ধি থেকে দূরে থাকবেন যার মাধ্যমে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শ্যালক এবং উমর ফারুক (রা.)-এর পুত্র। আপনি ওই ব্যক্তিদের নিকট যান। তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনার না যাওয়ার কারণে কোথাও কোনো মতভেদ সৃষ্টি না হয়ে যায়।” সাইয়েদা হাফসা (রা.) জেদ করে তাঁকে পাঠালেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনিও শরিক হলেন। [৩]

যখন উম্মতের বড় বড় ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন এবং সন্ধির সমস্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত হলো, তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.)-কে বললেন: “উঠুন এবং ঘোষণা করে দিন যে, আপনি খিলাফতের দায়িত্ব আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন।”

হযরত হাসান (রা.) মিস্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন:

“সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তা হলো তাকওয়া এবং সবচেয়ে বড় বোকামি হলো গুনাহ। এই বিষয়টি যাতে আমার এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে মতভেদ ছিল, এতে যদি আমি হকের ওপর থাকতাম তবে আমি উম্মতের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং তাদের রক্ত নিরাপদ রাখার জন্য...”

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৫৯, ১৬০... বর্ণনায় দিনার না দিরহাম তা স্পষ্ট নয়। আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চাশ লক্ষ দিনার ছিল কারণ একটি সহীহ সনদের বর্ণনায় “খামসু মিআতি আলফি আলফি দিরহাম” (পঞ্চাশ কোটি দিরহাম)-এর উল্লেখ রয়েছে। মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩৮০৮। সম্ভবত এক দিনার একশ দিরহাম মূল্যের সমান ছিল, তাই পঞ্চাশ লক্ষ দিনার নিয়ে পঞ্চাশ কোটি দিরহাম আদায় করে দেওয়া হয়েছে।

[২] মু’জামুল বুলদান: ৫/২৮৮

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৩১০৮, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতুল খন্দক; মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ১৯৭৭৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, বর্ণনা নম্বর: ৫৭০। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর শুরুতে দ্বিধা ছিল স্বাভাবিক মনঃকষ্টের কারণে। এটা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও মানবিক অনুভূতি বর্জিত ছিলেন না। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তো হযরত উমর ফারুক (রা.) কর্তৃক গঠিত শক্তিশালী শুরা কমিটির সদস্য ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তো এটি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, খিলাফতের বিষয় পর্যায়ক্রমে ওই সকল বড় বড় ব্যক্তিদের পরামর্শে নির্ধারিত হবে যারা অধিক সংখ্যক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩২৪)। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) অধিকাংশ যুদ্ধে শরিক ছিলেন। এছাড়া মুসলিম বিশ্বে তাঁর যে অবস্থান ছিল সেই প্রেক্ষিতে কেবল সাধারণ মানুষ নয় বরং তাঁর নিজেরও এই প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক ছিল না যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করা জরুরি মনে করা হবে। কিন্তু যখন তা হলো না, তখন তাঁর সাময়িক মনঃকষ্ট অবশ্যই হয়েছিল। তবে এটিও তাঁর মহানুভবতা ছিল যে, তিনি মনঃকষ্ট কাটিয়ে এই সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য তামরীফ আনেন।

“নিজের হক নিজেই ত্যাগ করেছি, আর যদি অন্য কেউ অধিক হকদার হয়ে থাকে তবে আমি তার হক তাকে দিয়ে দিয়েছি।”

এরপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: [১] وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

(আমি জানি না যে সম্ভবত এটি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষার মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনোপকরণ।) [২]

ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যক্রমের পর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন, এরপর কুফায় গমন করলেন এবং মানুষের কাছ থেকে নিজের জন্য বায়আত গ্রহণ করলেন। [৩]

খিলাফতে রাশিদাহর সমাপ্তি:

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সাথে সাথেই উম্মাহর ইতিহাসের সেই বরকতময় যুগের সমাপ্তি ঘটল যাকে “খিলাফতে নবুওয়াত” বা “খিলাফতে রাশিদাহ” বলা হয়। এরপর যে যুগ শুরু হলো, জমহুর ইসলামি উলামায়ে কেরাম তাকে “খিলাফতে আন্মাহ” বলেন। একে “খিলাফত” এই জন্য বলা হয় যে, এরপরও শাসকরা এই পদের জন্য একই শিরোনাম ব্যবহার করেছেন এবং “আমীরুল মুমিনীন” উপাধি একইভাবে বহাল রেখেছেন। এছাড়া শরয়ী আইন, হুদুদ ও কিসাস একইভাবে কার্যকর ছিল এবং ইসলামি ব্যবস্থা বিভিন্ন যুগে কমবেশি দুর্বলতা সত্ত্বেও চলতে থাকে। একে “রাশিদাহ”-এর পরিবর্তে “আন্মাহ” এই জন্য বলা হয় যে, এতে ভালো, মন্দ, মধ্যম সব ধরনের শাসক এসেছেন। অথচ খিলাফতে রাশিদাহর মানদণ্ড এর চেয়ে অনেক উচ্চে ছিল।

এই “খিলাফতে আন্মাহ”-কে “মুলুকিয়াত” (রাজতন্ত্র) হিসেবেও অভিহিত করা হয়, কারণ ধীরে ধীরে এতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু শাসকের সত্তা হয়ে দাঁড়ায় এবং শাসনব্যবস্থা শাসকের পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যেমনটি রাজতন্ত্রের রীতি হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শাসনের এই ধারা খিলাফতে আন্মাহকে প্রায় মুলুকিয়াতের সদৃশ করে তুলেছিল। শাসনের এই ধরন বৈধতার সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সেই আদর্শ শুরা (পরামর্শ) ভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ছিল, যা খিলাফতে রাশিদাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। খিলাফতে রাশিদাহতে শাসক নির্বাচনের পেছনে পরিবার বা গোত্রের কোনো প্রভাব ছিল না। জনবল বা সামরিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সেখানে কোনো প্রশ্নই ছিল না। শাসনের জন্য প্রচেষ্টা এমনকি পদের আকাঙ্ক্ষাও নিন্দনীয় গণ্য করা হতো। শাসক ও কর্মকর্তাদের নির্বাচন হতো শ্রেষ্ঠত্ব, ইলম ও ফিকহ, মারিফাত ও তাকওয়া, অসাধারণ যোগ্যতা এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কুরবানির উজ্জ্বল অবদানের ভিত্তিতে। এই কারণেই চারজন খলিফায়ে রাশিদুন আলাদা আলাদা পরিবারের ছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রথম ভাষণ:

খিলাফতের পদে আসীন হওয়ার পর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে একটি ভাষণ দেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবীব ইবনে মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ এভাবে শোনান:

[১] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১১১

[২] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/১২৬, মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩৮১৩, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৩০৬৯৮, ত-আর-রুশদ

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

যখন মানুষজন চলে গেল, তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খুতবা দিলেন এবং বললেন: “এখন এই বিষয়ে কেউ কথা বলতে চাইলে মাথা তুলে কথা বলুক, আমরা এই বিষয়ের (খিলাফত) তার এবং তার পিতার চেয়ে বেশি হকদার।”

বর্ণনাকারী হাবিব ইবনে মাসলামা (রা.) বলেন: আমি (ইবনে উমর রা.-কে) জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কি তার কথার উত্তর দেননি? তিনি বললেন: আমি আমার জায়গা থেকে ওঠার জন্য নড়াচড়া করেছিলাম। আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, এই বিষয়ের (ক্ষমতার) বেশি হকদার সেই ব্যক্তি যে তোমার এবং তোমার পিতার বিরুদ্ধে ইসলামের খাতিরে যুদ্ধ করেছে [১]। কিন্তু আমি এই কারণে বলতে বলতে থেমে গেলাম যে, পাছে ঐক্যে ফাটল ধরে এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, আর আমার কথার অন্য কোনো অর্থ নেওয়া হয়। তাই আমি জান্নাতের সওয়াবের ওপরই সন্তুষ্ট থাকলাম।

হাবিব ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন: “আপনি নিরাপদ থাকলেন এবং বেঁচে গেলেন।”

[১] من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطلع لنا قرنه فلنحن احق به منه ومن ابيه [১] (সহীহ বুখারী, হা: ৪১০৮, বাবু গায়ওয়াতিল খন্দক)

“তার কথা” দ্বারা এখানে “মিনহু ওয়া মিন আবিহি” (তার এবং তার পিতার চেয়ে)-এর অর্থ এই বলা হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইশারা নিজের দিকে ছিল, অর্থাৎ যদি সাহাবীদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মনে করেন যে তিনি আমাদের চেয়ে বেশি শাসনের হকদার, তবে তিনি সামনে আসুন। ইবনে উমর (রা.) এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি এবং অকারণে বিচলিত হতে থাকলেন।

লেখার এই মন্তব্যটি অত্যন্ত আদ্ভুত, কারণ যদি বিষয়টি এমনই হতো তবে হাবিব ইবনে মাসলামা (রা.)-এর এত আশঙ্কা হতো না যার উল্লেখ এই বর্ণনায় রয়েছে। সম্ভব যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে বোঝার ক্ষেত্রে আপত্তি এবং সুর ইত্যাদিতে পছন্দসই পাওয়া যায়নি এবং তিনি নিজেই আশঙ্কায় ভুগছিলেন। হাবিব ইবনে মাসলামা (রা.), যিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সেনাপতি এবং ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সেই অর্থই বুঝেছিলেন যা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বুঝেছিলেন। হাবিব ইবনে মাসলামা (রা.) তার বোঝার ওপর আপত্তি করেননি বরং এটি বলেছেন যে আপনি সবর করে ভালো করেছেন। কিন্তু এরপর তিনি নিজে কিতাবের শব্দগুলো থেকে সঠিক অর্থ গ্রহণ করেননি। এই কারণেই হাদীসের ব্যাখ্যাকারদের (শারহিন) মধ্যে কেউ এই অর্থ গ্রহণ করেননি।

হাদীসের ব্যাখ্যাকার এখানে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইশারার ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো, ইশারা হযরত হাসান (রা.) এবং তার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর দিকে ছিল। দ্বিতীয়টি হলো, ইশারা দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক টানাপোড়েন বিবেচনা করলে প্রথম সম্ভাবনাটি অত্যন্ত স্পষ্ট, এই কারণেই হাফেজ ইবনে হাজার দ্বিতীয় মতটিকে দূরবর্তী (অসম্ভব) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন: قيل اراد علياً وعرض بالحسن والحسين، وقيل اراد عمر وعرض بابنه عبدالله، وفيه بُعدٌ لان معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر (বলা হয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলী (রা.) এবং তিনি হযরত হাসান ও হুসাইনের ওপর কটাক্ষ করেছেন। এও বলা হয়েছে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত উমর (রা.) এবং তিনি তার পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.)-এর ওপর কটাক্ষ করেছেন, কিন্তু এই সম্ভাবনা দূরবর্তী কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে অত্যন্ত সম্মান করতেন।) (ফাতহুল বারী: ৭/৪০৩)। এখন প্রশ্ন হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.) এবং হাসান (রা.)-এর বিপরীতে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে এই মহান ব্যক্তিদের চেয়ে খিলাফতের বেশি হকদার কীভাবে বলছিলেন? এর উত্তর স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একটি খুতবা থেকে পাওয়া যায় যেখানে তিনি فرميا: “আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই, কারণ তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-এর মতো ব্যক্তির আবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” (لكني عسيت ان اكون انفعلكم لعدوكم وانفعكم) “কিন্তু আমি তোমাদের শত্রুর জন্য বেশি কষ্টদায়ক এবং তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণকামী হতে পারি।” (তারিখে দামেশক: ৫৯/২৬৩)

এই কারণেই হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: “হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর রায় ছিল যে, (খিলাফতের ক্ষেত্রে) শক্তি, কৌশল এবং প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তি, নিছক ইসলাম গ্রহণ, দ্বীনদারী এবং ইবাদতে অগ্রগামী ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য পাবে। এই কারণেই তিনি নিঃসংকোচে বলেছিলেন যে তিনি বেশি হকদার। পক্ষান্তরে ইবনে উমর (রা.)-এর রায় এর বিপরীত ছিল যে, কম মর্যাদাবান ব্যক্তির বায়াত গ্রহণ করা উচিত নয় যতক্ষণ না ফিতনার আশঙ্কা থাকে। এই কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর পরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর বায়াত গ্রহণ করেন, এরপর তার পুত্র ইয়াজিদেব বায়াতও করেন এবং নিজের পুত্রদের তার বায়াত ভাঙতে নিষেধ করেন, এরপর আব্দুল মালিকের বায়াতও করেন।” (ফাতহুল বারী: ৭/৪০৩)

সারকথা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজেকে হযরত আলী, হুসাইন বা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বলতেন না, তবে তার ধারণা ছিল যে তিনি শাসনকার্য বেশি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন, তাই তিনি এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি এই প্রচেষ্টায় যা-ই হোক নেক নিয়ত ছিলেন এবং পরবর্তী পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে যে নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত যোগ্য এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাসক ছিলেন।

[২] উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি সেই প্রাচীন মুহাজির সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা বদর, ওহুদ এবং খন্দকে তোমাদের পিতা আবু সুফিয়ান (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, তোমরা তখন মুসলমান হওনি। পূর্ববর্তী খিলাফতগুলোতে “ইসলামে অগ্রগামিতা” এবং হিজরত, জিহাদ ও কুরবানিকে যোগ্যতার মাপকাঠি করা হয়েছিল, সেই হিসেবে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি যোগ্য।

সহীহ বুখারী, হা: ৪১০৮, আল-মাগাযী, বাবু গায়ওয়াতিল খন্দক।

একটি ভুল ধারণার নিরসন: কিছু ঐতিহাসিক এবং হাদীস ব্যাখ্যাকারদের এই ভুল ধারণা হয়েছে যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই ভাষণ ইয়াজিদেব উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সময়... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অবস্থা ও কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে এবং বুঝে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে এবং তিনি ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী ও উম্মতের কল্যাণকামী। যদি এমনটি না হতো, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই সন্ধি করতেন না, বরং যুদ্ধ করতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গুণাবলির কারণে হযরত আলী (রা.)-ও হযরত হাসান (রা.)-কে তাঁর সাথে সন্ধি করতে নিষেধ করেননি। ইঁ্যা, তাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের গুণাবলির তুলনায় যে পার্থক্য ছিল, তাকেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আহলে মদীনার বায়আত:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর ক্ষমতা ত্যাগ এবং নিজের খেলাফত ঘোষণার পর সমগ্র ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নিজের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা মানুষের কাছ থেকে তাঁর বায়আত গ্রহণ করে। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন: “আমুল জামাআতের বছর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বুসর বিন আরতাত (রা.)-কে মদীনায় পাঠালেন যাতে তিনি মদীনার প্রতিটি গোত্র থেকে তাদের পতাকাসমূহের উপস্থিতিতে বায়আত গ্রহণ করেন। যখন আনসারদের উপস্থিতির দিন এল, তখন সেই দিন...”

(বাকি হাশিয়া গুয়াশতা)... এটি নুরে ওহীতে ছিল। (কাশফুল ইস্তিকার মিন হাদীসিস সহীহাইন লি ইবনুল জাওযী ১/১৬৭)

এটি একটি শক্তিশালী যুক্তি। বর্ণনায় কোথাও ইয়াজিদের উল্লেখ নেই। এই কiyাসের জন্য ভিত্তি হওয়ার মতো ঘটনাটি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন হাবীব বিন মাসলামাহ ফিহরী এবং উবাইদুল্লাহ বিন আদী। তাঁরা হিজরী ৪২ সনের আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। (তাকরীবুত তাহযীব অনুবাদ: ১১০৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/৩; তারীখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪২)

ইয়াজিদের ব্যাপারে যেহেতু এই বর্ণনাকে ইয়াজিদের খেলাফতের প্রতি ‘ইজমা’র দলিল হিসেবে পেশ করা হয়, তাই তারা এই কথা বের করেছে যে হাবীব বিন মাসলামাহ (রা.)-এর ওফাত ৫০ হিজরীর কাছাকাছি হয়েছে। এই কারণে তারা এই সুরত তৈরি করেছে: “তিনি মুয়াবিয়ার সাথে তাঁর যুদ্ধসমূহে সর্বদা ছিলেন এবং তিনি তাঁকে আরমিয়ার দিকে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি।” (আল-ইসাবাহ: ২/২২৩ ইবনে সাদ) অথচ হিজরতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে তাঁর ওফাত ৪২ হিজরীতে হয়েছে। “পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি” থেকে উদ্দেশ্য তাঁর বয়স। অর্থাৎ সে সময় তাঁর বয়স ৫০ বছরের কম ছিল। যেমনটি হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) নকল করেছেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের দিন হাবীবের বয়স ছিল বারো বছর।” (তাহযীবুল কামাল: ৫/৩৯৮)

যখন এই ঘটনা বর্ণনাকারী রাবী হাবীব বিন মাসলামাহ (রা.) নিজেই ৫০ হিজরীর আগেই ইন্তেকাল করেছেন, তবে এই ঘটনা ইয়াজিদের ওলী-আহদী সংক্রান্ত কীভাবে হতে পারে যা বছ বছর পরে হয়েছিল? মুজাম তাবারানী এবং মুজাম আওসাতের একটি বর্ণনায় এই মাসআলাটি সমাধান করে দেওয়া হয়েছে:

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: “যখন সেই দিন এল যখন দুমাতুল জান্দালে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে ঐক্যমত হলো (সেই দিনগুলোতে), তখন আমাকে হাফসা (রা.) বললেন: ‘আপনার জন্য এটি শোভা পায় না যে আপনি এই সন্ধি থেকে দূরে থাকেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্যালক এবং উমর ফারুক (রা.)-এর পুত্র।’ অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একটি বড় খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়ে আসলেন। বললেন: ‘কে আছে যে এই বিষয়ের (খেলাফতের) আকাঙ্ক্ষা ও আশা রাখে? অথবা এর জন্য ঘাড় বাড়িয়ে দেয়?’ ইবনে উমর (রা.) বলেন: ‘সেই দিনের আগে দুনিয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জাগেনি, আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, এই বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা সে রাখে যে তোমাকে এবং তোমার পিতাকে ইসলামের জন্য লড়াই করেছে যতক্ষণ না তোমাদের ইসলামে দাখিল করিয়েছে। তারপর আমি জামাত ও এর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করলাম এবং এই চিন্তা থেকে বিরত থাকলাম।’”

হায়সামি বলেন, একে তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, আর প্রকাশ্যে এটি হাসান বিন আলী (রা.)-এর সাথে সন্ধির বর্ণনাকারী। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হাদীস নম্বর: ৯৭৫৭)

আবু বকর হায়সামি এই বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এই ব্যাখ্যাও করছেন যে, এখানে হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর সাথে সন্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাবীকে যে বিভ্রান্তি হয়েছে (যে দুমাতুল জান্দালের কথা উল্লেখ করেছেন, অথচ সেখানে সন্ধি হয়নি), তা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খেলাফতের চুক্তি ইরাকে হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য যে এটি ৪১ হিজরীর ঘটনা। তাই ৪২ হিজরীতে ইন্তেকালকারী হাবীব বিন মাসলামাহ (রা.) এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করতে পারেন। এই ঘটনার সাথে ইয়াজিদের ওলী-আহদী বা বায়আতের কোনো সম্পর্ক নেই।

বনু সালামাও এল। বুসর ইবনে আরতাত বললেন: “তাদের মধ্যে কি জাবির আছে?”

লোকেরা বলল: “না।”

বুসর বললেন: “এই লোকেরা ফিরে যাক, জাবির না আসা পর্যন্ত আমি তাদের বায়াত গ্রহণ করব না।”

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন যে, অতঃপর এক ব্যক্তি আমার কাছে এল এবং বলল:

“আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের সাথে চলুন এবং বায়াত করে নিন। যাতে আপনি নিজের এবং আপনার কওমের রক্ত রক্ষা করতে পারেন, যদি আপনি তা না করেন তবে আমাদের যুবকদের হত্যা করা হবে এবং আমাদের সন্তানদের দাসী বানানো হবে।”

হযরত জাবির বলেন, আমি তাদের রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললাম। সন্ধ্যায় আমি উন্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে গেলাম এবং এই ঘটনা শোনালাম। তিনি বললেন: “হে আমার ভাতিজা! যাও বায়াত করে নিজের এবং নিজের কওমের রক্ত রক্ষা করো। আমি আমার ভাতিজাকেও একই কথা বলেছি, সে গিয়ে বায়াত করে নিয়েছে।” [১]

হযরত হাসানের পক্ষ থেকে অস্বীকার পালন:

হযরত হাসান, যিনি ইখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খেলাফত হযরত মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করেছিলেন, পরবর্তীতেও উম্মতের এমন প্রিয় বুজুর্গ ছিলেন যে, তাঁর ইশারায় হাজার হাজার গর্দান কাটতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তিনি উম্মতের স্বার্থ বিবেচনা করে এবং হযরত মুয়াবিয়ার যোগ্যতা স্বীকার করার কারণে তাঁর অনুগত ছিলেন।

যদিও কিছু লোক তাঁকে হযরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করত এবং তাঁর পক্ষ থেকে অস্বীকার করাকে তাঁর দুর্বলতা বা কাপুরুষতা বলে অভিহিত করত, কিন্তু হযরত হাসান তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং ভুল কথা প্রচারকারীদের প্রতিবাদও করতেন।

সন্ধির পর কোনো এক সময়ে হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: “লোকেরা বলছে যে আপনি (এখনও) খেলাফতের আকাঙ্ক্ষী?”

তিনি জোরালোভাবে অস্বীকার করে বললেন:

[১] আবু উসামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ওয়ালিদ ইবনে কাসীর ওয়াহাব ইবনে কায়সান থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি: যখন জামাআতের বছর (আমুল জামাআত) এল, মুয়াবিয়া মদিনায় বুসর ইবনে আরতাতকে পাঠালেন যাতে তিনি তাদের পতাকা ও গোত্র অনুযায়ী তাদের বায়াত গ্রহণ করেন। যখন আনসারদের আসার দিন এল, বনু সালামা এল। বুসর তাদের বললেন, জাবির কি আছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তবে তারা ফিরে যাক, জাবির উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বায়াত গ্রহণ করব না। জাবির বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি আমার কাছে এল এবং বলল: আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের সাথে চলুন এবং বায়াত করুন এবং আপনার রক্ত ও আপনার কওমের রক্ত রক্ষা করুন। কারণ আপনি যদি তা না করেন তবে আমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে এবং আমাদের সন্তানদের বন্দী করা হবে। জাবির বলেন, আমি তাদের রাত পর্যন্ত অবকাশ দিতে বললাম। যখন সন্ধ্যা হল, আমি নবীর স্ত্রী উম্মে সালামার কাছে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে সংবাদটি জানালাম। তিনি বললেন: হে আমার ভাতিজা, যাও বায়াত করো এবং তোমার রক্ত ও তোমার কওমের রক্ত রক্ষা করো, কারণ আমি আমার ভাতিজাকেও বায়াত করতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩০৫২২, সহীহ মুত্তাসিল সনদে বরং এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা, ত আল-রুশদ)

এই বর্ণনার অর্থ যেন এমন না নেওয়া হয় যে, হযরত মুয়াবিয়ার লঙ্কর বায়াত না করা মুসলমানদের হত্যা করত এবং তাদের সন্তানদের গোলাম বানাত। এটি মূলত হতে পারে না। এমনকি এটিও বর্ণিত হয়নি যে, প্রতিটি শহরে বায়াতের জন্য লঙ্কর পাঠানো হয়েছিল। তবে মদিনায় লঙ্কর পাঠানোর কথা এই সহীহ বর্ণনায় এসেছে যার ব্যাখ্যা দেওয়া আহলে ইলমদের ওপর আবশ্যিক। যদি হিজরি প্রথম শতাব্দীর বিভিন্ন ঘটনা যেমন মুশাজারাআত (বিবাদ) এবং হাররার ঘটনা ইত্যাদি দেখা যায়, তবে বোঝা যাবে যে হিজাজবাসী বিশেষ করে মদিনাবাসীদের সিরিয়াবাসীদের অধীনে থাকার কোনো আগ্রহ ছিল না। সিরিয়াবাসীরাও এই বিষয়টি ভালোভাবেই জানত। এই কারণেই এখানে বায়াতের জন্য বিশেষভাবে লঙ্কর পাঠানো হয়েছিল যাতে মদিনাবাসীদের ওপর কিছুটা প্রভাব থাকে এবং তারা দ্রুত যাকাত আদায় ও আনুগত্য করে নেয় এবং বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার স্ফুলিঙ্গ যেন পুনরায় জ্বলে না ওঠে। হযরত জাবিরকে লোকেরা যা বলেছিল যে নিজের এবং নিজের কওমের রক্ত রক্ষা করুন নতুবা যুবকদের হত্যা করা হবে এবং সন্তানদের দাসী বানানো হবে, এগুলো ছিল আশঙ্কা। বাস্তবে এমনটি কার্যকরভাবে ঘটেনি। যাই হোক, এই আশঙ্কার প্রেক্ষিতেই হযরত উম্মে সালামাও বলেছিলেন যে বায়াত করে নিজের এবং কওমের রক্ত রক্ষা করো।

“আরবদের মাথা আমার জন্য কাটা পড়তে প্রস্তুত। আমি যার সাথে লড়াই করব, তারা তার সাথেই লড়াই করবে। আমি যার সাথে সন্ধি করব, তারা তার সাথেই সন্ধি করবে। আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার রক্ত রক্ষার খাতিরে খেলাফত ত্যাগ করেছি। তবে কি আমি এখন পুনরায় নিজের হিজাজে রক্তপাত ঘটাব?” [১]

কায়েস বিন সাদ রাদিআল্লাহু আনহু-এর বায়াত:

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু-এর কিছু একনিষ্ঠ আমির প্রকৃতপক্ষে শুরুতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়াত হতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের মধ্যে কায়েস বিন সাদ রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন তালিকার শীর্ষে। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু বিচক্ষণতা ও নম্রতার সাথে কাজ করে তাদের রাজি করিয়ে নেন, যাতে যেকোনো মূল্যে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হযরত কায়েস রাদিআল্লাহু আনহু-এর কাছে দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কার আদেশে লড়াই করতে উদ্যত হয়েছেন? কারণ আপনি যার অনুগত ছিলেন, তিনি তো নিজেই আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন।”

কায়েস বিন সাদ রাদিআল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু-এর কাছে নতি স্বীকার করা পছন্দ করেননি। তখন হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু একটি সাদা কাগজে মোহর মেরে লিখে দিলেন: “আপনি যে শর্তগুলো চান তা এতে লিখে দিন, আমার কাছে সব গ্রহণযোগ্য।” আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু এত উদারতাকে সতর্কতার পরিপন্থী মনে করলেন এবং বললেন: “কায়েসের সাথে এমন শিথিলতা প্রদর্শন সমীচীন নয়।”

এ কথা শুনে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু বললেন: “আপনি ভেবে দেখুন, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর বিজয়ী হতে পারব না যতক্ষণ না সিরিয়া ও ইরাকবাসীর সমসংখ্যক লোক নিহত হয়। তারপর তাদের ছাড়া জীবনের কী স্বাদ থাকবে? আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পথ সম্ভব, আমি কায়েসের সাথে লড়াই করব না।”

হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু যখন সেই মোহরকৃত কাগজটি পাঠালেন, তখন হযরত কায়েস রাদিআল্লাহু আনহু নিজের এবং হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর সমর্থকদের জন্য এই নিশ্চয়তা চাইলেন যে, (বিগত যুদ্ধগুলোতে) যারা তাদের হাতে নিহত হয়েছে বা যে গনিমতের মাল তাদের হস্তগত হয়েছে, তার কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। এই চুক্তিতে তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু-এর কাছে সম্পদের কোনো আকাঙ্ক্ষা করেননি। হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু তাদের শর্ত মেনে নিলেন। তাদের সকল সঙ্গী হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু-এর বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। [২]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু-এর রাজনৈতিক কৌশলে নম্রতা ও মন জয় করাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। তিনি আন্তরিকভাবে উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন এবং যথাসম্ভব শক্তির পরিবর্তে সমঝোতার রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সন্ধিপত্রে এই শর্তও ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু-এর পর হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু খলিফা হবেন। কিন্তু প্রাচীন উৎসের কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায় না। যদি এই শর্ত নির্ধারিত হতো, তবে পরবর্তীতে ইয়াজিদের উত্তরাধিকার মনোনয়নের সময় মানুষ অবশ্যই বলত যে, এই অধিকার হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু-এর ছিল এবং যেহেতু তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তাই এই অধিকার তাঁর সন্তানদের হওয়া উচিত। কিন্তু সে সময় কেউ এই যুক্তি দেননি। সম্ভবত এই বর্ণনাটি এজন্য তৈরি করা হয়েছিল যাতে হযরত...

[১] আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, খণ্ড: ৩/৪৯৫ সহিহ সনদে

[২] তারিখুত তাবারী, ৫/১৬৫

...হাসান (রা.)-এর হত্যার অপবাদ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর চাপানো যায়।

হযরত হাসনাইন কারিমাইন (রা.)-এর ইরাক থেকে প্রস্থান এবং শেষ কথোপকথন:

খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর হযরত হাসান (রা.) মাদায়েনের দুর্গে লোকদের একত্রিত করলেন এবং বললেন:

“হে ইরাকবাসী! তোমরা আমার কাছে এই শর্তে বায়আত হয়েছিলে যে, তোমরা শান্তি ও যুদ্ধে আমার সাথে থাকবে। আমি হযরত মুয়াবিয়ার কাছে বায়আত হয়েছি। এখন তোমরা তাঁর কথা শোনো এবং মানো।” [১]

এরপর হযরত হাসান (রা.) কুফায় গেলেন এবং শহরবাসীদের থেকে বিদায় নেওয়ার আগে একটি প্রভাবশালী ভাষণ দিলেন, যাতে তিনি লোকদের প্রতিবেশী, মেহমান এবং বনু হাশিমের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখার তাগিদ দিলেন। [২]

ইরাকের ফিতনাবাজ লোকদের থেকে সাদাতগণ (নবী বংশ) অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু হযরত হাসান (রা.) প্রস্থানের আগে আদর্শ উদারতার পরিচয় দিয়ে সেই বাড়াবাড়িগুলো ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন:

“হে ইরাকবাসী! আমি তোমাদের তিনটি বিষয় ক্ষমা করে দিলাম: আমার পিতার হত্যা, আমার ওপর বর্ষার আঘাত এবং আমার আসবাবপত্র লুটতরাজ।” [৩]

হযরত হাসান (রা.)-এর এই কথাগুলো শুনেও কিছু লোকের মন শান্ত হলো না। তারা তাঁকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করার কারণে লজ্জা দিতে লাগল এবং বলল:

“আপনি মুমিনদের জন্য লজ্জার কারণ।”

তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন: “লজ্জা উত্তম, আগুন (জাহান্নাম) নয়।” [৪]

হযরত হাসনাইন কারিমাইন (রা.)-এর মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান:

এরপর তিনি (রা.) তাঁর ভাই হযরত হুসাইন (রা.) এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে একটি কাফেলার আকারে মদিনা মুনাওয়ারায় চলে গেলেন। [৫]

এই স্থানান্তরের পেছনে অনেক হিকমত ছিল: তিনি নিজেকে রাজনৈতিক ঝামেলা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন যা কুফায় সম্ভব ছিল না। তাঁর চরমপন্থী সমর্থক এবং খারেজীদের পক্ষ থেকেও তাঁর জীবনের ঝুঁকি ছিল। মদিনা মুনাওয়ারা তাঁর জন্য নিরাপদ ও প্রিয় স্থান ছিল যেখানে তিনি তাঁর বাকি জীবন একাগ্রতার সাথে কাটাতে চেয়েছিলেন।

[১] আল-মা'রিফাহ ওয়াত তারিখ: ৩/৩১৭, ত. আর-রিসালাহ।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৫।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৫৯, ১৬০, ইসমাঈল বিন রাশিদ থেকে বর্ণিত... পিতার হত্যা ক্ষমা করার অর্থ এই নয় যে ঘাতককে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, বরং ঘাতক আব্দুর রহমান বিন মুলজামকে তো কিসাস হিসেবে হত্যা করা হয়েছিল। সম্ভবত হযরত হাসান (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি এই হত্যার পেছনের ষড়যন্ত্র তদন্ত করা হতো তবে ইরাকবাসীদের মধ্যে অনেকেই অপরাধী সাব্যস্ত হতো এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রমাণিত হতো, আর শাসক তা'যীর (শাস্তি) হিসেবে এমন লোকদেরও সাজা দিতে পারতেন, কিন্তু হযরত হাসান (রা.) তাদের ক্ষমা করে দিলেন। পিতার হত্যা ক্ষমা করার দ্বারা সম্ভবত এটাই উদ্দেশ্য ছিল।

[৪] আল-ইসাবাহ: ২/৬৩; অর্থাৎ আগুন।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৫।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — ১৫তম খণ্ড

আপনার বাকি জীবন মদিনা মুনাওয়ারায় উম্মতের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং আকিদা সংশোধনে অতিবাহিত হয়েছে। আপনি ফিতনাবাজদের পক্ষ থেকে সাদাতে কিরামের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত ধারণার সর্বদা প্রতিবাদ করতেন। কেউ জিজ্ঞেস করল:

“আপনার সমর্থকরা এই আকিদা পোষণ করে যে, হযরত আলী (রা.) কিয়ামতের আগেই পুনরায় জীবিত হবেন।”

হযরত হাসান (রা.) অত্যন্ত জোর দিয়ে তা অস্বীকার করে বললেন:

“আল্লাহর কসম! তারা মিথ্যা বলছে। তারা আমাদের লোক নয়। যদি আমরা হযরত আলী (রা.)-এর পুনরায় জীবিত হওয়ার আকিদা রাখতাম, তবে তাঁর স্ত্রীদের পুনরায় বিবাহ দিতাম না এবং তাঁর মিরাস (উত্তরাধিকার) বণ্টন হতে দিতাম না।” [১]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাসনাইন কারিমাইনের সাথে সদ্ব্যবহার:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সারা জীবন হাসনাইন কারিমাইনের খেদমত এবং সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে থাকেন। একবার হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি বললেন:

“আমি আপনাদের এমন উপহার দেব যা ইতিপূর্বে কেউ কাউকে দেয়নি।” এরপর তিনি তাঁদের দুই লক্ষ দিরহাম দিলেন। [২]

একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.) এবং (তাঁদের চাচাতো ভাই) আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.)-কে এক লক্ষ করে দিরহাম পাঠালেন। [৩]

উপহার দেওয়ার এই ধারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উপহার গ্রহণ করতেন। [৪]

হযরত হাসান (রা.)-এর চরিত্র হননের অভিযান:

যেহেতু হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত হাসান (রা.)-এর সন্ধির কারণে চরমপন্থীরা হতাশ হয়েছিল, তাই তারা নিজেদের ক্ষোভ ঝাড়তে হযরত হাসান (রা.)-কে “মুজিল্লুল আরব” (আরবদের লাঞ্ছিতকারী) শব্দে কটাক্ষ করত। [৫] এ ছাড়াও তারা এমন সব বর্ণনা ছড়িয়ে দেয় যে, আপনি কেবল ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে জীবন কাটিয়েছেন, কেবল বিবাহ ও তালাক দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আপনি বিবাহের কয়েক দিন পরেই তালাক দিয়ে দিতেন। এমনকি আপনার উপাধি হয়ে গিয়েছিল “মিতলাক” অর্থাৎ অধিক তালাক প্রদানকারী। [৬]

এই সমস্ত বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল বরং অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন বা ভিত্তিহীন। যদি সনদ থাকেও তবে তাতে হিশাম কালবি, ইবনে সাদ এবং ওয়াকিদী...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২৬৩, দাররু রিসালাহ।

[২] তারিখু দিমাশক: ১৩/৫৯।

[৩] তারিখু দিমাশক: ১৩/৫৯।

[৪] তারিখু দিমাশক: ১৩/৫৯।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৫।

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৭, ১৯।

...এমন রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছেন যাদেরকে জারাহ ও তাদীল-এর ইমামগণ অত্যন্ত যয়ীফ (দুর্বল) সাব্যস্ত করেছেন। ভাববার বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তালাককে আল্লাহর নিকট হালাল কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন। [১] আল্লাহর নবীর প্রিয় নাতি, যিনি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী ছিলেন, তিনি কি আল্লাহর নিকট ঘৃণ্য একটি কাজ এত অধিক পরিমাণে করতে পারতেন?

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল:

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু সারা জীবন মদীনা তাইয়েব্যায় অবস্থান করেছেন। ৪৯ হিজরী বা ৫০ হিজরীতে যখন তাঁর বয়স সাতান্ন (৫৭) বছর ছিল, তখন কেউ তাঁকে রহস্যজনকভাবে বিষ প্রয়োগ করে, যার প্রভাবে তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েক দিন পর ইন্তেকাল করেন। জানাযার নামাযের জন্য হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাঈদ বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সামনে এগিয়ে দেন, যিনি বনু উমাইয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জান্নাতুল বাকীতে তাঁর মহীয়সী মাতা হযরত সায্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পাশে দাফন করা হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উপলক্ষে মসজিদে নববীতে সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বললেন:

“হে লোকসকল! আজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়জন চলে গেলেন।”

এটি শুনে উপস্থিতদের মধ্যে কেউই নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। [২]

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময়কাল যদিও সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু উম্মতের ওপর তাঁর এই ইহসান (উপকার) সর্বদা অম্লান থাকবে যে, তিনি অতুলনীয় আত্মত্যাগ এবং অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে উম্মতকে ঐক্যের পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি এমন এক কুরবানী দিয়েছেন যার জন্য মুসলিম ইতিহাস গর্ববোধ করবে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর। খিলাফতের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ইরাকের সেনাবাহিনী তাঁর ইশারায় জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি নতি স্বীকার করা গ্রহণ করে নিলেন। তাঁর জায়গায় অন্য কোনো শাসক হলে নিজের ক্ষমতার জন্য আমৃত্যু লড়াই করত। কিন্তু হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো পার্থিব বাদশাহ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সেই খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিশিষ্ট ও প্রতিচ্ছবি যাদের ক্ষমতা ব্যক্তিস্বার্থ, উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তি, কামনা ও স্বার্থের মতো বিষয়গুলো থেকে মুক্ত ছিল। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু যে অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা কেবল একজন খলীফায়ে রাশেদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বিভেদ ও অনৈক্যের যুগে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং ফিতনাবাজদের হাত থেকে শান্তি রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের পথপ্রদর্শন করতে থাকবে।

[১] আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য হালাল কাজ হলো তালাক (সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড: ২১৭৮, কিতাবুত তালাক, বাব ফি কারাহিয়াতিত তালাক)।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২১০/১১ থেকে ২১২।

এটি প্রসিদ্ধ যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী জাদা, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পুত্র ইয়াজিদের হাত ছিল, কিন্তু এই বিষয়টি সনদের দিক থেকে প্রমাণের স্তরে পৌঁছায় না। যেসব বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সনদের দিক থেকে মাজহুল ও যয়ীফ রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত। বিস্তারিত “বাব ইয়ালায়ে শুবহাত”-এ দেখা যেতে পারে।

খিলাফতে রাশিদাহ সম্পর্কিত ইসলামী আকিদাহ

জমহুর মুসলিমদের ঐক্যমত ও ইজমায়ী আকিদাহ হলো, খিলাফতে রাশিদাহ হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত ছিল, যখন হযরত হাসান (রা.)-এর পাঁচ মাসের শাসনকাল আলভী যুগেরই পরিশিষ্ট ছিল। তাঁর পরবর্তী যুগ খিলাফতে রাশিদাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি কোনো ঐতিহাসিক বিতর্ক নয়, বরং আকিদাহর বিষয়, তাই এই আলোচনাকে আকিদাহর কিতাবসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [১]

[১] সালাফগণ খিলাফতে রাশিদাহর খলিফাদের ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তার মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে আকিদাহর কিতাবসমূহের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে:

১. ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: “নবীদের পর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর আস-সিদ্দিক, তারপর উমর ইবনুল খাত্তাব, তারপর উসমান বিন আফফান যুন-নুরাইন, তারপর আলী বিন আবি তালিব।” (আল-ফিকহুল আকবর, পৃষ্ঠা ১৪)

২. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী।” (আস-সুন্নাহ, আহমদ বিন হাম্বল রেওয়ায়েত খলাল, পৃষ্ঠা ২৩)

৩. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: “অগ্রগণ্য হলেন আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী, তাঁরাই হলেন খিলাফায়ে রাশিদুন।” (নাকলাহ আল-ইমাম আস-সুয়ুতী ফী হাকীকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহ, পৃষ্ঠা ২০৯)

৪. ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র ইমাম ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া আল-মুযানী বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলিফা আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়... সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবীগণের পর। তাঁর পর আল-ফারুক উমর বিন আল-খাত্তাব... তারপর যুন-নুরাইন উসমান বিন আফফান... তারপর আল-ওয়াসি আত-তাকি আলী বিন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাসীন)।” (শরহুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১৬)

৫. ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী বলেন: “আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর খিলাফত সাব্যস্ত করি প্রথমে আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.)-এর জন্য... তারপর উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.)-এর জন্য, তারপর উসমান (রা.)-এর জন্য, তারপর আলী বিন আবি তালিব (রা.)-এর জন্য। তাঁরাই হলেন খিলাফায়ে রাশিদুন এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত ইমাম।” (আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃষ্ঠা ৮১)

৬. ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী বলেন: “এঁরাই হলেন সেই চার ইমাম যাদের ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ওপর ইজমা হয়েছে... রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, এরপর রাজতন্ত্র হবে। তারপর সাফিনা (রা.) বলেন: আবু বকরের খিলাফত, উমরের খিলাফত, উসমানের খিলাফত ধরো, তারপর আলী বিন আবি তালিবের খিলাফত ধরো।” (উসুলুদ দিয়ানাহ, আবুল হাসান আল-আশআরী, পৃষ্ঠা ২৫৯)

৭. ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “তাঁরা বিশ্বাস করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর খলিফা হলেন আবু বকর, উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী... আর যে ব্যক্তি এঁদের কারো খিলাফতের ব্যাপারে কটাক্ষ করবে, সে তার ঘরের গাধার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট।” (আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ, পৃষ্ঠা ১১৮, ত ত আযওয়াউস সালাফ) বরং আহলে সুন্নাহ সেই হাদীসের প্রবক্তা যা সুন্নাহ গ্রন্থে রয়েছে: “নবুওয়াতের খিলাফত ত্রিশ বছর, এরপর তা রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩/৫২৭)

৮. ইমামুল মুতাকাল্লিমীন আবু বকর আল-বাকিল্লানী বলেন: আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন: “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন” (সূরা আন-নূর: ৫৫)। আর এটিই ছিল আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এবং চার ইমাম খিলাফায়ে রাশিদুনের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। (তামহীদুল আওয়াযিল, পৃষ্ঠা ৮৫)

৯. ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী বলেন: “খিলাফায়ে রাশিদুন... ইমামতের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকারের ক্রম হলো ফযিলতের ক্রম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাসীন)। আর নবী (সা.) বলেছেন: খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে, এরপর তা কামড়ানো রাজতন্ত্রে পরিণত হবে। আর এই খলিফাদের সময়কাল এই পরিমাণই ছিল।” (লুমউল আদিল্লাহ ফী কাওয়াইদি আকায়িদি আহলিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১৩০) — (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

কিছু লোক খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল এবং পরবর্তী সরকারগুলোর তুলনা এই দৃষ্টিকোণ থেকে করে থাকেন যে, কার আমলে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ বেশি হয়েছে এবং কোন খলিফা বা বাদশাহ বেশি দেশ জয় করেছেন। যদিও আদর্শ শাসনের জন্য এই বিষয়গুলোকে প্রথম মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা সঠিক নয়। যদি কেউ এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তবে সুলতান মাহমুদ গজনভীর শাসনকাল হযরত আবু বকর সিদ্দীক-এর শাসনকাল থেকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কারণ রাজ্যের সীমানা এবং ভূখণ্ড বিজয়ের পরিমাপে সুলতান মাহমুদ গজনভীর শ্রেষ্ঠত্ব একেবারেই স্পষ্ট। কিন্তু ইসলামী মূল্যবোধ ও মর্যাদার পার্থক্য সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তিই এমন কথা বলতে পারেন না।

খুলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণসমূহ:

খিলাফতে রাশেদার মূল ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ছিল চারটি:

- খুলাফায়ে রাশেদীন রাসুলুল্লাহ-এর সান্নিধ্য এবং নবুওয়াতের নূর থেকে প্রকাশমান গুণাবলীতে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন।
- ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, হিজরত এবং দ্বীনের খাতিরে কুরবানির দিক থেকে তারা সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন।
- ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও এই খলিফাগণ উম্মতের বাকিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন।
- তাদের শাসনামলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামী শুরার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সমস্ত উচ্চতর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল যা একটি সর্বোত্তম এবং অনুকরণীয় ইসলামী সরকারের জন্য কাম্য।

নিঃসন্দেহে খুলাফায়ে রাশেদীনের গুণাবলীর কিছু অংশ উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু পরবর্তী ইসলামী শাসকদের রাজনৈতিক পদ্ধতি খুলাফায়ে রাশেদীনের থেকে ভিন্ন ছিল। কারণ তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শাসন ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল। এই কর্মপদ্ধতি খুলাফায়ে রাশেদীনকে সাধারণ খিলাফত ও রাজতন্ত্র (মুলুকিয়াত) থেকে আলাদা করে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে এবং সহীহ হাদীস “আল-খিলাফাতু সালাসুনা সানাহ” (খিলাফত ত্রিশ বছর) এর ওপর মোহর মেরে দিয়েছে।

[১] ইমাম গাজালী বলেন: “খুলাফায়ে রাশেদীন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম ইমামতের ক্ষেত্রে তাদের ক্রম অনুযায়ী... এবং তারা হলেন আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী।” (আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, পৃ. ১৩৩)

[২] ইমাম নাসাফী বলেন: “মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর সিদ্দীক, তারপর উমর ফারুক, তারপর উসমান যুন-নুরাইন, তারপর আলী মুরতাজা। তাদের খিলাফতও এই ক্রম অনুযায়ী।” (মতন আকাইদ নাসাফী, পৃ. ৪)

[৩] মোল্লা আলী কারী তার শরহ-এ বলেন: “রাসুলুল্লাহ-এর পর যারা উম্মতের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের মধ্যে এই ক্রম অনুসরণ করা সমস্ত উম্মতের ওপর ওয়াজিব। রাসুলুল্লাহ-এর পর খিলাফত আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলীর জন্য।” (শরহুল মাকাসিদুস সাবআ, পৃ. ৩৩৮)

[৪] কোনো কোনো আলেম হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজকেও খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (উমদাতুল কারী: ১১৩/১) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবারের-কেও এই শ্রেণিতে গণ্য করা হয়েছে। (আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা লি ইবনে হাজার হাইতামী: ৬২৯/২)

[৫] ইবনে খালদুন হযরত মুয়াবিয়া সম্পর্কে লিখেছেন: “তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত।” (তারিখ ইবনে খালদুন: ৪৫০/২)

[৬] আভিধানিক অর্থের দিক থেকে অন্যান্য শাসকদের ওপরও ‘রাশেদ’ শব্দটির প্রয়োগ হতে পারে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ শাসককে ‘রাশেদ’ বলা যেতে পারে। কিন্তু পরিভাষায় খুলাফায়ে রাশেদীন বলতে সেই চারজনকেই বোঝানো হয় যারা নবী করীম-এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তবে যদি বিশেষভাবে এই গুণাবলী কারো মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাকে রাশেদ বলা যেতে পারে, কিন্তু উম্মতে ইসলামিয়ার ঐকমত্যের বিপরীতে তার ব্যক্তিগত মতের কোনো গুরুত্ব থাকবে না।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর বাণী:

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন:

“হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। چنانچہ আপনার (সা.) ওফাতের পর সরাসরি আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলিফা হন এবং দুই বছর চার মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) খলিফা হন এবং দশ বছর ছয় মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) খলিফা হন এবং বারো বছর থেকে কয়েক দিন কম খিলাফত পরিচালনা করেন। এরপর হযরত আলী (রা.) খলিফা হন এবং চার বছর নয় মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। এরপর ইমাম হাসান (রা.) খলিফা হন এবং পাঁচ মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। এই হিসাব অনুযায়ী চার খলিফার খিলাফতের মেয়াদ উনত্রিশ (২৯) বছর সাত (৭) মাস হয় এবং ইমাম হাসান (রা.)-এর পাঁচ (৫) মাসের খিলাফতের মাধ্যমে ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। ইমাম হাসান (রা.)-এর সাথে আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই সন্ধি ১৫ই জমাদিউল আউয়াল ৪১ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হয় এবং এরপর ইমারত ও হুকুমত অর্থাৎ সালতানাত ও রাজত্ব শুরু হয়।” [১]

[১] ‘ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা’ থেকে সংক্ষেপিত: ২/৩৫২ থেকে ৩৫৩

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

সাধারণ খিলাফত

হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগ

শান্তি ও স্থিতিশীলতার যুগ

৪১ হিজরি থেকে ৬০ হিজরি

৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ

বংশ ও প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কুরাইশ বংশের বনু উমাইয়া শাখার অত্যন্ত প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা.) এবং মাতা হিন্দ বিনতে উতবা (রা.) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তিনি এর আগেই ৭ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উমরাতুল কাজার সময় গোপনে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় আঠারো বছর। [১] হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল মর্যাদাপূর্ণ ও প্রভাবশালী। তিনি দীর্ঘদেহী এবং ফর্সা বর্ণের অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ ছিলেন। [২] শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, চেহারা দেখে মানুষ চেনার পারদর্শীরা তাঁকে এক নজর দেখেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠতেন: “আল্লাহর কসম! এই শিশুটি তার জাতির নেতা হবে।” [৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র খিদমতে আমির মুয়াবিয়া (রা.):

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কুরাইশদের হাতেগোনা শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে গণ্য হতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাতিব (লেখক) নিযুক্ত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দিয়ে আরব নেতাদের কাছে চিঠি লেখাতেন এবং ওহীও লিখিয়ে নিতেন। [৪]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তিন বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং প্রচুর পরিমাণে হাদিস শোনার ও বর্ণনা করার সুযোগ পান। তাঁর থেকে একশত তেষটি (১৬৩) টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। [৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিদমতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করতেন। একবার এই দোয়া করেছিলেন: “اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ” [৬] “হে আল্লাহ! তাকে হেদায়েত দানকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন এবং তার মাধ্যমে হেদায়েতকে ব্যাপক করে দিন।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পবিত্র জীবনে এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদের নেতৃত্বের বিশাল দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়বে। একবার মহানবী (সা.) তাঁকে বলেছিলেন: “মুয়াবিয়া! যদি তোমাকে শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং ন্যায় ও ইনসারের সাথে কাজ করো।”

[১] তারিখু দামেশক লি ইবনে আসাকির: ৫৯/৫৭; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/৪০৬, ত. সাদির। ইসলাম গ্রহণের এই সময়কাল তাঁর মৃত্যুর সময়ের বয়সের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১২১, ত. আর-রিসালাহ

[৩] তারিখু দামেশক লি ইবনে আসাকির: ৫৯/৫৭

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩০১৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১২৩, ত. আর-রিসালাহ

[৫] আসমাউস সাহাবাতুর রুওয়াত লি ইবনে হাজম, পৃ. ৫৫

[৬] সুনানে তিরমিজি, হা: ৩৮৪২, আবওয়াবুল মানাকিব, হাসান সনদে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলতেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণীর কারণে (যা নিঃসন্দেহে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল) আমার মনে সর্বদা এই ধারণা ছিল যে, আমাকে অবশ্যই শাসনের পরীক্ষায় লিপ্ত করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে এই দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হলো।” [১]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর:

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বড় ভাই ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সাথে সিরিয়া বিজয়ে শরিক ছিলেন এবং নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে সেই ভূখণ্ডে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) ইন্তেকাল করলে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নির্বাচনের দৃষ্টি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর পড়ে, যিনি যোগ্যতায় তাঁর সকল ভাইদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে সিরিয়ার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তের আমির বানানো, যেখানে প্রতি মুহূর্তে রোমানদের আক্রমণের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল, তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থার প্রমাণ ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে ইসলামের এই সেনাপতি নৌ-জিহাদ শুরু করেন, রোমানদের নাস্তানাবুদ করেন এবং বহু এলাকা জয় করেন। [২]

সন্ধি হোক বা যুদ্ধ, আপনি সর্বাবস্থায় ইসলামি শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। একবার রোমানদের সাথে আপনার সন্ধি চুক্তি চলছিল, এই সময়ে আপনি সীমান্ত এলাকায় সৈন্য সমাবেশ করেন এবং সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই সৈন্যবাহিনীকে শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করিয়ে দেন। এমন সময় একজন সাহাবী হযরত আমর বিন আবাসা (রা.) দ্রুতবেগে আসলেন এবং বললেন: “চুক্তি ভঙ্গ করা মুমিনের স্বভাব নয়।” এরপর এই হাদিস স্মরণ করিয়ে দিলেন: “যখন দুই জাতির মধ্যে সন্ধি চুক্তি থাকে, তখন কোনো পক্ষই যেন তা ভঙ্গ না করে।” অর্থাৎ এই সময়ে সন্ধির পরিপন্থী কোনো কাজ না করে। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যুদ্ধবিরতির সময় সৈন্য সমাবেশ করে আক্রমণের অপেক্ষায় থাকা এবং মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই সীমান্ত লঙ্ঘন করা সঠিক নয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এটি শোনামাত্রই তৎক্ষণাৎ বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন এবং যে এলাকাগুলো জয় করেছিলেন, সেগুলো খালি করে দেন। [৩]

আল্লাহর আইনের অনুসরণের এমন উদাহরণ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে।

আপনার ওপর সাহাবীদের আস্থা:

খুলাফায়ে রাশেদিন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের আপনার যোগ্যতার ওপর কেবল পূর্ণ আস্থাই ছিল না, বরং আপনার রাজনীতির ধরন দেখে তাঁরা প্রশংসাও করতেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলতেন:

“তোমাদের কায়সার ও কিসরার রাজনীতির আলোচনার কী প্রয়োজন, যখন তোমাদের মাঝে মুয়াবিয়া বিদ্যমান।” [৪]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন: “আমি মুয়াবিয়া (রা.)-এর চেয়ে বড় রাজনীতি বিশেষজ্ঞ আর কাউকে দেখিনি।” [৫]

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৩, রিজালু সিকা।

[২] উসদুল গাবাহ: ৫/২০১।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৩৫।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩০, সহিহ সনদে।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৭, সহিহ সনদে।

খিলাফতের যুগের সূচনা

জামাদিউল আউয়াল ৪১ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন মসনদে আসীন হলেন, তখন মুসলিম বিশ্বে এক নতুন যুগের সূচনা হলো। উম্মতে মুসলিমা বছরের পর বছর ধরে যে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলো মুসলমানদের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় আনন্দিত ছিল, তা থেকে তারা মুক্তি পেল। একনিষ্ঠ মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেন। দামেস্ক প্রথমবারের মতো মুসলমানদের রাজধানী হলো। এরপর প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত এটি খিলাফতের কেন্দ্র হিসেবে বহাল ছিল। [১]

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের সময় একনিষ্ঠ মুসলমানরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন: প্রথম দলটি ছিল সিরিয়াবাসীদের, যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অনুগত ছিল। দ্বিতীয় দলটি ছিল ইরাকের মুসলমানদের, যারা হযরত হাসান (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিল যে, আপনি যার সাথে সন্ধি করবেন, আমরাও তার সাথে সন্ধি করব।

এ ছাড়া বিপুল সংখ্যক নিরপেক্ষ লোকও ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, উসামা বিন যায়েদ, সালামা ইবনুল আকওয়া, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবু মুসা আশআরি এবং হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত হাসান (রা.) যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে খিলাফতের পদ ত্যাগ করলেন, তখন ইরাকের মুসলমানরাও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন। তাদের মধ্যে হযরত কায়েস বিন সাদ (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। অন্যদিকে নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ যখন দেখলেন যে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তখন তারাও বায়াত গ্রহণ করলেন। এ কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ক্ষমতা গ্রহণের বছরকে ‘আমুল জামায়াত’ (ঐক্য ও সংহতির বছর) বলা হয়। এ দিক থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন অত্যন্ত বরকতময় প্রমাণিত হয়েছে। [২]

এটা সত্য যে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হাসান (রা.)-এর হাতে বায়াত না করা এবং সিরিয়ায় নিজের স্বাধীন শাসন কায়েম রাখা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইজতিহাদি ভুল ছিল। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর উত্তরসূরি হযরত হাসান (রা.) যখন শাসনভার তার হাতে অর্পণ করলেন, তখন তিনি নিঃসন্দেহে শরয়ী শাসকের মর্যাদা লাভ করলেন। [৩]

চরমপন্থীদের ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কর্মপন্থা:

এমন কিছু লোকও তখন বিদ্যমান ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে সচেতন বা অবচেতনভাবে তাগুতি শক্তির হাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। তারা ছিল তিনটি দল:

- ১. হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩২৩; ইবনে হাজার বলেন: মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কারণে একে ‘আমুল জামায়াত’ (ঐক্যের বছর) নামকরণ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী: ১৩/৬৩)

[২] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: ৪১ হিজরির অধীনে; তারিখু আবি যুরআ আদ-দিমাশকি: ১/১৯০, তাবাতা মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ।

[৩] হযরত মাওলানা আবদুল হাই লখনভী ফারুকী (রহ.) ‘সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন’ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আকিদাগত মূলনীতিসমূহ শিরোনামে লিখেছেন: “হযরত মুয়াবিয়া (রা.) শুরুতে তো বিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর সন্ধি ও বায়াতের পর তিনি বৈধ খলিফা হয়ে যান।” (সীরাতে খুলাফায়ে রাশেদীন, পৃষ্ঠা ১১)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

২. খারেজী মানসিকতা সম্পন্ন সংকীর্ণমনা লোক যারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে মুসলিম মনে করত না।

৩. সিরিয়ার চরমপন্থী উমাইয়া ও মারওয়ানিরা যারা গোত্রীয় গোঁড়ামির শিকার ছিল।

সিরিয়ার সকল গোষ্ঠী কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই আগে থেকেই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিল। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা, যাদের মধ্যে সাবায়ীরাও মিশে ছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিল যাতে নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারে। খারেজীরাও অনুরূপ করেছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাদের সকলকে সামলেছেন। ধৈর্য, সহনশীলতা এবং উত্তম কৌশলের মাধ্যমে তাদের মধ্যপন্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন এবং প্রয়োজন ছাড়া কঠোরতা অবলম্বন থেকে বিরত থেকেছেন।

খারেজীরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পরাজিত হয়ে তাদের সামরিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু এখন তারা ভেতরে ভেতরে পুনরায় সংগঠিত হচ্ছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাধারণ মানুষের ওপর হাত দেননি, তবে তাদের মধ্যে যারা আইন অমান্য এবং প্রকাশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়েছিল, তাদের দমন করতে দেরি করেননি। সাবায়ীদের সাথেও একই আচরণ করা হয়েছিল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লক্ষ্যসমূহ

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ওপর অর্পিত সেই দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন যা তিনি শাসনভার গ্রহণের মাধ্যমে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, বনু হাশিমের মহান কোরবানি এবং মুসলমানদের সম্মিলিত চেতনার ফলে যে মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তাকে একটি স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ এবং অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করতে। এই লক্ষ্যে তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের সীরাত সামনে রাখার পাশাপাশি বিশ্বের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা থেকেও উপকৃত হন এবং এমন প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে উমাইয়া রাষ্ট্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আরও শক্তিশালী হয় এবং কোনো শত্রু শক্তি এতে ফাটল ধরাতে না পারে।

এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য তাঁর সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা
২. আরব নেতৃত্বের সুসংগঠন
৩. বহিঃশক্তির হাত থেকে মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষা এবং নতুন বিজয়সমূহ
৪. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা উন্নত ও আধুনিক রূপ দান করা
৬. বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ আন্দোলনগুলোকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা

শাসনভার গ্রহণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আপনার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মনোযোগ এই লক্ষ্যগুলো পূরণের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। আসুন এই লক্ষ্যগুলোর জন্য হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ওপর এক নজর বুলিয়ে নিই।

১ শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা

শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন পূর্ববর্তী খলিফাদের জীবনের মূলনীতি ছিল, সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.)-ও এর প্রবক্তা ছিলেন। তাই তিনি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তের গণ্ডি থেকে পা বাড়াননি। আপনার শাসনামলে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শহরে কিতাব ও সুন্নাহর আইনি মর্যাদা ছিল। আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিতেন। [১]

নসিহতের ওপর আমল:

তিন খলিফায়ে রাশেদীনের ওপর ঘাতক হামলার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.) নিজের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন, যাতে করে সব সময় যে কেউ আপনার কাছে পৌঁছাতে না পারে। এটি দেখে একবার সাহাবী আবু মারিয়াম আল-আজদী (রা.) আপনার কাছে গেলেন এবং বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ যাকে মানুষের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন এবং সে যদি নিজের এবং মুসলমানদের প্রয়োজন ও অভাবের মাঝে পর্দা (বাধা) তৈরি করে, তবে আল্লাহ তার প্রয়োজন ও অভাবের মাঝে পর্দা তৈরি করে দেবেন।” সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.) এটি শোনামাত্রই একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন যাতে সে মানুষের প্রয়োজন ও অভাবগুলো তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। [২]

কিসাস সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন:

শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দলীলসমূহ বিবেচনা করে হযরত আলী (রা.)-এর সেই ইজতিহাদ ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছিলেন যা তিনি কিসাস সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ না করে বরং তাদের সাথে সাধারণ ক্ষমার আচরণ করা হয়েছিল। [৩] এভাবে এই ইজতিহাদ সব দিক থেকে ইজমার রূপ ধারণ করেছিল।

আপনার বিশ বছরের শাসনামলে সেই সমস্ত মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছিল যারা কোনো পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ...

[১] হযরত আলী (রা.)-এর যুগে আপনার রাজনৈতিক মতপার্থক্য সঠিক নিয়তের ওপর ভিত্তি করে ছিল এবং এতে শরীয়তের বিরোধিতা করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সেই সময়ে আপনি যা কিছু করেছেন তা ইজতিহাদের ভিত্তিতে শরীয়তসম্মত মনে করেই করেছেন। তাই জমহুর মুসলিমগণ একে ইজতিহাদী ভুল বলেন, বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা নয়। (আর ইজতিহাদী ভুলের ওপর সওয়াব পাওয়া যায়)।

[২] সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড: ২, ২৯৩৮, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ, বাবু ফি মা ইয়ালজামুল ইমাম মিন আমরির রাইয়্যাহ ওয়াল হজ্জাহ আনহু।

[৩] তবে বিশেষ অপরাধের ক্ষেত্রে যেখানে হত্যার ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয়েছিল: যেমন কিনানা বিন বিশর, আবু শিমর আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ প্রমুখকে তদন্তের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৬০, ২৫৯; আল-ইসাবাহ: ১/৩৮৬; জামহারাতুল আনসাব লিল আরব লি ইবনে হাজম, পৃষ্ঠা: ৪৩৫; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ১৫/২১৭ (আল-মুরশিদ)।

তারা এতে শরিক ছিলেন কিন্তু বর্তমান সরকারের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এটিই ছিল শরয়ী মাসআলা এবং এটিই ছিল সেই হিকমতে আমলী ও দূরদর্শিতার দাবি যা হযরত মুয়াবিয়া ইতিপূর্বে গৃহযুদ্ধের আবেগপ্রবণ ও জরুরি পরিস্থিতির কারণে বুঝতে পারেননি। কিন্তু এখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতার লাগাম হাতে নেওয়ার পর সেই বিষয়টিই তাঁর জন্য এক জীবন্ত বাস্তবে পরিণত হলো।

খিলাফতের পদে তাঁর নিযুক্তি হযরত হাসান এবং তাঁর সমর্থকদের সাথে সন্ধি এবং এই ওয়াদার ভিত্তিতে হয়েছিল যে, (বিগত যুদ্ধগুলোতে) ইরাকবাসীদের হাতে যারা নিহত হয়েছে বা যে গনিমতের মাল তাদের হস্তগত হয়েছে, তার কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। [১] ইরাকবাসীরা এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে সিরিয়াবাসীদের কাছে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হতো এবং এটিই ছিল একমাত্র শরয়ী কারণ যার ভিত্তিতে সিরিয়াবাসীরা ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করা জায়েজ মনে করছিল।

কিন্তু খিলাফতের মসনদে নিযুক্তি এবং বাইয়াতে আম্মার সময় হযরত মুয়াবিয়াকে এই অবকাশ মেনে নিতে হয়েছিল যে, প্রাক্তন বিদ্রোহীদের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শনের বিষয়টি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দাবি এবং শরয়ীভাবেও সঠিক। অন্যথায় তিনি তাঁর সাথে যুদ্ধরত সেই লোকদের প্রাণভিক্ষার চুক্তি কখনোই করতে পারতেন না যাদের সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, তাদের মধ্যে হযরত উসমান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যক্তিরোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এখন হযরত মুয়াবিয়া এটিও বুঝতে পারলেন যে, যেভাবে এখন তিনি ইরাকের সেই লোকদের বিদ্রোহী বলতে পারেন না যারা এর আগে সিরিয়াবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, বরং এখন তাদের জান-মালের সুরক্ষা সরকারের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে; ঠিক তেমনি হযরত আলী-ও হযরত উসমান-এর বিদ্রোহীদের বাইয়াতের পর সুরক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন। আর হযরত উসমান-এর সেই বিদ্রোহীরা আজ ইরাকবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও তারা তাদের পূর্ববর্তী বিদ্রোহ সত্ত্বেও শরয়ীভাবে ঠিক সেভাবেই নিরাপদ, যেভাবে ইরাকের সেই যুদ্ধরত লোকদের নিরাপদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে যারা সিরিয়াবাসীদের মোকাবিলায় এসেছিল।

হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্যের কোনো কারণ ছিল না যে, একদিকে তিনি সেই ইরাকী বাহিনীকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন যারা হযরত আলীর নেতৃত্বে সিরিয়াবাসীদের সাথে লড়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে হযরত উসমান-এর বিদ্রোহীদের শাস্তির যোগ্য মনে করবেন। সিফফিনে যারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়েছিল এবং যাদেরকে তিনি তখন বিদ্রোহী মনে করে তলোয়ারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন, তাদেরকে যদি তিনি এখনও ক্ষমার অযোগ্য মনে করতেন, তবে তাঁকে সন্ধি ও সমঝোতার নীতি ত্যাগ করে একটি বিশাল গোষ্ঠীকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হতো, যা কার্যত অসম্ভব ছিল। যদি এমন চেষ্টা করা হতো, তবে নিশ্চিতভাবেই সমস্ত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো তাঁর বিরোধিতায় ফুঁসে উঠত এবং যে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য হযরত হাসানের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল, তার শিখা নতুন তীব্রতায় জ্বলে উঠত। এর ফলে উম্মাহ অসহনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতো।

সুতরাং হযরত মুয়াবিয়া জননিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা এবং শরয়ী দলীলসমূহের ওপর বিচার-বিশ্লেষণ করে হযরত আলীর প্রস্তাবিত সেই নীতিই গ্রহণ করে নিলেন যে, প্রাক্তন বিদ্রোহী যারাও হোক না কেন, বাইয়াতের পর তারা নিরাপদ।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৫

তারা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, কিসাসের বিষয়টি বিদ্রোহের বিষয় থেকে আলাদা এবং এতে কেবল তারাই শাস্তির যোগ্য হবে যাদের নিহত ব্যক্তির ওপর প্রাণঘাতী আঘাত করা প্রমাণিত হবে। এই নীতি গ্রহণ করার পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে আপনজনদের অভিযোগের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল; কারণ উসমানী আন্দোলনের অধিকাংশ লোক উসমানের কিসাসের জন্য ব্যাকুল ছিল এবং আন্দোলনের পূর্ববর্তী ইশ্‌ার অনুযায়ী তারা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যাযোগ্য মনে করত। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কোনো বড় থেকে বড় ব্যক্তিত্বের আবেগপূর্ণ যুক্তির আর কোনো পরোয়া করেননি।

শাসনভার গ্রহণ করার পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন প্রথমবার মদিনা মুনাওয়ারায় গেলেন, তখন সেখানে শহরের অলিগলি দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত উসমান (রা.)-এর ঘর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! হে আমিরুল মুমিনীন!”

ইনি ছিলেন তৃতীয় খলিফার কন্যা, যিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আগমনে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার হত্যাকাণ্ড এবং কিসাস আন্দোলনের বিয়োগান্তক ঘটনাগুলো স্মরণ করে কাঁদছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেখানে তাশরিফ নিলেন এবং তাঁকে বললেন:

“আমার ভাতিজি! মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের আনুগত্য কবুল করেছে এবং আমরাও আমাদের রাগকে দমন করে তাদের সাথে সহনশীলতার আচরণ করেছি। যদি আমরা ধৈর্য ছেড়ে দিই, তবে তারাও আমাদের আনুগত্য ত্যাগ করবে। দেখো! তোমার আমিরুল মুমিনীনের কন্যা হয়ে থাকা যেকোনো অবস্থায় এর চেয়ে উত্তম যে তুমি সাধারণ সাধারণ মানুষের একজন হয়ে যাও। অতএব, আজকের পর আমি যেন তোমাকে হযরত উসমানের কথা উল্লেখ করতে আর কখনো না শুনি।” [১]

এর অর্থ ছিল এই যে, আমাদের শাসনামলে তুমি বনু উমাইয়ার রাজকুমারী। যদি আমাদের কঠোর নীতির কারণে শাসনব্যবস্থাই ভেঙে পড়ে, তবে তোমার আর কী মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কিসাসের দাবিতে বদ্ধপরিকর লোকদের সুযোগ বুঝে বোঝাতেন। যে যেভাবে আশ্বস্ত হতে পারত, তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন এবং যথাসম্ভব শরীয়তের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াতেন না।

[১] তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি হজ পালনের জন্য মদিনায় আসলেন, তখন উসমানের ঘর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন: হে আমিরুল মুমিনীন! হে আমিরুল মুমিনীন! তিনি বললেন: এটা কী? তারা বলল: উসমানের কন্যা উসমানের জন্য বিলাপ করছেন। তখন লোকজন চলে গেল, এরপর তিনি তাঁর কাছে গেলেন। তিনি বললেন: হে চাচাতো বোন! নিশ্চয়ই মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং আমরাও রাগের ওপর তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা আমাদের সহনশীলতা ফিরিয়ে নিই, তবে তারাও তাদের আনুগত্য ফিরিয়ে নেবে। আর তোমার আমিরুল মুমিনীনের কন্যা হয়ে থাকা সাধারণ মানুষের একজন হওয়ার চেয়ে উত্তম, তাই আজকের পর আমি যেন তোমাকে উসমানের কথা উল্লেখ করতে না শুনি। (ইবনে তাইমিয়া এটি মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩০৮/৩-এ বর্ণনা করেছেন)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

২ আরব নেতৃত্বের পুনর্গঠন

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একটি অনেক বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি তাঁর যুগে আরবদেরকে ইসলামের রক্ষক জাতি হিসেবে নতুনভাবে সংগঠিত করেছিলেন। তিনি অনারবদের (আজম) প্রতি ঝুঁকে না থেকে বরং আরবদেরকেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্বশীল বানিয়েছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই স্পষ্ট পার্থক্য ছিল যে, হযরত আলী (রা.) ইসলামকে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হিসেবে এগিয়ে নিয়ে নববিজিত জাতিগুলোর জন্য শাসন ও রাজনীতির দরজা খুলে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে ইসলামের ওপর কেবল আরবীয় ছাপ না পড়ে বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক দ্বীন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের এই বিশ্বজনীনতাকে সামনে রেখে তিনি আরবদের কেন্দ্র হিজাজ ত্যাগ করে কুফায় বসতি স্থাপন করেছিলেন, যা অনারব ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল, তবে জাজিরাতুল আরব থেকেও খুব বেশি দূরে ছিল না। নিঃসন্দেহে হযরত আলী (রা.)-এর এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চ ও মহান এবং দ্বীনের চেতনার অধিকতর নিকটবর্তী ছিল, যেখানে কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যে, হযরত আলী (রা.) যাদের মাধ্যমে এই কাজ নিতে চেয়েছিলেন, তারা আন্তর্জাতিক তো দূরের কথা, স্থানীয়ভাবেও সংগঠিত হওয়ার যোগ্য ছিল না; বরং তাদের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্যের উপাদান প্রবলভাবে মিশে ছিল। এই অভিজ্ঞতাপূর্ণ দেখে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রশাসনিক কৌশল এই ছিল যে, আরবদেরকেই এই বৈশ্বিক দ্বীনের দাঈ ও রক্ষক হিসেবে পরিচিত হতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল যে, আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের বিজয়ের জন্য এটি জরুরি যে, এই কাজ সম্পাদনকারী দলটি অত্যন্ত সুসংগঠিত, গতিশীল ও সক্রিয় হতে হবে। এই গুণগুলো আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। তাছাড়া সেই সময়ের উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ সাহাবী ও তাবিঈদের একটি বড় অংশ ছিল আরব বংশোদ্ভূত। তাঁদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখাই ছিল সকল সাফল্যের চাবিকাঠি।

এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর যুগে নওমুসলিমদের অধিকার হরণ করা হতো এবং তাঁদেরকে শোষণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। মোটেও না। নওমুসলিম তো দূরের কথা, অমুসলিম অর্থাৎ জিম্মিরাও ইসলামের দেওয়া সকল অধিকার ভোগ করছিলেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের জন্য অর্থনীতি, বাণিজ্য ও চাকুরির দরজাও উন্মুক্ত ছিল। যার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যেতে পারে যে, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাতিব (সেক্রেটারি) “সারজুন” একজন খ্রিস্টান ছিলেন। [১] তবে সাধারণভাবে কৌশল এই ছিল যে, রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে আরবদের ওপরই ভরসা করা হবে।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৮

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

আরব নেতৃত্বের সংগঠনের সাথে বর্তমান আরব জাতীয়তাবাদের পার্থক্য:

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আরবদের ওপর আস্থা এবং তাদের সংগঠন ছিল নিছক একটি প্রশাসনিক নীতি। এটি আরব জাতীয়তাবাদ বা আরব ন্যাশনালিজমের বর্তমান দর্শন ছিল না, যাতে দ্বীনকে পেছনে ফেলে কেবল আরব হওয়াকেই গর্বের বিষয় মনে করা হয়। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামি রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখতে এবং দ্বীনকে প্রচার করার জন্যই আরবদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরব নেতাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন:

“হে আরব গোত্রসমূহ! আল্লাহর কসম! তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুস্পষ্ট দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তোমরা যদি তার ওপর অবিচল না থাকো, তবে অন্যদের কাছ থেকে কী আশা করা যেতে পারে যে তারা এই দ্বীনকে রক্ষা করবে।” [১]

বনু উমাইয়ার একচেটিয়া আধিপত্য: একটি অনিবার্য পরিস্থিতি:

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে আরব নেতৃত্বের সংগঠিত হওয়ার পাশাপাশি বনু উমাইয়া অনিবার্যভাবে আরও বেশি বিকশিত হয়ে সামনে আসে। এটি আশ্চর্যের কোনো বিষয় ছিল না কারণ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবদের ঐক্যকে যুদ্ধাভিযান ও বিজয়ের জন্য ব্যবহার করছিলেন এবং এ কথা সন্দেহাতীত যে যুদ্ধ পরিচালনায় বনু উমাইয়া সর্বদা অগ্রগামী ছিল, গাজওয়াত এবং অধিকাংশ জিহাদি অভিযানে তারা নিজেদের তলোয়ার চালনায় দক্ষ প্রমাণ করেছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও উমাইয়া ছিলেন এবং তাঁর অনেক বিশেষ সঙ্গীও। সুতরাং এই যুগে বনু উমাইয়ার বিশিষ্ট হয়ে রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠা ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই প্রশাসনিক নীতি এতটাই কার্যকর ছিল যে বনু উমাইয়া ষাট-সত্তর বছর পর্যন্ত এটি সফলভাবে পরিচালনা করেছিল। তবে পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই নীতি আর কার্যকর থাকেনি, যার ফলে বিরোধীদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হয়। যা-ই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে নিজ সময়ের প্রেক্ষাপটে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নীতি ছিল উপযুক্ত, যার সাক্ষী সেই যুগের মহান বিজয়সমূহ।

[১] মুসনাদে আহমাদ: ১৭৬৭৯

৩ মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষা এবং নতুন বিজয়সমূহ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষার সাথে সাথে বিজয়ের সেই ধারাকে পুনরায় এগিয়ে নেওয়া যা গৃহযুদ্ধের কারণে কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল। আপনার (রা.) খিলাফতকালে জিহাদি ধারা আবারও পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। আপনি (রা.) ছিলেন একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং সামরিক পরিকল্পনাকারী। আপনি হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে রোমানদের একের পর এক পরাজিত করেছিলেন। আপনারই সাহস ও পরিকল্পনার বদৌলতে ইসলামী নৌবাহিনীর সূচনা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে আপনি সাইপ্রাস এবং মাল্টার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্বীপগুলো রোমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। [১]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন মুসলিম বিশ্ব যে বহিঃশক্তির মোকাবিলা করছিল, তা ছিল তিনটি:

- ১. সেই মূর্তিপূজক জাতিগুলো যারা মধ্য এশিয়া থেকে খোরাসান এবং হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এগুলো ছিল ডজন ডজন ছোট ছোট রাষ্ট্র। এদের মধ্যে কিছু গোত্র বারবার পরাজিত হয়ে বশীভূত হতো কিন্তু সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে বসত। সেই সময়েও তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল।
- ২. আফ্রিকার অসভ্য গোত্রসমূহ যাদের শক্তি উত্তর আফ্রিকায় বেশি ছিল। এরাও বারবার বিদ্রোহ করত।
- ৩. রোমান সাম্রাজ্য যাকে বশীভূত করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিন্তু সাইয়েদনা মুয়াবিয়া (রা.) সাময়িক কৌশলের খাতিরে রোমানদের সাথে সীমিত সময়ের জন্য সন্ধি করে নেন যাতে প্রথমে একাগ্রতার সাথে অন্যান্য ফ্রন্টগুলো সামলানো যায়। [২] আপনি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে মিসর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির (রা.)-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন যারা ছিলেন স্বীকৃত সেনাপতি এবং রাজনীতিবিদ। [৩]

এই দুই ব্যক্তি চমৎকার পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমে ইসলামী বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান যার ফলে খোরাসান এবং আফ্রিকা থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করা হয় এবং সেখানে ইসলামী বাহিনীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়। হিন্দুস্তানের সীমান্ত, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানেও বেশ কিছু জিহাদি অভিযান পরিচালিত হয় এবং বিজয় অর্জিত হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এই সমস্ত অঞ্চলের বিজয়সমূহের আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করছি।

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৫৩, ত. হিলাল

[২] তারিখ খলিফা খাইয়াত, পৃ. ২০৫

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৩, সন ৩১ হিজরি

উপমহাদেশে জিহাদ

সাধারণত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ৯২ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু সঠিক কথা হলো, মুসলমানরা হযরত উমর-এর যুগে সিন্ধুর উপকূলীয় অঞ্চল ও দেবল পর্যন্ত আক্রমণ করেছিলেন এবং হযরত আলী-এর যুগে তাদের অভিযান ‘কীকান’ পর্যন্ত চলছিল। [১]

উপমহাদেশে সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন এজন্য হয়েছিল যে, এখানকার যোদ্ধারা হঠাৎ আক্রমণ করে মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্যদের শহীদ করে দিত। হযরত আলী-এর পক্ষ থেকে এই রণাঙ্গনের কমান্ডার হযরত হারিস বিন মুররাহ অনেকগুলো যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর ৪২ হিজরিতে তিনি এই রণাঙ্গনেই অধিকাংশ সঙ্গীসহ শহীদ হন। [২] তাদের পর বসরার গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির এই অভিযান রাশিদ বিন আমর আল-জুদাইদি-এর ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি ৪২ হিজরিতে সৈন্য নিয়ে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেন এবং মাকরান হয়ে সিন্ধুর অভ্যন্তর পর্যন্ত অগ্রসর হন। [৩]

বনু ও লাহোর অভিযান:

৪৪ হিজরিতে উমাইয়াদের প্রখ্যাত সেনাপতি হযরত মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা অন্য দিক থেকে অগ্রসর হন এবং বনু (বনু) জয় করেন। [৪] এই অভিযানে মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা এমন এক স্থানে ছিলেন যেখানে শত্রুর আঠারোজন অশ্বারোহী হঠাৎ তাকে ঘিরে ফেলে শহীদ করার চেষ্টা করে, কিন্তু হযরত মুহাল্লাব একাই তাদের সবাইকে হত্যা করেন। [৫] এরপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে ‘আল-আহওয়ার’ (লাহোর)-এর নিকটবর্তী হন। এখানে একটি অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে হিন্দুরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং হযরত মুহাল্লাব শহর দখল না করেই বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসেন। [৬]

কীকান (কিরথর পর্বতমালা)-এর দ্বিতীয় অভিযান:

হযরত মুয়াবিয়া আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার-কে ‘কীকান’-এ অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল এবং প্রখ্যাত নেতা...

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৬; মুজামুল বুলদান: ৪/৪৩৩, কীকান হলো সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মধ্যবর্তী কিরথর পর্বতমালার পাহাড়ি এলাকা।

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৭১, দারুল হিলাল।

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০২-২০৩।

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৬।

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৭১, দারুল হিলাল।

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৬। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই অভিযানটি উপেক্ষা করেছেন এবং অনেকে ‘লাহোর’-কে ‘আহওয়াজ’ মনে করেছেন। এই ভুলটি এজন্য হয়েছে যে, পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া-এর কারনামাসমূহের অধীনে মুহাল্লাবের অভিযানে লাহোরের উল্লেখ পাওয়া যায় না, অথচ প্রাচীন ইতিহাসগুলোতে এর উল্লেখ রয়েছে। ‘মুজামুল বুলদান’-এর ইবারত: “গাজওয়াতুল মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা ফি সানাহ ৪৪ হিজরি আইয়্যামে মুয়াবিয়া নহরুস সিন্ধ ফা-আতা বনু ওয়া লাহোর ওয়াহ্মা বাইনা কাবুল ওয়া মুলতান” (৫০১/১, বাব আল-বা ওয়াল-আলিফ ওয়ান-নুন)।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ছিলেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হওয়ার সময় তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, কোনো তাঁবুতে যেন চুলা না জ্বলে, সবার খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব আমার। এক রাতে তিনি শিবিরের কোথাও আগুন জ্বলতে দেখলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, এক মহিলা সন্তান লাভের নেয়ামত লাভ করেছেন, তার জন্য হালুয়া রান্না করা হচ্ছে। এটি শুনে তিনি নির্দেশ দিলেন: “তিন দিন পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে সবাইকে হালুয়া খাওয়ানো হোক।” [১]

কাইকানের পাহাড়ি অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ছিল, তবুও হযরত আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার এখানে সফল জিহাদ পরিচালনা করেন এবং ফেরার সময় অনেক কাইকানি ঘোড়া হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে উপহার হিসেবে পেশ করেন। এখানে একদিন সুযোগ পেয়ে উপজাতীয় যোদ্ধারা তাকে তার সাথীসহ ঘেরাও করে শহীদ করে দেয়। [২]

সাইয়্যিদুনা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৮ হিজরিতে হযরত সিনান বিন সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেলুচিস্তান অভিযানের সেনাপতি বানিয়ে পাঠান। তিনি তার অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় প্রখ্যাত সেনাপতি রাশিদ বিন উমর জাদিদি রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫০ হিজরিতে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে জিহাদ চলাকালীন শহীদ হয়ে যান। [৩]

এভাবে মাকরানসহ বেশ কিছু এলাকা পুনরায় মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার এবং হারিস বিন মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু৷র পর এই তৃতীয় ইসলামী সেনাপতির শাহাদাত ছিল অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। হযরত সিনান বিন সালামা এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বেলুচিস্তানে এলে প্রতিপক্ষ বিশাল বাহিনী নিয়ে সামনে এসে হাজির হয়। হযরত সিনান ছিলেন অনেক বড় আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ। তিনি তার মুজাহিদদের কসম করিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি লড়াই থেকে পালাবে তার স্ত্রীকে তালাক। [৪]

শত্রুর আধিক্য দেখে তিনি তার সাথীদের সাহস যোগালেন এবং বললেন: “সুসংবাদ! তোমরা অবশ্যই দুটির মধ্যে একটি সফলতা লাভ করবে: হয় জান্নাত অথবা বিজয়।” তারপর তিনি সাতটি পাথর হাতে নিলেন এবং মুজাহিদদের সামনে এসে বললেন:

“যখন আমাকে আক্রমণ করতে দেখবে, তখন তোমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বে।”

হযরত সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিনীকে প্রস্তুত অবস্থায় রাখলেন। যখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে এল, তখন তিনি তাকবির বলতে বলতে একে একে ছয়টি পাথর শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করলেন। এরপর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, যখন সূর্য কিছুটা ঢলে পড়ল তখন সপ্তম পাথরটি ছুড়ে দিয়ে স্লোগান দিলেন: “হা-মীম লা ইউনসারুন।” তারপর আল্লাহু আকবার বলে মূর্তিপূজকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মুসলমানরাও তাদের নেতার পেছনে পেছনে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই মুশরিকদের লাশের স্তুপ জমে গেল, বাকিরা পালিয়ে গেল। মুসলমানরা বারো মাইল (সাড়ে ১৯ কিলোমিটার) পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করল। অবশেষে পলায়নকারীরা একটি দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। মুসলমানরা দুর্গটি ঘেরাও করলে স্থানীয় লোকেরা ভেতর থেকে বলে পাঠাল: “আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের মারোনি, বরং চিত্রবিচিত্র ঘোড়ায় সওয়ার সাদা পাগড়ি পরিহিতরা আমাদের মেরেছে।” মুসলমানরা বলল: “এটি আল্লাহর সাহায্য ছিল।”

এই যুদ্ধে মুসলমানদের মাত্র একজন ব্যক্তি শহীদ হন। পরবর্তীতে কোনো এক সৈনিক হযরত সিনান বিন সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই...

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭..... এই যুগে স্ত্রীদের জিহাদে সাথে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এই মহিলারা শিবিরে অবস্থান করতেন এবং তাদের স্বামী, ভাই ও সন্তানদের সেবা করতেন যাতে জিহাদের সওয়াবে অংশীদার হতে পারেন।

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭; তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২০৮

[৩] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২০৯, ২১১

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭

...পড়ার সময় এত বিরতির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: “রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনই করতেন।” [১]

হযরত সিনান বিন সালামাহ (রা.) এই অভিযানে তলোয়ারের জোরে মাকরান পুনরায় জয় করেন এবং এই পুরো এলাকাটি নতুন করে আবাদ ও সংগঠিত করেন। তিনি এখানে দুই বছর অবস্থান করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। [২]

খোরাসানের অভিযানসমূহ

বসরার প্রথম গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) এবং দ্বিতীয় গভর্নর যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান খোরাসান থেকে বিদ্রোহ দমন এবং নতুন বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখেন। বসরার সদর দপ্তর থেকে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের জন্য আলাদা আলাদা সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। উত্তর আফগানিস্তানের অভিযান হযরত কায়েস বিন হাইসাম এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন খাযেমের ওপর ন্যস্ত করা হয়। হযরত কায়েস বলখের বিদ্রোহীদের শাস্তি দেন এবং তাদের অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস করে দেন। আবদুল্লাহ বিন খাযেম হেরাত ও বাদগিসের বিদ্রোহীদের দমন করেন। [৩]

আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-এর নেতৃত্বে কাবুলের জিহাদ:

মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের জন্য প্রখ্যাত সাহাবী আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়, যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এই অঞ্চল বিজয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখন তিনি একটি চুক্তির অধীনে কাবুল জয় করেছিলেন, কিন্তু এখন কাবুল থেকে রুখজ (কান্দাহার) পর্যন্ত পুরো এলাকা আবার স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) সেনাবাহিনী নিয়ে কাবুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর সাথে বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম, কয়েক ডজন প্রখ্যাত তাবেরী এবং আরবের বিখ্যাত অশ্বারোহীরা ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত উমর বিন উবাইদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ বিন খাযেম, হযরত মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা, হযরত আব্বাদ বিন হুসাইন, হযরত হিশাম বিন আমির, হযরত হাসান বসরী, হযরত সিলাহ বিন আশয়াম, হযরত যায়েদ আল-আবদী এবং কাতারি বিন ফুজাআ উল্লেখযোগ্য। [৪]

সিলাহ বিন আশয়াম (রা.)-এর মুজাহাদা:

হযরত সিলাহ বিন আশয়াম (রা.) অত্যন্ত ইবাদতগুজার মানুষ ছিলেন। তাঁর এক সফরসঙ্গী যায়েদ আল-আবদী বলেন:

“এক রাতে বাহিনী তাবু ফেলল, এশার সালাত আদায় করে সবাই শুয়ে পড়ল। আমি ভাবলাম আজ রাতে জেগে দেখব...”

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৩, ২১৪

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮, হিলাল সংস্করণ

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৯৬, হিলাল সংস্করণ

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৪, হিলাল সংস্করণ

সিলাহ বিন আশিম কেমন ইবাদত করেন? আমি দেখলাম যে হযরত সিলাহও সব মুজাহিদদের মতো শুয়ে পড়লেন, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল তখন তিনি হঠাৎ উঠে পাশের জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। আমি তাঁর পিছু নিলাম। দেখলাম যে তিনি ওজু করলেন এবং নামাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর নামাজ চলছিল এমতাবস্থায় হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটি সিংহ বেরিয়ে এল এবং তাঁর একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে একটি গাছে চড়ে বসলাম। হযরত সিলাহ প্রশান্তির সাথে নামাজ পড়তে থাকলেন। আমি ভাবলাম সিংহ হয়তো এখন পর্যন্ত সিলাহকে দেখেনি অথবা দেখে থাকলেও তাঁকে কোনো গাছ মনে করেছে। ইতিমধ্যে হযরত সিলাহ সেজদায় চলে গেলেন। আমি ভাবলাম এবার তো সিংহ তাঁকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে, কিন্তু কিছুই হলো না। অবশেষে হযরত সিলাহ সালাম ফেরালেন এবং সিংহের দিকে ফিরে বললেন: ‘হে হিংস্র প্রাণী! তোমার রিজিক অন্য কোথাও তালাশ করো।’ সিংহ এটি শুনে এত জোরে গর্জন করতে করতে ফিরে গেল যে আমার মনে হলো পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হযরত সিলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এভাবে নামাজ পড়তে থাকলেন যতক্ষণ না ভোরের আলো স্পষ্ট হলো। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন, দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতে থাকলেন। শেষে বললেন: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে শুধু এই সওয়াল করছি যে আমাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দাও। আমার মতো গুনাহগারের জান্নাত চাওয়ার সাহস কোথায়।’

এরপর হযরত সিলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লস্করে ফিরে এলেন। সকালে আমি তাঁকে এমন প্রফুল্ল দেখলাম যেন তিনি সারা রাত নরম বিছানায় ঘুমিয়েছেন, অথচ রাত জাগার কারণে আমার অবস্থা এমন ছিল যা আল্লাহই জানেন। [১]

এভাবে আল্লাহর ওলিদের এই লস্কর কাবুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। যখন যুদ্ধক্ষেত্র কাছে এল (এবং পাহাড়ি উপত্যকা শুরু হলো) তখন লস্করের আমির বললেন: ‘লস্করের কোনো ব্যক্তি যেন এদিক-ওদিক না হয়।’

এখন লস্কর রওনা হতে শুরু করলে হযরত সিলাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির খচ্চর তাঁর আসবাবপত্রসহ কোথাও পালিয়ে গেল। তিনি সেখানেই থেমে নামাজের নিয়ত বাঁধতে লাগলেন। লোকেরা বলল: ‘জনাব! লস্কর রওনা হয়ে গেছে।’

তিনি কয়েক কদম চললেন তারপর থেমে বললেন: ‘আমাকে দুই রাকাত তো পড়তে দাও।’

সাথীরা বলল: ‘লস্কর চলে যাচ্ছে।’

বললেন: ‘আমার সওয়ারি এবং আসবাবপত্র হালকা (সহজেই লস্করের সাথে গিয়ে মিলে যাব)।’

এখন তিনি দুই রাকাত পড়ে দোয়া করলেন: ‘হে আল্লাহ! তোমাকে কসম দিচ্ছি যে আমার সওয়ারি এবং আসবাবপত্র ফিরিয়ে দাও।’

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর খচ্চর আসবাবপত্রসহ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। [২]

দুই আরব মুজাহিদ শত্রুদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন:

সফরের সময় এক জায়গায় গোত্রীয় যোদ্ধাদের সাথে জোরদার যুদ্ধ হলো। হযরত সিলাহ বিন আশিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্য একজন তাবেয়ী হযরত হিশাম বিন আমির রহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র ছিলেন, সেদিন একাকী এগিয়ে গিয়ে তলোয়ার চালনা করলেন।

[১] শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, হা: ২৯৪২; আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়েক লি আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, হা: ৮৬৩, ত. ইলমিয়াহ

[২] প্রাগুক্ত

বল্লম চালনার নৈপুণ্য দেখালেন এবং শত্রুর মুখ ফিরিয়ে দিলেন। কাফেরদের ওপর এমন আতঙ্ক ছেয়ে গেল যে তারা বলতে লাগল: “দুইজন আরব সৈন্য আমাদের এই দশা করল, যদি তারা সবাই আমাদের ওপর আক্রমণ করত তবে আমাদের কী অবস্থা হতো?” ফলে তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিল।

কেউ একজন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে এই যুদ্ধের খবর দেওয়ার সময় তাঁর ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন: “হিশাম সেদিন নিজেকে ধ্বংস করতে কোনো কমতি রাখেননি।”

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ধমক দিয়ে বললেন: “কখনোই নয়, তিনি তো এই আয়াতের লক্ষ্য হতে চেয়েছিলেন: [১] وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ”

“আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিক্রি করে দেয়।” [২]

সুবহানাল্লাহ! এই ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের জিহাদের জযবা।

কাবুল উপত্যকায়:

এ ধরনের ঈমানদীপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে এই বরকতময় বাহিনী কাবুলে পৌঁছাল। কাবুল প্রাকৃতিকভাবে পাহাড়ে ঘেরা একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত শহর ছিল। শহরবাসীরা মরণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল, তাই বিজয় ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) কঠোরভাবে অবরোধ করলেন, যা কয়েক মাস ধরে চলল। অবশেষে তীব্র শীত ও তুষারপাতের মৌসুম শুরু হলো যা আরবদের জন্য অত্যন্ত ক্রার دشوار (কষ্টকর) ছিল, কিন্তু মুসলমানরা অটল রইলেন। শীত ও তুষারপাত... তাও আবার কাবুলের... আল্লাহ্ আকবার!... পুরো শীতকাল এই অবস্থায় কাটল, অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল পার হয়ে আবার শীতের দিন চলে এল। তবুও মুসলমানরা নামাজ কসর করে পড়তে থাকলেন কারণ স্থায়ীভাবে অবস্থানের নিয়ত ছিল না। [৩]

রণক্ষেত্রে ফিকহ ও হাদিসের শিক্ষা:

অবরোধ চলাকালীন হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) হাদিস ও ফিকহের শিক্ষা দিতে থাকলেন। এই রণাঙ্গনে তাঁর সাথে হযরত হাসান বসরী, হযরত ইবনে হাবিব এবং হযরত ইবনে উবাইদ (রহ.)-এর মতো তাবেয়ী ছাত্র হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই একই সাথে আলেমও ছিলেন আবার মুজাহিদও। হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) যুদ্ধের সময় তাঁদেরকে সালাতুল খওফ পড়িয়ে এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেন। [৪] হাদিসের দরসে হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) একটি হাদিস শোনালেন যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছে: “পদমর্যাদা প্রার্থনা করো না। যদি তুমি চেয়ে পাও তবে তা وبال (বিপদের কারণ) হবে, আর যদি না চেয়ে পাও তবে এ ব্যাপারে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) তোমাকে সাহায্য করা হবে।” [৫]

[১] সূরা আল-বাকার, আয়াত: ২০৭

[২] শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বর্ণনা নম্বর: ৩৯৩১; আয-যুহদ ওয়ার রাকায়েক, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক; আয-যুহদ, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, বর্ণনা নম্বর: ৮৬৩

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৫০৯৯, ৮২০৩, ত: আর-রুশদ; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ৫৬৩৯, ৫৬৪৮, ত: আল-ইলমিয়াহ

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ৬০০৭, ৬০৩৫

[৫] মুসনাদে আহমদ, হা: ২০৬৩৯

বসন্তকাল এলে কাবুলের চারপাশের বাগানগুলো ফলে ভরে যেত। ইসলামি মুজাহিদদের অনুমতি ছিল যে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী ফল খেতে পারবে, কিন্তু সাথে করে নিয়ে যাওয়া বা ফলদ বৃক্ষের ক্ষতি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। [১]

মানজানিক-এর ব্যবহার:

যখন কাবুল কোনোভাবেই জয় করা যাচ্ছিল না, তখন আবদুর রহমান বিন সামুরা রাদিআল্লাহু আনহু মানজানিক ব্যবহার করে শহরের প্রাচীর ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুসলমানরা সাধারণত দুর্গ ধ্বংসকারী সরঞ্জাম ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কারণ এতে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তবে গাজওয়ায়ে তায়েফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানজানিক ব্যবহার করেছিলেন, তাই এর বৈধতা বিদ্যমান ছিল।

মানজানিকের পরীক্ষা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হলো। ভারী পাথরের বৃষ্টি কাবুলের অপরাজেয় প্রাচীরে একটি বড় ফাটল তৈরি করে দিল। রাতে কাবুলের যোদ্ধারা এই ফাটল ভরাট করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু ইসলামি বাহিনীর অফিসার হযরত আব্বাদ বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু সারা রাত অবিরাম তীর নিক্ষেপ করে তাদের ফাটল থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এই বীরত্ব সম্পর্কে বলতেন: “আমি আব্বাদ বিন হুসাইনকে দেখার আগে কখনো কল্পনাও করিনি যে, একজন ব্যক্তি একাই হাজারো মানুষের সমান হতে পারে।” [২]

চূড়ান্ত যুদ্ধ:

সকাল হলে শহরের ফটক খুলে গেল। পরাজয় সামনে দেখে কাবুলের মুশরিকরা বন্যার মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের সাথে একটি ভয়ংকর যুদ্ধ-হস্তীও ছিল, যা সামনে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পিষে ফেলার জন্য উদ্যত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন খাযিম এটি দেখে বিদ্যুতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাতিটি ফটক থেকে সামান্য বাইরে আসতেই তিনি সেটিকে সেখানেই মেরে ফেললেন। হাতিটি ফটকের একটি কপাটের সাথে এমনভাবে লুটিয়ে পড়ল যে মুশরিকরা ফটক বন্ধ করতে পারল না। মুসলমানরা তাদের হটিয়ে শহরে প্রবেশ করল এবং এভাবেই কাবুলের মতো সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত শহর তলোয়ারের জোরে বিজিত হলো, যার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রাদিআল্লাহু আনহু হযরত উমর বিন উবায়দুল্লাহ এবং হযরত মুহাম্মাব বিন আবি সাফরা রাদিআল্লাহু আনহুকে বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলেন। [৩]

মুজাহিদদের সততা:

কাবুল বিজয়ে প্রচুর গনিমতের মাল হস্তগত হলো, বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জামের স্তুপ জমে গেল। কিছু লোক এই জিনিসগুলো ছিনিয়ে নিতে শুরু করল। আবদুর রহমান বিন সামুরা রাদিআল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ একজনকে বললেন যেন সে ঘোষণা করে দেয়: “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস হলো: যে লুটতরাজ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব যা কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তা ফেরত দাও।” এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই মুসলমানরা...

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, হা: ১৮০০৮

[২] মাকারিমুল আখলাক লি ইবনি আবিদ দুনিয়া, ১/ ২৫, ১৮৩; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৩, ত. আল-হিলাল

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৩, ত. আল-হিলাল

...সব জিনিস ফেরত রেখে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো সমানভাবে বণ্টন করলেন। [১] প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের অধিকাংশ মুসলমান এতই বিবেকবান ছিলেন যে, নবীর নির্দেশের সামনে তৎক্ষণাৎ মাথা নত করে দিতেন, এটাই ছিল তাদের সফলতার সবচেয়ে বড় রহস্য।

কাবুলের বন্দী শিশুরা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন:

বিজয়াভিযানে যারা বন্দী ও দাস হতো তাদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করা হতো। দাস শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। কাবুল বিজয়ের ফলে যে দাসরা হস্তগত হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন কিশোর অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিল। এই কিশোররা উম্মতের আলেমদের মজলিসে বসে শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মাশায়েখ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে নাফে মাওলা ইবনে উমর, সালেম বিন আজলান, আবু আইয়ুব সাখতিয়ানি এবং আবু সাঈদ আত-তবিল মেহরান ইলম ও ফজিলতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। [২] তাদের মধ্যে মাকহুলও ছিলেন যিনি বংশগতভাবে সিক্কি ছিলেন কিন্তু সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর মাকহুল আশ-শামি নামে প্রসিদ্ধ হন এবং মহান মুহাদ্দিস হন। [৩]

কান্দাহার বিজয়:

কাবুল বিজয়ের পর হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) সিজিস্তান (দক্ষিণ আফগানিস্তান)-এর দিকে অগ্রসর হন এবং বিভিন্ন শহর, দুর্গ ও গোত্রসমূহকে পদানত করে রুখজ (কান্দাহার) ও বুস্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই অভিযানের সময় তিনি গজনীর পার্শ্ববর্তী জাবুলও জয় করেন। [৪]

আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-এর ইন্তেকাল:

৪৬ হিজরি সনে হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.) খোরাসান থেকে অপসারিত হন এবং তাকে বসরায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি কাবুল থেকে অনেক দাস সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, যারা বসরায় তার প্রাসাদের আঙিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। এর কয়েক বছর পর ৫০ হিজরি সনে খোরাসান ও সিজিস্তানের এই মহান বিজেতার ইন্তেকাল হয়। [৫]

নতুন বিদ্রোহ ও তার প্রতিকার:

হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-এর পর খোরাসানের স্থানীয় গোত্রগুলো জায়গায় জায়গায় পুনরায় বিদ্রোহ শুরু করে। কাবুল থেকে কান্দাহার পর্যন্ত আবারও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে নতুন গভর্নর হযরত রাবি বিন জিয়াদ বুস্ত নামক স্থানে গোত্রীয় নেতাদের প্রধান যার উপাধি ছিল “রাতবিল”, তাকে পরাজিত করেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে বিদ্রোহীদের বড় কেন্দ্র কান্দাহারকে পুনরায় পদানত করেন। [৬]

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২০৬১৯

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৬, সন ৩৩ হি.

[৩] সুবুলুস সালাম: ১২৭/৬; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৬

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৩, ত. আল-হিলাল

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৩, ত. আল-হিলাল

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৮

রবী বিন যিয়াদ-এর পর উবায়দুল্লাহ বিন আবি বকর এসে খোরাসানি ও সিজিস্তানি গোত্রগুলোর বিজয়ের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেন। এই সময়ে প্রতিপক্ষ প্রধান রুতবিল দুই লক্ষ নগদ এবং দশ লক্ষ বার্ষিক করে বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন। উবায়দুল্লাহ বিন আবি বকর চূড়ান্ত চুক্তির আগে ইরাক গিয়ে যিয়াদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এই সন্ধির ব্যাপারে পরামর্শ করেন। যিয়াদ অনুমতি দেন। কারণ গোত্রীয় বিশৃঙ্খলা শেষ হওয়ার নাম নিচ্ছিল না। এটাই উপযুক্ত ছিল যে কোনোভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ হোক। ফলে এই সন্ধি সম্পন্ন হয়। [১]

ঘৌর ও আশাল বিজয়:

আফগানিস্তানের কেন্দ্রে ঘৌর প্রদেশ মরুভূমির গোলকধাঁধা এবং ভয়ংকর পাহাড়ি গিরিপথের কারণে প্রতিটি বিজয়ের জন্য সবচেয়ে কঠিন স্থান ছিল। ৪৭ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সেনাপতি হযরত হাকাম বিন আমর গিফারি (রা.) প্রথমবার এই দুর্গম এলাকা জয় করেন। [২]

৫০ হিজরিতে তিনি কোহ-ই-আশাল এলাকায় অগ্রসর হন। এখানকার মানুষ সোনার পাত্র ব্যবহার করত। ইসলামি বাহিনী প্রতিটি গিরিপথ অতিক্রম করে এবং শত্রুকে পরাজিত করে পাহাড়ি পথে এগিয়ে যেতে থাকে। একবার মুসলমানরা শত্রুর ঘেরাওয়ে পড়ে যায়। সৌভাগ্যবশত এই সময়ে শত্রুর একজন সর্দার ধরা পড়ে, যে মুক্তির বিনিময়ে মুসলমানদের ফিরে আসার নিরাপদ পথ দেখিয়ে দেয়। এভাবে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে এই বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।

যেহেতু এই বিজয়ে রূপার পরিবর্তে সোনা পাওয়া গিয়েছিল, তাই পূর্ব অঞ্চলের গভর্নর যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান হযরত হাকাম বিন আমর (রা.)-কে তাগিদ দেন যে সোনার পরিবর্তে রূপার জিনিসপত্র কেন্দ্রীয় খেলাফতে পাঠানোর জন্য ইরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এই অভিযানের পর মার্ভে হযরত হাকাম বিন আমর (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়। [৩]

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৫, ত. আল-হিলাল

[২] তারিখুত তাবারি: ৩২৯/৫

[৩] তারিখুত তাবারি: ২৫০/৫ ও ২৫২

কোহ-ই-আশাল সম্পর্কে ইতিহাস ও ভূগোলের বইগুলো প্রায় নীরব। তাবারির বর্ণনায় এই স্থানের নাম “জাবালুল আশাল” উল্লেখ করা হয়েছে যা সম্ভবত “কোহ-ই-আশাল”-এরই অনুবাদ। বর্ণনায় এখানকার বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, “তাদের অস্ত্রশস্ত্র চামড়ার এবং তাদের পাত্র সোনার।” অর্থাৎ তারা চামড়ার ঢাল এবং সোনার পাত্র ব্যবহার করত। সম্ভব যে “কোহ-ই-আশাল” বর্তমান কোয়েটার এলাকা, যা ব্রিটিশ আমলের আগে “শালকোট” নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী বারো শতাব্দীতে “কোহ-ই-আশাল” সংকুচিত হয়ে “শাল” এবং তারপর “শালকোট” হয়ে গেছে। হাকাম বিন আমর গিফারি (রা.)-এর অভিযান যা জুরজান-এর কাছাকাছি ছিল না, বরং মার্ভ ও ঘৌরে ছিল যা কোয়েটা থেকে ২৯৫ মাইল (৪৭২ কিমি) দূরে। ৫০ হিজরিতে তিনি কোহ-ই-আশালে আসেন। তিন বছরের অভিযানের সময় এত দূরত্বে অভিযান চালানো অসম্ভব নয়, তবে এটি কি কোহ-ই-আশাল ছিল কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পশমি কাপড়ের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে কোহ-ই-আশাল একটি শীতল এলাকা ছিল। শীতকালে পশমি কাপড়ের ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই হতো কিন্তু সোনার প্রাচুর্যের কারণ কী হতে পারে? কোহ-ই-আশালের কাছে কি সোনার কোনো খনি ছিল? নাকি এই লোকেরা সোনার ও রূপার পাত্র ব্যবহার করত? আজ কোয়েটার আশেপাশে সোনার বা রূপার খনির অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়। তবে একটি বর্ণনা অনুযায়ী সিব্বি সংলগ্ন এলাকায় সোনার ভাণ্ডার রয়েছে। সোনা কি বুঝ উপত্যকার কাছে “সিন্দাক”-এ পাওয়া যায় যা কোয়েটা এলাকা থেকে দূরে। যাই হোক, এই সম্ভাবনা গবেষণার দাবি রাখে।

মধ্য এশিয়ায় বিজয়ের সূচনা

সাইয়্যিদুনা হযরত মুয়াবিয়া [রা.] ৫১ হিজরিতে হযরত উমর ফারুক [রা.]-এর সেই সীমানার বাইরে আক্রমণাত্মক জিহাদ শুরু করেন যার আগে এখন পর্যন্ত কোনো ইসলামী বাহিনী যায়নি। এটি ছিল আমু নদী যার ওপারে মধ্য এশিয়ার উর্বর এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। কেউ জানত না যে দেড় শতাব্দী পরে এই ভূমি ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন এক দোলনা হয়ে উঠবে যে, ইসলামের প্রথম সারির আলেমদের মধ্যে স্থান পাওয়া মুহাদ্দিসগণ এই মাটি থেকেই আবির্ভূত হবেন।

আমু নদীর ওপারে:

কিছুকাল আগে হযরত মুয়াবিয়া [রা.]-এর সেনাপতি হযরত হাকাম বিন আমর গিফারি [রা.] মুসলিম বিশ্বের এই শেষ সীমানায় পৌঁছেছিলেন। আমু নদীর পানি সামনে ঢেউ খেলছিল। হযরত হাকাম বিন আমর [রা.] নদী পার হলেন, তাঁর ইশারায় তাঁর গোলাম নদীর তাজা ও সুস্বাদু পানি নিজের ঢালে ভরে তাঁকে পেশ করল। তিনি পানি পান করে নদী থেকে অজু করলেন। মুজাহিদদের কদম এখানে পৌঁছানোর শুকরিয়া স্বরূপ দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং পরিস্থিতি দেখে ফিরে গেলেন।

এখন হযরত মুয়াবিয়া [রা.]-এর আদেশে রাবি বিন যিয়াদ হারিসি বাহিনী নিয়ে আসলেন এবং নদী পার হয়ে কিছু সীমান্ত এলাকায় জিহাদ করলেন এবং প্রচুর গনিমত নিয়ে ফিরে আসলেন। এটি ছিল মধ্য এশিয়ায় উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার প্রথম জিহাদ। [১]

বুখারার রানীর মোজা ফেলে পলায়ন:

৫৩ হিজরিতে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ চব্বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মধ্য এশিয়ায় আক্রমণ করেন। এই ভূমিকে আরবরা “মাওয়ারাউন নহর” এবং পারস্যবাসীরা তুর্কিস্তান বলত। এখানে বড় শক্তিশালী তুর্কি গোত্রগুলোর আধিপত্য ছিল। সমরকন্দ, তিরমিয এবং খিভা এখানকার বিখ্যাত শহর ছিল। তুর্কিদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল বুখারা, যার চারপাশে মরুভূমি ও পাহাড়ি এলাকা ছিল। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ উটের পিঠে চড়ে এই মরুভূমি পাড়ি দেন। তুর্কিরা মোকাবিলায় এলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তুর্কিদের সাহায্যের জন্য বুখারার খান এবং রানী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। অবশেষে তারা পরাজিত হলো। খান তার রানীসহ পালিয়ে গেল। বিশৃঙ্খলার মধ্যে পালানোর সময় রানী তার মোজা সেখানেই ফেলে গেল যা পরে দুইশ দিরহামে (প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা) বিক্রি হয়েছিল।

রানী খুব চালাক ছিল। সে বুখারা শহরে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের সাথে একটি মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে সন্ধি করে নিল। সন্ধি চুক্তির অধীনে বুখারা মুসলমানদের জন্য খুলে দেওয়া হলো। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজে গিয়ে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক শহরটি পরিদর্শন করলেন। আশেপাশের অন্যান্য তুর্কিদের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি। তাই উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ এখানে দুই বছর অভিযান পরিচালনা করেন এবং বুখারার শহরতলী এলাকা: নাসাফ এবং বাইকান্দ জয় করে নিলেন। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৫৬, উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের অধীনে

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৫৩ হিজরি; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৯৭, তবা আল-হিলাল; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২২২

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আফ্রিকার অভিযানসমূহ

ইসলামি বিশ্বের পশ্চিমে আফ্রিকা একটি বিশাল মহাদেশ ছিল, যার উত্তর উপকূল ভূমধ্যসাগরের সাথে মিশে আছে, যা অনেকগুলো রাষ্ট্রকে নিজের মধ্যে ধারণ করে আছে। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এখানে কিছু বিজয় অর্জিত হয়েছিল কিন্তু মুসলমানদের জন্য এখানে তখনও স্থায়িত্ব অর্জিত হয়নি। ইউরোপীয় রাজা এবং রোমের কায়সার এখানকার কাফেরদের সাহায্য করত যাতে তারা মুসলমানদের সামনে টিকে থাকতে পারে। কায়সার আফ্রিকান নেতাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি স্থাপনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি বারবার তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতেন। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মিশরের গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আফ্রিকার বিজয়ের জন্য তাঁর চাচাতো ভাই হযরত উকবা বিন নাফি (রা.)-কে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। [১]

উকবা বিন নাফি (রা.)-এর বিজয়সমূহ:

হযরত উকবা (রা.) ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সামরিক নেতা, সাহসী এবং ইবাদতগুজার মানুষ। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম বছরেই আফ্রিকায় সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে লুবিয়া (লিবিয়া) পর্যন্ত পৌঁছে যান। লুবিয়া ও মারাকিয়া জয় করে তিনি যখন ফিরে আসছিলেন, তখন পরাজিত আফ্রিকানরা বিদ্রোহ করে। হযরত উকবা (রা.) পুনরায় ফিরে আসেন, বিপুল সংখ্যক শত্রুকে হত্যা করেন এবং বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দেন।

পরের বছর তিনি আরও অগ্রসর হন এবং এক তীব্র যুদ্ধের পর “গাদামেস” জয় করেন। [২]

৪৩ হিজরিতে তিনি অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে রেখে মাত্র ৪০০ অশ্বারোহী এবং ৮০০ পানি বহনকারীকে সাথে নিয়ে দক্ষিণ দিকে সুদানের মরুভূমির দিকে রওনা হন এবং “জুওয়াইলা”-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে “ওয়াদান” জয় করে স্থানীয় নেতাকে বন্দি করেন। [৩]

আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ইন্তেকাল:

মিশরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ৪৩ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের দিন ইন্তেকাল করেন। [৪]

পারস্পরিক বিবাদে (মুশাজারাত) অংশগ্রহণের কারণে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর চরিত্রের ওপর কিছু লোক প্রশ্ন তোলে এবং বাতিলপন্থীরা তাদের নিজস্ব বুদ্ধি বা দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁকে জালিম ও মুনাফিক মনে করতে শুরু করে। অথচ তিনি ছিলেন একজন মহান সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ হলো: “আস-এর দুই পুত্রই মুমিন: আমর এবং হিশাম।” [৫]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৩

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৫

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩০৬; মুজামুল বুলদান: ৩৬৬/৫

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৫

[৫] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৮০৩২, সনদ হাসান; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১৯২/৩, ত. সাদির; মুস্তাদরাকে হাকিম, হা: ৫০৫৩, সনদ হাসান

হাফেজ যাহাবী (রহ.) লিখেছেন: “তিনি কুরাইশদের একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং দুনিয়ার স্বীকৃত মানুষ ছিলেন। মেধা, প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি মাঝারি উচ্চতার ছিলেন এবং কালো খেজাব লাগাতেন।” [১]

যখন তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি তীব্র অস্থিরতার মধ্যে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (বিন আমর) (রা.) বললেন: “কেন কাঁদছেন? আপনি কি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছেন?”

তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! মৃত্যুর জন্য নয়, বরং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য।”

সাহেবজাদা বললেন: “আপনি তো ভালো জীবন অতিবাহিত করেছেন।” এই বলে তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য এবং সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণের কথা মনে করিয়ে দিতে লাগলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলতে লাগলেন:

“তুমি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কথাটি বাদ দিয়েছ। তা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। দেখ! আমার জীবন তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। আমি খুব ভালো করেই জানি কোন স্তরে আমি কেমন ছিলাম। প্রথমে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোর বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যদি আমি সেই সময় মারা যেতাম, তবে নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামী হতাম। তারপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম, তখন আমি তাঁর সামনে সবচেয়ে বেশি লজ্জাবোধ করতাম। আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারতাম না। তাঁর কাছে যা কিছু বলতে চাইতাম, তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারতাম না। যদি আমি সেই স্তরে মারা যেতাম, তবে মানুষ বলত: ‘আমরকে মোবারকবাদ, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কল্যাণের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার জন্য জান্নাতের আশা রয়েছে।’ কিন্তু এরপর আমি ক্ষমতা ও শাসনের মতো বিষয়গুলোতে জড়িয়ে পড়লাম। জানি না এখন সেগুলো আমার জন্য উপকারী হবে নাকি খতিকর। সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন কেউ যেন আমার জন্য না কাঁদে।” [২]

একটি বর্ণনায় আছে যে, সাহেবজাদা বললেন: “অস্থিরতা কিসের! রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে কাছে টেনে নিতেন এবং আমার বানাতেন।” তিনি বললেন: “বৎস! বিষয়টি এমনই ছিল, তবে আমি তোমাকে বলি, আল্লাহর কসম! আমি জানি না রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সাথে এই আচরণ ভালোবাসার কারণে করতেন নাকি মন জয়ের জন্য। তবে আমি দুই ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভালোবাসতেন। একজন ইবনে সুমাইয়া (আম্মার বিন ইয়াসির) এবং অন্যজন ইবনে উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)।” এই বলে তিনি নিজের হাত চিবুকের নিচে রাখলেন এবং দুআ করলেন:

“হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হুকুম দিয়েছিলেন আর আমরা তা ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাদের নিষেধ করেছিলেন আর আমরা তা করেছি। আপনার ক্ষমা ছাড়া আমাদের আর কোনো আশ্রয় নেই।” এই বলতে বলতে তাঁর রুহ প্রকৃত স্রষ্টার কাছে চলে গেল। [৩]

“ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।”

এরাই ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁদের পারস্পরিক মতপার্থক্য থাকলেও তাঁরা ছিলেন মুখলিস এবং নেক নিয়তের অধিকারী। আখেরাতের চিন্তা ছিল তাঁদের ভূষণ, আর যদি কোনো ভুল হয়ে যেত তবে তা স্বীকার করতে এবং তওবা ও ইস্তেগফার করতে তাঁরা সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৩/৫৩ থেকে ৫৭, দারুল রিসালাহ।

[২] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯৯, মুসনাদে হাসান।

[৩] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০১, ইসনাদুহু সহীহ আলা শর্তে মুসলিম।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জিহাদ:

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিবর্তে মাসলামা বিন মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসর ও উত্তর আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত হন। এই সময়ে ৩৫ হিজরিতে কায়সার উইলিয়াম নামক এক আমিরকে আফ্রিকা পাঠিয়ে লোকদের নিজের আনুগত্যে আসার দাওয়াত দেন। একজন আফ্রিকান সর্দার এসে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এই সংবাদ দিলে তিনি মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আফ্রিকায় আরও বিজয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। [১]

তিনি আফ্রিকার জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময়ে তিনি একটি পাহাড়ে ক্যাম্প স্থাপন করেন যেখানে তাকে প্রচণ্ড বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়, যার ফলে এই জায়গাকে ‘জাবালুল মাতার’ (বৃষ্টির পাহাড়) বলা হতে থাকে। [২]

৪৭ হিজরিতে আফ্রিকার অভিযানের জন্য হযরত রুয়াইফি বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সেনাপতি করে পাঠানো হয়। তিনি তারাবলুস আল-মাগরিব (ত্রিপোলি, লিবিয়ার বর্তমান রাজধানী) পর্যন্ত পৌঁছান এবং তা জয় করে ফিরে আসেন। [৩]

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সমুদ্র শান্ত থাকত, তখন ত্রিপোলির উপকূলে রোমানদের আক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যেত, তবে শীতকালে সমুদ্রের উত্তাল অবস্থার কারণে এই আশঙ্কা থাকত না। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতি বছর বসন্তকালে ত্রিপোলির উপকূলে অতিরিক্ত সতেজ ও শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন করতেন। যখন শীতকাল আসত এবং সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ দেখা দিত, তখন আমির অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে সেখানে অবস্থান করতেন এবং বাকি বাহিনী ফিরে যেত। [৪]

সুস বিজয়:

৫০ হিজরিতে মিসরের শাসক হযরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পুনরায় জিহাদের জন্য আফ্রিকায় পাঠানো হয়। তার সাথে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মতো বিশিষ্ট কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। রোমান সম্রাট আফ্রিকার ওপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি নিচফুর নামক এক নবাবকে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য পাঠান। রোমান বাহিনী আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছানো মাত্রই হযরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু অশ্বারোহীদের একটি বিশাল দল নিয়ে তাদের দিকে রওনা হন।

উপকূলীয় শহর সুস থেকে বারো মাইল (সাড়ে ১৯ কিলোমিটার) দূরে একটি উঁচু টিলায় পৌঁছে তারা অবস্থান নেন। এখান থেকে উপকূলীয় রোমান বাহিনী দেখা যাচ্ছিল। রোমান সেনাপতি নিচফুর যখন তাদের আগমনের খবর পেলেন, তখন তিনি এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে তৎক্ষণাৎ জাহাজে চড়ে পালিয়ে গেলেন। তার বাহিনী পেছনে পড়ে রইল। [৫]

[১] আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, মারাকুশি: ৮/১। এই সাহাবীর নাম কোনো কোনো কিতাবে মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ লেখা হয়েছে, তবে হুদাইজ নামই সঠিক। খুদাইজ কোনো বর্ণনাকারীর নাম অথবা লিপিকারদের ভুল।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৭।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৮।

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১২৯, ত ত আল-হিলাল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

এখন হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) তিনশ আরোহীকে নিয়ে সরাসরি সেই শহরের সামনে উপকূলে গিয়ে পৌঁছালেন। একদিকে রোমান বাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল, অন্যদিকে শহরের প্রবেশদ্বার ছিল। আসরের ওয়াক্ত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) সেখানেই কাতার সোজা করে আসরের নামাজ শুরু করে দিলেন।

রোমানরা বিস্ময়ের সাথে এই দৃশ্য দেখছিল। অবশেষে তিনি একে আক্রমণের সর্বোত্তম সুযোগ মনে করে অশ্বারোহীদের সামনে এগিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে নামাজ আদায় করতে থাকলেন এবং প্রতিপক্ষের এই নড়াচড়ার প্রতি সামান্যতম ঝঞ্জেপ করলেন না। শত্রুর কাছে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে তিনি সালাম ফিরিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তাকবির বলতে বলতে রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমানরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে হযরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ (রা.) আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে এক হাজার অশ্বারোহীর একটি দল দিয়ে ‘জালুলা’ নামক শহরের দিকে পাঠালেন যা কায়রোয়ান থেকে চব্বিশ মাইল (সাড়ে ৩৮ কিলোমিটার) দূরে।

আবদুল মালিক অবরোধ করে মিনজানিক দিয়ে প্রচণ্ড পাথর বর্ষণ করলেন কিন্তু শহরটি জয় করা সম্ভব হলো না। প্রাচীর দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কোথাও থেকে ভাঙেনি, তাই বিজয়ে বিলম্ব হচ্ছিল। এদিকে প্রধান সেনাপতি মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ (রা.)-এর পাঠানো বড় বাহিনীও আবদুল মালিকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, তবুও সফলতা আসেনি।

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান একদিন জালুলার ওপর জোরদার হামলা করলেন। শহরবাসীরা সফলভাবে প্রতিরোধ করতে থাকল। এরই মধ্যে আবদুল মালিকের কাছে মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ (রা.)-এর নির্দেশ পৌঁছাল যে অভিযান ছেড়ে ফিরে আসো। আবদুল মালিকের কাছে এই নির্দেশ পালন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি সৈন্যদের ফিরে আসার সংকেত দিলেন। আবদুল মালিক নিজে নিজের তাঁবুর দিকে রওনা হলেন, কিছুদূর যাওয়ার পর মনে পড়ল যে তার ধনুকটি সেখানেই একটি গাছের সাথে ঝুলে রয়ে গেছে। ফিরে গিয়ে ধনুকটি নিলেন, এই সময় হঠাৎ শহরের প্রাচীরের ওপর নজর পড়তেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন; কারণ প্রাচীর এক জায়গা থেকে ধসে পড়েছিল।

আবদুল মালিক সাথে সাথে উচ্চস্বরে সৈন্যদের ডেকে ফিরিয়ে আনলেন এবং পুরো শক্তি দিয়ে শহরের ওপর হামলা করে দিলেন। মুসলমানরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করার পর শহরে প্রবেশ করলেন এবং তা জয় করে নিলেন। [১]

এই বিজয়ে এত বেশি গনিমতের মাল হস্তগত হলো যে প্রত্যেক মুজাহিদ দুইশ এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী চারশ দিরহাম পেলেন। [২]

এই বিজয়গুলোর সময় হযরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ (রা.) আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে সাথে নিয়ে তিউনিস থেকে ৩২ মাইল (৫১ কিলোমিটার) পশ্চিমে উপকূলে অবস্থিত ‘বিনজারত’ নামক বিখ্যাত শহরটিও জয় করে নিলেন। [৩] [৪]

হযরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ (রা.) এই অভিযান থেকে এক বছর পর ফিরে এলেন। [৫]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/৮; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১১।

[২] মুজামুল বুলদান: ১৫৬/২, জালুলা; আল-বায়ানুল মুগরিব লি-ইবনে ইজারি: ৮/১।

[৩] মুজামুল বুলদান: ৫০০/১।

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১১।

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১১।

মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-এর জিহাদ:

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর স্থলে মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রা.) মিসর ও উত্তর আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত হন। এই সময়ে ৪৫ হিজরিতে কায়সার (রোমান সম্রাট) উইলিয়াম নামক একজন আমিরকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে লোকদের তার বশ্যতা স্বীকার করার আহ্বান জানান। হুবাবা নামক একজন আফ্রিকান সর্দার এসে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে এই সংবাদ দিলে তিনি মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-কে আফ্রিকায় আরও বিজয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। [১]

তিনি আফ্রিকার বনাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময়ে তিনি একটি পাহাড়ে ক্যাম্প স্থাপন করেন যেখানে তাদের প্রচণ্ড বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়, যার ফলে সেই স্থানটিকে “জাবালুল মাতুর” (বৃষ্টির পাহাড়) বলা হতে থাকে। [২]

৪৭ হিজরিতে আফ্রিকার অভিযানের জন্য হযরত রুয়াইফি বিন সাবিত (রা.)-কে সেনাপতি করে পাঠানো হয়। তিনি ত্রিপোলি আল-মাগরিব (লিবিয়ার বর্তমান রাজধানী ত্রিপোলি) পর্যন্ত পৌঁছান এবং তা জয় করে ফিরে আসেন। [৩]

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সমুদ্র শান্ত থাকত, তখন ত্রিপোলির উপকূলে রোমানদের আক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যেত। তবে শীতকালে সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে এই আশঙ্কা থাকত না। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রতি বছর বসন্তকালে ত্রিপোলির উপকূলে অতিরিক্ত সতেজ বাহিনী মোতায়েন করতেন। যখন শীতকাল আসত এবং সমুদ্র উত্তাল হতো, তখন সেনাপতি অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে সেখানে অবস্থান করতেন এবং বাকি বাহিনী ফিরে যেত। [৪]

সুস বিজয়:

৫০ হিজরিতে মিসরের শাসক হযরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-কে পুনরায় জিহাদের জন্য আফ্রিকায় পাঠানো হয়। তাঁর সাথে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.), আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এবং আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের মতো প্রখ্যাত কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। রোমান সম্রাট আফ্রিকার ওপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি নাবুর নামক একজন নবাবকে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা দিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাঠান। রোমান বাহিনী আফ্রিকার উপকূলে অবতরণ করার সাথে সাথেই হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) অশ্বারোহীদের একটি দল নিয়ে তাদের দিকে রওনা হন।

উপকূলীয় শহর সুস থেকে বারো মাইল (সাড়ে ১৯ কিলোমিটার) দূরে একটি উঁচু টিলায় পৌঁছে তারা থেমে যান। এখান থেকে উপকূলে রোমান বাহিনীকে দেখা যাচ্ছিল। রোমান সেনাপতি নাবুর এই মহান ব্যক্তিদের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পেয়ে যান। তিনি এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে, তৎক্ষণাৎ জাহাজে চড়ে পালিয়ে যান। তার বাহিনী পেছনে রয়ে যায়।

[১] আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, মাররাবুশি: ১/৮। কোনো কোনো কিতাবে এই সাহাবীর নাম মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ‘খ’ দিয়ে খুদাইজ সঠিক। হুদাইজ কোনো বর্ণনাকারীর ধারণা বা পাণ্ডুলিপির ভুল।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ২০৭

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ২০৮

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১২৯, ত ত আল-হিলাল

এখন হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ছয়শ অশ্বারোহী নিয়ে সরাসরি সুস শহরের সামনের উপকূলে গিয়ে পৌঁছালেন। একদিকে রোমান বাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল, অন্যদিকে ছিল শহরের প্রবেশদ্বার। আসরের সময় ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) সেখানেই কাতার সোজা করে আসরের সালাত শুরু করে দিলেন।

রোমানরা বিস্ময়ের সাথে এই দৃশ্য দেখছিল। অবশেষে তারা একে আক্রমণের মোক্ষম সুযোগ মনে করে অশ্বারোহীদের সামনে এগিয়ে দিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে সালাত আদায় করতে থাকলেন এবং প্রতিপক্ষের এই কাপুরুষোচিত আচরণের বিন্দুমাত্র পরোয়া করলেন না। শত্রু কাছে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে তিনি সালাম ফিরিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তাকবীর ধ্বনি দিয়ে রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমানরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.) আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে এক হাজার অশ্বারোহীর একটি দল দিয়ে ‘জালুলা’ নামক শহরের দিকে পাঠালেন, যা কাইরাওয়ান থেকে চব্বিশ মাইল (সাড়ে ৩৮ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত।

আব্দুল মালিক অবরোধ করে মানজানিক দিয়ে প্রচণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন কিন্তু শহর জয় করা সম্ভব হলো না। প্রাচীর দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কোথাও থেকে ভাঙছিল না, ফলে বিজয় অর্জনে বিলম্ব হচ্ছিল। এদিকে প্রধান সেনাপতি মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-এর পাঠানো বড় বাহিনীও আব্দুল মালিকের কাছে পৌঁছে গেল, তবুও সফলতা এল না।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান একদিন জালুলার ওপর জোরালো আক্রমণ করলেন। শহরবাসীরা সফলভাবে প্রতিরোধ করতে থাকল। এরই মধ্যে আব্দুল মালিক মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-এর আদেশ পেলেন যে, অভিযান ছেড়ে ফিরে এসো। আব্দুল মালিকের কাছে আদেশ পালন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সৈন্যদের শিবিরের দিকে ফিরে যাওয়ার সংকেত দিয়ে আব্দুল মালিক নিজে তাঁর তাঁবুর দিকে রওনা হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মনে পড়ল যে, ধনুকটি সেখানেই কোনো একটি গাছে ঝোলানো রয়ে গেছে। ফিরে গিয়ে ধনুকটি তুললেন, এই সময় হঠাৎ শহরের প্রাচীরের ওপর নজর পড়তেই বিস্ময়ে থমকে গেলেন; কারণ প্রাচীরটি এক জায়গায় ধসে পড়েছিল।

আব্দুল মালিক তৎক্ষণাৎ ডাক দিয়ে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনলেন এবং শহরের ওপর পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করলেন। মুসলমানরা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শহরে প্রবেশ করলেন এবং তা জয় করে নিলেন। [১]

এই বিজয়ে এত বেশি গণীমতের মাল হস্তগত হলো যে, প্রত্যেক মুজাহিদ দুইশ এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী চারশ দিরহাম পেলেন। [২]

এই বিজয়গুলোর সময় হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.) আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে সাথে নিয়ে তিউনিস থেকে ৩২ মাইল (৫১ কিলোমিটার) পশ্চিমে উপকূলে অবস্থিত ‘বিজারত’ এর বিখ্যাত শহরটিও জয় করে নিলেন। [৩]

হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.) এই অভিযান থেকে এক বছর পর ফিরে এলেন। [৪]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ৮/১; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১১

[২] মুজামুল বুলদান: ১৫৬/২, জালুলা; আল-বায়ানুল মুগরিব লি ইবনে আযারি: ৮/১

[৩] মুজামুল বুলদান: ৫০০/১

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১১

আফ্রিকায় প্রথম ইসলামী সেনানিবাস, কায়রোয়ান শহর নির্মাণ:

এ পর্যন্ত আফ্রিকায় মুসলমানদের আক্রমণগুলো ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ বাড়ানো এবং তাদের অনিষ্টকামিতার শক্তি ভেঙে দেওয়ার জন্য। মুসলমানদের সেনাবাহিনী এখানে এসে স্থায়ীভাবে অবস্থান করত না, তাই এ পর্যন্ত অনেক জিহাদী অভিযান সত্ত্বেও আফ্রিকায় মুসলমানদের কোনো শহর আবাদ হয়নি। এর ক্ষতি এই হচ্ছিল যে, ইসলামী সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার সাথে সাথেই কোনো না কোনো অনিষ্টকারী সর্দার লোকদের একত্রিত করে বিদ্রোহ করে দিত এবং কিছুকাল পর মুসলিম বাহিনীকে পুনরায় এসে এলাকাটি জয় করতে হতো।

মুসলমানদের এখানে আবাদ হতে না পারার অনেক কারণ ছিল: এই এলাকাগুলোতে শত শত মাইল পর্যন্ত একটানা মরুভূমি ও জঙ্গল বিস্তৃত ছিল। জনবসতি ছিল কোথাও কোথাও এবং তাও ছিল খুব কম। আবার সেগুলোতে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন, তাই সভ্য মানুষের আবাদ হওয়া ছিল খুব দুষ্কর। এর বিপরীতে সিরিয়া, মিশর এবং ইরাক ও পারস্যের এলাকাগুলো আগে থেকেই আবাদ এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভরপুর ছিল, তাই মুসলমানরা সেখানে সহজেই শহর, দুর্গ ও সেনানিবাস তৈরি করে ফেলেছিল।

যা-ই হোক, আফ্রিকায় বিদ্রোহের ধারা বন্ধ করার জন্য একটি ইসলামী শহর পত্তন করা জরুরি ছিল। এই মহান কাজের দায়িত্ব ৫০ হিজরি সনে হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর সেনাপতি হযরত উকবা বিন নাফে رضى الله عنه গ্রহণ করেন। হযরত উকবা কুরাইশদের বনু ফিহর বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১০ হিজরি সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল, এখন তিনি চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বারকার আশেপাশে ক্যাম্প স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযানে যেতেন। তিনি আফ্রিকার অনেক শহর জয় করেছিলেন এবং ইসলামী সীমান্তকে সুদান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। [১]

তিনি লস্করের আমিরদের এক বৈঠকে বললেন:

“আফ্রিকায় যখনই আমাদের কোনো সেনাপতি সৈন্য নিয়ে আসেন, এই লোকেরা ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে, কিন্তু ইসলামী বাহিনী চলে যাওয়ার সাথে সাথেই বিদ্রোহ করে দেয়; তাই আপনারা এখানে এমন একটি শহর আবাদ করুন যা চিরদিনের জন্য মুসলমানদের জিহাদের কেন্দ্র হয়ে যায়।”

সবাই এই মতের সাথে একমত হলেন। কিছু লোক মত দিলেন যে, এই শহরটি উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মাণ করা হোক যাতে সমুদ্রসীমার সুরক্ষাও হতে থাকে। কিন্তু হযরত উকবা বিন নাফে رضى الله عنه বললেন:

“এই অবস্থায় সম্ভব যে কায়সার হঠাৎ আক্রমণ করে এটি দখল করে নেবে। উত্তম হলো একে সমুদ্র উপকূল থেকে তিন দিনের দূরত্বের দূরত্বে নির্মাণ করা হোক যাতে শত্রুর নৌবাহিনী এলেও হঠাৎ সেখানে পৌঁছাতে না পারে।”

সবাই এই মতের সাথে একমত হলেন। [২]

উকবা বিন নাফে رضى الله عنه এই পরিকল্পনার জন্য “আস-সাবখা” হ্রদের নিকটবর্তী এলাকা পছন্দ করলেন। ৫১ হিজরি সনে মুসলমান...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/৬৩; আল-আলাম লিয যিরিকলি: ৪/২৪১; মুজামুল বুলদান: ৪/৩৪০।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/৯ আজও বড় শহর আবাদ করার ক্ষেত্রে এই প্রতিরক্ষা সতর্কতা বজায় রাখা হয় যে, তা যেন সীমান্ত থেকে উপযুক্ত দূরত্বে থাকে।

কাজ শুরু করতে গিয়ে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো যে, সেখানকার ঘন জঙ্গল হিংস্র পশু, সাপ এবং বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ ছিল; ভেতরে পা রাখা ছিল মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর নামান্তর। [১]

হিংস্র পশুরা জঙ্গল খালি করে দিল:

হযরত উকবা (রা.) লশকর থেকে বাছাইকৃত কিছু ব্যক্তিকে একত্রিত করলেন যাদের মধ্যে আঠারো জন সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সবাই মিলে এই কাজের সহজতার জন্য দোয়া করলেন। উকবা বিন নাফে (রা.) সরাসরি সাবিল উপত্যকায় পৌঁছালেন যেখানে শহর আবাদ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেখানে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন:

“হে জঙ্গলের হিংস্র পশুরা! সাপেরা! এবং বিচ্ছুরা! আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথী। এখান থেকে চলে যাও। আমরা এখানে অবস্থান করব। ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে যাকে দেখা যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে।”

দেখতে দেখতে গাছের ঝোপঝাড় থেকে হিংস্র পশু এবং গর্ত থেকে সাপ ও বিচ্ছুর দল বের হতে লাগল। জঙ্গল খালি হতে শুরু করল। পশুরা রাসূলের সাহাবীদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। তারা নিজেদের বাচ্চাদেরও সাথে নিয়ে যাচ্ছিল যারা নিজেরা চলতে পারছিল না। নেকড়েরা তাদের বাচ্চাদের মুখে চেপে ধরে পালাচ্ছিল। সাপেরা তাদের বাচ্চাদের সাথে জড়িয়ে গর্ত থেকে বের হচ্ছিল। হযরত উকবা (রা.) আওয়াজ দিলেন: “কেউ এই পশুদের গায়ে হাত দিও না, এদের যেতে দাও।”

জঙ্গল খালি হয়ে গেলে সাথীদের বললেন: “এখন আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে প্রবেশ করো।”

মুসলমানরা জঙ্গলে প্রবেশ করলে সেখানে কোনো পশুর নামনিশানাও ছিল না। এই দৃশ্য দেখে বারবার গোত্রের অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সেই এলাকার আশেপাশে আর কোনো ক্ষতিকর প্রাণী দেখা যায়নি। [২]

হযরত উকবা (রা.)-এর নির্দেশে গাছপালা ও ঝোপঝাড় কেটে একটি বিশাল এলাকা পরিষ্কার করা হলো। প্রথমে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করা হলো। তারপর এর আশেপাশে মুজাহিদদের ঘরবাড়ি তৈরি করা হলো। প্রতিটি মহল্লায় একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করা হলো। শহরের প্রাচীরের পরিধি সাড়ে চার মাইল (সোয়া সাত কিলোমিটার) রাখা হলো।

শহরের ভিত্তি স্থাপিত হলে মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই এটি জনবসতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। একে ‘কাররোয়ান’ নাম দেওয়া হলো। [৩] এটি আফ্রিকায় মুসলমানদের প্রথম সেনানিবাস এবং প্রথম শহর ছিল। [৪]

হযরত উকবা বিন নাফে (রা.) বিজিত এলাকাগুলোতে তাবলিগের কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন যার ফলে এই মহাদেশে দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য বারবার ও অন্যান্য গোত্র ইসলামে দাখিল হয়। [৫]

[১] আল-বায়ানুল মাগরিব: ১/১

[২] আল-বায়ানুল মাগরিব: ১/১

[৩] এটি ফারসি শব্দ ‘কারওয়ান’-এর পরিবর্তিত রূপ।

[৪] আল-বায়ানুল মাগরিব: ১০৯/১, তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১০

[৫] ফুতুহ মিসর ওয়াল মাগরিব লি-আবুল কাসিম আল-মিসরি: ৫৫৩/৩

আবু মুহাজির দিনার এবং হাসসান বিন নুমান-এর বিজয়সমূহ:

কয়েক বছর পর হযরত উকবা বিন নাফে رضى الله عنه কে ফিরিয়ে আনা হলে ৫৩ হিজরিতে খালিদ বিন সাবিত ফাহমি এবং তাঁর পর আবু মুহাজির দিনার رضى الله عنه একে একে আফ্রিকার রণাঙ্গনে জিহাদি খিদমত আঞ্জাম দেন এবং হযরত উকবা বিন নাফে رضى الله عنه এর বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন। [১]

৭৪ হিজরিতে এখানে হযরত হাসসান বিন নুমান رضى الله عنه নিযুক্ত হন। একই বছর আবিস বিন সাদ উত্তর আফ্রিকার শহর লাসতাজানা আক্রমণ করেন। [২] বারবার গোত্রগুলো যারা আলজেরিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তারা তাদের সাথে সন্ধি করে এবং কর প্রদান করতে শুরু করে। হযরত হাসসান বিন নুমান رضى الله عنه হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর মৃত্যু পর্যন্ত এখানে নিয়োজিত ছিলেন। [৩]

৫৯ হিজরিতে আবু মুহাজির দিনার رضى الله عنه উত্তর আফ্রিকার উপকূলে রোমানদের প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর ‘কারতাজানা’ (কার্টেজ)-এ আক্রমণ করেন। এখানে সারাদিন তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলমানরা পিছু হটে রাতে তাদের অধিকৃত আফ্রিকান শহর তিউনিস (বর্তমান তিউনিসিয়া)-এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে তাদের প্রতিরক্ষা লাইন শক্তিশালী করে এবং ভোরে কাফেরদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালায়। স্থানীয় লোকজন অস্ত্র সমর্পণ করে শহরটি তাদের হাতে তুলে দেয়। কারতাজানার পর আবু মুহাজির رضى الله عنه আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ‘মিলা’-কেও জয় করেন। [৪] এভাবে সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া رضى الله عنه এর যুগে প্রায় সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

রোমান সাম্রাজ্য এবং عالم اسلام (ইসলামী বিশ্ব)

কিসরার শান-শওকত ইসলামী খিলাফতের প্রতাপ ও উত্থানের সামনে কয়েক বছরের বেশি টিকেতে পারেনি। হযরত উমর ফারুক رضى الله عنه এর যুগে সাসানীয়দের রাজধানী বিজিত হয় এবং হযরত উসমান গনি رضى الله عنه এর যুগে তাদের শেষ কিসরাও নিহত হয়। তবে কায়সারে রোম এশিয়া থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপে পূর্ণ শান-শওকতের সাথে বিদ্যমান ছিল। قسطنطينيه (কনস্টান্টিনোপল) ছিল তার কেন্দ্র এবং ভূমধ্যসাগরের অনেক দ্বীপ তার দখলে ছিল, যেগুলোর সেনানিবাস থেকে রোমান বাহিনী عالم اسلام-এর উপকূলগুলোতে লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাত। হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه কায়সারি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। রোমানদের রাজধানী قسطنطينيه-তে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা ছিল আপনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং আপনার পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে খিলাফতের প্রথম বছরগুলোতে আপনাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং অন্যান্য রণাঙ্গনে অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল, তাই আপনি সেই সময় রোমানদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। [৫]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২২৩

[২] মুজাম্মুল বুলদান: ১/১২২

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২২৩

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, সন ৫৯ হিজরি

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৫

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সাথেও অঙ্গীকার রক্ষা:

এই সন্ধির সূচনা কায়সারের পক্ষ থেকে হয়েছিল। তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভীত ছিলেন, কারণ বছরের পর বছর ধরে তিনি সিরিয়ার উপকূল এবং ভূমধ্যসাগরের ঢেউয়ের মাঝে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শক্তি ও শৌর্যের মহড়া দেখে আসছিলেন। এমন একজন জেনারেল খলিফা হওয়ায় তিনি যতটা অস্থির হতেন তা কমই ছিল। তিনি সন্ধির জন্য বার্ষিক একটি বড় অংকের অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। যেহেতু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমানদের প্রতারণা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, তাই শর্ত রাখলেন যে জামানত হিসেবে রোমানরা তাদের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে জিম্মি হিসেবে তাঁর কাছে রাখবে। কায়সার কিছু ব্যক্তিকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিলেন যাদেরকে বালবাকের দুর্গে রাখা হয়েছিল। এই সন্ধি দুই বছর পর্যন্ত জারি ছিল।

কিছুকাল পর রোমানরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং একতরফাভাবে সন্ধি চুক্তি ভেঙে দিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু চাইলে কোনো দুনিয়াদার বাদশাহর মতো এই সুযোগে জিম্মিদের হত্যা করাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে এই ফয়সালা দিলেন যে কায়সারের ভুলের বিনিময়ে এই জিম্মিদের হত্যা করা জায়েজ নয়। তিনি এই জিম্মিদের এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী বাক্যটি বলে মুক্ত করে দিলেন: “وَفَاءٌ بِغَدْرِ خَيْرٌ مِنْ غَدْرِ بَغْدَرْ”

“অঙ্গীকার ভঙ্গের বিনিময়ে অঙ্গীকার ভঙ্গের চেয়ে উত্তম হলো অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সাথেও অঙ্গীকার রক্ষা করা।” [১]

□□□

রোমানদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ

৪৩ হিজরি সনে আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং এরপর সারাজীবন যুদ্ধবিরতি করেননি। এর জন্য আপনি প্রতি বছর শীতকাল এবং গ্রীষ্মকালে আলাদা আলাদা বাহিনীকে রোমানদের সীমান্তে মোতায়েন করার কৌশল অবলম্বন করেন। এই বিশেষ বাহিনীগুলো সিরিয়ার উত্তরে এশিয়া মাইনর (বর্তমান তুরস্ক)-এ অবস্থান করত, এই ভূখণ্ডের কিছু অংশ মুসলমানদের এবং কিছু অংশ রোমানদের দখলে ছিল। এই বিশেষ বাহিনীগুলো সেই নৌবাহিনী ছাড়াও ছিল যারা সিরিয়া ও আফ্রিকার উপকূলে রোমান নৌবাহিনীর সাথে লড়াইরত থাকত। যেহেতু এশিয়া মাইনরের রণাঙ্গনে শীতকাল অত্যন্ত কঠোর হয়, তাই ঐতিহাসিকগণ বেশিরভাগ সেই বাহিনীগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিশেষভাবে শীতকালের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

মৌসুমী শীতকালীন অভিযানসমূহ:

এই ধারার প্রথম অভিযান ৪৩ হিজরি সনে বুসর বিন আরতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে রওনা হয় এবং কনস্টান্টিনোপল উপসাগর পর্যন্ত যায়। এই বাহিনী পুরো শীতকাল রণাঙ্গনে অতিবাহিত করে। [২]

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৫৯; খত আল-হিলাল ১; তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২০৬

[২] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২৯৬; তারিখ ইবনে খালদুন: ১১/৩

৪৩ এবং ৪৫ হিজরির শীতকালে সাইফুল্লাহ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর সাহেবজাদা হযরত আবদুর রহমান (রা.) মুজাহিদদের সেনাপতি হিসেবে রোমানদের মোকাবিলায় ছিলেন। [১]

তাঁদের পর হযরত মালিক বিন হুবায়রা এবং হযরত আবদুর রহমান আল-কাইনি ৪৭ হিজরি থেকে ৪৯ হিজরি পর্যন্ত বিভিন্ন বছরের শীতকালীন মৌসুমে এশিয়া মাইনর এবং আন্তাকিয়ার রণাঙ্গনে অটল ছিলেন। [২]

এক শীতকালীন মৌসুমে ইয়াজিদ বিন শাজারা আল-রাহাভিও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। [৩]

জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া এই বিশাল বাহিনী সীমান্তে গিয়ে ছোট ছোট দ্রুতগামী অশ্বারোহী দলে বিভক্ত হয়ে যেত। হযরত উবাইদাহ বিন কায়েস আল-কিলাবি (রা.)-এর নেতৃত্বে চল্লিশ-পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর এমন একটি দল ছিল যারা ‘শামাহ’ নামক দুর্গ জয় করেছিল। এখান থেকে প্রত্যেক অশ্বারোহী গনিমতের মাল হিসেবে দুইশ করে দিনার পেয়েছিলেন।

এই মহান ব্যক্তির নেতৃত্বেই কনস্টান্টিনোপল উপসাগরের উপকূলে আরও একটি দুর্গ পদানত হয়েছিল যাকে ‘মাদান’ বলা হতো। [৪]

গ্রীষ্মকালীন অভিযানসমূহ:

এই সময়ে গ্রীষ্মকালেও রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ছিল যার নেতৃত্ব হযরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস আল-ফাজারি এবং হযরত মালিক বিন হুবায়রা আল-কিন্দি (রা.) দিচ্ছিলেন। [৫]

তবে গ্রীষ্মকালীন অভিযানগুলোতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল হযরত মালিক বিন আবদুল্লাহ আল-খাসআমি (রা.)-এর, যিনি তাঁর বীরত্বপূর্ণ কাজের কারণে ‘মালিকুস সাওয়াইফ’ (গ্রীষ্মকালীন অভিযানের মালিক) উপাধিতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। [৬]

হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর শীতকালীন অভিযান এবং প্রত্যাবর্তন:

রোমানদের বিরুদ্ধে একটি শীতকালীন অভিযানের আমির ছিলেন হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি (রা.)। তিনি অসহনীয় শীত মুজাহিদদের জন্য ক্ষতিকর দেখে দ্রুত ফিরে আসেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বললেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী আমার সামনে ছিল যে, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: “এই বাণী কি আপনি নিজে শুনেছেন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, আমি নিজে শুনেছি।” [৭]

মোদাকথা, এই অভিযানে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান করা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী পরীক্ষা।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৭

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২২৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ১১/৩

নোট: তারিখ ইবনে খালদুনের কিছু পাণ্ডুলিপিতে এখানে ইয়াজিদ বিন শমরা লেখা হয়েছে যা অনুলিখনের ভুল।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৮, ২০৯

[৪] তারিখ দামেশক: ২/৩০, ৩৭; জীবনী: আতিয়্যাহ বিন কায়েস; আল-মা’রিফাহ ওয়াত তারিখ: ২/৩৯৮, তাবাকাতুর রুসাফাহ...

‘মাদান’ দুর্গটিকে ‘মাদিন’ এবং ‘আল-মাদানি’ও বলা হয়েছে, একইভাবে ‘শামাহ’ দুর্গটিকে ‘সামাহ’ও বলা হয়েছে।

[৫] তারিখ ইবনে খালদুন: ১১/৩

[৬] উসদুল গাবাহ: ৫/৩৮; আল-ইসাবাহ: ৫/৫৩১, ৫৩৪ অধীনে: মালিক বিন আবদুল্লাহ বিন সিনান আল-খাসআমি

[৭] মুসনাদে হুমাইদি: ২/৩৫৩, জারির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেছেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রোমানদের ভূখণ্ডে ষোলোটি অভিযান প্রেরণ করেন। একটির পর একটি বাহিনী পর্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্মকালে সেখানে যেত। তাঁর পুত্র ইয়াজিদে প্রতি তাঁর শেষ অসিয়ত ছিল যে, রোমানদের কণ্ঠরোধ করে দাও।” [১]

এই সমস্ত অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সীমান্ত রক্ষা করা, শত্রুর ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করা এবং তাদের শক্তির পরিমাপ করতে থাকা।

কনস্টান্টিনোপলের ওপর বড় আক্রমণ:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আট বছর পর্যন্ত গেরিলা আক্রমণের কৌশল পরীক্ষা করার পর অবশেষে ৫০ হিজরিতে রোমান রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের ওপর বড় ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। [২] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর চব্বিশ বছর বয়সী পুত্র ইয়াজিদকে বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। [৩] আব্দুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) স্বেচ্ছাসেবকদের, উকবা বিন আমির (রা.) মিশরীয় বাহিনীর এবং ফাদালা বিন উবাইদ (রা.) রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। [৪]

ইয়াজিদ অতীতে কোনো ছোটখাটো সামরিক অভিযানেও কোনো বিজয় অর্জন করেনি, তাই এত বড় একটি অভিযানের নেতৃত্ব তার হাতে ন্যস্ত হওয়া এবং প্রখ্যাত সেনাপতি ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের তার অধীনে থাকা উম্মতের কিছু বড়দের কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়েছিল। বিশেষ করে এই কারণে যে, ইলম, মর্যাদা, নেক আমল ও তাকওয়ার দিক থেকেও ইয়াজিদ অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ইখলাস, বিনয় ও আনুগত্যের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁরা এই পরিস্থিতির ওপর বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি। যদি কারো মনে কোনো অসন্তুষ্টি এসেও থাকে, তবে তিনি তা প্রকাশ করেননি, বরং সেই অসন্তুষ্টির জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ইমাম সারাখসী (রহ.) লিখেছেন:

“মুহাম্মদ বিন সিরিন (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, যখন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়াকে বাহিনীর আমির বানানো হলো, তখন আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর কাছে তার সাথে জিহাদে বের হওয়া অপছন্দনীয় মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি এর জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং পরবর্তীতে তার সাথে জিহাদে শরিক হন।” [৫]

আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জিহাদে বের হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলতেন: “আল্লাহর নির্দেশ হলো: ‘তোমরা বের হও হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায়’ (জিহাদের জন্য বের হও, স্বাচ্ছন্দ্যে হোক বা কষ্টে), আমি এই দুই অবস্থার কোনো একটিতে আছি।” [৬]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৩৩৫

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২১১; তারিখ তাবারী ৪৯ হিজরি এবং কেউ কেউ ৫২ হিজরিও উল্লেখ করেছেন, তবে সঠিকতার কাছাকাছি হলো ৪৯ হিজরি।

[৩] মুসনাদে আহমদ, হা: ২৩৫২৩; উসদুল গাবাহ: ২/১২১, জীবনী: খালিদ বিন যায়েদ বিন কুলাইব (আবু আইয়ুব আনসারী)

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হা: ৯৬২৫; ১৮০৬০, ১৮১৯৫

[৫] মুহাম্মদ বিন সিরিন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়াকে একটি বাহিনীর ওপর নিযুক্ত করা হলো, তখন আবু আইয়ুব আনসারী তার সাথে বের হওয়া অপছন্দ করলেন, অতঃপর তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন... ইত্যাদি। (শারহুস সিয়ারিল কাবীর লিস-সারাখসী: ২/২৩৫, বাবুল শহীদ ওয়ামা ইউসনাউ বিহি)

[৬] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৯৩০

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ প্রস্তুত হন, যাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [১]

এই বাহিনী রওনা হওয়ার আগে, ৫০ হিজরিতেই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সুফিয়ান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রোমানদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী দিয়ে এশিয়া মাইনরের দিকে পাঠিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা ‘তুওয়ানা’ নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সম্ভবত এই বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের ব্যস্ত রাখা যাতে তারা কনস্টান্টিনোপলগামী বাহিনীর পথ রোধ করতে না পারে। সুফিয়ান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী এশিয়া মাইনরের ‘ফারকাদুনাহ’ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই স্থানে আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল এবং প্রচণ্ড শীত ছিল, যার ফলে মুজাহিদগণ দুর্ভিক্ষ, জ্বর, চুলকানি এবং অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত হন। [২]

সুফিয়ান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কনস্টান্টিনোপলগামী বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পরও সেখানেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ বিন মাসআদাহ আল-ফাজারি রাদিয়াল্লাহু আনহু কমান্ড গ্রহণ করেন। [৩]

কনস্টান্টিনোপল বাহিনীর কার্যক্রম:

কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা বাহিনীটি এশিয়া মাইনরের কয়েক মাসের পথ অতিক্রম করে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছায়। পথিমধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া তাঁর সেবা করতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন: “আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে? তবে ব্যক্ত করুন।” তিনি বললেন: “আমি যখন মারা যাব, তখন আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে শত্রুর দেশের যতটুকু ভেতরে সম্ভব নিয়ে যেও। তারপর লোকদের নির্দেশ দিও যেন তারা আমাকে সেখানে দাফন করে।” [৪]

ইমাম সারাখসি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অসিয়ত এজন্য করেছিলেন যাতে তিনি জিহাদের জন্য শত্রুর যত বেশি সম্ভব কাছে গিয়ে অধিক সওয়াব লাভ করতে পারেন। [৫]

অবশেষে মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল প্রণালী অতিক্রম করে রোমানদের এই অপরাজেয় রাজধানীর ওপর আক্রমণ চালায়। এখানে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। হযরত আবদুল আজিজ বিন যুরারাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিদিন শাহাদাতের তামান্না এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবিত ফিরে আসার ওপর এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন। যুদ্ধের একদিন তিনি রোমানদের সারিতে ঢুকে পড়েন এবং লাশের...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/২৩২।

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কি কনস্টান্টিনোপল জিহাদে শরিক ছিলেন?

প্রসিদ্ধ আছে যে সাইয়েয়েদনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই জিহাদে শরিক ছিলেন, কিন্তু কোনো হাদিস বা তাবাকাত গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। প্রথমবার অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে হাফেজ ইবনে কাসীর এটি কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৭৩৭)।

তাই এই ঘটনার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। সম্ভব যে এটি একটি বানোয়াট বর্ণনা; কারণ হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদে যাওয়ার মতো একটি অসাধারণ ঘটনা এবং তাঁর প্রথম ও শেষ ওফাত পর্যন্ত কোনো বর্ণনাকারী বা ইতিহাসবিদ অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও কোনো সূত্র খুঁজে পাননি।

[২] তারিখু দুামেশক: ৬৫/৩০৫; তারিখুত তাবারী, পৃ. ২০০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩৫, ৫৩ হিজরির ঘটনাবলি।

[৩] শারহুস সিয়ারিল কাবীর লিস সারাখসি: ২/২৩৫, বাবুশ শহীদ ওয়া মা ইউসনাউ বিহি; উসদুল গাবাহ: ৩/১২১।

[৪] শারহুস সিয়ারিল কাবীর লিস সারাখসি: ২/২৩৫, বাবুশ শহীদ ওয়া মা ইউসনাউ বিহি।

...এর আমির নিযুক্ত করলেন, অবশেষে রোমানরা তাদের ঘিরে ফেলল এবং বর্শার আঘাতে শহীদ করে দিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সংবাদ পেয়ে দুঃখের সাথে বললেন: “আল্লাহর কসম! আরবদের এক যুবক বীর চলে গেল।”

হযরত আব্দুল আজিজ (রা.)-এর পিতা অবাক হয়ে বললেন: “কে? আমার সন্তান নাকি আপনার?”

বললেন: “আপনার।”

পিতা বললেন: “প্রত্যেক যুবক বীরকেই মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে, তা যৌবনে হোক বা বার্ধক্যে।” [১]

কনস্টান্টিনোপলের সামনে খোলা ময়দানেও যুদ্ধ হয়েছিল। একদিন রোমানদের একটি বিশাল বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলো। এখানে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আব্দুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। মিশরীয় বাহিনীর আমির ছিলেন উকবা বিন আমির জুহানি (রা.) এবং সিরীয় বাহিনীর আমির ছিলেন হযরত ফাদালা বিন উবায়দ (রা.)। রোমানদের এই সারির সাথে লড়াই করার জন্য মুসলমানদেরও একটি বিশাল সারি প্রস্তুত হলো। মুখোমুখি হতেই একজন মুজাহিদ একাকী রোমানদের সারিতে ঢুকে পড়লেন। তার সঙ্গীরা তাকে থামানোর জন্য চিৎকার করে বলতে লাগলেন: “না, না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। কিন্তু তিনি কোনো পরোয়া করলেন না এবং বীরত্ব প্রদর্শন করে কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। লোকজন অবাক হয়ে বলল: “সুবহানাল্লাহ! এ তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।” তারপর এই কাজের নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ হিসেবে তারা এই আয়াত পাঠ করল:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

“তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।”

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এই বিতর্ক শুনে আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে বললেন:

“ভাইয়েরা! এই আয়াত আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যখন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে বিজয়ী করলেন, তখন আমরা গোপনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম: আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেছে। চলো এখন আমরা আমাদের ধন-সম্পদের দেখাশোনা করি এবং সেগুলোর উন্নতি করি, আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের মনের আশা পূরণ করবেন। এর ওপর এই আয়াত নাযিল হয়, অর্থাৎ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার অর্থ ছিল এই যে, আমরা দুনিয়াদারিতে লিপ্ত হয়ে যাব এবং জিহাদ ছেড়ে দেব।” [২]

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এই যুদ্ধক্ষেত্রেই কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন।

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন লশকর বা বাহিনীর আমির ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া তাকে দেখতে যান। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) তখন বললেন: “উম্মতের লোকদের আমার সালাম জানাবেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছি যা আমার এই অবস্থা না হলে কখনো বলতাম না। সেই বাণীটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা যাবে যে সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৯ হিজরীর অধীনে।

[২] সুনানে আবু দাউদ, হা: ২৫১২; কিতাবুল জিহাদ; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৭৯২৫।

একটি বর্ণনায় আছে যে তিনি বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে একটি কথা শুনেছি যা এখন পর্যন্ত তোমাদের কাছে গোপন রেখেছিলাম। তিনি ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা গুনাহ না করতে তবে আল্লাহ এমন এক সৃষ্টি তৈরি করতেন যারা গুনাহ করত এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন।” [১]

এরপর হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ইন্তেকাল হলো। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া জানাজার নামাজ পড়ালেন। [২]

মুসলমানরা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ওসিয়ত অনুযায়ী রাতের অন্ধকারে তাঁর মরদেহ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। এমনকি তাঁরা কনস্টান্টিনোপলের আকাশচুম্বী প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁকে নীরবে দাফন করা হলো। দাফনের পর তাঁর কবর থেকে একটি আলোর ঝলক বের হয়ে আসমান পর্যন্ত চলে গেল। এই অদ্ভুত দৃশ্য রোমান সৈন্যরাও দেখল এবং তারা বিস্মিত হয়ে গেল। পরের দিন তাদের দূত এসে জিজ্ঞাসা করল: “এই ব্যক্তি কে যাকে তোমরা দাফন করেছ?” উত্তর দেওয়া হলো: “আমাদের রাসূলের সাহাবী।” শহীদের এই কারামত দেখে অনেক রোমান মুসলমান হয়ে গেল। [৩]

রোমানদের হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর প্রতি এমন ভক্তি জন্মেছিল যে, তারা শত শত বছর ধরে কেবল তাঁর কবরের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করত না, বরং দুর্ভিক্ষের সময় তারা এখানে এসে দোয়াও করত। [৪]

মুসলমানরা দীর্ঘ সময় ধরে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে রাখলেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। অবশেষে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সৈন্যবাহিনীসহ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। [৫]

এশিয়া মাইনরের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়সমূহ:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে এরপরও শীত ও গ্রীষ্মকালে রোম সীমান্তে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর ধারা অব্যাহত থাকে। ৫৩ হিজরিতে হযরত আবদুর রহমান বিন উম্মুল হাকাম, ৫৪ হিজরিতে হযরত মুহাম্মদ বিন মালিক, ৫৬ হিজরিতে হযরত মাসউদ বিন আবি মাসউদ, ৫৭ হিজরিতে হযরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস, ৫৮ হিজরিতে হযরত মালিক বিন আবদুল্লাহ খাসআমি এবং ৫৯ হিজরিতে হযরত আমর বিন মুররা আল-জুহানি (রা.) এই অভিযানগুলোর নেতৃত্ব দেন। [৬]

এই অভিযানগুলোতে এশিয়া মাইনরের কিছু দুর্গ আনুষ্ঠানিকভাবে জয় করে সেখানে মুসলমানদের সীমান্ত টোঁকিও স্থাপন করা হয়। এগুলোর মধ্যে এশিয়া মাইনরের একটি প্রাচীন রোমান দুর্গ ‘কায়সারিয়া’ (এটি সিরিয়ার কায়সারিয়া নয়)-এর অবরোধ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এখানে এক লক্ষ রোমান, এক লক্ষ ইহুদি এবং ত্রিশ হাজার সামারি জাতির লোক ছিল। হযরত ওমর বিন তামিম এই রণাঙ্গনে নিয়োজিত ছিলেন। সাত বছর কেটে গেল এবং মুসলমানরা এর বিজয় সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় সেনাপতি একটি গোপন সুড়ঙ্গের সন্ধান পেলেন যেখান দিয়ে উট আরোহীও যাতায়াত করতে পারত।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৫৩... হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন যে, আমার মতে বারা এবং পূর্ববর্তী হাদিসটি ইয়াজিদকে এক পর্যায়ে “গুনাহ সত্ত্বেও ক্ষমা পাওয়ার অস্বাভাবিক আশা”র মধ্যে লিপ্ত করার কারণ হয়েছিল এবং এই কারণেই সে এমন অনেক কাজ করে ফেলেছিল যার জন্য তার সমালোচনা করা হয়। বৃষ্টির সতেজতায় কোনো সন্দেহ নেই... কিন্তু তা বাগানে টিউলিপ ফোটার আর লোনা জমিতে আগাছা জন্মায়।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৫৩

[৩] শারহু সিয়াবিল কাবীর লিস-সারখাসি: ১/২৩৫

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৫৩

[৫] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/১১

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, ৫৩ হি. থেকে ৫৯ হি., পৃ. ২১৬ থেকে ২২৬

এই সুড়ঙ্গ দিয়ে ইসলামী বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করল। হযরত আমর বিন তামীম দুর্গের মিনারে চড়ে বসলেন এবং ঘোষণা করলেন: “শুনে রাখো! কায়সারিয়া জয় হয়েছে।” লোকেরা এ কথা শুনে অস্ত্র সমর্পণ করল এবং এখানে ইসলামী পতাকা ওড়ানো হলো। [১]

রোমের সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ‘কামনাথ’ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের এক বছর আগে ৫৯ হিজরিতে পদানত করা হয়। এর বিজয়ে হযরত উমাইর বিন হাবাব নামক এক মুজাহিদের সাহসী ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি তীর ও পাথরের বৃষ্টির মধ্যে একাকী দুর্গের প্রাচীরে চড়ে বসেন এবং একাই রোমানদের আঘাত করে করে প্রাচীর থেকে সরিয়ে দেন। এরপর বাকি বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করে। [২] এই বাহিনীগুলোতে বড় বড় আলেম ও ক্বারীগণ অংশগ্রহণ করতেন এবং জিহাদের সময় কুরআন ও হাদীস পড়া ও পড়ানোর ধারা সমানভাবে চলতে থাকত। [৩]

ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহ দখলের অভিযানসমূহ:

কনস্টান্টিনোপল আক্রমণে ব্যর্থতা থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই আন্দাজ করেছিলেন যে, এটি জয় করার জন্য চারপাশের সমুদ্রপথ এবং গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমূহের ওপর আধিপত্য জরুরি। ফলে ৫২ হিজরিতে কনস্টান্টিনোপল থেকে বাহিনী ফিরে আসার পরের বছরই সাইয়েদেনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয় দ্বীপসমূহ দখলের অভিযান শুরু করে দেন। এর একটি উদ্দেশ্য এটিও ছিল যে, সিরিয়ার উপকূলকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা, যা এই দ্বীপগুলো থেকে ক্রমাগত করা হতো।

এই ইসলামী নৌবাহিনী জুনাদা বিন উমাইয়া (রা.)-এর মতো অতুলনীয় নাবিকের অধীনে ছিল। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম রোমানদের শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্র রোডস দ্বীপে আক্রমণ করেন। ষাট বর্গমাইল (৯৬ কিলোমিটার) আয়তনের এই সবুজ-শ্যামল দ্বীপটি এশিয়া মাইনর (তুরস্ক)-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে আঙুর, জয়তুন এবং অন্যান্য ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

হযরত জুনাদা বিন উমাইয়া (রা.) ৫৩ হিজরিতে এখানে আক্রমণ করেন এবং এটি জয় করে এখানে মুসলমানদের একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন যা একটি অত্যন্ত মজবুত দুর্গের মধ্যে ছিল। মুসলমানরা এখান থেকে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয় নৌবহরগুলোর ওপর নজর রাখতেন। তাদের গোয়েন্দারা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে ছিল যারা তাদেরকে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করত। সমুদ্র দিয়ে শত্রুর কোনো জাহাজ যাওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং সাহায্য ও রসদ লুট করে নিতেন। হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন: ‘كَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْكُفَّارِ’। “এই সৈন্যরা কাফেরদের জন্য অত্যন্ত কঠোর লোক ছিলেন।” [৪]

পরের বছর জুনাদা বিন উমাইয়া (রা.) আরও একটি দ্বীপ ‘আরওয়াদ’ জয় করে নেন। এখানে জিহাদকারীদের মধ্যে বিখ্যাত ক্বারী হযরত মুজাহিদ বিন জাবর আল-মুকরিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি এখানে কুরআন মাজীদেব শিফার ধারা শুরু করেন। তাঁর প্রখ্যাত ছাত্র ক্বারী তাবি বিন আমির (কাব আহবারের সৎ ছেলে) এখান থেকেই তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। [৫]

[১] মুজামুল বুলদান: ৪/৪২১, ৪২২

[২] তারিখু দামেশক: ৩০/৪৩, ৩০/৪৭; তরজমা: আতিয়্যাহ বিন কায়স; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২৩৩

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৫৯ হিজরি

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৫৯; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২৩৩, তবা আল-হিলাল

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২৩৩; মুজামুল বুলদান: ১/১৬২

৫৫ হিজরিতে হযরত জুনাদা বিন আবু উমাইয়া [রা.] ক্রিট দ্বীপে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু এখানে দখল করতে পারেননি। [১] এই অভিযানগুলোর সময়ই সিসিলি দ্বীপটি বিজিত হয় এবং এটি সিসিলি ও মাহদিয়ার মাঝখানে অবস্থিত। ইয়াজিদ বিন শাজারাহ [রা.] এর একটি নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং ৫৮ হিজরির একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শহীদ হন। [২] হযরত আমর বিন ইয়াজিদ জুহানিও এই ধরনের কিছু অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। [৩]

হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত মুয়াবিয়া [রা.] কেন চীন ও হাবশার ওপর আক্রমণ করেননি?

আকর্ষণীয় বিষয় হলো হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত মুয়াবিয়া [রা.] খোরাসান, হিন্দুস্তান, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত জিহাদি কার্যক্রমের পরিধি বেশ বিস্তৃত করেছিলেন, কিন্তু পূর্ব দিকে তুর্কিদের মূল আবাসভূমি চীন এবং পশ্চিমে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা হাবশা ইত্যাদিতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেননি। এর একটি কারণ রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর এই বাণী ছিল: “তুর্কিদের ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে না যতক্ষণ তারা তোমাদের না ছাড়ে।” [৪]

একইভাবে একটি বর্ণনায় আছে: “হাবশাবাসীদের ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে না যতক্ষণ তারা তোমাদের না ছাড়ে।” [৫]

মূলত রাসূলুল্লাহ [সা.]-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কিয়ামতের আগে এই জাতিগুলোর হাতে মুসলমানদের ওপর কঠিন বিপদ আসবে, তাই রাসূলুল্লাহ [সা.] সতর্কতা ও মমতাবশত এই জাতিগুলোর সাথে অকারণে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটাই কারণ ছিল যে হযরত ওমর ফারুক [রা.] এই অঞ্চলগুলোতে সৈন্যবাহিনী পাঠাননি।

সেই দিনগুলোতে সৈন্যবাহিনী না পাঠানোর একটি বড় কারণ এটিও ছিল যে সেই সময়ে রোমের সাথে যুদ্ধ চলছিল, তাই চীন বা মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের অর্থ ছিল উত্তর আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগর থেকে সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যা নিশ্চিতভাবেই বিপজ্জনক হতো। এজন্য হযরত মুয়াবিয়া [রা.] বলতেন: “এই দুটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিও না।” [৬]

এ থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে অকারণে এমন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা প্রজ্ঞার পরিপন্থী যাকে কাবু করা কঠিন।

আহলে শামের জিহাদের উল্লেখ হাদিসে

আহলে শামের জিহাদ ও বিজয়ের দিকে হাদিসেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদিন হযরত মুয়াবিয়া [রা.] এই হাদিস শোনাচ্ছিলেন: “আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর আদেশের ওপর অটল থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকবে এবং তারা মানুষের ওপর বিজয়ী হবে।”

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২৩৩, ত. আল-হিলাল; মু'জামুল বুলদান: ১/১৬২।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/৪৪৭; তারিখে দামেস্ক: ৬৫/২২৩, তরজমা: ইয়াজিদ বিন শাজারাহ।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, পৃ. ৫৯ হিজরি।

[৪] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৩০২, কিতাবুল মালাহিম, বাবুল্লাহয় আনিত তাহরিজিল তুর্কি ওয়াল হাবশা।

[৫] সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ৩৯৩।

[৬] “লা তুহরিজু আর-রাবিহিন” (মু'জামুল বুলদান: ২/২৩)।

এটি শুনে হযরত মালিক বিন ইখামির নামক এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বললেন: “আমি হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, তারা হবে সিরিয়াবাসী।” হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এটি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। [১]

এই যুদ্ধগুলো কি দস্যুবৃত্তি ছিল?

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানরা হিন্দুস্তান, আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরে যে যুদ্ধগুলো করেছিল, সেগুলোর অধিকাংশের উদ্দেশ্য শহরগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে জয় করা ছিল না। বরং সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল গেরিলা অভিযান, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর ওপর প্রভাব বজায় রাখা, তাদের শক্তির পরিমাপ করা, সেই ভূখণ্ডের চড়াই-উতরাই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং গনিমতের মাল লাভ করা। এই ধরনের অভিযানের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের পথ সুগম হতো।

প্রাচ্যবিদরা এই অভিযানগুলোকে দস্যুবৃত্তি বলে অভিহিত করেন, অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। এটি ছিল দুটি জাতির মধ্যে নিয়মিত রাজনৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে সংঘটিত সামরিক সংঘাত, যাতে প্রতিটি পক্ষ (যতক্ষণ না একে অপরের সাথে কোনো চুক্তি হয়) প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার আশ্রয় চেষ্টা করে। যদি মুসলমানরা রোমান, আফ্রিকান এবং ভারতীয়দের এলাকায় হস্তক্ষেপ করত, তবে তারাও ক্রমাগত ইসলামী সীমান্তগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে যেত।

কিছু বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগের বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হলো, ইয়েমেনে হযরত আবদুল্লাহ বিন কিলাবাহ (রা.)-এর একটি উট হারিয়ে যায়। তিনি সেটির সন্ধানে কোনো এক মরুভূমিতে ঘুরছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তার সামনে একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ দৃশ্যমান হলো, যা প্রকৃতপক্ষে শাদাদের তৈরি কৃত্রিম জান্নাত ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন কিলাবাহ সেখান থেকে কিছু কস্তুরী, জাফরান এবং মুক্তা সংগ্রহ করলেন। যখন তিনি ফিরে আসলেন, তখন সেই শহরটি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

হযরত আবদুল্লাহ বিন কিলাবাহ (রা.) এই ঘটনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি কাব আহবার (রা.)-কে ডেকে এই বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: “এটি স্তম্ভবিশিষ্ট (শাদাদ) নির্মিত জান্নাত ‘ইরাম’ ছিল। আপনার যুগের একজন খাটো গড়নের, লাল বর্ণের, নীল চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি যার গালে এবং কপালে তিল থাকবে, সে এটি দেখতে পাবে। সে তার উটের সন্ধানে বের হবে।”

এই কথা বলে তিনি যখন ফিরলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন কিলাবাহ-এর ওপর তার নজর পড়ল। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন: “আল্লাহর কসম! এই সেই ব্যক্তি।” [২]

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১৬৯৩২

[২] তাফসীরে কুরতুবী: ২০/৪৭, আত-তাফসীর আল-রাজি, সূরা আল-ফজর—এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন: “আবদুল্লাহ বিন কিলাবাহ অপরিচিত এবং সনদের একজন রাবী ইবনে লাহিয়াহ (যিনি যয়ীফ)।” (ফাতহুল বারী: ৮/৭০২)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

কায়সার একবার তার সালতানাতের দুইজন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠালেন: তাদের একজন ছিল রোমের সবচেয়ে শক্তিশালী কুস্তিগীর এবং অন্যজন ছিল সবচেয়ে দীর্ঘকায় মানুষ। কায়সার প্রস্তাব দিলেন যে, যদি আপনি আপনার রাজ্য থেকে তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং বেশি দীর্ঘকায় মানুষ উপস্থাপন করতে পারেন তবে ঠিক আছে। অন্যথায় আপনাকে আমাদের সাথে তিন বছরের যুদ্ধবিরতি করতে হবে।

যখন উভয় ব্যক্তি দামেস্কে আসলেন, তখন হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের মোকাবিলার জন্য হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাহেবজাদা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনীর সাবেক সেনাপতি কায়েস বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে পাঠালেন। হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া আরবদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হিসেবে গণ্য হতেন এবং হযরত কায়েস বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শারীরিক উচ্চতায় অনন্য ছিলেন।

প্রথমে রোমান কুস্তিগীর এবং হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হলো। নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু মেঝেতে বসে পড়লেন। রোমান কুস্তিগীর তার হাত ধরে তাকে দাঁড় করানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করল, কিন্তু পুরো শক্তি ব্যয় করেও সে তাকে নড়াতে পারল না। এবার হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন। রোমান বসে পড়ল। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার হাত ধরে এক ঝটকায় টান দিলেন, ফলে সে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল।

এরপর রোমান দীর্ঘকায় ব্যক্তি এবং হযরত কায়েস বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উচ্চতা পরিমাপ করা হলো। হযরত কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উচ্চতা তার চেয়ে বেশি বের হলো। এভাবে কায়সারের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হয়ে গেল। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১ / ৩৬০, ৩৬১, আলোচনা: কায়েস বিন সাদ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

(৪) শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ

টেকসই শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছিল হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর চতুর্থ বড় লক্ষ্য, যা অর্জনের জন্য প্রজাদের ন্যায়বিচার প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই বিষয়ে এতই সংবেদনশীল ছিলেন যে, তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং কখনও কখনও মান-মর্যাদাকেও উপেক্ষা করে ন্যায়বিচারের দাবিগুলো পূরণ করতেন।

মদিনা মুনাওয়ারায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কিছু জমি ছিল। এর ওপর হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ভাতিজা হযরত আবদুর রহমান নিজের অধিকারের দাবি করেন। এই সিলসিলায় তিনি দামেস্কে গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে দেখা করেন। তিনি তাঁর দাবি শুনে অত্যন্ত উদারতার সাথে বললেন: “এই বিষয়ে ফাদালা বিন উবাইদ (রা.) (শহরের কাজী) যা ফয়সালা করবেন, তা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।” ফাদালা (রা.) উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে হযরত আবদুর রহমানের পক্ষে ফয়সালা দেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তা সানন্দে গ্রহণ করেন এবং নিজের জমি থেকে সরে দাঁড়ান। [১]

মদিনা তাইয়েবার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকাম হযরত সুহাইব রুমি (রা.)-এর ছেলের বেতন এই জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে, তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি মারওয়ানকে লিখলেন: “তুমি সুহাইব (রা.)-এর ছেলের সাথে হযরত উসমান গনি (রা.)-এর কারণে এমন আচরণ করেছ, কিন্তু মনে রেখো যে তার পিতার সম্পর্ক নবী করীম (সা.)-এর সাথে। সুহাইবের সন্তানের বেতন চালু করো। তাকে সম্মান করো এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করো।” [২]

ন্যায়বিচারের ছায়া প্রতিটি নাগরিকের জন্য ছিল, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। দামেস্কে খ্রিস্টানদের একটি গির্জা মসজিদের সাথে লাগানো ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য সেটি নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু খ্রিস্টানরা তা দিতে অস্বীকার করে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদের ওপর কোনো জোর-জবরদস্তি করেননি এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মসজিদের সম্প্রসারণ করেননি। [৩]

আইন ও ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরামকে, যারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যুহদ ও তাকওয়া এবং হিকমতে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি সত্যবাদিতায়ও অনন্য ছিলেন, বিভিন্ন শহরে কাজী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, দামেস্কে হযরত ফাদালা বিন উবাইদ আনসারি (রা.) কাজীউল কুদাত (প্রধান বিচারপতি) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৪]

[১] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ৫/১৩২, ত. দারুল ফিকর

[২] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ৫/১০৮, ত. দারুল ফিকর

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১২৯, ত. আল হিলাল

[৪] উসদুল গাবাহ: ৩/৩২৬, ত. আল ইলমিয়াহ

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

হযরত যায়েদ বিন সাবিত মদিনা মুনাওয়ারায় এবং হযরত ইমরান বিন হুসাইন বসরায় কাজী নিযুক্ত ছিলেন। কুফায় কাজী ছিলেন হযরত শুরাইহ, যিনি হযরত উমর ফারুক-এর যুগ থেকে এই পদে আসীন ছিলেন। [১]

অফিসারদের জবাবদিহিতা

হযরত উমর ফারুক-এর যুগে গভর্নর ও কাজীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাজের যে নিবিড় তদারকি ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা চালু ছিল, হযরত মুয়াবিয়া তা একইভাবে বহাল রাখেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁর অধীনস্থদের হিসাব নিতেন।

অধিকাংশ কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত নেককার ও মুত্তাকী ছিলেন, তাই তাঁদের মনে আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় লেগেই থাকত। একবার ফিলিস্তিনের একজন অফিসার হযরত আবু রাশিদ আল-আজদী হযরত মুয়াবিয়া-এর দরবারে আসলেন। তিনি তাঁর কাছে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। আবু রাশিদ কেঁদে ফেললেন। হযরত মুয়াবিয়া কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন: “আমার কিয়ামতের জবাবদিহিতার কথা মনে পড়ে গেছে।” [২] এমন ন্যায়পরায়ণ খলিফা এবং এমন খোদাভীরু কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে রাজ্যে কেনই বা ন্যায়বিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলার রাজত্ব থাকবে না।

পুলিশ বিভাগ (শুরতা)

শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হযরত মুয়াবিয়া পুলিশ বিভাগকে (শুরতা), যা হযরত উমর ফারুক-এর যুগে শুরু হয়েছিল, আরও উন্নত করেন। ফলে খোরাসান থেকে মিশর পর্যন্ত চোর-ডাকাত ও বিশৃঙ্খলার কোনো নামনিশানা ছিল না। পুলিশ বাহিনীর তদারকি প্রথমে হযরত ইয়াজিদ বিন হুর, এরপর হযরত কায়েস বিন হামজা এবং তারপর হযরত জুল বিন আমর-এর ওপর ন্যস্ত ছিল। [৩]

বিবেকের স্বাধীনতা

ন্যায়বিচার ও ইনসাফের এই সুফল হিসেবে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। মানুষের ওপর কোনো জোর-জবরদস্তি ছিল না বরং তাদের জন্য এক আনন্দদায়ক ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে প্রত্যেকে নিজের সমস্যা বলতে এবং বিবেকের ডাক অনুযায়ী মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা রাখত।

একবার মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকাম মসজিদে নববীতে উপস্থিতদের জানালেন যে, এবার আপনাদের বেতন ও অনুদানের পরিমাণ কিছুটা কম, তবে হযরত মুয়াবিয়া-এর নির্দেশ হলো যে কোনোভাবেই হোক যেন পূর্ণ পরিশোধ করা হয়। তাই ইয়েমেনের রাজস্ব থেকে এই ঘাটতি পূরণ করা হবে। ইয়েমেনের লোকেরা পরিস্কারভাবে অস্বীকার করল এবং বলল: “ঐ অর্থ ইয়েমেনবাসীদের হক। হযরত মুয়াবিয়া-কে বলুন যেন তিনি আমাদের জিজিয়ার অর্থ থেকে এটি পূর্ণ করে দেন।”

মারওয়ান তাদের এই মতামত মেনে নিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া-কে অবহিত করলেন। তিনি অবশিষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন। [৪]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২২৭, ২২৮

[২] আল-ইসাবাহ, ৪/২৭৯, আবদুর রহমান বিন আবদ-এর অধীনে

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২২৮

[৪] কিতাবুল আমওয়াল লিল-কাসিম বিন সালাম, পৃ. ৩৩০, ত. দারুল ফিকর

৫) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা উন্নত ও আধুনিক রূপ দান

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পঞ্চম বড় লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও আধুনিক রূপ দান করা। তাঁর মেধা ছিল অত্যন্ত উর্বর। তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী উপকারী ও উন্নত সংযোজন এবং নতুনত্ব সৃষ্টি করতেন। এই নতুন ব্যবস্থাপনার একটি বালক লক্ষ্য করুন।

দিওয়ানুল খাতাম: সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের বিভাগ

এর আগে সরকারি চিঠিপত্র ও আদেশনামা খোলা কাগজের আকারে পাঠানো হতো। সেগুলোতে লেখার নিচে খলিফা বা আমিরের মোহর থাকাই যথেষ্ট মনে করা হতো। একবার এমন হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এক লক্ষ দিরহাম বা দিনার গ্রহণের একটি চিরকুট লিখে দিলেন। সে চিরকুটের লেখা পরিবর্তন করে সরকারি দপ্তর থেকে দুই লক্ষ গ্রহণ করে নিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে যখন হিসাব এলো, তখন তিনি তদন্ত করালেন। জানা গেল যে, মূল লেখায় পরিবর্তন করে একের জায়গায় দুই লক্ষ গ্রহণ করা হয়েছে। তখন তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য একটি নতুন কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন, যার অধীনে প্রতিটি সরকারি লেখা বা আদেশনামা মোহরযুক্ত খামে (সিল করে) পাঠানো শুরু হয়। যে দপ্তরে সরকারি আদেশনামাগুলো সিল করা হতো, সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল “দিওয়ানুল খাতাম”। [১]

এই দপ্তরের ইনচার্জ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর হিমযারি।

হিরাসাহ: নিরাপত্তা বিভাগ

এর আগে খলিফাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শত্রুরা এর সুযোগ নিয়ে হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদ করেছিল। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও পাহারাদার না থাকার কারণে হামলায় আহত হয়েছিলেন। খোদ হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপরও প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনায় পুরো মুসলিম বিশ্বের ভিত কঁপে উঠত। তাই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনী (নিরাপত্তা, বডিগার্ড) বিভাগ কায়েম করেন, যার প্রধান হিসেবে হযরত আবু মুখারিক-কে নিযুক্ত করেন। [২] পরবর্তীতে প্রত্যেক খলিফা ও বাদশাহ এই বিভাগকে তাঁদের ব্যবস্থার অংশ করে নেন।

আমির ও নেতার নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। বদর যুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং... [৩]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৫৩, লাহোর মুদ্রণ

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৮

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৩৬৫

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

কিছু কিছু ক্ষেত্রে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেহরক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই ব্যবস্থা সুন্নাহরই অনুরূপ ছিল।

হিজাবা... খলিফার সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের দায়িত্ব

পূর্ববর্তী যুগে যে কেউ যখন সুযোগ পেত খলিফার সাথে দেখা করে নিত। তাদের মধ্যে সাধারণ প্রয়োজনের লোকও থাকত আবার সময় নষ্টকারী লোকও থাকত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সময়ের সুরক্ষা এবং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি নতুন পদ্ধতি তৈরি করেন, যার অধীনে খলিফার সাথে বিশেষ সাক্ষাতের জন্য অনুমতি এবং সময় নেওয়া আবশ্যিক করা হয়। এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ‘হাজিব’ এবং এই ব্যবস্থাকে ‘হিজাবা’ বলা হতো।

[১]

উন্নয়নমূলক ও নির্মাণাধীন কীর্তিসমূহ

হযরত উমর (রা.)-এর মতো হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলেও দেশের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করার জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। নতুন সামরিক ছাউনি স্থাপন করা হয় এবং অনেক নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হয়। সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপকূলীয় শহর রোমানদের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ ‘জাবলা’কে তিনি নতুন করে নির্মাণ করে সেনাবাহিনীর একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত করেন। ‘লাজিকিয়া’, ‘আনতারতুস’ এবং ‘আতরতুস’ শহরগুলোকে নতুন করে আবাদ করেন। [২] তাঁর যুগে ‘মারআশ’-এ একটি দুর্গ নির্মিত হয় যা মজবুত হওয়ার দিক থেকে প্রবাদতুল্য ছিল। [৩] ‘মারকিয়া’ এবং ‘বানিয়াস’ জনপদ আবাদ করাও তাঁরই কীর্তি। [৪] তাঁর অনুমোদনেই আফ্রিকায় ‘কায়রাওয়ান’ নামক সামরিক কেন্দ্রীয় শহরটি আবাদ করা হয়। [৫]

আপনার আগে জাহাজ নির্মাণের কারখানা কেবল মিশরে ছিল। আপনি ৩৯ হিজরিতে সিরিয়ায় নতুন কারখানা স্থাপনের নির্দেশ দেন। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর এবং কাঠমিস্ত্রিদের একত্রিত করা হয় এবং আক্কা ও সুরের উপকূলে জাহাজ নির্মাণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়। [৬]

মিশরে আপনার গভর্নর হযরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ আনসারী (রা.) (যিনি ৫৩ হিজরির জুন মাসে এই পদে অধিষ্ঠিত হন) ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন এবং ফুসতাত ও মিশরকে একটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও সুন্দর অঞ্চলে পরিণত করেন এবং সেখানে মসজিদ ও মুয়াজ্জিনদের আধিক্যের কারণে আজানের ধ্বনি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শোনা যেত।

[৭]

হযরত আতা বিন সায়েব খোরাসানের প্রাচীন শহর বলখের নদীগুলোর ওপর তিনটি সেতু নির্মাণ করেন যা ‘কানাতিরে আতা’ নামে পরিচিত হয়। [৮]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৬৫

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৩৫, ত ত আল-হিলাল; মুজাম্মুল বুলদান: ১/২৮০

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৪৮, ত ত আল-হিলাল

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৩৫, ত ত আল-হিলাল

[৫] মুজাম্মুল বুলদান: ৩/৩২০

[৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১২০, ত ত আল-হিলাল

[৭] মুজাম্মুল বুলদান: ৩/২৬৫

[৮] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৯৭, ত ত আল-হিলাল

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলিম বিশ্বের কিছু শহরে এমন কিছু যোদ্ধা জাতি ও গোষ্ঠী ছিল যারা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তাদের লক্ষ্যভেদ ও যুদ্ধবিদ্যার দক্ষতা থেকে অধিকতর সুবিধা গ্রহণ এবং তাদের আরও ভালোভাবে দেখাশোনার জন্য হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদেরকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত করেন। এই পদক্ষেপের একটি উদ্দেশ্য ছিল ওই জাতিগুলোর কিছু অনিষ্টকারীর ওপর নজর রাখা। এই ধারাবাহিকতায় ‘জত’ (জাট) ও ‘সিয়াবিজাহ’ জাতির অনেক লোককে ‘আন্তাকিয়া’ এবং এর আশপাশের অন্যান্য উপকূলীয় শহরে এনে বসতি স্থাপন করানো হয়। [১]

বালবাক, হিমস ও আন্তাকিয়ায় বসবাসরত পারস্য বংশোদ্ভূত লোকদের জর্ডানের উপকূলে, সুর ও আক্কায় এনে পুনর্বাসিত করা হয়। বসরা ও কুফার অনারব তীরন্দাজদের এবং বালবাক ও হিমসের পারসিকদের আন্তাকিয়া শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু মিশরীয় লোককেও এই উপকূলগুলোতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উপকূলগুলোতে ইউরোপীয় বাহিনীর আক্রমণের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

[২]

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৬২, ত. আল-হিলাল

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১২০, ১৬২, ত. আল-হিলাল

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৬. বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন

বিজয়াভিযান ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের মোকাবিলাও করতে হয়েছিল। এই ফিতনাগুলো দমন করা তাঁর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সকল বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেন।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো তারাই ছিল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাই হিজাজ, শাম, মিসর ও অন্যান্য শহরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। তবে ইরাকের দুটি বড় শহর: কুফা ও বসরা আপাতদৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তখনো বিদ্রোহী দলগুলোর গোপন কর্মীদের আস্তানা ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই দুটি শহরের ওপর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে তিনি মুসলিম বিশ্বের পূর্ব সীমান্ত রক্ষার নিশ্চয়তা মনে করতেন। তাই তিনি সেখানে বিদ্রোহীদের মোটেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেননি। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের খুব বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি যে, প্রথমে কুফা এবং পরে বসরার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো তাদের শক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পূর্ণ তৎপরতার সাথে এই দুটি শহরকে ফিতনার কেন্দ্র হওয়া থেকে রক্ষা করেন, যার বিবরণ নিচে পেশ করা হলো:

কুফায় খারেজীদের বিদ্রোহ

সর্বপ্রথম কুফায় খারেজী গোষ্ঠী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই গোষ্ঠীটি গোপনে সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে শত শত লোক একত্রিত করেছিল। ফলে তাদের বেশ কয়েকজন সর্দার একে একে সরকারি বাহিনীর সাথে লড়াই করতে বের হয়। বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে খারেজীদের নামকরা সর্দার ফারওয়া বিন নওফেল, আবদুল্লাহ বিন আবিল হাওসা এবং হাওসারা বিন ওয়াদা নিহত হয়। কিন্তু এই লোকেরা একজন সর্দার মারা গেলেই অন্যজনকে আমির বানিয়ে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হতো।

তাদের ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা দেখে অবশেষে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুগীরা বিন শুব্বা (রা.)-কে কুফার গভর্নর বানিয়ে পাঠান, যাঁর সাহসিকতা, প্রজ্ঞা ও রাজনীতি সমগ্র আরব স্বীকার করত। হযরত মুগীরা (রা.) অত্যন্ত হিকমত ও কৌশলের সাথে খারেজীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। খারেজীরা শাবিব বিন বাজরা [১], মুয়াইন বিন আবদুল্লাহ, আবু মারিয়াম এবং আবু লায়লার মতো সর্দারদের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে তাদের শক্তি ভেঙে যায় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

[১] নোট: এই শাবিব সেই ব্যক্তি যে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর ঘাতক হামলায় ইবনে মুলজামের সাথে ছিল, সেই সময় সে আত্মগোপন করেছিল কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। (আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/১৩) অবশেষে ৩৯ হিজরিতে মুনির বিন বাশাহ ইয়াশকারীর সাথে মোকাবিলায় কুফার শস্য গুদামের কাছে নিহত হয়। (তারিখ খলিফা পৃ. ২০৯)

দুই বছর পর ৪৩ হিজরিতে খারেজি গোষ্ঠী মুস্তাওরিদ বিন আলকামা নামক এক নেতার নেতৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হয়। মুস্তাওরিদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ১লা শাওয়াল ৪৩ হিজরিতে যখন শহরের মানুষ ঈদের নামাজের জন্য বাইরে যাবে, তখন হঠাৎ আক্রমণ করে শহর দখল করে নেওয়া হবে। কিন্তু হযরত মুগিরা বিন শুবা (রা.) সময়মতো এই সংবাদ পেয়ে যান। তিনি সেই বাড়িতে অভিযান চালান যা ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিল। মুস্তাওরিদ পালিয়ে যায়। তার দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোক ধরা পড়ে। হযরত মুগিরা (রা.) জানতেন যে, কুফাবাসীদের মধ্যে এখনও খারেজি ও সাবায়ি মতবাদের প্রভাব বিদ্যমান এবং তাদেরই কিছু লোকের গোপন সমর্থনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা বেড়ে উঠছে। এ ধরনের লোকেরা শাসকদের কোমলতার সুযোগ নিয়ে অন্যায় ফায়দা হাসিল করে এবং জনগণের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত মুগিরা (রা.)-এর চেষ্টা ছিল রক্তপাত ছাড়াই যেন এই ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা নিবৃত্ত হয়।

হযরত মুগিরা (রা.) কুফার লোকদের একত্রিত করে বললেন:

“হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য শান্তি পছন্দ করি, তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ থেকে বাঁচাতে চাই। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমার আচরণের কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা যেন আরও বিগড়ে না যায়। আমি ভয় পাচ্ছি যে, মুখ্দের সাথে সাথে শরিফ ও ভদ্রলোকরাও যেন আমার পাকড়াওয়ার মধ্যে না চলে আসে। অতএব, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগেই তোমরা তোমাদের মুখ্দের থামাও। আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু লোক মুখ্তা ও মুনাফেকির বীজ বপন করছে। আল্লাহর কসম! এ ধরনের লোক আরবের যে গোত্রেরই থাকুক না কেন, আমি তাদের হত্যা করব এবং তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেব।”

এই হুমকিতে মানুষ ভয় পেয়ে গেল এবং তাদের সরদাররা নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে জামানত দিল যে, তারা কোনো বিদ্রোহের অংশ হবে না। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন সরদাররা তাদের অধীনস্থ লোকদের বিদ্রোহী মানসিকতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করল, তখন খারেজিদের সুবিধা করার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের আমির মুস্তাওরিদ তার বিশেষ সমর্থকদের নিয়ে এলাকা থেকে দূরে চলে গেল।

হযরত মুগিরা বিন শুবা (রা.)-এর জন্য এখন উপযুক্ত সুযোগ ছিল। তিনি মাকিল বিন কায়েস (রা.)-কে তার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত করলেন। বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে বিপুল সংখ্যক খারেজি নিহত হলো। শেষ সংঘর্ষে মুস্তাওরিদ আওয়াজ দিয়ে মাকিল বিন কায়েসকে শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানাল। তিনি উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মুস্তাওরিদ মাকিল (রা.)-কে বর্শা বিদ্ধ করে শহীদ করে দিল, কিন্তু লুটিয়ে পড়ার আগেই মাকিল (রা.) নিজের তলোয়ার মুস্তাওরিদের খুলিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মুস্তাওরিদের মৃত্যুর সাথে সাথেই খারেজিরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং ইরাকের শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার হলো। [১]

সাবায়ি গোষ্ঠীর তৎপরতা

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে খারেজিরা তো পুরোপুরি ব্যর্থ হলো, কারণ তাদের কর্মপদ্ধতি ষড়যন্ত্রমূলক ছিল না বরং ছিল প্রকাশ্য বিপ্লবী। প্রথমে তারা হযরত আলী (রা.)-এর যুগে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং নিহত হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগেও কয়েক দফা যুদ্ধের পর তাদের শক্তি ভেঙে যায়। কিন্তু সাবায়ি গোষ্ঠী, যারা গোপন ষড়যন্ত্রে অভ্যস্ত ছিল, তারা তলে তলে কাজ করে যাচ্ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৫, ১৬৬, ১৭৩, ১৭৯, ১৮১, ২১০।

এই লোকদের গোপন তৎপরতা প্রায় দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে তাদের লক্ষ্য ছিল হযরত মুয়াবিয়া (রা.), তাঁর নায়েবগণ এবং তাঁর বিশেষ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে তাঁদেরকে কলঙ্কিত করা। এটি ছিল ঠিক সেই পদ্ধতি যা হযরত উসমান গনি (রা.)-এর বিরুদ্ধে অবলম্বন করা হয়েছিল। এখানেও কিছু বাস্তব ঘটনাকে বিষাক্ত সংযোজনের মাধ্যমে কলুষিত করা হয়েছিল। কিছু জাল কিছা তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই দলের লোকেরা এই জাল বর্ণনাগুলোকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।

বসরা ও কুফায় জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের নিয়োগ

জিয়াদ তায়েফের সুমাইয়া নামক এক দাসীর পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত আবু সুফিয়ান (রা.), কিন্তু তিনি সুমাইয়াকে গোপনে বিবাহ করেছিলেন, তাই এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল না। যা-ই হোক, জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বৈমাত্রেয় ভাই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল এগারো বছর; তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টি প্রমাণিত নয়, তাই তাঁকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয় না। তিনি মেধা, প্রজ্ঞা, উত্তম ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, বাগ্মিতা, রচনাইশৈলী এবং বীরত্বের ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন। তিনি দাপ্তরিক বিষয়াবলি, লিপিবিদ্যা এবং হিসাববিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। যৌবনকালে তিনি হযরত আবু মুসা আশআরী, হযরত মুগীরা বিন শুবা এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর মতো সাহাবায়ে কেরামের খেদমতে অতিবাহিত করেন এবং তাঁদের কাতিব (সেক্রেটারি) ছিলেন [১]। সাইয়্যিদুনা উমর ফারুক (রা.) তাঁকে বসরার যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেছিলেন, যেখান থেকে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ আফগানিস্তান এবং খোরাসানের সীমান্ত এলাকাগুলো তদারকি করতেন [২]।

সাইয়্যিদুনা আলী (রা.) এবং সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতপার্থক্যের দিনগুলোতে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন এবং তিনি তাঁকে পারস্যের (ফারস) গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। জিয়াদের প্রচেষ্টায় সেখানে বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় [৩]। হযরত হাসান (রা.) যখন খিলাফত হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট হস্তান্তর করেন, তখন জিয়াদ এক বছর পর্যন্ত পারস্যের একটি দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন এবং বায়আত গ্রহণ করেননি। এক বছর দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর জিয়াদ আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট সিরিয়ায় চলে যান [৪]।

জিয়াদের সংস্কার ও কীর্তিসমূহ:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৪৫ হিজরীতে তাঁকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। সে সময় বসরার প্রশাসনিক অবস্থা অত্যন্ত অস্থিতিশীল ছিল; জিয়াদ শাসক হয়ে সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে অনুকরণীয় করে তোলেন। তিনি খোরাসানকে চারটি জেলায় বিভক্ত করে আলাদা আলাদা নায়েব নিযুক্ত করেন [৫]।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৪৯৪, ৪৯৭, ত. আর-রিসালা।

[২] আল-ইসাবা: ২/৫২৮; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিন-নববী: ১/১৯৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/১৩৮, ১৪০।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/১৭৬ থেকে ১৭৮।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/২১৬, ২১৭।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

খণ্ড ২

সে সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে অত্যন্ত দ্রুততর করে তুলল। যেহেতু বসরা খারেজী ও সাবায়ীদের কেন্দ্র ছিল যারা তখনও গোপনে বিদ্যমান ছিল এবং তাদের বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল, তাই যিয়াদ রাতে কারফিউ জারি করলেন যা এশার নামাজের দুই ঘণ্টা পর থেকে ফজর পর্যন্ত বলবৎ থাকত। এই সময়ে মানুষের বাইরে বের হওয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এর ফলে এলাকায় এমন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো যে, যদি কারও কোনো জিনিস রাস্তায় পড়ে থাকত, তবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কেউ তা তুলত না। একজন একাকী নারী রাতে ঘরের দরজায় খিল না লাগিয়েই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত। যিয়াদের বক্তব্য ছিল যে, খোরাसानে যদি কারও একটি দড়িও হারিয়ে যায়, তবে আমি খুঁজে বের করতে পারব যে সেটি কে নিয়েছে।

যিয়াদ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের উচ্চ পদে আসীন করেন। তিনি হযরত ইমরান বিন হসাইন, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত হাকাম বিন আমর, হযরত সামুরা বিন জুনদুব এবং হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। শহরের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চার হাজার পুলিশ নিয়োগ করেন। সরকারি দেহরক্ষী হিসেবে পাঁচশ জন নিযুক্ত করেন। এভাবে বসরায় পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। [১]

৫০ হিজরিতে কুফার গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শু'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করলে হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদকে বসরার পাশাপাশি কুফার গভর্নরও বানিয়ে দেন। এভাবে প্রথমবারের মতো কোনো আমীর এই দুই শহরের শাসনভার একসাথে পেলেন। যিয়াদ একই সাথে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালনা করতেন যে, শীতকাল বসরায় কাটাতেন এবং গ্রীষ্মকাল কুফায়। [২]

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৫/২২২, ২২৩

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৫/২৩৩

তারিখ উম্মাতে মুসলিমা

আমীর মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু সামনে আসে যার কারণে অনেক মানুষ হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আরোপ করে থাকে:

- ১. হুজর বিন আদি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইস্যু
- ২. ইয়াজিদের উত্তরাধিকার (ওয়ালি আহদি)

সাধারণত এই ইস্যুগুলোকে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে দেখা হয়। যদিও ইনসাফের দাবি হলো সমস্ত বর্ণনা এবং সমস্ত দিক সামনে রেখে এই ঘটনাগুলো পড়া এবং যাচাই করা উচিত যাতে এই ঘটনাগুলোর সঠিক চিত্র সামনে আসতে পারে। পরবর্তী লাইনগুলোতে আমরা এই উভয় ইস্যুকে ইনসাফ এবং সতর্কতার সাথে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা [দ্বিতীয় খণ্ড]

(১) হুজর বিন আদি (রা.)-এর ঘটনা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে কঠিন, ধৈর্য-পরীক্ষাকারী এবং স্নায়ুচাপ সৃষ্টিকারী পরীক্ষা কুফার কিছু এমন মুরূবিবদের রক্তপাতের আকারে সামনে এসেছিল যাদের নবীজির (সা.) সাহচর্য লাভের গৌরবও অর্জিত ছিল। তাদের মধ্যে হযরত আমর বিন আল-হামিক (রা.)-ও ছিলেন যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) যৌবন উপভোগ করার দোয়া করেছিলেন, ফলে আশি বছর বয়সেও তিনি যুবকই মনে হতেন। [১] তাদের প্রধান ছিলেন হযরত হুজর বিন আদি (রা.), যিনি ইলম, ফযীলত এবং ইবাদতে বিশিষ্ট ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মহলে তার অসাধারণ সম্মান ছিল। [২] ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর চক্রান্তের শিকার হয়ে এই ব্যক্তিবর্গ কুফায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় কুফার গভর্নর যিয়াদ হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-কে তার কয়েকজন সঙ্গীসহ গ্রেফতার করে কুফা থেকে দামেস্কে পাঠিয়ে দেন। হযরত আমর বিন আল-হামিক (রা.) পালিয়ে গিয়ে মোসেলের পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিলেন, যেখানে সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হয়। হুজর বিন আদি (রা.)-কে গ্রেফতার করে রাজধানী দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশে বিদ্রোহের অভিযোগে তাকে তার সাত সঙ্গীসহ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই ঘটনা ৫১ হিজরীর। সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

যে পর্যন্ত এই দুর্ঘটনার কারণ এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণের সম্পর্ক রয়েছে, এর অধিকাংশ অংশই দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। তাবারীতে “যিকর মাকতাল হুজর বিন আদি ওয়া আসহাবুহু” শিরোনামে ২৫-৩০ পৃষ্ঠার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। যার মধ্যে মাত্র কয়েক লাইন ব্যতীত পুরো ঘটনাটিই আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত। এই বর্ণনাগুলোতে ঘটনাটিকে একপাক্ষিক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে যা পড়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে তীব্র আবেগ সৃষ্টি হয়।

[১] মারিফাতুস সাহাবা: ৩০০৬/৩; আল-ইসাবাহ: ৫১৩/২।

[২] আল-ইসতিয়াব: ৩২৯/১; উসদুল গাবাহ: ৪/১; আল-ইসাবাহ: ১২৯/২। হযরত হুজর বিন আদি সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম তাকে সাহাবী বলেছেন এবং কেউ কেউ তাবেয়ী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেছেন: “ইবনে সা’দ এবং হাকেম মুসআব আল-যুবারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার ভাই হানির সাথে নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন।” তিনি আরও লিখেছেন: “ইমাম বুখারী, ইবনে আবি হাতিম, খলিফা বিন খাইয়াত এবং ইবনে হিব্বান তাকে তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।” (আল-ইসাবাহ: ৩৩২/২, ৩৩৩, তাবারী)। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন: “তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফযীলতপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” (আল-ইসতিয়াব: ৩২৭/৩)। হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন: “তিনি সাহাবী এবং প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪৬৩/৩)। একইভাবে ইবনুল আসীর বলেন: “নিঃসন্দেহে তিনি সাহাবায়ে কেরামের একজন মহান ও ফযীলতপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, যার দোয়া কবুল হতো।” (উসদুল গাবাহ: ৪/১)। তার সম্পর্কে এই বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, তিনি হযরত আলী (রা.) বা হযরত আম্মার (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একটি হাদীসও মারফু হিসেবে তার থেকে বর্ণিত। (আল-ইসাবাহ: ৩৩২/২, বৈরুত)। আফসোস যে কিছু পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিক এই ব্যক্তিদের ফিতনাবাজ, বদমাশ এবং অনিষ্টকারী আখ্যা দিয়েছেন, শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা উমাইয়াদের বিরোধী ছিলেন। আমরা হাফেজ যাহাবীর বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি যিনি হুজর বিন আদির নামের সাথে (রা.) লিখেছেন, যদিও তাবেয়ী হওয়ার বক্তব্যও নিজস্ব গুরুত্ব রাখে। যাই হোক, এই মতভেদ নির্বিশেষে তিনি একজন সাহাবী বা তাবেয়ী হোন না কেন, সর্বাবস্থায় তিনি একজন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার চরিত্র হনন করা অনেক বড় বাড়াবাড়ি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

এই বর্ণনাগুলো বলে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হুজর বিন আদি (রা.)-কে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং জুলুমের সাথে হত্যা করিয়েছিলেন। হযরত হুজর (রা.)-এর অপরাধ কেবল এই ছিল যে, তিনি মিশরে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নরদের হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করতে দেখতে পারতেন না। একইভাবে যখন যিয়াদ খুতবা দীর্ঘ করে সালাতে দেরি করত, তখন হযরত হুজর (রা.) এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এই কাজগুলোর কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে তার সাথীদেরসহ হত্যা করেন, যা ছিল এক চরম জুলুম। এটি আবু ইসহাকের বর্ণনাগুলোর সারসংক্ষেপ। তবে ইনসাফের কথা হলো এই যে, হুজর বিন আদি (রা.)-এর মর্যাদা ও অবস্থানের স্বীকৃতির পাশাপাশি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অবস্থানকেও বুঝতে হবে। হযরত হুজর বিন আদি (রা.) সম্পর্কে আমরা এই সুধারণাই পোষণ করি যে, তিনি নিজের দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কেও আমরা এটি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না যে, তিনি শরয়ী এবং জাতীয় দায়িত্ব মনে করে হযরত হুজর (রা.) এবং তার সাথীদের শাস্তি দিয়েছিলেন। দুর্বল বর্ণনাগুলো এই ঘটনার শুরু এবং এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নরদের হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর প্রতি গালিগালাজের ফলে এই ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল। সহীহ এবং হাসান বর্ণনাগুলো একে অস্বীকার করে। আসল পরিস্থিতি কী ছিল? আসুন! লভ্য ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে সেগুলোর একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করি।

১. ঘটনার প্রেক্ষাপট

কুফায় সরকার বিরোধী গোষ্ঠীর কর্মীরা অনুসারী সেজে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-কে দীর্ঘকাল ধরে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছিল। এটি স্বাভাবিক যে, কোনো বিশেষ মতাদর্শের বলয়ে থাকা এবং একতরফা কথা শোনা ব্যক্তিদের পক্ষে প্রকৃত সত্য এবং সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। হযরত হুজর (রা.) এমন একজন বুজুর্গ ছিলেন যিনি হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি অতিরঞ্জিত ভালোবাসা পোষণকারী গোষ্ঠী “হায়জানে আলী”-র প্রভাবে চলে আসছিলেন। এই গোষ্ঠী বনু হাশিমের পরিবর্তে বনু উমাইয়ার ক্ষমতা সহ্য করতে পারত না। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেছেন:

“হযরত হুজরের চারপাশে শিয়ানে আলীর অনেকগুলো দল লেগে ছিল, এই লোকেরা তাকে শক্তি যোগাচ্ছিল এবং তার মাধ্যমে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছিল, এই লোকেরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে গালিগালাজ করত এবং তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত।” [১] এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত হুজর (রা.) অবচেতনভাবে অন্যদের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছিলেন।

২. সন্ধির প্রতি অসন্তুষ্টি

এই গোষ্ঠীর উস্কানির কারণে হযরত হুজর (রা.) শুরু থেকেই হযরত হাসান (রা.)-এর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধির...

[১] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ১১/২৩০

...থেকে বিরক্ত ছিলেন। হযরত হাসান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের ওপর হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপ:

“রাসূলুল্লাহর পুত্র! আফসোস, আমি যদি এটি দেখার আগে মারা যেতাম। আপনি আমাদের ন্যায়বিচার থেকে বের করে জুলুমের মধ্যে নিয়ে আসলেন।”

হযরত হাসান (রা.)-এর কাছে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর এই কথাটি অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন:

“আমি দেখেছি যে অধিকাংশ মানুষ সন্ধি করতে ইচ্ছুক এবং যুদ্ধ থেকে বিমুখ। আমি তাদের অপছন্দনীয় কোনো জিনিসের ওপর প্ররোচিত করা ভালো মনে করি না।”

হুজর বিন আদি (রা.) এখান থেকে হতাশ হয়ে হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং কুফায় নিজের সমর্থকদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সামরিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.)-ও তাদের চিন্তাধারার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

“আমরা (হযরত মুয়াবিয়ার কাছে) বায়াত গ্রহণ করেছি। অঙ্গীকার ও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, তা ভঙ্গ করার কোনো অবকাশ নেই।” [১]

মোদাকথা, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করতে রাজি হননি। এ কারণে এই দলের লোকেরা এই মহান ব্যক্তিদের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে কিছু মুখরা লোক হযরত হাসান (রা.)-কে “ইয়া মুজিল্লাহুল মুমিনীন!” (হে মুমিনদের লাঞ্ছিতকারী!) পর্যন্ত বলে সম্বোধন করেছিল। [২]

৩. হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে পত্রালাপ

হযরত হাসান (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই দলের কিছু করার সাহস হয়নি, কিন্তু ৪৯ বা ৫০ হিজরিতে তিনি যখনই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, ষড়যন্ত্রকারী দলটি “হবেব আলী” (আলীর ভালোবাসা)-এর নামে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল। হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর মতো কয়েকজন বুজুর্গকে তারা আবারও ব্যবহার করতে শুরু করল। এই বুজুর্গরা তাদের সরল স্বভাব, অসাধারণ ইখলাস এবং প্রত্যেকের প্রতি সুধারণার কারণে এই দলের লোকদের সাদাতদের আশেক এবং মুজাহিদ মনে করতেন। ফলে হযরত হুজর (রা.)-এর এক সঙ্গী জাদা বিন হুবায়রা মাখজুমি হযরত হুসাইন (রা.)-কে (যিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ছিলেন) কুফা থেকে চিঠি লিখে বললেন:

“আমাদের পুরো দলের দৃষ্টি আপনার ওপর নিবদ্ধ। তারা আপনার সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। আপনার ভাই হাসান (রা.) যুদ্ধ এড়ানোর জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন, এই লোকেরা সে সম্পর্কে অবগত এবং তারা এও জানে যে আপনি আপনার বন্ধুদের জন্য নরম এবং শত্রুদের জন্য কঠোর এবং আল্লাহর কাজে আপসহীন। আপনি যদি এই জিনিসটি (খিলাফত) চান তবে আমাদের কাছে চলে আসুন।”

হযরত হুসাইন (রা.) জবাবে তাদের কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, এই আবেগপ্রবণ চিন্তাধারাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন এবং বললেন:

“আমার ভাই যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, আমার মতে আল্লাহই তাকে এর তাওফিক দান করেছিলেন এবং তিনি তার পদক্ষেপে সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন।”

[১] আল-আখবারুত তিওয়াল, আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি, পৃ. ২২০

[২] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ২২১

হজরত হুসাইন (রা.) আরও লিখেছেন:

“যতদিন আমি বেঁচে আছি, আল্লাহ হজরত মুয়াবিয়াকে কোনো কষ্টে লিপ্ত হতে দেবেন না।” [১]

ফিতনাবাজ লোকদের বলয়ের প্রভাব

এরপর তো হজরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি সেই ফিতনাবাজ লোকদের বলয় থেকে বের হতে পারেননি যাদের উদ্দেশ্যই ছিল অনিষ্ট সৃষ্টি করা। হাফেজ ইবনে কাসির (রহ.)-এর মতে, এই লোকেরা হজরত উসমান (রা.)-কে গালিগালাজ করত, তাঁকে জালেম সাব্যস্ত করত, শাসক ও আমিরদের ওপর আপত্তি তুলত, যেকোনো উসিলায় তাঁদের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকত, এসব বিষয়ে কঠোরতা ও অতিরঞ্জন করত, বিশৃঙ্খলাকে সমর্থন করত এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করত। [২]

যেন এটি মুসলমানদের সেই সরলমনা দল ছিল যারা মূলত সাবায়ীদের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল। হজরত হুজর এবং হজরত আমর বিন হামিক (রা.) সুধারণা ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। এই বুজুর্গদের ইখলাস, ইলম এবং লিঙ্কাহিয়াতের ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁদের কর্মকাণ্ড উম্মতের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক ছিল। এই কারণেই উম্মতের অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ী এবং খোদ হাসনাইন কারিমাইন (রা.), তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানবোধ থাকা সত্ত্বেও এসব কর্মকাণ্ডে তাঁদের সমর্থন করতে পারেননি।

প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা

অবশেষে সেই সময় এল যখন এই লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা করল। কুফার গভর্নর হজরত মুগিরা বিন শুবা (রা.) জুমার নামাজের খুতবায় নিয়ম অনুযায়ী হজরত উসমান (রা.)-এর জন্য রহমতের দোয়া এবং তাঁর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন, এমন সময় হজরত হুজর বিন আদি (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হজরত মুগিরা (রা.)-এর বিরুদ্ধে এমন জোরালো স্লোগান দিলেন যে আওয়াজ মসজিদের বাইরে পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হলো। এরপর তিনি হজরত মুগিরা (রা.)-কে বলতে লাগলেন:

“হে ব্যক্তি! বার্ষিক্যের কারণে তোমার এই বোধটুকুও নেই যে তুমি কার ভালোবাসায় মরে যাচ্ছ। আমাদের ভাতা চালু করার নির্দেশ দাও যা তুমি বন্ধ করে রেখেছ, অথচ তোমার এর কোনো অধিকার নেই। তোমার আগে কেউ আমাদের ভাতার লোভ করেনি। তোমার আমিরুল মুমিনি (হজরত আলী রা.)-এর সমালোচনা করার এবং অপরাধীদের (বনু উমাইয়া) প্রশংসা করার বড় নেশা হয়েছে।”

হজরত মুগিরা (রা.) তাঁদের এই কটু কথা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে শুনলেন এবং চুপচাপ বাড়ি চলে গেলেন। সঙ্গীরা জেদ ধরলেন যে তাঁদের অবশ্যই সতর্ক করা উচিত, কিন্তু হজরত মুগিরা (রা.) অত্যন্ত সহনশীল মেজাজের মানুষ ছিলেন। তিনি বললেন:

“আমি ভুলকারীর ভুল ক্ষমা করে দিই।” [৩]

কুফায় জিয়াদের নিয়োগ এবং হজরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর সাথে আচরণ

৫০ হিজরিতে হজরত মুগিরা বিন শুবা (রা.) ইন্তেকাল করলে হজরত মুয়াবিয়া (রা.) বসরার শাসক জিয়াদকে...

[১] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ২২১, ২২২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩৯

[৩] তারিখুত তাবারি: ৫/২৫৩, ২৫৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (সপ্তম খণ্ড)

আবি সুফিয়ানকে প্রশাসনিক বিষয়ে অসাধারণ যোগ্যতা দেখে কুফার গভর্নরও বানিয়ে দেওয়া হলো। [১] এই সময়ে কুফায় হযরত হুজর ইবনে আদি (রা.)-এর চারপাশে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর এক বিশাল সংখ্যক লোক একত্রিত হয়েছিল, তারা তাকে তাদের “শেখ” মনে করত এবং তাকে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে বলত: “আপনি এই কথার সবচেয়ে বেশি যোগ্য যে তারা শাসকদের সমালোচনা করবেন।” [২]

জিয়াদের সাথে হযরত হুজর ইবনে আদি (রা.)-এর পুরনো সম্পর্ক ছিল, কারণ অতীতে তারা উভয়েই হযরত আলী (রা.)-এর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জিয়াদ হযরত হুজর (রা.)-এর ঝোঁক এবং তার চারপাশে সমবেত হওয়া লোকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। তার কুফায় নিয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও এটাই ছিল যে তিনি যেন হযরত হুজরকে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখেন, অন্যথায় পূর্ব সীমান্তগুলোর এই গুরুত্বপূর্ণ শহরে আবারও ফিতনা ও ফাসাদের কেন্দ্র হয়ে যাওয়া নিশ্চিত ছিল।

জিয়াদ শুরুতে হযরত হুজর (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদায় কোনো কমতি রাখেননি এবং তাকে নিজের কাছে টেনে নেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করেন। জিয়াদ বলতেন: “আপনি আমার সাথে এই সিংহাসনে বসুন, আপনার সমস্ত প্রয়োজনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।” [৩]

কিন্তু হযরত হুজর ইবনে আদি (রা.)-এর আচরণ সরকারের প্রতি যথারীতি আক্রমণাত্মকই ছিল।

কুফায় জিয়াদের প্রথম ভাষণ এবং হযরত হুজর (রা.)-এর অসন্তুষ্টির মূল কারণ:

জিয়াদ তার প্রাথমিক ভাষণে কুফাবাসীদের শান্তিপ্রিয়তা এবং আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন:

“আমরা তোমাদের পরীক্ষা করেছি এবং আমাদেরও পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমরা শাসিতও হয়েছি এবং শাসনও করেছি। আমরা দেখেছি যে পরবর্তী লোকদের অবস্থা সেই নীতির ভিত্তিতেই সংশোধন হতে পারে যার মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা সঠিক ছিল। অর্থাৎ এমন আনুগত্য যার প্রকাশ্য ও গোপন সমান হয়, অনুপস্থিত ও উপস্থিত একই রকম হয়, অন্তর ও জিহ্বা এক হয়। আমরা দেখেছি যে মানুষের সংশোধনের জন্য এমন কোমলতা থাকা উচিত যাতে দুর্বলতার সন্দেহ না হয় এবং এমন কঠোরতা হওয়া উচিত যাতে জুলুম না হয়। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে দায়িত্বশীল হব তা যেভাবেই হোক পূরণ করে ছাড়ব।”

এরপর জিয়াদ উমাইয়া শাসকদের দস্তুর অনুযায়ী হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের কথা উল্লেখ করে তাঁদের প্রশংসা করেন, তাঁদের হত্যাকারীদের অভিশাপ দেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন। এতে হযরত হুজর ইবনে আদি (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিবাদ করলেন। [৪]

আসলে হযরত হুজর (রা.)-এর বিশ্বাস ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী মনে করেন এবং উমাইয়া আর্মিররা যখনই উসমানের হত্যাকারীদের অভিশাপ দেন, তখন তাদের উদ্দেশ্য হয় হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা। স্পষ্টতই হযরত আলী (রা.)-এর একজন আশেক ও একনিষ্ঠ অনুসারী উসমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়ার পর এমনটাই বিশ্বাস করতেন।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১০

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৮, বৈরুত; তারিখ দিমাশক: ১২/২১৭, জীবনী: হুজর ইবনে আদি

[৩] তারিখ দিমাশক: ১২/২১৫-২১৬, জীবনী: হুজর ইবনে আদি

[৪] তারিখ তাবারী: ৫/২৫৫-২৫৬, আবু মিখনাফ থেকে; তারিখ দিমাশক: ১২/২১৭, জীবনী: হুজর ইবনে আদি

সহ্য করতে পারতেন না। যেহেতু হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি হযরত মুগীরা (রা.)-এর খুতবায়ও উসমানের হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতেন এবং অন্যদের সাথেও তাঁর এই আচরণ বজায় ছিল।

৮. জিয়াদের পক্ষ থেকে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা ও বুঝানো:

জিয়াদ হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর এই ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করলেন এবং তাঁকে আলাদাভাবে ডেকে বললেন: “হে আবু আবদুর রহমান! আপনি জানেন হযরত আলীর প্রতি আমার কতটুকু ভালোবাসা রয়েছে। আমি আপনাকে সতর্ক করছি যে, আপনি যেন অপ্রীতিকর কোনো কাজ না করেন।” [১] কিন্তু হযরত হুজর (রা.)-এর ভুল ধারণা দূর হলো না; অবশেষে জিয়াদ পুনরায় চেষ্টা করলেন এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় হুমকিও দিলেন। তিনি বললেন: “একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি এবং আপনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে কেমন (অনুগত ও উৎসর্গকারী হয়ে) ছিলাম, তা আমারও জানা আছে এবং আপনারও জানা আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। আমি আপনার মেজাজের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে অবগত। আপনি নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং নিজের ঘরে শান্তিতে বসে থাকুন। এই মূর্খদের সাথে মিশবেন না, পাছে তারা আপনাকে নিজেদের নেতা বানিয়ে না ফেলে। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আমার হাতে আপনার রক্তের এক ফোঁটাও যেন না পড়ে।” হযরত হুজর (রা.) বললেন: “আমি বুঝতে পেরেছি।” কিন্তু যখন তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন এবং ফিতনাবাজ গোষ্ঠী তাঁর সাথে দেখা করে তাঁর ও জিয়ারের মধ্যকার কথোপকথন শুনল, তখন তারা পুনরায় তাঁকে জিয়ারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল এবং বলল: “সে আপনার সাথে কোনো কল্যাণকামিতা করেনি।” ফলে জিয়ারের কথা শোনা এবং ভয় দেখানো বৃথা হয়ে গেল। [২]

৯. জিয়াদের বসরা গমন এবং কুফার পরিস্থিতির পরিবর্তন:

জিয়াদের নিয়ম ছিল ছয় মাস কুফায় এবং ছয় মাস বসরায় অতিবাহিত করা। যখন বসরা যাওয়ার সময় এল, তখন তাঁর সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর পেছনে হযরত হুজর বিন আদি (রা.) কোনো বিদ্রোহের কারণ হয়ে না দাঁড়ান। বাস্তবতা ছিল এই যে, যদি হযরত হুজর (রা.) শান্ত থাকতেন, তবে অন্য লোকদের পক্ষ থেকে তেমন কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল না; কারণ প্রকৃত ফিতনাবাজ লোক ছিল অল্পই, কিন্তু হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর প্রভাব ছিল অনেক বেশি। তাঁদের মধ্যে হযরত আমর বিন আল-হামিক (রা.)-এর মতো সাহাবীগণ এবং হযরত রিফায়া বিন শাদদাদের মতো উচ্চমর্যাদার তাবয়ীগণ এবং হাজার হাজার বিশুদ্ধ আকিদার একনিষ্ঠ মুসলিম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা সবাই ইলম, ফযীলত এবং যুহদ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশিষ্ট ছিলেন। যদি হযরত হুজর (রা.) কোনো পদক্ষেপ নিতেন, তবে আশঙ্কা ছিল যে অনেক লোক কিছু না ভেবেই তাঁর অনুসরণ করবে এবং এভাবে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে হযরত উসমান গনী (রা.)-এর শাহাদাত কিংবা জঙ্গ জামাল ও সিফফিনের মতো কোনো দুর্ঘটনা পুনরায় ঘটতে পারত। তাই জিয়াদ বসরা যাওয়ার সময় হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর সাথে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করলেন যেন তিনি তাঁর সাথে বসরা চলে যান। জিয়াদ বললেন: “আমার পক্ষ থেকে আপনার সাথে যে সদ্ব্যবহার করা হয়েছে তা আপনি দেখেছেন। আমি চাই আপনি আমার সাথে বসরা চলুন। আপনাকে পেছনে রেখে যাওয়া আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না, কারণ হতে পারে সেখানে আপনার সম্পর্কে আমার কাছে এমন কোনো কথা পৌঁছাবে...”

[১] তারিখ দামেশক: ১২/২১৩

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৮, ত. সাদির

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

...যা অপ্রীতিকর হয়। আপনি সাথে থাকলে এমন কোনো কথা আমার মনে আসতে পারে না। হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.) সম্পর্কে আপনার অনুভূতি সম্পর্কে আমি অবগত এবং আমারও ঠিক একই আবেগ ও অনুভূতি ছিল, কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে আল্লাহ পরিস্থিতির লাগাম হযরত মুয়াবিয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন, তখন আমি আল্লাহ তাআলাকে কোনো দোষ দিতে পারি না, বরং আমি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের বিষয়টি যে পরিণতির দিকে পৌঁছেছে আমি তাও দেখেছি (অর্থাৎ হযরত হাসান (রা.) ক্ষমতা হযরত মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করেছেন)। আল্লাহর দোহাই! আপনি এমন সব বিষয়ের দায়িত্ব নেবেন না যাতে সামান্যতম জড়িত হওয়াও ধ্বংসের কারণ হয়।“ (অর্থাৎ সরকারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এবং বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা করা প্রায়ই প্রাণ হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়)।

হযরত হুজর বিন আদি (রা.) অসুস্থতার অভ্যুত্থানে দেখিয়ে জিয়াদের সাথে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। [১]

জিয়াদ কুফায় উমর বিন হুরাইত (রা.)-কে নায়েব (প্রতিনিধি) বানিয়ে নিজে বসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পেছনে তাই হলো যার আশঙ্কা ছিল। শিয়ানে আলীর দলবদ্ধতা বাড়তে লাগল। হযরত হুজর (রা.) জামে মসজিদে আসতেন তখন এই লোকেরা প্রকাশ্যে তাঁর সাথে থাকত। [২]

হযরত উমর বিন হুরাইত (রা.) এই অবস্থা দেখে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর কাছে বার্তা পাঠালেন:

“আবু আবদুর রহমান! আমি যতটুকু জানি আপনি নিজের ব্যাপারে আমার (জিয়াদ)-কে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তাহলে আপনার সাথে এই দল কিসের?” হযরত হুজর (রা.) বার্তাবাহককে ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। [৩]

এখন কুফার কিছু স্বাক্ষরীও এই কর্মকাণ্ডে शामिल হয়ে গেলেন। এভাবে বিদ্রোহীদের শক্তি এতটাই বেড়ে গেল যে কুফার রাষ্ট্রীয় শক্তি অসহায় হয়ে পড়ল। নায়েব হাকেম হযরত উমর বিন হুরাইত (রা.)-এর কোনো নির্দেশ কার্যকর হতে পারছিল না। [৪]

হযরত হুজর (রা.)-এর প্রতিবাদ এবং জিয়াদের জরুরি ভিত্তিতে কুফায় প্রত্যাবর্তন

একদিন খুতবা চলাকালীন হযরত হুজর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা হযরত উমর বিন হুরাইত (রা.)-কে বাধা দিলেন এবং পাথর ছুড়ে মারলেন। [৫] অবশেষে হযরত উমর বিন হুরাইত (রা.) অতিষ্ঠ হয়ে জিয়াদের কাছে জরুরি বার্তা পাঠালেন:

“হযরত হুজর এবং তাঁর সঙ্গীরা আমাকে অসহায় করে দিয়েছেন। এখন আপনি যা ভালো মনে করেন তা-ই করুন।”

এও লিখলেন: “যদি আপনার কুফার প্রয়োজন থাকে, তবে যা করার দ্রুত করুন।”

এই বার্তা পাওয়া মাত্রই জিয়াদ দ্রুত কুফায় চলে এলেন। [৬] জিয়াদের আগমনে হযরত হুজর বিন আদি (রা.) তিন হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে বের হলেন এবং মসজিদে অবস্থান নিলেন। জিয়াদ মসজিদে খুতবা দিতে চাইলেন, কেবল এতটুকুই বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই আমরা মুমিনীন...”

[১] তারিখ দামেশক: ১২/২১৬ - বুগইয়াতুত তালাব: ৫/২১১৪, ২১১৫, এবং হাকেম আল-মুস্তাদরাক-এ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫৯৮।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৮, তবা সাদির - তারিখ দামেশক: ১২/২১৭, বুগইয়াতুত তালাব: ৫/২১১৫।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৮, তবা সাদির - তারিখ দামেশক লি ইবনে আসাকির: ১২/২১৮, বুগইয়াতুত তালাব: ৫/২২৪৬।

[৪] তারিখ দামেশক: ১২/২১৬, বুগইয়াতুত তালাব: ৫/২১২০।

[৫] তারিখ দামেশক: ১২/২১৯।

[৬] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৮, তবা সাদির - তারিখ দামেশক: ১২/২১৮, ২১৯।

“...এর হক।” যে হযরত হুজর বিন আদি (রা.) “মিথ্যা মিথ্যা” বলে চিৎকার করে কথা খামিয়ে দিলেন। তারপর কক্ষর ছুঁড়ে মারলেন। জিয়াদ মিস্বর থেকে নেমে সালাত আদায় করল এবং বাড়ি চলে গেল। [১]

আলোচনার শেষ চেষ্টা:

পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েছিল। স্ফুলিঙ্গ যেকোনো সময় শিখায় পরিণত হতে পারত। জিয়াদ আরও একবার আলোচনার চেষ্টা করল এবং তিনজন সাহাবী: হযরত আদি বিন হাতিম তাঈ, হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী এবং হযরত খালিদ বিন উরফাতাহ (রা.)-কে কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর কাছে পাঠাল যাতে তারা তাকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দলের নেতৃত্ব দেওয়া এবং আমীরদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা থেকে বিরত থাকতে রাজি করাতে পারেন। কিন্তু যখন এই ব্যক্তিবর্গ হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর কাছে পৌঁছালেন এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন হযরত হুজর বিন আদি (রা.) তাদের কথা শোনার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। অবশেষে এই ব্যক্তিবর্গ ফিরে আসলেন এবং জিয়াদকে ঘটনা শোনালেন, সাথে সাথে জিয়াদকে এই বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শনের উপদেশ দিলেন। কিন্তু জিয়াদ ছিল একজন কঠোর এবং অনমনীয় প্রকৃতির প্রশাসক এবং এই ধরনের বিষয়ে চোখ বন্ধ করে রাখার পক্ষপাতী সে মোটেও ছিল না। সে বলল:

“যদি এখনও আমি তাদের সাথে নমনীয়তা করি, তবে আমি আবু সুফিয়ানের ছেলে নই।” [২]

হুজর বিন আদি (রা.)-এর গ্রেপ্তারের কার্যক্রম:

জিয়াদ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আগে কুফার জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলল: “হামদ ও সালাতের পর! মনে রেখো! জুলুম ও বিদ্রোহের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এই লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে অহংকারী হয়ে গেছে। তারা আমাকে নিজের ব্যাপারে শান্তিকামী পেয়ে বেপরোয়া হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা সোজা না হও, তবে আমি রোগের চিকিৎসা সেই রোগের ওষুধ (অর্থাৎ যেমন রোগ তেমন চিকিৎসা) দিয়েই করব।” [৩]

জিয়াদের আদেশে পুলিশ অফিসার শাদাদ হিলালী সিপাহী হুসাইন বিন আব্দুল্লাহকে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর কাছে পাঠাল যাতে তাকে কাসরে ইমারতে আনা হয়। হযরত হুজর বিন আদি (রা.) আসতে অস্বীকার করলেন। শাদাদ হিলালী এবার গ্রেপ্তারের জন্য সৈন্য পাঠাল কিন্তু হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর সঙ্গীরা তাদের ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল। [৪]

এদিকে জিয়াদ কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একত্রিত করল এবং একটি হুমকিমূলক ভাষণ দিয়ে তাদের আদেশ দিল যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে হুজর বিন আদি (রা.) থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে। এই কৌশল কার্যকর হচ্ছিল এবং কুফার গণ্যমান্যদের বোঝানোর ফলে অধিকাংশ লোক হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর সঙ্গ ছেড়ে দিল। এখন পুলিশ হুজর বিন আদি (রা.)-কে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করল। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলো। বেশ কয়েকজন লোক আহত হলো। পুলিশ হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-কে গ্রেপ্তার না...

[১] তারিখ দামেশক: ২১৩/১২, তরজমা: হুজর বিন আদি

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৬, ২১৯/৩, ত. সাদির

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ২৫৬/৫

[৪] তারিখ আত-তাবারী: ২৫৭/৫, তাবাকাত ইবনে সাদ: ২১৯/৬, ত. সাদির

করতে পারেনি, তবে তাদের সমর্থক জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এই সময়ে হযরত হুজর বিন আদি (রা.) পালিয়ে গিয়ে নিজের গোত্র কিনদাহর মহল্লায় আত্মগোপন করেছিলেন। জিয়াদ পুলিশের ব্যর্থতার পর স্থানীয় গোত্রগুলোর সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করে এবং তাকে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর পেছনে কিনদাহতে পাঠায়। সেখানে আরও একটি সংঘর্ষ হয় কিন্তু হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর চারপাশে সমবেত হওয়া কুফাবাসীদের মজ্জায় বিশ্বাসঘাতকতা মিশে ছিল। তারা শীঘ্রই তাকে ধোঁকা দিল। যে অবশিষ্ট ঘনিষ্ঠ সাথীরা তার সাথে ছিলেন, হযরত হুজর বিন আদি (রা.) তাদেরকে বিপদে ফেলা সমীচীন মনে করেননি এবং নিজেই তাদের সরিয়ে দিলেন। [১]

হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর গ্রেপ্তার এবং অভিযোগনামার নথি প্রস্তুতকরণ:

অবশেষে একদিন জিয়াদ আকস্মিকভাবে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর আশ্রয়স্থলের সন্ধান পেয়ে গেল। সে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে সেখান থেকে নিজের কাছে উপস্থিত হতে বলল। হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর জিয়াদের কঠোর মেজাজ সম্পর্কে ধারণা ছিল, তিনি জানতেন যে জিয়াদ তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ছাড়বে না। তাই মানুষের পরামর্শে তিনি হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-কে সুপারিশকারী হিসেবে পাঠালেন, যিনি জিয়াদের সামনে এই শর্ত রাখলেন যে, সে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-কে হত্যা করবে না বরং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই বিষয়ে ফয়সালা করবেন। জিয়াদ এর নিশ্চয়তা দিল এবং হযরত হুজর বিন আদি (রা.) নিজেকে সরকারের হাতে সোপর্দ করলেন। [২]

হযরত হুজর বিন আদি (রা.) সম্ভবত নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি শান্তিপূর্ণভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিজেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং জিয়াদকে বললেন: “আমি হযরত মুয়াবিয়ার বায়াতের ওপর অটল আছি। আমি তা থেকে বিচ্যুত হইনি।” [৩]

জিয়াদ প্রথমে খিলাফত দরবারে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণের প্রমাণ পেশ করা জরুরি মনে করল। সে কুফার সত্তর জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে হুজর বিন আদি (রা.) এবং তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করাল। এই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আমর বিন হুরাইস, হযরত খালিদ বিন আবি উরফাতাহ, হযরত ওয়াইল বিন হুজর এবং হযরত কাসীর বিন শিহাব (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এখন জিয়াদ সাক্ষীদের এবং তারপর হযরত হুজর বিন আদি (রা.) ও তার সাথীদের হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে রাজধানী দামেস্কে পাঠিয়ে দিল। এও লিখে দিল যে, এই লোকদের আপনার সাথে কথা বলা পর্যন্ত প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। [৪]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মামলা নিয়ে চিন্তাভাবনা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে অভিযোগনামার ওপর সাক্ষ্যসমূহের নথি পড়ে শোনানো হলো। সেই সাথে সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দি দিল। [৫] হুজর বিন আদি (রা.) এবং তার সঙ্গীদের দামেস্কের শহরতলীর উপত্যকা ‘মারজ আজরা’-তে রাখা হলো। এই এলাকাটি হযরত উমর (রা.)-এর যুগে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-ই জয় করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আসামিদের সাথে দেখা করতে এলে হুজর বিন আদি (রা.) ডেকে বললেন: “হে আমিরুল মুমিনীন!” [৬]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/২৫৭ থেকে ২৬২

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৫/২৬৮, ২৬৯; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৫১, ২১১

[৪] তারিখ দিমাশক: ১২/২১৬, জীবনী: হুজর বিন আদি

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৯, টীকা

[৬] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৯, টীকা

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বলে সালাম করলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রুক্ষ স্বরে বললেন: “আমি কি এখনো (তোমার নিকট) আমিরুল মুমিনিন?” হযরত হুজর ইবনে আদি (রা.) বায়াতের ওপর অটল থাকার কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সন্তুষ্ট হলেন না। [১]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল এবং ক্ষমা করারও। শাস্তি সংক্রান্ত এই হাদিসে নববী বিদ্যমান ছিল:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرِقَ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّهُ مَنْ كَانَ

(যে এই উম্মতকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, অথচ উম্মত ঐক্যবদ্ধ আছে, তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করো, সে যেই হোক না কেন।) [২]

অন্যদিকে হযরত হুজর (রা.)-এর মর্যাদা ও অবস্থান, তাঁর ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে আন্দোলনে শরিক হওয়া এবং এখন নিজের বায়াতের ওপর অটল থাকার স্বীকৃতি তাঁকে সন্দেহের সুবিধা দিয়ে ক্ষমার যোগ্য করে তুলছিল। তাঁর ঝোঁকও ছিল যে হযরত হুজর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হোক, তবে তাঁর এই আশঙ্কাও ছিল যে দুষ্কৃতকারীরা পুনরায় তাঁকে অভিভাবক বানিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে। ফলে তিনি জিয়াদের কাছে এই পত্র পাঠালেন: “হুজর এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য এবং সাক্ষীদের কথা বিবেচনা করার পর কখনো আমার মনে হয় যে তাদের হত্যা করাই উত্তম, আবার কখনো ভাবি যে ক্ষমা করে দেওয়াই ভালো।” [৩]

এর সাথে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও পরামর্শের জন্য একত্রিত করলেন। হযরত আমর ইবনুল আসওয়াদ, হযরত আবু মুসলিম খাওলানি, ইয়াজিদ ইবনে আসাদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের রায় ছিল যে, তাদের শাস্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত, তবে ক্ষমা করে দিলে ভালো হবে। [৪] এই চারজন ছাড়া বাকি সবাই জোর দিলেন যে আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। [৫]

ইতিমধ্যে জিয়াদের উত্তরও চলে এল। সেও শাস্তি দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছিল এবং লিখেছিল:

“আমি অবাক হচ্ছি যে এই বিষয়ে আপনার কেন দ্বিধা হচ্ছে। যদি আপনার এই শহরের (কুফা) প্রয়োজন থাকে, তবে হুজর এবং তাঁর সঙ্গীদের আমার কাছে ফেরত পাঠাবেন না।” [৬]

৫. মৃত্যুদণ্ড কার্যকর:

তকদিরের লিখন যে, পরিশেষে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার বিপরীতে এই রায়ই মেনে নিলেন যে হযরত হুজর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করে দিলেন। এই লোকেরা মারজ আজরা নামক স্থানে বন্দি এবং নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন। সেখানেই তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। [৭] হত্যার আগে হযরত হুজর (রা.)-এর শেষ আমল ছিল দুই রাকাত সালাত। [৮]

সালাত শেষ করে তিনি বললেন: “আমার বেড়ি খুলবে না, গোসলও দেবে না। রক্ত ও শিকলসহ দাফন করে দিও,”

[১] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৯৮১; বুগইয়াতুত তালাব: ৫/২১১৬... কিছু বর্ণনায় আছে যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আসামিদের দেখেনওনি এবং বলেছিলেন: “আমি তাদের দেখতে পছন্দ করি না” (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৯), কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা তাদের সাথে আসামিদের সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণ করে।

[২] সহিহ মুসলিম, হা: ৪৯০২, কিতাবুল ইমারা, হকমু মান ফাররাকা আমরাল মুসলিমিন।

[৩] তারিখুত তাবারি: ৫/২৭২।

[৪] তারিখু দামেশক: ১২/৩০৩, হাসান সনদে।

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২১৯, সাদির।

[৬] তারিখু দামেশক: ২/২৩০, ২৩৩; বুগইয়াতুত তালাব: ৫/২১১, হাসান সনদে।

[৭] তারিখুত তাবারি: ৫/২৭৩-২৭৪।

[৮] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৯৮১।

“কাল মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে এই অবস্থায় মিলিত হব।” এরপর তাকে হত্যা করা হয়। [১]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সুপারিশনামা:

হযরত হুজর (রা.)-এর গ্রেফতারির খবরে ইরাক থেকে হিজাজ পর্যন্ত এক শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর গ্রেফতারির খবর শুনেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন হারিসকে দামেস্কে পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে সুপারিশ করে তাঁর সাথীদেরসহ প্রাণভিক্ষা করিয়ে আনেন।

আব্দুর রহমান বিন হারিস উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর পত্র নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পৌঁছালে জল্লাদরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য বধ্যভূমির দিকে চলে গিয়েছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর পত্র পড়ামাত্রই একজন দ্রুতগামী দূতকে পাঠান যাতে সবার প্রাণভিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু যখন দূত সেখানে পৌঁছাল, হযরত হুজর বিন আদি (রা.) সহ সাতজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়ে গিয়েছিল। বাকি ছয়জনের ওপর তখনো দণ্ড কার্যকর হয়নি, তাই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। [২]

সহীহ রেওয়ায়েত এবং সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যযীফ রেওয়ায়েতসমূহের আলোকে হযরত হুজর (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কে এটিই একটি বাস্তবসম্মত চিত্র। এটি দেখে যে কেউ বুঝতে পারে যে, জাল রেওয়ায়েতসমূহে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে এই বিষয়ে কলঙ্কিত করার জন্য কী কী বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

আবু মিখনাফের অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহ:

আবু মিখনাফ এবং হিশাম কালবীর রেওয়ায়েতসমূহে বলা হয়েছে যে, বেঁচে যাওয়া ছয়জন ব্যক্তিকে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুপারিশের ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আর যারা নিহত হয়েছে তাদের কোনো সুপারিশকারী ছিল না। এই রেওয়ায়েতসমূহে ইহাও আছে যে, জল্লাদরা প্রত্যেককে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর গালিগালাজ করার নির্দেশ দিচ্ছিল কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, যে গালিগালাজ করবে তাকে ছেড়ে দাও। এটিও শুধুমাত্র আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত। একইভাবে কিছু ব্যক্তিকে তওবা না করার কারণে কুফায় পাঠিয়ে জীবন্ত কবর দেওয়ার রেওয়ায়েতও আবু মিখনাফের মনগড়া কাহিনীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [৩]

হযরত হুজর (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে সাহাবী ও তাবয়ীগণের প্রতিক্রিয়া:

হযরত হুজর (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) প্রায়ই তাঁর কথা জিজ্ঞেস করতেন। যখন হত্যার খবর পেলেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর হেঁচকি উঠে গিয়েছিল। [৪] খোরাসানে ইসলামী সেনাপতি হযরত রবী বিন যিয়াদ হারিসী যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি এতটাই ব্যথিত হলেন যে, লোকদের একত্রিত করে নিজের মৃত্যুর জন্য দুআ করলেন। মজলিস থেকে...

[১] তাবারী ৩/২৩৭; ইবনে সা'দ ৬/২২০। হুজর বিন আদি (রা.)-এর এই উক্তি ছাড়াও মারফু হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন: “وهكذا نقل عن حجر بن عدي” (মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/৫০২)। মুহাম্মদ বিন সিরীন (রহ.)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, শহীদকে কি গোসল দেওয়া হবে? তখন তিনি হুজর বিন আদি (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন: “لا تطلقوا عني حديداً وتغسلوا عني دماً، ادفنوني في ثيابي فأني والتقي ودي” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩২৮০৫, আল-মুসান্নাফ)।

[২] তাবাকাত ইবনে সা'দ ৬/২২০, ২১৯।

[৩] এই অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহ তাবারী ৫/২৭৫ ও ২৭৭ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

[৪] তারীখে দামেস্ক ১২/২১০; তারীখুল ইসলাম লিজ জাহাবী ৩/১৯৪, লিল ইমরী।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

...উঠতে না পারতেই দেহ থেকে প্রাণ উড়ে গেল। [১] হুজর বিন আদি (রা.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর বোনও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও অশ্রুসিক্ত কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যা আরবি সাহিত্যে অত্যন্ত সাবলীল ও অলঙ্কারপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তার মধ্যে কয়েকটি হলো:

হে উজ্জ্বল চাঁদ! তুমি উদিত হও এবং আরও উপরে ওঠো... যাতে তুমি হুজরকে চলতে দেখতে পাও।

সে মুয়াবিয়া বিন হারব (আবু সুফিয়ান বিন হারব)-এর কাছে যাচ্ছে... যাতে সে তাকে হত্যা করতে পারে, যেমনটি আমীর (জিয়াদ)-এর দাবি।

হুজরের জন্য সমস্ত শহর মরুভূমি হয়ে গেছে... যেন সেগুলোতে কখনও বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ জীবন দান করেনি।

শোনো হে হুজর! হে বনী আদির হুজর... তোমাকে (আখেরাতে) শান্তি ও আনন্দ নসিব হোক।

অতঃপর তুমি যদি ধ্বংস হয়ে যাও তবে তাতে কী হয়েছে, কারণ প্রতিটি জাতির সরদারকেই... দুনিয়া থেকে বিদায়ের পথে যেতে হয়। [২]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দুঃখ ও অনুশোচনা:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজেও শীঘ্রই অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর কঠোর মেজাজের উপদেষ্টাদের ব্যক্তিগত মতামতই তাঁর ওপর প্রবল হয়ে গিয়েছিল, অন্যথায় উত্তম হতো যদি হযরত হুজর (রা.)-কে ক্ষমা করে দেওয়া হতো অথবা বড়জোর বন্দি করে রাখা হতো।

যখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর দূত আব্দুর রহমান বিন হারিস তাঁকে বললেন:

“আপনি হুজর বিন আদি ও তাঁর সঙ্গীদের কেন জেলে নিক্ষেপ করলেন না অথবা কেন প্লেগ (বা অন্য কোনো রোগের) শিকার হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না?” তখন হযরত

মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “কারণ আমার লোকদের মধ্যে তোমার মতো কেউ ছিল না।” [৩]

একইভাবে যখন বনী উমাইয়ার শুলত মারওয়ান বিন হাকাম এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে লিখলেন:

“আপনার চিন্তা ও ধৈর্য কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল যার প্রত্যাশা করা হচ্ছিল?”

তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জবাবে লিখলেন: “কারণ তারা আমার কাছে ছিল না।” [৪]

[১] তারিখ আল-তবারী: ২১০/৩... হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী সাহেব এই ঘটনাগুলোর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: “হুজর বিন আদির মর্যাদা ও খ্যাতি ছিল অনেক এবং সত্য কথা হলো, যারা পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত নয় তাদের কাছে এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক মনে হবে। কিন্তু আফসোস, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কীভাবে দলিল পেশ করা যেতে পারে যার সামনে চল্লিশটি সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছিল এবং তারা সবাই এই বিষয়ে একমত ছিল যে হুজর বিন আদি বিদ্রোহ করেছেন।” (হযরত মুয়াবিয়া রা. এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা, পৃষ্ঠা ৯৩)

[২] বুগইয়াতুত তালাব: ২১২৩/৫; তাবাকাত ইবনে সাদ: ২২০/৬।

[৩] আল-ইসতিআব: ৩২৯/১; তাহযীবুল কামাল: ৪৭/১, ৪৩২/৩১।

[৪] তারিখ দিমাশক: ২৩০/১২।

কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি এটাও ভাবতেন যে, হযরত হুজর (রা.)-কে ক্ষমা করে দিলে পাছে রক্তপাতের এক নতুন ধারা শুরু না হয়ে যায়। এজন্য তিনি এটাও বলতেন: ‘এক লক্ষ মানুষের হত্যার চেয়ে তার নিহত হওয়া উত্তম ছিল।’ [১]

বনী উমাইয়া নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামি মিল্লাতকে একটি নতুন গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচানোর জন্যই এই তিক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, অন্যথায় হযরত হুজর (রা.)-এর সাথে তাদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না এবং তার মর্যাদা ও অবস্থানও তাদের কাছে গোপন ছিল না। সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.) প্রায়ই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করতেন। এটি ছিল দায়িত্ব ও সম্পর্কের এক কঠিন পরীক্ষা এবং হৃদয় ও আত্মার এক গভীর আঘাত। [২]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর অসন্তুষ্টি এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওজরখাহি:

এই ঘটনার পর (৫৬ হিজরিতে) যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হজের জন্য গেলেন এবং মদিনা মুনাওয়ারায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন উম্মুল মুমিনীন (রা.) তার এই পদক্ষেপের ওপর তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আরজ করলেন: ‘হে মা! একজন মানুষকে হত্যা করে বাকি মানুষদের বাঁচিয়ে নেওয়া আমার কাছে তাকে ছেড়ে দিয়ে সবাইকে ধ্বংস করার চেয়ে উত্তম মনে হয়েছে। হে মা! আমার ভয় ছিল যে বিষয়টি যেন বেড়ে না যায় এবং এমন কোনো ফিতনা যেন মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে যাতে রক্তপাত হয় এবং হালাল-হারামের সীমারেখা মুছে যায়। আপনি হযরত হুজর এবং আমার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন।’

উম্মুল মুমিনীন (রা.) বললেন: ‘আল্লাহর কসম! আমি আপনার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলাম।’ [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩৯

[২] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৫৯৮০ বর্ণনাকারী বলেন: আমরা যখনই তার (অর্থাৎ জারীরের সাথে মুয়াবিয়ার) কাছে যেতাম, তখনই হুজর বিন আদির হত্যাকাণ্ডের আলোচনা হতো।

[৩] তারিখু দামেশক: ১২/২২৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩২ হাসান সনদে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই কথোপকথন থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, কখনো কখনো শাসককে এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় যেখানে তিনি নিজের ও আল্লাহর মাঝে কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়ে যান এবং তার সেই বাধ্যবাধকতাগুলো আদালতের প্রমাণের গণ্ডিতে আসতে পারে না। যদি আদালতের দিক থেকে হিসাব করে তার কাজের বিচার করা হয় তবে তা ভুল প্রমাণিত হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে এই পদক্ষেপ না নিলে দেশের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে, তবে এমন অবস্থায় যেখানে তাকে বিবেকের আদালতে নির্দোষ হতে হবে, তেমনি আল্লাহর কাছেও তার নির্দোষ হওয়ার আশা করা যেতে পারে, যদিও মানুষের কাছে তা আপত্তিকর থেকে যায়।

সম্ভবত হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এজন্যই হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সাথে কোনো ফিকহি বিতর্কে জড়াননি এবং নিজের কাজের শরয়ি দলিল পেশ করেননি, বরং নিজের সেই অনুভূতি ও ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। যদিও উম্মুল মুমিনীন এবং সাধারণ মুসলিমদের দৃষ্টিতে এই আশঙ্কাগুলো খুব বেশি গুরুত্ব না-ও রাখতে পারে, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেগুলোকে জরুরি মনে করেছিলেন। এজন্যই তিনি এই বলে আলোচনার ইতি টেনেছিলেন যে: ‘আপনি হযরত হুজর এবং আমার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন।’

এটিই ছিল সেই পয়েন্ট যেটির সাথে উম্মুল মুমিনীনও একমত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমি আপনার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলাম। অর্থাৎ ফয়সালা যাই হোক, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পদক্ষেপের সাথে তার যতই দ্বিমত থাকুক না কেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে ছাড় দিয়েছেন। আব্বাসীয় শাসক মামুনুর রশীদের নিম্নোক্ত উক্তিটি এমন পরিস্থিতির ওপর একটি চমৎকার মন্তব্য:

‘শাসকগণ কখনো কখনো তাদের বিশেষ সদস্যদের সাথে যা করেন, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষ কখনোই ন্যায়সঙ্গত মতামত গ্রহণ করতে পারে না। তারা দেখে যে আবেগ বা রাজকীয় পদের প্রতি আনুগত্য এতটাই প্রকাশ পেয়েছে যে তার ভাৱে শাসকের ঘাড়ও মুক্ত হতে পারে না। ফলে তারা দ্বিধাহীনভাবে এই মত পোষণ করে যে, শাসক যা কিছু করেছেন তা কেবল হিংসা বা মন্দের কারণে করেছেন। তারা জানে না যে ওই সদস্যদের কিছু কর্মকাণ্ড ছিল নিজেদের পিঠ ভেঙে ফেলার নামান্তর। এখন শাসক এই বাধ্যবাধকতায় আটকা পড়ে যান: না তিনি এই রহস্যগুলো জনগণের কাছে প্রকাশ করতে পারেন, না তিনি সেই উজির বা নায়েবে সালতানাতকে ক্ষমা করতে পারেন। বাধ্য হয়ে তাকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা বাহ্যত করা উচিত নয়। শাসক জানেন যে এখন সাধারণ মানুষও তাকে নির্দোষ ভাববে না। কিন্তু প্রয়োজনের সময় কারো সমালোচনার পরোয়া করা হয় না।’ (আল-বায়ান ওয়া তাবয়ীন লিল জাহিজ: ৩/২৩২)

মগর এর অর্থ যেন কখনোই এমন না নেওয়া হয় যে, আজকাল বিভিন্ন দেশের মুসলিম শাসক ও কর্মকর্তারা যেভাবে সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে বিরোধীদের বিচারবহির্ভূত আটক, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন, তাও সঠিক এবং ইসলামি শরিয়ত এর সুযোগ দিচ্ছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে তো আমরা এজন্য সুধারণা পোষণ করি যে তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। আজকালকার কোন শাসক মুজতাহিদ? যদি কেউ তেমনটি করা জরুরি মনে করেন, তবে তাকে অন্তত শরিয়ত ও আইনের বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ অবশ্যই করা উচিত।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যুশয্যায় আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ তাঁর সেবা করতে এলেন। তাঁর পিতা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে হুজর বিন আদি (রা.) সম্পর্কে ক্ষমা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই কথা স্মরণ করে বললেন: “আল্লাহ তোমার পিতার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি হুজর বিন আদির ব্যাপারে আমাকে হিতাকাঙ্ক্ষীমূলক পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাঁর হত্যা থেকে আমাকে নিষেধ করেছিলেন।” [১]

হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর মর্যাদা এবং তাঁর হত্যার বেদনাদায়ক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উলামায়ে কেরাম তাঁকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছেন। বিশেষ করে এই কারণে যে, তিনি একটি ব্যাখ্যার (তাওয়িল) ভিত্তিতে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নিজের সত্যের ওপর অটল ছিলেন। পরে তিনি তাঁর বাইয়াত নবায়ন করেছিলেন অথবা নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন। তাই তাঁর চরিত্রের উচ্চমর্যাদায় কোনো আঁচ আসতে পারে না। তাঁর নিহত হওয়া একটি বড় ট্র্যাজেডি ছিল, সম্ভবত এটি তাঁর ভুলত্রুটির ক্ষমা এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব লিখেছেন:

“যেহেতু হযরত হুজর বিন আদি একজন ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর থেকে এমনটি আশা করা যায় না যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে যা কিছু করেছেন তা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। তাই প্রবল ধারণা এটাই যে, তাঁর বিদ্রোহ কোনো ব্যাখ্যার (তাওয়িল) ভিত্তিতেই ছিল। সুতরাং তাঁর আলোচনা অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে হওয়া উচিত। সম্ভবত এই কারণেই শামসুল আইন্মাহ সারাখসি (রহ.)-এর মতো কিছু ফকিহ তাঁর মৃত্যুর জন্য ‘শাহাদাত’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।” [২]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সাথে যে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা ছিল মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করার জন্য। সুতরাং এই বিষয়টিকে ভিত্তি করে সমালোচনা ও নিন্দা করা সঠিক নয়। সেই যুগের আকাবিরগণও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কেউ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন পরিচালনা করেননি। কারণ তাঁরা ফয়সালার ভুল এবং জুলুম ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। আল্লাহ তাআলা হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) এবং হযরত হুজর বিন আদি (রা.) উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন। আমীন।

[১] তারিখ দিমাশক: ১২/২৩১; তাজিলুল মানফায়াহ লি-ইবনে হাজার: ২/৩৬৮, দারুল বাশায়ির।

[২] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আগর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা ২২৬, ২২৭।

২ ইয়াজিদের ওলী-অহদী

প্রত্যেক দূরদর্শী শাসকের মতো হযরত মুয়াবিয়াও চেয়েছিলেন যে দেশ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে শক্তিশালী ও সুসংহত হোক। এজন্য তিনি ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন আনা জরুরি মনে করতেন যার ফলে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা শেষ হয়ে যায়। এই কারণেই তিনি আরবদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করেছিলেন এবং নিজের গোত্রীয় শক্তির ওপর বেশি আস্থা রেখেছিলেন, যার ফলে অনিবার্যভাবে বনু উমাইয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেহেতু সাধারণত ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়টি গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াত, তাই হযরত মুয়াবিয়ার আশঙ্কা ছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর যেন আবার কোনো সংকট তৈরি না হয়। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরকে এমন ঝামেলা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন যা মতের বৈপরীত্য এবং কেন্দ্রবিমুখতার কারণ হয়। তিনি অন্যান্য সালতানাতের চালচলন ও রীতিনীতির মধ্য থেকে কিছু বিষয় প্রয়োজনের তাগিদে গ্রহণ করারও প্রবক্তা ছিলেন এবং এর শরয়ী অবকাশও ছিল। [১]

এই পরিস্থিতিতে নিজের শাসনের ষোড়শ বর্ষে (৫৬ হিজরিতে) হযরত মুয়াবিয়া একটি অসাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং নিজের পুত্র ইয়াজিদকে নিজের উত্তরসূরি মনোনীত করেন। যদিও সাহাবায়ে কেরামের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে একজন নিম্নতর ব্যক্তিকে উত্তরসূরি বানানো অদ্ভুত ছিল, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া দেখছিলেন যে তাঁর শাসনের অধিকাংশ নির্ভরতা বনু উমাইয়া এবং সিরিয়াবাসীদের শক্তির ওপর। সুতরাং যদি পরিবারের বাইরের কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী বানানো হতো, তবে এই লোকেরা গোত্রীয় গোঁড়ামির কারণে তা সহ্য করত না এবং উম্মাহ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ত। [২]

[১] আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেন:

“যখন হযরত উমর ফারুক সিরিয়া সফরে হযরত মুয়াবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে রাজকীয় শান-শওকত ও জাঁকজমকের সাথে দেখলেন, তখন বললেন: ‘হে মুয়াবিয়া! এই কিসরাভী চালচলন কেন?’ হযরত মুয়াবিয়া বললেন: ‘আমীরুল মুমিনীন! আমরা শত্রুদের সীমান্তে রয়েছি। তাদের মোকাবিলায় আমাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং শান-শওকত প্রকাশ করার প্রয়োজন পড়ে।’ হযরত উমর ফারুক নীরব হয়ে গেলেন এবং তাঁর প্রতিবাদ করলেন না: কারণ হযরত মুয়াবিয়া একটি সঠিক বিষয় এবং একটি দ্বীনি উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নিজের কাজের দলিল দিয়েছিলেন। যদি রাজতন্ত্রের মন্দ হওয়ার অর্থ একে নিরঙ্কুশভাবে বর্জন করা হতো, তবে এই উত্তর হযরত উমর ফারুককে সন্তুষ্ট করত না, বরং তিনি তাঁকে এই সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। হযরত উমর ফারুকের ‘কিসরাভী চালচলন’ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল শাসনের সেই ধরন যার পারস্য শাসকরা অভ্যস্ত ছিল, যা অধার্মিকতা, জুলুম, অবাধ্যতা, অধিকার হরণ এবং আল্লাহর প্রতি গাফিলতির ওপর ভিত্তি করে ছিল। হযরত মুয়াবিয়া উত্তরে যা জানালেন তা হলো উদ্দেশ্য কিসরাভী পদ্ধতি নয় বরং উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি।”

(তারিখ ইবনে খালদুন: ১/ ৪৫৩, মুকাদ্দিমা, ফাসল ২৮ বাব ফি ইনকিলাবিল খিলাফতি ইলাল মুলক)

[২] পরবর্তী পরিস্থিতি এই আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণ করেছে, ফলে পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের যখন খলিফা হলেন তখন অবশিষ্ট সমস্ত মুসলিম উম্মাহ তাঁর বায়াত গ্রহণ করে নিয়েছিল কিন্তু উমাইয়া আমীরগণ তাঁর বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে গেল। তারা আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের সাহাবিয়াত, ইলম ও ফজল এবং জুহদ ও তাকওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের শাসন মেনে নেওয়ার ওপর জেদ বজায় রাখল এবং নয় বছরের দীর্ঘ রক্তপাতের পর আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরকে শহীদ করে ছাড়ল এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হলো।

খিলাফতে বনু উমাইয়া

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

জমহুর উলামাদের অভিমত হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই পদক্ষেপের দুটি দিক ছিল:

একটি হলো নিজের পরে উত্তরসূরি নিযুক্ত করা যাতে উম্মত ঐক্যবদ্ধ ও একমত থাকে। এটি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

দ্বিতীয় দিকটি ছিল নিজের ছেলেকে উত্তরসূরি বানানো। এই দ্বিতীয় দিকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল; প্রশাসনিক মতামত এবং রাজনৈতিক কৌশলের বিচারে এই সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়নি। তবে তিনি তাঁর এই কাজে সদিচ্ছা সম্পন্ন, একনিষ্ঠ এবং উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন। তাঁর কাছে অবশ্যই এমন কিছু দলিল ছিল যার ভিত্তিতে তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং তাঁর এই সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, শরয়ি বৈধতার সীমার মধ্যেই ছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দৃষ্টিতে পরবর্তী খলিফা সিরিয়াবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল, অন্যথায় কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো এবং পুরো মুসলিম বিশ্ব প্রভাবিত হতো। তাই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ইখতিয়ার নিজের কাছে রাখেন এবং তাঁর সঙ্গীদের পরামর্শে নিজের ছেলে ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। যদিও এভাবে বিষয়টি রাজতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক শাসনের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মনে করতেন যে, যদি আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে, তবে বংশানুক্রমিক শাসনের সুযোগ রয়েছে। কারণ এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান নেই; বরং ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা হিসেবে পাঠিয়েছেন’ [১] এবং ‘সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন’ [২]-এর মতো কুরআনি দলিল থেকে মূলত রাজতন্ত্র ও বংশানুক্রমিক শাসনের অবকাশ প্রমাণিত হয়।

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের কারণগুলোর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন:

“যে বিষয়টি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে অন্যদের পরিবর্তে ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী বানাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা ছিল উম্মতের ঐক্য ও সংহতির কল্যাণ। বনু উমাইয়ার নীতিনির্ধারকগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন। সেই সময় তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কারো ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা কুরাইশদের সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিলেন এবং মিল্লাতের অধিকাংশ মানুষ তাদের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে অগ্রাধিকার দেন এবং উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তমকে বেছে নেন; এটি কেবল ঐক্য ও মতৈক্যের জন্যই করেছিলেন যার শরীয়তে অনেক গুরুত্ব রয়েছে।” [৩]

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেছেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অভিমত ছিল যে, ইয়াজিদ খিলাফতের যোগ্য। ছেলের প্রতি পিতার তীব্র স্বাভাবিক ভালোবাসার পাশাপাশি ইয়াজিদের পার্থিব আভিজাত্য, তার মধ্যে অশ্বারোহীদের মতো গুণাবলি, সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান, সরকারি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্যতা এবং এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার সক্ষমতার কারণে তাঁর এই অভিমত তৈরি হয়েছিল... এবং তাঁর ধারণা ছিল যে, সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের মধ্যে কেউ এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারবে না।” [৪]

[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। (সূরা আল-বাকার, আয়াত: ২৪৭)

[২] সুলাইমান (আ.) দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী হলেন। (সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৬)

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ১ / ২৬৩ পৃষ্ঠা

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১ / ৩০৮, দার হিজর

ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার কারণসমূহ:

সম্ভবত শুরুতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মনে ইয়াজিদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোনো চিন্তা ছিল না। একবার ইরাকের গভর্নর জিয়াদ কোনো এক কাজে হযরত কাবিছা বিন জাবিরকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে দামেস্কে পাঠান। কথোপকথনের সময় তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার পরে খিলাফতের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন?”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “বিষয়টি মুসলমানদের জামাতের মধ্যে রাখা হবে, তারা কুরাইশের মহৎপ্রাণ ব্যক্তি সাঈদ বিন আল-আসকে বেছে নেবে, অথবা লজ্জা, পরহেজগারি ও দানশীলতায় কুরাইশ যুবক আবদুল্লাহ বিন আমিরকে, অথবা মহৎ নেতা হাসান বিন আলীকে, অথবা কুরআনের কারী, দ্বীনি আলেম এবং শরীয়তের সীমার কঠোর অনুসারী মারওয়ান বিন আল-হাকামকে, অথবা মুর্তওয়াতসম্পন্ন আবদুল্লাহ বিন উমরকে, অথবা বুদ্ধিমান ও চতুর মানুষ আবদুল্লাহ বিন আল-জুবায়েরকে।” [১]

এই ঘটনাটি হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর জীবদ্দশার (অর্থাৎ ৪৯ হিজরি বা তার আগের)। এতে বোঝা যায় যে, সেই সময় পর্যন্ত হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মনেও খিলাফতের নেতৃত্ব শুরু বা পরামর্শের মাধ্যমে নির্ধারণ করা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা ছিল না এবং তাঁর দৃষ্টিতে খিলাফতের হকদার অন্য ব্যক্তিরাই ছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মনে ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের চিন্তা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরে এসেছিল, যা তিনি চিন্তাভাবনার পর বাস্তবায়ন করেছিলেন। সম্ভবত এই চিন্তাভাবনার সময়কাল ছিল ৪৯ হিজরি থেকে ৫২ হিজরি পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে হযরত হাসান (রা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন; তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবিদাররা নীতির বিপরীতে বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কুফায় বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং ৫১ হিজরিতে হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর মতো বুজুর্গের মূল্যবান প্রাণ এর বলি হয়। সম্ভবত এই পরিস্থিতির কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতের বিষয়টি মুসলমানদের শুরার ওপর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আর আশ্বস্ত থাকতে পারেননি।

এই সময়ে ৫০ হিজরিতে ইয়াজিদ কনস্টান্টিনোপল অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং ৫১ হিজরিতে হজ্জের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যার ফলে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) আশ্বস্ত হন যে ছেলের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে। এই দিকগুলো সামনে রেখে তিনি ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ বিষয়ে কিছু আমীরের সাথে পরামর্শও করেন।

[১] তারিখ ইবনে আবি জুরআ আদ-দিমাশকি (মৃত্যু ২৮১ হি.): ১/৫৯২, আবদুল্লাহ বিন মুবারক থেকে সহীহ সনদে। এর বর্ণনাকারীরা বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী, কেবল আহমদ বিন শুরবাহ ব্যতীত এবং তিনিও নির্ভরযোগ্য। হাফেজ ইবনে কাসীর এটি আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩২০-এ উদ্ধৃত করেছেন।

নোট: এটি প্রসিদ্ধ যে ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের চিন্তা ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে ছিল এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর প্ররোচনায় ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু এই কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কারণ হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর মৃত্যু ৫০ হিজরিতে হয়েছিল এবং ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়টি ৫৬ হিজরিতে শুরু হয়েছিল। ইহাও বলা হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছলচাতুরি এবং জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে ইয়াজিদের পক্ষে জনমত গঠন করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর মতো বড়দের ভয়ভীতি দেখিয়েছেন, প্রলোভনও দিয়েছেন, তাঁদের মাথার ওপর তলোয়ার হাতে জল্লাদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি বিরোধিতা করেন তবে মাথা কেটে ফেলা হবে... তারপর জনসভায় গিয়ে মিথ্যা ঘোষণা করে দিলেন যে এই ব্যক্তির বায়াত গ্রহণ করেছেন।

এই ধরনের বর্ণনাগুলো অত্যন্ত ঘষীফ (দুর্বল), যা মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। এই অংশের শেষে আমরা “অধ্যায়” “মুয়াবিয়া আমল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের উত্তর”-এর অধীনে এই বর্ণনাগুলোর বাস্তবতা বর্ণনা করব। তাছাড়া হযরত মুফতি তকী উসমানী সাহেব মদাজিল্লুল আলীর মূল্যবান গ্রন্থ “হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা” অধ্যয়ন করা উচিত যাতে এই ধরনের আপত্তিগুলোর অত্যন্ত চমৎকার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী:

“যখন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের জন্য বায়আত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি যিয়াদকে চিঠি লিখে পরামর্শ চাইলেন। যিয়াদ উবাইদ বিন কাবকে ডেকে এই ঘটনা শোনালেন এবং বললেন: ‘আমীরুল মুমিনীন এই বিষয়ে জনগণের বিরোধিতার আশঙ্কা করছেন এবং তিনি তাদের সমর্থন চান ও আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। এটি ইসলামের বিষয় এবং বড় দায়িত্বের ব্যাপার। ইয়াজিদের মধ্যে কিছুটা উদাসীনতা রয়েছে এবং সে শিকারের প্রতিও খুব আসক্ত। তুমি আমীরুল মুমিনীনের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে ইয়াজিদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করো এবং বলো যে, তিনি যেন এই বিষয়ে তাড়াহড়ো না করেন।’ উবাইদ বললেন: ‘আমীরুল মুমিনীনকে তার ছেলের প্রতি বিমুখ করা সমীচীন নয়, আমি ইয়াজিদের সাথে গিয়ে দেখা করছি, তাকে বলব যে আমীরুল মুমিনীন তাকে উত্তরাধিকারী (ওয়ালি আহদ) বানানোর পরামর্শ করছেন। সে যেন এসব কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেয় যাতে মানুষ সমালোচনা ও বিরোধিতার সুযোগ না পায়।’ যিয়াদ এই মতকে সমর্থন করলেন এবং উবাইদকে ইয়াজিদের কাছে পাঠালেন। উবাইদের বোঝানোর ফলে ইয়াজিদ তার অনেক অভ্যাস ত্যাগ করল।” [১]

ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আপত্তি:

ইসলামী বিশ্বের রাজনীতিতে মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের একমত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষভাবে ইরাকের গভর্নর যিয়াদকে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠান যাতে সে মদীনার অধিবাসীদের আশ্বস্ত করতে পারে। যিয়াদ বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে একমত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন: “হে বনু উমাইয়া! তোমরা আমাদের তিনটি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণ করো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অথবা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সুন্নাতকে গ্রহণ করো। এই বিষয়টি তাদের সবার সামনেই এসেছিল। তাদের প্রত্যেকের পরিবারেই এই পদের যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তারা বিষয়টি মুসলমানদের জামাতের ওপর সোপর্দ করেছিলেন। তোমরা কায়সারী (রাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থা আনতে চাচ্ছ যে, যখন একজন কায়সার মারা যাবে তখন অন্যজন চাপিয়ে দেওয়া হবে।” [২]

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুকাল পর এই একই কাজ মারওয়ানকে অর্পণ করেন, যাকে ৫৪ হিজরীতে দ্বিতীয়বারের মতো মদীনার গভর্নর করা হয়েছিল। মারওয়ান ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বললেন: “এটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সুন্নাতে রাশিদাহ।” আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় আপত্তি করলেন [৩] এবং বললেন: “এটি কায়সার ও হেরাক্লিয়াসের পদ্ধতি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকেও বাদ দিয়ে বনু আদীর এক ব্যক্তিকে (হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) শুধুমাত্র এই দেখে নির্বাচন করেছিলেন যে, তিনি এই কাজের যোগ্য।” [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩০৩

[২] আত-তারিখুল কাবীর লি-ইবনে আবি খাইসামা বিস-সাফারিস সালিস: ২/৭১, হা: ৮৪৭ আন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আল-জুমাহী, রিজালুহু সিকাত... যিয়াদ মদীনা আসার ঘটনা ৫৩ হিজরীর আগের; কারণ ৫৩ হিজরীতে যিয়াদের মৃত্যু হয়েছিল। (তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২১৯)

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪৮২৭ কিতাবুত তাফসীর, বাবু ল্লাযী ক্বলা লি-ওয়ালিদাইহি উফফিন লাকুমা... কুরআন থেকে প্রমাণিত যে এটি ৫৩ হিজরীর ঘটনা।

[৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হা: ৩০৫৬৭; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী: ৬/৩৫৮, হা: ১১৩২৭ বি-সানাদিন মুরসাল আন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আল-জুমাহী (মৃ: ১২০ হি.); তাফসীর ইবনে আবি হাতিম: ১৩/২২৩ আন ইসমাইল বিন আবি খালিদ।

ইয়াজিদের বায়আত থেকে মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কহীনতা:

আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রা.) ছাড়াও আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং হুসাইন বিন আলী (রা.) ইয়াজিদের উত্তরাধিকার (উলি আহদি) থেকে অনীহা প্রকাশ করেন। [১] উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ আশারায়ে মুবাশশারার শেষ দুই প্রবীণ ব্যক্তি: সাঈদ বিন যায়েদ এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত একটি নিয়ম অনুযায়ী তাদের ছাড়া খিলাফতের বিষয় চূড়ান্ত হতে পারত না। [২] কিন্তু এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি বায়আতের ব্যাপারে একেবারেই কোনো আগ্রহ দেখাননি। মারওয়ান দীর্ঘক্ষণ সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর জন্য অপেক্ষা করেন। [৩] অবশেষে একজন সিরীয় সৈন্য তাকে ডাকতে যায়। তিনি “শীঘ্রই আসব” বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। [৪] সিরীয় সৈন্যটি হুমকি দেয় যে, “আপনি চলুন, অন্যথায় আপনার গর্দান উড়িয়ে দেব।” কিন্তু সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ভীত হননি [৫] এবং মারওয়ানের কাছে যাননি। [৬] একইভাবে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও নিভৃতে অবস্থান করেন। [৭]

বায়আত থেকে বিমুখ থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দলিলসমূহ:

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইয়াজিদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা কারণহীন ছিল না। তাদের মতে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই পদ্ধতি সঠিক ছিল না। যদিও বাবা তার সন্তানকে শাসনের উত্তরাধিকারী বানানোর নিষেধাজ্ঞার ওপর কোনো অকাট্য দলিল (নস ক্বাতযী) বিদ্যমান ছিল না, তবে কিছু শরয়ী বিধান থেকে এই পদ্ধতির অনুপযুক্ত হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, কোনো বিচারিক মামলায় বাবার সাক্ষ্য ছেলের পক্ষে গ্রহণ করা যায় না, সুতরাং উম্মতের বিষয়ে বাবার পক্ষ থেকে ছেলের যোগ্যতার ওপর সাক্ষ্য সন্দেহজনক হবে। বাবা ছেলেকে যাকাত দিতে পারেন না কারণ এতে উম্মতের দরিদ্রদের হক রয়েছে, সুতরাং উম্মতের নেতৃত্বও একটি আমানত যা ছেলেকে সঁপে দেওয়া অন্তত সন্দেহজনক অবশ্যই হবে। সবকিছুর উর্ধ্বে এমন কোনো আমল রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.) থেকে প্রমাণিত ছিল না, বরং এই ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের পদের ক্ষেত্রে পেছনে এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে সামনে রেখেছিলেন। এই নতুন পদ্ধতি রাজতন্ত্রের সদৃশ ছিল যাতে বংশানুক্রমিক শাসন চলে এবং যোগ্যতার তোয়াক্কা না করে ক্ষমতা বংশপরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে আশঙ্কা ছিল যে, ভবিষ্যতে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরও রাজতন্ত্রের ছাপ পড়ে যাবে এবং উম্মতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ওপর অযোগ্য লোক চেপে বসবে।

তাহাড়া ইয়াজিদের চরিত্রও এমন পর্যায়ে ছিল না যে, উম্মতের সর্বোচ্চ পদটি কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাকে সঁপে দেওয়া যেত যেমনটি...

[১] আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লি-আহমদ রেওয়ায়েত ইবনুহু আবদুল্লাহ, নং: ৩৭৪৮। [২] আবদুর রহমান বিন আবযা (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর (রা.) থেকে: তিনি বলেন: এই বিষয়টি (খিলাফত) বদরবাসীদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকে, এরপর উহুদবাসীদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকে (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩৩৩/৩)।

দ্রষ্টব্য: সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) মদীনা থেকে তিন মাইল (পৌনে ৫ কিলোমিটার) দূরে শহরতলীর এলাকা আকীকে বসবাস করতেন। সেখানেই উভয়ের মৃত্যু হয়েছিল। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জানাইয, বাব মা জাআ ফি দাফনিল মাইয়িত্য)। অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য দেখুন: মুজামুল বুলদান: ১৩৯/৪।

[৩] আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, হা: ৪২৭, ত ত দারুন্ রাইয়াহ; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৫০/১। [৪] আত-তারিখুল আওসাত লিল-বুখারী: ১১২/১।

[৫] তারিখু দামেশক: ৮৮/২১ সহীহ সনদে। [৬] আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম, হা: ৫৮৫৩ হাসান সনদে।

[৭] সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে যে, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইয়াজিদের উত্তরাধিকার ঘোষণার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন, কিন্তু হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর কাফন-দাফন ও গোসলে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর অংশগ্রহণ সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের সময় জীবিত ছিলেন, সুতরাং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এরও সেই সময় জীবিত থাকা স্বয়ং প্রমাণিত হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ১১১৪৯, সহীহ সনদে; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী হা: ১১৩৬৯; এবং ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে তালীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন ‘বাব গুসলিল মাইয়িত্য ওয়া উজুয়িহি বিল মায়ি ওয়াস সিদর’।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ: দ্বিতীয়

স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দক্ষিণহস্ত যিয়াদ-এরও ব্যক্তিগত অভিমত এটাই ছিল যে, ইয়াজিদ খিলাফত পরিচালনার যোগ্য নয়। [১]

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব (দা.বা.) ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সম্পর্কে বলেন:

“যদি সেই পরিবেশকে সামনে রাখা হয় যাতে এই খিলাফত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তবে নিঃসন্দেহে এই অভিমত পোষণ করার পূর্ণ অবকাশ ছিল যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সে খিলাফতের যোগ্য নয়। স্পষ্টতই যে পরিবেশে হযরত হুসাইন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রা.)-এর মতো মহান সাহাবী, উম্মতের নেককার ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন, সেই পরিবেশে ইয়াজিদকে খিলাফতের জন্য অযোগ্য বা অনুপযুক্ত মনে করা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না।” [২]

এই মহান ব্যক্তিদের মতপার্থক্যের কথা বিবেচনা করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। ৫৬ হিজরিতে তিনি হজের উদ্দেশ্যে হিজাজে গমন করেন। ততদিনে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) উভয়েই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মনোযোগ অন্যান্য ব্যক্তিদের দিকে ছিল, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর এবং আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রা.) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তবে এই তিনজন ইয়াজিদের বায়াত থেকে বাঁচার জন্য মসজিদে হারামে আশ্রয় নিতে মক্কায় চলে যান। [৩] হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাদের পিছু পিছু মক্কায় পৌঁছান। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি বললেন: “হে ইবনে উমর! আপনি তো বলতেন যে আপনি একজন শাসককেও ছাড়া একটি রাতও কাটাতে পছন্দ করেন না। দেখুন! এখন আপনি এমন কিছু করবেন না যাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়।”

তিনি উত্তর দিলেন: “পূর্ববর্তী খলিফাদেরও সন্তান ছিল, আপনার সন্তান তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তারা তাদের সন্তানদের জন্য যা ভাবেননি, আপনি আপনার সন্তানের জন্য তা ভেবেছেন। যেখানে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও ফিতনা ছড়ানোর কথা, আমি তা করার লোক নই। যখন সব লোক একটি সিদ্ধান্তে একমত হবে, তখন আমিও তাদের সাথে शामिल হয়ে যাব।” [৪]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর সাথে যখন কথা হলো, তখন তিনি বললেন: “একই সময়ে দুই ব্যক্তির বায়াত কীভাবে হতে পারে? আপনি নিজেই তো এই হাদিস বর্ণনা করেন যে, যখন দুই খলিফার বায়াত করা হয়, তখন দ্বিতীয়জনকে হত্যা করে দাও।” [৫]

হযরত হুসাইন (রা.)-ও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে তাঁরও আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু কেউ কাউকে রাজি করাতে পারেননি। [৬] এরপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই ব্যক্তিদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়ে সিরিয়ায় চলে যান।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর উক্তি হলো: “হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হযরত হুসাইন বিন আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবদ্দশায় ইয়াজিদের বায়াত করেননি। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।” [৭]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩০৩/৫

[২] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং ঐতিহাসিক সত্য, পৃ. ১১৪

[৩] আল-তারিখ আল-আওসাত লিল-বুখারী: ১০৩/১; সনদ হাসান, ত: দারুল ওয়াযী

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৩, ২১৪

[৫] তারিখ খলিফা, পৃ. ২১৩; আল-মুজাম আল-আওসাত, হা: ৩৮৮৫; সনদ হাসান; মাজমা আল-যাওয়াইদ, হা: ৯০০১; আল-মুজাম আল-কাবীর লিত-তাবারানী: ৩১৩/১৯

[৬] মাজমা আল-যাওয়াইদ, হা: ৯০০৯

[৭] মাওসুআতুল আকওয়াল ইমাম আহমদ: ১৫৮, ১৫৭/৩

আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রা.)-এর মৃত্যু:

আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আগমনের পর মক্কা থেকে ফেরার সন্ধ্যায় মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু মক্কা থেকে দশ মাইল (১২ কিলোমিটার) দূরে “হাবশি” নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মক্কায়ে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়। [১] হযরত আয়েশা (রা.) পরের বছর হজের সময় তাঁর কবরে এসে বলেন: “আমি যদি তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকতাম, তবে তোমাকে সেখানেই দাফন করা হতো যেখানে তুমি মারা গিয়েছিলে।”

তারপর এই কবিতা পাঠ করেন:

আমরা জাযিমার দুই সঙ্গীর মতো দীর্ঘকাল একসাথে ছিলাম

এমনকি বলা হতে লাগল যে, এই দু’জন কখনো আলাদা হবে না

কিন্তু যখন আমরা আলাদা হলাম, তখন মনে হলো যেন আমি এবং (আমার সঙ্গী) মালিক দীর্ঘকাল একসাথে থাকা সত্ত্বেও যেন একটি রাতও একসাথে কাটাইনি। [২]

আমর বিন হাযম (রা.)-এর ভিন্নমত, নসিহত এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উত্তর:

অন্যান্য ব্যক্তিদেরও ইয়াজিদের উলি আহদি নিয়ে আপত্তি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আমর বিন হাযম আনসারি (রা.) মদিনা থেকে দামেস্কে গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে ইয়াজিদের উলি আহদি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কথা বলেন। তাঁদের উদ্বেগ ছিল যেন ইয়াজিদকে উলি আহদি না করা হয়। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদিসটি শোনান:

“আল্লাহ সেই বান্দাদের যাদেরকে প্রজাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন।”

একথা বলে হযরত আমর বিন হাযম আনসারি (রা.) বললেন: “মুয়াবিয়া! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি যে, আপনি আপনার পরে কাকে মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের অভিভাবক বানাচ্ছেন তা ভালো করে ভেবে দেখুন।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কিয়ামতের দিনের চিন্তায় শীতের মৌসুমেও ঘামতে শুরু করলেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন: “আপনি একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ, আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং খুব ভালোভাবেই ব্যক্ত করেছেন। আসল কথা হলো, এই মুহূর্তে হয় আমার ছেলে আছে অথবা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ছেলেরা। আর আমার ছেলে আমার কাছে তাদের ছেলেদের চেয়ে বেশি প্রিয়।” [৩]

এরপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করে বিদায় জানালেন।

[১] আত-তারিখুল আওসাত লিল বুখারি: ১০৩/১ হাসান সনদসহ; তারিখ ইবনে আসাকির: ২২৯/১।

[২] সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১০৫৫, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জাআ ফির রুখসাতি ফি যিয়ারাতিল কুবুর... উম্মুল মুমিনীন এখান থেকে এই দলিল গ্রহণ করেছেন যে শরিয়তের শিক্ষা হলো সেই এলাকার কবরস্থানে দাফন করা যেখানে মৃত্যু হয়েছে। অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা উপযুক্ত নয়। আল-ফাদলু আল-মাইয়্যিতু ইউসতাহাবু লাহ্‌ল দাফনু ফিল মাকানিল্লাজি ক্বাতলা ফিহি... আলখ (আল-বাহরুর রায়েক: ২১০/২)।

[৩] মুসনাদে আবি ইয়লা, খণ্ড: ৭, হাদিস: ৪১৩৭, সনদ সহিহ, দারুল মামুন।

ইরাকের প্রশাসক আহনাফ বিন কায়েসের মতামত:

হযরত মুয়াবিয়া মতপার্থক্যের কদর করতেন, তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতেন যে ইয়াজিদের নিয়োগের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। পরিশেষে তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের দামেস্কে ডেকে তাদের সাথে কথা বলেন। খোরাসান বিজয়ী এবং ইরাকের মহান প্রশাসক আহনাফ বিন কায়েসও ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে একমত ছিলেন না। যখন তার মতামত চাওয়া হলো, তখন তার উত্তর ছিল: “ইয়াজিদের দিন-রাত এবং প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা সম্পর্কে আপনিই বেশি অবগত। আমাদের কাজ হলো শোনা এবং মানা। আপনার কাজ হলো উম্মতের কল্যাণ কামনা করা।” [১] যা-ই হোক, দামেস্কে আমন্ত্রিত মজলিসের সদস্যরা হযরত মুয়াবিয়ার সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে গভর্নরদের মাধ্যমে ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বায়াত গ্রহণ করা হয়। [২]

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার এবং জমহুর ওলামাদের মাযহাব:

ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে জমহুর ওলামাদের মাযহাব হলো, এই মাসআলায় সেই সকল ব্যক্তিদের মতামতই অধিক সঠিক এবং অধিক উপযুক্ত ছিল যারা ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী বানানোর বিরোধী ছিলেন। যদিও সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে খেলাফত সেভাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেভাবে ইয়াজিদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবি বলেন:

“নিশ্চয়ই উত্তম ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া এই বিষয়টি শুরার ওপর ছেড়ে দিতেন এবং নিজের কোনো আত্মীয়কে এর জন্য মনোনীত করতেন না, চাই সে ছেলেই হোক না কেন... কিন্তু তিনি উত্তম পন্থাটি ত্যাগ করেছেন।” [৩]

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব জমহুরের অবস্থানের দলিল পেশ করতে গিয়ে লিখেন:

- হযরত মুয়াবিয়া নিঃসন্দেহে নিজের ছেলেকে সদিচ্ছার সাথে খেলাফতের যোগ্য মনে করে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু তার এই কাজ এমন এক নজির হয়ে দাঁড়ায় যা থেকে পরবর্তী লোকেরা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ফায়দা হাসিল করে। তারা এর আড়ালে খেলাফতের কাঙ্ক্ষিত শুরা ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয় এবং মুসলমানদের খেলাফতও রাজবংশে পরিণত হয়।
- নিঃসন্দেহে হযরত মুয়াবিয়ার যুগে ইয়াজিদের ফাসেক ও ফুজ্জুর হওয়া কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই তাকে খেলাফতের যোগ্য তো মনে করা যেতে পারত, কিন্তু উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিদের অভাব ছিল না যারা কেবল সততা ও তাকওয়ায় নয় বরং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিচারেও ইয়াজিদের তুলনায় বহুগুণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩০৭ (২) আল-ইকদুল ফারিদ: ১১/১১৮ আল-মাদায়েনি থেকে ১ মুরুজুয যাহাব: ৩/২১৯, তবা আল-জামিয়া আল-লুবনানিয়া নোট: প্রসিদ্ধ আছে যে হযরত মুয়াবিয়া ইয়াজিদের বায়াতের জন্য সাহাবীদের আনুগত্য ঘুষ দিয়ে কেনার চেষ্টা করেছিলেন। এর অধিকাংশ বর্ণনা যযিফ বরং মাওজু (জাল), তবে সহিহ সনদের একটি বর্ণনায় এর হাকিকত এই যে, হযরত মুয়াবিয়ার এই বুজুর্গদের দান-সদকা ও হাদিয়া দেওয়ার অভ্যাস ছিল। ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বছরও হাদিয়া প্রেরণ করেন, কিছুকাল পর যখন ইয়াজিদের বায়াতের দাবি পেশ করা হয় (যার সাথে প্রকৃতপক্ষে এই হাদিয়ার কোনো সম্পর্ক ছিল না), তখন এই ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে পড়ে যে সেই অর্থ মূলত রাজনৈতিক ঘুষ ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল এই আন্দোলনে সমর্থন লাভ করা। অথচ হযরত মুয়াবিয়ার নিয়ত এমন ছিল না।

[৩] আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃষ্ঠা ২২৮, তবা দারুল জিল

যদি খিলাফতের দায়িত্ব তাদের অর্পণ করা হতো, তবে নিঃসন্দেহে তারা এতে অনেক উত্তমভাবে যোগ্য প্রমাণিত হতেন। এটি সঠিক যে, আফজালের (উত্তম ব্যক্তি) উপস্থিতিতে গায়রে আফজালকে (কম উত্তম ব্যক্তি) খলিফা বানানো শরীয়তসম্মতভাবে জায়েজ (যদি তাতে খিলাফতের শর্তাবলি বিদ্যমান থাকে), কিন্তু উত্তম এটাই যে, খলিফা এমন ব্যক্তিকে বানানো হোক যিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে এই পদের জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য।

সদিচ্ছার সাথে পুত্রকে উত্তরাধিকারী (ওয়ালি আহাদ) বানানো শরীয়তসম্মতভাবে জায়েজ হলেও, একদিকে অপবাদের ক্ষেত্র হওয়ার কারণে তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম এবং তীব্র প্রয়োজন ছাড়া এমনটি করা নিজেকে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলা। এই কারণে সমস্ত খুলাফায়ে রাশেদিন এটি পরিহার করেছেন। [১]

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে ইয়াজিদের যোগ্যতা.....!

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতের সাথে একমত হয়ে যারা ইয়াজিদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অবস্থানও শরয়ী সীমার বাইরে ছিল না। উত্তরাধিকারের শর্তাবলির দিক থেকে দেখা গেলে ইয়াজিদের বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম, সুস্থ এবং কুরাইশী হওয়া এমন সব বাস্তবতা যার জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সে একটি জিহাদি অভিযানের নেতা এবং আমিরুল হজও ছিল, যা থেকে তার মধ্যে যুদ্ধবিদ্যা এবং ব্যবস্থাপনার কোনো না কোনো স্তরের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং তার বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে এটি মেনে নেওয়ার অবকাশও ছিল যে সে খিলাফতের যোগ্য।

যে পর্যন্ত ইয়াজিদের মদ্যপান এবং অন্যান্য অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার প্রশ্ন, তবে যে সকল বর্ণনা এটি প্রকাশ করে যে সে হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবদ্দশায় এই সব কাজে অভ্যস্ত ছিল, সেগুলো জয়িফ এবং বর্ণনার দিক থেকে সন্দেহজনক। [২]

হ্যাঁ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সে নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা এবং দ্বীনি দৃঢ়তায় সেই সময়ের অন্যান্য যোগ্য ও নেককার লোকদের থেকে বেশ পিছিয়ে ছিল। তার মধ্যে দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। মেজাজে তাড়াহুড়ো প্রবণতা, অস্থিরচিন্ততা এবং খামখেয়ালিপনা স্পষ্ট ছিল, যেমনটি খলিফা হওয়ার পর তার বহু সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া সে বিনোদনমূলক কাজে সীমার অতিরিক্ত মগ্ন থাকতো। [৩]

[১] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আওর তারিখি হাকায়িক, পৃ. ১৫০, ১৫১

[২] যেমন কিছু জয়িফ বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদের পানাহার সম্পর্কে অবগত হয়ে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এটি আনন্দপ্রিয় লোকদের থেকে লুকিয়ে করো। স্পষ্টতই এই বর্ণনাগুলো গ্রহণ করা যায় না; কারণ এখানে অভিযোগ শুধু ইয়াজিদের ওপর নয় বরং একজন সাহাবীর ওপর কবির গুনাহের অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ আরোপিত হচ্ছে। আমরা শুরুতে আসলাফদের এই নীতি পেশ করেছি যে, সাহাবীর ওপর অপবাদের জন্য জয়িফ বর্ণনা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যদিকে কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইয়াজিদ ইবাদতকারী ও পরহেজগার না হলেও প্রয়োজনীয় দ্বীনদারি থেকে বঞ্চিতও ছিল না, যেমনটি মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) ইয়াজিদ সম্পর্কে বলেছিলেন: “আমি তাকে সালাতের পাবন্দ, কল্যাণের অন্বেষী, ফিকহি মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী এবং সুন্নতের প্রতি যত্নবান পেয়েছি।” (যাকারাছয যাহাবি ফি তারিখিল ইসলাম: ৫/৩৭৩, যাহাবি এটি জয়িফ ও মুনকাতি সনদে উল্লেখ করেছেন; এবং ইবনুল মানজুর মুখতাসার তারিখি দামেশক: ২৮/২৮-এ এবং হাফেজ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৫৩-এ সনদ ছাড়াই এটি নকল করেছেন)

(নাসাউয়ি আল-বালাজুরি এই বিষয়টি অন্য একটি বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন যাতে ইয়াজিদের ব্যক্তিত্ব এবং তার সম্পর্কের মূল বিষয়টি স্পষ্ট হয়: “এবং সে ইবনে হানাফিয়াকে সাহায্য ও নসিহত করত এবং তাকে কুরআন ও ফিকহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত।” (আনসাবুল আশরাফ: ৩/২৭৮, তাবা দারুল ফিকর) মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার এই বর্ণনা যদিও সনদের দিক থেকে অত্যন্ত জয়িফ এবং ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর পূর্বের কোনো উৎসে এর উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না, এছাড়া এর সনদেও দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তবে একে ইয়াজিদের যোগ্যতার প্রমাণ বা তার শাসনকালে তার ফাসেক হওয়ার অস্বীকৃতি হিসেবে পেশ করা হচ্ছে না, বরং শুধু এটি বোঝানো উদ্দেশ্য যে, উত্তরাধিকারী হওয়ার সময় সে এমন প্রকাশ্য দুশ্চরিত্র ছিল না যে তাকে উত্তরাধিকারী বানানোর একেবারেই কোনো অবকাশ ছিল না।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩০৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

যদি এটি কোনো সাধারণ মানুষের চরিত্র হতো, তবে সম্ভবত কারো কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু যেহেতু ইয়াজিদকে ভবিষ্যতের খলিফা হিসেবে দেখা হচ্ছিল, তাই এই ত্রুটিগুলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক অনুভূত হচ্ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিজস্ব বলয়ে শামিল ব্যক্তিবর্গ যেমন আমর বিন হাযম (রা.), আহনাফ বিন কায়েস (রা.) এবং যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান সম্ভবত ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না। অন্যদিকে মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আপত্তির কারণ এও ছিল যে, এর ফলে ইসলামী শুরা ব্যবস্থা ও সীমিত রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হচ্ছিল।

এটা স্পষ্ট যে, ইয়াজিদের দুর্বলতাগুলো নিশ্চিতভাবেই আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গোপন ছিল না, তবে তিনি আশাবাদী ছিলেন যে দায়িত্বের বোঝা পড়ার পর এই ত্রুটিগুলো দূর হয়ে যাবে। [১] তাঁর এই বিশ্বাসও ছিল যে, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় শামিল উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন আমীর ও উপদেষ্টাদের দিকনির্দেশনা ইয়াজিদ প্রতিটি পদক্ষেপে লাভ করবে, যার ফলে সে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

এর পাশাপাশি আমীর মুয়াবিয়া (রা.) নিজেও ইয়াজিদকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এমন সব অসিয়ত ও উপদেশ দিতে থাকতেন, যেগুলোকে সামনে রেখে একজন সফল শাসক হওয়া সম্ভব ছিল। [২]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দোয়া ও ইস্তিখারা:

আপনি (রা.) এ বিষয়ে ইস্তিখারা ও দোয়ারও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। **چنانچہ** আপনি জুমার দিন এই দোয়া করেছিলেন: “হে আল্লাহ! যদি আপনি জানেন যে আমি ইয়াজিদকে তার যোগ্যতার কারণে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি, তবে এই পদের পূর্ণতা দান করুন যা আমি তাকে দিয়েছি। আর যদি আমি তাকে কেবল আমার ভালোবাসার কারণে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে থাকি, তবে এই পদের পূর্ণতা তার জন্য দান করবেন না।” [৩]

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পূর্ণ ইখলাস ও উম্মতের কল্যাণ কামনার সাথেই ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তার দুর্বলতাগুলো জানা সত্ত্বেও তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে সে সঠিক শাসন পরিচালনা করবে, যার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে দোয়া, মূল্যবান উপদেশ ও যোগ্য সহকর্মীদের পাথেয় প্রদান করেছিলেন।

[১] যেমনটি কিছু ব্যক্তিত্বের অবস্থার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ক্ষমতায় আসার আগে তারা বিলাসিতার জীবন অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে আসার সাথে সাথেই তাদের দিন-রাত বদলে গেছে। যেমন: উমর বিন আব্দুল আজিজ এবং সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী।

[২] এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত যা মূল্যবান উপদেশের সমষ্টি, আমরা সামনে তা উল্লেখ করব।

[৩] ইবনে কাসীর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি তাঁর খুতবায় বলেছিলেন: “**اللهم ان كنت تعلم اني وليته لانه اراه اهل لذلك فاتم له ما وليته، وان كنت وليته لاني احبه فلا تتم له ما وليته**” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৮০, ৬০ হিজরীর ঘটনাবলী)।

হাফেজ ইবনে কাসীর এটি “**روي**” (বর্ণিত আছে) শব্দে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ উল্লেখ করেননি। আপনার উচিত আল-যাহাবীর বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনাগুলো দেখা:

“আবু বকর বিন মারিয়াম আতিয়াহ বিন কায়েস থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: মুয়াবিয়া খুতবা দিলেন এবং বললেন: হে আল্লাহ, যদি আমি ইয়াজিদকে তার সেই ফযিলতের কারণে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে থাকি যা আমি তার মধ্যে দেখেছি, তবে আমি তার জন্য যা আশা করি তা পূর্ণ করুন এবং তাকে সাহায্য করুন। আর যদি আমাকে কেবল পিতার সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে এবং সে তেমন না হয় যেমনটি আমি তার সাথে করেছি, তবে তাকে সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু দান করুন।” (তারিখে ইসলাম যাহাবী: ৩/১৬৯, এবং অনুরূপ শব্দে তারিখে খুলাফা, পৃ. ১৫৭, ত. মাকতাবা নিযার)। এই সনদটিও বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি) এবং আমি পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে এই দুটি বর্ণনা খুঁজে পাইনি, তাই সনদের স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতার কারণে এগুলো যযীফ বা দুর্বল, তবে এটি ফাযায়েল ও আখবার (ইতিহাস) অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, আর এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত অবকাশ রয়েছে।

ছিলেন। তিনি তো আর অদৃশ্যের জ্ঞানী (আলেমুল গায়েব) ছিলেন না যে পরবর্তী শোচনীয় পরিস্থিতি দেখে নিতেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দিতেন।

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার, একটি টেস্ট কেস:

প্রকৃতপক্ষে হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা ছিল একটি পরীক্ষা বা একটি ‘টেস্ট কেস’, যার সফলতা বা ব্যর্থতার ফয়সালা পরবর্তী ফলাফলের মাধ্যমে হতে পারত। আমির মুয়াবিয়া (রা.) এই পরীক্ষার ফলাফল দেখার জন্য জীবিত ছিলেন না। এই পরীক্ষাকে ব্যর্থ বলা যেতে পারে, কিন্তু এর ভিত্তিতে আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিয়তের ওপর সন্দেহ করা মহত্ব ও ইনসাফের পরিপন্থী।

নিঃসন্দেহে এই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যদি তখন জীবিত থাকতেন, তবে অবশ্যই এই বিষয়টি সেখানেই শেষ করে দিতেন। আর এটিও একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, তাঁরই নাতি মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ ঠিক তাই করেছিলেন এবং বংশানুক্রমিক শাসনের পরীক্ষাকে সেখানেই শেষ করে দিয়ে ক্ষমতার দায়িত্ব উম্মতের শুরার (পরামর্শ সভা) হাতে সোপর্দ করেছিলেন। (যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (নূরুল্লাহ মারকাদাহ) ‘খিলাফত সম্পর্কে আমির মুয়াবিয়ার মাযহাব’ শিরোনামের অধীনে লিখেছেন:

“খিলাফত সম্পর্কে হযরত আমির মুয়াবিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, যার মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে, যদিও অন্যরা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ (আফযাল) হয়, তবুও অন্যদের পরিবর্তে তাকে খলিফা বানানোই উত্তম। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি ইয়াজিদকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। আর যদি তর্কের খাতিরে তাকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে নাও করা হতো, তবুও বিষয়টি এর চেয়ে বেশি এগোত না যে তিনি শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়েছেন; যেমনটি পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খলিফা বানানো উত্তম, ওয়াজিব নয়। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে ‘উত্তম ত্যাগের’ (তারকে আফযাল) গুনাহ তাঁর ওপর চাপানো যায় না যে আমরা আমির মুয়াবিয়ার সাথে গালিগালাজপূর্ণ আচরণ করব।” [১]

[১] আনওয়ারুল নুজুম (মাকতুবা-ই-কাসেমীর উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৭৩, ১৭৫; সংকলক: মাওলানা প্রফেসর আনওয়ারুল হাসান শেরকোটি, ফাযিল দারুল উলুম দেওবন্দ।

দ্রষ্টব্য: মনে রাখতে হবে যে, এই আলোচনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবদ্দশায় ইয়াজিদের চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। শাসক হওয়ার পর ইয়াজিদের তার পিতামাতার ওসিয়তসমূহ ভুলে যাওয়া এবং ফাসেকী ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া একটি ভিন্ন বিতর্ক। জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে সে ফাসেকীতে লিপ্ত ছিল। হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আমির মুয়াবিয়া (রা.) কি ইয়াজিদকে তাঁর সামনেই খলিফা করেছিলেন কি না? হযরত উত্তরে লিখেছিলেন: “হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে খলিফা করেছিলেন। সেই সময় ইয়াজিদ ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল।” এরপর একই ধরনের আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি এভাবে লেখেন: “ইয়াজিদ প্রথমে নেককার ছিল, খিলাফতের পর খারাপ হয়েছে।” (তালিফাত-ই-রশিদীয়া পৃ. ৪২২) খলিফা হওয়ার পর ইয়াজিদের কিছু বাড়াবাড়ি সহিহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এগুলো ছিল সেই পদক্ষেপ যা শাহাদাতে হুসাইন (রা.), ওয়াকিয়া-ই-হাররা এবং কাবা অবরোধের মতো বিয়োগান্তক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। যদিও শাসনকালে ইয়াজিদের কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ফাসেকী ও পাপাচার (মদ্যপান, সালাত ত্যাগ) করার বিষয়টি কেবল যয়ীফ (দুর্বল) রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তবুও খোদ মদিনার কিছু বড় মাপের তাবয়ীগণের একটি বিশাল জামাতের তার ফাসেকীর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) করা সহিহ সনদে বর্ণিত বরং মুতাওয়্যাতির। এই মহান ব্যক্তিদের দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর আমরা আমাদের সুধারণাকে প্রাধান্য দিতে পারি না। এই কারণেই জমহুর ওলামায়ে ইসলাম ‘সাধারণভাবে ইয়াজিদের’ সমালোচনা করছেন এবং তার ফাসেকী সম্পর্কিত যয়ীফ রেওয়ায়েতগুলোকেও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। যদিও ইয়াজিদের ওপর কিছু মিথ্যা অপবাদও দেওয়া হয়েছে এবং এই ধরনের অপবাদগুলোর প্রতিরক্ষায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) সবার অগ্রভাগে ছিলেন, তবুও তিনিও বলেন: “তা সত্ত্বেও তার মধ্যে যে জুলুমের উপাদান ছিল, তা তো ছিলই। এরপর ইয়াজিদ এবং সেই লোকেরা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং সে হাররাবাসীদের সাথে অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ করেছে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/১১১) এছাড়াও তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে কখনো ইয়াজিদ এবং তার মতো জালেম শাসকদের সাথে থাকা পছন্দ করবে না।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩/৪৮৪)

এই যুগের দুটি বড় শোকাবহ ঘটনা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে এমন দুই মহান ব্যক্তিত্বের ইন্তেকাল হয় যাদের থেকে হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার উন্মত্তের কাছে পৌঁছেছে, অর্থাৎ: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

১. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ইন্তেকালের শোকাবহ ঘটনা:

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হিজরী ৫৮ সনে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন [১]। শেষ বছরগুলোতে তিনি লাবীদ বিন রাবিয়া (রা.)-এর এই কবিতাটি পাঠ করতেন:

“সেই সব লোক চলে গেছেন যাদের ছায়াতলে জীবন অতিবাহিত হতো... আর আমি এমন লোকদের মধ্যে রয়ে গেছি যারা চুলকানিযুক্ত উটের চামড়ার মতো।”

তিনি বলতেন: “আল্লাহ লাবীদের ওপর রহম করুন, যদি তিনি আমাদের জামানার অবস্থা দেখতেন তবে কী বলতেন?”

উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর এই উক্তিটি একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। উত্তরসূরির বংশপরম্পরায় এটি বর্ণনা করতে থাকেন। প্রত্যেকেই বলতেন যে, “যদি সেই মহান ব্যক্তির আামাদের যুগ দেখতেন তবে কী বলতেন?” [২]।

৫৮ হিজরীতে উম্মুল মুমিনীন (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) তাঁকে দেখতে আসেন। উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর ওপর ভয়ের অবস্থা বিরাজ করছিল।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: “আপনি দুনিয়ার বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আপনার প্রিয়জনদের কাছে যাচ্ছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা কেবল সর্বোত্তমই হতে পারে। যখন আপনার হার হারিয়ে গিয়েছিল, তখন তার তালাশে রাসূলুল্লাহ (সা.) কাফেলা থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং পানির অভাবে মানুষ যখন পেরেশানিতে পড়েছিল তখন আল্লাহ তায়ালা তায়ান্মুমেস সহজতা দান করেছিলেন। আপনার পবিত্রতা ও নির্দোষিতার প্রমাণ আল্লাহ তায়ালা আরশ থেকে নাযিল করেছেন। এমন কোনো মসজিদ নেই যেখানে আপনার পবিত্রতার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় না।”

উম্মুল মুমিনীন (রা.) অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন:

“ইবনে আব্বাস! এসব কথা ছাড়ুন। আমি তো চাই যে হয়! আমি যদি বিস্মৃত কোনো বস্তু হতাম।” [৩]

[১] উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে মাওলানা আকবর শাহ নজীবাবাদী একটি অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন যে: “মারওয়ানের সাথে আপনার বিরোধিতা তীব্র ছিল। মারওয়ান প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আপনাকে এক দাওয়াতের বাহানায় একটি গভীর গর্তে ফেলে দেয়, যাতে নগ্ন তলোয়ার ও খঞ্জর ইত্যাদি রাখা ছিল। আপনি তাতে পড়ে যান। আপনি অত্যন্ত দুর্বল ও বৃদ্ধা ছিলেন এবং সেই জখমের আঘাতেই ইন্তেকাল করেন।” (তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ নজীবাবাদী: ১/৭৬৫)। এই কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওয়াকিদী এবং ইবনে সাদ প্রমুখও এটি উল্লেখ করেননি। জানা নেই মাওলানা নজীবাবাদী এই ভিত্তিহীন কথাটি কোথা থেকে পেয়েছেন। যদি মারওয়ানের উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর প্রতি এমন কোনো বিদ্বেষ থাকতো তবে এই বিষয়টি অবশ্যই প্রসিদ্ধ হতো। তাছাড়া উম্মুল মুমিনীন (রা.)-কে হত্যার দুঃসাহস কার হতে পারতো? আর বাস্তবে মারওয়ানের এত ক্ষমতাও ছিল না কারণ স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর সামনে অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে উপস্থিত হতেন।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২/১৯১, আল-রিসালাহ।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২৪৯৬, সনদ শক্তিশালী।

১৭ রমজানুল মোবারক রাতে তারাবিহ ও বিতর সালাত আদায় করার পর আপনি এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। যেখানে এই খবর পৌঁছাল মানুষ দৌড়ে চলে এল। অবিলম্বে জানাজার সালাতের প্রস্তুতি নেওয়া হলো। উপচে পড়া ভিড় ছিল। জানাজার সালাত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) পড়ালেন এবং জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হলো। ওফাতের ব্যাপারে ৫৮ হিজরির কথাটিই অগ্রগণ্য। [১]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ওফাতে হযরত উম্মে সালামা (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলেন:

“আল্লাহর কসম! হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।” [২]

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর ওফাতের ঘটনা:

৫৯ হিজরিতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-ও ইন্তেকাল করেন। আপনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী আলেম ছিলেন। আপনার বর্ণিত রেওয়ায়েতের সংখ্যা ৫৩৭৪। আপনার সম্পর্ক ইয়েমেনের দাউস গোত্রের সাথে ছিল। ৭ হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হন এবং নিজেকে নববী বাণীর সংরক্ষণের জন্য উৎসর্গ করেন। ৫৯ হিজরিতে অসুস্থ হন এবং কয়েক দিন পর ইন্তেকাল করেন। বয়স ৭৮ বছর ছিল। [৩]

উম্মতের হকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইয়াজিদকে ওসিয়ত

হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) নিজের পর উম্মতের ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইয়াজিদ উম্মতে মুসলিমার জন্য একজন সফল শাসক প্রমাণিত হোক, উম্মত তার ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকুক, সবদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকুক এবং কারো প্রতি কোনো অবিচার না হোক। যেহেতু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব ইয়াজিদের ওপর অর্পিত হচ্ছিল, তাই আপনি তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত করেছিলেন যার প্রতিটি বাক্য সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। এই ওসিয়তগুলো আপনার প্রজ্ঞা ও সতর্কতা, চিন্তার গভীরতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উম্মতের কল্যাণকামিতার সর্বোত্তম দলিল।

হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে বলেছিলেন:

- আল্লাহকে ভয় করতে থেকো। আমি তোমার জন্য এই খিলাফতের বিষয়টি ফয়সালা করে দিয়েছি। তোমাকে এর দায়িত্বশীল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- যদি কল্যাণের ওপর থাকো তবে এটি আমার সৌভাগ্য হবে। আর যদি এমন না করো তবে এটি তোমার দুর্ভাগ্য হবে।
- মানুষের সাথে নম্র আচরণ করা।
- তোমার প্রতি যে অবমাননা ও নিন্দার কথা পৌঁছাবে তা উপেক্ষা করো।
- শরীফদের সাথে কঠোরতা করো না। তাদের সম্মানহানি থেকে বেঁচে থেকো। তাদের নিজের কাছে রেখো।

[১] এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ কিন্তু গবেষণার পরিপন্থী।

[২] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৭৬; সিয়রু আলামিন নুবালা: ২/১৯২, ত ত রিসালাহ।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১১৩; আল-ইসাবাহ: ৭/৩৪৩, ৩৪৯।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

- যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসবে, তখন বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ, নেককার এবং পরহেজগার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে। তাদের মতামতের বিরোধিতা করবে না।
- নিজের মতামতের ওপর কখনো জেদ করবে না; কারণ শুধুমাত্র একটি মস্তিষ্কে আসা মতামত সবসময় সঠিক হয় না।
- নিজের নফসের সংশোধনের ব্যবস্থা করবে, তাহলে লোকেরাও তোমার সাথে সঠিকভাবে চলবে।
- মানুষকে কখনো কোনো আপত্তির সুযোগ দেবে না, কারণ মানুষ মন্দ কথা খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।
- জামাতের সাথে সালাত আদায়ের পাবন্দি করতে থাকবে।
- যদি এই উপদেশগুলোর ওপর আমল করো, তবে মানুষ নিজেদের ওপর তোমার হুক বুঝবে এবং তোমার শাসন ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১/৬৩৪, ৬৩৫।

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শেষ দিনগুলো এবং মৃত্যু

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স আশি (৮০) বছরের বেশি হয়েছিল। [১] ষাট বছরের রাষ্ট্রীয় পরিশ্রম তাঁকে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং তিনি মৃত্যুর দূতের পদধ্বনি অনুভব করছিলেন। একদিন এক খুতবায় তিনি বললেন:

“হে লোকসকল! আমি কেটে ফেলার মতো ফসলের একটি অংশ। আমার পরে তোমাদের কাছে দায়িত্বশীল শাসকরা আসবে। আমি তাদের চেয়ে উত্তম, যেমন আমার আগে যারা গত হয়েছেন তারা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। (হাদিসে) বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করি, তাই আপনিও আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করুন এবং এতে বরকত দান করুন।” [২]

আপনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে কবজিগুলো শুকনো কাঠির মতো মনে হতো। তিনি বলতেন: “আমি এই দুনিয়াকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আস্বাদন করেছি। এখন আমার আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা নেই। আল্লাহর কসম! আমাকে যদি পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হতো, তবে আমি তোমাদের মাঝে তিন দিনের বেশি থাকতাম না।” [৩]

তাঁর কাশিতে রক্ত আসত। শেষ দিনগুলোতে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুজন দাসী তাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিত এবং তিনি বলতেন: “এই ব্যক্তিকে উল্টেপাল্টে দিচ্ছে যারা দুনিয়াকে উল্টেপাল্টে দিতে পারদর্শী ছিল।”

অসুস্থতার তীব্রতা সত্ত্বেও নিজের শাসনের গান্ধীর্ঘ ও প্রভাব বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি এতই সচেতন ছিলেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে নিজের শয্যাশায়ী হওয়ার বিষয়টি মোটেও প্রকাশ হতে দেননি। যখন মানুষ অসুস্থতা দেখতে আসত, তখন তিনি ঘরের লোকদের বলতেন: “আমাকে সুরমা ও তেল লাগিয়ে দাও। বালিশের হেলান দিয়ে বসিয়ে দাও। ভেতরে আসা কেউ যেন আমাকে বসা (শুয়ে থাকা) অবস্থায় না পায়। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম করে চলে যাক।”

লোকেরা ভেতরে আসত, সালাম করত এবং তাঁকে প্রফুল্ল ও সতেজ দেখে এই বলতে বলতে চলে যেত যে আমিরাুল মুমিনীন ঠিকঠাক আছেন।

তাদের চলে যাওয়ার পর তিনি এই কবিতাগুলো পাঠ করতেন:

وَتَجَلَّدِي لِلشَّامِتِينَ أُرِيهِمْ ... أَنِّي لَرِيْبِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعُّعُ

বিদ্বেষ পোষণকারীদের সামনে আমি আমার ধৈর্য প্রদর্শন করি যাতে তারা আমাকে সময়ের বিপর্যয়ে ভেঙে পড়তে না দেখে।

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَشْبَتْ أَظْفَارَهَا ... أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

কিন্তু মৃত্যু যখন তার নখ গেঁথে দেয়... তখন তুমি সব ধরনের কবজকে নিষ্ফল পাবে। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/১৫৯।

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৩/৩১৬, আত-তাবারী, মুখতাসার তারিখ দিমাশক: ২৫/৭৯।

[৩] আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৭৭২১।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/৩২৬।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

একজন খাঁটি মুমিনের মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ভক্তি তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি পরিবারের সদস্যদের বললেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি চাদর পরিয়েছিলেন যা আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। এক সময় তিনি তাঁর নখ মোবারক কেটেছিলেন, সেগুলোও আমি একটি শিশিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমি যখন মারা যাব, তখন তোমরা আমাকে সেই চাদরে কাফন দিও এবং সেই নখগুলো পিষে আমার চোখের ওপর ও মুখের ওপর ছিটিয়ে দিও। আশা করি আল্লাহ তাআলা এগুলোর বরকতে আমার ওপর রহম করবেন।”

আল্লাহভীতির অবস্থা এই ছিল যে, মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পদ বায়তুল মালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে অজান্তে বায়তুল মালের অর্থে কোনো কমবেশি হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। [১] শেষ মুহূর্তে তিনি উপস্থিতদের বললেন: “আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে ভয় করতে থাকো। যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন এবং যাকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেন তার কোনো ক্ষতি করার কেউ নেই।” [২] কিছুক্ষণ পর আপনার পবিত্র আত্মা দেহ ত্যাগ করল।

হযরত দাহহাক বিন কায়স আল-ফিহরি (রা.) জানাজার নামাজ পড়ালেন। আপনাকে দামেশকেই দাফন করা হয়। [৩]

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

আপনি ২০ বছর গভর্নরের দায়িত্ব এবং তারপর ২০ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওফাতের ঘটনা ২২ রজব ৬০ হিজরি বৃহস্পতিবার ঘটেছিল। [৪]

তবে অগ্রগণ্য বর্ণনা অনুযায়ী ওফাতের তারিখ ৪ রজব। [৫]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩২৭

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩২৭

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩২৭; সনদ সহীহ

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/৩৫৮

[৫] আল-মা'রিফাত ওয়াত-তারিখ: ৩/৩২৩; আল-রিসালাহ ১; তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২২৯

ওফাতের তারিখ নিয়ে একটি মত ৪ রজব এবং অন্যটি ২২ রজব। বর্ণনার দিক থেকে ৪ রজবের মতটিই অগ্রগণ্য; কারণ এটি নিশ্চিত যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওফাতের সময় ইয়াজিদ দামেশক থেকে দূরে হওয়ারিনে ছিলেন। এটাও প্রমাণিত যে, ২২ রজব ইয়াজিদকে বায়আত করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল এবং ২৮ রজব হযরত হুসাইন (রা.) মদিনা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। (তাবারী: ৫/৪৮১; আনসাব আল-আশরাফ: ৪/১২০, তাবারী পাবলিশার্স) এখন যদি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওফাতের তারিখ ২২ রজব ধরা হয়, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয়: (১) ইয়াজিদ পর্যন্ত ওফাতের খবর পৌঁছানো (২) তাঁর হওয়ারিন থেকে দামেশকে আসা (৩) দাফন সম্পন্ন করা (৪) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে নির্দেশ জারি করা (৫) ইয়াজিদের পক্ষ থেকে মদিনার গভর্নরের কাছে নির্দেশ পৌঁছানো... সেই সময়ের যাতায়াত ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এই কাজগুলো সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ সেই যুগে সাধারণত একটি উট একদিনে এক মঞ্জিল (১৬ মাইল বা ২৬ কিলোমিটার) এবং দ্রুতগামী সওয়ার দুই মঞ্জিল (প্রায় ৫২ কিলোমিটার) অতিক্রম করতে পারত। অবশ্য ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করা যেত; কারণ প্রতি চৌকিতে সওয়ারি ও সওয়ার বদলে যেত। হওয়ারিন দামেশকের উত্তর-পূর্বে কমবেশি একশ মাইল দূরে অবস্থিত। (হওয়ারিন: দামেশক, তাদমুর ও হিমসের মধ্যবর্তী স্থান। আল-আলামুল আসির: পৃ. ১০৫) সাধারণ গতিতে কোনো বার্তাবাহক যদি হওয়ারিন থেকে দামেশকে আসত এবং ইয়াজিদ সেখান থেকে দামেশকে পৌঁছাতেন, তবে অবশ্যই তিন দিন সময় লাগত। এটাও অসম্ভব যে ইয়াজিদ বায়আতের জন্য বার্তাবাহক পাঠানোর আগেই দামেশকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এর আগে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করতে দুই-তিন দিন সময় লেগে থাকবে, যার পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ও বায়আতের নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। দামেশক থেকে মদিনার দূরত্ব প্রায় ৮০০ মাইল (১২৯১ কিমি), যা ৮০টি মঞ্জিল। ডাক ঘোড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতিতে পৌঁছাতেও ১২-১৫ দিন সময় লাগত। যদি এই সমস্ত সময়ের হিসাব করা হয়, তবে ৪ রজব ওফাতের তারিখ হওয়াই সঠিক মনে হয়। হ্যাঁ, যদি ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিটি কাজ অত্যন্ত অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং ইয়াজিদ একদিনেই ওফাতের খবর পেয়ে দামেশকে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে মদিনায় বায়আতের জন্য বার্তাবাহক পাঠানো হয়েছিল যারা সোয়া তিনশ কিলোমিটার প্রতিদিন অতিক্রম করে ৯ দিনে মদিনায় পৌঁছেছিল, তবে ২২ রজব ওফাতের তারিখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.)-এর মদিনা ত্যাগের সময়কে ধ্রুব সত্য ধরলে ২২ রজবের তারিখটি কেবল একটি অনুমান মাত্র। যদি হযরত হুসাইন (রা.)-এর মদিনা ত্যাগের তারিখ নিয়ে ভিন্ন কোনো বর্ণনা থাকত তবে ভিন্ন কথা ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে একাধিক বর্ণনা থাকলেও সবই একই মত পোষণ করে।

হাদীস গ্রন্থসমূহ এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সীরাত

যদি কেবল ইতিহাস গ্রন্থসমূহের ওপর নির্ভর করা হয়, তবে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিশ্চিতভাবে একজন দুনিয়াদার বাদশাহ মনে হয়। কিন্তু হাদীস গ্রন্থসমূহের নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডারের ওপর এক নজর বুলানো হলে তাঁকে একজন চরিত্রবান, আলিম-ফাযিল, মুখলিস এবং আল্লাহভীরু শাসক হিসেবে দেখা যায়। হাদীসের ভাণ্ডারে (জাওয়ামি, সুনান, মাসানিদ এবং মুআজিম) হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই চিত্রটি দেখুন:

মন্দ কাজ ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা:

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং প্রজাসাধারণকেও এসব বিষয় থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। তাঁর খুতবাসমূহ এই জযবারই প্রতিফলন। একবার তিনি বললেন: “নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, আমিও সেগুলো থেকে নিষেধ করছি: মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা থেকে, গান থেকে, ছবি থেকে, (প্রেমঘটিত ও অবৈধ) কবিতা থেকে, (পুরুষদের জন্য) স্বর্ণ ব্যবহার থেকে, হিংস্র পশুর চামড়া পরিধান করা থেকে, জাঁকজমক ও প্রদর্শন থেকে এবং (পুরুষদের জন্য) রেশম থেকে।” [১]

তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তার মেয়েকে অন্য একজনের সাথে বিয়ে দিয়েছে এবং এর মোহরের বিনিময়ে ওই ব্যক্তির মেয়েকে নিজের বিয়েতে গ্রহণ করেছে। তিনি তাঁর গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন যে, উভয় জোড়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দাও এবং নিজের পত্রে লিখলেন: “এটি নিকাহে শিগার, যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।” [২]

কখনো কখনো মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং সেগুলোর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে আল্লাহর কসম দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন যে, বলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এসব বিষয় থেকে নিষেধ করার কথা তোমরা জানো কি না। [৩]

সাবায়ী বর্ণনাকারীরা তাঁর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিবারে ইয়াজিদকে মদ্যপ এবং তাঁকে এই কাজের প্রতি উদাসীন হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা একটি অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু মদ্যপানের কঠোর নিন্দা জানিয়ে এই নববী ফরমান শোনাতেন: “যে মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় পান করলে আবার বেত্রাঘাত করো, পুনরায় পান করলে আবার বেত্রাঘাত করো। এরপর যদি চতুর্থবার পান করে তবে তাকে হত্যা করো।” [৪]

ফ্যাশন, কৃত্রিমতা এবং জাঁকজমক প্রদর্শন প্রতিরোধ:

তিনি জাঁকজমক ও প্রদর্শন অপছন্দ করতেন এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ড সময়মতো প্রতিরোধ করতেন। মহিলারা কালো রঙের ফিতা...

[১] মুসনাদে আবু ইয়লা, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৭৩, ত দারুল মামুন, দামেস্ক

[২] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৪; সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২০৭, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফিশ শিগার

[৩] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৬

[৪] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৩; আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫২৭, কিতাবুল হাদি ফিল খামর, ত আর-রিসালাহ

স্মর্তব্য যে, চতুর্থবার মদ্যপানের পর হত্যার নির্দেশকে ব্যাখ্যাকারগণ হাকীকত বা বাস্তব নয় বরং তাহদীদ অর্থাৎ ভয় দেখানোর জন্য অথবা মদকে হালাল মনে করে পান করার ওপর প্রয়োগ করেছেন।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মাথার ওপর বাঁধার জন্য এবং চুলে নকল চুল মেশানোর ফ্যাশন শুরু হয়েছিল। তিনি একে ‘যূর’ অর্থাৎ মিথ্যা বা কৃত্রিমতা বলে অভিহিত করেছেন এবং তা ফেলে দিয়েছেন। আর বলেছেন: “আমার ধারণা এটি ইহুদিদের পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়।” তিনি মানুষকে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। [১]

এই ধরনের কৃত্রিমতার নিষেধাজ্ঞা তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছিলেন, তাই তিনি এ বিষয়ে তাকিদ দিয়ে বলতেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) ‘যূর’ থেকে নিষেধ করেছিলেন, অথচ তোমরা এখন এই মন্দ পথ অবলম্বন করছ।”

একদিন এক ব্যক্তি লাঠির সাহায্যে মাথায় এ ধরনের কিছু বেঁধে আসলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন:

“মনোযোগ দিয়ে শোনো, এটাই হলো সেই কৃত্রিমতা।” [২]

কিছু লোক ফ্যাশনেবল চুল রাখতে শুরু করেছিল, তিনি এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। একবার মদিনা মুনাওয়ারায় এসে তিনি মসজিদে নববীর মিস্বরে এ ধরনের একগুচ্ছ চুল মানুষকে দেখালেন—(এই চুলগুলো কোনো ফ্যাশনপ্রিয় ব্যক্তির কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছিল) এবং বললেন: “আমি যেন ভবিষ্যতে কোনো ইহুদিকে এ ধরনের কাজ করতে না দেখি। নবী করীম (সা.) একে কৃত্রিমতা বলে অভিহিত করেছেন।” [৩]

তিনি আরও বললেন: “হে মদিনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায় গেলেন? আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: বনী ইসরাঈলের নারীরা যখন এই ফ্যাশন শুরু করেছিল, তখন তাদের ওপর আযাব এসেছিল।” [৪]

দ্বীনকে আসল রূপে বজায় রাখার প্রেরণা:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দ্বীনকে তার আসল রূপে রাখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। তিনি বিদআতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। দ্বীনের মধ্যে কোনো প্রকার কম-বেশি বা সংযোজন তিনি সহ্য করতেন না। তিনি জানতে পারলেন যে, কিছু লোক আসরের পর নফল নামাজ পড়ছে। তিনি তার খুতবায় এ বিষয়ে ধরপাকড় করলেন এবং বললেন: “তোমরা এমন এক নামাজ শুরু করেছ যা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে থাকাকালীন তাঁকে পড়তে দেখিনি, বরং নবী করীম (সা.) আসরের পর দুই রাকাত নফল পড়তে নিষেধ করেছেন।” [৫]

মানব জীবনের মূল্য ও মর্যাদা:

এটি প্রসিদ্ধ যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মানুষকে হত্যা করাতেন, অথচ তিনি নিজে বলতেন:

“আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর কাছে প্রতিটি গুনাহ মাফ হওয়ার আশা আছে, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে কাফের অবস্থায় মারা যায় অথবা যে কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে।” [৬]

অ-ইসলামী রীতিনীতি থেকে পরিহার:

লোকেরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে অনারব (আজমি) রাজকীয় রীতিনীতির ধারক হিসেবে প্রসিদ্ধ করেছে, অথচ তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য অ-ইসলামী আদব ও লৌকিকতা মোটেও পছন্দ করতেন না। একবার তিনি...

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ১৫৭০৬; সুনানে নাসায়ী মুজতাবা, হা: ৫২৩৬

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৫৭০৩, বাব তাহরীম ওয়াসল আল-ওয়াসিলাহ ওয়াসল-মুসতাওসিলাহ

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৫৯৩৮, কিতাবুল লিবাস, বাব আল-ওয়াসল ফিশ-শা’র

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৯১১

[৫] শরহ মাআনী আল-আসার, হা: ১৮২৩

[৬] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৯৫৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-এর নিকট তাশরিফ নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বসে রইলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদের সতর্ক করলেন এবং বললেন: “এমন করো না, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ হলো: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে মানুষ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।” [১]

তোষামোদকারীদের প্রতিরোধ:

কিছু লোক হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে একজন তোষামোদপ্রিয় শাসক হিসেবে গণ্য করেছেন যার কাছে সত্যবাদী লোকদের কোনো স্থান ছিল না। যার কাছে কেবল চাটুকাররাই মর্যাদা পেত। অথচ আপনি (রা.) চাটুকারিতাকে ঘৃণা করতেন। তোষামোদকারী লোকদের থেকে বাঁচার জন্য আপনি (রা.) প্রশংসা ও স্তুতি থেকে নিষেধ করতেন। তিনি এই হাদিসটি শোনাতেন:

“إِيَّاكُمْ وَالْمَادِحَ فَإِنَّهُ ذَبْحٌ”

প্রশংসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এটি জবেহ করার সমতুল্য। [২]

সত্যবাদিতায় উৎসাহ প্রদান ও বিবেকের স্বাধীনতা:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সত্য বলার পরিবেশ যদিও খিলাফতে রাশেদার মতো ছিল না, তবুও সত্যবাদী লোক বিদ্যমান ছিল এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদের কঠোর কথাগুলো হাসিমুখে শুনতেন। বরং কখনো যদি মানুষের মধ্যে সত্য বলার সাহস কম দেখতেন, তবে ভয় পেতেন যে তিনি যেন জালিম ও স্বৈরাচারী শাসকদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যান।

একবার আপনি (রা.) বক্তৃতায় পরীক্ষার স্বরূপ এই বাক্যটি বললেন: “এই সম্পদ আমাদের, যাকে ইচ্ছা দেব আর যাকে ইচ্ছা দেব না।” কেউ কোনো আপত্তি করল না। দ্বিতীয় জুমায় বক্তৃতায় আবার এই একই বাক্য বললেন। মানুষ চুপ থাকল। তৃতীয় জুমায় যখন এই একই বাক্য বললেন, তখন এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠল: “সম্পদ আমাদের, যদি কেউ বাধা দেয় তবে আমাদের তলোয়ার ফয়সালা করবে।” হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নামাজের পর তাকে সাথে নিয়ে গেলেন, নিজের সাথে আসনে বসালেন এবং উপস্থিতদের বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আমি শুনেছিলাম যে, অচিরেই এমন কিছু লোক আসবে যাদের কথার কেউ প্রতিবাদ করবে না। তারা বানরের মতো দোজখে নিষ্কিপ্ত হবে।” আমি দুই জুমা পর্যন্ত সেই কথা বলেছি, কোনো প্রতিবাদ হয়নি, তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম যে আমি সেই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেলাম কি না। এই ব্যক্তি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাকে ভালো রাখুন, আশা করি আল্লাহ আমাকে সেই জালিমদের মধ্যে গণ্য করবেন না। [৩]

একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জুমার খুতবায় প্লেগ রোগ থেকে পলায়ন করা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদিস শোনালেন এবং তাতে কোনো ভুল করে ফেললেন। হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রা.) খুতবা চলাকালীনই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন:

[১] শরহে মুশকিলুল আসার লিত-তাহাবি, খণ্ড: ১১/৩৭; মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, হা: ১০৩২; মুসনাদে আহমাদ, হাদিসে মুয়াবিয়া (রা.), হা: ১৬৮৭৬

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮২৬ সহিহ সনদে; আল-মু'জামুল কাবির লিত-তাবারানি: ১৯/৩৫০, ত মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া

[৩] মুসনাদে আবি ইয়াল্লা, হা: ৭৩৮৪, ত দারুল মামুন লিত-তুরাস দামেস্ক, সহিহ সনদে

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

“তোমার মা তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সালাতের পর হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.)-কে ডাকলেন এবং ইমামকে খুতবার সময় বাধা দেওয়ার জন্য সতর্ক করলেন। কিন্তু যখন তাঁর কথা শুনে নিশ্চিত হলেন যে সত্যিই হাদিস শোনানোর ক্ষেত্রে ভুল হয়ে গেছে, তখন আসরের সালাতের পর মিস্বরে নিজে ঘোষণা করলেন: “আমি মিস্বরে আপনাদের সামনে একটি হাদিস বর্ণনা করেছিলাম, বাড়ি গিয়ে জানতে পারলাম হাদিসটি তেমনই যেমন হযরত উবাদা বর্ণনা করেন। অতএব তাঁর থেকেই উপকৃত হোন, তিনি আমার চেয়ে বড় আলেম।” [১]

হযরত মিসওয়্যার বিন মাখরামা (রা.) একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে কোনো প্রয়োজনে গেলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “মিসওয়্যার! আপনি শাসকদের ওপর যে আপত্তিগুলো করে থাকেন সেগুলোর কী অবস্থা?”

তিনি ইতস্তত করলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জেদ ধরলেন।

“না, আপনি আপনার মনের সব কথা বলে ফেলুন।”

হযরত মিসওয়্যার (রা.) বলেন: তাঁর প্রতি আমার যত অভিযোগ ছিল সব বলে দিলাম, কোনো কথাই বাদ রাখিনি।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেগুলো শুনে বললেন: “ভুলত্রুটি থেকে কেউ পবিত্র হতে পারে না। আপনি নিজের মধ্যেও এমন কিছু অনুভব করেন নিশ্চয়ই যে, যদি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা না করেন তবে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।”

হযরত মিসওয়্যার (রা.) বললেন: “অবশ্যই।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “তাহলে আপনি আমাকেও নিজের মতো আল্লাহর কাছে ক্ষমার অধিকারী কেন মনে করেন না? আল্লাহর কসম! আমি জনগণের সংশোধন, শরিয়ি বিধান বাস্তবায়ন এবং জিহাদের যেসব খিদমতে নিয়োজিত আছি তা এই ভুলগুলোর চেয়ে বেশি। আর আমি সেই দ্বীনের অনুসারী যাতে রব নেক আমল কবুল করেন এবং গুনাহ ক্ষমা করেন।”

তারপর বললেন: “আল্লাহর কসম! যখনই আমার সামনে আল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ আসে, তখন আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বেছে নিই না।”

হযরত মিসওয়্যার (রা.) বলেন: আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দলিলের ওপর চিন্তা করতে থাকলাম। আমি মেনে নিলাম যে তিনি এই কথোপকথনে আমাকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন। এরপর হযরত মিসওয়্যার (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কথা উঠলে সবসময় তাঁর জন্য কল্যাণের দোয়া করতেন। [২]

অনাড়ম্বর জীবনযাপন:

জীবনযাপন এতটাই অনাড়ম্বর ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন বিশ্রাম নিতেন তখনও তাঁর সাথীরা আশেপাশে বসে নির্দিধায় কথাবার্তা বলতেন। কারো ওপর কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। [৩]

[১] জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, খণ্ড: ৫৮৩২; তারিখু দামেশক: ২৬/৯৫, তরজমা: উবাদা বিন সামিত।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/১৫১, ত রিসালাহ।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৯৫২।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

শরয়ী খুঁটিনাটি, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি খেয়াল:

কিছু মানুষের ধারণা যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কেবল একজন দুনিয়াবী শাসক ছিলেন, তাঁর মনোযোগ কেবল রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও বিস্তৃতির দিকে ছিল, ইসলামের পুনর্জাগরণ ও চারিত্রিক গঠনের দিকে নয়। তাই তারা তাঁর ফিকহী খুঁটিনাটি বিধান ও সুন্নাতসমূহের প্রতি মনোযোগকে উপেক্ষা করে যান। হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত তথ্যাদি এই ধারণাকে খণ্ডন করে।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কেবল সুন্নাত নয় বরং মুস্তাহাবসমূহেরও পাবন্দি করতেন। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে জামাতে সালাত আদায় করলেন এবং এরপর সেই স্থানেই সুন্নাত শুরু করে দিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সালাতের পর তাঁকে ডাকলেন এবং এই হাদীসটি শোনালেন: “لَا تُصَلِّ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ” (সালাতের সাথে সাথে অন্য সালাত মিলাবে না, যতক্ষণ না কোনো কথা বলো অথবা সেখান থেকে সরে যাও।) [১]

সুন্নাত প্রচারের উদ্দীপনা:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সুন্নাত ও ফিকহ শাস্ত্রের আলিম ছিলেন এবং এই ইলম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর প্রবল উদ্দীপনা ছিল। দ্বীন প্রচারকে তিনি মুসলিম শাসকের অন্যতম দায়িত্ব মনে করতেন, তাই সুযোগ বুঝে হাদীস বর্ণনা করতেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সাথীদের উযু করে দেখাতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবেই উযু করতেন। মানুষ সাধারণত মাথার মাসাহ করার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ব্যবহারিকভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কীভাবে হাতের তালু মাথার সামনের অংশে রেখে পেছনের ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন এবং কীভাবে পুনরায় কপালে ফিরিয়ে আনতেন। [২]

একজন তাবিঈ বলেন: আমরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় আযান শুরু হলো। তিনি ‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার’ থেকে শুরু করে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ পর্যন্ত প্রতিটি বাক্যের অনুরূপ জবাব দিলেন। ‘হাইয়া আলাস-সালাহ’ এবং ‘হাইয়া আলাল-ফালাহ’-এর স্থলে ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পড়লেন এবং বাকি শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর বললেন: “আমি তোমাদের নবী (সা.)-কে এভাবেই বলতে শুনেছি।” [৩]

বিশেষ দিনসমূহ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান ও ভারসাম্য:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বিশেষ দিনসমূহ যেমন: শবে কদর, ১০ই মহররম ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন যেন তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের এই দুর্লভ সুযোগগুলো থেকে ফায়দা হাসিল করে। তাঁর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী বর্ণিত হয়েছে: “রমজানের সাতাশতম রাতে শবে কদর তালাশ করো।” [৪]

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হা: ৩৯৩৩, ত: আল-ইলমিয়াহ।

[২] মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ১৬৮৫৫, ১৬৮৫৩।

[৩] আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হা: ১৯২৮; সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ২/২১৩; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৯৬, ১৬৮৩২, ১৬৮২৮।

[৪] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৩৬৮০।

কিন্তু এই ধরণের উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখতেন, যাতে একটি মুস্তাহাব আমলকে সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিব মনে না করা হয়। একবার ১০ই মহররম আপনি মদীনা মুনাওয়ারায় লোকদের সম্বোধন করে বললেন: “হে মদীনাবাসী! আজ আশুরার দিন, এর রোজা তোমাদের ওপর ফরজ নয়। তবে আমি রোজা রেখেছি। তোমাদের মধ্যে যে চায় সে রাখুক, আর যে চায় সে না রাখুক।” [১]

ছাত্রসুলভ আবেগ:

একজন আলেম ও ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও আপনি নিজেকে ইলম অন্বেষণকারী মনে করতেন। সারাজীবন সুন্নত শিখতে থাকেন। হযরত মুগীরা বিন শু’বা (রা)-কে চিঠি লিখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজের পর যে দোয়া পড়তেন তা লিখে পাঠান। তিনি দোয়াটি লিখে পাঠালেন:

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আ’তাইতা ওয়ালা মু’তিয়া লিমা মানা’তা, ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদি মিনকাল জাদু।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা) এই দোয়া মুখস্থ করে অন্যদেরও শেখাতে লাগলেন। [২]

দ্বীনি মাসআলা নিয়ে গবেষণা:

হযরত মুয়াবিয়া (রা) যতক্ষণ কোনো ফিকহি মাসআলা নিয়ে পূর্ণ গবেষণা না করতেন এবং পুরো সনদ সম্পর্কে অবগত না হতেন, ততক্ষণ সন্তুষ্ট হতেন না। শরয়ী মাসআলা ও সুন্নত শেখার এবং তা প্রচার করার প্রতি তাঁর এত আগ্রহ ছিল যে, একবার খুতবা চলাকালীন মিম্বরে বসেই হযরত কাসীর বিন সালাত (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে এই মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করে আসেন। [৩]

একটি মাসআলার জন্য এই পর্যায়ের অনুসন্ধান হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর ইলমি ও গবেষণামূলক রুচির স্পষ্ট প্রতিফলন।

ইলমি ও ফিকহি দক্ষতা এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের আপনার ইলমের ওপর আস্থা:

সুন্নতের ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর দৃষ্টি এতটাই গভীর ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ অত্যন্ত আস্থার সাথে গ্রহণ করতেন, এমনকি বনু হাশিমের সাহাবীগণও হাদিসের ক্ষেত্রে তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা করতেন। ইলমি ও ফিকহি দক্ষতার অবস্থা এই ছিল যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর মতো ইলম সাগরও তাঁর কাছ থেকে কিছু সুন্নত শিখেছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) হজের সময় তাওয়াফ চলাকালীন দেখলেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) কাবার চার কোণেই ইস্তিলাম (চুম্বন বা স্পর্শ) করছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে বললেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল দুটি কোণের (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানি) ইস্তিলাম করেছিলেন।” [৪]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) নিজেই একবার বলেছিলেন: “আমাকে হযরত মুয়াবিয়া (রা) জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছেন এবং তিনি (সা) কাঁচি দিয়ে নিজের মোবারক চুল ছেঁটেছিলেন।” হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ছাত্র হযরত মুজাহিদ এবং...

[১] শরহ মাআনী আল-আসার: ৩২৯৮, বাব সাওম আশুরা।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭২১৫, কিতাব আল-কদর, বাব লা মানিআ লিমা আ’তাইতা।

[৩] শরহ মাআনী আল-আসার: ১৮০৫; মুসনাদ আশ-শাফিঈ: ৩৬৩/১।

[৪] মুসনাদ আহমাদ, হা: ১৬৮৫৮; গয়াতুল মাকসাদ (যাওয়ায়েদুল মুসনাদ লিল হাইসামী): ৬৩/২।

আতা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতে লাগলেন: “হযরত! এই হাদিস আমরা অন্য কারো কাছ থেকে শুনি নি।”

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতে লাগলেন:

“মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন ছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের ব্যাপারে তাঁর ওপর সন্দেহ করা যায়।” [১]

আল্লাহর হুদুদ কায়েম করা, রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব:

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর হুদুদ স্থগিতকারী, দ্বীন বাস্তবায়ন বর্জনকারী এবং রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য জুলুমকারী হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, অথচ তিনি সর্বদা এই বিষয়ের ওপর জোর দিতেন যে, দ্বীন কায়েম করাই হলো সরকারের ভিত্তি। এই উম্মতের শাসন ও রাষ্ট্র দ্বীনের ভিত্তির ওপরই টিকে থাকবে, অন্যথায় নয়। একবার এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, এই খিলাফতের বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যে থাকবে। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অধোমুখে নিপতিত করবেন, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা দ্বীন কায়েমের ওপর অটল থাকবে।” [২]

খিলাফতের গুরুত্ব:

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য খিলাফত ও নেতার উপস্থিতি এবং জনগণের তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন এবং এই হাদিসটি শোনাতেন: “যে ব্যক্তি কোনো নেতা ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।” [৩]

দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার প্রতিকার: শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা

নতুন ফিতনা এবং দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার লক্ষণসমূহ তাঁর দৃষ্টিতে ছিল এবং তাঁর মতে এর একমাত্র সমাধান ছিল এই যে, সর্বপ্রথম এই দ্বীনের আদি আহ্বানকারী অর্থাৎ আরবগণ শরীয়তের ওপর সেই রূপে আমল করবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে এসেছিলেন।

একবার তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু হজের সময় মক্কা মুকাররমায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হলো: ইহুদি ও নাসারারা তাদের দ্বীনের মধ্যে বিভক্তির শিকার হয়ে ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই উম্মত অচিরেই ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে। সেই নাজাতপ্রাপ্ত দলটি হলো মুসলমানদের জামাত (সওয়াবে আজম অর্থাৎ জমহুর মুসলিমিন)।” [৪]

তারপর তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যথিত হৃদয়ে উপস্থিতদের সম্বোধন করে বললেন:

“আল্লাহর কসম! হে আরব গোত্রসমূহ! তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনে মুবিন নিয়ে এসেছেন, তোমরা যদি তার ওপর অটল না থাকো, তবে অন্যদের কাছ থেকে কী আশা করা যেতে পারে যে তারা এই দ্বীনকে রক্ষা করবে।” [৫]

সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা:

সাহাবায়ে কেরামের সকল স্তরের লোকদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতেন, কারো মনে কষ্ট না হওয়ার...

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৭৩; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তবারানি: ১৯/৩০৯

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭১৩৯; কিতাবুল আহকাম, বাবুল উমারা মিন কুরাইশ

[৩] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তবারানি: ১৯/৩৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৬২; সহীহ সনদে

[৫] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৯৩৭

দিতে। একবার আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: “তোমাদের ফযীলত সম্পর্কে আমি কি তোমাদের একটি হাদীস শোনাব না! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: ‘যে আনসারদের ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, আর যে আনসারদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহও তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেন।’” [১]

জিহাদ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা:

জিহাদ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল। তিনি যৌবনেই জিহাদের ঝাণ্ডা তুলেছিলেন এবং জীবনের শেষ বছরগুলো পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। তলোয়ারধারী এবং কলমধারী মুজাহিদদের তিনি উৎসাহ দিতেন। এ বিষয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী শোনাতেন। তার মধ্যে এই হাদীসটিও ছিল: “এই উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের ওপর অটল থাকবে, তাদের বিরোধিতাকারী বা মিথ্যা প্রতিপন্নকারী তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তারা এভাবেই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” [২]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জিহাদের ধারাকে বেগবান করতে গিয়ে ইউরোপ জয় করতে চেয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপল অভিযানের জন্য তিনি বড় বড় সাহাবী এবং নিজের সন্তানদের পাঠিয়েছিলেন। নিজের সঙ্গীদের প্রতি তার শেষ উপদেশ ছিল:

“রোমকদের কণ্ঠরোধ করো, কারণ তাদের মাধ্যমেই তোমরা অন্য জাতিগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে।” [৩]

ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলমানরা যতক্ষণ এই দূরদর্শী ব্যক্তির এই উপদেশ মনে রেখেছিল, ততক্ষণ সারা বিশ্বে তাদের আধিপত্য বজায় ছিল। কিন্তু যখনই তারা এটি ভুলে গেল এবং ইউরোপকে মাথা তোলার সুযোগ দিল, তখনই তাদের শান-শওকতের বড় বড় দুর্গ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

হাদীস বর্ণনায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পদ্ধতি:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হাদীস বর্ণনায় সনদের গুরুত্ব খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। তাই হাদীস শোনানোর সময় তার নিয়ম ছিল যে, কোনো অবস্থাতেই যেন সনদের কোনো অংশ বাদ না পড়ে। তিনি সর্বদা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলতেন:

“সমি’তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম”

(আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি—)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত প্রায় সকল বর্ণনা এভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। [৪]

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ৩২৩৫৬, কিতাবুজ জুহদ; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮২৭৩।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৪০, কিতাবুত তাওহীদ, বাব: কওলুল্লাহ: ইন্নামা কওলুনা লিশাই।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২৩০।

[৪] আল-নাজার মারওয়িয়াত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান ফি “মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল” নম্বর: ১৭৮৩৮ থেকে নম্বর: ১৬৯৩০ পর্যন্ত।

পরকালভীতির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন যাতে কোথাও কোনো অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা না হয়ে যায়। তিনি নিজে বলতেন: “এমন কেউ নেই যার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার মতো ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং সে আমার চেয়েও কম হাদীস বর্ণনা করে।” [১] ইলমী মহলে এটাও বলা হতো: “হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন।” [২]

জাল রেওয়ায়াত প্রতিরোধ ও তার ওপর তিরস্কার

এই যুগে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীগুলোর এজেন্ট এবং জাহেল ওয়ায়েজরা (বক্তারা) মনগড়া হাদীস ছড়াতে শুরু করেছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কঠোরভাবে তাদের খণ্ডন করতেন। যদি তিনি এমন কোনো বর্ণনা শুনতেন তবে তার প্রতিক্রিয়া হতো অত্যন্ত তীব্র। মিথ্যা হাদীস ছড়ানোর নিন্দা জানিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীসটি শোনাতেন: “যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।” [৩]

জাল রেওয়ায়াত চেনার মানদণ্ড

কোনো হাদীস মনগড়া হওয়ার আলামত তাঁর নিকট এই ছিল যে, তা কুরআনী আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী হবে অথবা সহীহ সনদে বর্ণিত হবে না অথবা তা নফসের খাহেশাত বা প্রবৃত্তির অনুসরণকারী হবে।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন: “আমি শুনেছি যে তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমন হাদীস শোনাচ্ছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও বর্ণিত নয়। এরা তোমাদের জাহেল লোক; তাদের থেকে বেঁচে থাকো এবং সেই প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকো যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।” [৪]

জাল বর্ণনাকারী ও জাহেল ওয়ায়েজদের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একটি মহান কীর্তি ছিল এই যে, তিনি জাল রেওয়ায়াতের ধারা বন্ধ করার জন্য জাহেল ওয়ায়েজদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। তাঁর যুগে সরকারিভাবে নিয়োগ বা পূর্ণ অনুমতি লাভ করা ব্যতীত সাধারণ মজলিসে রেওয়ায়াত ও কিছা শোনানোর অনুমতি ছিল না। কারণ এভাবে জাহেল লোকেরা সব ধরনের বর্ণনা ছড়িয়ে দেয়।

হজ্জের সময় জানা গেল যে মক্কা মুকাররমায় বনু মাখজুমের একজন আযাদকৃত গোলাম মানুষকে কিছা ও কাহিনী শোনাচ্ছে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমাকে কি এর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে?” সে বলল: “জ্বী না!” তিনি বললেন: “তাহলে অনুমতি ছাড়া এই কাজ করার অর্থ কী?” সে বলল: “আমরা তো সেই ইলম ছড়াচ্ছি যা আল্লাহ দিয়েছেন।”

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৬৩২, বাব ফজলুল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কুরআন, ত: দারুল জাহল।

[২] কান মুয়াবিয়া কল্লামা ইউহাদিসু আন রাসূলিল্লাহ ﷺ। (মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, হা: ১০৩৭)

[৩] শরহ মুশকিলিল আসার, খ: ৩৯৫; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৯/৩৯২, ত: মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

[৪] সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৩৯৭, কিতাবুল আহকাম, বাবুল উমারা মিন কুরাইশ।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তিনি বললেন: “আমি যদি তোমার মজলিসে আসতাম, তবে তোমার জিহ্বা কেটে দিতাম।” [১]

এই ভুল ধারণার খণ্ডন যে কেবল অভ্যন্তরীণ সংশোধনই যথেষ্ট:

সেই যুগে কিছু বিভ্রান্ত ফেরকা তলে তলে সক্রিয় হয়ে উঠছিল। সম্ভবত তাদের প্রভাবে সেই যুগের মানুষ এই ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিল যে, বাহ্যিক দিক শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া জরুরি নয়, শুধু অন্তর পরিষ্কার থাকলেই হবে। এই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করে তিনি (রা.) একবার বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: তোমাদের আমলের উদাহরণ একটি পাত্রে মতো; যদি এর উপরিভাগ ভালো হয় তবে এর নিচের অংশও ভালো হবে, আর যদি উপর থেকে নোংরা হয় তবে ভেতর থেকেও নোংরা হবে।” [২]

এর উদ্দেশ্য ছিল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক পবিত্র এবং শরীয়ত অনুযায়ী রাখা উচিত।

উলামা, তলাবা এবং মুয়াজ্জিনদের উৎসাহ প্রদান:

তিনি যখন মসজিদে ইলম ও জিকিরের মজলিসে মানুষকে দেখতেন, তখন অত্যন্ত আনন্দিত হতেন এবং তাদের উৎসাহ দিতেন। একবার তিনি একটি জিকিরের হালকায় (চক্রে) গেলেন এবং শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি কেবল জিকিরের জন্যই বসেছ?” ইতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও একবার এভাবেই একটি জিকিরের মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তারপর বলেছিলেন: ‘আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন’।” [৩]

তিনি বক্তৃতা বা প্রতি জুমায় ইলম অন্বেষণকারীদের উৎসাহ দিতে গিয়ে এই হাদিসটি শোনাতে: “আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফেকাহ) দান করেন।” [৪]

মুয়াজ্জিনগণ উম্মতের সেই শ্রেণী যাদের মর্যাদা ও গুরুত্বকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই ব্যক্তিদের অত্যন্ত মূল্যায়ন করতেন। তাদের উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি এই হাদিসটি শোনাতে: “إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ” (নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদের ঘাড় সব মানুষের চেয়ে দীর্ঘ হবে)। [৫]

দুনিয়া বিমুখতা, আখেরাতের চিন্তা এবং নববী প্রেম:

দুনিয়ার সাজসজ্জা ও কামনা-বাসনার প্রতি তাঁর (রা.) কোনো আগ্রহ ছিল না। অন্তর সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় বিভোর থাকত। এ বিষয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসসমূহ অধিক পরিমাণে স্মরণ করতেন এবং সাথীদের শোনাতে।

একবার বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দুনিয়াতে পরীক্ষা ও ফিতনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।” [৬]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩৫, ত. দারুল ফিকর

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৯৯

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৭০১, বাব ফজলুল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কুরআন

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৩৭, ১২৮৮৮; শারহ মুশকিলিল আসার, হা: ১৬৮৩; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তবারানি: ১৯/৪৬১

[৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা: ২৩৩১, ত. আর-রুশদ; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকি, হা: ২০৩৬, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৬] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৯৯

একবার খুতবা দেওয়ার জন্য মিস্বরে উপবিষ্ট হলেন। মানুষের চেহারার দিকে তাকালেন এবং ইস্তিগফার পড়ে কেঁদে দিলেন। তারপর বললেন: “চেহারা অনেক কিন্তু মারেফাতের চিহ্ন কম। মানুষ একে অপরের সমসাময়িক হয়। মানুষের মৃত্যুর লক্ষণ হলো তার সমসাময়িকরা বিলীন হয়ে যাওয়া। সিফফিনের যুদ্ধে আমার সাথে রাসুলের অনেক সাহাবী ছিলেন, আজ জমিনের বুকে তাদের মতো কেউ নেই।” [১]

এই কথা বলে মিস্বর থেকে নামলেন এবং কয়েক দিন পরেই ইন্তেকাল করলেন। [২]

নবী আকরাম ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে, যখন বয়স ৬৩ বছর হলো তখন আপনার তামান্না ছিল যেন এই বয়সেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, যাতে এই অনৈচ্ছিক সুন্নতের ওপর আমল হয়ে যায়। [৩]

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বাকস্বাধীনতা:

কিছু সমালোচকের দাবি হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে বিবেকের ওপর তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা ছিল না।

এই অভিযোগ এতটাই ভিত্তিহীন যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধিকাংশ বিরোধীরাও এর সাথে একমত নন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নম্রতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, উদারতা এবং সহিষ্ণুতা এমন গুণাবলি যা সাধারণ ইতিহাসবিদ তো বটেই, বিরোধী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন। নিচে কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা পেশ করা হলো:

একবার এক ব্যক্তি সাইয়ে্যদনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দীর্ঘক্ষণ গালিগালাজ করতে থাকল এবং তিনি চুপ থাকলেন। লোকজন বলল: “আপনি কি এর ওপরও সবর প্রদর্শন করবেন?”

বললেন: “আমি মানুষ এবং তাদের জিহ্বার মাঝখানে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধা হতে চাই না যতক্ষণ না তারা আমাদের হুকুমতের (শাসনের) পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।” [৪] (অর্থাৎ বিদ্রোহে লিপ্ত না হয়)

একবার এক ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অত্যন্ত কটু কথা শোনাল। উপস্থিতরা পরে বলল: “আপনি জবাব দিলে ভালো হতো।” বললেন: “আমি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জা পাই যে আমার সহনশীলতা আমার প্রজাদের কোনো ব্যক্তির ভুলের তুলনায় কম প্রমাণিত হোক।” [৫]

জনগণের খুশি এবং প্রশান্তিকে তিনি সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন, তাই তিনি ওইসব লোকদের বন্ধু ও নিকটবর্তী বানাতেন যারা জনগণের...

[১] কাসরাতুল উজুহ ওয়া কিল্লাতুল মাআরিফ ওয়া ইন্নামান নাসু কুর্‌নুন ওয়া মিন ফানাউল মারয়ি ফানাউ করনিহি, লাকাদ শাহিদা মাঈ সিফফিনা জুমলাতুন মিন আসহাবি মুহাম্মাদ ﷺ মা আসবাহা আলা ওয়াজহিল আরদি মিসলা আদলিহিম। (আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, উবাদাহ বিন নুসাই থেকে বর্ণিত, রেওয়াত নম্বর: ৫০০) এর সনদ বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি’), কারণ উবাদাহ বিন নুসাই ১১৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন যখন তিনি যুবক ছিলেন। (ইকমালু তাহজিবিল কামাল লিল মুগলাতাই: ৭/১৯৩, ত. আল-ফারুক আল-হাদিস) হাফিজ আয-যাহাবি বলেন “আমার ধারণা বড়দের থেকে তার বর্ণনা বিচ্ছিন্ন।” (আল-কাশিফ ফি মা’রিফাতি মান লাহ রেওয়াতুন ফিল কুতুবিস সিভাহ: ১/৫৩৩, ৫৩৪)

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর: ১৬৯১৯

[৩] উয়ুনুল আখবার লি ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি: ১/৬৩, ত. আল-ইলমিয়াহ; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/১২৬, সন ৬০ হিজরি

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৩৫, জীবনী: মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

...কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও মহব্বতের পাত্র হতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল: “আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কারা?”

তিনি বললেন: “যাদেরকে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।” [১]

কখনো কখনো মানুষের কঠোর কথা ও অভদ্রতার জবাবে তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও শুভাকাঙ্ক্ষার চমৎকার নমুনা পেশ করতেন। আবু জাহম নামক এক ব্যক্তি তাঁর সাথে রুঢ় ভাষায় কথা বলতে থাকেন, তিনি মাথা নিচু করে চুপ করে রইলেন। যখন সে মনের ঝাল মিটিয়ে ফেলল, তখন তিনি বললেন: “শাসকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, তাদের রাগ শিশুদের মতো হয় আর পাকড়াও হয় সিংহের মতো।”

এরপর সেই ব্যক্তিকে পুরস্কার ও সম্মান দিয়ে বিদায় করলেন। [২]

মত প্রকাশ, সত্যবাদিতা ও হক কথা বলার উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তোষামোদ ও অতি প্রশংসা থেকে নিষেধ করতেন। মারওয়ান বিন হাকামের ভাই আবদুর রহমান বিন হাকামকে কবিতা ও ছন্দচর্চায় মগ্ন দেখে তিনি বললেন:

“কাসিদা (প্রশংসামূলক কবিতা) বলা থেকে বেঁচে থেকো; কারণ এটি নির্লজ্জ মানুষের উপার্জন।” [৩]

এই বর্ণনাগুলো জোরালো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সাইয়েদেনা মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তোষামোদপূর্ণ কথা অপছন্দ করতেন, তিনি বিবেকের স্বাধীনতার উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর যুগে জনগণের কণ্ঠরোধ করা হয়নি যেমনটি কিছু মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে, বরং সেখানে সহনশীলতা, ক্ষমা ও নম্রতার পরিবেশ ছিল। স্বয়ং বড় বড় সাহাবীগণ এর সাক্ষ্য দিতেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রাজনীতিতে ক্ষমা ও উপেক্ষা করার দিকটি ছিল সুস্পষ্ট। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রবীণ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন। [৪]

তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর গভর্নর থাকাকালীন সময়ে একটি হাদীস শুনিয়েছিলেন যার ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমল করেছিলেন এবং তাঁর শাসনকাল সফল হয়েছিল। এটি দেখে হযরত আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন: “মুয়াবিয়াকে একটি বাক্য উপকৃত করেছে যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছিলাম, তা হলো—মানুষের গোপন বিষয়গুলোর পেছনে পড়ো না, অন্যথায় তুমি তাদের নষ্ট করে দেবে।” [৫]

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বড় বড় সাহাবীদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন। একবার উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে চিঠি লিখে নসিহত স্বরূপ কোনো বিশেষ হাদীস চাইলেন। তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আমি শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ করে, তার প্রশংসাকারীরাও তার সমালোচকে পরিণত হয়।” [৬]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৫, আল-কামিল ফিত তারিখ, পৃ. ৬০ হিজরী।

[২] তারিখু দামেশক: ৫৯/১৮২, আল-মাজলিস ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম লি আবি বকর আহমাদ আদ-দিনাওয়ারী: ৩/৩০৮, মিসর সংস্করণ।

[৩] তারিখু দামেশক: ৩৩/৩১৫, আল-কামিল ফিত তারিখ: পৃ. ৬০ হিজরী।

[৪] হযরত আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতকাল দেখার সুযোগ পাননি, বরং তিনি তাঁর সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন সময়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই মন্তব্যগুলো হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন সময়ের সাথে সম্পর্কিত, তবে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতকালও এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ছিল না। দ্রষ্টব্য: আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, শাসকরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবেন না এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গাফেল থাকবেন। উদ্দেশ্য হলো, গাফেলও হওয়া যাবে না আবার প্রতিটি ব্যক্তির পেছনেও লাগা যাবে না। সাধারণ ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করা উচিত, তবে প্রকাশ্য শত্রু এবং ইসলামী মিল্লাতের শত্রুদের ওপর কড়া নজর রাখা উচিত। এই নীতি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের জন্য কার্যকর। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগেও সাধারণ নাগরিকদের সাথে ক্ষমা ও নম্রতার আচরণ করা হতো, পক্ষান্তরে শত্রুদের ওপর কড়া নজর রাখা হতো।

[৫] একটি বাক্য যার দ্বারা আল্লাহ মুয়াবিয়াকে উপকৃত করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: মানুষের দোষ অনুসন্ধান করো না, অন্যথায় তোমরা তাদের নষ্ট করে দেবে। (আল-মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৯/৩১১)

[৬] আখবারুল মাকীন মিন তারিখ ইবনে আবি হাইসাম, পৃ. ৩৯, দারুল রওজা।

ইতিহাস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং সমাজবিজ্ঞানের জনক আল্লামা ইবনে খালদুন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সহনশীলতা সম্পর্কে বলেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আরবের নেতৃবৃন্দ এবং মুদার গোত্রসমূহের সাথে উপেক্ষা ও ক্ষমার আচরণ করতেন, কষ্টদায়ক ও অপ্রীতিকর বিষয়গুলো সহ্য করতেন এবং সেগুলোর ওপর ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি সহনশীলতার এমন চরম শিখরে ছিলেন যে অন্য কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারত না।” [১]

শিয়া ঐতিহাসিক মাসউদী-র এই বক্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য:

“আমীর মুয়াবিয়ার পর আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এবং তার মতো কিছু লোক হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর চরিত্র অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার মতো ধৈর্য, তার মতো রাজনৈতিক দক্ষতা, তার মতো পরিস্থিতির উপলব্ধি, মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের আপ্যায়ন এবং তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী দয়া ও অনুগ্রহের ব্যবস্থা আর কেউ করতে পারেনি।” [২]

শিয়া ঐতিহাসিক ইয়াকুবীর বর্ণনা হলো:

“মুয়াবিয়া (রা.) বলতেন যে, যেখানে আমার চাবুক কাজ দেয় সেখানে আমি তলোয়ার ব্যবহার করি না এবং যেখানে কথা দিয়ে কাজ হয়ে যায় সেখানে চাবুক ব্যবহার করি না। যদি আমার এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক একটি চুলের মাধ্যমেও যুক্ত থাকে, তবে আমি তাও ছিঁড়তে দেব না। জিজ্ঞাসা করা হলো: তা কীভাবে? তিনি বললেন: যখন তারা টানবে তখন আমি টিল দেব। আর যখন তারা টিল দেবে তখন আমি টেনে নেব।” [৩]

জানা গেল যে, সাইয়েদুনা মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞার অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৫

[২] মুরুজুয যাহাব: ৩/৩০২, ত. আল-জামিআতুল লুবনানিয়্যাহ

[৩] তারিখ ইয়াকুবী: পৃ. ২০২

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকালের প্রকৃত মর্যাদা

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকাল সম্পর্কে আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের আলোকে যে চিত্র উপস্থাপন করেছি, তা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর শাসনকালও শরীয়তের অনুসারী, ন্যায়বিচার ও ইনসাফ, জনদরদ, খোদাভীতি, জনগণের অধিকার রক্ষা এবং মিল্লাতের পাহারাদারির দিক থেকে আমাদের জন্য ঈর্ষণীয়। এই ধারণা সঠিক নয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের যুগ শেষ হওয়ার পর হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসন আসার সাথে সাথেই হঠাৎ করে ইনসাফের স্থলে জুলুম, নেকির স্থলে ফাসেকী ও পাপাচার, ত্যাগের স্থলে স্বার্থপরতা এবং সহমর্মিতার স্থলে স্বজনপ্রীতি স্থান করে নিয়েছিল।

তবে আমাদের উদ্দেশ্য এটিও নয় যে, তাঁর যুগ হুবহু খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের মতো ছিল এবং তাতে সেই বরকত, ত্যাগ ও কুরবানী এবং সাদাসিধে জীবনযাপনের সেই মানদণ্ড ছিল যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে ছিল। বরং সময়ের পরিবর্তন, পরিস্থিতির বদল, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, নওমুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য, আকাবিরে সাহাবার বিদায় এবং নবুওয়াতের যুগ থেকে দূরত্বসহ বিভিন্ন কারণে ইসলামী সমাজ হুবহু সেই মানসম্পন্ন শাসনব্যবস্থা ছিল না।

এই পরিবর্তন ও রূপান্তর ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক। যেহেতু সেই যুগে পূর্ববর্তী যুগের মতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বগণ ছিলেন না, তাই সেই পূর্ববর্তী কল্যাণ ও বরকত এই যুগে প্রত্যাশা করা যেত না।

পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় এই যুগের পার্থক্য কেবল গ্রহণযোগ্যই ছিল না, বরং পরবর্তীদের জন্য এর মানদণ্ড ছিল ঈর্ষণীয় এবং এর সমকক্ষ হওয়া কঠিন ছিল। হ্যাঁ, যেসব লোক হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগের তাকওয়া, পরহেজগারী এবং আমানত ও সতর্কতার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তারা অবশ্যই পার্থক্য অনুভব করতেন এবং কখনো কখনো এই পরিবর্তনের প্রতি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করতেন। তবে যে পরিবর্তনই আসুক না কেন, তা ছিল সময়ের স্বাভাবিক দাবি এবং বৈধতার সীমার মধ্যেই।

পরিবর্তনের একটি বড় কারণ:

আমাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তনের একটি বড় কারণ এটিও ছিল যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের সাথে সাথেই যে ফিতনার যুগ শুরু হয়েছিল, তার ফলে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, আকিদা ও মতাদর্শের জগতেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতও চলেছিল। আমাদের মতে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যা কিছু করেছেন, সম্ভবত তাঁর অভিমত ছিল যে, এই সংকটকালীন অবস্থায় সাধারণ পদ্ধতিতে (নরমাল প্রসেস) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি উন্মত্তের সাধারণ ও পরামর্শমূলক (শুরা) রাজনীতির ধারা থেকে সরে গিয়ে যে অসাধারণ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রেক্ষাপট ছিল এমনই। বর্তমান যুগেও আমরা দেখি যে, যখন কোনো গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি সংকটের শিকার হয়, তখন সেখানে কোনো...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

কোনো জেনারেল ক্ষমতায় এসে মার্শাল ল’ জারি করে দেন এবং দেশে কয়েক বছরের জন্য জরুরি অবস্থা (ইমার্জেন্সি) কার্যকর হয়ে যায়, কিছু অধিকারও স্থগিত হয়ে যায়। বিশ্বের বড় বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এমনটি বহুবার ঘটেছে এবং অধিকাংশ মানুষ মার্শাল ল’ পছন্দ না করা সত্ত্বেও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তা মেনে নেয়। কখনো কখনো পরিস্থিতি সত্যিই এমন হয় যে দেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মার্শাল ল’ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হাসান (রা.)-এর যুগে পরিস্থিতি সত্যিই এমন ছিল কি না? এটি একটি ভিন্ন বিতর্ক, তবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পরিস্থিতিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখছিলেন এবং তাঁর ‘ইমার্জেন্সি’ পদক্ষেপগুলোর পেছনে নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ইতিবাচক চিন্তা কাজ করছিল। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে একটি মর্যাদাপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন, তাই তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন না এবং তাঁর শাসনকালও ডিক্টেটরশিপ ছিল না। নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি ন্যায্যবিচারপূর্ণ খেলাফত যাতে পূর্ববর্তী খলিফাদের গুণাবলি অনেকাংশেই বিদ্যমান ছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগকে খেলাফতে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না কেন?

কথা হলো, এই গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও তাঁর যুগকে কেন খেলাফতে রাশেদা বলা হয় না, তার চারটি কারণ রয়েছে:

১. খেলাফতে রাশেদা একটি পরিভাষা, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধিত্বের (নিয়াবত) সেই উচ্চতর মান বোঝানো হয় যা তাঁর নিকটতম মুহাজির সঙ্গীরা আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রথম চারজন খলিফা ছিলেন প্রথম সারির মুহাজির সাহাবী, তাই তাঁদের খেলাফতের যুগকে খেলাফতে রাশেদা বলা হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই সারিতে ছিলেন না, তাই খেলাফতে রাশেদার পরিভাষাটি তাঁর ওপর প্রযোজ্য হয় না।

২. হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ক্ষমতায় আসা খেলাফতে রাশেদার ক্ষমতা হস্তান্তরের ‘প্রসেস’ বা প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন ছিল। খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের ইচ্ছা ছাড়াই উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের (আকাবির) সম্মতিতে শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন, পক্ষান্তরে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) চেষ্টা ও প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে শাসক হয়েছিলেন। উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঐকমত্য হওয়ার আগেই তিনি এর জন্য সচেষ্ট ছিলেন। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্ঠায় তিনি নেক নিয়ত এবং উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের ‘প্রসেস’-এর এই সুস্পষ্ট পার্থক্য তাঁর যুগকে খেলাফতে রাশেদা থেকে আলাদা করে দেয়। আল্লামা ইবনে খালদুন এই মৌলিক পার্থক্যের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে খেলাফত আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, যার কারণ ছিল তাঁর যুগে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সেই দলাদলি যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। অথচ এর আগে খেলাফত ছিল পারস্পরিক সম্মতি ও সমাবেশের মাধ্যমে; তাই উলামায়ে কেরাম উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। সুতরাং মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ও দলাদলির ভিত্তিতে হওয়া প্রথম খলিফা।” [১]

৩. চার খলিফা (খুলাফায়ে আরবাতা) নিজেদের সন্তানদের জন্য উত্তরাধিকারের পদ্ধতি চালু করেননি। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর সূচনা করেন। এই পদক্ষেপ যদিও বৈধতার সীমার মধ্যে ছিল, কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধিত্বের (নিয়াবত) উচ্চতর আদর্শ ছিল না বরং এই পদ্ধতিটি রাজতন্ত্রের সদৃশ ছিল।

[১] নিশ্চয়ই তাঁর সময়ের খেলাফত ছিল আধিপত্যের ভিত্তিতে, যার কারণ ছিল সেই গোত্রপ্রীতি (আসাবিয়াত) যা তাঁর যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। আর এর আগের খেলাফত ছিল পছন্দ ও সমাবেশের ভিত্তিতে। তাই তাঁরা (উলামায়ে কেরাম) উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তবে মুয়াবিয়া আধিপত্য ও গোত্রপ্রীতির ভিত্তিতে হওয়া প্রথম খলিফা। (তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৬৫০)

সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে: “খিলাফতে নবুওয়াত ত্রিশ বছর হবে।” [১]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ত্রিশ বছর পরের শাসনব্যবস্থা তার মর্যাদা ও মানদণ্ডের দিক থেকে ভিন্ন হবে।

খিলাফতে রাশেদার পরিভাষাকে চার খলীফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার এই চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, ‘খিলাফতে রাশেদা’ একটি পরিভাষা। এর অর্থ এই নয় যে, খিলাফতে রাশেদা ব্যতীত অন্য প্রতিটি খিলাফত বা প্রতিটি শাসনব্যবস্থা গোমরাহীর ওপর ভিত্তি করে হবে। আভিধানিক দিক থেকে প্রত্যেক নেককার খলীফাকে ‘রাশেদ’ এবং তাঁর যুগকে ‘খিলাফতে রাশেদা’ বলা যেতে পারে।

কিন্তু যেহেতু উম্মাহর জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট ‘খিলাফতে রাশেদা’ শব্দটি আকীদার ক্ষেত্রে একটি পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং এতে পরিবর্তনের চেষ্টা উম্মাহর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হবে, তাই এ ধরনের কোনো চেষ্টাকে সঠিক মনে করা যায় না।

খিলাফতে রাশেদা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আকাবির ওলামায়ে কেরামের বাণী:

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) খিলাফতে রাশেদা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের মধ্যকার পার্থক্য এভাবে স্পষ্ট করেছেন:

“যদি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগের তুলনা পরবর্তী শাসকদের সাথে করা হয়, তবে কোনো মুসলিম শাসক তাঁর চেয়ে উত্তম অতিবাহিত হননি এবং কোনো যুগের জনগণও এত ভালো ছিল না। হ্যাঁ, যদি তাঁর তুলনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং উমর ফারুক (রা.)-এর যুগের সাথে করা হয়, তবে মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।” [২]

আল্লামা আব্দুল আজিজ ফারহারী মুলতানী (রহ.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালের মর্যাদার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন:

“পুণ্যবান ব্যক্তিদের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাদের মধ্যে কেউ কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। প্রতিটি স্তর তার চেয়ে উচ্চতর স্তরের তুলনায় আপত্তিযোগ্য হয়ে পড়ে, এজন্যই এই প্রবাদটি প্রসিদ্ধ যে, ‘নেককারদের নেক আমলসমূহ নৈকট্যপ্রাপ্তদের নিকট গুনাহ হিসেবে গণ্য হয়’। নবী করীম (সা.) থেকে যে বাণী বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আমি প্রতিদিন সত্তর বার ইস্তিগফার করি’। এর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আকাবির এভাবে বলেছেন যে, আপনার (সা.) মর্যাদা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকত এবং আপনি যখনই উন্নতির পরবর্তী কোনো স্তরে পৌঁছাতেন, তখন (পূর্ববর্তী স্তরটি তার তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হতো, তাই) সেই পূর্ববর্তী স্তরের জন্য ইস্তিগফার করতেন। যখন এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন আমরা বলি যে, খুলাফায়ে রাশেদীন মুবাহ বিষয়সমূহে প্রশস্ততা অবলম্বন করেননি; তাঁদের জীবনধারা অভাব-অনটন ও মুজাহাদার দিক থেকে হযুর আকরাম (সা.)-এর জীবনধারার সদৃশ ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে কথা হলো, যদিও তিনি কোনো গুনাহে লিপ্ত হননি, কিন্তু মুবাহ বিষয়সমূহে প্রশস্ততা অবলম্বন করেছেন। খিলাফতের হক আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের স্তরের ছিলেন না, তবে ঐ মহান ব্যক্তিদের সমকক্ষ হতে না পারা তাঁর জন্য কোনো আপত্তির কারণ নয়।” [৩]

[১] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৪৬, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিল খুলাফা; সুনানে তিরমিযী, হা: ২২২৬, বাবু মা জাআ ফিল খিলাফাহ, সনদ হাসান।

[২] মিনহাজুস সুন্নাহ: ২৩২/৬।

[৩] আন-নিবরাস আলা শারহিল আকাইদ লিল ফারহারী, পৃ. ৫১০, ত. রশীদিয়াহ।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি মাদাজিল্লাহ এই আলোচনার সারসংক্ষেপ অত্যন্ত সাবলীলভাবে এভাবে পেশ করেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকালের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনব্যবস্থা সেই মানের ছিল না যা খুলাফায়ে রাশেদিন অর্জন করেছিলেন, কিন্তু জমহুর উম্মতের মতে এই পার্থক্য এত বেশি ছিল না যে একদিকে তাকওয়া এবং অন্যদিকে ফিসক ও ফুজুর, অথবা একদিকে ইনসাফ এবং অন্যদিকে জুলুম ও অত্যাচার ছিল; বরং এই পার্থক্য ছিল আজিমত ও রুখসত, তাকওয়া ও মুবাহাত, সতর্কতা ও প্রশস্ততা এবং সঠিক রায় ও ইজতিহাদি ভুলের পার্থক্য।” [১]

“হযরত খুলাফায়ে রাশেদিন সতর্কতা, তাকওয়া এবং দায়িত্ববোধের যে উচ্চমানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরবর্তীতে সেই মান আর অবশিষ্ট থাকেনি। খুলাফায়ে রাশেদিন আজিমতের ওপর আমল করতেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রুখসতের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের সাধারণ জীবনে তাকওয়া ও সতর্কতার ওপর আমল করতেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মুবাহাতের সীমা পর্যন্ত সতর্কতা পরিপন্থী বিষয়গুলোকেও মেনে নিতেন। উদাহরণস্বরূপ, খুলাফায়ে রাশেদিন আজিমত ও সতর্কতার ওপর আমল করে নিজেদের সন্তানদের ওয়ালি-এ-আহদ মনোনীত করেননি, যদিও তাঁদের সন্তানদের মধ্যে খিলাফতের শর্তাবলি বিদ্যমান ছিল; এর বিপরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রুখসতের ওপর আমল করে নিজের ছেলেকে ওয়ালি-এ-আহদ মনোনীত করেন। খুলাফায়ে রাশেদিন আজিমত ও সতর্কতার অধীনে নিজেদের জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত দরবেশসুলভ করেছিলেন, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রুখসত ও মুবাহাতের ওপর আমল করেন এবং তাঁদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছলতা অবলম্বন করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের দায়িত্ববোধের অবস্থা এমন ছিল যে তাঁরা জনগণের প্রত্যেকের খোঁজখবর নিতে তাদের ঘরে ঘরে যেতেন, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে এমন কোনো কথা বর্ণিত নেই। খুলাফায়ে রাশেদিনের সঠিক রায় এবং নির্ভুল ইজতিহাদের অবস্থা এমন ছিল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অনুসরণের পাশাপাশি তাঁদের অনুসরণেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে জমহুর উম্মতের আকিদা হলো যে তাঁর থেকে বেশ কিছু ইজতিহাদি ভুল সংঘটিত হয়েছিল।” [২]

সারকথা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল নিজ স্থানে সর্বোত্তম এবং প্রশংসনীয় ছিল। যদি এর তুলনা খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের সাথে করা হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই এটি সেই মানের ছিল না, যেমনটি স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মর্যাদা তাঁদের তুলনায় কম; কিন্তু পরবর্তীকালের তুলনায় এই যুগ ছিল অত্যন্ত উচ্চ ও মহান।

[১] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১৩৯, ১৫০

[২] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১৩৩

ইতিহাসের শিক্ষা

১. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর থেকে শুরু করে সরকার পরিচালনা পর্যন্ত এমন একটি রূহ কাজ করে যা শাসকদের স্বৈরাচারী হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়। এই ইসলামী রূহ জনপ্রতিনিধিত্ব, শুরা (পরামর্শ), জনগণ ও শাসকদের পারস্পরিক আস্থা এবং শাসকদের জনগণের সামনে জবাবদিহিতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। জনগণকে আমীরের আনুগত্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সাথে ইসলামী শাসনব্যবস্থা জনগণকে সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মতামত প্রকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে এবং মতপার্থক্যের অধিকার তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় না। এই মতপার্থক্য বিরোধী দলের রূপও ধারণ করতে পারে, অর্থাৎ শাসকদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীরা একত্রিত হয়ে একটি সংগঠিত দল গঠন করতে পারে।

২. সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে এমন মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়া এবং কিছু ক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পর্যন্ত হওয়া যদিও অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, তবে এতেও আল্লাহ তাআলার এক মহান হিকমত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর তা হলো এই যে, এভাবে মুসলমানদের পারস্পরিক মতপার্থক্য, রাজনৈতিক বিরোধ এবং নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ব্যবহারিকভাবে একটি নৈতিক আচরণবিধি ও মানদণ্ড নির্ধারিত হয়ে গেছে। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন:

“যদি হযরত আলী (রা.) (নিজের মুসলিম বিরোধীদের সাথে) যুদ্ধের জন্য বের না হতেন, তবে কেউ জানতে পারত না যে মুসলমানদের সম্পর্কে এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহারিক নমুনা কী?” [১]

৩. এই সংঘর্ষগুলোর কারণে কেবল গৃহযুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেই নয়, বরং দুইজন মুসলিম শাসকের মধ্যকার মনোমালিন্য ও বিরোধের জন্যও একটি নৈতিক আচরণবিধি আমাদের সামনে চলে এসেছে। অথচ অমুসলিম বিশ্বে এর কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্তও এমন কোনো আইনের কল্পনা করা সম্ভব হয়নি যা গৃহযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিকে সীমিত করতে পারে। আজ যদি এই বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, তবে তার প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৪. মতপার্থক্য সমাজের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ইসলাম এর ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, বরং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এটি আবেগের প্রতিটি স্বাভাবিক প্রবাহকে কিছু সীমা ও বিধিনিষেধের অনুসারী করে সমাজের জন্য ইতিবাচক ও উপকারী উপাদানে পরিণত করার চেষ্টা করে। বিরোধী দলও প্রতিটি দেশ, প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি দলের জন্য একটি স্বাভাবিক উপাদান। যদি একে কল্যাণকামিতার ওপর ভিত্তি করে থাকতে দেওয়া হয়, তবে এটি প্রায়শই অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। এটি উদ্ভূত সমস্যা ও পরিস্থিতির অন্য দিকগুলো সামনে নিয়ে আসে এবং ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে।

[১] বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব: ৩০২/১

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ ২

...অনুভূতি জাগায়, তা না হলে শাসকদের কাছে কেবল তোষামোদকারী এবং আজ্ঞাবহ লোকই থেকে যায় এবং জবাবদিহিতা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণেই খুলাফায়ে রাশেদিন ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী বিরোধী দলের অস্তিত্বকে গ্রহণ করেছিলেন।

৫. ইসলাম শাসককে বিভিন্ন ধরনের বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য কিছু নীতি ও নিয়ম দিয়েছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকের জন্য স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে।

ইসলামী সমাজে এই ধরনের গোষ্ঠীর পাঁচটি রূপ হতে পারে:

- একটি হলো যাতে কাফেররা মুসলমানদের ছদ্মবেশ ধারণ করে সক্রিয় থাকে, এর উদাহরণ হলো মুনাফিকরা যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই রূপ পরবর্তী যুগেও হতে পারে, তবে এমন মুসলমান রূপী কাফেরদের সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী কখন এবং কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, তার নিশ্চিত জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন; কারণ কোনো কালিমা পাঠকারীর ওপর বিশ্বাসগত নিফাকের (মুনাফিকি) হুকুম লাগানো যায় না। এই ধরনের দল যদিও অত্যন্ত ক্ষতিকর, তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ পরিস্থিতিতে তাদেরও সহ্য করেছেন, তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে সীমা লঙ্ঘন করত তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। এখনও অপরাধের প্রমাণ পেলেই কেবল এমন লোকদের ওপর শাস্তি কার্যকর করা যেতে পারে।
- এই ধরনের গোষ্ঠীর দ্বিতীয় রূপ হলো এতে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ লোক কালিমা পাঠকারী হবে কিন্তু বাতিলের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং নিজেদের অজ্ঞতার কারণে সরকারের বিরুদ্ধে ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হবে। হযরত উসমান (রা.)-কে এমনই এক বিরোধী দলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যেখানে তাঁর কর্মপদ্ধতি ইসলামী চেতনার সাথে হুবহু মিল রেখে বিশ্বকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, এমন বিরোধী দলকে তাদের অবস্থান তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করা উচিত, বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন বিরোধী দলের দাবি কেবল খলিফা বা তাঁর কর্মকর্তাদের অপসারণ হয়, অর্থাৎ আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। এমন অবস্থায় সরকারের অস্ত্র ধারণ শুরু করা উচিত নয় এবং যথাসম্ভব গৃহযুদ্ধ এড়ানোর কৌশল অবলম্বন করা উচিত। জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তির যদি সরকারের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে বিরোধী পক্ষের দাবিতে সরকারি কাঠামো ও ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হবে না, বরং কোনো তৃতীয় পথ বের করার চেষ্টা করা হবে এবং বিরোধী দলকে সহ্য করা হবে। ফলে হযরত উসমান (রা.) বিরোধী দলের মোকাবিলায় অত্যন্ত নরম মনোভাব গ্রহণ করেন, এ বিষয়ে তিনি আহলে শুরার পরামর্শ অবশ্যই শুনতেন কিন্তু তা গ্রহণ করতেন না; কারণ এটি ছিল ইসলামে প্রথম সরকার বিরোধী আন্দোলন, একে যদি কঠোরভাবে দমন করা হতো তবে পরবর্তী শাসকরা বিরোধীদের ওপর সব ধরনের জুলুম ও নির্যাতনের অজুহাত পেয়ে যেত।

তবে হযরত উসমান (রা.)-এর ধৈর্য যাই হোক না কেন তা ছিল স্বেচ্ছাধীন, তাঁর আশেপাশে উপস্থিত অধিকাংশ সাহাবীর মতামত ভিন্ন ছিল এবং তাঁরা এমন পরিস্থিতিতে তলোয়ার ধারণ করাকেই উত্তম মনে করতেন। তাই হযরত উসমান (রা.)-এর জীবনী দেখে পরবর্তী প্রত্যেক শাসকের ওপর এটি আবশ্যিক হয়ে যায় না যে তিনি বিরোধী দলের সাথে কেবল নরম আচরণই করবেন, বরং কিছু পরিস্থিতিতে তিনি কঠোরতা অবলম্বন করতে পারেন যেমন হযরত আলী (রা.) শক্তিও প্রয়োগ করেছিলেন এবং যেমন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বিরুদ্ধে হুজর বিন আদি (রা.)-এর পক্ষ থেকে উত্থিত বিরোধী...

আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করা যাতে উসমানের শাহাদাতের মতো আর কোনো দুর্ঘটনা পুনরায় না ঘটে।

৩. বিরোধী দলের তৃতীয় রূপ হলো সেই নেককার ও মুখলিস ব্যক্তিদের, যারা ব্যবস্থার সংস্কার এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য দাঁড়িয়েছেন, অন্যদিকে সেই শাসকও জাতির কল্যাণকামী এবং ন্যায়পরায়ণ যার কাছে দাবি জানানো হচ্ছে। এই উদাহরণ হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত তালহা ও জুবায়ের (রা.)-এর, যারা হযরত আলী (রা.)-এর যুগে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য সশস্ত্রভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) এই আন্দোলনকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণে যুদ্ধও শুরু হয়ে যায় যা দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর হযরত আলী (রা.) নেককার ও পরহেজগারদের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধার আচরণ করেছিলেন এবং আমর বিন জারমুজের মতো ফিতনাবাজদের ধিক্কার দিয়েছিলেন ও বকাবকা করেছিলেন।

৪. চতুর্থ সুরত এই যে, কোনো নেককার, সৎ এবং সঠিক আকিদাবিশিষ্ট নেতা ব্যাখ্যার (তাবিল) সাথে কোনো বৈধ দাবি মানানোর জন্য কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে একটি অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত শাসক হয়ে যান। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হযরত আলী (রা.)-এর সাথে নীতিগত ও ইজতিহাদি মতপার্থক্য এই প্রকারেরই ছিল। তিনি তাঁর সমর্থকদের মাধ্যমে কিসাসে উসমানের জন্য চাপ দিতে থাকেন, হযরত আলী (রা.) একদিকে শক্তির প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের অনুগত করার চেষ্টা করে এটি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শক্তির ব্যবহারও জায়েজ। অন্যদিকে আলোচনাও করেছেন। এমনকি যুদ্ধের মাঝখানে আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিয়ে যুদ্ধবিরতি করে দেন, বিরোধী নেতাদের চরিত্র হনন করেননি। তাঁদের ওপর ফাসেকী ও মুনাফেকীর অভিযোগ আনেননি।

৫. পঞ্চম সুরত এই যে, ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে এমন একটি দল সশস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যারা ভিন্ন আকিদা ও মতাদর্শের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিল এবং সাধারণ মুসলমানদের রক্ত হালাল মনে করত। এই উদাহরণ খারেজীদের মতো লোকদের, যারা হযরত আলী (রা.)-এর যুগে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর কর্মপন্থা শিখিয়েছে যে, এমন দলের দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করা হবে।

৬. শাহাদাতে উসমান থেকে শুরু হওয়া এই ফিতনার যুগে সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা আমাদের জন্য নমুনা যে, আহলে ইসলামের মধ্যকার মতপার্থক্যে সর্বোত্তম কর্মপন্থা কী হতে পারে।

৭. জঙ্গি সিফফিন ও তাহকিমের পর হযরত আলী (রা.)-এর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতি আচরণ প্রমাণ করে যে, খলিফার ওপর এটি আবশ্যিক নয় যে তিনি মুসলমানদের সমস্ত দেশের ওপর কবজা করবেন। যদিও উত্তম সুরত এটাই যে সারা বিশ্বের মুসলমান একজন শাসকের অধীনে থাকবে যাতে ঐক্য ও সংহতি কায়ম থাকে। কিন্তু যদি সবাইকে এক হুকুমতের অধীনে আনার চেষ্টায় ঐক্য ও সংহতি হিন্নভিন্ন হয়, রক্তপাত বৃদ্ধি পায় এবং অহেতুক প্রাণহানি ঘটে, তবে সমান্তরাল মুসলিম সরকারকে গ্রহণ করারও অবকাশ রয়েছে।

৮. সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপসমূহে উম্মতের কল্যাণকামী, মুখলিস এবং সওয়াবের অধিকারী ছিলেন, কেউই অনিষ্ট (শর) চাননি। হ্যাঁ, তথ্য ও সিদ্ধান্তে তাঁদের ভুল হতে পারত; কারণ তাঁরা আলিমুল গায়েব ছিলেন না।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

(৯) এই ঘটনাগুলোতে উম্মতের প্রত্যেক শাসক, নেতা, সেনাপতি এবং কর্মকর্তার জন্য শিক্ষা রয়েছে। যদি বিতর্কিত রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে তারা আন্তরিকভাবে শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা, পরামর্শ ও প্রজ্ঞার সাথে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে আশা করা যায় যে তারা সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। এরপর যদি ফলাফল ভুলও বের হয়, তবে তারা গুনাহগার হবে না, কারণ বান্দা তার সাধ্যের অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য দায়বদ্ধ নয়। হ্যাঁ, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টায় যে ত্রুটি করবে, সে আল্লাহর কাছে তিরস্কারযোগ্য হবে।

(১০) যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের যুগের এই মতপার্থক্যগুলোর পেছনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শরীয়ত পূর্ণতার হিকমত কার্যকর ছিল, তাই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিছু সাহাবী আযীমত-এর ওপর আমল করেছেন এবং কিছু হযরত রুখসত-এর ওপর। এভাবে উম্মতের সামনে শরয়ী সীমা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, কোন অবস্থাটি উচ্চতর, উত্তম এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাম্য, আর কোনটি কেবল জায়েয এবং কৌশলগত কারণে সহনীয়। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর কিছু সিদ্ধান্ত সিয়াসাতে শরঈয়াহর বিচারে আযীমতের ওপর ভিত্তি করে ছিল না, বরং তা কেবল বৈধতার সীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু এর ফলে উম্মত অনিবার্য পরিস্থিতিতে বৈধতার সীমার ওপর আমল করার সুযোগ পেয়ে গেল। যদি এমনটি না হতো, তবে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম শাসক ও নেতার জন্য সব অবস্থায় আযীমতের ওপর আমল করা ওয়াজিব হতো এবং কারো জন্য রুখসতের ওপর আমল করার কোনো সুযোগ থাকত না, অথচ মানুষ অনেক সময় এর জন্য বাধ্য হয়ে পড়ে।

X X X

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা ঈমানের সাথে আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও পরম করুণাময়।

(সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০)

উম্মতে মুসলিমার ইতিহাস

সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস... গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির এক ঝলক

৩৩ হিজরি থেকে ৩৫ হিজরি / ৬৫৩ খ্রি. থেকে ৬৫৬ খ্রি.

৩৩ হিজরি:

- ইবনে সাবার গোপন দাওয়াতের প্রকাশ, কুফার ফিতনাবাজদের নির্বাসন।

৩৪ হিজরি:

- আবু তালহা আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল... সফর (আগস্ট ৬৫৪ খ্রি.)।
- উবাদাহ বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল... জমাদিউল আউয়াল (নভেম্বর ৬৫৪ খ্রি.)।
- হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর প্রাণঘাতী হামলা।
- ইবনে সাবার গুজব ছড়ানো।
- কুফায় বিদ্রোহের চেষ্টা... রমজান (মার্চ ৬৫৫ খ্রি.)।
- কুফা থেকে সাঈদ বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অপসারণ... শাওয়াল (এপ্রিল ৬৫৫ খ্রি.)।
- কুফায় আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিয়োগ... শাওয়াল (এপ্রিল ৬৫৫ খ্রি.)।
- হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তদন্তকারী প্রতিনিধি দল... জিলহজ (অক্টোবর ৬৫৫ খ্রি.)।
- কাব আহবার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল... (৬৫৫ খ্রি.)।

৩৫ হিজরি:

- বিদ্রোহীদের মদিনায় আগমন এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিতর্ক... রজব (জানুয়ারি ৬৫৬ খ্রি.)।
- বিদ্রোহীদের দ্বিতীয়বার আগমন... শাওয়াল (এপ্রিল ৬৫৬ খ্রি.)।
- বিদ্রোহীদের সাথে চুক্তি... ১লা জিলকদ (১ মে ৬৫৬ খ্রি.)।
- বিদ্রোহীদের আক্রমণ এবং মদিনা দখল... মধ্য জিলকদ (১৫ মে ৬৫৬ খ্রি.)।

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত ১৮ জিলহজ (১৭ জুন ৬৫৬ খ্রি.)

খিলাফতে আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২৪ জিলহজ (২৩ জুন ৬৫৬ খ্রি.)

হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওফাত মহররম (জুলাই ৬৫৬ খ্রি.-এর শুরু) পৃষ্ঠা ৫৩৬

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা মহররমের শেষ (জুলাই ৬৫৬ খ্রি.-এর শেষ) পৃষ্ঠা ৫৩৬

হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওফাত রবিউল আউয়াল (আগস্ট ৬৫৬ খ্রি.-এর শেষ) পৃষ্ঠা ৫৩৬

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মদিনা থেকে কুফার দিকে যাত্রা ৩০ রবিউল আখের (২৫ অক্টোবর ৬৫৬ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৬

জঙ্গ জামাল ১০ জমাদিউল আখের (৫ ডিসেম্বর ৬৫৬ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৬

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিফফিনে পৌঁছানো জিলহজ (মে ৬৫৭ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৬

জঙ্গ সিফফিন ৭ সফর থেকে ৯ সফর (২৬ থেকে ২৮ জুলাই ৬৫৭ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৭

খারেজীদের আবির্ভাব রবিউল আউয়াল (আগস্ট ৬৫৭ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৭

তাহকিম দুমাতুল জান্দাল রমজান (ফেব্রুয়ারি ৬৫৮ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৭

আশতার নাখয়ি-এর মৃত্যু (৬৫৮ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৮

জঙ্গ নাহরাওয়ান শাবান (জানুয়ারি ৬৫৯ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৮

খিররিত বিন রাশিদ-এর দমন (৬৫৯ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৮

হযরত সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওফাত শাওয়াল (মার্চ ৬৫৯ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৮

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মিসর দখল (৬৫৯ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৮

পারস্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সেনাপতি জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের বিজয়সমূহ (৬৫৯ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৯

উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ওফাত রজব (নভেম্বর ৬৫৯ খ্রি.) পৃষ্ঠা ৫৩৯

৪২০:

হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর মধ্যে সন্ধি (৬৬০ খ্রি.)

হযরত আলী (রাযি.)-এর শাহাদাত ১৭ রমজান (২৫ জানুয়ারি ৬৬১ খ্রি.)

হযরত হাসান (রাযি.)-এর খিলাফত রমজান (জানুয়ারির শেষ ৬৬১ খ্রি.)

৪২১:

হযরত হাসান (রাযি.)-এর ক্ষমতা ত্যাগ রবিউল আউয়াল (আগস্ট ৬৬১ খ্রি.)

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফত রবিউল আউয়াল (আগস্ট ৬৬১ খ্রি.)

আফ্রিকায় উকবা বিন নাফে-এর বিজয়সমূহ (৬৬২ খ্রি.)

১৫৭ বছর বয়সে হযরত লাবিদ বিন রাবিয়া (রাযি.)-এর ইন্তেকাল জিলকদ (মার্চ ৬৬২ খ্রি.)

৪২২:

ইরাকে খারেজীদের বিদ্রোহ (৬৬২ খ্রি.)

দক্ষিণ আফগানিস্তানে আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রাযি.)-এর অভিযান (৬৬৩ খ্রি.)

সিন্ধুর ওপর রাশিদ বিন আমর-এর আক্রমণ জিলকদ (ফেব্রুয়ারি ৬৬৩ খ্রি.)

যিয়াদের হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর আনুগত্য স্বীকার (৬৬৩ খ্রি.)

হযরত উসমান বিন তালহা এবং হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রাযি.)-এর ইন্তেকাল (৬৬৩ খ্রি.)

৪২৩:

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাযি.)-এর ইন্তেকাল সফর (মে ৬৬৩ খ্রি.)

খারেজী নেতা মুস্তাওরিদ-এর হত্যা (৬৬৩ খ্রি.)

খুরাসানে আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রাযি.)-এর বিজয়সমূহ (৬৬৩ খ্রি.)

সুদানে উকবা বিন নাফে-এর বিজয়সমূহ (৬৬৩ খ্রি.)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাযি.)-এর ইন্তেকাল রজব (অক্টোবর ৬৬৩ খ্রি.)

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর ইন্তেকাল ৩০ রমজান (জানুয়ারি ৬৬৪ খ্রি.)

কাবুল বিজয় রবিউল আউয়াল (জুন ৬৬৪ খ্রি.) ৫৪২

মুহাফ্ফাব বিন আবি সাফরাহ-এর হিন্দুস্তান সীমান্তে বিজয়সমূহ (জুন ৬৬৪ খ্রি.) ৫৪২

লাহোর পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীর অগ্রযাত্রা (জুন ৬৬৪ খ্রি.) ৫৪২

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ইন্তেকাল জুমাদাল উলা (আগস্ট ৬৬৪ খ্রি.) ৫৪২

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তাঁর খিলাফতকালে প্রথম হজ যিলহজ (ফেব্রুয়ারি ৬৬৫ খ্রি.) ৫৪২

আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল যিলহজ (ফেব্রুয়ারি ৬৬৫ খ্রি.) ৫৪২

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যিয়াদের বংশধারা আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত হওয়ার ঘোষণা ৫৪২

মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আফ্রিকায় বিজয়সমূহ মহররম (মার্চ ৬৬৫ খ্রি.) ৫৪৫

যিয়াদের বসরার শাসনভার গ্রহণ (৬৬৫ খ্রি.) ৫৪৫

যায়েদ বিন সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল রজব (সেপ্টেম্বর ৬৬৫ খ্রি.) ৫৪৫

আবদুর রহমান বিন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল রজব (সেপ্টেম্বর ৬৬৬ খ্রি.) ৫৪৬

সিজিস্তানে কাবুল শাহের সাথে রাবি বিন যিয়াদ হারিসীর যুদ্ধ ও বিজয় (৬৬৬ খ্রি.) ৫৪৬

কিকানে আবদুল্লাহ বিন সাওয়ারের পরাজয় ৫৪৬

খোরাসান ও ঘোরের জিহাদ (৬৬৭ খ্রি.) ৫৪৭

রুয়াইফি বিন সাবিত আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক পূর্ব আফ্রিকার ত্রিপোলি দখল (৬৬৭ খ্রি.) ৫৪৭

কিকানে (সিন্ধু ও বেলুচিস্তান) সিনান বিন সালামাহ-এর বিজয়সমূহ (৬৬৭ খ্রি.) ৫৪৭

মদিনা থেকে মারওয়ানের অপসারণ, সাঈদ বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিয়োগ (৬৬৮ খ্রি.) ৫৪৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

৪৯:

- হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর ইন্তেকাল (৬৬৯ খ্রি.), একটি মত হলো ৫০ হিজরী।
- শুবায়্যেব বিন বাজরা খারিজীর বিদ্রোহ (৬৬৯ খ্রি.)

৫০:

- উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)-এর ইন্তেকাল সফর (মার্চ ৬৭০ খ্রি.)
- কাব বিন মালিক (রা.)-এর ইন্তেকাল রবিউস সানি (এপ্রিল ৬৭০ খ্রি.)
- আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-এর ইন্তেকাল জমাদিউল আখিরা (জুন ৬৭০ খ্রি.)
- মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর ইন্তেকাল শাবান (আগস্ট ৬৭০ খ্রি.)
- যিয়াদের কুফার শাসনভার লাভ (৬৭০ খ্রি.)
- কাবুলের জিহাদ (৬৭০ খ্রি.)
- কনস্টান্টিনোপলের জিহাদ — ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার নেতৃত্ব (৬৭০ খ্রি.)
- আফ্রিকায় প্রথম সামরিক শহর কায়রোয়ানের নির্মাণ (৬৭০ খ্রি.)

৫১:

- আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর শাহাদাত মহররম (জানুয়ারি ৬৭১ খ্রি.)
- হুজর বিন আদি (রা.)-এর মৃত্যুদণ্ড (৬৭১ খ্রি.)
- জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজালী (রা.)-এর ইন্তেকাল জিলহজ (ডিসেম্বর ৬৭১ খ্রি.)
- ইয়াজিদের নেতৃত্বে হজ জিলহজ (ডিসেম্বর ৬৭১ খ্রি.)

৫২:

- ইমরান বিন হুসাইন (রা.)-এর ইন্তেকাল সফর (ফেব্রুয়ারি ৬৭২ খ্রি.)
- কাব বিন আজরা (রা.)-এর ইন্তেকাল জমাদিউল আউয়াল (মে ৬৭২ খ্রি.)
- মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ (রা.)-এর ইন্তেকাল রজব (জুলাই ৬৭২ খ্রি.)
- আবু বাকরা (রা.)-এর ইন্তেকাল (৬৭২ খ্রি.)

৫৩:

- জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের মৃত্যু রমজান (আগস্ট ৬৭৩ খ্রি.)
- বাজাদাহ বিন উমাইয়া (রা.)-এর রোডস দ্বীপে জিহাদ (৬৭৩ খ্রি.)
- ফাদালা বিন উবাইদ আনসারী (রা.)-এর মৃত্যু, দামেস্কের প্রধান বিচারপতি (৬৭৩ খ্রি.)

৫৪:

- সাঈদ বিন আস (রা.)-কে মদিনা থেকে অপসারণ, মারওয়ানের পুনরায় নিয়োগ (৬৭৪ খ্রি.)
- উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের খোরাসানে নিয়োগ, বুখারায় প্রথম সামরিক অভিযান (৬৭৪ খ্রি.)
- উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর মৃত্যু রজব (জুন ৬৭৪ খ্রি.)
- হাকিম বিন হিয়াম (রা.)-এর মৃত্যু (৬৭৪ খ্রি.)
- হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর ১২০ বছর বয়সে মৃত্যু রমজান (আগস্ট ৬৭৪ খ্রি.)
- ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের জন্য মারওয়ান বিন হাকামের প্রচেষ্টা
- হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর মৃত্যু

৫৫:

- হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর ইন্তেকাল, মহররম (ডিসেম্বর ৬৭৪ খ্রি.)
- মধ্য এশিয়ায় সাঈদ বিন উসমানের আক্রমণ জিলকদ (সেপ্টেম্বর ৬৭৫ খ্রি.)

৫৬:

- উন্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর মৃত্যু মহররম (ডিসেম্বর ৬৭৫ খ্রি.)
- মধ্য এশিয়ায় সাঈদ বিন উসমানের বিজয়সমূহ, সমরকন্দ বিজয় রবিউস সানি (ফেব্রুয়ারি ৬৭৬ খ্রি.)
- সমরকন্দ রণাঙ্গনে কুসাম বিন আব্বাস (রা.)-এর শাহাদাত রবিউস সানি (ফেব্রুয়ারি ৬৭৬ খ্রি.)
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর তাঁর খিলাফতকালে দ্বিতীয় হজ - ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের ঘোষণা জিলহজ (অক্টোবর ৬৭৬ খ্রি.)

৫৭:

- আফ্রিকায় হাসসান বিন নু'মানের নিয়োগ এবং বিজয়সমূহ (৬৭৬ খ্রি.)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম

- মারওয়ান মদিনা থেকে অপসারিত। ওয়ালিদ বিন উতবা গভর্নর... শাওয়াল (আগস্ট ৬৭৭ খ্রি.)

৫৮ হিজরি:

- উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর ওফাত... জমাদিউল আখিরা (এপ্রিল ৬৭৮ খ্রি.)
- উকবা বিন আমির আল-জুহানি (রা.)-এর ওফাত, মিশরের সাবেক শাসক ও নৌবাহিনী প্রধান... (এপ্রিল ৬৭৮ খ্রি.)
- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ওফাত... ১৭ রমজান (১৩ জুলাই ৬৭৮ খ্রি.)

৫৯ হিজরি:

- আবুল মুহাজির দিনারের আফ্রিকা বিজয়, কার্থেজে আক্রমণ... (৬৭৯ খ্রি.)
- মক্কা মুকাররমার মুয়াজ্জিন আবু মাহজুরা (রা.)-এর ওফাত... (৬৭৯ খ্রি.)
- সাঈদ বিন আল-আস (রা.)-এর ওফাত... (৬৭৯ খ্রি.)
- হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর ওফাত... জিলকদ (আগস্ট ৬৭৮ খ্রি.), দ্বিতীয় মত অনুযায়ী ৫৭ হিজরি।

৬০ হিজরি:

- সামুরা বিন জুনদুব (রা.)-এর ওফাত... মহররম (অক্টোবর ৬৭৯ খ্রি.)
- হযরত আমির মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ওফাত... প্রসিদ্ধ মত ২২ রজব। সঠিক মত ৪ রজব (১১ এপ্রিল ৬৮০ খ্রি.)

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় অংশ

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ফিতনার যুগ

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া ... থেকে ... আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত
পর্যন্ত

রজব ৬০ হিজরি ... থেকে ... জমাদিউল আউয়াল ৭৩ হিজরি

এপ্রিল ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ ... থেকে ... অক্টোবর ৬৯২ খ্রিস্টাব্দ

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার যুগ

রজব ৬০ হিজরি... থেকে... রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরি

এপ্রিল ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ... থেকে... অক্টোবর ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরসূরি চৌত্রিশ বছর বয়সী ইয়াজিদ, তাঁর মৃত্যুর সময় হিমসের শহরতলীর দুর্গ “হাওয়ারিন”-এ ছিল। এই দুর্ঘটনার খবর শুনে সে দ্রুত রাজধানী অভিমুখে আসে, ততক্ষণে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাফন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। [১]

ইয়াজিদের প্রথম খুতবা:

ইয়াজিদ রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং দামেস্কবাসীদের উদ্দেশ্যে শোকাতুর ভাষণ দিতে গিয়ে হামদ ও সানার পর বলল:

“মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দা ছিলেন, আল্লাহ তাঁর ওপর ইনাম ও ইকরাম করেছেন এবং এরপর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। তিনি পরবর্তীদের চেয়ে উত্তম এবং পূর্ববর্তীদের চেয়ে নিম্নতর। আমি তাঁকে আল্লাহর কাছে মাসুম ঘোষণা করছি না, কারণ তিনিই তাঁর অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন। যদি তাঁর ক্ষমা হয় তবে তা আল্লাহর রহমতে হবে, আর যদি পাকড়াও হয় তবে তা তাঁর নিজের ত্রুটির কারণে হবে। তাঁর পর দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আমি নিজে এর চেষ্টা করিনি, তবে আল্লাহ যা মঞ্জুর করেন তাই হয়। আপনারা আল্লাহর জিকির ও ইস্তিগফার করুন।” [২]

বায়াতের জন্য দূত প্রেরণ:

আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষ দিনগুলোতে কুফায় হযরত নুমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু, বসরায় উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ এবং মদিনায় ওয়ালিদ বিন উতবা গভর্নর ছিলেন। ইয়াজিদ সে সময় তাঁদেরকেই বহাল রাখে। সিংহাসনে আরোহণের পর সে পুরো মুসলিম বিশ্বে আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সংবাদ এবং নিজের বায়াত তলব করার জন্য দূত ও প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়। [৩]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১৬৩... হাওয়ারিন দামেস্ক থেকে তিন-চার দিনের পায়ে হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত। (মাসালিকুল আবসার: ১/৭৬)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৫৯, এবং ইবনে কুতাইবা এর প্রথমাংশ বর্ণনা করেছেন: ‘নিশ্চয়ই মুয়াবিয়া আল্লাহর রশিদের মধ্য থেকে একটি রশি ছিলেন’। (উয়ুনুল আখবার: ২/৩৬০, তবা আল-ইলমিয়াহ)। ইয়াজিদের এই খুতবা প্রকাশ করে যে, খলিফা হওয়ার সময় সে এমন প্রকাশ্য ফাসেক ছিল না যেমনটা সাধারণত মনে করা হয়, এবং সে সারগর্ভ ও প্রাজ্ঞ বাগ্মিতার শিল্পে পারদর্শী ছিল।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৭

হযরত হুসাইন (রা.) কেন ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করেননি?

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) এবং তাঁর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর অবস্থান হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবনকাল থেকেই এই ছিল যে, বংশানুক্রমিক শাসন পরিহার করে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সেই বিস্তৃত ভিত্তিসম্পন্ন পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থাকে (শুরা) আগের রূপে ফিরিয়ে আনা উচিত এবং উম্মতের ক্ষমতার চাবিকাঠি সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। এই কারণেই তাঁরা ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী হিসেবে বায়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। তাঁদের উভয়ের ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করা ‘রুখসত’ (শিথিলতা)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত, কিন্তু ‘আযীমত’ (দৃঢ়তা) ছিল এই যে, এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হোক, যার কারণে ভবিষ্যতে অনেক ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। এর জন্য প্রথম ধাপ ছিল এই যে, এই ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মতপার্থক্যের ওপর অটল থেকে ইসলামী রাজনীতির সঠিক মর্মার্থকে ফুটিয়ে তুলবেন, বায়াত গ্রহণ করে ইয়াজিদের অনুসারীদের দলে शामिल হবেন না।

হযরত হুসাইন (রা.) কি বিদ্রোহ করতে উদ্যত ছিলেন?

পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অনুভূত হয় যে, হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর চিন্তা ও ভাবনা শুরুতে কেবল এতটুকুই ছিল যে, তাঁরা ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করবেন না এবং তাঁদের সততাপূর্ণ মতামতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত হবেন না। এমন কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যক্তিবর্গ কোনো বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে উদ্যত ছিলেন। অন্যথায় হযরত হুসাইন (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবদ্দশাতেই কুফাবাসীদের চিঠি পেতে শুরু করেছিলেন, যাতে তাঁকে কুফায় এসে উম্মতের নেতৃত্ব দেওয়ার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছিল [১]। কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত নয় যে, হযরত হুসাইন (রা.) এই দাওয়াতকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বরং আলামতসমূহ বলে যে, ইয়াজিদের সিংহাসন আরোহণের পরও হযরত হুসাইন (রা.) কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি এবং সম্ভবত তিনি সারাজীবন মদিনায় থাকতেই পছন্দ করতেন এবং একটি ফতোয়ার মর্যাদা হিসেবে নিজের মতামতের ওপর অটল থাকাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। কিন্তু যখন তাঁকে জোরপূর্বক বায়াত থেকে বাঁচার জন্য ঘরবাড়ি ছাড়তে হলো, তখন তিনি কুফায় যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা না করে পারলেন না। [২]

ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল:

ইয়াজিদের জন্য উচিত ছিল যে, সে এই ব্যক্তিবর্গকে নিজের বায়াত গ্রহণে বাধ্য করার চেষ্টা না করা। হযরত আলী (রা.) তাঁর যুগে অনেক ব্যক্তিকে নিরপেক্ষ থাকতে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সম্মানে কোনো কমতি করেননি। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও ইয়াজিদের বায়াত ও উত্তরাধিকার অস্বীকারকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁদের বিবেকের বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য করেননি। এটি ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল ছিল যে, সে এই বুজুর্গদের ওপর তাৎক্ষণিক বায়াতের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং তার সম্মানিত পিতার সেই ওসিয়ত উপেক্ষা করেছিল যাতে তাকে শরীকদের সাথে কঠোরতা না করতে এবং নিজের মতামতের ওপর জোর না দিতে তাকিদ করা হয়েছিল। [৩]

[১] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৩/২০১, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৫৫, ১৫৬, ত. দারুল ফিকর

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩৩, ২৩৫

এই ওসিয়ত বিস্মৃত হয়ে ইয়াজিদ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা আরও কঠিন পরিস্থিতির জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইয়াজিদ আরও ভুল সিদ্ধান্ত নেয় এবং এভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী, ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মুক্ত করা গোলাম রুজাইককে মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবার কাছে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তিনি যেন হুসাইন বিন আলী (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করেন। এই বার্তাবাহকই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যুর সংবাদও নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বার্তাবাহক যখন মদিনায় পৌঁছান তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। তিনি দ্বাররক্ষীকে অনুরোধ করে গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবার সাথে জরুরি সাক্ষাৎ করেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেন। [১]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং হুসাইন বিন আলী (রা.)-এর মদিনা থেকে মক্কায় যাত্রা:

ওয়ালিদ বিন উতবা তখনই প্রথমে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং পরে হযরত হুসাইন (রা.)-কে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠান এবং বায়াতের দাবি জানান। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) বললেন:

“এটি বায়াতের সময় নয় এবং আমার মতো ব্যক্তি এভাবে নির্জনে বায়াত করতে পারে না। আপনি আগামীকাল মিশরে বসে বায়াত গ্রহণ করবেন।”

এরই মধ্যে হযরত হুসাইন (রা.)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। যেহেতু ওয়ালিদ বিন উতবা কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি হযরত হুসাইন (রা.)-এর ওপরও বায়াতের জন্য চাপ সৃষ্টি করেননি এবং সে সময়ের জন্য উভয়কে চলে যেতে দেন। তবে নজরদারির জন্য পেছনে কিছু লোক পাঠিয়ে দেন। এই ব্যক্তিবর্গ সরকারের আচরণ দেখে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, বায়াত না করলে তাদের ওপর কঠোরতা করা হবে, অথচ বায়াত করা ছিল তাদের বিবেকের পরিপন্থী। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) রাতের শেষ প্রহরে শহর থেকে বের হয়ে একটি অপরিচিত পথে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। [২]

ওয়ালিদ সকালে তাদের অনুপস্থিতির কথা জানতে পেরে ত্রিশ বা আশি জন অশ্বারোহীকে তাদের পিছু ধাওয়া করতে পাঠান, কিন্তু তারা তাদের নাগাল পায়নি। [৩]

এক-দুই দিন পর হযরত হুসাইন (রা.)-ও পরিবারসহ মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নেন। [৪]

এই ব্যক্তিবর্গের মক্কায় যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, মদিনা সিরিয়ার তুলনায় নিকটবর্তী ছিল। মক্কা ছিল এর দ্বিগুণ দূরত্বে এবং পাহাড়বেষ্টিত। তাই সেখানে কর্মকর্তাদের পক্ষে তাদের পাকড়াও করা কঠিন ছিল। তাছাড়া হারামের পবিত্রতার কথা বিবেচনা করে সরকারের কাছ থেকে আশা করা যেত যে, তারা সেখানে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে দুর্নাম কুড়াবে না। এই দিকগুলো বিবেচনা করলে মদিনার তুলনায় মক্কায় তাদের নিরাপদ থাকা সহজেই বোঝা যায়। [৫]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩২; ওয়াহাব বিন জারির আন জুওয়াইরিয়া বিন আসমা আন মুহাম্মদ আন রুজাইক; আল-ইকদুল ফারিদ: ৫/২৫৫ আন কাসিম বিন সালাম; আল-মাহাসিন ওয়াল মাসাবি লি-ইবরাহিম আল-বাইহাকি, পৃ. ২৬ আন আবি মশার আস-সিন্দি, (পাণ্ডুলিপি)

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩২, আন ওয়াহাব বিন জারির আন জুওয়াইরিয়া বিন আসমা আন শুয়ুখুল মদিনা

[৩] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ৫/৩০০, ত. দারুল ফিকর; তারিখুত তাবারি: ৫/৩৩১ আন আবি মিখনাফ

[৪] তারিখুত তাবারি: ৫/৩৩১

[৫] তারিখুত তাবারি: ৫/৩৩১

হুসাইন (রা.)-এর মদিনা থেকে প্রস্থানের পূর্বে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ

হযরত হুসাইন (রা.) মদিনা থেকে প্রস্থানের পূর্বে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কাছেও গিয়েছিলেন। তিনি (ইবনে উমর) বললেন: “যাবেন না।” কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) তাতে সম্মত হলেন না। আলোচনার সময় তিনি ইবনে উমর (রা.)-কে ইরাকবাসীদের পাঠানো চিঠিপত্রের সেই বাণ্ডিলগুলোও দেখালেন। ইবনে উমর (রা.) সেগুলো দেখে বললেন: “ঐ লোকদের কাছে যাবেন না।” বিদায় জানানোর সময় ইবনে উমর (রা.) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদলেন এবং বললেন: “আমি আপনাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি, হে শহীদ।” [১]

হযরত হুসাইন (রা.)-এর মক্কার পথে আবদুল্লাহ বিন মুতী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?” তিনি (হুসাইন রা.) বললেন: “এখন তো মক্কায় যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে ভবিষ্যতের জন্য ইস্তিখারা করব।” [২]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুফাবাসীদের প্ররোচনা সত্ত্বেও হযরত হুসাইন (রা.) সেই সময় কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। কেন? কারণ তিনি যদি কুফায় যেতে চাইতেন, তবে মদিনা থেকে সরাসরি পথ ছিল, অথচ মক্কা হয়ে সেখানে যাওয়া মানে তুলনামূলক দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত হুসাইন (রা.) ২৭ বা ২৮ শে রজব রবিবার মদিনা থেকে বের হন এবং দ্রুত সফর করে ৩ রা শাবান মক্কায় পৌঁছান। এখানে আপনি চার মাস পাঁচ দিন (৮ ই জিলহজ ৬০ হিজরি পর্যন্ত) অবস্থান করেন এবং এই সময়ে পরিস্থিতির ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। [৩]

হযরত হুসাইন (রা.)-এর আন্দোলনের প্রকৃত প্রেক্ষাপট

হযরত হুসাইন (রা.) সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি রাসূল (সা.)-এর কোলে লালিত-পালিত হয়ে উচ্চতর ঈমানি ও চারিত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করেছিলেন। তিনি কেবল হযরত আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক এবং উসমান গনি (রা.)-এর স্নেহ-মমতাই পাননি, বরং তাঁদের থেকে জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। তিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে বংশীয় আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ এবং হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রাজনীতি ও ফিকহ শাস্ত্রের আমানতদার ছিলেন। দ্বীনি অন্তর্দৃষ্টি, ইলমি গভীরতা এবং দূরদর্শিতার দিক থেকে তিনি উম্মতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোনো অনভিজ্ঞ যুবক ছিলেন না, বরং সময়ের চড়াই-উতরাই দেখা এবং নিজের বয়সের ষষ্ঠ দশক পূর্ণকারী ব্যক্তি ছিলেন। এমন এক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই ধারণা করা অত্যন্ত অগভীর বিষয় হবে যে, তিনি কেবল ইয়াজিদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা তার ফাসেক-ফুজ্জুর হিসেবে পরিচিতিতে ভিত্তি করে বায়আত থেকে বিরত ছিলেন।

বাস্তবতা হলো, তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে ফাটল দেখা দিচ্ছিল, যা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য এবং আপাতত...

[১] শেষে ইবনে উমর বললেন: “আমি আপনাকে নিহত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি।” (মাজমাউজ জাওয়াইদ, হাদিস নম্বর: ১৫১৩০; আল-হাইসামি বলেন: এটি আল-বাযযার এবং আল-তাবারানি আল-আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং আল-বাযযারের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য; আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৫৯৭; তারিখু দামেশক: ১৩/২০২)।

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৫৫, ১৫৬, দারুল ফিকর। [৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮১ ইবনে আবি মিখনাফ থেকে; আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৬০।

তাচ্ছিল্যযোগ্য মনে হতো কিন্তু তিনি একজন অসাধারণ দূরদর্শী কুশলী ব্যক্তির মতো ভবিষ্যৎকে যেন খোলা চোখে দেখছিলেন, যেখানে এই সামান্য বিচ্যুতির প্রভাব কয়েক প্রজন্ম পরে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে প্রকাশ পেতে যাচ্ছিল।

যেভাবে বাঁধের ফাটল দিয়ে চুইয়ে পড়া পানি দেখে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি একটি বড় বিপদের আশঙ্কা নিশ্চিতভাবে অনুভব করেন এবং নিজের সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সেই সামান্য ফাটলটি বন্ধ করতে লেগে যান এবং সেই লোকদের আপত্তির পরোয়া করেন না যারা বিপদের গভীরতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে না, ঠিক তেমনি হযরত হুসাইন (রা.) আগামীকালের ক্ষতিসমূহকে আজই পুরোপুরি অনুধাবন করে নিজের জীবনের পরোয়া না করে একটি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং এরপর এ বিষয়ে কারো নসিহত ও উপদেশকে আমলে নেননি।

কথা হলো, হযরত হুসাইন (রা.)-এর এই পদক্ষেপের ওপর কি ‘খুরুজ’ (বিদ্রোহ) বা ‘বাগাওয়াত’-এর সংজ্ঞা প্রয়োগ করা যেতে পারে? প্রকৃতপক্ষে হযরত হুসাইন (রা.)-এর আন্দোলন এমন এক শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যাতে আত্মত্যাগ ও বীরত্বের রঙ ফুটে উঠেছিল, এই সতর্কতা ও পরিমিতিবোধের সীমার মধ্যে থেকে একে ‘খুরুজ’ বলা সহজ নয়।

এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলে জানা যাবে যে, হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদ অনুযায়ী তখনো ইয়াজিদের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কারণ হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে ইয়াজিদের জন্য যে বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল, তার মর্যাদা ছিল কেবল একটি পরামর্শের এবং এর দ্বারা ইয়াজিদের খিলাফত সাব্যস্ত হয়ে যায়নি। যেমনটি ইসলামী রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব কাজী আবু ইয়াল্লা আল-ফাররা (রহ.) লিখেছেন:

“খিলাফত কেবল উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং মুসলমানদের গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।” [১]

সেই সময়ের পরিস্থিতি ছিল এই যে, ইয়াজিদ খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সিরিয়া ছাড়া অন্য কোথাও মুসলমানদের সমর্থন তার ভাগ্যে জোটেনি। দামেস্ক ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের রাজনীতির বড় কেন্দ্রসমূহ: মক্কা, মদিনা, কুফা ও বসরা ছিল। আহলে হিজাজ ইয়াজিদের শাসনকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। কয়েক বছর আগে যখন প্রথম ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়টি সামনে এসেছিল, তখন হিজাজের বড় বড় ব্যক্তিবর্গ সবচেয়ে বেশি আপত্তি জানিয়েছিলেন। যেমন সেই সময় আব্দুর রহমান বিন আবি বকর (রা.) মসজিদে নববীতে প্রকাশ্যে এই নতুনত্বকে কায়সার ও কিসরার প্রথা বলেছিলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-ও বাইয়াতের মজলিসে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-ও বাইয়াত পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। হিজাজের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ যারা...

[১] মূল পাঠ: (ط العلية، ৯، لان الامامة لا تتعقد للمعهود اليه بنفس العهد، وانما تتعقد بعهد المسلمين). (الأحكام السلطانية للفراء، ص ১১)

ولا قيمة لعهد الامام لاحد من بعد بتولى منصب الخلافة مالم ترك الغالبية الامة هذا الترشيح وتبايعه على ذلك. (انظر حاشية “الأحكام السلطانية” دكتور আহমদ জাদ বলেন: (، ط دار الحديث القاهرة ১৯৬০ للهاوردی، ص ২)

হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) লিখেছেন: “উলামায়ে কেরামের অগ্রগণ্য মত হলো এই যে, উত্তরাধিকারী হওয়া কেবল একটি প্রস্তাবের মর্যাদা রাখে এবং খলিফার মৃত্যুর পর ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর ইখতিয়ার থাকে যে, তারা চাইলে সেই উত্তরাধিকারীকে খলিফা বানাবেন অথবা পারস্পরিক পরামর্শে অন্য কাউকে খলিফা নিযুক্ত করবেন। সুতরাং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ইয়াজিদের খিলাফত সেই সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি যতক্ষণ না ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ এ বিষয়ে পরামর্শ করে তাকে মঞ্জুর করেন।” (হযরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১৬১)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

...ছিলেন, তারা ইয়াজিদকে মুসলমানদের সন্তুষ্টি ও ঐকমত্য ছাড়াই জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া একজন শাসক হিসেবে দেখছিলেন। কিছু উচ্চমর্যাদার তাবিঈ ইয়াজিদের বায়াত থেকে বাঁচার জন্য হিজরত করেছিলেন। [১] এদিকে ইরাকের লোকেরাও ইয়াজিদের শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, এবং তাদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাছে আসা চিঠিগুলো প্রকাশ করছিল যে সেখানে ইয়াজিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। স্বয়ং ইয়াজিদের কিছু গভর্নরেরও বিশ্বাস ছিল না যে এই নতুন সরকার টিকে থাকতে পারবে কি না। তাদের নিজস্ব আন্তরিক ঝোঁক হযরত হুসাইন (রা.)-এর দিকে ছিল, যেমনটি কুফার গভর্নর নুমান বিন বশির (রা.) স্পষ্টভাবে বলতেন: ‘বজদলের নাতির তুলনায় আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাতি অধিক প্রিয়।’ [২]

এই পরিস্থিতিতে হযরত হুসাইন (রা.)-এর এই ধারণা বাস্তব পরিস্থিতির পরিপন্থী ছিল না যে, ইয়াজিদের অবস্থান এমন একজন রাজনীতিবিদের মতো যে উম্মতের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা ছাড়াই জোরপূর্বক চেপে বসার চেষ্টা করছে এবং তার খিলাফত এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব, তার আধিপত্য সাব্যস্ত হওয়ার আগেই একটি আদর্শ সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা সেই বিদ্রোহের (খুরুজ) অন্তর্ভুক্ত হবে না যা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। এটি কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ভেঙে ফেলা নয়, বরং একটি বিতর্কিত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে রুখে দিয়ে মুসলমানদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সর্বসম্মত ও গ্রহণযোগ্য সরকার প্রদানের চেষ্টা হবে। হযরত হুসাইন (রা.)-এর সামনে সেই নববী বাণীসমূহও ছিল যাতে কোনো মন্দকে অন্তর থেকে খারাপ জানাকে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর বলা হয়েছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তা হাত বা মুখ দিয়ে প্রতিহত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [৩]

হযরত হুসাইন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী তখনও সামর্থ্য ও সক্ষমতা বিদ্যমান ছিল, তাই মক্কায় পৌঁছানোর পর উভয়ই এই বিষয়ে একমত হলেন যে ইয়াজিদের শাসন প্রতিষ্ঠা রোধ করার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত। যদিও এই পথে কঠিন বিপদও ছিল এবং এই মহান ব্যক্তিদের পূর্ণ ধারণা ছিল যে এটি জীবনের ঝুঁকি, কিন্তু তাঁদের উভয়ের ফিকহী প্রজ্ঞা এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছিল যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংকল্পের (আযীমত) এই পথ অবলম্বন করা অন্তত তাঁদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়ে পড়েছে।

মদিনা মুনাওয়ারায় ধরপাকড়, ওয়্যাদ বিন উতবার অপসারণ এবং আমর বিন সাঈদের নিয়োগ:

ওয়ালিদ হযরত হুসাইন এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) চলে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন মুতী আল-আদভী (রা.) এবং মুসআব বিন আবদুর রহমান বিন আউফকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, যারা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর অনুরাগী ছিলেন। মদিনাবাসী আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কাছে ফরিয়াদ করলেন যেন তিনি শাসকদের এই ধরনের কঠোরতা থেকে বিরত রাখেন।

[১] শাহর বিন হাওশাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন আমাদের কাছে ইয়াজিদের বায়াতের খবর এল, তখন আমি বললাম যদি আমি শামের দিকে বেরিয়ে যেতাম তবে এই বায়াতের অনিষ্ট থেকে বেঁচে যেতাম। (জামে মা’মার বিন রাশিদ, বাবু আশরাতিস সা’আহ)

[২] কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যার সন্তান আমাদের কাছে বজদলের মেয়ের সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয়। (আল-মিহান, পৃ. ১৫০, ইমাম কাসিম বিন সালাম থেকে ইমাম সাহনুন সূত্রে)। স্মরণীয় যে, ইয়াজিদের মায়ের নাম ছিল মায়সুন বিনতে বজদল। এই নারী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ইয়াজিদের নানা বজদল, যে দামেস্কের একটি গির্জার মুতাওয়াল্লি ছিল, সে খ্রিস্টানই থেকে যায়। (আল-মা’রিফাতু ওয়া আদাবুহা বাইনাল আরাবিল জাহিলিয়াহ, রিজকুল্লাহ বিন ইউসুফ, পৃ. ৬১)

[৩] তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো অন্যায় দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়, যদি সে সক্ষম না হয় তবে মুখ দিয়ে, আর যদি সে সক্ষম না হয় তবে অন্তর দিয়ে, আর এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (সহীহ মুসলিম, হা: ১৮৬, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওনিন নাহয়ি আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান; মুসনাদে আবু ইয়লা, হা: ৫০০৯; সুনান ইবনে মাজাহ হা: ৪০১৩)

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) অস্থির হয়ে ওয়ালিদ বিন উতবার সাথে দেখা করলেন এবং তাকে বললেন: “তোমার শাসনের স্থায়িত্বের জন্য হকের ওপর অবিচল থাকো, জুলুম করো না। যাদেরকে গ্রেফতার করেছ তারা নির্দোষ, তাদের ছেড়ে দাও।” ওয়ালিদ বিন উতবা নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন যে, আমিরুল মুমিনীন ইয়াজিদের নির্দেশ এমনই।

মদিনাবাসী যখন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্বের সুপারিশকেও ব্যর্থ হতে দেখল, তখন তারা নিজেরাই কারাগারে হামলা করে বসল। এই অভিযানে আবদুল্লাহ বিন মুতি (রা.) মুক্ত হয়ে গেলেন এবং পালিয়ে মক্কায় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। [১]

হযরত হুসাইন এবং ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর মদিনা ত্যাগের খবরে ইয়াজিদের উদ্বেগ বেড়ে গেল। সে বায়আত গ্রহণে ব্যর্থতার সমস্ত দায়ভার ওয়ালিদ বিন উতবার ওপর চাপিয়ে দিল এবং তাকে দুর্বল মনে করে পদচ্যুত করল। তার স্থলে আমর বিন সাঈদ আল-আশদাককে নিয়োগ দেওয়া হলো, যে কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিল। [২] সে রমজান মাসে মদিনায় পৌঁছাল [৩] এবং এসেই কসম খেয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা আক্রমণের সংকল্প ব্যক্ত করল, যেখানে এই ব্যক্তিবর্গ আশ্রয় নিয়েছিলেন। [৪] কিন্তু আমর বিন সাঈদের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে মক্কায় হামলা করা সম্ভব ছিল না; কারণ শাওয়াল মাস ঘনিয়ে আসছিল এবং হাজীদের কাফেলা মক্কার দিকে রওনা হতে শুরু করেছিল। তাওহীদের অনুসারীরা এই পবিত্র ভূমিতে, এমন বরকতময় দিনগুলোতে, রহমতে আলম (সা.) এবং সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর নাতিদের মতো মহান ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ কীভাবে সহ্য করতে পারত। ফলে ইয়াজিদের সরকারের কাছে জিলহজ মাসের সমাপ্তি এবং হাজীদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

হযরত হুসাইন (রা.) কেন ইরাক যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন?

এই সময়ে পরিস্থিতির উত্থান-পতন নিয়ে চিন্তা করতে করতে হযরত হুসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.), যারা সময়ে সময়ে পরামর্শে লিপ্ত থাকতেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, কোনো উপযুক্ত স্থানকে কেন্দ্র বানিয়ে নিজেদের সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া উচিত। তবে সংগ্রামের কেন্দ্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয়ের মত ভিন্ন ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) মক্কাকে সবচেয়ে নিরাপদ ও উপযুক্ত মনে করতেন, যা ছিল মুসলিম বিশ্বের ঈমানি ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এবং সেখানে তার সমর্থক কুরাইশরা ছাড়াও নেককার ও পরহেজগার লোকদের বড় একটি সংখ্যা বসবাস করত। তিনি চেয়েছিলেন হযরত হুসাইন (রা.)-ও মক্কাতেই কেন্দ্র বানান।

কিন্তু যেভাবে হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাছে কুফা থেকে ক্রমাগত চিঠি এবং প্রতিনিধি দল এসে তাদের দৃঢ় সমর্থনের নিশ্চয়তা দিচ্ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হুসাইন (রা.) ইরাক যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্বের সাথে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন।

এর প্রথম কারণ ছিল এই যে, আপনার কাছে আন্দোলনে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হিজাজের তুলনায় ইরাকে জনশক্তি বেশি ছিল, তাই সেখানে কম ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে বিজয়ের আশা করা যেত।

[১] আনসাবুল আশরাফ, বালাগুরি: ৩০৩/৫, ত. দারুল ফিকর। এই ঘটনা থেকেও স্পষ্ট হয় যে, ইয়াজিদের শাসন তখন পর্যন্ত নামমাত্রই ছিল। আর সিরিয়াবাসী ছাড়া বাকি লোকেরা সাধারণত তাকে মেনে নেয়নি।

[২] তারিখুত তাবারী: ৩৩৩/৫

[৩] আমর বিন সাঈদ বিন আল-আস আল-আশদাক ৬০ হিজরির রমজান মাসে মদিনায় আসেন। (তারিখুত তাবারী: ৩৩৩/৫)

[৪] তারিখ খলিফা বিন খয়্যাতি, পৃ. ২৩৩, সনদ: জুয়াইরিয়া বিন আসমা।

দ্বিতীয়ত, আপনার কাছে হারমাইনের পবিত্রতা নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় ছিল, যার খাতিরে হযরত উসমান গনি (রা.) ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং যার কারণে হযরত আলী (রা.) দিয়ারে রাসূল (সা.) ত্যাগ করেছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.) নিশ্চিত ছিলেন যে, হজ্জের মৌসুমের পরেও যদি তিনি মক্কায় অবস্থান করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে, যার ফলাফল যাই হোক না কেন, এর ফলে পবিত্র ভূমিতে মুসলমানদের রক্তপাত হবে। তাই হযরত হুসাইন (রা.) মক্কায় অবস্থানকালে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে বলতেন: “আমি যদি অন্য কোথাও নিহত হই তবে তা আমার কাছে পছন্দনীয়, কিন্তু আমি এটা সহ্য করতে পারি না যে আমার কারণে এই ভূমির পবিত্রতা নষ্ট হোক।” [১]

এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, হযরত হুসাইন (রা.) নিজের জীবনের প্রতি যে বিপদ রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি ইরাকবাসীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং বনু উমাইয়ার পক্ষ থেকে কঠোরতা প্রদর্শনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। [২]

সুতরাং তিনি ইরাকবাসীদের অস্থির মেজাজ সম্পর্কে অনবগত ছিলেন না, তাদের ওপর তাঁর এমন অন্ধ বিশ্বাস ছিল না যেমনটি সাধারণত মানুষ মনে করে থাকে। এই কারণেই তিনি ইরাকে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো তাড়াহুড়ো করেননি।

কেন অধিকাংশ বড় বড় ব্যক্তিত্ব ইয়াজিদের হাতে বায়আত হতে সম্মত হয়েছিলেন?

ইতিমধ্যে ইয়াজিদের পক্ষ থেকেও তার শাসন ব্যবস্থা সুসংহত করার এবং বিভিন্ন স্থানে বায়আত গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছিল। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন শহরের গভর্নররা জনগণের কাছ থেকে বায়আত নিয়েছিলেন। [৩]

প্রশ্ন হলো, যদি ইয়াজিদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা খুলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতির অনুরূপ না হয়ে থাকে অথবা তার চরিত্র যদি আপত্তিজনক হয়ে থাকে, তবে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীনসহ সেই সকল ব্যক্তিবর্গ কেন বায়আত গ্রহণ করেছিলেন?

[১] আখবার মক্কা লিল-ফাকিহি: ২/২৩২, রিজালুল সিকাত, দারুল খিজর।

[২] আল-কামিলে উল্লেখ আছে যে, একবার হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাছে চিঠিপত্রের একটি স্তুপ আনা হলো। হযরত হুসাইন (রা.) বাঁদীকে নির্দেশ দিলেন সেগুলো নিয়ে আসতে এবং সেগুলো একটি পাত্রে ঢেলে দিতে। তারপর তিনি চিঠিপত্রগুলো না খুলেই পানিতে ফেলে দিলেন। ইয়াজিদ বিন আমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “এগুলো কাদের চিঠি?” তিনি বললেন: “ইরাকবাসীদের মধ্য থেকে যারা হকের দিকে আসে না এবং বাতিল থেকেও বিরত থাকে না। মনে রেখো! আমি তাদের সম্পর্কে কোনো সংশয়ে নেই, বরং আমি এই লোকদের ব্যাপারে ভীত।” এর দ্বারা হযরত হুসাইন (রা.) বিপদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৩/২০১, তাহকীক মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ, সনদ সহীহ)। এর অর্থ হলো, ইরাকবাসীরা হযরত হুসাইন (রা.)-কে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। স্পষ্টতই হযরত হুসাইন (রা.)-এর এই আশঙ্কাগুলো ভুল ছিল না। তা সত্ত্বেও যখন হযরত হুসাইন (রা.) ইরাকের দিকে যাত্রার সংকল্প করলেন, তখন আমরা দেখতে পাই এবং সাথে সাথে আমরা এটাও স্বীকার করি যে, হযরত হুসাইন (রা.) কোনো হঠকারী বা আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর সামনে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অবশ্যই ছিল যার মাধ্যমে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আশা করছিলেন। আমাদের মতে, হযরত হুসাইন (রা.) যখন ইরাকবাসীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সংকল্প করেছিলেন, তখন তিনি এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেছিলেন যে, ইরাকবাসীদের সমর্থনের জোয়ারে সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী ইয়াজিদ সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব এবং এর মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক খিলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এমন পরিস্থিতিতে কেবল শাসকদের ক্রোধ ও আক্রোশ নয় বরং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। সামনে আসা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এই প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য বিকল্প কর্মপন্থাও ভেবে রেখেছিলেন। বিস্তারিত সামনে আসছে।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৭।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বাস্তবতা হলো এই যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দলিল ও ইজতিহাদের সাথে একমত ছিলেন এবং কেউ কেউ শরীয়তের অন্য একটি হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। সেই হুকুমটি হলো ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং বিভেদ থেকে বিরত থাকা। এই হুকুম কুরআন ও হাদীসের বহু নস (অকাট্য প্রমাণ)-এ বিদ্যমান। এই গুরুত্বপূর্ণ হুকুমটি পালনের জন্য কিছু পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে গিয়ে কোনো নিম্নতর বা অনুত্তম পথকে অপছন্দ সত্ত্বেও গ্রহণ করে নেওয়া হয়। বায়আত গ্রহণকারী আকাবিরদের ধারণা এমনই ছিল।

হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, ইয়াজিদের খলিফা হওয়ার সময় তিনি একজন সাহাবীর কাছে গেলেন, তখন তিনি বললেন: “তোমরা বলছ যে ইয়াজিদ উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নয়, ইলম, ফিকহ ও মর্যাদায় সবার উর্ধ্বে নয়, আমিও তাই বলি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ঐক্যবদ্ধ থাকাকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ওপর প্রাধান্য দিই।” [১]

আকাবিরদের বায়আতে সম্মত হওয়ার একটি কারণ এও ছিল যে, সেই সময় ইয়াজিদের খ্যাতি তেমন ছিল না যেমনটি পরবর্তীতে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা, হাররার ঘটনা এবং কাবা অবরোধের মতো মুছে না যাওয়ার মতো কলঙ্ক তার আঁচলে লাগার পর হয়েছিল। বরং সিংহাসনে আরোহণের সময় সে তার কিছু ভ্রূটি থাকা সত্ত্বেও একজন সাহাবীর পুত্র, একটি নেক ও সৎ পরিবারের সদস্য এবং একজন উচ্চবংশীয় রাজপুত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই অনেক আকাবির আশঙ্কাগুলোকে উপেক্ষা করে ভালো আশা পোষণ করার সুযোগ আছে বলে মনে করছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) ইয়াজিদের বায়আত সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

সুতরাং ইয়াজিদের প্রতিনিধি যখন বায়আত নেওয়ার জন্য মক্কায় আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি উপস্থিতদের বললেন: “আল্লাহর কসম! মুয়াবিয়া তার পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো ছিলেন না, তবে তার পরে তার মতো আর কেউ আসবেও না। নিশ্চয়ই তার পুত্র ইয়াজিদ তার নেক পরিবারের একজন সদস্য। অতএব আপনারা সবাই নিজ নিজ স্থানে শান্তিতে বসে থাকুন। ইয়াজিদের বায়আত করে আনুগত্য করুন।” এরপর তিনি নিজেও বায়আত গ্রহণ করেন। [২]

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর অবস্থান ছিল এই যে, যদি সব মানুষ বায়আত করে নেয়, তবে আমিও করে নেব। [৩] এজন্যই যখন তিনি দেখলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বায়আত করে নিয়েছে, তখন তিনি ইয়াজিদের বিরোধিতায় সফলতার আশার পরিবর্তে উম্মতের বিভেদ ও রক্তপাতের আশঙ্কা অনুভব করলেন। ফলে তিনিও বায়আত করে নিলেন। [৪] স্পষ্টতই এই বায়আত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে ছিল না, এজন্যই তিনি বায়আতের সময় এই মন্তব্য করেছিলেন: “إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً صَبَرْنَا” (যদি এতে কল্যাণ থাকে তবে আমরা সন্তুষ্ট, আর যদি পরীক্ষা হয় তবে আমরা সবর করব।) [৫]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৭, সহীহ সনদে।

[২] “নিশ্চয়ই তার পুত্র ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া তার পরিবারের নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত।” (আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ৫/২৯০, ত. দারুল ফিকর)। এর সনদে আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া রয়েছে। আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া যার থেকে মাদায়েনি বর্ণনা করেন, তিনি হলেন আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আল-জিয়াদি। (দেখুন: আল-মাদায়েনি আন আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আল-জিয়াদি: কাল হাজ্জা আব্দুল মালিক ইলাখ; আনসাবুল আশরাফ: ৭/২৪৬)। তিনি একজন মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যক্তি, তাই অজ্ঞতার কারণে সনদটি যযীফ (দুর্বল)।

[৩] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৬৮০৯, ত. ইলমিয়াহ; আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩০১, জিকর মা কানা মিন আমরি আল-হসাইন বিন আলী, ত. দারুল ফিকর।

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৬৬৩৩, ত. ইলমিয়াহ।

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৭, সহীহ সনদে।

কি ইয়াযীদের পক্ষ থেকে শিথিলতা প্রদর্শন করা হচ্ছিল?

কিছু লোক মনে করেন যে, ইয়াযীদ পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত হুসাইন (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর প্রতি অত্যন্ত শিথিলতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন এবং এ কারণেই তিনি চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত তাদের “বিদ্রোহী তৎপরতার” বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইয়াযীদের ব্যাপারে এই ধারণা একটি ভিত্তিহীন ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইয়াযীদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব কেবল অনিবার্য ছিল এবং এর কিছু কারণও ছিল:

প্রথম কথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত হুসাইন (রা.) মক্কায় ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইয়াযীদের শাসন সেখানে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত হয়নি। জাজিরাতুল আরবে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং এটাই কারণ ছিল যে দামেস্কের সরকার চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত হযরত হুসাইন (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেনি।

আরেকটি কারণ ছিল যে, তারা দুজন মদিনা থেকে মক্কায় পৌঁছানোর দুই মাস পর শাওয়াল মাসে হজের মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই পরবর্তী তিন মাস হাজীদের ভিড়ের কারণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

যাইহোক, হাজীরা ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই এবং ইয়াযীদ তার শাসন সুসংহত করার পর, ৬১ হিজরিতে ইয়াযীদের গভর্নর আমর বিন সাঈদ দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কায় আক্রমণ করেন। এটি ভিন্ন কথা যে, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) মক্কাবাসীদের সহায়তায় তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন [১]।

সরকারের যদি বাইতুল্লাহর (আল্লাহর ঘর) পবিত্রতার প্রতি সামান্যতম সম্মান থাকত, তবে মক্কায় এই সৈন্য পাঠানোর অর্থ কী ছিল? আর যদি ইয়াযীদের পক্ষ থেকে শিথিলতা প্রদর্শনের নীতি থাকত, তবে এই “শিথিলতা” কেবল কয়েক মাস বা জাজিরাতুল আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না, বরং কুফার সীমান্তে এবং কারবালার ময়দানেও হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে সম্মানজনক আচরণ করা হতো। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে বারবার সৈন্য পাঠানো হতো না, বরং এই ব্যক্তিদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বায়াত দাবি করে তাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও প্রিয় শহর ছাড়তে বাধ্য করা হতো না।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর নামে ইয়াযীদের পত্র:

হযরত হুসাইন (রা.) যখন মক্কায় ছিলেন, তখনই ইয়াযীদ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-কে একটি পত্র পাঠিয়েছিল, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে সে হযরত হুসাইন (রা.)-এর গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল এবং তার পক্ষ থেকে বিদ্রোহের প্রবল আশঙ্কা করছিল। এই পত্রে হুমকির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ইয়াযীদ লিখেছিল:

“হুসাইন (রা.)-এর কাছে প্রাচ্যের (ইরাকের) লোকেরা আসছে এবং তাকে খিলাফতের আশা দিচ্ছে। আপনি পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত এবং একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। যদি হুসাইন (রা.) এমনটি করেন, তবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আপনি পরিবারের একজন বড় ও সম্মানিত ব্যক্তি, তাকে এই বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত রাখুন।”

[১] তারিখ আল-তবারী: ৫/৩৪৪, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/১২, এর সারমর্ম সহীহ বুখারী (হাদিস নং: ১০৩, কিতাবুল ইলম)-এও বিদ্যমান।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) জবাবে লিখেছিলেন:

“আমি আশা করি যে, হুসাইন (রা.)-কে এমন কোনো কাজে পাঠানো হবে না যা আপনার কাছে অপছন্দনীয় হবে।” [১]

মোটকথা, দামেস্কের পরিবেশ ছিল অস্থির। কুফাবাসীদের সাথে হযরত হুসাইন (রা.)-এর যোগাযোগ দেখে ইয়াজিদ শঙ্কিত ছিল যে তারা বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে। অন্যদিকে হযরত হুসাইন (রা.) নিশ্চিত ছিলেন যে, ইয়াজিদ বা তার কর্মকর্তারা তাঁর অবস্থানের কথা বিবেচনা না করেই তাঁকে বিদ্রোহের অপরাধী সাব্যস্ত করে হত্যা করতে পারে। তাই সেই সময়ে হযরত হুসাইন (রা.) ইয়াজিদের সাথে দেখা করে নিজের অবস্থান তুলে ধরার চেয়ে ইরাকে গিয়ে তাঁর সমর্থকদের সাহায্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করাকেই ফলপ্রসূ মনে করেছিলেন।

ইরাকবাসীদের চিঠি:

কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত চিঠি ও বার্তাবাহক আসছিল এবং তথ্য ছিল এই যে, পুরো ইরাক ইয়াজিদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। শুধুমাত্র কুফাতেই এক লক্ষ সশস্ত্র লোক হযরত হুসাইন (রা.)-কে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। [২] আর সেখানকার মানুষ স্থানীয় গভর্নর নুমান বিন বশির (রা.)-এর পেছনে জুমার নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছে। মানুষ হযরত হুসাইন (রা.)-এর অনুগত এবং তিনি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। [৩]

পরিস্থিতির এই দৃশ্যপট বলে দিচ্ছিল যে, যদি অবিলম্বে ইরাক সফর না করা হয় তবে সেখানে ভয়াবহ হত্যা ও লুণ্ঠন শুরু হতে পারে, কারণ সেখানকার স্বল্প ধৈর্যশীল ও হঠকারী লোকেরা যেকোনো সময় বিদ্রোহ শুরু করে দিতে পারত।

হযরত হুসাইন (রা.) বছরের পর বছর ধরে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কর্মপদ্ধতির প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, তিনি সেই অবুঝ লোকদের তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে মমতা ও ভালোবাসার সাথে তাদের প্রশিক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় হাজার হাজার ভক্ত অস্থির হয়ে হযরত হুসাইন (রা.)-কে ডাকছিল এবং হযরত হুসাইন (রা.) ছাড়া এমন কেউ ছিল না যে তাদের মাথায় হাত রেখে তাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে। যদি তাদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে একটি উদ্দেশ্যহীন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত।

[১] তারিখ দিমাশক: ১৩/৩১০... এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত হুসাইন (রা.)-এর পরিকল্পনা শুরু থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল, যাতে তিনি জনসমর্থনের মাধ্যমে পরিস্থিতির সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। প্রতিটি সম্ভাব্য পরিস্থিতির সম্ভাবনা তাঁর সামনে ছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহও লিখেছেন: “আর হুসাইন (রা.) যুদ্ধের ইচ্ছা করেননি, বরং তিনি মনে করেছিলেন যে লোকেরা তাঁর আনুগত্য করবে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৫৩০)। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার অর্থ এও হতে পারে যে, হযরত হুসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে ফিতনা, ফাসাদ ও যুদ্ধের কোনো ভয় নেই। এ থেকে আরও অনুমান করা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর মধ্যে এই আন্দোলনের লক্ষ্য, কর্মপন্থা এবং বাস্তব ব্যবস্থা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছিল এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর রূপরেখা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। এজন্যই তিনি হযরত হুসাইন (রা.)-এর নিয়ত ও সংকল্পের ব্যাপারে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং ইয়াজিদকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে এটি কোনো বিদ্রোহী আন্দোলন নয় বরং পরিস্থিতির সংস্কারের একটি প্রচেষ্টা। তবে অন্যান্য বর্ণনা থেকে এও অনুমান করা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত হুসাইন (রা.)-এর আন্দোলনের পরিণাম নিয়ে চিন্তিতও ছিলেন। কারণ তিনি কুফাবাসীদের স্বভাব ও অস্থিরতা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন না। আন্দোলনের পরিণাম দেখে তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে কুফাবাসীরা হয়তো ভীরুতার শিকার হবে এবং আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে হযরত হুসাইন (রা.)-কে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে পারে। এই কারণেই অন্যান্য সাহাবীগণও ইরাক সফরে বাধা দিয়েছিলেন। এই চিঠি থেকে এও অনুমান করা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত হুসাইন (রা.) ইরাকবাসীদের শক্তি সঞ্চয় করার আগে আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রকাশ করাকে রাজনৈতিক ভুল মনে করতেন। তাই এই চিঠিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এমন ভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন এবং হযরত হুসাইন (রা.) কী করতে চান সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি। তিনি কেবল ইয়াজিদকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে সে তাড়াহুড়ো করে কোনো হঠকারী পদক্ষেপ না নেয়।

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৩৯১, মুসনাদ সহীহ, কাতাবা ইলাইহি আহলুল কুফা আন্না মাআকা মিআতা আলফ।

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৩৩, মুসনাদ হাসান।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

...যেখানে একজন নেতার উপস্থিতিতে জনগণকে সংগঠিত করে তাদের চাপের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে অথবা সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব ছিল। এই কারণে আপনি ঝুঁকি নিয়ে ইরাক যাওয়া জরুরি মনে করলেন। আপনি আশা করেছিলেন যে সেখানে আপনি মানুষের সম্ভৃষ্টি ও আগ্রহের সাথে উম্মতের নেতৃত্বের সুযোগ পাবেন, অন্যদিকে হিজাজবাসীরাও আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর নেতৃত্বে সমর্থন দেবে। এত শক্তিশালী জনসমর্থন পাওয়ার পর সিরিয়াবাসীদের ওপর যে চাপ পড়বে, তার ফলে হয় তারা প্রতিরোধ ত্যাগ করে ব্যবস্থার সংস্কারে প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই একটি আদর্শ সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আর যদি সিরিয়াবাসীরা না মানে, তবে ইরাক ও হিজাজের সম্মিলিত শক্তি কোনো বড় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই তাদের পরাভূত করে ফেলবে।

৬০ হিজরির কুফিবাসী:

৬০ হিজরিতে যখন হযরত হুসাইন (রা.) কুফায় যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, তখন শিয়াবাদ তার প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। রাফেজিদের এত চর্চা ছিল না, আর তাদের কোনো আলাদা পরিচয়ও ছিল না। হযরত হুসাইন (রা.) যাদের আমন্ত্রণে কুফায় যেতে চেয়েছিলেন, তারা সঠিক আকিদার মুসলিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে কিছু অত্যন্ত সুনামধন্য ও মুখলিস লোকও ছিলেন। সাধারণ মুসলিমদের সাথে তাদের মতাদর্শের পার্থক্য শুধু এতটুকুই ছিল যে, এই লোকেরা হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। তবে পরবর্তী পরিস্থিতি বলে দেয় যে, কুফার এমন কিছু নেক ও মুখলিস লোকও কোনো ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় ও পূর্বপরিকল্পিত এবং এর উদ্দেশ্য মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু করানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী কী করতে চেয়েছিল?

ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী জানত যে হযরত হুসাইন (রা.) কেবল উম্মতের কল্যাণের জন্যই কুফায় তশরিফ আনবেন। অন্যদিকে তারা এটাও জানত যে ইয়াজিদ এবং তার কর্মকর্তারা হযরত হুসাইন (রা.) সম্পর্কে সন্দিহান এবং তারা তাকে বিদ্রোহপ্রবণ বলে নিশ্চিত হয়ে আছে। তৃতীয়ত, এটাও স্পষ্ট ছিল যে কুফার সাধারণ সহজ-সরল মানুষ বনু হাশিমকে অবশ্যই ভালোবাসে, কিন্তু পরীক্ষার সময় এই লোকেরা সবসময় পিছিয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা ছিল হযরত হুসাইন (রা.)-কে যেকোনোভাবে কুফার দিকে নিয়ে আসা। এর আগে কুফায় কিছু না কিছু হাঙ্গামা সৃষ্টি করে সরকারকে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া যে হযরত হুসাইন (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ফলে সরকার কোনো বিচক্ষণতার পরিচয় না দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হযরত হুসাইন (রা.) শহীদ হয়ে যাবেন। এই গোষ্ঠীর বিশ্বাস ছিল যে যদি সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে সেই সময় কুফাবাসীরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে এবং কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

এটা ঠিক যে আমাদের কাছে ষড়যন্ত্র সাজানোর এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যাতে লেখা আছে যে অমুক ব্যক্তি এই ধরনের পরিকল্পনা সাজিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী বিস্ময়কর ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা বলে দেয় যে সবকিছু হঠাৎ করে ঘটে যায়নি, বরং পর্দার আড়ালে কিছু হাত ছিল যারা বিষয়টিকে নিকৃষ্টতম পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে তারা কুফারই কিছু লোক ছিল। এই কারণেই আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার জন্য কুফাবাসীদের তিরস্কার করতেন।

তারিখ-এ উম্মত-এ মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

কোনো ব্যক্তির নাম নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না, তবে ধারণা করা হয় যে, যারা চিঠি পাঠিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ষড়যন্ত্রকারী ছিল। যদিও চিঠি পাঠানোদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ও নেক চরিত্রের মানুষ ছিলেন এবং তারা আহলে বাইতের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি রাখতেন, কিন্তু কোনো প্রমাণ ছাড়া তাদের এই ষড়যন্ত্রে শরিক মনে করা যায় না। তবে ষড়যন্ত্রকারীরা অবশ্যই তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। [১]

হযরত হুসাইন (রা.)-কে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর পরামর্শ:

হিজাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কুফার ইতিহাস সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তাই যখন সফরের ইচ্ছা হলো, তখন হযরত হুসাইন (রা.)-এর অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ হলো এবং সবাই কুফাকে বিপজ্জনক মনে করে আপনাকে হিজাজেই থাকার পরামর্শ দিলেন। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-ও ছিলেন। যখন তিনি আপনার দৃঢ় সংকল্পের কথা জানতে পারলেন, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন:

“আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ঐ লোকদের কাছে যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে এবং আপনার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?” হযরত হুসাইন (রা.) বললেন: “যদি আমি এখানে বা ওখানে কোথাও নিহত হই, তবে তা আমার কাছে পছন্দনীয়, কিন্তু আমি এটা চাই না যে আমার কারণে এই পবিত্র ভূমির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোক।” [২]

এই বর্ণনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণিত হয়:

- হযরত হুসাইন (রা.) হিজাজে নিজের উদ্দেশ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশের আশা করছিলেন না।
- তাঁর ভয় ছিল যে সরকার তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করবে। নিজের মতাদর্শে অটল থাকার কারণে হত্যার আশঙ্কাও ছিল।
- এই আশঙ্কা অন্য কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রেও ছিল, কিন্তু তিনি হারামে রক্তপাত পছন্দ করতেন না।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) হযরত হুসাইন (রা.)-এর অত্যন্ত একনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং তিনি তাঁকে কুফায় যাওয়ার ব্যাপারে শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই নিষেধ করেছিলেন। এর বিপরীতে কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি হযরত হুসাইন (রা.)-কে ইরাকে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন যাতে তিনি হিজাজ দখল করতে পারেন। সেই বর্ণনাসমূহ অত্যন্ত দুর্বল এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য।

মুসলিম বিন আকীলের কুফা অভিমুখে যাত্রা:

যখন চিঠি ও প্রতিনিধিদলের আসা অব্যাহত থাকল, তখন হযরত হুসাইন (রা.) অনুভব করলেন যে কুফায় গিয়ে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তাই আপনি সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তবে নিজে যাওয়ার আগে সতর্কতা হিসেবে নিজের চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় পাঠালেন যাতে তিনি নিজের চোখে সেখানকার পরিস্থিতি দেখে নিতে পারেন। [৩]

[১] মনে রাখা দরকার যে, হযরত হুসাইন (রা.)-কে কুফায় আহ্বানকারী ব্যক্তিদের তালিকায় আবু মিখনাফ এবং হিশাম কালবীর বর্ণনায় অনেক নাম রয়েছে। এর মধ্যে কিছু উচ্চপদস্থ মুসলিমদের নামও রয়েছে যা সন্দেহজনক। হতে পারে এই নামগুলো পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটাও হতে পারে যে কিছু লোক আন্তরিকভাবে হযরত হুসাইন (রা.)-কে ডাকছিলেন এবং কিছু লোক ধোঁকা দিতে চাচ্ছিলেন। পরিশেষে ধোঁকাবাজদের ষড়যন্ত্রই জয়ী হয়। (ওয়াল্লাহু আলাম)

[২] আখবার মক্কা লিল-ফাকিহি: ৩/৩৩২, রিজালু সিকাত, দার খিজর।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯১, সনদ সহীহ আন হাফস।

তারিখুত উম্মাতিল মুসলিমাহ

মুসলিম বিন আকীলের প্রতি নুমান বিন বশীর (রা.)-এর আচরণ:

মুসলিম বিন আকীল কুফায় পৌঁছে শহরের একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হানি বিন উরওয়ার বাড়িতে মেহমান হলেন। কুফাবাসীরা বিপুল সংখ্যায় তাঁর কাছে সমবেত হতে শুরু করল।

[১] কুফার গভর্নর নুমান বিন বশীর (রা.) ছিলেন একজন বিজ্ঞ ফকীহ সাহাবী। তিনি ২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। [২] তিনি অত্যন্ত পরহেযগার এবং চমৎকার বাগ্মী ছিলেন। [৩] মুসলিম বিন আকীলের আগমন এবং তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও নুমান বিন বশীর (রা.) তাঁকে কোনো প্রকার বাধা দেননি। কুফার কিছু কঠোর মেজাজের কর্মকর্তা নুমান বিন বশীর (রা.)-এর এই উদার আচরণের সমালোচনা করেন এবং তাঁকে দুর্বলতার অপবাদ দেন। তিনি উত্তরে বললেন:

“আল্লাহর আনুগত্যের সীমার মধ্যে থেকে দুর্বল হিসেবে পরিচিত হওয়া আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়, কিন্তু আল্লাহর নাফরমানি করে শক্তিশালী হিসেবে পরিচিত হওয়া আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।” [৪]

আবু মিখনাফের বর্ণনায় নুমান বিন বশীর (রা.)-এর এই বাক্যটিও রয়েছে:

“আমি সন্দেহ বা অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করব না। তবে হ্যাঁ, যদি এটি প্রকাশ পায় যে তোমরা খলীফার বায়াত ভঙ্গ করেছ এবং প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করেছ, তবে আল্লাহর কসম! আমি তলোয়ার চালাতে কোনো কার্পণ্য করব না।” [৫]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) হযরত মুসলিম বিন আকীল এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর কার্যক্রমকে ফিতনা ও ফাসাদ মনে করতেন না। [৬] স্পষ্টতই তিনি গভর্নর ছিলেন। তাঁর কাছে সব ধরনের তথ্য পৌঁছাচ্ছিল। যদি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিন আকীল সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতেন, তবে এই বিষয়টি তাঁর কাছে গোপন থাকত না এবং তিনি অবশ্যই এতে বাধা দিতেন।

মুসলিম বিন আকীলের সন্তোষজনক পত্র এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর সফরের সংকল্প:

মুসলিম বিন আকীল এই পরিস্থিতিতে হযরত হুসাইন (রা.)-কে সংবাদ পাঠালেন যে, বারো হাজার লোক বায়াত গ্রহণ করেছে, আপনি চলে আসুন। [৭]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩৯১/৫, সনদ সহীহ আন হাফস।

[২] সিয়রুু আলামিন নুবালা: ৩১১/৩, ৩১২।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩৩৮/৫, রেওয়ায়েত আন্নার আদ-দুহনী, সনদ হাসান।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩৩৮/৫।

[৫] উল্লেখ্য যে, আবু মিখনাফের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত হুসাইন (রা.) মুসলিম বিন আকীলকে কুফাবাসীদের নামে যে শেষ নির্দেশনামা লিখেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ এখানে দেওয়া হলো:

“হুসাইন বিন আলীর পক্ষ থেকে আহলে ঈমান এবং মুসলমানদের জামাতের প্রতি। হানি এবং সাঈদ আপনাদের চিঠিগুলো আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। আপনাদের দূতদের মধ্যে তাঁরাই সবার শেষে এসেছেন। আপনারা যা লিখেছেন তা হলো আপনাদের কোনো ইমাম নেই, আপনারা আসুন, হয়তো আল্লাহ আপনাদের মাধ্যমে আমাদের হিদায়েত ও সত্যের ওপর একত্রিত করবেন। আমি আমার ভাই, চাচাতো ভাই এবং আমার পরিবারের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (মুসলিম বিন আকীল)-কে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। আমি তাঁকে বলেছি যে, তিনি যেন আপনাদের অবস্থা এবং মতামতের কথা আমাকে লিখে জানান। যদি তাঁর চিঠির মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে আপনাদের বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেই বিষয়ে একমত যে বিষয়ে আপনাদের দূতরা আমার কাছে এসেছেন এবং যা আপনাদের চিঠিপত্রে উল্লেখ আছে, তবে আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের কাছে আসব ইনশাআল্লাহ। আমার জীবনের কসম! ইমাম বা নেতা কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করেন, ইনসাফ কায়েম করেন এবং সত্য দ্বীনের অনুসারী হন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ওয়াসসালাম।” (তারিখুত তাবারী: ৩৫৩/৫)

[৬] এই শেষ চিঠিতেও যুদ্ধের প্রস্তুতির কোনো ইঙ্গিত নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, হযরত হুসাইন (রা.) কুফাবাসীদের কাছ থেকে কেবল সমর্থন ও সহযোগিতা চাচ্ছিলেন।

[৭] তারিখুত তাবারী: ৩৩৮/৫, রেওয়ায়েত আন্নার আদ-দুহনী, সনদ হাসান।

একটি বর্ণনায় রয়েছে: “পুরো কুফাবাসী আপনার সাথে আছে, আপনি আমার এই চিঠি পড়া মাত্রই চলে আসুন।” [১]

এই পত্রটি ১১ই জিলকদ ৬০ হিজরিতে পাঠানো হয়েছিল। [২]

কুফার পরিস্থিতির পরিবর্তন: উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নিয়োগ:

মুসলিম ইবনে আকীলের পত্র পৌঁছাতে তিন-চার সপ্তাহ সময় লেগেছিল এবং এই সময়ের মধ্যে কুফার পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছিল, যা সম্পর্কে হযরত হুসাইন (রা.) অবগত ছিলেন না। বিষয়টি হলো, কুফার কিছু কটরপন্থী নেতা গভর্নর নুমান ইবনে বশির (রা.)-এর নরম মনোভাব পছন্দ করেননি। তারা প্রথমে তাকে গালমন্দ করল, এরপর যখন দেখল তিনি নিজের অবস্থানে অটল রয়েছেন, তখন তারা ইয়াজিদকে পুরো পরিস্থিতি লিখে পাঠাল। ইয়াজিদ নুমান ইবনে বশির (রা.)-এর মতো একজন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী মানুষকে বরখাস্ত করে দিল। সে এক আদেশের মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে সন্তুষ্টি ও আনন্দের সাথে বসরাসহ কুফার শাসনভারও তার হাতে অর্পণ করল। সাথে এই নির্দেশও দিল যে, মুসলিম ইবনে আকীলকে খুঁজে বের করো, তাকে হয় বন্দী করো অথবা হত্যা করো। [৩]

এভাবে ইরাকের সমস্ত বিষয় এমন এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে এল, যার স্বভাব যেকোনো সময় যেকোনো দুঃখজনক ঘটনার জন্ম দিতে পারত। উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ইয়াজিদের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বসরা থেকে সরাসরি কুফায় পৌঁছে গেল। মুসলিম ইবনে আকীল তখন শহরের একজন বিশিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা হানি ইবনে উরওয়ার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ খবর পেয়ে গেল। সে হানিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। যখন তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থান জানালেন না, তখন তাকে প্রচণ্ড মারধর করে দুর্গের ভেতরে বন্দী করে রাখা হলো। [৪]

মুসলিম ইবনে আকীলের শাহাদাত:

এই পর্যায়ে মুসলিম ইবনে আকীলের পক্ষ থেকেও একটি বড় ভুল হয়ে গেল, যা ঘটনার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিল। তিনি হানি ইবনে উরওয়াকে মুক্ত করার জন্য চার হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে ময়দানে নেমে এলেন। [৫]

যখন তিনি এই জনতাকে নিয়ে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন শুরুতে উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ভীত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শীঘ্রই কুফাবাসীদের পুরনো স্বভাব আবার প্রকাশ পেল। মুসলিম ইবনে আকীল যখন সামনের দিকে এগোচ্ছিলেন, তখন ত্রিশ-চল্লিশ জন করে লোক তার সঙ্গ ত্যাগ করে ডানে-বামে গলিতে পালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম ইবনে আকীল যখন উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মুখোমুখি হলেন, তখন মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন লোক (প্রায় পঞ্চাশ জন) তার সাথে অবশিষ্ট ছিল। [৬]

[১] আনসাবুল আশরাফ, বালাগুরি: ৩/১৬, ১৭, ত. দারুল ফিকর।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮১ আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত; তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৫ আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৮ আশ্মার থেকে হাসান সনদে বর্ণিত, এই বর্ণনায় রয়েছে যে, ইয়াজিদকে এই বিষয়টি উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের হাতে ন্যস্ত করার পরামর্শ তার লেখক সারজুন দিয়েছিল, যে ছিল একজন খ্রিস্টান। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টি চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কেমন লোক সক্রিয় ছিল।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৮ আশ্মার থেকে হাসান সনদে বর্ণিত।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৪১ সহীহ সনদে; ৫/৩৪৯, ৩৫০ হাসান সনদে।

[৬] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯১ সহীহ সনদে; আল-মিহান, পৃ. ১৫১ ইমাম কাসিম ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত; আল-ইকদুল ফারিদ: ৫/১২, ২৮।

মুসলিম বিন আকীলের সাথে যে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক অবশিষ্ট ছিল, তাদের অধিকাংশকে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ চাতুর্য ও হুমকির আশ্রয় নিয়ে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার করার জন্য সে সৈন্যদের সামনে পাঠায়। এই সংঘর্ষে মুসলিম বিন আকীল আহত হয়ে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যান। সেই সময় অবস্থা এমন ছিল যে, শহরের অলিগলি চেনার জন্য একজন ব্যক্তিও সাথে ছিল না। বনী হাশিম বংশের এই প্রদীপ আহত অবস্থায় ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে একাকী কুফার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে এক নারী তাঁকে পানি পান করান এবং তিনি মুসলিম বিন আকীল—একথা জানতে পেরে তাঁকে আশ্রয় দেন। কিন্তু সেই মহিলার ছেলে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের ডান হাত মুহাম্মদ বিন আশআসের সহযোগী ছিল। সে খবর দিয়ে দেয়। মুসলিম বিন আকীল সেই ঘর থেকে গ্রেফতার হন। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাঁকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ প্রাসাদের ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেয়। হানী বিন উরওয়াহকেও হত্যা করা হয়। [১]

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কুফা যেতে নিষেধ করা:

হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। মুসলিম বিন আকীলের আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি পরিবার-পরিজনসহ কুফা যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এটি নিশ্চিত যে, তিনি যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রওনা হয়েছিলেন। [২]

যখন তিনি মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হতে চাইলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন:

“আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সেই লোকদের কাছে যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, যারা আপনার ভাইকে জখম করেছে। যদি আমার ও আপনার জন্য লজ্জার বিষয় না হতো, তবে আমি আপনাকে মাথার চুল ধরে আটকে দিতাম।”

হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে সেই উত্তরই দিয়েছিলেন যা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন:

“অন্য কোথাও আমার নিহত হওয়া, আল্লাহ ও রাসূলের পবিত্র শহরগুলোতে রক্তপাত ঘটান চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়।” [৩]

জাবির বিন আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু ওয়াকিদ লাইসী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-ও ইরাক যেতে বাধা দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনিও নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বলতেন: “হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বের হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কথা শোনেননি। আমার প্রাণের কসম! তিনি তাঁর পিতা ও ভাইয়ের যে শিক্ষণীয় পরিস্থিতি দেখেছিলেন এবং মানুষের পক্ষ থেকে তাদের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা দেখেছিলেন, এরপর তো তাঁর সারা জীবনে কোনো নড়াচড়া করা উচিত ছিল না; বরং তাঁর সেই সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল যাতে সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ ঐক্যবদ্ধ থাকতেই কল্যাণ নিহিত।” [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২; সনদ সহীহ; ৩৫০/৫ রেওয়ায়েত গফফার আয-যাহাবী সনদ হাসান।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮১ আন আবি মুখনাফ; আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৬০... প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মক্কা মুকাররমা থেকে রওনা হওয়া ৮ যিলহজ হয়েছিল। একই দিনে কুফায় মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাত হয়েছিল। (আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৬০; তারিখু দিমাশক: ১৩/২১২)। ধারণা করা হয় যে, রওনা হওয়ার বিষয়টি এর আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছু “গবেষক” এই অনুমান করেছেন যে, হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হজ্জ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ তিনি যিলহজের শুরুতেই রওনা হয়েছিলেন যা হজ্জের একদিন আগে।

[৩] লাউ আন ইউযরা বিহি ওয়াইকা নাশাবাত ইয়াদি ফী রাসিক। (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৯২; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪৭৬, ৪৭৭; আল-ইরশাদ, সনদ সহীহ) আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/১১৯, তবা মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ।

[৪] তারিখু দিমাশক: ১৩/২০৮; তাহযীবুল কামাল: ৬/৪১২।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বলতেন: “তকদীরের লিখন ছিল যে হুসাইন (রা.) তাড়াছড়ো করেছেন, অন্যথায় আমি যদি তাঁর কাছে পৌঁছে যেতাম তবে তাঁকে বের হতে দিতাম না—তবে তিনি আমাকে নিরুপায় করে দিতেন।” [১]

হযরত হুসাইন (রা.)-কে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কেন বিরত হলেন না?

এতসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং একনিষ্ঠ বন্ধুদের নিষেধ করা সত্ত্বেও হযরত হুসাইন (রা.) কেন ইরাক যাওয়ার ব্যাপারে অটল ছিলেন? তিনি কি ক্ষমতার লোভী ছিলেন? কক্ষনোই নয়। আসল কথা হলো, একদিকে তিনি অনুভব করছিলেন যে, সেখানে যাওয়া ছাড়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের কোনো পথ নেই। অন্যদিকে হিজাজে উমাইয়া শাসকদের পক্ষ থেকে এই আশঙ্কার সম্মুখীন ছিলেন যে, সুযোগ পেলেই তারা তাঁকে বায়আত হতে বাধ্য করবে। বায়আত না করার ক্ষেত্রে যে সংঘাত সৃষ্টি হতো তাতে হারামে রক্তপাতের আশঙ্কা ছিল। নিঃসন্দেহে অন্যান্য সাহাবীদের পরামর্শ অনুযায়ী সেই সময়ে আপনি বায়আত করে ঘরে বসে থাকলে তা শরয়ী অবকাশ (রুখসত) হতো এবং নিরাপদও হতো, কিন্তু আপনি তা গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকাকে পছন্দ করেননি। নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী অন্তত সংকল্পের (আযীমত) পথ বেছে নেওয়াকে ওয়াজিব মনে করেছিলেন যাতে সরকারের ওপর একটি পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্যের পরিবেশ খতম করে ইসলামী শুরা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। এই কারণেই সবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনার বিবেক সন্তুষ্ট ছিল না। আপনার নিয়ত কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং উন্মতের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

চিঠিপত্র সাথে কেন নিলেন?

এটি উল্লেখযোগ্য যে, হযরত হুসাইন (রা.) রওনা হওয়ার সময় কুফাবাসীদের লেখা সেই চিঠিপত্রগুলো সাথে নিয়েছিলেন। [২] এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, যদি কুফাবাসীরা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তবে তাদের সেই প্রতিশ্রুতি ও আনুগত্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই চিঠিগুলো দেখানো যেতে পারে।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর যাত্রার তারিখ

প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী হযরত হুসাইন (রা.)-এর রওনা হওয়ার তারিখ ৮ই জিলহজ ছিল, কিন্তু সঠিক মত হলো এর আগেই তিনি রওনা হয়েছিলেন। [৩]

[১] তারিখ দামেশক: ১৪/২০৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৭৯।

[২] তারিখ দামেশক: ১৪/২০২।

[৩] এর প্রথম দলিল হলো, আবু আল-আরব তামীমীর বর্ণনা অনুযায়ী উমাইয়া গভর্নর সাঈদ ইবনে আস ইয়াওমুত তারবিয়াহ (৮ই জিলহজ)-এর একদিন আগে মক্কায় এসেছিলেন এবং হযরত হুসাইন (রা.) মক্কা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। (আল-মিহান, পৃষ্ঠা ১৭৯) দ্বিতীয় দলিল হলো, পথে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে এমন সব লোকদের দেখা হয়েছিল যারা হজের জন্য আসছিলেন, যেমন তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে যাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আবদ রাবিহ-এর বর্ণনা সহীহ রেওয়ায়েতে আছে যে তিনি হজে যাচ্ছিলেন এবং পথে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে দেখা হয়। (তারিখ তাবারী: ৫/৩৯৬) এভাবে হযরত হুসাইন (রা.) মক্কা থেকে দুই মঞ্জিল সামনে ‘জাতু ইরক’ পৌঁছালে আরবের বিখ্যাত কবি ফারাজদাকের সাথে দেখা হয় যিনি ইরাক থেকে হজের জন্য আসছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর কাছে কুফার অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন: “লোকদের অন্তর আপনার সাথে, কিন্তু তাদের তলোয়ার বনু উমাইয়ার সাথে।” (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ২৩১) তৃতীয় দলিল হলো, মক্কা থেকে কারবালা পর্যন্ত যতগুলো মঞ্জিল রয়েছে, যদি গতির স্বাভাবিক গতিবেগ ধরা হয় (যেমনটা নারী ও শিশুদের সাথে থাকার কারণে অনুমান করা যায়), তবে ৮ই জিলহজ রওনা হয়ে ২রা মহরম কারবালা পৌঁছানো অসম্ভব। যদি আপনি ৮ই জিলহজ রওনা হতেন তবে ২রা মহরমের আগে কারবালা পৌঁছানো সম্ভব ছিল না, অথচ এই সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনা অস্বীকার করা অসম্ভব হবে যা সহীহ ও হাসান রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া এখানে অত্যন্ত কঠিন। মাহমুদ আব্বাসী এবং তাঁর অনুসারীরা এখানে অত্যন্ত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। প্রথমে তারা এই ধারণা তৈরি করেছেন যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর রওনা হওয়া হজের পরে হয়েছিল, তারপর সফরের মঞ্জিলগুলো কমিয়ে দিয়েছেন যাতে হজের পর রওনা হয়ে হযরত হুসাইন (রা.) ২রা মহরম কারবালা পৌঁছাতে পারেন। অথচ রেওয়ায়েতসমূহে যেসব ঘটনার উল্লেখ আছে তা এত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। সুতরাং এই সব মনগড়া কথা, যা কেবল কয়েক দিন অবস্থানের কিয়ামত কায়ম করার পর ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছে। এটি কোনো গবেষণা নয় বরং প্রতারণা।

ইয়াজিদকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর যাত্রার সংবাদ প্রদান এবং মারওয়ানের ইবনে জিয়াদের কাছে পত্র:

এই সময়ে হিজাজের গভর্নর আমর বিন সাঈদ হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রস্থানের সংবাদ রাজধানী দামেস্ক এবং কুফায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে লিখেছিলেন: “হুসাইন তোমার দিকে আসছেন।” [১]

একই সংবাদ মারওয়ান বিন হাকামও ইবনে জিয়াদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তবে সাথে সাথে এই সমস্যাটি সতর্কতার সাথে সমাধান করার এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর মর্যাদা ও সম্মানের খেয়াল রাখার নসিহত করেছিলেন। তবে এটি কোনো সরকারি আদেশ ছিল না, বরং নিছক পরামর্শ ছিল। মারওয়ান লিখেছিলেন:

“হুসাইন (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা। আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে হুসাইনের চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। সাবধান! আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু করে বসো না যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয় এবং মানুষ তা ভুলে যেতে না পারে।” [২]

মারওয়ানের এই পত্র থেকে বোঝা যায় যে, বনু উমাইয়ার গম্ভীর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির হযরত হুসাইন (রা.)-কে সম্মান করতেন। কিন্তু আফসোস যে, উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ এমন ব্যক্তিদের পরামর্শে কর্ণপাত করেননি! কারণ বড়দের সম্মান করা তার স্বভাবে ছিল না। সে ছিল সামরিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা এক যান্ত্রিক প্রকৃতির মানুষ। হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রতি তার কোনো ভক্তি ছিল না, আর মারওয়ানের মতো প্রবীণ উমাইয়া আমিরের কথাও তার কাছে কোনো গুরুত্ব রাখত না।

ইয়াজিদের পত্র উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নামে:

এই সময়ে ইয়াজিদ উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে একটি বার্তায় লিখে পাঠিয়েছিলেন:

“আমি সংবাদ পেয়েছি যে হুসাইন কুফার দিকে আসছেন। হুসাইন (রা.)-এর ব্যাপারে সমস্ত সময়ের মধ্যে তোমার সময়কে, সমস্ত শহরের মধ্যে তোমার শহরকে এবং সমস্ত শাসকদের মধ্যে তোমাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ধরনের পরীক্ষাতেই মানুষ উন্নতি লাভ করে অথবা গোলামদের মতো নিচু স্তরে পতিত হয়।” [৩]

ইয়াজিদ তাকে মুসলিম বিন আকিলের হত্যার জন্য সাবাশী দিয়ে এই নির্দেশগুলোও দিয়েছিলেন:

“গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র প্রহরী মোতায়ন করো। যাদের ওপর সন্দেহ হয় তাদের গ্রেপ্তার করো। যার ওপর কোনো অভিযোগ থাকে তাকে পাকড়াও করো, তবে হত্যা কেবল তাকেই করবে যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আমাকে উদ্ভূত পরিস্থিতির সংবাদ দিতে থেকো।” [৪]

[১] তারিখ দামেস্ক: ১৩/২১২

[২] তারিখ দামেস্ক: ১৩/২১২, তাহযীবুল কামাল: ৬/৩২২

[৩] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৩/১১৫, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া

[৪] তারিখুত তাবারানি: ৫/৩৮১ আবু মিখনাফ থেকে।

কিছু বার্তা একই ধরনের শব্দের সাথে আবু হানিফা দিনাওয়ারিও বর্ণনা করেছেন। এতেও প্রথমে মুসলিম বিন আকিলের হত্যার জন্য ইবনে জিয়াদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে: “তুমি একজন দৃঢ়চেতা ও সাহসী ব্যক্তির মতো কাজ করেছ।” এরপর লেখা হয়েছে: “আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে হুসাইন বিন আলী মক্কা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার শহরের দিকে রওনা হয়েছেন। সুতরাং তার ওপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করো এবং রাস্তাগুলোতে প্রহরী বসাও। সর্বোত্তমভাবে দায়িত্ব পালন করো, তবে যে তোমার সাথে যুদ্ধ করবে সে ছাড়া অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করো না। আর প্রতিদিনের সংবাদ আমাকে লিখে পাঠাও।” (আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ২৪৪) এটি আবু মিখনাফের বর্ণনা, তবে এটি প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নেই; এই বর্ণনাটি ইয়াজিদের সমর্থকরাও গর্বের সাথে উদ্ধৃত করে থাকে।

ইয়াজিদের পত্রের ওপর মন্তব্য:

এই পত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদের পক্ষ থেকে ইবনে জিয়াদকে হুসাইনী কাফেলার সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়নি, বরং এই পদক্ষেপকে অপরিহার্য পরিস্থিতির সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছিল। সম্ভবত ইয়াজিদ নিজের ধারণায় এই কৌশলকে যথেষ্ট মনে করেছিল, কিন্তু পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে যে এই নির্দেশাবলি একেবারেই অপরিপাক ছিল। এই পত্রে মুসলিম বিন আকীলের হত্যার ওপর ইবনে জিয়াদকে যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল, তা এই কঠোর মেজাজের ব্যক্তিকে এই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনাশ করার সামান্যতম সুযোগ পেলেও তাকে গনিমত মনে করা উচিত এবং হুসাইনী কাফেলার সাথে কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

যদি ইয়াজিদ এর পরিবর্তে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে এই নির্দেশ দিত যে, হযরত হুসাইন (রা.)-কে সম্মানের সাথে দামেস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তবে ষড়যন্ত্রকারী মহলের আশা পূরণ হতো না। নিঃসন্দেহে ইয়াজিদের এই গুরুতর ভুল ছিল যা বিষয়টিকে চরম অবনতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের হযরত হুসাইন (রা.)-কে বেখবর রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা:

মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাতের পর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের প্রথম চেষ্টা ছিল হযরত হুসাইন (রা.)-কে কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর রাখা। সে বসরা থেকে শাম পর্যন্ত সমস্ত মহাসড়কে এমন কঠোর পাহারা বসিয়েছিল যে, প্রায় পুরো এক মাস কোনো ব্যক্তি এই এলাকা অতিক্রম করে হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাছে পৌঁছাতে পারেনি এবং আরব থেকে আগত কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি ছাড়া ইরাকের সীমানায় প্রবেশ করতে পারেনি। মুসলিম বিন আকীল ৮ই জিলহজ শহীদ হয়েছিলেন এবং এর দুই-তিন দিন আগে হযরত হুসাইন (রা.) মক্কা থেকে রওনা হয়েছিলেন। তারা এটাও জানতেন না যে কুফায় এখন কোমল হৃদয়ের নুমান বিন বশীর (রা.) নন, বরং কঠোর মেজাজের উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ ক্ষমতাসীন। যদি পথ বন্ধ না থাকতো, তবে কুফা থেকে বের হওয়া কোনো সংবাদবাহক তাদের জাজিরাতুল আরবের সীমান্তে বা এর আশেপাশে এই তথ্যগুলো দিয়ে দিত, যার ফলে হুসাইনী কাফেলার যাত্রীরা আর সামনে অগ্রসর হতো না। [১]

হযরত হুসাইন (রা.)-এর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা এবং মুসলিম বিন আকীলের ভাইদের সামনে অগ্রসর হওয়ার জেদ:

ইরাকের সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে আপনি খবর পেলেন যে মুসলিম বিন আকীল (রা.) কুফায় শহীদ হয়েছেন। [২] হযরত হুসাইন (রা.) অনুমান করলেন যে এখন শাসকদের পক্ষ থেকে কঠোর আচরণ এবং সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না এবং উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ আপনাকে মুসলিম বিন আকীল ও হানি বিন উরওয়ার মতো আচরণের লক্ষ্যবস্তু বানাবে। তাই আপনি এটাই ভালো মনে করলেন যে হিজাজে ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু তকদিরে যা লেখা ছিল তা তো ঘটবেই। যখন আপনি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেন...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৩৯২/৫, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৩৮৯/৫, আম্মার থেকে হাসান সনদে।

আবু মিখনাফের বর্ণনা অনুযায়ী, এই খবর জনৈক ব্যক্তি আপনাকে পৌঁছে দিয়েছিল এবং আপনি তখন ‘জারুদ’ (বর্তমানে আল-খুজাইমিয়া) নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন যা ফাদাক থেকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ইমাম কাসিম বিন সালামের বর্ণনা অনুযায়ী আপনি মুসলিমের (খবর) ‘শরাফ’-এ পেয়েছিলেন যা মক্কার পথে ছিল এবং ওয়াদি মানজিল (৩৩০ কিলোমিটার দূর) থেকে কয়েক মাইল সামনে। (আল-মুহিব্ব, পৃষ্ঠা ১৫৩)। ইমাম কাসিম বিন সালামের বর্ণনাই অগ্রগণ্য।

হুসাইনের বর্ণনামতে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ কাদেসিয়া থেকে বসরা ও শাম পর্যন্ত এই রাস্তাগুলোর ওপর নজরদারি শুরু করেছিল। (তারিখ আল-তাবারী: ৩৯২/৫, সহীহ সনদে)।

স্পষ্টতই মুসলিম বিন আকীলের ভাইয়েরা, যারা আপনার সাথে ছিলেন, তারা আবেগের সাথে বললেন: “আল্লাহর কসম! আমরা যতক্ষণ মুসলিমের রক্তের বদলা না নেব ততক্ষণ ফিরে যাব না, চাই আমরা সবাই নিহত হই।”

একথা শুনে হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “তোমাদের ছাড়া বেঁচে থাকার কী স্বাদ।” [১]

ঐ যুবকরা আরও বলল: “আপনি কেন ফিরে যাচ্ছেন যখন আমাদের ভাই সেখানে নিহত হয়েছে এবং আপনার কাছে ঐ লোকদের চিঠিগুলো রয়েছে যাদের ওপর আপনার আস্থা আছে।” [২]

আপনি পুনরায় কিছুটা আশাবাদী হলেন এবং আল-মুগীসা থেকে কিছুটা সামনে কুফা জেলার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন যেখানে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের গ্রহরী মোতায়েন ছিল। এখানেই ইবনে জিয়াদের সেনাপতি হুর বিন ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। [৩]

হুর বিন ইয়াজিদের পরামর্শ, হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দামেস্ক যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং এর কারণসমূহ:

হুর বিন ইয়াজিদ একজন ভদ্র লোক ছিলেন। তিনি হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কল্যাণ কামনা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন: “কোথায় যাচ্ছেন?” যখন আপনি কুফার সংকল্পের কথা জানালেন তখন হুর কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন: “ফিরে যান। সেখানে আপনার জন্য কল্যাণের কোনো আশা নেই।”

এই পরিস্থিতিতে হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের কাছে দামেস্ক যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, এই সিদ্ধান্ত এতটাই অটল ছিল যে আপনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই অবিলম্বে তা কার্যকর করলেন এবং সিরিয়ার পথ অবলম্বন করলেন। [৪]

কর্মপন্থা পরিবর্তনের কারণ ছিল এই যে, হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ফিকহী প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সমস্যার ধরণ পরিবর্তন হতে দেখেছিলেন। আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়াজিদের সরকার প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত হয়ে গেছে, তাই একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা এখন খুরুজ এবং বিদ্রোহের পর্যায়ে পড়বে, তাই আপনি শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে বিকল্প পথকে প্রাধান্য দিলেন এবং চাইলেন যে দামেস্ক গিয়ে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করা হোক, সম্ভবত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। আপনার এই আচরণ বলে দেয় যে, ইয়াজিদের সরকারের ব্যাপারে আপনার দৃঢ় সংকল্প ভিত্তিক মতামত থাকা সত্ত্বেও আপনি ঐ সকল সাহাবীর দৃষ্টিভঙ্গিরও সম্মান করতেন যারা শরয়ী অবকাশ দেখে ইয়াজিদের সরকারকে কিছু মৌলিক প্রশাসনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছিলেন। হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কুফা যাওয়ার উদ্দেশ্যও ক্ষমতা দখল ছিল না বরং ঐ সকল দুর্বলতার সংশোধনই ছিল। কুফায় নিজের ভক্তদের একত্রিত করে সম্ভবত আপনি এটাই করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখন যেহেতু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল তাই আপনি...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৮৯, আন্নার থেকে হাসান সনদে।

[২] আল-মু'জাম, পৃ. ৫৩, ইমাম কাসিম বিন সালাম থেকে, ইমাম শাহরুল থেকে... আবু মিখনাফের বর্ণনা অনুযায়ী কিছু সঙ্গী সান্ত্বনা দিয়ে এও বলেছিলেন: “আল্লাহর কসম! আপনি মুসলিম বিন আকীলের মতো নন। যখন আপনি কুফায় পৌঁছাবেন তখন মানুষ দ্রুত আপনার চারপাশে জমা হয়ে যাবে।” (তারিখ তাবারী: ৫/৩৯৮)

[৩] তারিখ তাবারী: ৫/৩৮৯, আন্নার থেকে হাসান সনদে।

[৪] আল-মুগীসা কুফা থেকে সাতাশতম মঞ্জিল (২৯৫ কিলোমিটার দূরে) ছিল, যেখান থেকে কাদিসিয়া তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) এবং মহাসড়কের ডান দিকে ছিল।

[৫] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৮৯, আন্নার থেকে হাসান সনদে।

সরাসরি ইয়াজিদের সাথে কথা বলাকেই এই উম্মতের কল্যাণের জন্য জরুরি মনে করা হয়েছিল এবং এ ছাড়া অন্য কোনো পথও ছিল না। যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে দামেস্ক ও কুফায় সরকারি নীতি একই হবে এবং প্রতিটি স্থানেই আপনাকে বিদ্রোহী মনে করা হবে, কিন্তু ইবনে জিয়াদের কঠোর মেজাজ দেখে এটা বোঝা খুব কঠিন ছিল যে ইয়াজিদ কি আপনার সাথে ইবনে জিয়াদের মতো কঠোর আচরণ করবে নাকি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অন্তত আপনার অবস্থান শুনবে। [১]

আপনি দামেস্কের পথে প্রায় ৪৫৮.৫ মাইল (৭৩৭.৫ কিলোমিটার) সফর করে শেষ পর্যন্ত এমন এক স্থানে পৌঁছালেন যা কুফা থেকে দামেস্কগামী মহাসড়কে অবস্থিত। এটি ফোরাৎ নদীর তীরের কাছে ছিল যাকে ‘আত-তাফ’ বলা হতো। [২]

ইবনে জিয়াদ কী চেয়েছিল এবং কেন?

উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ চাইলে হুসাইনি কাফেলাকে দামেস্কের দিকে যেতে দিতে পারত, কিন্তু আফসোস যে সে সামান্যতম সৌজন্য প্রদর্শন করেনি এবং কারবালায় তাদের আটকে রেখে জেদ ধরেছিল যে হযরত হুসাইন (রা.) যেন এখানেই আত্মসমর্পণ করেন এবং তাকে কুফায় নিয়ে আসা হয়।

প্রশ্ন জাগে যে শেষ পর্যন্ত সে এমনটি কেন করল? তার ওপর কি দামেস্কের পক্ষ থেকে কোনো চাপ ছিল? এ কথা নিশ্চিত যে হুসাইনি কাফেলা ইরাকের সীমান্তে পৌঁছানোর পর ১০ই মহরম পর্যন্ত কুফা ও দামেস্কের মধ্যে নতুন কোনো সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব ছিল না। [৩]

দামেস্ক থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তার দায়িত্ব ছিল কেবল ইরাকের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। সেখানকার মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং হযরত হুসাইন (রা.) এখন কুফা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে উবায়দুল্লাহর জন্য তাকে যেতে না দেওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না? তার তো খুশি হওয়া উচিত ছিল যে একটি পরীক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে।

[১] হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের বিষয়ে একটি অবস্থান ছিল এবং ইয়াজিদের কাছে এই অবস্থান নিয়ে যাওয়ার সংকল্প কেবল অনুমান নয় বরং খোদ ইয়াজিদের নিজের বর্ণনা থেকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর এই কর্মপন্থা প্রমাণিত হয়। কারবালার ঘটনার পর সে বলত: “আমার কী ক্ষতি হতো যদি আমি কিছু কষ্ট সহ্য করে নিতাম এবং হুসাইন (রা.)-কে তার নিজের ঘরে থাকতে দিতাম এবং তিনি যা চাইতেন তাকে সেই ক্ষমতা দিতাম, যদিও এতে আমার শাসনের শক্তি ও জৌলুস কিছুটা কম হতো। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হক এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবি ছিল।” (তারিখে তাবারী: ৫/৫০৬) এ থেকে স্পষ্ট হয় যে খোদ ইয়াজিদের কাছেও এমন তথ্য পৌঁছেছিল যে হযরত হুসাইন (রা.) কিছু দাবি নিয়ে বের হয়েছিলেন যা পূরণ করলে তার পারিবারিক শাসনের শক্তি কম হতো। এখান থেকে আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই দাবিগুলো সুন্নাহ ও শরীয়তের পুনরুজ্জীবন এবং বংশীয় ও স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের সাথে সম্পর্কিত ছিল, অন্যথায় ইয়াজিদের এ কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না যে এতে আমার শাসনের শক্তি ও জৌলুস কম হয়ে যেত।

রইল এই কথা যে ইয়াজিদ কি হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল? এটিও অসম্ভব নয় যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর ছেলে আলী ইবনে হুসাইন জয়নুল আবেদিন (রা.), যিনি কারবালার ঘটনার পর কিছুদিন ইয়াজিদের কাছে ছিলেন, তাকে এই সত্যগুলো জানিয়েছিলেন।

[২] তারিখে তাবারী: ৩৯২/৫, হাসিন বিন আবদুর রহমান থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত, এবং তিনি বলেন: ‘আত-তাফ’ হলো ফোরাৎ নদীর তীরের এলাকা। অর্থাৎ সৈকত এবং আল-তাফ হলো কুফার পথে মরুভূমির সেই এলাকা যেখানে মাকতালুল হুসাইন বিন আলী অবস্থিত।

স্মরণীয় যে কুফা থেকে কারবালার মধ্যবর্তী মঞ্জিলগুলো সম্পর্কে তাবারী আবু মাখনাফ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি কুফা থেকে কমপক্ষে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত। (আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক: ১/৭৩)

[৩] কুফা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী দূরত্ব ৪৫৮.৫ মাইল (৭৩৭.৫ কিলোমিটার)। কোনো দ্রুতগামী অশ্বারোহী যদি প্রতিদিন গড়ে ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে তবে দামেস্ক পৌঁছাতে ৭-৮ দিন সময় লাগত। সেখান থেকে ফিরতি বার্তা আনতে আরও সমপরিমাণ সময় লাগত। অর্থাৎ ইয়াজিদকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং তার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাওয়ার জন্য কমপক্ষে ১৫ দিন সময়ের প্রয়োজন ছিল। অথচ ইবনে জিয়াদ কাফেলা আসার পর কারবালায় তাদের আটকে রাখতে পাঁচ দিনও সময় নেয়নি বরং ১০ই মহরম হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের শহীদ করে দেওয়া হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ইয়াজিদের পূর্ববর্তী চিঠিপত্র পাওয়ার পর নিজেকে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকারী মনে করেছিল এবং চূড়ান্ত পদক্ষেপের জন্য নতুন কোনো নির্দেশনার অপেক্ষা করেনি।

আমরা ইবনে জিয়াদের আচরণকে একজন জেনারেলের জেদ ও হঠকারিতা বলতে পারি। এটা মানতেই হবে যে, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ রাসূল ﷺ-এর দৌহিত্রকে একজন বিপজ্জনক বিদ্রোহী এবং একজন নিকৃষ্ট অপরাধী হিসেবে গণ্য করেছিল। সম্ভবত সে নিজের অহংবোধকে তুষ্ট করতে এবং নিজের দাপট কায়েম করতে চেয়েছিল। সে যেভাবে মুসলিম বিন আকিল এবং হানি বিন উরওয়াহকে বাধ্য ও অসহায় করে হত্যা করেছিল, ঠিক একই ধরনের আচরণ সে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথেও করার সংকল্প করেছিল যাতে সবার ওপর শাসকদের আতঙ্ক জেঁকে বসে এবং মানুষ শতাব্দীকাল পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তোলার চিন্তা পর্যন্ত মাথায় না আনে।

যদি ইবনে জিয়াদ কেবল কুফায় বিশৃঙ্খলা রোধ করতে চাইত, তবে তার জন্য এটা খুব সহজ ছিল যে, সে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নুমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অপসারণ, নিজের নিয়োগ, ইরাকবাসীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং মুসলিম বিন আকিলের বেদনাদায়ক পরিণতির খবর দ্রুত পৌঁছাতে দিত। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এই তথ্যগুলো আগে পেয়ে গেলে তিনি পথ থেকেই সহজে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু ইবনে জিয়াদ সীমান্তে এমন কঠোর অবরোধ আরোপ করেছিল যে স্থানীয় গ্রামবাসীরাও প্রদেশের সীমানা থেকে বের হতে পারছিল না। ফলে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে কোনো সংবাদ পৌঁছাতে পারেনি এবং তিনি অজ্ঞাতসারে ইরাকের সীমানায় প্রবেশ করেন। ইবনে জিয়াদ এটাই চেয়েছিল যে তাদের আসতে দেওয়া হোক এবং হঠাৎ গ্রেফতার করা হোক। সে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে আমি এত বড় রাজনীতিবিদ যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো বড় নেতাকে নিজের জালে আটকে ফেলেছি। এই কারণেই উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের পক্ষ থেকে সীমান্ত বাহিনীকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন হুসাইনী কাফেলাকে সরাসরি কুফায় নিয়ে আসে। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন এবং কুফার বাহিনীর অফিসার হুর বিন ইয়াজিদ তার নশ্রতা ও ভদ্রতার কারণে আপনাকে বাধা দিতে বিরত ছিলেন।

উমর বিন সা'দের কারবালা অভিমুখে যাত্রা:

এই পরিস্থিতিতে ইবনে জিয়াদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে উমর বিন সা'দকে 'রে' (তেহরান)-এর গভর্নর বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করল যে, সে গিয়ে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিষয়টি ফয়সালা করবে, অর্থাৎ তাকে কোনো নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছাড়াই নিঃশর্তভাবে গ্রেফতার করে কুফায় নিয়ে আসবে এবং যদি তিনি নিজেকে সোপর্দ না করেন তবে তাকে হত্যা করবে। যেহেতু হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বের ওপর হাত তোলা কিয়ামত পর্যন্ত বদনাম কুড়ানোর সমতুল্য ছিল, তাই উমর বিন সা'দ অপারগতা প্রকাশ করল। কিন্তু ইবনে জিয়াদ পদ কেড়ে নেওয়া, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা এবং গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল। [১]

উমর বিন সা'দ সকাল পর্যন্ত সময় চাইল এবং সারা রাত ভাবতে থাকল। মন ও মগজের যুদ্ধে মগজ জয়ী হলো। সকালে এসে সে তার প্রস্তুতির কথা জানাল এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে কারবালায় গিয়ে পৌঁছাল। [২]

[১] তাবাকাত ইবনে সা'দ: ৫/১৬৮, ত. সাদির

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮৯ আন আশ্মার বিন সা'দ হাসান

মনে রাখা প্রয়োজন যে, উমর বিন সা'দের সাথে মিল থাকা একটি নাম হলো আমার বিন সা'দ। উভয়েই হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র ছিলেন। উমর বিন সা'দ ইয়াজিদের সরকারি বাহিনীর অফিসার ছিল, পক্ষান্তরে আমার বিন সা'দ কারবালার ঘটনায় ইয়াজিদি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন।

কারবালার শাহাদাত

কারবালার ময়দানে সরকারি বাহিনীর অফিসার উমর ইবনে সাদ, শিমার ইবনে জিল জাওশান এবং হুসাইন ইবনে নুমাইরের সাথে হযরত হুসাইন (রা.)-এর কথোপকথন হয়।

হযরত হুসাইন (রা.) তাদেরকে আল্লাহ ও দ্বীনের দোহাই দিয়ে বললেন:

“আমাকে আমিরুল মুমিনিনের কাছে যেতে দাও, আমি আমার হাত তাঁর হাতে তুলে দেব।” [১]

এটি ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং স্পষ্ট দাবি, যার ফলে কর্তৃপক্ষের সমস্ত অভিযোগ দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন (রা.)-কে নিঃশর্তভাবে গ্রেফতার করার নির্দেশ ছিল, তাই সেনাপতিরা উত্তর দিল:

“ইবনে জিয়াদের সিদ্ধান্তের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।” [২]

হযরত হুসাইন (রা.) কর্তৃক বাহিনীকে তিনটি বিকল্প প্রদান:

সমস্ত পথ রুদ্ধ দেখে হযরত হুসাইন (রা.) দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখলেন:

- যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।
- ইয়াজিদের কাছে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক।
- কোনো সীমান্তের দিকে চলে যেতে দেওয়া হোক।

উমর ইবনে সাদ রাজি হলেন। তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে অবহিত করলেন, কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করল এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ওপর জোর দিল। [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে। এখানে সহীহ বর্ণনায় “আমিরুল মুমিনিন” শব্দটি রয়েছে, তাই আমরা অনুবাদে তা হুবহু নকল করেছি। তবে এই শব্দ থেকে যেন কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। “আমিরুল মুমিনিন” শব্দ থেকে ইয়াজিদের শাসক হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা যেতে পারে, কিন্তু তার নেককার ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা সঠিক হবে না। “আমিরুল মুমিনিন” উপাধিটি যদিও খিলাফতে রাশেদার সময় শুরু হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ভালো-মন্দ সব শাসকই এটি ব্যবহার করতে থাকেন। মামুন এবং মুতাসিমের মতো ভ্রান্ত আকিদার খলিফাদেরও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো ইমামগণ “আমিরুল মুমিনিন” বলতেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৪০০-৪০২)। হযরত হুসাইন (রা.) ইয়াজিদের জন্য এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। তবে এই শব্দটি অবশ্যই প্রমাণ করছে যে, শেষ পর্যন্ত হযরত হুসাইন (রা.) একটি বাস্তব সত্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াজিদের শাসনের অধিকার মেনে নিয়েছিলেন। যদি ইয়াজিদের সাথে আলোচনা হতো এবং সে হযরত হুসাইন (রা.)-এর শর্তগুলো মেনে নিত, তবে সম্ভবত এরপর হযরত হুসাইন (রা.)-এর বাইয়াত করতেও কোনো আপত্তি থাকত না, যেমনটি “হাতে হাত দেওয়া” শব্দটি এর প্রমাণ। এর দ্বারা এটিও প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদের অবমাননা ফাসেক ও পাপাচারের পর্যায়ে থাকলেও তা কুফরে বাওয়াহ (প্রকাশ্য কুফর) পর্যন্ত ছিল না, অন্যথায় হযরত হুসাইন (রা.) আলোচনার জন্য প্রস্তুত হতেন না।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮৯, আসলু থেকে হাসান সনদে।

আবু মিখনাফের মতে, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হযরত হুসাইন (রা.)-এর এই প্রস্তাবে রাজি হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শিমর বিন যিল জাওশান তাকে বুঝিয়েছিলেন যে শর্তহীন গ্রেপ্তারই সঠিক পদক্ষেপ যাতে সিদ্ধান্ত সরকারের এখতিয়ারে থাকে। শিমর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বলেছিল: “আল্লাহ শত্রুকে আপনার কজায় এনে দিয়েছেন, আর আপনি তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন?” [১] ইবনে যিয়াদের প্রথম সিদ্ধান্তও এটাই ছিল, ফলে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। [২] শিমরের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিজের চরিত্র কলঙ্কমুক্ত হয়ে যায় না। আসলে শিমর তার মনের কথাই বলেছিল, অন্যথায় সে কোনো শিশু ছিল না যে শিমর তাকে বিভ্রান্ত করবে।

আরও একবার হুসাইন (রা.)-কে শর্তহীন গ্রেপ্তারে রাজি করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এমনটা করা কেবল নবুওয়াতের পরিবারের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থীই ছিল না, বরং এটি সেই মহান উদ্দেশ্যকে নিজের হাতে চিরতরে পদদলিত করার শামিল ছিল, যার জন্য কলিজার টুকরা বাতুল (ফাতিমা রা.) নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যদের জীবন বাজি রেখেছিলেন। তাই তিনি (রা.) বলেছিলেন: “এমনটা কখনোই হতে পারে না।” [৩]

গ্রেপ্তার কেন দিলেন না?

কিছু ‘গবেষক’ এতে বিস্মিত হন যে, যখন হযরত হুসাইন (রা.) ইয়াযিদের হাতে বায়াত হতে রাজি ছিলেন, তখন ইবনে যিয়াদের হাতে বায়াত হতে তার আপত্তি কেন ছিল? অথচ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজের নয়, বরং ইয়াযিদের আনুগত্যেরই বায়াত নিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিবর্গ হযরত হুসাইন (রা.)-এর আসল লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে তাকে ক্ষমতার ময়দানের একজন অবুঝ ভাগ্য-অশেষী হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছেন। তারা হযরত হুসাইন (রা.)-এর ইয়াযিদের হাতে বায়াত হওয়ার আগ্রহকেও সেই একই দৃষ্টিতে দেখেন এবং মনে করেন যে, রাসূলের দৌহিত্র কেবল নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত সেই জিনিসেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন যা তিনি শুরু থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হারাম মনে করে আসছিলেন। অথচ যদি হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রাণের পরোয়া থাকত, তবে তাকে ইবনে যিয়াদের চল্লিশ গুণ শক্তিশালী বাহিনীর সামনে যেভাবেই হোক মাথা নত করতেই হতো। সত্য এই যে, যেখানে শিয়া সম্প্রদায় সাদাতদের (নবী বংশীয়দের) নিষ্পাপত্বের (ইসমত) আসনে বসিয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছে, সেখানে তাদের খণ্ডন করতে গিয়ে কিছু ‘উচ্চমার্গের গবেষক’ কলিজার টুকরা বাতুলকে তার মর্যাদা থেকে নিচে নামানোর চেষ্টায় লিপ্ত। তারা হযরত হুসাইন (রা.)-কে বর্তমান যুগের রাজনীতিবিদদের সাথে তুলনা করে তার দৃঢ় সংকল্পের আন্দোলনকে একটি নিচু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন। এই কারণে তারা হুসাইন (রা.)-এর চিন্তাধারা সম্পর্কে স্থানে স্থানে বিভ্রান্তিকর চিন্তার শিকার হয়েছেন।

যদি হযরত হুসাইন (রা.)-এর উচ্চতর লক্ষ্যসমূহ সামনে রাখা হয়, তবে তার প্রতিটি কাজের যৌক্তিকতা বোঝা সম্ভব। হযরত হুসাইন (রা.)-এর লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়ন করা, আর তিনি এই সংস্কার বাস্তবায়নের শর্তে বায়াত করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু এই এখতিয়ার কেবল...

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৪১৩, ৪১৪ আবু মিখনাফ থেকে; আল-মিহান, পৃ. ১৫৩ ইমাম কাসিম বিন সাল্লাম থেকে ইমাম সাহনুন সূত্রে; এবং শিমর বিন যিল জাওশানের পিতা একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার থেকে আবু ইসহাক আস-সাবিঈ বর্ণনা করেন। আয-যাহাবী বলেন: সে বর্ণনার যোগ্য নয় কারণ সে হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের একজন। (মিযানুল ইতিদাল: ২/২৮০)

[২] আল-মিহান, পৃ. ১৫৩ ইমাম কাসিম বিন সাল্লাম থেকে ইমাম সাহনুন সূত্রে।

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৩৩৯ আন্নার থেকে হাসান সনদে।

ইয়াজিদের কাছে ছিল, তাই আপনি সরাসরি তার সাথে দেখা করে বায়াত করতে চেয়েছিলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে মূলত দাবি মেনে নেওয়ার কোনো ইখতিয়ারই ছিল না, তাই তার কাছে বায়াত করার কোনো অর্থই হতে পারত না, বিশেষ করে এমন অবস্থায় যখন সে কোনো নিরাপত্তা এবং ইয়াজিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা না দিয়ে নিঃশর্ত বায়াত নেওয়ার ব্যাপারে জেদ করছিল।

যুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো?

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও উমর ইবনে সাদ যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কুফায় বসে মুহূর্তের খবর নিচ্ছিল। সে জুয়াইরিয়া ইবনে বদর তামিমিকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠাল যে, উমর ইবনে সাদকে বলো অবিলম্বে হুসাইন এবং তার সঙ্গীদের সাথে লড়াই শুরু করতে, অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। উমর ইবনে সাদ এই হুমকি শুনে দ্রুত অস্ত্র পরিধান করলেন এবং যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিলেন। [১]

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোচনা নিষ্ফল দেখে নিজের সারির দিকে ফিরে চললেন। অক্টোবর মাস ছিল, হালকা শীতের মৌসুম ছিল তাই আপনি জুববা পরিহিত ছিলেন। উমর ইবনে সাদের বাহিনীর এক ব্যক্তি উমর তাহাবি আপনার পিঠ লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল। এটি যেন যুদ্ধের ঘোষণা ছিল। তীর হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জুববার দুই কাঁধের মাঝখানে বিঁধে গেল। [২]

এই সময়ে কুফার অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি হুর ইবনে ইয়াজিদের বিবেক জেগে উঠল। বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে সে অন্যান্য কর্মকর্তাদের তিরস্কার করে বলল: “তোমরা কি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আবেদন গ্রহণ করবে না? আল্লাহর কসম! যদি এমন আবেদন তুর্কিস্তান ও দাইলামের কাফেররাও তোমাদের কাছে করত, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা জায়েজ হতো না।”

কিন্তু সেই কর্মকর্তাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না। তখন হুর তার ঘোড়ার মুখ ফেরালেন এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীদের দিকে ছুটিয়ে দিলেন। তারা মনে করলেন যে কেউ লড়াই করতে আসছে। হুর কাছে এসে নিজের ঢাল উল্টে দিলেন (যা সন্ধির সংকেত ছিল) এবং সবাইকে সালাম করলেন। এরপর ইবনে জিয়াদের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করলেন। তাদের মধ্য থেকে দুজনকে হত্যা করলেন এবং নিজেও শাহাদাত বরণ করলেন। [৩]

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবমাননা:

এখন উভয় পক্ষ অস্ত্র হাতে মুখোমুখি হলো। ইবনে জিয়াদের সৈন্যরা লড়াই উসকে দেওয়ার জন্য সাদাতদের অবমাননা শুরু করল। এক হতভাগা দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল: “তোমাদের মধ্যে কি হুসাইন আছে?”

উত্তর এল: “হ্যাঁ”। সেই ব্যক্তি বলল: “তাদেরকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও।”

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “না, বরং রব ক্ষমাশীল, দয়ালু এবং পরম করুণাময়, যাঁর আনুগত্য করা হয়।”

তারপর আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন: “আচ্ছা, তুমি কে?” সে বলল: “আমি হুওয়াইজার ছেলে।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে, এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তীর আপনার মোটা জুব্বায় আটকে গিয়েছিল এবং কোনো গভীর ক্ষত হয়নি।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে।

আপনি (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “হে আল্লাহ! একে জাহান্নামে টেনে নিন।”

ঠিক সেই মুহূর্তে ওই ব্যক্তির সওয়ারিটি ভড়কে গিয়ে দৌড়াতে শুরু করল এবং তার পা রেকাবে আটকে গেল। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তার পুরো শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেল, রেকাবে শুধু তার পা-টিই অবশিষ্ট রইল। [১]

সাহেবজাদা আবদুল্লাহর শাহাদাত এবং যুদ্ধের সূচনা:

হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাহেবজাদা আবদুল্লাহ অত্যন্ত সুদর্শন ও সুশ্রী ছিলেন। এক কুফী সৈন্য তাকে দেখে বলল: “একে তো আমি অবশ্যই হত্যা করব।”

অন্যান্য লোকেরা তাকে বোঝাল যে, একে হত্যা করে তোমার কী লাভ! কিন্তু সে নাছোড়বান্দা রইল এবং অস্ত্র বের করে আবদুল্লাহর ওপর চড়াও হলো। যখন সে আবদুল্লাহর ওপর আঘাত করল, তখন তিনি চিৎকার করে উঠলেন: “হায় চাচা!”

হযরত হুসাইন (রা.) সেই আওয়াজ শুনে বললেন: “এমন ব্যক্তির ডাকে লাববাইক, যার সাহায্যকারী কম এবং শত্রু অনেক।”

একথা বলে আপনি ওই কুফীর ওপর আক্রমণ করলেন এবং তার হাত কেটে ফেললেন। এরপর দ্বিতীয় আঘাতে তাকে মেরে ফেললেন। এরপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। [২]

কুফাবাসীদের ভীরুতা:

কুফার কিছু লোক যুদ্ধের দৃশ্য দেখার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী টিলাগুলোর ওপর পৌঁছে গিয়েছিল। তারা অশ্রুসিক্ত নয়নে এই দৃশ্য দেখছিল এবং আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করছিল, কিন্তু তাদের ভীরুতার অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য নিচে নেমে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল না। কেউ একজন বলল: “হে আল্লাহর শত্রুরা! তোমরা নিচে নেমে তাদের সাহায্য করতে যাচ্ছ না কেন?”

কিন্তু তারা না কোনো উত্তর দিতে পারল, না বাস্তবে কিছু করতে পারল। [৩]

সেই সময় হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে প্রায় একশ জন ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর পাঁচ ছেলে এবং বনু হাশিমের ষোল জন ব্যক্তি ছাড়াও বনু সুলাইম এবং বনু কিনানার একজন করে মিত্রও ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামক এক ব্যক্তিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৪]

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৭/৩৭৩, ত: আর-রুশদ; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি, ৩/১১৬, ত: মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া। এখানে এটি মনে রাখা উচিত যে, যদিও হযরত হুসাইন (রা.)-এর কিসসায় আমরা সহীহ ও হাসান রেওয়ায়েতকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি, তবে প্রয়োজনে কিছু যযীফ রেওয়ায়েতও নেওয়া হয়েছে যাতে কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যায় যা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। তবে বিশেষ করে যুদ্ধের ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা কেবল সহীহ বা হাসান রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছি। কোনো যযীফ রেওয়ায়েত এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আজকাল কারবালার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে শিয়াদের বানানো অনেক কিচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত আছে এবং দাবি করা হয় যে, এই বিষয়ে সমস্ত রেওয়ায়েত আবু মিখনাফের মতো শিয়া রাবীদের থেকে বর্ণিত এবং প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু আমরা মূল পাঠে সহীহ ও হাসান রেওয়ায়েতের ওপর ভিত্তি করে যে বিবরণ পেশ করছি, তা তথাকথিত গবেষকদের দাবির চূড়ান্ত খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। এটি একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ। বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তির “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া” দেখতে পারেন।

[২] আল-মিহান: পৃ. ১৫৩, ইমাম কাসিম বিন সালাম থেকে, তিনি ইমাম সাহনুন থেকে... এই রেওয়ায়েতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, কুফী বাহিনীই যুদ্ধ শুরু করেছিল। প্রথমে হযরত হুসাইন (রা.)-এর পিঠে তীর মারা হয়, এরপর তার অগ্নিবয়সী ছেলের ওপর আক্রমণ করা হয়। কিছু ঐতিহাসিক মুস্তাশরিকদের বরাত দিয়ে দাবি করেন যে, হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথীরাই অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন; উল্লিখিত রেওয়ায়েতগুলো এই ভিত্তিহীন দাবির খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯২, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে।

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত:

অবশেষে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সরকারি বাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমস্ত সাথী শহীদ হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে দশজনেরও বেশি যুবক তাঁর পরিবারের সদস্য ছিলেন। একটি তীর এসে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর গায়ে লাগল যে তাঁর কোলে ছিল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন: “হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মধ্যে তুমিই ফয়সালা করো, তারা আমাদের ডেকেছিল যাতে আমাদের সাহায্য করে, আর এখন তারা আমাদেরই হত্যা করছে।” [১]

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত হলেন যে, এই লোকেরা কেবল তাঁকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং তাঁর লাশ থেকে কাপড় খুলে নিতেও দ্বিধা করবে না। তিনি পরিবারের সদস্যদের বললেন: “আমাকে এমন একটি সাধারণ কাপড় দাও যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না, আমি এটি পোশাকের নিচে পরে নেব যাতে আমাকে উলঙ্গ না করা হয়।” [২]

মহিলারা একটি পুরনো চাদর দিলেন, তিনি সেটি ছিঁড়ে পোশাকের নিচে পরে নিলেন। তারপর তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। [৩]

কিছুক্ষণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলল। অবশেষে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। [৪]

ঘাতকরা সেই চাদরটি ছাড়া তাঁর বাকি সব কাপড় খুলে নিল এবং পবিত্র মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। [৫]

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

কারবালার শহীদগণ:

কারবালার যুদ্ধে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আলে আবি তালিবের ‘১৮’ জন ব্যক্তি শহীদ হন।

- ছয়জন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই ছিলেন: (১) আব্বাস (২) জাফর (৩) উবায়দুল্লাহ (৪) উসমান (৫) মুহাম্মদ (৬) আবু বকর।
- দুইজন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে: (১) আব্দুল্লাহ (২) আলী আকবর।
- তিনজন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে ছিলেন: (১) কাসেম (২) আবু বকর (৩) আব্দুল্লাহ।
- তিনজন আকিল ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে (মুসলিম ইবনে আকিল রহ.-এর ভাই) ছিলেন: (১) জাফর (২) আব্দুর রহমান (৩) আব্দুল্লাহ।
- দুইজন হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি ছিলেন: (১) আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম (২) মুহাম্মদ ইবনে আবি সাজিদ ইবনে আকিল।
- দুইজন আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে ছিলেন: (১) আউন (২) মুহাম্মদ।

উমর ইবনে সা’দের বাহিনীর ৮৮ জন লোক নিহত হয়েছিল। [৬] হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহেবজাদা আলী (জয়নুল আবেদিন) তখন অসুস্থ ছিলেন, তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। উমর ইবনে সা’দ সৈন্যদের বলেছিল: “এই অসুস্থ ব্যক্তিকে কিছু বলো না।” [৭]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩৮৯/৫, আশ্মার থেকে হাসান সনদে।

[২] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১১৪/৩; তারিখুত তাবারী: ৩৮৯/৫, আশ্মার থেকে হাসান সনদে।

[৩] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১১৪/৩।

[৪] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১১৪/৩, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ সংস্করণ; তারিখুত তাবারী: ৩৮৯/৫, আশ্মার থেকে হাসান সনদে।

[৫] তারিখু খলিফা ইবনে খইয়্যাৎ, পৃষ্ঠা: ২৩৩, ২৩৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৫৫১, ৫৫২।

[৬] আত-তারিখুল কাবীর লি ইবনে আবি খাইসামা, আস-সাফারুস সানি: ৯১৩/২।

ঘাতকের গর্বিত কবিতা:

হযরত হুসাইন (রা.)-এর মস্তক নিয়ে ঘাতক কুফার কাসরে ইমারাহ (গভর্নর হাউজ)-এ পৌঁছাল এবং ইবনে যিয়াদকে সুসংবাদ দেওয়ার সময় এই গর্বিত কবিতাটি আবৃত্তি করল:

أَوْقِرْ رِكَابِي فِضَّةً وَذَهَبًا ... فَإِنِّي قَتَلْتُ الْمَلِكَ الْمُحَجَّبًا
قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ أُمًّا وَأَبًا ... وَخَيْرَهُمْ إِن يَنْسُبُونَ نَسَبًا

“আমার সওয়ারিকে সোনা ও রূপা দিয়ে পূর্ণ করে দাও, কারণ আমি এমন এক বাদশাহকে হত্যা করেছি যিনি পাহারায় থাকতেন। আমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পিতা-মাতার সন্তানকে হত্যা করেছি, বংশমর্যাদা গণনার সময় যাঁর বংশ সবচাইতে উচ্চ বলে গণ্য হয়।” [১]

পবিত্র মস্তক উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে:

পবিত্র মস্তকটি একটি তশতরিতে রেখে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে পেশ করা হলো। হযরত হুসাইন (রা.)-এর চুলে খেজাব লাগানো ছিল। [২]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের হৃদয় ছিল পাথরের মতো। এর ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না। লাঠি দিয়ে তাঁর চুল নাড়াচাড়া করতে করতে সে বলল: “দেখো! আবু আব্দুল্লাহর চুলে শুভ্রতা চলে এসেছে।” [৩] এরপর লাঠিটি ঠোঁটের ওপর রেখে বলল: “মুখটি তো বেশ সুন্দর।”

সেই সময় কুফার বয়োজ্যেষ্ঠ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-ও ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রাগান্বিত করব। শোনো! আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সেখানে চুম্বন করতে দেখেছি যেখানে তুমি লাঠি রেখেছ।” [৪]

সাদাত কাফেলা উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে:

উমর বিন সাদ যুদ্ধ শেষ করে হযরত হুসাইন (রা.)-এর পরিবার-পরিজনকেও কুফায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। [৫]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ পাষণ্ড হৃদয়ের হলেও সে নারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেনি। সে তাঁদের একটি আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, খরচ এবং পোশাক-আশাক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। [৬]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এই বিষয়টিকে পুরোপুরি একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মামলার মতো দেখেছিল। তার কাছেও ‘বিদ্রোহী’ শব্দটি কেবল হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর পুরুষ সঙ্গীদের ওপরই প্রযোজ্য ছিল, ঘরের শিশু ও নারীদের ওপর নয়। তাই সে তাঁদের শাস্তির যোগ্য মনে করত না।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮৯, আম্মারা বিন হাসসান থেকে বর্ণিত। ইমাম আবু নুয়াইম তাঁর সনদে যুহাইর বিন আলা-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কারবালার শহীদের ব্যাপারে ঘাতক সিনান বিন আনাস নাখঈ এ কথা বলেছিল, যদিও খাওলি বিন ইয়াযিদ পবিত্র মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং সেই মস্তক ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই কবিতাগুলো সেই শুনিয়েছিল। (মা’রিফাতুস সাহাবা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৭৭)। অন্যদিকে আবু মুখনাফের বর্ণনা অনুযায়ী কবিতা আবৃত্তিকারী ছিল সিনান বিন আনাস নাখঈ। (তারিখুত তাবারী: ৫/৩৫৪)

[২] সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর: ৩৭৪৮, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবুল হাসান ওয়াল হুসাইন।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৩।

[৪] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/১৩৫, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ সংস্করণ।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯০, আম্মারা বিন হাসসান থেকে বর্ণিত।

[৬] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৩, হুসাইন থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত।

হযরত জয়নুল আবেদিন এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ:

কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত সাদাত পরিবারের সকল পুরুষকে শহীদ করা হয়েছিল। কেবল হযরত হুসাইন (রা.)-এর পুত্র আলী বিন হুসাইন (যিনি জয়নুল আবেদিন উপাধিতে পরিচিত হন) এই কারণে বেঁচে গিয়েছিলেন যে, তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাঁবুর বাইরে আসতে পারেননি।

যখন তিনি কাফেলার নারীদের সাথে কুফায় পৌঁছালেন, তখন উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ এই ভেবে যে তিনিও বিদ্রোহে शामिल ছিলেন, সৈন্যদের নির্দেশ দিল যে তাকেও হত্যা করো। তাঁর ফুফু যয়নাব বিনতে আলী অত্যন্ত সাহসী নারী ছিলেন। তিনি জয়নুল আবেদিনকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন: “যতক্ষণ আমাকে হত্যা না করবে, ততক্ষণ তাকে মারতে পারবে না।”

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ নরম হয়ে গেল এবং তাদের ছেড়ে দিল।

এরপর সে হুসাইনী কাফেলার সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে তাদের ইয়াজিদের কাছে দামেস্কে পাঠিয়ে দিল। [১]

আবু মিখনাফ প্রমুখের কিছু বর্ণনায় সাদাতদের সাথে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং ইয়াজিদের কঠোর দুর্ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। যেমন এই নারীদের কুফা থেকে দামেস্ক পর্যন্ত অনাবৃত মস্তকে, পায়ে শিকল পরা অবস্থায় উটের পিঠে বন্দীদের মতো বসিয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং ইয়াজিদ দরবারে তাদের অপমান করেছিল এবং অহংকারী কথা বলেছিল, কিন্তু এমন দুর্ব্যবহার কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়।

ইয়াজিদের কাছে সাদাত কাফেলা:

যখন সাদাত কাফেলা দামেস্কে পৌঁছাল, তখন ইয়াজিদও এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করল। হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাহেবজাদা হযরত জয়নুল আবেদিন (রহ.)-এর বর্ণনা হলো:

“আমাদের ইয়াজিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, আমাদের দেখে তার চোখ ভিজে এল এবং সে আমাদের তা-ই দিল যা আমরা চেয়েছিলাম।” [২]

ইয়াজিদের দরবারে নীল চোখের এক লাল বর্ণের লোক ছিল, সে হযরত হুসাইন (রা.)-এর এক অল্পবয়সী কন্যার দিকে তাকাল এবং বলল: “আমীরুল মুমিনীন! এই মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন।”

এ কথা শুনে যয়নাব বিনতে আলী বলে উঠলেন:

“আল্লাহর কসম! না তোমার এই অধিকার আছে, না ইয়াজিদের। কেবল তখনই সম্ভব যদি সে আল্লাহর দ্বীন অস্বীকারকারী হয়ে যায়।”

নীল চোখের লোকটি আবার একই কথা বলল। ইয়াজিদ বলল: “চুপ থাকো।” [৩]

তখন ফাতিমা বিনতে হুসাইন বললেন: “হে ইয়াজিদ! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যারা কি বন্দী হবে?” এ কথা শুনে ইয়াজিদও কেঁদে ফেলল। তার সাথে থাকা লোকেরাও এত বেশি কাঁদল যে কান্নার আওয়াজ উচ্চকিত হলো।

[১] তারিখ আল-তবারী: ৫/৩৯০, আম্মার থেকে হাসান সূত্রে।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩২০, নির্ভরযোগ্য সূত্র ও বর্ণনাকারী সহ।

[৩] তারিখ আল-তবারী: ৫/৩৮৯, আম্মার থেকে হাসান সূত্রে।

এই সময়ে হযরত নুমান বিন বশীর (রা.)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইয়াজিদকে বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি তাদেরকে এই অবস্থায় দেখতেন, তবে তিনি তাদের সাথে যেমন আচরণ করতেন, আপনিও তেমনই আচরণ করুন।”

এ কথা শুনে ইয়াজিদ বলল: “তাদেরকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসল করাও, তাদের জন্য বড় তাঁবু খাটাও।”

লোকেরা তেমনই করল। ইয়াজিদ তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করল, কাপড় সরবরাহ করল এবং প্রচুর পরিমাণে উপটোকন দিল। এরপর বলল: “যদি ইবনে জিয়াদের সাথে হুসাইন (রা.)-এর কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকত, তবে সে তাকে হত্যা করত না।” [১]

সাদাতদের প্রতি ইয়াজিদের উত্তম আচরণের সাক্ষ্য আবু মুখনাফ তার কিছু বর্ণনায় দিয়েছেন এবং হযরত ফাতিমা বিনতে আলী (হযরত হুসাইন রা.-এর নাতনি)-এর বরাতে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন:

ইয়াজিদ নুমান বিন বশীর (রা.)-কে বলল: “নুমান! এই লোকদের প্রস্থানের ব্যবস্থা যথাযথভাবে করুন। তাদের সাথে সিরিয়ার এমন কোনো ব্যক্তিকে পাঠান যে আমানতদার ও নেককার হয়, সাথে কিছু অশ্বারোহী ও খাদেমও দিন যারা তাদের সবাইকে মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে দেবে।”

এরপর সে নারীদের জন্য নির্দেশ দিল যে, তাদেরকে যেন একটি আলাদা ঘরে রাখা হয় যেখানে প্রয়োজনীয় সব জিনিস বিদ্যমান থাকে এবং তাদের ভাই আলী বিন হুসাইনও যেন সেই ঘরেই থাকেন যেখানে এই মহিলারা থাকবেন।

এই মহিলারা যখন ইয়াজিদের ঘরে গেলেন, তখন আল-ই-মুয়াবিয়ার এমন কোনো নারী ছিল না যারা কাঁদতে কাঁদতে এবং বিলাপ করতে করতে তাদের কাছে আসেনি। তিন দিন সবাই সেখানে শোক পালন করল। ইয়াজিদ সকাল-সন্ধ্যায় খাবারের সময় আলী বিন হুসাইন (জয়নুল আবেদিন)-কে অবশ্যই ডেকে পাঠাত। [২]

যখন এই লোকেরা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন ইয়াজিদ আলী বিন হুসাইনকে ডেকে পাঠাল এবং তাকে বলল: “ইবনে মারজানা (উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ)-এর ওপর আল্লাহর লানত হোক। আল্লাহর কসম! যদি হুসাইন (রা.) আমার কাছে আসতেন, তবে তিনি আমার কাছে যা দাবি করতেন আমি তা পূরণ করে দিতাম। তাকে যেভাবে সম্ভব হতো হত্যা হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিতাম, চাই তাতে আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ মারা যেত, কিন্তু আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে যা আপনি দেখেছেন। আপনার যা কিছু প্রয়োজন হবে, লিখে পাঠাবেন।” [৩]

ইয়াজিদ বনু হাশিমের নারীদের কাছ থেকে একে একে জানতে চাইল যে, (লুটতরাজের হাঙ্গামায়) কার কী লুট হয়েছে? মহিলারা যা কিছু জানাল, ইয়াজিদ তাদেরকে তার দ্বিগুণ প্রদান করল। [৪]

ইয়াজিদ হাশেমী কাফেলাকে মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচ্চরিত্রবান লোক নিযুক্ত করল। তাদের সরদারকে সাদাতদের সাথে উত্তম আচরণের অসিয়ত করল। ফলে সে তাদেরকে নিয়ে রওনা হলো। সে তাদেরকে নিয়ে রাতে সফর করত এবং তাদেরকে সামনে রাখত যাতে তারা এক মুহূর্তের জন্যও তার দৃষ্টির আড়াল না হয়।

[১] আল-মিহান লি আবি আল-আরব আল-তামিমি, পৃ. ১৩৩, ১৩৫, ইমাম কাসিম বিন সালাম থেকে ইমাম সাহনুন সূত্রে।

[২] তারিখ আল-তবারী: ৫/৩৬২, আবু মুখনাফ থেকে।

[৩] তারিখ আল-তবারী: ৫/৩৬৩, আবু মুখনাফ থেকে।

[৪] তারিখ আল-তবারী: ৫/৩৬৩, আবু মুখনাফ থেকে।

যখন তারা কোথাও যাত্রাবিরতি করতেন, তখন এই খাদেমরা তাদের থেকে দূরে সরে যেতেন এবং তাদের চারপাশে পাহারা দিতেন। তাদের এমন জায়গায় অবস্থান করাতেন যেখানে অজু এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কোনো অসুবিধা না হয়। তারা তাদের প্রয়োজনের পূর্ণ খেয়াল রাখতেন এবং উত্তম আচরণের সাথে ধাপে ধাপে তাদের মদিনায় নিয়ে আসলেন।

তাদের এই উত্তম ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ফাতিমা বিনতে আলী কাফেলা প্রধানকে নিজের অলঙ্কার খুলে পারিশ্রমিক হিসেবে পেশ করলেন এবং পুরস্কারের স্বল্পতার জন্য ক্ষমাও চাইলেন। সে জবাবে বলল:

“যদি দুনিয়ার জন্য এই উত্তম আচরণ করতাম, তবে এই অলঙ্কার বরং এর চেয়ে কমও আমাকে খুশি করার জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আপনাদের আত্মীয়তার খাতিরে এমনটি করেছি।” [১]

□□□

রাসূল ﷺ যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন কী জবাব দেবে?

যখন এই কাফেলা মদিনায় প্রবেশ করল, তখন অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর চাচাতো বোন হযরত য়নাব বিনতে আকীলও ছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে এই কবিতাগুলো পড়ছিলেন:

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ ... مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ

“লোকেরা! তোমরা কী জবাব দেবে যখন পয়গম্বর ﷺ তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা শেষ উম্মত হয়ে কী করেছ?”

بِعِترَتِي وَبِأَهْلِي بَعْدَ مُفْقِدِي ... مِنْهُمْ أُسَارَى وَقَتْلَى ضَرَجُوا بِدَمٍ

“আমার পরে আমার সন্তান ও পরিজনদের সাথে কী আচরণ করেছ? তাদের মধ্যে কেউ বন্দি হয়েছে, কেউ নিহত হয়ে ধুলো ও রক্তে লুটিয়ে পড়েছে।”

مَا كَانَ هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ ... أَنْ تَخْلُفُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمِي

“আমি তোমাদের যে পথপ্রদর্শন করেছিলাম তার প্রতিদান তো এটি ছিল না যে, আমার পরে আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহার করবে।” [২]

হযরত আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (মৃ. ৬৯ হিজরি) পর্যন্ত যখন এই কবিতাগুলো পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন: “আমরা এটাই বলব: [৩]

[8] رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

□□□

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৬২, ৩৬৩, আবু মুখনাফ থেকে বর্ণিত।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯০, আস্মার থেকে হাসান সনদে বর্ণিত; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/১১৮, ১২৫, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ।

[৩] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/১১৮; মাজমাউয যাওয়াইদ: ১৫১৮৩।

[৪] হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (আল-আরাফ: ২৩)

কারবালা ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী কে?

এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিদ্যমান যে, কারবালা ট্র্যাজেডির জন্য শেষ পর্যন্ত দায়ী কে ছিল? রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই পৃথিবী থেকে পর্দা করার মাত্র পঞ্চাশ বছর পর তাঁর পরিবারকে ধুলো ও রক্তে রঞ্জিত করার হোতা কারা ছিল?

কারবালা ট্র্যাজেডি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনো একজন ব্যক্তিকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করা যায় না। এর জন্য বেশ কিছু গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন লোক দায়ী ছিল। তাদের মধ্যে কারো ষড়যন্ত্র, কারো অযোগ্যতা, কারো জেদ এবং কারো প্রতিশোধের স্পৃহা পরিস্থিতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, উম্মত নিজের নবীর সন্তানদের রক্তে হাত রাঙিয়ে ফেলেছিল। নিচে আমরা সেই দায়ী গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের উল্লেখ করছি।

কুফাবাসী:

যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তবে কারবালা ট্র্যাজেডির সবচেয়ে প্রথম দায় কুফাবাসীদের ওপর বর্তায়, যারা হযরত হুসাইন (রা.)-কে হাজার হাজার ওয়াদা দিয়ে ডেকে এনেছিল এবং পরে ধোঁকা দিয়ে একা ফেলে দিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে মন্তব্যগুলো পড়লে জানা যায় যে, এর দায় সবচেয়ে বেশি কুফাবাসীদের ওপরই ছিল।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) যখন হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের খবর পেলেন, তখন তিনি বলেছিলেন:

“আল্লাহ সেই লোকদের ধ্বংস করুন যারা হযরত হুসাইন (রা.)-কে ধোঁকা দিয়েছে। তাদের ওপর আল্লাহর লানত হোক।” [১]

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কাছে যখন কোনো এক ইরাকি ইহরাম অবস্থায় মশা মারার মাসআলা জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি উপস্থিতদের দিকে ফিরে বললেন: “একে দেখো! সে আমার কাছে মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছে, অথচ এই লোকগুলোই নবীর সন্তানকে হত্যা করেছে এবং আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই দু’জন (হাসান ও হুসাইন) দুনিয়াতে আমার দু’টি ফুল।” [২]

যুদ্ধের সময় হযরত হুসাইন (রা.)-এর এই কথাগুলো প্রাণিধানযোগ্য: “হে আল্লাহ! আমাদের এবং এই লোকদের মধ্যে ইনসাফ করুন। তারা আমাদের সাহায্য করার জন্য ডেকেছিল এবং এখন তারাই আমাদের হত্যা করছে।” [৩]

এই কথাগুলোর লক্ষ্যবস্তু উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ বা উমর বিন সাদ প্রমুখ হতে পারে না; কারণ তারা তাঁকে কখনোই ডাকেনি।

[১] ফাযায়িলুস সাহাবাহ লি আহমাদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ১৩৯২; আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তবারানী: ৩/১০৮ সহীহ সনদে।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৫৯৯৪, কিতাবুল আদব, বাব রাহমাতুল ওয়ালাদ ওয়া তাকবীলুহ।

[৩] তারিখুত তবারী: ৫/৩৮৯ আম্মার থেকে হাসান সনদে।

দ্বিতীয় অংশ | তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এর পরিষ্কার অর্থ হলো কুফার অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে শিয়ানে আলীর এমন লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা হযরত হুসাইন [রা.] -কে চিঠি লিখেছিল কিন্তু এখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

হযরত হুসাইন [রা.] -এর বিরুদ্ধে হামলায় শরিক শিয়ানে আলী:

ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে কুফার আক্রমণকারী বাহিনীতে নিম্নোক্ত শিয়ানে আলীর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়:

- ১. আমর বিন হাজ্জাজ: এ সেই ব্যক্তি যে হানি বিন উরওয়ার গ্রেফতারির সময় গিয়ে ইমারত প্রাসাদের দরজায় চড়াও হয়েছিল। [১] এই আমর বিন হাজ্জাজই কারবালায় ইবনে জিয়াদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বলছিল: “হে লোকসকল! এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে দ্বিধা করো না যে দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে এবং শাসকের বিরোধিতা করেছে।” [২]
- ২. শিমার বিন জিল জাওশান: জঙ্গ সিফফিনে হযরত আলী [রা.] -এর লস্করে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই লড়াইয়ে আহতও হয়েছিল। [৩] ইবনে জিয়াদের লস্করের নায়েব সালার এই ছিল এবং সেই হযরত হুসাইন [রা.] -এর ওপর প্রাণঘাতী আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিল। [৪]
- ৩. আব্দুল্লাহ বিন জুহাইর বিন সালিম: কুফার বাহিনীর একটি অংশ আব্দুল্লাহ বিন জুহাইর বিন সালিমের নেতৃত্বে ছিল। [৫] এই ব্যক্তি বিখ্যাত শিয়া ঐতিহাসিক আবু মুখনাফ লুত বিন ইয়াহইয়ার প্রপিতামহ (মায়ের দাদা) ছিল। [৬]
- ৪. কাইস বিন আশআস: বাহিনীর একটি অংশ কাইস বিন আশআসের কমান্ডে ছিল। [৭] তার পিতা আশআস বিন কাইস [রা.] জঙ্গ সিফফিনে হযরত আলী [রা.] -এর সেনাপতি ছিলেন। [৮]
- ৫. সিনা বিন আনাস নাখয়ি: সে শিমারের নির্দেশে বর্শার মোক্ষম আঘাত করেছিল, সে নাখয়ি গোত্রের ছিল যাতে শিয়ানে আলীর প্রাধান্য ছিল।
- ৬. খাওলি বিন ইয়াজিদ আল-আসবিহি: সে পবিত্র মস্তুক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। [৯] সে হিমইয়ার গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল যা একটি ইয়েমেনি গোত্র ছিল যেখান থেকে আব্দুল্লাহ বিন সাবা জন্ম নিয়েছিল এবং সেখানে শিয়া মতবাদের প্রভাব গভীর ছিল।

রইল এই কথা যে, এই লোকেরা হযরত হুসাইন [রা.] -কে শহীদ করার কেন সংকল্প করেছিল? তারা হযরত হুসাইন [রা.] এবং...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৬৭ আবু মুখনাফ থেকে।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৩৫।

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৮; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৩/১৭৫।

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৫৩ আবু মুখনাফ থেকে; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/৪৬।

[৫] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩২২ আবু মুখনাফ থেকে।

[৬] তাহযিব আল-কামাল: ১৩/২১৯।

[৭] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৩৩ আবু মুখনাফ থেকে।

[৮] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩০, তাবাতুর রিসালাহ।

[৯] সিনান এবং খাওলির হযরত হুসাইন [রা.] -এর রক্তে হাত রাঙানোর বিষয়টি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় রয়েছে। (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৩/১১৭; মাজমাউয যাওয়াইদ: ১৫১৪২)। সিনান হযরত হুসাইন [রা.] -কে শহীদ করার পর ইবনে জিয়াদের কাছে গান গাইতে গাইতে এসেছিল: “আমার রেকাব সোনা ও রূপা দিয়ে ভরে দাও।” (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৩/১১৭)। অবশ্য এই দুজনের শিয়া হওয়ার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, সিনানের নাখয়ি হওয়ার ভিত্তিতে ধারণা করা যেতে পারে যে সে শিয়ানে আলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। একইভাবে খাওলি বিন ইয়াজিদের হিমইয়ার গোত্রের হওয়ার কারণে আন্দাজ করা যেতে পারে যে সম্ভবত সে শিয়া ছিল, কারণ এই উভয় গোত্র: নাখয় এবং হিমইয়ারে শিয়া মতবাদের প্রভাব প্রবল ছিল।

নোট: বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত এই শিয়ানে আলীর নাম স্বয়ং শিয়া ঐতিহাসিকগণ নকল করেছেন। আমরা উল্লিখিত সমস্ত নাম আবু মুখনাফের বর্ণনা থেকে নিয়েছি যা ‘তারিখ আল-তাবারী’তে রয়েছে। শাবাস বিন রাবঈকেও আবু মুখনাফ এই বাহিনীতে গণনা করেছেন (ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ শাবাস থেকে একটি করে বর্ণনা নিয়েছেন, জারাহ ও তাদিলের ইমামগণ তাকে যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন)। এছাড়া শিয়াদের নিজস্ব কিতাব যেমন: জালাউল উয়ুন এবং ইহতিজাজে তাবারসিতে এমন আরও উদ্ধৃতি পাওয়া যেতে পারে। তবে যদি তাদের মধ্যে এমন কোনো নাম থাকে যাকে আমাদের জারাহ ও তাদিলের ইমামগণ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) সাব্যস্ত করেছেন, তবে তার দিকে হুসাইন হত্যার সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে শিয়াদের মিথ্যাবাদী গণ্য করা হবে।

তাদের সঙ্গীদের আহত অবস্থায় বেঁধে কুফায় নিয়ে যাওয়া যেত। তাদের হত্যা করে কী অর্জিত হলো? যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তবে মনে হয় যে তাদের ভয় ছিল যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সঙ্গীরা যদি জীবিত থাকে তবে পাছে তাদের গোপন রহস্য ফাঁস না হয়ে যায়। তাদের কাছে হযরত হুসাইন (রা.)-এর লেখা কিছু চিঠিও ছিল। যদি এই চিঠিগুলো উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ বা ইয়াজিদ পর্যন্ত পৌঁছে যেত, তবে এই লোকদের রক্ষা পাওয়া কঠিন হতো এবং তারা কঠোরতম শাস্তির যোগ্য হতো। কিন্তু লুটপাটের অজুহাতে সেই চিঠিগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ইতিহাসে এমন কোনো বর্ণনা নেই যে যুদ্ধের পর সেই চিঠিগুলো সামনে এসেছে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এভাবে হযরত হুসাইন (রা.)-কে প্ররোচিত করে আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট থাকল না। ফিতনাবাজরা পরিষ্কার বেঁচে গেল এবং একটি মহান উদ্দেশ্যের জন্য আসা হযরত হুসাইন বিন আলী (রা.) সপরিবারে শহীদ হলেন।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

উমর বিন সাদ

উমর বিন সাদের নামও কারবালা দুর্ঘটনার দায়বদ্ধদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না [১]। কারণ হযরত হুসাইন (রা.)-এর ওপর আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ড তার হাতেই ছিল। যদিও শুরুতে তিনি হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রমে শরিক হতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের হুমকি এবং ‘রাই’ প্রদেশের গভর্নর হওয়ার লোভে তাকে এই অভিযানে প্ররোচিত করেছিল। সম্ভবত তার প্রত্যাশা ছিল যে রক্তপাত ছাড়াই বিষয়টি মিটে যাবে। আবু মিখনাফের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে উমর বিন সাদ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ছাড়াই বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করেছিলেন [২]। তিনি হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করে ইবনে জিয়াদকে লিখেছিলেন: “আল্লাহ আগুনের শিখা নিভিয়ে দিয়েছেন, মতভেদ দূর করেছেন এবং উন্মত্তের বিষয়টি মীমাংসা করে দিয়েছেন।” উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ রাজি হয়ে বলেছিলেন যে তিনি এটি কবুল করেছেন। কিন্তু শিমর তার মত পরিবর্তন করে দিয়ে আবার যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে দিল [৩]। আবু মিখনাফের বর্ণনা হলো যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের পর উমর বিন সাদ এত বেশি কেঁদেছিলেন যে তার দাড়ি ভিজে গিয়েছিল [৪]। যাই হোক, উমর বিন সাদ মনেপ্রাণে না হলেও এই কার্যক্রমে শরিক ছিলেন এবং আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ড তারই হাতে ছিল, তাই তাকে কোনোভাবেই নির্দোষ সাব্যস্ত করা যায় না [৫]।

[১] তিনি হলেন উমর বিন সাদ, তার পিতা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) জাম্মাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। উমর বিন সাদ ২৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। আল-ইজলি বলেছেন: তিনি মাদানি, নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), তিনি তার পিতার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে লোকেরা হাদিস বর্ণনা করেছে। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি হুসাইনকে হত্যা করেছেন; আমি বলি, তিনি বাহিনীর আমির ছিলেন কিন্তু সরাসরি হত্যায় অংশ নেননি। (আত-তাবাকাত লি-ইবনে সাদ ৫/৩৩৩, ত. মাকতাবাতুল খানজি)।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কারবালা যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের কারণে তাকে বিশ্বাস করেন না। একবার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তার থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাকে বলল: “আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না! আপনি উমর বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেছেন?” তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: “আমি আর কখনো তার থেকে হাদিস বর্ণনা করব না।” (তাজহিবুল কামাল ৪/৩৪৮-৩৫৮)। ইবনে আবি খাইসামা বলেন: আমি ইয়াহইয়া বিন মাসীনকে জিজ্ঞেস করলাম: উমর বিন সাদ কি নির্ভরযোগ্য? তিনি বললেন: হুসাইনের হত্যাকারী কীভাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে! (তারিখুল কাবীর, ইবনে আবি খাইসামা আস-সালাফি ২/৯৩৫)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে উমর বিন সাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা উচিত নয়, কারণ তিনি বাহিনীর প্রধান এবং রক্তপাতের জন্য দায়ী ব্যক্তি ছিলেন যিনি হুসাইন বিন আলীর শাহাদাতের সময় উপস্থিত ছিলেন। (আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খিলাল, ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, পৃ. ৩৩৭)।

[২] তারিখুত তাবারি ৫/৩১৩-৩১৪।

[৩] তারিখুত তাবারি ৫/৩১৫ আবু মিখনাফ থেকে।

[৪] তারিখুত তাবারি ৫/৪৫২।

[৫] তারিখুত তাবারি ৫/৪৫২।

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ:

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ সম্পর্কে সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, সে হযরত হুসাইন (রা.)-কে একজন বিদ্রোহী অপরাধী হিসেবে গণ্য করেছিল এবং কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন না করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। [১] হযরত হুসাইন (রা.)-এর কর্তিত মস্তক দেখেও তার মন গলেনি, বরং তার প্রতিক্রিয়া এমন ছিল যেন কোনো সাধারণ দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই দুর্ঘটনার আসল দায়ী ছিল সে-ই।

এখানে এই প্রশ্ন অবশ্যই জাগে যে, যদি হযরত হুসাইন (রা.)-কে হত্যার নির্দেশ ইয়াজিদ না দিয়ে থাকত, তবে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ বা উমর বিন সাদ-এর মতো ব্যক্তিদের এত বড় সাহস কীভাবে হলো যে তারা ইয়াজিদকে না জিজ্ঞেস করেই এত বড় ব্যক্তিত্বকে হত্যা করিয়ে দিল? বিশেষ করে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের তো অবশ্যই আন্দাজ থাকা উচিত ছিল যে এই পদক্ষেপের ফলে সরকার খুশি হবে নাকি অসন্তুষ্ট।

গভীরভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তার ইয়াজিদের অসন্তুষ্টির কোনো ভয় ছিল না; কারণ ইয়াজিদ নুমান বিন বশীর (রা.)-এর স্থলে তাকে কুফার শাসনভার এজন্যই দিয়েছিল যে ইয়াজিদের মতে নুমান বিন বশীর (রা.)-এর কোমলতার কারণে ইরাকবাসী নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সুতরাং উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নিয়োগের উদ্দেশ্যই এর বাইরে আর কিছু ছিল না যে ইয়াজিদ কুফার জন্য একজন কঠোর লোক প্রয়োজন মনে করেছিল। ফলে ইবনে যিয়াদ যে কঠোরতা দেখিয়েছিল, ইয়াজিদের দৃষ্টিতে তা কেবল কাম্যই ছিল না বরং তার পদের স্থায়িত্ব ও পদোন্নতির কারণও ছিল। অন্য কথায়, ইয়াজিদের পক্ষ থেকে তাকে এমন আস্থা ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যা ইবনে যিয়াদকে এই জঘন্য কাজ করার সাহস জুগিয়েছিল, যার কোনো ক্ষতিপূরণ সম্ভব ছিল না। ইবনে জিয়াদের ধারণা অনুযায়ী ঠিক দারুল খিলাফতের ইচ্ছা অনুযায়ীই তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অবশ্য ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদের এই নিষ্ঠুর পদক্ষেপের প্রতি প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেনি বরং বলেছিল: “ইবনে যিয়াদ হুসাইন (রা.)-এর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করেছে, তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন।” [২]

কারবালার ট্র্যাজেডি এবং ইয়াজিদের ভূমিকা:

এটিও প্রসিদ্ধ যে, হযরত হুসাইন (রা.)-কে ইয়াজিদ হত্যা করিয়েছে, অর্থাৎ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে এর নির্দেশ ইয়াজিদই দিয়েছিল। কিন্তু কোনো রেওয়ায়েতে এর স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে ইয়াজিদ হযরত হুসাইন (রা.)-কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। প্রমাণিত সত্য এই যে, উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজের ক্ষমতাবলে এই জুলুম চালিয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া লেখেন:

“আহলে রেওয়ায়েতদের ঐকমত্য রয়েছে যে, ইয়াজিদ হযরত হুসাইন (রা.)-কে হত্যার নির্দেশ দেয়নি।” [৩]

ইবনে সালাহ বলেন: “আমাদের মতে এটি সঠিক নয় যে ইয়াজিদ হযরত হুসাইন (রা.)-কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। প্রমাণিত সত্য এই যে, হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে সেই যুদ্ধের নির্দেশ, যা হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের কারণ হয়েছিল, ইরাকের গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ দিয়েছিল।” [৪]

[১] উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ভতিজা এবং হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর নাতি ছিল, সুদর্শন কিন্তু দূরদর্শিতার অভাব ছিল। আমির মুয়াবিয়া তাকে ২৫ বছর বয়সে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তার চরিত্রে তার পিতা যিয়াদ বিন আবিহির প্রভাব ছিল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৫৪৫, ত আল-রিসালাহ)

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৪২৫

[৩] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৫৫৭

[৪] ফাতাওয়া ইবনে সালাহ, পৃষ্ঠা ২১৬

তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইয়াজিদকে কারবালার ট্র্যাজেডি থেকে নির্দোষ এবং সম্পর্কহীন মনে করা হবে। যদি কারবালার নিহতদের মামলা দুনিয়ার কোনো আদালতে পেশ করা হতো, তবে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণের অভাবে ইয়াজিদ খালাস পেয়ে যেত, কিন্তু নৈতিক ও প্রথাগত দিক থেকে জনগণের আদালতে তার নির্দোষ হওয়া সম্ভব ছিল না। (আর আখেরাতের আদালতের ফয়সালা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে।)

যদি এটি মেনে নেওয়া হয় যে, ইয়াজিদ হযরত হুসাইন (রা.)-কে হত্যা করাতে চায়নি, তবে এটি স্বীকার করতে হবে যে সে বুদ্ধি ও বিবেক থেকে একেবারেই বিমুখ ছিল; কারণ এই পুরো ঘটনায় তার কৌশল ছিল সম্পূর্ণ ভুল। সে যদি উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে পরিষ্কার ভাষায় এই নির্দেশনা দিত যে বনু হাশিমকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে দামেস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তবে কখনোই এই ট্র্যাজেডি ঘটত না। উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ সরকারের কট্টর অনুগত ছিল। সে জেনে-বুঝে ইয়াজিদের নির্দেশ অমান্য করতে পারত না।

একজন শাসককে দেশে ঘটা প্রতিটি ভালো-মন্দের জন্য দায়ী মনে করা হয়। যদিও আইনি দিক থেকে কোনো অলি-গলিতে ঘটা খুনের বদলে শাসককে ফাঁসি দেওয়া হয় না, আর না কারো নামাজ ও নফল ইবাদতের সওয়াব শাসকরা পায়, কিন্তু যখন মানুষের জান-মাল এবং মান-সম্মান লুণ্ঠিত হয়, তখন তারা শাসককেই অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং এই অভিযোগ তোলায় তারা সম্পূর্ণ সঠিক। বিবেকবান ও দরদী শাসকরাও এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে বিবেকের আদালতে অপরাধী মনে করেন এবং আখেরাতের চিন্তায় কেঁপে ওঠেন। তারা বলেন যে, ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি উটও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যায়, তবে তার দায়ভার আমার ওপর বর্তাবে।

ইয়াজিদ এই ট্র্যাজেডির সময় সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় ছিল। মুসলমানদের তাকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানোরই কথা ছিল এবং তারা এতে সঠিক ছিল। বিশেষ করে এই কারণে যে, ইয়াজিদ এই ট্র্যাজেডির পর কেবল দুঃখ প্রকাশই করেছে, উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবং কুফার কর্মকর্তাদের আড়ালে গালমন্দ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয় যে, উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ওপর অভিযোগ এই কারণে আনা সম্ভব ছিল না যে সে নিজস্বভাবে একটি সরকারি অপারেশনে লিপ্ত ছিল এবং একটি বিদ্রোহ দমন করছিল, আর এই বিষয়টি যদি উপেক্ষা করা হয় যে বিষয়টি ছিল খাতামুল আশ্বিয়া (সা.)-এর দৌহিত্রের সাথে সম্পর্কিত, তবুও এই প্রশ্ন থেকে যাবে যে বিদ্রোহীদের সাথে আচরণের যে শরয়ী মূলনীতি ও নিয়মাবলি রয়েছে, সরকারি কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনী কি তার কোনো তোয়াক্কা করেছে? হযরত হুসাইন (রা.) সমঝোতায় রাজি ছিলেন এবং তার অবস্থান শুনে খোদ উমাইয়া কর্মকর্তা হুর ইবনে ইয়াজিদ চিৎকার করে বলছিল যে, যদি এমন প্রস্তাব কাফেররাও করত তবে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া ওয়াজিব হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সাথে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়েছে যা কাফেরদের সাথেও করা বৈধ নয়।

সুতরাং কারবালার ময়দানে যা কিছু ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবেই প্রকাশ্য জুলুম ও অত্যাচার ছিল যার শরিয়তে কোনো অবকাশ ছিল না। এমন জুলুমের হোতাকে তিরস্কার স্বরূপ অন্তত বরখাস্ত তো করা যেত যাতে মজলুমদের উত্তরাধিকারী এবং শোকে বিহ্বল জনগণ কিছুটা সান্ত্বনা পেত, কিন্তু আফসোস যে ইয়াজিদ থেকে এতটুকুও হয়নি।

সুতরাং এই অবহেলার কারণে মানুষের মধ্যে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যত ঘৃণাই ছড়িয়েছে তা কম ছিল; কারণ সাধারণ মানুষ এর অর্থ এটাই নিতে পারত যে সে হুসাইন হত্যার ওপর সন্তুষ্ট। এই কারণেই মুসলিম বিশ্বে বনু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ বারবার তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বয়ং ইয়াজিদকে এই ভুলের খেসারত এমন বদনামের মাধ্যমে দিতে হয়েছে যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সমস্যার সমাধান কী ছিল?

এখন পর্যন্ত অধ্যয়নে এটি প্রমাণিত যে, উভয় পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। সরকারের যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল, তা সরাসরি আলোচনার মাধ্যমেই নিরসন করা সম্ভব ছিল। হযরত হুসাইন (রা.)-ও যখন কারবালার ময়দানে দেখলেন যে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তা সম্পূর্ণ অচলাবস্থায় পৌঁছে গেছে, তখন তিনি ইয়াজিদের কাছে চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইয়াজিদও এই বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বারবার এই আক্ষেপ প্রকাশ করত যে, হায়! সে যদি হযরত হুসাইন (রা.)-কে নিজের কাছে ডেকে নিত এবং তাঁর দাবিগুলো মেনে নিত। ইয়াজিদ যদি সত্যিই হযরত হুসাইন (রা.)-এর অবস্থান শোনার জন্য তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে নিজের কাছে ডেকে নিত অথবা তাঁর সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য নিজে হিজাজ সফর করত এবং উদারতা প্রদর্শন করত, তবে হয়তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কর্মপন্থা এমনই ছিল যে তিনি সরাসরি আলোচনা করতেন। আলোচনার জন্য কখনো নিজে যেতেন, আবার কখনো অন্যদের আমন্ত্রণ জানাতেন। কিন্তু ইয়াজিদের সেই তৌফিকও হয়নি। পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে সে যা বলত:

“আমার কী ক্ষতি হতো যদি আমি কিছুটা কষ্ট সহ্য করে নিতাম এবং হুসাইন (রা.)-কে নিজের ঘরে থাকতে দিতাম এবং তিনি যা চাইতেন, তাঁকে সেই অধিকার দিতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান এবং তাঁর (সা.) হক ও আত্মীয়তার মর্যাদার দাবিও ছিল এটাই। যদিও এতে আমার সরকারের শক্তি ও শৌর্যবীর্য কমে যেত। আল্লাহ ইবনে মারজানার ওপর লানত বর্ষণ করুন যে হুসাইন (রা.)-কে ধিক্কার দিয়েছে এবং (লড়াই করতে) বাধ্য করেছে, অথচ হুসাইন (রা.) তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে সে যেন তাঁর পথ ছেড়ে দেয় যাতে তিনি ফিরে যেতে পারেন, কিন্তু সে তা করেনি। অথবা হুসাইন (রা.) নিজের হাত আমার হাতে তুলে দেবেন, অথবা কোনো ইসলামী সীমান্তে চলে যাবেন এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত (জিহাদে লিপ্ত) থাকবেন। কিন্তু ইবনে জিয়াদ তাও করেনি। সে অস্বীকার করেছে, তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে হত্যা করেছে। তাঁকে হত্যা করে সে মুসলমানদের কাছে আমাকে ঘৃণিত করে তুলেছে। মুসলমানদের অন্তরে আমার প্রতি শত্রুতার বীজ বপন করে দিয়েছে। নেককার হোক বা পাপাচারী, সবাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করেছে। কারণ হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত মানুষের কাছে অনেক বড় একটি ট্র্যাজেডি। ইবনে জিয়াদের সাথে আমার কী সম্পর্ক, আল্লাহ তার ওপর লানত বর্ষণ করুন, তার ওপর আল্লাহর গজব নাজিল হোক।” [১]

যাই হোক, ইয়াজিদের এই অনুশোচনা বৃথা ছিল। ইবনে জিয়াদ, উমর বিন সাদ এবং শিমার প্রমুখের বিরুদ্ধে কিছু করার তৌফিক তার হয়নি। তার এই ইচ্ছা মনের মধ্যেই রয়ে গেল এবং বাস্তবে এর কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। [২] তাই ইয়াজিদের আক্ষেপ ও অনুতাপ তার দামনের দাগ ধুতে পারেনি, বরং এরপর সে একের পর এক গুরুতর অপরাধ সংঘটিত করেছে। মদিনা মুনাওয়ারা এবং মক্কা মোয়াজ্জমার ওপর সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। এই রক্তক্ষয়ী অভিযানগুলোতে তার বাহিনী যা করেছে, তা তার দুর্নাম আরও বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

[১] তারিখ তাবারী: ৫/৫০৬, ইবনে জারীর এই সনদে বর্ণনা করেছেন, আবু জাফর বলেন এবং আমাকে আবু উবায়দাহ মা’মার বিন আল-মুসাম্মা বর্ণনা করেছেন: ইউনুস বিন হাবিব আল-জারমি তাকে বর্ণনা করেছেন।

[২] ইয়াজিদের অলসতা এমন ছিল যে, ভরা যৌবন সত্ত্বেও তার পুরো খেলাফতকালে সে রাজধানী দামেস্ক এবং তার গ্রাম ‘হাওয়ারিন’ থেকে বের হয়নি। কোনো হজ বা উমরার সফর করেনি, জিহাদও করেনি। জনগণের সাথে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজকীয় অতিথি এবং দরবারীদের ছাড়া আর কারো সাথে তার যোগাযোগ ছিল না। পুরোপুরি বিলাসপ্রিয় রাজাদের মতো এক নমুনা।

কারবালা ট্র্যাজেডি..... ইতিহাসের শিক্ষা

আমাদের আকিদা হলো যে, আল্লাহর সত্তা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় এবং সর্বশক্তিমান। প্রতিটি বিষয় তাঁর ফয়সালা ও তাকদির এবং লাওহে মাহফুয অনুযায়ী হয়ে থাকে। কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা বা ট্র্যাজেডি তাঁর নির্দেশ ছাড়া সংঘটিত হয় না এবং তাঁর প্রতিটি কাজে গভীর হিকমত বা প্রজ্ঞা নিহিত থাকে। হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ট্র্যাজেডি, যা হৃদয়কে ব্যথিত করে, সেখানেও তাকদির ও ফয়সালা এবং তাকভিনি হিকমতের ওপর ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। এই ঘটনার পেছনে কী কী রহস্য বা হিকমত ছিল? আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা তা পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারি না। তবে চিন্তা-ভাবনা করলে কিছু হিকমত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:

- আল্লাহ জানতেন যে, হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর পরিবার সম্পর্কে দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা তাঁদের অতিপ্রাকৃত সত্তা মনে করবে, তাঁদের গায়েবদান, হাজত-রাওয়া এবং মুশকিল-কুশা মনে করতে শুরু করবে। কারবালার ঘটনা সত্য সন্ধানীদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য একটি দলিল হয়ে থাকবে যে, হযরত হুসাইন (রা.) যদি গায়েবদান হতেন তবে তিনি কুফার দিকে যাত্রা করতেন না। যদি তিনি হাজত-রাওয়া এবং মুশকিল-কুশা হতেন তবে এভাবে মজলুম অবস্থায় শহীদ হতেন না, বরং তাঁর একটি ইশারাতেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।
- এই ঘটনা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার এক অদ্ভুত শিক্ষা দেয়। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো কঠিন বিপদ আসে, বারবার ব্যর্থতা ঘিরে ধরে, ঋণের বোঝা অসহনীয় হয়ে যায়, ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যায়, আপনজনরা নিহত হয়, অসুস্থতা লাচার করে দেয়, তবে ভাবা উচিত যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। যখন হুসাইন (রা.)-এর মতো উচ্চমর্যাদার মানুষকে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তখন আমরা তো নগণ্য।
- রাজনৈতিক বিষয় ও কার্যাবলীর অনেক দিক এবং ডজন ডজন সম্ভাবনা থাকে। মানুষ শরয়ী সীমার মধ্যে থাকলেও প্রশাসনিক ভুলের সম্ভাবনা থাকে। অগণিত মানুষের হকের জন্য মানুষকে জবাবদিহি করতে হয়। পদে পদে ভুল হওয়ার এবং আল্লাহর কাছে পাকড়াও হওয়ার আশঙ্কা থাকে। খুব কম শাসকই এমন আছেন যারা নিজেদের সুনাম রক্ষা করতে পারেন। দুর্নামের ভয় লেগেই থাকে। শাসক যদি সঠিক নিয়তে সঠিক পথে কাজও করেন, তবুও অনেক সময় জনগণ শাসকের কৌশল ও হিকমত বুঝতে পারে না এবং তাঁকে দোষারোপ করে। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, সাদাতগণ যেন সর্বদা সম্মানিত ও প্রিয় থাকেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সুনাম ও চিরস্থায়ী খ্যাতি বজায় থাকে। তাই খোদায়ী হিকমত এই ঘটনার মাধ্যমে উচ্চমর্যাদার সাদাতদের তৎকালীন রাজনীতি থেকে আলাদা করে দিয়েছে।
- আল্লাহ তাআলা সাদাতদের মাধ্যমে উম্মতের ইলমি ও আধ্যাত্মিক তরবিয়তের কাজ নিতে চেয়েছিলেন, তাই হযরত হুসাইন (রা.)-এর পর...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

বনু ফাতেমার কিছু বুজুর্গ বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনো আন্দোলনই সফল হতে পারেনি এবং ধীরে ধীরে এই ব্যক্তিবর্গ রাজনীতি থেকে সরে এসে পুরোপুরি ইলমি ও আধ্যাত্মিক খিদমতে মশগুল হয়ে যান, যা আল্লাহর তাকদিরি ফয়সালা ছিল।

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাণী:

এখানে আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি বাণী স্মরণ রাখার মতো:

“বনু হাশিমের মাধ্যমেই এই দ্বীনের সূচনা হয়েছিল এবং বনু হাশিমের শাসনের মাধ্যমেই এর সমাপ্তি ঘটবে। (যেমনটি হাদিসসমূহে মাহদির আত্মপ্রকাশকে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হিসেবে জানানো হয়েছে) সুতরাং যখন তোমরা দেখবে যে কোনো হাশেমী ক্ষমতায় আসীন হয়েছে, তখন বুঝবে যে সময়ের সমাপ্তি ঘনিয়ে এসেছে।” [১]

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কালিমায়ে হক এবং ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান:

অধিকাংশ সাহাবীর নিকট বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম পথ এটাই ছিল যে, কোনো রাজনৈতিক বিপ্লব আনার পরিবর্তে সত্য কথা বলার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা এবং মানুষকে হাদিসে নববীর আলোকে সত্য সম্পর্কে অবগত করা এবং জানানো যে এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা কী। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও সেই সকল সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি শামে বসবাস করতেন। নিজের মহল্লার মসজিদে হাদিসের দরস দিতেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় কালিমায়ে হক বুলন্দ করতে গিয়ে শাসকদের মন্দ কাজের সমালোচনাও করতেন। তিনি বলতেন:

“কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি হলো, মন্দ লোকদের উন্নতি দেওয়া হবে এবং নেককার লোকদের নিচু করে দেওয়া হবে।” [২]

ইয়াজিদের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর কড়া নজরদারি রাখা হতো এবং তাঁকে হাদিস শোনানোর ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের সিলসিলা জারি ছিল। একবার তিনি হাদিস শোনাচ্ছিলেন, এমন সময় ইয়াজিদের এক সৈন্য এসে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে গেল। আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসের ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন: “দেখো! সে এজন্যই এসেছে যাতে আমাকে রাসূলের হাদিস শোনানো থেকে বিরত রাখতে পারে।” [৩]

[১] তারিখ দামেশক: ১৩/২০৩ সহিহ সনদে; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৯৭। এখানে ক্ষমতা বলতে উম্মতের সাধারণ নেতৃত্ব এবং নিরঙ্কুশ খিলাফত বোঝানো হয়েছে যা পুরো মুসলিম বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে থাকে, অন্যথায় বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা অঞ্চলে বনু হাশিমের শাসন কায়েম ছিল। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফারাও হাশেমী ছিলেন। একইভাবে আফ্রিকার ইদ্রিসি রাষ্ট্রের সিংহাসন অলংকৃতকারীরাও ফাতেমি বংশোদ্ভূত হাশেমী ছিলেন। ইয়েমেনে গত শতাব্দী পর্যন্ত বনু হাশিমের শাসন কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান ছিল।

[২] সুনান আদ-দারেমি, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমি আস-সামারকান্দি মৃত্যু ২৫৫ হিজরি, হাদিস: ৩৯৩, তাবা দারুল মুগনি, মুহাক্কিক হুসাইন সালিম আসাদ বলেছেন: এর সনদ জাইয়িদ।

[৩] আবদুল্লাহ বিন আবি হুজাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে একজন শায়খ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি শামের একটি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করে বসলাম। এরপর একজন শায়খ আসলেন এবং একটি খুঁটির পাশে সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, তখন মানুষ তাঁর কাছে সমবেত হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা বলল: আবদুল্লাহ বিন আমর। এরপর ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার এক দূত এসে বলল, নিশ্চয়ই ইনি চান যে আপনারদের কেউ আপনার অবাধ্য হোক। অথচ আপনারদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন নফস থেকে যা তৃপ্ত হয় না, এমন অন্তর থেকে যা ভীত হয় না, এমন ইলম থেকে যা উপকারে আসে না এবং এমন দোয়া থেকে যা শোনা হয় না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১২৬৫, ৬৬১)

ইয়াজিদের আমলের অভিযানসমূহ

কারবালার ট্র্যাজেডি ইয়াজিদের আমলকে এমনভাবে কলঙ্কিত করেছে যে তার সময়ের অন্যান্য অভিযানগুলো আড়ালে চলে গেছে। যদিও এই সময়েও আফ্রিকা, খোরাসান এবং তুর্কিস্তানে অভিযানের ধারা অব্যাহত ছিল। এখানে কেন্দ্রীয় পদগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সব জেনারেলরাই ছিলেন যারা হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমল থেকে চলে আসছিলেন। তাদের মধ্যে মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রা.), জুনাদা বিন উমাইয়া (রা.), মুনজির বিন جارود (জারুদ), বুস্তান বিন সালামা, উকবা বিন নাফি, জুহাইর বিন কায়েস এবং আবুল মুহাজির দিনার (রা.) উল্লেখযোগ্য। অভ্যন্তরীণ অভিযানে সরকারি বাহিনী যে বাড়াবাড়ি করেছে তা নিজ নিজ স্থানে নিন্দনীয়, তবে বৈদেশিক ফ্রন্টগুলোতে কিছু পিছু হটার পাশাপাশি কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। নিচে এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইউরোপে আক্রমণ স্থগিত

আমির মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে ওসিয়ত করেছিলেন যে রোমানদের কণ্ঠরোধ করে রাখো [১]। কিন্তু ইয়াজিদ তার সামরিক কৌশলে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ স্থগিত করে দেয়। সে খলিফা হওয়ার পর তার প্রথম ভাষণে বলেছিল: “মুয়াবিয়া (রা.) তোমাদেরকে সামুদ্রিক অভিযানের জন্য পাঠাতেন, আমি পাঠাব না। তিনি শীতকালেও রোমের সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন রাখতেন, আমি শীতকালে কাউকে সেখানে মোতায়েন করব না।” [২]

আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে গ্রিসের রোডস দ্বীপে জুনাদা বিন উমাইয়া (রা.) মুজাহিদদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। এই দ্বীপটি ৫৩ হিজরিতে জয় করা হয়েছিল। মুসলমানরা এখানে একটি বিশাল দুর্গে অবস্থান করত। তারা সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে ইউরোপীয় নৌবাহিনীকে পর্যুদস্ত করত, তাদের চলাচল ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত থাকত এবং রসদপত্র ছিনিয়ে নিত। রোডসে বসবাসকারী মুসলমানরা বিশাল কৃষি জমি এবং ধন-সম্পত্তির মালিকও হয়ে গিয়েছিল। আমির মুয়াবিয়া (রা.) এই অবস্থানটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং এই মুজাহিদদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন; তাদের খাদ্য, পোশাক, অস্ত্র এবং নগদ অর্থসহ সবকিছু পাঠাতেন। [৩] আমির মুয়াবিয়া (রা.) তার শেষ দিনগুলোতে তাদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যেন তারা শীতকালও সেখানেই কাটায় এবং তার ব্যবস্থা করে নেয়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ আশা করেনি যে ফেব্রার সফর শুরু হবে।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩০

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৪৬০; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৪৩৭ মুসনাদে হাসান, ত. আর-রিসালাহ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৫৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কাব আল-আহবার (রা.)-এর সৎ ছেলে নাবীহ বিন আমির লঙ্করে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, শীতকাল আসার আগেই তারা ফিরে যাবে, কিন্তু কারো তাঁর কথার ওপর বিশ্বাস ছিল না। একদিন একটি নৌকা দ্বীপ থেকে এলো। ইয়াজিদের প্রতিনিধি এলো। সে জানাল যে, আমির মুয়াবিয়া (রা.) ইন্তেকাল করেছেন। প্রতিনিধি নতুন খলিফার বায়াত গ্রহণ করল এবং জানাল যে, খলিফা বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ফলে মুসলমানরা রোডস খালি করে ফিরে এল। [১]

ভূমধ্যসাগরে রোমানদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল সাইপ্রাস দ্বীপ, যা আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে রোডসের চেয়ে বড় ছিল। সেখানে মুসলমানদের ঘনবসতিও ছিল। এটি ৩৩ হিজরিতে হযরত উসমান (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জয় করেছিলেন। ইয়াজিদ খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই এই দ্বীপটিও খালি করে দিল। [২]

ঐতিহাসিকগণ রোডস ও সাইপ্রাস থেকে বাহিনী ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারেননি। সম্ভাব্য দুটি কারণ হতে পারে:

- ইয়াজিদের খেলাফত বিতর্কিত ছিল, মানুষ মন থেকে সন্তুষ্ট ছিল না, ইরাক ও হিজাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, এমতাবস্থায় শক্তি ছাড়া খেলাফত টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই অভ্যন্তরীণ এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত বাহিনীর প্রয়োজন ছিল যাতে বিরোধীদের দমন করা যায়।
- ইয়াজিদ বাহিনীর কষ্ট কমিয়ে অফিসার ও সৈন্যদের মন জয় করতে চেয়েছিল।

আফ্রিকায় উকবা বিন নাফে-র বিজয়সমূহ:

ইয়াজিদের আমলে প্রখ্যাত তাবেয়ি উকবা বিন নাফে (রা.) আফ্রিকায় নিযুক্ত ছিলেন। আফ্রিকান গোত্রগুলো ছিল অত্যন্ত অবাধ্য ও প্রতারক। তারা বারবার বিদ্রোহ করত। আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে উকবা বিন নাফে (রা.) আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা জয় করেছিলেন। মিশর ও আফ্রিকা সেই সময় একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতো। আফ্রিকায় অভিযানের কেন্দ্র ছিল মিশর, যেখানে আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রা.) গভর্নর ছিলেন এবং উকবা বিন নাফে (রা.) তাঁর অধীনে জিহাদ করছিলেন।

৫৫ হিজরিতে আমির মুয়াবিয়া (রা.) মিশরে মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ (রা.)-এর স্থলে মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রা.)-কে নিযুক্ত করেন, যাঁর ওপর তিনি তাঁর মুক্ত করা গোলাম আবু আল-মুহাজির দিনারের চেয়ে বেশি আস্থা রাখতেন। তাই উকবা বিন নাফে (রা.)-এর পরিবর্তে আফ্রিকার রণাঙ্গন আবু আল-মুহাজির (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করা হলো। উকবা বিন নাফে (রা.), যিনি আরও সামনে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, এই নির্দেশের ফলে রণাঙ্গন থেকে ফিরে এলেন।

আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আফ্রিকার অঞ্চল আবু আল-মুহাজির (রা.)-এর অধীনেই ছিল। এই সময়ে বারবার গোত্রগুলোর বিদ্রোহের কারণে অনেক বিজিত এলাকা হাতছাড়া হয়ে যায়। যখন ইয়াজিদ শাসনভার গ্রহণ করল, তখন উকবা বিন নাফে (রা.)-এর পূর্বের...

[১] আল-মারিফাত ওয়াত তারিখ: ৩/৩২৪, ত. আর-রিসালাহ

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৫৩, ত. আল-হিলাল

রোডস ও সাইপ্রাস থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থান ছিল। সাইপ্রাসবাসীদের সাথে মুয়াবিয়া (রা.)-এর একটি শান্তি চুক্তি ছিল, কিন্তু মুসলমানরা সেখান থেকে চলে আসার সাথে সাথেই গ্রিকরা তা দখল করে নেয়। এরপর এক হাজার বছর ধরে বিভিন্ন মুসলিম শাসক তা দখলের চেষ্টা করেছেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে উসমানীয় তুর্কিরা তা জয় করেছিল কিন্তু দুই শতাব্দী পর গ্রিকরা তা পুনরায় হিনিয়ে নেয়। যদি ইয়াজিদ তার পিতার নীতি অনুযায়ী এখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করত, তবে এই অঞ্চলটি মুসলিমদের দখলেই থাকত এবং ইউরোপ বিজয়ের জন্য এটি একটি “বেস” বা ঘাঁটি হিসেবে কাজ করত, যা মুসলমানদের জন্য সহজ হতো।

৬২ হিজরিতে তাকে সরাসরি আফ্রিকার ওয়ালী নিযুক্ত করা হয় এবং আরও বিজয়ের অনুমতি দিয়ে পাঠানো হয়। যখন তিনি ইয়াজিদের পক্ষ থেকে আফ্রিকার পুনর্নিয়োগের আদেশপত্র নিয়ে রওনা হলেন এবং মিশরে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি বললেন: “আশা করি আপনি এমন এক সেনাবাহিনীতে আছেন যার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।” [১]

উকবা বিন নাফে (রা.) উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের কেন্দ্র কায়রোয়ানকে, যা অবহেলার কারণে বিরান হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় আবাদ করলেন। এর চারপাশে চক্র দিয়ে দুআ করলেন: “হে আল্লাহ! একে ইবাদতকারী ও আনুগত্যশীলদের নিদর্শনে পরিপূর্ণ করে দিন এবং একে আপনার দ্বীনের সম্মান ও কাফেরদের অপমানের মাধ্যমে বানান।”

তারপর সেনাবাহিনীর একটি অংশ এখানে মোতায়েন করে জুহাইর বিন কায়েসকে দায়িত্বশীল বানালেন এবং সন্তানদের একত্রিত করে বললেন: “আমি আমার প্রাণ আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, আমি শপথ করেছি যে এখন মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করতে থাকব। জানি না এখন আর দেখা হবে কি না।” [২] এই সংকল্প এ কারণে ছিল যে বারবারদের অবাধ্যতা শেষ হচ্ছিল না।

উকবা বিন নাফে (রা.) সন্তানদের শেষ ওসিয়ত হিসেবে বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস কেবল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে গ্রহণ করবে। ঋণ নিও না, যদিও জীর্ণ পোশাক পরতে হয়। এমন কিছু লেখায় মগ্ন হয়ো না যা তোমাকে কুরআন মাজীদ থেকে গাফেল করে দেয়।” [৩]

উকবা বিন নাফে (রা.) প্রথমে ‘কাস লিমিস’ তারপর ‘কুহ’ এবং এর পরে ‘বাগানাহ’ শহর জয় করলেন। তারপর ‘বিলাদুল জেরিড’ এলাকা দখল করে ‘জাব’ থেকে ‘বাগায়া’ পর্যন্ত এবং শত্রুদের পরাজিত করে ‘তাহেরত’ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, যেখানে রোমান ও আফ্রিকান বারবারদের এক বিশাল বাহিনী একত্রিত হয়েছিল। এখানে মুজাহিদ্দীন-ই-ইসলাম এবং কাফেরদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা শুরুতে পরাজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য শামিল হলো, মুসলমানরা বিজয়ী হলো এবং প্রচুর গণীমত হস্তগত হলো। এই অভিযানের সময় ‘গুমারা’র খ্রিস্টান শাসক সন্ধি করে নিল।

উকবা বিন নাফে (রা.) এখান থেকে মরক্কোর বিখ্যাত শহর তানজারে পৌঁছালেন যা ভূমধ্যসাগরের তীরে উত্তর আফ্রিকার শেষ শহর এবং স্থানীয় রাজা ইলিয়ানের রাজধানী ছিল। মরক্কোর সমস্ত শাসক তাকে কর দিত। উকবা বিন নাফে (রা.) অবরোধের পর সন্ধির মাধ্যমে এখানে দখল করে নিলেন। ইলিয়ান তাকে মূল্যবান উপহার প্রদান করল।

উকবা বিন নাফে (রা.) এখন প্রণালী পার হয়ে আন্দালুসে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন এবং ‘জাজিরাতুল খাদরা’ আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু ইলিয়ান বলল: “আপনার পেছনে বারবার এবং অন্যান্য শত্রুরা রয়েছে, সমুদ্র পার হয়ে ফ্রাঙ্কদের সাথে যুদ্ধ করা সমীচীন নয়, এতে সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।”

উকবা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “এখানে আর কোন কাফের গোত্র আছে?” ইলিয়ান বলল: “সুস এলাকায় শক্তিশালী গোত্রসমূহ রয়েছে যাদের কোনো দ্বীন নেই। তারা পশুর মতো। তাদের আকিদা-বিশ্বাস অগ্নিপূজকদের মতো। তারা আল্লাহকে মানে না।”

[১] মুখতাসার তারিখ দিমাশক, ৭/১২১, ১২২। সম্ভবত এই বাক্যে আপনার শাহাদাতের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ১/২৭।

[৩] মুখতাসার তারিখ দিমাশক, ৫/১১১।

উকবা বিন নাফে রহ. এটি শুনে ফিরে এলেন। সুস অঞ্চলটি অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। এখানে জুরহন পাহাড়ের কাছে দুটি নদী: “সেবু” এবং “ওরঘা”-এর মাঝখানে মরক্কোর সবচেয়ে বড় শহর “ওয়ালিলি” ছিল, যাকে আজ “কাসরে ফেরাউন” বলা হয়। উকবা বিন নাফে রহ. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এটিও জয় করে নিলেন। এরপর “দারা” এবং “সুস”-এর দিকে অভিযান চালান যেখানে বারবারদের প্রচণ্ড শক্তির মোকাবিলা করতে হয়। ভয়াবহ যুদ্ধ এবং প্রাণপণ লড়াইয়ের পর উকবা বিন নাফে রহ. তাদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবনের সময় তাদের লাশের স্তুপ করতে করতে এগিয়ে চললেন এবং বাড়তে বাড়তে লমতুনা মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পথে আসা প্রতিরোধের প্রতিটি দেয়াল ভেঙে পড়তে থাকল। উকবা রহ. আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত “আসফি” (মালিয়ান)-এ আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে পৌঁছে গেলেন যেখানে সমুদ্রের অবাধ্য ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছিল। উকবা বিন নাফে রহ. ঘোড়াকে তাড়া দিয়ে নিজের জানবাজদের নিয়ে পানিতে নেমে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সাথীদের বললেন: “দোয়ার জন্য হাত তোলো।” সবাই হাত তুললে এই মুস্তাজাবুদ দাওয়াত মুজাহিদ আবেগঘন কণ্ঠে বললেন:

“হে ইলাহি! যদি এই সমুদ্র বাধা না হতো তবে যেখানে পর্যন্ত জমি পাওয়া যেত সেখানে পর্যন্ত জিহাদ করে যেতাম। হে আল্লাহ! তুমি জানো আমরা কোনো অহংকার ও অবাধ্যতার কারণে এখানে আসিনি। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই বের হয়েছি যা তোমার বান্দা জুলকারনাইনের কাম্য ছিল যে, কেবল তোমারই ইবাদত করা হবে এবং তোমার সাথে কাউকে শরিক করা হবে না। হে আল্লাহ! আমরা কুফরের বিরোধী এবং ইসলামের রক্ষক। সুতরাং তুমি আমাদের সাহায্যকারী হও, আমাদের বিপক্ষে যেও না।”

এই দোয়া করতে করতে উকবা বিন নাফে রহ. ফিরে এলেন। সম্ভবত এই দৃশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন:

মরু তো মরু, নদীও আমরা ছাড়িনি

অন্ধকার সমুদ্রেও আমরা ঘোড়া ছুটিয়েছি

ফেরার পথে উকবা এক বিশাল মরুভূমি অতিক্রম করছিলেন, মুসলমানরা পানির তীব্র সংকটে পড়েছিলেন। অবস্থা এমন ছিল যে পুরো বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। উকবা বিন নাফে রহ. দুই রাকাত Salat আদায় করে আল্লাহর কাছে পানি পাওয়ার দোয়া করলেন। হঠাৎ তার ঘোড়া এক জায়গায় গিয়ে নিজের খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। দেখতে দেখতে সেখান থেকে মিষ্টি পানির একটি ঝরনা ফুটে বের হলো। উকবা রহ. ডেকে সবাইকে একত্রিত করলেন, মুজাহিদরা পানি পান করলেন এবং মশকগুলো ভরে নিলেন। এই জায়গাটি আজও “মাউল ফারাস” (ঘোড়ার ঝরনা) নামে পরিচিত। [২]

যেহেতু এখন মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা বিজিত হয়ে গিয়েছিল, তাই আপাতদৃষ্টিতে বিপদের কোনো কারণ ছিল না। এজন্য কায়রোয়ান থেকে আট মঞ্জিল দূরে “তাহনা” পর্যন্ত এসে উকবা বিন নাফে রহ. বাহিনীকে সামনে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে অল্প কিছু সৈন্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে পেছনে রয়ে গেলেন। এই সময়ে কুসাইলা নামক এক খ্রিস্টান সরদার, যে উকবা বিন নাফে রহ.-এর সাথে অনুগত হয়ে চলছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং স্থানীয় লোকদের সাথে নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে বসল। বেঁচে ফেরার কোনো উপায় ছিল না। উকবা বিন নাফে রহ. ...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, পৃ. ২১৩; আল-ইসতিকসা লি আখবার দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা: ৩৮/১

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬২/৪; আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ পৃ. ৫৯

...এর সাথে আবু মুহাজির বিন দিনার বন্দী অবস্থায় আসছিলেন। যেহেতু উকবা তাঁর পূর্ববর্তী কাজের কারণে তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে উকবা তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন: “আপনি এখান থেকে চলে যান এবং মুসলমানদের কাছে (কায়রোয়ান) গিয়ে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আমি শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করব।” আবু মুহাজির বিন দিনার বললেন: “আমিও শাহাদাত কামনা করি।”

দুজনেই তলোয়ার কোষমুক্ত করে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে লড়াই করতে করতে দুজনেই শাহাদাতের সুখা পান করলেন। তাঁদের সাথে শহীদ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় তিনশ জন উচ্চমর্যাদার তাবিঈ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১]

দুই সাহাবী মুহাম্মদ বিন আউস আল-আনসারী এবং ইয়াজিদ বিন খালাফ আল-আবসী (রা.) এবং আরও কয়েকজন বন্দী হলেন। মুসলমানরা পরে মুক্তিপণ দিয়ে তাঁদের মুক্ত করে আনেন। এই সমস্ত ঘটনা ৬২ হিজরী অথবা ৬৩ হিজরীর। [২]

আফ্রিকায় বিদ্রোহ:

৬৩ হিজরীর শেষের দিকে একদিকে যখন ইয়াজিদের সেনাপতি মুসলিম বিন উকবা মদীনার দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন অন্যদিকে আফ্রিকায় পুনরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। উকবা বিন নারফিকে শহীদকারী খ্রিস্টান নেতা কুসাইলা বারবার গোত্রগুলোকে একত্রিত করে অনেকগুলো ইসলামী বিজিত অঞ্চল ছিনিয়ে নেয় এবং অগ্রসর হয়ে কায়রোয়ান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমীর জুহাইর বিন কাইস প্রতিরোধ করতে না পেরে শহর খালি করে ‘বারকা’ চলে যান। এভাবে মহররম ৬৪ হিজরীতে কায়রোয়ান খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। [৩]

খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার অভিযানসমূহ:

পূর্ব সীমান্তগুলোতেও সামরিক অভিযান অব্যাহত ছিল। নিয়ম ছিল যে, গ্রীষ্মকালে ইসলামী বাহিনী আমু দরিয়ান নদী পার হয়ে অভিযানে যেত এবং শীতকালে ফিরে এসে ‘মার্ভ’-এ অবস্থান করত। এই সময়ে খাওয়ারিজমের একটি পার্শ্ববর্তী শহরে স্থানীয় নেতারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো।

তাদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য ৬২ হিজরীতে মুসলিম বিন যিয়াদ, যাকে ইয়াজিদ ৬১ হিজরীতে খোরাসান ও সিজিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, শীতকালে আরবের বাছাইকৃত জেনারেলদের সাথে নিয়ে অভিযান চালান। ছয় হাজার সৈন্যের এই বাহিনীতে ইমরান বিন ফুদাইল, মুহাম্মাব বিন আবি সুফরা, আবদুল্লাহ বিন খাযিম, তালহা বিন আবদুল্লাহ আল-খুযাই, সীলা বিন আশয়াম, হানযালা বিন আরাদা এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়ামারের মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইসলামী বাহিনী সেই শহরটি অবরোধ করে যেখানে স্থানীয় ষড়যন্ত্রকারী নেতারা একত্রিত হয়েছিল। তারা ভীত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে এবং ৫০ লক্ষ দিরহাম প্রদান করে প্রাণ ভিক্ষা পায়। এরপর মুসলিম বিন যিয়াদ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেওয়ার জন্য সমরকন্দের ওপর আক্রমণ করেন। স্থানীয় লোকজন এখানেও সন্ধি করে নেয়। মুসলিম একটি বাহিনী খুজান্দের দিকে প্রেরণ করেন যা শত্রুদের পরাজিত করে। মুসলিম বিন যিয়াদ তাঁর ভাই ইয়াজিদ বিন যিয়াদকে পশ্চিম ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের গভর্নর বানিয়েছিলেন। ৬২ হিজরীতে কাবুলের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে এবং আবু উবাইদা বিন যিয়াদকে বন্দী করে। এই খবর পাওয়া মাত্রই ইয়াজিদ বিন যিয়াদ বাহিনী নিয়ে কাবুল পৌঁছান কিন্তু সেখানে পরাজিত হন।

[১] আল-ইসতিকসা লি-আখবার দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা: ১/১৩৫-১৩৬; আল-কামিল ফিত তারিখ, পৃ. ৬২৮

[২] আল-ইসতিকসা লি-আখবার দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা: ১/১৩৬

[৩] আল-ইসতিকসা লি-আখবার দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা: ১/১৪০

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলমানরা বিপুল সংখ্যায় শহীদ হন, যাদের মধ্যে স্বয়ং ইয়াজিদ বিন জিয়াদ, আমর বিন তাহিয়াহ, হুদাইল বিন নুআইম, উসমান বিন আদম, ইয়াজিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি মালিকা এবং সিলাহ বিন আশইয়ামও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন এই ঘটনার সংবাদ মুসলিম বিন জিয়াদ পেলেন, তখন তিনি তালহা বিন আব্দুল্লাহর কাছে (যিনি তালহাতুত তালাহাত উপাধিতে পরিচিত ছিলেন) সংবাদ পাঠালেন। তিনি পাঁচ লক্ষ দিরহাম দিয়ে আবু উবাইদা বিন জিয়াদকে মুক্ত করে আনলেন। [১]

৬২ হিজরিতে আব্দুল্লাহ বিন আসাদ বিন কুরজ কায়সারিয়ার দিকে জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই বছরের গ্রীষ্মকালীন জিহাদে হসাইন বিন নুমাইর সিরিয়ার ওপর আক্রমণ করেন। এই বছর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ মুনজির বিন জারুদকে কান্দাবিল রণাঙ্গনে নিযুক্ত করেন। মুনজির এই অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন, তার পুত্র অভিযান অব্যাহত রাখেন এবং কান্দাবিল দখল করেন। উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ এরপর বানান বিন সালামাহকে কুমুকান অভিযানে প্রেরণ করেন। কিছুকাল পর ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এই রণাঙ্গনে আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ আল-হিলালিকে নিযুক্ত করেন। [২]

সামগ্রিকভাবে ইয়াজিদের খিলাফতকালে সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস পেয়েছিল, কারণ রোডস এবং সাইপ্রাস তারা নিজেরাই খালি করে দিয়েছিল, অন্যদিকে উকবা বিন নাফি যে অঞ্চলগুলো জয় করেছিলেন, ইয়াজিদের শেষ দিনগুলোতে শত্রুরা সেগুলো পুনরায় দখল করে নিয়েছিল।

একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়:

কিছু লোকের মতে, এই অভিযানগুলোর কৃতিত্ব ইয়াজিদের প্রাপ্য নয়, কারণ এই অভিযানগুলো উকবা বিন নাফির মতো সাহসী ও দক্ষ সেনাপতিদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ছিল; কিন্তু আমরা এর সাথে একমত নই। যাই হোক না কেন, কেন্দ্র থেকেই নির্দেশনা ও ব্যয়ভার গ্রহণ করা হতো এবং সেনাপতিদের নিয়োগ ও অভিযানের অনুমোদন খলিফার পক্ষ থেকেই হতো, তাই এই অভিযানগুলোতে ইয়াজিদের অবশ্যই অংশ রয়েছে। তবে এই বাস্তবতার অন্য দিকটি হলো, কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর থেকে ওয়াকআয়ে হাররা পর্যন্ত দেশে সেনাবাহিনীর হাতে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে এ কথা বলাও ভুল হবে যে এগুলো সেনাপতিদের ব্যক্তিগত অপকর্ম ছিল এবং এতে ইয়াজিদের কোনো দায় নেই। যদি জিহাদ, অভিযান ও বিজয়ের কৃতিত্ব কেবল সেনাপতিদের দেওয়া হয় এবং সরকারপ্রধানকে এর সাথে সম্পর্কহীন মনে করা হয়, তবে তা যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং, সেই একই সেনাবাহিনীর হাতে সংঘটিত জুলুম-অত্যাচার থেকে শাসককে কীভাবে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত বলা যেতে পারে?

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ:

ইয়াজিদের হিসাব-নিকাশ ও নির্মাণকাজে আগ্রহ ছিল। সে কিছু উন্নয়নমূলক কাজও করিয়েছিল। জাবালে কাসিউনের উপত্যকায় একটি ছোট খাল ছিল, যা দিয়ে কিছু জমি সেচ করা হতো। ইয়াজিদ একে প্রশস্ত করে সাড়ে চার ফুট চওড়া এবং সাড়ে চার ফুট গভীর করিয়েছিল, যার ফলে ঘোটার এক বিশাল এলাকা চাষযোগ্য হয়ে ওঠে। এই খালটি ‘নহরে ইয়াজিদ’ নামে পরিচিতি লাভ করে। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ২১ হিজরি; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ২৩৯।

[২] তারিখ খলিফা, পৃষ্ঠা ২৩৫, ২৩৬; আল-কামিল ফিত তারিখ, পৃষ্ঠা ২১১।

[৩] তারিখ দিমাশক, ২/৩৬৯; আল-আলাকুল খাতিরা ফি জিকর উমরা আশ-শাম ওয়াল জাজিরা লি-ইবনে শাদাদ, আল-কিসমুস সানি, আল-বাবুল আউয়াল। দ্রষ্টব্য: বলা হয় যে, ইয়াজিদই সর্বপ্রথম কাবাকে রেশমি গিলাফ পরিয়েছিলেন। (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৫৯)। তবে ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী কাবাকে সর্বপ্রথম রেশমি গিলাফ পরিয়েছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনি এটি নিজের সনদে বর্ণনা করেছেন। (মুসাম্মাফে আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯০৮)। একইভাবে হাফেজ জাহাবি লিখেছেন যে, হিশাম বিন আব্দুল মালিক প্রথম ব্যক্তি যিনি কাবার ওপর রেশমি গিলাফ চড়িয়েছিলেন। (তারিখুল ইসলাম, ৫/৩৩৩)। তবে সঠিক ও অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো, এই কীর্তি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর। (আখবারু মক্কা লিল-আযরাকি: ১/২৫৩)। এই আলোচনাটি রেশমি গিলাফ পরানো সংক্রান্ত, নতুবা গিলাফ পরানোর প্রথা জাহিলিয়াত আমলেও ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদিনও এই প্রথা অনুসরণ করেছেন। (আখবারু মক্কা লিল-আযরাকি: ১/২৫৩)।

মদিনাবাসীদের ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

কারবালা ট্র্যাজেডির পর ইসলামি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতার ঢেউ হিজাজে সবচেয়ে বেশি ছিল, যেখানে একদিকে মক্কা মুকাররমায় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মতো অভিজ্ঞ নেতা এখন পর্যন্ত ইয়াজিদের আনুগত্য (বাইয়াত) থেকে দূরে ছিলেন এবং অন্যদিকে মদিনাবাসী যারা রাসূলের পরিবারের প্রেমিক ছিলেন, তারা এই দুর্ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই লোকেরা শুরু থেকেই ইয়াজিদের খেলাফতকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি এবং এখন কারবালার ঘটনা তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

যদিও ইয়াজিদ কারবালার ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া সাদাতদের (সৈয়দদের) সাথে ভালো ব্যবহার করেছিল এবং বিশেষ করে হযরত হুসাইন (রা.)-এর পুত্র আলী বিন হুসাইন জয়নুল আবেদিন (রহ.)-কে অনেক সম্মান করেছিল, কিন্তু মদিনাবাসী হুসাইনের হত্যাকারীদের ব্যাপারে ইয়াজিদের নীরবতা দেখে এটা বুঝতে বাধ্য হয়েছিল যে শাসক এই জুলুমের পৃষ্ঠপোষক। এই কারণেই মদিনাবাসী রাসূলের পরিবারের ব্যাপারে শাসকদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা বোধ করত, তাই মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) আলী বিন হুসাইন (রা.)-কে বলেছিলেন:

“আপনার যদি আমার কোনো কাজে প্রয়োজন হয় তবে বলবেন।” তিনি বললেন: “এমন কোনো প্রয়োজন নেই।”

মিসওয়ার (রা.) বললেন: “আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তলোয়ারটি আমাকে (আমানত হিসেবে) দিন। আমার ভয় হচ্ছে যে এই (শাসক) লোকেরা এটি আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। আপনি আমাকে এটি দিয়ে দিন, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ কেউ এই তলোয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।” [১]

মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধি দল ইয়াজিদের কাছে:

৬১ হিজরির মহররম মাসে কারবালার ট্র্যাজেডি ঘটে। সাদাতদের কাফেলা ইয়াজিদের কাছে পৌঁছায়। সে তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়। এরপর ৬১ হিজরির বাকি দিনগুলো এবং ৬২ হিজরির পুরো বছর শান্তিতে কেটেছে। এই সময়ে কোথাও কোনো বিদ্রোহ ছিল না। আফ্রিকা, খোরাসান এবং বেলুচিস্তানের ফ্রন্টগুলোতে উমাইয়া জেনারেলদের অভিযান অব্যাহত ছিল। ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কিছু গভর্নর বদলিও করা হয়েছিল এবং মক্কায় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে সাথে নেওয়ার বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও করা হয়েছিল। [২]

এর পাশাপাশি ইয়াজিদ কারবালার ঘটনার ফলে তার ক্ষতিগ্রস্ত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিল। এই কারণেই সে হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রহ.)-কে, যিনি রাজনৈতিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন, সিরিয়া আসার আমন্ত্রণ জানায়। তার পুত্র আবদুল্লাহর আশঙ্কা ছিল যে ইয়াজিদ তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, তাই তিনি তাদের যেতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু তারা চলে যান। ইয়াজিদ তাদের সম্মান ও আপ্যায়ন করে, তাদের প্রভাবিত করার জন্য কখনো তাদের কাছে ফিকহ এবং কখনো কুরআনের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে থাকে। [৩]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৪২, ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব ফাযায়িলে ফাতিমা (রা.)।

[২] বিস্তারিত সামনে আসবে।

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৩/৪৭৭, ৪৭৮, ত: দারুল ফিকর।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কারবালা ট্র্যাজেডির প্রায় দুই বছর পর ৬৩ হিজরীর শুরুতে ইয়াজিদ মদীনার গভর্নর উসমান বিন মুহাম্মদকে নির্দেশ দেন যেন তিনি মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দল সিরিয়ায় পাঠান। [১] নির্দেশ পালিত হলো এবং মদীনার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সিরিয়া পৌঁছে ইয়াজিদের মেহমান হলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন জাফর, আবদুল্লাহ বিন হানজালা, মা'কাল বিন সিনান, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, মুনজির বিন জুবায়ের (ইবনে আওয়াম), আব্বাস বিন সাহল (বিন সাদ) এবং নুমান বিন আতা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ইয়াজিদ দশ দিন পর্যন্ত তাদের সাথে দেখা করেননি। যখন সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি দেখা করতে দেরি করার জন্য ওজর পেশ করে নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন:

“পায়ে অনবরত ব্যথা হচ্ছে। মাছিও যদি বসে তবে পাহাড়ের মতো ভারী মনে হয়।” [২] এরপর ইয়াজিদ এই ব্যক্তিদের অত্যন্ত খাতির-যত্ন করলেন এবং উপটোকন ও হাদিয়া দিয়ে বিদায় করলেন। [৩]

ইয়াজিদ আবদুল্লাহ বিন হানজালার খেদমতে এক লক্ষ দিরহাম পেশ করলেন। তার আট ছেলের প্রত্যেককে দশ হাজার দিরহাম করে উপটোকন দিলেন। [৪] মুনজির বিন জুবায়ের ইবনে আওয়ামকে এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া পেশ করলেন। [৫] প্রতিনিধি দলের বাকি সদস্যদেরও তিনি হাদিয়া দিলেন, যা ইয়াজিদ তৎক্ষণাৎ প্রদান করেছিলেন। [৬]

এই সম্মান ও সমাদর সত্ত্বেও সিরিয়া সফর থেকে ফেরার পর মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইয়াজিদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসলেন এবং ফিরে এসেই ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের (খুরুজ) ঘোষণা দিলেন। এই ব্যক্তিরা সিরিয়া থেকে এই তথ্য নিয়ে ফিরেছিলেন যে, ইয়াজিদ নামাজ ত্যাগ করেন এবং মদ্যপানের মতো কিছু কবির গুনাহে লিপ্ত রয়েছেন। [৭]

এই ব্যক্তিদের এই অবস্থান যেসব বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেগুলো সনদগতভাবে দুর্বল হতে পারে, তবে এটি সত্য যে সহীহ বর্ণনা এবং নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরায় (তাওয়াতুর) এটি প্রমাণিত যে, এই ব্যক্তিরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তার শাসন ক্ষমতা উৎখাত করার জন্য নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিলেন। এ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, বিদ্রোহকারী সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট ইয়াজিদ কিছু কবির গুনাহে লিপ্ত ছিলেন তা নিশ্চিত ছিল। [৮]

মদীনাবাসী কেন বিদ্রোহ করলেন এবং উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এতে কেন শরিক হলো না?

মদীনার সেই সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট একজন ফাসিকের শাসন মেনে নেওয়া জায়েজ ছিল না, বরং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম জরুরি ছিল। তাদের সামনে নবী করীম (সা.)-এর এই নির্দেশ ছিল: “মুন রআ মিনকুম মুনকারান ফালইউগাইয়িরহু বিয়াদিহি।”

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো অন্যায় (গুনাহ) দেখে, তবে সে যেন তা নিজের হাত (শক্তি) দিয়ে প্রতিহত করে।” [৯]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৬

[২] তারিখ দামেশক: ২৫৯/২৬

[৩] তারিখ খলিফা, পৃ. ২৩৬, ২৩৭

[৪] আনসাবুল আশরাফ ২৩০/৫; তারিখ তাবারী: ৩৮০/৫

[৫] তারিখ দামেশক: ২৫৯/২২

[৬] দালায়েলুন নুবুওয়াহ: ৩৭৩/৬; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৭; তারিখ তাবারী: ৩৮০/৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫৩/১১

[৭] ইয়াজিদের প্রতি সুধারণা পোষণকারীদের ধারণা হলো যে, মদীনার প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা বনু উমাইয়ার বিরোধী গোষ্ঠীর প্রোপাগান্ডার শিকার হয়েছিলেন। তবে এটি স্পষ্ট যে, ইয়াজিদের সমসাময়িক সাহাবী ও তাবেয়ীদের একটি বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ জামাতের সুনিশ্চিত বিশ্বাসের ওপর কয়েক শতাব্দী পরের লোকদের নিজেদের ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

[৮] সহীহ মুসলিম, হা: ১৮৬, কিতাবুল ঈমান, বাব: অন্যায় কাজে বাধা প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; মুসনাদে আবি ইয়লা হা: ১০০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ হা: ৪০১৩

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) এই অভিযোগগুলোকে বিশ্বাস করেননি; কারণ তিনি সিরিয়ায় গিয়ে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তখন তিনি ইয়াজিদের মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখেননি। তাই যখন আবদুল্লাহ বিন মুতী (রা.) তাকে বললেন: “ইয়াজিদ মদ পান করে এবং সালাত ত্যাগ করে।” তখন মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া উত্তর দিলেন: “আমি তার মধ্যে এসব দেখিনি। আমি তার কাছে ছিলাম এবং তাকে সালাতের পাবন্দ, নেক কাজের অনুরাগী এবং শরয়ী মাসআলা অন্ত্রেষণকারী হিসেবে পেয়েছি।” [১]

তবে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.)-এর এই সাফাই মদিনার অধিকাংশ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

অন্যদিকে এটিও একটি বাস্তবতা যে, সাহাবী ও তাবিসীদের একটি বড় অংশ ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। স্পষ্টতই এর কারণ কোনো লোভ, ভয় বা চাপ ছিল না। যারা কায়সার ও কিসরার সামনে মাথা নত করেননি, তারা ইয়াজিদকে কেন ভয় পাবেন? তাদের নীরব থাকার কারণ ছিল নবী করীম (সা.)-এর সেই নির্দেশনাবলী যাতে শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা নেককার ও সৎ হোক কিংবা ফাসেক ও জালেম। [২]

[১] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবী ৩/৩১৫, মাদায়িনী সূত্রে সাখর বিন জুওয়াইরিয়া থেকে নাফে'র বর্ণনা; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/২৩৩। তবে সনদটি ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা)-এর কারণে যযীফ।

[২] সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এই হাদীসগুলো সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, তাই তাদের অধিকাংশ প্রতিটি যুগে বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকতেন। দুটি হাদীস হলো:

আউফ বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তোমাদের সর্বোত্তম শাসক তারা যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারা তোমাদের ভালোবাসে, তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে এবং তোমরা তাদের জন্য দোয়া করো। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসক তারা যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারা তোমাদের ঘৃণা করে, তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারা তোমাদের অভিশাপ দেয়।” আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তলোয়ার দিয়ে তাদের মোকাবিলা করব না? তিনি বললেন: “না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে।” (সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারাহ; মুসনাদ আহমাদ ৬: ২৩৯৮১)।

আউফ বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ হলো তোমাদের সর্বোত্তম শাসক তারা যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারা তোমাদের ভালোবাসে... আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসক তারা যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারা তোমাদের ঘৃণা করে। আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তলোয়ার দিয়ে তাদের মোকাবিলা করব না? তিনি বললেন: না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে। যখন তোমরা তোমাদের শাসকদের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন তাদের কাজকে ঘৃণা করো কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিও না।

উবাদাহ বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত: “রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ডাকলেন এবং আমরা তাঁর কাছে এই মর্মে বায়আত হলাম যে, আমরা কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, সুখে ও দুঃখে শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব এবং আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হলেও আমরা যেন শাসকদের সাথে ক্ষমতার প্রশ্নে বিবাদ না করি, যতক্ষণ না তোমরা তাদের মধ্যে প্রকাশ্য কুফর (কুফরে বুওয়াহ) দেখতে পাও যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে।” (সহীহ বুখারী: কিতাবুল ফিতান; সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারাহ)।

উবাদাহ বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ডাকলেন এবং আমরা তাঁর কাছে বায়আত হলাম। যে বিষয়ে তিনি আমাদের থেকে বায়আত নিয়েছিলেন তা হলো আমরা কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, সুখে ও দুঃখে এবং আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব এবং আমরা যেন শাসকদের সাথে ক্ষমতার প্রশ্নে বিবাদ না করি। তিনি বললেন: তবে যদি তোমরা তাদের মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাও যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে।

আল্লামা শাওকানী (রহ.) “কুফরে বুওয়াহ”-এর ব্যাখ্যায় বলেন:

“এর অর্থ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শাসকদের কাজে কোনো কুফরের সম্ভাবনা না থাকে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ নয়।” (নাইলুল আওতার ৭/২০৭, দারুল হাদীস)।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.) “কুফরে বুওয়াহ”-এর ব্যাখ্যায় বলেন:

“যাতে কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, যেমন কেউ আল্লাহকে তিনের এক বলা ইত্যাদি।” (শারহুল আরবাসীন আন-নববীয়াহ, পৃষ্ঠা ১২২)।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন: “যদি গুনাহ ও জুলুমের লিপ্ত হওয়া ছাড়া জালেম শাসককে অপসারণ করা সম্ভব হয় তবে তা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব।” আর কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, জালেম শাসককে অপসারণ করা জায়েজ নয়। তবে যদি সে কুফরে লিপ্ত হয় তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৮)।

জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসক সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন: “জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং তার সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য করা উত্তম, কারণ এতে রক্তপাত বন্ধ থাকে এবং জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।” (বাকি অংশ পরের পৃষ্ঠায়)

﴿وَج﴾ সম্পর্কে জমহরের মাযহাব:

এই নববী নির্দেশনাসমূহের ভিত্তিতে উম্মতের জমহরের মাযহাব শুরু থেকেই এই যে, শাসক ফাসিক ও ফাজির হলেও যতক্ষণ না সে প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত হয়, ততক্ষণ তার বায়আত ভঙ্গ করা যাবে না।

ইয়াজিদের ফিসক ও ফুজুর (পাপাচার ও দুরাচার) প্রসিদ্ধ হওয়ার ফলে উম্মতের ইতিহাসে এমন এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন মুসলমানদের প্রতিটি বিষয়ে লড়াই করতে হয়েছিল। সম্ভবত এতেও আল্লাহর তাকদিরি হিকমত ছিল যে, এই বিষয়ে মহান ব্যক্তিত্বদের কর্মপন্থা যেন এই যুগেই সামনে চলে আসে এবং পরবর্তীদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ইয়াজিদের বায়আত বহাল রাখা বা তা ভঙ্গ করার বিষয়ে সাহাবী ও তাবিঈদের দুটি দল হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠরা সেই সব নববী ফরমানকে সামনে রাখেন যাতে সালাত, জিহাদ এবং নেক কাজে সর্বদা শাসকদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা শাসক ভালো হোক বা মন্দ। তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার তোলার অনুমতি ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি যতক্ষণ না তারা প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত হয়। [১]

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সতর্ক অবস্থান:

এই দলের সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ইলমি ও ফিকহি দিক থেকে নিঃসন্দেহে তৎকালীন পুরো মুসলিম বিশ্বে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কর্মপন্থা ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি দলিল; তাই সংখ্যাগরিষ্ঠরা ইয়াজিদের ফিসক ও ফুজুরের প্রসিদ্ধিকে উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেন। [২]

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সময়ে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতা আবদুল্লাহ বিন মুতী’ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিষেধও করেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন: “আমি কেবল একটি হাদিস শোনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার কাছে (নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য) কোনো দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে তার গলায় (তৎকালীন শাসকের) বায়আতের (বন্ধন) নেই, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।” [৩]

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র ও খাদেমদেরও একত্রিত করে এই লড়াই থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন এবং বলেন:

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ) .. রক্ষা। এই হাদিসটিই এই মহান ব্যক্তিদের দলিল। ফকিহগণ কেবল সেই অবস্থাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করেছেন যখন শাসকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় তার আনুগত্য বৈধ নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত করা ওয়াজিব। (ফাতহুল বারী: ১৩/৭)

(বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা)

[১] এই নির্দেশের অন্তর্নিহিত হিকমত বা রহস্য সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি হিকমত হলো ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে সুরক্ষা, যা শাসক পরিবর্তনের চেষ্টার ফলে সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া মুসলিম সমাজে অনেক গুনাহ সাধারণত প্রকাশ্যে হয় না, তাই কারো ফিসক ও ফুজুর নিশ্চিত প্রমাণের মাধ্যমে জানা সহজ নয়। কারো প্রতি ফিসকের অপবাদ মিথ্যাও হতে পারে। যেহেতু প্রতিটি সমাজেই শাসকদের বিরোধী দল থাকে, তাই তারা প্রায়ই অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। এই অভিযোগগুলো সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। বিরোধী দলের জন্য শাসকের অপকর্মের খবর প্রচার করা কঠিন কিছু নয়। সুতরাং, শরিয়ত যদি শাসকদের ব্যক্তিগত ফিসক ও ফুজুরের প্রসিদ্ধির কারণে ﴿وَج﴾ বা বিদ্রোহের পথ খুলে দিত, তবে প্রতিটি সরকার সবসময় বিপদের মুখে থাকত এবং ইসলামি সমাজে কখনো সরকারের স্থিতিশীলতা অর্জিত হতো না।

[২] কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা এটি প্রমাণিত নয় যে, ইয়াজিদ হারামকে হালাল ঘোষণা করেছিল বা শরিয়তকে অস্বীকার করেছিল; তাই তার ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর আঙুল তোলা হলেও তা ‘কুফরে বাওয়াহ’ (প্রকাশ্য কুফরি) ছিল না। সুতরাং জমহরের মতে তার বিরুদ্ধে ﴿وَج﴾ বা বিদ্রোহ সঠিক ছিল না, যদিও বিদ্রোহকারী সাহাবী ও তাবিঈগণও মুখলিস (নিষ্ঠাবান) ও মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তাদের ওপর কোনো দোষারোপ নেই।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ১৮৪৯, কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল আমরি বিলুযুমিল জামাআতি ইনদা যুহরিল ফিতান, ত: দারুল জীল।

“আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা স্থাপন করা হবে। আমরা এই ব্যক্তির (ইয়াজিদ) বায়আত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশের অনুগত হয়ে করেছি। আমি জানি না যে, কোনো ব্যক্তি কোনো শাসকের কাছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর (বায়আত) হিসেবে বায়আত করবে এবং তারপর তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ইয়াজিদের বায়আত ভঙ্গ করে এবং এই (নতুন সরকারের) বিষয়ে বায়আত করে, তবে আমার এবং তার মধ্যে হুজ্জত কায়েম হয়ে গেছে।” [১]

সাহাবীদের জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাযহাব এটাই ছিল। আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুও, যিনি মদীনার প্রতিনিধি দলের সাথে দামেস্ক যাওয়ার পর ইয়াজিদের কাছেই অবস্থান করছিলেন, এই কারণেই বিদ্রোহে (খুরুজ) শরিক হননি। [২]

নুমান বিন বশির, আব্দুল্লাহ বিন মাসআদাহ ফাজারি এবং দাহহাক বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুমও এই কারণেই সরকারি পদে বহাল ছিলেন। [৩]

আর এই কারণেই বিভিন্ন রণাঙ্গনে জিহাদে লিপ্ত ডজন ডজন সাহাবী এবং শত শত তাবেয়ী, যারা বীরত্ব, ধর্মীয় আত্মমর্যাদা এবং তাকওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অংশ না নিয়ে নিজ নিজ অর্পিত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে মুনজির বিন জারুদ, বুস্তান বিন সালামাহ, আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ হিলালি, সিলাহ বিন আশইম, আমর বিন উতবাহ, হুদাইল বিন নুয়াইম, উসমান বিন আদম এবং আব্দুল্লাহ বিন আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। [৪]

নীরবতার পথ অবলম্বনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির মধ্যে স্বয়ং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরাধিকারী জয়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু আনহুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও বিদ্রোহে (খুরুজ) শরিক হননি। [৫]

তবে মা’কাল বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ বিন হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ বিন মুতি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মদীনার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিপরীত অবস্থানও নিজ নিজ যুক্তিতে...

[১] সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নম্বর: ৭১১১, কিতাবুল ফিতান, বাব ইয়া কালা ইনদা কওম...

[২] তারিখ দামেস্ক: ২৫৯/২৬, তরজমা: আব্বাস বিন সাহল

[৩] উসদুল গাবাহ, আল-ইসতিয়াব, আল-ইসাবাহ: নুমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু, দাহহাক বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ বিন মাসআদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী দেখুন।

[৪] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ: ২৬৬, ২৫১

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৮৬/৩, ৩৯০, ত ত-রিসালাহ

একটি মত এমনও আছে যে, অনেক ব্যক্তি হয়তো এই কারণে বিদ্রোহে (খুরুজ) শরিক হননি যে, ইয়াজিদের ফাসেক ও পাপাচারী হওয়া তাদের কাছে প্রমাণিত ছিল না, যেমন মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহর ধারণা এমনই ছিল। তবে আসল এবং নিশ্চিত কারণ হলো সেই সব হাদীস, যাতে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারা ফাসেক এবং জালেম হলেও, যতক্ষণ না তারা প্রকাশ্য কুফরিতে (কুফরে বাওয়াহ) লিপ্ত হয়। শিয়া মতবাদের খণ্ডনে “মিনহাজুস সুন্নাহ”-এর নিকট ইয়াজিদের ন্যায়পরায়ণ ও নেককার হওয়া ইসলামের মৌলিক অধিকার মর্যাদা লাভ করেছে, কারণ তাদের মতে যদি এটি অস্বীকার করা হয়, তবে সেই সমস্ত সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) অস্বীকার করা হবে যারা ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী হওয়ার সময়ও নীরব ছিলেন এবং তার পুরো শাসনকালে বিদ্রোহে (খুরুজ) কোনো অংশ নেননি, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদেরও বিদ্রোহ (খুরুজ) থেকে বিরত রেখেছেন। এই “গবেষকগণ” বলেন যে, ইয়াজিদকে ফাসেক মানলে এই সমস্ত ব্যক্তিদের বেদ্বীন হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়বে।

এই যুক্তিটি নিজের জায়গায় অত্যন্ত জোরালো, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই সব বাণীকে সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ফাসেক ও জালেম শাসকদের বায়আত বজায় রাখা, তাদের সাথে জিহাদ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীসগুলো প্রমাণিত নয়, তারা এই যুক্তিটি পূর্ণ হৃদয়ে মেনে নিতে পারেন। এরপর ইয়াজিদের ন্যায়পরায়ণতার ওপর আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হবে না এবং তার ফাসেক হওয়ার খণ্ডনে কোনো বিতর্কেরও অবকাশ থাকবে না।

কিন্তু যারা এই সহীহ হাদীসগুলোকে মানেন (এবং আলেমদের মধ্যে এমন কেউ নেই যারা এগুলো অস্বীকার করেন), তাদের তো এটি মানতেই হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করতে পারতেন না, শাসক কে ছিল এবং সে নেককার ছিল না ফাসেক ছিল তা বিবেচনা না করেই। তাদের তো রাসূলের নির্দেশের অনুসরণে যে কোনো অবস্থায় শাসকের বায়আত বজায় রাখতে হতো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই বাণীর অর্থ এটাই ছিল যে, আমরা এই ব্যক্তির (ইয়াজিদ) বায়আত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশের অনুগত হয়ে করেছি। আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়া তো দূরের কথা, বরং তার পতাকাতলে জিহাদ করাকেও শাসকের ফাসেক হওয়ার অস্বীকৃতির দলিল হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

রাখতেন। তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী শাসক ব্যক্তিগত ফাসেকির কারণে অপসারিত হওয়ার যোগ্য হতেন এবং তার বিরুদ্ধে খুরুজ ওয়াজিব হয়ে যেত। [১]

যেহেতু ইয়াজিদ সম্পর্কে মদিনাবাসীদের নিশ্চিত তথ্য এটাই ছিল যে সে পাপাচার ও অবাধ্যতায় অভ্যস্ত, তাই এই ব্যক্তিবর্গ খুরুজের ব্যাপারে অনড় ছিলেন। এই ইজতিহাদে তারা সম্পূর্ণ সদিচ্ছার অধিকারী ছিলেন এবং তাদের এই লড়াই ছিল খাঁটি আল্লাহর জন্য।

খুরুজের সূচনা:

মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা খেলাফতে রাশেদার যুগের মতো মুহাজির ও আনসারদের সম্মতি এবং পরামর্শের (শুরা) ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করবেন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবস্থার ভিত্তিতে নয়। মদিনাবাসী একটি নাগরিক সরকার গঠন করেন যাতে সাধারণ মুহাজিরদের নেতৃত্ব মা'কাল বিন সিনান (রা.)-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। কুরাইশদের জন্য আবদুল্লাহ বিন মুতি (রা.)-কে আলাদা আমির নিযুক্ত করা হয়।

আনসারগণ আবদুল্লাহ বিন হানজালা (রা.)-এর অধীনে চলে আসেন। [২]

এই ব্যক্তিবর্গ শহরের শাসনভার গ্রহণ করে ইয়াজিদের গভর্নর উসমান বিন মুহাম্মদ বিন আবি সুফিয়ান এবং বনু উমাইয়ার অন্যান্য ব্যক্তিদের মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের করে দেন। [৩]

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর মতো অন্যান্য শহরে অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহাবীগণ এই আন্দোলনের সফলতার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), যিনি তায়েফে অবস্থান করছিলেন, তিনি এই আন্দোলনের সাথে একমত ছিলেন না। যখন তিনি এই নতুন সরকারের খবর পেলেন, তখন বললেন: “তাদের দুইজন করে আমির রয়েছে। এই লোকগুলো মারা যাবে।” [৪]

যা-ই হোক, মদিনাবাসীদের নেতা আবদুল্লাহ বিন হানজালা (রা.) অত্যন্ত কঠোরতার সাথে লোকজনকে সিরি়াবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মৃত্যুর ওপর বায়আত গ্রহণ করেন যে, তারা লড়তে লড়তে মারা যাবেন কিন্তু যুদ্ধ থেকে পালাবেন না। এভাবে যেন ধ্বংস ও অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হলো। [৫]

[১] পরবর্তীতেও ওলামায়ে কেরামের একটি দল ফাসেক শাসকের বিরুদ্ধে খুরুজকে জায়েজ এবং একটি দল একে ওয়াজিব বলে আসছেন। (শারহুল আকাইদ আন-নাসাফি, পৃ. ৩১৭; আহকামুল কুরআন লিল ইমাম আল-জাসসাস আর-রাজি, ১/৮৫, তবা আল-ইলমিয়া)

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৬

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৬

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৭

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৬ সহিহ সনদে

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

জঙ্গ-এ হাররা

ইয়াজিদের মধ্যে সৈনিকসুলভ উদ্দীপনার কোনো অভাব ছিল না। তবে সে ছিল একজন রাষ্ট্রপ্রধান, যার জন্য উদ্দীপনার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল দূরদর্শিতা, সহনশীলতা এবং বিচক্ষণতার। ইয়াজিদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এটিই প্রমাণ করে যে, সে এই গুণাবলি থেকে বঞ্চিত ছিল। হযরত হুসাইন (রা.)-এর ব্যাপারেও তার পক্ষ থেকে এমন কিছু ভুল এবং বাড়াবাড়ি সংঘটিত হয়েছিল, যার ফলে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। হওয়া তো উচিত ছিল এই যে, এরপর সে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যেত এবং সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে পরবর্তী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হাজার বার চিন্তা করত। কিন্তু আফসোস যে, যখন মদিনাবাসীদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হলো, তখন তার মেজাজ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। এবং সে মদিনা মুনাওয়ারা এবং সেই সাথে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর দমনের জন্য মক্কার ওপরও হামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। দামেস্কে উপস্থিত সাহাবী ও তাবিঈগণ ইয়াজিদকে এই অভিযান বর্জন করার জন্য জোর সুপারিশ করেছিলেন। [১]

ইয়াজিদ সাহাবী ও তাবিঈগণের পরামর্শের প্রতি বিমুখ

আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.) ইয়াজিদকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য এমনকি এ পর্যন্ত বলেছিলেন: “এমনটি করে তুমি নিজের জীবনকেই ধ্বংস করে দেবে।” [২] কিন্তু ইয়াজিদের ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না। সাখর বিন মাবাদ (রা.)-ও তাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন কিন্তু ইয়াজিদ নিজের জেদেই অটল রইল। [৩] নুমান বিন বশীর (রা.) সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে বললেন: “এই কাজের জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিন, আমিই যথেষ্ট হব।” [৪] কিন্তু ইয়াজিদের মদিনাবাসীদের জন্য কোনো ধৈর্যশীল ও সহনশীল মেজাজের ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল না, বরং তার একজন পাষণ্ড হৃদয় এবং কঠোর প্রকৃতির লোকের প্রয়োজন ছিল। তাই নুমান বিন বশীর (রা.)-এর প্রস্তাবও বৃথা গেল। [৫]

উমাইয়া আমীরগণও মদিনায় হামলার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট: উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের সাফ জবাব

মদিনা ও মক্কার ওপর হামলার কথা চিন্তা করতেই প্রত্যেকের অন্তর কেঁপে উঠত। ইয়াজিদের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও ওই সকল আমীরগণও এই কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না যারা কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিলেন। আমর বিন সাঈদের মতো ব্যক্তি, যে দুই বছর আগে মক্কার ওপর সৈন্য পরিচালনা করেছিল, সেও এবার পরিষ্কার অস্বীকার করল। অবশেষে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে এই কাজ সোপর্দ করার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু সে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার কারণে নিজের...

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/১৪৫, ত: সাদির; তারীখ দিমাশক: ৪/৪৭৩

[২] “এতে” আব্দুল্লাহ বিন জাফর বললেন: “নিশ্চয়ই তুমি তাদের মাধ্যমে নিজেকেই হত্যা করবে।” (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/১৪৫, ত: সাদির)

[৩] তারীখ দিমাশক: ৪/৪৭৩

[৪] তিনি বললেন: “হে আমীরুল মুমিনীন, বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দিন।” (তারীখ দিমাশক: ৪/৪৭৩)

[৫] তারীখ তাবারী: ৫/৪৮৩

সে অপমানের জন্য ইয়াজিদকে দায়ী মনে করত, যার সন্তুষ্টির জন্য সে এই জুলুমগুলো করেছিল। ফলে এখন সে ইয়াজিদের খাতিরে আরও বদনাম হওয়ার সাহস করতে পারল না এবং পরিষ্কার জবাব দিয়ে বলল: “এই ফাসিক (ইয়াজিদ)-এর জন্য আমি এই দুটি কাজ কখনো একত্রিত হতে দেব না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতির হত্যাকারীও আমার জিন্মায় হোক এবং বাইতুল্লাহর ওপর আক্রমণও।” [১]

সবাইকে ইতস্তত করতে দেখে ইয়াজিদ মুসলিম বিন উকবার মতো পাষণ্ড হৃদয়ের এক ব্যক্তিকে এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করল [২] এবং তাকে তাকিদ দিল:

“তিন দিন পর্যন্ত মদিনাবাসীদের আনুগত্যের দাওয়াত দেবে, তারপরও যদি তারা না মানে তবে যুদ্ধ করবে। যদি তোমরা বিজয়ী হও তবে তিন দিন পর্যন্ত শহর লুট করবে। টাকা-পয়সা, সাধারণ ব্যবহারের জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্যসামগ্রী সেনাবাহিনীর হবে। আলী বিন হুসাইন (জয়নুল আবেদীন রহ.)-এর খেয়াল রাখবে, এই বিদ্রোহের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।” [৩]

এই সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল বারো হাজার। [৪] অর্থাৎ এই লশকর মদিনাবাসীদের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি ছিল কারণ সেখানে যুদ্ধ করার মতো...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৮৩-৩৮৪ হাসান সনদে এবং তাবারী এটি আবু হামিদ থেকে, তিনি জারীর থেকে, তিনি মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের অবস্থা: ইবনে হুমাইদ অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন হুমাইদ আল-রাযী (মৃত্যু ২৪৮ হিজরী) ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের শায়খ ছিলেন, যদিও তাঁকে দুর্বল বলা হয়েছে কিন্তু ইমাম আহমদ তাঁর প্রশংসা করতেন। হাফেজ যাহাবী বলেন যে, তাঁর বর্ণনার ওপর নির্ভর করা যায় না তবে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১১/৫০৩)। জারীর অর্থাৎ জারীর বিন আব্দুল হামিদ আবু আব্দুল্লাহ আল-যাব্বী আল-কুফী (মৃত্যু ১৮৮ হিজরী), বুখারী ও মুসলিমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। (মিযানুল ইতিদাল: ১/৩৯৪)। মুগীরা বিন মিকসাম (মৃত্যু ১৩৬ হিজরী) বুখারী ও মুসলিমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, ইব্রাহিম নাখয়ী ও ইমাম শাবী-র ছাত্র। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৩/৭৮৮, ত বাশার)।

[২] তারিখ আল-তাবারী ৫/৩৮৩, ৩৮৫ ওয়াকিদী ও আবু মিখনাফ থেকে। ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিম বিন উকবার বয়স তখন ৯০ বছরের বেশি ছিল। (তারিখু দিমাশক: ৫৮/১০৫)। আমাদের মতে ওয়াকিদীর এই বর্ণনাটি দুর্বল। প্রথমত এর সনদ দুর্বল, দ্বিতীয়ত এত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। ইয়াজিদ তাকে এজন্য বেছে নিয়েছিল যে সে তার অনুগত ছিল, যাকে বৃদ্ধ বয়সেও কাজে লাগানো যেত, কিন্তু সাধারণ যুক্তিতে মনে হয় না যে মুসলিম বিন উকবা এত বৃদ্ধ ছিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু লোক ওয়াকিদীর এই বর্ণনাকে ভিত্তি করে এক প্রকার মানসিক প্রশান্তি লাভ করে যে মুসলিম বিন উকবাকে ‘সাহাবী’ গণ্য করা হয়েছে, শুধুমাত্র এজন্য যাতে ইয়াজিদের এই অপরাধের জন্য কোনো অজুহাত তৈরি করা যায়। এক দুর্বল বর্ণনাকারীর কথার ওপর ভিত্তি করে একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য সাহাবিয়ারের মতো মহান মর্যাদা সাব্যস্ত করা এবং তারপর তার জুলুমকে জায়েজ করার চেষ্টা করা চরম পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ ওয়াকিদীর সনদের দুর্বলতা বিবেচনা করে ফয়সালা দিয়েছেন যে মুসলিম বিন উকবা ‘ইদরাম’ এবং ‘ইদরাম’ এর অর্থ হলো নবুওয়াত পাওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো দলিল না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা সাহাবিয়ার প্রমাণিত হয় না। طبقات ابن سعد (তাবাকাত ইবনে সাদ), الاستيعاب (আল-ইসতিয়াব) এবং اسد الغابة (উসদুল গাবাহ) এর মতো রিজাল শাস্ত্রের প্রাচীন কিতাবগুলোতে কোথাও মুসলিম বিন উকবাকে সাহাবীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ইবনে আসাকির ‘ইদরাম’ এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু সাথে এও বলেছেন যে ‘ইদরাম’ অর্থ হলো সে নবী ﷺ-কে দেখেছে কিন্তু তাঁর থেকে কোনো হাদিস সংরক্ষণ করেনি। (তারিখু দিমাশক: ৫৮/১০২)। অধিকাংশ আলেম মুসলিম বিন উকবাকে তার চরম নিষ্ঠুরতার কারণে ‘মুসরিফ বিন উকবা’ নামে অভিহিত করেছেন। মুসলিম বিন উকবা আল-দিবানি ফাহ মুসরিফ বিন উকবা, ইদরাম আন-নবী ﷺ। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৫/২৩৩)। সাহাবিয়ারের দাবি শুধু হাফেজ যাহাবীই করেননি বরং হাফেজ ইবনে হাজার ‘আল-ইসাবাহ’ গ্রন্থে মুসলিম বিন উকবার উল্লেখ করেছেন কিন্তু সাহাবীদের বিরুদ্ধে তার কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে সকল হযরত ইমাম যুহরীর মতো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনাকেও শিয়া হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন, তারা এখানে একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে মুসলিম বিন উকবাকে সাহাবী মেনে নিচ্ছেন। সাহাবিয়ারের মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে যে তা এমন এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করা হবে।

[৩] আনসাবুল আশরাফ, ৫/৩২২, ৩২৩, ত দারুল ফিকর; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৫/২৫ ত তদমরী। এই বর্ণনাটি দুর্বল, সনদে متروك (পরিত্যক্ত) এবং অন্যান্য জরাহ ও তাদীল এর ইমামদের ঐক্যমত হলো যে ইয়াজিদ এই নির্দেশ দিয়েছিল, তাই এখানে ইয়াজিদের দিকে এই শব্দগুলো সম্বন্ধ করা হয়েছে।

[৪] তারিখ খলিফা, পৃ. ২৩৭, ২৩৮।

...মাত্র দুই হাজার জানবাজ ছিলেন। [১]

মদিনার দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ঝলসানো পাহাড়ের সারি রয়েছে যেগুলোকে ‘হাররা’ বলা হয়। কোনো এক যুগে আগ্নেয়গিরির লাভা উদগিরণের ফলে এই এলাকাটি পুড়ে গিয়েছিল। এ কারণে এই জায়গাটি হাররা নামে পরিচিত ছিল। [২]

মদিনাবাসী খন্দকের যুদ্ধের আদলে পরিখা খনন করে শহরকে সুরক্ষিত করে নিয়েছিলেন যাতে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধমূলক লড়াই করা যায়। [৩] তবে পূর্ব দিক থেকে হাররা ওয়াকিম এলাকাটি উন্মুক্ত ছিল। মদিনাবাসী সিরীয় বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য এখানেই সমবেত হয়েছিলেন। সিরীয় সৈন্যরা এই দিক থেকেই মদিনার সামনে এসে পৌঁছায়। [৪]

ভয়াবহ যুদ্ধ, আবদুল্লাহ বিন হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আত্মত্যাগ:

শহরের মানুষকে মরণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত দেখে সিরীয় সৈন্যরা থমকে গেল, মদিনা মুনাওয়ারার পবিত্রতাও তাদের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এটি দেখে মুসলিম বিন উকবা দুই বাহিনীর মাঝখানে নিজের আসন পাতলেন এবং হাঁক দিলেন: “এখন আমাকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করো।” তখন সিরীয়রা জোরালো আক্রমণ করল এবং অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। [৫]

আবদুল্লাহ বিন হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অবস্থায় নিজের সাত ছেলেকে একে একে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। তারা সবাই বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। [৬]

এই সময়ে মদিনাবাসীদের একটি গোত্র বনু হারিসা সরকারি বাহিনীকে সহযোগিতা করল এবং তাদের পেছন দিক থেকে মদিনায় প্রবেশের পথ করে দিল। যখন মদিনার স্বাধীনতাকামীরা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে তাকবিরের ধ্বনি শুনতে পেল, তখন তারা বুঝতে পারল যে শত্রু শহর দখল করে নিয়েছে। ফলে তারা পিছু হটতে শুরু করল। কিছু সাহাবী এবং তাদের আত্মমর্যাদাশীল সন্তানরা ময়দানে অটল রইলেন এবং লড়াই করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। [৭] পিছু হটার সময় অনেক মানুষ সেই পরিখায় পড়ে গেল যা শহরের প্রতিরক্ষার জন্য খনন করা হয়েছিল। পরিখায় পড়ে যারা আহত হয়েছিল তাদের সংখ্যা নিহতদের চেয়েও বেশি ছিল। [৮]

আবদুল্লাহ বিন হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধীনে মাত্র পাঁচজন ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলেন। কেউ একজন বলল: “আল্লাহর কসম! এখন আমাদের আর কোনো সঙ্গী অবশিষ্ট নেই, এখন কিসের ভরসায় লড়াই করব?” আবদুল্লাহ বিন হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন: “তোমার ধ্বংস হোক। আমরা তো মৃত্যুর অঙ্গীকার করেই বের হয়েছি।” [৯]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৬; ত: সাদির

[২] মুজামুল বুলদান: ২/২৪৯

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮৭, আবু মিখনাফ থেকে; তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৫, জুয়াইরিয়াহ থেকে, সহীহ সনদে

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৮

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৮

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৮

[৭] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৮

[৮] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৮

[৯] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৫, জুয়াইরিয়াহ থেকে, সহীহ সনদে

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমা

এই কথা বলে তিনি প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লড়তে লড়তে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। [১] এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ২৭ জিলহজ ৬৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়। [২]

মদিনাবাসীদের শহীদদের সংখ্যা:

হাররার ট্র্যাজেডি একটি অগ্নিঝড়ের মতো মুহাজির ও আনসারদের সুগন্ধি বাগানকে উজাড় করে দিয়েছিল। ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি উত্তম বর্ণনা অনুযায়ী:

“হাররার ঘটনায় নিহতদের মধ্যে সাতশ জন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা কুরআন মাজিদের হাফেজ ও কারী ছিলেন।” [৩]

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম:

হাররার যুদ্ধে অন্তত পাঁচজন মদিনাবাসী সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন। একজনকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। একজন পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। একজন সাহাবী যিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাঁকে পরে বাড়ি থেকে ডেকে এনে শহীদ করা হয়। এই ব্যক্তিদের নাম নিচে দেওয়া হলো:

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা (রা.) ... যিনি আনসারদের নেতা ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। [৪]
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ ইবনে আসিম (রা.) ... ইনি সেই সাহাবী যিনি হযরত ওয়াহশি (রা.)-এর সাথে মিলে মুসাইলামা কাজ্জাবকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রক্ষাকারিণী উম্মে আন্মারা (রা.)-এর পুত্র। তাঁর থেকে ওয়ুর সুনাত পদ্ধতির হাদিস বর্ণিত আছে। [৫] তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।
- হযরত আবু তালিয়া মুয়াজ ইবনুল হারিস (রা.) ... যাঁর সুন্দর তিলাওয়াতের কারণে হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁকে তারাবিহর ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। [৬] তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।
- প্রবীণ সাহাবী হযরত মাকিল ইবনে সিনান (রা.) ... যিনি মক্কা বিজয়ের সময় বনু আশজা গোত্রের পতাকা বহন করেছিলেন, যুদ্ধের পর তিনি বন্দী হন, ইয়াজিদের সেনাপতি মুসলিম ইবনে উকবা তাঁকে হত্যা করায়। [৭]
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতি (রা.) ... ইনি একমাত্র সাহাবী যিনি যুদ্ধ থেকে জীবিত বেঁচে ফিরেছিলেন। [৮]

[১] তারিখ দামেশক ২৭/৩৩০; তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ২৩৮

[২] তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ২৫০

[৩] ক্বাতলু ইয়াওমিল হাররাতি মিন হামালাতিল কুরআন সাবউ মিয়াতি, (আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ: ৩/৩২৫, ত. আর-রিসালাহ; তারিখ দামেশক: ৫৩/৮৩; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৫/৩০) বর্ণনার সনদ সহিহ এবং মুত্তাসিল। ইমাম মালিক পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন, বাকি বর্ণনাকারীদের অবস্থা লক্ষ্য করুন: মুহাম্মদ ইবনে দাহহাক (আল-মাদানি) সিকাহ, (আস-সিকাত লি ইবনে হিব্বান: ৩/১৫১) ইব্রাহিম ইবনুল মুনজির আল-মাদানি (মৃ. ২৩৬ হি.) বুখারির বর্ণনাকারী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১০/৬৮৯) ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (মৃ. ২৭৭ হি.) সিকাহ। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৩/১৮০) মনে রাখা প্রয়োজন যে, ওয়াকিদী নারী ও শিশুদের মিলিয়ে নিহতদের মোট সংখ্যা দশ হাজার বলেছেন। (আল-মুস্তাদরাক: ৩/৮; ওয়াফাউল ওয়াফা: ১/১২৭, ত. ইলমিয়াহ) কিন্তু এই বর্ণনা ওয়াকিদীর কারণে যয়িফ। একইভাবে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়ে মসজিদে নববী পর্যন্ত পৌঁছানোর বর্ণনাগুলো যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেগুলো এতটাই যয়িফ যে সেগুলোকে মাওজু (জাল) বলা যেতে পারে।

[৪] তারিখ দামেশক ২৭/৩৩০

[৫] ৩৮৭/১ رجال صحيح البخارى:

[৬] ৬৭২৭ تقريب التهذيب، ترجمه نمبر:

[৭] ২৫০ تاريخ خليفه بن خياط، ص

[৮] طبقات ابن سعد: ১৪৭/৫ ط صادر

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

এই পাঁচজন ব্যক্তি ছাড়াও ষষ্ঠ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন জামআ (রা.), যিনি উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.)-এর ভাগ্নে ছিলেন, যুদ্ধের পর ঘর থেকে ডেকে এনে তাঁকে হত্যা করা হয়। [১]

মুহাজিরদের প্রসিদ্ধ শহীদগণ:

সাহাবায়ে কেরামের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন যারা এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের সংখ্যা ছিল শত শত, যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের নাতি আবদুল্লাহ। হারিসের প্রপৌত্র ফজল।
 - রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবি তালিব (রা.)-এর সাহেবজাদা আবু বকর।
 - হযরত উমর (রা.)-এর তিন নাতি: আবু বকর, আবদুল্লাহ, সুলাইমান।
 - উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বৈপিত্রেয় ভাই মুসা বিন আল-হারিস।
 - উম্মুল মুমিনীন সাওদা বিনতে জামআ (রা.)-এর ভাই আব্দুর রহমান। তিন ভতিজা: রাবিআহ, আমর, আবদুল্লাহ।
 - উম্মুল মুমিনীন সাওদা বিনতে জামআ (রা.)-এর ভাগ্নে হযরত আব্দুর রহমান বিন হুয়াইতিব এবং তাঁর ছেলে আব্দুল মালিক।
 - আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর ছেলে যায়েদ এবং তিন ভতিজা: আবান, ইয়াজ, মুহাম্মদ।
 - আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর দুই ছেলে: উমাইর ও উমর। তিন ভতিজা: ইসহাক, ইমরান ও মুহাম্মদ।
 - আশারায়ে মুবাশশারার সদস্য হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর ছেলে: উমর (বা আমর) এবং নাতি আবু বকর।
 - প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত হাতিব বিন আবি বালতাআ (রা.)-এর নাতি আবদুল্লাহ।
 - হযরত মিসওয়াল বিন মাখরামা (রা.)-এর ছেলে মুহাম্মদ।
 - হযরত উতবা বিন গাজওয়ান (রা.)-এর ছেলে উবাইদুল্লাহ।
 - বনু জুমাহ-এর ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহ, ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ, আবু সালামা বিন আবদুল্লাহ, মিকদাদ বিন ওয়াহাব, খালিদ বিন আবদুল্লাহ।
- সামগ্রিকভাবে কুরাইশদের ‘৯৭’ জন মূল্যবান ব্যক্তি এই বিয়োগান্তক ঘটনার শিকার হন।
- [২] রাহিমাহুমুল্লাহ রহমাতান ওয়াসিআহ।
- মুহাজিরদের প্রসিদ্ধ শহীদগণ:
- আবদুল্লাহ বিন হানজালা (রা.)-এর সাত ছেলে, যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ছয়জনের নাম সংরক্ষিত আছে: আব্দুর রহমান, হারিস, হাকাম, আসিম, ইয়াহইয়া, আবদুল্লাহ (শেষ দুজন যমজ ছিলেন)।
 - ক্বারী কাসীর বিন আফলাহ (রা.), যাঁকে দিয়ে হযরত উসমান (রা.) কুরআন মাজীদ লিখিয়ে সংরক্ষিত কপি প্রকাশ করেছিলেন। [৩]
 - হযরত সাদ বিন মুআয (রা.)-এর নাতি আবদুল্লাহ।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৯ সহীহ সনদসহ।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩০ থেকে ২৩৫; আল-ইবার লিয-যাহাবী, ৬৩ হিজরীর ঘটনাবলী; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৫/৯/৩০, ৬৩ হিজরীর ঘটনাবলীর অধীনে।

[৩] আল-ইবার, ১/৫০, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

- হযরত উসমান বিন হানিফ (রা.)-এর দুই ছেলে: সাহল এবং মুহাম্মদ।
- হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর পাঁচ ছেলে: সাঈদ, সুলাইমান, জায়েদ, ইয়াহইয়া, আবদুল্লাহ।
- হযরত আমর বিন হাযম (রা.)-এর চার ছেলে: মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ, জাবির, মুয়াবিয়া; আমরা ও ঘরের অন্যান্য সদস্যদের মিলিয়ে তেরো জন।
- হযরত আমর বিন হাযম (রা.)-এর তিন পৌত্র: আবদুর রহমান, উসমান, আবদুল মালিক।
- হযরত উবাই বিন কাব (রা.)-এর ছেলে মুহাম্মদ।
- হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর পৌত্র ইসমাইল।
- হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর দুই ছেলে: আবদুল্লাহ এবং ইয়াহইয়া।
- হযরত সাবিত বিন কায়েস (রা.)-এর তিন ছেলে: মুহাম্মদ, ইয়াহইয়া, আবদুল্লাহ।
- হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রা.)-এর পৌত্র নওফেল।
- হযরত কাব বিন আমর (রা.)-এর ছেলে মুহাম্মদ।
- হযরত রিফায়াহ বিন রাফি (রা.)-এর ছেলে হারিস।
- বনু হারিস বিন হারিসের আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন সাহল, কিনানাহ বিন সাহল, আবদুল্লাহ বিন উওয়াইস, সাহল বিন আবি উমামাহ।

আনসারদের মোট ১৭৩ জন ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন। [১] رَحْمَةُ اللهِ وَاسْعَةٌ (আল্লাহ তাদের ওপর প্রশস্ত রহমত বর্ষণ করুন)।

হাররার ঘটনা ইসলামী ইতিহাসের সেই মহান ট্র্যাজেডি ছিল, যাতে মুহাজির ও আনসারদের বংশধরদের একটি বিশাল এবং অত্যন্ত মূল্যবান অংশ এক নিমেষে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) বলতেন:

“প্রথম ফিতনা উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সময় সংঘটিত হয়েছিল, যার ফলে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। তারপর দ্বিতীয় ফিতনা ‘আল-হাররা’ সংঘটিত হলো, তখন হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ বাকি রইল না। এরপর যখন তৃতীয় ফিতনা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে উমাইয়া আমিরদের বিদ্রোহ) সংঘটিত হলো, তখন তা থামার আগেই মানুষের মধ্যে কোনো প্রাণশক্তি অবশিষ্ট ছিল না।” [২]

শামী বাহিনীর মদিনাবাসীদের ওপর জুলুম, রাসুলুল্লাহর শহরে লুটতরাজ:

মদিনাবাসীদের পরাজিত করে মুসলিম বিন উকবা যখন শহরে প্রবেশ করল, তখন তার মন থেকে মদিনাবাসীদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সেই বাণীগুলো মুছে গিয়েছিল, যাতে মদিনাবাসীদের সম্মান ও মর্যাদার বিশেষ খেয়াল রাখার তাকিদ দেওয়া হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: “যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের ভয় দেখাবে, আল্লাহ তাকে ভয় দেখাবেন; তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত হবে।” [৩]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৫-২৪০; আল-ইবার: ১/৫০, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪০২৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব শুহুদুল মালাইকা বদরান। বুখারীর একাধিক ব্যাখ্যাকারী যেমন: আল্লামা কিরমানি (রহ.) এবং আল্লামা কুরতুবী (রহ.) তৃতীয় ফিতনার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটি হাজ্জাজ কর্তৃক আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করাকে বোঝানো হয়েছে এবং কুরআন থেকেও এটিই স্পষ্ট। দ্রষ্টব্য: আল-কাওয়াকিব আদ-দুরারি: ৫/৯৬; আল-কাওসার আল-জারি ইলা রিয়াদ আহাদিস আল-বুখারি: ৬/১৫৬।

[৩] আল-মু'জাম আল-কাবীর লিত-তাবারানি: ৭/১৪৩, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

তারিখ উম্মত মুসলিমাহ — দ্বিতীয় খণ্ড

সিরিয়ার অধিবাসীদের শক্তির পরীক্ষা যদি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলা করতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তবে এক পর্যায়ে এর অবকাশ আছে বলে মনে করা যেত। এবং বলা যেত যে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে একটি বিদ্রোহ দমন করছিল; কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো এই যে, বিজয়ের পর মুসলিম বিন উকব্বার নেতৃত্বে সিরীয় সৈন্যরা তিন দিন পর্যন্ত শহরে লুটতরাজ চালাতে থাকে। [১]

তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান ও ইকামাত দেওয়ার মতো কেউ ছিল না, কেবল সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রা.) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। যখন নামাজের ওয়াক্ত হতো, তখন রওজায়ে আতহার থেকে একটি হালকা গুঞ্জন শোনা যেত। [২] সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী, মদীনা মুনাওয়ারার যে সকল সাহাবী যুদ্ধে শরিক ছিলেন না, তারাও সিরীয়দের নিষ্ঠুরতার শিকার হন। প্রখ্যাত সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.), যিনি সে সময় অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন, যুদ্ধে শরিক ছিলেন না, তার ঘরও লুট করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কাছ থেকে একটি উট কিনেছিলেন এবং এর মূল্য হিসেবে কিছু দিরহাম বা দিনার দিয়েছিলেন, যা থেকে তিনি কিছু অংশ নিজের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছিলেন, কিন্তু সিরীয়রা এই মূল্যবান সম্পদও লুট করে নিয়ে যায়। [৩]

এই ট্র্যাজেডির দিন এই জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) তার দুই পুত্র: মুহাম্মদ এবং আব্দুর রহমানের ওপর ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি একটি পাথরে হাঁচট খেলেন, তখন তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন: “ধবংস হোক সেই ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আতঙ্কিত করেছে।”

সাহেবজাদারা বললেন: “আব্বাজান! কেউ কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেও আতঙ্কিত করতে পারে?”

এই সাহাবী রাসূল (সা.) নিজের দুই পাঁজরে হাত রেখে বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই আনসারের গোত্রকে আতঙ্কিত করল, সে আমার এই দুই (পাঁজরের) মাঝখানের জিনিসকে (হৃদয়কে) আতঙ্কিত করল।” [৪]

মদীনা মুনাওয়ারায় ভয় ও আতঙ্কের অবস্থা এমন ছিল যে বলা হয়, অনেক মানুষ জীবন ও সম্মানের ভয়ে শহর ছেড়ে পাহাড় ও জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল। সিরীয় সৈন্যরা এমন লোকদের খুঁজছিল। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, এক ব্যক্তি তাকে দেখে ফেলল এবং গিয়ে কোনো সিরীয় সৈন্যকে খবর দিল। সে তলোয়ার হাতে গুহার মুখে এসে হাজির হলো এবং চিৎকার করে বলল: “বাইরে বের হও।”

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-ও নিজের তলোয়ার হাতে নিলেন এবং বললেন: “আমি বের হব না। তুমি ভেতরে এলে আমি তোমাকে হত্যা করব।”

[১] طبقات ابن سعد (তাবাকাত ইবনে সাদ), ৩৮/৫, ত. সাদির, বা-ইসনাদ সহীহ মুত্তাসিল মুহাম্মদ বিন সাদ আন মুসা বিন ইসমাইল (মিন রুওয়াতুল বুখারী ওয়া মুসলিম) জুওয়াইরিয়া বিন আসমা (মিন রুওয়াতুল বুখারী ওয়া মুসলিম) আন নাফি' ওয়াহ্মা শাহিদ আইয়ান লি ওয়াকয়াতিল হাররা। ওয়া আখরাজাহত তাবারানী বা-ইসনাদ হাসান বি-লাফজ: “লাম্মা দাখালা মুসলিম বিন উকব্বা আল-মদীনা হারাবা মিনহু ইয়াওমাইযিন বাকায়্যা আসহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাউয়াকয়াত ফিহা ওয়া আসরাফা ফিল কাতল।” (আল-মু'জামুল কাবীর: ৯২/১৩, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া)।

[২] سنن الدارمی (সুনান আদ-দারিমি), ১/৪৪, ত. দারুল মা'রিফ। কাল আস-সাহাফুল আদ-দারানী: রিজালুহ সিকাত লাকিন সাঈদ বিন আব্দুল আজিজ আসগারু মিন আন ইয়াদরিকা হাযিহিল হাদিসা আও ইয়াসমা' মিন সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব।

[৩] حدثنا شعبه (হাদ্দাসানা শু'বাহ), আন মুহারিব সামি'তু জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) ইয়াকুলু বা'আতু মিনান নবী (সা.) বাইরান... ফালামাম্মা আল-মদীনা কাল ইতি আল-মাসজিদ ফাসাল্লি রাকাতাইন... ফাওয়াজানা... কাল শু'বাহ আউরাহু ফাওয়াজানা লি, ফারায়ি'তু, ফামা ইলা মা'আ মিনহা হাত্তা আসাবাহা আহলুশ শাম ইয়াওমাল হাররা। (সহীহ বুখারী, হা: ২৭০৩, কিতাবুল হিবা, বাবু হিবাতিল মাকবুয়া ওয়া গায়রিল মাকবুয়া)।

[৪] مسند ابی داؤد طيالسی (মুসনাদ আবি দাউদ আত-তয়ালিসি), পৃ. ১৮৬, সনাদ কে তামাম রাভী সিকাত হ্যায়, মুত্তালিব বিন শুয়াইব মে মামুলি জুফ হ্যায়, কাল ইবনে হাজার: “সাদুক।” (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৩০০০) ওয়া রাজে': মুসনাদ আহমদ, হা: ১৩৮১৮ বা-ইসনাদ সহীহ, ওয়া রাজে': আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, হা: ১৮১৬।

কিন্তু যখন সিরীয় (সৈন্য) ভেতরে প্রবেশ করল, তখন আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আখেরাতের চিন্তায় বাধ্য হয়ে নিজের তলোয়ার মাটিতে ফেলে দিলেন এবং বললেন: “নাও! আমার এবং তোমার নিজের গুনাহ মাথায় নিয়ে জাহান্নামী হয়ে যাও।” সে লজ্জিত হয়ে গেল এবং বলল: “আপনি কি আবু সাঈদ খুদরী?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” সে বলল: “আমার জন্য ইস্তিগফার করুন।” তিনি বললেন: “আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।” [১]

এমনও ছিল না যে মদিনার প্রতিটি ঘরে লুটতরাজ করা হয়েছে। ফলে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.), হযরত জয়নুল আবেদিন এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাঁদের পরিজনরা নিরাপদ ছিলেন। তা সত্ত্বেও এত বেশি লুটতরাজ হয়েছিল যে শহরে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। খাদ্যদ্রব্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মানুষ মদিনা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছিল। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁদেরকে মদিনাবাসীদের জন্য নববী শাফায়াতের সুসংবাদ শোনালেন যাতে তাঁরা স্থান পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকেন। [২] আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কিছু পরিজনও স্থান পরিবর্তনের অনুমতি চাইলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) মদিনায় বসবাসের ফজিলত শুনিয়ে তাঁদেরকে অত্যন্ত কষ্টে বিরত রাখলেন। [৩]

সিরীয় সৈন্যরা কি কাফের ছিল?

এ কথা স্পষ্ট যে সিরীয় সৈন্যরা কাফের ছিল না বরং তারা মুসলমানই ছিল। তাদের মধ্যে কিছু নেক ও সৎ লোকের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যারা এই অভিযানকে ইসলামী খেলাফতের স্থিতিশীলতার মাধ্যম মনে করে শরিক হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সৈন্যরা বেতন, পুরস্কার এবং গনিমতের জন্য এসেছিল। দৃশ্যত লুটতরাজ এই সাধারণ সৈন্যরা করেছিল যাদের উদ্দেশ্যই ছিল পার্থিব স্বার্থ। যখন তাদেরকে লুটতরাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা পিছপা হয়নি কারণ তারা আগে থেকেই মদিনাবাসীদের বিদ্রোহী হিসেবে দেখত। যাই হোক, এই লুটতরাজ অত্যন্ত দুঃখজনক এবং শরীয়ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ নাজায়েজ ছিল। বিশেষ করে এজন্য যে মদিনা শহরের আদব ও সম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব ছিল।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৯, হাসান সনদে।

[২] এখন কথা হলো লুটতরাজের নির্দেশ কি মুসলিম বিন উকবা নিজের পক্ষ থেকে দিয়েছিলেন নাকি এটি ইয়াজিদের নির্দেশ ছিল? লেখক যতটুকু অনুসন্ধান করেছেন, ইয়াজিদের পক্ষ থেকে এই অনুমতির সম্পৃক্ততার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য সনদের বর্ণনায় নেই। (তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৮৩ থেকে ৩৮৭; আনসাব আল-আশরাফ: ৫/৩২২, ৩৩৩) অথবা এটি ওয়াক্বিদীর বর্ণনা। (তাবাকাত ইবনে সাদ, মু'জামুস সাহাবা, তাবাকায়ে খামিসা, ত দারুস সিদ্দিক তায়েফ: ২/১৬৩; তারিখ দিমাশক: ৫৮/১০৬)। কিন্তু যেহেতু এই বর্ণনাগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের ওপর কোনো অপবাদ নেই, তাই সালাফদের ইলমী মূলনীতি অনুযায়ী এগুলো নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। যুক্তির খাতিরেও যদি দেখা যায়, তবে ইয়াজিদের অনুমতি ছাড়া মুসলিম বিন উকবার এত বড় দুঃসাহস করা অত্যন্ত সুদূরপরাহত; কারণ কারবালায় যা ঘটেছিল, তা যদি ইয়াজিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তবে এখন অবশ্যই প্রতিটি সেনাপতি যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হতেন। বিশেষ করে মদিনা মুনাওয়ারা সম্পর্কে যত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হতো ততই কম ছিল, কিন্তু মুসলিম বিন উকবা এখানে এমন স্বাধীনভাবে জুলুম চালিয়েছেন যেন ইয়াজিদ বিন জিয়াদের মতো কেন্দ্রীয় কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় তার ছিল না। এই কারণেই যে সকল সালাফ হুসাইনের (রা.) ঘটনার দায় ইয়াজিদের ওপর চাপানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন, তাঁরাও মদিনার পবিত্রতা লঙ্ঘনের দায় থেকে তাকে কখনোই মুক্ত মনে করতেন না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াজিদকেই দায়ী করা হয়েছে, তিনি বলতেন: “هو الذى فعل بالمدينة ما فعل” (সেই তো মদিনায় যা করার তা করেছিল)। জিজ্ঞাসা করা হলো: সে কী করেছিল? তিনি বললেন: “نهى” (সে মদিনাকে লুণ্ঠন করেছিল)। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, খণ্ড: ৮৩৫, সহিহ সনদে, ত দারুস রায়াহ)। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.), যিনি যথাসম্ভব ইয়াজিদের ওপর রাফেজিদের পক্ষ থেকে আরোপিত মিথ্যা অপবাদগুলোর প্রতিরক্ষা করেন, তিনি এ বিষয়ে বলেন: “فبعث اليهم جيشا وامره اذا لم يطيعوه بعد ثلاث ان يدخلها بالسيف و يبيحها ثلاثا” (ইয়াজিদ মদিনাবাসীদের দিকে একটি বাহিনী পাঠায় এবং তাকে নির্দেশ দেয় যে, যদি তারা তিন দিন পর্যন্ত আনুগত্য প্রকাশ না করে তবে তলোয়ারের জোরে মদিনায় প্রবেশ করতে এবং তিন দিন পর্যন্ত তা লুণ্ঠন করতে)। (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩/৪১২)।

[৩] আবু সাঈদ মাওলা আল-মাহরী থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাররার রাতে আবু সাঈদ খুদরীর কাছে আসলেন এবং মদিনা থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। (সহিহ মুসলিম, হা: ৩৩০৫, কিতাবুল হজ)।

[৪] সহিহ মুসলিম, হা: ৩৩১১, কিতাবুল হজ, বাবুত তারগিব ফি সাকানিল মদিনা।

মুসলিম বিন উকবার জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ:

বিজয়ের নেশায় মত্ত হয়ে মুসলিম বিন উকবা মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করল এবং লোকদের কাছ থেকে ইয়াজিদের আনুগত্যের বাইয়াত নিল। এই কার্যক্রমেও সে চরম কঠোরতা প্রদর্শন করল। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িত থাকার বা যুদ্ধকারীদের পক্ষ নেওয়ার সন্দেহ ছিল, তাদের সবাইকে একত্রিত করে ঘোষণা করল: “এই শর্তে বাইয়াত করো যে, তোমরা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার গোলাম। সে তোমাদের ঘরবাড়ি এবং জান-মালের ব্যাপারে যা ইচ্ছা ফয়সালা করবে।” [১]

আবদুল্লাহ বিন জামআ (রা.) ছিলেন উম্মে সালামা (রা.)-এর আপন ভাগ্নে। [২] তিনিও মুসলিম বিন উকবার কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য আসলেন। যদিও তিনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার পুরনো বন্ধু ছিলেন, তবুও মুসলিম বিন উকবা তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করল এবং বলল: “এই শর্তে বাইয়াত করো যে, তুমি আমিরুল মুমিনিনের গোলাম। তিনি তোমার পরিবার-পরিজন এবং মালের ব্যাপারে যেকোনো ফয়সালা করার অধিকার রাখেন।”

আবদুল্লাহ বিন জামআ (রা.) বললেন: “আমি কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে নববীর অনুসরণের ওপর বাইয়াত করছি।”

মুসলিম বিন উকবা নির্দেশ দিল যে, তাকেও যেন হত্যা করা হয়। মারওয়ান বিন হাকাম দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আবদুল্লাহ বিন জামআ (রা.)-কে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং প্রাণভিক্ষার সুপারিশ করলেন, কিন্তু মুসলিম বিন উকবা একটি কথাও শুনল না এবং আবদুল্লাহ বিন জামআ (রা.)-কে হত্যা করেই ক্ষান্ত হলো। [৩]

মুসলিম বিন উকবা মদিনার প্রখ্যাত তাবেরী হযরত সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব (রা.)-কেও হত্যা করার সংকল্প করেছিল, কিন্তু মারওয়ান বিন হাকাম কসম খেয়ে তাকে বিশ্বাস করালেন যে, তিনি একজন পাগল লোক, তখন তাঁর প্রাণ রক্ষা পেল। [৪]

উম্মে সালামা (রা.) কর্তৃক ইয়াজিদের বাইয়াতকে “বাইয়াত-এ-দালালাত” ঘোষণা করা:

বাইয়াতের জন্য ঐসব লোকদেরও ডাকা হয়েছিল যারা বিদ্রোহে মোটেও শরিক ছিল না। এতে উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা (রা.) সহ মদিনার প্রবীণ সাহাবীগণ অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন এবং এই ধরনের জোরপূর্বক বাইয়াতকে “বাইয়াত-এ-দালালাত” (পথভ্রষ্টতার বাইয়াত) বলে অভিহিত করতেন।

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত সহিহ সনদের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য। জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন: “যখন মুসলিম বিন উকবা মদিনায় আসল তখন লোকদের কাছ থেকে বাইয়াত নিল, এটি হাররার যুদ্ধের পরের ঘটনা। মুসলিম বিন উকবার কাছে বনু সালামাও আসল। সে বলল: আমি তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত নেব না যতক্ষণ না জাবির আসে। জাবির বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে গেলাম যাতে তাঁর পরামর্শ নিতে পারি। তিনি বললেন: আমি অবশ্যই একে ‘বাইয়াত-এ-দালালাত’ মনে করি, কিন্তু আমি আমার ভাই আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়াকেও নির্দেশ দিয়েছি সে যেন তার কাছে যায় এবং বাইয়াত করে নেয়। হযরত জাবির (রা.) বলেন, অতঃপর আমিও গিয়ে বাইয়াত করে নিলাম।” [৫]

[১] তারিখ খলিফা, পৃ. ২৩৯ আন জুওয়াইরিয়া বিসানাদিন সহিহ; আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩৩৫ বিসানাদিন সহিহ; তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৫ বিসানাদিন সহিহ।

[২] উসদুল গাবাহ: ৩/৩৩৬, আল-ইসাবাহ: ৪/৮৩।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৯ বিসানাদিন সহিহ।

[৪] তাজকিরাতুল হুফফাজ লিজ জাহাবি: ১/৩৫।

[৫] আখরাজাহ ইবনে হাজার বিইসনাদিন সহিহ, (আল-ইসাবাহ: ৩/১১ ত ত ইলমিয়াহ)।

প্রকৃতপক্ষে হাররার ঘটনায় মুসলিম বিন উকবার ভূমিকা এতটাই দুঃখজনক ছিল যে এর কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, এই কারণেই আসলাফ তাকে ‘মুসরিফ বিন উকবা’ বলে স্মরণ করতেন। [১]

সিরীয় বাহিনী কি শ্লীলতাহানি করেছিল?

এটি প্রসিদ্ধ যে সিরিয়ার বাহিনী মদিনার নারীদের শ্লীলতাহানি করেছিল। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎসসমূহ: তারিখ তাবারী, তাবাকাতে ইবনে সাদ, আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি এবং তারিখ খলিফাতে এমন কোনো বর্ণনা বিদ্যমান নেই। ওয়াকিদি এবং আবু মুখনাফও এমন কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করেননি। এই সংযোজনটি হয়তো আল-মাদাইনির একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যাতে উল্লেখ আছে: “হাররার ঘটনার পর, এক হাজার নারী বিবাহ ছাড়াই সন্তান প্রসব করেছিল।” [২]

দ্বিতীয়ত, ইমাম বায়হাকী একে মুগীরা বিন মিকসাম (মৃত্যু ১৩৬ হিজরি) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: “মুগীরার ধারণা যে এই উপলক্ষে এক হাজার কুমারী মেয়ের সাথে জিনা করা হয়েছিল।” [৩]

যৌক্তিক দিক থেকে দেখলে সেই যুগে এমন ঘটনা ঘটা খুবই অসম্ভব ছিল কারণ মুসলিম বাহিনী বারবার কাফেরদের শহরগুলো দখল করেছে, সেখানেও নারীদের সাথে কখনো এমন আচরণ করা হয়নি, তাহলে একটি ইসলামী শহর এবং তাও মদিনা মুনাওয়ারায় এমন গণপাপের প্রদর্শন তারা কীভাবে করত!! হ্যাঁ, দু-একজন হতভাগা এমন কাজ করেছিল যেমনটি উম্মুল হাইসাম বিনতে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার সামনে এক নারী ‘ইয়াওমুল হাররা’র দিন নিজের ইজ্জত লুণ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। [৪]

একটি বর্ণনায় আছে যে, আবদুল্লাহ বিন মুতি رضى الله عنه একটি বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। একজন সিরীয় সৈন্য সেখানে ঢুকে গৃহকর্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের চেষ্টা করলে আবদুল্লাহ বিন মুতি رضى الله عنه তাকে হত্যা করেন। [৫] সম্ভবত এই কারণেই শুধু হাফেজ ইবনে হাজার رحمه الله-ই নন বরং ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله-ও আংশিকভাবে শ্লীলতাহানির ঘটনাগুলোকে স্বীকার করেছেন। [৬]

যাই হোক, গণহারে শ্লীলতাহানি প্রমাণিত নয়। যদি এমন হতো তবে সম্ভবত আবদুল্লাহ বিন উমর رضى الله عنه-এর মতো ব্যক্তিদের অবস্থানও বদলে যেত, অথচ আবদুল্লাহ বিন উমর رضى الله عنه হাররার ঘটনার পরেও আবদুল্লাহ বিন মুতি رضى الله عنه-কে মক্কায় যেতে বাধা দিচ্ছিলেন এবং সরকারের আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছিলেন। [৭]

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৬/৩৭৫, ত. ইলমিয়াহ; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩২৩, ত. রিসালাহ।

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাজি, ৫/৬; আল-মাদাইনির কিতাবুল হাররা থেকে উদ্ধৃত, বর্ণনার সনদ দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন।

[৩] “মুগীরা দাবি করেছেন যে সেখানে এক হাজার কুমারীর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে।” (দালায়েলুন নুবুওয়াহ: ৬/৩৭৫, ত. ইলমিয়াহ) বর্ণনার সনদ দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন।

[৪] আল-মুনতাজাম: ৬/১৫; ওয়াফাউল ওয়াফা: ১/১৩২, খালিদ আল-কিন্দি থেকে তিনি তার ফুফু উম্মুল হাইসাম বিনতে ইয়াজিদ থেকে।

[৫] সিরিয়ার এক লোক সেই নারীর ঘরে প্রবেশ করল যেখানে ইবনে মুতি আত্মগোপন করেছিলেন, সে তাকে দেখে মুগ্ধ হলো এবং তার সাথে কুকর্ম করতে চাইল, কিন্তু নারীটি তাকে বাধা দিল। তখন সে তাকে আক্রমণ করল। ইবনে মুতি এটি দেখে সেখানে প্রবেশ করলেন এবং সিরীয় লোকটিকে হত্যা করে তাকে উদ্ধার করলেন। (আল-ইসাবাহ: ৫/৩২০)

[৬] ফলে তার বাহিনী মদিনা মুনাওয়ারায় তিন দিন পর্যন্ত হত্যা, লুণ্ঠন এবং নিষিদ্ধ যৌনাচারে লিপ্ত ছিল। (মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া: ৩/৩১২) আরও দেখুন: আল-ইসাবাহ: ৬/২৩৩, জীবনী: মুসলিম বিন উকবা; আল-ওয়াসিয়াতুল কুবরা লি ইবনে তাইমিয়া ২৫।

[৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/১৩৬, হাসান সনদে, ত. সাদির।

হাররাহ ঘটনার ওপর হযরত আবু হুরায়রা-এর প্রতিক্রিয়া:

হাররাহ ঘটনা যখন ঘটল, তখন কিছু সাহাবায়ে কেরামের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল। তাদের নিকট ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এই সতর্কবাণীগুলোর লক্ষ্যবস্তু ছিল। মদিনা মুনাওয়ারার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আবু আব্দুল্লাহ আল-কারাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা-কে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সম্পর্কে বলতে শুনেছেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ হলো: যে ব্যক্তি এই শহর অর্থাৎ মদিনার অধিবাসীদের সাথে কোনো মন্দের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।” [১]

হাররাহ ঘটনার ওপর ইয়াজিদের প্রতিক্রিয়া:

হাররাহ ঘটনার ওপর ইয়াজিদের পক্ষ থেকে মুসলিম বিন উকবার জুলুমের নিন্দার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একটি বর্ণনায় আছে যে, সে মদিনাবাসীদের কষ্টের ওপর দুঃখ ও আফসোস প্রকাশ করেছিল। হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন:

“যখন ইয়াজিদ এই ঘটনার (হাররাহ) খবর পেল, তখন সে বলল: হায় আমার কওম! তারপর সে দাহহাক বিন কায়েস-কে ডাকল এবং বলল: মদিনাবাসীদের ওপর যা অতিবাহিত হয়েছে তা তোমার জানা আছে। বলো এর প্রতিকারের উপায় কী? তিনি বললেন: খাদ্য ও আর্থিক সাহায্য। ইয়াজিদ মদিনাবাসীদের জন্য খাদ্য সরবরাহের নির্দেশ দিল এবং তাদের জন্য আর্থিক সাহায্য জারি করে দিল।” [২]

[১] আব্দুর রাজ্জাক... আন বনী মা’শার কল সামি’তু আবা আব্দুল্লাহ আল-কারাত ইয়াকুলু সামি’তু আবা হুরায়রা ইয়াকুলু ফী ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া: “ইম্মা রাসূলাল্লাহ ﷺ কালা: মান আরাদা আহলা হাযিহিল বালদাতি বিসুয়িন ইয়ুরিদুল মদিনাতা আযাবাহুন্নাহ তা’আলা কামা ইয়াদুবুল মিলছ ফিল মা-ই।” (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৪৭১)

বর্ণনাকারীদের অবস্থা: আব্দুর রাজ্জাক: সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। আবু মা’শার নাজিহ বিন আব্দুর রহমান আস-সিন্দি (মৃত্যু: ১৭০ হিজরি): ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহইয়া বিন মাস্নিন তাকে ‘সালেহ’ ও ‘লাইয়িনুল হাদিস’ বলেছেন। তবে ইয়াহইয়া বিন মাস্নিন তাকে ‘যয়ীফ’ও বলেছেন। (তহযীবুল কামাল: ৩২৯/২৯) আবু আব্দুল্লাহ আল-কারাত (মৃত্যু: ১১০ হিজরি): সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনাকারী। এই বর্ণনাটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত) সনদ হলে তা সহীহ হবে। আবু মা’শারের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে, কিন্তু এটি তার হেফজ বা মুখস্থ শক্তির কারণে, মিথ্যাচার বা ফাসেকির কারণে নয়। ইমাম তিরমিজি বলেন: আবু মা’শার যার নাম নাজিহ মাওলা বনী হাশিম, ইলম অর্জনকারীদের কেউ কেউ তার হেফজ বা মুখস্থ শক্তির কারণে তার সমালোচনা করেছেন। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২১৩০) তবে তিনি সিয়ার বা ইতিহাসে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মাগাযী বা যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন কিন্তু তার সনদ দলিল হিসেবে পেশ করার মতো নয়। (মাওসুআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, পৃষ্ঠা: ৩৩০২)

যাই হোক, ইতিহাসবিদ মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি গ্রহণযোগ্য। আবু দাউদ ও তিরমিজি, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ-তে তার বর্ণনা রয়েছে। এই বিবেচনায় উল্লিখিত বর্ণনাটিকে ‘হাসান’ বলা যেতে পারে।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৫৫/১১, ৬৩ হিজরির ঘটনাবলী, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার জীবনী।

এই বর্ণনাটি ‘কিতাবুল ফিতান’-এ নেই। হাফেজ ইবনে কাসীর এটি সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন, যা সম্ভবত কোনো ঐতিহাসিক থেকে বর্ণিত। এর সনদ সহীহ হওয়ার কোনো প্রমাণ আমাদের সামনে নেই, তবে এর বিষয়বস্তু এমন নয় যে কেউ একে অসম্ভব মনে করবে। বলা যেতে পারে যে ইয়াজিদ এভাবে তার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছিল। আর যদি এই বর্ণনাটি যয়ীফ বা দুর্বল হয় এবং ইয়াজিদ মদিনাবাসীদের ওপর কোনো সমবেদনা প্রকাশ না করে থাকে, তবে এটি তার ওপর কুফরের অভিযোগ আরোপ করার জন্য যথেষ্ট নয়। আসলে হাররাহ ঘটনা সম্পর্কে একটি দুর্বল বর্ণনা প্রকাশ করে যে ইয়াজিদ বেঈমান ছিল। এতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াজিদ যখন হাররাহ বিজয় এবং মদিনাবাসীদের পরাজয়ের খবর পেল, তখন সে এই কুফরি কবিতাগুলো পাঠ করেছিল:

“হায় বদরে (নিহত হওয়া) আমার মুরুব্বরা যদি উপস্থিত থাকতেন... খাযরাজ (আনসার)-এর আর্তনাদ দেখতেন।” (আনসাবুল আশরাফ: ৩৪৩/৫)

এই কবিতাগুলো ইবনে যিব’আরী উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের সময় পাঠ করেছিলেন। (তারিখে তাবারী: ৩৩৯/২, পরে ইবনে যিব’আরী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)। বালাযুরি এটি ‘বলা হয়’ (কিলা) শব্দ দিয়ে পেশ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে কেউ কেউ এই কবিতাগুলো ইয়াজিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে। এই বর্ণনার ওপর বিশ্বাস করা হলে ইয়াজিদের ঈমানও শেষ হয়ে যায়। মনে হয় যেন সে মদিনার সাধারণ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বদরে নিহত কুরাইশ কাফেরদের প্রতিশোধ নিয়েছিল। এটি একটি অত্যন্ত আপত্তিকর বিষয় যা রাফেজিদের কাজ। জমহুর মুসলিমগণ ইয়াজিদকে কাফের মনে করেন না, তাই হাফেজ ইবনে কাসীর এই বর্ণনার প্রতিবাদ করা জরুরি মনে করেছেন।

(বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার ঢিকায়)

জুলুম, কুফর না কি মুনাফিকি:

এটা প্রমাণিত নয় যে, ইয়াজিদের মদিনা বা মক্কায় সৈন্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া এবং মুসলিম বিন উকবার আক্রমণ করা কোনো কুফর ও নিফাকের আবেগের বশবর্তী ছিল, বরং বাহ্যত এসবই ছিল ক্ষমতার লালসার ফল। অর্থাৎ এই লোকেরা যেকোনোভাবে নিজেদের ক্ষমতা এবং নিজেদের সরকারের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন, নেককার এবং বুজুর্গ ছিলেন, কিন্তু সরকারের দৃষ্টিতে তারা ছিল আইনত বিদ্রোহী যাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ব্যবহার করা শাসকরা নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার মনে করত। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সরকারি লোকেরা যে পর্যায় পর্যন্ত জুলুম করেছে, সেগুলোকে সেই সীমার মধ্যেই রাখা উচিত। এই অভিযানগুলোতে যেসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সেগুলোতে ঈমানদারদের ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক বিষয় এবং সেগুলোর নিন্দা করা আবশ্যিক, কিন্তু এই ট্র্যাজেডিগুলোকে শাসকদের তাকফির, ধর্মহীনতা বা মুনাফিকির দলিল বানানো যাবে না।

যা-ই হোক, উম্মতের উলামায়ে কেরাম ইয়াজিদ এবং তার শাসকদের এই আচরণকে কখনোই সঠিক মনে করেননি বরং এর তীব্র নিন্দা করেছেন। যেসব ব্যক্তি ইয়াজিদ বা তার শাসকদের জুলুমের শিকার হয়েছেন তারা অত্যন্ত সম্মানীয় ছিলেন। তাদের মধ্যে যারা লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন তারা একটি মহৎ উদ্দেশ্যে, নেক আবেগের সাথে, একটি শরয়ি তাউইলের ভিত্তিতে লড়াই করছিলেন। তাই উম্মতের উলামায়ে কেরাম তাদের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা, পরকালীন উচ্চ মাকাম এবং আজর ও সওয়াবের আশা রাখেন।

গত পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা: ইয়াজিদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মাদাইনির একটি এমন বর্ণনা পাওয়া গেছে যা উল্লিখিত বর্ণনার বিপরীত ছিল। সুতরাং তিনি এর সনদের অবস্থা কী তা বিবেচনা না করেই এটি পেশ করেছেন; কারণ এর বিপরীতে দ্বিতীয় বর্ণনাটিও অত্যন্ত দুর্বল ছিল। **حناح** হাফেজ ইবনে কাসির ইয়াজিদ এবং দাহহাক বিন কায়েস ফিহরির কথোপকথন সংক্রান্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে লিখেন: “এই বর্ণনাটি মিথ্যাবাদী রাফেজিদের বর্ণিত কথার বিপরীত যাতে বলা হয়েছে যে, ইয়াজিদ মদিনাবাসীদের হত্যাকাণ্ডে খুশি হয়েছিল, তার অন্তর শীতল হয়েছিল এবং সে ইবনুল জিবআরির গর্বিত কবিতাগুলো পড়েছিল।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৬৫৫)

হাফেজ ইবনে কাসিরের পূর্বে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ইয়াজিদের উক্ত গর্বিত কবিতাগুলো পড়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। (মিনহাজ্জুস সুন্নাহ: ৪/৫৪৯, ৫৫০) হাফেজ ইবনে কাসির এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহর ভারসাম্য ও ইনসাফের প্রশংসা করা উচিত যে, তারা ইয়াজিদের মন্দ কাজগুলোকে সেই সীমা পর্যন্তই রেখেছেন যে সীমা পর্যন্ত সেগুলো প্রমাণিত ছিল। কিন্তু তাদের এই আচরণ থেকে যদি কেউ এই অর্থ নিতে চায় যে, এই ব্যক্তিবর্গ ইয়াজিদের প্রশংসাকারী ছিলেন এবং তাকে একজন ফেরেশতাসুলভ শাসক মনে করতেন, তবে তা হবে অসততা ও গোঁড়ামির চরম পর্যায়।

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এবং ইয়াজিদ

এই সমস্ত ঘটনার সময় রাসূল (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) মক্কা মুকাররমায় মাসজিদুল হারামের চার দেয়ালের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, অন্তত মহাবিশ্বের এই পবিত্রতম কোণে তিনি নিরাপদ থাকবেন। মক্কা মুকাররমায় বছরের চার মাস হাজীদের জন্য এবং বাকি দিনগুলোতে ওমরাহ পালনকারী ও ইবাদতকারীদের ভিড় থাকার কারণেও এই আশা করা যেত যে, সরকার এখানে কোনো সশস্ত্র ব্যবস্থা নেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়ে বদনাম কুড়াবে না। তাই তিনি নিজের উপাধি ‘আল-আইজু বিল্লাহ’ বা ‘ইয়া আইজু বাইতিল্লাহ’ (আল্লাহর ঘরে আশ্রয় গ্রহণকারী) রেখেছিলেন। [১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর অবস্থান ছিল সেই একই যা আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়ে ছিল; অর্থাৎ মুসলিম সমাজে ক্ষমতার হস্তান্তর বংশানুক্রমিক হওয়া উচিত নয় বরং তা শুরার (পরামর্শ) ভিত্তিতে হওয়া উচিত, যেখানে মুহাজির ও আনসার এবং উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। যদিও অধিকাংশ সাহাবী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে খেলাফতে আফজালের (উত্তম ব্যবস্থা) পরিপন্থী বিষয়গুলো সহ্য করে নিচ্ছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) তাঁর ইলমি প্রজ্ঞা এবং সুন্নাহ অনুসরণের অসাধারণ আবেগের কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রাসূল (সা.)-এর পছন্দনীয় মানেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.)-এর অবস্থানও এটাই ছিল।

ইয়াজিদ মসনদে বসার পর যখন হযরত হুসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে বায়াত গ্রহণে বাধ্য করার চেষ্টা করল, তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) হঠাৎ রাতের অন্ধকারে মদিনা ত্যাগ করেন। [২] যখন তাঁরা মক্কায় পৌঁছে গেলেন, তখন ইয়াজিদ ওয়ালিদ বিন উতবাকে এর জন্য দায়ী মনে করে তাকে বরখাস্ত করেন এবং আমর বিন সাঈদকে নিযুক্ত করেন। [৩]

সহীহ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত যে, হযরত হুসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) মক্কায় আসার পরও বনু উমাইয়াদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র অভিযানের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। যেহেতু হযরত হুসাইন (রা.) মক্কায় রক্তপাতের সম্ভাবনা এড়াতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি এখানে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যাওয়ার আগে তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে বলেছিলেন: “অন্য কোথাও নিহত হওয়া আমার কাছে পছন্দনীয়, কিন্তু হারামে রক্তপাত আমার কাছে অসহনীয়।” [৪]

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে হযরত হুসাইন (রা.) ইরাকবাসীর সমর্থনে সরকারের সংস্কারের প্রচেষ্টায়...

[১] তারিখ দামেশক: ২৮/২০৩-২০৫; আনসারুল আশরাফ: ৫/৩০৩, দারুল ফিকর।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৩।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৩।

[৪] আখবারু মক্কা লিল-ফাকিহি: ২/২২১ সনদ সহীহ, দারুল খিজর।

সাফল্যের আশা নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং সেখানে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা এবং মক্কা মুকাররমার পবিত্রতা ছাড়াও নিজেদের দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ কিছুকাল তাঁর ওপর হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকে। এই সময়ে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, কেউ তাঁকে তাঁর ফতোয়া ও বিবেকের বিরুদ্ধে বায়আত করতে বাধ্য করছে না। তিনি হারামে আশ্রয় নিয়ে উন্নত পরিস্থিতির অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সারাদিন খানায়ে কাবা তাওয়াফ করতেন, নফল নামাজ পড়তেন এবং অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটাতেন। তিনি কারও বিরোধিতা করতেন না এবং কেউ তাঁকে পাকড়াও করত না। [১]

আমর বিন সাঈদের মক্কা অভিযান:

তবে সরকার ক্রমাগত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ন্ত্রণে আনার চিন্তায় ছিল। তাঁর মক্কায় পৌঁছানোর মাত্র এক মাস পর ৬০ হিজরির রমজান মাসে হিজাজের নতুন উমাইয়া গভর্নর আমর বিন সাঈদ মসজিদে নববীর মিম্বর থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দেওয়ার সময় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর কঠোর সমালোচনা করেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেন: “সে মক্কায় আশ্রয় নিয়েছে তো কী হয়েছে, আল্লাহর কসম! আমরা সেখানেও তার ওপর হামলা করব এবং সে যদি মক্কায় প্রবেশ করে থাকে তবে মক্কাকে তার চারপাশে জ্বালিয়ে দেব, তাতে কারও নাক কাটা গেলে যাক।” [২]

মদিনা বা মক্কায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাদের সংক্ষিপ্ত দল আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো জনপ্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে ধরতে পারত না। এটি একটি বড় সামরিক অভিযান ছাড়া সম্ভব ছিল না এবং ইয়াজিদের সরকার যা সেই সময় নিজেই টালমাটাল ছিল, তা সহ্য করার মতো ছিল না। যদি দামেস্কে কোনো বড় বাহিনী একত্রিত করা হতো তবুও এই কাজ অবিলম্বে করা সম্ভব ছিল না কারণ মক্কার মতো অনুৎপাদনশীল এলাকায় কোনো বাহিনীর ছাউনি ফেলা সাহায্য ও রসদের দীর্ঘ ও শক্তিশালী লাইন স্থাপন করা ছাড়া সম্ভব ছিল না।

ইয়াজিদের সরকারের পা জমিয়ে বসতে এবং সামরিক অভিযানের শক্তি অর্জন করতে কিছুটা সময় লেগে গেল। তারপর অভিযানের জন্য চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তুতিতেও কিছু দিন লাগল। এরপর হারামের পবিত্রতা বা কোনো ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বিবেচনা না করেই আমর বিন সাঈদ নিজের সংকল্প অনুযায়ী কাজ করলেন এবং দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী মক্কায় পাঠালেন। সেই সময় একজন সাহাবী আবু শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর বিন সাঈদকে নিষেধ করে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে বললেন:

“হে আমির! যদি অনুমতি দেন তবে একটি হাদিস শোনাই যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে সরাসরি নিজের কানে শুনেছি, নিজের চোখে দেখেছি এবং নিজের হৃদয়ে তা সংরক্ষিত রেখেছি। আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মক্কাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীর জন্য এখানে রক্তপাত করা বৈধ নয়, এমনকি এখানকার গাছ উপড়ানোও বৈধ নয়।”

সাহাবীর এই উপদেশমূলক কথা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের জবাবে আমর বিন সাঈদ অত্যন্ত কঠোরভাবে বললেন: “আবু শুরাইহ! আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি যে মক্কা কোনো গুনাহগার, কোনো পলাতক খুনি এবং কোনো পলাতক অপরাধীকে বাঁচাতে পারে না।” [৩]

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৩৩৩, তারিখ দিমাশক: ২৮/৪০৭

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৩৩

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪২৯৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব মানযিলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াওমাল ফাতহ

আমর ইবনে সাঈদের বাহিনী মক্কায় পৌঁছালে মক্কাবাসীরা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর দক্ষিণহস্ত আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ানের নেতৃত্বে সমবেত হয় এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত আমর ইবনে সাঈদের বাহিনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। [১]

এই অভিযানের ব্যর্থতায় আমর ইবনে সাঈদের বিরোধী আমীরগণ ইয়াজিদকে বিশ্বাস করান যে, আমর ইবনে সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অবহেলা করেছেন। ফলে ইয়াজিদ আমর ইবনে সাঈদকে অপসারণ করে পুনরায় ওয়ালিদকে হিজাজে নিযুক্ত করেন। [২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ব্যক্তিত্বের নেতিবাচক চিত্রায়ন?

ঐতিহাসিকগণ সহীহ ও যয়ীফের (সঠিক ও দুর্বল) পার্থক্য না করেই এমন ডজনখানেক ভুল বর্ণনা গ্রহণ করেছেন যা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে একজন ফিতনাবাজ, ক্ষমতালোভী এবং অদূরদর্শী নেতা হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) ফিতনাবাজ ছিলেন না এবং ক্ষমতার লোভীও ছিলেন না। তিনি ইয়াজিদের মৃত্যু পর্যন্ত খেলাফত বা শাসনের দাবিও করেননি। [৩]

হযরত হুসাইন (রা.)-এর মতো তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল উম্মাহর সঠিক রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলতেন: “আল্লাহর কসম! আমার নিয়ত সংস্কার এবং সত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়।” [৪]

তিনি নিজেকে আমীর বা খলিফা বলতেন না এবং নিজের শাসনের দিকেও আহ্বান জানাতেন না, বরং তিনি এই অবস্থান প্রচার করতেন যে, মুসলিম উম্মাহর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে *شورائیت* (পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা) এবং *مجلس شوری* (পরামর্শ সভা)-কে শাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে সক্রিয় ও ক্ষমতাধর স্থান দিতে হবে। [৫]

হিজাজের অধিকাংশ মানুষ মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর সাথে ছিল এবং তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে যাতে তিনি শাসক হিসেবে হিজাজের শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি এতটাই নিঃস্বার্থ ছিলেন যে তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। তবে এই ধরনের সংবাদ ইয়াজিদকে অবশ্যই চিন্তিত করে তুলেছিল এবং সে তার টলটলায়মান ক্ষমতা হারানোর তীব্র আশঙ্কা করছিল। [৬]

ইয়াজিদের প্রস্তাব:

মক্কায় ব্যর্থ হামলার পর ইয়াজিদ হঠাৎ নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। সে নুমান ইবনে বশীর (রা.) এবং হান্নাম ইবনে কুবাইসা (রা.)-কে পাঠিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর কাছে প্রস্তাব দেয় যে, তিনি যদি বায়াত গ্রহণ করেন তবে তাঁকে পুরো হিজাজের *ولايت* (শাসনভার) দিয়ে দেওয়া হবে।

[১] তারিখ তাবারী: ৫/ ৩৩৪ থেকে ৩৪০। এই যুদ্ধের বিবরণ ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যাতে এও রয়েছে যে, আমর ইবনে সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ভাই নুজারকে সাথে নিয়ে তাঁর মাধ্যমে আক্রমণ করান, আমর ইবনে জুবায়ের পরাজিত ও বন্দী হন, তিনি যাদের প্রহার করেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) আমরকে তাদের হাতে সোপর্দ করেন, তারা এমন কঠোর প্রতিশোধ নেয় যে আমর ইবনে জুবায়ের মারা যান। ওয়াকিদীর এই বর্ণনাগুলো সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিভিন্ন ধরনের অপবাদে কলুষিত, তাই আমরা এগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করি না, তবে আমর ইবনে সাঈদের আক্রমণ এবং পিছু হটা প্রমাণিত। এটিও মনে রাখা উচিত যে, ওয়াকিদী এই আক্রমণের বছর ৬০ হিজরি বলেছেন কিন্তু এটি অসম্ভব ছিল কারণ ৬০ হিজরির রমজান মাসে আমর ইবনে সাঈদ মদিনার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং শাওয়াল মাসে হজের মৌসুম শুরু হয়ে যায়, আমর ইবনে সাঈদ হজের জন্য মক্কায় পৌঁছেছিলেন এবং তিনি রাতে সৈন্য পরিচালনা করেননি। (আল-মিহান, পৃ. ১৩৯), একইভাবে ৬০ হিজরির শেষ পর্যন্ত মদিনায় তাঁর উপস্থিতিতে মক্কায় আক্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। যদি এমনটি হতো তবে অস্বাভাবিক রক্তপাত হতো যা অত্যন্ত পরিচিত হতো। অন্যান্য প্রমাণ থেকে স্পষ্ট যে ওয়াকিদীর বর্ণনা ভুল, এই আক্রমণ ৬১ হিজরিতে হয়েছিল, এর ব্যর্থতায় আমর ইবনে সাঈদকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

[২] তারিখ তাবারী: ৫/ ৩৪৭

[৩] তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ২৫৭, ২৫৮

[৪] আল্লাহর কসম! আমি সংস্কার এবং সত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই চাই না। (আনসাবুল আশরাফ: ৫/ ৩১৫, তবা দারুল ফিকর)

[৫] ইবনে জুবায়ের এর আগে চেষ্টা করেছিলেন যেন উম্মাহর মধ্যে পরামর্শ ব্যবস্থা কয়েম হয়। (তারিখ খলিফা, পৃ. ২৫৮)

[৬] মক্কাবাসীরা ইবনে জুবায়েরের বায়াত গ্রহণ করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। (তারিখ খলিফা, পৃ. ২৫২)

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস — দ্বিতীয় খণ্ড

এবং তারা তাদের পরিবারের যেকোনো সদস্যকে যেখানে ইচ্ছা শাসক নিযুক্ত করতে পারেন।

যদি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করা হতো, তবে তাঁর জন্য এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কোনোটি ছিল না, কিন্তু তিনি একটি মূলনীতির ভিত্তিতে ইয়াজিদের সাথে দ্বিমত পোষণ করছিলেন। তাই তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন। [১]

কিছু ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর এই প্রত্যাখ্যানকে অদূরদর্শিতা হিসেবে গণ্য করেছেন, কিন্তু এটি সঠিক নয়। আসল বিষয়টি ছিল এই যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর ইয়াজিদের হাতে বায়আত না করা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ ও ফতোয়ার ভিত্তিতে। আর সেই সময়ে বায়আত থেকে বিরত থাকার মূল কারণ অর্থাৎ ক্ষমতায় বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার এবং একটি পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য যেমন ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছিল, বরং কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার কারণে সরকারের কর্মকাণ্ডের ওপর আরও অনেক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছিল। এমনকি যদি ইয়াজিদকে সরাসরি জড়িত নাও মানা হয়, তবুও নমনীয় ভাষায় তার সরকারকে ব্যর্থ হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে।

এছাড়া ইয়াজিদের ফাসেক ও পাপাচারের খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে হিজাজে এই খবরগুলো নিশ্চিত রূপ লাভ করেছিল (মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ এই বিশ্বাসের কারণেই হয়েছিল)। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-ও তাঁর মুজতাহিদসুলভ মতামতের ভিত্তিতে একজন ফাসেক শাসককে শক্তির মাধ্যমে অপসারণ করা ওয়াজিব মনে করতেন। তাই ইয়াজিদের সরকারের অংশ হওয়া তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। [২]

ইয়াজিদের শপথ

ইয়াজিদ, যে যেকোনো মূল্যে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে রাজি করাতে চেয়েছিল, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ফলে অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। সে ক্ষিপ্ত হয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে অপমান করার সিদ্ধান্ত নিল এবং শপথ করল যে, এখন সে তাঁর বায়আত তখনই গ্রহণ করবে যখন তাঁকে হাতকড়া এবং গলায় বেড়ি পরিয়ে আনা হবে। [৩] ইয়াজিদের উপদেষ্টারা তাকে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সাথে কঠোর আচরণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। ইয়াজিদের পুত্র মুয়াবিয়াও তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এমন অপমান কখনো গ্রহণ করবেন না। মুয়াবিয়া নিজের সমর্থনের জন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.)-এর মাধ্যমেও সুপারিশ করান, কিন্তু ইয়াজিদের সিদ্ধান্ত ছিল অটল। [৪] ইয়াজিদ আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর নামে চিঠি লিখল: “আমি তোমার কাছে রূপার শিকল, সোনার বেড়ি এবং রূপার হাতকড়া পাঠাচ্ছি। আমি শপথ করেছি যে, তুমি এগুলো পরেই আমার কাছে আসবে।” [৫]

ইয়াজিদের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ বিন মাসআদা ফাজারি (রা.) এবং ইবনে আজাহ আশআরি বন্দিত্বের এই অলঙ্কার নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ইয়াজিদ তাঁদের একটি টুপিযুক্ত জুব্বা (বুরনুস)-ও দিয়েছিল যাতে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে বেড়ি ও শিকল পরানোর পর সেটি পরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাঁর পর্দা বজায় থাকে। [৬]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫২

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫২

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫২; মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ২০৮৩

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতাম্মিমুস সাহাবা তাবাকা খামিসা: ৩৩, ৩৪/২

[৫] তারিখ দিমাশক: ২০৯/২৮ সহিহ সনদে, হিশাম বিন উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর জীবনীতে

[৬] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ৩৩/২; তারিখুত তাবারী: ৪৬/৫; মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৬৩৩৭; হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩৩১/১

যদিও ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, এই পদক্ষেপটি কেবল খলিফার শপথ পূর্ণ করার জন্য, তবে এটা স্পষ্ট যে আসল উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গ্রেফতার করা। অন্যথায় ইয়াজিদ চাইলে তার জন্য শপথের কাফফারা দেওয়া কি কঠিন ছিল?

ইয়াজিদের দূত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ইবনে আযা বললেন:

‘মজলুম খলিফা হযরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্য ও সুরক্ষায় আপনার ভূমিকা কারো কাছে গোপন নয়, কিন্তু আমিরুল মুমিনীন ইয়াজিদ এই কারণে রাগান্বিত হয়েছেন যে, আপনি নুমান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যস্থতায় পাঠানো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই আমিরুল মুমিনীন শপথ করেছেন যে, আপনাকে হালকা হাতকড়া পরিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হবে।’ [১]

عبدالله بن زيبر رضى الله عنه نے اس ذلت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: ’اللہ اس کی قسم پوری نہ ہونے دے۔‘

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অপমান গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন: ‘আল্লাহ তাঁর শপথ পূর্ণ হতে দেবেন না।’

তারপর এই কবিতাগুলো পাঠ করলেন:

إِنِّي لَمِنْ نَبْعَةٍ صُمِّمَ مَكْرِهَا ... إِذَا أَنَا وَحَسِبَ الْقَضَاءُ وَالْعَشْرُ

‘আমি সেই শাখা যা নুইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্ত, যদিও বড় বড় গাছ নুইয়ে যায়।’

وَلَا أَلَيْنُ لَغَيْرِ الْحَقِّ أَمَالَهُ ... حَتَّى يَلِينَ لِضَرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرِ

‘আমি যে হকের প্রত্যাশী তা ছাড়া নরম হব না, যতক্ষণ না কোনো চর্বণকারীর দাঁতে পাথর নরম হয়ে যায়।’

এ কথা বলে তিনি বললেন: ‘আল্লাহর কসম! সম্মানের সাথে তলোয়ারের আঘাত সহ্য করা অপমানের সাথে চাবুক খাওয়ার চেয়ে উত্তম।’ [২]

শেষে বললেন: ‘আল্লাহর কসম! আমি কখনো ইয়াজিদের বায়াত করব না এবং তার আনুগত্যের বলয়ে প্রবেশ করব না।’ [৩]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু আপস থেকে বিরত থাকলেন কেন?

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ পর্যন্ত ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, তাহলে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু আপস থেকে কেন বিরত থাকলেন?

আসলে এর কারণ ছিল এই যে, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সেই পরিস্থিতিতে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করা ছাড়া ব্যবস্থার সংস্কারের আর কোনো সম্ভাব্য পথ অবশিষ্ট ছিল না। তাছাড়া ইয়াজিদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর সরাসরি কোনো রোষানল আসেনি, তাই তিনি তাঁর কাছ থেকে উপযুক্ত আচরণের আশা করতে পারতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু সরাসরি ইয়াজিদের রোষানলের শিকার ছিলেন। [৪]

তাছাড়া কারবালার ঘটনার সময় ইয়াজিদের ফাসেকী ও পাপাচারের বিষয়টি তেমন প্রকাশ্য ছিল না যেমনটি পরে আলোচনার বিষয় হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হয় যে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকটও ইয়াজিদের ফাসেকী ও পাপাচার নিশ্চিত ছিল এবং জমহরের বিপরীতে তাঁর ইজতিহাদ এটাই ছিল যে, ফাসেক ব্যক্তি শাসনের যোগ্য থাকে না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) করা জরুরি হয়ে পড়ে এবং এর ওপর ‘নিষিদ্ধ খুরুজ’ (খুরুজে মানহি আনহু) প্রযোজ্য হয় না।

[১] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ৩/৩৩৭, তাবা দার খিজর; আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩০৮, তাবা দারুল ফিকর

[২] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৩/৯, হাসান সনদে

[৩] খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২৫০; তারিখুত তাবারানি: ৫/৩৭২, উত্তম সনদে

[৪] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ৩/৩৩৭, তাবা দার খিজর

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর [রা.] গ্রেফতারি দিতে অস্বীকার করার পর মক্কা মুয়াজ্জামায় পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন হলো যে, শহরটি কার্যত তার ভক্ত-অনুরাগীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসলো। সিদিকে আকবর [রা.] -এর নাতির চারপাশে জানবাজদের সশস্ত্র পাহারার কারণে শহরে একটি বিকল্প শক্তির উত্থান ঘটল এবং স্থানীয় উমাইয়া শাসকের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল।

মক্কায় এই পরিস্থিতি ছিল, আর এদিকে ৬৩ হিজরিতে মদিনাবাসী উমাইয়া শাসক উসমান বিন মুহাম্মদকে শহর থেকে বের করে দিয়ে নিজেদের শুরা ভিত্তিক সরকার কায়েম করল, যার ফলে দামেস্কের সাথে মক্কার যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং মক্কায় আবদুল্লাহ বিন যুবাইর [রা.] -এর অনুসারীদের অবস্থান আরও মজবুত হলো। [১] আবদুল্লাহ বিন যুবাইর [রা.] -এর নেতৃত্বে মিসওয়ার বিন মাখরামা [রা.], মুসআব বিন আবদুর রহমান বিন আউফ, আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান এবং জুবাইর বিন শাইবা -এর সমন্বয়ে চার সদস্যের একটি শুরা পরিস্থিতি সামাল দিল। [২] হিজাজবাসীদের দমনের জন্য ইয়াজিদ যে বাহিনী পাঠিয়েছিল, তার ফলে হাররার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে, যা জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তোলে।

শামী বাহিনীর মক্কার হারামের ওপর আক্রমণ:

হাররার যুদ্ধের তিন দিন পর মুসলিম বিন উকবা তার বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন। পথিমধ্যে অসুস্থতা অনেক বেড়ে গেল এবং বেঁচে থাকার কোনো আশা রইল না। ৭ই মহররম তিনি আবওয়ার কাছে মারা গেলেন। [৩] মৃত্যুর আগে তিনি ইয়াজিদের নির্দেশ অনুযায়ী হুসাইন বিন নুমাইরকে ডেকে নিজের স্থলাভিষিক্ত সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। [৪] তিনি তাকে কঠোরভাবে বলেছিলেন: “কুরাইশদের ব্যাপারে সতর্ক থেকে এবং তাদের সাথে মুনাফিকি আচরণ করো।” [৫] এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন: “সেখানে পৌঁছে ব্যুহ তৈরি করবে, আক্রমণ করবে এবং ফিরে আসবে। কোনো কুরাইশীর পরামর্শে কান দেবে না।” [৬] তার ভয় ছিল যে, কুরাইশ নেতারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারে। হুসাইন বিন নুমাইর ২৬ বা ২৭শে মহররম ৬৪ হিজরিতে মক্কা আক্রমণকারী বাহিনীর সাথে সেখানে পৌঁছে গেলেন। [৭] অন্যদিকে মক্কাবাসীও তাদের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। বেশ কয়েক দিন ব্যর্থ আলোচনার পর ১৩ই সফর ৬৪ হিজরিতে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। [৮]

মুনজির বিন যুবাইর [রা.] -এর মক্কায় আগমন এবং শ্রদ্ধেয়া মাতার সাথে সাক্ষাৎ:

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর [রা.] -এর বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ ভাই মুনজির বিন যুবাইর [রা.] ইরাকে ছিলেন। ইয়াজিদ তার পক্ষ থেকেও বিপদ অনুভব করল। সে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশনামা পাঠাল, কিন্তু উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ ততদিনে ইয়াজিদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল, তাই সে মুনজির বিন যুবাইর [রা.] -কে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল এবং তিনি মক্কা অবরোধের আগেই হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর [রা.] -এর কাছে পৌঁছে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর [রা.] তার আগমনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫১; তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৩ হাসান সনদসহ।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতান্নিমুস সাহাবা আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৩৯।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ, জুয মুতান্নিমুস সাহাবা আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৬৭; তারিখুত তাবারী: ৫/৪৯৬।

[৪] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৩/৯৩ হাসান সনদসহ, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৫।

[৬] তাবাকাত ইবনে সাদ, জুয মুতান্নিমুস সাহাবা আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৬৭; আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৩/২২১।

[৭] আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩২, ত. দারুল ফিকর।

মুনজির বিন জুবায়ের (রা.) তাঁর শ্রদ্ধেয় মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর খেদমতে কিছু উন্নত মানের কাপড় পেশ করলেন। তিনি তা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে ফেরত দিলেন। এরপর মুনজির বিন জুবায়ের (রা.) সাধারণ সুতি কাপড় পেশ করলেন। হযরত আসমা (রা.) তা গ্রহণ করলেন এবং বললেন: “আমি এই ধরনের কাপড়ই পরি।” [১]

মুনজির বিন জুবায়ের (রা.)-এর বীরত্ব ও শাহাদাত:

মক্কা যখন অবরুদ্ধ হলো, তখন মুনজির বিন জুবায়ের (রা.)-ও হুসাইন বিন নুমাইরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে শরিক হলেন। সেখানে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর সাহসিকতার অবস্থা এই ছিল যে, তিনি সারাদিন শত্রুদের সাথে লড়াই করতেন এবং রাতে তাদের পাহারার ব্যবস্থা করতেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সাহসী মানুষ। আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) এই চল্লিশ বছর বয়সী নাতি জাবালে আবু কুবাইস এবং কুয়াইকিআন পাহাড়ের উচ্চতা থেকে সিরীয়দের বিরুদ্ধে এমনভাবে তলোয়ার চালাতেন যে, তিনি বীরত্বের সাথে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

لَمْ يَبْقَ إِلَّا حَسْبِي وَدِينِي وَصَارِمٌ تَلْتَذُّ بِهِ يَمِينِي

“আমার বংশীয় মর্যাদা এবং দীন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই... আর এই ধারালো তলোয়ারটি ছাড়া, যা আমার ডান হাতকে আনন্দ দেয়।”

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) মসজিদে হারামের প্রাঙ্গণ থেকে তাঁকে বাঘের মতো লড়াই করতে দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠতেন:

هَذَا رَجُلٌ يُقَاتِلُ عَنْ دِينِهِ وَحَسَبِهِ (এই সেই ব্যক্তি যে তার দীন এবং বংশীয় মর্যাদার জন্য লড়াই করছে।)

একদিন এক সিরীয় ব্যক্তি মুনজির বিন জুবায়ের (রা.)-কে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাল। দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে একে অপরের ওপর আক্রমণ করলেন। প্রত্যেকের বর্শা অপরজনের শরীর ভেদ করে চলে গেল। মুনজির বিন জুবায়ের (রা.) শহীদ হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) তাঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হলেন, কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে শুধু এতটুকু বললেন: “আবু উসমানও কাজে এসে গেল।”

মক্কার এক মহিলা মুনজির বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন:

قُلْ لِأَيِّ بَكْرِ السَّاعِي بِذِمَّتِهِ وَمُنْذِرٍ مِّثْلٍ لَيْثِ الْغَابَةِ الضَّارِي

“আবু বকরকে বলো, যিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আর মুনজির, যিনি বনের হিংস্র সিংহের মতো আক্রমণকারী ছিলেন।”

فَدَى لَكُمَا أُمِّي وَمَا وَلَدْتُ لَا تُوصِلِيَنِي إِلَى الْمُخْزَةِ وَالْعَارِ

“তোমাদের ওপর আমার মা এবং তাঁর সন্তানরা (তোমাদের মতো সন্তান) কুরবান হোক, (সাবাশ যে) তোমরা আমাকে লাঞ্ছনা ও অপমানে পতিত হতে দাওনি।” [২]

হুসাইন বিন নুমাইরের অবরোধ কঠোর থেকে কঠোরতর:

হুসাইন ধীরে ধীরে ঘেরাও সংকীর্ণ করতে লাগল। রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ উদিত হলে সে মসজিদে হারামের নিকটবর্তী পাহাড়সমূহ: জাবালে আবু কুবাইস...

[১] তারিখ দামেশক: ৬০/২৯০

[২] তারিখ ওফাত: ২০০/৬০

ফায়দা: মুনজির বিন জুবায়ের (রা.)-এর কন্যা ফাতেমা বিনতে মুনজির একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিসা ছিলেন। হাদিসের কিতাবসমূহে তাঁর অনেক বর্ণনা রয়েছে, যার মধ্যে বেশিরভাগই তিনি তাঁর দাদী আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র সহীহ বুখারীতেই ফাতেমা বিনতে মুনজিরের দশটি বর্ণনা রয়েছে।

এবং কুহে কাইকিয়ান দখল করে নিয়েছিল। এখান থেকে ওরা রবিউল আউয়াল সে মিনজানিকের মাধ্যমে অপরুদ্ধদের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করে [১], যা এতটাই তীব্র ছিল যে আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা তাওয়াফ করার জন্য কাবার কাছে আসতে পারছিলেন না। [২]

মিসওয়াল বিন মাখরামা (রা.) এবং মুসআব বিন আবদুর রহমান (রা.)-এর শাহাদাত:

এই সময়ে আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.)-এর দক্ষিণহস্ত হযরত মিসওয়াল বিন মাখরামা (রা.) পাথর নিক্ষেপের আঘাতে শহীদ হন। [৩] আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর সাহেবজাদা মুসআব বিন আবদুর রহমান, যিনি ফিকহ শাস্ত্রে উচ্চ মর্যাদার কারণে কাজী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন, একটি তীরের আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [৪]

খারেজীদের কিছু দল আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.)-কে সমর্থন দিচ্ছিল, কিন্তু এই সময়ে হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে মতামতের বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.)-এর সাথে তাদের বিরোধ তৈরি হয়। খারেজীরা হযরত উসমান (রা.)-এর সমালোচনা করত এবং আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.) তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। খারেজীরা আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.)-এর এই অবস্থানের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করলে আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.) পরিস্কারভাবে বলে দেন যে, তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছ।

অবশেষে খারেজীদের সর্দার নাফে বিন আজরাক আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়। কিছু লোক এ কারণে আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.)-কে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মনে করেছিল; তাদের ধারণা ছিল যে সাময়িক কৌশল এটাই ছিল যে খারেজীদের সামনে নিজের অবস্থান ব্যক্ত না করা এবং তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে সাথে রাখা, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.) আকিদাগত বিষয়ে স্পষ্টবাদিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। যদি এতে মনঃক্ষুব্ধ হয়ে কেউ সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়, তবে তিনি তার পরোয়া করতেন না। [৫]

কাবা শরীফে অগ্নিকাণ্ড:

عبد الله بن زبير (রা.) মসজিদুল হারামের চত্বরে একটি বড় তাবু খাটিয়েছিলেন যেখানে মক্কার মহিলারা মুজাহিদদের পানি পান করাতেন, খাবার খাওয়াতেন এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা ও দেখাশোনা করতেন। একদিন হুসাইন বিন নুমাইর পাহাড়ের উচ্চতা থেকে এই তাবু দেখে বলল: “এখান থেকে সিংহরা বেরিয়ে অনবরত আক্রমণ করছে, যেন এটি তাদের গুহা। এমন কেউ কি আছে যে এই তাবু মিটিয়ে দেবে?” এক রাজকীয় সৈন্য বলল: “আমি এটা করে দেখাব।”

রাতে সে তার বর্ষার মাথায় একটি জ্বলন্ত প্রদীপ বাঁধল, ঘোড়াকে ছুটিয়ে সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এল এবং তাবুর ওপর বর্ষা নিক্ষেপ করল। নিশানা সঠিক লাগল। তাবু জ্বলতে শুরু করলে বাতাসের তীব্র ঝাপটা শিখাগুলোকে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দিল। কাবার ইমারত (যা তখন ২৭ ফুট উঁচু ছিল) অনবরত পাথর নিক্ষেপের কারণে আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখন আগুন লাগার ফলে—

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/২৩৪

[২] আল-মিহান, পৃ: ২০৩

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ মুতাম্মিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৭১

[৪] আত-তারিখুল কাবীর লি-ইবনে আবি খাইসামা আস-সাফারুস সালিস: ২/৬২ ত: ফারুক কায়রো; আল-মিহান, পৃ: ২০৩; আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩৫০ দারুল ফিকর

[৫] আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩১৭ ত: দারুল ফিকর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথমে কাবার গিলাফ দন্ধ হলো, তারপর কাবার দেয়ালগুলো, যা ইট ছাড়াও সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি ছিল, তাতে আগুন ধরে গেল। [১]

এই দুঘটনা ৩ রবিউল আউয়াল শনিবার সংঘটিত হয়েছিল। [২]

কাবার দহন উভয় পক্ষের হৃদয় কাঁপিয়ে দিল। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এক কোণে গিয়ে কান্নাকাটি ও আহাজারিতে মগ্ন হলেন। তিনি বলছিলেন: “হে রব! হে রব! আমি কি জানতাম যে এমন দুঘটনা ঘটবে।” [৩]

শাম বাহিনীর এক বিচলিত ব্যক্তি দৌড়ে এল এবং জমজমের কিনারায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল: “সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রয়েছে, উভয় পক্ষই ধ্বংস হয়ে গেছে।” [৪]

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যু:

ইতিমধ্যে ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরিতে ৩৮ বছর বয়সী ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া ৩ বছর ৭ মাস ২২ দিন শাসনের পর দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। সে সময় সে ‘হাওয়ারিন’-এ অবস্থান করছিল। তার ছেলে মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ জানাজার নামাজ পড়িয়েছিল। [৫]

[১] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি ৩০/৯২১ হাসান মুত্তাসিল সনদে। ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

আলী বিন আল-মুবারক, য়ায়েদ বিন আল-মুবারক, আবদুল মালিক বিন আবদুর রহমান আদ-দামারি, কাসিম বিন মা’ন, হিশাম বিন উরওয়াহ, উরওয়াহ বিন আল-জুবায়ের।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- আলী বিন আল-মুবারক (আবুল হাসান আস-সানআনি মৃ. ২৮১ হি.) সিকাহ (আর-রওদুল আনফ আল-ফাসি ওয়াদ-দানি ইলা তারাজিমুশ শুমুখ আত-তাবারানি: ১/৩৪১, ত. দারুল কিয়ান রিয়াদ)।
- য়ায়েদ বিন মুবারক (মৃ. ২১১ হি.) সিকাহ। (আস-সিকাত লি-ইবনে হিবান: ৮/২৫১) আবু দাউদ ও নাসায়ী বলেছেন সিকাহ। (তাহজিবুত তাহজিব: ৩/৪২৫)।
- আবদুল মালিক বিন আবদুর রহমান আদ-দামারি (মৃ. ১৯১ হি.) সিকাহ। (তাহজিবুত তাহজিব: ৬/৪০১)।
- কাসিম বিন মা’ন: সিকাহ হুজ্জাহ। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৮/১৯০)।

হিশাম বিন উরওয়াহ এবং উরওয়াহ বিন জুবায়েরের নির্ভরযোগ্যতা কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়।

এবং খলিফা বিন খাইয়াত তার ইতিহাসে ইবনে জুরাইজ (পৃ. ২৫২) পর্যন্ত সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন এবং দেখুন: আল-মিহান লি-আবীল আরব, পৃ. ২০৩, ২০৪।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৫।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৩।

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৫।

পার্ট টু

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ইয়াজিদের অবস্থার আলোচনার সারসংক্ষেপ

ইয়াজিদের যুবরাজ নিযুক্ত হওয়া থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে গত পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা যে আলোচনা করেছি, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- আমীর মুয়াবিয়া (রা.) উম্মতের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে নেক নিয়তে ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছিলেন।
- খলিফা হওয়ার আগ পর্যন্ত তার চরিত্র এমন আপত্তিকর ছিল না যেমনটি পরে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দা.বা.) লিখেছেন:

“নিঃসন্দেহে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে ইয়াজিদের ফাসেকী ও পাপাচার কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়।” [১]

- ইয়াজিদকে যুবরাজ বানানো বৈধতার সীমার মধ্যে ছিল, যদিও উম্মতের মধ্যে তার চেয়ে উত্তম ও শাসনের অধিক যোগ্য ব্যক্তির বিদ্যমান ছিলেন।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দা.বা.) লিখেছেন:

“তাকে (ইয়াজিদকে) খিলাফতের যোগ্য মনে করা যেতে পারত, কিন্তু উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিদের অভাব ছিল না যারা দ্বীনদারি, তাকওয়া, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক থেকে ইয়াজিদের তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।” [২]

- ইয়াজিদের সিংহাসন আরোহণের পর হযরত হুসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) তাদের শরয়ী আপত্তি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে তার হাতে বায়াত হননি এবং তার সরকারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাকি সাহাবী ও তাবয়ীগণ অন্যান্য শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন, যদিও সিরিয়াবাসী ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।
- হযরত হুসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবদ্দশায় এবং ইয়াজিদের শাসনামলে মূল আপত্তির বিষয় ছিল এই যে, বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা ইসলামী শুরার চেতনার পরিপন্থী। তাই এই শাসনব্যবস্থা সংস্কারযোগ্য এবং একে পুনরায় হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর আদর্শে ফিরিয়ে আনা জরুরি। এটি ছিল এই মহান ব্যক্তিদের আন্তরিক ইজতিহাদ ও ফতোয়া।
- আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং জুমহুর সাহাবায়ে কেরামের নিকটও সর্বোত্তম অবস্থা সেটিই ছিল যার দিকে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) ও হুসাইন (রা.) আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের মতে পরিবর্তনের চেষ্টার ফলে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। তাই বিদ্যমান সরকার ও ব্যবস্থার সাথে (যা বৈধতার সীমার মধ্যে ছিল) আনুগত্য বজায় রাখা আবশ্যিক ছিল।

[১] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১১৫

[২] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ইয়াজিদের ফিসক ও ফুজুরের খ্যাতি তার খলিফা হওয়ার পর হয়েছিল। মাওলানা রশীদ আহমদ গান্ধুহী লিখেছেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে খলিফা করেছিলেন। সে সময় ইয়াজিদ উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল।”

তিনি আরও লিখেছেন: “ইয়াজিদ শুরুতে নেককার ছিল। খেলাফতের পর খারাপ হয়ে যায়।” [১]

ইয়াজিদের ফিসক ও ফুজুরের ওপর বিশ্বাস রেখে মদিনাবাসী তার বিরুদ্ধে খুরুজ করেন। তাদের ফিকহি মাযহাব অনুযায়ী ফাসেক শাসককে অপসারিত করা ওয়াজিব ছিল। তাদের সামনে সেই সব হাদিস ছিল যাতে হাত দিয়ে গুনাহ প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যক্তিবর্গ তাদের সিদ্ধান্তে মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তাদের প্রচেষ্টার সমালোচনা করা যাবে না।

জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীসহ উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই সব বাণীর কারণে ইয়াজিদের বায়াত বহাল রেখেছিলেন যাতে শাসকদের বায়াত ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারা জালেম ও ফাসেক হলেও। কিছু লোক এমনও ছিলেন যাদের মতে ইয়াজিদের ফিসক প্রমাণিত ছিল না, যেমন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া।

ইয়াজিদের প্রতি আরোপিত কুফরি কাজ এবং নিকটাত্মীর সাথে ব্যভিচারের মতো অভিযোগগুলো, যা দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক নয়। তবে ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত এবং এর সবচেয়ে বড় ও অকাট্য দলিল হলো মদিনার অসংখ্য সাহাবী ও তাবেয়ীর খুরুজ, যা ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তার জুলুম-অত্যাচারও ফিসকের একটি বড় কারণ। শাসক হওয়ার পর ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কিছু অশোভন সিদ্ধান্ত জারি হয় যা অনেক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংকট, জুলুম-অত্যাচার, প্রজাদের অসন্তুষ্টি এবং শাসকের দুর্নামের কারণ হয়েছিল, কিন্তু এসব পদক্ষেপের সাথে আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর কোনো সম্পর্ক ছিল না কারণ তিনি গায়েব জানতেন না। এসবই তার ইন্তেকালের পর হয়েছিল।

ইয়াজিদের বড় ভুল রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- তিনি হযরত হুসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর কাছ থেকে বায়াত নেওয়ার ব্যাপারে জেদ ধরেছিলেন। বিচক্ষণতা ছিল এই যে, তিনি তাদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাদের ফতোয়া ও বিবেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে দিতেন। হযরত মুফতি রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী লিখেছেন: “তাদের (হযরত হুসাইন রা.) ইয়াজিদের বায়াত না করার কারণে হত্যার আশঙ্কা বরং নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যদিও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর খলিফার বায়াত করা ফরজ নয়। শুধু এতটুকু ফরজ যে সে বিদ্রোহ করবে না।” [২]

ইয়াজিদ তাদের বায়াত থেকে বিরত থাকার সুযোগ দেননি যার কারণে এই ব্যক্তিবর্গকে মদিনা ছেড়ে মক্কায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল এবং পরবর্তীতে হযরত হুসাইন (রা.)-কে কুফার সফর করতে হয়েছিল।

- তিনি নুমান ইবনে বশীর (রা.)-এর মতো দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোকদের পরিবর্তে উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, আমর ইবনে সাঈদ এবং মুসলিম ইবনে উকবার মতো কঠোর শাসকদের নিয়োগ দেন এবং শাসনকার্যের লাগাম তাদের হাতে তুলে দেন। এই লোকদের হাতেই কারবালা, মদিনা ও মক্কায় হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজের বাজার গরম হয়েছিল।

[১] তলিফাতে রশীদিয়া, পৃ. ৪৪২

[২] আহসানুল ফাতাওয়া: ৬/২১৮; শরহে মুসলিম লিন-নববী: ১২/৭৮, দার ইহয়াউত তুরাস

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

৩. ইয়াজিদ ঐ সকল শাসকদের জুলুম ও বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে তাদের অগোচরে নিন্দাসূচক দু-একটি কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করেনি।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি ইয়াজিদের এই কর্মপন্থা সম্পর্কে লিখেছেন:

“তার এই ভুল অনস্বীকার্য যে, সে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে এই জঘন্য অপরাধের জন্য কোনো শাস্তি দেয়নি।” [১]

এই কর্মপন্থার কারণে সরকার কলঙ্কিত হয় এবং চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়াজিদ সম্পর্কে আসলাফদের অভিমত:

ইয়াজিদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা কখনোই ইসলামের আলেমদের নীতি ছিল না। ইয়াজিদের চরিত্র সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মহান ছাত্র ইমাম মুহাম্মা বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর কথোপকথন প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন:

- “আমি ইমাম আহমদ (রহ.)-কে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।”
- তিনি বললেন: “সে তো সেই ব্যক্তি যে মদিনায় যা করার তা করেছিল।”
- আমি বললাম: “সে কী করেছিল?” তিনি বললেন: “সে মদিনা মুনাওয়ারায় নবী (সা.)-এর সাহাবীদের হত্যা করেছিল এবং আরও অনেক কিছু করেছিল।”
- আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আর কী করেছিল?” তিনি বললেন: “মদিনা লুটতরাজ করেছিল।”
- আমি বললাম: “তার থেকে কি হাদিস বর্ণনা করা যাবে?”
- তিনি বললেন: “তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা যাবে না। কারো জন্য তার কোনো হাদিস লেখা সমীচীন নয়।”
- আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “মদিনায় ঐসব কাজ যারা করেছিল তারা কারা ছিল?”
- তিনি বললেন: “শামবাসী।” আমি বললাম: “আর মিশরবাসী?”
- তিনি বললেন: “না। মিশরবাসীরা হযরত উসমান (রা.)-এর ঘটনায় জড়িত ছিল।” [২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

“ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া কিছু মন্দ কাজ করেছিল, যার মধ্যে ‘হাররার ঘটনা’ও রয়েছে।” [৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) আরও লিখেছেন:

“ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সাহেবজাদা বললেন: ‘কিছু লোক বলে যে আমরা ইয়াজিদকে ভালোবাসি।’ ইমাম সাহেব বললেন: ‘যার মধ্যে সামান্যতম কল্যাণ আছে এমন কোনো ব্যক্তি কি ইয়াজিদকে ভালোবাসতে পারে?’” [৪]

[১] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা ১১৫

[২] মুহাম্মা বলেন: আমি আহমদকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন: সে তো মদিনায় যা করার তা করেছে। আমি বললাম: সে কী করেছে? তিনি বললেন: সে মদিনায় নবী (সা.)-এর সাহাবীদের হত্যা করেছে এবং (আরও অনেক কিছু) করেছে। আমি বললাম: তার থেকে কি হাদিস বর্ণনা করা যাবে? তিনি বললেন: না, তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা যাবে না এবং কারো জন্য তার কোনো হাদিস লেখা উচিত নয়। আমি বললাম: মদিনায় তার সাথে যারা ঐ কাজ করেছিল তারা কারা ছিল? তিনি বললেন: শামবাসী। আমি বললাম: মিশরবাসী? তিনি বললেন: না, মিশরবাসীরা তো তাদের মধ্যে ছিল যারা উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। (আস-সুন্নাহ লি আবি বকর বিন আল-খাল্লাল, হাদিস: ৮৪৫, সহিহ সনদে)

[৩] রা’সুল হুসাইন লি ইবনে তাইমিয়াহ, পৃষ্ঠা ২০৫

[৪] আল-মাসায়েল ওয়াল আজওয়িবা লি ইবনে তাইমিয়াহ, পৃষ্ঠা ৮০

হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“ইয়াজিদ সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের আমরা মন্দ বলি না এবং তাদের ভালোবাসিও না।” [১]

শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম শেখ ইবনুল হাদ্দাদ (আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন) বলেন:

“আমরা মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রহমতের দোয়া করি এবং ইয়াজিদের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ওপর সোপর্দ করি।” [২]

ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত:

উম্মতের উলামায়ে কেরাম ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে একমত চলে আসছেন।

প্রথম সারির কয়েকজন আলেমের মতামত পেশ করা হলো:

হযরত আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়াজিদকে “ফাসেক, অনিষ্টকারী, মদ্যপ এবং জালেম” লিখেছেন। [৩]

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ইয়াজিদকে প্রকাশ্যে ফাসেকিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন। [৪]

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “ইয়াজিদ নিঃসন্দেহে ফাসেক ছিল।” [৫]

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি ফতোয়ার জবাবে বলেন:

“ইয়াজিদ ফাসেক ছিল এবং ফাসেকের বেলায়েত (শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া) মতভেদপূর্ণ।” [৬]

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।” [৭]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/৫, ত. আর-রিসালাহ। তবে হাফেজ যাহাবীর এই উক্তির অর্থ যেন এমন না নেওয়া হয় যে, প্রয়োজনে ইয়াজিদের সমালোচনা করা এবং তার মন্দ কাজগুলো যা বাস্তবে প্রমাণিত, সেগুলো বর্ণনা করাও নিষেধ। হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ইবারতের কয়েক প্যারাগ্রাফ পরেই স্বয়ং ইয়াজিদের আলোচনা এভাবে করেছেন: “সে ছিল কঠোরপন্থী নাসিবী, অভদ্র, মদ্যপ এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত। তার শাসনকাল হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং হাররার ঘটনার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল, তাই মানুষ তাকে ঘৃণা করত। ফলে তার জীবনে বরকত হয়নি।”

[২] ইজতিমাউল জুইউশিল ইসলামিয়া লি ইবনিল কাইয়্যিম, পৃ. ৬৬

[৩] এবং এই মতানুসারে যে সে মুসলিম, তবে সে ফাসেক, অনিষ্টকারী, মদ্যপ ও জালেম (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা: ২/৬৩২)

[৪] রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার: ৩/১৩৬, কিতাবুত তালাক, বাবুর রাজআহ, মাতলাব ফি হুকমি লানিল উসাত

[৫] এবং ইয়াজিদ নিঃসন্দেহে ফাসেক। (আল-আরফুশ শাযী, বাবু মা জাআ ফি হুরমতি মাক্কাহ: ২/২১৩, ত. দারুল তুরাসিল আরাবি)

[৬] আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভীর দুর্লভ রিসালা “শাহাদাতে হুসাইন ও কিরদারে ইয়াজিদ”-এর শুরুতে “আত-তামহীদ ফি বায়ানি ফিসকি ইয়াজিদ” শিরোনামে একটি ভূমিকায় এবং মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আলভী তার কালজয়ী গ্রন্থ “মাকামে হুসাইন ও ইয়াজিদ”-এ ইয়াজিদ সম্পর্কে উপমহাদেশের অসংখ্য জলীলুল কদর আলেম ও দৃঢ়চেতা আকাবিরের প্রতিনিধিত্বশীল মতামত তাদের ইবারতসহ পেশ করেছেন। এই আকাবিরের মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী, সৈয়দ আহমদ শহীদ, মাওলানা আব্দুল হাই লখনভী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, মুফতি আজিজুর রহমান উসমানী মুফতি দারুল উলুম দেওবন্দ, হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আব্দুল শাকুর লখনভী, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলভী, কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনসুরপুরী, মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী উসমানী, ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব কাসেমী, শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী, মাওলানা আব্দুল হাই আরিফী, মাওলানা আব্দুল শাকুর তিরমিযী এবং মুফতি জামিল আহমদ খানভীসহ অসংখ্য আকাবির অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। (পূর্ণাঙ্গ হাওয়াল ও ইবারতের জন্য দেখুন: শাহাদাতে হুসাইন ও কিরদারে ইয়াজিদ, পৃ. ১৫৯। মাকামে হুসাইন ও ইয়াজিদ, পৃ. ৯০ থেকে ৯৮) এই সকলের ইবারতের সারকথা এটাই যে, ইয়াজিদ ছিল জাহেল, ফাসেক এবং জালেম।

[৭] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৩/৪৬৫, ত. দারুল উলুম করাচি

[৮] সংক্ষেপে নিঃসন্দেহে সে ফাসেক ছিল। (মাআরিফুস সুনান: ৬/৮, ত. এইচ এম সাঈদ কোম্পানি)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা সলিমুল্লাহ খান (রহ.) ইয়াজিদের চরিত্র সম্পর্কে বলেন:

“ইয়াজিদের ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধা নেই। ইয়াজিদের ফিসক-এর মূল কারণ হলো তার শাসনকালের এই তিনটি ঘটনা...”

এরপর শাইখুল হাদিস (রহ.) কারবালা প্রান্তরের অপরাধীদের শাস্তি না দেওয়া, হাররার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীগণের হত্যাকাণ্ড এবং এরপর মক্কা মুকাররমায় ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী প্রেরণের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি এই সন্দেহের একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গবেষণামূলক উত্তর দেন যে, ইয়াজিদের দুশ্চরিত্রের সমস্ত বর্ণনা তো শিয়াদের ছড়ানো। মরহুম হযরত শাইখুল হাদিস সাহেব লিখেছেন:

“বাকি শিয়া সম্প্রদায়ের অলীক কল্পনা ও অপবাদ আরোপের যে বিষয়, তা থেকে খুলাফায়ে সালাসা, হযরত মুয়াবিয়া এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.) পর্যন্ত বাদ যাননি। রাফেজিরা যখন এই মহান সাহাবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যার স্তূপ রচনা করেছে, তখন তা থেকে আন্দাজ করা যায় যে, এই সম্প্রদায় ইয়াজিদ সম্পর্কে কতই না অলীক ও আজেবাজে কথা তৈরি করে থাকবে। তবে উল্লিখিত তিনটি ঘটনা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় মুতাওয়াতির এবং আহলে সুন্নাতের আকাবিরগণ এগুলোর ওপর আস্ত্র রেখেছেন। আহলে সুন্নাত মহলের উচিত সাহাবায়ে কেরামের পাশাপাশি আহলে বাইতে আতহার (যার অন্তর্ভুক্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত পবিত্র স্ত্রীগণ, সমস্ত পবিত্র কন্যাগণ এবং সমস্ত পবিত্র পুত্রগণ (রা.))-এর ফজিলত ও মর্যাদা পূর্ণ একাগ্রতা ও ঈমানি জজবার সাথে বর্ণনা করা। আর যারা ইয়াজিদের প্রশংসা ও গুণগান করে, তাদের পথ রোধ করা উচিত।” [১]

ইয়াজিদের খিলাফতকাল সম্পর্কে সঠিক বর্ণনার আলোকে যে সত্যগুলো প্রমাণিত হয়েছে, তা আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছি। যেসব বিষয়ের উল্লেখ কেবল দুর্বল বর্ণনায় রয়েছে এবং সেগুলো সহিহ বর্ণনার পরিপন্থী, আমরা সেগুলো খণ্ডন করেছি। ওলামায়ে কেরামের মতামতও পাঠকদের সামনে রয়েছে। এগুলোর আলোকে সঠিক ও ভুলের ফয়সালা করা কঠিন নয়।

[১] মাসিক সাফদার, মুকাররাম সলিম-এর নিবন্ধ ‘ইয়াজিদের ফিসক প্রসঙ্গে’, পৃষ্ঠা ১৫, ১৬, সংখ্যা: ৫৯, ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি.।

স্মরণীয় যে, অনেক মহান আলেম ইয়াজিদের ঈমানকে সন্দেহজনক মনে করতেন। আল্লামা তাফতাজানি বলেন: “আমরা তার মর্যাদার ব্যাপারে নয় বরং তার ঈমানের ব্যাপারে দ্বিধাবিহীন” (শরহে আকায়েদে নাসাফি, পৃষ্ঠা ৩৭৪)। আল্লামা মাহমুদ আলুসী লিখেছেন: “যদি মেনেও নেওয়া হয় যে সেই খবিস মুসলিম ছিল, তবে সে এমন এক মুসলিম ছিল যে এত বেশি কবির গুনাহ করেছে যা বর্ণনার পরিধির বাইরে” (রুহুল মাআনি, ১০: ২২৮, আহজাব)।

অনুরূপভাবে সালাফে সালাহীনের অনেক মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইয়াজিদকে লানত দেওয়া জায়েজ হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন, যেমনটি আল্লামা ইবনুল জাওজি এই বিষয়ে একটি কিতাব ‘আর-রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনীদিল মানি’ মিন যাম্মি ইয়াজিদ’ লিখেছেন, যার উর্দু অনুবাদ মুফতি মুহাম্মদ শুয়াইব করেছেন যা দারুত তাকওয়া লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে লানত দেওয়ার প্রবক্তাদের দলিলসমূহও সামনে চলে আসে, তবে জমহুর-এর মাযহাব সতর্কতার ওপর ভিত্তি করে, যাতে মূর্খ লোকেরা ইয়াজিদকে লানত দেওয়াকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে লানত দেওয়ার পথ বানিয়ে না নেয়। এজন্য জমহুর কুফর বা লানতের হুকুম লাগানো বা লানত করা থেকে নিষেধ করেছেন, তবে ফিসক-এর ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই এবং কেউ এতে দ্বিধাবোধ করেননি। ইয়াজিদকে লানত দেওয়া জায়েজ না হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন: “ইয়াজিদ এবং তার মতো বাদশাহদের ব্যাপারে শেষ কথা হলো তারা ফাসিক ছিল।” (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪: ৫৬৭)। প্রমাণিত হলো যে, ইয়াজিদকে লানত করা থেকে নিষেধকারী ওলামায়ে কেরামও তার ফিসক-কে স্বীকার করেন।

মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ

ইয়াজিদের তরুণ পুত্র মুয়াবিয়া চরিত্র, আচরণ, রাজনীতি এবং বিচক্ষণতার দিক থেকে সব দিক দিয়েই নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন। বলা হতো যে, তৎকালীন সময়ে বনু উমাইয়াদের মধ্যে ভদ্রতা ও ইবাদত-বন্দেগিতে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। [১] ইয়াজিদ তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।

তার জন্ম ৪৪ হিজরিতে হয়েছিল। ফর্সা গায়ের রঙ, বড় চোখ, উঁচু নাক এবং কোঁকড়ানো চুলের সাথে তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ ছিলেন। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও একবারও রাজপ্রাসাদে আসতে পারেননি। [২] রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই তিনি পূর্ববর্তী কর্মকর্তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রেখেছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি চল্লিশ দিন এবং অন্য বর্ণনা অনুযায়ী দেড় মাস শাসন করতে পেরেছিলেন। [৩]

তবে এই সংক্ষিপ্ত সময়কাল এই দিক থেকে প্রশংসনীয় যে, তিনি শাসনব্যবস্থাকে তার মূল রূপ ও কাঠামোতে ফিরিয়ে আনার পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন, যা খুলাফায়ে রাশেদিন কর্তৃক গৃহীত এবং উম্মতের পছন্দনীয় ছিল। তিনি রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথ এটাই বের করেছিলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের সম্মতি ও পরামর্শের (শুরা) ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক, যেমনটি মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবস্থানও চলে আসছিল। [৪]

বনু উমাইয়াদের ইতিহাস কি আব্বাসীয় যুগে বিদ্বৈষমূলক মনোভাবের অধীনে রচিত হয়েছিল?

মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের গুণাবলি পড়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। প্রথমত, বনু উমাইয়া পরিবারে ভালো, দ্বীনদার এবং আল্লাহভীরু লোকও প্রচুর ছিল, তাই সমস্ত উমাইয়া খলিফা, শাহজাদা এবং আমিরদের ঢালাওভাবে ফাসেক, পাপাচারী ও জালেম মনে করা হবে চরম অবিচার। দ্বিতীয়ত, এটি সামনে আসে যে, প্রাচীন মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বনু উমাইয়া সম্পর্কেও চমৎকার বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন যা নির্ভরযোগ্য সূত্র পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ধারণাটি ভিত্তিহীন যে, বনু উমাইয়াদের পুরো ইতিহাস আব্বাসীয় যুগে তাদের দরবারি ঐতিহাসিকরা বিদ্বৈষমূলক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে রচনা করেছিলেন। যদি তাই হতো, তবে ইয়াজিদের পুত্র মুয়াবিয়ার চরিত্র হনন কেন করা হলো না? হযরত উমর বিন আবদুল আজিজকে কেন গুণাবলির आधार হিসেবে তুলে ধরা হলো? বনু উমাইয়াদের বিজয়সমূহ কেন প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবরণসহ বর্ণনা করা হলো? আবদুল মালিক এবং তার পুত্রদের অনেক কীর্তি কেন ইতিহাসের অংশ করা হলো? এমনকি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো কঠোর সামরিক শাসকেরও অনেক গুণ কেন এই ইতিহাসে অবশিষ্ট রাখা হলো? অন্যদিকে, বনু আব্বাসীয় যুগে সংকলিত এই বইগুলোতেই আব্বাসীয় শাসকদের অনেক দোষত্রুটি কোন স্বার্থে বর্ণনা করা হয়েছে? এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইয়াকুবি, মাসুদি এবং আবুল ফারাজ ইসফাহানির মতো দু-একটি উদাহরণ বাদ দিলে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই নিরপেক্ষ ছিলেন। তাদের সবার ওপর ঢালাওভাবে বনু উমাইয়াদের দোষত্রুটি বানিয়ে বলার অভিযোগ আনা ভুল। একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বিদ্বৈষমূলক প্রোপাগান্ডা এবং বর্ণনা তৈরির বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। বনু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সেই সময়ের বিরোধী দল অবশ্যই তা করেছে। যেকোনো শাসক এবং যেকোনো সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্বৈষমূলক প্রোপাগান্ডা এবং বর্ণনা তৈরির বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। বনু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বর্ণনা তৈরির কাজ তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি হয়েছে, কারণ তাদের যুগ ছিল চরম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ষড়যন্ত্রের। কিন্তু এটি নিছক একটি অমূলক ধারণা যে, বনু উমাইয়াদের সমস্ত দোষত্রুটি বানোয়াট এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি যেন ফেরেশতা ছিলেন, তাই তাদের সম্পর্কে প্রতিটি নেতিবাচক কথা শত্রুদেরই কারসাজি হবে।

[১] তারিখ দামেশক: ৬৭/২৮৯, অনুবাদ: আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন আবি কাসির

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৮ সাদির, তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ২৫৫, তারিখ দামেশক: ২৭/২৫৯

[৩] তারিখ দামেশক: ৫৯/২৯৯

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ২৫৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

রোগের তীব্রতায় যখন তার বেঁচে থাকার আশা রইল না এবং বনু উমাইয়ার নেতৃবৃন্দ তাকে পীড়াপীড়ি করল যে তিনি যেন নিজের পরে কাউকে খলিফা মনোনীত করে যান, তখন তিনি পরিষ্কার অস্বীকার করলেন। [১]

যখন সিরিয়ার আমীরগণ তাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তখন তিনি বললেন: “আল্লাহ আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। তবে তোমরা এতটুকু করো যে, আমি মারা গেলে ওয়ালিদ বিন উতবা যেন জানাজার নামাজ পড়ান, আর যতক্ষণ না খিলাফতের সমস্যার সমাধান হয় ততক্ষণ দাহহাক বিন কায়স (রা.) নামাজে ইমামতি করতে থাকবেন।” [২]

তার মা দুধের দোহাই দিয়ে তার ওপর জোর দিলেন যেন তিনি তার ভাই খালিদ বিন ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী বানান, কিন্তু তিনি এক অদ্ভুত উত্তর দিলেন: “আমি জীবিত অবস্থায়ও এই ভারী বোঝা বহন করব আবার মরেও!! আমি এমনটা করব না।” [৩]

এটি সেই একই উত্তর ছিল যা হযরত উমর (রা.) মৃত্যুশয্যায় এই ধরনের পীড়াপীড়ির উত্তরে দিয়েছিলেন: “أَكْرَهُ أَنْ أَتَحْمِلَهَا حَيًّا وَ مَيِّتًا” [৪]

এই সিদ্ধান্ত এবং এই উত্তর থেকে আন্দাজ করা যায় যে, মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ অল্পবয়সী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। যদি জীবন সায় দিত তবে তিনি অত্যন্ত ভালো শাসক প্রমাণিত হতেন।

তার আংটির খোদাই ছিল: بِاللَّهِ يَتَّقُ مُعَاوِيَةَ (মুয়াবিয়া আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখে)। [৫]

মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং হুসাইন বিন নুমাইরের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি:

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যু ১৩ই রবিউল আউয়াল হয়েছিল। এই সংবাদ সতেরো দিনে ১লা রবিউস সানি মক্কায় পৌঁছায় যেখানে হুসাইন বিন নুমাইর এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন। [৬]

দামেস্কে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর কিছু সমর্থক ও সংবাদবাহক উপস্থিত ছিলেন যারা তাকে তৎক্ষণাৎ খবরাখবর পৌঁছে দিতেন। তাই ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ হুসাইন বিন নুমাইরের আগেই আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) পেয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সিরিয়াবাসীদের ডেকে বললেন: “আপনারা এখন কার জন্য লড়াই করছেন? আপনাদের প্রধানের তো মৃত্যু হয়েছে।”

সিরিয়াবাসীরা বলতে লাগল: “এখন আমরা ইয়াজিদের উত্তরাধিকারীর জন্য লড়াই করব।”

চল্লিশ দিন পর মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদও এসে পৌঁছাল। এই সংবাদ এবং এর বিস্তারিত বিবরণও আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) আগেই জানতে পেরেছিলেন। তখন তিনি সিরিয়াবাসীদের বললেন: “ইয়াজিদের উত্তরাধিকারীরও মৃত্যু হয়েছে।”

[১] তারিখ দামেশক: ৫৯/ ৩০১, ৩০৩

[২] তারিখ দামেশক: ৫৯/ ২৯৯, ৩০২

[৩] “লা আতাহাম্মালুহা হাইয়ান ওয়া মাইয়্যিতান” তারিখ দামেশক: ৫৯/ ৩০৩

[৪] তারিখ দামেশক: ৩২/ ৩২৮

[৫] তারিখ দামেশক: ৫৯/ ৩০৩

[৬] আখবারে মক্কা লিল আজরাফি: ১/ ১৯৭, দারুল আন্দালুস বৈরুত

শামবাসীরা বলল: “এখন আমরা তার উত্তরসূরির জন্য যুদ্ধ করব।”

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “সে কাউকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করেনি।”

হুসাইন বিন নুমাইর বলতে লাগল: “আপনি যা বলছেন তা যদি সঠিক হয়, তবে খুব শীঘ্রই আমরাও তা জানতে পারব।”

যখন হুসাইন বিন নুমাইর সরকারি দূতের কাছ থেকে মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদেদে মৃত্যুর সংবাদ পেলেন এবং সেই সাথে এই বিস্তারিত তথ্যও পেলেন যে এখন উম্মাহর কোনো খলিফা নেই, তখন তিনি অবরোধ তুলে নিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি নিজে এসে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি হারামের কবুতরগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছিলেন। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটি দেখে বললেন: “তাদের কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারছ না, অথচ এখানে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছ?”

হুসাইন লজ্জিত হয়ে বললেন: “এখন আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করব না। আমাদের তাওয়াফ করার সুযোগ দিন। আমরা ফিরে যাব।”

ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি দিলেন। আর এই ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, শামবাসীদের মধ্যে যারা চায় তারা সাধারণ মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে পারে এবং যারা চায় তারা ফিরে যেতে পারে।

হুসাইন বিন নুমাইরের প্রস্তাব এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দূরদর্শিতা:

বালাযুরীর সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ফিরে যাওয়ার আগে হুসাইন বিন নুমাইর আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন: “আমি আগামীকাল হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে আপনার কাছে এই শর্তে বায়াত গ্রহণ করব যে, আপনি শাম অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং সেখানেই অবস্থান করবেন। আমরা আপনার প্রতিরক্ষায় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ করব।”

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন: “আমি আমার শুরা সদস্যদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তাদের সাথে আলোচনা করে আপনাকে জানিয়ে দেব।”

তিনি যখন তার উপদেষ্টাদের কাছে মতামত চাইলেন, তখন তারা বললেন: “আপনি কি আল্লাহর হারাম এবং তাঁর নিরাপত্তা ত্যাগ করবেন যেখানে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেছেন, তার পরিবর্তে আপনি এমন লোকদের সাহায্য নেবেন যারা বাইতুল্লাহর ওপর আক্রমণ করেছে?”

হযরত ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসাইনকে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন: “আমার সাথীরা শাম যেতে রাজি নয়।”

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথীদের শামবাসীদের ওপর আস্থাহীনতা ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই সাথীদের সংখ্যা দুই হাজারও ছিল না। যদি এই প্রস্তাবের পেছনে কোনো প্রতারণা থাকত, তবে শাম গিয়ে তারা সবাই মারা পড়তেন। যদি হুসাইন বিন নুমাইর আন্তরিকও হতেন, তবুও জানা ছিল না যে দামেস্কের আমিরদের আচরণ কেমন হতো? হ্যাঁ, যদি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে সেই সময় এত বড় বাহিনী থাকত যার মাধ্যমে রাজকীয় আমিররা শক্তির দিক থেকে পরাভূত হতো, তবে শাম যাওয়ায় কোনো...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৫

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৫০১ ইসহাক বিন ইসরাঈল থেকে যযীফ সনদে

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩৫১, তবা দারুল ফিকর

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

অন্যথায় সতর্কতার দাবিও এটাই ছিল যে, আপনি সেখানে যেতেন এবং সেখানেই অবস্থান করে সিরিয়াবাসীদের সমর্থন লাভ করতেন আর আপনি তাই করেছিলেন। ভবিষ্যতের পরিস্থিতি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক ও দূরদর্শী ছিল।

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত হিশাম কালবীর উপাখ্যান:

হিশাম কালবীর বর্ণনায় রয়েছে যে:

হুসাইন, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তার সাথে সিরিয়ায় চলে যান, সিরীয় সেনাবাহিনী তার সাথে আছে এবং সেখানে সবাই তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। শর্ত হলো এই যে, এ পর্যন্ত পারস্পরিক রক্তপাতে যারা নিহত হয়েছে, তাদের রক্ত মাফ করে দিতে হবে। এটি শুনে ইবনে জুবাইর (রা.) চিৎকার করে বললেন: “আমি কি এই রক্ত মাফ করে দেব? আমি তো তোমাদের একজনের বদলে তোমাদের দশজনকে হত্যা করেও শান্ত হব না।”

হুসাইন নিচু স্বরে কথা বলছিলেন, তিনি বললেন: “আমি আপনাকে একজন রাজনীতিবিদ, সুসভ্য ও বুদ্ধিমান মনে করতাম, অথচ আমি আপনার সাথে নম্রভাবে কথা বলছি আর আপনি চিৎকার করে উত্তর দিচ্ছেন। আমি আপনার সামনে খিলাফত পেশ করছি, আর আপনি হত্যা ও ধ্বংসের কথা বলছেন।” এই বলে তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে গেলেন। ইবনে জুবাইর (রা.) পরে লজ্জিত হলেন এবং তাকে বায়আত করার জন্য সিরিয়া যাওয়ার কথা বলে লোক পাঠালেন, কিন্তু হুসাইন আর ফিরে আসেননি। [১]

এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর বিরুদ্ধে অযৌক্তিক এবং শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর বর্ণনাকারী হিশাম কালবী একজন রাফেযী। সে নিজেও এটি নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করেনি বরং ইবনে জুবাইর (রা.)-এর দিকে সম্পর্কিত শব্দগুলো সন্দেহের সাথে এভাবে বর্ণনা করে:

“কুরাইশদের কেউ কেউ দাবি করেছে যে তিনি বলেছিলেন: আমি কি সেই রক্তগুলো বৃথা যেতে দেব? আল্লাহর কসম! না, আমি সন্তুষ্ট হব না যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেকের বদলে দশজনকে হত্যা করা হয়... ইত্যাদি।”

সনদের দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। যুক্তিগতভাবেও এটি মেনে নেওয়া যায় না যে, ইবনে জুবাইর (রা.)-এর মতো একজন বিজ্ঞ আলেম, সুন্নাহর প্রেমিক এবং আল্লাহভীরু সাহাবী একজনের বদলে দশজনের প্রাণ নিতে উদ্যত হবেন। এটি ইসলাম নয়, বরং জঙ্গলের আইন ছিল, যা সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর নাতি এবং আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কাছে লালিত-পালিত ব্যক্তির কাছ থেকে কখনোই আশা করা যায় না। হ্যাঁ, এতটুকু প্রমাণিত যে হুসাইন বিন নুমাইর, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি (ইবনে জুবাইর) ওজর পেশ করেছিলেন যার পেছনে জোরালো কারণ বিদ্যমান ছিল।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৫০১-৫০২। এই বর্ণনাটি বালাজুরী অন্য একটি সনদেও নকল করেছেন। (আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩৪৭, দারুল ফিকর)। কিন্তু এই সনদে হাইসাম বিন আদী রয়েছে যাকে ‘মাতরুকুল হাদীস’ এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। (মীযানুল ইতিদাল: ৪/৩২৪) তাই এর কোনো গুরুত্ব নেই। মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে কোনো ওজন তৈরি হতে পারে না; কারণ এই ধরনের মিথ্যা বর্ণনাকারী যদি ডজন ডজনও একত্রিত হয় তবুও বর্ণনায় কোনো শক্তি তৈরি হয় না।

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস-এর দুঃখ প্রকাশ ও সতর্কবাণী:

হুসাইন বিন নুমাইরের প্রস্থানের কিছুদিন পর আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রা.) কিছু সঙ্গীর সাথে উমরাহ করার জন্য মক্কায় আসলেন। তিনি দেখলেন যে কাবা পুড়ে গেছে এবং এর দেয়ালের পাথরগুলো অত্যন্ত জীর্ণ ও বিধ্বস্ত অবস্থায় খসে পড়েছে। আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে তাঁর গাল ভিজিয়ে দিতে লাগল। তিনি বললেন:

“হে লোকসকল! আবু হুরায়রা (রা.) যদি তোমাদের বলে দিতেন যে তোমরা তোমাদের নবীর (সা.) সন্তানের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের রবের ঘর পুড়িয়ে দেবে, তবে তোমরা বলতে যে আবু হুরায়রার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর কেউ নেই। আমরা কি আমাদের নবীর (সা.) সন্তানকে হত্যা করিনি? আমরা কি আমাদের রবের ঘর পুড়িয়ে দিইনি? আল্লাহর কসম! তোমরা তা করেছ। তোমরা তোমাদের নবীর (সা.) সন্তানকেও হত্যা করেছ এবং আল্লাহর ঘরকেও পুড়িয়েছ। সুতরাং এখন তোমরা এর শাস্তির প্রতীক্ষায় থাকো। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আবদুল্লাহ বিন আমরের প্রাণ, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে আপোসে লড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গৃহযুদ্ধের স্বাদ আশ্বাদন করাবেন।”

এই শেষ কথাগুলো তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর আরও উচ্চস্বরে বললেন:

“কোথায় সৎকাজের আদেশ দানকারীরা? কোথায় মন্দ কাজে বাধা দানকারীরা? সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আবদুল্লাহ বিন আমরের প্রাণ, যদি আল্লাহ তোমাদের দলে দলে বিভক্ত করে লড়িয়ে দেন এবং তোমাদের গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করেন, তবে সেই সময় সেই ব্যক্তির জন্য জমিনের উপরিভাগের চেয়ে জমিনের অভ্যন্তর (মৃত্যু) উত্তম হবে, যে না সৎকাজের আদেশ দিয়েছে আর না মন্দ কাজে বাধা দিয়েছে।” [১]

[১] আখবারু মক্কা লি আবিল ওয়ালিদ আল-আযরাকি: ১/১৯৬, ১৯৭।

আবু ওয়ালিদ আল-আযরাকি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। ইমাম বুখারিও তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে ‘সহিহ বুখারি’তে উদ্ধৃত করেছেন। শাফেয়ী ফকিহদের প্রথম সারিতে তাঁর গণনা করা হয়। তিনি সরাসরি ইমাম শাফেয়ী থেকে ফিকহ ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আল-আযরাকি ‘আখবারু মক্কা’ গ্রন্থে যথাসম্ভব সহিহ ও হাসান বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করেছেন, যদিও এতে কিছু দুর্বল বর্ণনাও রয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে এই কিতাবটি মুহাদ্দিসদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

উল্লিখিত বর্ণনার সনদ হলো: আবু ওয়ালিদ বর্ণনা করেছেন আমার দাদা আহমদ বিন মুহাম্মদ থেকে, তিনি ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আশ-শাফেয়ী থেকে, তিনি মুসলিম বিন খালিদ থেকে, তিনি ইবনে খুসাইম থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন সাদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস-এর সাথে প্রবেশ করেছিলেন।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- ১. ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আশ-শাফেয়ী: মৃত্যু ২৩৭ হিজরি, ইমাম শাফেয়ীর চাচাতো ভাই, নির্ভরযোগ্য। (সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/১৬৬)
- ২. মুসলিম বিন খালিদ: মৃত্যু ১৮০ হিজরি, ফকিহ, সত্যবাদী, অধিক ভ্রমকারী। (তাকরিবুত তাহযিব, অনুবাদ নম্বর: ৬৬২৫)
- ৩. ইবনে খুসাইম: আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন খুসাইম, ইবনে খুসাইম আল-মাক্বি নামে পরিচিত, মৃত্যু ১৩২ হিজরি, সত্যবাদী। (তাকরিবুত তাহযিব, অনুবাদ নম্বর: ৩৪২৬)
- ৪. আবদুল্লাহ বিন সাদ: সম্ভবত ইনি ওয়াজিহুল্লাহ বিন সাদ, যিনি ইয়াসার বিন নুমাইর থেকে হযরত উমর (রা.)-এর বর্ণনা গ্রহণ করতেন এবং তাঁর থেকে শারিক বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। নির্ভরযোগ্য ইমামদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়েছে। (আস-সিকাত লিমান লাম ইয়াকা’ ফিল কুতুবিল সিভাহ: ৭/২৭২) তবে লেখকের সন্দেহ আছে যে ইনি সেই আবদুল্লাহ নাকি অন্য কেউ।

এই বর্ণনার সনদে যদি কিছু দুর্বলতা প্রমাণিতও হয়, তবে তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। কারণ এই বর্ণনা একদিকে যেমন কোনো ইসলামি মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, অন্যদিকে সেই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এর মর্যাদা নিঃসন্দেহে উত্তম বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত

৯ রজব ৬৪ হিজরী থেকে ১৭ জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরী

৩ মার্চ ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫ অক্টোবর ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর মর্যাদা

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাগ্নে এবং হযরত সিদ্দিক আকবর (রা.)-এর নাতি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফাতো ভাই এবং আশারায়ে মুবাহশারার সদস্য যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)-এর কলিজার টুকরা ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.), যিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বড় বোন ছিলেন। সুতরাং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বংশীয় সম্পর্কগুলো লাভ করেছিলেন, তার প্রতিটিই ছিল ঈর্ষণীয়।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর উচ্চতা ছিল মাঝারি, গায়ের রং গন্দমী (শ্যামলা) এবং শরীর ছিল দোহারা ও পাতলা। দাড়ি ছিল লালচে ও হালকা। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছিল। তাঁর স্বভাব-চরিত্রে আত্মমর্যাদাবোধ ও বীরত্ব ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। [১]

জন্ম ও শৈশব:

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) হিজরতের প্রথম বছর জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পর তিনিই ছিলেন প্রথম জন্মগ্রহণকারী শিশু। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের লাল্য মুবারক ও খেজুর দিয়ে তাঁর তাহনিক করান এবং বরকতের দোয়া করেন। সে দিনগুলোতে ইহুদিরা রটিয়ে দিয়েছিল যে, তারা জাদুর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ছেলে সন্তান জন্ম নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর জন্মের মাধ্যমে তাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। [২]

বর্ণনায় এসেছে যে, যখন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর জন্ম হয়, তখন মদিনার মুসলমানরা আনন্দের আতিশয্যে তাকবিরের ধ্বনি উচ্চারণ করেন, যার ফলে পুরো শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। [৩] হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এই বরকতময় নাতিকে কোলে তুলে মদিনা মুনাওয়ারায় ঘুরিয়েছিলেন যাতে ইহুদিরা লজ্জিত হয়। [৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের থেকে বায়াত গ্রহণ করতেন না, কিন্তু যখন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) তাঁর পিতার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৩৪১; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৭০, ত. আর-রিসালা।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৫৪৬৯, কিতাবুল আতইমাহ, বাব তাসমিয়াতুল মাওলুদ; ৩৯০৯, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুন নবী (সা.)।

[৩] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৬৩৩০।

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ, মুজামুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৮৮।

যখন তিনি বাইয়াত হওয়ার জন্য আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে তাকে বাইয়াত করে নিলেন। তাঁর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.), উমর ইবনে আবি সালামাহ এবং আরও অনেক শিশুকে আনা হয়েছিল। অন্য শিশুরা ইতস্তত করছিল, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) এগিয়ে গিয়ে বাইয়াত হতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন এবং বললেন: “ইন্নাহ ইবনু আবিহি।” (এ তো তার বাবারই ছেলে!) [১]

সে সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বা আট বছর। [২]

তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে আসতেন, কারণ এটি ছিল তাঁর খালা হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাসস্থান। [৩]

সাহসিকতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী:

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) শৈশব থেকেই অত্যন্ত সাহসী এবং নেতৃত্বের গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। একবার তিনি তাঁর সমবয়সী ছেলেদের সাথে মদিনার গলিতে খেলছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে শিশুদের ভয় দেখানোর জন্য জোরে চিৎকার করল। শিশুরা ভয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) পিছু না হটে তাঁর সঙ্গীদের ডেকে বললেন:

“ভাইয়েরা! আমাকে আমির (নেতা) বানাও এবং এই লোকটির ওপর আক্রমণ করো।”

একবার গলিতে খেলছিলেন, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি খলিফা ছিলেন। শিশুরা ভীত হয়ে এদিক-সেদিক সরে গেল, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “ব্যাপার কী, তুমি তোমার সঙ্গীদের সাথে পালালে না কেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! আমি তো কোনো অপরাধ করিনি যে আপনাকে ভয় পাব, আর রাস্তাও এত সংকীর্ণ নয় যে আমি সরে গিয়ে আপনার জন্য তা প্রশস্ত করব।” [৪]

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) মাত্র ১৩ বছর বয়সে সাহাবায়ে কেরামের যুগের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ‘ইয়ারমুক’-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা জুবায়ের (রা.)-এর সাথে ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। যখন রোমানরা পিছু হটে পালাচ্ছিল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) তাদের আহতদের শেষ করে দিচ্ছিলেন। [৫]

হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে তিনি আফ্রিকা বিজয়ী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর রণকৌশলের কারণে ২০ হাজার মুসলমান এক লক্ষ বিশ হাজার কাফেরের ওপর বিজয়ী হয়েছিল। তিনি এই যুদ্ধে নিজে কয়েকজন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে আক্রমণ করে আফ্রিকার রাজা জর্জিরকে হত্যা করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের তৎপরতা রুখতে তিনি নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তিনি কুস্তনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। আফ্রিকার অভিযানে তিনি নেতৃত্বের পারদর্শিতা দেখান। “নুসা” জয় করেন। [৬] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে অনেক সম্মান করতেন। একবার আপনি...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/১৮৮, সাহরালাহ তারিখু দামেশক

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৬৪, ৩৬৫, ত-আর রিসালাহ, আল-ইসাবাহ: ৩/৮

[৩] ইয়া আমিরুল মুমিনিন লাম আজরিম ফাআখাফাকা ওয়া লাম তাকুনিত তারিকু দাইয়িকাতান ফাআউসিআ লাকা। (তারিখু দামেশক: ২৮/১৬৫)

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৮১৬৭, সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯৭৫, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কতলি আবি জাহল

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৮৭

[৬] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/১২, ১৬

এলেন তখন বললেন: “স্বাগতম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফুর ছেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাওয়ারীর ছেলে!” এবং এক লক্ষ (দিরহাম) উপহার দিলেন। [১]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা:

সিদ্দিকা-এ কায়েনাত হযরত আয়েশা (রা.) আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এজন্যই যখন সিদ্দিকা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজের কুনিয়াত (উপনাম) নির্ধারণের জন্য পরামর্শ চেয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছিলেন: “তুমি তোমার ছেলে আব্দুল্লাহর নামে নিজের কুনিয়াত ‘উম্মে আব্দুল্লাহ’ কেন রাখছ না?” এরপর থেকে তিনি উম্মে আব্দুল্লাহ নামে পরিচিত হন। [২]

জঙ্গে জামালে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) আশতার নাখরীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নিজের খালার সুরক্ষায় রক্তাক্ত হয়ে যান। ৪০টিরও বেশি মারাত্মক জখম হয়। বাহ্যত বেঁচে থাকার কোনো আশা ছিল না। হযরত আয়েশা (রা.) যখন তাঁর প্রাণ বেঁচে যাওয়ার খবর পেলেন, তখন খুশিতে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং সুসংবাদদাতাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

তাঁর ভাই উরওয়া বিন জুবায়ের (রহ.) বলতেন: “আমি আমার পিতা জুবায়ের (রা.) এবং খালা আয়েশা (রা.)-কে কারো জন্য এত দোয়া করতে দেখিনি, যতটা আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর জন্য করতে দেখেছি।” তিনি আরও বলেন: “খালা আয়েশা (রা.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের।” [৩]

জুহদ ও ইবাদত:

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) জুহদ ও ইবাদতে নিজের উপমা নিজেই ছিলেন। সালাতে তাঁর একাগ্রতা দেখার মতো ছিল। যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের সাথে মানসিক ও আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। নফল সালাতে দীর্ঘ দীর্ঘ রাকাত পড়তেন। কিয়ামের সময় শরীরে সামান্যতম নড়াচড়া হতো না। মনে হতো যেন একটি কাঠ গেড়ে দেওয়া হয়েছে। কখনো কখনো এত দীর্ঘ সেজদা করতেন যে চড়ুই পাখি এসে পিঠের ওপর বসে পড়ত। [৪] একদিন সালাত আদায় করছিলেন, তখন ছাদ থেকে একটি সাপ পড়ল এবং তাঁর ছেলেকে পেঁচিয়ে ধরল। মহিলারা চিৎকার-চৈচামেচি শুরু করল, অবশেষে ঘরের অন্যান্য সদস্যরা দৌড়ে এসে সাপটিকে মেরে ফেলল। আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এই পুরো সময় সালাতে মগ্ন ছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র টের পাননি। সালাম ফেরানোর পর মানুষ তাঁকে এই দুর্ঘটনার খবর দেয়। [৫]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলতেন যে, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) সালাত শিখেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছ থেকে এবং তিনি শিখেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে। (এজন্যই সালাতে এত খুশি ও খুজু হতো।) [৬]

মক্কা অবরোধের সময় যখন মিনজানিক পাথর বর্ষণ করছিল, তখনও সালাতের সময় আপনার প্রশান্তি ও একাগ্রতায় কোনো পার্থক্য আসত না। একবার মিনজানিকের একটি পাথর মসজিদে হারামের একটি ওপরতলার কক্ষে লাগে, যার ফলে একটি টুকরো উড়ে এসে তাঁর কণ্ঠনালীর...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৬৭, ত. আর-রিসালাহ

[২] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা: ৬৩৮, ইমাম যাহাবী একে সহীহ বলেছেন, আল-জামে লি ইবনে ওয়াহাব আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল-মিসরি পৃ. ১৬৭, আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি ১৮/২৩, মুসনাদে আহমদ, হা: ২৫৫৩০

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৬৭, ত. আর-রিসালাহ

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/১৮৯

[৫] তারিখে দামেশক: ২৮/৪৭৩

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/১৮৯

...এবং দাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেল। তখনও তিনি পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সালাতে মশগুল ছিলেন, শরীরে সামান্যতম কম্পনও হয়নি। [১]

মুজাহিদ বলতেন: “ইবনে জুবাইর (রা.)-এর মতো ইবাদতের শক্তি কারো নেই। একবার বন্যায় কাবা ঘর তলিয়ে গেলে তিনি সাঁতার কেটে তাওয়াফ করতে থাকেন। [২] প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনটি বিষয়ে তাঁর কোনো সমকক্ষ ছিল না: ইবাদতে, বীরত্বে এবং বাগ্মিতায়।” [৩]

আপনার অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত হতো, তাই আপনি ‘হামামাতুল মসজিদ’ (মসজিদের কবুতর) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। [৪]

ইলমি ও প্রশাসনিক শ্রেষ্ঠত্ব:

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বিশেষ মনোযোগ ও লালন-পালন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে হাদিস ও ফিকহের এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত করেছিল। অনেক প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস যেমন: তাউস বিন কায়সান, আমর বিন দিনার, সাবিত আল-বুনানি, ইবনে আবি মুলাইকা, ওয়াহাব বিন কায়সান, আবু ইসহাক আস-সাবিঈ, সাঈদ বিন মিনা এবং আবুল জুবাইর আপনার ছাত্র ছিলেন। আপনার ভাই উরওয়াহ বিন আল-জুবাইর, ভাতিজা হিশাম বিন উরওয়াহ এবং ভাতিজি ফাতিমা বিনতে মুনজির বিন জুবাইরও আপনার সান্নিধ্যে থেকে ফকিহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে গড়ে ওঠেন। [৫]

বলা হতো যে, মদিনা মুনাওয়ারায় আব্দুল্লাহ নামের চারজন ব্যক্তি ফিকহ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন: আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)। বিশেষ করে হজের আহকামের শরয়ি দলিল ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলি উদঘাটনে আপনার সমকক্ষ কেউ ছিল না। হজের সময় আপনি বলতেন:

“হে হাজিগণ! আমাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করো, কারণ আমাদের কাছেই কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হতো, আমরা এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত।” [৬]

হযরত উসমান গনি (রা.) যখন তাঁর যুগে ভুলভ্রান্তিমুক্ত কুরআন মাজিদের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শুরু করেন, তখন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জায়েদ বিন সাবিত (রা.) এবং অন্যান্য ক্বারি সাহাবিদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৭] বাগ্মিতা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে আপনার প্রভাব পুরো আরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ ও গাভীরূপূর্ণ। যখন ভাষণ দিতেন, তখন দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছাত এবং উপত্যকাগুলো প্রতিধ্বনিত হতো। [৮]

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলি এবং দুনিয়াবি কাজেও আপনি অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। আপনার কাছে বিভিন্ন গোত্র ও বংশের দাস ছিল যারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) প্রত্যেকের সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতেন। তাঁর সান্নিধ্যে থাকা এক ব্যক্তি উমর বিন কায়স বলেন:

“আমি যখন তাঁকে দুনিয়াবি কাজে মশগুল দেখতাম, তখন (دنيا میں ان کی مہارت دیکھ) মনে হতো যে আল্লাহর সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক - দুনিয়ার কাজে তাঁর দক্ষতা দেখে) নেই, আর যখন আখিরাত সম্পর্কে তাঁর অবস্থা দেখতাম, তখন মনে হতো তিনি চোখের পলক ফেলার সমান সময়ের জন্যও দুনিয়ায় মশগুল হন না।” [৯]

[১] তারিখ দمشক: ২৮/ ৭২

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/ ৩৬৮, ত. আর-রিসালাহ

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/ ৩৬৭

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/ ১৯৩

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/ ১৯৩

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/ ৩৬৩

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/ ৩৭০, ত. আর-রিসালাহ

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/ ২০৩

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) তাঁর কথা উল্লেখ করে বলতেন:

“তিনি আল্লাহর কিতাবের হাফেজ ও ফারী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতের অনুসারী ছিলেন, আল্লাহর অনুগত ছিলেন, আল্লাহর ভয়ে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে (নফল) রোজা রাখতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাওয়ারীর (সাথী) সন্তান ছিলেন, তাঁর মা ছিলেন আবু বকর (রা.)-এর কন্যা, তাঁর খালা ছিলেন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), যিনি আল্লাহর হাবীবের প্রিয়তমা ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মর্যাদা ও গুরুত্বকে কেবল সেই ব্যক্তিই উপেক্ষা করতে পারে যাকে আল্লাহ অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছেন।” [১]

চিন্তার বিষয়:

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর ওপর বড়জোর যে আপত্তি তোলা যেতে পারে তা হলো, তিনি ইয়াজিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তার বায়আত গ্রহণ করেননি, যাকে খুরুজ (বিদ্রোহ) বলা হয়। তবে আমাদের এটিও মনে রাখা উচিত যে, তিনি এই পদক্ষেপে মুজতাহিদ ছিলেন, যেমনটি হযরত তালহা, জুবাইর এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খুরুজ ছিল ইজতিহাদী।

এছাড়া এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ওলামায়ে কেরামের একটি বড় দল খুরুজ তাকেই গণ্য করেন যা “ইমামে আদিল” (ন্যায়পরায়ণ শাসক)-এর বিরুদ্ধে হয়। আর এটিই ছিল আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর অভিমত। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর পদক্ষেপের ওপর খুরুজ শব্দটির প্রয়োগও হবে না।

জমহুর (অধিকাংশ আলেম)-এর মতে খুরুজের ক্ষেত্রে ইমামে আদিলের শর্ত নেই, বরং শাসকের বায়আত থেকে বিরত থেকে সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে কোনো এলাকা দখল করাকেই খুরুজ বলা হবে। তবে তা সত্ত্বেও আলী (রা.)-এর যুগ এবং ইয়াজিদের যুগের পার্থক্য অন্ধ ব্যক্তিও দেখতে পাবে। আলী আল-মুরতাজা (রা.) নিঃসন্দেহে খলিফায়ে রাশেদ এবং ইমামে আদিল ছিলেন, পক্ষান্তরে ইয়াজিদের মধ্যে ইমামে আদিলের কোনো গুণ ছিল না। তাই ইয়াজিদের বিরুদ্ধে মুজতাহিদানা খুরুজের মর্যাদা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে মুজতাহিদানা খুরুজ থেকে ভিন্ন হবে।

এরপর এই সমস্ত কথা সত্ত্বেও খুরুজের এই প্রয়োগ কেবল ইয়াজিদের মৃত্যু পর্যন্তই হতে পারে। এরপর আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর খেলাফত নিঃসন্দেহে শরয়ী ছিল। যেভাবে হযরত হাসান (রা.)-এর ক্ষমতা ত্যাগের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খুরুজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে উম্মতের শরয়ী শাসক হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-ও পরবর্তীতে শরয়ী খলিফা হয়ে গিয়েছিলেন।

বিস্ময় লাগে সেই সব লোকদের ওপর যারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ইজ্জত ও সম্মানের হেফাজতের দাবিদার, অথচ সেই মহান ব্যক্তিদের প্রিয়ভাজন, তাঁদেরই হাতে গড়ে ওঠা এই বিশিষ্ট সাহাবীকে ফাসাদী (দাঙ্গাবাজ), নির্বোধ এবং পথভ্রষ্ট বলতে তাদের কোনো দ্বিধা হয় না। ইয়াজিদকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্য কি এমন প্রতারণা ও শূন্যতা প্রয়োজন যার আঘাত সরাসরি এমন একজন মহান সাহাবীর ওপর পড়ে? আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এই আচরণকে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরক্ষা হিসেবে মেনে নিতে পারে?

যদি কেউ বলে যে, আমরা হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর বিপরীতে ইয়াজিদের প্রতিরক্ষা এই জন্য করি যাতে ইয়াজিদের আমলে নীরবতা অবলম্বনকারী জমহুর সাহাবীদের ওপর বিবেক বিক্রির অভিযোগ না আসে, তবে এই অজুহাত নিরর্থক; কারণ জমহুর সাহাবীদের নীরবতাও ছিল ইজতিহাদী এবং হযরত হুসাইন (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সংগ্রামও ছিল ইজতিহাদী।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৬৬৩, ৪৬৬৪, কিতাবুত তাফসীর, বাব সানি আস-সনাইন; মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৬৩৩১; হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

যখন এটি নির্ধারিত যে জমহুর সাহাবীর ইজতিহাদ অনুযায়ী জালিম ও ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো শরীয়তসম্মতভাবে সঠিক ছিল না, তবে ইয়াজিদের যুগে এই মহান ব্যক্তিদের নীরবতা থেকে কীভাবে এটি আবশ্যিক হয়ে যায় যে তারা বিবেকহীন ও ভীরা ছিলেন? আর এর দ্বারা কীভাবে এটি প্রমাণিত হয় যে ইয়াজিদ নেককার, ন্যায়পরায়ণ এবং ফেরেশতাসুলভ শাসক ছিল? আর এটিই বা কীভাবে নির্ধারিত হয় যে তার অপরাধের বর্ণনাগুলো যা তাওয়াতুর এর পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার সবগুলোই জাল? আর যখন বিষয়টি ইজতিহাদি ছিল, তখন হযরত হুসাইন^{রা} বা আবদুল্লাহ বিন জুবারের^{রা} এর শানে কোনো প্রকার সমালোচনা করার অবকাশই বা কোথা থেকে আসতে পারে?

যদি সাহাবীদের প্রতিরক্ষা ইয়াজিদের প্রতিরক্ষার ওপর নির্ভরশীল হতো, তবে চৌদ্দ শতাব্দী ধরে উম্মতের উলামায়ে কেরাম ইয়াজিদের ফিসক ও জুলুমের ব্যাপারে একমত হয়ে আসতেন না। বিবেক কি এটি বিশ্বাস করে যে হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আল্লামা ইবনুল জাওজি, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ যাহাবী, হাফেজ ইবনে কাসীর এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানি থেকে শুরু করে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী এবং ফকিহুল আসর হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী^{রা} পর্যন্ত আমাদের আসলাফ যারা সাহাবীদের আদালত ও সততার আকিদা প্রমাণ করার জন্য সর্বদা সক্রিয় ছিলেন, ইয়াজিদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এমন অবস্থান গ্রহণ করে থাকবেন যা তাদের নিজেদের আকিদার মূলে কুঠারাঘাত করছে, আর উম্মতের সওয়াদে আজম চৌদ্দ শতাব্দী ধরে চলমান এই ধর্মীয় আত্মহত্যার ব্যাপারে কখনো অনুভবই করতে পারেনি!!

৬৪ হিজরির বিপজ্জনক রাজনৈতিক সংকট

৬৪ হিজরির শুরুর দিনগুলোতে ইসলামি বিশ্বে এক নতুন রাজনৈতিক সংকট দানা বাঁধতে দেখা যাচ্ছিল। ২৩ রবিউস সানি সিরিয়ায় ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর এমন কেউ ছিল না যে রাজনীতির লাগাম নিজের হাতে তুলে নেবে। স্বয়ং মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদেরও অভিমত ছিল যে, উম্মতের বিষয়গুলো মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের (শুরা) ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। আবদুল্লাহ ইবনে জুবারের (রা.)-ও এই দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি এখন পর্যন্ত হিজাজবাসীদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও খেলাফতের দাবি করেননি, বরং ক্ষমতার হস্তান্তর এবং সরকারি ব্যবস্থায় সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছিলেন।

মদিনাবাসী আগে থেকেই এই নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল এবং মুহাজির ও আনসারদের স্পষ্ট প্রতিনিধিত্ব চাচ্ছিল। সে সময় কোনো সরকার বা প্রধান ছিল না। সিরিয়া ও ইরাকের অবস্থাও একই ছিল, কিন্তু নতুন শাসনব্যবস্থার রূপরেখা কী হবে? এই প্রশ্নের জবাবে সবদিকে পূর্ণ নীরবতা ছিল।

এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে হযরত নুমান ইবনে বশির (রা.)-এর সেই পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা তিনি ইরাকের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লিখেছিলেন এবং এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সহনশীলতার তাগিদ দিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন অন্ধভাবে কারো অনুসরণ না করে এবং উম্মতের মধ্যে চলমান বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করা থেকে বিরত থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি তার পত্রে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন: কিয়ামতের আগে অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা আসবে। মানুষ সকালে মুমিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হবে, মানুষ সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে নিজের বিবেক বিক্রি করে দেবে।” [১]

যাহহাক ইবনে কায়েস (রা.), যিনি মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের ওসিয়ত অনুযায়ী দামেস্কে নামাজের ইমামতি করছিলেন, তিনি এই প্রসঙ্গে ইরাকবাসীদের কাছে পত্র লিখে বলেন:

“আপনারা আমাদের ভাই, যতক্ষণ না আমরা নিজেদের জন্য কোনো কথা চূড়ান্ত করি, আপনারা তাড়াহুড়ো করবেন না।” [২]

উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কর্তৃক বায়াত গ্রহণ:

এই সময়ে ময়দান খালি দেখে বসরার গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিজেই মানুষের কাছ থেকে বায়াত নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। জনগণ আগে থেকেই তার কঠোরতার কারণে বিরক্ত ছিল এবং কারবালার ঘটনার পর সে আরও বেশি কুখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, তাই কেউ তার হাতে বায়াত হতে চাচ্ছিল না। ইবনে জিয়াদ কিছু ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং কিছু প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দিয়ে...

[১] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৫৪, সনদ সহিহ।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৫০৩, উমর ইবনে শাব্বাহ থেকে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

মাধ্যমে তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ এবং তাদের নেতা হওয়ার চেষ্টা করল। সে তার ভাষণে বলল:

“যখন আমি তোমাদের গভর্নর হয়েছিলাম, তখন সরকারি ভাতা প্রাপ্ত তোমাদের তলোয়ারধারী যোদ্ধার সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার, এখন তা আশি হাজার। আগে তোমাদের দাপ্তরিক কর্মচারীর সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার, এখন তা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। আমি তোমাদের এমন কোনো শত্রু বাকি রাখিনি যাকে তোমরা ভয় পেতে পারো। তোমাদের সংখ্যা সবার চেয়ে বেশি। তোমরা কেন কারো পরোয়া করবে! তোমরা নিজেদের জন্য এমন একজন শাসক বেছে নাও যে দ্বীনদারির দিক থেকে এবং তোমাদের জামাতের উপকারের দিক থেকে তোমাদের পছন্দনীয় হয়। আমিও তার আনুগত্য মেনে নেব। তারপর যদি সিরিয়াবাসী এমন কাউকে বেছে নেয় যার ব্যাপারে তোমরা একমত হও, তবে তোমরা সকল মুসলিমের সাথে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও। অন্যথায় যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা পূরণ না হয়, ততক্ষণ তোমরা নিজেদের ভূখণ্ডের মালিক হয়ে থাকো। তোমাদের অন্য কোনো শহরের আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, বরং মানুষ তোমাদের ছাড়া চলতে পারবে না।”

এই ভাষণের মাধ্যমে ইবনে জিয়াদের উদ্দেশ্য কি ইরাকে কোনো নতুন বিশৃঙ্খলা রোধ করা ছিল নাকি নিজেই ইরাকের সিংহাসন দখল করা? এ বিষয়ে দুটি মত থাকতে পারে, তবে ইবনে জিয়াদ যে কোনো মূল্যে চেয়েছিলেন যেন ইরাকবাসী আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর দিকে ঝুঁকে না পড়ে; কারণ সে ছিল তাঁর ঘোর বিরোধী।

এদিকে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ছিল এমন যে, কিছু সংকীর্ণমনা গোষ্ঠী ছাড়া প্রায় সকল সাহাবায়ে কেলাম, তাবায়ীন, নেককার ও সৎ লোক এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-ই নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন। অন্যদিকে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ তাঁর খিলাফতের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে জনগণকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল।

ইরাকের আমীর-ওমরাহগণ ইবনে জিয়াদের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু কী আর করার ছিল! তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সবার ওপর ছেয়ে ছিল। অবশেষে গোত্রীয় প্রধান এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার সাথে এক অদ্ভুত খেলা খেললেন। তারা ইবনে জিয়াদের তোষামোদ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন:

“আমীর সাহেব! আল্লাহর কসম! আপনার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই, তাই আমরা আপনার কাছেই বায়আত গ্রহণ করব।”

এই বলে তারা সামনে এগিয়ে এল এবং তার হাতে বায়আত গ্রহণ করতে লাগল। [১]

এর পাশাপাশি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জোরালো দাবির মুখে ইবনে জিয়াদ বন্দীদের মুক্তি দিল, যাদের মধ্যে বড় একটি অংশ ছিল খারেজিদের। তারা সবাই এসে ইবনে জিয়াদের হাতে বায়আত গ্রহণ করল, কিন্তু এসবই ছিল লোকদেখানো। আসল উদ্দেশ্য ছিল বন্দীদের মুক্ত করা। ফলে বায়আত অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে যখন এই লোকেরা বাড়ির দিকে রওনা হলো, তখন তারা রাজপ্রাসাদের দেয়ালে হাত মুছতে মুছতে যাচ্ছিল এবং বিদ্রূপের সুরে বলছিল: “এটি ইবনে মারজানার পুত্রের বায়আত; সে কি মনে করে যে আমরা উম্মতের সাথে থাকা বা আলাদা থাকার বিষয়ে তার নির্দেশ মেনে চলব?” [২]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৫০৩, ৫০৫; উমর বিন শাব্বা থেকে বর্ণিত।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৫০৫; আনসাব আল-আশরাফ ১/৫।

ইবনে যিয়াদ বসরার লোকদের বাহ্যিক আনুগত্যে সন্তুষ্ট ছিল। সে এখন কুফাবাসীদের কাছে দূত পাঠাল এবং সেখানকার গভর্নরের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিতে চাইল। কিন্তু কুফাবাসী আনুগত্য করতে সরাসরি অস্বীকার করল। এটি দেখে বসরার লোকদের সাহসও বেড়ে গেল এবং তারাও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করল। বসরায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। [১]

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ দেখল যে পরিস্থিতি তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। সে তার অভ্যাস অনুযায়ী বিরোধীদের গর্দান উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু খিলাফতের পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন না থাকায় তার শক্তি কমে গিয়েছিল। ইরাকে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল, যাতে ইবনে যিয়াদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। সবাই তার প্রাণের পেছনে পড়েছিল। অবশেষে ৬৪ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে সে আত্মগোপন করল। তার অনুপস্থিতিতে বসরার লোকেরা গভর্নরের প্রাসাদে ঢুকে তা লুট করল। বসরার প্রধান আহনাফ বিন কায়স এই বিশৃঙ্খলা দেখে তৎপর হলেন এবং বায়তুল মাল, জেলখানা ও সরকারি দপ্তরগুলোতে পাহারাদার নিযুক্ত করলেন। তারপর লোকদের একত্রিত করে তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শহর পরিচালনার জন্য আবদুল্লাহ বিন আল-হারিসকে শহরের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। [২] এভাবে সাময়িকভাবে দাঙ্গা প্রশমিত হলো।

খোরাসানসহ পূর্বদিকের সমস্ত প্রদেশ কুফা ও বসরা থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। খোরাসানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। স্থানীয় নেতারা উমাইয়া কর্মকর্তাদের বের করে দিল। প্রতিটি অঞ্চলে স্বঘোষিত নেতারা দখলদারিত্ব কায়েম করল এবং নিজেদের মধ্যে তলোয়ার চলতে লাগল। [৩]

বসরার অবস্থা এমন ছিল যে জুমার নামাজ পড়ানোর জন্য একজন অস্থায়ী আমিরের ব্যাপারেও কোনো ঐক্য ছিল না। স্থানীয় নেতারা তর্ক-বিতর্ক করত এবং অনেক শোরগোল ও হট্টগোলের পর কাউকে আমির নিযুক্ত করত, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে আসত। পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে চারবার এই পরিবর্তন ঘটেছিল। [৪]

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর কেন খলিফা হলেন?

এই পরিস্থিতিতে উম্মাহর জন্য বিলম্ব না করে একজন নেতা নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। হিজাজ ও আরবের নেতাদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আবদুল্লাহ বিন জুবাইর তখনো নিজের খিলাফতের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি তাকে এই ভারী বোঝা কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য করছিল, যা উম্মাহর কোমর ভেঙে দিচ্ছিল। তাছাড়া সেই সময়ে উম্মাহর মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমর বা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ছাড়া তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ ছিল না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও একটি ভয় ছিল যে, যদি আরও দেরি করা হয় তবে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মতো কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক ও তলোয়ারের জোরে খিলাফতের মসনদ দখল করে নিতে পারে।

অবশেষে ৬৪ হিজরির রজব মাসে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর মক্কা মুকাররমায় উম্মাহর নতুন খলিফা হিসেবে সাধারণ মুসলমানদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৫৩৭

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৮

[৩] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৪৬৭, আল-মাদায়েনী থেকে বর্ণিত, মুসনাদে হাসান

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৫২৭

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। [১] বাইয়াতে ওয়াদা ছিল যে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পথে পরিচালিত করবেন। আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র মুসআব এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাহেবজাদা উবাইদুল্লাহ সর্বপ্রথম বাইয়াত গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [২]

মুসলিম বিশ্বে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা:

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম খলিফা যার খিলাফতের কেন্দ্র ছিল মক্কার হারাম। তাঁর প্রতিনিধিরা মক্কা থেকে সিরিয়া ও ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যাতে সেখানকার লোকদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করা যায়। মদিনাবাসীরা তো আগেই তাঁর অনুরাগী ছিল। বাইয়াতের পর সেখানে উবাইদাহ বিন জুবায়েরকে আমির নিযুক্ত করা হলো। মিশরের লোকেরাও বাইয়াত গ্রহণ করল, সেখানে আবদুর রহমান বিন জাহদাম ফাহরিকে আমির বানানো হলো। [৩]

বসরার অধিবাসীরা আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতায় অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই যোগাযোগ করল যাতে তাদের ওপর কোনো আমির নিযুক্ত করা হয়। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার জন্য বসরায় অবস্থানরত মর্যাদাবান সাহাবী, খাদেমুর রাসূল, আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তিনি বসরার অধিবাসীদের ইমামতি করতে লাগলেন। যখন শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এল, তখন কিছুদিন পর আমর বিন উবাইদুল্লাহকে নিযুক্ত করা হলো। কুফায় তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পৌত্র ইবরাহিমকে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হলো। আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ আনসারীকে দাপ্তরিক বিষয়াবলির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠানো হলো। এভাবে ইরাকও জুবাইরি খিলাফতের অধীনে চলে এল। এটি ৬৪ হিজরির রমজান মাসের ঘটনা। [৪]

সিরিয়ার অধিকাংশ আমিরের আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বাইয়াত:

সিরিয়াতেও আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভক্ত ও সমর্থক কম ছিল না। দামেস্কে রাসূলের সাহাবী দাহহাক বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি সাবেক খলিফা মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের ওসিয়ত অনুযায়ী সালাতের ইমাম ছিলেন, তিনি নিজেও আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কটুর সমর্থক ছিলেন এবং চাইতেন যে বনু উমাইয়াদের আমিররা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করুক। [৫]

এই সময়ে দামেস্কের কিছু আমির বনু উমাইয়ার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ওয়ালিদ বিন উতবার হাতে বাইয়াত হতে চাইলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন এবং কিছুদিন পরই মৃত্যুবরণ করলেন। [৬] এভাবে দাহহাক বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থান আরও সুদৃঢ় হলো। তিনি প্রথমে দামেস্কে গোপনে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে জনমত গঠন করলেন এবং এরপর প্রকাশ্যে তাঁর বাইয়াতের দাওয়াত দিলেন। মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিল এবং বাইয়াত গ্রহণ করল। [৭] আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দাহহাক বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রচেষ্টার কথা জানতে পারলেন, তখন অত্যন্ত কদরদানি করলেন এবং তাঁকে সিরিয়ার আমির নিযুক্ত করলেন। [৮]

[১] তারিখ খলিফা, পৃ. ২৫৮

[২] আনসাবুল আশরাফ ৫/৩৫২, ত. দারুল ফিকর

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৫৩০

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৯; তারিখুত তাবারী: ৫/৫৩২, ৫৩০

[৫] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি: ৫/১২২, ৩৫০, ৩৫২, ৬/২৬৬, ত. দারুল ফিকর

[৬] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৫/২৬৭ আনিল মাদায়িনী বি-সানাদিন হাসান, ত. তাদমুরী

[৭] তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতাম্মিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৩০১, ৩০২

[৮] তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতাম্মিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৩০২, ৩০৩; আনসাবুল আশরাফ: ৬/৩৫৮, ত. দারুল ফিকর

সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হিমসের গভর্নর নুমান বিন বশীর (রা.)-ও আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী এবং উমাইয়া সরকারের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইয়াজিদের পর দাহহাক বিন কায়েস এবং তাঁরও জুবায়েরী খিলাফত গ্রহণ করা এই কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফত সম্পূর্ণ সঠিক ও শরয়ী ছিল। এদিকে কিননাসরিনে জুফার বিন আল-হারিস এবং ফিলিস্তিনে নাতিল বিন কায়েসের মতো প্রভাবশালী নেতারাও আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সমর্থনে দাঁড়িয়ে সেখানে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছিলেন। জর্ডানের গভর্নর হাসসান বিন মালিক ব্যতীত প্রায় পুরো সিরিয়ার শীর্ষস্থানীয় আমীরগণ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তাঁর খিলাফত শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট ছিল না।

কেবল বনু উমাইয়ার পূর্ববর্তী শাসক পরিবার এবং তাদের কিছু গোঁড়া অনুগতরা বায়াত গ্রহণ করেনি, যাদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ, মারওয়ান বিন আল-হাকাম, আমর বিন সাঈদ আল-আশদাক এবং হাসসান বিন মালিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [১]

উম্মাহর ঐক্যকে হিন্মভিন্নকারী রাজনীতি

মনে হচ্ছিল যে এখন ইসলামি বিশ্বে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার দিন শুরু হতে যাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ উমাইয়া রাজনীতিবিদ মারওয়ান বিন আল-হাকামের একটি মারাত্মক ভুল পরিস্থিতিকে পুনরায় উদ্বেগজনক করে তুলল। মারওয়ানকে এই ভুল পথে পরিচালিত করেছিল উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ। বসরা ও কুফার রাজনীতি থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও সে উম্মাহর পথে ফিতনার কাঁটা বিছিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

সে দিনগুলোতে মারওয়ান বিন আল-হাকাম সিরিয়ায় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর জনপ্রিয়তাকে একটি বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এরপর যখন এই নতুন সরকারে দাহহাক বিন কায়েস (রা.)-এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়তে দেখলেন, তখন তিনি নিজেই মক্কায় গিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন; এবং নিজের সাথে আমর বিন সাঈদকে নিয়ে সিরিয়া থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু যখনই তিনি সীমান্ত এলাকা ‘আজরুহাত’-এ পৌঁছালেন, তখন ইরাকের দিক থেকে আসা ফিতনার সওদাগর উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সাথে তাঁর দেখা হলো, যে বসরায় নিজের বিরুদ্ধে জনরোষ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে কিছুকাল আত্মগোপনে ছিল এবং এখন প্রাণ বাঁচাতে দামেস্কের দিকে আসছিল।

যখন সে জানতে পারল যে মারওয়ান আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন সে অত্যন্ত বিচলিত হলো, কারণ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর ন্যায়বিচারপূর্ণ শাসনে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা সম্ভব ছিল না। উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ভেবে রেখেছিল যে যেকোনোভাবে সিরিয়াকে জুবায়েরী খিলাফত থেকে মুক্ত করে সেখানে নিজের অংশ বের করে নেওয়া হবে। সে মারওয়ানের সিদ্ধান্তের ওপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল এবং তাকে লজ্জা দিয়ে বলল: “আপনি কুরাইশদের নেতা, বনু আবদে মানাফের মুরূবি। আপনি কি ইবনে জুবায়েরের হাতে বায়াত গ্রহণ করবেন? আল্লাহর কসম, আপনি তাঁর চেয়ে খিলাফতের বেশি হকদার।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৫৩১, তারিখু খলিফা, পৃ. ২৫৯... হাসসান বিন মালিক ইয়াজিদের মামা, আক বিন জাদালের পুত্র এবং বনু কালব গোত্রের প্রধান ছিলেন। (মুখতাসার তারিখু দামেশক: ৬/৩০৯) বনু উমাইয়াকে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টার বড় ভূমিকা ছিল, যার বিবরণ শিক্ষণীয়। এই সংঘাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ‘ইয়াওমে মারজে রাহিত’, যা দামেস্কে সংঘটিত হয়েছিল, বালাজুরি এই সমস্ত বিবরণ লিখেছেন। (আনসাবুল আশরাফ: ২/২৬৩ থেকে ২৬৭)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মারওয়ান চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: “তাহলে তুমিই বলো আমি কী করব?”

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ বললেন: “তুমি ফিরে যাও এবং তোমার খিলাফতের দাওয়াত দাও। কুরাইশ এবং তাদের সংশ্লিষ্টদের আমি সামলে নেব।”

একটি সমস্যা আরও সামনে ছিল তা হলো বনু উমাইয়ার কিছু লোক ইয়াজিদের দ্বিতীয় ছেলে খালিদ বিন ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে দেখতে চেয়েছিল।

যখন এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো তখন আমার বিন সাঈদ মারওয়ানকে সমাধান বাতলে দিয়ে বললেন:

“তুমি ইয়াজিদের বিধবা উম্মে খালিদ (ফাখতাহ বিনতে আবি হাশিম বিন উতবাহ)-কে বিয়ে করে নাও, এবং খালিদকে তোমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে নাও।”

মারওয়ানের এই পরিকল্পনা পছন্দ হলো। তিনি আমার বিন সাঈদ এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের সাথে শাম ফিরে এলেন। তিনি নিজে হালব থেকে ৮০ মাইল (১২৮ কিলোমিটার) দূরে “তাদমুর”-এ অবস্থান নিলেন যাতে পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি দেখে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ সরাসরি দামেস্কে পৌঁছে গেলেন যাতে বাহ্যিকভাবে দাহহাক বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সহযোগী হয়ে জুবাইরি খিলাফতের শিকড় কেটে ফেলতে পারেন। [১]

গোঁড়ামির আগুন:

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহী আন্দোলনকে “ইজতিহাদি বিদ্রোহ” বলা নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতা হবে, কারণ এখানে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য বা শরয়ী ব্যাখ্যা কোথাও দেখা যায় না, বরং আঞ্চলিক গোঁড়ামি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যাকে কিছু ধর্মীয় শিরোনাম দিয়ে উসকে দেওয়া হচ্ছিল। যখন মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের মৃত্যুর পর জর্ডানবাসী ছাড়া সমস্ত শামবাসী আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করল, তখন পূর্ববর্তী সরকারের কিছু অনুগতরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল: “শাসন তো আমাদের শামবাসীদের কাছে চলে আসছিল, এটি হিজাজে কেন স্থানান্তরিত হলো? আমরা এটি কখনোই গ্রহণ করব না।” [২]

এই নেতারা মানুষের মধ্যে গোঁড়ামির প্রবণতাকে জাগিয়ে তুললেন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। ইয়াজিদের মামাতো ভাই হাসসান বিন মালিক জর্ডানের মানুষের মধ্যে গোঁড়ামির আগুন জ্বালানোর পর তাদের জিজ্ঞেস করলেন:

“হে জর্ডানবাসী! তোমরা আবদুল্লাহ বিন জুবাইর এবং হাররার নিহতদের সম্পর্কে কী বলো?”

লোকেরা চিৎকার করে উঠল: “আবদুল্লাহ বিন জুবাইর মুনাফিক। হাররার নিহতরা জাহান্নামী।”

তারপর হাসসান জিজ্ঞেস করলেন: “হাররায় নিহত শামবাসী এবং ইয়াজিদ সম্পর্কে কী বলো?”

লোকেরা আবার চিৎকার করে উঠল: “ইয়াজিদ জান্নাতী। আমাদের নিহতরাও জান্নাতী।”

হাসসান বিন মালিক বললেন: “যদি ইয়াজিদ হকের ওপর থেকে থাকে তবে আজও তার অনুসারীরা হকের ওপর আছে। যদি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর গতকাল বাতিলের ওপর থেকে থাকে তবে আজও সে বাতিলপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত।”

লোকেরা বলল: “তুমি সত্য বলেছ।” এবং হাসসানের কাছে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বায়াত গ্রহণ করল। [৩]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতান্নিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/২০২; তারিখুল ইসলাম, যাহাবী: ৫/৩৫, ১৩৩; ইয়াসিদ বিন সাদ আল-মাদায়িনী থেকে, তিনি খালিদ বিন ইয়াজিদ বিন বাশির থেকে, তিনি তার পিতা থেকে এবং মাসলামাহ বিন মুহারির থেকে।

[২] তারিখু দামেশক: ১৮/৪৩৮

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৬৩, ত. দারুল ফিকর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - অষ্টম খণ্ড

আইমান আসাদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতা:

এই পরিস্থিতিতে সেই সব লোকই সর্বোত্তম ছিল যারা ফিতনার এই আগুন থেকে দূরে ছিল। মারওয়ান যখন আইমান ইবনে খুরাইম আল-আসাদীকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন তিনি ওজর পেশ করে বললেন: “আমার পিতা ও চাচা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমি কোনো কালেমা পাঠকারীর রক্তে হাত রঞ্জিত করব না। আপনি যদি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টিপত্র এনে দিতে পারেন, তবে আমি আপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব।”

মারওয়ান বললেন: “তোমার মতো লোকের আমাদের প্রয়োজন নেই।” এর ওপর আইমান এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতাগুলো পাঠ করলেন:

ذَلِكَ مُقَاتِلُ رَجُلٍ يُصَلِّي ... عَلَى سُلْطَانٍ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ

“আমি অন্য কোনো কুরাইশীর শাসনের জন্য কোনো নামাজি (আহলে কিবলা)-এর সাথে কখনোই যুদ্ধ করব না।”

لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي ... مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ سَفَهٍ وَطَيْشٍ

“কেননা সে তো রাজত্ব পাবে আর আমার হবে গুনাহ। এমন মুর্থতা ও ত্রোধ থেকে আল্লাহর পানাহ।”

[১] أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ ذَنْبٍ ... فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي

“আমি কি কোনো মুসলমানকে বিনা অপরাধে হত্যা করব? এই কাজ সারাজীবনে আমাকে কোনো উপকার দেবে না।”

দাহহাক বিন কায়েস (রা.) এবং মারওয়ান মুখোমুখি:

عبدالله بن زبير (রা.)-এর বিরুদ্ধে বনু উমাইয়াকে লড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের। একদিকে সে মারওয়ানকে খিলাফতের দাবির ওপর উদ্বুদ্ধ করল, অন্যদিকে দামেস্কে পৌঁছে সে দাহহাক বিন কায়েস (রা.)-এর সাথে বন্ধুত্বের ভান করতে লাগল। প্রথমে সে দাহহাক (রা.)-কে প্ররোচিত করে খিলাফতের দাবির ওপর উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করল। দাহহাক বিন কায়েস (রা.) এই ভুল করতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে বন্ধুদের পরামর্শে নিজেকে সামলে নিলেন।

যখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সমর্থনের ওপর অটল থাকলেন এবং মানুষ দলে দলে তাঁর হাতে বায়আত হতে লাগল, তখন ইবনে জিয়াদ তা সহ্য করতে পারল না। সে আরেকটি চাল চালল এবং তাঁদেরকে মারওয়ানের সাথে লড়াই করতে উস্কানি দিল। দাহহাক বিন কায়েস (রা.) তখন দামেস্কের সুরক্ষিত শহরে ছিলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে তাঁকে বোঝাল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু উমাইয়ার শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ না করা হবে, ততক্ষণ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর খিলাফত স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে না। সে তাঁকে খোলা ময়দানে শক্তি পরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে বলল: “যে আপনার মতো মহান উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায়, সে শহর ও দুর্গের ভেতর বসে থাকে না, বরং বাইরে বেরিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী সংগ্রহ করে। দামেস্ক থেকে বের হোন এবং নিজের বাহিনী প্রস্তুত করুন।”

এই কথা দাহহাক (রা.)-এর আত্মমর্যাদায় আঘাত করল এবং তিনি সেনাবাহিনীসহ শহর থেকে বেরিয়ে ‘মারজ রাহিত’-এ তাবু ফেললেন। ইবনে জিয়াদ নিজে তখনও দামেস্কে ছিল, যখন মারওয়ান এবং বনু উমাইয়ার আমিরগণ ‘তাদমুর’-এ অবস্থান করছিল।

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৬/ ২৬৭, ২৬৮, ত: দারুল ফিকর।

দ্বিতীয় খণ্ড | তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

দাহহাক ইবনে কায়েসকে ময়দানে বের করে এই ধূর্ত ব্যক্তি মারওয়ানকে লিখল: “লোকদেরকে নিজের খিলাফতের দাওয়াত দাও এবং দাহহাকের দিকে ধাবিত হও। সে তোমার সামনে খোলা ময়দানে চলে এসেছে।”

মারওয়ান ইয়াজিদের বিধবা উম্মে খালিদকে বিয়ে করে গোত্রীয় আভিজাত্যের ভিত্তিতে নিজের চারপাশে এক বিশাল জনসমাবেশ ঘটিয়েছিল এবং এখন সে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ইশারার অপেক্ষায় ছিল। এই লোকেরা, যাদের মধ্যে সিরিয়ার নেতৃবৃন্দ এবং বনু উমাইয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, জাবিয়া নামক স্থানে সমবেত হলো। [১]

“জাবিয়া” এর পরামর্শ:

জাবিয়ার মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর নিন্দা এবং মারওয়ানের গুণাবলী ও প্রশংসায় জোরালো বক্তৃতা হলো। যারা ইয়াজিদের ছেলে খালিদকে খলিফা নিযুক্ত করতে চেয়েছিল, তাদের মতামতকেও পূর্ণ শক্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হলো।

এই মজলিসে কিছু বুদ্ধিমান লোক পরামর্শ দিলেন যে, যদি আপনারা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ব্যাপারে একমত না হন, তবে উম্মতে মুসলিমা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর খিলাফতের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু উমাইয়া নেতারা তা মানলেন না। রাওহ ইবনে জুনবা’ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন:

“আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর গুণাবলী তার জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু তিনি একজন দুর্বল ব্যক্তি এবং উম্মতে মুসলিমার নেতা কোনো দুর্বল ব্যক্তি হতে পারে না। আর আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের কথা যদি বলি, যদিও তিনি আসমা বিনতে আবু বকরের ছেলে, কিন্তু তিনি একজন মুনাফিক। তিনি দুই খলিফা ইয়াজিদ এবং তার ছেলে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, রক্তপাত করেছেন, মুসলমানদের ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের নেতৃত্ব এমন কোনো মুনাফিককে দেওয়া যেতে পারে না। আর মারওয়ান ইবনে হাকামের কথা যদি বলি, ইসলামে এমন কোনো ফাটল সৃষ্টি হয়নি যা জনাব মারওয়ান পূরণ করেননি। তিনি আমিরুল মুমিনীন উসমান (রা.)-এর ঘরে হামলার দিন তাঁর প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করেছেন, তিনি জঙ্গ জামালে আলী ইবনে আবি তালিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি তালহাকে হত্যা করে উসমান (রা.)-এর প্রতিশোধ নিয়েছেন। তাহলে কি আমরা ছোটর হাতে বায়াত করব আর বড়কে ছেড়ে দেব?” [২]

হাসান ইবনে মালিক তার বক্তৃতায় বললেন: “আমারও একই মত। আমি এটা সহ্য করতে পারি না যে খিলাফত ইবনে জুবায়েরের কাছে চলে যাক এবং আহলে বাইত (বনু উমাইয়া) থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হোক। মারওয়ান কুরাইশদের একজন বড় এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি মজলুম খলিফা উসমান (রা.)-এর চাচাতো ভাই। তিনিই সর্বপ্রথম উসমানের কিসাসের দাবি তুলেছিলেন। উসমান (রা.)-এর উত্তরাধিকার তাঁরই প্রাপ্য। তিনি ইবনে জুবায়েরের চেয়ে অনেক উত্তম, যে ধর্মহীন, যে খিলাফতের অবাধ্যতা করেছে এবং যে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানি করেছে।” [৩]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতাম্মিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ৩/৩০২ থেকে ৩০৩; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৫/১৩৫, ১৩৬, ত. তাদমুরি; তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ২৬০

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৬৭, ত. দারুল ফিকর [৩] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২২০, ত. দারুল ফিকর

কিছু লোক মারওয়ানকে সাহাবী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যান। একটু চিন্তা করে দেখুন! মারওয়ানের এই গুণাবলীর তালিকায় কি তার নবীপ্রেমের সৌভাগ্য অর্জনের কোনো উল্লেখ আছে? অথচ তিনি যদি সত্যিই এই সৌভাগ্য লাভ করতেন, তবে তার প্রশংসাকারীরা অন্তত এর ইঙ্গিত হলেও উল্লেখ করতেন। কিন্তু এখানে তার গুণাবলী হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি তালহা (রা.)-কে হত্যা করেছেন এবং আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে মারওয়ান সাহাবী ছিলেন না। তার চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল কিসাস আন্দোলনে সক্রিয় হওয়া। জাবিয়া সম্মেলনের দৃশ্যগুলো এটিও প্রকাশ করে যে, ৬৪ হিজরি নাগাদ ইয়াজিদপন্থী রাজকীয় নেতাদের মধ্যে গোত্রীয় আভিজাত্যের পরিবেশ সাধারণ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর উপস্থিতদের সর্বসম্মতিক্রমে মারওয়ান খিলাফতের দাবি করেন। এটি যুল-কাদ ৬৪ হিজরীর ঘটনা। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের رضى الله عنه-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর তখন চার মাস অতিবাহিত হয়েছিল। [১]

মারওয়ানের পক্ষ থেকে খিলাফতের দাবি উত্থাপিত হওয়ার সাথে সাথেই বনু উমাইয়ার অধিকাংশ সমর্থক অবিলম্বে তার বায়াত গ্রহণ করে এবং বলে: “আল্লাহর শুরুরিয়া যে, তিনি এই খিলাফত আমাদের বাইরে যেতে দেননি।” [২]

মারওয়ানের এই অবৈধ খিলাফতের দাবি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ رضى الله عنه-এর সেই কোরবানিকে নিষ্ফল করে দেয়, যা তিনি ক্ষমতার বিষয়টি মুসলিম জনসাধারণের সন্তুষ্টি ও পরামর্শের (শুরা) ওপর ন্যস্ত করে পেশ করেছিলেন। এই ভুল পদক্ষেপের কারণে উম্মাহ পুনরায় এক নতুন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয় যা দশ বছর পর্যন্ত থামেনি। এই ফিতনার সবচেয়ে বেশি দায়ভার উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, হাসসান ইবনে মালিক এবং মারওয়ানের ওপরই বর্তায়, যারা বনু উমাইয়ার বংশীয় অভিজাত্য এবং সিরিয়াবাসীদের আঞ্চলিক গোঁড়ামিকে উসকে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের আগুন পুনরায় জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং মুসলমানরা একজন খলিফার ওপর একমত হওয়ার পর আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বনু উমাইয়া খিলাফতকে অন্য কোনো বংশের হাতে মেনে নিতে অস্বীকার করে প্রকাশ্যে এক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করেছিল।

মারজ-ই-রাহিতের যুদ্ধ:

মারওয়ান এখন পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মারজ-ই-রাহিত পৌঁছান যেখানে যাহহাক ইবনে কায়েস ইতিপূর্বেই তার বাহিনীসহ অবস্থান করছিলেন। মারওয়ান এখানে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। [৩] এখন উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদও যুবায়েরী খিলাফতের সমর্থনের ভণ্ডামি ত্যাগ করে দামেস্ক থেকে বের হন এবং মারজ-ই-রাহিতে মারওয়ানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান। এই সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী দামেস্কে বনু উমাইয়ার সমর্থক ইয়াযীদ ইবনে আবি নামস বিদ্রোহ করেন এবং যাহহাক ইবনে কায়েস رضى الله عنه-এর প্রতিনিধিকে শহর থেকে বের করে দেন।

যুল-হিজ্জাহ ৬৪ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। যাহহাক ইবনে কায়েস رضى الله عنه-এর সাথে ষাট হাজার এবং মারওয়ানের পতাকাতলে তেরো হাজার সৈন্য ছিল। উভয় পক্ষই স্বভাবগতভাবে রক্তপাত অপছন্দ করত, তাই তারা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ এড়িয়ে চলছিল। বিশ দিন পর্যন্ত কোনো ফলাফল আসেনি। তখন উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের অনিষ্টকারী স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ আবার ঘটল। সে মারওয়ানকে বলল: “এই যুদ্ধ আমরা কেবল প্রতারণার মাধ্যমেই জিততে পারি। তাদের সন্ধির প্রস্তাব দাও। যখন তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে তখন আক্রমণ করে দাও।”

তার পরামর্শে মারওয়ান যাহহাক ইবনে কায়েস رضى الله عنه-কে যুদ্ধবিরতি ও আলোচনার প্রস্তাব দেন। যাহহাক ইবনে কায়েস رضى الله عنه এবং তার সঙ্গীরা রাজি হয়ে যান। তাদের এই নিশ্চিন্ত অবস্থার সুযোগে এক রাতে মারওয়ান অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে জোরালো আক্রমণ করেন। যুবায়েরী বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তবে যাহহাক ইবনে কায়েস رضى الله عنه তার সঙ্গীদের নিয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। তাদের গোত্র বনু কায়েস নিজেদের পতাকাসহ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অটল থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পতাকাবাহী নিহত হন। যাহহাক ইবনে কায়েস رضى الله عنه-ও শহীদ হন এবং তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতাম্মিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ২/৪০২ থেকে ৪০৩; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৫/১৩৫, ১৩৬, ত-তাদমুরী; তারিখু খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ২৬০

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৬০, ত-দারুল ফিকর

[৩] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/৯২ হাসান মুত্তাসিল সনদে, ত-মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — সপ্তম

মারওয়ান ঘোষণা করলেন: “পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করা হবে না।” [১] মারওয়ানের সামনে যখন যাহহাক বিন কায়েসের বিচ্ছিন্ন মস্তক আনা হলো, তখন তিনি ব্যথিত হয়ে বলতে লাগলেন: “যখন বয়স পার হয়ে গেল এবং হাড়গুলো জরাজীর্ণ হয়ে গেল, তখন আমি সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম।” [২]

হাফেজ যাহাবীর মতে, যুদ্ধের শেষ লড়াইটি ৬৫ হিজরীর মহরম মাসের শুরুতে সংঘটিত হয়েছিল। [৩]

মারজ রাহিতের যুদ্ধে যাহহাক বিন কায়েসের গোত্র বনু কায়েসের এক বিশাল অংশ তলোয়ারের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সিরিয়ায় ইবনে যুবায়েরের সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং তাঁর খিলাফতের আহ্বানকারী ছিল এই গোত্রটি। তাই যেখানেই পরাজয়ের খবর পৌঁছাল, সেখান থেকেই যুবায়েরপন্থীদের পা উপড়ে গেল। এভাবে সিরিয়ায় আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের সমর্থকদের জন্য আর কোনো স্থান অবশিষ্ট রইল না। হিমসের শাসক নুমান বিন বশীরকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। তিনি যাহহাকের পরাজয়ের খবর শুনে পরিবার-পরিজনসহ শহর ত্যাগ করেন, কিন্তু হিমসের উপকণ্ঠে বনু কালব গোত্র তাঁকে খুঁজে বের করে এবং হত্যা করে তাঁর শিরশ্ছেদ করে। এভাবে পুরো সিরিয়া বিদ্রোহীদের দখলে চলে আসে। [৪]

নুমান বিন বশীরের বিচ্ছিন্ন মস্তক তাঁর স্ত্রী নায়িলার কোলে ফেলে দেওয়া হলো। এটি দেখে তাঁর সাহসী কন্যা উম্মে আবান সাহস ও গর্বের সাথে বললেন: “আমি এর বেশি হকদার।” সৈন্যরা মাথাটি তুলে তাঁর কোলে ছুঁড়ে দিল। [৫]

মারজ রাহিতের যুদ্ধে সিরিয়ার আমিরদের বিদ্রোহী পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ফলে নবী করীম (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো: “যখন আমার উম্মতের মধ্যে তলোয়ার রাখা হবে (যুদ্ধ শুরু হবে), তখন তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।” [৬]

যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ হযরত উসমানের শাহাদাতের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল, তবে পরবর্তী যুগগুলোতে এর বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশি দেখা যায়। আমরা দেখি যে, এরপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষীরা ইসলামী শুরা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ গৌণ করে দেয় এবং ক্ষমতা অর্জনের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তলোয়ারের ওপর ভরসা করে। স্পষ্টতই তলোয়ারের এই পরীক্ষা মুসলমানদের ওপরই হয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজে এরপর ক্ষমতা অর্জনের জন্য যে রক্তপাত শুরু হয়েছিল, তা আর কখনো থামেনি।

পরাজয়ের কারণসমূহ:

মারজ রাহিতের যুদ্ধে যুবায়েরপন্থীদের পরাজয়ের বেশ কিছু কারণ ছিল:

- ১. তারা প্রতারণিত হয়েছিল। তারা একজন ধূর্ত শত্রুকে নিজেদের মতো নীতিবান মনে করে এই ধারণায় ছিল যে সে বিশ্বাসঘাতকতা...

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৫/১৩৫, ১৩৬; আনিল মাদায়িনী; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৬০

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৬৯, তাবা দারুল ফিকর [৩] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৫/৩১

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/৫৩১; আনসাবুল আশরাফ, বালায়ুরী: ৬/২৬৯ থেকে ২৮৩, তাবা দারুল ফিকর; সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৩/২১২, তাবা আর-রিসালাহ; তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতাম্মিমুস সাহাবাহ: ২/৩০৪ থেকে ৩০৭; তাবাকাত ইবনে সাদ, ৩/৫৩, তাবা সাদির

[৫] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৮৩... নুমান বিন বশীর এবং আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের সমবয়সী ছিলেন। হিজরতের পর মদীনায় মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং আনসারদের মধ্যে নুমান বিন বশীর সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণকারী শিশু ছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৮৩) তাঁর পিতা বশীর বিন সাদ আনসারী একজন নেতা ছিলেন। সাকিফায়ে বনী সায়েদাহ-তে হযরত আবু বকরের বায়াত গ্রহণকারী প্রথম আনসারী ছিলেন তিনি। বশীর বিন সাদ বিভিন্ন যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ: ১/৪২৪)

[৬] ইয়া ওয়াদআস সাইফু ফী উম্মাতি লাম ইউরফা আনহা ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ (সুনানে তিরমিযী, হা: ২২০২ হাদিসটি হাসান সহীহ)

...করবে না। অথচ তাদের জন্য জরুরি ছিল যে তারা পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করত এবং আলোচনার ধোঁকায় না পড়ত।

- দাহহাক বিন কায়েসের সাথে মুখলিস ও সাহসী লোক ছিল, পক্ষান্তরে মারওয়ানের সাথীরা যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি ধূর্তও ছিল। জয়-পরাজয়ের বাহ্যিক দৃশ্যে ধূর্ততা প্রায়ই ইখলাস ও আখলাকের ওপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং সাময়িকভাবে ময়দান দখল করে নেয়।
- আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর সমর্থকরা সিরিয়ার কেন্দ্র দামেস্ককে সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ফলে সেখানে মারওয়ানের সমর্থকরা দখলদার হয়ে যায়। এভাবে সরকারি কোষাগার বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়।
- হিজাজ থেকে দাহহাক বিন কায়েসের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছায়নি। যদি সময়মতো সাহায্য পৌঁছে যেত, তবে সম্ভব ছিল যে মারওয়ান ঘেরাওয়ার মধ্যে পড়ে পরাজিত হতো।

□□□

মারজ রাহিতের যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য

“মারজ রাহিত” যুদ্ধ ছিল উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাসের একটি বেদনাদায়ক মোড়। এই যুদ্ধের ফলে উম্মতে মুসলিমাহ যেমন দাহহাক বিন কায়েস এবং নুমান বিন বশির (রা.)-এর মতো সাহাবী এবং শত শত মহান তাবেয়ীকে হারিয়েছে, তেমনি এই সত্যটিও স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে যে, উম্মতের কিছু অভিজাত এবং কয়েকজন প্রভাবশালী তলোয়ারধারী ব্যক্তি যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিল এবং কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতার অলিগলি থেকে আলাদা হওয়া বরদাশত করতে পারছিল না, উম্মত তাদের শাসক হিসেবে দেখতে পছন্দ করুক বা না করুক। তাদের প্রথম সারিতে ছিল উমাইয়া আমিররা, যারা নিজেদের পরিবার ছাড়া অন্য কারো শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয় সারিতে ছিল সেই সিরীয় জেনারেলরা, যারা আঞ্চলিক গোঁড়ামিতে লিপ্ত হয়ে হিজাজ বা ইরাকবাসীদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

তাদের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় কিছু ব্যক্তিত্বও शामिल হয়ে গিয়েছিলেন, যাদের এই কাজকে নিশ্চিতভাবে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা ভুল আবেগের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আমরাও সুধারণা পোষণ করি যে, এই ব্যক্তিবর্গ কোনো ইলমি বিভ্রান্তি, পরিস্থিতির ভুল বিশ্লেষণ, কোনো ফিকহি ত্রুটি বা ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এক সময় এই লোকগুলোই ছিল উম্মতের রাজনৈতিক লাগাম ধরার মতো শ্রেণি, কিন্তু এখন একজন সর্বসম্মত শরয়ি খলিফার মোকাবিলায় এসে তারা সাংবিধানিক দিক থেকে বিদ্রোহীদের মর্যাদা গ্রহণ করেছিল।

সিরিয়া এবং বনু উমাইয়ার আমিরদের এই আচরণকে আমরা জাহেলি যুগের গোঁড়ামির ওপর চাপিয়ে দিই না, যেমনটি কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন। বরং ইসলাম জাহেলিয়াতের আদর্শিক গোঁড়ামি মিটিয়ে দিয়েছিল, তাই কিছু রাজনৈতিক বিবাদ ছাড়া সাধারণভাবে বনু উমাইয়ার সম্পর্ক বনু হাশিম এবং বড় বড় সাহাবীদের সমস্ত পরিবারের সাথে অত্যন্ত ভালো ছিল এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্রমাগত বজায় ছিল এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার সম্পর্কও অবশিষ্ট ছিল।

আমরা বনু উমাইয়ার ভালো এবং যোগ্য খলিফাদের অহেতুক অভিযুক্ত করা ভুল মনে করি, তবে এতটুকু কথা অবশ্যই ছিল যে, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলনের অংশ হওয়া উমাইয়া ও সিরীয় আমিরদের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পেছনে ভুল ব্যাখ্যার বড় হাত ছিল।

বিদ্রোহ যদি কোনো বিচারযোগ্য ভুলের ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে তা বিদ্রোহীদের ফাসিক বা বিশ্বাসঘাতক বানায় না, কিন্তু যেকোনো অবস্থায় ভুল রাজনৈতিক পদক্ষেপের ফলাফল ভুলই হতে পারে। সুতরাং এর ফলে যে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়েছে, তার দায়ভার এই বিদ্রোহের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ওপরই বর্তাবে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তাঁর সমর্থকদের ওপর নয়।

উমাইয়া নেতৃবৃন্দ কিসের ভিত্তিতে বিদ্রোহী হয়েছিল?

কিছু লোক মনে করেন যে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর কাছে মজবুত যুক্তি ছিল, যেমন:

- তাঁরা উম্মতের পুরনো আহলে হাল ওয়াল আকদ এবং কেন্দ্রের আসহাবে সাইফ। তাঁদের সম্মতি ছাড়া কারো খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; তাই ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর বায়আত সম্পন্ন হয়নি।
- জাবিয়াতে মারওয়ানের নির্বাচন দামেস্ক ও সিরিয়ার রাজনীতিবিদরা করেছিলেন। তাঁদের ওপর প্রথমত কোনো অধিকার ছিল না, তবুও তাঁদের সিদ্ধান্ত পুরো ইসলামি বিশ্বের ওপর আবশ্যক হয়ে যায়; তাই বাকি সবার উচিত তাঁদের আনুগত্য করা।
- যেহেতু ইসলামি বিশ্বে ঐক্য জরুরি এবং অনৈক্য নাজায়েজ, তাই ইসলামি রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য এটি জরুরি যে দুজন খলিফা যেন না থাকে এবং অবৈধ খলিফা ও তাঁর সমর্থকদের শক্তির মাধ্যমে পরাজিত করা উচিত। [১]

এই মানসিকতার সাথে জাবিয়া কনফারেন্সের সিরীয় জেনারেলরা সেইসব মুসলমানদের রক্ত হালাল মনে করে নিয়েছিল যারা ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর সমর্থক ছিল। আর এটিই ছিল সেই বিষয় যার ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বছর ধরে উভয় পক্ষ একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এবং একে জায়েজ মনে করত।

:عبدالله بن زبير رضى الله عنه كى خلافت شرعى تھى

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিরীয় নেতৃবৃন্দের এই যুক্তিগুলো ছিল অত্যন্ত দুর্বল। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) ৬৪ হিজরির রজব মাসেই মুসলমানদের সর্বসম্মত খলিফা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বায়আত ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, উসমান গনি এবং আলী (রা.)-এর বায়আতের মতো, যাতে কোনো জোর-জবরদস্তি ছিল না বরং মুসলমানদের সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হয়েছিল। মুসলমানদের পাঁচটি বড় রাজনৈতিক কেন্দ্র: হিজাজ, কুফা, বসরা, দামেস্ক এবং মিশরের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে এমন এক ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন যার সাহাবি হওয়ার মর্যাদা, উচ্চ বংশমর্যাদা, ইলম, ফজল, আমানতদারি, তাকওয়া, বীরত্ব এবং নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। যখন মুসলিম উম্মাহ তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল, তখন তার চার মাস পর উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ এবং হাসসান বিন মালিকের প্ররোচনায় সিরিয়ার কিছু নেতৃবৃন্দ এবং বনু উমাইয়ার মনে হঠাৎ এই খেয়াল এল যে, শাসন ও রাষ্ট্র তো তাদের উত্তরাধিকার, এটি অন্য কেউ কীভাবে পেতে পারে?

:عبدالله بن زبير رضى الله عنه كى كردار كشى كى مهم

বনু উমাইয়ার এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফত প্রত্যাখ্যান করার আর কোনো পথ ছিল না যে, সাহাবি শাসকদের শেষ স্মৃতিকে কলঙ্কিত করা হোক এবং তাঁর চরিত্র হননে কোনো ত্রুটি রাখা না হয়। এই একগুঁয়ে মানসিকতার...

[১] সিরিয়াবাসীদের ওকালতিতে এই যুক্তিগুলো সাধারণত মারওয়ানিরা বর্ণনা করে থাকেন।

এর কারণ ছিল এই যে, ইয়াজিদের আমলের রাজনৈতিক দুর্বলতা বনু উমাইয়া এবং সিরিয়ার আমিরদের অনেকের মধ্যে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা, দুঃসাহস এবং অহংকার সৃষ্টি করেছিল। এই লোকেরা সরকারি আধিপত্য বজায় রাখাকেই তাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে করত এবং নিজেদের দ্বীন ও দুনিয়ার ঠিকাদার ভাবত। ফলে তারা সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের সাথেও ভালো আচরণ করত না এবং তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের মর্যাদা দিত।

উমাইয়া শাসক আমর বিন সাঈদ আশদাক-এর হযরত আবু শুরাইহ (রা.)-এর সামনে নিজের ইলম নিয়ে গর্ব করার ঘটনা সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। [১]

বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পরিবর্তে তলোয়ারধারীদের ওপর নির্ভরতা, একটি ভুল নীতি:

সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং পরবর্তী রাজনীতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল এই যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটি বিশাল সংখ্যা ছিল সর্বগুণে গুণাবিত বুজুর্গদের, যারা একই সাথে দাঈ, শিক্ষক, মুজাহিদ, সেনাপতি, প্রশাসক, কাজী, মুফতি এবং শাসক হওয়ার গুণাবলীতে সমৃদ্ধ ছিলেন। এই পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বরকতময় সাহচর্যে অতুলনীয় প্রশিক্ষণ লাভ এবং দীর্ঘ সময় ধরে কঠোরতম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার ফসল। তাঁদের অন্তর, মস্তিষ্ক এবং আত্মার ওপর আল্লাহর মহব্বত, ভয় এবং আখেরাতের চিন্তার প্রাধান্য ছিল এবং তাঁরা প্রতি মুহূর্তে আত্ম-সমালোচনার (মুহাসাবায়ে নারফস) খেয়াল রাখতেন; তাই প্রতিটি দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই সর্বগুণাবিত হওয়ার উদাহরণ কমতে থাকে। তলোয়ারধারী (যোদ্ধা), আলেম এবং বিচক্ষণ ও প্রশাসকগণ আলাদা আলাদা বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল যে, প্রদেশ ও শহরগুলোর শাসনভার জেনারেলদের পরিবর্তে এমন মধ্যপন্থী, আলেম-ফায়েল এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের হাতে দেওয়া, যাদের মধ্যে আনুগত্যের চেয়ে দ্বীনদারী এবং জনমকবুলিয়তের গুণটি বেশি স্পষ্ট হতো। এমন লোক প্রতিটি প্রদেশ এবং প্রতিটি শহরে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আমরা ইয়াজিদের আমল আসতেই দেখি যে, জনপ্রিয় ও প্রিয় ব্যক্তিদের একে একে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইবনে যিয়াদ, আমর বিন সাঈদ এবং মুসলিম বিন উকবার মতো কঠোর জেনারেলদের জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসের অধিকাংশ খলিফা এই কৌশলকেই কার্যকর মনে করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, কিছু বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া এই রাজনৈতিক পদ্ধতি সর্বদা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর মুকাদ্দিমায় এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় লিখে স্পষ্ট করেছেন যে, যদিও কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুগে তলোয়ারধারীদের (যোদ্ধাদের) প্রয়োজন বেশি থাকে, তবে স্থিতিশীলতা ও উন্নতির সময়কাল আলেম ও কলম সৈনিকদের (জ্ঞানী ব্যক্তিদের) কাছে ঋণী থাকে। [২]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪২৯৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব: মানযিলুন নবী (সা.) ইয়াওমাল ফাতহ। এই পৃষ্ঠার অন্য এক ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রবীণ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-কে অত্যন্ত অভদ্রভাবে বলেছিল: “তোমরা তো সাহাবীদের মধ্যে নিম্নস্তরের লোক।” (আসারু মাদ্দাহ: আস-সানি, পৃ: ১০৯২) উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের জন্ম ছিল ৩২ হিজরিতে। (যেমন ফাহল ইবনে দুকাইনের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের সময় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের বয়স ছিল আটশ বছর। তারিখুল ইসলাম লিখ-যাহাবী: ২/৬/৫, তাদমুরী) অথচ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্যবান সাহাবী। অর্থাৎ এই কথোপকথনের সময় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ছিল একেবারেই যুবক, আর আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর বয়স ছিল ৭০ বছরের কাছাকাছি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩৮৩/২, তাবা’তুর রিসালাহ) কোনো ভদ্র লোক কোনো সাধারণ বৃদ্ধের সাথেও এমনভাবে কথা বলে না, যেমন এই হতভাগা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রবীণ সাহাবীর সাথে করেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-ও উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: “তোর সম্পদ নসিব না হোক! সাহাবীদের মধ্যে কি কেউ নিম্নস্তরের হতে পারে? তাঁরা তো তাঁদের জাতির সর্বোত্তম এবং সম্মানিত লোক ছিলেন।” (আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, হা: ১০৯২; মুসনাদুশ শিহাব লি ইবনে হাম্মুন আল-কুদায়ী, হা: ৮০৬)

[২] ইবনে খালদুন: ১/৩১৮, মুকাদ্দিমা, তৃতীয় অধ্যায়, পঁয়ত্রিশতম পরিচ্ছেদ।

تاريخ امت مسلمة

محصة هفت

নিঃসন্দেহে বনু উমাইয়ার শাসনের স্থিতিশীলতা হযরত আমীর মুয়াবিয়া رضی اللہ عنہ এর শাসনামলে ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল, তাই ইয়াজিদের আমলে উচ্চতর কৌশলের অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কৌশল অবলম্বন করে সব জায়গায় সেই তলোয়ারগুলোর ওপর ভরসা করা হয়েছিল যা বন্ধু ও শত্রুর পার্থক্য জানত না, এমনকি তাদের আঘাতে সাহাবীগণও নিরাপদ থাকতে পারেননি। অবিবেচক তলোয়ারের শক্তির নেশা এই ক্ষমতাসীনদের মধ্যে যে মাত্রায় ছিল, তার আন্দাজ উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল رضی اللہ عنہ এর সাথে কথোপকথন এবং হযরত হুসাইন رضی اللہ عنہ এর সাথে আচরণের মাধ্যমে ভালভাবে করা যেতে পারে। মুসলিম ইবনে উকবার মদিনার সাহাবী ও তাবেয়ীদের ওপর জুলুম ও নির্যাতনের মধ্যেও এরই প্রতিফলন স্পষ্ট হয়। আবার চরম সীমা হলো এই যে, এই লোকেরা তাদের এই কালো কারনামার জন্য কখনও অনুতপ্তও হয়নি।

ইয়াজিদও শাসক হিসেবে তার আমলের ট্র্যাজেডিগুলোর দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না, তবে পরবর্তীতে এই ঘটনাগুলোর ওপর তার অনুশোচনা প্রকাশ প্রমাণিত। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ কারবালার ঘটনার ওপর বিন্দুমাত্র লজ্জিত ছিল না। যখন সে ইরাক থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে সিরিয়ায় পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথে তাকে চিন্তিত দেখে কোনো এক সঙ্গী আন্দাজ করে বলল:

“সম্ভবত আপনি ভাবছেন যে হায়! আপনি যদি হুসাইনকে হত্যা না করতেন।”

ইবনে জিয়াদ বলল: “একেবারেই না, হুসাইন তো আমাকে হত্যা করতে আসছিলেন। আমি তার আগেই তাকে হত্যা করে দেওয়া উত্তম মনে করেছি।” [১]

মদিনা মুনাওয়ারার পবিত্রতা লঙ্ঘনকারী মুসলিম ইবনে উকবা মৃত্যুর সময় বলছিলেন: “হে আল্লাহ! আমি তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর এমন কোনো আমল করিনি যা আমার কাছে মদিনাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে বেশি প্রিয় এবং আখেরাতের দিক থেকে যাতে উপকারের বেশি আশা থাকে। যদি আমি এত বড় কাজ করেও দোজখে যাই তবে অবশ্যই আমি হতভাগা হব।” [২]

শরীফ বা অভিজাতদের অবমাননা ও তুচ্ছজ্ঞান করা এবং হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার এই আচরণ, যার বীজ ইয়াজিদের যুগে বপন করা হয়েছিল, পরবর্তী যুগে তা একটি স্থায়ী শিক্ষা হিসেবে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ইয়াজিদের পুত্র মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর রাজনৈতিক সংকটের সময় দামেস্কের ‘জাইরুন’ মহল্লায় যে পরামর্শ সভা হয়েছিল তাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের رضی اللہ عنہ এর চরিত্র হননে কোনো কসুর বাকি রাখা হয়নি। [৩]

এরপর জাবিয়াতে বনু উমাইয়া আমীরদের এবং সিরীয় জেনারেলদের পরামর্শ সভায় গোঁড়ামির এই নেশা আরও চড়ে বসতে দেখা যায়। এরপর মারজ রাহিত-এ যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনার চুক্তি সত্ত্বেও দাহহাক ইবনে কায়েস رضی اللہ عنہ এর বাহিনীর ওপর প্রতারণামূলকভাবে হঠাৎ আক্রমণ করা এবং তারপর হযরত মুয়াবিয়া رضی اللہ عنہ এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত নুমান ইবনে বশীর رضی اللہ عنہ কে পর্যন্ত কোনো দ্বিধা ছাড়াই প্রকাশ্যে হত্যা করে দেওয়া প্রমাণ করছিল যে, ক্ষমতাচ্যুত এই গোষ্ঠীটি পুনরায় ক্ষমতায় আসার জন্য সব ধরনের কৌশল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এর বিপরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের رضی اللہ عنہ এর কর্মপন্থা ছিল ঈর্ষণীয় যে, মক্কার ওপর সিরীয় বাহিনীর আক্রমণ এবং কঠোর অবরোধের সময় তিনি তার সঙ্গীদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সিরীয় বাহিনীর ওপর...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫২২/৫ عن عمرو بن الزبير

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৩৩/১১; তারিখুত তাবারী: ৩৯/৫; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবী: ৩৩/৫, ত তদমুরী

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ২৬৫/৬, ط دار الفكر

...যখন রক্তপাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং মুসলমানদের ওপর এমন সামরিক কৌশল প্রয়োগ করা জায়েজ মনে করা হতো না, যাতে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। [১]

আমাদের এতে কোনো অস্বীকার নেই যে, প্রথম যুগের উমাইয়া আমিরগণ জাতীয় স্বার্থের অনুভূতি থেকে বিমুখ ছিলেন না। আমরা এই বাস্তবতাও অস্বীকার করি না যে, তারা সাধারণত সীমান্ত বিস্তার ও সুরক্ষা এবং মিল্লাতের পাহারাদারির জন্য প্রস্তুত থাকতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলনে তাদের ছলচাতুরী এটা প্রকাশ করে দিয়েছিল যে, তাদের নিকট ক্ষমতা লাভের জন্য যেকোনো কিছু করা যেতে পারে। এই আচরণকে রাজনৈতিক গোঁড়ামির ব্যাধিই বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক গোঁড়ামির ব্যাধি এবং পরবর্তী যুগের ওপর এর প্রভাবসমূহ:

রাজনৈতিক গোঁড়ামির ব্যাধির সাথে শুরু হওয়া এই বিদ্রোহী উমাইয়া আন্দোলন অন্তত নয় বছর পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। এই নয় বছরে এই আন্দোলনের কর্মী এবং নতুনভাবে উঠে আসা তরুণ নেতাদের প্রশিক্ষণ এই ধারাতেই হয়েছিল। ফলে তারা যখন ক্ষমতায় এলো, তখন এই নীতি একটি নতুন রূপ ধারণ করল আর তা হলো এই যে, শুধু ক্ষমতা লাভ করাই নয় বরং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যও সমস্ত সীমা ও বিধি-নিষেধ অতিক্রম করা যেতে পারে।

এরপর এর সাথে ক্ষমতাকে গোত্র থেকে নিজের পরিবারে, পরিবার থেকে নিজের ঘরে এবং ঘরে নিজের বিশেষ প্রিয় স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চল শুরু হলো এবং এভাবেই উত্তরাধিকার একটি ব্যাধির রূপ ধারণ করল। এই ব্যাধির শিকড় ৬৪ হিজরির বিদ্রোহী আন্দোলনের সাথেই প্রোথিত হয়েছিল যখন মারওয়ানের পর খালিদ বিন ইয়াজিদ এবং তার পর আমর বিন সাঈদকে খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের মধ্যে সম্ভবত এমন কেউ ছিল না যে সালাত, সিয়াম এবং সুন্নাহ অনুযায়ী লেবাস-পোশাকের অনুসারী ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারি সমস্যা ও বিষয়াবলীতে জুলুম করাকেও ‘জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রয়োজন’-এর অজুহাতে বৈধতার সীমানায় অন্তর্ভুক্ত করে নিত এবং এর জন্য নিজের মনের ফতোয়াকেই যথেষ্ট মনে করত। তাদের এই ধারণা ছিল যে, তারা যা কিছু করছে সব সঠিক এবং আল্লাহও তাদের কাজে সন্তুষ্ট। এই সিলসিলায় কুফার সেনাপতি শিমার বিন জিল জাওশানের উদাহরণটি প্রণিধানযোগ্য, যে হযরত হুসাইন (রা.)-কে শহীদ করার কার্যক্রমের সরাসরি কমান্ড করেছিল এবং যখন সরকারি সৈন্যরা রাসূল (সা.)-এর দৌহিত্রের ওপর আক্রমণে ইতস্তত করছিল, তখন সে-ই চিৎকার করে বলেছিল:

“তোমাদের সর্বনাশ হোক! কিসের অপেক্ষা করছ? একে মেরে ফেলো।”

এবং যখন কলিজার টুকরা বাতুলকে শহীদ করে মস্তক মোবারক আলাদা করে দেওয়া হলো। [২]

এই শিমার বিন জিল জাওশান সাধারণ জীবনে ছিল একজন কটুর নামাজি ও ইবাদতগুজার। ফজরের সালাত আদায় করে ইশরাক পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকত, তারপর ইশরাকের নফল পড়ে দোয়া করত: “ইলাহি! তুমি জানো আমি কত শরিফ। আমাকে ক্ষমা করে দাও।”

[১] তাকে হাজ্জাজের ঘরে ডাকা হতো, তখন সে বলত: এই ঘর (কা’বা) উপযুক্ত নয় এবং আমরা একে (রক্তপাতের জন্য) বৈধ মনে করি না। (আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৬, ত. দারুল ফিকর)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৫৩৮

কেউ একজন বলল: “আল্লাহ তোমাকে কেন ক্ষমা করবেন? তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাটিকে শহীদ করার কাজে অংশ নিয়েছিলে।”

শিমর বলল: “তোমার সর্বনাশ হোক! আমি আর কী-ই বা করতাম। আমাদের শাসকরা তো এই নির্দেশই দিয়েছিলেন। আমরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতাম না। যদি করতাম, তবে আমাদের অবস্থা পানি বহনকারী গাধার চেয়েও খারাপ হতো।” [১]

হাফেজ যাহাবী রহ. শিমরের এই উত্তরের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

“এই অজুহাত ছিল সম্পূর্ণ অসার; কারণ (শাসকদের) আনুগত্য কেবল সৎ কাজেই করা উচিত।” [২]

এই একটি ঘটনা থেকে সেই যুগের আমিরদের সাধারণ মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই নেতিবাচক মানসিকতা এরপর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গত চৌদ্দ শতাব্দীতে এই দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি বারবার উম্মাহকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে।

□□□

মারওয়ানের সিরিয়া ও মিসর দখল

মারজ রাহিতের ময়দানে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর সমর্থকদের পরাজিত করে মারওয়ান বিন আল-হাকাম বনু উমাইয়ার একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, তবে এখন এই সরকার আবু সুফিয়ান বিন হারব রা.-এর সন্তানদের ছিল না, বরং হাকাম বিন আল-আসের বংশের ছিল। যদিও জাবিয়ায় বনু উমাইয়ার যিলকদ ৬৪ হিজরিতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সম্মেলনে মারওয়ান বিন আল-হাকামের পর খালিদ বিন ইয়াজিদ এবং তারপর আমর বিন সাঈদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়েছিল, কিন্তু মারওয়ান ক্ষমতায় নিজের দখল মজবুত করতেই খালিদ ও আমর বিন সাঈদের উত্তরাধিকার বাতিল করে দেন এবং নিজের ছেলে আবদুল মালিক ও তারপর দ্বিতীয় ছেলে আবদুল আজিজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। [৩] এভাবে বংশানুক্রমিক শাসনের শিকড় আরও গভীর হয়ে যায়।

যিলকদ ৬৪ হিজরিতে খিলাফতের দাবি করার পর মারওয়ান জীবনের মাত্র আরও নয় মাস সময় পান। মহররম ৬৫ হিজরিতে তিনি মারজ রাহিতের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এরপর সিরিয়ার অন্যান্য এলাকা দখল করেন। এরপর তিনি মিসর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং সেখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে গোপন আঁতাত করেন। মিসরে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর প্রতিনিধি আবদুর রহমান ইবনে জাহদামের শাসন ছিল। মারওয়ান সেখানে পৌঁছে রাজধানী ফুসতাত অবরোধ করেন। শহরবাসী কয়েক দিন পর্যন্ত প্রকাশ্য লড়াই চালিয়ে যায়।

যুদ্ধের শেষ দিনে শহরে অবস্থানরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস রা. ইন্তেকাল করেন। যুদ্ধের কারণে মানুষ তাঁর জানাজায়ও শরিক হতে পারেনি। তাঁকে তাঁর নিজের ঘরেই দাফন করা হয়। ওই দিনই শহরবাসী অস্ত্র সমর্পণ করে।

[১] তারিখ দামেশক ২৩/১৮৯।

[২] মিজানুল ইতিদাল ২/২৮০।

[৩] তারিখুত তাবারী ৫/৬০৫।

মুহাম্মাদ বায়াত গ্রহণ না করা ৮০ জন ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যাদের মধ্যে উসমান (রা.)-এর গৃহ অবরোধে অংশগ্রহণকারী আকীদ বিন হাম্মাম নামক এক বৃদ্ধও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি ১৫ জমাদিউল আখিরা ৬৫ হিজরীর ঘটনা। মুহাম্মাদ তার পুত্র আব্দুল আজিজকে মিশরের গভর্নর এবং মুসা বিন নুসাইরকে তার উজির বানিয়ে সিরিয়ায় ফিরে আসেন। [১]

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) মিশরবাসীদের সাহায্যের জন্য তার ভাই মুসআব বিন জুবায়েরকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মাদের সেনাপতি আমর বিন সাঈদ তাদের সিরিয়ার সীমান্তে থামিয়ে দেন এবং পিছু হটতে বাধ্য করেন। [২]

হিজাজে মুহাম্মাদের বাহিনীর পরাজয়:

মুহাম্মাদ এখন হিজাজ দখল করতে চেয়েছিলেন। তিনি হাবিশ বিন দুলজা এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন হাকামকে ছয় হাজার সৈন্যের এক বাহিনী দিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা দখলের উদ্দেশ্যে পাঠান। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার পিতাও এই বাহিনীতে ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) বসরা থেকে সাহায্য তলব করেন এবং রাবাযা নামক স্থানে এই বাহিনীকে থামিয়ে দেন। ১ রমজান ৬৫ হিজরীতে দুই বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে মুহাম্মাদের ভাই আব্দুল্লাহ এবং সেনাপতি হাবিশ নিহত হন এবং অধিকাংশ সৈন্য তলোয়ারের আঘাতে শেষ হয়ে যায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার পিতা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। [৩]

মুহাম্মাদের মৃত্যু:

পরাজয়ের খবর তখনও দামেস্কে পৌঁছায়নি, যখন ৬৩ বছর বয়সী মুহাম্মাদ বিন হাকামের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। উমাইয়াদের এই প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ৩ রমজান ৬৫ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [৪] তিনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার বিধবা স্ত্রী উম্মে খালিদকে বিয়ে করেছিলেন। ইয়াজিদের পুত্র খালিদ তার ঘরেই লালিত-পালিত হচ্ছিল, কিন্তু তার সাথে মুহাম্মাদের আচরণ ভালো ছিল না। একদিন তিনি সবার সামনে খালিদের মাকে গালি দেন। খালিদ তার মাকে বিষয়টি জানান। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং মুহাম্মাদকে শেষ করে দেওয়ার সংকল্প করেন।

রাতে মুহাম্মাদ যখন শয়নকক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, খালিদের মা কয়েকজন দাসীকে ভেতরে ডাকেন। তারা মুহাম্মাদের মুখের ওপর একটি বড় বালিশ রেখে সবাই তার ওপর চেপে বসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসরোধ হয়ে মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেন। [৫] যে ব্যক্তি তার রাজনীতি দিয়ে দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিয়েছিলেন, তিনি ঘরের নারীদের রাজনীতির শিকারে পরিণত হলেন।

মুহাম্মাদ বিন হাকামকে সাহচর্য লাভের দিক থেকে জ্যেষ্ঠ তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ এবং কুরআন তিলাওয়াতের খুব পাবন্দ ছিলেন। [৬] জ্ঞান, সাহিত্য, বীরত্ব, সামরিক দক্ষতা, ফিকহ এবং রাজনীতিতে তিনি উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন, কিন্তু রাজনীতির ময়দানের ভুলগুলো তাকে কলঙ্কিত করে দেয়। ইতিহাসে তার পরিচয় এই হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি মুহাম্মাদী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যদি তার...

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৩/২১৫, ত. তাদমুর।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৩/৪৫৩; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৩/২১৫, ত. তাদমুর। ইবনুল আসীর এই ঘটনাটি ৬৪ হিজরীর অধীনে লিখেছেন, অথচ এটি ৬৫ হিজরীর ঘটনা।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৩/২১৫।

[৪] তারিখে খলিফা, পৃ. ২৬৩।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬৫ হিজরীর ঘটনাবলির অধীনে; আস-সিকাত লিল-ইজলি: ২/২৬০, ত. দার।

[৬] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৬০, ত. দারুল ফিকর।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

যদি তার আঁচলে হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ [রা.]-এর হত্যার কলঙ্ক না থাকত এবং আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের [রা.]-এর শরয়ী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করত, তবে সম্ভবত ইসলামী ইতিহাসে হাসান বসরী [রহ.] এবং সাঈদ বিন মুসাইয়িব [রহ.]-এর মতো তাবিসীদের মধ্যে তার গণনা করা হতো এবং তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হতো। কিন্তু উচ্চতর যোগ্যতার ভুল ব্যবহার তাকে সেই উচ্চাসনে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে, যা তার সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের সতর্ক ব্যক্তির। এই ধ্বংসাত্মক কাজগুলো থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে অর্জন করেছিলেন। [১]

(১) মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে মারওয়ান:

যদিও মারওয়ানের জন্ম হয়েছিল ওহদ যুদ্ধের বছর, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল আট বছর, তা সত্ত্বেও আসমা-উর-রিজাল (জীবনীগ্রন্থ)-এর সকল কিতাবে তাকে তাবিসি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৬; আল-ইসতিয়াব: ৩/১৩৮; আসাদুল গাবাহ: ৫/১৩৯) কিছু লোক হাফেজ ইবনে হাজার [রহ.]-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মারওয়ানকে সাহাবী প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার [রহ.] এমন কোনো দাবি করেননি। তবে এক জায়গায় এর সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন কিন্তু সাথে সাথেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে: ‘লাম আরা মান জাযামা বি-সুহবাতিহি’ (আমি এমন কাউকে দেখিনি যে তার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে)। (আল-ইসাবাহ: ৩/৪৬৭)। হাফেজ ইবনে হাজার [রহ.] অন্য জায়গায় আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন: ‘লা তাসবুতু লাহল সুহবাহ’ (তার সাহাবী হওয়া প্রমাণিত নয়)। (তাকরীবুত তাহযীব মুতারজাম: ২/১৫৬৭)

হাফেজ যাহাবী [রহ.] মারওয়ান সম্পর্কে ইমাম বুখারী [রহ.]-এর মতামত উদ্ধৃত করে লিখেছেন: মারওয়ান বিন আল-হাকাম: ইমাম বুখারী বলেছেন: ‘লাম ইয়ারা আন-নাবিয়্যা [সা.]’ (সে নবী [সা.]-কে দেখেনি)। এরপর হাফেজ যাহাবী লিখেছেন: ‘কুলতু: তাবিসিন লাহ তিলকাল আফাঈল’ (আমি বলছি: সে একজন তাবিসি ছিল এবং তার কিছু মন্দ কাজও ছিল)। (আল-মুগনি ফিজ জুযাফা: ২/৬৫১)। একইভাবে মীযানুল ইতিদাল-এ লিখেছেন: “আমি বলছি যে তার কিছু কাজ ধ্বংসাত্মক ছিল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।” (মীযানুল ইতিদাল: ৪/৮৯)। শুধুমাত্র ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে সে নবী [সা.]-কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। (আত-তাদীল ওয়াত তাজরীহ লি-আবীল ওয়ালীদ আল-বাজী: ২/৭১৪)

কিন্তু ভালো-মন্দ সব কিছু একত্রকারী ওয়াকিদীর কথাকে ইমাম বুখারী এবং তার মতো অসংখ্য মুহাদ্দিসের মতামতের ওপর কীভাবে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে? আল্লামা ইরাকী লিখেছেন: “ইমাম তিরমিযী [রহ.] আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী [রহ.]-কে নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ‘আমি ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করলাম: মারওয়ান কি রাসূলুল্লাহ [সা.]-কে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, না’।” (কুলতু লাহ মারওয়ানুবনুল হাকাম রাআন নাবিয়্যা [সা.]? কালা: লা)। (তুহফাতুত তাহসীল ফী যিকরি রুওয়াতিল মারাসীল লি-ইবনিল ইরাকী: ১/২৯৮)। বড় বড় মুহাদ্দিসগণের স্পষ্ট বক্তব্যকে উপেক্ষা করে ওয়াকিদীর মতো দুর্বল রাবীর কথা দিয়ে কারো জন্য সাহাবীয়াতের মতো মহান মর্যাদা প্রমাণ করা পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অনেক মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মারওয়ানকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মনে করেছেন, এজন্যই সহীহ বুখারীতে তার একাধিক বর্ণনা রয়েছে। সে হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী [রা.] থেকে বর্ণনা নকল করেছে এবং তার থেকে যারা বর্ণনা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে সাহল বিন সাদ [রা.], উরওয়াহ বিন জুবায়ের এবং আলী বিন হুসাইন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। (আল-জারছ ওয়াত তাদীল, ইবনে আবী হাতিম: ৮/২৭২)। এর কারণ হলো মারওয়ান এই বর্ণনাগুলো আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের [রা.]-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আগে বর্ণনা করেছিল। (ফাতহুল বারী: ১/৩৩৩)। এবং সম্ভবত সেই সময় পর্যন্ত কায়স বিন আবী হাযিমের সেই বর্ণনাটি খুব বেশি প্রসিদ্ধ হয়নি যাতে মারওয়ানকে হযরত তালহা [রা.]-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সেই সময় পর্যন্ত তার মর্যাদা ছিল সাহাবায়ে কেরামের সামিধ্যপ্রাপ্ত একজন আলেম ও গুণী ব্যক্তির মতো। এজন্য তার ভুল কাজগুলো সত্ত্বেও এই সন্দেহ করা যায় না যে সে জেনেশুনে হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করেছে, যা চরম পর্যায়ের খিয়ানত।

এটাও হতে পারে যে, মুহাদ্দিসগণ মারওয়ান সম্পর্কে উরওয়াহ বিন জুবায়ের [রা.]-এর নির্ভরযোগ্যতার ওপর আস্থা রেখেছেন, যিনি মারওয়ান এবং তার উত্তরসূরিদের কঠোর রাজনৈতিক ও নিপীড়নমূলক পরিবেশ সত্ত্বেও বলতেন: “আখবারানি মারওয়ানুবনুল হাকাম ওয়ালা উহাশাহ ইউভাহামু আলাইনা” (মারওয়ান বিন আল-হাকাম আমাদের সংবাদ দিয়েছে এবং আমি তাকে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত মনে করি না)। (আত-তরীখুল কাবীর লি-ইবনি আবী খাইসামাহ, আস-সাফারুস সালিস: ২/৩১৭)। তা সত্ত্বেও কিছু মুহাদ্দিস যেমন: ইমাম মুসলিম এবং ইবনে হিব্বান মারওয়ানকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না, বরং জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট মধ্যপন্থা ছিল এই যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে চূড়ান্ত মনে করা হবে না এবং তার আংশিক ভুলগুলো যদি সহীহ সনদে প্রমাণিত হয় তবে সেগুলো অস্বীকারও করা হবে না। এর বিপরীতে এটি একটি চরমপন্থা হবে যে তার ভুল কাজগুলোকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হবে বরং আরও মহত্ব দিয়ে তাকে সাহাবীয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মনে করা হবে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

মুখতার: বনু সাকিফের কাজ্জাব

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) এবং মারওয়ানের এই টানাপোড়েনের সময় মক্কা মুয়াজ্জামায় এক নতুন ভাগ্যসন্ধানী ব্যক্তি সমগ্র ইসলামি বিশ্বকে নিজের হাতের মুঠোয় নেওয়ার পরিকল্পনা করছিল। এই ব্যক্তির নাম ছিল মুখতার বিন আবু উবায়দ। বনু সাকিফ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ইতিহাসে তাকে মুখতার সাকিফ বলে স্মরণ করা হয়। তার পিতা আবু উবায়দ বিন মাসউদ সাকিফ (রা.) একজন সাহসী তাবিঈ ছিলেন, যিনি হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইরাকের সীমান্তে ইসলামি বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকালে “জঙ্গে জিসর” (সেতুর যুদ্ধ)-এ শহীদ হয়েছিলেন। বলার জন্য মুখতারও তাবিঈদের যুগে ছিল, কিন্তু ইলম ও ফযল এবং দিয়ানত ও তাকওয়া থেকে সে একেবারেই শূন্য ছিল। তবে নিজের বাকপটুতা, চতুরতা এবং ধূর্ততার জোরে সে বনু সাকিফ গোত্রের প্রথম সারির যুবকদের মধ্যে গণ্য হতো। [১]

শুরু থেকেই তার ওপর উচ্চ পদ লাভের ভূত সওয়ার ছিল। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের সময় সে যুবক ছিল এবং তার চাচার সাদ বিন মাসউদ মাদায়েনের শাসক ছিলেন। ওই সময় মুখতারের মাথায় এই বুদ্ধি আসে যে, যদি হযরত হাসান (রা.)-কে গ্রেপ্তার করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে তুলে দেওয়া যায়, তবে বিনিময়ে অবশ্যই কোনো বড় পদ হস্তগত হবে। সে যখন এই পরিকল্পনা তার চাচার সামনে পেশ করল, তখন তিনি তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। [২]

ইয়াজিদের আমলে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তার ফিতনা-ফ্যাসাদের খবর পেয়ে তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন এবং শহর থেকে বহিষ্কার করে তায়েফে পাঠিয়ে দেন। [৩] চাবুকের এই শাস্তির সময় তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তাই বাকি জীবন সে একচক্ষু বিশিষ্ট ছিল। [৪]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) এবং ইয়াজিদের টানাপোড়েনের সময় এই ভাগ্যসন্ধানী মক্কায় চলে আসে এবং হুসাইন বিন নুমাইরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর পক্ষ নেয়। তার বিশেষ কৌশল ছিল এই যে, সে উম্মতের বড় বড় ব্যক্তিদের কাছে ওঠাবসা করত এবং নিজেকে ওইসব ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ হিসেবে প্রচার করে মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসা অর্জন করত।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ছাড়াও তার মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.)-এর কাছেও যাতায়াত ছিল। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ মানুষ ছিলেন, তাই তার ধূর্ততা ধরে ফেলেছিলেন। ফলে তিনি তার থেকে সতর্ক থাকতেন। অবশ্য আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) শুরুতে তার ওপর আস্থা রাখতেন। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে কিছুকাল পর সে তার কাছে ইরাক যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল। তার...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৩/৫৪০, তাবা আল-রিসালাহ।

[২] তারিখুত তাবারী, ৫/১৫৯, আন মুসা বিন আবদুর রহমান।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৩/৫৪৩, তাবা আল-রিসালাহ।

[৪] আল-ইবার, ১/৩০৩।

...নিশ্চিত করেছিলেন যে সেখানে তাঁর উপস্থিতি খেলাফতে জুবাইরির জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে। [১]

তহরিক-ই-তাওয়াবিন

অবশেষে মুখতার আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে ৬৪ হিজরির রমজান মাসে মক্কা থেকে বের হয়ে কুফায় চলে আসেন। [২]

সে দিনগুলোতে সেখানে একজন সাহাবি সুলাইমান বিন সুরাদ (রা.) হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। [৩] কুফায় বসবাসরত শিয়ানে আলী তাঁর চারপাশে সমবেত হচ্ছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছিল। এই সমস্ত লোক কারবালার ঘটনায় হযরত হুসাইন (রা.)-কে বন্ধুহীন ও সাহায্যহীন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য লজ্জিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কুফার সেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাজ ছিলেন যারা হযরত হুসাইন (রা.)-কে চিঠি লিখে হিজাজ থেকে ইরাকে ডাকার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা তাঁদের এই আন্দোলনকে “তহরিক-ই-তাওয়াবিন” (তওবাকারীদের আন্দোলন) নাম দিয়েছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাহায্যে অবহেলার জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি তাঁর হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া অথবা নিজেরা লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এর জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে ইরাক থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি বিশাল বাহিনী তৈরি করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া হবে এবং সেখানে ক্ষমতাসীন বনু উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী, বিশেষ করে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি উন্মত্তে মুহাম্মদিয়ার রক্তে রক্তে মিশে ছিল, তাই এই স্লোগানে হাজার হাজার যুবক হযরত সুলাইমান বিন সুরাদ (রা.)-এর চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন। [৪]

তহরিক-ই-তাওয়াবিনের কার্যক্রম ছিল প্রকাশ্য। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এবং তাঁর গভর্নররা জেনেশুনেই একে অগ্রসর হতে দিয়েছিলেন; কারণ এর শক্তি তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী সিরীয় শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছিল। এভাবে এই আন্দোলন খেলাফতে জুবাইরির পক্ষেই ছিল। সুলাইমান বিন সুরাদ (রা.)-এর পর মুসাইয়িব বিন নাজবা ফাজারি, আবদুল্লাহ বিন সাদ, আবদুল্লাহ বিন ওয়াল... [৫]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ ৫/ ৯৮ ত ত সাদির। গুরুত্বপূর্ণ নোট: “খেলাফতে জুবাইরিয়া” পরিভাষাটি পরবর্তীকালের কিছু আলেম গ্রহণ করেছেন। আমরা বর্ণনার সুবিধার্থে এটি গ্রহণ করেছি। অন্যথায় স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) বা তাঁর সমর্থকরা এই খেলাফতকে “খেলাফতে জুবাইরিয়া” বা অন্য কোনো বিশেষ নাম দেননি।

[২] তারিখ আল-তাবারী ৫/ ৫৭৭, ৫৭৮।

[৩] সুলাইমান বিন সুরাদ (রা.)-এর সাহাবিয়ারের ব্যাপারে পূর্বসূরীদের ঐকমত্য রয়েছে, জরাহ ও তাদিলের ইমামদেরও এটিই সর্বসম্মত অভিমত। (আত-তারিখুল কাবির লিল বুখারি ৪/ ১৬, আল-ইসতিয়াব ২/ ৬ ৫১, ৭৫০, সিয়রু আলামিন নুবালা ৩/ ৩৯৪, ত রিসালাহ, আল-ইসাবাহ ৩/ ১৪৩, মুজাম্মুস সাহাবাহ ৩/ ১৫৯)।

[৪] মনে রাখা প্রয়োজন যে মারওয়ানিয়াত দ্বারা প্রভাবিত কিছু “আধুনিক গবেষক” সুলাইমান বিন সুরাদ (রা.)-এর সাহাবি হওয়াকে এই জন্য অস্বীকার করেছেন যে, একজন সাহাবির কোনো বিদ্রোহী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া কল্পনাভীত। কিন্তু প্রথমত জঙ্গ জামাল এবং জঙ্গ সফফিনের উদাহরণ সামনে রাখলে এই যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন। দ্বিতীয়ত বাস্তবতা হলো তহরিক-ই-তাওয়াবিন কোনো বিদ্রোহী দল ছিল না বরং তা ছিল শরয়ী খলিফা আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সমর্থক। এর লক্ষ্য ছিল সিরিয়ার শাসকরা যারা শরয়ী খেলাফতের বিদ্রোহী ছিল। এটি সত্য যে এই আন্দোলনে বড় সংখ্যায় শিয়ানে আলী ছিল কিন্তু তৎকালীন আলীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল সহীহ আকিদার অধিকারী। শুধুমাত্র তাদের রাজনৈতিক গোষ্ঠী যারা পরবর্তীতে রাফেজিয়াতের ভিত্তি হয়েছিল, তারা ভ্রান্ত আকিদায় লিপ্ত ছিল। কিছু অনিষ্টকারীর কারণে কোনো পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনকে বাতিল ঘোষণা করা কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। পৃথিবীতে হকপন্থীদের এমন কোনো সংগঠন হবে না যাতে এই ধরনের লোক অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। সবাই জানেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে মদিনায় মুনাফিকরা ঈমানদারদের সাথে মিলেমিশে অনিষ্ট সাধনে লিপ্ত ছিল। সুতরাং পরবর্তীতে কোনো দল বা আন্দোলনে এমন লোকদের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি তাদের উপস্থিতি সেই আন্দোলন বাতিল হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

[৫] তারিখ আল-তাবারী ৫/ ৫৫২ থেকে ৫৬০।

...এবং রিফাতা বিন শাদাদের মতো বড় বড় তাবয়ীগণ এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন।

[১]

মুখতার তাওয়াবীনদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে:

মুখতার যখন কুফায় পৌঁছাল, তখন সেখানে সমস্ত মানুষ সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী-এর চারপাশে সমবেত ছিল এবং হুসাইনের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। তখন মুখতার অনুভব করল যে, এই স্লোগানের মাধ্যমে খুব দ্রুত অসংখ্য মানুষকে হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব। ফলে সেও নিজের পক্ষ থেকে সাদাতদের প্রতিশোধ নেওয়ার ডাক দিতে শুরু করল। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী ছিলেন একজন প্রবীণ মুরাব্বী; তাঁর উপস্থিতিতে মুখতারকে কে পাত্তা দেবে।

ফলে মুখতার তার মিথ্যাচারের কৌশল অবলম্বন করল এবং বলতে শুরু করল: “আমি যামানার মাহদী মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি আমাকে তাঁর উজির, আমীন এবং বিশেষ বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।” সে সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী-এর যুদ্ধ পরিকল্পনাকে অকার্যকর ঘোষণা করে বলত: “তাঁর উদ্দেশ্য তো কেবল এটাই যে, নিজে নিহত হওয়া এবং তোমাদেরকেও মরতে দেওয়া। যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং এই ময়দান সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞানও নেই।”

এ ধরনের দাবির মাধ্যমে সে সুলায়মান বিন সুরাদের কিছু লোককে নিজের সাথে ভিড়িয়ে নিল। এভাবে শিয়ানে আলীর দুটি দল হয়ে গেল: সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী-এর সাথে ছিল এবং সংখ্যালঘু অংশ মুখতারের চারপাশে। [২]

তাওয়াবীনদের পরিণতি:

মুখতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সে সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী এবং তাঁর সঙ্গীদের পরিণতি দেখে কোনো পদক্ষেপ নেবে; তাই সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল। তবে মৌখিকভাবে সে তাওয়াবীনদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রশংসা করত এবং তাদের উৎসাহিত করত।

সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন, তখন ষোলো হাজার মানুষ সাথে যাওয়ার জন্য নাম লেখাল। জনগণের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে কুফায় উপস্থিত হুসাইনের হত্যাকারীদের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। উমর বিন সাদ, যে হযরত হুসাইন-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকারী বাহিনীর প্রধান ছিল, ভয়ের চোটে নিজের ঘরের পরিবর্তে কাসরে ইমারতেই রাত কাটাত। কিন্তু এই সমস্ত তোলপাড় সত্ত্বেও ৬৫ হিজরীর রবিউস সানি মাসে সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী যখন যুদ্ধের জন্য বের হলেন, তখন মাত্র চার হাজার মানুষের একটি দল তাঁর সাথে ছিল। তবুও সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি।

অভিজ্ঞ ব্যক্তির। তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি যেন এত অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে সিরিয়ার দুর্ধর্ষ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ভুল না করেন। কিন্তু সুলায়মান বিন সুরাদ খুযায়ী আবেগের আতিশয্যে সেদিকে কণ্ঠপাত করেননি।

এই সময়ে কুফার কর্মকর্তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে, সিরিয়া থেকে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ একটি বাহিনী নিয়ে ইরাক আক্রমণের জন্য আসছে। তাই কুফার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ সুলায়মান বিন সুরাদকে বললেন: “আপনারা এখানেই থেকে যুদ্ধ করুন, আমরা এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নেব। শত্রু যখন এখানে আসবে, তখন আমরা মিলেমিশে মোকাবিলা করব।” কিন্তু সুলায়মান বিন সুরাদ এতটুকু অপেক্ষা করাও পছন্দ করেননি।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৫৬১, ৫৭০

ইতিহাসে উন্মতে মুসলিমা

৫ রবিউল আউয়াল ৬৫ হিজরিতে তওবাকারীদের (তাওয়াবীন) বাহিনী কুফা থেকে বের হলো এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর কবরে দোয়া ও কান্নাকাটি করে রওনা হলো। এই দলের বিশেষ স্লোগান ছিল “ইয়া লিসারাতিল হুসাইন” (হুসাইনের প্রতিশোধ)। পরে মুখতার সাকাফিও এই স্লোগান পছন্দ করেছিলেন।

পথে ‘কারকিসিয়া’র প্রাচীরবেষ্টিত শহরে আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.)-এর সমর্থক জুফার বিন হারিস তাদের স্বাগত জানান এবং খুব আতিথেয়তা করেন। জুফার বিন হারিস এত অল্প সৈন্য নিয়ে রাজকীয় বাহিনীর সাথে খোলা ময়দানে লড়াই করাকে আত্মঘাতী বলে অভিহিত করে বললেন: “আপনারা আমাদের শহরে অবস্থান করে দুর্গবন্দী হোন, এই অবস্থায় আমাদের এবং আপনাদের লক্ষ্য এক হবে। সিরিয়া থেকে আপনাদের মোকাবিলায় অনেক বড় বাহিনী রওনা হয়েছে।” সুলাইমান বিন সুরদ (রা.) এই হিতৈষী পরামর্শকে পছন্দ করলেও বললেন: “এই পরামর্শ তো আমাদের শহরবাসীরাও দিয়েছিল কিন্তু আমরা তা মানিনি।”

অবশেষে জুফার বিন হারিস যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে তাদের বিদায় দিলেন।

সুলাইমান বিন সুরদ (রা.) সেই চার হাজার তওবাকারীকে নিয়ে সিরিয়ার সীমান্তে ‘আইনুল ওয়ার্দা’ নামক স্থানে পৌঁছালে রাজকীয় বাহিনীর সাথে মুখোমুখি হলেন। এটি ২৬ রবিউল আখের ৬৫ হিজরির ঘটনা। এই সময় উমাইয়া আমিরদের প্রধান মারওয়ান বিন হাকাম জীবিত ছিলেন এবং তিনিই এই বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তিন দিন ধরে এখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। অবশেষে রাজকীয় বাহিনী তওবাকারীদের পরাজিত করল। সুলাইমান বিন সুরদ (রা.), মুসাইয়িব বিন নাজাবা, আবদুল্লাহ বিন সাদ এবং আবদুল্লাহ বিন ওয়ালি আল-তামিমি সহ প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ এবং অধিকাংশ তওবাকারী শহীদ হলেন। শুধুমাত্র রিফাআ বিন শাদ্দাদ এবং আরও কিছু লোক সাথে নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হন। [১]

সুলাইমান বিন সুরদ (রা.)-এর বয়স ৯৩ বছর ছিল। [২] তিনি কিছু বর্ণনা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করতেন। [৩]

পরাজয়ের কারণসমূহ:

সুলাইমান বিন সুরদ (রা.)-এর পরাজয়ের কারণগুলো খুব স্পষ্ট:

- তিনি পরিকল্পনাকারী ছিলেন না। কেবল তাওয়াক্কুল এবং জোশ ও জজবার ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধ জিততে চেয়েছিলেন।
- সৈন্য সংখ্যা কম ছিল। মাত্র চার হাজার। যেখানে রাজকীয় বাহিনীতে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ছিল।
- যুদ্ধের ময়দান সিরিয়ার কাছে এবং কুফা থেকে দূরে ছিল। তওবাকারীদের জন্য সাহায্য পৌঁছানো কঠিন ছিল এবং সিরিয়াবাসীদের জন্য সহজ ছিল।
- সুলাইমান বিন সুরদ (রা.)-এর যুদ্ধ পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তাদের বাহিনীতে কোনো নামকরা কমান্ডার ছিল না। অন্যদিকে উমাইয়াদের পক্ষে হুসাইন বিন নুমাইরের মতো চতুর সেনাপতি ছিল যার পেছনে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের মতো পরিকল্পনাকারী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিল।
- তওবাকারীদের মধ্যে পারস্পরিক শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার অভাব ছিল। ১৬ হাজারের মধ্যে ৮ হাজার লোক ঠিক যুদ্ধের সময় তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।
- মুখতার সাকাফি বাহ্যত এই আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। মুখতারের কারণে অনেক লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৫৮৩ থেকে ৬০৫; তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৩/৩৬, ৩৭; আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫।

[২] জামিউল উসুল: ১২/৩২৮; মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড ৩, হাদিস: ২৫৫৫।

[৩] আল-মুজামুল কাবীর লিত তাবারানি: ১৯১/৩, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — খণ্ড ২

দূরে সরে থাকলেন। যার ফলে তাওয়াবীনদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। এভাবে এই কারণগুলো তাওয়াবীনদের পরাজয় নিশ্চিত করে দিল।

মুখতারের তৎপরতা শুরু

সুলাইমান বিন সুরাদ (রা.) কুফা থেকে রওনা হওয়ার পরপরই পেছনে মুখতারের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কুফায় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর প্রতিনিধি আশঙ্কা করলেন যে, এই ব্যক্তি হয়তো শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সরকারের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে কুফার গভর্নর আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ হঠাৎ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেন এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। [১]

অবশিষ্ট তাওয়াবীনরা যখন ফিরে এলেন, তখন মুখতার কারাগারেই ছিলেন এবং সেখান থেকেই যোগাযোগ রক্ষা করে কর্মীদের উৎসাহিত করছিলেন।

মুখতার ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর শ্যালক। তার বোনের প্রচেষ্টা এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সুপারিশে অবশেষে তিনি মুক্তি পান। তবে কুফার প্রশাসন শহরের দশজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে জামিননামা লিখিয়ে নেয় যে, এই ব্যক্তি বাইরে এসে কোনো সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে না। এ বিষয়ে মুখতারের কাছ থেকে শপথ নেওয়া হয়।

বাইরে এসেই মুখতার বললেন: “এই লোকগুলো কতই না নির্বোধ! তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে আমি আমার শপথগুলো পূর্ণ করব?” এই বলে তিনি আগের চেয়েও বেশি দ্রুতগতিতে তার তৎপরতা শুরু করে দিলেন। [২]

সুলাইমান বিন সুরাদ (রা.)-এর শূন্যস্থান পূরণ করতে তিনি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন। তাওয়াবীনদের অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আহলে বাইতের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য ব্যাকুল লোকেরা তার চারপাশে সমবেত হতে শুরু করল। তার জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ ছিল এই যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-এর একটি জাল চিঠি তৈরি করেছিলেন যাতে তাকে সাহায্য করার নির্দেশ ছিল। তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-কে মাহদী এবং নিজেকে তার প্রতিনিধি বলে দাবি করতেন। কিছু লোকের তার এই দাবির ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। তারা সত্যতা যাচাই করার জন্য হিজাজে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন।

মুখতার সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-এর বক্তব্য:

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.) স্পষ্ট ভাষায় মুখতারকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেননি, তবে তিনি বললেন:

“আমি চাই যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যার মাধ্যমে ইচ্ছা আমাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।”

মুখতারের মনে ভয় ছিল যে, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.) হয়তো তার গোমর ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিনিধি দল যখন ফিরে এল, তখন তিনি নিজের মতো করে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-এর কথার সারমর্ম এভাবে বর্ণনা করলেন: “মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ আমাদের মুখতারকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।” [৩]

এভাবে মুখতারের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেল।

কুফায় মুখতারের তৎপরতা বাড়তে দেখে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) সেখানে আবদুল্লাহ বিন মুতী’কে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি সালাত এবং রাজস্ব ব্যবস্থা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিলেন। ইয়াস বিন মুযারিবকে পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে নম্রতা এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাথে কঠোর আচরণ করতে হবে। [৪]

[১] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ১১/৬৮৯, ৬৯০

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/৫৩৬, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ১২/২০৫

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/১২, ১৩

[৪] তারিখুত তাবারী: ৬/১০, ১১

অলৌকিক চেয়ার

মুখতার সাক্ষাৎ মানুষকে নিজের অনুসারী বানানোর জন্য অদ্ভুত ও বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করছিল। এই সিলসিলায় সে যার ওপর চাইত টাকার বৃষ্টি বর্ষণ করত, যার ফলে মানুষ তার প্রতি পাগল হয়ে যেত। তুফাইল বিন জাদআহ নামক এক দরিদ্র ব্যক্তির টাকার প্রয়োজন ছিল। সে এক তেল বিক্রেতার কাছ থেকে একটি অত্যন্ত পুরনো চেয়ার তুলে আনল যার ওপর তেল ও ময়লা জমে ছিল; এর কাঠ এই স্তরের নিচে লুকিয়ে গিয়েছিল। সে মুখতারকে এই চেয়ার দেখিয়ে বলতে লাগল:

“আমার পিতা এই চেয়ারে বসতেন এবং বলতেন যে এতে একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে।”

মুখতার বলল: “বাহ! এই কথা আগে কেন বলোনি?” তারপর সে চেয়ারটি আনিয়ে নিল এবং এর বিনিময়ে তুফাইলকে বারো হাজার দিরহাম দিল।

এখন মুখতার এই চেয়ার সম্পর্কে একটি পুরো কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করল এবং মুরিদদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলল:

“বিগত উম্মতদের এমন কোনো মুজিজা দেওয়া হয়নি যা আমাদের নসিব হয়নি। বনী ইসরাঈলের কাছে একটি সিন্দুক (তাবুত) ছিল যাতে মূসা ও হারুন (আ.)-এর স্মৃতিচিহ্ন ছিল। আমাদের কাছেও অনুরূপ একটি জিনিস বিদ্যমান রয়েছে।”

এই কথা বলে সে ইশারা করল। চেয়ারটি, যা একটি আবরণে মোড়ানো ছিল, আনা হলো। যখন এর আবরণ খোলা হলো এবং চেয়ারটির ওপর নজর পড়ল, তখনই মানুষ তার দাবির ওপর ঈমান নিয়ে এল। সাবায়ী গোষ্ঠীর লোকেরা উত্তেজনার বশে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাত তুলে তাকবীরের ধ্বনি দিতে লাগল। কুফার বিখ্যাত সরদার শাবাস বিন রিবঈ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং আওয়াজ দিলেন: “হে লোকসকল! কুফরী করো না।” কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না, বরং শাবাস বিন রিবঈকে ধাক্কা দিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হলো। [১]

মুখতার তার কাছে আসা প্রত্যেক মেহমানকে এই চেয়ারের ফজিলত শোনাত। সেই সাথে সে এই দাবিও শুরু করে দিল: জিবরাঈল (আ.)-ও তার কাছে আসেন এবং এই চেয়ারে বসেন।

রিফআহ বিন শাদ্দাদ (রহ.) একদিন মুখতারের কাছে গেলেন; তিনি পৌঁছানো মাত্রই সে বলল:

“আপনার আসার ঠিক আগ মুহূর্তে জিবরাঈল (আ.) এই চেয়ার থেকে উঠে গেছেন।”

রিফআহ বিন শাদ্দাদ বলেন: “আমি আমার তলোয়ারের হাতলে হাত রাখলাম এবং মনে মনে বললাম: আমি এখন কিসের অপেক্ষা করছি যে, তার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিচ্ছি না? তারপর হঠাৎ আমার বিন আল-হামিক (রা.)-এর বর্ণিত একটি নববী বাণী মনে পড়ে গেল যে, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো কাছ থেকে নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাপদ থাকে, তারপরও যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে বিশ্বাসঘাতকতার পতাকার নিচে দাঁড় করানো হবে।” [২]

এই হাদীসের কথা চিন্তা করে রিফআহ বিন শাদ্দাদ প্রতারণার মাধ্যমে মুখতারকে হত্যা করা সমীচীন মনে করলেন না। [৩]

আল্লাহ মুখতারকে টিল দিয়েছিলেন। সে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকল এবং অবশেষে ১৪ই রবিউল আউয়াল ৬৬ হিজরীতে সে কুফায় প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করল। [৪]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৮২/৬, ৮৩

[২] মুসনাদে আবু দাউদ আল-তায়ালিসী, হাদীস নম্বর: ১৩৮২

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৬৬, ৬৬ হি. (মূল পাঠে ৬২ হি. লিখিত)

কুফার গভর্নর আবদুল্লাহ বিন মুতী’কে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো এবং মুখতারের অনুসারীরা শহরের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করল। এই সময়ে আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের অনুগত কিছু সৈন্য এবং বেশ কয়েকজন মুসলমান প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হন, যাদের মধ্যে রিফায়া বিন শাদ্দাদ এবং আবদুল্লাহ বিন সা’দ বিন কায়েসও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১]

হুসাইনের হত্যাকারীদের পরিণাম:

মুখতার ক্ষমতা গ্রহণের পর সর্বপ্রথম সেই সব লোকদের বেছে বেছে হত্যা করতে শুরু করলেন যারা হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যায় বা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কুফার ওপর তাঁর দখল প্রতিষ্ঠিত হতেই হুসাইনের হত্যাকারীদের মধ্যে কেউ কেউ পালিয়ে গেল এবং কেউ আত্মগোপন করল। শিমার বিন জিল জাওশান বসরার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল; মুখতারের লোকেরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলল। শিমার লড়াই করতে করতে নিহত হলো। [২] মুখতার কুফায় ঘোষণা করলেন: “হুসাইনের হত্যাকারীরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, মানুষ যেন তাদের নাম বলে দেয়, তাদের খুঁজে বের করে এবং হত্যা করে। যতক্ষণ না আমি জমিনকে তাদের থেকে পবিত্র করছি, ততক্ষণ আমার ওপর পানাহার হারাম।”

এই ঘোষণায় শহরে তোলপাড় সৃষ্টি হলো। হুসাইনের হত্যাকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করে আনা হলো। মুখতার কাউকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেন, কারও হাত-পা কেটে ফেলে রাখলেন এবং এভাবেই তার প্রাণ বের হলো। কাউকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানালেন। মালিক বিন বশীর হযরত হুসাইন (রা.)-এর জুব্বা খুলে নিয়েছিল, তার হাত-পা কেটে ফেলা হলো। খাওলি বিন ইয়াজিদ যে মোবারক মাথাটি নিয়ে গিয়েছিল, তার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে সে একটি বুড়ির নিচে লুকিয়ে ছিল। মুখতার তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেন।

মারাত্মক আঘাতকারী এবং বড় অপরাধী সিনান বিন আনাস হাতে আসেনি। মুখতার তার ঘর ধ্বংস করে দিলেন। উমর বিন সা’দকে প্রাণের নিরাপত্তার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ডেকে আনা হলো এবং শিরশ্ছেদ করা হলো। তার ছেলে হাফস যখন তার বাবার মৃতদেহ দেখল, তখন সে ইম্না লিল্লাহ পড়ল। তাকেও হত্যা করা হলো এবং বলা হলো যে, এটি আলী আকবর বিন হুসাইনের বদলা। মুখতার এই দুজনের কাটা মাথা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যার কাছে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা এর কোনো উত্তর দেননি। [৩]

মুখতারের সেনাপতি ছিলেন ইব্রাহিম বিন মালিক; তিনি আশতার নাখয়ীর ছেলে এবং বড় সাহসী মানুষ ছিলেন। মুখতার কুফায় বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে এবং হুসাইনের হত্যাকারীদের মোকাবিলায় তাকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

মুখতারের আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর কাছে পত্রালাপ:

মুখতারের চতুরতা এই পর্যায়ের ছিল যে, কুফায় বিদ্রোহ করার পরও তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি, বরং তাঁকে একটি পত্র পাঠালেন যাতে নিজের এই পদক্ষেপের কারণ হিসেবে বর্ণনা করলেন যে, আবদুল্লাহ বিন মুতী’ আপনার বিরোধীদের প্রতি নরম ছিলেন, তাই তাঁর আনুগত্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। [৪]

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৬; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, ৫০/৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮/২৭৩; তারিখুত তাবারি, ৬/৫২ থেকে ৫৫

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮/২৭৩

[৪] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি, ৫০/৫

মাদাইনীর বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি লিখেছেন: “আবদুল্লাহ বিন মুতী আপনার বিরোধী ছিলেন এবং আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সাথে ষড়যন্ত্র করছিলেন, অথচ আবদুল মালিকের তুলনায় আপনি আমার কাছে বেশি প্রিয়।” [১]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-ও একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি মুখতারের চালবাজিগুলো ভালোভাবেই বুঝতেন, কিন্তু সেই সময় কিছু বিশেষ স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাকে কুফার শাসনের অনুমতিপত্র লিখে পাঠান। [২]

মনে হয় তিনি তার শক্তির মাধ্যমে সিরীয় বিদ্রোহীদের পরাভূত করতে চেয়েছিলেন।

মুখতারের সিরিয়া আক্রমণ এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের হত্যা:

যুল-কাদা ৬৬ হিজরিতে মুখতার সেনাপতি ইব্রাহিম বিন মালিক আশতারকে সাত হাজার সৈন্যসহ সিরিয়ায় পাঠান যাতে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে খতম করা যায়। এই বাহিনীকে বিজয়ের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য তিনি একটি অলৌকিক চেয়ারকে বিজয়ের গ্যারান্টি হিসেবে সাব্যস্ত করে বাহিনীর সাথে পাঠান। এটিকে একটি আবরণে মুড়িয়ে খচ্চরের ওপর চাপানো হয়েছিল এবং ডানে-বামে সাতজন করে লোক এটিকে ধরে রেখেছিল। [৩]

মুহাররম ৬৭ হিজরিতে এই বাহিনী মসুল থেকে ৫ মাইল (২৪ কিলোমিটার) দূরে ‘খাযির’ নামক স্থানে সিরীয় বাহিনীর সাথে প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যেহেতু উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ তার জুলুম-অত্যাচার এবং বিশেষ করে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার প্রধান অপরাধী হওয়ার কারণে মুসলমানদের তীব্র ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু ছিল, তাই ইরাকবাসীরা অবর্ণনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করে। এর সাথে ইব্রাহিমের সামরিক দক্ষতা এবং যুদ্ধকৌশল সিরীয় বাহিনীকে আতঙ্কিত করে তোলে। অবশেষে তাদের কাতারগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের অধিকাংশ লাশের স্তুপ ফেলে রেখে পিছু হটে। ইব্রাহিম নিজে আক্রমণ করতে করতে সামনে এগিয়ে যান এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে যান, যে তখনও ময়দানে অটল ছিল। এই আক্রমণে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ নিহত হয়। তার লাশ পরবর্তীতে সেই তীব্র সুগন্ধির কারণে চেনা গিয়েছিল যা সে পোশাকে ব্যবহার করত।

হুসাইন বিন নুমাইর এবং শুরাহবিল বিন যুল-কাল-এর মতো বিখ্যাত সিরীয় জেনারেলরা এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। কাকতালীয়ভাবে এটি ছিল ১০ই মুহাররমের দিন। ছয় বছর আগে এই তারিখেই উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ সাদাতদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছিল।

ইব্রাহিম উবাইদুল্লাহর বিচ্ছিন্ন মাথা মুখতারের কাছে কুফায় পাঠিয়ে দেন। [৪]

সুনানে তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে যে, মুখতারের সামনে যখন উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের মাথা রাখা হলো, তখন হঠাৎ একটি সাপ এল এবং তিনবার তার নাকের ভেতর ঢুকল, প্রতিবার কিছুক্ষণ ভেতরে থাকল এবং তারপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। [৫]

দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ক্রোধ থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই।

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৭, ত. দারুল ফিকর

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহবী: ৫/৫০

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৮৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৫, ৩৮

[৫] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৮৪০ হাসান সহীহ সনদে

ইতিহাসে উন্মত্তে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুখতারের মধ্যে উত্তেজনা

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুখতারের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছিলেন। এ পর্যন্ত তিনি তাকে জেনেশুনে টিল দিচ্ছিলেন। মুখতারও দ্বিমুখী চাল চালছিলেন। একদিকে তিনি কুফা দখল করে আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতিনিধিদের ইরাকের একটি বড় অংশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং নিজের অনুসারীদের সামনে আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কঠোর সমালোচনা করতেন যাতে মানুষ তার কবজায় থাকে এবং অন্য কারো মহত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

অন্যদিকে তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাথে তাৎক্ষণিক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারছিলেন না। তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের শক্তি আরও বৃদ্ধি করা এবং তারপর হঠাৎ হিজাজের ওপর আক্রমণ করা যখন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দুর্বল হয়ে পড়বেন। নিজের শত্রুতা গোপন করার জন্য তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবাইরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি চিঠি লিখলেন:

“আমি সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের সাথে আপনার হাতে বাইয়াত হয়েছিলাম এবং আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন আপনি আমার প্রতি উদাসীনতা দেখালেন তখন আমি আপনার থেকে দূরে সরে গেলাম। তবে আপনি যদি এখনও আপনার পূর্বের সদাচরণ বজায় রাখেন তবে আমাকে আপনার অনুগতই পাবেন।” [১]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জানতেন যে মুখতার প্রতারণা করছেন; তবুও তার দাবির অসারতা প্রমাণ করার জন্য তিনি আবদুর রহমান বিন হারিসকে ডাকলেন, তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম দিলেন এবং বললেন:

“তুমি কুফায় চলে যাও, আমি তোমাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেছি।” তিনি বললেন: “সেখানে তো মুখতারের দখল রয়েছে।” আপনি বললেন: “কিন্তু সে তো দাবি করছে যে সে আমার অনুগত।”

যখন মুখতার আবদুর রহমান বিন হারিসের আগমনের খবর পেলেন, তখন তিনি যায়িদা বিন কুদামাকে সাতশ অশ্বারোহীর সেনাপতি বানালেন এবং তাকে সত্তর হাজার দিরহাম দিয়ে নির্দেশ দিলেন: “আবদুর রহমান বিন হারিসের কাছে গিয়ে এই অর্থ দিয়ে তাকে ফিরে যেতে রাজি করাও। যদি সে না মানে তবে তলোয়ারের জোরে তাকে ফেরত পাঠাও।”

আবদুর রহমান বিন হারিস যখন পথে এই নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, তখন তিনি নিরবে সত্তর হাজার দিরহাম নিয়ে বসরায় চলে গেলেন যা তখনও আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতিনিধিদের অধীনে ছিল। এভাবে প্রমাণিত হলো যে মুখতার যেকোনো মূল্যে নিজের স্বাধীন শাসন চান এবং কারো ছত্রছায়ায় থাকার দাবিটি নিছক একটি প্রতারণা। [২]

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মুখতার এখন আরবদের তুলনায় অনারবদের প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন। এর কারণ ছিল অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত আরব তার ধূর্ততা ও অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে গিয়েছিল, যেখানে ইরানি এবং অন্যান্য জাতির লোকেরা ছিল অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই তাদের বিভ্রান্ত করা এবং বোকা বানানো কঠিন ছিল না। ফলে তিনি তাদের ওপরই বেশি আস্থা রাখছিলেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/৩৩১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/৩৩১

দামেস্কের নতুন শাসক: আবদুল মালিক

দামেস্কের সিংহাসনে এখন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান আসীন ছিলেন। এই একত্রিশ বছর বয়সী যুবকের বর্তমান ও পূর্ববর্তী জীবনের মধ্যে এক অসাধারণ পার্থক্য ছিল। পিতার মসনদ গ্রহণ করার আগে, তিনি দিনরাত কুরআন, হাদিস এবং ফিকহের মতো ইলম অর্জনে মগ্ন থাকতেন। নফল ইবাদত এবং তিলাওয়াতের আধিক্য তাঁর রুটিনের অংশ ছিল। [১] তিনি কেবল কবিরা গুনাহ থেকেই নয়, বরং সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকেও বহু দূরে থাকতেন। মারজ রাহিতের যুদ্ধে যখন বনু উমাইয়ার প্রায় সকল আমীর ও সেনাপতি তাদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছিল, তখনও তিনি এই যুদ্ধে শরিক হননি; কারণ তাঁর মতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপ ছিল সন্দেহজনক এবং সতর্কতা ছিল এতেই যে, এমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা। [২] কিন্তু এখন যখন সিরিয়া ও মিসরের লাগাম তাঁর হাতে ছিল, তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু-কে শরয়ী খলিফা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং যেকোনো মূল্যে তাঁর শাসন শেষ করতে চেয়েছিলেন। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, রাজনৈতিক স্বার্থ মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও ভাবনাকে কীভাবে বদলে দেয়।

মুখতারের ব্যর্থ চাল, হিজাজে আবদুল মালিকের ব্যর্থ অভিযান:

আবদুল মালিক সুযোগ পেয়েই হিজাজে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যার প্রথম লক্ষ্য ছিল মদিনার উত্তরে অবস্থিত কৃষি অঞ্চল ওয়াদিউল কুরা। কুফায় মুখতার সাক্ষাৎ এই খবর পেলে তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু-কে সাহায্যের অজুহাতে হিজাজে নিজের বাহিনী প্রবেশ করানোর পরিকল্পনা করেন। তিনি অবিলম্বে দূত পাঠিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু-কে এই বার্তা দেন:

“আপনি যদি পছন্দ করেন তবে আমি আপনার কাছে সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাতে পারি।”

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু-এর সাহায্যের কঠোর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি এই বার্তার মধ্যে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাকেও উপেক্ষা করতে পারছিলেন না। তিনি উত্তর পাঠালেন: “যদি তুমি আমার অনুগত হও তবে এই বিষয়টি আমার কাছে মোটেও খারাপ লাগবে না। তুমি ওয়াদিউল কুরায় একটি বাহিনী পাঠিয়ে দাও যাতে তারা সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করতে পারে।”

এর পাশাপাশি তিনি আব্বাস বিন সাহল রাদিআল্লাহু আনহু-কে দুই হাজার নির্বাচিত সৈন্য দিয়ে মদিনা মুনাওয়ারার সীমান্তে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন: “যদি মুখতারের বাহিনী আমাদের অনুগত হয় তবে ঠিক আছে। অন্যথায় তাদের সাথে সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আচরণ করবে যাতে এই সময়ের মধ্যে আমরা তাদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে পারি।”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/২৩৮, ত. আর-রিসালাহ

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৬/২৭০, ত. দারুল ফিকর

এদিকে মুখতার শুরাহবিল বিন ওয়ারসকে তিন হাজার সৈন্য দিয়ে, যাদের মধ্যে সাতশ আরব এবং বাকিরা অনারব ছিল, হিজাজে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে প্রথমে মদিনা ও পরে মক্কা দখলের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু যখন এই বাহিনী মদিনার কাছে পৌঁছাল, তখন এখানে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সেনাপতি আব্বাস বিন সাহল (রা.)-এর সাথে তাদের মোকাবিলা হলো। আব্বাস বিন সাহল (রা.) শুরাহবিলকে জিজ্ঞেস করলেন:

“আপনি কি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর অনুগত নন?”

সে বলল: “কেন নয়, অবশ্যই অনুগত।”

আব্বাস বিন সাহল (রা.) বললেন: “যদি তাই হয়, তবে তাঁর নির্দেশ হলো ওয়াডিউল কুরায় পৌঁছে শামবাসীদের মোকাবিলা করুন।”

শুরাহবিল বলল: “আমার মনিব আমাকে মদিনায় পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে পৌঁছে তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করব কী করতে হবে।”

আব্বাস বুঝে গেলেন যে মুখতারের উদ্দেশ্য হিজাজ দখল করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সময় তিনি কৌশলের খাতিরে চুপ থাকলেন, কিন্তু রাতে সুযোগ বুঝে হঠাৎ মুখতারের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসলেন। শুরাহবিল নিহত হলো এবং বাহিনীর অনেক সৈন্যও মৃত্যুর মুখে পতিত হলো। বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। [১]

বসরা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা:

মুখতার এই পরাজয়ের খবরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সে ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র বসরায় তার দাঈ মুসান্না বিন মুখাররিবার মাধ্যমে বিদ্রোহের চেষ্টা করল, কিন্তু এখানে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর কর্মকর্তারা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, তাই বিদ্রোহ সফল হয়নি। [২]

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াকে ব্যবহারের ব্যর্থতা:

মুখতার বক্তৃতার মাধ্যমে তার অনুসারীদের আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে আরও উসকে দিল। সেই সাথে সে হিজাজ জয়ের জন্য মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.)-এর পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।

এ পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) সতর্কভাবে হুসাইনের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মুখতারের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে তার পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন না। মুখতার হিজাজে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের পেছনে লুকিয়ে থাকা হীন উদ্দেশ্য গোপন রেখে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.)-কে বিভ্রান্ত করতে চাইল এবং সালেহ বিন মাসউদের মাধ্যমে এই চিঠি পাঠাল:

“আমি আপনার সাহায্যের জন্য মদিনার দিকে সৈন্য পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের সেই বাহিনীকে প্রতারণার শিকার বানিয়েছে। এখন যদি আপনার রায় হয়, তবে আমি দ্বিতীয় একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং আপনিও মদিনাবাসীদের কাছে দূত পাঠিয়ে এই বিষয়টি জানিয়ে দিন।”

কিন্তু মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) এই মিথ্যাবাদীর চালে পা দেওয়ার মতো ছিলেন না। তিনি ফিরতি চিঠিতে লিখলেন:

“আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো আল্লাহর আনুগত্য। তুমি প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহর অনুগত হও এবং মনে রেখো যে, যদি আমাকে যুদ্ধ করতে হতো তবে মানুষ দ্রুত আমার চারপাশে সমবেত হতো। আমার সাহায্যকারী প্রচুর আছে, কিন্তু আমি নিজে...”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৩, তারিখুত তাবারী: ৬/৭১ থেকে ৭৫, ৬৬ হিজরি

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/৫৬৬, ৬৬ হিজরি

তাদের থেকে নির্জনবাসী হয়ে বসে আছি এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করছি। যতক্ষণ না আল্লাহ আমার জন্য ফয়সালা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

অতঃপর আপনি মুখতারের দূতকে বললেন: “মুখতারকে বলো, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং রক্তপাত বন্ধ করে।” [১]

এই বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, মুহাম্মদ বিন হানিফিয়া এবং আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের এর মধ্যে শত্রুতার যে বর্ণনা কিছু ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য নয়। মুহাম্মদ বিন হানিফিয়া চাইলে আগেই নিজের চারপাশে লোক জমা করে হিজাজের শাসন ক্ষমতা লাভ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজের ইবাদতগুজার প্রকৃতি এবং ইলমি শান অনুযায়ী নির্জনবাসের জীবন বেছে নিয়েছিলেন এবং পদের প্রত্যাশী হননি। [২]

মুখতারের নবুওয়াতের দাবি:

কুফা দখল এবং উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে পরাজিত করার পর মুখতারের খ্যাতি ও প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে এক ধাপ এগিয়ে নবুওয়াতের দাবিও করে বসল এবং বলতে লাগল যে, আমার কাছে জিবরাঈল ওহী নিয়ে আসেন। [৩]

সে পুরো ইরাকে নিজের দাঈদের ছড়িয়ে দিল যারা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং গোত্র প্রধানদের বায়াতের দাওয়াত দিচ্ছিল। মুখতারের বক্তব্য ছিল যে, যে ব্যক্তি তার হাতে বায়াত হবে, সে তাকে দুনিয়াতে সবকিছুর এবং আখিরাতে জান্নাতী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। মুখতার নিজেও পত্র লিখে লিখে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিজের বায়াতের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল। জলীলুল কদর তাবিঈ আহনাফ বিন কায়েস বসরার অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি প্রকাশ্যে মুখতারকে কাজ্জাব বলতেন। মুখতার তাকে নিম্নোক্ত পত্রটি লিখল:

“আসসালামু আলাইকুম! বনু মুদার এবং রাবিয়াহ ধ্বংস হোক! হে আহনাফ! তুমি তোমার কওমকে জাহান্নামের দিকে এমনভাবে নিয়ে যাচ্ছ যে সেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। আমি তাকদীর পরিবর্তন করতে পারি না। জানতে পারলাম যে তুমি আমাকে কাজ্জাব বলো। আমাকে...”

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৫০৭, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/৩৩

[২] প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের মুহাম্মদ বিন হানিফিয়াকে নিজের বায়াতের জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করেন এবং যখন তিনি রাজি হননি তখন তাকে বন্দি করেন এবং হত্যার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন হানিফিয়া মুখতারকে খবর পাঠিয়ে সাহায্য চান। সে ৭৫০ জন বাছাইকৃত অশ্বারোহী পাঠায় যারা দিনদুপুরে মক্কায় প্রবেশ করে মুহাম্মদ বিন হানিফিয়াকে মুক্ত করে আনে। (তারিখুত তাবারী: ৬/৭০৫, ৭১৭)

কিন্তু এই বর্ণনাটি আবু মিখনাফের, যার দুর্বলতা এবং সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ গোপন নয়, সুতরাং সাহাবীদের ওপর অপবাদযুক্ত এই দুর্বল বর্ণনা গ্রহণ করা মূলনীতির পরিপন্থী। যৌক্তিকভাবেও এটি সম্ভব নয় যে, ৭৫০ জন অশ্বারোহী পুরো হিজাজ অতিক্রম করে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের এর রাজধানীতে ঢুকে পড়বে আর তার পুরো বাহিনী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। মুহাম্মদ বিন হানিফিয়া এর নিজের বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট হচ্ছে যে, তিনি বন্দি ছিলেন না বরং নিজের ইচ্ছায় নির্জনবাসী ছিলেন। মুখতার তার জন্য কোনো সৈন্যবাহিনী পাঠাননি, তাদের কাছে অনুমতি অবশ্যই চেয়েছিলেন কিন্তু তারা নিষেধ করে দিয়েছিলেন, যদিও মুহাম্মদ বিন হানিফিয়ার বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বর্ণিত বর্ণনাটিও আবু মিখনাফের এবং এভাবে সনদের দিক থেকে দুর্বল কিন্তু যুক্তির দিক থেকে শক্তিশালী, পক্ষান্তরে তাদের বন্দি করার বর্ণনাটি দুর্বলতার পাশাপাশি যুক্তির দিক থেকেও ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনায় যা কিছু ঘটেছে তা আবু মিখনাফ থেকেই বর্ণিত এবং তার নিজের বর্ণনার মধ্যেই বৈপরীত্য রয়েছে, তাই এগুলোর মধ্যে সাহাবীদের প্রতি অপবাদযুক্ত এবং যুক্তির পরিপন্থী বর্ণনাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের এর মতো ফকীহ এবং মুত্তাকী মানুষ শুধুমাত্র বায়াত না করার কারণে মুহাম্মদ বিন হানিফিয়াকে হত্যা করা বরং পুড়িয়ে মারতে কীভাবে প্রস্তুত হতে পারেন, আর ৭৫০ জন অশ্বারোহী আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের এর সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কীভাবে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এই কারণেই হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এই দ্বিতীয় বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন: “ফি সিহহাতিহি নাজার” “এর সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে।” (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/৩৬)

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৫৩১, ত. আর-রিসালাহ

“আগের নবীদেরকেও এভাবেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। আমি তাদের অধিকাংশের চেয়ে উত্তম নই, তাই আমাকে যদি মিথ্যাবাদী মনে করা হয় তবে তাতে কী হয়েছে।”

এই চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মুখতার নিজেকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করাত এবং কোনো কোনো নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদারও ছিল। [১]

সে মুরিদদের সামনে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী করত। তার দাবি ছিল যে, সে গায়েবের জ্ঞান লাভ করে। কোনো ঘটনার আগাম আন্দাজ হয়ে গেলে বা কোনো দুর্ঘটনার খবর দ্রুত পেয়ে গেলে সেটিকে গায়েবের খবর বলে প্রচার করে মানুষের ভক্তি অর্জন করত।

মুখতার এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতা:

ভুয়া নবুওয়াতের নাটক করা এবং হাজার হাজার মুরিদকে সাথে রাখা সত্ত্বেও মুখতার দেখেছিল যে, ইরাকের ওপর ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর নিয়ন্ত্রণ এখনও মজবুত। হিজাজে সৈন্য পাঠানোর ক্ষেত্রেও সে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল এবং বসরাতেও। এই আশঙ্কাও ছিল যে, আবদুল মালিক বিন মারওয়ান, উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যেকোনো সময় সক্রিয় হতে পারে; তাই মুখতার অন্তত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক আর তিক্ত করতে চাচ্ছিল না। সে তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে এক পত্রে লিখেছিল:

“আমি কুফাকে কেন্দ্র বানিয়েছি। আপনি যদি আমাকে এখানে শাসনের সুযোগ দিতে থাকেন এবং এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দেন, তবে আমি শামে আক্রমণ করে আপনার বিরোধীদের কাজ খতম করে দিতে পারি।”

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এই পত্র পড়ে বললেন:

“বনু সাকিফের এই কাজ্জাব এবং আমার মধ্যে প্রতারণার এই কারবার আর কতদিন চলবে।”

এরপর আপনি মুখতারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে স্পষ্ট ভাষায় লিখে পাঠালেন:

“আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে একটি দিরহামও দেব না।” [২]

এভাবে মুখতার এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মধ্যে নামমাত্র সম্পর্কও শেষ হয়ে গেল এবং প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু হলো।

মুখতারকে “কাজ্জাব” কেন বলা হতো?

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) মুখতারকে কাজ্জাব এই জন্য বলেছিলেন যে, এ বিষয়ে আপনার মাতা আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) এই হাদিস শোনাতেন: “নিশ্চয়ই বনু সাকিফে একজন ব্যক্তি বড় মিথ্যাবাদী হবে এবং একজন চরম রক্তপিপাসু।” [৩]

হযরত আসমা (রা.) এবং ওই যুগের বড় বড় ব্যক্তিদের এটাই ধারণা ছিল যে, বনু সাকিফের কাজ্জাব হলো এই মুখতার; তাই মুখতারের উপাধি তার জীবদ্দশাতেই “কাজ্জাব” হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে নিজেও তার বক্তৃতায় বলত: “আমি যদি আলে মুহাম্মাদের প্রতিশোধ না নেই তবে...”

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৬৮ থেকে ৭০

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৬/৪৪

[৩] “ইম্মা ফী সাকীফিন কাযযাবান ওয়া মুবীরান” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৫৪৫, ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব যিকর কাযযাব সাকীফ ওয়া মীবীরিহা)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

“...আমি তেমনই একজন কাজ্জাব যেমনটি মানুষ আমাকে ডাকে।” [১]

ইরাকে মুসআব বিন জুবায়ের (রা.)-এর গভর্নরশিপ:

মুখতারের হাতে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ এবং হুসাইন বিন নুমাইরের হত্যার ফলে সিরিয়াবাসীদের শক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর জন্য সিরিয়া থেকে কোনো তাৎক্ষণিক বিপদ ছিল না। এখন মুখতারকে তার পরিণতির দিকে পৌঁছে দেওয়ার উপযুক্ত সময় ছিল, কারণ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির পর এই কাজ্জাবের সাথে আর কোনো শিথিলতা প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না। এর পাশাপাশি এই আশঙ্কাও ছিল যে, দেরি করলে মুখতার হয়তো বসরাও দখল করে নেবে এবং পুরো ইরাক হাতছাড়া হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এই কাজটির দায়িত্ব তার রণকুশলী এবং উচ্চ সাহসী ভাই মুসআব বিন জুবায়ের (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেন। তাকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় যাতে তিনি পুরো ইরাককে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের এই তুফান থেকে মুক্ত করতে পারেন। মুসআব বিন জুবায়ের (রা.) ছিলেন আরবের একজন প্রখ্যাত অশ্বারোহী, সুদর্শন, যুদ্ধবিদ্যায় অতুলনীয় এবং দানশীলতা ও উদারতায় সমসাময়িকদের মধ্যে অনন্য। [২]

মাজারের চূড়ান্ত যুদ্ধ:

কুফাসহ মুখতারের দখলকৃত সমস্ত এলাকার নেককার, সৎ, সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত মানুষ মুখতারের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। গোলাম, মাওয়ালি, চাকর-বাকর এবং মূর্খ ও দুশ্চরিত্রের লোকেরা মুখতারের দাবিগুলোর ওপর বিশ্বাস করত এবং তার উস্কানিতে সবদিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বেড়াত। এমনকি নারী ও শিশুরাও নিরাপদ ছিল না। মুসআব বিন জুবায়ের (রা.) বসরায় পৌঁছালে কাদিসিয়া থেকে মুহাম্মদ বিন আশআস এবং কুফা থেকে শাবাস বিন রাবিসহ ইরাকের অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। নির্যাতিত মুসলমানরা তার আগমনের সাথে সাথেই তার চারপাশে সমবেত হতে শুরু করেন। খোরাসানের প্রখ্যাত বিজেতা এবং জেনারেল মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরা (রা.)-ও সেখানে এসে পৌঁছান। প্রথমে তিনি রাজি ছিলেন না, কিন্তু মুহাম্মদ বিন আশআস নিজে গিয়ে তাকে নারী ও শিশুদের ওপর মুখতারের অনুচরদের অত্যাচারের কাহিনী শোনাতে তিনি প্রস্তুত হন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলে আসেন।

মুখতার মুসআব বিন জুবায়েরের সংকল্প আঁচ করতে পেরে বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে বসরার ওপর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন আহমার বিন শুমাইত এবং আবু আমরা কায়সান। মুসআব বিন জুবায়ের (রা.) খোলা ময়দানে বেরিয়ে এসে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করেন। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ওয়াসিত এবং বসরার মাঝখানে বসরা থেকে চার মঞ্জিল সামনে মায়সানের নিকট ‘মাজার’ নামক প্রান্তরে সংঘটিত হয়। হযরত আলী (রা.)-এর সাহেবজাদা উবাইদুল্লাহ (রা.) এখানে মুসআব বিন জুবায়ের (রা.)-এর পতাকাতলে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এখানেই তার মাজার অবস্থিত। [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৫৭

[২] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবী: ৫/৫৭ ত তদমুরী; সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৩/১৩১, ত রিসালাহ

[৩] মুজাম্মুল বুলদান: ৫/৮৮

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

মুসআব বিন যুবাইর (রা.)-এর সাথীরা বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। তুমুল যুদ্ধের পর অবশেষে মুখতারের দুই সেনাপতি আহমার বিন শুমাইত এবং আবু আমরাহ নিহত হলেন এবং অবশিষ্ট পর্যুদস্ত বাহিনী কুফার দিকে পিছু হটল। মুসআব বিন যুবাইর (রা.) যুদ্ধকে একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নিজের বাহিনী নিয়ে শত্রুর পিছু ধাওয়া করলেন। ওয়াসিত নামক স্থানে তারা ফোরাতে নদী পার হলেন এবং বাহিনীর সাজসরঞ্জাম ও নিরাপত্তা রক্ষী দলের সাথে নৌকায় করে ফোরাতে নদীর সমান্তরালে কুফার দিকে অগ্রসর হলেন।

মুখতার শত্রুকে কুফার দিকে অগ্রসর হতে দেখে ফোরাতে নদীর ডানে ও বামের খালের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন যাতে ফোরাতের পানি কমে যায়। মুসআব বিন যুবাইর (রা.)-এর নৌকাগুলো নদীর বিভিন্ন দিক থেকে আসছিল। যখন নদীর পানি আটকে দেওয়া হলো, তখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পানির স্তর নিচে নেমে গেল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে নদীতে কাদা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। মুসআব বিন যুবাইর (রা.)-এর সৈন্যরা নৌকা থেকে নেমে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন, দ্রুত বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে পানির পথ খুলে দিলেন এবং পুনরায় পানি প্রবাহিত হতে শুরু করল। এভাবে ৭ রমজান ৬৭ হিজরিতে মুসআব বিন যুবাইর (রা.)-এর বাহিনী কুফার সামনে পৌঁছে গেল।

মুখতার বাধ্য হয়ে নিজের সমর্থকদের নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে এলেন। এখানে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো, যাতে মুহাম্মদ বিন আশআছ, যিনি মুখতারের মোকাবিলা করছিলেন, শহীদ হলেন। তবে মুখতারের সমর্থকদের পা দ্রুতই উখড়ে গেল। তাদের পরাজয়ের সাথে সাথে মুসআব বিন যুবাইর (রা.)-এর জানবাজরা শহর দখল করে নিলেন।

মুখতার প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন পর্যন্ত পরিখা থেকে লড়াই চলল। তার অধিকাংশ সাথী আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুসআব বিন যুবাইর (রা.) দুর্গের কঠোর অবরোধ করেছিলেন যাতে মুখতার খাদ্য ও রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু শহরের অনেক নারী মুখতারের ভক্ত ছিল। তারা গোপনে তার কাছে খাবার পৌঁছে দিচ্ছিল। অবশেষে মুসআব বিন যুবাইর (রা.) বিষয়টি জানতে পারলেন এবং নারীদের আসা-যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরবরাহ পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। তখন মুখতারের সাথীরা দুর্বল হয়ে পড়ল। যখন দানাপানি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি নিজের বিশেষ সাথীদের নিয়ে আত্মত্যাগ লড়াই করার সংকল্প করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেই সময় তার অধিকাংশ ভক্ত আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল এবং তাকেও এই পরামর্শ দিচ্ছিল, কিন্তু তার বক্তব্য ছিল যে লড়াই করতে করতে মরে যাওয়াই উত্তম। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যেহেতু তিনি মানুষ হত্যা করেছেন, তাই তারা তাকে প্রাণভিক্ষা দেবে না। এই কারণে তিনি তার অনুসারীদেরও নিজের সাথে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

দুর্গের দরজা খোলার আগে তিনি নিজের ডান হাত সায়েব বিন মালিকের কাছে মনের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন: “আমিও একজন আরব। যখন আমি দেখলাম যে ইবনে যুবাইর হিজাজ দখল করেছেন, নজদাহ খারেজি ইয়ামামা দখল করেছেন এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সিরিয়া দখল করেছেন, তখন আমি ভাবলাম যে আরব হওয়ার দিক থেকে আমি তাদের চেয়ে কম নই। এই কারণে আমিও এই শহরগুলো দখল করেছি।”

এভাবে মুখতার মৃত্যুর আগে নিজেই স্বীকার করে নিলেন যে তার আসল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল এবং যা কিছু তিনি করেছিলেন তা এই উদ্দেশ্যেই ছিল।

জন্য করা হয়েছিল।

অবশেষে সে তলোয়ার কোষমুক্ত করে ১৯ জন ব্যক্তির সাথে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলো। মুসআব বিন জুবাইরের সামনে তার মাথা কেটে রাখা হলো। এটি ১৪ রমজান ৬৭ হিজরির ঘটনা। সে সময় মুখতারের বয়স ছিল ৬৭ বছর। এভাবে এই দুষ্ট ও কদর্য স্বভাবের মানুষটি থেকে উম্মাহ মুক্তি পেল এবং আল্লাহর সৃষ্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মুখতারের এই দুশ্চরিত্র সত্ত্বেও তার হাতে হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের পরিণতি লাভ করা এক অদ্ভুত বিষয়। ইতিহাসের এই দৃশ্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদিসের বাস্তব প্রতিফলন বলে মনে হয়:

“ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر-”

“নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে পাপিষ্ঠ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মাধ্যমেও সাহায্য করেন।” [২]

ইব্রাহিম ও মুসআব:

মুখতারের সেনাপতি ইব্রাহিম বিন মালিক তখন মোসেলে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন জেনারেল। মুখতারের আসল শক্তি ছিল তাঁরই কারণে। উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে তিনিই পরাজিত করেছিলেন। তিনি কটুর শিয়া ছিলেন না, বরং মুখতারের অন্ধ অনুসারীও ছিলেন না; বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার সাথে ছিলেন। ভ্রান্ত আকিদার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার প্রমাণ হলো, যখন মুখতারের বাহিনী উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিল এবং ডুবন্ত সেই কারামতের কুরসির চারপাশে ঘিরে হাত তুলে দোয়া করছিল, তখন ইব্রাহিম বিন মালিক বলছিলেন: “হে আল্লাহ! এই নির্বোধদের কর্মকাণ্ডের কারণে আমাদের ধ্বংস করবেন না।” এটি তো ছিল একটি প্রদর্শনী, যখন তারা তাদের গোবৎসকে ঘিরে এভাবেই সমবেত হতো। [৩]

মুখতার নিহত হওয়ার পর দামেস্কে আব্দুল মালিক এবং কুফায় মুসআব বিন জুবাইর (রা.), উভয়েরই চেষ্টা ছিল ইব্রাহিমকে সাথে নিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ইব্রাহিমকে প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি যদি তাঁর অধীনে এসে ইরাকের যতটুকু এলাকা জয় করবেন, তা তাঁকে দিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে মুসআব বিন জুবাইর (রা.) প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি যদি তাঁদের কাতারে এসে যতটুকু এলাকা জয় করবেন, তা তাঁরই হয়ে যাবে। ইব্রাহিম আব্দুল মালিকের তুলনায় আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে প্রাধান্য দিলেন এবং এসে মুসআব বিন জুবাইরের সাথে যোগ দিলেন। মুসআব বিন জুবাইর তাঁকে কুফার সেনাপতি বানিয়ে দিলেন। তাঁর স্থলে মোসেল ও আল-জাজিরায় মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাকে নিযুক্ত করলেন। [৪]

[১] তারিখ আত-তাবারী ৫, পৃষ্ঠা ৬১০ থেকে ৬১১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮, পৃষ্ঠা ২৫৫, ২৭৩, ২৭১।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হাদিস ৩০৬২, আল-মাগাজি অধ্যায়, খায়বার যুদ্ধ পরিচ্ছেদ; সহীহ মুসলিম, হাদিস ৩১৮, কিতাবুল ঈমান, আত্মহত্যা হারাম হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

[৩] তারিখ আত-তাবারী ৬/৮২।

[৪] তারিখ আত-তাবারী ৬/১১০, ১১১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৭২, ৭৩; তারিখুল ইসলাম আয-যাহাবী ৫/২৬, ২৭।

খারেজীদের বিদ্রোহ

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতের সময় তাঁর মোকাবিলায় আরও একটি বড় শক্তি ছিল। এটি ছিল খারেজী গোষ্ঠী, যারা হিজাজে নজদ ও ইয়ামামা থেকে বাহরাইন পর্যন্ত এবং ইরাকে কুফা ও বসরা থেকে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খারেজীরা বনু উমাইয়াদেরও শত্রু ছিল এবং সাদাতদেরও। তাদের মতে হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতি ভক্তি পোষণকারী লোকেরা পথভ্রষ্ট ছিল, যাদের হত্যা করা ওয়াজিব ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে ইয়াজিদের সৈন্য অভিযানের সময় তাদের সরদাররা: নাজদাহ বিন আমের, নাফে বিন আল-আজরাক এবং আবদুল্লাহ বিন ইবাদ কিছুকাল এই ভেবে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-কে সমর্থন দিয়েছিলেন যে, তিনি হযরত উসমান (রা.) সহ সমস্ত উমাইয়া খলিফাদের বিরোধী হবেন। কিন্তু যখন তাঁর মুখ থেকে এমন কোনো কথা শুনতে পেলেন না, তখন তারা জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলেন না:

“হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে আপনার মতামত কী?”

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) বললেন: “আমি তাঁর জীবদ্দশায়ও তাঁকে ভালোবাসতাম এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও ভালোবাসি।”

খারেজীরা এ কথা শুনে ফিরে গেল এবং তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল। [১]

জাজিরাতুল আরবে খারেজী:

এরপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-কে তাদের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার ক্রমাগত সম্মুখীন হতে হয়। আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথেই খারেজীরা তাঁর মোকাবিলায় বেরিয়ে আসে। সে সময় তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল: প্রথম দলের সরদার নাফে বিন আল-আজরাক ইরাকে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দলটি ইয়ামামায় আবু তালুতের অধীনে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আবু তালুত ৬৫ হিজরিতে জাজিরাতুল আরবের কাফেলাগুলোর ওপর লুটতরাজ শুরু করেন। ৬৬ হিজরিতে আবু তালুতের স্থলে নাজদাহ বিন আমের তাদের প্রধান হন। তিনি বিভিন্ন স্থানে গোত্রীয় সরদারদের পরাজিত করার পর ৬৭ হিজরিতে বাহরাইন ও ইয়ামামাও দখল করে নেন। আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) ইরাক অভিযান এবং রাজকীয় সরকারের সাথে দ্বন্দ্ব এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, নাজদাহর কর্মকাণ্ডের কোনো প্রতিরোধ করতে পারেননি।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৩। খলিফা বিন খাইয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনাটি হুসাইন বিন নুমাইরের সাথে যুদ্ধের পরের, যেখানে বালাজুরীর বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধের সময়ই খারেজীদের সাথে হযরত উসমান (রা.) সংক্রান্ত আকিদার বিষয়ে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে খারেজীদের সবচেয়ে বড় সরদার নাফে বিন আজরাক যুদ্ধের মাঝপথেই তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) সেদিকে কোনো ঞ্ক্ষিপ করেননি। আনসাবুল আশরাফ ৫: ৫/৭, ৩১, ৩৭। আল-ফিতান। কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকে সাবায়ীদের অনুগ্রহ মনে করেন এবং আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতকে খারেজীদের শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্রোহী সরকার বলেন, অথচ খারেজীদের জুবায়েরীদের সমর্থক ও পরামর্শদাতা হিসেবে থাকার দাবি ছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য। যদি কোনো খিলাফত বাতিল হওয়ার দলিল এটাই হয়, তবে বনু উমাইয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ (রা.)-এর খিলাফতও বাতিল বলে গণ্য হবে, কারণ খারেজীরা তাঁরও অনুগত ও সমর্থক ছিল।

৬৯ হিজরিতে নজদাহর শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মতো ৮৬০ জন ব্যক্তির সাথে আলাদা পতাকা নিয়ে হজের জন্য মক্কায় পৌঁছান। সৌভাগ্যবশত ৭০ হিজরিতে নজদাহর জামাতে ফাটল ধরে। অনেক খারেজি আমির তার বিরোধী হয়ে যান এবং তারা নিজেরাই তাকে হত্যা করেন। [১]

ইরাকি খারেজিদের বিদ্রোহ:

ইরাকের খারেজিরা নাফে ইবনুল আজরাকের নেতৃত্বে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। নাফে ইবনুল আজরাকের সম্পর্কের কারণে এই দলকে ‘আজারিফা’ বলা হতো। নাফে ৬৫ হিজরিতে আহলে বসরার সাথে যুদ্ধে নিহত হন কিন্তু তার দল টিকে থাকে। আমিররা বদলাতে থাকে এবং সরকারি বাহিনীর সাথে মোকাবিলায় লিপ্ত হয়ে মারা যেতে থাকে। খারেজিরা এই সময়ে আহওয়াজ এবং পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে এবং মানুষের কাছ থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করতে শুরু করে। [২]

ইরাকে খারেজিদের বিদ্রোহের কারণে বসরার জনবসতি চরম বিপদের মুখে ছিল। আহনাফ বিন কায়েস (রা.) সহ বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাকে অনুরোধ করেন যাতে তিনি তাদের এই ফিতনা থেকে মুক্তি দেন। মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা তখন খোরাसानে নিযুক্ত ছিলেন। তাকে ইরাকে ডেকে আনা হয় এবং প্রচুর অর্থ ও একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে এই অভিযানে পাঠানো হয়। তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর, যাতে উভয় পক্ষের ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়, খারেজিদের বসরা ও এর আশপাশ থেকে বিতাড়িত করেন। খারেজিদের ‘৪৮০০’ লোক নিহত হয়। তারা পালিয়ে কেরমানের দিকে চলে যায়। [৩]

তিন বছর পর্যন্ত শান্তি বজায় ছিল। ৬৭ হিজরিতে মুসআব বিন জুবায়ের (রা.) মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা (রহ.)-কে আজারবাইজান, আল-জাজিরা এবং মসুলের আমির নিযুক্ত করেন। [৪] তার চলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েই খারেজিরা পুনরায় তীব্রভাবে বিদ্রোহী তৎপরতা শুরু করে যার ফলে পুরো ইরাকে শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। [৫]

খারেজিদের এক জায়গায় স্থিরতা ছিল না। এক ময়দানে পরাজিত হয়ে বেরিয়ে গেলে তারা অন্য জায়গায় গিয়ে মানুষের ওপর শক্তি পরীক্ষা শুরু করত। মাদায়েনের স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর তারা এমন জুলুম করেছিল যে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে ফেলা হয়েছিল। একইভাবে সাবাতোও তারা সন্ত্রাসের লোমহর্ষক দৃশ্য প্রদর্শন করেছিল। [৬] ইসফাহানে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাদের সর্দার ইবনে মাহজ নিহত হয়। খারেজিরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড ৪, পৃ. ৬৫। যিকর নজদাহ বিন আমের; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৩৮৪ ও ৩৮৫। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তারিখুত তাবারী, খণ্ড ৫, ৭০ হিজরির ঘটনাবলি।

[২] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২৫৬, ২৫৭; তারিখুত তাবারী: ৫/৬১৩ ও ৬১৫।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৬১৫ থেকে ২১৯; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবী: ৫/৩১, ৬৫ হিজরির ঘটনাবলি।

[৪] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবী: ৫/৬২, ৬৭ হিজরি।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৬/১১৯, ১২০।

[৬] তারিখুত তাবারী: ৬/১২১।

সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সরকারের দখলে চলে এল। কিন্তু এই লোকেরা এক অদ্ভুত উপাদানে তৈরি ছিল। নেতৃত্বের মৃত্যুতে তাদের কোনো পার্থক্য হতো না। ইবনে মাছজের পর তারা কাতারি বিন ফুজায়া নামক এক আরব যোদ্ধাকে সরদার বানিয়ে নিল, যে তাদের পুনরায় সংগঠিত করে এদিক-সেদিক লুটতরাজ শুরু করে দিল। অবশেষে মুসআব বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারও মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠালেন। মুহাল্লাব পুরো আট মাস পর্যন্ত কাতারি বিন ফুজায়ার সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। [১]

তাউনে জারফ:

এদিকে বসরা এবং এর আশপাশে প্লেগের সেই ভয়াবহ মহামারি ছড়িয়ে পড়ল যাকে “তাউনে জারফ” নামে স্মরণ করা হয়। মহামারির তিন দিন অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল যাতে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের ৭০-৮০ জন শিশু এর শিকার হয়। বসরায় নিস্তব্ধতা ছেয়ে গিয়েছিল। জুমার নামাজের জন্য জামে মসজিদে মাত্র সাতজন লোক ছিল। মৃতদের কাফন-দাফন করার এবং জানাজা বহন করার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বসরার শাসকের মা যখন মারা গেলেন, তখন জানাজায় কাঁধ দেওয়ার জন্য মাত্র চারজন লোক পাওয়া গিয়েছিল। [২] এই দুর্ঘটনা মুসআব বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর জনশক্তির অনেক ক্ষতি করল কারণ তাঁর অধিকাংশ অনুগত সৈন্য বসরার অধিবাসী ছিল।

আমর বিন সাঈদের হত্যাকাণ্ড:

দামেস্কে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকে নস্যাৎ করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে ছিল জন্মগত রাজনীতিবিদ। সে সুযোগসন্ধানী এবং পরিকল্পনাকারীও ছিল। সে বনু মারওয়ানের শাসনকে অপরাজেয় করার জন্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ কাঁটা দূর করে দিয়েছিল। জাবিয়ার সমাবেশে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী মারওয়ানের পর খালিদ বিন ইয়াজিদ এবং তারপর আমর বিন সাঈদ আল-আশদাককে শাসক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মারওয়ান ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজের ছেলেদের: আব্দুল মালিক এবং আব্দুল আজিজকে একের পর এক ওয়ালি আহাদ নিযুক্ত করেছিলেন।

খালিদ বিন ইয়াজিদ স্বভাবগত ভদ্রতার কারণে চুপ ছিল কিন্তু আমর বিন সাঈদ ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সাহসী মানুষ। সে স্পষ্ট ভাষায় আব্দুল মালিকের কাছে দাবি করল যে সে যেন তার ওয়ালি আহাদ হওয়ার ঘোষণা দেয়। যখন আব্দুল মালিক ভ্রক্ষেপ করল না, তখন সে প্রতিবাদস্বরূপ দামেস্কের দুর্গ দখল করে নিল। এটি ৬৯ হিজরির শেষের দিকের ঘটনা।

আব্দুল মালিক দেখল যে শক্তি প্রয়োগ করলে সমস্যা দীর্ঘায়িত হবে। সে ওয়ালি আহাদ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমর বিন সাঈদকে রাজি করাল, তারপর একদিন সুযোগ বুঝে নিজের প্রাসাদে ডেকে আনল এবং প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করল। [৩]

হত্যা করার আগে আব্দুল মালিক তাকে বলেছিল: “যদি আমার ধারণা হতো যে তুমি জীবিত থেকে আমার আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করবে তবে...”

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/১৩৩, ১৪৭, এই সময়ে মুসআব বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সৈন্য অভিযানের মোকাবিলা করতে গিয়ে শহীদ হন।

[২] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৫/২৬, সন ৬৯ হিজরি।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/১৩০ থেকে ১৪৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১২ থেকে ১২০।

“আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিতাম, কিন্তু কথা হলো এক খোঁয়াড়ে দুই ষাঁড় একত্রিত হতে পারে না, তাদের একজন অন্যজনকে তাড়িয়েই দেয়।” এটি ৭০ হিজরির শুরুর দিকের ঘটনা।

এভাবে উমাইয়া বংশের একজন বড় রাজনীতিবিদ ইতিহাসে কোনো বড় কাজ দেখানোর আগেই আপনজনদের তলোয়ারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে হাজারো আক্ষেপ নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

খুরাসানের অবস্থা:

ইরাকে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত খুরাসানের আমিরদের মধ্যে রক্তপাত চলতে থাকে। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) যখন খলিফা হলেন, তখন খুরাসানের শাসক আবদুল্লাহ বিন খাযিম (রা.) তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর পুরো শাসনামলে আবদুল্লাহ বিন খাযিম (রা.)-ই খুরাসানের আমির ছিলেন।

দক্ষিণ আফগানিস্তানে যাকে সিজিস্তান বলা হতো, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর যুগে আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-এর পুত্র আবদুল আজিজকে সেখানকার ওয়ালি নিযুক্ত করা হয়েছিল। আবদুল আজিজের আগমনের পর মুসলমানরা যারাঞ্জ রণাঙ্গনে রতবিলের মোকাবিলা করে। এই যুদ্ধে রতবিল নিহত হয় এবং অগ্নিপূজকরা পিছু হটে। [৩]

এটি ছিল আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর যুগে খুরাসানের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

□□□

আবদুল মালিক এবং মুসআব বিন জুবাইরের দ্বন্দ্ব

অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করে আবদুল মালিক তাঁর পূর্ণ মনোযোগ বহিঃশত্রু আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এবং তাঁর ভাই মুসআব বিন জুবাইর (রা.)-এর ওপর নিবদ্ধ করেন। আবদুল মালিক জানতেন যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর আসল শক্তি ইরাকে নিহিত, তাই তিনি প্রথমে ইরাকে মুসআব বিন জুবাইর (রা.)-কে পরাজিত করার পরিকল্পনা তৈরি করেন। এজন্য তিনি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রোমানদের সাথে—যাদের আক্রমণের আশঙ্কা সবসময় লেগে থাকত—প্রতি সপ্তাহে এক হাজার দিনার প্রদানের বিনিময়ে সন্ধি করেন। [১]

এই নীতি সাহাবীদের কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তো এমন সময়ে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে মিলে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন, যার ফলে রোমানরা ভীত হয়ে পিছু হটেছিল। এই চুক্তির ব্যাপারে হাফেজ যাহাবী বলেন: “আমি বলি, এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দুর্বলতা যা প্রবেশ করেছিল। যার কারণ ছিল কেবল পারস্পরিক মতভেদ।” [২][৪]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৬২

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৫, ত. আল-হিলাল

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫০

[৪] যাহাবী বলেন: “আমি বলি, এটিই প্রথম দুর্বলতা যা ইসলামে প্রবেশ করেছে, আর তা কেবল মতভেদের কারণেই হয়েছে।” (আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ১/৫৮, ত. আল-ইলমিয়াহ)।

আব্দুল মালিকের ইরাকি আমিরদের সাথে ষড়যন্ত্র:

এখন আব্দুল মালিক মুসআব বিন জুবাইরের জেনারেলদের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। প্রথমে প্রথম সারির আমিরদের—পারস্যের শাসক মুহাল্লাব বিন আবি সুফরাহ, খোরাসানের শাসক আব্দুল্লাহ বিন খাযিম এবং কুফার সেনাপতি ইব্রাহিম বিন মালিককে নিজের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ রাজি হলেন না। [১]

তবুও আব্দুল মালিক জানতেন যে ইরাকিদের স্বভাবে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাধি রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশকেই কেনা সম্ভব। ফলে ৭১ হিজরিতে তিনি তার একজন প্রতিনিধিকে গোপনে বসরায় পাঠিয়ে নিজের জন্য বায়আত গ্রহণের অভিযান শুরু করেন। [২]

মুসআব (রা.) তখন হিজাজে গিয়েছিলেন। [৩] তার অনুপস্থিতিতে বসরার অনেক আমির আব্দুল মালিকের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন, তবে মুসআব বিন জুবাইর (রা.)-এর অনুগত আমিররা সময়মতো এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেন। এদিকে মুসআব (রা.)-ও দ্রুত বসরায় পৌঁছে যান এবং আব্দুল মালিকের প্রতি ঝুঁকে পড়া আমিরদের কঠোর সতর্কবার্তা দেন। [৪]

ইরাকি আমিররা বিক্রি হয়ে গেলেন:

আব্দুল মালিক ইরাকিদের আনুগত্য কেনার চেষ্টায় লিপ্ত থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের অনেককে গোপন চিঠিপত্র ও চুক্তির মাধ্যমে নিজের জালে আটকে ফেললেন। [৫] তাদের মধ্যে কেউ কেউ বংশগতভাবে উমাইয়া ছিলেন এবং কেউ কেউ বনু উমাইয়ার গত শাসনামলে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আব্দুল মালিকের আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি ছাড়াও এই পূর্ব সম্পর্ক এবং গোত্রীয় আত্মীয়তা মুসআব বিন জুবাইর (রা.)-এর প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে মুসআব (রা.)-এর ডান হাত ইব্রাহিম বিন মালিকের কাছেও একটি সিলমোহরকৃত চিঠি এসেছিল। ইব্রাহিম আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ চিঠিটি না পড়েই মুসআব (রা.)-কে পেশ করে দিলেন। এতে ইব্রাহিমকে শাম সরকারের সাথে যোগ দেওয়ার বিনিময়ে ইরাকের গভর্নর করার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। ইব্রাহিম মুসআব (রা.)-কে জানালেন যে আব্দুল মালিক এই ধরনের চিঠি ইরাকের সমস্ত আমিরদের কাছে পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে পরামর্শ দিলেন: “আমার কথা মানলে এই আমিরদের হত্যা করিয়ে দিন।”

মুসআব (রা.) বললেন: “এমনটি করলে এই আমিরদের গোত্রগুলো আমাদের প্রতি অনুগত থাকবে না।”

ইব্রাহিম বললেন: “আচ্ছা, তাহলে অন্তত এই আমিরদের কিসরার সাদা দুর্গে বন্দি করে রাখুন।”

মুসআব (রা.) স্বভাবজাত ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের কারণে এই পদক্ষেপকেও সমীচীন মনে করলেন না, তবে তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতকদের মাঝে ঘেরাও হয়ে পড়েছেন এবং শীঘ্রই কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। [৬]

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৫৭, ৬/১১৭; আনসাবুল আশরাফ: ৭/৮৫, ত. দারুল ফিকর

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৩৫

[৪] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৩; মুসনাদে উমর বিন শাব্বাহ আবু যায়েদ আন আবিল হাসান আল-মাদায়িনী আন মাসলামাহ

[৫] আনসাবুল আশরাফ: ৭/৮৫, ত. দারুল ফিকর

[৬] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৭

৭১ হিজরিতে মুসআব বিন জুবায়ের (রা.)-এর জন্য পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। একদিকে ‘তাউন-ই-জারফ’ (মহামারী) তাদের শক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। অন্যদিকে পারস্যের আজরাকি খারিজিদের মোকাবিলায় তাদের পূর্ব দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। তাদের আমীরদের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল আলাদা এক বিষয়। ঠিক এই সময়ে বাহরাইনে নাজদা বিন আমিরের পরিবর্তে ‘আবু ফুদাইক’ খারিজিদের একটি দলের প্রধান হয়ে ওঠে। মুসআব বিন জুবায়ের (রা.) ইরাকের নাজুক পরিস্থিতির কারণে সেখান থেকে সৈন্য কমিয়ে তাকে দমনের জন্য সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হন, কিন্তু জাওলি ময়দানে তারা পরাজিত হয়। [১] এভাবে মুসআব এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শক্তি এক বড় ও কঠিন ধাক্কা খায়।

আবদুল মালিকের ইরাকের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ:

অবশেষে আবদুল মালিক যখন নিশ্চিত হলেন যে ইরাকি বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসআব (রা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে, তখন তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দামেস্ক থেকে ইরাকের দিকে রওনা হলেন।

পথে আল-জাজিরার শহর ‘কারকিসিয়া’ ছিল যেখানে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সমর্থক জুফার বিন হারিস মোতায়েন ছিলেন। ইরাক রক্ষার জন্য এই শহরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবদুল মালিক চল্লিশ দিনের অবরোধের পর এটি জয় করেন। [২] এবং ৭২ হিজরিতে ইরাকের সীমান্তে তাঁবু ফেলেন। [৩] এটি দজলা নদীর পশ্চিম তীরে ‘সাওয়ার-ই-ইরাক’ এবং তিকরিত জেলার সীমানার মাঝখানে অবস্থিত। এখানেই ‘দাইরুল জালিক’ নামক সেই ঐতিহাসিক ময়দান ছিল যেখানে আবদুল মালিক এবং মুসআব (রা.)-এর মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়েছিল। [৪]

মুসআব (রা.)-ও তার বাহিনী গুছিয়ে বের হলেন এবং ‘বাজুমাইরা’-তে এসে শিবির স্থাপন করলেন। [৫] পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই সময় তার প্রধান সেনাপতি ইব্রাহিম বিন মালিক ছাড়া প্রায় সমস্ত বড় অফিসার ও অনুগতরা আবদুল মালিকের কাছে নিজেদের আনুগত্য বিক্রি করে দিয়েছিল। খোরাসানে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর নায়েব আবদুল্লাহ বিন খাযিম (রা.) যখন এই বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: “মুসআবের সাথে কি উমর বিন আবদুল্লাহ আছেন?” উত্তর এলো: “না, তিনি তো পারস্যে মোতায়েন আছেন।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “তার সাথে কি মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা আছেন?” উত্তর এলো: “না, তিনি তো মোসুলে মোতায়েন আছেন।” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: “তার সাথে কি আব্বাদ বিন হুসাইন আছেন?” উত্তর এলো: “না, তিনি তো বসরায় আছেন।” আবদুল্লাহ বিন খাযিম (রা.) অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন: “আর আমি এখানে খোরাসানে পড়ে আছি।” তারপর তিনি এই কবিতাটি পড়লেন:

خَذِنِي فَجْرِي جُعَادٍ وَأَبْشَرِي ... بِلَحْمِ امْرِئٍ لَمْ يَشْهَدْ الْيَوْمَ نَاصِرُهُ

“আমাকে ধরে নাও এবং টেনে নিয়ে যাও হে জুআদ (ঘৃণ্য নারী)! আর এমন এক ব্যক্তির লাশের সুসংবাদ দাও যার আজ কোনো সাহায্যকারী উপস্থিত নেই।” [৬]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৬৬, ২৬৭।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৭।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৭।

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৭/৩১৮ থেকে ৩১৯।

[৪] আর-রওদুল মিতার, পৃ. ২৫১।

[৬] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৮।

মুসআবের শাহাদাত:

মুসআব বিন যুবাইর (রা.) পাগড়ি বেঁধে তাঁর বাহিনীর সামনে আসলেন, যারা অগ্রসর হওয়ার জন্য দুই সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্য ও অফিসারদের চেহারার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর পুত্র উরওয়াহ (রা.)-এর ওপর পড়ল। তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁর কাছ থেকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা শুনতে লাগলেন। যখন উরওয়াহ (রা.) উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণ করার দাবি এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়াই করার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করলেন, তখন মুসআব (রা.) তাঁর সওয়ারিকে ইশারা করলেন এবং এই কবিতাটি পাঠ করলেন:

إِنَّ الْأُلَىٰ بِالطِّفِّ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ... تَأْسَوْا فَسَنُوا لِلْكَرَامِ النَّاسِيَا

“নিশ্চয়ই তাফ (কারবালা) প্রান্তরে হাশেমী বংশের সেই ব্যক্তির একটি ঐতিহ্য কায়েম করেছেন এবং শরীফদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছেন।”

এটি শুনে উরওয়াহ (রা.) বুঝে গেলেন যে, মুসআব (রা.) পরাজয়ের ক্ষেত্রে পলায়ন করার চেয়ে মৃত্যুকে বেছে নেবেন। [১]

অবশেষে ১৩ই জুমাদাল উলা ৭২ হিজরিতে “দাইরুল জাছালিক”-এর ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ও বেদনাদায়ক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা যুবাইরী খিলাফতের অবসানের পূর্বাভাস ছিল। [২]

আব্দুল মালিক তাঁর বাহিনীর ডানে ও বামে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও খালিদকে নিযুক্ত করেছিলেন; আর অগ্রবর্তী দলের (হারওয়াল) কমান্ড দিয়েছিলেন তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন মারওয়ানকে। [৩]

যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো, তখন মুসআব বিন যুবাইর (রা.) তাঁর সেনাপতি ইবরাহিম বিন মালিক আল-আশতারকে সিরীয় অগ্রবর্তী দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। ইবরাহিম এক জোরালো আক্রমণ চালালেন, যার ফলে মুহাম্মদ বিন মারওয়ানের পা টলে গেল। [৪] এবং সিরীয় সেনাপতি মুসলিম বিন আমর আল-বাহিলী (কুতাইবা বিন মুসলিমের পিতা) সহ অনেক লোক নিহত হলো। কিন্তু অন্যদিকে ইবরাহিম বিন মালিকও জীবিত ফিরে আসার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। মুসআব (রা.)-এর বাকি সেনাপতিরা আগে থেকেই আব্দুল মালিকের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন এবং এটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। সেনাপতি ইবরাহিমের মৃত্যুর সাথে সাথেই ইরাকী অশ্বারোহী দলের নেতা পালিয়ে গেল। এটি দেখে মুসআব (রা.) অন্য এক সেনাপতিকে ডাকলেন: “আবু উসমান! তুমি তোমার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কুফীদের ওপর আক্রমণ করো।”

উত্তর এলো: “আমি কেন অকারণে আমার গোত্রকে হত্যা করাব?”

মুসআব (রা.) অন্য এক সেনাপতিকে বললেন: “তুমি তোমার পতাকা নিয়ে সামনে অগ্রসর হও।”

সে বলল: “আমি কেন ওই নোংরা নাপাক লোকদের কাছে যাব?”

অন্য এক আমীরকে যখন তিনি নির্দেশ দিলেন, তখন সে বলল: “যখন অন্য কেউ নির্দেশ মানছে না, তখন আমি কেন মানব?” [৫]

[১] তারিখু দামেশক: ২৩০/৫৮

[২] তারিখুত তাবারী: ১১২/৬; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৬৩

[৩] তারিখুত তাবারী: ১৫৬/৬

[৪] তারিখুত তাবারী: ১৫৬/৬

[৫] তারিখুত তাবারী: ১৫৭/৬

মুসআব (রা.) বুঝতে পারলেন যে শেষ সময় ঘনি়ে এসেছে এবং তাঁর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন: “হায়! এই সময় যদি ইবরাহিম জীবিত থাকত।”

সেই সময় তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিলেন: “আপনি কোনো দুর্গে অবস্থান নিন এবং মুহান্নাব বিন আবি সুফরাহ-এর মতো অনুগতদের একত্রিত করে পুনরায় প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।”

জবাবে মুসআব (রা.) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অবশিষ্ট সাথীদের নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন:

“তুমি কেন বলছ যে তলোয়ার আমার কাঁধকে ভারী করে দিচ্ছে, অথচ আমি তা নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি।”

“আমি তোমাদের আমৃত্যু রক্ষা করব। আর যে সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করে, তার ওপর কোনো অভিযোগ বা তিরস্কার নেই।”

তারপর তিনি তাঁর পুত্র ঈসাকে বললেন: “তুমি এখনই তোমার সাথীদের নিয়ে তোমার চাচার কাছে মক্কায় চলে যাও এবং তাঁকে আমার সাথে ইরাকিদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর দাও। আমার চিন্তা করো না। আমি তো নিহতই হব।”

ঈসা বললেন: “আপনি বসরায় চলে যান, সেখানে আপনার অনুগতরা রয়েছে। অথবা আপনিও আমিরুল মুমিনীনের কাছে মক্কায় চলুন।”

মুসআব (রা.) বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি কুরাইশদের এই সুযোগ দেব না যে তারা আমাকে সাথীদের ছেড়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার খোঁটা দেবে। আমি লড়াই চালিয়ে যাব। যদি রণক্ষেত্রে তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ যায় তবে তাতে কোনো অপমানের বিষয় নেই। পালিয়ে যাওয়া আমার স্বভাবে নেই, আর যদি তুমিও পালিয়ে যেতে লজ্জা বোধ করো তবে তুমিও গিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।”

ঈসা এ কথা শোনামাত্রই প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হলেন। আব্দুল মালিকের সাথে মুসআব (রা.)-এর পুরনো বন্ধুত্ব ছিল, তাই তিনি তাঁকে জীবিত বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন মারওয়ানকে পাঠিয়ে তাঁকে প্রাণের নিরাপত্তা (আমান) দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। মুসআব (রা.) উত্তর দিলেন: “আমার মতো মানুষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে অথবা পরাজিত হয়ে।” [১]

শত্রু এখন মাথার ওপর পৌঁছে গেছে। মুসআব (রা.) সিংহাসন থেকে নামলেন। তলোয়ার কোষমুক্ত করে নিজের দিকে ধেয়ে আসা শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন এবং দীর্ঘক্ষণ লড়াই করলেন। প্রতিপক্ষ প্রথমে তাঁকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ঝাঁঝরা করে দিল। তারপর মুখতার কাযযাবের এক অনুসারী যায়দাহ বিন কুদামাহ ‘হায় মুখতারের প্রতিশোধ’ বলে তাঁর শরীরে বর্শা বিদ্ধ করে দিল। এক ব্যক্তি তলোয়ার দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করল। [২]

আব্দুল মালিক যখন মুসআব (রা.)-এর নিহত হওয়ার খবর পেলেন, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন: “আমার এবং তাঁর বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীর ও পুরনো ছিল, কিন্তু এই রাজনীতি বড়ই অবিশ্বস্ত জিনিস। মুসআব! তোমার মতো পুত্র আর কোনো মা কোথায় পাবে।” [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৮, ১৫৯

[২] তারিখু দিমাশক: ৫৮/২৩১; তারিখুত তাবারী: ৬/১৫৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১৩০

মুসআব রা.-এর মাথা কেটে আনা ব্যক্তি আব্দুল মালিককে বলল: “হায়! আপনি যদি তাকে বর্শা ও তলোয়ারের সাথে কৌশল পরিবর্তন করে করে ডানে-বামে আক্রমণকারীদের ধরাশায়ী করতে দেখতেন।” এই দৃশ্য দৃষ্টি এবং হৃদয়কে বীরত্ব ও সাহসিকতায় ভরপুর করার জন্য যথেষ্ট ছিল। যখন তার সাথীরা পালিয়ে গেল এবং তাকে ঘেরাওকারীরা সংখ্যায় বেড়ে গেল, তখন তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন:

وَإِنِّي لِأَهْلُ الشَّرِّ بِالشَّرِّ مُرْصِدٌ وَإِنِّي لِدِينِي سَلْمٌ أَذِلُّ مِنَ الْأَرْضِ

“আমি মন্দ লোকদের জন্য মন্দের ওত পেতে থাকি এবং অনুগতদের জন্য মাটির চেয়েও বেশি নরম হয়ে যাই।” [১]

আব্দুল মালিক বললেন: “আল্লাহর কসম! তিনি এমনই ছিলেন।”

কুফার কসর-ই-ইমারত: মাথা প্রদর্শনের স্থান:

এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল মালিক বিন উমাইর বলেন: “আমি জীবনে সবচেয়ে অদ্ভুত এই বিষয়টি দেখেছি যে, একবার আমি কুফার কসর-ই-ইমারতে প্রবেশ করলাম এবং দেখলাম উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ এই সিংহাসনে বসে আছে এবং হযরত হুসাইন বিন আলী রা.-এর কাটা মাথা একটি ঢালে তার সামনে পেশ করা হয়েছে। কিছুকাল পর এই একই জায়গায় এই দৃশ্য দেখলাম যে, মুখতার সাকাফী সিংহাসনে বসে আছে এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের কাটা মাথা তার কাছে আনা হয়েছে। কিছুকাল পর এই ইমারতেই দেখলাম যে, মুখতার সাকাফীর কাটা মাথা মুসআব বিন যুবায়েরের কাছে আনা হয়েছে এবং তারপর এই একই জায়গায় সিংহাসনে আব্দুল মালিককে দেখলাম এবং মুসআব বিন যুবায়েরের মাথা তার সামনে রাখা ছিল।” [২]

শাহাদাতের সময় মুসআব বিন যুবায়ের রা.-এর বয়স ৩৬ বা ৩৫ বছর ছিল। [৩]

তিনি হযরত হুসাইন রা.-এর জামাতা ছিলেন। হযরত হুসাইন রা.-এর কন্যা সাকীনা তার বিবাহে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, দানশীল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ ছিলেন। ইমাম শাবী রহ. বলেন:

“আমি মুসআব রহ.-এর চেয়ে বড় কোনো শাসক দেখিনি যার শাসনামলে বিশৃঙ্খলার মধ্যেও উন্নত ঐক্যবদ্ধ হতে পারত। তিনি অধস্তন কর্মকর্তাদের প্রিয় ছিলেন। দানশীলতার জায়গায় দানশীলতা এবং কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা অবলম্বনকারী ছিলেন।” [৪]

মুসআব বিন যুবায়ের রা.-এর পরাজয়ের কারণ:

মুসআব বিন যুবায়ের রা.-এর পরাজয়ের প্রধান কারণগুলো ছিল:

- তার সেরা সেনাপতিরা অনেক দূরে মোতায়েন ছিল, যখন অল্প সাহসী এবং বিশ্বাসঘাতক আমীররা তাকে ঘিরে রেখেছিল।
- মুসআব রা. বীরত্ব ও আত্মমর্যাদায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন কিন্তু রাজনীতি, কূটকৌশল এবং পরিকল্পনায় দক্ষ ছিলেন না। পুরো বাহিনীতে ইব্রাহিম বিন মালিক আশতারই এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি যুদ্ধের ময়দানে পারদর্শী ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় শহীদ হন। অন্যদিকে আব্দুল মালিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ষড়যন্ত্রকারী ও চতুর মানুষ ছিলেন, রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যা উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন, তাই তিনি বিজয়ী হন।

[১] তারিখ বাগদাদ: ১৩/১০৭, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ

[২] তারিখ দামেস্ক: ৫৮/২৩৩, ৭৩৫

[৩] তারিখ দামেস্ক: ৫৮/২৫০

[৪] তারিখ দামেস্ক: ৫৮/২৩৯

৩. মুসআব (রা.) পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন না, তবুও তিনি কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে চূড়ান্ত লড়াই করার মতো করে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে খারেজীদের সাথে যুদ্ধের কারণে বাহিনীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, দক্ষ অফিসাররা দূরে ছিলেন এবং বর্তমান অফিসাররা শত্রুর সাথে আঁতাত করে রেখেছিলেন। এই অবস্থায় বিচক্ষণতা ছিল কুফা ত্যাগ না করা এবং পারস্য ও খোরাসান থেকে দক্ষ সেনাপতি ও বাহিনী না আসা পর্যন্ত চূড়ান্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখা।

৪. কেন্দ্র থেকে কোনো সাহায্য আসেনি। যদি হিজাজ থেকে সাহায্য আসত, তবে সিরীয় বাহিনীকে উভয় দিক থেকে ঘিরে ফেলা যেত।

৫. মুখতার কাজ্জাবের অনুসারী সামরিক অফিসাররা মুসআব (রা.)-এর সাথে ছিলেন কিন্তু তারা নিজেদের বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই লোকেরা বিদ্রোহে এবং মুসআবকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও শরিক ছিল।

বিজয়ের পর ইরাকে আব্দুল মালিকের নতুন ব্যবস্থা:

এই বিজয়ের পর আব্দুল মালিক কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পুরো ইরাক ও পারস্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন এবং সেখানে নিজের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি কুফায় তার ভাই বিশর বিন মারওয়ানকে এবং বসরায় খালিদ বিন আব্দুল্লাহকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। পারস্যে আজরাকী খারেজীদের সাথে যুদ্ধরত মুহালাব বিন আবি সুফরা (রা.) নীরবে এই নতুন সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। আব্দুল মালিক বিচক্ষণতার সাথে তাকে এই ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে আহওয়াজে নিযুক্ত করেন। [২]

তবে খোরাসানের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন খাযিম (রা.) আব্দুল মালিকের বায়আত গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করেন। আব্দুল মালিক কোনো বিলম্ব ছাড়াই খোরাসানের নায়েব বুকাইর বিন উইশামকে খোরাসানের শাসনের লোভ দেখিয়ে সেখানে বিদ্রোহ উসকে দেন। যার ফলে আব্দুল্লাহ বিন খাযিম মার্ভের কাছে এই বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হন। এভাবে খোরাসানও আব্দুল মালিকের অধীনে চলে আসে। [১]

মুসআব (রা.)-এর শাহাদাতে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর ঐতিহাসিক খুতবা:

মুসআব বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের খবর যখন আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি খুতবা দেওয়ার জন্য মিসরে আরোহণ করলেন। তার চেহায়ায় গভীর দুঃখ ও বেদনার ছাপ ছিল এবং কপাল ঘর্মাক্ত ছিল। তিনি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন, তারপর বললেন:

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যাঁর হাতে সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব। যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। তিনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে চান রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। তিনি যাকে চান সম্মানিত করেন এবং যাকে চান লাঞ্ছিত করেন। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে লোকসকল! মনে রেখো, যে হকের ওপর আছে সে কখনো লাঞ্ছিত হতে পারে না, যদিও সে একা হয়। আর শয়তানের সাথীদের আল্লাহ তাআলা কখনো সম্মান দান করেন না, যদিও সব মানুষ তাদের সমর্থক হয়ে যায়। আমাদের কাছে ইরাক থেকে এমন খবর এসেছে যা আমাদের ব্যথিতও করেছে আবার আনন্দিতও করেছে। হ্যাঁ, মুসআব বিন জুবায়েরের শাহাদাতের খবর... তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। যে বিষয়টি আমাদের ব্যথিত করেছে তা হলো একটি...”

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৬৮

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৬/১৭৭

কিন্তু বন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যার বিচ্ছেদে দুঃখ হয়, তবে বুদ্ধিমান মানুষ এরপর সবরের আশ্রয় নেয়। যে বিষয়টি আমাদের আনন্দিত করেছে তা হলো আমরা জানি যে মুসআবের মৃত্যু শাহাদাত। এতে তার জন্য এবং আমাদের জন্য আল্লাহ কল্যাণ রেখেছেন।

শুনে রাখো! ইরাকিরা যারা নিফাক ও গাদ্দারিতে অভ্যস্ত, তারা তাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছে বরং একটি উটের দামের চেয়েও কমে বিক্রি করে দিয়েছে। অতঃপর মুসআব শহীদ হয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি শহীদ হয়েছেন তো কী হয়েছে? তার পিতা (যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.), তার ভাই, চাচা, মামা সবাই তো শহীদই হয়েছিলেন। এরা সবাই সর্বোত্তম নেককার লোক ছিলেন। আজ যদি মুসআবের শাহাদাত আমাকে ব্যথিত করে থাকে, তবে এর আগে হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাত নিজের চোখের সামনে দেখার শোকও আমি সহ্য করেছি। নিজের পিতা যুবাইর রা.-এর শাহাদাতের ঘটনাও দেখেছি। মুসআব আমার তরুণ সাথীদের মধ্যে একজন ছিল।

একথা বলতে বলতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন:

“আল্লাহর কসম! আমরা আকস্মিক মৃত্যু বরণকারী লোক নই। আমরা তো লড়াই করে বর্ষার আঘাতে নিহত হই এবং তলোয়ারের ছায়াতলে মৃত্যুবরণ করি। মনে রেখো! দুনিয়া এমন এক বাদশাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ধারের বস্তু যার বাদশাহির কোনো পতন নেই। সুতরাং দুনিয়া যদি আমার কাছে আসে তবে আমি তা কোনো দুষ্ট অহংকারী ব্যক্তির মতো গ্রহণ করব না, আর যদি তা আমার হাত থেকে চলে যায় তবে আমি কোনো নির্বোধ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তির মতো তার জন্য বিলাপ করব না।” [১]

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এরপর একজন আনসারীর মাধ্যমে ইরাকবাসীদের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদের পুনরায় খেলাফতের কেন্দ্রের আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু সেখানে আবদুল মালিকের গভর্নর বিশর ইবনে মারওয়ান তা জানতে পেরে সেই আনসারীকে ধরে হত্যা করে ফেলল। [২]

[১] তারিখ দামেশক: ৫৮/ ২৩৬ থেকে ২৩৮

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৭/ ১৩৮, ত. দারুল ফিকর

হিজাজে আব্দুল মালিকের হস্তক্ষেপ

মুসআব বিন জুবায়ের (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড কেবল ইরাক নয়, বরং হিজাজ থেকেও জুবায়েরী খিলাফতের পতনের পূর্বাভাস হিসেবে প্রমাণিত হলো। মদিনা মুনাওয়ারার ওপর বনু মারওয়ানের সেনাপতি তারিক বিন আমরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, যিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর প্রতিনিধি তালহা বিন আব্দুল্লাহকে সেখান থেকে বের করে দিলেন। [১]

আব্দুল মালিকের জন্য এখন পথ একদম পরিষ্কার ছিল। ইরাক দখলের পর দামেস্কে ফিরে এসেই তিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্য অভিযানের জন্য শামের আমিরদের উৎসাহিত করলেন। তবে হারাম শরীফের পবিত্রতার কথা চিন্তা করে অধিকাংশ আমির এই অভিযান থেকে বিরত থাকতে চাইলেন। [২]

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আবির্ভাব:

আব্দুল মালিকের তুণে একটি নতুন ও কঠোর তীর মজুদ ছিল। তিনি ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। ৩২ বছর বয়সী এক সুঠাম যুবক যার প্রকৃতিতে কঠোরতা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের বছর ৪০ হিজরিতে তায়েফে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [৩] তিনি বনু সাকিফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরআন মাজীদেবর ক্বারী হওয়ার পাশাপাশি হাদীস সম্পর্কেও কিছুটা অবগত ছিলেন। বাগ্মিতা ও যুদ্ধবিদ্যায় তিনি অনন্য ছিলেন। তবে তার মধ্যে এমন দুটি ত্রুটি ছিল যা তার সমস্ত গুণের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল: একটি হলো হযরত উসমান (রা.)-এর মহব্বত ও সমর্থনে তিনি চরমপন্থী মানসিকতা পোষণ করতেন। যদি ভুলবশত কোনো প্রবীণ সাহাবীর ব্যাপারেও তার সন্দেহ হতো যে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে বিরত ছিলেন, তবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে চরম রাগান্বিত হয়ে যেতেন।

দ্বিতীয় ত্রুটিটি ছিল এই যে, তিনি সরকারি আদেশকে হুবহু দীন ও ঈমানের মতো পালন করতেন, এর অবাধ্যতাকে কুফর মনে করতেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতেন। যদি এর কবলে কোনো বড় থেকে বড় মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বও আসতেন, তবে তিনি তাতে কোনো দ্বিধাবোধ করতেন না। এটি প্রায় সেই একই চরিত্র ছিল যা এর আগে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ ইয়াজিদ ও মারওয়ানের আনুগত্যের ঋণ শোধ করার জন্য প্রদর্শন করেছিলেন। আব্দুল মালিক উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের স্থলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পেয়ে গেলেন যিনি তার চেয়েও অনেক বেশি নিষ্ঠুর ছিলেন।

হাজ্জাজ একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার পূর্বপুরুষরা শ্রমিক পেশার ছিলেন যারা পাথর বহন করতেন, মাটি টানতেন এবং কুয়া খনন করতেন। [৪] তিনি এবং তার পিতা তায়েফে শিশুদের পড়াতে। [৫] কিছু আরব কবির কালাম থেকে জানা যায়...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২২৮

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/১৬৩

[৩] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৩/১৭৮

[৪] আল-আখবার আত-তিওয়াল, পৃ. ৩৩৩

[৫] আল-ইকদুল ফারিদ: ৫/৪৫৫, ত. আল-ইলমিয়াহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

জানা যায় যে, হাজ্জাজ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের পড়াতেন। সে সময় তার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। [১]

অবশেষে তার পিতা তাকে নিয়ে দামেস্কে চলে আসেন এবং উভয়ে মারওয়ান বিন আল-হাকামের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। রমজান ৬৫ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে দামেস্ক থেকে আসা সেনাবাহিনীতে হাজ্জাজ ও তার পিতা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পরাজয়ের পর কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছিলেন। [২]

হাজ্জাজের মেজাজ সম্পর্কে একটি ঘটনা থেকে ধারণা করা যায় যা হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

“মিসরের কাজি সুলাইম বিন আত্র (রহ.) অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ ও মুত্তাকি মানুষ ছিলেন। তিনি হাজ্জাজের পিতার কাছে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি তাকে এই পদ থেকে অপসারিত করার ব্যবস্থা করেন। হাজ্জাজের পিতার কাছে কাজি সাহেবের এই পরহেজগারি এবং পদের প্রতি অনীহা ভালো লাগে এবং তিনি তার ছেলের কাছে প্রশংসার ছলে তার কথা উল্লেখ করেন। হাজ্জাজ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল: ‘এমন লোক আমাদের সরকারের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এদের দেখে মানুষ আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-কে স্মরণ করে, তাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, তারপর শাসকের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয় এবং বিদ্রোহ করে। আল্লাহর কসম! আমি ক্ষমতা পেলে এই কাজি এবং তার মতো লোকদের হত্যা করে ছাড়ব।’ পিতা বললেন: ‘বৎস! মনে হয় আল্লাহ তোমাকে হতভাগ্য হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন।’”

হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: “তার পিতার ধারণা একদম সঠিক ছিল।” [৩]

আব্দুল মালিক যখন ক্ষমতায় বসেন, তখন তার উজির রাউহ বিন জিনবা-এর সুপারিশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় যেন তিনি সেনাবাহিনীর যাত্রার সময় সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করেন। হাজ্জাজ এই কাজ হাতে নিয়ে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী রাউহ বিন জিনবা-কেও ছাড় দেননি। যখন দেখলেন যে সেনাবাহিনীর যাত্রার সময় হওয়া সত্ত্বেও রাউহ বিন জিনবা-এর তাঁবুতে দস্তরখান বিছানো রয়েছে, তখন তিনি ভোজনরত লোকদের চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করেন এবং তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেন। রাউহ বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে ফরিয়াদ করেন। আব্দুল মালিক হাজ্জাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বলেন: “এটি আমি করিনি। আমার হাত আপনার হাত। আমার চাবুক আপনার চাবুক। আপনি রাউহকে একটি তাঁবুর বদলে দুটি তাঁবু দিয়ে দিন, কিন্তু যে কাজের দায়িত্ব আপনি আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তা করার ক্ষেত্রে আমাকে বাধা দেবেন না।” [৪]

সেদিন থেকেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আব্দুল মালিকের নজরে আসেন। আব্দুল মালিকের অভিজ্ঞ চোখ বুঝে নিয়েছিল যে, কঠিনতম পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে এবং অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের নতি স্বীকার করাতে হাজ্জাজ অত্যন্ত কার্যকর হবে।

যখন আব্দুল মালিক দরবারে জিজ্ঞাসা করছিলেন: “তোমাদের মধ্যে কে ইবনে জুবায়েরকে মোকাবিলা করবে?” সে সময় সিরিয়ার বড় বড় আমিররা ইতস্তত করছিলেন, তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বললেন: “আমিরুল মুমিনিন! এই কাজের জন্য আমি প্রস্তুত।”

[১] জনৈক কবি বলেছেন: সেই সময়টি ছিল যখন সে খচ্চরের পিঠে চড়ে... গ্রামের শিশুদের সকাল-সন্ধ্যায় পড়াত। (আল-ইকদুল ফারিদ: ৫/২৭৫; দিওয়ানুল হামাসাহ, পৃ. ২৩৫)

[২] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৫/৩৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩১১

[৪] আল-ইকদুল ফারিদ: ৫/২৭৬, তাবা ইলমিয়াহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আবদুল মালিক তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে পুনরায় ডাকলেন। হাজ্জাজ পুনরায় নিজেকে পেশ করলেন এবং সাথে সাথে বললেন: “আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি ইবনে জুবায়েরের চামড়া ছাড়িয়ে নিজে পরিধান করেছি।” এটি শুনে আবদুল মালিক এই অভিযান তারই ওপর ন্যস্ত করলেন। [১]

আবদুল মালিক প্রথমে মক্কাবাসীদের সংবাদ পাঠালেন যে তারা যদি অস্ত্র ত্যাগ করে তবে তাদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। এরপর হাজ্জাজ দুই হাজার লোক নিয়ে ৭২ হিজরির জমাদিউল আখিরাহ-এর শেষ দিকে যাত্রা শুরু করেন এবং আবদুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী মদিনা ও মক্কার প্রধান সড়ক ছেড়ে ইরাকের পথ ঘুরে শাবান মাসে তায়েফে পৌঁছান, যেখানে বনু সাকিফ গোত্র তার সাহায্যের জন্য উপস্থিত ছিল। হাজ্জাজ এখান থেকে একের পর এক অশ্বারোহী দল মক্কার দিকে পাঠাতে থাকেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সমর্থকরা মোকাবিলার জন্য বের হতে থাকেন। এই সংঘর্ষগুলোতে হাজ্জাজের সৈন্যরা বিজয়ী হতো এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথীরা পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।

অবশেষে হাজ্জাজ আবদুল মালিককে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সামরিক শক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার সুসংবাদ দিয়ে অবরোধের অনুমতি এবং অতিরিক্ত সৈন্য তলব করেন। আবদুল মালিক ইতিবাচক উত্তর দেন এবং মদিনার গভর্নরের কাছে পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেন। ৭২ হিজরির শাওয়াল মাসে হাজ্জাজ তার বাহিনী নিয়ে তায়েফ থেকে বের হন এবং জিলকদ মাসে মক্কা অবরোধ করেন। [২]

মক্কা অবরোধ:

সিরিয়াবাসীদের জনশক্তির কোনো অভাব ছিল না, সাহায্যও আসছিল। খাদ্য ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত মজবুত। মক্কা থেকে মদিনা এবং সেখান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সাপ্লাই লাইন সচল ছিল। অন্যদিকে মক্কাবাসীদের সংখ্যাও কম ছিল এবং তাদের কাছে শস্যের মজুদও ছিল সীমিত। হাজ্জাজ অবরোধ দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিলেন যাতে শহরের মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আত্মসমর্পণ করে। [৩]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) তার সাথীদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন যেকোনো মূল্যে জাবালে আবু কুবাইস এবং জাবালে কুয়াইকিয়ান রক্ষা করে এবং শত্রুকে তা দখল করতে না দেয়। তিনি (রা.) বলেছিলেন: “যতক্ষণ তোমরা তাদের এই পাহাড়গুলো দখল করতে না দেবে, ততক্ষণ তোমরাই শ্রেষ্ঠ থাকবে।” [৪] কিন্তু মক্কাবাসীদের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। হাজ্জাজের বাহিনী তাদের পিছু হটিয়ে অবশেষে এই উভয় পাহাড়ে পা রাখতে সক্ষম হয়। এখন মিনজানিক দিয়ে মক্কা উপত্যকায় পাথর বর্ষণ শুরু হলো। এরই মধ্যে হজের দিনগুলো ঘনিয়ে এল এবং হাজিরা মক্কায় সমবেত হতে শুরু করলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-ও ছিলেন, যিনি এই পরিস্থিতিতেও হজ স্ফুর্তি করেছিলেন। [৫]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার সাথীরা হাজিদের মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং তাওয়াফ করার সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু মিনজানিকের পাথর বর্ষণ কাবার চারপাশের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। হাজিদের মধ্যে জাবির বিন আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ খুদরি, সালামা বিন আকওয়া এবং রাফে বিন খাদিজ (রা.)-এর মতো মদিনার সাহাবিগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে কথা বলেন।

[১] আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি: ১৩/৯২ হাসান সনদসহ; আখবারু মক্কা লিল-ফাকিহি: ২/৩৩৭; তারিখু দামেশক: ৩৩/৩৮

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/১৭৪, ১৭৫

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/২৭৮

[৪] মুস্তাদরাকে হাকিম, হা: ৬৩৩৯; আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি: ১৩/৯২ হাসান সনদসহ

[৫] আল-জামে লি-ইবনে ওয়াহাব, হা: ১৩২, দারুল ওয়াফা

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

আলোচনা করে পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করার আবেদন করা হলো যাতে হাজীরা হজের কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন। [১] আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও জোরালো সুপারিশ করলেন। হাজ্জাজ এই কথা মেনে নিল। [২] তবে যুদ্ধরত পক্ষগুলো নিজ নিজ সীমানায় অন্যকে প্রবেশ করতে দেয়নি। হাজ্জাজ ও তার সঙ্গীরা তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারেনি। অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা প্রতিপক্ষের অবরোধের কারণে আরাফাতে যেতে পারেননি। [৩]

হজের জন্য আসা অনেক বেদুইন সশস্ত্র ছিল এবং মক্কার প্রতিরক্ষার জন্য অবস্থান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হতো তা সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না; তাই আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এদিকে হজের কার্যাদি সম্পন্ন হওয়া মাত্রই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে, মানুষ যেন অবিলম্বে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়, হারামের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু হতে যাচ্ছে। [৪]

হাজীরা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই জাবালে আবু কুবাইস এবং জাবালে কুআইকিআন-এ স্থাপিত শামবাসীদের পাঁচটি মানজানিক চলতে শুরু করল এবং কাবার চত্বর সেগুলোর আওতায় চলে এল যেখানে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার অনুগত সঙ্গীরা অবস্থান করছিলেন। এই মানজানিকগুলো চালানোর জন্য হাবশা থেকে লোক আনা হয়েছিল। [৫]

নতুন হিজরি সন ৭৩ হিজরি শুরু হওয়ার সময়ও এই যুদ্ধ চলছিল। একদিন পাথর নিক্ষেপ চলাকালে হঠাৎ মেঘ ছেয়ে গেল, গর্জন ও চমকসহ বিদ্যুৎ এমন জোরে চমকাল যে পাথর নিক্ষেপের শব্দ দমে গেল। রাজকীয় সৈন্যরা ভয় পেয়ে মানজানিকগুলো বন্ধ করে দিল। হাজ্জাজ এটি দেখে দ্রুত এল এবং নিজে পাথর তুলে মানজানিকে রাখল এবং ধমক দিয়ে পাথর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিল। এই সময়ে একের পর এক দুইবার আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ভয়াবহ গর্জনের সাথে পড়ল যার ফলে বারোজন রাজকীয় সৈন্য পুড়ে মারা গেল। পুরো বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে এটি আসমানি আজাব। হাজ্জাজ বলল: ‘ভয় পেয়ো না, এগুলো তিহামার বিদ্যুৎ। এখন বিজয় নিকটবর্তী।’ পরের দিন বিদ্যুৎ পড়ার কারণে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গীদেরও প্রাণহানি ঘটল যার ফলে শামবাসীদের ভয় দূর হয়ে গেল এবং তারা আরও প্রবলভাবে আক্রমণ করতে শুরু করল। [৬]

once বিদ্যুৎ পড়ার কারণে একটি মানজানিক কয়লা হয়ে গেল। সৈন্যরা ভয় পেলে হাজ্জাজ বলল: ‘এটি তো কবুল হওয়ার লক্ষণ। পূর্ববর্তী উম্মতদের কোরবানি এভাবেই কবুল হতো যে আগুন এসে সেগুলোকে পুড়িয়ে দিত।’ এটি শুনে সৈন্যরা আশ্বস্ত হলো। [৭]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এই পাথর নিক্ষেপের সময় পূর্ণ প্রশান্তির সাথে কাবার চত্বরেই সালাত আদায় করতেন। পাথর...

[১] আখবার মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৩৭৩

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৪/১১৯, ত. দারুল ফিকর

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/১৬৫; আনসাবুল আশরাফ: ৪/১১৯, ত. দারুল ফিকর

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৪/১১৯, ত. দারুল ফিকর

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/১৭৮

[৬] তারিখুত তাবারী: ৬/১৮৭

[৭] আনসাবুল আশরাফ লিল বালাজুরি: ৪/১২২, ১২৩, ত. দারুল ফিকর

সেগুলো তাঁর আশেপাশে এসে পড়ত কিন্তু তিনি সেগুলোর বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। [১]

মসজিদুল হারামের দিকে নেমে আসা পথগুলোতে শামী সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। হাবশার কিছু লোক আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সাথে ছিলেন। তাঁরা এমনভাবে বর্শা নিক্ষেপ করতেন যে লক্ষ্য কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। তাঁরা তলোয়ার চালনায় পারদর্শী ছিলেন না। যখন সংঘর্ষ হতো, তখন ইবনে জুবাইর (রা.) নিজেই তলোয়ারধারীদের সাথে নিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতেন। এরপর হাবশীরা পলায়নরত শত্রুদের বর্শার লক্ষ্যবস্তু বানাতেন। [২]

শামী বাহিনীর কাছে দামেস্ক থেকে ছাতু, আটা এবং বিস্কুটের রসদ অনবরত আসছিল। [৩] এর পাশাপাশি শামীরা অপেক্ষায় ছিল যে কখন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর গুদামে গম, যব এবং খেজুরের মজুদ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য বণ্টন করছিলেন। আপনি বলতেন: “যতক্ষণ খাদ্য অবশিষ্ট আছে, আমাদের সাথীদের মনোবল অটুট থাকবে।” [৪]

অবরুদ্ধদের অনাহারের শিকার হওয়া:

অবশেষে অবরোধের তীব্রতা প্রভাব দেখাতে শুরু করল। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সাথীরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লেন। খাদ্যের মজুদ শেষ হয়ে গেল। জমজমের পানি ছাড়া তাঁদের জন্য আর কিছুই ছিল না। [৫]

মানুষ সওয়ারি এবং মালবাহী পশু জবাই করে খেতে শুরু করল। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর কাছে একটি ঘোড়া অবশিষ্ট ছিল যা যুদ্ধের সময় দ্রুত চলাফেরা এবং পরিখা পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাথীদের অনাহার দেখে একদিন সেটিও জবাই করতে হলো। যখন কিছুই অবশিষ্ট রইল না, তখন মৃত পশু খাওয়ার উপক্রম হলো। [৬]

عبدالله بن زبير (রা.) যুদ্ধাবস্থাতেও আদর্শের ব্যাপারে এতটাই অটল ছিলেন যে, আপনাকে বারবার বলা হয়েছিল প্রতিপক্ষের ওপর অতর্কিত নৈশ হামলা চালাতে, কিন্তু আপনি বলতেন: “নৈশ হামলা সঠিক নয়। আমরা একে হালাল মনে করি না।” [৭]

যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে এখন বিজয়ের কোনো আশা অবশিষ্ট ছিল না, তাই তাঁর অধিকাংশ সাথী প্রাণ বাঁচানোর উপায় নিয়ে চিন্তা শুরু করলেন। কেউ কেউ মক্কা থেকে গোপনে অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আপনি বললেন: “তখন তো আমি ইসলামী ইতিহাসের নিকৃষ্টতম নেতা হিসেবে গণ্য হব, যে জাতিকে যুদ্ধে লিপ্ত করল, আর যখন তারা নিহত হলো তখন তাদের লাশ ফেলে নিজে পালিয়ে গেল।”

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২১, ত. দারুল ফিকর

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২০, ১১৯, ত. দারুল ফিকর

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৮, ত. দারুল ফিকর

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২১... এই কারণেই আপনি পুরো ছয় মাস পর্যন্ত শামী বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। আপনার এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপকে আপনার বিরোধী বর্ণনাকারীরা একটি খোটা হিসেবে প্রচার করে দিয়েছে এবং এই কথা ছড়িয়েছে যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর অত্যন্ত লোভী, কৃপণ, সংকীর্ণমনা এবং নিচ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, যিনি নিজের লোকদেরও পেট ভরে খাওয়ানোর পরিবর্তে কয়েক লোকমার জন্য তৃষ্ণার্ত রাখতেন। ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে আমরা এমন অনেক বর্ণনা দেখতে পাব যা সনদের দিক থেকে দুর্বল এবং মতন বা পাঠের দিক থেকে বানোয়াট।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/১৭৮

[৬] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২১, ১২০, ত. দারুল ফিকর

[৭] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৬, ত. দারুল ফিকর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - ২য় খণ্ড

কেউ পরামর্শ দিলেন যে আপনি কাবার ভেতরে প্রবেশ করুন। তিনি বললেন: “কাবার ভেতরের অংশ হাজ্জাজের কাছে বাইরের অংশের মতোই। আমি চাই না গর্তে লুকিয়ে থাকা শিয়ালের মতো ধরা পড়তে। আমি তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে করতে মরব।”

তঁার এক ভাই হামজা বললেন: “আপনি কাবার ছাদে উঠে যান, আমরা নিচে আপনার চারপাশে পতঙ্গের মতো লড়াই করে আপনার আগে প্রাণ দিয়ে দেব।” জবাবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এই কবিতাটি পাঠ করলেন:

فَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسَبَّةٍ وَلَا مُرْتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلْمًا

“আমি কোনো অপমানের বিনিময়ে জীবন ক্রয় করব না এবং মৃত্যুর ভয়ে কোনো সিঁড়িতে আরোহণ করব না।” [১]

বাঁচার সহজ ও সর্বোত্তম উপায় ছিল শত্রুর সাথে আলোচনা করা, কিন্তু যখন আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এই পরামর্শ দেওয়া হলো, তখন তিনি কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রকৃতপক্ষে আলোচনার ফলাফল হতো আবদুল মালিকের বিদ্রোহী সরকারকে মেনে নেওয়া। তঁার কাছে এই বিষয়টি ছিল অকল্পনীয়, কারণ তঁার এ পর্যন্ত সংগ্রামের মূল লক্ষ্যই ছিল এই ধরনের শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো। তাছাড়া আবদুল মালিক একটি শরয়ি খিলাফতকে সংকুচিত করে অপরাধী হয়েছিল। তার সামনে মাথা নত করে তার সরকারকে কেন বৈধতা দেওয়া হবে? এর পরিবর্তে তিনি নিজের প্রাণ দিয়ে ভুলকারীদের কিয়ামত পর্যন্ত ভুলকারী হিসেবেই ইতিহাসের অংশ করে রাখা পছন্দ করতেন। তাই যখন কেউ তাঁকে সন্ধির পরামর্শ দিল এবং বলল যে বিনিময়ে হাজ্জাজ আপনাকে কোনো শহরের শাসনভার দিয়ে দেবে, তখন তিনি বললেন: “আমি কেন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো সম্মানের মৃত্যু বরণ করব না?” [২]

দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, সিরিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে তঁার বিশেষ সঙ্গীদের প্রাণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ওপর তঁার আস্থা ছিল না। তঁার ধারণা ছিল যে প্রতিপক্ষ কাবু করার পর অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে। তাই তিনি বললেন:

“আল্লাহর কসম! যদি এই লোকেরা তোমাদের কাবার কোলেও পায়, তবুও তারা জবেহ না করে ছাড়বে না।” [৩]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একা হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ:

অবরোধের এখন সাড়ে ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। মক্কাবাসী আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন এবং তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে তিনি সত্যের ওপর আছেন। বিষয়টিও এমনই ছিল যে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন শরয়ি খলিফা, যাঁর বিপরীতে আবদুল মালিক এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিদ্রোহীদের অবস্থানে ছিল। তাই মক্কাবাসী কয়েক মাস ধরে চরম কষ্ট সহ্য করেও বীরত্বের সাথে শহর রক্ষা করে আসছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা ক্ষত, অনাহার এবং ক্লান্তিতে নিরুপায় হওয়ার পাশাপাশি প্রতিরোধে কোনো সাফল্যের ব্যাপারে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন নিজেদের পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিলেন। এদিকে হাজ্জাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছিল:

“হে লোকসকল! কেন নিজেদের ধ্বংস করছ? যে অবরোধ থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে আসবে, সে নিরাপদ।” [৪]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৪১৭ এবং তাবারানি এই সাক্ষাতের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, আল-মু'জামুল কাবীর: ১৩/৯২ হাসান সনদে।

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৪১৭, তাবা দারুল ফিকর।

[৩] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৩/৯২, তাবা হাসান সনদে, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৭৮।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৬/১৮৮, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৭৯, তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৫/৩৩৫।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) প্রাণ বাঁচানোর জন্য শরয়ী অবকাশকে স্বীকার করতেন। তিনি তাঁর সাথীদের অনুমতি দিয়েছিলেন যে, যে চায় সে হাজ্জাজের কাছে থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তার কাছে চলে যেতে পারে। যখন তাঁর সাথীরা আবদুল্লাহ বিন যুবাইরকে বললেন: “আপনি পছন্দ করলে আমরা কি আপনার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে নেব?”

তিনি বললেন: “তোমরা চাইলে নিজেদের জন্য নিরাপত্তা লাভ করো, আমার এর প্রয়োজন নেই।”

তাঁর ছেলে যুবাইর তাঁর সাথেই অটল ছিলেন। তিনি তাকেও বললেন:

“বৎস! তুমিও চলে যাও, তোমার বেঁচে থাকা আমার কাছে তোমার নিহত হওয়ার চেয়ে বেশি প্রিয়।”

কিন্তু যুবাইর বললেন: “আমি যদি আপনার ওপর আপতিত বিপদে শরিক না হয়ে আপনাকে একা ফেলে চলে যাই, তবে আমার চেয়ে মন্দ আর কে হবে।” [১]

যা-ই হোক, অধিকাংশ মানুষ নিরুপায় হয়ে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান ছেড়ে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন নিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে যেতে শুরু করল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মক্কার সাধারণ নাগরিক এবং বাকিরা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর সৈন্য ও অফিসার। এভাবে প্রায় দশ হাজার লোক যুদ্ধের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে এল। শেষ দিনগুলোতে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর দুই সাহেবজাদা হামজা ও খুবাইবও বেরিয়ে এলেন। হাজ্জাজ সবাইকে প্রাণের নিরাপত্তা দিল। [২]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) কি ভুলের ওপর ছিলেন নাকি সংকল্পের (আযীমত) ওপর?

কিছু লোক বলে থাকে যে, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) শরয়ী ও নৈতিক দিক থেকে ভুলের ওপর ছিলেন। এই যুদ্ধ ছিল কেবল তাঁর ব্যক্তিগত রায় এবং একটি বিচ্ছিন্ন মতের ওপর অটল থাকার কারণে। তিনি যদি ভুলের ওপর না থাকতেন, তবে তাঁকে একা দেখা যেত না; অন্তত তাঁর ছেলেরা অবশ্যই তাঁর সাথে থাকত।

অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সত্যের পথে কুরবানি দিতে গিয়ে কখনো কখনো পরীক্ষা এত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, অধিকাংশ মানুষ সংকল্পের (আযীমত) মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে না এবং অবকাশের (রুখসত) ওপর আমল করে। কেবল হাতেগোনা কিছু ব্যক্তিই মান-সম্মান ও প্রাণের পরোয়া না করে নিজেদের অবস্থানে অটল থাকেন। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ছিলেন সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের একজন, যাঁদের অবস্থানের সত্যতা সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও স্পষ্ট ছিল। তাঁর সঙ্গ ত্যাগকারীরা নিজেদের জায়গায় অপারগ ছিল যে, তারা সামনে মৃত্যু দেখছিল এবং তাদের কাছে আরও প্রতিরোধের অর্থ ছিল কেবল নিহত হওয়া। এজন্য প্রথমে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) নিজেই তাদের উৎসাহিত করে তাদের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন তারা মানল না, তখন তারা নিজেদের ইচ্ছায় চলে গেল। সম্ভবত তারা আশা করেছিল যে, তিনি একেবারে একা হয়ে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) হয়তো অস্ত্র সমর্পণ করবেন; কিন্তু এমনটি হয়নি। কারণ তিনি ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নাতি এবং আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ভাগ্নে, যিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করতে জানতেন না।

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৩৯৭, দারুল ফিকর।

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/১৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৭৯; তারিখুল ইসলাম লিখ-যাহাবী: ৫/৩৩৫।

শাহাদাতের প্রস্তুতি:

দূরদর্শী নেতা আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) যুদ্ধের ফলাফল এবং নিজের পরিণাম জানতেন। পরিণামদর্শিতার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর এ বিশ্বাসও ছিল যে শত্রু কেবল হত্যার ওপরই ক্ষান্ত হবে না, বরং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য লাশের প্রদর্শনীও করবে। [১]

সোমবার ১৭ জমাদিউল আউয়াল ৭৩ হিজরিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দম ভাঙতে দেখেছিল। এখন সে তার সৈন্যদের একত্রিত করে বলছিল: “বিজয় সামনেই, ইবনে যুবায়েরের সাথে হাতেগোনা কয়েকজন লোক অবশিষ্ট আছে, তারাও ক্ষুধার্ত ও নিরুপায়।”

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে সিরীয় সৈন্যরা নির্ভয়ে মাসজিদুল হারামের উপত্যকায় নেমে আসে এবং হাজুন থেকে মাসজিদুল হারামের দরজা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। [২]

এদিকে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) তাঁর মাকে বলছিলেন: “মা! আমার ভয় হচ্ছে যে হত্যার পর সিরীয় সৈন্যরা আমার নাক-কান কেটে ফেলবে এবং লাশ ঝুলিয়ে অবমাননা করবে।”

সাহসী মা বললেন: “যখন ছাগল জবাই করা হয়, তখন চামড়া ছাড়ানোর কোনো কষ্ট হয় না। তুমি তোমার অবস্থানে অটল থাকো এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।” [৩]

শেষ রাত:

সেই রাতে উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর ভতিজা আবদুর রহমান বিন যায়েদ এসে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর সাথে দেখা করেন এবং প্রস্তাব দেন যে তিনি তাঁর জন্য নিরাপত্তা (আমান) নিয়ে তাঁকে নিরাপদভাবে হাজ্জাজের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। [৪]

মঙ্গলবার ১৭ জমাদিউল আউয়ালের সুবহে কাযিবের সময় হাজ্জাজের সৈন্যরা উপত্যকায় নেমে মাসজিদুল হারামকে ঘিরে ফেলেছিল। প্রতিটি দরজায় পাঁচশ করে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে সুযোগ পাওয়া মাত্রই ভেতরে ঢুকে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-কে কাবু করা যায়। কাবা ঘরের সামনের দরজায় হিমসের, বাব বনী শায়বায় দামেস্কের, বাব সাফায় জর্ডানের, বাব বনী জুমাহে ফিলিস্তিনের এবং বাব বনী সাহমে কিননাসরিনের বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। হাজ্জাজ নিজে মারওয়ার দিকে আবলাজের কোণে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। [৫]

এদিকে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) সারা রাত নফল সালাত আদায় করছিলেন। সুবহে কাযিবের সময় তলোয়ারের বেল্ট দিয়ে কোমর বেঁধে বসে থাকা অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর যথারীতি ফজর সালাতের জন্য নিজে নিজেই জেগে ওঠেন। [৬]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৮, ত. দারুল ফিকর

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৩, ত. দারুল ফিকর

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৩, ত. দারুল ফিকর

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৫, ত. দারুল ফিকর

[৫] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯০

[৬] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯১

শ্রদ্ধেয় মায়ের সাথে শেষ সাক্ষাৎ এবং আসমা বিনতে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার ঐতিহাসিক বানী:

ফজরের সালাতের আগে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শ্রদ্ধেয় মা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলেন। তিনি মসজিদুল হারামের সাথে সংলগ্ন একটি নিরাপদ ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং এই স্থানটিই ছিল হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থায়ী আবাসস্থল। [১]

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স তখন একশ বছর পূর্ণ হয়েছিল, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ঠিক তেমনই অটুট ছিল যেমনটি ছিল সেই দিন, যখন তিনি মক্কার ঘর থেকে তাঁর পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদিনার উদ্দেশ্যে বিদায় দিচ্ছিলেন। [২]

এখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা এবং তাঁর নাতির (আবদুল্লাহ বিন জুবাইর) মধ্যে সেই কথোপকথন হলো যার প্রতিটি অক্ষর স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার এবং হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সালাম দিয়ে মায়ের সামনে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর হাত নিজের হাতে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং বললেন: “হে প্রিয় মা! আমি বিদায় জানাতে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে আজ জীবনের শেষ দিন।” [৩]

মা জিজ্ঞেস করলেন: “যুদ্ধের পরিস্থিতি কী?”

তিনি বললেন: “শত্রু চারপাশ ঘিরে ফেলেছে।” তারপর হেসে বললেন: “মৃত্যু অনেক বড় স্বস্তির বিষয়।”

মা বললেন: “বেটা! সম্ভবত তুমি আমার জন্যও মৃত্যুর তামান্না করছ, কিন্তু আমি চাই মরার আগে দুটির মধ্যে একটি বিষয় দেখে নিতে: হয় তুমি বিজয়ী হও এবং আমার চোখ জুড়িয়ে যাক, অথবা তুমি শহীদ হও আর আমি তার ওপর সওয়াবের আশা করি।” [৪]

ছেলে আরজ করলেন: “হে প্রিয় মা! মানুষ সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। মাত্র একমুঠো লোক অবশিষ্ট আছে যাদের প্রতিরোধ অল্প সময়ের মেহমান মাত্র। অন্যদিকে শত্রু প্রস্তুত আছে যে আমি যা চাইব তারা তা-ই দেবে। আপনার রায় কী?”

মা বললেন: “বেটা! যদি তুমি মনে করো যে তুমি হক ও সত্যের ওপর আছো এবং এরই দাওয়াত দিচ্ছ, তবে এর ওপর অটল থাকো; কারণ এরই খাতিরে তোমার সাথীরা প্রাণ দিয়েছে। আর যদি তোমার এই সংগ্রাম দুনিয়ার জন্য হয়ে থাকে তবে তুমি নিকৃষ্টতম মানুষ; কারণ তুমি নিজেকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলে এবং যারা তোমার খাতিরে নিহত হয়েছে তাদের রক্তও বৃথা গেল। আর যদি তুমি বলো যে আমি তো হক ও সত্যের ওপর আছি, কিন্তু যেহেতু আমার সাথীরা শত্রুদের সাথে গিয়ে মিলেছে তাই আমিও দুর্বল হয়ে পড়েছি, তবে বেটা! এটি শরীফ ও আল্লাহর ওলীদের চিন্তা নয়। তুমি দুনিয়ায় চিরকাল থাকবে না। এমন অবস্থায় লড়াই করে মরার উত্তম।” [৫]

তারপর বললেন: “বেটা, মৃত্যুর ভয়ে নিজের দ্বীনের একটি বিষয়ও ছেড়ে না।” [৬]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১, উরওয়াহ বিন জুবাইর থেকে হাসান সনদে।

[২] “সেদিন তাঁর বয়স ছিল একশ বছর” (মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৬৩৩৯)।

নোট: মুসনাদে আহমদে (হা: ২৬৯৭৩) আছে যে হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে মুস্তাদরাক হাকিমে আছে: “তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়নি” সহীহ। (মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৬৩৩৯)। মুসনাদে আহমদের বর্ণনার সকল রাবী নির্ভরযোগ্য, অন্যদিকে মুস্তাদরাকের এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। তাই আমাদের নিকট হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার অন্ধ হয়ে যাওয়ার বর্ণনাটিই অগ্রগণ্য।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/১৮৯।

[৪] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৩/৯২, হাসান সনদে; হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১, হাসান সনদে।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৬/১৮৮, ১৮৯।

[৬] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৩/৯৩, হাসান সনদে; হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১, হাসান সনদে।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতার এই উৎসাহব্যঞ্জক কথাগুলো শুনে তাঁর মাথায় চুমু খেলেন এবং বললেন:

“আল্লাহর কসম! আমার চিন্তাও এটাই ছিল, কিন্তু আমি আপনার মতামত জানতে চেয়েছিলাম। আপনি আমার সংকল্প ও ইচ্ছাকে আরও সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। আম্মাজান! আপনি দেখবেন, আজ আমি শহীদ হয়ে যাব। আমার শোকে আপনি বিচলিত হবেন না। বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করুন; কারণ আপনার ছেলে কখনো জেনেশুনে কোনো গুনাহ করেনি। কখনো অলীলতায় লিপ্ত হয়নি, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেনি, কারো সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি, কোনো মুসলিম বা জিম্মির ওপর জুলুম করেনি, কোনো অধস্তনের বাড়াবাড়িতে সায় দেয়নি, আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর অন্য কোনো কিছুকে প্রাধান্য দেয়নি।”

তারপর বললেন: “হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জানো যে, আমি এই কথাগুলো নিজের প্রশংসার জন্য বলিনি, বরং আমার মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছি।” এরপর তিনি তাঁর মায়ের কাছে দোয়ার আবেদন করলেন।

তিনি বললেন: “হে আল্লাহ! দীর্ঘ রাতের জাগ্রত অবস্থা, মদিনা ও মক্কার তপ্ত দুপুরে তাঁর রোজা রাখা, ইবাদত এবং পিতা-মাতার সেবার কারণে তাঁর ওপর রহম করো। আমি তাঁর বিষয়টি তোমার ওপর সোপর্দ করলাম। তোমার ফয়সালা যা-ই হোক, আমি তাতে সন্তুষ্ট। সুতরাং আমার ছেলে আবদুল্লাহর কারণে আমাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের সওয়াব দান করো।” [১]

তারপর মা বললেন: “বেটা! আমার আরও কাছে এসো, যাতে আমি তোমাকে বিদায় জানাতে পারি।” এই বলে তিনি তাঁর ছেলেকে চুমু খেলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) মখমলের একটি জামা পরেছিলেন। মা এর কোমলতা অনুভব করে বললেন:

“বৎস! যারা শাহাদাত কামনা করে তারা এমন পোশাক পরে না। এমন পোশাক পরো যাতে মানুষকে চটপটে, কর্মঠ ও সাহসী দেখায়।”

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) তৎক্ষণাৎ মখমল খুলে ফেললেন এবং আস্তিন গুটিয়ে নিলেন। মা তাঁকে এই বলে বিদায় দিলেন:

“ধৈর্য ধরো, আল্লাহর কসম! তোমার পিতা আবু বকর সিদ্দিক ও যুবাইর এবং তোমার দাদি সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব।” [২]

তারপর বললেন: “আমার প্রিয় বৎস! নিজের অবস্থানের ওপর অটল থাকো।” [৩]

এরপর এই মহীয়সী নারী নামাজ ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। [৪]

হারামে শেষ নামাজ, নামাজের মুস্তাহাবসমূহের পূর্ণ খেয়াল:

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদে হারামে আসলেন।

[৫] মুয়াজ্জিনকে আজান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং অজু করলেন। অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। [৬] মসজিদের দরজায় সশস্ত্র সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিল। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সঙ্গীরা দ্রুত নামাজ শেষ করতে চাচ্ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, “হে আমিরুল মুমিনিন! নামাজ পড়িয়ে দিন।”

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বললেন: “সকাল হতে দাও।” [৭]

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/১৮৮, ১৮৯।

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯০।

[৩] আখবারু মক্কা লিল-ফাকিহী: ২/৭৩, বিশুদ্ধ সনদসহ, দারুল খিজর।

[৪] অনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৩, দারুল ফিকর।

[৫] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১, উরওয়াহ বিন যুবাইর থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ।

[৬] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯১।

কিছু মুহূর্ত পর পুনরায় অনুরোধ করা হলো। আপনি আবারও একই উত্তর দিলেন।

যখন ঠিক সেই মুস্তাহাব সময় হলো যাতে আপনি প্রতিদিন ফজরের সালাত পড়াতেন, তখন আপনি আসলেন। [১]

ফজরের সালাত পড়ানোর সময় আপনি অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে ‘সূরা আল-কলম’ তিলাওয়াত করলেন। [২]

আপনার কিরাত পাঠের ভঙ্গি, রুকু ও সিজদাহ এবং তাকবীরসমূহে সাধারণ রুটিন থেকে সামান্যতম পার্থক্যও ছিল না। [৩]

প্রাণ উৎসর্গকারীদের প্রতি শেষ ভাষণ:

সালাম ফিরিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাতীমে আসলেন এবং নিজের সাদা রঙের খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন। [৪]

এখন সময়ের এই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ব্যক্তি তার সেই প্রাণ উৎসর্গকারী সাথীদের দিকে মনোনিবেশ করলেন যারা সবাই বর্ম পরিহিত ছিলেন। শিরস্ত্রাণ এবং পাগড়ির কারণে মুখমণ্ডল ঢাকা ছিল। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আকাশের দরজা খুলে গেছে এবং আমি তাতে প্রবেশ করেছি। আল্লাহর কসম! আমি দুনিয়া থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বয়স ৭২ বছর হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস যে আজ আমি শহীদ হয়ে যাব। হে আল্লাহ! আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করি, তুমিও আমার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করো।”

এই সময় আপনার মন চাইল যে শাহাদাতের আগে শেষবারের মতো আপনার সেই অনুগতদের মুখগুলো একবার দেখে নেন যারা পরীক্ষার সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তেও সাথে ছিল। বললেন: “একটু আমাকে তোমাদের মুখগুলো দেখাও।”

সবাই শিরস্ত্রাণ খুলে নিজেদের মুখমণ্ডল উন্মোচিত করলেন। আপনি তাদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের উৎসাহ দিলেন। তাদের সাহস বাড়িয়ে বললেন: “বন্ধুরা! তলোয়ারের আঘাতে ভয় পেয়ো না। নিজেদের তলোয়ারগুলোকে মুখমণ্ডলের হিফাজতের মতো হিফাজত করো, কারণ তলোয়ার ছিনিয়ে নিলে মানুষ অসহায় নারীর মতো হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের দিকে মনোনিবেশ করো। আমার চিন্তা করো না। জিজ্ঞেস করো না যে আমি কোথায় আছি। আমি সবার সামনে থাকব। [৫] আল্লাহর কসম! আমি সর্বদা প্রথম কাতারেই লড়াই করেছি।” [৬]

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শেষ যুদ্ধ:

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়তেই উপত্যকায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো: “দরজাগুলোতে অটল থাকো, ইবনে জুবাইর যেন পালিয়ে যেতে না পারে।”

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটি শুনে বললেন:

“এই দুর্ভাগা আমাকে নিজের এবং নিজের বাবার মতো মনে করে যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।” [৭]

[১] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৩৩৭ সহীহ সনদে, ত দার খিজর

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯১

[৩] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৩৩৭ সহীহ সনদে

[৪] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৩৩৭ সহীহ সনদে

[৫] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৩২১; এবং তাবারানী এই ভাষণটি সংক্ষেপে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন (আল-মু’জামুল কাবীর: ৩/৯১)

[৬] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১ উরওয়াহ বিন জুবাইর থেকে হাসান সনদে

[৭] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৫, ত দারুল ফিকর... এটি সেই যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত যা মদীনার কাছে হয়েছিল যাতে হাজ্জাজ এবং তার বাবা পালিয়ে গিয়েছিল।

(তারিখুল ইসলাম লিখ যাহাবী: ৫/৩৩)

রাজকীয় সৈন্যরা মসজিদুল হারামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর প্রাণোৎসর্গকারী সাথীরা প্রতিটি দরজায় সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছু জানবাজ সাথী মসজিদের ছাদ থেকে ইট বর্ষণ করে আক্রমণকারীদের ঠেকানোর চেষ্টা করছিলেন। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) মসজিদের চত্বরে দুই হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সবার আগে একজন হাবশি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করল। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) তলোয়ারের আঘাতে তার পা জখম করে দিলেন। হাবশিটি চিৎকার করে উঠল: “হায় ব্যভিচারিণীর সন্তান!” আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বললেন: “ধবংস হ ওরে কালো, আসমা (রা.)-কে ব্যভিচারিণী বলহিস!!” এই বলে এমন আক্রমণ করলেন যে হাবশির সমস্ত সাথী মসজিদ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। [১]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর অতুলনীয় বীরত্ব:

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) যে দরজার দিকে অগ্রসর হতেন, সেখানে প্রতিপক্ষ সৈন্যদের বিপদ ঘনিয়ে আসত এবং তারা উল্টো পায়ে পালিয়ে যেত। হিমসের একজন সৈন্যের বর্ণনা হলো:

“সবার আগে আমাদের দল অতর্কিত আক্রমণ করে মসজিদে প্রবেশ করল, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) একাই আমাদের তাড়িয়ে দিলেন এবং ধাওয়া করতে করতে একাকী মসজিদের বাইরে চলে এলেন, তাঁর মুখে এই কবিতাটি ছিল:

إِنِّي إِذَا أَعْرِفُ يَوْمِي أَصْبِرُ إِنَّمَا يَعْرِفُ يَوْمَهُ الْحُرُّ

(আমি যখন আমার প্রতিশ্রুত দিনটিকে চিনতে পারি, তখন দৃঢ়তা প্রদর্শন করি। শরীফ ব্যক্তিই তার এমন দিনকে চিনতে পারে)

إِذْ بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ ثُمَّ يَنْكِرُ

অথচ কিছু লোক এমন মুহূর্তে জেনে-বুঝে না জানার ভান করে।”

একথা শুনে আমি বললাম: “আল্লাহর কসম! আপনি সত্যিই একজন খাঁটি ও শরীফ মানুষ।” [২]

বাব বনী মাখজুম এবং বাব বনী সাহম থেকে জর্ডান ও হিমসের আলাদা আলাদা দল আক্রমণ করল। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) তাদের পিছু হটতে বাধ্য করলেন। [৩] এরপর নিজের সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন: “হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী মিসরীয়রা কোন দিকে?” সাথীরা বাব বনী জুমাহ-এর দিকে ইশারা করল। আপনি উচ্চস্বরে পাঠ করলেন:

حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং যেসব মুমিন আপনার অনুসরণ করেছে, তারা যথেষ্ট।)

আপনি সেই দিকে আক্রমণ করলেন এবং মিসরীয় সৈন্যদের পিছু হটিয়ে তাদের “দার উন্মে হানি” পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। [৪] অনেকবার আপনি সেই সৈন্যদের ধাওয়া করতে করতে উপত্যকায় আসার পথ “আবলাজ” পর্যন্ত দৌড়ে আসতেন এবং...

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১ উরওয়া বিন যুবাইর থেকে হাসান সনদে, এবং তাবারানিও এটি বর্ণনা করেছেন: (আল-মু'জামুল কাবীর: ১৩/৯৩ হাসান সনদে)

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯০, এবং আবু নুয়াইম সংক্ষেপে হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩৩)

[৩] আল-মু'জামুল কাবীর: ১৩/৯৩ হাসান সনদে

[৪] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহ: ৪/৩৭ সহীহ সনদে, ত দার খিজর

সেখানে তিনি একাকী প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু কারো কাছে আসার সাহস হলো না। আপনার মুখে এই পঙক্তিটি ছিল:

لَوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِدًا لَّكَفَيْتُهُ

যদি আমার প্রতিপক্ষ একজন হতো, তবে আমিই তার জন্য যথেষ্ট হতাম।

এটি শুনে আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান (রা.) বললেন: “আল্লাহর কসম! যদি এক হাজারও হয়, তবে আপনি তাদের জন্য যথেষ্ট।” [১]

আবদুল্লাহ বিন মুতি (রা.)-ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁর ঠোঁটে ছিল এই কবিতাগুলো:

أَنَا الَّذِي فَرَرْتُ يَوْمَ الْحَرَّةِ وَالْحَرُّ لَا يَفِرُّ إِلَّا مَرَّةً

“আমি সেই ব্যক্তি যে হারবার যুদ্ধে বেঁচে পালিয়েছিলাম, কিন্তু (যুদ্ধের) উত্তাপ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ একবারই পাওয়া যায়।”

فَالْيَوْمَ أَجْزِي فَرَّةً بِكَرَّةٍ

“সুতরাং আজ আমি পুনরায় আক্রমণ করে পলায়নের ক্ষতিপূরণ করছি।” [২]

হাজ্জাজ যখন দেখল যে তার সৈন্যরা আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের ওপর কাবু করতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন সে রাগান্বিত হয়ে নিজে পায়ে হেঁটে চলে এল এবং তার সৈন্যদের মসজিদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল, সেই সাথে নিজের পতাকা বাহককে সামনে এগিয়ে দিতে লাগল। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-ও তাঁর পতাকা বাহককে সামনে এগিয়ে দিলেন এবং শত্রুর ওপর তীব্র আক্রমণ করে তাদের পিছু হটিয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) নিজে মসজিদে হারামে এসে মাকামে ইব্রাহিমের কাছে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে লাগলেন। এদিকে শত্রু পুনরায় আক্রমণ করল এবং বাবু বনী শায়বার কাছে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর পতাকা বাহককে হত্যা করে পতাকা ছিনিয়ে নিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এর মধ্যেই সালাত সম্পন্ন করলেন এবং পুনরায় শত্রুর মোকাবিলা শুরু করলেন। [৩]

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত:

রাজকীয় সৈন্যদের আক্রমণের ধারা অব্যাহত রইল এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর সঙ্গীরা একে একে শহীদ হতে লাগলেন। যখন সবাই শহীদ হয়ে গেলেন, তখন শত্রুরা একযোগে সব দিক থেকে ভেতরে প্রবেশ করে আপনাকে রুকনে ইয়ামানি এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে ঘিরে ফেলল। [৪]

এই সময়ে আপনার কপালে একটি ইট এসে লাগল। [৫] ইট লাগার সাথে সাথেই দ্রুত রক্ত বইতে শুরু করল, মুখমণ্ডল ও মুখ ভিজ়ে গেল।

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/১৯০, ১৯১

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৭

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১২৫, তাবা দারুল ফিকর

[৪] তাবারানী ইব্রাহিম বিন আল-হাক্ক থেকে বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী, এটি পাথর নিক্ষেপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদের ছাদের একটি টুকরো ছিল যা হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল। (আল-মু'জামুল কাবীর: ১৩/৯১)। অন্যদিকে তাবারানী কাসিম বিন মা'ন থেকে বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর কিছু সঙ্গী মসজিদের ছাদ থেকে শত্রুর ওপর ইট বর্ষণ করছিলেন, তাদের মধ্য থেকে একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর মাথায় গিয়ে লাগে। (আল-মু'জামুল কাবীর: ১৩/৯২)। তাবারানী কাসিম বিন মা'ন থেকে বর্ণিত বর্ণনাটি হাসান হওয়ার কারণে এটি স্পষ্ট যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর হত্যার দায় সিরিয়াবাসীদের (আহলে শাম) ওপর থেকে সরে যায় না, যেমনটি কিছু লোক ইট লাগার এই বর্ণনাটি নিয়ে দাবি করে যে, “আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে সিরিয়াবাসীরা নয় বরং তাঁর নিজের সঙ্গীরাই হত্যা করেছিল”। প্রথমত, প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে এ ধরনের ভুল মোটেও অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এই বর্ণনা থেকে কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, ইট লাগার ফলে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) আহত হয়েছিলেন। এর পরেও বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, সিরিয়াবাসীরাই তাঁকে আক্রমণ করে শহীদ করেছিল এবং তাঁর পবিত্র মস্তক বিচ্ছিন্ন করেছিল।

[৫] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩২

তারিখ উম্মত মুসলিমাহ

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এই অবস্থায় এই রণসঙ্গীত পাঠ করলেন:

فَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُّوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقَطُّرُ الدِّمَاءُ

“আমরা এমন নই যে যাদের জখমের রক্ত গোড়ালিতে পড়ে, বরং আমাদের রক্ত পায়ের পাতার ওপর ঝরে পড়ে।” [১]

আপনার ওপর মূর্ছা ভাব তরী হলো এবং আপনি পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন। জবান মুবারক থেকে বের হলো:

أَسْمَاءُ إِنْ قُتِلَتْ لَا تَبْكِينِي لَمْ يَبْقَ إِلَّا حَسْبِي وَدِينِي

(আসমা! যদি আমি নিহত হই তবে আমার জন্য কেঁদো না; আমার উচ্চ বংশমর্যাদা এবং আমার দ্বীন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।)

وَصَارِمٌ لَّأَنْتَ بِهِ يَمِينِي

এবং সেই তলোয়ার ছাড়া যা আমার ডান হাত খুব সহজেই চালায়। [২]

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু এক শামী সৈন্য আপনাকে দেখে পুনরায় আক্রমণ করল। আপনি বাম কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সামান্য উঠলেন এবং ডান হাতের তলোয়ার দিয়ে আক্রমণকারীর ওপর এমন আঘাত করলেন যে তার দুই পা কেটে গেল। ইতিমধ্যে অনেক শত্রু সৈন্য আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আপনি এই অবস্থায় যতক্ষণ শক্তি ছিল তলোয়ার চালাতে থাকলেন। [৩]

আপনি দুর্বল হয়ে পড়লে শামীদের দুই গোলাম এই কথা বলতে বলতে সামনে এগিয়ে এল:

“গোলামের কাজ হলো তার মনিবের সহায়তা করা।”

উভয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে আপনাকে শহীদ করে দিল। [৪] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই ঘটনা ১৭ জুমাদাল আখিরা ৭৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়। আপনার সাথে যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে আপনার পুত্র উরওয়াহ, ভাই হামজাহ, ভ্রাতুষ্পুত্র মুয়াবিয়া বিন মুনজির, আমর এবং ইবনে হাজম, আবু সুফিয়ানের পুত্র আম্মারা, সাফওয়ান বিন উমাইয়ার পুত্র এবং বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মুতী (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৫]

[১] আল-মু'জাম আল-কাবীর: ১৩/৯২; হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১ হাসান সনদে; মাজমাউজ জাওয়াইদ: ৭/৩৫৫; তারিখুত তাবারী: ৬/১৯২।

[২] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩২; মাজমাউজ জাওয়াইদ: ১৩০৮৫।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৮৩।

[৪] আল-মু'জাম আল-কাবীর: ১৩/৯২ হাসান সনদে; হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১ হাসান সনদে; মাজমাউজ জাওয়াইদ: ৭/৩৫৫।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন: “আল-হাইসামি বলেছেন: এতে আব্দুল মালিক বিন আব্দুর রহমান আদ-দামারী রয়েছেন, ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং আবু যুরআ ও অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। আমি বলি: ইমাম হাইসামি এই আব্দুল মালিক বিন আব্দুর রহমান আশ-শামীকে আব্দুল মালিক বিন আব্দুর রহমান আদ-দামারী মনে করে ভুল করেছেন, অথচ তিনি অন্য ব্যক্তি। হাফিজ ইবনে হাজার এই পার্থক্য স্পষ্ট করে বলেছেন: “আবু হাতিম ও বুখারী শামী এবং দামারীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন, এবং তারা উভয়েই আমর বিন আলী থেকে বর্ণনা করেন। আমি বলি: তাদের মধ্যে পার্থক্যের সঠিক উপায় হলো শামী যার কুনিয়াত আবু আব্বাস, তিনি আওয়ালী ও ইব্রাহিম বিন আবি আবলা থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে বুখারী মুনকারুল হাদিস বলেছেন এবং আবু যুরআ তাকে অনুসরণ করেছেন। আবু হাতিম বলেছেন তিনি শক্তিশালী নন। আর দামারী যার কুনিয়াত আবু হিশাম এবং তার দাদার নামও হিশাম, তিনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেছেন: শায়খ, এবং বুখারী তার সম্পর্কে কোনো জরাহ (সমালোচনা) উল্লেখ করেননি এবং ইবনে হিব্বান তাকে সিকাং (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন এবং তাকে আমর বিন আলী নির্ভরযোগ্য বলেছেন।” (তাহযীবুত তাহযীব: ৬/৪০১)

[৫] আনসাবুল আশরাফ, বালায়ুরী: ৪/১৩৩, দারুল ফিকর।

আবদুল্লাহ বিন মুতী এবং আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ানের মাথা কেটে শামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (আখবারু মক্কা লিল-ফাকিহী: ২/৩৩৯ সহীহ সনদে)।

মক্কা মুয়াজ্জমায় হাহাকার:

হযরত আসমা (রা.) জানতেন যে ছেলের পরিণতি এটাই হবে। তিনি সুগন্ধি মাখিয়ে কাফন তৈরি করে রেখেছিলেন এবং মসজিদুল হারামের দরজাসম্মুখে কয়েকজন দাসীকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যাতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) শহীদ হওয়া মাত্রই সংবাদ দিতে পারে। [১]

যখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) জখমে জর্জরিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন, তখন এক দাসী তা দেখে মসজিদের দিকে ইশারা করে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল: “হায় আমিরুল মুমিনীন!” [২]

এ কথা শোনা মাত্রই পুরো মক্কা মুয়াজ্জমা আহাজারি ও দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠল। [৩]

সেই সাথে সিরীয় বাহিনী বিজয়ের আনন্দে তাকবীরের ধ্বনি দিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), যিনি হজের পর তখনও মক্কায় ছিলেন, এই শোরগোল শুনলেন। তাঁর সেই মনোরম দিনের কথা মনে পড়ে গেল যখন মদিনা মুনাওয়ারায় হাওয়ারিয়ে রাসূল যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)-এর ঘরে নবজাতকের আগমনে সাহাবায়ে কেরাম তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সেই দৃশ্য স্মরণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন: “তাঁর জন্মের সময় তাকবীর ধ্বনি প্রদানকারী মহান ব্যক্তিগণ তাঁর শাহাদাতের সময় তাকবীর প্রদানকারীদের চেয়ে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” [৪]

হযরত আসমা (রা.) লাশটি কাফন-দাফনের জন্য নিজের কাছে আনানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু ততক্ষণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর শিরশ্ছেদ করে ফেলেছিল, যা সে আবদুল মালিকের পরিদর্শনের জন্য দামেস্কে পাঠাচ্ছিল। আর বাকি দেহটি সে রাজপথে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। [৫] মক্কা মুয়াজ্জমার উপত্যকায় অবতরণকারী গিরিপথ “সানিয়াতু কাদা”-তে একটি খুঁটি গেড়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর আদরের ভাণের মস্তকবিহীন দেহটি তাতে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। [৬]

এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। এটাই ছিল সৃষ্টিজগতের বিধান। যেভাবে গারে সওরের দুই সঙ্গী সফর ও অবস্থান থেকে শুরু করে কবর ও হাশর পর্যন্ত এক হয়েছেন, তেমনিভাবে তাঁদের দুই নাতিও জীবন থেকে শাহাদাত পর্যন্ত এমন এক অনন্য শান দেখিয়ে গেছেন যে দুনিয়াকে বলতে হয়েছে:

যে শান নিয়ে কেউ বধ্যভূমিতে যায়, সেই শান চিরকাল অম্লান থাকে।

লাশের সাথে হাজ্জাজের নির্মম আচরণ:

হযরত আসমা (রা.) হাজ্জাজের কাছে দাবি জানালেন যেন লাশটি কাফন-দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু সে লাশের চারপাশে কঠোর পাহারা বসিয়ে দিল এবং বলল: “যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, এটি এভাবেই কাঠের ওপর ঝুলে থাকবে।” [৭]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৭/২৮১, ত. দারুল ফিকর

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/৯৩... সম্ভবত এই দাসী মসজিদুল হারামের সাথে সংযুক্ত পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, তাই তার আওয়াজ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

[৩] তারিখু দামেশক: ১৩/১২০

[৪] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরী: ৭/১৩০, ত. দারুল ফিকর

[৫] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১৩৮, ত. দারুল ফিকর

[৬] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৬১০, সাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও ধ্বংসকারীর আলোচনা অধ্যায়; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: “যখন হাজ্জাজ ইবনে যুবাইরকে হত্যা করল এবং তাঁকে উল্টো করে শূলে চড়ালো, তখন সে মিম্বারের ওপর ছিল, এমতাবস্থায় আসমা আসলেন এবং তাঁর সাথে একজন দাসী ছিল যে তাঁকে পথ দেখিয়ে আনছিল, আর তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল।” (হা: ২৬৯৭৩) এবং এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।

[৭] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরী: ৭/১২৯, ত. দারুল ফিকর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত আসমা (রা.) যখন জানতে পারলেন তখন বললেন:

“আল্লাহ এই রক্তপিপাসুকে ধ্বংস করুন, সে আমাকে আমার ছেলেকে দাফন করার সুযোগও দিল না।” [১]

হযরত আসমা (রা.)-এর দুঃখ দেখে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং সমবেদনা জানিয়ে বললেন:

“এই দেহ কিছুই নয়, আত্মা তো আল্লাহর কাছে চলে যায়। অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন।”

হযরত আসমা (রা.) বললেন: “আমি কেন ধৈর্য ধরব না? পরিশেষে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর মাথাও তো কাটা হয়েছিল এবং এক ব্যভিচারিণী নারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল।” [২]

নবুওয়াতের সাহচর্য ধন্য শেষ খলিফা, আফ্রিকা বিজয়ী, সাহাবা যুগের শেষ শাসক এবং কুরাইশদের এই মহান ব্যক্তির লাশ ‘সানিয়াতুল বিদা’ উপত্যকায় ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

কুরাইশদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ মানুষ দলে দলে এই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। [৩] তৃতীয় দিন হযরত আসমা (রা.) সওয়ারিতে চড়ে এখানে আসলেন। এমন

হৃদয়বিদারক দৃশ্যও এই ধৈর্যশীলা নারীর মনোবল দমাতে পারেনি। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “أَمَّا أَنْ لِهَذَا الرَّأِيبِ أَنْ يَنْزِلَ؟”

“এখনো কি এই অশ্বারোহীর নামার সময় হয়নি?” [৪]

হাজ্জাজের অভদ্রতা এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কন্যার অতুলনীয় সত্যবাদিতা:

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে যখন এই কথা পৌঁছাল, সে রাগে দিশেহারা হয়ে গেল; কারণ সে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর লাশ এই জন্য ঝুলিয়ে রেখেছিল যাতে তিনি চরম অপমানিত হন, কিন্তু হযরত আসমা (রা.)-এর একটি প্রাঞ্জল বাক্য তার সমস্ত প্রচেষ্টায় পানি ঢেলে দিয়েছিল। হাজ্জাজ তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাল যেন আসমা (রা.)-কে নিয়ে আসা হয়। আবু বকর (রা.)-এর কন্যা এই লাঞ্ছনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

হাজ্জাজ পুনরায় লোক পাঠাল এবং বলে পাঠাল:

“নিজে আসলে ভালো, অন্যথায় আমি এমন লোক পাঠাব যারা তোমাকে চুল ধরে টেনে নিয়ে আসবে।”

হযরত আসমা (রা.) উত্তরে বলে পাঠালেন: “হঁ্যা হঁ্যা! তাদেরই পাঠাও যারা চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে।”

হাজ্জাজ এই উত্তর শুনে রাগে ফেটে পড়ল, পা আছড়াতে আছড়াতে নিজেই দ্রুত তাঁর কাছে এল এবং বলল:

“দেখেছ তো! আমি তোমার পথভ্রষ্ট ছেলের কী দশা করেছি।”

হযরত আসমা (রা.) বললেন: “আমি তো শুধু এটাই দেখেছি যে, তুমি তার দুনিয়া বরবাদ করেছ আর সে তোমার আখেরাত।”

এই দাঁতভাঙা জবাব হাজ্জাজের মতো বাচালকে স্তব্ধ করে দিল। তার কাছে কোনো উত্তর ছিল না।

[১] আনসাবুল আশরাফ, ৭/৪৮০, ত: দারুল ফিকর

[২] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি, ২/৩৫৭, ত: দারু খিজর

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫৪০

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৩৩ সহীহ সনদে

হযরত আসমা (রা.) পুনরায় বললেন: “আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকে ‘দুই কোমরবন্ধওয়ালীর সন্তান’ বলে লজ্জা দিতে। হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমিই সেই দুই কোমরবন্ধওয়ালী। কিন্তু তুমি আমাকে কোন কোমরবন্ধের লজ্জা দেবে? সেই কোমরবন্ধের, যাতে খাবার বেঁধে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আবু বকর (রা.)-এর কাছে পাঠাতাম যখন তাঁরা গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন, নাকি সেই কোমরবন্ধের যা প্রত্যেক শরীফ নারী ঘরের কাজের প্রয়োজনে বেঁধে থাকে?” [১]

সত্যের এই আঘাত হাজ্জাজকে ভেতর পর্যন্ত বিদ্ধ করল। আরবের এই মহান বাগ্মী জবাবে কেবল এটুকুই বলতে পারল: “সে তো মুনাফিক ছিল।”

আসমা (রা.) বললেন: “মুনাফিক নয়, বরং সে ছিল রোযাদার, তাহাজ্জুদ গুজার এবং নেককার।”

হাজ্জাজ আর কোনো জবাব দিতে পারল না। বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল: “বুড়ি! যা চলে যা, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”

হযরত আসমা (রা.) বললেন: “আল্লাহর কসম! আমার মাথা খারাপ হয়নি।” [২]

তারপর হাজ্জাজের মুখের ওপর তাকে লাঞ্ছিত করার মতো একটি হাদীস এভাবে শোনালেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই বাণী আমার খুব মনে আছে যে, বনু সাকীফ থেকে একজন মিথ্যাবাদী (কাযযাব) এবং একজন রক্তপিপাসু (মুবীর) প্রকাশ পাবে। মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখে ফেলেছি, আর রক্তপিপাসু তো তুই-ই।” [৩]

হাজ্জাজ এই হাদীস অস্বীকার করতে পারল না এবং এই বলে ফিরে গেল: “আমি অবশ্যই রক্তপিপাসু, তবে মুনাফিকদের রক্তপিপাসু।” [৪]

হযরত আসমা (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন: “না, বরং মুনাফিকদের সরদার।” [৫]

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর ধৈর্য ও শোকাবহ ইন্তেকাল:

হযরত আসমা (রা.) লাশের পাশে দীর্ঘক্ষণ দোয়ায় মগ্ন রইলেন, চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরল না। তারপর এই বলতে বলতে ফিরে গেলেন: “মানুষ বাতিলের জন্য প্রাণ হারায়। হে বৎস! তুমি হকের জন্য প্রাণ দিয়েছ।” [৬]

ছেলের শাহাদাতের পঞ্চম বা দশম দিনে আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-ও এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। [৭]

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া:

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) নিজের উটনীর পিঠে চড়ে সেই উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। উটনীটি থেমে গেল এবং সেই খুঁটির সাথে অস্থিরভাবে মাথা ঘষতে লাগল যেটিতে শহীদের লাশ ঝুলছিল। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন:

“আসসালামু আলাইকা আবাবা খুবাইব! আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। দেখ! আল্লাহ সাক্ষী, আমি (স্নেহবশত) তোমাকে এই (বিপজ্জনক পথ) থেকে নিষেধ করেছিলাম।”

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫৪৫, বাব যিকর কাযযাব সাকীফ ওয়া মুবীরাহ; ওয়া আখরাজাহুল ইমাম আহমাদ ফী মুসনাদিহী মুখতাসারান, হা: ২৬৯৬৭

[২] হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩৩৩/১ বাসনাদ সহীহ; তারিখ দিমাশক: ৪৩৭/২৮

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫৪৫, বাব যিকর কাযযাব সাকীফ ওয়া মুবীরাহ

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ১৩০/৭, ত. দারুল ফিকর; ওয়া আখরাজাহুল হুমাইদী ফী মুসনাদিহী মুখতাসারান, হা: ৩২৮, ত. দারুস সাকা

[৫] তারিখ দিমাশক: ৪৩৭/২৮

[৬] তারিখুত তাবারী: ১৯০/৭

...থেকে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহর কসম! আমি যতদূর জানি তোমরা নিঃসন্দেহে অনেক রোজা পালনকারী, প্রচুর নফল নামাজ আদায়কারী এবং অনেক দান-সদকা দানকারী মানুষ ছিলে। আল্লাহর কসম! যে উম্মতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তোমার মতো হবে, সে উম্মত অবশ্যই কল্যাণময় হবে। [১]

এর অর্থ ছিল এই যে, তোমাদের মতো নেক মানুষকে হত্যাকারীরা নিকৃষ্টতম মানুষ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মন্দ বলে পরিচিতরা যদি তোমাদের মতো ফেরেশতাসুলভ চরিত্রের অধিকারী হয়, তবে এই উম্মতের নেককার বলে পরিচিত ব্যক্তিরা কোন স্তরের হবে।

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর লাশ জানাজা ও কাফন ছাড়াই ফেলে রাখা হলো:

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে শহীদ করার পর তাঁর লাশ জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য বুলিয়ে রেখেছিল। যখন সে দেখল যে উম্মতে মুসলিমার নেককার ব্যক্তিরা সেখানে এসে তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করছে, তখন সে তাঁর লাশ শূল থেকে নামিয়ে আনল এবং ওয়ারিশদের কাছে হস্তান্তর করার পরিবর্তে ইহুদিদের কবরস্থানে ফেলে দিল। [২]

জানাজা ও কাফন-দাফনের অনুমতি এর পরেও দেওয়া হয়নি। এটি ছিল জুলুমের চরম সীমা।

উরওয়াহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে আবদুল মালিকের সাক্ষাৎ:

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পরপরই তাঁর ভাই উরওয়াহ হঠাৎ একটি দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [৩] কারণ তিনি হাজ্জাজের পক্ষ থেকে নিজের পরিবারের জান-মাল ও সম্মানের চরম ক্ষতির আশঙ্কা করছিলেন। এছাড়া ভাইয়ের লাশ কাফন-দাফনের অনুমতিও পেতে চেয়েছিলেন। আবদুল মালিকের কাছে থেকে তিনি নরম আচরণের আশা করেছিলেন; কারণ সে তাঁর পুরনো বন্ধু ছিল। কিন্তু উরওয়াহ পৌঁছানোর আগেই হাজ্জাজ আবদুল মালিকের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল যেন উরওয়াহকে গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠানো হয়।

উরওয়াহ বিন জুবায়ের (রা.) আবদুল মালিকের কাছে পৌঁছালেন এবং তার শাসন মেনে নিয়ে নিজের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিলেন। সেই সাথে ভাইয়ের হত্যার খবর দিয়ে অনুরোধ করলেন যেন লাশ কাফন-দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়। এই আলোচনা চলাকালেই হাজ্জাজের চিঠি এসে পৌঁছাল, যা পড়ে আবদুল মালিক জানতে পারল যে হাজ্জাজ উরওয়াহকে গ্রেপ্তার করতে চায়। আবদুল মালিক সৈন্যদের বললেন:

“উরওয়াহকে হাতকড়া পরিয়ে দাও।” তিনি বললেন: “আমি এই অবস্থায় আপনার কাছে আসিনি (বরং আমি নিরাপদ)।”

আবদুল মালিক বলল: “হাজ্জাজের কথা তো মানতেই হবে।” উরওয়াহ (রা.) রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন:

“যাকে তুমি হত্যা করেছ, সে লাঞ্ছিত নয়। লাঞ্ছিত সে, যার ওপর তুমি রাজত্ব করছ।”

আবদুল মালিক এ কথা শুনে লজ্জিত হলো। হাতকড়া খুলে দিল এবং হাজ্জাজকে নির্দেশ পাঠাল:

“উরওয়াহর কোনো ক্ষতি করবে না, সে নিরাপদ। লাশ তাঁর মায়ের কাছে হস্তান্তর করে দাও।” [৪]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৬৬০, বাব যিকর কাযযাব সাকাফ ও মুবীর।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৬৬০।

[৩] উরওয়াহ বিন জুবায়ের (রহ.) একজন জলীলুল কদর তাবেরী এবং মহান মুহাদ্দিস ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর রেওয়ায়েতসমূহের একটি বড় অংশ তাঁর মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। সিহাহ সিভাহ ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক-এ উরওয়াহ (রহ.)-এর ১২৫৯টি এমন রেওয়ায়েত রয়েছে যা জামেউল মাসানিদ থেকে নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র সহীহ বুখারীতেই এমন ৩৩৭টি রেওয়ায়েত রয়েছে।

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৪১৩, ত: দারুল ফিকর।

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর এক মাস পর দাফন:

উরওয়াহ (রা.) এক মাস পর বাড়ি ফিরে এলেন। ভাইয়ের কবর ও কাফনবিহীন লাশ এখন তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হলো। উরওয়াহ বিন জুবাইর (রা.) জানাজার নামাজ পড়ে তাঁর গর্বিত ভাইকে হাজুন-এর কবরস্থানে দাফন করলেন। [১]

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর কবর থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মিশকের সুগন্ধ আসতে থাকে, যা তাঁর সত্যপন্থী হওয়ার এক প্রকাশ্য প্রমাণ ছিল। [২]

আকাশ তোমার কবরে শিশির বর্ষণ করুক

নবজাত ঘাস এই ঘরের পাহারাদারি করুক

আভিজাত্য ও উচ্চ বংশমর্যাদা, সাহস ও বীরত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তাকওয়া ও মারেফাতের এই মূর্ত প্রতীক মক্কার ধূলিকণায় বিলীন হওয়ার সাথে সাথেই সাহাবায়ে কেরামের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের এক গৌরবময় যুগের অবসান ঘটল, যে যুগের প্রতি কালজয়ী সময় ঈর্ষা করতে থাকবে... যে যুগের সূচনা হয়েছিল সিদ্দিক-এ-আকবর (রা.)-এর মাধ্যমে এবং সমাপ্তি ঘটল তাঁরই দৌহিত্র আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর মাধ্যমে।

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এবং মুসআব বিন জুবাইর (রা.)-এর শাহাদাতে বিশ্ব মুসলিমের শোক ও দুঃখ:

হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর বেদনাদায়ক শাহাদাতে পুরো মুসলিম বিশ্ব শোক ও দুঃখে নিমজ্জিত হলো, মানুষ চোখের পানি ফেলল এবং কবির কবিতার মাধ্যমে তাঁদের দুঃখিত অনুভূতি প্রকাশ করলেন। নুআইম বিন মাসউদ শায়বানি বলেন:

أَلَا إِنَّ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مُصْعَبٍ ... وَبَعْدَ أَخِيهِ قَدْ تَنَكَّرَ أَجْمَعُ

“শুনে রাখো! মুসআব এবং তাঁর ভাইয়ের পর দ্বীন পুরোপুরি অপরিচিত হয়ে গেছে।”

فَصَمَّتِ الْأَذَانُ مِنْ بَعْدِ مُصْعَبٍ ... وَمِنْ بَعْدِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْأَنْفُ أَجْدَعُ

“সুতরাং আমি মুসআব এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহর পর কান বন্ধ করে নিয়েছি এবং নাক কাটা গেছে।”

فَقِيَ كُلَّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ عَطَاؤُهُ ... وَغَيْثُ لَنَا فِيهِ مَصِيفٌ وَمَرْبَعٌ

“তাঁরা এমন যুবক ছিলেন যে প্রতি বছর দুইবার দান করতেন। তাঁরা এমন বৃষ্টি ছিলেন যাতে আমাদের শরৎ ও বসন্ত ছিল।”

عَلَى ابْنِ حَوَارِي النَّبِيِّ نَحْيَةً ... مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي وَيَنْعُ

“নবী ﷺ-এর হাওয়ারির পুত্রের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম হোক, কারণ আল্লাহই দান করেন এবং তিনিই বন্ধ করেন।” [৩]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৭/১৩১, ত. দারুল ফিকর। এই বর্ণনায় যে উল্লেখ আছে যে মা গোসল দিয়েছিলেন, তা সম্ভবত কোনো বর্ণনাকারীর ভ্রম; কারণ প্রথমত এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল এবং অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আসমা (রা.) ততদিনে ইস্তিকাল করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য ভাই ও পুত্রদের উপস্থিতিতে একজন দুর্বল ও অন্ধ মাকে গোসলের কষ্ট দেওয়া যুক্তিসঙ্গতভাবেও অসম্ভব। লাশ দাফনের অনুমতি আদায়ে হাজ্জাজের কাছে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সুপারিশেরও বড় ভূমিকা ছিল। (আখবারে মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৩৫১, ত. দার খিজর)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/১২

[৩] আখবারে মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৩৫২; তারিখ দামেশক: ২৮/২৫৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আমর বিন মা'মার যাহলি বলেছেন:

তোমার কসম! আমি মানুষের কাছে কোনো প্রয়োজন পেশ করিনি। আমি লালসার পোশাক পরিধান করিনি এবং দ্বিধাগ্রস্তও হইনি।

সেই সকালে যখন মুসআব আমাকে ডাকলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলাম এবং বললাম: সুস্বাগতম!

আপনার পিতা নবী ﷺ-এর হাওয়ারি এবং তাঁর তলোয়ার ছিলেন, আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি বংশমর্যাদায় আমাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আর আপনার সেই ভাই যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোয় হেদায়েতপ্রাপ্ত, তিনি মক্কায় আমাদের এমনভাবে ডাকেন যার উত্তর লাভবাইক হতো।

সুতরাং এই কাল যদি মুসআবকে ধ্বংস করে দেয় এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরও ছিন্নভিন্ন লাশে পরিণত হন।

তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে, যদিও তার চেষ্টা ও ভীতি বিফলে যায়। [১]

□□□

সুওয়াইদ বিন মানজুফ সাদুসি বলেছেন:

শোনো! এই গোঁড়া তিরস্কারকারীকে বলে দাও, মুসআবের পর এই রাত অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে।

তাঁর সেই ভাইয়ের পর যিনি বাইতুল্লাহর বাসিন্দা ছিলেন, আমাদের এমন লাঞ্ছনার শিকার করা হয়েছে যা সমস্ত শরীফ ব্যক্তিদের গ্রাস করেছে।

ফলে আমরা সেই মেষপালের মতো হয়ে গেছি যার রাখাল নিখোঁজ এবং তারা অন্ধকার রাতে নেকড়েদের সামনে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।

এখন আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তাদের উভয়ের জন্য কাঁদতে থাকব এবং তাদের প্রশংসা করতে থাকব। আর আমি এ থেকে কখনো বিরত হব না।

[১] তারিখ দামেশক: ২৫৬/২৮

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

তারা দু’জন যা-ই ছিলেন, দ্বীনদারদের জন্য রক্ষাকবচ ছিলেন; সুতরাং এখন এর পর কি আর কোনো উদ্দেশ্য অবশিষ্ট থাকতে পারে?

আমি দেখছি যে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই যেন গতকাল... গতকাল সেই দু’টির সাথে ‘আনকা’ (এক কাল্পনিক পাখি) হয়ে গেছে যা দুর্লভ।

সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তাদের পাথেয় হলো রহমতের দোয়া এবং বিচ্ছেদের সেই দহন যা দীর্ঘশ্বাসের সাথে সর্বদা থাকবে। [১]

□□□

কায়স বিন হাইশাম আল-হিলালী, যিনি আবদুল্লাহ বিন যুবাইর এবং মুসআব-এর বন্ধু ছিলেন, তিনি নিজের আবেগ এভাবে প্রকাশ করেছেন:

“আমরা মুসআব এবং তার ভাইকে হারিয়েছি... যখন নির্দয় আকাশ তাদের সঙ্গ দেয়নি।”

“আমরা এমন ছিলাম যে আমাদের ঘর সম্পর্কে (মন্দ) চিন্তাও করা যেত না। আমরা আমাদের মজলিসে চাদর টেনে হেঁটে বেড়াতাম।”

“এটি তখন ছিল যখন পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ থাকত। আর যদি আমরা বিপদের অবস্থায় থাকতাম, তবে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেতাম এবং ছোট বর্ম পরার কষ্টও করতাম না।”

“যে আমাদের লক্ষ্যবস্তু বানাত আমরাও তাকে শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু বানাতাম, এবং এমন লোকদের অত্যন্ত কঠোরভাবে পিষ্ট করে দিতাম।”

“হায় আমার এবং আমার পিতা-মাতার দুঃখ! এই দু’জনের (মুসআব ও আবদুল্লাহ বিন যুবাইর) পর তো আমি লাঞ্ছিত হয়ে গেলাম।”

“আর হায় আফসোস! সেই (সৌভাগ্য) এর ওপর যা আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। হায়! আমিও যদি এই শহীদদের সাথে শহীদ হয়ে যেতাম।” [২]

□□□

[১] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৩৫৯; তারীখে দামেশক: ২৮/৩৫৬, ৩৫৭

[২] তারীখে দামেশক: ২৮/৩৫৫, ৩৫৬

কায়স বিন হাইশামকে অধিকাংশ উলামা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদিও তার থেকে কোনো বর্ণনা বর্ণিত নেই। ইমাম বুখারী থেকেও এটিই বর্ণিত যে তিনি সাহাবী ছিলেন। আল্লামা আব্দুল বার এবং আবু নুয়াইম আসবাহানীও এটিই নকল করেছেন। যদিও কিছু উলামা তাকে তাবিঈ হিসেবে গণ্য করেছেন।

(আল-ইসাবাহ: ৫/৩৮৩; আল-ইসতিআব: ৩/১৩০২; মা’রিফাতুস সাহাবাহ লি আবি নুয়াইম আল-আসবাহানী: ৩/২৩৩৩)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ছিলেন সত্যপন্থী খলিফা, হাজ্জাজ এবং তার দল ছিল বিদ্রোহী:

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) তাঁর সময়ের সত্যপন্থী খলিফা ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেছিল তারা নিঃসন্দেহে বিদ্রোহী ও ফিতনাবাজ ছিল। জমহুর উলামাদের অভিমত এটাই। ইমাম ইবনে হাজম (রহ.) লিখেছেন:

“মারওয়ান আমিরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং খিলাফতের দাবি করেছিল।” [১]

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর জীবনী উল্লেখ করার আগে এই শিরোনাম দিয়েছেন:

“তারজামা আমিরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু” [২]

এরপর তিনি লিখেছেন: “৬৪ হিজরিতে তাঁর বায়আত সম্পন্ন হয়েছিল এবং তাঁর যুগে মানুষ কল্যাণ লাভ করেছিল।” [৩]

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) প্রায় বিশ (২০) পৃষ্ঠায় তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে তিনি বলেন:

“তিনি ছিলেন আলেম, ইবাদতগুজার, প্রভাবশালী ও গান্ধীর্ষপূর্ণ, অধিক রোজা পালনকারী ও নামাজি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত মজবুত ছিলেন।” [৪]

শেষে তিনি বলেন:

“তিনি প্রশংসনীয় গুণাবলির অধিকারী ছিলেন, তাঁর শাসনক্ষমতায় দাঁড়ানো ছিল মহান আল্লাহর জন্য। অতঃপর মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদে মৃত্যুর পর তিনি নিঃসন্দেহে সত্যপন্থী খলিফা ছিলেন। তিনি মারওয়ান বিন হাকামের চেয়ে উত্তম ছিলেন, যার খিলাফত গোঁড়ামির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অথচ সকলের বায়আত তাঁর (আবদুল্লাহ বিন যুবাইর) অনুকূলে সম্পন্ন হয়েছিল এবং তাঁদের শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত হওয়ার পর সে (মারওয়ান) তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল।” [৫]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

“আহলুল হকের মাযহাব হলো আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) মজলুম ছিলেন। হাজ্জাজ এবং তার সঙ্গীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী ছিল।” [৬]

হাফিজ যাহাবী (রহ.) বলেন:

“তাঁর গণনা ছোট সাহাবীদের মধ্যে হয়, কিন্তু ইলম, মর্যাদা, জিহাদ ও ইবাদতে তিনি অনেক বড় ছিলেন।”

পুনরায় বলেন:

“তিনি তাঁর যুগে কুরাইশদের অশ্বারোহী ছিলেন এবং তাঁর যুদ্ধজয়ের বীরত্বগাথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।” [৭]

[১] “قام حتى أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وادعى الخلافة” (জমহুরাতু আনসাবিল আরব লি-ইবনে হাজম, পৃ. ৮৭)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৮৬

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৮৭, ত. দার হিজর

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/২০৩

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/২০৯

[৬] শারহ মুসলিম লিন-নববী, হা: ২৫৩৫

[৭] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৬৩, ৩৬৪

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

হাজ্জাজের মক্কাবাসীদের প্রতি ভাষণ:

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতে মক্কাবাসীদের শোক ও দুঃখের সীমা ছিল না। হাজ্জাজ শহীদের প্রতি তাদের এই ভালোবাসা সহ্য করতে পারল না। সে তার বাগ্মিতা ও চতুর কথার মাধ্যমে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল এবং একটি জনসভা ডেকে বলল:

“হে মক্কাবাসী! জানতে পারলাম যে ইবনে যুবায়েরের মৃত্যুতে তোমরা ব্যথিত। মানছি যে সে উম্মতের একজন নেক লোক ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সে খেলাফতের লোভ করে এবং খেলাফতের অধিকারীদের সাথে লড়াই করে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ছেড়ে দিয়েছিল। আদমের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাকে ফেরেশতারা সিজদা করেছিল এবং যিনি জান্নাতের অধিবাসী ছিলেন, তিনি আল্লাহর অবাধ্যতা করার কারণে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে ভেবে দেখো আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের তো আদম থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তিনি আল্লাহর কিতাব বদলে ফেলেছিলেন।”

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন, তিনি এই আজোবাজে কথা সহ্য করতে পারলেন না এবং উচ্চস্বরে বলে উঠলেন:

“তুমি মিথ্যা বলেছ, মিথ্যা বলেছ, মিথ্যা বলেছ। ইবনে যুবায়ের (রা.) আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করেননি, এমনটা করার ক্ষমতা তারও ছিল না আর তোমারও নেই। [১] আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) তো কুরআনের অনুসারী ছিলেন, হকের ওপর আমলকারী ছিলেন। [২]”

হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে বলল: “চুপ করো। তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছ। তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এমন যেন না হয় যে তোমাকে গ্রেপ্তার করে গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়, তোমার লাশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় আর শিশুরা তা তামাশা হিসেবে দেখে।” [৩]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৮৩, সহীহ সনদসহ, ত. সাদির

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১৮৫

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৮৩ সহীহ সনদসহ, ত. সাদির

সনদ: মুহাম্মদ বিন সাদ বলেন, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুসলিম বিন ইবরাহিম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন আসওয়াদ বিন শায়বান, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন খালিদ বিন সামীর।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- ১. খালিদ বিন সামীর: আবু দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনাকারী: ইমাম নাসায়ী বলেন তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), এবং ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (তাহযীবুল কামাল: ৮/৯০)
- ২. আসওয়াদ বিন শায়বান: মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনাকারী: মৃত্যু ১৬০ হিজরী। ইয়াহইয়া বিন মাস্নিন বলেন: নির্ভরযোগ্য। আবু হাতিম বলেন: হাদীসের ক্ষেত্রে উত্তম (সালিহুল হাদীস)। (তাহযীবুল কামাল: ৩/২২৫)
- ৩. মুসলিম বিন ইবরাহিম: বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী (মৃত্যু ২২১ হিজরী)। ইয়াহইয়া বিন মাস্নিন বলেন: নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। (তাহযীবুল কামাল: ২৭/৪৯০)

ইতিহাসে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর যুগের ওপর এক নজর

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাসনকাল ছিল সাহাবীদের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। এই পৌনে নয় বছরের শাসনামলে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ খুব বেশি হতে পারেনি। তবে কাবা ঘরকে ইব্রাহিমি ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ করা তাঁর একটি বিখ্যাত ও স্মরণীয় কীর্তি।

মহান কীর্তি: ইব্রাহিমি ভিত্তির ওপর কাবা নির্মাণ:

মক্কার প্রথম অবরোধে, যা ইয়াজিদের আমলে শুরু হয়েছিল, মিনজানিকের পাথর নিক্ষেপ এবং পরবর্তীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কাবা জরাজীর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) কাবা পুনর্নির্মাণ করা জরুরি মনে করলেন। তিনি তাঁর খালা আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বাণী শুনেছিলেন, যাতে তিনি কাবাকে ইব্রাহিমি ভিত্তির ওপর নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ হাতিমের অংশ যা কুরাইশরা কাবার বাইরে রেখে দিয়েছিল, তা কাবার চার দেয়ালের ভেতরে নিয়ে আসা। এ ছাড়া কুরাইশরা কাবার দরজা উঁচু করে দিয়েছিল যাতে কেবল সম্মানিত ব্যক্তিরাই ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) চেয়েছিলেন কাবার প্রবেশ সবার জন্য সহজ হোক, মাটির সমতলে কাবার দুটি দরজা থাকুক। মানুষ একটি দিয়ে প্রবেশ করবে এবং অন্যটি দিয়ে বের হবে এবং সবাই কাবার বরকত লাভ করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেননি এই ভয়ে যে, নওমুসলিম কুরাইশরা কাবার ভাঙচুর দেখে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা আস্থার সংকটে না পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে বলেছিলেন: “তোমার কওম যদি নওমুসলিম না হতো, তবে আমি কাবাকে ভেঙে ইব্রাহিমি নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করতাম।” [১]

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এই হাদিসে নববীর আলোকে কাবাকে নতুন করে নির্মাণ করালেন। হাতিমকে চার দেয়ালের ভেতরে নিয়ে এলেন। দরজা দুটি রাখলেন এবং সেগুলোও মাটির সমান করলেন। [২]

আফসোস! আপনার (রা.) এই কীর্তি যদি চিরস্থায়ী হতো, কিন্তু মক্কার দ্বিতীয় যুদ্ধে সিরীয় বাহিনীর পাথর নিক্ষেপে কাবা আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হিজাজের গভর্নর নিযুক্ত করেন, তখন সে কাবার নির্মাণে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর পরিবর্তনের কথা আব্দুল মালিককে লিখে পাঠায়। সে জবাবে লিখেছিল: “ইবনে জুবাইরের অনিষ্টের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।” ফলে আব্দুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জরাজীর্ণ কাবাকে ভেঙে পুনরায় কুরাইশদের নকশা অনুযায়ী তৈরি করে দেয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কাবা সেই নকশা অনুযায়ীই বিদ্যমান রয়েছে। [৩]

[১] সহিহ মুসলিম, খণ্ড: ৩৩০৮, ৩৩১০, কিতাবুল হজ, বাব নাকজুল কাবা

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস: ১২৬, কিতাবুল ইলম

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/১০২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ছিলেন প্রথম খলিফা যিনি কাবা শরীফকে রেশমি গিলাফ পরিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে বাইতুল্লাহকে এত বেশি সুগন্ধি লাগানো হতো যে পুরো হারাম সুবাসিত হয়ে যেত। [১]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ এটিও ছিল যে, তিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মক্কাকে রাজধানী বানিয়েছিলেন এবং এভাবে ধর্মীয় মর্যাদার পাশাপাশি একে রাজনৈতিক গুরুত্বও দান করেছিলেন। তাঁর আগে বা পরে কেউ মক্কাকে ক্ষমতার কেন্দ্র বানায়নি। যদিও এই পদক্ষেপের কারণে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু তিনি হারামের জন্য রাজনৈতিক কেন্দ্রের মর্যাদা বজায় রেখেছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর ওপর কৃপণতার অভিযোগের বাস্তবতা:

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করতেন। তাই তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠজন ও আমিরদের ওপর উপটোকন বর্ষণ করার কোনো ধারা ছিল না। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পদ হোক বা সরকারি অর্থ, তিনি তা সমষ্টিগত পর্যায়ে ব্যয় করে সাধারণ মানুষের বেশি উপকার পৌঁছাতে পছন্দ করতেন। তাঁর এই আর্থিক সতর্কতাকেই বিরোধীরা কৃপণতা নাম দিয়েছিল এবং এ বিষয়ে নানা ধরনের গল্প ছড়িয়ে দিয়েছিল যার কোনো বাস্তবতা নেই। যদিও কিছু ঐতিহাসিক এই বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু সেগুলোর বর্ণনাসূত্র দুর্বল ও সন্দেহজনক, যা স্পষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর কৃপণতার নিন্দা করতেন। [২] এই বর্ণনাগুলোর কিছু বর্ণনাকারী যেমন আবুল সালম দুর্বল ও পরিত্যক্ত। কিছু বর্ণনায় যথাযথ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

অনুরূপভাবে কিছু কবি তাঁদের কবিতায় এই মহান সাহাবীকে কৃপণ বলে অভিহিত করেছেন। [৩] কিন্তু এটা স্পষ্ট যে কবির কাউকে ছাড় দেন না, উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ও তাঁদের জিহ্বা থেকে নিরাপদ ছিলেন না।

এই দুর্বল, পরিত্যক্ত ও ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলোর বিপরীতে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর কবিদের প্রতি বদান্যতার প্রমাণও বিদ্যমান। দুর্ভিক্ষের সময় নাবিগা বিন জাদা নামক এক কবি এসে ফরিয়াদ করলে তিনি তাকে সাতটি উটনী এবং এক উট বোঝাই গম, যব, খেজুর ও কাপড় দিয়ে বিদায় করেন। [৪] এক সফরে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) তৃষ্ণার্ত বোধ করলেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর কাছে লোক পাঠালেন যিনি সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি তাঁকে মালামাল দিয়ে ধন্য করলেন। [৫]

আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে এক ব্যক্তি কোনো এক দানবীরের প্রশংসায় কবিতা পাঠ করলে তিনি বললেন: “এ তো কেবল আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-ই হতে পারেন।” [৬]

৭০ হিজরিতে তাঁর ভাই মুসআব (রহ.) ২০ হাজার ছাগল এবং ১ হাজার উট কোরবানি করে হিজাজের অধিবাসীদের মাঝে বণ্টন করেন। [৭] স্পষ্টতই এই আয়োজন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায়ই হয়েছিল, যাতে মক্কাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল।

[৮]

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৩৩৩/৫

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৩৩৩/৫, টীকা সহ।

[৩] তারিখ দিমাশক, ১৯২/২৮

[৪] তারিখ দিমাশক, ১৯৩/২৮

[৫] আনসাবুল আশরাফ, ৪১৩/৭, দারুল ফিকর।

[৬] তারিখ দিমাশক, ৯৩/২৮

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩০/১২; তারিখুত তাবারী, ১৫০/৬

জুবাইরি খিলাফতের পতনের কারণসমূহ:

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর খিলাফত আট বছর দশ মাস স্থায়ী ছিল। এর পতনের পেছনে আল্লাহর ইচ্ছার পর কিছু প্রকাশ্য কারণও দেখা যায়, যা নিম্নরূপ:

- ১. আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর যুগ ছিল ফিতনা-ফ্যাসাদে ভরপুর। খারেজি, মুখতার সাকাফি এবং তাদের চেয়েও বেশি সিরিয়াবাসী ছিল তাঁর ঘোর বিরোধী। জুবাইরি খিলাফতের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য একই সাথে এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করতেই ব্যয় হতো।
- ২. সেই সময়ের রাজনীতি ছিল গোত্রীয় নেতাদের সন্তুষ্ট করা এবং তাদের মন জয় করার। জুবাইরি খিলাফতের বিরোধীরা এই খাতে অকাতরে ব্যয় করত। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) উমর ফারুক (রা.)-এর অনুসৃত নীতি অবলম্বন করতেন, যা সেই সময়ের রাজনৈতিক নেতারা অপছন্দ করত। এর পরিবর্তে তারা সিরিয়াবাসীদের লেনদেন ভিত্তিক রাজনীতি পছন্দ করত।
- ৩. খিলাফতের কেন্দ্র প্রদেশগুলোর সাথে সুসংযুক্ত ছিল না, বরং প্রতিটি প্রদেশ তাদের নিজস্ব বিষয়াদি নিজেরাই পরিচালনা করত। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে নির্দেশনার প্রয়োজন হতো, তা খুব কমই জারি হতো। এই স্বায়ত্তশাসনের পরিবেশে নেতাদের জন্য সহজ ছিল যে, যখনই প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ থেকে চাপ আসত বা আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো, তখন তারা তাদের কাতারে চলে যেত।
- ৪. কেন্দ্র থেকে প্রদেশগুলোতে কোনো সাহায্য পৌঁছাত না, বরং কেন্দ্রকেই প্রতিটি পদক্ষেপে ইরাক থেকে সাহায্য চাইতে হতো। হিজাজ কখনোই এমন উৎপাদনশীল অঞ্চল ছিল না যে সেখানে পনের হাজার সৈন্য রাখা সম্ভব হতো। যদি রাখা হতো, তবে খাদ্যের মজুদ কমে যেত এবং প্রতিদিন রসদবাহী কাফেলা আনানোর প্রয়োজন হতো। তাই মক্কায় শেষ আক্রমণ পর্যন্ত প্রতিরক্ষার জন্য কোনো বড় বাহিনী ছিল না, মদিনাতেও ছিল না। জুবাইরি খিলাফতের সামরিক ঘাঁটিগুলো ইরাকে ছিল, যা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।
- ৫. কেন্দ্রের উভয় গুরুত্বপূর্ণ শহর মক্কা ও মদিনার কোনো প্রাচীর বা দুর্গ ছিল না। তাই যখনই শত্রু আক্রমণ করত, কোনো প্রতিরোধ হতো না।
- ৬. আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) মক্কাতে খিলাফতের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন, যা বাকি মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। যার ফলে এখান থেকে যাতায়াত, খাদ্য সরবরাহ, যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানসহ সমস্ত প্রশাসনিক কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে সম্পন্ন হতো। প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করে অগ্রগামিতা লাভ করত।
- ৭. বনু হাশিমের কিছু মুরাব্বি, যেমন: আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করেননি। এই পুরো সময়ে তারা নিরপেক্ষ ছিলেন। এতে আপনার জনপ্রিয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমর্থকদের মাঝে ঘাটতি দেখা দেয়।
- ৮. ইরাকে মুসআব বিন জুবাইর (রা.)-এর অভিযানের সময় মুখতার এবং তার অসংখ্য অনুসারী নিহত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় সেখানে অভ্যন্তরীণভাবে একটি শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হয়, যারা যুদ্ধের ময়দানে মুসআব বিন জুবাইর (রা.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে শহীদ করে এবং পরে এই লোকেরাই আবদুল মালিকের ডান হাত ও বাহুতে পরিণত হয়।
- ৯. জুবাইরি খিলাফত সিরিয়ার বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে কেবল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার ওপরই সন্তুষ্ট ছিল; একে খতম করাকে লক্ষ্য বানায়নি, বরং সিরিয়ার সীমানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং সেখানে কখনো কোনো সামরিক অভিযান বা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটায়নি। যেখানে আবদুল মালিক...

শাম, খেলাফতে জুবাইরিয়ার অবসানের জন্য অবিচল ছিল এবং একে সব দিক থেকে ক্ষতি পৌঁছাতে থাকে।

১০. খেলাফতে জুবাইরিয়া তাদের দাওয়াতকে সাধারণ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা তৈরি করেনি। প্রচার মাধ্যম, দাঈ, কবি এবং প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পুরো মুসলিম বিশ্বে মানসিক সচেতনতা তৈরির জন্য কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। যদিও এই খেলাফত কোনো জনপ্রিয়তা ছাড়াই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল, কিন্তু যখন প্রতিপক্ষ এই যুগের প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে খেলাফতে জুবাইরিয়ার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে শুরু করল, তখন অনেক মানুষ প্রতিপক্ষের প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে গেল।

১১. শামী প্রতিপক্ষ অত্যন্ত পরিকল্পনাকারী এবং রাজনীতিতে দক্ষ ছিল। তারা হৃদয় দিয়ে নয়, মস্তিষ্ক দিয়ে সিদ্ধান্ত নিত। যুদ্ধ ব্যবস্থায়ও তারা দক্ষ ছিল। তাদের জেনারেলরাও ছিল অত্যন্ত অভিজ্ঞ। অন্যদিকে পরিকল্পনার অভাব ছিল। সিদ্ধান্তগুলো আবেগপ্রসূত হতো। যুদ্ধ ব্যবস্থাও প্রতিপক্ষের তুলনায় দুর্বল ছিল এবং জেনারেলরা তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। যদিও উলামা, সালেহীন, আউলিয়া এবং নেককার লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মানসিকভাবে খেলাফতে জুবাইরিয়ার সমর্থক ছিল, কিন্তু সংঘাতের সময় শুধু তাদের দোয়া কোনো কাজে আসতে পারত না।

১২. আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর নিজস্ব রাজনৈতিক ভঙ্গি ছিল এই যে, সর্বোত্তম ব্যবহারিক নমুনা পেশ করা হোক এবং মানুষকে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা না করা হোক। যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাথে দেবে, তাদের অমুখাপেক্ষিতার সাথে গ্রহণ করা হবে। যারা পিছুটান দেবে, তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না। কিন্তু এই কর্মপদ্ধতির পরিমণ্ডলে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার মতো ব্যক্তিত্বরাও আসতেন, যারা বছরের পর বছর ধরে খলিফা ও শাসকদের পক্ষ থেকে হৃদ্যতা, সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে আসছিলেন। ফলে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব, যাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) কাঙ্ক্ষিত সমর্থন পেতে পারতেন, এই রাজনৈতিক পদ্ধতির কারণে কাছে আসতে পারেননি।

উম্মতের গর্বিত সম্পদ

জয়-পরাজয়ের সাময়িক বিতর্ক বাদ দিলে, এই বাস্তবতা তার নিজ স্থানে অটল যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এবং তাঁর ভাই মুসআব বিন জুবাইর (রহ.)-এর সীরাত উম্মতে মুসলিমাহর জন্য এক গর্বিত সম্পদ। তাঁদের অবস্থা পাঠ করলে আজও রগগুলোতে ঈমানি জোশ সৃষ্টি হয় এবং চোখ অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারে না।

এই ব্যক্তিবর্গ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে সিদ্দিকী পরিবারের এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যে, ইনশাআল্লাহ হাশরের ময়দানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত সাফিয়া (রা.), হযরত জুবাইর বিন আওয়াম (রা.), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) তাঁদের এই সন্তানদের জন্য গর্বিত হবেন। কী চমৎকার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সিদ্দীক-ই-আকবর (রা.)-এর মধ্যে যেখানে অন্যান্য অসংখ্য সাদৃশ্য ছিল, সেখানে উভয়ের নাতিরাও একই রকম ছিলেন। হিন্মত, প্রচেষ্টা ও জিহাদে এবং শাহাদাতেও; তাঁদের জীবনও এক ছিল এবং মৃত্যুও।

আল্লাহ তাআলা উম্মতের এই মহসিনদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ রহমত নাযিল করুন। আমীন।

সাহাবীগণের যুগ এবং পরবর্তী রাজনীতির তুলনা

খিলাফতে জুবাইরিয়্যার সমাপ্তির মাধ্যমে যা প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের নেতৃত্বের বরকতময় যুগের সমাপ্তি ছিল, আমরা একটু থেমে গত চল্লিশ বছরের পরিস্থিতির একটি পর্যালোচনা করি। ইতিহাসের এই যুগটি ৩৪ হিজরিতে হযরত উসমান গনি (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং ৭৩ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

যেহেতু এই যুগের রাজনীতিতে সাহাবায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাই এটি ইতিহাস, আকিদা এবং আদর্শের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। একে সাধারণ যুগের মতো ভাসাভাসাভাবে বোঝা সম্ভব নয় এবং এই কারণেই এই যুগের ঘটনাবলী বর্ণনা করার জন্য মুহাদ্দিসগণের গবেষণার পদ্ধতি এবং যাচাই-বাছাইয়ের পথ অবলম্বন করা জরুরি। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা ইতিহাসের এই নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুহাদ্দিসগণের মূলনীতিসমূহ বিবেচনায় রেখে পূর্ণ সতর্কতার সাথে আপনাদের সামনে পেশ করেছি। এই অধ্যয়নের ফলে যে পরিস্থিতি আমাদের সামনে এসেছে, তা দেখে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক দিক উজ্জ্বল হয় এবং চিন্তা-গবেষণার অনেক দ্বার উন্মোচিত হয়।

এই চল্লিশ বছরের সময়ে আমরা পাঁচজন শাসক সাহাবী, অর্থাৎ: হযরত উসমান গনি, হযরত আলী আল-মুরতাজা, হযরত হাসান বিন আলী, হযরত আমীর মুয়াবিয়া এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে বিভিন্ন যুগে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে দেখি। এই মহান ব্যক্তিদের রাজনীতির ধরণ, বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত, পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাঁদের কৌশল, অ-نصوصی (যেখানে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর পাঠ নেই) রাজনৈতিক মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে তাঁদের ফিকহী প্রজ্ঞা ও ইস্তিহ্বাত করার ক্ষমতা, বিরোধীদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্কতা—এই সব কিছুই আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা প্রদান করে। পরবর্তী ফকীহ এবং আইন্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের এই সকল আদর্শকে সামনে রেখেই শরয়ী মাসআলা বিশেষ করে ইসলামি রাজনীতির আদব ও মূলনীতিসমূহ সংকলন করেছেন। মুসলমানরা যখনই এই আদব ও মূল্যবোধ অনুসরণ করেছে, তারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তা, জাতীয় কল্যাণ এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির গ্যারান্টি। মুসলমানরা যখনই সামষ্টিকভাবে কোনো সংকটের শিকার হয়েছে, তার পেছনে ইসলামি শিক্ষা এবং সাহাবায়ে কেরামের সীরাত থেকে সাধারণ বিচ্যুতির একটি বড় ভূমিকা ছিল। কোনো রোগ কারণ ছাড়া সৃষ্টি হয় না; আর যখন পরিবর্তন বা ক্ষতি ব্যাপক হয়, তখন কারণটিও সেই পর্যায়েই হবে।

নিজের ইতিহাসে স্থানে স্থানে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক নয় যে, নাউযুবিল্লাহ ইসলামে কোনো ঘাটতি আছে। কখনোই নয়; বরং ঘাটতি থাকে সেই সামষ্টিক চেতনা বা জনমতে যা সমস্ত মুসলমান বা তাদের কোনো কোনো দল গ্রহণ করে নিয়েছে অথবা নেতৃত্বের সেই দুর্বল সিদ্ধান্তে থাকে যাতে ইসলামি শিক্ষা থেকে সচেতনভাবে বা অজান্তে বিচ্যুতি ছাড়া কখনো...

অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকে কিছু ত্রুটি থেকে যায়, যাকে আমরা রাজনৈতিক ভুল হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

সাহাবায়ে কেরামের যুগের পরেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমরা অধিকাংশ মুসলিম শাসককে রোজা ও নামাজের অনুসারী হিসেবে দেখতে পাই। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় শাসক, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়: ক্ষমতা গ্রহণের আগে এবং ক্ষমতা গ্রহণের পরে। ক্ষমতা গ্রহণের পর অধিকাংশ প্রখ্যাত শাসক জাতির কল্যাণকামী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর্যায়ে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষীদের সব ধরনের বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতে দেখি।

এটি ছিল সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগের শাসকদের সাধারণ প্রবণতা, যদিও কিছু শাসকের জীবন এর বিপরীত ছিল। অর্থাৎ, শাসনের আগে তাদের খ্যাতি এতটা খারাপ ছিল না, কিন্তু ক্ষমতার মসনদে বসে তারা দায়িত্বহীনতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছেন, যেমন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া। তবে এমন উদাহরণ কম।

প্রায়ই আমরা রাজনৈতিক ভুল এবং জুলুমের ধারাবাহিকতা ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে দেখতে পাই। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন জাগে যে, ইসলাম কি ক্ষমতা হস্তান্তরের এই নাজুক পর্যায়ে অতিক্রম করার জন্য কোনো সমাধান পেশ করেছিল কি না? যদি করে থাকে, তবে উম্মাহ তা থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কতটুকু হতে পারে?

ইস্তিনাসের মূলনীতি: সম্ভ্রুতি ও আগ্রহ:

চিন্তা করলে ইসলামী শিক্ষাগুলোতে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, যা ‘ক্ষমতা হস্তান্তর’ পর্যায়ে দেখা দেওয়া অগণ ٱ فিতনা ও বিপদ দূর করে দেয়। এই মূলনীতিটি হলো ‘ইস্তিনাস’, অর্থাৎ মানুষকে আপন করে নিয়ে তাদের সম্ভ্রুতি ও আগ্রহের সাথে তাদের ইমামত ও নেতৃত্বের বিষয়গুলো মীমাংসা করা।

‘ইস্তিনাস’ এজন্য জরুরি যে, এমনটি না করলে মনঃক্ষুব্ধতা, অভিযোগ, বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টি হবে, যা যেকোনো জাতি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। একারণেই নামাজের ইমামতিও সবচেয়ে বড় আলেম ও ক্বারীকে অর্পণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যদি এই গুণে একাধিক ব্যক্তি সমান হয়, তবে অধিক পরহেজগার ব্যক্তিকে এই সুযোগ দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যদি এই গুণগুলোতেও একাধিক ব্যক্তি সমান হয়, তবে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

নামাজের ইমামতির বিষয়টি মীমাংসা করার ক্ষেত্রে এত সূক্ষ্মতা কেন অবলম্বন করা হয়েছে? যাতে সামষ্টিক ইবাদত উপস্থিতদের ‘ইস্তিনাস’ ও হৃদয়ের প্রশান্তির সাথে সম্পন্ন হয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, বিভেদ না ছড়ায়। আর একারণেই মুক্তাদিদের সম্ভ্রুতি ও আগ্রহের বিরুদ্ধে ইমামতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটাই রহস্য যে, নিজে থেকে নেতৃত্ব ও পদ প্রার্থনা করার নিন্দা জানানো হয়েছে; কারণ যখন একটি পদের প্রত্যাশী অনেক লোক হবে, তখন নিশ্চিতভাবেই অন্তরে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ফাটল সৃষ্টি হবে। আর একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ গোত্রগুলোর ইসলাম গ্রহণের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী সরদারদেরই আমির হিসেবে বহাল রেখেছিলেন, কারণ মানুষ তাদের সাথেই পরিচিত ও সম্ভ্রুত ছিল। এটাই ছিল রহস্য যে, তিনি ٱ لا ائمة من قريش (নেতৃবৃন্দ কুরাইশ থেকে হবে) বাণী শুনিয়েছিলেন; কারণ আরবদের মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে সম্মানিত গোত্র এবং সামগ্রিকভাবে জাজিরাতুল আরবের সমাজ...

তাদের নেতৃত্বের সাথে পরিচিত ছিল, তাই সেই যুগে তাদের নেতৃত্বই সবার ‘আস্তিনাস’ এবং ঐক্যের কারণ হতে পারত।

শুরাইয়াত:

ইসলামী রাজনীতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো শুরাইয়াত, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘আস্তিনাস’ এরই ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই আস্তিনাসের জন্য শুরাইয়াত অপরিহার্য। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন এবং এর ব্যবহারিক শিক্ষাও দিতেন। ইসলামের আগে ‘ক্ষমতা লাভ’ এবং ‘ক্ষমতা হস্তান্তর’-এর একমাত্র মাধ্যম ছিল তলোয়ারের জোরে সরকার গঠন করা এবং চালানো। যদি কেউ শাসক হতো, তবে তার পরিষ্কার অর্থ ছিল এই যে, তার দল সবার চেয়ে বেশি শক্তিশালী, চাই সে চরিত্র ও নৈতিকতার দিক থেকে যেমনই হোক না কেন। এজন্য সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করত।

খিলাফতে রাশেদাহ-তে:

ইসলাম এই জরাজীর্ণ পদ্ধতি শেষ করে এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সাধারণ চেতনা দান করেছে যে, মানুষ আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম বানাত। যখন নবী করীম ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক[ؓ]-কে কোনো সামরিক শক্তি, কোনো জবরদস্তি বা কোনো গৃহযুদ্ধ ছাড়াই মাত্র একটি মজলিসে আলোচনার পর খলিফা নিযুক্ত করা হয়। হযরত উমর[ؓ]-এর জন্য শুরার মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি, নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি হওয়া এতটাই স্পষ্ট ছিল যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক[ؓ] কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করেছিলেন এবং কোনো বিরোধিতাও হয়নি। এটি ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার চরম শিখর। হযরত উমর[ؓ]-এর পর হযরত উসমান[ؓ] এবং হযরত আলী[ؓ] মর্যাদা ও স্তরের দিক থেকে প্রায় সমান মনে হতেন। এই দুজনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোনো চেষ্টা ছাড়াই হযরত উমর[ؓ] খিলাফতের জন্য যোগ্যতম ছয়জন ব্যক্তির মধ্যে তাদের নাম শীর্ষে রেখেছিলেন এবং ইস্তিসাওয়াব-এর বিশেষ ভোটদান পদ্ধতি বলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে নাগরিকদের কাছ থেকে সাধারণ মতামতও নেওয়া হয় এবং উম্মত হযরত উসমান[ؓ]-এর ওপর একমত হয়। কোনো গৃহযুদ্ধ হয়নি।

হযরত উসমান[ؓ]-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী[ؓ]-কেও মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে খলিফা নিযুক্ত করে। হযরত আলী[ؓ] হযরত হাসান[ؓ]-কে উত্তরসূরি বানাননি, বরং ইরাকের আহলে হল ও আকদ তাকেই নির্বাচিত করেন। আমীর মুয়াবিয়া[ؓ] যদিও হযরত আলী[ؓ] বা হযরত হাসান[ؓ]-এর হাতে বায়াত হননি, তবে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও যুদ্ধ সত্ত্বেও একটি নীতিগত বিরোধী দলের নমুনা পেশ করেছিলেন। এরপর যখন হযরত হাসান[ؓ]-এর খিলাফতের পালা এল, তখন তিনি উম্মতকে রক্তপাত থেকে বাঁচাতে আমীর মুয়াবিয়া[ؓ]-কে খিলাফত সাঁপে দেন এবং এভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়।

শুরাইয়াত থেকে ব্যক্তিগত শাসন পর্যন্ত সফর:

হযরত মুয়াবিয়া[ؓ]-এর যুগ ইসলামী বিজয়, ন্যায়বিচার এবং নির্মাণ ও অগ্রগতির দিক থেকে ঈর্ষণীয় ছিল, কিন্তু খিলাফতে রাশেদাহর তুলনায় এই যুগে কিছু পরিবর্তনও দেখা দিতে শুরু করেছিল। খিলাফতে রাশেদাহর পর আসা এই পরিবর্তনগুলো আকস্মিক এবং কারণহীন ছিল না, বরং বিগত ঘটনাবলির পরিবেশে এর ভিত্তি ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। যখন সিরিয়ায়

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

উসমান (রা.)-এর কিসাসের আন্দোলন যখন হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল, তখন উমাইয়া অভিজাতরাই এর প্রথম সারিতে ছিল। কারণ নিহত খলিফার উমাইয়া হওয়ার সুবাদে এই ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারী এবং এই হত্যা মামলার দাবিদার মনে করত। কিসাস আন্দোলনের পতাকাবাহী ব্যক্তিবর্গের নেক নিয়ত, মুখলিস, মুজতাহিদ এবং মাগফুর ও মাযুর হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আবার এটিও একটি প্রাকৃতিক নীতি যে, রাজনৈতিক ভুল কখনো নিষ্ফল হয় না, বিশেষ করে যখন যুদ্ধের উপক্রম হয়, তখন তার প্রভাব অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সিফফিনের যুদ্ধের আগে এবং পরে শামবাসীদের মধ্যে ইরাক ও হিজাজবাসীদের বিরুদ্ধে যে গোঁড়ামি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনিষ্টকারী উপাদানগুলো যেভাবে একে সুসংগঠিতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে বনু উমাইয়ার কটরপন্থীদের মধ্যে বনু হাশিমের বিরুদ্ধে নেতিবাচক আবেগ সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে ইরাকিদের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং তাদের অনেকেই বনু উমাইয়াকে নির্বিচারে বনু হাশিমের শত্রু মনে করে নিয়েছিল। এটিও ছিল একটি চরমপন্থী মনোভাব।

হযরত হাসান (রা.)-এর ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোকে যেখানে অধিকাংশ মুসলমান কুরবানি ও আত্মত্যাগের এক মহান দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করেছিল, সেখানে শামের একটি গোষ্ঠী একে নিজেদের তরবারির কর (খরাজ) হিসেবে গণ্য করে হুকুমতকে নিজেদের চূড়ান্ত অধিকার মনে করেছিল। নিশ্চিতভাবেই নবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক ও আত্মীয়তার কারণে সমস্ত মুসলমানের মতো বনু উমাইয়ার অধিকাংশ অভিজাত ব্যক্তিও বনু হাশিমকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত এবং তারা তাদের সাথে আত্মীয়তা ও আর্থিক উপটৌকনের ধারাও বজায় রেখেছিল। কিন্তু এই সম্মান ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বনু হাশিম রাজনীতির ময়দান থেকে দূরেই ছিল। হযরত হাসান (রা.)-এর নির্জনবাস অবলম্বনের পর প্রায় ৯২ বছর পর্যন্ত বনু হাশিমের কোনো ব্যক্তি মহান ইসলামী সাম্রাজ্যের কোনো অংশে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা অন্য কোনো উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হননি। যদিও বনু হাশিম নিজেরা পদের লোভ করেনি বরং পূর্ণ অমুখাপেক্ষিতার সাথে নির্জনবাসী ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো পদ গ্রহণ না করেই উমাইয়া পতাকাতলে জিহাদ করতে থাকত, কিন্তু উমাইয়া খলিফারাও তাদেরকে ক্ষমতায় বসানো রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী মনে করতেন। এই পরিস্থিতির কারণে পরামর্শ ও ঘনিষ্ঠতার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ওই প্রদেশগুলোতে যারা গৃহযুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থক বা নিরপেক্ষ ছিল, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উমাইয়া পরিবার বা উসমানী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই নিয়োগ দেওয়া হতে থাকে, যাতে হুকুমতের ওপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত থাকে। এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, উম্মতের অভিজাতদের একটি বিশেষ শ্রেণী উচ্চ পদগুলোতে সামনে আসতে লাগল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাধ্যবাধকতা:

সাধারণত মানুষ এই বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে দোষারোপ করে থাকে, যদিও এই সময়ের পরিস্থিতি, অতীতের ঘটনাবলির প্রেক্ষাপট এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাধ্যবাধকতাগুলোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সিফফিনের যুদ্ধে শামবাসীদের ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল। এই নিহতদের যদি ত্রিশ-চল্লিশ হাজার পরিবারের সদস্য হিসেবে গণনা করা হয়, তবে তা লাখে গিয়ে পৌঁছায়। ইরাকবাসীদের সাথে রাজনৈতিক সন্ধি হওয়া সত্ত্বেও সমাজের নিম্নস্তরে এই যুদ্ধের ক্ষত পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। যুদ্ধের আগে থেকেই কিসাসের আন্দোলন এবং যুদ্ধের পরের সংঘর্ষ ও উত্তেজনার পরিবেশে ইরাকে হাশিমী এবং শামে উমাইয়া গোঁড়ামিকে জাগিয়ে দিয়েছিল। হযরত হাসান (রা.)-এর সন্ধি এবং হুকুমত থেকে সরে দাঁড়ানো...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

যদিও ইরাকবাসীদের একটি গোষ্ঠী পুনরায় হাশেমী খিলাফত পুনরুজ্জীবিত করার আকাঙ্ক্ষী ছিল। এমন পরিস্থিতিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বনু হাশেমকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখাই উম্মতের জন্য উত্তম মনে করতেন যাতে পুনরায় কোনো গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা না থাকে। এছাড়া ওই পরিস্থিতিতে উসমানী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বা বনু উমাইয়ার ওপরই বেশি ভরসা করতে হতো, কারণ তাদেরই আত্মত্যাগ ও জানবাজির মাধ্যমে এই হুকুমত কায়েম হয়েছিল। এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় যে, যখন কোনো বিপ্লবের মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে, তখন দেশের শৃঙ্খলা ও শাসনভার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এবং প্রথম সারির কর্মীদের হাতেই আসে। কিসাসে উসমান বা উসমান হত্যার বিচারের আন্দোলন যা মূলত ন্যায়বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল, তা ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করেছিল। যখন হযরত হাসান (রা.) এই বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেক নিয়ত এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যোগ্যতা দেখলেন, তখন উম্মতকে রক্তপাত থেকে বাঁচাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা বিপ্লবীদের প্রথম সারির কাছে হস্তান্তর করলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই প্রথম সারির লোকদের নিয়ে কাজ করতে বাধ্য ছিলেন। এরাই ছিলেন তারা যাদের ওপর যেকোনো অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে আস্তা রাখা যেত।

এই কারণেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথেই কুফায় মুগীরা বিন শুবা (রা.) এবং মিশরে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই দুই ব্যক্তি উমাইয়া ছিলেন না বরং উসমানী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। বসরায় আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি এই আন্দোলনের নেতা এবং বনু উমাইয়ার উচ্চ বংশীয় ছিলেন। হিজাজে প্রথমে মারওয়ান বিন হাকাম এবং ৩৮ হিজরিতে সাঈদ বিন আস (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা উভয়েই উমাইয়া ছিলেন। ৫৩ হিজরিতে পুনরায় মারওয়ানকে নিযুক্ত করা হয়। ৫৭ হিজরিতে তার স্থলে একজন উমাইয়া শাহজাদা ওয়ালিদ বিন উতবাকে নিযুক্ত করা হয় যিনি দীর্ঘ সময় এই পদে বহাল ছিলেন।

৫০ হিজরিতে মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তার বৈমাত্রেয় ভাই যিয়াদকে পুরো ইরাকের শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি নিজের মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। ৫৩ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হলে তার পুত্র উবায়দুল্লাহকে খোরাসানের গভর্নর বানানো হয়। ৫৫ হিজরিতে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে খোরাসান থেকে সরিয়ে বসরার গভর্নর বানানো হয় এবং খোরাসানের গভর্নরের দায়িত্ব সাঈদ বিন উসমানকে দেওয়া হয়, তিনিও উমাইয়া ছিলেন। অন্যদিকে কুফার শাসকগণ পরিবর্তিত হতে থাকেন। [১]

এই পদাধিকারীদের যোগ্যতার ওপর কোনো আপত্তি তোলা যায় না। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মুত্তাকী, আলেম, ফাযেল এবং মুজাহিদ। তাদের মধ্যে বড় সংখ্যায় ছোট সাহাবী বা বড় তাবেয়ী ছিলেন, বরং মুগীরা বিন শুবা এবং আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতো বড় সাহাবীগণও মৃত্যু পর্যন্ত এই গভর্নরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এখানে উদ্দেশ্য শুধু এটি দেখানো যে কেন্দ্রীয় পদগুলোতে বনু উমাইয়া বা উসমানী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব স্পষ্ট ছিল। এই পরিস্থিতি কিছুকাল পর বনু উমাইয়ার নিছক পারিবারিক সরকারের রূপ ধারণ করে। এটি এমন এক বাস্তবতা যা অস্বীকার করা নিরর্থক এবং অনস্বীকার্য। কিন্তু যদি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উল্লিখিত বাধ্যবাধকতাগুলোর ওপর চিন্তা করা হয় তবে সেগুলোকে ক্ষমার যোগ্য হিসেবে বোঝা যেতে পারে।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ২০৩ থেকে ২২৫।

যদিও অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য গোত্রের যোগ্য ব্যক্তিদেরও উচ্চ পদ দেওয়া হয়েছিল, বরং মাঝারি পর্যায়ের পদগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য গোত্রের ব্যক্তিদেরই প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছিল।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

এই ধরনের বাধ্যবাধকতার কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মজলিসে এমন কিছু আমীর এবং অনুসারীও অনিবার্যভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা বনু হাশিমের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাকে উমাইয়া ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করত। এই কারণেই যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজের মজলিসে হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তেকালের খবর দিলেন, তখন এক ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল:

“জমরাতুন আতফাহাল্লাহ” (তিনি তো একটি স্ফুলিঙ্গ ছিলেন যাকে আল্লাহ নিভিয়ে দিয়েছেন)। [১]

হযরত আলী (রা.) মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশাল কর্মীবাহিনী রেখে গিয়েছিলেন যাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন এবং তাবয়ীনও। তাদের মধ্যে সেনাপতিও ছিলেন এবং রাজনীতিবিদও। উজিরও ছিলেন এবং উপদেষ্টাও। কিন্তু সাধারণভাবে তারাও গোত্রীয় বিদ্বেষের শিকার হন এবং তাদের মধ্যে গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া কেউ নতুন সরকারে জায়গা পাননি। শুধু তাই নয়, বরং মাঝেমাঝে তারা মৌখিক কটুক্তি ও নিন্দার লক্ষ্যবস্তুতেও পরিণত হতেন।

হযরত উসমান বিন হানিফ (রা.), যাকে হযরত আলী (রা.)-এর যুগে বসরার গভর্নর বানানো হয়েছিল, তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর পুরনো অভ্যাস ছিল যে তিনি খলিফাদের “আইয়্যুহাল আমীর” বলে সম্বোধন করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনকেও তিনি একইভাবে সম্বোধন করে আসছিলেন। কিন্তু দামেস্কের দরবারে “আমীরুল মুমিনীন”-এর পরিবর্তে তাঁর “আইয়্যুহাল আমীর” বলা সহ্য করা হলো না। কিছু লোক এতে রাগান্বিত হয়ে ভরা মজলিসে হযরত উসমান বিন হানিফ (রা.)-কে “মুনাফিক” বলে ফেলল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর ওপর উসমান বিন হানিফ (রা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বীকার করলেন যে, সিরিয়াবাসীরা ফিতনার যুগের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে নিজেদের নেতাদের ব্যাপারে অন্ধ অনুরাগী হয়ে গেছে। [২]

এই গোঁড়ামির অনিবার্য ফল ছিল এই যে, বনু উমাইয়া উচ্চ সরকারি পদগুলোতে আলভী খিলাফতের কর্মকর্তাদের সহ্য করত না। (দু-একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ থাকতে পারে)। এই পরিস্থিতির কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে বনু উমাইয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বনু উমাইয়ার ওপর নির্ভরতা অনিবার্য হওয়ার কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কিছু পদ এমন লোকদের দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন যাদের সম্পর্কে পরবর্তীতে অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে তারা ওই পদগুলোর যোগ্য ছিল না, যেমন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। ৫৩ হিজরিতে তার বয়স ছিল মাত্র একুশ বছর যখন তার পিতা যিয়াদের মৃত্যু হয়। উবায়দুল্লাহ তৎক্ষণাৎ দামেস্কে পৌঁছাল।

[১] আবু দাউদের এই বর্ণনা থেকে যেমন জানা যায় যে সিরিয়ায় একদল উগ্র মেজাজের লোকও ছিল, তেমনি এই বর্ণনা এও জানায় যে তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার মতো লোকও সেখানে সবসময় উপস্থিত ছিল। যেমন ওই ব্যক্তির এই কথার ওপর ওই মজলিসেই উপস্থিত একজন সম্মানিত মেহমান হযরত মিকদাম বিন মাদি কারিব (রা.) তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৭২২৮; আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তবারানী, ২০/২৬৯, তবা মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ; সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪১৩৩, বাবু ফি জুলুদুন নুমুরি ওয়াস সিবাযি, আলবানী বলেছেন: সহীহ)

[২] আমাদের কাছে ইসহাক বিন ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মা’মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: উসমান বিন হানিফ মুয়াবিয়া (রহ.)-কে সালাম দিলেন এবং বললেন: আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহাল আমীর! তাঁর কাছে সিরিয়ার একদল লোক ছিল, তারা বলল: “এই মুনাফিকটি কে যে আমীরুল মুমিনীনের অভিবাদনে ত্রুটি করল?” তখন উসমান মুয়াবিয়াকে বললেন: “এরা আমার সম্পর্কে এমন কিছু জেনেছে যা আপনি ভালো জানেন, অথচ আমি আবু বকর, উমর ও উসমান (রহ.)-কেও এভাবেই অভিবাদন জানিয়েছি।” তখন মুয়াবিয়া বললেন: “আমি মনে করি তিনি যা বলছেন তার কিছু সত্যতা আছে, কিন্তু সিরিয়াবাসীরা যখন ফিতনা দেখা দিল তখন বলল: আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই আমাদের ধীনকে জানব এবং আমাদের নেতার অভিবাদনে ত্রুটি করব না। আর হে মদিনাবাসী! আমি তোমাদের বিরোধিতা করছি কারণ তোমরা সদকা গ্রহণকারীদেরও আমীর বলো।” (আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তবারানী: ২/৯ সহীহ সনদে)

এবং তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পদ প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। দুই বছর পর তাকে বসরার শাসনভার প্রদান করেন। [১] ৫৯ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আহনাফ ইবনে কায়েসের পরামর্শে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু বনু উমাইয়াদের মধ্যে তার কোনো বিকল্প না পাওয়ায় কয়েকদিন পর তাকে পুনরায় সেই পদে বহাল করেন। [২]

অন্যান্য উমাইয়া আমীরদের মতো এই যুবকও ছিল একজন দক্ষ তলোয়ারবাজ ও যোদ্ধা, কিন্তু সে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলী থেকে বঞ্চিত ছিল। মানুষ তার উগ্র মেজাজে অতিষ্ঠ ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ন্যায়বিচার, প্রজ্ঞা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের কারণে এ ধরনের উগ্রপন্থী লোকেরা তার জীবদ্দশায় নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু তার পরে এ ধরনের লোকদের একাধিপত্য বৃদ্ধি পায় এবং ইয়াজিদের শাসনামলে তাদের লাগামহীনতা অনেক দুর্ঘটনা ও ট্র্যাজেডির জন্ম দেয়। এভাবে রাজনীতিতে একটি বিশেষ শ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে অনেক মানুষ ইসলামী রাজনীতির মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়।

ইমারাতুস সিবইয়ান

সুন্নাহর ব্যাখ্যাকারদের মতে, এটিই সেই যুগ যাকে হাদিসে ‘ইমারাতুস সিবইয়ান’ (বালকদের শাসন) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে: “আরবদের জন্য নিকটবর্তী অনিষ্ট থেকে ধ্বংস অনিবার্য, যা হলো বালকদের শাসন; যদি মানুষ তাদের আনুগত্য করে তবে তারা তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর যদি আনুগত্য না করে তবে তারা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবে।” [৩]

একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মারওয়ানের মুখের ওপর বলেছিলেন: আমি সত্যবাদী ও সত্য প্রত্যায়নকারী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে: “আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশদের কয়েকজন বালকের হাতে হবে।” মারওয়ান এটি শুনে বলল: “সেই বালকদের ওপর আল্লাহর লানত।” এর ওপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন: “তুমি চাইলে আমি নাম ধরে বলে দিতে পারি যে, অমুকের পুত্র অমুক উদ্দেশ্য।” [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/ ২৯৪, ২৯৬, ২৯৭

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/ ৩৩৩

[৩] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবদের জন্য নিকটবর্তী অনিষ্ট থেকে ধ্বংস অনিবার্য, বালকদের শাসন; যদি তারা তাদের আনুগত্য করে তবে তারা তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবে এবং যদি তারা তাদের অবাধ্য হয় তবে তারা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৭৫১, তাবা আর-রুশদ) এর সনদ সহীহ ও মুত্তাসিল।

[৪] আমি সত্যবাদী ও সত্য প্রত্যায়নকারীকে বলতে শুনেছি: আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশদের কয়েকজন বালকের হাতে হবে। মারওয়ান বলল: সেই বালকদের ওপর আল্লাহর লানত। তখন আবু হুরায়রা (রা.) বললেন: তুমি চাইলে আমি তাদের নাম বলে দিতে পারি যে, অমুক বংশের অমুক এবং অমুক বংশের অমুক। (সহীহ বুখারী, হা: ৩৬০৫, আল-মানাকিব, আলামাতুন নুবুওয়াহ; হা: ৭০৫৮, কিতাবুল ফিতান, বাবু হালাকি উম্মাতি)। এই বর্ণনাটি মুসনাদে আহমদে কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সব জায়গাতেই এটি মারফু বর্ণনা।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

“এই হাদিসে সেই কথারও দলিল রয়েছে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, সুলতান জালেম হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না; কারণ নবী করীম (সা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে এ ধরনের লোক এবং তাদের পিতাদের নাম পর্যন্ত বলে দেওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নির্দেশ দেননি; কারণ বিদ্রোহ করা তাদের আনুগত্যের তুলনায় অধিক ধ্বংস ও সমূলে বিনাশের কারণ হবে। সুতরাং তিনি দুটি মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত হালকা মন্দ এবং দুটি কাজের মধ্যে সহজতর কাজটিকে গ্রহণ করেছেন। সতর্কতা: মারওয়ানের সেই বালকদের ওপর লানত করা আশ্চর্যজনক মনে হয়, যদিও এটি স্পষ্ট যে এ ধরনের বালকরা তার সন্তানদের মধ্য থেকেই ছিল। মনে হয় আল্লাহ তার মুখে এই কথাটি এজন্য জারি করিয়েছেন যাতে তাদের ওপর পুরোপুরিভাবে হুজ্জত কায়েম হয়ে যায় এবং সম্ভবত তারা উপদেশ গ্রহণ করে।” (ফাতহুল বারী: ১৩/ ১১)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের নির্বোধ বালকদের হাতে হবে। [১]

একটি বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন: “৬০ হিজরি এবং বালকদের শাসন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।” [২]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এক স্থানে এটিও বর্ণিত আছে:

“আমার এই থলিতে এমন একটি হাদীস আছে যা আমি বর্ণনা করলে তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে।”

তারপর দুআ করলেন: “হে আল্লাহ! আমি যেন ৬০ হিজরির শুরুতে না পৌঁছাই। (হে আল্লাহ! আমাকে ৬০ হিজরি পর্যন্ত পৌঁছাবেন না।)”

লোকেরা জিজ্ঞেস করল: “৬০ হিজরি কী?”

বললেন: “বালকদের শাসন, পদ বিক্রি, পুলিশের আধিক্য, চেনা-জানার কারণে সাক্ষ্য দেওয়া, আমানতকে গণীমত মনে করা, যাকাতকে জরিমানা মনে করা এবং কিছু যুবক কুরআনকে বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে নেওয়া এবং রক্ত সস্তা হয়ে যাওয়া।” [৩]

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ) ইবনে আবি শায়বার বরাতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) সম্পর্কে নকল করেছেন: “হযরত আবু হুরায়রা (রা) বাজারে চলতে চলতে বলতেন: হে আল্লাহ! আমি যেন ৬০ হিজরি এবং বালকদের শাসন পর্যন্ত না পৌঁছাই।” [৪]

আবার হাফেজ ইবনে হাজার (রহ) বলেন: “এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে বালকদের প্রথম শাসন ৬০ হিজরিতে হবে এবং এটি এভাবেই হয়েছিল যে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সেই বছর খলিফা হয়েছিল।” [৫]

[১] হালাকু উম্মতি আলা ইয়াদায় গিলমানিন সুফাহা মিন কুরাইশ। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬৭১২, আল-আজমি বলেছেন: এর সনদ শায়খাইনের শর্ত অনুযায়ী সহীহ)। এভাবে এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই কুরাইশী বালকরা ধ্বংসের কারণ হবে। অর্থাৎ তারা জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং উন্নত চরিত্র থেকে বঞ্চিত হবে। দূরদর্শিতার অভাব এবং ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তারা উম্মতকে কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন করবে।

[২] তাআউউজ্জু বিল্লাহি মিন রা'সিস সিভিন ওয়া মিন ইমারাতিল সিবিয়ান। (কানযুল উম্মাল, হা: ৩০৮৫৩)।

[৩] আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানি, হা: ১৩৯৭। এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য তবে আলী বিন যায়েদ বিন জুদআন ব্যতীত; ইবনে হাজার বলেছেন: “দুর্বল কিন্তু পরিত্যাজ্য নয়।” (তাহযীবুত তাহযীব, জীবনী নম্বর: ৪৩৩)।

[৪] “ইম্মা আবাহুরায়রা ইয়ামশি ফিস-সুকি ওয়া হুয়া ইয়াকুলু: আল্লাহুমা লা তুদরিকনি সানাতা সিভিন ওয়া লা ইমারাতাস সিবিয়ান।” (ফাতহুল বারী: ১০/১৩)।

[৫] এসব বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে ৬০ হিজরির উল্লেখ একটি মাকতু বর্ণনা, অর্থাৎ এটি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বক্তব্য, মারফু হাদীস নয়। তবে এমন কথা নিজের পক্ষ থেকে বলা সম্ভব নয়, তাই ধারণা করা হয় যে হযরত আবু হুরায়রা (রা) এটি নবী করীম (সা) থেকে শুনে থাকবেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ) লিখেছেন: “হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আমি সত্যবাদী ও সত্যায়িত (রাসূল সা) থেকে শুনেছি: হালাকাতু উম্মতি আলা ইয়াদায় গিলমানিন মিন কুরাইশ। (আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কিছু বালকের হাতে হবে)। আর সম্ভবত হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূল (সা) সেই শাসকদের নামও বলে দিয়েছিলেন, তাই তিনি দুআ করতেন: ‘আল্লাহুমা লা তুদরিকনি সানাতা সিভিন ওয়া লা ইমারাতাস সিবিয়ান’ (হে আল্লাহ! আমাকে ৬০ হিজরি এবং বালকদের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত রাখবেন না)।” (ফাতহুল বারী: ১৩/১০)। সংক্ষেপে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ) এবং অধিকাংশ হাদীস ব্যাখ্যাকার এই বর্ণনাগুলোকে ইয়াজিদের শাসনামলের ওপর প্রয়োগ করেছেন। হাদীসে “ইমারাতুস সিবিয়ান” (বালকদের শাসন)-কে ফিতনা এবং মন্দের উৎস বলা হয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণ এই বর্ণনাগুলোকে ৬০ হিজরি এবং ইয়াজিদের শাসনের ওপর প্রয়োগ করেন; কারণ ইয়াজিদ, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং আমর বিন সাঈদ সেই যুবক ছিল যাদের হাতে বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো ঘটেছিল। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ) এই বর্ণনার ব্যাখ্যায় লিখেছেন: “ওয়া ফী হাজা ইশারাতুন ইলা আন্না আউওয়ালাল আগলিমা কানা ফী সানাতা সিভিন ওয়া হুয়া কাজালিকা ফা-ইম্মা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া ইস্তাখলাফা ফীহা।” (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে বালকদের প্রথম শাসন ৬০ হিজরিতে ছিল এবং এটি এমনই ছিল কারণ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এতে খলিফা নিযুক্ত হয়েছিল)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে ইয়াজিদ ছিল প্রথম যুবক যে বড়দের কাছ থেকে শহরগুলোর শাসনভার কেড়ে নিয়েছিল এবং তাদের জায়গায় নিজের আত্মীয় ও অল্পবয়সী লোকদের নিযুক্ত করেছিল। (ফাতহুল বারী: ১৩/১০)।

৭০ হিজরির ফিতনার দিকে হাদিসে ইঙ্গিত:

কিছু হাদিসে ৭০ হিজরির ফিতনার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন একটি বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ৭০ হিজরির শুরু এবং বালকদের শাসন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। [১]

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ৭০ হিজরিতে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতের বিপরীতে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের বিদ্রোহী সরকার শক্তিশালী হতে থাকে। এই বছরই আব্দুল মালিক রোমানদের সাথে সন্ধি করে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর জেনারেলদের নিজের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেন, যার ফলে ইরাক থেকে জুবায়েরি খিলাফতের অবসান ঘটে এবং ৭৩ হিজরিতে মক্কায় অবরোধের সময় আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। [২]

নিশ্চিতভাবে এই যুগে যে গৃহযুদ্ধগুলো হয়েছিল তাতে উগ্র মেজাজের কুরাইশ যুবকদের হাত ছিল। হাদিসে এই যুগের ফিতনাগুলোর দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এবং এই ফিতনাগুলো থেকে সতর্ক করে তাতে অংশ নেওয়ার পরিবর্তে নির্জনতা অবলম্বন, একাগ্রতা এবং পরহেজগারির জীবন কাটানোর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

কিছু লোক ‘ইমারাতুস সিবইয়ান’ (বালকদের শাসন)-এর প্রয়োগ উমাইয়া শাসকদের ওপর করতে এই কারণে অস্বীকার করেন যে, ‘সিবইয়ান’ মানে ‘শিশু’ এবং ইয়াজিদ, ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ প্রমুখ শিশু ছিলেন না বরং পূর্ণ যুবক ছিলেন। এটি একটি শাব্দিক ভুল। হাদিসে এই যুবকদের রূপকভাবে ‘সিবইয়ান’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথা ও বাগধারায় বড়দের উপস্থিতিতে ছোটদের ‘শিশু’ বলা একটি সাধারণ বিষয়। অভিজ্ঞ ও বরণ্য ব্যক্তিদের সামনে আনাড়ি ও অযোগ্যদেরও ‘শিশু’ বলা হয়। এই দিক থেকে হযরত হুসাইন, হযরত আনাস, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মতো ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ইয়াজিদ ও ইবনে জিয়াদ শিশুরাই ছিল, যদিও তারা দেখতে পূর্ণ যুবক কেন না হোক।

যদি হাদিসের শব্দগুলোকে প্রকৃত অর্থে অর্থাৎ নাবালক বালকদের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তবে বিষয়টি অনেক দূরে চলে যাবে। কারণ মুসলমানদের ইতিহাসে প্রথম নাবালক বালককে ২৯৫ হিজরিতে শাসক বানানো হয়েছিল। সে ছিল আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ, যার বয়স তখন তেরো বছর ছিল। অথচ সমস্ত হাদিস বিশারদ একমত যে, ‘ইমারাতুস সিবইয়ান’ হাদিসের সম্পর্ক প্রথম হিজরি শতাব্দী এবং উমাইয়া যুগের সাথে।

[৩]

[১] ইয়াহইয়া ইবনে আবি বকর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কামিল আবুল আলা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমি আবু সালেহ থেকে শুনেছি, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমরা ৭০ হিজরির শুরু এবং বালকদের শাসন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। (মুসনাদে আহমদ: ৮৩২০)

বর্ণনাকারীদের অবস্থা: আবু সালেহ জাকওয়ান, নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ়। (তাকরিবুত তাহজিব, নং: ১৮৩১)

আবুল আলা কামিল: সত্যবাদী। (তাকরিবুত তাহজিব, নং: ৫৬০৩) ইয়াহইয়া বিন আবি বকর: নির্ভরযোগ্য। (তাকরিবুত তাহজিব, নং: ৭৬১১)

ইবনে আবি শাইবা তার মুসান্নাফে এটি বর্ণনা করেছেন (হাদিস: ৩৭২৩৫, আর-রুশদ সংস্করণ), এর সনদ সহিহ ও মুত্তাসিল: ওকি’ থেকে কামিল থেকে আবু সালেহ থেকে আবু হুরায়রা (রা.)। এই সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/১৫০, ১৫৭, ১৭১; আনসাবুল আশরাফ: ৫/৩৯৩, দারুল ফিকর সংস্করণ।

[৩] যেমন হাদিসে এসেছে: তোমরা ৭০ হিজরির শুরু এবং বালকদের শাসন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ৮৩২০) এটি একে পুরোপুরিভাবে প্রমাণিত করে দিয়েছে।

তারিখ উম্মত মুসলিমাহ

ইমারাতুস সিবইয়ানে আবু বারযা আসলামি (রা.)-এর অবমাননা:

ইয়াজিদের কিছু গভর্নর সাহাবায়ে কেরামকে অবমাননা ও লাঞ্ছিত করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছিল। তাদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ সবার আগে ছিল। সে একবার আবু বারযা আসলামি (রা.)-কে দেখে দরবারের সামনে চিৎকার করে বলল:

إِنَّ مُحَمَّدِيَكُمْ هَذَا الدُّحَا حُ

“এই হলো তোমাদের খাটো ও স্থূলকায় মুহাম্মাদি.....” (নাউযুবিল্লাহ)

হযরত আবু বারযা (রা.) তার কথা বুঝতে পারলেন (তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে তাকে স্থূলকায় ও খাটো বলাকে উপেক্ষা করলেন, কিন্তু সে “মুহাম্মাদি” বলে যে বিদ্রূপ করেছিল, তা তিনি সহ্য করতে পারলেন না) এবং বললেন: “আমি ভাবিনি যে আমি এমন লোকদের জন্ম হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকব যারা আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্য লাভের জন্য লজ্জা দেবে।”

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ (কথা ঘুরিয়ে) বলতে লাগল: “মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্য আপনার জন্য অলঙ্কার, কোনো দোষ নয়।” [১]

আইয বিন আমর (রা.)-এর অবমাননা:

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কঠোরতা দেখে কিছু প্রবীণ সাহাবী তাকে বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু সে তাদেরকেই ধমকাতে লাগল। হযরত আইয বিন আমর (রা.), যিনি বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত একজন প্রবীণ সাহাবী ছিলেন, উপদেশের উদ্দেশ্যে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে গেলেন এবং বললেন: “হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নিকৃষ্টতম শাসক তারাই যারা কঠোর হয়, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকো।”

এই উপদেশপূর্ণ কথা এবং নববী বাণীর জবাবে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ অহংকারের সাথে উত্তর দিল: “বসে যাও। তুমি তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের আবর্জনা।”

সাহাবী বললেন: “সাহাবীদের মধ্যেও কি কোনো আবর্জনা থাকতে পারে? আবর্জনা তো তারা যারা তাদের ছাড়া অন্য এবং তাদের পরবর্তী।” [২]

আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.)-এর সাথে ইবনে যিয়াদের আচরণ:

হযরত হাসান বসরী (রহ.) উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের আগমন এবং তার চরিত্রের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ এভাবে বর্ণনা করেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ গভর্নর হয়ে আমাদের কাছে আসে। সে ছিল এক নির্বোধ ও অল্পবয়সী যুবক যে রক্তপাতে অত্যন্ত বেপরোয়া ছিল। আমাদের এখানে আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.)-ও ছিলেন, যিনি সেই দশজন ব্যক্তির একজন ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) শিক্ষক হিসেবে বসরায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি জুমার দিন উবায়দুল্লাহর ঘরে তাশরিফ নিয়ে...”

[১] সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৭৩৯, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিল হাওয়।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ১৮৩০, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ফাযিলাতিল ইমামিল আদিল।

আইয বিন আমর (রা.) ৭১ হিজরিতে অর্থাৎ ইয়াজিদের যুগে মৃত্যুবরণ করেন। (আল-ইসতিয়াব, ৪/৯৯, আল-ইসাবাহ)

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ যদিও হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে বসরার গভর্নর হয়েছিল, তবে প্রবল ধারণা এটাই যে, প্রবীণ সাহাবীদের সাথে বেয়াদবি করার সাহস তার ইয়াজিদের যুগেই হয়েছিল যখন তাকে বসরার সাথে সাথে কুফা অর্থাৎ পুরো ইরাক, হামদান, খোরাসান এবং আল-জাযিরার শাসক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গেলেন এবং তাকে বললেন: “আপনার আচরণ থেকে বিরত থাকুন। নিকৃষ্টতম শাসক তারাই যারা কঠোর প্রকৃতির হয়।”

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ বলতে লাগল: “তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে নিচু স্তরের লোক ছাড়া আর কী?”

আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) বললেন: “সাহাবীদের মধ্যে কি কেউ নিচু স্তরের হতে পারে? তারা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও মহৎ লোক। সাক্ষী থেকে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো শাসক যদি তার প্রজাদের সাথে প্রতারণা করে একটি রাতও অতিবাহিত করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।”

একথা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং মসজিদে গিয়ে বসলেন। আমরা তার চারপাশে ছিলাম এবং তার চেহারায় সেই কষ্ট অনুভব করছিলাম যা উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা বললাম:

“আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! সবার সামনে এই নির্বোধকে একথা বলার আপনার কী প্রয়োজন ছিল?”

আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) বললেন: “আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিসটি সংরক্ষিত ছিল, আমি চেয়েছিলাম মৃত্যুর আগে এটি প্রকাশ্যে বর্ণনা করে যেতে। হায়! যদি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের ঘরে সমস্ত বসরাবাসী জায়গা পেত। তারা সবাই সেখানে সমবেত হতো যাতে আমার ও তার কথোপকথন শুনতে পেত।”

হাসান বসরী (রহ.) বলেন যে, এরপর আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) মৃত্যুশয্যা় আক্রান্ত হলেন। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ তাকে দেখতে এল এবং বলতে লাগল: “আপনি কি চান যে আমরা আপনার জন্য কিছু করি?”

আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) বললেন: “তুমি কি সত্যিই করবে?”

সে বলল: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

তিনি বললেন: “আমি চাই তুমি আমার জানাঘার নামাজ পড়বে না এবং আমার কবরেও আসবে না। আমার এবং আমার সাথীদের মাঝে অন্তরায় হবে না।” [১]

ইয়াজিদ থেকে মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ পর্যন্ত:

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পূর্ণ সদিচ্ছার সাথে ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.), হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) এবং আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রা.) ইসলামী রাজনীতিতে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার কুফল প্রবেশের আশঙ্কা প্রকাশ করে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবদ্দশাতেই এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন। তবে তারা যুদ্ধ ও বিবাদের পথ পরিহার করেছিলেন।

[১] ইবনে আবি আসিম ‘আল-আহাদ ওয়াল মাসানি’ হা: ১০৯২; ইবনে হারুন আল-রুয়ানি (মৃ. ৩০৭ হি.) ‘মুসনাদ আল-রুয়ানি’ হা: ১১১১; এবং ইবনে হাকমুন আল-কুদায়ি (মৃ. ৩৫৩ হি.) ‘মুসনাদ আল-শিহাব’ হা: ৮০৬-এ এটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদ আল-রুয়ানি-তে এই বর্ণনাটি হাসান বসরীর পরিবর্তে ওহাব বিন কায়সান থেকে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। শেখ আলবানী এর সনদকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

নোট: আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে: ৫৭ হি., ৬০ হি., ৭০ হি.। প্রবল ধারণা হলো তার মৃত্যু ৬১ হিজরিতে হয়েছে, অর্থাৎ ইয়াজিদের শাসনামলে। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা ইয়াজিদের আমলের; কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলে শাসকরা এ ধরনের অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে পারত না।

ইয়াজিদের ক্ষমতা শুরু হলো তো মতামতের এই পার্থক্য ছড়িয়ে পড়ল এবং গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হতে লাগল। তবে হযরত হুসাইন (রা.)-এর শেষ পদক্ষেপটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, তিনি ক্ষমতার হস্তান্তর বা ব্যবস্থার সংস্কার “ইস্তিনাস”-এর মাধ্যমেই চেয়েছিলেন। তাই কুফাবাসীদের প্রত্যাশার বিপরীতে ক্ষমতাসীনদের কাতারে দেখার পর তিনি নিজেও ইয়াজিদের সাথে দেখা করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গুলো মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ সম্পন্ন হতে দেয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) তাঁর ফতোয়ার ভিত্তিতে ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণে অবশ্যই বিলম্ব করেছিলেন, কিন্তু নিজে খেলাফতের ঘোষণা দেননি এবং উম্মাহকে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন। যদিও ইয়াজিদ কোনো ছাড় না দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল, যা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে উত্তরসূরি বানানোর যে পরীক্ষা করেছিলেন, তা বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিল। ফলে তাঁর নাতি মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ বংশানুক্রমিক শাসনের “পৌনে চার বছরের টেস্ট কেস” সমাপ্ত করে শাসনব্যবস্থাকে পুনরায় উম্মাহর শুরাইয়াত (পরামর্শ ব্যবস্থা)-এর হাতে সোপর্দ করে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) এবং উমাইয়া আমিরদের সংঘাত:

মিসর থেকে খোরাসান পর্যন্ত পুরো উম্মাহ কোনো বিলম্ব ছাড়াই এই বিরল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। এই খেলাফতের জন্য কোনো সামরিক অভিযান চালানো হয়নি বা কাউকে কেনা হয়নি। সর্বত্র সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সাথে বায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঘটনাটি উম্মাহর ইতিহাসে অত্যন্ত সিদ্ধান্তমূলক ছিল। উম্মাহ পুনরায় ইস্তিনাস এবং শুরাইয়াতের ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসছিল।

সেই সময় বনু উমাইয়া এবং সিরিয়ার আমিরদের মধ্য থেকে কিছু রাজনীতিবিদ চরম গোঁড়ামির পরিচয় দিয়ে এই খেলাফত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বিষয়টি তলোয়ারের জোরে সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেন। যেন তাদের অবস্থান ছিল এমন যে, খেলাফত কেউ যদি শক্তির জোরে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে তবে যেন দিয়ে দেখায়, আমরা আলাপ-আলোচনা, আলোচনা বা যুক্তির শক্তিতে বিশ্বাস করি না; বরং আমরা তলোয়ারের জোর এবং রাজনৈতিক কূটকৌশলের মাধ্যমে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারলে অবশ্যই ছিনিয়ে নেব।

এটি ছিল ইসলামী রাজনীতির ইস্তিনাস নীতি এবং শুরাইয়াত নীতি থেকে প্রকাশ্য বিচ্যুতি। একদিকে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.), নুমান ইবনে বশীর (রা.), যাহহাক ইবনে কায়েস (রা.), আনাস ইবনে মালিক (রা.) এবং আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.)-এর মতো বরণ্য ব্যক্তিবর্গসহ পুরো উম্মাহ ছিল, আর অন্যদিকে মারওয়ান, উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এবং আমর ইবনে সাঈদের মতো কয়েকজন আমির। যদি এই লোকেরা কেন্দ্রের অধীনে চলে আসত, তবে ইসলামের ইতিহাসের মোড় অন্যরকম হতো এবং বিজয় ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগ শুরু হতো। কিন্তু তাদের ভুল চিন্তার ফলে সেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল যা দৃশ্যত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত চলেছিল, কিন্তু বাস্তবে তা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। কারণ জনমত এবং জনগণের সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে শক্তি ও প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং শক্তির জোরে রাজত্ব করা ছিল জাহেলিয়াত যুগের রীতি। এতে পদমর্যাদার মোহ, সম্পদের লালসা, নৈতিকতার অবক্ষয়, প্রাণের বিনাশ এবং জাতিসমূহের বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নেই। ইসলাম এই প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, তাই এগুলোর সমষ্টিগত পদক্ষেপকে কীভাবে বৈধ ঘোষণা করতে পারে?

কিন্তু আফসোস যে এমনটাই হয়েছে। যখন এই রাজনীতিবিদরা তলোয়ারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করলেন, তখন পরবর্তীকালে অধিকাংশ মুসলিম রাজনীতিবিদ এই শাসন পদ্ধতিকেই ক্ষমতার এবং একেই সফল রাজনীতির মাধ্যম মনে করলেন। এটাই ছিল বিবাদ ও গৃহযুদ্ধের মূল কারণ।

তলোয়ারের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে ইসলামের বার্তা হলো তলোয়ার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক জিহাদ, নিজেদের সীমান্ত রক্ষা অথবা নিরুপায় অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ব্যবহৃত হবে। একজন নেককার ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতিষ্ঠিত শরয়ী সরকারকে তলোয়ারের জোরে ছিনিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেই। কিন্তু হিজরি প্রথম শতাব্দীতে যখন উম্মাহর কিছু রাজনীতিবিদ সাহাবায়ে কেরামের ক্ষমতার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তার সাথেই ইসলামী রাজনীতির সোনালী যুগের সমাপ্তি ঘটল। সেই সোনালী যুগ যা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, অন্যদের ছড়ানো ফিতনা, কিছু গৃহযুদ্ধ এবং কিছু রাজনৈতিক ভুল থাকা সত্ত্বেও ইসলামী রাজনীতির ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক ও আদর্শ ছিল। কারণ এতে আদর্শ ছিলেন সেই মহান ব্যক্তিগণ যাদের বক্ষে “রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু” এর পদক জ্বলজ্বল করছিল।

যখন উম্মাহর রাজনীতিবিদরা হৃদয়তা, পরামর্শ এবং সন্তুষ্টি ও সম্মতির ইসলামী রাজনীতি ত্যাগ করে শক্তি ও সামরিক রাজনীতি গ্রহণ করলেন, তখন সমাজ আর সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ যেমন—সুদূরপ্রসারী ও নেককার নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধিত্ব, ন্যায়বিচার, অধিকার প্রদান, সত্য বলার স্বাধীনতা এবং জনকল্যাণমূলক সেবার দিকে সেভাবে অগ্রসর হতে পারল না যেমনটি আগে ছিল। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আলো এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়াও আগের মতো রইল না। শাসকরা জনগণের প্রতি এবং জনগণ শাসকদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে থাকল। সমাজে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যার ফলে বারবার শ্রেণীগত দলাদলি ও সংঘাতের জন্ম হতে থাকল। গোপন ষড়যন্ত্র, ক্রমাগত বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধের এক অন্তহীন ধারা ইসলামী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াল, যেমনটি অন্যান্য সমাজ ও একনায়কতন্ত্রে চলে আসছিল।

উত্তরাধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থাকে রাজনীতির মূলনীতি বানানো আরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। যদিও এর বিপরীতে আমরা কিছু উদাহরণ পাই, তবে সাধারণ নিয়ম এটাই হয়ে গেল যে, পিতার পর পুত্র, ভাই বা নিকটতম আত্মীয় উত্তরাধিকারী হবে। এটি ছিল স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মূলনীতি যা ইসলামী রাজনীতিতে জুড়ে দেওয়া হলো। যদিও স্বৈরতন্ত্র, রাজকীয় শাসন ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার ভিত্তিক ক্ষমতার কিছু সুবিধাও রয়েছে, তবে এই শাসন পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী এবং বিশেষ বর্ণ ও বংশের গোষ্ঠীর জন্য কার্যকর, যা প্রজাসাধারণ ও রাষ্ট্রের পরিধিকে আরও সংকুচিত করে দেয় এবং বড় বড় সাম্রাজ্যগুলোকে যৌক্তিকভাবে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করতে থাকে। ইসলামের সর্বজনীন ব্যবস্থা, ভৌগোলিক সীমানার উর্ধ্ব এর জাতীয় ঐক্যের আদর্শ এবং ইসলামী খিলাফতের উচ্চতর ধারণা এই সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণমনা শাসন ব্যবস্থার সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদি ইসলামী খিলাফতকে বিশ্বব্যাপী টিকিয়ে রাখা কাম্য হতো, তবে এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের রাজনীতিবিদরা উত্তরাধিকারের নীতিকে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিলেন এবং এর পরোয়া করলেন না যে এর ফলে জাতীয় ঐক্য কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ফলাফল তাই বের হলো যা এর আগে বড় বড় সাম্রাজ্যের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হয়েছিল। যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী মুসলমানরা দেখল যে এই ব্যবস্থার অধীনে তারা কখনোই শাসক হতে পারবে না এবং বিশ্ব শাসনের এই সংবিধানে তাদের বংশীয় প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগ নেই, তখন তারা তলোয়ারের জোরে সুযোগ তৈরির চেষ্টা করল। যার ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতেই ইসলামী খিলাফতের বিশ্বজনীনতা শেষ হয়ে গেল এবং জায়গায় জায়গায় স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। শক্তিশালী আমিররা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইসলামী বিশ্বের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে নিজেদের সরকার কায়েম করতে থাকল। এভাবে খিলাফতের প্রতিষ্ঠানটি নামমাত্র হয়ে গেল এবং চারদিকে ‘সুলতানদের’ আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ল। এরপর তাদের পারস্পরিক লড়াই এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ব্যাধির কারণে যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তা এক দীর্ঘ কাহিনী। যদি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সেই চেতনা, যা সত্যনিষ্ঠা, শুরা এবং সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বজায় রাখা হতো, তবে নিশ্চিতভাবেই ইসলামী খিলাফত এত দ্রুত সীমাবদ্ধ ও দুর্বল হতো না।

মনে রাখা দরকার যে, আমরা এই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তকদের ব্যক্তিগত মর্যাদার ওপর কোনো আক্রমণ করছি না। মারওয়ান, আবদুল মালিক এবং এই ধরনের আরও অনেক ব্যক্তি চরিত্র ও গুণাবলির দিক থেকে পরবর্তীকালের লোকদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলেন, কিন্তু তারা যে রাজনৈতিক ভুলগুলো করেছিলেন তা প্রভাব না দেখিয়ে থাকেনি। তারা উম্মতকে এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দিয়েছিল যার ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভালো হয়নি।

যা-ই হোক, প্রথম হিজরি শতাব্দীতে যা কিছু হয়েছে তা মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই নির্ধারিত ছিল। তাকদিরিভাবে এটিই স্থির ছিল যে, সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতেই উম্মত সব ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে—খিলাফতে রাশেদা, খিলাফতে আম্মা, ইমারত ও মুলুকিয়াত, জিহাদ ও গৃহযুদ্ধ—যাতে সব ধরনের পরীক্ষার নমুনা এই প্রাথমিক যুগেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এজন্যই পরিস্থিতি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে।

হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী (রহ.) এই বাস্তবতা এভাবে বর্ণনা করেন:

“খিলাফতকে ইমারত ও মুলুকিয়াতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রাকৃতিকভাবেই সেই পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়া জরুরি ছিল যেগুলোর মধ্য দিয়ে খিলাফতে উসমানী ও খিলাফতে মুরতাজভী অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং এই মহান ব্যক্তিদের যুগে যে ফিতনা ও ঘটনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল, তা ছিল প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেরই অনুসারী। আল্লাহর রীতি অনুযায়ী প্রতিটি বিপ্লবে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন অপরিহার্য। নবুওয়াতের খিলাফত সমাপ্ত হওয়ার দুটি পথ ছিল: একটি হলো তা হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, আর দ্বিতীয়টি হলো তা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকা এবং নিজের স্বাভাবিক বয়সে পৌঁছে শেষ হওয়া। আল্লাহর রীতি অনুযায়ী যা এই পৃথিবীতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও চলমান রয়েছে, খিলাফতে খাসসার সমাপ্তিও এভাবেই হয়েছে। এর স্বাভাবিক বয়স তাকদিরে ইলাহিতে আগে থেকেই ত্রিশ বছর নির্ধারিত ছিল এবং সেই সময়ের মধ্যেই তা সমাপ্ত হয়েছে।” [১]

[১] ইসলামিয়াত কে পচাস সাল, পৃ. ৪৪৯

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস — দ্বিতীয় খণ্ড

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কেন এত বেশি গৃহযুদ্ধ হয়েছিল?

প্রায়ই এই প্রশ্ন করা হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে যার সময়কাল ১১ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত (৬৩ বছর) ছিল, কেন এত বেশি গৃহযুদ্ধ হয়েছিল? অথচ পরবর্তী কোনো যুগে অভ্যন্তরীণভাবে এত রক্তপাত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের সেই মনোনীত মুসলমানরা কেমন ছিলেন যারা নিজেদের মধ্যে এভাবে লড়াই-ঝগড়া করতেন?

এই প্রশ্নটি মূলত ভুল বোঝাবুঝির ফসল। বাস্তবতা হলো, ততটা গৃহযুদ্ধ হয়নি যতটা ইতিহাস অধ্যয়ন করলে অনুভূত হয়। বরং অধিকাংশ সময় শান্তি ও শৃঙ্খলাই বজায় ছিল। এই ধারণার কারণ হলো, ইতিহাস সংবাদে সমষ্টি দিয়ে তৈরি হয় এবং সংবাদ সাধারণত সেই বিষয়টি হয় যা সমাজের সাধারণ রুটিন থেকে আলাদা। এই কারণে সংবাদে নেতিবাচক বিষয়গুলো বেশি জায়গা পায়। যদি কোনো শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ নামাজি হয়, তবে এটি সংবাদ হয় না এবং ইতিহাসের অংশও হয় না। কিন্তু দশজন মানুষও যদি চোর, ডাকাত বা হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তা সংবাদ হয়ে যায়। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ সততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে, কোনো সংবাদ হয় না। যদি একজন ব্যক্তিও জালিয়াতি বা আত্মসাৎ করে, তবে তা সংবাদ হয়ে যায়। আবার যে বিষয়গুলো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে সম্পর্কিত হয় অথবা অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত হয়, সেগুলো সংবাদ বা ইতিহাসে বেশি জায়গা পায়। সাধারণ মানুষ কাউকে গালি দিলে সংবাদ হবে না। প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে এমন নিচু শব্দ বের হলে তা সংবাদ হয়ে যাবে।

সাহাবায়ে কেরামের যুগ ছিল শান্তি, নৈতিকতা, ভালোবাসা এবং কল্যাণকামিতার যুগ। সাহাবায়ে কেরামের এই গুণাবলি এবং সেই যুগের ঈর্ষণীয় ঘটনাবলির বিবরণ আলাদা কিতাবসমূহ যেমন: আল-ইসাবাহ, আল-ইসতিয়াব, উসদুল গাবাহ, সিয়রু আলামিন নুবালা, হিলয়াতুল আউলিয়া এবং হায়াতুস সাহাবায় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে বেশিরভাগ সংবাদ (অস্বাভাবিক বিষয়সমূহ) সংগ্রহ করা হয়েছে, তাই ইতিহাসে গৃহযুদ্ধের পাতাগুলো বেশি, অন্যথায় সেগুলোর সময়কাল সংক্ষিপ্তই ছিল।

খিলাফতে রাশেদায় আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু (১১ হিজরি)-এর খিলাফত থেকে উসমান গনি রাযিয়াল্লাহু আনহু (৩৫ হিজরি)-এর শাহাদাত পর্যন্ত চব্বিশ বছরে এমন কোনো গৃহযুদ্ধ হয়নি যাতে হকপন্থীরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

সিদ্দিক আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে মুসাইলামা কাযযাব এবং মুরতাদদের ফিতনা প্রথম গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে হক ও বাতিলের সংঘাত ছিল। এই সমস্ত লড়াই এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ১২ হিজরি থেকে ৩৫ হিজরি পর্যন্ত সম্পূর্ণ শান্তি ছিল। ইবনে সাবার গোপন আন্দোলন চলেছিল কিন্তু কোথাও সশস্ত্র সংঘাত বা গৃহযুদ্ধ হয়নি। নিজের শাহাদাত পর্যন্ত হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের মধ্যে তলোয়ার চলতে দেননি।

হকপন্থীদের প্রথম পারস্পরিক সংঘাত হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে ৩৬ হিজরিতে জঙ্গ জামালের সময় হয়েছিল। এমন দ্বিতীয় দুর্ঘটনা সিফফিনে ঘটেছিল। এই উভয় যুদ্ধের জন্য সফর ও অবস্থান, কথোপকথন ও আলোচনা, লড়াই এবং সালিশি সহ সমস্ত বিষয়ে বড়জোর ৮ মাস

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

খরচ হয়েছিল। যেখানে তলোয়ার চলার সময় জঙ্গে জামালে মাত্র কয়েক ঘণ্টা এবং সিফফিনে তিন দিন ছিল। আলী (রা.)-এর যুগে আলোচনা ও যুদ্ধসহ সমস্ত বিষয়ে বড়জোর চার মাস লেগেছিল। কুফা ও শামের বাহিনীর মধ্যে সীমান্ত লঙ্ঘনের সময়কাল এক বছর হতে পারে। এরপর আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর ২০ বছরের শাসনামল সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। যদি এই পঞ্চাশ বছরে গৃহযুদ্ধের প্রকৃত সময়কাল দেখা হয়, তবে তা বড়জোর বারো-তেরো বছর হবে। সাহাবায়ে কেরামের শাসনের প্রকৃত সময়কাল ছিল এই পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ ১১ হিজরি থেকে ৬০ হিজরি পর্যন্ত।

৬০ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত এই ১৩ বছরের শাসনামলে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বেশিরভাগই তাবেরীদের হাতে ছিল। এই তেরো বছর সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এতে গৃহযুদ্ধের সময়কাল ছিল অস্বাভাবিক। ইয়াজিদের পৌনে চার বছরের শাসনামলে কারবালা, হাররা এবং দুইবার মক্কা আক্রমণের আকারে চারটি যুদ্ধ হয়েছিল, যাতে সামগ্রিকভাবে প্রায় এক বছর ব্যয় হয়েছিল।

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর যুগে শামের আমীরগণ, মুখতার সাকাফী এবং খারেজীরা কেন্দ্রীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে, তাই এই সময়ের একটি বড় অংশ গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে। তবে এর দায়ভার তাদের ওপর যারা তাঁর খেলাফত কবুল করেনি। এই ৯ বছরের মধ্যে পাঁচ বছর ছিল বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার। পক্ষান্তরে ৬৭ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত চার বছরে কিছু ছোটখাটো বিদ্রোহ ছাড়া সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল।

ভৌগোলিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ফিতনা ও গৃহযুদ্ধের বেশিরভাগ দৃশ্য ইরাক অর্থাৎ কুফা, বসরা এবং কখনো কখনো পারস্য ও খোরাসানে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের যুগে বাকি স্থানগুলো অধিকাংশ সময় নিরাপদ ছিল।

ইরাক ছাড়া বাকি এলাকাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই চল্লিশ বছর মেয়াদে মিশরে দুটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল: একটি হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর মুহাম্মদ বিন আবি বকরের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়টি মারওয়ানের আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর গভর্নরের বিরুদ্ধে।

হিজাজে পাঁচটি যুদ্ধ হয়েছিল:

- ১. আমর বিন সাঈদের মক্কা আক্রমণ
- ২. মদিনায় মুসলিম বিন উকবার আক্রমণ
- ৩. মক্কায় হুসাইন বিন নুমায়েরের আক্রমণ
- ৪. মদিনার বাইরে মুসআব বিন জুবায়েরের সাথে শামী বাহিনীর মোকাবিলা
- ৫. মক্কায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আক্রমণ

জাজিরাতুল আরবের আশপাশে, বাহরাইন ইত্যাদিতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর যুগে খারেজীদের দাপট ছিল। তবে ‘জাওয়ারা’ নামক একটি যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি। শামে দুটি যুদ্ধ হয়েছিল: সিফফিন এবং মারজ রাহিত।

যাই হোক, এই লড়াইগুলোতে বড় বড় ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ বিষয়টিকে স্পর্শকাতর করে তুলেছিল এবং পরবর্তীতে অতিরঞ্জিত বর্ণনার সংযোজন এই বিষয়গুলোকে আরও ঘোলাটে করে দিয়েছে। আমরা এই ঘটনাগুলোকে পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠায় নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করব।

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

সঠিক বিষয়টি সামনে আনার জন্য গবেষণার কাজ আমাদের জন্য লেখার সফরকে দীর্ঘ করে দিয়েছে। যদি চিন্তা করা হয়, তবে সাহাবীগণের যুগের পর উন্মত্তের ওপর ফিতনা ও ফাসাদের যে সময়গুলো চেপে বসেছিল, সেগুলোর স্থায়িত্ব ছিল অনেক দীর্ঘ এবং সেগুলোতে জান ও মালের ক্ষতির অনুপাত ছিল অনেক বেশি। কারণ পরবর্তী বিবাদমান পক্ষগুলো মুসলিমদের রক্তপাতের ব্যাপারে সতর্ক ছিল না। অথচ সাহাবীগণের যুগে সাধারণ পরিবেশ ছিল সতর্কতাপূর্ণ।

আমরা যদি নিজেদের ইতিহাস বাদ দিয়ে ইউরোপ, ভারত ও চীনের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তবে সেখানে রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ, রাজকীয় ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এবং গণহত্যার এমন এক ভয়াবহ ও অন্তহীন ধারা দেখতে পাই যার সামনে ইসলামি বিশ্বের ইতিহাসের বড় থেকে বড় রক্তপাতকেও তুচ্ছ মনে হয়। বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই! দুই-তিন শতাব্দী আগে আমেরিকার নতুন পৃথিবীতে ইউরোপীয় জাতিগুলোর পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী লড়াই এবং স্থানীয় লোকদের গণহত্যার পরিসংখ্যান দেখে নিন, যা অতিরঞ্জন ছাড়াই কোটিতে পৌঁছে যায়। একইভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপ এবং আধুনিক সভ্যতার পতাকাবাহী আমেরিকার সেই পাশবিকতা কারো অজানা নয়, যেখানে একের পর এক শহর গোলাবর্ষণ ও বোমা হামলার শিকার হয়েছিল এবং পারমাণবিক হামলায় হিরোশিমা ও নাগাসাকি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছিল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামের শত্রুরা নিজেদের কালো কারসাজিগুলো লুকানোর জন্য আমাদের ইতিহাসের গুটিকয়েক ঘটনা ও কিছু দুর্ঘটনাকে পুঁজি করে কেবল আমাদের পুরো ইতিহাসকেই কলঙ্কিত করে দেখায় না, বরং সাহাবীগণের চরিত্র হনন করে পুরো ইসলামকেই সন্দেহভাজন করার চেষ্টা করে।

□□□

একটি প্রশ্ন এমনও করা হয় যে, নেক ও সৎ লোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন বারবার তলোয়ার চলল? বিষয়গুলো কেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হলো না? ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া কেন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো না? যখন ইসলামে এর জন্য ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, তখন প্রথম যুগের মুসলিমরা এ ব্যাপারে কেন উদাসীন ছিলেন?

এই প্রশ্নগুলো ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সাহাবীগণের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার ফসল। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আপনারা দেখেছেন যে, সেই যুগের মুসলিমরা শান্তি ও আলোচনার জন্য সব সময় সব জায়গায় সচেষ্ট ছিলেন। তারা জানতেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা সব অবস্থায় প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন এবং প্রতিটি সমাজের মৌলিক অধিকার। সাহাবীগণ এবং মহান তাবেরীদের অবস্থান এটাই ছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে হওয়া উচিত। কারণ ইসলাম ক্ষমতার লোভ, পদের মোহ, দুনিয়ার জন্য লড়াই এবং ফাসাদের নিন্দা করে। ইসলামের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন সব জায়গায় ফাসাদকে অস্বীকার করে এবং দেহ ও প্রাণের সুস্থতা থেকে শুরু করে পুরো সমাজ এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতিতে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম মানুষের জীবনের মূল্যকে যে গুরুত্ব দেয়, তা কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ইসলাম মুসলিমদের পাশাপাশি আহলে জিম্মাহ (ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-দের জান ও মালের নিরাপত্তাকেও সমান গুরুত্ব দেয়, তাই একটি ইসলামি সমাজে...

অংশ: সপ্তম

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

এবং ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের রক্ত নিবিচারে ঝরতে থাকা ইসলামের পথের পরিপন্থী, যা প্রকৃত মুসলমানরা কখনোই বরদাশত করতে পারতেন না।

প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান গনি (রা.) ও আলী আল-মুরতজা (রা.) থেকে শুরু করে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) পর্যন্ত শাসক সাহাবীদের এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল। তাই তারা নিজেরা অন্য মুসলমানদের প্রাণ নেওয়া থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতেন, যেমনটি আমরা সহীহ বর্ণনার আলোকে সর্বত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কোথাও সত্যপন্থীদের তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল বিদ্রোহ দমন করা, যার অনুমতি শরীয়তও নিরুপায় অবস্থায় দিয়েছে এবং যুক্তির বিচারেও এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট; কারণ অভ্যন্তরীণ শত্রুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কোনো অবস্থাতেই শাসকের কাছে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকলে কোনো সরকারই কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না। একে যেকোনো সময় ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে। তাই সাহাবীদের যুগে যদি আমরা কোথাও গৃহযুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পাই, যাতে কখনো কখনো মহান ব্যক্তিত্বদেরও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, তবে আমাদের উচিত সেই ঘটনাগুলোকে সন্দেহজনক, যয়ীফ, অতিরঞ্জিত এবং বানোয়াট ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো সরিয়ে দেওয়া; এভাবে এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অধিকাংশ আপত্তি ও সন্দেহের নিরসন আপনাআপনিই হয়ে যাবে।

আমরা এই সত্য অস্বীকার করছি না যে সাহাবীদের যুগে গৃহযুদ্ধ হয়নি। আমরা এটি বলছি যে, এই গৃহযুদ্ধগুলোর বর্ণনায় সত্য কম এবং গল্পগাথা বেশি। যা ঘটেছিল তা অতটা বেশি ছিল না। আর এই সমস্ত দ্বন্দ্বই জরুরি পরিস্থিতিতে হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলো উসকে দেওয়ার পেছনে এক পর্যায়ে বিভ্রান্ত ও অনিষ্টকারী চক্রের ষড়যন্ত্রও সক্রিয় ছিল। এরপর তার চেয়েও বেশি এই ঘটনাগুলোর বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের জন্য একদল লোক অস্বাভাবিকভাবে তৎপর ছিল। এটি জরুরি যে আমরা ইতিহাসকে সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে দেখি এবং প্রতিটি ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর বিশ্বাস না করি।

সাহায্যে কেরামের যুগের রাজনৈতিক সংঘাতের আলোচনার সারসংক্ষেপ

এই যুদ্ধসমূহ এবং এতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রতিটি স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকদের জন্য আবারও সারসংক্ষেপ হিসেবে তা বর্ণনা করা হচ্ছে:

- হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনটি ছিল ষড়যন্ত্রকারী মহলের কারসাজি। একজন মুসলিমের রক্তের মর্যাদা এবং মদিনা মুনাওয়ারার পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য হযরত উসমান (রা.) নিজে থেকে মোকাবিলা করা থেকে বিরত থাকেন এবং নববী অসিয়ত অনুযায়ী খেলাফত থেকে পদত্যাগ করেননি। অবশেষে বিদ্রোহীরা তাঁকে শহীদ করে দেয়।
- হযরত আয়েশা (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত জুবারের (রা.) উসমানের হত্যাকারীদের নির্মূল করার জন্য বসরায় গিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তাঁদের ঐক্যের ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্র উভয় দলকে যুদ্ধে লিপ্ত করে দেয়। এই যুদ্ধটি ছিল ইজতিহাদি ভুল, যার জন্য উভয় পক্ষের নেতৃত্ব সারাজীবন অনুতপ্ত ছিলেন।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত গ্রহণ করতে বিলম্ব কেন হয়েছিল? কারণ সিরিয়াবাসী উসমানের কিসাসের জন্য অস্থির ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতের অধিকার স্বীকার করতেন, কিন্তু কিসাস গ্রহণ না করা পর্যন্ত বায়াত স্থগিত রাখাকে সমীচীন মনে করতেন। এই বিলম্ব ছিল তাঁর ইজতিহাদি ভুল, যাতে তিনি সদিচ্ছাপ্রণোদিত এবং সওয়াবের অধিকারী ছিলেন। তবে এর রাজনৈতিক ক্ষতি এই হয়েছিল যে, ইরাক ও সিরিয়া দুটি যুদ্ধরত শক্তি হিসেবে সিফফিনে মুখোমুখি হয়। অস্বাভাবিক জানমালের ক্ষতির পর উভয় নেতা শান্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যুদ্ধবিরতি করেন, কিন্তু আলোচনার ধারা “তাহকিম-এ-দুমাতুল জান্দাল” কোনো ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়। কিছুকাল সীমান্ত সংঘর্ষের পর উভয় পক্ষ সীমান্তের মর্যাদা রক্ষার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর কয়েক মাস পর জনৈক খারেজি হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করে দেয়।
- হযরত আলী (রা.)-এর উত্তরসূরি হযরত হাসান (রা.) কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই শুধুমাত্র উম্মতের কল্যাণে ৪১ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে খেলাফত হস্তান্তর করেন এবং পরবর্তী ২০ বছর পর্যন্ত উম্মত ঐক্যবদ্ধ ও নিরাপদ ছিল।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজের পরে একজন উত্তরসূরি নিযুক্ত করেছিলেন। এটি ছিল সম্পূর্ণ সঠিক একটি ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত, তবে নিজের ছেলেকে মনোনীত করা ছিল একটি ইজতিহাদি ভুল, যাতে তিনি সদিচ্ছাপ্রণোদিত এবং সওয়াবের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু এর ফলাফল ভালো হয়নি। তা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইয়াজিদের যুবরাজ পদ ও খেলাফত মেনে নিয়েছিল যাতে গৃহযুদ্ধ না হয়।
- হযরত হুসাইন (রা.) সরকারের বংশানুক্রমিক রূপ ধারণ করার আশঙ্কা অনুভব করে পরিস্থিতির সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সক্রিয় হয়েছিলেন কিন্তু কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইয়াজিদের বাহিনীর জুলুমের শিকার হন।

- আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর অবস্থান ছিল হযরত হুসাইন (রা.)-এর অনুরূপ। দীর্ঘ সময় হারামে আশ্রয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি খেলাফতের দাবি করেননি।
- ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের ‘টেস্ট কেস’ শরয়ী বৈধতার সীমার মধ্যে ছিল, কিন্তু আমির মুয়াবিয়া (রা.) এর ফলাফল নিজে দেখার জন্য জীবিত ছিলেন না। পরীক্ষাটি ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর তার নাতি মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ ক্ষমতার ব্যবস্থা পুনরায় উম্মাহর হাতে সোপর্দ করেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুসলিম উম্মাহর সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর হাতে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের শরয়ী খলিফা নিযুক্ত হন।
- মারওয়ান এবং তার পুত্র আবদুল মালিক এই শরয়ী খেলাফত কবুল করেননি এবং সিরিয়া দখল করে তলোয়ারের জোরে নিজেদের পারিবারিক রাজতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত জুবায়েরী খেলাফতের অবসান ঘটান।
- প্রথম শতাব্দীতে সত্যপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছাড়াও খারেজী, সাবায়ী অনুচর এবং মুখতার সাকাফীর মতো লোকদের সাথে প্রায় প্রতিটি শাসককেই মোকাবিলা করতে হয়েছে। তাদের দমনের জন্য যে প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছে, তার সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

তারিখ সাহাবা: ফিতনার যুগের এক বালক

৬০ হিজরি ৭৩ হিজরি

৬৮০ খ্রিস্টাব্দ ৬৯২ খ্রিস্টাব্দ

৬০ হিজরি

- হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকাল... নির্ভরযোগ্য মত ৪ রজব, (১১ এপ্রিল ৬৮০ খ্রি.), প্রসিদ্ধ মত ২২ রজব
- ইয়াজিদের দামেস্কে আগমন ও সিংহাসন আরোহণ... রজব (এপ্রিল ৬৮০ খ্রি.)
- বায়াতের জন্য ইয়াজিদের দূতের মদিনায় আগমন... রজব (মে ৬৮০ খ্রি.)
- আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ও হযরত হুসাইন (রা.)-এর মদিনা থেকে প্রস্থান... রজবের শেষ দিকে (মে ৬৮০ খ্রি.)
- আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ও হযরত হুসাইন (রা.)-এর মক্কায় আগমন... শাবানের শুরুতে (মে ৬৮০ খ্রি.)
- হিজাজ থেকে ওয়ালিদ বিন উতবার অপসারণ এবং আমর বিন সাঈদের নিয়োগ... রমজান (জুন ৬৮০ খ্রি.)
- কুফা থেকে নুমান বিন বশির (রা.)-এর অপসারণ, উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নিয়োগ
- আমর বিন সাঈদ আমিরুল হজ নিযুক্ত
- মুসলিম বিন আকিল (রা.)-এর শাহাদাত... ৮ জিলহজ (১০ সেপ্টেম্বর ৬৮০ খ্রি.)
- হযরত হুসাইন (রা.)-এর মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা... ৭ জিলহজ (৯ সেপ্টেম্বর ৬৮০ খ্রি.)

৬১ হিজরি

- কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা... ১০ মহররম (১১ অক্টোবর ৬৮০ খ্রি.)
- মুসলিম বিন জিয়াদ খোরাসানের ওয়ালি নিযুক্ত... (৬৮১ খ্রি.)
- আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে গ্রেফতারের জন্য মক্কায় আমর বিন সাঈদের ব্যর্থ হামলা
- হিজাজের ইমারত থেকে আমর বিন সাঈদের অপসারণ, ওয়ালিদ বিন উতবার পুনরায় নিয়োগ... ১ জিলহজ (২৮ আগস্ট ৬৮১ খ্রি.)
- আমিরুল হজ, ওয়ালিদ বিন উতবা... (৬৮১ খ্রি.)
- আইজ বিন আমর (রা.)-এর ইন্তেকাল... (৬৮১ খ্রি.)

৬২ হিজরি

- ইয়াজিদের কাছে মদিনাবাসীদের প্রতিনিধি দলের আগমন... মহররম (সেপ্টেম্বর ৬৮১ খ্রি.)
- আফ্রিকা রণাঙ্গনে উকবা বিন নাফে রহ.-এর নিয়োগ... (৬৮২ খ্রি.-এর শুরু)
- মুসলিম বিন জিয়াদের মধ্য এশিয়ায় বিজয় অভিযান... (৬৮২ খ্রি.)
- কাবুল রণাঙ্গনে পরাজয়, ইয়াজিদ বিন জিয়াদের শাহাদাত... (৬৮২ খ্রি.)
- আবদুল্লাহ বিন আসাদের কায়সারিয়া অভিযান... (৬৮২ খ্রি.)
- আমিরুল হজ ওয়ালিদ বিন উতবা... (৬৮২ খ্রি.)
- মিশরের গভর্নর মুসলিম বিন মখলাদ যুরাকী রাযি.-এর মৃত্যু, আলকামা বিন কায়েস নাখয়ী রহ.-এর মৃত্যু, আবু মুসলিম খাওলানি রহ.-এর মৃত্যু, মার্ভে বুরাইদা বিন হাসিব আসলামি রাযি.-এর মৃত্যু, আমর বিন হাযম আনসারি রাযি.-এর মৃত্যু।

৬৩ হিজরি

- ওয়ালিদ বিন উতবা অপসারিত, উসমান বিন মুহাম্মদ হিজাজের আমির নিযুক্ত... (৬৮২ খ্রি.-এর শুরু)
- উকবা বিন নাফে রহ.-এর আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিজয়... (৬৮২ খ্রি.)
- মদিনাবাসীদের ইয়াজিদের আনুগত্য অস্বীকার, উমাইয়া গভর্নর উসমান বিন মুহাম্মদের অপসারণ... (৬৮৩ খ্রি.)
- মক্কা বনু উমাইয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাযি.-এর নেতৃত্বে হজ... (৯ আগস্ট ৬৮৩ খ্রি.)
- আফ্রিকায় উকবা বিন নাফে রহ. এবং আবু মুহাজির দিনার রহ.-এর শাহাদাত... (৬৮৩ খ্রি.)
- মদিনায় সিরীয় বাহিনীর আক্রমণ, হাররার ঘটনা... ২৭ জিলহজ (২৮ আগস্ট ৬৮৩ খ্রি.)
- মা'কাল বিন সিনান রাযি., আবদুল্লাহ বিন হানজালা রাযি., আবদুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসিম রাযি.-এর শাহাদাত।
- আফ্রিকায় বারবারদের বিদ্রোহ, অনেক এলাকা হাতছাড়া... জিলহজ (আগস্ট ৬৮৩ খ্রি.)
- কুফার ফকিহ মাসরুক বিন আজদা রহ.-এর মৃত্যু... (৬৮৩ খ্রি.)

৬৪ হিজরি

- বিদ্রোহীদের কায়রোয়ান দখল... মহররম (সেপ্টেম্বর ৬৮৩ খ্রি.)
- হুসাইন বিন নুমাইরের মক্কা আক্রমণ ও অবরোধ... ২৬ মহররম (২৪ সেপ্টেম্বর ৬৮৩ খ্রি.)
- হযরত মিসওয়াল বিন মাখরামা রাযি.-এর শাহাদাত... (৬৮৩ খ্রি.)
- কাবা শরীফে অগ্নিকাণ্ড... ৩ রবিউল আউয়াল (১ নভেম্বর ৬৮৩ খ্রি.)
- ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যু... ১৪ রবিউল আউয়াল (১০ নভেম্বর ৬৮৩ খ্রি.)
- মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের মৃত্যু... ২৩ রবিউস সানি (২০ ডিসেম্বর ৬৮৩ খ্রি.)

তারিখে উন্মতে মুসলিমা (সপ্তম খণ্ড)

মক্কার অবরোধ সমাপ্ত ১০ জুমাদাল উলা (৫ জানুয়ারি ৬৮৪ খ্রি.)

ইরাকে বিদ্রোহ, উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের আত্মগোপন জুমাদাল উলা (জানুয়ারি ৬৮৪ খ্রি.)

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের জন্য বায়াত গ্রহণ করা হয় ৯ রজব (৩ মার্চ ৬৮৪ খ্রি.)

মুখতার সাকাফির মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা রমজান (মে ৬৮৪ খ্রি.)

মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ, নিজের বিকল্প খিলাফত ঘোষণা জিলকদ (জুন ৬৮৪ খ্রি.)

মারজ রাহিত-এ উমাইয়া ও জুবায়েরি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ জিলহজ (জুলাই ৬৮৪ খ্রি.)

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক কাবা শরীফকে ইব্রাহিমি ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ (৬৮৪ হি.)

ওয়ালিদ ইবনে উতবার মৃত্যু (৬৮৪ হি.)

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল (৬৮৪ হি.)

৬৫ হি.

মারজ রাহিত-এ বনু উমাইয়ার বিজয় এবং সিরিয়া দখল মহররমের শুরু (আগস্ট ৬৮৪ খ্রি.)

হযরত যাহহাক ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত মহররমের শুরু (আগস্ট ৬৮৪ খ্রি.)

হযরত নুমান ইবনে বশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত মহররম (সেপ্টেম্বর ৬৮৪ খ্রি.)

তাওয়াবিনদের কুফা থেকে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া ৫ রবিউস সানি (২০ নভেম্বর ৬৮৪ খ্রি.)

তাওয়াবিনদের পরাজয় সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত ২৬ রবিউস সানি (১১ ডিসেম্বর ৬৮৪ খ্রি.)

মিশরে মারওয়ানের আক্রমণের সময় শহরে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল (৬৮৪ খ্রি.)

মারওয়ানের মিশর দখল ১৫ জুমাদাস সানি (২৮ জানুয়ারি ৬৮৫ খ্রি.)

হিজাজে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মোকাবিলায় সিরীয় বাহিনীর পরাজয় ১ রমজান (১১ এপ্রিল ৬৮৫ খ্রি.)

মারওয়ান ইবনুল হাকামের মৃত্যু ৩ রমজান (১৪ এপ্রিল ৬৮৫ খ্রি.)

আবু তালুত খারেজির আরবে লুটতরাজ (৬৮৫ খ্রি.)

৬৬ হি.

মুখতারের কুফা দখল, হুসাইন-হত্যাকারীদের দমন রবিউল আউয়াল (অক্টোবর ৬৮৫ খ্রি.)

সিরিয়ায় মুখতারের আক্রমণ, উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিহত, সিরীয় বাহিনীর পরাজয় জিলকদ (জুন ৬৮৬ খ্রি.)

হিজাজে মুখতারের অগ্রসর হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা (৬৮৬ খ্রি.)

নাজদাহ ইবনে আমির খারেজির লুটতরাজ (৬৮৬ খ্রি.)

পারস্য ও ইরাকে আজরাকি খারেজিদের সন্ত্রাসবাদ (৬৮৬ খ্রি.)

- হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.)-এর ওফাত (৬৮৬ খ্রি.)

৬৭ হিজরি

- কুফায় মুখতারের অবরোধ ও হত্যা... ১৪ রমজান ৬৭ হিজরি... (৩ এপ্রিল ৬৮৭ খ্রি.)
- আদি বিন হাতেম (রা.)-এর ওফাত... জমাদিউল আউয়াল (নভেম্বর ৬৮৬ খ্রি.)
- ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর ওফাত... (৬৮৬ খ্রি.)

৬৮ হিজরি

- তায়েফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর ওফাত, বয়স ৭১ বছর... রবিউস সানি (অক্টোবর ৬৮৭ খ্রি.)
- দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী ৬৯ হিজরিতে
- যায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানি (রা.)-এর ওফাত, আবু শুরাইহ আল-খুজায়ি (রা.)-এর ওফাত... (৬৮৭ খ্রি.)
- আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি (রা.)-এর ওফাত... শাওয়াল (এপ্রিল ৬৮৮ খ্রি.)

৬৯ হিজরি

- নাজদাহ বিন আমের খারেজির তার বিরোধী খারেজিদের হাতে মৃত্যু... (৬৮৮ খ্রি.)
- বসরায় প্লেগ রোগে (তাউনে জারফ) ব্যাপক মৃত্যু... (৬৮৮ খ্রি.)
- আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.)-এর ওফাত... (৬৮৮ খ্রি.)
- জাবির বিন সামুরা (রা.)-এর ওফাত... (৬৮৮ খ্রি.)
- হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর খাদেম আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালি (রহ.)-এর ওফাত... শাওয়াল (মার্চ ৬৮৯ খ্রি.)

৭০ হিজরি

- আসেম বিন উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.)-এর ওফাত... রবিউস সানি (সেপ্টেম্বর ৬৮৯ খ্রি.)
- আব্দুল মালিকের ইরাকের দিকে অগ্রসর হওয়া, খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্রত্যাবর্তন... জমাদিউস সানি (নভেম্বর ৬৮৯ খ্রি.)
- আমর বিন সাঈদ আল-আশদাক-এর হত্যা... (৬৮৯ খ্রি.)
- রোমানদের সাথে আব্দুল মালিকের সন্ধি... (৬৮৯ খ্রি.)

৭১ হিজরি

- জুফার বিন আল-হারিসের বিরুদ্ধে আব্দুল মালিকের বিজয়, কারকিসিয়া দখল... (৬৯০ খ্রি.)
- হযরত সাফিনা (রা.)-এর ওফাত, উমর বিন আখতাব (রা.)-এর ওফাত, আব্দুর রহমান বিন আবজা (রা.)-এর ওফাত

৭২ হিজরি

- হযরত আহনাফ বিন কায়েস (রা.)-এর ওফাত... রবিউস সানি (সেপ্টেম্বর ৬৯১ খ্রি.)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

- দাইরুল জাসালিকের যুদ্ধ, মুসআব ইবনে যুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত ১৩ জুমাদাল উলা (১২ অক্টোবর ৬৯১ খ্রি.)
- হযরত উবাইদাহ সালমানী (রা.)-এর ইন্তেকাল রজব (নভেম্বর ৬৯১ খ্রি.)
- হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মক্কা আক্রমণ - আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর বিরুদ্ধে অবরোধ, ১লা জিলকদ (২৫ মার্চ ৬৯২ খ্রি.)
- হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর ইন্তেকাল জিলকদ (মার্চ ৬৯২ খ্রি.)
- মাবাদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা.)-এর ইন্তেকাল, আবদুল্লাহ ইবনে সাযিব (রা.)-এর ইন্তেকাল
- হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের জন্ম (৬৯২ খ্রি.)

৭৩ হিজরি

- মক্কার ওপর হাজ্জাজের দখল, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত ১৭ জুমাদাল উলা (১৫ অক্টোবর ৬৯২ খ্রি.)
- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল ২৭ জুমাদাল উলা (১৫ অক্টোবর ৬৯২ খ্রি.)
- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক কুরাইশদের নকশা অনুযায়ী কাবা পুনর্নির্মাণ (৬৯২ খ্রি.)
- আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রা.)-এর ইন্তেকাল, সাবিত ইবনে যাহহাক আনসারী (রা.)-এর ইন্তেকাল

দ্বিতীয় খণ্ড মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

প্রথম হিজরি শতাব্দীতে

উম্মাহর ইলমি, ফিকরি, সংশোধনমূলক ও নৈতিক তরবিয়তের দায়িত্ব পালনকারীগণ

উম্মাহর মহসিনগণ

গত পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ৩৫ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত উম্মাহর ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি। এই যুগে মাঝখানের কয়েক বছর বাদ দিলে ক্ষমতার চাবিকাঠি হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত আমীর মুয়াবিয়া এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বদের হাতে ছিল। আমরা গত পাতাগুলোতে এই বুজুর্গদের অবস্থা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে পড়েছি এবং এটি অনুভব করেছি যে, এই যুগে যখন উম্মাহর অস্তিত্ব লাভের এক শতাব্দীও পূর্ণ হয়নি, আল্লাহর তাকদিরি ফয়সালা অনুযায়ী মুসলমানদের কিছু কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই যুগে এই ব্যক্তিবর্গ যেখানে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে উম্মাহর কায়েদ ও নেতা ছিলেন, সেখানে দ্বীনি, ঈমানি ও আধ্যাত্মিক নুরের বিচারেও মুসলমানদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। আর উম্মাহকে উম্মাহ হিসেবে জীবিত রাখতে এবং সুসংহত করতে এই যুগে এই ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনার সবচেয়ে বড় অংশ রয়েছে। এই মহান সত্তাগণ অত্যন্ত অসাধারণ এবং বহুমুখী গুণের অধিকারী ছিলেন, তাই তারা একই সাথে জিহাদের ময়দান, রাজনীতির ময়দান এবং ইসলাহ ও ইরশাদের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন।

তবে আল্লাহ তাআলার ইলমে ছিল যে, পরবর্তীতে সময় এবং সমকালীন মানুষের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং দ্বীনি দিকনির্দেশনার কেন্দ্রগুলো আলাদা হয়ে যাবে। সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করা এবং প্রজাদের প্রশাসনিক বিষয়াবলি দেখাশোনা করা ব্যক্তির মানুষ গড়ার কাজ করতে পারবেন না। তাই আল্লাহর পূর্ণ ইচ্ছায় সাহাবায়ে কেরামের এই যুগে যখন বড় বড় সাহাবীগণও উপস্থিত ছিলেন, কিছু ব্যক্তিকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে মুসলমানদের দ্বীনি, ঈমানি, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক তরবিরের জন্য বেছে নেওয়া হলো। এই ব্যক্তিবর্গ নিজেদের জীবন মানুষ গড়ার কাজে উৎসর্গ করে দিলেন যাতে উম্মাহর জন্য আকিদা এবং ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে পরিপক্ক কর্মীবাহিনী সরবরাহের সেই বরকতময় ধারা বন্ধ না হয় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু করেছিলেন এবং যা নবুওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং এভাবে এই মানুষ গড়ার কাজ প্রকৃতপক্ষে উম্মাহর বিকাশের জন্য ঠিক তেমনি জরুরি ছিল যেমন ফসলের জন্য পানি।

এই পবিত্র আত্মাসমূহ দরবারে রিসালাত থেকে অর্জিত ফয়েজ পরবর্তীতে তাবেয়ীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাবেয়ীগণ ইখলাস, নিঃস্বার্থতা, লিল্লাহিয়াত, জুহদ ও ইবাদত এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার সকল গুণে গুণান্বিত হয়ে এই ধারাকে একইভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এভাবে উম্মাহর গঠনের শুরুতেই তালিম ও তাআলুম, দরস ও তাদরিস, দাওয়াত ও ইরশাদ, সত্যবাদিতা ও সততা এবং ঈমান ও ইয়াকিনের দুটি মজলিস সুসজ্জিত হলো যা আজ পর্যন্ত বিভিন্ন রূপে চলে আসছে। কোথাও এটি দ্বীনি মাদরাসার সুরতে...

কোথাও মক্তব আকারে জীবিত আছে। কোথাও এই সিলসিলার ব্যক্তিবর্গ তাজকিয়া ও ইহসানের কেন্দ্র পরিচালনা করছেন এবং কোথাও সঠিক আকিদার পরিচর্যা ও বাতিল চিন্তাধারার খণ্ডনে জান-মাল ও মনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কোথাও কিছু উৎসর্গিত প্রাণ কাফেরদের মোকাবিলায় বুক চিতিয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ঐতিহ্যকে জীবন্ত ও উজ্জ্বল করে রেখেছেন আবার কোথাও আল্লাহর কিছু বান্দা নির্জনে বসে গ্রন্থ রচনা ও তালিফ এবং ইলমি গবেষণায় মগ্ন রয়েছেন। এই যা কিছু আছে এবং যে রূপেই আছে, তা মূলত আইন্মায়ে আখইয়ারের অনুগ্রহ। তাঁদের কোরবানি না থাকলে উম্মতে মুসলিমার ব্যক্তিত্ব কখনো এত মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠত না।

প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের প্রতিটি দিক উপদেশের বহুবিধ দিক ধারণ করে আছে। শুধু দেখার জন্য একটি দৃষ্টি প্রয়োজন আর তা হলো ঈমানি বসিরত। ঈমানি বসিরত তখনই নসিব হয় যখন আল্লাহ, তাঁর হাবিব এবং হাবিবের প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত থাকে। যদি এই মহব্বত থাকে তবে সিরাতে সাহাবার প্রতিটি দিক আবে হায়াত হয়ে কাজে আসবে। যদি আল্লাহ না করুন কেউ এই মহব্বত থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তার জন্য হাজার হাজার পৃষ্ঠাও নিছক মস্তিষ্ক চালনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিন! এখন উম্মতের এই মহসিনদের মধ্য থেকে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সাহাবায়ে কেরাম, তবে এমন কয়েকজন জলিলুল কদর তাবেয়িও রয়েছেন যারা আকাবির সাহাবায়ে কেরামের ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন এবং আসাগির সাহাবায়ে কেরামের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উম্মত গঠনের কাজ করে গেছেন। [১]

[১] তাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদিনসহ শাসক সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা এই জন্য করা হয়নি যে, তাঁদের অবস্থা পূর্ণ বিস্তারিতভাবে পেশ করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি উম্মতের কাছে সবচেয়ে বেশি হাদিস পৌঁছে দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। আপনার থেকে বর্ণিত বর্ণনার সংখ্যা “৫৩৭৪”।

আপনার সম্পর্ক ছিল ইয়ামেনের দাওস গোত্রের সাথে। সেখানে তিনি বকরি চরাতেন। যখন ইয়ামেনে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল, তখন বিভিন্ন গোত্র ইসলাম শেখার জন্য মদিনায় আসতে শুরু করল। তিনিও নিজ গোত্রের সাথে ৮ হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের সময় হজুর আকরাম (সা.)-এর খিদমতে হাজির হন এবং নিজেকে ইরশাদাতে নববীর সংরক্ষণের জন্য ওয়াকফ করে মদিনাতেই বসবাস শুরু করেন। সে সময় তাঁর বয়স ৩০ বছরের বেশি ছিল। তিনি ছিলেন ফর্সা বর্ণ, দীর্ঘদেহী, প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বৃদ্ধ বয়সে দাড়িতে লাল মেহেদির খেজাব লাগাতেন। তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের, দানশীল, সাদাসিধে এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আসহাবে সুফফার সাথে বসে হাদিস মুখস্থ করতেন। [১]

তিনি তাঁর মায়ের অনেক সেবা করতেন। তাঁকে ইয়ামেন থেকে নিজের সাথে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন এবং একটি ঘরে রেখেছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন আর তিনি তা অস্বীকার করতেন। একদিন জবাবে মা কিছু কঠোর কথা বলে ফেললেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বারগাহে রিসালতে হাজির হলেন এবং ঘটনা শুনিয়া আবেদন করলেন যে, আমার মায়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া করুন। রহমতে আলম (সা.)-এর হাত দোয়ার জন্য উঠে গেল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) দোয়ার প্রভাব দেখার জন্য দ্রুত বাড়ি পৌঁছালেন, তখন দরজা বন্ধ ছিল। ভেতর থেকে গোসলের পানি পড়ার শব্দ আসছিল। কিছুক্ষণ পর মা দরজা খুললেন এবং কালিমা শাহাদাত পাঠ করে জানালেন যে, তাঁর অন্তরে হেদায়েতের আলো প্রবেশ করেছে। [২] ইতিহাসে তাঁকে উম্মে আবি হুরায়রা, উমাইমা বা মায়মুনা বিনতে সবিহ নামে স্মরণ করা হয়। [৩]

আবু হুরায়রা (রা.) সারাদিন আসহাবে সুফফার সাথে খিদমতে নববীতে থাকতেন। ইলম অর্জন করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। বাকি সাহাবীদের কোনো না কোনো জীবিকা এবং পরিবার-পরিজন ছিল। সুফফাবাসীরা ছিলেন প্রবাসী ও দরিদ্র, যারা নিজেদের দ্বীনি ইলম এবং দাওয়াতের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। মদিনাবাসী তাঁদের জন্য মসজিদের একটি খুঁটিতে খেজুর ঝুলিয়ে দিতেন অথবা অন্য কিছু সদকা ও খয়রাত পাঠিয়ে দিতেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২/৫৮৬ থেকে ৫৮৮, ত. আর-রিসালাহ

[২] সহিহ মুসলিম, হা: ২৪৯১, ফাযায়িলুস সাহাবা, বাবু ফাযায়িলি আবি হুরায়রা (রা.)

[৩] আল-ইসাবাহ: ৮/৪২৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

দুইজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যেত। কখনো কখনো অনাহারেও থাকতে হতো। ক্ষুধার কারণে কখনো কখনো মসজিদে নববীতে পুরো কাতার পড়ে যেত। এই সব কঠোরতা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সহ্য করেছেন। তিনি নিজেই বলেন যে, “কখনো কখনো আমি বেহুঁশ হয়ে রাসূল (সা.)-এর হজরা এবং মিস্বরের মাঝখানে পড়ে থাকতাম, আর মানুষ মনে করত আমার মৃগী রোগ হয়েছে, অথচ ক্ষুধার কারণে এই অবস্থা হতো।”

আবু হুরায়রা (রা.)-এর আর্থিক সংকটের কারণে তাঁর মাকেও দারিদ্র্য ও অনাহারের পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসলেন। দেখলেন সুফফার অন্য সাথীরাও ক্ষুধার্ত। রাসূল (সা.) আসলেন, তাঁর কাছে এক থালা খেজুর ছিল, তিনি তাদের মধ্যে দুটি করে খেজুর ভাগ করে দিলেন এবং বললেন: “এগুলো খাও এবং উপরে পানি পান করে নাও। আজকের দিন চলে যাবে।”

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) একটি খেজুর খেলেন এবং অন্যটি যত্ন করে রেখে দিলেন। রাসূল (সা.) কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন:

“এটি মায়ের জন্য রেখে দিয়েছি। তিনিও অনাহারে আছেন।”

রাসূল (সা.) মমতার সাথে বললেন:

“তুমি এই দুটিই খেয়ে নাও। মায়ের জন্য আমরা তোমাকে আরও খেজুর দেব।” [১]

এমন পরিস্থিতিতে কখনো কখনো রাসূল (সা.)-এর মুজিজাতও প্রকাশ পেত। একবার অনাহারের অবস্থায় তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। নবীজির ঘরে মাত্র এক পেয়ালা দুধ ছিল যা কেউ হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছিল। রাসূল (সা.) বললেন: “সব আসহাবে সুফফাকে ডেকে আনো।” আবু হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে তাদের সবাইকে পান করানোর পর আমার জন্য কী অবশিষ্ট থাকবে। যাই হোক, আদেশ পালন করতে গিয়ে আসহাবে সুফফাকে ডেকে আনলাম। রাসূল (সা.) তাদের পান করানোর দায়িত্ব তাঁর ওপরই দিলেন।

উপস্থিত সবাই তৃপ্ত হয়ে দুধ পান করলেন, কিন্তু আল্লাহর শান! পেয়ালা যেমন ছিল তেমনই পূর্ণ রয়ে গেল।

শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন:

“এখন শুধু আমি আর তুমিই বাকি রয়েছি।”

এই বলে তিনি পেয়ালা দিলেন। তিনি পান করতে থাকলেন। রাসূল (সা.) বলতে থাকলেন:

“আরও পান করো, আরও পান করো।”

এমনকি তাঁকে বলতে হলো যে, এখন আর পান করার মতো একদমই জায়গা নেই। [৩]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে সেই দুধ পান করলেন। [৪]

এমনটি ছিল না যে তিনি জীবিকা নির্বাহের চিন্তা থেকে একদম মুক্ত ছিলেন, বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি হযরত উতবা বিন গাজওয়ান (রা.)-এর বোন বুসরা বিনতে গাজওয়ান (রা.)-এর বাড়িতে পানি ভরে আনতেন, এর বিনিময়ে দুই বেলা রুটি পেতেন। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাঁকে সচ্ছলতা দান করলেন, তখন এই বুসরা বিনতে গাজওয়ান (রা.)-এর সাথেই তাঁর বিবাহ হয়। [৫]

[১] সুনান তিরমিজি, হা: ২৩১৭, আবওয়াবুজ জুহদ, বাবু মা জাআ ফি মাঈশাতি আসহাবি নবী (সা.); হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৭৮, ত: মিসর।

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩/৩২৮, ত: সাদির।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৬৪৫২, বাবু কাইফা কানা আইশুন নবী (সা.) ওয়া আসহাবিহি; সুনান তিরমিজি, হা: ২৪৭৭।

[৪] তারিখে দামেশক, ৬৭/৩৬৫।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

বিড়ালদের প্রতি তাঁর অনেক ভালোবাসা ছিল। ইয়েমেনে যখন তিনি তাঁর পরিবারের ছাগল চরাতে, তখন একটি বিড়ালের বাচ্চা খুব শখের সাথে লালন-পালন করতেন এবং সেটির সাথে খেলা করতেন। মদিনাতেও এই শখ কিছুটা বাকি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সম্পর্কের কারণে তাঁকে “আবা হির” (বিড়ালের পিতা) বলে ডাকতেন। এই ভালোবাসার শব্দটি এতটাই প্রসিদ্ধ হলো যে তাঁর আসল নাম পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) আবু হুরায়রা হয়ে গেল। তিনি নিজেও এই কুনিয়াত এতটাই পছন্দ করতেন যে গর্বের সাথে বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে এই কুনিয়াত দিয়েছেন, তোমরা এটি পরিবর্তন করো না। এক শতাব্দী পর যখন উলামায়ে কেরাম তাঁর আসল নাম নিয়ে গবেষণা করতে চাইলেন, তখন প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদা আলাদা নাম শুনলেন। এ বিষয়ে প্রায় ত্রিশটি মত পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হলো যে জাহিলিয়াত যুগে তাঁর নাম ছিল আবদু শামস, ইসলাম গ্রহণের পর রাখা হয় আবদুল্লাহ। [১]

তাঁর স্মৃতির প্রখরতাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি মুজিজা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলেছিলেন:

“তোমার চাদর বিছিয়ে দাও।” তিনি তাই করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদিস বর্ণনা করে বললেন: “চাদরটি তোমার বুকের সাথে জড়িয়ে নাও।” তিনি তাই করলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো বাণী কখনো ভুলতেন না। [২]

আল্লাহ তাঁর হাদিসের পাঠে অনেক বরকত দিয়েছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণনা কারী সাহাবী ও তাবেয়ীদের সংখ্যা আটশ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে। মদিনার গভর্নর মারওয়ান তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মসজিদে নববীতে মারওয়ানের লেখক হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসের পাঠে বসে বর্ণনাগুলো লিখে নিতেন। আবু হুরায়রা (রা.) যখন বর্ণনাগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন, তখন একটি শব্দেরও পার্থক্য হতো না। [৩]

কিছু লোক তাঁর বর্ণনার আধিক্যের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলতেন:

“আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসায় ব্যস্ত থাকতেন এবং আনসার ভাইয়েরা কৃষিকাজে। আর আমি সুফফার দরিদ্রদের মধ্যে একজন ছিলাম, পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে পড়ে থাকতাম। আমি সেই সময় উপস্থিত থাকতাম যখন অন্যরা অনুপস্থিত থাকতেন। আমি সেই সব কথা শুনতাম যা অন্যরা শুনতে পেতেন না।” [৪]

ইলমি ব্যস্ততার পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে জিকির করতেন। প্রতিদিন এক হাজার তসবিহ পাঠ করা তাঁর নিয়ম ছিল। একটি থলিতে খেজুরের আঁটি জমা করে রাখতেন এবং সেগুলো দিয়ে তসবিহ পাঠ করতেন। [৫]

শাসন ও রাজনীতির প্রতি তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল না, তবে হযরত উমর (রা.)-এর যুগে কিছু সময়ের জন্য তাঁকে বাহরাইনের আমিল (গভর্নর) বানানো হয়েছিল। হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক মতভেদে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। মদিনা মুনাওয়ারা...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, ২/৫৮৬, ৫৮৮, ত. আল রিসালা।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫৫৫, হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৮১।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা, ২/৫৯৮, ত. আল রিসালা।

[৪] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫৫৫, কিতাব ফাযাইলুস সাহাবা, বাবু মিন ফাযাইলি আবি হুরায়রা।

[৫] সুনানে দারেমী, হা: ১৩৭১, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মা ইউকরাহ মিন যিকরির রাজুলি মা ইয়াকুনু মিন ইসাবাতি আহলিহি।

তিনি নিজের ঘরটি তাঁর মুক্ত করা দাসদের দান করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে শহরের বাইরে যুল-হুলাইফার গ্রামগুলোতে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। তিনি সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগের তীব্রতার সময় কেউ তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন:

“তোমাদের এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমি কাঁদছি না, বরং আমি কাঁদছি আমার সফরের দীর্ঘতা এবং পাথেয় বা সফরের সরঞ্জামের স্বল্পতার কারণে। আমি একটি পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছি যার পাদদেশে একদিকে জান্নাত এবং অন্যদিকে জাহান্নাম। জানি না আমি জান্নাতে পড়ব নাকি জাহান্নামে।”

কয়েক দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবা জানাজার নামাজ পড়ান। তাঁকে বাক্বী-তে দাফন করা হয়। তাঁর বয়স ছিল ৭৮ বছর। [১]

রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরদাহু।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৩৬২; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৬১০ থেকে ৬২৬, তাবা আর-রিসালাহ।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু খাইরুল কুরানের (উত্তম যুগ) সেই মহান আলেমদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের অবদান ইসলামী উলূমের প্রতিটি শাখায় বিদ্যমান। তাঁকে ‘হিবরুল উম্মাহ’ (উম্মতের বিজ্ঞ আলেম) বলা হয়।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন চাচা হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র। হিজরতের পূর্বে শিয়াবে আবু তালিবে বনু হাশিমের অवरুদ্ধ থাকাকালীন সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাহনিক করান এবং তাঁর মুখে নিজের পবিত্র লালা মবারক প্রদান করেন। তাঁর মাতার নাম উম্মুল ফজল লুবাবা বিনতে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা। উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতা—এই তিন নারী পরস্পরের আপন বোন ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স ছিল তিন বছর। তাঁর পরিবার তখনো হিজরত করেনি; বরং সেই সময় পর্যন্ত তাঁর পিতা হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশও করেননি [১]।

৭ হিজরীর যিলকদ মাসে উমরাতুল কাযার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ‘সরফ’ নামক স্থানে তাঁর খালা হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ব্যবস্থাপনায় হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর স্ত্রী নিয়োজিত ছিলেন [২]। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন দশ বছর বয়সী ছিলেন।

পরবর্তী বছর ৮ হিজরীর শেষভাগে মক্কা বিজয়ের পর হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সপরিবারে মদীনা মুনাওয়ারায় স্থানান্তরিত হন। সেই সময় আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স ছিল এগারো বছর। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রায় আড়াই বছর উপকৃত হওয়ার সুযোগ পান। নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি যেকোনো সময় দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হতে পারতেন [৩]।

এই সংক্ষিপ্ত সময়েই তাঁর ইলমী অন্বেষণ এবং জ্ঞানপিপাসু রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কখনো কখনো তিনি তাঁর খালা সায্যিদা মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে রাত কাটাতেন যাতে নববী রুটিন পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এই সময়ে তিনি সম্ভাব্য সকল খেদমত আঞ্জাম দিতেন এবং দুআ লাভ করতেন। একবার এভাবেই বাইতে নববীতে (নবীজির ঘরে) অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ুর জন্য দাঁড়ালে তিনি একটি পাত্রে পানি ভরে রেখে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন: “এই পানি কে রেখেছে?” হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন: “আবদুল্লাহ বিন আব্বাস।”

[১] সিয়রু আলামিন নুবাল: ৩/৩৩২, ৩৩৩, ত. আল-রিসালা।

[২] সুনানে নাসাঈ আল-মুজতাবা, হা: ৩৩৭৩; সিয়রু আলামিন নুবাল: ২/২৩৯, ত. আল-রিসালা।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবাল: ৩/৩৩২, ত. আল-রিসালা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করেছেন:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ (হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান এবং তাফসীরের ইলম দান করুন।) [১]

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈনন্দিন আমল দেখার জন্য তিনি তাঁর খালার ঘরে অবস্থান করেন এবং তাহাজ্জুদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই জেগে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সালাতের জন্য দাঁড়ালে তিনি ইত্তিদা করার জন্য পেছনে দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে টেনে নিজের বরাবর দাঁড় করিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করলেন, তখন তিনি আবার কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি এটা কী করলে?”

তিনি আরজ করলেন: “أَوْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟”

(কারণে জন্য কি এটা শোভা পায় যে, সে আপনার বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল?)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞায় খুশি হয়ে দুআ করলেন: “হে আল্লাহ! তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে দিন।” [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তেরো বছর বয়সী ছিলেন। এ কারণে তিনি পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাননি, তবে নবুওয়াতের ইলম অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠেছিল। তাই তিনি একজন একজন সাহাবীর কাছে গিয়ে হাদীস মুখস্থ করতে শুরু করেন। তিনি নিজেই বলতেন:

“যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন আমি একজন আনসারী সাথীকে বললাম:

‘এসো! সাহাবীদের থেকে হাদীস শিখি, আজ তাঁরা বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান আছেন।’

সাথী বললেন: ‘আশ্চর্যের বিষয়! তুমি কি মনে করো যে ভবিষ্যতে মানুষের তোমার প্রয়োজন হবে এবং মানুষ তোমার কাছে হাদীস ও মাসআলা জানার জন্য আসবে?’

সেই সাথী এই কাজকে কোনো গুরুত্ব দেননি এবং আমি এই ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলাম,

সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস সংগ্রহ করতে থাকলাম। কখনো কখনো কোনো সাহাবী

সম্পর্কে আমি জানতে পারতাম যে তাঁর কাছে কোনো হাদীস আছে। আমি তাঁর দরজায়

যেতাম, তিনি যদি ঘুমিয়ে থাকতেন তবে আমি দরজায় মাথার নিচে চাদর রেখে বসে

থাকতাম বা শুয়ে পড়তাম। যখন তিনি বাইরে আসতেন তখন বলতেন: ‘হে আল্লাহর

রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি কোন প্রয়োজনে এখানে এসেছেন? আমাকে কেন ডেকে

পাঠালেন না?’ আমি বলতাম: ‘হাজির হওয়া আমার দায়িত্ব।’ তারপর হাদীস জেনে নিতাম।

অবশেষে এমন সময় এল যখন সেই আনসারী সাথী দেখলেন যে মানুষ আমার চারপাশে

ভিড় করছে এবং আমার কাছে হাদীস ও মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে। এটি দেখে সেই সাথী

বললেন: ‘এই যুবকটিই বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয়েছে।’” [৩]

[১] ফায়াইলুস সাহাবা লি-আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ১৮৫৮; সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৩৩, কিতাবুল ওয়ু, বাব ওয়াদউল মা-ই ইনদাল খালা।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩০৬৪, আর-রিসালাহ।

[৩] আল-ইসাবাহ: ৩/১২৫, ত. আল-ইলমিয়াহ।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

যে সাহাবীর কাছ থেকে তিনি কিছু শিখতেন, তাঁর প্রতি তিনি তেমনই আদব প্রদর্শন করতেন যেমনটি কেউ তার শিক্ষকদের প্রতি করে থাকে। একবার তিনি হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর সওয়ারির লাগাম ধরলেন। তিনি (যায়েদ) বললেন: “হে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই! এমন করবেন না।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন:

هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا

“আমাদেরকে আমাদের আলেমদের সাথে এমনই সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

হযরত য়ায়েদ (রা.) তৎক্ষণাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর হাত চুম্বন করে বললেন:

هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا

“আমাদেরকে আমাদের নবীর আহলে বাইতের (পরিবারবর্গের) সাথে এমনই সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।” [১]

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) ছিলেন ভরা যৌবনে। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় খলিফা তাঁকে বিশেষ মজলিসগুলোতে প্রবীণ সাহাবীদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতেন। জটিল মাসআলাগুলোতে তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আব্বাস (রা.) এটি দেখে একবার বললেন:

“আমি দেখছি যে আমীরুল মুমিনীন তোমাকে একান্তে ডাকেন, তোমার থেকে পরামর্শ নেন এবং প্রবীণ সাহাবীদের ওপর তোমাকে প্রাধান্য দেন। আমি তোমাকে চারটি বিষয়ে নসীহত করছি: কখনো তাঁর গোপন কথা ফাঁস করবে না। তিনি যেন কখনো তোমার থেকে মিথ্যা শুনতে না পান। তাঁর সামনে কারো গীবত করবে না। তাঁর কল্যাণকামিতার কোনো কথা কখনো তাঁর থেকে গোপন করবে না।” আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর প্রতিটি কথাকে হাজারো নসীহতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন। [২]

একবার কেউ হযরত উমর (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করল যে, “আপনি ইবনে আব্বাসকে (মজলিসে) অন্তর্ভুক্ত করেন, আমাদের সন্তানদের কেন করেন না?”

হযরত উমর (রা.) বললেন: “সে যুবক হওয়া সত্ত্বেও পরিপক্ক চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী।” [৩]

প্রবীণ সাহাবীরা তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন مسعود (রা.) বলতেন: “যদি তিনি আমাদের সমবয়সী হতেন, তবে আমাদের কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারত না।” তিনি আরও বলতেন: “কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির হলেন ইবনে আব্বাস।”

হযরত আলী (রা.) বলতেন: إِنَّهُ لَغَوَاصٌّ “নিশ্চয়ই তিনি একজন ডুবুরি। তিনি ইলমের সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণকারী।”

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উক্তি হলো: “আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হজ্জের মাসআলাসমূহ সবচেয়ে বেশি জানেন।”

উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বলতেন: “আমি ইবনে আব্বাসের মতো কোনো ব্যক্তি কখনো দেখিনি।”

হযরত মুজাহিদ (রহ.)-এর উক্তি হলো: “আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ছিলেন ইলমের সমুদ্র।”

[১] আল-ইসাবাহ: ২/৩২৭

[২] উয়ুনুল আখবার লি-ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারী: ১/৩১, তাবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

[৩] আল-ইসাবাহ: ২/৩২৭

মাসরুফ (রহ.) বলতেন: “যখন আমি তাঁর চেহারা দেখতাম, তখন বলতাম: এটি সৌন্দর্যের চরম শিখর। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তাঁকে সবার চেয়ে বেশি বাগ্মী মনে হতো। যখন তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন আমি চিৎকার করে বলতাম যে তিনি সবার চেয়ে বড় আলেম।”

আমাশ (রহ.) তাঁকে সুরা নূরের তাফসির করতে শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠতেন:

“রোম ও পারস্যবাসীরা যদি এই বর্ণনা শুনত, তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করত।” [১]

আপনি হযরত উসমান (রা.)-এরও বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে আফ্রিকার জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। সেখানকার বাদশাহ জুরজীরের সাথে কথা বলার জন্য আপনাকে পাঠানো হয়েছিল। আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা এবং বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে সে বলে উঠেছিল: “আপনি আরব বিশ্বের অনন্য আলেম।” [২]

৩৫ হিজরিতে হযরত উসমান গনি (রা.)-এর ঘর অবরোধের সময় তাঁকেই আমিরুল হজ নিযুক্ত করা হয়েছিল। [৩]

হযরত আলী (রা.)-এর যুগে আপনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় আপনার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। বসরার উলামায়ে কেরাম বলতেন যে আমরা তাঁকে হাদিস, ফিকহ, তাফসির, কবিতা, গণিত, ইলমে মিরাস, সিরাত ও ইতিহাসসহ সমস্ত ইলমি কামালিয়াতের ক্ষেত্রে অতুলনীয় পেয়েছি। [৪]

বসরায় আপনি হাদিস পাঠের হালকা কায়েম করেছিলেন; রমজানুল মুবারকে আপনার কাছে ফিকহ কোর্সের জন্য আগ্রহী ছাত্রদের ভিড় জমে যেত। মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই আপনি তাঁদের ফকিহ বানিয়ে দিতেন। [৫]

পাঠদানের ভঙ্গি ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.) বলতেন:

“আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর কাছ থেকে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও আবেগঘন ভঙ্গিতে হাদিস শুনতাম যে, তিনি অনুমতি দিলে আমি তাঁর মাথায় চুমু দিতাম।” [৬]

হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর আপনি মদিনায় চলে যান এবং রাজনৈতিক বিষয়াবলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে দ্বীনি ইলমের খিদমতে উৎসর্গ করেন। এখানে আপনার পাঠদানের হালকা এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে সবদিক থেকে ছাত্ররা ছুটে আসত। তাঁর এক ছাত্র বলতেন: “তিনি কয়েকটি বিষয়ে সমস্ত মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন। তাঁর আগে যে পরিমাণ হাদিস বর্ণিত হয়েছিল, তাঁর ইলম ছিল তার চেয়ে বেশি। ইলমে ফিকহেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। ধৈর্য ও সহনশীলতায়, ইলমে আনসাবে (বংশবিদ্যা) এবং তাবিল ও তাফসিরে তিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা.)-এর ফয়সালাসমূহের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কেউ ছিল না।”

[১] আল-ইসাবাহ: ১২৮/৩

[২] আল-ইসাবাহ: ১৩১/৩

[৩] তারিখুত তাবারী, ৩৫ হিজরি

[৪] উসদুল গাবাহ: ২৯১/৩, দারুল ইলমিয়াহ

[৫] আল-ইসাবাহ: ১২৯/৩

[৬] আল-ইসাবাহ: ১২৯/৩

জানতেন না। তিনি একদিন বসতেন এবং সেদিন ফিকহ ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা করতেন না, একদিন তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হতো কেবল তাফসীর, একদিন তাঁর মজলিসের বিষয়বস্তু হতো কেবল কবিতা, একদিন তাঁর বিষয়বস্তু হতো আরবের ইতিহাস। [১]

শেষ কয়েক বছরে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে আপনি তায়েফে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই ৬৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সে সময় আপনার বয়স ছিল ৭২ বছর। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রা.) আপনার জানাঘার নামায পড়ান। [২]

রাজনৈতিক বিষয়ে আপনার সতর্ক ও সক্রিয় ভূমিকা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। তাই এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরদাহু

□□□

[১] উসদুল গাবাহ: ৩/২৯১

[২] আল-ইসাবাহ: ৩/১২৫ থেকে ১৩৩

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) ইসলামী ইতিহাসের সেই মহান আলেম ও ফকীহ সাহাবীদের একজন, যাদের জীবনচরিত, অবস্থা, কর্ম ও বাণীকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়। বংশমর্যাদার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট যে, তিনি হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর পুত্র এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর আপন ভাই ছিলেন। [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দ্বিতীয় বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন তাঁর পিতা হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন হযরত উমর ফারুক (রা.) হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ আনেন, তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর বয়স ছিল দশ বছর। ঘরের পরিবেশ ছিল দ্বীনের জন্য নিবেদিত। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) পুরোপুরি সেই রঙেই রঞ্জিত হয়েছিলেন।

শৈশব থেকেই তাঁর মেধা ও ফিকহী প্রজ্ঞার নিদর্শন প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন গাছটি মুমিন বান্দার সদৃশ, যা সর্বদা সতেজ থাকে এবং ফল দেয়?” হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) সহ সকলেই চুপ থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “তা হলো খেজুর গাছ।” আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বিষয়টি আগেই বুঝে ফেলেছিলেন। পরে যখন তিনি তাঁর পিতাকে বিষয়টি জানালেন, তখন তিনি বললেন: “যদি তুমি উত্তর দিতে, তবে তা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হতো।” [২]

ইলমী মেজাজ হওয়া সত্ত্বেও জিহাদী উদ্দীপনায় তিনি কারো চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য তিনি নিজেকে পেশ করেছিলেন। বদরে তাঁর বয়স ছিল তেরো এবং উহুদে চৌদ্দ বছর, তাই নবী আকরাম (সা.) তাঁকে অনুমতি দেননি। [৩] খন্দকের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হয়েছিল, তাই তাঁকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। [৪] এরপর থেকে তিনি প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তিনি হৃদয়বিয়ার সন্ধিতেও शामिल ছিলেন। [৫] আঠারো বছর বয়সে তিনি মুতার ভয়াবহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। [৬] মক্কা বিজয়ের সময় তিনি একজন পূর্ণ যুবক ছিলেন, তাই তিনি পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রথম সারিতে शामिल হন এবং নবী আকরাম (সা.)-এর সাথে কাবায় প্রবেশের গৌরবও অর্জন করেন। [৭]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৪২, দার সাদির, জীবনী: আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ১৩১, কিতাবুল ইলম, বাবুল হায়া ফিল ইলম।

[৩] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৪৭২৭।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৪০৯৭, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতিল খন্দক।

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ২৭১১, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতি মুতাহ।

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ৪২৮৯, কিতাবুল মাগাযী, বাবু দুখুলিন নবী (সা.) মিন আ'লা মক্কাহ।

এর পর তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ (গাজওয়াত) এবং সারায়াতে (অভিযান) অংশগ্রহণ করেন। [১]

যৌবনে তিনি ঘোড়দৌড়েরও শৌখিন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন; আবদুল্লাহ বিন উমর-এর এই প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশগ্রহণ করাও প্রমাণিত। [২]

চেহারা ও অবয়বে তিনি তাঁর পিতার সাথে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। গায়ের রং ছিল গন্দমি (শ্যামলা)। তিনি দীর্ঘদেহী ও বলিষ্ঠ গড়নের ছিলেন। দাড়ি ছিল এক মুষ্টি এবং চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় সাধারণ পোশাক পরতেন, তবে মাঝে মাঝে দামী পোশাকও পরিধান করতেন। কুর্তা, সালোয়ার এবং কালো আমামা ছিল তাঁর সাধারণ পোশাক। [৩]

ইবাদত ও রিয়াজতের দিক থেকেও তাঁর জীবন ছিল ঈর্ষণীয়। যৌবনকাল থেকেই তিনি জাহিদানা (সংসারবিরাগী) স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। হিজরত করে মদিনায় আসার পর তিনি সাধারণত মসজিদেই থাকতেন এবং সেখানেই ঘুমাতে। একবার তিনি একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন এবং তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-কে তা শোনান। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন: “আবদুল্লাহ ভালো মানুষ, যদি সে রাতে নফল নামাজও পড়ে তবে খুব ভালো হয়।” এরপর থেকে তিনি অধিক পরিমাণে নফল ও তাহাজ্জুদ নামাজকে নিজের জন্য আবশ্যিক করে নেন। [৪]

তাঁর পিতার খিলাফতকালে তিনি একজন মুজাহিদের জীবন অতিবাহিত করেন এবং ইয়ারমুক ও মিশরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। [৫]

যৌবনের সাথে সাথে তাঁর দ্বীনি প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পেতে থাকে। হযরত উমর (রা.) ঘাতকের হামলায় আহত হওয়া সত্ত্বেও শেষ সময় পর্যন্ত কোনো উত্তরসূরির নাম ঘোষণা না করায় মানুষের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁর পিতার গান্ধীর্ষ ও প্রভাবের কারণে সাধারণত তাঁর সামনে চুপ থাকতেন, কিন্তু এই অবস্থা দেখে সাহস করে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন:

“যদি আপনার উট বা বকরির রাখাল তাদের এভাবে ছেড়ে চলে আসে, তবে আপনি মনে করবেন যে সে সবকিছু নষ্ট করে দিয়েছে; সুতরাং মানুষের দেখাশোনার বিষয়টি তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।” হযরত উমর (রা.) এই মতামতের গুরুত্ব অনুভব করলেন। [৬]

এই আলোচনার পর তিনি তাঁর খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যের একটি শুরা গঠন করেন। [৭]

দ্বিতীয় খলিফার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে পদমর্যাদা থেকে দূরে থাকতেন। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে তাঁকে কাজি (বিচারক) হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবে তিনি ২৭ হিজরিতে আফ্রিকা এবং ৩০ হিজরিতে খোরাসান ও তাবারিস্তানের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। [৮] হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিরক্ষায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁকে সাহস জোগাতে থাকেন যেন তিনি বিদ্রোহীদের দাবি না মানেন এবং খিলাফত থেকে কোনোভাবেই পদত্যাগ না করেন। [৯]

[১] আল-ইসতিয়াব, ৩/৯৫১

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৮৭০, কিতাবুস সালাত, বাব: হাল ইউকালু মাসজিদু বানি ফুলান

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৪/১৩৫, ১৭৩, ৭৫; ত. সাদির

[৪] সহীহ আল-বুখারী, হা: ১১২১, কিতাবুস সালাত, বাব: ফাদলু কিয়ামিল লাইল

[৫] উসদুল গাবাহ: ৩/৩৩৯, ত. আল-হালাবিয়াহ

[৬] সহীহ মুসলিম, হা: ১৮২৩, কিতাবুল ইমারাহ, বাব: আল-ইসতিখলাফ ওয়া তারকুহ; সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৭০০, কিতাবুল মানাকিব, বাব: কিসসাভুল বাইয়াহ

[৭] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২৩৩ ত. আল-হিলাল; তারিখুত তাবারী, ৪/২২৯

[৮] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৬২ সাদির

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মজলিসে শুরার সপ্তম সদস্য ছিলেন। বংশীয় মর্যাদা, রাসূল (সা.)-এর সাথে আত্মীয়তা এবং ইলম ও তাকওয়ার দিক থেকে তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। এবং একজন অত্যন্ত প্রিয় ও জনপ্রিয় খলিফার পুত্র ছিলেন, সেই হিসেবে তিনি উম্মতে মুসলিমাহর রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতেন এবং মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আপনার খেলাফতের ব্যাপারে একমত হতে পারত, কিন্তু আপনি কখনো এমনটি ভাবেননি। ফিতনাবাজ লোকেরা চাইত যে আপনিও রাজনীতির ময়দানে নেমে আসুন। মাঝেমাঝে কিছু মুখলিস ব্যক্তিও এই প্রস্তাব দিতেন, কিন্তু আপনার পবিত্রতা ও দূরদর্শিতা সর্বদা এ ধরনের প্ররোচনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপর ইবনে উমর (রা.) সারা জীবন যেকোনো রাজনৈতিক সংঘাতের অংশ হওয়া থেকে দূরে ছিলেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর কিছু লোক তাঁকে খলিফা হওয়ার জন্য প্ররোচনা দেয় এবং বলে: “আপনি আমিরের পুত্র আমির, আমাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করুন।” কিন্তু আপনার উত্তর ছিল: “আমি নিজের জন্য একটি মশার রক্তও ঝরতে দেব না।” [১]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর যুগে কেউ তাঁকে বলেছিল: “সব লোক শেষ হয়ে গেছে, আপনি রাসূলের সাহাবী এবং উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পুত্র। ময়দানে কেন আসছেন না?” তিনি বললেন: “আল্লাহ ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন। তাই ময়দানে আসছি না।” কেউ বলল: “আল্লাহ তো বলেন: **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ**” [২] তিনি বললেন: “এটি সেই সময়ের নির্দেশ ছিল যখন কাফেররা মুসলমানদের কষ্ট দিত। এটিই ছিল ফিতনা যা বন্ধ করার জন্য জিহাদের নির্দেশ হয়েছিল, সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা লড়াই করেছি যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়েছে এবং আল্লাহর দ্বীনই অবশিষ্ট থেকেছে। তোমরা এজন্য লড়াই করতে চাও যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর দ্বীন শেষ হয়ে যায়।” [৩]

আপনি তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। আপনার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৩০। কুরআন মাজীদ অত্যন্ত গভীর চিন্তা ও গবেষণার সাথে শিখেছিলেন। সূরা বাকারার ইলম অর্জন করতে চৌদ্দ বছর সময় লাগিয়েছিলেন। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর আপনি প্রায় ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে আপনার বেশিরভাগ ব্যস্ততা ছিল হাদীস বর্ণনা এবং ফতোয়া প্রদানের কাজে। এজন্যই কখনো কোনো পদ গ্রহণ করেননি যাতে এই বরকতময় ব্যস্ততায় কোনো কমতি না আসে।

প্রতি বছর হজের জন্য যেতেন এবং উমরার সফরও চলত। হজের মৌসুমে সারা বিশ্ব থেকে হাদীসের শিক্ষার্থীরা আসত যাদের মধ্যে জলীলুল কদর তাবেয়ীগণও থাকতেন, তাঁরা আপনার থেকে উপকৃত হতেন। [৪]

[১] “নিশ্চয়ই আপনি মানুষের নেতা এবং নেতার পুত্র, সুতরাং বের হোন আমরা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করি।” (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৫১, ত. সাদির)

[২] সূরা আল-বাকার, আয়াত: ১৯৩

[৩] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ৩/৩৫, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল-বাকার, পরিচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: ‘আর তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়’

[৪] উসদুল গাবাহ: ৩/৩৩৬

মদিনায় আপনার মজলিস একটি স্থায়ী দরসের হালকার মর্যাদা রাখত। সব সময় ওঠা-বসার কোনো না কোনো উপলক্ষে কোনো না কোনো হাদিস বা আয়াত শোনাতেন। শুধু মৌখিকভাবে নয়, **كُتِبَ** ব্যবহারিকভাবে আপনি সুন্নাহর ছাঁচে ঢালাই করা ছিলেন। আপনার জীবন হাজার হাজার হাদিস সম্বলিত এমন এক জীবন্ত ছবি ছিল যা কিছুক্ষণ দেখে নেওয়া বছরের পর বছর হাদিসের দরস শোনার সমান ছিল। সাহাবী ও তাবয়ীগণ স্পষ্টভাবে বলতেন যে, তাঁর কোনো কাজই সুন্নতে নববী থেকে বিচ্যুত হয় না।

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের অবস্থাগুলোর অনুসরণ তাঁর মতো আর কেউ করতে পারেনি। [১]

তাঁর বিশেষ ছাত্র ছিলেন নাফে (রহ.), যিনি তাঁর কাছ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন। তিনি নিজের ছাত্রদের বলতেন যে, যদি তোমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে সুন্নাহ ও আসার (সাহাবীদের আমল) তালাশ এবং অনুসরণে মগ্ন দেখতে, তবে তাঁকে পাগল মনে করতে। [২]

সেই যুগের নেককার লোকেরা দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের জীবনে ইবনে উমর (রা.)-কে জীবিত রাখুন, কারণ তাঁর চেয়ে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত আর কেউ নেই। [৩]

হাদিসসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শব্দে ছবছ শোনানোকে জরুরি মনে করতেন। কেউ একজন হাদিস শোনালেন:

‘مَثَلُ الْمَنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنَ رَيْضَتَيْنِ ----’ (মুনাফিক সেই বকরির মতো যে দুই পালের মাঝখানে থাকে।)’

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন এবং বললেন: ‘كَشَاةٍ بَيْنَ رَيْضَتَيْنِ’ (কাশাতিন বাইনা গানামাইন), যদিও رَيْضَتَيْنِ এবং غَنَمَيْنِ-এর অর্থ একই অর্থাৎ দুই পাল। [৪] এই কারণেই মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণনার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) প্রায় পনের বছর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে ছিলেন। হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর পুরো যুগ আপনার সামনে ছিল। কমপক্ষে ত্রিশ বছর নিজের শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত উমর (রা.)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তাঁর পর বারো বছর হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকেও উপকৃত হয়েছেন। যখন আপনার ইলমের চর্চা ছড়িয়ে পড়ল, তখন হযরত নাফে (রহ.) আপনার সাথে ত্রিশ বছর অতিবাহিত করেন এবং এই ইলম অর্জন করেন। এরপর ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) প্রায় বারো বছর হযরত নাফে (রহ.) থেকে ইলম অর্জন করেন। এই তিন বুজুর্গ: হযরত ইবনে উমর (রা.), নাফে এবং ইমাম মালিক (রহ.) সারা জীবন মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেছেন, যেখানকার ইলম ছিল সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ। এই কারণে মুহাদ্দিসগণ তাঁদের সনদকে ‘سلسلة الذهب’ (স্বর্ণশৃঙ্খল) বলে অভিহিত করতেন।

ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, হাদিসের কিতাবসমূহে সবচেয়ে উচ্চমানের সনদ হলো: ‘মালিক আন নাফে আন ইবনে উমর’।

মুয়াত্তা মালিক, যা সহীহ বুখারীর পর মতন (মূল পাঠ) ও সনদের বিশুদ্ধতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদা রাখে, তা বেশিরভাগই আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর বর্ণনা সম্বলিত, যার একটি বিশাল অংশ এই সনদের ওপর ভিত্তি করে।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২১১ থেকে ২১৩, ত. আর-রিসালাহ

[২] নাফে থেকে বর্ণিত: যদি তুমি ইবনে উমরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে দেখতে, তবে বলতে: এ তো পাগল। (মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৬৩৭৬)

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৩৪, ত. সাদির, আব্দুল্লাহ বিন উমরের আলোচনায়

[৪] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪৮৭৩

হাদিসের পাশাপাশি ফিকহ ও ইফতাতেও আপনার খেদমত অবিস্মরণীয়। মালেকী ফিকহ মূলত আপনার ফতোয়ার ওপরই নির্ভরশীল। ইমাম মালেক বলতেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ষাট বছর পর্যন্ত ফতোয়া দিয়েছেন। এই ফতোয়া ও ফিকহী মতামতগুলো একত্রিত করলে একটি বিশাল সংকলন তৈরি হবে। এগুলোর বড় অংশ মুয়াত্তা ইমাম মালেক এবং মুসনাদে আহমদে বিদ্যমান। কিছু আকাবিরের অভিমত ছিল যে, একা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা ও ফতোয়াসমূহ পুরো দ্বীনের ইলমের জন্য যথেষ্ট। [১]

কবিতা, সাহিত্য ও ইতিহাসে আপনার কোনো আগ্রহ ছিল না। দ্বীনি ইলমই ছিল আপনার প্রাণের প্রশান্তি। বাকি কবিতা ও সাহিত্য আপনার দৃষ্টিতে তেমন গুরুত্ব পেত না, তবে কখনো কখনো আলোচনার প্রেক্ষিতে কোনো কবিতা আপনার মুখে চলে আসত। [২]

রাতের বড় অংশ নফল নামাজ পড়তেন। [৩] প্রতিদিন একটি কুরআন মাজীদ খতম করতেন। [৪]

সওয়াব অর্জনের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। ঘর থেকে অজু করে ছোট ছোট কদম ফেলে মসজিদের দিকে যেতেন, কারণ প্রতিটি কদমে সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে, তাই যত বেশি কদম হবে তত বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। [৫]

প্রতি বছর বিরতিহীনভাবে হজ করতেন, এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আক্রমণের সময়কার হজও ছাড়েননি। [৬] এই ভেবে প্রথমে উমরা এবং পরে হজের ইহরামও বেঁধে নিলেন যে, যদি হারামে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন তবে হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উমরা না করে ইহরাম খুলে ফেলার সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে। [৭]

সুন্নতের অনুসরণে আপনার আশেকানা ও আবেগপূর্ণ রুচি ছিল। [৮] হজে যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে যেখানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই অবতরণ করতেন। যেখানে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজ পড়েছিলেন, তিনিও সেখানে নামাজ পড়তেন। [৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াত কবুল করতেন। ইবনে উমর (রা.)-ও দাওয়াত কবুল করতেন, এমনকি নফল রোজা থাকলেও। মেজবানের বাড়িতে খাবার খেতেন না কিন্তু হাজিরা অবশ্যই দিতেন যাতে সুন্নত আদায় হয়ে যায়। [১০]

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের সময় আপনি তাঁর হাতে বায়াত করেছিলেন কিন্তু কার্যত নিরপেক্ষ ছিলেন। তবে পরবর্তীতে আপনি যে পরিস্থিতি দেখলেন, তার প্রেক্ষিতে আপনি এটি অনুভব না করে পারলেন না যে, ফিতনা-ফাসাদের সময় নিরপেক্ষ থাকার চেয়ে উত্তম হলো যে

[১] ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, আমি মালেককে বললাম: “আপনি কি মদীনার মাশায়েখদের বলতে শুনেছেন যে, ইবনে উমর কোনো বিষয়ই বাদ দেননি?” তিনি বললেন, হ্যাঁ (আল-ইসাবাহ: ৩/১৫৯)

[২] আল-মাবসূত লিস-সারখাসি: ৩/৬, তবা’ আল-মা’রিফাহ

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ১১২২, বাবু ফাদলি কিয়ামিল লাইল

[৪] ওফয়াতুল আইয়ান: ১/৩৩০, উসদুল গাবাহ: ৩/৩৩৬

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৫৩, তবা’ সাদির

[৬] আখবারে মক্কা লিল-ফাকিহি: ২/৩২৩, তবা’ দারু খিজর

[৭] সহীহ বুখারী, হা: ১৮০৬, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ইয়া উহসিরাল মু’তামির, হা: ১৮১৩, বাবু মান ক্বলা লাইসা আলাল মুহসার বাদাল

[৮] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা: ৬৩৭৬

[৯] আল-ইসাবাহ: ৩/১৬০

[১০] সহীহ মুসলিম, হা: ৩৫৮৯, কিতাবুন নিকাহ, আল-আমর বি-ইজাবাতিদ দা’য়ী

যথাযথ খলিফাকে সমর্থন করা উচিত। তাই আপনি বলতেন:

“আমি হাত গুটিয়ে রেখেছি এবং সামনে অগ্রসর হইনি, তবে হকের জন্য লড়াইকারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।” [১]

একবার আপনি কুরআন মাজিদের আয়াত: “অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা বাড়াবাড়ি করছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে” [২]-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন: “আমি কোনো বিষয়ে এতটা ব্যথিত নই যতটা এই বিষয়ে যে, আমি বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করিনি যেমনটি আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।” [৩]

আপনার রায়ের সঠিকতা এমন ছিল যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), যিনি জঙ্গ জামালের পর নিজের ইজতিহাদি ভুলের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ছিলেন, একবার আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে বলতে লাগলেন: “হে আবু আবদুর রহমান! আপনার কী হয়েছিল যে আপনি আমাকে এই সফর থেকে বিরত রাখেননি?” তিনি আরজ করলেন: “আমি দেখেছিলাম যে জুবায়ের (রা.) আপনার রায়ের ওপর প্রবল হয়ে গিয়েছিলেন।”

উম্মুল মুমিনীন বললেন: “আল্লাহর কসম! যদি আপনি আমাকে নিষেধ করতেন তবে আমি কখনোই (এই সফরে) বের হতাম না।” [৪]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের বায়আতের মজলিসে আপনি উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু আপনি উম্মতকে ফিতনা ও ফাসাদ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, তাই ইয়াজিদের যুগে কিছুটা বিলম্বের পর তারও বায়আত গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বায়আত থেকে এই কারণে বিরত ছিলেন যে, তার এবং আবদুল মালিকের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল এবং ফলাফল অস্পষ্ট ছিল। আপনি কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া প্রকাশ করতে চাননি এবং এই সংঘাতকে ফিতনা মনে করতেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পর আপনি আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের বায়আত গ্রহণ করেন। আবদুল মালিক বিন মারওয়ান আপনাকে সম্মান করত। সে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে তাকিদ দিয়েছিল যেন হজের মানাসিকে ইবনে উমর (রা.)-এর অনুসরণ করা হয়। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতে আপনি অত্যন্ত শোকাহত হন। হাজ্জাজ যখন তার দোষত্রুটি বর্ণনা করতে শুরু করল, তখন আপনি তা সহ্য করতে পারলেন না এবং সাধারণ মজলিসে হাজ্জাজের মুখের ওপর তার প্রতিবাদ করলেন। এই সত্যবাদিতা হাজ্জাজকে আপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলল। ৭৩ হিজরির হজে আপনি কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির বিষাক্ত তীরের আঘাতে আহত হন এবং ১লা মহররম ৭৪ হিজরিতে সেই জখমেই ইন্তেকাল করেন। সাধারণ ধারণা ছিল যে, হত্যার ষড়যন্ত্র হাজ্জাজই করেছিল। [৫]

মৃত্যুর আগে নিজের ছেলে সালেমকে বললেন: “বেটা! আমি মারা গেলে আমাকে হরমের সীমানার বাইরে দাফন করো, আমি পছন্দ করি না যে যেখান থেকে হিজরত করেছি সেখানেই দাফন করা হোক।”

সাহেবজাদা বলতে লাগলেন: “আববাজান! সম্ভব হলে অবশ্যই করব।”

আপনি রাগান্বিত হয়ে বললেন: “আমার কথা শুনে তুমি বলছ যে সম্ভব হলে করবে।”

[১] কাফাফতু ইয়াদি ফালাম উক্বাদিম ওয়াল মুকাতিলু আলাল হাক্কি আফদাল। (আল-ইসতিয়াব: ৩/ ৯৫১)

[২] “অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা বাড়াবাড়ি করছে।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯)

[৩] মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩২২, ইমাম যাহাবী বলেছেন: বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

[৪] “আম্মা ইম্বাকা লাও নাহাইতানি মা খারাজতু।” (আল-ইসতিয়াব: ৩/ ৯৫০, ইবনে আবদুল বার তার সনদে বর্ণনা করেছেন; আত-তারিখ বি-দামিশক: ৩১/ ১১০)

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/ ৩০৬ থেকে ৩২৩, ত ত-রিসালাহ।

তিনি বললেন: “আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে হাজ্জাজ জবরদস্তি করবে এবং সেই জানাজা পড়াবে।”

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

আপনার মৃত্যু হলে হাজ্জাজ হস্তক্ষেপ করল এবং অসিয়তের বিপরীতে আপনাকে হৃদুদে হারামের মধ্যেই দাফন করিয়ে দিল।

রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরদাহ।

□□□

ফিতনার যুগ এবং আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিতনার যুগের রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে কার সাথে ছিলেন? তিনি কাকে অপরাধী এবং কাকে সত্যের ওপর মনে করতেন? এই প্রশ্নগুলো আজকাল খুব জোরালোভাবে তোলা হচ্ছে। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্ব অবিসংবাদিত ছিল এবং প্রতিটি শ্রেণী তাঁকে সম্মান করে এবং তাঁর বাণী ও ফতোয়া থেকে উপকৃত হয়ে আসছে, তাই প্রতিটি শ্রেণীর চেষ্টা থাকে তাঁকে নিজেদের সমমনা প্রমাণ করার। ফলে কিছু লোক দাবি করে যে, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়া শাসকদের ধর্মহীন বা মুনাফিক মনে করতেন। আবার কিছু লোক দাবি করে যে, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বনু উমাইয়ার শাসন খিলাফতে রাশেদার চেয়ে কম ছিল না এবং আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আক্ষেপ ছিল যে, হায়! যদি বনু উমাইয়ার বিরোধী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদের সৌভাগ্য অর্জিত হতো। সংক্ষেপে, প্রত্যেকেরই একটি পূর্বনির্ধারিত মতামত রয়েছে যা সঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি পেশ করে। অথচ হওয়া উচিত ছিল এই যে, আমরা নিরপেক্ষতার সাথে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করি। অতএব, আমরা এই পরস্পরবিরোধী দাবি এবং তাদের দলীল খণ্ডন করার পরিবর্তে প্রকৃত সত্য জানার জন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক ধারণাগুলো পর্যালোচনা করছি। চেষ্টা থাকবে যেন যথাসম্ভব সহীহ সনদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করা হয়। আমরা এই আলোচনার সূচনা সাহাবায়ে কেরামের একটি যৌথ মজলিসের ঘটনা দিয়ে করছি, যার মাধ্যমে শুধু আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নয় বরং আরও কিছু বড় সাহাবীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার ওপরও আলোকপাত হয়:

হিশাম বিন হাসান বলেন যে, সাহাবীদের একটি দল একত্রিত হয়েছিল যাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত হুজাইফা, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন। তাঁরা ফিতনার যুগের আলোচনা করলেন। হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন: “যদি আমি সেই যুগ পাই তবে আমি জানতে পারব যে তা থেকে মুক্তির পথ কী।” হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “আমি সেই যুগ পেলে আমার কাছে মুক্তির পথ জানা থাকবে না।” হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন: “আমি যদি সেই যুগে হই এবং আমাকে এমন কোনো তলোয়ার দেওয়া হয় যা বলে দেবে যে এ মুমিন এবং ও কাফের, তবেই আমি লড়াই করব নতুবা নয়।” আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন: “আমি আপনার সাথে আছি।”

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৪/১৮৭ ত সাদির

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — ৬৬৭

আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) বলতেন: “আমি যদি সেই সময়টি পাই, তবে আমি আমার তলোয়ার কাঁধে তুলে নেব, তারপর উম্মতের বড় জামাতে शामिल হব, এরপর তলোয়ার চালাব যতক্ষণ না (বিভিন্ন দল) এক হয়ে যায়।” [১]

হযরত আলী এবং হযরত হাসান (রা.)-এর যুগে:

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব কোনো অংশ নেননি। যখন জঙ্গ জামাল এবং সিফফিনের প্রভাবে উম্মত দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) সেই স্তরে ছিলেন যারা কোনো পক্ষের সাথেই ছিলেন না। [২] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ব্যবহারিক সমর্থন না পাওয়ায় হযরত আলী (রা.)-এর শক্তি ও শৌর্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। [৩]

যখন ইরাকবাসী এবং সিরিয়াবাসীদের বিরোধ চরমে পৌঁছাল এবং জঙ্গ সিফফিন সংঘটিত হলো, এরপর মীমাংসার প্রচেষ্টার জন্য সালিশি মজলিস অনুষ্ঠিত হলো। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এই উপলক্ষে নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে সালিশি মজলিসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। [৪] যখন সালিশি মজলিস কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলো, তখন উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে খলিফা বানানোর পরামর্শ দিতে লাগলেন। নিঃসন্দেহে তিনি এমন এক স্তরে ছিলেন যে উম্মত তাকে খলিফা হিসেবে বেছে নিত। আল্লাহ তাকে যেমন উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন, তেমনি তার চরিত্রও ছিল অত্যন্ত উন্নত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নিকট একটি আদর্শ ইসলামী সরকার বা খেলাফতের ধারণা এমন ছিল যে, উম্মত যেন নিজের খুশি এবং মতৈক্যের ভিত্তিতে কাউকে শাসনের জন্য পছন্দ করে। মুসলমানদের অপছন্দ সত্ত্বেও শাসন ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা তার মতে একটি ভুল পদ্ধতি ছিল, যা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করতেন না এবং অন্যদের জন্যও নয়।

[১] মুসনাদুল হারিস, ২/৭৫৯, রেওয়ায়েত নম্বর: ৭৫৫, ইসনাদ সহীহ মুরসাল।

[২] এটি সাধারণ ধারণা যে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর হাতে মোটেও বায়াত হননি; কারণ তিনি নিরপেক্ষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বায়াত গ্রহণকারীদের তালিকায় তার নাম নেই, যেখানে ওয়াকিদীর বর্ণনায় বায়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (তারিখে তাবারী: ৪/৪৩০, ৪৩১)। তবে এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত যে, যেসব বর্ণনায় মুহাজির ও আনসারদের সাধারণ বায়াতের কথা উল্লেখ আছে, তাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। “তাদের মধ্যে তালহা, যুবায়ের, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন আমর বিন নুফায়েল, আম্মার বিন ইয়াসির, উসামা বিন যায়েদ, সাহল বিন হুнайফ, আবু আইয়ুব আনসারী, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ, যায়েদ বিন সাবিত, খুজাইমা বিন সাবিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা মদীনায় ছিলেন তারা সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/৩১, মুহাম্মদ বিন আল-হানাফিয়ার বর্ণনায়: “মুহাজির ও আনসাররা প্রবেশ করলেন এবং তার হাতে বায়াত হলেন, এমনকি সাধারণ মানুষের শেষ ব্যক্তিটিও আলী বিন আবি তালিবের হাতে বায়াত হলেন।”) (তারিখে তাবারী: ৪/৪২৭) সহীহ মুরসাল সনদে। (তারিখে তাবারী: ৪/৪৩৩) “সংখ্যাগরিষ্ঠরা বললেন: আলী বিন আবি তালিব, আমরা আপনার সাথে আছি।” (তারিখে তাবারী: ৪/৪৩৩)। যদি তার বায়াত না হওয়ার বর্ণনাটি সঠিক হয়, তবে এর গুরুত্ব খুব বেশি নয়। এটিই প্রবল ধারণা যে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) ব্যক্তিগতভাবে বায়াত হয়েছিলেন কিন্তু ব্যবহারিক সাহায্য থেকে দূরে ছিলেন। যেমনটি আরও অনেক সাহাবী ও তাবয়ী সতর্কতামূলক পথ অবলম্বন করেছিলেন। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী লেখেন: “উসমানিয়াহরা বলেন: একদল সাহাবী তার থেকে দূরে ছিলেন, তাদের মধ্যে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ, ইবনে উমর, উসামা বিন যায়েদ এবং তাদের সমপর্যায়ের অন্যান্যরা ছিলেন। আমরা বলি: বায়াতের ক্ষেত্রে তারা পিছপা হননি, তবে তারা তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত ছিলেন। যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অংশগ্রহণ না করা সুন্নাহ ও ইজতিহাদের বিষয় ছিল।” “হাফিয (যাহাবী) বলেন যে, একদল লোক হযরত আলীর বায়াত থেকে বিরত ছিলেন, যাদের মধ্যে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ, আবদুল্লাহ বিন উমর, উসামা বিন যায়েদ এবং তারা ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তি ছিলেন। আমরা বলি যে তারা বায়াত থেকে বিরত ছিলেন না, হ্যাঁ, সাহায্য করা থেকে দূরে ছিলেন এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন কারণ এটি ছিল তাদের ইজতিহাদী অবস্থান।” (আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃ. ১৫০)।

[৩] যদিও হযরত (আলী) তাদের ব্যক্তিগত মতামতের কারণে ব্যথিত ছিলেন; কারণ তিনি সেইসব হাদীসের দিকে লক্ষ্য করছিলেন যাতে ফিতনার সময় নির্জনবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৫৭০, ৫৭১; তারিখে তাবারী: ৫/৬৭ থেকে ৭১।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

তাই যখন সালিশি মজলিসে তাঁকে খিলাফতের প্রস্তাব দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন:

“لَا أُعْطِي وَلَا أُقْبَلُهَا إِلَّا عَنْ رِضَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ”

(এই পদ আমাকে দেওয়া যেতে পারে না এবং আমি তা গ্রহণও করতে পারি না, যতক্ষণ না মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত হয়।)

হাফেজ যাহাবী বলেন: “আমিরুল মুমিনীন আলী [রা] এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস [রা]-এর মতো ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সেদিন তাঁর বায়আত প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর যদি তাঁর বায়আত করা হতো, তবে দুইজন ব্যক্তিও তাঁর ওপর মতভেদ করত না।” [২]

আবদুল্লাহ বিন উমর [রা]-এর নিকট উত্তম শাসনের মানদণ্ড:

মূলত আবদুল্লাহ বিন উমর [রা]-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, শাসনব্যবস্থা আদর্শ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এতে ক্ষমতা লাভের কোনো আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র থাকা উচিত নয়।

[৩] এছাড়া তিনি এও মনে করতেন যে, রাজনৈতিক ইমামত উম্মতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তির পাওয়া উচিত, যাতে মতভেদের সম্ভাবনা ন্যূনতম থাকে, যেমনটি সালাতের ইমামতির ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান রয়েছে। [৪]

এ কারণেই যখন হযরত মুয়াবিয়া [রা] প্রচেষ্টা ও কৌশলের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে শাসক হলেন এবং হযরত হাসান [রা] উম্মতের কল্যাণের স্বার্থে ক্ষমতা ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর [রা] এই পরিবর্তনে সন্তুষ্ট ছিলেন না [৫], কিন্তু উম্মতকে ফিতনা থেকে বাঁচাতে তিনি বায়আত করে নেন। [৬]

শুধু তাই নয়, বরং হযরত মুয়াবিয়া [রা]-এর পক্ষ থেকে খিলাফতের উদ্বোধনী খুতবায় পূর্ববর্তী শাসকের প্রতি যে কটাক্ষ করা হয়েছিল, আবদুল্লাহ বিন উমর [রা] তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও চুপ ছিলেন যাতে ঐক্যে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। [৭]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩/১-৩৯ সহীহ সনদে, তবা আস-সাআদাহ।

[২] ইমাম আলী এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের মতো ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সেদিন তাঁর বায়আত প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর যদি তাঁর বায়আত করা হতো তবে তাঁর ওপর দুইজন লোকও দ্বিমত পোষণ করত না। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/২১৭)

[৩] অর্থাৎ সর্বোত্তম পদ্ধতি এটাই, কারণ অনেক হাদীসে পদপ্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও জরুরি পরিস্থিতিতে এর অবকাশ রয়েছে, যেমনটি “আমাকে জমিনের ভাণ্ডারসমূহের দায়িত্ব দিন” আয়াতের অধীনে হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. শর্তাবলি সহ বিস্তারিত লিখেছেন। (মোআরিফুল কুরআন, সূরা ইউসুফ আয়াত ৫৫)

[৪] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: ইবনে উমরের রায় এর বিপরীত ছিল যে, ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে কম মর্যাদাবান ব্যক্তির বায়আত করা উচিত নয়। “ইবনে উমর [রা]-এর মত ছিল এর বিপরীতে যে, ফিতনার আশঙ্কা ছাড়া কম মর্যাদাবান ব্যক্তির বায়আত করা উচিত নয়।” (ফাতহুল বারী: ১৩/২০৪)

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৩১০৮, কিতাবুল মাগাযী, বাব গায়ওয়ায়ে খন্দক।

[৬] ইবনে হাজার বলেন: এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে মুয়াবিয়া এবং তারপর তাঁর পুত্র ইয়াজিদের বায়আত করেন এবং তাঁর সন্তানদের বায়আত ভঙ্গ করতে নিষেধ করেন। “এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে মুয়াবিয়া এবং তারপর তাঁর পুত্র ইয়াজিদের বায়আত করেন এবং তাঁর সন্তানদের বায়আত ভঙ্গ করতে নিষেধ করেন।” (ফাতহুল বারী: ১৩/২০৪)

[৭] হযরত মুয়াবিয়া [রা] এই খুতবায় বলেছিলেন, “এখন কেউ যদি এই বিষয়ে কথা বলতে চায় তবে সে মাথা তুলে কথা বলুক, আমরা এই বিষয়ের (খিলাফতের) তাঁর এবং তাঁর পিতার চেয়ে বেশি হকদার।” ইবনে উমর [রা] বলেন যে, আমি আমার জায়গা থেকে ওঠার জন্য নড়াচড়া করলাম। আমি তাঁকে বলতে চেয়েছিলাম যে, এই বিষয়ের হকদার সেই ব্যক্তি যে ইসলামের খাতিরে আপনার এবং আপনার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু আমি এই ভয়ে বলা থেকে বিরত থাকলাম যে পাছে উম্মতের ঐক্যে ফাটল ধরে, কথার অন্য কোনো অর্থ নেওয়া হয়, তাই আমি জান্নাতের সওয়াবের ওপরই সন্তুষ্ট থাকলাম। (সহীহ বুখারী, হা: ৩১০৮, কিতাবুল মাগাযী, বাব গায়ওয়ায়ে খন্দক)

হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে:

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন, তবে রাজনৈতিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তবুও তাঁর ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন যে, তিনি হয়তো শাসনের কোনো চেষ্টা করবেন। তিনি নিজের সন্তুষ্টির জন্য আমর বিন আল-আস (রা.)-কে তাঁর কাছে পাঠান যাতে তাঁর মনের অবস্থা যাচাই করা যায়। আমর বিন আল-আস (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন: “হে আবু আবদুর রহমান! মানুষের সামনে এসে তাদের বায়াত গ্রহণ করা থেকে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী এবং আমিরুল মুমিনীন উমর (রা.)-এর পুত্র। আপনি এই পদের সবচেয়ে বেশি হকদার।”

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বললেন: “আপনি যা বলছেন, সে বিষয়ে কি সবাই একমত?”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ! কিছু লোক ছাড়া।”

তিনি বললেন: “যদি পুরো অঞ্চলের তিনজন খ্রিস্টানও দ্বিমত পোষণ করে, তবে আমার এই পদের কোনো প্রয়োজন নেই।” [১]

এই পুরো সময়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর এই অভিমত ছিল যে, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ না করাই উত্তম। কিছু লোক এ বিষয়ে আপত্তিও করত। এক ব্যক্তি এসে বলল: “আপনি এক বছর হজ এবং এক বছর উমরা করেন। আপনি জিহাদ ছেড়েই দিয়েছেন। অথচ আপনি জানেন যে আল্লাহ এর জন্য কত উৎসাহ দিয়েছেন।”

তিনি বললেন: “ইসলামের পাঁচটি রুকন রয়েছে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমজানের রোজা, জাকাত আদায় এবং বাইতুল্লাহর হজ।”

সে বলতে লাগল: “আপনি কি আল্লাহর এই বাণী শোনেননি:

وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي [২] حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

তিনি বললেন: “এই আয়াতের কারণে লজ্জিত হওয়া এবং যুদ্ধ না করা আমার কাছে পছন্দনীয়। তবে এটি সহ্য করার মতো নয় যে, আমাকে এই আয়াত পড়ে লজ্জা দেওয়া হবে যাতে আল্লাহ বলেন: [৩] وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا:

সেই ব্যক্তি বলতে লাগল: আল্লাহর বাণী হলো: وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ: [৪]

[১] لو لم يبق الا ثلاثة اعلاج بهجر لم يكن لي فيها حاجة [১] (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৬৩, সাদির সংস্করণ, সহিহ সনদসহ)

[২] যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের মধ্যে যদি এক দল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা বাড়াবাড়ি করে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে মীমাংসা করো এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯)

[৩] আর যে কেউ কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩)

[৪] আর তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৯)

তিনি বললেন: “আমরা এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে করেছি যখন মুসলিমরা সংখ্যায় অল্প ছিল। একজন মানুষকে তার দ্বীনের কারণে পরীক্ষায় ফেলা হতো। লোকেরা তাকে হত্যা করত অথবা বন্দী করে রাখত। শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল এবং ফিতনা আর থাকল না।”

সে বলতে লাগল: “আপনি হযরত উসমান এবং আলী সম্পর্কে কী বলেন?”

তিনি বললেন: “আলী এবং উসমান সম্পর্কে আমার বক্তব্য আর কী হতে পারে! উসমানকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু তোমাদের এটি সহ্য হচ্ছে না যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। আলী তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা এবং এই যে তার ঘর যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।” [১]

একটি বর্ণনা অনুযায়ী, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে কেউ তাকে ‘وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً’ আয়াতটি শুনিয়ে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাতে তিনি বললেন: “তুমি কি জানো ফিতনা কী? মুহাম্মদ ﷺ মুশরিকদের সাথে লড়াই করতেন এবং মুশরিকদের দ্বীনে প্রবেশ করা ছিল ফিতনা। সেটি তোমাদের মতো রাজতন্ত্রের জন্য লড়াই ছিল না।” [২]

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার (উলি আহদি) সংক্রান্ত আপনার অভিমত:

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের সেই প্রচেষ্টার সাথে একমত ছিলেন না যা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শেষ জীবনে শুরু করেছিলেন। কারণ ইয়াজিদ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং তার মনোনয়ন উম্মতের বড়দের পক্ষ থেকেও হয়নি। এই মনোনয়ন ছিল হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে এবং তিনি চেয়েছিলেন যে বাকি ব্যক্তিবর্গ যেন তাকে সমর্থন করেন। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ফিকহি মত ছিল এই যে, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তির বায়আত সেই অবস্থায় করা যেতে পারে যখন তা না করলে ফিতনা ও ফাসাদের আশঙ্কা থাকে। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকেও তার বিরোধিতার আশঙ্কা ছিল। তার এই ভয়ও ছিল যে তিনি হিজাজবাসীদের তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবেন এবং কোনো বিদ্রোহ দেখা দেবে যার পরিণতি হবে ভয়াবহ রক্তপাত। ফলে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হজের জন্য হিজাজে গেলেন। তিনি যখন মদিনায় পৌঁছালেন, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তখন হজের জন্য মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বিষয়ে মসজিদে নববীর মিম্বরে আলোচনা করলেন এবং তার মুখ থেকে আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে এমনকি এটিও বেরিয়ে গেল: “আল্লাহর কসম! যদি তিনি বায়আত না করেন তবে আমি তাকে হত্যা করব।” [৩]

পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুভব করলেন যে তিনি তার ধৈর্য ও সহনশীলতার বিপরীতে রাগের মাথায় একটি কঠোর বাক্য বলে ফেলেছেন। কিন্তু এই কথাটি দ্রুত ছড়িয়ে মক্কায় পৌঁছে গেল। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই খবর শুনে বলতে লাগলেন: “আমি কি মুয়াবিয়াকে ছেড়ে দেব যে তিনি আপনাকে হত্যা করবেন? আল্লাহর কসম! যদি শুধু আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরাও বাকি থাকি, তবুও আপনার সুরক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাব।”

[১] অর্থাৎ রাসূলের ঘরের সাথে লাগানো ঘরটি তার, এর চেয়ে বেশি নৈকট্য আর কী হতে পারে। সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৭৫০, কিতাবুত তাফসীর, বাব: ওলাকাদ আফাল্লাহু আনহুম।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭০৯৫, কিতাবুল ফিতান, বাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: ফিতনা পূর্ব দিক থেকে আসবে।

[৩] ওয়ালাহি লাইউবায়িউল্লা আও লা-আকতুলাল্লাহ, (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৩ সহীহ সনদে); তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৮৩ সহীহ মুত্তাসিল সনদে।

যখন হযরত মুয়াবিয়া হুজ্জের জন্য মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান অভ্যর্থনাকারীদের সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কি বলেছেন যে, ইবনে উমর যদি আপনার ছেলের বায়আত গ্রহণ না করেন তবে আপনি তাঁকে হত্যা করবেন?” হযরত মুয়াবিয়া বললেন: “আমি কি আবদুল্লাহ বিন উমরকে হত্যা করব? আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে হত্যা করব না।” [১]

এরপর তিনি আবদুল্লাহ বিন উমরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর বললেন: “যখন মানুষ একটি সিদ্ধান্তে একমত হবে, তখন আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” [২]

ইয়াজিদের যুগে:

হযরত মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর যখন ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করল, তখন আবদুল্লাহ বিন উমর বললেন: “যদি এটি কল্যাণকর হয় তবে আমরা সম্মত। আর যদি বিপদ হয় তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করব।” [৩]

এই যুগে তিনি হযরত হুসাইনকে কুফায় যেতে নিষেধ করেছিলেন কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যে এর ফলে কোনো ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে। [৪]

তিনি ইয়াজিদের বায়আতকে ততক্ষণ পর্যন্ত এড়িয়ে চললেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শরয়ী অবকাশ পেলেন। হাফিজ ইবনে কাসীর লিখেছেন: “ইয়াজিদের গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবা তাঁকে ডেকে বললেন: ইয়াজিদের বায়আত করুন।” তিনি বললেন: “যখন মানুষ বায়আত সম্পন্ন করবে, তখন আমিও করে নেব।” এক ব্যক্তি বলল: আপনি কি চান যে মানুষ মতভেদ ও লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে যাক, আর যখন আপনি ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকবে না তখন বাকি মানুষ আপনার বায়আত করবে? তিনি বললেন: তুমি যা বললে আমি তা চাই না, তবে যখন মানুষ বায়আত করে নেবে এবং আমি ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, তখন আমিও বায়আত করে নেব। আর এই লোকেরা (বনু উমাইয়া) তাঁর থেকে বিপদ অনুভব করত। [৫]

[১] আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান তাঁর কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আপনি কি সেই ব্যক্তি যিনি দাবি করেন যে আপনি আবদুল্লাহ বিন উমরকে হত্যা করবেন? তিনি বললেন: আমি ইবনে উমরকে হত্যা করব? আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাঁকে হত্যা করব না (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৫ সহীহ সনদে)। এখানে হযরত মুয়াবিয়ার শব্দগুলো লক্ষ্যণীয়, তিনি উত্তরে মিথ্যা বলেননি, অস্বীকার করেননি যে আমি এমনটি বলিনি, বরং বলেছেন “আমি তাঁকে হত্যা করব না”। স্পষ্টতই এটি সম্পূর্ণ সত্য ছিল। পূর্ববর্তী বাক্যগুলো তাঁর মুখ থেকে রাগের মাথায় বেরিয়েছিল। নিজের কোনো পদক্ষেপের সংকল্প ছিল না। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয়, তবে তিনি তা থেকে ফিরে এসেছিলেন। সুতরাং এই সন্দেহ করা যায় না যে মাজাজালাহ! তিনি ভুল তথ্য দিয়েছেন। এটি শরয়ী সতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তার একটি চমৎকার উদাহরণ যে মিথ্যা না বলেই অন্যদের আশ্বস্ত করা হয়েছে।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৩, ২১৪ সহীহ সনদে।

[৩] যদি এটি কল্যাণকর হয় তবে আমরা সম্মত, আর যদি বিপদ হয় তবে আমরা ধৈর্যশীল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/৮৩ সাগির; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৭ সহীহ সনদে)।

[৪] আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি, হা. ৫৯৭, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, মাজমাউয যাওয়াইদ, হা. ১৫১৩০; তারিখ দামেশক: ১৩/২০২, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/২৯২ শাবী থেকে বর্ণিত।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৩৬৯, হাফিজ ইবনে কাসীর এরপর বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ বিন উমর বায়আত বিলম্বিত করেছিলেন, যখন অন্যান্য শহর থেকে ইয়াজিদের বায়আতের খবর এল তখন তাঁরাও বায়আত করে নিলেন। যখন শহরগুলো থেকে বায়আত এল, তখন তিনি মানুষের সাথে বায়আত করলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৬৯)।

জং-এ হাররার আগে তিনি তাঁর অনুসারীদের এই কারণেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছিলেন। [১]

আসলে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সামনে সেই সব হাদিস ছিল যাতে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, চাই তারা ফাসিক ও জালেম হোক না কেন, যতক্ষণ না তারা কুফরে বাওয়াহ (প্রকাশ্য কুফরি)-তে লিপ্ত হয়। তাই তাঁর মাযহাব ছিল এই যে, কোনো শাসক যদি উম্মতের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা ছাড়াই যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে, তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সে শাসক হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় শরীয়ত অনুযায়ী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করা উচিত নয় এবং এমন চেষ্টাকারী দল যাই হোক না কেন, তারা বিদ্রোহী হিসেবেই গণ্য হবে। [২]

কেউ তাঁর কাছে সমস্ত ইলম বর্ণনা করার অনুরোধ করলে তিনি বললেন: “ইলম তো অনেক, তবে যদি সম্ভব হয় তবে এমনটি করো যে, আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করো যেন তোমার পিঠে মানুষের রক্তের বোঝা না থাকে, তোমার পেটে মানুষের সম্পদ না থাকে, তোমার জিহ্বা মানুষের মানহানি থেকে নিরাপদ থাকে এবং তুমি মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরে থাকো, তবে অবশ্যই এমনটি করো।” [৩]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং বনু উমাইয়ার দ্বন্দ্বের যুগে:

এই সময়ে শুরুতে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর ব্যক্তিগত আমল রাজনৈতিক বিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই ছিল।

অবশ্য কিছু বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ (বিদ্রোহী দল)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ না নেওয়ায় আফসোস করতেন।

এই বিষয়ে তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে:

- কিছু বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নিকট ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ ছিল আহলে শামের দল (যখন তারা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল)।
- কিছু বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নিকট ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দল।
- কিছু বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নিকট ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ ছিল আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর দল।

এগুলোর মধ্যে প্রথম সুরতটি উদ্দেশ্য হলে তাতে কোনো সংশয় নেই, কারণ জমহুর ওলামাদের মাযহাব এটাই যে, হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে আহলে শাম বিদ্রোহী ছিল।

দ্বিতীয় সুরতটি উদ্দেশ্য হলেও কোনো সংশয় নেই, কারণ হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফত কায়েম হওয়ার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার মনিব অর্থাৎ মারওয়ান ও আবদুল মালিক নিশ্চিতভাবেই বিদ্রোহী ছিল।

তৃতীয় সুরতটি উদ্দেশ্য হলে তাতে অবশ্যই সংশয় সৃষ্টি হয় যে, শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে কোন ভিত্তিতে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭১১১, কিতাবুল ফিতান, বাব ইয়া কাল ইনদা কওমিন শাইয়ান।

[২] এটাই জমহুর ফুকাহাদের মাযহাব।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২২৩, ত. আর-রিসালাহ।

কিন্তু যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তবে বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার যে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মতামত। ইয়াজিদের মোকাবিলায় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদক্ষেপকে খুরুজ এই কারণে বলা যেতে পারে যে, সেই সময় পর্যন্ত ইয়াজিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং উম্মাহ যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বাঁচার জন্য স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাকে শাসক হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই খুরুজ কোনো ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং একজন জালেম শাসকের বিরুদ্ধে ছিল, যা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদে বৈধ ছিল এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদে অবৈধ ছিল। তাঁর আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী বলা ছিল সেই বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে। [১]

[১] এই বিষয়টি পূর্ণ বিস্তারিতভাবে “ইজালায়ে শুবুহাত” অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের অধীনে পেশ করা হবে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) সেই সকল সাহাবীদের একজন যাদের সত্তা বরকতে পরিপূর্ণ ছিল এবং যাদের থেকে বিচ্ছুরিত নূরানি কিরণ আজও হেদায়েতের পথযাত্রীদের পথপ্রদর্শক। তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতুল গোত্র বনু নাজ্জারের সাথে। [১]

দশ বছর বয়স ছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন। [২] হযরত আনাস (রা.)-এর মা উম্মে সুলাইম (রা.) তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে নিয়ে যান এবং আরজ করেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এই শিশুটিকে আপনার খিদমতের জন্য কবুল করুন।” [৩]

তাঁর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা এমন ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে আসার আগেই তিনি লিখতে ও পড়তে শিখে গিয়েছিলেন। [৪]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) দশ বছর পর্যন্ত রহমাতুল্লিল আলামিন (সা.)-এর খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। [৫] তিনি (সা.) এই ছোট্ট খাদেমের সাথে কৌতুকও করতেন এবং বলতেন: “ইয়া যাল উযুনাইন!” (হে দুই কান বিশিষ্ট ব্যক্তি!)। [৬]

অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও আনাস (রা.) বিশেষ খাদেম হিসেবে গায়ওয়ায়ে বদর [৭], গায়ওয়ায়ে উহুদ [৮] এবং গায়ওয়ায়ে খায়বারে [৯] শরিক ছিলেন। এই যুদ্ধগুলোর চাম্ফুষ ঘটনাবলী তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করতেন। [১০]

অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দায়িত্ববোধের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোপনীয় বিষয়গুলো পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে কোনো বার্তা দিয়ে কারো কাছে পাঠালেন। পরবর্তীতে তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন সেই বার্তাটি কী ছিল, কিন্তু তিনি মুখ খোলেননি এবং বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোপন কথা ফাঁস করতে পারি না।” [১১]

সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি তাঁর এতটাই আগ্রহ ছিল যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কোনো এক দাওয়াতে শরিক হলেন। দেখলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কদুর (লাউ) টুকরো খুঁজে খুঁজে খাচ্ছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন: “সেই সময় থেকে কদু আমার প্রিয় খাবারে পরিণত হয়েছে।” [১২]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৭/১৭, দার সাদির।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৫৩০৯, আল-আশরিবা, ইস্তিহাব ইদারাতুল মা ওয়াল লাবান।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৫৩১, ফাযায়েলুস সাহাবা, ফাযায়েলু আনাস বিন মালিক।

[৪] আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত: উম্মে সুলাইম (রা.) আমার হাত ধরে নবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, এটি আমার পুত্র... (তাবাকাত ইবনে সাদ, ৩/১৯)।

[৫] সহীহ মুসলিম, হা: ৫৩০৯, আল-আশরিবা, ইস্তিহাব ইদারাতুল মা ওয়াল লাবান।

[৬] সুন্নাহ আবু দাউদ, হা: ৫০০০, কিতাবুল আদব, বাবু ফিল মিযাহ, আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

[৭] আনাস বিন মালিককে জিজ্ঞেস করা হলো: আপনি কি বদরে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন: আমি বদর থেকে কোথায় অনুপস্থিত থাকব? (মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ২৩৩৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/১১)।

[৮] সহীহ বুখারী, হা: ৫৮১১, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিব আবি তালহা।

[৯] সহীহ বুখারী, হা: ২৮৫৩, কিতাবুল জিহাদ, বাবু মান গাযা বি-সাবিয়্যিন লিল খিদমাহ।

[১০] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩৩৬৯।

[১১] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৩২৬, কিতাবুল আশরিবা, বাবু জাওয়ায আকলিল মারাক।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দুআ দিতেন। একবার বললেন: “হে আল্লাহ! আনাসের মাল ও সম্ভানে বৃদ্ধি দান করুন এবং তাকে বরকতময় করুন।” [১]

নবুওয়াতের দরবারের দুআর বরকতে বড় হয়ে আপনি অনেক সচ্ছল হয়ে যান। সম্ভান-সম্ভতিও প্রচুর হয়। তাঁর ছেলে, নাতি ও নাতনিদের সংখ্যা একশ’র বেশি হয়ে গিয়েছিল। [২]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে আপনি বাহরাইনে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত হন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। হযরত উমর (রা.) খলিফা হলে আপনি মদিনা তাইয়েবায় ফিরে আসেন। ইরাকের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তুস্তারের রণাঙ্গন থেকে ইরানি সেনাপতি হরমুজানকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসেন। ইরাক বিজয়ের পর বসরায় স্থানান্তরিত হন এবং সারাজীবন সেখানেই ছিলেন। [৩]

বসরায় আপনার একটি বাগান ছিল। আল্লাহর শান যে, এই বাগান বছরে দুইবার ফল দিত এবং তা থেকে মিশকের মতো সুগন্ধি আসত। [৪]

হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর মতো বড় সাহাবীগণও কেবল আপনার সম্মানই করতেন না, বরং আপনার সেবাও করতেন কারণ আপনি “খাদেমুর রাসূল” ছিলেন। [৫]

হযরত আনাস (রা.) মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। একবার অনাবৃষ্টির সময় আপনার কাছে রহমতের বৃষ্টির জন্য দুআ করার অনুরোধ করা হলো। আপনি ওয়ু করে দুই রাকাত সালাত পড়লেন এবং দুআ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে মেঘ চলে এল এবং মুষলধারে বৃষ্টি সমস্ত জমিনকে সিঞ্চিত করে দিল। [৬]

হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি সুন্নতের ওপর আমল করতেন। সালাতের আদবসমূহের প্রতি এত খেয়াল রাখতেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মতো সাহাবী আপনার সালাত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠতেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের মতো সালাত হযরত আনাস (রা.)-এর চেয়ে বেশি আর কাউকে পড়তে দেখিনি।” [৭]

হযরত আনাস (রা.) সাধারণত রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরেই থাকতেন, তবে কিছু ক্ষেত্রে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে তাঁকে বসরার মজলিসে শুরার সদস্য করা হয়েছিল। [৮]

হযরত আনাস (রা.) তাঁর দীর্ঘ জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। আপনি এই বয়সেও ইবাদতে অনেক পরিশ্রম করতেন। রাতে নফল সালাতে এত দীর্ঘ সময় কিয়াম করতেন যে পায়ে পানি জমে যেত। [৯]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৮১, ফাযায়িলুস সাহাবা, ফাযায়িলু আনাস (রা.)।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫৩১।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪০২, ৪০৩, ত: আর-রিসালাহ।

[৪] সুন্নে তিরমিজি, হা: ৩৮৩৩, আলবানী বলেছেন: সহীহ।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪০১, ত: আর-রিসালাহ।

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪০৬, তরজমা: আনাস বিন মালিক (রা.)।

[৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪০৭, তরজমা: আনাস বিন মালিক (রা.)।

[৮] তারিখুত তাবারী, ৪/৪৬৯।

[৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪০৫, তরজমা: আনাস বিন মালিক (রা.)।

রাফেযী ও নাসিবী প্রবণতা থেকে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন; তিনি বলতেন: “এই লোকেরা বলে যে উসমান ও আলীর মহব্বত এক হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে এই উভয়ের মহব্বত একত্রিত করে দিয়েছেন।” [১]

৬০ হিজরীর হাঙ্গামাপূর্ণ যুগেও তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন, যখন হযরত হুসাইন বিন আলী-র পবিত্র মস্তক উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে রাখা অবস্থায় তিনি কুফার ইমারত প্রাসাদে দেখেছিলেন। [২] ৬৭ হিজরীর মহামারীতে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে ৭০ জন সদস্য ইন্তেকাল করেন। [৩]

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের-এর খিলাফতকালে হযরত আনাস বিন মালিক-কে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল এবং তাঁকে বসরার জামে মসজিদের ইমামতি অর্পণ করা হয়েছিল। [৪]

কিন্তু যখন হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের শহীদ হলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের নেতৃত্বের যুগ জোরপূর্বক সমাপ্ত করা হলো এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই কালো অধ্যায়ের জন্য ইরাকের গভর্নর বানানো হলো, তখন কঠিনতম পরীক্ষার যুগ শুরু হলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আচরণ হযরত আনাস বিন মালিক-এর সাথে অত্যন্ত অপমানজনক ছিল, যার ফলে তিনি বাধ্য হয়ে আবদুল মালিকের কাছে অভিযোগপত্র পাঠান, যার প্রেক্ষিতে আবদুল মালিক হাজ্জাজকে সতর্ক করে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন। [৫]

আবদুল মালিকের এই সতর্কবার্তায় হাজ্জাজ ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নিজের আচরণ নরম করেন। [৬]

তা সত্ত্বেও হযরত আনাস বিন মালিক হাজ্জাজের অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত ব্যথিত থাকতেন। হাজ্জাজ সালাত আদায় করতে এত বিলম্ব করতেন যে হযরত আনাস বিন মালিক বলতেন: “নবী করীম (সা.)-এর যুগের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, এখন তো সালাতও নষ্ট করা হচ্ছে।” [৭]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪০০, তরজমা: আনাস বিন মালিক।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৭৪৮, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবিল হাসান ওয়াল হুসাইন।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪০৫, তরজমা: আনাস বিন মালিক। [৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২৫৯।

[৫] আল-হাকিম: মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আল-হাফিয আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, আম্বানা মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ, যিয়াদ বিন আইয়ুব ও আবু কুরাইব, তারা বলেন: আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বকর বিন আইয়াশ, আল-আমাশ থেকে। তিনি বলেন: আনাস বিন মালিক আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে লিখেছিলেন: “হে আমীরুল মুমিনীন! আমি দশ বছর মুহাম্মদ (সা.)-এর খিদ্মত করেছি, আর হাজ্জাজ আমাকে বসরার সাধারণ মানুষের মতো গণ্য করছে।” আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে লিখলেন: “তোমার ধ্বংস হোক! আমি আশঙ্কা করছি যে তোমার হাতেই আমার রাজত্ব ধ্বংস হবে। যখন আমার এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছাবে, তখন তুমি আনাস বিন মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।” (মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৬৪৫৩ সহীহ সনদে)।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

১. মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব (মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব নিশাপুরী, মৃত্যু: ৩৪৮ হি.) আয-যাহাবী বলেন: আস-সাদুক। (তারিখুল ইসলাম: ২১৫/৮, বাশার)।

২. মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ আন-নিশাপুরী: ইবনুল মুনযির বলেন: ইমাম, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। (মাওসুআতু আকওয়াল আদ-দারাকুতনী: ৩৫৩/২) আয-যাহাবী বলেন: আল-হাফিযুল হজ্জাহ ইমামুল আইম্মাহ। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩৬৫/১৩)।

৩. যিয়াদ বিন আইয়ুব: (জন্ম: ১৬৬ হি., মৃত্যু: ২৫২ হি.) সহীহ বুখারীর রাবী, সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ২০৫৬)।

৪. আবু কুরাইব মুহাম্মদ বিন আল-আলা: (জন্ম: ১৬০ হি., মৃত্যু: ২৪৩ হি.) বুখারী ও মুসলিমের রাবী, সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৬২০৩)।

৫. আবু বকর বিন আইয়াশ: (জন্ম: ১০০ হি., মৃত্যু: ১৯৩ হি.) বুখারী ও মুসলিমের রাবী, সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৭৯৮৫)।

৬. আল-আমাশ: (জন্ম: ৬০ হি., মৃত্যু: ১৪৮ হি.) বুখারী ও মুসলিমের রাবী, সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৪২১৫)।

[৬] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ: ৩২৩, দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবী, সনদ যয়ীফ।

[৭] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১২১৬৮; সহীহ বুখারী, হা: ৫৩০, কিতাবুল মাওয়াকিতিস সালাত, বাবু তাদীয়াস সালাতি আন ওয়াকতিহা।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

লোকেরা হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আচরণের অভিযোগ করল। তিনি তাদের ধৈর্যের উপদেশ দিলেন এবং বললেন: “আমি তোমাদের নবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, তোমাদের ওপর এমন কোনো কাল আসবে না যার পরবর্তী কাল তার চেয়ে বেশি মন্দ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হও।” [১]

শেষ জীবনে তিনি দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, তাঁর বয়স এমন হয়েছে যে তিনি বেঁচে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। [২]

আপন আকা (সা.)-এর স্মৃতি এবং স্বপ্নে তাঁর জিয়ারত হওয়াই ছিল তাঁর দুঃখ-বেদনার একমাত্র অবলম্বন। একবার বললেন: “এমন কোনো রাত নেই যাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখি না।” এ কথা বলে তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। [৩]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) ৯৩ হিজরিতে ১০৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং বসরা থেকে ছয় মাইল (সাড়ে নয় কিলোমিটার) দূরে সমাহিত হন। বসরায় ইন্তেকালকারী তিনি শেষ সাহাবী। তাঁর নবী-প্রেমের আন্দাজ এ থেকে করা যায় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু চুল সারা জীবন সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং অসিয়ত করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর এই চুলগুলো যেন তাঁর জিহ্বার নিচে রাখা হয়। چنانچہ তেমনই করা হয়েছিল। [৪]

হযরত আনাস (রা.) সারা জীবন কুরআন ও হাদীসের প্রচার-প্রসারকে নিজের ধ্যান-জ্ঞান বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ফতোয়াও দিতেন। এজন্য তাঁকে মুকরি, মুহাদ্দিস ও মুফতি বলা হতো। [৫]

সীরাত ও মাগাজির প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। আপনি নবী করীম (সা.)-এর মাদানী জীবন খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, তবে আপনি মক্কী যুগের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবী আকরাম (সা.)-এর অবস্থা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় আপনি অন্য সাহাবীদের কাছ থেকে শুনে অনেক রেওয়ায়েতও সংগ্রহ করেছিলেন যেগুলোর আপনি চাম্ফুষ সাক্ষী ছিলেন না। আপনার থেকে ২২৮৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৮০টি বুখারী ও মুসলিম উভয়েই একমত। ৮০টি বুখারীতে এবং ৯০টি মুসলিমে এককভাবে রয়েছে।

রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরদাহু

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭০৬৮, কিতাবুল ফিতান, বাব: লা ইয়াতি যামানুন ইল্লাল্লাযী বা’দাহ শাররুন মিনহু।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/২০, দার সাদর।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/২০, দার সাদর।

[৪] আল-ইসাবাহ: ১/২৭৬; আল-ইসতিয়াব, তরজমা: আনাস বিন মালিক (রা.)।

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৯৬, ত: আর-রিসালাহ।

উওয়াইস বিন আমের আল-কারনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

উওয়াইস বিন আমের আল-কারনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়েমেনের বাসিন্দা এবং মুরাদ গোত্রের শাখা কারনের সাথে সম্পর্কযুক্ত একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি হজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু জিয়ারত ও সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। তাঁর সম্পর্ক উম্মতের সেই স্তরের সাথে ছিল যারা ইবাদত ও রিয়াযতকে নিজেদের ওড়না-বিছানা বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সারা জীবন নিভৃতে এবং নির্জনে কাটিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মর্যাদার উচ্চতা এই ছিল যে তাঁকে ‘খায়রুত তাবেয়ীন’ (তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) উপাধি স্বয়ং দরবারে রেসালাত থেকে দেওয়া হয়েছিল। হাফেজ জাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পরিচয় এভাবে করিয়েছেন: “পেশওয়া, দরবেশ, নিজ সময়ের সাইয়্যিদুত তাবেয়ীন।”

তিনি আরও বলেন: “তিনি আল্লাহর ওলী ছিলেন, খোদাভীরু এবং মুখলিস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” [১]

হজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এই উম্মতের বুজুর্গী এবং কারামত সম্পর্কে জানতেন। আপনি কিছু বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর বিশেষ নিদর্শনসমূহ বলে তাকিদ করেছিলেন যে যখন তাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হবে তখন যেন তাঁরা তাঁর কাছে মাগফিরাতের দুআ করান। একবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন: “তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ উওয়াইস নামক এক ব্যক্তি। সে মুরাদ গোত্রের শাখা কারনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সে নিজের মায়ের অনেক বড় খেদমতকারী। তার শ্বেতী রোগ ছিল। আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ তা দূর করে দেন, কেবল নাভির কাছে এক দিরহাম পরিমাণ দাগ বাকি আছে। সে যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম খায় তবে আল্লাহ তার কসম পূর্ণ করে দেখাবেন।” হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে আরও বলেছিলেন: “তোমাদের কাছে ইয়েমেনের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সাহায্যকারী দল আসবে, উওয়াইস তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি সম্ভব হয় তবে তার কাছ থেকে মাগফিরাতের দুআ করিয়ে নিও।” [২]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বহু বছর ধরে উওয়াইস করনী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অপেক্ষায় ছিলেন। যখনই কোনো অভিযানের জন্য ইয়েমেন থেকে সাহায্যকারী দল আসত, তিনি খোঁজ নিতেন যে তাদের মধ্যে উওয়াইস কে। অবশেষে একদিন উওয়াইস রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে গেল। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে চিনে নিলেন। নাম-বংশ এবং একে একে সেই নিদর্শনসমূহ জিজ্ঞাসা করলেন যা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। যখন নিশ্চিত হলেন তখন তাঁর কাছ থেকে মাগফিরাতের দুআ করালেন।

তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: “কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে?” তিনি উত্তর দিলেন: “কুফা।”

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চেয়েছিলেন তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি হোক, তাই বললেন: “আমি কি সেখানকার গভর্নরের নামে কোনো পত্র লিখে দেব?”

[১] সিয়্যরু আলামিন নুবালা: ৪/২০০, ত: আর-রিসালাহ

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৬৫৩, ফাযায়িলুস সাহাবাহ, বাবু মিন ফাযায়িলি উওয়াইস আল-কারনী; মুসতাদরাক হাকেম, খ: ৩/৫৬১৯

তিনি বললেন: “না! আমি অখ্যাত লোকদের মধ্যে থাকতেই পছন্দ করি।”

ওয়াইস করনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কুফায় চলে গেলেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি একজন অখ্যাত মুজাহিদের মতো কুফা থেকে প্রেরিত বাহিনীগুলোতে शामिल হতেন, কারণ ইয়ামেন থেকে তাঁর বের হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। জিহাদ ছাড়াও তিনি জিকির ও ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করতেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা থেকে আসা হাজীদের কাছে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। কুফার যেসব লোক ওয়াইস রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে চিনতেন, তারা জানাতেন যে তিনি একইভাবে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের অনুসরণে অন্যদেরকেও তাকিদ দিতেন যেন তারা ওয়াইসের কাছে মাগফিরাতের দুআ করায়। [১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং একইভাবে হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই তাকিদগুলো থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর ওলিদের জিয়ারত করা, দ্বীনি ও ঈমানি উপকারের জন্য তাঁদের খিদমতে যাওয়া এবং তাঁদের দুআ নেওয়া সুন্নাত এবং এর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাকিদে কিছু লোক কুফায় হযরত ওয়াইস রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে গিয়ে দেখা করতেন এবং দুআ করাতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কখনো তাঁর খিদমতও করতেন। উসাইর বিন জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর দুআ নেওয়ার পর তাঁকে একটি উত্তম পোশাক পরিয়ে দেন। ওয়াইস করনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন এই পোশাক পরে বের হতেন, তখন তাঁর অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে মানুষ অবাক হতো, কারণ সাধারণত তিনি জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় থাকতেন। [২]

যদিও কুফায় তাঁর জীবন নির্জনে অতিবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু কস্তুরীর সুগন্ধ কি আর লুকিয়ে রাখা যায়? ধীরে ধীরে অনেক মানুষ তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেল। তারা তাঁর কাছে সমবেত হতো। ওয়াইস করনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বভাবগতভাবে অল্পভাষী ও শান্ত মেজাজের ছিলেন। তাই তাঁর মজলিসে ওয়াজ-নসিহত বা হাদিস বর্ণনার প্রচলন ছিল না। ইঁ্যা, মাঝে মাঝে কাউকে কিছু নসিহত করতেন যার বিষয়বস্তু সাধারণত দুনিয়ার নশ্বরতা এবং আখেরাতের চিন্তা হতো। এ ছাড়া তাঁর মজলিসে আল্লাহর জিকির ছাড়া আর কিছু হতো না। ধারণা করা হয় যে, এই জিকির তিলাওয়াতে কুরআন এবং মাসনুন জিকিরের রূপেই হতো। [৩]

ওয়াইস করনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থনে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হন। [৪]

রাহিমাহুল্লাহ রাহমাতান ওয়াসিআহ।

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৬৫২, ফাযায়িলুস সাহাবা, বাবু মান ফাযায়িলি ওয়াইস আল-করনি, ত: দারুল জিল।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৬৫২, ফাযায়িলুস সাহাবা, বাবু মান ফাযায়িলি ওয়াইস আল-করনি, ত: দারুল জিল।

[৩] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৩/৫৫৫ থেকে ৫৫৭ তাদমুরি; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩০ থেকে ৩৩, ত: আর-রিসালাহ।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩১, ত: আর-রিসালাহ।

নোট: ওয়াইস করনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে অনেক যযীফ ও মাওজু বর্ণনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যেগুলোতে তাঁর অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হাফেজ জাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি “সিয়ারু আলামিন নুবালা”-তে সেগুলোর ওপর জরাহ (সমালোচনা) করেছেন। সহীহ বর্ণনা বা সামান্য যযীফ বর্ণনা দ্বারা যা কিছু প্রমাণিত, আমরা কেবল তাই বর্ণনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর মদিনায় আসা এবং মায়ের তাকিদের কারণে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে যাওয়ার কাহিনীটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই কাহিনী সহীহ বর্ণনা তো দূরের কথা, যযীফ বর্ণনাগুলোতেও নেই। দৃশ্যত এই কাহিনীটি অনেক পরে তৈরি করা হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত প্রতিটি ঘটনার ওপর বিশ্বাস রাখে, কিন্তু অন্যদিকে এমন একটি দলও আছে যারা তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। অথচ তাঁর মর্যাদা সহীহ মুসলিমের সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তাই এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিও গবেষণার পরিবর্তে সংকীর্ণ মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

আহনাফ বিন কায়েস (রা.)

আহনাফ বিন কায়েস (রা.) সেই সব তাবেয়ীদের একজন যারা নবুওয়াতের যুগে বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য পাননি। তার আবাসস্থল ছিল বসরা। তিনি বনু তামীম গোত্রের সর্দার ছিলেন। তার মধ্যে একজন সফল নেতা এবং জাতীয় নেতার সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তিনি দূরদর্শী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, সাহসী, বাগ্মী, দক্ষ যোদ্ধা, দানশীল, দয়ালু এবং আল্লাহভীরু মানুষ ছিলেন।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তিনি মদীনায় আসেন এবং কয়েক বছর তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকেন। হযরত উমর (রা.) তাকে খুব কাছ থেকে দেখেন এবং তার অসাধারণ গুণাবলী লক্ষ্য করেন। অবশেষে বসরার গভর্নর হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে তাকে বসরায় পাঠিয়ে দেন। এর ফলে তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। [১]

তিনি বসরার জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধি এবং জাতীয় মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। খিলাফতের দরবারে বসরার জনগণের কণ্ঠস্বর পৌঁছানোর জন্য তার চেয়ে উত্তম আর কেউ ছিল না। এ কারণে বিভিন্ন পরামর্শের জন্য তিনি মদীনায় উপস্থিত হতেন। [২]

ইরানি রাজধানী মাদায়েন বিজয়ের পর বারবার বিদ্রোহ হচ্ছিল, যার কারণ হযরত উমর (রা.) জানতে চেয়েছিলেন। আহনাফ বিন কায়েস (রা.) সমস্যার মূলে পৌঁছে বললেন যে, যতক্ষণ ইয়াজদাগার্দ জীবিত থাকবে, এই বিদ্রোহ চলতেই থাকবে। তখন হযরত উমর (রা.) ইরানে সাধারণ যুদ্ধের নির্দেশ দেন এবং বিভিন্ন দিকে বাহিনী প্রেরণ করেন। আহনাফ বিন কায়েস (রা.)-কে এই অভিযানের প্রধান করা হয়। এই অভিযানের ফলে ইয়াজদাগার্দ পরাজিত হয়ে পিছু হটে তুর্কিস্তানের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং পুরো ইরান ও খোরাসান মুসলমানদের দখলে চলে আসে। [৩]

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে যখন খোরাসানে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন আহনাফ বিন কায়েস (রা.) পুনরায় সেখানে গিয়ে এলাকাগুলো নতুন করে জয় করেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করেন। [৪]

এই বীরত্বপূর্ণ কাজগুলো আহনাফ বিন কায়েস (রা.)-কে একজন জাতীয় নেতার মর্যাদা দান করে। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগেও তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে তার পরামর্শ নেওয়া হতো। কিন্তু যখন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বসরার গভর্নর হলেন, তখন তিনি চরম অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে আহনাফ (রা.)-কে পদচ্যুত ও নিষ্ক্রিয় করে দেন। তবে যখন এই কথা...

[১] তবাকাত ইবনে সাদ: ৭/৯৩, বৈরুত সংস্করণ

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৮৯, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩/৩১ থেকে ৩২

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/১৯৯

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যখন বিষয়টি স্পষ্ট হলো, তখন তাঁর সতর্কবার্তার পর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাঁর মর্যাদা পুনর্বহাল করেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর ওপর এতটাই আস্থা রাখতেন যে, ইয়াজিদের উত্তরাধিকার (উলি আহদি) সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য তাঁকে বসরা থেকে দামেস্কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা.)-এর মতে ইয়াজিদের উত্তরাধিকার ছিল মصلহাতের (যৌক্তিকতার) পরিপন্থী; তিনি এই মত প্রকাশও করেছিলেন, তবে সেই সাথে এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, সরকারিভাবে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, তা মেনে নেওয়া হবে। [১]

ইয়াজিদের শাসনামলে আহনাফ (রা.)-এর কোনো ভূমিকা দেখা যায় না। মনে হয় এই সময়টি তিনি নির্জনে অতিবাহিত করেছিলেন। তবে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর যখন ইরাকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তখন আহনাফ (রা.) ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং বিশৃঙ্খলা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। [২] আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতের সময় আহনাফ (রা.) তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দেন। প্রখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবি সাফরা (রা.)-কে তিনিই খারেজিদের মোকাবিলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। [৩]

আহনাফ (রা.) ইরাকে মিথ্যাবাদী মুখতার সাকাফির বিরুদ্ধে মানুষকে জাগ্রত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। [৪]

আবদুল মালিক যখন শামে বিদ্রোহ করেন, তখন তিনি আপনাকে নিজের দলে ভেড়ানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁর কথায় কান দেননি এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর প্রতি অনুগত থাকেন। [৫]

আপনি উম্মতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের (হুকামা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনার ইন্তেকালের পর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেছিলেন যে, আজ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার মৃত্যু হলো। [৬] হাসান বসরী (রহ.) বলতেন: আমি কোনো জাতির সরদারকে আহনাফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পাইনি। [৭]

তাঁর সহনশীলতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রবাদতুল্য ছিল। একবার এক ব্যক্তির সাথে তাঁর বিবাদ হলো। সে বলল: “আপনি যদি একটি কথা বলেন, তবে আমি আপনাকে দশটি কথা শুনিযে দেব।”

আহনাফ ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিলেন: “তুমি যদি দশটি কথা শোনাও, তবে আমার পক্ষ থেকে একটিও শুনবে না।” [৮]

তাঁর সাধনার অবস্থা এমন ছিল যে, প্রচণ্ড শীত এমনকি তুষারপাতের মধ্যেও তিনি পূর্ণ ওয়ুর ব্যবস্থা করতেন, তায়াম্মুমের ওপর নির্ভর করতেন না। খোরাসানের এক অভিযানে রাতে তাঁর ওপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাউকে জাগাননি। নিজেই কাঁটায়ুক্ত রোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পানির সন্ধানে বের হন। এ সময় পা জখম হয়ে গেলেও তিনি পরোয়া করেননি। এক জায়গায় বরফ খুঁড়ে পানি বের করেন এবং তা দিয়েই গোসল করেন। [৯]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/ ৮২

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫৮

[৩] তারিখ তাবারী: ৫/ ৬১৫

[৪] তারিখ তাবারী: ৬/ ৬৮ থেকে ৭০

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/ ১৯৬ ত সাদার

[৬] তাহজিবুত তাহজিব: ১/ ১৯১ ত দাক্ষিণাত্য

[৭] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/ ১৯৫ ত সাদার

[৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/ ৯৩, ত আর-রিসালাহ

[৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/ ৯৩, ত আর-রিসালাহ

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগিতেও কোনো কমতি করতেন না। বার্ষিক্যেও প্রচুর রোজা রাখতেন। কেউ নিজের প্রতি দয়া করতে বললে বলতেন, “আমি এক দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছি।”

নির্জনে সুযোগ পেলেই কুরআন মাজিদ নিয়ে বসে যেতেন। নিজের নেক আমল ও পবিত্রতার ওপর বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। নিজেকে গুনাহগার মনে করতেন। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করতেন:

“হে আল্লাহ! যদি ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমার মেহেরবানি, আর যদি শাস্তি দাও তবে আমি তার যোগ্য।”

রাতে দীর্ঘ সময় নফল নামাজ পড়তেন। নফসের হিসাব নিতেন। কোনো ভুল হয়ে গেলে আঙুল প্রদীপের শিখার ওপর রেখে নফসকে জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন: “হে নফস! এটি আশ্বাদন করো, তবে জাহান্নামের আগুনের কী হবে?” [১]

মানুষের বিবাদ ও ঝগড়া হিকমতের সাথে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মতো আর কেউ ছিল না। একবার একটি হত্যার দিয়ত (রক্তপণ) সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কিছু লোক এলো। তিনি ফরিয়াদি পক্ষকে অধিকার দিলেন যে তারা যেভাবে সম্ভুষ্ট হয় সেভাবেই ফয়সালা হবে। তারা বলল: “আমরা দ্বিগুণ দিয়ত নেব।” তিনি বললেন: “যেমন তোমাদের ইচ্ছা।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন: “দেখো! আল্লাহ একজন মানুষের হত্যার বিনিময়ে একটি দিয়ত নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহও একটি দিয়ত। আরবদের মধ্যেও এই নিয়ম চলে আসছে। আজ তোমরা দ্বিগুণ দিয়ত নেওয়ার প্রথা চালু করছ। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে কাল অন্য লোকেরাও তোমাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ দিয়ত দাবি করবে।” [২]

এই কথা শুনে ফরিয়াদি পক্ষ বুঝতে পারল এবং তারা একটি দিয়ত নিয়েই বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে রাজি হলো।

অত্যন্ত গম্ভীর ও মর্যাদাবান ছিলেন। বলতেন: “আমি কখনো ডাক ছাড়া কোনো শাসকের কাছে যাইনি, কখনো দুই ব্যক্তির বিবাদে নিজে থেকে জড়াইনি যতক্ষণ না তারা আমার কাছে এসেছে। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, আমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করেছি।” [৩]

নিজে দানশীল ছিলেন এবং অন্যদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। এক ব্যক্তির হাতে দিরহাম দেখে জিজ্ঞেস করলেন: “এটি কার?” সে বলল: “আমার।”

বললেন: “এটি তোমার তখনই হবে যখন তুমি একে সওয়াবের কাজে অথবা উপার্জনের কাজে ব্যয় করবে।” [৪]

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতের পতনের এক বছর আগে ৭২ হিজরিতে কুফায় অবস্থানকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। দাফনে শরিক এক ব্যক্তি বলেন যে আমি দেখেছি তাঁর কবর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে গেছে। [৫]

তাঁর মজলিসে ইলম ও হিকমতের কথা হতো। অনর্থক কথা শোনা পছন্দ করতেন না। মজলিসে উপস্থিতদের নসিহত করতেন: “আমাদের মজলিসকে পানাহারের আলোচনা দিয়ে কলুষিত করো না।”

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/৯৫, ৯৬, ৯৭।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৯৩।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৯২।

[৪] তারিখুল ইসলাম লিঙ্গ জাহাবি: ৫/৩৫৩।

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৯৫।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

তাঁর বাণীসমূহ ছিল হিকমতের মুক্তাস্বরূপ যা গুণগ্রাহীরা কুড়িয়ে নিতেন। একেকটি বাক্যে শতাব্দীর অভিজ্ঞতা নিহিত ছিল। নমুনা হিসেবে কয়েকটি বাণী নিচে পেশ করা হলো:

- শাসকের কাজ উজির ও পারিষদবর্গ ছাড়া চলতে পারে না। উজির ও পারিষদবর্গ দয়া ও উপদেশ ছাড়া চলতে পারে না। দয়া ও উপদেশ ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হয় না যতক্ষণ না তার পেছনে দূরদর্শিতা ও পবিত্র চরিত্র থাকে।
- তিন প্রকারের মানুষ তিন ধরনের মানুষের সাথে তাদের মতো আচরণ করতে পারে না: শরীফ ব্যক্তি নীচ লোকদের সাথে; নেককার ব্যক্তি ফাসেক ও পাপাচারী লোকদের সাথে; ধৈর্যশীল ব্যক্তি নির্বোধদের সাথে।
- আদবের মূল হলো জিহ্বা।
- চরিত্রহীন কথার, তথ্যহীন দর্শনের, দানশীলতাহীন ধন-সম্পদের, আনুগত্যহীন সঙ্গীর, তাকওয়াহীন দ্বিনি ইলমের, সদিচ্ছাহীন সদকা ও খয়রাতের এবং স্বাস্থ্য ও শান্তিহীন জীবনের কোনো ফায়দা নেই।
- যার ভুলত্রুটি গণনা করা যায় সে-ই পূর্ণাঙ্গ মানুষ। (অর্থাৎ মাসুম তো কেবল নবীগণই হতে পারেন।)
- যে ব্যক্তি মানুষের সাথে রুঢ় আচরণে ক্ষিপ্ততা দেখায়, মানুষও তার সম্পর্কে শোনা কথা রটনা করতে ক্ষিপ্ততা দেখায়।
- শাসকের জন্য রাগান্বিত হওয়া শোভা পায় না। ক্ষমতাধর ব্যক্তির রাগ তলোয়ার চালানো এবং পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [১]

আল্লাহ তাঁর ওপর প্রশস্ত রহমত বর্ষণ করুন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৯৩, ৯৪, আর-রিসালাহ সংস্করণ।

কাজী শুরাইহ বিন আল-হারিস রহমাতুল্লাহি আলাইহি

কাজী শুরাইহ বিন আল-হারিস রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজী এবং বড় তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল ইয়ামেনে বসবাসকারী পারস্যের কিন্দাহ গোত্রের সাথে। তিনি রাসূলের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হয়নি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তিনি ইয়ামেন থেকে মদিনায় চলে আসেন। [১]

তিনি বড় বড় সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং য়ায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো মহান সাহাবীদের থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। শাবী, ইবনে সিরিন এবং ইব্রাহিম নাখয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমদের মতো ফকিহগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। [২]

যদিও তিনি উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিসও ছিলেন, তবে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল ফিকহ শাস্ত্রে। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার সমাধান বের করতেন। নিজের মেধার কারণে তিনি জটিল থেকে জটিলতর বিষয়ের মূলে পৌঁছে যেতেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কঠিন মামলায় তাঁর ফয়সালায় মুগ্ধ হয়ে নিজের খিলাফতকালে তাঁকে কুফার কাজী নিযুক্ত করেন। তিনি এই দায়িত্ব এতোটা নিপুণতার সাথে পালন করেন যে, সেই সময় থেকে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের খিলাফত পর্যন্ত এই পদেই বহাল ছিলেন। এটি প্রায় ষাট বছরের একটি দীর্ঘ সময়। এই সময়ের মধ্যে বড় বড় বিপ্লব ঘটে গেছে এবং কত সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কাজী শুরাইহ সবার আস্থাভাজন ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে “আকযাল আরব” (আরবদের সবচেয়ে বড় বিচারক) বলতেন। [৩]

তিনি ফয়সালা করার ক্ষেত্রে বড় থেকে বড় কোনো ব্যক্তিত্বকেও ছাড় দিতেন না, বরং প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন। এই বিষয়ে তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতামতকে মোটেও গুরুত্ব দিতেন না। এমনকি যদি প্রমাণ এমন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেত যাকে তিনি সত্যপন্থী বা নির্দোষ মনে করতেন, তবুও তিনি মামলার ফয়সালা দলিল ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই করতেন। এটাই ইনসাফের সর্বোচ্চ স্তর এবং একেই আইনের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কুফাকে রাজধানী বানান, তখন এখানে একবার তিনি নিজেই বাদী হিসেবে কাজী শুরাইহের আদালতে উপস্থিত হন। মামলাটি ছিল এই যে, তাঁর একটি বর্ম কোথাও পড়ে গিয়েছিল এবং এক ইহুদির হাতে পড়েছিল। সেই ইহুদি এখন সেটির ওপর নিজের মালিকানা দাবি করতে শুরু করেছিল। অবশেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আদালতে দাবি করলেন যে, সেই বর্মটি তাঁর।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৪/১০০, ত. আর-রিসালাহ

[২] তাজকিরাতুল হুফফাজ, ১/৩৮, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] আখবারুল কুযাত লি আবি বকর ওয়াকি আল-বাগদাদি, ২/১৯৩ থেকে ২০০; আল-ইসতিয়াব, ২/৭০১, ৭০২; তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/২৪৪

মামলার শুনানি শুরু হলে কাজী শুরাইহ (রহ.) ইহুদিকে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কী বলো?”

সে বলল: “বর্মটি আমার।”

কাজী শুরাইহ (রহ.) প্রমাণ চাইলে সে বলল: “প্রমাণ হলো এটি আমার দখলে আছে।”

কাজী শুরাইহ (রহ.) হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনার কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে যে বর্মটি আপনার কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল?”

তিনি তাঁর পুত্র হাসান (রা.) এবং গোলাম কানবারকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন।

কাজী শুরাইহ (রহ.) বললেন: “কানবারের সাক্ষ্য তো গ্রহণযোগ্য, কিন্তু হাসান (রা.)-এর সাক্ষ্য নয়।”

হযরত আলী (রা.) বললেন: “আপনি কি সেই হাদিস শোনেননি যে, হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার?”

কাজী শুরাইহ (রহ.) বললেন: “শুনেছি, কিন্তু আমি পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করি না।”

যেহেতু মালিকানার প্রমাণ দুইজন সাক্ষীর নেসাব পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হতো, তাই কাজী শুরাইহ (রহ.) একজন সাক্ষীকে অপরিপূর্ণ ঘোষণা করে মামলাটি খারিজ করে দিলেন। এই ফয়সালায় ইহুদি এতটাই প্রভাবিত হলো যে সে নিজেই বলে উঠল: “বর্মটি হযরত আলী (রা.)-এরই এবং এই দ্বীন সত্য, যার কাজী শাসকের বিরুদ্ধে ফয়সালা দেয় এবং তিনি কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই সেই ফয়সালা মেনে নেন।”

এ কথা বলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। হযরত আলী (রা.) এতে এতই খুশি হলেন যে বর্মটি ইহুদিকে উপহার দিয়ে দিলেন। [১]

একজন কাজী ও বিচারকের জন্য আইনের গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার সাথে সাথে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাও অত্যন্ত জরুরি, কারণ অনেক মামলার জট এগুলোর মাধ্যমেই খোলে। কাজী শুরাইহ (রহ.) এই গুণাবলীতে সমৃদ্ধ ছিলেন। অনেক ঘটনা থেকে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। একবার দুই মহিলা একটি বিড়ালের ছানা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে এল। একজনের দাবি ছিল এটি আমার বিড়ালের ছানা। অন্যজন বলছিল এটি আমার বিড়ালের ছানা। কাজী শুরাইহ (রহ.) এক মহিলাকে নির্দেশ দিলেন যে তার বিড়ালটিকে এই ছানাটির কাছে ছেড়ে দিতে। যদি বিড়ালটি তাকে আদর করে, দুধ পান করায় এবং খুশির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তবে এই ছানাটি তারই বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি তার লোম খাড়া হয়ে যায় এবং সে পালিয়ে যেতে শুরু করে, তবে ছানাটি তার হবে না। নির্দেশ পালন করা হলে সত্য সামনে চলে এল এবং ফয়সালা করে দেওয়া হলো। [২]

তাঁর বুদ্ধিমত্তার আরেকটি চমৎকার ঘটনা হলো, একবার শহরে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কারণে তিনি কিছুদিনের জন্য লোকালয় থেকে দূরে চলে যান। সেখানে খোলা জায়গায় দীর্ঘ নফল নামাজ আদায় করাকে রুটিন বানিয়ে নেন। একটি শিয়াল তাঁর পিছু নিল। যখনই তিনি নফলের নিয়ত বাঁধতেন, সেটি ঠিক সামনে এসে হাজির হতো এবং লাফালাফি করে তাঁর মনোযোগ নষ্ট করত। অবশেষে একদিন তিনি তাঁর জায়নামাজের ওপর কাঠের একটি খুঁটি দাঁড় করিয়ে সেটিকে নিজের কাপড় পরিয়ে দিলেন। নিজে আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। যখন শিয়াল...

[১] আখবারুল কুদাত: ২/২০০

[২] আখবারুল কুদাত: ২/৩৯৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

যখন সে অভ্যাসমতো এল এবং লাফালাফি করতে লাগল, তখন তিনি চুপিচুপি পেছন থেকে গিয়ে তাকে জাপটে ধরলেন।

তখন থেকে আরবরা কাজী শুরাইহ রহমতুল্লাহ-কে ‘আদহা মিনাস সা’লাব’ (শেয়ালের চেয়েও চালাক) বলতে লাগল। [১]

কাজী শুরাইহ রহমতুল্লাহ-এর স্বভাবে ধৈর্য, সহনশীলতা ও কৃতজ্ঞতার গুণ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। যখনই কোনো পার্থিব বিপদ আসত, তখন ইম্না লিল্লাহ পড়ার পর চারবার আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। তিনি বলতেন:

“একবার আলহামদুলিল্লাহ একারণে বলি যে, এর চেয়ে বড় কোনো বিপদ আসেনি। দ্বিতীয়বার একারণে যে, ধৈর্য ধারণের তাওফিক পেয়েছি। তৃতীয়বার একারণে যে, ইম্না লিল্লাহ পড়ার তাওফিক হয়েছে। চতুর্থবার একারণে যে, বিপদটি দ্বিনি নয় বরং দুনিয়াবি।” [২]

কাজী শুরাইহ রহমতুল্লাহ একশ দশ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকালে ৮০ হিজরিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। [৩]

রহমতুল্লাহি রহমাতান ওয়াসিআহ।

নোট: এই যুগে উম্মতে মুসলিমাহর ইলমি, ঈমানি ও আখলাকি তরবিয়ত প্রদানকারী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উম্মাহাতুল মুমিনীন, বিশেষ করে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এরও অনেক বড় অবদান রয়েছে। উভয়েই প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের অবস্থা প্রথম খণ্ডে ‘উম্মাহাতুল মুমিনীন’ প্রসঙ্গে এসে গেছে, তাই এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

[১] তাহযীবুল কামাল: ১২/৩৩৩

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/১০৫, তাবা আর-রিসালাহ

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/১০৬, তাবা আর-রিসালাহ

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

সংশয় নিরসন

সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের উত্তর

এই পৃষ্ঠাগুলো সাধারণ পাঠকদের জন্য নয়, বরং ঐসব ব্যক্তিদের জন্য যারা সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস সংক্রান্ত কোনো সংশয় অথবা কোনো ইলমী ও তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির শিকার। এই পৃষ্ঠাগুলোতে তারা সেই যুগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি এবং প্রসিদ্ধ সংশয়সমূহের উত্তর খুঁজে পাবেন। সাধারণ পাঠকরা এটি বাদ দিয়ে “মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস” তৃতীয় খণ্ড অধ্যয়ন শুরু করুন।

গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন

এই পৃষ্ঠাগুলোতে ইতিহাসের অধ্যয়নকালে সামনে আসা ঐসব সংশয়ের উত্তর দেওয়া হচ্ছে, যা ইতিহাসের ছাত্র ও পাঠকরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমার বই ও কলামের পাঠক এবং আমার ঐতিহাসিক লেকচারসমূহের অংশগ্রহণকারীরা আমাকে শত শত প্রশ্ন করেছেন। অধিকাংশ প্রশ্নই ঐসব আপত্তি বা ভুল গবেষণার ফলে সৃষ্টি হয়েছে যা বর্তমান যুগের কিছু ‘আধুনিকতাবাদী’ পেশ করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে সেগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়েছে। সরাসরি কথোপকথন ছাড়াও ডাকযোগ, ই-মেইল বা ফেসবুকের মাধ্যমে অগণিত প্রশ্ন করা হয়েছে। এখানে সেই সবগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এই ভুল বোঝাবুঝি ও সংশয়গুলো দূর করার জন্য এই পৃষ্ঠাগুলো যথেষ্ট হবে। উত্তরগুলো রেফারেন্সসহ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলোতে যদি অন্য কিতাবের রেফারেন্স পেশ করা হয়ে থাকে, তবে আমরা সেগুলোর ওপর আলোকপাত করারও পূর্ণ চেষ্টা করেছি। অবশ্য যদি রেফারেন্সগুলো বিভিন্ন সংস্করণের হয়ে থাকে, তবে আমরা সেগুলোকে আমাদের সামনে থাকা সংস্করণ অনুযায়ী মিলিয়ে দিয়েছি যাতে পাঠকদের রেফারেন্স দেখার সময় বিভিন্ন সংস্করণ খোঁজার কষ্ট করতে না হয়। যেহেতু পাঠকদের আদর্শিক ও ঈমানি প্রশিক্ষণই আমাদের এই প্রচেষ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, তাই আমরা এই অধ্যায়টিকে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছি। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য এই অধ্যায়টি কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেছে, তবে এই দীর্ঘতা অনিবার্য ছিল। কারণ আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো পাঠকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আদর্শিকভাবে শক্তিশালী করা যাতে অন্যদের কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক বিভ্রান্তি তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে না পারে।

এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার বিবাদ, মতভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা বর্জন করাই উত্তম; কিন্তু যখন এই ঘটনাগুলোর প্রতিটি বিষয়কে টেনে এনে লেখা ও বক্তৃতায় সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র হনন করা হচ্ছে, অথবা খেলাফতে রাশেদা এবং এই বিবাদগুলোর ব্যাপারে উম্মতের সওয়াবে আজমের সম্মিলিত মতামতের ওপর আক্রমণাত্মক হামলা চালানো হচ্ছে এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ায় এগুলোর ছড়াছড়ি এবং সঠিক উত্তর সন্ধানী মানুষ অস্থির হয়ে পড়ছে, তখন এমন পরিস্থিতিতে নীরবতার মোহর ভেঙে উত্তর দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এর ‘মিনহাজুস সুন্নাহ’, আল্লামা ইবনে হাজার আল-হায়তামী (রহ.)-এর ‘তাতহীরুল জানান’, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ‘ইয়ালাতুল খাফা’, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ‘হেদায়াতুশ শিয়া’ এবং হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানীর ‘হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা’ এই ধরনের কাজের এক একটি অনবদ্য সৃষ্টি। মাওলানা আব্দুল শাকুর লখনভী ফারুকী, মাওলানা কাজী মাজহার হোসেন (চাকওয়াল), মাওলানা মুহাম্মদ নাফে (মুহাম্মদ শরীফ, ঝং), মরহুম উস্তাদ...

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা আবদুস সাত্তার তুনসভী এবং উস্তাদে গেরামী মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ.-এর তো বহু তালিফাত ও তাসনিফাত (রচনা ও সংকলন) এই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ‘ইযালায়ে শুবহাত’ (সন্দেহ নিরসন)-এর এই সংকলন পেশ করা কোনো ‘নতুন রীতি’, কোনো ‘ফিতনা’ বা কোনো ‘বিদআত’ নয়।

শুরুতে চিন্তা ছিল যে, প্রতিটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও সন্দেহসমূহকে ‘তারিখে উম্মতে মুসলিমা’-তে সেই যুগের আলোচনার সাথেই উল্লেখ করে দেওয়া হবে। কিন্তু বন্ধুদের সাথে পরামর্শের পর এটিই উত্তম মনে হয়েছে যে, সওয়াল-জওয়াব এবং ইযালায়ে শুবহাতের এই অধ্যায়টি আলাদা রাখা হোক, যাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা প্রভাবিত না হয় এবং যারা প্রথমবার ইতিহাস পড়ছেন এবং যাদের মনে এ জাতীয় কোনো প্রশ্নই নেই, তারা যেন কোনো বিভ্রান্তিতে না পড়েন। তারা সওয়াল-জওয়াবের এই অধ্যায়টি বাদ দিয়ে পরবর্তী যুগের ঘটনাবলির দিকে চলে যেতে পারেন।

এই পৃষ্ঠাগুলোতে সন্দেহ নিরসনের বিষয়গুলো কালানুক্রমিক বিন্যাসে আনা হয়েছে। প্রথমে হযরত উসমান গনি, এরপর হযরত আলী আল-মুরতাজা, এরপর হযরত মুয়াবিয়া এবং সবশেষে হযরত হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর যুগ সংশ্লিষ্ট ভুল বোঝাবুঝিগুলোর খণ্ডন করা হয়েছে।

এই ভুল বোঝাবুঝিগুলো খণ্ডন করার জন্য আমরা বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি; আমাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক, আবেগ বা প্রবণতাকে ভিত্তি বানাইনি। নিজের কিয়াস (অনুমান) ও আন্দাজের মাধ্যমে কোনো বর্ণিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা সাধারণ মানুষের কাজ। এর জন্য কোনো যোগ্যতা বা পড়াশোনারও প্রয়োজন হয় না। যেকোনো চরম মূর্খ ব্যক্তিও যেকোনো বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির কথাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে যে, ‘আমার বুঝে এটি আসছে না, আমি মানি না’। স্পষ্টতই এটি কোনো তাত্ত্বিক পদ্ধতি নয়। এভাবে দুনিয়ার কোনো সমস্যারই সমাধান হতে পারে না, বরং ফাসাদ, অনৈক্য ও বিবাদ বাড়তেই থাকে।

কোনো বর্ণিত বিষয়কে কিয়াস, আন্দাজ ও বুদ্ধির মাধ্যমে তখনই অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে, যখন সেই বিষয়টি অসম্ভব বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন কেউ যদি বলে যে, রাতে সূর্য উঠেছে, অথবা পঁচিশে রমজানে ঈদের চাঁদ দেখা গেছে।

যদি কোনো বিষয় সম্ভবপর বিষয়াবলির গণ্ডির মধ্যে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে আমরা অহেতুক সেটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারি না। হ্যাঁ, যদি তার কথার মধ্যে সন্দেহের কোনো দিক থাকে, তবে প্রথমে সেই সংবাদদাতার অবস্থা যাচাই-বাছাই করা হবে। যদি তার দুর্বলতা (যঈফ হওয়া) প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সন্দেহের দিকটি জোরালো হবে। এরপর যদি সেটি কোনো সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি অপবাদ হয়, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

এজন্য আমরা মহান ব্যক্তিত্বদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সন্দেহজনক ও বিতর্কিত বর্ণনাকে প্রথমে সনদের বিচারের যঈফ (দুর্বল) প্রমাণ করেছি, এরপর যৌক্তিকভাবে তার দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করেছি। এটিই হলো তাত্ত্বিক পদ্ধতি।

ইতিহাসের অধিকাংশ সন্দেহ যঈফ বা জাল বর্ণনা থেকে জন্ম নেয়, এজন্য অধিকাংশ সন্দেহের উত্তরে আমরা বর্ণনার দুর্বলতা বা জাল হওয়া প্রমাণ করে আপত্তির ভিত্তিকেই শেষ করে দিয়েছি। কারণ এই মূলনীতি নির্ধারিত যে, যঈফ উপকরণের মাধ্যমে সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে না। পাঠকরা এটিও লক্ষ্য রাখবেন যে, আমরা আপত্তির কারণ হওয়া বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা বা খণ্ডন করার সময় এমন কিতাব সংকলক বা বর্ণনাকারীদের আপত্তির লক্ষ্যবস্তু বানাইনি যারা সিকাহ (নির্ভরযোগ্য), নেককার ও আমানতদার হিসেবে প্রসিদ্ধ। কারণ সংকলক ও বর্ণনাকারীরা ঐতিহাসিক হোন বা মুহাদ্দিস, তারা নিজ নিজ শর্ত অনুযায়ী বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করতেন। আপত্তির কারণ...

তৈরি হওয়া বর্ণনাগুলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। যেসব বর্ণনা থেকে ভুল দলিল পেশ করা হয়, সাধারণত ত্রুটি সেগুলোর মধ্যে নয় বরং পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে। কিছু বর্ণনা যঈফ হয় কিন্তু সেগুলোরও ব্যাখ্যা হতে পারে। হ্যাঁ, যে বর্ণনায় কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এবং তা সনদের দিক থেকেও যঈফ, সেখানে আমরা যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করেছি এবং ভুল দলিল পেশকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছি।

এই ইলমি কর্মপদ্ধতির তৃতীয় দিকটি হলো, আমরা সহীহ সনদে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে কোথাও আমাদের অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রত্যাখ্যান করিনি, চাই তা বেদনাদায়ক, অপ্রীতিকর বা অপ্রত্যাশিত হোক না কেন। কারণ একটি প্রমাণিত ঘটনা, চাই তা অপ্রীতিকরই হোক না কেন, তা মেনে নেওয়াই সুস্থ স্বভাবের মানুষের কাজ। তারা জানেন যে, চোখ বন্ধ করে রাখলে সত্য বদলে যায় না। সহীহ সংবাদ ও সহীহ বর্ণনা আমাদের অতীত ও বর্তমানের সত্যের কাছে পৌঁছে দেয়। সেগুলো অস্বীকার করা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। পৃথিবীর যেকোনো ঘটনার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত মত গ্রহণ করার পথ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমরা নির্ভরযোগ্য সনদ থেকে বর্ণিত বিষয়বস্তু গ্রহণ করব এবং সন্দেহজনক সূত্রের বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করব।

যদি সহীহ বিষয়বস্তুকেও নিজের রায় ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ বের করে নেওয়া হয়, তবে আর কোথাও কোনো বিষয়ে ঐকমত্য সম্ভব হবে না; কারণ এর অনিবার্য অর্থ দাঁড়াবে এই যে, বর্ণনা গ্রহণ বা বর্জনের মূল ভিত্তি হলো আকল, নকল নয়। এই মূলনীতি মেনে নেওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই সুযোগ তৈরি হবে যে, সে চাইলে নিজের রুচি ও খেয়ালের ভিত্তিতে দুর্বল থেকে দুর্বলতম বর্ণনাকেও যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করে গ্রহণ করে নেবে এবং তার নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে জেদ ধরবে, আবার নিজের অনুমানের ভিত্তিতে সহীহতম বর্ণনাকেও প্রত্যাখ্যান করে দেবে। এমন অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব রায় হবে এবং নিজস্ব দ্বীন ও মাযহাব। এই চিন্তাধারাই শুরুতে মতভেদ এবং শেষ পর্যন্ত ফেরকাবাজির ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই আমাদের আসলাফ তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রেও রেওয়াজেতকে দেয়াতের ওপর এবং মনকুলকে মাকুলের ওপর প্রাধান্য দেন। ইতিহাসেও আমাদের এর ওপরই অটল থাকা উচিত। অন্যথায় কোনো বিতর্কিত বিষয়ে প্রতিপক্ষের কাছ থেকেও নীতিগত অবস্থানের আশা করা নিছক একটি অমূলক ধারণা হবে।

ইহাও মনে রাখা উচিত যে, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সব কিতাবের যঈফ, অবিশ্বস্ত ও জাল বর্ণনাগুলোই স্পষ্ট করেছি যা ইসলামী কুতুবখানায় পাওয়া যায়। আমাদের সেই হাজার হাজার জাল বর্ণনা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই যা বিভিন্ন ফেরকা ও মাযহাবের লোকেরা তাদের শত শত রিসালা ও কিতাবে ভরে রেখেছে; কারণ সেগুলোর অসারতা একজন সাধারণ মানুষের কাছেও স্পষ্ট হওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। শুধু সামান্য বোধশক্তির প্রয়োজন। কোনো একটি ফেরকার কিতাবসমূহের বিষয়বস্তু চাই সেই ফেরকার কাছ থেকে সত্য হোক না কেন, কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে সেগুলোর বিশুদ্ধতা মেনে নেওয়ার দাবি করা কীভাবে সঠিক হতে পারে? আর কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ের গবেষণা এমন বিতর্কিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে কীভাবে হতে পারে?

স্পষ্টতই কোনো সমস্যা যদি সত্যিই ইলমিভাবে সমাধান করতে হয়, তবে তা কেবল তখনই সম্ভব যখন সর্বসম্মত উৎসসমূহ সামনে রেখে কিছু সর্বসম্মত মূলনীতি অনুযায়ী আলোচনা করা হবে। এটাই সেই পয়েন্ট যার ওপর আসলে গোঁড়ামি ও ফেরকাবাজিতে আক্রান্ত...

মানুষ এড়িয়ে চলে। যাই হোক, এই ধরনের নির্বোধ লোকদের নিজেদের চোখে পড়ি বেঁধে নেওয়ার কারণে সত্য বদলে যায় না। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সত্য ঘটনাগুলো সেগুলোই যা কুরআন মাজীদ এবং সুন্নাতে মুহাম্মাদিয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! প্রতিটি যুগে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলের সুন্নাহর ওপর আস্তা রেখে এসেছে। আমরা যেকোনো ইলমি আলোচনা করলে সবার আগে এগুলোকেই সামনে রাখব। যদি ঐতিহাসিক আলোচনা হয়, তবে কুরআন ও সুন্নাহর পর মুসলমানদের সওয়াবে আযমের মধ্যে প্রচলিত ইতিহাসের কিতাবগুলো গ্রহণ করব। এবং সেগুলোর বর্ণনাগুলোকেও কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি ও মানদণ্ড অনুযায়ী দেখব।

এখন যদি কোনো দল কুরআনের বিশুদ্ধতা ও সংরক্ষণের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং কুরআনের মর্যাদা যদি তাদের কাছে সন্দেহজনক হয়, একইভাবে তারা যদি হাদীসের কিতাবসমূহের সংজ্ঞার ওপর একমত না হয় বরং তাদের হাদীসও আলাদা হয়, এবং ইতিহাসেও যদি তাদের আলাদা উৎস থাকে যা বানোয়াট বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং সেগুলো পেশ করে তারা তা মানিয়ে নেওয়ার জন্য জেদ ধরে, তবে এর প্রতিকার কী হতে পারে? এমন লোকদের জন্য সেটাই বলা যেতে পারে যা কুরআন মাজীদে নির্দেশ এবং যা হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. অত্যন্ত সুন্দর প্রেক্ষাপটে পেশ করেছেন। তিনি জঙ্গ জামালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করার পর লেখেন: [১]

“এটি সেই বর্ণনাগুলোর সারসংক্ষেপ যা আবু জাফর ইবনে জারীর রহ. এই শাস্ত্রের ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে সেই হাদীসগুলো নেই যা শিয়া বা অন্যান্য দলের স্বার্থান্বেষী লোকেরা সাহাবীদের বিরুদ্ধে জাল করেছে, আর না এতে সেই মিথ্যা সংবাদগুলো আছে যা এই লোকেরা বর্ণনা করে থাকে। যখন এই লোকদের সুস্পষ্ট হকের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তারা বলে:

‘আমাদের জন্য আমাদের ইতিহাসের কিতাব এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ইতিহাসের কিতাব।’

আমরা জবাবে তাদের বলি:

সালামুন আলাইকুম লা নাবতাগিল জাহিলীন [২]

‘আমরা তোমাদের সালাম জানাই। আমরা নির্বোধ লোকদের সাথে তর্কে জড়াতে চাই না।’“

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭ / ৩৭৩

[২] সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫৫

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

হযরত উসমান গনি (রা.) সংক্রান্ত সংশয়সমূহ

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কারা ছিলেন?

(প্রশ্ন) এটি প্রসিদ্ধ যে, উসমান (রা.) খলিফা হওয়ার পর কেবল নিজের আত্মীয়-স্বজনদের পদ প্রদান করেছিলেন এবং বনু উমাইয়া ব্যতীত সবার জন্য উন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়ে স্বজনপ্রীতির প্রমাণ দিয়েছিলেন। যদি এটি ভুল হয়, তবে জানানো হোক যে হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণ কারা ছিলেন?

(উত্তর) এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল যে, কেবল বনু উমাইয়াদের পদমর্যাদা দেওয়া হতো এবং বাকি পরিবারগুলোর জন্য উন্নতির পথ বন্ধ ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারের লোকদের প্রচুর পরিমাণে পদ দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবতা জানার জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের তালিকার ওপর নজর বুলিয়ে দেখে নিন যে, তাদের মধ্যে প্রতিটি গোত্রের লোক ছিল কি না?

হযরত উসমান গনি (রা.)-এর কর্মকর্তাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

ক্রমিক নং নাম গোত্র নিয়োগের স্থান

১ আশআছ বিন কায়েস (রা.) বনু আদি, কিন্দি আজারবাইজানের ওয়ালি

২ আবুল আওয়ার আমর বিন সুফিয়ান (রা.) সুলমি জর্ডানের ওয়ালি

৩ আবু দারদা (রা.) আনসারি দামেস্কের কাজি

৪ আবু মুসা আশআরি (রা.) আশআর কুফার ওয়ালি

৫ জারির বিন আব্দুল্লাহ বাজালি (রা.) বাজিলা কারকিসিয়ার ওয়ালি

৬ জাবির বিন আমর আল-মুজানি মুজানি খেরাজ সংগ্রাহক, ইরাক

৭ হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.) বনু মাজিন আজারবাইজানের সালার

৮ হাবিব বিন মাসলামা (রা.) বনু ফিহর কিনাসরিনের সালার

৯ হাকিম বিন সালামা হিয়ামি মসুলের ওয়ালি

১০ হুবাইশ বনু আসাদ মাসাবাজানের ওয়ালি

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

- ১১. খনিস বিন খুবেশ — আউস — অজ্ঞাত
- ১২. খালিদ বিন আল-আস — বনু মাখজুম — মক্কার ওয়ালি
- ১৩. খারিজা বিন হুজাফা আদভী — বনু আদি — মিসরের মুহাসিব
- ১৪. জায়েদ বিন সাবিত — বনু খাযরাজ — মদিনা মুনাওয়ারার কাজী
- ১৫. শুরাইহ বিন আল-হারিস — কিন্দি — কুফার কাজী
- ১৬. সাবরা বিন আমর — আশ্বারি — ইয়ামামার ওয়ালি
- ১৭. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস — বনু জুহরা — কুফার ওয়ালি ২৩ হিজরি
- ১৮. সাঈদ বিন আল-আস — বনু উমাইয়া — কুফার ওয়ালি ৩০ হিজরি
- ১৯. সালমান বিন রাবিয়া — বাহিলি — আরমিনিয়ার সালার
- ২০. সামাক বিন মাখরামা আল-আনসারী — বনু আসাদ — অজ্ঞাত
- ২১. সায়েব বিন আল-আকরা — বনু সাকিফ — ইসফাহানের ওয়ালি
- ২২. সাঈদ বিন কায়েস — বনু আদি — রে-এর ওয়ালি
- ২৩. আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার আল-আবদি — বনু আবদ — বাহরাইনের ওয়ালি
- ২৪. আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ — বনু আমির — মিসরের ওয়ালি
- ২৫. আবদুল্লাহ বিন উমর আল-হাদরামি — বনু কিনদাহ — মক্কার ওয়ালি
- ২৬. আবদুল্লাহ বিন আমির — বনু আবদ শামস — বসরার ওয়ালি
- ২৭. আবদুল্লাহ বিন কায়েস — বনু ফাজারা — অজ্ঞাত
- ২৮. আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া — বনু মাখজুম — জানদের ওয়ালি
- ২৯. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ — বনু হুযাইল — কুফার কাজী ও খাজিন
- ৩০. আবদুল্লাহ বিন আরকাম — বনু জুহরা — বায়তুল মালের নাজিম
- ৩১. আবদুর রহমান বিন খালিদ — বনু মাখজুম — হিমসের ওয়ালি
- ৩২. উতবা বিন আন-নাহাস — ইজলি — হালওয়ানের ওয়ালি
- ৩৩. উসমান বিন আবি আল-আস — বনু সাকিফ — বাহরাইন ও ইয়ামামার ওয়ালি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | দ্বিতীয় খণ্ড

৩৪. উকবা বিন আমির (রা.) | জুহানি, আনসারি | মক্কার ওয়ালি
৩৫. আলকামা বিন হাকিম কিনানি | বনু কিনানা | ফিলিস্তিনের ওয়ালি
৩৬. আলী বিন রাবিয়া | বনু আবদে শামস | মক্কার ওয়ালি
৩৭. আমর ইবনুল আস (রা.) | বনু সাহাম | মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার ওয়ালি
৩৮. কাব বিন সুর | আজদি | বসরার কাজি
৩৯. কাকা বিন আমর (রা.) | বনু তামিমি | কুফার সেনাপতি
৪০. কাসিম বিন রাবিয়া | বনু সাকিফ | তায়েফের ওয়ালি
৪১. মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) | বনু উমাইয়া | শামের ওয়ালি
৪২. মারওয়ান বিন হাকাম | বনু উমাইয়া | বাহরাইনের ওয়ালি/কাতিব
৪৩. মুগিরা বিন শুবা (রা.) | বনু সাকিফ | কুফা ও আজারবাইজানের ওয়ালি
৪৪. মালিক বিন হাবিব | ইয়ারবুয়ি | মাহ-এর ওয়ালি
৪৫. নুসাইর আল-ইজলি | আনসারি, ইজলি | হামাদানের ওয়ালি
৪৬. ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) | বনু উমাইয়া | কুফার ওয়ালি
৪৭. ইয়ালা বিন উমাইয়া (রা.) | তামিমি | সানআ ও ইয়েমেনের ওয়ালি [১]

এটি হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ৪৭ জন ব্যক্তির তালিকা। এদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.)-এর নিকটাত্মীয় মাত্র ছয়জন। এদের মধ্যে বনু উমাইয়া বংশীয় আত্মীয় চারজন:

১. হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) (বৈমাত্রেয় ভাই)
২. হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) (চাচাতো ভাই)
৩. হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) (চাচাতো ভাই)
৪. মারওয়ান বিন হাকাম (চাচাতো ভাই)

বনু উমাইয়া বংশের বাইরের আত্মীয় মাত্র দুইজন:

১. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) (মামাতো ভাই—গোত্রীয় দিক থেকে আবশামি)
২. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.) (দুধ ভাই—গোত্রীয় দিক থেকে বনু আমিরি)

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৩০, ৩৩১; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১২৮ ও ১৪০; আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, ড. আকরাম জিয়া উমারি, পৃ. ৪৭৩, ৪৩৮/৭; এছাড়াও আসাদুল গাবাহ এবং আল-ইসাবাহ-তে উল্লিখিত নামগুলোর অধীনে বিস্তারিত দেখুন।

• নোট: এই তালিকায় কোথাও কোথাও এক পদের জন্য একাধিক নাম রয়েছে। যেমন: আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নামও মিসরের শাসক হিসেবে রয়েছে এবং আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.)-এর নামও। এটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কারণে। অর্থাৎ প্রথমে এটি একজনের কাছে ছিল, পরে অন্যজনকে দেওয়া হয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

এই ছয়জনকে বাদ দিলে বাকি একচল্লিশ জন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা সবাই অন্য গোত্রের।

দ্রষ্টব্য:

মক্কা বিজয় থেকে শুরু করে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত সময়ের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর আমলের আগে বনু উমাইয়া গোত্রের কর্মকর্তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, যা তাঁর খিলাফতকালে পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

পূর্ববর্তী আমলগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সরকারি যন্ত্রে বনু উমাইয়া গোত্রের দশজন ব্যক্তি ছিলেন:

- হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)
- হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.)
- হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান (রা.)
- হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা.)
- হযরত আত্তাব বিন আসিদ (রা.)
- হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)
- হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আল-আস (রা.)
- হযরত আমর বিন সাঈদ বিন আল-আস (রা.)
- হযরত আবান বিন সাঈদ বিন আল-আস (রা.)
- হযরত সাঈদ বিন সাঈদ বিন আল-আস (রা.)

এই কারণেই আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে কুরাইশের অন্য কোনো গোত্রে বনু উমাইয়াদের চেয়ে বেশি লোক ছিল না, কারণ বনু উমাইয়ারা সংখ্যায় অধিক ছিল এবং তাদের মধ্যে অভিজাত্য ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিল।” [১]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা বনু উমাইয়া পরিবার থেকে নিযুক্ত করেছিলেন, যার কারণ ছিল বনু উমাইয়াদের সহজাত সামরিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা। এই কারণেই তারা এক শতাব্দী ধরে আরবের রাজনীতিতে বিশিষ্ট অবস্থানে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের এই যোগ্যতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন।

এই দশজন উমাইয়া কর্মকর্তার মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ সাঈদ বিন সাঈদ (রা.) হিজরি ৮ সনে তায়েফ যুদ্ধে শহীদ হন। তাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় বাকি নয়জন উমাইয়া গভর্নরকে পান, যাদেরকে তিনি শেষ পর্যন্ত বহাল রাখেন।

এই ব্যক্তিদের মধ্যে খালিদ বিন সাঈদ বিন আল-আস, আমর বিন সাঈদ বিন আল-আস এবং আবান বিন সাঈদ বিন আল-আস (রা.) আজনাদাইন যুদ্ধে শহীদ হন। এদিকে আত্তাব বিন আসিদ (রা.)-ও ইস্তেকাল করেন। ফলে হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত উমাইয়া কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে পাঁচজন ব্যক্তিকে পান:

- হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)
- হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.)
- হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান (রা.)
- হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা.)
- হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)

হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; বাকি ব্যক্তির সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এরপর এই পাঁচজনের মধ্যে ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান (রা.) হিজরি ১৮ সনে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইস্তেকাল করেন এবং...

[১] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/১৯২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত আবু সুফিয়ান বার্বাক্যের কারণে সক্রিয় ছিলেন না, তাই হযরত উমর বনু উমাইয়া থেকে একজন যুবক হযরত সাঈদ বিন আল-আস-কেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এজন্য হযরত উসমান তাঁর আমলে বনু উমাইয়া থেকে মাত্র তিনজন কর্মকর্তা পেয়েছিলেন: হযরত মুয়াবিয়া, হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা এবং হযরত সাঈদ বিন আল-আস।

হযরত উসমান এই তিনজনকে বহাল রাখেন। হযরত মুয়াবিয়া তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, যিনি ফারুকী যুগ থেকেই সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। একটি মত হলো, তিনি কেবল তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে পুরো সিরিয়ার শাসক বানিয়েছিলেন। কিন্তু সঠিক মত হলো, হযরত উমরই তাঁকে পুরো সিরিয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। [১]

ওয়ালিদ বিন উকবা-কে ২৫ হিজরিতে পদোন্নতি দিয়ে কুফার গভর্নর করা হয়। ২৯ হিজরিতে তাঁকে অপসারণ করা হয় এবং তাঁর স্থলে হযরত সাঈদ বিন আল-আস-কে নিযুক্ত করা হয়। ৩৪ হিজরিতে কিছু বিশৃঙ্খলাকারীর প্রতিবাদের কারণে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। সংক্ষেপে, এই তিনজন উমাইয়া সাহাবী আগে থেকেই সরকারি পদে ছিলেন। [২]

একইভাবে তাঁর দুধভাই হযরত আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারহ-ও হযরত উমরের সময় থেকে মিশরের সাঈদ অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। [৩] তিনি কেবল তাঁকে পদোন্নতি দেন এবং ২৭ হিজরিতে পুরো মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। [৪]

অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছিল মাত্র, তিনি কোনো নতুন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন না।

তিনি নতুন করে মাত্র দু’জন আত্মীয়কে নির্বাচন করেছিলেন: প্রথমত, তাঁর মামাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির, যাকে ২৯ হিজরিতে বসরা ও পারস্যের গভর্নর করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দিওয়ানে খিলাফতের লেখক মারওয়ান বিন আল-হাকাম।

হযরত উসমানের শাহাদাতের সময় তাঁর সরকারে মাত্র চারজন আত্মীয় ছিলেন: হযরত মুয়াবিয়া, হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির এবং মারওয়ান বিন আল-হাকাম।

মক্কা বিজয় থেকে শুরু করে হযরত উসমানের শাহাদাত পর্যন্ত সময়ের এই বিস্তারিত পর্যালোচনা দেখাচ্ছে যে, বনু উমাইয়ার কর্মকর্তারা আগে থেকেই সংখ্যায় বেশি ছিলেন, হযরত উসমানের খিলাফতের সময় তাঁরা সংখ্যায় বাড়েননি বরং কমেছিলেন।

কি হযরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সাহাবায়ে কেরাম উস্কে দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন: হাদীস ও ইতিহাসের অনেক সহীহ ও হাসান বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সাহাবায়ে কেরাম উস্কে দিয়েছিলেন এবং এর মূল কারণ ছিল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বনু উমাইয়া ক্ষমতার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বনু উমাইয়ার ক্ষমতার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এটি প্রমাণিত যে, দেশের শেষ বছরগুলোতে পাঁচ-ছয়জন বিশিষ্ট কর্মকর্তা... [৫]

[১] খলিফা বিন খাইয়াত, হযরত উমরের অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেন: “লাম ইয়াজমা আশ-শামা কুল্লাহা লি-মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান।” (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৫৫)

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৫, ২৯, ৩৩, ৪০ হিজরি।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৩/৩৩, ত. আল-রিসালা।

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৭ হিজরি।

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৯ হিজরি।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

বহরগুলোতে একটিই পরিবার বা গোত্রের কাছে ছিল। ২৯ হিজরিতে যখন হযরত উসমান (রা.) তাঁর মামাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করলেন, তখন মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, কার্যত পুরো দেশের ওপর একটি পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। কারণ বসরার গভর্নর হওয়ার অর্থ কেবল একটি শহর নয়, বরং পুরো পারস্য, খোরাসান এবং ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত শাসনভার ছিল। কুফার গভর্নর হওয়ার অর্থ ছিল পুরো ইরাক এবং মধ্য এশিয়ার নিয়ন্ত্রণ, যেখানে সাঈদ বিন আস আল-উমাবী (রা.) গভর্নর ছিলেন। সিরিয়ার গভর্নর হওয়ার অর্থ ছিল পুরো জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন এবং এশিয়া মাইনরের শাসন, যেখানে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন। তিনিও উমাইয়া ছিলেন। মিশরের গভর্নর হওয়ার অর্থ ছিল পুরো আফ্রিকার শাসন, যেখানে হযরত উসমান (রা.)-এর দুধভাই আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.)-এর গভর্নরশিপ ছিল। জাজিরাতুল আরবের কয়েকটি ছোট প্রদেশ অর্থাৎ: মক্কা, ইয়েমেন এবং বাহরাইন বাদে সেই সময়ের পুরো মুসলিম বিশ্ব এটাই ছিল।

অধিকন্তু, এই সকল পদাধিকারীরা ছিলেন তুলাকাদের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের সময় যাদের ক্ষমা করে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তদুপরি, শেষ সারির এই ব্যক্তিদের সামনে আনার জন্য কিছু প্রবীণ সাহাবীকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) আশারায় মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) ছিলেন মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী শেষ সারির সাহাবী। এজন্য হাফেজ যাহাবী (রহ.) লিখেছেন যে:

“এটি সেই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার কারণে তারা উসমানের সমালোচনা করেছিল যে, তিনি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে কুফা থেকে অপসারণ করে একে (ওয়ালিদকে) নিযুক্ত করেছিলেন।” [১]

হযরত সাঈদ বিন আস (রা.)-ও অল্পবয়সী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [২] একইভাবে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে সরিয়ে আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.)-কে আনা হয়েছিল। তিনিও মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী শেষ সারির সাহাবী ছিলেন। এবং এর আগে একবার মুরতাদ হওয়ার কারণে তাঁর খ্যাতি ভালো ছিল না। [৩] আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর স্থলে বসরার ওপর আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনিও যুবক ছিলেন। [৪] প্রবীণ সাহাবীদের উপস্থিতিতে এই কনিষ্ঠ সাহাবীদের নিয়োগ মানুষের জন্য বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল।

হাকাম বিন আসকেও তুলাকাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই ব্যক্তিকে কিছু সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের কারণে নবী করীম (সা.) শহর থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর এমন ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনা এবং খিলাফতের প্রশাসনিক দপ্তরের (দেওয়ান-ই-খিলাফত) দায়িত্ব তাঁরই ছেলে মারওয়ানকে দেওয়াও মানুষের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। [৫] কেবল সাধারণ মানুষই নয়, বরং মুহাম্মদ বিন আবি বকর এবং মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার মতো ব্যক্তির যারা প্রবীণ সাহাবীদের সন্তান ছিলেন, এই পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। [৬]

[১] এটি সেই সব কাজের অন্তর্ভুক্ত যার ভিত্তিতে মানুষ হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল যে, তিনি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে সরিয়ে ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে শাসক বানিয়েছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৩১৩, ৩১৫ ত. আর-রিসালাহ)

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪৪৫, ত. আর-রিসালাহ

[৩] হুসনুল মুহাদারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা, ১/৫৭৯, ত. দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ

[৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৮

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৫/৩৯ ত. সাদির; আল-ইসতিয়াব, ১/৩৫৬; উসদুল গাবাহ, অনুবাদ নম্বর: ১২১৭, ৩৮৩৮, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৬] তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী, ৩/৬০২, অনুবাদ: মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা; আল-ইসতিয়াব, ৩/৩৬৬, অনুবাদ: মুহাম্মদ বিন আবি বকর

আর এই কারণেই (তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী) যখন বিন আমর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে প্রকাশ্যে বলেছিলেন:

“আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনদের পদ দিয়েছেন— মারওয়ানকে, মুয়াবিয়াকে, আবদুল্লাহ বিন আমিরকে এবং আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহকে, যার রক্ত হালাল হওয়া সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যার রক্ত (ঝরানো) রাসূলুল্লাহ (সা.) বৈধ ঘোষণা করেছিলেন।” [১]

কিছু হাদীসের বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর পরিবারের আধিপত্য বনু হাশিমের কাছেও অপছন্দনীয় ছিল। এই কারণেই হযরত হাসান (রা.) ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে বেত্রাঘাত করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন:

“وَلِيَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا” [২]

“এই কাজের উত্তাপ সেই সহ্য করুক, যে এর শীতলতা ভোগ করেছে।”

ইমাম নববী (রহ.) এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন:

والضمير عائد الى الخلافة والولاية، اي كما ان عثمان واقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به، [৩]

অর্থাৎ, যেমন উসমান ও তাঁর আত্মীয়রা খিলাফতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছেন এবং এর জন্য বিশেষায়িত হচ্ছেন, তেমনি এর কষ্ট ও আবর্জনাও তারাই গ্রহণ করুক। এর অর্থ হলো, এই বেত্রাঘাতের কাজ উসমান নিজে অথবা তাঁর নিকটাত্মীয়দের কেউ সম্পন্ন করুক।

অর্থাৎ শাসনের আনন্দদায়ক কাজের স্বাদ যখন হযরত উসমান (রা.)-এর আত্মীয়রাই গ্রহণ করছেন, তখন এর নিরানন্দ কাজের বোঝাও তারাই বহন করুক; আমাদের যেন এই ধরনের কাজের কষ্টে না ফেলা হয়।

এই বর্ণনাটি আবু দাউদেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং হাদীস বিশারদগণ উল্লিখিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন। [৪]

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন:

“اي وَلَّ شِدَائِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا مَنْ تَوَلَّى مَنَافِعَهَا وَهُمْ بَنُو أُمِيَّة” [৫]

এই প্রেক্ষাপট এবং উল্লিখিত বর্ণনাগুলো থেকে সামগ্রিকভাবে এটি প্রমাণিত হয় যে, বনু উমাইয়ার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সাহাবায়ে কেরামের কাছে অপছন্দনীয় ছিল। এই কারণেই তাঁরা হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) নেতৃত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি এবং নিজের ভুল নীতিমালার মাধ্যমে নিজেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

جواب (উত্তর): এটি সত্য যে হযরত উসমান (রা.)-এর শেষ যুগে অধিকাংশ বড় প্রদেশের গভর্নর পদ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ছিল। কিন্তু এর থেকে এই অর্থ বের করা যে হযরত উসমান (রা.) তাঁর দায়িত্ব পালনে কোনো খিয়ানত করেছেন, তা একটি অপবাদ ও অপপ্রচার মাত্র। হযরত উসমান (রা.)-এর মহান গুণাবলির প্রেক্ষিতে তাঁর আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত।

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৬৬

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৫৫২, কিতাবুল হুদুদ; সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৪৮০, কিতাবুল হুদুদ

[৩] শারহ সহীহ মুসলিম লিন-নববী: ১১/২১৯, তবা’ ইহয়াউত তুরাস

[৪] আওনুল মাবুদ: ১২/১১৭, ১১৮, তবা’ আল-ইলমিয়াহ

[৫] এর কঠোর ও অপছন্দনীয় কাজগুলো তারাই আঞ্জাম দিক যারা এর সুফল ভোগ করেছে। বায়লুল মাজহদ: ১৭/৩৫৩, তবা’ আল-ইলমিয়াহ

...তাই তিনি যে পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার পেছনে উম্মতের কল্যাণই উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থ নয়। প্রত্যেক মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সেই সব লোককেই নির্বাচন করে, যাদের ওপর তার অধিক আস্থা থাকে। হযরত উসমান (রা.)-এর নিজের বংশের যুবকদের ওপর অধিক আস্থা ছিল, তাই তিনি তাদের মধ্য থেকে কাউকে উচ্চ পদে আসীন করেছেন অথবা কাউকে বহাল রেখেছেন এবং কাউকে পদোন্নতি দিয়েছেন। এ ধরনের কাজে খলিফার ইখতিয়ার থাকে। যদি তা না থাকে, তবে তাকে খলিফা বানানো অর্থহীন।

এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় ছিল যাতে হযরত উসমান (রা.)-এর নিয়ত একদম পরিষ্কার ছিল। তিনি যদি এই উচ্চতর দায়িত্বগুলো তার নিকটাত্মীয়দের দিয়ে থাকেন, তবে তা কেবল এই কারণে যে, তার দৃষ্টিতে এই ব্যক্তির রাজনৈতিক বিষয়াদি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য পুরোপুরি যোগ্য, বরং এই পদগুলোর জন্য সর্বোত্তম হকদার ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা বা মুহাম্মদ বিন আবি বকর যদি এই পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে তা ছিল তাদের ভুল, যার পরিণতিতে তারা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে शामिल হয়ে যান। যদি দুষ্কৃতকারীরা এই ধরনের লোকদের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনকে উসকে দেওয়ার জন্য সাহায্য নিয়ে থাকে, তবে এতে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর কোনো দোষ আসে না। বড়জোর কেউ এ কথা বলতে পারে যে, বিদ্রোহীরা এই পরিস্থিতিতে ভুল রঙ দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু এ কথা বলা যে, হযরত উসমান (রা.) নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য নিজেই দায়ী ছিলেন এবং এর চেয়েও বড় কথা যে তিনি (নাউযুবিল্লাহ) অযোগ্য বা খিয়ানতকারী ছিলেন—এটি একটি মিথ্যা দাবি।

এটিও প্রমাণিত যে, হযরত উসমান (রা.) শেষ পর্যন্ত জনগণকে এই ইখতিয়ার দিয়ে দিয়েছিলেন যে, যে শহরের মানুষ যাকে ইচ্ছা নিজেদের শাসক হিসেবে নির্বাচন করে নিক। তা সত্ত্বেও কিছু শহরের মানুষ হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত শাসকদের বহাল রাখার ঘোষণা দিয়েছিল। [১] এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আর কী অভিযোগ বাকি থাকে!!

সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হযরত হাসান (রা.)-এর বাক্য: “ول حارها من تولى قارها” থেকেও এই ফলাফল বের করা সঠিক নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম হযরত উসমান (রা.)-এর শত্রু ছিলেন। হ্যাঁ, একে মতপার্থক্য হিসেবে মেনে নিয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কিছু সাহাবী আন্তরিকভাবে এই মত পোষণ করতেন যে, একটি বংশের আধিপত্য উম্মতের কল্যাণের দিক থেকে উপযুক্ত নয়।

তাবারীর উদ্ধৃতিতে জাবালা বিন আমর (রা.) কর্তৃক হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর সমালোচনার যে উল্লেখ রয়েছে, তা ওয়াকিদীর বর্ণনা যার দুর্বলতা স্পষ্ট। কিন্তু এই বর্ণনাটি মেনে নিলেও প্রমাণিত হবে যে, সেই যুগে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। হযরত উসমান (রা.) যে ইখলাসের সাথে এই গভর্নরদের নিয়োগ দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ইখলাসের সাথেই কিছু সাহাবায়ে কেরাম এই ভিন্ন মত পোষণ করতেন এবং পূর্ণ সততার সাথে মাঝেমাঝে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতেন।

কোনো এক পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে কোনো সাহাবীর মুখ থেকে কোনো কঠোর বাক্য বেরিয়ে গিয়ে থাকলে সেটিও কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়; তারা তো মানুষই ছিলেন যাদের ওপর কখনো দুঃখ-বেদনা বা রাগের মতো অনুভূতিগুলো প্রবল হয়ে উঠত। এটি অনেক বড় বিভ্রান্তি যে, এই ধরনের ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও শান-শওকতের বিরুদ্ধে মতামত তৈরি করা হবে এবং তাদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হবে; কারণ এই ব্যক্তিত্বরাই হলেন দ্বীনের সনদ, তাদের মহানুভবতা, মর্যাদা এবং আমানতদারী ও সততার ধারণা ছাড়া দ্বীন টিকে থাকতে পারে না।

[১] তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৩/১১১৪

অংশ দ্বিতীয় | তারিখ উম্মতে মুসলিমা

স্বজনপ্রীতির অভিযোগের প্রতিরক্ষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

- (১) হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলের কর্মকর্তাদের মধ্যে তাঁর কোনো পুত্র বা জামাতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যদিও হযরত উসমান (রা.)-এর বয়স সত্তর থেকে আশির মধ্যে ছিল এবং তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ যুবক এবং কেউ কেউ প্রৌঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ ছিলেন। তাঁর নয়জন পুত্র ছিল, দুই পুত্র: আবদুল্লাহ এবং আবদুল মালিক শৈশবে ইন্তেকাল করেছিলেন, বাকি সাতজন ছেলে: আবদুল্লাহ আসগর, উমর, খালিদ, আবান, উমর, ওয়ালিদ এবং সাজিদ যুবক হয়েছিলেন এবং জ্ঞান ও মর্যাদার শিখরে পৌঁছেছিলেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) নিজের জীবনে কখনো তাঁদের সামনে আনার চেষ্টা করেননি।

পরবর্তীতে হযরত সাজিদ (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলে এবং হযরত আবান (রা.) আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর বাকি পাঁচ পুত্রকে দুনিয়া জানেই না এবং যাদের জানে তারা হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে এতটাই অখ্যাত ছিলেন যে সেই আমলের ইতিহাসে কোনো ঘটনায় প্রসঙ্গক্রমেও তাঁদের নাম খুব কমই পাওয়া যাবে। নিজের সন্তানদের পেছনে রাখার সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়া কি এমন হতে পারে যে মানুষ এত বড় শাসকের সাহেবজাদাদের নাম পর্যন্ত জানবে না? একইভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর সাতজন কন্যা ছিল কিন্তু নিজের কোনো জামাতাকে আপনি (রা.) কোনো সরকারি পদ দেননি। সাধারণ মানুষ আজ পর্যন্ত আপনার জামাতাদের নাম সম্পর্কে অজ্ঞাত।

- (২) আহলে তাশাইয়ু-দের জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর এই আপত্তি কোনোভাবেই শোভা পায় না কারণ সেক্ষেত্রে তাদের কাছে নাসিবিদের এই অভিযোগের কোনো উত্তর থাকে না যে হযরত আলী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে কেন বনু হাশিমকে পদ দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত কুসাম ইবনে আব্বাস, হযরত তাম্মাম ইবনে আব্বাস (রা.) এবং নিজের পালক পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর-এর প্রত্যেককে গভর্নর বানিয়েছিলেন, এর ওপর কোনো সাহাবী কোনো আপত্তি করেননি। [১]

প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আহলে তাশাইয়ু-দের আপত্তি সঠিক নয় এবং হযরত আলী (রা.)-এর ওপর নাসিবিদের আপত্তিও সঠিক নয়। জমহুর উলামায়ে দ্বীন এটি মানেন যে আত্মীয়-স্বজন যদি যোগ্য হন তবে প্রয়োজনের সময় তাঁদের কোনো পদ দেওয়া ভুল নয়। হযরত উসমান (রা.) বা হযরত আলী (রা.) নিজের যেসব আত্মীয়দের পদ দিয়েছিলেন তার পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্বজনপ্রীতির আবেগ একেবারেই ছিল না।

- (৩) হযরত উসমান (রা.) যেসব আত্মীয়দের পদ দিয়েছিলেন বা তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে তাঁরা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির (রা.) বসরার গভর্নর হয়ে যে বিজয়গুলো অর্জন করেছিলেন তা ইতিহাসের অংশ।

একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারহ (রা.) মিসর ও আফ্রিকার আয়ে অসাধারণ বৃদ্ধি করে দেখিয়েছেন এবং জিহাদের ধারাকেও এগিয়ে নিয়েছেন যার একটি উদাহরণ হলো গাযওয়ায়ে জাতুস সাওয়ারি। [২]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০০, ২০১।

[২] এই বিজয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ তারিখ খলিফা এবং তারিখ আত-তাবারিতে ২৪ হিজরি থেকে ৩৩ হিজরির ঘটনাবলীর অধীনে দেখা যেতে পারে।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমাহ

সাহাবায়ে কেরাম রাজনীতিকে দ্বীন মনে করতেন। তাঁদের নিকট এটি ছিল সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একটি মাধ্যম। এটি কোনো দুনিয়াবী খিদমত ছিল না যে মাল ও সম্মানের লোভ থাকবে। সুতরাং জাতীয় ও ধর্মীয় খিদমতে আত্মীয়-স্বজনকে শরিক করাতে কোনো দোষ নেই, যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা থাকে। হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (দা.বা.) “সূরা ত্বহা”-এর আয়াত ২৯: “وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي” (এবং আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন) এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“এই দোয়ায় মুসা (আ.) যে উজির (সাহায্যকারী) প্রার্থনা করেছিলেন, তার সাথে ‘মিন আহলি’ (আমার পরিবার থেকে) শর্তটিও যুক্ত করেছিলেন। কারণ নিজের পরিবারের লোকদের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে মানুষ অবগত থাকে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মিল থাকে, যা কাজে সহায়ক হয়। তবে শর্ত হলো সেই ব্যক্তি যেন কাজের যোগ্য হয়। যদি দেখা যায় যে কেবল আত্মীয়তার খাতিরেই কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং কাজের যোগ্যতা তার মধ্যে নেই, বরং কেবল স্বজনপ্রীতিই উদ্দেশ্য, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। যেহেতু বর্তমানে সাধারণত আমানতদারী ও ইখলাসের অভাব দেখা যায় এবং আসল কাজের চিন্তা অনুপস্থিত থাকে, তাই কোনো আমীর বা নেতার জন্য তার কোনো নিকটাত্মীয়কে উজির বা নায়েব বানানোকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু যেখানে আমানতদারীর ওপর পূর্ণ আস্থা থাকে এবং কোনো যোগ্য ও সৎ আত্মীয়কে কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে তা কোনো দোষের বিষয় নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য অধিকতর উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনও সাধারণত সেই ব্যক্তিদেরই গুরুত্ব দিতেন যাদের সাথে নবী পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।” [১]

□□□

ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও কেন গভর্নর বানানো হয়েছিল?

(প্রশ্ন) অনেক মানুষ ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে গভর্নর বানানোর কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর সমালোচনা করেন। তারা বলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন যার সম্পর্কে সূরা আল-হুজুরাতের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসেক ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও।”

এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে একটি গোত্রের নিকট যাকাত আদায় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সংবাদ দিলেন যে, ওই গোত্রটি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এটি শুনে ওই গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু পরে প্রকৃত সত্য জানা গেল যে ওই গোত্রের লোকেরা মুসলমানই ছিল। ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং তিনি ভুল সংবাদ দিয়েছিলেন।

এর ওপর এই আয়াত নাযিল হয়। [২] এর থেকে জানা গেল যে ওয়ালিদ (রা.) ফাসেক ছিলেন। তাহলে কেন উসমান (রা.) তাকে গভর্নর বানালেন?

[১] মাআরিফুল কুরআন ৬/৭৮

[২] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১৮৩৬৯, ত: আর-রিসালাহ; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৭৯৭৫, ১৭৯৭৬, ত: আল-ইলমিয়াহ

উত্তর: এই আপত্তির উত্তরে প্রথমে এটি বিবেচনা করা উচিত যে, ওয়ালিদ বিন উকবা এই ঘটনার আগে থেকেই ফাসিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন নাকি কোনো গোত্র সম্পর্কে তদন্ত ছাড়াই অপবাদ দেওয়া তার ফাসিক হওয়ার কারণ হয়েছিল। পরিশেষে যদি বলা হয় যে, এই কাজের কারণে তিনি ফাসিক হয়েছেন, তবে তা ভুল। স্পষ্টতই তিনি ভুল বোঝাবুঝির কারণে ওই গোত্রের ওপর অভিযোগ এনেছিলেন এবং ভুল বোঝাবুঝি বড় বড় আউলিয়াদেরও হয়ে থাকে, এটি কারো নিকটই ফাসিক হওয়ার কারণ হতে পারে না। যদি বলা হয় যে তিনি আগে থেকেই ফাসিক ছিলেন, তবে তাও ভুল হবে কারণ তিনি যদি এমন চরিত্রের হতেন তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিতেন না, যা অত্যন্ত সতর্কতা, আমানতদারি এবং বিশ্বস্ততার কাজ। হযরত উমর (রা.) তাকে অফিসার বানাতেন না।

প্রকৃত সত্য এই যে, আয়াত সংশ্লিষ্ট পেশকৃত তাফসিরি হাদিসগুলোর অধিকাংশের সনদ দুর্বল। হ্যাঁ, কিছু সহিহ সনদের রেওয়ায়েতেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে এসেছে কিন্তু সেগুলোর কোথাও স্পষ্ট শব্দে এটি বলা হয়নি যে ওয়ালিদ ফাসিক ছিলেন, বরং সেগুলো থেকে কেবল এটি জানা যায় যে এই আয়াতটি তার ঘটনার প্রেক্ষিতে নাথিল হয়েছে। এখন কথা রইল যে, ফাসিক দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে? তো এর সবচেয়ে সুন্দর উত্তর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (রহ.) এভাবে দিয়েছেন: “এটিও সম্ভব যে ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে কোনো দুষ্ট ব্যক্তি এই অভ্যর্থনা সম্পর্কে ভুল সংবাদ দিয়েছিল এবং তাকে আক্রমণ ও ভিড়ের (হামলার) রূপ দিয়ে দেখিয়েছিল। এর ওপর আল্লাহ (তাআলা) ফাসিক শব্দটি ওই ব্যক্তির ওপরই প্রয়োগ করেছেন।” [১]

সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, যে ব্যক্তির আমানত ও বিশ্বস্ততা সুদৃঢ় নয়, তার ওপর বিশ্বাস করে কাউকে গাদ্দার, বেঈমান বা অপরাধী মনে করে নেওয়া উচিত নয়। আয়াত সংশ্লিষ্ট সহিহ রেওয়ায়েতগুলোরও সাবলীল অর্থ এটাই এবং তাদের শব্দাবলিতে এই অর্থ গ্রহণের পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। এতে হযরত ওয়ালিদ (রা.)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আসে না। অতএব তাকে গভর্নর বানাতে কোনো অসুবিধা ছিল না।

□□□

হযরত উসমান (রা.) কি প্রবীণ সাহাবীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন?

প্রশ্ন: হযরত উসমান (রা.) কি হযরত আবু যর (রা.)-কে কষ্ট দিয়েছিলেন এবং তাকে নির্বাসিত করে রাবাযায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? আর এটি কি সঠিক যে হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর ওপর এত নির্যাতন করেছিলেন যে তার দুটি পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল?

উত্তর: উভয় অভিযোগই ভিত্তিহীন। সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু যর (রা.)-কে মদিনা মুনাওয়ারায় রাখতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজেই নিজের ইচ্ছায় নির্জন স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তার স্ত্রী বলতেন: আল্লাহর কসম! উসমান আবু যরকে বের করে দেননি বরং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “যখন মদিনার জনবসতি সাল’ পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন সেখান থেকে বেরিয়ে যেও।” যেহেতু মদিনার জনবসতি সাল’ পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি মদিনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। [২]

হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর ওপর নির্যাতনের রেওয়ায়েতটি সনদবিহীন এবং রাফেজিদের মনগড়া। [৩]

[১] তরজুমানুল কুরআন: ৩/৩৮২, সূরা আল-হজুরাত।

[২] মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৫২৬৮, বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

[৩] তারিখ ইয়াকুবি, পৃষ্ঠা: ১৭৩, এর একমাত্র বর্ণনাকারী ঐতিহাসিক ইয়াকুবি শিয়া এবং সনদ ছাড়াই এই ঘটনাটি বর্ণনা করে, ফলে ইসনা আশারি আলেম ইবনুল মুতাহহার আল-হিল্লি যখন ‘মিনহাজুল কারামাহ’ গ্রন্থে এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন, তখন আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ এর স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন যে এই রেওয়ায়েতটি ভিত্তিহীন। (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২৫৫)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে প্রহার করার প্রকৃত ঘটনা:

প্রশ্ন: হযরত উসমান (রা.) কি আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে প্রহার করিয়েছিলেন এবং এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে কি কোনো শত্রুতা ছিল?

উত্তর: এগুলো অতিরঞ্জিত কথা। বাস্তবতা কেবল এতটুকুই যে, হযরত উসমান (রা.) তাঁর বিরুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্রের তদন্তের জন্য হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কিছু দিন বেশি অবস্থান করেন এবং সেই সময়ে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগগুলো শুনে সম্ভবত কিছুটা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। [১]

এরপর যখন তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন একটি মজলিসে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর কিছু সমালোচনাও করেন, যার ফলে হযরত উসমান (রা.)-এর কিছু ভক্ত অসন্তুষ্ট হন। [২] পরিশেষে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) চাইলেন হযরত সাদ বিন আব্বি ওয়াক্কাস (রা.)-এর সাথে মিলে সরাসরি হযরত উসমান (রা.)-এর কাছেই এই অভিযোগগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এই দুই ব্যক্তি যখন আমিরুল মুমিনীনের বাড়িতে পৌঁছালেন, তখন তিনি ব্যস্ততার কারণে দ্বাররক্ষী পাঠিয়ে তাঁদের ফিরে যেতে বললেন। হযরত সাদ (রা.) তো ফিরে গেলেন কিন্তু হযরত আম্মার (রা.) ফিরে যাননি। এতে দ্বাররক্ষী তাঁর ওপর হাত তোলে। [৩]

স্পষ্ট যে, এই কাজে হযরত উসমান (রা.)-এর কোনো সম্মতি ছিল না। যে বর্ণনায় দ্বাররক্ষীর হাতে প্রহারের কথা উল্লেখ আছে, সেখানেই এই স্পষ্টীকরণ রয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) যখন জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন: “আমি দ্বাররক্ষীকে মারধর করতে বলিনি।” সেই সাথে তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, আমি উপস্থিত আছি, আম্মার (রা.) চাইলে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) সমস্ত সন্দেহের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করেন। [৪]

সুতরাং আম্মার (রা.) অবরোধের সময় হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ নিয়েছিলেন এবং দুঃখিত হয়ে বিদ্রোহীদের বলেছিলেন: “তোমরা এমন এক ব্যক্তির পানি বন্ধ করে রেখেছ, যিনি রুম্মাহর কূপ কিনে ওয়াকফ করেছিলেন।” [৫]

একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আম্মার (রা.) অবরোধকারীদের হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। [৬] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আম্মার (রা.) শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

[১] আম্মারকে মিশরের একদল লোক নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছিল... (তারিখুত তাবারী ৩৩১/৩) বর্ণনাটি অবশ্য দুর্বল; কারণ এর বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ফাকসী অজ্ঞাত।

[২] মুস্তাদরাক হাকিম হা: ৫৬৫৪; আন আব্বিল আলিয়া, ও রিজালুহ সিকাত।

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আব্বি শায়বা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৬৬৯১, ত ত আল-রশিদ, ইসনাদুহ হাসান, ফিহি উসমান বিন মুসলিম, হুয়া সিকা (তাকরীবুত তাহযীব নম্বর: ৪৬২৫) ওয়া ফিহি আবু হাফস হাসিন বিন নুমাইর আল-ওয়াসিতি, রমি বিন নাসব, ওয়া সাকাহ আবু জুরআ কাল ইবনে মঈন: সালিহ, কাল আবু হাতেম: লা বাসা বিহি। (তাহযীবুল কামাল: ৫৩৭/৬) ওয়া হাসিন বিন আব্দুর রহমান সিকা কাবলাল ইখতিলাত। (তাকরীবুত তাহযীব নম্বর: ১৩৬৯) ওয়া রেওয়ায়েত ইবনে নুমাইর আনহ বা’দাল ইখতিলাত, ওয়া ফিহি রাজুলুন মিন বনী ফিহর কাল আল-বুখারী: জুহায়ম আল-ফিহরী (তারিখুল কাবীর: ২৫১/২) ওয়া সাকাহ ইবনে হিব্বান: কাল: জুহায়ম আল-ফিহরী ইয়ারওয়ী আন উসমান ওয়া সাদ ওয়া আম্মার রওয়ী আনহ হাসিন বিন আব্দুর রহমান। (আস-সিকাত লি ইবনে হিব্বান, ৩: ২০৮৩)

[৪] প্রাপ্ত।

[৫] রেওয়ায়েত মুহিব আল-তাবারী; আনযুর আর-রিয়াদুন নাদরা ফি মানাকিবিল আশারা ৯৮/৩, আন আব্বি হুরায়রা (রা.), ওয়া লাম আজিদহ লি কুতুবিল মুতাকাদিমীন।

[৬] “এমনকি যখন উসমান (রা.)-কে অবরোধ করার দিন এল, আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম: সাবধান! তোমরা একে হত্যা করো না। আমি তাঁর দিকে তাকলাম, দেখলাম তিনি আম্মার (রা.)।” (আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩৬৩/২২)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সাহাবীগণ এবং হযরত উসমান গনি (রা.)-এর মধ্যে কি কোনো উত্তেজনা ছিল?

প্রশ্ন: হযরত উসমান (রা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কি তীব্র উত্তেজনা ছিল এবং কিছু সাহাবী কি বিদ্রোহে জড়িত ছিলেন?

উত্তর: সহীহ ও হাসান বর্ণনাগুলোতে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মধ্যে কোনো সাহাবীর নাম পাওয়া যায় না। যয়ীফ বর্ণনাগুলো থেকে বড়জোর এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, কিছু অখ্যাত সাহাবী অথবা এমন কিছু লোক যাদের সাহাবী হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত, তারা হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি মৌখিক সমালোচনা বা দারে উসমান (উসমানের বাসভবন) ঘেরাও করার সাথে জড়িত ছিলেন। সহীহ বর্ণনাগুলোতে অধিকাংশ সাহাবীর পক্ষ থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিরক্ষাই প্রমাণিত। হ্যাঁ, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সাহাবীর পক্ষ থেকে এক-আধ জায়গায় মৌখিক সমালোচনা বর্ণিত হয়েছে অথবা প্রতিরক্ষায় যথাযথভাবে অংশ না নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় [১], তবে এর দ্বারা তাদের ওপর কোনো অভিযোগ আসে না। তারা যাই হোক মানুষ ছিলেন। নেককার মানুষদের মধ্যেও বাদানুবাদ হতে পারে এবং ফিতনার পরিস্থিতিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে।

হযরত আলী (রা.) কি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধী এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন?

প্রশ্ন: কিছু বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার প্রাথমিক দিনগুলোতে হযরত আলী (রা.), হযরত হাসান বিন সাবিত, হযরত কাব বিন মালিক এবং হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর পরামর্শে হযরত উসমান (রা.)-এর সমালোচনা করেন, তাকে বোঝান, আল্লাহর কঠোর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং চেষ্টা করেন যাতে তিনি তার কর্মপন্থা সংশোধন করেন এবং তার প্রতিনিধিদের লাগামহীন ছেড়ে না দেন; হযরত উসমান (রা.) অভিযোগগুলো গ্রহণ করেননি। এই বর্ণনাগুলোর সনদ ও অর্থের দিক থেকে মর্যাদা কী?

উত্তর: এই বর্ণনাগুলো শুধুমাত্র ওয়াকিদীর, যিনি একজন যয়ীফ বর্ণনাকারী। এই বর্ণনাগুলো দেখে বড়জোর এটি মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, হযরত আলী (রা.) উপদেশের খাতিরে কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক বাদানুবাদ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে এমনটি হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এই বর্ণনাগুলো থেকে কেউ এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, হযরত উসমান (রা.) ভুলকারী ও গুনাহগার ছিলেন অথবা হযরত আলী (রা.) তার ক্ষমতা উল্টে দিতে চেয়েছিলেন, তবে এই কথাটি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে হযরত আলী (রা.) নিজেই নির্দোষিতা প্রকাশ করেছিলেন, যেমনটি সহীহ সনদের সাথে তার থেকে বর্ণিত হয়েছে: “আমি না তাদের হত্যা করেছি, না কাউকে এর জন্য প্ররোচিত করেছি।” [২] এতটুকু কথা অবশ্যই সত্য যে, সাবায়ী প্রোপাগান্ডার কারণে অনেক মানুষের মনে এই সন্দেহ হচ্ছিল যে, হযরত আলী (রা.) হয়তো এই অপরাধে শরিক। কিছু সাহাবীর মনেও এই সন্দেহ অবশ্যই হয়েছিল, ফলে য়ায়েদ বিন আরকাম (রা.) আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

[১] মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৫৬৫৮; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/২৬০, ত: সাদির, এতে নির্ভরযোগ্যদের থেকে আমাদের বিন খুজাইমা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি উসমান (রা.)-এর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু বর্ণনাগুলো কিছু ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।

[২] তারিখে তাবারী: ৩/৩৩৬

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/২৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

“আপনি কি উসমান (রা.)-কে হত্যা করিয়েছিলেন?”

হযরত আলী (রা.) বললেন: “সেই সত্তার কসম যিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেন, আমি তাঁকে হত্যা করিনি, এর নির্দেশও দিইনি এবং এই দুর্ঘটনায় আমি খুশিও হইনি।”

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) বলেন:

“আমি তাঁর হত্যাকাণ্ড অপছন্দ করছিলাম, কিন্তু আমি অসহায় ছিলাম।” [১]

হযরত আলী (রা.) কর্তৃক তাঁর সাহেবজাদাদের তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করা এই কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তৃতীয় খলিফা সত্যের ওপর ছিলেন এবং মজলুম ছিলেন, হযরত আলী (রা.) তাঁর সমর্থক ছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিরক্ষা করা একটি নেক কাজ ছিল।

মোটকথা, ওয়াকিদী এবং এই স্তরের দুর্বলতম বর্ণনাকারীদের এই রেওয়ায়েতগুলো, যা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতবিরোধের বিষয়ে বাস্তবতার নিরিখে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অগ্রহণযোগ্য।

□□□

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) কি হত্যাকাণ্ডে শরিক ছিলেন?

প্রশ্ন: কিছু লোক হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করার জন্য মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করে থাকেন, যাতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন: “ইয়া লাইতানি কুনতু নাসইয়াম মানসিয়া ওয়াল্লাহি মা ইনতাহাকতু মিন উসমানা শাইয়ান ইল্লা কদ ইনতাহাকা মিন্নি মিসলাহ হাত্তা লাও ওয়াদিত্তু কাতলাহ লাকাতালতু।”

“কাশ! আমি বিস্মৃত হয়ে যেতাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর যে অবমাননা করেছি, তার সমপরিমাণ তিনি আমার অবমাননা করে ফেলেছেন। যদি আমি তাঁকে হত্যা করা পছন্দ করতাম তবে হত্যা করে দিতাম।” [২]

উত্তর: এই রেওয়ায়েতটি সনদের দিক থেকে সহীহ, কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম বুঝতে হবে। এটি হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের প্রতি আগ্রহ নয় বরং তাঁর এবং তাঁর হত্যাকারীদের প্রতি চরম আক্ষেপ প্রকাশ পাচ্ছে।

রেওয়ায়েতের যে প্রারম্ভিক শব্দগুলো নিয়ে আপত্তি তোলা হচ্ছে, প্রথমে সেগুলোর অর্থ বোঝা জরুরি। শব্দগুলো হলো:

“ওয়াল্লাহি মা ইনতাহাকতু মিন উসমানা শাইয়ান ইল্লা কদ ইনতাহাকা মিন্নি মিসলাহ।”

অনুবাদ: “আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সাথে যে বাড়াবাড়ি করেছি, তিনি আমার সাথে তার অনুরূপ করেছেন।”

এই শব্দগুলোর সঠিক মর্ম জানার জন্য হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যকার সম্পর্ক দেখা উচিত, তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো মতবিরোধ বা বিবাদের উদাহরণ পাওয়া যায় না। যেমন হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে উম্মুল মুমিনীনের...

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪৩৭, য়ায়েদ বিন আরকাম থেকে; পৃষ্ঠা ৪৬৭, ৪৭২, ইবনে আব্বাস থেকে, ত. আর-রুশদ।

[২] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক মা জামে মা'মার বিন রাশিদ, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২০৯৬৭, বাব মাকতাল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, ত. আল-মজলিস আল-ইলমি পাকিস্তান।

সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হতো, তেমনি উসমানী যুগেও তা অব্যাহত ছিল বরং ভাতা ও সরকারি অনুদান আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সমালোচকরা এমন একটি বর্ণনা নিয়ে আসুক যার মাধ্যমে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামান্যতম কোনো মতপার্থক্য বা মনোমালিন্য প্রমাণ করা যায়। যখন এটি প্রমাণিত নয়, তখন বর্ণনার অর্থ সাধারণ বাগধারা অনুযায়ী “ধরে নেওয়া” (بالفرض) অর্থে গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ যদি আমাদের মধ্যে তর্কের খাতিরে কোনো উঁচুনিচু হয়ে থাকে, বা কোনো সামান্য বিষয়ে স্বাভাবিক অসন্তুষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে, তবে সেই বিষয়টিও সমান সমান; এমন কোনো পরিস্থিতি নয় যে এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের ওপর অবিচার চলত আর অন্যজন বাধ্য হয়ে জুলুম সহ্য করত, গোপনে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টায় থাকত এবং বদলা নেওয়ার সুযোগ খুঁজত। যেমন এর পরের শব্দগুলো এর সাক্ষী: “حتى لو وددت قتله” “যদি আমি তাকে হত্যা করতে চাইতাম তবে হত্যা করে দিতাম।”

বিজ্ঞজনরা জানেন যে “لو” (যদি) দুটি বাক্যের ওপর আসে: শর্ত ও জাযা (প্রতিদান/ফলাফল)। “لو” শর্তের নেতিবাচকতার কারণে জাযার নেতিবাচকতার ফায়দা দেয়, অর্থাৎ প্রথম বিষয়টি হতে পারেনি তাই দ্বিতীয়টিও হতে পারেনি। যেমন “لو كان بعدى نبيا لكان” “যদি আমার পরে কোনো নবী হতো তবে উমর হতো”, যেহেতু আমার পরে নবুওয়াত সম্ভব নয় তাই উমরও নবী হতে পারেননি।

এই নিয়মটি মাথায় রেখে অর্থ দেখলে এটাই হবে যে, আমি যদি হত্যা করাতে চাইতাম তবে করিয়ে দিতাম কিন্তু আমি চাই-ই নি, তাই হত্যাও করাইনি। এর অর্থ হলো আমি কোনো অসহায় নারী নই। আমি উম্মুল মুমিনীন, আমার তাদের সাথে কোনো শত্রুতা ছিল না, যদি থাকত তবে আমি আমার হাজার হাজার আধ্যাত্মিক সন্তানদের বলে আগেই তাদের হত্যা করিয়ে দিতাম। আমার গোপন ষড়যন্ত্রের কী প্রয়োজন।

মোদাকথা উম্মুল মুমিনীনের উদ্দেশ্য এটাই যে, কোনো পূর্ববর্তী সংঘাত ছিলই না, যার কারণে আজ আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করব। এখন এই বর্ণনার বাকি শব্দগুলো দেখুন, দুধের দুধ আর পানির পানি আলাদা হয়ে যাবে।

“তারপর উম্মুল মুমিনীন বললেন: হে উবাইদুল্লাহ বিন আদি! যাদের তুমি চেনো (অর্থাৎ হযরত উসমান [রা.] -এর শত্রু, যেমনটি পরবর্তী শব্দগুলোতে স্পষ্ট করা হয়েছে) তাদের পর যেন কোনো ব্যক্তি তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে (অর্থাৎ তার বাহ্যিক ইবাদত ও যুহদ দেখে প্রভাবিত হয়ো না)। আল্লাহর কসম! আমি কখনো রাসূলের সাহাবীদের আমলকে তুচ্ছ মনে করিনি, যতক্ষণ না কুরআন পাঠকারী সেই সব লোক প্রকাশ পেল যারা হযরত উসমান [রা.] -এর ওপর অপবাদ আরোপ করেছিল (অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগি দেখে সাহাবীদের ইবাদত ও রিয়াযত কম মনে হতে লাগল, যেমনটি খোদ হাদীসে রয়েছে যে, এই দলের সালাত ও সিয়াম তোমাদের সালাত ও সিয়ামের চেয়ে বেশি মনে হবে কিন্তু তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। যেমনটি সহীহ বুখারীতে রয়েছে)। এই লোকেরা এমন কিরাত পাঠ করত যার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না, এমন সালাত আদায় করত যার কোনো নজির ছিল না, এমন সিয়াম পালন করত যার কোনো উদাহরণ ছিল না এবং এমন সুন্দর কথা বলত যা আমরা বলতে পারতাম না, কিন্তু যখন আমি তাদের চরিত্রের ওপর লক্ষ্য করলাম তখন তারা সাহাবীদের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি। সুতরাং এখন যখন তুমি কোনো ব্যক্তির ভালো কথা শুনবে তখন শুধু এতটুকু বলে দাও: আমল করতে থাকো। আল্লাহ তোমার আমল দেখে নেবেন এবং রাসূল ও মুমিনগণও... আর কেউ যেন তোমাকে নির্বোধ বানাতে না পারে।”

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (সপ্তম খণ্ড)

মোদাকথা, সামগ্রিকভাবে বর্ণনাটি উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর জবানিতে হযরত উসমান (রা.)-এর রক্ত থেকে নির্দোষিতা এবং তাঁর হত্যাকারীদের প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রমাণ করছে। অসাধু ঐতিহাসিকরা উম্মুল মুমিনীন-এর নির্দোষিতা প্রকাশের বক্তব্যের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে একে অপরাধ স্বীকারোক্তি হিসেবে উপস্থাপন করছে। এর চেয়ে বড় ইলমী থিয়ানত আর কী হতে পারে?

শেষ কথা হলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগ থেকে নির্দোষিতা প্রকাশ করে বলেছিলেন: “আল্লাহর পানাহ! আমি কীভাবে মুসলমানদের রক্ত ঝরানোর, তাদের খলিফাকে হত্যা করার এবং হারামকে হালাল করার নির্দেশ দিতে পারি।”

হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে চিঠি লেখার অভিযোগ থেকে নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য কসম খেয়ে বলেছিলেন: “আমি এ বিষয়ে সাদা কাগজে কালো কালিতে কিছুই লিখিনি।” [১]

সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর ওপর এ ধরনের অপবাদ বিভেদ ছড়ানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।

□□□

রাসুলের হাওয়ারী হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) কি ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন?

(প্রশ্ন) হযরত যুবাইর (রা.) সম্পর্কে কিছু মানুষের ধারণা যে, তিনি কোনো না কোনো পর্যায়ে ষড়যন্ত্রে অবশ্যই শরিক ছিলেন, অন্যথায় হযরত উসমান (রা.)-এর সমর্থন থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত কেন দূরে থাকলেন, ঠিক সময়ে মদিনার বাইরে কেন চলে গেলেন?

(উত্তর) এটি নিছক একটি সংশয়। সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত যুবাইর (রা.) বিদ্রোহীদের প্রথমবার আগমনের সময় হযরত উসমান (রা.)-এর দূত হয়ে তাদের আপত্তির জবাব দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর নিরাপত্তার জন্য নিজের কলিজার টুকরো হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে পাহারাদারদের আমীর নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.) এবং যুবাইর (রা.)-এর মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান অব্যাহত ছিল।

অবরোধের পর মদিনা থেকে বাইরে যাওয়ার বিষয়টি হলো, হযরত যুবাইর (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহীদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে আরব গোত্রগুলোর শক্তি একত্রিত করা এবং তাদের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করা। جُنَاحُ হযরত যুবাইর (রা.)-এর বার্তা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে পৌঁছেছিল যে, আপনি বললে আমি একাই এসে প্রতিরোধ করব, আর আমি তো বনী আমর ইবনে আউফ-এর অপেক্ষা করছি যারা আমার কাছে এসে সাথে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হযরত উসমান (রা.) তাঁকে সেখানেই অবস্থান করে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [২]

হযরত যুবাইর (রা.)-এর হযরত তালহা (রা.)-এর সাথে মিলে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোই এই কথার দলিল যে, তিনি কোনো ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন না, বরং হযরত উসমান (রা.)-এর সমর্থক ও অনুগত ছিলেন।

□□□

[১] তারিখুল মদিনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ৪/১২২৩; তারিখু খলিফা ইবনে খইয়াত, পৃ. ১৭৬ সহীহ সনদে।

[২] তারিখু দামেশক: ৩৯/৩৩ হাসান সনদে, তরজমা: উসমান।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কি হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.) বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

প্রশ্ন: কিছু লোক হযরত তালহা (রা.)-এর ওপর বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার সন্দেহ পোষণ করেন এবং এই বর্ণনাটি পেশ করেন যে, অবরোধ চলাকালীন হযরত উসমান (রা.) ঘর থেকে উঁকি দিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করেছিলেন: “আফীকুম তালহা?” (এখানে কি তালহা উপস্থিত আছেন?) কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তালহা (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। হযরত উসমান (রা.) বললেন: “আমি তোমাকে এখানে কেন দেখছি? আমাদের প্রত্যাশা ছিল না যে তুমি এমন দলের মধ্যে থাকবে। তিনবার আমার প্রশ্ন শুনেও তুমি চুপ ছিলে।” এরপর হযরত উসমান (রা.) নিজের ফযীলতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। [১]

এর দ্বারা কি হযরত তালহা (রা.)-এর বিদ্রোহীদের সমর্থক হওয়া প্রমাণিত হয় না?

উত্তর: এই বর্ণনায় এমন কোনো কথা নেই যা হযরত তালহা (রা.)-কে হত্যা বা ষড়যন্ত্রে শরিক হিসেবে প্রমাণ করে। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী, সেদিন হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কেও একইভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন: “আফীকুম আলী?” (এখানে কি আলী আছেন?) [২]

তাহলে কি এর অর্থ এই নেওয়া হবে যে, হযরত আলী (রা.)-ও হত্যার ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন? এটাও সম্ভব যে, এই ব্যক্তিবর্গ এই লজ্জার কারণে সামনে আসতে চাচ্ছিলেন না যে, আমীরুল মুমিনীনকে এই সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখেও আমরা নিরুপায়। অথবা এই শোকাবহ অবস্থায় কোনো পাল্টা কৌশল নির্ধারণ করতে না পারার দুঃখের কারণে চুপ ছিলেন। বড়জোর এটা বলা যেতে পারে যে, মানুষ হওয়ার খাতিরে সাময়িকভাবে তারা ফিতনার পরিবেশ এবং গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। এর থেকে এই অর্থ বের করা একেবারেই ভুল যে, এই ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সেদিন হযরত উসমান (রা.) নিজের ফযীলতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সবার বিবেককে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, যে ঘটনাগুলোর অন্যতম বড় সাক্ষী ছিলেন হযরত আলী এবং হযরত তালহা (রা.)-এর মতো বড় বড় সাহাবীগণ।

যেমন: হযরত উসমান (রা.)-এর একটি ফযীলত এই ছিল যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরা পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ পাহাড় কাঁপতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) পদাঘাত করে বললেন: “স্থির হও, তোমার ওপর নবী, সিদ্দিক এবং শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই।” ওই সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে পাহাড়ে আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক এবং উসমান গনী (রা.) ছাড়াও হযরত আলী এবং তালহা (রা.)-ও ছিলেন। [৩] এই কারণেই হযরত উসমান (রা.) বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তালহা কি এখানে আছেন? আলী কি এখানে আছেন? যাতে তারা এই ফযীলতগুলোর সাক্ষ্য দিতে পারেন।

[১] মুসনাদে আহমাদ: ১/৫৫১, ৫৫২, ইসনাদ সহীহ।

[২] তারিখুল মদীনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ৪/১৩০৩; তারিখুল ইসলাম লি-যাহাবী: ৩/৩৫৯; তাদমুরী; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৪৫, ত. নিয়ার আল-ফাত লি-ইবনে হিব্বান: ৩/২৬১; তারিখে দামেশক: ৩৯/৩১৮; আর-রিয়াজুন নাদরাহ ফী মানাকিবিল আশারাহ: ৩/২৫, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[৩] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৬৯৭, সহীহ সনদে, মানাকিবে উসমান (রা.)।

অতএব, এই বর্ণনাগুলো থেকেই প্রমাণিত হয় যে হযরত তালহা (রা.) স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। [১] যদি তিনি ষড়যন্ত্রে শরিক হতেন, তবে কেন উসমান (রা.)-এর ফযিলতের সাক্ষ্য দিতেন? ষড়যন্ত্রের জন্য তো এমনিতেও শত শত মিথ্যা বলতে হয়। হযরত তালহা (রা.) যদি ষড়যন্ত্র করতে পারতেন, তবে কেন মিথ্যা বলতে পারলেন না? সত্য বলে নিজেরই ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডাকে কেন অকার্যকর হতে দিলেন?

প্রশ্ন: হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.) সম্পর্কে একটি বর্ণনায় আছে যে, ‘ইন্না আশাদদাস সাহাবাতি আলা উসমান’। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত উসমানের সবচেয়ে কঠোর বিরোধী ছিলেন তালহা (রা.)। এই বর্ণনাতেই আছে যে, হযরত উসমানের বিষয়টি তালহা (রা.)-এর বন্ধুত্বই নষ্ট করেছে। [২] তাছাড়া তাবারীতে আছে যে, হযরত তালহা (রা.) অবরোধের দিনগুলোতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে হযরত উসমানের স্থলে ইমামতি করতে থাকেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি বিদ্রোহের মূল হোতা ছিলেন।

উত্তর: এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। উল্লিখিত উভয় বর্ণনাও এর দলিল হতে পারে না। হযরত তালহা (রা.) সম্পর্কে ‘আশাদদুস সাহাবা...’ বর্ণনাটি প্রথমত আমাদের নিকট সনদের দিক থেকেও আপত্তিকর, কারণ এর একজন বর্ণনাকারী জাফর বিন সুলাইমান আদ-দুবায়ী সত্যবাদী হলেও ‘শিয়া’ ছিলেন। [৩]

যদি বর্ণনাটিকে সনদের দিক থেকে সঠিক মেনেও নেওয়া হয়, তবুও ‘আশাদ’ (কঠোরতম) শব্দের অর্থ কীভাবে এটা হতে পারে যে তিনি বিদ্রোহে শরিক এবং এর নেতা ছিলেন? ‘আশাদ’ দ্বারা বুঝানোর ক্ষেত্রে কঠোরতা করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। দুই অকৃত্রিম বন্ধু কি শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কখনো কখনো রাগ করেন না? তবে কি তাদেরকে একে অপরের শত্রু মনে করা হয়? এটি তো পারস্পরিক আন্তরিকতার লক্ষণ, শত্রুতার নয়। অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষী দেয় যে, এই ‘আশাদদুস সাহাবা আলা উসমান’-ই হযরত উসমানের শত্রুদের ধমক দিতেন এবং অভিশপ্ত আখ্যা দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন [৪], বরং হযরত উসমানের ঘরে হামলার সময় তিনি বর্ম পরিধান করে প্রতিরক্ষার জন্য আসতেন। [৫] প্রমাণিত হলো যে, তিনি কিছু প্রশাসনিক বিষয়ে হযরত উসমানের সাথে দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এর দ্বারা এটাও অনুমান করা যায় যে, যখন ‘আশাদদুস সাহাবা আলা উসমান’-এর এই অবস্থা ছিল, তখন বাকি সাহাবায়ে কেরামও নিশ্চিতভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

আর অবরোধের দিনগুলোতে হযরত তালহা (রা.)-এর মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ানোর বিষয়টি, যা প্রশ্নকারী তারিখুত তাবারীতে ওয়াকিদীর বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমরা তাবারীতে এই বর্ণনার উপস্থিতির সত্যতা নিশ্চিত করতে পারিনি, তবে প্রশ্নকারীর উদ্ধৃতিকে মেনে...

[১] মুসনাদে আহমাদ, বর্ণনা নম্বর: ৫৫১

[২] ইন্না আশাদদাস সাহাবাতি আলা উসমান ওয়া ইন্নামা আফসাদা উসমানা বিতানাতুন ইস্তাবতানাহা মিনাত তুলাকা। (তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৩/ ১১২৯)

[৩] দেখুন মিজানুল ইতিদাল: ১/ ৪০৮

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/ ৪৫০

[৫] আন আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা ক্বালা: রায়াইতু তালহাতা ইয়াউমাদ দারে ইউরামিহিম ওয়া আলাইহি ক্বাবাউন ফাকাশাফাতুর রিহ আনহু ফারাআইতু বায়াদাদ দিরয়ি মিন তাহতিল ক্বাবা। (তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৩/ ১১৬৯)

আমরা বলি যে, যদি এই বর্ণনাটি থেকেও থাকে তবে ওয়াকিদির দুর্বলতা স্পষ্ট। বরং হযরত তালহা (রা.)-এর ইমামতি করা যদি সহিহ সনদে প্রমাণিতও হয়ে যায়, তবুও তা বিদ্রোহের দলিল হতে পারে না। এই সময়ে হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণও মসজিদে নববীতে নামাজ পড়িয়েছেন। হযরত সাহল বিন হুнайফ (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে ইমামতির নির্দেশ দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে। [১] তাঁর পুত্র উমামা বিন সাহলের নামাজ পড়ানোর কথাও উল্লেখ আছে। [২] ইয়াহইয়া বিন আদম বলেন যে, সম্ভবত সেই দিনগুলোতে একের পর এক বিভিন্ন ব্যক্তি ইমামতি করতে থাকেন। [৩] একটি বর্ণনা অনুযায়ী ঈদুল আযহার নামাজ হযরত আলী (রা.) পড়িয়েছিলেন। [৪] সুতরাং স্পষ্ট যে, এই সকল ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁরই নির্দেশের পালনে নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তাই একে বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা হিসেবে গণ্য করা সম্পূর্ণ ভুল।

□□□

প্রশ্ন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বায় আছে যে, হযরত আলী (রা.) আশতার নাখরীর হাত ধরে তাকে হযরত তালহা (রা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং তাঁকে বলেন যে, এই লোকেরা আপনার কথা মানে, আপনি তাদের হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা থেকে বিরত রাখুন। এর উত্তরে হযরত তালহা (রা.) জবাব দেন যে, আমি এমন রক্তকে কীভাবে থামাতে পারি যা প্রবাহিত করা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন? [৫] এর দ্বারা কি হযরত তালহা (রা.)-এর নেতিবাচক ভূমিকা প্রমাণিত হয় না?

جواب: এই বর্ণনার সনদ দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি), কারণ এটি সাঈদ বিন আবি আরুবা কাতাদা বিন দাআমা থেকে বর্ণনা করেছেন। এই উভয় ব্যক্তি যদিও নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), কিন্তু কাতাদা বিন দাআমার জন্ম ৬০ হিজরিতে। [৬] তিনি এই বর্ণনাটি কোনো অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর নাম বাদ দিয়ে পেশ করেছেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে এই বর্ণনাটি দলিল হতে পারে না।

□□□

প্রশ্ন: তাবারিতে আছে যে, হযরত আলী (রা.) হযরত তালহা (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিরক্ষা এবং অবরোধকারীদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে কসম দিলে হযরত তালহা (রা.) বলেছিলেন: “আল্লাহর কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত নয় যতক্ষণ না বনু উমাইয়া হক আদায় করবে।” [৭]

এর দ্বারা স্পষ্ট যে তিনি ষড়যন্ত্রে শরিক ছিলেন, এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে সহিহ।

[১] তারিখুল মদিনা, উমর বিন শাব্বাহ: ৩/১৩১৮

[২] তারিখুল মদিনা, উমর বিন শাব্বাহ: ৩/১১১০; ফাতহুল বারী: ২/১৮৯

[৩] তারিখুল মদিনা, উমর বিন শাব্বাহ: ৩/১৩১৭

[৪] শারহু মাআনিল আসার, হা: ২৬২০, বাবু আকলি লুহমিল আদাহি

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৩৭৭১০, তাবা আর-রুশদ

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫/২৭০, তাবা আর-রিসালাহ

[৭] হাকিম বিন জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী তালহাকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে তুমি লোকদের উসমানের কাছ থেকে সরিয়ে দাও, তিনি বললেন, না আল্লাহর কসম, যতক্ষণ না বনু উমাইয়া নিজেদের পক্ষ থেকে হক আদায় করবে। (তারিখুত তাবারি: ৩/৩০৫ সহিহ সনদে)

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

উত্তর: এ থেকে কেবল এতটুকুই প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি কিছু সময়ের জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত ছিলেন না, এর দ্বারা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ প্রমাণিত হয় না। সম্ভবত সেই সময় তাঁর মনে কোনো ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল অথবা তিনি কোনো মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, তবে এই অবস্থা স্থায়ী ছিল না। অবরোধের পূর্বে হযরত উসমান (রা.)-এর জন্য তাঁর চিন্তিত হওয়া, সৈন্যদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া, অতঃপর হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর পাথর নিক্ষেপের পর বাড়িতে তাঁর কুশল সংবাদ নিতে যাওয়া প্রমাণিত।

সম্ভব হতে পারে যে, এরপর তিনি বিরোধীদের ছড়ানো কথায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে অবরোধ চলাকালীন তৃতীয় খলিফার সহায়তা থেকে বিরত থেকেছেন যেমনটি উল্লিখিত বর্ণনায় রয়েছে। হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে তাঁর রাজনৈতিক নীতিতে মতপার্থক্য থাকা অসম্ভব কিছু নয়। সম্ভবত মতামতের পর্যায়ে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়ার সাথে একমত ছিলেন না এবং অবরোধ চলাকালীন এই মতামতে তীব্রতা চলে আসে।

তবে এটিও প্রমাণিত যে, কিছু দিন পর এই ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যায় এবং তাঁর পুনরায় এই বিশ্বাস জন্মে যে, হযরত উসমান (রা.) উম্মতের হকে অত্যন্ত মুখলিস। এই বিষয়ে একটি বর্ণনা উল্লেখযোগ্য যার অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) উসামা বিন য়ায়েদ (রা.) এবং কিছু সাহাবায়ে কেরামকে বার্তা পাঠান: “আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আমানতদার এবং উত্তম সে-ই যে নিজের হাত গুটিয়ে রাখে, কিন্তু কিছু লোক আমার বাড়িতে জমা হয়েছে এবং নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে চায়। আমি তাদের রক্ত ঝরানো পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি হযরত আলী (রা.)-এর নিকট যান এবং তাঁকে বলুন যে মানুষের বিষয়টি এখন আপনার ওপর ন্যস্ত। আপনি এই বিষয়ে তা-ই করুন যা আল্লাহ তাআলা আপনার অন্তরে ঢেলে দেন। অতঃপর জুবাইর (রা.) এবং তালহা (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁদেরকেও এই কথা জানান।” এই ব্যক্তিবর্গ আমিরুল মুমিনিনের এই মতামত পছন্দ করেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর বাড়ির বাইরে মানুষের ভিড় ছিল এবং তিনি দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হতে পারেনি। অতঃপর এই ব্যক্তিবর্গ হযরত জুবাইর (রা.)-এর নিকট গেলেন। তিনি এই মতামত শুনে বললেন: “আমিরুল মুমিনিন ইনসাফের কথা বলেছেন।”

এখন এই ব্যক্তিবর্গ সাইয়েয়েদনা তালহা (রা.)-এর নিকট গেলেন। তিনি এটি শুনে কেঁদে ফেললেন। [১]

এরপর হযরত তালহা (রা.)-এর নিজের ছেলেকে পাহারার জন্য পাঠানো এবং নিজেও প্রতিরক্ষার জন্য পৌঁছানো প্রমাণিত। সমস্ত বর্ণনা সামনে রাখলে এতটুকুই প্রমাণিত হবে যে, শুরুতে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে দিয়েছেন, অতঃপর সম্ভবত ষড়যন্ত্রকারী মহলের অপপ্রচারের কারণে সন্দিহান হয়ে পড়েন, তাই অবরোধ প্রত্যাহারে অস্বীকার করতে থাকেন। অতঃপর যখন ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে গেল তখন অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী লজ্জিত হলেন, প্রতিরক্ষার জন্য গেলেন। এরপর তাঁর বেদনাদায়ক শাহাদাতে আফসোস করলেন এবং খুনিদের কেবল অভিশাপ ও তিরস্কারই করেননি বরং তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনও পরিচালনা করেন এবং তাতেই নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

[১] তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৩/১২০৪, ১২০৫।

হযরত উসমান (রা.) শেষ দিনগুলোতে এটিও বলতেন: “ولان يليها ابن ابي طالب احب الى من ان يلي غيره” অর্থাৎ “খিলাফত হযরত আলী (রা.)-এর পাওয়া আমার নিকট অন্য কারো খলিফা হওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।” (তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ৩/২০৬, আনিল আসমাঈ)

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন:

الذي كان منه في حق عثمان تمغفل وتألب فعله باجتهاد ثم تغير منه عند ما شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته.

“হযরত তালহা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে, তা ছিল অবহেলা ও সমালোচনা; তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে তা করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি উসমানের শাহাদাত প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তাঁর চিন্তাধারা বদলে গেল এবং তিনি তাঁকে (যথাযথভাবে) সাহায্য করতে না পারার কারণে লজ্জিত হলেন।” [১]

প্রশ্ন: হযরত তালহা রাযিআল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর হত্যার পর জঙ্গ জামালে নিজের শাহাদাতের পূর্বে কিছু কবিতা পড়েছিলেন... ‘ندمت ندامة’ (আমি কুসায়ি নামক ব্যক্তির মতো লজ্জিত হয়েছি), তারপর দুআ করেছিলেন: ‘اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى’ (হে আল্লাহ! আমার থেকে উসমানের বদলা নিয়ে নিন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান)। [২]

এই বর্ণনাটি শক্তিশালী সনদে প্রমাণিত, এর দ্বারা বোঝা যায় যে তিনি বিদ্রোহে শরিক ছিলেন বরং এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উত্তর: এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে হযরত তালহা রাযিআল্লাহু আনহু বিদ্রোহে শরিক ছিলেন বা বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। এই একই শব্দ এর চেয়েও শক্তিশালী সনদের সাথে হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু থেকেও প্রমাণিত। জঙ্গ জামালের সময় তিনিও এটাই বলছিলেন: ‘اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى’। [৩]

তাহলে কি এটা বোঝা যাবে যে হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-ও উসমানের শাহাদাতে শরিক ছিলেন?

প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রাণ বাঁচাতে না পারার অনুশোচনা প্রকাশ পাচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে এই ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহ বা হত্যাকাণ্ডে শরিক ছিলেন। অনুশোচনা ছিল এই কারণে যে হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-কে যেভাবে সাহায্য করা উচিত ছিল তা করা হয়নি, এত মুসলমানের উপস্থিতিতে তাঁকে হত্যা করা হলো, এ কারণে পরকালে যেন পাকড়াও না হতে হয়; হযরত আলী এবং হযরত তালহা রাযিআল্লাহু আনহুমা উভয়েই এই কারণে দুআ করেছিলেন যে আল্লাহ যে বদলা নিতে চান, তা যেন দুনিয়াতেই নিয়ে পবিত্র করে দেন।

তারিখুল খুলাফা এবং তারিখু দিমাশকের কিছু বর্ণনার ওপর আলোচনা:

প্রশ্ন: আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী রহ. তারিখুল খুলাফাতে হাফিজ ইবনে আসাকিরের বরাতে ইমাম যুহরীর একটি দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যাতে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর ওপর গুরুতর অভিযোগ আরোপ করেছেন এবং বলা হয়েছে যে তাঁর আত্মীয়স্বজন...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১/৩৫, ত. আর-রিসালাহ

[২] তারিখু খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ: ৩৩

[৩] মুস্তাদরাকে হাকিম, হা: ৩৫২৭, সহীহ সনদে, বাবু মা’রিফাতিস সাহাবা

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

এবং আমীরদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং তাদের জুলুম-অত্যাচার প্রতিরোধ না করা তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর কারণ হয়েছিল। এছাড়া হযরত আলী (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.)-এর পক্ষ থেকে ইনসাফের তাকিদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের ভুল পথে অটল থাকা আরও অবনতির কারণ হয়েছিল। এই দাবিও করা হয় যে, মারওয়ান মিশরীয় প্রতিনিধি দলকে হত্যা করার জন্য চিঠির মাধ্যমে যে ষড়যন্ত্র করেছিল, যা ধরা পড়ে গিয়েছিল, তখন মিশরীয় কাফেলা মারওয়ানকে হস্তান্তরের দাবি জানায় কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বাধা হয়ে দাঁড়ান। এই রেওয়ায়েতে এমনকি এও উল্লেখ আছে:

“মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে এমন কেউ বাকি ছিল না যে উসমানের ওপর রাগান্বিত ছিল না এবং এটি তাদের ক্ষোভ ও রাগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল যারা ইবনে মাসউদ, আবু যর এবং আন্মার বিন ইয়াসিরের কারণে রাগান্বিত ছিল।”

মদীনার কোনো ব্যক্তি এমন ছিল না যে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর রাগান্বিত ছিল না, এবং ইবনে মাসউদ (রা.), আবু যর (রা.) ও আন্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর সাথে (হযরত উসমান রা.-এর) দুর্ব্যবহারের কারণে এই অসন্তুষ্টি আরও বেড়ে গিয়েছিল।

এই রেওয়ায়েতে এই ব্যাখ্যাও রয়েছে যে, হত্যাকারীদের স্বয়ং মুহাম্মদ বিন আবু বকর পেছনের দেয়াল টপকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন। এই রেওয়ায়েতের মর্যাদা কী? [১]

উত্তর: এই রেওয়ায়েতটি ভাসাভাসা দৃষ্টিতেও সন্দেহজনক, আর যখন গবেষণা করা হয় তখন এর বাতিল হওয়া একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। সন্দেহজনক হওয়ার প্রথম কারণ হলো রেওয়ায়েতটির অস্বাভাবিক দীর্ঘতা। একটি মাত্র রেওয়ায়েত তিন-চার পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত। সনদসহ ঘটনাবলী বর্ণনা কারী প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ যেমন ইবনে সাদ, তাবারী এবং বালাযুরী প্রমুখের সংকলনগুলো দেখলে এত দীর্ঘ রেওয়ায়েত খুব কমই পাওয়া যাবে। সাধারণত এ ধরনের দীর্ঘ রেওয়ায়েতগুলো যৌগিক সনদের (مركب اسناد) হতো, অর্থাৎ বর্ণনাকারী অনেক বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে একত্রিত করে একটি ধারাবাহিক ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিন্তু এখানে সনদও যৌগিক নয়।

সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ হলো সনদের সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-এর ওপর শেষ হওয়া। সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-এর রেওয়ায়েত প্রচুর রয়েছে কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র ছিল ফিকহ ও হাদীস, তাই তাঁর বর্ণিত বিষয়গুলোও সুন্নাহ ও আহকাম সংক্রান্ত। সংবাদ ও ঘটনাবলীর বর্ণনা তাঁর থেকে বর্ণিত নয়। এমন ব্যক্তির থেকে যদি কখনো কদাচিৎ কোনো ঘটনা বর্ণিতও হয়, তবে তা সংক্ষিপ্ত হবে, মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ নয়।

তর্কের খাতিরে যদি এত বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ শাহাদাতে উসমানের মতো সংবেদনশীল ঘটনাকে এভাবে খুঁটিনাটিসহ বিস্তারিত বর্ণনা করতেন, তবে এই রেওয়ায়েতের প্রসিদ্ধি হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো মুহাদ্দিস তো দূরের কথা, কোনো ঐতিহাসিকও একে নিজের কিতাবে উদ্ধৃত করেননি; এমনকি ওয়াকিদী এবং আবু মিখনাফের মতো ভালো-মন্দ সব ধরনের বর্ণনা পেশকারীরাও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেননি।

শতাব্দীকাল ধরে আলেমদের একে উপেক্ষা করা প্রমাণ করে যে, এটি নিছক একটি বানোয়াট রেওয়ায়েত যা সম্ভবত হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছে। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে কিছু অসতর্ক বর্ণনাকারী একে মৌখিকভাবে বর্ণনা করা শুরু করেন এবং ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ.) যখন ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকলন জমা করতে শুরু করেন, তখন এই জাল রেওয়ায়েতটি তাতে স্থান পেয়ে যায়। যেসব ব্যক্তিবর্গের ‘তারিখে দামেশক’-এ আল্লামা ইবনে আসাকিরের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তারা এতে অবাক হবেন না।

[১] দ্রষ্টব্য: তারিখে দামেশক: ৩৯/৩১৫ থেকে ৩১৯; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১২৩ থেকে ১২৬, ত নয়র।

হওয়া উচিত; কারণ আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ.)-এর মানহাজ ছিল এই যে, সনদের দুর্বলতা এমনকি জাল হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা না করেই সনদের মাধ্যমে যা কিছু বর্ণিত পাওয়া যেত, তিনি তা উদ্ধৃত করে নিতেন। তবে এতে বিস্ময় অবশ্যই জাগে যে, আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) ‘তারীখুল খুলাফা’-এর মতো সংক্ষিপ্ত সংকলনে এটি উদ্ধৃত করার সময় সনদের মানদণ্ডের দিকে কেন লক্ষ্য রাখেননি। আল্লাহ তাঁর এই বিচ্যুতি ক্ষমা করুন।

পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ আল্লামা সুয়ুতী (রহ.)-এর ওপর আস্তা রেখে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। এভাবে এই বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। অথচ এই বর্ণনাটি সনদ এবং মতন উভয় দিক থেকেই অন্ততপক্ষে প্রশ্নবিদ্ধ তো অবশ্যই ছিল।

এখন আপনি বর্ণনার সনদের দিকে লক্ষ্য করুন।

আবু বকর ওয়াজিহ বিন তাহির আবু হামিদ বিন হাসান মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হামদুন আহমদ বিন মুহাম্মদ হাসান মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আয-যুহলী হিশাম বিন আম্মার মুহাম্মদ বিন ঈসা আল-কাসিম বিন সামী দামেশকী মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি যিব মুহাম্মদ বিন শিহাব আয-যুহরী সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব।

এই সনদে মুহাম্মদ বিন ঈসা আল-কাসিম বিন সামী (মৃত্যু ২০৪ হিজরি) থেকে যদিও ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি কিছুটা দুর্বল রাবী এবং মুদাল্লিসও। [১]

এখানে তিনি এই তাদলীস করেছেন যে, এই বর্ণনাটি মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি যিব-এর মতো নির্ভরযোগ্য রাবীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন, অথচ তিনি নিজে তাঁর থেকে এটি শোনেননি। এই বিষয়টি খোদ মুহাম্মদ বিন ঈসার ছেলেই স্পষ্ট করেছেন এবং বলেছেন:

[২] لم يسمع أبى حديث مقتل عثمان من ابن أبى ذئب، انما هو فى كتاب أبى عن قاص

(আমার পিতা উসমানের শাহাদাতের বর্ণনা ইবনে আবি যিব থেকে শোনেননি, বরং এটি তাঁর কিতাবে কোনো এক গল্পকারের থেকে বর্ণিত হয়েছে।)

আবার এই সনদেই ‘আহমদ বিন মুহাম্মদ হাসান (আস-সাকানী) মৃত্যু ৩০৪ হিজরি’ও দুর্বল, যেসব ব্যক্তিবর্গ তাঁকে অনেক ছাড় দিয়েছেন তাঁরা তাঁকে ‘লায়িন’ বলেছেন। [৩] পক্ষান্তরে আবু শাইখ আসফাহানী ‘তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন’-এ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন:

[৪] يحدث بالبواطيل فتركوا عنه

(তিনি বাতিল বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করতেন, তাই মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা বর্জন করেছেন।)

এই বর্ণনার কিছু অংশ উমর বিন শাব্বাহ-ও উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু শেষে বলে দিয়েছেন যে, এই বর্ণনাটি বিভ্রান্তিতে ভরপুর। [৫]

[১] তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, ইবনে হাজার আসকালানী, পৃষ্ঠা ৫১, ত: আল-মানার।

[২] আল-কামিল ফি দুয়াফাউর রিজাল, ৭/৩৮৮।

[৩] তারীখুল ইসলাম, আয-যাহাবী, ২৩/১৩৫, ত: তাদমুরী।

[৪] তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসফাহান ওয়াল ওয়ারিদীন আলাইহা, আবু শাইখ আল-আসফাহানী (মৃত্যু ৩৬৯ হিজরি), ৩/১০১, ত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ।

[৫] হাজা হাদীসুন কাসীরুত তাখলীত মুনকারুল ইসনাদ লা ইউ’রাফু সাহিবুহ আল্লাযী রাওয়াহু আন ইবনি আবি যিব। (তারীখুল মদীন, ইবনে শাব্বাহ, ৩/১২০৪)।

মূল পাঠের অসঙ্গতি এখান থেকে স্পষ্ট যে, এটি অন্যান্য সহীহ, হাসান এবং তুলনামূলক কম যঈফ বর্ণনার সমষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক, যাতে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণগুলো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরামকে হযরত উসমান (রা.)-এর অনুগত ও অনুসারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোতে এটিও স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ বিন আবু বকর হত্যাকারীদের ঘরে নিয়ে আসেননি, বরং তিনি অনুতপ্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। একইভাবে হত্যাকারীরা দেয়াল টপকে নয়, বরং খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

□□□

তারিখে দামেশকের আরেকটি বর্ণনার জবাব:

(প্রশ্ন) ইবনে আসাকির ইয়াজিদ বিন হাবিবের সূত্রে আরেকটি দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে অন্যান্য অভিযোগের সমর্থনের পাশাপাশি এটিও জানা যায় যে, বিদ্রোহীদের দলগুলোকে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) গোপন বৈঠকের মাধ্যমে নির্দেশনা দিতেন। [১] এর জবাব কী?

(উত্তর) এর সনদে ইবনে লাহিয়াহ রয়েছে, যার দুর্বলতা সবার কাছে স্পষ্ট। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন: তাঁর থেকে প্রচুর মুনকার বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি যঈফ রাবীদের বর্ণনার সাথে তাদলীস করতেন, যা তাদলীসের নিকৃষ্টতম প্রকার। [২] তাছাড়া এই বর্ণনার মূল পাঠ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সমষ্টির পরিপন্থী। তাই এই বর্ণনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

□□□

ফিতনার বীজ কি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বপন করেছিলেন?

(প্রশ্ন) এটি কি প্রমাণিত যে, হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) অগ্রণী ছিলেন এবং বিদ্রোহ উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) সবচেয়ে বেশি জড়িত ছিলেন? হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ছিল এই যে, হযরত উসমান (রা.) তাঁকে মিসরের শাসনভার থেকে অপসারিত করেছিলেন, তাই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) অসন্তুষ্ট ছিলেন; এই কারণেই তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর বোনকে তালাক দিয়েছিলেন।

তিনটি বর্ণনার মাধ্যমে এই ঘটনাগুলো প্রমাণিত:

প্রথম বর্ণনা (সারসংক্ষেপ)..... যখন প্রথমবার বিদ্রোহীরা মদিনা মুনাওয়ারায় আসে, তখন হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদের পাঠিয়ে তাদের অভিযোগ দূর করার এবং সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা চলে যাওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) মারওয়ানের প্ররোচনায় পড়ে মসজিদে মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলেন যে, মিসর থেকে আগত লোকদের কাছে আমার সম্পর্কে ভুল অভিযোগ পৌঁছেছে। এটি শুনে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি ধ্বংসাত্মক গুনাহ করেছেন এবং...

[১] দ্রষ্টব্য, তারিখে দামেশক: ৩৯/৪২৫

[২] তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, পৃ. ৫৩, তবা আল-মানার

আমরাও আপনার সাথে शामिल আছি। এখন আপনিও তওবা করুন, আমরাও তওবা করব।

হযরত উসমান (রা.) বললেন: “যখন থেকে আমি তোমাদের বরখাস্ত করেছি, তোমাদের উকুন কামড়াচ্ছে।”

অন্য কেউ আওয়াজ দিল: “আপনি তওবা করুন।”

হযরত উসমান (রা.) কিবলার দিকে মুখ করে তওবা করলেন। এরপর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ফিলিস্তিনে চলে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকলেন। [১]

দ্বিতীয় বর্ণনা (সারসংক্ষেপ): ...আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-কে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করলেন... তারপর হাজীদের সাথে পথে দেখা করলেন, তাদের হযরত উসমান (রা.)-এর কর্মকাণ্ড শুনিয়ে উত্তেজিত করলেন। যখন হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধ করা হলো, তখন তিনি ফিলিস্তিনে চলে গেলেন, সেখানে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার খবরের অপেক্ষায় ছিলেন। একদিন বলছিলেন: “এখনও পর্যন্ত উসমানের ব্যাপারে কোনো খবর আসেনি...” ইতিমধ্যে এক আরোহী এসে খবর দিল যে উসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন। তখন আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন: “আমি যখন কোনো ক্ষত খুঁড়ি, তখন তাকে ফেড়েই ছাড়ি। আমি উসমানের বিরুদ্ধে সবাইকে উস্কানি দিতে থাকতাম, এমনকি পাহাড়ের চূড়ায় বকরির রাখালদের পর্যন্ত উস্কানি দিয়েছি।”

নিজের বরখাস্তের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর বোনকে তালাক দিয়েছিলেন। [২]

তৃতীয় বর্ণনা: আমর ইবনুল আস (রা.)-কে যখন হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন: “আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি ওয়াদি-এ-সিবা-তে থাকাবস্থায় উসমানকে হত্যা করেছি।” তারপর বললেন: “যদি এখন খিলাফত আলী (রা.)-এর কাছে যায় এবং তিনি হক দেখে তা বহাল রাখেন, তবে তিনি আমার কাছে খিলাফতের ওয়ালি হওয়ার জন্য সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি হবেন।”

তারপর যখন আমর ইবনুল আস (রা.) জানতে পারলেন যে আলী (রা.) খলিফা হয়েছেন, তখন তিনি খুব চিন্তিত হলেন। তারপর জানতে পারলেন যে মুয়াবিয়া (রা.) শামে আলী (রা.)-এর বায়আত করতে অস্বীকার করেছেন, তখন তিনি শামে যাওয়ার জন্য নিজের ছেলেদের সাথে পরামর্শ করলেন: আবদুল্লাহ এবং মুহাম্মদ। আবদুল্লাহ তাকে নির্জনবাসের পরামর্শ দিলেন কিন্তু মুহাম্মদ তাকে রাজনৈতিক ময়দানে নামার কথা বললেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন: আবদুল্লাহ এমন পরামর্শ দিয়েছে যা দুনিয়াতে ক্ষতি করবে এবং আখেরাতে কাজে আসবে। আর মুহাম্মদ এমন পরামর্শ দিয়েছে যা দুনিয়া বানাবে কিন্তু আখেরাত নষ্ট করবে। এরপর তিনি শামে গিয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে शामिल হলেন। [৩]

এই বর্ণনাগুলো পড়ে মানুষ অবাক হয়ে যায় যে সে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করবে। কোনো সাহাবী কি এমন হতে পারেন? আমর ইবনুল আস (রা.) কি সত্যিই মাল ও পদের জন্য জেনে-বুঝে নিজের আখেরাত ধ্বংস করার পথে চলেছিলেন?

[১] তারিখ আল-তবারী: ৩/৩৫৯, ৩৬০

[২] তারিখ আল-তবারী: ৩/৩৫৭

[৩] তারিখ আল-তবারী: ৫/৬০১

জবাব: এই সমস্ত সংশয় উল্লিখিত তিনটি বর্ণনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তিনটিই ভিত্তিহীন এবং ইলমি ও গবেষণামূলক মানদণ্ডে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়:

প্রথম কথা হলো, তিনটি বর্ণনাই ওয়াকিদির। সনদের দিক থেকে এগুলো অগ্রহণযোগ্য। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ওয়াকিদি বা তার প্রতিবেশী বর্ণনাকারী মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করে আবদুল্লাহ বিন সাবার অপকর্মগুলো আমার ইবনুল আস (রা.)-এর ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছে। উসমান (রা.)-এর শাহাদাত, জঙ্গ জামাল, সিফফিন এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতবিরোধের বিষয়ে ওয়াকিদির বর্ণনাগুলো অত্যন্ত দুর্বল ও স্বরচিত উপাদানে ভরপুর; এ ধরনের উপাদানকে বিন্দুমাত্র নির্ভরযোগ্য মনে করা উচিত নয়। ইমাম নাসায়ি (রহ.) বলেন, “সে হাদিস জাল করার জন্য প্রসিদ্ধ।” [১]

দ্বিতীয় কথা হলো, ওয়াকিদি ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাকারী এই অবস্থান গ্রহণ করেননি। অন্য কোনো বর্ণনা, তা দুর্বল হলেও, এসব বিষয়ে ওয়াকিদিকে সমর্থন করে না। যদি এই বিষয়গুলো সত্য হতো, তবে সেই যুগের অন্যান্য বর্ণনাকারীরা কেন তা জানতে পারলেন না?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, ওয়াকিদির এই বর্ণনাগুলো অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনার বিপরীত। ওয়াকিদির বর্ণনাগুলো বলছে যে, অবরোধে উস্কানিদাতা ছিলেন হযরত আমার ইবনুল আস (রা.) এবং উস্কানির কাজটি তিনি আশেপাশের বন ও গ্রামগুলোতে করেছিলেন। অর্থাৎ আক্রমণকারীরা ছিল হিজাজের রাখাল ও গাঁয়ে লোক। অথচ সহিহ বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মিসর ও কুফার দুষ্কৃতকারীরা মদিনায় প্রবেশ করে হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করেছিল। হাসান এবং কম দুর্বল বর্ণনা অনুযায়ী, এই দুষ্কৃতকারীদের আবদুল্লাহ বিন সাবা তৈরি করেছিল। এই বর্ণনাগুলোর উপস্থিতিতে ওয়াকিদির উল্লিখিত বর্ণনাগুলো গালগল্পের চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে না।

ওয়াকিদির বর্ণনাগুলো এও বলছে যে, আমার ইবনুল আস (রা.) নিজের পদচ্যুতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে এই ফিতনা ছড়িয়েছিলেন, অথচ হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক কাউকে পদ থেকে অপসারণ করা এমন কোনো কারণ হতে পারে না যার ফলে কোনো সাহাবি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত হতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগ থেকেই সিনিয়র সাহাবায়ে কেরামের পদচ্যুতি ও নিয়োগের ধারা অব্যাহত ছিল। হযরত আমার ইবনুল আস (রা.)-ও এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অবসরপ্রাপ্ত বা বদলি হয়েছিলেন। তিনি সামরিক শৃঙ্খলার অনুসারী মানুষ ছিলেন। সর্বদা নেতাদের ইশারায় চলতেন। যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাকে রাজস্বের আরামদায়ক পদ থেকে সরিয়ে সামরিক নেতৃত্বের ঝুঁকিপূর্ণ পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন, তখন হযরত আমার ইবনুল আস (রা.) নিজের মেজাজ ও প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ এভাবে করেছিলেন: “আমি ইসলামের তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর, আপনি যেখানে খুশি নিক্ষেপ করুন।” [২]

[১] ইমাম নাসায়ি বলেন: “ওয়াকিদির কিতাবগুলো মিথ্যায় পরিপূর্ণ।” ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাকে কাজ্জাব বলতেন। ইমাম বুখারি বলেন: “আমরা ওয়াকিদি থেকে একটি অক্ষরও গ্রহণ করিনি।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/ ৪৬৩, ত. আর-রিসালাহ, জীবনী: মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি)। ওয়াকিদির বর্ণনাগুলোর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে আমরা এই অংশের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[২] আমি ইসলামের তীরসমূহের একটি তীর, আর আপনি আল্লাহর পরে তা নিক্ষেপকারী এবং তা সংগ্রহকারী। সুতরাং আপনি দেখুন কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে ভয়ংকর এবং সবচেয়ে উত্তম, অতঃপর আমাকে সেখানে নিক্ষেপ করুন। (তারিখে দামেশক: ২/ ৭২, জীবনী: আবু বকর আস-সিদ্দিক; তারিখে তাবারী: ৩/ ৩৭৯, রেওয়ায়েত: সাইফ আন আবু ইসহাক)।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

সাহাবায়ে কেরামের মেজাজ এমনই ছিল যে, খলিফা যেখানে চাইতেন তাদের নিয়োগ করতেন এবং যেখান থেকে চাইতেন সরিয়ে দিতেন। এই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতারই ফল ছিল যে, মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কেরাম কায়সার ও কিসরার বিশাল সাম্রাজ্যকে মাত্র কয়েক বছরেই জয় করে নিয়েছিলেন। যদি এই মহান ব্যক্তিগণ (নাউযুবিল্লাহ) এমন একগুঁয়ে ও স্বার্থপর হতেন যে, সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগ ও বরখাস্তের আদেশে তারা ক্ষুব্ধ হতেন, তবে প্রশ্নই আসত না যে ইসলাম এভাবে চোখের পলকে বিশ্বের তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ সাক্ষী যে, হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর মতো সেনাপতিকে বরখাস্ত করেছিলেন, হযরত উসমান (রা.) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) এবং হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর মতো ব্যক্তিদের তাদের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিকল্প ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছিলেন। এটা সম্ভব যে এতে তাদের কিছুটা কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু কেউ কখনও টু শব্দটিও করেনি। তবে সাহাবায়ে কেরামের মতো একটি সুশৃঙ্খল ও সফল জামাতের চরিত্র থেকে এটা অনেক দূরে যে, তারা এই সামান্য বিষয়গুলোর জন্য তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর প্রতি এই দাবি আরোপ করা যে তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে বলেছিলেন: “আপনি ধ্বংসাত্মক গুনাহ করেছেন এবং আমরাও আপনার সাথে তাতে শরিক আছি... আপনিও তওবা করুন, আমরাও তওবা করব।” এটি একটি হাস্যকর উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়... কারণ হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আরোপিত সমস্ত অভিযোগই ছিল মিথ্যা এবং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে আমিরুল মুমিনীনের জোরালো প্রতিরক্ষা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত... প্রতিরক্ষা দানকারীদের মধ্যে স্বয়ং হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এটাও সাব্যস্ত যে, বিদ্রোহীরা এই উত্তরগুলোতে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গিয়েছিল... এর পরে হযরত উসমান (রা.)-কে লজ্জিত করার কী অবকাশ থাকতে পারে?... বিশেষ করে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতো ব্যক্তি, যাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ছিল দৃষ্টান্তমূলক, তিনি কেন এমন ভিত্তিহীন কথা বলে নিজেকেও গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য করে নিজের অবমাননা করাবেন?

এই বিষয়টি বিস্ময়কর যে, ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরীয় প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তনের পর হযরত উসমান (রা.)-কে লজ্জিত করেছিলেন, তওবা করিয়েছিলেন, তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মেষপালকদের পর্যন্ত উস্কানি দিয়েছিলেন এবং তারপর ফিলিস্তিনে চলে গিয়েছিলেন এবং এই উস্কানির ফলাফল দেখার অপেক্ষায় ছিলেন।

এই সমস্ত কথা বৈপরীত্য এবং অসম্ভবতার সমষ্টি; কারণ যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে লজ্জিত করে তওবা করিয়েছিলেন, তবে আবার হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর কী প্রয়োজন ছিল? যদি বলা হয় যে (নাউযুবিল্লাহ) হযরত উসমান (রা.)-এর তওবা ছিল একটি প্রতারণা, তবে কি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর তাঁর তওবার ওপর বিশ্বাস ছিল না? সুতরাং এর পরেও যদি তিনি নিজের জেদ ও শত্রুতার কারণে গোপন আন্দোলন চালিয়ে যেতেন, তবে প্রশ্ন উঠবে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কীভাবে এত বড় গোপন আন্দোলন চালালেন? মিশরীয় প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তন ছিল ৩৫ হিজরীর রজব মাসে এবং নিয়মিত বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে। এত অল্প সময়ে বিভিন্ন শহর, জনপদ, জঙ্গল এবং পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মানুষের মন পরিবর্তন করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? সেই যুগে কি প্রচার মাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এত দ্রুতগামী ছিল?

এত অল্প সময়ের মধ্যে জাতির লোকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা, প্রত্যেকের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সবার মন পরিবর্তন করে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। এমন অলৌকিক ঘটনা তো আজও অসম্ভব; মাস এমনকি বছরের পর বছর মানসিক গঠন, সদস্য গঠন এবং নিজের ইশতেহারের দাওয়াতের পর এই পর্যায় আসে।

এটাও আশ্চর্যের বিষয় যে ওয়াক্ফিদীর মতে, আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই নিজের মুখে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শহীদ হওয়ার পর এই দাবি করেছেন যে, “এই ক্ষত বিদীর্ণকারী আমিই, এই সব আমারই করা।”

চিন্তা করে দেখুন, হযরত আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের মূল হোতা (মাস্টারমাইন্ড) হতেন, তবে কি তিনি যথাসম্ভব নিজেকে গোপন রাখতেন না? মাস্টারমাইন্ডরা কি এতই বোকা হয়ে থাকেন যে তাদের ষড়যন্ত্রের রহস্য এত সহজে ফাঁস করে দেবেন?

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতে হযরত আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শোক প্রকাশ এবং শোকগাথা পাঠ করা অন্যান্য বর্ণনায় বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শব্দগুলো ছিল:

تَكُونُ حَرْبٌ، مَنْ حَكَ فِيهَا قُرْحَةً نَكَأَهَا.

“যুদ্ধ হয়েই ছাড়বে, যে ক্ষত খুঁচিয়েছে, সে তা বিদীর্ণ করেই ছাড়বে।” [১]

এর অর্থ ছিল এই যে, যেসব ষড়যন্ত্রকারী ফিতনা শুরু করেছে তারা সামনে মুসলমানদের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধও বাঁধিয়ে ছাড়বে। এই শব্দগুলোকে কোনো বর্ণনাকারী উদ্দেশ্যমূলকভাবে উল্টে-পাল্টে বিকৃত করে এভাবে করে দিয়েছে:

إِذَا حَكَّكَتُ قُرْحَةً نَكَأْتُهَا.

“যখন আমি কোনো ক্ষত খুঁচিয়ে দিই, তখন তা বিদীর্ণ করেই ছাড়ি।” [২]

এভাবে পুরো বর্ণনায় বিকৃতি ঘটিয়ে এই মহান সাহাবীর চরিত্রকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কোনো বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন সাবার চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য এই কাহিনীগুলো বানিয়েছে বা নকল করেছে।

হযরত আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রে সামান্যতম অংশগ্রহণও করতেন, তবে তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেওয়ার অভিযানে অগ্রণী হতেন না। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে নিজের বিশেষ উপদেষ্টা বানাতেন না।

যদি কেউ বলে যে হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না বরং তারা কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে একে অপরের সাথে আঁতাত করেছিলেন, তখনও একটি বড় প্রশ্ন থেকে যাবে তা হলো, যদি হযরত আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হত্যার ষড়যন্ত্রে শরিক হতেন তবে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অবশ্যই বলতেন যে উসমানের হত্যাকারীরা...

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৫

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/৪৭, ৩৫

তাঁর প্রধান হোতা আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আছে, প্রথমে তাঁর থেকে প্রতিশোধ নিন? কারণ হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর শ্লোগান তো যা-ই হোক হযরত আলী (রা.)-এর মোকাবিলায় ক্বাতিলিনে উসমান থেকে কিসাস গ্রহণ করাই ছিল। হযরত আলী (রা.) এই বিষয়ে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কেও কখনো কোনো দোষারোপ করেননি যা প্রমাণ করে যে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর নিকটও উসমান হত্যার দায় থেকে মুক্ত ছিলেন।

আমর বিন আল-হামিক (রা.) কি হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কি না?

প্রশ্ন: সাধারণত বলা হয় যে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর ঘাতকসুলভ আক্রমণকারীদের মধ্যে আমর বিন আল-হামিক (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই কথাটি কি সঠিক?

উত্তর: এটি সম্পূর্ণ ভুল। আমর বিন আল-হামিক (রা.) একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। আসমাউর রিজাল এবং তাবাকাতের সমস্ত কিতাবে তাঁকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নবী করীম (সা.) তাঁকে তাঁর যৌবনকালে বরকতের দোয়া দিয়েছিলেন যার কারণে আশি বছর বয়সেও তাঁর সমস্ত চুল কালো ছিল। [১]

হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে কিছু বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে, যেমন “মুসনাদে বাজ্জার”-এ তাঁর থেকে নবীজীর বাণী বর্ণিত হয়েছে: “যে ব্যক্তি কাউকে আশ্রয় দিয়ে পুনরায় তাকে হত্যা করল, সে কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা বহন করবে।” [২]

তাঁর হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা নিছক একটি উপকথা, এই বিষয়ে শুধুমাত্র একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যা ওয়াকিদীর। এই বর্ণনাটি পড়ুন যে এতে কোনো মানুষের কাজ দেখানো হয়েছে নাকি পশুর!! এতে বলা হয়েছে যে আমর বিন আল-হামিক (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর বুকের ওপর চড়ে বসেন যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, বর্শা দিয়ে নয়টি আঘাত করেন এবং বলেন: “তিনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং ছয়টি নিজের অন্তর ঠান্ডা করার জন্য।” [৩]

এই অধঃপতিত যুগেও কোনো মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে এটি কল্পনা করতে পারে না যে সে একজন আহত, ছটফট করা এবং মুমূর্ষু বিরশি বছর বয়সী বৃদ্ধকে এভাবে নির্বিচারে কেটে ফেলবে। সাহাবীদের থেকে কি এটি আশা করা যেতে পারে?? পরবর্তীকালের যারা এই বর্ণনাটি নকল করেছেন তারা হয় ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন অথবা সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন যার পরিষ্কার অর্থ এটাই যে ওয়াকিদী থেকে নকল করা হয়েছে, ওয়াকিদীর দুর্বলতা সুস্পষ্ট। এমন বর্ণনা থেকে কোনো সাহাবীর বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা নীতিগতভাবে ভুল। আমর বিন আল-হামিক (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছিলেন। যদি তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতেন তবে হযরত আলী (রা.) তাঁকে কেন নিজের সঙ্গী বানাতেন?

[১] মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুয়াইম: ২০০৬/৪

[২] আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮২৮৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: ২৬৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২১৯৬৬

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩৯৪/৪

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

হযরত আলী তো হযরত যুবাইর-এর হত্যাকারীকেও জাহান্নামী বলেছিলেন। হযরত উসমান-এর মর্যাদা নিশ্চিতভাবেই হযরত যুবাইর-এর চেয়ে বেশি ছিল, তাঁর হত্যাকারীরা হযরত আলী-এর প্রিয়পাত্র কীভাবে হতে পারতেন? জানা গেল যে আমার বিন আল-হামিক হযরত উসমান-এর রক্ত থেকে মুক্ত।

আবদুর রহমান বিন উদাইস কি হত্যা বা বিদ্রোহে শরিক ছিলেন?

প্রশ্ন: আবদুর রহমান বিন উদাইস আল-বালভীও একজন সাহাবী। তাঁর থেকে এক-দুটি হাদিসও বর্ণিত আছে। কিছু আলেম তাঁকে বাইয়াতে রিদওয়ানে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি মিশর থেকে আসা বিদ্রোহী কাফেলার প্রধান ছিলেন এবং হযরত উসমান-এর অবরোধ ও হত্যায় শরিক ছিলেন। এটা কি সঠিক?

উত্তর: এ বিষয়ে বর্ণনাগুলোতে যা কিছু উল্লেখ আছে, তার সবই দুর্বল উপাদান। ফিতনায় আবদুর রহমান বিন উদাইস-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বর্ণনার বড় অংশ ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ বিন সাদসহ হিজরি তৃতীয় শতাব্দী এবং পরবর্তী অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ এই উপাদান ওয়াকিদী থেকেই নিয়েছেন।

হ্যাঁ! অন্য একজন বর্ণনাকারী সাইফ বিন উমরও তাঁদের বিদ্রোহী জামাতে শরিক বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনিও দুর্বল। গবেষকগণ হযরত উসমান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এই ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকে সন্দেহের শব্দ (ক্বীল) সহ উল্লেখ করে বলেছেন: “নিসবাহ বা’দুল মুতাআখখিরীন...” তাঁদের দিকে এই বিষয়টি পরবর্তীগণ সম্পৃক্ত করেছেন। [১]

কিছু মুহাদ্দিস তাঁদের বিদ্রোহী জামাতে শরিক হওয়ার বিষয়ে বিশ্বাস করে তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা জায়েজ মনে করতেন না। جناح মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আয-যুহলী বলতেন:

“আবদুর রহমান বিন উদাইস ফিতনার মূল হোতা ছিল, তাই তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা হালাল নয়।” [২]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো সহীহ বর্ণনা দ্বারা এই দুই ব্যক্তির হত্যা তো দূরের কথা, বরং ফাসাদে অংশগ্রহণও প্রমাণিত হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: ফিতনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে কোনো সাহাবীর ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) ক্ষুণ্ণ হতে পারে না:

যদি কিছু সাহাবীর হযরত উসমান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শরিক হওয়া কোনো সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েও যায়, তবুও এর দ্বারা সেই ব্যক্তিদের ন্যায়পরায়ণতা ক্ষুণ্ণ হয় না; কারণ এত বড় ফিতনায় মানবিক দুর্বলতার কারণে তাঁরাও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে পারতেন। ইসলামের আলেমগণ সাহাবীদের নিষ্পাপ হওয়ার প্রবক্তা নন। কিছু সাহাবী থেকে অবশ্যই ভুল সংঘটিত হয়েছে। কিছু সাহাবী থেকে...

[১] মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুয়াইম আল-আসফাহানি: ১৮৫২/৪

[২] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল-বায়হাকী: ৩৯৩/৬, ত. দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ

কিছু গুনাহ সংঘটিত হওয়াও প্রমাণিত।

আমরা নিশ্চিতভাবে এই বিষয়ে আদিষ্ট নই যে, কেবল ভক্তির কারণে তাদের কোনো প্রমাণিত ভুলের প্রতিবাদ করব। আর এই কারণেই আমরা হুদু ও কিসাস সংক্রান্ত সেই সहीহ হাদীসগুলোকে অবশ্যই বিশ্বাস করি, যেগুলোতে কিছু সাহাবীর অপরাধের উল্লেখ রয়েছে, যার কারণে তাদের ওপর হদ কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারাও এই মহান ব্যক্তিদের ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) ক্ষুণ্ণ হয় না। শরয়ী শাস্তি কার্যকর হওয়া এবং ইসলামের জন্য তাদের সেবা ও নেক আমলসমূহ প্রতিটি ভুলের কাফফারা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ধর্মীয়ভাবেও আমরা তাদের নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ভুলের পর তওবা ও ইস্তিগফারে তারা অগ্রগামী ছিলেন। উসমান (রা.)-এর শাহাদাত এবং জঙ্গ জামাল ও সিফফিনের মতো ফিতনার কবলে পড়া সমস্ত নেককার ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা এই ধারণা পোষণ করতে আদিষ্ট যে, তারা যা কিছু করেছেন তা ভুল বোঝাবুঝির কারণে কিন্তু নেক নিয়তে করেছেন। অতঃপর ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতির কারণে বিচার বিভাগীয়ভাবে তাদের ওপর কোনো শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব ছিল না, যেমনটি সাহাবী ও তাবয়ীদের ইজমা (ঐক্যমত) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [১]

কুরআন ও হাদীসের নস (দলিল)-সমূহে সাহাবীয়াতের মর্যাদা লাভকারীদের জন্য ক্ষমা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি প্রমাণিত রয়েছে, তাই এই মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা কল্যাণকর কথা বলা ছাড়া অন্য কিছু বলার পক্ষপাতী নই।

□□□

মুহাম্মদ বিন আবি বকর এবং মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে কেন ছিলেন?

(প্রশ্ন) হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অগ্রগামী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে সাহাবীদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ বিন আবি বকর এবং মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের অভিযোগ কী ছিল এবং মুহাম্মদ বিন আবি বকর কি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শরিক ছিলেন কি না?

(উত্তর) এই বিষয়ের হাকিকত হলো, মুহাম্মদ বিন আবি বকর ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর পুত্র। তিনি বিদায় হজের সময় হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ ছিল সেই ভুল বোঝাবুঝিগুলো যা সাবায়ী গোষ্ঠী ছড়িয়ে দিয়েছিল, তিনি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এর পাশাপাশি একটি কারণ এটিও ছিল যে, প্রথম খলিফার পুত্র হওয়ার সুবাদে তার মধ্যে শাসনকার্যে অংশীদারিত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা বিদ্রোহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পূরণ হতে পারত।

এছাড়া হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর তার রাগের আরও একটি কারণ ছিল এই যে, তার ওপর কারো পাওনা ছিল যা হযরত উসমান (রা.) জোরপূর্বক তার কাছ থেকে আদায় করে পাওনাদারকে পাইয়ে দিয়েছিলেন এবং তার প্রতি কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করেননি, যার ফলে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। [২]

সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রহ.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল: “মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে কোন জিনিসটি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিল?”

[১] ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: যখন উসমান (রা.)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হলো, তখন সাহাবীগণ (রা.) এই বিষয়ে একমত হলেন যে, যে ব্যক্তি (ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে) রক্তপাত ঘটিয়েছে তার ওপর কিসাস নেই, আর যে ব্যক্তি ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হারাম যৌনাচার করেছে তার ওপর হদ নেই, এবং যে ব্যক্তি ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সম্পদ হস্তগত করেছে তার ওপর কোনো দায় নেই, তবে যদি সেই সম্পদ হব্ব পাওয়া যায় তবে তা তার মালিককে ফেরত দিতে হবে। (আল-ফিকহুল আবসাত, পৃষ্ঠা ২০)

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩০০

তারা উত্তর দিল: “ক্রোধ এবং লোভ।” [১]

তবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন আবি বকর হত্যাকাণ্ডে মোটেও জড়িত ছিলেন না। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করার জন্য অবশ্যই ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। [২]

কুরাইশ নেতা উতবা বিন রাবিয়ার নাতি এবং হযরত আবু হুজাইফা (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা নববী সাহচর্য লাভের সুযোগ পাননি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল মাত্র কয়েক বছর)। তার পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে হযরত উসমান (রা.) এই এতিমকে নিজের লালন-পালনে গ্রহণ করেন, যেমনটি তিনি কুরাইশের আরও অনেক এতিমদের ভরণপোষণ করতেন। [৩]

মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার যৌবনকালে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের যুগ এসে গিয়েছিল। মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা তার কাছে গভর্নর পদের আবেদন করেন; হযরত উসমান (রা.) স্নেহভরে এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, তুমি এখনও এর যোগ্য নও।

মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা বললেন: “তাহলে আমাকে উপার্জনের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিন।”

হযরত উসমান (রা.) তাকে সফরের সরঞ্জাম এবং পর্যাপ্ত অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন। মিশরে পৌঁছে মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফার মনে এই ক্ষোভ রয়ে গেল যে, কেন আমাকে সরকারে অংশীদার করা হলো না। [৪]

অথচ এটি ছিল হযরত উসমান (রা.)-এর চরম সতর্কতা যে, তিনি তার পালক পুত্রকে চাওয়ার পরেও কোনো পদ দেননি, কারণ এতে ইসলামের কল্যাণ ছিল না।

মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা এই জেদ ও রাগের বশবর্তী হয়ে সাবায়ী আন্দোলনে যোগ দেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধিতা শুরু করেন। মিশরের গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.) শাওয়াল ৩৫ হিজরিতে হযরত উকবা বিন মালিক (রা.)-কে নায়েব (প্রতিনিধি) বানিয়ে মিশর থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলে, পেছন থেকে মুহাম্মদ বিন আবি হুজাইফা বিদ্রোহ করেন এবং রাজধানী ফুসতাত দখল করে নেন। [৫]

মোদাকথা, কিছু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা, পদের লোভ এবং সাবায়ী আন্দোলনের কিছু প্রভাব এই ধরনের যুবকদের বিপথগামী করেছিল।

তৃতীয় খলিফার বাকীতে দাফন নিয়ে কি কোনো হাঙ্গামা হয়েছিল?

প্রশ্ন: জাবালা বিন আমর (রা.) বা ইবনে হাজরা সাঈদী কি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করতে বাধা দিয়েছিলেন? আর হযরত উসমান (রা.)-এর দাফনের সময় কি কোনো হাঙ্গামা হয়েছিল এবং তাকে কি ‘হাশশ-ই-কাওকাব’-এ দাফন করা হয়েছিল এবং এই জায়গাটি কি ইহুদিদের কবরস্থান ছিল? [৬]

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩০০

[২] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৪

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৮০, ত. আর-রিসালাহ

[৪] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৯৯

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৮১, ত. আর-রিসালাহ

[৬] আল-ইসাবাহ: ১/৩৫৭; তারিখুল মদিনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ১/১১২

উত্তর: এই সমস্ত কথা অগ্রহণযোগ্য, কারণ এগুলোর সনদ অত্যন্ত দুর্বল এবং দুর্বল বা অজ্ঞাত বর্ণনাকারীদের ওপর ভিত্তি করে। এগুলোর জাল হওয়া এখান থেকেই স্পষ্ট যে, জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের ওপর কখনও কোনো ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার ছিল না। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, একদল লোক সেখানে দখল করে বসে থাকবে এবং মৃত ব্যক্তিকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী দাফন করা হবে? যখন কবরস্থান কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তখন কোনো ব্যক্তিকে সেখানে দাফন করতে কে বাধা দিতে পারত? আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এক-দুজন ব্যক্তি সাবায়ি প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে কোনো বাধা সৃষ্টি করেছিল, তবে তাতে হযরত উসমান (রা.)-এর মর্যাদায় কী পার্থক্য পড়ে?

নিঃসন্দেহে হযরত উসমান (রা.)-কে যে স্থানে দাফন করা হয়েছিল তাকে ‘হাশশে কাওকাব’ বলা হতো। তবে এই জায়গাটি কখনোই ইহুদিদের কবরস্থান ছিল না, বরং বছ বছর ধরে এটি বাকিরই অংশ হিসেবে চলে আসছিল। বাকি কবরস্থান অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, খালি জায়গা হিসেবে এই অতিরিক্ত জমিও ছিল যা হযরত উসমান (রা.) নিজেই ক্রয় করে বাকির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর নিজেরও ইচ্ছা ছিল সেখানেই দাফন হওয়ার। [১] এই জায়গাকে ইহুদিদের কবরস্থান সাব্যস্ত করে হযরত উসমান (রা.)-এর দাফনকে বাকির বাইরে মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে কি আসলে অনারবদের হাত ছিল?

প্রশ্ন: নিকট অতীতের অনেক লেখক দাবি করেছেন যে, উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের জন্য মূলত অনারব এবং ইরানিরা দায়ী ছিল। এই বিষয়টি কি গবেষণার সাথে সংগতিপূর্ণ?

উত্তর: এই বিষয়টি গবেষণার পরিপন্থী। বিদ্যমান বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সকল ব্যক্তিই ছিলেন আরব। আজ পর্যন্ত কোনো অনারবের নাম সামনে আসেনি। খোদ আবদুল্লাহ বিন সাবা যদিও ইয়েমেনি ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিল, কিন্তু তার মা ছিল হাবশি; যাই হোক, যেহেতু বংশপরম্পরা পিতার দিক থেকে চলে, তাই তাকেও আরবই বলা হবে। হ্যাঁ, আলামত থেকে এটি অনুমান করা যায় যে, এই আন্দোলনের পেছনে কায়সারের রোম সাম্রাজ্যের মদদ ছিল। কারণ মিশরের বিদ্রোহী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল সেখানেই, যেখানে কায়সার গোয়েন্দাবৃত্তির একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন যার পেছনে অটল অর্থ ব্যয় করা হতো। [২] একইভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা সক্রিয় হতেই কায়সার স্বয়ং বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ইসলামি বিশ্বের সীমান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। [৩]

যে পর্যন্ত অনারব অর্থাৎ ইরানিদের সম্পর্ক, এটা সম্ভব যে তারা পর্দার আড়ালে কাজ করছিল, কিন্তু কুফা, বসরা এবং মিশর থেকে এসে যারা উসমান (রা.)-এর ঘর ঘেরাও করেছিল এবং পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.)-এর দলে সমবেত হওয়া সৈন্যদের মধ্যে অনারবদের অন্তর্ভুক্তির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। হতে পারে তারা স্বল্প সংখ্যায় ছিল অথবা তারা ছিল মাওয়ালি, যারা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সাথে মিশে গিয়েছিল। যাই হোক, নেতৃত্বদানকারী সকল লোকই ছিল আরব।

[১] মাজমাউজ জাওয়াইদ, বর্ণনা নম্বর: ১৬৫৫৮, আল-হাইসামি বলেন, এটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৬৬২, দার হিজর।

[৩] তারিখুত তাবারী, পৃষ্ঠা ৩৫ হিজরি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্রোহে জড়িত ব্যক্তিদের কি কাফির মনে করা হবে?

প্রশ্ন: হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িত ব্যক্তিদের পরকালীন পরিণতি কী হবে? তাদের কি কাফির ও জাহান্নামী মনে করা হবে?

উত্তর: হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যারা শরিক ছিল, তারা সামগ্রিকভাবে মুনাফিক এবং ইসলামের শত্রুদের একটি দল ছিল, যেমনটি একটি হাদিসে তাদের জন্য “মুনাফিকুন” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সহিহ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী উদ্ধৃত হয়েছে:

يا عثمان! ان ولاك الله هذا الامر يوماً فارادك المنافقون ان تخلع قيصك الذي قصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك ثلاث مرات-

“হে উসমান! যদি আল্লাহ তোমাকে কোনোদিন এই পদে আসীন করেন, আর মুনাফিকরা চায় যে আল্লাহ তোমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা তুমি খুলে ফেলো, তবে তুমি তা খুলবে না।” [১]

এর পরিষ্কার অর্থ হলো, সামগ্রিকভাবে এটি ছিল পথভ্রষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং মুনাফিক প্রকৃতির লোকদের একটি দল। এতে যদি দু-একজন ভালো মানুষ না বুঝে शामिल হয়েও থাকেন, তবে তাদের সংখ্যা এতই কম ছিল যে উল্লিখিত হাদিসে তাদের আলাদা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বসূরিগণ (আসলাফ) সতর্কতাবশত এই দলের কোনো ব্যক্তির নাম নিয়ে নিশ্চিতভাবে তাকে কাফির বা জাহান্নামী হওয়ার ফতোয়া দেননি। হ্যাঁ, এমন লোকেরা পথভ্রষ্টতা, ফাসাদ এবং কবিরি গুনাহে অবশ্যই লিপ্ত হয়েছে, তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিমুখতা প্রকাশ করা জরুরি, তবে যার তওবা প্রমাণিত হয়েছে সে ব্যতীত।

হাফেজ জাহাবি লিখেছেন:

“খারেজিরা জাহান্নামের কুকুর যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাদের মূর্তি ও ক্রুশ পূজারীদের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে নিশ্চিত মনে করি না।” [২]

আল্লামা সাফাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী আবদুর রহমান বিন মুলজামের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

“রাফেজিদের মতে সে পরকালের সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষ। আমরা আহলে সুন্নাত তার জন্য জাহান্নামের আশঙ্কা করি, তবে এটাও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তার হুকুম হযরত উসমান, হযরত জুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন, হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি, খারিজা বিন হুজাফা (যাকে খারেজিরা হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করে হত্যা করেছিল) এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের মতোই। আমরা তাদের থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি এবং তাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করি।” [৩]

[১] সুনান ইবনে মাজাহ, হা: ১১২, আলবানী বলেছেন: সহিহ

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/১২৮, ত: আর-রিসালাহ

[৩] আল-ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত লিস-সাফাদি: ২/১৮, ত: দার ইহয়া আত-তুরাস

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

সপ্তম

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণীসমূহ

১. এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, যদি কিছু নেক ও সৎ ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শরিক হয়ে থাকেন, তবে এটি কোনো অসম্ভব বিষয় ছিল না। হতে পারে তারা ইসলামের কেন্দ্র মদিনা থেকে দূরে থাকার কারণে এই ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী বা বিদ্রোহ সম্পর্কে নির্দেশনাবলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, অথবা হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে হাদিসসমূহ তাদের জানা ছিল না এবং তারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে বিদ্রোহে शामिल হয়ে গেছেন। এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা আশা করি যে, ইনশাআল্লাহ তারা তওবা করার তাওফিক পেয়েছেন, যেমনটি ছিল প্রথম যুগের অধিকাংশ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। এটিও সম্ভব যে তারা ফাসাদে শরিক ছিলেন না, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী নিজেদের “সত্যতা” জাহির করার জন্য তাদেরকে জামাতের পৃষ্ঠপোষক ও আমির হিসেবে প্রচার করে দিয়েছিল।

২. বিদ্রোহে शामिल অনেক লোকের তওবা করা প্রমাণিত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী, বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেক লোক হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং বড় বড় সাহাবীদের সামনে অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন। [১] সম্ভবত এরা তারাই ছিলেন যারা কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই আন্দোলনের অংশ হয়েছিলেন। আমরা আশা করি যে আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩১২

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের সময়কাল সম্পর্কিত সংশয়সমূহ

প্রশ্ন: হযরত আলী (রা.)-এর নিকট শামের অধিবাসীরা বায়আত গ্রহণ করেনি, তাহলে তাঁকে সর্বসম্মত (বিল-ইজমা) খলিফা বলা কীভাবে সঠিক হবে? মুজতাহিদগণের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছাড়া আর কেউ কি আছেন যিনি তাঁকে খলিফা হিসেবে গণ্য করেন?

উত্তর: হযরত আলী (রা.) খলিফা হওয়ার জন্য মদিনাবাসীদের ইজমা বা ঐক্যমত্যই যথেষ্ট ছিল, যেমনটি তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলিফার ক্ষেত্রে মদিনার আরবাব-এ-হাল-ও-আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর ঐক্যমত্যই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল এবং তাঁদের বায়আতের মাধ্যমেই পুরো উম্মতের ওপর বায়আত আবশ্যিক হয়ে গিয়েছিল। এই দাবি যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছাড়া অন্যান্য মুজতাহিদগণ হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত স্বীকার করেননি, তা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদগণের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর উক্তি হলো: “আবু বকর (রা.)-কে অগ্রগণ্য রাখো, তারপর উমর (রা.), তারপর উসমান (রা.), তারপর আলী (রা.); সুতরাং তাঁরাই হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন।” [১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করলেন: “হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত কি প্রমাণিত?”

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বললেন: “সুবহানাল্লাহ! হযরত আলী (রা.) কি ইখতিয়ার বা কর্তৃত্ব থাকা অবস্থায় শরয়ী হদ ও দণ্ডবিধি কায়েম করতেন না, (চোরের হাত) কাটতেন না, জাকাত আদায় ও বণ্টন করতেন না? আমি এমন কথা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। হ্যাঁ, তিনি এমন খলিফা ছিলেন যাঁর ওপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন, জিহাদ করেছেন, হজ করেছেন, তাঁরা তাঁকে আমিরুল মুমিনীন বলতেন, তাঁরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, বিমুখ ছিলেন না। সুতরাং আমরা তাঁদের অনুসারী এবং আশা করি যে তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা সওয়াব পাব, কারণ আল্লাহ ও রাসূল (সা.) আমাদের এরই নির্দেশ দিয়েছেন।” [২]

একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে বলা হলো: “আপনি কি হাদীসে সাফিনা [৩] থেকে দলিল পেশ করেন?” তিনি বললেন: “এতে বাধা কোথায়?” বলা হলো: “হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত তো পরামর্শ ও ইখতিয়ার ছাড়াই কায়েম হয়েছিল।” তিনি বললেন: “এ বিষয়ে বিতর্ক করো না। হযরত আলী (রা.) হজের সময় মানুষের আমির ছিলেন, হদ কায়েম করতেন এবং গনীমত বণ্টন করতেন...”

[১] আবু বকরকে অগ্রগণ্য করো, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী; তাঁরাই খুলাফায়ে রাশেদীন। (হাকীকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহ লিল ইমাম আস-সুয়ুতী, পৃ. ৩০৯)

[২] আমি বললাম: তাঁর খিলাফত কি প্রমাণিত? তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! তিনি হদ কায়েম করতেন, সদকা (জাকাত) গ্রহণ ও বণ্টন করতেন, অথচ তাঁর খিলাফত কি ওয়াজিব হবে না? আমি এমন কথা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি এমন খলিফা ছিলেন যাঁর ওপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন, হজ করেছেন, তাঁকে আমিরুল মুমিনীন বলতেন, তাঁরা তাঁর অনুসারী ছিলেন, বিমুখ ছিলেন না। সুতরাং আমরা তাঁদের অনুসারী এবং তাঁদের অনুসরণে সওয়াবের আশা রাখি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। (আস-সুন্নাহ লি আবু বকর আল-খাল্লাল, খণ্ড: ৩, পৃ: ১১৩)

[৩] হযরত সাফিনা (রা.) থেকে বর্ণিত নববী বাণী হলো: “খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে।” (সুনানে তিরমিযী, হা: ২২২৬) এর মাধ্যমে চার খলিফার খিলাফতের ওপর দলিল পেশ করা হয়।

...বণ্টন করতেন। এটা কীভাবে সম্ভব যে তিনি খলিফা হবেন না অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলতেন। [১] মোদাকথা, এটা প্রমাণিত যে মুজতাহিদ ইমামগণ হযরত আলী (রা.)-কে চতুর্থ খলিফা হিসেবে মানতেন। একে অস্বীকার করা নিছক জেদ ও শত্রুতা।

প্রশ্ন: এই বিষয়টি বোধগম্য নয় যে হযরত আলী (রা.) উসমানের হত্যাকারীদের তদন্ত করার ক্ষমতা রাখতেন না। অন্তত মুহাম্মদ বিন আবু বকর তো জানতেন যে হত্যাকারী কারা ছিল। হযরত আলী (রা.) কেন তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেই ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি?

উত্তর: আমরা এই সম্ভাবনাকে নাকচ করছি না যে হযরত আলী (রা.)-কে কিছু ব্যক্তির নাম হত্যাকারী হিসেবে বলা হয়ে থাকতে পারে। মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং আশতার নাখয়ী প্রমুখের কাছ থেকে এ ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু সেগুলোর মর্যাদা তথ্যের চেয়ে বেশি হতে পারত না। কিসাস কার্যকর করার জন্য হয় অপরাধীর স্বীকারোক্তি প্রয়োজন ছিল অথবা শরয়ী সাক্ষ্য। এই উভয় জিনিসই অনুপস্থিত ছিল। মুহাম্মদ বিন আবু বকরের সাক্ষ্য কারও ওপর কিসাস কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট ছিল না, কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আক্রমণাত্মক হামলার আগেই লজ্জিত হয়ে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। [২]

যারা হত্যার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানেই হযরত উসমান (রা.)-এর গোলামদের হাতে নিহত হয়েছিল এবং বাকিরা দূর-দূরান্তের এলাকায় পালিয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী (রা.)-এর আশেপাশে কোনো হত্যাকারী অবশিষ্ট ছিল না। যুক্তিসঙ্গতভাবেও এটা সম্ভব নয় যে একজন খলিফাকে হত্যা করার পর অপরাধীরা সেই এলাকাতেই নিরাপদ থাকবে। যেখানে আমরা দেখি যে কোনো সাধারণ মানুষকে হত্যা করার পরও অপরাধীরা অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে যায় এবং আত্মগোপন করে। সুতরাং এটা কীভাবে সম্ভব ছিল যে একজন খলিফার হত্যাকারীরা পালাবে না এবং হযরত আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেরীগণের মাঝে নিশ্চিত্তে ঘুরে বেড়াবে।

হাদিস ভাণ্ডারের সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে হযরত উসমান (রা.)-এর প্রকৃত হত্যাকারীরা ঘটনার পর মদিনা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল। [৩]

[১] তাঁকে বলা হলো: আপনি কি সাফিনার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করছেন? তিনি বললেন: তা প্রত্যাখ্যান করার কী আছে? তাঁকে বলা হলো: আলীর খিলাফত তো পরামর্শ বা আদেশ ছাড়াই হয়েছিল? তিনি বললেন: এ বিষয়ে কথা বলো না, আলী তো সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে দণ্ডবিধি (হুদুদ) কার্যকর করা সঠিক হয় এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (ফায়) বণ্টন করা হয়; তিনি খলিফা হবেন না অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁকে ‘হে আমীরুল মুমিনীন’ বলে সম্বোধন করবেন, তা হতে পারে না। (আস-সুন্নাহ লি-আবি বকর আল-খাল্লাল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪১৭)

[২] তারিখ তাবারিতে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের ফিরে আসার একাধিক বর্ণনা রয়েছে: “অতঃপর তিনি বের হয়ে গেলেন এবং তাঁকে ছেড়ে দিলেন।” (৪/৩৮৩) “অতঃপর তিনি বিরত হলেন এবং ফিরে এলেন।” (৪/৩৯১)

[৩] তাদের একজন একটি তীরের ফলা দিয়ে তাঁর ঘাড়ের রগ কেটে দেয় এবং অন্যজন তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করে। অতঃপর তারা পলায়ন করে, রাতে পথ চলত এবং দিনে আত্মগোপন করত যতক্ষণ না তারা মিশর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা একটি গুহায় আত্মগোপন করল। সেই এলাকার এক নাবতি (কৃষক) তার গাধা নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, একটি মাছি গাধার নাকের ছিদ্রে ঢুকে পড়ল। গাধাটি ছটফট করতে করতে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ল। কৃষকটি মনে করল তার সাথী সেখানে এসেছে, তাই সে ভেতরে গেল এবং তাদের দেখতে পেল। সে হযরত মুয়াবিয়ার গভর্নরের কাছে গিয়ে তাদের খবর দিল। গভর্নর হযরত মুয়াবিয়াকে অবহিত করলেন। তিনি অপরাধীদের গ্রেফতার করলেন এবং তাদের গদান উড়িয়ে দিলেন। (মুসাম্মাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৬৯১, আর-রুশদ সংস্করণ, সনদ সহীহ বা হাসান, এর বর্ণনাকারীগণ বুখারীর বর্ণনাকারী, কেবল জুওয়াইম আল-ফিহরি ব্যতীত, তবে ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন)।

উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী দুনিয়াবাসী তাদের অবস্থা সম্পর্কে তখন জানতে পারে যখন এক গ্রাম্য লোক তার হারিয়ে যাওয়া গাধার সন্ধানে সেই গুহা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এই সন্দেহভাজন লোকদের দেখতে পায়। গ্রাম্য লোকটি ওই এলাকার শাসককে সংবাদ দেয়, যিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে খবর দেন। তিনি অপরাধীদের হেফাজতে নেন এবং (তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর) কিসাস হিসেবে হত্যা করে দেন। এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে অপরাধীদের একজনের নাম ছিল আবু আমর। হতে পারে এই নামের সামান্য সাদৃশ্যের কারণে হযরত عمرو بن الحنف (আমর বিন আল-হামাক) (রা.)-কেও ভুলভাবে হত্যাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেমনটি ওয়াকদীর বর্ণনায় রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: এই ঘটনাটি নিশ্চিতভাবেই সিফফিনের যুদ্ধের দেড় বছর পরের অর্থাৎ ৩৮ হিজরির। কারণ ফিলিস্তিন ও মিশরে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই অপরাধীদের মদিনা থেকে পালিয়ে যাওয়া নিম্নোক্ত সত্যগুলো প্রমাণ করে:

- অপরাধীদের হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে পূর্ণ আশঙ্কা ছিল যে, তিনি তাদের থেকে কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না।
- হযরত আলী (রা.) হত্যাকাণ্ডের আন্দোলনে কোনোভাবেই শরিক ছিলেন না, অন্যথায় অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না; বরং তারা হযরত আলী (রা.)-এর আশেপাশে থাকাকেই নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করত।
- হযরত আলী (রা.)-এর আশেপাশে হযরত উসমান (রা.)-এর কোনো হত্যাকারী ছিল না, যেমনটি তাঁর বিরোধীরা দাবি করত।

মোদাকথা, আসল অপরাধীরা ছিল পলাতক ও আত্মগোপনে, আর অধিকন্তু এই সময়ে হযরত আলী (রা.) একদিনের জন্যও স্বস্তি পাননি। এই দাবি প্রবল ছিল যে, কেবল মারাত্মক আঘাতকারী হত্যাকারীদের থেকেই কিসাস নেওয়া হবে না, বরং দাঙ্গাকারী আড়াই-তিন হাজার ব্যক্তিকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.)-এর অক্ষমতা ও বাধ্যবাধকতা প্রশাসনিক দিক থেকেও স্পষ্ট এবং ফিকহী দিক থেকেও। যে অপরাধীরা তাঁর এলাকা থেকে বেরিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনাধীন অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল এবং দুনিয়া তাদের সম্পর্কে বেখবর ছিল, তাদের কীভাবে আদালতে আনা যেত!! হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাদের খবর একটি আকস্মিক ঘটনার কারণে পেয়েছিলেন। অন্যথায় সম্ভব ছিল যে আরও বহু বছর কেটে যেত, এমনকি এটাও হতে পারত যে এই অপরাধীরা চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যেত।

মা-এ হাওয়াব-এর বর্ণনার বাস্তবতা কী?

(প্রশ্ন) প্রসিদ্ধ আছে যে, বসরা যাওয়ার পথে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হাওয়াব নামক একটি ঝরনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে তাঁর ওপর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন যে, তোমাদের মধ্যে একজনের ওপর হাওয়াবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে। উম্মুল মুমিনীনের সেই হাদীসটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি ফিরে যাওয়ার সংকল্প করলেন, কিন্তু হযরত তালহা ও হযরত জুবায়ের (রা.) সহ পঞ্চাশ জন ব্যক্তি কসম খেয়ে বললেন যে এটি হাওয়াব নয়। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মিথ্যা কসম। [১]

তাবারীতে একজন বেদুইন থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি বর্ণনা রয়েছে যার সারসংক্ষেপ হলো, হযরত আয়েশা (রা.) যখন মক্কা থেকে বসরা যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে আমার কাছ থেকে চারশ বা ছয়শ দিরহাম দিয়ে একটি দ্রুতগামী উট ক্রয় করেন। মা-এ হাওয়াব অতিক্রম করার সময় কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। লোকেরা জায়গার নাম জিজ্ঞেস করলে আমি “মা-এ হাওয়াব” বললাম। এটি শুনে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) তাঁর উট বসিয়ে দিলেন এবং বললেন: “আল্লাহর কসম! আমিই সেই হাওয়াবের কুকুরওয়ালী, আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।” কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) আওয়াজ দিলেন যে আলী বিন আবি তালিব পিছু ধাওয়া করে পৌঁছে যাচ্ছেন। এটি শুনে সবাই রওনা হয়ে গেলেন। [২]

একইভাবে লাইস আন জুহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন উম্মুল মুমিনীন ফিরে যাওয়ার সংকল্প করলেন তখন আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) বললেন যে, যে ব্যক্তি এই জায়গাকে মা-এ হাওয়াব বলেছে সে মিথ্যা বলেছে, তিনি এর ওপর এত জোর দিলেন যে হযরত আয়েশা (রা.) পুনরায় বসরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [৩]

[১] মুরুজুজ জাহাব: ৩/১০২, ১০৩, ত. আল-জামিআতুল লুবনানিয়্যাহ

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৫৭

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৬৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

এই ঘটনাটি কি এভাবেই ঘটেছিল? তাছাড়া কিছু লোক মা-এ হাওয়াবের (হাওয়াবের পানি) ঘটনাটি পুরোপুরি অস্বীকার করে। সঠিক কথাটি কী?

উত্তর: এই ঘটনাটি সেভাবে ঘটেনি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো সবই যয়ীফ (দুর্বল) বর্ণনা। মাসউদী শিয়া। বর্ণনাটিও সনদবিহীন, তাই এর ওপর অধিক জেরা (সমালোচনা) করার প্রয়োজন নেই। তাবারী বেদুইনের কাছ থেকে উট কেনার যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, তার একজন রাবী ইসমাইল বিন মুসা আল-ফাজারীকে চরমপন্থী শিয়া বলা হয়েছে। [১] এর শেষ রাবী একজন অজ্ঞাত বেদুইন। সুতরাং এটি যয়ীফ। যুহরী এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। তাই বর্ণনাটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) ও বটে। আর এর দুর্বলতা অনেক বেড়ে যায়। ইমাম তাবারী আবু মিখনাফ থেকে এমন একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যার রাফেযী হওয়া সবার কাছে স্পষ্ট।

তবে হযরত আয়েশা (রা.)-এর মা-এ হাওয়াব অতিক্রম করার বিষয়টি অস্বীকার করাও ভুল। সহীহ হাদীস দ্বারা মূল ঘটনাটি ভিন্নভাবে প্রমাণিত যা নিচে দেওয়া হলো। সহীহ ইবনে হিব্বানে আছে:

“যখন হযরত আয়েশা (রা.) রওনা হলেন, তখন বনী আমিরের একটি ঝরনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে তাদের কুকুরগুলো রাতে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। তখন উম্মুল মুমিনীন কুকুর ডাকার শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলেন: এটি কোন ঝরনা? লোকেরা বলল: হাওয়াব। তিনি বললেন: আমার মনে হয় আমার ফিরে যাওয়া উচিত। লোকেরা বলল: থামুন, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত করুন, আপনি সামনে এগিয়ে যান। মুসলমানরা আপনাকে দেখলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন। তিনি বললেন: আমার মনে হয় ফিরে যাওয়াই উচিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: ‘তোমাদের মধ্যে একজনের কী অবস্থা হবে যখন তার ওপর হাওয়াবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে।’ [২]”

সহীহ সনদে এই ঘটনাটি মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়াল্লা এবং মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতেও রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সনদের এই বর্ণনাগুলোতে সাহাবী সন্তানদের মিথ্যা কসম খাওয়ার কথা উল্লেখ নেই এবং অন্য কোনো কুরুচিপূর্ণ কথাও নেই। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি সাধারণ বাণী বর্ণিত হয়েছে এবং মা-এ হাওয়াব দিয়ে উম্মুল মুমিনীনের অতিক্রম করা, ফিরে যাওয়ার চিন্তা এবং অন্যান্য সাহাবীদের পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে সংস্কারের (সন্ধি) কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত ঘটনা থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ওপর কোনো আপত্তি আসে না। কারণ:

- উল্লিখিত নববী বাণীতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে স্পষ্টভাবে এমন সফর থেকে নিষেধ করা হয়নি। শুধু একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং তাতেও অস্পষ্টতা ছিল যে এর লক্ষ্য কে হবে।
- হ্যাঁ, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর মনে অবশ্যই সন্দেহ জেগেছিল যে সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য তিনিই ছিলেন এবং তাকেই নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা তার...

[১] মীযানুল ইতিদাল: ১/২৫১

[২] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নম্বর: ৬৭৩২

মুসনাদে আহমদে আছে, হযরত যুবায়ের (রা.) বললেন: “আপনি কি ফিরে যাচ্ছেন? সম্ভবত আল্লাহ আপনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন।” (মুসনাদে আহমদ, হা: ২৪২৯৯, সনদ সহীহ, তাখরীজ: ২৪২৫৪)

আরও দেখুন: মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, হা: ৪৮৬৮; আল-ফিতান লি-নুআইম বিন হাম্মাদ, হা: ১৮৮; মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, হা: ৩৭৭৭৩; আর-রাঈদু আলা মান আশাক মিন রাহওয়াইহ, হা: ১৫৬৯; কাশফুল আসতার, হা: ৩৩৭৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১২০২৫, আল-হাইসামী বলেন: আহমদ, আবু ইয়াল্লা ও বাযযার এটি বর্ণনা করেছেন এবং আহমদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ-এর বর্ণনাকারী।

উম্মাহর ইতিহাস - তৃতীয় খণ্ড

চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়ে গেল যখন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম সফরের উপযোগিতার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং হযরত আয়েশা (রা.) নিজেও যখন আরও চিন্তা করলেন যে, মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি এবং মজলুমকে ইনসাফ পাইয়ে দেওয়ার গুরুত্ব যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা একটি হাদীসের সম্ভাব্য অর্থের চেয়ে বেশি ওজনদার। তাই আপনি (রা.) সফর অব্যাহত রাখলেন। যদি হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকত, তবে উম্মুল মুমিনীন অবশ্যই তা মেনে নিতেন এবং মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখতেন।

•

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর অতিক্রম করার সময় কুকুর ঘেউ ঘেউ করার কোনো নেতিবাচক অর্থ নেওয়ার অবকাশ নেই। কুকুর কোনো মুসাফিরের ওপর ঘেউ ঘেউ করা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তারা যেকোনো পথচারী বা কাফেলা ইত্যাদির ওপর ঘেউ ঘেউ করে থাকে, এটি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। যদি এই মুহূর্তে তারা ঘেউ ঘেউ করে থাকে, তবে তার কারণ ছিল যে কাফেলাটি কোনো সাধারণ কাফেলা ছিল না—এত বড় কাফেলায় যেখানে উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্বও ছিলেন এবং তিনি হাওদাজের পর্দার ভেতরে ছিলেন, যা দেখে কোনো প্রাণীর উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। হ্যাঁ, এখানে উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর নিজের খোদাভীতি অবশ্যই প্রশংসনীয় যে, তিনি যখনই কোনো বিপদের আশঙ্কা অনুভব করেছেন, তখনই তাঁর মনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই বাণীর কথা উদয় হয়েছে, যাতে এক মহিলার ওপর হাওয়াবের কুকুরদের ঘেউ ঘেউ করার কথা উল্লেখ ছিল। তাঁর মনে হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী হয়তো সতর্কবাণী হিসেবে ছিল, পাছে এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য না হয়। পরে সঙ্গীদের বোঝানোর ফলে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

•

এই বাণীতে উল্লিখিত মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নন, বরং অন্য কোনো বিশেষ মহিলা ছিলেন। বরং বর্ণনার শব্দ থেকে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারী এটিও বুঝেছেন যে, সেই সময় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যবস্তু কে তা জানা ছিল না। [১]

সাইফ বিন উমর থেকে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, উম্মে যামল সালমা বিনতে মালিক নামক এক মহিলা কোনো এক যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছিলেন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর দাসী হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন সে-ও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং অন্যান্য স্ত্রীগণও জমা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “তোমাদের মহিলাদের মধ্যে একজন হাওয়াবের কুকুরদের উত্তেজিত করবে।” উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) পরে অনুগ্রহ করে সালমাকে মুক্ত করে দেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে যখন ফিতনা-ই ইরতিদাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সে মুরতাদ হয়ে নিজের কওমের নেত্রী বনে যায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। নিজের অভিযানের সময় সে ‘যফর’ ও ‘হাওয়াব’-এর মধ্যবর্তী স্থানে সফর করত। যখন সে হাওয়াব দিয়ে অতিক্রম করত, তখন কুকুররা তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করত। [২]

অতএব সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী উম্মে যামল সম্পর্কেই ছিল। যেহেতু সেই মজলিসে অধিকাংশ উম্মাহাতুল মুমিনীন উপস্থিত ছিলেন, তাই তাদের কেউ কেউ এই বাণীকে নিজের ক্ষেত্রে ভেবেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-ও যখন হাওয়াবের পানি দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে হয়তো এই বাণীটি তাঁর সম্পর্কেই। এটা সম্ভব যে, সেই উদ্দেশ্য তিনি নন বরং উম্মে যামল উদ্দেশ্য ছিল। ওয়াল্লাহু আলাম (আল্লাহই ভালো জানেন)!

[১] ইমাম তহাবী (রহ.) এই বিষয়ের বিভিন্ন বর্ণনার সমন্বয় করে এই ফলাফল বের করেছেন যে, এই বাণীর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দিষ্টভাবে জানতেন না, তবে পরে আপনাকে (সা.) তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আপনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন: “অচিরেই তোমার ও আয়েশার মাঝে কিছু একটা ঘটবে।” (শরহ মুশকিলিল আসার, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭১; খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ৫৬, ৯৫)

[২] তারিখুত তাবারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৬৩, ২৯৩; মুজামুল বুলদান লি-ইয়াকুত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১৪। হাওয়াব। এই ঐতিহাসিক বর্ণনাটি যদিও দুর্বল সনদের, তবে প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে এর উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যদি দুর্বল বর্ণনাগুলো মহান ব্যক্তিত্বদের ওপর অপবাদ বা অন্য কোনো ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং এই বিষয়ে এই বর্ণনাটি আনুষঙ্গিকভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য উপযুক্ত, তবে এর অর্থ এই নয় যে আলোচনার ভিত্তি কেবল এই দুর্বল বর্ণনার ওপর রাখা হবে। আলোচনার মূল ভিত্তি সহীহ বর্ণনার ওপর হওয়া উচিত।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

জমহুর উলামা এবং হাদিস বিশারদদের অভিমত এই যে, “হাদিসে মাউল হাওয়াব”-এর লক্ষ্যবস্তু ছিলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) [১] এবং এর উদ্দেশ্য ছিল পুরো কাফেলাকে সতর্ক করা। কারণ এই কাফেলা বসরায় পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি এমনভাবে তৈরি হতে থাকে যে জঙ্গ জামাল সংঘটিত হয়, যার পরিণতিতে হযরত তালহা ও যুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাত এবং স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। হাদিসে এই ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল যার জন্য এই সফরটি একটি ভূমিকা স্বরূপ ছিল। তবে সফরকারীদের নিয়ত দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শরিয়তে মুতাহহারার হেফাজত ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং যা কিছু হয়েছে তা ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়েছে, তাই তাদের ওপর কোনো অভিযোগ বর্তায় না। আর না এই হাদিসকে তাদের দ্বীনহীনতা, ফাসেকী বা গোমরাহির দলিল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

কায়েস বিন আবি হাযেমের নির্ভরযোগ্যতার ওপর আপত্তি:

প্রশ্ন: হাদিসে মাউল হাওয়াবের যেসব বর্ণনাকে সহিহ বলা হচ্ছে, সেগুলোর বর্ণনাকারী হলেন কায়েস বিন আবি হাযেম, যিনি “মুনকারুল হাদিস”। ইয়াহইয়া বিন সাঈদের পক্ষ থেকে কায়েসের ব্যাপারে “মুনকারুল হাদিস” হওয়ার জরাজীর্ণ বিদ্যমান রয়েছে এবং তাও এই কারণে যে তিনি হাদিসে মাউল হাওয়াব বর্ণনা করতেন। সুতরাং এই বর্ণনাকে সহিহ বলা কি একটি ইলমি খিয়ানত নয়?

উত্তর: নিঃসন্দেহে কায়েস বিন আবি হাযেমের ওপর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ “মুনকারুল হাদিস” হওয়ার হুকুম লাগিয়েছেন, তবে এর অর্থ বর্তমান সময়ের “মুনকার হাদিস” (হাদিস অস্বীকারকারী) হওয়া নয়, আর না এটি মুহাদিসগণের সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী তার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে। বরং এর অর্থ কেবল এই যে, বর্ণনাকারী এমন সব বর্ণনাও নিয়ে আসেন যা অন্য বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেন না।

আসল কথা হলো এই যে, কোনো বর্ণনাকারীকে “মুনকারুল হাদিস” বলা দুটি অর্থে হয়ে থাকে: এক. বর্ণনাকারীর অধিকাংশ বর্ণনা অদ্ভুত ও বিরল প্রকৃতির হওয়া। দুই. তিনি কিছু একক এবং স্বতন্ত্র ধরনের বর্ণনা পেশ করেন। প্রথম ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী যয়িফ এবং সন্দেহভাজন হয়ে যান। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি যয়িফ প্রমাণিত হন না।

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুদি’ লিখেন:

“মুনকারুল হাদিস পরিভাষাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী দিকও রয়েছে যা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, তা হলো: কিছু প্রাচীন আলেম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, বর্ণনাকারী এই বর্ণনায় একক এবং তিনি একটি স্বতন্ত্র বর্ণনা পেশ করছেন। কিছু ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান কর্তৃক কায়েস বিন আবি হাযেমকে মুনকারুল হাদিস সাব্যস্ত করাকে এরই ওপর প্রয়োগ করেছেন।” [২]

এই কারণেই হাফেজ ইবনে হাজারও কায়েস বিন আবি হাযেমের ব্যাপারে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানের উক্তি “মুনকারুল হাদিস”-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন: “আল-ফারদুল মুতলাক” (নিছক কিছু একক বর্ণনার বর্ণনাকারী)। [৩]

[১] যে পর্যন্ত লেখক দেখেছেন, সকল হাদিস বিশারদদের এটাই অভিমত।

[২] তাহরির উলুমুল হাদিস: ১/৬১৬, ত. মুয়াসসাসাতুর রায়য়ান বৈরুত।

[৩] তাহযিবুত তাহযিব: ৮/৩৮৯, ত. নিজামিয়া দাক্ষিণাত্য।

তারিখ امت مسلمہ (তারিখে উম্মতে মুসলিমা) - جلد دوم (দ্বিতীয় খণ্ড)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীকে এই অথেই ‘মুনকারুল হাদিস’ বলেছেন, যেমন তিনি হুসাইন বিন আল-হুসাইন আল-আশকার সম্পর্কে বলেন: ‘মুনকারুল হাদিস ও কান সাদুকান’ (তিনি মুনকারুল হাদিস এবং তিনি সত্যবাদী ছিলেন)। [১]

পরিশেষে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাকে ‘মুনকারুল হাদিস’ বলার পাশাপাশি সত্যবাদী বলছেন কীভাবে?

কারণ এখানে ‘মুনকারুল হাদিস’ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য, প্রথমটি নয়।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ‘মুনকারুল হাদিস’ বলে কাইস বিন আবি হাযিমের ওপর দুর্বলতার হুকুম লাগিয়েছেন, তবুও একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে লাগানো এই শায (বিচ্ছিন্ন) হুকুমের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ জমহুর (অধিকাংশ) উলামার নিকট কাইস বিন আবি হাযিম একজন জলীলুল কদর তাবেয়ী এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এই কারণেই ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমও তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তার সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: ‘সিকাহ’ (নির্ভরযোগ্য)। [২]

হাফেজ যাহাবীর প্রশংসাসূচক শব্দগুলো হলো: ‘আল-আলিম, আস-সিকাহ, আল-হাফিজ’। [৩]

অন্য স্থানে তিনি বলেন: ‘সিকাহ, হুজ্জাত’। [৪]

ইমাম আবু দাউদ বলতেন: ‘আজওয়াদুত তাবেয়ীন ইসনাদান কাইস’। অর্থাৎ ‘তাবেয়ীদের মধ্যে কাইসের সনদই সবচেয়ে উত্তম’।

সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলতেন: ‘কুফায় কাইসের চেয়ে বেশি সাহাবীদের থেকে বর্ণনা উদ্ধৃতকারী আর কেউ ছিল না।’

তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আশারা মুবাশশারার মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত বাকি সবার সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাদের থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। [৫]

হাফেজ যাহাবী আরও বলেন যে, কাইসের নির্ভরযোগ্যতার ওপর ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে এবং যে ব্যক্তি তার ওপর জারাহ (সমালোচনা) করেছে সে নিজেকেই কষ্টে ফেলেছে। [৬]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কাইসকে আফদালুত তাবেয়ীন (তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) গণ্য করতেন। [৭]

এরপর মজার ব্যাপার হলো, কুফায় বসবাস করা সত্ত্বেও কাইস বিন আবি হাযিম সেই সময়ের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে ওসমানের কিসাসের দাবিদারদের সাথে ছিলেন। অর্থাৎ তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত তালহা ও জুবায়ের এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তাকে ‘উসমানী’ বলা হতো। [৮] এমন একজন বুজুর্গের পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে ‘মা-এ হাওয়াব’ (হাওয়াবের পানি) এর বর্ণনা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত, কারণ তিনি শিয়াদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার ওপর যদি কিছু জারাহ হয়েও থাকে, তবে তা শিয়া প্রভাবের কারণে নয় বরং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা এবং উসমানীয় চিন্তাধারায় কঠোরতার কারণে। কুফার অনেক মুহাদিস...

[১] মাওসুআতু আকওয়ালি আহমাদ বিন হাম্বল: ২৬৫/১

[২] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৫৫৬৬

[৩] মীযানুল ইতিদাল: ৩৯২/৩

[৪] মীযানুল ইতিদাল: ৩৯৩/৩

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯৮/৩ ত্বর রিসালাহ

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯৮/৩ ত্বর রিসালাহ

[৭] মাওসুআতু আকওয়ালি আল-ইমাম আহমাদ: ১৮৭/৩

[৮] “তিনি কুফী ও উসমানী ছিলেন এবং এটি বিরল।” (তারিখুল ইসলাম লিয়াহাবী লিল আসরি: ৩৫৮/৬, বাশার: ১১৫৯/২)

তারা যে তাঁর থেকে বর্ণনা ত্যাগ করেছিলেন, তার কারণ এটাই ছিল। কারণ কুফায় হযরত আলী (রা.)-কে রাজনৈতিক বিরোধী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখা হতো। [১]

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বা দুর্বল (যয়ীফ) হওয়ার ফয়সালা আসমাউর রিজাল-এর কিতাবসমূহ থেকে করা হয়, নিজের রুচি অনুযায়ী নয়। যদি জারাহ ও তা’দীল-এর ইখতিয়ার আজকের লোকদের দিয়ে দেওয়া হয়, তবে আমাদের সর্বোত্তম বর্ণনাকারী এমনকি কিছু ইমাম মুজতাহিদও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বরং নামকরা ফকীহ ও মুহাদিসগণের মধ্যেও এমন এক বিশাল সংখ্যা রয়েছে যাদের ওপর কেউ না কেউ জারাহ করেছেন। সুতরাং নির্ভরযোগ্যতা বা দুর্বলতার ফয়সালা কোনো একজন বা দুইজন সমালোচকের মতামতের ভিত্তিতে হবে না, বরং জমহুর বা অধিকাংশের সেই মতামতের ভিত্তিতে হবে যা হাফেজ যাহাবী এবং হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ সংকলন করেছেন।

জঙ্গে জামালে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিপক্ষ দলের অবস্থান?

প্রশ্ন: কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে হকের ওপর না থাকার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদীস শুনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: ‘লাতুকাতিলান্নাহ ওয়া আনতা জালিম’ (তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে এমনভাবে যে তুমি হবে জালিম)। এটি শুনে হযরত যুবাইর (রা.) যুদ্ধ না করার কসম খেলেন এবং ফিরে যেতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এই বলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন যে, আপনি তো যুদ্ধের জন্য আসেননি। আপনি তো মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে এসেছেন। এই পরামর্শে হযরত যুবাইর (রা.) কসমের কাফফারা দিয়ে দিলেন এবং সেখানেই অবস্থান করলেন। এই বর্ণনার সনদগত অবস্থান কী? এর দ্বারা কি হযরত যুবাইর (রা.) এবং তাঁর দলের জালিম হওয়া প্রমাণিত হয় না?

উত্তর: এই বর্ণনার অধিকাংশ সনদই দুর্বল, তবে মুস্তাদরাক-এর একটি বর্ণনাকে হাফেজ যাহাবী সহীহ বলেছেন। [২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ‘লাতুকাতিলান্নাহ ওয়া আনতা জালিম’-এর অর্থ এই নয় যে, হযরত যুবাইর (রা.) (নাউযুবিল্লাহ) গুনাহগার ও নাফরমান ছিলেন। ‘জালিম’ দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে তাঁর অবস্থান ও পদক্ষেপ সঠিক ছিল না, যাকে ফিকহী পরিভাষায় ‘খুরুজ’ বলা হবে। তবে যেহেতু তিনি এবং তাঁর সাথী সাহাবীগণ মুজতাহিদ ছিলেন, তাই এই ভুলটি ছিল মূলত ইজতিহাদী ভুল।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, আরবিতে ‘জুলুম’ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর মূল অর্থ হলো কোনো জিনিসকে তার সঠিক স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে সামান্য ভুলও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আবার শিরকের মতো বড় অপরাধও। এটি উর্দুর (বা বাংলার প্রচলিত) ‘জুলুম’ নয় যার অর্থ সীমিত।

[১] হাফেজ যাহাবী বলেন: তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল যার থেকে হাদীসের কোনো কিছুই গ্রহণ করা হয়নি এবং তার মাযহাবের কারণে তার ওপর অভিযোগ আনা হয়েছে, আর তারা বলেছে: সে আলীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করত। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১৯৯, ত. আর-রিসালাহ)। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কায়েস বিন আবি হাযিম থেকে সহীহ মুসলিমে ১৪টি, আবু দাউদে ৩টি, তিরমিযীতে ২৮টি, নাসাঈতে ৬টি এবং ইবনে মাজাহতে ৪৭টি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের মধ্যে তাঁর থেকে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা ইমাম বুখারী গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ সহীহ বুখারীতে কায়েসের ৬১টি বর্ণনা রয়েছে। একইভাবে চার ইমামও তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালেকে তাঁর ১টি, কিতাবুল আসার লি-আবি ইউসুফে ১টি, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ীতে ৪টি এবং মুসনাদে আহমদে ১৭১টি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

[২] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫৫। মুস্তাদরাকে এই সহীহ বর্ণনার আগে একই বিষয়ের আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যাকে হাফেজ যাহাবী প্রশ্নবিদ্ধ (মাহাল্লে নজর) বলেছেন। এছাড়া এর পরে একই বিষয়ের টানা তিনটি বর্ণনা রয়েছে কিন্তু হাফেজ যাহাবী সেখানে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আরও দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, হাদীস নং: ৩৭৮২৭।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হাদীসের শব্দগুলোর সঠিক অর্থ কেবল এটাই যে, হযরত যুবাইর (রা.) কোনো এক সময় হযরত আলী (রা.)-এর সাথে রাজনৈতিক মতভেদ করবেন যাতে হযরত আলী (রা.)-এর রায়ই সঠিক হবে। হযরত যুবাইর (রা.) এই নববী ফরমান ভুলে গিয়েছিলেন। যখন মনে পড়ল, তখন আল্লাহর ভয়ে সেই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। পরে তাঁর সাহেবজাদা তাঁকে থামালেন এবং কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করলেন। ফলে হযরত যুবাইর (রা.) সন্ধির আলোচনার জন্য তিন দিন অবস্থান করলেন। এই আলোচনার ফলেই ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রের ফলে যুদ্ধ শুরু হলো, তখন তিনি ঐ এলাকা থেকে চলে গেলেন।

মোটকথা, হযরত যুবাইর (রা.)-এর হযরত আলী (রা.)-এর সাথে রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে মতভেদ ছিল। হযরত আলী (রা.)-এর মতো হযরত তালহা, হযরত যুবাইর এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্দেশ্যও একটাই ছিল যে, উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করা হোক। এই সময়ে যে সংঘাত হয়েছিল, তার কারণে তাঁদের নিয়তের ওপর সন্দেহ করা সঠিক নয়। এটি ছিল ইজতিহাদী ভুল, যাতে ভুল করেও ইনশাআল্লাহ তাঁরা সওয়াবের অধিকারী হবেন। যারা ভুল অবস্থায় লড়াই করে নিহত হয়েছেন, তাঁরাও ক্ষমাযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নিজের পরে সংঘটিত হতে যাওয়া ফিতনাগুলোর কথা উল্লেখ করলেন, তখন কিছু সাহাবী (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন:

“আমরা যদি ঐ যুগে থাকি তবে কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?”

জবাবে ইরশাদ হলো: “আমার সাহাবীদের জন্য (কাফফারা হিসেবে) নিহত হওয়াই যথেষ্ট হবে।” [১]

হযরত তালহা, যুবাইর এবং আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মতো উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে বিচ্যুতি ঘটল?

(প্রশ্ন) মহান মর্যাদার অধিকারী সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও উসমান (রা.)-এর কিসাসের বিষয়ে কীভাবে বিচ্যুতি ঘটল?

(উত্তর) ফিকহী বিষয়ে বিচ্যুতি হওয়া আশ্চর্যজনক হলেও অসম্ভব নয়। ইলমে কুল্লী (পূর্ণ জ্ঞান) কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং কামিল শরয়ী ইলম কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিগণও কখনো কখনো ফিকহী বা প্রশাসনিক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা, দ্বিধা বা ভুলের শিকার হয়েছেন। পরে যখন তারা সত্য জানতে পেরেছেন, তখন তারা সেই বিশেষ বিষয়ে নিজেদের ভুল মৌখিকভাবে স্বীকারও করেছেন। এমনও হয়েছে যে, কিছু নতুন বিষয়ে একদিকে একজন খলিফায়ে রাশেদ ছিলেন এবং অন্যদিকে সমস্ত সাহাবী। কিন্তু খলিফায়ে রাশেদের রায়ই সঠিক ছিল। এর কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাফনের সময় কারো জানা ছিল না যে, পবিত্র কবরের জায়গা সম্পর্কে কোনো হাদীস আছে কি না। কেউ বলছিলেন মসজিদে দাফন করা হোক, কেউ বলছিলেন সাহাবীদের সাথে বাকীতে দাফন করা হোক। কেবল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এই সমস্যার সমাধান করলেন এবং নববী বাণী শোনালেন: “মা কাবিদা নাবিয়্যুন ইল্লা উদফিনা হাইসু কাবিদা” (নবী যেখানে ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়)। [২]

[১] بحسب اصحابي القتل. (আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৫/১)

[২] মুসনাদে আবু ইয়লা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৩

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

- উসামা (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণের সময় হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত সাঈদ বিন য়ায়েদ (রা.) সকলেই এর বিপক্ষে ছিলেন। সিদ্দিকে আকবর (রা.) একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি লশকর প্রেরণের ব্যাপারে অটল ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর অভিমতই সঠিক প্রমাণিত হয়। [১]
- এগুলো তো ছিল প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কৌশলগত মতপার্থক্য। কিন্তু যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.)-এর অভিমত শুরুতে ফিকহী দিক থেকেও অসম্মতিমূলক ছিল। তিনি এই হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করতেন: “আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।” তিনি যুক্তি দিতেন যে, কেউ কালিমা পাঠ করলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। সিদ্দিকে আকবর (রা.) জবাবে বলতেন: “আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে।” (আমি সালাত ও যাকাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করব না। যে পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।) হযরত উমর (রা.) সে সময় নিজের মতকে সঠিক মনে না করে খলীফার সাথে একমত হয়ে যান। তিনি বলতেন: “فقاتلنا معه، فرأينا ذلك” (আমরা তাঁর সাথে যুদ্ধে শরিক হলাম, অতঃপর আমরা দেখলাম যে এটাই সঠিক পথ ছিল।) [২]
- কুরআন মাজীদ সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর মতের সাথে হযরত উমর (রা.)-এর দ্বিমত ছিল। তিনি একে বিদআত মনে করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্বের মতের ভুল স্পষ্ট হয়ে যায়। [৩]
- হযরত উমর (রা.)-এর ফিকহী প্রজ্ঞা ও গান্ধীর্ষ নিয়ে কার সন্দেহ থাকতে পারে? তিনি একবার এক গর্ভবতী মহিলাকে ব্যভিচারের অভিযোগে পাথর নিক্ষেপ (রজম) করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার স্বামী চার বছর পর বাড়ি ফিরেছিল। হযরত মুয়ায (রা.) তাঁকে বাধা দেন এবং বলেন যে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন তার দাঁতও ছিল এবং সে ছবছ তার পিতার মতো ছিল। হযরত উমর (রা.) তখন নিজের ফিকহী সিদ্ধান্তের ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন: “لولا معاذ لهلك عمر” (যদি মুয়ায না থাকত, তবে উমর ধ্বংস হয়ে যেত।) [৪]

মোদাকথা হলো, কোনো সাহাবীর কোনো ফিকহী মাসআলায় ভুল রায় দেওয়া বা নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য করা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। এই মতপার্থক্য ব্যক্তিগতও হতে পারে আবার সমষ্টিগতও হতে পারে। এক বা একাধিক সাহাবীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলিত হয়নি এবং ফিকহও বিধিবদ্ধ হয়নি। সাহাবীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যার কাছে হাদীসের সমস্ত ভাণ্ডার মুখস্থ বা সংরক্ষিত ছিল।

[১] তারীখ খলীফা বিন খইয়াত, পৃ: ১০২; এবং অনুরূপ তাবারী, ইবনে খালদুন এবং আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া।

[২] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃ: ১৭, সহীহ সনদসহ, তাবা আল-রিসালা।

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭১৯১, ৪৯৮৬, কিতাব ফাযাইলুল কুরআন, বাব জামউল কুরআন।

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হা: ১৫৫৯৮; আল-মাবসূত লিস-সারাখসী, বাবুল ইদ্দাহ, ৫/৩৫, দারুল মা’রিফাহ। কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের সাথে হযরত আলী (রা.) দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এবং হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন: “لولا علي لهلك عمر” (যদি আলী না থাকত, তবে উমর ধ্বংস হয়ে যেত)। ইমাম আল-মাওয়াযী (মৃত্যু ৪৫০ হি.) এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে প্রসিদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। (আল-হাবী আল-কাবীর লিল-মাওয়াযী, ১৩/১১৫)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা। খণ্ড ২।

দাবি করা যেতে পারে না। যে সাহাবীর স্মৃতিতে যে পরিমাণ হাদীস ছিল, তিনি সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই ফয়সালা করতেন। বিষয়গুলোকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হওয়ার এটিও একটি কারণ ছিল। হাদীস বোঝা এবং তা থেকে বিধান আহরণ করার যোগ্যতাও সবার সমান ছিল না। ফিকহ ও ইজতিহাদী যোগ্যতায় তাঁদের মধ্যে কেউই খুলাফায়ে রাশেদীনের সমান ছিলেন না। এই সমস্ত বিষয় থাকা সত্ত্বেও যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তবে জানা যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় ধরনের মতপার্থক্য সেই সময়েই হয়েছে যখন বিচার বিভাগ বা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত কোনো সম্পূর্ণ নতুন মাসআলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেহেতু এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো আমলী বা ইজমাই নমুনা বিদ্যমান ছিল না, তাই বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি রায় কয়েম করে নিয়েছিলেন। যদি কোনো পূর্ববর্তী নমুনা থাকত, তবে এমন কঠোর মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো না।

উসমান (রা.)-এর কিসাসের বিষয়টিও ছিল এমনই একটি নতুন মাসআলা, যাতে সেই সময়ে হযরত আলী (রা.)-এর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক ছিল। যেসব ব্যক্তিবর্গ তাঁর ফিকহী রায়কে ভুল মনে করেছিলেন, তাঁদের নিয়ত ছিল নেক এবং উম্মতের কল্যাণ কামনায় কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁরা এই মাসআলাগুলোতে যা সঠিক মনে করেছিলেন, তা পূর্ণ নেক নিয়তের সাথে পালন করেছিলেন এবং এর জন্য জান ও মালের ঝুঁকিও নিয়েছিলেন (এজন্য তাঁরা তাঁদের এই কাজে সওয়াব পাবেন এবং সম্পূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত)। কিন্তু যেমন যেমন মাসআলাগুলো স্পষ্ট হতে থাকল, এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছে সেই আইনি ও ফিকহী পদ্ধতিই সঠিক ছিল যা হযরত আলী (রা.) গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যই ইসলামী ফিকহ আজ যেভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছে, তা হযরত আলী (রা.)-এরই সত্যায়ন করে। সাহাবায়ে কেরাম এই মাসআলাটি স্পষ্ট করতে খুব বেশি সময় নেননি, বরং জঙ্গ জামাল ও জঙ্গ সিফফীনের কিছুকাল পরেই হযরত আলী (রা.)-এর যুগে এ বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, উসমান (রা.)-এর কিসাস এবং বিদ্রোহীদের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর ফয়সালা হুবহু কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী ছিল। [১]

জঙ্গ জামালে লড়াই কি হযরত যুবাইর (রা.) শুরু করেছিলেন?

(প্রশ্ন): মুস্তাদরাক হাকেমের একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অপরপক্ষে হযরত যুবাইর (রা.) তীরন্দাজদের হামলার নির্দেশ দেন। তিনি নিজেই যুদ্ধ শুরু করতে চেয়েছিলেন। যখন তীর আসতে শুরু করল, তখন হযরত আলী (রা.)-এর সাথীরা আর স্থির থাকতে পারলেন না এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। [২]

ইমাম তহাবী (রহ.) সহীহ সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.) যুদ্ধ করা থেকে বিরত ছিলেন, যতক্ষণ না তারা (বিপক্ষ দল) যুদ্ধ শুরু করল, তখন হযরত আলী (রা.)-ও তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। [৩]

কি এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে, যুদ্ধ সৈন্যরা নয় বরং আসহাবে জামাল (জামাল যুদ্ধের সাথীরা) নিজেরাই শুরু করেছিলেন?

[১] আল-ফিকহুল আবসাত লিল ইমাম আবি হানীফা, পৃষ্ঠা ২০; আল-মাবসূত লিল ইমাম আস-সারখাসী, ১০/১২৮, কিতাবুল খাওয়ারিজ।

[২] অতঃপর যুবাইর তাঁর সাথে থাকা তীরন্দাজদের বললেন: তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করো। মনে হচ্ছিল তিনি যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছেন। যখন তাঁর সাথীরা যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হলেন, তখন তারা আর অপেক্ষা না করে আক্রমণ করে বসলেন। (মুস্তাদরাক হাকেম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৫৫৯৩)

[৩] তিনি তালহা, যুবাইর এবং তাঁদের সাথীদের থেকে বিরত থাকলেন এবং তাঁদের (শান্তির দিকে) আহ্বান জানালেন যতক্ষণ না তারা (যুদ্ধ) শুরু করল, অতঃপর তিনি তাঁদের সাথে যুদ্ধ করলেন। (শারহ মাতানীল আসার, খণ্ড: ২/৫১১ সহীহ সনদে)

উত্তর: তহাবীর বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে সহীহ, তবে এতে “বাদাউ” (তারা শুরু করেছে) এর জমা মুজাক্কার গায়েব-এর যমীরের মারজা (উদ্দেশ্য) হলো হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর সাথীরা, স্বয়ং হযরত তালহা ও যুবাইর (রা.) নন। তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর সাথীদের মধ্যে সাবায়ীরাও মিশে ছিল, যারা তীর নিক্ষেপ করে যুদ্ধ শুরু করিয়েছিল। তাই বর্ণনাকারী, যিনি যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি এটাই দেখছিলেন যে যুদ্ধের সূচনা তালহা ও যুবাইর (রা.)-এর সাথীদের পক্ষ থেকে হচ্ছে। তিনি এই কথাটিই বর্ণনা করেছেন।

پس اس صحیح السند روایت کا ان تاریخی روایات سے کوئی تعارض نہیں جن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ گروہ سبائیوں کا تھا جو لشکر اصحاب جمل میں خلط ملط ہو گیا تھا۔

সুতরাং এই সহীহ সনদের বর্ণনার সাথে ঐসব ঐতিহাসিক বর্ণনার কোনো বিরোধ নেই যেগুলোতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এটি ছিল সাবায়ীদের দল যারা জঙ্গ জামালের সাথীদের লশকরে মিশে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, মুস্তাদরাকে হাকিমের উল্লিখিত বর্ণনায় এই স্পষ্টতা রয়েছে যে, তীর নিক্ষেপের নির্দেশ হযরত যুবাইর (রা.) দিয়েছিলেন, কিন্তু এই বর্ণনাটি দলিল হতে পারে না। এর একজন বর্ণনাকারী আল-হুসাইন বিন ইয়াহইয়া আল-মারওয়াযী ‘মাজহুলুদ দাত’ (অজ্ঞাত পরিচয়)। আবার এতে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ নিজে নির্ভরযোগ্য হলেও তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করছেন যিনি মাজহুল (অজ্ঞাত), কারণ ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বংশপরিচয়ই মতভেদপূর্ণ। এভাবে বর্ণনাটি অত্যন্ত যয়ীফ (দুর্বল) হয়ে যায়। তাই এটি অগ্রহণযোগ্য।

হযরত আলী (রা.) ইবনে জুরমুযকে কেন হত্যা করালেন না?

سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابن جرموز کو جہنمی تو کہا مگر قصاصاً قتل کیوں نہ کرایا؟

প্রশ্ন: হযরত আলী (রা.) হযরত যুবাইর (রা.)-এর হত্যাকারী ইবনে জুরমুযকে জাহান্নামী তো বলেছেন, কিন্তু কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করালেন না কেন?

جواب: اس کی وجہ یہ تھی کہ شرعاً ایسے مقتول کا قصاص نہیں لیا جاتا جو کسی جنگ یا بغاوت کے دوران بحالت معرکہ قتل کر دیا گیا ہو۔ کیوں کہ اس میں مجرم کو شک اور تاویل کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی جان بچانے [۱] کے لیے ہتھیار چلایا تھا۔ پس مجرم دیانتہً قابل عتاب تھا مگر قضاءً قابل قصاص نہ تھا۔

উত্তর: এর কারণ ছিল এই যে, শরীয়ত অনুযায়ী এমন নিহতের কিসাস নেওয়া হয় না যাকে কোনো যুদ্ধ বা বিদ্রোহ চলাকালীন রণক্ষেত্রে হত্যা করা হয়েছে। কারণ এতে অপরাধী সন্দেহ এবং ব্যাখ্যার (তাওয়ীল) সুযোগ পেয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সে বলতে পারে যে আমি তো নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য অস্ত্র চালিয়েছিলাম। সুতরাং অপরাধী ধর্মীয়ভাবে (দিয়ানাতান) তিরস্কারের যোগ্য ছিল কিন্তু বিচার বিভাগীয়ভাবে (কাদায়ান) কিসাসের যোগ্য ছিল না। [১]

کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عثمان بن حنیف کی ڈاڑھی اکھڑوا دی تھی؟

হযরত আয়েশা (রা.) কি উসমান বিন হুনাইফের দাড়ি উপড়ে ফেলেছিলেন?

سوال: ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب بصرہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، پھر کسی نے سفارش کی کہ یہ صحابی ہیں تو قتل کا حکم واپس لے لیا مگر ان کی ڈاڑھی، سر، ابرو اور پلکوں کے بال اکھڑوا دیے اور چالیس کورے کیا یہ درست ہے؟ [۲] لگوائے۔

প্রশ্ন: একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) যখন বসরায় পৌঁছে হযরত আলী (রা.)-এর গভর্নর উসমান বিন হুনাইফ (রা.)-এর ওপর বিজয় লাভ করলেন, তখন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর কেউ সুপারিশ করল যে তিনি একজন সাহাবী, তখন হত্যার নির্দেশ ফিরিয়ে নিলেন কিন্তু তার দাড়ি, মাথা, ঙ্র এবং চোখের পাপড়ির চুল উপড়ে ফেললেন এবং চুল্লিশটি বেত্রাঘাত করালেন। [২] এটি কি সঠিক?

[৩] جواب: یہ بالکل من گھڑت روایت ہے۔ اس کا راوی ابو مخنف کذاب ہے۔

উত্তর: এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট বর্ণনা। এর বর্ণনাকারী আবু মুখনাফ একজন চরম মিথ্যাবাদী (কাযযাব)। [৩]

[১] এটি একটি সূক্ষ্ম ফিকহী পার্থক্য। মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্ত কিতাবসমূহে ‘বাবুল বুগাত’ (বিদ্রোহীদের অধ্যায়) এবং ‘আবওয়াবুল কিসাস ওয়াদ দিয়াত’ (কিসাস ও দিয়াতের অধ্যায়) এর অধীনে দেখা যেতে পারে: আস-সিয়ারুল কাবীর লিল ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানী; আল-মাবসূত লিল আল্লামা আস-সারখসী; রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার লি ইবনে আবিদীন শামী।

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৬৯।

[৩] আবু মুখনাফ ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাকারী এই কাহিনী বর্ণনা করেননি।

ইমাম শাবীর এই উক্তিটি কি সঠিক যে জঙ্গ জামালে মাত্র চারজন সাহাবী শরীক ছিলেন?

প্রশ্ন: ইমাম শাবীর দিকে এই উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত করা হয় যে: *لم يشهد الجمل من اصحاب النبي*। “রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে আলী, আম্মার, তালহা এবং জুবায়ের ছাড়া আর কেউ জঙ্গ জামালে শরীক হননি। যদি লোকেরা পঞ্চম কোনো সাহাবীকে প্রমাণ করতে পারে তবে আমি মিথ্যাবাদী।” [১]

কি তাঁর এই উক্তিটি প্রমাণিত? যদি হ্যাঁ হয়, তবে এটি কি বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে?

উত্তর: ইমাম শাবীর এই উক্তিটি সনদের দিক থেকে প্রমাণিত হলেও একে হুবহু বাস্তবতার ওপর প্রয়োগ করা যায় না। হাফেজ ইবনে কাসীর এর প্রতিবাদ করে বলেন:

“হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, মুহাম্মদ বিন আবু বকর, সাহল বিন হুনাইফ এবং অন্যান্যরাও শরীক হয়েছিলেন।” [২]

সুতরাং ইমাম শাবীর এই উক্তির উদ্দেশ্য অন্য কিছু হবে। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন যে, ইমাম শাবীর উদ্দেশ্য ছিল মুহাজিরদের মধ্য থেকে এই চারজনই শরীক হয়েছিলেন। হিজরতের পর জন্মগ্রহণকারী ছোট সাহাবী বা আনসারী সাহাবীদের দিকে তাঁর ইশারা ছিল না। [৩] আল্লাহই ভালো জানেন। যাই হোক, এই উক্তিটিকে হুবহু গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই।

□□□

আহলে জামাল এবং আহলে শামের পদক্ষেপগুলোকে গুনাহ এবং নাফরমানি কেন বলা যাবে না?

প্রশ্ন: কুরআন ও হাদীসে নিজেদের শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে অনেক তাকিদ এসেছে। একটি আয়াতে আছে যে, উলুল আমরের আনুগত্য করো। অনেক মুফাসসির এখানে ‘উলুল আমর’ বলতে শাসক উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আবার হাদীসে তো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসেছে যে, শাসকদের, আমীরদের আনুগত্য করো; সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ইমারাহ-তেই এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। এর সাথে সাথে প্রায় সকল মুসলমানই এটি মানেন যে, হযরত আলী শরয়ীভাবে খলীফা হয়েছিলেন। এর পর স্বাভাবিকভাবেই যে সকল ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের কাজ নাজায়েজ ছিল, আর এই নাজায়েজ গুনাহের পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে, কারণ আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে যত শরয়ী দলীল এসেছে সেগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এর বিরোধিতার ব্যাপারে কঠোর ধমকিও রয়েছে। তাই আনুগত্য ওয়াজিব হয়েছে। এর বিরোধিতা হারাম হয়েছে, অর্থাৎ একে বিদ্রোহ এবং নাফরমানি বলা ছাড়া উপায় নেই।

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৪৮, প্রকাশনী: আর-রুশদ; আস-সুন্নাহ লি আবি বকর আল-খাল্লাল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৬৭

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০ / ৪৩৭

[৩] হাশিয়া আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০ / ৪৩৭, প্রকাশনী: দার হিজর

তারপর হযরত আয়েশা, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের এবং হযরত মুয়াবিয়ার বিদ্রোহকে কেন অবাধ্যতা ও গুনাহ বলা হয় না? আহলে সুন্নাত এ বিষয়ে কেন পক্ষপাতিত্ব করে? ভুলকে ভুল কেন বলে না? আর সত্যকে কেন স্বীকার করে নেয় না? মাসআলাটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিজ্ঞ আলেমদের বক্তব্যের আলোকে প্রদান করুন।

উত্তর: এ কথাটি একেবারেই ভুল যে আহলে সুন্নাত পক্ষপাতিত্ব করে এবং ভুলকে ভুল বলে না। এই ব্যক্তিবর্গ সত্যকে স্বীকার করেন এবং তাও অত্যন্ত সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে, যেখানে সমস্ত শরয়ী নুসূসের (দলিল) প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রতিটি বিদ্রোহের ওপর গুনাহ ও ফিসকের হুকুম প্রযোজ্য হয় না, বরং একটি অবস্থা এর ব্যতিক্রম এবং তা হলো এই যে, বিদ্রোহকারীরা যদি আহলে ইলম, ফযিলত ও নেককার লোক হন এবং তাদের কোনো ইলমী ভুল বোঝাবুঝি (মুগালতাহ) হয়ে থাকে। আর এটি কোনো নজিরবিহীন বিষয় নয়। আহলে সুন্নাত, আহলে তাশাইয়ু, মুতাজিলা ইত্যাদি সবার কাছেই এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি যে, শরয়ী মাসআলায় যদি কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায় এবং যদিও বাকি সমস্ত ফকীহ তার ভুল হওয়ার ব্যাপারে একমত হন এবং তা হালাল-হারামের মাসআলাও হয়, তবুও এই আমলকে গুনাহ বা ফিসক বলা হবে না। হ্যাঁ, একে ভুল এবং খাতা-এ-ইজতিহাদী অবশ্যই বলা ও বোঝা হবে, কিন্তু ইজতিহাদের কারণে একে ‘খাতা-এ-ইজতিহাদী’ হিসেবে অভিহিত করা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যবেহ করা পশুর ওপর জানবুঝে আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) ছেড়ে দিয়ে যবেহ করা বা এমন পশুর গোশত খাওয়া অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে কবির গুনাহ। কুরআন মাজীদে স্পষ্ট নির্দেশ হলো:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

(আর তোমরা এমন জানোয়ার থেকে খেয়ো না যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি এবং নিঃসন্দেহে এটি গুনাহের কাজ।) [১]

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে একে জায়েজ মনে করতেন। [২] এখন শরয়ী দলিলসমূহ বিবেচনা করে শুধু হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণই ইমাম শাফেয়ীর এই ইজতিহাদকে ভুল বলেননি, বরং স্বয়ং জমহূর শাফেয়ীগণও তাঁদের ইমামের এই মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং একে দুর্বল মত হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু কোনো শাফেয়ী কিংবা কোনো হানাফী, মালেকী বা হাম্বলী কখনো এ কথা বলেননি যে, ইমাম শাফেয়ীর এই আমল ফিসক ও গুনাহ। শুধু তাই নয়, আজও যদি কোনো শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ভাই তাঁর ইমামের মতের ওপর আমল করে এমন পশু খায়, তবে যদিও অধিকাংশ আলেম একে ভুল বলবেন এবং প্রকৃতপক্ষেও শরয়ী দলিলের বিচারে এটি কবির গুনাহ ও ফিসকই, কিন্তু যেহেতু সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সততার সাথে ইজতিহাদকারী একজন মহান মর্যাদাবান ইমাম মুজতাহিদের তাকলীদ করছে, তাই না তো সেই ইমামকে আর না তাঁর অনুসরণকারীকে ফাসেক বলা যেতে পারে।

এই ধরনের কঠোর ইজতিহাদী মতপার্থক্যের উদাহরণ শিয়া, মুতাজিলা এবং খারেজী ইত্যাদির ফিকহ শাস্ত্রেও বিদ্যমান এবং সেখানে কারো কোনো আপত্তি হয় না, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ গণ্ডির এই মতপার্থক্যকে ইজতিহাদী হিসেবেই গণ্য করে এবং নিজের ইমাম বা বুজুর্গের ওপর কখনো ফিসকের তকমা লাগায় না।

[১] সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১২১।

[২] আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব লিন-নববী: ৮/৪০৮, ত. দারুল ফিকর।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (جلد دوم - দ্বিতীয় খণ্ড)

রাজনীতিও শরয়ী আহকামের একটি শাখা। এখানেও ইজতিহাদী মাসায়েল একইভাবে সামনে আসে যেমনটি অন্যান্য অধ্যায়ে আসে। কোনো শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কখন জায়েজ বা কখন নাজায়েজ? এ বিষয়ে যেখানে অনেক স্পষ্ট শরয়ী আহকাম দেওয়া হয়েছে, সেখানে কিছু শরয়ী নস (দলিল) বোঝার ক্ষেত্রে মুজতাহিদদের মধ্যে মতপার্থক্যও হতে পারে। এরপর এই মাসায়েলগুলো পরিস্থিতি এবং তথ্যের ওপরও নির্ভর করে।

যদিও সাধারণভাবে বিদ্রোহ করা কবির গুনাহ এবং ফিসক (পাপাচার), কিন্তু যদি এমন কোনো ব্যক্তি যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন, নিজের দীনদারী ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে এবং পরিস্থিতিকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে এবং নিজের কাছে থাকা সংবাদ ও তথ্যের ওপর বিশ্বাস রেখে কোনো সময় কোনো মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েজ মনে করেন (এই শর্তে যে তিনি খারেজীদের পর্যায়ে না যান, অর্থাৎ সরকারের অনুগতদের কাফের সাব্যস্ত না করেন এবং সাধারণ মানুষের জান-মাল হালাল মনে না করেন), তবে এই ভিত্তিতে তাকে ফাসেক বলা হবে না বরং তার এই ভুলকে ‘খতায় ইজতিহাদী’ (ইজতিহাদী ভুল) বলা হয়।

ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) লিখেছেন:

“আর বিদ্রোহীরা যদি আহলে বিদআত (বিদআতী) না হয়, তবে তারা ফাসেক নয় বরং তাদের ব্যাখ্যা ভুল; আর ইমাম এবং আহলে আদল (ন্যায়পরায়ণরা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সত্যের ওপর রয়েছেন। [১] তাদের উদাহরণ ঠিক তেমনই যেমন শরয়ী আহকামে মুজতাহিদ ফকীহদের মতপার্থক্য হয়ে থাকে।” [২]

কিন্তু এখানে এটাও বুঝে নেওয়া উচিত যে, অন্যান্য দ্বিনী মাসায়েলের মতো ইজতিহাদের দরজা এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়নি যে গোলাম আহমদ পারভেজের মতো লোকেরা হালাল-হারাম এমনকি ইসলামের স্পষ্ট আহকাম এবং কুফরের বিষয়ে রদবদল করতে শুরু করবে। বরং ইজতিহাদের অত্যন্ত কঠিন শর্তাবলী রয়েছে যা কেবল প্রথম সারির কয়েকজন আলেমই পূরণ করতে পারেন। একইভাবে বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও ইজতিহাদ হওয়ার অত্যন্ত কঠিন শর্তাবলী রয়েছে যা কোনো সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে থাকা সহজ নয়। তবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার বিবাদসমূহে (মুশাজারাতে) সকল পক্ষই ইজতিহাদের যোগ্য লোক বিদ্যমান ছিলেন, তাই তাদের বিদ্রোহ ফিসক নয় বরং খতায় ইজতিহাদী।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন:

“আর হযরত আমীর (আলী মুরতজা রাযি.)-এর সাথে যে যুদ্ধ হয়েছে, তা হয়তো মানবিক ত্রুটি ছিল অথবা ইজতিহাদী ভুল ছিল। আর যে কাজ ইজতিহাদী ভুলের কারণে সংঘটিত হয়, তা না অবাধ্যতা আর না গুনাহ।” [৩]

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী (মাদাজিল্লুহুল আলী) বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে আলোকপাত করেছেন। এক স্থানে হযরত হুজর বিন আদি (রাযি.)-এর হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

[১] যারা মুসলিম শাসকের অনুগত থাকে, ফিকহী পরিভাষায় তাদের ‘আহলে আদল’ বলা হয়।

[২] “বিদ্রোহীরা যদি বিদআতী না হয় তবে তারা ফাসেক নয়, বরং তারা তাদের ব্যাখ্যায় ভুল করে এবং ইমাম ও ন্যায়পরায়ণরা তাদের সাথে যুদ্ধে সঠিক পথের ওপর থাকেন; তারা সকলেই ফকীহ মুজতাহিদদের মতো।” (আল-মুগনী লি ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী, ৬/৮, তাবা মাকতাবাতুল কাহেরা)।

[৩] হেদায়াতুশ শিয়া, পৃষ্ঠা ২৯, দারুল ইশাআত করাচি।

আমরা হযরত হুজর বিন আদি সম্পর্কে যা কিছু লিখেছি, তার সারকথা হলো এই যে, তাঁর কর্মকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের অধীনে আসত, তাই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে যে আচরণ করেছেন, তাতে তিনি ওজরপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, হযরত হুজর বিন আদি এই বিদ্রোহের কারণে ফাসেক সাব্যস্ত হয়েছেন। বরং উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, বিদ্রোহকারী যদি বিদআতি না হয় এবং নেক নিয়তের সাথে নির্ভরযোগ্য দলিল ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে যদিও তার ওপর বিদ্রোহীদের (আহলে বাগি) বিধানই জারি হবে, কিন্তু এই কারণে তাকে ফাসেক বলা যাবে না। যেমন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এতে জমহুর আহলে সুন্নাতে মতে হক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিল, তাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে বিদ্রোহীদের মতো আচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

এই যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনেক সঙ্গী শহীদও হয়েছিলেন এবং এটা স্পষ্ট যে, তাদের শাহাদাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন ইমামে বরহক। কিন্তু এই কারণে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ফাসেক সাব্যস্ত করা হয়নি বরং তাঁকে মুজতাহিদে মুখতি বলা হয়েছে। [১]

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি মাদাজিল্লুহুম শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদিসে দেহলভি রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ‘তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া’-এর একটি ইবারত সম্পর্কে, যা এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু কিছুটা জটিল, মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

“হযরত শাহ সাহেবের এই ইবারত এবং এই ধরনের আরও কিছু ইবারত গভীরভাবে পাঠ করার পর আমি তাঁর অবস্থান যা বুঝেছি তা হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত যেহেতু অত্যন্ত মজবুত দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে ভুল ছিল এবং দুনিয়াবী বিধানের বিচারে তা বিদ্রোহের অধীনে আসত যা প্রকৃতপক্ষে কবির গুনাহ অর্থাৎ ফাসেকী। এই কারণেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েজ ও সঠিক ছিল। কিন্তু যেহেতু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, উভয়ের পক্ষ থেকেই এই কাজ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষের কারণে হয়নি বরং সংশয় ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছিল এবং যাই হোক তাদের কাছেও দলিল ছিল যা ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে হলেও তা ছিল সততাপূর্ণ, তাই আখেরাতের বিধানের বিচারে তাদের এই কাজ ভুলের অধীনে আসে, এজন্য তাদের প্রতি নিন্দা করা জায়েজ নয়। [২]”

হযরত মুফতি সাহেব মাদাজিল্লুহুম অন্য একটি প্রবন্ধে লিখেছেন:

“হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হোন বা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, উভয়ের পক্ষ থেকেই এই কাজ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষের কারণে নয়, বরং সংশয় ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছিল; এবং যাই হোক তারা নিজেদের কাছে এমন দলিল রাখতেন যা ভুল বোঝাবুঝির ওপর...

[১] হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ২২৫, ২২৬

[২] হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ২৩৯, ২৪০

ভিত্তি যাই হোক, কিন্তু তা ছিল সততাপূর্ণ, তাই পরকালীন বিধানের বিচারে তাদের এই আমল ইজতিহাদী ভুলের অন্তর্ভুক্ত হয়, এজন্য তাদের প্রতি বিদ্রোপ করা জায়েজ নয়।

এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন যে, জবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিয়ে জবেহ করা এবং এরপর তা খাওয়া অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে কবির গুনাহ, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর ইজতিহাদে একে জায়েজ মনে করেছেন। তাই যদি কোনো শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তি তা খেয়ে নেয়, তবে শরয়ি দলিলের দৃষ্টিতে তার এই কাজ কবির গুনাহ ও ফিসক, কিন্তু যেহেতু তা সততাপূর্ণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে, তাই সেই ব্যক্তিকে ফাসেক বলা হবে না। [১]

হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব (রহ.) “মাকামে সাহাবা”-তে এই বিষয়টি প্রতিটি দিক থেকে সমাধান করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আহলে সুন্নাতের মাযহাব এভাবে বর্ণনা করেন:

“পারস্পরিক বিবাদসমূহে (মুশাজারাতে) যদিও এক পক্ষ ভুলের ওপর ছিল এবং অপর পক্ষ হকের ওপর ছিল, আর উম্মতের ওলামায়ে কেরামের ইজমা এই বিবাদসমূহে হযরত আলী (কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহ)-এর হকের ওপর থাকা এবং তাঁর বিপরীতে যুদ্ধকারীদের ভুলের ওপর থাকার বিষয়টি পূর্ণ স্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার সাথে বর্ণনা করে দিয়েছে; কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর উল্লিখিত নসূসসমূহের ভিত্তিতে এ বিষয়েও সকলের ইজমা ও ঐক্য হয়েছে যে, যে পক্ষ ভুলের ওপর ছিল, তাদের সেই ভুলটিও মূলত ইজতিহাদী ছিল যা গুনাহ নয়, বরং এর ওপর একটি সওয়াব পাওয়ার প্রতিশ্রুতি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি হত্যা ও যুদ্ধের হাঙ্গামায় কারো পক্ষ থেকে বাস্তবে কোনো বিচ্যুতি বা গুনাহ হয়েও থাকে, তবে তারা সে জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন এবং তওবা করেছেন, যেমনটি অধিকাংশ হযরত থেকে এ জাতীয় কথা বর্ণিত হয়েছে।” [২]

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি (রহ.) এই মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন:

“জমহুর আহলে সুন্নাত স্বীকার করেন যে, হযরত আলী আল-মুরতাজার বিরুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়ার পদক্ষেপ শরয়িভাবে ভুল ও নাফরমানি ছিল, কিন্তু যেহেতু এর ভিত্তি ছিল ইজতিহাদী ভুলের ওপর, তাই আমরা তাঁকে অপারগ মনে করি, বরং তাঁকে ইজতিহাদের একটি সওয়াবের অধিকারী মনে করি।” [৩]

কথা থেকে যায় যে, একটি ভুল যদি মুজতাহিদ করেন তবে তাঁর গুনাহ হয় না বরং সওয়াব মেলে, আর যদি সেই একই ভুল কোনো সাধারণ মানুষ করে তবে তার গুনাহ হয়—এটি কি অবিচার নয়? এর উত্তরে হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দা.বা.) বলেন:

“এর উদাহরণ ঠিক এমন যে, যদি কোনো সনদপ্রাপ্ত ডাক্তার কোনো রোগীকে কোনো ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ভুল ওষুধ দিয়ে দেন এবং তাতে সেই রোগীর মৃত্যু ঘটে, তবে যদি এটি প্রমাণিত হয় যে তিনি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনে সততার সাথে ওষুধ দিয়েছিলেন, তবে দুনিয়ার কোনো আইন তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করে না। এর বিপরীতে যদি সেই একই ওষুধ কোনো সনদবিহীন...”

[১] মাসিক আল-বালাগ করাচি, জিলহজ ১৩৯০ হিজরি, পৃষ্ঠা ৭৬

[২] মাকামে সাহাবা, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬

[৩] শরীয়ত ও তরিকত কা তলাজুম, পৃষ্ঠা ২৩৯, ত মাকতাবাতুশ শায়খ করাচি, ১৯৯৩ খ্রি.

হাতুড়ে ডাক্তার যদি কোনো রোগীকে ওষুধ দেয় এবং তার ফলে তার মৃত্যু ঘটে, তবে দুনিয়ার প্রতিটি আইন তাকে পাকড়াও করে। পার্থক্য এই যে, ভুল থেকে দুনিয়ার কোনো মানুষই নিরাপদ নয়। তবে তার দায়িত্ব ছিল ভুল থেকে বাঁচার জন্য যত উপায় হতে পারে, সেগুলো পুরোপুরি অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি ডাক্তার হতে চায়, তার জন্য উপায় হলো সে যেন চিকিৎসা বিজ্ঞান দক্ষ উস্তাদদের থেকে অর্জন করে এবং তাদের থেকে তা শোনে। এরপর যদি তার থেকে কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে এটি এমন ভুল যা থেকে কোনো মানুষই নিরাপদ থাকার গ্যারান্টি দিতে পারে না। একইভাবে একজন আলেমের জন্য বাহ্যিক উপায় হলো তিনি কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ ইলম যথাযথভাবে অর্জন করবেন, দক্ষ উস্তাদদের থেকে তার প্রশিক্ষণ নেবেন; এরপর যদি তার থেকে ভুল হয়, তবে তা একজন দক্ষ ডাক্তারের ভুলের মতো নিন্দনীয় হবে না। এর বিপরীতে যে ব্যক্তির ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই, তার উদাহরণ হাতুড়ে ডাক্তারের মতো এবং তার ভুল নিন্দনীয় ও পাকড়াওযোগ্য। [১]

আকাবিরদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, আহলে সুন্নাত সর্বদা শরয়ী মাসআলার অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, রাফেযীদের মতো কাজ করেন না। এটিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইজতিহাদী ভুল এবং প্রকাশ্য নাফরমানির মধ্যে পার্থক্য কী এবং কারা ইজতিহাদ করার যোগ্য আর কারা নয়। আর এটিও যে, খুরুজ ও বগাওয়াত-এর হুকুম সর্বদা প্রযোজ্য হয় না, বরং কিছু ক্ষেত্র ব্যতিক্রমও রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং স্পষ্ট উদাহরণ হলো সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.), তাদের এই ধরনের বিচ্যুতিকে নাফরমানি ও গুনাহ বলা হয় না এবং শরয়ী ও যৌক্তিক দলিলের বিচারে এটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ অবস্থান।

ওয়াকায়ে জামালের একটি নতুন ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: ইন্টারনেট ও ইতিহাসে কোর্স করানো এক ব্যক্তি জঙ্গ জামাল ইত্যাদির ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, হযরত আলী (রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.), হযরত যুবাইর (রাযি.) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে নিজেদের মধ্যে শুরু থেকেই একমত ছিলেন। ফিতনাবাজ সাবায়ীদের অন্ধকারে রাখার জন্য উভয় দল নিজেদের মধ্যে মতভেদের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে যাতে সাবায়ীরা যেকোনো একটি দলের সাথে সন্তুষ্ট থাকে এবং এরপর উভয় দল সুযোগ বুঝে তাদের হত্যা করে ফেলে। হযরত আলী (রাযি.) একারণেই হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর (রাযি.)-কে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এজন্যই তারা মদিনা থেকে যাওয়ার পরও বেশ কিছু দিন মক্কায় অবস্থান করেন এবং এতদিন পর রওনা হন যে, এর মধ্যে হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর (রাযি.) বসরার সাবায়ীদের চিনে ফেলেছিলেন। হযরত আলী (রাযি.)-ই তাদের এই গোপন টাস্ক দিয়ে বসরায় পাঠিয়েছিলেন যে, যেসব লোকের ওপর সরকারি সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি নিজে হাত দিতে পারছেন না, তারা যেন তাদের শেষ করে দেন। জঙ্গ জামালের ব্যাপারে এই গবেষক সাহেব বলেন যে, হযরত আলী (রাযি.) সাবায়ীদের জামালের ময়দানে নিয়ে এসে...

[১] ফাতাওয়া উসমানী ১০/১৮২, ১৮৩।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে হত্যা করাতে চেয়েছিলেন। তিনি এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ভেতর থেকে এক ছিলেন। কিন্তু এগুলো ছিল অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়, তাই হযরত আলী (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের কাছেও এই সত্যগুলো প্রকাশ পায়নি, বর্ণনাকারীরা কীভাবে তা জানতে পারত। তাই বর্ণনাকারীরা যা বাহ্যিকভাবে দেখেছিল তাই লিখেছে। আসল সত্য ছিল অন্য কিছু।

আপনার কাছে জিজ্ঞাসা এই যে, এই ঐতিহাসিক গবেষণা সঠিক কি না? এটি মেনে নিতে বাধা কোথায়? কারণ এটি সাহাবীদের মহানুভবতা এবং চরিত্রের উচ্চতার অধিক নিকটবর্তী।

উত্তর: সাহাবীদের মহানুভবতা এবং উচ্চ চরিত্র কি চৌদ্দ শতাব্দী পর প্রথমবারের মতো এই গবেষক সাহেবই বুঝেছেন? এর আগে কি পুরো মুসলিম উম্মাহ ঘুমিয়ে ছিল? এই সব কথা নিছক অনুমান মাত্র। এগুলোকে কীভাবে “গবেষণা” বলা যেতে পারে? গবেষণার যে নীতি ও নিয়ম নির্ধারিত আছে, সেগুলো কি এখানে পূর্ণ হচ্ছে?

হ্যাঁ, এই অনুমানটি আকর্ষণীয় এবং মনঃপূত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি সহীহ হাদীস এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে পদে পদে সাংঘর্ষিক, যা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীদের এই দুই দলের মধ্যে উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে না হলেও, কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে অবশ্যই কঠোর মতপার্থক্য ছিল। যদি তাদের মধ্যে সব বিষয়ে ঐক্য থাকত, তবে “ইজতিহাদী মতপার্থক্য” কোন বিষয়ে ছিল? আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম কেন এক পক্ষকে সঠিক (মুসীব) এবং অন্য পক্ষকে ভুলকারী (মুখতী) হিসেবে গণ্য করেন? সহীহ হাদীসসমূহে সেই সময়ের উভয় পক্ষকে স্পষ্ট শব্দে “ফিয়াতান” (দুটি দল) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যদি কোনো মতপার্থক্য না থাকত, তবে কেন “ফিয়াতান” বলা হলো? [১]

হাদীসে সেই সময়কালকে “ইন্দা ফিরকাতিন মিনাল মুসলিমীন” (মুসলমানদের বিভক্তির সময়) বলা হয়েছে। যদি কোনো মতপার্থক্য না থাকত, তবে কেন “ফিরকাহ” শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হলো? [২]

হাদীসে “তাকতুলু ফিয়াতানি আজিমাতানি” শব্দ এসেছে। অর্থাৎ দুটি বড় দলের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধ হবে এবং তাদের মধ্যে এক পক্ষকে “আওলাত তয়িফাতাইনি বিল হাক্ক” (অধিকতর সত্যপন্থী) বলা হয়েছে। যদি যুদ্ধ কেবল সাবায়ীদের সাথেই হতো, তবে হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হতো যে, এক দল সত্যপন্থী এবং অন্য দল ধর্মহীন হবে। [৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যুবায়ের (রা.)-কে বলেছিলেন যে, “লাতুকাতিলামাহ ওয়া আনতা জালিমুন” অর্থাৎ তুমি একদিন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি হবে। [৪] এই হাদীসকে কি অস্বীকার করা হবে?

যদি কোনো মতপার্থক্য না থাকত, তবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যুদ্ধবিরতির দলিলে হযরত আলী (রা.)-এর নামের সাথে “আমীরুল মুমিনীন” শব্দটি মুছে ফেলার জন্য কেন জোর দিয়েছিলেন? [৫]

[১] “লা তাকুমুস সাআতু হাত্তা তাকতুলা ফিয়াতানি আজিমাতানি” (মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হা: ১৮৬৫৮)

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫০৭

[৩] “তামরুকু মারিকাতুন ইন্দা ফিরকাতিন মিনাল মুসলিমীন ইয়াকতুলুহা আওলাত তয়িফাতাইনি বিল হাক্ক।” (সহীহ মুসলিম, হা: ২৫০৭) “লা তাকুমুস সাআতু হাত্তা তাকতুলা ফিয়াতানি আজিমাতানি দাওয়াহমা ওয়াহিদাতুন, তামরুকু বাইনাহমা মারিকাতুন, ইয়াকতুলুহা আওলাত তয়িফাতাইনি বিল হাক্ক।” (মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হা: ১৮৬৫৮)

[৪] মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৫৫৭৪ সহীহ সনদে; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৮৩৭

[৫] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩১৮৭

“উক্ত গবেষক”-এর এ কথা বলা যে, উভয় দল মতভেদের প্রদর্শনী করে সাবায়ীদের ধোঁকায় ফেলছিল, তা নিছক একটি কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা এজন্য সৃষ্টি হয়েছে যে, “গবেষক সাহেব” সাবায়ীদের হযরত আলী (রা.)-এর ওপর প্রভাবশালী মনে করছেন। (যেমনটি মারওয়ানিয়া ফেরকারও মতবাদ।) অথচ প্রকৃতপক্ষে জমহুর মুসলিমদের মোকাবিলায় সাবায়ীরা এমন কোনো বড় শক্তি ছিল না যে, হযরত আলী (রা.)-কে এমন সুদূরপ্রসারী কৌশল অবলম্বন করতে হতো। যদি অস্ত্র সমর্পণকারী বিদ্রোহীদের হত্যা করার শরয়ি অবকাশ থাকত, তবে হযরত আলী (রা.) কেবল হিজাজের সাহাবী ও তাবয়ীদের মাধ্যমেই সাবায়ীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারতেন। একইভাবে তাঁর হযরত তালহা (রা.) ও যুবাইর (রা.)-কে বসরায় পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। বসরায় তাঁর গভর্নর উসমান বিন হুнайফ (রা.) সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে একটি নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিলেই তিনি বসরার সাবায়ীদের, যারা সংখ্যায় মাত্র সাত-আটশ ছিল, নিজেই শায়েস্তা করতে পারতেন।

যদি সাহাবীদের উভয় দলের মধ্যে আদতে কোনো মতভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি না থাকত এবং সাবায়ীদের থেকে কিসাস নেওয়ার কর্মপদ্ধতির ব্যাপারেও উভয় দল একমত থাকত এবং সেই কর্মপদ্ধতিও যদি নির্ধারিত থাকত যে, উভয় দল একে একে ইরাক পৌঁছে সম্মিলিত শক্তিতে সাবায়ীদের ঘিরে ফেলবে, তবে তেমনটি হলো না কেন? এর পরিবর্তে ইরাক পৌঁছে উভয় দল সাবায়ীদের হাঙ্গামা সৃষ্টির কারণে কেন আপসে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো? হাঙ্গামা শুরু হওয়া মাত্রই তো তাদের বেছে বেছে সাবায়ীদের হত্যা করা উচিত ছিল? সুতরাং এই “অনুমাননির্ভর গবেষণা” জটিলতা নিরসন করে না, বরং শরয়ি, যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়।

একইভাবে এই কথাটিও ভ্রান্ত অনুমান যে, হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না এবং হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীতে অধিকাংশ সাবায়ী ছিল। হযরত আলী (রা.) তাদেরই হত্যা করানোর জন্য সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি সত্যিই এমন হতো, তবে হযরত আলী (রা.)-এর দুই মাস পর্যন্ত ছাউনি ফেলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে আলোচনার কী প্রয়োজন ছিল? সিমফ্রিনে রাতারাতি সাবায়ীদের তাবুগুলো ঘিরে ফেলে কেন তাদের কাজ খতম করে দেওয়া হলো না? এর পরিবর্তে সেখানে হযরত আন্সার বিন ইয়াসির, হযরত খুজাইমা বিন সাবিত, হযরত উবায়দুল্লাহ বিন উমর, হযরত যুল কালা হিমযারি এবং হযরত হাওশাব যি যুলিম-এর মতো ব্যক্তিবর্গ এবং মুহাদ্দিসগণের বর্ণনা অনুযায়ী সত্তর হাজার মানুষ কেন নিহত হলো? সাবায়ীরা তো সংখ্যায় এত বেশি ছিল না।

এটা বলা কতটা বোকামি যে, মূল বিষয়গুলো বর্ণনাকারীদের জানাই ছিল না। যদি সেই যুগের মানুষরা প্রকৃত অবস্থা জানতে না পেরে থাকেন, তবে কি চৌদ্দশ বছর পর “গবেষক সাহেব” “ওহী”-র মাধ্যমে তা জানতে পেরেছেন?

যদি বলা হয় যে, জামাল ও সিমফ্রিনে সাহাবীদের পরস্পর যুদ্ধরত মনে করা ইসলামী আকিদার পরিপন্থী, তবে কি বিগত চৌদ্দশ বছরে অতিক্রান্ত হাজার হাজার ফকীহ, মুহাদ্দিস, তার্কিক ও কালাম শাস্ত্রবিদ আলেম, যারা এই ঘটনাগুলোকে এভাবেই মেনে এসেছেন, তারা কি ভুল আকিদার ওপর ছিলেন? যদি বলা হয় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো যেভাবে প্রসিদ্ধ, তাতে বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা সৃষ্টি হয়, তবে কি এই নতুন কাহিনী থেকে আরও কঠিন বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা জন্ম নিচ্ছে না?

যদি এই ধরনের ভিত্তিহীন কথার অবকাশ থাকে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি সীরাত ও ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী রূপ দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে বলতে পারে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ওহুদ যুদ্ধের আগে...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

...এনেছিলেন। ওহুদ ও খন্দকে তারা মুশরিকদের নেতৃত্ব এই জন্য দিয়েছিলেন যাতে তাদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করিয়ে দিতে পারেন।

এর বিপরীতে কোনো রাফেযী এ কথাও বলতে পারে যে, তারা মক্কা বিজয়ের সময়ও অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজ পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়া। শিয়া-সুন্নি ঐক্যের পতাকাবাহী কোনো ব্যক্তি এই ‘গবেষণা’ও নিয়ে আসতে পারেন যে, হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান হযরত আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাকেই প্রকৃত খলিফা মনে করতেন, কিন্তু হযরত আলীর ইচ্ছাতেই তা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ হতে দেননি। তারা প্রতিটি কাজ হযরত আলীর অনুমতিক্রমেই করতেন; এই বিষয়গুলো গোপন ছিল, তাই কোনো বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করতে পারেননি।

এর বিপরীতে গবেষক সাহেবের মতো কেউ এই কাহিনীও সাজাতে পারেন যে, চতুর্থ খলিফা ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া। হযরত উসমান তারই জন্য গোপন অসিয়ত করেছিলেন কিন্তু আলী তা জানতেন না। এই কারণেই হযরত মুয়াবিয়া হযরত আলীর বায়আত গ্রহণ করেননি এবং এই কারণেই তিনি তার নামের সাথে ‘আমীরুল মুমিনীন’ শব্দ গ্রহণ করতেন না।

মোদ্দাকথা, এমন ‘ভিত্তিহীন গবেষণার’ কোনো শেষ নেই। এগুলো মেনে নেওয়া মানে হলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত ঐতিহাসিক বর্ণনা, ফিতনার যুগ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ, বিবাদসমূহ সম্পর্কে ইসলামের বিজ্ঞজনের মতামত এবং বিদ্রোহীদের সম্পর্কিত ফিকহী মাযহাবসমূহ—সবকিছু অস্বীকার করার নামান্তর। কোনো জ্ঞানবান এবং সুস্থ বিবেকের অধিকারী ব্যক্তি এগুলো গ্রহণ করতে পারেন না। এমন প্রচেষ্টার মাধ্যমে কি ‘উম্মাহর ঐক্য’-এর পথ উন্মুক্ত হবে নাকি দলাদলির মাঝে নতুন এক দলাদলির পথ সুগম হবে? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তা ভেবে দেখতে পারেন।

জঙ্গি সিফফিন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

(প্রশ্ন) জঙ্গি সিফফিনে সাহাবীদের দুটি বড় দল একে অপরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। এটা বলা যাবে না যে, এমনটা হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে হয়ে গিয়েছিল। কারণ যেভাবে অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে সীমান্তে আনা হয়েছিল, তারপর দুই-তিন মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান করেছিল, তা একটি সুসংগঠিত প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব নয়। আবার যুদ্ধও তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এটাও কোনো আকস্মিক বিষয় হতে পারে না। শুরুর মতো যুদ্ধের সমাপ্তিও চিন্তাভাবনা করেই করা হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা তো কবির গুনাহ বরং আকবারুল কাবায়ের। তা সত্ত্বেও এখানে মুসলমানদের হাতে মুসলমানরা নিহত হতে থাকল। পরিশেষে উভয় দলের কাছে এই রক্তপাতের শরয়ি বৈধতা কী ছিল?

যদি বলা হয় যে, এই সবকিছু সাবায়ীদের কারসাজি ছিল, তবে কি আমরা এটা মেনে নেব যে, মাতাযাল্লাহ উভয় পক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ও অপ্রকৃতিস্থ ছিল যে সাবায়ীদের কথায় প্ররোচিত হয়ে একটি অত্যন্ত হারাম কাজ এবং কবির গুনাহ তিন দিন পর্যন্ত করতে থাকল? এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, যাদের রাজনীতি কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিল, তারা এতই সহজ-সরল হয়ে গিয়েছিল যে সাবায়ীরা তাদের লড়িয়ে দিচ্ছিল? আচ্ছা, যদি মেনে নেওয়া হয় যে সাবায়ীরাই সবকিছু করছিল, তবে কি সাবায়ীদের প্ররোচনার কারণে তারা সবাই মরফুউল কলম হয়ে গিয়েছিল? তাছাড়া যদি এই লড়াইগুলো চিন্তাভাবনা ছাড়াই হঠাৎ হয়ে থাকত, তবে উভয় পক্ষের কাজকে ইজতিহাদ এবং তাদেরকে মাযুর কোন ভিত্তিতে বলা হবে? ইজতিহাদ তো তা-ই হয় যাতে খুব চিন্তাভাবনা করে শরয়ি দলিলসমূহ দেখে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু কারো প্ররোচনায় পড়ে কিছু মুসলমান একে অপরকে ভুল বোঝাবুঝির কারণে হত্যা করে ফেললে, তা কি ইজতিহাদ এবং সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হবে?

(উত্তর) উভয় পক্ষের পারস্পরিক লড়াইয়ে সাবায়ীদের ভূমিকা ছিল উস্কানি দেওয়া, ভুল তথ্য প্রচার করা এবং কোনো কোনো সময় সন্ধির আলোচনার সময় হাঙ্গামা সৃষ্টি করার পর্যায় পর্যন্ত। পরিস্থিতির লাগাম বড় বড় সাহাবীদের হাতে ছিল। তারাই ছিলেন উভয় পক্ষের নেতা। নাউযুবিল্লাহ তারা না তো কম বুদ্ধিমান ছিলেন, আর না মরফুউল কলম ছিলেন। তারা যা কিছু করেছেন, চিন্তাভাবনা করেই করেছেন। এই কারণেই উম্মত তাদের পদক্ষেপসমূহকে ‘ইজতিহাদ’ হিসেবে গণ্য করে। আর এই প্রশ্ন যে, উভয় পক্ষের কাছে এই পদক্ষেপের শরয়ি কারণ কী ছিল? তবে উভয় পক্ষের দলিল ছিল এই আয়াত: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ [১]

এতে আল্লাহ বিদ্রোহকারী দলের বিরুদ্ধে তলোয়ারের মাধ্যমে দমন করাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। যেহেতু অধিকাংশ মুসলমানের নিকট হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাদের নিকট হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর...

[১] “যদি এক দল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা বাড়াবাড়ি করা দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।” (সূরা আল-হুজুরাত: ৯)

...বাইয়াত থেকে বিরত থেকে কোনো অঞ্চলের ওপর দখলদার ব্যক্তিদের অবস্থান “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া” (বিদ্রোহী দল)-এর মতো হয়ে গিয়েছিল। [১]

অন্যদিকে সিরিয়াবাসীরা ইরাকবাসীদের “ফিয়াতুল বাঘিয়া” হিসেবে গণ্য করছিল, কারণ তাদের কাছে এই তথ্য ছিল যে, হযরত আলী (রা.)-এর শাসন পূর্ববর্তী খলিফার হত্যাকারীদের শক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তারা এই শাসনকে শরয়ি সরকারের পরিবর্তে একটি বিদ্রোহী দলের (ফিয়াতুল বাঘিয়া) সরকার মনে করত। সংক্ষেপে, উভয় পক্ষের একে অপরের সাথে যুদ্ধের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা একে অপরকে বিদ্রোহের (খুরুজ) অপরাধী মনে করছিল। আর যেহেতু বিদ্রোহকারী দলের সাথে যুদ্ধ করা শরয়িভাবে বৈধ বরং কোনো কোনো সময় অনিবার্য হয়ে পড়ে, তাই উভয় পক্ষ এই অবস্থানের ভিত্তিতেই সফফিনে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সুতরাং এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, উভয় পক্ষের কাছে যুদ্ধের কোনো শরয়ি কারণ ছিল না, বরং যুদ্ধের কারণ বিদ্যমান ছিল যা উভয় পক্ষের নিকট “খুরুজ” (বিদ্রোহ) ছিল। [২]

তবে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মুসলিম উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য (ইজমা) হলো যে, এই বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর মতই সঠিক ছিল। [৩]

[১] কারণ শরয়ি পরিভাষায় খুরুজ বা বিদ্রোহের অর্থ হলো, মুসলমানদের কোনো দল শরয়ি শাসকের আনুগত্য থেকে বিরত থাকা এবং কোনো অঞ্চলের ওপর দখলদার হওয়া। আল-নাসাফি বলেন: বিদ্রোহীরা হলো এমন একদল মুসলিম যারা ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে এবং কোনো শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, ইমাম তাদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদের সংশয় দূর করেছেন, অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছেন। (কানযুদ দাকায়িক, পৃ. ৩৯০, কিতাবুস সিয়্যার, বাবিল বুঘাত, তাবা দারুল বাশায়ের)

আদ-দুররুল মুখতারে রয়েছে: যখন কোনো মুসলিম দল তার (ইমামের) আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং কোনো শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তিনি তাদের দাওয়াত দেবেন এবং তাদের সংশয় দূর করবেন। যদি তারা অটল থাকে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ যতক্ষণ না তাদের দল ছত্রভঙ্গ হয়। (রদুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার লি-ইবনে আবিদিন শামি: ৩/৪৪৪)

[২] এই বিষয়টি হযরত আলী (রা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন: “তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ধারণা করেছিল যে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং আমরা ধারণা করেছিলাম যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা যুদ্ধ করেছি।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৫/২২৫)

লেখকের মতে, “কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দুটি বিশাল দল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের দাবি হবে অভিন্ন” (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ১৮৬৫৮) - এই হাদিসে উভয় পক্ষের দাবি অভিন্ন হওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত অর্থ এটিও হতে পারে যে, উভয় পক্ষই একে অপরকে বিদ্রোহের অপরাধী মনে করত।

[৩] উলামায়ে কেরামের ইজমা হলো যে, এই যুদ্ধগুলোতে হযরত আলী (রা.) মুজতাহিদ মুসিব (সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত গবেষণাকারী) ছিলেন এবং তার ওপর আনুগত্যযোগ্য ইমামের বিধান প্রযোজ্য হতো। তার বিরোধীদের পক্ষ থেকে ইজতিহাদি ভুল হয়েছিল যার ওপর তিরস্কার প্রযোজ্য হতো। উম্মতের কয়েকজন মহান মনীষীর মতামত নিচে দেওয়া হলো যার মাধ্যমে এই বিষয়ে জমহুরের নিকট ইজমা হওয়া প্রমাণিত হবে:

যুদ্ধরত উভয় পক্ষ সম্পর্কে বড়দের বক্তব্য:

ইমাম আবু মনসুর আসফারায়িনি (রহ.):

“তারা সফফিনের ব্যাপারে বলেছেন যে, সত্য হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও তার সঙ্গীরা একটি ব্যাখ্যার (তাউইল) ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যাতে তারা ভুল করেছিলেন, তবে তাদের ভুলের কারণে তাদের কাফের বলা যাবে না।” (আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ৩৩৩)

কাজী আয়াজ মালিকি (রহ.):

“জমহুরের মতে হযরত আলী (রা.) এবং তার সঙ্গীরা ইমামত রক্ষা করতে এবং যারা তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল তাদের সাথে যুদ্ধ করতে সত্যের ওপর ছিলেন।” (ইকমালুল মুয়াল্লিম বি-ফাওয়াইদি মুসলিম, শারহু সহিহ মুসলিম: ৮/৩২২)

[৪] এবং তার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) বাণী ‘আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’, এতে এই কথার স্পষ্ট দলিল রয়েছে যে সত্য হযরত আলী (রা.) এবং তার দলের সাথে ছিল, যদিও অপর পক্ষ ইজতিহাদি কারণে অপারগ ছিল। (ইকমালুল মুয়াল্লিম বি-ফাওয়াইদি মুসলিম: ৮/৩৫৯)

ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি (রহ.):

“ইমামুল হারামাইন হযরত আলী (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন: ‘তিনি ছিলেন সত্য ইমাম, এবং তার সাথে যুদ্ধকারীরা ছিল বিদ্রোহী।’” (কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৩৩৩) — (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত আলী (রা.) কি অসহায় ছিলেন নাকি ক্ষমতাশালী?

প্রশ্ন: আমাদের ধারণা হলো যে, হযরত আলী (রা.) কিসাস গ্রহণ করেননি কারণ তাঁর কাছে শক্তি ছিল না, তিনি অসহায় ও বাধ্য ছিলেন। সাবায়ীরা তাঁর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আহলে জামাল এবং আহলে শাম হযরত আলী (রা.)-এর চারপাশে সমবেত সাবায়ীদের আধিপত্য খতম করার জন্য এবং তাঁকে মুনাফিকদের বেষ্টনী থেকে বের করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর লাচার, অসহায় ও বাধ্য হওয়ার...

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকী (রহ.):

[১] “আমরা হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড থেকে নির্দোষ হওয়ার সপক্ষে সেই ঘটনাগুলো দলিল হিসেবে পেশ করি যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর বায়আত সম্পন্ন হয়েছিল (যদি তিনি হত্যাকারী হতেন তবে সাহাবীগণ তাঁর বায়আত গ্রহণ করতেন না)। এরপর তাঁর সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করা, হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া, তাঁর অসংখ্য ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়গুলো যা ইলম ও মারেফাত সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সুপরিচিত, এই সব বিষয়ই এই কথার দলিল যে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তারা ছিল বিদ্রোহী। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) আগেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমাদের বিন ইয়াসির (রা.)-কে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে, অতঃপর তাঁকে সেই লোকেরাই হত্যা করেছে যারা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।” (আল-ইতিয়াদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস: পৃষ্ঠা ৩২৭, ত: দারুল আফাক)

[২] “হযরত আলী (রা.) থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, তিনি যাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তা ছিল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থীদের যুদ্ধ।” (আল-ইতিয়াদ: পৃষ্ঠা ৪৫৪)

[৩] “যে ব্যক্তিই আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর শাসনকালে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, সে ছিল বিদ্রোহী। আমি আমার মাশায়েখদের এই আকিদার ওপরই পেয়েছি এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহ.)-ও এই কথাই বলেছেন। এরপর হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাননি; কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: কিয়ামত কায়ম হবে না যতক্ষণ না দুটি বড় দল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে, তাদের উভয়ের দাবি এক হবে।” (আল-ইতিয়াদ: পৃষ্ঠা ৪৫৬)

ইমাম নববী (রহ.) ‘হাদীসে আমাদের’-এর ব্যাখ্যায়:

[১] “এই হাদীসে আহলে সুন্নাতের (এই আকিদার) দলিল রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সঠিক পথে ছিলেন এবং অন্য পক্ষ ছিল বিদ্রোহী। বিশেষ করে নবী করীম (সা.)-এর এই বাণীর আলোকে যে, আমাদেরকে (বিদ্রোহী) দুই দলের মধ্যে সেই দল হত্যা করবে যারা হকের নিকটবর্তী হবে।” (শরহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআহ)

[২] “এই বর্ণনাগুলো এই কথার স্পষ্ট দলিল যে, হযরত আলী (রা.)-ই সঠিক এবং হকের ওপর ছিলেন এবং অন্য দল অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথীরা অপব্যর্থতার (তাভীল) মাধ্যমে বিদ্রোহকারী ছিল।” (শরহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআহ)

হাফেজ যয়নুদ্দীন আল-ইরাকী:

“উভয় দলের মধ্যে হকের ওপর কে ছিলেন তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইবনে জারীর তাবরীর দ্বিধার কোনো অর্থ হয় না, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ রয়েছে যে, আমাদেরকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। এই কারণেই লেখক এই হাদীসের ওপর অধ্যয়ন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ‘আল-বুগাত’ (বিদ্রোহীগণ) শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমনটি আমরা হকের বর্ণনা দিয়েছি যে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধকারী দল বিদ্রোহী ছিল যদিও তারা অপব্যর্থতা (তাভীল) করছিল। তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা হকের অন্বেষণকারী ছিল, তাই তাদের নিন্দা করা হবে না বরং ইজতিহাদের কারণে তারা সওয়াব পাবে। বিশেষ করে সাহাবীগণের ব্যাপারে আমাদের উচিত তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা।” (তরহুস তাসরীব: ৭/২৪৮)

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

তারীখে মিল্লাতে মুসলিমা

প্রমাণের জন্য তাদের এই উক্তিই যথেষ্ট যা তারা হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.)-এর পক্ষ থেকে কিসাস দ্রুত গ্রহণের দাবির জবাবে বলেছিলেন: “আমি এমন এক কওমের সাথে কী করতে পারি যারা আমাদের ওপর কর্তৃত্বশীল হয়ে গেছে এবং আমরা তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল নই।” [১]

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৪৪৭।

বর্তমান পৃষ্ঠার ঢাকা:

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ঢাকা অবশিষ্টাংশ:

ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আর-রাযী (রহ.):

“হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহী দলের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর সাথে বড় বড় সাহাবী ও বদরী সাহাবীগণও ছিলেন... হযরত আলী (রা.)-এর এই যুদ্ধের বিষয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও তাদের অনুসারী ছাড়া আর কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। যাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন তারা বিদ্রোহী ছিল। নবী করীম (সা.) আমাদের (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। এই হাদীসটি এতই প্রসিদ্ধ ও মুতাওয়াতির যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তা অস্বীকার করতে পারেননি।” (আহকামুল কুরআন লিল-রাযী: ৩/৪২২, ত. ইলমিয়াহ)

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.):

- বিদ্রোহের কারণে তাদের ঈমান থেকে বের করে দেওয়া হয়নি এবং তাদের থেকে ‘ভ্রাতৃত্ব’ নামটিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে বলেছেন: “নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।” (আল-হুজুরাত, ১০)
- আর আমাদের (রা.) সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর বাণী: “তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।”
- ইবনুল আরাবী তাঁর তাফসীরে বলেন: আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়...” এটিই মুসলমানদের মধ্যে যারা বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল ভিত্তি। সাহাবায়ে কেরাম এই আয়াতের মাধ্যমেই দলিল পেশ করেছেন। নবী করীম (সা.)-এর বাণী দ্বারাও এটি প্রমাণিত যে, আমাদের (রা.)-কে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। ৱাঈজদের সম্পর্কে তাঁর বাণী ছিল যে, তারা এমন এক সময়ে বের হবে যখন মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং সত্যের অধিক নিকটবর্তী দলটি তাদের হত্যা করবে। আর হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-ই তাদের হত্যা করেছিলেন। সুতরাং উলামায়ে ইসলামের নিকট এটি সাব্যস্ত ও অকাট্য দলিল যে, হযরত আলী (রা.) ইমাম ছিলেন এবং তিনি সত্যের ওপর ছিলেন। আর যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তারা ছিল বিদ্রোহী। (আহকামুল কুরআন লি-ইবনিল আরাবী, সূরা হুজুরাত)

আল্লামা ইবনে রুশদ আল-মালিকী (রহ.):

- ইবনে রুশদ জঙ্গ জামাল (উটের যুদ্ধ) প্রসঙ্গে বলেন: “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামগণের বক্তব্য হলো: হযরত আলী (রা.) সত্যের ওপর ছিলেন এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেছে তারা সঠিক ও সত্যের ওপর ছিল। আর হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-এর বিষয়টি ছিল এই যে, তারা উভয়েই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং তিনি সত্যের ওপর ছিলেন। হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-এর ইজতিহাদ ভুল ছিল, তবে যেহেতু তারা মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তাদের ওপর সেই ইজতিহাদই ওয়াজিব ছিল যা তারা করেছিলেন।” (আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল: ১৭/৩৬১)
- “আর যে কথাটি আমরা বলেছি যে, তারা সবাই ইজতিহাদ করেছেন, অতঃপর হযরত আলী (রা.) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.) ভুল করেছেন, এটিই সঠিক কথা যার ওপর বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক। সুতরাং হযরত আলী (রা.) তাঁর ইজতিহাদের কারণে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-এর জন্য তাদের ইজতিহাদের কারণে একটি সওয়াব রয়েছে।” (আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল: ১৭/৩৬১)

(বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

দ্বিতীয় অংশ | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

অর্থাৎ তারা আমাদের ওপর চেপে বসেছে। তাদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এতে বোঝা গেল যে, হযরত আলী (রা.)-এর কিসাস না নেওয়াটা ছিল নিরুপায় হওয়ার কারণে। আপনি একে কোন দলিলের ভিত্তিতে ফিকহি মাসআলা হিসেবে গণ্য করছেন?

উত্তর: যখন ইসলামি ফিকহ এটাই বলে যে, হযরত আলী (রা.) যা করছিলেন তা-ই ছিল দ্বীন ও শরিয়তের দাবি এবং এর ওপরই উম্মতের ফকিহগণের ইজমা (ঐক্যমত) হয়েছে, তখন একে নিরুপায় অবস্থা বলার কী প্রয়োজন? এমন পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে যে—

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

হাফেজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি (রহ.):

وكان قاتل تلك الطائفة امير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهو صاحب الحق بلاريب، ولذلك سخر عليه الصلوة والسلام بمن عمار قتلته الفئة الباغية، وكان علي على السابق الى الامامة فمن نازعه فخطى مأجور مجتهد.

“এই জামাত (খারেজিদের) সাথে আমিরুল মুমিনীন আলী (রা.) যুদ্ধ করেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে হকের ওপর ছিলেন। এজন্যই নবী (সা.) আমাদের (রা.)-এর ব্যাপারে খবর দিয়েছিলেন যে, তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। আর আলী (রা.) ইমামতের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন, যারা তার সাথে বিবাদ করেছে তারা ভুলকারী, তবে তারা ইজতিহাদকারী হওয়ার কারণে সওয়াবের অধিকারী।” (আল-মুকাদ্দিমাতুয যাহরা, পৃষ্ঠা ১৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.):

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই বিষয়ে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) উলামায়ে কেরামের সাথে সামান্য দ্বিমত পোষণ করে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) নিশ্চিতভাবেই হকের ওপর ছিলেন এবং সিরিয়াবাসী (শামবাসী) নিশ্চিতভাবেই বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তাদের যুদ্ধ করা জায়েজ ছিল না, বরং তা ছিল অনুত্তম (খিলাফে আওলা)। (যেমনটি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)-এর মত, যা তিনি ‘ইয়ালাতুল খাফা’ গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই বিষয়ে যারা ‘আযীমত’ (দৃঢ়তা) পালন করেছেন তারা তারাই ছিলেন যারা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন। যাই হোক, জমহুর উলামায়ে কেরামের সাথে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতের যে পার্থক্য তা কেবল দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, যা খুবই সামান্য। তিনি লিখেছেন:)

.

ফাসাহাব মুয়াবিয়া ইন কান রুদ বাগাও ক্ববলিল ক্বিতাল লিকাওনিহিম লাম ইউবায়িউছ আলাইহা ফালাইসা ফিল আয়াতিল আমরি বিক্বিতালি মান বাগা ওয়া লাম ইউকাতিল।

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথীরা যুদ্ধের আগে থেকেই বিদ্রোহ করে ফেলেছিলেন, কারণ তারা হযরত আলী (রা.)-এর বায়াত গ্রহণ করেননি। কিন্তু আয়াতে এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ নেই যারা বিদ্রোহ করেছে কিন্তু যুদ্ধ শুরু করেনি।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৫/৫৩)

.

ফাভাফাফা আহলুস সুন্নাতি আলা আম্মাহ লা তুফাসসাকু ওয়াহিদাতুন মিনাত তযিফাতাইনি ওয়া ইন ক্বালু ফি ইহদাহুমা আম্মাহম বুগাতুন লিআম্মাহম কানু মুতাওয়্যিলিনা মুজতাহিদিনা ওয়াল মুজতাহিদু লা ইউকাফফারু ওয়া লা ইউফাসসাকু।

“আহলুস সুন্নাতের ঐক্যমত হলো যে, উভয় দলের কাউকেই ফাসেক বলা যাবে না। যদিও এক দল সম্পর্কে বলা হয় যে তারা বিদ্রোহী ছিল, কিন্তু তারা যেহেতু ব্যাখ্যাকারী ও মুজতাহিদ ছিল, আর মুজতাহিদকে কাফের বা ফাসেক বলা যায় না।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৩৯৩)

.

ওয়াক্বালা আইদান ফি শারহি হাদিস: তাফতিহুল ফিআতুল বাগিয়াতু ইয়াদউহুম ইলাল জাম্মাতি ওয়া ইয়াদউনাছ ইলাল নার। “ওয়া হাজা দালিলুন আলা সিহহাতি ইমামতিহি ওয়া উজুবু তযিয়াতিহি ওয়াম্মাদ দায়ি ইলা তযিয়াতিহি দায়িন ইলাল জাম্মাতি ওয়াদ দায়ি ইলা মুক্বাতিলতিহি দায়িন ইলাল নারি ওয়া ইন কানা মুতাওয়্যিলান, ওয়া হুয়া আসহুল্ল ক্বাওলাইনি লিআসহাবিনা ওয়াহুয়াল মুহকামু বিতখতিয়াতি মান ক্বাতলাছ ওয়াহুয়া মাজহাবু আইস্মাতিল ফুকাহায়ি আল্লাজিনা রাউ আলা জালিকাল ক্বিতালিল বুগাতিল মুতাওয়্যিলিনা।”

এই হাদিস হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত সঠিক হওয়ার এবং তার আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার দলিল। তাকে এবং তার আনুগত্যের দিকে আহ্বানকারী জাম্মাতের দিকে আহ্বানকারী এবং তার সাথে যুদ্ধের দিকে আহ্বানকারী জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী, যদিও সে ব্যাখ্যাকারী (মুতাওয়্যিল) হোক না কেন। আমাদের সাথীদের (হাম্বলি) দুটি মতের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সঠিক মত। আর এটিই সেই অকাট্য ফয়সালা যে, হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যারা যুদ্ধ করেছে তারা ভুলকারী ছিল। এটিই সেই ফকিহদের মাজহাব যারা ব্যাখ্যাকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার মাসআলা এখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৪/৪৩৭)

.

মাতা আম্মা আলিয়ান আওলা বিল হাক্বি মিন ফারিকেহি ওয়া মাতা আম্মা আম্মারান তাফতাহুল ফিআতুল বাগিয়াতু কামা জাতাত বিহীন নুসুসু ফায়ালিনা আন নু’মিনা বিক্বল্লি মা জাতা মিন ইন্দিম্মাহি ওয়া নুকাররু বিল হাক্বি ক্বল্লিহি ওয়া লা ইয়াকুনু লানা হাওয়া ওয়া লা নাতাকাল্লামু বিগাইরি ইলমিন বাল নাসলুকু সাবিলিল ইলমি ওয়াল আদলি ওয়া জালিকা হুয়াত্তিবাযুল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি। ফাম্মা মান তামাসসাকা বিবা’দিল হাক্বি দুনা বা’দিন ফাজালিকা মানশাউল ফিরক্বাতি ওয়াল ইখতিলাফ।

“এর সাথে সাথে এটাও সত্য যে, হযরত আলী (রা.) তার বিরোধী দলের তুলনায় হকের অধিক নিকটবর্তী ছিলেন। আর এটাও সত্য যে, আমাদের (রা.)-কে বিদ্রোহী জামাত হত্যা করেছে, যেমনটি নসুস (দলিল)-এ এসেছে। এখন আমাদের ওপর ওয়াজিব হলো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তার ওপর ঈমান আনা এবং পূর্ণ হককে স্বীকার করা। এতে আমাদের প্রবৃত্তি যেন शामिल না হয় এবং আমরা যেন ইলম ছাড়া কথা না বলি, বরং ইলম ও ইনসাফের পথে চলি। আর এটাই হলো কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ। তবে যারা হকের কিছু অংশ গ্রহণ করে আর কিছু বর্জন করে, সেটাই হলো দলাদলি ও মতভেদের উৎস।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৪/৩৩৯-৩৫০) (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যে পদ্ধতিতে কিসাস আদায়ের দাবি জানানো হচ্ছিল, তা সঠিক ছিল না এবং হযরত আলী (রা.) শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে অপারগ ছিলেন। এই শরয়ী প্রতিবন্ধকতা অস্বীকার করার সুযোগ কেবল তখনই তৈরি হতে পারে যখন এই শরয়ী বিধান এবং শরয়ী ইজমার...

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ:

আল্লামা যাইলায়ী (রহ.):

“আর এই বিষয়টি যে, সেই সময়ে হযরত আলী (রা.) হকের ওপর ছিলেন, তার দলিল হলো হযরত আম্মার (রা.)-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী যে, ‘তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।’ এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গীরা তাঁকে হত্যা করেছিল। ইমামুল হারামাইন ‘আল-ইরশাদ’-এ লিখেছেন: হযরত আলী (রা.) তাঁর সময়ে হকের ওপর ছিলেন এবং তাঁর বিরোধীরা বিদ্রোহী ছিল। তবে তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা আবশ্যিক যে, তারা কল্যাণেরই ইচ্ছা করেছিল যদিও ভুল করেছিল। আর এ বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) জঙ্গ জামাল ও সিফফিনে হকপন্থী ছিলেন। জঙ্গ জামালে তাঁর মোকাবিলায় ছিলেন হযরত তালহা, হযরত যুবাইর এবং হযরত আয়েশা (রা.) এবং তাঁদের সাথে যারা ছিলেন। আর সিফফিনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর বাহিনী ছিল, যারা বিদ্রোহী ছিল। আর হযরত আয়েশা (রা.)-ও নিজের ভুল প্রকাশ করেছিলেন, যেমনটি ইবনে আবদিল বার ‘আল-ইসতিয়াব’-এ ইবনে আবি আতিক অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আবু বকর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে বললেন: ‘হে আবু আবদুর রহমান! আপনাকে আমার এই সফর থেকে বিরত রাখতে কিসে বাধা দিয়েছিল?’ তিনি আরজ করলেন: ‘আমি দেখলাম যে, হযরত যুবাইর (রা.) আপনার মতের ওপর প্রবল ছিলেন।’ উম্মুল মুমিনীন বললেন: ‘আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাকে নিষেধ করতেন তবে আমি (এই সফরে) বের হতাম না।’” (নাসবুর রায়হ: ৪/৬৯, ৭০)

ইমাম শামসুদ্দীন কুরতুবী (রহ.):

“মুসলিম উলামায়ে কেরামের নিকট এটি স্থিরকৃত এবং শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রা.) ইমাম (খলিফা) ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই বিদ্রোহী ছিল, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব ছিল যতক্ষণ না তারা হকের দিকে ফিরে আসে।” (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত)

আল্লামা মারগিনানী, হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.):

“অত্যাচারী শাসকের (যে শরয়ী আইন অনুযায়ী শাসক হয়নি) পক্ষ থেকে পদ গ্রহণ করা বৈধ যেমনটি ন্যায়পরায়ণ শাসকের পক্ষ থেকে বৈধ। কারণ সাহাবায়ে কেরাম হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে পদ গ্রহণ করেছিলেন, অথচ হযরত আলী (রা.)-এর যুগে হক (সাংবিধানিক শাসন) তাঁরই হাতে ছিল।” (হিদায়া, কিতাব আদাবুল কাযী)

আল্লামা তাফতাজানী (রহ.):

“সালেফে সালেহীন ও মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর দলের ওপর লানত করার বৈধতা বর্ণিত হয়নি। কারণ তাদের বিষয়টি বড়জোর বিদ্রোহ ও খিলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থানের ছিল, আর এই বিষয়টি লানত করাকে ওয়াজিব করে না।” (শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়া, পৃষ্ঠা ৩৭৩)

ইবনুল ওয়াযীর আল-কাসিমী (রহ.):

“হযরত হাসান (রা.)-এর হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গীদের মুসলমান হিসেবে অভিহিত করেছেন। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তাওয়াতুর (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা) দ্বারা এটিও প্রমাণিত যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গীরা বিদ্রোহী ছিল, যেমনটি আম্মার (রা.)-এর হাদিসে এসেছে।” (আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম: ৪/১৭০) (অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

অস্বীকার করে কি এটা প্রমাণ করা যাবে যে ইসলামী ফিকহ ও শরীয়তের বিধান অন্য কিছু ছিল এবং তা হযরত আলী সম্পাদন করতে পারেননি। যদি দেখা যায় তবে ফিকহী বিধানসমূহ এ ব্যাপারে এতই স্পষ্ট যে তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। [১]

সুতরাং কিসাসের ব্যাপারে হযরত আলী-এর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এই অর্থ বের করা একেবারেই ভুল হবে যে তিনি একেবারেই অক্ষম ও বাধ্য ছিলেন।

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর তাদের ওপর কোনো জরিমানা নেই এবং তাদের ওপর কোনো হদ (শাস্তি) নেই, আর রক্তের ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো কিসাস নেই। (আল-ফিকহুল আবসাত লিল ইমাম আবু হানিফা, পৃ. ৩০)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

আল্লামা আলাউদ্দিন আল-কাসানি:

“রাসূলুল্লাহ আম্মার বিন ইয়াসির সম্পর্কে বলেছিলেন এবং তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন যে তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।” (আল-বাদায়ে ওয়াস সানায়ে: ৭/৩৩৩, ফাসল ফি আহকামিশ শহীদ)

হাফিজ ইবনে কাসীর আদ-দামেশকী:

১. “এটি আম্মার বিন ইয়াসির-এর শাহাদাতের ঘটনা যা হযরত আলী-এর সাথে ছিলেন। সিরিয়াবাসীরা তাকে হত্যা করেছিল। এর মাধ্যমে তা প্রকাশ হয়ে গেল এবং সেই রহস্য উন্মোচিত হলো যার খবর রাসূলুল্লাহ দিয়েছিলেন যে তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে হযরত আলী হকের ওপর ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া বিদ্রোহী ছিলেন।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/৫২৬)

২. “এই হাদিসটি নবুওয়াতের দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত যাতে রাসূলুল্লাহ আম্মার সম্পর্কে খবর দিয়েছিলেন যে তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে এবং সিরিয়াবাসীরা তাকে সিফফিনের যুদ্ধে হত্যা করেছিল যখন আম্মার হযরত আলী এবং ইরাকবাসীদের সাথে ছিলেন। আর হযরত আলী মুয়াবিয়ার চেয়ে হকের বেশি নিকটবর্তী ছিলেন। আর মুয়াবিয়া-কে বিদ্রোহী বলার কারণে তাদের কাফের বলা আবশ্যিক হয় না, যেমনটি শিয়া ও অন্যদের মতো পথভ্রষ্ট মুখ্দের ধারণা; কারণ তারা মূলত ইজতিহাদকারী ছিলেন যা তারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে করেছিলেন আর প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন না।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/৫৩৮)

৩. “(উভয় জামাতের মধ্যে) হযরত আলী এবং তাঁর সাথীরা হযরত মুয়াবিয়া-এর সাথীদের তুলনায় হকের বেশি নিকটবর্তী ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া-এর সাথীরা হকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধী ছিলেন। যেমনটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে আপনি আম্মার-কে বলেছিলেন তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/১৯৩)

আল্লামা ইবনে হাজার আল-হায়তামী:

১. “হযরত মুয়াবিয়া-এর জন্য তাঁর ইজতিহাদের কারণে একটি সওয়াব রয়েছে। আর যেখানে হযরত আলী-এর সম্পর্ক, তাঁর জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে; একটি তাঁর ইজতিহাদের ওপর, অন্যটি সঠিক হওয়ার ওপর।” (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা: ২/৬২৩)

২. “(হযরত মুয়াবিয়া-এর জামাত যদিও বিদ্রোহী ছিল কিন্তু তা এমন বিদ্রোহ ছিল না যাতে ফাসেকী হয়, কারণ তা একটি ব্যাখ্যার (তাবিল) ভিত্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল যাতে তাঁর সাথীরা ওজরপ্রাপ্ত ছিলেন।)” (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা: ২/৭১৭)

৩. “সুতরাং তাদের মধ্যে যারা হযরত আলী-এর সাথে যুদ্ধ করেছিল তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিল কিন্তু খারেজীরা ছাড়া বাকিরা গুনাহগার ছিল না। কারণ তারা ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন।” (মুখতাসার তাতহীরুল জানান, পৃ. ২৯)

(বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

খণ্ড ২

হ্যাঁ, তাদের যে সব পেরেশানি ও জটিলতা দেখা দিয়েছিল তারা তা অস্বীকার করত না। সাবায়ীদের ষড়যন্ত্রও অবশ্যই অব্যাহত ছিল, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে হযরত আলী (রা.) ক্ষমতাহীন ছিলেন। তিনি মুসলমানদের খলিফা ও সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। জঙ্গ জামাল...

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ:

কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম আল-হানাফী (রহ.) বলেন: “নিশ্চয়ই সত্য সেই সব যুদ্ধে আলীর সাথেই ছিল। আমাদেরকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে—রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণীর কারণে। আর তাকে মুয়াবিয়ার সাথীরাই হত্যা করেছিল, যা তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।”

অর্থাৎ সত্য আলীর সাথেই ছিল। কারণ তাদের বায়আত সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। জঙ্গ জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে তিনি হকের ওপর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আমাদের জন্য ইরশাদ করেছিলেন যে, তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। তাকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথীরাই হত্যা করেছিল, যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তারা বিদ্রোহী ছিল। (ফাতহুল কাদির: ৪/৩৬১, ত: দারুল ফিকর)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

- “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: ‘আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’—এটি একটি স্পষ্ট দলিল যে আলী (রা.) হকের ওপর ছিলেন এবং যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা ভুলকারী ছিল, যদিও তারা তাদের ইজতিহাদে ভুল করেছিল।” (ফাতহুল বারী: ১৩/৭৭, ত: দারুল মা’রিফাহ বৈরুত)
- “আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে—এই হাদীসটি এই কথার দলিল যে হযরত আলী (রা.) এই যুদ্ধে সঠিক পথে ছিলেন। কারণ আম্মারকে মুয়াবিয়ার সাথীরাই হত্যা করেছিল।” (ফাতহুল বারী: ১৩/৮৫)
- “এই হাদীসটি নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং হযরত আলীর একটি প্রকাশ্য মর্যাদা। এতে সেই সব নাসেবীদের প্রতিবাদ রয়েছে যারা বলে যে হযরত আলী (রা.) এই যুদ্ধগুলোতে সঠিক পথে ছিলেন না।” (ফাতহুল বারী: ১/৫৩৩)
- “আহলে সুন্নাতের জমহুর উলামাগণ সেই সব লোকদের সঠিক হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন যারা আলীর সাথে মিলে যুদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: ‘যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়...’। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা উভয় দলকে মুমিন বলেছেন। সুতরাং আহলে সুন্নাতের মাহাব হলো যে, উভয় দলের কাউকেই মন্দ বলা যাবে না। যদিও হযরত আলী (রা.) হকের ওপর ছিলেন এবং অপর পক্ষ বিদ্রোহী ছিল, কিন্তু তারা ইজতিহাদে ভুল করেছিল।” (ফাতহুল বারী: ১৩/৭৭)
- “হযরত আলী (রা.) এবং তার সাথীদের জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল যতক্ষণ না তারা হকের দিকে ফিরে আসে। এটিই হযরত আলী (রা.) এবং তার সাথীদের হকের ওপর থাকার দলিল।” (ফাতহুল বারী: ১৩/২৮৮)

ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন: “কোনো আলেমই হযরত আলীকে ভুলকারী সাব্যস্ত করেননি।” (এহয়াউল উলুম আদ-দীন: ১/১১৫)

আল্লামা মাহমুদ আল-আলুসী (রহ.) বলেন: “আহলে সুন্নাতের কিছু বিচ্ছিন্ন লোক ছাড়া সকলেই বলেন যে হযরত আলী (রা.) তার সমস্ত বিষয়ে হকের ওপর ছিলেন। তার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বিদ্রোহী ছিল, কিন্তু শিয়াদের আকিদার বিপরীতে তারা কাফের ছিল না।” (আল-আজউবাতুল ইরাকিয়াহ: ৩৮)

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন: “আহলে সুন্নাত একমত যে যারা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তারা হকের ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তবে এই ইজতিহাদী ভুল ক্ষমাযোগ্য।” (আন-নাহিয়াহ আন তন আমিরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া: ১/৭৩)

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলমান)

সিফফীন এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নেতৃত্ব তিনিই দিয়েছিলেন। তাঁর চারপাশে অধিকাংশ ছিল জানবাজ এবং দ্বীনদার লোক, মুনাফিক নয়। মুহাজির ও আনসারগণ তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। [১] তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী গভর্নরদের নিয়োগ করতেন এবং অধিকাংশ স্থানে তিনি সাহাবীদেরই নিযুক্ত করেছিলেন। [২] যদি সাবায়ীরা তাঁর ওপর প্রভাবশালী হতো, তবে অধিকাংশ প্রদেশের গভর্নরশিপ সাহাবীরা পেতেন না।

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] মুহাজির ও আনসারগণ প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাতে বায়াত হলেন, অতঃপর সাধারণ মানুষ তাঁর বায়াত গ্রহণ করল। (তারিখুত তাবারী: ৪/ ৪২৭); মুহাজির ও আনসারগণ প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাতে বায়াত হলেন। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, বর্ণনা নম্বর: ৪১৭); অতঃপর সাধারণ মানুষ তাঁর বায়াত গ্রহণ করল। (তারিখুত তাবারী: ৪/ ৪৩৩); জমহরের বক্তব্য: আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করা হয়েছে। (তারিখুত তাবারী: ৪/ ৪৩৩); সকল মানুষ তাঁর বায়াত গ্রহণ করল। (তারিখুত তাবারী: ৪/ ৪৩৫)

[২] কুফায় আবু মুসা আশআরী, অতঃপর কারাজা ইবনে কাব আনসারী, অতঃপর আবু মাসউদ আনসারী; মক্কায়ে আবু কাতাদা আনসারী, অতঃপর কুসাম ইবনে আব্বাস; ইয়ামেনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস; বসরায় উসমান ইবনে হুনাইফ, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা সকলেই সাহাবী ছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ: ২/ ২৩০; তারিখু খলিফা, পৃষ্ঠা: ২০০, ২০১)

বিগত পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

মোহাম্মাদ আলী কারী হানারী (রহ.):

- “এ কারণেই নবী (সা.) বলেছেন: ‘যখন আমার সাহাবীদের কথা আলোচনা করা হয়, তখন তোমরা বিরত থাকো।’ এর উদ্দেশ্য হলো তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা; কারণ কুরআনে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া ওয়াজিব। এছাড়াও উম্মতের জিন্মায় তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের প্রশংসা ও উত্তম দোয়ার মাধ্যমেই স্মরণ করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, মুজতাহিদদের মধ্যে যারা আলীর (রা.) বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে না। আর মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর দল বিদ্রোহী ছিল, যেমনটি আমাদের (রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত: ‘তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বিধান বর্ণনা করা এবং মুজতাহিদ যে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং যে ভুল করেছে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা। তবে এর সাথে সাথে সকল সাহাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের সকলের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা রাখা অপরিহার্য।” (মিরকাতুল মাফাতিহ: ৮/ ৩৩৯, কিতাবুল ফিতান, মাকতাবাতু দারুল ফিকর)
- “এই হাদীস দ্বারা হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের বৈধতা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিদ্রোহী হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা হয়।” (শরহে মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা, পৃষ্ঠা: ৪২৫)

ইমাম ইবনে হাজম জাহেরী (রহ.):

- “আমরা নিশ্চিতভাবে আলী (রা.)-এর সঠিকতা এবং তাঁর ইমামতের বৈধতার প্রবক্তা। তিনি সত্যের ওপর ছিলেন এবং তিনি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী—একটি ইজতিহাদের সওয়াব এবং অন্যটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সওয়াব। আর আমরা নিশ্চিতভাবে মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর সাথীদের মুজতাহিদ মনে করি যারা ভুল করেছেন। তারা তাদের ইজতিহাদের জন্য একটি সওয়াব পাবেন।” (আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল: ৩/ ১২৫)
- “অনুরূপভাবে নবী (সা.) সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমাদেরকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আলী (রা.) সত্যের ওপর ছিলেন এবং তিনিই প্রকৃত ইমাম। আর যারা তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল তারা ভুলকারী মুজতাহিদ ছিল। মুয়াবিয়া (রহ.) ভুলকারী মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তিনি একবার সওয়াব পাবেন।” (আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল: ৩/ ৫৩)

মাওলানা আব্দুল শাকুর লখনভী (রহ.):

‘আহলুস সুন্নাহর জরুরি আকিদা’ শিরোনামে তিনি লিখেছেন: “দ্বিতীয়ত সিফফীনের যুদ্ধ: যাতে একপক্ষে ছিলেন হযরত আলী (রা.) এবং অন্যপক্ষে ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)। এই যুদ্ধের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সিদ্ধান্ত হলো যে, হযরত আলী মুরতাজা (রা.) খলিফায়ে বারহাক ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর সাথীরা ভুল পথে ছিলেন। কিন্তু তাদের ভুল বলা জায়েজ নয়, কারণ তাঁরাও সাহাবী এবং ফযিলতের অধিকারী। তাঁদের এই ভুলটি ছিল ইজতিহাদী ভুল, যার পেছনে কোনো মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না।” (সীরাতে খুলাফায়ে রাশেদীন, পৃষ্ঠা: ৪৭৩, কুতুবখানা মজিদিয়া)

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

যখন নাহরাওয়ানে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে নিশ্চিতভাবে নেককার লোকদের সমাবেশ ছিল, যাদেরকে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে হযরত আলী (রা.) বলছিলেন: “আল্লাহর কসম! যদি খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সৈন্যদের জানা থাকত যে নবী করীম (সা.)-এর জবানীতে তাদের জন্য কী কী সুসংবাদের ওয়াদা করা হয়েছে, তবে তারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে সামান্যতম অবহেলা করত না।” এই সুসংবাদ শুনে ইরাকবাসীরা অত্যন্ত আত্মোৎসর্গের সাথে খারেজীদের সামরিক শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। [১] যদি হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হতো, তবে কেন তারা খারেজীদের তছনছ করত এবং কীভাবে এই সুসংবাদের হকদার হতো?

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২৫০৫, বাবু যিকরিল খারেজ, হাদীস: ৪৫১৬, বাবুতাহরীয আল কিতালিল খারেজ।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.):

“আর মুয়াবিয়া (রা.)-এর গণনা যে হযরত আমীর (আলী) (রা.)-এর সাথে হয়েছে, আহলে সুন্নাত তাকে কবে ভালো ও জায়েজ বলেছে? আহলে সুন্নাতের কোনো কিতাব যদি দেখা হতো, তবে দেখা যেত আহলে সুন্নাত তাদেরকে ‘আহলে বগি’ (বিদ্রোহী) বলে, কিন্তু ‘গাবিয়া’ (পথভ্রষ্ট) বলে না। আর এই ভুলের কারণে তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যাননি, যেমনটি আপনার এবং আপনার পূর্বসূরিদের ধারণা।” (হিদায়াতুশ শিয়া, পৃষ্ঠা ৩০, তাবা দারুল ইশাআত)

মাওলানা আনোয়ার শাহ কান্দাহরী (রহ.):

“لا وجه عندى ان الكلام فى حق الامير معاوية رضى الله عنه- لم انى قوله: تفعله الفئة الباغية- و صرح صاحب الهداية فى كآب القضاء ان الامر معاويه كان بغى على- على رضى الله عنه-”

“আমার নিকট তো কারণ এই যে, এই কথা হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: ‘তাকতুলুহুল ফিআতুল বাগিয়া’ (একটি বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে) পর্যন্ত। আর হিদায়া গ্রন্থকার স্পষ্ট করেছেন যে, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।” (ফয়জুল বারী শরহে বুখারী: ২/১৯৩)

মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দাহরী (রহ.):

“বিদ্রোহীর ওপর লানত করা জায়েজ নয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই সশস্ত্র সংগ্রামে যদিও বাহ্যত বিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু ইজতিহাদী ভুলের কারণে বলা যাবে না যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কবির গুনাহে লিপ্ত ছিলেন।” (খিলাফতে রাশেদা, পৃষ্ঠা ২১১)

মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী (রহ.) আম্মারের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

- [১] “এ থেকে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর জামাত বিদ্রোহী হওয়া জানা যায়।” (তাকরীরে সহীহ বুখারী: ২/১৬৬)
- [২] “আমাদের আকিদা হলো হযরত আলী (রা.) হকের ওপর ছিলেন এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর জামাত ভুলের ওপর ছিল, কিন্তু তাদের ওপর কোনো আপত্তি নেই। কারণ এটি ছিল ইজতিহাদী ভুল, আর ইজতিহাদী ভুলে কোনো পাকড়াও নেই বরং সওয়াব পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক মুসীব (সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তি) সওয়াবের অংশ পান, মুজতাহিদও সওয়াবপ্রাপ্ত হন।” (ঐ: ১৬৭)
- [৩] “قال والذى رحمه الله: عقيدتنا ان سيدنا عليا رضى الله عنه كان على الحق، وسيدنا معاوية رضى الله عنه وجماعته كانت على خطأ ولكن لا يعترض عليهم، لانه كان- خطأ اجتهاديا- (আমার পিতা (রহ.) বলেছেন: আমাদের আকিদা হলো আমাদের নেতা আলী (রা.) হকের ওপর ছিলেন এবং আমাদের নেতা মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর জামাত ভুলের ওপর ছিল কিন্তু তাদের ওপর আপত্তি করা যাবে না, কারণ তা ছিল ইজতিহাদী ভুল।)” (আল-কানযুল মুতাওয়ারী: ৩/১৬৭, কিতাবুস সালাত, বাবুতানি ফী বিনাইল মাসজিদ)

মাওলানা মুহাম্মদ নাফে (রহ.), মুহাম্মদী শরীফ ঝং:

“উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.) এবং তাঁর জামাতের জন্য এই মাসআলায় এই বিষয়টি সামনে ছিল যে, প্রতিপক্ষ আমাদের নিকট ‘আহলে বগি’ (বিদ্রোহী দল)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব যতক্ষণ না এই লোকেরা হকের দিকে ফিরে আসে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যিক।” (সীরাতে আলী আল-মুরতাজা, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫; সীরাতে আমীর মুয়াবিয়া (রা.), পৃষ্ঠা ২১৩)

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর বিদ্রোহী শব্দের প্রয়োগ (আল-ফিআতুল বাগিয়া বর্ণনা অনুযায়ী) ওই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ হযরত আলী আল-মুরতাজার সাথে তাঁর আঞ্চলিক বিভক্তির ভিত্তিতে সমঝোতা হয়নি।” (সীরাতে আলী আল-মুরতাজা, পৃষ্ঠা ৩৬৩)

মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.):

“এই হাদীসকে একভাবে এই কথার স্পষ্ট দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছে তাতে হযরত আলী (রা.) হকের ওপর ছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হুকুম হযরত আলী (রা.)-এর নিকট বিদ্রোহী জামাতের হুকুম ছিল।” (ইনআমুল বারী: ৩/১৯১)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত আলী (রা)-এর ক্ষমতায় থাকার একটি অকাট্য প্রমাণ এটিও যে, শেষ পর্যন্ত পূর্বদিকের অঞ্চলগুলোতে অভিযান পাঠানোর ধারা অব্যাহত ছিল। পারস্য ও কিরমানের অধিবাসীরা কর (খরাজ) দেওয়া বন্ধ করে দিলে চার হাজার ইরাকি সৈন্য গিয়ে বিশৃঙ্খলাকারীদের দমন করে। [১] এমনই এক অভিযানে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন। [২]

মুর্তাদদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পাঠানো হয়েছিল, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত মা'কাল বিন কায়েস (রা)। [৩]

একইভাবে বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে আরও অগ্রগতি হয়েছিল। হারিস বিন মুররা আল-আবদি (রা) মাকরান, কান্দাবিল (ঝাল মাগসি) এবং কাইকান (কোহ-এ-খায়ের খার)-এ অসাধারণ বিজয় অর্জন করেন। [৪]

ইয়াজিদ বিন রাশিদ নাজি নামক এক ধর্মহীন ব্যক্তি অনারব ও খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে একত্রিত করে বিদ্রোহ করলে হযরত আলী (রা) হযরত মা'কাল বিন কায়েস (রা)-কে পাঠান, যিনি এক শক্তিশালী আক্রমণের মাধ্যমে তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দেন। [৫]

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের (মুফসিদ্দীন) সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর এই উক্তি: “আমি সেই কওমের সাথে কী করব যারা আমাদের ওপর কর্তৃত্বশীল হয়ে পড়েছে অথচ তাদের ওপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই।”

এর বর্ণনাকারী সাইফ বিন উমর মুহাদিসগণের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল (যয়ীফ)। দুর্বল বর্ণনাকে সর্বদা এই শর্তে গ্রহণ করা হয় যে, তা যেন সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত সুদৃঢ় তথ্যের পরিপন্থী না হয়। হযরত আলী (রা) শরয়ী খলিফা হওয়া আহলে ইসলামের জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট আকিদাগত বিষয়, যা শক্তিশালী বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

অতএব, এর পরিপন্থী দুর্বল বর্ণনাকে হয় পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা হবে অথবা এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে।

আমাদের দৃষ্টিতে, এই উক্তিটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন যখন কোনো শান্ত শহরে চুরি-ডাকাতির ঘটনা শুরু হয়, তখন বলা হয়: “শহরে ডাকাতদের রাজত্ব চলছে।” এটি একটি রূপক প্রকাশভঙ্গি। এর অর্থ এই নয় যে, সরকারের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যদি সাবায়ীদের হযরত আলী (রা)-এর ওপর নিরঙ্কুশ প্রভাবশালী মনে করা হয়, তবে একদিকে যেমন হযরত আলী (রা)-এর শরয়ী খিলাফত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, অন্যদিকে শামের অধিবাসীরাও নিশ্চিতভাবে এই পরিস্থিতিতে প্রভাবশালী পক্ষ অর্থাৎ সাবায়ী নেতাদের সাথেই আলোচনা করত, হযরত আলী (রা)-এর সাথে নয়। সিফফিনে যুদ্ধবিরতির কথা সাবায়ীদের সাথেই বলা হতো। ৩৯ হিজরিতে সীমান্ত সম্মান রক্ষার চুক্তিও তাদের সাথেই করা হতো। ৪১ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত হাসান (রা)-এর পরিবর্তে সাবায়ী নেতৃত্বের সাথে সন্ধি করে ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করতেন।

যদি বলা হয় যে, সাবায়ীরা পর্দার আড়ালে থেকে হযরত আলী (রা) এবং হযরত হাসান (রা)-কে তাদের ইশারায় চালাচ্ছিল, তবে এটিও ভুল। কারণ এর দ্বারা এটি আবশ্যিক হয়ে পড়ে যে, সিফফিনে শামের অধিবাসীদের হযরত আলী (রা)-এর সাথে যুদ্ধবিরতি মূলত সাবায়ীদের...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/১৩৭, ১৩৮।

[২] শরহ মা'আনী আল-আসার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫১, কিতাব আল-সিয়ার, বাব ইয়াকুন আল-রাজুল বিহি মুসলিমা।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ১৯১; ফুতুহ আল-Buldan, পৃষ্ঠা ৭১, দার আল-হিলাল।

[৪] তারিখ আল-তাবারী: ৫/১৪২; ১৩২।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

...এর সাথে যুদ্ধ বিরতি ছিল। ৩৯ হিজরিতে সীমানা সম্মানের চুক্তিটি মূলত সাবায়ী রাষ্ট্রের সাথে করা হয়েছিল, যার অধীনে হযরত আলী (রা.) নামমাত্র আসীন ছিলেন। ৪১ হিজরির ঐক্য বাহ্যিকভাবে হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাবায়ীদের সাথে ছিল, যারা ইরাকের শাসন ক্ষমতা লাভ করেছিল। এভাবে এটাও মানতে হবে যে, সিরিয়াবাসীরা নিজেরা সাবায়ীদের মূলোৎপাটনে আন্তরিক ছিল না বরং এটি কেবল ক্ষমতার লড়াই ছিল। যদি সিরিয়াবাসীরা সাবায়ীদের জানী দুশমন হতো এবং ইরাকি সরকার সাবায়ীরা চালাত, তবে সিরিয়াবাসীদের কোনো অবস্থাতেই ইরাক সরকারের সাথে সমঝোতা করা উচিত ছিল না।

ভাবার বিষয় হলো, যদি হযরত আলী (রা.) বা হযরত হাসান (রা.)-এর ওপর সাবায়ীদের বা উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকত, তবে এই মহান ব্যক্তিগণ সুযোগ পেলেই পালিয়ে সিরিয়ায় কেন চলে গেলেন না? সিম্বলিফিকেশনে তো এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে যাওয়া তাদের জন্য মোটেও কঠিন ছিল না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম অসহায়ত্বের কারণে সাবায়ীদের ঘেরাও থেকে পালাতে পারছিলেন না, তবে সিরিয়াবাসীদের ওপর আবশ্যিক ছিল যে তারা যেকোনো মূল্যে সাহাবায়ে কেরামকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করত। তারা কেন সন্ধি করল? প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নে উপস্থাপিত বর্ণনাগুলো অত্যন্ত দুর্বল, যার ওপর বিশ্বাস করলে কেবল হাদিস ও ইতিহাসের ভাণ্ডারই কলঙ্কিত হয় না, বরং সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রেও কলঙ্কজনক দাগ লেগে যায়, যা থেকে এই মহান ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণ মুক্ত।

আলী (রা.)-এর লস্করে দশ হাজার সাবায়ীর কাহিনী এবং এর উত্তর:

প্রশ্ন: ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রা.)-এর লস্করে পুরো দশ হাজার সাবায়ী ছিল এবং তারা কিসাস গ্রহণে বাধা দিত। যখনই কিসাসের বিষয়টি সামনে আসত, তারা বাধা হয়ে দাঁড়াত। “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া”-তে আছে যে, আবু দারদা এবং আবু উমামা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর কাছে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি যদি উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণ করেন, তবে আমি সবার আগে বায়াত গ্রহণ করব। যখন তারা উভয়ই হযরত আলী (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং এই দাবি জানানলেন, তখন এক বিশাল জনতা বেরিয়ে এল এবং বলতে লাগল: “আমরা সবাই উসমানের হত্যাকারী, যে চায় আমাদের সাথে মোকাবিলা করুক।” [১]

দ্বিতীয় বর্ণনা “আল-আখবারুত তিওয়াল”-এ আছে, যাতে রয়েছে যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আবু মুসলিম খাওলানির মাধ্যমে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন যাতে এটিও লেখা ছিল:

“দ্বিতীয় কথা যার কারণে আপনি সন্দেহভাজন হয়েছেন তা হলো আপনার উসমানের হত্যাকারীদের আশ্রয় দেওয়া, তারা আপনার হাত ও বাহু, সাহায্যকারী এবং রাজদার (গোপন সহযোগী)। আমাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে আপনি তাদের রক্ত থেকে দায়মুক্তি প্রকাশ করেন। যদি এই কথা সত্য হয় তবে আপনি তাদের হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন, আমরা তাদের উসমানের বদলে হত্যা করব এবং সবার আগে আপনার (বায়াত)-এর দিকে ধাবিত হব। অন্যথায় আমাদের কাছে আপনার এবং আপনার সাথীদের জন্য তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই সত্তার কসম যার ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমরা উসমানের হত্যাকারীদের জলে ও স্থলে...”

[১] অতঃপর তাদের সামনে এক বিশাল জনতা বেরিয়ে এল এবং বলল, আমরা সবাই উসমানের হত্যাকারী, সুতরাং যার ইচ্ছা সে আমাদের লক্ষ্যবস্তু বানাক।

(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৫০৮, মিসর সংস্করণ)

খুঁজে বের করব এবং তাদের হত্যা করব অথবা আমাদের প্রাণ চলে যাবে।” [১]

আবু মুসলিম খাওলানি এই পত্র নিয়ে হযরত আলী-এর কাছে গেলেন এবং বললেন:

“নিশ্চয়ই উসমান মজলুম হিসেবে নিহত হয়েছেন। আপনি তাঁর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। আপনি আমাদের আমির হবেন।” [২]

পরের দিন যখন তিনি মসজিদে হযরত আলী-এর কাছে গেলেন, তখন দেখলেন যে দশ হাজার লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং চিৎকার করে বলছে যে আমরা সবাই উসমানের হত্যাকারী। আবু মুসলিম হযরত আলী-কে বললেন: “আমি আপনার সাথে এমন এক কওমকে দেখছি যাদের উপস্থিতিতে আপনার করার কিছু নেই। আমার ধারণা তারা জেনে গেছে যে আমি কী কাজে এসেছি। তাই তারা এই ভয়ে এমনটি করেছে যে পাছে আপনি তাদের আমার হাতে সোপর্দ করে দেন।” হযরত আলী জবাবে বললেন: “আমি এই বিষয়ের নাক ও চোখ উপড়ে ফেলেছি। আমার কাছে এই লোকদের আপনার বা অন্য কারো হাতে সোপর্দ করা সঠিক মনে হচ্ছে না।” [৩]

প্রমাণিত হলো যে হযরত আলী একেবারেই অবুঝ বা একেবারেই অপারগ ছিলেন, যেখানে হযরত মুয়াবিয়া-এর অবস্থান ছিল স্পষ্ট ও সঠিক।

উত্তর: আপনার শুরুতে পেশ করা “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া”-এর বর্ণনাটি সনদবিহীন। তাই এর কোনো সনদগত মর্যাদা থাকতে পারে না, বরং এতে হযরত আবু দারদা-এর উল্লেখ প্রমাণ করে যে বর্ণনাটি জাল: কারণ এই ঘটনাটি ৩৬ হিজরির বলা হচ্ছে, অথচ হযরত আবু দারদা এর চার বছর আগে ৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। [৪]

দ্বিতীয় বর্ণনাটি আপনি “আল-আখবারুত তিওয়াল” থেকে পেশ করেছেন। সেটিও সনদবিহীন হওয়ার কারণে অত্যন্ত দুর্বল। হতে পারে এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। মনে রাখা দরকার যে, রাফেজিরা অনেক বর্ণনা এই উদ্দেশ্যেই তৈরি করেছিল যাতে হযরত আলী-এর শাসন সাবায়িদের ওপর নির্ভরশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে বিশ্বাস করানো যায় যে হযরত আলী-এর আসল সমর্থক রাফেজিরাই।

তবে যদি উল্লিখিত বর্ণনাগুলোকে মেনে নেওয়া হয়, তবে সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যাও সম্ভব। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে হযরত আলী সাবায়িদের সামনে অসহায় ছিলেন। হ্যাঁ! হযরত আবু মুসলিম খাওলানি-এর এমন ধারণা হতে পারে, কিন্তু তাঁর ধারণা সঠিক হওয়া জরুরি নয়। হযরত আলী-এর জবাব থেকে স্পষ্ট যে তিনি এই বিষয়টি পূর্ণ দূরদর্শিতার সাথে বুঝতে পেরেছিলেন এবং যা কিছু করছিলেন তা ভেবেচিন্তেই করছিলেন। দশ হাজার লোকের একটি জোরালো স্লোগান দিয়ে দেওয়া থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে তারা সবাই সাবায়ি, সব...

[১] “এবং অন্যটি যার দ্বারা আপনি কলঙ্কিত, আপনার তিন পিতা (পূর্বসূরি) ছিলেন আপনার বাহু, আপনার হাত, আপনার সাহায্যকারী এবং আপনার ঘনিষ্ঠজন। আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে আপনি তাঁর রক্ত থেকে দায়মুক্ত হতে চাইছেন। যদি আপনি সত্যবাদী হন তবে আমাদের তাঁর হত্যাকারীদের ওপর ক্ষমতা দিন যাতে আমরা তাদের হত্যা করতে পারি, তবে আমরা আপনার কাছে দ্রুততম লোক হব। অন্যথায় আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের জন্য আমাদের কাছে তলোয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমরা স্থলে ও জলে উসমানের হত্যাকারীদের খুঁজতে থাকব যতক্ষণ না আমরা তাদের হত্যা করি অথবা আমাদের প্রাণ শান্তির সাথে মিলিত হয়।” (আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৬২)

[২] “নিশ্চয়ই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মজলুম হিসেবে নিহত হয়েছেন, সুতরাং তাঁর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সোপর্দ করুন এবং আপনি আমাদের আমির হোন।” (আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৬৩)

[৩] যখন পরের দিন হলো, তিনি আলীর কাছে প্রবেশ করলেন যখন তিনি মসজিদে ছিলেন। হঠাৎ সেখানে প্রায় দশ হাজার লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং তারা চিৎকার করছিল, “আমরা সবাই উসমানের হত্যাকারী।” আবু মুসলিম আলীকে বললেন: “আমি এমন এক কওমকে দেখছি যাদের সাথে আপনার কোনো আদেশ চলে না। আমার মনে হয় তারা আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য জেনে গেছে, তাই তারা এটি করেছে এই ভয়ে যে আপনি তাদের আমার হাতে সোপর্দ করবেন।” আলী বললেন: “আমি এই বিষয়ের নাকে ও চোখে আঘাত করেছি, তাই আমি তাদের আপনার বা অন্য কারো হাতে সোপর্দ করা সঠিক মনে করি না।” (আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৬৩)

[৪] তাঁর ইন্তেকাল সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে: প্রসিদ্ধ মতটি ৩২ হিজরির, দ্বিতীয় মতটি ৩১ হিজরির। (তাবাকাত ইবনে সাদ, ৭/৩৯৩, তবা সাদির)

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী এবং তারা সবাই কিসাসের যোগ্য ছিল। মদিনায় বিদ্রোহকারীদের সংখ্যা ছিল বড়জোর আড়াই থেকে তিন হাজার। তাদের মধ্যে প্রকৃত হত্যাকারী ছিল মাত্র কয়েকজন। এটা কীভাবে সম্ভব যে পরে তারা দশ হাজার হয়ে যাবে? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে তারা সাবায়ী ছিল, তবুও আমরা জানি যে সিফফিনে হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীতে এক লক্ষ সৈন্য ছিল। এটা কীভাবে সম্ভব যে দশ হাজার লোক বাকি ৯০ হাজার মুসলমানের ওপর বিজয়ী হবে?

পরিস্কার কথা হলো, এই দশ হাজার লোক হযরত আলী (রা.)-এর সাধারণ ও অনুগত সৈন্য ছিল (তাদের মধ্যে কিছু সাবায়ীও থাকতে পারে, কিন্তু সবাই নয়)। তাদের এই স্লোগান দেওয়া সিরিয়াবাসীদের দাবির একটি দাঁতভাঙ্গা জবাব ছিল। অর্থাৎ সিরিয়াবাসীরা যদি মাত্র কয়েকজন হত্যাকারীর পরিবর্তে তাদের সমস্ত সাহায্যকারী, সমর্থক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও কিসাসের যোগ্য মনে করে, তবে তারা দুই-তিন হাজার ব্যক্তি নয়, বরং হযরত আলী (রা.)-এর পুরো বাহিনীর সাথে লড়তে হবে। কারণ তারা সবাই হযরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে এক জাতি এবং এক প্রাণ।

হাদিস ও ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক একটি অনুমানমূলক মতামতের খণ্ডন:

(প্রশ্ন) আমরা মনে করি যে জঙ্গ জামাল ও সিফফিনের সময় সাবায়ীদের আধিপত্য ছিল। এরপর হযরত আলী (রা.) তাদের কবল থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকেন। তাই তারা সাবায়ীদের একটি নতুন রূপ খারেজীদের বিরুদ্ধেও নাহরাওয়ানে যুদ্ধ করেন এবং সফল হন। সিরিয়াবাসীদের সাথে ঐক্যের পথে একমাত্র বাধা ছিল মুনাফিকরা, এতে সিরিয়াবাসীদের কোনো ভুল ছিল না। নাহরাওয়ানে খারেজীদের নির্মূল হওয়ার সাথে সাথেই সিরিয়া ও ইরাকবাসী এক হয়ে গেল। প্রমাণিত হলো যে, সিরিয়াবাসী ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না, বরং বাধা ছিল কেবল সাবায়ী ও খারেজীরা। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার বিবাদ সম্পর্কে মৌনতা, নীরবতা এবং বিরত থাকা শরীয়তের কাম্য, যার দাবি হলো আমরা যেন এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রচার করি।

(উত্তর) সিরিয়াবাসী এবং হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে দ্বীন ও মাযহাবের কোনো বিরোধ ছিল না। তারা ইসলামের মূলনীতি এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে একমত ছিলেন। একইভাবে সাবায়ীদের ষড়যন্ত্র থেকেও কেউ অস্বীকার করে না। তাদের ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই সিরিয়াবাসীরা হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত ছিল। তবে এর পাশাপাশি সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের মধ্যে ফিকহী মতপার্থক্যও বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই এই সংঘাতকে ইজতিহাদী মতপার্থক্য বলা হয়। [১]

যেখানে এই দাবির প্রশ্ন যে, জঙ্গ নাহরাওয়ানের আগে হযরত আলী (রা.) সাবায়ীদের কজায় ছিলেন এবং এই যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সিরিয়াবাসীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি অনেক দিক থেকেই ভুল।

গত প্রশ্নের উত্তরে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর থেকে নিজের শাহাদাত পর্যন্ত স্বাধীন ও ক্ষমতামূলক শাসক ছিলেন। এই কারণেই তাকে খলীফায়ে রাশেদ মানা হয়। যদি উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি মেনে নেওয়া হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে যে তার খিলাফত জঙ্গ নাহরাওয়ানের পর শুরু হয়েছে, অথচ কেউ এর প্রবক্তা নয়।

[১] এই ফিকহী ও ইজতিহাদী মতপার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশেষ করে হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত অধ্যায়ে করা হয়েছে।

ব্যখ্যার এই অংশটিও বাস্তবতাবিরোধী যে, নাহরাওয়ান যুদ্ধের পরপরই আহলে শামের (সিরিয়াবাসী) সাথে সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। হাদিস ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার সাক্ষ্য দেয় যে, আহলে শামের সাথে সংঘাত নাহরাওয়ান যুদ্ধের সময়ও অব্যাহত ছিল এবং এই যুদ্ধের পরও দুই বছর পর্যন্ত আহলে শাম হযরত আলী (রা.)-এর রাজ্যের সীমানায় হস্তক্ষেপ করতে থাকে। [১]

যদি গৃহযুদ্ধে আহলে শামের কোনো অংশ না থাকত, তবে কঠিন সময়ে তাদের হযরত আলী (রা.)-কে সাহায্য করা উচিত ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে ৩৬ হিজরিতে যখন হযরত আলী (রা.) পূর্বে ব্যস্ত ছিলেন, তখন আহলে শাম তাঁর পশ্চিম প্রদেশ মিসরের সীমান্তে আক্রমণ করে। [২] ৩৮ হিজরির শাবান মাসে ঠিক সেই সময়ে যখন খলিফায়ে রাশেদ খারেজিদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন, আহলে শাম সুযোগ বুঝে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বসরার ওপর দখলের চেষ্টা চালায়, যা হযরত আলী (রা.)-এর সেনাপতি জারিয়া বিন কুদামা (রা.) ব্যর্থ করে দেন। [৩]

এরপর দুই বছর পর্যন্ত আহলে শামের সাথে সীমান্ত সংঘর্ষ মাঝেমধ্যে চলতে থাকে। ৪০ হিজরিতে গিয়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। এটিও কোনো আনুষ্ঠানিক ঐক্য বা একীভূতকরণ ছিল না। এর মর্যাদা ছিল কেবল বিতর্কিত সীমান্তগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের। ফলে শেষ পর্যন্ত উভয় দেশের আয়, হিসাব এবং রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থাপনা আলাদা আলাদা ছিল। [৪]

যদি আহলে শামের সাথে কোনো বিরোধ না থাকত এবং মাঝে কেবল সাবায়ীরাই বাধা হতো, তবে হযরত আলী (রা.) যখন নাহরাওয়ান যুদ্ধে খারেজিদের পরাজিত করার পর (দাবিকারীর মতে) সাবায়ীদের থেকে মুক্ত হলেন, তখন তাঁর উচিত ছিল কোনো দ্বিধা ছাড়াই শামে চলে যাওয়া। অথবা আহলে শাম তাঁকে মুক্ত দেখে তাঁর কাছে চলে আসত এবং তাঁর বায়াত গ্রহণ করত। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত এমন কিছুই ঘটেনি। বরং হযরত হাসান (রা.)-এর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শামে অবিলম্বে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আলাদা খেলাফতের ঘোষণা হয়ে গেল। [৫]

স্পষ্টতই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এটি নিজের বিবেচনায় করেছিলেন, সাবায়ীদের চাপে পড়ে নয়। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে, প্রতিটি কাজ সাবায়ীদের ইশারায় হচ্ছিল না। এসব পদক্ষেপের আসল কারণ ছিল ইরাকি ও শামি নেতৃবৃন্দের মধ্যে অসাধারণ ইজতিহাদি ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য। পরিস্থিতির অবনতিতে কিছু চরম ভুল বোঝাবুঝিরও ভূমিকা ছিল, যেগুলোকে অনিষ্টকারী লোকেরা ভুল তথ্য, গোঁড়ামি এবং আবেগপ্রবণতার মাধ্যমে শক্তিশালী করেছিল।

বিবাদগুলো (মুশাজারা) একটি বাস্তবতা। কেউ সারা জীবন এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকুক, এগুলোর একটি অক্ষরও না পড়ুক তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এই কর্মপন্থা অত্যন্ত অদ্ভুত যে, জিহ্বা সংযত রাখা (কাফফে লিসান), নীরবতা এবং বিরত থাকার শিরোনাম দিয়ে এই সমস্যাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে এবং তাও এমনভাবে যে কেবল ধারাবাহিক ইতিহাসই নয় বরং আকিদা, ফিকহ এবং হাদিসের ভাণ্ডারকেও ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে এবং একে দ্বীনের খেদমত মনে করা হবে। সত্য অস্বীকার করা নিরর্থক। হ্যাঁ, এই মতপার্থক্যগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে যা বর্ণনা করা হয়েছে।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত; তারিখ তাবারী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; আল-কামিল ফিত তারিখ এবং তারিখুল ইসলাম জাহাবী; ৩৮, ৩৯, ৪০ হিজরির ঘটনাবলি দ্রষ্টব্য।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১১৮; তারিখ তাবারী: ১৩০/৫।

[৩] তারিখ তাবারী: ১২১/৫।

[৪] তারিখ তাবারী: ১০৬/৫।

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৬, ১৯৭; সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭০৮, কিতাবুল ফিতান, বাব কওলুহ লা তারজিউ বাদি কুফফারা।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — সপ্তম খণ্ড

কি হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনী কেবল উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের নিয়ে গঠিত ছিল?

(প্রশ্ন) ইন্টারনেটে ইতিহাসের কোর্স করান এমন এক ব্যক্তির গবেষণা হলো যে, সিরিয়া আক্রমণ উসমানের হত্যাকারীরা করেছিল এবং হযরত আলী (রা.) কেবল এই জন্য তাদের সাথে গিয়েছিলেন যাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ না হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিপরীতেও উসমানের হত্যাকারী ও মুনাফিকরা ছিল এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা.) তাদের সাথেই লড়াই করেছিলেন। দয়া করে জানাবেন এটি কতটুকু সঠিক?

(উত্তর) এই ব্যাখ্যাটি আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হয়; কারণ এর এই দিকটি বাহ্যিকভাবে ইতিবাচক যে, সাহাবীদের মধ্যে আদৌ কোনো যুদ্ধ হয়নি, বরং একপক্ষে ছিল নিছক ফিতনাবাজরা এবং অন্যপক্ষে ছিল নিছক সত্যপন্থীরা।

কিন্তু অন্যদিকে এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ার যৌক্তিক ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতে রাশিদাহ এবং এর সমর্থনে বর্ণিত হাদীসসমূহ অস্বীকার করা হবে। কারণ এর দ্বারা এটি আবশ্যিক হয়ে পড়ে যে, হযরত আলী (রা.)-এর সাথে অধিকাংশ লোকই ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও মুনাফিক, তাদের নির্দেশই চলত, এমনকি তারা যুদ্ধের ময়দানও নিজেদের ইচ্ছামতো নির্ধারণ করত, আর হযরত আলী (রা.) ছিলেন কেবল একজন পুতুল। এমন অবস্থায় হযরত আলী (রা.) খলীফায়ে রাশিদ তো দূরের কথা, খলীফাই সাব্যস্ত হবেন না, কারণ শাসনের জন্য কর্তৃত্ব থাকা শর্ত। [১]

এই নতুন মতটি কেবল মুতাওয়াতির ইতিহাসই নয় বরং হাদীস ভাণ্ডারেরও পরিপন্থী। সেই সহীহ হাদীসগুলো নিয়ে চিন্তা করুন যেগুলোকে উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে সিফফিনের যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরবর্তীতে ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের সন্ধির ওপর প্রয়োগ করেছেন, তবে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে, এই বর্ণনাগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে “ফিতাতি উম্মতি” (আমার উম্মতের দুটি দল), “মিন উম্মতি” এবং “মিনাল মুসলিমীন” বলেছেন। [২]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উভয় বাহিনীই ঈমান ও তাকওয়াসম্পন্ন লোকদের ছিল। তাদের মধ্যে যদি কিছু লোক ফিতনাবাজ থেকেও থাকে, তবে তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে নবীজির বাণীতে তাদের আলাদা করার প্রয়োজনও মনে করা হয়নি।

[১] “কেননা মানুষ যদি বায়আত করে কিন্তু তাদের ওপর তার নির্দেশ কার্যকর না হয় তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম হওয়ার কারণে, তবে সে ইমাম হবে না।” (মাজমাউল আনহুর ফী শারহি মুলতাকাল আবহুর, ইমাম শাইখি জাদাহ দামাদ আফান্দি: ১/৬৯৯, ত. দারু ইহয়ায়িত তুরাস)

এবং আল-মাওয়াযী বলেন: “যদি বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদের জন্য কোনো ইমাম নিযুক্ত করে এবং তার বায়আতে প্রবেশ করে ও তার আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তাদের হাতে থাকা ইমাম ইমামত থেকে খারিজ হয়ে যাবেন যদি তার মুক্তির কোনো আশা না থাকে।” (আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ৩৮, ত. দারুল হাদীস কায়রো)

[২] নিশ্চয়ই আমার এই সন্তান একজন সরদার, সম্ভবত আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন। (সহীহ বুখারী, হা: ২৭০৪, কিতাবুস সুলহ)

“আমার উম্মতের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হবে, তাদের মধ্য থেকে একটি দল বের হয়ে যাবে, যারা হকের অধিক নিকটবর্তী তারা তাদের হত্যা করবে।” (সহীহ মুসলিম, হা: ২৫০৮, বাবু যিকরিল খাওয়াজ, ত. দারুল জীল)

“আমার উম্মতের দুটি বড় দল একে অপরের মুখোমুখি হবে, যাদের দাবি হবে এক।” (আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ, ইবনে আব্দুল বার: ২৩/৩২৮, ত. আল-মাগরিব)

মুসলমানদের একটি দলের মধ্যে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী বের হবে, হকের অধিক নিকটবর্তী দলটি তাদের হত্যা করবে। (সহীহ মুসলিম, হা: ২৫০৬)

কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মুসলমানদের দুটি বড় দল একে অপরের সাথে লড়াই করবে যাদের দাবি হবে এক, তাদের মধ্যে যারা হকের ওপর থাকবে তারা বিজয়ী হবে যখন তাদের মধ্য থেকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী বের হবে যারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।“ (মুসনাদুল হমাইদী, হা: ৭৬৬)

“কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দুটি বড় দল লড়াই করবে এবং তাদের মধ্যে বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটবে অথচ তাদের দাবি হবে এক।” (সহীহ মুসলিম, হা: ৭৩৩৮)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা)-এর এই বাণীটিও প্রমাণিত যে: “আমাদের নিহতরা এবং তাদের নিহতরা জান্নাতি।” [১]

অর্থাৎ উভয় পক্ষের নিহতরাই জান্নাতি। এর দ্বারা উভয় বাহিনীর ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী এবং সম্ভুষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়। যদি ইরাকি বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাবায়ী, ধর্মহীন এবং মুনাফিক হতো, তবে হযরত আলী (রা) কখনোই এমন কথা বলতেন না।

তাছাড়া হযরত আলী (রা)-এর প্রতিনিধি হযরত আবু মাসউদ কুফি (রা)-এর খুতবাটিও সামনে রাখা উচিত, যাতে তিনি লোকদের সিম্ফিনের যুদ্ধের জন্য বের হতে উৎসাহিত করেছিলেন। [২]

এটিও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রা)-এর লশকর বা বাহিনীর বিভিন্ন অংশ প্রখ্যাত সাহাবী এবং তাবায়ীগণের নেতৃত্বে ছিল; আসমাউর রিজাল-এর কিতাবসমূহে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং তাবায়ীগণ কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [৩]

এরপর যুদ্ধবিরতির ঘটনা তো সহীহ বুখারীতে রয়েছে, যা অনুযায়ী হযরত আলী (রা) যখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর নির্দেশ মান্য করা হলো এবং পুরো ইরাকি লশকর যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। [৪]

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী কেবল আশতার নাখয়ী এবং ফারীগণ (যারা পরবর্তীতে খারেজী হয়েছিল) আপত্তি করেছিল, কিন্তু নির্দেশের অবাধ্যতা তারাও করতে পারেনি, [৫] কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হযরত আলী (রা)-এর অনুগত, তাই সংখ্যালঘু অনিষ্টকারী দলটির কোনো প্রভাব খাটেনি। যদি অধিকাংশ ইরাকি বাহিনী ‘বিদ্রোহীদের’ হতো, তবে হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশ কীভাবে কার্যকর হতে পারত?

সংক্ষেপে, এ কথা বলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, সিরিয়া আক্রমণ হযরত আলী (রা)-এর ইচ্ছা ব্যতিরেকে উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা করেছিল এবং হযরত আলী (রা) কেবল যুদ্ধ থামাতে সাথে গিয়েছিলেন। এগুলো অবাস্তব কথা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো কল্পনাপ্রসূত বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এত উচ্চ এবং অকাট্য দলীলসমূহের কারণে এত সুরক্ষিত যে, তা রক্ষার জন্য এমন বিভ্রান্তিকর অনুমান, দুর্বল যুক্তি এবং নিরর্থক ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৭৮, প্রকাশনী: আর-রুশদ

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৭৭, হাসান সনদে, প্রকাশনী: আর-রুশদ

[৩] তারিখুল ইসলাম, যাহাবী: ৩/৫৬৫; তারিখে খলিফা পৃষ্ঠা: ১৯৩, ১৯৬; আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান: ৩/৩০০; আল-ইসাবাহ: ৩/৩৯৩; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/৯৮; আল-ইসাবাহ: ২/৪৫২; উসদুল গাবাহ: ১/৩৪৮; আত-তারিখুল আওসাত: ১/৯৭; আল-ইস্তিআব: ১/৭৭

[৪] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪১৮৯, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতিল হুদায়বিয়া; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৯১, প্রকাশনী: আর-রুশদ

[৫] আনসাবুল আশরাফ, বালায়ুরী: ২/৩৩৩; তারিখুত তাবারী: ৫/৫৩, ৫৫

হাদিস আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর ওপর কিছু সংশয়

প্রশ্ন: সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এ বিষয়ে তাবারী, মুস্তাদরাক হাকিম এবং মুসনাদে আবি ইয়ালা-তে একটি বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যার অনুযায়ী আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পর আমর বিন আস (রা.)-এর ছেলে আবদুল্লাহ (রা.) তাকে এই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: “আববাজান! আপনি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়ে দিলেন অথচ তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু বলেছিলেন।” আমর বিন আস (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “কী বলেছিলেন?” সাহেবজাদা বললেন: “আপনি কি তখন আমাদের সাথে ছিলেন না যখন আমরা মসজিদে নববী নির্মাণ করছিলাম, লোকেরা একটি করে ইট বহন করে আনছিল। আম্মার দুটি করে ইট বহন করে আনছিলেন। এই কারণে তার ওপর মূর্ছা ভাব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: সুমাইয়ার ছেলে! তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।”

হযরত আমর বিন আস (রা.) এই বর্ণনাটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে শোনালেন তখন তিনি একটি অশোভন বাক্য বললেন অর্থাৎ: “তুমি পাগল বৃদ্ধ, নিজের প্রস্রাবে পিছলে সারাদিন হাদিস শোনাতে থাকো।” তারপর বলতে লাগলেন: “আম্মারকে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে নিয়ে এসেছে।” [১]

এই বর্ণনাগুলো কি সঠিক? এগুলোর সনদের মান কী? এগুলোর দ্বারা আহলে শামের ‘খুরুজ’ প্রমাণিত হয় কি না? এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে উল্লিখিত অশোভন বাক্যটির সম্বন্ধ করা সঠিক কি না?

উত্তর: নিঃসন্দেহে হাদিস ‘তাকতুলুকা আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ (তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে) থেকে আম্মার (রা.)-এর হত্যাকারীদের ওপর ‘খুরুজ’-এর প্রয়োগ প্রমাণিত। তাছাড়া সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আম্মার (রা.)-এর শামী বাহিনীর হাতে নিহত হওয়া, তার শাহাদাতের ওপর হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর কথোপকথন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আহলে শামকে ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ হিসেবে মানতে অস্বীকার করাও প্রমাণিত।

কিন্তু প্রশ্নে যে বর্ণনাগুলো পেশ করা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনার দাবি রাখে। তাবারীর বর্ণনার সনদে আতা বিন মুসলিম খাফফাফ রয়েছে। [২] কিবার ইয়াম বিন মুসলিম মুস্তাদরাকের বর্ণনাতেও রয়েছে। মুসনাদে আবি ইয়ালা-র উল্লিখিত বর্ণনার সনদে ইসমাইল বিন মুসা আল-ফাজারি ‘সদুক শিয়া’ (সত্যবাদী শিয়া), কিন্তু দুর্বল দিকটি হলো তার ওপর রাফয-এর অপবাদও রয়েছে। [৩]

আবার এই বর্ণনাগুলোর সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো এই যে, আমর বিন আস (রা.)-এর ছেলে আবদুল্লাহ (রা.) তাকে হাদিস স্মরণ...

[১] তারিখ তাবারী: ৫/৩১, মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৫৬৬০, মুসনাদে আবি ইয়ালা, হা: ৭৩৫১

[২] মিজানুল ইতিদাল: ৩/৭৬

[৩] তাকরিবুত তাহযিব, অনুবাদ নম্বর: ৪৮২

স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: “আপনি কি সেই সময় আমাদের সাথে ছিলেন না যখন আমরা মসজিদে নববী নির্মাণ করছিলাম?”

অথচ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মসজিদে নববী নির্মাণের বহু বছর পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে মসজিদে নববী নির্মাণে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই এই বর্ণনাগুলোতে কিছু জাল সংযোজন থাকা স্পষ্ট। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতি আরোপিত একটি বাক্য ‘দুহিজতা ফী বাউলিকা’ (তুমি তোমার প্রস্রাবে পিছলে পড়েছ)-কে সংযোজন হিসেবেই গণ্য করা উচিত। [১]

সহীহ সনদের বর্ণনাগুলো এ ধরনের অসংলগ্ন বাক্য ও কুরুচিপূর্ণ শব্দ থেকে মুক্ত। সহীহ বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করুন:

১. আবদুল্লাহ বিন হারিস বলেন যে, আমি সিফফীন থেকে ফেরার পথে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে তাঁর এবং আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মাঝখানে হাঁটছিলাম। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বললেন: “আব্বাজান! আপনি কি শোনেননি যে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন: হে সুমাইয়ার পুত্র, আফসোস যে তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।”

আমর ইবনুল আস (রা.) এটি শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বললেন:

“আপনি কি শুনছেন না সে কী বলছে?”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “তুমি সবসময় অপ্রীতিকর কথা নিয়ে আসো। আমরা কি আমাদেরকে হত্যা করেছি? তাকে তো তারাই হত্যা করিয়েছে যারা তাকে নিয়ে এসেছে।” [২]

২. হানজালা বিন খুওয়াইলিদ বলেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় দুই ব্যক্তি হযরত আমাদের (রা.)-এর মাথা নিয়ে ঝগড়া করতে করতে এল। প্রত্যেকেই বলছিল যে আমি তাকে হত্যা করেছি। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন: “তোমাদের প্রত্যেকেই অন্যের ব্যাপারে মনে মনে আশ্বস্ত থাকো, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে তাকে (হযরত আমাদের (রা.)-কে) একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রশ্ন করলেন, “তাহলে আপনি আমাদের সাথে কেন আছেন?”

তিনি বললেন, “আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যতক্ষণ তোমার পিতা জীবিত থাকবেন তাঁর আনুগত্য করবে এবং তাঁর অবাধ্য হবে না। তাই (সম্মানিত পিতার নির্দেশের অধীনে) আমি আপনার সাথে আছি, কিন্তু আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছি না।” [৩]

[১] অথবা একে চরম অস্থির অবস্থায় উচ্চারিত একটি বাক্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

নোট: আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.)-এর শরহে বুখারী দেখলে জানা যায় যে, তিনি এই বর্ণনার বিভিন্ন সূত্র একত্রিত করেছেন এবং একটি সূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এটি মসজিদে নববীর প্রাথমিক নির্মাণের ঘটনা নয় বরং এটি ছিল নতুন নির্মাণ যা ‘আমুল উফুদ’ (প্রতিনিধি দলের বছর)-এ সেই সময় হয়েছিল যখন চারদিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়া এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের ব্যাপক আগমনের কারণে মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। (ফাতহুল বারী, আল্লামা ইবনে রজব: ৩/৩০৩, ৩০৪, দারুল হারামাইন কায়রো)

ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.)-এর গবেষণা মেনে নিলে এই প্রশ্নও শেষ হয়ে যায় যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এই হাদীসটি কখন শুনেছিলেন? কারণ তিনি ৮ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর ‘আমুল উফুদ’ হলো ৯ হিজরী।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৪২৬, ৬৪৯৯ সহীহ সনদে।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৪৯৫, ৬৫৩৮, ৬৯২৯ সহীহ সনদে, ত. আর-রিসালাহ; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হা: ৩৭৮৩৫, ত. আর-রুশদ।

প্রশ্ন ৬: কি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ (বিদ্রোহী দল) সংক্রান্ত বর্ণনাটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? যদি অবগত থাকতেন, তবে কেন তিনি নিজের ভুলের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন? এই যুক্তি কি সঠিক ছিল?

জবাব: হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই বর্ণনাটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। একবার হযরত আম্মার (রা.) অসুস্থ হলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে দেখতে যান। সে সময় তিনি দোয়া করেন: “হে আল্লাহ! আম্মারের মৃত্যু যেন আমাদের হাতে না হয়। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।” [১]

এই কারণেই সিফফিনের ময়দানে হযরত আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পর যখন তাকে এই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি এই বর্ণনাটি অস্বীকার করেননি, বরং এর অর্থের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি সম্ভাবনা পেশ করেন এবং যুক্তি দেন।

মুসনাদে আহমদের সহিহ বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) শহীদ হলেন, তখন আমর বিন হাযম (রা.) হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন: “আম্মার শহীদ হয়ে গেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।”

আমর ইবনুল আস (রা.) “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পড়তে পড়তে ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “কি হয়েছে?” বললেন: “আম্মার কি শহীদ হয়ে গেছেন?” হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “আম্মার শহীদ হয়েছেন তো কি হয়েছে?” তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।” হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: “আমরা কি আম্মারকে হত্যা করেছি? না, বরং আলী এবং তার সঙ্গীরা তাকে হত্যা করিয়েছে। তারা তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্শার মুখে ঠেলে দিয়েছে।” [২]

যদিও জমহুর উলামায়ে কেরাম এই যুক্তিকে সঠিক মনে করেন না, তবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পরিস্থিতিকে যেভাবে দেখছিলেন এবং সেটি যে ধরনের পেরেশানি, অস্থিরতা ও আবেগের সময় ছিল, সেই বিবেচনায় তাকে এমনটি ভাবা বা বলার ক্ষেত্রে অপারগ মনে করা যেতে পারে।

এখানে এই বিষয়টি বুঝে নেওয়া দরকার যে, শরীয়ত অনুযায়ী কোনো মুসলিম দলের সাথে যুদ্ধের বৈধতার কেবল দুটি পথ রয়েছে: (১) তারা ডাকাত বা দস্যু হবে। (২) তারা বিদ্রোহী হবে। এখানে উভয় পক্ষের কারো ক্ষেত্রেই (নাউযুবিল্লাহ) প্রথম সুরতটি কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং দ্বিতীয় সুরতটি নির্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সিফফিনের যুদ্ধ এই পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে ছিল যে, উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই অপর পক্ষকে “বিদ্রোহী” মনে করত এবং প্রত্যেকের জন্য যুদ্ধের একমাত্র বৈধ কারণ এটাই ছিল। এছাড়া শরীয়ত অনুযায়ী অন্য কোনো বৈধ কারণ হতে পারে না।

ইরাকবাসীদের নিকট সিরিয়াবাসীরা (আহলে শাম) বিদ্রোহী ছিল; কারণ হযরত আলী (রা.) খলিফা হয়ে গিয়েছিলেন, খলিফার আনুগত্য অস্বীকার করা এবং একটি অঞ্চলের ওপর দখল বজায় রাখা ছিল বিদ্রোহ (খুরুজ)। তাই খলিফার সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল শরীয়তসম্মত। সিরিয়াবাসীদের নিকট হযরত আলী (রা.) (খিলাফতের যোগ্যতা রাখা সত্ত্বেও) খলিফা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন না, বরং তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাদের সাহায্যে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। [৩] সুতরাং সিরিয়াবাসীরা, যারা পূর্ববর্তী খলিফার...

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, বর্ণনা নম্বর: ১৫৬১৩

[২] মুসনাদে আহমদ: ১৭৭৮৪; মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, হা: ৭৩৫১ সহিহ সনদে; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: ২০৩৩৭; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা: ২৬৬৩

[৩] ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “আর এটিই ছিল তাদের বায়আত ত্যাগ করার কারণ যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি জালিম এবং তিনি উসমানের হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি উসমানের হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন তাদের সাথে একমত হওয়ার কারণে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৩০৬)

উন্মতে মুসলিমার ইতিহাস

হামী এবং যারা কিসাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, তারা ইরাকবাসীদের বিদ্রোহী মনে করতেন। সম্ভবত তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদীসটিও ছিল যা তিনি একবার হযরত উসমান গনি (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন:

“তাদের পায়ের নিচ থেকে একটি ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং সেই সময় উসমান ও তার অনুসারীরা হিদায়াতের ওপর থাকবে।” [১]

যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজের তথ্য এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে আমরা হকের ওপর আছি এবং ইরাকবাসীরা বিদ্রোহী, তখন ‘আম্মার (রা.)-এর শাহাদাত সংক্রান্ত হাদীসটি তার অনুভূত ও পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়গুলোকে পরিবর্তন করতে পারেনি এবং তিনি “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া” (বিদ্রোহী দল) শব্দটিকে সেই লোকদের ওপর প্রয়োগ করলেন যাদেরকে তিনি আগে থেকেই “বিদ্রোহী” বলে বিশ্বাস করতেন। এজন্যই তার মনে এই হাদীসের মূল অর্থের পরিবর্তে এই দূরবর্তী সম্ভাবনাটি উদয় হলো যে, ‘আম্মারকে হত্যাকারী হলো সেই ব্যক্তি যে তাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তার শাহাদাতের আসল দায়বদ্ধতা সেই লোকদের ওপর যাদের সাথে তিনি যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন।

এ ছাড়াও কিছু লোক হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে আরও একটি ব্যাখ্যাও আরোপ করেছেন। তা হলো “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো “কিসাস তলবকারী দল”। কাজী আইয়ায (রহ.) বলেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই শব্দ (আল-বাঘিয়া)-কে ‘তলব’ (খোঁজা বা চাওয়া) অর্থে গ্রহণ করেছেন। এর আগে তিনি (একটি ব্যাখ্যা হিসেবে) এ কথাও বলেছিলেন যে, ‘আম্মারকে সেই ব্যক্তিই হত্যা করেছে যে তাকে নিয়ে এসেছে’, যাতে তিনি নিজের ওপর থেকে এই বৈশিষ্ট্য (আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া) দূর করতে পারেন। এরপর তিনি এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দিকে চলে যান।” [২]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে উন্মতের আলেমদের মতামত:

প্রশ্ন: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই ব্যাখ্যা (যে আলী (রা.) এবং তার সাথীরাই আম্মার (রা.)-কে হত্যা করেছেন) সম্পর্কে উন্মতের আলেমদের মতামত কী?

উত্তর: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই ব্যাখ্যাকে উন্মতের আলেমরা গ্রহণ করেননি। কেবল মারওয়ানি (নাসিবী) গোষ্ঠী এই ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করত। এছাড়া বর্তমানে কিছু ‘মুজতাহিদে দ্বীন’ এই ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করছেন, কিন্তু চৌদ্দশ বছর ধরে জমহুর উন্মতের রায় এ বিষয়ে এক এবং অভিন্ন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন:

“হ্যাঁ! নবী (সা.) হযরত আম্মার (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন: ‘তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’। সিরি়াবাসী (আহলে শাম) যে ব্যাখ্যা করেছিল তা বাতিল ব্যাখ্যা। তারা বলেছিল যে, আমরা আম্মারকে হত্যা করিনি বরং সেই ব্যক্তিই তাকে হত্যা করেছে যে তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্শার সামনে ফেলে দিয়েছে। এটি এমন এক বাতিল ব্যাখ্যা যা শব্দের হাকীকত বা প্রকৃত অর্থের পরিপন্থী এবং...”

[১] মুসনাদে আহমাদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৮০৬৭, ৬০৮/২৯, সনদ সহীহ।

[২] “কিন্তু মুয়াবিয়া একে তলব (চাহিদা) অর্থে গ্রহণ করেছেন, আর তিনি এর আগে বলেছিলেন: ‘নিশ্চয়ই তাকে সেই ব্যক্তি হত্যা করেছে যে তাকে নিয়ে এসেছে, যাতে তিনি নিজের ওপর থেকে এই গুণটি দূর করতে পারেন, অতঃপর তিনি অন্য ব্যাখ্যার দিকে ফিরে যান’।” (ইকমালুল মুয়াল্লিম বি-ফাওয়ায়েদি মুসলিম: ৪৫৯/৮)।

এর বাহ্যিক দিক থেকেও। কারণ আমাদের (রা.)-এর হত্যাকারী তো সেই ব্যক্তিই ছিল যে তাকে হত্যা করেছে, সে নয় যে তার থেকে সাহায্য নিয়েছিল। [১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

“আমার জানা নেই যে আইন্মায়ে আরবা (চার ইমাম) বা আহলে সুন্নাতের মতো মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ একজনও এই মত পোষণ করেন। তবে অনেক মারওয়ানি (নাসিবি) এবং তাদের সমমনা লোকদের এটি একটি বক্তব্য।” [২]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন:

“হযরত আলী (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন যে, তাহলে তো রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হামযাহ (রা.)-কে হত্যা করিয়েছেন যখন তিনি তাকে (জিহাদের জন্য) বের করেছিলেন। এটি হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে এমন একটি অকাট্য জবাব যার কোনো উত্তর নেই, এটি এমন এক দলিল যার ওপর কোনো আপত্তি তোলা সম্ভব নয়।” [৩]

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই কথা যে, তাকে সেই ব্যক্তি হত্যা করেছে যে তাকে আমাদের তলোয়ারের সামনে নিয়ে এসেছে, এটি অত্যন্ত দূরবর্তী একটি ব্যাখ্যা। যদি এমনটি হতো, তবে সরাসরি সেই সেনাপতিকে ঐ সকল মুজাহিদদের হত্যাকারী মানতে হতো যারা আল্লাহর পথে শহীদ হন, কারণ তিনিই তাদের শত্রুদের তলোয়ারের সামনে নিয়ে গেছেন।” [৪]

হাদিসের শব্দ “আন-নাকিবাহ আনিত ত্বরীক” (পথচ্যুত)-এর ভিত্তিতে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ)-এর মতাদর্শের ওপর আপত্তি:

প্রশ্ন: হাদিসে হযরত আমাদের (রা.)-কে হত্যাকারী ‘আল-ফিয়াতুল বাগিয়া’ (বিদ্রোহী দল)-এর চিহ্ন এই বলা হয়েছে যে, তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবে। “তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাগিয়া, আন-নাকিবাহ আনিত ত্বরীক।” [৫] আহলে শাম (শামবাসী) ঈমানদার ও মুজতাহিদ ছিলেন। এই হাদিসটি তাদের ওপর কীভাবে প্রয়োগ হতে পারে? এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ‘আল-ফিয়াতুল বাগিয়া’ সেই জামাতই হবে যারা বেদ্বীন, পথভ্রষ্ট, ফাসিক ও ফাজির, নাস্তিক এবং কাফের ছিল। সাহাবায়ে কেরাম এমন ছিলেন না, তাই তাদের কোনো দল ‘আল-ফিয়াতুল বাগিয়া’-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

[১] আহলে শামের এই ব্যাখ্যাটি বাতিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী “আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে” প্রসঙ্গে তারা বলেছিল: আমরা তাকে হত্যা করিনি, বরং তাকে সেই ব্যক্তি হত্যা করেছে যে তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্শার সামনে ফেলেছে। এটি একটি বাতিল ব্যাখ্যা যা শব্দের প্রকৃত অর্থ ও বাহ্যিক রূপের পরিপন্থী। কেননা হত্যাকারী সেই ব্যক্তি যে সরাসরি হত্যা করেছে, সে নয় যার থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। (الصواعق المرسلة: ১/১৮৩, ১৮৫)

[২] এই বক্তব্যের কোনো প্রবক্তা চার ইমামের অনুসারী বা আহলে সুন্নাতের অন্য কারো মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই, তবে এটি অনেক মারওয়ানি এবং তাদের অনুসারীদের বক্তব্য। (منهاج السنة: ৪/৪০৬)

[৩] হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন: তাহলে তো রাসূলুল্লাহ (সা.) হামযাহকে হত্যা করেছেন যখন তিনি তাকে বের করেছিলেন। এটি একটি অকাট্য যুক্তি যার কোনো উত্তর নেই এবং এর ওপর কোনো আপত্তি তোলা যায় না। (الذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة، باب، جلاء من علمان لما قتل، دار المنهاج، رياض)

[৪] মুয়াবিয়ার এই কথা যে, তাকে সেই ব্যক্তি হত্যা করেছে যে তাকে আমাদের তলোয়ারের সামনে পেশ করেছে, এটি অত্যন্ত দূরবর্তী একটি ব্যাখ্যা। কারণ যদি এমনটি হতো, তবে সেনাপতিই আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিদের হত্যাকারী হতেন, যেহেতু তিনি তাদের শত্রুদের তলোয়ারের সামনে পেশ করেছেন। (البدایة والنهاية: ৭/৩২১)

[৫] মাজমাউজ যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ, হাদিস: ১৫৬৩৩

উত্তর: প্রথমত, ‘আন-নাকিবাহ আনিত ত্বরীক’ (পথভ্রষ্ট) অংশটি সম্বলিত বর্ণনাটি যঈফ (দুর্বল), কারণ এর বর্ণনাকারী মুসলিম বিন কায়সান আল-আওয়ার পরিত্যক্ত (মাতরুক)।

[১] এই অতিরিক্ত অংশটি সেই সহীহ বর্ণনাগুলোতে একেবারেই নেই যা থেকে জমহুর (অধিকাংশ আলেম) দলিল পেশ করেন।

অতঃপর যদি কোনো আলেম দলিলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আনুষঙ্গিকভাবে ‘আন-নাকিবাহ’ সম্বলিত বর্ণনাটি গ্রহণ করে থাকেন, তবে এর দ্বারা সহীহ বর্ণনাগুলোর সামগ্রিক মর্মার্থ এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ইজমা প্রভাবিত হয় না। আর এর দ্বারা জমহুরের এই মাযহাবের ওপর কোনো আঁচ আসে না যে, আহলে জামাল এবং আহলে শাম বিদ্রোহী ছিল। কারণ জমহুর উলামায়ে কেরাম না তো একথা বলেন যে, এই ব্যক্তিবর্গ (নাউযুবিল্লাহ) বেদ্বীন ও পথভ্রষ্ট ছিলেন, আর না ‘আন-নাকিবাহ আনিত ত্বরীক’ শব্দটি কারো পথভ্রষ্ট বা বেদ্বীন হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। বরং এর আভিধানিক অর্থ হলো ‘পথ থেকে বিচ্যুত’, এই মর্মার্থের প্রয়োগ ইজতিহাদী ভুলের ওপরও হতে পারে। এটি জরুরি নয় যে এর অর্থ কবীরা গুনাহ, ইলহাদ (ধর্মত্যাগ) বা ফাসেকী হতে হবে।

এটি অত্যন্ত অদ্ভুত যুক্তি যে, একটি হাদীসের শব্দের মধ্যে অন্য অর্থের পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এর অর্থ টেনেহিঁচড়ে এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যা ইসলামের পরিপন্থী। অতঃপর এই মর্মার্থের ওপর জেদ ধরে জমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাবকেই পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত করা হবে, অথচ তাঁরা সঠিক ব্যাখ্যার সাথে সঠিক অর্থই গ্রহণ করেছেন, ইসলামের পরিপন্থী কোনো অর্থ নয়।

□□□

বুখারীর শব্দ ‘ইয়াদউহুম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাহ ইলান নার’-এর ওপর আপত্তি:

প্রশ্ন: ঠিক আছে, ‘আন-নাকিবাহ আনিত ত্বরীক’ সম্বলিত বর্ণনাটি না হয় যঈফ হলো, কিন্তু বুখারীতে ‘আল-ফিয়াতুল বাগিয়া’ (বিদ্রোহী দল)-এর নিদর্শন এই বলা হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী হবে: “আফসোস আন্মারের জন্য, তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে, সে তাদের জান্নাতের দিকে ডাকবে আর তারা তাকে আগুনের (জাহান্নামের) দিকে ডাকবে।” আহলে শাম মুমিন এবং ইজতিহাদকারী সাহাবী ছিলেন। তাদের ওপর ‘দাওয়াত ইলান নার’ (আগুনের দিকে আহ্বান)-এর প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে? এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ‘আল-ফিয়াতুল বাগিয়া’ সেই দলই হবে যারা দোযখের দিকে আহ্বানকারী হবে অর্থাৎ কাফের, ফাসেক ও বেদ্বীন।

উত্তর: সহীহ বুখারী মাশাআল্লাহ বারো শতাব্দী ধরে মুহাদ্দিসীন এবং হাদীস ব্যাখ্যাকারীদের হাতে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারো কাছেই এই হাদীসের সেই মর্মার্থ বোধগম্য হয়নি যা এই জনাব বুঝেছেন। জমহুর উলামায়ে কেরামের নিকট এই বর্ণনার প্রয়োগ আহলে শামের ওপরই হয়। আর এই কথা যে, তাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন, তবে তাদের ওপর ‘দাওয়াত ইলান নার’-এর প্রয়োগ কীভাবে সঠিক হতে পারে? এর বেশ কিছু উত্তর বিদ্যমান রয়েছে। যেকোনো একটি বুঝে নিলেই সাহাবায়ে কেরামের দ্বীন ও ঈমানের ওপর কোনো আপত্তি আসে না।

১. প্রথম এবং সাবলীল উত্তর হলো, ফসীহ ও বালীগ (অলঙ্কারপূর্ণ) কালামে সব জায়গায় হাকীকী (আক্ষরিক) অর্থ নয় বরং অনেক সময় মাজাযী (রূপক) অর্থও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানে ‘জান্নাত’ দ্বারা রূপকভাবে শান্তি-নিরাপত্তা এবং ঐক্য ও সংহতি উদ্দেশ্য। আর শান্তিপূর্ণ স্থানকে ‘জান্নাত’ হিসেবে ব্যক্ত করা একটি সাধারণ বিষয়।

বেহেশত সেখানেই যেখানে কোনো কষ্ট নেই... কারো সাথে কারো কোনো কাজ (বিবাদ) নেই।

আর যুদ্ধকে ‘আন-নার’ (আগুন) হিসেবে ব্যক্ত করাও সাধারণ বিষয়: “যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন।” [২]

[১] মীযানুল ইতিদাল: ৩/৪০৬

[২] “যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন।” (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬৪)

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

সুতরাং অর্থ একেবারেই পরিষ্কার যে, হযরত আম্মার (রা.) এমন কিছু দিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন যার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতো, অর্থাৎ সিরিয়াবাসীরাও যদি হযরত আলী (রা.)-এর বায়াত গ্রহণ করে নিত তবে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত, জান্নাতের মতো একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অর্জিত হতো। কিন্তু সিরিয়াবাসীদের বায়াত অস্বীকার করা যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যদিও তাদের এই পদক্ষেপ ছিল ইজতিহাদভিত্তিক, কিন্তু এর ফলাফল যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। আর শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। ‘ইয়াদউল্হম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’ (তিনি তাদের জান্নাতের দিকে ডাকছেন আর তারা তাকে আগুনের দিকে ডাকছে)-এর এই সহজ অর্থ বুঝে নেওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের দ্বীন ও ঈমান বরং তাদের ইজতিহাদের ওপরও কোনো প্রশ্ন আসে না।

(২) দ্বিতীয় উত্তরটি হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর এবং এটি আলেমদের নিকট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন: “যদি বলা হয় যে, আম্মার (রা.)-এর হত্যাকারী সিফফিনে ছিল এবং সে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল এবং যারা হত্যা করেছে তারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে ছিল। আর তাদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের একটি দলও ছিল, তবে এটা বলা কীভাবে জায়েজ হবে যে তারা জাহান্নামের দিকে ডাকছিল? এর উত্তর হলো, সেই ব্যক্তিবর্গ (সিরিয়াবাসীরাও নিজেদের পক্ষ থেকে) এটাই মনে করছিলেন যে তারা জান্নাতের দিকে ডাকছেন। তারা সবাই এই বিষয়ে মুজতাহিদ ছিলেন, তাদের নিজেদের চিন্তাধারা অনুসরণের কারণে তাদের ওপর কোনো তিরস্কার নেই। সুতরাং জান্নাতের দিকে ডাকার অর্থ হলো জান্নাতের কারণের দিকে ডাকা, আর তা ছিল শাসকের আনুগত্য। একইভাবে আম্মার (রা.) তাদের আলী (রা.)-এর আনুগত্যের দিকে ডাকছিলেন, আর তিনি ছিলেন এমন শাসক যার আনুগত্য সেই সময় ওয়াজিব ছিল। আর সেই ব্যক্তিবর্গ (সিরিয়াবাসীরা) এর বিরুদ্ধে ডাকছিলেন, কিন্তু তারা সেই ব্যাখ্যার (তাওয়িল) কারণে অপারগ ছিলেন যা তাদের নিকট প্রকাশ্য ছিল।” [১]

(৩) তৃতীয় উত্তর হলো, ‘ইয়াদউল্হম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’ অংশটি এই হাদিসে প্রমাণিত নয়। [২]

[১] ফাতহুল বারী: ১/ ৫৪১

[২] এই বিষয়ে হাদিস দুই প্রকার: এক, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর; দুই, সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় দলের। আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনাটি মুরসাল, তিনি নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ (বিদ্রোহী দল) সংক্রান্ত বর্ণনাটি শোনেননি। তা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে সম্বন্ধ করে এই বর্ণনাটি শোনাতেন এবং কোথাও মধ্যবর্তী মাধ্যম (হযরত আবু কাতাদা)-এর নাম নিতেন। সনদের এই পার্থক্য ছাড়াও মতন (মূল পাঠ)-এর বর্ণনায়ও পার্থক্য রয়েছে, আর তা হলো তিনি হাদিসটি এভাবে শোনাতেন: কখনো এভাবে শোনাতেন ‘তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাগীয়া, ইয়াদউল্হম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’। আর অধিকাংশ সময় এভাবে শোনাতেন: ‘তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’। অর্থাৎ তিনি ‘ইয়াদউল্হম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’ অংশটি অধিকাংশ সময় বর্ণনা করতেন না। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের একটি বিশাল দলও এই হাদিসটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে কোথাও ‘ইয়াদউল্হম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’ আসেনি। এভাবে বাস্তবে এগুলো দুটি হাদিস: একটি হলো ‘তাকতুলু আম্মারান আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ যা সাহাবায়ে কেরাম এত অধিক পরিমাণে বর্ণনা করেছেন যে এই সংবাদটি মুতাওয়াতির (অকাট্য) হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টি হলো ‘ইয়াদউল্হম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’ সংক্রান্ত বর্ণনা যা সাহাবায়ে কেরামের মুরসাল বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত এবং এর মতন মুতাওয়াতির নয়। হাদিস বিশারদগণ আলোচ্য বিষয়ে সেই বর্ণনাগুলোকে মূল হিসেবে গণ্য করেছেন যাতে ‘তাদউল্হম ইলাল হাক্কি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’ শব্দগুলো নেই। এই বর্ণনাগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো এগুলোর সনদ উচ্চমানের এবং মারফু। সারকথা হলো, অধিকাংশ সাহাবী থেকে এবং স্বয়ং আবু সাঈদ খুদরী থেকেও অধিকাংশ স্থানে ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ সংক্রান্ত বর্ণনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে তাতে ‘ইয়াদউল্হম ইলাল জান্নাতি ওয়া ইয়াদউনাউ ইলাল নার’ বাক্যটি নেই। অনুসন্ধান জানা যায়, এই বর্ণনাটি ২০ জনেরও বেশি সাহাবী থেকে বর্ণিত এবং হাদিসের কিতাবসমূহে প্রায় ১০০টি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা একটি বলক পেশ করছি। (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

সাধারণ মুহাদ্দিসগণ “আফসোস আন্মারের জন্য, তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে, সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে” শব্দগুলোকে প্রমাণিত মনে করেন, তবে তারা এগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা করেন যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে এমন কোনো কথা আবশ্যিক হয় না যা ইসলামী আকিদার পরিপন্থী। হ্যাঁ, তাঁদের ভুল প্রমাণিত হয় যা ইসলামী মূলনীতির বিরোধী নয়; কারণ এটি ইসলামী আকিদা নয় যে সাহাবায়ে কেলাম ভুলত্রুটি থেকে মাসুম ছিলেন।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

- উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে: (সহীহ মুসলিম, হা: ৭৩৫০, ৭৩৫১; কিতাবুল ফিতান; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৫৬৩, ২৬৬৫০, ২৬৬৮০; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি, হা: ১৬০৩; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮২৯০, ৮২৯১, ৮২৯২, ৮২৯৩, ৮২৯৪; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ৩৭৮৫১; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ২৩/৩২৩)।
- আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে: (সহীহ মুসলিম, হা: ৭৫০৩, শব্দাবলী: ‘তাহফতাহ ফিয়াতুন বাঘিয়াহ’, কিতাবুল ফিতান; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১১০১১, ১১২২১; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮২৯৫, ৮২৯৬; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি, হা: ২১৮২, ২১৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১১১৬১)।
- আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে: (মুসনাদে আহমাদ, হা: ২২৬০৯, ২২৬১০; আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, হা: ১৮৬০; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮২৯৭)।
- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে: (সুনানে তিরমিজি, বাবু মানাকিবে আম্মার)।
- আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে: (মুসনাদে ইবনুল জাদ, হা: ১৬২১, ১৬২২; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৭৭৬৭; মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, হা: ১৮৬৬, ১১৯; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৭৮৫১, ৩৭৮৫৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: ২০৪২৭; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৯/৩৩০)।
- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে: (মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৪৯৯, ৭৫৩৮, ৬৯৩৬, ৬৯৩৯; মুসনাদে বাজ্জার, হা: ২৩২৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ৩৭৮৪৫; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, রেওয়ায়েত নম্বর: ৮২৯৬, ৮২৯৭, ৮২৯৮; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৯/১৩১)।
- আমর বিন হাজম (রা.) থেকে: (মুসনাদে আহমাদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৭৭৭৮)।
- খুজাইমা বিন সাবিত যুল-শাহাদাতাইন (রা.) থেকে: (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৭৮৪৫; মুসনাদে আহমাদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ২১১৮৩; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৪/৮৫)।
- আব্দুল্লাহ বিন আবি আল-হাযল (রা.) থেকে: (মুসনাদে তায়ালিসি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৯৩; মুসনাদে আহমাদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১০১৬; মুসনাদে হারিস, রেওয়ায়েত নম্বর: ১০১৮)।
- য়ায়েদ বিন আবি আওফা (রা.) থেকে: (আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, রেওয়ায়েত নম্বর: ২৭০৭; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৫/২২০)।
- আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল আওসাত, রেওয়ায়েত নম্বর: ৬৩১৫)।
- আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল আওসাত, রেওয়ায়েত নম্বর: ৫৫২৬)।
- উসমান বিন আফফান (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল সাগীর, রেওয়ায়েত নম্বর: ৫১৬)।
- আবু রাফে (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১/৩২০)।
- আবু আইয়ুব (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৪/১২৮)।
- যিয়াদ বিন আল-মুফরাদ ও আবু আল-হাশর (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৫/২৭৬)।
- আবু আল-ইউসর (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৯/১৫০, ১৫১)।
- হুজাইফা ও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে: (মুসনাদে বাজ্জার, রেওয়ায়েত নম্বর: ২৯৩৮)।
- মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.) থেকে: (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৯/৩৯২)।

‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ’ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলো এসব স্থানে দেখুন, তবে এতে “সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে” শব্দগুলো নেই। সহীহ বুখারী ছাড়া “সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে” শব্দগুলো শুধুমাত্র এখানে পাওয়া গেছে:

- মুসনাদে আহমাদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১১৮৬১, আবু সাঈদ থেকে মুরসাল হিসেবে।
- সহীহ ইবনে হিব্বান, রেওয়ায়েত নম্বর: ৭০৭৮, ৭০৭৯, আবু সাঈদ থেকে মুরসাল হিসেবে।

(বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

আল-মারিকাহ, আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ এবং খারিজিদের লক্ষ্যবস্তু কারা?

প্রশ্ন: ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ’-এর লক্ষ্যবস্তু প্রকৃতপক্ষে খারিজিরা। ‘কানযুল উম্মাল’-এ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খারিজি সর্দারকে বলেছিলেন: “ইউকতালুহ আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ” (বিদ্রোহী দলটি তাকে হত্যা করবে)। [১]

অন্যান্য বর্ণনায় খারিজিদের ‘আল-মারিকাহ’ও বলা হয়েছে, অর্থাৎ দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া লোক। [২] আল-মারিকাহ এবং আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ-এর অর্থ কাছাকাছি। সুতরাং, যেভাবে ‘আল-মারিকাহ’ খারিজি ছিল, তেমনি ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ’ও তারাই ছিল। হাফিজ ইবনে হাজার, ইমাম নববী এবং মোল্লা আলী ক্বারী প্রমুখ কোন ভিত্তিতে আহলে শামের (সিরিয়াবাসীদের) ওপর এটি প্রয়োগ করেন?

উত্তর: ইসলামের আকাবিরগণ (মনীষীগণ) মুতাওয়াতির হাদীস, ফিকহী মূলনীতি এবং প্রমাণিত ঘটনাবলীর অধীনে এই প্রয়োগ করেন, যা অস্বীকার করা সম্ভব নয়; যদি না ইতিহাস ও হাদীসের সহীহ বর্ণনাগুলোকেও গুরুত্বহীন ঘোষণা করা হয়।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

যেহেতু এই উভয় বর্ণনা মুরসাল এবং মারফু বর্ণনায় এই শব্দগুলো নেই, তাই এ থেকে বোঝা যায় যে এগুলো মূলত হাদীসের শব্দ ছিল না। কিছু গবেষকের মতে, বুখারী শরীফের মূল পাণ্ডুলিপিতে এই হাদীসটি এভাবে ছিল: “ওয়াইহা আন্মার ইয়াদউহম ইলাল জাম্মাহ ওয়া ইয়াদউনাহ ইলান নার।” এটি একটি স্বতন্ত্র হাদীস ছিল যার সাথে ফিয়াতুল বাঘিয়াহ অর্থাৎ আহলে শামের বিষয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীতে পাণ্ডুলিপিগুলোর পার্থক্যের কারণে দুটি হাদীস মিশে গেছে। বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে ‘তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ’ মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং বর্ণনাটি এভাবে হয়ে গেছে:

“ওয়াইহা আন্মার তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ, ইয়াদউহম ইলাল জাম্মাহ ওয়া ইয়াদউনাহ ইলান নার।”

বুখারীর সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থ যা আন্দালুসের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে বাত্তাল (মৃত্যু ৪৪৯ হিজরী) পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে লিখেছেন, তিনি এই হাদীসের শব্দগুলো এভাবে উদ্ধৃত করেছেন: “ওয়াইহা আন্মার, ইয়াদউহম ইলাল জাম্মাহ ওয়া ইয়াদউনাহ ইলান নার।” (শরহে বুখারী, ইবনে বাত্তাল: ২/৯৫)

এজন্যই বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হুমায়দী (মৃত্যু ৩৮৮ হিজরী) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার সংকলন ‘আল-জাম বাইনাস সাহিহাইন’-এ এই অতিরিক্ত শব্দগুলো (তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ) উদ্ধৃত করেননি। হুমায়দী এই হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেন: “ওয়াইহা আন্মার, ইয়াদউহম ইলাল জাম্মাহ ওয়া ইয়াদউনাহ ইলান নার...”। এরপর তিনি বলেন:

“এই হাদীসে একটি প্রসিদ্ধ অতিরিক্ত অংশ রয়েছে যা ইমাম বুখারী তাঁর বর্ণনার উভয় স্থানে উল্লেখ করেননি। (অর্থাৎ প্রতিটি স্থানেই ‘তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ’ বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন)। সম্ভবত বুখারীর নিকট এই শব্দগুলো প্রমাণিত ছিল না, অথবা প্রমাণিত ছিল কিন্তু তিনি কোনো কারণে তা বাদ দিয়েছেন। এই সংযোজনটি এই হাদীসে আবু বকর আল-বারকানী এবং আবু বকর আল-ইসমাঈলী বর্ণনা করেছেন। আবু মাসুদ দামেশকী বলেন যে, ইমাম বুখারী এই অতিরিক্ত শব্দগুলো বর্ণনা করেননি। এগুলো আব্দুল আজিজ বিন মুখতার এবং খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ওয়াসিতী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। আব্দুল ওয়াহাবের বর্ণনায় যা ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন, তা এই শব্দগুলো থেকে মুক্ত।” (আল-জাম বাইনাস সাহিহাইন, বুখারী ও মুসলিম: ২/২৬২)

হাফিজ ইবনে হাজার রহ. এর ওপর আরও আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

“যেহেতু এই অতিরিক্ত শব্দগুলো (তাকতুলুহ আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ) হুমায়দী ‘আল-জাম’-এ উল্লেখ করেননি এবং বলেছেন যে বুখারী এগুলো মোটেও উল্লেখ করেননি।” এরপর তিনি বলেন: “আমার মনে হয় বুখারী এই শব্দগুলো (আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ) ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়েছেন, কারণ এটি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর একটি সুস্ব স্বীকারোক্তি যে তিনি এই অতিরিক্ত শব্দগুলো নবী করীম ﷺ থেকে শোনেননি। (অর্থাৎ হাদীসের মূল পাঠ এতটুকুই যে: ‘ওয়াইহা আন্মার, ইয়াদউহম ইলাল জাম্মাহ ওয়া ইয়াদউনাহ ইলান নার’)। ফলে এটি প্রমাণিত হলো যে ‘ফিয়াতুল বাঘিয়াহ’ শব্দগুলো এই বর্ণনায় পরবর্তীতে সংযোজন করা হয়েছে। আর যে বর্ণনায় (ফিয়াতুল বাঘিয়াহ) শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে, তা বুখারীর শর্ত অনুযায়ী নয়। এই বর্ণনাটি আবু দাউদ ইবনে আবু হিন্দ বিন নযর বিন আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং মসজিদ (নববী) নির্মাণ ও সাহাবায়ে কেরামের একটি একটি ইট বহনের কথা উল্লেখ করার সময় এতে আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে: ‘আমার কিছু সাথী আমাকে জানিয়েছে, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনি নি যে, তিনি বলেছেন: হায় আন্মার! একটি বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে’।” (ফাতহুল বারী: ১/৫৪২)

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] কানযুল উম্মাল, হাদীস নম্বর: ৩১৫৭২; জামিউল আহাদীস, হাদীস নম্বর: ৩৩৩৭০।

[২] আল-মু’জামুল আওসাত, হাদীস নম্বর: ৭৬৫৯।

“আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” (বিদ্রোহী দল) কোনো একটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরি নয়। বিদ্রোহী দল একাধিক হতে পারে। যে কেউ শরয়ী খলিফার আনুগত্য অস্বীকার করে কোনো এলাকার ওপর দখলদার হবে, তার ওপর ‘বাগী’ (বিদ্রোহী) শব্দটির প্রয়োগ সঠিক হবে। আহলে শামের (সিরিয়াবাসী) বিদ্রোহ কেবল আন্মার (রা.)-এর হাদীসের ওপর নির্ভরশীল নয়। যদি এই হাদীস সামনে নাও থাকত, তবুও সিফফীনের যুদ্ধের বহু সহীহ বর্ণনা হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ‘খুরুজ’ (বিদ্রোহ)-এর ফিকহী সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই হযরত আন্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পূর্বেই সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিশাল জামাত হযরত আলী (রা.)-এর সাথে আহলে শামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন; কারণ বিদ্রোহের শরয়ী সংজ্ঞা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

খারেজীদের ব্যাপারে কথা হলো, তাদের বিদ্রোহী হওয়া তো স্পষ্ট। যদি ইনসাফের গণ্ডির মধ্যে থেকে আন্মার (রা.)-এর হাদীসের শব্দগুলো তাদের ওপর প্রয়োগ করার সুযোগ থাকত, তবে ইসলামের উলামায়ে কেরাম এতে কোনো দ্বিধা করতেন না। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরিদের (আসলাফ) নীতি ছিল এই যে, তারা শত্রুর ব্যাপারেও ইলমী থিয়ানত থেকে বেঁচে থাকতেন। তাদের কাছে এটি স্পষ্ট ছিল যে, আন্মার (রা.)-এর হাদীসের লক্ষ্যবস্তু তারাই হবে যারা হযরত আন্মার (রা.)-কে হত্যা করবে। আর সহীহ বর্ণনা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, হত্যাকারী ছিল শামী অফিসার আবু আল-গাদিয়া জুহানী (রা.)। সুতরাং এই সহীহ বর্ণনাগুলোকে উপেক্ষা করে কেবল ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ এবং ‘আল-মারিকা’ শব্দগুলোর মধ্যে অর্থগত সামঞ্জস্য দেখে কিয়াসের মাধ্যমে খারেজীদের বাগী সাব্যস্ত করা কোনো গুরুত্ব রাখে না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে খারেজীরাও বিদ্রোহী ছিল, যেমনটি তাদের বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট ছিল। অধিকন্তু, তাদের বিদ্রোহ কোনো ব্যাখ্যা (তাবীল) বা ইজতিহাদ বর্জিত ছিল; তাই তারা কেবল বিদ্রোহীই ছিল না, বরং পথভ্রষ্ট ও গুনাহগারও ছিল। এজন্যই তাদের ‘মারিকা’ বলা হয়েছে, কেবল ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ নয়। তাছাড়া যেখানে তাদের ‘মারিকা’ বলা হয়েছে, সেখানে এটিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আবির্ভাব হবে দুটি বড় দলের মধ্যে যুদ্ধের পর [১]। যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ‘মারিকা’ একটি আলাদা দল।

মনে রাখা দরকার যে, সমগ্র হাদীস ভাণ্ডারে খারেজীদের জন্য ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ শব্দগুলো কেবল ‘কানযুল উন্মাল’-এর এই বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ‘কানযুল উন্মাল’-এ এটি ইবনে আবী আসিমের ‘আস-সুন্নাহ’ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে আবী আসিম নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে, এর একজন বর্ণনাকারী ইসহাক বিন ইদ্রিস আল-বসরী ‘মাতরুক’ (পরিত্যক্ত), এবং এটিও বলা হয়েছে যে মুহাদিসগণ এই বর্ণনার শব্দগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেও ‘ইয়াকতুলু আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ শব্দগুলোকে প্রমাণিত মনে করেননি [২]। সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনাটি লেখকের দাবি প্রমাণের জন্য একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

তবে যদি এই বর্ণনার সমস্ত শব্দকে হুবহু প্রমাণিত হিসেবে মেনেও নেওয়া হয়, তবুও জমহুর উলামায়ে কেরামের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না; কারণ ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ (বিদ্রোহী দল)-কে একটি মাত্র দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কোনো দলিল নেই। এটি স্পষ্ট যে, বিদ্রোহী দল যেকোনো যুগে একাধিক হতে পারে।

[১] “দুটি বিশাল দল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের দাবি হবে এক, এমতাবস্থায় তাদের মধ্য থেকে একটি দল বের হবে (বিচ্যুত হবে), যাদেরকে হত্যা করবে সত্যের অধিক নিকটবর্তী দলটি।” (আল-মু’জাম আল-আওসাত: ৭৬৫৯; মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক: ১৮৬৫৮)।

[২] আস-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসিম, হাদীস নম্বর: ৯১১।

“আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” (الفئة الباغية)-এর ওপর “আলিফ লাম” নিয়ে একটি সংশয়:

প্রশ্ন: হাদীস বিশারদগণ কি এটি ভাবেননি যে “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া”-তে আলিফ লামের উপস্থিতি অকারণে নয়? এটি দেখুন, হাদীসের সঠিক অনুবাদ এটি নয় যে: “আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।” বরং আলিফ লামের সাথে এর সঠিক অনুবাদ হলো: “আম্মারকে সেই বিদ্রোহী দলটি হত্যা করবে।” (সঠিক অনুবাদে বিদ্রোহী দলটি নির্দিষ্ট বা মারেফা, অথচ ভুল অনুবাদ অনির্দিষ্ট বা নাকেরা অনুযায়ী করা হয়।)

ইরশাদে নববীর শব্দগুলো বলে দিচ্ছে যে, সেটি একটি সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ বিদ্রোহী দল। যে সময় এই হাদীসটি শোনানো হয়েছিল, সে সময় ইসলামি বিশ্বে কোনো বিদ্রোহী দল ছিল না, কেবল সেই মুনাফিকরা ছাড়া যারা মদীনায় থেকে গোপন ষড়যন্ত্র করত। (এই নববী বাণী বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদে নববী নির্মাণের সময় এবং মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী খন্দকের যুদ্ধের সময় ইরশাদ করা হয়েছিল)। তাই এখানে “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” দ্বারা নিশ্চিতভাবে এমন কোনো দল উদ্দেশ্য ছিল যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্ঞান ও চিন্তায় ছিল। এর কোনো পরিচয় না দিয়ে একে “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” বলে বর্ণনা করা এটি প্রকাশ করে যে, পরবর্তী যুগে তারা বিদ্রোহের জন্য সুপরিচিত ও বিখ্যাত হবে এবং সুপরিচিত থাকবে। যখনই “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” শব্দটি বলা হবে, তখনই কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাদের কথা মনে আসবে। বিদ্রোহই হবে তাদের পরিচয়।

হযরত মুয়াবিয়া এবং তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য সংশোধন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহী গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন না। তাঁরা মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকতেন। তাই তাঁদের ওপর “আল-ফিয়াতুল বাগীয়া” প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন।

অন্যদিকে যদি লক্ষ্য করা হয়, তবে সাহাবায়ে কেরামের শাসনকালে বিদ্রোহী দল হিসেবে যারা সক্রিয় ছিল, তারা ছিল আব্দুল্লাহ বিন সাবার জামাত এবং উসমানের হত্যাকারীদের দল। তারাই হযরত আলীর যুগে খারেজীদের রূপ ধারণ করেছিল এবং এরপর প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তারা জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ করতে থাকে। হাদীসের বাহ্যিক শব্দে যেভাবে বিদ্রোহী দলের কথা কোনো দ্বিধা ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই লোকদের ওপরই প্রযোজ্য হয়। উম্মতের সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী বিদ্রোহী দল প্রতিটি যুগে এই লোকেরাই ছিল, যদিও তাদের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

উত্তর: খারেজী এবং সাবায়ীদের পথভ্রষ্টতা এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই লোকেরা বারবার বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার প্রকাশ্য প্রদর্শনও করেছে। কিন্তু আহলে শামের সাথে সংঘাতকে, যাতে তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ হয়েছিল, কোন শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে ‘খুরুজ’ (বিদ্রোহ) মানা হবে না? অথচ ফিকহ শাস্ত্রের বইগুলোতে একে খুরুজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যদি একজন খলীফায়ে রাশেদের সাথে যুদ্ধও “খুরুজ” না হয়, তবে খুরুজের সংজ্ঞা কী?

প্রশ্ন এটি নয় যে কোন দলটি অনিষ্টকারী, মুনাফিক ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কোনটি দ্বীনদার, মুত্তাকী ও পরহেযগার? নিশ্চিতভাবেই সাবায়ী এবং খারেজীরা অনিষ্টকারী ছিল। আর সাহাবী ও তাবায়ীগণ, চাই তাঁরা ইরাকী হোন বা শামী, দ্বীনদার ও মুত্তাকী ছিলেন। কিন্তু প্রশ্নকারী যে দাবি করেছেন তা তখনই প্রমাণিত হতে পারে যখন খুরুজের এমন কোনো নতুন ফিকহী সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যাবে যা আহলে শামের পদক্ষেপগুলোর ওপর প্রযোজ্য হবে না।

এও প্রমাণ করা জরুরি হবে যে, হযরত আম্মার-এর হত্যা সিরিয়াবাসীরা (আহলুশ শাম) করেনি।

“আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া”-এর ওপর ‘আলিফ লাম’-এর অনুমানমূলক আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে খুব ভালো মনে হলেও এটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। যদি এটি মেনে নেওয়া হয়, তবে হযরত আম্মার-এর হত্যাকারী আবু গাদিয়া-কে সাবায়ী বলে গণ্য করতে হবে, অথচ তিনি ছিলেন একজন সিরীয় সাহাবী।

যখন এটি প্রমাণিত হয়েছে যে আম্মার-এর হত্যা আবু গাদিয়া আল-জুহানি করেছেন এবং “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া” দ্বারা সিরিয়াবাসীদের বোঝানো হয়েছে, তখন এটিও মেনে নিতে হবে যে হাদিসে “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া”-এর ‘আলিফ লাম’ (আলিফ লাম আহদি) যে বিশেষ দলটিকে নির্দেশ করছে, তারা সিরিয়াবাসীই ছিল।

“আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া”-এর ওপর ‘আলিফ লাম’ এজন্যও আসতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্ঞান ও চিন্তায় সিরিয়াবাসীদের বিদ্রোহের চিত্রটি স্পষ্ট ছিল। ইসলামী ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম বড় বিদ্রোহ যা সিফফিনের যুদ্ধ থেকে ৩৭ হিজরি পর্যন্ত চলতে থাকে। ৪০ হিজরির মধ্যে সীমান্ত সম্মানের একটি চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু হযরত আলী-এর শাহাদাত পর্যন্ত তাঁর বায়াত গ্রহণ করা হয়নি। এই দ্বন্দ্ব তখন শেষ হয় যখন হযরত হাসান খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে সম্মত হন এবং পাঁচ বছর পর মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়।

সাবায়ীরা ছিল অনিষ্টকারী, পথভ্রষ্ট এবং মুনাফিক, কিন্তু তারা কখনো প্রকাশ্যে ময়দানে আসেনি। খারিজিদের শক্তিও কয়েক হাজারের বেশি ছিল না, যারা কয়েক মাসের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সিরিয়াবাসীদের দলটি ছিল অনেক বড় এবং এই বিবাদে রক্তপাতও ছিল অনেক বেশি এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাছাড়া যেহেতু উভয় দলই দীনদার ছিল, তাই ভালো মানুষ প্রচুর পরিমাণে নিহত হয়েছিলেন; এই দিক থেকে এই বিবাদটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন: “কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে দুটি বড় দল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে ভয়াবহ রক্তপাত হবে। তাদের দাবি একই হবে।” [১]

প্রশ্ন: হযরত আম্মার-ও সাহাবী ছিলেন এবং তাঁকে হত্যাকারী আবু গাদিয়া-ও সাহাবী ছিলেন। এটি কীভাবে সম্ভব যে একজন সাহাবী অন্য একজন সাহাবীকে হত্যা করেছেন? সুতরাং, আবু গাদিয়া আম্মার-এর হত্যাকারী ছিলেন না এবং সিরিয়াবাসীরাও “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া” নয়।

উত্তর: এই ঘটনাটি যুদ্ধাবস্থার এবং এই সময়ে আবু গাদিয়া-র নিজস্ব বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত যে, তিনি জানতেন না যে তিনি কার ওপর আঘাত করেছেন, কারণ হযরত আম্মার শিরস্ত্রাণ (খুদ) পরিহিত ছিলেন। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে তিনি জেনেশুনে হত্যা করেছিলেন, তবুও যুদ্ধে কিছু সাহাবীর হাতে অন্য সাহাবীদের শাহাদাত প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই, কারণ যুদ্ধ যখন ছিল তখন অনিবার্যভাবে এমনটি হতেই হতো। যদি যুদ্ধকে অস্বীকার করা না যায়, তবে শাহাদাতের খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলো অস্বীকার করে কী লাভ? সুতরাং, এই যুক্তির মাধ্যমে আবু গাদিয়া আল-জুহানির হাতে আম্মার-এর হত্যার ঘটনা অস্বীকার করা—যাতে সিরিয়াবাসীদের একজন সাহাবীর হত্যার দায় থেকে মুক্ত প্রমাণ করা যায়—একটি নিরর্থক ব্যাখ্যা। যদি আম্মার-এর হত্যা থেকে সিরিয়াবাসীদের মুক্ত ঘোষণা করাও হয়, তবে সিফফিনের বাকি হাজার হাজার নিহতের ব্যাপারে কী বলা হবে, যাদের মধ্যে কত সাহাবী ও তাবিঈ ছিলেন? তারা সবাই কি সাবায়ীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন? বাকি নিহতদের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য, জমহুর উলামায়ে কেরাম হযরত আম্মার-এর হত্যার ব্যাপারেও সেই একই ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৭০২১, কিতাবুল ফিতান, বাবু খুরুজিন নার; সহীহ মুসলিম, হা: ২২১৪, কিতাবুল ফিতান।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অর্থাৎ হযরত আম্মার (রা.) সহ সিফফিনের যুদ্ধে নিহত সকল সাহাবী ও তাবেরী ইজতিহাদের অধীনে সংঘটিত একটি যুদ্ধের শহীদ। এই যুদ্ধে হত্যাকারীদের গুনাহগার মনে করা যাবে না এবং মজ্জুলদেরও (নিহতদের) নয়। ইনশাআল্লাহ তারা সবাই সওয়াবপ্রাপ্ত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত।

□□□

কি “আল-ফিতাতুল বাঘিয়া” এর অর্থ “কিসাস তলবকারী জামাত” করা যেতে পারে?

(প্রশ্ন) “আল-ফিতাতুল বাঘিয়া” দ্বারা উদ্দেশ্য “কিসাস তলবকারী জামাত”। কারণ এর মূল ধাতু “আল-বাগি” যার অর্থ “তলব করা” বা “খোঁজা”। অর্থাৎ আহলে শাম উসমানের কিসাস তলব করছিল যেমনটা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত। এই দিক থেকে হাদিসে তাদের ওপর “আল-ফিতাতুল বাঘিয়া” প্রয়োগ করা কোনো নিন্দা নয় বরং পূর্ণ প্রশংসা। উচিত ছিল এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু এর পরিবর্তে অধিকাংশ হাদিস ব্যাখ্যাকারী আহলে শামকে বাস্তবে বিদ্রোহী মনে করে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে আহলে সুন্নাতের আলেমদের মধ্যে রাফযি মতবাদের জীবাণু সর্বদা বিদ্যমান।

(উত্তর) “আল-ফিতাতুল বাঘিয়া” এর এই ব্যাখ্যায় যদি সামান্যতম ওজন থাকত তবে হাদিস ব্যাখ্যাকারীরা সাহাবায়ে কেরামকে আপত্তি থেকে বাঁচানোর খাতিরে অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন। উম্মতের আলেমদের মধ্যে রাফযি মতবাদের জীবাণু কখনোই নেই, বরং তারা কখনো কাল্পনিক ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তা ছিলেন না। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসলামের সুরক্ষা। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের জীবনের উদ্দেশ্য। উম্মতের আলেমদের নিকট সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ সমর্থনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ইসলামের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, কারণ আমাদের নিকট সুন্নতে নববী পৌঁছানোর প্রথম মাধ্যম হলেন এই ব্যক্তিবর্গই।

ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণে স্বয়ং ইসলাম এবং সুন্নতে নববীর সঠিক অর্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। যখন উদ্দেশ্য দ্বীন রক্ষা করা, তখন যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীর কোনো কাজের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্বয়ং ইসলামের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেখানে তাদের কাজের ব্যাখ্যা করা হবে না বরং তাদের ভুলকে ভুল হিসেবেই গণ্য করা হবে। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহাবীর ভুলকে এমন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে ঢেকে দেওয়া ফরজ হতো যে মূল ঘটনাটিই বদলে যায় এবং ভুল ভুল না থাকে, তবে একাধিক সহিহ হাদিসে বর্ণিত কিছু সাহাবীর চুরি, ঘিনা এবং মদ্যপান ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়া এবং তাদের ওপর হাত কাটা ও রজম করার দণ্ড কার্যকর করার বিষয়গুলোকেও কোনো না কোনো দূরবর্তী অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক হয়ে পড়ত যে এগুলো কবির গুনাহ নয়। এমন অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে উম্মতের ওপর এই অবস্থান গ্রহণ করা ফরজ হতো যে কোনো সাহাবী থেকে কখনো এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়নি যার ওপর হদ জারি হতে পারে।

এর ফলাফল কী হতো? এমন ব্যাখ্যার মাধ্যমে একদিকে কিছু সাহাবীর সাময়িক পক্ষ সমর্থন তো হতো ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে শরয়ী হদ ও বিধান অস্বীকার করা হতো এবং বাতিল ফেরকাগুলোর জন্য হাদিসে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও মনগড়া সুন্ম তর্কের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেত।

“আল-ফিতাতুল বাঘিয়া” হাদিসটি সহিহ, মুতাওয়াতিহ এবং এর অর্থ একেবারেই স্পষ্ট। এর প্রয়োগ এমন এক জামাতের ওপর হয়েছে যারা তাদের সমস্ত ফজিলত ও মর্যাদা এবং নেক নিয়ত থাকা সত্ত্বেও ভুল বুঝাবুঝির কারণে বিদ্রোহের (খুরুজ) লিপ্ত হয়েছিল। হযরত আলী (রা.) কুরআন মাজিদের হেদায়েত অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে বিদ্রোহের শরয়ী শাস্তি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে কার্যকর করেছিলেন।

ছিলেন। তাদের এই পদক্ষেপ কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্রোহের (খুরুজ) মাসআলাসমূহের জন্য একটি নীতিমালা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং এভাবে উন্মত হৃদু ও কিসাসের মতো বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সংজ্ঞা ও মাসআলা বোঝার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য উৎস লাভ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞ আলেমদের (উলামায়ে রাসিখীন) নিকট এটি কেবল কঠিনই নয় বরং নাজায়েজ ছিল যে, তারা ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ হাদিসের এমন কোনো ব্যাখ্যা (তাবিল) গ্রহণ করবেন যা শরয়ি পরিভাষাকে পদদলিত করে এবং ভুলকারী পক্ষের ভুলকে বৈধতা বরং প্রশংসার সনদ দান করে।

অতএব, জমহুর উলামায়ে কেরাম এই অর্থকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করেননি বরং একে হাদিসের স্পষ্ট মর্মের বিকৃতি (তাহরিফ) এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যা (তাবিল ফাসিদ) হিসেবে গণ্য করেছেন। মোল্লা আলী কারী রহ. এই অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন:

“যেমনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটি একটি বিকৃতি। কারণ এখানে (আল-বাঘিয়া শব্দ দ্বারা) কিসাস তলব করা উদ্দেশ্য নেওয়া অনুপযুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি হযরত আম্মার রা.-এর ফজিলত এবং তাঁর হত্যাকারীদের নিন্দাস্বরূপ বলেছেন, কারণ হাদিসে ‘ওয়াইহা’ শব্দটি এসেছে। আমি বলি যে, ‘ওয়াইহা’ শব্দটি এমন ব্যক্তির জন্য বলা হয় যে এমন বিপদে পতিত হয়েছে যার সে যোগ্য নয়, তার প্রতি করুণাবশত এবং আক্ষেপ করে ‘ওয়াইহা’ বলা হয়। জামেউস সাগির-এ ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারি থেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা.-এর সূত্রে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: ‘আম্মারের জন্য আফসোস! তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে, সে তাদের জান্নাতের দিকে ডাকবে আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে’। এটি ঠিক তেমনই যেমন কিতাবুল্লাহতে ‘আল-বাঘি’ শব্দটি যেখানেই সাধারণভাবে এসেছে, সেখানে এর দ্বারা এই সঠিক এবং তাৎক্ষণিক বোধগম্য অর্থই উদ্দেশ্য, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

‘এবং তিনি অলীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন (আল-বাঘি) থেকে নিষেধ করেন।’ [১]

এবং ইরশাদ হয়েছে: ‘অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়।’

সুতরাং একটি শরয়ি (পারিভাষিক) শব্দকে আভিধানিক অর্থের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইনসাফ থেকে দূরে। এটি জুলুমের দিকে ঝোঁকা, যা কোনো বস্তুকে তার স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার নাম।“ [২]

হাফেজ জাহাবি রহ.-এরও একই অভিমত। তিনি আম্মারের হাদিস সম্পর্কে বলেন:

“এই হাদিসটি সহিহ। কিছু লোক এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, বাঘি (বিদ্রোহী) মানে ‘তলবকারী’ (অন্বেষণকারী), কিন্তু এই কথার কোনো ভিত্তি নেই।” [৩]

ইমাম কুরতুবি রহ. ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’-কে কিসাস তলবকারী অর্থে গ্রহণ করাকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা (তাবিল ফাসিদ) হিসেবে গণ্য করে বলেন:

“এই প্রথম ব্যাখ্যাটি ভ্রান্ত হওয়ার স্পষ্টীকরণ হলো এই যে, যদিও ‘আল-বাঘি’-এর আভিধানিক অর্থ অন্বেষণ করা বা চাওয়া, কিন্তু ভাষা ও শরিয়তে এর ব্যবহার সীমালঙ্ঘন ও ফাসাদের জন্য হয়। এজন্যই আবু উবাইদ এবং অন্যান্য ভাষাবিদগণ লিখেছেন: ‘আল-বাঘি’ ‘অতিরিক্ততা’ বা ‘সীমালঙ্ঘন’-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।”

[১] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯০; সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯।

[২] মিরকাতুল মাফতিহ: ৯/৪৮৫, কিতাবুল ফাদায়েল, বাবুল মুজিজাত, দারুল ফিকর।

[৩] আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল, পৃ. ২৫১।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — সপ্তম

তিনি ‘আল-বাগি’ শব্দের ওপর সংক্ষিপ্ত আভিধানিক আলোচনার পর লেখেন:

‘আল-বাগি’-এর অবস্থা ‘আস-সালাত’ এবং ‘আদ-দাব্বাহ’-এর মতো পারিভাষিক বিশেষ্যগুলোর (পরিভাষায় একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত নাম) মতো। যখন কেউ এগুলো শোনে, তখন তার মন পারিভাষিক অর্থের দিকেই যায়, মূল আভিধানিক অর্থের দিকে নয় যা পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। আর শব্দের এই পারিভাষিক অর্থের ওপর ভিত্তি করার কারণেই আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও সেই যুগের সমসাময়িক লোকেরা এই ব্যাখ্যাকে (অর্থাৎ বাগিয়া বলতে অন্ত্রেষণকারী উদ্দেশ্য) বিকৃতি বলে মনে করেছিলেন।

চলুন আমরা পরিভাষা ছেড়ে দিয়ে মেনে নেই যে, ‘বাগিয়া’ শব্দে অন্ত্রেষণ এবং ফাসাদ (বিপর্যয়) উভয়টির সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু নবী করীম (সা.) এই হাদীসে ‘আল-ফিয়াতুল বাগিয়া’ (বিদ্রোহী দল)-এর উল্লেখ হযরত আন্নার (রা.)-এর মর্যাদা এবং তাঁর হত্যাকারীদের নিন্দাস্বরূপ করেছেন। যদি ‘আল-বাগি’ দ্বারা কেবল অন্ত্রেষণ করা উদ্দেশ্য হতো, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদীসের কোনো অর্থ থাকত না। হাদীসের প্রেক্ষাপট এই উভয় বিষয়কে (আন্নার (রা.)-এর মর্যাদা এবং তাঁর হত্যাকারীদের নিন্দা) প্রকাশ করেছে। হাদীসের সমস্ত সূত্র একত্রিত করে চিন্তা করে দেখুন, এটাই প্রমাণিত হবে।

এছাড়া যদি এখানে ‘আল-বাগি’ দ্বারা ‘অনরষণ করা’ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে কেবল আন্নার (রা.)-এর হত্যাকারীদের বাগি অর্থাৎ কিসাস অন্ত্রেষণকারী সাব্যস্ত করা একটি নিরর্থক বিষয় হবে। কারণ হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সাথীরাও তো উসমানের কিসাস অন্ত্রেষণকারী ছিলেন, যদি তাঁরা এ থেকে অবসর হতে পারতেন এবং এর ওপর সামর্থ্য রাখতেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা মতভেদ ও তাড়াছড়ো করে তাঁদেরকে এই কাজ থেকে বিরত রাখেন, অথচ হযরত আলী (রা.) বলছিলেন যে, লোকেরা যে বৃত্তে প্রবেশ করেছে আপনারাও তাতে शामिल হয়ে যান, আমরা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে তাদের ওপর আল্লাহর কিতাবের ফয়সালা কার্যকর করব। কিন্তু এই ব্যক্তিবর্গ তাঁর কথার প্রতি মনোযোগ দেননি এবং তার ওপর চলেদেনি। তাকদীর প্রবল হয়ে গিয়েছিল এবং ঘরে শহীদ হওয়া ব্যক্তির (হযরত উসমান (রা.)) কারণে এক মহা ট্র্যাজেডি সংঘটিত হওয়ার ছিল। [১]

হযরত আলী (রা.)-এর নাম থেকে আমীরুল মুমিনীন শব্দ বাদ দেওয়ার ওপর কেন জেদ করা হয়েছিল?

প্রশ্ন: সিয়ফীনে যুদ্ধবিরতির চুক্তি লেখার সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নামের সাথে আমীরুল মুমিনীন শব্দটি মুছে ফেলার ওপর জোর দিয়েছিলেন। [২] এ থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে খিলাফতের যোগ্য এবং এই পদের উপযুক্ত মনে করতেন না?

উত্তর: একটি হলো শাসক হওয়া এবং অন্যটি হলো শাসনের যোগ্যতা থাকা। একইভাবে একটি হলো কাউকে শাসনের যোগ্য মনে করা, অন্যটি হলো কাউকে নিজের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা উচিত। শাসক হওয়ার যোগ্যতা একই সময়ে অনেক ব্যক্তির...

[১] আল-মুফহিম লিমা আশকাল মিন তালখিস মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআহ, ৭/২৫৫

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩১৮৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৫৬৫, ৫৬৬, তারিখুত তাবারী: ৫/৫৩

হতে পারে, কিন্তু একটি দেশের সাংবিধানিক শাসক এক সময়ে একজনই হয়ে থাকেন। যেমন খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আশারায়ে মুবাশশারার প্রত্যেকেই খিলাফতের যোগ্যতা রাখতেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে থেকে পর্যায়ক্রমে মাত্র চারজনকে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আলী (রা.)-কে খিলাফতের যোগ্য মনে করতেন, যেমনটি আবু মুসলিম খাওলানীর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেছেন: “হযরত আলী আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং খিলাফত ও শাসনের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি হকদারও।” [১]

কিন্তু তিনি হযরত আলী (রা.)-কে তৎক্ষণাৎ খলিফা হিসেবে স্বীকার করতেন না। যদি খলিফা হিসেবে স্বীকার করতেন, তবে তাঁর আনুগত্য করাকে ওয়াজিব মনে করতেন। তিনি কেবল এই বাস্তবতাকে তো মানছিলেন যে আলী (রা.) খিলাফতের যোগ্য। কিন্তু তিনি পরিস্থিতিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছিলেন, সেই অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) তৎক্ষণাৎ শরয়ী শাসক বা আমীরুল মুমিনীন ছিলেন না এবং তাঁর দলবদ্ধতাকে সরকার বলা যেত না। এই কারণেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেই মুহূর্তে হযরত আলী (রা.)-এর বায়আত করা এবং তাঁকে নিজের প্রধান হিসেবে মেনে নেওয়া সঠিক মনে করতেন না। তাঁর মতে, সিরিয়াবাসীদের আস্থায় না নিয়ে খিলাফতের বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না এবং সিরিয়াবাসীরা তখনই আস্থা রাখতে পারত যখন ওসমানের কিসাস গ্রহণ করা হতো। এটাই ছিল মূল বিরোধ।

তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একজন দক্ষ আইনজীবীর মতো সন্ধিপত্র থেকে হযরত আলী (রা.)-এর নামের সাথে ‘আমীরুল মুমিনীন’ শব্দটি সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ইরাকবাসীরা এই যুক্তি দেওয়ার সুযোগ না পায় যে, দাপ্তরিক কাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ‘আমীরুল মুমিনীন’ শব্দটি গ্রহণ করা বায়আতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে এবং এখন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করা বায়আত ভঙ্গের শামিল হবে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কাউকে এই সাংবিধানিক আপত্তির সুযোগ দিতে চাননি।

এটি ছিল হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি। বাকি বাস্তবে হযরত আলী (রা.) খলিফা ছিলেন কি না? এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে ইসলামের একই অভিমত যে, তিনি নিঃসন্দেহে খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের ব্যাপারে সিরিয়াবাসীদের অভিজ্ঞতা সঠিক ছিল না। তবুও হযরত আলী (রা.) তাঁদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং সন্ধির খসড়ায় নিজের নামের সাথে ‘আমীরুল মুমিনীন’ শব্দটি বাদ দেওয়া মেনে নিয়েছেন যাতে কোনোভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

□□□

সিফফিনে যুদ্ধবিরতি এবং তাহকীম (সালিশি) ঘটনার দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের মর্যাদা?

- প্রশ্ন: সিফফিনে যুদ্ধবিরতি এবং তাহকীমের বর্ণনাসমূহ সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কটাক্ষ এবং নেতিবাচক বিষয়ে পরিপূর্ণ। সনদের দিক থেকে এগুলো কেমন?
- উত্তর: সনদের দিক থেকে এগুলো সবই অবিশ্বস্ত। এই বর্ণনাসমূহের অবস্থা লক্ষ্য করুন:
- ১. তাবারীতে এক জায়গায় সিফফিনে হযরত মুয়াবিয়া এবং আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক হযরত আলী (রা.)-কে প্রতারণিত করার জন্য বর্শার মাথায় কুরআন মাজীদ তুলে ধরে সন্ধির প্রস্তাব দেওয়া এবং হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে সন্ধির বার্তাকে প্রতারণা বলে অভিহিত করার কথা উল্লেখ আছে। [২]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩০/৩, ত ত রিসালাহ, আস-সাহতী বলেছেন এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য; ফাতহুল বারী: ৮৬/১৩ হাসান সনদে।

[২] তারিখুত তাবারী: ৩৮/৫ থেকে ৫৬, ৩৭ হিজরীর অধীনে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

তাবারীতে অন্য এক স্থানে দুমাতুল জান্দালে সালিশি বৈঠকের (মজলিসে তাহকিম) সময় হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে ধোঁকা দেওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। [১] তবে এই বর্ণনাগুলো আবু মিখনাফের, যে একজন পক্ষপাতদুষ্ট রাফেযী বর্ণনাকারী।

তাবারীতে ইবনে শিহাব যুহরীর সূত্রেও একটি বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানেও সিফফিনে বর্শার মাথায় কুরআন উঁচিয়ে ধোঁকা দেওয়া এবং পরবর্তীতে সালিশির সময় আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে প্রতারণিত করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। [২] কিন্তু ইবনে শিহাবের এই সনদে সুলাইমান বিন ইউনুস বিন ইয়াজিদ নামক একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত (মাজহুল)। [৩] সম্ভবত তিনি যুহরীর ছাত্র ইউনুস বিন ইয়াজিদ আল-আইলীর পুত্র, কিন্তু তার নিজের অবস্থা কোথাও বর্ণিত নেই। তাই সনদের দুর্বলতা স্পষ্ট। [৪] তদুপরি যুহরী নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, তাই তার এই বর্ণনাটি মুরসাল; আর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুরসাল বর্ণনা যথেষ্ট নয়, যেমনটি মূলনীতিবিদদের (আহলুল উসুল) নিকট সুনির্ধারিত। [৫]

এই ঘটনার আরেকটি বর্ণনা ইবনে আসাকির তার সনদে যুহরী পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু সেটিও মুরসাল; তদুপরি তাতে আবু বকর বিন সাবরাহ রয়েছে, যে হাদীস জাল করত। [৬] অধিকন্তু এই সনদে ওয়াকিদীও রয়েছে যে পরিত্যক্ত (মাতরুক)। [৭]

এই প্রসঙ্গে আহমদ বিন ইব্রাহিম থেকে একটি দীর্ঘ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে যাতে এই ধরনের ভিত্তিহীন কথাবার্তা রয়েছে। [৮] এই বর্ণনার দুর্বলতা স্পষ্ট কারণ এতে ‘ইবনে জুদুবাহ’ (ইয়াজিদ বিন আইয়ায) নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যাকে ইমাম মালিক (রহ.) মিথ্যাবাদী [৯] এবং হাফেজ যাহাবী (রহ.) পরিত্যক্ত (মাতরুক) বলে অভিহিত করেছেন। [১০]

দারাকুতনী (রহ.) বলেন, সে দুর্বল ও পরিত্যক্ত। [১১] ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে মুনকারুল হাদীস হিসেবে গণ্য করেন। [১২] ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.)-এর বক্তব্য হলো, তার হাদীস যেন লেখা না হয়। ইমাম মালিক (রহ.) তাকে ‘সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী’ (আকযাব) বলতেন। [১৩]

আনসাবুল আশরাফে এই ঘটনাটি আবু দাইমাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে [১৪] কিন্তু এই সনদেও ইবনে জুদুবাহ রয়েছে।

এই কাহিনীটি আনসাবুল আশরাফে আবু মিখনাফ থেকেও বর্ণিত হয়েছে [১৫] যার দুর্বলতা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৬৭, ৭১

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৫৭, ৫৮

[৩] আল-মারাসীল লি-ইবনে আবি হাতিম: পৃ. ৩; আল-জারহ ওয়াত তা’দীল লি-ইবনে আবি হাতিম: ১/২৪৬

[৪] তাহযীবুত তাহযীব: ১২/২৭

[৫] আনসাবুল আশরাফ: ৩/৩৩৪, ৩৩৫, ত. দারুল ফিকর

[৬] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৭৭৬১

[৭] মাওসুআতু আকওয়ালিদ দারাকুতনী: ৩/৭২২

[৮] আত-তারীখুল কাবীর: ৮/৩৫১

[৯] আল-কামিল ফী দুয়াফাউর রিজাল: ৯/৩১

[১০] আনসাবুল আশরাফ: ২/৩৩১ থেকে ৩৩৩, ত. দারুল ফিকর

[১১] আনসাবুল আশরাফ: ২/৩৪৮ থেকে ৩৫২, ত. দারুল ফিকর

(৭) আনসাবুল আশরাফ-এ বালাগুরি তাঁর শায়খ বকর বিন হাইশাম থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। [১] কিন্তু বকর বিন হাইশাম একজন মাজহুলুল হাল (অজ্ঞাত পরিচয়) বর্ণনাকারী। তাঁর অবস্থা কোথাও বর্ণিত হয়নি।

(৮) ‘মুরুজুয যাহাব’-এ ‘মাসউদী’ আরেকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যিনি নিজে শিয়া এবং বর্ণনাটিও সনদবিহীন। [২]

সারকথা হলো, যুদ্ধবিরতি এবং সালিশি (তাহকিম) সংক্রান্ত সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা এবং অন্যান্য নেতিবাচক বিষয় সম্বলিত বর্ণনাগুলোর একটিও সহীহ সনদযুক্ত নয়। তদুপরি, এই সমস্ত দুর্বল বর্ণনাগুলোর খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ অপরিসীম এবং অস্থিরতা এত বেশি যে, এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন বরং অসম্ভব। যার পরিষ্কার অর্থ হলো, কিছু জালিয়াত সংবাদ পরিবেশক মূল ঘটনাকে আড়াল করে অনেক কিছু সংযোজন করেছে। এই কারণে প্রতিটি বর্ণনা অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বড় পার্থক্য এটাই যে, সত্য সব সময় একই থাকে এবং মিথ্যা প্রতিটি স্থানে রূপ পরিবর্তন করে।

□□□

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া প্রমাণিত কি না?

• প্রশ্ন: আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) কি হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন? তাবারী ৪০ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আবুল আসওয়াদ দুয়ালী হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পত্র লিখে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বিরুদ্ধে, যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন, বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনেন। হযরত আলী (রা.) অভিযোগ তদন্তের জন্য ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর কাছে জিজিয়ার অর্থের হিসাব চাইলেন, তখন তিনি হিসাব দিতে অস্বীকার করেন এবং বায়তুল মালে যা কিছু ছিল তা গুটিয়ে নিয়ে মক্কায় চলে যান। [৩] এই বর্ণনাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং প্রমাণিত?

• উত্তর: এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর সনদে আবু মুখনাফ নামক চরম মিথ্যাবাদী (কাযযাব) বিদ্যমান। তাবারী এর পাশাপাশি আবু যায়েদের দ্বিতীয় একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যাতে আবু মুখনাফের বর্ণনার খণ্ডন রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত বসরাতেই ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মক্কায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। যাওয়ার সময় তিনি বসরা থেকে তাঁর ঘরের আসবাবপত্র এবং বায়তুল মাল থেকে সামান্য কিছু অর্থ নিয়েছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, এটি আমার বেতন। [৪]

□□□

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৩৪০/২, তবা দারুল ফিকর

[২] মুরুজুয যাহাব: ১৩৮/৩, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬

[৩] তারিখুত তাবারী: ১৩৩/৫

[৪] ওমা লা মিন বায়তিল মালি কলীলান ওয়া কালা হিয়া আরযাকী। (তারিখুত তাবারী: ১৩৪/৫) নোট: এই বর্ণনাটিও যদিও দুর্বল, তবে এর সনদের দুর্বলতা আবু মুখনাফের বর্ণনার চেয়ে কম।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মুজতাহিদ এবং বিদ্রোহীর মর্যাদা কীভাবে একত্রিত হলো?

(প্রশ্ন) উলামায়ে কেরাম হযরত আলী (রা.)-এর মোকাবিলায় যারা এসেছিলেন তাদের মুজতাহিদ ও মাজুরও বলেন এবং একই সাথে ভুলকারী ও বিদ্রোহীও বলেন। এই অবস্থানটি স্পষ্ট বৈপরীত্যের ওপর ভিত্তি করে। হয় তাদের মুজতাহিদ বলুন অথবা বিদ্রোহী। ইজতিহাদ একটি মহান দ্বীনি খিদমত, পক্ষান্তরে বিদ্রোহ একটি পুরোপুরি নাজায়েজ কাজ। আপনারা একই সাথে দুটি বিপরীত মর্যাদা কীভাবে মেনে নেন? আর ভুলের ওপর কোনো ব্যক্তি কীভাবে মাজুর হতে পারে?

(উত্তর) ইজতিহাদের অর্থ কী? ফিকহী অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি, শরয়ী দলিল এবং সম্ভাব্য তথ্যের অধীনে কোনো নতুন সমস্যার সমাধানের সম্ভাব্য রূপগুলোর মধ্য থেকে একটি রূপ গ্রহণ করা। এতে তার চিন্তা ও দৃষ্টি বিভ্রান্তির শিকারও হতে পারে, তথ্যের অভাবও ইজতিহাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই জেদ করতে পারেন না যে, প্রত্যেক মুজতাহিদের প্রতিটি ইজতিহাদ সর্বদা সঠিকই হবে। এই কারণেই ইসলামের ফকীহদের নিকট মূলনীতি নির্ধারিত আছে: আল-মুজতাহিদু ইউসিবু ওয়া ইউখতি (المجتهد يصيب ويخطئ - মুজতাহিদ সঠিকও হতে পারেন আবার ভুলও করতে পারেন)।

যখন এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন পরবর্তী কথাটি বোঝাও সহজ। তা হলো ইজতিহাদ ভুল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন অনুযায়ী কোনো না কোনো হুকুম অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। যেমন নামাজ ফাসিদ হয়ে যাওয়া, বা রোজা নষ্ট হয়ে যাওয়া, অথবা হজ আদায় থেকে বঞ্চিত থাকা।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বিমানে নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং মুসাফির ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় যে বিমানে নামাজ পড়বেন কি না। এই বিষয়ে আগে থেকে কোনো ফতোয়া সামনে নেই। এখন একজন ফকীহ নামাজ পড়ে নিলেন এবং অন্য ফকীহ এই ভেবে বসে রইলেন যে নামাজে সেজদা জরুরি, আর সেজদা হলো “ওয়াদউল জাবহা আলাল আরদ” (وضع الجبهة على الارض - জমিনে কপাল রাখা)। এখানে জমিন নেই তাই সেজদাও হতে পারে না এবং সেজদা ছাড়া নামাজ হবে না। ফলে তিনি এয়ারপোর্টে নামার অপেক্ষা করতে থাকলেন এবং নামাজের ওয়াক্ত চলে গেল। এখন যদি পরবর্তীতে অন্যান্য ফকীহগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে বলে দেন যে বিমানের মেঝে জমিনের মেঝের হুকুমেই পড়ে, তাই নামাজ সেখানেই পড়ে নেওয়া উচিত ছিল এবং এই বিষয়ে ঐকমত্য হয়ে যায়, তবে যে ফকীহ শরয়ী দলিলসমূহ বিবেচনা করে উড্ডয়নকালে নামাজ আদায় করেননি তিনি কি গুনাহগার হবেন? তিনি তার ঈমান এবং তার দ্বীনি বুঝ অনুযায়ী যা সঠিক মনে করেছেন, তাই করেছেন। সুতরাং এই কাজকে ইজতিহাদ বলা হবে। তবে এর সাথে এটাও মানা হবে যে তার নামাজ কাজা হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ বলে যে “হয় এই ফকীহকে নামাজ কাজা করা ব্যক্তি বলুন অথবা মুজতাহিদ। নামাজ কাজা করা এবং ইজতিহাদ কীভাবে একত্রিত হলো?” তবে কি এই আপত্তির কোনো গুরুত্ব থাকবে?

সুতরাং একইভাবে “মুজতাহিদ এবং বিদ্রোহী”কে পরস্পরবিরোধী সাব্যস্ত করাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আপত্তি। এই কথাটিও বুঝে নেওয়া উচিত যে মুজতাহিদের ভুলকে ভুলের ওপর মাজুর বলা হয় না, বরং ইজতিহাদের ওপর মাজুর বলা হয়। ভুলের বিধান হলো সাধারণ অবস্থায় তাকে গুনাহগার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে দলিলের অস্পষ্টতার কারণে তাকে “অপারগ” (মা’জুর) গণ্য করা হবে।

যেখানে সিরিয়াবাসী বা জঙ্গ জামালের লোকদের সম্পর্ক, তাদের মুজতাহিদ হওয়ার অন্য কোনো দলিল না থাকলেও এই দুই যুদ্ধের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর সেই সব বাণী ও পদক্ষেপ এর সাক্ষী যা মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ সংরক্ষণ করেছেন। সেগুলোতে হযরত আলী (রা.) বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিও ব্যবহার করেছেন যা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

...। সেই সাথে তিনি বিরোধী পক্ষের নিহতদেরকেও জান্নাতী বলে ঘোষণা করছেন, যা তাদের মাজুর (পুরস্কৃত) এবং মুজতাহিদ হওয়ার ঘোষণা। যখন হযরত আলী (রা.) নিজেই কোনো বিদ্রোহীকে মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করছেন, তখন আমাদেরও উচিত তাঁর বাণীসমূহকে হাকীকত বা বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা, তাকিয়ার ওপর নয়; যা সাদাতদের সাহস ও সত্যবাদিতার গুণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি জঘন্য অপবাদ।

এখানে এটিও মনে রাখা উচিত যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ‘মুজতাহিদ’ শব্দটি উভয় পক্ষের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। সাধারণ সৈন্যদের ক্ষেত্রে কথা হলো, তাদের মধ্যে সব ধরনের লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল; আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াইকারী যেমন ছিল, তেমনি গোঁড়ামির কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া লোকও ছিল। তাদের প্রত্যেকে ফকীহ বা আলেমও ছিলেন না যে তারা ইজতিহাদ করতে পারতেন। সুতরাং উভয় পক্ষের প্রত্যেকের ওপর ‘মুজতাহিদ’ শব্দটির প্রয়োগ হবে না। অতএব, শামের লস্করে যারা গোঁড়ামি বা অজ্ঞতার কারণে হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়েছিল, তাদের ওপর ‘বিদ্রোহ’ শব্দটি প্রযোজ্য হবে, ইজতিহাদ নয়; এই দিক থেকে তাদেরকে মাজুরও বলা যাবে না। অবশ্য যেহেতু তারা একজন ভুলকারী মুজতাহিদের অনুসরণ করছিল, তাই ইনশাআল্লাহ তাদের ভুল ক্ষমাযোগ্য হবে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) এই বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন:

“জেনে রাখা উচিত যে, যদিও সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদ সম্পর্কে নীরব থাকা এবং উভয় পক্ষের জন্য ইস্তিগফার করা ও তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখাই পছন্দনীয়, তবুও এই আকিদা পোষণ করা ওয়াজিব নয় যে, (উভয় পক্ষের) সেনাবাহিনীর প্রত্যেক ব্যক্তিই ওলামাদের মতো মুজতাহিদ এবং ব্যাখ্যাকারীই ছিলেন। বরং তাদের মধ্যে গুনাহগারও ছিল, ভুলকারীও ছিল এবং কোনো নফসানিয়াত বা কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ইজতিহাদে ত্রুটি বিচ্যুতি করা লোকও ছিল। কিন্তু যখন অনেক নেক আমলের মাঝে কোনো মন্দ কাজ থাকে, তখন তা ওজনে কম এবং ক্ষমাযোগ্য হয়ে থাকে। আহলে সুন্নাত তাদের সবার ব্যাপারে উত্তম কথা গ্রহণ করেন, তাদের জন্য রহমতের দোয়া ও ইস্তিগফার করেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যতীত অন্য কাউকে গুনাহ থেকে অথবা ইজতিহাদী ভুলের ওপর অটল থাকা থেকে মাসুম মনে করেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়া বাকিদের থেকে গুনাহ হওয়া এবং ভুলের ওপর অটল থাকা সম্ভব। তবে তারা তেমনই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

[১] أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ

(তরাই সে সব লোক যাদের নেক আমলসমূহ আমি কবুল করি এবং তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করে দেই।)

আমলের ফযীলত তার ফলাফল ও পরিণতির ওপর নির্ভর করে, বাহ্যিক সুরতের ওপর নয়।“ [২]

এটিও স্পষ্ট বিষয় যে, যেভাবে হযরত আলী (রা.)-এর লস্করে চরমপন্থী লোক এবং কিছু সাবায়ী অন্তর্ভুক্ত ছিল, তেমনি আহলে শামের মধ্যেও সেই গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল যারা ফিতনার আগুন জ্বালিয়েছিল এবং মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে হযরত আলী (রা.) উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষক। এমন লোকদেরকে ওজরখাহ বা অপারগ মনে করা যায় না, বরং তারা ছিল ফিতনার মূল, অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং কঠোর গুনাহগার।

[১] সূরা আল-আহকাফ: ১৬

[২] মাজমুউল ফাতাওয়া লি-ইবনে তাইমিয়াহ: ৪/৩৩৩

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত আলী (রা.) কেন আগে যুদ্ধ পরিহার করেননি?

প্রশ্ন: হযরত আলী (রা.) পরবর্তীতে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দেখে আফসোস করতে থাকেন। তিনি আগে কেন এই বিষয়টি বুঝতে পারেননি যে, যুদ্ধ করলে অবশ্যই মানুষ মারা যাবে এবং মুসলমানদের রক্ত ঝরবে? এটি তো অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয় ছিল যে, এই যুদ্ধে কাফেরদের সাথে মোকাবিলা ছিল না, তাই মুসলমানরাই লক্ষ্যবস্তু হবে। সুতরাং এই পরিণতির কথা চিন্তা করে তিনি কেন আগে থেকেই যুদ্ধ পরিহার করেননি? যদি যুদ্ধবিরতিই সঠিক হয়ে থাকে তবে আগে যুদ্ধ কেন করলেন, আর যদি যুদ্ধই সঠিক হয়ে থাকে তবে যুদ্ধবিরতি কেন করলেন?

উত্তর: যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হোক বা সন্ধির, এগুলো সবই শাসকের স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত। শাসক উম্মতের কল্যাণ ও উপকারের দিক বিবেচনা করে যুদ্ধে ফায়দা মনে করলে যেভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার রাখেন, তেমনি শরয়ি দলীলসমূহ তাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করারও অধিকার দিয়েছে এবং যদি **مصلحة** (কল্যাণ) থাকে তবে তাদের সাথে সন্ধিও করা যেতে পারে। উদ্ধৃত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.)-এর ধারণা প্রথমে এটাই ছিল যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বড় কোনো রক্তপাত ছাড়াই শক্তির মাধ্যমে পরাভূত করে মুসলিম রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলবেন। পরবর্তীতে এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। যখন তিনি দেখলেন যে, বড় পরিসরে মুসলমানদের রক্ত নষ্ট হয়ে গেছে এবং নিজের বাহিনীর মধ্যেও যুদ্ধের প্রতি অনীহার লক্ষণ অনুভব করলেন, তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রস্তাবকে অনিবার্য পরিস্থিতিতে গ্রহণ করে নিলেন যাতে যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়। [১]

এই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের মাধ্যমে উম্মতের জন্য বড় ধরনের সুবিধা তৈরি হয়েছে। ইসলামী রাজনীতির নমনীয়তা ও প্রশস্ততার এক বাস্তব নমুনা সামনে এসেছে। হযরত আলী (রা.) যদি এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত না নিতেন, তবে মুসলমানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত পারস্পরিক বিবাদ ও রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা করার জন্য সীরাতে তায়্যিবা বা সীরাতে সাহাবায় কোনো বাস্তব নমুনা সামনে থাকত না।

হযরত আলী (রা.)-এর পদক্ষেপসমূহ থেকে ‘খুরুজ’ (বিদ্রোহ)-এর সংজ্ঞাও বোঝা গেল। যারা বিদ্রোহ করে তাদের সাথে শুরুতে আলোচনা করা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার পূর্ণ চেষ্টা করার শিক্ষাও পাওয়া গেল। জঙ্গি সফফীন থেকে অনিবার্য পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগও বেরিয়ে এল। পরবর্তী পদক্ষেপগুলো থেকে এটিও প্রমাণিত হলো যে, শাসকের জন্য রাষ্ট্রীয় কল্যাণের খাতিরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা, সমস্যা সমাধানের জন্য সালিশ নিযুক্ত করা এবং সীমান্ত সন্মানের চুক্তিসহ অবস্থা সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতির এখতিয়ার রয়েছে। একইভাবে হযরত হাসান (রা.)-এর আমল থেকে উম্মতের কল্যাণে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার সুযোগও প্রমাণিত হলো। এই পরিস্থিতিতে ইসলামী রাজনীতির পথনির্দেশক মূলনীতিগুলো পদে পদে বিদ্যমান রয়েছে।

[১] আবু হানিফা থেকে বর্ণিত, তিনি মুসা ইবনে আবি কাসীর থেকে, তিনি আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন আবু মুসা (রা.)-কে সালিশ নিযুক্ত করেন তখন তাকে বলেছিলেন: “আমাকে এ থেকে মুক্তি দাও, যদিও আমার ঘাড় মটকে যায়। কারণ তাদের বিরুদ্ধে কেউ আক্রমণ করবে না তবে সে ব্যর্থ তীরের মতো হবে। আমি কামনা করতাম যদি তাদের জায়গায় বনী ফিরাসের বনী গানাম গোত্রের এক হাজার অশ্বারোহী থাকত। তাদের বাতিলের ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া তোমাদের হকের ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেয়েও শক্তিশালী।” (কিতাবুল আসার লি-আবি ইউসুফ, বর্ণনা নম্বর: ৯২৯, সহীহ সনদে)

[২] আসিম ইবনে কুলাইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম যখন ইবনে আব্বাসকে দেখলাম যখন তিনি দুই সালিশের বিষয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছ থেকে ফিরে এলেন... তাতে রয়েছে, ইবনে আব্বাস বললেন: তোমরা কি জানো যে সিরিয়াবাসীরা ফয়সালা চেয়েছিল কিন্তু আমরা তা অপছন্দ করেছিলাম এবং অস্বীকার করেছিলাম? অতঃপর যখন তোমরা আহত হলে এবং ব্যথায় কাতর হলে এবং ফোঁরাত নদীর পানি থেকে বঞ্চিত হলে, তখন তোমরা তা চাইতে শুরু করলে। মুয়াবিয়া আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার কাছে এমন এক ঘোড়া আনা হয়েছিল যার পেট মাটি থেকে অনেক উঁচুতে ছিল যাতে তিনি তার ওপর চড়ে পালিয়ে যেতে পারেন, যখন তোমাদের সেই অবস্থা হয়েছিল। তিনি বললেন: আমি ইরাকবাসীদের এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে তারা মক্কায় বিদায়ী রাতে মানুষের ভিড়ের মতো ঢেউ খেলছিল। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৮৭৩, সহীহ সনদে, তবু আর-রুশদ)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

খলিফাকে অপসারিত করার দাবি না থাকলে খুরুজ (বিদ্রোহ) এর প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে?

প্রশ্ন: আহলে শাম (সিরিয়াবাসী) বা আহলে বসরা (বসরার অধিবাসী) কীভাবে বিদ্রোহের সংজ্ঞায় পড়তে পারে? তারা তো হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে খিলাফত কায়েম করার দাবি করেনি? তারা তো কেবল একটি ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তাদের ওপর খুরুজ বা বিদ্রোহের অভিযোগ আনা সম্পূর্ণ ভুল।

উত্তর: অধিকাংশ ফকীহগণের মতে, কোনো অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তির। যদি খলিফাকে অপসারিত করার দাবি নাও করে এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবুও তাদের এই কাজ “খুরুজ” বা বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য হবে। স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সিদ্ধান্ত ও আমলও এর অনুরূপ ছিল। হযরত হুজর বিন আদি (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁকে অপসারিত করার দাবি করেননি, বরং তিনি তো এ পর্যন্ত বলতেন যে, আমি আমার বাইয়াতের ওপর অটল আছি। [১] কিন্তু তিনি একটি সশস্ত্র দলের সাথে একটি ছোট অঞ্চলে সরকারি ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছিলেন, তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর ওপর খুরুজ শব্দটির প্রয়োগ করেন এবং তাঁর মর্যাদার কথা বিবেচনা না করেই তাঁর বেশ কয়েকজন সঙ্গীসহ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন যাতে দেশের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয়। [২]

সুতরাং এই বিষয়টি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছেও স্বীকৃত ছিল না যে, খুরুজ হওয়ার জন্য খলিফার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা শর্ত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উত্তরসূরি অন্যান্য উমাইয়া খলিফাদেরও একই মতাদর্শ ছিল। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে ইরাকি সেনাপতি আব্দুর রহমান বিন আশআস সরকারের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে বলেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ইরাকের গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত করা হোক। আব্দুর রহমান বিন আশআসের সাথে প্রথম সারির উলামা ও ফকীহগণ ছিলেন যারা বলতেন:

“আল্লাহর কসম! আমরা আমিরুল মুমিনীনের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হইনি। আমরা তাঁকে অপসারিত করতে চাই না। কিন্তু আমিরুল মুমিনীনের প্রতি আমাদের আপত্তি হলো যে, তিনি কেন আমাদের ওপর হাজ্জাজকে গভর্নর নিযুক্ত করেছেন? অতএব তাকে অপসারিত করুন।” [৩]

এই দাবিটি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল; কারণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোরতা, জুলুম-নির্যাতন এবং শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডে সাহাবীগণও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। [৪] সে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে হত্যা করিয়েছে, [৫] আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, আনাস বিন মালিক (রা.) এই জালেমের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, [৬] সালামা বিন আকওয়া (রা.)-এর সাথে সে অভদ্রতা করেছিল। [৭] সে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষের হত্যাকারী ছিল। [৮]

[১] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৯৮১

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২১৯/৬, সাদর

[৩] “আল্লাহর কসম! আমরা আমিরুল মুমিনীনের অবাধ্য হইনি এবং তাঁকে অপসারিত করতে চাই না, বরং আমরা হাজ্জাজকে তাঁর নিয়োগের কারণে ঘৃণা করি, তাই তাকে অপসারিত করুন।” - তাবাকাত ইবনে সাদ: ১২৩/৬

[৪] সহীহ মুসলিম, হা: ২২৬০; মুসনাদ আহমদ, হা: ২২৯৭৩

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৯৬৬, ৯৬৭, কিতাবুল জুমুআ, বাব মা ইয়াকরাহ মিন হামলিস সিলাহ ফিল ঈদ ওয়াল হারাম; তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৮৪/৩

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ৭০৬৮, কিতাবুল ফিতান, বাব লা ইয়াতী জামানুন ইল্লাল্লাযী বা’দাহ শাররুন মিনহ

[৭] সহীহ বুখারী, হা: ৭০৮৭; সহীহ মুসলিম, হা: ৩৯৩২, কিতাবুল ইমারাহ, বাব তাহরীম রুজুউল মুহাজির ইলাল ইত্তিতান ফি ওয়াতানিহ

[৮] হিশাম বিন হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “হাজ্জাজ ধৈর্যশীল অবস্থায় (বন্দী অবস্থায়) যাদের হত্যা করেছে তাদের গণনা করো, তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজারে পৌঁছেছে।” (সুনান তিরমিযী, হা: ২২২০, বাব মা জাআ ফিল কাত্তাব ওয়াল মুবীর, আলবানী একে সহীহ বলেছেন)

সেই যুগের উমাইয়া শাহজাদা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) এই জুলুমগুলো দেখে বলতেন:

“সিরিয়ায় ওয়ালিদ, ইরাকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, ইয়েমেনে তার ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ, মিশরে কুররা ইবনে শারিক এবং হিজাজে উসমান ইবনে হাইয়ান মুররি। আল্লাহর জমিন জুলুমে ভরে গেছে।” [১]

এমন জালেমকে অপসারণের দাবি কতটা সঙ্গত ছিল তা সবার কাছে স্পষ্ট, কিন্তু আবদুল মালিক দাবিদারদের প্রচেষ্টাকে খুরুজ এবং বিদ্রোহ হিসেবেই গণ্য করেন এবং সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়, এমনকি ইবনে আশআসের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে পলাতক অবস্থায় নিহত হয়। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.)-এর মতো মহান ফকিহ ও মুহাদ্দিসকে এই খুরুজের অপরাধেই হত্যা করা হয়েছিল।

ফকিহদের নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা লক্ষ্য করুন যে, এখানেও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে শরীয়তকে মানদণ্ড বানিয়ে ইবনে আশআস ও তার সঙ্গীদের অভিযানকে ‘খুরুজ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যদিও সেই সঙ্গীদের মধ্যে ইমাম শাবি, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, মালিক ইবনে দিনার, নযর ইবনে আনাস ইবনে মালিক, আবু উবাইদাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আতা ইবনে সাযিব, আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রহ.)-এর মতো মহান তাবয়ী, ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এই ব্যক্তিবর্গ খলিফার ক্ষমতার বিরোধী ছিলেন না। [২]

সুতরাং খুরুজের সংজ্ঞায় যদি খলিফার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার শর্ত যুক্ত করা হয়, তবে আবদুল মালিক এবং তার আগে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর এই অভিযোগ আসবে যে, তারা অ-বিদ্রোহী ওপর বিদ্রোহী শাস্তি প্রয়োগ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যার সমাধান ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না খুরুজের কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। সংজ্ঞা নির্ধারণের দুটি উপায় আছে: একটি হলো আমরা আমাদের মনের ঝোঁক অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব ও সংকীর্ণতাকে ভিত্তি বানাই এবং এমন সংজ্ঞা গ্রহণ করি যা আহলে শাম ও আহলে জামালের ওপর প্রয়োগ করা না যায়। দ্বিতীয় উপায় হলো নিরপেক্ষতার সাথে ফকিহদের কিতাবসমূহ দেখা যে সঠিকতম সংজ্ঞা কোনটি, চাই তা আহলে শাম ও আহলে জামালের ওপর প্রয়োগ হোক বা না হোক।

এখন ফকিহদের কিতাব বরং আকায়েদের কিতাব ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ দেখার পর অন্তত এই সত্যটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সেগুলোতে খুরুজ ও বিদ্রোহের বিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপরও যদি এই দাবি করা হয় যে, এই ঘটনাগুলোতে দ্বিতীয় পক্ষের ওপর খুরুজের প্রয়োগ হতো না, তবে এই দাবি আকায়েদের কিতাব, ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব এবং হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থের পুরো ভাণ্ডার থেকে আস্তা তুলে নেওয়ার নামান্তর হবে।

অন্যান্য সমস্যার মতো এই বিবাদেও নাজাতের পথ এটাই যে আমরা আসলাফদের ওপর আস্তা রাখি। তাদের মতামত কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসারী। গবেষণা করে প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ আলেম এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাবেন।

[১] সীরাতে উমর ইবনে আবদুল আজিজ লি-ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ২৭

[২] তারিখে খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ২৮৬ থেকে ২৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/ ৩৩৬ থেকে ৩৩৮; তারিখে ইসলাম লিয-যাহাবী, ওফাত: ৮১ থেকে ১০০ হিজরি; আল-ইসাবাহ: ৫/ ১২, জীবনী: আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

প্রশ্ন: খুরুজ এবং বাগাওয়াত-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার অধিকার যেভাবে পূর্ববর্তী ফকীহদের ছিল, আমাদেরও আছে। যদি আমরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরক্ষায় এমন কোনো সংজ্ঞা গ্রহণ করি বা নিজেরা তৈরি করি যা আহলে শাম এবং আহলে জামালের ওপর প্রযোজ্য হতে না পারে, তবে কি তা উম্মাহর ঐক্যের জন্য উত্তম হবে না? যদি কেউ এমনটি করে তবে তার ওপর কী অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং এমনটি করলে কী ক্ষতি হতে পারে এবং আমাদের উলামা ও মুফতিগণ এ বিষয়ে কেন অগ্রসর হচ্ছেন না?

উত্তর: কোনো ফিকহী পরিভাষা বা সংজ্ঞা তৈরি করা এবং সে বিষয়ে একমত হওয়া কোনো খেলা নয়। উম্মাহর প্রথম সারির ফকীহগণ বংশপরম্পরায় গবেষণার পর এই স্তরে পৌঁছান। ফিকহ শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক নেই এমন কিছু আলেমদের আগেও মুশাজারাত সম্পর্কে আইন্মায়ে মুজতাহিদ্দীনদের মতামতের ব্যাপারে সংশয় ছিল, কিন্তু আইন্মায়ে মুজতাহিদ্দীন এবং ফকীহদের সিদ্ধান্ত নিজ স্থানেই অটল ছিল এবং এর ওপরই উম্মাহর ইজমা হয়েছে। আল্লাহ প্রতিটি শাস্ত্রের জন্য বিশেষজ্ঞ (রিজাল) সৃষ্টি করেছেন। খুরুজ-এর সংজ্ঞা তৈরি করা এবং এর প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করার ময়দানও আইন্মায়ে মুজতাহিদ্দীনদের ছিল, এখানে তাঁদের মতামতই গ্রহণযোগ্য হবে। দ্বিতীয় সারির কোনো আলেম যত বড়ই হোন না কেন, তিনি যদি এতে হস্তক্ষেপ করে কোনো নতুন মতামত প্রকাশ করেন তবে তিনি হোঁচট খাবেন। হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. বলেন:

“যেভাবে এই ইলম (আসমাউর রিজাল) এর বিশেষজ্ঞদের জন্য নির্দিষ্ট যারা এর পদ্ধতি ও রহস্য সম্পর্কে জানেন, একইভাবে ‘উলামায়ে আহকাম’ (ফকীহগণ)-ই এই ইলম (নকদ)-এর পথগুলো বিশেষভাবে জানেন। এই কারণেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. প্রতিটি শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিতেন। এজন্য তিনি ইয়াহইয়া বিন মাস্নিন রহ.-কে প্রথম শাস্ত্রের (আসমাউর রিজাল) বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকার করতেন, রিজাল শাস্ত্রের জ্ঞানে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দিতেন এবং তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। অথচ ইয়াহইয়া বিন মাস্নিন রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. সম্পর্কে (কখনও) এমন কথা (ও) বলে ফেলতেন যা সঠিক হতো না। এমনকি একবার তিনি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের আলোচনায় লিপ্ত হলেন, অতঃপর ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ওপর আপত্তি নিয়ে ইমাম আহমদ রহ.-এর কাছে উপস্থিত হলেন। কারণ ইমাম শাফেয়ী রহ. বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে হযরত আলী রা.-এর সাথে হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রা.-এর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম আহমদ রহ. তাঁকে উত্তর দিলেন: ‘এই মাসআলায় কি এ ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব?’”

এবং সম্ভবত এটিও বলেছিলেন: “যে শাস্ত্রে আপনার ভালো দক্ষতা নেই, আপনি সে বিষয়ে কথা বলবেন না।” [১]

সুতরাং উলামা ও মুফতিয়ানে কেরাম এমন কোনো নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে পারেন না যা মুশাজারাতের ক্ষেত্রে আহলে জামাল এবং আহলে শামের ওপর প্রযোজ্য হতে না পারে। যদি কেউ এমনটি চিন্তা করে তবে সবার আগে এই প্রশ্ন দেখা দেবে যে, এই মহান ব্যক্তিদের খুরুজ-এর প্রয়োগ থেকে বের করার জন্য কী শরয়ী দলিল দেওয়া হবে? সেই ঘটনাগুলোকে কীভাবে অস্বীকার করা হবে যা হাদীসের কিতাবসমূহেও বিদ্যমান? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটিই দেখা দেবে যে, যদি আহলে জামাল এবং আহলে শামের ওপর বাগাওয়াতের সংজ্ঞা প্রযোজ্য না হতো, তবে হযরত আলী রা. কীভাবে নির্দোষ হতে পারেন? তবে তো তাঁর কাছে যুদ্ধের কোনো শরয়ী বৈধতা নিশ্চিতভাবেই থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে একটি অ-শরয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি তাঁর...

[১] লিতালখীস কিতাব আল-ইস্তিগাসা লি-ইবনে কাসীর: ১/৭১, ত. মাকতাবাতুল গুরবা, আল-আসারিয়াহ (এটি ইবনে তাইমিয়ার ‘আল-ইস্তিগাসা বির-রাদি আলাল বাকরি’-এর সহজীকরণ)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

পুরো জামাত কবির গুনাহের অপরাধী এবং অন্যায় হত্যার অপরাধী সাব্যস্ত হবে। (যেমনটি মুতাজিলাদের একটি দলের মাযহাব)। যদি বলা হয় যে, হযরত আলী (রা.) নিজের ইজতিহাদ ও ধারণার ওপর আমল করতে গিয়ে আহলে জামাল এবং আহলে শামকে (যারা প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী ছিল না) বিদ্রোহী মনে করে নিয়েছিলেন, তবে তো আবশ্যিক হয়ে পড়বে যে হযরত আলী (রা.)-এর ইজতিহাদ ভুল ছিল এবং ওই সব বিবাদে তিনি ভুলকারী মুজতাহিদ (মুজতাহিদ মুখতি) ছিলেন, পক্ষান্তরে আহলে জামাল এবং আহলে শাম সঠিক মুজতাহিদ (মুজতাহিদ মুসিব) ছিলেন। এটি আহলে সুন্নাহের ইজমার পরিপন্থী।

চার ইমামের ফিকহের সমস্ত কিতাবে বিদ্রোহীদের (বুগাত) বিধানের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে আদর্শ মানা হয়েছে এবং আহলে জামাল ও আহলে শামকে বিদ্রোহী মনে করে হযরত আলী (রা.)-এর ফয়সালাসমূহ থেকে বিধান আহরণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি দেখা হয়, তবে ফিকহের এই সমস্ত অধ্যায় অস্বীকার করে নতুন করে তা সংকলন করতে হবে।

তারপর কথা এখানেই থেমে থাকবে না। সাহাবায়ে কেরামকে প্রতিটি ভুল ও ত্রুটি থেকে মুক্ত প্রমাণ করার একনিষ্ঠ আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু লোক অনিবার্যভাবে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অধিক জেদের সাথে ফিকহের ওই সব অধ্যায়ও নতুন করে সংকলন করতে চাইবে, যেগুলোতে চুরির হদ, মদ্যপানের হদ এবং হদে কযফ কিছু সাহাবী বা সাহাবীয়ার ওপর প্রয়োগ হওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

কেননা যদি আমরা মেনে নেই যে কিছু সাহাবীকে ভুলকারী মনে করাও সাহাবায়ে কেরামের অবমাননার পথ খুলে দেয়, তবে আমাদের ঈমানের দাবি হবে যে কিছু সাহাবীর পক্ষ থেকে কবির গুনাহ সংঘটিত হওয়ার বর্ণনাগুলোকে আরও কঠোরতার সাথে অস্বীকার করি। কারণ যদি কিছু সাহাবীকে ইজতিহাদী ভুলের শিকার বলা বেয়াদবি হয়, তবে পাপাচারের (মা'সিয়াত) শিকার মনে করা তো আরও বেশি কঠোর বেয়াদবি হবে এবং এটি সাহাবায়ে কেরামের অবমাননার অনেক বড় মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে। ফলে 'কিতাবুল হুদুদ'-এর সমস্ত হাদীস অস্বীকার করা ঈমানের মৌলিক দাবি হয়ে দাঁড়াবে এবং ওই সব হাদীস সম্বলিত ফিকহের অধ্যায়সমূহ অস্বীকার করাকেও ঈমানের অংশ মনে করা হবে। এভাবে সুন্নাহর ভাণ্ডার এবং ফিকহী ঐতিহ্যকে নিজ হাতে ডুবিয়ে দেওয়ার ধারা শুরু হবে। উম্মতের ঐক্য তো দূরের কথা, বরং অবশ্যই একটি নতুন ফেরকা বা দল সৃষ্টি হবে।

□□□

বিদ্রোহীদের (বুগাত) একটি শায (বিরল) সংজ্ঞার ওপর আলোচনা:

সওয়াল: অতীতের কিছু ফকীহ এমন একটি সংজ্ঞা পেশ করেছেন যার মাধ্যমে আহলে জামাল এবং আহলে শাম হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধী সাব্যস্ত হন না। দেখুন, ইবনে কুদামা হাম্বলী (রহ.) বিদ্রোহীদের সংজ্ঞায় এই শর্ত রেখেছেন যে, তারা ইমামকে অপসারণ করতে চায়: “ওয়া রামু খালাআহ।” [১]

অনুরূপভাবে খুরুজ (বিদ্রোহ)-এর সংজ্ঞায় আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসের আস-সা'দী (রহ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“মান খরাজা আলাল ইমামি ইউরিদু ইয়ালাতাহ্ আন মানসাবিহি ফাহওয়া বাগিন।”

যে শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে চায়, সেই বিদ্রোহী। [২]

[১] আল-কাফি ফি ফিকহিল ইমাম আহমাদ বিন কুদামা আল-মাকদিসি (মৃত্যু ৬২০ হি.), ৩/৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

[২] মানহাজুস সালিকিন ওয়া তাওযীহুল ফিকহি ফিদ দ্বীন, পৃ. ২৩৩, দারুল ওয়াতান।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

একইভাবে “ফাতাওয়া আলমগিরি”-তে বিদ্রোহী জামাতের সংজ্ঞায় এই শর্তটিও লেখা হয়েছে:

“এবং তারা নেতৃত্বের দাবি করে।” [১]

অর্থাৎ যারা ক্ষমতার দাবি করে তারা বিদ্রোহী।

ইবনে কুদামা হাম্বলী অনেক বড় ফকিহ। সারা বিশ্ব তাঁর ফিকহী পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দেয়। ফাতাওয়া আলমগিরি মুফতিগণের একটি পুরো জামাত মিলে সংকলন করেছেন। এই সকল ব্যক্তিবর্গ এই সংজ্ঞার ওপর একমত হয়েছেন। এর দ্বারা আমাদের দাবি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বিদ্রোহের (খুরুজ) প্রয়োগ তখনই হবে যখন কেউ খলিফা বা শরয়ি শাসকের বিপরীতে খেলাফত বা শাসনের দাবিদার হবে। জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে এই পরিস্থিতি মোটেও ছিল না, তাই সেখানে এর প্রয়োগও হবে না। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করতে ক্ষতি কী?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে এমন নাজুক মাসআলাগুলোতে বিচ্ছিন্ন (শায) মতামতকে মানদণ্ড বানানো নিশ্চিতভাবেই ইনসাফের কথা নয়। এমন সংজ্ঞা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা পূর্বসূরিদের (আসলাফ) ফিকহী ঐতিহ্যের অনুকূল হবে, প্রতিকূল নয়। তবে যদি কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলসমূহ এই বিচ্ছিন্ন সংজ্ঞার সমর্থন এবং সর্বজনগৃহীত সংজ্ঞার প্রতিবাদ করে। স্পষ্টতই এখানে এমন কোনো বিষয় নেই।

ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ.-এর মর্যাদা নিজ স্থানে অনেক উঁচুতে, কিন্তু তাঁর পেশকৃত সংজ্ঞাকে খোদ জমহুর হাম্বলীগণও গ্রহণ করেননি। ইবনে কুদামা রহ. তো সপ্তম হিজরি শতকের আলেম। তাঁর এক শতাব্দী পূর্বে বিখ্যাত হাম্বলী ফকিহ আবুল খাত্তাব আল-কালওয়াযানী রহ. (মৃত্যু ৫১০ হিজরি) বিদ্রোহীদের (বুগাত) সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছিলেন: “প্রতিটি জামাত যাদের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শক্তি আছে এবং তারা ইমামের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে গেছে এবং কোনো সম্ভাব্য ব্যাখ্যার (তাউইল) ভিত্তিতে তাঁকে অপসারণ করতে বা তাঁর বিরোধিতা করতে উদ্যত হয়েছে, তারাই বিদ্রোহী।”

প্রতিটি জামাত যাদের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শক্তি আছে এবং তারা শাসকের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে গেছে এবং কোনো সম্ভাব্য ব্যাখ্যার ভিত্তিতে শাসককে অপসারণ করতে বা তাঁর বিরোধিতা করতে উদ্যত হয়েছে, তারাই বিদ্রোহী। [২]

আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. “শাসককে অপসারণ বা তাঁর বিরোধিতা করার ইচ্ছা পোষণ করা” থেকে দ্বিতীয় অংশটি ছেড়ে দিয়ে প্রথম অংশটিকে সংজ্ঞার অংশ বানিয়ে নিয়েছেন এবং কিছু হাম্বলী ফকিহ তাঁর ইবারতটি হুবহু গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জমহুর হাম্বলীগণ এমনটি করেননি এবং এই বাস্তবতা বুঝে নিয়েছেন যে, “অপসারণের ইচ্ছা করা” শর্তটি অপরিহার্য (কাইদে ইহতিরাজি) নয়। যেহেতু সাধারণত এমনটি ঘটে যে বিদ্রোহী লোকেরা শাসককে অপসারণ করতে চায়, তাই সংজ্ঞায় এই শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সবসময় এমনটি হয় না। সুতরাং বিদ্রোহের জন্য এটি শর্ত নয়। چنانچہ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দাদা ইমাম আবদুস সালাম আল-হাররানি রহ. বিদ্রোহীদের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেন:

“যখন কোনো শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দল কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইমামের বিরুদ্ধে বের হয়, তখন তারা বিদ্রোহী।”

[১] আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ: ২/২৮৩, ত. দারুল ফিকর।

[২] আল-হিদায়াহ আলা মাজহাবি ইমাম আহমাদ: ১/৫৩৩, মুআসসাসাতু গুরাস।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ সপ্তম)

“যখন কোনো জামাত উপযুক্ত ব্যাখ্যার (তাবিল) সাথে এমন অবস্থায় ইমামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় যে তাদের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শক্তি থাকে, তবে তারা বাগী (বিদ্রোহী)।” [১]

একইভাবে ইমাম বুরহানুদ্দিন হাম্বলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বুগাত-এর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

هم القوم الذين يخرجون عن طاعة الامام بتاويل سائغ ولهم منعة وشوكة.

এরা সেই সব লোক যারা কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যার কারণে শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং তাদের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শক্তি থাকে। [২]

মোটকথা, জমহুর হাম্বলিগণ ‘শাসককে বরখাস্ত করার’ শর্তারোপ করেননি, যেমনটি বাকি তিনটি ফিকহি মাযহাবও এই ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। একইভাবে হানাফি ফকিহগণের ফিকহি উৎসগুলোতেও সাধারণত এই সীমাবদ্ধতা পাওয়া যায় না। [৩] এর কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, এই সকল হযরতগণ আহলে জামাল এবং আহলে সিফফিনের বিষয়টি সামনে রেখে এই শর্তের অবকাশ মনে করেননি। যৌক্তিকভাবেও যদি দেখা যায়, যদি দেশের কোনো প্রদেশে কোনো দল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে নিজের পূর্ণ একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে নেয় এবং তারা বাকি প্রদেশগুলো থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি না জানিয়েই নিজের প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব চলতে না দেয় এবং জেদ ধরে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অমুক অমুক (তা শতভাগ বৈধ হলেও) দাবি মেনে নেওয়া না হচ্ছে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা স্বীকার করবে না, তবে কি একে খুরুজ (বিদ্রোহ) হিসেবে অভিহিত করা হবে না? এটি কি এমন এক তীব্র রাজনৈতিক সংকট হবে না যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে? দেশ তো দূরের কথা, কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠানও কি এটি সহ্য করতে পারে যে প্রতিষ্ঠানের কোনো বিভাগের দায়িত্বশীলরা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আনুগত্য থেকে সরে দাঁড়াবে এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে নিজেদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেবে, চাই তারা কিছু বৈধ দাবিই পেশ করুক না কেন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বরখাস্ত করার দাবি না করুক, তবুও যে কোনো অবস্থায় এমন পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে গণ্য হবে এবং যদি জরুরি ভিত্তিতে এর প্রতিকার না করা হয় তবে নিশ্চিতভাবে এই পরিস্থিতি পুরো প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের কারণ হবে।

সুতরাং কিছু হাম্বলি ফকিহদের খুরুজ-এর সংজ্ঞায় ‘রামু খালআহ’ (তারা তাকে বরখাস্ত করার ইচ্ছা করে) এর শর্ত বাড়ানো এবং ফাতাওয়া আলমগিরিতে ‘ওয়াইয়াদউনা আল-বিলায়াহ’ (তারা শাসনের দাবি করে) এর ইবারতটি কাইদে ইহতিরাজি (আবশ্যকীয় শর্ত) নয় বরং কাইদে ইত্তিফাকি (আকস্মিক শর্ত)। যদি কেউ প্রমাণ করে দেয় যে এটি কাইদে ইহতিরাজি, তবে এটাই বলা হবে যে এটি একটি তাফাররুদ (একক মত) যার পক্ষে না কোনো যৌক্তিক সমর্থন আছে না কোনো নকলি (দলিলভিত্তিক) সমর্থন। আর একারণেই জমহুর হাম্বলি এবং জমহুর হানাফি ছাড়াও শাফেয়ি ও মালিকিগণও এই শর্ত গ্রহণ করেননি।

এই সংজ্ঞার একক বৈশিষ্ট্য (তাফাররুদ) স্পষ্ট করার পর এখন আমরা বিদ্রোহ ও বুগাত-এর পরিচিত সংজ্ঞাগুলোর ওপর এক নজর দিই।

[১] আল-মুহররার ফিল ফিকহ আলা মাযহাবিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়াহ আল-হাররানি: ২/১১৬, মাকতাবাতুল মাআরিফ রিয়াদ।

[২] আল-মুবিদি ফি শারহিল মুকনি, বুরহানুদ্দিন আবু ইসহাক ইব্রাহিম: ৭/৩৬৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

[৩] হানাফি ফিকহে বুগাত-এর গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাগুলো সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

শেখ আব্দুল কাদির আওদাহ মরহুম এ বিষয়ে চার ফিকহী মাযহাবের সারসংক্ষেপ এভাবে বর্ণনা করেছেন:

মালিকীগণ বিদ্রোহের (বগাওয়া) সংজ্ঞা এভাবে দেন যে, এটি কোনো ব্যাখ্যার (তাওয়ীল) মাধ্যমে বৈধ কাজে এমন ব্যক্তির আনুগত্য থেকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরত থাকার নাম যার শাসন সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তারা বিদ্রোহীদের সংজ্ঞা এভাবে দেন যে, তারা মুসলমানদের এমন একটি দল যারা ইমামে আজম বা তার প্রতিনিধির কোনো ওয়াজিব হক আদায়ে বাধা দিয়ে ইমাম বা তার প্রতিনিধির বিরোধিতা করে।

হানাফীগণ বিদ্রোহীদের সংজ্ঞা দেন এবং তা থেকে বিদ্রোহের সংজ্ঞা বের করেন যে, এটি ইমামের আনুগত্য থেকে অন্যায়ভাবে বের হয়ে যাওয়ার নাম এবং বিদ্রোহী হলো সে যে হকের ইমামের আনুগত্য থেকে অন্যায়ভাবে বের হয়ে যায়।

শাফেয়ীগণ বিদ্রোহীদের সংজ্ঞা এভাবে দেন যে, তারা এমন মুসলমান যারা ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার আনুগত্য ত্যাগ করে অথবা তাদের ওপর অর্পিত কোনো হক আদায়ে বাধা দিয়ে তার বিরোধিতা করে, তবে শর্ত হলো তাদের শক্তি (শওকত) থাকতে হবে, একটি ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) থাকতে হবে এবং তাদের মধ্যে একজন অনুসরণীয় নেতা থাকতে হবে। তারা এমন ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার (ফাসিদ তাওয়ীল) কারণে আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় যার ত্রুটি অকাট্য নয়, যদি তাদের সংখ্যাধিক্য বা শক্তির কারণে প্রভাব থাকে এবং তাদের মধ্যে একজন অনুসরণীয় নেতা থাকে। সুতরাং শাফেয়ীদের মতে, বিদ্রোহ হলো প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন এবং একজন অনুসরণীয় নেতা আছে এমন কোনো দলের কোনো ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার কারণে ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া।

হাম্বলীগণ বিদ্রোহীদের সংজ্ঞা এভাবে দেন যে, তারা এমন লোক যারা কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার কারণে ইমামের বিরুদ্ধে বের হয়ে যায়, যদিও সেই ইমাম ন্যায়পরায়ণ না হয়, তবে শর্ত হলো তাদের শক্তি থাকতে হবে, যদিও তাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি না থাকে যার আনুগত্য তারা করে। হাম্বলীদের নিকট বিদ্রোহের সংজ্ঞা শাফেয়ীদের সংজ্ঞা থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়।

...আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়, চাই সে (শাসক) ন্যায়পরায়ণ না হোক, এবং তাদের কাছে আত্মরক্ষার সক্ষমতা থাকে, চাই তাদের মধ্যে কোনো নেতা না থাকুক। সুতরাং হাম্বলিদের নিকট বিদ্রোহের সংজ্ঞা শাফেয়িদের সংজ্ঞা থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। [১]

□□□

এটি ছিল শেখ আব্দুল কাদির আওদাহর বক্তব্য, যা আমরা সংক্ষিপ্ততা ও ব্যাপকতার খাতিরে আগে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেছি। এখন ফিকহি মাযহাবসমূহের মূল উৎস থেকে কিছু উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন। হযরত ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন:

وإذا كانت لاهل البغي جماعة تكبر و يمتنع مثلها بموضعها الذي هي به بعض الامتناع حتى يعرف ان مثلها لا ينال الا حتى تكثر نكايته واعتقدت ونصبت اماما و اظهرت حكما وامتنعت من حكم الامام العادل فهذه الفئة الباغية.

(যখন বিদ্রোহী বা আহলে বগির কোনো দল বড় হয়ে যায় এবং কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থান করে এমন পর্যায়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে যে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাদের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না তাদের ওপর ব্যাপক আঘাত হানা হয়, এবং সেই দলটি (পরস্পর) অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে একজন শাসক নির্ধারণ করে এবং তার নির্দেশ কার্যকর করে এবং ন্যায়পরায়ণ ইমামের নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকে, তবে এটিই হলো ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ বা বিদ্রোহী দল।) [২]

শাফেয়ি ফিকহের ব্যাখ্যাকার ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি (রহ.) অত্যন্ত চমৎকার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, তিনি লিখেন:

والقدر الذي يجب الاكتفاء به، ذكر الامام العادل والخروج عن طاعته الواجبة.

(বিদ্রোহের সংজ্ঞায়) যতটুকু বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব তা হলো, ন্যায়পরায়ণ ইমামের উল্লেখ করা এবং তার আবশ্যকীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া।

এরপর ফকিহগণের বর্ণিত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তিনি এভাবে বর্ণনা করেন:

وقد قال الفقهاء: البغاة هم الذين يستجمعون اوصافاً: احدها: التمسك بتاويل مظنون يزعمون انه حامل على خروج الامام والانسلال عن متابعتة، هذا لا بد منه، والثاني: ان يرجعوا الى شوكة ومنعة، فهذا معتبران.

(ফকিহগণ বলেছেন যে, বিদ্রোহী তারা যাদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়। প্রথমত: তাদের কোনো ধারণাপ্রসূত ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া এবং তারা মনে করে যে এটিই শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এবং তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ। এটি একটি আবশ্যকীয় শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হলো: তারা প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার সক্ষমতা অর্জন করবে।

সুতরাং এই দুটি শর্তই গ্রহণযোগ্য।) [৩]

[১] আত-তশরিউল জিনায়ি আল-ইসলামি মুকারানান বিল কানুনিল ওয়াজয়ি (আব্দুল কাদির আওদাহ) দারুল কিতাব আল-আরাবি বৈরুত।

[২] কিতাবুল উম্ম: ৪/২৩০, এবং ইমাম শাফেয়ির ছাত্র ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া আল-মুজানিও একইভাবে এটি বর্ণনা করেছেন (মুখতাসারুল মুজানি, পৃষ্ঠা ৩৬৩)।

[৩] নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযাহিব: ১৭/১২৬, ত. দারুল মিনহাজ।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

ইমাম গাজালী (রহ.) এই মাসআলাটি নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। তিনি মাসআলাটি স্পষ্ট করে বলেন:

ويعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة، والتأويل، ونصب الامام فيما بينهم.

“তাদের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত বিবেচনা করা হয়: শক্তি (শওকত), ব্যাখ্যা (তাউইল) এবং নিজেদের মধ্যে একজন শাসক নিযুক্ত করা।”

...الشرط الأول: الشوكة: وهو ان يجتمع قوم ذونجدة على مخالفة الامام

“প্রথম শর্ত হলো শওকত (শক্তি); এর অর্থ হলো একদল সাহসী লোক শাসকের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া...”

তিনি আরও বলেন:

ثم لا يخفى ان الشوكة لا تتم ما لم يكن فيهم واحد مطاع.

“অতঃপর এটি গোপন নয় যে, প্রতিরোধের শক্তি ততক্ষণ পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যার আনুগত্য করা হয়।” [১]

ইমাম ইয়াহইয়া ইমরানী শাফেয়ী (রহ.) বিদ্রোহ (বাগাওয়াত) এবং বিদ্রোহীদের (বুগাত) সংজ্ঞায় বিবেচ্য শর্তগুলো এভাবে বর্ণনা করেন:

احدها: ان يكونوا طائفة فيهم منعة يحتاج الامام في كفهم الى عسكر فان لم يكن فيهم منعة وانما هم عدد قليل لم يتعلق بهم احكام البغاة.

“প্রথম শর্ত হলো তারা এমন এক শক্তিশালী দল হবে যাদের দমনে শাসকের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়। যদি তাদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকে এবং তারা সংখ্যায় অল্প হয়, তবে তাদের ওপর বিদ্রোহীদের (বুগাত) বিধান প্রযোজ্য হবে না।”

الشرط الثاني: ان يخرجوا من قبضة الامام، فان لم يخرجوا من قبضته لم يكونوا بغاة.

“দ্বিতীয় শর্ত হলো তারা শাসকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। যদি তারা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তবে তারা বিদ্রোহী নয়।”

الشرط الثالث: ان يكون لهم تاويل سائغ مثل ان تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج على الامام او منع حق لهم وان اخطئوا في ذلك.

“তৃতীয় শর্ত হলো তাদের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা (তাউইল) থাকতে হবে, যেমন তাদের মধ্যে এমন কোনো সংশয় সৃষ্টি হওয়া যার কারণে তারা শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বা তাদের কোনো অধিকার আদায়ের বিশ্বাস পোষণ করে, যদিও তারা সেই ব্যাখ্যায় ভুল করে থাকে।”

...وهل من شرطهم ان ينصبوا اماما؟ ففيه وجهان: احدهما ان ذلك من شرطهم لان

“আর তাদের জন্য কি একজন ইমাম নিযুক্ত করা শর্ত? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে: একটি হলো এটি তাদের জন্য শর্ত কারণ...”

[১] আল-ওয়াসীত ফিল মাযহাব: ৫/৩১২, ৩১৩, দারুস সালাম কায়রো।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কিছু ফকীহ যেমন সাগানী বিদ্রোহীদের সংজ্ঞায় এই শর্তারোপ করেছেন যে, তারা মুসলমানদের জান ও মাল হালাল মনে করবে। (৬/১৪০: ৭/১৪০)। কিন্তু চার মাযহাবের জমহুর ফকীহগণ বহু স্থানে স্পষ্ট করেছেন যে, এটি খারেজীদের শর্ত, বিদ্রোহীদের (বুগাত) নয় এবং উভয় মাসআলাকে পৃথক রেখেছেন। আর উভয়কে এক মনে করা একটি ভুল। মৌলিক পার্থক্য হলো বিদ্রোহীরা মুসলমানদের জান হালাল মনে করে না এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ মনে করে না; তাই বিদ্রোহ গুনাহ হলেও এর ফলে ফাসেক হওয়া আবশ্যিক নয়। বরং এটি ইজতিহাদ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতেও হতে পারে, যেমনটি জঙ্গ জামাল ও সিফফীন এবং হাররার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। পক্ষান্তরে খারেজীদের জন্য কঠোর ঈশিয়ারি রয়েছে; তারা মুজতাহিদ নয় বরং পথভ্রষ্ট, ফাসেক এবং বিদআতী।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন: এবং তারা একজন ইমাম নিযুক্ত করবে। দ্বিতীয় মতটি হলো—যা মাযহাবের (শাফেয়ী মাযহাবের) অভিমত—যে তাদের জন্য ইমাম নিযুক্ত করা শর্ত নয়। কারণ হযরত আলী রা.-এর সাথে বসরাবাসী এবং নাহরওয়ানবাসীদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বিধান কার্যকর হয়েছিল অথচ তারা কোনো ইমাম নিযুক্ত করেনি। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. যা উল্লেখ করেছেন, তা তিনি এজন্য উল্লেখ করেছেন যে সাধারণত তাদের অবস্থা এমন হয় যে তারা ইমাম নিযুক্ত করে থাকে।

আর বিদ্রোহী হওয়ার জন্য কি এটি শর্ত যে তারা নিজেদের মধ্যে কোনো শাসক নিযুক্ত করবে? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে: একটি শর্ত এই যে, যেমন ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন যে তারা কোনো ইমাম নিযুক্ত করবে। দ্বিতীয় মত যা (শাফেয়ী মাযহাবের) অভিমতও বটে, তা হলো এটি শর্ত নয় যে তারা নিজেদের জন্য কোনো শাসক নিযুক্ত করবে; কারণ হযরত আলী রা.-এর মোকাবিলায় আহলে বসরা (আহলে জামাল) এবং আহলে নাহরওয়ান-এর ওপর বিদ্রোহীদের বিধান জারি হয়েছিল অথচ তারা কোনো শাসক নিযুক্ত করেনি। ইমাম শাফেয়ী রহ. যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তা তিনি এজন্য উল্লেখ করেছেন যে সাধারণত বিদ্রোহীরা তাদের কোনো শাসক নিযুক্ত করে থাকে। (অর্থাৎ এটি কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত নয়) [১]

বিদ্রোহীদের মাসআলায় ফুকাহায়ে আহনাফের সংজ্ঞা সবচেয়ে বেশি ব্যাপক, মানসম্পন্ন এবং যৌক্তিক ও নকলি দলিলের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিকহে হানাফীর অধিকাংশ উৎসে ‘বিদ্রোহ’ (বগাভত)-এর অধীনে বুগাত-এর সংজ্ঞা এভাবে পেশ করা হয়েছে:

যখন মুসলমানদের কোনো দল কোনো শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।

“মুসলমানদের কোনো জামাত যারা কোনো শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।” [২]

অতঃপর যদি মুসলমানদের কোনো জামাত তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং কোনো শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তবে তিনি তাদের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করবেন এবং তাদের সংশয় নিরসন করবেন। অতঃপর যদি তারা কোনো স্থানে সমবেত হয়ে অবস্থান নেয়, তবে আমাদের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হবে যতক্ষণ না আমরা তাদের ঐক্য ছত্রভঙ্গ করে দেই।

“যদি মুসলমানদের কোনো জামাত শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং কোনো শহরের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে, তবে শাসক তাদের আনুগত্যের দাওয়াত দেবেন এবং তাদের ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করবেন। যদি তারা কোনো স্থানে সমবেত হয়ে অবস্থান নেয়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হবে যতক্ষণ না আমরা তাদের ঐক্য ছত্রভঙ্গ করে দেই।” [৩]

আল্লামা আইনী রহ. এভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন: “বিদ্রোহী হলো তারা যারা ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে।”

“বিদ্রোহী হলো তারা যারা শরয়ী শাসকের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়।” [৪]

পাঠকগণ লক্ষ্য করতে পারেন যে ফুকাহায়ে আহনাফের সংজ্ঞা সবার চেয়ে বেশি সহজবোধ্য, সহজ এবং স্পষ্ট। এর কারণ সম্ভবত এই যে ফিকহে হানাফীর কেন্দ্র ছিল কুফা, তাই হযরত আলী রা.-এর ইলমি উত্তরাধিকার থেকে আহনাফ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন। বর্তমান যুগের বিজ্ঞ ফকীহগণ এই সমস্ত সংজ্ঞার সারসংক্ষেপ এভাবে বের করেছেন:

[১] আল-বায়ান ফি মাযহাবিল ইমামিশ শাফেয়ী: ১৩/১৮-১৯ দারুল মিনহাজ জেদ্দা।

[২] হেদায়া খণ্ড ২ বাবুল বুগাত। এবং বলা হয়েছে: একদল মুসলিম ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং কোনো শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল।

(কানযুদ দাকায়িক, কিতাবুস সিয়্যার, বাবুল বুগাত)

[৩] রদুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার লি ইবনে আবিদিন আশ-শামী: ৩/৩৩৩।

[৪] আল-বিনায়া শারহুল হেদায়া লি বদরুদ্দিন আল-আইনী: ৭/২৬৮ আল-ইলমিয়্যাহ।

তারিখ উম্মতে মুসলিম

আল-বুগাত হলো সেই সব মুসলিম যারা কোনো তাউইলের (ব্যখ্যা) কারণে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং যাদের শক্তি (প্রতিরোধ ক্ষমতা) রয়েছে। [১] (কোনো তাউইলের কারণে শরয়ী শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া মুসলিম যাদের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।)

ফিকহী সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে এটি প্রমাণিত হয় যে, এগুলোর প্রয়োগ আহলে জামাল এবং আহলে শামের ওপর অত্যন্ত স্পষ্ট। আর ফিকহী দলিলসমূহ দেখলে এটিও গোপন থাকবে না যে, এই সংজ্ঞাসমূহ আহলে জামাল এবং আহলে শামের ঘটনাবলি থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার চেষ্টা করা পুরো ফিকহী ভাণ্ডারকে অর্থহীন করে দেওয়ার নামান্তর হবে। উম্মতের ইজমার বিরোধিতা করা এবং ফিকহ ও হাদিসের অধ্যায়সমূহকে প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে এটি অনেক বেশি সহজ যে, ইবনে কুদামা, আব্দুর রহমান আল-সাদি এবং ফাতাওয়া আলমগিরিতে বর্ণিত বুগাত-এর সংজ্ঞাকে সংশোধনযোগ্য বা ব্যখ্যার যোগ্য মনে করা হোক। এই আলোচনাটি আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি ফতোয়ার মাধ্যমে শেষ করছি। তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে আন্মার (রা.)-এর হাদিস উল্লেখ করে বলেন:

“এই হাদিসটি এই কথার দলিল যে, হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধকারী ভুল পথে ছিল, চাই তা তাউইলের সাথে হোক অথবা তাউইল ছাড়াই বিদ্রোহকারী হোক। আর এটিই আমাদের সাথীদের দুটি মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক মত, যা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধকারীর ওপর মুখতি (ভুলকারী) হওয়ার হুকুম আরোপ করে। এটিই সেই সব মুজতাহিদ ইমামদের মাযহাব যারা এই ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে তাউইলকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের মাসআলা গ্রহণ করেছেন। একইভাবে যখন ইয়াহইয়া ইবনে মাজীন (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ওপর আপত্তি তুললেন যে, তিনি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)-এর সীরাত থেকে কেন দলিল গ্রহণ করেছেন [২] এবং বললেন: “ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কি হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.)-কে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করেছেন?” তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তার প্রতিবাদ করে বললেন: “আপনার ওপর আফসোস! ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জন্য আর কিসের সুযোগ ছিল যা তিনি এই স্থানে রাখতেন?” এর অর্থ ছিল, যদি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এখানে হযরত আলী (রা.)-এর সীরাতের অনুসরণ না করতেন, তবে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের মাসআলায় তার কাছে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর মধ্য থেকে কিছুই থাকত না।” [৩]

যাই হোক, যদি কেউ কেবল নিজের ধারণায় ইসলামের উত্তম সেবা এবং আকিদা অধিকতর সংরক্ষণের জন্য এই ফিকহী ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হয়, তবে তাকে খুরুজ-এর কোনো নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু এভাবে কি সবার জন্য এই সুযোগ তৈরি হবে না যে, তারা অন্যান্য মাসআলায় চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে এবং যেকোনো দ্বীনি হুকুমের সংজ্ঞাও বদলে ফেলবে?

[১] আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ: ১৩০/৮

[২] ইমাম শাফেয়ীর এই দলিল গ্রহণ তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ “কিতাবুল উম্ম”-এ দেখা যেতে পারে। (কিতাবুল উম্ম: ২২৯/৪, প্রকাশনা: আল-মা’রিফাহ)

[৩] আর এটি এই কথার দলিল যে, আলীর সাথে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। আর এই ভিত্তিতে তার সাথে যুদ্ধকারী ভুলকারী, যদিও সে মুতাআউয়িল (ব্যখ্যাকারী) হোক অথবা তাউইল ছাড়াই বিদ্রোহী হোক। আর এটিই আমাদের সাথীদের দুটি মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক মত, যা আলীর সাথে যুদ্ধকারীকে ভুলকারী সাব্যস্ত করার হুকুম দেয়। এটিই সেই সব ফিকহ ইমামদের মাযহাব যারা এর ওপর ভিত্তি করে তাউইলকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের শাখা-প্রশাখা বের করেছেন। একইভাবে ইয়াহইয়া ইবনে মাজীন ইমাম শাফেয়ীর ওপর আপত্তি করেছিলেন যে তিনি তাউইলকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আলীর সীরাত থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন: তিনি কি তালহা ও যুবাইরকে বিদ্রোহী বানাচ্ছেন? এই সংবাদ ইমাম আহমদের কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন: তোমার ওপর আফসোস! এই স্থানে তার জন্য আর কী করার সুযোগ ছিল? অর্থাৎ যদি তিনি এই বিষয়ে আলীর সীরাতের অনুসরণ না করতেন, তবে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে তার কাছে খুলাফায়ে রাশেদীনের কোনো সুন্নাহ থাকত না। (মাজমুউল ফাতাওয়া লি-ইবনে তাইমিয়্যাহ: ৩৩৮/৪)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

আসলাফ (পূর্বসূরিগণ) সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের আকিদা পোষণ করা সত্ত্বেও কেন কিছু সাহাবীর ওপর ‘খুরুজ’ (বিদ্রোহ) শব্দটির প্রয়োগ করেছেন?

(প্রশ্ন) আসলাফ এবং আকাবির উলামায়ে কেরামকে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার ঝাঙা উড্ডীন রাখতে দেখা যায়, তেমনি অন্যদিকে তাঁরা আহলে শাম এবং আসহাবে জামালের ওপর বিদ্রোহ শব্দটির প্রয়োগ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করেননি। এটি কেমন দ্বিচারিতা? বর্তমান যুগের সাধারণ মুসলমানও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন কথা বলা পছন্দ করে না, তাহলে এত বড় বড় উলামায়ে কেরাম কেন এমনটি লিখে গেছেন? বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কি স্বভাবগতভাবেই এটি পছন্দ করতেন যে, একটি পক্ষকে “বিদ্রোহী” বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক?

(উত্তর) এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যেক মুসলমান স্বভাবগতভাবেই এটাই চাইবে যে, সাহাবায়ে কেরামের কারো ওপর কোনো অবস্থাতেই “খুরুজ” বরং কোনো ভুলের প্রয়োগ যেন না হয়। প্রথম যুগ থেকেই স্বভাবগতভাবে এটিই পছন্দনীয়। এই কারণেই যেখানে সম্ভব হয়েছে, আসলাফগণ সামান্যতম সাহাবীর বিচ্যুতি বা ভুলেরও কোনো না কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। নিশ্চিতভাবেই আসলাফদের কাছে এই বিষয়টি অনেক বেশি অপ্রীতিকর মনে হতো যে, কিছু সাহাবীর ওপর “খুরুজ” শব্দটির প্রয়োগ করা হোক। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিক ও ব্যবহারিক ভালোবাসায় তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু বিষয়টি ছিল সেই দ্বীনের হেফাজতের, যার জন্য খোদ সাহাবায়ে কেরাম কুরবানি দিয়ে গেছেন। এই দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ইসলামী হুকুমত, যার প্রতিষ্ঠা যেমন জরুরি, তেমনি এর স্থায়িত্বও জরুরি এবং মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। এই স্থায়িত্বের জন্য আবশ্যিক হলো দেশকে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো নীতিমালা থাকা। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল খুরুজ বা বিদ্রোহের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা, যাতে তা দেখে সর্বদা এটি স্থির করা যায় যে, শাসকের আনুগত্য অস্বীকার করার কোন ধরনটি খুরুজ এবং কোনটি নিছক সমালোচনা বা প্রতিবাদ। কোন ধরনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও সামরিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে আর কোথায় নেই।

উদাহরণস্বরূপ, ইফতা বা ফতোয়া প্রদানের আসনে আসীন হযরত আলকামা ইবনে কায়েস (রহ.)-এর মতো তাবয়ীগণ, যারা নিজেরা সিফফিনের যুদ্ধে আলভী বাহিনীর অংশ ছিলেন, তাঁরা আবশ্যিকভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, বিদ্রোহের বিধানের জন্য কীভাবে আইন প্রণয়ন করা যায়। যদিও বিদ্রোহের শাস্তি সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত **فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي نِصْرٍ** তাঁদের সামনে ছিল, কিন্তু সুনতে নববী এমনকি প্রথম তিন খলিফার যুগেও এমন কোনো স্পষ্ট ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ছিল না যা দেখে খুরুজের সঠিক সংজ্ঞা এবং এর আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ স্থির করা যায়।

এমন পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.) দেশের অভ্যন্তরে বিরোধীদের সাথে যে যুদ্ধগুলো করেছেন এবং সেগুলোতে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, সেটিই বিদ্রোহের সংজ্ঞা এবং বিধান আহরণের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সর্বসম্মতিক্রমে খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। পরবর্তী যুগে তাঁদের মতো কেউ ছিলেন না যার মাধ্যমে এমন অত্যন্ত নাজুক বিষয়ে দলিল পেশ করা যেতে পারে।

সুতরাং আলভী যুগে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধগুলোকে সামনে রেখে ফকীহগণ বিদ্রোহের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। সংজ্ঞার শব্দাবলীতে পার্থক্য থাকলেও এর সারমর্ম প্রায় একই, অর্থাৎ কোনো এলাকা দখল করা এবং শাসকের আনুগত্য অস্বীকার করা।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

সুতরাং ফকীহগণ যদি ব্যক্তিত্বের সম্মানের দিকে লক্ষ্য করতেন এবং সিরিয়াবাসীদের ওপর, যারা পুরো একটি প্রদেশের ওপর দখলদার ছিল, বিদ্রোহের বিধান প্রয়োগ না করতেন, তবে কেয়ামত পর্যন্ত কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো শহর বা দুর্গের ওপর দখলদার কোনো বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির প্রশ্নই আসত না। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই প্রশ্নই সামনে আসত যে, খাইরুল্ল কুরুনে (উত্তম যুগে) যখন পুরো একটি প্রদেশের ওপর দখলদার জামাতের ওপর বিদ্রোহের বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা নাজায়েজ ছিল, তবে এখন কোনো একটি শহর বা কয়েকটি দুর্গের সরকারের আনুগত্য না করাকে কীভাবে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে? তখন এই কথা বলে সমস্যার বাস্তবতা পরিবর্তনের কোনো সুযোগই থাকত না যে, তারা সাহাবী ও তাবিঈ ছিলেন, তাই তাদের বিষয়টি ভিন্ন ছিল এবং সম্মানের খাতিরে তাদের বিদ্রোহের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

এজন্য যে, শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোনো মানুষকে ব্যতিক্রম রাখেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল কার্যত কিছু সাহাবীর ওপর কিছু হদ কার্যকরই করেননি, বরং মৌখিকভাবেও বলে দিয়েছিলেন যে, যদি আমার কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম। [১]

সেই শাস্তিগুলো এবং এখানে সিরিয়াবাসীদের পরিস্থিতির মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে, তবে তা ছিল এই যে, সেগুলো ছিল ব্যক্তিগত পদস্বলনের বিষয় আর এটি ছিল একটি জামাতের ভুল। কিন্তু শরীয়তে এমন কোনো নীতি নেই যেখানে ব্যক্তিগত ভুল দণ্ডনীয় হবে আর জামাতগত ভুল সমর্থনযোগ্য হবে। যদি তর্কের খাতিরে এই কারণ বের করে যে, সিরিয়াবাসীরা পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাদের সম্মানের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন, তাদেরকে বিদ্রোহের বিধান থেকে ব্যতিক্রম রাখা হতো, তবে কেয়ামত পর্যন্ত এটি নির্ধারিত হয়ে যেত যে, যদি কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় তবে তা বিদ্রোহ হবে, কিন্তু কোনো বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব যদি পুরো একটি প্রদেশও নিজের হাতে নিয়ে নেন, তবে তাকে বিদ্রোহ বলা শরয়ীভাবে ভুল হবে। তখন আর এটি বলা যেত না যে, বিদ্রোহ থেকে অব্যাহতি কেবল সাহাবীদের জন্য ছিল; কারণ এর জবাবে সাথে সাথেই এটি বলা যেত যে, সাহাবীদের একে অপরের কাছে যে মর্যাদা ছিল, পরবর্তীকালের লোকদেরও একে অপরের কাছে সেই একই মর্যাদা রয়েছে এবং অব্যাহতির কারণ হলো সম্মান ও পবিত্রতা, যা এখানে এই বুজুর্গ ব্যক্তির জামাতের অর্জিত হয়েছে।

স্পষ্টতই কুরআনের আয়াত: “فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي” (তবে তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা বিদ্রোহ করে)-এর অধীনে মুসলমানদের কোনো জামাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কেবল একটিই সুরত বা অবকাশ রয়েছে, অর্থাৎ যখন তারা বিদ্রোহ করে। যদি প্রথম যুগের নেক জামাতগুলোকে সম্মান ও পবিত্রতার নীতির অধীনে এই বিধানের প্রয়োগ থেকে বের করে দেওয়া হতো, তবে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্রোহের এমন এক দরজা খুলে যেত যে, কোনো মুসলিম রাষ্ট্র কয়েক বছরের জন্যও টিকে থাকতে পারত না। এমন এক নিকৃষ্ট ব্যবস্থা অস্তিত্বে আসত যে সারা দুনিয়া তামাশা দেখত। আসমানী শরীয়ত থেকে বঞ্চিত এবং কেবল বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চলা সরকারগুলোও ইসলামী সরকারগুলোর তুলনায় বহুগুণ স্থিতিশীল হতো; কারণ তাদের কাছে বিরোধীদের থামানোর এবং অনুগত করার ক্ষমতা থাকত। অথচ মুসলিম বিশ্বের কোনো ছোট সরকারের কাছেও এই নিশ্চয়তা থাকত না যে, তা কয়েক বছরের মধ্যে আরও অসংখ্য টুকরোয় বিভক্ত হবে না। সম্মান ও পবিত্রতার নীতির সুযোগ নিয়ে যদি প্রতিটি দেশে একাধিক বুজুর্গ নিজ নিজ শহরগুলো দখলে নিয়ে শাসন করতেন, তবে ইসলামের মুফতিগণ, বিচার বিভাগের কাজীগণ এবং কোনো আল্লাহভীরু শাসকই তাদের কিছু বলতে পারতেন না; কারণ প্রথম যুগে নির্ধারিত নীতি যদি ভেঙে ফেলা হতো, তবে সরকার অনৈসলামিক বলে গণ্য হতো।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৬৭৮৭, কিতাবুল হুদুদ, বাব: ইকামাতুল হুদুদ আলাশ শরীফ ওয়াল ওয়াদীয়।

এর দুটি ফলাফল হতে পারত: হয় ইসলামি বিশ্ব প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যেত, অথবা শাসকদের এটি মেনে নিতে হতো যে ইসলামের সাথে রাজনীতি পরিচালনা করা অসম্ভব। সুতরাং, কোনো শাসকই পবিত্রতার দাবিদার বিদ্রোহীদের দমন করে কোনো শক্তিশালী সরকার তখনই গঠন করতে পারতেন, যখন তিনি আগে সরকার ও ধর্মের পৃথকীকরণের ঘোষণা দিতেন।

যদি হযরত আলী (রা.)-এর যুগে সিরিয়াবাসীদের ওপর বিদ্রোহের বিধান প্রয়োগ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকে বৈধ মনে করার মাধ্যমে এটি নির্ধারিত না হতো যে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহের বিধান থেকে মুক্ত নন, তবে স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জন্যও হযরত হুজর ইবনে আদি (রা.)-এর বিরুদ্ধে কিছু করার কোনো সুযোগ থাকত না। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রেখে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ড এই উদ্দেশ্যেই দিয়েছিলেন যাতে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। সংক্ষেপে, বিদ্রোহের এই সংজ্ঞা যা হযরত আলী (রা.)-এর যুগে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর তাদের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার না করেই প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করা হয়েছিল, তা ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক দাবি। ফকিহগণ উপরে বর্ণিত সমস্ত পরিণতির কথা বিবেচনা করে সময়মতো এটি অনুধাবন করেছিলেন এবং স্থির করেছিলেন। স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বরং সমস্ত উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণ এটিই গ্রহণ করেছিলেন। এটি এই উন্মত্তের ওপর আল্লাহর এক বিশাল রহমত ছিল যে, এই বিধান ও শিষ্টাচার তখনই প্রণীত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে ইসলামি ব্যবস্থার পথে চলতে ইচ্ছুক প্রত্যেক শাসকের জন্য এমন নাজুক বিষয়ে একটি অত্যন্ত উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপন্থা অর্জিত হয়েছিল যাতে কোনো বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা নেই। এতে এমন কঠোরতাও নেই যে নাগরিকরা ভীত হয়ে পড়ে, আবার এমন শিথিলতাও নেই যে দেশের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

পরিশেষে, নিজস্ব মতামতের ওপর জোর প্রদানকারী মুজতাহিদদের প্রতি অনুরোধ যে, তাঁরা এই পয়েন্টটি বিবেচনা করুন যে, আহলে জামাল এবং আহলে শামকে খুরুজের বিধানের বাইরে গণ্য করলে কী অনিবার্য ফলাফল দাঁড়াবে?

এটাই যে, আহলে জামাল এবং আহলে সফফিনের পক্ষ থেকে খুরুজ সংঘটিত হওয়া ছাড়াই আলভী বাহিনী তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এর অনিবার্য অর্থ এই হবে যে, হযরত আলী, হযরত হাসনাইন কারিমাইন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং তাঁদের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী অসংখ্য সাহাবী (রা.) সকলেই শরয়ী সীমার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা সবাই ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় হত্যার অপরাধী এবং কবির গুনাহে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফলে এর পরিণামে হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে আসা সিরীয়রা তো মজলুম এবং সত্যপন্থী প্রমাণিত হবে, কিন্তু তাদের বিপরীতে হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা অন্যায় হত্যার অপরাধী হয়ে ফাসেক, ফাজের এবং জালেম প্রমাণিত হবেন। অথবা যদি তাঁদের সাহচর্যের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তবে বড়জোর এতটুকু বলার সুযোগ থাকবে যে তাঁদের পক্ষ থেকে খতায় ইজতিহাদি হয়েছিল। এটি হুবহু মারওয়ানিদের মতাদর্শ। তাদের মধ্যে চরমপন্থীরা হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের ফাসেক, ফাজের এবং জালেম বা নির্বোধ মনে করে, আর কিছু লোক কিছুটা ছাড় দিয়ে বলে যে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে খতায় ইজতিহাদি সংঘটিত হয়েছিল। এই মতাদর্শ ইজমায়ে উন্মত্তের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। জমহুর ওলামায়ে কেরাম খুরুজের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, সেই অনুযায়ী বিদ্রোহ এবং খতায় ইজতিহাদির প্রয়োগ নিঃসন্দেহে আহলে জামাল ও সফফিনের ওপর হয়, হযরত আলী (রা.)-এর ওপর নয়। অধিকন্তু, ওই ব্যক্তিদের মুজতাহিদ, অপারগ, ক্ষমাপ্রাপ্ত বরং সওয়ালের অধিকারীও মনে করা হয়। এখন ভেবে দেখুন কোন পথটি...

সাহাবায়ে কেরামের ইনসাফ ও মর্যাদার জন্য কোনটি বেশি উপযুক্ত এবং কোনটি পথভ্রষ্ট দলগুলোর মতামতের কাছাকাছি... যদি কেউ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তবে সে যদি চিন্তা করে দেখে তবে দেখা যাবে যে একটি পক্ষ অবশ্যই ভুল প্রমাণিত হবে। পার্থক্য এই হবে যে, তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মহান সাহাবায়ে কেরামকে ভুল সাব্যস্ত করা হবে এবং সেই সাথে ইজমার বিরোধিতা করাও আবশ্যিক হয়ে পড়বে। সুতরাং এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজের জন্য বেছে নেওয়া বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গিয়ে নর্দমার নিচে দাঁড়ানোর সমতুল্য।

আকাবিরগণ মতবিরোধের ব্যাপারে নীরব থাকার নির্দেশ দেওয়ার পর কেন এই আলোচনায় লিপ্ত হন?

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আলেমদের চিন্তাধারা বোধগম্য নয় এবং দ্বিমুখী নীতির ওপর ভিত্তি করে। একদিকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, মোল্লা আলী ক্বারী, ইমাম নববী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দিদে আলফে সানি, ইমাম রাজী, আল্লামা আলুসী এবং শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভীর মতো আলেমদের কিতাবসমূহে স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে, হাদীসের নির্দেশ হলো সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ ও বিবাদ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা, এ বিষয়ে কথা না বলা; কারণ তাকদীরের আকিদার মতো এটিও একটি ধ্বংসাত্মক স্থান, “মানযিলাতুল আকদাম” (পা পিছলে যাওয়ার স্থান)। এটি থেকে বেঁচে থাকো। কিন্তু স্থানে স্থানে তারা নিজেরাই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং শেষে আবার বলেন যে, এই মহান ব্যক্তিগণ মুজতাহিদ ছিলেন, এ বিষয়ে বিতর্ক করা উচিত নয়। ইজতিহাদী ভুল ছাড়া অন্য কোনো কথা যেন কখনোই না বলা হয়। কিন্তু তবুও সীমার বাইরে গিয়ে ইজতিহাদের উর্ধ্ব উঠে এই ফয়সালা দিয়ে দেন যে, অমুক ভুল ছিলেন এবং অমুক সঠিক ছিলেন। আমার বক্তব্য হলো, হয় নীরবতা ও বিরত থাকার মাযহাবের ওপর চলুন, এই মাসআলাগুলোতে কখনো মুখ বা কলম চালাবেন না যেমনটি হাদীসের নির্দেশ। অথবা শুধুমাত্র ইজতিহাদ পর্যন্ত কথা বলে উভয় পক্ষকে সঠিক (মুসীব) বলে আলোচনা শেষ করে দিন। যদি ধৃষ্টতা করতেই হয়, তবে দ্বিমুখী নীতি ত্যাগ করে রাফেজীদের মতো সরাসরি সেটাকেই নিজেদের মাযহাব বানিয়ে নিন। এই দ্বিমুখী নীতি বোধগম্য নয়।

جواب: এখানে সবার আগে আপনার ওপরই প্রশ্ন আসে যে, আপনি কেন এই আলোচনা শুরু করছেন? আপনার প্রশ্ন থেকে মনে হচ্ছে যে আপনার মাযহাব হলো এই বিষয়ে সর্বদা নীরবতা অবলম্বন করা ফরজ, এজন্যই আপনি এর ওপর জোর দিচ্ছেন। তাহলে সবার আগে আপনার উচিত আপনার প্রশ্ন ফিরিয়ে নিয়ে নিজের নীরবতার মাযহাবের ওপর আমল করা। যেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাযহাবের বিষয়, তাদের নিকট সাধারণ অবস্থায় নীরব থাকা আবশ্যিক কিন্তু প্রয়োজনে এই আলোচনার অনুমতিও রয়েছে। আহলে সুন্নাতের কোনো দ্বিমুখী বা ত্রিমুখী নীতি নেই। তাদের প্রতিটি কথার নিজস্ব প্রেক্ষিত রয়েছে। সেটিকে সেই স্থানে রেখে দেখলে এর প্রয়োজনীয়তা এবং সঠিক অবস্থান বোঝা সম্ভব। আলেমগণ যেখানে বিবাদপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, তার অর্থ এই নয় যে প্রয়োজনেও এ বিষয়ে মুখ খোলা যাবে না। বরং আকিদার শিক্ষা, হাদীসের পাঠদান ও ব্যাখ্যা, অথবা কোনো ভ্রান্ত চিন্তার অধিকারীর আপত্তির খণ্ডনের জন্য এ বিষয়ে আলোচনা করা মাঝে মাঝে জরুরি হয়ে পড়ে। যদি কোথাও সাহাবায়ে কেরামের বিবাদ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়, যেমনটি আজও এই...

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড

মধ্যে লিখিত ও মৌখিক আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে, তাই এই বিষয়ে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য কলম ও জবান দিয়ে চেষ্টা করা আবশ্যিক। অন্যথায় বাতিল মতবাদগুলোকে প্রতিহত করার কেউ থাকবে না। এটা সত্য যে, সালাফগণ সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য (মুশাজারাতে সাহাবা)-এর আলোচনাকে ‘মাযাল্লাতুল আকদাম’ (পদস্থলনের স্থান) বলেছেন, তবে এরও একটি প্রেক্ষাপট ও প্রেক্ষিত রয়েছে যা বোঝা জরুরি। এর ব্যাখ্যার জন্য লেখক তার উস্তাদ মরহুম হযরত মুফতি মুহাম্মদ মুজাহিদ শহীদ-এর একটি ফতোয়ার উদ্ধৃতি নকল করেছেন। তিনি বলেন:

“এই বিষয়ে যদি সালাফদের গবেষণার তোয়াক্কা না করে স্বাধীন পথ অবলম্বন করা হয়, তবে এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন, বিপজ্জনক এবং পদস্থলনের কারণ। আর যদি সালাফদের ওপর আস্তা রেখে ‘আত্তাবিউল সাওয়াদুল আযম’ (বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুসরণ করো)-এর পথ অবলম্বন করা হয়, তবে অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে এই পুলসিরাত পার হওয়া সম্ভব। তাই অন্যান্য আকিদার মতো এই বিষয়েও সেই সকল মহান ব্যক্তিদের রায়কে প্রশস্ত হৃদয়ে গ্রহণ করা উচিত, যা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ব্যাপারে যে সকল দিক বিবেচনা করা জরুরি, সেই সব দিক বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর মেজাজ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা ভাবা যেতে পারে।” [১]

প্রশ্ন: একজন ‘গবেষক’ বলছেন যে, হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয়ই ১০০ শতাংশ সঠিক ছিলেন। হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শরয়ি ও আইনি দিক থেকে সঠিক ছিলেন, আর হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সঠিক ছিলেন। শরয়ি দাবি ছিল যে, হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকারীদের অবকাশ দেওয়া হোক; কারণ তাদের বিরুদ্ধে কোনো শরয়ি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। আর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দাবি ছিল যে, শরয়ি প্রমাণ না থাকলেও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনা হোক। এই রায় কি সঠিক?

উত্তর: এই রায় তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন প্রথমে এটি মেনে নেওয়া হবে যে, ইসলামি শরীয়ত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দেয় না। এটি একটি সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও নয়। এছাড়া এই চিন্তাধারার অনিবার্য ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রশাসনিক দিক থেকে দুর্বল ছিলেন। অথচ এই কথাটি একেবারেই ভুল। যে পরিমাণ কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে মোকাবিলা করেছেন, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে। আবার এই রায় গ্রহণ করলে হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর ততটা আঘাত আসে না যতটা হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর আসে। এই রায়ের সারকথা হলো, হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শরয়ি গণ্ডির বাইরে পা রাখতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে জেনেশুনে সেই গণ্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এটিও একটি ডাহা মিথ্যা। হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয়ই যথাসম্ভব শরয়ি গণ্ডির ভেতরে থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জেনেশুনে শরীয়তের বিরোধিতা করেননি, বরং তার পক্ষ থেকে ইজতিহাদি ভুল সংঘটিত হয়েছিল।

[১] ফতোয়াটি হযরত মুফতি মুহাম্মদ মুজাহিদ শহীদ (জামিয়া ইমদাদিয়া ফয়সালাবাদ) কর্তৃক লিখিত, বিষয়: সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদ, ১২ই মহররম ১৪১১ হিজরি, অপ্রকাশিত। মূল কপি জামিয়া ইমদাদিয়ার ফতোয়া বিভাগের রেকর্ডে লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে। এই ফতোয়ার ওপর হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দামাত বারাকাতুহুম)-এর সত্যায়নও রয়েছে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

কি মালুমুল আকিবা (যাদের শেষ পরিণাম জানা) ব্যক্তিদের ওপর নামালুমুল আকিবা (যাদের শেষ পরিণাম অজানা) কোনো হুকুম লাগাতে পারে?

প্রশ্ন: সাহাবীগণ “মালুমুল আকিবা” ছিলেন। তাঁদের শেষ পরিণাম জানা এবং নির্ধারিত, অর্থাৎ জানাতুল ফিরদাউস। আমরা “নামালুমুল আকিবা”। জানি না জানাতে যেতে হবে নাকি জাহান্নামে। “মালুমুল আকিবা”-এর বিষয়টি “নামালুমুল আকিবা” নির্ধারণ করতে পারে না। তাহলে পরবর্তী লোকেরা নিজেদের শেষ পরিণাম না জেনে এই জান্নাতী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কেন হুকুম (ফয়সালা) লাগিয়ে দিল?

উত্তর: “মালুমুল আকিবা” এবং “নামালুমুল আকিবা”-এর দর্শনটি মৌলিকভাবে ভুল; কারণ আমরা সাহাবীগণের শেষ পরিণাম সম্পর্কে (নাউযুবিল্লাহ) কোনো হুকুম দিচ্ছি না। কেবল জুমহুর আইন্মায়ে আহলে সুন্নাতের উক্তিগুলো উদ্ধৃত করছি এবং জুমহুরের উক্তির সঠিকতা স্পষ্ট করছি। জুমহুরের উক্তিগুলোতে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের শেষ পরিণামের ওপর কোনো আক্রমণ করা হয়নি বরং উভয় পক্ষকে ক্ষমাশীল ও সওয়াবের অধিকারী মানা হয়েছে। “মালুমুল আকিবা” এবং “নামালুমুল আকিবা”-এর প্রশ্ন তো সেখানে তোলা উচিত যেখানে কোনো ব্যক্তি কোনো সাহাবীর শেষ পরিণামের ওপর আক্রমণ করছে, তাঁদেরকে গুনাহগার বা তার চেয়ে বেশি কিছু বলছে।

আচ্ছা ঠিক আছে! আমরা এক মুহূর্তের জন্য এই নীতিটি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কথা সেখানেই থাকবে; কারণ এভাবে এই বিষয়টি তো নির্ধারিত হয়ে যায় যে, “মালুমুল আকিবা” ব্যক্তিগণ “মালুমুল আকিবা”-এর বিষয়ে মতামত দিতে পারেন। সকল ওলামায়ে কেরামের নিকট হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.) মতপার্থক্যের যুগের “মালুমুল আকিবা” ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। তাঁরই ফয়সালা ছিল যে শামের অধিবাসীরা বিদ্রোহী, এই শরয়ী দলিলের ভিত্তিতেই তিনি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তলোয়ার কোষমুক্ত করেছিলেন। আমরা “নামালুমুল আকিবা” লোকেরা সাহাবীগণের মধ্যে চতুর্থ মহানতম, মনোনীত এবং নিঃসন্দেহে “মালুমুল আকিবা” সত্তার মতামতকে প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস করতে পারি না, সুতরাং আমরা তাঁরই অনুসরণ করছি এবং চৌদ্দ শতাব্দী ধরে আইন্মায়ে মুজতাহিদ্দীন, ফুকাহা এবং মুহাদিসগণের একটি পুরো কাতার আমাদের সামনে এই মতাদর্শের সাথেই দাঁড়িয়ে আছে। (পক্ষান্তরে অন্য মতাদর্শীদের কাছে এমন কোনো কাতার নেই, বরং সেই মতাদর্শ এক শতাব্দীর মধ্যেই নিজের ভিত্তির দুর্বলতার কারণে শেষ হয়ে গিয়েছিল।)

অতঃপর জুমহুর আইন্মায়ে কেরামের কাতারে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগতভাবে “মালুমুল আকিবা” না হলেও তাঁদের সম্মিলিত মতাদর্শের অনুসরণ “মালুমুল আকিবা”; কারণ হাদীসসমূহে উম্মতের ইজমার অনুসরণকেই নাজাতের মাধ্যম এবং তা থেকে বিমুখ হওয়াকে ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে। [১] সুতরাং “নামালুমুল আকিবা” লোকদের জন্য নিজেদের “আকিবা” (শেষ পরিণাম) সুন্দর করার একমাত্র মাধ্যম এটাই যে, তারা উম্মতের জুমহুরের পেছনে চলবে, ব্যক্তিগত মতামত প্রদানকারীদের অনুসরণ করবে না। এই কারণেই আমরা জুমহুরের পেছনে দাঁড়িয়ে আছি।

[১] যখন তোমরা মতপার্থক্য দেখবে, তখন বড় দলের (সাওয়াদে আজম) অনুসরণ করবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খণ্ড: ৩৯৫০)

আল্লাহ এই উম্মতকে—অথবা বলেছেন আমার উম্মতকে—কখনো গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না, আর তোমরা বড় দলের অনুসরণ করো, কেননা যে বিচ্ছিন্ন হয় সে জাহান্নামে বিচ্ছিন্ন হয়। (আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, খণ্ড: ৩৯২)

নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত জামাতের ওপর, আর শয়তান জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাথে দৌড়ায়। (সুনানে নাসায়ী মুজতাবা, খণ্ড: ৪০২০)

সুতরাং তোমরা বড় দলের অনুসরণ করো। (আস-সুন্নাহ লি ইবনে আবি আসিম, খণ্ড: ৮০) তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো। (শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, খণ্ড: ১০৫৭৩)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

উভয় পক্ষ কেন সঠিক (মুসিব) নয়?

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে সম্মান ও ইনসাফের দাবি তো এটাই ছিল যে, তাদের মধ্যকার বিবাদগুলোতে উভয় পক্ষকে ‘মুসিব’ (সঠিক) বলা হতো এবং সবাইকে সমান রাখা হতো। একজনের সঠিক হওয়া এবং অন্যজনের ভুল প্রকাশ করা কোন ধরনের ইনসাফ?

উত্তর: উভয় পক্ষকে মুসিব বলাও সমস্যার সমাধান নয়। সেই যুগেও কিছু মুতাজিলা এবং তাদের সাথে কিছু আশায়েরা হাদিসে মুতাওয়াতির (হাদিসে আন্নার বিন ইয়াসির রা.) উপেক্ষা করে বিতর্ক শেষ করার জন্য বলেছিল যে, উভয় পক্ষই মুসিব ছিল। [১] কিন্তু বিতর্ক তবুও শেষ হয়নি। প্রশ্ন দেখা দিল যে, শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ কেন এবং কীভাবে মুসিব? এখন এর কোনো উত্তর নেই যে, উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই একনিষ্ঠ ছিল এবং নিজ নিজ অবস্থানে হকের জন্য লড়ছিল। কিন্তু এই যুক্তির দুর্বলতা স্পষ্ট; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যখন একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন প্রত্যেকেই নিজেকে সঠিক মনে করে। প্রশ্ন তো হলো বাস্তবে কে সঠিক এবং কে ভুল? এটি তো দলিলের মাধ্যমেই জানা সম্ভব এবং যখন বিষয়টি শরয়ী হয়, তখন দলিলও শরীয়ত থেকেই নিতে হবে। সুতরাং যখন হাদিসে মুতাওয়াতির (হাদিসে আন্নার রা.: তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে) এবং খারেজিদের সাথে যুদ্ধ করার প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলো হযরত আলী রা.-এর দলকে মুসিব এবং আহলে শামকে (সিরিয়াবাসী) মুখতি (ভুলকারী) প্রমাণ করে দিল, তখন আইন্মায়ে মুজতাহিদীনও এর ওপরই ফয়সালা দিলেন এবং খারেজি, নাওয়াসিব ও রাওয়াফিযের মতো পথভ্রষ্ট দলগুলো ছাড়া জমহুর মুসলিমিন এর ওপর একমত হয়ে গেলেন।

কেন বলা হবে না যে কোনো একটি অজ্ঞাত দল মুসিব হবে?

প্রশ্ন: যদি উভয় পক্ষকে মুসিব মানা সম্ভব না হয়, তবে কি এটা বলা যায় যে আমরা জানি না কে মুসিব ছিল? কোনো একজন মুসিব হবে যার ফয়সালা আল্লাহর জিন্মায়, আমাদের জিন্মায় নয়।

উত্তর: প্রাচীন যুগে এই মতটিও পেশ করা হয়েছিল। কাররামিয়া ফেরকা এবং কিছু শিখিলপন্থী নাসিবি এর প্রবক্তা ছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. স্পষ্ট করেছেন যে, যারা এই মত পেশ করে তাদের মধ্যে কিছুটা নাসিবিয়াত থাকে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে পেশ করেছেন যার প্রতিটি লাইন গভীরভাবে পড়ার যোগ্য। তিনি একটি ইস্তিফতা-এর জবাবে হাদিসে আন্নার রা.-এর বেশ কিছু সূত্র উল্লেখ করার পর লিখেন:

“এই বিষয়ে তৃতীয় মতটি হলো (হযরত আলী রা. এবং যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্য থেকে) কোনো একজন অনির্ধারিত পক্ষ মুসিব ছিল। এই মতটি কাররামিয়া ফেরকার মতো আহলে বসরা, আহলে হাদিস এবং আহলে কালামের মতের সদৃশ যারা বলে যে (হযরত আলী রা. এবং হযরত মুয়াবিয়া রা. উভয়ই একই সময়ে) উভয়ই খলিফা ছিলেন। এই লোকেরা (একই সময়ে) দুই খলিফার বায়াতকে জায়েজ মনে করে। কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. থেকে স্পষ্ট ভাষায় এই লোকদের মতের ভুল সাব্যস্ত করা...”

[১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: দ্বিতীয় মতটি হলো: তাদের প্রত্যেকেই মুসিব ছিল, আর এটি সেই ব্যক্তির মতের ওপর ভিত্তি করে যে বলে যে প্রত্যেক মুজতাহিদই মুসিব এবং এটি মুতাজিলা ও আশায়েরা সম্প্রদায়ের একদল আহলে কালামের মত। (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৩৮/৩)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বর্ণিত আছে যে, যারা হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাদের সম্পর্কে বলেছেন: এমন ব্যক্তি তার পালিত গাধার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট। ইমাম আহমদ (রহ.) এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেও নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমদ (রহ.) এবং আহলে সুন্নাতের ইমামগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, হযরত আলী (রা.) অন্যদের তুলনায় অধিক হকের ওপর ছিলেন। আহলে সুন্নাতের ইমামগণের মধ্যে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং দুই পক্ষের মধ্যে কোনো একজনকে সুনির্দিষ্টভাবে সঠিক (মুসীব) সাব্যস্ত করা এই কথা বলারই নামান্তর যে, হযরত আলী (রা.) ছাড়া আর কেউ হকের ওপর ছিলেন না। এটি এমন এক কথা যা কেবল সেই ব্যক্তিই বলতে পারে যে পথভ্রষ্ট ও বিদআতি এবং যার মধ্যে কিছুটা হলেও নাসিবিয়াত (আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ) রয়েছে অথবা সে নিজের কথার অপব্যখ্যা করছে। [১]

স্মর্তব্য যে, হযরত আলী (রা.)-এর পৌত্র হাসান বিন মুহাম্মদ (বিন হানাফিয়া) (রহ.) প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই ‘ইরজা’ (বিষয়টিকে স্থগিত রাখা)-এর শিরোনামে একটি মত পেশ করেছিলেন যে, উভয় পক্ষের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। তার বক্তব্য ছিল:

“আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম মনে হয় যে, হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-এর বিষয়টি স্থগিত রাখা হোক। তাদের সাথে কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করা হবে না এবং তাদের বিরোধিতাও করা হবে না।” [২]

কিছু লোক এটি পছন্দ করেছিল, কিন্তু এই মতবাদটি একটি নতুন চিন্তাধারার ভিত্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে হাসান বিন মুহাম্মদ (রহ.) যখন দেখলেন যে তার এই অবস্থানের কারণে একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি অনুতপ্ত হয়ে বললেন: “হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম।” [৩]

যেভাবে ‘উসমানিয়াত’ পরবর্তীতে ‘মারওয়ানিয়াত’ ও ‘নাসিবিয়াত’-এ পরিণত হয়েছিল এবং ‘তাশাইয়ু’ (শিয়াত) চরমপন্থায় রূপ নিয়ে ‘রাফিযিয়াত’-এ পরিবর্তিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি এই ‘ইরজা’ যা শুরুতে আপাতদৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত ‘সুলহে কুল’ (শান্তিবাদী) মতবাদ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল, পরবর্তীতে তা একটি স্থায়ী ফেরকা ‘মুরজিয়া’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যাদের বক্তব্য ছিল যে, কোনো ব্যক্তি যত রক্তপাতই করুক না কেন, তার ওপর কোনো দোষ নেই। বড় থেকে বড় কবিরা গুনাহ করলেও সে নিশ্চিতভাবে ক্ষমা পেয়ে যাবে, কেবল তাওহীদের বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট। [৪]

মোটকথা, মতবিরোধ (মুশাজারাত) সম্পর্কে যত প্রকারের মতামত মাথায় আসতে পারে, তা প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই সামনে চলে এসেছিল। জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) উলামাদের মতের বাইরেও অনেক মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল। যেমন: উভয় পক্ষই কাফির ছিল; উভয় পক্ষই ফাসিক ছিল; এক পক্ষ সঠিক ছিল এবং অন্য পক্ষ ভুল ছিল; এক পক্ষ কাফির এবং অন্য পক্ষ মুমিন ছিল; এক পক্ষ ফাসিক এবং অন্য পক্ষ নেককার ছিল; উভয় পক্ষই ভুলকারী ছিল। উভয় পক্ষের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না, তাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।

[১] এখানে একটি তৃতীয় মত রয়েছে যে, কেবল একজনই সঠিক ছিল—আর এই মতটি বসরার কিছু লোক এবং আহলে হাদীস ও আহলে কালামের এক দলের দিকে নিসবত করা হয় যারা বলে: তারা উভয়েই ইমাম ছিলেন এবং দুই খিলাফতের চুক্তিই বৈধ ছিল। তবে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আলীর খিলাফতের ব্যাপারে যারা সংশয় পোষণ করে তাদের বিদআতি বলেছেন এবং বলেছেন যে সে তার গাধার চেয়েও অধম এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ও বিবাহ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আহমদ বা আহলে সুন্নাতের অন্য কোনো ইমাম এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি যে আলী (রা.) অন্যদের চেয়ে হকের নিকটবর্তী ছিলেন। তবে তারা সুনির্দিষ্টভাবে একজনকে সঠিক সাব্যস্ত করতে দ্বিধাবোধ করেছেন যাতে অন্য পক্ষকে বাতিল সাব্যস্ত করা না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে আলী (রা.) ছাড়া আর কেউ হকের ওপর ছিলেন না, সে বিদআতি এবং তার মধ্যে নাসিবিয়াত রয়েছে যদিও সে অপব্যখ্যা করে থাকে। (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩/৩৩৮)

[২] তারিখ দিমাশক: ১৩/৩৮০, ৩৮১।

[৩] তারিখ দিমাশক: ১৩/৩৮০, ৩৮১।

[৪] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল লিশ শাহরাস্তানি: ১/১৩৯ থেকে ১৪৫, তিবআতু মুয়াসসা সাভুল হালাবি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (২য় খণ্ড)

নতুন নতুন মতবাদ যা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী এবং তাদের মধ্যে থেকে প্রতিটি মতবাদ একটি নতুন ফেরকা তৈরি করেছে। খারেজিরা উভয় পক্ষকে কাফের এবং মুতাজিলারা উভয়কে ফাসেক বলেছে, রাফেজিরা আলবিদের (আলী রা.-এর অনুসারী) মুমিন এবং শামবাসীদের কাফের বলেছে, নাসিবির শামবাসীদের মুমিন এবং ইরাকবাসীদের ফাসেক মনে করেছে। যারা এই বিতর্ক শেষ করার জন্য বলেছিল যে আমরা কিছুই জানি না, তারা কোনো বিতর্ক বন্ধ করতে পারেনি বরং ‘মুরজিয়া ফেরকা’র ভিত্তি স্থাপন করেছে, যারা সঠিক ও ভুলের প্রশ্ন এবং আখেরাতের পাকড়াওকেই খতম করে দিয়েছে।

পরবর্তীদের কে এই অধিকার দিয়েছে যে তারা কোনো সাহাবীকে মুসিব এবং কাউকে মুখতি বলবে?

প্রশ্ন: সাহাবীদের মধ্যে কাউকে মুখতি বা কাউকে মুসিব বলার অধিকার পরবর্তীদের কে দিয়েছে? এই অধিকার হয় আল্লাহর আছে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর। যেহেতু এই ঘটনাগুলো ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হওয়ার পর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ঘটেছে, তাই এই বিষয়ে না আল্লাহর কালাম সামনে আছে, না রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বলবেন। সুতরাং আমরা কাউকে মুসিব বা মুখতি বলতে পারি না। সাহাবীরা নিজেদের মধ্যে সমান এবং পরবর্তীরা তাদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের। তাদের এই অধিকার নেই যে কাউকে মুখতি এবং কাউকে মুসিব বলবে?

উত্তর: এই কথাটি নীতিগতভাবে ভুল যে সাহাবীদের মধ্যে কাউকে মুসিব এবং কাউকে মুখতি বলার অধিকার পরবর্তীদের নেই বরং কেবল আল্লাহ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরই এই অধিকার আছে। কোনো বিষয়ে ভুল বা সঠিক বলার জন্য সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সশরীরে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা দেওয়া জরুরি নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ এবং বাণীসমূহ এই বিষয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট। **مَنْ جُنِبَ** মতপার্থক্যের (মুশাজারাতে সাহাবা) বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীসমূহ বিশেষ করে আন্নার ইবনে ইয়াসির সংক্রান্ত হাদিস, খারেজিদের সাথে যুদ্ধের হাদিস এবং হাদিস “খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে” থেকে মুসিব এবং মুখতি স্পষ্টভাবে জানা যায়। [১]

এটি কোনো অনন্য উদাহরণ নয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। অনেক বিষয়ে কিছু সাহাবীর পক্ষ থেকে ইলমি ভুলও হয়েছে। পরবর্তীতে আইন্মায়ে মুজতাহিদীন সর্বসম্মতিক্রমে ফয়সালা করেছেন যে এই বিষয়ে অমুক সাহাবী মুসিব ছিলেন এবং অমুক মুখতি। হযরত আবু যর গিফারী (রা.) সোনা-রূপা জমা করাকে হারাম মনে করতেন কিন্তু উম্মতের ফকিহদের ইজমা বা ঐক্যবদ্ধ ফতোয়া এর বিরুদ্ধে। [২] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ওযুতে পা ধোয়ার পরিবর্তে মাসেহ করার প্রবক্তা ছিলেন। [৩] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আগুনে রান্না করা জিনিস ব্যবহারের ফলে ওযু ভেঙে যায় বলে মনে করতেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। [৪] পরবর্তীতে সমস্ত ফকিহ এই ফয়সালা দিয়েছেন যে এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মুসিব ছিলেন। কিছু সাহাবীর মাযহাব ছিল যে বীর্যপাত হলেই কেবল গোসল ওয়াজিব হয়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবীর মাযহাব ছিল যে বীর্যপাত না হলেও মিলনের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। পরবর্তীতে সমস্ত মুজতাহিদীনদের ইজমা হয়েছে যে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক ছিল। [৫]

[১] এই বিষয়ে আমরা আগে এত বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে কোনো ন্যায়পরায়ণ এবং সমবাদার ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে পারবে না, যদি সে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়।

[২] সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব: মা আদা যাকাতাহ ফালাইসা বিকানযিন।

[৩] আল-মাবসুত লিস-সারখাসি: ৮/১।

[৪] সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাব: মা জাআ ফিল ওযু মিন্মা গাইয়্যারাতিন নার।

[৫] সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাব: মা জাআ ফিল মা-ই মিনাল মা-ই।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

এটা স্পষ্ট যে, আইন্মায়ে মুজতাহিদীনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এসে বলে দেননি যে কোন সাহাবী সঠিক (মুসীব) ছিলেন আর কে ভুলকারী (মুখতি)। বরং আইন্মায়ে মুজতাহিদীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং অন্যান্য শরয়ী ও যৌক্তিক দলীল সামনে রেখে এই ফয়সালাগুলো দিয়েছেন। এখন যদি কেউ মনে করে যে, পরবর্তীতে কারো এই অধিকার ছিল না যে তারা কোনো সাহাবীকে ভুলকারী এবং কাউকে সঠিক হিসেবে সাব্যস্ত করবেন, তবে তার উচিত পবিত্রতা ও সালাত থেকে শুরু করে পানাহার পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে যেখানে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ হয়েছে, সেখানে থমকে যাওয়া; কাউকে সঠিকও না বোঝা আর ভুলও না বোঝা। বরং এমন চিন্তা করাকেও ধৃষ্টতা মনে করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সঠিক বা ভুলের প্রশ্ন করার জন্য কিয়ামতের দিনের অপেক্ষা করা।

কিন্তু আহলে সুন্নাত কাল্পনিক দুনিয়ায় নয়, বাস্তব দুনিয়ায় বাস করেন। তারা কিয়ামতের অপেক্ষা করেন না, বরং এই দুনিয়াতেই যেভাবে সাহাবায়ে কেরামের অন্যান্য মতভেদপূর্ণ ফিকহী মাসআলাগুলোতে ভুলকারী ও সঠিকের ফয়সালা করেন, তেমনিভাবে বিবাদগুলোকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইজতিহাদী বিষয় মনে করে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে সঠিক ও ভুলকারীর হুকুম লাগান এবং অধিক গুরুত্বের সাথে লাগান; কারণ অন্যান্য মাসআলার সম্পর্ক ফিকহী খুঁটিনাটি বিষয়ের সাথে যাতে ভুলের কারণে মানুষের আমলের ক্ষতি হয়, কিন্তু এটি একটি আকিদাগত বিষয় এবং এখানে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে মানুষের আকিদা নষ্ট হয়ে যাবে।

□□□

আহলে সুন্নাতের বর্ণনায় কেন বৈপরীত্য রয়েছে?

প্রশ্ন: আহলে সুন্নাতের পূর্বসূরীরা কোথাও তো বলেন যে, উভয় পক্ষ ইজতিহাদ করেছেন এবং অমুক সঠিক ছিলেন আর অমুক ভুলকারী। আর সাথে এটাও বলেন যে, এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু বলি না। কিন্তু এই ব্যক্তিবর্গই আবার অন্য স্থানে মুজতাহিদ মুসীব এবং মুজতাহিদ মুখতি-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে বলেন যে, অমুক শরয়ী খলিফা ছিলেন, অমুক বিদ্রোহ করেছেন, অমুক অবাধ্যতা করেছেন ইত্যাদি। এটি কেমন বৈপরীত্য?

উত্তর: মুজতাহিদ মুসীব এবং মুজতাহিদ মুখতি-এর হুকুম লাগানো এবং এক পক্ষকে শরয়ী খলিফা ও অন্য পক্ষের ওপর বিদ্রোহের শব্দ প্রয়োগ করার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। প্রথম বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত এবং দ্বিতীয়টিতে সঠিক হওয়া বা ভুলের ধরন স্পষ্ট করা হয়েছে। যেকোনো ঘটনার বর্ণনার জন্য কিছু শব্দ সাধারণ হয় এবং কিছু বিশেষ, যা সমস্যার ধরনকে স্পষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ, কোথাও কোনো দুঃখজনক ঘটনা ঘটলে তাকে ‘দুর্ঘটনা’ বলা হবে। এর ধরন স্পষ্ট করার জন্য একে এক্সিডেন্ট, আত্মহত্যা, হত্যা ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হবে। কেউ কোনো ভুল করলে তাকে অপরাধী বলা হবে। অবশ্যই সেই অপরাধের কোনো না কোনো ব্যাখ্যাও থাকবে, যেমন ডিউটিতে অনুপস্থিতি, বিলম্ব, পদের অপব্যবহার ইত্যাদি।

বিবাদগুলোতেও মুসীব ও মুখতি দ্বারা যে বিষয়ের সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রেক্ষাপটে ভুল ও সঠিকের কোনো প্রকৃত ধরনও তো রয়েছে। তা এমন নয় যে এক পক্ষের সালাত সঠিক হয়েছিল আর অন্য পক্ষের হয়নি, বরং তা ছিল এই যে, হযরত আলী (রা.) শরয়ী খলিফা এবং আনুগত্যের যোগ্য ছিলেন, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষ তাদের ইখলাস ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা শরয়ীভাবে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসীব ও মুখতি-এর ফয়সালা যে হাদীস...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

...মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা) মাধ্যমে হয়েছে, এই হাদিসেই ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ (বিদ্রোহী দল) শব্দটি বিদ্যমান। অর্থাৎ আহলে শামের ওপর ‘খতি’ (ভুলকারী) শব্দের প্রয়োগ পরে এবং এই হাদিসের আলোকে ‘আল-ফিয়াতুল বাগীয়া’ শব্দের প্রয়োগ আগে হয়েছে। এখন যদি শরয়ী মাসআলা এবং সঠিক আকিদা স্পষ্ট করার জন্য আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম কখনো প্রয়োজনবশত এর ব্যাখ্যা করেন, তবে তাতে ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী কী আছে? অথচ সাধারণত এই আলোচনার আগে বা পরে উভয় পক্ষের ইজতিহাদ, ইখলাস এবং ফযিলত ও মানাকিবও (মর্যাদা) বর্ণনা করে দেওয়া হয়।

প্রকাশ্য বিদ্রোহ, রূপক বিদ্রোহ নাকি প্রকৃত বিদ্রোহ?

প্রশ্ন: নিকট অতীতের কিছু আকাবিরের (বড়দের) লেখায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) প্রমুখের ব্যাপারে লেখা হয়েছে যে, এটি ছিল ‘সুরাতান’ (রূপকভাবে) বিদ্রোহ, অথবা তারা আপাতদৃষ্টিতে বিদ্রোহী ছিলেন, অথবা রূপকভাবে বিদ্রোহী ছিলেন। যার অর্থ হলো এটি বাস্তবে বিদ্রোহ ছিল না? অথচ অধিকাংশ আলেম ও আসলাফ (পূর্বসূরি) কোথাও ‘সুরাতান’ বা রূপক হওয়ার শর্তারোপ করেননি, বরং সব জায়গায় সাধারণভাবে বিদ্রোহ লিখেছেন। তাহলে এই বিরোধের মধ্যে কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল? আরও বলুন যে, যদি এটি রূপক বিদ্রোহ হয়ে থাকে, তবে এই মহান ব্যক্তিদের ওপর প্রকৃত বিদ্রোহীদের বিধান কেন প্রয়োগ করা হলো এবং জঙ্গ জামাল ও সিফফীন থেকে প্রকৃত বিদ্রোহীদের বিধান কীভাবে উদ্ভাবন করা হলো, অথচ তারা তো প্রকৃত বিদ্রোহী ছিলেনই না?

উত্তর: এই উভয় প্রকার অভিব্যক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সাধারণ অভিব্যক্তিতে যেখানে ‘সুরাতান’ বা রূপক হওয়ার শর্ত নেই, সেখানে উদ্দেশ্য হলো শরয়ী পরিভাষার বিচারে বাস্তবে এটি বিদ্রোহ ছিল। এই কারণেই প্রতিপক্ষের ওপর বিদ্রোহের শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এই যুদ্ধগুলো থেকেই ফকিহগণ প্রকৃত বিদ্রোহের শরয়ী মাসআলাসমূহ উদ্ভাবন করেছেন।

যেখানে ‘সুরাতান’ বিদ্রোহ বা আপাতদৃষ্টিতে বিদ্রোহের অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে পরিভাষাগত বিদ্রোহকে অস্বীকার করা হচ্ছে। বরং এর অর্থ হলো এই মহান ব্যক্তিদের পদক্ষেপসমূহে ‘বিদ্রোহের রুহ’ (প্রাণসত্তা) বিদ্যমান ছিল না, কেবল তার কাঠামো ছিল। এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন যেমন নেককারদের একটি সালাত, যা পূর্ণ খুশু-খুজু, মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে আদায় করা হয়। এতে সালাতের পূর্ণ রুহ বিদ্যমান থাকে যা অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে। দ্বিতীয় সালাত হলো সাধারণ মানুষের, যাতে সালাতের শর্তাবলি ও রুকনসমূহ তো পূর্ণ হয় কিন্তু খুশু-খুজু থাকে না। এই সালাতকে পরিভাষাগতভাবে সালাতই বলা হবে, আদায়কারীর ওপর সালাত আদায়কারীর সমস্ত শরয়ী ও ফিকহি বিধানও জারি হবে, কিন্তু বিজ্ঞজনরা একে ‘সুরাতে সালাত’ (সালাতের রূপ) বলবেন, প্রকৃত সালাত নয়। যদিও এভাবে সালাত আদায় করলে জিন্মাদারি আদায় হয়ে যায়।

একইভাবে (সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার) মতবিরোধপূর্ণ যুদ্ধগুলোতে এক পক্ষের ওপর ‘সুরাতে বাগাওয়াত’ (বিদ্রোহের রূপ) প্রয়োগ এই অর্থে করা হচ্ছে যে, বিদ্রোহ সাধারণত ক্ষমতার লোভ, লুটতরাজ এবং মারপিটের মতো মন্দ কাজের সমষ্টি হয়। এই মন্দ কাজগুলোকে আমরা বিদ্রোহের রুহ বলতে পারি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে বিষয়টি মোটেও তেমন ছিল না। সেখানে কোনো লুটতরাজ ছিল না, অবাধ্যতা ছিল না, দুনিয়ার লোভ ছিল না এবং ক্ষমতার লালসাও ছিল না। তারা যা কিছু করছিলেন আখেরাতের চিন্তায় বাধ্য হয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করছিলেন। সুতরাং সেখানে বিদ্রোহের কেবল...

এটি ছিল একটি বাহ্যিক রূপ যার ওপর শরয়ী বিধান তো প্রয়োগ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বিদ্রোহের মূল চেতনা অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং মতপার্থক্য (মুশাজারা) সম্পর্কে পারিভাষিক বিদ্রোহের সাধারণ ব্যাখ্যাও ভুল নয়, এবং ‘বাহ্যিক’ বা ‘আকারগত’ বিদ্রোহের ব্যাখ্যাও নিজ নিজ অর্থে সঠিক, বরং স্থান-কাল বিবেচনায় সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এটি বেশি উপকারী হতে পারে, যদি আভিধানিক ও পারিভাষিক বিদ্রোহকে অস্বীকার না করা হয়।

আম্মারের হাদিস যদি সহিহ হতো তবে তখনই কেন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো না?

প্রশ্ন: আম্মার رضی اللہ عنہ-এর হাদিসটি প্রকৃতপক্ষে সহিহ হাদিস হওয়া কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। যদি অনেক সাহাবী এটি শুনে থাকতেন তবে সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা তখনই হয়ে যেত এবং সবাই একমত হয়ে যেতেন। পরিশেষে যখন হযরত আম্মার رضی اللہ عنہ শহীদ হলেন, তখন সেই সব সাহাবী যারা এই হাদিসের বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত, তারা এসে কেন ঘোষণা দিলেন না যে হযরত আলী رضی اللہ عنہ-এর সত্যপন্থী হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে?

جواب: এর কারণ হলো, বর্ণনাকারী অধিকাংশ সাহাবী না সিফফিনের যুদ্ধে শরিক ছিলেন, আর না তাদের জানা ছিল যে আম্মার رضی اللہ عنہ এই লড়াইয়ে শহীদ হবেন। আর এটাও সম্ভব ছিল না যে হযরত আম্মার رضی اللہ عنہ-এর শাহাদাতের খবর তাদের কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাবে এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যাবেন। মনে রাখতে হবে যে, হযরত আম্মার رضی اللہ عنہ-এর শাহাদাত যুদ্ধের তৃতীয় দিন মাগরিবের পর হয়েছিল এবং সেই রাতেই শেষ প্রহরে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। [১] তবে কীভাবে সম্ভব ছিল যে আম্মারের হাদিসের সকল বর্ণনাকারী এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সিফফিনে পৌঁছে যেতেন এবং হযরত আলী رضی اللہ عنہ-কে সমর্থন করতেন?

হ্যাঁ, এটি প্রমাণিত যে কিছু উচ্চমর্যাদার সাহাবী যেমন: হযরত খুজাইমা বিন সাবিত رضی اللہ عنہ, যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু যুদ্ধে কারো পক্ষ নিচ্ছিলেন না, সিরিয়াবাসীদের হাতে হযরত আম্মার رضی اللہ عنہ-এর শাহাদাতের খবর পাওয়া মাত্রই তিনি হযরত আলী رضی اللہ عنہ-এর পক্ষে চলে যান এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। [২] একইভাবে সিরীয় বাহিনীরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন: হযরত জুবাইদ বিন আব্দুল খাওলানি رضی اللہ عنہ সিরীয় লস্করের একটি অংশের আমির ছিলেন, হযরত আম্মার رضی اللہ عنہ-এর শাহাদাতের পরপরই হযরত আলী رضی اللہ عنہ-এর সাথে এসে মিলিত হন। [৩] হযরত উমর বিন তালহার মুক্ত করা গোলাম হযরত হানি رضی اللہ عنہ (যিনি সুন্যাহর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত) তিনিও সিরীয় লস্করে ছিলেন, তিনি নিজেই বলেন: “আমাদের বিশ্বাস ছিল যে আম্মার কখনো আমাদের হাতে শহীদ হবেন না; কারণ যদি এমনটা হয় তবে আমরা তেমনই প্রমাণিত হব যেমনটা ইরাকবাসীরা আমাদের মনে করে।” যখন আম্মার رضی اللہ عنہ শহীদ হলেন, তখন হযরত হানি رضی اللہ عنہ সিরীয় নেতৃত্বের কাছে গিয়ে আম্মারের হাদিস স্মরণ করিয়ে দেন এবং এরপর নিজে হযরত আলী رضی اللہ عنہ-এর সাথে शामिल হয়ে যান। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/ ৫২৭ থেকে ৫৩৩

[২] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৩/ ৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২১৮৭৩

[৩] যখন আম্মার নিহত হলেন তখন তিনি আলীর বাহিনীর দিকে চলে গেলেন। (আল-ইসাবাহ: ৩/ ৫০২, জীবনী: জুবাইদ বিন আবদ); তিনি মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের সাথে সিফফিনে বনু খাওলানের মর্যাদায় ছিলেন, যখন আম্মার বিন ইয়াসির নিহত হলেন তখন তিনি আলীর দিকে ফিরে গেলেন। (তারিখে ইবনে ইউনুস আল-মিসরি, পৃ. ১৮৫)

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/ ২৫৩

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

আম্মার-এর হাদিস যদি সঠিক হয় তবে সিরিয়াবাসীরা কেন নিজেদের ভুল স্বীকার করেনি? (প্রশ্ন) যদি সত্যিই আম্মার-এর হাদিস প্রমাণিত ছিল, তবে সিরিয়াবাসীরা কেন নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয়নি এবং কেন হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেনি? সিরিয়াবাসীদের মধ্যে আম্মার-এর হাদিসের দুই বর্ণনাকারী সাহাবী অর্থাৎ আমর ইবনুল আস (রা.) এবং স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) সহ হাজার হাজার সাহাবী এবং লক্ষ লক্ষ তাবেয়ি কেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সমর্থন অব্যাহত রেখেছিলেন? (উত্তর) এই বিষয়টি অবশ্যই বিস্ময়কর যে সিরীয় নেতৃত্বের কাছে কেন নিজেদের ভুল প্রকাশ পায়নি, তবে তা অসম্ভব নয়। আমরা তাঁদের নিয়তের ওপর কোনো সন্দেহ না করেই বলতে পারি যে, সেই সময়টি এমন হাঙ্গামা, অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলার সময় ছিল যে স্বভাবের ওপর আবেগ প্রবল ছিল। এই কারণেই সিরীয় নেতৃত্ব নিজেদের অবস্থান থেকে ফিরে আসেনি বরং আম্মার-এর হাদিসের একটি ব্যাখ্যা (তাউইল) করে নিয়েছিল যে, আম্মার-এর হত্যাকারী হলেন হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা যারা তাঁকে নিয়ে এসেছেন এবং মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। [১] যেহেতু উসমান হত্যার প্রতিশোধ (কিসাস) আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সিরীয়রা সামরিক শৃঙ্খলার এমন অনুসারী ছিল যে তারা চোখ বন্ধ করে নেতৃত্বের পেছনে চলত, [২] তাই তারা এই ব্যাখ্যাকে কোনো প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিয়েছিল। ফলে হযরত আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পরও উভয় পক্ষের মধ্যে ঐক্য সম্ভব হয়নি।

এখানে এই মূলনীতি মনে রাখা উচিত যে, আলেমদের দায়িত্ব মোটেও এটি নয় যে তারা কোনো দুর্বল (মারজুহ) মতবাদের পক্ষে দলিল খুঁজবেন। তাঁদের দায়িত্ব কেবল এটিই যে, যে বিষয়টি শরয়ি দলিলের মাধ্যমে অগ্রগণ্য (রাজাহ) প্রমাণিত হয়েছে, তার ওপর ফয়সালা দেওয়া এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে দলিলও উল্লেখ করা। যদি কোনো দুর্বল মত এতই দুর্বল হয় যে তার কোনো শরয়ি দলিলই নেই, তবে আলেমদের দায়িত্ব নয় যে তারা তার জন্যও দলিল তৈরি করবেন। যে ব্যক্তি তাঁদের ফয়সালা মানে না, তার দায়িত্ব হলো তাঁদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সর্বসম্মতিক্রমে এই বিবাদে হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থানকে অগ্রগণ্য মনে করেন, তাই তাঁরা তাঁর পক্ষে প্রচুর দলিল পেশ করেছেন। এর বিপরীতে সিরিয়াবাসীরা ভুল করেছিলেন, তাই আলেম সমাজ এই ভুলকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য দলিল সংগ্রহ করার কোনো প্রয়োজনই মনে করেননি; কারণ এমনটি করা দ্বীনের বিকৃতির (তাহরিফ ফিদ দ্বীন) অন্তর্ভুক্ত। বরং প্রথম সারির আহলে সুন্নাত ইমামগণ সিরিয়াবাসীদের সেই একমাত্র ব্যাখ্যার ভুলটিও স্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন যা সিরিয়াবাসীরা নিজেদেরকে আম্মার-এর হাদিসের প্রয়োগ (আল-ফিয়াতুল বাঘিয়াহ বা বিদ্রোহী দল) থেকে বাঁচানোর জন্য করেছিল।

হ্যাঁ! আলেমদের ওপর এটি ওয়াজিব ছিল যে তাঁরা সিরীয় নেতৃত্বের সাহচর্যের মর্যাদাকে (শরাফতে সোহবত) বিবেচনায় রাখবেন, তাই তাঁরা সিরিয়াবাসীদের ভুল...

[১] “তাকে আলী এবং তাঁর সঙ্গীরাই হত্যা করেছে যারা তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্ষার সামনে ফেলে দিয়েছে।” (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৬৬৬৮, সহিহ সনদে) মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ২৬২৩ একই শব্দে। ইমাম জাহাবি বলেন: “এটি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।” এবং এটি উসুলবিদদের নিকট বিশুদ্ধতম সনদ।

[২] নেতৃত্বের নির্দেশ চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়ার এই অভ্যাস বনু মারওয়ানের যুগে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অনেক সরকারি লোক শাসকের নির্দেশে প্রকাশ্যে গুনাহ করার সময়ও পরকালে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকত। এটি ছিল তাদের অসৎ উদ্দেশ্য যে তারা ইয়াজিদ প্রমুখের অবস্থা দেখে এটি বুঝে নিয়েছিল যে শাসক যা-ই করুক না কেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বনু হাইয়ান উসমান (মারওয়ানি, নাসিবিদের) কথা উল্লেখ করে তাদের এই ভুল আকিদার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন: “তাদের আনুগত্য ছিল তাদের শাসকের প্রতি নিরঙ্কুশ, কারণ তারা মনে করত যে আল্লাহ তাদের ওপর শাসকের আনুগত্য নিরঙ্কুশভাবে ওয়াজিব করেছেন এবং আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদের পাকড়াও করবেন না।” (অনুবাদ: আমির এবং ক্ষমতাধিকারীর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করার এই রীতি ছিল, তারা মনে করত যে আল্লাহ তাদের ওপর শাসকের প্রতিটি ক্ষেত্রে আনুগত্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাদের গুনাহের জন্য তাদের পাকড়াও করবেন না।) (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪২০/৬) নোট: ইবারতের পূর্বাপর দেখে জানা যায় যে এটি মারওয়ানিদেরই আলোচনা।

তারিখে উম্মাতে মুসলিমা

হিসসা দুয়াম (দ্বিতীয় খণ্ড)

...কে ইজতিহাদি হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাঁদেরকে অপারগ ও ক্ষমায়োগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্নে উল্লিখিত এই দাবির কোনো ভিত্তি নেই যে, “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া” সংক্রান্ত হাদিস শোনার পর এবং হযরত আন্মার-এর শাহাদাতের পরেও হাজার হাজার সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সমর্থন অব্যাহত রেখেছিলেন। হাদিসের কিতাবসমূহ, ইতিহাসের কিতাবসমূহ এবং আসমাউর রিজাল-এর ভাণ্ডার অনুসন্ধান করলে খুব কষ্টে বিশ-পঁচিশ জন এমন সাহাবী পাওয়া যাবে যারা সিফফিনের যুদ্ধে বা পরবর্তী সংঘর্ষগুলোতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে ছিলেন অথবা তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিংবা যারা মৌখিকভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অবস্থানকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং এর পক্ষে ওকালতি করেছিলেন।

এটি একটি মৌলিক কথা যে, সাহাবীগণ জ্ঞান, মর্যাদা, আমানতদারি ও বিশ্বস্ততায় সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের এই ধারণা পোষণ করতে হবে যে, যে বিষয়ের শরয়ী দলিল আমাদের সামনে স্পষ্ট, তা তাঁদের কাছেও স্পষ্ট ছিল এবং তাঁরা সেটিরই প্রবক্তা ছিলেন। সুতরাং, কোনো সাহাবীকে শরয়ী দলিল, অগ্রগণ্য মত বা মুজতাহিদ মুসিব-এর বিরোধী তখনই গণ্য করা হবে যখন তাঁর নিজস্ব কথা বা কাজ থেকে সঠিক বিষয়ের বিরোধিতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। সঠিক বিষয়ের সমর্থনের উল্লেখ না থাকাকে বিরোধিতার দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে না।

যেহেতু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতো কয়েকজন সাহাবীর মুজতাহিদ মুসিব-এর বিরোধিতা করা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত এবং কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটি বলা সম্ভব নয় যে তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করেননি; কারণ এমনটি বলা মুতাওয়াতির বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী হবে, তাই জমহুর তাঁদেরকে মুজতাহিদ মুসিব-এর বিরোধী হিসেবে গণ্য করেছেন। আর সেই সাথে তাঁদের সাহচর্য বা সোহবতের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদেরকে মুজতাহিদ মুখতি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তবে সিরিয়ায় বসবাসকারী বাকি শত শত বা হাজার হাজার সাহাবীর পক্ষ থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অবস্থানের মৌখিক বা ব্যবহারিক সমর্থন মোটেও প্রমাণিত নয়। তাঁরা সবাই এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা উসমানের কিসাস আন্দোলনের সাধারণ কর্মীদের মতো আবেগ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। এই কারণেই তাঁরা সতর্কতাবশত যুদ্ধ থেকেও দূরে ছিলেন। প্রবল ধারণা এই যে, শরয়ী দলিল পর্যালোচনা করে তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর মুজতাহিদ মুসিব হওয়া বুঝতে পেরেছিলেন এবং যাদের শরয়ী দলিল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সক্ষমতা ছিল না, তাঁরা নববী বাণী “আকদাহুম আলী”-এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর আস্থা রেখেছিলেন এবং তাকলিদ স্বরূপ তাঁর অবস্থানকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। যেমনটি আজও হযরত আলী (রা.)-এর সঠিকতা মানার জন্য এতটুকু দেখা এবং চিন্তা করাই যথেষ্ট হয়ে যায়।

কিছু সাহাবী যেমন: উবাদাহ বিন সামিত (রা.)-এর নাম সিরীয় বাহিনীতে ভুলভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আসমাউর রিজাল ও ইতিহাসের কিতাবসমূহ থেকে এর কোনো সত্যতা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এমন সাহাবী প্রচুর রয়েছেন যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিয়মিত খলিফা হওয়ার পর জিহাদী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর সাথে দ্বন্দ্বের সময়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৌখিক বা ব্যবহারিক সমর্থনকারী সাহাবী নিঃসন্দেহে খুব কম ছিলেন। তাঁদের ক্ষেত্রে হাজার তো দূরের কথা, শত শত শব্দটিও প্রয়োগ করা যায় না। প্রমাণের জন্য এতটুকু দেখে নেওয়াই যথেষ্ট হবে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় লড়াই ছিল সিফফিনের যুদ্ধ, যাতে উভয় দল তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। এই যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে পরিচিত ও প্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে...

থেকে বড়জোর পাঁচ-ছয় জনের নাম পাওয়া যায়। [১] ছোট সাহাবীদের মধ্য থেকেও বড়জোর দশ-পনেরো জনের নাম পাওয়া যায়। [২] তাদের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন অপরিচিত সাহাবী, যাদের মধ্যে অনেকের সাহাবিত্ব নিয়েই মতভেদ রয়েছে। [৩]

যদি কেউ আরও বেশি অনুসন্ধান করে এবং সব ধরনের দুর্বল বর্ণনা এবং পরস্পরবিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য বক্তব্যও সংগ্রহ করে, তবে এই তালিকায় কিছুটা বৃদ্ধি ঘটবে, কিন্তু তাতে মূল সমস্যায় কী আর পার্থক্য হবে? হাজার হাজার সাহাবীর সিরীয় বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া তবুও প্রমাণিত হতে পারে না, আর এটি এমন কোনো বিষয় নয় যে এমন একটি বিতর্কিত বিষয়ে একে অনুমানের ভিত্তিতে মেনে নেওয়া হবে।

কিন্তু এখানে সীমা এই যে, কেবল অনুমানের ভিত্তিতে হাজার হাজার সাহাবীকে ভুলকারী পক্ষের অন্তর্ভুক্তই মানা হচ্ছে না, বরং অনুমানের ওপর অনুমান করে সেই হাজার হাজার সাহাবীকে আম্মার (রা.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবেও কল্পনা করা হচ্ছে। এরপর এই কাল্পনিক ভিত্তির ওপর এই মত প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে যে, আম্মার (রা.)-এর হাদীসের সেই অর্থই নয় যার ওপর জমহুর আহলে সুন্নাতের ইজমা চলে আসছে। সুবহানাল্লাহ!

বাস্তবতা এটাই যে, সিরীয় সাহাবীদের অধিকাংশ এই বিষয়গুলো থেকে দূরেই ছিলেন, কারণ হযরত আলী (রা.)-এর মোকাবিলায় আসা এবং তারপর মুসলমানদের সাথে লড়াই করা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপছন্দনীয় ছিল। তাই সমস্ত সতর্ক ব্যক্তির এ থেকে বিরত ছিলেন। কেবল তারাই এই অভিযানে শরিক হয়েছিলেন যারা উসমানের (রা.) কিসাসের বিষয়ে আবেগের বশবর্তী হয়েছিলেন। সিফফিনের যুদ্ধসহ হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্যান্য অভিযানে মানুষের অনাগ্রহ বরং অনীহার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, খোদ বনু উমাইয়ার নিকটাত্মীয় প্রথম সারির লোকেরাও এই দ্বন্দ্ব থেকে দূরেই ছিলেন।

উমাইয়া যুগের বিখ্যাত বিজেতা মুসা বিন নুসাইরের পিতা নুসাইর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মুক্ত করা গোলাম এবং তাঁর বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর তাঁর ওপর অনেক অনুগ্রহ ছিল। যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি সরাসরি ক্ষমা চাইলেন এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকে নিজের বিবেকের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করলেন। [৪] হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাঁর ওপর কোনো জোরজবরদস্তি করেননি এবং তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকলেন।

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.), যারা হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে গভর্নর ছিলেন এবং বনু উমাইয়ার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু সিফফিনের যুদ্ধের সময় হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) তায়েফে নির্জনে অবস্থান করছিলেন। [৫]

[১] যেমন: উকবা বিন আমের আল-জুহানি (আল-ইসাবাহ: ৩/ ৪২৯), আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (উসদুল গাবাহ: ৩/ ৩৪৫), আমর বিন আল-আস (উসদুল গাবাহ: ৩/ ৩৩৪)।

[২] যেমন: মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/ ৪২৩), আব্দুর রহমান বিন খালিদ, হাবিব বিন মাসলামা, বুসর বিন আরতাহ, আবুল আওয়ার আসলামি (তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯৫, ১৯৬), উবাইদুল্লাহ বিন উমর বিন আল-খাত্তাব (আল-ইসাবাহ: ৫/ ৩০৪)।

[৩] যেমন: আবু গাদিয়া জুহানি (আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ২২/ ৩৬৩), যুল কালা আল-হিময়ারি (আল-ইসাবাহ: ২/ ৩৫৬), হাওশাব যি যুলিম আল-হিময়ারি (আল-ইসতিয়াব: ১/ ৪১০), হামল বিন সাদানা (আল-ইসাবাহ: ২/ ১০৮), উবাদাহ বিন লুফি (মুখতাসার তারিখ দিমাশক: ১১/ ৩০১), য়া'ল বিন আমর (আল-ইসাবাহ: ২/ ৩৬৯), শুরাহবিল বিন সামত (আল-ইসাবাহ: ৩/ ২৬৬), আমর বিন সাবি' (আল-ইসাবাহ: ৩/ ৫২২), ইয়াজিদ বিন আসাদ (আল-ইসাবাহ: ৬/ ৫০৬)।

[৪] নাফহত তীব: ১/ ২৪০; আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/ ২৪।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/ ৩৫৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/ ২৯; আল-ইসতিয়াব: ৩/ ১৩৪৬।

আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ ফিলিস্তিনের আসকালান শহরে নির্জনে বসবাস করছিলেন। [১] মারওয়ান বিন আল-হাকাম হযরত উসমান (রা.)-এর বিশেষ লেখক ছিলেন। তিনি উসমানের হত্যার প্রতিশোধের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও সিফফিনের যুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন। [২] একইভাবে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রা.) অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন, কিন্তু আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনি পুরোপুরি আলাদা হয়ে যান। এরপর সারাজীবন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। [৩]

শাম বা সেই সমস্ত এলাকায় বসবাসকারী সাহাবীগণ যাদের ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিয়ন্ত্রণ ছিল, তাদের হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অবস্থানের বিরুদ্ধে আওয়াজ না তোলা এই কথার দলিল নয় যে, তারা আম্মার (রা.) সংক্রান্ত হাদিস অস্বীকারকারী ছিলেন অথবা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাখ্যাকে সঠিক এবং হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থানকে ভুল মনে করতেন। তাদের হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থানের বিরোধী হওয়া তখন প্রমাণিত হতে পারত যদি তারা আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পরেও কার্যত হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অভিযানে শরিক থাকতেন অথবা অন্ততপক্ষে আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের পর মৌখিকভাবে হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থানের বিরোধিতা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওকালতি করতেন।

প্রকৃতপক্ষে আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের আগেও শামে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন সাহাবীর নাম পাওয়া যায় যারা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে কার্যত বা মৌখিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী নীরব এবং কার্যত নিরপেক্ষ ছিলেন। শরীয়ত অনুযায়ী তাদের ওপর এটি আবশ্যিক ছিল না যে, তারা তাদের ঘরবাড়ি, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে হযরত আলী (রা.)-এর এলাকায় চলে যাবেন। একইভাবে যে সমস্ত সাহাবী শামে বিচার বিভাগ, অর্থ বিভাগ বা অন্যান্য বিভাগে কর্মরত ছিলেন, তাদের ওপরও শরীয়ত অনুযায়ী চাকরি ছেড়ে দেওয়াওয়াজিব ছিল না। [৪] আর না এটি সমীচীন ছিল যে, তারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন; কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও দ্বীনের বিজয় চেয়েছিলেন, তিনি নিজের এলাকায় শরীয়তই কার্যকর করে রেখেছিলেন, (নাউযবিলাহ) কোনো কুফরি আইন নয়। যদি শামী সাহাবীগণ তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তবে শামী বাহিনী তাদের দমন করার চেষ্টা করত, ফিতনার আগুন নেভার পরিবর্তে আরও জ্বলে উঠত এবং রক্তপাতের পরিধি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। পারস্পরিক ঘৃণা আরও বৃদ্ধি পেত এবং মাঝখানে কখনো শেষ না হওয়া দেয়াল তৈরি হয়ে যেত, তাই এই ব্যক্তিবর্গ...

[১] তারিখ ইবনে ইউনুস আল-মিসরি (মৃত্যু ৩৪৭ হিজরি): ১/২৭০, ৩৩১, তাবাত আল-ইলমিয়াহ; তারিখ আল-মদিনা ইবনে শাব্বাহ: ৩/১১৫৩; মুতাজিল আন আলী ওয়া মুয়াবিয়া। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৬৫০)

[২] মারওয়ান বিন আল-হাকাম: কারণ তিনি তাঁর গোত্রের সাথে ছিলেন এবং সাদিইয়্যাহ নামক স্থানে চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করেন যতক্ষণ না মুয়াবিয়া তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করেন। (তারিখ আল-ইসলাম যাহাবী: ৫/২৩৩)

[৩] মুসনাদ আহমদ, হা: ৬৫৩৮; তবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৪৬৬, ৪৬৭, তাবা সাদির।

[৪] শরয়ী মাসআলা এটাই, ফুকহাদের কিছু বক্তব্য নিচে দেওয়া হলো:

কারণ বিদ্রোহী ব্যক্তি শক্তির জোরে সুলতান হয়ে যায়, আপনি কি দেখেন না যে তার পক্ষ থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা জায়েজ। (আল-মুহিত আল-বুরহানি ফি আল-ফিকহ আল-নুমানি: ৮/৪১৭)

কেননা অনেক আলেম মুয়াবিয়ার কাছ থেকে কর্মসংস্থান ও বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যদিও তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। (আল-মুহিত আল-বুরহানি ফি আল-ফিকহ আল-নুমানি: ১৮/৮)

এবং বিদ্রোহী শাসকের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ যেমন ন্যায়পরায়ণ শাসকের কাছ থেকে বৈধ, কারণ সাহাবীগণ (রা.) হযরত আলী (কোররামাল্লাহ ওয়াজাহ) -এর বিরুদ্ধে বিরোধ প্রকাশের পরেও হযরত মুয়াবিয়ার কাছ থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যদিও সত্য আলীর সাথেই ছিল। আর তারা ইয়াজিদের ফাসেক ও জালেম হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাবয়ীগণ হাজ্জাজের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যদিও সে তার সময়ের সবচেয়ে বড় জালেম ছিল। (দুরার আল-হুকাম ফি শারহ গুরার আল-হুকাম: ২/৫০৪)

ন্যায়পরায়ণ সুলতান, জালেম সুলতান এবং বিদ্রোহীদের কাছ থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা জায়েজ, কারণ সাহাবীগণ (রা.) মুয়াবিয়ার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অথচ সত্য হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে ছিল এবং তাবয়ীগণ হাজ্জাজের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যে তার সময়ের সবচেয়ে বড় জালেম ও ফাসেক ছিল। (আল-বাহরর রায়েক: ৬/২৯৮)

...তিনি এটাই যথাযথ মনে করেছেন যে, যেখানে সম্ভব হয়, নশ্তার সাথে কাজ করে ঐক্যের পথ বের করা হোক অথবা নিরব থেকে পরিস্থিতির উন্নতির অপেক্ষা করা হোক। এজন্য তারা রাজনৈতিক বিবাদ থেকে দূরে থাকাকেই কল্যাণকর মনে করেছেন এবং ঐক্য ও সংহতির সময় আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। এই সময়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সত্য কথা যথাসময়ে স্পষ্ট করতে থাকেন, যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস এবং উবাদাহ বিন সামিত-এর ভূমিকা এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। [১]

হাদীসে আম্মার সহীহ হলে অধিকাংশ সাহাবী কেন নিরপেক্ষ ছিলেন?

প্রশ্ন: যদি হাদীসে আম্মারের লক্ষ্যবস্তু সিরিয়াবাসী হয়ে থাকে এবং আম্মার-এর শাহাদাতের পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এরপরও অধিকাংশ সাহাবী কেন নিরপেক্ষ থাকলেন? হযরত আলী-এর সাথে যুদ্ধে কেন শরিক হলেন না? যদি হযরত আলী-এর সঠিক হওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশকৃত হাদীসগুলো সহীহ হয় এবং সেগুলোর অর্থ তাই হয় যা আপনারা বর্ণনা করেন, তবে সমস্ত সাহাবী হযরত আলী-এর সাথে কেন হয়ে গেলেন না? শেষ পর্যন্ত তাঁর লঙ্করে সাহাবীদের সংখ্যা সীমিত কেন ছিল? ইমাম ইবনে সিরীনের প্রসিদ্ধ উক্তি তো আপনাদের জানা থাকবে যে, বিবাদসমূহে শরিক সমস্ত সাহাবীর সংখ্যা ত্রিশের চেয়েও কম ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সব বা অধিকাংশ সাহাবী হযরত আলী-এর সাথে কেন ছিলেন না?

উত্তর: আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন এটি জানানো হয় যে অমুক অমুক সহীহ হাদীস দ্বারা হযরত আলী-এর অবস্থানের সঠিকতা খুব স্পষ্ট হচ্ছে, তখন সাথে সাথে বলা হয় যে, “অমুক অমুক উক্তি অনুযায়ী বিবাদসমূহে মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ জন ব্যক্তিই শরিক ছিলেন? সুতরাং যদি এই হাদীসগুলো সঠিক হয়, তবে সব সাহাবী হযরত আলী-এর সাথে কেন দিলেন না?”

এই সময়ে এই উক্তিগুলোর সনদগত অবস্থান না দেখে এবং সেগুলোর ওপর আসা শক্তিশালী আপত্তিগুলোকে উপেক্ষা করে এই ধারণা দেওয়া হয় যে, যেন এই উক্তিগুলো অকাট্য; কারণ তখন উদ্দেশ্য কেবল এটাই থাকে যে হযরত আলী-এর অবস্থানকে দুর্বল করা হোক। কিন্তু যখন আমীর মুয়াবিয়া-এর সমর্থকদের কথা আসে, তখন এই উক্তিগুলো ভুলে গিয়ে বিনা দলিলে বলা হয় যে, “শত শত হাজার হাজার সাহাবী, উম্মতের অর্ধেক, লক্ষ লক্ষ তাবেয়ী হযরত আলী-এর অবস্থানের বিরোধী ছিলেন।” এবং এই ভিত্তিহীন দাবির পর জিজ্ঞাসা করা হয় যে, “শেষ পর্যন্ত এমন কেন ছিল?” যে বিষয়টি ঘটেইনি, তার কারণ কী বলা হবে।

হযরত মুয়াবিয়া-এর শাসনাধীন এলাকা অর্থাৎ: সিরিয়া ও মিশরের অধিকাংশ সাহাবীর নিরবতার কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। এখন অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্ব অর্থাৎ হযরত আলী-এর শাসনাধীন এলাকায় বসবাসকারী সাহাবীদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী উত্তর থেকে এই প্রশ্নের মূল উত্তরও স্পষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কারো কথা বা কাজ থেকে এই প্রমাণ না পাওয়া যায় যে তিনি হাদীসে আম্মার-এর অন্য কোনো অর্থ নিতেন এবং মুজতাহিদ মুসীব-এর ইজতিহাদকে ভুল মনে করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুজতাহিদ মুসীব-এর বিরোধী...

[১] তাদের জীবনী দেখুন: সিয়রু আলামিন নুবালা - উবাদাহ বিন সামিত: ২/৫ থেকে ১১, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস: ৩/৭৯ থেকে ৯৩, ত: আর-রিসালাহ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

মোটোও বলা যায় না। একইভাবে, অনেক লোকের হযরত আলী-র সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাও এটি প্রমাণ করে না যে তারা হযরত আলী-কে খলিফা বরহক হিসেবে মানতেন না; কারণ শরীয়ত অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য খলিফা বরহকের বাস্তব সাহায্য করা আবশ্যিক নয়, বরং তাঁর আনুগত্যের সাধারণ গণ্ডিতে অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং তাঁর বিরোধিতা না করাই যথেষ্ট।

উম্মতে মুসলিমার এই নীতি চলে আসছে যে, যে বিষয়টি শক্তিশালী শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং তা উম্মতের একটি ইজমাস্ট বিষয়ও হয়, তবে উলামা, ফুকাহা, মুজতাহিদ এবং সালেহীনদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত করে সেই বিষয়ের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়, যদি না কোনো আলেম, কোনো ফকিহ বা কোনো মুজতাহিদের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে এর বিরোধিতা প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে আমরা কেন এটি বিশ্বাস করি যে, সাহাবীগণের যুগে সবার নিকট হযরত আবু বকর-ই খিলাফতের প্রথম হকদার ছিলেন? এই বিষয়ে কি প্রত্যেক সাহাবী এবং তাবেয়ীর সাক্ষ্য বর্ণিত আছে? না, বরং এজন্য যে নববী বাণীর মধ্যে এর শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান রয়েছে এবং তাওয়াতুর-এর সাথে উম্মতে মুসলিমার ইজমাস্ট মাযহাব এটাই। যদিও কিছু বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সাদ বিন উবাদাহ তাঁর খিলাফতের সাথে একমত হননি এবং তিনি নিজেকে খিলাফতের অধিকতর হকদার মনে করতেন। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, দলীলবিহীনভাবে এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরোধিতার কারণে ইজমাস্ট বিষয়ে কোনো পার্থক্য তৈরি হয় না। [১]

এখন যদি কোনো ‘আধুনিক গবেষক’ বলেন যে, ‘সোয়া লক্ষ সাহাবী এবং কয়েক লক্ষ তাবেয়ীর মধ্যে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন সাহাবী এবং পঞ্চাশ-ষাট জন তাবেয়ীর ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় যে তারা হযরত আবু বকর-এর বায়আত করেছিলেন; এবং মাত্র পনেরো-বিশ জন সাহাবী এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ জন তাবেয়ী হযরত আবু বকর-এর মানাকিব (গুণাবলি) সম্পর্কিত বর্ণনা বর্ণনা করেছেন; এবং মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন সাহাবী এবং দুই-তিনশ তাবেয়ী তাঁর কাছ থেকে পদ গ্রহণ করেছিলেন; এবং মাত্র আট-দশ হাজার সাহাবী এবং বিশ-ত্রিশ হাজার তাবেয়ী তাঁর অধীনে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন; অথচ সাহাবী ও তাবেয়ীদের অধিকাংশের ব্যাপারে নাম ধরে ধরে এমন কোনো স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে তারা বায়আত করেছিলেন। একইভাবে অধিকাংশের পক্ষ থেকে তাঁর মানাকিবও বর্ণিত হয়নি, অধিকাংশের পক্ষ থেকে তাঁর খিলাফতের ওকালতিও বর্ণিত হয়নি, অধিকাংশ লোক তাঁর পদ গ্রহণ করেননি এবং অধিকাংশ লোক তাঁর সাথে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হননি, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে হযরত আবু বকর-এর খিলাফতের দলীল সম্বলিত হাদীসসমূহ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর নিকট সঠিক ছিল না এবং অধিকাংশ লোক সাদ বিন উবাদাহ-র সাথে ছিলেন এবং হযরত আবু বকর-কে খিলাফতের প্রথম হকদার মনে করতেন না।’ তবে বলুন, এই ভিত্তিহীন দলীলের কি কোনো গুরুত্ব থাকবে?

এর চেয়েও স্পষ্ট আরও একটি উদাহরণ নিন। সাহাবীগণের মধ্যে কুরআনের মুসহাফ নিয়ে মতভেদ ছিল যে কোন কপিটি সঠিক। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ নিজের মুসহাফের সঠিকতার ওপর অটল ছিলেন এবং কিছু সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর সমর্থক ছিলেন; অন্যদিকে হযরত উসমান, যায়েদ বিন সাবিত এবং তাঁদের সঙ্গীদের নিজেদের সংকলিত কপির সঠিকতার ওপর আস্তা ছিল, এজন্যই সরকারিভাবে সেটিকেই প্রচলিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনার তাওয়াতুর বলে যে, মুসলমানদের এক বিশাল সংখ্যা...

[১] যদিও একটি মত এই যে, তিনি সামান্য বিরোধের পর সিদ্দীকী খিলাফত মেনে নিয়েছিলেন।

খিলাফতে রাশেদাতে এই উসমানী মুসহাফের বিশুদ্ধতার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে এটিও ঐতিহাসিক তাওয়াতুর দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কিছু ইরাকি ছাত্র তাঁর মুসহাফকেই প্রাধান্য দিতেন, যার বিরুদ্ধে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অভিযান চালিয়েছিলেন এবং এর কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। [১]

তবুও চতুর্থ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মুসহাফ কোনো না কোনো আকারে অবশিষ্ট ছিল। অবশেষে ৩৯৮ হিজরিতে শাফেয়ীদের ইমাম আবু হামিদ আল-ইসফারাইনীর ফতোয়ার ভিত্তিতে এর শেষ পাণ্ডুলিপিটিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। [২]

যা-ই হোক, যেহেতু উম্মতের ইজমা উসমানী মুসহাফের ওপর রয়েছে, তাই আমাদের কাছে এমন বর্ণনা বিদ্যমান না থাকলেও যেখানে সাহাবী, তাবয়ী এবং উলামা ও ফুকাহাদের প্রত্যেকের নাম নিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি উসমানী মুসহাফের প্রবক্তা ছিলেন, তবুও আমরা এই মহান ব্যক্তিদের আমানতদারি, বিশ্বস্ততা এবং ফিকহী প্রজ্ঞার ওপর আস্থা রেখে এটি মেনে নিতে বাধ্য যে, তারা হয় ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ের সমস্ত দিক ও শরয়ী দলিলসমূহ পর্যালোচনা করে অথবা খলিফায়ে রাশেদের ওপর আস্থার কারণে তাঁর অনুসরণ করে এই পথই বেছে নিয়েছিলেন। যদি এমনটি না হতো, তবে একটি বিশাল জনসমষ্টির পক্ষ থেকে উসমানী মুসহাফের বিরোধিতা বর্ণিত হতো। আমরা কেবল সেই ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতে পারি যার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে তার মত এই ইজমা থেকে ভিন্ন ছিল, যেমন খোদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) অথবা তাঁর কয়েকজন সঙ্গী। বাকিদের আমরা অনুমানের ভিত্তিতে এই কাতারে দাঁড় করাতে পারি না।

এখন আজ যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, “যদি উসমানী মুসহাফই অগ্রগণ্য হতো, তবে সোয়া লক্ষ সাহাবী এবং কয়েক লক্ষ তাবয়ীর মধ্য থেকে এর সমর্থনে কয়েকশ সাহাবী এবং দুই-তিন হাজার তাবয়ীর স্পষ্ট বক্তব্য দেখান; আর যদি আপনি আশ্রয় চেষ্টা করেও মাত্র পনের-বিশজন সাহাবী এবং চল্লিশ-পঞ্চাশজন তাবয়ীর বেশি সমর্থনের প্রমাণ পেশ করতে না পারেন, তবে এর অর্থ হবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের উসমানী মুসহাফের ওপর ঐকমত্য ছিল না অথবা অন্তত এটি কোনো ইজমাভিত্তিক বিষয় ছিল না। সুতরাং আজও উসমানী মুসহাফ এবং ইবনে মাসউদের মুসহাফকে সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত, কারণ এই বিষয়ে খোদ সাহাবী এবং তাবয়ীরা দুটি বড় অংশে বিভক্ত ছিলেন।” তবে কি এই দলিলের কোনো ওজন থাকবে?

স্পষ্টতই এটি কোনো দলিল নয়, বরং একটি ভ্রান্ত অনুমান, এমনকি একটি মূর্খতাসুলভ সংশয়। এই আপত্তি উত্থাপনকারী ভুলে যাচ্ছেন যে, যা শতাব্দীকাল ধরে ইজমাভিত্তিক মতাদর্শ হিসেবে চলে আসছে, কাউকে তার অনুসারী প্রমাণ করার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই, বরং তার বিরোধী প্রমাণ করার জন্য দলিলের প্রয়োজন। অন্যথায় যদি এমন মূর্খতাসুলভ অনুমানকে মূলনীতি বানিয়ে নেওয়া হয়, তবে উম্মতে মুসলিমার সমস্ত ঈমানি আকিদাকে একে একে ভেঙে ফেলা সম্ভব। এমনকি কোনো মূর্খ এও বলতে পারে যে, “উপমহাদেশের অধিকাংশ আলেম মির্জা কাদিয়ানীকে নবী মানতেন, কারণ উপমহাদেশে এক শতাব্দীতে কয়েক লক্ষ আলেম অতিবাহিত হয়েছেন যাদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার থেকে মির্জা কাদিয়ানীর মৌখিক বা লিখিত খণ্ডন প্রমাণিত। সুতরাং বাকি লক্ষ লক্ষ আলেম মির্জা কাদিয়ানীর সমর্থক ছিলেন।”

স্পষ্টতই এগুলো সব ভ্রান্ত অনুমান। এই অনুমানের অবস্থাও ঠিক তেমনই যে, যদি উম্মতের হাদিস সহিহ হতো এবং হযরত আলী (রা.)...

[১] সুনান আবু দাউদ: ৪৬৩৩, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফিল খুলাফা।

[২] তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ২৭/ ২৩৭।

যদি সঠিক হওয়া নিশ্চিত হতো, তবে অধিকাংশ সাহাবী থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমর্থন করা কেন বর্ণিত নেই? আল্লাহ এমন মূর্থতা থেকে তাঁর আশ্রয়ে রাখুন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতির ইজমার্ট (ঐক্যবদ্ধ) মতাদর্শের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন।

আম্মারের হাদীস যদি সহীহ হয়, তবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অকাট্য দলীল থাকা সত্ত্বেও কেন যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করেছিলেন?

প্রশ্ন: যদি আম্মারের হাদীস সিরিয়াবাসীদের বিদ্রোহী হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল হয়, তবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অকাট্য দলীল থাকা সত্ত্বেও কেন যুদ্ধবিরতি এবং সালিশি (তাহকীম) মেনে নিলেন? অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিদ্রোহীদের সাথে তো সন্ধি করা জায়েয হতে পারে না।

উত্তর: বিদ্রোহীদের শরয়ী বিধানের মধ্যে এটি কোথায় আছে যে, বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনা, যুদ্ধবিরতি এবং চুক্তি হতে পারে না? ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী শরীয়তসম্মতভাবে এই সবকিছু যেভাবে কাফেরদের সাথে জায়েজ, একইভাবে বিদ্রোহীদের সাথে আরও বেশি যুক্তিযুক্তভাবে জায়েজ। সুতরাং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিরিয়াবাসীদের সাথে আলোচনা, যুদ্ধবিরতি এবং সালিশি গ্রহণ করার ওপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না।

পরবর্তী যুগের মুহাদিসগণের নিকট হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঠিক হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু সমসাময়িক হাজার হাজার তাবেয়ীদের নিকট কেন হলো না, এটি কীভাবে সম্ভব?

প্রশ্ন: ঠিক আছে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বড় সাহাবী অল্প কয়েকজনই ছিলেন, ছোট সাহাবীও কম ছিলেন, কিন্তু তাবেয়ী তো যাই হোক হাজার হাজার ছিলেন, যেমনটি এই যুদ্ধগুলোতে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ থেকে প্রমাণিত। আবার এই বাহিনীগুলোতে নামাজ পড়ানোর ইমাম এবং আলেম তাবেয়ীগণও ছিলেন। তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে, আম্মারের হাদীস এবং খারিজিদের সাথে যুদ্ধ করার বর্ণনাগুলো দেখে পরবর্তী যুগের মুহাদিস ও আলেমদের নিকট হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঠিক হওয়া অকাট্যভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু খোদ সেই যুগে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমর্থক আলেমদের নিকট তাঁর সত্যতা স্পষ্ট হতে পারল না? হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত পর্যন্ত প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে, এই দীর্ঘ সময়ে কি সিরিয়াবাসীগণ এই হাদীসগুলো জানতে পারেননি এবং বুঝতে পারেননি?

উত্তর: মতবিরোধের যুগটি ছিল ফিতনা ও দুর্ঘটনার যুগ। দুর্ঘটনা যেভাবে ঘটে, তা সাধারণত অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত হয়, তবে অসম্ভব মোটেও নয়। ফিতনার যুগে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তা সত্যিই অদ্ভুত ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিশাল জামাত থাকা সত্ত্বেও হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ড কি অদ্ভুত নয়? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো ব্যক্তিত্বের ওপরও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ না হওয়া এবং সিরিয়াবাসীদের বায়াত গ্রহণে অস্বীকার করা কি অদ্ভুত নয়? এত সম্মানিত দলগুলোর তলোয়ার নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া কি অদ্ভুত নয়? নিশ্চিতভাবেই এই সবকিছু অদ্ভুত বরং অদ্ভুততর, আর কেউ এটি বুঝুক বা না বুঝুক, এগুলোই বাস্তবতা। এরপর যখন ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়, তখন সেই ঘটনাগুলোর কিছু কারণও সামনে চলে আসে যার ফলে বিস্ময় কিছুটা কমে যায়, তবে দুর্ঘটনার অপ্রত্যাশিত হওয়ার প্রভাব তো যেকোনো অবস্থাতেই থেকে যায়। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোর দিকে তাকালেও আমরা বিস্মিত হই, যদিও সেগুলো আমাদের নিজেদের সাথেই ঘটে থাকে। আজকাল জায়গায় জায়গায় গোপন ক্যামেরা লাগানো থাকে, অনেক রাস্তা...

দুর্ঘটনার ভিডিও দেখলে কি বিস্ময় জাগে না? যদিও পুরো দৃশ্যটি রেকর্ড করা থাকে, তবুও তদন্তকারীরা অনেক দুর্ঘটনার প্রতিটি খুঁটিনাটি এবং প্রতিটি যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে পারেন না। কিছু কারণ জানা যায়, কিন্তু কারণের ধারা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, তা আল্লাহই জানেন। ঈমানদাররা এমন পরিস্থিতিতে ‘ওয়াল্লাহু আলাম’ (আল্লাহই ভালো জানেন) বলে বিতর্ক বন্ধ করে দেন। কিন্তু ‘ওয়াল্লাহু আলাম’ বলার অর্থ এই নয় যে, দুর্ঘটনার সংঘটন এবং রেকর্ডকৃত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করা হবে। আর যদি কেউ এমনটি করে, তবে তাকে অপ্রকৃতিস্থই মনে করা হবে। এটি একটি মৌলিক ও নীতিগত কথা যা এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

এখন আমরা মূল প্রশ্নের দিকে আসি যে, হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত আহলে শাম (সিরিয়াবাসী) কেন তাদের ভুল স্বীকার করেনি? আসলে এর বড় কারণ ছিল এই যে, মানুষ এমন সব বিশাল দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যার ফলে কয়েক দশক ধরে সিরিয়াবাসী ও ইরাকীদের মধ্যে ঘৃণা ও আবেগের একটি ব্যবধান বিরাজ করছিল। আর না সেখানে নববী হাদিসসমূহের এমনভাবে আদান-প্রদান হতে পেরেছিল যা ঐক্য ও আস্থার পরিবেশে সম্ভব ছিল, আর না সেগুলোর ওপর চিন্তা-গবেষণা করে ইজমার (ঐক্যমত্য) পরিবেশ তৈরি হতে পেরেছিল। [১]

হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদাবিষয়ক অধিকাংশ হাদিস ইরাক, ইয়ামেন এবং হিজাজের মুহাদ্দিসদের কাছে ছিল এবং সিরীয় বর্ণনাকারীরা সাধারণত সেগুলোর ওপর ভরসা করতেন না। তাই সেই সময়ে সত্য স্পষ্ট হতে পারেনি। আমাদের (রা.)-এর হাদিসের সূত্রগুলো সেভাবে একত্রিত হতে পারেনি যেভাবে পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে সেগুলো হাদিসে মুতাওয়াতির-এর রূপ ধারণ করেছিল। একইভাবে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে হযরত আলী (রা.)-এর সত্যতার প্রমাণ সম্বলিত হাদিসগুলো ইরাক ও হিজাজে তো প্রচলিত হয়েছিল, কিন্তু সিরিয়াবাসীরা কয়েক দশক ধরে সেগুলোর বর্ণনাকারীদের সন্দেহের চোখে দেখত। অনেক সিরীয় মুহাদ্দিস ইরাকীদের এমনকি স্বয়ং হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনাগুলোও উদ্ধৃত করা পছন্দ করতেন না। [২]

কিন্তু ধীরে ধীরে সন্দেহ ও সংশয়ের এই মেঘ কেটে গেল এবং যখন সুন্নাহর ভাণ্ডার সংগৃহীত হলো, তখন তার আলোতে প্রতিটি বিষয় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। ফলে সাওয়াদে আজম (মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ) এই বিবাদের এই ফয়সালাই করেছে যে, উভয় পক্ষই মুজতাহিদ ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) সত্যের ওপর ছিলেন এবং তাঁর ওপর খলিফায়ে ওয়াজিবুল ইতাআত (আনুগত্য করা আবশ্যিক এমন খলিফা) কথাটি প্রযোজ্য হতো। অন্যদিকে আহলে শাম ও আসহাবে জামাল ভুলকারী ছিলেন এবং তাদের ওপর খুরুজ (বিদ্রোহ) কথাটি প্রযোজ্য হতো। তবে সকলেই সওয়াবপ্রাপ্ত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত ছিলেন। এমনটি ছিল না যে, দুই ফিতনার অন্ধকারে যাদের পথ ভুল ছিল এবং তারা নিজেদের ভুলকে সঠিক মনে করে অজ্ঞতার অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তারা কাফের বা ফাসেক ছিলেন।

যেমন অন্ধকার ও ঝোড়ো রাতে কিবলা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে কোনো ইমাম অনুসন্ধান (তাহারি) করে মানুষকে ভুল দিকে মুখ করে সালাত পড়িয়ে দেন এবং রাতের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই ভুলেই অটল থাকেন এবং সেই দিকে মুখ করেই তাহাজ্জুদ পড়তে থাকেন, আর তারপর সেই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

[১] এমন মনে হয় যে, হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদাবিষয়ক কিছু সহিহ হাদিস সম্পর্কে হযরত মুয়াবিয়া (রা.), মুগিরা বিন শুবা (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণও অবগত ছিলেন না এবং বহু বছর পর হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর কাছ থেকে তারা এই বর্ণনাগুলো শোনেন। (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৬; সহিহ মুসলিম, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭৮)

[২] সিরিয়ায় মারওয়ান ও আব্বাসীয়দের একটি পুরো যুগ এমন ছিল যা আলী (রা.)-এর মর্যাদাবিষয়ক বর্ণনাগুলো অস্বীকার করত। পরবর্তীতে আসা উমাইয়া খলিফারাও এই পরিবেশ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বর্ণনাগুলোর ওপর আস্থা রাখতেন না। উদাহরণস্বরূপ, উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে এই সহিহ হাদিসটি যে, কাবার নির্মাণ ইব্রাহিমি ভিত্তির ওপর হওয়া উচিত, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পরও তিনি এই বিষয়ে অটল ছিলেন এবং কাবা ভেঙে কুরাইশদের প্রাচীন নির্মাণ অনুযায়ী তৈরি করান। পরবর্তীতে অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে এই হাদিসটি সত্যিই সহিহ ছিল, তখন তিনি নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩১, কিতাবুল হাজ্জ, বাব নাকজিল কাবা ওয়া বিনাইহা)

দ্বিতীয় অংশ | তারিখ উম্মতে মুসলিম

...হয়ে যায় তবে দিনের সূর্য দেখে এটা তো নিশ্চিতভাবেই বলা হবে যে ইমামের অভিমুখ অবশ্যই ভুল ছিল কিন্তু এটা বলা যাবে না যে তার সালাত হয়নি, তিনি সওয়াব পাননি। তাকে ফাসিক বা কাফির বলা তো দূরের কথা। এটি একজন সাধারণ ব্যক্তির উদাহরণ, অথচ সাহাবা কিরামের মর্যাদা এর চেয়ে বহুগুণ উর্ধ্ব যাদের সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রচুর পরিমাণে ফযীলত ও মানাকিব বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাদের সম্মান বজায় রাখা ওয়াজিব মনে করে মাশাজারাতে সেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত যা জুমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত গ্রহণ করেছে।

মাশাজারাতে একজনের সঠিক হওয়া এবং অন্যজনের ভুল হওয়াকে নিশ্চিত কেন মনে করা হয়?

প্রশ্ন: যদি মাশাজারাতে বিষয়টি ইজতিহাদী হয় তবে তাতে এক পক্ষের সঠিক হওয়া এবং অন্য পক্ষের ভুল হওয়া কি অকাট্যই হবে? কারণ ইজতিহাদের অর্থ হলো উভয় পক্ষের কাছেই দলিল ছিল। তাহলে একজনের ভুলকে নিশ্চিতভাবে মেনে নেওয়া হলো কীভাবে? মুজতাহিদগণও এই মূলনীতি লিখেছেন যে, ইজতিহাদী মাসআলায় আমরা যে মুজতাহিদকে অনুসরণ করি এবং তাকে সঠিক মনে করি, তার সঠিক হওয়াও ধারণাপ্রসূত এবং বিরোধী মুজতাহিদকে যদি আমরা ভুলের ওপর মনে করি তবে তার ভুল হওয়াও ধারণাপ্রসূত। তাহলে মাশাজারাতে আহলে সুন্নাত এক পক্ষকে সঠিক এবং অন্য পক্ষকে ভুল হওয়ার ব্যাপারে কেন নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে? আর যদি এটি অকাট্য মাসআলা হয় তবে অন্য পক্ষ অর্থাৎ আহলে শামকে মুজতাহিদ নয় বরং কাফির বলা উচিত; কারণ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের বিরোধিতাকারী তো কাফির হয়ে যায়?

উত্তর: আপনার আপত্তির শেষ অংশটি এই ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে, আহলে সুন্নাত এই বিষয়টিকে ইসলামের অকাট্য ও মৌলিক বিশ্বাস অর্থাৎ জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। অথচ অকাট্য আকিদা বা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এক জিনিস আর কোনো ইজতিহাদী মাসআলায় কোনো মুজতাহিদের ভুল অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া ভিন্ন জিনিস।

অকাট্য আকিদা সেগুলো যার ওপর ঈমান আনা জরুরি এবং যার কোনো একটি অস্বীকার করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়, যেমন আল্লাহ, রাসূলগণ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ এবং পরকালের জীবনের ওপর ঈমান আনা এবং ইসলামের রুকনসমূহ স্বীকার করা, হুজুর ﷺ-এর রিসালাত এবং খতমে নবুওয়াত মানা—এগুলো অকাট্য আকিদা। এগুলো জানা ও মানা জরুরি। এগুলোর কোনো একটি অস্বীকার করা কুফর। কিন্তু মাশাজারাতে মাসআলাগুলো সম্পর্কে কারো জ্ঞান না থাকলেও সে মুসলিম। তবে মাশাজারা সংঘটিত হওয়া একটি নিশ্চিত বিষয় এবং উভয় পক্ষের এত কঠোর মতভেদে এক পক্ষের রায় সঠিক হওয়া এবং অন্য পক্ষের রায় ভুল হওয়াও একটি অনিবার্য বিষয়।

সুতরাং কোনো বিষয় মৌলিক ও অকাট্য আকিদার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং কোনো ইজতিহাদী বিষয়ে কোনো মুজতাহিদের ভুল অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মাশাজারাতে আহলে সুন্নাতের মাযহাবের সম্পর্ক প্রথম সুরতের সাথে নয়, বরং দ্বিতীয় সুরতের সাথে এবং একে নিশ্চিত বা অকাট্য মাসআলা এই বিশেষ অর্থেই বলা হয়। আর এই কারণেই মাশাজারা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ঈমান ও ইসলামে কোনো পার্থক্য ঘটে না। আর যদি কেউ এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে তবে তাকে তাকফির করা যাবে না।

এই মাসআলাটি যদিও জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে আহলে সুন্নাত একে সাধারণ ধারণাপ্রসূত মাসআলাগুলোর চেয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে।

এবং একে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়ে আকাইদের কিতাবসমূহে স্থান দেওয়া হয়েছে; কারণ এতে বিচ্যুতি ঘটানোর কারণে উন্মত্ত মুসলিমের মধ্যে খারিজি, নাওয়াসিব, রাওয়াফিজ এবং মুতাজিলার মতো ফেরকাগুলোর জন্ম হয়েছে। তাই এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি (ইফরাত ও তাফরিত) থেকে মুক্ত অবস্থান পেশ করা জরুরি মনে করা হয়েছে এবং এই মধ্যমপন্থা থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিকে বিদআতি ও আহলে সুন্নাত থেকে বহিস্কৃত বলে গণ্য করা হয়েছে।

আর এই কথা যে, অন্যান্য ইজতিহাদি মাসআলার মতো এখানে একজনের ভুল এবং অন্যজনের সঠিক হওয়াটা ধারণাপ্রসূত (জন্ম) কেন নয়? তো এর কারণ হলো, এখানে সঠিক হওয়া বা ভুল হওয়া কোনো ধারণাপ্রসূত দলিল দ্বারা নয়, বরং হাদিসে মুতাওয়াতির এবং সুন্নতে মাশহুরা দ্বারা প্রমাণিত। তারপর এর ওপর আহলে সুন্নাতের ইজমা হয়ে গেছে। মুজতাহিদগণের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একজনের সঠিক হওয়া এবং অন্যজনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকে যতক্ষণ না কোনো একটি সুরতের ওপর ইজমা হয়। সুতরাং যেসব ইজতিহাদি মাসআলায় উলামায়ে কেরাম মতপার্থক্যের পর কোনো একটি বিষয়ের ওপর ইজমা করেছেন, সেখানে বিরোধী মতের ভুল হওয়াটাও অকাট্য ও নিশ্চিত বলে মানা হয়, ধারণাপ্রসূত নয়; চাই সেই মতটি কোনো সাহাবীরই হোক না কেন। অবশ্য যারা ইজমার পূর্বে মতপার্থক্যের অবস্থায় গত হয়ে গেছেন, তাদের ওপরও কোনো প্রকার কটাক্ষ করা জায়েজ নয়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝুন যে, কোনো একটি বাহিনী পথ চলছে, রাতে সালাতের সময় হলো কিন্তু বৃষ্টি, তুফান এবং অন্ধকারের কারণে কিবলার দিক নির্ধারণ করা সম্ভব হলো না। এমতাবস্থায় বাহিনীর বিভিন্ন ইমাম নিজ নিজ পক্ষ থেকে তাহারি এবং চিন্তা-ভাবনা করে আলাদা আলাদা দিক নির্ধারণ করে নিলেন এবং মানুষ আলাদা আলাদা জামাত তৈরি করে তাদের পেছনে সালাত আদায় করে নিলেন। এখন এটা বলা হবে না যে, তাদের সবার দিক কিবলার দিকে ছিল। কিন্তু যেহেতু তাদের পক্ষ থেকে কিবলা নির্ধারণ একটি শরিয়তি দলিল অর্থাৎ ‘তাহারি’র ওপর ভিত্তি করে ছিল, তাই নিশ্চিতভাবে তাদের সবার সালাত আদায় হয়ে যাবে এবং সবাই তাহারি ও চিন্তা-ভাবনার প্রচেষ্টার সওয়াবও পাবেন। কিন্তু যখন দিনে সূর্য উদিত হবে এবং জানা যাবে যে পূর্ব কোন দিকে আর পশ্চিম কোন দিকে, তখন নির্ধারিত হয়ে যাবে যে কার ধারণা ভুল ছিল আর কার সঠিক। সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না বরং সবাই নিশ্চিতভাবে বলবে যে অমুক ইমামের দিক সঠিক ছিল আর অমুক ইমামের ভুল।

মুশাজারাতেও একই অবস্থা ছিল যে ফিতনা, হাঙ্গামা, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনিষ্টতা এবং ফিতনাবাজদের ছড়ানো ভুল বোঝাবুঝির কারণে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিবেশ ঘোলাটে ছিল এবং মুসলমানদের নেতৃত্বের দিকগুলোও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং মুসলমানরা এক অবস্থানের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। আল্লামা ইবনে খালদুন মুশাজারা এবং সাহাবীদের একটি দলের হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বায়আত নিয়ে মতপার্থক্যের পরিবেশের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করার পর লেখেন:

“কিন্তু তাদের পর দ্বিতীয় প্রজন্মের (করনে সানি) লোকেরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বায়আত অনুষ্ঠিত হওয়া, তা সমস্ত মুসলমানদের ওপর আবশ্যিক হওয়া, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদক্ষেপসমূহের সঠিক হওয়া এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের ভুলের ওপর একমত হয়ে গেছেন।” [১]

[১] কারণ তাদের পরবর্তী দ্বিতীয় যুগের লোকেরা হযরত আলীর বায়আত অনুষ্ঠিত হওয়া এবং তা সমস্ত মুসলমানদের জন্য আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন এবং তিনি যে মত গ্রহণ করেছিলেন তাকে সঠিক সাব্যস্ত করেছেন এবং মুয়াবিয়া ও যারা তাঁর মতের ওপর ছিল তাদের পক্ষ থেকে ভুল হওয়াকে সুনির্দিষ্ট করেছেন। (তারিখে ইবনে খালদুন: ১/ ৪৬৭)

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি মাদাজিল্লাহ-এর অত্যন্ত উপকারী গবেষণা

এই আলোচনার সমাপ্তি আমরা হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি মাদাজিল্লাহল আলীর একটি লেখার মাধ্যমে করছি, যাতে তিনি এই নাজুক আলোচনাটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে এভাবে সমাধান করেছেন:

“কখনও কখনও একজন মুজতাহিদ কোনো অবস্থান এই কারণে গ্রহণ করেন যে, বিরোধী দলিলসমূহ তার কাছে স্পষ্ট থাকে না। তাই সেই মুজতাহিদ অপারগ (মা’জুর) হিসেবে গণ্য হন, কিন্তু পরবর্তীতে অকাট্য দলিল (দালাইলে কাতিয়া) দ্বারা তা খণ্ডন হয়ে যায়। এমন অবস্থায় তার ক্ষেত্রে বিষয়টি জন্নি (ধারণাপ্রসূত) ছিল, কিন্তু পরবর্তী লোকদের জন্য তাদের ভুল হওয়াটা অকাট্য হয়ে যায়; শর্ত হলো দ্বীনের অপরিহার্য বিষয় (জরুরিয়াতে দ্বীন) না হওয়ার কারণে এর বিরোধিতা যেন কুফরের কারণ না হয়।

যেমনটি কিছু সাহাবীর বিরল মতামতের (শাওয়াদ) ক্ষেত্রে হয়েছে; যেমন- সম্পদ পুঞ্জীভূত করার (ইকতিনা-জ) ব্যাপারে আবু যর-এর মাযহাব, দুই পা মাসেহ করার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস-এর মাযহাব এবং মুদ্রা বিনিময়ের (সরফ) বৈধতার ব্যাপারে ইবনে উমর-এর মাযহাব ইত্যাদি।

এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এভাবেও সম্ভব যে, জন্নি (ধারণাপ্রসূত) বিষয় দুই প্রকার:

- এক. যার বিরোধিতা করা এখনও শরীয়তসম্মতভাবে জায়েজ। যেমন অধিকাংশ ফিকহি মাসআলা।
- দুই. যার বিরোধিতা করা এখন আর শরীয়তসম্মতভাবে জায়েজ নয়। দ্বিতীয় প্রকারটি অকাট্যের (কাতি) কাছাকাছি। যেমন পূর্ববর্তী উদাহরণসমূহ।

অধমের কাছে মনে হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরোধ মূলত ইজতিহাদি ছিল এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ক্ষেত্রে তা জন্নি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দলিলের স্পষ্টতা এবং আহলে সুন্নাতে ঐকমত্যের পর তা হয় অকাট্য হয়ে গেছে, অথবা দ্বিতীয় প্রকারের জন্নি হয়ে গেছে যার বিরোধিতা করা জায়েজ নয়।“ [১]

[১] হযরত মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি শহীদ (জামিয়া ইমদাদিয়া ফয়সালাবাদ)-এর সাহায্যে কেরামের পারস্পরিক বিরোধ (মুশাজারাতে সাহাবা) সংক্রান্ত ফতোয়ার ওপর হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানির সংশোধনমূলক নোট, পৃষ্ঠা ৪৭, অপ্রকাশিত।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণীসমূহ

(১) জমহুর উলামায়ে ইসলামের কিতাবসমূহে যেখানেই আহলে শাম বা আহলে জামালের জন্য “বাগী” শব্দ এসেছে, তা ফিকহী পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ: □ যে শরয়ী শাসকের আনুগত্য করে না অথবা □ কোনো এলাকার ওপর দখলদার হয়ে যায়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে “বাগী”র সংজ্ঞার সারকথা এটাই। এটাও অনস্বীকার্য যে, আসহাবে জামাল এবং আহলে শাম খলিফার আনুগত্য থেকে বিরত ছিলেন এবং একটি এলাকার ওপর তাদের দখলও ছিল। সুতরাং জমহুর উলামা এই ব্যক্তিদের ওপর “বাগী” শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কেবল এতটুকুই উদ্দেশ্য নেন, এবং সেই সময় পর্যন্তই উদ্দেশ্য নেন যতক্ষণ এই বিষয়টি এই অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ইসলাম থেকে বিদ্রোহ, ধর্মহীনতা, অবৈধ রক্তপাত, লুটতরাজ, ফাসেকী ও পাপাচার বা ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী কোনো বিষয় এর দ্বারা মোটেও উদ্দেশ্য নয়।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহম এই বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

“এটা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, যারা হযরত মুয়াবিয়া [রা.] -এর জন্য বাগী বা জালেম ইমাম শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তাদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল এটাই যে, তিনি হযরত হাসান [রা.] -এর সন্ধির পূর্বে প্রকৃত বিচারে হকের ওপর ছিলেন না। অন্যথায় যেহেতু তাদের এই বিদ্রোহ ব্যাখ্যার (তাওয়ীল) ভিত্তিতে ছিল, তাই তারা মুজতাহিদ মুখতী (ভুলকারী গবেষক) ছিলেন।” [১]

(২) সাধারণ উর্দু প্রবাদ ও প্রচলিত অর্থে যদি “বাগী” শব্দ বলা হয়, তবে তা থেকে একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী, অবাধ্য এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তিত্বের কথা মাথায় আসে। এই অর্থে কোনো সাহাবীর দিকে বাগী হওয়ার সম্বন্ধ করা চরম পর্যায়ের গোমরাহি। ইলমী ও ফিকহী আলোচনায় যেখানে মাসআলার বিশ্লেষণ উদ্দেশ্য হয়, সেখানে এই শব্দটি অনিবার্য অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

আমাদের এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায়ও এ জাতীয় আলোচনায় এই শব্দটি অনিবার্যভাবে এসেছে। লেখক এখন পর্যন্ত অনুসন্ধানের পরেও এর এমন কোনো বিকল্প শব্দ পাননি যা ফিকহী মর্মকেও পুরোপুরি আদায় করে দেয়। বিদ্রোহের (বগাওয়াত) স্থলে “খুরাজ” শব্দটি তুলনামূলক হালকা মনে হয়, কিন্তু “বাগী”র স্থলে “খারেজী” ব্যবহার করা যায় না; কারণ এর অত্যন্ত জঘন্য হওয়া স্পষ্ট। কিছু ব্যক্তি আমাদের “মুনহারিফ” (বিচ্যুত) শব্দ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু যতটুকু চিন্তা করা হয়েছে, এটিও ফিকহী পরিভাষাকে পুরোপুরি আদায় করে না। যদি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কোনো বিকল্প শব্দের ওপর একমত হন, তবে আগামী সংস্করণে সেটিই ব্যবহার করা হবে। যাই হোক, মাসআলার বিশ্লেষণ এবং ইলমী ও আকিদাগত আলোচনা ব্যতিরেকে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সাধারণ কথাবার্তা বা লেখায় এই শব্দের ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকাই সতর্কতার দাবি; কারণ সাধারণ মানুষ যাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে আগে থেকেই সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত করা হচ্ছে, তারা বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতা, তাকওয়া এবং হেদায়েত অকাট্য দলিল (নুসুসে কাতিয়াহ) দ্বারা প্রমাণিত। তারাই রাসূলুল্লাহ [সা.] এবং উম্মতের মাঝে ইসলামের মাধ্যম ও উসিলা। তাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ মনে করা গোমরাহির মূল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মধ্যম পন্থায় অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন।

[১] হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১৩৯, ১৪০-এর পাদটীকা।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

প্রতিশ্রুত খিলাফতে রাশিদাহ সম্পর্কে কিছু সংশয়

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) কি খিলাফতে রাশিদাহকে চার খলিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতেন না?

প্রশ্ন: খিলাফতে রাশিদাহ ত্রিশ বছর হওয়া কেবল একটি বর্ণনায় রয়েছে যা খবর-এ-ওয়াহিদ; কারণ এটি কেবল একজন সাহাবী হযরত সাফিনা (রা.) থেকে বর্ণিত এবং এর সনদে ত্রুটি রয়েছে। এর বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে জুমহান নির্ভরযোগ্য নন, তাই আল্লামা ইবনে খালদুন খিলাফত ত্রিশ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রবক্তা নন, এবং এই কারণেই তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে বলেছেন: “فهو من الخلفاء الراشدين” (হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত।) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খিলাফতে রাশিদাহ চার খলিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া কোনো ইজমাস্ট আকিদা নয়। এই ভুল আকিদা হাদিসে সাফিনা অর্থাৎ ‘ত্রিশ বছর’ সম্বলিত হাদিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, আল্লামা ইবনে খালদুন একেও ভুল আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন: “এই বিষয়ে ‘খিলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত’ সম্বলিত হাদিসের দিকে যেন না তাকানো হয়; কারণ এই হাদিসটি সহিহ নয়।” [১]

উত্তর: আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) এখানে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমনটি তাঁর পূর্ণ বক্তব্য থেকে জানা যায়:

فهو من الخلفاء الراشدين ومن كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المروانية ممن تلاه في المرتبة” [২]

“অতএব তিনি (মুয়াবিয়া রা.)-ও খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত, এবং দ্বীন ও মর্যাদায় যারা তাঁর অনুসারী হয়েছে, এবং মারওয়ানি খলিফাদের মধ্যে যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তারা মর্যাদার দিক থেকে অনুরূপ, এবং একইভাবে পরবর্তীতে বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে যারা এমন ছিল (তারাও এই গণনায় অন্তর্ভুক্ত হবে)।”

অর্থাৎ ইবনে খালদুন (রহ.) বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসের প্রত্যেক নেককার শাসককে খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত করছেন। স্পষ্টতই এটি পারিভাষিক খিলাফতে রাশিদাহ হতে পারে না, বরং আভিধানিকই হবে।

পারিভাষিক খিলাফতে রাশিদাহ সম্পর্কে তিনি নিজেই জানান যে, উলামায়ে কেরাম একে চার খলিফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগকে এই কারণে এতে অন্তর্ভুক্ত করেননি যে, তাঁর শাসন আসাবিয়াত থেকে সৃষ্ট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছিল।

[১] “ولا ينظر في ذلك الى حديث الخلافة ثلاثون سنة فانه لم يصح” (তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৬৫০)

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৬৫০

তারিখ-এ-উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

এতে এসেছে এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা প্রথম শাসক। তিনি বলেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে খেলাফত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, যার কারণ ছিল সেই যুগে উদ্ভূত হওয়া সেই গোষ্ঠীগত সংহতি (আসাবিয়াহ) যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। অথচ এর আগে খেলাফত সম্ভ্রুষ্টি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছিল। তাই উলামায়ে কেরাম এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং মুয়াবিয়া (রা.) প্রচেষ্টা ও গোষ্ঠীগত সংহতির ভিত্তিতে হওয়া প্রথম খলিফা ছিলেন।” [১]

শুধু তাই নয়, বরং আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর ‘মুকাদ্দিমা’-এ ‘খেলাফত’ থেকে ‘রাজতন্ত্রে’ (মুলকিয়াত) রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়ে একটি বিস্তারিত অধ্যায় রচনা করেছেন। যাতে তিনি পূর্ণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে খেলাফতে রাশেদার পর বনু উমাইয়াদের যুগে খেলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই আলোচনার সময় তিনি বলেন:

“তুমি দেখেছ কীভাবে খেলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেল, কিন্তু খেলাফতের এই মর্মার্থ বাকি থাকল যে তা দ্বীন ও দ্বীনি বিধানের হেফাজত এবং সত্যের পথ অবলম্বন করার নাম। সেই যুগে কেবল শাসকদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল, যারা দ্বীনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তারপর (এই পরিবর্তন বাড়তে বাড়তে) গোষ্ঠীগত সংহতি ও তলোয়ারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। হযরত মুয়াবিয়া (রা.), মারওয়ান এবং তাঁর পুত্র (আবদুল মালিক) থেকে শুরু করে বনু আব্বাসের প্রাথমিক শাসক হারুনুর রশিদ এবং তাঁর কিছু পুত্র পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় ছিল। এরপর খেলাফতের মর্মার্থ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল এবং কেবল এর নামই বাকি থাকল। শাসনব্যবস্থা খাঁটি রাজতন্ত্রে পরিণত হলো।” [২]

এই আলোচনার সময় তিনি মারওয়ান এবং আবদুল মালিকের কিছু গুণাবলি উল্লেখ করা সত্ত্বেও তাঁদেরকে বাদশাহ হিসেবে গণ্য করেছেন:

“মারওয়ান এবং তাঁর পুত্রের অবস্থা এমনই, যদিও তাঁরা বাদশাহ ছিলেন।” [৩]

তিনি উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে ‘খুলাফায়ে আরবা’ (চার খলিফা)-এর সূনাত পুনরুজ্জীবিতকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী শাসকদের দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পূরণকারী বাদশাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। [৪] এ ছাড়াও তাঁর এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে যা স্পষ্ট করে যে, তাঁর নিকট পারিভাষিক এবং প্রতিশ্রুত খেলাফত কেবল ‘খুলাফায়ে আরবা’-এরই ছিল। [৫]

[১] নিশ্চয়ই তাঁর যুগের খেলাফত ছিল আধিপত্যের ভিত্তিতে, সেই গোষ্ঠীগত সংহতির কারণে যা তাঁর যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। আর এর আগে তা ছিল পছন্দ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে। তাই তাঁরা এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং মুয়াবিয়া ছিলেন আধিপত্য ও গোষ্ঠীগত সংহতির ভিত্তিতে প্রথম খলিফা। (তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৬৫০)

[২] তুমি দেখেছ কীভাবে বিষয়টি রাজতন্ত্রের দিকে চলে গেল, তবে খেলাফতের মর্মার্থ অর্থাৎ দ্বীনের অনুসরণ, এর পথ চলা এবং সত্যের পথে পরিচালিত হওয়া অবশিষ্ট ছিল। পরিবর্তন কেবল সেই চালিকাশক্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল যা আগে দ্বীন ছিল এবং পরে তা গোষ্ঠীগত সংহতি ও তলোয়ারে পরিণত হয়েছিল। মুয়াবিয়া, মারওয়ান ও তাঁর পুত্র আবদুল মালিক এবং বনু আব্বাসের প্রথম দিকের খলিফাদের মধ্যে হারুনুর রশিদ ও তাঁর কিছু পুত্র পর্যন্ত বিষয়টি এমনই ছিল। এরপর খেলাফতের মর্মার্থ চলে গেল এবং কেবল এর নাম অবশিষ্ট থাকল এবং বিষয়টি খাঁটি রাজতন্ত্রে পরিণত হলো।

[৩] একইভাবে মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং তাঁর পুত্রও ছিলেন, যদিও তাঁরা বাদশাহ ছিলেন। (তারিখ ইবনে খালদুন: ১/২৫৮)

[৪] তাঁদের মাঝে উমর ইবনে আবদুল আজিজ মধ্যবর্তী ছিলেন, যিনি তাঁর সাধ্যমতো চার খলিফা ও সাহাবায়ে কেরামের পথে ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে সময় দেওয়া হয়নি। এরপর তাঁদের উত্তরসূরীরা আসলেন এবং তাঁরা তাঁদের দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে রাজতন্ত্রের প্রকৃতি ব্যবহার করলেন। (তারিখ ইবনে খালদুন: ১/২৫৮)

[৫] আর খেলাফত হলো তাঁর পূর্বসূরি খুলাফায়ে রাশেদীনের সূনাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি মিল্লাতের স্তম্ভ চার খলিফার সীরাতে গ্রহণ করেছিলেন। (তারিখ ইবনে খালদুন: ৬/৪৭)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

সুতরাং আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.)-এর অবস্থান জমহুর আহলে সুন্নাতের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

কিন্তু চলুন ধরে নেওয়া যাক যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খিলাফতে রাশেদার পারিভাষিক অর্থকেই প্রত্যাখ্যান করা; তাহলে ভেবে দেখুন, জমহুর মুহাদ্দিসিন, ব্যাখ্যাকার এবং মুতাকাল্লিমিনদের বিপরীতে একজন মাত্র আলেমের মতামতের কতটুকু ওজন হতে পারে? যদি সত্যিই আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) ‘ত্রিশ বছর’ (সালাসুন সানাহ) সংক্রান্ত হাদিসটি অস্বীকার করে থাকেন, তবে এই অস্বীকার করা নিজেই ভুল; বরং এই অস্বীকার তাঁর নিজের গবেষণারই পরিপন্থী; কারণ তিনি ‘মুকাদ্দিমা তারিখ’-এ নিজেই সাফিনা (রা.)-এর হাদিস থেকে দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন:

“(কেননা পূর্ণ ইনসাফ তো শরয়ী খিলাফতেই ছিল যার সময়কাল ছিল সংক্ষিপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ হলো: ‘আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর। এরপর দংশনকারী রাজতন্ত্র আসবে।’)” [১]

যখন আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) এমন হাদিসকে ‘লা ইয়াসিহ’ (বিশুদ্ধ নয়) বলে অভিহিত করছেন যা থেকে তিনি নিজেই দলিল পেশ করেন, তখন আমাদের তাঁর মতামতের বাহ্যিক বৈপরীত্য পরিহার করে ইলমে হাদিসের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ফয়সালা নিতে হবে যে তাঁরা কী বলেন।

মুহাদ্দিসগণের এক বিশাল জামাত এই হাদিসটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন [২] এবং মহান ইমামগণ একে ‘আকিদার কিতাবসমূহে’ অন্তর্ভুক্ত করেছেন [৩], যা এই কথার প্রমাণ যে তাঁরা এই বর্ণনাটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণের যোগ্য মনে করতেন।

যে সকল ব্যক্তিবর্গ এই ত্রুটির কারণে যে এর বর্ণনাকারী সাঈদ বিন জুমহান (রহ.) উচ্চপর্যায়ের নির্ভরযোগ্য নন, একে ‘সহিহ’ স্তরে রাখেননি, তাঁরাও এটি স্বীকার করেন যে এই হাদিসটি ‘হাসান’ স্তরের নিচে নয়; কারণ সাঈদ বিন জুমহান (রহ.) যে কোনো অবস্থাতেই ‘সদুক’ (সত্যবাদী) হিসেবে স্বীকৃত। [৪] এই কারণেই ইমাম তিরমিজি (রহ.) এই বর্ণনাটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। [৫]

এই হাদিসটিকে ‘খবরে ওয়াহিদ’ বলাও ভুল; কারণ এই হাদিসটি হযরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে:

خِلَافَةُ نَبْوَةٍ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ-

(নবুওয়াতের খিলাফত ত্রিশ বছর, এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করবেন।)

হযরত আবু বাকরাহ (রা.) নিজেই এই হাদিসটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে শুনিয়েছিলেন এবং তিনিও এটি অস্বীকার করেননি বরং বলেছিলেন:

قَدْ رَضِينَا بِالْمُلْكِ- (আমরা রাজতন্ত্রেই সন্তুষ্ট।) [৬]

[১] (তারিখ ইবনে খালদুন: ১/৪৬১) “إِذِ الْعَدْلُ الْمُحَضُّ هُوَ فِي الْخِلَافَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهُوَ قَلِيلَةُ اللَّبْثِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَعُودُ مَلِكًا عَضُوضًا”

[২] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৪৬, ৪৬৪৭; সুনানে তিরমিজি, হা: ২২২৬; সুনানে নাসায়ি আল-কুবরা, হা: ৮০৯৯; শারহ মুশকিলিল আসার লিত-তাহাবি, হা: ৩৩৩৯; মুসনাদে আবি দাউদ আত-তায়ালিসি, হা: ১২০৩; আল-ইতিকাদ লিল-বায়হাকি, বাবু তাসমিয়াতিল খুলাফা; সহিহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬৬৫৭; আল-আহাদ ওয়াল মাসানি লিবনি আবি আসিম, হা: ১১৩; আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি: ১/৫৫; মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ২১৯২৯

[৩] দ্রষ্টব্য: আশ-শরীয়াহ লিল-আজুরি (বাবু জিকরি খিলাফতি আবি বকর ওয়া উমর ওয়া উসমান ওয়া আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম); শারহ উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ লি-আবি মানসুর আর-রাজি (সিয়াকু মা রুভিয়া ফি তারতিবিল খিলাফতি বাইনাল আরবাতাহ); শারহস সুন্নাহ লিল-বাগাউয়ি (বাবু ফাদলিস সাহাবাহ)

[৪] তাকরিবুত তাহজিব, অনুবাদ নম্বর: ২২৭৯

[৫] সুনানে তিরমিজি, হা: ২২২৬, আলবানি একে সহিহ বলেছেন

[৬] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল-বায়হাকি: ৬/৩৩২, ত. ইলমিয়াহ; আল-খাসায়েসুল কুবরা লিস-সুয়ুতি: ২/১৯৭

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.)-এর অভিমত আসার পরেও মুহাদ্দিসগণ এবং হাদীস বিশারদগণ এই কথা মেনে নেননি যে, এই হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য। এর বিপরীতে তারা আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.)-এর অভিমতকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। ইবনে খালদুন (রহ.) ইলমে হাদীসের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। যখন কোনো ব্যক্তি নিজের বিচরণক্ষেত্রের বাইরের ময়দানে কথা বলেন, তখন সেখানে তার পদস্থলন হতে পারে। এখানেও তার ভুলটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার পক্ষ থেকে বড়জোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, তার নিকট ‘লা ইয়াসিহ’ (সঠিক নয়) এর অর্থ ছিল ‘মনগড়া’ বা ‘বানোয়াট’। অথচ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা অনুযায়ী এর অর্থ হলো এর মান সহীহ পর্যায়ে নিচে। এর পরেও যারা এই হাদীসকে ‘লা ইউনজার’ (বিবেচনাযোগ্য নয়) বলেন, তাদের এই কথা জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ)-এর সম্মিলিত মতামতের বিপরীতে কোনোভাবেই সঠিক নয়, বরং তারা নিজেরাই এই মতামতের বিরুদ্ধে স্ববিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত করার একটি দলিলের জবাব:

প্রশ্ন: হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একজন সাহাবীও ছিলেন এবং তিনি হযরত হাসান (রা.)-এর পক্ষ থেকে শাসনভার লাভ করেছিলেন। তাহলে তাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেই গণ্য করা উচিত; কারণ হযরত হাসান (রা.) কর্তৃক হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে ক্ষমতা অর্পণ করা ঠিক তেমনই ছিল যেমন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। যখন একজন খলিফা নিজের ইচ্ছায় অন্যজনের কাছে শাসনভার হস্তান্তর করেন এবং উম্মত তাতে একমত হয়, তখন সেই নতুন শাসকের মর্যাদা ঠিক তেমনই হবে যা পূর্ববর্তী খলিফার ছিল। সুতরাং মর্যাদার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কেও খুলাফায়ে রাশেদীনের সেই সারিতে স্থান দেওয়া উচিত যেখানে হযরত হাসান (রা.) এবং পূর্ববর্তী খলিফাগণ ছিলেন।

উত্তর: মর্যাদার পার্থক্য ছাড়াও এখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃতিতেও স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরসূরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে খেলাফতের কোনো দাবি ছিল না এবং খলিফার সামনে দুটি পথের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার কোনো প্রশ্নও ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং মুসলিম উম্মাহরও এ বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো মত ছিল না।

এর বিপরীতে হযরত হাসান (রা.)-এর বিপরীতে একটি সমান্তরাল অসাংবিধানিক সরকার ছিল। উভয় সরকারের প্রধানদের ইচ্ছা এটাই ছিল যে মুসলিম উম্মাহ যেন একজন খলিফার ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধি প্রবীণ সাহাবীদের সেই সুযোগই দেওয়া হয়নি যে তারা উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন। অন্যথায় সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন য়ায়েদ, আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর অগ্রবর্তী ছিলেন। আর স্বয়ং হযরত হাসান (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব যেকোনো সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে ছিল।

প্রথম বিষয়টি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি নিয়োগের ছিল না, বরং দুটির মধ্যে একটি বিষয় বেছে নেওয়ার ছিল:

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

• সিরিয়াবাসীদের হাতে খেলাফত অর্পণ করা...

• বিভেদ ও গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা গ্রহণ করা।

শরয়ী ও যৌক্তিক নীতি হলো, অনেক সময় কোনো বড় ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য তুলনামূলক কম স্তরের কোনো জায়েজ বিষয়কে কৌশলগত কারণে গ্রহণ করে নেওয়া হয়, একে “আখতিয়ারু আহওয়ানিল বালিয়্যাতাইন” (দুটি বিপদের মধ্যে সহজটি বেছে নেওয়া) বলা হয়। এখানে যদি সিরিয়াবাসীদের হাতে শাসনভার অর্পণ করা না হতো, তবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ অবশিষ্ট থাকত এবং ভবিষ্যতে আরও রক্তপাতের সম্ভাবনাও ছিল; কারণ সিরিয়াবাসীরা কোনোভাবেই ইরাকবাসীদের নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই হযরত হাসান এবং তাঁর অনুসারীরা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উম্মাহর ঐক্যের খাতিরে জেদ পরিহার করে সিরিয়াবাসীদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ যেখানে হযরত হাসানের ত্যাগের মহিমার প্রশংসা করে এই ইরশাদ করেছিলেন: “নিশ্চয়ই আমার এই সন্তান একজন সরদার। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেবেন।” [১]

সেখানে এই সন্ধির পরিবেশ সম্পর্কে: “হুদনাতুন আলা দাখান” (অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সাথে সন্ধি)-এরও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। [২]

এই নববী বাণী অনুযায়ী এই সন্ধি কল্যাণ ও অপ্রীতিকর—উভয় দিকই ধারণ করেছিল। কল্যাণকর ছিল এই কারণে যে, এর ফলে পারস্পরিক যুদ্ধের আশঙ্কা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। নাপছন্দ দিকটি, যা অনুভব করা স্বাভাবিক ছিল, তা হলো খেলাফত তার সর্বোত্তম হকদারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই দিকটি এবং উম্মাহর একটি বড় অংশের মনে যে স্বাভাবিক কষ্ট পৌঁছেছিল, সে কারণে হাদিসে একে: “জামাআতুন আলা আকযা” (মলিনতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া) হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। [৩]

এখানে এই বিষয়টি দৃষ্টির আড়ালে থাকা উচিত নয় যে, অধিকাংশ মহান আলেম খুলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী শাসকদের প্রকৃত খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি এবং শুধুমাত্র অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে তাদের জন্য খলিফা উপাধি ব্যবহার করা জায়েজ মনে করেছেন।

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৭০৪, কিতাবুস সুলহ।

[২] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই কল্যাণের পর কি কোনো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন: ফিতনা ও অকল্যাণ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই অকল্যাণের পর কি কোনো কল্যাণ আছে? তিনি বললেন: হে হুযাইফা! আল্লাহর কিতাব শেখো এবং তাতে যা আছে তা অনুসরণ করো—তিনবার বললেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এই অকল্যাণের পর কি কোনো কল্যাণ আছে? তিনি বললেন: ধোঁয়াটে সন্ধি এবং আবর্জনার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! ধোঁয়াটে সন্ধি কী? তিনি বললেন: মানুষের অন্তরগুলো আগের মতো (পরিচ্ছন্ন) অবস্থায় ফিরে আসবে না। (সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪২৪৭, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুল ফিতান, সনদ হাসান)।

সহীহ বুখারীতে আছে: এই কল্যাণের পর কি কোনো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম: সেই অকল্যাণের পর কি কোনো কল্যাণ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে তাতে ধোঁয়া (কালিমা) থাকবে। আমি বললাম: তার ধোঁয়া কী? তিনি বললেন: এমন এক দল যারা আমার আদর্শ ছাড়া অন্য পথে পরিচালিত হবে, তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়টিই দেখবে। (হা: ৩৬০৬, কিতাবুল মানাকিব, বাব আলামাতুন নুবুওয়াহ ফিল ইসলাম)।

ইমাম মুসলিমও তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন (হা: ১৮৪৭, কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল আমর বি-লুযুমিল জামাআহ)।

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪২৪৬, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুল ফিতান, সনদ হাসান।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “দ্বিতীয় কল্যাণটি হলো মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া যখন হাসান ও মুয়াবিয়া সন্ধি করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল ধোঁয়াটে সন্ধি এবং আবর্জনার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। মানুষের মনে যা ছিল তা ছিলই, রাসূলুল্লাহ যা ঘটবে তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/৫২০, ৫২১)।

আমাদের নিকট এই খবরের অর্থ হলো, ত্রিশ বছর পর তাদের খলিফা বলা জায়েজ, তাও নিরুপায় অবস্থায়, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ ছিলেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৫/৩৯, ত রিসালাহ)।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

বিখ্যাত মুহাদ্দিস, হাদিস বিশারদ এবং আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. (মৃ. ৩৫৪ হি.) “খিলাফত ত্রিশ বছর” এবং বারো জন খলিফা সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

“আমাদের নিকট হাদিসের মর্মার্থ হলো এই যে, ত্রিশ বছর পরের ব্যক্তিদেরকে বাধ্য হয়ে খলিফা বলা যেতে পারে, যদিও তারা বাস্তবে রাজা (মুলুক) ছিলেন।” [১]

ইমাম উমর নাসাফি রহ., যার আকাইদ গ্রন্থ মাদরাসা-ই-নিজামিয়ার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত, তিনি লিখেছেন:

“আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে, এরপর রাজতন্ত্র ও আমীরতন্ত্রের যুগ হবে।” [২]

এই ইমামগণের এই উক্তির একটি বড় কারণ ছিল পরিবেশের সেই পার্থক্য, যার দিকে উল্লিখিত হাদিসে ইঙ্গিত করে একে ‘দাখান’ (ধোঁয়াটে) এবং ‘আকযা’ (চোখের ময়লা) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা হযরত হাসান রা.-এর ক্ষমতা ত্যাগের পরবর্তী সময়কাল।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন:

“হযরত মুয়াবিয়া রা. এবং তাঁর পরবর্তী অধিকাংশের শাসন পদ্ধতি ছিল রাজাদের ন্যায়, যদিও তাঁরা খলিফা হিসেবে অভিহিত হন।” [৩]

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. ইমাম ইবনে আবি খাইসামা রহ.-এর সনদে (যার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বা সত্যবাদী) স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন:

“আমি প্রথম রাজা এবং শেষ খলিফা।” [৪]

এর অর্থ ছিল এই যে, আমার শাসনামলে রাজতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যও রয়েছে এবং খিলাফতের বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। এর পরে কেবল রাজতন্ত্রই অবশিষ্ট থাকবে।

অন্যান্য শাসক সাহাবীগণ যদি খলিফায়ে রাশেদ হন, তবে হযরত মুয়াবিয়া রা. কেন খলিফায়ে রাশেদ নন?

প্রশ্ন: এমন মনে হয় যে, আলেম সমাজের হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর সাথে জন্মগত শত্রুতা রয়েছে এবং শীর্ষস্থানীয় আহলে সুন্নাহ আকাবিরগণও ভেতর থেকে কোনো না কোনোভাবে শিয়া। অন্যথায় এখন পর্যন্ত হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর খলিফায়ে রাশেদ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) হয়ে যেত। সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ‘রাশেদ’ (সঠিক পথপ্রাপ্ত), যাদেরকে কুরআন মজিদ ‘আর-রাশিদুন’ উপাধি দিয়েছে। সুতরাং যে সাহাবীই খলিফা হবেন, কুরআনের নস (স্পষ্ট বর্ণনা) অনুযায়ী তাঁকে খলিফায়ে রাশেদ মানা উচিত। প্রথম চারজন ব্যক্তি যাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়, তাঁরাও...

[১] আমাদের নিকট এই খবরের অর্থ হলো, ত্রিশ বছর পর যারা আসবে তাদেরকেও বাধ্য হয়ে খলিফা বলা জায়েজ, যদিও তারা বাস্তবে রাজা ছিলেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৫/৩৭, তাবা’আতুর রিসালাহ)

[২] খিলাফত ত্রিশ বছর, এরপর রাজতন্ত্র ও আমীরতন্ত্র। (মাতনুল আকাইদিন নাসাফিফিয়াহ, পৃ. ৩)

[৩] আর মুয়াবিয়া এবং তাঁর পরবর্তী অধিকাংশের অবস্থা ছিল রাজাদের ন্যায়, যদিও তাঁদেরকে খলিফা নামকরণ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী: ১২/৩৯২)

[৪] আমি প্রথম রাজা এবং শেষ খলিফা। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৩৯)

সাহাবীগণ। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও একজন সাহাবী। তাদের মধ্যে নবী ও উম্মতের মতো কোনো পার্থক্য নেই। যদি মর্যাদার পার্থক্যের বিষয় হয়, তবে প্রথম চার খলিফার মধ্যেও পরবর্তী প্রত্যেকেই পূর্ববর্তীদের চেয়ে কম মর্যাদার ছিলেন, কিন্তু যুগ ও পরিবেশের পার্থক্য দেখলে দেখা যায় যে, প্রথম চার খলিফার প্রত্যেকের যুগের কল্যাণ ও বরকত পরবর্তী যুগে ছিল না। তাহলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে এই বৈষম্য কেন? এগুলো কি রাফেজি মতবাদের জীবাণু নয় যা আহলে সুন্নাতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে?

উত্তর: একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জন্য এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, “খিলাফতে রাশিদাহ” আহলে সুন্নাতের আলেমদের একটি প্রাচীন পরিভাষা। প্রতিটি পরিভাষার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আহলে সুন্নাতের ইজমা (ঐক্যমত) অনুযায়ী সেই সীমাবদ্ধতাগুলো প্রথম চার খলিফার খিলাফতের মধ্যে পাওয়া যায়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তা পাওয়া যায় না। এর ওপর আহলে সুন্নাতের ইজমা রয়েছে এবং আকীদার কিতাবসমূহ এর সাক্ষী। অবশ্য খিলাফতে রাশিদাহ চার খলিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ইজমাভিত্তিক আকীদাকে রাফেজি, খারেজি এবং নাসিবির মানে না। প্রশ্নকারীও এটি স্বীকার করছেন না। এই ধরনের সন্দেহের গবেষণামূলক উত্তর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আমরা এটি বলেছি যে, প্রত্যেক সাহাবীই ‘রাশিদ’ (সঠিক পথপ্রাপ্ত) এবং শাব্দিক দিক থেকে প্রত্যেক ভালো খলিফাকে ‘খলিফায়ে রাশিদ’ বলা যেতে পারে। কিন্তু একে শরয়ী পরিভাষা বা আকীদা বানানো যাবে না; কারণ পরিভাষাটি যেসব শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা প্রত্যেক শাসক সাহাবীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

এখন আমরা এখানে প্রশ্নকারীকে পাল্টা প্রশ্ন হিসেবে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আহলে সুন্নাতের আলেমদের পরিভাষাকে ভেঙে আপনি খিলাফতে রাশিদাহর পরিভাষা কোন মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান? এই মূলনীতির ওপর কি যে, “প্রত্যেক শাসক সাহাবীই খলিফায়ে রাশিদ”? তাহলে এই অবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতকে কি “খিলাফতে রাশিদাহ”-এর অন্তর্ভুক্ত করবেন কি করবেন না?

যদি অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে দলের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তা ছিল এই বনু উমাইয়া দল। ইয়াজিদ তো আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে দুইবার যুদ্ধ করেছিল, তাকে আপনি কী মর্যাদা দেবেন? মারওয়ানকে কী বলবেন? ইয়াজিদ এবং তার ছেলের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) খলিফা হন। ৬৪ হিজরীর রজব মাসে সমস্ত প্রদেশে তাঁর হাতে বায়াতও গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন তিনি খলিফায়ে রাশিদ ছিলেন কি ছিলেন না? যদি থেকে থাকেন, তবে তাঁর বিরোধীদের অবস্থান কী বলে গণ্য হবে?

আর যদি কেউ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে এই কারণে খলিফায়ে রাশিদ না মানে যে, তাঁর খিলাফত পুরো মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে এই দলিল অনুযায়ী তাকে হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতে রাশিদাহকেও অস্বীকার করতে হবে, যিনি সিরিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। আর হযরত আলী (রা.)-কে খলিফায়ে রাশিদ না মেনে কোনো ব্যক্তি কীভাবে আহলে সুন্নাতভুক্ত থাকতে পারে?

আর যদি কেউ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে এই কারণে খলিফায়ে রাশিদ না মানে যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উত্তরসূরি ইয়াজিদের সাথে যুদ্ধ করেছেন (যে সাহাবী না হওয়ার কারণে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর পায়ের ধুলোর সমানও ছিল না), তবে এই দলিল আরও তীব্রভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে যাবে, যাঁর যুদ্ধক্ষেত্র ছিল তাঁর চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে।

মোদাকথা, এই নতুন পরিভাষা কোনোভাবেই প্রমাণিত হতে পারে না। এটি প্রবর্তন করার মাধ্যমে আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতিরক্ষা হবে না, বরং আশঙ্কা রয়েছে যে, এই ধরনের প্রচেষ্টা অনেক ধ্বংসাত্মক প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দেবে। এই একটি প্রশ্নই কি কম যে, গত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে...

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম

আহলে সুন্নাত একটি বাতিল আকিদার ওপর কীভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে? এর পরিষ্কার অর্থ তো এই যে, আহলে সুন্নাত বাতিলপন্থী, যেমনটি সাইয়ি-এরও তাদের রাফেযি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এই চিন্তা আহলে সুন্নাতের চৌদশ বছরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার নামান্তর।

যদি কেউ এই মূর্খতাসুলভ চিন্তায় নিমগ্ন থাকে যে, আকিদার মধ্যে দু-একটি “ভালো” সংশোধন করলে কোনো পার্থক্য হয় না এবং এই “ভালো” সংশোধন সওয়াদে আযম থেকে বের হয়ে যাওয়ার নামান্তর নয় বরং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির কারণ, তবে তার মনে রাখা উচিত যে, সমস্ত ফেরকা শুরুতে দু-একটি “সুন্দর” সংশোধন নিয়ে এই দাবির সাথেই দাঁড়িয়েছিল যে, এর ফলে ইসলামি আকিদা আরও বেশি সংরক্ষিত ও মজবুত হবে। কিন্তু প্রতিটি সংশোধন এমন অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে যার ফলে একটি নতুন ফেরকা বা দলের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এই নতুন বিতর্কের ফায়দা না কোনো সাহাবির হতে পারে, না মুসলমানদের। এই বিষয়টি উত্থাপনকারীরাও সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরক্ষায় একনিষ্ঠ বলে মনে হয় না; কারণ সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তো আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের আকাবিরগণ শতাব্দীকাল ধরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করে আসছেন। এই নতুন পরিভাষাটি প্রবর্তন করার ব্যাপারে জেদ ধরা ব্যক্তির চরম গোঁড়ামিতে লিপ্ত বলে মনে হয়।

হযরত হাসান বিন আলী (রা.) সংক্রান্ত সংশয়সমূহ

হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত হাসান (রা.)-এর সন্ধির ব্যাপারে হযরত হুসাইন (রা.)-এর অবস্থান কী ছিল?

প্রশ্ন: বর্ণিত আছে যে, হযরত হুসাইন (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত হাসান (রা.)-এর সন্ধির বিরোধী ছিলেন এবং তিনি সন্ধির সময় হযরত হাসান (রা.)-কে বলেছিলেন: “আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি যে, মুয়াবিয়ার কথার সত্যায়ন এবং হযরত আলীর কথার মিথ্যায়ন করবেন না।” [১] এতে বর্ণনাকারী আওয়ানা বিন আল-হাকাম (মৃ. ১৪৭ হি.) নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য হন, তাঁর থেকে শ্রবণকারী যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ (মৃ. ১৮৩ হি.)-ও সত্যবাদী, তাঁর থেকে শ্রবণকারী উসমান বিন আব্দুর রহমানও গ্রহণযোগ্য। তাহলে কি এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে সহীহ হবে? নাকি এতে কোনো ত্রুটি আছে?

উত্তর: এই বর্ণনাটি ইনকিতা (সূত্র বিচ্ছিন্নতা)-এর কারণে যয়ীফ (দুর্বল), কারণ আওয়ানা বিন আল-হাকামের বয়স যদি একশ বছরও ধরা হয়, তবুও তিনি ৪১ হিজরিতে ঘটা এই ঘটনার পরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঘটনার সাক্ষী কোনোভাবেই হতে পারেন না। আবার এই বর্ণনার শেষ সূত্র উসমান বিন আব্দুর রহমান বিন মুসলিম আল-খুযাঈ (মৃ. ২০৩ হি.) যদিও নেক ও সৎ ছিলেন, কিন্তু তিনি যয়ীফ বর্ণনা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই কারণেই তিনি ‘তরাইফী’ (অদ্ভুত কিছা শোনানো ব্যক্তি) হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। [২] সুতরাং এই বর্ণনাটি যয়ীফ।

হযরত হুসাইন (রা.) উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন। এটা ধারণা করা যে তিনি উম্মতকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন, তা ভুল। এই ধরনের বর্ণনাগুলো অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। হয় এগুলোকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে অথবা এগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যেমন, যে সময় হযরত হুসাইন (রা.) এই মত দিয়েছিলেন, সেই সময় সিরিয়াবাসীদের অবস্থা তেমনই ছিল যেমনটি হযরত আলী (রা.)-এর যুগে ছিল, অর্থাৎ খলিফার আনুগত্য ত্যাগ করার কারণে তাদের ওপর ‘আল-ফিয়াতুল বাগিয়া’ (বিদ্রোহী দল) শব্দটির প্রয়োগ হতো। তাই হযরত হুসাইন (রা.)-এর শুরুতে এই মত হয়েছিল যে তাদের ওপর বিজয় লাভের চেষ্টা করা উচিত; কারণ খলিফার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার থাকে। কিন্তু এটাও প্রমাণিত যে (যদি বাস্তবে তাঁর এই মত থেকে থাকে তবুও শেষ পর্যন্ত) তিনি হযরত হাসান (রা.)-এর মতের সাথে একমত হয়েছিলেন। বর্ণনাগুলো সাক্ষী যে, হযরত হুসাইন (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে তাঁর অনুগত ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাঁদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি তাঁদের উপহার পেশ করতেন। হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর উপহার গ্রহণ করতেন। [৩] একবার হযরত হুসাইন (রা.)-কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন কুফাকে কেন্দ্র বানিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬০

[২] আল-কামিল ফী যুয়াফাউর রিজাল: ৬/২৮৫

[৩] তারিখু দামেশক: ৫৯/১৯৩

হযরত হুসাইন (রা.)-এর উত্তর ছিল: “আমরা বাইয়াত করে ফেলেছি, চুক্তি হয়ে গেছে। এটি ভঙ্গ করার কোনো অবকাশ নেই।” [১]

হযরত হাসান (রা.) কেন এই শর্তারোপ করেছিলেন?

প্রশ্ন: হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধিতে কেন উত্তরাধিকারের শর্ত রেখেছিলেন? তিনি কি খিলাফত সম্পর্কে এই বাণীটি উপেক্ষা করেছিলেন: “আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সাথে কথাও বলবেন না, যে কেবল দুনিয়ার স্বার্থে কোনো শাসকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে; যদি দুনিয়া পায় তবে আনুগত্য করে, অন্যথায় বিশ্বাসঘাতকতা করে।” [২]

উত্তর: বাস্তবতা হলো, হযরত হাসান (রা.) দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং আখিরাতে প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি এই ইমামত ও শাসনভার নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থেকে গ্রহণ করেননি। বরং এটি ছিল সেই আমানত যা তাঁর সম্মানিত পিতা তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। একইভাবে, এটি থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানো পরিবারের স্বার্থে ছিল না, বরং নিজের জেদ ও প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য ছিল। এতে রাজনীতি, ব্যক্তিত্ব গঠন বা কোনো হীন স্বার্থের অবকাশ ছিল না। এটি ছিল কেবল এই জন্য যাতে মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হয় এবং তারা পারস্পরিক মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহর জন্য কল্যাণের পথ সুগম করা এবং তাদের পারস্পরিক রক্তপাত থেকে রক্ষা করা। উম্মাহর এই বৃহত্তর স্বার্থেই হযরত হাসান (রা.) খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই খিলাফত হযরত হাসান (রা.)-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেননি:

ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফত হযরত হাসান (রা.)-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেননি, বরং এটি তাঁদের মধ্যে একটি চুক্তির অধীনে নির্ধারিত হয়েছিল। হযরত হাসান (রা.) স্বয়ং নিজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে এটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। হযরত হাসান (রা.) যে পত্রগুলো লিখেছিলেন, সেগুলো পড়লে বোঝা যায় যে, হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে লেখা পত্রগুলোতে স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন যে, আমি এই খিলাফত আপনার কাছে হস্তান্তর করছি যাতে উম্মাহর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয় এবং রক্তপাতের অবসান ঘটে। এই চুক্তি কোনো জবরদস্তি বা চাপের ফল ছিল না। [৩]

এ ছাড়া এ কথাটিও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত হাসান (রা.) তাঁর জীবনে কখনোই এই চুক্তি থেকে বিচ্যুত হননি এবং এর ওপর কোনো আপত্তিও করেননি। তিনি সর্বদা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করেছেন। এটি এই কথার প্রমাণ যে, তিনি এই চুক্তির ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন। [৪] [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪১

[২] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়: যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে

[৩] তারিখুত তাবারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২২

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭

[৫] তারিখুত তাবারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৪

এটিও লক্ষ্যণীয় যে উল্লিখিত বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল কারণ এর একজন বর্ণনাকারী ইউনুস বিন ইয়াজিদ আইলি, যিনি ইবনে শিহাব জুহরি থেকে এমন সব কথা বর্ণনা করার জন্য পরিচিত যা অন্য কেউ বর্ণনা করে না। তদুপরি জুহরি এটি জানাননি যে তিনি কার কাছ থেকে এই কথাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এই ঘটনার সতেরো বছর পর ৫৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি নিজেই দুর্বল হয়ে যায়।

এখন অন্যান্য বর্ণনাগুলো দেখলে জানা যাবে যে হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে পঞ্চাশ লক্ষ আদায় করার শর্তে সন্ধি হয়েছিল। [১] আর সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পাঁচ লক্ষ দিরহাম (পঞ্চাশ কোটি দিরহাম) পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলেন। [২] এর পরেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সন্ধিনামা লঙ্ঘনের দায়ে কীভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে?

বিখ্যাত শিয়া ঐতিহাসিক আবু হানিফা দিনাওয়ারির কথাই মেনে নিন, যিনি লিখেছেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পুরো জীবনে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে নিজের হকের ব্যাপারে কোনো অপ্রীতিকর কথা দেখার সুযোগ হয়নি। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনোটিই তিনি লঙ্ঘন করেননি এবং তাদের সাথে তাঁর সদাচরণের আচরণও কখনো পরিবর্তন হয়নি।” [৩]

মোটকথা, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর সন্ধিনামা পূর্ণ না করার অভিযোগ সম্পূর্ণ দুর্বল বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এবং এটি একেবারেই ভুল।

হযরত হাসান (রা.) কি তালাক দিতেন?

প্রশ্ন: ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো কি সঠিক যে হযরত হাসান (রা.) প্রচুর বিবাহ করতেন এবং প্রচুর তালাক দিতেন, এমনকি তাকে ‘মিতলাক’ (অর্থাৎ প্রচুর তালাক প্রদানকারী) উপাধি দেওয়া হয়েছিল? [৪]

উত্তর: এই বর্ণনাগুলো সন্দেহজনক। মনে হয় হযরত হাসান (রা.)-এর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করার কারণে অনিষ্টকারীরা অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল, তাই তারা নিজেদের ক্ষোভ ঝাড়তে একদিকে তাকে ‘মুজিল্লুল আরব’ (আরবদের অপমানকারী) বলে গালি দিয়েছিল। [৫] অন্যদিকে তাঁর সম্পর্কে এমন বর্ণনা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তিনি সারা জীবন কেবল বিবাহ ও তালাক দিতেই কাটিয়েছেন এবং সন্ধি কেবল ভোগবিলাস ও আরামের জন্য করেছিলেন।

এই সমস্ত বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল বরং অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন বা সনদবিহীন। মুত্তাসিল অর্থাৎ পূর্ণ সনদযুক্ত বর্ণনা মাত্র দুটি: একটি বালাজুরির এবং অন্যটি ইবনে আসাকিরের। বাকি সব বিচ্ছিন্ন, যাদের মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীদের হদিস পাওয়া অসম্ভব।

বালাজুরির বর্ণনা অনুযায়ী... আব্বাস বিন হিশাম কালবি তার পিতা হিশাম কালবি থেকে এবং তিনি তার পিতা মুহাম্মদ বিন সায়েব...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬০, ১৫৯।

[২] মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩, পৃ: ৩৮০৮।

এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তাবারীর বর্ণনায় এটি স্পষ্ট নয় যে পঞ্চাশ লক্ষ দিনার ছিল না দিরহাম। যদি দিরহাম ধরা হয় তবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে শতগুণ বেশি অর্থ প্রদান করেছিলেন। আর যদি দিনার ধরা হয় তবে এর অর্থ হবে দিনারের পরিবর্তে তার সমমূল্যের দিরহাম প্রদান করা হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

[৩] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ: ২২৫।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৯৭, ১৯৮।

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৫।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

কালবি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হাসান (রা.) ৯০টি বিবাহ করেছিলেন। তিনি বিবাহ করতেন এবং তালাক দিতেন, এমনকি হযরত আলী (রা.) বললেন যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে অনেক গোত্রের সাথে আমাদের শত্রুতা তৈরি হয়ে যাবে। [১]

এই বর্ণনার পুরো সিলসিলা বা ধারাটিই শিয়া ঐতিহাসিকদের। এর দুর্বলতা বরং বানোয়াট হওয়া স্পষ্ট।

বালাযুরীর পর কোনো ঐতিহাসিক পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো বর্ণনা পেশ করেননি।

পাঁচ শতাব্দী পর ইবনে আসাকির ‘তারিখে দামেশক’-এ হযরত হাসান (রা.)-এর অধিক বিবাহ করা এবং অধিক তালাক দেওয়া সংক্রান্ত একাধিক বর্ণনা জমা করেছেন [২], কিন্তু সবগুলোই মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত এবং সবগুলোর সনদ বিচ্ছিন্ন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরি শতাব্দীর কিছু ঐতিহাসিক সনদ বাদ দিয়ে এই বর্ণনাগুলো সরাসরি ওয়াকিদীর ছাত্র মুহাম্মদ বিন সা’দ-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মুহাম্মদ বিন সা’দ-এর ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’ এই বর্ণনাগুলো থেকে মুক্ত। এর পরিবর্তে এই বর্ণনাগুলো কয়েক শতাব্দী পর ‘তাহযীবুল কামাল’, ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’ এবং ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’-তে পাওয়া যায় এবং সেগুলোও বিচ্ছিন্ন সনদের সাথে। এই বর্ণনাগুলোর ওপর এক নজর দিন। ‘তারিখে দামেশক’-এ আছে:

•

১. কানাল হাসান আহসানা তিসঈনা ইমরাআতান।

“হাসান (রা.) নববই (৯০) জন নারীকে বিবাহ করেছিলেন।” [৩]

এর বর্ণনাকারী ইবনে জাদবা অর্থাৎ ইয়াজিদ বিন আইয়াশকে মিথ্যাবাদী এবং পরিত্যক্ত (মাতরুক) সাব্যস্ত করা হয়েছে। [৪]

বর্ণনায় বিবাহের স্থলে ‘আহসানা’ শব্দটি লক্ষ্যণীয়, সম্ভবত অর্থের মধ্যে বিবাহ ছাড়াও মৃতআ-কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আনা হয়েছে।

এই একই বর্ণনা ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’-তে মাদায়িনী থেকে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

[৫] মূল বর্ণনা ইবনে জাদবারই।

•

২. ফলা আলী: ইয়া আহলাল কুফা! লা তুযাভভিজুল হাসানাবনা আলী ফাইন্নাহ রাজুলুন মিতলাফ।

“হযরত আলী (রা.) বলেছেন: হে কুফাবাসী! হাসানের সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দিও না, কারণ সে অধিক তালাক প্রদানকারী।” [৬]

হাফেজ যাহাবী এটি দুই জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় একে জাফর বিন মুহাম্মদের সনদে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই সনদ বিচ্ছিন্ন। [৭]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ২/৫১৩, ত: দারুল ফিকর

[২] তারিখে দামেশক: ১৩/৩৩৯

[৩] তারিখে দামেশক: ১৩/৩৩৮, ৩৩৯, মাদায়িনী থেকে, তিনি ইবনে জাদবা থেকে

[৪] তাকরীবুত তাহযীব, তর: ৭৭১১

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/২৭১, ত: আর-রিসালাহ

[৬] তারিখে দামেশক: ১৩/৩৯৪, মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকিদী থেকে

[৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/২৬২, ত: আর-রিসালাহ

অন্য জায়গায় একে ওয়াকিদি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। [১] ওয়াকিদির দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

“হাসান বিন আলী নারীদের অধিক তালাক প্রদানকারী ছিলেন।” [২]

“হাসান বিন আলী প্রচুর পরিমাণে নারীদের তালাক দিতেন।” [৩]

উল্লিখিত বর্ণনাটি এই শব্দগুলোতেই ‘তহজীবুল কামাল’-এ বর্ণিত হয়েছে। [৪]

হাফিজ ইবনে কাসীর রহ.ও এই বর্ণনাগুলো ওয়াকিদির বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। [৫]

মোটকথা, কালবি পরিবারের মতো কউর রাফেজি, ইবনে জাদাবার মতো মিথ্যাবাদী এবং ওয়াকিদির মতো দুর্বল বর্ণনাকারীদের দেখার পর এই ধরনের বর্ণনাগুলোকে কোনো ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা দেওয়ার কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকে না।

দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনাগুলোতে হাসান রা.-এর বিয়ে সম্পর্কে একটি মত সত্তরটি, দ্বিতীয় মত দুইশত পঞ্চাশটি এবং তৃতীয় মত তিনশতটিরও রয়েছে। প্রথম মতটি ‘নাহজুল বালাগাহ’-এর ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল হাদিদ (মৃ. ৬৫৫ হি.) থেকে বর্ণিত। চরমপন্থী শিয়া ও মুতাজিলি হওয়ার কারণে তার বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা যায় না। [৬]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতটি আবু তালিব মক্কি ‘কুতুল কুলুব’ নামক তাসাউফের কিতাবে উল্লেখ করেছেন যার কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র দেওয়া হয়নি। এতে এমনকি এও লেখা হয়েছে যে, তিনি একসাথে কখনো চারটি করে বিয়ে করতেন এবং চারজনকেই একসাথে তালাক দিয়ে দিতেন, এমনকি আলী রা.-কে বলতে হয়েছিল যে, হাসানকে বিয়ের প্রস্তাব দিও না, সে প্রচুর তালাক প্রদানকারী। [৭]

সারকথা হলো, এই সমস্ত বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল বরং অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন অথবা সূত্রহীন; যদি সূত্র থাকেও তবে তাতে হিশাম কালবি, ইবনে জাদাবা এবং ওয়াকিদির মতো বর্ণনাকারী রয়েছে যারা রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহে চরম পর্যায়ের দুর্বল হিসেবে গণ্য।

বরং চিন্তা করলে এই বিষয়টি গোপন থাকে না যে, এই বর্ণনাগুলো ‘মুতা’ বিবাহকে ইমামদের সুন্নাত হিসেবে প্রমাণ করার জন্য প্রচার করা হয়েছে। সবাই জানেন যে, তালাককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আবগায়ুল হালাল ইলাল্লাহ’ (আল্লাহর নিকট হালাল কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ) হিসেবে গণ্য করেছেন। [৮]

তালাক কেবল প্রয়োজনের খাতিরে জায়েজ করা হয়েছে। কিন্তু তালাকের শিকার হওয়া নারীদের জিজ্ঞেস করুন যে তাদের ওপর দিয়ে কী বয়ে যায়। অন্তর থেকে কেমন বদদোয়া বের হয়। এমন অশোভন কাজ হাসান রা.-এর মতো একজন ভদ্র মানুষ ক্রমাগত কীভাবে করতে পারেন? তাদের নিকট কি নারীদের মর্যাদা খেলনার মতো ছিল যা বারবার পরিবর্তন করা হতো?

বলা হয় যে, মানুষ হাসান রা.-কে নিজেরাই এত বিয়ের প্রস্তাব দিত যাতে তারা সাদাতদের সাথে সম্পর্কের কারণে গর্ব করার সুযোগ পায়। কিন্তু যদি সেই সমাজে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এভাবেই হতো, তবে হাসান রা.-এর আগে তাঁর সম্মানিত পিতা রা.-এর প্রতি আরও বেশি...

(১) সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২৬৭, ত. আর-রিসালাহ

(২) তারিখু দিমাশক: ১৩/২৫১ ওয়াকিদি থেকে

(৩) তহজীবুল কামাল: ৬/২৩৭ মুহাম্মদ বিন সাদ থেকে ওয়াকিদির বরাতে বিচ্ছিন্ন সূত্রে

(৪) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/১৯৭, ১৯৮

(৫) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৩৫৩

(৬) কুতুল কুলুব: ২/৪০৯, ত. আল-ইলমিয়াহ

(৭) সুনানে আবু দাউদ, হা: ২১৮০, কিতাবুত তালাক, বাবু ফি কারাহিয়াতিত তালাক

...অধিকারী ছিলেন যে, মানুষ তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্য তাঁকে অগণিত বিয়ের প্রস্তাব দিত।

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, আত্মীয়তা ও সম্মানের জন্য হযরত হাসান (রা.)-কে এতগুলো বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে সেই মহিলারা এবং তাঁদের গোত্রগুলোর নাম ইতিহাসে কেন বিখ্যাত নয়? এই মহিলারা উম্মতের অত্যন্ত সম্মানিত, নামী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত ছিল। এই সম্মানের কারণে তাঁদের মধ্যে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের নাম ও বংশ পরিচয় সংরক্ষিত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু ইতিহাস, হাদীস ও বংশবিদ্যার সমস্ত ভাণ্ডার অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে হযরত হাসান (রা.)-এর মাত্র ছয়জন মহিলার সাথে বিবাহ প্রমাণিত:

- ১. আয়েশা খাসমিয়াহ
- ২. বিনতে আশআস
- ৩. উম্মে ইসহাক বিনতে তালহা
- ৪. উম্মে কুলসুম বিনতে ফজল বিন আব্বাস
- ৫. হিন্দ বিন সুহাইল
- ৬. খাওলা বিনতে মানজুর। এই ছয়জন ছাড়া তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। [২]

যদি হযরত হাসান (রা.) এতগুলো বিবাহ করতেন, তবে তাঁর সন্তান সংখ্যা বেশি না হলেও অন্তত স্ত্রীদের সংখ্যার অর্ধেক তো হতো। কিন্তু তাঁর মাত্র দশটি সন্তান ছিল, যারা এই উল্লিখিত ছয়জন স্ত্রীর গর্ভজাত ছিল।

□□□

হযরত হাসান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে কি আমির মুয়াবিয়া (রা.) এবং ইয়াজিদের হাত ছিল? (প্রশ্ন) হযরত হাসান (রা.)-কে কি তাঁর স্ত্রী জাদা বিনতে আশআস বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন এবং তা কি আমির মুয়াবিয়া বা ইয়াজিদের নির্দেশে করা হয়েছিল? (উত্তর) এই কাহিনী এতটাই দুর্বল যে আবু মিখনাফ, ওয়াকিদী এবং সেই যুগের কোনো শিয়া ঐতিহাসিকও এটি বর্ণনা করেননি। তাবারীসহ সেই যুগের সমস্ত ইতিহাস এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। ওয়াকিদী হযরত হাসান (রা.)-এর বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর ঘটনা অবশ্যই বর্ণনা করেছেন কিন্তু কারো ওপর এর অভিযোগ আরোপ করেননি। একইভাবে সেই যুগের অধিকাংশ বর্ণনাকারী বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর ঘটনা তো বর্ণনা করেছেন কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া বা ইয়াজিদের ওপর কোনো অভিযোগ আনেননি। [৩] এই তথ্যগুলো মাথায় রেখে পরবর্তী বিষয়টি বুঝুন:

- ১. হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর হযরত হাসান (রা.)-কে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগ সর্বপ্রথম চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে শিয়া ঐতিহাসিক মাসউদী (মৃত্যু ৩৪৬ হি.) ‘মুরুজুয যাহাব’-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি এই বর্ণনার কোনো সনদ (সূত্র) উল্লেখ করেননি। [৪]
- ২. প্রায় একই সময়ে আবুল ফারাজ ইসফাহানী (মৃত্যু ৩৫৬ হি.) ‘মাকাতিলুত তালিবীন’-এ এই কিছা বর্ণনা করেছেন, তিনিও এই বর্ণনাটি সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। [৫]

[১] তারিখ দামেশক: ১৩/২৫২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/২০৮; আল-মুহাব্বার: ১/৪৩৯, ৪৪২, ৩২৬, ৩৫০।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/২৩; তারিখ দামেশক: ১৩/২৮৩; তাহযীবুত তাহযীব: ২/৩০১; তাহযীবুল কামাল: ৬/২৫৩।

[৩] মুরুজুয যাহাব: ৩/১৮২, তবা আল-জামিআতুল লুবনানিয়াহ।

[৪] মাকাতিলুত তালিবীন, পৃ. ৬০, তবা দারুল মা’রিফাহ... অবশ্য এর আগে হযরত হাসান (রা.)-এর কথার জড়তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এর যে সনদ বর্ণনা করেছেন তাতে মুফাযযাল বিন সালিহ দুর্বল। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৬৮৫৩) যদি বিষক্রিয়ার ঘটনাও তাঁর থেকেই বর্ণিত হয় তবুও সনদ দুর্বলই হবে, অন্যথায় বর্ণনাটি সনদবিহীন গণ্য হবে। উভয় ক্ষেত্রেই এর কোনো গুরুত্ব নেই। ইসফাহানী নিজেও শিয়া ছিলেন। (আল-আ’লাম, যিরিকলী: ৪/২৬৮) তাই এই বিষয়ে তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।

(৩) এই যুগেই আল-মুতাহার বিন তাহির (৩৫৫ হিজরি) হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর ওপর অভিযোগ আরোপ করেছেন এবং কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। [১]

(৪) এর পর ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে আল্লামা ইবনুল জাওজি رحمه الله সনদের সাথে এটি বর্ণনা করেছেন, তবে এতে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ কেবল ইয়াজিদের ওপর লাগানো হয়েছে, হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর ওপর নয়। [২]

আল্লামা ইবনুল জাওজি رحمه الله থেকে আমরা যে একমাত্র সনদটি পাই, তা অত্যন্ত দুর্বল। এতে মুহাম্মদ বিন সালাম আল-জুমাহি (১৫০ হিজরি - ২৩২ হিজরি) কাদরিয়া ফেরকার একজন কবি; কেউ কেউ তাকে সদুক বলেছেন, তবে ইবনে আবি খাইসামা رحمه الله বলেন যে, তার থেকে কবিতা বর্ণনা করা যেতে পারে কিন্তু হাদিস নয়। [৩] এই সনদে আবু আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামানি অজ্ঞাত (মাজহুল)। আবু আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামানি দুইজন: একজন ওয়াহাব বিন মুনাবিহ যিনি ১০০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। দ্বিতীয়জন আবু আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামানি আশ-শানি যার মৃত্যু ১৩৯ হিজরিতে। সনদে আবু আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামানি, মুহাম্মদ বিন সালাম থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন যার জন্ম ১৫০ হিজরিতে। এই উভয় বর্ণনাকারী তাদের ইন্তেকালের পর কীভাবে বর্ণনা করতে পারেন? সুতরাং এই আবু আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামানি তৃতীয় শতাব্দীর কোনো অজ্ঞাত বর্ণনাকারী, যার উল্লেখ আসমাউর রিজাল-এ নেই।

এই কাহিনী বর্ণনাকারী মূল রাবী ইবনে জা’দাহ-ও অজ্ঞাত পরিচয় (মাজহুলুল হাল)। এখানে কি জা’দাহ বিনতে আল-আশআসের কোনো পুত্র উদ্দেশ্য? সে কি দুর্বল নাকি নির্ভরযোগ্য? আর কেউ কি নিজের মা সম্পর্কে এমন কথা প্রচার করতে পারে? এই স্তরের একজন বর্ণনাকারী হলেন ইয়াহইয়া বিন জা’দাহ, কিন্তু তার ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন সালামের কোনো উল্লেখ নেই। তাই এই একমাত্র সনদটিও বিভিন্ন কারণে সন্দেহজনক এবং দুর্বল।

(৫) এই ব্যক্তিদের পর সপ্তম হিজরি শতাব্দীর হাকিম বিন আবি উসাইবিয়া (৬৬৮ হিজরি) হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর ওপর এই একই অভিযোগ বর্ণনা করেছেন। [৪] তিনি তাবারির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, অথচ তাবারিতে এই কথাটি বিদ্যমান নেই।

(৬) সপ্তম হিজরি শতাব্দীর আবুল ফিদা এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-কে এবং অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াজিদকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। [৫]

(৭) ইমাম সুয়ুতী رحمه الله-ও এই অভিযোগ ইয়াজিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। [৬]

যাই হোক, এরা সবাই চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম হিজরি শতাব্দীর লোক। এর আগে এই বর্ণনা কোথায় ছিল? বোঝা গেল যে, হয় এটি পরে জাল করা হয়েছে, অথবা এটি এতটাই দুর্বল ছিল যে কোনো ঐতিহাসিক চার শতাব্দী পর্যন্ত একে গুরুত্ব দেওয়ার যোগ্য মনে করেননি।

এজন্যই আল্লামা ইবনে খালদুন رحمه الله লিখেছেন: “এটি যা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه তাকে তার স্ত্রী জা’দাহ বিনতে আল-আশআসের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগ করিয়েছিলেন, এগুলো শিয়াদের বর্ণনা। হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه এ থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিলেন।” [৭]

[১] আল-বাদউ ওয়াত তারিখ লিল মুতাহার বিন তাহির আল-মাকদিসি: ৫/৬, তবা মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দ্বীনিয়াহ মিসর।

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ৫/২২৯; এই বর্ণনাটিই আল্লামা ইবনুল আসির “উসদুল গাবাহ” এবং “আল-কামিল ফিত তারিখ”-এ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

[৩] মিজানুল ইতিদাল: ৩/৫৬৭, ৫৬৮; আল-আ’লাম লিয যিরিকলি: ৬/১৩৬।

[৪] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা: ১/৭৩, তবা মাকতাবাতুল হয়াত।

[৫] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/১৮৩।

[৬] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৭৩, তবা নিযার।

[৭] ওয়ামা ইউনকালু মিন আন্না মুয়াবিয়াতা দাসসা ইলাইহিমুস সান্মা মা’আ যাওজাতিহি জা’দাহ বিনতে আল-আশআস ফাহুয়া মিন আহাদিসিশ শিয়া হাশা লি মুয়াবিয়াতা মিন যালিকা। তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৬৩৯।

যুক্তির নিরিখে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো ফায়দা ছিল না। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় নিভৃত জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে বিদ্রোহের কোনো আশঙ্কা ছিল না, আর না ছিল অন্য কোনো ষড়যন্ত্রের। তাঁকে হত্যা করিয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কেনই বা তাঁর বিরোধীদের উস্কানি দেওয়ার সুযোগ দেবেন।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এ বিষয়টি গোপন ছিল না যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক নির্বোধ মানুষকে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তাঁকে হত্যা করলে তো সরকারেরই চরম ক্ষতি হতো। তাই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তো দূরের কথা, কোনো বুদ্ধিমান শাসকই এমন পদক্ষেপের কথা ভাবতে পারতেন না। এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পরেও বনু হাশিমের সাহ্যিদগণ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসা-যাওয়া করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে উপটৌকন গ্রহণ করতেন। [১]

যদি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অপরাধী হতেন, তবে বনু হাশিম তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন কেন?

এই সমস্ত বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বিষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বনু উমাইয়া পরিবারের কোনো হাত ছিল না।

হত্যাকাণ্ডে কি জাদা বিনতে আশআস জড়িত ছিলেন?

প্রশ্ন: ঠিক আছে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদ এই অপরাধে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী জাদা বিনতে আশআস কি সত্যিই এই অপরাধে লিপ্ত ছিলেন?

উত্তর: বাস্তবতা হলো, রেওয়ায়েত ও দেওয়ায়েতের (বর্ণনা ও যুক্তির) মানদণ্ডে যাচাই করলে এই অভিযোগ জাদা বিনতে আশআসের ওপরও আরোপ করা যায় না। যেসব বর্ণনায় জাদার ওপর এই অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো হয় সনদবিহীন অথবা সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। বিস্তারিত লক্ষ্য করুন:

- ১. কিছু ঐতিহাসিক এই অভিযোগ সম্বলিত বর্ণনাগুলো মুহাম্মদ বিন সাদ এবং ওয়াকিদির বরাতে নকল করেছেন, কিন্তু এই বর্ণনাগুলো স্বয়ং ওয়াকিদির কিতাবসমূহে এবং মুহাম্মদ বিন সাদের ‘তাবাকাত ইবনে সাদ’-এ বিদ্যমান নেই। এভাবে এই দুই ঐতিহাসিকের দিকে এই বর্ণনাগুলোর সম্বন্ধ করা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। এই সম্বন্ধ যদি সঠিকও হয়, তবুও ওয়াকিদির দুর্বলতা ও পক্ষপাতিত্ব কার কাছে অজানা!! [২]
- ২. সর্বপ্রথম এই অভিযোগ চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে মাসউদি শিয়া একটি সনদবিহীন বর্ণনা পেশ করে উত্থাপন করেছেন। [৩]
- ৩. এরপর একই শতাব্দীর দ্বিতীয় শিয়া ঐতিহাসিক আবুল ফারাজ আসবাহানি এই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই বর্ণনাটিও সনদবিহীন। [৪]
- ৪. এই হিজরি শতাব্দীরই ‘আল-বাদউ ওয়াত তারিখ’-এও এটি সনদবিহীন। [৫]
- ৫. পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি কাতাদা এবং আবু বকর বিন حفص (হাফস)-এর মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদ থেকে নকল করেছেন, যারা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব। মুনকাতি সনদের দুর্বলতা সুস্পষ্ট। [৬]
- ৬. পরবর্তী শতাব্দীতে ইবনুল জাওজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি মুহাম্মদ বিন সালামের মতো কাদারি এবং কয়েকজন মাজহল (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। [৭]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৭৭৭

[২] আল-বাদউ ওয়াত তারিখ লিল মুতাহহার বিন তাহির: ৫/৬

[৩] মুরুজুয যাহাব: ৩/১৮২, ত. আল-বানানিয়াহ

[৪] আল-ইসতিআব: ১/৩৮৯

[৫] মাকতালুত তালিবিন, পৃ. ৬০

[৬] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ৫/২২৬

- (৭) সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে ইবনুল আসীর ‘উসদুল গাবাহ’ এবং ‘আল-কামিল’-এ এটি উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনাটি সনদবিহীন। [১]
- (৮) ‘উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা’-তে এই বর্ণনাটি তাবারীর বরাতে দেওয়া হয়েছে, অথচ তাবারীতে এই বর্ণনাটি নেই। [২]
- (৯) সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে ‘আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার’-এও এই বর্ণনাটি সনদবিহীন। [৩]
- (১০) অষ্টম হিজরী শতাব্দীতে ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’-তেও এই বর্ণনাটি সনদবিহীন। [৪] সনদে বর্ণিত মুহাম্মদ বিন ইসহাক, ইয়াহইয়া বিন মঈন, আবু মুয়াবিয়া—এদের মধ্যে অনেকেই নামহীন ও অপরিচিত। সনদে অনেক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।
- (১১) এই সনদে নির্ভরযোগ্যতার অভাব রয়েছে। এতে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) রয়েছে। [৫]
- (১২) আবু নুয়াইম (মৃত্যু ৪৩০ হি.)-এর সনদেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। [৬] ইয়াহইয়া বিন মঈনের মৃত্যু ২৩৩ হিজরী। [৭] গ্রন্থকার ও ইয়াহইয়ার মাঝে দুই প্রজন্মের ব্যবধান রয়েছে। [৮] ফলে এই বর্ণনাটি মুরসাল। এতেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। [৯]
- (১৩) নবম হিজরী শতাব্দীতে ‘তারিখুল খুলাফা’-তে এটি সনদবিহীন। [১০]
- (১৪) নবম হিজরী শতাব্দীতে হাফেজ ইবনে হাজার (মৃত্যু ৮৫২ হি.)-এর সনদেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। [১১] সুয়ুতী (মৃত্যু ৯১১ হি.)-এর বর্ণনায়ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

সারকথা এই যে, উম্মত এই বর্ণনার ওপর একমত নয়। এটি সনদবিহীন এবং দুর্বল। এটি কোনো একটি সনদের মাধ্যমেও প্রমাণিত নয়। যখন এর সনদই নির্ভরযোগ্য নয়, তখন এই বর্ণনাটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ. বর্ণনার বিষয়বস্তুর ওপর চিন্তা করুন:

১. এটি সাহাবী হযরত আশ’আছ বিন কায়েস (রা.)-এর ব্যাপারে। তিনি একজন মহান সাহাবী ছিলেন। তিনি ইয়ারমুক ও কাদিসিয়ার যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। শত্রুদের চোখে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি নিজের গোত্রের জন্য অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তিনি তাদের জান, মাল ও সন্তানদের রক্ষা করেছিলেন।

[১] আসাদ... আল-কামিল ফিত তারিখ ৫/৮

[২] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা ১/৩০, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া। অর্থাৎ তাবারীতে এই বর্ণনাটি নেই।

[৩] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার ১/৯৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৩৩৯

[৫] সিয়াকু আলামিন নুবালা ৩/৪৫৩, মুয়াসসাসাতুর রিসালা

[৬] তাহযীবুল কামাল ৬/৫২৬

[৭] তাকরীবুত তাহযীব নং ৫৩৫

[৮] তাহযীবুল কামাল ৭/২৫৩

[৯] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবী ৪/৩-৪, বাশার ৫/৯-১০

[১০] তারিখুল খুলাফা লিস সুয়ুতী, পৃ. ১৭৩

[১১] তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩০০, তাবা’আতে দাক্বি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুতরাং এটা পুরোপুরি সম্ভব যে, হযরত আশআছ বিন কায়েস (রা.)-এর কন্যা হযরত জা'দাহকেও এই কারণে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অপবিত্র ধৃষ্টতায় এটাও ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, তিনি হযরত হাসান (রা.)-এর ইজ্জত ও সম্মান। ঘরের কত্রীর সুনাম পুরো পরিবারের সম্মান এবং তার প্রতি কটুক্তি পুরো বংশের বদনামের কারণ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখে-শুনে এমন স্ত্রী খোঁজে যে সেবাপরায়ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়। ভেবে দেখুন, আপনি বা আমি কি কোনো দুশ্চরিত্রা, নীচ এবং প্রতারক নারীকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে রাখা পছন্দ করতে পারি? যদি না হয়, তবে ভেবে দেখুন যে, সাইয়্যিদুনা হাসান (রা.)-এর মতো উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কি কোনো নীচ স্বভাবের, লোভী এবং ধূর্ত নারীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন? যদি জা'দাহ কোনো ষড়যন্ত্রকারী এবং নীচ নারী হতেন, তবে কয়েক মাসের মধ্যেই তার চরিত্রের কথা জানা যেত। হযরত হাসান (রা.) তাকে তালাক দিতে পারতেন। অথবা বিষের প্রভাব প্রকাশ পাওয়ার পর আপনি বলে দিতে পারতেন যে, এই নারী প্রতারক, যাতে পরিবারের বাকি সদস্যরা তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত বিবাহবন্ধনে রাখা এবং তার বিরুদ্ধে কিছু না বলা হযরত হাসান (রা.)-এর নিজ সম্মানিত স্ত্রীর প্রতি আস্থার প্রমাণ।

২. এটাও ভেবে দেখুন যে, শেষ পর্যন্ত হযরত আশআছ বিন কায়েস (রা.)-এর মতো প্রখ্যাত সাহাবীর কন্যা কেন এমন জঘন্য কাজ করবেন? ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে কেন তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি এবং বদনাম কুড়াবেন? সেই যুগে বিচার বিভাগ ও কাজীর পদে বড় বড় সাহাবী ও তাবয়ীগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন, বিচার বিভাগ ছিল স্বাধীন। এমন পরিস্থিতিতে জা'দাহর কাছে কী নিশ্চয়তা ছিল যে, সাদাতগণ তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন না এবং কাজী সাহেবগণ হত্যা মামলার তদন্ত করে কিসাস নেবেন না? চিন্তা করলে এই প্রশ্নটিই জা'দাহ বিনতে আশআছ-এর ওপর থেকে অভিযোগ খণ্ডন করে দেয়।

এই জাল বর্ণনাগুলোতে বলা হয়েছে যে, জা'দাহ ইয়াজিদের সাথে বিয়ের লোভে এই কাজ করেছিলেন, যার জন্য ইয়াজিদ অথবা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)—উভয়েই তাকে প্ররোচিত করেছিলেন। এই বর্ণনাটি মেনে নিলে বলা যেতে পারে যে, জা'দাহকে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হয়তো তারা দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, শুধুমাত্র জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কাউকে এত বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করতে পারে না যতক্ষণ না কোনো বড় ধরনের লোভ থাকে। যদি এই লোভ ইয়াজিদের সাথে বিয়ের প্রস্তাব হয়ে থাকে, তবে জা'দাহর এই বিয়েতে কেনই বা আগ্রহ থাকতে পারত? তার স্বামী হযরত হাসান (রা.) তো আরব ও অনারবের সরদার ছিলেন। জা'দাহ এর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা আর কী পেতে পারতেন যে তিনি ইয়াজিদের স্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখবেন?

৩. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, খোদ বনু হাশিম হযরত জা'দাহকে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত এবং পবিত্র ও সচ্চরিত্রা মনে করতেন। এই কারণেই হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর সাহেবজাদা হযরত আব্বাস জা'দাহকে বিবাহ করেছিলেন। [১]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩১৫, দার সাদির।

যদি তারা এই কাজে লিপ্ত হতেন, তবে বনু হাশিম তাদের সাথে আত্মীয়তা করা পছন্দ করত না, বরং তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে শাস্তি দেওয়াত অথবা অন্তত বনু উমাইয়ার কাছে অবশ্যই প্রতিবাদ করত। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.)-সহ সাদাতদের মধ্যে কেউ কখনো বনু উমাইয়ার ওপর এই অভিযোগ আনেননি বা মামলা করেননি।

□□□

হযরত হাসান (রা.)-এর হত্যাকারী কে ছিল?

যেহেতু এই বিষয়ে কোনো বর্ণনা সहीহ নয় বরং অধিকাংশ বর্ণনাই সম্পূর্ণ সনদবিহীন, তাই অনুমানের ভিত্তিতে এই জট খোলার সুযোগ রয়েছে যে, এটি কার কাজ ছিল? যদি তদন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে এ জাতীয় ঘটনায় এটি দেখা হয় যে:

- ১. নিহতের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি লাভ কার হয়েছে?
- ২. তদন্তকে ভুল পথে কে পরিচালিত করছে?

আসুন প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করি।

সবাই জানেন যে হযরত হাসান (রা.)-এর আশেপাশে একনিষ্ঠ শিয়া এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিয়া—উভয় প্রকারের মানুষই একত্রিত ছিল। একনিষ্ঠ শিয়ারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে আপনার সন্ধির ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে অসৎ প্রকৃতির সঙ্গীরা এতে শান্ত ছিল না এবং যত দ্রুত সম্ভব বিদ্রোহী আন্দোলন শুরু করে ক্ষমতার দখল নিতে চেয়েছিল। হযরত হাসান (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা তাঁর জীবদ্দশায় এই আন্দোলন শুরু করতে পারছিল না। হযরত হাসান (রা.)-এর মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি লাভ এই লোকেরাই উঠাতে পারত। সুতরাং এটি পুরোপুরি সম্ভব যে, তাঁর সাথে চলাফেরা করা লোকেরাই হযরত হাসান (রা.)-এর খাবারে বিষ মিশিয়েছিল যাতে তাঁর পরে বিদ্রোহী আন্দোলন শুরু করা যায়। এই সম্ভাবনাটি আরও দুটি বিষয় দ্বারা শক্তিশালী হয়:

১. একটি হলো এই যে, এই লোকেরাই আগে হযরত হাসান (রা.)-এর ওপর প্রাণঘাতী হামলা করেছিল যখন তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করছিলেন। [১]

এছাড়া যখন হযরত হাসান (রা.) সন্ধির ঘোষণা দিলেন, তখন এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী আপনার তাঁবুতে হামলা করে ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, এমনকি আপনার পায়ের নিচ থেকে গালিচাও টেনে নিয়ে যায়। [২]

এটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত যে, হযরত হাসান (রা.)-এর আশেপাশে থাকা এই লোকেরাই পুনরায় তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল এবং এবার সফল হয়েছিল।

২. হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তেকালের পরের পরিস্থিতির দিকে তাকালে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে প্রকৃত হত্যাকারী কারা ছিল। আমরা দেখি যে, হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তেকাল হওয়া মাত্রই ইরাকে বিদ্রোহী আন্দোলন দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এই কারণেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নরদের কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। আর এই সূত্রেই বিদ্রোহীদের সাথে হযরত আমর বিন হামিক (রা.) এবং হুজর বিন আদি (রা.)-এর মতো কিছু একনিষ্ঠ বুজুর্গের মূল্যবান প্রাণও বিসর্জিত হয়, যারা ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৬৩, যুহরী থেকে; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/৯৩।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/১৫৯, ইসমাইল বিন রাশিদ থেকে।

আন্দোলনে शामिल হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং আসল হত্যাকারী সম্ভবত এই সাবায়ী লোকেরাই ছিল। এই লোকেরাই ভুল বর্ণনা ছড়িয়ে তদন্তকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। আসল অপরাধীদের লুকিয়ে নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যাকারী হিসেবে প্রচার করে দিয়েছিল। “চোরই শোরগোল করে” প্রবাদটি এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যই বলা হয়।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি হযরত হাসান (রা.)-এর মৃত্যুতে খুশি হয়েছিলেন?

প্রশ্ন: বর্ণিত আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর মৃত্যুতে খুশি হয়েছিলেন? তাঁর খুশি দেখে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছিলেন: খুশি হবেন না, আপনিও তাঁর পরে বেশিদিন বাঁচবেন না। [১] একইভাবে মাসউদী একটি বর্ণনা পেশ করেছেন যে, যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসান (রা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন, তখন তাঁর মজলিস আনন্দের আতিশয্যে তাকবীরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। [২] এটা কি সত্য?

উত্তর: প্রথম বর্ণনাটি আবু হানিফা দিনাওয়ারী শিয়া বর্ণনা করেছেন এবং তাও আবার সনদ (সূত্র) ছাড়াই। সুতরাং এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। দ্বিতীয় বর্ণনাটির মিথ্যা হওয়া এভাবে স্পষ্ট যে, মাসউদী এটি ইবনে জারীর তাবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, অথচ ইবনে জারীর তাবারী নিজে তাঁর ইতিহাসে এই বর্ণনাটি একেবারেই উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, মাসউদী নিজেই শিয়া। আবার এই সনদে মুহাম্মদ বিন হুমাইদ আর-রাযী রয়েছে। তাকেও যয়ীফ (দুর্বল) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। [৩] এছাড়া এই সনদে আলী বিন মুজাহিদও রয়েছে যিনি মাতরুক (পরিত্যক্ত)। [৪] এভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই বর্ণনাগুলো শিয়াদের মনগড়া এবং একেবারেই ভিত্তিহীন।

[১] আখবারুল তিওয়াল, আবু হানিফা দিনাওয়ারী, পৃ. ২২২

[২] মুরুজুয যাহাব: ৩/১৮৫, প্রকাশনা: আল-জামিআতুল লুবনানিয়া

[৩] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৫৮৩৩

[৪] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৪৭৯০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) সংক্রান্ত সংশয়সমূহ

একটি গোষ্ঠী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর চরিত্র হননের জন্য অনেক শক্তি ব্যয় করে আসছে। আব্বাসী আন্দোলনের সময় বনু উমাইয়্যার বিরোধিতা একটি রাজনৈতিক অভিযান হিসেবে করা হয়েছিল। এই যুগে অনেক বর্ণনা জাল করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার ফলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সীরাত সম্পর্কে প্রচুর সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, একটি গোষ্ঠী হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতিরক্ষায় এতদূর এগিয়ে গেছে যে তারা হাদীস ও ইতিহাসের ভাণ্ডারের এমন সহীহ বর্ণনাগুলোকেও অস্বীকার করতে বা সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দিতে উদ্যত হয়েছে, যা থেকে তাঁর বা তাঁর সঙ্গীদের কোনো বিচ্যুতি প্রমাণিত হয়। এই গোঁড়ামির কারণেই এই গোষ্ঠী তাঁকে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে এবং এমন পক্ষপাতমূলক মতাদর্শ গ্রহণ করেছে যা সহীহ হাদীসসমূহের পরিপন্থী। এই পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর আরোপিত ভুল অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করছি। সেই সাথে এই চেষ্টাও থাকবে যেন আমরা এই প্রতিরক্ষায় পক্ষপাতদুষ্ট গোষ্ঠীর অন্ধ অনুসরণ থেকে বিরত থাকি এবং প্রতিটি বিষয়কে সহীহ বর্ণনা ও ইলমে আসমাউর রিজালের আলোকে দেখি।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর আরোপিত সকল আপত্তির নয়, বরং কেবল প্রসিদ্ধ সন্দেহ ও সংশয়গুলোর পর্যালোচনা করছি; তা সত্ত্বেও বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে এই অধ্যায়টি স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা দীর্ঘ হবে। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো মনে গেঁথে নিন যে:

- সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর কিছু পদক্ষেপ, যা উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট সঠিক ছিল না, সেগুলোকে খতায় ইজতিহাদী হিসেবে গণ্য করা হয়।
- কিছু সংশয় কিছু সহীহ বর্ণনা ভাসা ভাসা ভাবে পড়া এবং সেগুলোর প্রকৃত অর্থ না বোঝার কারণে সৃষ্টি হয়। আমরা বিশ্লেষণ করে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ পেশ করব যাতে ভুল সংশয়গুলো নিরসন হয়।
- অধিকাংশ আপত্তি যযীফ এবং মনগড়া বর্ণনার ওপর বিশ্বাস করার ফল। আমরা ইলমে আসমাউর রিজালের আলোকে প্রথমে সেই বর্ণনাগুলোর সঠিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করব। সনদ দুর্বল প্রমাণিত হওয়ার পর সেগুলোর ওপর যৌক্তিক জেরা করা হবে।
- এগুলোর মধ্যে প্রতিটি আপত্তির অধীনে অনেকগুলো আনুষঙ্গিক প্রশ্ন রয়েছে যা আমরা সেখানেই উল্লেখ করব।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে প্রচলিত সন্দেহসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

- তাঁর ক্ষমতা ছিল অবৈধ ও অসাংবিধানিক।
- হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মকর্তাগণ আইনের ঊর্ধ্বে ছিলেন। কোনো কারণ ছাড়াই বা তুচ্ছ কারণে তাঁরা মানুষকে কঠোরতম শাস্তি দিতেন, যেমন বসরার শাসক আবদুল্লাহ বিন আমর বিন গাইলান এবং যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান। তাঁর কিছু গভর্নর ও অফিসার বিলাসপ্রিয় ছিলেন, যেমন মুগীরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
- হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরোধীদের শিরশ্ছেদ করার ধারা শুরু করেন এবং কিছু সাহাবীর মাথাও কলম করান, যেমন আম্মার বিন ইয়াসির এবং আমর বিন আল-হামিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা কাটা হয়েছিল।
- বিরোধীদের বিষ প্রয়োগ করে শেষ করে দেওয়া হতো, যেমন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদুর রহমান বিন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
- হুজর বিন আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো ইবাদতকারী ও পরহেজগার বুজুর্গকে কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করিয়েছেন।
- হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর গালিগালাজ ও নিন্দার প্রথা চালু করেন।
- নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে যিয়াদ বিন সুমাইয়ার বংশ পরিচয় বদলে দেন। তাকে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছেলে ঘোষণা করে নিজের ভাই বানিয়ে নেন, ইসলামে যার কোনো অবকাশ নেই।
- আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর কর্মকর্তাগণ আর্থিক দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই এই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি গনীমতের মাল থেকে সোনা, রূপা এবং মূল্যবান জিনিসপত্র নিজের জন্য আলাদা করার নির্দেশ দেন। সরকারি অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতেন।
- কিসাসে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্লোগান দিয়ে উম্মতকে প্ররোচিত করেন, কিন্তু যখন নিজে শাসক হলেন তখন কিসাসের কথা ভুলে গেলেন।
- তিনি শরীয়ত পরিবর্তন করে দেন এবং বিদআত উদ্ভাবন করেন। জিম্মির দিয়াতের অর্ধেক অংশ তার উত্তরাধিকারীদের পরিবর্তে নিজের জন্য বরাদ্দ করেন। মুসলমানকে জিম্মির ওয়ারিশ ঘোষণা করেন। খুতবা দাঁড়িয়ে না দিয়ে বসে দিতেন। মৃত্যুর সময়ও আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে টুকরো টুকরো করে ফেলার ওসিয়ত করেন। হযরত মুগীরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে মিলে উম্মতকে ফিতনা-ফাসাদের পথে ঠেলে দেন।
- ইয়াজিদকে অবৈধভাবে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে উম্মতকে ধ্বংস করেন। ইয়াজিদের অপকর্মের দায়ভার তাঁর ওপরই বর্তায়।

এখন আমরা এই অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করব। সেই সাথে কিছু আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরও পেশ করব।

১) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ক্ষমতা কি অবৈধ ছিল?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ক্ষমতাকে অবৈধ ও শরীয়ত পরিপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। আসুন! আমরা বিবেচনা করি যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন কি সাংবিধানিক ও শরীয়তসম্মত ছিল কি না।

১. সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। [১]

এই ঐতিহাসিক সত্যটি শিয়া সম্প্রদায়ও স্বীকার করে যে, হযরত হাসান (রা.) উম্মতের নেতৃত্ব হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর অনুগতরা ছাড়াও সেই সমস্ত ব্যক্তিরও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যারা জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন। সুতরাং যে বছর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খলীফা হন, সেই বছরকে “আমুল জামায়াত” (ঐক্যের বছর) বলা হয়। [২]

২. ইসলামের ফকীহগণ “ইমাম”-এর জন্য যেসব শর্ত ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেগুলোর ওপর পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলিম, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, সচেতন, সুস্থ, ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী, কুরাইশ বংশোদ্ভূত, ফকীহ ও মুজতাহিদ এবং সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তিতে ভূষিত। এগুলো সেই গুণাবলী যা খিলাফতের পদের জন্য উল্লেখ করা হয়। [৩]

আল্লামা মাওয়াদ্দী (রহ.)-এর মতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

- একটি হলো আহলে হাল ওয়াল আকদ (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ) মিলে কাউকে খলীফা নির্বাচন করবেন।
- দ্বিতীয়টি হলো পূর্ববর্তী খলীফা কাউকে মনোনীত করবেন। [৪]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একজন খলীফা হযরত হাসান (রা.) তাঁর কাছে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

অধিকাংশ ফকীহ খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চারটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন:

১. খলীফা ইন্তেকাল করবেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মতো মৃত্যুর আগে কারো নাম প্রস্তাব করবেন।
২. খলীফা ইন্তেকাল করার আগে বিষয়টি শুরার (পরামর্শ সভা) ওপর ছেড়ে দেবেন, যেমনটি হযরত উমর ফারুক (রা.) করেছিলেন।
৩. আহলে হাল ওয়াল আকদ নিজেরা একত্রিত হয়ে কাউকে নির্বাচন করবেন, যেমনটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে নির্বাচন করা হয়েছিল।
৪. খলীফা তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে পদত্যাগ করবেন।

[১] ইমাম বুখারী এই ঘটনাটি পূর্ণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭০৩, কিতাবুস সুলহ, বাব কওলুন নবী ﷺ লিল হাসান ইবনে আলী: ইন্না ইবনী হাযা সাইয়্যিদুন)

[২] তারিখ খলীফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা: ২০৩; আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা: ২১৮, ২২০

[৩] মাআসিরুল আনাফাহ ফী মাআলিমিল খিলাফাহ লিল কালকাশান্দী: ১/ ৩১ থেকে ৩৭, কুয়েত সংস্করণ; আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ লিল মাওয়াদ্দী, পৃষ্ঠা: ৯, ২০

[৪] আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ লিল মাওয়াদ্দী, পৃষ্ঠা: ২১, ২২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

স্পষ্টতই, ফকীহগণ এই চতুর্থ সুরতটি (পদ্ধতি) হযরত হাসান (রা.)-এর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট খিলাফত অর্পণ এবং এর ওপর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য থেকে গ্রহণ করেছেন, অন্যথায় এর আগে উম্মতের মধ্যে এমন কোনো উদাহরণ বিদ্যমান ছিল না।

মোটকথা, ফিকহী মূলনীতির আলোকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাংবিধানিক শাসক হওয়া সুস্পষ্ট। এরপর তাঁর খিলাফতকে আইনবহির্ভূত বলা একেবারেই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। এটা ঠিক যে, সাংবিধানিক শাসক হওয়ার আগে তিনি হযরত আলী এবং হযরত হাসান (রা.)-এর ব্যাপারে যে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং ইরাকি খিলাফতের ব্যাপারে যে সংগ্রাম করেছিলেন, তাকে সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল মনে করা সত্ত্বেও সঠিক বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর শরয়ী শাসকের মর্যাদা লাভ করাও একটি সর্বসম্মত বিষয়। এটি অস্বীকার করা গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবয়ীনগণ তাঁকে ইমাম হিসেবে মানতেন এবং তাঁকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলে সম্বোধন করতেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলতেন এমন ব্যক্তিদের এক বালক লক্ষ্য করুন:

- হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত (রা.) [১]
- হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) [২]
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) [৩]
- হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.) [৪]
- হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রা.) [৫]
- হযরত আমর বিন হাযম আল-আনসারী (রা.) [৬]
- হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) [৭]
- হযরত উবাইদ বিন আউস (রা.) [৮]
- হযরত আমর বিন মুররাহ (রা.) [৯]
- হযরত আদী বিন হাতিম (রা.) [১০]
- হযরত আশআস বিন কায়েস (রা.) [১১]

[১] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৩৪/৫; আল-আদাবুল মুফরাদ লিল-ইমাম বুখারী, পৃ. ৩৮৬, তাবা দারুল বাশায়ের বৈরুত। য়ায়েদ বিন সাবিত (রা.) তাঁর ফিকহী প্রজ্ঞার কারণে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন, তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে চিঠিপত্রে ‘আমীরুল মুমিনীন’ উপাধিতে সম্বোধন করতেন।

[২] শুআবুল ঈমান, হা: ৭৭০৬

[৩] সহীহ বুখারী, ফাযায়েলুস সাহাবা, বাবু যিকরি মুয়াবিয়া (রা.), হা: ৩৭৬৫; মুস্তাখরাজ আবি আওয়ানা: ৩৩৩/৯, তাবা আল-জামিআতুল ইসলামিয়া

[৪] ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা: ২৫/৮ মুসনাদে আবি ইয়ালা-এর বরাতে, তাবা দারুল ওয়াতান

[৫] আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবারানী, হা: ১১৭৬

[৬] মুসনাদে আবি ইয়ালা, হা: ৭৩৪৬

[৭] মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার লিল-বায়হাকী: ৩০/১৩, তাবা দারুল ওয়াফা, কায়রো

[৮] জামিউল আহাদীস: ২০২/৩৮

[৯] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা: ৯৩৮

[১০] মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুয়াইম, হা: ২১০০

[১১] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২৩৮/১

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত ইয়াযিদ বিন জারিয়া আনসারী (রা.) আনসারদের একটি পূর্ণ জামাতের সাথে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে আমীরুল মুমিনীন বললেন। [১]

• হযরত উরইয়ান বিন হাইসাম (রা.) [২]

• হযরত হাওয়াহ বিন কায়েস [৩]

• হযরত মা'ন বিন আলী (রা.) [৪]

• হযরত নুমাইর বিন আওস (রা.) [৫]

• তাবিঈদের একটি জামাত [৬]

• কুরাইশদের নেতৃবৃন্দ [৭]

• মদীনার আনসার [৮] সাধারণ মানুষ [৯]

তাই এটি সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, কেউ কোনো অসাংবিধানিক শাসক বলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মর্যাদা কমানোর চেষ্টা করবে।

খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত হওয়ার অর্থ কী?

সাধারণত হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালকে অনৈসলামিক প্রমাণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী পেশ করা হয়:

“اَلْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا”

(আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র হবে।) [১০]

এই হাদীসটি তার নিজ স্থানে প্রমাণিত এবং সহীহ, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ত্রিশ বছর পর আসা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন অনৈসলামিক ছিল। যদি এই অর্থই নেওয়া হয়, তবে অনিবার্যভাবে এই প্রশ্ন দেখা দেবে যে:

রাসূলুল্লাহ (সা.), যিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ও নেতা, তিনি কি এমন এক দুর্বল শাসনব্যবস্থা গঠন করে গিয়েছিলেন যা অর্ধশতাব্দীও টিকে থাকতে পারেনি? আর তিনি কি উত্তরসূরিদের এমন এক অপরিপক্ক জামাত রেখে গিয়েছিলেন যাদের জীবদ্দশাতেই ইসলামী ব্যবস্থায় ফাটল ধরেছিল?

এই হাদীসের এই অর্থ মেনে নেওয়া হলে এই প্রশ্নও দেখা দেবে যে, ইসলামী শাসক বা খলিফা নিয়োগ করা সমস্ত ফকীহদের মতে ওয়াজিব...

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৭১

[২] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ২০৮৩৯, প্রকাশনা: আল-মাজলিসুল ইলমী

[৩] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/১৫০, প্রকাশনা: মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া

[৪] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৯/৩৬২

[৫] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৯/৩৯১

[৬] আখবারে মক্কা লিল-আযরাকী: ১/১৭৩

[৭] আখবারে মক্কা লিল-আযরাকী: ১/২৭০

[৮] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৮৭১

[৯] আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৭৭৩১

[১০] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬৬৫৭

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস)

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জানাযার নামায বিলম্বিত করা হয়েছিল। তবে কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তিরোধানের ত্রিশ বছর পর এই দায়িত্ব ত্যাগ করা হয়েছিল? আর উম্মত কি এখন পর্যন্ত এই দায়িত্ব থেকে গাফেল রয়েছে? বরং স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রা.), যারা আর্মীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর পরেও বিদ্যমান ছিলেন, তারা কি এই দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন? স্পষ্টতই এসব কথার উত্তর ইতিবাচক হতে পারে না।

ত্রিশ বছর বলতে নবুওয়াতের আদলে খেলাফত বোঝানো হয়েছে:

হাকিকত বা বাস্তবতা হলো, এই বর্ণনার অর্থ এই নয় যে ত্রিশ বছর পর ইসলামী শাসন শেষ হয়ে যাবে; বরং এর অর্থ হলো ইসলামী শাসনের সর্বোত্তম, আদর্শ এবং অনুকরণযোগ্য নমুনা ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। এজন্যই একে “খেলাফতে রাশেদা” বলা হয়। ইসলামী রাজনীতির পথপ্রদর্শক মূলনীতি প্রদানকারী খেলাফতও এই ত্রিশ বছরই হবে। এর অর্থ এই নয় যে এরপর ইসলামী শাসন পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একারণেই এই ত্রিশ বছরের খেলাফতকে গবেষকগণ “আল-খিলাফাতু আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ” (নবুওয়াতের আদলে খেলাফত) বা “খিলাফাতুন নুবুওয়াহ” (নবুওয়াতী খেলাফত) বলেছেন। [১]

অর্থাৎ এই ত্রিশ বছরের খেলাফতও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতের মতো কিয়ামত পর্যন্ত একটি নীতিমালা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

“আল-খিলাফাতু সালাসুন সানাহ” (খেলাফত ত্রিশ বছর) হাদীসটি সমালোচকদের দৃষ্টিতে:

অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং মুতাকাল্লিম “আল-খিলাফাতু সালাসুন সানাহ” হাদীসটিকে সহীহ বা সঠিক বলে গণ্য করেছেন। তবে কিছু ব্যক্তি যারা এই বর্ণনার ওপর জেরা বা সমালোচনা করেন, তাদের মতামতও দেখে নেওয়া উচিত। হযরত মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা.বা.) এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

“কিছু আলেম এই হাদীসের সনদের ওপর সমালোচনা করে একে অ-সহীহ (গাইরে সহীহ) বলেছেন। যেমন কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন: ‘হাযা হাদীসুন লা ইয়াসিহু’ (এই হাদীসটি সহীহ নয়)। আবার অন্য কিছু আলেম বলেছেন যে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত (মুজমাল) হাদীস এবং এতে ত্রিশ বছরের পর একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। একারণেই হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর শাসনকাল সর্বসম্মতিক্রমে এর থেকে ব্যতিক্রম।” [২]

বারো খলীফার হাদীস:

অন্যদিকে কিছু সহীহ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ত্রিশ বছরের পরেও খলীফাদের ধারা অব্যাহত থাকবে।

জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: মানুষ কুরাইশদের অনুসারী। এই বিষয়টি (খেলাফত) শেষ হবে না যতক্ষণ না...

[১] ফাতহুল বারী: ১৩/২১২, উমদাতুল কারী: ২৩/২৮২, মিরকাতুল মাফাতিহ: ৯/৩৮৬৩।

[২] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আওর তারিখী হাকায়েক, পৃষ্ঠা: ১৩।

নোট: আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.)-এর এই হাদীসটিকে অ-সহীহ বলা একটি ব্যতিক্রমী মত। জমহুর মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিমদের নিকট এটি সহীহ এবং আহলে সুন্নাতের আকিদাও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন: “আহলে সুন্নাত সেই হাদীস অনুযায়ী কথা বলেন যা সুন্নাহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে: ‘খিলাফাতুন নুবুওয়াহ সালাসুন সানাহ সুন্নাহ ইউসিরু মুলকান’।” (মিনহাজুন সুন্নাহ: ৩/৫২২)। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: আশ-শারীয়াহ লিল আজ্জুররী: বাব যিকর খিলাফাতু আবী বকর ওয়া উমর ওয়া উসমান ওয়া আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম; শারহ উসুল ইতিকাদ আহলিস সুন্নাহ লি ইবনিল মানসুর আর-রাযী: সিয়াক মা রুয়ি ফি তারতীবিল খিলাফাহ বাইনাল আরবাআ; শারহস সুন্নাহ লিল বাগভী: বাব ফাদলিস সাহাবা।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তাদের মধ্যে বারো জন খলিফা অতিবাহিত হবেন যারা সবাই কুরাইশ থেকে হবেন।

“মানুষ কুরাইশদের অনুসারী। এই বিষয় (খিলাফত) শেষ হবে না যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বারো জন খলিফা অতিবাহিত হন, তারা সবাই কুরাইশ হবেন।” [১]

বারো জন খলিফা পর্যন্ত ইসলাম শক্তিশালী থাকবে।

“এই দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত সমুন্নত থাকবে, যতক্ষণ না এতে বারো জন খলিফা অতিবাহিত হন যারা কুরাইশ হবেন।” [২]

জাবির বিন সামুরা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: এই দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না বারো জন খলিফা অতিবাহিত হন যারা কুরাইশ থেকে হবেন।

জাবির বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই বর্ণনাটি আমির বিন সাদ, সিমাক, সাঈদ আল-হামদানি, আব্দুল মালিক বিন উমাইর, ইমাম শাবি রাহিমাহুমুল্লাহ এবং আরও অনেক তাবেয়ী বর্ণনা করেছেন। [৩]

সামুরা বিন জুনদুব থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: বারো জন খলিফা এমন হবেন যাদের ওপর উম্মত ঐক্যবদ্ধ হবে।

“বারো জন খলিফা এমন হবেন যাদের ওপর উম্মত ঐক্যবদ্ধ হবে।” [৪]

সুতরাং “খিলাফত ত্রিশ বছর” এর বর্ণনাটিকে সহীহ মেনে নিয়ে, এর অর্থ বারো জন খলিফার হাদীসের আলোকে বুঝতে হবে। উভয় হাদীসের মধ্যে আপাত বৈপরীত্য দূর করার জন্য এই বাস্তবতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, ইসলামী খিলাফত কেবল চারজন খলিফার মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়নি বরং এরপরও এর ধারা অব্যাহত ছিল যাতে বারো জন এমন প্রখ্যাত খলিফার আবির্ভাব সুনিশ্চিত যাদের ওপর পুরো উম্মত একমত হবে এবং তাদের যুগে ইসলাম সমুন্নত ও বিজয়ী হবে। এই খলিফাদের মধ্যে অনেকে অতিবাহিত হয়ে গেছেন এবং কিছু পরে আসবেন।

অতিবাহিত হওয়া শ্রেষ্ঠ খলিফাদের মধ্যে সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, সাইয়্যিদুনা উমর ফারুক, সাইয়্যিদুনা উসমান গনি, সাইয়্যিদুনা আলী আল-মুরতাজা, সাইয়্যিদুনা হাসান এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবারের রাদিয়াল্লাহু আনহুদের সাথে সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যায় না, কারণ তাদের যুগে মুসলমানরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল, তা অমুসলিমরাও স্বীকার করে।

“ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا” এর অর্থ কী?

আর এই কথা যে “আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর” হাদীসটিতে “ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا” (এরপর রাজতন্ত্র আসবে) শব্দগুলোও রয়েছে, তো এই কথাটি তার নিজ স্থানে সঠিক যে এরপর যে যুগ শুরু হয়েছিল, তাতে ‘রাজতন্ত্রের’ লক্ষণগুলো স্পষ্ট ছিল। পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা (শুরা) সীমিত হয়ে গিয়েছিল এবং একটি পরিবার অর্থাৎ বনু উমাইয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই কারণেই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকে খিলাফতে রাশেদার মানদণ্ডে গণ্য করা হয় না। স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এই পার্থক্য স্বীকার করতেন, তাই...

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ১৮২১, বাব আল-খিলাফাতু ফি কুরাইশ

[২] সহীহ মুসলিম, বাব আল-খিলাফাতু ফি কুরাইশ

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২০৮০৫ হাসান সনদে

[৪] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪২৪৯, কিতাব আল-মাহদী

যদি কেউ তাঁকে বাদশাহ বলতেন, তবে তিনি তাতে কিছু মনে করতেন না। একবার হযরত

আবু বকরা (রা.) তাঁকে একটি হাদীস শোনালেন:

خِلَافَةُ نَبْوَةٍ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ

(নবুওয়াতের খিলাফত ত্রিশ বছর, এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন।)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বললেন: قَدْ رَضِينَا بِالْمُلْكِ (আমরা রাজত্বেই সন্তুষ্ট।) [১]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আবু বকরা (রা.)-কে বললেন:

”أَتَقُولُ الْمُلْكَ؟ فَقَدْ رَضِينَا بِالْمُلْكِ”

(তুমি কি বলছ এটি রাজত্ব? তবে আমরা রাজত্বেই সন্তুষ্ট।) [২]

তবে খিলাফতে রাজকীয় বৈশিষ্ট্যের এই সংমিশ্রণ সরকারের বৈধতা ও শরয়ী হওয়ার পরিপন্থী নয়, আর না এর দ্বারা এটি ইসলামী সরকার হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়।

তাছাড়া যে পরিস্থিতিতে এই বিপ্লব এসেছিল, তাতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অনেকটা বাধ্য ও অপারগও ছিলেন। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) লিখেছেন:

“শাসনকার্যের এটি একটি স্বাভাবিক দাবি যে, এই সম্মানে শাসক অনন্য হবেন এবং একজনকে অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হবে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই অপরিহার্য বিষয়টি নিজের সত্তা এবং নিজের কওম থেকে কীভাবে দূরে রাখতে পারতেন, কারণ এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় যা দলীয় সংহতি থেকে সৃষ্টি হয়। বনু উমাইয়া এই পরিণাম আঁচ করতে পেরেছিল। তাদের সেই অনুসারীরাও এতে একমত হয়েছিল যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতো হকের অনুসরণের জন্য নয় বরং (গোত্রীয় সংহতির ভিত্তিতে) তাঁর সমর্থনের জন্য দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁর জন্য কুরবানি দিয়েছিল। যদি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অন্য কোনো উপায়ে মানুষকে রাজি করাতেন, তবে শাসনের অপরিহার্য প্রভাবকে উপেক্ষা করে মানুষের বিরোধিতা করলে ঐক্য ও সংহতি নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যেত, যা তিনি অনেক কষ্টে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।” [৩]

তাছাড়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে কোনো মন্দ ছিল না, যেমনটি আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) উল্লিখিত আলোচনার শেষে বলেন:

“এই সমস্ত বিষয়ে সরকারি প্রবণতাগুলো উদ্ভূত করে যা দলীয় সংহতির অপরিহার্য ফলাফল। যদি শাসন ক্ষমতা অর্জিত হয় এবং তর্কের খাতিরে একজন ব্যক্তিকে শাসনের ওপর দখলদার হয়ে যায় এবং সে তা সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করে এবং হক ও সত্যের পথ না ছাড়ে, তবে সেই ব্যক্তি ও সেই শাসনের ওপর আর কী অভিযোগ থাকতে পারে? দেখুন হযরত সুলাইমান (আ.) এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ছিল, তাঁরা উভয়েই বনী ইসরাঈলের বাদশাহ ছিলেন।” [৪]

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৬/৩৪২, ত. ইলমিয়াহ; আল-খাসায়েসুল কুবরা লিস সুযুতী: ২/১৬৭

[২] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ২০৫০৩, ২০৫০৫... এবং এগুলোর সনদে আলী বিন যায়েদ (বিন জাদআন) দুর্বল। (মিয়ানুল ইতিদাল: ৩/১২৭)

[৩] মুকাদ্দিমাহ ইবনে খালদুন, অধ্যায়: ৩, পরিচ্ছেদ: ২৮

[৪] মুকাদ্দিমাহ ইবনে খালদুন, অধ্যায়: ৩, পরিচ্ছেদ: ২৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই আলোচনার ফলশ্রুতিতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন নিশ্চিতভাবেই সাধারণ খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত এবং এর শরয়ি হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামি (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন খিলাফত নাকি রাজতন্ত্র—এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বলেন:

“যদিও তাঁর খিলাফত সঠিক ছিল, কিন্তু এর ওপর রাজতন্ত্রের সাদৃশ্য প্রবল হয়ে গিয়েছিল। কারণ তা অনেক বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং একে খিলাফত বলা এজন্য সঠিক যে, হযরত হাসান (রা.)-এর ক্ষমতা ত্যাগ এবং আহলে হাল ওয়াল আকদ-এর ঐকমত্যের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত সত্য ও সঠিক ছিল। আর একে রাজতন্ত্র বলা এজন্য সঠিক যে, তাঁর শাসনকালে এমন কিছু বিষয় সংঘটিত হয়েছিল যার উৎস ছিল ভুল ইজতিহাদ। যার ভিত্তিতে মুজতাহিদ গুনাহগার তো হন না, কিন্তু তাঁর মর্যাদা الْحُكْم (যাই হোক) ঐসব লোকদের চেয়ে কমে যায় যাদের ইজতিহাদ সঠিক এবং বাস্তবসম্মত ছিল, যেমন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হাসান (রা.)।”

অতএব, যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের ওপর রাজতন্ত্র শব্দ প্রয়োগ করেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো এই যে, তাঁর শাসনামলে উল্লিখিত ইজতিহাদসমূহ সংঘটিত হয়েছিল। আর যারা একে খিলাফত হিসেবে গণ্য করেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো এই যে, হযরত হাসান (রা.)-এর ক্ষমতা ত্যাগ এবং আহলে হাল ওয়াল আকদ-এর ঐকমত্যের পর তিনি সত্য খলিফা এবং আনুগত্যের যোগ্য ছিলেন। আনুগত্যের দিক থেকে জনগণের ওপর তাঁর সেই অধিকারই ছিল যা খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর ছিল। কিন্তু এই কথা তাঁর পরবর্তী শাসকদের ব্যাপারে বলা যাবে না, কারণ তারা ইজতিহাদের যোগ্য ছিলেন না। বরং কেউ কেউ তো প্রকাশ্য গুনাহগার ও ফাসিক ছিলেন, যাদেরকে কোনোভাবেই খলিফাদের মধ্যে গণ্য করা যায় না, বরং তারা রাজতন্ত্রের (বাদশাহদের) কাতারেই পড়ে। [১]

□□□

“মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা”-এর একটি বর্ণনার ওপর আপত্তি এবং তার উত্তর:

প্রশ্ন: “মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা”-এর একটি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সেনাবাহিনী উম্মতের কাছ থেকে জোরপূর্বক বায়আত নিত এবং বায়আত না করা যুবকদের হত্যা করত ও নারীদের দাসী বানাত।

এই বর্ণনা অনুযায়ী আমুল জামাআতের বছর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বুসর বিন আরতাত (রা.)-কে মদিনাবাসীদের কাছ থেকে বায়আত নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বায়আত দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি বায়আত করতে যাননি। এতে বুসর বিন আরতাত (রা.) তাঁর গোত্রের বায়আত প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, জাবির আসলে তবেই বায়আত কবুল করা হবে।

লোকজন পেরেশান হয়ে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং কসম দিয়ে বললেন: “আমাদের সাথে গিয়ে বায়আত করে নিন, অন্যথায় আমাদের যুবকদের হত্যা করা হবে এবং আমাদের সন্তানদের দাসী বানানো হবে।”

[১] আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকা: ২/ ৬৩৮, ৬৩৯

জাবির (রা.) তবুও প্রস্তুত ছিলেন না, বরং প্রথমে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি নিজের জীবন বাঁচানোর ভয়ে বায়াত করার পরামর্শ দিলেন। [১]

উত্তর: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে সহীহ। তবে এতে এমন কোনো কথা নেই যা আপত্তিকর হতে পারে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন যদিও হযরত হাসান (রা.)-এর অনুমোদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে এর পেছনে শক্তি ও সামর্থ্যের যোগান এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই শাসন অর্জিত হয়েছিল। এই দিক থেকে এখানে ক্ষমতা হস্তান্তর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুযায়ী ছিল না (যাদের প্রত্যেকেই খিলাফতকে একটি ভারী বোঝা মনে করে তা থেকে বাঁচতে চাইতেন, কিন্তু উম্মাতের পক্ষ থেকে নির্বাচন বা পূর্ববর্তী খলীফার আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই দায়িত্ব নিতে বাধ্য হতেন)।

যখন শুরা-ভিত্তিক খিলাফত হযরত হাসান (রা.)-এর হাত থেকে বেরিয়ে সিরিয়াবাসীদের কাছে চলে গেল, তখন উম্মাতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই ব্যথিত হয়েছিলেন। তবে তারা গৃহযুদ্ধ ও বিভেদের চেয়ে শান্তি ও ঐক্যকে প্রাধান্য দিতেন, তাই কৌশলগত কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকেও তারা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। (এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও একজন যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন।)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একজন দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন এবং জানতেন যে ইরাক ও হিজাজে তার খিলাফত ফিতনা দমনের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনেক ব্যক্তির অসন্তুষ্টি এখনও বিদ্যমান। তাই তার এই আশঙ্কা ছিল যে মদিনাবাসীরা তার বায়াত থেকে বিরত থাকতে পারে। এজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বুসর বিন আরতাত (রা.)-কে সেনাবাহিনী দিয়ে মদিনায় পাঠানো হয়েছিল।

বায়াতের জন্য পুরুষদের হত্যা করা এবং নারীদের দাসী বানানো হয়েছে—এই কথাটি না এই বর্ণনায় উল্লেখ আছে, না অন্য কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। হযরত জাবির (রা.)-কে যা বলা হয়েছিল যে নিজের এবং নিজের কওমের রক্ত রক্ষা করুন নতুবা যুবকদের হত্যা করা হবে এবং সন্তানদের দাসী বানানো হবে, এটি কোনো সাধারণ ব্যক্তির আশঙ্কা ছিল (যার নামও বর্ণনায় নেই) যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সাধারণ দুনিয়াদার রক্তপিপাসু রাজাদের সাথে তুলনা করেছিল। জনসাধারণের মধ্যে এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়া এবং ভিত্তিহীন আশঙ্কার কথা জানাজানি হওয়া কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবে এই আশঙ্কা বাস্তব ছিল যে যদি মদিনাবাসী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বায়াত না করেন, তবে কিছু ফিতনাবাজ লোক এর সুযোগ নিয়ে নতুন সরকারের বৈধতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারত। যদি এমনটি হতো তবে মানুষের প্রাণহানি ঘটত। সম্ভবত উম্মে সালামা (রা.) এই আশঙ্কার কারণেই বলেছিলেন যে বায়াত করে নিজের ও কওমের রক্ত রক্ষা করো। সুতরাং এই বর্ণনায় কোনো কথা আপত্তিকর নয়।

[১] আবু উসামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ওয়ালিদ বিন কাসীর আমাকে ওয়াহাব বিন কায়সান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি: যখন জামাআতের বছর (আমূল জামাআহ) ছিল, তখন মুয়াবিয়া বুসর বিন আরতাতকে মদিনায় পাঠালেন যাতে তিনি তাদের পতাকা ও গোত্র অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করেন। যখন সেই দিন এল এবং আনসাররা তার কাছে এল, তখন বনু সুলাইমও এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তাদের মধ্যে কি জাবির আছে?” তারা বলল, “না।” তিনি বললেন, “হে আল্লাহ, তাদের একত্রিত করুন যাতে আমরা তাদের বায়াত নিতে পারি যতক্ষণ না জাবির উপস্থিত হয়।” তিনি (দূত) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, “আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে আপনি আমাদের সাথে চলুন এবং বায়াত করুন, যাতে আপনি আপনার রক্ত এবং আপনার কওমের রক্ত রক্ষা করতে পারেন, কারণ আপনি যদি তা না করেন তবে আপনার যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে এবং আমাদের সন্তানদের বন্দী করা হবে।” তিনি বললেন: আমি তাদের কাছে রাত পর্যন্ত সময় চাইলাম। যখন সন্ধ্যা হলো, আমি নবী (সা.)-এর স্ত্রী উম্মে সালামার কাছে গেলাম এবং তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, “হে বৎস, যাও এবং বায়াত করো এবং তোমার রক্ত ও তোমার কওমের রক্ত রক্ষা করো, কারণ আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকেও বায়াত করতে যাওয়ার আদেশ দিয়েছি।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩০৫১২)

২. প্রতিনিধিদের আইনের উর্ধ্ব রাখার অভিযোগ?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর এই অভিযোগ করা হয় যে, তাঁর শাসক ও প্রতিনিধিরা জালেম ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁদের আইনের উর্ধ্ব স্থান দিয়েছিলেন। তাঁরা বিনা কারণে বা তুচ্ছ বিষয়ে মানুষকে কঠোরতম শাস্তি দিতেন।

ইবনে গায়লানের জুলুমের ঘটনা:

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া হয় যে, বসরার শাসক আবদুল্লাহ বিন আমর বিন গায়লানকে জুমার খুতবা চলাকালীন এক ব্যক্তি পাথর ছুড়ে মারে। ইবনে গায়লান তাকে থেপ্তার করে তার হাত কেটে দেন, যদিও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এমন কোনো অপরাধ ছিল না যার জন্য হাত কাটা যায়। যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে ফরিয়াদ করা হলো, তখন তিনি বললেন: “আমার গভর্নরদের থেকে কিসাস নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।”

কিন্তু এই অভিযোগের বাস্তবতা কী? লক্ষ্য করুন ইবনে গায়লানের ঘটনার বিষয়ে তাবারীর ইবারতের অনুবাদ:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন গায়লানকে বসরা থেকে অপসারিত করে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এর কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন গায়লান বসরার মিস্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন জুবায়ের বিন যাহহাক নামক এক ব্যক্তি, যে বনু দাব্বা গোত্রের ছিল, তাঁকে পাথর ছুড়ে মারে। ইবনে গায়লান তার হাত কেটে দেন। বনু দাব্বা এসে বলল যে, আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তির দ্বারা যা হওয়ার তা হয়েছে, গভর্নরও তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে যে এখন এই খবর আমিরুল মুমিনীন পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং সেখান থেকে কোনো আজাব কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের ওপর নেমে আসবে। তাই আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে নিজে আমিরুল মুমিনীনের নামে একটি চিঠি লিখে আমাদের দিন, আমরা আমাদের লোকদের মধ্য থেকে কারো মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব। আপনি তাতে লিখে দিন যে, হাত (চুরি ইত্যাদির অপরাধের) সন্দেহে কাটা হয়েছে, অপরাধ স্পষ্ট নয়। গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নামে চিঠি লিখে তাদের দিয়ে দিলেন। এই চিঠি এক বছর বা ছয় মাস পর্যন্ত পড়ে রইল। এরপর গভর্নর নিজে চিঠি লিখে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে এই ঘটনা জানালেন। বনু দাব্বাও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পৌঁছাল এবং বলতে লাগল: আবদুল্লাহ আমাদের এক ভাইয়ের হাত অন্যায়ভাবে কেটে দিয়েছে এবং আপনার নামে তার এই চিঠি বিদ্যমান আছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) চিঠিটি পড়ে বললেন: “আমার গভর্নরদের থেকে কিসাস নেওয়া সঠিক নয়, এর কোনো পথ নেই। হ্যাঁ, তোমরা যদি চাও তবে আমি দিয়াত পাইয়ে দিতে পারি।” তারা রাজি হয়ে গেল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদের বায়তুল মাল থেকে দিয়াত পাইয়ে দিলেন এবং ইবনে গায়লানকে অপসারিত করলেন।” [১]

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/২৯৯, ৩০০।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমাহ

ঘটনাটি পর্যালোচনা করলে এটি অনুমান করা কঠিন নয় যে, বনু দ্বাব্বার যে ব্যক্তি খুতবা চলাকালীন গভর্নর ইবনে গায়লানকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, সে ছিল এক দুষ্কৃতকারী দলের সদস্য। যদি এটি কেবল একটি বোকামি হতো, তবে হাত কাটার শাস্তির বিরুদ্ধে তার গোত্র নিজেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে অবহিত করে প্রতিবাদ করত। কিন্তু যেহেতু তার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর ছিল, তাই গোত্রের লোকেরা এই ভেবে ঘাবড়ে গেল যে, খলিফা যদি প্রকৃত সত্য জানতে পারেন তবে তিনি আমাদের সবাইকে বিদ্রোহী গণ্য করে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। গোত্রের লোকেরা চতুরতার আশ্রয় নিল এবং গভর্নর ইবনে গায়লানের সাথে দেখা করে এই মর্মে একটি লিখিত দলিল লিখিয়ে নিল যে, এই ব্যক্তির হাত ‘সন্দেহের’ বশবর্তী হয়ে কাটা হয়েছে। ইবনে গায়লান তাদের চাতুরি বুঝতে পারেননি এবং তা লিখে দিলেন।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাস্তি প্রদান করা একটি শরয়ী পরিভাষা। এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়, বরং তাতে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে; এমতাবস্থায় আইনত অভিযুক্তকে সন্দেহের সুবিধা (benefit of doubt) প্রদান করে মূল শরয়ী শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যদি এমন পরিস্থিতিতে কোনো কাজী বা বিচারক অভিযুক্তের ব্যাপারে নমনীয় ফয়সালা করেন, তবে বলা হয় যে, অভিযুক্তকে সন্দেহের সুবিধা দিয়ে শাস্তি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে বা শাস্তি লঘু করা হয়েছে। আর যদি পূর্ণ শাস্তি কার্যকর করা হয়, তবে বলা হয় যে, তিনি অভিযুক্তকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাস্তি দিয়েছেন।

এটি স্বীয় স্থানে নির্ধারিত যে, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাস্তি প্রদান করা কাজী বা বিচারকের একটি গুরুতর ভুল হিসেবে গণ্য হবে। তবে সারা বিশ্বের আইন হলো, যদি বিচারক ভুলবশত কাউকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে সেই ভুলের কারণে স্বয়ং কাজী বা বিচারককে শাস্তি দেওয়া হবে না। কারণ, যেভাবে সন্দেহের সুবিধা অভিযুক্ত ব্যক্তি পায়, তেমনিভাবে বিচারকও তা পেয়ে থাকেন। ভুল ফয়সালার জন্য উচ্চ আদালত বিচারককে সতর্ক করতে পারে, পদ থেকে বরখাস্তও করতে পারে; কিন্তু এটি বৈধ নয় যে, ভুল ফয়সালার শাস্তিস্বরূপ তার থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) নেওয়া হবে। কারণ বিচারকও একজন মানুষ, তার সামনে আসা বিষয়গুলোর প্রায়শই অনেকগুলো দিক থাকে; সঠিক ফয়সালা করার ক্ষেত্রে তার ভুলও হতে পারে। ফয়সালার প্রতিটি ভুলের জন্য যদি বিচারককে শাস্তির যোগ্য করা হয়, তবে এই পদ গ্রহণ করার জন্য কেউ প্রস্তুত হবে না।

উল্লিখিত বিষয়ে ইবনে গায়লান কেবল গভর্নরই ছিলেন না, বরং তিনি বিচারক ও কাজীও ছিলেন... যেমনটি সেই যুগে সাধারণত হতো যে, বিজ্ঞ ও যোগ্য প্রশাসকদের বিচারিক ক্ষমতাও প্রদান করা হতো... যে ব্যক্তি খুতবা চলাকালীন তাকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে সরকারি কর্তৃত্বকে (writ of the government) চ্যালেঞ্জ করেছিল... ইবনে গায়লান এই কাজটিকে সেই দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন, কারণ এর আগে বারবার বিদ্রোহীরা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন শুরু করেছিল। সৈয়দনা উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা এভাবেই শুরু করেছিল যে, মসজিদে নববীতে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল। যেন এই কাজটি বিদ্রোহীদের বৈশিষ্ট্য এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইবনে গায়লান সেই ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেওয়া জরুরি মনে করেছিলেন... বিদ্রোহীর সর্বোচ্চ শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু এই ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সেই পর্যায়ে ছিল না, তাই হত্যার পরিবর্তে হাত কেটে ফেলে নিজের বিবেচনায় একটি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অভিযুক্তের গোত্রের লোকেরা তার অবাধ্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল, এই কারণেই তারা নিজেদের ওপর কোনো বিপদ আসার ভয়ে ভীত ছিল। তাই যখন তার ওপর শাস্তি...

জারি হলো তখন তারা এই ব্যক্তির সমর্থন করেনি বরং অত্যন্ত চতুরতার সাথে নিজেদের সুরক্ষার জন্য গভর্নরের কাছ থেকে একটি লিখিত দলিল নিয়ে নিল যাতে এই বিষয়টিকে সন্দেহের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে এই লিখিত দলিল নিয়ে এই লোকেরা ইবনে গীলানকেই অভিযুক্ত বানাল এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, আপনার গভর্নর আমাদের লোকের হাত সন্দেহের কারণে কেটে দিয়েছে। তাদের থেকে কিসাস পাইয়ে দিন (হাতের বদলে তার হাত কাটা হোক)।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে বিষয়টি যেভাবে পেশ করা হয়েছিল তিনি সে অনুযায়ীই ফয়সালা করলেন। যেহেতু ফকিহগণ এই মূলনীতি লিখে দিয়েছেন যে, সন্দেহের ভিত্তিতে সাজা দেওয়ার কারণে শাসকের থেকে কিসাস নেওয়া যাবে না। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কিসাস নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন, তবে একই সাথে লোকদের সন্তুষ্টির জন্য গভর্নর ইবনে গীলানকে বরখাস্ত করে দিলেন। শুধু তাই নয় বরং সেই লোকদের আরও আশ্বস্ত করার জন্য বললেন যে, তারা যেন তাদের পছন্দমতো শাসক নিযুক্ত করে নেয়। তারপর তাদের পরামর্শে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে নিযুক্ত করলেন। যদি বিষয়টি প্রকৃত রূপে সামনে আসত তবে সম্ভবত হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইবনে গীলানকে বরখাস্ত করতেন না। [১]

যদি দেখা যায় তবে এর মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণতা এবং উত্তম কৌশলের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তার গভর্নরের কঠোর সিদ্ধান্তের সমর্থন করেননি কিন্তু এর ভিত্তিতে তিনি আইনের বিরুদ্ধে তার থেকে কিসাসও নিতে পারতেন না, তাই অত্যন্ত যথাযথ ফয়সালা করলেন যে মজলুমকে দিয়ত পাইয়ে দিলেন এবং গভর্নরকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু আফসোস যে কিছু লোক একে গভর্নরদের জুলুম-অত্যাচার এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে আইনহীনতার পৃষ্ঠপোষকতা নাম দিয়ে প্রচার করে দিল।

যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের জুলুমের হাকিকত:

শাসকদের জুলুম-অত্যাচারের প্রোপাগান্ডার অধীনে দ্বিতীয় ঘটনা যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের বর্ণনা করা হয় যে, সে কুফার গভর্নর হতেই অনেক ব্যক্তির হাত কাটিয়ে দিয়েছিল। হাকিকত জানার জন্য “তাবারী”-র মূল বর্ণনার অনুবাদ লক্ষ্য করুন:

যিয়াদ যখন কুফায় এল তখন মিশরে আরোহণ করল এবং আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করল, তারপর বলল: “আমাকে বসরায় এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল... আমি ভেবেছিলাম যেখানকার পুলিশের দুই হাজার লোক নিয়ে এখানে আসব কিন্তু আবার খেয়াল হলো যে আপনারা সত্যপন্থী লোক। আপনাদের সত্যপ্রিয়তা অনেকবার বাতিলকে পরাজিত করেছে... তাই আমি শুধু আমার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে এখানে এসেছি। আল্লাহর শুকরিয়া যে লোকেরা আমাকে যতটা নিচে নামিয়েছে আল্লাহ আমাকে ততটাই উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। লোকেরা যাকে ধ্বংস করেছে আল্লাহ তাকে হিফাজত করেছেন।”

যিয়াদ খুতবা শেষ করে মিশরেই ছিল যে লোকেরা তাকে পাথর মারতে শুরু করল... এই সময় যিয়াদ সেখানেই বসে রইল, তারপর তার কর্মচারীদের ডেকে নির্দেশ দিল যে মসজিদের সব দরজা বন্ধ করে দাও। তারপর বলল:

“প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাশের লোকটিকে ধরে ফেলুক... কেউ যেন না বলে যে আমি আমার পাশের জনকে চিনি না।”

[১] তারিখ তাবারী: ৩০০/৫, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৮১/১১ - সাইয়েদনা উমর বিন আব্দুল আজিজ-এর অবস্থার শুরুতে “তারিখ তাবারী”-তে বিস্তারিত রয়েছে, যেখানে “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া” এবং “আল-কামিল” ইত্যাদিতে কিছুটা সংক্ষেপে নকল করা হয়েছে।

তারপর যিয়াদ মসজিদের দরজায় নিজের জন্য একটি চেয়ার রেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং চার চার জন করে লোককে ডেকে কসম নিতে থাকলেন যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ পাথর মারে নি। যে কসম খেল তাকে ছেড়ে দিলেন, আর যে কসম খেল না তাকে আটকে রাখলেন। তারা সবাই মিলে ত্রিশ বা আশি জন লোক ছিল। তাদের সবার হাত কেটে ফেলা হলো। [১]

এখানে যিয়াদের এই আচরণকে যালিমোচিত বলার আগে এটি ভেবে দেখা উচিত যে, যারা তাকে পাথর মেরেছিল তারা কি সাধারণ কোনো লোক ছিল? তারা কি সেই সব লোক ছিল না যারা সাবেক গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-কে পাথর মেরেছিল? তারা কি সেই দল ছিল না যারা হযরত উসমান (রা.)-কে মসজিদে নববীর মিস্বরে পাথর মেরে নিজেদের বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিল? স্পষ্টতই কোনো সাধারণ মানুষের কী দায় পড়েছে যে মসজিদে প্রকাশ্যে গভর্নরকে পাথর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানাবে? নিশ্চিতভাবেই এরা ছিল সেই ফিতনাবাজ লোক যারা প্রকাশ্যে তাদের কেন্দ্রবিমুখতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করছিল। যিয়াদের আগে অন্যান্য কোমল স্বভাবের গভর্নররা অতিবাহিত হয়েছেন যারা তাদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন। সুযোগের তো একটা শেষ সীমা থাকে। যিয়াদকে কুফায় নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যই ছিল যেন ফিতনাবাজদের আর কোনো ছাড় দেওয়া না হয়। তিনি 'প্রথম দিনেই বিড়াল মারা' (শুরুতেই কঠোর হওয়া)-র প্রবাদ অনুযায়ী প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির লক্ষ্যবস্তু বানালেন। অন্য কোনো দুনিয়াদার শাসক হলে তাদের শিরশ্ছেদ করাতেন, কিন্তু যিয়াদ এক ۛ (সীমা) পর্যন্ত শিথিলতা প্রদর্শন করে কেবল হাত কাটার ওপরই ক্ষান্ত হলেন। এতেও তিনি এতটুকু সুযোগ রেখেছিলেন যে, যে ব্যক্তিই কসম খেয়ে এই কাজ থেকে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করেছে, যিয়াদ তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজের মুখে এই অপরাধ স্বীকার করেছে, কেবল তাকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

এর পরিষ্কার অর্থ হলো, এই অপরাধীরা প্রকাশ্যে অবাধ্যতার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা এতটাই ধৃষ্ট ছিল যে ফিতনাবাজদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততার জন্য গর্ব করত এবং এর জন্য যেকোনো শাস্তি ভোগ করতেও প্রস্তুত ছিল।

পৃথিবীর কোনো সরকারই এ ধরনের কর্মকাণ্ড সহ্য করতে পারে না। যদি শাসকের পাল্টা পদক্ষেপকে অবৈধ মনে করা হয়, তবে এর ফলাফল হবে এই যে, যখনই কোনো দেশে, কোনো সংগঠনে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা তা উপেক্ষা করতে থাকবেন এবং যখন পানি মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে তখন নিজেরা কোণঠাসা হয়ে সমস্ত ক্ষমতা বিরোধীদের হাতে তুলে দেবেন। এ কথাটি নিজের জায়গায় সঠিক যে, যিয়াদ যদি কারাদণ্ড বা জরিমানার মতো কোনো শাস্তি দিতেন তবে তা বেশি উপযুক্ত হতো, কিন্তু সম্ভবত যিয়াদের ধারণায় এর কোনো ফায়দা ছিল না; কারণ মৌখিক তিরস্কার এবং কারাবরণের দাওয়াই সাবেক গভর্নররা প্রয়োগ করে দেখেছিলেন। যিয়াদের শাস্তিকে কঠোর অবশ্যই বলা যেতে পারে, কিন্তু তা একেবারেই অযৌক্তিক নয়।

সামুরা বিন জুনদুব (রা.)-এর যুলুমের হাকীকত কী?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সেনাপতি হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো প্রসিদ্ধ করা হয়েছে:

- যখন যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান তাকে বসরার নায়েব (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি আট হাজার মানুষকে হত্যা করালেন। কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো: সামুরা সেখানে কাদের কাদের হত্যা করেছেন? উত্তর পাওয়া গেল: সামুরার হাতে নিহতদের কীভাবে গণনা করা সম্ভব!!

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/২৩৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত সামুরা বিন জুনদুব رضى الله عنه-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “আপনি কি ভয় পান না যে তাদের মধ্যে কোনো নির্দোষ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে?” তিনি বললেন: “যদি আমি আরও সমপরিমাণ হত্যা করি তবুও কোনো পরোয়া নেই।” [১]

• হযরত সামুরা رضى الله عنه একদিন খুব ভোরে এক গোত্রের ৪৭ জন ক্বারী ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। [২]

• তাঁর অশ্বারোহীরা পথচারীদের মারতে মারতে চলে যেত। [৩]

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হযরত সামুরা رضى الله عنه-এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত তিনটি বর্ণনাই সনদের দিক থেকে অত্যন্ত যয়ীফ।

প্রথম বর্ণনায় ইসহাক বিন ইদ্রিস রয়েছে যাকে ইমাম বুখারী ‘মাতরুক’, আবু যুরআ ‘ওয়াহি’ এবং ইয়াহইয়া বিন মঈন ‘কাযযাব, ইয়াদাউল আহাদিস’ বলেন। [৪] দ্বিতীয়টিতে নুহ বিন কায়স শিয়া রয়েছে। [৫] তৃতীয় বর্ণনায় জাফর আস-সাদাফী মাজহুল। অন্যদিকে আউফ (আউফ আল-আরাবী মৃত্যু ১৪৬ হিজরী) সিকাহ হিসেবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও কাদরী এবং শিয়া হিসেবে পরিচিত। [৬] তাছাড়া তিনি এক শতাব্দী আগের ঘটনা সরাসরি বর্ণনা করেছেন। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী অনুপস্থিত। এভাবে সনদ নিশ্চিতভাবেই মুনকাতি এবং যয়ীফ হয়ে যায়।

মনে হয় যে, এই তিনটি বর্ণনাই খারেজীদের সৃষ্টি। সামুরা বিন জুনদুব رضى الله عنه খারেজীদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত তলোয়ার ছিলেন। তাঁর উক্তি ছিল: “আকাশের নিচে নিকৃষ্টতম লোক তারা যারা মুসলমানদের কাফের বলে এবং তাদের রক্ত প্রবাহিত করে।” ইবনুল আসীর আল-জাযারী رحمه الله তাঁর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলেন: “এজন্যই খারেজী এবং তাদের সমমনা লোকেরা হযরত সামুরা رضى الله عنه-এর ওপর অপবাদ আরোপ করে এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলে।” [৭]

□□□

প্রশ্ন: তাবারীর একটি বর্ণনা থেকে ধারণা করা হয় যে, সামুরা বিন জুনদুব رضى الله عنه জুলুম করতেন এবং তাও হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه-এর আদেশে। কারণ যখন হযরত মুয়াবিয়া رضى الله عنه তাঁকে পদচ্যুত করেন তখন সামুরা رضى الله عنه বলেছিলেন: “আল্লাহ মুয়াবিয়ার ওপর লানত করুন! যদি আমি আল্লাহর আনুগত্য সেভাবে করতাম যেভাবে মুয়াবিয়ার আনুগত্য করে আসছিলাম, তবে আল্লাহ আমাকে আযাব দিতেন না।” [৮]

উত্তর: এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয় কারণ এটি উমর বিন শাব্বাহ ‘বালাগানি আন জাফর বিন সুলাইমান’ (জাফর বিন সুলাইমান থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে) শব্দে বর্ণনা করেছেন, এভাবে মধ্যবর্তী মাধ্যমটি মাজহুল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ত্রুটি হলো জাফর বিন সুলাইমান যদিও সাদুক শিয়া, যাঁর থেকে ইমাম মুসলিমও বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/২৩৬, ২৩৭

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/২৩৭

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/২৩৭

[৪] মীযানুল ইতিদাল: ১/১৮৩

[৫] মীযানুল ইতিদাল: ৩/২৭৯

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৩৮৩, ত ত রিসালাহ

[৭] উসদুল গাবাহ, তরজমা: সামুরা বিন জুনদুব رضى الله عنه

[৮] তারিখুত তাবারী: ৫/২৯১, সন ৫৩ হিজরী

মৃত্যু ১৭৮ হিজরির [১]। যদি বয়স একশ বছরও ধরা হয়, তবুও উল্লিখিত ঘটনাটি তার জন্মের আগের। সুতরাং সনদ বিচ্ছিন্ন এবং বর্ণনাটি দুর্বল। নিঃসন্দেহে এটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরোধীদের রটানো কথা, যা একজন সদুক (সত্যবাদী) বর্ণনাকারী শিয়া ঝাঁকের কারণে সামনে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

□□□

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-এর ওপর বিলাসিতা ও ব্যভিচারের অভিযোগ:

মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-কে কলঙ্কিত করার আশ্রয় চেপ্টা করেছে। তাকে বিশেষভাবে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের মতো জঘন্য অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে।

তারিখে তাবারিতে হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ আছে, যাতে তার ওপর ব্যভিচারের অপবাদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে চারজন ব্যক্তি তাদের ঘরের জানালা দিয়ে তাকে সহবাস করতে দেখেছে এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।

এই কাহিনীর বাস্তবতা কেবল এতটুকুই যে, হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-এর ওপর স্থানীয় কিছু লোক ব্যভিচারের অভিযোগ এনেছিল, যা তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হলে হযরত উমর (রা.) অভিযোগকারীদের হদ্দে কাযফ (অপবাদের শাস্তি) অনুযায়ী বেত্রাঘাত করেন। [২]

স্বভাবতই কোনো অত্যন্ত শরীফ ব্যক্তির ওপরও পাপের অভিযোগ আসা অসম্ভব কিছু নয়। এমনটি ভুল বোঝাবুঝির কারণেও হতে পারে, কিন্তু এটি জুলুম হবে যে, কোনো ব্যক্তি কিছু দুর্বল বর্ণনাকে পুঁজি করে কোনো সাহাবীর চরিত্রে কালিমা লেপন করার চেপ্টা করবে, বিশেষ করে যখন হযরত উমর (রা.)-এর মতো ন্যায়পরায়ণ শাসকের আদালতে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছিল।

আমরা মূল ঘটনা অর্থাৎ অভিযোগ ওঠার বিষয়টি অস্বীকার করছি না, তবে তাবারী ইত্যাদির এই বর্ণনাগুলোতে বর্ণিত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে অনেক বিষয় সন্দেহজনক বরং অবিশ্বাস্য। তাবারীতে দুটি বর্ণনা রয়েছে: প্রথমটিতে বলা হয়েছে যে, হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) উম্মে জামিল নামক এক দুশ্চরিত্রা মহিলার কাছে প্রায়ই যেতেন। দ্বিতীয়টিতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, সেই যুগে মহিলারা দেহব্যবসা করত, তাদের মধ্যে উম্মে জামিল নামক এক মহিলা এলাকার শরীফ ও আমীরদের সাথে সম্পর্ক রাখত এবং হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) তার কাছে যাতায়াত করতেন। [৩] (নাউয়ুবিল্লাহ)

এই উভয় অপবিত্র বর্ণনা সনদ ও মতন (মূল পাঠ) উভয় দিক থেকেই অগ্রহণযোগ্য। এই ঘটনাটি ১৭ হিজরির অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়াবে যে, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে যখন আমীর ও শরীফ ব্যক্তির সাহায্যে কেরামই ছিলেন, তখন এই জঘন্য কাজ হচ্ছিল যা আজও শরীফদের কোনো মহল্লায় সহ্য করা হয় না।

মতন বা মূল পাঠে সাহাবীদের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ বিষয়বস্তু ছাড়াও প্রথম বর্ণনায় স্বয়ং ওয়াকিদীর উপস্থিতি এর চরম দুর্বলতার...

[১] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৯৩২

[২] শারহ মুশকিলিল আসার: ২/৩৬২, ত্বর রিসালাহ; শারহ মা'আনিল আসার, হা: ৬১৩৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: ১৩৫৬৩; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৭০৪৩; আবুল ফিদা: খণ্ড ১, পৃ ১৭১, বাবু যিকরি উমর ইবনুল খাত্তাব ওয়া মা ওয়াকা'আ ফী আইয়ামিহি মিনাল ফুতুহাত ওয়া গাইরিহা (আখরাজাছল বুখারী ফী সহীহিহি তা'লীকান, হা: ২৬৩৮)

[৩] তারিখে তাবারী: ৩/৬৯ থেকে ৭২

...এর জন্য যথেষ্ট। আর কোনো জেরার (সমালোচনার) প্রয়োজন নেই। [১]

দ্বিতীয় বর্ণনাটিও অত্যন্ত দুর্বল, কারণ এর সনদে একাধিক দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী রয়েছে। সাররি বিন শুয়াইব এবং সাইফ বিন উমর উভয়েই দুর্বল। এছাড়া ‘মুহাম্মদ, আল-মুহাল্লাব, তালহা ও আমার তাদের সনদসহ’ বর্ণনাটিকে কেবল তালগোল পাকিয়ে ফেলেনি, বরং কিছু বর্ণনাকারীকে অজ্ঞাতও (মাজহুল) করে দিয়েছে। এ ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর বিশ্বাস করা কেবল রেওয়ায়েত ও দেওয়ায়েতের (বর্ণনা ও যুক্তির) মূলনীতির পরিপন্থী নয়, বরং আমাদের ঈমানেরও পরিপন্থী।

৩) সাহাবায়ে কেরামের মাথা কাটার অভিযোগ

অভিযোগ করা হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বিরোধীদের মাথা কাটার প্রথা শুরু করেছিলেন এবং বড় বড় সাহাবীদের মাথা কাটিয়েছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) এবং আমার বিন আল-হামাক (রা.)-এর হত্যার ঘটনাগুলো শোনানো হয় এবং বলা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে এই ভয়াবহ কাজ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ই শুরু করেছিলেন।

আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর মাথা কাটার বাস্তবতা:

আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর হত্যা এবং মাথা কাটার বিষয়ে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পেশ করা হয়:

“হানজালা বিন খুয়াইলিদ বলেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে ছিলাম, এমতাবস্থায় দুই ব্যক্তি হযরত আম্মার (রা.)-এর মাথা নিয়ে বিতর্ক করতে করতে আসছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই বলছিল যে, আমি তাকে হত্যা করেছি।” [২]

এই বর্ণনাটি পেশ করে দাবি করা হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর মাথা কাটিয়েছিলেন, তাই হত্যাকারীরা তাঁর উপস্থিতিতে এই বিতর্ক করছিল যাতে মাথা কাটার পুরস্কার নিতে পারে। অথচ বর্ণনায় কেবল এটুকু উল্লেখ আছে যে, তারা উভয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে নিহত ব্যক্তির অস্ত্রের মালিকানা নিয়ে ঝগড়া করছিল। এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে, হযরত আম্মার (রা.)-এর মাথা কাটায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আদেশ বা সম্মতি ছিল। হযরত আম্মার (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটেছিল, মাথাও সেখানেই কাটা হয়েছিল এবং কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হত্যাকারী নিজেও জানত না যে সে কাকে হত্যা করেছে।

ওয়াকিদী এই বর্ণনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন: ‘ওয়া হাদাসানি মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব বিন উতবা আন আবিহি’। এই বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব নিজেই অজ্ঞাত পরিচয় (মাজহুলুল হাল)। (যদিও তাঁর পিতা ইয়াকুব বিন উতবাকে নির্ভরযোগ্য মানা হয়েছে)। এভাবে সনদ...

[১] প্রথম বর্ণনাটি ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত হওয়া তারিখুত তাবারির ইবারতে (বাক্যে) কিছুটা অস্পষ্ট মনে হতে পারে; কারণ ‘বাব জিকর উবাইর আযলুল মুগিরা আনিল বাসরা’ এর পর ‘ক্বালা ওয়া ফি হাজিহিস সানাহ’ থেকে কথা শুরু করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অধ্যায়ের আগে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকিদীর বর্ণনার অংশগুলো উদ্ধৃত করা হচ্ছে। যেমন: ক্বালা আল-ওয়াকিদী ওয়া ফি উমরাতিহি হাজিহি... ফা ইম্মা: ওয়া হাদাসানি কাসির বিন আব্দুল্লাহ। ক্বালা: ওয়া ফিহা তাযাওয়াজা উমর বিন আল-খাতাব... সুতরাং এই বর্ণনাটি নিশ্চিতভাবেই ওয়াকিদী থেকেই বর্ণিত।

[২] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৬৬৯৫, বাব আব্দুল্লাহ বিন আমার।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — অষ্টম খণ্ড

এতে আরও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন:

সিফফিনের দিন আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) প্রথম পদাতিক বাহিনীতে এগিয়ে গিয়ে দুই সারির মাঝখানে এলে এক ব্যক্তি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে ফেলে দেয়। তখন তার শিরস্ত্রাণ খসে পড়ে। এরপর সে আবার আঘাত করলে দেখতে পায় যে তিনি আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)। [১]

□□□

আমর বিন আল-হামিক (রা.)-এর মাথা কাটার প্রকৃত রহস্য:

আমর বিন আল-হামিক (রা.)-এর হত্যা এবং মাথা কাটার বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে জড়িত করার জন্য নিচের বর্ণনাগুলো পেশ করা হয় এবং যুক্তি দেওয়া হয় যে, ইসলামী রাজনীতিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ই সর্বপ্রথম এই ভুল প্রথা চালু করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বিষয়ে বর্ণনাগুলো দুই প্রকার: নির্ভরযোগ্য (হাসান বা সহীহ) এবং দুর্বল। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলো থেকে কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে, মাথা কেটে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। সেগুলোতে মোটেও উল্লেখ নেই যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই কাজের আদেশ দিয়েছিলেন বা এটি পছন্দ করেছিলেন। সেগুলোতে এটাও উল্লেখ নেই যে, আমর বিন আল-হামিক (রা.)-কে কেন হত্যা করা হয়েছিল? কেন মাথা কাটা হয়েছিল? প্রথমে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলো দেখে নেওয়া যাক:

- হুনাইদাহ আল-খুজায়ী থেকে বর্ণিত: ইসলামে প্রথম যে মাথাটি উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল তা ছিল আমর বিন আল-হামিকের মাথা, যা মুয়াবিয়ার কাছে পাঠানো হয়েছিল।

“ইসলামে প্রথম আমর বিন আল-হামিক (রা.)-এর মাথা কাটা হয়েছিল, যা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল।” [২]

এই সনদে শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-কাজী সত্যবাদী ছিলেন কিন্তু দুর্বল স্মৃতির অধিকারী ছিলেন এবং প্রচুর ভুল করতেন। [৩] তার বিরুদ্ধে তাদলীসের অভিযোগও রয়েছে। [৪] তাই বর্ণনাটি হাসান।

- হুনাইদাহর এই বর্ণনাটিই ইমাম বুখারী (রহ.) তিনটি সূত্রের মাধ্যমে নকল করেছেন। ইউসুফ বিন ইয়াকুব এবং আবু বকর বিন আইয়াশ নির্ভরযোগ্য, তবে তৃতীয় ব্যক্তি জাওয়াদ আদ-দাব্বীর অবস্থা জানা যায়নি। এতে এই শব্দগুলোর আধিক্য রয়েছে:

“যিয়াদ এটি মুয়াবিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন...” অর্থাৎ এই মাথাটি যিয়াদ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। [৫]

- ইমাম আবুল আরব তামীমী এই বিষয়ে এই বর্ণনাটি নকল করেছেন:

আব্দুল মালিক বিন হুযাইল, ইসমাঈল বিন ইসহাক আল-কাজী থেকে, তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে, তিনি আলী বিন মাদীনী থেকে, তিনি উমারা আদ-দাহাবী থেকে:

[১] মুত্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৬৫৮, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয় বর্ণনাটি স্বয়ং আক্রমণকারী আবু জুয়াইরিয়াহ আল-জারমী থেকে বর্ণিত। তিনি জানান যে, হত্যা করার পর জানা যায় যে ইনি আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)। (আল-মু’জাম আল-কাবীর লিত-তাবারানী: ২২/৩৬২, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ)

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৩৬০১৯, ত: আর-রুশদ

[৩] তাকরীবুত তাহযীব, নং: ২৭৮৭

[৪] তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, পৃ: ৩৩

[৫] আত-তারীখুল আওসাত: ১/১৩১; আল-ইসাবাহ: ৩/৫১৫, ত: আল-ইলমিয়াহ

ইসলামে প্রথম যে মাথাটি বহন করা হয়েছিল তা ছিল আমার বিন হামিক-এর, মুয়াবিয়ার কাছে

“ইসলামে প্রথম যে মাথাটি কেটে বহন করা হয়েছিল তা ছিল আমার বিন হামিক (রা.)-এর, যা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল।” [১]

• এই বর্ণনাটি ওয়াকিদি থেকেও বর্ণিত হয়েছে, যার দুর্বলতা স্পষ্ট। [২]

• আর একটি বর্ণনাও রয়েছে যা হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) মধ্যবর্তী মাধ্যমগুলোকে বাদ দিয়ে এভাবে পেশ করেছেন: মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-গালাবি ‘আখবার-ই-যিয়াদ’ নামক গ্রন্থে তার নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন:

রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রা.)-এর কাছে কোনো কতিত মস্তক নিয়ে যাওয়া হয়নি। সর্বপ্রথম আমার বিন হামিক (রা.)-এর মস্তক হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। [৩]

যাই হোক, মাথা কাটা এবং তা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পাঠানোর বিষয়টি সামগ্রিকভাবে প্রমাণের স্তরে পৌঁছে যায়। তাই এই পর্যন্ত কথাটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এই বর্ণনাগুলো থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই কাজটিকে প্রথা হিসেবে চালু করেছিলেন, বরং এ থেকেও এটি প্রমাণিত হয় না যে তিনি এই কাজের আদেশ দিয়েছিলেন।

কি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আমার বিন হামিক (রা.)-কে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন?

যেসব বর্ণনায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সরাসরি এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলা হয়েছে, সেগুলোর অবস্থা লক্ষ্য করুন:

• তাবারিতে আবু মুখনাফ এবং মুজালিদ বিন সাঈদ আমার বিন হামিক (রা.)-এর হত্যার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যার শেষে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে আমার বিন হামিক (রা.)-এর এই হত্যা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আদেশে হয়েছিল:

“অতঃপর মুয়াবিয়া তাকে লিখলেন: সে দাবি করেছে যে সে উসমান বিন আফফান (রা.)-কে তার কাছে থাকা একটি তীরের ফলা দিয়ে নয়টি আঘাত করেছিল। আমরা তার ওপর সীমালঙ্ঘন করতে চাই না, সুতরাং তাকেও নয়টি আঘাত করো যেমন সে উসমানকে করেছিল। অতঃপর তাকে বের করা হলো এবং নয়টি আঘাত করা হলো, সে প্রথম বা দ্বিতীয় আঘাতেই মারা গেল।”

[১] আল-মিহান, পৃ. ১৩৬ সনদ হাসান; আসাদুল গাবাহ: ৩/২০৫

[২] সনদে আব্দুল মালিক বিন বাদিলকে ‘রাসিখিনা ফিল ইলম’ বলা হয়েছে: (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি তাদমুরি: ২৬/৯১, মাশার: ৮/৫৮)। ইসমাইল বিন ইসহাক কাজিকে ‘আল-আল্লামাতুল হাফিজ’ বলা হয়েছে, তার ওপর কোনো জরাহ (সমালোচনা) বর্ণিত নেই। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৩/৩৩৯, ত. আর-রিসালাহ)। বাকি বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২৬, ত. সাদির

[৪] আত-তালখিসুল হাবির লি ইবনে হাজার আল-আসকালানি: ৩/২৯৮, ত. আল-ইলমিয়াহ

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) লিখেছেন যে, সে (আমর ইবনুল হামাক) দাবি করেছে যে সে উসমান বিন আফফান (রা.)-কে নয়বার বর্শা দিয়ে আঘাত করেছে। আমরা তার ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাই না। তাকে ঠিক সেভাবেই নয়বার বর্শা মারো যেভাবে সে উসমান (রা.)-কে মেরেছিল। অতঃপর তাকে বের করে নয়বার বর্শা মারা হলো। সে প্রথম বা দ্বিতীয় আঘাতেই মৃত্যুবরণ করল।” [১]

এই ঘটনাটি বালাজুরি কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। [২]

আবু মুখনাফ ইউসুফ বিন ইয়াজিদ থেকে একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে আমর ইবনুল হামাক (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তার এক ভক্ত একইভাবে তার হত্যাকারীর মাথায় আঘাত করেছিল। [৩]

এই বর্ণনাগুলোতে হয় আবু মুখনাফ এবং হিশাম বিন মুহাম্মদের মতো মিথ্যাবাদী রয়েছে অথবা মুজালিদ বিন সাঈদ রয়েছে, যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, “লাইসা বিশাই” (তার কোনো গুরুত্ব নেই)। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করতেন। কাউকে তার বর্ণনা খুঁজতে যেতে দেখলে তিনি বলতেন: “তুমি অনেক মিথ্যা লিখে নিয়ে আসবে।”

ইবনে মাজিন এবং আবু হাতিম বলেন: “তাদের থেকে দলিল গ্রহণ করা যাবে না।”

আবু সাঈদ আশাজ বলেন, “সে শিয়া ছিল।”

দারাকুতনি বলেন: “দুর্বল ছিল।” [৪]

আমর ইবনুল হামাক (রা.)-এর ওপর হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে শরিক থাকার অভিযোগ হয় ওয়াকিদির বর্ণনায় পাওয়া যায় (যার সম্পর্কে উসমান (রা.)-এর যুগের শেষাংশে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে) অথবা আবু মুখনাফ ও মুজালিদ বিন সাঈদের সেই বর্ণনাগুলোতে যার উদ্ধৃতি উপরে দেওয়া হয়েছে। কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে এই কথাটি মোটেও বর্ণিত হয়নি।

যখন এই অভিযোগই ভুল, তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর কিসাস হিসেবে তার ওপর আঘাত করার নির্দেশ জারি করা এবং তার প্রথম বা দ্বিতীয় আঘাতেই মারা যাওয়াও একটি উপকথা। এটি বোঝার জন্য সনদে আবু মুখনাফ এবং হিশাম বিন মুহাম্মদ কালবীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

আমর ইবনুল হামাক (রা.)-এর মৃত্যুবরণ এবং মাথা কাটার আসল কারণ? নির্ভরযোগ্য বর্ণনায়

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী আমর ইবনুল হামাক (রা.) দুর্ঘটনাবশত মৃত্যুবরণ করেছিলেন। একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দেখুন:

আব্দুল মালিক বিন হুজাইল, ইসমাইল বিন ইসহাক আল-কাজি থেকে, তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনা থেকে, তিনি আলী বিন মাদিনী থেকে, তিনি আম্মার আদ-দুহনী থেকে: “মুয়াবিয়া তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে সাপে দংশন করল এবং সে মারা গেল। তখন প্রেরিত ব্যক্তির ভয় পেল যে...”

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/২৬৫

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৫/৪৬১, ত. দারুল ফিকর

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/২৫৭, ২৫৮

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৪৮৩, ৪৮৭, ত. আর-রিসালাহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

“...تتهم به نخذوا رأسه وحملوه” [১]

“আম্মারা দোহনীর বর্ণনা হলো যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আমর ইবনুল হামিক (রা.)-কে তাঁর কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সাপের কামড়ে মারা গেলে বার্তাবাহকরা ভয় পেয়ে গেল যে পাছে তাদের ওপর (হত্যার) অভিযোগ না আসে। তারা আমর (রা.)-এর মাথা কেটে নিয়ে গেল। (যেন তাঁকে মোকাবিলায় নিহত হিসেবে প্রকাশ করা হয়)।”

এই সনদটি হাসান সুরের নিচে নয়। এই বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনার বাস্তবতা ছিল এই যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আমর ইবনুল হামিক (রা.)-কে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাও এই কারণে যে তিনি কুফায় হুজর ইবনে আদি (রা.)-এর বিদ্রোহী আন্দোলনের অংশ হয়ে গিয়েছিলেন। (গ্রেফতারের নির্দেশ এই কারণে দেওয়া হয়নি যে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী ছিলেন।) তিনি বাঁচার জন্য মোসেলের কোনো এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। যখন সরকারি লোকরা তাঁর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলেন। সরকারি লোকরা তাঁর মাথা কেটে ফেলেছিল।

হাফেজ যাহাবী (রহ.) এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেন:

“ا هذا اصح مما مر فانه ذلك من رواية الكلبي”

“পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলোর তুলনায় এই বর্ণনাটি সবচেয়ে সঠিক, নিঃসন্দেহে সেটি (বল্লমের মাথায় বিদ্ধ করে হত্যা করার বর্ণনাটি) ইবনে কালবী (শিয়া)-এর বর্ণনা।” [২]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.)-ও একই কথা লিখেছেন। [৩]

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ইবনে সাকান-এর বরাতে লিখেছেন যে, গ্রেফতারের পর তিনি ভয়ে মারা গিয়েছিলেন। এতে লোকেরা ভয় পেল যে তাদের ওপর (হত্যার) অপবাদ না আসে, তাই তারা তাঁর মাথা কেটে নিয়ে গেল। [৪]

ইবনে হিব্বান লিখেছেন:

“هرب الى الموصل فدخل غارا، فنهشته حية، فقتلته، وبعث الى الغار في طلبه، فوجدوه” [৫]

“তিনি মোসেলের দিকে পালিয়ে যান এবং একটি গুহায় প্রবেশ করেন। তাঁকে সাপে দংশন করে এবং তিনি মারা যান। তাঁর সন্ধানে গুহার দিকে লোক পাঠানো হলে তারা তাঁকে মৃত অবস্থায় পায়।”

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.)-ও তাঁর নিজস্ব সনদে এই ঘটনাটি এভাবেই লিখেছেন। [৬]

[১] আল-মিহান, পৃ. ১৩৬; আসাদুল গাবাহ: ৪/২০৫, ত. ইলমিয়্যাহ

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী লিদ-দামিরি: ৩/৮৯; বাশার: ২/২৩৩

[৩] আল-ইসতিয়াব: ৩/১১৭৩

[৪] আল-ইসাবাহ: ৩/৫১৫

[৫] আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান: ৩/২৭৫

[৬] তালকিহ ফুহুম আহলিল আসার লি-ইবনিল জাওযী, পৃ. ৩৩০

ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারীও এই ঘটনাটি একইভাবে বর্ণনা করেছেন। [১]

আবু ইউসুফ আল-ফাসাওয়ীও এটিই বর্ণনা করেছেন। [২]

লক্ষ্য করুন যে আসল বিষয়টি কী ছিল এবং তাকে কী বানানো হয়েছে।

কি এটিই প্রথম মাথা ছিল?

এর সাথে এটিও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কিছু বর্ণনাকারীর এই কথা যে ইসলামের ইতিহাসে এটিই প্রথম মাথা ছিল যা কেটে পাঠানো হয়েছিল, এটি তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ। এ বিষয়ে আরও মতামত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন:

- সবচেয়ে প্রথম ঘটনা হলো আবু জাহলের মাথা কাটার, যা হুজুর আকরাম ﷺ-এর খিদমতে আনা হয়েছিল। [৩]
- সবচেয়ে আগে ইহুদি কাব বিন আশরাফের মাথা কেটে হুজুর আকরাম ﷺ-এর খিদমতে আনা হয়েছিল। [৪]
- সবচেয়ে আগে মুশরিক আবু আজ্জাহ জুমাহীর মাথা কেটে হুজুর আকরাম ﷺ-এর খিদমতে আনা হয়েছিল। [৫]

একটি মত হলো যে, সর্বপ্রথম এমনটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক-এর যুগে হয়েছিল। সহীহ সনদ অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দিক-এর নিকট একজন রোমান নেতার মাথা পেশ করা হয়েছিল। তিনি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে এটি পছন্দ করেননি এবং বলেছিলেন:

“এ বিষয়ে চিঠি পাঠানো এবং সংবাদ দেওয়াই যথেষ্ট।” [৬]

এর অর্থ এই নয় যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক একে হারাম মনে করতেন, কারণ সুন্নাহ থেকে এর অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে। তবে তিনি এই অবকাশের ওপর আমল করা সমীচীন মনে করেননি যে, কাফিররা মুসলমানদের সাথে এই আচরণ করে থাকে, তাই মুসলমানদের ভিন্ন আচরণ করা উচিত।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কার মাথা কাটা হয়েছিল:

এটি তো ছিল কাফিরদের মাথার কথা। মুসলমানদের মাথার ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে, তাদের মাথা বিচ্ছিন্ন করার সূচনা কোন যুগে হয়েছিল।

একটি মত হলো যে, সর্বপ্রথম হযরত হুসাইন-এর মাথা কেটে পাঠানো হয়েছিল। যেমনটি ইমাম শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَوَّلَ رَأْسٍ حُمِلَ فِي الْإِسْلَامِ.

“সর্বপ্রথম যে মাথাটি বহন করা হয়েছিল, সেটি ছিল হুসাইন বিন আলীর মাথা।” [৭]

[১] আল-মাআরিফ লি ইবনে কুতাইবা: ২৯৩/১

[২] আল-মাআরিফ ওয়াত তারিখ: ৮১৩/২, ত ত্বর রিসালাহ

[৩] উমদাতুল কারী ফী শারহিল বুখারী: ৮০/৮, ত ত্বর দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি

[৪] উমদাতুল কারী ফী শারহিল বুখারী: ৭১/১৪; ওয়াসিমতুন নুজুমিল আওয়ালী লিল ইসামী: ১৩৩/২, ত ত্বর ইলমিয়াহ

[৫] উমদাতুল কারী ফী শারহিল বুখারী: ১৩৩/১৭; আত-তালখীসুল হাবীর: ৩৮/৪, ত ত্বর ইলমিয়াহ

[৬] আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, বাবু হামলির রুউস, হা: ৮৬২০ সহীহ সনদে; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১৮৩৫১, ত ত্বর ইলমিয়াহ

[৭] আল-মুজামুল কাবীর লিত তবারানী: ১২৪/৩

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

একটি মত হলো যে, প্রথম উদাহরণটি হলো হযরত জুবায়ের বিন আদীর মাথার, যা আমার বিন জারমুজ কেটে হযরত আলীর সামনে রেখেছিল এবং হযরত আলী তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ শুনিয়েছিলেন। [১]

এখন চিন্তা করে দেখুন যে, যদি হযরত জুবায়েরের মাথা নিজের সামনে দেখার ক্ষেত্রে হযরত আলী নির্দোষ হন, তবে হযরত আমার বিন হামাকের মাথা হযরত মুয়াবিয়ার কাছে পৌঁছানোর কারণে হযরত মুয়াবিয়ার ওপর কেন অভিযোগ আসতে পারে, যেখানে এই দুই মহান ব্যক্তির কেউই এমন কোনো আদেশ দেননি।

হযরত আবু বকর, হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়ার ঘটনাগুলোর মধ্যে এই সাধারণ মিল রয়েছে যে, তাঁদের তিনজনের কেউই এই কাজের আদেশ দেননি। পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কাজের প্রতি তাঁদের অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ আছে। হযরত মুয়াবিয়ার অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু কোনো কথা উল্লেখ না থাকার অর্থ এই নয় যে, তা ঘটেনি।

যদি অনুমান করা হয়, তবে এটাই বোঝা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়ার মতো ধৈর্যশীল ও দয়ালু শাসক এটি পছন্দ করেননি। কারণ এই ঘটনাটি ৫১ হিজরির, এরপর হযরত মুয়াবিয়া প্রায় নয় বছর শাসন করেছেন। এই সময়ে তাঁর কত শত্রু নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে কাফেরও ছিল এবং বিদ্রোহীও ছিল। তাদের কারো মাথা আপনার খেদমতে আনার কথা বর্ণিত নেই। যদি আপনি এমন কোনো প্রথা চালু করতেন বা এর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন, তবে আরও অনেক মাথা আপনার কাছে পাঠানোর কথা বর্ণিত থাকত।

অতএব, কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জন্য এর পরে আর শোভা পায় না যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়ার ওপর মাথা কাটার প্রথা চালু করার অভিযোগ আরোপ করবেন।

আমনা বিনতে শারীদে ওপর জুলুমের উপকথা:

কিছু রেওয়ায়েতে এই কাহিনীকে আরও দীর্ঘ করা হয়েছে। এই ঘটনাকে একটি বেদনাদায়ক উপকথার রূপ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমীর মুয়াবিয়াকে তাঁর সময়ের হিটলার প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই রেওয়ায়েতগুলোতে আছে যে, আমার বিন আল-হামাককে যখন গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি, তখন হযরত মুয়াবিয়া তাঁর স্ত্রী আমনা বিনতে শারীদকে বন্দি করেন। যখন হযরত আমার বিন আল-হামাকের কাটা মাথা হযরত মুয়াবিয়ার কাছে পাঠানো হলো, তখন তিনি তা প্রদর্শন করালেন। তারপর অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তা তাঁর স্ত্রীর কোলে ফেলে দিলেন।

১. সর্বপ্রথম এই উপকথাটি তৃতীয় হিজরি শতকের একজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী আব্বাস বিন আল-বাক্কার আল-রাফেজি (মৃত্যু ২২২ হিজরি) তাঁর গ্রন্থ ‘আখবারুল ওয়াফিদাত মিনান নিসা আলা মুয়াবিয়া’-তে বর্ণনা করেছেন। [২]

এই গ্রন্থে দুর্বল এবং অনেক মনগড়া কাহিনীতে ভরপুর। লেখক এর মাধ্যমে এটি প্রমাণ করার...

(১) কানজুল উন্মাল, খণ্ড: ৩২৬১৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৩৬ হিজরি।

(২) আখবারুল ওয়াফিদাত মিনান নিসা আলা মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান, পৃ. ১৫।

চেপ্টা করা হয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নারীদের আসা-যাওয়া প্রচুর ছিল। তিনি পছন্দের নারীদের সাথে খোলামেলা আড্ডা দিতেন এবং বিরোধীদের নারীদের ওপর জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানাতেন। লেখক ‘আখবারুল ওয়াফিদিন মিনাল রিজাল আলা মুয়াবিয়া’ নামে আরও একটি কিতাব রচনা করেছেন। সেটিও মান, বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে একই ধরনের।

আব্বাস বিন বাকার সম্পর্কে ইবনে আদি বলেন: সে মুনকার হাদিসগুলোকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করত। [১]

ইমাম দারাকুতনি তাকে কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) বলেন।

ইমাম উকাইলি বলেন: “তার বর্ণনাগুলো বিভ্রান্তি এবং মুনকার কথায় ভরপুর।”

হাফেজ জাহাবি রহমতুল্লাহি আলাইহি ‘মিজানুল ইতিদাল’-এ তার বাতিল ও মুনকার বর্ণনার কিছু নমুনা পেশ করেছেন। [২]

২. আব্বাস বিন বাকারের পর আমর বিন আল-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কান কাটার এবং আমিনা বিনতে শরিদের ওপর জুলুম করার এই ঘটনাটি বালাগুরি (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি) কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। [৩]

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বালাগুরি এটি তার পূর্বসূরি আব্বাস বিন বাকার থেকে বর্ণনা করেছেন। বালাগুরি কেন এর সনদ উল্লেখ করেননি, তার কারণ হিসেবে মনে হয় যে, বালাগুরি খলিফা মুতাওয়াঙ্কিল আব্বাসির দরবারি ছিলেন। মুতাওয়াঙ্কিল আহলে সুন্নাতের আলেমদের প্রশংসাকারী এবং বিদআতিদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই বালাগুরি সাধারণত শিয়া বর্ণনাকারীদের নাম সনদ থেকে বাদ দিয়ে প্রায়ই ‘কালু’ (তারা বলেছে) এবং কোথাও ‘রুবিয়া’ (বর্ণিত আছে) বলে এ ধরনের বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করতেন যাতে শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা যায়। [৪]

৩. এই একই কাহিনী শিয়া ঐতিহাসিক ইয়াকুবি সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। [৫]

৪. ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে এই বর্ণনাটি ইবনে আসাকির আবু জাকারিয়া, আবদুল্লাহ বিন মুগিরা কুরাইশি, হাতেম বিন মুসা, ইয়াহইয়া বিন হামজা, ইসহাক বিন আবি ফারওয়া, ইউসুফ বিন সুলাইমান তার দাদি মায়মুনা থেকে বর্ণনা করেছেন। [৬]

এই পুরো সনদটি অত্যন্ত দুর্বল যোগসূত্র দ্বারা গঠিত। ইয়াহইয়া ইবনে হামজাকে কাদরিয়া ফেরকার বলা হয়েছে। ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি ফারওয়া মাতরুক (পরিত্যক্ত)। [৭]

৫. ‘তারিখে দামেশক’-এর প্রথম বর্ণনাটি পরবর্তী শতাব্দীতে আল্লামা ইবনুল আসির জাজরি রহমতুল্লাহি আলাইহি একই সনদসহ বর্ণনা করেছেন। [৮]

স্পষ্টতই, এতে বর্ণনার দুর্বলতা মোটেও কমেনি। পরবর্তী শতাব্দীতে হাফেজ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহি আলাইহি ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’-তে এই ঘটনাটি সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। দৃশ্যত তিনি এটি ‘তারিখে দামেশক’ অথবা ‘উসদুল গাবাহ’ (ইবনুল আসির) থেকেই গ্রহণ করেছেন। [৯]

[১] আল-কামিল ফি দুয়াফাউর রিজাল: ২/৬০৭

[২] মিজানুল ইতিদাল: ৩৮২/২

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৩৭/৫, তাবা দারুল ফিকর

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/১৩, তাবা আর-রিসালাহ

[৫] তারিখে ইয়াকুবি, পৃ. ২০১

[৬] তাকরিবুত তাহজিব, নং: ৩৬৮

[৭] তারিখে দামেশক: ৩০/৬৯, জীবনী: আমিনা বিনতে শরিদ

[৮] উসদুল গাবাহ: ২০৫/৩

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী, আমনা বিনতে শারীদ হযরত আমর ইবনুল হামিক (রা.)-এর বিচ্ছিন্ন মস্তক নিজের কোলে দেখেছিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বদদোয়া দিয়েছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে নিজের দরবারে ডেকে ধমক দেন এবং অবশেষে দামেস্ক থেকে বের করে দেন। তিনি কুফায় চলে যান। [১]

এই বর্ণনার কোনো সনদ নেই। শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ শাবাশতি এটি উল্লেখ করেছেন। শাবাশতি ৩৮৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মিশরের উবাইদি শিয়া সরকারের দরবারী ছিলেন। [২] এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, চতুর্থ হিজরি শতকের একজন শিয়া দরবারী সদস্যের বর্ণিত এই বর্ণনার গুরুত্ব কতটুকু হতে পারে, যার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মোদাকথা, এটি একটি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনা যা উম্মাহর ইতিহাসে প্রথমবার তৃতীয় এবং এরপর ষষ্ঠ হিজরি শতকে সামনে আসে। এর আগে ওয়াকিদি, আবু মিখনাফ, মাসউদি, ইয়াকুবি, মুহাম্মদ বিন সাঈব কালবি প্রমুখের মতো কউর শিয়ারাও এটি বর্ণনা করেননি। সুতরাং শুধুমাত্র বড় বড় কিতাবের নাম দেখে সাহায্যে কেরাম (রা.)-এর ব্যাপারে এমন ভিত্তিহীন ও বিষাক্ত বর্ণনা যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

(৪) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে এটিও রটানো হয়েছে যে, তিনি তাঁর বিরোধীদের বিষ প্রয়োগে খতম করে দিতেন। এই সিলসিলায় নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো পেশ করা হয়:

- তিনি মালিক বিন হারিস আল-আশতার নাখয়িকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে মিশরের গভর্নর হতে যাচ্ছিলেন। পথে এক অমুসলিম কৃষকের কাছে অবস্থান করেন। কৃষক মধুতে বিষ মিশিয়ে পান করিয়ে দেয়, যার ফলে আশতারের মৃত্যু ঘটে। [৩] এই কাজ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ই করাতে পারতেন।
- তিনি নিজের গভর্নর হযরত আব্দুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তায় বিপদ অনুভব করেন এবং নিজের খ্রিস্টান চিকিৎসক ইবনে আসালের মাধ্যমে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করান। [৪]
- হযরত হাসান (রা.)-কে তাঁর স্ত্রী জাদা বিনতে আশআসের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে হত্যা করান। [৫] এবং এই কাজের বিনিময়ে ইয়াজিদ জাদা বিনতে আশআসের সাথে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কাজ হাসিল হওয়ার পর তিনি অস্বীকার করেন। [৬]

প্রকৃত সত্য এই যে, এসব অভিযোগ প্রমাণের জন্য পেশকৃত তথ্যাদি সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য। লক্ষ্য করুন:

[১] তারিখু দামেশক: ৪০/৬৯, ৪১

[২] আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৪/৩২৫

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪/৫৫৩

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/২২৭

[৫] উসদুল গাবাহ: ২/৬৪; আল-কামিল ফিত তারিখ, পৃ. ৩৯ হিজরি

[৬] আল-মুনতায়াম: ৫/২২৬

অশতর নাখয়ীকে বিষ প্রয়োগ:

অশতর নাখয়ীকে বিষ প্রয়োগের বর্ণনাটি আবু মুখনাফের, যা পরিত্যক্ত। এরপর যদি এটি মেনেও নেওয়া হয়, তবে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রমাণ করে যে, এই ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অগ্রণী ছিল এবং ফিতনার আগুন জ্বালানোর ক্ষেত্রে সবার আগে ছিল। স্বয়ং হযরত আলী (রা.) তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। তার এই পরিণতি মোটেও ভুল ছিল না।

আবদুর রহমান বিন খালিদ (রা.)-কে বিষ প্রয়োগের বাস্তবতা:

হযরত আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বিষ প্রয়োগের ঘটনাটি তাবারী যে সনদে বর্ণনা করেছেন, তাতে একজন বর্ণনাকারী হলেন আলী (আলী বিন মুহাম্মদ), যার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। দ্বিতীয়জন হলেন মুসালামা বিন মুহারিব, যিনি মাজহুলুল হাল, অর্থাৎ তার সত্তা পরিচিত হলেও তার অবস্থা অজানা। সুতরাং সামগ্রিকভাবে সনদটি দুর্বল।

এরপর এই অভিযোগটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ স্বয়ং তাবারীর পরবর্তী বর্ণনা থেকেই পাওয়া যায়। অভিযোগ সম্বলিত বর্ণনাটি তাবারীতে ৩৬ হিজরীর অধীনে রয়েছে। এরপর ৩৮ হিজরীর ঘটনাবলীতে তাবারী বেশ কিছু জিহাদী অভিযানের বিবরণ এবং তাদের সেনাপতিদের নাম লিখে জানিয়েছেন: **.....وعلى جميعهم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن وليد** “তাদের সবার প্রধান সেনাপতি ছিলেন খালিদ, যিনি আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদের পুত্র ছিলেন।” [১]

যদি আবদুর রহমান বিন খালিদ (রা.)-কে বিষ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রয়োগ করাতেন, তবে কীভাবে সম্ভব ছিল যে নিহতের সাহেবজাদা এরপরও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অনুগত থাকতেন এবং নিজের জীবন বাজি রেখে তাঁর জন্য যুদ্ধ করতেন?

যদি কেউ বলে যে খালিদ বিন আবদুর রহমান হয়তো আসল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতেন না, তবে প্রশ্ন জাগে যে, দেড় শতাব্দী পর মুসালামা বিন মুহারিব কীভাবে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন? এটা কীভাবে সম্ভব যে পুত্র, যিনি সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, তিনি এত বড় সত্য সম্পর্কে জানতেন না?

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বিষ প্রয়োগের বর্ণনায় ইহাও রয়েছে যে, হযরত খালিদ বিন আবদুর রহমান অনবরত হত্যাকারীর সন্ধানে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত হিমসে গিয়ে তাকে খতম করে দেন। এই হত্যাকারী ছিল একজন খ্রিস্টান। তার নাম ছিল ইবনে আছাল। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খালিদ বিন আবদুর রহমানকে সতর্ক করার জন্য কয়েক দিন হেফাজতে রাখেন এবং এরপর কোনো শাস্তি ছাড়াই ছেড়ে দেন। এটি নিজেই এই কথার প্রমাণ যে, খালিদ বিন আবদুর রহমান তাঁর পিতার হত্যাকাণ্ডে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে জড়িত মনে করতেন না, অন্যথায় ইবনে আছালের পরিবর্তে তিনি সরাসরি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে লক্ষ্যবস্তু বানানোর চেষ্টা করতেন।

এখন কথা থাকে যে, তাহলে আসল ষড়যন্ত্র কার ছিল? তবে সম্ভব যে কায়সার এই খ্রিস্টান চিকিৎসকের সাহায্যে এই কাজ করিয়েছেন যাতে হযরত সাইফুল্লাহ খালিদ (রা.)-এর কাছে পাওয়া পরাজয়গুলোর প্রতিশোধ তাঁর সন্তানদের থেকে নেওয়া যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

হযরত হাসান (রা.)-কে তাঁর স্ত্রী জাদা বিনতে আশআছের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগের অভিযোগটিও ভুল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে হযরত হাসান (রা.) সম্পর্কে সংশয়সমূহের অধীনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/২৩১

(৫) হযরত হুজর ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যা সম্পর্কে প্রশ্নসমূহ

প্রশ্ন: হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বিদ্রোহের অভিযোগে কেন হত্যা করলেন? প্রথমত, তিনি তো একজন সাহাবী ছিলেন অথবা অন্য মতানুসারে অন্তত একজন আবিদ ও যাহিদ তাবিঈ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তো গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহী বন্দীকে হত্যা করা জায়েজ নয়।

উত্তর: প্রথম কথার উত্তর হলো, কারো বুজুর্গি বা মহত্বের কারণে শরয়ী সাজা রহিত হয়ে যায় না। হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী উসমানী সাহেব হযরত হুজরকে সাজা দেওয়ার ওপর আপত্তির উত্তরে লিখেছেন: “যেখানে ইবাদত ও যুহদ (পরহেজগারি)-এর সম্পর্ক, তা এই কথার জন্য কোনো অজুহাত নয় যে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে।” [১]

দ্বিতীয় কথার উত্তর হলো, বিদ্রোহী বন্দীকে হত্যা করা সেই সময় নাজায়েজ যখন তার দলের শক্তি ও ঐক্য শেষ হয়ে যায় এবং তাকে জীবিত রাখলে কোনো ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। ইমাম সারাখসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“অনুরূপভাবে (বিদ্রোহী) বন্দীকে ততক্ষণ হত্যা করা হবে না যতক্ষণ তার দল অবশিষ্ট না থাকে। যদি তার দল বিদ্যমান থাকে তবে তাদের বন্দীকে হত্যা করাতে কোনো দোষ নেই যাতে তাদের শক্তি খর্ব হয়, বরং সে বাধ্য হয়ে গেছে। যদি সে মুক্ত হয়ে যায় তবে সে তার দলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। সুতরাং যখন শাসক তাকে হত্যা করার মধ্যে কল্যাণ মনে করবেন তখন তাকে হত্যা করাতে কোনো দোষ নেই।” [২]

“আলমগিরী”-তে আছে যে, তাদের মধ্য থেকে যাকে বন্দী করা হবে তাকে ততক্ষণ হত্যা করা জায়েজ নয় যতক্ষণ জানা না যায় যে তার কোনো শক্তিশালী দল আছে। কিন্তু যদি জানা যায় যে তাকে হত্যা না করলে সে কোনো শক্তিশালী দলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে, তবে শাসক তাকে হত্যা করতে পারেন।” [৩]

হুজর ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দল বিদ্যমান ছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আশঙ্কা ছিল যে তাকে জীবিত রাখলে মানুষ তার চারপাশে সমবেত হয়ে ফিতনা ছড়াবে। সেজন্যই তিনি মালিক বিন হুযায়রা-কে বলছিলেন: “হুজর ইবনে আদি বেঁচে থাকলে আমার আশঙ্কা হয় যে সে তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে নিজের দিকে প্ররোচিত করবে এবং এই বিষয়টি মুসলমানদের জন্য হুজরের হত্যার তুলনায় অনেক বেশি ফিতনার কারণ হবে।” [৪] তিনি আরও বলেছেন: “তোমার চাচাতো ভাই হুজর কওমের নেতা এবং আমার ভয় হয় যে আমি যদি তাকে ছেড়ে দিই তবে সে আমার দেশ সংকীর্ণ করে দেবে।” [৫] একবার বললেন: “তার সাথে থাকা এক লক্ষ লোককে হত্যা করার চেয়ে তাকে হত্যা করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।” [৬]

[১] হযরত মুয়াবিয়া এবং ঐতিহাসিক সত্য, পৃষ্ঠা ৯৩।

[২] “অনুরূপভাবে বন্দীদের হত্যা করা হবে না যদি তাদের কোনো দল না থাকে। আর যদি তাদের দল থাকে তবে তাদের হত্যা করাতে কোনো দোষ নেই কারণ তাদের অনিষ্ট দূর করা হয়নি বরং তারা পরাজিত। যদি শাসক তাদের হত্যা করার মধ্যে কল্যাণ দেখেন তবে তাদের হত্যা করাতে কোনো দোষ নেই।” (আল-মাবসুত লিস-সারাখসী: ১০/২১৫, দারুল ফিকর বৈরুত)

[৩] “আর তাদের মধ্য থেকে যাকে বন্দী করা হবে তাকে হত্যা করা হবে না যদি জানা যায় যে সে কোনো দলের সাথে মিলিত হবে না। কিন্তু যদি জানা যায় যে সে কোনো শক্তিশালী দলের সাথে মিলিত হবে তবে তাকে হত্যা করা হবে।” (আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া আল-মারুফ বি ফাতাওয়া আলমগিরী: ২/৩৮৩, ত: দারুল ফিকর)

[৪] “নিশ্চয়ই হুজর ইবনে আদি যদি বেঁচে থাকে তবে আমার ভয় হয় যে সে তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে প্ররোচিত করবে এবং এটি মুসলমানদের জন্য হুজরের হত্যার চেয়ে বড় বিপদ হবে।” (তারিখুত তাবারী: ৫/২৭৮)

[৫] “নিশ্চয়ই তোমার চাচাতো ভাই হুজর কওমের নেতা এবং আমার ভয় হয় যে যদি তাকে ছেড়ে দিই তবে সে মিশরে ফিতনা সৃষ্টি করবে।” (তারিখুত তাবারী: ৫/২৭৩)

[৬] “তাকে হত্যা করা আমার কাছে তার সাথে থাকা এক লক্ষ লোককে হত্যা করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩৯)

হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আবু মিখনাফের মিথ্যা বর্ণনা:

প্রশ্ন: হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর হত্যার কাহিনীতে আবু মিখনাফ অনেক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, এর মর্যাদা কী? এই বর্ণনাগুলো তাবারিতে বিদ্যমান রয়েছে।

উত্তর: এই বর্ণনাগুলোতে স্থানে স্থানে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে ঘটনার রূপ বিকৃত করা হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

- হযরত হুজর বিন আদি (রা.) খিলাফতকে কেবল আল-ই-আলীর অধিকার মনে করতেন।
- হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর বিরুদ্ধে চার্জশিটে জিয়াদ এটিও লিখিয়েছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যে কুফরি করেছেন।
- জিয়াদ নিজের মনগড়া কথার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অভিযুক্তদের সাথে সাক্ষাৎ না করে এবং তাদের কথা না শুনেই ফয়সালা শুনিয়েছিলেন।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রস্তাব ছিল যে, যে অভিযুক্ত হযরত আলী (রা.)-এর ওপর তাবাররা ও অভিশাপ দেবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।
- জিয়াদ হযরত হুজর (রা.)-এর সন্ধানে কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিলেন।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আমীরদের সুপারিশে ছয়জন অভিযুক্তকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর জন্য মালিক বিন হুবাইরা সুপারিশ করেছিলেন কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এই সংযোজনগুলো এমন যে এগুলোর অধিকাংশের খণ্ডন সহীহ বর্ণনা দ্বারা হয়ে যায়। কিছু বিষয় ইসলামী আকিদার পরিপন্থী, যেমন খিলাফতকে আল-ই-আলীর জন্য নির্দিষ্ট মনে করা। কিছু বিষয় মহান ব্যক্তিত্বদের সুপরিচিত চরিত্রের পরিপন্থী। তাই দুর্বল বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করা যায় না।

প্রশ্ন: হুজর বিন আদি (রা.) প্রসিদ্ধ মতানুসারে সাহাবী ছিলেন। দ্বিতীয় মতানুসারে তিনি একজন উচ্চমর্যাদার তাবীঈ ছিলেন। অন্যদিকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও সাহাবী। একজন উচ্চমর্যাদার ব্যক্তিত্ব অন্য একজন বুজুর্গকে হত্যা করালেন। এখন আমরা কাকে সঠিক বলব আর কাকে পথভ্রষ্ট বলব?

উত্তর: আমরা হুজর বিন আদি (রা.)-এর মর্যাদা ও অবস্থান অস্বীকার করতে পারি না, আর না তাঁর পদক্ষেপগুলোর ওপর পথভ্রষ্টতার তকমা লাগানো সঠিক হবে। তাঁর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর বিচ্যুতিকে ইজতিহাদী ভুল বলাই সমীচীন। একইভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও এই বিবাদে যে ফয়সালা করেছিলেন, তা নিজের পক্ষ থেকে উন্মত্তের সামগ্রিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই করেছিলেন। তবে তিনি ফেরেশতা বা নবী ছিলেন না যে তাঁর দ্বারা ভুল হওয়া অসম্ভব। আমরা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ব্যাপারে নিষ্পাপ হওয়ার আকিদা রাখি না। হুজর বিন আদি (রা.)-এর বিবাদে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শেষ আদেশনামা প্রকাশ করে যে...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তিনি তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্তকে ভুল মনে করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা.)-এর সুপারিশনামা পাওয়ার পর সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসে হজর বিন আদি (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করার আদেশ জারি করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে তকদিরের ফয়সালা কার্যকর হয়ে গিয়েছিল এবং হজর বিন আদি (রা.)-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে গিয়েছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মনে সর্বদা এই অনুভূতি ছিল যে এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। কারণ যখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর দূত জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি হজর বিন আদি-কে কেন জেলে বন্দি করে রাখলেন না?” তখন তিনি বললেন: “কারণ আমার লোকদের মধ্যে তোমার মতো কেউ উপস্থিত ছিল না।” [১] মারওয়ান বিন হাকাম সমালোচনা করে বললেন যে, “আপনার চিন্তা-চেতনা ও সহনশীলতা তখন কোথায় গিয়েছিল?” তখন তিনি (রা.) উত্তর দিলেন যে, “তুমি আমার কাছে ছিলে না।” [২] তিনি (রা.) সারা জীবন হযরত হজর বিন আদি (রা.)-এর হত্যার কথা স্মরণ করতেন। [৩]

মৃত্যুর সময় তিনি ইয়াজিদ বিন আসাদ কুশাইরীকে স্মরণ করেছিলেন যিনি তাঁকে হজর (রা.)-কে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন এবং তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে বলেছিলেন: “আল্লাহ তোমার পিতার ওপর রহম করুন, তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তিনি আমাকে হজর বিন আদি-কে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন।” [৪]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই অনুশোচনা এবং ভুল স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মহানুভবতা ও উদারতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পুরো বিশ বছরের শাসনকালের আদর্শ ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং বিজয় ও উন্নতির অসংখ্য অধ্যায়কে উপেক্ষা করে কেবল দু-একটি সিদ্ধান্তের কারণে তাঁকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানানো এবং তাঁর শাসনকালকে একটি যালিম শাসনকাল হিসেবে অভিহিত করা একেবারেই অনুচিত হবে।

ভুল তো হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর দ্বারাও হয়েছিল যে, বনু জাযিমার সেই ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন যারা ঈমান প্রকাশের জন্য “আসলামনা” (আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি)-এর পরিবর্তে “সাবানা” (আমরা ধর্মত্যাগী হয়েছি) শব্দটি বলেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর এই পদক্ষেপ থেকে দায়মুক্তি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে ফাসিক বা যালিম হিসেবে গণ্য করেননি। [৫]

ভুল হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর দ্বারাও হয়েছিল যে, যুদ্ধ চলাকালীন এক ব্যক্তি কালিমা তাইয়েবা পাঠ করা সত্ত্বেও তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন এই ভেবে যে সম্ভবত সে প্রতারণা করছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসামা (রা.)-এর এই কাজের ওপর রাগ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে কোনো শাস্তি দেননি, কারণ উভয় ঘটনায় উদ্দেশ্য ছিল নেক, কিন্তু ধারণা বা তথ্যের ভুলের কারণে কাজটি ভুল হয়ে গিয়েছিল। [৬]

এ জাতীয় বিষয়ের সম্মুখীন মানুষকে হতেই হয়। ভুল থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাই এই সকল মহান ব্যক্তিদের পদক্ষেপসমূহকে ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য করে তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা উচিত।

[১] আল-ইসতিয়াব: ১/৩২৯, দারুল জিল সংস্করণ; তাহযীবুল কামাল: ৭/৩২, ৩৩, আর-রিসালাহ সংস্করণ।

[২] তারিখু দিমাশক: ১২/২৪০।

[৩] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৯৮০... এবং আমরা তাঁর (অর্থাৎ জারীরের সাথে মুয়াবিয়ার) কাছে প্রবেশের পর হজর বিন আদির হত্যার কথা ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা হয়নি।

[৪] তারিখু দিমাশক: ৩/২৪১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/২৩২, হাসান সনদে।

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৪৩৭৯, কিতাবুল মাগাযী, বাব: নবী (সা.) কর্তৃক খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ।

[৬] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব: কাফির ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর তাকে হত্যা করা হারাম হওয়া।

৬. হযরত আলী (রা.)-এর ওপর সাব্ব ও শাতম (গালিগালাজ ও মন্দ বলা)-এর অভিযান

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর সবচেয়ে কঠোর আপত্তি এই যে, তাঁর যুগে হযরত আলী (রা.) এবং সাদাত (আহলে বাইত)-এর অবমাননা ও মর্যাদাহানির অভিযান চালানো হয়েছিল। তাঁর গভর্নররা জুমার খুতবায় হযরত আলী (রা.)-এর ওপর সাব্ব ও শাতম করতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) স্বয়ং এই অনিষ্টের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এই পাপে শরিক হতে বাধ্য করতেন।

উল্লিখিত আপত্তির উত্তর দেওয়ার আগে আমরা তিনটি মূলনীতিমূলক কথা উল্লেখ করতে চাই:

১. সাব্ব ও শাতম-এর অর্থ:

“সাব্ব” এবং “শাতম” প্রায়শই গালি দেওয়া বা ধমক দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। বদদোয়া দেওয়া এবং লানত-মালাফত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। [১] আমরা একে মন্দ বলা বা কঠোর ভাষায় কথা বলা হিসেবে প্রকাশ করতে পারি। “আল-কামুসুল ওয়াহিদ”-এ আছে: সাব্ব: গালি দেওয়া, মন্দ বলা, দোষারোপ করা, কড়া সমালোচনা করা। শাতম: গালি দেওয়া। [২]

তবে সাব্ব ও শাতম করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের মানদণ্ড এক হওয়া জরুরি নয়। ইতর শ্রেণির মানুষ এতে অশ্লীল গালিগালাজও করে ফেলে, যেখানে ভদ্র ও মার্জিত মানুষ সতর্ক শব্দে মন্দ বলাকেই যথেষ্ট মনে করেন। তাছাড়া, যে ব্যক্তিকে “সাব্ব ও শাতম” করা হচ্ছে, তার মর্যাদার প্রেক্ষিতেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। একটি নেতিবাচক শব্দ কোনো সাধারণ মানুষের জন্য হয়তো গালি হিসেবে গণ্য হবে না, কিন্তু সেই একই শব্দ কোনো মহান ব্যক্তিত্বের জন্য গালি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো গেঁয়ো লোককে “জাহেল” (মূর্খ) বা কোনো পিয়নকে “অহমক” (নির্বোধ) বললে কোনো হাঙ্গামা হবে না। কিন্তু কোনো নেতার ওপর এই শব্দগুলো প্রয়োগ করা হলে তাঁর ভক্তরা একে কটু কথা বরং গালি হিসেবে গণ্য করবেন। অবশ্য তাঁর বিরোধীরা একে “সত্য প্রকাশ” হিসেবে অভিহিত করবেন, তাঁদের দৃষ্টিতে এটি কটু কথা হবে না।

সাব্ব ও শাতম-এর সাথে মিল থাকা একটি শব্দ হলো “নালা মিনহ”। এর অর্থ হলো মন্দ বলা, গিবত করা বা অপবাদ দেওয়া। [৩]

এর দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাব্ব ও শাতম-এর অর্থ সব জায়গায় মন্দ বলা বা গালি দেওয়া হয় না। বরং আরবি ভাষায় কখনো কখনো সামান্য আপত্তি, সমালোচনা বা সতর্ক করাকেও “সাব্ব” শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। [৪] আর এটাও হতে পারে যে একটি গোষ্ঠী...

[১] আশ-শাতমু কাবিহুল কালামি ওয়া লাইসা ফিহি কাযফ। (তাজুল আরুস লিজ-জাবিদি: ৩২/৩৫৩; তাহযিবুল লুগাহ লি-আবি মানসুর আল-আযহারি: ১১/২২৫) আশ-শাতমু কাবিহ আমরিল মাশতুমি বিল-কাউলি ওয়াস-সাব্বু হুয়াল ইত্তাবু ফিশ-শাতম। (আল-ফুরুকুল লুগাবিয়্যাহ লিল-আসকারি, পৃ. ৫২)

[২] আল-কামুসুল ওয়াহিদ, আরবি-উর্দু, পৃ. ৩৫৬, ৩০৬।

[৩] ফুলানুন ইয়ানালু মিন ইরদি ফুলানিন ইয়া সাব্বাহ নালা মিনহ ওয়া আব্বাহ ওয়া কাতাআহ বিল-গিবতি ওয়াল-বুহতান। (তাহযিবুল লুগাহ: ৬/৮০, ৮/১৫)

[৪] তাবুক যুদ্ধের সফরে নবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে তাকিদ করেছিলেন যে, আগামীকাল তাবুকের ঝরনায় পৌঁছে আমার আগে কেউ যেন এর পানি স্পর্শ না করে। দুইজন সাহাবী কাফেলা থেকে এগিয়ে গিয়ে পানি স্পর্শ করেন। রাসূল (সা.) জানতে পেরে তাঁদের “সাব্ব” করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কি এর পানি থেকে কিছু স্পর্শ করেছ?” তাঁরা বললেন: “হ্যাঁ।” তখন নবী (সা.) তাঁদের সাব্ব করলেন। (সহীহ মুসলিম, হা: ৬০৮৬, কিতাবুল ফাদায়িল, বাব মুজিজাতুন নবী সা.) স্পষ্টতই এখানে (নাউযুবিল্লাহ) গালি দেওয়া নয় বরং সতর্ক করা উদ্দেশ্য।

অন্য দলের নেতার ওপর সামান্য সমালোচনা করা হলেও সেই নেতার প্রশংসাকারীরা একে গালিগালাজ (সাবর ও শাতাম) হিসেবে অভিহিত করেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের একে অপরের সম্পর্কে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে যদি কোনো বর্ণনাকারী শাতাম, গাল এবং ইয়াসুবু-এর মতো শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে থাকেন, তবে তাঁদের মর্যাদার পার্থক্যের কথা বিবেচনা করে এর অর্থ অভিশাপ দেওয়া বা গালিগালাজ করা হিসেবে নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না কোনো সহীহ বর্ণনার স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। সাধারণত এর অর্থ এটাই হবে যে, কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে একজন অন্যজনের সমালোচনা করেছেন। যদিও মানুষ হিসেবে কখনো কখনো মন্দ কথা বলার পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়াও সম্ভব। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সাবর ও শাতাম দ্বারা গালিগালাজ করা উদ্দেশ্য নেওয়া হবে না, যদি না কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এমন শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে।

২. যুদ্ধের সময়ে জিহ্বার আঘাত (জরাহাতুল লিসান):

যখন হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনী একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং কখনো সিফফিনের ময়দানে আবার কখনো সীমান্ত সংঘর্ষে একে অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার চলছিল, তখন সেই যুগে উভয় পক্ষের মধ্যে “জরাহাতুল লিসান” (জিহ্বার আঘাত) অব্যাহত থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয়। [১] সামান্য ঝগড়া-বিবাদেও এমন হয় না যে, দুই ব্যক্তি চুপচাপ বসে আছে এবং হঠাৎ একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে জিহ্বা নড়ে ওঠে। মতপার্থক্য প্রকাশ পায়। তারপর যখন মৌখিক কথাবার্তায় বিষয়টি মীমাংসা হয় না, তখন হাতাহাতি শুরু হয়। দেশগুলোর লড়াইয়েও এমনটাই ঘটে, তবে কিছুটা মার্জিতভাবে। প্রথমে মতপার্থক্য মৌখিক ও লিখিত মাধ্যমে প্রকাশ পায়। দূতদের মাধ্যমে আলোচনা হয়। যখন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন নিজ নিজ সমর্থকদের আত্মত্যাগের মানসিকতাকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রতিপক্ষের ভুলকে জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়, যাতে নিজ পক্ষের লোকেরা জানতে পারে যে তারা হকের জন্য লড়াইছে, আর প্রতিপক্ষ হকের বিরোধিতা করছে। যুদ্ধের পরেও এই পরিবেশ কোনো না কোনোভাবে বজায় থাকে। তবে সাধারণ মানুষের লড়াই এবং শাসকদের যুদ্ধের মধ্যে এই স্পষ্ট পার্থক্য সবসময়ই ছিল যে, সাধারণ মানুষ লড়াইয়ের আগে, চলাকালীন এবং পরেও একে অপরকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। অন্যদিকে শাসকদের কথা বলার ধরন যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ও ভিন্ন হয়। কালামুল মুলুক মুলুকুল কালাম (বাদশাহদের কথা কথার বাদশাহ হয়ে থাকে)।

শাসকরা নিজেদের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে মতপার্থক্যও মার্জিত ও যথাযথভাবে প্রকাশ করেন। সমালোচনাও করেন মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে। (খুবই নিম্নস্তরের কোনো শাসক হবে যে প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করতে শুরু করে।) শাসকের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা কখনো তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির আতিশয্যে, আবার কখনো তোষামোদ হিসেবে বিরোধীদের নিন্দা প্রকাশ্য শব্দে করে থাকেন। ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্র শাসকরা এটিও পছন্দ করেন না, তবে সব ক্ষেত্রে তাঁরা এমন দরবারী ও প্রতিনিধিদের জবাবদিহি করতে পারেন না, কারণ আশঙ্কা থাকে যে প্রতিনিধিরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে প্রতিপক্ষের সাথে গিয়ে না মিশে যায়।

[১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাফেজীদের দাবির খণ্ডনে বলেন: আর আলী (রা.)-কে অভিশাপ দেওয়ার বিষয়ে তারা যা উল্লেখ করেছে, তবে অভিশাপ দেওয়ার বিষয়টি উভয় পক্ষের পক্ষ থেকেই ঘটেছিল যেমন যুদ্ধ ঘটেছিল। এরা তাদের দোয়ায় তাদের নেতাদের অভিশাপ দিত এবং তারা তাদের দোয়ায় এদের নেতাদের অভিশাপ দিত। বলা হয়েছে যে, প্রতিটি দলই অন্য দলের বিরুদ্ধে কুনুত পড়ত। আর হাত দিয়ে লড়াই করা জিহ্বা দিয়ে অভিশাপ দেওয়ার চেয়েও বড় বিষয়। আর এই সব কিছু চাই তা গুনাহ হোক বা ইজতিহাদ, ভুল হোক বা সঠিক, আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত তওবা, পাপমোচনকারী নেক আমল এবং কাফফার স্বরূপ বিপদ-আপদ ইত্যাদির মাধ্যমে তা शामिल করে নেয়। (মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/৪৬৮)

এটি সাধারণ শাসকদের কথা, অথচ সাহাবায়ে কেরাম চরিত্র ও অভিজাত্যে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এই কারণেই যুদ্ধের পরিবেশেও আমাদের হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সুন্দর কথা, চরিত্র ও শিষ্টাচারের প্রশংসা করতে হয়। এই সময়ে উভয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন একটি বাক্যও বর্ণিত হয়নি যাকে গালিগালাজ বলা যেতে পারে।

আবার হযরত আলী (রা.) যেভাবে মর্যাদা ও মহত্ত্বে অগ্রগামী ছিলেন, তেমনি তাঁর কাছে চরিত্র ও ইনসাফের মানদণ্ডও অনেক উঁচুতে দেখা যায়। ফলে শুধু হযরত আলী (রা.) নন, বরং তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও তাঁদের বিরোধীদের ব্যাপারে এমন কোনো বাক্য শুনতে রাজি ছিলেন না যা শরীয়তের পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়।

যখন হযরত আলী (রা.)-এর সামনে কেউ চিৎকার করে বলল, “হে আল্লাহ! সিরিয়াবাসীদের ওপর লানত বর্ষণ করুন।” তখন হযরত আলী (রা.) তাকে নিষেধ করে বললেন: “সিরিয়াবাসীদের মন্দ বলো না। তাদের মধ্যে আবদাল (উচ্চমর্যাদার ওলীগণ) বিদ্যমান রয়েছেন।” [১]

যখন সিফফিনের যুদ্ধে কেউ হযরত আম্মার (রা.)-এর সামনে বলল: “সিরিয়াবাসীরা কাফের হয়ে গেছে।” তখন তিনি তা অস্বীকার করে বললেন: “আমাদের এবং তাদের নবী এক এবং কেবলাও এক, তবে তারা ফিতনার শিকার হয়েছে।” [২]

তবে এর দ্বারা এটিও প্রমাণিত হয় যে, কিছু কর্মকর্তা, সৈন্য ও সাধারণ মানুষের (তারা যে পক্ষেই হোক না কেন) যুদ্ধের সময় জিহ্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না (আর প্রত্যেকের কাছ থেকে এমন চারিত্রিক উচ্চতা প্রত্যাশাও করা যায় না)। সুতরাং যদি তাদের পক্ষ থেকে একে অপরের বড়দের বিরুদ্ধে কটু কথা প্রমাণিত হয়, তবে তার দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের ওপর কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। [৩]

এটি ছিল সেই সময়ের ‘জরাহাতুল লিসান’ (জিহ্বার আঘাত)-এর প্রেক্ষাপট যখন যুদ্ধ চলছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি গালিগালাজ:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা হওয়ার পর কি হযরত আলী (রা.) এবং সম্মানিত সادات (বংশধরদের) প্রতি গালিগালাজ করা হতো?

একদল বলে যে, স্বয়ং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর প্রতিনিধিরা হযরত আলী (রা.) এবং সম্মানিত সادات-দের প্রতি গালিগালাজে লিপ্ত ছিলেন; জুমার খুতবাতেও এই কটু কথা বলা হতো এবং তাঁদের মজলিসগুলোও এই মন্দের দ্বারা কলুষিত ছিল।

অন্যদিকে কিছু লোক বলে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কর্মকর্তা এবং সহচরদের মধ্যে কেউই এই মন্দের সাথে জড়িত ছিলেন না, বরং বনু উমাইয়ার কাছে হযরত আলী (রা.) বা সম্মানিত সادات-দের মন্দ বলা অসহনীয় ছিল।

আমাদের দৃষ্টিতে উভয় মতই বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িতে (আফরাত ও তাফরিত) পূর্ণ। হাদিসের সহিহ ও হাসান বর্ণনা এবং একইভাবে সহিহ ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে যতটুকু প্রমাণিত হয় তা হলো: “কিছু উমাইয়া কটরপন্থী গভর্নর গালিগালাজ করতেন, যেখানে সতর্ক ব্যক্তিরা তা থেকে বিরত থাকতেন। গালিগালাজ কোনো সরকারি নীতি বা বাধ্যতামূলক আদেশ ছিল না যা প্রতিটি গভর্নরের ওপর আবশ্যিক ছিল।”

[১] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক মা’আ জামে’ মা’মার বিন রাশিদ, হাদিস: ২০৩৫৫, প্রকাশনা: আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান।

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হাদিস: ৩৫৮৩১, প্রকাশনা: আর-রুশদ।

[৩] লওর বিন ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, তার দাদা সিফফিনে উপস্থিত ছিলেন এবং সেদিন নিহত হন। তাই লওর যখন আলীর কথা উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন, আমি এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসি না যে আমার দাদাকে হত্যা করেছে। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪৫৭/৭)

মারওয়ান বিন আল-হাকামের গালিগালাজ করা কি প্রমাণিত নাকি নয়?

প্রশ্ন: যখন মারওয়ান বিন আল-হাকাম হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নর ছিলেন, তখন কি সেই যুগে তার গালিগালাজ করা প্রমাণিত? আর এটাও কি প্রমাণিত যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে এর নির্দেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে এই জঘন্য কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে মোটেও প্রমাণিত নয়। তবে মারওয়ান নিজে এই কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে প্রমাণিত। নিচের সহীহ ও হাসান বর্ণনাগুলো এর প্রমাণ:

.

হযরত জয়নুল আবেদিন (রা.)-কে মারওয়ান বিন আল-হাকাম বলেছিল: “আমাদের নেতা অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-কে আপনার নেতা অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) যতটা রক্ষা করেছিলেন, ততটা আর কেউ করেনি।” হযরত জয়নুল আবেদিন জিজ্ঞেস করলেন: “তাহলে তোমরা মিস্ররগুলোতে তাকে কেন গালিগালাজ করো?” মারওয়ান বলল: “আমাদের শাসনব্যবস্থা এটি ছাড়া চলে না।” (বর্ণনার সনদ সহীহ।) [১]

.

আয়েশা বিনতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেন যে, মারওয়ান বিন আল-হাকাম হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে আসছিল, তার কাছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) উপস্থিত ছিলেন যিনি মারওয়ানের কাজী ছিলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বললেন: “তাকে ফিরিয়ে দাও।” হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলতে লাগলেন: “সুবহানাল্লাহ! কুরাইশের একজন বড় ব্যক্তি এবং শহরের শাসক আপনাকে দেখতে আসছেন। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া কি তার প্রাপ্য অধিকার!” হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বললেন: “ঠিক আছে, তাকে আসতে দাও।” যখন মারওয়ান ভেতরে প্রবেশ করল এবং সাদ (রা.) তাকে দেখলেন, তখন তিনি নিজের মুখ তার মেয়ে আয়েশার খাটের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

[১] ইবনুল আসবাহানি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট শারীক বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে, তিনি উমর বিন আলী বিন আল-হুসাইন থেকে, তিনি আলী বিন আল-হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: মারওয়ান বিন আল-হাকাম আমাকে বলেছিল, লোকদের মধ্যে আমাদের সাথী অর্থাৎ উসমান বিন আফফানকে আপনার সাথী অর্থাৎ আলী বিন আবি তালিবের চেয়ে বেশি প্রতিরক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। আমি বললাম: তাহলে মিস্ররগুলোতে তাকে গালিগালাজ করার কারণ কী? সে বলল: এটি ছাড়া শাসনব্যবস্থা ঠিক থাকে না। (আত-তারিখুল কাবীর লিস-সাফারিস সানি: ২/৭১৯)

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

১. ইবনুল আসবাহানি: মুহাম্মদ বিন সাঈদ (মৃত্যু: ৩০০ হিজরি), বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী, সিকাহ (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৫৯১১)।
২. শারীক বিন আব্দুল্লাহ: (মৃত্যু: ১৭৭ হিজরি), মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদের বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী তার থেকে তালীকান বর্ণনা নিয়েছেন। সাদুক (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ২৭৮৭)।
৩. মুহাম্মদ বিন ইসহাক: (মৃত্যু: ১৫০ হিজরি), মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদের বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী তার থেকে তালীকান বর্ণনা নিয়েছেন। সাদুক (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ২৫৫৭)। নোট: মুহাম্মদ বিন ইসহাক বয়সে শারীকের চেয়ে বড় এবং শারীকের উস্তাদগণও তার থেকে বর্ণনা করেন।
৪. উমর বিন আলী বিন আল-হুসাইন: (মৃত্যু: ১১৩ হিজরি), মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযীর বর্ণনাকারী, সিকাহ (তাহযীবুল কামাল ২১/৪৬৬)।
৫. আলী বিন আল-হুসাইন: ইমাম জয়নুল আবেদিন; কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

কিছু আলেম শারীক এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাককে সামান্য দুর্বল মনে করেছেন, কিন্তু ইমাম মুসলিম এই উভয়ের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বর্তমান সুন্নাহর উপস্থিতিতে এই বর্ণনার মান হাসান-এর চেয়ে কম নয়, হাফেজ যাহাবী এই সনদকে ‘শক্তিশালী’ গণ্য করেছেন। (তারিখুল ইসলাম: ৩/৪৬১, ৪২১, তাদমুর)। এই বর্ণনাটি ইবনে আসাকিরও আবু বকর বিন আবি খাইসামার মাধ্যমে নিজের সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এতে কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী নেই। (তারিখ দিমাশক: ৪৩/৩৩৮)।

ইমাম বালাজুরিও শারীক থেকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে উমর বিন আলীর সনদে এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন: “মারওয়ান আলী বিন আল-হুসাইনকে বললেন: আপনাদের সাথীর মতো আমাদের সাথীর পক্ষাবলম্বনকারী আর কেউ ছিল না; তবে আমরা মিস্ররগুলোতে তাকে গালিগালাজ করি কারণ এটি ছাড়া আমাদের কাজ চলে না।” (আনসাবুল আশরাফ: ২/১৮৪)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — খণ্ড ২

তারপর তাদের ওপর কম্পন সৃষ্টি হলো এবং তারা বলল: “হে মারওয়ান! তোমার ধ্বংস হোক। এই লোকেরা অর্থাৎ সিরিয়াবাসীরা (আহলে শাম), তোমরা আলী বিন আবি তালিব (রা.)-কে গালিগালাজ করা সত্ত্বেও তোমাদের অনুগত।”

এটি শুনে মারওয়ান রাগে উঠে দাঁড়াল এবং সেখান থেকে চলে গেল। (বর্ণনার সনদ সহীহ।) [১]

হযরত হাসান (রা.)-এর উপস্থিতিতে মারওয়ান হযরত হুসাইন (রা.)-কে বলল: তোমরা আহলে বাইত অভিশপ্ত। জবাবে হযরত হুসাইন (রা.) বললেন: তোমার পিতা হাকামের ওপর আল্লাহর নবী সেই সময় লানত করেছিলেন যখন তুমি তার পৃষ্ঠদেশে ছিলে। (বর্ণনার সনদ হাসান।) [২]

উমাইর বিন ইসহাক বলেন, মারওয়ান ৬০ হিজরিতে মদিনায় আমাদের আমির ছিল, সে জুমুআর দিনগুলোতে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করত। এরপর বর্ণনায় বিস্তারিত ঘটনা রয়েছে যে, মারওয়ান দূত পাঠিয়ে হযরত হাসান (রা.)-কে গালি দেওয়ায়, হাসান (রা.) ধৈর্য ধারণ করেন, হযরত হুসাইন (রা.) জানতে পেরে মারওয়ানকে বলে পাঠান যে, তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিশপ্ত বলেছেন। [৩]

[১] “যখনই মারওয়ান প্রবেশ করত এবং সা’দ তাকে দেখতেন, তিনি তার চেহারা তার মেয়ে আয়েশার মোহরের দিকে ফিরিয়ে নিতেন। তখন সা’দ তাকে টেনে ধরতেন এবং বলতেন: হে মারওয়ান, তোমার ধ্বংস হোক! আলী বিন আবি তালিবকে গালি দেওয়ার ব্যাপারে সিরিয়াবাসীদের আনুগত্য তোমার ওপর (বর্তায়)।” মারওয়ান রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং রাগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। আত-তরীখুল কাবীর লি-ইবনি আবি খাইসামাহ, আস-সাফারুস সালিস: ৩/৩৭, এর সনদ মুত্তাসিল সহীহ। সামগ্রিক ঘটনা: ১. তাদের মৃত্যু ৮৩ হিজরি বা ৮৪ হিজরিতে হয়েছে। (তাকরীবুত তাহযীব, তর: ৮২৩২; তরীখুল ইসলাম লিয়-যাহাবী: ৪/৩৯২) ২. মুহাজির বিন মিসমার: সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী, ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিকাহ। (তাহযীবুল কামাল: ২৮/৫৮৩, ৫৮৪) ৩. ইয়াকুব বিন জাফর বিন আবি কাসীর: নাসায়ীর বর্ণনাকারী, মাকবুল। (তাকরীবুত তাহযীব, তর: ৮১১৩) ৪. ইব্রাহিম বিন আল-মুখতার: ইমাম বুখারীর উস্তাদ, সিকাহ। (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা: ৯/২৮৯, দারুন্ রিসালাহ)

[২] তাবাকাত ইবনে সা’দ, মুতাম্মিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ১/৩০২, ত. মাকতাবাতুস সিদ্দিক, এবং ইবনু আসাকির এটি তরীখু দিমাশকে (৫৭/২৩৩) বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটিকে কিছু লোক এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি কাউকে বদদোয়া দিতেন তবে তার খ্যাতির কারণ কী ছিল, কোনো ব্যক্তির জন্ম এবং মন্দ কাজ করার আগেই আপনি (সা.) তাকে কীভাবে বদদোয়া ও লানত দিতে পারেন। এই সন্দেহের উত্তর হলো, এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য লানত করা নয় বরং নির্ভীক হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা উদ্দেশ্য।

[৩] ইবনে সা’দ একে ‘আখবারানা আফফান বিন মুসলিম আল-খাল হাদ্দাসানা হাম্মাদ বিন সালামাহ, ক্বলা আখবারানা আতা বিন সাযিব আন আবি ইসহাক’-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। আফফান বিন মুসলিম সহীহাইনের, হাম্মাদ বিন সালামাহ মুসলিমের এবং আতা বিন সাযিব যিনি বুখারীর বর্ণনাকারী, তারা তিনজনই সিকাহ, তবে শেষ বয়সে তাদের তিনজনেরই স্মৃতিশক্তি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল (তাহযীবুত তাহযীব, তারাজিম: ৩৬৪৫, ৩৯৯, ৩৫৯৪)। আবু ইয়াহইয়া আল-আ’রাজ (যিয়াদ) ও সিকাহ। (তাহযীবুল কামাল: ৫/৫৩১) তাই বর্ণনার মান হাসান-এর কম নয়। ২. উমাইর বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মারওয়ান বিন আল-হাকাম মদিনায় কয়েক বছর আমাদের আমির ছিল, সে মিস্বারের ওপর প্রতি জুমুআয় আলীকে গালি দিত। (তাবাকাত ইবনে সা’দ, মুতাম্মিমুস সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসাহ: ১/৩৯৯, তরীখুল ইসলাম লিয়-যাহাবী, তাদমুরী: ৫/২৩১; বাশার: ২/৬০৬; তরীখু দিমাশক: ৫৭/২৪৩)। উস্তাদ: আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী, আবু মুহাম্মদ আল-জাওহারী থেকে, তিনি আবু উমর বিন হাইয়ুবিয়াহ থেকে, তিনি আহমদ বিন মা’রুফ থেকে, তিনি হুসাইন বিন আল-ফাহম থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন সা’দ থেকে, তিনি ইসমাইল বিন ইব্রাহিম আল-আসাদী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আউন থেকে, তিনি উমাইর বিন ইসহাক থেকে। এই বর্ণনাটি সনদ অনুযায়ী যয়ীফ। সনদের দুর্বলতার কারণসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

- মুহাম্মদ বিন সা’দ একে ইবনে আউনের মাধ্যমে উমাইর বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন অর্থাৎ ঘটনার মূল বর্ণনাকারী হলেন উমাইর বিন ইসহাক। তার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে জারাহ ও তা’দীলের ইমামগণ নিশ্চিত নন। তাকে মদিনার অধিবাসী বলা হতো কিন্তু মদিনার আলেমগণ তার বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। (আল-কামিল ফী দুয়াফাউর রিজাল: ৬/১৩৩; তাবাকাত ইবনে সা’দ: ৬/৩০১, ত. সাদির)।
- তার বর্ণনাগুলো শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ বিন আউন বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ নয়। এই কারণে মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি এক অপরিচিত ব্যক্তিত্ব, তাই জারাহ ও তা’দীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নন বলেন: উমাইর বিন ইসহাক কোনো কিছুর সমান নয়... তিনি কোনো গণনার মধ্যেই নন। (আল-কামিল ফী দুয়াফাউর রিজাল: ৬/১৩৩)।
- ইবনু আসাকিরের দীর্ঘ সনদে উল্লিখিত হুসাইন বিন আল-ফাহম (মৃ. ২৮৯ হি.) সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন: ‘তিনি শক্তিশালী নন’। (তাযকিরাতুল হুফফায: ৩/১৮৪)।
- হুসাইন বিন আল-ফাহমের ছাত্র হলেন আহমদ বিন মা’রুফ, তার বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে তারীখে বাগদাদ এবং তারীখে দিমাশক ও অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায় কিন্তু স্বয়ং তার নির্ভরযোগ্যতা বা জারাহ সম্পর্কে জারাহ ও তা’দীলের ইমামগণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন।
- আবু উমর বিন হাইয়ুবিয়াহ সিকাহ কিন্তু অষ্টম স্তরের বর্ণনাগুলো নকল করতেন। এছাড়া মাঝে মাঝে এক বর্ণনার স্থলে অন্য বর্ণনা দিয়ে দিতেন। ওয়াক্বিদীর বর্ণনা প্রচারের ক্ষেত্রে তার বড় ভূমিকা রয়েছে। (লিসানুল মীযান: ৫/২১৪)

এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। মারওয়ানের গালিগালাজ সংক্রান্ত এ ধরনের আরও অনেক দুর্বল বর্ণনা রয়েছে। যেহেতু উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়, তাই বাকি বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

সামগ্রিকভাবে এই বর্ণনাগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মারওয়ান এবং তার অনুসারীরা হযরত আলী (রা.), আহলে বাইত এবং হাসনাইন কারিমাইনের ওপর গালিগালাজ, আক্রমণ এবং নিন্দা ও সমালোচনা করতে থাকত। তারা এমন সব অভিযোগও আরোপ করত যেগুলোর ব্যাপারে তারা জানত যে এই ব্যক্তিবর্গ সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, কিন্তু ‘রাজনৈতিক প্রয়োজনের তত্ত্ব’ (theory of political necessity) এর অধীনে তারা এই স্বাদহীন পাপে লিপ্ত হতো। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, এভাবেই তারা তাদের পক্ষপাতদুষ্ট গোষ্ঠীকে নিজেদের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে। সম্ভবত তাদের ভয় ছিল যে, যদি তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীও আহলে বাইতের অনুরাগী হয়ে যায়, তবে সেই শক্তি বিলীন হয়ে যাবে যার ওপর ভিত্তি করে এই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

□□□

মারওয়ানের আহলে বাইতের ওপর গালিগালাজ করা কি যুক্তিসঙ্গতভাবে অসম্ভব?

প্রশ্ন: মারওয়ানের পক্ষে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নয়, কারণ তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বৈবাহিক আত্মীয় (বেয়াই) ছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর দুই কন্যা মারওয়ানের দুই পুত্র: আব্দুল মালিক এবং মুয়াবিয়ার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। [১]

৬৩ হিজরিতে যখন মদিনাবাসী বনু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন মারওয়ানের প্রাণ বাঁচাতে এবং তাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিতে এগিয়ে এসেছিলেন হযরত আলী (রা.)-এর পৌত্র হযরত জয়নুল আবেদিন আলী বিন হুসাইন (রা.)। [২] হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) দীর্ঘকাল মদিনা মুনাওয়ারায় মারওয়ানের পেছনে সালাত আদায় করেছেন এবং কখনো সালাত পুনরায় আদায় করেননি। [৩] যদি এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এমন শত্রুতা থাকত যে এক পক্ষ থেকে মিস্র থেকে পিতাকে গালি দেওয়া হতো এবং অন্য পক্ষ থেকে অভিশাপ পাঠানো হতো, তবে এই আত্মীয়তা কীভাবে সম্ভব হতো? মারওয়ান যদি নবুওয়াতের জবান থেকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত হতেন, তবে সাদাতদের পক্ষে তার পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা কীভাবে সম্ভব ছিল?

উত্তর: হযরত আলী (রা.)-এর কন্যাদের মারওয়ানের পুত্রদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বল বরং ভিত্তিহীন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মারওয়ান কর্তৃক হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করার বিষয়টি কিছু সহীহ বর্ণনায়ও রয়েছে যা ইতিপূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে।

যদি যুক্তির ভিত্তিতেই প্রতিটি বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে এখানে প্রশ্নকারীর দাবির বিপরীতে কেউ আরও দৃঢ়তার সাথে সেই ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করতে পারে যেগুলোতে হযরত আলী (রা.)-এর কন্যাদের মারওয়ানের পুত্রদের সাথে বিবাহের কথা উল্লেখ আছে। সে বলতে পারে যে, এটি অসম্ভব ছিল যে হযরত আলী (রা.)-এর কন্যারা তাদের গালি প্রদানকারীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মেনে নেবেন।

হাসনাইন কারিমাইন (রা.)-এর মারওয়ানের পেছনে সালাত আদায় করা বা হযরত জয়নুল আবেদিন (রা.)-এর মারওয়ানকে আশ্রয় দেওয়া থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে মারওয়ান কোনো ফেরেশতা ছিল। এটি তো ছিল এই মহান ব্যক্তিবর্গের শরীয়তের অনুসরণ যে, নববী ফরমান: ‘صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ’ (প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পেছনে সালাত আদায় করো) [৪]-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা মারওয়ানের পেছনেও সালাত আদায় করতে থাকেন। এটি তাদের...

[১] জামহরাতু আনসাবিল আরব, ইবনে হাজম, পৃ: ৮৭, ৩৮

[৩] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৩/৪৮৪, ত. আর-রিসালাহ

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯৩, আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত

[৪] সুনানে দারা কুতনী. হা: ১৭৬৮, ১, ত. মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ ২)

এটি সংকীর্ণমনা চিন্তা যে এমন ব্যক্তিকেও বিপদের সময় আশ্রয় দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি মনে করে যে নবুওয়াতের পরিবারের দয়া ও অনুগ্রহ কেবল বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সে নির্বোধ। যদি এই ধরনের অনুমান মেনে নেওয়া হয়, তবে যে কোনো মূর্খ এও বলতে পারে যে আবু জেহেলের সমস্ত কালো কারনামা সন্দেহজনক; কারণ আবু জেহেলের মেয়ে জুওয়াইরিয়াকে আত্তাব বিন আসিদ (রা.) বিয়ে করেছিলেন। [১] হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুম (যা হাদীসের সহীহ ও হাসান বর্ণনাগুলোতে বর্ণিত আছে) [২] তাও বানোয়াট হতে পারে কারণ আলী (রা.)-এর এক নাতনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকাহে ছিলেন। [৩] কোনো তথাকথিত গবেষক এই দাবিও করতে পারেন যে মুখতার কাযযাব ফিতনাবাজ ছিলেন না বরং অনেক বড় ওলীআল্লাহ ছিলেন কারণ তার বোন সাফিয়া হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। [৪]

এই সবই ভিত্তিহীন অনুমান। বাস্তবতা হলো, মন্দ লোকদের মন্দ কাজ তাদের নিজ স্থানে প্রমাণিত এবং তাদের সন্তানদের ভালো লোকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই যুগে আজকের মতো সংকীর্ণমনা ও ঈর্ষাপরায়ণতা ছিল না যে একজনের মন্দের কারণে তার পুরো পরিবারকে কলঙ্কিত মনে করা হবে। কোনো ব্যক্তির ফাসেকী ও জুলুমের কারণে শরীয়তগতভাবে তার সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। হ্যাঁ, জুলুম ও পাপাচারে শরিক হওয়া অবশ্যই নিষিদ্ধ। বিরোধীদের সাথে এই ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই হিকমতও লক্ষ্য রাখা হতো যাতে বিরোধীদের ওপর ভালো প্রভাব পড়ে এবং তাদের গোঁড়ামি থেকে বের করে এনে ভারসাম্যের কাছাকাছি আনা যায়।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সকল গভর্নর কি গালিগালাজ করতেন?

প্রশ্ন: মারওয়ানের গালিগালাজের কারণে কি বাকি গভর্নরদেরও এই মন্দের সাথে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়? এর প্রমাণ কী যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সকল গভর্নর এই মন্দ কাজের অপরাধী ছিলেন না?

উত্তর: ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো এটাই প্রমাণ করে যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিশিষ্ট গভর্নরগণ এই জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকতেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) উমাইর বিন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন: “মারওয়ান জুমার দিন হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করত। এরপর তাকে বরখাস্ত করে সাজিদ বিন আস (রা.)-কে নিযুক্ত করা হলো। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করতেন না।” [৫]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে গালিগালাজ করা কিছু গভর্নরের ব্যক্তিগত কাজ ছিল। যদি এটি সরকারি নীতি বা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশ হতো, তবে সকল গভর্নরই তা করতেন।

[১] আল-ইসাবাহ ২/৪৮৭

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২২৬০, বাব যিকর কাযযাব সাকীফ ওয়া মুবীরাহা, এবং আহমাদ তার মুসনাদে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, হা: ২৬৯৬৭, হাসান লি-গাইরিহি, হা: ৩৭৩৩ সহীহ সনদে; সুনান আত-তিরমিযী, হা: ২২২০, ইমাম আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

[৩] জামহারাত আনসাব আল-আরব, ইবনে হাযম, পৃ. ৩৮

[৪] তাহযীব আল-কামাল ২১/৩৫

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা ৩/৪৪৩, ত. আল-রিসালাহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি হযরত আলী (রা.)-এর ওপর গালিগালাজ করাতেন?

এখন পর্যন্ত আলোচনা ‘গালিগালাজ সমস্যার’ ভূমিকা ছিল। আসল প্রশ্ন যা অত্যন্ত জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয় তা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি নিজে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর গালিগালাজ করতেন এবং অন্যদের দিয়ে করাতেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিজ মুখে হযরত আলী (রা.)-কে মন্দ বলা কোনো নির্ভরযোগ্য (সহীহ বা হাসান) বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর যদি কোনো যযীফ বর্ণনায় এমন কিছু বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে তা আমাদের জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন আমরা সেই বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করব যার মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সরাসরি গালিগালাজের অপরাধে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

১. সহীহ মুসলিমের বর্ণনা:

এই দাবির সবচেয়ে বিখ্যাত দলিল হলো মুসলিম শরীফের বর্ণনা। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন:

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟ (আপনি হযরত আলী (রা.)-এর নিন্দা কেন করেন না?)

হযরত সাদ (রা.) এর কারণ বর্ণনা করেন:

فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أُسَبَّهُ... الخ

“তিনটি এমন কথা রয়েছে যা (আলী (রা.)-এর জন্য) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, সেগুলোর কারণে আমি কখনোই তাঁর অবমাননা করব না। সেগুলোর মধ্যে একটি কথাও যদি আমি পেতাম, তবে তা আমার কাছে লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো:

প্রথম কথা: রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আমি সেই সময় বলতে শুনেছি যখন তিনি (সা.) কোনো যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা.)-কে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে পেছনে রেখে যাচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের কাছে রেখে যাচ্ছেন? তিনি (সা.) বললেন: ‘তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার সম্পর্ক তেমন হোক যেমন হযরত হারুন (আ.)-এর সম্পর্ক হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে ছিল? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।’

দ্বিতীয় কথা: আমি খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: ‘আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেব যে...’

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

“...আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ভালোবাসেন।” আমরা সবাই এই অপেক্ষায় ছিলাম যে সেই ব্যক্তি কে হবে। তারপর তিনি (সা.) বললেন: “আলীকে ডাকো।” তাঁকে ডাকা হলো, তখন তাঁর চোখে ব্যথা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পবিত্র লালা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁকে ঝাণ্ডা (পতাকা) দিলেন। আল্লাহ হযরত আলীর (রা.) হাতে বিজয় দান করলেন।

তৃতীয় কথা... যখন এই পবিত্র আয়াত নাঘিল হলো:

“فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ” (বলুন, এসো আমরা আমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের সন্তানদের ডাকি...)।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী, হযরত ফাতিমা এবং হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে (রা.) ডাকলেন এবং বললেন: “হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার।” [১]

সাধারণত এই বর্ণনার অর্থ এই নেওয়া হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে (রা.) হযরত আলীর (রা.) সমালোচনা করার জন্য প্ররোচিত করছিলেন। এমনটি কেবল সেই ব্যক্তিই ভাবতে পারে যে হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) সহনশীলতা ও ধৈর্য এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) সত্যবাদিতা ও সাহসিকতা সম্পর্কে অবগত নয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলীকে (রা.) এত উচ্চ মর্যাদা দিতেন যে তাঁর শাহাদাতের সংবাদ শুনে তিনি বেসামাল হয়ে কেঁদে উঠেছিলেন:

“আলীর মৃত্যুর সাথে সাথে জ্ঞান ও ফিকহ (প্রজ্ঞা) বিদায় নিল।” [২]

তিনি হযরত আলীর (রা.) সঙ্গীদের পীড়াপীড়িতে তাঁর গুণাবলী শুনতেন এবং অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন:

“আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন, তিনি সত্যিই এমনই ছিলেন।” [৩]

হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) সামনে কেউ হযরত আলীর (রা.) সমালোচনা করলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিতেন। [৪]

জীবনের শেষ খুতবায় তিনি বলেছিলেন:

“আমার পরে যারা আসবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম, যেমন আমার আগে যারা ছিল তারা আমার চেয়ে উত্তম ছিল।” [৫]

অন্যদিকে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) চরিত্র ছিল এমন যে তিনি সেই প্রথম সারির সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে ‘আশারা মুবাশশারা’ বলা হয়। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) আরবের সিংহহৃদয় বীর ছিলেন। তিনি কাদিসিয়ার সেনাপতি এবং মাদায়েন ও কিসরার বিজয়ী ছিলেন, যিনি হযরত উসমানের (রা.) শাহাদাতের পর নিজেকে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন যাতে তাঁর জিহ্বা ও তলোয়ার কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়।

এমন উচ্চ চরিত্রের ও পরহেজগার মানুষকে যদি কেউ হযরত আলীর (রা.) অবমাননার মতো অপবিত্র কাজের প্ররোচনা দিত, তবে তাঁর আত্মমর্যাদা...

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৬২২৪, কিতাবুল মানাকিব, ফাযায়িলে আলী (রা.)।

[২] তারিখু দিমাশক: ৪২/৫৮৩।

[৩] তারিখু দিমাশক: ৩/৫৮৩।

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৫।

[৫] সিমতুন নুজুমিল আওয়ালী: ২/৬৭; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/১১৯।

ঈমানি জোশ অবশ্যই আসত এবং তিনি কোনো কঠোরতম জবাব দিতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উদ্দেশ্য জানতেন যা মোটেও অবমাননা ছিল না, তাই তিনি শান্তভাবে একটি ইলমি জবাব দিলেন এবং জোরালো কারণসমূহ বর্ণনা করলেন, যা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনতে থাকলেন।

যদি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা.)-কে গালি দেওয়ানো হতো, তবে তিনি চুপচাপ হযরত আলী (রা.)-এর এত দীর্ঘ গুণগান শুনতেন না, বরং মাঝপথেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করতেন। কিন্তু এমন কিছুই হয়নি এবং এই বরকতময় মজলিসে বর্ণিত সাইয়্যিদিনা আলী (রা.)-এর গুণগান সমগ্র উম্মত পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মুসলিমের বর্ণনার যথাযথ ব্যাখ্যা:

এখন কথা হলো, শেষ পর্যন্ত হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কেন হযরত সাদ (রা.)-কে বললেন যে, ‘আপনাকে হযরত আলীর সমালোচনা করা থেকে কোন জিনিস বাধা দিচ্ছে?’ সেই সময়ের পরিস্থিতি এবং হযরত সাদ (রা.)-এর জীবনের ওপর লক্ষ্য করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

বিষয়টি ছিল এই যে, হযরত সাদ (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে ইরাক বিজয়ের পর কুফায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগেও কিছুকাল সেখানে গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ২৫ হিজরিতে পদচ্যুত হয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। উসমানের শাহাদাতের পর আপনি (রা.) শহর থেকে তিন মাইল (পৌনে ৫ কিলোমিটার) দূরে আকিক নামক স্থানে নির্জনবাস গ্রহণ করেন এবং হযরত আলী (রা.) বা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কারো পক্ষই অবলম্বন করেননি।

এই সময়ে কুফায় হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করা নাসিবি ও খারিজিরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। হযরত সাদ (রা.) এ সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করতেন। আবু বকর বিন খালিদ বিন উরফাতা নামক এক তাবিস্ট কুফা থেকে এলে হযরত সাদ (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘আমি জানতে পেরেছি যে, কুফায় তোমাদের সামনে হযরত আলী (রা.)-কে গালি দেওয়া হয়। তোমরাও কি হযরত আলী (রা.)-এর নিন্দা করো?’

তিনি বললেন: ‘আল্লাহর পানাহ।’

হযরত সাদ (রা.) বললেন: ‘সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে সাদের প্রাণ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে যা বলতে শুনেছি (তার পর) যদি আমার মাথার ওপর করাত রেখে বলা হয় যে আলীর নিন্দা করো, তবে আমি তখনও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলব না।’ [১]

মনে হয় যে, এমন লোকেরা হযরত সাদ (রা.)-কেও নিজেদের সমমনা বলে প্রচার করছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এটি জানতেন যে হযরত সাদ (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করার মতো লোক নন, কিন্তু তিনি তাঁকে এটি জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলেন না যে, ফিতনার এমন ভয়াবহ যুগে যখন ভারসাম্যের ওপর থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে এবং অনেক লোক হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি করছে, তখন আপনি এই দক্ষতা কীভাবে অর্জন করলেন যে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ না নিয়েও আপনি...

[১] মুসনাদে আবি ইয়লা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৭, হাদিস: ৭৭৭, হাসান সনদে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

...থেকে এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিছু শোনা যায়নি?

ইমাম নববী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা:

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই উক্তি ‘আপনাকে আবু তুরাবের সমালোচনা করা থেকে কিসে বাধা দিচ্ছে?’ এর দ্বারা এটি স্পষ্ট হয় না যে তিনি হযরত সাদ (রা.)-কে হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বরং তিনি তাঁর সমালোচনা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করছিলেন। তিনি কি বলতে চাচ্ছিলেন: ‘আপনি কি শরয়ী সতর্কতা বা অন্য কোনো ভয়ের কারণে এমনটি করছেন?’ যদি এর কারণ শরয়ী সতর্কতা এবং হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি সম্মান হয়, তবে আপনি সম্পূর্ণ সঠিক ও ভালো করছেন। আর যদি অন্য কোনো কারণ থাকে তবে তার প্রেক্ষিত ভিন্ন হবে। সম্ভবত হযরত সাদ (রা.) এমন লোকদের সাথে থাকতেন যারা (হযরত আলী (রা.)-এর) সমালোচনা করত, কিন্তু হযরত সাদ (রা.) তা করতেন না, তবে তিনি তাদের বাধা দিতেও অক্ষম ছিলেন। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন।” [১]

আমাদের এটিও মনে রাখা উচিত যে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পারস্পরিক পুরনো সম্পর্ক ছিল, তারা একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তারা ছিলেন স্বচ্ছ হৃদয়ের এবং অকপট। এমন বন্ধুরা যখন একত্রে বসেন, তখন কখনো কখনো হাসি-ঠাট্টায় একে অপরকে খোঁচাও দেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও খুব রসিক মেজাজের ছিলেন। তিনি হযরত সাদ (রা.)-এর সতর্ক ও নিরপেক্ষ নীতির কারণ জানতে চেয়েছিলেন। যদি এই প্রশ্নটি কোনো অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতো, তবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একটু রাখঢাক করে জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু এখানে বিষয়টি ছিল দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এমন একটি বাক্য বললেন যাতে হযরত সাদ (রা.) তাঁর সতর্ক অবস্থান সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.)-এর গুণাবলী বর্ণনা না করে থাকতে না পারেন।

২. আবু যুরআহ দিমশকী-র দিকে সম্বন্ধযুক্ত বক্তব্যের জবাব:

সমালোচকরা নিম্নোক্ত বর্ণনাটিও পেশ করে থাকেন:

لما حج معاوية اخذ بيد سعد بن ابي وقاص وادخله الدار الندوة فاجلسه معه على سريرته ثم ذكر علي..... بن ابي طالب فوقه فيه، فقال ادخلتني دارك واجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন হজ করলেন, তখন তিনি হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাত ধরে দারুন নদওয়্য নিয়ে গেলেন, তাঁকে নিজের সাথে সিংহাসনে বসালেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর কথা উল্লেখ করে তাঁর সমালোচনা শুরু করলেন। হযরত সাদ (রা.) বললেন: আপনি আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে এলেন, আপনার সিংহাসনে বসালেন এবং তারপর হযরত আলী (রা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ ও গালিগালাজ শুরু করলেন...”

[১] শরহ সহীহ মুসলিম লিন-নববী: ১৫/১৭৫

“তারা আপনাকে গালিগালাজ করছে।” [১]

এই বর্ণনাটিও ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে প্রথম ইবনে আসাকির উদ্ধৃত করেছেন। মুতাকাদিমীনদের (পূর্বসূরিদের) নিকট এর কোনো নাম-নিশানা নেই। তদুপরি এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন আবি নাজীহ রয়েছে, যার ওপর তাকদীর অস্বীকার করার আকিদার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সে একজন মুদাল্লিসও। [২] আরও বিষয় হলো সে আমার বিন উবাইদের অনুসারী ছিল যে মুতাজিলাদের ইমাম ছিল এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মিথ্যা হাদিস জাল করত। যেমন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমরা মুয়াবিয়াকে আমার মিস্বরে দেখবে, তখন তাকে হত্যা করে ফেলো।” [৩]

হাফিজ ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ একে আবু জুরআহ দিমাশকির বরাতে উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু আবু জুরআহর ইতিহাসে এই বর্ণনা পাওয়া যায় না। এই বর্ণনার যদি কোনো গুরুত্ব থাকত তবে তা পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত কোথায় ছিল? কোনো মুহাদ্দিস বা ঐতিহাসিক কেন এটি বর্ণনা করেননি? ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে ইবনে আসাকির এটি বর্ণনা করেছেন এবং তাও আবার একটি দুর্বলতম সনদে, তবে তা চোখ বন্ধ করে কেন গ্রহণ করা হবে? যদি ঐতিহাসিকদের প্রতিটি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়, তবে এর সনদ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও যদি এতে সাহাবায়ে কেরামের ওপর অপবাদ দেওয়া হয়, তবে এই স্তূপে হযরত আলী, হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং বনু হাশেম সম্পর্কিত অত্যন্ত আপত্তিকর বর্ণনাও পাওয়া যাবে, তখন সেগুলোকে কী মর্যাদা দেওয়া হবে?

৩. মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালিগালাজ করার নির্দেশ দেওয়ার বর্ণনা:

তাবারীর একটি বর্ণনা অনুযায়ী, ৪১ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার গভর্নর বানিয়ে পাঠানোর সময় কিছু নির্দেশনা দেন এবং এই প্রসঙ্গে বলেন:

“আলীকে মন্দ বলতে, উসমানের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করতে, আলীর সঙ্গীদের দোষারোপ করতে ও তাদের দূরে সরিয়ে দিতে এবং উসমানের সমর্থকদের প্রশংসা করতে ও তাদের কাছে টেনে নিতে কোনো ক্রটি করবে না।” [৪]

আবার এই বর্ণনাই বলছে যে, হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার গভর্নর থাকাকালীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিন্দা এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রহমত ও ইস্তিগফার, তাঁর সঙ্গীদের ওকালতি এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের দোষারোপ ও লানত সর্বদা করতে থাকতেন। [৫]

কিন্তু আপনি যদি এই বর্ণনার সনদ দেখেন তবে তা থেকে দলিল গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই, কারণ এর সনদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যাবাদী, বর্ণনা তৈরিকারী বা অজ্ঞাত লোক দেখা যায়। সনদটি হলো:

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৫০, জিকর শাই মিন ফাদায়িল আমিরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু; তারিখ দিমাশক: ৩৩/১১৯

[২] তাকরীবুত তাহযীব, তরজমা নম্বর: ৩৬২২

[৩] মাওসুআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল: ২/৩৫৫, ত. আলমুল কুতুব

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫/২৫৩, সন ৫১ হি.

[৫] তারিখুত তাবারী: ৫/২৫৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

কালবি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হাসান (রা.) ৯০টি বিবাহ করেছিলেন। তিনি বিবাহ করতেন এবং তালাক দিতেন, এমনকি হযরত আলী (রা.) বললেন যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে অনেক গোত্রের সাথে আমাদের শত্রুতা তৈরি হয়ে যাবে। [১]

এই বর্ণনার পুরো সিলসিলাই শিয়া ঐতিহাসিকদের। এর দুর্বলতা বরং বানোয়াট হওয়া স্পষ্ট।

বালায়ুরীর পর কোনো ঐতিহাসিক পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো বর্ণনা পেশ করেননি।

পাঁচ শতাব্দী পর ইবনে আসাকির ‘তারিখে দামেশক’-এ হযরত হাসান (রা.)-এর অধিক হারে বিবাহ করা এবং অধিক হারে তালাক দেওয়া সংক্রান্ত একাধিক বর্ণনা জমা করেছেন [২] কিন্তু সবকটিই মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকিদ থেকে বর্ণিত এবং সবগুলোর সনদ বিচ্ছিন্ন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরি শতাব্দীর কিছু ঐতিহাসিক সনদ বাদ দিয়ে এই বর্ণনাগুলোকেই সরাসরি ওয়াকিদর ছাত্র মুহাম্মদ বিন সা’দ-এর বরাতে নকল করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মুহাম্মদ বিন সা’দ-এর ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’ এই বর্ণনাগুলো থেকে মুক্ত। এর পরিবর্তে এই বর্ণনাগুলো কয়েক শতাব্দী পর তাহযিবুল কামাল, সিয়রু আলামিন নুবালা এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে পাওয়া যায় এবং তাও বিচ্ছিন্ন সনদের সাথে। এই বর্ণনাগুলোর ওপর এক নজর দিন: ‘তারিখে দামেশক’-এ আছে:

•

১. কানাল হাসান আহসানা তিসঈনা ইমরাআতান।

“হাসান (রা.) নব্বই (৯০) জন নারীকে বিবাহ করেছিলেন।” [৩]

এর বর্ণনাকারী ইবনে জা’দাবাহ অর্থাৎ ইয়াযিদ বিন আইয়াযকে মিথ্যুক এবং পরিত্যক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। [৪]

বর্ণনায় বিবাহের স্থলে ‘আহসানা’ শব্দটি লক্ষ্যণীয়, সম্ভবত অর্থে বিবাহের পাশাপাশি মৃতআকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আনা হয়েছে।

এই একই বর্ণনা ‘সিয়রু আলামিন নুবালা’-তে মাদায়িনি থেকে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত আছে।

[৫] মূল বর্ণনা ইবনে জা’দাবাহরই।

•

২. ক্বালা আলী: ইয়া আহলাল কুফা! লা তুযাভভিজু লি হাসান বিন আলী ফাইন্নাহু রাজুলুন মিতলাকুন।

“হযরত আলী (রা.) বলেছেন: হে কুফাবাসী! হাসানের সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দিও না, সে অধিক হারে তালাক প্রদানকারী।” [৬]

হাফেজ যাহাবী এটি দুই জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় একে জাফর বিন মুহাম্মদের সনদে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই সনদ বিচ্ছিন্ন। [৭]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৩/২৫, ত: দারুল ফিকর

[২] তারিখে দামেশক: ১৩/২৩৯

[৩] তারিখে দামেশক: ১৩/২৩৮, ২৩৯, মাদায়িনি থেকে, তিনি ইবনে জা’দাবাহ থেকে

[৪] তাকরিবুত তাহযিব, তর: ৭৬১১

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২৭৩, ত: আর-রিসালাহ

[৬] তারিখে দামেশক: ১৩/২৩৯, মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকিদ থেকে

[৭] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২৬৩, ত: আর-রিসালাহ

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দাবি মানেননি। যখন হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু দাবি করলেন যে, এমনভাবে গালিগালাজ না করা হোক যাতে তাঁর কানে আওয়াজ পৌঁছায়। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দাবি মেনে নিলেন, কিন্তু তা পূরণ করেননি।

[১]

আল-কামিল-এর এই ইবারতের কিছু অংশ তাবারির বর্ণনার মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং দুটি কথা অতিরিক্ত:

- ১. হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর গালিগালাজ পুরোপুরি বন্ধ করার দাবি করেছিলেন, যখন তা পূরণ হলো না তখন দাবি করলেন যে, অন্তত এত জোরে গালিগালাজ না হোক যা আমি শুনতে পাই।
- ২. হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়াদা পূরণ করেননি।

শুধু এই দুটি কথাই নয় বরং ইবনুল আসীরের বর্ণিত বাকি ঘটনাটিও কোনো গবেষণার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না কারণ ইবনুল আসীর এটি কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

৬. হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লিখেছিলেন যে:

“أَنْ لَا يُسَبَّ عَلَيَّ بِحَضْرَتِهِ” (“যাতে তাঁর উপস্থিতিতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গালিগালাজ না করা হয়।”) [২]

কিন্তু এই বর্ণনার সনদে মুজালিদ (মুজালিদ বিন সাঈদ) রয়েছে যাকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ যয়ীফ বলেছেন। আব্দুর রহমান মাহদী তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে কোনো গুরুত্ব দিতেন না। শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তিনি এমন সব বর্ণনা শোনাতেন যা অন্য মুহাদ্দিসগণ শোনাতেন না। [৩]

মোটকথা, হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিজের শ্রবণ থেকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি গালিগালাজ দূরে রাখার শর্তারোপ করা কোনোভাবেই প্রমাণিত নয়। আর না এটি প্রমাণিত যে, হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু গালিগালাজ করাতেন।

৭. তাবারিতে আছে যে: فَكَانَ إِذَا قَتَلَ لَعَنَ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ وَالْأَشْثَرَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا.

“হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন দোয়ায়ে কুনুত পড়তেন তখন তাতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আশতার এবং হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর লানত করতেন।” [৪]

কিন্তু এই বর্ণনাটি আবু মুখনাফ-এর, যার মিথ্যাবাদী হওয়া সবার জানা।

৮. ‘আল-ইকদুল ফারিদ’-এ আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হজ্জের জন্য গেলে মদিনায় মিশ্বরে রাসূলে আরোহণ করে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর লানত করতে চাইলেন, লোকেরা বলল যে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিবাদ করবেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এনে এর জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করলে তিনি বললেন: “যদি তুমি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর লানত করো তবে আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাব।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৪১ হিজরি

[২] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার লিয যাহাবী: ১/৩৫, ত. ইলমিয়াহ

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/২৮৬, ত. আর-রিসালাহ

[৪] তারিখুত তাবারি: ৫/৭১

“যাব, কখনও ফিরে আসব না।” হযরত মুয়াবিয়া থেমে গেলেন। যখন হযরত সা’দ-এর ইন্তেকাল হলো, তখন হযরত মুয়াবিয়া নির্দেশ দিয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বে এই কাজ শুরু করিয়ে দিলেন। উম্মে সালামাহ এতে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত মুয়াবিয়া-কে একটি উপদেশমূলক পত্র লিখলেন কিন্তু তার কোনো প্রভাব পড়ল না। [১]

এটিই একমাত্র বর্ণনা যাতে হযরত মুয়াবিয়া-এর নির্দেশে পুরো মুসলিম বিশ্বে হযরত আলী-কে গালিগালাজ শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু আল-ইকদুল ফারিদ (২৩৬ হি. - ৩২৮ হি.)-এর লেখক এটি কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। সনদবিহীন কথার কোনো গুরুত্ব নেই, বিশেষ করে যখন সাহাবায়ে কেরামের বিষয় হয় তখন তো অবশ্যই মজবুত ও সহীহ সনদ প্রয়োজন।

যদি দুর্বল বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়, তবে যেমন এই বর্ণনায় হযরত মুয়াবিয়া কর্তৃক হযরত আলী-কে গালিগালাজ করার কথা বর্ণিত হয়েছে, তেমনি কিছু দুর্বল বর্ণনায় হযরত আলী কর্তৃক হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনুল আস প্রমুখকে গালিগালাজ করার কথাও বর্ণিত হয়েছে। শুধু একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ দেখে নিন:

قال ابو مخنف، حدثني عبدالرحمن بن جندب الازدي عن ابيه، ان عليا قال: عباد الله! امضوا على حاكم و صدقكم قتال عدوكم، فان معاوية و عمرو بن العاص و ابن ابي معيط و حبيب بن مسلمة و ابن ابي سرح و الضحاك بن قيس ليسوا باصحاب دين و لا قرآن، انا اعرف بهم منهم، قد صحبتهم اطفالا و صحبتهم رجالا، فكانوا شر اطفال و شر رجال.

“আবু মুখনাফ বলেছেন, আমার কাছে আব্দুর রহমান বিন জুনদুব আল-আজদি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী বলেছেন: আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের হকের ওপর এবং তোমাদের সত্যের ওপর অটল থেকে তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে যাও। কেননা মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস, ইবনে আবি মুয়াইত, হাবিব বিন মাসলামাহ, ইবনে আবি সারাহ এবং যাহহাক বিন কায়েস দ্বীনদার লোক নয় এবং তারা কুরআনের অনুসারীও নয়। আমি তাদের সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। আমি শৈশবেও তাদের সাথে ছিলাম এবং যৌবনেও তাদের সাথে ছিলাম। তারা নিকৃষ্ট শিশু এবং নিকৃষ্ট পুরুষ ছিল।” [২]

এই ধরনের দুর্বল বর্ণনা হযরত আলী-এর ব্যাপারেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং হযরত মুয়াবিয়া-এর ব্যাপারেও নয়।

কিছু লোকের দাবি হলো যে, আমীর মুয়াবিয়া-এর অনুসারীরা হযরত আলী-এর ভক্তদের ‘তুরাবি’ বলে খেপিয়ে তুলত। সা’সা’আ বিন সুহান তাদের কাছে গেলেন। আমীর মুয়াবিয়া আমর ইবনুল আস-কে তাদের বসার জায়গা দিতে গিয়ে বললেন: “তুরাবিকে জায়গা দাও।” এতে সা’সা’আ বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি তুরাবি। মাটি থেকেই আমি সৃষ্টি হয়েছি, মাটিতেই আমি ফিরে যাব এবং মাটি থেকেই আমাকে পুনরুত্থিত করা হবে। আপনি আগুনের স্ফুলিঙ্গদের একজন।” [৩]

এই বর্ণনাটিও সনদবিহীন। আল-ইকদুল ফারিদ ছাড়া অন্য কোথাও এর উল্লেখ নেই। ইলমি মানদণ্ডে এর কোনো গুরুত্ব নেই।

[১] আল-ইকদুল ফারিদ: ৪/১৩৫, দারুল ইলমিয়াহ।

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৯, ৩৮।

[৩] আল-ইকদুল ফারিদ: ৫/১১৫।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

সুনান ইবনে মাজাহ-তে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করার বর্ণনার জবাব

প্রশ্ন: সুনান ইবনে মাজাহ-তে বর্ণিত আছে যে:

ইবনে সাবিত (যিনি আব্দুর রহমান) থেকে বর্ণিত, তিনি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: মুয়াবিয়া তাঁর কোনো এক হজের সময় আসলেন, তখন সাদ তাঁর কাছে গেলেন। লোকেরা আলীর কথা উল্লেখ করলে তিনি (মুয়াবিয়া) তাঁর সমালোচনা করলেন। এতে সাদ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: আপনি এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে এই কথা বলছেন যার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: “আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।” এবং আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: “তুমি আমার কাছে তেমন, যেমন হারুন ছিলেন মুসার কাছে।” এবং আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: “আজ আমি এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।”

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কোনো এক হজের সময় আসলেন, তখন হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাঁর কাছে গেলেন। লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর কথা উল্লেখ করলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করলেন। এতে হযরত সাদ (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: আপনি এই কথা সেই ব্যক্তির সম্পর্কে বলছেন যার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু; এবং আমি আপনাকে বলতে শুনেছি যে, তুমি আমার জন্য তেমন যেমন মুসার জন্য হারুন; এবং যার সম্পর্কে আমি শুনেছি যে, আজ আমি এই পতাকা সেই ব্যক্তিকে দেব যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।” [১]

এই বর্ণনাটিকে শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন। একে মুসলিম শরীফের বর্ণনার সাথে মেলালে বিষয়টি পূর্ণতা পায়, অর্থাৎ এটি প্রমাণিত হয় যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজই করেছিলেন এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এই কারণেই রাগান্বিত হয়েছিলেন। সুতরাং আপনার সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বাতিল এবং এটি প্রমাণিত যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজেও গালিগালাজ করতেন।

উত্তর: এই বর্ণনাটিকে সহীহ বলা সঠিক নয়। কারণ এর সনদ বিচ্ছিন্ন। এর বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন সাবিত নির্ভরযোগ্য হলেও ‘কাসীরুল ইরসাল’ ছিলেন। [২] হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত হওয়া খুবই কঠিন। তাহযীবুল কামাল-এও এই উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ইবনে সাবিতের হযরত সাদ (রা.) থেকে শ্রবণ প্রমাণিত নয়। [৩] যদিও এই উক্তিটি ‘কীল’ (বলা হয়) শব্দে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তবে এটিই শক্তিশালী। কারণ: প্রথমত, হযরত সাদ (রা.) থেকে তাঁর এটি ছাড়া আর কোনো বর্ণনা নেই। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং এই বর্ণনার শব্দগুলো থেকে কোথাও এটি প্রমাণিত হয় না যে, ইবনে সাবিত হযরত সাদ (রা.) থেকে এই ঘটনাটি শুনেছেন, অথবা তিনি নিজে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ঘটনাটি বর্ণনা করছেন। বর্ণনার শব্দগুলো (সাদ রাগান্বিত হলেন) ইত্যাদি থেকে স্পষ্ট যে, হযরত সাদ (রা.) নিজের এই ঘটনাটি নিজের মুখে বর্ণনা করেননি, অন্যথায় তিনি উত্তম পুরুষ ব্যবহার করতেন।

[১] সুনান ইবনে মাজাহ, খণ্ড: ১, কিতাবুল ঈমান: ফজল আলী বিন আবি তালিব।

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী লি-উমারী: ৭/৩১৩; বাশার: ৩/৩৭২।

[৩] বলা হয়: তিনি তাঁর থেকে শোনে ননি। (তাহযীবুল কামাল: ১৭/১২৩, ১৩৩)।

... সুতরাং মূল বর্ণনাকারী অন্য কেউ। ইবনে সাবিত মূল বর্ণনাকারী হওয়া এজন্য কঠিন যে, তার মৃত্যু ১১৮ হিজরিতে হয়েছিল। [১] তার জন্মের বছর সংরক্ষিত নেই। যদি তাকে দীর্ঘজীবী যেমন ৭৫ বছর বয়সের ধরা হয়, তবে তার জন্ম ৪৩ হিজরিতে হবে। এখন লক্ষ্য করলে জানা যাবে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত সাদ (রা.)-এর জীবদ্দশায় শেষবারের মতো হজের জন্য ৫০ হিজরিতে এসেছিলেন। [২] ইবনে সাবিতের বয়স যদি ৭৫ বছরও ধরা হয়, তবে তিনি সে সময় সাত বছর বয়সের হবেন। আবার তিনি ছিলেন মক্কাবাসী। অথচ এই মহান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ মদিনায় হয়েছিল। হজের দিনগুলোতে একজন অল্পবয়সী শিশু কীভাবে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে বড়দের মজলিসে শরিক হবে? হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে দেখার শখও কোনো কারণ হতে পারে না, কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজেই মক্কা আসছিলেন। তাই এই বর্ণনাটিকে মুত্তাসিলুস সানাদ (সংযুক্ত সূত্র) প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেছে এবং সে কথাটিকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছে।

যদি বর্ণনাটিকে সহিহ মেনে নেওয়া হয় যেমনটি মরহুম শেখ আলবানী বলেছেন, তবুও এর দ্বারা সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা এবং তাদের বর্ণিত মর্যাদার ওপর কোনো আঘাত আসে না। যুক্তিগত, শরয়ি, প্রথাগত এবং নৈতিকভাবে এমন ক্ষেত্রে বর্ণনার সঠিক ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক হবে। “নালা মিনছ” শব্দগুলোকে গালিগালাজ বা মন্দ বলার ওপর নয়, বরং এমন ধরনের সমালোচনার ওপর প্রয়োগ করা হবে যেমনটি একজন ভদ্র নেতা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের পরিবেশে তার বিরোধী নেতার সম্পর্কে করে থাকেন। সহিহ মুসলিমের বর্ণনাটি আরও একবার দেখে নিন। তাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হযরত সাদ (রা.)-এর সাথে যে কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, তার শব্দগুলো ছিল এই:

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟ (আপনি কেন আবু তুরাবের [হযরত আলী (রা.)] সমালোচনা করেন না?) [৩]

এই শব্দগুলোর মধ্যে নিজে থেকে কোনো নিন্দা নেই, বরং এটি একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের অনেকগুলো দিক হতে পারে, ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। উপযুক্ত দিকগুলোর সম্ভাবনা এবং উত্তম ব্যাখ্যাসমূহ আমরা পেশ করেছি।

আমরা এই কথা অস্বীকার করছি না যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ একে অপরের সমালোচনা করেননি। কিন্তু একে বর্তমানকালের নোংরা রাজনীতিতে চলমান বিরোধীদের লজ্জাজনক ধরনের চরিত্রহননের ওপর প্রয়োগ করে এটি মনে করা যে, সাহাবীদের পারস্পরিক মতপার্থক্য প্রবৃত্তি পূজা, অহংকার, স্বার্থপরতা এবং সুবিধাবাদের ওপর ভিত্তি করে ছিল এবং এতে ভদ্রতা ও নৈতিক মূল্যবোধের সীমা নির্দিষ্টায় লঙ্ঘন করা হতো, তা চরম পর্যায়ের ভুল বুঝাবুঝি। প্রকৃতপক্ষে এই মহান ব্যক্তিদের মাঝে কখনো সখনো হওয়া মনোমালিন্য এবং পারস্পরিক সমালোচনাও প্রতিটি দিক থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইখলাস এবং নিঃস্বার্থপরতার ওপর ভিত্তি করে ছিল এবং মতপার্থক্যজনিত দ্বন্দ্ব ও নৈতিকতা ও ধৈর্য-সহনশীলতার সীমার মধ্যেই থাকতো।

[১] তারিখুল ইসলাম লিখ-যাহাবি, তাদমুরি: ৭/৩১৩, বাশার: ৩/২৭২

[২] মতপার্থক্যের (মুশাজারাতে সাহাবা) সময়কালে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তিনবার হিজাজে যেতে পেরেছিলেন। তার খেলাফতকালে তার সফরগুলো ৪৪ হিজরি এবং ৫০ হিজরিতে হয়েছিল। তৃতীয় হজ এক বর্ণনা অনুযায়ী ৫৫ হিজরিতে করেছিলেন, যদিও প্রথম গবেষণা অনুযায়ী তা ৫৬ হিজরির। এই তৃতীয় হজ পর্যন্ত হযরত সাদ (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে হযরত সাদ (রা.)-এর সাক্ষাৎ ৪৪ হিজরি বা ৫০ হিজরির। যদি ৫৫ হিজরির বর্ণনা মেনেও নেওয়া হয়, তবুও আমাদের উত্তরের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

[৩] সহিহ মুসলিম, হা: ২৪০৪, কিতাবুল ফাযায়েল, ফাযায়েলু আলী (রা.)

সুনান আবি দাউদের বর্ণনা থেকে গালিগালাজের স্বপক্ষে দলিল এবং এর জবাব:

প্রশ্ন: এটি প্রমাণিত যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মজলিসে লোকেরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বা বনু হাশেমের প্রতি বিদ্রূপ করত এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ থাকতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন:

মিকদাম বিন মাদি কারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন: “আপনি কি জানেন যে হাসান বিন আলী ইন্তেকাল করেছেন?” এটি শুনে হযরত মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পাঠ করলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “আতরাহা মুসিবা?” (আপনি কি একে বিপদ মনে করেন?) তিনি বললেন: “আমি একে বিপদ মনে করব না কেন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কোলে বসিয়ে বলেছিলেন: এই (হাসান) আমার, আর হুসাইন আলীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।” [১]

এই একই বর্ণনা ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ধিত অংশের সাথে বর্ণনা করেছেন যে: মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বনু আসাদের এক ব্যক্তিও এসেছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের সংবাদ দিলেন, তখন সে বলে উঠল: “জামরাতুন আতফাহাল্লাহ” (সে তো একটি স্মৃতিস্তম্ভ ছিল যাকে আল্লাহ নিভিয়ে দিয়েছেন)। এতে হযরত মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন: “আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে সরব না যতক্ষণ না আপনাকে রাগান্বিত করি এবং এমন কিছু শোনাই যা আপনার কাছে অপছন্দনীয়।” এরপর হযরত মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কিছু কাজের কঠোর সমালোচনা করলেন যার প্রেক্ষিতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “আমি জানতাম যে আমি আপনার থেকে বাঁচতে পারব না।” [২]

বর্ণনার শেষে আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবমাননাকারী বনু আসাদের সেই ব্যক্তিকে বিদায় করার সময় পুরস্কার ও সম্মাননাও দিয়েছিলেন। এই বর্ণনায় কোথাও উল্লেখ নেই যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই কটুভাষীকে ধমক দিয়েছিলেন। প্রমাণিত হলো যে, তিনি নিজেই নিজের মজলিসে সাদাত কিরামের প্রতি বিদ্রূপ ও গালিগালাজকে উৎসাহিত করতেন।

جواب: এই ধরনের কথার উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিজ্ঞজনের কাছে গোপন নয়। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর “আতরাহা মুসিবা?” বলাটা জরুরি নয় যে তা অস্বীকারসূচক প্রশ্ন হবে। বরং সম্ভবত এটি ছিল স্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন, অর্থাৎ তিনি নিজেও একে শোক বা বিপদ মনে করতেন।

[১] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৩০, এবং রিজালদের অবস্থা: সনদে শুধুমাত্র বাকিয়্যাহ বিন আল-ওয়ালিদ এমন একজন রাবী যার ওপর জরাহ (সমালোচনা) করা হয়েছে। তাকে তাদলীস করার অভ্যস্ত বলা হয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে তিনি নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারী তার থেকে তালীকান এবং বাকি সমস্ত সিহাহ সিভাহর সংকলকগণ তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার বলেন: সাদুকুন কাসীরুত তাদলীস আনিল দুয়াফা। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৭২৯) হাফেজ যাহাবী বলেন: ওয়াসাকাহুল জুমহুর লিমা সামিয়া মিনাস সিকাত। ইমাম নাসাঈ বলেন: যখন তিনি ‘হাদাসানা’ বা ‘আখবারানা’ বলেন তখন তিনি নির্ভরযোগ্য। (আর এখানে এই বর্ণনায় তিনি ‘হাদাসানা’ বলছেন)। ইবনে হিব্বান বলেন: ‘হুয়া সিকাতুন মুত্তাফাকুন আলাইহি’। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক তাকে সাদুক বলেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাকে ইসমাইল বিন আইয়াশ থেকে বেশি পছন্দনীয় মনে করেন। অনেকে বলেন যে যখন তিনি নির্ভরযোগ্যদের থেকে বর্ণনা করেন তখন তিনি নির্ভরযোগ্য। (মিযানুল ইতিদাল: ১/৩৩১)

[২] সুনান আবি দাউদ, হা: ৪১৩১, বাবু ফি জুলুদিল নামুর ওয়াস সিবাহ, আলবানী বলেন: সহীহ, এবং তাবারানী আল-মুজামুল কবীর: ১৯/২৬০ এ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনায় “আতরাহা মুসিবা” এর পরিবর্তে “আকাহা” বলা হয়েছে, (ফাকলা লাহ রাজুলুন), তবে মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে “ফাকলা লাহ মুয়াবিয়া” রয়েছে।

এবং হযরত মিকদাম বিন মাদিকারিব (রা.)-এর থেকেও এটাই প্রত্যাশা করতেন।

আসাদিকে সতর্ক না করার কারণও স্পষ্ট। দীর্ঘ সময় ধরে শাম (সিরিয়া) দেশের জনগণ হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিপক্ষ ছিল, যুদ্ধের ময়দানে ইরাকিদের হাতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। তাই শামবাসীদের মধ্যে উগ্র মেজাজের লোকেরা এই সমস্ত রক্তপাতের দায় হযরত আলী (রা.)-এর ওপর চাপিয়ে তাঁর অবমাননা ও সমালোচনা করত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আশেপাশেও এমন কিছু লোক ছিল যাদের দিয়ে তাঁকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজ নিতে হতো। তাই তিনি কখনো কখনো কৌশলগত কারণে এ ধরনের কথা সহ্য করে নিতেন। উল্লিখিত ঘটনায়ও সেই পরিবেশের কারণেই তিনি সেই উগ্র মেজাজের আসাদিকে সতর্ক করেননি। বাকি রইল পুরস্কার ও সম্মান প্রদানের বিষয়টি, তো আমির মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন দানশীল মানুষ। দরবারে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তিনি পুরস্কৃত করতেন। এটি ছিল সরকারি প্রটোকল যা প্রত্যেক মেহমানকে দেওয়া হতো। তবে এই প্রটোকলে পদমর্যাদা অনুযায়ী পার্থক্য অবশ্যই থাকত।

আবু দাউদের এই বর্ণনাতেই স্পষ্ট যে, হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) আসাদিকে বনু উমাইয়ার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও কম পুরস্কার দিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে হযরত মিকদাম (রা.)-এর মুখ থেকে কঠোর সমালোচনা শোনা সত্ত্বেও তাঁকে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তো হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর সত্যপ্রিয়তা ও মহানুভবতাই প্রকাশ পায়।

এর মাধ্যমে ইহাও স্পষ্ট হয় যে, শাম এমন সত্যবাদী ও সাহসী সাহাবীদের থেকে শূন্য ছিল না যারা সময়ে সময়ে মারওয়ানি ও হাশেমিদের ভুল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন এবং সأتاد কিরামের মর্যাদার প্রতিরক্ষা করতেন [১]। আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এ ধরনের ব্যক্তিদের অসাধারণ কদর করতেন। যদিও কিছু বাধ্যবাধকতা ও কৌশলের কারণে উগ্র প্রকৃতির লোকদের নিজের কাছে আসা-যাওয়া সহ্য করে নিতেন। তবুও এক-দুটি বর্ণনা দেখে এটি বলা একেবারেই ভুল যে, তাঁর মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হতো এবং তিনি সবসময় চুপ থাকতেন। এমনটা হয়তো কদাচিৎ হতো।

এটি বলা ভুল যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সবসময় শিথিলতা প্রদর্শন করতেন। এটি প্রমাণিত যে, কখনো কখনো তিনি এ ধরনের লোকদের সতর্কও করে দিতেন। যেমন একবার বুসর বিন আরতাহ (রা.) যায়িদ বিন উমর (রা.)-এর উপস্থিতিতে হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করেন। যায়িদ (রা.) এটি শুনে বুসর (রা.)-এর ওপর চড়াও হন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উভয়কে আলাদা করেন এবং বুসর (রা.)-কে ধমক দিয়ে বলেন: “তুমি আলী (রা.)-এর সমালোচনা করছ অথচ তিনি যায়িদের নানা।” [২]

মোদাকথা এটি প্রমাণিত যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এ ধরনের লোকদের তিরস্কারও করতেন।

[১] মিকদাম বিন মাদিকারিব (রা.) শামে বসবাসকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, হিমসে বসবাস করতেন, ৮৭ হিজরিতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন, বয়স ৯০ বছরের বেশি ছিল। (মুজামুস সাহাবা লিল বাগভী: ৫/২৯৯; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩২৭; তাহযিবুল কামাল: ২৮/৩৫৯)

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৩৫। যায়িদ বিন উমর ছিলেন হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা.)। এই হিসেবে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর আপন নাতি ছিলেন। (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী তাদমুরী: ৩/৫৮; ও বাশার: ২/৩১১)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

কি মুগীরা বিন শু'বা (রা.) গালিগালাজ করতেন?

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে কুফার গভর্নর ছিলেন। তাঁকে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর সমালোচনার অপরাধে সবচেয়ে বেশি বদনাম করা হয়েছে। যেহেতু এমন অনেক বর্ণনা হাদীসের ভাণ্ডারেও রয়েছে, তাই বিরোধীরা তাদের দাবির সত্যতার ওপর অনেক জোর দেয়। বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিচে দেওয়া হলো:

প্রশ্ন: মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী এবং মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বায় বর্ণিত আছে যে, মুগীরা বিন শু'বা (রা.) যখন হযরত আলী (রা.)-এর ওপর সমালোচনা করলেন, তখন য়ায়েদ বিন আরকাম (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন: “আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত ব্যক্তিদের গালি দিতে নিষেধ করেছেন? তাহলে আপনি কেন আলী (রা.)-কে গালি দিচ্ছেন যখন তিনি ইন্তেকাল করেছেন?” [১]

এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুগীরা বিন শু'বা (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে গালি দিতেন।

জবাব: এই বর্ণনাটি যযীফ (দুর্বল), কারণ এর বর্ণনাকারী আবু হাজ্জাজ (আবু আইয়ুব) মাওলা বনী সা'লাবা মাজহুলুল হাল (অজ্ঞাত পরিচয়)। হাফেজ ইবনে হাজারও তাঁর সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধানের পর কেবল এটুকু জানতে পেরেছেন যে, তাঁর কুনিয়াত হলো আবু আইয়ুব। তাঁর সম্পর্কে প্রায় এক পৃষ্ঠা আলোচনার পর তিনি লিখেছেন:

ولم يستفد من ذلك كله معرفة حال حجاج ابى ايوب مولى بنى ثعلبة.

(এই সব কথা থেকে হাজ্জাজ আবু আইয়ুব মাওলা বনী সা'লাবার অবস্থা জানা যায় না।)[২]

সুতরাং এই মাজহুল বর্ণনাকারীর কারণে সনদটি যযীফ এবং বর্ণনাটি সন্দেহজনক।

সম্মানিত পাঠকগণ একবার ভেবে দেখুন যে, যেখানেই মতন (মূল পাঠ)-এ কোনো সাহাবীর অবমাননার দিক ফুটে ওঠে, সেখানেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদে কোনো না কোনো ত্রুটি বেরিয়ে আসে। প্রমাণিত হলো যে, সন্দেহজনক বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহজনক সনদ থেকেই বর্ণিত হয়। যার দ্বিতীয় অর্থ হলো, জালিয়াতরা প্রায়ই তাদের হীন উদ্দেশ্যে আমাদের ইতিহাস ও সীরাতে সাহাবার মধ্যে এমন সব বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে তাদের দল শক্তিশালী হয় এবং ইসলামের ভিত্তি নড়বড়ে করা যায়।

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৯৩১৭, ১৯২৮৮; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৬৮/৫, ত: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ১১৯৮৬, ত: আর-রুশদ; হিলয়াতুল আউলিয়া: ২৩৬/৭।

জেনে রাখুন হে প্রিয় পাঠক! এই বর্ণনার কিছু সূত্রে “শু'বা আন মিসআর আন যিয়াদ বিন ইলাকা” উল্লেখ আছে, কিন্তু অন্যান্য সনদের প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় যে, কিছু বর্ণনাকারী “হাজ্জাজ মাওলা বনী সা'লাবা” মাজহুলকে মিসআর ও যিয়াদের মাঝখান থেকে বাদ দিয়েছেন। সুতরাং বর্ণনাটির দুর্বলতা সর্বাবস্থায় অটল।

[২] তা'জীলুল মানফাআ লি ইবনে হাজার আল-আসকালানী: ৩১৩/৩, ত: দারুল বাশায়ের, বৈরুত।

মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর গালিগালাজে পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগ:

প্রশ্ন: হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গভর্নরদের উপস্থিতিতে গালিগালাজ হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে এর ওপর নীরব পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন করা সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপস্থিতিতে কায়স বিন আলকামা নামক এক ব্যক্তি এসে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে গালিগালাজ করল। মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ থাকলেন। অবশেষে সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে লজ্জা দিয়ে বললেন:

“انا ارى اصحاب النبي ﷺ يسبون عندك ثم لا تتكر ولا تغير”

“আমি দেখছি আপনার উপস্থিতিতে রাসূলের সাহাবীদের নিন্দা করা হচ্ছে, কিন্তু আপনার ওপর এর কোনো প্রভাব পড়ছে না।” [১]

দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী, মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার সবচেয়ে বড় মসজিদে ছিলেন এবং ডানে-বামে মানুষের ভিড় ছিল। এই সময়ে সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পাশে বসালেন। এমন সময় কুফার এক ব্যক্তি আসলো এবং মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে মুখ করে কাউকে গালিগালাজ করতে লাগল।

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন: “সে কাকে গালিগালাজ করছে?”

হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “হযরত আলী-কে।”

সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “হে মুগীরা বিন শুবা! আমি যেন না শুনি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের আপনার সামনে গালিগালাজ করা হচ্ছে। আপনি না নিষেধ করছেন, না আপনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যা আমার কান শুনেছে এবং অন্তর সংরক্ষণ করেছে। আমি তাঁর ﷺ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারি না, কারণ আমি (কিয়ামতের দিন) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি, উসমান জান্নাতি, আলী জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, যুবাইর জান্নাতি, আব্দুর রহমান জান্নাতি এবং সা’দ বিন মালিক জান্নাতি।“

এরপর বললেন: “وتاسع المؤمنين في الجنة” (নবম মুমিনও জান্নাতি।)

এখন মসজিদ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মানুষ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল: “হে রাসূলের সাহাবী! নবম ব্যক্তি কে?”

তিনি বললেন: “তোমরা আল্লাহর কসম দিয়েছ তাই বলছি যে, আল্লাহর কসম! নবম ব্যক্তি আমিই।” [২]

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর গালিগালাজকে প্রশ্রয় দিতেন।

উত্তর: এই উভয় বর্ণনা কেবল এতটুকুই প্রমাণ করে যে, হযরত মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর সমালোচনা শুনে নীরব ছিলেন। তবে এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, হযরত মুগীরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ধৈর্যশীল ও সহনশীল মেজাজের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি...

[১] ফাযায়িলুস সাহাবা লি-আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২৫; সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৫০, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফিল খুলাফা, সহীহ সনদে।

[২] মুসনাদে আহমদ, হা: ১৬২৯।

হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা কারীদের হযরত মুগীরা (রা.) মাঝপথে থামাননি, কিন্তু হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) মনে করেছিলেন যে তিনি তাদের কথা খুশিমনে শুনছেন। এ কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই রাগান্বিত হয়েছিলেন।

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে হযরত মুগীরা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলা কাউকে শাস্তি দিতেন না, তবে এটি বলা যেতে পারে যে নাসিবী, খারেজী বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর ওপর প্রকাশ্যে সমালোচনা করত। কিন্তু যেভাবে হযরত আলী (রা.) নিজের সময়ে পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত আশতার নাখয়ীর মতো উগ্র মেজাজের লোকদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিলেন, ঠিক তেমনি হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.), যাঁর নিয়োগ এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হয়েছিল, চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতেন, তারা নিজের দলের হোক বা অন্যদের। সম্ভবত তিনি এই ধরনের কটু কথা সহ্য করে নিতেন যাতে কোনো ফিতনা ও বিভেদ সৃষ্টি না হয়। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর মতো কিছু মহান ব্যক্তিত্বের কাছে এই কৌশলগত অবস্থান পছন্দনীয় ছিল না। তাই তিনি হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর নীরবতার ওপর আপত্তি জানিয়েছিলেন।

যাই হোক, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বা হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.)-এর মজলিসে যদি কেউ হযরত আলী (রা.) বা হাসনাইন (রা.)-এর বিরুদ্ধে কিছু বলে থাকে, অথবা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আশতার নাখয়ীর মতো লোকেরা সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে গীবত করে থাকে, তবে একে এই মহান ব্যক্তিত্বদের হিকমত ও সহনশীলতার ওপর ভিত্তি করে দেখা উচিত, (নাউযুবিল্লাহ) সংকীর্ণমনা হিসেবে নয়।

রহমতে আলম (সা.)-এর মজলিসেও মুনাফিকরা এই ধরনের কাজ করত, কিন্তু দরবারে নবুওয়াতের অনুগ্রহ ও দয়া এমন ছিল যে এই ধরনের লোকদের সাথেও কঠোরতা করা হতো না, সাধারণত উপেক্ষা করা হতো। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অপবিত্র কথাবার্তায় হযরত উমর ফারুক (রা.) উত্তেজিত হয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন যে গিয়ে তার শিরশ্ছেদ করে দেবেন, কিন্তু রাসূল (সা.) তাকে নিষেধ করে দিলেন যাতে মানুষ না বলে যে মুহাম্মদ তার নিজের লোকদের হত্যা করে [১]।

:عبدالله بن ظالم سے مروی سب و شتم کی روایات

(আবদুল্লাহ বিন জালিম থেকে বর্ণিত গালিগালাজের বর্ণনাগুলো:)

:سوال: ایک حقیقت پر آپ کب تک پردہ ڈالیں گے۔ دیکھیے، امام نسائی نے کیا نقل کیا ہے

(প্রশ্ন: একটি সত্যের ওপর আপনি কতক্ষণ পর্দা দিয়ে রাখবেন? দেখুন, ইমাম নাসাই কী বর্ণনা করেছেন:)

لما قدم معاوية الكوفة اقام المغيرة بن شعبه الخطباء يتناولون عليا رضي الله عنه فاخذ بيدي سعيد بن زيد، فقال الاترى هذا الظالم الذي يأمر بلعن رجل من اهل الجنة؟ فاشهد على التسعة انهم في الجنة ولو شهدت على العاشر

যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কুফায় আসলেন, তখন হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.) খতীবদের দাঁড় করালেন যাতে তারা হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করে। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বিন জালিম বলেন যে, সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) আমার হাত...

[১] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৩১৫, তাফসীরুল কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

ধরলেন এবং বললেন: তুমি কি এই জালেমকে দেখছ না যে এমন এক সত্তার ওপর লানত করার নির্দেশ দিচ্ছে যিনি জান্নাতী ছিলেন। আমি নয়জন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তারা জান্নাতী এবং যদি দশম ব্যক্তির ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিই তবে আমার কোনো গুনাহ হবে না। (উদ্দেশ্য তিনি নিজে ছিলেন। এরপর তিনি আশারায়ে মুবাশশারা সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ হাদীস শোনালেন।) [১]

এবং আরও দেখে নিন, মুসনাদে আহমাদে রয়েছে:

আবদুল্লাহ ইবনে জালেম আল-মাযিনী থেকে বর্ণিত, যখন মুয়াবিয়া কুফা থেকে বের হলেন, তিনি মুগীরা বিন শুবা-কে গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি খতীবদের দাঁড় করালেন যারা আলীর সমালোচনা করতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের পাশে ছিলাম। তিনি রাগান্বিত হলেন, দাঁড়ালেন এবং আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর পেছনে চললাম। তিনি বললেন: তুমি কি নিজের ওপর জুলুমকারী এই ব্যক্তিকে দেখছ না যে জান্নাতী এক ব্যক্তির ওপর লানত করার নির্দেশ দিচ্ছে? আমি নয়জন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তারা জান্নাতী এবং যদি দশম ব্যক্তির ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিই তবে আমার কোনো গুনাহ হবে না...

“হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন কুফা থেকে বের হলেন তখন মুগীরা বিন শুবা (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি খতীবদের দাঁড় করালেন যারা হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করতে লাগল। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বিন জালেম বলেন যে, আমি সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর পাশে বসা ছিলাম, তিনি রাগান্বিত হলেন, দাঁড়ালেন এবং আমার হাত ধরলেন আর আমি তাঁর পেছনে চললাম। তিনি বললেন: তুমি কি নিজের ওপর জুলুমকারী এই ব্যক্তিকে দেখছ না যে জান্নাতী এক ব্যক্তির ওপর লানত করার নির্দেশ দিচ্ছে? আমি নয়জন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তারা জান্নাতী এবং যদি দশম ব্যক্তির ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিই তবে আমার কোনো গুনাহ হবে না।” [২]

এই বর্ণনা সুনানে আবু দাউদ, সহীহ ইবনে হিব্বান এবং মুস্তাদরাকে হাকেমেরও রয়েছে। কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তারিত, কোথাও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং মুগীরা বিন শুবা (রা.) উভয়ের নাম রয়েছে। কোথাও শুধু হযরত মুগীরা (রা.)-এর নাম রয়েছে। কোথাও উভয়ের বা কোনো একজনের নাম গোপন করে তাদের ব্যক্তিত্বকে ‘ফ্লান’ (অমুক) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন সুনানে আবু দাউদে আছে:

“যখন অমুক কুফায় আসলেন, তখন অমুক একজন খতীবকে দাঁড় করালেন। তখন সাঈদ বিন যায়েদ আমার হাত ধরলেন এবং বললেন: তুমি কি এই জালেমকে দেখছ না? এবং তিনি খতীবের দিকে ইশারা করলেন। আমি নয়জন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তারা জান্নাতী এবং যদি দশম ব্যক্তির ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিই তবে আমার কোনো গুনাহ হবে না।” [৩]

কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ‘ফ্লান’ (অমুক) দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, چنانچہ সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যায় রয়েছে:

“যখন অমুক কুফায় আসলেন, তখন অমুক একজন খতীবকে দাঁড় করালেন: আল-ফাতহুল ওয়াদুদ-এ বলা হয়েছে: এবং তিনি ভালো করেছেন...”

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ, হা: ৮১৫১।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৩৩।

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৪৮, বাবু ফিল খুলাফা।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা, দ্বিতীয় খণ্ড

আবু দাউদ এই স্থানে মুয়াবিয়া এবং মুগিরা-এর নামের পরিবর্তে ‘অমুক’ (٠٧٦) শব্দ ব্যবহার করে খুব ভালো করেছেন যাতে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা হয়, কারণ তারা উভয়েই সাহাবী।

(আবু দাউদ খুব ভালো করেছেন যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুগিরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নামের পরিবর্তে “অমুক” শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা হয়, কারণ তারা উভয়েই সাহাবী।) [১]

যাই হোক, এই বর্ণনাগুলো পুরোপুরিভাবে বলছে যে গালিগালাজ হতো এবং এতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পৃষ্ঠপোষকতাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পরেও যদি কেউ এই সত্যকে না মানে, তবে আমরা তাকে একগুঁয়েমিই বলব।

উত্তর: আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রশ্নকারীর উপস্থাপিত রেফারেন্স ছাড়াও এই বর্ণনার বিভিন্ন সূত্র সামনে রেখে প্রত্যেকটির সনদের পর্যালোচনা করেছি। সবগুলোর বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন জালিম, যে মাজহুল (অপরিচিত)। যদিও এটি আশ্চর্যজনক যে একজন মাজহুল বর্ণনাকারীর বর্ণনা কেন অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসগণ উদ্ধৃত করেছেন, তবে আলেম সমাজ জানেন যে কোনো সন্দেহজনক বা দুর্বল বর্ণনা হাদিসের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

সম্ভবত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন জালিমের সন্দেহজনক অবস্থান বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ কারণেই তারা এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেননি। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আব্দুল্লাহ বিন জালিমের সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস সহিহ নয়। [২]

আব্দুল্লাহ বিন জালিমের আসল নাম কোথাও হাইয়ান বিন গালিব বলা হয়েছে, কোথাও মালিক বিন জালিম এবং কোথাও অন্য কিছু। হাদিসের কিতাবসমূহে তার থেকে মাত্র দুটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে:

- একটি এটিই, যাতে মুগিরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে গালিগালাজের অভিযোগ রয়েছে।
- দ্বিতীয়টি হলো নববী ইরশাদ: আব্দুল্লাহ বিন জালিম থেকে বর্ণিত, তিনি সাঈদ বিন যায়েদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো ফিতনার কথা উল্লেখ করেছেন। [৩]

তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহকেও চিন্তিত রেখেছে। “তাকরীবুত তাহযীব”-এ তিনি লিখেছেন:

“আব্দুল্লাহ বিন জালিমকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ‘লায়িন’ (শিথিল) হিসেবে গণ্য করেছেন।” [৪]

“লিসানুল মিজান”-এ তিনি বলেন: “আব্দুল্লাহ বিন জালিম যিনি হিলাল বিন ইয়াসারের উস্তাদ, তিনি অপরিচিত।” [৫]

এবং “তাজীলুল মানফায়াহ”-তে এই ব্যক্তিত্বের ওপর দীর্ঘ মন্তব্য করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি লিখেছেন:

[১] আউনুল মাবুদ: ১২/২৬৭, ত. আল-ইলমিয়াহ।

[২] আদম বিন মুসা আমাকে বলেছেন, তিনি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছেন: আব্দুল্লাহ বিন জালিম কর্তৃক সাঈদ বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসটি সহিহ নয়। (আদ-দুয়াফাউল কাবীর লিল উকাইলি: ২/২৬৭)।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৩৮।

[৪] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৩৩০০।

[৫] আব্দুল্লাহ বিন জালিম হিলাল বিন ইয়াসারের উস্তাদ, তিনি অপরিচিত। (লিসানুল মিজান: ৪/৪৯২)।

‘মালিক বিন জালিম আবু হুরায়রা (রা.) থেকে কুরাইশী গোলামদের বর্ণনাটি নকল করেছেন এবং তাঁর থেকে সিমাক বিন হারব। হুসাইনী তাঁর উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর কোনো অবস্থা বর্ণনা করেননি। একে সঠিক সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তিনি হলেন আবদুল্লাহ বিন জালিম। আর উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ বিন জালিমকে ইবনে হিব্বান সিকাহ সাব্যস্ত করেছেন। নাসায়ী তাফসীরে মালিক বিন জালিমের সনদে যা নকল করেছেন তা এই কিতাবের শর্ত অনুযায়ী নয়। তবে হুসাইনী তাঁর ওজর এই বর্ণনা করেছেন যে, মিযযী তাঁর উল্লেখ করেননি। (ইবনে হাজার বলেন) আমি তাহযীবুত তাহযীব-এ তাঁর সংযোজন করেছি। ইবনে হিব্বান তাঁকে সিকাহ সাব্যস্ত করে তাঁর বর্ণনা নিজের সহীহ-তে নকল করেছেন। হাকেমও এই বর্ণনার তাখরীজ করেছেন এবং বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেননি; কারণ এই সনদে শু’বাহ ও সুফিয়ানের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অতঃপর হাকেম বর্ণনাটি সুফিয়ানের সনদে নকল করেছেন, কখনো তিনি রাবীকে আবদুল্লাহ বিন জালিম বলেন আবার কখনো মালিক বিন জালিম। আর আবু আওয়ানা সিমাকের সনদে তাঁকে সিকাহদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সেখানে মালিক বিন জালিম বলেছেন। আর আবদুল্লাহ বিন জালিমের জীবনীতে এটি উল্লেখ নেই যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে কোনো বর্ণনা গ্রহণ করেছেন অথবা তাঁর থেকে সিমাক কিছু নকল করেছেন। বুখারী উভয়ের জীবনীতে এমনই লিখেছেন। এটি অসম্ভব নয় যে এরা দুইজন পৃথক ব্যক্তি। আল্লাহই ভালো জানেন। যাহাবী মীযানে তাঁর উল্লেখ করেছেন। এটিও বর্ণিত আছে যে তাঁকে মালিক বিন আবদুল্লাহ বিন জালিম বলা হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ এই যে তাঁকে আবদুল্লাহ বিন জালিম বলা হয়েছে, মালিক বিন জালিম নয়। আযদী থেকে বর্ণিত আছে যে, এই (আবদুল্লাহ বিন জালিম)-এর বর্ণনার মুতাবেয়াত করা হয় না।’ [১]

এটি তো সনদের কথা, যাতে একজন রাবী আবদুল্লাহ বিন জালিম সম্পর্কে নবম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত কোনো ফয়সালা হয়নি যে তিনি কে। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিত্ব যিনি ইলমে হাদীস এবং আসমাউর রিজালের ভাণ্ডারের ওপর আধিপত্য রাখেন, তিনিও এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত মতামত দিতে অক্ষম।

এখন মতনের (মূল পাঠ) দিকে লক্ষ্য করুন, এই বর্ণনার বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে আপোসে চরম বৈপরীত্য রয়েছে যা নিজেই এর দুর্বলতার স্পষ্ট দলিল।

- কোথাও আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কুফায় এলে এই ঘটনা ঘটেছিল... কোথাও আছে যে, তিনি কুফা থেকে বের হলে এটি হয়েছিল।
- কোথাও আছে যে, হযরত মুগীরা (রা.) নিজে খুতবা দিয়েছিলেন... কোথাও আছে যে, তিনি খতীবদের দাঁড় করিয়েছিলেন।
- কোথাও আছে যে, সাঈদ বিন য়ায়েদ (রা.) এবং রাবী উভয়েই মসজিদে বসা ছিলেন যখন এমনটি ঘটেছিল... কোথাও আছে যে, সাঈদ বিন য়ায়েদ (রা.) তখন বাড়িতে ছিলেন। রাবী গিয়ে তাঁকে সংবাদ দেন যে এমনটি হচ্ছে।
- কোথাও সাঈদ বিন য়ায়েদ (রা.) নিজেই আবদুল্লাহ বিন জালিমকে বলেন, তুমি কি এই জালিমকে দেখছ না? কোথাও আবদুল্লাহ বিন জালিম বলেন, আপনি এই জালিমকে দেখুন। কোথাও সাঈদ বিন য়ায়েদ (রা.)-কে অন্য কেউ সংবাদ দেয় এবং তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেননি, জিজ্ঞেস করেন যে সত্যিই কি এমন হয়েছে?

[১] তা’জীলুল মানফায়াহ লি-ইবনে হাজার: ২২৬/২

কোথাও বলা হয়েছে যে এটি একবারের ঘটনা এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) এতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। কোথাও বলা হয়েছে যে মুগীরা (রা.) এমনটি করতেন, এটি তাঁর অভ্যাস ছিল।

এই বৈপরীত্যের কারণে এই বর্ণনাটি সন্দেহজনক হয়ে পড়ে।

এর সাথে যদি দিরায়াত (যৌক্তিক বিশ্লেষণ) এর মূলনীতি গ্রহণ করা হয়, তবে বর্ণনার কিছু অংশকে সন্দেহজনকই মানতে হবে। কারণ এই বিষয়টি কোনোভাবেই বুদ্ধিতে আসে না যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং মুগীরা বিন শু'বা (রা.) কুফার জামে মসজিদে খতীবদের একটি অভিযান হিসেবে নিযুক্ত করবেন যাতে তারা আলী (রা.)-কে গালিগালাজ ও নিন্দা করে এবং সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি এর প্রতিবাদও করবে না।

যদি বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ঠিক এমনই হতো, তবে কুফার অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করতেন। শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ বিন যালিমের মতো একজন অপরিচিত (মাজহল) ব্যক্তিই কেন এটি বর্ণনা করছে?

মনে হয় যে, এই হাদীসটি আশারায়ে মুবাশশারার নামসমূহের কারণে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এই বর্ণনায় নয় বা দশজন সাহাবীর আশারায়ে মুবাশশারা হওয়ার বিষয়টি একসাথে বর্ণিত হয়েছে, তাই অধিকাংশ মুহাদ্দিস এই উপকারী অংশের জন্য এটি গ্রহণ করে নিয়েছেন।

তবে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম এটি গ্রহণ করেননি, কারণ আব্দুল্লাহ বিন যালিম তাঁদের নিকট সন্দেহভাজন ছিল।

আমাদের ধারণা এই যে, এই বর্ণনার কেবল ততটুকু অংশই গ্রহণযোগ্য যাতে সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) নয় বা দশজন ব্যক্তির জন্য রাসুলের মুখে জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন। কারণ হাদীসের কিতাবসমূহের অনেক স্থানে এই বর্ণনাটি প্রায় একই সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে হযরত আলী (রা.)-এর অবমাননার অভিযান চালানোর কোনো উল্লেখ নেই। [১]

সুতরাং এই বর্ণনার কিছু সূত্রে হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-এর ওপর হযরত আলী (রা.)-এর অবমাননার অভিযান চালানোর যে অভিযোগ রয়েছে, তা পরবর্তী কোনো ব্যক্তির সংযোজন। সনদের দুর্বলতা এবং দিরায়াত পরিপন্থী হওয়ার কারণে এটি গ্রহণ করা যায় না।

এই বিষয়টি মাথায় রাখুন যে, কোনো বর্ণনাকে অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করা বা সেটিকে সহীহ আখ্যা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেই বর্ণনাটি হুবহু দলিল হিসেবে গ্রহণের যোগ্য, যে এটি পড়বে সে এর বাহ্যিক রূপের ওপর চোখ বন্ধ করে আমল করে নেবে। উদাহরণস্বরূপ, সিহাহ সিত্তাহর নিম্নোক্ত সহীহ বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত এবং অনেক মুহাদ্দিস এটি বর্ণনা করেছেন:

ইশরাবু মিন আবওয়ালিহা ওয়া আলবানিহা। (এই উটনীগুলোর প্রস্রাবও পান করো এবং দুধও।) [২]

এখন যদি কেউ এটি থেকে ঐতিহাসিক দলিল পেশ করে বর্ণনা করে দেয় যে, সেই معاشرے (সমাজে) উটের প্রস্রাব দুধের সাথে মিশিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে পান করা ও করানো হতো, তবে কি তা সঠিক হবে?

[১] সুনান ইবনে মাজাহ, হা: ১৩৩, ফায়াইলুল আশারা, আলবানী বলেছেন সহীহ; সুনান তিরমিযী, হা: ৩৭৪৭, তিরমিযী বলেছেন এটি হাসান সহীহ হাদীস; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হা: ২৩২; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৩৫; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩১৯৩৮, আর-রুশদ প্রকাশনী।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৬৮০২, কিতাবুল হুদুদ, বাবুল মুহারিবীন; সহীহ মুসলিম, হা: ৪৩৪৪; সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৩৬৩ সহীহ সনদে; সুনান তিরমিযী, হা: ১৮৪৫ হাসান সহীহ সনদে।

আর যদি কেউ এ থেকে ফিকহি দলিল পেশ করে প্রস্তাবকে হালাল মনে করে, তবে কি এই দলিল সঠিক হবে? যেভাবে হাদিস থেকে ফিকহি দলিল পেশ করা একজন দূরদর্শী ফকিহর কাজ, যিনি সমস্ত বর্ণনা সামনে রেখে তার সঠিক অর্থ বর্ণনা করেন, তেমনি কোনো হাদিস থেকে ঐতিহাসিক দলিল পেশ করাও এত সহজ কাজ নয়। কোনো বর্ণনা পড়ে, চাই তা একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা করে থাকুন না কেন, সাথে সাথে কোনো অর্থ বের করে নেওয়া সঠিক নয়। বরং এটি গবেষক আলেমদের কাজ যে, তারা ঘটনাটিকে অন্যান্য বর্ণনা, আহার ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে দেখে তার অর্থ বলবেন, অথবা তা থেকে দলিলের মর্যাদা নির্ধারণ করবেন।

উল্লিখিত ঘটনাটিকে যদি সাহাবায়ে কেরামের সেই সাধারণ চরিত্রের আলোকে দেখা হয় যা কুরআন মাজিদ এবং সহিহ বর্ণনাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, তবে এই ঘটনার অতিরিক্ত অংশের প্রতিবাদ করা আবশ্যিক। নাউযুবিল্লাহ যে, আমরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন নিচু চরিত্রের কল্পনা করব। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন মাজিদের সাক্ষ্য হলো: رَحَاءُ بَيْنَهُمْ (তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি দয়াশীল)। সুতরাং মানতে হবে যে, মতভেদের সময়ও তারা একে অপরের কল্যাণকামী এবং নৈতিক সীমার অনুসারী ছিলেন। কুরআনি অকাট্য প্রমাণ ছাড়াও অসংখ্য সহিহ হাদিস এবং ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়, যা সিরাতে নববী এবং সিয়ারে সাহাবার কিতাবগুলোতে দেখা যেতে পারে।

□□□

কিছু ঐতিহাসিক হযরত মুগিরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গালিগালাজের শব্দও বর্ণনা করেছেন। উপযুক্ত হবে যে সেগুলোর ওপর এক নজর বুলিয়ে নেওয়া যাক। ইমাম তাবারী তার খুতবার শব্দগুলো এভাবে পেশ করেছেন:

وكانت مقالته..... اللهم ارحم عثمان بن عفان، وتجاوز عنه واجزه بأحسن عمله فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم جمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوماً. اللهم فارحم انصاره واوليائه ومحبيه والطالبين بدمه، ويدعو على قتلته

“হযরত মুগিরার বক্তব্য ছিল: হে আল্লাহ! উসমান বিন আফফানের ওপর রহম করো এবং তাকে ক্ষমা করো, তাকে তার আমলের সর্বোত্তম প্রতিদান দাও যে তিনি তোমার কিতাব অনুযায়ী আমল করতেন, তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণ করতেন, তিনি আমাদের ঐক্য বজায় রেখেছেন, আমাদের রক্ত রক্ষা করেছেন এবং মজলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। হে আল্লাহ! তার সাহায্যকারী ও বন্ধুগণ, তাকে ভালোবাসেন যারা এবং তার রক্তের বদলা গ্রহণকারীদের ওপর রহম করো..... এবং তিনি (মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতেন।” [১]

এটাও মনে রাখা দরকার যে, এটি একজন কটুর রাফেজি বর্ণনাকারী আবু মুখনাফের বর্ণনা। এই খুতবায় সেই গালিগালাজ কোথায় যার চর্চা করা হয়? হাদিস ও ইতিহাসের রেকর্ডে যদি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো গভর্নরের হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর সমালোচনার কোনো

(১) তারিখুত তাবারী ২৫৩/৫ আবু মুখনাফ থেকে।

এমন প্রমাণ বিদ্যমান যার বাক্যগুলোও সংরক্ষিত রয়েছে, তা কেবল এটাই। এই বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনো বক্তব্য বা সম্বোধনের কোনো বাক্য কোথাও বর্ণিত নেই যা দেখে জানা যেতে পারে যে, তা কী ধরনের ছিল—গম্ভীর সমালোচনা নাকি গালিগালাজ? রাজনৈতিক মতপার্থক্য প্রকাশ করা কি মন্দ বলা? এই খুতবাটি উদ্ধৃতকারী একজন রাফেজি ঐতিহাসিক, তাই এটাও বলা যায় না যে তিনি তার বর্ণনার কঠোর শব্দগুলো বাদ দিয়ে নরম শব্দগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

এই খুতবাটি দেখুন এবং বলুন এর কোনো শব্দকে কি হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি গালিগালাজের নাম দেওয়া যেতে পারে? এতে তো কেবল হযরত উসমান (রা.)-এর সমর্থকদের জন্য দোয়া এবং হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া রয়েছে।

আসল কথা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নররা জুমার খুতবায় হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করতেন। এই বাক্যগুলো হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের কাছে খুব তিক্ত লাগত। একইভাবে কিছু একনিষ্ঠ শিয়াও মনে করতেন যে, এখানে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী বলতে হযরত আলী (রা.) এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য, কারণ সিফফিনের যুদ্ধের সময় সিরিয়াবাসীদের দাবি ছিল যে এই ব্যক্তিবর্গ হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষক। যাই হোক, এই পরিবেশে এই ধরনের বদদোয়াকে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি ‘সাবর ও শাতম’ (গালিগালাজ) নাম দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়েছে এবং ছড়ানো হচ্ছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের দুটি বর্ণনা, একটি প্রসিদ্ধ আপত্তির জবাব

প্রশ্ন: সহীহ বুখারী থেকে প্রমাণিত যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নররা গালিগালাজ করতেন। বর্ণনাটি হলো:

ان رجلا جاء الى سهل بن سعد فقال هذا فلان لامير المدينة يدعو عليا عند المنبر قال فيقول ماذا قال يقول له ابو تراب الخ

“এক ব্যক্তি হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.)-এর কাছে এসে বলল, এই মদিনার অমুক আমির মিস্বরের কাছে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করছে। হযরত সাহল (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে কী বলছে?’ সে বলল, ‘সে আলী (রা.)-কে আবু তুরাব বলছে।’ হযরত সাহল (রা.) এটি শুনে হাসলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহর কসম! এই নামটি তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) দিয়েছিলেন এবং আলী (রা.)-এর কাছে এই নামটি সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত সাহল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এর কারণ কী ছিল?’ তিনি বললেন, ‘হযরত আলী (রা.) হযরত সৈয়দা ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে গেলেন, তারপর বের হয়ে মসজিদে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) (হযরত ফাতিমা রা.-কে) জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার চাচাতো ভাই কোথায় গেছেন?’ তিনি বললেন, ‘মসজিদের দিকে।’ রাসূলুল্লাহ (সা.) বাইরে বের হয়ে দেখলেন হযরত আলী (রা.)-এর চাদর শরীর থেকে আলাদা হয়ে পড়ে আছে এবং পিঠে মাটি লেগে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পিঠ থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে দিয়ে দুবার বললেন, ‘হে আবু তুরাব (মাটির বাবা)! এখন ওঠো’।“ [১]

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৭০৩, কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব মানাকিবে আলী (রা.)।

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মদীনার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশে জুমার খুতবায় মিস্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করতেন। যেহেতু এটি সাহাবায়ে কেরামের যুগের ঘটনা, যাতে খলিফা ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)।

(জবাব): বর্ণনার শব্দগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। সেগুলোর কোথাও কি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশের কথা উল্লেখ আছে? মোটেও নেই। ইবারত (পাঠ্য) থেকে শুধু এতটুকু প্রমাণিত হচ্ছে যে, মদীনার কোনো এক শাসক মসজিদে নববীর মিস্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করছিলেন। এই ‘আমীরুল মদীনা’ যে কেউ হতে পারেন। শেষ পর্যন্ত কোন দলিলের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া হলো যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগেরই হবেন এবং তাঁর নির্দেশেই এমনটি করছিলেন? সাহাবায়ে কেরাম হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের পরেও তিন দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। খোদ যে সাহাবীর কথা এই বর্ণনায় আছে, অর্থাৎ হযরত সাহল বিন সাদ (রা.), তাঁর ইন্তেকাল ৯১ হিজরীতে হয়েছে। এত দীর্ঘ সময়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এক ডজনেরও বেশি গভর্নর পরিবর্তিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর মতো নেককার মানুষও ছিলেন এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো জালেমও ছিলেন। এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে? বর্ণনায় এর কোনো উল্লেখ নেই।

অতঃপর এই বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকু জানা যাচ্ছে যে, মদীনার আমীর হযরত আলী (রা.)-কে ‘আবু তুরাব’ বলতেন। এটি সম্ভব যে, এর উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করা ছিল, যেমনটি বনু উমাইয়ার কিছু কর্মকর্তার অভ্যাস ছিল। আমরা আগেই বলেছি যে, বনু উমাইয়ার কিছু কর্মকর্তার হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা প্রমাণিত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে মারওয়ানের এই কাজে লিপ্ত হওয়ার কথা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা দালিলিকভাবে এই প্রোপাগান্ডা খণ্ডন করেছি যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর নির্দেশ দিতেন অথবা এটি কোনো সরকারি নীতি ছিল।

□□□

(প্রশ্ন): সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিযুক্ত ব্যক্তির শুধু গালিগালাজই করতেন না, বরং সাহাবায়ে কেরামকেও এর নির্দেশ দিতেন। বর্ণনাটি দেখুন:

استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره ان يشتم عليا الخ.

“আল-ই-মারওয়ান (মারওয়ান বংশ) থেকে এক ব্যক্তিকে মদীনা মুনাওয়ারার আমিল (গভর্নর) নিযুক্ত করা হলো। সে হযরত সাহল বিন সাদ (রা.)-কে ডেকে নির্দেশ দিল যে, তিনি যেন হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করেন। হযরত সাহল (রা.) অস্বীকার করলেন। তখন সেই শাসক বলল: ‘যদি আপনি এটি না মানেন, তবে অন্তত এতটুকু বলুন যে, আবু তুরাবের ওপর আল্লাহর লানত হোক’।”

হযরত সাহল (রা.) বললেন: “হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আবু তুরাবের চেয়ে প্রিয় আর কোনো নাম ছিল না। যখন তাঁকে এই নামে ডাকা হতো, তখন তিনি খুশি হতেন।”

সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: “তাঁর নাম আবু তুরাব কেন রাখা হয়েছিল? আমাদের এই ঘটনাটি শোনান।”

(তখন হযরত সাহল (রা.) সেই ঘটনা শোনালেন যা সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে।) [১]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪০৯, ফাযায়িলুস সাহাবা, ফাযায়িল আলী (রা.)।

তারিখ উন্মত মুসলিমা

এই বর্ণনাকে পূর্ববর্তী বর্ণনার সাথে মেলালে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশে তাঁর গভর্নরদের হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করা বরং অভিশাপ দেওয়া এবং দেওয়ানো প্রমাণিত হচ্ছে।

উত্তর: সহীহ মুসলিমের এই বর্ণনা থেকে কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মদীনার কোনো এক গভর্নর হযরত সাহল বিন সাদ (রা.)-কে দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর অভিশাপ দেওয়ানোর ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এই গভর্নর কে ছিলেন? এবং তাকে কোন খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন? এর উল্লেখ এই বর্ণনায় নেই এবং সহীহ বুখারীর পূর্ববর্তী বর্ণনায়ও নেই। সহীহ বুখারীতে তো নিয়োগের উল্লেখই নেই। সহীহ মুসলিমেও ব্যবহৃত শব্দগুলো মাজহুল (অজ্ঞাতনামা), অর্থাৎ ‘নিযুক্ত করা হয়েছিল’। এটাও স্পষ্ট নয় যে, উভয় ঘটনা একই গভর্নরের নাকি আলাদা আলাদা গভর্নরের।

যে গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন তাকে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় ‘মদীনার আমিরের জন্য অমুক’ এবং মুসলিমের বর্ণনায় ‘আলে মারওয়ানের এক ব্যক্তি’ বলা হয়েছে। ‘আলে মারওয়ানের এক ব্যক্তি’ কথাটির শাব্দিক দিক থেকে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে:

- ১. এক এই যে, মারওয়ানের বংশীয় সন্তান উদ্দেশ্য।
- ২. দ্বিতীয় এই যে, আলে মারওয়ান থেকে উদ্দেশ্য ‘মারওয়ানী গোষ্ঠী’র কোনো ব্যক্তি হোক। [১]

যদি ‘আলে মারওয়ানের এক ব্যক্তি’ থেকে মারওয়ানের বংশের কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে প্রশ্ন জাগবে যে তিনি কে হতে পারেন? সমস্ত ইতিহাস দেখে নিন, প্রমাণিত হবে যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে মারওয়ানের ছেলে বা নাতিদের মধ্যে এমনকি আব্দুল মালিক, আব্দুল আজিজ, ওয়ালিদ, সুলাইমান, হিশাম প্রমুখের কেউই মদীনা মুনাওয়ারার আমীর ছিলেন না। এই যুগে মারওয়ান বিন হাকাম ছাড়া কেবল সাঈদ বিন আস (রা.) এবং ওয়ালিদ বিন উতবা মদীনার গভর্নর ছিলেন। এই দুজনের বংশ পরিচয় খুঁজলে তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত কোনো মারওয়ান পাওয়া যাবে না।

মোদাকথা, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগের কোনো শাসক এমন নেই যার ওপর ‘আলে মারওয়ানের এক ব্যক্তি’ কথাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

একইভাবে ইয়াজিদের যুগে মদীনার গভর্নরদের নাম ও বংশ পরিচয় দেখলে দেখা যায় যে, ইয়াজিদের যুগে ওয়ালিদ বিন উতবা, আমর বিন সাঈদ বিন আস এবং উসমান বিন মুহাম্মদ (বিন আবু সুফিয়ান বিন হারব বিন উমাইয়া) বিভিন্ন সময়ে মদীনার আমীর ছিলেন। এদের মধ্যেও কারো পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো ‘মারওয়ান’ অতিবাহিত হননি যে তার সন্তানদের ওপর আলে মারওয়ান কথাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাই হাদীসে উল্লিখিত ‘আলীকে গালি দেওয়া’র ঘটনা ইয়াজিদের যুগেও প্রমাণিত হতে পারে না।

ইয়াজিদের পর ৬৩ হিজরী থেকে ৭৩ হিজরী পর্যন্ত (মদীনা) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর অধীনে ছিল। তাদেরকে বা তাদের গভর্নরদেরও আলে মারওয়ান বলা যেতে পারে না। তাদের ওপর হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করার অভিযোগ তাদের বিরোধীরাও কখনো লাগায়নি।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পর পবিত্র হিজাজ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের অধীনে আসলে মদীনা মুনাওয়ারায় ৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীকে এবং ৭৫ হিজরীতে ইয়াহইয়া বিন হাকাম বিন মারওয়ানকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

[১] যেমন কুরআনে ফেরাউনের চারপাশের লোকদের ‘আলে ফেরাউন’ বলা হয়েছে। ‘মারওয়ানী’ তারাই ছিল যাদেরকে পরবর্তীতে ‘নাসিবী’ বলা হতে থাকে। যেহেতু হযরত আলী (রা.)-এর ওপর গালিগালাজের ক্ষেত্রে মারওয়ানের ভূমিকা প্রধান ছিল, তাই শুরুতে এই গোষ্ঠীটি তারই নামে পরিচিত হয়।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

৮৩ হিজরীর পর থেকে আবান বিন উসমান (হযরত উসমান রা.-এর পুত্র) এখানে গভর্নর ছিলেন। এরপর হিশাম বিন ইসমাইল মাখজুমী নিযুক্ত হন, যিনি আব্দুল মালিকের ইন্তেকালের দুই বছর পর (৮৬ হিজরী) পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।

এই চারজনের মধ্যে আবান বিন উসমান, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (সাকাফী) এবং হিশাম বিন ইসমাইল (বনু মাখজুম)-এর ওপর বংশগতভাবে ‘আলে মারওয়ান’ কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে না। আবান বিন উসমান রহ. অত্যন্ত বড় আলেম, ফাযেল এবং নেক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এমন আচরণের প্রত্যাশা করা যায় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে ‘রাজুলুন মিন বনী উমাইয়া’ দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য, তবে ‘রাজুলুন মিন আলে মারওয়ান’ বলা যায় না। [১]

তাদের পর ৮৭ হিজরী থেকে ৯৩ হিজরী পর্যন্ত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. মদীনার গভর্নর ছিলেন। [২]

এটি ছিল ৪১ হিজরী থেকে ৯৩ হিজরী পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারার গভর্নরদের একটি পর্যালোচনা। আমরা এই গভর্নরদের নাম ও বংশ পরিচয় এজন্য পেশ করেছি যে, হযরত সাহল বিন সাদ রা., যাঁর বর্ণনা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, তিনি ৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল প্রায় একশ বছর। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকালকারী শেষ দশজন আনসারী সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৩]

মোটকথা, ৪১ হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর খলীফা হওয়া থেকে শুরু করে হযরত সাহল বিন সাদ রা.-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত মদীনায় যতজন আমীর নিযুক্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে যদি কাউকে ‘আলে মারওয়ান’ বলা যেতে পারে, তবে তারা মাত্র দুইজন: এক. ইয়াহইয়া বিন হাকাম বিন মারওয়ান; দুই. উমর বিন আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এই আচরণকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। মদীনার গভর্নর থাকাকালীন তিনি এই গুনাহ থেকে বিরত ছিলেন [৪] এবং খলীফা হওয়ার সাথে সাথেই তিনি এই ঘৃণ্য প্রথা বন্ধ করে দেন। [৫]

সুতরাং যদি ‘আলে মারওয়ান’ বলতে মারওয়ানের বংশধরদের বোঝানো হয়, তবে এই শব্দের প্রয়োগ কেবল ইয়াহইয়া বিন হাকাম বিন মারওয়ানের ওপর হতে পারে, যিনি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের চাচা ছিলেন এবং তাঁরই আমলে মদীনার আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। [৬]

এই বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো যে, বর্ণনার অস্পষ্ট শব্দ ‘উম্মত’মিলা রাজুলুন মিন আলি মারওয়ান’ এবং ‘আমীরুল মদীনা’ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বর্ণনাকারী অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছিলেন অথবা ভয়ের শিকার ছিলেন। এমন ভয় যা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এবং তাঁর ছেলে ওয়ালিদের যুগে মানুষের ওপর ছেয়ে ছিল, কারণ তাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সবাই ভয় পেত।

হযরত সাহল বিন সাদ রা. থেকে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তাবিঈ আবু হাযেম রহ., যিনি ১০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি সেই যুগেরই লোক ছিলেন। তাঁর বর্ণনার শব্দগুলো পরিষ্কারভাবে বলছে যে, হযরত সাহল বিন সাদ রা.-এর সাথে এই ঘটনাটি যখন ঘটেছিল, তখন তিনি তাঁর ছাত্র...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩০৩ থেকে ৩১১।

[২] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ২৩/৩; হসনুল মুহাযারা ফি তারিখি মিসর ওয়াল কাহিরা: ২০৭/১।

[৩] আল-আশির মিনাল মুস্তাহাবাতিল বাগদাদিয়া লি আবি তাহের আস-সিলাফি: ৬৩/১।

[৪] তারিখুল খুলাফা লিস-সুয়ুতী, পৃ. ১৮৩; আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৯৯/৩।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৬৫/৩; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৯৩।

[৬] মনে রাখা দরকার যে, এই ইয়াহইয়া মারওয়ান বিন আল-হাকামের ছেলে ছিলেন না বরং তাঁর ভাই ছিলেন। যদি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা থেকে একজনই গভর্নর উদ্দেশ্য হয়, তবে সহীহ বুখারীর ‘আমীরুল মদীনা’ দ্বারা তিনিই উদ্দেশ্য হবেন। আব্দুল মালিক তাঁকে ৭৫ হিজরীতে গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং পরের বছরই বরখাস্ত করেন। বরখাস্তের কোনো কারণ ইতিহাসে উল্লেখ নেই। সম্ভবত তাঁর আচরণের কারণে সাহাবী ও তাবিঈদের প্রতিবাদের মুখে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

আবু হাজেম নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন: ‘ফাবি সাহল, ফাদাহিকা, ফাকাল সাহল’ শব্দগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সমস্ত শব্দ ছাত্রের, ঘটনার মূল ব্যক্তি হযরত সাহল বিন সাদ (রা.)-এর নয়। এ থেকে স্পষ্ট যে, কথাটিকে ‘ইস্তামিলা’ এবং ‘আমীরুল মদীনা’-এর মতো অস্পষ্ট শব্দে আবু হাজেম (রা.)-ই রূপ দিয়েছেন। দৃশ্যত তাকে এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে যাতে তার ওপর আব্দুল মালিকের গভর্নরের অবমাননার অভিযোগ না আসে।

যদি ‘আল-ই মারওয়ান’-এ ‘আল’ দ্বারা বংশগত সন্তান নয় বরং ‘মারওয়ানি গোষ্ঠী’ বা মারওয়ান বিন হাকামের প্রতিনিধিদের বোঝানো হয়, তবুও এই ঘটনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলের নয়, বরং বনু মারওয়ান সাম্রাজ্যের আমলের। এটাও নিশ্চিত যে, এই ঘটনা মারওয়ান বিন হাকামের কোনো গভর্নরের হতে পারে না। কারণ এখানে মদীনার গভর্নরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মারওয়ানের মদীনায় কোনো গভর্নর নিয়োগ করার সুযোগ হয়নি, কারণ আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মোকাবিলায় তার শাসন কেবল সিরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

এভাবে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এই ঘটনা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান অথবা তার পুত্র ওয়ালিদের আমলের।

ইমাম বুখারী ‘আত-তারিখুল কাবীর’-এ একটি সহীহ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা এই সমস্যা সমাধানে আরও সাহায্য করতে পারে:

“ইবনে মনসুর (ইসহাক বিন মনসুর) আমাকে বলেছেন যে, ওয়াহাব (বিন জারীর) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা (জারীর বিন হাজেম) আমাকে শুনিয়েছেন যে, আমি ইয়ালা বিন হাকীম থেকে শুনেছি, তিনি নাফে থেকে বর্ণনা করেন যে, হিশাম বিন ইসমাইল ইয়াজিদ বিন উমাইয়া আল-বুস্তান আদ-দুয়ালিকে—যিনি ওহুদ যুদ্ধের দিনগুলোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন যেন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করেন। তিনি বললেন: ‘আমি তাকে গালিগালাজ করব না। কিন্তু তুমি যদি চাও তবে আমি দাঁড়িয়ে তার বরকতময় আমলের অবস্থা এবং তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি উল্লেখ করে দিতে পারি।’” [১]

ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য রয়েছে যে, এই হিশাম বিন ইসমাইল আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের আমলে মদীনার গভর্নর ছিল। ইমাম বুখারীর উল্লিখিত বর্ণনা থেকে এটাও প্রমাণিত হলো যে, সে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করানোর ব্যাপারে অত্যন্ত বেপরোয়া ছিল। সুতরাং প্রবল ধারণা এই যে, সহীহ বুখারীর বর্ণনায় যে ‘আমীরুল মদীনা’ এবং সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় যে ‘রাজুলুন মিন আলি মারওয়ান’-এর উল্লেখ রয়েছে, সে এই ব্যক্তিই। আল-ই মারওয়ান দ্বারা বংশগত সন্তান নয় বরং চিন্তাগত ও আদর্শিক অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে।

এখন আরও একবার দেখে নিন যে, উল্লিখিত বর্ণনাগুলোতে এমন কোনো শব্দ নেই যা থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন খলিফা গভর্নরকে এই অপবিত্র কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বরং দৃশ্যত এটাই মনে হয় যে, এই গভর্নর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে এই কাজ করেছিল।

যদি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের উভয় ঘটনা একই গভর্নরের হয় (যেমনটি প্রবল ধারণা), তবে বলা যেতে পারে যে, প্রথমে সে মসজিদে নিজে এই কাজ করেছে এবং পরে হযরত সাহল (রা.)-কে ডেকে এনে তাকেও এই মন্দের অংশীদার করতে চেয়েছে এবং তার মুখ দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর ‘লানত’ করাতে চেয়েছে এবং এমন ভঙ্গি অবলম্বন করেছে যা হীনম্মন্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি হযরত আলী (রা.)-এর নিন্দা অন্য কোনোভাবে করতে না পারো, তবে অন্তত তার ওপর লানত তো করো। অর্থাৎ এই হতভাগ্যের নিকট...

[১] আত-তারিখুল কাবীর লিল বুখারী: ৩১৯/৮

আলী (রা.)-এর প্রতি গালিগালাজ ও অপমানের এটি ছিল একটি সামান্য পর্যায়।
নাউযুবিল্লাহ।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই উমাইয়া শাসক অত্যন্ত অজ্ঞ ছিলেন, অন্যথায় ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তি একজন সাধারণ মুসলমানকেও অভিশাপের লক্ষ্যবস্তু বানাতে না। আলী (রা.) সম্পর্কেও তিনি সেই পক্ষপাতদুষ্ট পরিবেশে প্রচলিত মিথ্যা বর্ণনাগুলোর ওপর বিশ্বাস করেছিলেন, যেগুলোতে আলী (রা.)-কে সাবায়ীদের নেতা এবং উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী ইত্যাদি হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল। যদি তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান থাকত, তবে তিনি এমনটি ভাবতেও পারতেন না। সাহল (রা.) তাঁর অন্তরের ব্যাধি বুঝতে পেরেছিলেন এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে তাঁকে তিরস্কার করার পরিবর্তে আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী শোনার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। এই বর্ণনার শব্দগুলো থেকে বোঝা যায় যে, সম্ভবত সেই ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি নিজেই অনুরোধ করে আলী (রা.)-এর গুণাবলী শুনেছিলেন।

যা-ই হোক, যেহেতু সমালোচকরা মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিহান, তাই তারা সাহল বিন সাদ (রা.)-এর দীর্ঘ জীবনকালকে উপেক্ষা করে ধরে নিয়েছেন যে, এই ঘটনাটি মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলেই ঘটেছিল। অথচ সাহল বিন সাদ (রা.) ৯১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এই সময়ের মধ্যে অনেক খলিফা ও গভর্নর পরিবর্তিত হয়েছিলেন। তাই এর পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল যে, আলী (রা.)-কে গালিগালাজকারী আমীরকে মুয়াবিয়া (রা.) নিযুক্ত করেননি। বরং এটি তাঁর আমলের ঘটনাই না হতে পারে। আর আমরা গবেষণার মাধ্যমে এটি প্রমাণও করেছি। কিন্তু সমালোচকরা এই সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে এই অনিষ্টের দায় মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করেছেন যে, মুয়াবিয়া (রা.)-এর আদেশে মদিনার গভর্নর আলী (রা.)-কে গালি দিতেন এবং গালি দেওয়াতেন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

উম্মে সালামাহ (রা.)-এর বর্ণনা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নরদের ওপর আলী (রা.)-কে অবমাননা করার অভিযোগ

প্রশ্ন: হাদীসের কিতাবসমূহে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর একটি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর গভর্নরগণ মিস্বরে দাঁড়িয়ে আলী (রা.)-এর অবমাননা করতেন। বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন:

আবু আব্দুল্লাহ আল-জাদালী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে বললেন: “তোমাদের মাঝে কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে গালি দেওয়া হয়?” আমি বললাম: “মা’আযাল্লাহ (আল্লাহর পানাহ) অথবা সুবহানাল্লাহ অথবা এই জাতীয় কিছু।” তিনি বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: যে আলীকে গালি দিল, সে আমাকেই গালি দিল।” [১]

উত্তর: এই বর্ণনার সনদ কোনো কোনো সূত্রে সহীহ এবং কোনো কোনো সূত্রে হাসান। কিন্তু এতে এই উল্লেখ নেই যে, হযরত আলী (রা.)-কে মিস্বরে দাঁড়িয়ে গালি দেওয়া হতো। বরং এখানে হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) আবু আব্দুল্লাহ আল-জাদালীকে ‘ফীকুম’ (তোমাদের মাঝে) বলছেন, অর্থাৎ তোমাদের ওখানে হযরত আলী (রা.)-কে গালি দেওয়া হয়। স্পষ্টতই ‘তোমাদের ওখানে’ বলতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কুফাবাসী; কারণ আবু আব্দুল্লাহ আল-জাদালী কুফার অধিবাসী ছিলেন। [২] এ থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, কুফায় কিছু লোক এই কাজ করত। এই পর্যন্ত বিষয়টি আমাদের কাছেও স্বীকৃত যে, এই কাজ হতো। কিন্তু কে করত? হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গভর্নরগণ? এটি এই বর্ণনায় মোটেও বর্ণিত হয়নি। আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি এর নির্দেশ দিতেন? এটিও কোনো সহীহ বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৩, হাদীস: ২৬৭৯৮; মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২১, ইমাম যাহাবী একে সহীহ বলেছেন; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হাদীস: ৮৪৩২; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হাদীস: ৩২১১৩, আর-রুশদ প্রকাশনী; আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী, ২৩: ৩২২, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ প্রকাশনী, সনদ হাসান।

[২] তাহযীবুল কামাল: ৩৩/৪৪।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রশ্ন: হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর একটি বর্ণনা অন্য একটি সনদেও বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে মিস্রগুলোতে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করা হতো। সেই বর্ণনায় আছে:

হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর নিকট একবার আবু আব্দুল্লাহ আল-জাদালি আসলেন, তখন উম্মুল মুমিনীন তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

أَيُّسَبُّ رَسُولُ اللَّهِ فِيكُمْ عَلَى مَنَابِرٍ؟

“তোমাদের মাঝে কি মিস্রগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে গালিগালাজ করা হয়?”

তিনি বললেন: “সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কীভাবে গালিগালাজ করা সম্ভব?”

উম্মুল মুমিনীন (রা.) বললেন: “আলী ইবনে আবি তালিব এবং যারা তাকে ভালোবাসে তাদের কি মন্দ বলা হয় না? আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে রাসূলুল্লাহ (সা.) আলীকে ভালোবাসতেন।” [১]

স্পষ্টতই হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর মৃত্যু ৫৯ হিজরিতে আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবদ্দশায় হয়েছিল, তাই এই বর্ণনাগুলোতে যে গালিগালাজের উল্লেখ রয়েছে তা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালেই (৪১ হিজরি থেকে ৬০ হিজরি) ছিল।

জবাব: এই পুরো দাবির ভিত্তি যে অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা সঠিক নয়, অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) ৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন—এই কথাটি ভুল। হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) ইয়াজিদের যুগেও জীবিত ছিলেন। ইয়াজিদের সেনাপতি মুসলিম বিন উকবা ৬৩ হিজরির শুরুতে মদিনায় আক্রমণ করেছিল। নিচের বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে সেই সময় উম্মে সালামাহ (রা.) জীবিত ছিলেন।

“যখন মুসলিম বিন উকবা মদিনায় আসলো এবং মানুষের কাছ থেকে বায়আত নিল, এটি হাররার যুদ্ধের পরের ঘটনা। তার কাছে বনু সালামাহ গোত্রও আসলো। তখন সে বলল: আমি তোমাদের থেকে বায়আত নেব না যতক্ষণ না জাবির আসে। হযরত জাবির (রা.) বলেন: আমি উম্মে সালামাহ (রা.)-এর কাছে গেলাম যাতে তার পরামর্শ নিতে পারি। তিনি বললেন: আমি অবশ্যই একে ভ্রষ্টতার বায়আত মনে করি, তবে আমি আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াকেও নির্দেশ দিয়েছি যেন সে তার কাছে যায় এবং বায়আত করে। হযরত জাবির (রা.) বলেন: অতঃপর আমিও গিয়ে বায়আত করলাম।” [২]

বরং সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে উমাইয়া বাহিনীর আক্রমণ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ, বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ ইবনুল কিবতিয়্যাহ বলেন:

“হারিস বিন আবি রাবিয়াহ এবং আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান এবং তাদের সাথে আমিও হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাকে সেই বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাদেরকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। এটি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সময়ের কথা।” [৩]

[১] আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানি, বর্ণনা নম্বর: ৫৮৩২; মুসনাদে আবি ইয়াল্লা, হা: ৭০১৩; আল-মাকসাদুল আলী ফি যাওয়াইদি আবি ইয়াল্লা: ৩/১৮৯।

[২] আল-ইসাবাহ: ১/৩ - ইবনে উয়াইনাহর সনদ আল-ওয়ালিদ বিন কাসীর থেকে, তিনি ওয়াহাব বিন কায়সান থেকে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে। যা অন্তত হাসান পর্যায়ের।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৮৮২, উমাইয়া বাহিনী আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে তিনবার আক্রমণ করেছিল: ৬১ হিজরি, ৬৪ হিজরি এবং ৭৩ হিজরিতে।

তাই উম্মে সালামাহ (রা.)-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে ৫৯ হিজরির মতের ওপর বিশ্বাস করে অন্য লোকদের অপরাধকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা জুলুম। প্রবল ধারণা এটাই যে, কুফার মিস্বর ও মেহরাবে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করার প্রথা ইয়াজিদের যুগে শুরু হয়েছিল। ইয়াজিদের গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ শিয়ানে আলীর ঘোর বিরোধী, বদমেজাজি এবং জালিম মানুষ ছিল। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, শিয়ানে আলীকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করার জন্য সেই-ই মেহরাব ও মিস্বরে এই কাজ শুরু করিয়েছিল। উম্মে সালামাহ (রা.) তখন জীবিত ছিলেন, তাই তিনি এর সমালোচনা না করে থাকতে পারেননি। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উল্লিখিত উভয় হাদিসই নিজ নিজ স্থানে সঠিক বলে গণ্য হয় এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপরও কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয় না।

কি মিস্বরের ওপর অবমাননা খারেজিদের কাজ ছিল?

প্রশ্ন: এমন কি বলা যায় না যে, কুফায় মিস্বরের ওপর হযরত আলী (রা.)-এর অবমাননার কাজ খারেজিরা করত এবং হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর উদ্দেশ্য তারাই ছিল? কারণ ‘আলাল মানাবির’ (মিস্বরসমূহের ওপর) শব্দটি নিজেই বলে দিচ্ছে যে, জামে মসজিদের সেই মিস্বর উদ্দেশ্য ছিল না যেখানে গভর্নর খুতবা দিতেন। এমন হলে ‘আলাল মিস্বর’ (মিস্বরের ওপর) বলা হতো, ‘আলাল মানাবির’ নয়। পরিশেষে কুফায় তো কেবল একটিই মসজিদ ছিল না। ফারুক-এ-আজম (রা.)-এর যুগে কুফার জনসংখ্যা ছিল এক লক্ষ। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে কেবল বসরা এবং এর আশপাশ...

[১] হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর এই বর্ণনাটি অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে। যদি এই সবগুলোকে একত্রিত করা হয়, তবে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া যুগে কুফার মিস্বর ও মেহরাবে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর গালিগালাজ করা হতো; এই কারণেই ঐতিহাসিকগণ বনু উমাইয়াদের যুগে এই প্রথাকে একটি মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্ন) বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (নাওয়াদিরুন্না খুলাফা: ১/১৮, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯৯ হিজরি, তারিখ ইবনুল ওয়ারদ: ১/২১১, তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৮২, সিমতুন নুজুম আল আওয়ালি: ৩/৩২৬)। এটি ভিন্ন কথা যে, কিছু ফিতনাবাজ ঐতিহাসিক একে সরাসরি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। (আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/১৮৬)। অথচ এটি গবেষণার পরিপন্থী।

হাদিস বিশারদগণও এ বিষয়ে একমত যে, উমাইয়া যুগে গালিগালাজ হতো। “অতঃপর আলীর ব্যাপারে যা হওয়ার ছিল তা-ই হলো, ফলে একদল লোক প্রকাশ পেল যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করল, তারপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হলো এবং তারা তাঁকে ফাসেক সাব্যস্ত করল এবং মিস্বরসমূহে তাঁকে অভিশাপ দেওয়াকে সুন্নাত (প্রথা) বানিয়ে নিল। খারেজিরা কিছু বিষয়ে তাদের সাথে একমত হলো এবং আরও বাড়িয়ে দিল এমনকি তারা তাঁকে কাফের বলল। এর সাথে তারা উসমানকেও যুক্ত করল। ফলে মানুষেরা আলীর হকের ব্যাপারে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল: আহলে সুন্নাত, খারেজি বিদআতিরা এবং বনু উমাইয়া ও তাদের অনুসারী যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিল।” (ফাতহুল বারী: ৭/৭১)। ওমর বিন আব্দুল আজিজ কতই না উত্তম কাজ করেছিলেন যখন তিনি মিস্বরসমূহের ওপর বনু উমাইয়াদের নেতাদের দ্বারা আহলে বাইতকে গালি দেওয়ার পরিবর্তে এই পবিত্র আয়াতটি স্থাপন করেছিলেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ: ৩/১০৩২)। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি মিস্বরসমূহে আলীর যে আলোচনা হতো তা দূর করেছিলেন, কারণ বনু উমাইয়ারা মিস্বরসমূহে আলীকে অভিশাপ দিত। (শারহুল বুখারি লিস সাফাহরি: ১/৩১০)। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মূল পাঠে উল্লিখিত উভয় বর্ণনার মধ্যে প্রথমটি সনদ অনুযায়ী সহিহ বা অন্তত হাসান, দ্বিতীয় বর্ণনাটি জয়যিফ (দুর্বল)। একইভাবে অন্যান্য যেসব সনদে এই বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সম্ভবত কোনটিই দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। দুর্বলতার কারণ হলো: হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে এই বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য সব জায়গায় একজনই ব্যক্তি আবু আব্দুল্লাহ আল-জাদালি রয়েছে, যাকে কেউ কেউ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) মনে করেছেন কিন্তু তার ওপর তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ)-এর অভিযোগও রয়েছে। (তাকরিবুত তাহজিব, নং: ৮২০৭)। বরং ইবনে সাদ তাকে “শাদিদুত তাশাইয়ু” (কটুর শিয়া) এবং হাফেজ জাহাবি “শিয়ি বাগিজ” (বিদ্বৈষী শিয়া) বলেছেন। এও বলা হয় যে, সে মুখতার কাজ্জাবের বাহিনীর একজন অফিসার ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২২৮ ত ত সাদির, মিজানুল ইতিদাল: ৪/৫৩৪)।

আবু আব্দুল্লাহ আল-জাদালি থেকে ‘আলাল মানাবির’ (মিস্বরসমূহের ওপর) বৃদ্ধির সাথে এই বর্ণনাটি কেবল সুন্নি বর্ণনা করেছেন, তাশাইয়ু-এর অভিযোগ সুন্নির ওপরও রয়েছে। (তাকরিবুত তাহজিব, নং: ৬৪৩)। ইবনে মাইন তাকে কিছুটা দুর্বল এবং আবু হাতিম দলিল হিসেবে অযোগ্য বলেন। (মিজানুল ইতিদাল: ১/২৩৬)। এগুলোর মধ্যে কিছু বর্ণনার সনদে ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন মুসা দেখা যায়, যাদের যদিও সিকাহ মনে করা হয়েছে (তাকরিবুত তাহজিব নং: ৩৩৩৫) এবং যদিও সহিহ বুখারিতেও তাদের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু তাদের ওপরও তাশাইয়ু-এর অভিযোগ রয়েছে এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলতেন: হাদ্দাসা বি-আহাদিসা সু (তিনি মন্দ হাদিস বর্ণনা করেছেন)। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫৫৬, ত আর-রিসালাহ)।

মোটকথা, এই অন্যান্য সনদগুলোতে এমন সব রাবি (বর্ণনাকারী) বিদ্যমান যারা শিয়া ছিলেন অথবা তাদের ওপর তাশাইয়ু (এবং কারো কারো ওপর কটুর তাশাইয়ু)-এর অভিযোগ ছিল; যদিও কেউ কেউ তাদের সদুক (সত্যবাদী) মনে করেছেন কিন্তু তাশাইয়ু-এর প্রেক্ষাপটে তাদের বর্ণনাগুলো অবশ্যই পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে যদি এই অভিযোগকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পরবর্তী উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ:

(১) এই ধরনের বিষয়ে দুর্বল বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য। (২) সহিহ বর্ণনা থেকেও কিছু উমাইয়া কর্মচারীদের গালিগালাজ করা প্রমাণিত হয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

সরকারি ভাতা পাওয়া লোকের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার এবং তলোয়ারধারী ছিল ৮০ হাজার। [১] অর্থাৎ শহর ও শহরতলীর জনসংখ্যা চার-পাঁচ লক্ষ অবশ্যই হবে। এমন শহরে নিশ্চিতভাবেই ডজন ডজন মসজিদ এবং ডজন ডজন মিম্বর থাকবে, আর এগুলোর মধ্যেই নাসিবি এবং খারিজিদের মসজিদও অবশ্যই থাকবে যাদের মিম্বর থেকে এই কাজ চলত।

জবাব: এটি তো বেশ ভালো কথা যদি কিয়াসের (অনুমান) সাথে কোনো উদ্ধৃতিও থাকত। খারিজিদের সাধারণ মজলিসে হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করা তো একটি বাস্তবতা। কিন্তু তাদের মিম্বর থেকে এই কাজ করা একটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতির মুখাপেক্ষী যা আপনি পেশ করেননি। কেবল কিয়াস দিয়ে এটি প্রমাণ করা যায় না। আসলে সেই যুগে মিম্বর কেবল জামে মসজিদগুলোতে থাকত এবং খারিজিদের কাছে সেই যুগে কোনো স্থায়ী শহর বা কোনো জামে মসজিদ ছিল না। ‘আলাল মানাবির’ (মিম্বরসমূহের ওপর) শব্দ থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে কুফায় অনেক জামে মসজিদ ছিল যেগুলোর অনেকগুলো মিম্বর ছিল। প্রথম হিজরি শতাব্দীতে কোনো শহর এত বিস্তৃত ছিল না যে সেখানে অনেকগুলো জামে মসজিদের প্রয়োজন হতো। একটিই জামে মসজিদ হতো এবং শ্রোতাদের আধিক্যের কারণে সেখানে অনেকগুলো মিম্বর থাকত। খতিবের আওয়াজ দূর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এই মিম্বরগুলো নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা হতো এবং খতিবের পেছনে দাঁড়িয়ে মুবাঞ্জিগগণ খুতবার শব্দগুলো আগে পৌঁছে দিতেন। [২]

যদি কোনো শহরে জামে মসজিদ একাধিকও হতো, তবুও জুমার আয়োজনের ব্যবস্থাপনা কেবল সরকারের অধীনে থাকত। খারিজিরা উমাইয়া শাসনের বিরোধী ছিল, সরকার তাদের কোনো মিম্বরে বসার এবং নিজেদের বিভ্রান্তি প্রচারের সুযোগ কীভাবে দিতে পারত? [৩] সুতরাং এই সব গালিগালাজ খারিজিদের ঘাড়ে চাপানো দুর্বল কিয়াস। প্রমাণ অনুযায়ী এটি কেবল কিছু উমাইয়া গভর্নরের কাজ ছিল।

আলোচনার সারসংক্ষেপ:

কোনো সহিহ রেওয়ায়েত থেকে এটি প্রমাণিত নয় যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) গালিগালাজ করতেন বা এর নির্দেশ দিতেন। বড়জোর এটি প্রমাণিত যে কিছু উমাইয়া গভর্নর (অ-সাহাবী) মিম্বরে দাঁড়িয়ে (অন্য সাহাবীদের) গালিগালাজ করতেন বা কখনো সাধারণ মজলিসে কিছু লোক এমন করত। যদি এমন কিছু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে হতো, তবে তিনি কখনো সতর্ক করতেন এবং কখনো কৌশলগত কারণে উপেক্ষা করতেন।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৫০৩, ৫০৫, আন উমর বিন শাব্বাহ।

[২] লাউডস্পিকার আবিষ্কারের আগে বড় সমাবেশে যেখানে ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জিন বা ওস্তাদের আওয়াজ সব মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন হতো, সেখানে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। (যার একটি রূপ বর্তমানে তাবলিগি জামাতের ইজতেমাগুলোতেও দেখা যায়)। হাদিসের কিতাবগুলোতে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন: ‘ফাতাহ উমর বিয়ালিক আলা রুউসিল মানাবির’ (নাইলুল আওতার: ৭/১০); হাদ্দাসানা আল-লাইস বিন সাদ আন ইবনে শিহাব আন্বাহ কানা কায়দান আলা মানাবিরে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি মুয়ারাযাতু আলাল মদিনা ওয়া মাআহ উরওয়াহ বিন যুবাইর। (আল-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ: ১২/৮); ওয়া কওলুহু ইয়াসমাউদ দুআ আই মিনাল মানাবির বিআ’লিস সওত। (আর-রাব্বুল মুহতার: ২/৫৩, ত: দারুল ফিকর); ওয়া হাযা আসল ফিল ইসতিসকা আলাল মিম্বর ইনদা কাসরাতিল মাতার। (আল-মুসাফফা শারহুল মুয়াত্তা লিল ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী: ১/২৩৩)। স্পষ্ট যে বৃষ্টির জন্য দোয়া করার জায়গা একটিই ছিল, এখানে মিম্বরসমূহ মানে সেই মিম্বর যা জামে মসজিদে রাখা হতো।

[৩] সেই যুগে সাধারণ খারিজিরা সমাজে মিশে থাকত। যখন তাদের সশস্ত্র দল হতো, তখন তারা জঙ্গল ও গ্রামগুলোতে আস্তানা বানাত। কুফার মেহরাব ও মিম্বরে তাদের পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তবে তারা যখন শক্তি অর্জন করত তখন শহর দখল করে নিত, কিন্তু তা স্থায়ী হতো না। ৬৭ হিজরিতে তারা বসরা, বাহরাইন এবং ইয়ামামার ওপর দখলদারিত্ব কায়ম করেছিল। ইরাকে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে তারা অনেক হাঙ্গামা করেছিল কিন্তু কোনো শহরে স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারেনি। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/২৫৫, যিকর নাযদাহ বিন আমের; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/১৮৩, ১৮৭; তারিখ আল-তাবারী: ৬/৪৬, ৪৭, ৬৭ হিজরির ঘটনাবলি।

সহীহ ও যঈফ বর্ণনার পার্থক্য না করে যারা বিতর্ক করে তাদের প্রতি প্রশ্ন:

সহীহ ও যঈফ বর্ণনার পার্থক্য করার মূলনীতি যদি বিবেচনায় রাখা হয়, তবে প্রত্যেক গবেষক সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। তবে যদি কেউ হযরত আলী (রা)-এর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে এই মূলনীতি মানতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমাদের নিকট যঈফ বর্ণনাও সব দিক থেকে নির্ভরযোগ্য, আর যেহেতু কিছু যঈফ বর্ণনা হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, তাই এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়।

এমন ব্যক্তিদের নিকট আমরা আরজ করব যে, ইনসাফ বজায় রেখে তবে নিচের বর্ণনাটির ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করুন। আবু মিখনাফ হযরত আলী (রা) সম্পর্কে আজোবাজে কথা বলতে গিয়ে বলেন:

“হযরত আলী (রা) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন দুআয়ে কুনুত পড়তেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ! মুয়াবিয়া, আমার ইবনুল আস, আবু আল-আওয়ার আস-সুলামী, হাবীব, আবদুর রহমান ইবনে খালিদ, দাহহাক ইবনে কায়স এবং ওয়ালিদের ওপর লানত বর্ষণ করুন। যখন এই সংবাদ হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনিও যখন কুনুত পড়তেন, তখন হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আশতার এবং হাসান ও হুসাইনের ওপর লানত বর্ষণ করতেন।” [১]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতবিরোধের বিষয়ে যদি কোনো যঈফ ও ভিত্তিহীন বর্ণনা গ্রহণ করতে হয়, তবে এই বর্ণনাটি বলছে যে, লানত বর্ষণের ধারা সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা) শুরু করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর প্রতিক্রিয়ায় এটি করেছিলেন। যারা সহীহ ও যঈফের পার্থক্য মানেন না, তাদের এটিও বিশ্বাস করে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পারস্পরিক লানত ও নিন্দার এই জাতীয় বর্ণনাগুলোকে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য মনে করি না। আমরা হযরত আলী এবং হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-কে এমন মনে করি না, আর না হযরত মুয়াবিয়া, আমার ইবনুল আস, মুগীরা ও ইবনে শুবা (রা) এবং তাঁদের অন্যান্য সঙ্গীদের। কারণ আমরা শুরুতেই এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছি যে, এই জাতীয় বিষয়ে সহীহ ও সুস্পষ্ট বর্ণনার সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। যঈফ বর্ণনা এই ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য।

গালিগালাজের বর্ণনা, একটি অনুমাননির্ভর দলিল এবং তার জবাব:

প্রশ্ন: উমাইয়া যুগে গালিগালাজের সহীহ বর্ণনাগুলোও আমাদের নিকট মিথ্যা। এটি ছিল হিজরী প্রথম শতাব্দী যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) ‘খাইরুল কুরুন’ (সর্বোত্তম যুগ) বলেছেন। এটি সম্ভবই ছিল না যে, কোনো ব্যক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ্যে কোনো সাহাবীকে গালি দেবে। যারা এটি বলে এবং শোনে তারা কেন চুপ থাকে, যেখানে আজকের এই সরকারি যুগেও সাধারণ মানুষের ভিড়ে কোনো সাহাবীকে গালি দেওয়ার সাহস কারো নেই? যদি সেই যুগে এমন কোনো কটু কথা বলা হতো, তবে শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ উঠে দাঁড়িয়ে সেই শাসকের টুটি চেপে ধরত, বরং এমন শাসককে টেনে হিঁচড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হতো।

[১] “আর তিনি যখন ফজরের সালাত পড়তেন তখন কুনুত পড়তেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ! মুয়াবিয়া, আমার, আবু আল-আওয়ার আস-সুলামী, হাবীব, আবদুর রহমান ইবনে খালিদ, দাহহাক ইবনে কায়স এবং ওয়ালিদের ওপর লানত বর্ষণ করুন। অতঃপর যখন এই সংবাদ মুয়াবিয়ার নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি যখন কুনুত পড়তেন তখন আলী, ইবনে আব্বাস, আশতার, হাসান এবং হুসাইনের ওপর লানত বর্ষণ করতেন।” (তরীখুত তাবারী: ৫/৪১)

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

উত্তর: সহীহ বর্ণনাসমূহের খণ্ডনে এই অনুমানভিত্তিক দলিল অত্যন্ত দুর্বল, যার ভিত্তি হলো এই ভুল ধারণা যে বনু উমাইয়ার পুরো যুগকে সব দিক থেকে সমানভাবে একটি আদর্শ শাসনকাল মনে করে নেওয়া হয়েছে। অথচ স্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পর ইসলামী সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ কমতে শুরু করেছিল। ইয়াজিদের যুগে আলে রাসূল (সা.)-এর রক্ত ঝরানো এবং পবিত্র স্থানসমূহের পবিত্রতা পদদলিত করার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে। একইভাবে আব্দুল মালিক এবং তার সন্তানদের যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং শাসকদের জবাবদিহিতার সেই স্বাধীনতা একেবারেই ছিল না যা সাহাবায়ে কেরামের শাসন আমলে ছিল। সেই যুগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কয়েক দশক ধরে মুসলিম বিশ্বের ওপর চেপে বসেছিল যার সামনে মুখ খোলাও ছিল মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর নামান্তর। এমনকি সাহাবায়ে কেরামও তার কষ্ট দেওয়া থেকে নিরাপদ ছিলেন না।

এটা ভুল যে উম্মতে মুসলিমা এবং তাদের আকাবিরগণ এই সবকিছু খুশিমনে সহ্য করেছেন। তবে তারা প্রতিবাদের ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শের মুখাপেক্ষী ছিলেন না যে কটু কথা বলা শাসক বা খতিবকে চড় মারতেন বা টেনে হিঁচড়ে নামাতেন। উম্মে সালামাহ (রা.), হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর এই ধরনের কটু কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা সহীহ বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে। যদি এই মহান ব্যক্তিগণ শরীয়ত অনুযায়ী খুরুজ-এর সুযোগ দেখতেন তবে হয়তো তারাও তা করতেন, কিন্তু খুরুজ-এর নিষেধাজ্ঞার হাদীসসমূহ দেখে তারা ধৈর্যের পথ অবলম্বন করেছিলেন। যে সকল সাহাবী ও তাবয়ী নিজেদের ইজতিহাদ অনুযায়ী কিছু করার সুযোগ দেখেছিলেন তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) এবং আহলে হাররার সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের বাড়াবাড়ি রোধ করা। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে সাঈদ বিন জুবায়ের এবং ইমাম শাবী (রহ.)-এর মতো বুজুর্গদের লড়াই করার ঘটনাও ইতিহাসে বিদ্যমান। এটি কঠোরতম প্রতিবাদ না হলে আর কী ছিল।

বনু আব্বাসের আন্দোলনের সাথে জনগণের সহানুভূতি কেবল এজন্য যুক্ত হয়নি যে তা বনু হাশিমের আন্দোলন ছিল, বরং এর একটি বড় কারণ ছিল বনু উমাইয়ার এমন শাসন পদ্ধতি যা জনগণ ও শাসকদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছিল এবং ভালোবাসার স্থলে ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল। পরিশেষে তিন মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত বনু উমাইয়া সাম্রাজ্য এক শতাব্দীও পূর্ণ করতে পারেনি এবং দেখতে দেখতেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

বনু মারওয়ানের এই ভুল ধারণা ছিল যে হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলে নিজেদের দলকে অধিক থেকে অধিকতর গোঁড়া বানিয়েই তারা তাদের শাসন সুসংহত করতে পারবে। তাদের মধ্যে কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তবুও কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁর নিন্দা ও দোষারোপ করতেন। অন্যদিকে তাদের জেদের বিপরীতে চরমপন্থী শিয়ারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর নিন্দা করত।

এমন পরিস্থিতিতে মুহাদিসগণ হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) উভয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীসমূহ পূর্ণ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কেও সেই সম্মানজনক স্থান দিয়েছেন যার তিনি শরীয়ত অনুযায়ী হকদার ছিলেন। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে সমাজকে ভ্রান্ত চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন করার অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল, নাসিবিয়াত ও শিয়া মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারল না এবং সঠিক ইসলামী চিন্তাধারাই বিজয়ী থাকল।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

গালিগালাজ ও অপবাদের বাস্তবতা — আলোচনার সারসংক্ষেপ

গালিগালাজ ও অপবাদ সংক্রান্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ও হাদীস ভিত্তিক বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো এই যে, একদিকে বনু উমাইয়া এবং কিসাসে উসমান-এর আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত চরমপন্থী লোকেরা হযরত আলী (রা)-কে উসমানের হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষক মনে করত এবং নিজেদের অবস্থান সঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা হযরত আলী (রা)-এর ওপর অপবাদ আরোপ করত। অন্যদিকে ইরাকবাসীদের চরমপন্থী লোকেরাও একইভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কটু কথা বলত। কিন্তু গালিগালাজ ও অপবাদের এই ধারাকে সরাসরি সাহায্যে কেরামের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং একে একটি সাধারণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা ভুল। হযরত মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.) বলেন:

“হযরত আলী (রা) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির যে তীব্র মতপার্থক্য ছিল, তা কারো কাছে গোপন নয়। হযরত আলী (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে বিদ্রোহের অপরাধী মনে করতেন এবং এর বহিঃপ্রকাশও করতেন। অন্যদিকে হযরত মুয়াবিয়া (রা) মনে করতেন যে, হযরত আলী (রা) উসমানের হত্যাকারীদের কাছ থেকে কিসাস নেওয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করছেন, তাই তিনি ভুলের ওপর আছেন। দৃষ্টিভঙ্গির এই তীব্র মতপার্থক্য উভয়ের ব্যক্তিগত মজলিসগুলোতে প্রকাশ পেত। হযরত মুয়াবিয়া (রা) নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও মর্যাদায় হযরত আলী (রা)-এর সমকক্ষ ছিলেন না, তাই হতে পারে যে তাঁর ব্যক্তিগত মজলিসগুলোতে তাঁর মুখ থেকে কোনো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দও বের হয়ে যেত, কিন্তু এই মতামতের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের কোন যুক্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে যে, ‘তিনি প্রকাশ্যে খুতবায় মিস্বরের ওপর হযরত আলী (রা)-এর ওপর গালিগালাজের বৃষ্টি বর্ষণ করতেন’।” [১]

সাধারণ মানুষের কথা বললে, তাদের মধ্যে অবশ্যই অনেক চরমপন্থী ছিল, যাদের মধ্যে একদিকে রাফেযী, অন্যদিকে খারেজী এবং তৃতীয় দিকে মারওয়ানী ও নাসিবী ছিল। এই লোকদের কর্মকাণ্ডকে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যেমন সঠিক নয়, তেমনি হযরত আলী (রা)-এর ওপরও নয়। হযরত আলী (রা)-এর উচ্চতর চরিত্রের অনেক উদাহরণ আমরা পেশ করেছি। অন্যদিকে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা এবং উদারতা স্বীকার করতে আহলে তাশাইয়ুও (শিয়ারা) বাধ্য। মাসউদী লেখেন: তাঁর সহনশীলতা অনুসরণের চেষ্টা পরবর্তীকালের লোকেরাও করেছে কিন্তু কেউ তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। [২] ইয়াকুবী লেখেন: “তিনি ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং বলতেন যে, যদি মানুষের সাথে আমার একটি চুলের মতো সম্পর্কও থাকে তবে আমি তাও ছিঁড়তে দেই না।” [৩]

[১] হযরত মুয়াবিয়া (রা) আওর তারিখি হাকায়েক, পৃ. ১৫১

[২] মুরুজুজ জাহাব: ৩/২২৪, ত. আল-জামিয়াতুল লুবনানিয়া

[৩] তারিখ ইয়াকুবী, পৃ. ২০৩

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

তবে কি এমন বুদ্ধিমান ও উদারমনা মানুষ সম্পর্কে কোনো শত্রুও কি এই ধারণা করতে পারে যে, তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কটুভাষার কোনো অভিযান চালাবেন? বাস্তবতা হলো এই যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগ পর্যন্ত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর গালিগালাজ কোনো অভিযান হিসেবে শুরু হয়নি এবং তাঁর গভর্নরদের যে কাজকে গালিগালাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়, তা কোনো সহীহ বর্ণনা দ্বারা গালিগালাজের পর্যায় পর্যন্ত মোটেও প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ! এটা বলা যেতে পারে যে, সেই যুগে সরকারের কাছে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য বর্তমানের মতো প্রচারমাধ্যম ছিল না, তাই যেভাবে জুমার খুতবা এবং জামে মসজিদের মিস্বরগুলোকে সরকারি ঘোষণার জন্য ব্যবহার করা হতো, ঠিক সেভাবেই এই মিস্বরগুলোতে অতীত ঘটনাবলি সম্পর্কে নিজেদের অবস্থানও স্পষ্ট করা হতো। উসমানের শাহাদাত, জঙ্গ জামাল ও সিফফীন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসত এবং উসমানের হত্যাকারী ও তাদের সমর্থক গোষ্ঠীর নিন্দাও করা হতো; কারণ উসমানী আন্দোলনের অনেক লোক সরাসরি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রক্তের অভিযোগ আনতেন এবং উমাইয়া শাসকরা এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন, তাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভক্ত-অনুরাগীদের জন্য এটা মনে করা স্বাভাবিক ছিল যে, এটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এরই নিন্দা করা হচ্ছে। এটাই ছিল সেই গালিগালাজ যা বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই এটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর গালিগালাজের অভিযান হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে তাঁর নির্দেশে শুরু হয়েছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি রাজনৈতিক স্বার্থে জিয়াদের বংশপরিচয় পরিবর্তন করেছিলেন?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর এই অভিযোগও রয়েছে যে, তিনি জিয়াদকে—যার বংশপরিচয় অজ্ঞাত ছিল—অশরীয়াতি পন্থায় নিজের ভাই হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন যাতে তার মাধ্যমে নিজের শাসন মজবুত করতে পারেন এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। জিয়াদ ছিল সুমাইয়া নামক এক দাসীর পুত্র, তার পিতা ছিল অজ্ঞাত। যেহেতু জিয়াদ হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীর একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন, তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জোরপূর্বক তাকে ভাই ঘোষণা করে নিজের সহযোগী বানিয়ে নেন। তিনি সেই হাদীসেরও তোয়াক্কা করেননি যাতে উল্লেখ আছে যে: “আল-ওয়ালাদু লিল-ফিরাশ।” অর্থাৎ সন্তান তার দিকেই সম্বন্ধযুক্ত হবে যার বিছানায় সে জন্মগ্রহণ করেছে।

কিন্তু এই অভিযোগ কেবল কুধারণার ফসল। বাস্তবতা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সম্মানিত পিতা হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) জাহেলিয়াতের যুগে তায়েফের সেই দাসী সুমাইয়ার সাথে এক প্রকারের বিবাহ করেছিলেন যা জাহেলিয়াতে প্রচলিত ছিল। যদিও ইসলাম এর অনুমতি দেয় না এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে একে বিবাহ বলা যায় না, তবে সেই সময়ের সমাজে এই বিবাহ সঠিক ছিল। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) এবং সুমাইয়ার এই সম্পর্কের মাধ্যমেই জিয়াদের জন্ম হয়। এই সম্পর্কের কথা তেমন জানাজানি হয়নি। বনু উমাইয়াদের কিছু লোক এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে জিয়াদের পিতা ছিল অজ্ঞাত ব্যক্তি, তাই তাকে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে ‘জিয়াদ বিন সুমাইয়া’ অথবা পিতার দিকে সম্বন্ধ করে ‘জিয়াদ ইবনে আবিহি’ বলা হতো।

জিয়াদ হযরত আলী (রা.) এবং হাসান (রা.)-এর যুগে পারস্যের গভর্নর ছিলেন; তার প্রচেষ্টায় সেখানে বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত হাসান (রা.) যখন ক্ষমতা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে অর্পণ করেন, তখন এক বছর বিরতির পর জিয়াদও এই খেলাফত মেনে নেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে সিরিয়ায় চলে আসেন। [১]

জিয়াদের বংশপরিচয় সন্দেহজনক হওয়া একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় ছিল, তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করেননি, এভাবে দুই বছর কেটে গেল। ৪৪ হিজরিতে তাঁর সামনে এমন একটি ঘটনা ঘটল যে তিনি জিয়াদের বংশপরিচয় তদন্ত করতে বাধ্য হলেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, বনু আবদ কায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি রাজধানী দামেস্কে এল এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একজন গভর্নরের সাথে দেখা করল। গভর্নর এবং জিয়াদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য চলছিল। কথোপকথনের সময় গভর্নর আবদ কায়েসের সেই ব্যক্তিকে বললেন:

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/১৭৬ থেকে ১৭৮

“ইবনে সুমাইয়া (যিয়াদ) আমার কাজের সমালোচনা করে, আমার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের ওপর আপত্তি তোলে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরাইশের কিছু লোকের কাছ থেকে শপথ নেওয়াব যে আবু সুফিয়ান কখনো সুমাইয়ার চেহারাও দেখেননি।” [১]

এই কথাগুলো যিয়াদের কানে পৌঁছে গেল যে, গভর্নর কেবল তার বংশের ওপর সমালোচনাই করেননি, বরং এর জন্য রীতিমতো একটি প্রচার অভিযান চালানোর সংকল্প করেছেন। উচ্চপদে আসীন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মানুষের জন্যও এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক বিষয় যে মানুষ তার বংশপরিচয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবে। যিয়াদ যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তার আন্দাজ কেবল তিনিই করতে পারেন যিনি কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে খবর দিলেন। তিনি ওই গভর্নরের এই কথায় এতটাই অসন্তুষ্ট হলেন যে, তার কাছে ওই গভর্নরের যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দিলেন। অবশেষে গভর্নর তার পুত্র ইয়াজিদের মাধ্যমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সুযোগে গভর্নরকে কঠোর ভাষায় বললেন:

“আপনি কি যিয়াদ সম্পর্কে কিছু বলেছেন? শুনে রাখুন, পুরো আরব জানে যে আমি জাহেলিয়াতের যুগেও আরবের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলাম (যেহেতু কুরাইশ নেতার পুত্র ছিলাম), ইসলাম আমার সম্মান আরও বৃদ্ধি করেছে। আমার সঙ্গীদের মধ্যেও এমন কোনো অভাব ছিল না যা যিয়াদ এসে পূরণ করেছে অথবা আমার কোনো অপমানকে সে সম্মানে রূপান্তরিত করেছে। হ্যাঁ, আমি তার সাথে সেই আচরণই করেছি যার সে যোগ্য ছিল। (এর অর্থ ছিল এই যে, আমি যিয়াদের প্রতি দয়া এজন্য করি না যে আমার কোনো স্বার্থ আছে, বরং সে নিজেই এই অনুগ্রহের যোগ্য।)”

গভর্নর নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং বললেন: “আমি মুখ দিয়ে কেবল সেই কথাই বের করব যাতে যিয়াদের খুশি থাকে।”

এরপর গিয়ে যিয়াদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি মিটমাট করে নিলেন। [২]

এই ঘটনা থেকে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন যে, যিয়াদের বংশপরিচয় সম্পর্কে অন্য লোকেরাও সন্দেহের শিকার হবে এবং তার বিরোধীরা এই ধরনের কটাক্ষ করে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। তাই আপনি রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে যিয়াদের বংশপরিচয় থেকে অপবাদ দূর করতে দেরি করা সঠিক মনে করেননি। এর একটি কারণ এও ছিল যে, এখন পর্যন্ত এমন কিছু লোক জীবিত ছিলেন যারা যিয়াদ হযরত আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সন্তান হওয়ার সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর এই লোকগুলো মারা গেলে যিয়াদের সম্মানে চিরদিনের জন্য কলঙ্ক লেগে থাকত।

হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিয়ে সেই সময় এমন কোনো ঘোষণা দেননি যে যিয়াদ তার ভাই এবং হযরত আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র, কারণ এর কোনো শরয়ী প্রমাণ বিদ্যমান ছিল না। তাই হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে সাক্ষীদের সন্ধান শুরু করলেন, যারা হযরত আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু যিয়াদের মা সুমাইয়ার সাথে নিকাহ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং এই সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২২, ২৩, মিসর সংস্করণ; তারিখুত তাবারী, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ১৮৯, লাইডেন সংস্করণ।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৩।

তারিখ امت مسلمہ

অবশেষে দশজন পুরুষ ও নারী পাওয়া গেল যারা শপথ করে এই সত্য বর্ণনা করেছেন; তাদের মধ্যে জিয়াদ বিন আসমা, মালিক বিন রাবি, মুনজির বিন জুবাইর, মাসতুরদ বিন শাদ্দাদ আল-ফাহরি, ইবনে আবিল হার আস-সাকাফি, জায়েদ বিন নুফাইল আল-আজদি, শুবা বিন আলকামা আল-মাজিনি; হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বোন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে আবু সুফিয়ান এবং বনু সাখর ও বনু শায়বান এবং বনু মুস্তালিকের দুই ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তারা সবাই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা আবু সুফিয়ান (রা.)-এর মুখ থেকে শুনেছেন যে জিয়াদ তার ছেলে। মুনজির বিন জুবাইর (রা.) বলেছেন যে, তিনি সরাসরি আবু সুফিয়ান (রা.)-এর কাছ থেকে শোনেনি বরং হযরত আলী (রা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন যে আবু সুফিয়ান (রা.) এই কথা বলেছিলেন। [১]

এই ধরনের বিষয়ে শরয়ী সাক্ষ্যের জন্য দুইজন ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সতর্কতাবশত অনেক সাক্ষ্য সামনে রেখেছিলেন এবং যখন এই সত্য প্রমাণিত হলো তখন তাকে স্বীকার করে ঘোষণা করলেন যে জিয়াদ তার ভাই এবং তার পরিবারের একজন সদস্য। এভাবে দীর্ঘ সময় পর জিয়াদ এক চরম মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন এবং তার বংশের কলঙ্ক দূর হলো।

প্রকৃতপক্ষে এটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নৈতিক উচ্চতা ছিল যে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় শাসক হওয়া সত্ত্বেও একজন সন্দেহজনক বংশপরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যাপারে শরয়ী সাক্ষ্য স্বীকার করে তাকে নিজের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। অন্যথায় আজকেও ভেবে দেখুন কে এমন ব্যক্তি আছে যে এমন কাউকে পরিবারের অংশ করে নেয় যার বংশ নিয়ে আঙুল তোলা হয়। কে আছে যে একজন বংশপরিচয়হীন যুবককে ভাই মেনে নিয়ে নিজের সম্পত্তিতে অংশীদার করে নেয়।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মানুষের নিন্দার পরোয়া না করে একজন মজলুম ব্যক্তিকে তার অধিকার পাইয়ে দিয়েছেন এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সম্পর্কের শিকলকে জুড়ে দিয়েছেন, এটি ছিল তার উদারতা, কোনো অপরাধ ছিল না।

রইল এই কথা যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আগে এই পদক্ষেপ কেন নেননি? তো এর উত্তর তাবারির বর্ণনায় নিজেই বিদ্যমান যে তার একজন গভর্নরের কর্মকাণ্ড থেকে তার মনে এই খেয়াল আসেনি যে জিয়াদের বংশ নিয়ে তদন্ত করা জরুরি, অন্যথায় মানুষ তার ওপর সমালোচনা করতে থাকবে এবং কালক্রমে সত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

যেসব লোকের ধারণা যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই পদক্ষেপ নাজায়েজ ছিল, তারা কি বলবেন যে এই দশজন বুজুর্গ কি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কথায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? ঈমান ও আখলাকের এই পর্যায়ে অবক্ষয় হয়তো আমাদের সমাজে হতে পারে কিন্তু সেই যুগের মুসলমানদের কাছ থেকে এর প্রত্যাশা কীভাবে করা যেতে পারে।

যেখানে এই আপত্তি যে সাইয়েদনা মুয়াবিয়া (রা.) রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এই চাল চলেছিলেন, তবে তার খণ্ডনের জন্য এটাই দেখা যথেষ্ট যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই পদক্ষেপ কখন নিয়েছিলেন? ৪৪ হিজরি পর্যন্ত জিয়াদ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সৈন্য ও কোষাগার নিয়ে পারস্যের একটি দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেই দিনগুলোতে তাকে নিজের ভাই প্রমাণ করার চেষ্টা করলে কেউ বলতে পারত যে তিনি জিয়াদের বিদ্রোহ শেষ করার জন্য এটি করছেন।

[১] আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ: ৫২৮/৩

করার জন্য এবং তাকে অনুগত বানানোর জন্য এই ‘চাল’ চলেছেন, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেই সময় এমন কিছুই করেননি। তারপর যিয়াদ তাঁর কাছে বায়াত হলেন এবং কোনো পদ বা মর্যাদা ছাড়াই তাঁর কাছে থাকতে লাগলেন। দুই বছর কেটে গেল। তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে নিজের ভাই হিসেবে ঘোষণা করলেন, অথচ তার কোনো রাষ্ট্র ছিল না, না ছিল কোনো সেনাবাহিনী বা কোষাগার যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সেটির প্রতি লোভ থাকবে। আর এই ধারণা যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যিয়াদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে এবং তাকে দৃঢ় অনুগত বানানোর জন্য এমনটি করে থাকবেন, এটিও একটি ভিত্তিহীন কথা; কারণ যখন একজন ব্যক্তি আগে থেকেই তাঁর কাছে বায়াত ছিল, তখন তিনি তাকে যে দায়িত্বই অর্পণ করতেন সে তা পালন করতে বাধ্য ছিল, বরং সে খুশিই হতো যে সে কোনো পদ পেয়েছে। ভাই বানিয়ে মাথায় তুলে নেওয়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কী লাভ ছিল!! এভাবে তো উল্টো নিজের অধস্তনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে পারত।

যেখানে এই প্রসিদ্ধ হাদিসের প্রশ্ন: ‘الْوَدُّ لِلْفِرَاشِ’ (আল-ওয়ালাদু লিল-ফিরাশ)। অর্থাৎ ‘সন্তানের বংশপরিচয় তার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হবে যার বিছানায় সে জন্মগ্রহণ করেছে’। তো হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পদক্ষেপ এই হাদিসের পরিপন্থী মোটেও নয়। হাদিসটি সেই পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করে এবং তারপর সেই নারীর কাছে সন্তানের জন্ম হয়, তখন সন্তানের বংশপরিচয় নারীর স্বামীর সাথে যুক্ত করা হবে। যদি সেই ব্যভিচারী ব্যক্তি দাবি করে যে এটি আমার ছেলে অর্থাৎ আমার ব্যভিচারের ফসল, তবে এই বক্তব্যকে অপরাধ স্বীকারের সমতুল্য গণ্য করে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া হবে, যেমনটি হাদিসের পরবর্তী শব্দাবলি: ‘وَالْعَاهِرُ الْحَجْرُ’ (ওয়া লিল-আহিরিল হাজার) (ব্যভিচারীর জন্য পাথর) থেকে স্পষ্ট হয়। কিন্তু সন্তান তার বলে সাব্যস্ত হবে না।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) জাহেলিয়াত যুগে সুমাইয়ার সাথে যে সম্পর্ক রেখেছিলেন, সেই যুগে তার ওপর ব্যভিচার প্রযোজ্য হতো না। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) এ বিষয়ে লেখেন:

‘আবু সুফিয়ান নিজের কোনো কাজে তায়েফ গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি সুমাইয়ার সাথে সেই ধরনের নিকাহ করেছিলেন যে ধরনের নিকাহ জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। এই সম্পর্কের ফলে যিয়াদ জন্মগ্রহণ করে, সুমাইয়াও যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন। স্বয়ং হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-ও এই সম্পর্কের কথা গোপনে স্বীকার করেছিলেন।’ [১]

আল্লামা ইবনে আসির আল-জাযারি (রহ.)-এর লেখা থেকে এ বিষয়ে আরও আলোকপাত হয়। তিনি লেখেন:

‘যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে ওজরপ্রাপ্ত মনে করেন তাদের বক্তব্য হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যিয়াদকে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা এজন্য দিয়েছিলেন যে, জাহেলিয়াত যুগে নিকাহর অনেক প্রকার ছিল, যা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সেগুলোর মধ্যে একটি রূপ ছিল এই যে, লোকেরা কোনো পেশাদার নারীর সাথে সহবাস করত, যখন সে গর্ভবতী হতো এবং সন্তানের জন্ম হতো, তখন সে যার সাথে চাইত সন্তানের বংশপরিচয় যুক্ত করে দিত। যখন ইসলাম এলো তখন এই নিকাহ হারাম হয়ে গেল, কিন্তু জাহেলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী যে সন্তান কারো দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, ইসলামের পরেও তাকে তার দিকেই সম্বন্ধযুক্ত রাখা হয়েছে এবং বংশপরিচয়ের প্রমাণে (বৈধ ও অবৈধের) পার্থক্য করা হয়নি।’ [২]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৯

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৩ হিজরির আলোচনাবী

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

জানা গেল যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) সুমাইয়ার সাথে ব্যভিচার করেননি, বরং এক বিশেষ ধরনের বিবাহ করেছিলেন যা জাহেলিয়াত যুগে অবৈধ ছিল না। ইসলাম এই ধরনের বিবাহকে হারাম ঘোষণা করেছে, তবে এর মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের উত্তরাধিকারহীন বা অবৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য করেনি। যিয়াদ হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বিশেষ মজলিসগুলোতে এই বিবাহের কথা স্বীকার করেছিলেন, তাই যিয়াদ সেই যুগেই তাঁর আইনগত পুত্র হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর যিয়াদের সাথে তাঁর সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হতে পারত না।

সমস্যা যদি তৈরি হয়ে থাকে তবে তা কেবল এই কারণে যে, তিনি এই সত্যটি কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন, ফলে সাধারণ মানুষ যিয়াদের বংশপরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল এবং নানা ধরনের কথা বলত। তাদের মধ্যে যারা যিয়াদ হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সন্তান হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করত, তারা অজ্ঞতার কারণেই এমনটি বলত। যেহেতু জাহেলিয়াত যুগের বিবাহসমূহ সম্পর্কে শরয়ী অবস্থান তাদেরও জানা ছিল, তাই তারা এটি বলত না যে, “হযরত আবু সুফিয়ান সুমাইয়ার সাথে ব্যভিচার করেছিলেন, সুতরাং ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানের বংশপরিচয় প্রমাণিত হবে না।” বরং তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) তো সুমাইয়ার চেহারা পর্যন্ত দেখেননি। অর্থাৎ যিয়াদ বৈধ সন্তান, তবে অন্য কারো হবে। যিয়াদকে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর দিকে সম্বন্ধ করার বিরোধিতায় তাঁর একই মায়ের গর্ভজাত ভাই হযরত আবু বাকরা (রা.)-এর নামও নেওয়া হয়। তবে তিনিও এই সম্পর্কের অস্বীকৃতি জানাতে গিয়ে এই কারণই বর্ণনা করতেন:

আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই যে সুমাইয়া কখনো আবু সুফিয়ানকে দেখেছেন। [১]

এই একই আপত্তি ইবনে কুজ (ইবনে আমির)-এর ছিল, যিনি এই বংশপরিচয় অস্বীকার করার জন্য অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: “আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কুরাইশদের একটি দলের কাছ থেকে শপথ নেওয়াব যে আবু সুফিয়ান সুমাইয়াকে কখনো দেখেননি।” [২]

যেসব কবি এই বিষয়ে যিয়াদকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন, তাদের আসল আপত্তি এটাই ছিল। আবদুর রহমান বিন হাকাম বলেছিলেন:

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যখন যিয়াদ সুমাইয়ার গর্ভে এসেছিল, তখন আবু সুফিয়ান সুমাইয়ার নিকটবর্তীও ছিলেন না।”

এবং ইবনে মুফারিগ বলেছিলেন:

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তোমার মা কখনো ওড়না সরিয়ে আবু সুফিয়ানের সাথে আলিঙ্গন করেননি।” [৩]

জানা গেল যে, এই সকল আপত্তিকারীদের নিকটও যদি হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) এবং সুমাইয়ার মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত সম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে যেত, তবে তারাও যিয়াদকে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর বৈধ পুত্র হিসেবে মেনে নিতেন। অন্যথায় তাদের এই কথার পুনরাবৃত্তি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না যে আবু সুফিয়ান (রা.) সুমাইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তারা পরিষ্কারভাবে এভাবে বলতেন যে, আবু সুফিয়ান (রা.) যদি সুমাইয়ার সাথে...

[১] আল-ইসতিয়াব: ৫২৬/২

[২] তারিখুত তাবারী: ২১৩/৫

[৩] আল-ইসতিয়াব: ৫২৮/২

ছিল তবে এই সম্পর্ক ছিল ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে কোনো আত্মীয়তা প্রমাণিত হয় না।

সুতরাং যদি তাদের কাছেও আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সাথে সুমাইয়ার সম্পর্ক প্রমাণিত হতো, তবে তারা যিয়াদকে তাঁর বৈধ পুত্র হিসেবে মেনে নিতেন, যেমনটি ইসলামে এর অবকাশ রাখা হয়েছে। আর এই কারণেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আলেমদের কাছ থেকে এই ফতোয়া নেননি যে, ইসলাম-পূর্ব যুগের এ ধরনের বিবাহের ফলে জন্ম নেওয়া সন্তানের বংশ পরিচয় প্রমাণিত হবে কি না, কারণ এটি আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল যে বংশ পরিচয় প্রমাণিত হবে। আসল বিষয় ছিল ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল কি না। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সামনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত দশজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, যাদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যখন সাক্ষ্য দিলেন যে বাস্তবে এমনটিই ঘটেছিল, তখন শরীয়ত অনুযায়ী এই বংশ পরিচয় প্রমাণিত হয়ে গেল।

এটিই ছিল পুরো ঘটনার আসল প্রেক্ষাপট যা সমালোচকরা উপেক্ষা করে গেছেন।

কিছু লোক বলেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই পদক্ষেপকে খোদ বড় বড় সাহাবীগণ ভুল আখ্যা দিয়েছিলেন এবং এর সমালোচনা করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-ও যিয়াদকে ভাই হিসেবে মেনে নিতে এবং পর্দা করতে অস্বীকার করেছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-ও এই পদক্ষেপের সমালোচক ছিলেন। সবচেয়ে বেশি যিয়াদের বৈমাত্রেয় ভাই আবু বাকরা (রা.) এর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং সারাজীবন যিয়াদের সাথে কথা না বলার কসম খেয়েছিলেন এবং তিনি এটাই বলতেন যে, যিয়াদ তার মা সুমাইয়ার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। খোদ বনু উমাইয়া হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে কটাক্ষ করতে থাকে।

এই বিষয়ে সত্য কথা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের ওপর মানুষের সমালোচনার অধিকাংশ ঘটনা যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা হলো হিশাম বিন মুহাম্মদ কালবি এবং মুহাম্মদ বিন সায়েব কালবি। হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর যিয়াদের সাথে পর্দা করা অর্থাৎ তাকে ভাই হিসেবে না মানা, হযরত আবু বাকরা (রা.)-এর যিয়াদের সাথে সারাজীবন কথা না বলার কসম খাওয়া এবং একে তার মায়ের পরিচয়ের পরিপন্থী আখ্যা দেওয়া এবং বনু উমাইয়ার পুরুষদের হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই পদক্ষেপের ওপর কটাক্ষ ও নিন্দা করা এই সূত্রেই বর্ণিত। [১]

এটি সঠিক যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) শুরুতে যিয়াদকে “ইবনে আবি সুফিয়ান” বলা থেকে বিরত থাকতেন যার কারণ হতে পারে সতর্কতা। [২] কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাকে “যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান” বলতে শুরু করেন। যেমনটি তাঁর একটি পত্র থেকে স্পষ্ট যা “উম্মুল মুমিনীন আয়েশার পক্ষ থেকে যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের প্রতি” দিয়ে শুরু হয়। যিয়াদ এটি দেখে খুশি হয়েছিল যে দুনিয়ার সবচেয়ে সত্য চিঠি এটিই ছিল। [৩] হ্যাঁ, কিছু সহীহ বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত যে হযরত আবু বাকরা (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের সাথে এবং যিয়াদের এই বংশ পরিচয়ের সাথে একমত ছিলেন না। [৪]

[১] আল-বিদায়া: ৮/২৬

[২] তারিখ দামেশক: ১৯/১৭০, তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৭, তারিখ তাবারী: ৪/১৫৫

[৩] তারিখ দামেশক: ১৯/১৭০, সহীহ মুসলিম খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৬৩, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ানি হালি ঈমানি মান রগিবা আন আবিহি

[৪] হযরত আবু বাকরা (রা.)-এর অবস্থান ছিল ইলমী (তাত্ত্বিক), তিনি একে হাদীস “আল-ওয়ালাদু লিল ফিরশি ওয়া লিল আহিরিল হাজার”-এর পরিপন্থী মনে করতেন। (ফাতহুল বারী পৃষ্ঠা ১২/৩৬)

বর্ণনাটি ছিল তাদের নিজস্ব অভিমত এবং নিজস্ব ইজতিহাদ। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইজতিহাদ ছিল প্রশস্ততার ওপর ভিত্তি করে এবং হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইজতিহাদ ছিল সতর্কতার ওপর। অন্যান্য আপত্তিকারীদের মতো হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মূল সমস্যা ছিল এই যে, তাঁর কাছে সুমাইয়া এবং আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্পর্কের কোনো প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তাঁর এই অজ্ঞতার কারণে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর কোনো অভিযোগ আসতে পারে না, যিনি এই বংশপরিচয়ের প্রমাণের ওপর দশজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিবেচনাযোগ্য দিক

এটি তো ছিল দলিলের বিতর্ক, কিন্তু এখন একটু এই বিষয়টির ওপর নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে দৃষ্টি দিন এবং একটু ভাবুন! আজ যদি কোনো ইউরোপীয় নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন, যারা আগে আমেরিকান রীতিনীতি অনুযায়ী গার্লফ্রেন্ড ও বয়ফ্রেন্ড হিসেবে বসবাস করতেন এবং এই সম্পর্কের ফলে তাদের সন্তানও থাকে... ইসলাম গ্রহণের পর তারা খুব ভালো মুসলিম হিসেবে প্রমাণিত হন। তাদের ছেলে বড় হয়ে আলেম ও ফাজেল হয়ে উম্মতের খিদমতে নিয়োজিত হয়... তবে এই পরিবারটি কি প্রশংসার যোগ্য হবে নাকি তিরস্কারের? এখন যদি কেউ সেই ছেলেকে ‘হারামি’ এবং তার নওমুসলিম বাবা-মাকে ব্যভিচারী হিসেবে প্রচার করে, তবে এই কাজকে আমরা কী নাম দেব!!

এমন মনে হয় যে, এই বিষয়ে যিয়াদকে কলঙ্কিত করার জন্য ভালোভাবেই বর্ণনা তৈরি করা হয়েছিল। যেহেতু যিয়াদ বিদ্রোহী উপাদানগুলোকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন, তাই এই উপাদানগুলো তাকে কলঙ্কিত করার জন্য এমন সব বর্ণনা তৈরি করতে থাকে যাতে যিয়াদের বংশপরিচয় সন্দেহজনক থাকে, মানুষ তাকে অবৈধ সন্তান মনে করে, হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও কলঙ্কিত হন এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও এই বিষয়ে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনকারী বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

মনে রাখতে হবে যে, যিয়াদের বংশপরিচয় গ্রহণের (ইস্তিলহাক) সমস্ত বিতর্কে সহীহ এবং স্পষ্ট বর্ণনা কেবল একটিই আছে, অর্থাৎ সহীহ মুসলিমের বর্ণনা।

আবু উসমান থেকে বর্ণিত, যখন যিয়াদের বংশপরিচয় দাবি করা হলো, তখন আমি আবু বাকরার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে বললাম, আপনারা এটি কী করলেন? আমি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছি, আমার দুই কান আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছে: “من ادعى ابا في الاسلام غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام” (যে ব্যক্তি ইসলামে নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করে, অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, তবে তার জন্য জান্নাত হারাম)। তখন আবু বাকরা বললেন: আমিও এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি। [১]

এই বর্ণনা থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, যিয়াদের বংশপরিচয় গ্রহণ (ইস্তিলহাক) করা হয়েছিল এবং আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সেই যুগের কিছু বুজুর্গ হুজুর আকদাস রহীম-এর উল্লিখিত বাণীর আলোকে এই পদক্ষেপের সাথে একমত ছিলেন না। এছাড়া তাবারী, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তারিখ ইবনে আসীর, তারিখ দামেশক, তারিখ ইবনে খালদুন ইত্যাদিতে এই বিষয়ে যত বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে এই বিষয়ে যা আলোচনা করা হয়েছে, তার সবকিছুর ভিত্তি হলো যযীফ বর্ণনাসমূহ। [২]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২২৮, কিতাবুল ঈমান, বাব: যে ব্যক্তি তার পিতা থেকে বিমুখ হয় তার ঈমানের বর্ণনা; এবং ইমাম বুখারী এটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, হা: ৬৭৬৬।

[২] উদাহরণস্বরূপ, আপনি এই বিষয়ে আল্লামা ইবনে আসীরের ‘আল-কামিল’ (৪৪ হিজরীর ঘটনাবলী) দেখতে পারেন, সেখানে তিনি যিয়াদের বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশ অংশ আগের কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই উপাদানগুলো আল-মাদায়িনী প্রমুখের সেই সব পুস্তিকা থেকে নেওয়া হয়েছে যা এখন দীর্ঘকাল ধরে দুপ্রাপ্য। যেহেতু ইবনে আসীর এর কোনো সন্দেহ বর্ণনা করেননি, তাই এই উপাদানের সত্যতা যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন। ধারণা এটাই যে, এই সবটুকুই যযীফ উপাদান।

আমরা শুরুতে এটি লিখেছি এবং মাঝে মাঝে বারবার এই নীতিটি পুনরাবৃত্তি করেছি যে, দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে রাসূলের সাহাবীদের চরিত্রের সমালোচনা করা সঠিক নয়। সুতরাং, নীতিগত কথা এখানেও এটাই যে, দুর্বল এবং সনদবিহীন বর্ণনার এই স্তূপকে হয়তো পুরোপুরি বর্জন করা উচিত অথবা ইস্তিলহাক-এ-যিয়াদের (যিয়াদের বংশীয় অন্তর্ভুক্তি) বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয় পথটি হলো, এই ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ থেকে সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশগুলোকে গ্রহণ করা। তৃতীয় কোনো পথের এখানে কোনো অবকাশ থাকতে পারে না যে, এই কণ্টকাকীর্ণ বন থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) এবং যিয়াদ সম্পর্কে কাঁটাগুলো বেছে বেছে ঐতিহাসিক সত্যের নামে বইগুলোতে সাজিয়ে রাখা হবে।

যেসব ব্যক্তিবর্গ এমনটি করেছেন, তাদের কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য দলিল হতে পারে না। কারণ আল্লাহর তৌফিকে আমরা এই আলোচনায় বর্ণনার দুর্বলতা যাচাই করে সঠিক বিষয়টি প্রমাণ করেছি।

□□□

৮. হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি আর্থিক দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিলেন?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কোষাগারের (বাইতুল মাল) অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও প্রচার করা হয়েছে। বলা হয় যে, তিনি সরকারি কোষাগারকে ব্যক্তিগত জায়গির বানিয়ে রেখেছিলেন, উৎকৃষ্ট গনিমতের মাল নিজের জন্য জমা করে রাখতেন, তারপর সম্পদের সেই ভাণ্ডার দিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আনুগত্য ক্রয় করতেন, যেমনটি বর্তমান যুগের দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদরা করে থাকেন।

এই দাবির সপক্ষে এই প্রমাণগুলো পেশ করা হয়:

হাকাম বিন আমর (রা.) এবং আশাল-এর গনিমতের মালের ঘটনা:

৫০ হিজরিতে ইরাকের আমির যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের আদেশে হযরত হাকাম বিন আমর গিফারি (রা.) খোরাসানে জিহাদ করার সময় ‘আশাল’ নামক স্থানে পৌঁছালে সেখানে প্রচুর গনিমতের মাল হস্তগত হয়, বিশেষ করে সোনা ও রূপার ভাণ্ডার। কারণ সেই লোকদের পাত্র পর্যন্ত সোনা-রূপার ছিল। এই সময়ে তিনি যিয়াদের একটি পত্র পান যাতে লেখা ছিল: “আমিরুল মুমিনীন নির্দেশ দিয়েছেন যে, সোনা ও রূপা তাঁর জন্য আলাদা করে রাখা হোক, মুসলমানদের মধ্যে যেন তা বণ্টন না করা হয়।”

যেহেতু শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সরকারি কোষাগারে এবং বাকি অংশ মুজাহিদদের প্রাপ্য ছিল, তাই হযরত হাকাম বিন আমর (রা.) এই নির্দেশকে শরীয়তের এই নিয়মের পরিপন্থী মনে করেন এবং যিয়াদকে জবাবে লেখেন:

“আল্লাহর কিতাব তোমার চিঠির আগেই আমার কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহর কসম! আসমান ও জমিন যদি কোনো ব্যক্তির জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য পথ বের করে দেবেন।”

অতঃপর হযরত হাকাম বিন আমর (রা.) গনিমতের মাল মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

[১] মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৪২; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২১৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; তারিখুত তাবারী, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৪১।

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

সপ্তম

এই বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু গনিমতের মাল সরকারি কোষাগারের পরিবর্তে নিজের পকেটে ভরতেন এবং মুজাহিদদেরও তাদের প্রাপ্য অধিকার দিতেন না, যার কারণে হযরত হাকাম বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো সাহাবীগণও তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে এই দাবি প্রমাণিত হয় না; কারণ:

এটি কেবল একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ, এর দ্বারা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বা তাঁর কোনো গভর্নরের কাজকে অভ্যাস এবং নীতি হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় না। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নীতি গনিমতের মালের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার হুবহু অনুরূপ ছিল। چنانچہ গভর্নর ইবনে জিয়াদের নিয়োগের সময় তাঁকে যে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি এটিও ছিল: “ওয়াকাসিমহুম আলা কিতাবিল্লাহ।” (আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মাল বণ্টন করো।) [১]

এই বর্ণনার যতগুলো সূত্র রয়েছে সেগুলোর কোথাও এটি উল্লেখ নেই যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সোনা-রূপা নিজের সত্তার জন্য আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

‘মুস্তাদরাক হাকেম’-এর শব্দগুলো হলো: “ফান্না আমিরুল মুমিনীন কাতাবা আন ইয়াসতাক্ফিয়া লাহল বাইদা ওয়া সাফরা ওয়ালা তুকসাম বাইনাল মুসলিমিনা যাহাবান ওয়ালা ফিজ্জাতান।”

‘আল-মা’রিফাত ওয়াত তারিখ’-এ আছে: “আন্না আমিরুল মুমিনীন কাতাবা আন ইস্তাসফা কুল্লা সাফরা ওয়া বাইদা।” [২]

প্রায় একই ইবারত তাবারিতেও রয়েছে।

তিনটিরই মর্মার্থ প্রায় একই যে, “আমিরুল মুমিনীন নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর জন্য সোনা-রূপা সংগ্রহ করে রাখা হয়।”

এর পরিষ্কার অর্থ এটাই যে, যেভাবে গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ কেন্দ্রীয় বায়তুল মালে যায়, সেই খাতে এবার গনিমতের মালের সোনা-রূপা রাজধানী পাঠিয়ে দেওয়া হোক, যাতে তা বায়তুল মালে জমা করা যায়।

এই অস্বাভাবিক নির্দেশের কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাগুলো নীরব, কিন্তু সম্ভাব্য কারণ অনেক হতে পারে যেমন:

সেই সময় বায়তুল মালে সোনা-রূপার তীব্র প্রয়োজন ছিল। হতে পারে টাকশালে মুদ্রা তৈরির জন্য এই ধাতুগুলোর ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। হতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ঋণ পরিশোধ করতে হতো। অথবা কোনো বড় জিহাদী অভিযান শুরু করার ইচ্ছা ছিল.....

এই ঘটনাটি ৫০ হিজরির, এই বছরের দুটি বড় অভিযান প্রসিদ্ধ:

এই বছর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য ইয়াজিদের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়েছিলেন এবং

[১] তারিখুত তাবারী: ২৯৬/৫

[২] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৫৮৬৯; আল-মা’রিফাত ওয়াত তারিখ: ২৫/৩, আর-রিসালাহ; তারিখুত তাবারী: ২৫০/৫ থেকে ২৫২

নোট: তাবারিতে আছে: “আন্না আমিরুল মুমিনীন কাতাবা ইলা আন আসতাক্ফিয়া লাহ কুল্লা সাফরা ওয়া বাইদা ওয়ালা তাহরাকান শাইআন হান্না তাখরুজা যালিকা।” এতে “ওয়ালা তাহরাকান” (অর্থাৎ কোনো কিছু নাড়াচাড়া করবে না) এর সংযোজন কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গি। বাইদা হাকেম এবং আল-ফাসাউয়ির বর্ণনাগুলোতে নেই। যাদের সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাবারির সনদে একজন বর্ণনাকারী হাতেম বিন কুবাইসা, সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের যুগে থানার হাকেম ছিলেন। আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৯৮ হিজরি কিন্তু তাঁর ব্যাপারে জরাহ বা তা’দীল থেকে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। (আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, ইবনে আবি হাতেম: ২৬০/৩; আল-মু’জামুস সাগীর লি-রুওয়াত ইবনে জারীর: ৯৭/১)। এর ফলে সনদে দুর্বলতা চলে আসে এবং অতিরিক্ত শব্দগুলো যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেননি, তা সন্দেহজনক হয়ে যায়।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

جلد ہفتم (সপ্তম খণ্ড)

এই বছর আফ্রিকায় ইসলামী বাহিনীর জন্য সেনানিবাস হিসেবে নতুন শহর কায়রোয়ান নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। [১] এই ধরনের প্রয়োজনের জন্য তাৎক্ষণিক অর্থের ব্যবস্থা সোনা-রূপার মাধ্যমেই হতে পারত। সম্ভবত এই কারণেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) গনিমতের মাল থেকে সোনা-রূপা আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতো একজন মহান সাহাবী সম্পর্কে কেবল কোনো সংকীর্ণমনা ব্যক্তিই এমনটি ভাবতে পারে যে, তিনি মুসলমানদের আমানত এবং বায়তুল মালের অর্থ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চেয়ে পাঠাচ্ছিলেন।

আর এই কথা যে, গনিমতের মাল বণ্টনের আগেই সোনা-রূপা আলাদা করে বায়তুল মালে জমা করা তো শরয়ী নিয়মের লঙ্ঘন এবং মুজাহিদদের হক নষ্ট করা হচ্ছিল; কারণ শরীয়ত চার ভাগ মুজাহিদদের জন্য এবং পঞ্চম ভাগ বায়তুল মালের জন্য নির্ধারণ করে... তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) গনিমতের মালের মোট পরিমাণ সম্পর্কে জানতেন এবং সোনা-রূপার পরিমাণ সম্পর্কেও। কারণ এই বর্ণনাগুলো থেকেই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) গনিমতের মালে সোনা-রূপার অস্বাভাবিক পরিমাণের কথা জানতেন, তবেই তিনি সোনা-রূপা দামেস্কে তলব করেছিলেন। নিজের বিশ বছরের খেলাফতকালে তিনি এর আগে বা পরে কখনো এমনটি করেননি। তিনি যদি সোনা-রূপা জমা করার শৌখিন হতেন, তবে তিনি প্রত্যেক সেনাপতিকেই এই নির্দেশ দিতেন, কারণ প্রতিটি জিহাদেই কিছু না কিছু সোনা-রূপা হস্তগত হতো, যেহেতু সেই যুগটিই ছিল সোনা-রূপার মুদ্রার। বিশ বছরের মধ্যে তাঁর শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্রে সোনা-রূপা তলব করা নিজেই প্রকাশ করে যে, তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে এই জিহাদে সাধারণ অভ্যাসের চেয়ে বেশি সোনা-রূপা পাওয়া গেছে এবং বাস্তবতাও এটাই ছিল যে, ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা এমনকি সোনা-রূপার পাত্রও ব্যবহার করত, যা মুসলমানদের গনিমতের মাল হিসেবে অর্জিত হয়েছিল।

যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলছে যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই অভিযানে সোনা-রূপার অস্বাভাবিক পরিমাণের কথা জেনে গিয়েছিলেন, তখন সাথে সাথে এই সম্ভাবনাও জোরালো হয় যে, যে ব্যক্তি তাঁকে গনিমতের মালের প্রাচুর্যের কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন, তিনিই গনিমতের মালের মোট পরিমাণ এবং সোনা-রূপার অনুপাতের কথাও লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই বিস্তারিত তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি সেনাপতি উকবা বিন নাফে (রা.)-এর কোনো কেরানি, লেখক, কোষাধ্যক্ষ বা অন্য কোনো আমীর হতে পারেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতো বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের পক্ষে এটা মোটেও অসম্ভব ছিল না যে, তিনি তাঁর সেনাপতিদের ওপর নজর রাখার জন্য তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের কাছ থেকে গোপনে তথ্য নিতেন। এমন লোকদের মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গনিমতের মালের সঠিক পরিমাণ এবং তাতে সোনা-রূপার অনুপাত সম্পর্কে জানা হয়ে যাওয়া মোটেও অসম্ভব নয়।

এখন যেহেতু এই জিহাদে এই অনুপাত এক-পঞ্চমাংশ (১/৫) হচ্ছিল, তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই পঞ্চম অংশকে, যা শুধুমাত্র সোনা-রূপা ছিল, নিজের কাছে আনিয়ে নিয়েছিলেন যাতে তা সরকারি কোষাগারে অন্তর্ভুক্ত করে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা যায়। এতে শরীয়তের কোনো লঙ্ঘন ছিল না এবং কারো হকও নষ্ট করা হয়নি।

[১] তারিখ খলিফা বিন খয়্যাতি ২১০, ২১১

দ্বিতীয় খণ্ড | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

প্রশ্ন থেকে যায় যে, হাকাম বিন আমর (রা.) কেন এই নির্দেশকে আল্লাহর কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেছিলেন এবং কেন তা পালন করেননি? আসলে তাঁর মতে গনীমতের মালকে তার মূল অবস্থায় এক-পঞ্চমাংশ (১/৫) হারে বণ্টন করা জরুরি ছিল, যেমনটি সাধারণ নিয়ম ছিল। অর্থাৎ সোনা-রূপা, শস্য, গবাদি পশু, পোশাক এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ সব ধরনের জিনিসের চার ভাগ প্রথমে মুজাহিদগণ পেতেন এবং তারপর সব ধরনের জিনিসের পঞ্চম অংশ সরকারি কোষাগারে যেত। স্বদেশ থেকে দূরে অবস্থানরত মুজাহিদদের এমনিতেও নগদ অর্থের প্রয়োজন হতো এবং এই প্রয়োজন সোনা-রূপার মাধ্যমে পূরণ হতে পারত, কারণ সেই যুগের মুদ্রা ছিল এই ধাতুগুলোই। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশ মানলে এই নিয়মের ওপর আমল হচ্ছিল না, অথচ হযরত হাকাম বিন আমর (রা.) পুরনো নিয়মটি হুবহু পালন করা আবশ্যিক মনে করতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশ মানলে মুজাহিদদের মন ভেঙে যাওয়ারও আশঙ্কা ছিল, যা একজন সহানুভূতিশীল ও দয়ালু নেতা কখনোই পছন্দ করেন না। তাই হযরত হাকাম বিন আমর (রা.) নির্দেশ পালনে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন।

সংক্ষেপে, এটি ছিল দুই সাহাবীর মতপার্থক্য। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর নিজ অবস্থানে সঠিক ছিলেন যে, তাঁর সামনে কেন্দ্রে নতুন জিহাদী অভিযান এবং শহর নির্মাণের মতো প্রয়োজনীয়তা ছিল। আর হযরত হাকাম বিন আমর (রা.) তাঁর নিজ অবস্থানে সঠিক ছিলেন যে, তাঁর সামনে ছিল মুজাহিদদের প্রয়োজনীয়তা। হযরত হাকাম বিন আমর (রা.) প্রশংসার যোগ্য ছিলেন যে, যে বিষয়টি তিনি তাঁর মতে কিতাবুল্লাহর পরিপন্থী মনে করেছেন তা অস্বীকার করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর নিজ অবস্থানে ঠিক ছিলেন যে, তিনি গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশই চাচ্ছিলেন, যদিও তা সংগ্রহের পদ্ধতি সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী ছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উদারতা:

পরিশেষে এই ঘটনার শেষ অংশটুকুও পড়ে নেওয়া যাক যাতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে হৃদয়ে জমে থাকা ধূলিকণা দূর হয়ে যায়। ইবনে আসাকিরের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যখন হযরত হাকাম বিন আমর (রা.)-এর এই আচরণের খবর পৌঁছাল, তখন লোকজন এমন সেনাপতিকে অবাধ্যতার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়ার পরামর্শ দিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাদের ধমক দিয়ে হযরত হাকাম বিন আমর (রা.)-এর কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করলেন এবং বললেন:

بَلْ أَحْسَنَ وَأَجَلَّ وَأَصَابَ (হ্যাঁ, তিনি ভালো করেছেন, উত্তম করেছেন এবং একদম সঠিক করেছেন।) [১]

শুধু সরকারি দপ্তরেই নয়, বরং দ্বীনি আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আজ এমন কতজন প্রভাবশালী ব্যক্তি পাওয়া যাবে যারা নিজের নির্দেশের বিপরীতে অধস্তনের পক্ষ থেকে অবাধ্যতার খবর শুনেও রাগান্বিত হবেন না এবং তার কাজকে শুধুমাত্র এই কারণে প্রশংসা করবেন যে সে সদিচ্ছার অধিকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার খাতিরে এই নির্দেশ অস্বীকার করছে। এই ঘটনা থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যে উদারতা প্রমাণিত হচ্ছে তা আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

□□□

[১] তারিখ দামেশক: ৫৯/১৭০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

হাকাম বিন আমর (রা.)-এর মৃত্যুর জন্য কি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দায়ী ছিলেন?

প্রশ্ন: এটি প্রমাণিত যে, হাকাম বিন আমর (রা.) এই ঘটনার পর মনঃক্ষুব্ধ হয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য দোয়া করেছিলেন যা কবুল হয়েছিল। [১] তিনি এই অভিযান থেকে ফেরার পথে ‘হামরুজ’ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। [২] স্পষ্টত তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশের কারণে মানসিক চাপের শিকার হয়েছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুর জন্য হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দায়ী।

উত্তর: বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশকে তিনি নির্ভীকভাবে উপেক্ষা করে গনিমতের মাল সাধারণ নিয়মে সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এতে খুশিও হয়েছিলেন। তাহলে মনঃক্ষুব্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মানসিক চাপ ও হতাশার কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশ ছিল না, বরং যিয়াদের সেই পত্র ছিল যা তাঁর নির্দেশ অমান্য করার খবর পেয়ে রাগান্বিত অবস্থায় লিখেছিলেন, যার শব্দগুলো ছিল:

“আল্লাহর কসম! আমি যদি জীবিত থাকি তবে তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব।” [৩]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন:

“সঠিক কথা হলো, যখন যিয়াদের তিরস্কারমূলক পত্র তাঁর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি নিজের জন্য বদদোয়া করেন, ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।” [৪]

অতএব, এই পুরো ঘটনায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর কোনো দায় বর্তায় না।

□□□

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি সরকারি মাল ব্যক্তিগত কাজে খরচ করতেন?

প্রশ্ন: সহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ বর্ণনায় আব্দুর রহমান বিন আব্দ রাবিবল কাবা নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.)-এর কাছে গেলেন যিনি মসজিদুল হারামে শাসকদের আনুগত্য সম্পর্কিত হাদিস শোনাচ্ছিলেন।

আব্দুর রহমান তাঁকে বললেন: “هذا ابن عمك معاوية، يامرنا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل ونقتل انفسنا، والله عز وجل يقول: ‘ياايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم، ان الله كان بكم رحيمًا’”

“এই যে আপনার চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া, তিনি আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করি এবং নিজেদের হত্যা করি, অথচ আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা বলেন: ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।’”

[১] “হে আল্লাহ! যদি তোমার কাছে আমার জন্য কোনো কল্যাণ থাকে, তবে আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।” (আল-ইসতিয়াব: ১/৩৫৭)

[২] আল-মা’রিফাত ওয়াত তারিখ: ৩/২৫, সহীহ সনদে, ত ত রিসালাহ।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫/৫০, আল-ইসাবাহ: ২/৯৩।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

فسكت ساعة ثم قال اطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله.

(এটি শুনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেলেন।

তারপর বললেন: আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করো, আল্লাহর অবাধ্যতার

ক্ষেত্রে তাদের কথা মেনো না।) [১]

সহীহ ইবনে হিব্বানে এই শব্দগুলোও রয়েছে: ولنهریق دمائنا..... (তারা নির্দেশ দেয় যেন

আমরা আমাদের রক্ত বরাই।) [২]

এই একই ঘটনা সুনানে আবু দাউদে সংক্ষেপে রয়েছে, তাতে বর্ণনাকারীর প্রশ্নে আছে:

هذا ابن عمك معاوية يامر ان نفعل كذا وكذا. (তিনি আমাদের এমন এমন করার নির্দেশ

দেন।) [৩]

এই বর্ণনাগুলো থেকে কি এটি প্রমাণিত হয় না যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

অন্যদের সম্পদ লুণ্ঠন করা, অন্যায়ভাবে খরচ করা এবং মুসলমানদের হত্যা করার নির্দেশ

দিতেন?

উত্তর: এই সন্দেহের মূলনীতিগত উত্তর হলো, ইস্তিফতা (ফতোয়া জিজ্ঞাসা)-তে কারো

সম্পর্কে কোনো ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই এটি প্রমাণিত হয় না যে, বাস্তবেও তেমনটি

ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুফতির কাছে ইস্তিফতা আসলো: “জনাব মুহতামিম

সাহেব আমাদের মাদরাসার সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

আমাদের জন্য কি তার কথা মানা জায়েজ হবে? আরজকারী, অমুক ইবনে অমুক।”

তখন মুফতি এটি দেখবেন না যে মুহতামিম সাহেব এই কাজ করেন কি না। মাসআলার

সুরতহাল (প্রেক্ষাপট) তদন্ত করা মুফতির কাজ নয়। তিনি তো মাসআলার সুরতহাল দেখে

জায়েজ ও নাজায়েজের বিধান বলে দেবেন। এটি তার কাজ নয় যে তিনি ঘটনার সত্যতা

বা অসত্যতা নিয়ে বিতর্ক করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে

আলেমদেরকে আদাবে ইফতা (ফতোয়া প্রদানের আদব) শিক্ষা দিয়েছেন। মুফতিদের কাজ

এটি নয় যে, নিজেদের জানাশোনার কারণে ইস্তিফতা-তে পেশকৃত মাসআলার সুরতহাল

অস্বীকার করবেন বা তার তদন্ত শুরু করে দেবেন। উদাহরণস্বরূপ, আজ যদি কোনো

মুফতির বন্ধু তাকে বলে: আমার চাচা চাচিকে তিন তালাক দিয়েছেন, এর বিধান কী? মুফতি

এটাই বলবেন যে তালাক মুগাল্লাজাহ হয়ে গেছে। তিনি এটি বলবেন না যে আপনার ভুল

ধারণা হয়েছে; আপনার চাচা এমনটি কীভাবে করতে পারেন?

যদি সেই সময়ের পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়, তবে আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-

এর বিশ বছরের শান্তিপূর্ণ, ন্যায়বিচারপূর্ণ এবং বিজয়ে ভরপুর শাসনামল সম্পর্কে এমন

ধারণা করা একটি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে যে, সেখানে লুটতরাজ চলছিল এবং তাও

আবার খলিফার নির্দেশে।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি মাসুম (নিষ্পাপ) না হয়ে থাকেন, তবে আবদুর

রহমান ইবনে আবদে রাব্বিল কাবাও কোনো ফেরেশতা ছিলেন না যে তার ভুল বোঝাবুঝি

হতে পারে না। এটি মনে রাখবেন যে, এই আবদুর রহমানের জীবনীতে শুধু এতটুকুই

পাওয়া যায় যে তিনি একজন তাবেরী ছিলেন। তিনি এই একটি বর্ণনার কারণেই প্রসিদ্ধ।

তার আরেকটি বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রয়েছে। এছাড়া

তার আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমরা বলতে পারি না যে তিনি কার কথায় বিশ্বাস

করে এই প্রশ্নটি করেছিলেন।

যদি কেউ ধারণা করে যে আবদুর রহমান হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমির বা

অফিসার ছিলেন এবং তিনি ভেতরের খবর জানতেন, তবে...

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৮৮২, আল-ইমারাহ, বাবু আল-ওয়াফা বি-বাইআতিল খুলাফা; মুসনাদে আহমাদ, খ: ৬৫০৩; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হা: ৩৭১০৯

[২] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৫৯৬১

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪২৪৮, বাবু জিকরিল ফিতান

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

এই ধারণাটি ভিত্তিহীন হবে কারণ তিনি যদি এমন কোনো পদে থাকতেন তবে তিনি একজন সুপরিচিত তাবিঈ হতেন। তাঁর অপরিচিত হওয়া নিজেই প্রমাণ করছে যে তিনি সেই যুগের একজন সাধারণ নাগরিক ছিলেন। এমন ব্যক্তির শোনা কথাকে সত্য মনে করে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয় হবে যে আমরা তাঁর প্রশ্নকে একটি প্রমাণিত সত্যের নাম দিয়ে দিই।

□□□

পাঠকগণ! এটিই ছিল এই বর্ণনার সহজ অর্থ। এর ওপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয় না। তবে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্য একটি উত্তর দিয়েছেন। বিদ্বানগণ শরহে মুসলিমের আরবি ইবারত অধ্যয়ন করতে পারেন। [১] লেখক এর মর্মার্থ নিজের ভাষায় পেশ করছেন।

এই ঘটনাটি সেই সময়ের যখন হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু এবং হযরত মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু-এর মধ্যে যুদ্ধের পরিবেশ ছিল অর্থাৎ ফিতনার সময় ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ বুঝতে পারছিল না যে কার আনুগত্য করবে আর কার বিরোধিতা। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিআল্লাহু আনহুমা সেই ফিতনার যুগে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত কর্মপন্থা বর্ণনা করছিলেন যা ছিল এই যে, এমন পরিস্থিতিতে মানুষ সবচেয়ে বেশি নিজের ঈমানের চিন্তা করবে। এরপর যে দলটিকে তার কাছে সত্য মনে হবে তাতে शामिल হয়ে যাবে এবং এরপর যে আমিরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তার আনুগত্য করবে। যখন বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান তাঁর কাছে পৌঁছালেন তখন আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিআল্লাহু আনহুমা এই হাদিসটি শোনাচ্ছিলেন:

“এই উম্মতের শুরুর যুগে নিরাপত্তা রয়েছে এবং শীঘ্রই এর শেষ যুগে পরীক্ষা আসবে এবং অদ্ভুত ও বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এমন একটি ফিতনা আসবে যে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বন্দী করবে, এমন একটি ফিতনা আসবে যে মুমিন বলবে এখন আমার ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু সেই ফিতনা কেটে যাবে। এরপর এমন ফিতনা আসবে যে মুমিন বলবে: এটাই ধ্বংস, এটাই শেষ। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতে যেতে চায়, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে সে আল্লাহ এবং পরকালের ওপর ঈমান রাখে। আর তাকে এমন লোকদের কাছে চলে যাওয়া উচিত যাদের কাছে যাওয়া সে পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল এবং তাকে নিজের হাতের প্রতিশ্রুতি ও অন্তরের সম্ভ্রুতি প্রদান করল, তবে যতক্ষণ সম্ভব সে যেন তার আনুগত্য করে। যদি সেই আমিরের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী চলে আসে যে তার সাথে মোকাবিলা করে, তবে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দাও।”

এই হাদিস শুনে বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান অনুভব করলেন যে হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর সাথে মোকাবিলা করার কারণে হযরত মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু বাতিলের ওপর রয়েছেন, সুতরাং তাঁর জনগণের কাছ থেকে কর নেওয়া এবং সেনাবাহিনীর ওপর খরচ করা সবই অবৈধ সম্পদ ভক্ষণের অন্তর্ভুক্ত এবং একইভাবে তাঁদের সীমান্তে পাহারা দেওয়া এবং লড়াই করা নিজেকে ধ্বংস করার নির্দেশের शामिल। ফলে তিনি এই শব্দগুলোতেই বললেন যে আপনার ভাই মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু তো আমাদের এই নাজায়েজ বিষয়গুলোর নির্দেশ দেন, তবে এই ব্যাপারে আমরা কী করব?

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিআল্লাহু আনহুমা এর যে নীতিগত ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন তা-ই ছিল যথাযথ অর্থাৎ শাসক যেই হোক না কেন, শরীয়ত বিরোধী কাজে তার আনুগত্য নিঃশর্ত নয় বরং কেবল জায়েজ বিষয়গুলোতেই তার কথা মানা হবে, নাজায়েজ বিষয়ে নয়। উদ্দেশ্য

[১] শরহে মুসলিম, নববী: ১২ / ২২২ ত. দার ইহয়াউত তুরাস

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

প্রশ্নকারী যেমনটি ধারণা করেছিল, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তাকে সে অনুযায়ীই উত্তর দিলেন।

□□□

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এত দান-উপহার কোথা থেকে দিতেন?

প্রশ্ন: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আর্থিক দুর্নীতির প্রমাণ হলো এই যে, তিনি ধন-সম্পদ বিলিয়ে বড় বড় সর্দার ও ব্যক্তিত্বদের নিজের সাথে ভিড়িয়ে নিতেন। যেহেতু তিনি পারিবারিকভাবে দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব আয় এত ছিল না যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তাই এটা স্পষ্ট যে তিনি বায়তুল মালকেই ব্যক্তিগত জায়গির বানিয়ে এই অর্থ ব্যয় করতেন।

উত্তর: এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থ গ্রহণের সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোনো সহিহ রেওয়াজ পেশ করা হলে তা বিবেচনা করা যেত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন একটি রেওয়াজও নেই যাতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ব্যয়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগার থেকে নেওয়া হয়েছিল। এটি কেবল একটি অনুমান যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে বায়তুল মাল ছাড়া আয়ের অন্য কোনো উৎস ছিল না। যুক্তির নিরিখে এর পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সরকারি বেতন ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি এবং অন্যান্য হালাল উপায়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আয় করতেন। পরিশেষে, যে ব্যক্তি চীনের সীমান্ত থেকে মরক্কো পর্যন্ত সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন, তিনি কিছু অধীনস্থ লোক রেখে কেন কোনো ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না? যদি এমন ব্যবসা পাঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে চলতে থাকে এবং আল্লাহ তাতে বরকত দিতে থাকেন (যেমনটি আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের সাথে করে থাকেন), তবে ব্যক্তিগত মালিকানায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আসা অসম্ভব কী? সুতরাং এটি নিছক কুধারণা যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সরকারি কোষাগার থেকে এত দানশীলতা দেখাতেন।

এছাড়া এটিও একটি অনুমান যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে কর্মকর্তা, মুরাব্বি এবং আমিরদের বড় বড় উপহার প্রদান কোনো ব্যক্তিগত ও নিজস্ব উদ্দেশ্যে ছিল। যে উদাহরণগুলো দেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোতে জাতীয় উদ্দেশ্যেই অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। এভাবে অর্থ ব্যয় করা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ ছিল যা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও একইভাবে প্রচলিত ছিল। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো সম্পদকে যতটা সম্ভব বেশি বণ্টন করা যাতে তা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র পৌঁছায়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যদি সর্দার, আমির এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা দিতেন, তবে এই অর্থ কেবল সেই ব্যক্তিদের পকেটে যেত না বরং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শত শত মানুষের কাছে পৌঁছাত।

এর দুটি রূপ ছিল: কখনো এই অর্থ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা এবং পরিবারের মুরাব্বিদের আমানত হিসেবে দেওয়া হতো। এর প্রকৃত হকদার ছিল সেই হাজার হাজার মানুষ যাদেরকে “মুকাতিলিন” বলা হতো। এরা ছিল পেশাদার সেনাবাহিনী অথবা প্রয়োজনবোধে তলব করা স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য। তাদের উৎসাহ প্রদান করতেন তাদের গোত্রীয় প্রধানরা এবং এই খাতে কেন্দ্র থেকে তাদের অর্থ দেওয়া হতো। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগ থেকে এই ব্যবস্থা এভাবেই চলে আসছিল। হযরত আলী (রা.)-ও একইভাবে অর্থ বণ্টন করতেন, সুতরাং জঙ্গে জামালের পর বসরায় এসে তিনি বায়তুল মালের সাথে

এক লক্ষ দিরহামের বেশি অর্থ নিজের সাথীদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। [১]

অর্থ প্রদানের দ্বিতীয় রূপটি ছিল উপটোকন ও হাদিয়ার আকারে, যা ব্যক্তিদের মর্যাদা ও পদের ভিত্তিতে কম-বেশি করা হতো। যে ব্যক্তিকে এই অর্থ দেওয়া হতো, সে এর মালিক হয়ে যেত। তবে সেই যুগে যেহেতু কল্যাণ, দান-সদকা ও বদান্যতার প্রচলন ছিল, তাই এই অর্থ একইভাবে যথাসময়ে ব্যয় হয়ে নিম্ন স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যেত।

নিঃসন্দেহে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এভাবে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করতেন। কিন্তু এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কারা ছিলেন? বনু হাশিমের সেই মহান ব্যক্তিবর্গ, যাদের মধ্যে হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদি এই অর্থ দেওয়া জায়েজ না হতো এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে ভুল হতো, তবে গ্রহণকারীরাও অভিযোগের মুখে পড়তেন। জানা গেল যে, এভাবে হাদিয়া হিসেবে অর্থ দেওয়াও জায়েজ ছিল এবং গ্রহণ করাও; চাই তা সরকারি কোষাগার থেকেই হোক না কেন। কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তা নিজের বিলাসিতায় নয়, বরং মুসলিম জাতীয় নেতাদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য ব্যয় করতেন। এটি একটি নির্ধারিত বিষয় ছিল, কোনো দুর্নীতি নয়। এর যথাযথ হিসাব-নিকাশ রাখা হতো। যদি এই হাদিয়া প্রদান শরিয়ত পরিপন্থী হতো, তবে শত শত মহান বুজুর্গ, যাদের বর্ণনার ওপর দীন নির্ভরশীল, তারা তা গ্রহণ করতেন না।

আজ যদি কোনো শাসক কোনো জাতীয় ব্যক্তিত্ব বা মহান হিতৈষীকে সরকারি কোষাগার থেকে একটি বড় অংকের অর্থ প্রদান করে তাকে জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেন যাতে তিনি জাতীয় সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারেন, তবে এই নীতিকে প্রশংসা করা হয়। একইভাবে বিরোধীদের শান্ত করতে এবং দেশের অশুভ শক্তির আনুগত্য কেনার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থ ব্যয় করা হয়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে প্রতি বছর সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকার ফান্ড দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম চালানো হয়; জাতীয় শত্রুদের অর্থ দিয়ে বশ করা হয়। একে কেউ দুর্নীতি বলতে পারে না কারণ এই সব ব্যয়ের একটি নীতি, নিয়ম, অন্তর্ভুক্তি এবং অডিট থাকে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যদি কিছু বিরোধীকে এভাবে অর্থ প্রদান করে শান্ত করে থাকেন যাতে দেশের শান্তি ও উন্মাহর ঐক্য বজায় থাকে, তবে সরকারি অর্থের এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আর কী হতে পারে? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পরামর্শ দেবেন যে, সম্পদ কোষাগারে জমা থাকুক আর দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাক?

যারা মনে করেন যে হযরত উসমান, হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বাইতুল মাল থেকে যা ব্যয় করতেন তার কোনো হিসাব-নিকাশ ছিল না, বরং তা ছিল 'বিনা পয়সার মাল, নির্দয় মন'-এর মতো অবস্থা, তারা সরকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এটি একটি আশ্চর্যজনক বিষয়ই হবে যে, চীন থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সরকার কোনো হিসাব-নিকাশ, অর্থের অন্তর্ভুক্তি এবং দাপ্তরিক রেকর্ড ছাড়াই চলছে। প্রতিটি কোণে প্রতি মুহূর্তে জিজিয়া, খরাজ, গনিমত, খুমুস, জাকাত ও উশরের মতো লেনদেন চলছে। শত শত কর্মকর্তা, হাজার হাজার অধস্তন, লক্ষ লক্ষ কর্মচারী এবং সৈন্যদের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে, গভর্নর, কমান্ডার এবং আমিলদের কাছে প্রতিদিন নির্দেশনা পাঠানো হচ্ছে এবং তাদের জবাব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু কোনো...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫৩১/৩

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

কোনো জিনিসের কোনো ব্যবস্থা নেই। যেন মানুষ এই যুগের সবচেয়ে বড় সরকারকে ফুটপাতে বসানো একটি চায়ের দোকান মনে করে নিয়েছে, যেখানে একটি ছোট বাক্সে আয় জমা হয়। একটি-দুটি খাতায় প্রয়োজনীয় লেনদেন লিখে রাখা হয়... বন্ধু-বান্ধবরা বিনামূল্যে চা পান করে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। কোনো ফকির আল্লাহর নামে চাইলে তাকেও দুই-চার টাকা ধরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তো একটি এনজিও-র অফিসও চলে না, সেখানে একটি সরকার কীভাবে পূর্ণ শান-শওকতের সাথে এভাবে চলতে পারে।

(৯) হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কেন উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণ করেননি?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর এই অভিযোগও আনা হয় যে, তিনি উসমানের কিসাসের স্নোগান দিয়ে উম্মতকে প্ররোচিত করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি নিজে শাসক হলেন তখন উসমানের কিসাসের কথা ভুলে গেলেন এবং উসমানের হত্যাকারীদের হত্যা বা গ্রেপ্তার করেননি।

বাস্তবতা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উসমানের কিসাসের দাবিতে পুরোপুরি আন্তরিক ছিলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর যুগে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কিসাস গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। এই মতভেদ ফিকহিও ছিল এবং প্রশাসনিকও। ফিকহি মতভেদটি ছিল এই যে, হযরত আলী (রা.)-এর রায় অনুযায়ী কিসাস হিসেবে কেবল সেই ব্যক্তিদেরই হত্যা করা উচিত ছিল যারা ঘরে ঢুকে আক্রমণ করেছিল। বাকি যারা বিদ্রোহ ত্যাগ করে নতুন সরকারের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিল, তারা ক্ষমার যোগ্য ছিল। হযরত মুয়াবিয়া, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-এর রায় বা ইজতিহাদ অনুযায়ী, হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত এবং তাঁর ঘর অবরোধকারী সকল ব্যক্তিই কিসাস হিসেবে হত্যার যোগ্য ছিল।

প্রশাসনিক মতভেদটি ছিল এই যে, হযরত আলী (রা.) কিসাসের আগে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যাতে নিশ্চিত প্রকৃত হত্যাকারীদের বিচারিক প্রক্রিয়ার আওতায় আনা যায়। হযরত মুয়াবিয়া, হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের (রা.)-এর রায় অনুযায়ী কিসাস গ্রহণের কাজটি অবিলম্বে করা উচিত ছিল।

এই মতভেদ উভয় পক্ষ থেকে সততা, সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার ওপর ভিত্তি করে ছিল। উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেরামের কর্মপন্থা এটাই যে, তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের মতভেদকে নেক নিয়তের ওপর ভিত্তি করে মনে করেন, যেখানে বিভ্রান্ত দলগুলো একে দুনিয়াদারি, পদমর্যাদার লোভ এবং সম্পদের মোহের রঙ দেয়।

সাহাবীদের এই মতভেদ ছিল ইজতিহাদি এবং মুজতাহিদের রায় পরিবর্তনও হতে পারে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইজতিহাদি রায় একটি সময় পর্যন্ত এটাই ছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-এর ঘর অবরোধকারী সকল ব্যক্তিই কিসাসের যোগ্য। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর আমল প্রমাণ করে যে, তাঁর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি হযরত আলী (রা.)-এর রায়ের প্রবক্তা হয়ে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের...

তাদের নিকটও কেবল তারাই কিসাসের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিলেন যারা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল।

সাধারণ বিদ্রোহী যারা কেবল হাঙ্গামায় শরিক ছিল এবং প্রথমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং এখন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট বায়আত হয়ে শান্তিপূর্ণ নাগরিকে পরিণত হয়েছিল, তাদের ওপর শান্তির বিধান কার্যকর হতো না। এটাই কারণ ছিল যে কুফার দুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি: কুমাইল বিন যিয়াদ এবং উমাইর আল-দাবি যারা উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অগ্রণী ছিল, তারা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিশ বছরের খিলাফতকালে নিরাপদ ছিল। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭৫ হিজরিতে উমাইরকে এবং ৮৩ হিজরিতে কুমাইলকে হত্যা করে। [১]

সেই অপরাধী যারা খুনি হামলার দায়ে দোষী ছিল তারা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তি যেমন: কিনানা বিন বিশর, সুদান বিন হামরান, জাবালা, আল-মাউত আল-আসওয়াদ ইত্যাদি (উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের আলোচনায় আমরা এই ব্যক্তিদের নাম নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেছি)। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘটনাস্থলেই হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উৎসর্গিত প্রাণ সাথীদের হাতে নিহত হয়েছিল যেমন সুদান বিন হামরান। কাউকে কাউকে ভুলবশত খুনি হিসেবে প্রসিদ্ধ করা হয়েছিল অথচ তারা এই ঘটনায় শরিক ছিল না যেমন আমার বিন আল-হামিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

যাই হোক, ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খুনিদের সন্ধানে কোনো ত্রুটি রাখেননি। এই প্রচেষ্টার ফলে কিছু লোক গ্রেপ্তার এবং নিহতও হয়। [২] খুনিদের এই দলটি সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তে কোনো এক গুহায় আত্মগোপন করেছিল। কোনো এক গ্রামবাসী তাদের দেখে সরকারকে খবর দেয়। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের গ্রেপ্তার করেন এবং এরপর তাদের শিরশ্ছেদ করেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবু উমর। [৩] একজন ছিল কিনানা বিন বিশর। ফিলিস্তিনের গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আদেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। [৪] অপরাধীদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিল আবু শাম্মার যে কাবার ওপর আক্রমণকারী ইয়েমেনি শাসক আবরাহার বংশধর ছিল। সেও গ্রেপ্তার হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একইভাবে আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ নামক এক অপরাধীকেও হত্যা করা হয়। [৫] হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হিমসের নিকটবর্তী জলীল নামক জনপদে একটি কারাগার এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন যেখানে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের বন্দি রাখা হতো এবং তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো যে তারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল কি না। [৬] এইসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কিছু অপরাধী বেঁচে গিয়ে থাকে তবে তা অসম্ভব নয়। কারণ যদি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫/৩৩৩, ৩৩৪ সহিহ সনদে

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৬/৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৩৬৫

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বর্ণনা নম্বর: ৩৭৬৯১, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং তারা বুখারীর বর্ণনাকারী কেবল হাইয়াম আল-ফিহরি ব্যতীত এবং ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, ফিল্ল রুশাদ

[৪] তারিখ দিমাশক: ৫০/৫৯, ২৬০, আল-ইসাবাহ: ৫/৩৮৬

[৫] জামহারাতু আনসাবিল আরব লি-ইবনে হাজম: ২/২৩৫

[৬] “মুয়াবিয়া সেখানে এমন একটি স্থানে বন্দি করে রাখতেন যাকে তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে পেতেন।” (মুজামুল বুলদান: ২/১৫৮)

নোট: যদিও এই সমস্ত বর্ণনায় এটি স্পষ্ট নয় যে এই অপরাধীরা সরাসরি খুনি ছিল নাকি কেবল সাহায্যকারী ও সহযোগী, তবে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্ভরযোগ্যতা থেকে এটাই আশা করা যায় যে তিনি শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে কেবল মূল খুনিদের থেকেই কিসাস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া যদি তিনি সাহায্যকারী ও সহযোগীদেরও হত্যা করতেন তবে ইতিহাসে শত শত মানুষের হত্যার কথা উল্লেখ থাকত; কারণ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘর ঘেরাওকারীরা তো আড়াই-তিন হাজারের কম ছিল না।

গভর্নররা খুনিদের খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন সাবাও ছিল একটি গোপন সংগঠনের মাস্টারমাইন্ড এবং মুনাফিকদের প্রধান নেতা। নিজের পরিচয় গোপন করা, ছদ্মবেশ ধারণ করা এবং নাম ও বংশ পরিচয় পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে এই ইহুদির চেয়ে বেশি দক্ষ আর কে হতে পারে? ধারণা করা হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথেই ইবনে সাবা আত্মগোপন করেছিল। সম্ভবত সে তার গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীদেরও আভারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এই কারণেই আমরা দেখি যে, হযরত হাসান এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সন্ধির সাথে সাথেই আবদুল্লাহ বিন সাবা এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মুখ চিরতরে আড়ালে চলে যায়।

১০. শরীয়ত পরিবর্তন এবং বিদআত প্রচারের অভিযোগ

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ফকিহসুলভ দূরদর্শিতার ভিত্তিতে যে ইজতিহাদি সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন, সেগুলোকেও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে এবং বিদআত বলে প্রচার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেক বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে সম্পৃক্ততা কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে প্রমাণিত নয়। তাই অহেতুক এগুলো তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁর অবমাননা করা জুলুম। আমাদেরও এই সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ সেগুলো প্রমাণিতই নয়। উদাহরণস্বরূপ তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে:

- তিনি মুসলমানকে কাফিরের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) সাব্যস্ত করেছেন, অথচ শরীয়ত অনুযায়ী না কাফির মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে, না মুসলমান কাফিরের।
- এই অভিযোগও রয়েছে যে, তিনি মুয়াহিদ (জিম্মি)-এর দিয়াত (রক্তপণ) অর্ধেক করে দিয়েছিলেন এবং বাকি অর্ধেক দিয়াত নিজে নেওয়া শুরু করেছিলেন, অথচ শরীয়ত অনুযায়ী তার পূর্ণ দিয়াত হয় যা পুরোপুরি তার ওয়ারিশরা পায়।

স্মরণ রাখতে হবে যে, এই উভয় কথা একটি দুর্বল সনদে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা সর্বপ্রথম ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে ইবনে আসাকির আবু আমর মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া, আবুল ইয়ামান, আন শুয়াইব আন যুহরি-এর সনদে পেশ করেছেন। [১]

যুহরির জন্ম ৫৮ হিজরিতে, অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের দুই বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। [২]

তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো সিদ্ধান্ত বা ফতোয়ার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পারেন না। তিনি এই বর্ণনা কার কাছ থেকে নিয়েছেন? তা জানা নেই। এভাবে এই বর্ণনাটি মুরসাল। যুহরির মুরসাল বর্ণনাগুলোকে সমালোচকগণ গুরুত্বহীন মনে করেন।

অতঃপর ইবনে আসাকির রাহিমাহুল্লাহ এটি আবু আমর বিনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি ৩১৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে আসাকির রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্ম ৪৯৯ হিজরিতে। মধ্যবর্তী দুই শতাব্দীতে এই বর্ণনাটি কোন কোন রাবি (বর্ণনাকারী) সামনে এগিয়ে নিয়েছেন এবং এতে কী কী সংযোজন করেছেন, তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। আবার এই আবু আমর বিনহু সম্পর্কে একটি মত হলো যে, “কান গালিবান ফিত তাশাইয়ু” অর্থাৎ “তিনি কটুর শিয়া ছিলেন, বনু উমাইয়ার সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করতেন।” [৩]

[১] তারিখু দামেশক: ৫৯/২০৩

[২] আল-আলাম লিয যিরিকলি: ৭/৯৭

[৩] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি, তাদমুরি: ২৩/৫৬১; বাশার: ৭/৩৯

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

অতএব বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে তাদের থেকে বর্ণিত যেকোনো বর্ণনা সন্দেহজনক হিসেবেই গণ্য হবে।

একইভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজের জন্য আযান ও ইকামাত শুরু করার জন্য দায়ী করা হয়। এই বর্ণনাটিও অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত। ইবনে আসাকির (রহ.) এটিও আবু আরুবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর এতে মুয়ায বিন হিশাম আদ-দাস্তাওয়ালী রয়েছেন, যিনি সদুক (সত্যবাদী) হলেও ওয়াহমি (ভ্রান্তিপ্রবণ); ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের মতে তিনি হুজ্জাত (প্রমাণযোগ্য) নন। [১]

সনদের শেষ প্রান্ত ‘কাতাদাহ বিন দা’আমাহ আন সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব’-এর ওপর। কাতাদাহ বিন দা’আমাহ নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃত হলেও তাকদীরের আকিদায় ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি তাদলীস করতে অভ্যস্ত ছিলেন। [২] ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী ‘কাতাদাহ আন সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব’ সম্বলিত সমস্ত হাদিসকে অত্যন্ত দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন, কারণ তাঁর মতে এই দুই রাবীর মাঝে বেশ কয়েকজন বর্ণনাকারী অনুপস্থিত ছিলেন। [৩]

তাই এই ফিকহি সিদ্ধান্তগুলোকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে নিসবত করা (সম্পর্কিত করা) সঠিক নয়।

ইঁগা, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কিছু ফতোয়া ও বিধান এমন রয়েছে যা সহীহ সনদে প্রমাণিত এবং সেগুলোর ব্যাপারে তৎকালীন আকাবিরদের (বড়দের) দ্বিমত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আনা যাবে না; কারণ তিনি ছিলেন একজন ফকিহ ও মুজতাহিদ। যখন কোনো বিষয় তাঁর কাছে শরয়ী দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হতো, তখন কারো বিরোধিতার পরোয়া না করে তার ওপর আমল করা অন্তত তাঁর ওপর ওয়াজিব ছিল। এই বাস্তবতা স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-ও বুঝতেন। جُنَاحُ সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘মুয়াবিয়া তো বিতরের এক রাকাত পড়েন, আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?’

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আরোপ না করেই বললেন: ‘আসাবা ইম্নাহ ফকিহ’। অর্থাৎ ‘তিনি ঠিকই করছেন, কারণ তিনি একজন ফকিহ।’ [৪]

যদি দেখা যায়, তবে এই ধরনের ফিকহি মতপার্থক্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ী ও তাব-তাবয়ী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ফকিহ ও মুফতিয়ানে কেরামের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বিষয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কোনো না কোনো শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে আমল করেছেন এবং ফতোয়া দিয়ে এসেছেন। যদি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই কারণে অভিযুক্ত হন, তবে আহলে ইলমদের (বিদ্বানদের) মধ্যে খুব কম লোকই হয়তো এই অভিযোগ থেকে রেহাই পাবেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই ইজতিহাদগুলো কোনো অদ্ভুত বিষয় ছিল না, কিন্তু যে ফিতনাবাজ গোষ্ঠী সাইয়্যিদুনা উসমান গনি (রা.)-এর ফিকহি সিদ্ধান্তগুলোকে বিদআত বলে প্রচার করেছিল, তারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে কেন ছাড় দেবে? তাই ফিতনাবাজ গোষ্ঠীর বর্ণনাকারীরা ইতিহাসে এই বিষ় মিশিয়ে দিয়েছে। কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যদি করেও থাকেন, তবে তা কোনো ওজরের (অজুহাতের) কারণে। তিনি সেগুলোকে সুন্নাত হিসেবে গণ্য করতেন না এবং অন্যদেরও তা করার নির্দেশ দিতেন না। যেমন, বসে খুতবা দেওয়া তিনি এজন্য গ্রহণ করেছিলেন যে, শরীরের ভার এবং পায়ে...

[১] মীযানুল ইতিদাল: ৩/১৩৩

[২] তাহযীবুত তাহযীব: ৮/২৫৬

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/৭১, ত. আর-রিসালাহ

[৪] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু যিকরি মুয়াবিয়া (রা.)

ব্যথার কারণে তিনি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। [১]

এটি নিশ্চিতভাবেই তাঁর শেষ সময়ের আমল হবে যখন বার্ক্যও জেঁকে বসেছিল এবং অসুস্থতাও ছিল, তারপর তিনি (আহলে ইলমদের) কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এই অবকাশ গ্রহণ করেছিলেন। [২]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত ওসিয়তের হাকিকত:

প্রশ্ন: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই ওসিয়তটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, তিনি মৃত্যুশয্যা় ইয়াজিদকে কাছে ডেকে বলেছিলেন:

“বৎস! আমি আরবদের ঘাড় তোমার জন্য নুইয়ে দিয়েছি এবং তোমার জন্য এত কিছু জমা করেছি যা অন্য কেউ করেনি। খেলাফতের বিষয় তোমার জন্য মজবুত হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা নেই যে এখন চারজন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে: হুসাইন বিন আলী, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং আব্দুর রহমান বিন আবু বকর।

তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে ইবাদত ধ্বংস করে দিয়েছে। যখন তিনি দেখবেন যে অন্য সবাই আনুগত্যের শপথ (বায়াত) করে নিয়েছে, তখন তিনিও করে নেবেন। আর হুসাইন বিন আলীর বিষয়টি হলো, ইরাকবাসীরা তাকে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েই ছাড়বে, যদি তারা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তুমি তাদের ওপর জয়ী হও তবে তাদের ক্ষমা করে দিও কারণ তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে এবং তাদের বড় হকও রয়েছে। আর আবু বকরের ছেলে তো অন্যদের মতো কাজ করবে এবং সে দেখবে যে তার সঙ্গীরা যা করছে সেও তাই করছে এবং তার চিন্তা কেবল নারী ও বিলাসিতা নিয়ে। তবে যে ব্যক্তি সিংহের মতো আক্রমণ করবে এবং শিয়ালের মতো ধোঁকা দেবে সে হলো আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, যদি তুমি তার ওপর জয়ী হও তবে তাকে ছাড়বে না, বরং টুকরো টুকরো করে দেবে।” [৩]

এই বর্ণনাটি কি সনদ অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য? হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি শেষ সময়ে ইয়াজিদকে এই নির্দেশনাগুলো দিয়েছিলেন?

উত্তর: এই বর্ণনার সনদে অত্যন্ত দুর্বল দুইজন বর্ণনাকারী রয়েছেন: হিশাম কালবী এবং আবু মুখনাফ। এতে ইয়াজিদকে ওসিয়ত শোনানোর বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যকর কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় ইয়াজিদ উপস্থিত ছিল না বরং জানাজার পরেও পৌঁছেছিল। [৪] □□□ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে এই ওসিয়ত কীভাবে করতে পারতেন? আশ্চর্যের বিষয় হলো এই ওসিয়তে হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.)-এরও উল্লেখ রয়েছে। অথচ তিনি এর চার বছর আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ওসিয়তে তাঁর কথা কীভাবে উল্লেখ করতে পারেন!!

আরও তামাশার বিষয় হলো বর্ণনাকারী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাহেবজাদা আব্দুর রহমান (রা.)-কে কোনো পঁচিশ-ত্রিশ বছরের বখাটে যুবক হিসেবে কল্পনা করেছে যার চিন্তা কেবল নারী ও বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু ছিল না, নাউজুবিল্লাহ! অথচ আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) যদি

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩৫৮৯২, ৫১৯৩, ত. আর-রশিদ

[২] তারিখ দিমাশক: ৩০২/৫৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২৮/৮, তরজমা মুয়াবিয়া (রা.), আন আবিস সালিহ, ওয়া ফি সানাদিহি জুফ

[৩] তারিখ তাবারী: ৩২৩, ৩২২/৫

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৫৯/১১; সিয়াকু আলামিন নুবালা: ১৬২/৩; সনদ হাসান, ত. আর-রিসালা

দ্বিতীয় খণ্ড | তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা | খুলাফা-এ-রাশেদিন

এই সময়ে জীবিত থাকলে তাঁর বয়স কমবেশি ৮০ বছর হতো, কারণ তিনি ২ হিজরিতে বদরের যুদ্ধে शामिल ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ২০-২২ বছর অবশ্যই হবে। এই হিসেবে ৬০ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর হওয়া উচিত। এমন একজন বৃদ্ধ সম্পর্কে কি কেউ বলতে পারে যে তিনি কেবল নারী ও বিলাসিতার কথাই ভাবেন? অথচ তিনি একজন সাহাবীও ছিলেন। নিঃসন্দেহে বর্ণনাকারী এখানে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিবারকে কলঙ্কিত করার জন্য একটি কুরুচিপূর্ণ কাজ করেছেন এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন।

এই অসিয়তনামা নিয়ে আরও চিন্তা করলে এর জাল হওয়ার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে ইয়াজিদের উত্তরাধিকার মেনে নিতে বাধ্য করেননি, বরং খোলা মনে তাঁর অবস্থান শুনেছেন, তাঁর ওপর কোনো কড়াকড়ি করেননি। তাহলে কি তিনি তাঁর সম্পর্কে এমন কঠোর অসিয়ত করতে পারতেন যে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হোক? যদি তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে শেষ করতে চাইতেন, তবে তা নিজের জীবদ্দশায় কেন করলেন না? তাঁকে কি তখন সময় দেওয়া হয়নি? অথচ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর অবস্থান চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত তাঁর সামনেই ছিল। কোনো বিদ্রোহী বা অবাধ্যকে গ্রেপ্তার ও দমনের জন্য কি এত সময় যথেষ্ট ছিল না? ইবনে যুবাইর (রা.)-এর কাছে কি কোনো কেলা বা বাহিনী ছিল? যদি বায়আতের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এমন কোনো অপরাধ হতো যার কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে হত্যা করতে চাইতেন, তবে তাঁকে কে রুখেছিল? যদি তিনি নিজের ছেলের জন্য সমস্ত বিপদ দূর করতে এবং তাঁর জন্য শাসনের পথ সুগম করতে আগ্রহী হতেন, তবে এমন বড় বিপদ কেন বাকি রেখে যাচ্ছিলেন? এই অভিযান কেন ইয়াজিদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন? তিনি কি নিজেই আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে ভয় পেতেন? নাকি ইয়াজিদ ও তাঁর লস্কর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল? মোদাকথা, এই মিথ্যা বর্ণনার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। এর জাল হওয়া স্পষ্ট।

□□□

প্রশ্ন: একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দাহহাক বিন কাইস ফাহরি (রা.)-কে ডেকে বললেন:

“ইয়াজিদকে আমার সালাম জানিও এবং এই অসিয়ত পৌঁছে দিও যে, হিজাজবাসীদের সাথে সদাচরণ করো। ইরাকবাসীরা যদি প্রতিদিন শাসক পরিবর্তনের দাবি করে, তবে তাও মেনে নিও; কারণ একজনকে বরখাস্ত করা তোমার বিরুদ্ধে এক লক্ষ তলোয়ার কোষমুক্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম। সিরিয়াবাসীদের ব্যাপারে কল্যাণের অসিয়ত করছি, তাদের নিজের সাহায্যকারী বানিও, তাদের অধিকার চিনে রেখো। কুরাইশদের মধ্য থেকে আমার কেবল তিন ব্যক্তির ব্যাপারে আশঙ্কা রয়েছে: হুসাইন, আবদুল্লাহ বিন উমর এবং ইবনে যুবাইর। ইবনে উমরকে তো ইবাদত নিষেজ করে দিয়েছে। হুসাইন একজন অগ্নিবুদ্ধি মানুষ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেই লোকদের মাধ্যমেই মোকাবিলা করাবেন যারা তাঁর পিতাকে হত্যা করেছে এবং তাঁর ভাইকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে। তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে, বড় অধিকারও আছে। মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তাও রয়েছে। আমার ধারণা হলো, ইরাকবাসীরা তাঁকে বিদ্রোহে প্ররোচিত না করে ছাড়বে না। যদি তুমি তাঁর ওপর জয়ী হও, তবে ক্ষমা করে দিও; কারণ এই বিষয়টি যদি আমার সামনে হতো তবে আমিও তাঁকে ক্ষমা করে দিতাম। আর ইবনে যুবাইর, সে তো গর্তে লুকিয়ে থাকা গুইসাপের মতো। যদি সে...”

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

তোমাদের সামনে প্রকাশ পায় তবে তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত মোকাবিলা করে যতক্ষণ না তারা নিজেরা সন্ধির আবেদন করে। যদি তারা এমনটি করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করে নিও। মানুষের রক্তপাত থেকে যতটুকু সম্ভব বেঁচে থেকো। [১]

হযরত মুয়াবিয়া-এর অসিয়তের এই বর্ণনাটিকে কি আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারি?

উত্তর: এটিও আবু মুখনাফ থেকে বর্ণিত। এর সনদ তো দুর্বল বটেই, কিছু বিষয়বস্তুও সন্দেহজনক। এতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জবানিতে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন বলানো হয়েছে। অথচ হযরত মুয়াবিয়া, হযরত হুসাইনকে অনেক সম্মান করতেন। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বিদ্রোহের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। সামনে আমরা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত সন্দেহসমূহের উত্তরে এটি স্পষ্ট করব যে, তাঁকে বিদ্রোহের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হিসেবে প্রসিদ্ধকারী একটি বর্ণনাও সहीহ সনদের নয়, বরং এর সবগুলোই শিয়া বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। সেগুলোর মধ্যেও অধিকাংশ বর্ণনা আবু মুখনাফেরই। এটিও সেগুলোর মধ্যে একটি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

১১. ইয়াজিদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আপত্তি

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এই সন্দেহগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করে সেগুলোর উত্তর দেব।

কি ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের আন্দোলন ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে ছিল?

প্রশ্ন: এটা কি সত্য নয় যে, ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের আন্দোলন হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) শুরু করেছিলেন এবং তাও ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে, যাতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নৈকট্য লাভ করে পুনরায় কুফার গভর্নর পদ ফিরে পান?

চঞ্চাখেও তারিখ তাবারিতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে এসে বার্বাক্যের কারণে কুফার গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেন, যা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্থলে হযরত সাঈদ বিন আস (রা.)-কে নিযুক্ত করতে চান। হযরত মুগীরা (রা.)-এর কাছে বিষয়টি খারাপ লাগে। তিনি পুনরায় পদ ফিরে পাওয়ার জন্য ইয়াজিদের সাথে দেখা করে তাকে খুশি করার চেষ্টা করেন এবং তাকে উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন। ইয়াজিদ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে এই প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন। তিনি হযরত মুগীরা (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং এই তাগিদ দিয়ে পুনরায় কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন যে, তিনি যেন মানুষকে ইয়াজিদের বায়াতের জন্য প্রস্তুত করেন। [১]

উত্তর: এই বর্ণনাটি বিভিন্ন কারণে অগ্রহণযোগ্য:

১. এর সনদে আলী বিন মুজাহিদ রয়েছে যে পরিত্যক্ত (মাতরুক), ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, সে বর্ণনার জন্য জাল সনদও তৈরি করত। [২] তাই এই বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল (যয়ীফ)।

২. অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) ৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৩] একটি মত ৫১ হিজরির এবং একটি মত ৪৯ হিজরিরও রয়েছে। [৪]

৩. এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যখন তাঁকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন, তখন তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানকার গভর্নর ছিলেন। [৫]

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৩০১-৩০২

[২] তাকরীব আত-তাহযীব, তর: ৪৭৯০; মীযানুল ইতিদাল: ৩/১৫৩; তাহযীবুল কামাল: ২১/১১৮

[৩] ফাতহুল বারী: ১/১৬৮; উসদুল গাবাহ: ৩/৩০; আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ৭/২৭৭; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩২, ত: আর-রিসালাহ; তাহযীবুত তাহযীব: ১০/৩৩৫; তাহযীবুল কামাল: ২৮/৪৭৩; আল-ইসাবাহ: ৬/১৫৭

[৪] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৪৫৫, সন ৫১ হি.; আল-ইসাবাহ: ৬/১৫৭

[৫] অতঃপর মুয়াবিয়া বায়াত গ্রহণ করেন যখন মানুষ তাঁর ওপর একত্রিত হয়, তারপর তিনি তাঁকে কুফার দায়িত্ব দেন এবং তিনি সেখানে আমীর হিসেবে বহাল থাকেন যতক্ষণ না তিনি অধিকাংশের মতে ৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (আল-ইসাবাহ: ৬/১৫৭) মুগীরা ৪১ হিজরিতে কুফার ওয়ালী হন এবং ৫১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন; তখন কুফা ও বসরা উভয়ই যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের অধীনে দেওয়া হয়। “তিনি ৪১ হিজরিতে কুফার ওয়ালী হন এবং ৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর কুফা ও বসরা উভয়ই যিয়াদের অধীনে দেওয়া হয়।” (তারিখ আত-তাবারী: ৫/৪৫৫)

অন্যদিকে ইয়াজিদের উলি আহদির (উত্তরাধিকার) কথা ৫৬ হিজরিতে শুরু হয়েছিল। [১]

সহীহ বুখারীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মদিনায় ইয়াজিদের উলি আহদির ঘোষণা মারওয়ান ইবনুল হাকাম শুনিয়েছিলেন। [২]

এটি নিশ্চিত যে, মারওয়ান ৪৯ হিজরি থেকে ৫৩ হিজরি পর্যন্ত মদিনা মুনাওয়ারার গভর্নর ছিলেন না। এই সময়ে গভর্নরের দায়িত্ব হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে ছিল। মারওয়ান প্রথমে ৪১ হিজরি থেকে ৪৮ হিজরি পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন এবং এরপর ৫৪ হিজরি থেকে ৫৮ হিজরি পর্যন্ত। [৩]

৪৮ হিজরি থেকে ৫৪ হিজরি পর্যন্ত উলি আহদির বিষয়টি উত্থাপিতই হয়নি, তাই সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী যখন এই ঘোষণা মদিনায় গভর্নর মারওয়ান শুনিয়েছিলেন, তখন এটি মারওয়ানের মদিনার শাসনের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ৫৪ হিজরির পরের কোনো বছরেই হতে পারত। আর ঐতিহাসিকরা লিখে দিয়েছেন যে সেটি ছিল ৫৬ হিজরি।

এখন পুরো বিষয়টি বিবেচনা করুন যে, যখন হযরত মুগীরা ইবনে শুর'বা (রা.) ৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন ৫৬ হিজরিতে তিনি কীভাবে এই প্রস্তাব দিতে পারেন।

এই ব্যাখ্যা নিরর্থক যে প্রস্তাবটি ৫০ হিজরিতে দেওয়া হয়েছিল এবং এর ওপর আমল কয়েক বছর পর হয়েছে; কারণ এই বর্ণনায় মুগীরা (রা.)-এর কুফায় গিয়ে প্রচারণা চালানো এবং দামেস্কে প্রতিনিধি দল পাঠানোরও উল্লেখ আছে, যেন বর্ণনাটি নিজেই বলছে যে তিনি কেবল প্রস্তাবই দেননি বরং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী উলি আহদির জন্য পথও সুগম করেছিলেন এবং এর জন্য প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। অথচ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী উলি আহদি বিষয়ে পরামর্শ এবং এর ঘোষণা সবই ৫৬ হিজরিতে হয়েছিল। মোটকথা, এই বর্ণনাটি যে তৈরি করেছে সে ইতিহাসের অজ্ঞতার কারণে স্থানে স্থানে হাস্যকর ভুল করেছে।

এই পয়েন্টটিও বিবেচনার যোগ্য যে, এই বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুগীরা (রা.) বার্ষিক্যের কারণে নিজেই পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার নিজের পদের কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। যদি তাকে বরখাস্ত করা হতো, তবে গল্পে এই কথাগুলো ঢোকানোর সুযোগ ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি পুনরায় কুফার গভর্নরের পদ চাচ্ছিলেন, তাই তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে খুশি করে এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হযরত মুগীরা (রা.)-এর প্রতি কোনো অভিযোগই ছিল না এবং হযরত মুগীরা (রা.) নিজেও পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন, তবে কেন হঠাৎ করে তার পুনরায় গভর্নরের পদের আকাঙ্ক্ষা হবে? তারা কি ছোট শিশু ছিলেন যে দস্তুরখান থেকে উঠে গিয়েছিলেন এবং তারপর অন্য কাউকে বসতে দেখে পুনরায় शामिल হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন? (নাউযুবিলাহ)

ধরা যাক তিনি যদি পুনরায় পদটি চাইতেনও, তবে কোনো নাটকের কী প্রয়োজন ছিল? যদি পদত্যাগ পেশ করার পর তার পুনরায় এই দায়িত্ব পালনের খেয়াল এসেই থাকত, তবে তিনি এই কথাটি সরাসরি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বলতে পারতেন। সেই সময় পর্যন্ত...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩০০; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৬ হিজরির অধীনে; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩০৬।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮২৭, কিতাবুত তাফসীর, বাব: ওয়াল্লাযী ক্বলা লিওয়ালিদাইহি।

[৩] দেখুন: তারিখুত তাবারী, তারিখু খলিফা, আল-কামিল ফিত তারিখ এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে এই বছরগুলোর ঘটনাবলী।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — সপ্তম খণ্ড

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সেখানে সাঈদ বিন আল-আস (রা.)-কে নিযুক্ত করেননি। তারা তো খুশি হতেন যে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি পুনরায় নিজের পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এই সমস্ত দিক প্রকাশ করছে যে এই বর্ণনাটি পুরোপুরিই বানোয়াট।

‘আল-কামিল ফিত তারিখ’-এর সনদবিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা:

‘আল-কামিল ফিত তারিখ’-এ এই ঘটনাটি কোনো সনদ ছাড়াই অতিরিক্ত সংযোজনসহ বিস্তারিতভাবে পেশ করা হয়েছে। এতে এও রয়েছে যে, হযরত মুগীরা (রা.) দৈবক্রমে জানতে পারেন যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে বরখাস্ত করতে চান। হযরত মুগীরা (রা.) এটি দেখে মিথ্যা মৃত্যুর ভান করে অসুস্থ হয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এরপর ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের আন্দোলন শুরু করেন। অথচ তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিজের পদ টিকিয়ে রাখা এবং তা পাকাপোক্ত করা।

এই অতিরিক্ত কথাগুলো ইবনুল আসীরের আগে কোথাও পাওয়া যায় না। ইবনুল আসীরের ইতিহাস রচনার ধরন হলো তিনি কোনো ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ চিত্র পেশ করার চেষ্টা করেন এবং এতে সহীহ ও যয়ীফ (দুর্বল) বিচার না করে সব ধরনের উপাদান গ্রহণ করেন এবং কোনো কিছুই সনদ বর্ণনা করেন না। সুতরাং কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই ধরনের বর্ণনার কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না।

হযরত মুয়াবিয়া ও মুগীরা বিন শু’বা (রা.) কি উন্মতের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিলেন?

প্রশ্ন: হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত নিচের বর্ণনাটির সনদ ও মতন (মূল পাঠ) অনুযায়ী অবস্থান কী, যাতে হাসান বসরী (রহ.) বলেন: “আসলহা আমরান নাস আরবাআতু ওয়া আফসাদাহুন নাসু আন-নাসু।”

অর্থাৎ উন্মতের বিষয়াবলী চারজন ব্যক্তি (খুলাফায়ে রাশেদীন) সংশোধন করেছেন এবং চারজন ব্যক্তি (হযরত মুয়াবিয়া ও মুগীরা বিন শু’বা রা.) তা নষ্ট করেছেন। এতে এও আছে যে, মুগীরা বিন শু’বা (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে ইয়াজিদের খিলাফতের আশা দেওয়ার পর জনসভায় বলেছিলেন:

“ইন্নি কদ ওয়াদাতু রিজলা মুয়াবিয়াত ফী গুরযিন লা ইয়াযালু ফীহি ইলা ইয়াওমিল কিয়ামা।”
আমি মুয়াবিয়ার পা এমন এক গোমরাহীর গর্তে ফেলে দিয়েছি যেখান থেকে সে কিয়ামত পর্যন্ত বের হতে পারবে না। [১]

উত্তর: এই বর্ণনাটি অত্যন্ত সন্দেহজনক। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে এটি প্রথমবারের মতো সনদসহ ‘তারিখে দামেশক’-এ পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচ শতাব্দীর ইলমী ভাণ্ডারে এটি কারো কাছ থেকে বর্ণিত হয়নি।

১. এর প্রথম সনদে...

একজন বর্ণনাকারী আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আবু সাউদ (৪৫৩ হি. থেকে ৫২৫ হি.) হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হিসেবে গণ্য হন। [২]

আরেকজন বর্ণনাকারী আবু আলী মুহাম্মদ বিন ওয়াশাহ আর-রাযী (৩৬৩ হি.) রাফেযী এবং মুতাযিলী ছিলেন। [৩]

[১] প্রথম বর্ণনা সনদসহ তারিখে দামেশক: ৩০/২৮৬, ২৮৭; দ্বিতীয় বর্ণনা সনদসহ তারিখে দামেশক: ১৫/৩১০।

[২] লাম ইয়াকুন ইয়ারিফু শাইয়ান মিনাল হাদীস, ওয়া কানা ইয়া’ইয়ু ওয়া ইয়াদাক্কিরু। (তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী তদমুরী: ১২৮/৩৬; বাশার: ১১/৩২৭)।

[৩] “ফিহি রাফযুন।” (মিযানুল ইতিদাল: ৩/৫৮)।

“আল-ওয়াসি” লেখাটি ভুলবশত হয়েছে, সঠিক হলো “আল-ওয়াশাশা”। যদি আল-রাযীকে সহীহ মানা হয়, তবে এই ব্যক্তিত্বকে অজ্ঞাত (মাজহুল) মানতে হবে।

একজন রাবী ঈসা বিন আলী বিন ঈসা (৩০২ হি. থেকে ৩৯১ হি.)-কে খতীব বাগদাদী ‘সহীহুল কিতাব’ এবং ‘সাবিতুস সামা’ বলেছেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ দার্শনিক জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন থাকার কারণে তাঁর ওপর জরাহ করেছেন। [১] তিনি তায়ি’ লিল্লাহর দরবারী ছিলেন [২] যিনি স্বয়ং ইসনা আশারি শিয়া বংশ বনী বুওয়াইহ-এর অধীনে শাসন করতেন।

একজন রাবী আবুল সাকীন যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া (মৃ. ২৫১ হি.)-কে ইবনে হিব্বান এবং খতীব বাগদাদী সিকাহ সাব্যস্ত করেছেন [৩] কিন্তু দারাকুতনী তাঁকে মাতরুক বলেছেন। [৪]

একজন রাবী যহর বিন হিসন (মৃ. ২০১ হি. বা ২ ২০১০ হি.) মাজহুলুল হাল। [৫]

দ্বিতীয় সনদে একজন রাবী আবু বকর আল-মুয়াদিব-এর অবস্থা অজ্ঞাত। ইবনে আসাকির তাঁর ‘মু’জাম’-এ কেবল তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন এবং কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, জরাহ বা তা’দীল করেননি। [৬]

একজন রাবী ‘আবু আমর বিন ইউদ’ সম্পূর্ণ মাজহুল। একজন রাবী সারী ইবনে ইসমাইল (মৃ. ১৬৭ হি.) মাতরুক। [৭]

অতঃপর এই বর্ণনাটি শেষে একজন মাজহুল রাবীর ওপর গিয়ে শেষ হয় যাকে ‘বা’যু মান সামি’আল মুগীরা’ (মুগীরা থেকে শ্রবণকারী জনৈক ব্যক্তি) বলে স্মরণ করা হয়েছে। মোটকথা, এই বর্ণনার উভয় সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এমন গ্রহণযোগ্যতাহীন বর্ণনাগুলো নিয়ে মুগীরা বিন শু’বা-এর মতো সাহাবীর ব্যাপারে কি এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি উম্মতকে কিয়ামত পর্যন্ত গোমরাহীর গর্তে ফেলে গেছেন এবং এর ওপর গর্বও প্রকাশ করেছেন? না হাসান বসরী রহ.-এর থেকেও এমন প্রত্যাশা করা যায় না যে, তিনি এভাবে সাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করবেন।

□□□

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের জন্য ঘুষ দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন: কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বায়আতের জন্য সাহাবীদের আনুগত্য ঘুষের বিনিময়ে কেনার চেষ্টাও করেছিলেন। যেমন তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক লক্ষ (দিরহাম) ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এতে অসন্তুষ্ট হন এবং বায়আত করতে অস্বীকার করেন।

‘তাবাকাত ইবনে সাদ’-এ এই বর্ণনাটি সহীহ সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

“নিশ্চয়ই মুয়াবিয়া ইবনে উমরের নিকট এক লক্ষ (দিরহাম) পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর যখন তিনি ইয়াজিদের জন্য বায়আত নেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি (ইবনে উমর) বললেন, আমি দেখছি তিনি এটাই চেয়েছিলেন; তাহলে তো আমার নিকট আমার দ্বীন সস্তা হয়ে যাবে।”

[১] হাফেজ যাহাবীর বক্তব্য অনুযায়ী: এই জ্ঞানসমূহ তাঁকে কলঙ্কিত করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৬/৫৫০, ত. আর-রিসালাহ)

[২] আল-আলাম লিয়-যিরিকলী: ৫/১০৬

[৩] মীযানুল ইতিদাল: ২/৯১

[৪] শক্তিশালী নন, মাতরুক। (ইকমালু তাহযীবিল কামাল: ৫/৪৩)

[৫] হাফেজ যাহাবী বলেন: “অপরিচিত” (মীযানুল ইতিদাল: ২/৬৯)

[৬] মু’জাম ইবনে আসাকির, জীবনী নং: ১৩৮৩

[৭] তাকরীবুত তাহযীব, নং: ২২২১

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে এক লক্ষ (দিরহাম) পাঠালেন। তারপর যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইচ্ছা করলেন যে ইয়াজিদের (উত্তরাধিকারের) বায়াত গ্রহণ করবেন, তখন ইবনে উমর (রা.) বললেন: আমার মনে হয় তিনি কি এরই ইচ্ছা করেছিলেন? যদি তাই হয়, তবে আমার দ্বীন আমার দৃষ্টিতেই অত্যন্ত সস্তা। [১]

এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে সহীহ। এ থেকে জানা যায় যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সত্যিই ঘুষ দিয়েছিলেন। অথবা অন্তত ইবনে উমর (রা.) তাঁর উপহারকে রাজনৈতিক ঘুষ হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। তাঁর শব্দ ‘أَرْنِي هَذَا أَرَادَ’ (আমার মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য এটাই ছিল) থেকে তো এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। এর উত্তর কী?

উত্তর: কখনো কখনো সহীহ বর্ণনাগুলোর মধ্যেও বৈপরীত্য দেখা দেয়। এখানে এ বিষয়ে আমরা আরেকটি সহীহ বর্ণনা দেখতে পাই যাতে হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

নিশ্চয়ই মুয়াবিয়া ইবনে উমরের নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর যখন মুয়াবিয়া ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার বায়াতের দিকে আহ্বান করলেন, তিনি (ইবনে উমর) বললেন: তোমরা কি মনে করো তিনি এরই ইচ্ছা করেছিলেন? যদি তাই হয় তবে আমার নিকট আমার দ্বীন অত্যন্ত সস্তা। অতঃপর যখন মুয়াবিয়া ইন্তেকাল করলেন এবং মানুষ ইয়াজিদের ওপর একমত হলো, তখন তিনি (ইবনে উমর) তাঁর বায়াত গ্রহণ করলেন।

নাফে বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে এক লক্ষ দিরহাম পাঠালেন। তারপর যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদের বায়াতের দিকে আহ্বান করলেন, তখন ইবনে উমর (রা.) (উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে) বললেন, “তোমাদের কি এই ধারণা যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল? যদি তাই হয় তবে আমার দ্বীন আমার দৃষ্টিতেই অত্যন্ত সস্তা হয়ে গেল।” যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইন্তেকাল করলেন এবং মানুষ ইয়াজিদের ওপর একমত হলো, তখন ইবনে উমর (রা.) ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করলেন। [২]

এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নয় বরং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী লোকদের এই ধারণা হচ্ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ঐ অর্থ ঘুষ হিসেবে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাদের ভুল ধারণাকে খণ্ডন করে বললেন: أَتَرُونِ هَذَا أَرَادَ (তোমরা কি মনে করো যে মুয়াবিয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল?)

এরপর এই ধারণাকে নাকচ করে বললেন যে, যদি এমনই হতো তবে তিনি হতেন ঘুষদাতা আর আমি হতাম ঘুষগ্রহীতা। যেন আমি আমার দ্বীন এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করে এর খুব সস্তা দাম নির্ধারণ করলাম।

এখন প্রশ্ন হলো যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী এই উভয় সহীহ বর্ণনার মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এর জন্য আমরা উভয়ের সনদ দেখি।

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৪/১৮২, তবা সাদির।

[২] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ১৬৬৩২, তবা ইলমিয়াহ। এই বর্ণনাটি আল-ফাসাবী ‘লারখিস’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, ‘ফাল্লামা মাতা’ থেকে ‘বায়আহ’ পর্যন্ত শব্দগুলো তাঁর বর্ণনায় নেই। (আল-মা’রিফাত ওয়াত তারিখ: ১/৪৯৪)

“তাবাকাত ইবনে সাদ”-এর বর্ণনার সনদ হলো: আরিম বিন আল-ফাদল, সুলাইমান বিন হারব, হাম্মাদ, আইয়ুব এবং নাফি।

ইমাম বায়হাকীর বর্ণনার সনদ হলো: ইয়াকুব বিন সুফিয়ান, সুলাইমান বিন হারব, হাম্মাদ, আইয়ুব এবং নাফি।

সুলাইমান বিন হারব, হাম্মাদ, আইয়ুব এবং নাফি উভয় সনদে অভিন্ন। তারা সবাই সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)।

উভয় সনদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, সনদের শুরুর বর্ণনাকারী তাবাকাত-এ আরিম বিন আল-ফাদল এবং বায়হাকীতে ইয়াকুব বিন সুফিয়ান। এখন দেখা যাক যে, এই দুজনের মধ্যে কে বেশি নির্ভরযোগ্য? ইয়াকুব বিন সুফিয়ান নাকি আরিম বিন আল-ফাদল? ইয়াকুব বিন সুফিয়ানের ব্যাপারে সবাই একমত যে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন: “সিকাহ হাফিজ”। আল্লামা যাহাবী (রহ.)-এর মত হলো: “আল-হাফিজ, সিকাহ, খাইর, সালিহ”। [১]

আরিম বিন আল-ফাদল (মৃত্যু ২২৪ হিজরি) সম্পর্কে জারহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল, তিনি বর্ণনাগুলোকে গুলিয়ে ফেলতেন। [২]

ইমাম আবু দাউদের মতে শেষ আট বছর এবং ইমাম আবু হাতিমের মতে শেষ চার বছর তাঁর স্মৃতিশক্তি খারাপ ছিল। ইবনে হিব্বান বলেন যে, স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়ার কারণে তাঁর বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। [৩]

মুহাদিসগণ এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব ব্যক্তি তাঁর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়ার আগে তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, শুধুমাত্র তাদের থেকে প্রাপ্ত আরিমের বর্ণনাগুলোই গ্রহণযোগ্য। যেসব ব্যক্তি এর পরে তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন, তাদের বর্ণিত আরিমের বর্ণনাগুলো গ্রহণ করা হবে না। আর যদি কোনো বর্ণনাকারী সম্পর্কে জানা না থাকে যে তিনি আরিমের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়ার আগে বর্ণনা শুনেছেন নাকি পরে, তবে সতর্কতা হলো তা বর্জন করা। [৪]

এখন যেহেতু এটি জানা সম্ভব নয় যে এই বর্ণনাটি আরিমের স্মৃতিভ্রমের আগের নাকি পরের, তাই একে পরিত্যক্ত না হলেও অন্তত সন্দেহজনক অবশ্যই মনে করা হবে।

“তাবাকাত ইবনে সাদ”-এ আরিম বিন আল-ফাদলের বর্ণনাটি ইবনে সাদ নিজেই বর্ণনা করছেন। তাঁর এবং আরিমের মধ্যে কোনো প্রকাশ্য মাধ্যম নেই। কিন্তু আরিমের মৃত্যু ২২৪ হিজরিতে এবং মুহাম্মদ বিন সাদের জন্ম ১৬৮ হিজরিতে। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই মাঝখানে কোনো অজ্ঞাত বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেছে। সেই বর্ণনাকারী কে? এ বিষয়ে সমস্ত কিতাব নীরব। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ বর্ণনাটিকে সহীহ আস-সানাদ (সঠিক সনদযুক্ত) হিসেবে গণ্য করাও প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে।

সনদের এই দুর্বলতা বোঝার পর এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয় যে, এই মাসআলায় ইয়াকুব বিন সুফিয়ানের বর্ণনাটিই নির্ভরযোগ্য যা বায়হাকী উল্লেখ করেছেন। আরিমের বর্ণনার মতন (মূল পাঠ) “শুজুজ” (বিচ্যুতি) থেকে মুক্ত নয়। অর্থাৎ বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও...

[১] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৭৮১৭

[২] মীযানুল ইতিদাল: ৩/৮০, মনে রাখতে হবে যে আরিম বিন আল-ফাদলের আসল নাম “محمد بن الفضل السدوسي” (মুহাম্মদ বিন আল-ফাদল আস-সাদুসী)।

[৩] আশ-শাযাল ফাইয়াহ মিন উলুমি ইবনিস সালাহ লি-আবি ইসহাক আল-আবুনাসী, পৃ. ৮০২ হিজরি, ১/১১২, ত. মাকতাবাতুর রুশদ

[৪] তাহযীবুল কামাল: ২৬/৪৯০; আশ-শাযাল ফাইয়াহ মিন উলুমি ইবনিস সালাহ: ২/৭৭১

সত্ত্বেও তিনি নিজের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বাইরে গিয়ে বর্ণনা করছেন। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান বর্ণনা করেন: আনতারুনা হাযা আরাদা... আরিম একে এভাবে বর্ণনা করেছেন: আরী যাকা আরাদা।

ইয়াকুব বিন সুফিয়ানের বর্ণনাটি আরও একবার পড়লে জানা যাবে যে, এতে কোনো ঘুষ দেওয়ার উল্লেখ নেই এবং এতে এমন কোনো ধারণাও পাওয়া যায় না যে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কোনো কুধারণা ছিল, বরং এতে স্পষ্ট হয় যে এটি অন্য লোকদের ধারণা ছিল।

আসল কথা হলো, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই বুজুর্গদের উপহার ও হাদিয়া দেওয়ার পুরনো অভ্যাস ছিল, যার প্রমাণ হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবনী সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের আন্দোলনের বছরও তিনি এই ব্যক্তিদের কাছে নিয়ম অনুযায়ী একইভাবে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন।

কিছুকাল পর যখন ইয়াজিদের বায়াতের দাবি পেশ করা হলো (যার সাথে প্রকৃতপক্ষে এই হাদিয়ার কোনো সম্পর্ক ছিল না), তখন এই ব্যক্তিদের প্রভাবাধীন মহলে এই ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ল যে, সেই অর্থ আসলে রাজনৈতিক ঘুষ ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল এই আন্দোলনে সমর্থন লাভ করা। এই বুজুর্গরা এই ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেন এবং বলেন: তোমরা কি মনে করছ যে হযরত মুয়াবিয়া এই (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্যে অর্থ পাঠিয়েছিলেন (যা আমি গ্রহণ করেছিলাম)? যদি বিষয়টি তেমনই হয় যেমনটি তোমরা ধারণা করছ, তবে তো আমি আমার দ্বীনের মূল্য অনেক কম নির্ধারণ করেছি।

যদি ইবনে উমর (রা.)-এর এই হাদিয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকত অথবা তিনি একে রাজনৈতিক ঘুষ মনে করতেন, তবে তিনি তা ফেরত দিতেন। যদি এই বিষয়টি পরে বুঝে আসত, তবে পরেই ফেরত দিতেন, কিন্তু কোনো বর্ণনায় এমন কোনো উল্লেখ নেই বরং উল্লিখিত বর্ণনাগুলোতেই বর্ণিত হয়েছে যে: “ফালাম্মা মাতা মুয়াবিয়া ওয়াজতামাআন-নাসু আলা ইয়াজিদ, বায়আহু...” অর্থাৎ ‘যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইন্তেকাল করলেন এবং মানুষ ইয়াজিদের ব্যাপারে একমত হলো, তখন ইবনে উমর (রা.)-ও ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন।’ [১]

এভাবে এই বর্ণনাগুলো স্বয়ং ইবনে উমর (রা.)-এর এই বিষয়ে কোনো আপত্তি না থাকার প্রমাণ দেয়।

প্রশ্ন: একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকর (রা.) ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করেননি, তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে এক লক্ষ দিরহাম পাঠান, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। “ফারদাহা ওয়া ক্বলা লা আবিউ দ্বীনি বি-দুনিয়ায়ি...” অর্থাৎ ‘তিনি বললেন, আমি আমার দ্বীনকে আমার দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করব না।’ এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আনুগত্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। [২]

উত্তর: এই বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য। এটি সপ্তম ও নবম হিজরি শতাব্দীর ব্যক্তিবর্গ জুবায়ের বিন বাক্কার থেকে বর্ণনা করছেন, যিনি ২৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। মাঝখানে অনেক বড় বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) রয়েছে। আবার জুবায়ের বিন বাক্কার এটি ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ আল-জুহরি থেকে বর্ণনা করেন; এই ইব্রাহিম সম্পর্কে ইবনে আদি বলেন যে, তার অধিকাংশ হাদিসই মুনকার (অস্বীকৃত)।

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, খণ্ড: ১৬৬৩২, ত: আল-ইলমিয়াহ।

[২] আল-ইসাবাহ: ২৭১৩; উসদুল গাবাহ: ৩/৩২২।

হাফেজ যাহাবী (রহ.) একে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন যে, তাঁরই পরামর্শে ইমাম মালিক (রহ.)-কে চাবুক মারা হয়েছিল। [১] এত দুর্বল সনদ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ওপর জরাহ (সমালোচনা) কীভাবে সঠিক হতে পারে?

□□□

কি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদের বায়াতের জন্য জোরজবরদস্তি করেছিলেন?

(প্রশ্ন) ইতিহাসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বায়াতের জন্য জোরজবরদস্তিও করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জোরপূর্বক রাজি করানোর জন্য সিরিয়া থেকে মদিনায় এসেছিলেন। তখন ইয়াজিদের বায়াত করতে অস্বীকারকারী বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম মদিনা ছেড়ে মক্কার দিকে চলে যান। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও তাঁদের পিছু পিছু মদিনা থেকে রওনা হন। তিনি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের মাথার ওপর নগ্ন তলোয়ার ঝুলিয়ে বায়াত নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাঁরা তবুও বায়াত হননি, তখন তিনি বাইরে গিয়ে মিথ্যা ঘোষণা করে দেন যে, এই ব্যক্তিবর্গ বায়াত হয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে বর্ণনাগুলো নিম্নরূপ:

- সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনা যা ইবনে আসাকিরের, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মক্কার নিকটবর্তী পৌঁছালে পথে তিনি তাঁর নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে বললেন: আমার সাথে কাউকে চলতে দিও না, কেবল তাকে ছাড়া যাকে আমি সাথে নেব। এ কথা বলে তিনি নিজে আগে চললেন। মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী ‘আরাক’ উপত্যকার মাঝখানে প্রথমে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে তাঁর দেখা হলো। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে মারহাবা বললেন, সওয়ারি পেশ করে সাথে নিলেন। এরপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা.), এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর সাথে দেখা হলো। প্রত্যেকের সাথে সওয়ারি পেশ করলেন এবং আনন্দদায়ক কথাবার্তা বললেন। তাঁরা সবাই মিলে মক্কায় পৌঁছালেন। সেখানে তিনি তাঁদেরকে দাওয়াত দিয়ে সম্মান ও আপ্যায়ন করতেন। হজের কার্যাদি সম্পন্ন করা পর্যন্ত তিনি তাঁদের সাথে ইয়াজিদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। এই ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলেন: ভাইয়েরা! এই ব্যক্তির খাতির-যত্নে ধোঁকা খেয়ো না, এটি তোমাদের প্রতি ভালোবাসা বা সম্মানের কারণে নয়, বরং তিনি তাঁর নিজের এই উদ্দেশ্যের খাতিরেই এই আপ্যায়ন করছেন। এর জন্য জবাবের প্রস্তুতি নিয়ে নাও। একদিন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এই ব্যক্তিবর্গকে বায়াতের জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করলেন এবং খুতবা দিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে সদাচরণই করে আসছি। ইয়াজিদ তোমাদের ভাই, সেও তোমাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে। তোমরা তাঁর নাম খেলাফতের জন্য পেশ করে দাও। এরপর সরকারের সমস্ত আয়-ব্যয়, কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বরখাস্ত সব তোমাদের হাতেই থাকবে।

এই ব্যক্তিবর্গ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে মুখপাত্র বানিয়েছিলেন। তিনি এই অবস্থান পেশ করলেন যে, হয় আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো কাউকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করবেন না। আমরা নিজেরাই আমাদের খলিফা নির্বাচন করে নেব।

[১] মিজানুল ইতিদাল, ৫৬/১।

...গেল। হয় আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মতো পরিবারের বাইরের কোনো ব্যক্তির নাম নির্ধারণ করে দিন অথবা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মতো ছয় ব্যক্তির শুরার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করুন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর কোনোটিতেই রাজি হলেন না এবং জল্লাদদের তলোয়ার হাতে তাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন যে, যদি তারা আমার বিরোধিতা করে তবে গর্দান উড়িয়ে দিও। এরপর তাদের নিয়ে জনসমাবেশে আসলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তারা বায়আত গ্রহণ করেছে, ফলে সকল মানুষ বায়আত গ্রহণ করল। [১]

উত্তর: এই বর্ণনাটি যদিও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিক একে নিশ্চিত মনে করে নিজ ইতিহাসের অংশ বানিয়েছেন, কিন্তু গবেষণা করলে দেখা যায় যে এটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। কেননা জুয়াইরিয়া একে ‘আশয়াখে আহলে মদিনা’ থেকে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ মূল বর্ণনাকারী কিছু অজ্ঞাত লোক। তাদের নির্ভরযোগ্যতা কেমন ছিল এবং স্মৃতিশক্তি কেমন ছিল? কিছুই জানা নেই, তবে বর্ণনাটিকে নিশ্চিত বলে কীভাবে মেনে নেওয়া যায়। আবার এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মূল ঘটনার মধ্যে কিছু জাল সংযোজনের প্রমাণ পেশ করছে। যেমন:

- যদি এই ব্যক্তিবর্গ ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে বের হতেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পেছনে থাকতেন, তবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অতি নিকটে চলে আসার পর তারা পথ পরিবর্তন করার বা লুকিয়ে থাকার চেষ্টা কেন করলেন না?
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কীভাবে জানতে পারলেন যে এই ব্যক্তিবর্গ নিশ্চিতভাবে পথে এত সময় পর মিলিত হবেন?

তাই এই বর্ণনাটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রশ্ন: তাবারির বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এসে প্রথমে হযরত হুসাইন, তারপর ইবনে জুবায়ের, তারপর ইবনে উমর এবং তারপর আব্দুর রহমান বিন আবি বকর (রা.)-কে আলাদা আলাদা ডাকলেন। প্রত্যেককে বললেন যে, তোমাদের সাথীরা তো বায়আতের জন্য প্রস্তুত, তোমরা তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলো না। প্রত্যেকে এই উত্তর দিলেন যে, এতে আমার কোনো হাত নেই, অন্যরা প্রস্তুত হয়ে গেলে আমিও প্রস্তুত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রত্যেককে এই তাকিদ দিয়ে বিদায় করতে থাকলেন যে, এই কথাগুলো অন্যদের কাছে উল্লেখ করো না। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকর (রা.)-এর সাথে অত্যন্ত কঠোর কথাবার্তা হলো। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে হত্যার হুমকি দিলেন এবং তিনি তাকে জাহান্নামের হুঁশিয়ারি শোনালেন। [২] এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জোরপূর্বক বায়আত নিয়েছিলেন।

উত্তর: এই বর্ণনাটিও সম্পূর্ণ জয়িফ। একে ইবনে আউন ‘হাদাসানি রাজুলুন বিনখলাহ’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই ‘রাজুল’ (ব্যক্তি) কে? নির্ভরযোগ্য নাকি মিথ্যাবাদী, ন্যায়পরায়ণ নাকি অসাধু, কিছুই জানা নেই। তাই এটি গ্রহণ করা সঠিক নয়। মোটকথা, ভয়ভীতি ও জালিয়াতির মাধ্যমে বায়আতে ওলি আহদি নেওয়ার বর্ণনাগুলো সনদের দিক থেকে সম্পূর্ণ দুর্বল এবং দলিল হিসেবে অযোগ্য। এই বর্ণনাগুলোতে শুধু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর মিথ্যা ও প্রতারণার অপবাদই নেই, বরং খোদ মদিনার সেই মহান ব্যক্তিদের ওপরও এই অভিযোগ রয়েছে যে, তারা মাথার ওপর তলোয়ার দেখে প্রাণের ভয়ে চুপ ছিলেন এবং উন্মত্তে মুহাম্মদীকে ধোঁকায় পড়তে দিয়েছেন।

[১] তারিখ খলিফা বিন খয়্যাত, পৃ. ২১৬, ২১৭

[২] তারিখুত তাবারী: ৫/৩০৩

সঠিক বর্ণনাসমূহে ঘটনাটি হলো এই যে, এই ব্যক্তিবর্গ তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান পেশ করেছিলেন যার ওপর ইয়াজিদ তাদের কোনো জেরা করেননি। একটি সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে বলেছিলেন: “তোমার জন্য মদিনায় তিনজন কুরাইশ রয়েছে যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করবে না, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) রয়েছে, আপনি বলে দিন যে তারা যেন এটা না ভাবেন যে মসজিদে বসে সময় নষ্ট হচ্ছে।” হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) জবাবে বলেছিলেন: “পূর্ববর্তী খলিফাগণ নিজেদের থেকে দূরে চিন্তা করেছিলেন, আপনি আপনার ছেলের জন্য চিন্তা করে ফেলেছেন। বাকি যখন মানুষ একটি সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যাবে তখন আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এটি শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন: “আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।”

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এই ওজর পেশ করেছিলেন যে, “একই সময়ে দুটি বায়আত হতে পারে না। আপনার জীবদশায় বায়আত হতে পারে না, যখন জমিনে ওই ব্যক্তি খলিফা নন তখন বায়আত কার করব?”

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দেখলেন যে তাদের আসল আপত্তি ইয়াজিদের সত্তার ওপর নয় বরং মূলনীতির ওপর। তিনি مصلحت (কল্যাণ) এতেই মনে করলেন যে মানুষের সামনে এই ব্যক্তিবর্গের অবস্থান পুনরাবৃত্তি না করা হোক অন্যথায় ফিতনার সূরতে প্রাণের ঝুঁকি হতে পারে। আপনি বললেন: “আমি এই দুই ব্যক্তির কথা শুনে ফেলেছি। আমাকে এই ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে যে কথাগুলো জানানো হয়েছিল আমি সেগুলোকে মিথ্যা পেয়েছি, তারা শুনেছে যে আমি তাদের ব্যাপারে ভুল কথা বলি।” এভাবে মিথ্যা বলা যেতে পারে না। মানুষ তাদের সম্পর্কে ভুল কথা ছড়িয়েছিল এবং তাদের বদনাম করার দাওয়াত দিয়েছিল। এটাও সত্য ছিল যে এই লোকেরা খিলাফতের প্রত্যাশী ছিলেন। এটাও সত্য ছিল যে তারা হযরত হুসাইন (রা.)-এর বায়আত এবং তাঁর হকের ব্যাপারে মুখলিস ছিলেন যাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বড়জোর এটা হতে পারে যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াজিদকে নসিহত করেছিলেন যে সম্ভবত সে কামিয়াবি এবং সৌভাগ্য লাভ করবে যা থেকে মানুষ নিজ নিজ হিসাব অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করে নিয়েছে, কোনো مصلحت এবং প্রয়োজনে সম্ভবত এই ফরমান অবকাশ রাখে যে এমন مصلحتগুলোকে ফিতনা থেকে বাঁচাও।

□□□

কি আব্দুল রহমান বিন আবি বকর (রা.)-কে হুমকি দেওয়া হয়েছিল?

ইয়াজিদের উত্তরাধিকার মনোনয়নে সাহাবায়ে কেরামের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং নাজায়েজ মাধ্যম ব্যবহার করা এভাবেও প্রমাণিত যে খলিফা বিন খাইয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী বায়আত না করার কারণে আব্দুল রহমান বিন আবি বকর (রা.)-এর সাথে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর তিক্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে হুমকিও দিয়েছিলেন এবং এটাও বলেছিলেন: “তোমাকে যেন সিরিয়া থেকেই হত্যা না করে দেওয়া হয়।”

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৩, ২১৪, সনদ: ওয়াহাব বিন জারির আন জারির বিন হাজিম আন হাসান বিন রাশিদ আন যুহরি আন যাকওয়ান কাসিম, রাবি বুখারি ও মুসলিমের।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৩; মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড: ৯, পৃ. ৪০১; আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি, ১৯: ৩১৪, ত. মক্কা ইবনে তাইমিয়া।

[৩] অতঃপর মুয়াবিয়া দাঁড়ালেন যখন তারা তাকে অস্বীকার করল এবং বললেন, সাবধান! মানুষের কথাবার্তা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এই দলটির ব্যাপারে আমার কাছে এমন কিছু কথা পৌঁছেছিল যা আমি মিথ্যা পেয়েছি, অথচ তারা শুনেছে, আনুগত্য করেছে এবং উন্মত্ত যে শান্তিতে প্রবেশ করেছে তারাও তাতে প্রবেশ করেছে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া: ১/ ৩৩০; ৩৩১ এবং এটিই এই অধ্যায়ে সনদ ও মতন হিসেবে সবচেয়ে সহীহ, ত. আস-সাআদাহ)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই বর্ণনায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইবনে উমর (রা.) এবং ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতে এই ব্যক্তিদের ইয়াজিদের হাতে বায়আত করার কোনো উল্লেখ নেই, বরং সামনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ঘোষণায় রয়েছে: “سمعوا، واطاعوا، وبايعوا” (তারা শুনেছে, আনুগত্য করেছে এবং বায়আত করেছে)। [১]

অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কি মিথ্যা ঘোষণা করেছিলেন যে এই লোকেরা বায়আত করে নিয়েছে? এটা কি শরীয়ত অনুযায়ী জায়েজ?

জবাব: ঘটনার সঠিক রূপ সেটিই যা আমরা উপরে ‘হিলয়াতুল আউলিয়া’-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছি এবং সেই বর্ণনাটিই এই বিষয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ। যেখানে এই বর্ণনার প্রশ্ন, এর সনদে নুমান বিন রাশিদ রয়েছে যে সত্যবাদী (সদুক) কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। [২]

ইমাম বুখারী (রহ.) তার থেকে তালীকাত হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তার সম্পর্কে আরও বলেছেন:

“صدوق في حديثه وهم كثير” (সে তার হাদিসে সত্যবাদী কিন্তু তার অনেক ভুল/ভ্রম হয়)।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে সে মুদতারিবুল হাদিস (বর্ণনায় অস্থিরতা সৃষ্টিকারী) এবং মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বর্ণনা করে। ইবনে মাজিন, নাসাঈ এবং আবু দাউদও তাকে দুর্বল বলেছেন। [২] সম্ভব যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কিছু কথা তার থেকে ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এই বর্ণনার মাধ্যমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা সঠিক নয়।

□□□

ইয়াজিদের ভুল কাজের দায়িত্ব কি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর?

নিঃসন্দেহে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর উত্তরসূরি ইয়াজিদের আমলে কারবালার ঘটনা, হাররার ট্র্যাজেডি এবং মক্কা মুকাররমায় হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের মতো বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং এটি বাস্তবতা যে এই পরিস্থিতিগুলোর মোকাবিলায় ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সব পরিস্থিতি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের পর সামনে এসেছে। যখন তিনি ইয়াজিদকে মনোনীত করেছিলেন, তখন তিনি নিজের সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এবং ভবিষ্যতের পরিস্থিতির অনুমান করে এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এটি ৫৬ হিজরির কথা, এর পাঁচ বছর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কখনোই আশা করেননি যে তার পরে এমন সব ঘটনা ঘটবে বা ইয়াজিদ প্রজ্ঞার পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত নেবে বা বাড়াবাড়ি করবে।

তিনি নিজের পক্ষ থেকে নেক নিয়ত এবং উম্মতের কল্যাণ কামনায় ইয়াজিদের উত্তরসূরি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদি ফলাফল তার প্রত্যাশার বিপরীতে বের হয়, তবে তার নিয়তের ওপর আক্রমণ করা যায় না। আমাদের সাথেও প্রায়ই এমন হয় যে আমরা জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত খুব ভেবেচিন্তে এবং পূর্ণ নেক জজবায় করি কিন্তু পরে ফলাফল উল্টো বের হয়, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে সেই সিদ্ধান্তটি উপযুক্ত ছিল না। এখন এটি বলা যেতে পারে যে এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ এই সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের খাইন (বিশ্বাসঘাতক), বদনয়িত (মন্দ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত), দুশ্চরিত্র বা নির্বোধ বলে প্রচার করে, তবে আমাদের অনুভূতি কেমন হবে?

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১৩

[২] তাকরীবুত তাহযীব, তরজমা নম্বর: ৭১৫৩

এই ধরনের সিদ্ধান্ত অন্যান্য প্রবীণ সাহাবীদের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে। সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সিরিয়া অভিযানে প্রেরিত প্রাথমিক বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি রণকৌশলের বিপরীতে রোমানদের এলাকায় অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে যান এবং শত্রুর ঘেরাওয়ে পড়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অতি কষ্টে মাত্র কয়েকজন লোক নিয়ে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে সরিয়ে হযরত আবু উবাইদাহ, হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত শুরাহবিল বিন হাসনাহ (রা.)-কে এই অভিযানে নিযুক্ত করেন, যারা একের পর এক বিজয় লাভ করতে থাকেন। [১]

এখন যদি কেউ বলে যে, হযরত সিদ্দিক আকবর (রা.) হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.)-কে সেনাপতি বানিয়ে মুসলমানদের জন্য ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছিলেন, তবে কি একে সঠিক মন্তব্য বলা হবে?

হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত আবু উবাইদ সাকাফি (রা.)-কে ইরানের প্রাথমিক অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি একজন তাবেরী ছিলেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অধীনে রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। হযরত আবু উবাইদ (রা.) যে রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা মুসলমানদের চরম পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [২]

কিন্তু কেউ কি বলতে পারে যে, হযরত উমর (রা.) ভুল লোক নিয়োগ করেছিলেন, অথবা তাঁর লোক চেনার ক্ষমতা ছিল না, কিংবা এই পরাজয়ের দায়ভার আসলে তাঁর ওপর বর্তায়!!

অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। মানুষের সাধ্য রয়েছে সর্বোত্তম পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা, যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে শুরু করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ সময়ের প্রেক্ষাপটে যে সুযোগে যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তা-ই গ্রহণ করেছেন।

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৩৮৮

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৩/৪৪৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এবং কারবালার ঘটনা

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আন্দোলনকে কি বিদ্রোহ বা খুরুজ বলা যেতে পারে?

উত্তর: প্রথমত, জমহুর উলামায়ে ইসলামের কেউই এর প্রবক্তা নন। আল্লামা ইবনুল আরাবীর মতো দু-একজন ব্যক্তিত্ব এমনটি বলেছেন, তবে এটি স্পষ্ট যে এটি একটি শায উক্তি। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থাকে যদি শরয়ি দলিলের আলোকে দেখা হয়, তবে সেটিই প্রমাণিত হবে যার প্রবক্তা জমহুর উলামায়ে কেরাম।

যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তবে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আন্দোলনে রক্তপাত থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা এবং শান্তি বজায় রাখার দিকটিই প্রবল ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি এমন একটি সতর্ক পরিকল্পনা অনুসরণ করছিলেন যাতে খুরুজ বা বিদ্রোহের প্রয়োগ থেকেও বড় পরিসরে সুরক্ষা ছিল, যা সাধারণত বিভেদ ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা জরুরি:

- (১) হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথাও নিজে উদ্যোগী হয়ে মানুষকে অস্ত্র তুলে নেওয়ার উৎসাহ দেননি। তিনি যদি কেবল ক্ষমতার লোভী হতেন এবং যেকোনো মূল্যে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর হতেন, তবে সবার আগে তিনি হিজাজবাসীদের এর জন্য দাওয়াত দিতেন, বড় বড় সাহাবীদের নিজের সমর্থক বানাতেন, বনু হাশিমকে আশ্বস্ত করতেন, মদিনা ও মক্কায় সরকারের বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরি করতেন এবং নিজের চারপাশে অধিক থেকে অধিকতর জনসমাবেশ করার চেষ্টা করতেন। স্পষ্টতই লড়াইয়ের জন্য এই প্রচেষ্টাগুলো ছিল অপরিহার্য।

কিন্তু কোনো একটি বর্ণনা থেকেও এটি প্রমাণিত হয় না যে, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, এর জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে কোনো দলিল পেশ করেছিলেন অথবা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোথাও কোনো ভাষণ দিয়েছিলেন।

আপনি যদি এমনটি করতেন তবে মদিনা বা মক্কা থেকেই আপনার এত লোক জুটে যেত যে হিজাজে আপনার নিয়মিত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত; কারণ ওই সময় পর্যন্ত এখানে বনু উমাইয়ার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু আপনি রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে হারামাইন শরীফাইনের পবিত্রতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং এখানে অবস্থানের পুরো সময় জুড়ে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন।

- (২) যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপনি যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই ক্ষমতা লাভ করতে চেয়েছিলেন এবং এই কাজের সূচনা ইরাক থেকেই করতে চেয়েছিলেন, তবে সেখানে যাওয়ার আগে কুফাবাসীদের শহর দখল করার এবং উমাইয়া কর্মকর্তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ...

জারি করে দেওয়া কি কঠিন ছিল? এর জন্য আপনার আগে থেকেই কুফায় থাকা জরুরি ছিল না। আপনার কাজ তো ছিল নির্দেশ দেওয়া, যা বাইরে থেকে আরও নিরাপদভাবে হতে পারত। আর তর্কের খাতিরে যদি আপনি নিজের উপস্থিতিতেই ক্ষমতা উল্টে দিতে চাইতেন, তবে মক্কা থেকে একটি শক্তিশালী দল নিয়ে বের হতেন, যারা প্রয়োজনে আপনাকে রক্ষা করত এবং কুফাবাসীদের বিদ্রোহে সাহায্য করত।

(৩) শেষ পর্যায়ের কৌশল এটি হতে পারত যে, আপনি (রা.) এক-দুজন ব্যক্তির সাথে গোপনে কুফায় প্রবেশ করতেন এবং আত্মগোপন করে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু আপনি তাও করেননি। পুরো পরিবারকে নিয়ে এমনভাবে বের হয়েছেন যে গোপন সফর বা কোথাও আত্মগোপনের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। যে ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠিত সালতানাতের ভিত্তি উপড়ে ফেলার জন্য যুদ্ধ শুরু করতে চায়, সে কখনোই এমন কৌশল অবলম্বন করতে পারে না। এই আলামতগুলো আপনার (রা.) ‘যুদ্ধ-বিগ্রহের’ সংকল্পের বিষয়টিকে নাকচ করে দিচ্ছে। এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে এই বিশ্লেষণ আরও দৃঢ় হয় যে, আপনি (রা.) কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পতনের জন্য সেখানে যাচ্ছিলেন না।

সম্ভবত নারী ও শিশুদের সাথে নেওয়ার পেছনে এই হিকমতও কাজ করেছিল যে, যদি পথে পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায় এবং ইরাকে বনু উমাইয়ার শাসন অপ্রত্যাশিতভাবে সুসংহত হয়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রেও যেন আল্লাহর কুদরতের দরজা খোলা থাকে এবং বিরোধীরা যদি আপনাকে কোনো বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান মনে করে থাকে, তবে কাফেলার অবস্থা তাদের সেই ভুল ধারণা দূর করার জন্য যথেষ্ট হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, খুরুজ বা বিদ্রোহের প্রয়োগ তখন হয় যখন:

- ১. কোনো গোষ্ঠী একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়।
- ২. কোনো অঞ্চলের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে। [১]

হযরত হুসাইন (রা.) না কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, না শেষ পর্যন্ত কোনো অঞ্চলের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেছিলেন। বরং শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল। কুফার ওপরও কোনো সময় আপনার সমর্থকরা দখলদারিত্ব কায়েম করেনি।

তাই খুরুজের প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে!! বড়জোর খুরুজের ইচ্ছা বলা যেতে পারে।

আর তর্কের খাতিরে যদি খুরুজ প্রমাণিত হয়েও যায়, তবুও হযরত হুসাইন (রা.)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আসে না। কারণ তিনি ছিলেন মুজতাহিদ এবং এই পদক্ষেপ ইজতিহাদি ভুল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যদি হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খুরুজ অভিযোগযোগ্য না হয়ে বরং একটি ইজতিহাদি বিষয় হয়ে থাকে, তবে হযরত হুসাইন (রা.)-এর ওপর কীভাবে অভিযোগ তোলা বৈধ হতে পারে?

আর এতেও শেষ পর্যন্ত হযরত হুসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে সমঝোতার প্রস্তাব প্রমাণিত। যার পর তাঁর ওপর খুরুজের প্রয়োগ করার কোনো অবকাশই থাকে না, বরং জুলুম ও অন্যায়ের সমস্ত দায়ভার তাদের ওপর বর্তায় যারা সমঝোতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কলিজার টুকরা বাতুলকে নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল।

[১] কিছু ব্যক্তি এতে ইমামে আদিলের শর্তও যুক্ত করেন। আল্লামা আইনি (রহ.) সংজ্ঞাটি এভাবে দিয়েছেন: اهل البغي هم الخارجون على امام الحق بغير الحق। ‘বিদ্রোহী তারা যারা ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই হকের ইমামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।’ (আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ লি-বদরুদ্দিন আল-আইনি: ৭/২৯৮, আল-ইলমিয়াহ)। অর্থাৎ যদি ইমাম ন্যায়পরায়ণ না হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে খুরুজকে নাজায়েজ বলা যায় না। আর আহলে সুন্নাতের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ইয়াজিদকে ইমামে আদিল বলে থাকে, যেমনটি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন: ومن آمن بالله واليوم الآخر لا يختار ان يكون مع يزيد ولا مع امثاله من الملوك الذين ليسوا (রহ.)। ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে কখনোই ইয়াজিদ এবং তার মতো অন্যায় শাসকদের সাথে থাকা পছন্দ করবে না।’ (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ: ৪/৪৮৪)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

শুরুতে ইয়াজিদের বায়াত থেকে বিরত থাকা এবং শেষে সমঝোতায় রাজি হওয়ার কারণ কী?

প্রশ্ন: যদি হযরত হুসাইন (রা.)-এর শেষ পর্যন্ত ইয়াজিদের সাথে সমঝোতায় রাজি হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তার কারণ কী ছিল? যদি বায়াত জায়েজ ছিল তবে আগে কেন রাজি হননি? যদি নাজায়েজ ছিল তবে পরে কেন রাজি হলেন? এটি কি ভীৰুতা ছিল না?

উত্তর: হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে জোরালো কারণ ছিল। শুরুতে তাঁর নিকট ইয়াজিদের সরকারের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত ছিল না। তাই একটি উত্তম ও ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালানো খুরুজ-এর হুমকির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং এটিই ছিল দৃঢ় সংকল্পের কাজ। সুতরাং হযরত হুসাইন (রা.) এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইরাকে একটি আদর্শ সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন, এজন্যই ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখন ইরাকে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিবর্তিত দেখলেন এবং ইয়াজিদের সরকারের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন, তখন খুরুজ-এর হুমকি থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম মনে করলেন।

তাহাড়া হযরত হুসাইন (রা.) একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান পোষণ করতেন যার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী রাজনীতিকে শুরা-এর পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনা এবং উম্মতকে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র থেকে রক্ষা করা। ইরাক যাওয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। যদি শুরুতে ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করা হতো, তবে এই অভিযানের যৌক্তিকতাই শেষ হয়ে যেত। যখন ইরাকে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে, জনগণকে সাথে নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় হাত থেকে চলে গেছে, তখন তিনি মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিকল্প কৌশল অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ ইয়াজিদের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে তাকে সংস্কারে রাজি করানো এবং সংস্কার বাস্তবায়নের শর্তে বায়াত করা। এটি ভীৰুতা নয়, বরং কৌশলের পরিবর্তন ছিল। একারণেই তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের হাতে নিঃশর্ত বায়াতের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি এবং এর পরিবর্তে মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন; কারণ এমনটি করলে উদ্দেশ্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেত।

যদি তিনি দমে যাওয়ার বা মাথা নত করার লোক হতেন, তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়ে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের চার হাজার সৈন্যের সামনে রুখে দাঁড়ানোর পরিবর্তে আত্মসমর্পণ করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং একটি মহৎ উদ্দেশ্যের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ষাট জন কুফিবাসী সংক্রান্ত উপকথা এবং কারবালার ঘটনা অস্বীকার:

প্রশ্ন: বর্তমান যুগের একটি দলের দাবি হলো যে, হযরত হুসাইন (রা.) এবং ইয়াজিদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। কারবালায় কোনো যুদ্ধ হয়নি। মক্কা থেকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে ষাট জন কুফিবাসী রওনা হয়েছিল। কুফার নিকটবর্তী হয়ে হযরত হুসাইন (রা.) পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে সেই কুফিবাসীরাই জেদ ধরে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায়। এরপর তিনি যখন দামেস্কের দিকে রওনা হলেন, তখন এই কুফিবাসীরাই তাদের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে কারবালায় হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁকে শহীদ করে। উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের পাঠানো সরকারি বাহিনী আপনার নিরাপত্তার জন্য কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা পৌঁছানোর আগেই আপনি শহীদ হয়ে যান। উমর ইবনে সাদ প্রমুখের এতে কোনো হাত ছিল না। এই কথাগুলো কতটুকু সঠিক?

উত্তর: কারবালার ঘটনার এই নতুন রূপটি নিছক কাঁচা অনুমান এবং ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি; কারণ:

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — ২য় খণ্ড

(১) হযরত হুসাইন (রা.) এবং ইয়াজিদের মধ্যকার মতপার্থক্য এবং উমর বিন সা’দ-এর নেতৃত্বে প্রেরিত সরকারি বাহিনীর হাতে আপনার শাহাদাত সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। একে কেবল সেই ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে যে নিজের খেয়াল-খুশির গোলাম অথবা কোনো মূলনীতির প্রবক্তা নয়।

(২) মক্কা থেকে ষাট জন কুফাবাসীর সাথে চলার যে বর্ণনাটি অত্যন্ত জোরেশোরে বর্ণনা করা হয়, তা অত্যন্ত দুর্বল বরং ভিত্তিহীন। সাত শতাব্দী পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক এমন কোনো কথা উল্লেখ করেননি। সাত শতাব্দী পর শুধুমাত্র হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) এটি কোনো সনদ ছাড়াই নকল করেছেন। এই ইবারতটি ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ (৭০ হিজরীর ঘটনাবলি, সিফাত মাখরাজ আল-হুসাইন-এর অধীনে) বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) এটি এভাবে উল্লেখ করেছেন:

[১] فخرج متوجها الى العراق في اهل بيته وستين شيخا من اهل الكوفة

পাণ্ডুলিপিগুলোতে শব্দের পার্থক্য রয়েছে। অন্য একটি পাণ্ডুলিপির ইবারত হলো:

[২] فخرج متوجها اليهم في اهل بيته وستين شخصا من اهل الكوفة صحبتته

প্রথমত এই বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। তাছাড়া যদি এই বর্ণনাটি মেনেও নেওয়া হয়, তবুও এটি প্রমাণিত হয় না যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর ফিরে আসার পথে এরাই বাধা ছিল। দাবিদাররা নিজেদের অবস্থানের সপক্ষে আবু মিখনাফ-এর বর্ণনার এই অংশটি পেশ করেন:

فقال له بعض اصحابه انك والله ما انت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس اسرع اليك [৩]

কিন্তু এই ইবারতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে এরা পরামর্শদাতা ছিল নাকি নিছক সফরসঙ্গী ছিল। এর বিপরীতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোতে স্পষ্ট রয়েছে যে, এই জেদ আপনার চাচাতো ভাইয়েরা করেছিল। আমাদের আদ-দুহনী-এর হাসান বর্ণনায় রয়েছে:

“যখন আপনি (রা.) ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন মুসলিম বিন আকীল-এর ভাইয়েরা যারা আপনার সাথে ছিল, তারা আবেগের সাথে বলে উঠল: ‘আল্লাহর কসম! আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাব না যতক্ষণ না মুসলিমের রক্তের বদলা নিই অথবা নিজেরা সবাই নিহত হই।’ হযরত হুসাইন (রা.) বললেন: ‘তোমাদের ছাড়া বেঁচে থাকার স্বাদই বা কী!’” [৪]

সাদাত কিরাম-এর হত্যার দায়ভার ঐ ষাট জন কুফাবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং সরকারি বাহিনী, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও উমর বিন সা’দ-কে সম্পূর্ণ নির্দোষ বরং সাদাত কিরাম-এর হিফাযতকারী হিসেবে গণ্য করা একটি ভিত্তিহীন ধারণা ও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো দুর্বল বর্ণনাও এই দাবিকে প্রমাণ করে না। যেখানে হুসাইন বিন আব্দুর রহমান-এর সহীহ সনদ এবং আমাদের আদ-দুহনী-এর হাসান বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি ভিত্তিহীন বর্ণনায় কল্পনা মিশিয়ে পুরো কাহিনী তৈরি করা এবং সহীহ বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করা চরম গোঁড়ামির বহিঃপ্রকাশ।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৭০। অর্থাৎ হযরত হুসাইন (রা.) পরিবার এবং কুফার ষাট জন বৃদ্ধের সাথে ইরাকের দিকে রওনা হলেন।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৭৮। অর্থাৎ হযরত হুসাইন (রা.) মক্কা থেকে কুফাবাসীদের দিকে রওনা হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর পরিবার ও কুফার ষাট জন লোক ছিল যারা তাঁর সাথে মক্কা থেকে বের হয়েছিল।

[৩] তারিখ তাবারী: ৫/৩৯৮ (তাঁর কিছু সঙ্গী বলল: আল্লাহর কসম! আপনি মুসলিম বিন আকীল-এর মতো নন। আপনি কুফায় পৌঁছালে মানুষ অত্যন্ত দ্রুত আপনার চারপাশে সমবেত হবে।)

[৪] তারিখ তাবারী: ৫/৩৮৯, আমাদের থেকে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু) কেন শুরুতে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেননি?

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু) ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য একেবারে শেষ মুহুর্তে কেন প্রস্তুত হলেন? শুরুতেই দামেস্কে গিয়ে কেন সংস্কারের দাবি পেশ করেননি, আসলে এতে বাধা কী ছিল?

উত্তর: বাধা ছিল এই যে, শাসকরা নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থায় কোনো সংস্কারের প্রয়োজন মনে করতেন না। তাদের মতে তাদের শাসন পদ্ধতি একদম ঠিক ছিল। এমন সরকারের ওপর যতক্ষণ কোনো চাপ না পড়ে, তারা সংস্কারে রাজি হয় না। পরিস্থিতির এই দিকটিও বিশেষ গুরুত্ব রাখে যে, সরকার হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট থেকে বায়আত প্রত্যাশী ছিল। তাদের প্রথম ও শেষ দাবি ছিল হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু) যেন নিঃশর্ত বায়আত গ্রহণ করেন। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যদি বনু উমাইয়া শাসকদের সামনে ব্যবস্থার পরিবর্তনের মৌখিক আবেদন-নিবেদন করা হতো, তবে তার কোনো গুরুত্ব থাকত না। এর পরিবর্তে যদি নিজের সমর্থকদের একটি বড় দল নিয়ে সংস্কারের দাবি রাখা হতো, তবে তার একটি জোরালো চাপ সৃষ্টি হতো। সমর্থকদের সমাবেশের জন্য ইরাকের পরিবেশ বেশি অনুকূল মনে হচ্ছিল। তাই হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু) প্রথমে সেখানেই গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে যখন দেখলেন যে ইরাকবাসী সরকারের চাপে দমে গেছে, তখন তিনি শেষ পথ হিসেবে ইয়াজিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষ বায়আতের জন্য প্রস্তুত হলেন।

দলবদ্ধ হয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা কি জায়েজ?

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু) যদি দলবদ্ধ হয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইতেন, তবে তা কীভাবে জায়েজ ছিল? শরীয়তে এর অনুমতি কোথায় আছে? শরীয়ত তো সব অবস্থায় শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উচিত ছিল চোখ বন্ধ করে ইয়াজিদের আনুগত্য করা। যখন তিনি তা করেননি বরং শরীয়ত বিরোধী প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলেন, তখন ইয়াজিদ বা তার কর্মকর্তাদের ওপর আবশ্যিক ছিল তাকে শরীয়ত বিরোধী প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা। সুতরাং এই বাধা দেওয়ার জন্য তারা যা কিছু করেছে তাই সঠিক ছিল।

উত্তর: অবশ্যই ইসলাম আমাদের শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়, কিন্তু এই আনুগত্য নিঃশর্ত নয়, বরং শর্তযুক্ত। মুসলমান জায়েজ কাজে শাসকদের আনুগত্য করতে বাধ্য, নাজায়েজ কাজে নয়। যদি শাসকরা ভুল করে তবে ইসলাম নির্দেশ দেয় যে তাদের ভুলের সংশোধনের চেষ্টা করা হোক এবং কালিমায়ে হক উচ্চকিত করা হোক। কালিমায়ে হক উচ্চকিত করার ক্ষেত্রে যদি একক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর কার্যকর না হয়, তবে প্রজ্ঞা, কৌশল ও ইজতিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সামষ্টিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, যেমন বর্তমান যুগে উলামায়ে হক সরকারের ভুল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণকে একত্রিত করেন, সভা-সমাবেশ ও মিছিল বের করেন। এই সব বিষয় শরয়ী বৈধতার সীমানার ভেতরে এবং উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় বরং কোনো কোনো সময় ওয়াজিবও হয়ে যায়।

এই কথাটি যে, সৈয়দনা মুয়াবিয়া (রা.) মদিনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী মতভেদগুলোর প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত মনোযোগ দেননি যতক্ষণ না তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সুসংবাদপ্রাপ্ত বাহিনীর সাথে ইয়াজিদের নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি এই ফিতনাগুলোর অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন যা ওয়াজিব ছিল। তবে এর ফলাফল কী হয়েছে তা ভিন্ন বিষয়। হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর থেকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল, তা দমন করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। বিশেষ করে কুফী ও বসরার ফেতনা সৃষ্টিকারীরা যখনই সুযোগ পেত, তখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। তাদের দমন করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

হযরত হুসাইন (রা.) নিশ্চিতভাবেই একজন মুখলিস বান্দা ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ ছিল না, বরং তিনি ছিলেন উম্মতের কল্যাণকামী। তিনি যখন দেখলেন যে খেলাফতের নামে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং শরীয়তের বিধানগুলো অবহেলিত হচ্ছে, তখন তিনি এর প্রতিবাদ করা নিজের ঈমানি দায়িত্ব মনে করেছিলেন। তাঁর এই অবস্থান ছিল সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর অবস্থানের প্রতি তাদের অবজ্ঞা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী শোকের বার্তা বহন করে।

কি কারবালায় যুদ্ধের সূচনা হযরত হুসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে হয়েছিল?

.

প্রশ্ন: মাহমুদ আহমদ আব্বাসী তাঁর “খিলাফতে মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদ” গ্রন্থে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে এই দাবি করেছেন যে, যুদ্ধের সূচনা ফাতেমিদের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং কুফী বাহিনী কেবল তলোয়ার সরানোর জন্য দাঁড়িয়েছিল। এটি কি সঠিক?

.

উত্তর: এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন। মাহমুদ আব্বাসী ইসলামি ইতিহাস থেকে এর কোনো উদ্ধৃতি দেননি, বরং এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের একজন প্রাচ্যবিদের (Orientalist) একটি সনদবিহীন খবর নকল করেছেন। স্পষ্টতই এর কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না। এর বিপরীতে হুসাইন বিন আবদুর রহমানের সহিহ সনদে বর্ণিত এবং আন্নার বিন আবি আন্নারের হাসান বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, যুদ্ধের সূচনা কুফার সরকারি বাহিনীই করেছিল। আব্বাসী সাহেব এবং তাঁর অনুসারীদের কাহিনীগুলো, যা চৌদ্দশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছে, তা নিছক কল্পনাপ্রসূত। যদি এই ধরনের কাহিনীগুলো মেনে নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে যে কেউ সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করে কারবালার ঘটনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বলতে পারে যে, “খাইরুল্ল কুরুল্ল”-এ (উত্তম যুগে) এমন ট্র্যাজেডি সম্ভবই ছিল না; বরং হযরত হুসাইন (রা.) বিষক্রিয়ায় ইন্তেকাল করেছিলেন—যে চক্র তাঁর ভাইকে বিষ দিয়েছিল, তারাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। [১]

[১] আমি এই কথাটি তর্কের খাতিরে লিখেছিলাম, কিন্তু কয়েকদিন আগে প্রাপ্ত একটি পুস্তিকা দেখে আমি বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তাতে জটিল গবেষক সাহেব কারবালার ঘটনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে দাবি করেছেন যে, হযরত হুসাইন (রা.) অনেক আগেই ইয়াজিদের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের সময় যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন এবং সেখানেই সমাহিত হয়েছিলেন। মুখতা ও গোঁড়ামি মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! বাস্তবতা হলো, হযরত হুসাইন (রা.)-এর কনস্টান্টিনোপল জিহাদে অংশগ্রহণ করাও শক্তিশালী সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যার সনদ পাওয়া যায় না। এই ধরনের ভিত্তিহীন কথার ওপর অনুমানের প্রাসাদ নির্মাণ করা এবং তাকে গবেষণা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া আজকাল সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ইয়াজিদের হাতে পবিত্র মস্তকের অবমাননা প্রমাণিত নাকি নয়?

- প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রা.)-এর পবিত্র মস্তকের প্রতি ইয়াজিদের হাতে অবমাননার বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এটি কি সঠিক?
- উত্তর: এ বিষয়ে কোনো সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান নেই। মোট পাঁচটি বর্ণনা রয়েছে, প্রতিটির অবস্থা লক্ষ্য করুন:

১. মু'জামুল কাবীর তাবারানীতে লাইস বিন সাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন পবিত্র মস্তক ইয়াজিদের সামনে আনা হলো, তখন সে এই কবিতা আবৃত্তি করল:

نَفْلَقُ هَامًا مِنْ رِجَالٍ أَعَزَّةٍ عَلَيْنَا وَكَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمًا

(আমরা এসব লোকদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেই যারা আমাদের সাথে কঠোরতা করে এবং তারা অবাধ্য ও জালিম।)

এবং লাঠি দিয়ে পবিত্র মুখে আঘাত করল। ইয়াজিদের সাথে আবু বারযা আসলামী (রা.) বসা ছিলেন, তিনি এর প্রতিবাদ করলেন। [১]

“মাজমাউয যাওয়াইদ”-এ এই বর্ণনার রাবীদের নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে, [৩] কিন্তু এর বর্ণনাকারী ইমাম লাইস বিন সাদ (রহ.) ৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। [৪] তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারেন না। এভাবে বর্ণনায় ইনকিতা (সূত্রবিচ্ছিন্নতা) রয়েছে।

২. দ্বিতীয় বর্ণনাটিও মু'জামুল কাবীর তাবারানীতে রয়েছে যা দুটি সূত্রে বর্ণিত। প্রথমটিতে একজন রাবী মাজহুলুল হাল (অজ্ঞাত পরিচয়)। দ্বিতীয় সনদটি অত্যন্ত যয়ীফ (দুর্বল)।

৩. তৃতীয় বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আবিদ দুনইয়ার, যা হাফেজ ইবনে কাসীরও উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদে একজন রাবী মাজহুল। একজন রাবী সালিম বিন আবি হাফসা যয়ীফ। ইমাম নাসাঈ তাকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে হিব্বান বলেন, সে ঘটনাপ্রবাহে ওলটপালট করত এবং বর্ণনায় তার বিভ্রম হতো। [২] তদুপরি সে শিয়া মতবাদে চরম কটুরপন্থী ছিল। [৫]

৪. চতুর্থটি আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত যে, হুসাইন (রা.)-এর মস্তক দেখে ইয়াজিদ উল্লিখিত অহংকারমূলক কবিতা (নুফাল্লিকু হামান) পাঠ করে। আবু মিখনাফ থেকে এটিও বর্ণিত যে, ইয়াজিদ পবিত্র মস্তক দেখে লাঠি দিয়ে পবিত্র মুখে আঘাত করে যার ওপর আবু বারযা আসলামী (রা.) আপত্তি জানান। [৬] এই বর্ণনার দুর্বলতা স্পষ্ট, কারণ আবু মিখনাফ মিথ্যাবাদী (কাযযাব) হিসেবে প্রসিদ্ধ।

৫. পঞ্চম বর্ণনাটিও আবু মিখনাফের, যা লাইস বিন সাদের বর্ণনার অনুরূপ। [৭] দুর্বলতা স্পষ্ট।

[১] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ৩/১০৩, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ সংস্করণ।

[২] আল-মাজরুহীন লি-ইবনে হিব্বান: ১/৩৩৩, দারুল ওয়াঈ সংস্করণ।

[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড: ১৫১৩৮।

[৪] সয়ারু আলামিন নুবালা: ৮/১৩৭।

[৫] ইবনে সাদ বলেন: “সে চরম শিয়া মতাবলম্বী ছিল।” আবু মজিদ বলেন যে তিনি বনু উমাইয়ার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তওয়াফের সময় তালবিয়া এভাবে পড়তেন: “লাব্বাইক মুহলিকু বনী উমাইয়া লাব্বাইক” (হাজির হে বনু উমাইয়া ধ্বংসকারী, আমি হাজির)। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে সেই যুগে উমাইয়াদের প্রতি বিদ্বেষের আবেগ কতটা তীব্র ছিল। লেখকের বক্তব্য হলো, এই পরিবেশের কারণে কিছু বর্ণনাকারী বনু উমাইয়া সম্পর্কিত খবরে জালিয়াতি বা অতিরঞ্জন এবং কখনো প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে যারা উম্মতের পূর্বসূরীদের জ্ঞান ও ফন (কলাকৌশল) এবং ঘটনার আমানতদার ছিলেন না, তারা সাধারণ বর্ণনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তাই তারা ঘটনাগুলোকে হুবহু পেশ না করে তাতে পরিবর্তন এনেছেন। তাদের মধ্যে কিছু মিথ্যাবাদী ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখুন মুহাম্মদ বিন সাদ এখানে সালিম বিন আবি হাফসার শিয়া মতবাদকে কতটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তাই যদি মুহাম্মদ বিন সাদের সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের কিতাবে কোনো দুর্বল বা সন্দেহজনক বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সেগুলোকে সত্য মনে করার পরিবর্তে এমন বর্ণনাকারীদের ওপর চাপানো উচিত যারা ফিতনার যুগে বাড়াবাড়ির কারণে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। (তবকাতে ইবনে সাদ: ৬/৩৩৬, বৈরুত সংস্করণ)

[৬] তারীখে তাবারী: ৫/৩৬৫, আবু মিখনাফ আন কাসিম বিন বাখীত।

[৭] তারীখে তাবারী: ৫/৩৬৫।

সারকথা এই যে, এমন একটিও সহীহ বর্ণনা নেই যার দ্বারা ইয়াজিদ কর্তৃক পবিত্র মস্তকের অবমাননা করা প্রমাণিত হয়।

যাইহোক, যদি কেবল যঈফ বর্ণনাগুলোর সমষ্টি থেকে এই বিষয়টি বর্ণিত হতো এবং এর বিপরীতে কোনো সহীহ বর্ণনা না থাকতো, তবে ইতিহাসের মানদণ্ডে তা গ্রহণ করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু একটি সহীহ বর্ণনায় পরিস্থিতি এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে:

“মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের মুক্ত করা গোলাম জানিয়েছেন যে, যখন হুসাইন رضی اللہ عنہ-এর মস্তক আনা হলো এবং তা ইয়াজিদের সামনে রাখা হলো, তখন আমি তাকে কাঁদতে দেখলাম, সে বলছিল:

‘যদি ইবনে জিয়াদের সাথে হুসাইন رضی اللہ عنہ-এর কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতো, তবে সে এমনটি করতো না।’” [১]

এ ছাড়া ইয়াজিদের সাদাতদের দেখে অশ্রুসিক্ত হওয়া এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করাও ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং সাদাতদের সাথে উত্তম আচরণ করার পাশাপাশি যুক্তিগতভাবে এটি অত্যন্ত সুদূরপর্যায়ত যে, সে পবিত্র মস্তকের অবমাননা করবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمہ اللہ বলেন যে, যেসব সাহাবী যেমন আবু বারযাহ আসলামী رضی اللہ عنہ কর্তৃক ইয়াজিদকে হযরত হুসাইন رضی اللہ عنہ-এর পবিত্র মস্তকের অবমাননার জন্য ধমক দেওয়ার কথা যঈফ বর্ণনাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, সেই মহান ব্যক্তিগণ ওই সময়ে শামে ছিলেনই না। [২]

[১] তারিখ তাবারী: ৫/৩৯৩

[২] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৫৫৭

স্মরণ থাকে যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمہ اللہ ‘রাসুল হুসাইন’-এ বিস্তারিত আলোচনা করে এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন যে, হযরত হুসাইন رضی اللہ عنہ-এর মস্তক কারবালা থেকে দামেস্কে যাওয়া প্রমাণিত নয়। কিন্তু আমরা যতদূর বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করেছি, তাতে অগ্রগণ্য এটাই মনে হয় যে, পবিত্র মস্তক দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ইয়াজিদের সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং সে পবিত্র মস্তক দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিল বরং অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর প্রমাণ হলো এই সহীহ বর্ণনাটি যা হুসাইন বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এই সহীহ বর্ণনার শেষ অংশটিকে কেবল এই কারণে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এই শেষ অংশটি যে মওলা মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু যদি অন্যান্য বর্ণনাগুলো দেখা হয় যাতে এই মওলা মুয়াবিয়াকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তবে আর এই সংশয় থাকে না। এই মওলা মুয়াবিয়া হলেন কাসিম বিন আব্দুর রহমান দামেশকী। জারহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি সদুক হিসেবে গণ্য। হাফেজ যাহাবী رحمہ اللہ তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন: ‘আল-ইমাম মুহাদ্দিস দামেশক’।

তাছাড়া তার জীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি চল্লিশজন বদরী সাহাবীর জিয়ারত করেছেন। তিনি নিজে বলতেন যে, আমি একশজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। ইয়াহইয়া বিন মাস্ন তাকে সিকাহ বলতেন। তার যুহদ ও রিয়াজতের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তিনি ফাসতাতিনিয়া (কনস্টান্টিনোপল)-এ শরিক ছিলেন, তখন প্রতিদিন লঙ্গরখানা থেকে সবাইকে দুটি করে রুটি দেওয়া হতো। তিনি একটি রুটি আহার করতেন এবং অন্যটি সদকা করে দিতেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/১৯৩, ত. আর-রিসালাহ)

তাই তার মাধ্যমে পবিত্র মস্তক ইয়াজিদের কাছে পৌঁছানো সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়ে যায়। হ্যাঁ, পথে তা প্রদর্শন করা বা ইয়াজিদ কর্তৃক তার অবমাননা করা কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

ইয়াজিদ এবং মদিনায়ে কায়সারের হাদিস

প্রশ্ন: ইয়াজিদের ক্ষমা তো সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সহিহ বুখারিতে আছে: “أَوَّلُ جَيْشٍ” “আমার উম্মতের প্রথম যে সেনাবাহিনী কায়সারের শহরে জিহাদের জন্য যাবে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে ইয়াজিদ কায়সারের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণকারী প্রথম ইসলামি সেনাবাহিনীর আমির ছিল, তাই এই হাদিস অনুযায়ী তার ক্ষমা নিশ্চিত। তাহলে তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না দেওয়ার যৌক্তিকতা কী? [১]

উত্তর: প্রথমত, এই হাদিসের লক্ষ্যবস্তু ইয়াজিদ এবং তার বাহিনীকে সাব্যস্ত করা কোনো অকাট্য বিষয় নয়। এটি একটি সম্ভাবনা মাত্র। এই সম্ভাবনাকে গোঁড়ামির ভিত্তিতে নিশ্চিত মনে করে নেওয়া হয়েছে। ন্যায়বিচারের খাতিরে এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য:

হাদিসে ইয়াজিদের নাম নিয়ে ক্ষমার সুসংবাদ দেওয়া হয়নি। এই বর্ণনাকে আশাওয়ায়ে মুবাশশারার জাম্বাতি হওয়ার বর্ণনার সমপর্যায়ের মনে করা যাবে না, যাতে দশজন সাহাবীকে নাম ধরে ধরে জাম্বাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। নেক আমলের সাধারণ সুসংবাদ থেকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য ক্ষমার নিশ্চিত ফয়সালা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, হাদিসে নামাজির বিনা হিসাবে জাম্বাতে প্রবেশের সুসংবাদ আছে, কিন্তু কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, জায়েদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি, অতএব সে জাম্বাতি।

হাদিসে ‘কনস্টান্টিনোপল’ নয় বরং ‘মদিনায়ে কায়সার’ শব্দ এসেছে, অর্থাৎ কায়সারের রাজধানী। কায়সারের ইউরোপীয় রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল এবং এশীয় রাজধানী ছিল হিমস। তাই এই সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এই সুসংবাদের লক্ষ্যবস্তু সেই সেনাবাহিনী যারা হিমস জয় করেছিল। এই অভিযান হযরত উমর (রা.)-এর যুগে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছিল। [২]

হাদিসের সুসংবাদ ‘أَوَّلُ جَيْشٍ’ অর্থাৎ রোমান রাজধানীতে জিহাদকারী প্রথম সেনাবাহিনীর জন্য। এটি প্রমাণিত যে, কনস্টান্টিনোপল অভিযানের প্রথম সেনাবাহিনী হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে গিয়েছিল। [৩]

[১] সহিহ আল-বুখারি, হা: ২৯২৪, কিতাবুল জিহাদ, বাবু কিতালির রুম।

[২] হিমস জয়ে প্রখ্যাত সাহাবীগণ শরিক ছিলেন। এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা ছিল। এই শহরের প্রাচীর জয় করা যাচ্ছিল না। অবশেষে সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে তাকবির ধ্বনি দিলেন, যার ফলে হিমসের ভবনগুলোতে ফাটল ধরে গেল, খ্রিস্টানরা ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ শহরটি মুসলমানদের হাতে তুলে দিল। (ফুতুহুশ শাম লিল আজদি, পৃ. ১২২, ১২৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৬৪৯, দারু হাজার)।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৩৪। এই সেনাবাহিনী সেই স্থানে তাবু গেড়েছিল যেখানে এখন ইস্তাম্বুলের পূর্ব অংশ অবস্থিত। যদিও এই অভিযানে যুদ্ধের উপক্রম হয়নি, তবে জিহাদি অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হলেও তাকে ‘গাজওয়া’ বলা হয়, যুদ্ধ না হলেও জিহাদের পূর্ণ সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ অভিযান গাজওয়ায়ে তাবুকে কোনো যুদ্ধ হয়নি, তবুও একে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ এবং বড় আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই আক্রমণকে কনস্টান্টিনোপলের প্রথম জিহাদ হিসেবে না মানার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, যদি কেউ হাদিসের ‘يَغْزُونَ’ (যুদ্ধ করবে) শব্দ থেকে বিজয়ী জিহাদ উদ্দেশ্য নেয়, তবে তার লক্ষ্যবস্তু হবে কেবল সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ-এর সেনাবাহিনী, যিনি ৮৫৭ হিজরিতে (১৪৫৩ খ্রি.) কনস্টান্টিনোপল জয় করেছিলেন। ইয়াজিদের আগে এবং পরে কনস্টান্টিনোপলে হওয়া বাকি সমস্ত আক্রমণ এই সুসংবাদ থেকে বাদ পড়ে যাবে। আর যদি মদিনায়ে কায়সার দ্বারা হিমস উদ্দেশ্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সেনাবাহিনীই এই সুসংবাদের লক্ষ্যবস্তু হবে যারা প্রথম আক্রমণেই ‘মদিনায়ে কায়সার’ জয় করে নিয়েছিল।

সুতরাং যদি মেনে নেওয়া হয় যে “মদিনাতু কায়সার” দ্বারা কুসতুনতুনিয়া-ই উদ্দেশ্য, তবুও এই সুসংবাদ ইয়াজিদের জন্য সাব্যস্ত হতে পারে না; কারণ ইয়াজিদ, যে সেই সময় ছয় বছরের ছিল, নিশ্চিতভাবেই এই প্রথম জিহাদে শরিক ছিল না।

এই সমস্ত দিক উপেক্ষা করে যদি ইয়াজিদের বাহিনীকে এই হাদিসের সুসংবাদের লক্ষ্যবস্তু মেনে নেওয়া হয়, তবুও ইয়াজিদের বিষয়টি বড়জোর ক্ষমার আওতাধীন বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার নিশ্চিতভাবে ক্ষমা পাওয়া কোনোভাবেই প্রমাণিত হতে পারে না; কারণ:

- একটি হলো, নেক আমলের ফাজিলতে ক্ষমা লাভের পর তা ধরে রাখাও জরুরি। যদি কোনো ব্যক্তি এরপর মন্দ কাজ করে, তবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সে ফাসেক ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন:

“আমরা এটি বলি না যে আমাদের নেক আমলসমূহ কবুল এবং আমাদের গুনাহসমূহ মাফ, যেমনটি মুরজিয়ারা বলে থাকে। বরং আমরা বলি যে, যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল তার সমস্ত শর্তাবলি সহকারে এমনভাবে আদায় করে যে তা নষ্টকারী ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত থাকে, এবং সেই ব্যক্তি কুফর, ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) ও মন্দ আচরণের মাধ্যমে সেই নেক আমলকে নষ্ট না করে, এমনকি মুমিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তবে আল্লাহ এমন ব্যক্তির নেক আমল নষ্ট করবেন না, বরং তা কবুল করে সওয়াব দান করবেন।” [১]

এই কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি হজ করে আসে এবং এরপর মদ্যপান, সালাত ত্যাগ ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে কখনোই বলা হবে না যে যেহেতু সহিহ হাদিসে হাজির ক্ষমার ওয়াদা রয়েছে, তাই এই ব্যক্তি এখনও ক্ষমাপ্রাপ্ত।

- দ্বিতীয় শরয়ি বিধান হলো, হুকুকুল ইবাদ (বান্দার হক) কোনোভাবেই মাফ হয় না। বড় থেকে বড় নেক আমলের মাধ্যমেও তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না।

এমন অনেক নেক আমল রয়েছে যেগুলোর ওপর ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ হাদিসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: হাদিসে রয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে যায় যেমন শরৎকালে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে। [২] ঈদের সালাতের সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর ইজ্জত ও জালালের কসম খেয়ে সমস্ত রোজাদারদের ক্ষমার ঘোষণা দেন। [৩] শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়ার সাথে সাথেই তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। [৪] হাজির ব্যাপারে ওয়াদা রয়েছে যে, সে এমনভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে যেন সদ্যজাত শিশু। [৫] কিন্তু সুসংবাদগুলোর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি এই নেক আমল করে নিয়েছে সে এখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে।

যদি আমরা কুসতুনতুনিয়ার যুদ্ধে ইয়াজিদকে শরিক দেখে তাকে নিশ্চিতভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত বলি, তবে এটি এমন হবে যেন আমরা যেকোনো হাজি বা মুজাহিদকে ক্ষমাপ্রাপ্ত মনে করে নিলাম, চাই সে পরবর্তীতে মনভরে হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হুকুকুল ইবাদ (বান্দার হক) নষ্ট করতে থাকুক।

[১] আমরা এটি বলি না যে আমাদের নেক আমলসমূহ কবুল এবং আমাদের মন্দ কাজসমূহ মাফ, বরং আমরা বলি যে, যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল তার সমস্ত শর্তাবলি সহকারে এমনভাবে আদায় করে যা নষ্টকারী ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত থাকে, এবং কুফর, ইরতিদাদ ও মন্দ আচরণ তা বাতিল না করে, এমনকি সে মুমিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তা নষ্ট করবেন না বরং তার পক্ষ থেকে তা কবুল করবেন এবং তাকে এর প্রতিদান দেবেন। (আল-ফিকহুল আকবার, পৃষ্ঠা ৩৭)

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২১৫৫৬

[৩] শুআবুল ঈমান, হা: ৩৩৩৪, দুর্বল সনদসহ

[৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ১৯৪৬৭

[৫] সহিহ বুখারি, হা: ১৫২১, বাব ফাদলুল হাজ্জিল মাবরুর

শাহাদাতের চেয়ে বড় আমল আর কী হতে পারে যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ [সা.] বলেছেন: “আল্লাহর পথে নিহত হওয়া প্রতিটি গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।” [১] তিনি আরও বলেছেন: জান্নাতের একশটি স্তর আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। [২] তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সফরে বের হয়, তারপর মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয় তবে সে শহীদ, অথবা সে যদি ঘোড়া বা উট থেকে পড়ে মারা যায় বা কোনো বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে অথবা নিজের বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে তবে সে শহীদ এবং জান্নাতী। [৩]

রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর সাথে জিহাদ করা এবং তাতে প্রাণ দেওয়া নিশ্চিতভাবেই কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে অংশগ্রহণের চেয়ে অনেক বড় বিষয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ [সা.] নিজের সাথে জিহাদে নিহত হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত ক্ষমার নির্দেশ দেননি, বরং কাউকে কাউকে স্পষ্টভাবে জাহান্নামী বলেছেন।

এক জিহাদের পর সাহাবীগণ বললেন: “অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেছে।” রাসূলুল্লাহ [সা.] বললেন: “সে জাহান্নামে আছে।” পরে জানা গেল যে, সে শেষ মুহুর্তে জখমের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। [৪]

রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর সাথে জিহাদে প্রাণ দিয়েও যদি একজন ব্যক্তি একটি গুনাহের কারণে আযাবের যোগ্য হতে পারে, তবে ইয়াজিদ তো কনস্টান্টিনোপল অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে একটি বড় নেক কাজ করেছিল ঠিকই, এছাড়া তার আরও হাজারো নফল ও ফরজ নেক কাজ থাকতে পারে, কিন্তু তার পাঠানো লাগামহীন বাহিনী মদিনায় যা কিছু করেছে, তা দেখার পর রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর এই বাণীটিও সামনে রাখা উচিত:

“যে ব্যক্তি মদিনায় কোনো জুলুম করবে বা এখানে জুলুমকারীকে আশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।” [৫] এক হাদিসে আছে: “যে ব্যক্তি মদিনাবাসীকে আতঙ্কিত করবে, আল্লাহ তাকে আতঙ্কিত করবেন, তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।” [৬]

ইয়াজিদ মদিনাবাসীর সাথে যা কিছু করেছে এবং রাসূলুল্লাহ [সা.] এ ধরনের ব্যক্তিদের নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যে ইঁশিয়ারি শুনিয়েছেন, তা সত্ত্বেও কি কেউ দ্বিধাহীনভাবে ইয়াজিদের নিশ্চিত ক্ষমা এবং তার নেক আমল কবুল হওয়ার দাবি করতে পারে? সহীহ মুসলিমে আছে যে, এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তবে কি আমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? তিনি বললেন: “হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে সবার করে, সওয়াবের আশায় এবং পিঠ না দেখিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে শহীদ হও।”

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ [সা.] সাহাবীকে ডেকে বললেন: “তুমি কী জিজ্ঞেস করেছিলে?” তিনি প্রশ্নটি পুনরায় করলে তিনি বললেন: (একই উত্তর পুনরাবৃত্তি করলেন)।

[১] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ১৬৩০; মুসনাদে আহমদ।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৭৯০, কিতাবুল জিহাদ, বাব দারাজাতুল মুজাহিদ্দীন।

[৩] সুনান আবু দাউদ, হা: ২৪৯৯, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিমান মাতা গাযিয়া।

[৪] মুসনাদে ইবনুল জাদ, রেওয়ায়েত নম্বর: ২৯৩০; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হা: ৫৩৩২; আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২৯৬/১; ইবনে তাইমিয়াহ।

[৫] মান আহদাসা ফিহা হাদাসান আও আওয়া মুহদিসান ফালাইহি লানাতুল্লাহি ওয়াল মালাইকাতি ওয়ান নাসি আজমাদিন, লা ইয়াকবালু মিনহু সরফুন ওয়াল আদলুন। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩১৭৯) হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: “অধিকাংশের মতে ‘সরফ’ অর্থ ফরজ এবং ‘আদল’ অর্থ নফল... আর মুরাদ হলো জুলুম ও জালেম।” (ফাতহুল বারী: ৮১/৩)

[৬] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১৩৩/৭।

তারিখে মদিনা মুনাওয়ারা

এরপর হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন, তখন সবাই এই পরামর্শ দিলেন যে, এটি ভেঙে ফেলা হোক এবং এর স্থলে নতুন ইমারত নির্মাণ করা হোক। ফলে হযরত উমর (রা.) এটি ভেঙে ফেললেন এবং এর স্থলে নতুন ইমারত নির্মাণ করলেন যাতে পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং এর ছাদ সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন: যদি আমরা মসজিদের সম্প্রসারণ না করতাম, তবে মানুষের জন্য জায়গা সংকীর্ণ হয়ে যেত। তিনি মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বৃদ্ধি করেন এবং একে উত্তর দিকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি বলেছিলেন: যদি এই মসজিদ সানআ পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তবে এটি মসজিদে নববী হিসেবেই গণ্য হবে। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে মসজিদের দেয়ালগুলো ছিল কাঁচা ইটের এবং খুঁটিগুলো ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের। এবং ছাদ খেজুরের ডালপালা দিয়ে তৈরি ছিল। [২]

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ:

হযরত উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতকালে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি লোকজনের সাথে পরামর্শ করলে সবাই এর সমর্থন দেন। ফলে তিনি ২৯ হিজরিতে মসজিদের সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন। তিনি মসজিদের দেয়ালগুলো কারুকার্যখচিত পাথর এবং চুন দিয়ে নির্মাণ করান। এবং খুঁটিগুলোও কারুকার্যখচিত পাথরের তৈরি করান যার ভেতরে লোহা ভরা ছিল। এবং ছাদ সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। তিনি কিবলার দিক থেকেও বৃদ্ধি করেন এবং উত্তর দিক থেকেও। হযরত উসমান (রা.) যখন মসজিদের সম্প্রসারণের ইচ্ছা করলেন, তখন কিছু লোক এর ওপর আপত্তি তুলল। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।” [১] এই সম্প্রসারণে মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৬০ হাত এবং প্রস্থ ১৫০ হাত হয়ে যায়। নির্মাণের এই কাজ রবিউল আউয়াল ৩০ হিজরিতে সম্পন্ন হয়। [৩]

এরপর ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে মসজিদের সম্প্রসারণ হয়। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক মদিনার গভর্নর উমর বিন আব্দুল আজিজকে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। ফলে তিনি চারদিক থেকে মসজিদের সম্প্রসারণ করেন এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের হজরাগুলোও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই সম্প্রসারণে মসজিদের দৈর্ঘ্য ২০০ হাত এবং প্রস্থ ২০০ হাত হয়ে যায়। এই কাজ ৮৮ হিজরিতে শুরু হয় এবং ৯১ হিজরিতে সম্পন্ন হয়।

[১] সহীহ বুখারী: ৪৫০, সহীহ মুসলিম: ৫৩৩।

[২] সহীহ বুখারী: ৪৪৯, কিতাবুস সালাত, বাব বুনিয়ানুল মসজিদ।

[৩] সহীহ মুসলিম: ৫৩৩, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব ফজলু বিনাইল মসজিদ।

আপনি ﷺ আরও বলেছেন: “যে ব্যক্তি মদিনাবাসীকে আতঙ্কিত করবে, তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ।” [১]

এই হাদিসটি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াকয়া-এ-হাররাহ-এর সময় শুনিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নিকট সিরীয়রা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং শহর লুণ্ঠনকারী সৈন্যরা যদি এই শাস্তির যোগ্য হয়, তবে সৈন্য প্রেরণকারী কি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে? এই বিষয়টিও স্পষ্ট যে, হাদিসে যে কাজের ওপর অভিশাপ এসেছে তা কবির গুনাহ, আর কবির গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং ইয়াজিদের ফাসেক হওয়া এভাবেও প্রমাণিত।

আবার এই বিষয়টি ছিল হুকুল ইবাদ বা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই এটি কেবল ব্যক্তিগত ফাসেকির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং জুলুমের সীমানায় প্রবেশ করে। এজন্য ইয়াজিদ ন্যায়পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত থাকে না বরং অনিবার্যভাবে জালেমদের কাতারে शामिल হয়। ইয়াজিদ যদি একজন সাহাবীর পুত্র, উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ে থাকে এবং বায়তুল্লাহর হজ বা কুস্তনতুনিয়া জিহাদ করে থাকে, তবে কি এর কারণে সে আল্লাহর শরীয়তের উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল? আর এই সম্পর্ক ও নেক আমলগুলোর পর কি তার প্রতিটি কাজ জায়েজ বরং প্রশংসনীয় হয়ে গিয়েছিল?

এই সমস্ত প্রশ্ন প্রতিটি যুগে উম্মতের ওলামায়ে কেরামের সামনে ছিল, তাই মারওয়ানিরা ব্যতীত কেউ ইয়াজিদের সমর্থনের পতাকা উত্তোলন করেনি। যারই নিজের আখেরাতের চিন্তা থাকবে, সে এ বিষয়ে অন্তত সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করবে।

আল্লামা কাসতালানির ভুল উদ্ধৃতি:

এক ব্যক্তি যার কিতাবসমূহের ইবারত মুখস্থ থাকার অহংকার ছিল, লেখকের সাথে ইয়াজিদ ইস্যুতে বিতর্ক করার সময় বলতে লাগলেন: আল্লামা কাসতালানির মতো মহান মুহাদ্দিস এবং হাদিস ব্যাখ্যাকারী “আউয়ালু জাইশিন মিন উম্মাতি” এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

“কায়সারের শহর (রোম) প্রথম আক্রমণকারী ছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া। আর এই হাদিসে মুয়াবিয়ার জন্য ফজিলত রয়েছে কারণ তিনি প্রথম সমুদ্র অভিযান চালিয়েছিলেন, এবং তাঁর পুত্রের জন্য ফজিলত রয়েছে কারণ তিনি প্রথম কায়সারের শহর আক্রমণ করেছিলেন।”

লেখক জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি এই ইবারত কোথায় দেখেছেন?”

তিনি বলতে লাগলেন: “সহিহ বুখারীর ওপর মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর টিকায়।”

লেখক বুখারী শরীফ আনিয়ে তাঁকে দেখালেন। এর টিকায় মাওলানা সাহারানপুরী লিখেছিলেন:

“মদিনাতু কায়সার অর্থাৎ রোম সাম্রাজ্য। কাসতালানি বলেন: কায়সারের শহর প্রথম আক্রমণকারী ছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এবং তাঁর সাথে সাহাবীদের এক জামাত ছিল যেমন ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে জুবায়ের এবং আবু আইয়ুব আনসারী। আর আবু আইয়ুব হিজরি ৫২ সনে সেখানে ইন্তেকাল করেন। সমাপ্ত।”

এরপর মাওলানা সাহারানপুরী লিখেছেন:

“ফাতহুল বারীতে মুহাম্মাব বলেন: এই হাদিসে মুয়াবিয়ার জন্য ফজিলত রয়েছে কারণ তিনি প্রথম সমুদ্র অভিযান চালিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রের জন্য ফজিলত রয়েছে কারণ তিনি প্রথম কায়সারের শহর আক্রমণ করেছিলেন। আর ইবনে তীন এবং ইবনে মুনাইর এর ওপর আপত্তি তুলেছেন যার সারমর্ম হলো যে, এর থেকে এটি আবশ্যিক হয় না...”

[১] ইতহাফুল খাইরাতিল মাহারা লিল বুসিরি, খণ্ড: ৪৬৭৩, দারুল ওয়াতান সংস্করণ; আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি: ৭/১৩৩, ইবনে তাইমিয়া সংস্করণ।

তার সেই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এই শর্তে যে, কোনো বিশেষ দলিলের মাধ্যমে সে তা থেকে বের হয়ে যাবে না। কেননা আলেমগণ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: ‘তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে’, এটি তাদের ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হওয়ার শর্তযুক্ত। এমনকি যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ এই যুদ্ধের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে এই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি প্রমাণ করে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের মধ্যে যার মাঝে ক্ষমার শর্তাবলি পাওয়া যাবে, সে-ই ক্ষমাযোগ্য হবে। সমাপ্ত।

লেখক এই উদ্ধৃতিগুলো দেখিয়ে বললেন:

“আপনি উদ্ধৃতিটি মুখস্থ তো করেছেন কিন্তু হয় বোঝেননি অথবা জেনেশুনে খেয়ানত করেছেন। আল্লামা কাসতালানি শুধু এটি উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াজিদ এই যুদ্ধে সাহাবীদের সাথে শরিক ছিল। এই হাদিসের ভিত্তিতে ইয়াজিদকে কোনো প্রশংসার অধিকারী সাব্যস্তকারী আল্লামা কাসতালানি নন, বরং তিনি হলেন মুহাম্মাব বিন আহমদ। আল্লামা সাহারানপুরি মুহাম্মাবের এই উদ্ধৃতিটি হাফেজ ইবনে হাজারের ফাতহুল বারি থেকে নিয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজারও মুহাম্মাবের এই উদ্ধৃতিটি সমর্থনের জন্য নয় বরং খণ্ডন করার জন্য উদ্ধৃত করেছেন। এই কারণেই তিনি এর পরে ইবনুত তীন এবং ইবনুল মুনিরের পর্যালোচনা উদ্ধৃত করেছেন, যা এই স্বীকৃত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে যে, কোনো আমলের ওপর ক্ষমার সাধারণ সুসংবাদ বর্ণিত হওয়ার কারণে সেই আমলকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আবশ্যিকভাবে সেই সুসংবাদের অধিকারী হয়ে যায় না; বরং ক্ষমার শর্তাবলি লঙ্ঘনকারী সেই সুসংবাদ থেকে বের হয়ে যায়।”

সেই ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন: “হয়তো মাওলানা সাহারানপুরি উদ্ধৃতিতে পরিবর্তন বা বিকৃতি করেছেন। আল্লামা কাসতালানির পূর্ণ উদ্ধৃতি পেশ করেননি। তাতে তো সেই কথাই লেখা ছিল যা আমি বলছিলাম।”

লেখকের কাছে তখন আল্লামা কাসতালানির ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ইরশাদুস সারি’ বিদ্যমান ছিল না। কয়েক দিন পর তা সংগ্রহ করলাম এবং ‘মদিনায়ে কায়সার’ (কায়সারের শহর) সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যা দেখলাম। বিস্ময়ের সীমা রইল না যে, মানুষ গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে কতটা ভুল ব্যাখ্যা করে। আল্লামা কাসতালানির পূর্ণ উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হলো:

“কায়সারের শহর প্রথম আক্রমণকারী ছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এবং তার সাথে সাহাবীদের একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন যেমন ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে জুবায়ের এবং আবু আইয়ুব আনসারি। আবু আইয়ুব হিজরি ৫২ সনে সেখানে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাব এর দ্বারা ইয়াজিদের খিলাফত সাব্যস্ত হওয়া এবং সে জান্নাতি হওয়ার দলিল পেশ করেছেন, কারণ সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: ‘তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে’-এর সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এটি বনু উমাইয়াদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে করা হয়েছে। আর তার সেই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে এটি আবশ্যিক হয় না যে, সে কোনো বিশেষ দলিলের মাধ্যমে তা থেকে বের হবে না। কেননা এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: ‘তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে’, এটি তার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হওয়ার শর্তযুক্ত। এমনকি যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ এই যুদ্ধের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে এই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি ইবনুল মুনির বলেছেন।”

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

এবং তাদের কেউ কেউ যা মাওলা সাদ আদ-দীন বর্ণনা করেছেন তাতে ইয়াজিদের ওপর লানত করাকে বৈধ বলেছেন, কারণ সে যখন হুসাইন (রা.)-কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল এবং তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং নবী ﷺ-এর আহলে বাইতকে অপমান করেছিল, তখন সে কুফরি করেছিল। যদিও এর বিস্তারিত বিবরণ আখবার-ই-আহাদ (একক বর্ণনা), কিন্তু এর অর্থ মুতাওয়াতির (অকাট্যভাবে প্রমাণিত)। সুতরাং আমরা তার অবস্থা সম্পর্কে নয়, বরং তার ঈমান সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত। তার ওপর এবং তার সাহায্যকারী ও সহযোগীদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। সমাপ্ত।

আর যারা নিষেধ করেন তারা এই দলিল পেশ করেন যে, নবী ﷺ নামাজি এবং যারা আহলে কিবলা তাদের ওপর লানত করতে নিষেধ করেছেন।

(অনুবাদ) কায়সারের শহরে প্রথম আক্রমণকারী ছিল ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া। তার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের এবং আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের একটি দল ছিল। আবু আইয়ুব (রা.) সেখানেই ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মুহাল্লাব এই হাদিস থেকে ইয়াজিদের খিলাফত সাব্যস্ত হওয়া এবং তার জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন যে, সে নবী ﷺ-এর বাণী ‘মাগফুর লাহুম’ (তাদের ক্ষমা করা হয়েছে)-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, বনু উমাইয়াদের প্রতি পক্ষপাতের কারণে এই কথা বলা হয়েছে।

[১]

কারো এই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে কোনো বিশেষ কারণে এই সুসংবাদ থেকে বহিষ্কৃত হতে পারবে না; কারণ এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ‘মাগফুর লাহুম’ এই শর্তের সাথে যুক্ত যে, সেই বান্দা ক্ষমার যোগ্যও হতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই জিহাদের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তবে সবার ঐকমত্য যে সে এই সাধারণ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই কথা ইবনুল মুনাইর বলেছেন।

কিছু লোক মাওলানা সাদ আদ-দীন (তাফতাজানি) থেকে বর্ণিত কথার কারণে ইয়াজিদের ওপর লানত করাকেও জায়েজ বলেছেন। কারণ হযরত হুসাইন (রা.)-কে হত্যার নির্দেশ দেওয়া, তাতে আনন্দিত হওয়া এবং আহলে বাইতকে লাঞ্ছিত করার কারণে সে কাফের হয়ে গিয়েছিল, যেমনটি এই বিষয়গুলো তাওয়াতুর-ই-মানবী (অর্থগতভাবে অকাট্য) দ্বারা প্রমাণিত, যদিও এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আখবার-ই-আহাদ। সুতরাং আমরা ইয়াজিদের অবস্থার ব্যাপারে নয়, বরং তার ঈমানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত (তাওয়াক্কুফ করি)। তার ওপর এবং তার আনসার ও সাহায্যকারীদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। আর যারা (লানত থেকে) নিষেধ করেন, তাদের দলিল হলো নবী ﷺ নামাজি এবং আহলে কিবলার ওপর লানত করতে নিষেধ করেছেন। [২]

পাঠকগণ! আল্লামা কাসতালানি (রহ.)-এর বক্তব্য তার অর্থের দিক থেকে একদম স্পষ্ট। ইয়াজিদের মাসআলায় তিনি জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা)-এর সাথে রয়েছেন। তার কোনো বক্তব্য থেকে ইয়াজিদের সমর্থনের কোনো দিক প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

[১] মুহাল্লাব আন্দালুসের আলমেরিয়া শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বুখারীর প্রাথমিক ব্যাখ্যাকারীদের একজন। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জন্মভূমিতে পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বনু উমাইয়াদের শাসন ছিল, তাই সেখানকার কিছু আলেম বনু উমাইয়াদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন।

[২] ইরশাদ আস-সারী লি-শারহি সহীহ আল-বুখারী লিল-কাসতালানি: ৫/১০৪, ১০৫, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা কিল্লা ফি কিতালির রুম। তাবা আল-মাকতাবাতুল আমিরিয়া।

তজকিরাহ সাযিদ্দুনা ইমাম হুসাইন

৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

সাযিদ্দুনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মহান ব্যক্তিত্ব কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর সীরাত ও চরিত্র, তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্ব এবং তাঁর আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসের এমন এক উজ্জ্বল অধ্যায় যার উদাহরণ মেলা ভার। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক আমাদের জন্য পথনির্দেশনা স্বরূপ। তিনি সত্যের খাতিরে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন কিন্তু বাতিলের সামনে মাথা নত করেননি। তাঁর এই উত্তম আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা।

আলোচ্য ‘তজকিরাহ সাযিদ্দুনা ইমাম হুসাইন’ গ্রন্থটি সেই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে। এই বইটিতে তাঁর জন্ম, শৈশব, যৌবন এবং এরপর কারবালার যুদ্ধের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে এই ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে পাঠকরা সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

এই বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো যাতে নতুন প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে ইসলামের ছাঁচে ঢালতে পারে। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং একে আমাদের সবার জন্য নাজাতের উসিলা বানান। আমীন।

- সাযিদ্দুনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত ও মর্যাদা
- কারবালা ঘটনার কারণ ও প্রেক্ষাপট
- কারবালার ময়দানে হক ও বাতিলের লড়াই
- আহলে বাইতের মহান আত্মত্যাগ
- ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের প্রভাব
- ইয়াজিদি চরিত্রের শিক্ষণীয় পরিণতি
- কারবালার পয়গাম ও আমাদের দায়িত্বসমূহ

ইয়াজিদ বা তার মতো লোকদের ব্যাপারে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ)-এর অবস্থান উল্লিখিত চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আসহাবে জারহ ওয়া তা'দীল এবং মুহাদিসগণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজস্ব আমল ও চরিত্রের আলোকে যাচাই করেছেন এবং ফয়সালা দিয়েছেন যে, “ইয়াজিদ ফাসেক ছিল, সে হাদিস বর্ণনার যোগ্য ছিল না, সে ন্যায়পরায়ণ ছিল না বরং জালেম ছিল।” এটা কেমন মানদণ্ড যে, যদি ইয়াজিদের ফুফু উম্মে হাবিবা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকাহে ছিলেন অথবা তার পিতা সাহাবী ছিলেন অথবা তার পুত্ররা নেককার ছিলেন, তবে তার নিজের প্রমাণিত মন্দ কাজগুলোকেও পুরোপুরি অস্বীকার করা হবে? আর এটাও নিছক মুখুতা যে, যদি ইয়াজিদ মন্দ হয় তবে এই হুকুম তার সন্তান এবং বাপ-দাদার ওপরও জারি হবে। এটাও স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব যে, যদি তার সন্তানাদি এবং বাপ-দাদাকে জালেম মনে না করা হয় তবে ইয়াজিদও ন্যায়পরায়ণ হবে।

যেভাবে রাফেজিরা বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে ইয়াজিদের মন্দ কাজের কারণে তার বাপ-দাদাকেও গালিগালাজ করে, তেমনিভাবে নাসিবির পক্ষপাতের পট্টি চোখে বেঁধে ইয়াজিদের বড়দের ও ফুফুদের দ্বীনদারি থেকে ইয়াজিদের নেককার হওয়ার দলিল পেশ করে। এই যুক্তি অনুযায়ী তো ইসলামের বিখ্যাত শত্রু ইহুদি সর্দার হুয়াই বিন আখতাবকেও উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)-এর পিতা এবং হুজুর (সা.)-এর শ্বশুর হওয়ার কারণে মুমিন ও নেককার হওয়া উচিত এবং সেই সমস্ত বর্ণনাকে সাবায়ী বর্ণনা হিসেবে গণ্য করা উচিত যেগুলোর মতে সে ইহুদি ছিল এবং কুফরি অবস্থায় নিহত হয়েছিল।

ইয়াজিদের বংশধর, মারওয়ানের বংশধর এবং আব্দুল মালিকের বংশধরের সাথে বনু হাশিমের আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে ইয়াজিদের নির্দোষিতা কীভাবে প্রমাণিত হতে পারে? সেটি ছিল খাইরুল্ল কুর'ুন (উত্তম যুগ) এবং তাতে কল্যাণ ও নেকির প্রাধান্য ছিল। বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়াসহ অধিকাংশ গোত্রের অধিকাংশ লোক নেককার ও দ্বীনদার ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং ইতিহাস ও হাদিসের ভাণ্ডার এটাও প্রমাণ করে যে, এর বিপরীতেও কিছু উদাহরণ ছিল এবং কিছু লোক মন্দও ছিল। তবে মানুষের মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি অবশ্যই ছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার প্রেক্ষিতে কোনো বংশের কয়েকজন মন্দ লোকের কারণে সেই বংশ এবং বংশপরম্পরার প্রত্যেক ব্যক্তিকে মন্দ মনে করার এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বোকামি করেনি। এই কারণেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় ছিল। আবার বিশেষ করে বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়ার অনেক বুদ্ধিমান লোক এই নিয়তেও আপসে আত্মীয়তা করেছেন যাতে কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষপাতের খেসারত পুরো গোত্রকে দিতে না হয় এবং যতটুকু সম্ভব পারস্পরিক সদ্যবহারের মাধ্যমে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু এর থেকে এই অর্থ কীভাবে বের করা যেতে পারে যে, যাদের পক্ষপাতিত্ব এবং যাদের দ্বারা জুলুম সংঘটিত হওয়া প্রমাণিত, তাদেরকে নির্দোষ মেনে নেওয়া হবে।

যদি আমাদের আধুনিকতাবাদীদের যুক্তির জোর এই অবস্থায় থাকে, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই যে কিছুদিন পর কেউ এই দাবিও করে বসবে যে, ইবনে আবি সুলুল মুনাফিক ছিল না, বরং অনেক বড় مسلمان (মুসলমান) ছিল; কারণ তার সাহেবজাদা আব্দুল্লাহ (রা.) সাহাবী এবং আশেকে রাসূল ছিলেন এবং তার কন্যা জামিলা (রা.)-ও সাহাবীয়া ছিলেন, সুতরাং তার দোষত্রুটির বর্ণনাগুলো সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর এটা খুবই সম্ভব যে, কোনো ব্যক্তি আবু আমের রাহিবের মতো শয়তানকেও এই বলে বেলায়েতের মর্তবায় আসীন করে দেবেন যে, গাসিলুল মালাইকা হযরত হানজালা (রা.)-এর মতো সাহাবী তার কলিজার টুকরো ছিলেন এবং জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর মতো সাহাবীয়া তার পুত্রবধূ ছিলেন, অতএব তার বিরুদ্ধে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো ইসলাম শত্রুদের তৈরি করা।

আর এতে কোনো বিচিত্রতা নেই যে, কোনো সাহেব এমন দাবিও করে বসবেন যে মুখতার কাযযাবের দোষ-ত্রুটি সংক্রান্ত সমস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনা বানোয়াট। না সে কাযযাব ছিল, না সে নবুওয়াতের দাবি করেছিল। কারণ তার পিতা হযরত আবু উবাইদ সাকাফী হযরত উমর (রা.)-এর সেনাপতি ছিলেন যিনি ইরানীদের সাথে জিহাদে শহীদ হয়েছিলেন এবং মুখতারের বোন সাফিয়্যাহ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। [১] যদি মুখতার কাযযাব হতো, তবে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্বের আত্মীয়তার জন্য কী কমতি ছিল যে তিনি একজন কাযযাবের বোনকে স্ত্রী বানাতেন? মোটকথা, ব্যক্তিত্ব যাচাইয়ের এই অদ্ভুত মানদণ্ড কেবল ইতিহাসের পুরুষদেরই নয় বরং ইলমুর রিজালকেও বদলে দেবে। এই ধরনের দুর্বল দলিলের ওপর যদি বিশ্বাস করা হয়, তবে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম চরিত্রগুলোও হাউজে কাউসারের পানি দিয়ে ধুয়ে পবিত্র হয়ে যাবে।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বিরোধীদের সাথে এই ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই কল্যাণ নিহিত ছিল যে বিরোধীদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং তাদের শত্রুতার পরিবর্তে ইনসাফের শিক্ষা দেওয়া যাবে। যারা রাজনৈতিক স্বার্থে গোঁড়ামি বজায় রাখতে চাইত, তারা এই ধরনের আত্মীয়তার বিরোধিতা করত।

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.)-এর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এর আগে খলিফা ইয়াজিদদের ভাই খালিদ বিন ইয়াজিদ হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বোন রামলাহকে বিবাহ করেছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন এই বিবাহের খবর পেলেন, তখন তিনি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে চাইলেন। আব্দুল মালিক জিজ্ঞেস করলেন: শেষ পর্যন্ত এতে ক্ষতি কী? খালিদ বিন ইয়াজিদ বললেন: “যখন থেকে আমি রামলাহ বিনতে জুবায়েরকে বিবাহ করেছি, আমার অন্তর থেকে জুবায়ের পরিবারের প্রতি শত্রুতা চলে গেছে।” এ কথা শুনে আব্দুল মালিক চমকে উঠলেন যেন কেউ তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে কড়া নির্দেশ পাঠালেন যে তিনি যেন আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.)-এর কন্যাকে তালাক দিয়ে দেন। হাজ্জাজ তার প্রভুর নির্দেশের বিনাবাক্যে পালন করলেন। [২]

রইল হযরত জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ এবং বনু হাশিমের নেতৃত্ববৃন্দের কথা যে তারা কেন বনু উমাইয়্যাহ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, তার কারণ স্পষ্ট। এই মহান ব্যক্তিগণ নিজেদের পরিবারের ওপর হওয়া জুলুমের বিষয়টি আল্লাহর আদালতের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর মতো উম্মতকে বিভক্তি থেকে বাঁচাতে রাজনৈতিক বিষয়াদি থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। তারা জানতেন যে মজলুম ও নিঃস্ব হয়ে বেঁচে থাকা সেই ক্ষমতার লড়াইয়ে শরিক হওয়ার চেয়ে উত্তম যাতে মানুষের হাত একে অপরের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। মজলুমদের এই নির্লিপ্ততাকে জালিমদের নির্দোষ হওয়ার দলিল হিসেবে কীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? এটিও ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, যারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সাদাত কিরামের ওপর জুলুমে লিপ্ত ছিল, তারা খুব দ্রুতই আল্লাহর পাকড়াওয়ার শিকার হয়েছে। ইয়াজিদ অল্প বয়সেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় এবং তার শাসন ক্ষমতা তার পরিবারের হাত থেকেই বেরিয়ে যায়। উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ, শিমর, উমর বিন সাদসহ প্রত্যেকেই নিজ নিজ করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে। [৩]

[১] তাহযীবুল কামাল: ৩৫/২১২।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৭৫।

[৩] এদের পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে আসবে।

মোল্লা আলী কারীর ওপর ইয়াজিদকে সমর্থনের অভিযোগ:

প্রশ্ন: মোল্লা আলী কারী ইয়াজিদকে ন্যায়পরায়ণ ও নেককার মনে করতেন। তিনি লিখেছেন
ومن ذاك
الاحاديث في ذم معاوية وذم عمرو بن العاص وذم بنى امية ومدح المنصور والسفاح وكذا
الاحاديث في ذم معاوية وذم عمرو بن العاص وذم بنى امية ومدح المنصور والسفاح وكذا
الحكم (অর্থাৎ: আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুয়াবিয়ার নিন্দা, আমর ইবনুল আসের নিন্দা, বনু উমাইয়ার নিন্দা, আল-মানসুর ও আস-সাফফাহর প্রশংসা এবং অনুরূপভাবে ইয়াজিদ, ওয়ালিদ ও মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিন্দা সম্পর্কিত হাদিসসমূহ।)

উত্তর: মনে হচ্ছে আপনি মোল্লা আলী কারীর এই বইটির নাম এবং এর বিষয়বস্তু পর্যন্ত বুঝতে পারেননি। মোল্লা আলী কারী এই বইটি ঘটনাপ্রবাহের সত্যতা যাচাই বা খণ্ডনের জন্য সংকলন করেননি, বরং এই বইটির উদ্দেশ্য হলো সেই সব বর্ণনা খণ্ডন করা যেগুলোকে ওয়ায়েজ এবং কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকারীরা মারফু হাদিস অর্থাৎ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) অমুকের ফজিলত বা অমুকের নিন্দায় এই কথা বলেছেন। যেহেতু রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রকৃতপক্ষে হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিন্দা সম্পর্কে কিছুই বলেননি, বরং রাফেজিরা এমন সব মিথ্যা বর্ণনা প্রচার করেছে যে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং আমর ইবনুল আস (রা.)-কে জাহান্নামী ও কুকুর বলেছেন, তাই মোল্লা আলী কারী খণ্ডন করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে এমন কিছুই বর্ণিত হয়নি।

এটা স্পষ্ট যে রাফেজিরা তো হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) সম্পর্কেও আজোবাজে কথা বানিয়ে বর্ণনা করেছে, সেখানে ইয়াজিদ তো কোন ছার!! তাই তারা ইয়াজিদ সম্পর্কেও হাদিস বানিয়ে নিয়েছে যে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইয়াজিদের নিন্দায় অমুক অমুক কথা বলেছেন। মোল্লা আলী কারীর মতো আলেমদের ইনসাফপ্রিয়তা প্রশংসার দাবিদার যে, তারা ইয়াজিদের মন্দ দিকগুলো ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননি এবং তার বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হাদিসগুলোর মিথ্যা হওয়া স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কীভাবে সঠিক হতে পারে যে ইয়াজিদ খারাপ ছিল না? নিশ্চিতভাবেই রাসুলুল্লাহ (সা.) তার নাম নিয়ে তার নিন্দায় কিছু বলেননি, কিন্তু কোটি কোটি ফাসেক ও ফাজের বরং কাফের ও মুশরিক এমন আছে যাদের রাসুলুল্লাহ (সা.) নিন্দা করেননি, তবে কি এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হবে যে তারা ভালো লোক?

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হালাকু খান অত্যন্ত জালেম ব্যক্তি ছিল। এখন কোনো ওয়ায়েজ যদি হালাকু খানের সাথে শত্রুতা মেটানোর জন্য এই স্বরচিত কথা বলে দেয় যে হুজুর (সা.) হালাকু খানকে জাহান্নামী ও দাজ্জাল বলেছিলেন, আর এই তথ্য পাওয়ার পর কোনো মুহাদ্দিস তার কিতাবে ব্যাখ্যা করে দেন যে হালাকু খানের নিন্দা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো বাণী বর্ণিত নেই, বরং তার নিন্দার বর্ণনাগুলো জাল, তবে কি এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে হালাকু খান নেক লোক ছিল? যদি এখনও কথাটি বুঝে না আসে তবে মোল্লা আলী কারীর এই ইবারত (উদ্ধৃতি) থেকে একটু সামনে দেখুন, তিনি বলেন: **كل حديث** **وكذا** (অর্থাৎ: এবং অনুরূপভাবে বাগদাদের প্রশংসা ও নিন্দা সম্পর্কিত প্রতিটি হাদিস।)

এখন এর অর্থ কি এই হবে যে বাগদাদে প্রশংসনীয় কোনো বিষয় নেই, আবার নিন্দনীয়ও কিছু নেই? এর নিন্দা দানকারীও মিথ্যাবাদী এবং এর প্রশংসা দানকারীও? এমন যুক্তি প্রদানকারীকে গবেষক বলা হবে নাকি বুদ্ধিহীন!!

[১] আল-আসারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাওদুআ, পৃ. ৭৭, ৩, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ইয়াজিদ সম্পর্কে মোল্লা আলী কারীর নিজস্ব মতামত তাই ছিল যা জমহুর ওলামায়ে ইসলামের ছিল, چنانچہ তিনি লিখেন:

“আবু হুরায়রা (রা.) (জালেম শাসকদের বৈশিষ্ট্য) এর মধ্য থেকে কিছু ইশারায় বর্ণনা করতেন এবং তাদের (শাসকদের) পক্ষ থেকে নিজের জীবনের আশঙ্কায় স্পষ্টভাবে বলতেন না, যেমনটি তাঁর বক্তব্য ছিল: আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই ষাট হিজরি এবং বালকদের শাসন থেকে। তিনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার খেলাফতের দিকে ইশারা করতেন কারণ তা ষাট হিজরিতে হয়েছিল, আর আল্লাহ তাআলা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর দোয়া কবুল করে নেন, ফলে তিনি ইয়াজিদের খেলাফতের এক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন।” [১]

এছাড়া তিনি ইয়াজিদের জুলুমের কথা উল্লেখ করে লিখেন: “ওয়াকিয়ায়ে হাররা ইসলামি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার যুগে সংঘটিত হয়েছিল যখন মদিনাকে ইয়াজিদের সেই সিরীয় বাহিনী লুণ্ঠন করেছিল যাকে সে মদিনার সাহাবী ও তাবয়ীদের সাথে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছিল।” [২] এরপরও কি কেউ এই ধারণা পোষণ করতে পারে যে মোল্লা আলী কারী ইয়াজিদকে ন্যায়পরায়ণ ও নেককার সাব্যস্ত করতেন?

ইয়াজিদের সমর্থনে আল্লামা ইবনুল আরাবীর ভিত্তিহীন দলিল:

প্রশ্ন: আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবী “আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম”-এ ইয়াজিদের ফাসেক হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন: “যদি বলা হয় ইয়াজিদ মদ্যপ ছিল তবে আমরা বলব এই কথাটি কেবল দুইজন সাক্ষীর মাধ্যমেই প্রমাণিত হতে পারে, সুতরাং কে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।” ইবনুল আরাবীর এই দলিলের কি কোনো জবাব আছে?

উত্তর: এই দলিলটি অত্যন্ত অদ্ভুত। যদি এটি মেনে নেওয়া হয় তবে কেবল ইতিহাসই নয় বরং সিরাতে নববী এবং সিরাতে সাহাবায় বর্ণিত অধিকাংশ নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের মন্দ কাজগুলোকেও অস্বীকার করতে হবে। যদি এখানে ইয়াজিদকে কোনো আদালতে পেশ করে তার ওপর শরয়ি হদ জারি করার বিষয় হতো তবে আল্লামা ইবনে আরাবী ইয়াজিদের উকিল হয়ে দুইজন সাক্ষীর দাবি করতে পারতেন কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দাবি করা সম্পূর্ণ ভুল। যদি একে দলিলের মানদণ্ড মেনে নেওয়া হয় তবে:

- কোনো রাফেজি বলতে পারে যে: যদি সত্যিই আব্দুল্লাহ বিন সাবা ষড়যন্ত্রকারী হতো তবে তার কোনো ফিতনা সৃষ্টির ওপর দুইজন সাক্ষী পেশ করা হোক।
- কোনো খারেজি বলতে পারে যে: হযরত আলী (রা.)-এর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। যদি কেউ হত্যা করে থাকে তবে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কে ছিল?
- বিজেপি সমর্থকরা বলতে পারে যে নরেন্দ্র মোদি তো অত্যন্ত নিষ্পাপ। তার বিরুদ্ধে গুজরাট হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নিয়ে আসুন যারা সাক্ষ্য দেবেন যে হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ মোদি দিয়েছিল।
- কেউ এও বলতে পারে যে বাগদাদ আক্রমণের নির্দেশ হালাকু খান দেয়নি, কারণ এর দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া যায় না।

[১] আবু হুরায়রা (রা.) তাদের ভয়ে নিজের জীবনের আশঙ্কায় কিছু বিষয় ইশারায় বলতেন এবং স্পষ্টভাবে বলতেন না, যেমন তাঁর কথা: আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই ষাট হিজরির শুরু এবং বালকদের শাসন থেকে। তিনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার খেলাফতের দিকে ইশারা করতেন কারণ তা হিজরি ষাট সনে ছিল এবং আল্লাহ তাআলা আবু হুরায়রার দোয়া কবুল করেন এবং তিনি এর এক বছর আগে ইন্তেকাল করেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ: ১/৩৩৫, কিতাবুল ইলম, ত দারুল ফিকর)

[২] ইসলামে এই ঘটনাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার দিনে ঘটেছিল যখন তার সিরীয় বাহিনী মদিনা লুণ্ঠন করেছিল যাদেরকে সে মদিনার সাহাবী ও তাবয়ীদের সাথে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছিল। (মিরকাতুল মাফাতিহ: ৮/৩৪০, কিতাবুল ফিতান, ত দারুল ফিকর)

মোটকথা আল্লামা ইবনুল আরাবীর এই যুক্তি এতটাই ভিত্তিহীন যে, এটি মেনে নিলে প্রতিটি যুগের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে পবিত্র ও নির্দোষ প্রমাণ করা সম্ভব। এই কারণেই উম্মতের জমহুর ওলামায়ে কেলাম আল্লামা ইবনুল আরাবীর মহান ইলমি খিদমতের স্বীকৃতি এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই একক ও দুর্বল বক্তব্যকে কখনোই গুরুত্বযোগ্য মনে করেননি।

ইয়াজিদের দুঃখ প্রকাশ করা বা হত্যার নির্দেশ না দেওয়া কি তার দায়মুক্তির দলিল?

প্রশ্ন: কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা এটি প্রমাণিত নয় যে, ইয়াজিদ কারবালা বা হাররার ঘটনায় জুলুমের নির্দেশ দিয়েছিল। তাই যা কিছু ঘটেছে তাতে ইয়াজিদের সম্মতি ছিল না। তার দুঃখ প্রকাশ করা প্রমাণ করে যে, যা ঘটেছে তা থেকে সে মুক্ত।

উত্তর: ইয়াজিদ ছিল একজন স্বৈরাচারী শাসক। তার পক্ষ থেকে এই ওজর কীভাবে যথেষ্ট হতে পারে যে, তার পক্ষ থেকে জুলুম ও নির্যাতনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি? এমন গুরুতর ও নাজুক বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি না হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সঠিক নির্দেশনা দেওয়া জরুরি ছিল।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.)-এর মালফুযাতে এক জায়গায় বর্ণিত আছে যে: “বাজারে যেখানে নারীদের ভিড় থাকে, সেখানে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য দৃষ্টি না দেওয়ার ইচ্ছা যথেষ্ট নয়, বরং দৃষ্টি না দেওয়ার সংকল্প করা জরুরি।”

অর্থাৎ সেখানে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এটি যথেষ্ট নয় যে, বান্দা বলবে আমার নারীদের দেখার ইচ্ছা ছিল না, শুধু নজর পড়ে গেছে; কারণ যেখানে আগে থেকেই গায়রে মাহরাম দেখার আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে সতর্ক হয়ে চলা উচিত। এই ইচ্ছা ও চেষ্টা করা জরুরি যে দৃষ্টি নিচু থাকবে। এরপরও যদি নজর পড়ে যায় তবে তা ক্ষমাযোগ্য। এই নিয়মই সব জায়গায় প্রযোজ্য। হত্যার নির্দেশ না দেওয়া থেকে ইয়াজিদের দায়মুক্তি প্রমাণিত হয় না যতক্ষণ না এটি প্রমাণিত হয় যে সে বাহিনীকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছিল।

যুক্তি ও বর্ণনা উভয় দিক থেকেই এটি প্রমাণিত যে, ইয়াজিদের পক্ষ থেকে সঠিক ও স্পষ্ট নির্দেশনা জারি করা হয়নি।

বর্ণনার দিক থেকে এভাবে যে, এমন কোনো যযীফ রেওয়ায়েতেও উল্লেখ নেই যে ইয়াজিদ নির্দেশ দিয়েছিল যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে ভালো ব্যবহার করা হোক, তাঁকে দামেস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। মদিনায় লুটতরাজ না হোক, মুসলমানদের মান-সম্মানের খেয়াল রাখা হোক।

যদি কেউ বলে যে, “ইয়াজিদ অবশ্যই এমন নির্দেশনা দিয়েছিল কিন্তু তা ইতিহাসে বর্ণিত হয়নি।” তবে বিবেক এই অনুমান মেনে নিতে পারে না; কারণ ইয়াজিদ যদি এই নির্দেশনা দিত, তবে তার অনুগত বাহিনী তার এতটা অবাধ্য হতে পারত না যে হযরত হুসাইন (রা.)-কে তাঁর সাথীদেরসহ হত্যা করে ফেলত অথবা শ্রেফ নিজের ইচ্ছায় মদিনায় লুটতরাজ চালাত। [১]

[১] ইয়াজিদের পক্ষ থেকে জারি করা যে শেষ নির্দেশনাগুলো ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, তাতে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে মুসলিম ইবনে আকীলের কাজ শেষ করার জন্য সাবাশি দেওয়া হয়েছিল এবং সীমান্তে গোয়েন্দা ও প্রহরী নিযুক্ত করার তাগিদের সাথে এই নির্দেশও ছিল যে, সন্দেহের ভিত্তিতে শত্রুকে হেফাজতে নিয়ে নেবে কিন্তু যুদ্ধ কেবল তার সাথেই করবে যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। এটিও বলা হয়েছিল যে, এমন পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ উন্নতি লাভ করে অথবা খড়্গটুর মতো নিচু স্তরে চলে যায়। (মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১৫/৩০১; তারিখুত তাবারানি: ৫/৩৮১) এই নির্দেশনামায় এই স্পষ্টীকরণ একেবারেই নেই যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর মর্যাদা ও অবস্থানের খেয়াল রাখা হোক এবং তাঁর সাথে আলোচনার পথ খোলা রাখা হোক। বরং এই পত্রগুলোর সামগ্রিক প্রভাব এই দাঁড়ায় যে, পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পুরো দায়িত্ব ইবনে যিয়াদের ওপর চাপানো হচ্ছে। তাকে তার দায়িত্ব অনুযায়ী পূর্ণ ক্ষমতাও দেওয়া হচ্ছে। ফলে ইবনে যিয়াদ সরকারের অধিপত্য বজায় রাখার জন্য যা বুঝেছে, তা জায়েজ বা নাজায়েজ এর তোয়াক্কা না করেই করে ফেলেছে।

এছাড়া ইয়াজিদ যদি এমন নির্দেশনা দিয়ে থাকত, তবে সে এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর পরপরই এর সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করত যে, আমার স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তোমরা কেন এমন জুলুম করলে? কিন্তু ইয়াজিদের পক্ষ থেকে এমন কোনো কথা বর্ণিত নেই। যা প্রমাণ করে যে, সে নিজেও স্বীকার করত যে সে সঠিক নির্দেশনা জারি করেনি। অন্যথায় যেখানে সে বলছিল যে, ‘আল্লাহ ইবনে মারজানার অমঙ্গল করুন’, সেখানে সে এটাও বলত যে, ‘আমি তো তাকে রক্তপাত করতে নিষেধ করেছিলাম’। যখন সে মদিনাবাসীদের ধ্বংসের কথা শুনে বলেছিল: ‘হায় আমার জাতি!’, সেখানে সে এটাও বলতে পারত যে, ‘আমার নিষেধ করা সত্ত্বেও মুসলিম বিন উকবা কেন এমন করল?’

ইবনে জিয়াদ এবং তার মতো অপরাধীদের বিরুদ্ধে ইয়াজিদের কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া এই কথার স্পষ্ট লক্ষণ যে, সে নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন ছিল। সে জানত যে, যদি এই কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তবে তারা এটাই বলবে যে, ‘আপনি যে অভিযান অর্পণ করেছিলেন, আমরা তা আমাদের সাধ্যমতো সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করেছি। যদি সত্যিই আপনার মনে থাকত যে এই অভিযান অমুক অমুক সীমার মধ্যে থেকে সম্পন্ন করতে হবে, তবে আমাদের আগে থেকে অবহিত করা আপনার দায়িত্ব ছিল।’

স্পষ্টতই ইয়াজিদের কাছে তাদের এই যুক্তির কোনো জবাব থাকত না। তাই সে তার কর্মকর্তাদের আড়ালে কয়েকটা তিরস্কারমূলক কথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের চেষ্টা করেনি যাতে নিজের ত্রুটি আরও বেশি প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

মোটকথা যুক্তি ও বর্ণনা উভয় দিক থেকেই এটি প্রমাণিত যে, ইয়াজিদ এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়কে অত্যন্ত ভাসাভাসাভাবে নিয়েছে এবং তা সমাধানের প্রকৃত চেষ্টা করেনি। একজন গম্ভীর ও দায়িত্বশীল শাসক কখনোই এমন অদূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন না। এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজিদ অত্যন্ত উদাসীন শাসক ছিল এবং তার মোটেও ধারণা ছিল না যে তার এই উদাসীনতা এমন এক বিশাল ট্র্যাজেডির জন্ম দেবে যার প্রভাব শাসকের জন্য চিরস্থায়ী কলঙ্ক এবং শাসনের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হবে।

□□□

কি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর রক্ত মাফ ছিল?

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, হত্যাকারীরা ব্যাখ্যার সাথে একটি বিদ্রোহ দমন করছিল, তাই তাদের থেকে কিসাস বিধিবদ্ধ ছিল না যেমন হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস বিধিবদ্ধ মনে করা হয়নি। সুতরাং ইয়াজিদকে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের জবাবদিহি না করার জন্য কেন অভিযুক্ত করা হয়?

উত্তর: শরয়ী মাসআলা যার ওপর সাহাবীদের ইজমা হয়েছিল তা হলো, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের যে জানমালের ক্ষতি হয়েছে তা ক্ষতিপূরণযোগ্য হবে না এবং এর ওপর কোনো বিচারিক জবাবদিহি থাকবে না।

এখন উল্লিখিত সংশয় তখনই সঠিক হতে পারে যখন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সঙ্গীদের বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে। বিদ্রোহের সংজ্ঞায় পড়ার জন্য কোনো ভূখণ্ডের ওপর দখল থাকাও শর্ত। কেউ কি বলতে পারেন যে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন নারী, শিশু এবং পুরুষের সাথে কোন ভূখণ্ডের ওপর দখলদার ছিলেন? তারপর হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে যাতে ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার আবেদন ছিল, নিজের অবস্থান এতটাই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে কোনো শত্রুও...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

তাদেরকে বিদ্রোহী বলা যায় না এবং এই কারণেই শেষ মুহুর্তে সরকারি বাহিনীর অফিসার হুর বিন ইয়াজিদ বাহিনীকে ছেড়ে হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাতারে शामिल হয়েছিলেন; কারণ মজলুম ও জালেমের পার্থক্য একেবারে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এরপরও সরকারি সৈন্যরা হুসাইনী কাফেলাকে নিজেদের লক্ষ্যবস্তু বানায়। একে কোনো যুদ্ধ (মা'রাকা) বলা যায় না যাতে একদিকে চার হাজার সৈন্য ছিল এবং অন্যদিকে মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তি। এটি ছিল গুটিকয়েক নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর একটি সম্মিলিত আক্রমণ। এমন পরিস্থিতিতে মজলুম ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অস্ত্র তুলে নেওয়াও হয়ে থাকে, যেমনটি হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আক্রমণের সময় তাঁর কয়েকজন গোলাম ঘাতকদের সাথে ভিড়ে গিয়েছিলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন, এছাড়া আবদুল্লাহ বিন যুবাইর এবং হযরত হাসান (রা.)-ও তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন। তাদের এই প্রতিরোধ অবশ্যই পরিস্থিতির চাপে (اضطرابی) ছিল এবং এই কারণে একে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার 'যুদ্ধাবস্থা' বা কিসাসের আওতা বহির্ভূত গণ্য করা যেত না।

হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর অল্প কয়েকজন সঙ্গীর ওপর একটি বিশাল বাহিনীর আক্রমণও ছিল এই প্রকৃতির। এখানেও প্রতিরোধ ছিল পরিস্থিতির চাপে, যার কারণে বিষয়টি 'কতলে আমদ' (ইচ্ছাকৃত হত্যা) এবং কিসাসের গণ্ডি থেকে বের হতে পারে না।

অতঃপর হযরত হুসাইন (রা.) লড়াই করতে করতে শহীদ হননি বরং সিজদারত অবস্থায় তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল, ঠিক যেমনটি হযরত উসমান (রা.)-কে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছিল। সুতরাং হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতও হযরত উসমান (রা.)-এর মতোই মজলুমানা ছিল। এই উভয় ঘটনাই নিঃসন্দেহে 'কতলে আমদ' ছিল, যাতে আক্রমণকারীরা নিশ্চিতভাবেই জালেম এবং কিসাসের যোগ্য ছিল।

আক্রমণকারীদের কোনো ব্যাখ্যা বা অজুহাত এখানে কাজে আসতে পারে না। হযরত হুসাইন (রা.)-কে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করার ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ বাতিল এবং ভ্রান্ত ধারণা, যার কোনো ভিত্তি নেই। যদি কিছু ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হযরত উসমান (রা.)-এর ঘাতকদের মনেও থেকে থাকে, তবে কি সেগুলোর কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর রক্ত মাফ হতে পারত!!

হযরত হুসাইন (রা.)-এর ওপর কি পানি বন্ধ করা হয়েছিল?

প্রশ্ন: মাহমুদ আব্বাসী এবং মাওলানা আতিকুর রহমান সাম্বালী কারবালা ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আবু মিখনাফের বর্ণনাসমূহ যৌক্তিক প্রমাণের আলোকে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর তিন দিন পর্যন্ত পানি বন্ধ রাখার ঘটনাটি নিছক একটি উপকথা। আবু মিখনাফ এই কাহিনী বানানোর জন্য হযরত হুসাইন (রা.)-এর কারবালায় পৌঁছানোর তারিখও ভুল বলেছে। যদি মক্কা ও কারবালার মধ্যবর্তী মঞ্জিলসমূহ এবং সফরের সম্ভাব্য গতিবেগ বিবেচনা করা হয়, তবে হযরত হুসাইন (রা.) হুসাইন বা ৭ই মহররম কারবালায় পৌঁছাতেই পারেন না, তাহলে তিন দিন পানি বন্ধ থাকে কীভাবে? এছাড়া কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের আগে গোসল করার কথাও বর্ণিত আছে। যদি পানি বন্ধ থাকত তবে তিনি গোসল করলেন কীভাবে?

উত্তর: আমাদের মতে এই বিতর্ক নিরর্থক। কোনো ব্যক্তিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হত্যা করা হোক বা পানি পান করিয়ে— কথা একই।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — অষ্টম খণ্ড

...একটিই। যদি পানি পাওয়া প্রমাণিত হয়েও যায়, তবে কি এতে কারবালার শহীদদের মজলুম হওয়া কমে যাবে? এভাবে কি ইয়াজিদ, ইবনে জিয়াদ এবং অন্যান্য শাসকরা দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ প্রমাণিত হয়ে যাবে?

যখন কোনো বাহিনী অবরুদ্ধদের পানি বন্ধ করে দেয়, তখন তার উদ্দেশ্য হয় অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের নিশ্বেজ করে দেওয়া যাতে তারা যুদ্ধ না করেই অস্ত্র সমর্পণ করে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনই না পড়ে। কিন্তু যদি বাহিনী এই কষ্ট না করে সরাসরি আক্রমণ করে দেয়, তবে এর পরিষ্কার অর্থ হলো তারা রক্তপাতে বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং পানি বন্ধ করার ঘটনা প্রমাণিত না হলেও ইয়াজিদ শাসক ও তার বাহিনীর কালো কারনামা তিল পরিমাণও কমে না, বরং এক দিক থেকে তাদের অপরাধ আরও গুরুতর হয়ে যায়।

যখন হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীরা শিয়া ছিল, তবে ইয়াজিদ ও ইবনে জিয়াদের ওপর কেন দোষারোপ করা হয়?

প্রশ্ন: অনেক ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীরা নিজেরাই শিয়া ছিল। এমতাবস্থায় ইয়াজিদ ও ইবনে জিয়াদ প্রমুখকে দোষারোপ করা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর: যেসব আলেম এমনটি লিখেছেন, তারা ইয়াজিদ ও তার কর্মকর্তাদের বাড়াবাড়িকে অস্বীকার করেননি। তাদের উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, ইয়াজিদের বাহিনীতে শিয়ানে আলীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা হযরত হুসাইন (রা.)-কে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু পরীক্ষার মুহূর্তে তারা ইয়াজিদের গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের কঠোরতা দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সরকারি বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। এতে সরকারি বাহিনী, সেনাপতি, গভর্নর এবং ইয়াজিদের পবিত্রতা কোথায় প্রমাণিত হয়?

যদি কোনো গোষ্ঠী সত্যপন্থীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের শত্রুদের সাথে গিয়ে হাত মেলায় এবং সেই উভয় শক্তি মিলে সত্যপন্থীদের রক্তের নদী বইয়ে দেয়, তবে কি এর অর্থ এই হবে যে কেবল বিশ্বাসঘাতকতাকারীরাই অপরাধী ছিল? যে মূল শত্রু চাপ, হুমকি বা প্রলোভনের মাধ্যমে তাদের নিজের সাথে মিলিয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে বা কর্তৃত্বে এই জুলুম সংঘটিত হয়েছিল, তারা কি মুত্তাকী ও পরহেজগার ছিল!!

প্রকৃতপক্ষে কিছু আলেম বিতর্কমূলক লেখনী বা বক্তৃতায় সেই শিয়াদেরকে—যারা হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যার দায় আহলে সুন্নাতের ওপর চাপায়—দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য অবশ্যই এটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হুসাইন (রা.)-কে শিয়ারা শহীদ করেছে এবং এর প্রমাণ হিসেবে ইতিহাস গ্রন্থ ও শিয়া উৎসসমূহ থেকে এমন সব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত অমুক অমুক ব্যক্তি শিয়া ছিল এবং একারণেই সাদাত বারবার কুফাবাসীদের তিরস্কার করেছিলেন।

কিন্তু যদি বর্তমানকালের কোনো “গবেষক সাহেব” ওইসব আলেমদের লেখনী ও বক্তৃতার এই অর্থ বের করতে শুরু করেন যে, তাদের মতে “শিয়ানে ইয়াজিদ” সমস্ত অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এবং সমস্ত দোষ কেবল শিয়ানে আলীর ছিল, তবে এর চেয়ে বড় অসততা আর কী হতে পারে। আর যদি সত্যিই কোনো আলেম ইয়াজিদ ও তার কর্মকর্তাদের দায়মুক্ত করার চেষ্টা করেও থাকেন, তবে তা প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার করার শামিল। যদি কোনো আলেমের কথা চোখ বন্ধ করে মানতেই হয়, তবে প্রাচীন মহান রব্বানী আলেমগণই অধিক হকদার যে তাদের গবেষণাকে গ্রহণ করা হোক।

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ইমাম তাবারী, আল্লামা ইবনে জাওযী, হাফেজ ইবনে কাসীর এবং হাফেজ যাহাবী রাহিমাল্হুমুল্লাহ থেকে শুরু করে হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব কাসেমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত সকল উলামায়ে কেরাম কারবালার ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন, সে অনুযায়ী নিঃসন্দেহে শাসকগোষ্ঠী এবং সরকারি বাহিনী সাদাতদের হত্যার জন্য দায়ী প্রমাণিত হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার বিপরীতে যদি কোনো ‘গবেষক’ কিছু লিখে থাকেন, তবে তা বর্জনীয়, অনুসরণযোগ্য নয়।

আর যদি কারো অন্ধ অনুসরণ না করে গবেষণার নিরিখে কথা মানতে হয়, তবে সহীহ ও হাসান বর্ণনা গ্রহণ করা এবং সেগুলোর বিরোধী যযীফ বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা গবেষণার অটল মূলনীতি। সহীহ ও হাসান বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, ইয়াজিদকে ইরাকের শাসন ক্ষমতা রক্ষা করতে হতো; সে একটি সুপরিকল্পিত নীতির অধীনে সেখান থেকে মধ্যপন্থী মেজাজের গভর্নর হযরত নুমান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অপসারিত করে একজন সাহাবী-বিদ্বৈষী এবং কুখ্যাত ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে সেখানে নিযুক্ত করে এবং নির্দেশ দেয় যে, যেকোনো উপায়ে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দেখাও। এরপর ইবনে যিয়াদের নির্দেশে উমর বিন সা’দের বাহিনী নিয়ে যাওয়া, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আলোচনার সুযোগ পর্যন্ত না দেওয়া, আক্রমণ করে তাকে পরিবারসহ শহীদ করে দেওয়া এবং এরপর লাশের কাপড় পর্যন্ত খুলে নেওয়া, এরপর ইয়াজিদের পক্ষ থেকে এই কিয়ামতে সুগরা বা মহাপ্রলয়ের ওপর কেবল মৌখিক আফসোস করেই ক্ষান্ত থাকা, এবং ইবনে যিয়াদসহ কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং এরপর একই দম্ভের সাথে মদিনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মুয়াজ্জমার ওপর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা—এই সমস্ত বিষয় এমন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে প্রমাণিত যাদের বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমসহ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন।

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতে কিছু শিয়ানে আলীর শরিক থাকার ব্যাপারে এই মূলনীতিটি মনে রাখবেন যে, কোনো সহীহ সনদে এটি মোটেও বর্ণিত হয়নি, বরং এটি নিছক যযীফ সনদের বিষয়বস্তু। (যদিও প্রয়োজনে এই যযীফ বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই, কারণ এতে ইসলামী আকিদার ওপর কোনো আঘাত আসে না।)

দ্বিতীয়ত, এই কথা জেনে রাখা উচিত যে, এই যযীফ বর্ণনাগুলো থেকে কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে, যে বাহিনী হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তাতে অন্তর্ভুক্ত শিয়ানে আলীগণ অধস্তন কর্মকর্তা বা সাধারণ সৈনিক হিসেবে ছিলেন। রণক্ষেত্রের কমান্ড ছিল উমর বিন সা’দের হাতে, উমর বিন সা’দ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশে চলছিলেন এবং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের লাগাম ছিল ইয়াজিদের হাতে, যা সে সম্পূর্ণ টিলে করে রেখেছিল। সৈনিক ও কর্মকর্তারা শাসকদের ইশারায় চলেন। বন্ধু বা শত্রু নির্বাচন করা তাদের কাজ নয়, বরং শাসকদের দায়িত্ব। যুদ্ধ শুরু করা বা শেষ করার ক্ষমতাও শাসকদের হাতে থাকে। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার কাফেলাকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ নিয়েছিল। তাই আসল অপরাধী ছিল সরকার এবং শিয়ানে আলীদের মধ্য থেকে কিছু বা অনেক লোক এই অপরাধে সরকারের সহযোগী ছিল। এটি সহীহ ও হাসান বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক নিরবচ্ছিন্নতা দ্বারা প্রমাণিত।

যেখানে সত্যপন্থীদের (আহলে হক) প্রশ্ন, তারা সেই সময়েও এই অপরাধ থেকে মুক্ত ছিলেন এবং তখন থেকে এখন পর্যন্ত এই জুলুমে শরিক প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, চাই সে শিয়ানে আলীদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা শিয়ানে ইয়াজিদের।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — সপ্তম খণ্ড

শিয়ানে আলী সরকারি ফৌজে কীভাবে এলেন?

প্রশ্ন: শিয়ানে আলী সরকারি ফৌজের অংশ কীভাবে হয়ে গেলেন? তাঁদের কি সেই সময়ই নিয়োগ করা হয়েছিল নাকি পরিস্থিতি অন্য কিছু ছিল?

উত্তর: কুফার জনবসতিতে আগে থেকেই শিয়ানে আলীর সংখ্যাধিক্য ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সরকারি ফৌজে কর্মরত ছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী কুফাবাসীদের মধ্য থেকে ষোলো, আঠারো বা ত্রিশ হাজার পর্যন্ত ব্যক্তি হযরত হুসাইন (রা.)-এর সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; বরং হুসাইন বিন আব্দুর রহমানের সহীহ সনদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁরা ছিলেন এক লক্ষ ব্যক্তি।

সেই সময় কুফার মোট জনসংখ্যা বড়জোর তিন-চার লক্ষ ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ হযরত হুসাইন (রা.)-এর সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কুফার যুবক ও যোদ্ধাদের অধিকাংশ হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফৌজের অফিসার ও সিপাহীও থাকবেন। যখন কারবালার জন্য ফৌজ গঠন করা হলো, তখন এমন লোকেরাও তাতে অন্তর্ভুক্ত হলো যারা গতকাল পর্যন্ত সাদাতদের আশেক সেজে বসে ছিল। কিন্তু এখন সরকারি নির্দেশের সামনে কথা বলার সাহস তাদের হলো না এবং তারা সরকারের অপরাধে সমান অংশীদার হয়ে গেল।

হযরত হুসাইন (রা.) কি কুফার শিয়ানে আলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না?

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রা.) একটি বাতিল ফিরকার লোকদের কাছে সাহায্য চাইতে কেন গিয়েছিলেন? আরবদের পরিবর্তে তিনি কেন অনারবদের ওপর ভরসা করলেন? আরব মুসলমানরা কি তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল না? আর যদি সত্যিই না থেকে থাকে এবং শুধুমাত্র একটি বাতিল ফিরকা তাঁকে সাহায্যের প্রলোভন দিচ্ছিল, তবে এর পরিষ্কার অর্থ কি এই নয় যে, হযরত হুসাইন (রা.) একটি বাতিল ফিরকার উদ্দেশ্য পূরণ করতে বের হয়েছিলেন, চাই তা সচেতনভাবে হোক বা অবচেতনভাবে?

উত্তর: এটা কি সম্ভব যে কুফাবাসীদের আকিদা আজকের “গবেষকরা” জেনে যাবেন কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) জানতেন না? সত্য এই যে, হযরত হুসাইন (রা.) যাদের কাছে যাচ্ছিলেন তারা সাধারণভাবে সঠিক আকিদার অধিকারী ছিল; কারণ সেই যুগের অধিকাংশ শিয়ানে আলী হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা.) সহ সমস্ত সাহাবীর সম্মান করতেন। সাধারণ মুসলমানদের সাথে তাঁদের কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিল না। যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা ছিল এই যে, তাঁদের মধ্যে অনেক লোক (সবাই নয়) হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। [১] তাঁকে দাওয়াত প্রদানকারী শিয়ানে আলী অনারব ছিলেন না, বরং অধিকাংশ ছিলেন আরব। অনারব যদি থেকে থাকে তবে তা দু-একজন এবং অপরিচিত যাদের নাম পর্যন্ত ইতিহাসে সংরক্ষিত নেই। কুফা ও বসরার অধিকাংশ জনসংখ্যা আরবদেরই ছিল। কিন্তু অস্থিরচিন্তা এখানকার মাটিতে মিশে ছিল। এই কারণে সাদাতগণ এখানে উত্তম সাহায্যকারী ও সহযোগী পাননি।

শিয়ানে আলীর হযরত হুসাইন (রা.)-কে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা এবং এর আগে হযরত আলী (রা.) ও হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করা নিশ্চিতভাবেই লজ্জাজনক ছিল। কিন্তু “শিয়ানে আলী” হওয়া মানেই আকিদা নষ্ট হওয়া নয়। ঠিক যেমন “শিয়ানে উসমান” বা “শিয়ানে মুয়াবিয়া” হওয়া আকিদা নষ্ট হওয়ার সমার্থক নয়। হ্যাঁ! এই দলগুলোর মধ্যে যারা চরমপন্থা অবলম্বন...

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

...করে তাকে নাসিবি বা রাফেজি বানিয়ে দিয়েছে, আহলে হক তা থেকে পরিষ্কারভাবে নিজেদের নির্দোষ ঘোষণা করেছেন।

হযরত হুসাইন (রা.) গায়েব জানতেন না যে ভবিষ্যৎ দেখে নিতেন, তবে বাহ্যিক কারণ এবং প্রকাশ্য অবস্থার ক্ষেত্রে হযরত হুসাইন (রা.) সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি কুফাবাসীদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন যে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আকিদা ঠিক তেমনি সহীহ যেমন মক্কাবাসী বা মদিনাবাসীদের। তবে তিনি হারামাইন শরীফাইনে রক্তপাত এড়াতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি হিজাজে সমর্থক সংগ্রহের চেষ্টা করেননি। অন্যথায় হাজার হাজার সাথী সেখানেও তার কাছে আসতে পারত। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর মত ছিল যে তিনি যেন মক্কায় অবস্থান করে চেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যান, কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) বলতেন: “যদি আমি অন্য কোথাও নিহত হই তবে তা উত্তম, কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে আমার কারণে এই পবিত্র ভূমির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোক।” [২]

কারবালায় যুদ্ধরত বাহিনী কি কুফার ছিল নাকি দামেস্কের?

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রা.)-কে শহীদকারী বাহিনী কি কুফার ছিল নাকি সিরিয়ার? যদি কুফার হয়ে থাকে তবে ইয়াজিদের ওপর কেন দোষারোপ করা হয়?

উত্তর: কুফা ও সিরিয়া কি দুটি আলাদা দেশ ছিল? নাকি একই সরকার এবং একই শাসকের অধীনে ছিল? আর কোনো কর্মকাণ্ড কি সরকারের দিকে তখনই সম্পৃক্ত হয় যখন রাজধানী থেকে বিশেষ বাহিনী গিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করে? শাসকের পক্ষ থেকে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদান করা এবং তাদের বাহিনী ব্যবহার করা কি কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা শাসকের দিকে করার জন্য যথেষ্ট নয়? হযরত হুসাইন (রা.)-এর কাফেলার ওপর হামলার জন্য দামেস্ক থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাজার সৈন্য কারবালায় আসত, তবেই কি ইয়াজিদের জুলুম প্রমাণিত হতো? হযরত হুসাইন (রা.)-এর ছোট কাফেলার তুলনায় কুফার সেনানিবাসে কয়েক গুণ বেশি সৈন্য আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। সরকারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই সৈন্যরা যথেষ্ট ছিল, তাই সিরিয়া থেকে সৈন্য ডাকার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এই অযৌক্তিক দলিল দিয়ে ইয়াজিদ সরকারের নির্দোষিতা কীভাবে প্রমাণিত হতে পারে?

[১] “আর যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছিল তারা সবাই আলীর ওপর উসমানকে শ্রেষ্ঠত্ব দিত না, বরং তাদের মধ্যে অনেকে উসমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করত যেমনটি আহলে সুন্নাতের অধিকাংশের মত।” (মিনহাজুস সুন্নাহ: ১৮৫/১)

এই সামান্য মতপার্থক্যকে কোনো গবেষকই বিদআত হিসেবে গণ্য করেননি বা এর কোনো সুযোগ রাখেননি। কুফার নামকরা মুহাদ্দিস ও ফকিহদের একটি বড় অংশ এই আকিদা পোষণ করতেন কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকেই বিদআতি বা পথভ্রষ্ট গণ্য করা হয়নি বরং তারা আহলে সুন্নাতের প্রথম সারির ইমাম হিসেবে স্বীকৃত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

জেনে রাখুন যে, এই উম্মতের মহান ব্যক্তি ও ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, এই উম্মতের মধ্যে আবু বকর (রা.) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তারপর উমর (রা.)। এরপর তারা মতভেদ করেছেন: একদল বলেন উসমান (রা.) শ্রেষ্ঠ এবং এটিই মালেক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত। আর একদল বলেন আলী (রা.) শ্রেষ্ঠ। আর কুফাবাসীদের একটি দল এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.) আলীকে উসমানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত পোষণ করেছেন। আবার কেউ কেউ শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে নীরবতা পালন করেছেন। আর এটি মালেক (রহ.) থেকে একটি বর্ণনা। (আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা: ১২৯/১)

অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যও এটিই বলে: “উসমানের ওপর আলীকে শ্রেষ্ঠত্ব দানকারী বিদআতি নয়।” (লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়াহ, আল্লামা সাফারিনী আল-হাম্বলী: ৩৫৫/২)

আহলে সুন্নাতের সঠিক মত হলো: আবু বকর (রা.) শ্রেষ্ঠ, তারপর উমর (রা.)। কুফাবাসীদের কেউ কেউ আলীকে উসমানের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর প্রসিদ্ধ ও সহীহ মত হলো উসমান (রা.)-কে প্রাধান্য দেওয়া। (আত-তাওযীহ আন তাওহীদিল খালাক: ৮২/১, সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব) আহলে সুন্নাতের কিছু লোক আলীকে উসমানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু চার ইমাম ও তাদের অনুসারীদের সিদ্ধান্ত হলো উসমান (রা.)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া। (আদ-দুরারুস সানিয়াহ ফিল আজউবাতিন নাজদিয়্যাহ: ৩২৫/১)

[২] আখবারু মক্কা লিল ফাকিহি: ২৩৩/২, রিজালু সিকাত, দার খিজর।

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

ইয়াজিদের সাথে হযরত আলী (রা.)-এর তুলনা

প্রশ্ন: এটা কি বলা যায় না যে, ইয়াজিদ হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম ছিল? কারণ হযরত আলী (রা.)-ও উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেননি। তিনি যেভাবে অক্ষম ছিলেন, ইয়াজিদও সেভাবে অক্ষম ছিল।

উত্তর: এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। হযরত আলী (রা.) তো মুজতাহিদ বরং মুজতাহিদদের ইমাম ছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল ইজতিহাদি, এর ওপর কোনো সমালোচনা সঠিক নয় যদিও আমাদের কাছে এর দলিল জানা না থাকে। তদুপরি তিনি সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রতি সুধারণা (হুসনে যন) রাখা ওয়াজিব। ইয়াজিদ মুজতাহিদও ছিল না, সাহাবীও ছিল না। তাকে সমালোচনা ও পর্যালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে, যেমনটি মুহাদিসগণ সাহাবী ব্যতীত অন্য সবাইকে যাচাই করেছেন, কোনো তাবিসির ক্ষেত্রেও শিথিলতা দেখাননি। এটি মর্যাদার পার্থক্যের একটি মৌলিক বিষয় এবং সুস্থ স্বভাবের অধিকারীদের জন্য এতটুকু পার্থক্য জানাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি হযরত আলী (রা.) এবং ইয়াজিদ উভয়কে সমান রেখে দেখা হয়, তবুও সমস্যার ধরণে পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন:

- (১) হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী হযরত আলী (রা.)-এর কর্মকর্তাদের কেউ ছিল না। হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারী ছিল ইয়াজিদের কর্মকর্তারা, অর্থাৎ ইয়াজিদের গভর্নরের আদেশে তার সৈন্যরা এটি করেছিল।
- (২) হযরত আলী (রা.) নিশ্চিতভাবেই হযরত উসমান (রা.)-এর রক্ত থেকে মুক্ত। তিনি কার্যতও হযরত উসমান (রা.)-কে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, নিজের সন্তানদের পাহারার জন্য পাঠিয়েছিলেন যারা রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। এরপর উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে নির্দোষিতার শপথ নিয়েছেন। তাই তাঁর নির্দোষিতা নিশ্চিত। ইয়াজিদের হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড থেকে নির্দোষ হওয়া একটি সম্ভাব্য বিষয়। সুধারণার পরিধিকে অনেক প্রশস্ত করা হলে বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সে হুসাইন (রা.)-কে হত্যা করার আদেশ দেয়নি।
- (৩) হযরত আলী (রা.) যাদের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করছিলেন, তারা ছিল পূর্বতন বিদ্রোহী যারা বায়াত গ্রহণ করে শরীয়ত মোতাবেক নিরাপদ (মামুন) হয়ে গিয়েছিল। যেমন: আশতার নাখয়ী এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকর, তাদের থেকে কিসাস নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সঠিক ছিল না। হযরত উসমান (রা.)-এর প্রকৃত হত্যাকারীরা হয়তো ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল যেমন সুদান বিন হামরান বা কাতীরা। অথবা তারা ছিল অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত যেমন জাবালা এবং আল-মাউত আল-আসওয়াদ। অথবা পালিয়ে সিরিয়া ও মিশরে চলে গিয়েছিল যেমন: কিনানা বিন বিশর। তর্কের খাতিরে যদি কোনো হত্যাকারী হযরত আলী (রা.)-এর আশেপাশে থেকেও থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে শরয়ী সাক্ষ্যপ্রমাণ উপলব্ধ ছিল না, অন্যথায় হযরত আলী (রা.) কিসাস ছেড়ে দেওয়ার লোক ছিলেন না। যেখানে হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের কথা বলতে গেলে, তারা ছিল সরকারি পদাধিকারী, গভর্নর, সেনাপতি, উপ-সেনাপতি এবং সেনাবাহিনীর সৈন্য এবং তারা ছিল সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট। তাদের মধ্যে কেউ হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে নির্দোষিতাও প্রকাশ করেনি। তাদের মধ্যে কেউ একে অপরাধ...

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

মনে করত না। ইবনে জিয়াদ নিজেই বলত: “হুসাইন আমাকে মারতে আসছিল। ভালোই হয়েছে যে আমি তাকে মেরে ফেলেছি।” [১]

শিমার প্রকাশ্যে বলত: “যদি আমরা আদেশ পালন না করতাম, তবে তোমাদের অবস্থা গাধার চেয়েও অধম হতো।” [২]

হুসাইনের মাথা কর্তনকারী নিজেই গর্বভরে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কাসরে ইমারতে (প্রাসাদে) পৌঁছেছিল। [৩]

এই ব্যক্তি অত্যন্ত গর্বের সাথে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো কঠোর মেজাজের উমাইয়া শাসকদের কাছে হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু-কে হত্যা করার ঘটনা শোনাত, কিন্তু কেউ কখনো তার ওপর হাত তোলেনি। [৪]

তাই এখানে খুনিদের শনাক্ত করার কোনো সমস্যা ছিল না। ব্যক্তির একদম স্পষ্ট ছিল। অর্থাৎ সবার উপরে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ, যে সৈন্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর উমর বিন সাদ, যে সৈন্য নিয়ে গিয়েছিল। তারপর শিমার, যে হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু-এর ওপর হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারপর সিনান বিন আনাস এবং খাওলি বিন ইয়াজিদ, যারা হত্যা করেছিল এবং মাথা আলাদা করেছিল। ইয়াজিদের জন্য তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে কী সমস্যা ছিল?

(৪) হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর যুগ ছিল বিভেদের যুগ, খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই প্রথমে জঙ্গ জামাল, তারপর জঙ্গ সিফফিন, এরপর খারেজি ইত্যাদির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। সিরিয়াবাসীদের থেকে সীমান্ত রক্ষার সমস্যা সর্বদা বিদ্যমান ছিল। তাঁর শেষ বছর ৪০ হিজরিতে গিয়ে সন্ধি হয় এবং সীমান্ত নিরাপদ ঘোষিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর জন্য অধিকাংশ সময়ই অবস্থা ছিল সংকটপূর্ণ।

ইয়াজিদের জন্য পেরেশানিগুলো এমন ছিল না। হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু পুরো মুসলিম বিশ্বকে তার জন্য অনুকূল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পরও দুই বছর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে নীরবতা ছিল, কোনো হাঙ্গামা ছিল না। ওয়াকায়ে হাররা চতুর্থ বছরে গিয়ে সংঘটিত হয়। এই সময়ের মধ্যে ইয়াজিদের জন্য কী সমস্যা ছিল যে, সে যদি অপরাধীদের অপরাধী মনে করত তবে তাদের বিচার করত?

□□□

কি ইয়াজিদ কান্নাকাটি করে দায়মুক্ত হয়ে যায়নি?

প্রশ্ন: কি কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনায় ইয়াজিদের দুঃখ-বেদনা প্রকাশ এবং সাদাতদের সম্মান ও সমাদর করা কি তাকে দায়মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়?

উত্তর: শাসক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং জালিমদের পরিণতির দিকে পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ। দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করে সেই ব্যক্তি দায়মুক্ত হতে পারে যে ক্ষমতাহীন। একজন একচ্ছত্র শাসক যতক্ষণ না তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে, ততক্ষণ সে আল্লাহর কাছেও দায়মুক্ত হতে পারে না, মানুষের কাছেও নয়। ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ এই দাবিকে প্রমাণ করে যে, ইয়াজিদ এই বিয়োগান্তক ঘটনা থেকে দায়মুক্ত ছিল না; বরং এর পরিবেশ তৈরিতে তার রাজনৈতিক ভুলগুলোর পূর্ণ ভূমিকা ছিল। যেমন:

[১] তারিখ তাবারী: ৫/৫২২

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী লি-উমারী: ৫/১২৬, বাশার: ২/৬৩৩

[৩] তারিখ তাবারী: ৫/৩৮৯, আন্নার বিন সাদ হাসান থেকে বর্ণিত।

[৪] আবু বকর বিন আইয়াশ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আসলাম আল-মিনকারী আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন: আমি হাজ্জাজের কাছে প্রবেশ করলাম যখন হুসাইনের হত্যাকারী সিনান বিন আনাস প্রবেশ করল। সে ছিল একজন বৃদ্ধ লোক যার চুলে মেহেদি লাগানো ছিল, লম্বা নাকবিশিষ্ট, তার মুখে দাগ ছিল, সে হাজ্জাজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হাজ্জাজ তার দিকে তাকিয়ে বললেন: “তুমি কি হুসাইনকে হত্যা করেছ?” সে বলল: “হ্যাঁ।” হাজ্জাজ বললেন: “তুমি কীভাবে তা করলে?” সে বলল: “আমি তাকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করেছি এবং তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করেছি।” হাজ্জাজ তাকে বললেন: “জেনে রেখো, তোমরা দুজনে কখনো এক আবাসে (জামাতে) একত্রিত হবে না।” (আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী ৩/১১১)

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

- ১. নুমান বিন বশীর (রা.)-কে মুসলিম বিন আকীলের প্রতি নরম আচরণ করতে দেখে তিনি এই বিষয়ের সমস্ত ক্ষমতা উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাতে কঠোরতা অবলম্বন করা যায়।
- ২. ইবনে জিয়াদ আসার সাথে সাথেই মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করিয়ে দেন। এই সংবাদ ইয়াজিদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং এর জন্য ইবনে জিয়াদকে উৎসাহিতও করা হয়েছিল। ইয়াজিদ কি এটা আন্দাজ করতে পারেননি যে ইবনে জিয়াদের হাতে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মূল হয়ে গেছে, আর এখন দ্বিতীয়জনের পরিণতিও এমন বরং এর চেয়েও কঠোর হতে পারে? আর যদি তিনি সত্যিই এটা আন্দাজ করতে না পারতেন, তবে তার চেয়ে বড় নির্বোধ আর কে হবে?
- ৩. ইয়াজিদ যদি বিষয়টি নরমভাবে সমাধান করতে চাইতেন, তবে প্রথমত তিনি ইবনে জিয়াদকে পাঠাতেনই না। অথবা তাকে অবশ্যই তিরস্কার করতেন যে, তুমি মুসলিম বিন আকীলকে কেন হত্যা করলে? অথবা অন্তত তাকে এই সতর্কতা দিতেন যে, হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে এমনটা করো না।
- ৪. যখন ইয়াজিদ হযরত হুসাইন (রা.)-এর কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার খবর শুনলেন, তখন তিনি উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে শুধু এতটুকুই লিখেছিলেন যে, তিনি আসছেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি সমাধান করে তুমি পদোন্নতি পাবে অথবা বরখাস্ত হবে। এর অর্থ কী ছিল?
- ৫. যদি এর অর্থ হতো তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া, তবে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের কোথায় এমন সাহস হতো যে সে তার প্রভুর আদেশ অমান্য করবে। মালিক ও গোলাম একে অপরের ইশারা ভালোভাবেই বোঝেন; তাই উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ সেটাই করেছিলেন যা তার মতে ইয়াজিদের ইচ্ছা ছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় শত্রুকেও প্রথমজনের মতো একইভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির লক্ষ্যবস্তু বানানো।
- ৬. “এমন বিষয়ে জড়িয়ে মানুষ পদোন্নতি পায় অথবা বরখাস্ত হয়” - এর দ্বারা ইয়াজিদের উদ্দেশ্য যদি নরম আচরণ করা হতো, তবে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর তিনি ইবনে জিয়াদকে বরখাস্ত করে দিতেন, কিন্তু তিনি ইবনে জিয়াদকে একইভাবে ইরাকের গভর্নর পদে বহাল রাখেন। এমন অবস্থায় জনশ্রুতি তো এটাই বলবে যে, ইবনে জিয়াদ ইয়াজিদের ইচ্ছাই পূরণ করেছিলেন।
- ৭. আর ইয়াজিদের সাদাতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বললে, তাতে এই কলঙ্ক মুছে যায় না। এটি দুনিয়াদার বাদশাহদের রাজনীতির প্রচলিত নিয়ম ছিল যা আগেও ছিল এবং এখনও আছে। আসল প্রতিদ্বন্দ্বী শেষ হয়ে গেলে তার উত্তরাধিকারীদের খুব তোয়াজ করা হয় যাতে তাদের সমর্থকরা শান্ত হয়ে যায় এবং নতুন কোনো বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে। ইংরেজরা টিপু সুলতানকে শহীদ করে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তার দাফন সম্পন্ন করেছিল, পুরো সেনাবাহিনী সালামি দিয়েছিল। এতে কি ইংরেজদের হাত কলঙ্কমুক্ত হয়ে গিয়েছিল?
- ৮. ইয়াজিদের কান্নাকাটিকে যদি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবে মেনেও নেওয়া হয়, তবে তাতে কী পার্থক্য পড়ে? রাজনীতিতে মানুষ নিজের আপন ভাইকে হত্যা করিয়ে দেয়। বাবা বুকে পাথর রেখে ছেলেকে মেরে ফেলে। ছেলে বাবাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। এমনটা করার সময়ও এই মানুষগুলো রক্ত-মাংসের সংবেদনশীল মানুষই থাকে, তাই প্রাকৃতিকভাবে তারা ব্যথিতও হয়, চোখের জলও ফেলে, কিন্তু তবুও তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সেই বুদ্ধিদীপ্ত শক্তির সাথেই নেয় যার পেছনে রাজ্য জয় এবং ক্ষমতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। কান্নাকাটি করেও তারা সেটাই করে যাতে সিংহাসন মজবুত হয়, চাই অন্য কোনো প্রিয়জন তার বলি হোক না কেন।
- ৯. ইয়াজিদ কারবালার ঘটনায় অবশ্যই শোকাহত হয়েছিলেন এবং কান্নাকাটি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি, কিন্তু যখন হাররার ঘটনা ঘটল, তখন তিনি কারবালার চেয়েও বেশি কঠোরতার প্রমাণ দিলেন। কারবালায় পঞ্চাশ-ষাট জন শহীদ হয়েছিলেন, হাররায় সাতশ পবিত্র আত্মার লাশ পড়েছিল এবং মদীনায়...

মর্যাদা পদদলিত হলো। ঘরবাড়ি লুণ্ঠিত হলো, মানুষ শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো।

১০. ইয়াজিদ আবারও ‘হায় আমার কওম’ স্লোগান দিল এবং অবশিষ্টদের জন্য খাবারও পাঠিয়ে দিল।

১১. কিন্তু এর পরপরই মক্কার ওপর একইভাবে আক্রমণ করল; আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবীকে শিকল দিয়ে বেঁধে গলায় বেড়ি পরিয়ে আনার কসম খেল। এই সত্যগুলোর সামনে ইয়াজিদকে কীভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিষ্পাপ মনে করা যেতে পারে?

ইয়াজিদ এবং হযরত আলী রা.-এর বায়আতে সাদৃশ্যের সন্দেহ এবং ইসলামী শাসননীতির ওপর এক দৃষ্টি

প্রশ্ন: খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পুরো মুসলিম বিশ্ব থেকে বায়আত নেওয়া জরুরি মনে করা হতো না, বরং কেন্দ্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বায়আতই যথেষ্ট মনে করা হতো। হযরত আলী রা.-এর খিলাফত আহলে শামের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু উলামায়ে কেরাম হযরত আলী রা.-এর শরয়ী খলিফা হওয়ার এই দলিলই দেন যে, দারুল খিলাফতের গণ্যমান্য ব্যক্তির একমত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর খিলাফত পুরো মুসলিম বিশ্বের ওপর আবশ্যিক হয়ে গিয়েছিল এবং যারা বায়আত করেনি তাদের ওপর কেবল ‘বাগী’ শব্দ প্রয়োগ করা সঠিক ছিল না, বরং খিলাফত রক্ষা এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েজ হয়ে গিয়েছিল।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইয়াজিদের খিলাফতও প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল; কারণ অন্তত দারুল খিলাফত দামেস্কে সবাই তাকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এরপর হযরত হুসাইন রা.-এর সরকারের বিরোধী কর্মকাণ্ডের ওপর কেবল ‘খুরাজ’ শব্দের প্রয়োগই স্পষ্ট হয় না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগও জায়েজ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এমন অবস্থায় ইয়াজিদ বা ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে কোনোভাবেই দোষী সাব্যস্ত করার কোনো কারণ থাকে না।

জবাব: ইয়াজিদ এবং ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সমর্থকরা সম্ভবত বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখে এবং তাদের মতে ইয়াজিদের খিলাফত প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, চাই তার যোগ্যতা কম স্তরের হোক এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের উপস্থিতিতে তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করা হয়ে থাকুক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের অবস্থান কি এটাই ছিল? এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

বিষয়টি গভীরভাবে বুঝলে হযরত হুসাইন রা.-এর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে সাধারণ নিয়ম এটাই ছিল যে, ইমামত প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক কেন্দ্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ঐক্য যথেষ্ট হতো এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এর ওপরই আমল ছিল। কিন্তু সাহাবীদের এই আমল এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ছিল যে, খলিফার বায়আত উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল, যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরবানি দিয়েছিলেন, যারা হিজরত করেছিলেন এবং ফাতহে মক্কার আগের কঠিন মুহূর্তগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত উমর রা. এই আশঙ্কায় যে, কোথাও প্রথম সারিতে কুরবানি দেওয়া মুহাজির ও আনসারদের উপেক্ষা করে চতুর ও হুঁশিয়ার লোকেরা ক্ষমতার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে নেয়, এই বিষয়টিকে একটি বিধিবদ্ধ নিয়মের রূপ দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে নিম্নোক্ত মূলনীতি প্রয়োগ করেছিলেন:

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

“এই খিলাফতের বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত আহলে বদরদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) ওপর নির্ভরশীল থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্য থেকে একজনও জীবিত থাকে। এরপর ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নির্ভরশীল থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্য থেকে একজনও অবশিষ্ট থাকে। এরপর অমুক যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের ওপর, এরপর অমুক যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের ওপর। খিলাফতের বিষয়ে তুলাকা (মক্কা বিজয়ের দিন মুক্ত করে দেওয়া ব্যক্তিগণ), তাদের সন্তান এবং মক্কা বিজয়ের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের বিন্দুমাত্র অংশ থাকবে না।” [১]

রিসালাতের যুগ থেকে শুরু করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত পর্যন্ত আশায়ে মুবাশশারা, শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ এবং উল্লিখিত স্তরের অধিকাংশ লোক মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন। তাদের ফিকহী প্রজ্ঞা, বিশ্বস্ততা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ওপর পুরো উম্মতের আস্থা আগে থেকেই চলে আসছিল। তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কিছু ব্যক্তি যেমন: হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর কোনো সরকারি পদ ছিল না, কিন্তু নিজেদের মর্যাদা ও গুণাবলির কারণে তারা পুরো উম্মতের প্রতিনিধিত্বকারী সমাবেশ ছিলেন। তাই তাদের বায়আতকেই পুরো উম্মতের বায়আতের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য করা হতো।

সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি ছিল এই যে, ক্ষমতাকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য উম্মতের সেই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঐক্যমত জরুরি যাদের ইসলামে অগ্রগামী হওয়ার গৌরব রয়েছে এবং যাদের ত্যাগ তুলনামূলকভাবে বেশি, তারা রাজনৈতিক কেন্দ্রে থাকুক বা বাইরে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এ ধরনের সমাবেশ বেশিরভাগ মদীনায় ছিল, তাই তাদের বায়আতই যথেষ্ট ছিল। পরবর্তীতে এই পরিস্থিতি আর থাকেনি, তাই যেখানে যেখানে উম্মতের যে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন তাদের সম্মতি জরুরি ছিল।

কিন্তু সিরিয়াবাসীরা (আহলে শাম) এই নীতিকে উপেক্ষা করে এবং এটি বিশ্বাস করায় যে, মদীনায় খলিফাদের বায়আত অনুষ্ঠান রাজনৈতিক কেন্দ্রের আমীর এবং সামরিক প্রধানদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং নীতি হলো এই যে, যদি সরকারি পদাধিকারী এবং সামরিক দায়িত্বশীলরা একমত হয়ে যান তবে শরয়ী ক্ষমতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, যদিও উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তাতে একমত না হন। তাদের মতে হিকমতের দাবি ছিল এই যে, যাদের কাছে সামরিক শক্তি আছে, সমস্যার সমাধান তাদের মতামতের ওপরই রাখা হোক। অন্যথায় সামরিক প্রধানরা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ করবে এবং উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট হবে। পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের মতামত ত্যাগ করার মধ্যে গৃহযুদ্ধের কোনো আশঙ্কা নেই। বড়জোর কিছুটা অসন্তোষ সৃষ্টি হবে যা সহ্য করে নেওয়া যাবে।

এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের উত্তরাধিকার (উলি আহদি) নির্ধারণের ক্ষেত্রে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান বিন আবি বকর, আব্দুল্লাহ বিন উমর, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং নিজের সঙ্গীদের মধ্য থেকে আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহনাফ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতপার্থক্যকে উপেক্ষা করে ইয়াজিদের উত্তরাধিকার ঘোষণা করে দেন। এটি ইয়াজিদ এবং তার গভর্নরদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, দামেস্কের আমীরদের বায়আত পুরো মুসলিম বিশ্বের ওপর আবশ্যিক ও ওয়াজিব হয়ে গেছে।

[১] হযরত আব্দুর রহমান বিন আব্বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: এই বিষয়টি (খিলাফত) আহলে বদরদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকে, এরপর আহলে ওহুদদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকে, এবং অমুক ও অমুকদের মধ্যে। এতে কোনো মুক্ত করা গোলাম (তালিক), মুক্ত করা গোলামের সন্তান বা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের কোনো অংশ নেই। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩৪২, জামিউল আহাদিস লিস সুয়ুতী, হা: ৩১৫২৮, কানযুল উম্মাল, হা: ৩৬০৪৬, এবং হাফেজ ফাতহুল বারীতে এটি বর্ণনা করেছেন: ১৩/২০৭)

তবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই মতটি ইসলামী রাজনীতির বিশ্বজনীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই নীতি গ্রহণের ফলে উন্মত শূরা, ইস্তিস্হাত এবং জনসম্পৃক্ততার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে সামরিক কেন্দ্রগুলোর কর্মকর্তাদের উন্মতের ওপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে, তাদের চরিত্র ভালো হোক বা মন্দ। এই দুর্বলতার কারণেই রাজনীতি অস্ত্রধারীদের ঘরের দাসীতে পরিণত হয়েছে এবং শরীয়তের ব্যাখ্যাকারী শ্রেণির প্রভাব ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়েছে।

এই দ্বিতীয় মতের সমর্থনে বড়জোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, অনিবার্য পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে এর সুযোগ থাকতে পারে এবং আমাদের সুধারণা এই যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী একে অনিবার্য পরিস্থিতিতেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, এটি খুলাফায়ে রাশেদীনের মতো একটি আদর্শ ইসলামী ব্যবস্থা ছিল। এই কারণেই উলামা ও ফুকাহাগণ ইয়াজিদের শাসনামলে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং অনেক ফকীহ সাহাবী (রা.)-এর আপোষমূলক আচরণের মাধ্যমে দলিল পেশ করে এই পরিস্থিতির ব্যাপারে এই শিক্ষা তো দিয়েছেন যে, উন্মতের সম্মতি ছাড়া ক্ষমতায় আসা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) করা উচিত নয় যাতে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত না ঘটে; কিন্তু কেউ এ কথা বলেনি যে, এই রাজনৈতিক পদ্ধতিই আদর্শ এবং এটাই খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিনিধিত্ব। বরং এর বিপরীতে ফুকাহাগণ এবং হাদীস বিশারদগণ স্পষ্টভাবে একে ‘রাজতন্ত্র’ (মুলুকিয়াত) হিসেবে অভিহিত করে এসেছেন।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর সংগ্রাম মূলত এই ‘রাজতন্ত্রের’ উদীয়মান লক্ষণের বিরুদ্ধেই ছিল। তিনি আদর্শ ইসলামী শাসনব্যবস্থা পুনর্জীবিত করার আহ্বানকারী ছিলেন। তাঁর মতে, খলিফা নির্বাচন উন্মতের মুরুব্বীদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে হওয়া উচিত ছিল। এছাড়া তাঁর মতে শাসকের জনমকবুল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কারণ অজনপ্রিয় ব্যক্তির শাসক হওয়া জাতীয় বিশৃঙ্খলা এবং দেশের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত হুসাইন (রা.) উন্মতের প্রকৃত প্রতিনিধিদের সম্মতিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত মনে করতেন এবং তাঁর মতে এর ব্যতিক্রমের একটিই রূপ ছিল, তা হলো শাসক মুসলমানদের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে শক্তির জোরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে পুরো দেশের ওপর চেপে বসবে। এমন পরিস্থিতিতে ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে বাঁচার জন্য কৌশলগত কারণে বাধ্য হয়ে তার শাসনকে মেনে নেওয়া এবং তাকে অপসারণের চেষ্টা ত্যাগ করাই শ্রেয় ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ইয়াজিদকে কোনোভাবেই খুলাফায়ে রাশেদীনের সাথে তুলনা করা যায় না, যারা নিজেদের মর্যাদা ও গুণাবলীর কারণে রিসালাতের যুগ থেকেই মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রিয় ছিলেন। তাঁদের খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য মদীনার সাধারণ মানুষের ঐক্যমত্যকে যথেষ্ট মনে করা বিস্ময়কর হওয়া উচিত নয়। যদিও হযরত আলী (রা.)-এর যুগে কিছু সাহাবী নিজেদের সংশয়ের কারণে তাঁর বায়আত ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও গুণাবলীর স্বীকৃতি দিতেন। তাঁরা যেসব সংশয়ের ভিত্তিতে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, সেগুলোও পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছে; তাই জমহুর উলামায়ে উন্মতের মতে, হযরত আলী (রা.)-এর ইমামত দেশের একটি প্রদেশে প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তসম্মতভাবে সাব্যস্ত ছিল। ইয়াজিদের পক্ষে খুলাফায়ে রাশেদীনের মতো জনপ্রিয়তার দশভাগের একভাগও অর্জিত ছিল না। সাহাবীদের উপস্থিতিতে উন্মত ইয়াজিদকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শাসক হিসেবে মেনে নিতে পারত, কিন্তু সানন্দে নয়। এমন অবস্থায় এটি স্পষ্ট ছিল যে, ইয়াজিদ শক্তির মাধ্যমে নিজের শাসন কায়েম করার চেষ্টা...

...করবে যা উত্তরাধিকারের রূপ নেওয়ার কারণে উম্মতের জন্য আরও বেশি অপছন্দনীয়তার কারণ হবে। ফলে হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর ইজতিহাদ ও ফিকহী প্রজ্ঞার ভিত্তিতে শরয়ী যতটুকু সুযোগ দেখেছেন, সেখানে ইয়াজিদের শাসন প্রতিষ্ঠা রোধ করার চেষ্টা করেছেন। যেসব সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে কুফায় যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সম্ভবত তাঁদের নিকট ইয়াজিদের শাসন কর্তৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, তাঁদের নিকট রাজনৈতিক কেন্দ্রে কোনো শাসকের বায়আত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর সাব্যস্ত হয়ে যেত। অধিকতর স্পষ্ট বিষয় হলো, যেহেতু বায়আত না করার ফলে বিভেদ ও গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, তাই সেই সাহাবীগণ ইয়াজিদের বায়আত করে নিয়েছিলেন।

এই সমস্ত কথার পর শেষে এটি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, ইয়াজিদের শাসন প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকুক কিংবা দামেস্কবাসীদের ঐক্যই তার শাসনের জন্য যথেষ্ট হোক না কেন, তা সত্ত্বেও হযরত হুসাইন (রা.)-এর পদক্ষেপের ওপর খুরাজের প্রয়োগ হতে পারে না; কারণ খুরাজের শরয়ী সংজ্ঞার প্রয়োগের জন্য কেবল বায়আত অস্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, বরং কোনো এলাকার ওপর দখল থাকাও শর্ত। হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে আহলে জামাল বসরার ওপর এবং আসহাবে সিফফীন সিরিয়ার ওপর দখলদার ছিলেন। তাই সেখানে খুরাজের প্রয়োগ হয়েছে। এই কারণেই হযরত আলী (রা.) সেখানে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহারে সঠিক অবস্থানে ছিলেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) কোনো এলাকা দখল করেননি। কারবালায় স্বয়ং সরকারি বাহিনী তাঁকে অবরুদ্ধ করেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শেষ পর্যন্ত তিনি মীমাংসার প্রস্তাবও পেশ করেছিলেন। এমতাবস্থায় ফিকহ শাস্ত্রের এমন কোনো ধারা নেই যার উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে বিদ্রোহী প্রমাণ করা যায় এবং সরকারি বাহিনীর পদক্ষেপের কোনো যৌক্তিকতা প্রদান করা যায়।

খুরাজের ইচ্ছা এবং বাস্তবে খুরাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির ব্যবহার বাস্তব খুরাজের ক্ষেত্রে বৈধ হয়, খুরাজের ইচ্ছার ওপর নয়। এই পার্থক্যটিই কুফার প্রথম গভর্নর নুমান বিন বশীর (রা.) লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং মুসলিম বিন আকীলের চারপাশে মানুষের সমাবেশের ওপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কিন্তু উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ শরয়ী সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং কারবালায় জুলুম ও নির্যাতনের বাজার গরম করে ছেড়েছে।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রচেষ্টা কোন দিক থেকে প্রশংসনীয়?

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রা.)-এর সংগ্রামের তো কোনো বাস্তব ফায়দা হয়নি, তাঁর এই অভিযান নিন্দনীয় হওয়া উচিত। একে কোন দিক থেকে প্রশংসনীয় বলা যেতে পারে?

উত্তর: প্রশংসার বিভিন্ন দিক রয়েছে, তবে আমাদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো হযরত হুসাইন (রা.) নিজের জীবন উৎসর্গ করে উম্মতকে রাজনৈতিক সচেতনতার দিকে আনার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক সফরের দিক থেকে উম্মত রাজতন্ত্রের নতুন অভিজ্ঞতার দিকে যাচ্ছিল এবং এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হিসেবে নির্ধারিত হচ্ছিল যে, সামরিক কর্মকর্তারা উম্মতের আসল আরবাবুল হাল্লি ওয়াল আকদ এবং তাদের এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে যে তারা উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মতামতকে উপেক্ষা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। এই চিন্তা পরবর্তীতে পাথরের রেখার মতো স্থায়ী হয়ে যায় এবং সাধারণ রেওয়াজ এটাই চলতে থাকে। শাসকের নিয়োগের...

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বীনি ও চারিত্রিক অবস্থাকে ভিত্তি বানানো এবং এই উম্মতের সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে রায় গ্রহণ করার যে দস্তুর বা নিয়ম ছিল তা শেষ হয়ে গেল এবং কেবল সামরিক কেন্দ্রের আমিরদের বায়আতকেই পুরো দেশের জন্য কার্যকর বলে গণ্য করা হতে লাগল।

এই পরিবর্তনের শুরুতেই হযরত হুসাইন (রা.) নিজের জীবন উৎসর্গ করে উম্মতকে এই অনুভূতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারা এবং বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবীগণ, যাদের সাক্ষ্যের সত্যতা নবুওয়াতের জবান থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং যাদের ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য অর্জনের জন্য কোনো বিশেষ দৌড়ঝাঁপের প্রয়োজন ছিল না, এখন আর তারা নেই। এছাড়া ছোট সাহাবীগণের যুগও শেষ হতে চলেছে যারা তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় মর্যাদায় কম হওয়া সত্ত্বেও বাকি উম্মতের চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। এই নতুন পরিস্থিতিতে উম্মতের উচিত ইসলামী রাজনীতির প্রাণসত্তাকে সামনে রেখে এই মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করা যে, মজলিসে শুরার সদস্য কারা হবেন? কার বায়আত পুরো উম্মতের বায়আত হিসেবে গণ্য হবে? এবং সরকার গঠনকারী মজলিস বা পরিষদ নির্বাচনের এখতিয়ার কার কাছে থাকবে?

মজলিসে শুরা কীভাবে নির্ধারিত হবে?

হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর পরে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) রাজতন্ত্রের পথে বাধা সৃষ্টি করার পর এমন কিছু প্রশ্ন সামনে এসেছে যেগুলোর ওপর চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আজ অনেক বেশি। প্রাচীন ইসলামী ইলমী ভাণ্ডারে খিলাফত, ইমামত, শুরা এবং আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর মতো পরিভাষাগুলো প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর সংজ্ঞায় অনেক বক্তব্য বিদ্যমান। যেমন: একটি মত অনুযায়ী আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইজতিহাদ। অর্থাৎ মজলিসে শুরার শীর্ষস্থানীয় ফকীহগণ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। [১] অন্য একটি মত অনুযায়ী: “তারা হলেন উলামা, নেতৃবৃন্দ এবং জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।” [২]

কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না যে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ বা মজলিসে শুরা কীভাবে নির্ধারিত হবে? শাসক নির্বাচন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কে গঠন করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শাসক শ্রেণী কার্যত এমনভাবে আমল করত যেন এই অধিকার কেবল শাসক পরিবারেরই। ফলে সেই পরিবারের সদস্য এবং তাদের অনুগত লোকেরাই আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হিসেবে গণ্য হতো এবং তারাই সরকার গঠন করত। উম্মতের ইলমী প্রতিনিধি এবং ধর্মীয় মুরব্বীদের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ আর দেওয়া হয়নি।

যদিও কুরআনের আয়াত, সীরাতে নববী এবং সাহাবায়ে কেরামের সীরাতে মজলিসে শুরা কীভাবে গঠিত হবে সে সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত অকাট্য দলিল (নস) পাওয়া যায় না, তবে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নেককার ও সৎ, আলেম ও ফাযেল, অভিজ্ঞ, কর্মঠ, আমানতদার এবং ত্যাগী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া শরয়ি ও যৌক্তিকভাবে কাম্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর যুগের পরামর্শগুলোর অবস্থা দেখলে তো এমনই মনে হয়।

[১] আল-মুজতাহিদীন মিন উম্মতি মুহাম্মাদ (সা.) (ফাতহুল বারী লি ইবনে হাজার: ১৩/৩০২)

[২] মিনাল উলামাইল মুজতাহিদীন ওয়ার রুআসাই (আল-বাহরর রায়েক: ৬/২৯৯)

[৩] মিনাল উলামাই ওয়ার রুআসাই ওয়া উজুহিন নাস (মিনহাজুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন ফিল ফিকহি লিন-নববী, পৃ. ২৯২)

ব্যক্তিত্বসমূহ অগ্রগণ্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন আযান, ইমামত, সালাত এবং জিহাদের মতো সামাজিক দায়িত্বগুলোতে সর্বদা এমন লোকদেরই সামনে রাখতেন। সম্ভবত এই বরকতময় যুগে মজলিসে শূরার গঠনের জন্য স্থায়ী নীতি ও নিয়মাবলী নির্ধারণের প্রয়োজন এজন্য ছিল না কারণ সর্বত্রই কল্যাণ ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রাচুর্য ছিল।

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর যদি শূরাতন্ত্রের বিষয়টি সীমাবদ্ধ না হতো এবং শক্তি ও ক্ষমতার জোরে সরকার গঠনের ধারা শুরু না হতো, তবে এটি অসম্ভব ছিল না যে প্রথম হিজরি শতাব্দীর আহলে ইলমগণই এমন সংবিধান এবং নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করে নিতেন যার মাধ্যমে মজলিসে শূরার সদস্যদের নির্বাচন পুরো উম্মতের মধ্য থেকে করা হতো এবং এভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সর্বোত্তম ও জনপ্রিয় ব্যক্তিদের দিকে হওয়ার দ্বিতীয় লক্ষ্যটি, যা খুলাফায়ে রাশেদীনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, অব্যাহত থাকতো এবং উম্মত উত্তরাধিকার ও তলোয়ারের জোরে শাসনের ধ্বংসলীলা থেকে বেঁচে যেত। হযরত হুসাইন (রা.)-এর উদ্দেশ্যও এটাই ছিল।

কি ইয়াযিদকে মুজতাহিদ মানা যেতে পারে না?

প্রশ্ন: ইয়াযিদ তাবিঈ, সাহাবী-পুত্র এবং খুলাফা ছিল, তাই সে মুজতাহিদও হবে। অতএব তার সকল কাজকে ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে তার প্রতি সুধারণা কেন রাখা হবে না?

উত্তর: ইজতিহাদ বা মুজতাহিদ একটি ফিকহি পরিভাষা। আভিধানিক দিক থেকে মুবাহ (বৈধ) বিষয়গুলোতে নিজের মতামতের ভিত্তিতে কোনো পথ অবলম্বন করাকেও ইজতিহাদ বলা হয় এবং এমন ইজতিহাদ যে কেউ করতে পারে। কিন্তু এখানে পারিভাষিক ইজতিহাদের কথা বলা হচ্ছে যার যোগ্য সবাই হয় না। তাবিঈ বা সাহাবী-পুত্র হলেই মানুষ মুজতাহিদ হয়ে যায় না, বরং যদি অযোগ্য ব্যক্তি ইজতিহাদের চেষ্টা করে তবে এটি নিজেই একটি মহাপাপ। হাদীসে এসেছে:

“কাজী (বিচারক) তিন প্রকার: দুই প্রকার জাহান্নামী, এক প্রকার জান্নাতী। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে অন্যায় ফয়সালা করে সে জাহান্নামী। যে কাজী অজ্ঞতার কারণে মানুষের অধিকার নষ্ট করে সেও জাহান্নামী। যে কাজী সত্য অনুযায়ী ফয়সালা করে সেই জান্নাতী।” [১]

হযরত আলী ইবনুল হুসাইন এই বর্ণনাটি মুরসাল হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন: “কাজী তিন প্রকার: দুই প্রকার জাহান্নামী, এক প্রকার জান্নাতী। যে দুইজন জাহান্নামী, তাদের একজন হলো সে যে জেনে-বুঝে জুলুম করে, সুতরাং সে জাহান্নামী। দ্বিতীয় ব্যক্তি সে যে ইজতিহাদ করে কিন্তু ভুল করে ফেলে, সেও জাহান্নামী। জান্নাতী সে যে ইজতিহাদ করে এবং সত্য পর্যন্ত পৌঁছায়।”

বর্ণনাকারী (কাতাদাহ) বলেন, আমি (আমার উস্তাদ) আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম: “তার অপরাধ কী যে ইজতিহাদ করল কিন্তু ভুল করে ফেলল?” তিনি বললেন: “তার অপরাধ হলো এই যে, যখন তার কাছে জ্ঞান ছিল না তখন সে কেন কাজী হলো।” [২]

[১] কাজী তিন প্রকার: দুই প্রকার জাহান্নামী এবং এক প্রকার জান্নাতী। এক ব্যক্তি যে সত্যের পরিপন্থী ফয়সালা করল এবং সে তা জানত, সে জাহান্নামী। আর যে কাজী জানত না এবং মানুষের অধিকার নষ্ট করল সেও জাহান্নামী। আর যে কাজী সত্য অনুযায়ী ফয়সালা করল সে জান্নাতী: (সুনানে তিরমিযী, হা: ১৩২২, আলবানী বলেছেন: সহীহ)

[২] মুসনাদে আবিল জা'দ, বর্ণনা নম্বর: ৯৮৯

ইমাম আবু বকর আল-রাজি (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

“রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই সতর্কবাণী সেই সব লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা এমন কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করবে যে বিষয়ে (অন্য পক্ষের) দলিল প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তবুও এই লোকেরা ভুল করবে যেমন খারিজি এবং তাদের মতো লোকেরা। সুতরাং তারা জাহান্নামী। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন: ‘এই খারিজিও ইজতিহাদ করেছিল কিন্তু সে জাহান্নামী।’” [১]

ইজতিহাদের সীমানার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ইমাম আবু বকর জাসসাস রাজি (রহ.) বলেন:

“ইজতিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ যতক্ষণ না কোনো নাস বা ইজমা পাওয়া যায়। যখন নাস বা ইজমা পাওয়া যায় তখন ইজতিহাদের বৈধতা বাতিল হয়ে যায়। আপনি কি দেখেন না যে, হযরত উমর (রা.) জুনের (জনীন) বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগ আছে বলে মনে করতেন, যতক্ষণ না হামাল বিন মালিক তাঁকে হাদিসের নাস জানানেন, তখন হযরত উমর (রা.) বললেন: আমরা প্রায় আমাদের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এই জাতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতাম, অথচ এই বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ বিদ্যমান রয়েছে। একইভাবে প্রত্যেক মুজতাহিদের অবস্থা। তার ইজতিহাদের বৈধতা তার দৃষ্টিতেও নাস এবং ইজমা না থাকার শর্তের সাথে যুক্ত। যখন সে ইজতিহাদ করে এবং তারপর তার মতের বিরুদ্ধে কোনো নাস বা ইজমা পায়, তখন সে তার ইজতিহাদ ত্যাগ করবে এবং নাস ও ইজমার অনুসরণ করবে। একইভাবে যেকোনো বিচার্য বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ এবং তাতে মতপার্থক্যের সুযোগও (তাদের নিকটও) একটি শর্তের সাথে যুক্ত ছিল এবং তা হলো এই যে, সেই (ইজতিহাদের) পর (তার বিরুদ্ধে) কোনো ইজমা যেন না হয়ে যায়।” [২]

মুজতাহিদের গুণাবলির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ইমাম আবু বকর রাজি (রহ.) লিখেছেন:

“একজন ব্যক্তি তখনই ইজতিহাদের যোগ্য হতে পারে যখন সে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে সাবিতাহ (সহিহ ও মশহুর হাদিসসমূহ) এবং আখবারে আহাদ সম্পর্কে জ্ঞানী হবে। মুহকাম এবং মানসুখ সম্পর্কে জানবে। আম এবং খাস সম্পর্কে জ্ঞানী হবে। হাকিকত এবং মাজাজ-এর নির্দেশনার পার্থক্য জানবে। প্রতিটি জিনিসকে তার সঠিক স্থানে এবং অবস্থানে রাখতে পারবে। এর পাশাপাশি সে যৌক্তিক বিধান এবং সেগুলোর নির্দেশনা সম্পর্কেও অবগত হবে এবং এর জায়েজ ও নাজায়েজ সীমা বুঝবে। সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাদের পরবর্তীগণের ইজমা বা ঐক্যমত্যের সিদ্ধান্তগুলো জানবে। ইস্তিদলাল-এর প্রকারভেদ এবং শরয়ী কিয়াস সম্পর্কে অবগত হবে। এতে কেবল আকলি কিয়াস যথেষ্ট নয়; কারণ শরয়ী কিয়াস আকলি কিয়াস থেকে আলাদা। এটি সেই পদ্ধতি যা সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ থেকে বংশপরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে এবং পরবর্তীগণ তা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে আসছে। এর পদ্ধতি এটি জানা যোগ্য ফকিহদের কাছ থেকে শিখতে হবে।”

এই কারণেই নতুন মাসআলাগুলোতে কথা বলা সেই সব লোক যারা শরয়ী কিয়াস সম্পর্কে অবগত নয়, আকলি কিয়াসের ওপর ভরসা করে ভুল করেছে। ফলে তারা দুঃসাহসী হয়ে অজ্ঞতা এবং গর্হিত কাজের লিপ্ত হয়েছে।

[১] আল-ফুসুল ফিল উসুল লিল ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আল-রাজি: ৩/৫৭, ৫৮

[২] আল-ফুসুল ফিল উসুল: ৩/৩৩৬

তারিখুল উম্মাতিল মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে, তার জন্য নতুন বিষয়গুলোতে ইজতিহাদ করা এবং মূলনীতি থেকে আনুষঙ্গিক মাসআলা বের করা জায়েজ। যদি সে আদিল (মুত্তাকী ও আমানতদার) হয় তবে সে ফতোয়া দিতে পারে। যদি এই সমস্ত শর্তাবলী একত্রিত হয় কিন্তু সে আদিল না হয়, তবে তার ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমন তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এবং যদি সে সাক্ষ্য দেয় তবে সেই সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।

[১]

ইমাম রাযী (রহ.)-এর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, একজন মুজতাহিদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ এবং উসূলে ফিকহে গভীর জ্ঞান থাকা এবং ফকীহদের সান্নিধ্যে থেকে কিয়াসে শরয়ীর প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরি। এই ইলমী দক্ষতার পাশাপাশি তার তাকওয়া, আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) এবং আমানত ও দিয়ানতদারীর গুণে গুণান্বিত হওয়াও আবশ্যিক। এই কঠোর শর্তাবলীর বিপরীতে ইয়াজিদের যে চরিত্র ছিল, তা আইম্মায়ে জারহ ও তাদীল এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“সে ছিল নাসিবী, কঠোর মেজাজী, রুঢ় স্বভাবের, নেশাগ্রস্ত এবং নাজায়েজ কাজে লিপ্ত। তার শাসনকাল হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত দিয়ে শুরু হয়ে হাররার বিয়োগান্তক ঘটনার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল, ফলে মানুষ তাকে ঘৃণা করত, তাই তার জীবনে বরকত হয়নি।” [২]

ইয়াজিদের ইতিবাচক চরিত্র সম্পর্কে বড়জোর যে সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা হলো মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-এর এই বক্তব্য:

“আমি তাকে নামাজের পাবন্দ, কল্যাণের অন্বেষী, ফিকহী মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী এবং সুন্নাহর প্রতি যত্নশীল পেয়েছি।” [৩]

যদিও এই বর্ণনাটি একটি যয়ীফ ও মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে নিজেই বিতর্কিত, কিন্তু যদি এটি মেনেও নেওয়া হয়, তবে এই গুণগুলো একজন সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও থাকে। এগুলোর ভিত্তিতে ইয়াজিদকে মুজতাহিদ এবং তার জঘন্য কর্মকাণ্ডকে ইজতিহাদ কীভাবে বলা যেতে পারে? যদি ইজতিহাদের সুযোগ এত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, তবে কেউ হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদেরও মুজতাহিদ প্রমাণ করে দিতে পারে।

□□□

হযরত হুসাইন (রা.)-কে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হিসেবে জাহিরকারী বর্ণনাগুলোর সনদগত অবস্থান কী?

প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হওয়া কি কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা নাকি উপকথা? যদি এটি বাস্তবতা হয়, তবে তা কি সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নাকি নয়? যদি এগুলো যয়ীফ বর্ণনা হয়, তবে কি যয়ীফ বর্ণনার ভিত্তিতে কোনো সাহাবীর দিকে এমন বিষয় নিসবত করা যেতে পারে যা শরীয়ত নিষেধ করেছে, অর্থাৎ বিদ্রোহ (খুরুজ), বিভেদ এবং রক্তপাত? আর যদি হযরত হুসাইন (রা.)-এর দিকে বিদ্রোহের নিসবত করা বেয়াদবি হয়, তবে জঙ্গ জামাল ও আহলে শামের দিকে এর নিসবত করা কীভাবে সঠিক?

[১] আল-মাহসুল ফিল উসূল: ৩/৪৩

[২] সে ছিল নাসিবী, রুঢ়, কঠোর, অভদ্র, নেশা পান করত এবং মন্দ কাজ করত। সে তার শাসনের সূচনা করেছিল শহীদ হুসাইনের হত্যার মাধ্যমে এবং সমাপ্তি ঘটিয়েছিল হাররার ঘটনার মাধ্যমে। (সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩৭, ত ত্বর-রিসালাহ)

[৩] আমি তাকে নামাজের প্রতি যত্নশীল, কল্যাণের অন্বেষী, ফিকহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী এবং সুন্নাহর অনুসারী হিসেবে দেখেছি। (তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবী: ৫/৪৩৬, বাশার: ২/৪৩১) এর সনদ যয়ীফ ও মুনকাতি, এবং ইবনুল মানযুর এটি সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন (মুখতাসার তারিখু দামেশক: ২৮/২৮) এবং আমি এটি তারিখু দামেশকে পাইনি, আর বালাযুরী অন্য একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা ইয়াজিদের ওপর ইবনুল হানাফিয়াহর আস্থার কথা প্রকাশ করে। (আনসাবুল আশরাফ: ৩/২৬) এর সনদ “কালু” (তারা বলেছে) শব্দ দ্বারা বর্ণিত, ফলে বর্ণনাকারীদের অজ্ঞাত হওয়ার কারণে বর্ণনাটি অত্যন্ত যয়ীফ হয়ে পড়ে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

উত্তর: হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিদ্রোহের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হওয়ার বিষয়টি কোনো সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়নি। আমরা ইতিহাসের কিতাবসমূহে কেবল এমন তিনটি নমুনা পেয়েছি যাতে হযরত হুসাইন (রা.)-এর জবানিতে নিজের শাসনের অধিকার এবং বিদ্রোহের সংকল্পের উল্লেখ রয়েছে:

১. প্রথম নমুনা: এটি আহলে ইরাকের নামে হযরত হুসাইন (রা.)-এর একটি চিঠি যাতে রয়েছে:

“আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মনোনীত করেছেন, নবুওয়াত দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন, রিসালাতের জন্য তাঁকে নির্বাচন করেছেন। যখন তিনি তাঁর বান্দাদের কল্যাণ কামনা শেষ করলেন এবং পয়গাম পৌঁছে দিলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। আমরা তাঁর পরিবার ও অসি (উত্তরাধিকারী), তাঁর ওলি ও ওয়ারিশ। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার আমরাই ছিলাম, কিন্তু আমাদের কওম আমাদের ওপর নিজেদের প্রাধান্য দিয়েছে। আমরা এতে সন্তুষ্ট হয়েছি। অনৈক্যকে অপছন্দ করেছি এবং শান্তি ও নিরাপত্তাকে পছন্দ করেছি। যদিও আমরা জানতাম যে, যারা এই বিষয়ের (নেতৃত্বের) দায়িত্ব নিয়েছে তাদের তুলনায় আমরাই বেশি হকদার। তারা ভালো কাজ করেছে এবং সংশোধনের চেষ্টা করেছে, সত্য অনুসন্ধান করেছে, আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন, আমাদের ও তাদের ক্ষমা করুন। আমি আমার দূতকে তোমাদের কাছে এই চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছি। আমি তোমাদের আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতে নববীর দিকে দাওয়াত দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই সুন্নতকে মৃত করে দেওয়া হয়েছে এবং বিদআতকে জীবিত করা হয়েছে। তোমরা আমার কথা শোনো এবং নির্দেশ মানো। আমি তোমাদের সঠিক পথ দেখাব।” [১]

২. দ্বিতীয় নমুনা: আবু মিখনাফ অন্য এক স্থানে হযরত হুসাইন (রা.)-এর ভাষণে এই শব্দগুলো পেশ করে:

“হে লোকসকল! যদি তোমরা পরহেজগার হও এবং হকদারদের জন্য হক স্বীকার করে নাও, তবে এটি আল্লাহকে বেশি সন্তুষ্ট করার মতো বিষয় হবে। আমরা আহলে বাইত এই বিষয়ের (খিলাফতের) জন্য ঐসব লোকদের চেয়ে বেশি হকদার যারা এমন জিনিসের দাবি করে যা তাদের হক নয়, এবং যারা তোমাদের সাথে জুলুম ও অত্যাচারের আচরণ করে।” [২]

৩. তৃতীয় নমুনা: হযরত হুসাইন (রা.) একটি ভাষণে বলেছেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ হলো: যে ব্যক্তি কোনো জালেম সুলতানকে দেখে যে হারামকে হালাল করে নিয়েছে, আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতের বিরোধিতা করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে গুনাহ ও জুলুমের আচরণ করে, অতঃপর সে কথা ও কাজের মাধ্যমে সেই সুলতানের সমালোচনা না করে, তবে আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে এমন ব্যক্তিকে তার ঠিকানায় (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করবেন। শোনো! এই লোকেরা শয়তানের আনুগত্যকে আবশ্যিক করে নিয়েছে, রহমানের আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে, ফাসাদ ছড়িয়েছে, হৃদুদ (সীমানা) পদদলিত করেছে, গনীমত আত্মসাৎ করেছে, হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। আমি অন্যদের চেয়ে (খিলাফতের) বেশি হকদার। আমার কাছে তোমাদের চিঠিপত্র এসেছে। তোমাদের দূতরা বাইয়াতের অঙ্গীকার নিয়ে এসেছে যে, তোমরা আমাকে কারো হাতে সোপর্দ করবে না এবং আমার সঙ্গ ছাড়বে না।” [৩]

[১] তারিখে তাবারী: ৫/৩৫৭, হিশাম কালবী থেকে, তিনি আবু মিখনাফ থেকে... হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) এই পত্রটিকে সন্দেহজনক আখ্য দিয়ে বলেন: “হুসাইন (রা.) থেকে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে, এবং প্রকাশ্যত এতে কিছু শিয়া বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত কথা যুক্ত করা হয়েছে।” “আমার নিকট এই পত্রটি হযরত হুসাইন (রা.)-এর দিকে সম্বন্ধ করা সন্দেহজনক। দৃশ্যত এতে কিছু শিয়া বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত কথা शामिल রয়েছে।” (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/২৯৩)

[২] তারিখে তাবারী: ৫/৩০৩, আবু মিখনাফ থেকে।

[৩] তারিখে তাবারী: ৫/৩০৩, আবু মিখনাফ থেকে।

এই তিনটি নমুনা ছাড়াও আবু মিখনাফই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে একটি অসিয়ত সম্বন্ধ করে এই ধারণা দিয়েছেন যে, তাঁর হযরত হুসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে বিদ্রোহের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। (তাবারী: ৫/৩২৩। এই অসিয়তটি পেছনে অতিক্রান্ত হয়েছে)। মোদাক্কা, বিদ্রোহের সংকল্পের প্রমাণ কোনো সহীহ রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। চারটিই রেওয়ায়েত এবং চারটিই মিথ্যাবাদী আবু মিখনাফের।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

মজার বিষয় হলো যে, হযরত হুসাইন (রা.)-কে খুরুজের জন্য প্রস্তুত হিসেবে দেখানো এই সমস্ত তথ্য কেবল একজন ব্যক্তি আবু মুখনাফ থেকে বর্ণিত, যে একজন কটুর রাফেযী এবং কাযযাব। লক্ষ্য করুন যে, রেখাঙ্কিত শব্দগুলোতে রাফেযীদের বিশেষ আকিদা ফুটে উঠেছে যে, সাদাত ব্যতীত অন্য কারো শাসন করার অধিকার নেই, অথচ হযরত হুসাইন (রা.) এবং সাদাতগণের এই আকিদার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এখন কথা হলো, এই যযীফ বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে হযরত হুসাইন (রা.)-এর দিকে খুরুজ বা খুরুজের সংকল্পের সম্বন্ধ করা কীভাবে সঠিক হতে পারে? যদি সঠিক না হয়, তবে আকাবির ও আসলাফগণ কেন এই সম্বন্ধ করে আসছেন?

এর উত্তর হলো, এটি নীতিগতভাবে নির্ধারিত যে, যযীফ বর্ণনা থেকে বর্ণিত কোনো বিষয় সাহাবীদের ক্ষেত্রে তখনই অগ্রহণযোগ্য হবে যখন তা অবমাননাকর হয়। হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রচেষ্টা জমহুর ওলামায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি ইজতিহাদী প্রচেষ্টা ছিল। এটি কোনো নেতিবাচক রঙের ‘অভিযোগ’ ছিল না যে, একে যযীফ বর্ণনায় বর্ণিত দেখে অস্বীকার করা হবে। তবে যারা হযরত হুসাইন (রা.)-এর খুরুজকে একটি অবৈধ এবং নিন্দনীয় পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং একই সাথে আহলে সুন্নাত হওয়ার দাবিদার, তাদের জন্য আবশ্যিক হলো এই নিন্দা প্রমাণ করার জন্য হযরত হুসাইন (রা.)-এর খুরুজ বা খুরুজের সংকল্প কোনো সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ করা। যযীফ বর্ণনা দিয়ে একজন মহান সাহাবীর ওপর নিন্দা করা নীতিগতভাবে ভুল।

যেখানে আহলে জামাল এবং আহলে শামের খুরুজের বিষয় রয়েছে, তা এমন সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যেখান থেকে ফকীহগণ বিধান আহরণ করেছেন। তাই তাদের খুরুজ প্রমাণিত। যদি তা অস্বীকার করা হয়, তবে ফিকহের সেই মাসআলাগুলোকে ভিত্তিহীন মনে করতে হবে যেগুলোর ভিত্তি এই যুদ্ধগুলো সম্পর্কিত বর্ণনার ওপর। এর পাশাপাশি এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, প্রতিটি খুরুজই গুনাহ, অভিযোগের কারণ এবং নিন্দার বিষয় হয় না। যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

“যদি বিদ্রোহী মুজতাহিদ এবং তাবীলকারী হয় এবং তার কাছে এটি স্পষ্ট না হয় যে সে বিদ্রোহী, বরং সে বিশ্বাস রাখে যে সে হকের ওপর আছে, যদিও সে ভুলের ওপর থাকে, তবে তাকে বিদ্রোহী বলা তাকে গুনাহগার বলার সমার্থক নয়, ফাসেক মনে করা তো দূরের কথা।”

“আর যে সকল ব্যক্তিবর্গ তাবীলকারী বিদ্রোহীদের সাথে কিতালের প্রবক্তা, তাদের বক্তব্য হলো, তাদের সাথে কিতালের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমাদের তাদের সাথে কিতাল করা তাদের বিদ্রোহের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়। বরং এটি বাড়াবাড়ি প্রতিরোধের জন্য।” [১]

এই কারণেই উন্মতের ওলামায়ে কেরাম আহলে জামাল এবং আহলে সিফফীনের পদক্ষেপগুলোকে নিন্দার কারণ মনে করেন না, বরং তাদের খুরুজকে ইজতিহাদী এবং সদিচ্ছার ওপর ভিত্তি করে হয়েছে বলে গণ্য করেন এবং এর সাথে জড়িতদের মাগফুর ও মাজুর মনে করেন। একইভাবে হযরত হুসাইন (রা.)-এর খুরুজ বা খুরুজের সংকল্প যদি সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হতো, তবে তাও ইজতিহাদী আমল এবং সওয়াবের কারণ হিসেবেই গণ্য হতো।

[১] আল-ফাতাওয়াল কুবরা লি-ইবনে তাইমিয়াহ: ৪/৪৫৭, তাবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

ইয়াজিদ এবং হাদিস বর্ণনা

প্রশ্ন: মুহাদ্দিসগণ কি ইয়াজিদ থেকে হাদিসও বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা তার আদিল (ন্যায়পরায়ণ) হওয়া প্রমাণিত হয়? যেমন ইয়াজিদ তার পিতা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে তিন খলিফার সিংহাসন আরোহণের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, যার শেষে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন: “হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল। তাকে জুলুম ও নির্যাতনের সাথে হত্যা করা হয়েছিল। অতঃপর সিরিয়াবাসীদের সাথে আমিও তার রক্তের বদলা নেওয়ার ডাক দিয়েছিলাম, সৈন্যও কম ছিল এবং সম্পদও, কিন্তু আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন, আরবরা আমার দিকে ফিরে আসতে শুরু করল...” [১]

উত্তর: ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া থেকে এ ধরনের দু-একটি বর্ণনা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রশ্নে উপস্থাপিত বর্ণনাটি ইতিহাসের কিতাবসমূহে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইয়াজিদ থেকে এই ঘটনাটি তার পুত্র খালিদ শুনেছেন এবং তার থেকে কিছু বর্ণনাকারী। ঐতিহাসিক বিষয় বর্ণনা করার দ্বারা বর্ণনাকারীর আদিল হওয়া প্রমাণিত হয় না কারণ এতে আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) শর্ত নয়। [২] এমনিতে অনেক মুহাদ্দিস হাদিসের কিতাবসমূহেও ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু উল্লিখিত বর্ণনার সনদে ইয়াজিদের উপস্থিতির কারণে হাদিসের কোনো কিতাবে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেও এটি কোথাও উদ্ধৃত করা হয়নি। হ্যাঁ, আসমাউর রিজাল-এর আলোচনায় যেখানে ইয়াজিদের মর্যাদা নির্ধারণ করা জরুরি ছিল সেখানে কিছু ইমাম এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন।

ইয়াজিদ থেকে শোনা অন্য দুই-চারটি বর্ণনার অবস্থাও একই যে, মুহাদ্দিসগণ যথাসম্ভব সেগুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন; কারণ ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে কেউ নিজের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করতে চাননি। আদালত যা নির্ভরযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, তা তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর উক্তি এ বিষয়ে যথেষ্ট।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া থেকে কি বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে? তিনি বললেন: “লা ইয়ুজকারু আনহু হাদিসুন” (তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করা যাবে না)। [৩]

হাফিজ যাহাবী (রহ.) বলেন:

“ইয়াজিদ তার পিতা থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছে এবং তার থেকে তার পুত্র খালিদ। তার আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) প্রশ্নবিদ্ধ।”

[১] তালখিসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম লিল খাতিব আল-বাগদাদি, পৃ. ৫০৮, ৫০৯, তলাস দামেস্ক সংস্করণ।

[২] বরং তা অমুসলিমদের থেকেও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন হাদিসে এসেছে: বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করো এতে কোনো দোষ নেই। (সহিহ বুখারি, হা: ৩৪৬১)

[৩] আমি আহমদকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন: সে তো সেই ব্যক্তি যে মদিনায় যা করার করেছে, রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের হত্যা করেছে এবং মদিনা লুণ্ঠন করেছে। আমি বললাম: তবে কি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা হবে? তিনি বললেন: তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করা হবে না। আমি ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন: সে তার (ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া) চেয়ে উত্তম। আমি বললাম: তার থেকে কি হাদিস বর্ণনা করা হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। (আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খালাল, ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, পৃ. ২৩৭)

...হয়। সে এই যোগ্য নয় যে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। [১]

হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে ইয়াজিদের ন্যায়পরায়ণতাকে (আদালত) সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এভাবে বলেন:

“ইয়াজিদের এমন কোনো বর্ণনা নেই যার ওপর নির্ভর করা যায়। ইয়াহইয়া বিন আব্দুল মালিক বিন আবি গানিয়াহ, যিনি একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী, তিনি বলেন যে, আমাদের কাছে নওফাল বিন আবি আকরাব—যিনি নির্ভরযোগ্য—তিনি বলেছেন: আমি উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন জনৈক ব্যক্তি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার কথা উল্লেখ করে বলল: আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদ। উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) বললেন: তুমি ইয়াজিদকে আমিরুল মুমিনিন বলছ! এবং তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন।” [২]

হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর এই বর্ণনাটি সহিহ সনদে উদ্ধৃত করেছেন এবং এভাবে এটি প্রমাণ করেছেন যে, ইয়াজিদের ন্যায়পরায়ণতার দলিল হিসেবে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত (দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন সনদের) বর্ণনাটি জারহ ও তাদিল বিশেষজ্ঞদের নিকট মোটেও দলিলযোগ্য নয়। অন্যথায় এই ইমামগণ একে গুরুত্ব দিয়ে ইয়াজিদকে ন্যায়পরায়ণ (আদিল) মেনে নিতেন এবং ফয়সালা দিতেন যে ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা জায়েজ।

এরপর হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) ব্যাখ্যা করেন যে, আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে ইয়াজিদের উল্লেখ এজন্য করা হয়নি যে ইলমে হাদিসে তার কোনো মর্যাদা আছে, বরং এই উল্লেখ মানুষকে সতর্ক করার জন্য যাতে তারা ইয়াজিদ নামের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের শাসক ইয়াজিদ মনে না করে বসেন। حناح هافيز ابنه هاجار (ره.) বলেন:

“আমি এখানে ইয়াজিদের উল্লেখ তাকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নাখয়ি থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য করেছি।” [৩]

ইয়াজিদের হাদিস জ্ঞান, মুহাদ্দিসগণের জবানিতে:

প্রশ্ন: হাফিজ ইবনে আসাকির (রহ.) এবং হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজিদ তার পিতার নিকট থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন: “আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন।” একইভাবে ওজুর একটি বর্ণনাও উদ্ধৃত হয়েছে। [৪]

একইভাবে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনি ‘মুসান্নাফ’-এ আব্দুর রহমান বিন আবি ইয়াজিদ সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন:

“তোমাদের দাস-দাসী, তোমাদের দাস-দাসী! তোমরা যা খাও তাদের তা খাওয়াও এবং তোমরা যা পরিধান করো তাদের তা পরিধান করাও। আর যদি তারা এমন কোনো অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে চাও না, তবে আল্লাহর বান্দাদের বিক্রি করে দাও কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দিও না।” [৫]

[১] মিজানুল ইতিদাল: ৩/৩৪০

[২] ইবনে হাজার ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের জীবনীতে বলেন: “তার এমন কোনো বর্ণনা নেই যা নির্ভরযোগ্য এবং ইয়াহইয়া বিন আব্দুল মালিক বিন আবি গানিয়াহ—যিনি অন্যতম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী—বলেন, আমাদের কাছে নওফাল বিন আবি আকরাব (যিনি নির্ভরযোগ্য) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি উমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তার কাছে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার কথা উল্লেখ করে বলল, আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদ। তখন উমর বললেন, তুমি ইয়াজিদকে আমিরুল মুমিনিন বলছ? এবং তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন।” (তাহজিবুত তাহজিব: ১১/৩৬১)

[৩] তাহজিবুত তাহজিব: ১১/৩৬১

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩৮; তারিখু দামেশক: ৬৫/৩৯৫

[৫] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৭৯৩৫, প্রকাশনী: আল-মাজলিসুল ইলমি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এতে ‘আন আবিহি’ (তার পিতা হতে) এর প্রয়োগ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ানের ওপর হয়। অর্থাৎ এই হাদিসটি খলিফা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার।

সনদটি হলো: আবদুর রাজ্জাক, সুফিয়ান আস-সাওরি, আসিম বিন উবায়দুল্লাহ, আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ আন আবিহি (ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া)। ইয়াজিদের পুত্র আবদুর রহমানকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তিনি তার পিতা এবং সাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে আসিম বিন উবায়দুল্লাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। [১]

এখন এটা কীভাবে সম্ভব যে পুত্র আবদুর রহমান তো মুহাদ্দিস এবং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) হবেন, আর পিতা ইয়াজিদ অযোগ্য এবং ফাসিক হবেন? আর একটু দেখুন যে ইমাম বুখারি রহ. ‘আত-তারিখুল কাবির’-এ আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ থেকে এই বর্ণনার অংশটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন:

আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাসআলা সম্পর্কে। তার থেকে আব্বাস বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন। আর আসিম বিন উবায়দুল্লাহ আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: ‘আরফাইকুম আরফাইকুম’। [২]

এই বর্ণনাগুলো ইয়াজিদের একজন মহান খলিফা হওয়ার পাশাপাশি একজন হাদিস বিশেষজ্ঞ এবং মুহাদ্দিস হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। তাহলে ইয়াজিদকে কেন ন্যায়পরায়ণ (আদিল) হিসেবে স্বীকার করা হয় না? এটা কি চরম পক্ষপাতিত্ব এবং শিয়াদের অন্ধ অনুকরণ নয়?

উত্তর: আপনার দাবির পুরো ইমারত চারটি হাওয়ালার (সূত্র) ওপর দাঁড়িয়ে আছে: তিনটি হাওয়ালার ইবনে আসাকির, ইবনে কাসির এবং ইমাম বুখারির, যে তারা তাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে ইয়াজিদ থেকে একটি করে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। চতুর্থ হাওয়ালারটি হলো একটি নিয়মিত হাদিসের কিতাবের, অর্থাৎ মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-এর, যাতে ইয়াজিদ থেকে একটি হাদিস নেওয়া হয়েছে। এই চতুর্থ হাওয়ালারটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রথমে আমরা এই চতুর্থ হাওয়ালার মাধ্যমে পেশকৃত বর্ণনার মর্যাদা স্পষ্ট করছি।

এই বর্ণনার রাবি আসিম বিন উবায়দুল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল (জয়িফ) এবং দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তার বর্ণনাগুলোতে প্রচুর গোলমাল থাকে। তার সম্পর্কে জারাহ ও তাদিলের ইমামগণের উক্তিগুলো লক্ষ্য করুন:

- ইয়াহইয়া বিন মাইন রহ. বলেন: ‘আসিম বিন উবায়দুল্লাহ দুর্বল (জয়িফ)।’ একবার তাকে চারজন রাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ‘আসিম এবং ইবনে আকিল এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্বল।’
- ইবরাহিম বিন ইয়াকুব জুজজ رحمہ اللہ রহ. বলেন: ‘তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া (বিন মাইন) তার স্মৃতিশক্তির (ত্রুটির) কারণে সমালোচনা করেছেন।’
- ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ রহ. বলেন: ‘যদিও মানুষ তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা রয়েছে এবং তিনি অনেক মুনকার (অস্বীকৃত) বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।’
- আবু হাতিম রহ. বলেন: ‘তার বর্ণনাগুলোতে অস্থিরতা (গোলমাল) রয়েছে। তার কোনো বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য নয়।’
- ইমাম বুখারি রহ. বলেন: ‘তিনি মুনকার হাদিসসমূহ বর্ণনা করেন।’

[১] আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান: ৫/১১৫; তাহজিবুত তাহজিব: ৬/৩০০

[২] আত-তারিখুল কাবির লিল বুখারি: ৫/৩৬৩

আবু বকর বিন খুজাইমাহ বলেন: “আমি তাঁর হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করি না কারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল।”

ইমাম দারাকুতনি বলেন: “তিনি পরিত্যক্ত (মাতরুক) এবং অসতর্ক (মুগাফফাল)।” [১]

ইয়াজিদের বর্ণনার এই রাবির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর এটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত যে তিনি সনদে ভুল করেছেন। এই হাদিসটি অন্য কারো থেকে বর্ণিত হতে পারে, যা তিনি ইয়াজিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন।

যদি মেনেও নেওয়া হয় যে এই হাদিসটি ইয়াজিদেরই, তবে এতে ইয়াজিদের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যায় না। দুই-চারটি বর্ণনা পেশ করলেই কোনো ব্যক্তি হাদিস বিশারদ বা মুহাদ্দিস হয়ে যান না। হ্যাঁ, তাঁর ওপর ‘রাবি’ (বর্ণনাকারী) শব্দটির প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু রাবি হওয়া এবং আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ও সালিহ (সৎকর্মশীল) হওয়া একে অপরের পরিপূরক নয়। রাবি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) হতে পারেন আবার দুর্বল (জয়িফ) ও মিথ্যাবাদী (কাযযাব), এমনকি দাজ্জাল ও ধর্মহীনও হতে পারেন। এই কারণেই জারহ ও তাদিল-এর ইমামগণ রাবিদের স্তর নির্ধারণ করেছেন। কোনো ব্যক্তির হাদিস বর্ণনাকারী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া তখনই গণ্য করা যেতে পারে যখন মুহাদ্দিসগণ তাঁকে সিকাহ হিসেবে এবং তাঁর বর্ণিত হাদিসকে ‘সহিহ’ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় শুধুমাত্র হাদিস বর্ণনা করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না যখন তাঁর চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হয়। একজন ফাসিক, পাপাচারী ও জালেম ব্যক্তি যদি কোনো হাদিস বর্ণনা করেন, তবে তা তাঁর পবিত্র, মুত্তাকি ও নেককার হওয়ার দলিল হয়ে যায় না।

মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদিসের কিতাবসমূহে কোনো বর্ণনাকে সহিহ বা হাসান হিসেবে উদ্ধৃত করা ভিন্ন বিষয়। (সেজন্য বুখারি ও মুসলিমের রাবিদের মর্যাদা অবশ্যই অনেক উর্ধ্ব।)

কিন্তু আসমাউর রিজাল, জারহ ও তাদিল-এর কিতাব, কিতাবুল ইলাল বা ইতিহাসের কিতাবসমূহে কোনো রাবির উল্লেখ আসা এবং তাঁর কিছু বর্ণনাকে উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। প্রথম ক্ষেত্রটি অবশ্যই রাবির মর্যাদা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি কখনোই গর্বের বিষয় নয় যতক্ষণ না এটি প্রমাণিত হয় যে তাঁকে সিকাহ হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে।

আসমাউর রিজাল, কিতাবুল ইলাল এবং ইতিহাসের কিতাবসমূহে আবু মুখনাফ এবং নাসর বিন মুজাহিমের মতো দাজ্জাল রাবিদের অবস্থা ও বর্ণনাও উদ্ধৃত হয়েছে। এর ফলে কি তাঁরা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস হিসেবে গণ্য হতে শুরু করবেন, অথচ এই কিতাবগুলোতেই তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা রাফেজি এবং মিথ্যাবাদী?

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার বিষয়টিও ঠিক তেমনই। আসমাউর রিজাল, কিতাবুল ইলাল বা ইতিহাসের কিতাবসমূহে তাঁর উল্লেখ থাকা এবং তাঁর বর্ণনার কোনো নমুনা উদ্ধৃত হওয়া তাঁর নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ হতে পারে না; কারণ মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে ‘মাতরুকুল হাদিস’ (হাদিস শাস্ত্রে পরিত্যক্ত) হিসেবে গণ্য করেছেন। একইভাবে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-এ ইয়াজিদের বর্ণনা আসা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার দলিল নয় কারণ মুসান্নাফ-এ সহিহ ও জয়িফ সব ধরনের বর্ণনা সংগ্রহ করা হয়েছে, কিছু স্থানে পরিত্যক্ত ও মিথ্যাবাদী রাবিদের থেকেও বর্ণনা নেওয়া হয়েছে, যেমন: মুসান্নাফ-এ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক জাবির বিন ইয়াজিদ জু’ফি-র কমবেশি ত্রিশটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যাঁর সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলতেন যে আমি জাবিরের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখিনি। [২]

[১] তহজিবুল কামাল: ১৩/৫০৪, ৫০৫।

[২] আল-কামিল ফি দুয়াফাউর রিজাল: ৩/৩২৮।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক-এ ইয়াজিদের বর্ণনার রাবী আসিম বিন উবাইদুল্লাহর অবস্থা আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল। এমন অনেক উদাহরণ প্রচুর রয়েছে যা প্রমাণ করে যে কেবল মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক বা এই মানের কোনো হাদিসের কিতাবে কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত হওয়া সেই রাবীর ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য বা যোগ্য হওয়ার দলিল নয়।

রইল এই কথা যে হাফেজ ইবনে আসাকির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হাফেজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের ইতিহাসে এবং ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আত-তারিখুল কাবিরে ইয়াজিদ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তবে তা স্পষ্ট যে এই মহান ব্যক্তিগণ একে ইয়াজিদের জীবনের একটি দিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা কেবল এতটুকু প্রমাণিত হয় যে ইয়াজিদ কখনো কখনো হাদিসও শুনিতে দিত। এমন কিছু হাদিস তো প্রত্যেক মুসলমানেরই মুখস্থ থাকে এবং সাধারণত শোনানোও হয়। কোনো ব্যক্তি যদি ফাসেক ও পাপিষ্ঠ হয়, তবে তার হাদিস শুনিতে দেওয়া তাকে আদিল ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করবে না, বরং তার মুখ থেকে এমন বর্ণনা আদায় হয়ে খবর হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, আজ যদি কোনো রাজনৈতিক নেতা তার ভাষণে বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হলো: ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।’ সংবাদপত্রে যদি এই খবর ছাপা হয় যে অমুক ব্যক্তি এই হাদিসটি পড়েছেন। পরবর্তীতে কোনো ঐতিহাসিক যদি এই খবরটিকে সেই নেতার জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে এর দ্বারা সেই ব্যক্তি মুহাদিস বা আদিল ও নেককার প্রমাণিত হবেন না। ইয়াজিদও একইভাবে কখনো সখনো কোনো হাদিস শুনিতে দিত। অন্যান্য কিছু বদনাম খলিফাও কখনো সখনো হাদিস বর্ণনা করতেন, উদাহরণস্বরূপ ইমাম তাবারানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার নিজস্ব সনদে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যাতে রাবী সালেহ বিন নাবাতাহ বলেন যে, আমি আমিরুল মুমিনীন মামুনকে বলতে শুনেছি যে তিনি তার পিতার নিকট থেকে অমুক হাদিস বর্ণনা করেছেন। [১]

এখন অকাট্য ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে মামুনের রশিদ তার শেষ বছরগুলোতে শিয়া মতবাদ ও মুতাজিলা মতবাদ প্রচারে কঠোরভাবে কোমর বেঁধেছিলেন। তিনি মুতাজিলা মতবাদ প্রসারের জন্য একটি নিয়মিত অভিযান শুরু করেছিলেন এবং নিজের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এর মতো মহান আলেমকে কেবল এই কারণে গ্রেফতার করিয়েছিলেন যে তিনি ‘খালকে কুরআন’ মাসআলায় সরকারি অবস্থানের সাথে একমত ছিলেন না।

এখন যদি মামুনের রশিদের মহব্বতে আত্মহারা হয়ে কোনো ‘গবেষক’ সাহেব এমন ‘গবেষণা’ পেশ করেন যে, ‘মামুন যে মুতাজিলা মতবাদ গ্রহণ করা এবং আইন্মায়ে ইসলামের ওপর জুলুম ও নির্যাতন করার সমস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনা তা ইসলাম বিদ্বেষী বর্ণনাকারীদের অপপ্রচার, অন্যথায় হযরত মামুনের রশিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তো একজন মহান মুহাদিস ছিলেন যার বর্ণনা ইমাম তাবারানিও উদ্ধৃত করেছেন এবং যখন এত বড় মুহাদিসের পক্ষ থেকে মামুনের রশিদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন তার বিপরীতে ঐতিহাসিকদের পেশ করা সেই সব তথ্যের কী মূল্য যাতে তার মুতাজিলা হওয়ার উল্লেখ রয়েছে, বরং তা ভিত্তিহীন ছাড়া আর কিছুই নয়’ - তবে আপনার কাছে এই ‘নতুন গবেষণা’র কী গুরুত্ব হতে পারে?

কিন্তু বর্তমান যুগে গবেষণার নামে প্রবৃত্তি ও কাঁচা আবেগের অনুসরণের যে ধারা শুরু হয়েছে তা দেখে এটি অসম্ভব নয় যে আগামীকাল কোনো ‘গবেষক’ সাহেব আরও এক ধাপ এগিয়ে এই ধরনের দাবিও করে বসবেন যে:

[১] আল-মু’জামুল সাগির লিত-তাবারানি, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৩২, দার আম্মার বৈরুত।

“এই সমস্ত বিবাদে ‘মহান মুহাদ্দিস আমিরুল মুমিনীন মামুনুর রশীদ’-ই সত্যের ওপর ছিলেন, পক্ষান্তরে আহমদ বিন হাম্বল ছিলেন একজন বিদ্রোহী, যিনি কাফেরদের প্ররোচনায় পড়ে এই মহান মুজাহিদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন যাতে ইসলামের এই মুজাহিদ, যিনি সেই সময় কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদ করছিলেন, পরাজিত হন এবং কাফেররা ইসলামি বিশ্বের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে পারে। কিন্তু আমিরুল মুমিনীন সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন।”

স্পষ্টতই যখন সমস্ত ইলমি উত্তরাধিকারকে উপেক্ষা করে এ ধরনের অন্তঃসারশূন্য দলিলের মাধ্যমে হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিপরীতে ইয়াজিদকে নেককার, মুহাদ্দিস, জান্নাতি এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বরং যেকোনো বড় থেকে বড় বুজুর্গের আর কী মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে! ইতিহাসকে যদি এভাবে নিজের খেয়ালখুশির অনুসারী বানিয়ে নেওয়া হয়, তবে সাঈদ বিন জুবায়ের, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) থেকে শুরু করে টিপু সুলতান পর্যন্ত সকলকেই বিভ্রান্ত, নির্বোধ এবং প্রবৃত্তি পূজারী প্রমাণ করা সম্ভব; পক্ষান্তরে তাদের বিপরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আব্দুল মালিক, মনসুর, মামুন এবং মীর সাদিকদের মতো ব্যক্তিদের মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং পরিতাপের বিষয় যে, বাস্তবে এমনটাই করা হচ্ছে।

কথার সারসংক্ষেপ হলো, দু-চারটি হাদিস শুনিয়ে দিলেই কোনো ব্যক্তি মুহাদ্দিস, সিকাহ, নেককার এবং ন্যায়পরায়ণ হয়ে যায় না, চাই সে ইয়াজিদ হোক বা মামুনুর রশীদ। এ ধরনের দু-চারটি হাদিস তো আজও অনেক নেতা স্টেজে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে থাকেন।

ইয়াজিদের বর্ণনা করার যোগ্যতা তখন প্রমাণিত হতো যখন এই বর্ণনা সহিহ বা হাসান হাদিস সংকলনসমূহে উদ্ধৃত হতো, অথবা মুহাদ্দিসগণ এর ওপর সহিহ বা হাসান হওয়ার হুকুম লাগাতেন। অথবা অন্তত জারাহ ও তাদিল বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট করতেন যে ইয়াজিদ সিকাহ। কিন্তু সিহাহ সিভাহ তো দূরের কথা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের উল্লিখিত একটি বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনো হাদিস সংকলনে ইয়াজিদের কোনো বর্ণনা গ্রহণ করা হয়নি, বরং মুহাদ্দিসগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সে বর্ণনা করার যোগ্য নয়। [১]

স্বয়ং হাফেজ ইবনে কাসির (রহ.), যিনি (ইয়াজিদের জীবনীতে লিখছেন যে সে তার পিতার নিকট থেকে হাদিস: ‘মান ইউরিদুল্লাহ বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ দ্বীন’ বর্ণনা করেছে) সাড়ে তেরো হাজার হাদিস সম্বলিত সুন্নাহর এক বিশাল ভাণ্ডার ‘জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান’ সংকলন করেছেন। পাঠকরা এটি যাচাই করে দেখতে পারেন যে এতেও ইয়াজিদের কোনো বর্ণনা বিদ্যমান নেই।

সীমা তো এই যে, এই একই সংকলনে ‘মান ইউরিদুল্লাহ বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ দ্বীন’ হাদিসটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে তিন জায়গায় উদ্ধৃত করা হয়েছে [২], কিন্তু এক জায়গাতেও একে ইয়াজিদের সনদে পেশ করা হয়নি। যার পরিষ্কার অর্থ হলো, মুহাদ্দিসগণ ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। এজন্য যে মুহাদ্দিস তার ইতিহাসে প্রাসঙ্গিকভাবে ইয়াজিদের কোনো হাদিস উল্লেখ করেছেন, তিনিও তার হাদিস সংকলনে তার বর্ণনা মোটেও গ্রহণ করেননি।

[১] আল-মুনতখাব মিন ইলালিল খাল্লাল, ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি: ১/২২৭, মিজানুল ইতিদাল: ৩/৪৪০

[২] এক জায়গায় রাজা বিন হাইওয়াহ আন মুয়াবিয়া। দ্বিতীয় জায়গায় জিয়াদ বিন জিয়াদ আন মুয়াবিয়া। তৃতীয় জায়গায় মুহাম্মদ বিন কাব আন মুয়াবিয়া (জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান: ৮/৪৪১, ৪৪৭)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই হাফিজ ইবনে কাসীরই ইয়াজিদের হাদিস বর্ণনার প্রসঙ্গে লিখেছেন:

“আমি বলছি: ইয়াজিদ এমন কিছুই বর্ণনা করেননি যার জন্য তার প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হয়। আলহামদুলিল্লাহ!” [১]

হ্যাঁ, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি একমাত্র ব্যক্তি যিনি হাদিস সংকলনে ইয়াজিদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তবে এটি ভুলবশতও হতে পারে। আর যুক্তিযুক্ত বিষয় হলো যে, তার পক্ষ থেকে অসাবধানতাই হয়েছে। সম্ভবত ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামক অন্য কোনো বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ একজন মনে করে ভুল করেছেন। অন্যথায় এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, শত শত অ-শিয়া মুহাদ্দিসদের মধ্যে একজনও তাদের হাদিস সংকলনে ইয়াজিদের বর্ণনা গ্রহণ করেননি, অথচ শুধুমাত্র এমন একজন মুহাদ্দিস তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন যিনি শিয়া মনোভাবাপন্ন হিসেবে পরিচিত। [২] যদিও শিয়া হওয়ার কারণে তারা ইয়াজিদকে যতটা ঘৃণা করেন তা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু পুরো হাদিস ভাণ্ডারে শুধুমাত্র এই একজন মুহাদ্দিসই আছেন যিনি হাদিস সংকলনে ইয়াজিদের সনদে একটি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। স্পষ্টতই এটি একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয়। তাই এর কারণ নিয়ে চিন্তা করা জরুরি।

যদি চিন্তা করা হয় তবে পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে এবং অজান্তেই তিনি তার সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে ফেলেছেন। আব্দুর রাজ্জাকের কর্মপদ্ধতি যারা যাচাই করেন তাদের কাছে এই সত্যটি গোপন নয় যে, তার প্রচেষ্টা ছিল যতটা সম্ভব বেশি বেশি বর্ণনা সংগ্রহ ও বর্ণনা করা। তবে এই ব্যাপকতা সত্ত্বেও এটি আশা করা যায় না যে, যে সুযোগ সহীহ ও অ-সহীহ বর্ণনা সংগ্রহকারী অ-শিয়া মুহাদ্দিসদের কেউ দেননি, আব্দুর রাজ্জাক শিয়া হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সুযোগ দেবেন।

এই বিষয়টিও স্বীকৃত যে, আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনার আধিক্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু তাহকীক (গবেষণা) এবং নাকদে রিজাল (বর্ণনাকারীদের সমালোচনা)-এ তার কোনো অবস্থান ছিল না; তাই হাদিস সমালোচকগণ রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় কোথাও তার উক্তি উদ্ধৃত করেননি। এমন অ-সমালোচক মুহাদ্দিসের পক্ষে এটি অসম্ভব নয় যে, তার দ্বারা কখনো কোনো এক-আধটি স্থানে বর্ণনাকারীদের চিনতে ভুল হয়ে যাবে। এই সনদের দিকে তাকালে কোনো অ-সমালোচক মুহাদ্দিসের ভুল হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে; কারণ এতে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া শব্দটি স্পষ্টভাবে নেই। সনদটি নিম্নরূপ:

আব্দুর রাজ্জাক আস-সাওরী থেকে, তিনি আসিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আসিম থেকে, তিনি আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে।

সনদের শব্দগুলো এমন যে, ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে কেউ চিনতে পারবে না যে এখানে ‘তার পিতা থেকে’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে হাদিস সমালোচকগণ দেখে বুঝতে পেরেছেন যে, এই আব্দুর রহমান তো সেই ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া উমাবীরই পুত্র। তাই তাদের মধ্যে কেউ আব্দুর রাজ্জাকের এই হাদিসটি গ্রহণ করেননি।

এই সমস্ত আলোচনা এই দিক থেকে ছিল যে, আব্দুর রাজ্জাকের পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে। তবে যদি এটি মেনে নেওয়া হয় যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এর সুযোগ দিয়েছেন, তবে এটি সমস্ত মুহাদ্দিসদের থেকে আলাদা একটি শায (ব্যতিক্রমী) আমল। আর স্পষ্ট যে, কারো শায আমল দলিল হতে পারে না।

[১] “قلت: لم يرو شيئا يحتاج فيه اليه والله الحمد” (আমি বলছি: তিনি এমন কিছুই বর্ণনা করেননি যাতে তার প্রয়োজন পড়ে, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।) (আত-তাকমিল ফিল জারহি ওয়াত তা’দীল, ৬/২, তবা মারকাজুন নুমান ইয়েমেন)

[২] মনে রাখবেন যে, এখানে শিয়া বলতে রাফেযী বোঝানো হয়নি। এরা সেই ধরনের শিয়া ছিলেন যাদেরকে জমহুর ওলামাগণ পথভ্রষ্ট বা বিদআতি গণ্য করেননি এবং মুহাদ্দিসগণ তাদের থেকে আহকামের ক্ষেত্রেও বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এখানে শুধুমাত্র এটি বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যখন সাধারণ আহলে সুন্নাতও ইয়াজিদকে ঘৃণা করেন এবং কট্টর আহলে সুন্নাত মুহাদ্দিসগণও ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা নেওয়া জায়েজ মনে করেন না, তখন যেকোনো ধরনের শিয়া মুহাদ্দিসের তো ইয়াজিদের প্রতি সাধারণ আহলে সুন্নাতের তুলনায় বেশি ঘৃণা থাকবে। তার ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা গ্রহণে আর কী আগ্রহ থাকতে পারে।

পরিশেষে আরজ এই যে, আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদের নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) হওয়া থেকে তার পিতা ইয়াজিদের নির্ভরযোগ্য হওয়া আবশ্যিক হয় না। পিতা ও পুত্রের অবস্থা সর্বদা এক হওয়া কোনো জরুরি বিষয় নয়। কখনো পাপাচারী পিতার পুত্র নেককার হয় এবং অনেক সময় জ্ঞানী পিতার পুত্র মূর্খ ও অযোগ্য হয়। বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে যে, পিতাকে অযোগ্য মনে করা হয়েছে কিন্তু পুত্রকে নির্ভরযোগ্য ও দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা এর বিপরীতে পিতা দলিল ও নির্ভরযোগ্য ছিল এবং পুত্র দুর্বল ও মিথ্যাবাদী। শরয়ী, যৌক্তিক, প্রথাগত এবং নৈতিক মূলনীতি এটাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কর্মের জন্য দায়ী। তাই প্রশ্নকারীর এই দলিলটির কোনো গুরুত্ব নেই।

হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর দৃষ্টিতে ইয়াজিদের মর্যাদা:

- প্রশ্ন: ইবনে শাওজাবের মতো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. ইয়াজিদের কথা উল্লেখ করার সময় তার জন্য রহমতের দোয়া করতেন। [১] এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পূর্বসূরিগণ ইয়াজিদের কদরদান ছিলেন।
- উত্তর: ইবনে শাওজাবের এই বর্ণনায় দ্বিগুণ দুর্বলতা রয়েছে: প্রথমত, এটি বিচ্ছিন্ন সূত্রবিশিষ্ট (মুনকাতিউল ইসনাদ)। দ্বিতীয়ত, এই বর্ণনাটি ইব্রাহিম বিন আবি আবলাহ থেকে বর্ণিত, যিনি একজন অজ্ঞাত (মাজহুল) বর্ণনাকারী। এই দুই দুর্বলতা একত্রিত হওয়ার পর এই বর্ণনার কোনো গুরুত্ব থাকে না। এর বিপরীতে তুলনামূলক উত্তম সূত্রের সাথে উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াজিদকে আমিরুল মুমিনিন বলা ব্যক্তিকে তিনি বিশটি বেত্রাঘাত করিয়েছিলেন। [২]

[১] ইবনে শাওজাব বলেন, আমি ইব্রাহিম বিন আবি আবলাহকে বলতে শুনেছি, আমি উমর বিন আবদুল আজিজকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার জন্য রহমতের দোয়া করতে শুনেছি। (লিসানুল মিজান: ২৯৩/৬)

[২] ইমাম যাহাবী বলেন: মুহাম্মদ বিন আবি আস-সারী বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আবদুল মালিক বিন আবি গানিয়া থেকে, তিনি নওফেল বিন আবি আকরাব থেকে। তিনি বলেন: আমি উমর বিন আবদুল আজিজের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার কথা উল্লেখ করে বলল, ‘আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদ’। তখন উমর বিন আবদুল আজিজ বললেন, তুমি তাকে আমিরুল মুমিনিন বলছ? এরপর তিনি তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন।

(তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী, তাদমুরি: ২৬৭/৫; বাশার: ৪৩১/২)

বর্ণনাকারীদের জারহ ও তাদিল (সমালোচনা ও প্রশংসা) সংক্রান্ত মতামত নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ বিন আবি আস-সারী: ইমাম যাহাবী বলেন: হাফেজ ও নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। আল-কাশিফ ফি মারিফাতি মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিল সিত্তাহ: ৩১৩/৩। ইমাম আহমদ ও ইবনে সালিহও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (তবকাতুল হনাবিলা লি ইবনি আবি ইয়ালা: ৩৩২/১, তাবা’ আল-মারিফাহ)।

ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার ‘ফাযায়িলুস সাহাবা’ গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইয়াহইয়া বিন আবদুল মালিক: (মৃত্যু ১৯০ হিজরি) বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাকে সালেহ (সৎ) এবং ইমাম আবু দাউদ তাকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বলেছেন। (তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী, তাদমুরি: ৩৫৭/১২; বাশার: ১০০/৩, তাবা’ বাশার; তাকরিবুত তাহজিব, অনুবাদ নম্বর: ৭৫৯৮)।

আবু আকীল: (মৃত্যু ১৫০ হিজরি) নির্ভরযোগ্য। তিনি উমর বিন আবদুল আজিজের বর্ণনাগুলো গ্রহণ করেছেন। হাফেজ যাহাবী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। (তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী, তাদমুরি: ৩১৩/৯; বাশার: ৯৯/৩)।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা থেকে স্পষ্ট যে, এটি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বর্ণনা।

ইবনে হাজার আসকালানি এই বর্ণনাটি অন্য একটি সূত্রের মাধ্যমেও উদ্ধৃত করেছেন: ইয়াহইয়া বিন আবদুল মালিক বিন আবি গানিয়া বলেন, আমাদের নিকট নওফেল বিন আবি আকরাব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি উমর বিন আবদুল আজিজের নিকট ছিলাম... (তাহজিবুত তাহজিব: ৩৬১/১১)।

নওফেল বিন আবি আকরাব: (মৃত্যু ১২০ হিজরি) তিনি বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং নির্ভরযোগ্য। তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী, তাদমুরি: ১৫৮/৭; বাশার: ৩৫০/৩; তাকরিবুত তাহজিব, অনুবাদ নম্বর: ৮৩২১।

দ্রষ্টব্য: রিজাল শাস্ত্রের কিছু কিতাবে ইয়াহইয়া বিন আবদুল মালিক বিন আবি গানিয়ার স্থলে ‘ইবনে আবি উতবা’ লেখা হয়েছে। সঠিক শব্দ হলো ‘ইবনে আবি গানিয়া’।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ইমাম আহমদ রহ.-এর “কিতাবুজ জুহদ”-এ কি ইয়াজিদের বর্ণনা রয়েছে?

প্রশ্ন: আল্লামা ইবনুল আরাবী রহ. লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. “কিতাবুজ জুহদ”-এ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার বর্ণনা পেশ করেছেন এবং তাকে তাবেয়ীদের পূর্বে সাহাবীদের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং তার একটি জাহিদসুলভ ও সূফীবাদী খুতবা পেশ করেছেন:

عن يزيد بن معاوية في “كتاب الزهد” انه كان يقول في خطبته: اذا مرض احدكم مرضا فاشفى ثم تماثل، فلينظر الى افضل عمل عنده فليلزمه.

(“কিতাবুজ জুহদ”-এ ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সে তার খুতবায় বলেছে:

“তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে, অতঃপর সুস্থতা লাভ করলে সে যেন তার উত্তম আমলের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তা আঁকড়ে ধরে।”) [১]

আল্লামা ইবনে আরাবী রহ. এর সাথে আরও বলেন:

هذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين.

(এই বর্ণনাটি এই কথার দলিল যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর নিকট ইয়াজিদ এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তিনি তাকে জাহিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।) [২]

ইয়াজিদের শ্রেষ্ঠত্বের এর চেয়ে বড় আর কী প্রমাণ হতে পারে যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. তার প্রশংসাকারী।

উত্তর: ইমাম আহমদ রহ.-এর ওপর এটি একটি মিথ্যা অপবাদ যে, তিনি ইয়াজিদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. তো ইয়াজিদ সম্পর্কে বলতেন: “لا يُذَكَّرُ عَنْهُ حَدِيثٌ” (তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করা যাবে না।) [৩]

প্রকৃতপক্ষে আল্লামা ইবনুল আরাবী এখানে চরম বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর “কিতাবুজ জুহদ”-এ এমন কোনো বর্ণনা আদৌ বিদ্যমান নেই যাতে শাসক ইয়াজিদের খুতবার একটি শব্দও আছে।

আল্লামা ইবনুল আরাবীর এই দাবি যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ইয়াজিদকে জাহিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন, তা এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ইমাম আহমদ রহ. জাহিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত বর্ণনাসমূহের মধ্যে ইয়াজিদের বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু বর্ণনার সনদে কেবল “ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া” শব্দ আসার কারণে বর্ণনাটি শাসক ইয়াজিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সনদ বা মতনে এর ওপর কোনো শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায়; কারণ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামে অন্যান্য হাদিস বর্ণনাকারীও রয়েছেন যাদের মধ্যে ‘ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নাখয়ী’ বর্ণনাকারী হিসেবেও প্রসিদ্ধ এবং আবেদ ও জাহিদ হিসেবেও।

এখন আপনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর “কিতাবুজ জুহদ” হাতে নিন এবং প্রতিটি বর্ণনা দেখতে থাকুন। আপনি জানতে পারবেন...

[১] আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃ. ২৩৫, তাবা দারুল জিল।

[২] আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃ. ২৩৫, তাবা দারুল জিল।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এর “কিতাবুজ জুহদ” মুহাম্মদ আবদুস সালাম শাহীনের টীকা সহ “দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ বৈরুত” থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি সাধারণত পাওয়া যায়। যদি কারো কোনো সন্দেহ থাকে তবে তিনি তা ভালোভাবে খুঁজে দেখতে পারেন। সম্ভবত ইবনুল আরাবী লেখার সময় কিতাবের কপি সামনে রাখেননি বরং স্মৃতির ওপর নির্ভর করেছিলেন, তাই তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

[৩] আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল, ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, পৃ. ২৩৭।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

হবে যে তিনি যেখানে যেখানে ‘ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া’র বর্ণনাগুলো এনেছেন, সেগুলোর অধিকাংশের সনদ বা মতনে এমন স্পষ্ট আলামত বিদ্যমান রয়েছে, যা থেকে জানা যায় যে এখানে শাসক ইয়াজিদের কথা বলা হচ্ছে না। যেমন:

একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আবুদারদা (রা.)-এর কাছে তাঁর কন্যা দারদার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। [১]

স্পষ্টতই এটি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের কথা হচ্ছে না; কারণ আবুদারদা (রা.)-এর মৃত্যু ৩২ হিজরিতে এবং ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের জন্ম ২৬ হিজরিতে। অর্থাৎ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের বয়স ছিল ছয় বছর যখন আবুদারদা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। এটি সম্ভব নয় যে ইয়াজিদ ছয় বছর বয়সে আবুদারদা (রা.)-এর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সুতরাং ইনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নাখয়ী।

‘কিতাবুয যুহদ’-এ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার আরও কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যেখানে সনদে ‘আন-নাখয়ী’ কথাটি তিনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। [২]

সুতরাং যেখানে সনদ বা মতনে ইয়াজিদ নামের একাধিক ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কাউকে নির্দিষ্ট করার কোনো আলামত থাকবে না, সেখানেও তাকে ইয়াজিদ নাখয়ীর দিকেই সম্বন্ধ করা হবে; কারণ ইমাম আহমদ তাঁর থেকেই অন্যান্য বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

অথবা বড়জোর এর অবকাশ থাকবে যে বিষয়টি স্থগিত রাখা হবে। এটি নিছক পক্ষপাতিত্ব বরং কারচুপি যে কোনো আলামত না থাকা সত্ত্বেও তাকে জোরপূর্বক শাসক ইয়াজিদের দিকে সম্বন্ধ করা হবে।

‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’-এ কি ইয়াজিদের কোনো বর্ণনা আছে?

প্রশ্ন: ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’ হাদীসের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। এতে ইমাম আবু দাউদের ‘মারাসিল’ থেকে আমীর ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার এই হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে:

“ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি বসরার অধিবাসীদের কাছে লিখেছিলেন: তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গনীমতের মাল থেকে পশমের একটি লাগাম চেয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি আমার কাছে আগুনের একটি লাগাম চেয়েছ, তোমার জন্য এটি চাওয়া সমীচীন ছিল না এবং আমার জন্যও এটি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এটি আবু দাউদও ‘আল-মারাসিল’-এ বর্ণনা করেছেন।”

ইয়াজিদের ইলম ও তাকওয়ার প্রমাণের জন্য কি এই হাদীসটি যথেষ্ট নয়? [৩]

جواب: ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’-এ ‘মারাসিল আবি দাউদ’-এর বরাতে ‘ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া’ নামক রাবীর যে বর্ণনা...

[১] ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আবুদারদার কাছে তাঁর কন্যা দারদার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, অতঃপর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন (আয-যুহদ লি-আহমদ বিন হাম্বল, হা: ৭২১; হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/২১৫, ত: আস-সাআদাহ)

[২] “ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নাখয়ী থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই দুনিয়াকে অল্প করা হয়েছে, অতঃপর এর যা অবশিষ্ট আছে তা অতি সামান্যই।” (আয-যুহদ লি-আহমদ বিন হাম্বল, বর্ণনা নম্বর: ২১৩২)

[৩] আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা: ২১০৫, কিতাবুল জিহাদ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

বর্ণনা করা হয়েছে, একে ‘ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান’-এর বর্ণনা হিসেবে গণ্য করা নিছক একটি দাবি। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামে আরও অনেক সুপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের বর্ণনা মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। এখানে ইয়াজিদের নামের সাথে ‘রাযিয়াল্লাহু আনহু’ও বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান নন বরং ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আল-বুকাযি রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি একজন সাহাবী। এমনিতেও ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান সম্পর্কে জারহ ও তা’দীল ইমামগণের মতামত বিবেচনা করলে এটি অত্যন্ত সুদূরপরাহত যে কোনো মুহাদ্দিস নিজের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার ঝুঁকি নিয়ে তার বর্ণনা উদ্ধৃত করবেন।

উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে কি মন্দ কাজগুলো বাতিল হয়ে যায়?

প্রশ্ন: যখন এটি নিশ্চিত যে আমির ইয়াজিদ হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং এই সম্পর্কের কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তারপর আমির ইয়াজিদ মুসলমানদের খলিফা, তবে এই উচ্চ মর্যাদাগুলো কি এটি জানার জন্য যথেষ্ট নয় যে তার মন্দ কাজের বদনাম ভুল?

উত্তর: উচ্চ মর্যাদা এবং উচ্চ বংশীয় সম্পর্কের কারণে মন্দ কাজের ওজন কমে না বরং মন্দ কাজ আরও গুরুতর হয়ে যায় এবং এর জন্য পাকড়াওও বেশি হয়। উম্মুল মুমিনীনদের সম্বোধন করে আল্লাহর বাণী হলো:

“হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তার জন্য আযাব দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে।” [১]

যখন কোনো ব্যক্তির কোনো মন্দ কাজ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তখন তার বংশীয় মর্যাদার কারণে সেই মন্দ কাজ নাকচ হবে না বরং তাতে আরও তীব্রতা আসবে। যদি উচ্চ বংশীয় মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হতো, তবে ইয়াজিদের তুলনায় আবু লাহাবের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তার বংশীয় মর্যাদা কোনো কাজে আসেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হওয়াও কোনো কাজে আসেনি। আবু লাহাবের প্রমাণিত মন্দ কাজগুলোকে কি কেউ এই ভিত্তিতে অস্বীকার করতে পারে যে তার অমুক অমুক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মর্যাদা ছিল? যদি ইয়াজিদ থেকে (নওয়াসিব ব্যতীত) সমগ্র মুসলিম উম্মাহ অসন্তুষ্ট থাকে তবে তা যথার্থই। ইয়াজিদের মতো কাজ যদি পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে কোনো শাসক করত তবে হয়তো এত বেশি ক্ষোভ ও ঘৃণা সৃষ্টি হতো না, কিন্তু যেহেতু সে খাইরুল্ল কুরুন (উত্তম যুগ)-এ ছিল, এত বরকতময় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এবং এমন মহান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে, তাই সে সেই বদনামেরই যোগ্য ছিল যা সে পেয়েছে।

[১] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩০

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা | দ্বিতীয় খণ্ড

ইয়াজিদেদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার একটি অভিনব দলিল:

প্রশ্ন: এটি প্রমাণিত যে, আমীর মুয়াবিয়া (রা.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমীর ইয়াজিদকে নিজের উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন। এটি আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে ইয়াজিদেদের ‘তাদীল’ (ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য)-এর সমতুল্য। যখন একজন মহান সাহাবী একজন তাবেরীর তাদীল ও তাওসীক (নির্ভরযোগ্যতা প্রদান) করে দিয়েছেন, তখন পরবর্তীকালে কেউ তার ওপর লাখো সমালোচনা (জারাহ) করলেও সেই সমালোচনা প্রত্যাখ্যাতই হবে।

উত্তর: নবী কারীম (সা.)-এর বাণী হলো:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلُ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّحْوَاتِيمِ-

(নিশ্চয়ই মানুষ জাহান্নামীদের মতো আমল করে অথচ সে জান্নাতী হয়, আবার কোনো ব্যক্তি জান্নাতীদের মতো আমল করে অথচ সে জাহান্নামী হয়। আমলের নির্ভরতা শেষ পরিণতির ওপর।) [১]

এই হাদীসে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমলের নির্ভরতা শেষ পরিণতির ওপর। অসংখ্য মানুষ সারাজীবন মূর্তিপূজারি বা ফাসেক ও পাপিষ্ঠ ছিল, কিন্তু মৃত্যুর আগে তারা ঈমান ও নেক আমলের তাওফীক পেয়েছে। তারা আল্লাহর কাছেও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষও তাদের ভাগ্যের ওপর ঈর্ষা করে। এর বিপরীতে যদি কোনো ব্যক্তি সারাজীবন ওলী হয়ে থাকে কিন্তু শেষ জীবনে ফাসেক ও পাপিষ্ঠ হয়ে যায়, তবে সে ফাসেকদের মধ্যেই গণ্য হবে। ইয়াজিদেদের অবস্থা শেষ চার বছরের শাসনামলে নিঃসন্দেহে খারাপ ছিল। তার শেষ কাজ, যার চলাকালীন তার মৃত্যু হয়েছিল, তা ছিল আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর মতো মহান সাহাবীর বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের ওপর সৈন্য পরিচালনা। [২]

সুতরাং হাদীসে বর্ণিত এই মূলনীতি অনুযায়ী উম্মতের উলামায়ে কেরাম ইয়াজিদেদের মর্যাদা “যালিম” এবং “ফাসেক” হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর তাদীল তাঁর ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিজের সুধারণার (হুসনে যন) ভিত্তিতে ছিল। পরবর্তী পরিস্থিতি তাঁর সামনে ছিল না। তাঁর ইলমে গায়েব ছিল না যে তিনি ইয়াজিদেদের মৃত্যু পর্যন্ত সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকবেন।

ইয়াজিদেদের মন্দ কাজগুলো হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের পর প্রকাশ পায়। এই কাজগুলো সম্পর্কে তারাই জানতেন যারা সেই যুগে ছিলেন অথবা তার পরে এসেছেন। সুতরাং ইয়াজিদেদের চরিত্র সম্পর্কে তাদের মতামতই নির্ভরযোগ্য হবে যারা ইয়াজিদেদের প্রাথমিক, মধ্যবর্তী এবং শেষ—সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সেই ব্যক্তিবর্গের মতামত কী ছিল, তা আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত আছে, যার কিছু নমুনা আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৬৬০৭, কিতাবুল কদর

[২] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ৩, হা: ১৮৩২

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামের পাঁচজন রাবী

কিছু লোক আসমাউর রিজাল (বর্ণনাকারীদের জীবনী) থেকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামক কিছু ব্যক্তির অবস্থা পেশ করে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ দিতে চায় এবং হাদীসের কিতাবসমূহে তাদের সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে এই ইয়াজিদের ওপর প্রয়োগ করে। এমনকি কেউ কেউ এই ইবারতগুলোর মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে ইয়াজিদকে সাহাবী হিসেবেও সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। এটি নিকৃষ্টতম খিয়ানত।

মনে রাখবেন যে, আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে ‘ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া’ নামে পাঁচজন ব্যক্তি প্রসিদ্ধ:

- ১. ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আল-বাকায়ি (রা.): তিনি একজন সাহাবী। তাঁকে ইয়াজিদ বিন মুহাজ্জালও বলা হয়। [১]
- ২. ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আল-আসওয়াদ (রা.): তিনিও একজন সাহাবী; তিনি খায়বার যুদ্ধ অথবা তায়েফ যুদ্ধে শহীদ হন। [২]
- ৩. ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আন-নাখয়ি: তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর ছাত্র ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন; তিনি অনেক বড় ইবাদতকারী ও যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) ছিলেন। তিনি জিহাদে শহীদ হন। সহীহ বুখারীতে যেখানে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর নিকট ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার ওয়াজ শোনার কথা উল্লেখ আছে, সেখানে এই ইয়াজিদ নাখয়িই উদ্দেশ্য। তাঁকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আল-আবাসিও বলা হয়। আবদুল্লাহ বিন মুবারক বা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এর ‘কিতাবুয যুহদ’-এ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার নাম দেখে কিছু লোকের সন্দেহ হয় যে, ইয়াজিদ এত বড় ইবাদতকারী ও যাহিদ ছিল যে ‘কিতাবুয যুহদ’-এ তার কথা উল্লেখ আছে, অথচ সেখানে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নাখয়ির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের নয়। [৩]
- ৪. ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আল-আমিরি: ইবনে হিব্বান তাঁকে ‘সিকাত’ (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী)-দের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। [৪]
- ৫. ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া, আবু শায়বা আল-কুফি আল-খুরাসানি: আবু যুরআর মতে তিনি একজন সালেহ (সৎ) রাবী। [৫]

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-এর বর্ণিত বর্ণনা (অথবা সম্ভবত এর মতো আরও এক-আধটি বর্ণনা) ব্যতীত হাদীসের কিতাবসমূহে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামে যে সকল বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান সম্পর্কে নয়।

[১] আল-ইসাবাহ লি-ইবনে হাজার: ২/৫২৮; তাওযীহুল মুশতাবীহ লি-ইবনে নাসিরুদ্দিন: ৯/৩২১।

[২] আল-ইসাবাহ: ৬/৫২৭।

[৩] সহীহ বুখারী, খণ্ড ১: ২৩১১, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু আল-মাও’ইজাহ সা’আতান বা’দা সা’আহ; ফাতহুল বারী: ১১/২২৮; আন-নুকাতে আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ লি-ইবনে হাজার: ২/৭৯৭; তারিখ ইবনে মাঈন বি-রিওয়ায়াতিল দুরী, তরজমা: ৩৩৩৫; আল-ইলাল ওয়া মা’রিফাতুর রিজাল বি-রিওয়ায়াতি আবদুল্লাহ বিন আহমদ লি-আহমদ বিন হাম্বল: তরজমা নং: ৩০০৫; আস-সিকাত লিল-ইজলি, তরজমা নং: ২০৩৬, ত. আল-গার।

[৪] আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান, তরজমা নং: ৬১৫১।

[৫] আদ-দুয়াফা ওয়াল-মাতরুকীন লি-ইবনুল জাওযী, তরজমা: ৩৮০৫, আরও দেখুন: তাওযীহুল মুশতাবীহ: ৯/৩২২; তাহযীবুত তাহযীব: ১১/৩৬০।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর ওপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের পর্যালোচনা

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর দিকে নিসবতকৃত রাজনৈতিক ভুলসমূহ

প্রশ্ন: শাহ মঈনুদ্দিন নদভী তাঁর “তারিখে ইসলাম”-এ লিখেছেন যে, মারওয়ানকে খিলাফতের দাবির ওপর উৎসাহিত করার পেছনে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের বড় ভূমিকা ছিল। শাহ সাহেব “ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর একটি রাজনৈতিক ভুল এবং এর ফলাফল” শিরোনামের অধীনে লেখেন:

“সেই সময় প্রায় সমগ্র ইসলামি বিশ্বে ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর খিলাফত স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি একটি মারাত্মক ভুল করেন যার ফলে বনু উমাইয়্যার উৎখাত হওয়া শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মরণ থাকবে যে, তিনি মক্কা ও মদিনা থেকে বনু উমাইয়্যাদের বের করে দিয়েছিলেন, কিন্তু হাররার ঘটনার পর এই লোকেরা পুনরায় ফিরে এসেছিল। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাদের সাহস এতটাই কমে গিয়েছিল যে, মদিনার শাসক মারওয়ান বিন হাকাম উমায়বি পর্যন্ত ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু-এর বনু উমাইয়্যাদের প্রতি এতটাই ঘৃণা ছিল যে, তিনি পরিণতির কথা চিন্তা না করেই মারওয়ান এবং তার ছেলে আবদুল মালিকসহ সমস্ত বনু উমাইয়্যাকে মদিনা থেকে বের করে দেন। সেই সময় আবদুল মালিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত ছিল, তাই মারওয়ানের জন্য মদিনা ত্যাগ করা কঠিন ছিল, কিন্তু ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু তাকে এক মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করতে দেননি এবং মারওয়ানকে সেই অবস্থাতেই আবদুল মালিককে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। পরবর্তীতে ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু এই ভুলের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং তাদের সন্ধানে লোক পাঠান, কিন্তু তারা ততক্ষণে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনা ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু এবং বনু উমাইয়্যা উভয়ের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যদি সেই সময় ইবনে যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু বনু উমাইয়্যাদের আটকে রাখতেন, তবে তাদের মোকাবিলা করার মতো আর কেউ থাকত না।” [১]

শাহ সাহেবের এই গবেষণা কি সঠিক?

উত্তর: সর্বপ্রথম শাহ সাহেবের এই বক্তব্যে উপস্থাপিত বর্ণনার সনদ দেখা জরুরি। ইসলামের ইতিহাসের সমগ্র ভাঙারে এই বর্ণনাটি এই কাল্পনিক রূপে কেবল একজন শিয়া ঐতিহাসিক আহমদ বিন ইসহাক ইয়াকুবি (মৃত্যু ২৯২ হিজরি)-এর ইতিহাসে দেখা যায়, যিনি তৃতীয় হিজরি শতকের মানুষ। এটি নিশ্চিত যে, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু বনু উমাইয়্যাদের মদিনা মুনাওয়ারা থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু এই ঘটনা কখন এবং কোন পরিস্থিতিতে ঘটেছিল এবং এই নির্বাসনে মারওয়ান অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না? এটি পর্যালোচনার বিষয়। সহিহ ও জয়িফ বর্ণনার পার্থক্য না করার কারণে প্রকৃত সত্য আড়ালে রয়ে গেছে এবং মানুষ...

[১] তারিখে ইসলাম: ১/৩৮১, বরাতে তারিখে ইয়াকুবি: ২/৩০৪... লেখকের কাছে উপলব্ধ তারিখে ইয়াকুবির পাণ্ডুলিপিটি এক খণ্ডের, যাতে এই ঘটনাটি ৩১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই তিনটি বর্ণনার মধ্যে প্রথমটি ওয়াকিদির, যার দুর্বলতা স্পষ্ট। দ্বিতীয়টি ইয়াকুবি কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন, তৃতীয়টি আল-মাদায়িনি থেকে একইভাবে কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি বর্ণনাই সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

সেই বর্ণনাগুলো যা প্রমাণ করে যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) মারওয়ানকে মদিনা থেকে বের করে দেননি:

১. মাদায়িনির একটি দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে যার সারসংক্ষেপ হলো, বনু উমাইয়ার মজলিসে নতুন খলিফা নিয়োগের বিষয়ে মারওয়ান, হাসান বিন মালিক, দাহহাক বিন কায়েস এবং অন্যান্য উমাইয়া আমিরদের পরামর্শ সভা ‘জাবিয়া’ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

“দাহহাক মারওয়ানের কাছে বার্তা পাঠালেন। তিনি এবং আমার বিন সাঈদ আল-আশদাক, খালিদ বিন ইয়াজিদ ও আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ তাঁর কাছে আসলেন। দাহহাক বিন কায়েস ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন: হাসানকেও লিখে দাও যেন সে জাবিয়া চলে আসে, আমরাও সেখানে যাব এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে খলিফা বানিয়ে নেব।”

“দাহহাক বিন কায়েস মারওয়ানকে বার্তা পাঠালেন। তিনি এবং আমার বিন সাঈদ আল-আশদাক, খালিদ বিন ইয়াজিদ এবং আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ তাঁর কাছে আসলেন। দাহহাক বিন কায়েস ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন যে, হাসানকেও লেখো যেন সে জাবিয়া চলে আসে, আমরাও সেখানেই যাব এবং তোমাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে খলিফা বানিয়ে নেব।”

এরপর পরামর্শ সভায় মতভেদ দেখা দিল। যার পর দাহহাক বিন কায়েস (রা.) আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর জন্য প্রকাশ্যে বায়াত গ্রহণ করলেন এবং মানুষ এই খেলাফতকে মেনে নিল। “ইবনে জুবাইরের বায়াত প্রকাশ পেল, ফলে তিনি তা করলেন এবং মানুষ তাঁর অনুসরণ করল।”

এই সব ঘটনার পর আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) দাহহাককে সিরিয়ার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং বনু উমাইয়াকে মক্কা ও মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন।

“ইবনে জুবাইরের কাছে খবর পৌঁছাল, তখন তিনি দাহহাককে সিরিয়ার শাসনভার অর্পণ করে পত্র লিখলেন এবং মক্কা ও মদিনায় অবস্থানরত উমাইয়াদের বহিষ্কার করলেন।” [১]

এই বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যখন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) বনু উমাইয়াকে হিজাজ থেকে বের করে দিচ্ছিলেন, তখন মারওয়ান সিরিয়ায় ছিলেন। [২]

২. দ্বিতীয় বর্ণনাটি ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত, তাই এটি দুর্বল, তবে এর সমর্থক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

ওয়াকিদির এই বর্ণনা অনুযায়ী, মদিনাবাসীরা ইয়াজিদের বায়াত ভঙ্গ করার পর প্রথমে তো মদিনায় অবস্থানরত বনু উমাইয়াদের কিছু

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, জুজ মুতাম্মিম আস-সাহাবা, আত-তাবাকাতুল খামিসা: ২/৪৯৮; ৫/২০৫, ত. মাকতাবাতুস সিদ্দিক তায়েফ; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি তাদমুরি: ৫/১৪৪; বাশার: ২/৬৩ আল-মাদায়িনি থেকে।

এই পুরো আলোচনায় শুধুমাত্র আল-মাদায়িনির এই বর্ণনাটির সনদ মজবুত এবং এটি স্পষ্ট শব্দে বলছে যে, যখন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর মদিনা থেকে বনু উমাইয়াদের বহিষ্কার করেন, তখন মারওয়ান সিরিয়ায় ছিলেন। এই বর্ণনাটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং হাসান। ইবনে সাদ মাদায়িনির দুটি সূত্র থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। মূল পাঠ অভিন্ন: (ক) ইবনে সাদ, আল-মাদায়িনি থেকে, তিনি মাসলামা বিন মুহারির থেকে, তিনি হারব বিন খালিদ থেকে। হারব বিন খালিদ সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। মাসলামা বিন মুহারিবকেও ইবনে হিব্বান নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। এভাবে এই বর্ণনাটি হাসান। (খ) ইবনে সাদ, আল-মাদায়িনি থেকে, তিনি খালিদ বিন ইয়াজিদ (বিন বশির) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। এই সূত্রে খালিদ বিন ইয়াজিদ দুর্বল, তবে উভয় সূত্র একত্রিত করলে সনদে শক্তি সৃষ্টি হয়।

[২] এটাও জানা যাচ্ছে যে, ইবনে জুবাইর (রা.) বনু উমাইয়াদের শুধু মদিনা থেকেই নয় বরং মক্কা থেকেও বের করে দিয়েছিলেন। এর কারণ এটাই হতে পারে যে, যখন তিনি দেখলেন যে এখন পর্যন্ত তারা শুধু বনু উমাইয়ার প্রতিনিধিদের এড়িয়ে চলছেন, তখন তিনি বিপদ অনুভব করলেন যে এই গোত্র তাদের শক্তি এবং রাজনৈতিক কলাকৌশলের কারণে তাঁর কেন্দ্রে যেকোনো সময় বিদ্রোহ ঘটাতে পারে। ফলে খেলাফত রক্ষার জন্য তিনি এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন।

ইতিহাসে উম্মতে মুসলিমা

...দিন পর্যন্ত কেবল অবরোধ করে রাখা হয়েছিল কারণ তাদের অধিকাংশ লোকই ইয়াজিদের সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। শহর দখলের জন্য তাদেরকে নিরুপায় করা জরুরি ছিল। তবে তাদের কাউকে হত্যা করা হয়নি। তাদের মধ্যে মারওয়ান বিন আল-হাকাম এবং তার ছেলে আব্দুল মালিকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছু দিন পর মদিনাবাসী এই শর্তে অবরোধ তুলে নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয় যে, তারা মদিনা আক্রমণের জন্য আসা সিরীয় বাহিনীকে এমন কোনো তথ্য দেবে না যাতে শহর দখল করা সহজ হয়ে যায়, বরং তারা সেই বাহিনীকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। বনু উমাইয়ারা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল এবং মুসলিম বিন উকবার সেই বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হলো যারা শহর আক্রমণ করতে আসছিল। তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম বিন উকবাকে মদিনা মুনাওয়ারার দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিল এবং আক্রমণের পরিকল্পনায় তাকে সহায়তা করল।

এরপর ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে, মারওয়ান বিন আল-হাকাম হাররার যুদ্ধে মুসলিম বিন উকবাকে সহায়তা করার পর সিরিয়ায় চলে যান এবং ইয়াজিদের কাছেই অবস্থান করেন। ইয়াজিদের উত্তরসূরি মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সময়ও মারওয়ান সেখানেই ছিলেন এবং তিনি এই দুর্ঘটনায় শোকগাথা পাঠ করেছিলেন। [১]

এই বর্ণনা থেকেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের رضى الله عنه-এর পক্ষ থেকে বনু উমাইয়াদের মদিনা থেকে নির্বাসনের সময় মারওয়ান মদিনায় নয় বরং সিরিয়ায় ছিলেন। [২]

তৃতীয় বর্ণনাটি আওয়ানা বিন আল-হাকামের, তাতে রয়েছে:

“আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের رضى الله عنه মদিনায় তার আমিলকে (গভর্নর) লিখেছিলেন যেন তিনি বনু উমাইয়াদের সেখান থেকে বের করে দেন, ফলে তারা তাদের সন্তান-সন্ততি ও নারীদেরসহ সেখান থেকে বহিষ্কৃত হলো। তারা দামেস্কে পৌঁছাল যেখানে মারওয়ান বিন আল-হাকাম উপস্থিত ছিলেন।” [৩]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৮, সাদির সংস্করণ... ওয়াকিদীর বর্ণনার প্রাথমিক অংশগুলো হলো: “যখন হাররার দিনগুলোতে মদিনাবাসী বিদ্রোহ করল, তখন তারা উসমান বিন মুহাম্মদ এবং বনু উমাইয়াদের মদিনা থেকে বের করে দিল এবং তাদেরকে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে দিল। তারা তাদের কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নিল যে, তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না এবং মুসলিম বিন উকবা আল-মুররির নেতৃত্বে তাদের দিকে প্রেরিত এই বাহিনীর কাছে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করবে না। কিন্তু যখন তারা মুসলিম বিন উকবার মুখোমুখি হলো, তখন তারা তাকে সালাম করল এবং সে তাদেরকে মদিনা ও মদিনাবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তখন মারওয়ান তাকে তথ্য দিতে শুরু করল এবং তাদের বিরুদ্ধে তাকে প্ররোচিত করতে লাগল।” (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৮, সাদির সংস্করণ)

[২] ওয়াকিদীর এই বর্ণনাটি তার পূর্ববর্তী বর্ণনার বিপরীত। এখন প্রশ্ন হলো, এটিকে গ্রহণ করা হবে নাকি পূর্ববর্তী বর্ণনাকে? যেহেতু ওয়াকিদীর এই বর্ণনাটি মাদাইনির হাসান বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং যুক্তির দিক থেকেও মজবুত; কারণ একবার গৃহীত হওয়ার পর ফিতনা ও গৃহযুদ্ধের পরিবেশে মারওয়ান পুনরায় পরিবার-পরিজনসহ মদিনায় কীভাবে বসবাস করতে পারতেন। তার জন্য মদিনার তুলনায় সিরিয়াই ছিল নিরাপদ স্থান। পক্ষান্তরে ওয়াকিদীর পূর্ববর্তী বর্ণনার কোনো সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না, তাই সেটির কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না। এর পাশাপাশি উভয় বর্ণনাকে মেলালে এটি প্রমাণিত হবে যে, বনু উমাইয়াদের মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বহিষ্কার দুইবার হয়েছিল: প্রথমবার বহিষ্কার মদিনাবাসীরা করেছিল। তাদের মধ্যে মারওয়ান বিন আল-হাকামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি হাররার যুদ্ধের আগের ঘটনা, ৬৩ হিজরির। মদিনাবাসীরা অনেক আগেই বনু উমাইয়াদের শহর থেকে বের করে দিয়েছিল, যার মূল কারণ ছিল তারা তাদের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা করছিল। তাদের এই পদক্ষেপের সাথে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের رضى الله عنه-এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

[৩] “আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের رضى الله عنه মদিনায় তার আমিলের কাছে লিখেছিলেন যেন তিনি বনু উমাইয়াদের মদিনা থেকে নির্বাসিত করেন। ফলে তারা তাদের পরিবার ও নারীদের নিয়ে সিরিয়ার দিকে চলে গেল। অতঃপর বনু উমাইয়ারা দামেস্কে পৌঁছাল এবং সেখানে মারওয়ান উপস্থিত ছিলেন।” (তারিখুত তাবারি: ৫/৫৩১)। এই বর্ণনার সনদে হিশাম কালবি রয়েছে, তাই এটিও দুর্বল। তবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এটি অন্তত ইয়াকুবি ও মাদাইনির সনদবিহীন বর্ণনাগুলোর চেয়ে উত্তম। যেহেতু এর সমর্থনে একটি হাসান বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে, তাই এটি উল্লেখ করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কারো যদি আপত্তি থাকে তবে সে এটি এবং এর আগে উদ্ধৃত ওয়াকিদীর বর্ণনাটিও ছেড়ে দিতে পারে; কারণ আমাদের অবস্থানের প্রমাণের জন্য মাদাইনির সেই একটি হাসান বর্ণনাই যথেষ্ট। এই দুর্বল বর্ণনাগুলো কেবল সমর্থনের জন্য আনা হয়েছে।

এই বর্ণনায় স্পষ্ট যে, যখন বনু উমাইয়া নির্বাসিত হয়ে সিরিয়ায় এসেছিল, তখন মারওয়ান আগে থেকেই দামেস্কে ছিল। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) তাকে নির্বাসিত করেননি। সে আগেই নিজের ইচ্ছায় সেখান থেকে চলে গিয়েছিল।

ফলাফল

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাহ সাহেব কর্তৃক উপস্থাপিত ঘটনাটি ভিত্তিহীন। এটি সনদের দিক থেকেও প্রমাণিত নয় এবং যুক্তির দিক থেকেও সঠিক নয়। এই বর্ণনাটি সেই সব বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক যেগুলোর সনদ অধিকতর উত্তম। তাছাড়া এটি একজন মহান সাহাবীর নৈতিকতা, চরিত্র এবং মানসিক স্তরের ওপর আপত্তির সমতুল্য। সনদবিহীন বর্ণনার মাধ্যমে এ ধরনের কোনো যুক্তি প্রদান করা বৈধ নয়।

□□□

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিপরীতে কি সাহাবীগণও ছিলেন?

প্রশ্ন: বলা হয় যে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিপরীতে মারওয়ানকে সমর্থনকারীদের মধ্যে কিছু সাহাবীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং যদি মারওয়ানকে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে এই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বও সেই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হন। এটি কি সঠিক?

উত্তর: আমরা এই বিষয়টি নিয়ে যতটুকু গবেষণা করেছি, তাতে এ ধরনের ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মাত্র দুইজনকে সাহাবী বলা হয়েছে: একজন মালিক বিন হুবাইরা আল-সাকুনি (রা.) [১], দ্বিতীয়জন আবদুল্লাহ বিন মাসআদা আল-ফাজারি (রা.) [২]। রুহ বিন জানবা নামক আরেকজন ব্যক্তির ব্যাপারে সাহাবী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা সঠিক নয়। তবে তার পিতা অবশ্যই সাহাবী ছিলেন। তিনি নিজে একজন সামরিক জেনারেল, বাগ্মী এবং বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। [৩]

ইবনে হাজার (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেছেন: “কেউ কেউ তাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন, কিন্তু তার সাহচর্য প্রমাণিত নয়। সঠিক কথা হলো তিনি নবীযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।” [৪] ইবনে আসাকিরের গবেষণাও এটাই এবং তিনি বলেন যে, তার বর্ণনা কেবল সিরিয়ায় বসবাসকারী সাহাবীদের থেকে, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে নয়। [৫]

যা-ই হোক, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযানে কারো অংশগ্রহণকে সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। কারণ এটি ছিল একজন নির্ধারিত শরয়ী খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ)। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) হিজরি ৬৪ সনের রজব মাসে খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া এবং মিসরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তার বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছিল। এর চার মাস পর জিলকদ মাসে মারওয়ান নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তাই একে বিদ্রোহ (খুরুজ) ছাড়া অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না।

[১] আল-ইসাবাহ: ৫/ ৫৬১, ৫৬২; আল-ইসতিয়াব: ৩/ ১৩৬১

[২] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৪/ ১৩৭; আল-ইসাবাহ: ৪/ ২৩০; আল-ইসতিয়াব: ৩/ ৯৮৭

[৩] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৩/ ৩৬; আল-ইসতিয়াব: ২/ ৫০২

[৪] আল-ইসাবাহ: ২/ ৩২০

[৫] তারিখ দামেস্ক: ১৮/ ২৪৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এতে যদি কিছু সাহাবীর অংশগ্রহণ সঠিক সনদে প্রমাণিত হয়, তবে তা ভুল আবেগ বা অসৎ উদ্দেশ্য নয় বরং ভুল ব্যাখ্যার (তাউইল) ওপর ভিত্তি করে হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। যেমন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুদ্ধ ইজতিহাদী ভুলের ওপর ভিত্তি করে ছিল। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে নিজের অবস্থানের স্বপক্ষে একটি ব্যাখ্যা (তাউইল) ছিল, যেখানে বিদ্রোহীদের কাছে কোনো কারণ ছিল না। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর প্রতিপক্ষ মূল সাহাবীগণ ছিলেন না বরং বনু উমাইয়ার কিছু আমীর ছিলেন।

ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিদ্রোহ করলে গুনাহ বা ফিসক আবশ্যিক হয় না:

এটি মনে রাখা উচিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি সাধারণ জীবনে নেককার ও সৎ হন কিন্তু বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ভুল করেন, তবে এর ফলে তিনি ফাসিক ও ফাজির হয়ে যান না। যদি তার বিদ্রোহ কোনো ব্যাখ্যার (তাউইল) ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে শরীয়ত তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করে না। কারণ তিনি হয়তো বিষয়টিকে কোনো বিশেষ দিক থেকে দেখেছেন এবং শরয়ী দলীলসমূহের কোনো বিশেষ দিক তার সামনে রয়েছে এবং তিনি অন্য কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারেও এমনটিই ধারণা করা হবে। তবে এটি আলাদা কথা যে, বিদ্রোহ একটি রাজনৈতিক বিচ্যুতি যা সমাজে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এই কারণে ইসলাম বিদ্রোহকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং সাধ্যমতো শাসকদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) কি ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রহ.)-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন?

প্রশ্ন: তাবাকাতে ইবনে সাদে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রহ.)-কে নিজের বায়আত গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন? তাদের বন্দি করেছিলেন, হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন এবং বনু হাশিমকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য কাঠ সংগ্রহ করেছিলেন। তারা প্রায় পুড়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ ইরাক থেকে মুখতার সাকাফীর অশ্বারোহীরা পৌঁছে তাদের রক্ষা করে। [১] এটি কি প্রমাণিত?

উত্তর: এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। সনদের মূল ভিত্তি ওয়াকিদীর ওপর, যার দুর্বলতা সুস্পষ্ট। এছাড়া ওয়াকিদী এই ঘটনাটি একটি মিশ্র (মুরাক্কাব) সনদে বর্ণনা করেছেন, যার কারণে এটি জানা সম্ভব নয় যে ঘটনার কোন অংশটি কোন রাবী বর্ণনা করেছেন। এই রাবীদের মধ্যে ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাও রয়েছেন, যাকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ‘মাতরু্কুল হাদীস’ (পরিত্যক্ত), ‘মুনকারুল হাদীস’ এবং ‘লাইসা বিশাই’ (কিছুই নয়) বলেছেন। [৩] এছাড়া আবু মিখনাফ এটি বর্ণনা করেছেন। [৪] তার দুর্বলতা বরং মিথ্যাবাদী হওয়াও সুস্পষ্ট।

[১] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/১০১, ত. সাদার।

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/১০০, ত. সাদার।

[৩] মাওসুআতুল আকওয়াল আহমদ: ১/৭৩।

[৪] তারিখে তাবারী: ৬/৭৫ থেকে ৭৭।

...রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বায়আত করার পর কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি।

নিঃসন্দেহে জুবায়েরের সন্তান (আবদুল্লাহ) সৌভাগ্যবান ও নেককার ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যারা বয়সে তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন এবং তাঁদের মর্যাদার সামনে তাঁর (আবদুল্লাহর) ফজিলত তেমন কোনো বিষয় ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববর্তী যুগের বড়দের সামনে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সাহাবীদের সামনে তাবেরীদের মতো। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ইমামত ও খিলাফতের পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। কারণ তিনি কুরাইশ বংশের ছিলেন এবং কুরাইশদের মধ্যে তাঁর পরিবার একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাঁর পিতা জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাওয়ারি এবং তাঁর মাতা ছিলেন আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)। তাঁর নানা ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কখনো আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর বায়আত করেননি, বরং তিনি ইয়াজিদের বায়আত করতেও অস্বীকার করেছিলেন। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রা.)-এর নিকট থেকে এত কঠোরভাবে কীভাবে বায়আত নিতে পারতেন?

এই সাহাবীগণ কেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর নিকট বায়আত হননি?

৭ سوال: একটি আপত্তি এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রা.) কেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর নিকট বায়আত হননি? অথচ পরবর্তীতে কেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন?

جواب: এ বিষয়ে মৌলিক কথাটি মনে রাখা উচিত যে, এই তিন বুজুর্গের বায়আত না করার পেছনে কোনো ফিতনা বা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তাঁদের অবস্থান ছিল এই যে, বায়আতের জন্য সমগ্র উম্মতের ঐক্যমত জরুরি। প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর বায়আত করা ওয়াজিব নয়, বরং যখন সকলে বায়আত হয়ে যাবে তখন তাঁর আনুগত্য করা উচিত। যাতে খিলাফতের নামে উম্মতের বিরুদ্ধে কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে না হয়। হযরত মুফতি রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী সাহেব (রহ.) লিখেছেন:

“খিলাফত কায়েম হওয়ার পরও প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর খলিফার বায়আত করা ফরজ নয়, শুধু এতটুকু ফরজ যে সে বিদ্রোহ করবে না।”

[১] তারিখ ইয়াকুবি, পৃষ্ঠা ৩০৪

[২] মুরুজুয যাহাব, ৩/ ৫৭-৬০, তিবআতুল লুবনানিয়্যাহ

[৩] আনসাবুল আশরাফ, ৪/ ৩৭৬ থেকে ৩৮৭, তিবআ দারুল ফিকর

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/ ৩০০

[৫] ইমাম নববী লিখেছেন: প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর এটি ওয়াজিব নয় যে সে খলিফার নিকট যাবে এবং নিজের হাত তাঁর হাতে দিয়ে বায়আত করবে; বরং ওয়াজিব হলো যখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি কারো ইমামতের ওপর একমত হবেন, তখন তাঁর আনুগত্য করা। মতভেদ না করা এবং তাঁর বায়আত অস্বীকার না করা। (শারহ সহিহ মুসলিম, ১২/ ২৭, তিবআ মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি; এবং অনুরূপ কথা আইনি উমদাতুল কারী-তে বলেছেন, ১০/ ২৫৮, তিবআ দারু ইহয়া)

[৬] আহসানুল ফাতাওয়া, ৬/ ১০২, তিবআ এইচ এম সাঈদ কোম্পানি করাচি

সুতরাং এই বুজুর্গদের বায়আত গ্রহণে বিলম্ব করা কোনো সমালোচনার বিষয় ছিল না। এটি প্রমাণিত যে, তারা কোনো সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না। এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এখন কথা হলো, তারা বায়আতে বিলম্ব কেন করেছিলেন? মূলত এই মহান ব্যক্তিদের অবস্থান ছিল এই যে, যখন উম্মত কোনো একজন খলিফার ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে, তখনই আমরা বায়আত গ্রহণ করব।

এই অবস্থানের কারণ ছিল এই যে, এই ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে রাজনৈতিক বিবাদ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই সময় পর্যন্ত সিরিয়ার কিছু আমির বায়আত গ্রহণ করেননি, বরং তারা মারওয়ান এবং পরবর্তীতে আবদুল মালিকের চারপাশে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। এখন যদি এই ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের কোনো একজনের কাছে বায়আত গ্রহণ করতেন, তবে তাদের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বে এক নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হতো।

সেই সময় এই মহান ব্যক্তিদের দিন-রাতের ব্যস্ততা ছিল পুরো উম্মতকে হাদিস শিক্ষা দেওয়া, ফতোয়া প্রদান করা, চারিত্রিক সংশোধন করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় থাকলেই কেবল তাদের থেকে ইলমি ও আধ্যাত্মিক উপকারের ধারা অব্যাহত থাকত। যদি তারা রাজনৈতিকভাবে কোনো এক পক্ষ অবলম্বন করতেন, তবে অনেক মানুষ তাদের শিক্ষার ওপর আস্থা রাখত না এবং তাদের ফয়েজ বা কল্যাণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত।

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর পূর্বেও এই তিন বুজুর্গ রাজনৈতিক বিষয়াদি থেকে দূরে ছিলেন, তবে কারো না কারো কাছে বায়আতবদ্ধ ছিলেন। ইয়াজিদের বায়আতও গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য করে নিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর যুগে তারা এটাই কল্যাণকর মনে করেছিলেন যে, যতক্ষণ না গৃহযুদ্ধ শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ বায়আতে বিলম্বই করা হোক। কারণ সেই সময় তাদের মর্যাদা পুরো উম্মতের আধ্যাত্মিক অভিভাবকের মতো হয়ে গিয়েছিল, যাদের কোনো একজনের পক্ষে দাঁড়ানো তাদের নিজেদের মর্যাদাকেই বিতর্কিত করে তুলত।

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর নির্লিপ্ততা ও অমুখাপেক্ষিতার ওপর ভিত্তি করে গৃহীত রাজনৈতিক নীতিকেও এই বুজুর্গদের বিলম্বের একটি অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী মুখতার এবং আবদুল মালিক এই বুজুর্গদের যথেষ্ট সম্মান ও খাতির-যত্ন করতেন। সম্ভবত তাদের এই সদাচরণ এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর নির্লিপ্ততা দেখে এই মহান ব্যক্তিদের কাছে এটাই উত্তম মনে হয়েছিল যে, আপাতত তার বায়আতে বিলম্ব বজায় রাখা হোক। এই কারণে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) আরও বেশি অভিযোগ ও দুঃখ পেলেন এবং তিনি কিছুটা কঠোর মনোভাবও গ্রহণ করলেন, তবে তা বন্দিত্ব বা শাস্তির পর্যায় পর্যন্ত ছিল না। এর ফলে সম্পর্কের মধ্যে আরও শীতলতা তৈরি হলো।

যা-ই হোক, তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তিবর্গ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করতে থাকলেন এবং তার বিরোধীদের বায়আত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর পরামর্শ সভাতেও শরিক হতেন। [১] ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর কাছে বায়আত গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে তার নিজের সেই বক্তব্য থেকেই আলোকপাত হয় যা সহিহ বুখারিতে রয়েছে। বর্ণনায় এসেছে, ইবনে মুলয়িকা যখন ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন:

“আপনার কি বিস্ময় জাগেনি যে ইবনে জুবায়ের (রা.) খিলাফতের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন? আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আমি এই পদের জন্য মনে মনে (নিজের সাথে) তার তুলনা করব না। আমি আবু বকর ও উমর (রা.)-এর সাথে কখনো এমন তুলনা করিনি। তারা এই পদের জন্য অবশ্যই সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আমি যখন (তুলনা করলাম তখন মনে মনে) বললাম:”

(১) সহিহ মুসলিম, হা: ৩৩০৯, কিতাবুল হাজ্জ, বাব নাকজিল কাবা।

তিনি নবী ﷺ-এর ফুফুর ছেলে, জুবায়ের (রা.)-এর ছেলে, আবু বকর (রা.)-এর বংশধর, খাদিজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আয়েশা (রা.)-এর ভাগ্নে। (তাই তিনি খেলাফতের জন্য সব দিক থেকেই হকদার)। কিন্তু পরে আমি দেখলাম যে, তিনি আমার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করছেন এবং এই চেষ্টা করছেন না (যে আমি তাঁর নিকটজন ও সমর্থক হই)। আমি মনে মনে বললাম: আমি আশা করিনি যে আমি তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে এই (সমর্থন) পেশ করব আর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। আমার মনে হয় না যে তিনি কল্যাণ চান। সুতরাং যদি কোনো উপায় না থাকে, তবে আমি অন্য কারো পরিবর্তে নিজের চাচাতো ভাইদের (বনু উমাইয়া) তত্ত্বাবধানে থাকাই পছন্দ করব। [১]

দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে মুলাইকার বর্ণনা হলো:

“আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্য ছিল। আমি এক সকালে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম: ‘আপনি কি ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর সাথে লড়াই করতে এবং পবিত্র হারামকে হালাল করতে চান?’ তিনি বললেন: ‘আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ এটি ইবনে জুবায়ের (রা.) এবং বনু উমাইয়ার কপালে লিখেছেন। আমি তো সেখানে লড়াইকে কখনোই হালাল বলব না।’”

তারপর বললেন: “লোকেরা আমাকে বলে ইবনে জুবায়েরের হাতে বায়আত হতে। (আমি বলি) তিনি এই পদের জন্য কেন উপযুক্ত হবেন না? তাঁর পিতা রাসূলের হাওয়ারী জুবায়ের (রা.) ছিলেন, নানা গুহার সাথে আবু বকর (রা.) ছিলেন, মা দুই কোমরবন্ধওয়ালী হযরত আসমা (রা.) ছিলেন, খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন, ফুফু রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী খাদিজা (রা.) ছিলেন। নবী ﷺ-এর ফুফু সাফিয়া (রা.) তাঁর দাদী। তারপর তিনি ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং কুরআনের কারী। আল্লাহর কসম! এই লোকেরা (ইবনে জুবায়েরের অনুসারীরা) যদি আমার সাথে সদাচরণ করত, তবে একজন নিকটাত্মীর সাথেই সদাচরণ করত। যদি তারা আমার ভরণপোষণ করত, তবে তারা আমার সমপর্যায়ের এবং সম্মানিত লোক হতো। কিন্তু ইবনে জুবায়ের (রা.) বনু আসাদের সাধারণ দলগুলোকে আমার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন পরিস্থিতি এমন যে, আবুল আসের ছেলে (আবদুল মালিক) অগ্রসর হয়ে আসছে আর ইবনে জুবায়ের (রা.) পিঠ প্রদর্শন করে পালাচ্ছেন।” [২]

এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে খেলাফতের অধিকতর হকদার মনে করতেন, কিন্তু তাঁর উদাসীনতায় তিনি মনঃস্কুণ্ন ছিলেন। এটি কোনো ধর্মীয় বিরোধ ছিল না বরং একটি স্বভাবজাত মনোমালিন্য ছিল। এই বর্ণনা থেকে এটিও প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা বায়আত হননি সেই বড়দের দৃষ্টিতেও বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে খেলাফতের প্রথম হকদার তিনিই ছিলেন। এটি এই মহান ব্যক্তিদের সততা ও নিষ্ঠার প্রমাণ। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) তো আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর হাতে বায়আত হওয়ার সংকল্পও করেছিলেন কিন্তু পরে থেমে যান। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মতো বুজুর্গ ব্যক্তি এই বিষয়ে সতর্ক হয়ে বলছিলেন: “আমি বিভক্তির অবস্থায় কারো হাতে হাত দেব না এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে বায়আত হতে দ্বিধা করব না।” [৩]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৬৬৬১, কিতাবুত তাফসীর, বাব সানি ইসনাইন।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯৬৫।

[৩] “লা উত্তী সাফকাত ইয়ামিনী ফী ফিরকাতিন ওয়া লা আমনাউহা ফী জামাআতিন ওয়া উলফাতিন।” আনসাবুল আশরাফ, ৫/৩৫৬, ত: দারুল ফিকর।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

এই দাবি ভুল যে, এই বুজুর্গগণ (আবদুল্লাহ বিন উমর রা., আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রা.) আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর বিপরীতে আবদুল মালিককে সমর্থন করেছিলেন বা তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

প্রকৃত সত্য হলো, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর জীবদ্দশায় এই তিনজন কারো হাতেই বায়াত হননি। তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. তো আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর জীবদ্দশাতেই ৬৮ হিজরির মধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন। [১]

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রা. আবদুল মালিকের হাতে বায়াত হয়েছিলেন, তবে তা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর শাহাদাতের পর। [২] আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর জীবদ্দশায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তীব্র চাপ ও হুমকি সত্ত্বেও তিনি আবদুল মালিকের বায়াত গ্রহণ করেননি। [৩]

আবদুল্লাহ বিন উমর রা.-ও আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর শাহাদাতের পরেই আবদুল মালিকের হাতে বায়াত হন; [৪] কারণ যখন কোনো খলিফা অবশিষ্ট রইল না এবং আবদুল মালিক জোরপূর্বক সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শাসক হয়ে গেলেন, তখন ইয়াজিদের মতো তার বায়াতও সঠিক ছিল। যদি এই ব্যক্তিবর্গ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর উপস্থিতিতে আবদুল মালিককে শরয়ি খলিফা মনে করতেন, তবে তখনই তার হাতে বায়াত গ্রহণ করতেন।

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-এর ব্যাপারে কি হাদিসে কোনো ঈশিয়ারি ছিল?

প্রশ্ন: বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান রা. আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-কে এই হাদিস শুনিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “মক্কায় কুরাইশদের এক মেঘ (ব্যক্তি) ধর্মদ্রোহিতা করবে যার নাম হবে আবদুল্লাহ, তার ওপর মানবজাতির অর্ধেক পাপের বোঝা থাকবে।” “এক কুরাইশ যুবক মক্কায় ধর্মহীনতা অবলম্বন করবে, নাম হবে আবদুল্লাহ, মানবজাতির অর্ধেক গুনাহ তার ঘাড়ে হবে।” [৫]

এই বর্ণনাটি নিয়ে কিছু লোক হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা.-কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী (বিশৃঙ্খলাকারী) বলে গণ্য করে। এর উত্তর কী?

উত্তর: এই বর্ণনাটি যঈফ (দুর্বল) বরং বানোয়াট। হাফেজ জাহাবি রহ. বলেন: “এর সনদে আপত্তি আছে।” [৬] হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন: “এই হাদিসটি সম্পূর্ণ মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)। এর সনদ যঈফ। রাবি (বর্ণনাকারী) ইয়াকুব কুন্মির মধ্যে শিয়াত্ব পাওয়া যায়, তার মতো ব্যক্তিদের একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সঠিক ধরেও নেওয়া হয়, তবে এতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রা. উদ্দেশ্য হতে পারেন না; কারণ তিনি নেক গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন।” [৭]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/৭৭

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৩/২৯২, দারুল ফিকর

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/১০৭, ত. দার সাদির

[৪] সহিহ বুখারি, হা: ৭৩০৫, কিতাবুল আহকাম, কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাস; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/২৩১, ত. আর-রিসালাহ

[৫] মুসনাদে বাজ্জার: ৪/৩১

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৩৭৫, ত. আর-রিসালাহ

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/২০৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নিকট কি ইবনে জুবায়ের (রা.) বিদ্রোহী এবং উমাইয়া শাসকরা সত্যের ওপর ছিলেন?

(প্রশ্ন) আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন যে, হায়! যদি তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাওফিক পেতেন। তিনি এও বলতেন যে, বিদ্রোহী দলটি হলো আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর জামাত। সহীহ রেওয়ায়েতে আছে:

“জুহরী বলেন যে, আমাকে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর পুত্র হামজা সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কাছে জনৈক ইরাকী ব্যক্তি এসে বলল: হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনার সীরাতের ওপর চলতে আগ্রহী এবং মানুষের বিশৃঙ্খলার যুগে আমি আপনার অনুসরণ করি এবং যেখানে সম্ভব মন্দ থেকে বেঁচে থাকি, কিন্তু কুরআন মাজীদে একটি অকাট্য আয়াত আমার অন্তরকে আঁকড়ে ধরেছে। আমাকে সে সম্পর্কে বলুন।

দেখুন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করছেন: **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** [১]”

“তো আপনি আমাকে এই আয়াত সম্পর্কে বলুন।” হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বললেন: “তোমার এই আয়াতের সাথে কী কাজ? এখান থেকে চলে যাও।” সে চলে গেল, এমনকি সে আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল, তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) আমাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন: আমার কোনো কিছুর জন্য এত আফসোস নেই যতটা এই আয়াতের হুকুম পালন না করার জন্য যে, আমি সেই বিদ্রোহী দলের (ফিয়া বাঘিয়া) সাথে লড়াই করিনি যেমনটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তাঁর পুত্র) হামজা জিজ্ঞেস করলেন যে, “ফিয়া বাঘিয়া” দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কী? এর ওপর আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বললেন: আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, যে এই লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। [২]

(জবাব) এই আপত্তির উত্তর দুইভাবে দেওয়া যেতে পারে:

প্রথম উত্তর: এই রেওয়ায়েতে পাঁচটি ত্রুটি রয়েছে যার কারণে এটি দলিল হতে পারে না:

[১] বায়হাকী এটি তিনটি সনদে বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটির ভিত্তি তিনটি সনদেই জুহরীর ওপর।

তিনটি সনদ হলো:

(১) আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আয-যাহিদ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আল-মাহদী বিন রুস্তম বিশর বিন শুয়াইব বিন আবি হামযা তাঁর পিতা (শুয়াইব বিন আবি হামযা) আয-জুহরী হামযা বিন আবদুল্লাহ বিন উমর।

[১] যদি মুমিনদের দুই দল নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি একদল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে তবে তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা বাড়াবাড়ি করছে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায্য ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন। (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯)

[২] “আমি আমার মনে কোনো কিছুর জন্য এত আফসোস পাই না যতটা এই আয়াতের ব্যাপারে পাই যে আমি এই বিদ্রোহী দলের সাথে লড়াই করিনি যেমনটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।” হামজা তাঁকে বললেন: আপনি বিদ্রোহী দল বলতে কাদের বুঝছেন? তিনি বললেন: “ইবনে জুবায়ের, অর্থাৎ এই লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।” (আস-সুনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৭২, তাবা আল-ইলমিয়াহ)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

(২) আবুল হুসাইন বিন আল-ফজল আল-কাত্তান... আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন দাস্তুওয়াইহ... ইয়াকুব বিন সুফিয়ান... হাজ্জাজ বিন আবি মানি... তাঁর দাদা (উবাইদুল্লাহ বিন আবি যিয়াদ, মাওলা বনী উমাইয়া)... আয-যুহরী... হামজা বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর।

(৩) ইয়াকুব... মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন ইসমাইল... ইবনে ওয়াহাব... ইউনুস... আয-যুহরী... হামজা বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর।

এখন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, “ومن ترى الفئة الباغية؟ قال ابن عمر: ابن الزبير، بغى على” (আর আপনি বিদ্রোহী দল হিসেবে কাকে দেখছেন? ইবনে উমর বললেন: ইবনে যুবায়েরকে, সে এই লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।)

- এই অতিরিক্ত অংশটি কেবল দুই নম্বর বর্ণনায় রয়েছে। অর্থাৎ যুহরী থেকে কেবল উবাইদুল্লাহ বিন আবি যিয়াদ এটি বর্ণনা করেছেন। ইউনুস এবং শুয়াইব বিন আবি হামজা যুহরী থেকে এমন কিছুই শোনেননি।

অর্থাৎ দুইজন বর্ণনাকারী এই বিতর্কিত শব্দগুলো বর্ণনা করেননি। এই অতিরিক্ত অংশটি কেবল একজন বর্ণনাকারী করেছেন। প্রশ্ন হলো, যদি এই শব্দগুলো প্রমাণিত হতো, তবে বাকি দুইজন বর্ণনাকারী কেন তা মনে রাখলেন না? এই প্রশ্নটি বর্ণনার এই অংশটিকে সন্দেহজনক করে তোলে।

(৪) যে বর্ণনাকারী এই শব্দগুলো মনে রেখেছেন অর্থাৎ উবাইদুল্লাহ বিন আবি যিয়াদ আর-রাসাফি, তিনি বনী উমাইয়া পরিবারের একজন সদস্য। অর্থাৎ তিনি উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের স্ত্রীর দুধভাই। [১]

যদিও তাকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মানা হয়েছে, কিন্তু অনেক সময় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরাজনৈতিক পক্ষপাতের কারণে তাদের বিরোধীদের প্রতি দুর্বল কথা আরোপ করার ক্ষেত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এটা স্পষ্ট যে বনী উমাইয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর ঘোর বিরোধী ছিল; তাঁর জীবদ্দশায় তারা তাঁকে প্রকাশ্যে মুনাফিক বলত। [২] তাই এটা অসম্ভব নয় যে, এই উমাইয়া ব্যক্তি এখানে বর্ণনায় দুর্বল বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যেমনটি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে এর বৈপরীত্য এই সন্দেহকে আরও জোরালো করে।

(৩) মুস্তাদরাক হাকেমের এই বর্ণনাটি রয়েছে, কিন্তু উবাইদুল্লাহ বিন আবি যিয়াদের অতিরিক্ত শব্দগুলো সেখানেও বর্ণিত হয়নি। [৩]

(৪) আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এর আগে কখনো আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা পোষণ করেননি। তিনি হাজ্জাজের মুখ থেকে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর চরিত্র হনন সহ্য করেননি, বরং তার মুখের ওপর শহীদের গুণাবলি প্রকাশ করেছিলেন। [৪]

এটা কীভাবে সম্ভব যে, সারা জীবন একজন মুসলমানের রক্ত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত মুত্তাকী একজন ব্যক্তি জীবনের শেষ দিনগুলোতে মসজিদে হারামে সংঘটিত সেই রক্তপাতে অংশীদার হওয়ার তামান্না (আকাঙ্ক্ষা) করতে শুরু করবেন, যাকে সাধারণ মুসলমানও কবির গুনাহ মনে করে।

(৫) আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে এই ধরনের কথোপকথন তাঁর দুই ছাত্র: হাবিব বিন আবি সাবিত (রহ.) এবং সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.) থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে এই শব্দগুলো বর্ণিত হয়নি, বরং এর বিপরীতে বনী উমাইয়াকেই বিদ্রোহী (বাগী) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

[১] তারিখ দামেশক: ৩৭/৩৬৩

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৫/৫৩৬

[৩] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড - ৩/৪২৪, বর্ণনাকারী: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-আসফাহানি, আহমদ বিন মাহদী, বিশর বিন শুয়াইব বিন আবি হামজা আবিহি, আয-যুহরী, হামজা বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর। ইমাম যাহাবী বলেছেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। এছাড়া হাদিস নম্বর: ৩৫৯৮ একই সনদে বর্ণিত। উভয়টিতে ‘কাল হামজা ফাকুলনা লাহ্...’ ইত্যাদি অতিরিক্ত অংশ বর্ণিত হয়নি। ইমাম হাকেম বলেন, এটি একটি বড় অধ্যায় যা আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে একদল বড় তাবয়ী বর্ণনা করেছেন।

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৮৩ তাবা সাদির সহীহ সনদে; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/১৮৫

সঈদ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য আফসোস করতেন । [১]

হাবীব ইবনে আবি সাবিত (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.)-এর পতাকাতলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ হারানোর জন্য আফসোস করতেন । [২]

[১] সঈদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি মৃত্যুশয্যা়় বলেছিলেন: “আমি দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করি না, কেবল সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার আফসোস ছাড়া যারা আমার সাথে যুদ্ধ করেছিল (অর্থাৎ হাজ্জাজ) ।” (কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী: ২২১; ওয়াসায়়়া আল-উলামা ইন্দা হুদুরিল মউত, ইবনুর রবি: ৯৭-৯৮) ।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা: আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন রাবিআহ (ইবনুর রবি, মৃত্যু: ৩২৯ হি.): ইমাম যাহাবী তাকে ‘আল-ইমাম, আল-আলিম, আল-মুহাদ্দিস, আল-ফকিহ, কাযী দিমাশক’ বলেছেন । তার থেকে আবু সুলাইমান মুহাম্মদ ও আদ-দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/৩২৫, ত. আর-রিসালাহ) । মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-মুনাদী (মৃত্যু: ২৭২ হি.): সদুক (তাকরিবুত তাহযীব: ৬০১৩) । রাওহ বিন উবাদাহ (মৃত্যু: ২০৫ হি.): সিকাহ, সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারী (তাকরিবুত তাহযীব: ১৯৪৬) । আওয়াম বিন হাওশাব (মৃত্যু: ১৪৮ হি.): সিকাহ, আহলে ইলমদের একজন (তাকরিবুত তাহযীব: ৫২০১) । আইয়াশ আল-আমিরী: সিকাহ, মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনাকারী (তাকরিবুত তাহযীব: ৫২৭০) । সঈদ বিন জুবায়ের: ইমামদের একজন, সিকাহ, সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারী (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩২১, ত. আর-রিসালাহ; তাকরিবুত তাহযীব: ২৩৪৮) ।

এইভাবে এই সনদটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত) যার সকল বর্ণনাকারী সিকাহ । আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন রাবিআহ সম্পর্কে খতীব বাগদাদী ‘জারহ মুবহাম’ (অস্পষ্ট সমালোচনা) করেছেন, যা ‘জারহ মুফাসসার’ (স্পষ্ট সমালোচনা)-এর বিপরীতে গ্রহণযোগ্য হবে না । এই বর্ণনাটিকে ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়াও একই সনদে পেশ করেছেন । (আল-মুহতাদরীন: ১৫৭) ।

[২] “আমি আলী (রাযি.)-এর সাথে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য যতটা আফসোস করি, অন্য কোনো কিছুর জন্য ততটা করি না ।” (মুস্তাদরাক হাকেম, বর্ণনা নং: ৬৩৬০) ।

তাবারানী হাবীব বিন আবি সাবিত থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: “আমি দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করি না, কেবল সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার আফসোস ছাড়া যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছিল ।” (আল-মু’জাম আল-কাবীর, খণ্ড ১৩ ও ১৪, বর্ণনা নং: ১৩৮২২; ১৫/১৩) । আল-হাইসামী বলেছেন: তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা সহীহ-এর বর্ণনাকারী ।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- আহমদ বিন আমর আবু বকর আল-বাসরী (মৃত্যু: ৩০০ হি.): ইবনে হিব্বান তাকে ‘আস-সিকাত’-এ উল্লেখ করেছেন । যাহাবী তাকে ‘আশ-শাইখ, আল-মুহাদ্দিস, আল-মুফতি’ বলেছেন (১৫/৫০৬) ।
- মুহাম্মদ বিন তুফায়েল (মৃত্যু: ২৩২ হি.): সিকাহ (তাহযীবুল কামাল: ২৫/৩১৩) ।
- শারীক বিন আবদুল্লাহ (মৃত্যু: ১৭৭ হি.): কুফার কাযী । বুখারী (তালিকান), মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন । ইবনে মাঈন ও ইবনে সা’দ তাকে সিকাহ বলেছেন । যাহাবী বলেছেন: তিনি সত্যবাদী ছিলেন । আমি বলি: তিনি ‘আল-আহওয়াস’ ব্যতীত সহীহ-এর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত । নাসায়ী বলেছেন: তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই । ইবনুল মুবারক বলেছেন: শারীক কুফার মুহাদ্দিসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইলম রাখতেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৮/২০২, ত. আর-রিসালাহ) । হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন: “সদুক ইয়াহতি (সত্যবাদী কিন্তু ভুল করেন), স্মৃতিশক্তি শেষ বয়সে পরিবর্তিত হয়েছিল, কুফার কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন, ন্যায়পরায়ণ ও ফয়সালাকারী ছিলেন, বিদআতিদের প্রতি কঠোর ছিলেন” (তাকরিবুত তাহযীব: ২৭৮৭) ।
- ফিতর বিন খলিফা (মৃত্যু: ১৫০ হি. এর পর): বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন । যাহাবী তাকে ‘আশ-শাইখ, আল-আলিম, আল-মুহাদ্দিস, আস-সদুক’ বলেছেন । ইমাম আহমদ তাকে সিকাহ বলেছেন । আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজলী বলেছেন: সিকাহ, হাসানুল হাদীস, তার মধ্যে সামান্য তাশাইয়ু (শিয়া ভাবধারা) ছিল । ইমাম আহমদ একবার বলেছেন: সিকাহ, সালিহুল হাদীস । তার হাদীসগুলো রেহাল (ভ্রমণ) করে সংগ্রহ করা হয়েছে (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৭/৩০, ত. আর-রিসালাহ) ।

ফিতর যদি কোনো বড় ধরনের ‘শী’ হতেন তবে তা অবশ্যই ক্ষতিকর হতো । এখানে তার ‘তাশাইয়ু’ বলতে হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভক্তি এবং হযরত আলী (রাযি.)-এর শানকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া বোঝানো হয়েছে । এটি এমন কোনো জারহ (সমালোচনা) নয় যা তার আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ও সিকাহ (নির্ভরযোগ্যতা)-এর পরিপন্থী । বুখারী ও মুসলিমের অনেক বর্ণনাকারী রয়েছেন যারা শিয়া মতাদর্শের প্রতি ঝুঁকে ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে ।

- হাবীব বিন আবি সাবিত (মৃত্যু: ১১৯ হি.): বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন । যাহাবী তাকে ‘আল-ইমাম, আল-হাফেজ, আল-ফকিহ, আল-কুফা’ বলেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/২৮৯, ত. আর-রিসালাহ) । ইবনে মাঈন, ইজলী ও নাসায়ী তাকে সিকাহ বলেছেন (তাহযীবুল কামাল: ৫/৩৬০-৩৬৩) ।

এই বর্ণনার ওপর একটি আপত্তি তোলা হয় যে, হাবীব বিন আবি সাবিত ‘মুদাল্লিস’ এবং তিনি এই বর্ণনাটি ‘আন’ (عن) শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন । একইভাবে ইবনে সা’দ-এর একটি বর্ণনায় হাবীব বিন আবি সাবিত এটি ইবনে উমর থেকে সরাসরি শোনার কথা অস্বীকার করেছেন । তাই এই বর্ণনাটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত) প্রমাণিত হয় না ।

ইবনে সা’দ বলেন: আমাদের কাছে মুহাম্মদ বিন উমর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে আব্দুল আজিজ বিন সিয়াহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হাবীব বিন আবি সাবিত আমাকে বলেছেন যে, তিনি ইবনে উমরকে তার মৃত্যুশয্যা়় বলতে শুনেন: “আমি দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করি না, কেবল সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার আফসোস ছাড়া যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছিল ।” (আত-তাবাকাত আল-কুবরা লি ইবনে সা’দ: ৪/১৮২, ত. সাদির) ।

এই আপত্তিটি ভিত্তিহীন কারণ ইমাম তাবারানী অন্য একটি সনদে হাবীব বিন আবি সাবিত থেকে ‘সামি’তু’ (আমি শুনেছি) শব্দের স্পষ্ট উল্লেখসহ বর্ণনা করেছেন: “আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি: আমি সালাত, সাওম ও দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করি না, কেবল সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার আফসোস ছাড়া যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলাম ।” (আল-মু’জাম আল-কাবীর, খণ্ড ১৩ ও ১৪, বর্ণনা নং: ১৩৮২৩; ১৫/১৩) ।

এজন্য উলামায়ে কেরাম সাধারণত এই বর্ণনার ব্যাখ্যা এভাবে করেন:

“আমি সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল, অর্থাৎ মুয়াবিয়া এবং তার সাথে যারা ছিল, যারা আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহ্-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ।” (রুহুল মাআনী: ১৩/৩০৩) ।

দ্বিতীয় উত্তর: উবাইদুল্লাহ ইবনে আবি যিয়াদের বর্ণনাকে যদি ছবছ সঠিক ধরে নেওয়া হয়, তবুও কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এক সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর এই অভিমত তৈরি হয়েছিল যে, ‘বিদ্রোহী দল’ কথাটি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর জামাতের ওপর প্রযোজ্য হয়। এর দ্বারা কোনোভাবেই এটি প্রমাণিত হয় না যে, এটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর স্থায়ী অভিমত ছিল; বরং অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষী দেয় যে, শীঘ্রই তাঁর অভিমত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর এই বক্তব্যের দুটি দিক ছিল: একটি নীতিগত এবং একটি শাখা বা প্রয়োগগত। নীতিগত দিক হলো এই যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। শাখা বা প্রয়োগগত দিক হলো এই যে, সেই সময় বিদ্রোহী দল ছিল আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর দল, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। এটি ছিল একটি উদাহরণ মাত্র, কোনো সর্বজনীন নিয়ম নয়। সামান্য বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তিও কখনোই এ কথা বলতে পারে না যে, শরীয়তে যখনই এবং যেখানেই বিদ্রোহী দলের কথা উল্লেখ করা হবে, তা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর দলের ওপর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যদি দাবিদারের দাবি মেনেও নেওয়া হয়, তবে আমরা বলতে পারি যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর উদাহরণ সেই সময়ের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দিয়েছিলেন।

পরিস্থিতি ছিল এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ইয়াজিদের মোকাবিলায় মক্কায় নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে ইয়াজিদ দুইবার সৈন্য পাঠিয়েছিল। প্রথম আক্রমণের সময় মুসলিম বিশ্বে ইয়াজিদের আধিপত্য এবং বায়াতের ধারা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণের সময় সে মক্কা ব্যতীত সমস্ত শহর ও প্রদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। তাই একটি বাস্তব সত্য হিসেবে সে এমন একজন শাসকে পরিণত হয়েছিল যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর (এবং পরবর্তীতে জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের) ফতোয়া অনুযায়ী সঠিক ছিল না। এই কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে নেককারদের সশস্ত্র প্রচেষ্টাকে ‘খুরুজ’ (বিদ্রোহ) হিসেবেই গণ্য করতেন এবং একে উন্মাহর জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন।

এরপর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ইয়াজিদ এবং তার পুত্র মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর একটি রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়। মুসলিম বিশ্বে কোনো খলিফা ছিল না। সেই দিনগুলোতে মারওয়ান আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে বলেছিল:

“হাত বাড়ান, আমরা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করছি; আপনি আরবের সরদার এবং সরদারের পুত্র।”

তিনি (রা.) বললেন: “পূর্ববাসীদের (আহলুল মাশরিক) কী করব?” (অর্থাৎ তোমরা সিরিয়াবাসীরা যদি বায়াত করোও, তবে ইরাকবাসীদের কী হবে?)

মারওয়ান বলল: “আপনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন যতক্ষণ না তারা বায়াত গ্রহণ করে।”

তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি সত্তর বছর শাসন করব আর আমার কারণে একটি প্রাণ যাবে—এটিও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।” [১]

এই রাজনৈতিক শূন্যতা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) দ্রুত পূরণ করেন। সর্বপ্রথম হিজাজ তাঁর দখলে আসে। তিনি বনু উমাইয়াদের মদিনা থেকে বের করে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন; কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তারা তাদের শত্রুতার কারণে কখনোই তাঁর অনুগত হবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকবে। [২]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৬৯, সাদির সংস্করণ, সহিহ সনদে। এই বর্ণনার ওপর কেবল এই আপত্তি রয়েছে যে, মারওয়ান সেই সময় সিরিয়ায় ছিল, মদিনায় নয়। তবে চিন্তা করলে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই কথোপকথন চিঠিপত্র বা দূতের মাধ্যমে হয়েছিল। এটিও সম্ভব যে, কোনো হজের সমাবেশে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

[২] আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মদিনার গভর্নরের কাছে লিখেছিলেন যেন বনু উমাইয়াদের মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। ফলে তাদের পরিবার-পরিজন ও নারীদেরসহ সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। অতঃপর বনু উমাইয়ারা দামেস্কে পৌঁছায় এবং সেখানে মারওয়ান ছিল। (তারিখুত তাবারি: ৫/৫৩১)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

যদি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই পুরো ইসলামী বিশ্ব তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল; কারণ খিলাফতের জন্য তাঁর মোকাবিলায় অন্য কোনো দাবিদার ছিল না। অবশ্য চার মাস পর হঠাৎ মারওয়ান খিলাফতের দাবি করে বসেন। ওই সময় কিছু লোক ছাড়া বাকি সবাই হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর হাতে বাইয়াত হয়ে গিয়েছিলেন। [১]

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) ওই সময় পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে একজন উদীয়মান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখতেন। তিনি যেমন নিজের জন্য শাসনের চেষ্টা করা পছন্দ করতেন না, তেমনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর কাছ থেকেও একই প্রত্যাশা রাখতেন। এর চেয়েও বড় কথা হলো, যখন বনু উমাইয়াকে হিজাজ থেকে বের করে দেওয়া হলো, তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তা অপছন্দ করেন এবং অনুভব করেন যে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর দলও একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং তাঁর উচিত বনু উমাইয়ার সাথে মিলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। (যে বর্ণনায় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে বিদ্রোহী বলা হয়েছে, তা ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে।)

তবে এটিও প্রমাণিত যে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর এই অভিমত খুব দ্রুতই বদলে গিয়েছিল, অর্থাৎ তিনি বনু উমাইয়াকে বৈধ শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাদের সাথে মিলে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করাকেও ভুল মনে করতে শুরু করেন।

এর একটি প্রমাণ হলো, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ওই সময় তিনি মক্কাতেই ছিলেন। যদি তিনি হাজ্জাজকে সত্যের ওপর মনে করতেন এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইতেন, তবে তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই বনু উমাইয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতেন, কিন্তু তিনি কখনোই তা করেননি। এর বিপরীতে এটি প্রমাণিত যে তিনি এই সুযোগেও নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন। নিচের বর্ণনাটি এর প্রমাণ:

“আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর ফিতনার সময় দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন: ‘লোকেরা মতভেদে লিপ্ত, আর আপনি উমর (রা.)-এর পুত্র এবং রাসুলের সাহাবী, আপনি কেন (ময়দানে) বের হচ্ছেন না?’ তিনি বললেন: ‘আমার নির্জনবাসের কারণ হলো আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত আমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন।’ তারা বলতে লাগলেন: আল্লাহর বাণী হলো: ‘আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়।’ তিনি বললেন: ‘আমরা লড়াই করেছি যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়েছে এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তোমরা লড়াই করতে চাও যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের দীন বিজয়ী হয়’।” [২]

অন্য একটি বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সেনাবাহিনীকেও বিদ্রোহী ও ফাসাদী গণ্য করতেন।

“হাইয়ান সুলামী বলেন, যখন হাজ্জাজ (বিন ইউসুফ) আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মোকাবিলা করার জন্য হারামে প্রবেশ করল, তখন আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম: ‘আর যদি মুমিনদের দুই দল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়’...”

[১] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: “দাহহাক বিন কায়েস ইবনে জুবায়েরের হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন, তেমনি নুমান বিন বশীর হিমসে এবং একইভাবে কিননাসরিন ও ফিলিস্তিনেও। উমাইয়াদের পক্ষে হাসান বিন বাহদাল ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না, তিনি ছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মামা এবং তিনি জর্ডানে তাঁর অনুগতদের মধ্যে ছিলেন।” (ফাতহুল বারী: ১৩/৭২)। এরপর হাফেজ আবু জুরআ আদ-দিমশকী থেকে উদ্ধৃত করেন: “মারওয়ান বিন হাকামের হাতে জর্ডানবাসী এবং দামেস্কের একদল লোক বাইয়াত হয়েছিল এবং বাকি সব মানুষ ইবনে জুবায়েরের সাথে ছিল।” (ফাতহুল বারী: ১৩/৭২)।

[২] সহীহ বুখারী, হা. ৪৫১৩, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল-বাকারা, অধ্যায়: “আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়”।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেছেন: “তোমরা কি সেই বিদ্রোহী দল এবং সেই দলকে চিনেছ যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছে? সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি আমি সেই দলকে চিনতে পারতাম যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছে, তবে তাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আমার আগে কেউ যেতে পারত না এবং তোমরাও না। কিন্তু বল তো, যখন উভয় দলই বিদ্রোহী হয় (তখন কী করা উচিত!!)। এমন লোকদের তাদের দুনিয়ার জন্য লড়তে দাও এবং নিজেদের ঘরে ফিরে যাও। যখন জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তাতে शामिल হয়ে যেও।” [১]

মারওয়ান, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এবং হাজ্জাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর অভিমত এই কারণে তৈরি হয়েছিল যে, পরিস্থিতি তাদের সামনে এক নতুন মোড় নিয়েছিল। মারওয়ান সিরিয়ায় আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর প্রতিনিধি দাহহাক বিন কায়েস (রা.)-কে আলোচনার সময় প্রতারণামূলক আক্রমণের মাধ্যমে পরাজিত করেন। দাহহাক বিন কায়েস (রা.) এবং নুমান বিন বশীর (রা.)-এর মতো সাহাবীদের হত্যা করে তিনি সিরিয়া দখল করেন। [২]

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) সমগ্র ইসলামি বিশ্বকে একটি রাষ্ট্র মনে করতেন, তাই তাঁর ধারণা ছিল যে যতক্ষণ না কোনো একটি দল পুরো দেশের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধরত দলকে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে। এই কারণেই তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করেননি, আবার মারওয়ান বা আব্দুল মালিকের কাছেও করেননি; কারণ তাঁর দৃষ্টিতে উমাইয়া সরকারও একটি বিদ্রোহী ও যুদ্ধরত দল ছিল।

তারপর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর অভিমত আরও পরিবর্তিত হয়, যখন তিনি হাজ্জাজের হাতে হাজার দিনগুলোতে হারামের ওপর আক্রমণ, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাত এবং তাঁর লাশের অবমাননার দৃশ্য দেখেন। তখন তাঁর দৃষ্টিতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর পরিবর্তে হাজ্জাজ বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন: “দুনিয়ার কোনো জিনিসের জন্য আমার আক্ষেপ নেই, কেবল গ্রীষ্মের দিনের রোজা এবং রাতের জাগরণ (তাহাজ্জুদ) ছাড়া, আর এই যে আমি সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি যারা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল, অর্থাৎ হাজ্জাজ।” [৩]

তাছাড়া এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) মনে করতেন হযরত আলী (রা.)-এর যুগে তাঁর সাহায্য করা সেভাবে করা হয়নি যেভাবে একজন খলিফায়ে রাশেদ হওয়ার খাতিরে তাঁর হক ছিল। তাই আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর ছাত্র হাবীব বিন আবি সাবিত (রহ.) বর্ণনা করেন যে তিনি (ইবনে উমর) বলতেন: “আমি কোনো জিনিসের জন্য আক্ষেপ করি না...”

[১] আখরাজাহ সাঈদ বিন মানসুর ও ইবনুল মুনিযির ও ইবনে আবি হাতেম... আদ-দুররুল মানসুর, সুয়ুতী: ৭/৫৯১।

[২] ফাতহুল বারী: ১৩/৪৬, ৪৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/২৫৬।

[৩] “আম্নি লাম উকাতিল হাযিহিল ফিয়াতাল বাগিয়াহ...” (কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী: ৬৩/১; ওয়াসায়াল উলামা, ইবনে যবর আর-রিবঈ: ৪৭৯)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

...নামাজ রোজা ছেড়ে দেওয়ার ওপর এবং বিদ্রোহী দলের সাথে যুদ্ধ না করার ওপর এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বায়আত ভঙ্গ করার ওপর। [১]

এ থেকে এটিও জানা গেল যে, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়আত করেছিলেন কিন্তু পরে কার্যত নিরপেক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন। (সম্ভবত এই আচরণকেই তিনি বায়আত ভঙ্গ করা হিসেবে ব্যক্ত করছিলেন, অন্যথায় আলাদাভাবে কোনো বর্ণনায় এটি উল্লেখ নেই যে তিনি বায়আত ভেঙেছিলেন)। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে যদি একটি বড় দল নিরপেক্ষ না থাকত, তবে বিরোধীদের আধিপত্য রোধ করা যেত। ফলে একটি সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এ ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলেছিলেন: “আমার এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই জন্য আক্ষেপ নেই যে, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে মিলে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।” [২]

সাইদ বিন জুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শেষ বক্তব্য আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দলকে বিদ্রোহী বলার ব্যাপারে ছিল না, বরং শেষ বক্তব্য অনুযায়ী তিনি হাজ্জাজ এবং তার প্রভুদের অর্থাৎ মারওয়ান ও আবদুল মালিককে বিদ্রোহী দল মনে করতেন। অন্যদিকে হাবীব বিন আবি সাবিত রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যুদ্ধরত দলগুলোকেও বিদ্রোহী মনে করতেন। সাইদ বিন জুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হাবীব বিন আবি সাবিত রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই; কারণ বিদ্রোহী দল বিভিন্ন সময়ে একাধিক হতে পারে। স্বয়ং মুফতির ফতোয়া এবং বিশ্লেষণও পরিবর্তিত হতে পারে। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক সময়ে ‘বিদ্রোহী’ শব্দটি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দলের ওপর প্রয়োগ করেছেন, অন্য সময়ে কিছু ছাত্রের সামনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যুদ্ধরত দলের ওপর এবং শেষ মুহূর্তে কিছু ছাত্রের সামনে হাজ্জাজের বাহিনীর ওপর করেছেন।

□□□

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতামতগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করার দলিল কী?

প্রশ্ন: আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ‘আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া’ (বিদ্রোহী দল) সংক্রান্ত বক্তব্যটি একই সময়ের, একে ভিন্ন ভিন্ন মজলিস এবং বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য হিসেবে গণ্য করা সঠিক নয়। যখন বায়হাকীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এর লক্ষ্যবস্তু আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমাণিত হয়ে গেছেন, তখন তাবারানী এবং অন্যান্য কিতাব ও বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগুলোকে বর্ণনাকারীর বিভ্রম বা ভুল বর্ণনার ওপরই গণ্য করতে হবে। পরিশেষে এই কথার কী প্রমাণ আছে যে, এই বক্তব্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও সময়ের?

جواب: আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই বক্তব্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন মজলিস ও পরিস্থিতির হওয়া স্বয়ং এই বর্ণনাগুলো থেকেই প্রমাণিত। এগুলোর মধ্যে একটি বায়হাকীর বর্ণনা যার শুরুটা এভাবে:

“যুহরী বলেন যে, আমাকে আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র হামজা সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে জনৈক ইরাকী ব্যক্তি এসে বলল: হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনার সীরাত অনুযায়ী চলতে আগ্রহী।” এই বর্ণনার সমাপ্তি এভাবে: “আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু...”

[১] আবদুল্লাহ বিন হাবীব বিন আবি সাবিত থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি: আমার কোনো কিছু ছুটে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ নেই কেবল আলো (দিনের বেলা) ও সালাত এবং বিদ্রোহী দলের সাথে যুদ্ধ না করা এবং বায়আতের ওপর অটল না থাকা ছাড়া। (আল-মুজামুল কাবীর, খণ্ড ১৩ ও ১৪, হা: ১৩৫/১৩৮২৫)

[২] হাবীব বিন আবি সাবিত থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি হযরত আলী-এর সাথে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর জন্য নিজেকে আক্ষেপ করতে দেখিনি। (আল-মুজামুল কাবীর, খণ্ড ১৩ ও ১৪, হা: ১৩৫/১৩৮২৩)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

তিনি বললেন: “তোমার এই আয়াতের সাথে কোনো কাজ নেই। এখান থেকে চলে যাও।” সে চলে গেল, এমনকি সে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) আমাদের দিকে মনোনিবেশ করে বললেন: “আমি কোনো বিষয়ের জন্য এত আফসোস করি না যতটা এই আয়াতের ওপর আমল না করার জন্য করি, যে আমি এই বিদ্রোহী দলের (আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি যেমনটি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।”

তঁার ছেলে হামযা জিজ্ঞেস করলেন: “আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া” দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কী? আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বললেন: “আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, যে এই লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।” [১]

বর্ণনার প্রেক্ষাপট বলছে যে, এটি আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর পক্ষ থেকে বনু উমাইয়াদের বের করে দেওয়ার কিছুকাল পরের ঘটনা। আর ওই সময় এই আলোচনা সাধারণ ছিল যে হকের ওপর কে এবং বিদ্রোহী কে? ঐতিহাসিকদের মতে এটি ৭২ হিজরীর ঘটনা।

এ থেকেও স্পষ্ট হচ্ছে যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তখন সুস্থ ছিলেন অথবা অন্তত এমন কোনো অবস্থায় ছিলেন না যাকে সাকরাত, নযআ-এর অবস্থা, শেষ সময় বা মরণব্যাপ্তি (মারাদুল মউত) বলা যেতে পারে। এছাড়া ওই সময় তিনি কোনো মজলিসে ছিলেন এবং তাঁর চারপাশে অনেক লোক উপস্থিত ছিল। [২] মজলিসটি এমন ছিল যেখানে অপরিচিত ও আগন্তুক লোকেরাও এসে প্রশ্ন করতে পারত। এই কারণেই এক অজ্ঞাত ইরাকী ব্যক্তি এসে এই প্রশ্ন করেছিল। [৩] ওই সময় তিনি কোনো উন্মুক্ত স্থানে ছিলেন, তাই প্রশ্নকারী ইরাকী সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলতে চলতে ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। [৪]

এখন এর বিপরীতে সাঈদ বিন জুবায়েরের বর্ণনাটি দেখুন, তবে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এগুলো মৃত্যুশয্যার কথা:

সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবনে উমর (রা.)-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই আমি সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি যারা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল, অর্থাৎ হাজ্জাজ।” [৫]

হাবীব বিন আবি সাবিতের বর্ণনাও এটাই প্রমাণ করে যে, এই কথোপকথন মরণব্যাপ্তির সময় হয়েছিল।

আমাদের সংবাদ দিয়েছেন ফজল বিন দুকাইন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয বিন সিয়াহ, তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন হাবীব বিন আবি সাবিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর থেকে তাঁর সেই অসুস্থতার সময় যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে তিনি বলেছেন: “আমি দুনিয়ার কোনো বিষয়ের জন্য নিজেকে এত ব্যথিত পাই না যতটা এই জন্য যে আমি বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।” [৬]

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৬৭, ত. ইলমিয়াহ। [২] যেমনটি এই শব্দগুলো নির্দেশ করে: “ইবনে উমর আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন আমার মনে যা উদ্ভূত হয়েছে ইত্যাদি।”

[৩] যেমনটি বর্ণনার শব্দগুলো নির্দেশ করে: “ইরাকবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আসলো।” [৪] যেমনটি বর্ণনার শব্দগুলো নির্দেশ করে: “সে চলতে থাকল এমনকি তার ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেল।”

[৫] ওয়াসায়াল উলামা ইনদা হুদুরিল মউত লি-ইবনে আবিদ দুনিয়া, পৃষ্ঠা: ৩৭৩ হিজরী; কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী: ৬২/১।

এই বর্ণনার ওপর এই আপত্তি হতে পারে যে “অর্থাৎ হাজ্জাজ” সাঈদ বিন জুবায়েরের কথা, আবদুল্লাহ বিন উমরের নয়, তাই একে আবদুল্লাহ বিন উমরের দিকে সম্বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু এই আপত্তির কোনো ওজন নেই; কারণ বর্ণনাকারী তাঁর যোগ্য ছাত্র এবং নিজের উস্তাদের উদ্দেশ্য ভালোভাবেই বোঝেন। এছাড়া আবদুল্লাহ বিন উমরের শব্দ: “যারা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল” নিজেই অর্থ স্পষ্ট করে দেয়; কারণ আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের বহু বছর ধরে মক্কায় ছিলেন। তিনি কারো ওপর চড়াও হননি। বরং হাজ্জাজের বাহিনীই ছিল যারা বাইরে থেকে এসে আক্রমণ করেছিল।

[৬] আত-তাবাকাতুল কুবরা: ১৩১/৪, ত. ইলমিয়াহ। যদিও এতে এই বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে আল-ফিয়াতুল বাঘিয়া দ্বারা কারা উদ্দেশ্য, তবে দ্বিতীয় বর্ণনাটি এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেয়। হাবীব বিন আবি সাবিত থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর থেকে, তিনি বলেন: আমি দুনিয়ার কোনো বিষয়ের ওপর নিজেকে আক্ষেপকারী পাই না কেবল এই ছাড়া যে আমি আলীর সাথে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। (আল-মু'জামুল কাবীর, খণ্ড ১৩ ও ১৪, পৃষ্ঠা: ১৩৮২৩) আল-হাইসামী বলেন: তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন একটি সনদে এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১২০৫০)।

এটা স্পষ্ট যে, এমন অবস্থায় একজন অসুস্থ ব্যক্তির এমন সাধারণ মজলিসে বসা যেখানে সব ধরনের মানুষ এসে প্রশ্ন করবে, তা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং বায়হাকীর বর্ণনাটি ভিন্ন সময়ের এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও হাবীব ইবনে আবি সাবিতের বর্ণনাগুলো ভিন্ন সময়ের। এখানে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদের বর্ণনার সাথে অন্যান্য বর্ণনার কোনো বিরোধ নেই যে, একটিকে গ্রহণ করে বাকিগুলোকে কেবল সনদের বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) বা সামান্য দুর্বলতার কারণে প্রত্যাখ্যান করা হবে, বরং প্রতিটি বর্ণনার নিজস্ব প্রেক্ষিত রয়েছে।

প্রশ্ন: হাবীব ইবনে আবি সাবিত একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এই বর্ণনাটি ‘আন’ (থেকে) শব্দে বর্ণনা করছেন। একইভাবে তাবাকাতে ইবনে সা’দের বর্ণনায় হাবীব ইবনে আবি সাবিত ঘটনাটি ‘বালাগানি’ (আমার কাছে পৌঁছেছে) শব্দে বর্ণনা করছেন। তাই এই বর্ণনাটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত) হবে না।

উত্তর: এই আপত্তিটি ভিত্তিহীন, কারণ ইমাম তাবারানী এই একই ঘটনা অন্য একটি সনদে হাবীব ইবনে আবি সাবিত থেকে ‘সামি’তু’ (আমি শুনেছি) এর স্পষ্ট উল্লেখসহ বর্ণনা করেছেন:

আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব ইবনে সাবিত তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি: আমি কোনো কিছুর জন্য আফসোস করি না যা আমার থেকে ছুটে গেছে, কেবল রোজা, সালাত এবং বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা এবং আলীর কাছে বায়আত বাতিলের আবেদন করা ছাড়া। [১]

প্রশ্ন: হাবীবের আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضى الله عنه থেকে শ্রবণ (সামা) প্রমাণিত নয়, তাই এই বর্ণনাটি যঈফ (দুর্বল) এবং মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)।

উত্তর: এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভুল। হাবীব ইবনে আবি সাবিতের উস্তাদদের (মাশায়েখ) মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضى الله عنه-এর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, কেউ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। [২]

[১] আল-মু’জামুল কাবীর, খণ্ড ১৩ ও ১৪, হা: ১৩৮২৫

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়াসিতি: (মৃত্যু ২৭০ হি.) ইমাম যাহাবী বলেন: বড় মুহাদ্দিস। (তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী লিল-আরাবি: ২৩/২২২, ২২৩; বাশার: ৭/১২৬) আল-হাফিয, আল-মুফিদ, আল-আলিম। (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা: ১৩/২৩২, ত. আর-রিসালাহ)
- যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাবিহ যাহমুওয়াইহ: (মৃত্যু ২৩৫ হি.) ইবনে হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের (সিকাত) অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন: তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। (আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান: ৮/৩৫৩; তা’জিলুল মানফায়াহ: ১/৫৫১)
- সিনান ইবনে হারুন: (মৃত্যু ১৮০ হি.) তার নির্ভরযোগ্যতা সাধারণ মানের: আবু হাতিম বলেন: শাযখ। ইবনে আদি বলেন: আমি আশা করি এতে কোনো সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন বলতেন: সিনান সাইফের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছেন। কেউ কেউ ইয়াহইয়া ইবনে মাইন থেকে তার ব্যাপারে এই সমালোচনা (জারহ) বর্ণনা করেছেন: তার হাদিস কিছুই নয়। (মিযানুল ইতিদাল: ২/২৩৫) ইমাম দারাকুতনী বলেন: তাকে বিবেচনা করা যায়। (মাওসুআতু আকওয়ালিদ দারাকুতনী: ১/৩০৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল ইয়াহইয়া ইবনে মাইন থেকে বর্ণনা করেন যে: সিনান ইবনে হারুন সাইফের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। (মাওসুআতু আকওয়ালি আহমাদ: ২/১৩০)

[২] আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব ইবনে আবি সাবিত: সিকাহ, মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনাকারী। (তাকরিবুত তাহযিব, অনুবাদ নং: ৩২৭০) সুতরাং এই বর্ণনাটি হাসানের চেয়ে কম নয়। এতে ‘সামি’তু’ এর স্পষ্ট উল্লেখ প্রমাণ করে যে বর্ণনাটি মুত্তাসিল এবং ‘আন’ বা ‘বালাগানি’ কোনো বর্ণনাকারীর বিভ্রমের ফল।

• তাহযিবুল কামাল: ৫/৩৫৯

• ইমাম বুখারী বলেন: হাবীব ইবনে আবি সাবিত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর থেকে শুনেছেন। (আত-তারিখুল কাবীর: ২/৩১৩; মিযানুল ইতিদাল: ১/৪৫১)

কি আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে ভুল পথে মনে করতেন?

প্রশ্ন: সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর ঝুলন্ত লাশ দেখে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেছিলেন: **أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنَّهُكَ عَنْ هَذَا** (আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করতাম।) [১] এ থেকে তো এটাই বোঝা যায় যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর অবস্থান সঠিক ছিল না, তিনি বিদ্রোহী ছিলেন, আর মারওয়ান ও আবদুল মালিকই সঠিক খলিফা ছিলেন?

جواب: প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর তাঁকে নিষেধ করা ছিল স্নেহ ও সহমর্মিতার কারণে। তিনি জানতেন যে, এই সংগ্রামের কোনো ফলাফল আসবে না এবং বনু মারওয়ানের সামরিক শক্তি তাঁর সরকারকে ছিন্নভিন্ন করে কঠোর প্রতিশোধ নেবে।

মনে রাখা দরকার যে, ইবনে উমর (রা.) ইহাও বলেছিলেন: **أما والله لامة انت اشرها**। “আল্লাহর কসম, যে উম্মতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তোমার মতো হবে, সেই উম্মত সর্বোত্তম।” [২]

কিছু লোক এর অর্থ এই বের করে যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) ইবনে জুবাইর (রা.)-কে উম্মতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি মনে করতেন। অথচ এটি একটি অলঙ্কারপূর্ণ কথা যা অস্বীকার করার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো— হে ইবনে জুবাইর! সিরিয়াবাসীরা তোমাকে এই জন্য হত্যা করে ঝুলিয়ে দিয়েছে যে, তাদের মতে তুমি উম্মতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। তো যদি তোমার মতো সাহাবী, নামাযী, রোযাদার, নেককার ও মুত্তাকী ব্যক্তি নিকৃষ্ট হয় এবং বাকি সবাই তোমার চেয়ে উত্তম হয়, তবে উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তিকে অত্যন্ত নেককার এবং পুরো উম্মতকে আগাগোড়া কল্যাণময় হতে হবে।

এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, যে উম্মতের নিকৃষ্টতম বলে অভিহিত ব্যক্তি বাস্তবে এত নেককার ও পবিত্র হবে, সেই উম্মতের নেককার বলে গণ্য ব্যক্তির কত উচ্চপর্যায়ের হবেন। এই বাক্যটি ঠিক তেমনই যেমন কোনো কবি বলেছেন:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سَيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَائِبِ

“তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোনো দোষ নেই যে, তাদের তলোয়ারগুলো বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে ভেঁতা হয়ে গেছে।”

عبد الله بن زبير (রা.) সম্পর্কে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মতামত

প্রশ্ন: একটি রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) লোভী ও লালসাগ্রস্ত ছিলেন। সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে বলেছিলেন: “লোভ ও লালসা তোমাকে কোনো বিপদে ফেলেই ছাড়বে। আফসোস! আমি যদি সেই সময় তোমার কাছে থাকতাম এবং তোমাকে বাঁচাতে পারতাম।”

যখন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) অবরুদ্ধ হলেন, তখন তিনি বলতেন: “মুয়াবিয়া আমাকে এটাই বলেছিলেন, আফসোস! তিনি যদি জীবিত থাকতেন।” [৩]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২২৯০, ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব যিকরে কাযযাবে সাকীফ ও মুবীরাহা।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২২৯০, ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব যিকরে কাযযাবে সাকীফ ও মুবীরাহা।

[৩] নিশ্চয়ই কৃপণতা ও লোভ তোমাকে ছাড়বে না যতক্ষণ না তোমাকে একটি সংকীর্ণ স্থানে প্রবেশ করায়, তখন আমি তোমার গোলাম হয়ে তোমাকে উদ্ধার করতে চাইতাম। যখন ইবনে জুবাইর অবরুদ্ধ হলেন তখন তিনি বললেন: মুয়াবিয়া আমাকে এটাই বলেছিলেন এবং আমি কামনা করি তিনি যদি জীবিত থাকতেন। (আনসাবুল আশরাফ: ৪/৪৭, ত: দারুল ফিকর)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | দ্বিতীয় খণ্ড

এর সনদ হলো: মাদায়িনী, মুসলিমাহ বিন আলকামা থেকে, তিনি খালিদ থেকে, তিনি আবু কিলাবা থেকে। এই সনদটি সহীহ। প্রমাণিত হলো যে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সমস্ত সংগ্রাম ছিল ক্ষমতার লালসার কারণে এবং এই কারণেই তিনি বিপদে পড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার যৌক্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

জবাব: প্রথমত, এই বর্ণনার সনদ সহীহ হওয়া প্রশংসাপেক্ষ। এর বর্ণনাকারী মুসলিমাহ বিন আলকামা সম্পর্কে জারাহ ও তাদীল ইমামদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন। ইয়াহইয়া বিন মাসীন তাকে সিকাহ এবং আবু হাতিম তাকে সালেহুল হাদীস বলেছেন। [১] পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ তাকে যযীফ বলে অভিহিত করেছেন। [২] ইয়াহইয়া বিন সাঈদও তার বর্ণনা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইমাম সাজীর মতে, তিনি মুনকার বর্ণনাগুলো নকল করতেন এবং কাদরী ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার বিদআতের কারণে তার থেকে কোনো বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। [৩]

দ্বিতীয়ত, এর মূল বর্ণনাকারী হলেন আবু কিলাবা আল-জারমী (عبد الله بن زيد), যিনি নিশ্চিতভাবেই সিকাহ, কিন্তু সমস্ত মুহাদিস স্বীকার করেন যে তার মধ্যে তাদলীস-এর ত্রুটি রয়েছে। [৪] হাফেজ যাহাবী বলেন: “তিনি নিজে সিকাহ, কিন্তু যাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের থেকেও এবং যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি তাদের থেকেও তিনি তাদলীস করেন।” [৫]

এটি একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, মুদাল্লিসের সেই বর্ণনা যা ‘আন’ (থেকে) শব্দ দ্বারা বর্ণিত, তা সন্দেহজনক হয়। এই বর্ণনাতেও আবু কিলাবা এটি স্পষ্ট করেননি যে তিনি এই তথ্য অন্য কারো কাছ থেকে নিয়েছেন নাকি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বা হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে নিজে কিছু বলতে শুনেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর অবরোধকালীন অবস্থার এই উক্তি যে, “মুয়াবিয়া (রা.) এটাই বলেছিলেন, হায়! তিনি যদি জীবিত থাকতেন।” এটি প্রমাণ করে যে এখানে অবশ্যই মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন; কারণ আবু কিলাবা হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে অবরুদ্ধ ছিলেন না যে তিনি তার মুখ থেকে এই কথা শুনতে পারতেন। যে ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, তিনি অন্য কেউ, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে উক্ত কথাটি তিনিই আরোপ করেছেন। সুতরাং সনদের বিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত। শেষ কথা হলো, যদি জারাহ ও তাদীল ইমামদের মতামত উপেক্ষা করে বর্ণনাটিকে সহীহ এবং মুত্তাসিল (সংযুক্ত) ধরেও নেওয়া হয়, তবে এটি ছিল হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একটি ধারণা। এটা জরুরি নয় যে, এক সাহাবীর অন্য সাহাবী সম্পর্কে প্রতিটি ধারণা সঠিক হবে।

হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত হাতিব (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছিলেন: “আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি এই মুনাফিকের ঘাড় উড়িয়ে দিই।” কিন্তু নবী আকরাম (সা.) তার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। [৬]

গজওয়ায়ে তাবুকের সময় হযরত কাব বিন মালিক (রা.) সম্পর্কে কিছু সাহাবী ধারণা করেছিলেন যে, বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ তাকে জিহাদ থেকে বিরত রেখেছে। কিন্তু মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। [৭]

[১] তাহযীবুল কামাল: ২৭/৫৬৬

[২] মীযানুল ইতিদাল: ৩/১০৯

[৩] ইকমাল তাহযীবুল কামাল: ১১/১৯০

[৪] আসমাউল মুদাল্লিসীন লিস-সুযুতী, পৃ. ৬৯

[৫] মীযানুল ইতিদাল: ২/৩৪৫, ৩৪৬

[৬] ادعنى اضرب عنق هذا المنافق، قال انه قد شهد بدرأ (সহীহ বুখারী, হা: ৩২৮৩, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফাতহে মক্কা)

[৭] সহীহ মুসলিম, হা: ২৭৬৯, কিতাবুত তাওবা, বাব হাদীসে তাওবা কাব বিন মালিক

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অংশ দ্বিতীয়

আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর সীরাত এবং তাঁর লালন-পালনকারী মহান ব্যক্তিত্বদের কথা বিবেচনা করে তাঁর নিয়তকে খাঁটি এবং তাঁর সংগ্রামকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মনে করি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর লড়াই করাও এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর কাজের জন্য মোটেও অনুতপ্ত ছিলেন না। অন্যথায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) কেন প্রথম চার মাসে ইবনে যুবাইর (রা.)-এর বায়আত গ্রহণ করেননি?

প্রশ্ন: আপনার উত্তর অনেকটা সন্তোষজনক হয়েছে, তবে একটি সংশয় রয়েই যায় যে, যদি আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.) আবদুল্লাহ বিন যুবাইর-এর বায়আত শুধুমাত্র এই কারণে না করে থাকেন যে, একদিকে যুবাইরি খিলাফত ছিল এবং অন্যদিকে বনু মারওয়ানের খিলাফত ছিল এবং এই ব্যক্তিবর্গ কোনো পক্ষের অংশ হতে চাননি, তবে প্রশ্ন হলো যে, যুবাইরি খিলাফতের প্রথম চার মাস পর্যন্ত তো অন্য কোনো পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল না। এই সময়ে এই ব্যক্তিবর্গ কেন বায়আত করেননি? কেন বিলম্ব করতে থাকলেন?

উত্তর: বায়আতে বিলম্ব হওয়া কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। হযরত কাইস বিন সাদ (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বায়আত কয়েক সপ্তাহ পরে করেছিলেন। [১] যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বায়আত এক বছর পরে করেছিলেন। [২]

আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-এর বায়আত না করার বেশ কিছু কারণ সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ (যা এই ব্যক্তিবর্গের কাজ ও কথা থেকে ফুটে ওঠে) ছিল এই যে, এই ব্যক্তিবর্গ রাজনীতি থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। পূর্ববর্তী গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন তাঁদের ব্যথিত ও মর্মান্বিত করে দিয়েছিল, তাই দুই-তিন দশক ধরে এই ব্যক্তিবর্গ নির্জনবাসী ছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) প্রথম চার মাস অবশ্যই সর্বসম্মত খিলাফত পেয়েছিলেন এবং এই সময়ে কোনো শহর বনু উমাইয়ার দখলে ছিল না, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-এর মতো অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ সম্ভবত সেই সময়েও এই বিপদ তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন যে, বনু উমাইয়া কখনোই ক্ষমতা অন্য কারো কাছে থাকতে দেবে না এবং শীঘ্রই প্রস্তুতি নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর-এর খিলাফত খুব দ্রুত শেষ করে ছাড়বে। এই আশঙ্কা স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এরও ছিল যে, বনু উমাইয়া তাদের শক্তি এবং রাজনৈতিক কূটকৌশলের মাধ্যমে যেকোনো সময় বিদ্রোহ ঘটাতে পারে, তাই খিলাফতকে বনু উমাইয়ার ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাতে তিনি তাঁদের হিজাজ থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন। [৩]

সুতরাং আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.) এই মধ্যবর্তী সময়েও তাঁদের পূর্ববর্তী একাগ্রতা ও নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখেন। আর এটি প্রমাণিত যে, পরবর্তীতে তাঁদের সেই আশঙ্কাগুলোই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল যা তাঁদের মনে ছিল। এটি ভিন্ন কথা যে, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) অসাধারণ দৃঢ়তার সাথে বনু মারওয়ানের তীব্র বিরোধিতা এবং...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯০৮/৩

[২] তারিখুত তাবারী: ১৭৬/৫ থেকে ১৭৮

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫৩১/৫

আক্রমণের সামনে সাড়ে আট বছর পর্যন্ত অটল ছিলেন কিন্তু বনু মারওয়ানও যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে না নিল, শান্তিতে বসেনি। এই দ্বন্দ্ব উভয় পক্ষ থেকে মুসলমানরা নিহত হতে থাকে। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এবং তাঁর সমমনা আকাবিরগণ চাননি যে তাঁরা কোনো একটি দলের সাথে দাঁড়ান এবং সেই সারিতে তাঁদের উপস্থিতিকে অজুহাত বানিয়ে তাঁদের ভক্তরা নিজেদের এবং অন্য মুসলমানদের রক্ত ঝরাক। এ ব্যাপারে আখেরাতে জবাবদিহিতার আশঙ্কা তাঁদের ছিল।

তবে এটাও প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন হজের সময় নিজের চোখে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হারামে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখলেন, তখন তিনি নিজের নিরপেক্ষতার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মসজিদে হারামে মজলুম হিসেবে শাহাদাত বরণ তাঁর মতামতকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল এবং মৃত্যুর আগে তিনি স্পষ্টভাবে হাজ্জাজের বাহিনীকে বিদ্রোহী ঘোষণা করেছিলেন এবং এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক না হওয়ার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন। আমরা এটাও বলেছি যে, যদি আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের হাতে বায়াত গ্রহণ না করে থাকেন, তবে এর জন্য তাঁদের ওপর কোনো গুনাহ বর্তায় না; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ইমামের বায়াত করা ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব কেবল এটাই যে, বিদ্রোহ (খুরুজ) না করা। [১]

হযরত সাদ বিন উবাদাহ (রা.) সম্পর্কে একটি বর্ণনা এই যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বায়াত করেননি। [২] তবে তিনি লোকদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে নিজের খেলাফতের দাবি ত্যাগ করেছিলেন এবং কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। তাই যদি কেউ ইমামের বায়াত করতে দেরি করে বা একেবারেই বায়াত না করে, তবে তার ওপর শরীয়তগতভাবে কোনো অভিযোগ আনা যাবে না, শর্ত হলো সে যেন বিদ্রোহ না করে।

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) কি নবী আকরাম (সা.)-এর নাম খুতবা থেকে বাদ দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন: একটি বর্ণনায় আছে যে, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) খুতবা থেকে হুজুর (সা.)-এর নাম বাদ দিয়েছিলেন এবং তাও এই ধারণায় যে, এর ফলে বনু হাশিমের মধ্যে অহংকার ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হতো। [৩] এটি কি সঠিক?

جواب: এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। সনদে হিশাম বিন আদি নামক একজন বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী (কাজ্জাব) হিসেবে পরিচিত। [৪] একইভাবে কিছু ঐতিহাসিক এই বর্ণনাটি আমির বিন সালেহ থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি পরিত্যক্ত (মাতরুক), ইয়াহইয়া বিন মাজীন তাঁকে কাজ্জাব বলতেন। [৫] আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর মতো আশেকে রাসুলের ব্যাপারে কে বিশ্বাস করতে পারে যে তিনি এমন ঈমান বিধ্বংসী কাজের লিপ্ত হবেন।

[১] শরহ মুসলিম নববী এবং আহসানুল ফাতাওয়ার বরাতে এই কথাটি আগে বলা হয়েছে।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১/২৭৭, ত. আর-রিসালাহ। যদিও সনদ অনুযায়ী এই ঘটনাটি দুর্বল।

[৩] আনসাবুল আশরাফ, ৫/২৭১, ত. দারুল ফিকর।

[৪] মিজানুল ইতিদাল: ৩/৩১৩

[৫] তাকরিবুত তাহজিব, অনুবাদ নম্বর: ৩০৯৬

প্রশ্ন: আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের শাহাদাত এবং রাজকীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধের বর্ণনাগুলো সব কারবালার ঘটনার মতো কাল্পনিক, কারণ এগুলো সব শিয়া বর্ণনাকারীদের থেকে, বিশেষ করে ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত। উলামায়ে কেরাম শিয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হযরত হুসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে অহেতুক সত্যপন্থী ও মজলুম প্রমাণ করার আবেগে এই মিথ্যা বর্ণনাগুলোর ওপর বিশ্বাস করে নিয়েছেন, অথচ বাস্তবে এই বর্ণনাগুলোর কোনো সনদগত ভিত্তি নেই। তাই এগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

উত্তর: এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কারবালার ঘটনারও সহীহ ও হাসান বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে এবং যে যয়ীফ বর্ণনাগুলো সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলোও মূলনীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। একইভাবে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর রাজকীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধ এবং শাহাদাতের ঘটনাগুলোও কেবল ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত নয়, বরং সহীহ ও হাসান বর্ণনাগুলোতেও এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের ‘কিতাবুল ফাযায়েল’-এও এর একটি বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। [১] ফাকিহির ‘আখবারে মক্কা’-তেও একটি সহীহ সনদের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। [২] তাছাড়া আবু নুয়াইম আসবাহানি ‘হিলয়াতুল আউলিয়া’-তে এই ঘটনার চারটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সনদে কোনো শিয়া বর্ণনাকারী একেবারেই নেই, সেগুলো হলো:

১. প্রথম বর্ণনায় ইয়াজিদ এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর দ্বন্দ্ব থেকে কথা শুরু করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মক্কা আক্রমণের ঘটনা পর্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শাহাদাতের সকালে মা ও ছেলের কথোপকথন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর নিজের উৎসর্গিত সাথীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, শত্রুদের মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। [৩] এই বর্ণনা হাসান স্তরের নিচে নয়। [৪]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২২৬০, ফাযায়েলুস সাহাবা, বাব যিকর কাযযাব সাকিফ ওয়া মুবিরাহ।

[২] আখবারে মক্কা লিল ফাকিহি: ২/৭৩, হাদ্দাসানা আব্দুল জাব্বার বিনুল আলা, ক্বলা সানা বিশর বিনুস সাররি, ক্বলা সানা নাফি বিন উমর, আন ইবনি আবি মুলাইকা। আব্দুল জাব্বার মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈর; বিশর বিনুস সাররি বুখারী ও মুসলিমের; নাফি বিন উমর মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈর এবং ইবনে আবি মুলাইকা (আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। এভাবে এই বর্ণনা সহীহ স্তরের নিচে নয়।

[৩] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩১।

[৪] সনদটি হলো: সুলাইমান বিন আহমদ সানা আলী বিনুল মুবারক, সানা ইয়াযিদ বিনুল মুবারক, সানা আব্দুল মালিক বিন আব্দুর রহমান আয-যামারি, সানা কাসিম বিন মা’ন, আন হিশাম বিন উরওয়া, আন আবিহি।

বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- সুলাইমান বিন আহমদ: তিনি মু’জাম গ্রন্থসমূহের রচয়িতা আবুল কাসিম আত-তাবারানি, যার নির্ভরযোগ্যতা (সিকাহ হওয়া) কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়।
- আলী বিনুল মুবারক (আবুল হাসান আস-সাগানি মৃত্যু ২৮১ হি.): তার আসল নাম আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুবারক। আল্লামা ইরাকি তাকে সিকাহ বলেছেন। আবু তাইয়েব আল-মানসুরি বলেন: “মকবুল” (ইরশাদুল কাসি ওয়াদ দানি ইলা তারাজিমুশ শুযুখিত তাবারানি, আবু তাইয়েব বিন সালাহ আল-মানসুরি: ১/৩৪১, তবা দারুল কিয়ান রিয়াদ)।
- ইয়াযিদ বিন মুবারক (মৃত্যু ২১৪ হি.): “ইয়াযিদ বিন মুবারক” শব্দটি লিখনপ্রমাদ (তাসহিফ)। সঠিক নাম হলো য়ায়েদ বিন মুবারক। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (আস-সিকাত: ৮/২৫১, তবা নিযামিয়া দাক্ষিণাত্য)। আবু হাতিম বলেন, তিনি সাদুক (সত্যবাদী)। (আল-জারহ ওয়াত তা’দিল: ৩/৫৭৩, তবা দাক্ষিণাত্য)। আবু দাউদ ও নাসাঈ বলেন, তিনি সিকাহ। (তাহযীবুত তাহযীব: ৩/৩৪৫)।
- আব্দুল মালিক বিন আব্দুর রহমান আয-যামারি (মৃত্যু ১৯০ হি.): তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম হলো আব্দুল মালিক বিন আব্দুর রহমান শামি, যাকে ইমাম বুখারী ‘মুনকারুল হাদীস’ এবং আবু হাতিম ‘লাইসা বিল ক্বাউয়ি’ বলেছেন। পক্ষান্তরে আয-যামারিকে ইবনে হিব্বান সিকাহদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আমর বিন আলীও তাকে সিকাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব: ৬/৪০১)।
- কাসিম বিন মা’ন (আবদুল্লাহ বিন মাসউদের প্রপৌত্র): তিনি সিকাহ, হজ্জাত এবং নিজ সময়ের ইমাম ছিলেন। ১০০ হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হিশাম বিন উরওয়া এবং আয়েশা বিনতে সাদ থেকেও বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৮/১৯০)। তাদের পর হিশাম বিন উরওয়া এবং উরওয়া বিন জুবাইরের নির্ভরযোগ্যতা কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়।

(২) দ্বিতীয় বর্ণনায় শত্রুকে মসজিদ থেকে পিছু হটানো এবং রণসঙ্গীতের পণ্ডিত “لو كان قرني واحد لكفيته” (যদি আমার সমকক্ষ একজন হতো তবে আমিই তার জন্য যথেষ্ট হতাম) এবং “لسنا على الا عقاب” (আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী নই...) পড়ার উল্লেখ রয়েছে। [১] এটিও হাসান সনদে বর্ণিত। [২]

(৩) তৃতীয় বর্ণনায় হাজ্জাজের সাথে হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথোপকথন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। [৩] এর সনদ সহীহ। সকল বর্ণনাকারী (রিজাল) নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। [৪]

(৪) এতে শত্রুদের মসজিদে প্রবেশ করা, তাদের পিছু হটানো, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথায় ইট লাগা এবং “اسماء ان قتلت لا تبكى” (হে আসমা, যদি আমি নিহত হই তবে তুমি কেঁদো না) কবিতা পড়ার উল্লেখ রয়েছে। [৫] এই সনদটি যযীফ (দুর্বল)। [৬] তবে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই পর্যায়ের বর্ণনাগুলো আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য; কারণ এখানে এমন কিছু নেই যা শরীয়ত অনুযায়ী অস্বীকারযোগ্য।

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩৩

[২] সনদটি হলো: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ফারুক বিন আব্দুল কাবীর আল-খাত্তাবি, তিনি আব্দুল আজিজ বিন মুয়াবিয়া আল-উতবি থেকে, তিনি জাফর বিন আউন থেকে, তিনি হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে। বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- ১. ফারুক বিন আব্দুল কাবীর (মৃত্যু ৩৬০ হিজরি) বসরার একজন দীর্ঘজীবী মুহাদ্দিস ছিলেন, যাঁর নিকট মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে বর্ণনা গ্রহণ করতে আসতেন, তাঁর ব্যাপারে কোনো সমালোচনা (জারহ) করা হয়নি। হাফেজ যাহাবী বলেন: “এতে কোনো সমস্যা নেই।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৬/১৪০)
- ২. আব্দুল আজিজ বিন মুয়াবিয়া আল-উতবি (মৃত্যু ২৮৩ হিজরি) সদুক (সত্যবাদী)। তিনি প্রায় একশ বছর বয়স পেয়েছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৩/৩৮৪)
- ৩. জাফর বিন আউন (মৃত্যু ২০৬ হিজরি) বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৪৩০)
- ৪. তাঁদের পর হিশাম বিন উরওয়াহ এবং উরওয়াহ বিন জুবায়েরের নির্ভরযোগ্যতা কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়।

[৩] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩৩

[৪] সনদটি হলো: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু বকর আত-তালহি, তিনি আবু হুসাইন আল-ওয়াদিয়ি থেকে, তিনি আহমদ বিন ইউনুস থেকে, তিনি আবু আল-মুহাইয়াহ ইয়াহইয়া বিন ইয়াল্লা আত-তাইমি থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- ১. আবু বকর তালহি আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন মুয়াবিয়া (মৃত্যু ৩৪৬ হিজরি) নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। (আর-রওয়াল বাসিম ফি তারাজিমি শুযুখিল হাকিম: ১/২৩৩)
- ২. আবু হুসাইন আল-ওয়াদিয়ি মুহাম্মদ বিন আল-হুসাইন বিন হাবিব, নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। (মাওসুআতু আকওয়ালিদ দারাকুতনি: ২/৫৬৭)
- ৩. আহমদ বিন ইউনুস, আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস (মৃত্যু ২২৭ হিজরি) বুখারী ও মুসলিমের নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১০/৪৭৪)
- ৪. ইয়াহইয়া বিন ইয়াল্লা তাইমি: ইয়াহইয়া বিন ইয়াল্লা বিন হারমালা (মৃত্যু ১৮৪ হিজরি) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী, নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। (তাকরিবুত তাহযিব, নং: ৭৬৭৬)
- ৫. ইয়াল্লা বিন হারমালা: ইমাম বুখারী জানান যে, তিনি হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেন। (আত-তারিখুল কাবীর: ৮/৪১৬) ইবনে হিব্বান তাঁকে ‘আস-সিকাত’-এ উল্লেখ করেছেন। (আস-সিকাত: ৫/৫৫৬)

[৫] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩২

[৬] সনদটি হলো: সুলাইমান বিন আহমদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আলী বিন আল-মুবারক থেকে, তিনি য়ায়েদ বিন আল-মুবারক থেকে, তিনি আমাদের এক সাথী (সাহিবুন লানা) থেকে, তিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন ইব্রাহিম বিন ইসহাক থেকে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ইসহাককে বলতে শুনেছি যখন ইবনে জুবায়েরকে ঘেরাও করে শহীদ করা হয়েছিল। বর্ণনাকারীদের অবস্থা:

- ১. সুলাইমান বিন আহমদ (তাবারানি), আলী বিন মুবারক, য়ায়েদ বিন মুবারক: তাঁদের পরিচয় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তাঁরা তিনজনই নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বা সত্যবাদী (সদুক)।
- ২. সাহিবুন লানা (আমাদের এক সাথী): কোনো একজন অজ্ঞাত (মাজহুল) ব্যক্তি।
- ৩. ইব্রাহিম বিন ইসহাক: ইবনে আসাকির এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার সময় তাঁকে ইব্রাহিম বিন আল-হাক বিন আবি ইসহাক নামে অভিহিত করেছেন। (তারিখে দামেশক: ২৮/২২৫)
- ৪. আবু ইসহাক: ইবনে আসাকির এই একই বর্ণনা এই সনদেই উদ্ধৃত করার সময় তাঁকে ইসহাক বিন আবি ইসহাক নামে অভিহিত করেছেন। (তারিখে দামেশক: ২৮/২২৫) ইমাম তাবারানির মুজামুল কাবীরেও এই বর্ণনাটি বিদ্যমান। সেখানে আবু ইসহাককে ইসহাক বিন আবি ইসহাক লেখা হয়েছে। (আল-মুজামুল কাবীর, খণ্ড ১৩ ও ১৪: ১২/১৮০) ইব্রাহিম বিন ইসহাক এবং ইসহাক বিন আবি ইসহাক একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি এই বর্ণনার সনদ পরম্পরায় উপযুক্ত হতে পারেন। ইমাম হাইসামি “মাজমাউয যাওয়াইদ”-এ এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন: “এতে এমন একদল লোক রয়েছে যাদের আমি চিনি না।” এই সনদটি তিনজন বর্ণনাকারীর অজ্ঞাত হওয়ার কারণে যযীফ (দুর্বল) হয়ে পড়ে।

মারওয়ান বিন আল-হাকামের সাহাবিয়াত এবং চরিত্রের ওপর প্রশ্নসমূহ?

প্রশ্ন: মারওয়ান বিন আল-হাকামকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা উচিত কারণ মারওয়ানের জন্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হয়েছিল। কিছু আলেমের মতে ২ হিজরী, কারো মতে গায়ওয়ায়ে উহদের দিনগুলোতে (৩ হিজরী) এবং কারো মতে গায়ওয়ায়ে খন্দকের দিনগুলোতে (৫ হিজরী) মক্কায় তার জন্ম হয়েছিল। [১] হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.)

মারওয়ান বিন আল-হাকামের জীবনীতে লিখেছেন:

“وهو صحابي عند طائفة كثيرة”

অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমের মতে মারওয়ানের সাহাবিয়াত প্রমাণিত।

(জবাব) হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) “طائفة كثيرة” (তায়েফায়ে কাসীরাহ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হলো “অনেক মানুষ”। এ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অর্থ গ্রহণ করা ভুল। এই শব্দগুলোতে এটিও স্পষ্ট নয় যে, এর দ্বারা আহলে সুন্নাত উদ্দেশ্য নাকি নাসিবী; আলেমগণ উদ্দেশ্য নাকি মুখর। যদি কারো দাবি হয় যে, হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.)-এর যুগ পর্যন্ত “অধিকাংশ আহলে সুন্নাত আলেম” মারওয়ানকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছিলেন, তবে অনুগ্রহ করে সেই যুগ পর্যন্ত কয়েকজন আহলে সুন্নাত আলেমের কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করুন যারা মারওয়ানকে সাহাবী বলেছেন। বাস্তবতা হলো, কোনো যুগেই আহলে সুন্নাতের আলেমগণ মারওয়ানের সাহাবী হওয়ার দাবি করেননি। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) যে ‘তায়েফায়ে কাসীরাহ’র কথা উল্লেখ করেছেন, তারা এতটাই গুরুত্বহীন লোক ছিলেন যে তাদের মধ্যে কারো নামও পরিচিত নয়। অধিকন্তু, তাদের কাছে মারওয়ানের সাহাবিয়াতের সপক্ষে একটিই দলিল ছিল যা হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) নিজেই উদ্ধৃত করেছেন (এবং পরবর্তীতে নিজেই তা খণ্ডন করেছেন যেমনটি সামনে আসছে)। দলিলটি হলো:

لانه ولد في حياة النبي ﷺ. وروي عنه في حديث صلح الحديبية، وفي رواية صحيح البخاري
”عن مروان والمسور بن مخرمة”

(এজন্য যে সে নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছিল। তার থেকে সুলহে হুদায়বিয়া সংক্রান্ত বর্ণনা বর্ণিত আছে, বুখারীতে মারওয়ান এবং মিসওয়ার বিন মাখরামা থেকে বর্ণনা বর্ণিত আছে।) [২]

কিন্তু কোনো ব্যক্তির নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করা বা মুরসাল হিসেবে কোনো বর্ণনা পেশ করা সাহাবী হওয়ার দলিল হতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত দর্শন (রুইয়াত) ও সাহচর্য (সোহবত) প্রমাণিত হয়। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) যেসব বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলো মুরসাল। এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু সুলহে হুদায়বিয়া সংক্রান্ত এবং কিছু গায়ওয়ায়ে হুনাইন সংক্রান্ত।

[১] আল-ইসতিয়াব: ৩/৩৮৭; আল-ইসাবাহ: ৬/২০৩

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭৫ হিজরীর ঘটনাবলী, জীবনী: মারওয়ান বিন আল-হাকাম

তারিখ উন্মত

সুলহ হৃদায়বিয়ার বর্ণনার শব্দগুলো দেখুন:

উরওয়াহ ইবনুল জুবাইর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে হৃদায়বিয়ার উমরাহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তারা আমাকে যা সংবাদ দিয়েছেন তাতে ছিল যে, হৃদায়বিয়ার দিন সন্ধিচুক্তির সময় সুহাইল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লেখক ছিলেন।

[১]

একইভাবে দ্বিতীয় বর্ণনার (যা গায়ওয়ায়ে হনাইন সম্পর্কিত) শব্দগুলোর ওপর লক্ষ্য করুন:

উরওয়াহ দাবি করেছেন যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলিম হয়ে তাঁর কাছে এল তখন তিনি দাঁড়ালেন। [২]

এখানে সনদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) এবং ইরসালের পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া ইমাম বুখারী কিতাবুশ শুরুত-এ সুলহ হৃদায়বিয়ার ঘটনার একটি দীর্ঘ বর্ণনা মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সেটিও মুনকাতী (বিচ্ছিন্ন)। দেখুন:

যুহরী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, উরওয়াহ ইবনুল জুবাইর আমাকে মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ এবং মারওয়ান থেকে সংবাদ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর হাদীসকে সত্যায়ন করছিলেন, তারা উভয়ে বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদায়বিয়ার সময় বের হলেন... [৩]

এই তিনটি বর্ণনায় ঘটনা বর্ণনার জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে মোটেও এই স্পষ্টতা নেই যে বর্ণনাকারীগণ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; বরং শব্দগুলোর মধ্যে পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা কারো কাছ থেকে শোনা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। [৪]

পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি সাব্যস্ত করে যে বিষয়টি এমনই ছিল। মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ-এর জন্ম ২ হিজরীতে, তবে তিনি মাদানী ছিলেন এবং সেই বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শোনার কথা স্পষ্ট করেছেন, তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। [৫] কিন্তু হনাইন এবং সুলহ হৃদায়বিয়ার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি ছিলেন না, মারওয়ানও ছিলেন না। উভয়ই শোনা ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ-এর মতো মারওয়ানের জন্মও যদি ২ হিজরী ধরে নেওয়া হয়, তবুও ৬ হিজরীতে সুলহ হৃদায়বিয়ার সময় উভয়ের বয়স হবে চার বছর এবং ৮ হিজরীতে গায়ওয়ায়ে হনাইনের সময় উভয়ের বয়স হবে ছয় বছর। সুলহ হৃদায়বিয়া মক্কার বাইরে হয়েছিল এবং সে সময় মারওয়ানের পিতাও ইসলাম গ্রহণ করেননি। প্রশ্নই ওঠে না যে চার বছর বয়সী মারওয়ান নিজে উপস্থিত হয়ে সন্ধিপত্রের শর্তাবলীর আলোচনার সাক্ষী হবেন। একইভাবে মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ সুলহ হৃদায়বিয়ার সময় চার বছর বয়সী ছিলেন, তিনি চুক্তির সাক্ষী মোটেও ছিলেন না। গায়ওয়ায়ে হনাইনেও তাঁর এবং মারওয়ানের অংশগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না কারণ...

[১] সহীহ বুখারী, হা: ২১৮০, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গায়ওয়াতিল হৃদায়বিয়াহ।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৩০৭, কিতাবুল ওয়াকালাহ, বাবু ইয়া ওয়াহাবা শাইয়ান।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৩১, কিতাবুল শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ; হা: ১৬৯৩, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু মান আশআরা ওয়া ক্বাল্লাদা বিযিল হলাইফাহ।

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/৩৯৩, ৩৯৪, তিবআতুর রিসালাহ।

[৫] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর এই মিষ্টারের ওপর দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুনেছি, আর আমি সেদিন ছিলাম একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক, তখন তিনি বলেছিলেন: নিশ্চয়ই ফাতিমা আমার অংশ (সহীহ বুখারী, হা: ৩১১০, কিতাবুল ফারদিল খুমুস, বাবু মা যুকির মিন দিরইন নবী ﷺ সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৪৯, ফাযায়িলুস সাহাবাহ, বাবু ফাযায়িলি ফাতিমাহ; সুনান আবু দাউদ, হা: ২০৬৯, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মা ইউকরাহ আন ইয়াজমাআ বাইনাহুনা মিনান নিসা)।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

নবী আকরাম ﷺ এত অল্প বয়সের শিশুদের জিহাদে সাথে নিয়ে যেতেন না। যুদ্ধগুলোতে বারো-তেরো বছরের শিশুদেরও ফিরিয়ে দেওয়া হতো, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের সাথে নেওয়া হতো। এখন মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.)-এর সাহচর্য তো অন্যান্য মুত্তাসিল (সংযুক্ত) এবং মারফু রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়, কিন্তু মারওয়ান কি শুধুমাত্র হৃদয়বিয়ার সন্ধি বা হনায়নের যুদ্ধের এই মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদযুক্ত রেওয়ায়েতগুলোর ভিত্তিতে সাহাবী হিসেবে প্রমাণিত হবে? যখন সে ঐসব ঘটনায় শরীকই ছিল না, তবে সে ঐসব ঘটনা সম্পর্কে নিজের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ কীভাবে বর্ণনা করতে পারে?

এখন আপনি সহীহ বুখারীর এই রেওয়ায়েতটি দেখলে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে; এই রেওয়ায়েতের সনদের অন্যান্য অস্পষ্টতা দূর করে দিয়ে এটি বলে দিচ্ছে যে, মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) এবং মারওয়ান এই ঘটনাগুলো অন্যান্য সাহাবীদের থেকে শুনেছেন।

আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে লাইস বর্ণনা করেছেন, উকাইল থেকে, ইবনে শিহাব থেকে, তিনি বলেন, আমাকে উরওয়াহ ইবনুল যুবাইর সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মারওয়ান এবং মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন: যখন সুহাইল ইবনে আমর সন্ধিপত্র লিখছিলেন... ইত্যাদি। [১]

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) সহীহ বুখারীর এই সনদটি উদ্ধৃত করে অন্যান্য সনদের অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছেন এবং সেই সাথে মারওয়ানের সাহাবী হওয়ার দাবির একমাত্র দলিলকে এভাবে খণ্ডন করেছেন: “এটাই সঠিক, কারণ মারওয়ান এবং মিসওয়ার (রা.) হৃদয়বিয়ার দিন অল্পবয়স্ক ছিলেন। স্পষ্ট বিষয় হলো, তারা উভয়েই এই ঘটনা সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুনেছেন।” [২]

আল্লামা আইনী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

“এই রেওয়ায়েতটি মুরসাল; কারণ তারা উভয়েই এই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না... যেখানে মারওয়ানের সম্পর্ক, তার না নবী ﷺ থেকে শোনা (সামা’) প্রমাণিত, আর না সাহচর্য (সোহবত); কারণ যখন নবী ﷺ তার পিতাকে শহরবদর করেছিলেন, তখন সেও তায়েফে চলে গিয়েছিল, অথচ সে তখন অবুঝ শিশু ছিল। সে তার পিতার সাথেই তায়েফে অবস্থান করছিল, এমনকি যখন হযরত উসমান (রা.) খলীফা হলেন তখন তিনি তাদের উভয়কে ফিরিয়ে আনলেন... আর যেখানে মিসওয়ার (রা.)-এর সম্পর্ক, নবী ﷺ থেকে তার শোনা (সামা’) প্রমাণিত, কিন্তু যখন তিনি তার পিতার সাথে মক্কা বিজয়ের পর আসলেন তখন তিনি শিশু ছিলেন এবং এই ঘটনা তারও দুই বছর আগের।” [৩]

সুতরাং হৃদয়বিয়ার সন্ধি সংক্রান্ত মারওয়ানের রেওয়ায়েতগুলো মুরসাল, যা তার সাহচর্য বা শোনার (সামা’) দলিল হতে পারে না।

[১] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৭১, কিতাবুশ শুরুত, বাব মা ইয়াজুযু মিনাশ শুরুত ফিল ইসলাম। এবং ইমাম নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন এই সনদে: ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম আদ-দাওরাকী থেকে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, ইবনে মুবারক থেকে, মা’মার থেকে, যুহরী থেকে, উরওয়াহ থেকে, মিসওয়ার বিন মাখরামা ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: যখন সুহাইল ইবনে আমর সন্ধিপত্র লিখছিলেন... ইত্যাদি।

(আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ, রেওয়ায়েত নম্বর: ১১৪৩৮)

[২] “আর এটাই সঠিক, কারণ মারওয়ান এবং মিসওয়ার হৃদয়বিয়ার দিন ছোট ছিলেন, আর স্পষ্ট বিষয় হলো তারা এটি সাহাবীদের থেকে গ্রহণ করেছেন।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/২৩৮, ২৩৭)

[৩] “আর এটি মুরসাল কারণ তারা এই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না... আর মারওয়ান, তার নবী ﷺ থেকে শোনা (সামা’) সহীহ নয় এবং তার সাহচর্যও নেই, কারণ সে তায়েফে চলে গিয়েছিল যখন নবী ﷺ তার পিতাকে শহরবদর করেছিলেন, সে তখন অবুঝ শিশু ছিল এবং তার পিতার সাথেই তায়েফে ছিল যতক্ষণ না উসমান (রা.) তাদের ফিরিয়ে আনলেন... আর মিসওয়ার, নবী ﷺ থেকে তার শোনা (সামা’) সহীহ, কিন্তু সে তার পিতার সাথে মক্কা বিজয়ের পর এসেছিল এবং সে তখন ছোট ছিল, আর এই ঘটনা তারও দুই বছর আগের।” (উমদাতুল কারী, কিতাবুশ শুরুত, বাব মা ইয়াজুযু মিনাশ শুরুত ফিল ইসলাম)

সাহাবী চেনার পদ্ধতিসমূহ:

মনে রাখা প্রয়োজন যে, উলামায়ে উসূলগণ কারো সাহাবী হওয়ার পরিচয়ের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করেছেন:

- তাঁর সাহাবী হওয়া তাওয়াতুর (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা) দ্বারা প্রমাণিত হওয়া, যেমন খুলাফায়ে রাশেদীন।
- তাঁর সাহাবী হওয়া তাওয়াতুর পর্যায়ে না হলেও প্রসিদ্ধ হওয়া, অর্থাৎ সাহাবী ও তাবিঈগণ তাঁকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করতেন... যেমন ইমরান বিন হুসাইন, জারীর বিন আব্দুল্লাহ, উক্বাশাহ বিন মিহসান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।
- বড় বড় সাহাবীগণ তাঁকে সাহাবী বলেছেন, যেমন আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হুমামাহ আদ-দাওসীর সাহাবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।
- রিসালাতের যুগের নিকটবর্তী সময়ে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও মুত্তাকী ব্যক্তি নিজে সাহাবী হওয়ার দাবি করেছেন এবং সাহাবীদের পক্ষ থেকে এর কোনো প্রতিবাদ বর্ণিত হয়নি।

[১]

এগুলোর কোনোটিই মারওয়ানের ওপর প্রযোজ্য হয় না। সে নিজেও কখনো এই দাবি করেনি যে সে সাহচর্য লাভের (সুহবাত) মর্যাদা রাখে। সাহাবীদের জীবনী নিয়ে লেখা কোনো কিতাবে মারওয়ানকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়নি। সাহাবীদের পরিচিতির ওপর চারটি কিতাবকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়: তাবাক্বাত ইবনে সাদ, আল-ইসতিআব, উসদুল গাবাহ এবং আল-ইসাবাহ। তাবাক্বাত ইবনে সাদ-এ মারওয়ানকে তাবিঈদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। [২] আল-ইসতিআব-এ ইবনে আব্দুল বার (রাহিমাহুল্লাহ) পরিষ্কার লিখেছেন যে, মারওয়ান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেননি, কারণ যখন তার পিতাকে দেশান্তর করা হয়েছিল তখন সেও সাথে তায়েফে চলে গিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করছিল। [৩] উসদুল গাবাহ-তে পরিচিতি দেওয়া সাহাবীদের মধ্যেও মারওয়ান অন্তর্ভুক্ত নয়। আল-ইসাবাহ-তেও তাকে সাহাবী বলা হয়নি।

হাফেজ ইবনে হাজার কি মারওয়ানকে সাহাবী মনে করতেন?

প্রশ্ন: মারওয়ানের সাহাবিয়াত কীভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে যেখানে হাফেজ ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) মারওয়ানকে সাহাবী মনে করতেন?

উত্তর: এটি একটি ভিত্তিহীন দাবি। হাফেজ ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ:

“মারওয়ান বিন আল-হাকাম বিন আবিল আস বিন উমাইয়্যাহ, উসমান বিন আফফানের চাচাতো ভাই। বলা হয় যে, সে দেখার (রুইয়াত) সৌভাগ্য লাভ করেছে। যদি এটি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে যে ব্যক্তি তার (মারওয়ান) সম্পর্কে সমালোচনা করেছে তার মত গ্রহণ করা হবে না।” [৫]

হাফেজ ইবনে হাজার এখানে মারওয়ানের “রুইয়াত” (দেখা) সম্পর্কে কেবল একটি সম্ভাব্য উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কোনো ফয়সালা দেননি। একইভাবে “আল-ইসাবাহ”-তেও তিনি কেবল সম্ভাবনা পেশ করেছেন এবং সেই সাথে স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

لم أر من جزم بصحبته আমি এমন কাউকে দেখিনি যে তার সাহাবিয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। [৪]

[১] আল-ইসাবাহ: ১/৫ (ড. আদিল আহমদের ভূমিকা), ১/২০ (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কোনো ব্যক্তি সাহাবী হওয়ার পরিচয় জানার উপায়)।

[২] তাবাক্বাত ইবনে সাদ: ৫/৩৭, ত. সাদির।

[৩] আল-ইসতিআব: ৩/১৩৮৭।

[৪] বলা হয় যে তার রুইয়াত (দেখা) রয়েছে, যদি তা প্রমাণিত হয় তবে যারা তার সমালোচনা করেছে তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপ করা হবে না। (ফাতহুল বারী: ১/৩৪৩)।

[৫] আল-ইসাবাহ: ৬/২০৩।

এই সমস্ত আলোচনার পর দেখুন যে হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর শেষ অভিমত কী ছিল?

তিনি ‘তাকরীবুত তাহযীব’-এ পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে লিখেছেন: ‘লা তুসবিতু লাহল সুহবাহ’ (তার সাহাবিয়াত প্রমাণিত নয়) [১]।

সুতরাং হাফিজ ইবনে হাজারের দিকে মারওয়ানের সাহাবিয়াতের কথাটি সম্বন্ধ করা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন এই বিষয়ে অন্যান্য ইমামদের মতামতও লক্ষ্য করুন। হাফিজ যাহাবী (রহ.) ‘মিযানুল ইতিদাল’-এ লিখেছেন:

“মারওয়ান বিন আল-হাকাম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন যে, সে নবী ﷺ-কে দেখেনি।

আমি বলি যে, তার কিছু কাজ ধ্বংসাত্মক ছিল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।” [২]

হাফিজ যাহাবী (রহ.) মারওয়ান সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভিমত উদ্ধৃত করে লিখেছেন:

“মারওয়ান বিন আল-হাকাম: ইমাম বুখারী বলেছেন: সে নবী ﷺ-কে দেখেনি।”

(ইমাম বুখারীর বক্তব্য হলো যে, সে রাসূল ﷺ-এর দর্শন লাভ করেনি।)

অতঃপর হাফিজ যাহাবী (রহ.) নিজের অভিমত এভাবে লিখেছেন:

“কুলতু: তাবিঈন লাহ আফাঈল। (আমি বলি সে তাবিঈ ছিল এবং তার কিছু মন্দ কর্মকাণ্ডও ছিল।)” [৩]

আল্লামা ইরাকী (রহ.) লিখেছেন:

“ইমাম তিরমিযী (রহ.) আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.)-কে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আমি তাকে বললাম: মারওয়ান বিন আল-হাকাম কি নবী ﷺ-কে দেখেছিলেন? তিনি বললেন: না।” [৪]

[১] তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৬৫৬৭

[২] “তার কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ রয়েছে, আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি, সে তালহাকে তীর নিক্ষেপ করেছিল এবং যা করার করেছিল।” (মিযানুল ইতিদাল: ৩/৮৯)।

মারওয়ানের যেসব ধ্বংসাত্মক কাজের দিকে হাফিজ যাহাবী (রহ.) ইঙ্গিত করেছেন, তার মধ্যে কিছু সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন:

- মারওয়ান কর্তৃক হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করার কথা বর্ণিত আছে। (আত-তারীখুল কবীর লি-ইবনে আবী খাইসামাহ: আস-সাফারুস সালিস: ৩/৩৭ সহীহ সনদ)
- একইভাবে মারওয়ান কর্তৃক হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.)-কে জঙ্গ জামালের (জামাল যুদ্ধ) সময় হত্যা করাও সহীহ সনদে প্রমাণিত। মারওয়ানের এই কাজের ওপর হাফিজ যাহাবী (রহ.) মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: “আমি বলি: তালহার হত্যাকারী পাপের ক্ষেত্রে আলীর হত্যাকারীর সমপর্যায়ের।”

“হযরত তালহা (রা.)-এর হত্যাকারী গুনাহগার হওয়ার ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)-এর হত্যাকারীর সমতুল্য।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৬, প্রকাশনা: আর-রিসালাহ)

হাফিজ ইবনে হাজারও মারওয়ানের এই অপরাধের বর্ণনা উদ্ধৃত করে এর সনদকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। আবু আল-কাসিম আল-বাগাবী সহীহ সনদে আল-জারুদ বিন আবী সাবরা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যখন জামালের দিন ছিল, মারওয়ান তালহার দিকে তাকাল এবং বলল: আজকের পর আমি আর আমার প্রতিশোধ খুঁজব না, অতঃপর সে তার দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করল এবং তাকে হত্যা করল। (আল-ইসাবাহ: ৩/৩৩৪, প্রকাশনা: আল-ইলমিয়াহ) হাফিজ ইবনে কাসীর একেই প্রসিদ্ধ উক্তি বলেছেন, যদিও তিনি এই কথাটিকে “অধিকতর নিকটবর্তী” বলে অভিহিত করেছেন যে, তীরটি কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৭/২৪৭)। কিন্তু যদি সহীহ বর্ণনাকে অনুমানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবে মারওয়ানের এই অপরাধ প্রমাণিত। আর এই কথা যে, মারওয়ান থেকে কেন এর কিসাস নেওয়া হয়নি? তবে এর কারণ হলো যে, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ এবং হাঙ্গামাপূর্ণ যুগে সংঘটিত রক্তের কিসাস দাবি করা শুরু হয়নি, এমনকি হযরত যুবাইর (রা.)-এর হত্যাকারীর থেকেও কিসাস নেওয়া হয়নি।

- মারওয়ান শরয়ী খলীফা হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং সমস্ত প্রদেশে তার বাইয়াত ও গভর্নরদের নিয়োগের চার মাস পর নিজেই খিলাফতের দাবি করে বসে। মারওয়ানের এই বিদ্রোহী আন্দোলনের সময় তার সৈন্যদের হাতে হযরত যাহহাক বিন কায়েস (রা.) এবং হযরত নুমান বিন বশীর (রা.)-এর মতো অবশিষ্ট সাহাবীদের শাহাদাত ঘটে। এই বিদ্রোহী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তার পুত্র আব্দুল মালিকের সৈন্য অভিযানে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) শহীদ হন এবং আরও কিছু সাহাবীকেও শহীদ করা হয় এবং কাবার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। এগুলোই মারওয়ানের সেই “আফাঈল” (মন্দ কাজ) যার দিকে হাফিজ যাহাবী ইঙ্গিত করেছেন।

[৩] আল-মুগনী ফিজ যুয়াফা: ২/৬৫১

[৪] তুহফাতুত তাহসীল লি-ইবনিল ইরাকী: ১/২৯৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - খণ্ড ৭

ইমামুল মুহাদিসীন আবু যুরআ (রহ.)-এর অভিমতও এটাই ছিল। তিনি বলতেন: মারওয়ান নবী (সা.) থেকে কিছুই শোনেননি। [১]

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী (রহ.) মারওয়ান সম্পর্কে লিখেছেন:

“মারওয়ান বিন আল-হাকাম আল-আস আল-উমাবী আল-মাদানী। তার সাহচর্য (সুহবত) প্রমাণিত নয়।” [২]

মোটকথা, জমহুর উলামায়ে কেরাম মারওয়ানকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করেননি। হ্যাঁ! কিছু লোক কিছু মুরসাল বর্ণনাকে মুত্তাসিল মনে করে এমনটি ধারণা করেছিলেন। আমরা এই বক্তব্যের অসারতা স্পষ্ট করে দিয়েছি, তাই জমহুর এই অভিমতকে গুরুত্বযোগ্য মনে করেননি।

□□□

ইমাম বুখারী মারওয়ানের নামের সাথে রাযিয়াল্লাহু আনহু লিখেছেন:

প্রশ্ন: মারওয়ান বিন আল-হাকামের উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম বুখারী ‘রাযিয়াল্লাহু আনহু’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা এই কথার প্রমাণ যে তিনি মারওয়ানকে সাহাবী মনে করতেন। বর্ণনাটি হলো:

“ইয়াহইয়া বিন বুকাইর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, লাইস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উকাইল থেকে, তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি বলেন: উরওয়াহ বিন যুবাইর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মারওয়ান এবং মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলতে শুনেছেন...” [৩]

এতে মারওয়ান এবং মিসওয়ার বিন মাখরামাহ-এর উল্লেখ করে উভয়কে একসাথে সাহাবী মানা হয়েছে এবং ‘রাযিয়াল্লাহু আনহুমা’ বলা হয়েছে।

উত্তর: এটি নিছক একটি ভুল বোঝাবুঝি। ইমাম বুখারী এমন সাহাবীর উল্লেখ করার সময় যার পিতাও সাহাবী ছিলেন, অনেক সময় ‘রাযিয়াল্লাহু আনহুমা’ শব্দ ব্যবহার করেন। [৪]

যেহেতু মিসওয়ার (রা.)-এর পিতা মাখরামাহ বিন নাওফাল (রা.)-ও সাহাবী ছিলেন, [৫] তাই ইমাম বুখারী সাহাবী পিতা-পুত্রের নাম আসার কারণে ‘রাযিয়াল্লাহু আনহুমা’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য স্থানে ইমাম বুখারীর নিজস্ব ইবারত (পাঠ্য) থেকেই এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়।

“নিশ্চয়ই মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং মারওয়ান তাকে সংবাদ দিয়েছেন...” [৬]

এখানে নিশ্চিতভাবেই এটি মিসওয়ার (রা.) এবং তার পিতা মাখরামাহ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে মারওয়ানকে ‘রাযিয়াল্লাহু আনহু’ ব্যতীত আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শুধু এই এক স্থানেই নয়, সহীহ বুখারীতে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে মারওয়ানের একক উল্লেখ রয়েছে এবং সেখানে সম্মানসূচক ‘রাযিয়াল্লাহু আনহু’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [৭]

[১] তুহফাতুত তাহসীল লি-ইবনিল ইরাকী: ১/২৯৮

[২] মারওয়ান বিন আল-হাকাম বিন আল-আস আল-উমাবী আল-মাদানী ওয়া লা ইয়াসবুতু লাহু সুহবাহ। (আওজায়ুল মাসালিক: ১/৩৮৩, তবা দারুল কলাম দামেস্ক)

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৩১

[৪] কিছু উদাহরণ দেখুন: ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে (হা: ৮), আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে (হা: ২০১০), বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে (হা: ৩৯৯), ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে (সহীহ বুখারী, হা: ৭৯)

[৫] মাখরামাহ বিন নাওফাল (রা.) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (আল-আবদা: ৬/৩১)

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ২৫৮৩, অধ্যায়: অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উপহার প্রদান বৈধ মনে করা সম্পর্কে

[৭] যেমন: হা: ৫০৯, ১৩১৫, ৯৫৬, ১৫৬৩, ২৮৩২, ৩৬০৫, ৩৭১৭

সুতরাং এই ধারণা ভুল যে, এখানে ইমাম বুখারী মারওয়ানকে সাহাবী মনে করে ‘রাযিয়াল্লাহু আনহু’ বলেছেন। অথচ অন্য স্থানে ইমাম বুখারী নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে, মারওয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেননি। [১]

□□□

মারওয়ানের পিতা হাকাম বিন আবিল আসের ভূমিকা কী ছিল?

প্রশ্ন: মারওয়ান বিন হাকামের পিতা হাকাম বিন আবিল আসকে কিছু লোক মুনাফিক বলে গণ্য করেন এবং কিছু লোক একজন মহান সাহাবী হিসেবে গণ্য করেন। এ বিষয়ে সঠিক কথাটি কী?

উত্তর: আমরা যতটুকু দেখেছি, এই ব্যক্তিত্বও মারওয়ানের মতোই সন্দেহভাজন। ইলমুর রিজালের ইমামদের মধ্যে কেউ হাকাম বিন আবিল আসের আলোচনা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে করেননি, বরং সতর্কতা অবলম্বন করে কেবল ‘রুইয়াত’ (দেখা) বা সামান্য সাহচর্যের কথা বলেছেন। এর কারণ ছিল স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাকামের ব্যাপারে অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন। এই কারণেই সালাফদের মধ্যে কেউ হাকামের নামের সাথে “রাযিয়াল্লাহু আনহু” যোগ করার সাহস করেননি এবং বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

হাকাম বিন আবিল আসের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“হাকাম বিন আবিল আস বিন উমাইয়া আল-উমাবী, আবু মারওয়ান, আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো ভাই। তার কুনিয়াত ছিল আবু মারওয়ান। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। সাহচর্যের সামান্য অংশ পেয়েছেন। বলা হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করে তায়েফে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটাচলার ধরন এবং কিছু অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিরস্কার করেন এবং দূরে তাড়িয়ে দেন। ফলে তিনি ওয়াদিয়ে ওয়াজ-এ গিয়ে বসবাস শুরু করেন। [২] একদল লোক আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর এই কারণেই সমালোচনা করেছেন যে, তিনি তার চাচা হাকামের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন, তাকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং মদীনায় ডেকে এনে এক লক্ষ (দিরহাম) অনুদান দিয়েছেন। হাকামের নিন্দায় কিছু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যা সহীহ সনদের নয়, এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: “কী ব্যাপার, আমি হাকামের সন্তানদের আমার মিস্বরে বানরের মতো লাফাতে দেখছি।” এটি আলা বিন আবদুর রহমান তার পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। [৩] এই অধ্যায়ে আরও কিছু হাদীস রয়েছে। শা’বী বলেন যে, আমি ইবনে যুবায়ের থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন: “কাবার রবের কসম! হাকাম বিন আবিল আস এবং তার সন্তানদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে অভিশপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।” [৪] হাকামের বিশজন পুত্র এবং আটজন কন্যা ছিল। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা ফাঁস করে দিতেন।”

[১] তুহফাতুত তাহসীল লি ইবনিল ইরাকী: ৩৯৮/১

[২] এটি তায়েফের একটি উপত্যকা।

[৩] হাইসামী এটি মাজমাউয যাওয়াইদ-এ বর্ণনা করেছেন, হা: ৯২৪৬, এবং বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ-এর বর্ণনাকারী, মুসআব বিন আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের ব্যতীত এবং তিনি নির্ভরযোগ্য।

[৪] নিশ্চয়ই হাকাম বিন আবিল আস এবং তার সন্তানরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে অভিশপ্ত। হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তারিখুল ইসলাম (৩/৩৬৮, তাদমুরী; ৩/১৯৮, বাশার)-এ এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেছেন: এর সনদ সহীহ।

করতেন। এজন্য আপনি ﷺ তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ৩১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

আলেমদের মধ্যে ইবনুল আসির আল-জাযারি হাকাম বিন আবিল আসের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কিত একাধিক বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বলেন:

“হাকামের ওপর লানত করা এবং তাকে শহর থেকে বহিস্কার করার বর্ণনা অনেক রয়েছে। সেগুলো উল্লেখ করার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এতটুকু কথা তো নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহনশীলতা এবং অপ্রীতিকর বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা সত্ত্বেও তাকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন, তা তার কোনো অত্যন্ত গুরুতর আচরণের কারণেই ছিল।” [২]

সালাফদের সমস্ত বক্তব্য সামনে রেখে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, যদি হাকাম বিন আবিল আসের জন্য সাহচর্য (সোহবত) সাব্যস্ত হওয়া নিন্দার পথে বাধা হয়, তবে অন্যদিকে বর্ণনাগুলোর প্রেক্ষিতে প্রশংসা ও গুণগান করাও সতর্কতার পরিপন্থী; কারণ সাহচর্য তো যুল খুওয়াইসিরাহ-এর মতো খারেজিদেরও নসিব হয়েছিল, কিন্তু তার নাম আদবের সাথে নেওয়া হয় না। সালাফগণ এই সতর্কতা বজায় রেখেছেন। আল-হাকাম সম্পর্কে যে বর্ণনাগুলো ছিল, সেগুলো হুবহু উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। যে বর্ণনাগুলো যয়্যিফ বা মাওজু ছিল, সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন এবং যেগুলো সহিহ ছিল, সেগুলোর অবস্থানও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল-হাকামের নিন্দা অথবা সম্মান ও মর্যাদা—উভয়টি থেকেই তারা বিরত থেকেছেন। আমরাও এটিকেই উত্তম মনে করি। [৩]

মারওয়ানের হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ:

প্রশ্ন: মারওয়ানকে হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী বলা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু মৌলিক সংশয় রয়েছে, যেমন: মারওয়ানের হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডে কী স্বার্থ থাকতে পারে? যদি বলা হয় যে, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডে অংশীদার হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই মারওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে ছিল, তবে এটি কোনো কারণ হতে পারে না; কারণ এই অপপ্রচারে মদিনার বাইরের লোকেরা প্রভাবিত হতে পারত। মারওয়ান এই মিথ্যার ওপর কীভাবে বিশ্বাস করতে পারত? যদি মারওয়ান হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করতে চাইত, তবে এই কাজ সাধারণ দিনগুলোতে আরও সহজে হতে পারত। গুপ্তহত্যার অনেক পদ্ধতি সহজেই প্রয়োগ করা যেত। যুদ্ধের দিন শত শত মানুষের উপস্থিতিতে তাঁকে হত্যা করার ঝুঁকি কেউ কেন নিতে যাবে? যদি মারওয়ান সমস্ত সতর্কতা উপেক্ষা করে জনসমক্ষে এই জুলুম করে থাকে, তবে সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ তাকে কেন ছেড়ে দিলেন? এত বড় সাহাবীর হত্যাকারীর কাছ থেকে কেন প্রতিশোধ নেওয়া হলো না?

جواب: মারওয়ানের হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করা অবশ্যই অদ্ভুত বা অপ্রত্যাশিত, কিন্তু কোনো বিষয় প্রত্যাশার বাইরে হওয়া এবং অসম্ভব হওয়ার মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। যদি কোনো অদ্ভুত সংবাদ নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছায়, তবে প্রায়ই তা বিশ্বাস করতে হয়। মারওয়ান...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২/১০৮, তাবা আর-রিসালাহ - হাফেজ যাহাবি “তারিখুল ইসলাম”-এ, হাফেজ ইবনে হাজার “আল-ইসাবাহ”-তে এবং হাফেজ ইবনে কাসির “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া”-তে ৬৫ হিজরির ঘটনার অধীনে হাকাম বিন আবিল আস সম্পর্কে যা লিখেছেন তাও দেখে নেওয়া উচিত।

[২] উসদুল গাবাহ: ২/২৮

[৩] মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাকাম বিন আবিল আস বিন বিশর সাকাফি যিনি ফারুকি যুগে বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি, তাঁর সাহচর্যও মতভেদপূর্ণ। (আল-ইসতিয়াব: ১/৩৫৮)

এই কাজটি একাধিক সহীহ সনদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। [১] এর সাথে সামান্য দুর্বল বর্ণনাগুলো যোগ করা হলে তা এত বেশি হয় যে, এই ঘটনাটি খবরে মশহুর-এর মর্যাদা লাভ করে। [২]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনো সংবাদের প্রমাণের জন্য যে উচ্চমান প্রয়োজন, তা এখানে বিদ্যমান। যদি এই মানের ভিত্তিতে প্রমাণিত কোনো ঘটনাকেও আমরা কেবল আমাদের মনে আসা যুক্তিনির্ভর কারণের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করি, তবে অন্যদেরও এই অধিকার থাকবে যে, যে বর্ণনা তাদের প্রত্যাশার বিপরীত মনে হবে তারা সেটিকে মিথ্যা বলে গণ্য করবে, যদিও তা সহীহ সনদের হয় এবং আমরা সেটির প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে অটল থাকি।

মারওয়ানের জন্য হযরত তালহা (রা.)-কে হত্যার প্ররোচনা ছিল এই যে, সাবায়ীরা হযরত তালহা (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী হিসেবে প্রচার করে দিয়েছিল। چنانچہ একটি বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করে তারা চিৎকার করে বলছিল: “তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ কোথায়? আমরা উসমানকে হত্যা করেছি।” [৩] মারওয়ান নিশ্চিতভাবেই এই প্রোপাগান্ডা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই দাবি ভিত্তিহীন যে, মারওয়ান সাবায়ীদের ধোঁকায় পড়তে পারত না। যখন মারওয়ান হযরত তালহা (রা.)-কে হত্যার সময় নিজেই এ কথা বলেছিল যে, এটি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ [৪], তখন এর চেয়ে বড় আর কী প্রমাণ হবে যে সে সাবায়ীদের প্রোপাগান্ডার শিকার হয়েছিল।

একইভাবে এ কথা বলা যে, প্রাণঘাতী হামলার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র অনুপযুক্ত স্থান ছিল অথবা এমন ধারণা করা যে মারওয়ানকে যদি এমনটি করতেই হতো তবে সে যুদ্ধের পর এর চেয়ে ভালো সুযোগ পেতে পারত, তা কেবল একটি অনুমান মাত্র। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী খোদ মারওয়ানেরও ধারণা ছিল যে, যুদ্ধের অবস্থার বিশৃঙ্খলার চেয়ে ভালো সুযোগ সে আর পাবে না। [৫]

এর দুটি কারণ ছিল: এক হলো, যুদ্ধকালীন হত্যার ওপর শরয়ী আদালত সাজা কার্যকর করে না। আক্রমণকারী সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার কারণে বিচার বিভাগীয়ভাবে এই মামলাটি খারিজ বলে গণ্য হয়। মারওয়ানের ফিকহী ও আইনি বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো জ্ঞান ছিল, তাই তীর নিক্ষেপ করার আগে সে বলেছিল: “আমি আজকের পর আর আমার প্রতিশোধ নিতে পারব না।” [৬]

[১] জঙ্গ জামালের দিন মারওয়ান ইবনুল হাকাম তালহাকে তীর নিক্ষেপ করেছিল। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭৭৭৪ সহীহ সনদে, ত. আর-রুশাদ) এবং কায়স ইবনে আবি হাযিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে দেখেছি যখন সে সেদিন তালহাকে তীর নিক্ষেপ করেছিল। (ইবনে সাদ, তাবারানি ও হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন। হাইসামি বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী; মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১৩৮২২, এবং ইবনে হাজার এর সনদকে সহীহ বলেছেন; আল-ইসাবাহ: ৩/৪৩২, ত. আল-ইলমিয়াহ)

[২] মুহাম্মাদ ইবনে যফর আল-হাফিয আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি হুসাইন ইবনে ইয়াহইয়া আল-মারওয়াযী থেকে, তিনি গালিব ইবনে হালবাস আল-কালবী আবুল হাইসাম থেকে, তিনি জুওয়াইরিয়াহ ইবনে আসমা থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন: মারওয়ান ইবনুল হাকাম তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে একটি তীর নিক্ষেপ করেন যা তার ঘোড়ার পার্শ্বদেশে বিদ্ধ হয়, ফলে ঘোড়াটি তাকে নিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকে যতক্ষণ না সে তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে যবেহ করে। তখন মারওয়ান তার সাথে থাকা আবান ইবনে উসমানের দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, আমি তোমার পিতার একজন হত্যাকারীর ব্যাপারে তোমাকে যথেষ্ট করেছি। (মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৫৫৯৩)। আমাদের নিকট তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি জুওয়াইরিয়াহ ইবনে আসমা থেকে শুনেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি তার চাচা থেকে যে, মারওয়ান তালহাকে একটি তীর নিক্ষেপ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। (তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ১৮১)। আবু আবদুর রহমান আল-কুরাশী থেকে বর্ণিত, তিনি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি কুররাহ ইবনে খালিদ থেকে, তিনি ইবনে সীরীন থেকে: তালহাকে একটি তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল যা তার কণ্ঠনালীর উপরিভাগে বিদ্ধ হয়। বর্ণনাকারী বলেন, মারওয়ান স্বীকার করেছেন যে তিনি তাকে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। (তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ১৮৫)। তাদের সকলেই নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, কুররাহ ইবনে খালিদ এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, তবে ইবনে সীরীন জঙ্গ জামালে উপস্থিত ছিলেন না কারণ তিনি ৩৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (আল-আলাম, যিরিকলী: ২/১৫৩, তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/১৯৩ ত. সাদির)

[৩] তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ কোথায়? আমরা ইবনে আফফানকে হত্যা করেছি। (তারিখ তাবারী: ৩/৪১৯, সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে)

[৪] জুওয়াইরিয়াহ ইবনে আসমা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি তার চাচা থেকে... মারওয়ান তালহাকে একটি তীর নিক্ষেপ করেন, তারপর আবান ইবনে উসমানের দিকে ফিরে তাকান এবং বলেন, আমি তোমার পিতার হত্যাকারীদের একজনের ব্যাপারে তোমাকে যথেষ্ট করেছি। (তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ১৮৫)

[৫] জারুদ ইবনে আবি সাবরাহ থেকে বর্ণিত, মারওয়ান ইবনুল হাকাম জঙ্গ জামালের দিন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আজকের পর আমি আর আমার প্রতিশোধ খুঁজব না। (তারিখ খলিফা, পৃ. ১৮১)

[৬] পূর্বোক্ত সূত্র অনুযায়ী।

দ্বিতীয়ত এই যে, যুদ্ধের সময় প্রত্যেকের মনোযোগ কেবল নিজের প্রতিপক্ষের দিকে থাকে; যদি কেউ দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে কাউকে লক্ষ্যবস্তু বানায়, তবে তা শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়। সুতরাং মারওয়ান সেই সময়টিকে প্রাণঘাতী হামলার জন্য সুযোগ এবং বিচারবিভাগীয় জবাবদিহিতার উর্ধ্বে মনে করছিল। আর মারওয়ানের কাছ থেকে কিসাস না নেওয়ার ভিত্তি এটাই ছিল যে, বিচারিক দিক থেকে এই মামলাটি অযোগ্য ছিল। ফলে অপরাধ সত্ত্বেও আদালতে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা চালানো হয়নি।

মারওয়ানের ভুলগুলোকে কি ইজতিহাদি বলা যেতে পারে?

প্রশ্ন: এটা কি বলা যায় না যে, মারওয়ান কর্তৃক হযরত তালহা (রা.)-কে হত্যা করা এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে ছিল? কারণ তিনি একজন ফকিহ এবং ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী ছিলেন?

উত্তর: মারওয়ান সম্পর্কে একটি মত এই যে, তিনি হযরত তালহা (রা.)-কে ব্যাখ্যার (তাউইল) ভিত্তিতে হত্যা করেছিলেন, যেমনটি হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) আল্লামা ইসমাইলির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু জমহুর (অধিকাংশ আলেম) থেকে এমনটি মোটেও বর্ণিত হয়নি; কারণ প্রতিটি তাউইল ইজতিহাদি হয় না। কখনো কখনো তাউইল কেবল ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে হয়। এমন পরিস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে অপরাধী সন্দেহের সুবিধা (benefit of doubt) পেয়ে যায় এবং সে অপরাধের বিচারিক শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পরনারীকে নিজের স্ত্রী মনে করে সহবাস করে, তবে তার ওপর যিনার হদ কার্যকর হবে না। কিন্তু এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে করা তাউইলকে ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য করা এবং এর কর্তাকে মুজতাহিদ বরং সওয়াবের অধিকারী মনে করা সঠিক নয়। এই কারণেই জমহুর ওলামায়ে কেরাম মারওয়ানের এই কাজগুলোর নিন্দা করেছেন এবং এই কারণেই তাঁদের বক্তব্যে মারওয়ানের নামের সাথে ‘রাহিমাহুল্লাহ’-এর মতো সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

এখানে এই বিষয়টিও মনে রাখা উচিত যে, ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজই ইজতিহাদি হওয়া জরুরি নয়, বরং তাঁর থেকেও ভুল বোঝাবুঝি এবং সন্দেহ-সংশয়ের ভিত্তিতে কোনো কাজ সংঘটিত হতে পারে। এমন ব্যক্তিত্ব যদি সম্মানিত এবং উচ্চমর্যাদার অধিকারী হন, তবে তাঁর কাজকে টেনেহিঁচড়ে শরয়ি দলিলের আওতায় আনার পরিবর্তে এটা বলা বেশি সমীচীন যে, এই কাজটি সদিচ্ছার সাথে ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে করা হয়েছে। সুতরাং যদি তাঁর দ্বারা نصوص (নসুস)-এর পরিপন্থী কোনো কাজ সংঘটিত হয়, তবে তাকে ইজতিহাদ নয় বরং গুনাহ ও নাফরমানিই বলা হবে। এটি ভিন্ন কথা যে, কেবল গুনাহ করার কারণে কোনো সুপরিচিত নেককার ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবে ফাসেক বা অন্যায়্য বলা যায় না, যতক্ষণ না গুনাহের ওপর অটল থাকা বা আলেমদের পক্ষ থেকে তাঁর ফাসেক হওয়া প্রমাণিত হয়। মারওয়ানের হাতে হযরত তালহা (রা.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, তিনি হয়তো সাবায়ি ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমনটি করেছিলেন, কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি বা সদিচ্ছার কারণে করা কোনো ভুল কাজ জায়েজ হয়ে যায় না। একইভাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে মারওয়ানের যুদ্ধও শরয়ি দলিলের আলোকে নিশ্চিতভাবে বিদ্রোহ ছিল। যদিও প্রত্যেক যুদ্ধবাজের মতো মারওয়ানের কাছেও তাঁর অভিযানের কারণ ও ব্যাখ্যা ছিল, কিন্তু তাকে ইজতিহাদের গণ্ডিতে আনা কঠিন। এতে গোঁড়ামি এবং একগুঁয়েমির উপাদান বেশি স্পষ্ট দেখা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

যদি মারওয়ান খারাপ লোক হয়ে থাকে, তবে তার বর্ণনা সহীহ বুখারী ও মুয়াত্তায় কেন আছে?

•

প্রশ্ন: যদি মারওয়ানের চরিত্র ভালো না হয়ে থাকে, তবে ইমাম মালিক (রহ.) এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতো সতর্ক মুহাদ্দিসগণ তার থেকে কেন বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যারা সামান্য ফাসিকের থেকেও বর্ণনা নিতেন না?

•

উত্তর: এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার উত্তর বোঝা উসূলে হাদীসের (হাদীসের মূলনীতি) জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। তবে আমরা এটি সহজবোধ্য করার জন্য কিছু ভূমিকা পেশ করতে চাই। এগুলো বুঝে নিলে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. যেকোনো রাবীর (বর্ণনাকারী) মর্যাদা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ এবং জারহ ও তা’দীল (সমালোচনা ও প্রশংসা) বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা বা না করার বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে। এটি জরুরি নয় যে, প্রতিটি সহীহ বর্ণনা প্রত্যেক মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে সহীহ হবে। এমন অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যা একজন মুহাদ্দিস বা ফকীহ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন বা তা থেকে দলিল পেশ করেছেন, কিন্তু অন্য মুহাদ্দিস বা ফকীহ সেগুলোকে সেই মর্যাদা দেননি এবং সেগুলো থেকে দলিল গ্রহণ করেননি।

২. ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতো হাদীস শাস্ত্রের দিকপালদের কোনো রাবী থেকে বর্ণনা করতে দেখলে সাধারণত এই বিশ্বাস জন্মে যে, সেই রাবী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু যদি এমন কোনো রাবী সম্পর্কে জারহ ও তা’দীলের ইমামদের একটি পুরো জামাতের মতামত নেতিবাচক হয়, তবে সেখানে সেই মতামতগুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা ইনসাফ হবে না। বড়জোর এটি বলা যেতে পারে যে, সেই রাবীর ওই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য যা ইমাম বুখারী বা ইমাম মুসলিম খুব যাচাই-বাছাই করে (কিছু শর্ত বা কিছু বিশেষ বিবেচনায়) গ্রহণ করেছেন; কিন্তু সেই রাবীর বর্ণনা অন্য কোথাও পাওয়া গেলে তা অবশ্যই পর্যালোচনার দাবি রাখবে; কারণ রাবীর ওপর যথেষ্ট জারহ (সমালোচনা) হয়েছে। [১]

৩. একইভাবে এটিও মনে রাখা উচিত যে, খোদ সহীহ বুখারীর নিজস্ব বর্ণনাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করলে দেখা যায়, সমস্ত বর্ণনার সহীহ হওয়ার মান হুবহু এক নয়; বরং রাবীদের পার্থক্যের কারণে সেগুলোর মধ্যেও মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। কিছু বর্ণনা সহীহ হওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে, কিছু মধ্যম এবং কিছু সাধারণ স্তরে। সহীহ মুসলিম এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৪. হাদীসের কিতাবগুলোতে প্রথম যুগের সত্যবাদী (সাদুক) শিয়া রাবী এবং সত্যবাদী নাসিবী রাবীদের বর্ণনাও গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং তাদের ওপর বিদআতের হুকুম আসত। কিন্তু যেহেতু সেই যুগে সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর প্রচলন ব্যাপক ছিল, তাই তাদেরকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) মনে করা হতো এবং তাদের বর্ণনা গ্রহণ করা হতো। [২]

[১] এই কারণেই আমাদের মখদুম মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী (রহ.) তার দরসে প্রায়ই বলতেন যে, সহীহ বুখারীকে “আসাহুল কুতুব বা’দা কিতাবিল্লাহ” (আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব) বলার অর্থ এই নয় যে, এর প্রতিটি বর্ণনা সহীহ হওয়ার এমন সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে যে অন্য কোনো হাদীসের কিতাবের কোনো বর্ণনা সহীহ হওয়ার সেই স্তরে নেই; বরং বিরোধের সময় প্রতিটি বর্ণনার পূর্ণ সনদ এবং সমস্ত রিজাল (বর্ণনাকারী) তুলনা করে ফয়সালা করা যেতে পারে যে, কোথায় সহীহ বুখারীর বর্ণনা অগ্রগণ্য আর কোথায় অন্য কোনো বর্ণনা।

[২] কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

১. আব্দুল্লাহ বিন শাকীক আল-উকাইলী (মৃ. ১০৮ হি.) সিকাহ, তার মধ্যে নাসব (আলী রা.-এর প্রতি বিদ্বেষ) ছিল। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৩৩৩৭)
 ২. উমার বিন যাব্বান আল-বুরহামী (মৃ. ১১০ হি.) সালিল্ল হাদীস, ইবনে মাঈন বলেন: আমরা মনে করি তিনি আলী (রা.)-কে গালি দিতেন। (তারীখুল ইসলাম: ৭/২৩১, ৩৩০)
 ৩. হারীয বিন উসমান (মৃ. ১৬৩ হি.) তিনি আমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য ছিলেন কিন্তু তিনি বিদআতী ছিলেন... তিনি আলী (রা.)-এর সমালোচনা করতেন। (মীযানুল ইতিদাল: ১/৪৬৭)
 ৪. আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আবু কিলাবা আল-বসরী (মৃ. ১০৪ হি.) সিকাহ, ফাযিল, কাসীরুল ইরসাল, আল-ইজলী বলেন: তার মধ্যে সামান্য নাসব ছিল। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৩৩৩৩)
 ৫. আযহার বিন আব্দুল্লাহ আল-হরাযী (মৃ. ১২০ হি.) তাবিঈ, হাসানুল হাদীস কিন্তু তিনি নাসিবী ছিলেন, আলী (রা.)-এর সমালোচনা করতেন। (মীযানুল ইতিদাল: ১/১৭৩)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

সহীহ বুখারীতেও এমন বর্ণনাকারীদের বর্ণনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এতে শিয়া বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বিন মুসা আল-আবসীর ৪৩টি বর্ণনা রয়েছে। উবায়দুল্লাহ বিন মুসার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত, কিন্তু একদল ইমাম তাঁর ওপর কঠোর জরাহ করেছেন। [১]

এখন যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) শেষ পর্যন্ত এমন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা কেন নিলেন? আর যদি নিয়েছেনই, তবে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে শিয়া হওয়ার অভিযোগ কেন মেনে নেওয়া হবে?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জানা ছিল না যে অন্যান্য জরাহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞ ইমামগণ উবায়দুল্লাহ বিন মুসার ওপর শিয়া হওয়ার অভিযোগ এনেছেন। শেষ পর্যন্ত ইমাম বুখারী (রহ.)-ও একজন মানুষ ছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রেও অবস্থা সম্পর্কে জানার বিষয়ে ভুল হতে পারে।

এই উত্তর সম্ভাবনার গণ্ডিতে তো আছে, কিন্তু এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে, জরাহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞ ইমামগণ যা জানতেন, তা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতো সমালোচকের কাছে কীভাবে গোপন থাকল।

এর দ্বিতীয় উত্তর এটি হতে পারে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) উবায়দুল্লাহ বিন মুসা সম্পর্কে জরাহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞ ইমামদের মতামত ভালোভাবে জানতেন, কিন্তু সেই অভিযোগগুলো সম্বলিত মতামতগুলোকে তিনি ভুল মনে করতেন। তাঁর নিকট অন্যান্য ইমামগণ উবায়দুল্লাহ বিন মুসা সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন।

এই উত্তর যুক্তি ও অনুমানের ভিত্তিতে সঠিক হতে পারে; কারণ কোনো বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকতে পারে।

কিন্তু এই উত্তর থেকে এটি সাব্যস্ত করে নেওয়া যে, প্রকৃতপক্ষে একা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতই সঠিক ছিল এবং জরাহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞ ইমামদের পুরো জামাত একটি ভুল বিষয়ে একমত হয়েছিল, এটি পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছুই হবে না, যদি না এর সপক্ষে কোনো প্রকাশ্য দলিল থাকে।

[১] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা নিতেন, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিদআতের কারণে তাঁকে অপছন্দ করতেন। (وحدث عنه احمد بن حنبل قليلاً)।
 كان يكرهه لبدعته - সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫৫৩)

তিনি আরও বলেন: “তিনি অনেক মন্দ হাদিস বর্ণনা করেছেন।” (حدث باحاديث سوء) - সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫৫৬) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা নেওয়া জায়েজ মনে করতেন, তবে বলেন: “তিনি কউর শিয়া ছিলেন।” (كان شيعياً محترفاً جاز حديثه) - সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫৫৫) হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন: “তিনি শাইখাইন-কে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না বরং হযরত আলী (রা.)-কে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন অর্থাৎ তিনি কউর শিয়া ছিলেন।” (ورواية)

عبد الله مثل هذا دال على تقديمه للشيخين ولكنه ينال من خصوم على - সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫৫৬)

হাফেজ যাহাবী (রহ.) আরও বলেন: “তিনি (শাইখুল ক্বারা ইমাম) হামজা (রহ.)-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর আখলাক গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইমাম হামজা (রহ.)-এর শহরবাসীদের থেকে যা পেয়েছেন তা হলো বিদআত ও কঠোরতা।” (فانه اخذه عن اهل بلده) - سيارو آلامين نوبالا: ٩/٥٥٥) انغمس على البدعة

ইবনে মান্দাহ (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী উবায়দুল্লাহ বিন মুসার গোঁড়ামি এই পর্যায়ে ছিল যে, তিনি কোনো সুন্নি ব্যক্তিকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে দিতেন না। (لم يدع احداً اسمه معاوية يدخل داره) (سيارو آلامين نوبالا: ٩/٥٥٩)

এই সব বলার উদ্দেশ্য নাউযুবিল্লাহ সহীহ বুখারীর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা নয়, বরং এটি স্পষ্ট করা যে সহীহ বুখারীর বর্ণনা এবং এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম বুখারী যে বর্ণনাগুলো ইমাম হুমাইদী, ইমাম মুসাদ্দাদ বা মুহাম্মদ বিন মুসান্না প্রমুখের কাছ থেকে শুনেছেন, সেগুলোর মর্যাদা উবায়দুল্লাহ বিন মুসার কাছ থেকে শোনা বর্ণনার চেয়ে অবশ্যই বেশি হবে; কারণ উবায়দুল্লাহ বিন মুসার নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।

গুরুত্বপূর্ণ নোট: বর্ণনাকারীদের মাসআলা বোঝার জন্য উদাহরণস্বরূপ শিয়া বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যিনি তলোয়ার হাতে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া বীরদের মতো ছিলেন, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ জরাহ ও তাদীল বিশেষজ্ঞ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল: ৪/১২৭) যা অন্য কারো জন্য নাও হতে পারে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের পরিষ্কার এবং নীতিগত উত্তর হলো, ইমাম বুখারী রহ. উবাইদুল্লাহ বিন মুসার অবস্থা সম্পর্কে জানতেন। অন্যান্য ইমামগণ তাঁর তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ) সম্পর্কে যা বলেছেন, তাও নিজ স্থানে সঠিক। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর থেকে বর্ণনা কেবল এই জন্য গ্রহণ করেছেন যে, তিনি তাশাইয়ু-এর ক্ষেত্রে চরমপন্থী ছিলেন না এবং বর্ণনা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সতর্ক ও সত্যবাদী হিসেবে গণ্য হতেন।

এই পাঁচটি ভূমিকার পর এই রহস্য নীতিগতভাবে সমাধান হয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম মালিক রহ. কেন মারওয়ান থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, অথচ মারওয়ানের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে?

এখানেও এ কথা বলা দুর্বল হবে যে, ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম মালিক রহ.-এর মতে মারওয়ান এই জন্য নির্ভরযোগ্য ছিলেন যে, এই মহান ব্যক্তিদের কাছে মারওয়ানের প্রতি আরোপিত অভিযোগের বর্ণনাগুলো পৌঁছায়নি। এ কথা বলাও কোনো গুরুত্ব রাখে না যে, সম্ভবত তাঁরা এই বর্ণনাগুলোতে কিছু ভুল অনুভব করেছিলেন, যার ভিত্তিতে তাঁরা এই বর্ণনাগুলোকে সহীহ হওয়ার স্তরে স্বীকার করেননি এবং তাঁদের নিকট মারওয়ানের ওপর আরোপিত অভিযোগগুলো যেমন: হযরত তালহা রা.-এর হত্যাকারী হওয়া এবং হযরত আলী রা.-কে গালি দেওয়া প্রমাণিত ছিল না। [১]

তবে এই দুটির তুলনায় অধিক যুক্তিযুক্ত উত্তর এটাই হবে যে, ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম মালিক রহ. মারওয়ানের অবস্থা সম্পর্কে জানতেন, তাঁর ভুল কাজগুলো সম্পর্কেও ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা মারওয়ান থেকে বর্ণনা কেবল এই জন্য গ্রহণ করেছেন যে, তিনি বর্ণনা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সতর্ক ও সত্যবাদী হিসেবে গণ্য হতেন এবং নসিহতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতেন না।

একই কথা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত সেই অন্যান্য নাসিবী এবং শিয়া বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, যাদের সম্পর্কে জারহ ও তা’দীল-এর ইমামগণ ‘ইউসাবু আলিয়ান’ বা ‘ইউনালু মিন মুয়াবিয়া’-এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। নিশ্চিতভাবেই এর দ্বারা উদ্দেশ্য গালিগালাজ নয় বরং সমালোচনা এবং অবস্থানের ওপর আপত্তি করা। অন্যথায় গালিগালাজ করা এবং অশ্লীল কথা বলা তো যেকোনো সাধারণ মুমিনের ব্যাপারেও ফাসেকী। যেমনটি সহীহ হাদীসে রয়েছে: “মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী।” [২]

[১] এটি মনে রাখা উচিত যে, হাফেজ ইবনে কাসীর মারওয়ান কর্তৃক হযরত তালহাকে হত্যা করার বর্ণনাকে ‘খবরে মশহুর’ (বিখ্যাত সংবাদ) তো বলেছেন, কিন্তু এর সাথে ‘আকরাব’ (অধিক নিকটবর্তী) একেই বলেছেন যে, হযরত তালহা কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তির ছোড়া তীরে শহীদ হয়েছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৪৭)

অন্যদিকে হাফেজ যাহাবী এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যারা ইবনে হাজমের মতো মারওয়ানকে হযরত তালহার হত্যাকারী মনে করার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ পোষণ করতেন না। আর এই কারণেই জমহুর মুহাদ্দিসগণ মারওয়ান থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী মারওয়ানের ব্যাপারে ইবনে হিব্বানের উক্তি উদ্ধৃত করেন: “আল্লাহ মারওয়ান বিন হাকাম থেকে পানাহ দিন, যার কিতাবসমূহে কোনো দলিল নেই।”

ইবনে হিব্বান: মা’আযাল্লাহ! আন নাহুতাজ্জা বি-মারওয়ান বিন আল-হাকাম ফী শাইয়িন ফী কুতুবিনা। (আওজায়ুল মাসালিক: ১/৩৮৩, ত ত দারুল কলম দামেস্ক) ইবনে হিব্বান মারওয়ানের বর্ণনাকে ‘না-কাবিলে ইস্তিদলাল’ (দলিল হিসেবে অযোগ্য) বলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কিছু উত্তরের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ মারওয়ানের বর্ণনাগুলো যদিও বর্ণনা করা হয় কিন্তু তা হুজ্জাত বা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণেই কিছু বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে: “মারওয়ানের বর্ণনা হালাল ও হারামের মাসআলাসমূহে নেওয়া হয়নি।” কেউ কেউ বলেছেন যে, মুয়াত্তা ইমাম মালিক এবং সহীহ বুখারীতে মারওয়ানের বর্ণিত বর্ণনাগুলো ‘তা’আমুল-এ আহলে মদীনা’ (মদীনাবাসীদের আমল) বর্ণনা করার জন্য, না কি মূলত মারওয়ানের বর্ণনার মাধ্যমে দলিল পেশ করার জন্য। কেউ কেউ বলেছেন যে, মারওয়ানের বর্ণনাগুলোকে মুয়াইয়্যিদাত (সমর্থনকারী) হিসেবে পেশ করা হয়েছে যার মূল দলিল অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। মারওয়ানের বর্ণনার মর্যাদা কেবল তাবি’ (অনুসরণকারী) হিসেবে, যা দুর্বল বর্ণনা থেকেও নেওয়া হয়ে থাকে।

[২] কিতালুল মুসলিম আখাছ কুফরুন ওয়া সিাবুহু ফুসুকুন (সুনানে তিরমিযী, হা: ২৬৩৪, আবওয়াবুল ঈমান)

মারওয়ানের হযরত আলী [রা.] -এর প্রতি গালিগালাজ ও নিন্দা করা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তবে এই ধরনের ত্রুটির সাথে জড়িত বলে বিবেচিত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মতো মারওয়ানের ব্যাপারেও এটাই যুক্তিযুক্ত যে, তার “সাব্ব ও শাতম” (গালিগালাজ ও নিন্দা) অশ্লীল গালিগালাজ ছিল না বরং তা ছিল রাজনৈতিক সমালোচনা।

সুতরাং এই আলোচনার মাধ্যমে এই বিভ্রান্তিও দূর হয়ে যায় যে, কেন মুহাদিসগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর কিছু শিয়া এবং কিছু নাসিবীর বর্ণনা গ্রহণ করতেন। কারণটি স্পষ্ট যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যাত এবং গোঁড়ামির ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি ছিল না এবং সত্যবাদিতা ছিল সাধারণ বিষয়। এই কারণে মুহাদিসগণ এর অবকাশ আছে বলে মনে করতেন। হাফেজ যাহাবী [রহ.] লিখেছেন:

“আমি জানি না যে সেই যুগে এমন কোনো শিয়া ছিল যে হযরত মুয়াবিয়া [রা.] বা তাঁর জামাতকে কাফের বলত, আর না এমন কোনো নাসিবী ছিল যে হযরত আলী [রা.] এবং তাঁর জামাতকে কাফের বলত; বরং তারা কেবল সমালোচনা করত এবং অসন্তুষ্টি পোষণ করত। কিন্তু আজ আমাদের যুগের শিয়ারা অজ্ঞতা ও শত্রুতার কারণে সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলে, তাঁদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয় এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.] পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন।” [১]

মারওয়ানের বর্ণিত হাদিসসমূহ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজারের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য:

হাফেজ ইবনে হাজার [রহ.] এই জটিল বিষয়ের ওপর চমৎকার আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন:

“মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া, উসমান ইবনে আফফানের চাচাতো ভাই; বলা হয় যে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যদি এই কথাটি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে যারা তার (মারওয়ান) সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে না। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের [রহ.] -এর বক্তব্য হলো, হাদিসের ক্ষেত্রে মারওয়ানকে সন্দেহভাজন মনে করা যায় না। মারওয়ানের সত্যবাদিতার ওপর আস্তা রেখে সাহাবী সাহল বিন সাদ সাঈদীও তাঁর থেকে বর্ণনা নকল করেছেন। আলেমগণ মারওয়ানের ওপর এই কারণে সমালোচনা করেছেন যে, তিনি জঙ্গ জামালে (জামাল যুদ্ধে) হযরত তালহা [রা.] -কে তীর মেরে হত্যা করেছিলেন। এরপর তিনি খেলাফতের আকাঙ্ক্ষায় তলোয়ার ধারণ করেন, এমনকি যা হওয়ার তা-ই হলো। যেখানে হযরত তালহা [রা.] -কে হত্যার প্রসঙ্গ আসে, মারওয়ান তা ব্যাখ্যার (তাবিল) ভিত্তিতে করেছিলেন যেমনটি ইসমাইলি এবং অন্যান্যরা বলেছেন। আর এর পরের বিষয়ের ক্ষেত্রে সাহল বিন সাদ, উরওয়াহ, আলী বিন হুসাইন এবং আবু বকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারিসের মতো ব্যক্তির তাঁর থেকে বর্ণনা নকল করতে থাকেন। এরা সেই সব লোক যাদের মাধ্যমে মারওয়ানের বর্ণনা ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন; কারণ মারওয়ান তখন মদিনায় তাঁদের আমির ছিলেন এবং এটি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে তাঁর বিরোধ প্রকাশ পাওয়ার আগের কথা। আল্লাহই ভালো জানেন। ইমাম মালিক এবং অন্যরা তাঁর হাদিস ও মতামতের ওপর আস্তা রেখেছেন, ইমাম মুসলিম ব্যতীত।” [২]

[১] ফাতহুল বারী: ১/৪৩৩

[২] আমি সেই যুগে এমন কোনো শিয়া সম্পর্কে জানি না যে মুয়াবিয়া ও তাঁর দলকে কাফের বলত, আর না এমন কোনো নাসিবী সম্পর্কে জানি না যে আলী ও তাঁর দলকে কাফের বলত; বরং তারা গালিগালাজ ও বিদ্বেষে লিপ্ত ছিল। অতঃপর আমাদের যুগের শিয়ারা অজ্ঞতা ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলে এবং তাঁদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয় এবং সিদ্দীক (আবু বকর) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩৭৫)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা:

হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর এই বক্তব্যটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এর ব্যাখ্যা হলো:

১. হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) এখানে এই আপত্তির জবাব দিচ্ছেন যে, যখন মারওয়ানের অতীত আপত্তিজনক ছিল, তখন সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে তার থেকে বর্ণনা কীভাবে গ্রহণ করা হলো? হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) এর একটি জবাব এই দিয়েছেন যে, কিছু ব্যক্তির মতে তিনি দিদার (রাসূলের দর্শন) লাভ করেছিলেন, তাই সেই সব লোক তাকে সাহাবী মনে করে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে থাকবেন; আর সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতার পর তাদের বক্তব্যের ব্যাপারে কোনো আপত্তির অবকাশ থাকে না, তাদের অবস্থা যাই হোক না কেন। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) “যদি এই মতটি প্রমাণিত হয়” বলে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তার মতে সাহাবী হওয়াও প্রমাণিত ছিল না। কেবল এর একটি সম্ভাবনা ছিল।

২. দ্বিতীয় জবাব এই দিয়েছেন যে, মারওয়ানের অতীত যেমনই হোক না কেন, উরওয়াহ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর মতো মহান ইমামগণ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন, তাই মুহাদিসগণ তাদের নির্ভরযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে মারওয়ান থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

৩. তৃতীয় জবাবের দিকে এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মারওয়ান এক সময় মদীনার আমীর ছিলেন (এবং তিনি শাসক ও বিচারকের মর্যাদাও রাখতেন)। সেই সময়ে মদীনার উলামায়ে কেরাম কোনো বিরোধিতা ছাড়াই তার দেওয়া ফয়সালাগুলো কার্যকর করেছিলেন এবং সেই ফয়সালাগুলো মদীনার আমল (প্রথা)-এর মর্যাদা লাভ করেছিল, তাই মুহাদিসগণ সেগুলোকে ফতোয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এর পাশাপাশি হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মারওয়ান থেকে এই বর্ণনাগুলো সেই সময়ে নেওয়া হয়েছিল যখন তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে জবরদখলমূলক যুদ্ধ শুরু করেননি। পরবর্তীতে তিনি যে ভুল কাজগুলো করেছেন তার কারণে তার থেকে পূর্বে নেওয়া বর্ণনাগুলোর ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। এটি এমন যে, কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদিসের শেষ বয়সে যদি স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার পরের বর্ণনাগুলো সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু তার আগে তার থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো সব অবস্থাতেই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয়।

এটিও বলা হয়েছে যে, কিছু আলেম মারওয়ানের ভুল কাজগুলোর ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) করেছেন, তাই তারা তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

সবশেষে হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, মারওয়ানের নির্ভরযোগ্যতা সর্বসম্মত নয়, বরং ইমাম মুসলিমের মতো ব্যক্তির তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না এবং তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেন না। ইমাম মুসলিমের সতর্কতার কারণ মারওয়ানের ‘কর্মকাণ্ড’ হতে পারে [১]।

মারওয়ান সম্পর্কে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদিস দেহলভী (রহ.)-এর অভিমত:

হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর বক্তব্যের পর সবশেষে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদিস দেহলভী (রহ.)-এর একটি বক্তব্যের ওপর নজর দিন। ইমাম বুখারী কর্তৃক মারওয়ান থেকে বর্ণনা গ্রহণের যে যৌক্তিকতা তিনি পেশ করেছেন, তা সবচেয়ে বেশি ওজনদার মনে হয় এবং এর...

[১] এটি ইবনে হিব্বানের অভিমত যে মারওয়ানের বর্ণনা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। - (আওজাযুল মাসালিক, শায়খুল মুহাদিস মুহাম্মদ জাকারিয়া আল-মুহাজির আল-মাদানি, ১/৫৮৩, দারুল কলম দামেস্ক)

এর পরে কোনো প্রকারের কোনো সংশয় একেবারেই অবশিষ্ট থাকে না। হযরত শাহ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“হ্যাঁ! বুখারীতে মারওয়ান থেকে অবশ্যই বর্ণনা এসেছে, যদিও সে নাওয়াসিবদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বরং সে এই দুর্ভাগা দলের সর্দার ও প্রধান ছিল। কিন্তু এই বর্ণনায়ও ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বর্ণনার ভিত্তি ইমাম জয়নুল আবেদীন রহমতুল্লাহি আলাইহির ওপর রেখেছেন এবং তাঁর ওপরই বর্ণনা শেষ করেছেন। যদি ইমাম নিজেই মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তবে ইমাম বুখারীর তা থেকে বেঁচে থাকার এবং বিরত থাকার অধিকার কখন থাকে? তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী কোনো স্থানেই একা মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেননি বরং মিসওয়ার বিন মাখরামা বা অন্যদেরকে তার সাথে এনেছেন। আর এই কথা আমরা আগেই লিখেছি যে, যদি কোনো মুনাফিক বা বিদআতী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আহলে হকের সাথে একমত হয়, তবে তার বর্ণনা গ্রহণে কোনো দোষ নেই। আর বুখারীতে তার মাত্র দুটি বর্ণনা রয়েছে: একটি হুদায়বিয়ার ঘটনায়, দ্বিতীয়টি তায়েফ ও বনী সাকীফ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে, আর এই উভয় স্থানই আকিদা ও আমল সংক্রান্ত নয়। একইভাবে সিহাহ-এর অন্যান্য কিতাবেও মারওয়ান থেকে এই ধরনের এবং এই পরিমাণই বর্ণনা রয়েছে। [১]”

শাহ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির এই মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা এই আলোচনার সমাপ্তি টানছি। পাঠকরা এই পরিমাণ স্পষ্টীকরণের পর ভালোভাবে চিন্তা করতে পারেন যে, মারওয়ান সম্পর্কে কী ধারণা রাখা উচিত এবং ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি কোন সীমার মধ্যে থেকে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

[১] তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া, উর্দু পৃষ্ঠা ১৩৯, ১৪০, মুদ্রিত দারুল ইশাআত করাচি।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শেষ কিছু কথা

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তারিখে উম্মতে মুসলিমার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে এখন পর্যন্ত লেখকের পূর্ণ চেষ্টা ছিল যে, ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আপনাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উম্মতের ইজমাস্ট অবস্থানের যথাযথ প্রতিরক্ষা হয়। যেহেতু পারস্পরিক বিবাদ ইতিহাসের একটি অংশ, তাই অনিবার্যভাবে সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরপর এই প্রসঙ্গে আসা সাধারণ ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগত ও ফিকহি দিকগুলোও স্পষ্ট করতে হয়েছে। এরপর বিশেষ সংশয় নিরসনের জন্য এই শেষ অধ্যায়টি আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে, ইতিহাসের প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে যে আপত্তি ও সংশয়গুলো উত্থাপিত হয় তা যেন দূর হয়ে যায়।

তবুও এই দাবি করা যায় না যে এই চেষ্টা সফল হয়েছে। এটা সম্ভব যে কিছু ব্যক্তির সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। আবার এটাও সম্ভব যে কিছু মানুষের মনে কিছু সংশয় এমনভাবে গেঁথে আছে যা কোনোভাবেই দূর না-ও হতে পারে। এরও সম্ভাবনা আছে যে কোনো ব্যক্তি কোনো কথার কারণে নতুন কোনো সংশয়ে নিপতিত হয়েছেন। তবুও তারা চান যে এমন কোনো মৌলিক কথা আসুক যা তাদের মনকে আশ্বস্ত করে।

এমন বন্ধুদের খেদমতে লেখক হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব (রহ.)-এর কিতাব ‘মাকামে সাহাবা’ থেকে কিছু নির্বাচিত পঙক্তি পেশ করছেন। আশা করা যায় যে সব ধরনের জটিলতার জন্য এই শব্দগুলো নিরাময়কারী হিসেবে প্রমাণিত হবে।

হযরত আল্লামা লিখেছেন:

“সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ইজমা ও ঐক্যমত রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক বিবাদসমূহে লিপ্ত না হওয়া বা নীরবতা অবলম্বন করা অথবা তাদের শানে এমন কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকা যার দ্বারা তাদের কারো অবমাননা হয়, এর ওপরও সকলের ঐক্যমত রয়েছে। একইভাবে তাদের সকলের ব্যাপারে এই ঐক্যমতও রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম আশ্বিয়ায়ে কেরামের মতো মাসুম নন। তাদের দ্বারা ভুল ও গুনাহ সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছেও, যাদের ওপর রাসূলুল্লাহ (সা.) দণ্ডবিধি ও শাস্তি কার্যকর করেছেন। হাদীসে নববীতে এই সব ঘটনা অনস্বীকার্য।” [১]

[১] একইভাবে অনেক ঘটনা ইতিহাসেও রয়েছে। হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত অনেক ঘটনা সনদ দুর্বল ও সন্দেহজনক হওয়ার কারণে অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে ইতিহাসে বর্ণিত অনেক ঘটনা সনদহীন। দুর্বল বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে, তবে সহীহ বর্ণনাগুলোকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং সেগুলোর ব্যাপারে হযরত মুফতি সাহেব (রহ.)-এর পেশকৃত এই পয়েন্টগুলো সর্বদা নজরে রাখা উচিত। আশা করা যায় যে, এই পয়েন্টগুলো কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্য দিয়ে পথ চলার মতো কাজ করবে। ইনশাআল্লাহ, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কোনো বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না এবং কোনো মুহাদ্দিস, সীরাত লেখক বা ঐতিহাসিকের ঈমানকে সন্দেহ করার ভুলও হবে না।

তবে তা সত্ত্বেও উম্মতের সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় সাহাবায়ে কেরাম **رضوان الله عليهم** কয়েক কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী:

- ১. নবী আকরাম **ﷺ**-এর সাহচর্যের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এমন বানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শরীয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ বা গুনাহ তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া ছিল অত্যন্ত বিরল। তাঁদের নেক আমলসমূহ—নবী আকরাম **ﷺ** ও ইসলাম ধর্মের জন্য নিজেদের জান ও মাল বাজি রাখা, সবকিছু উৎসর্গ করা এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির অনুসরণকে জীবনের ব্রত বানানো এবং এর জন্য এমন কঠোর সাধনা করা যার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পাওয়া যায় না—তাঁদের এই অসংখ্য নেক আমল এবং ফযীলত ও কামালাতের তুলনায় সারা জীবনে কোনো গুনাহ হয়ে যাওয়াটা তা নিজেই বিলুপ্ত করে দেয়।
- ২. আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল **ﷺ**-এর প্রতি ভালোবাসা ও মহত্ত্ব এবং সামান্য গুনাহ হয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের ভয় ও ভীতি এবং তৎক্ষণাৎ তওবা করা, বরং নিজেকে শাস্তি প্রদানের জন্য পেশ করা এবং এর ওপর জেদ করা হাদীসের বর্ণনাগুলোতে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী তওবা করার মাধ্যমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং এমন হয়ে যায় যেন কখনো গুনাহ করাই হয়নি।
- ৩. কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের নেক আমলসমূহও তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।
- ৪. দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের সাহায্যের জন্য নবী আকরাম **ﷺ**-এর সাথে চরম অভাব-অনটন ও কষ্ট-পরিশ্রমের সাথে এমন সব যুদ্ধ জয় করা যার দৃষ্টান্ত বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে নেই।
- ৫. এই মহান ব্যক্তিদের রাসূল **ﷺ** ও উম্মতের মধ্যে মাধ্যম ও যোগসূত্র হওয়া যে, অবশিষ্ট উম্মতের কাছে কুরআন ও হাদীস এবং দ্বীনের সমস্ত শিক্ষা এই মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমেই পৌঁছেছে। তাঁদের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি থাকত, তবে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের হেফাজত এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় তা প্রচারের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা নবী করীম **ﷺ**-এর সাহচর্যের বরকতে তাঁদের চরিত্র ও অভ্যাস এবং তাঁদের প্রতিটি নড়াচড়া ও স্থিতি দ্বীনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। প্রথমত তাঁদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিতই হতো না। আর যদি সারা জীবনে কখনো কদাচিৎ কোনো গুনাহ হয়ে যেত, তবে তৎক্ষণাৎ তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে এবং দ্বীনের ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করে তার কাফফারা আদায় করা তাঁদের মধ্যে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।
- ৬. আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের মাধ্যম ও যোগসূত্র বানিয়েছেন, তাই তাঁদেরকে এই বিশেষ সম্মানও দান করেছেন যে, এই দুনিয়াতেই এই সকল মহান ব্যক্তিদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা ও মার্জনা এবং নিজের সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা কুরআনে নাযিল করেছেন।
- ৭. নবী আকরাম **ﷺ** উম্মতকে হেদায়েত দিয়েছেন যে, এই সকল মহান ব্যক্তিদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ঈমানের আলামত এবং তাঁদের অবমাননা ও তুচ্ছজ্ঞান করা ঈমানের জন্য বিপদ এবং রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-কে কষ্ট দেওয়ার কারণ।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

৮. তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক মতপার্থক্য এবং যুদ্ধের উপক্রম হয়েছিল, সেই বিবাদগুলোতে যদিও এক পক্ষ ভুলের ওপর ছিল এবং অন্য পক্ষ হকের ওপর। আর উম্মতের আলেমদের ইজমা এই বিবাদগুলোতে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহ-এর হকের ওপর থাকা এবং তাঁর বিপরীতে যুদ্ধকারীদের ভুলের ওপর থাকাকে পূর্ণ স্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার সাথে বর্ণনা করে দিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে কুরআন ও সুন্নাহর উল্লিখিত দলীলসমূহের ভিত্তিতে এ বিষয়েও সকলের ইজমা হয়েছে যে, যে পক্ষ ভুলের ওপর ছিল তাদের ভুলটিও মূলত ইজতিহাদী ছিল যা গুনাহ নয়, বরং এর ওপর একটি সওয়াব পাওয়ার প্রতিশ্রুতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি হত্যা ও যুদ্ধের হাস্লামায় কারো পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিচ্যুতি বা গুনাহ হয়েও থাকে, তবে তারা তার ওপর লজ্জিত হয়েছেন এবং তওবা করেছেন, যেমনটি অধিকাংশ মহান ব্যক্তিদের থেকে এমন কথা বর্ণিত আছে। বিশেষ করে যখন কুরআন কারীম তাদের প্রশংসা ও গুণগান এবং তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট হওয়ার ঘোষণাও দিয়ে দিয়েছেন, যা ক্ষমা ও মার্জনা থেকেও উচ্চতর মর্যাদা।

৯. যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এটিও মেনে নেওয়া হয় যে, তা কেবল ইজতিহাদী ভুলই নয় বরং প্রকৃতপক্ষেই গুনাহের বিষয় ছিল, তবে এই মহান ব্যক্তিদের খোদাভীতি ও আখেরাতের চিন্তা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, তারা তা থেকে তওবা করে নিয়েছেন, চাই তার ঘোষণা না-ই হয়ে থাকুক এবং মানুষের জানা না থাকুক। আর যদি তর্কের খাতিরে এটিও না হয়, তবে তাদের নেক আমল এবং দ্বীনের খেদমত এতই মহান যে, সেগুলোর কারণে ক্ষমা হয়ে যাওয়া নিশ্চিতের কাছাকাছি। [১]

[১] মাকামে সাহাবা, পৃ. ৯৩, ৯৫, ২৬।

অতীতের ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে কুরআন মাজীদেবর শিক্ষা

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মনে রাখবেন যে, এই জীবনে অতীতের লোকদের সম্পর্কে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের নবীগণের কথা উল্লেখ করার পর ইরশাদ করেছেন:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(তারা ছিল এমন এক উম্মত যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।) [১]

অতএব, যেখানে নেক ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের উত্তর চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং আহলে ইলমদের নিকট জিজ্ঞাসার পরেও পাওয়া না যায়, সেখানে কুরআন মাজীদেবর এই নির্দেশ সামনে রেখে বিতর্কের পথ বন্ধ করে দিন এবং ঐ সকল মহান ব্যক্তিদেবর সম্পর্কে এই আয়াতে কারীমায় শিক্ষা দেওয়া দুআটি অধিক পরিমাণে পাঠ করুন, যা পাঠ করা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুমিন হওয়ার লক্ষণ:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

(আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা ঈমানের সাথে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও পরম করুণাময়।) [২]

[১] সূরা আল-বাকার, আয়াত: ১৩৪

[২] সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কয়েকটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর

উম্মতের ইতিহাসে পতন কেন বেশি?

ইতিহাস অধ্যয়নকারী অনেক বন্ধু প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন:

“ইসলামের ইতিহাসে জায়গায় জায়গায় পতন কেন দেখা যায়? মুসলমানদের স্বর্ণযুগ এত কম এবং অন্ধকার দিনগুলো এত বেশি কেন?”

এর উত্তরে আরজ এই যে, জাতিসমূহের নির্মাণ ও উন্নতি এবং পরাজয় ও ধ্বংসের উদাহরণ একটি দালানের মতো। নতুন থেকে নতুন এবং মজবুত থেকে মজবুত দালানও শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, রঙ-চঙ উঠে যায়। এর নতুন অবস্থা এবং জৌলুসের সময়কাল সবসময় সংক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যদি ভিত্তি এবং কাঠামো মজবুত হয়, তবে দালানটি বিবর্ণ হয়ে এবং বাহ্যিকভাবে জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় দেখা দিলেও শতাব্দীকাল টিকে থাকে। শত শত বছর পর যখন আমরা কোনো কেল্লাকে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং মাথা উঁচু করে থাকতে দেখি, তখন বলে উঠি:

“এর ভিত্তি কত গভীর।”

বিপরীতভাবে, একটি দুর্বল দালানের উন্নতির সময়কালই তার মোট স্থায়িত্বকাল। আজ নতুন বানানো হলো। পাঁচ-দশ বছর জাঁকজমকের সাথে কাটল, তারপর একটি বন্যা বা সামান্য ভূমিকম্পের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ইসলামের পতনের যুগ আমাদের কাছে অধিক পরিমাণে দৃশ্যমান হওয়ার কারণ হলো ইসলামের দালান মজবুত এবং এর কাঠামো টেকসই। অধিকাংশ যুগে এই দালানটি কারুকাষহীন এবং ভাঙাচোরা দেখা যায়, কিন্তু হাজারো ভূমিকম্প সহ্য করেও তা টিকে আছে। না এর ছাদ পড়েছে, না দেয়াল, না স্তম্ভ। যখনই কেউ প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, তখনই আবারও এর রূপ-লাবণ্য ফুটে উঠেছে, বরং নতুন মিনার এবং নতুন গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যখন এর কোনো দেখাশোনা করার কেউ ছিল না, তখনও এই জীর্ণ ও জরাজীর্ণ অবস্থায় তা তার আশ্রয়প্রার্থীদের মাথার ওপর ভেঙে পড়েনি, বরং তাদের যুগের হাজারো বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছে। কঠিন পরিস্থিতির হতাশাজনক বৃষ্টিতে তাদের নিজের কোলে আগলে রেখেছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিগুলো এই দালানের মজবুতি এবং স্থায়িত্বের প্রমাণ, দুর্বলতার নয়।

হ্যাঁ! এর মাধ্যমে আমাদের মুসলমানদের ত্রুটি এবং দুর্বলতা অবশ্যই প্রকাশ পায়, তবে স্পষ্টতই কারো কর্মের ত্রুটির জন্য ইসলামকে দায়ী করা যায় না।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড

উত্থান ও পতনের সাতটি স্বাভাবিক পর্যায়

যখন আপনি কোনো নতুন কাজ শুরু করেন, কোনো নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন অথবা কোনো নতুন ব্যবসা পরিচালনা করেন, তখন তাতে অবশ্যই সাতটি পর্যায় আসে:

- ১. ভিত্তি স্থাপন করা
- ২. স্থানীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া
- ৩. স্থিতিশীলতা
- ৪. বাহ্যিক বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া
- ৫. উন্নতি ও উত্থানের যুগ
- ৬. গোপন ষড়যন্ত্রের যুগ
- ৭. অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও সমাপ্তি... অথবা পুনরায় স্থিতিশীলতা ও উত্থান

এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বুঝুন।

১. ভিত্তি স্থাপনের যুগ:

প্রথম পর্যায় হলো এই প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার ভিত্তি স্থাপন করা। আপনি একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, যেমন: আপনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চান, অথবা সেবামূলক কাজ করে সুনাম অর্জন করতে চান, কিংবা অ্যাসেম্বলির সদস্য হতে চান। এই লক্ষ্য অনুযায়ী আপনি আপনার কাজের পরিধি নির্ধারণ করেন। এর জন্য আপনি প্রাথমিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করেন যা শুরুতে অত্যন্ত সীমিত থাকে। কাজের সাথীদের খোঁজ করেন এবং তাদের সাথে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

কাজের ভিত্তি স্থাপনের এই পর্যায়টি অত্যন্ত ধৈর্য্যপরীক্ষামূলক ও পরিশ্রমসাধ্য পর্যায়। অধিকাংশ মানুষের পরিকল্পনা এই প্রথম পর্যায়েই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই সময়ে কাজের সফলতা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

ক: লক্ষ্য স্পষ্ট ও উচ্চ হওয়া।

খ: কর্মীদের সাহসী, দৃঢ়চেতা এবং কাজের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া।

লক্ষ্য যত স্পষ্ট ও উচ্চ হবে, কাজ তত বেশি টেকসই হবে এবং সাথীরা যত উন্নত গুণের অধিকারী হবে, কাজ তত বেশি উন্নতি করবে।

২. স্থানীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া:

যখনই কাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তখনই তাকে প্রকাশ্য স্থানীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কোথাও ঘর ও আত্মীয়-স্বজনেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কোথাও স্থানীয় সর্দার ও চৌধুরীগণ। কোথাও বাজারে অন্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা পথে বাধা সৃষ্টি করে, কোথাও সরকার ও পুলিশ। কোনো কোনো জায়গায় ঘুষ দিয়ে বাধা দূর করা হয় এবং কোনো কোনো জায়গায় মারপিট এবং থানা, আদালত ও কাচারি পর্যন্ত যাওয়ার উপক্রম হয়। কিছু মানুষের কাজ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেই শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, সাহসী ব্যক্তির...

অংশ দ্বিতীয় | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

এর কাফেলা এখান থেকেও অতিক্রম করে যায়।

স্থানীয় স্থিতিশীলতার পর্যায়

বিরোধিতা সহ্য করে নেওয়ার পর কাজ স্থিতিশীল হয়ে যায়। একে “স্থানীয় স্থিতিশীলতার পর্যায়” বলা হয়। স্থানীয় বিরোধী শক্তিগুলোও মেনে নেয় যে, এই কাজকে সহজে শেষ করা যাবে না। স্থিতিশীলতার যুগে উপলব্ধ সম্পদগুলোকে যদি ভালোভাবে কাজে লাগানো হয়, তবে স্থানীয় বিরোধীরা যারা আগেই মানসিকভাবে ভীত হয়ে থাকে, তারা ময়দান থেকে সরতে শুরু করে।

বহিরাগত বিরোধিতা

এরপর কাজ যখন বিস্তৃত হয়, তখন নতুন নতুন ময়দানে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেখা মেলে। কোথাও সরকারি যন্ত্র বাধা প্রদান করে, আবার কোথাও বহিরাগত দেশসমূহ। কখনো যুদ্ধের সম্মুখীনও হতে হয়। এই পর্যায়টিও সাহস ও হিম্মতের এক কঠিন পরীক্ষা নেয়। যদি সাহস ও হিম্মত ভেঙে যায়, তবে কাজ সেখানেই শেষ হয়ে যায় অথবা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাহস ও হিম্মত তখনও অবশিষ্ট থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার এই কঠিন সময়ও কেটে যায়।

বহিরাগত স্থিতিশীলতা এবং উন্নতির যুগ:

এখন কাজ দিন দিন বহুগুণ উন্নতি করতে থাকে, এটি বহিরাগত ময়দানগুলোতেও স্থিতিশীলতা লাভ করে এবং এভাবেই এর উন্নতির যুগ শুরু হয়। উন্নতির যুগে বিস্তৃতিও লাভ হয়। নতুন শাখা খোলে, নতুন পদাধিকারী নিয়োগ করা হয়। নতুন নতুন এলাকা এর কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

গোপন ষড়যন্ত্র:

কাজের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে বহিরাগত শত্রুরা হিংসায় জ্বলতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণভাবেও কিছু লোক ঈর্ষা এবং কিছু লোক হিংসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা ভাবে যে, এমন ফ্যাক্টরি আমাদের কেন নেই, এমন খ্যাতি আমরা কেন পেলাম না, এমন পদে আমরা কেন নেই। এই লোকেরা বাহ্যিকভাবে সাথে থাকলেও অভ্যন্তরীণভাবে নিষ্ঠাবান থাকে না, বরং হিংসার বশবর্তী হয়ে গোপনে কিছু না কিছু ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ওদিকে বহিরাগত শত্রু বাইরে থেকে ছটফট করতে থাকে। যদি কাজ মজবুত হয়, তবে সাধারণত এই ধরনের অপতৎপরতায় কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু কখনো কখনো একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি পুরো ফ্যাক্টরিকে ভস্মীভূত করে দেয়। কখনো সামান্য বিষয়ও অনেক বড় ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই গাফিলতি মোটেও সমীচীন নয়। কখনো এমনও হয় যে, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় অশুভ শক্তির মধ্যে যোগাযোগ হয়ে যায়। তখন উভয় মিলে বড় ধরনের ক্ষতি করার নেশায় মেতে ওঠে। এটি অত্যন্ত বিপদের কথা।

পরিণতি বা ধারাবাহিকতা

ষড়যন্ত্রের পর পরিণতি চার ধরনের হতে পারে:

- (আলিফ) ষড়যন্ত্রের ওপর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা গেলে পতনের যুগ দ্রুত আসে না।

(খ) এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা না গেলে পতনের যুগ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়।

(গ) পতনের কারণসমূহ বাড়তে থাকলে একদিন না একদিন এই অভ্যন্তরীণ রোগগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) পতনের যুগে এই দুর্বলতাগুলো দূর করে দেওয়া হলে প্রথমে স্থিতিশীলতা এবং তারপর উন্নতির যুগ শুরু হয়।

তারপর এই ধারা এভাবেই আবর্তিত হতে থাকে।

বিস্তৃতি এবং কেন্দ্রের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য:

বিস্তৃতির সাথে কেন্দ্রের শক্তির একটি বিশেষ ভারসাম্য থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রের শক্তি এবং কাজের বিস্তৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে, ততক্ষণ বিস্তৃতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির কারণ হয়। কিন্তু এই ভারসাম্য না থাকলে বিস্তৃতি থেকে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত সংবেদনশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে প্ররোচিত করে। এই পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রসমূহের বিভক্তির পর বিভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এমন সময়ে স্বেচ্ছায় যথাযথ লেনদেনের মাধ্যমে বিভক্তিকে মেনে নেন। তারা শাখাগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে দেন। প্রদেশগুলোর ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলোকে নিজ নিজ স্থানে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেন। কিন্তু কখনো কখনো কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক সক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রকার বিভক্তির জন্য প্রস্তুত থাকে না। যদি প্রশাসনিক দুর্বলতাগুলো দূর না হয় এবং বিভক্তির সুযোগও না দেওয়া হয়, তবে এমন পরিস্থিতিতে ভাঙচুর ও ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কোনো বিপ্লবের মাধ্যমে বিভক্তি কার্যকর হয়। এটি ঠিক তেমন, যেমন পাঁচ কেজি ধারণক্ষমতার একটি শপিং ব্যাগে দশ কেজি ওজন রাখা হলো; স্বাভাবিকভাবেই যদি ব্যাগটিকে অতিরিক্ত কোনো অবলম্বন দেওয়া না হয়, তবে সেটি ফেটে যাবে।

অথবা এভাবে বুঝুন যে, যদি কোনো জমির মালিকের আয়ের উৎস প্রচুর থাকে, তবে সে আশেপাশের জমি কিনে তার কৃষিজমির পরিমাণ বাড়াতে থাকে। কিন্তু সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে তাকে সেই জমিগুলোই বিক্রি করে দিতে হয়। যদি সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে অন্যরা তার জমি দখলও করে নিতে পারে। সুতরাং বিস্তৃতি ও শক্তির মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে, বিস্তৃতি একটি পর্যায়ে গিয়ে বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। প্রতিষ্ঠান, পরিবার, দেশ এবং জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম সর্বদা চলে আসছে।

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমাহ ভূমিকা

প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক উত্থান-পতনের মূলনীতির আলোকে উন্মতে মুহাম্মাদিয়ার অবস্থান

আমরা যদি উল্লিখিত প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক মূলনীতিগুলোকে সামনে রেখে উন্মতে মুহাম্মাদিয়ার ইতিহাস দেখি, তবে জানতে পারব যে:

- রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবী (রা.)-দের মক্কী জীবনের দাওয়াতে ইসলামের সময়কাল ছিল উন্মতের ভিত্তি স্থাপনের যুগ।
- সেই যুগে শেষ নবী ﷺ এমন সুদৃঢ় আকিদা, এমন সত্য আদর্শ, এমন উচ্চতর গুণাবলি এবং এমন চমৎকার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর উন্মতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন যে, দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সেই ভিত্তিতে কোনো পরিবর্তন আসতে পারেনি। মক্কী ও মাদানী যুগে কুরাইশদের বিরোধিতার ধারা ছিল স্থানীয় প্রতিবন্ধকতার সময়কাল। এই সময়ে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং যে বিস্ময়কর ঈমানী জজবার সাথে বিরোধিতার এই তুফানের মোকাবিলা করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত এই উন্মতের জন্য পথপ্রদর্শক।

হৃদয়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ছিল স্থিতিশীলতার যুগ। এই সময়ে পুরো জাজিরাতুল আরব ইসলামের অধীনে চলে আসে। ইসলাম রাজনৈতিকভাবে এমন স্থিতিশীলতা লাভ করে যে, কায়সার ও কিসরাও একে মিটিয়ে দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ দুই বছর থেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রাথমিক কয়েক বছর পর্যন্ত ছিল বহিঃশক্তির সাথে সংঘাতের সময়কাল, যাতে গাযওয়ায়ে তাবুক, জাইশে উসামা, ইয়ারমুকের যুদ্ধ এবং কাদিসিয়ার যুদ্ধের মতো অভিযানগুলো সংঘটিত হয়েছিল।

হযরত ফারুক-এ-আযম (রা.)-এর যুগে সিরিয়া ও পারস্য বিজয়ের পর থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর শেষ বছরগুলো পর্যন্ত ছিল চরম উন্নতির যুগ। ইসলামের পয়গাম আফ্রিকার তপ্ত মরুভূমি থেকে শুরু করে হিন্দুকুশ পর্বতমালার বরফাবৃত চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

এই উন্নতির পর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তিসমূহের মধ্যে হিংসার জন্ম হওয়া, গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা এবং ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী অনিবার্য ছিল। ছয়-সাত বছরের মধ্যে উন্মত এই পর্যায়েটিও সফলভাবে অতিক্রম করে। একটি সীমিত গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ আকিদাগত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়নি। ইসলামী সীমান্তের এক ইঞ্চি জমিও শত্রুর দখলে যায়নি।

অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের সফল মোকাবিলা করে ৪১ হিজরিতে উন্মত পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে বিজয়ের ধারা পুনরায় শুরু হয়।

এভাবে জাতিসমূহের উত্থান-পতন এবং স্থিতিশীলতার অধিকাংশ পাঠ উন্মত সাহাবীদের উপস্থিতিতেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। এর ফলে উন্মতের ভিত্তি কখনো টলানো সম্ভব হয়নি। ইঁ্যা, এর স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, উত্থান-পতনের পর্যায়গুলো প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী আসতে থাকে; অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং চরিত্র ও কর্মের অবনতিও ক্ষতির কারণ হয়েছে।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

গোপন ষড়যন্ত্রের তুফানও বহুবার তোলা হয়েছে। নিজেদের নৈতিক ব্যাধি দূর করতে এবং ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে অবহেলা হওয়ায় আমাদের ওপর পতনের যুগও নেমে এসেছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে উম্মাহ তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এর দ্বীনের মানদণ্ড যা কুরআন ও সুন্নাহ, তা সংরক্ষিত ছিল; দ্বীনের আসল রূপ অটুট ছিল। উম্মাহর বিশাল অংশ ঈমান ও আকিদার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পথেই অবিচল ছিল।

বনু উমাইয়ার খিলাফতের প্রাথমিক ষাট-সত্তর বছর কেন্দ্র শক্তিশালী ছিল, তাই বিশালতা সত্ত্বেও কোনো প্রকার প্রশাসনিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি। শেষ পনের-বিশ বছরে কেন্দ্র দুর্বলতার শিকার হলে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তির দিকে ঝাঁক তৈরি হতে শুরু করে। বনু উমাইয়া এ ব্যাপারে কোনো আপস করেনি, তারা সর্বত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং একটি খিলাফত কায়েম রাখার চেষ্টা করেছে। অবশেষে আব্বাসীয় বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের শাসনের অবসান ঘটে।

বনু আব্বাসের যুগে যতক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালী ছিল, ততক্ষণ কোনো বিভক্তির প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু পরবর্তীতে কেন্দ্রের দুর্বলতার কারণে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং দুই শতাব্দীর মধ্যে বেশ কিছু স্বাধীন রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

দেশগুলোর বিভক্তি ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক কেন্দ্রের দুর্বলতার অনিবার্য পরিণতি। তবে দ্বীনি, ঈমানি ও ইলমি ক্ষেত্রগুলোর কথা বলতে গেলে, সেগুলোর ভিত্তি ছিল অত্যন্ত মজবুত, তাই প্রতিটি যুগে সেগুলোর স্থিতিশীলতা অতুলনীয় প্রমাণিত হয়েছে। উম্মাহ সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বদা জীবিত ছিল। পতনের যুগেও সে তার অস্তিত্ব হারায়নি এবং পুনরায় উত্থান ও উন্নতির সক্ষমতা বজায় রেখেছে। এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য যা কেবল উম্মাতে মুহাম্মদিয়া লাভ করেছে নবী খাতামুল মুরসালিন (সা.)-এর পবিত্র ও সর্বজনীন শিক্ষা এবং তাঁর সাহাবীদের অক্লান্ত ত্যাগের বদৌলতে।

দ্বিতীয় খণ্ড | তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

পরিকল্পনা, আন্দোলন, রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

পৃথিবীতে যখনই কোনো ব্যবসা, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো সাম্রাজ্য বা কোনো মতাদর্শকে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়, তখন সেই প্রচেষ্টার একটি বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্য থাকে। এতে কিছু বিশেষ গুণ থাকে যেগুলোকে আপনি জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করতে পারেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো শুরুতেই নির্ধারণ করে দেয় যে সেই কাজের আয়ু, তার শক্তি, তার বিস্তার এবং তার লাভ বা ক্ষতি কতটুকু হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি গোলাপের চারা রোপণ করে, তবে সে তার ছায়ায় বসে আরাম করার সুবিধা কখনোই ভোগ করতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তির লক্ষ্য কেবল নিজের পেট ভরা হয় এবং সে জন্য সে রাস্তায় টফির ভ্যান লাগায়, তবে তার ফলাফল কখনোই এমন হতে পারে না যে সে সিন্ধু নদে বাঁধ তৈরি করে ফেলবে। বাস ড্রাইভিংয়ের ফল কখনোই পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার রূপ নিতে পারে না। সংক্ষেপে, প্রচেষ্টার শুরুতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোই তার লাভ ও ক্ষতির হার নির্ধারণ করে দেয়।

মানের দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করলে এ ধরনের প্রচেষ্টার সাতটি স্তর হতে পারে:

১. ই গ্রেড: (ব্যর্থ প্রচেষ্টা)

যার ভিত্তিই স্থাপন করা যায় না। কাজ শুরুই হয় না। মানুষ কেবল ভেবেই যায়।

২. ডি গ্রেড: (দুর্বল প্রচেষ্টা)

ভিত্তি থাকলেও তা দুর্বল। ধাক্কা লাগলেই ধসে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটে।

৩. সি গ্রেড: (সাধারণ প্রচেষ্টা)

যা শুরু হয়ে প্রতিকূল ধাক্কাও সহ্য করে নেয় এবং কিছুকাল টিকে থেকে নিজের আলাদা পরিচয়ও তৈরি করে, কিন্তু উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। ঘরবাড়ি, দোকান, কারখানা, ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও কারুশিল্প, জ্ঞান ও শিল্পকলা অথবা শাসন ও সাম্রাজ্যের রূপে যেসব প্রচেষ্টা দেখা যায়, তার অধিকাংশই এই মানের।

৪. বি গ্রেড: (উন্নত প্রচেষ্টা)

যা টিকে থাকার পাশাপাশি নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করে এবং কিছু সময়ের জন্য উন্নতির শিখরেও পৌঁছায়, কিন্তু বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার পর তার প্রথম পতনই তার সম্পূর্ণ বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা [খণ্ড অষ্টম]

- ৫. এ গ্রেড: (সফল প্রচেষ্টা) যা উত্থানের পর পতনের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে।
- ৬. এ ওয়ান গ্রেড: (অত্যন্ত সফল প্রচেষ্টা) যা উত্থান ও পতনের সাথে বারবার মিলিত হয়েও বাহ্যিকভাবে অটুট থাকে। যদিও অভ্যন্তরীণভাবে মানদণ্ড ও লক্ষ্যের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়।
- ৭. এক্সিলেন্ট: (বিস্ময়কর এবং সফলতম প্রচেষ্টা) যা উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে বারবার অতিক্রম করে কেবল বাহ্যিকভাবেই অটুট থাকে না, বরং অভ্যন্তরীণভাবেও এর মানদণ্ড ও লক্ষ্যসমূহ নিজ মূলে অটুট থাকে।

যদি জাতিসমূহের ইতিহাসে দেখি, তবে আমরা কেবল উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকেই এমন দেখতে পাব যাকে “এ ওয়ান গ্রেড” থেকেও অগ্রবর্তী “এক্সিলেন্ট” হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে; কারণ এটিই সেই উম্মত যা উত্থান ও পতনের আবর্তের মধ্য দিয়ে বারবার অতিক্রম করেও কেবল বাহ্যিকভাবেই টিকে নেই, বরং আজও এর আকিদা, শরিয়ত এবং শরিয়তের উৎসসমূহ প্রথম দিনের মতোই সংরক্ষিত রয়েছে।

আল্লাহর তাকভিনি ব্যবস্থা বোঝা জরুরি

আমাদের আল্লাহর তাকভিনি ব্যবস্থা বোঝা উচিত। যেভাবে মানুষ ব্যক্তি হিসেবে এজন্য সৃষ্টি হয়েছে যে তার আমল যাচাই করা হবে, একইভাবে জাতিসমূহের সামষ্টিক অস্তিত্বও আল্লাহর পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে। এই পরীক্ষা তখনই হতে পারে যখন তার ওপর বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি আসবে, সহজও এবং কঠিনও।

এমন কোনো মানুষ নেই যাকে দুনিয়ায় সবসময় কেবল সুখই নসিব হয়েছে, কখনো কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি, প্রতিটি কাজ তার এক ইশারায় হয়ে গেছে। কখনো সে অসুস্থ হয়নি, কখনো কোনো দুঃসংবাদ পায়নি। সমস্ত পরিস্থিতি তার ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়েছে।

একইভাবে এমন কোনো উম্মত বা কোনো জাতি হতে পারে না যার পরিস্থিতি সবসময় ভালোই থাকবে, সে কেবল উত্থানের দিকেই উড়তে থাকবে। যদি তর্কের খাতিরে এমন কোনো ব্যক্তির কথা কল্পনা করি যে সবসময় সুখের দোলনায় দুলছে, তবে ভাবুন এমন ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবনে আমাদের জন্য কি কোনো শিক্ষা থাকতে পারে? কখনোই না।

একইভাবে সেই জাতির পরিস্থিতিতেও আমরা কোনো শিক্ষা পেতে পারি না যারা সবসময় কেবল আনন্দই করেছে। যাদের কখনো পরাজয় বা ব্যর্থতা আসেনি।

যখন আমরা পরাজয় ও পতনের দৃশ্য দেখি, তখন আমরা এমন সাহসী লোকও দেখতে পাই যারা হতাশ না...

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

খারাপ থেকে খারাপতর পরিস্থিতির হাসিমুখে মোকাবিলা করেছেন এবং পৃথিবীতে কিছু না কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি করে গেছেন। এমন মানুষ এবং খারাপতর পরিস্থিতির ফসল যারা আজ আমাদের জন্য ঈর্ষণীয় এবং আমাদের ইতিহাসের জন্য গর্বের কারণ।

আল্লাহ ঋতুগুলোকে বৈচিত্র্যময় করেছেন। যদি সারা বছর আমাদের পছন্দের ঋতু থাকত তবে আমরাও বিরক্ত হয়ে যেতাম। বসন্তের আনন্দ কিছু দিনের জন্যই হয় তখন এর কদর হয়। সারা বছর বসন্ত থাকলে কেউ বসন্তকে মনেও রাখত না।

আল্লাহর ব্যবস্থায় সব ধরনের ঋতু রয়েছে, প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব উপকারিতা রয়েছে। নিঃসন্দেহে বসন্তে আনন্দের জোয়ার থাকে কিন্তু এই বসন্তও অন্য কঠোর ঋতুগুলোরই ফসল। শরতের ঝরা পাতা সার হয়ে নতুন বসন্তের জন্ম দেয়। শীতকাল বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দিয়ে প্রকৃতির কারুকার্যকে বিশ্রাম দেয়, এই বিশ্রামের পর এক সতেজ শ্রমিকের মতো প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতেই বসন্তের সজীবতা ছেয়ে যায়।

তারপর গ্রীষ্মকাল আসে তো রিজিকের দানা পাকে। বর্ষা হয় তো জমিন পুরো বছরের জন্য পানির ভাণ্ডার সঞ্চয় করে নেয়। তারপর আবার সেই শরৎ, শীত ও বসন্ত।

জাতিসমূহের জীবনও একইভাবে স্থিতিশীলতা এবং উত্থান-পতনের ঋতুর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এটি প্রকৃতির নিয়ম, এতে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে এর পেছনের হিকমত বোঝা উচিত।

উত্থান-পতন জাতিসমূহের নিরন্তর সফরের লক্ষণ। যে ব্যক্তি এক জায়গায় বসে আছে সে না উত্থান পাচ্ছে না পতন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কঠিন সফরে বের হবে তাকে অবশ্যই উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে হবে; কারণ বন্ধুর পথ উঁচু-নিচু হয়েই থাকে। শুধু তাই নয় বরং পথে খাদও আসতে পারে এবং দুর্গম গিরিপথও। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কখনো খাদও পার হতে হবে। কখনো চূড়ায় চড়তে হবে। আবার চূড়ায় পৌঁছে মুসাফির সেখানে বসে থাকবে না বরং নিজের গন্তব্যের দিকে চলতে থাকবে। চাই তার জন্য তাকে আরও উঁচু কোনো চূড়ায় যেতে হোক বা নিচু কোনো পথে যেতে হোক। কিন্তু পাহাড়ের চূড়া যেমন সবসময় সংক্ষিপ্ত হয়, তেমনি উত্থানের স্থায়িত্বও কমই দেখা যায়; কারণ উত্থানের অর্থই হলো সেই বিন্দু যার পর পতন শুরু হয়। সূর্য সারাদিন জ্বলে কিন্তু তার দ্বিপ্রহরের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিনিটই হয়। এর মানে এই নয় যে সূর্যের উজ্জ্বলতা এরপর শেষ হয়ে যায়। সুতরাং উত্থান-পতনের কাহিনীতে বিচলিত হওয়া কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। নিজের জীবন হোক বা জাতির ইতিহাস—শুধুমাত্র উত্থান তালাশ করা এবং পতন সম্পর্কে পড়ে নিজে হতাশ হয়ে যাওয়া জ্ঞানীদের কাজ নয়।

পৃষ্ঠা - ১০৫৫

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

<https://t.me/BoierSomahar>

২য় খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ক্রমিক নং | বইয়ের নাম | লেখক

বর্ণ ‘আলিফ’

১. আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ যাকারিয়া আল-কাযভিনী
২. আবজাদুল উলুম সিদ্দিক হাসান খান কানৌজি
৩. আবুল হাসান আল-আশআরি হাম্মাদ বিন মুহাম্মদ আল-আনসারী
৪. আবু বকর আস-সিদ্দিক ওয়া বানুহ মাহমুদ আবদাল ফাত্তাহ শারাহ উদ্দিন
৫. আবু হানিফা হায়াতুহ ওয়া আসরুহ মুহাম্মদ আবু জাহরা
৬. ইতহাফুল খায়ারাতিল মাহারা বি-যাওয়াইদিল মাসানিদিল আশারা শিহাবুদ্দিন বুসিরি আল-কিনানি
৭. ইতহাফুস সাযিল বিমা ফিত তাহবিয়া মিন মাসায়িল বিশারহিল আকিদাতিত তাহবিয়া সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আল শেখ
৮. ইতহাফুল মাহারা বিল ফাওয়াইদিল মুবতাকারা মিন আতরাফিল আশারা ইবনে হাজার আসকালানি
৯. ইতহাফুল হাজওয়া বি-আখবারি আইন্মাতিল ফাতিহিন আল-খুলাফা তাকিউদ্দিন আল-মাকরিজি
১০. ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়া ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া
১১. আহসানুত তাকাসিম ফি মা’রিফাতিল আকালিম আবু আব্দুল্লাহ আল-মাকদিসি আল-বাজারি
১২. আহসানুল ফাতাওয়া মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী
১৩. আহকামুল কুরআন আল-জাসসাস আর-রাজি
১৪. ইহয়াউ উলুমিদ্দিন আবু হামিদ আল-গাজালি
১৫. আখবারু আবি হাফস উমর বিন আব্দুল আজিজ আবু বকর মুহাম্মদ বিন আল-হুসাইন আল-আজুরি
১৬. আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি আল-হুসাইন বিন আলী আস-সাইমারি
১৭. আখবারুল উলামা বি-আখবারিল হুকামা আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ আল-কিফতি
১৮. আখবারুল মাক্কিয়্যিন মিন তারিখ ইবনে আবি খাইসামা আবু বকর ইবনে আবি খাইসামা
১৯. আখবারুল ওয়াফিদাত মিনান নিসা আলা মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান আব্বাস বিন বাক্কার
২০. আখবারু বনি উবাইদ ওয়া সিয়রুলহুম মুহাম্মদ বিন আলী সাহাজি আল-কালার’যি
২১. আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়া লেখক: অজ্ঞাত, গবেষক: আব্দুল আজিজ আদ-দুরি
২২. আখবারুল কুদাত আবু বকর ওয়াকি বাগদাদী
২৩. আখবারু মক্কা (তারিখে মক্কা) আবু আব্দুল্লাহ আল-ফাকিহি
২৪. আখবারু মক্কা ওয়া মা জাআ ফিহা মিনাল আসার আবুল ওয়ালিদ আল-আযরাকি
২৫. আখলাক-ই জালালি জালালুদ্দিন দাওয়ানি
২৬. উর্দু দাইরা-ই মাআরিফ-ই ইসলামিয়া লেখকবৃন্দ
২৭. ইরশাদুস সারি লি-শারহি সহিহিল বুখারি আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-কাসতালানি

তারীখে উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

হরফ আলিফ (বর্ণ ‘আলিফ’)

৬৮২ হি. ১ দার সাদির, বৈরুত উল্লেখ নেই

১৩০৭ হি. ১ দার ইবনে হাজম ১৪২৩ হি. - ২০০২ খ্রি.

১৩১৮ হি. ১ আল-জামিআতুল ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৯২ হি. - ১৯৭৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো উল্লেখ নেই

১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খ্রি. ১ দারুল ফিকর আল-আরাবি ১৯৭৭ খ্রি.

৮৩০ হি. ৮ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ ১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৮৫২ হি. ১৯ মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪১৫ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৮৩৫ হি. ৩ লাজনাতু ইহয়ায়িত তুরাসিল ইসলামি, মিসর উল্লেখ নেই

৭৫১ হি. ১ দারু আলমিল ফাওয়াইদ ১৪২১ হি.

৩৮০ হি. ১ দার সাদির, বৈরুত ১৪১১ হি. - ১৯৯১ খ্রি.

১৩৩২ হি. ১০ এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচি ১৩২৫ হি.

৭৩০ হি. ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৫ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৫০৫ হি. ৪ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩৬০ হি. ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.

৪৩২ হি. ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.

৬৩৬ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ২০০৫ খ্রি.

২৭৯ হি. ১ দারুল ওয়াতান ১৯৯৭ খ্রি.

৪২২ হি. ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৬২৮ হি. ১ দারুস সাহওয়াহ, কায়রো উল্লেখ নেই

তৃতীয় হিজরি শতাব্দী ১ দারুত তালিআহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩০৬ হি. ৩ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৩৬৬ হি. - ১৯৪৭ খ্রি.

৪২৭ হি. ৫ দারু খিজর, বৈরুত ১৪১৩ হি.

২৫০ হি. ২ দারুল আন্দালুস লিন-নাশর, বৈরুত উল্লেখ নেই

৯০৮ হি. ১ শেখ মুবারক আলী তাজিরে কুতুব, লাহোর ১৩০২ হি.

.

২৪ দানিশগাহ, পাঞ্জাব ১৯৬৪ খ্রি. থেকে ১৯৯৩ খ্রি.

৯২৩ হি. ১০ আল-মাতবাতাতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ, মিসর ১৩২৩ হি.

দ্বিতীয় খণ্ড

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বই লেখক

২৮ ইরশাদুল কাসি ওয়াদ দানি ইলা তারাজিমুশ শুয়ুখিত তাবারানি আবুল তাইয়েব

নায়েফ বিন সালাহ আল-মানসুরি

২৯ আসাদুল গাবাহ ইবনুল আসির আল-জাযারি

৩০ আসমাউল মুদাল্লিসিন জালালুদ্দিন সুয়ুতি

৩১ উসুলুস সুন্নাহ (আস-সুন্নাহ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

৩২ উসুলু মাযহাবিশ শিয়াহ আল-ইমামিয়াহ আল-ইসনা আশারিয়াহ আরদুন ওয়া নাকদুন

..... ডক্টর নাসির বিন আব্দুল্লাহ আল-কাফারি

৩৩ আদওয়াউ আলাল হিন্দ (তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ) আব্দুল মুনইম আল-নামির

৩৪ ইতিকাদ আহলুস সুন্নাহ (শারহ্ উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ)

হিবাতুল্লাহ বিন আল-হাসান আবুল কাসিম আত-তাবারানি আল-লালকাযি

৩৫ ইতিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমিন ওয়াল মুশরিকিন ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি

৩৬ ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাবিবিল আলামিন ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়াহ

৩৭ আকাওয়িলুস সিকাত ফি তাওয়িলিল আসমা ওয়াস সিফাত মারযি বিন ইউসুফ

আল-মাকদিসি আল-হাম্বলি

৩৮ ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়াহ

আল-হাররানি

৩৯ ইকমালুল মুয়াল্লিম বি ফাওয়াইদি মুসলিম (শারহ্ সহিহ মুসলিম) কাজি আইয়াজ

ইয়াহসুবি আস-সাবতি

৪০ ইকমালু তাহজিবিল কামাল আলাউদ্দিন মুগলতাই

৪১ আল-আহাদ ওয়াল মাসানি আবু বকর ইবনে আবি আসিম আশ-শায়বানি

৪২ আল-ইবানাহ আন শারিয়াতিল ফিরকাতিন নাজিয়াহ ইবনে বাত্তাহ আল-উকবারি

৪৩ আল-ইহতিজাজ (ইহতিজাজে তাবারসি) আবু মনসুর আত-তাবারসি

৪৪ আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি

৪৫ আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ আবু ইয়াল্লা আল-ফাররা

৪৬ আল-আখবারুত তিওয়াল আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি

৪৭ আল-ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদ আল-মাওসিলি, আবুল

ফজল আল-হানফি

৪৮ আল-ইখতিতামিইয়াহ আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়াহ আল-হাররানি

৪৯ আল-আদাবুল মুফরাদ ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি

৫০ আল-ইরশাদ ফি মারিফাতি উলামাইল হাদিস আবু ইয়াল্লা খলিলি আল-কাজউইনি

৫১ আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা শিহাবুদ্দিন আদ-দারযি

আস-সালাওয়ি

৫২ আল-ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব ইবনে আব্দুল বার কুরতুবি

৫৩ আল-আসরারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওদুআহ মোল্লা আলী কারী

৫৪ আল-ইশরাফ ফি মানাজিলিল আশরাফ ইবনে আবিদ দুনিয়া

৫৫ আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ ইবনে হাজার আসকালানি

তারীখে উম্মাতে মুসলিমা

সংক্ষিপ্ত

মৃত্যুর বছর খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের বছর

সমসাময়িক ১ দার আল-কিয়ান, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৬৩০ হিজরি ৮ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

৯১১ হিজরি ১ দার আল-জিল উল্লেখ নেই

২৪১ হিজরি ১ দার আল-মানার, সৌদি আরব ১৪১১ হিজরি

সমসাময়িক ৩ দার আল-বাশির ১৪১৩ হিজরি

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ ১ দার আল-আহদ আল-জাদিদ, মিশর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

৪১৮ হিজরি ৪ দার তাইয়িবাহ, রিয়াদ ১৪০২ হিজরি

৬০৬ হিজরি ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৫১ হিজরি ৪ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

১০৩৩ হিজরি ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০৬ হিজরি

৭২৮ হিজরি ২ দার আলম আল-কুতুব, বৈরুত ১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

৫৪২ হিজরি ৮ দার আল-ওয়াফা, মিশর ১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

৭৬২ হিজরি ১২ আল-ফারুক আল-হাদিসিয়্যাহ ১৪২২ হিজরি - ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

৪৮৭ হিজরি ৬ দার আর-রায়াহ, রিয়াদ ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

৪৮৭ হিজরি ৩ দার আর-রায়াহ লিন-নাশর, সৌদি আরব ১৪১৮ হিজরি

পঞ্চম হিজরি শতাব্দী ২ মাতাবিউন নুমান, নাজাফ আল-আশরাফ ১৩৮৬ হিজরি - ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

৪৫০ হিজরি ১ দার আল-হাদিস, কায়রো

.

৪৫৮ হিজরি ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২১ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

২৮২ হিজরি ১ দার ইহয়া আল-কুতুব আল-আরাবি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

৬৮৩ হিজরি ৫ মাতবা হালাবি, কায়রো ১৩৫৬ হিজরি - ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

৭২৮ হিজরি ১ দার আল-খাজ্জার, জেদ্দা ১৪২০ হিজরি

৪৫৬ হিজরি ১ দার আল-বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৯ হিজরি

৪৩৬ হিজরি ৩ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ

.

১৩১৫ হিজরি ৩ দার আল-কিতাব

.

৪৬৩ হিজরি ১০ দার আল-জিল, বৈরুত ১৪১২ হিজরি - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

১০১২ হিজরি ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ

.

২৮১ হিজরি ১ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪১১ হিজরি - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

৮৫২ হিজরি ৮ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৫ হিজরি

দ্বিতীয় অংশ

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

আল-আসনাম (হিশাম বিন মুহাম্মদ আল-কালবি) ৫৬

আল-আদদাদ (আবু বকর ইবনুল আনবারি) ৫৭

আল-ইতিসাম (ইব্রাহিম বিন মুসা আল-শাতিবি) ৫৮

আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ আলা মাজহাবিস সালাফ ওয়া

আসহাবিল হাদিস (আবু বকর বায়হাকি) ৫৯

আল-ইতিরাক ফিল ইতিকাদ - শারহুল উমদাহ ফি আকিদাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ

(আবুল বারাকাত আন-নাসাফি) ৬০

আল-আলাকুল খাতিরাহ ফি জিকরি উমারাইশ শাম ওয়াল জাজিরাহ (ইবনে শাদ্দাদ আল-

হালাবি) ৬১

আল-আলাম (খায়রুদ্দিন আয-যিরিকলি) ৬২

আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান জাম্মাত তারিখ (শামসুদ্দিন আস-সাখাভি) ৬৩

আল-আগানি (আবু আল-ফারাজ আল-ইসফাহানি) ৬৪

আল-ইকতিফা বিমা তাদাম্মানাহ মিন মাগাজি রাসুলুল্লাহ ﷺ ওয়াস সালাসাহ আল-খুলাফা

(আবু আল-রাবি আন-নুমাইরি) ৬৫

আল-ইকমাল ফি জিকরি মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফি মুসনাদিল ইমাম আহমাদ সিওয়া মান

জুকিরা ফি তাহজিবিল কামাল (শামসুদ্দিন আল-হুসাইনি আশ-শাফিঈ আদ-দিমাশকি)

৬৬

আল-উম্ম (কিতাবুল উম্ম) (মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফিঈ) ৬৭

আল-ইমাম আশ-শাফিঈ (মুহাম্মদ আবু জাহরা) ৬৮

আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ (ইবনে কুতাইবাহ আদ-দিনাওয়ারি) ৬৯

আল-আমওয়াল (ইবনে জানজুওয়াইহ) ৭০

আল-ইনতিসার লিস-সাহবি ওয়াল আল মিন ইফতিরাআত আস-সামাভি আদ-দাল (ইব্রাহিম

বিন আমির আল-রুহাইলি) ৭১

আল-ইনতিকা ফি ফাদাইলিস সালাসাহ আল-আইম্মাহ আল-ফুকাহা (ইবনে আব্দুল বার

আল-মালিকি) ৭২

আল-আনসাব (আব্দুল কারিম বিন মুহাম্মদ আস-সামআনি) ৭৩

আল-ইনসাফ ফিমা ইয়াজিবু ইতিকাদুহু ওয়া লা ইয়াজুজুল জাহলু বিহি (আবু বকর ইবনুল

বাকিলানি) ৭৪

আল-আনোয়ারুল কাশিফাহ লিমা ফি কিতাব “আদওয়া আলাস সুন্নাহ” মিনায যালাল

ওয়াত তাদলিল ওয়াল মুজাজাফাহ (আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-ইয়ামানি) ৭৫

আল-আওয়াইল (আবু হিলাল আল-আসকারি) ৭৬

আমালি আল-কালি (আবু আলি আল-কালি) ৭৭

ইমাম আবু হানিফা কি তাদউইন-এ-কানুন-এ-ইসলামি (ডক্টর হামিদউল্লাহ) ৭৮

ইমতাউল আসমা (তাকিউদ্দিন মাকরিজি) ৭৯

ইমদাদুল ফাতাওয়া (মাওলানা আশরাফ আলী খানভী) ৮০

আনসাবুল আশরাফ (আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি) ৮১

ইনসানি দুনিয়া পার মুসলমানো কে উরুজ-ও-জাওয়াল কা আসার (মাওলানা সৈয়দ আবুল

হাসান আলী নদভী) ৮২

আনোয়ারুল নুজুম (উর্দু তরজমা মাকতুবাত-এ-কাসেমী, আজ মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম

নানুতভী) (মাওলানা আনোয়ারুল হাসান শেরকোটী) ৮৩

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

মৃত্যু সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

২০৩ হি. ১ মাকতাবা শামিলা

.

৩২৮ হি. ১ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, বৈরুত ১৪০৭ হি.-১৯৮৭ খ্রি.

৭৯০ হি. ১ দারু ইবনে আফফান, সৌদি আরব ১৪১২ হি.-১৯৯২ খ্রি.

৩৫৮ হি. ১ দারুল আফাক, বৈরুত ১৪০১ হি.

৭১০ হি. ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়াহ ফিত-তুরাস, মিসর ১৪৩২ হি.-২০১২ খ্রি.

৬৮৩ হি. ৩ মানশুরাত ওয়াজারাতিস সাকাফাহ, সিরিয়া ১৯৯২ খ্রি.

১৩৯২ হি. ৮ দারুল ইলম লিল-মালায়ীন ২০০৩ খ্রি.

৯০৩ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩৪৭ হি. ২৪ দারুল ফিকর, বৈরুত উল্লেখ নেই

৬২৩ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২০ হি.

৭২৫ হি. ১ জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, করাচি উল্লেখ নেই

২০৩ হি. ৮ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৪১০ হি.-১৯৯০ খ্রি.

১৩৯৩ হি.-১৯৭৩ খ্রি. ১ দারুল ফিকরিল আরাবি ১৯৭৮ খ্রি.

২৬০ হি. ১ মাকতাবাতুন নীল, মিসর ১৩২৩ হি.-১৯০৩ খ্রি.

৪৫১ হি. ১ মারকাজুল মালিক ফয়সাল, সৌদি আরব ১৪০২ হি.-১৯৮২ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪২৩ হি.-২০০৩ খ্রি.

৪৬৩ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৫৬২ হি. ১৩ দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়াহ, দাক্ষিণাত্য ১৩৮২ হি.-১৯৬২ খ্রি.

২০৩ হি. ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়াহ উল্লেখ নেই

১৩৮৬ হি. ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৬ হি.-১৯৮৬ খ্রি.

৩৯৫ হি. ১ দারুল বাশির ১৪০৮ হি.

৩৫৬ হি. ৪ দারুল কুতুবিল মিসরিয়াহ ১৩৫২ হি.-১৯৩২ খ্রি.

২০০২ খ্রি. ১ উর্দু একাডেমি, সিন্ধু ১৯৮৩ খ্রি.

৮৩৫ হি. ১৫ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪২০ হি.-১৯৯৯ খ্রি.

১৩৩৩ হি.-১৯১৩ খ্রি. ৬ মাকতাবা দারুল উলুম করাচি ১৪৩১ হি.-২০১০ খ্রি.

৭৬৯ হি. ১৩ দারুল ফিকর, দামেস্ক ১৪১২ হি.-১৯৯২ খ্রি.

১৪১৯ হি.-১৯৯৯ খ্রি. ১ মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি উল্লেখ নেই

১৩৯৬ হি.-১৯৭৬ খ্রি.

.

নাশরানে কুরআন লিমিটেড, লাহোর উল্লেখ নেই

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

৮৪ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সৈয়দ সুলাইমান নদভী

৮৫ আওজাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা ইমাম মালিক শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজির মাদানী

৮৬ ইছারুল হক আলাল খালক ইযযুদ্দিন আল-ইয়ামানী

৮৭ ইযাহুদ দালীল ফি কাতয়ি হুজাজি আহলিত তাতীল বদর উদ্দিন আল-কিনানী আল-হামভী আশ-শাফিঈ

৮৮ ইযাহু শা ওয়াহিদিল ইযাহ আবু আলী আল-ফারসী

বা (ب) বর্ণ

৮৯ আল-বাহরুর রায়েক শরহ কানযুদ দাকায়েক ইবনে নুজাইম আল-মিসরী

৯০ আল-বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর আবু হাইয়ান আন্দালুসী

৯১ আল-বাদ ওয়াল তারিখ আল-মুতাহার বিন আল-তাহির আল-মাকদিসী

৯২ আল-বুলদান (কিতাবুল বুলদান) আহমদ বিন ইসহাক ইয়াকুবী

৯৩ আল-বিনায়াহ শরহ আল-হিদায়াহ বদর উদ্দিন আইনী

৯৪ আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব ইবনে ইযারী আল-মাররাকুশী

৯৫ আল-বায়ান ফি মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ ইয়াহইয়া আল-উমরানী আল-ইয়ামানী

৯৬ বুহস ফি তারিখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ আকরাম জিয়া উমরী

৯৭ বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে আলাউদ্দিন আবু বকর আল-কাসানী

৯৮ বাযলুল মাজহুদ ফি হাল্লি আবি দাউদ মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী

৯৯ বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব কামাল উদ্দিন ইবনুল আদিম

তা (ت) বর্ণ

১০০ আল-আজউয়িবাতুল ফাযিলাহ লিল আসইলাতিল আশরাতিল কামিলাহ (শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ-এর টীকা সহ) মাওলানা আব্দুল হাই লখনভী

১০১ আত-তারিখুল ইসলামী ডক্টর মাহমুদ শাকির

১০২ তুহফাতুত তাহসীল ফি যিকরি রুয়াতিল মারাসীল আবু যুরআ ইবনুল ইরাকী

১০৩ তানভীরুল ঈমান উর্দু তরজমা তালীমুল ঈমান লেখক: ইবনে হাজার হাইতামী (অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল শাকুর)

১০৪ আত-তারিখুল ইসলামী আল-আম আলী ইব্রাহিম হাসান

১০৫ আত-তারিখুল আন্দালুসী মিনাল ফাতহিল ইসলামী হাভা সুকুতি গারনাতা ডক্টর আব্দুর রহমান আলী আল-হাজ্জী

১০৬ আত-তারিখুল আওসাত মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী

১০৭ আত-তারিখুল কবীর (মাহমুদ খলিল-এর টীকা সহ) মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী

১০৮ আত-তারিখুল কবীর লি-ইবনে আবি খাইসামা আস-সাফার আস-সালিস আবু বকর আহমদ বিন আবি খাইসামা

১০৯ আত-তারিখুল কবীর লি-ইবনে আবি খাইসামা আস-সাফার আস-সানি আবু বকর আহমদ বিন আবি খাইসামা

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৭৩ হিজরী ১ মজলিস নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি ১৯৯৭ খ্রি.

১৩০২ হিজরী ১৭ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪২৪ হিজরী - ২০০৩ খ্রি.

৮২০ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৯৮৭ খ্রি.

৩৩৭ হিজরী ১ দারুস সালাম লিত-তিবাহাহ ওয়ান-নাশর, মিশর ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রি.

৬০০ হিজরীর পূর্বে ১ দারুল গারব আল-ইসলামী ১৪০৮ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রি.

বর্ণ 'বা'

- | ৯৭০ হিজরী | ৬ | দারুল কিতাব আল-ইসলামী | উল্লেখ নেই |
- | ৪২৫ হিজরী | ১০ | দারুল ফিকর, বৈরুত | ১৪২০ হিজরী |
- | ৩৫৫ হিজরী | ৬ | মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দ্বীনিয়াহ, মিশর | উল্লেখ নেই |
- | ২৯২ হিজরী | ১ | দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ | ১৪২২ হিজরী |
- | ৮৫৫ হিজরী | ১৩ | দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ | ১৪২০ হিজরী - ২০০০ খ্রি. |
- | ৬৯২ হিজরী | ২ | দারুস সাকাফাহ, বৈরুত | ১৯৮৩ খ্রি. |
- | ৫৫৮ হিজরী | ১৩ | দারুল মিনহাজ, জেদা | ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রি. |
- | সমসাময়িক | ১ | বিসাত, বৈরুত | ১৯৭২ খ্রি. |
- | ৫৮৭ হিজরী | ৭ | দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ | ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রি. |
- | ১৩৩৬ হিজরী | ২০ | দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ | উল্লেখ নেই |
- | ৬৬০ হিজরী | ১২ | দারুল ফিকর | উল্লেখ নেই |

বর্ণ 'তা'

- | উল্লেখ নেই | ১ | হালব | উল্লেখ নেই |
- | ৪০১ হিজরী | ২২ | আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরুত | ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রি. |
- | ৮২৬ হিজরী | উল্লেখ নেই | মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ | উল্লেখ নেই |
- | ৯৭৪ হিজরী | ১ | আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়াহ, লাহোর | উল্লেখ নেই |
- | বিংশ শতাব্দী | উল্লেখ নেই | মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়াহ | ১৯৬৩ খ্রি. |
- | সমসাময়িক | ১ | দারুল কলম, দামেস্ক | ১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রি. |
- | ৪৫৬ হিজরী | ২ | দারু ইহয়াইত তুরাস, হালব, কায়রো | ১৩৯৭ হিজরী - ১৯৭৭ খ্রি. |
- | ৪৫৬ হিজরী | ৮ | মাতবাহাহ উসমানিয়াহ, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য | উল্লেখ নেই |
- | ২৭৯ হিজরী | ৩ | আল-ফারুক আল-হাদিসিয়াহ, কায়রো | ১৪২৭ হিজরী - ২০০৬ খ্রি. |
- | ২৭৯ হিজরী | ২ | আল-ফারুক আল-হাদিসিয়াহ, কায়রো | ১৪২৭ হিজরী - ২০০৬ খ্রি. |

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

১১০. আত-তাবসির ফিদ দ্বীন ওয়া তাময়ীযুল ফিরাকিন নাজিয়া মিনাল ফিরাকিল হালিকীন
..... তাহের বিন মুহাম্মদ আল-ইসফারায়িনী
১১১. আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর শেখ মুহাম্মদ বিন তাহের আল-আশুর
১১২. আত-তুহফাতুল মাকদিসিয়্যাহ ফি মুখতাসার তারিখিন নাসরানিয়্যাহ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসি
১১৩. আত-তাকিরাতুল হামদুনিয়্যাহ ইবনে হামদুন, বাহাউদ্দিন আল-বাগদাদী
১১৪. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব আব্দুল আজিম আল-মুনযিরী
১১৫. আত-তাহরীউল জিনায়িল ইসলামী মুকারানাম বিল কানুনিল ওয়াদয়ী আব্দুল কাদির আওদাহ
১১৬. আত-তা'দীল ওয়াত তাজরীহ লিমান খারাজা লাহ আল-বুখারী ফিল জামিউস সহীহ
..... আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী
১১৭. আত-তাকসীরুল ওয়াসীত ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী
১১৮. আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর ইয়াহইয়া বিন শরাফ আন-নববী
১১৯. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর আলা তাহরীরিল কামাল ইবনুল হুমাম ইবনে আমীর হাজ, ইবনুল মুওয়াক্কিত আল-হানাফী
১২০. আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ শারহ মুকাদিমাতি ইবনিস সালাহ যয়নুদ্দীন আল-ইরাকী
১২১. আত-তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল ওয়া মা'রিফাতিস সিকাত ওয়াদ দুয়াফা ওয়াল মাজাহীল ইবনে কাসীর দামেশকী
১২২. আত-তালখীসুল হাবীর ফি তাখরীজি আহাদীসির রাফিয়িল কাবীর ইবনে হাজার আল-আসকালানী
১২৩. আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ ইবনে আব্দুল বার আল-কুরতুবী
১২৪. আত-তানবীহ ওয়াল ইশরাফ আবুল হাসান আলী আল-মাসউদী
১২৫. আত-তানবীহ ওয়ার রাদু আলা আহলিল আহওয়াযি ওয়াল বিদা' আবুল হুসাইন আল-মালাতী আল-আসকালানী
১২৬. তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস মুরতাজা আয-যাবীদী
১২৭. তারিখে ইসলাম শাহ মুঈনুদ্দীন নদভী
১২৮. তারিখে দামেশক (৭৪ খণ্ড মূল পাঠ, ৬ খণ্ড সূচি) হাফেজ ইবনে আসাকির
১২৯. তারিখে সিন্ধু আব্দুল হালীম শারার
১৩০. তারিখে সিন্ধু (গবেষণা: ডক্টর উমর বিন মুহাম্মদ দাউদ পোতা) মীর মাসুম শাহ বকরী
১৩১. তারিখে ইবনে খালদুন ওয়া মুকাদিমা আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন
১৩২. তারিখে ইবনে মাঈন (রিওয়ায়াতুদ দুরী) ইয়াহইয়া বিন মাঈন
১৩৩. তারিখে ইবনে ইউনুস আল-মিসরী আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস আল-মিসরী
১৩৪. তারিখে আবি যুরআহ আদ-দামেশকী আবু যুরআহ আদ-দামেশকী
১৩৫. তারিখে ইসলাম আকবর শাহ নজীবাবাদী

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৭১ হিজরী ১ আলম আল-কুতুব, লেবানন ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ৩০ তিউনিস ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৫৬২ হিজরী ৩০ দার সাদির, বৈরুত ১৩১৭ হিজরী

৬৯৬ হিজরী ৪ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৩১৭ হিজরী

৭১৩ হিজরী ২ দার আল-কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭১৩ হিজরী ৩ দার আল-লিওয়া, রিয়াদ ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ দার আল-ফিকর ১৩২৩ হিজরী

৭৬৭ হিজরী ১ দার আল-কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৮৬৯ হিজরী ৩ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮০৬ হিজরী ১ মাকতাবা আস-সালাফিয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৮৯ হিজরী - ১৯৬৯
খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৩ হিজরী ৪ মারকাজ আন-নুমান, ইয়েমেন ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫২ হিজরী ৪ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩১৩ হিজরী ২৪ মরক্কোর সাধারণ ওয়াকফ ও ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩৮৭ হিজরী

৩৩২ হিজরী ১ দার আস-সাদি, কায়রো উল্লেখ নেই

৩৭৭ হিজরী ১ আল-মাকতাবা আল-আযহারিয়াহ, মিশর উল্লেখ নেই

১২০৫ হিজরী ৪০ দার আল-হিদায়াহ উল্লেখ নেই

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ ২ দার আল-ইশাআত উল্লেখ নেই

১৭০ হিজরী ৮০ দার আল-ফিকর ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ ১ দিল গুদাজ প্রেস, লক্ষৌ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩৩ হিজরী ১ মারকাজ তাহকিকাত, ইসফাহান উল্লেখ নেই

৮০৮ হিজরী ৮ দার আল-ফিকর, বৈরুত ১৪০৮ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

২৩৩ হিজরী ৪ মারকাজ আল-বাহাস আল-ইলমি, মক্কা আল-মুকাররামা ১৩৯৯ হিজরী -
১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩৪ হিজরী ২ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৩২১ হিজরী

২৮১ হিজরী ১ মাজমা আল-লুগাহ আল-আরাবিয়াহ, দামেস্ক উল্লেখ নেই

বিংশ শতাব্দী ৩ নারফিস একাডেমি, করাচি ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম (তাহকীক বাশার) - অধিকাংশ
স্থানে তারিখুল ইসলাম তাদমুরি সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু স্থানে বাশার সংস্করণও
ব্যবহৃত হয়েছে। ‘ত তাদমুরি’ প্রথম উল্লিখিত এবং ‘ত বাশার’ দ্বিতীয় উল্লিখিত এর চিহ্ন
..... শামসুদ্দিন আয-যাহাবি ১৩৬

তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম (তাহকীক তাদমুরি)
শামসুদ্দিন আয-যাহাবি ১৩৭

তারিখুল খুলাফা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি ১৩৮

তারিখুল খামিস ফি আহওয়ালি আনফাসিন নাফিস হুসাইন বিন মুহাম্মদ আদ-দিয়ার
বাকরি ১৩৯

তারিখুল তাবারি (তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক) ইবনে জারির আত-তাবারি ১৪০

তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস ডক্টর খলিল ইব্রাহিম আস-সামারাই
১৪১

তারিখুল ফিকর আদ-দ্বীনি আল-জাহিলি মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-ফাইয়ুমি ১৪২

তারিখুল মদিনা উমর বিন শাববাহ ১৪৩

তারিখুল আন্দালুস মাওলানা রিয়াসাত আলী নদভী ১৪৪

তারিখ-ই-বাররে সাগির প্রফেসর এম. এ. জামিল ১৪৫

তারিখ-ই-বাগদাদ, ওয়া ইউলাহ খতিব আবু বকর আল-বাগদাদি ১৪৬

তারিখ-ই-দাওয়াত ওয়া আজিমত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ১৪৭

তারিখ-ই-দামেস্ক ইবনে কালানিসি, হামজা বিন আসাদ ১৪৮

তারিখ-ই-ফালাসিফাতুল ইসলাম মুহাম্মদ লুতফি জুমা ১৪৯

তারিখ-ই-মক্কা আল-মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদুল হারাম ওয়াল মদিনাতুশ শরিফাহ ওয়াল
কাবরুশ শরিফ ইবনে জিয়া আল-মাক্কি আল-হানাফি ১৫০

তারিখ-ই-হিন্দ ডক্টর মাকসুদ চৌধুরী ১৫১

তারিখ-ই-ইয়াকুবি আহমদ বিন ইসহাক ইয়াকুবি ১৫২

তালিফাত-ই-রশিদীয়া মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী ১৫৩

তাবিইদুস সাহিফাহ বি মানাকিবি আবি হানিফাহ জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি ১৫৪

ততিম্মাতু সোয়ানিল হিকমাহ ইবনে ফান্দুক ১৫৫

তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম ইবনে মিসকাওয়াইহ ১৫৬

তাহরিরু উলুমিল হাদিস আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুদি ১৫৭

তুহফাতুল ফুকাহা আবু বকর আলাউদ্দিন আস-সামারকান্দি ১৫৮

তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া (উর্দু) শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদিস দেহলভী, অনুবাদ:

মাওলানা খলিলুর রহমান নোমানী মাজাহিরি ১৫৯

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ (অষ্টম খণ্ড)

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৭৩৮ হি. ১৫ দারুল গারব আল-ইসলামী ২০০৩ খ্রি.

৭৩৮ হি. ৫২ দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৯১১ হি. ১ মাকতাবা নিযার ১৪২৫ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৯৬৬ হি. ২ দার সাদির উল্লেখ নেই

৩১০ হি. ১১ দারুল মাআরিফ মিসর, দারুত তুরাস বৈরুত ১৩৮৭ হি.

সমসাময়িক ১ দারুল কুতুব আল-জাদিদাহ, বৈরুত ২০০০ খ্রি.

১৩২৭ হি. ১ দারুল ফিকর আল-আরাবি ১৪১৫ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৬২ হি. ৪ সাইয়েদ হাবিব জেদ্দা ১৩৯৯ হি.

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী ১ মাকতাবা দারুল কুতুব, লাহোর ২০০৩ খ্রি.

৭৬৬ হি. ১ জিল পাবলিশার্স, করাচি ১৯৮৬ খ্রি.

৪৬৩ হি. ২৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৭ হি.

১৩১৯ হি. ৮ মজলিস নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি উল্লেখ নেই

৫৫৫ হি. ১ দারুল ইহসান, দামেস্ক ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী ১ মুয়াসসাসাতু হিন্দাউয়ি, মিসর ২০১২ খ্রি.

৮৫৩ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৯৮৬ খ্রি. ১ মাকসুদ এন্ড সন্স, করাচি ১৯৮৫ খ্রি.

৩৯২ হি. ১ মাকতাবা শামিলা

.

১৩২৩ হি. ১ ইদারা-ই-ইসলামিয়াত, লাহোর ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৯১১ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

৫৬৫ হি. ১ মাকতাবা শামিলা

.

৪২১ হি. ৭ সরুশ, তেহরান ২০০০ খ্রি.

.

২ মুয়াসসাসাতুর রায়ান, বৈরুত ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৫৩০ হি. ৩ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

.

১ আলমি মজলিস তাহাফফুজে ইসলাম, পাকিস্তান উল্লেখ নেই

তারিখে উম্মতে মুসলিমা সপ্তম খণ্ড

১৬০. তাহকীকু মুনিফুর রুতবা ফি সাবতি লিশ-শারিফিস সাহবা সালাহউদ্দীন আলায়ী
আদ-দিমাশকী

১৬১. তাদরীবুর রাবী ফি শারহি তাকরীবিন নাওয়াবী জালালুদ্দীন সুয়ুতী

১৬২. তাযকিরাতুল হুফফাজ (তাবাকাতুল হুফফাজ) হাফেজ যাহাবী

১৬৩. তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক কাযী আইয়ায বিন মুসা আল-
মালিকী

১৬৪. তারজুমানুল কুরআন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

১৬৫. তাতহীরুল ইতিকাদ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আস-সানআনী/আমীর ইয়ামানী
মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী

১৬৬. তা'জীলুল মানফায়াহ বি-যাওয়াইদি রিজালিল আইম্মাতিল আরবাআহ ইবনে
হাজার আল-আসকালানী

১৬৭. তা'জীম কদরিস সালাত মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী

১৬৮. তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ইবনে আবি হাতিম আর-রাযী

১৬৯. তাফসীর ইবনে কাসীর হাফেজ ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী

১৭০. তাফসীরুল আলুসী (তাফসীর রুহুল মাআনী) শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলুসী

১৭১. তাফসীরুল রাযী (মাফাতিহুল গায়েব) ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী

১৭২. তাফসীরুল তাবারী (জামি'উল বায়ান) ইবনে জারীর আত-তাবারী

১৭৩. তাফসীরুল কুরতুবী (আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন) শামসুদ্দীন আল-
আনসারী আল-কুরতুবী

১৭৪. তাফসীরুল সা'লাবী আবু ইসহাক আস-সা'লাবী

১৭৫. তাফসীরুল আবদুর রাজ্জাক আবদুর রাজ্জাক বিন হান্মাম আস-সানআনী

১৭৬. তাফহীমুল বুখারী মাওলানা জহরুল বারী আল-আজমী

১৭৭. তাকরীবুল তাহযীব ইবনে হাজার আল-আসকালানী

১৭৮. তাকরীরে বুখারী শরীফ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া
কান্কালাভী

১৭৯. তাকভীমে আহদে নববী আলী মুহাম্মদ খান

১৮০. তাকভীমে তারীখী মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী

১৮১. তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী

১৮২. তালখীসুল মুশতাবিহ ফির রাসম খতীব আবু বকর আল-বাগদাদী

১৮৩. তালখীসু কিতাবিল ইস্তিগাসাহ (আল-ইস্তিগাসাহ আর-রাদু আলাল বকরী লি-ইবনে
তাইমিয়াহ) হাফেজ ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী

১৮৪. তালকীহু ফুহুমি আহলিল আসার ফি উয়ুনিত তারীখি ওয়াস সিয়াহ আবদুর
রহমান ইবনুল জাওয়ী

১৮৫. তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালায়েল আবু বকর বাকিল্লানী

১৮৬. তাহযীবুল আসার ইবনে জারীর আত-তাবারী

১৮৭. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত মহিউদ্দীন শরফ আন-নাওয়াবী

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৭৬১ হিজরী - দারুল আসিমা, রিয়াদ ১৪১০ হিজরী

৯১১ হিজরী ২ দারু তাইয়েবা উল্লেখ নেই

৭৪৮ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩২ হিজরী ৬ মাতবাআ ফাদালা, মরক্কো ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

• ৩ ইসলামী একাডেমি, লাহোর উল্লেখ নেই

১১৮২ হিজরী - ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ ১ মাতবাআ সাফির, রিয়াদ ১৪২২ হিজরী

৮৫২ হিজরী ২ দারুল বাশায়ের, বৈরুত ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

২৯৩ হিজরী ২ মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৬ হিজরী

৩২৭ হিজরী ৩ মাকতাবাতু নিযার, সৌদি আরব ১৪১৯ হিজরী

৭৬৩ হিজরী ৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৯ হিজরী

১২৮০ হিজরী ১৬ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

৬০৭ হিজরী ৩২ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২০ হিজরী

৩১০ হিজরী ২৪ দারু হিজর ১৪২২ হিজরী

৫৬১ হিজরী ১০ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৩৮৩ হিজরী -

১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪২৬ হিজরী ১০ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি ১৪২৩ হিজরী - ২০০২

খ্রিষ্টাব্দ

২১১ হিজরী ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৯ হিজরী

সমসাময়িক ৩ দারুল ইশাআত, করাচি উল্লেখ নেই

৮৫২ হিজরী ১ দারুল রশীদ, সিরিয়া ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

১৩০২ হিজরী ৪ মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি উল্লেখ নেই

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ ১ ডক্টর নূর মুহাম্মদ ইউসুফ জাই, করাচি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

• ১ ইদারা তাহকিকাত-ই-ইসলামিয়া, ইসলামাবাদ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ২ মাকতাবাতু দারুল উলুম, করাচি উল্লেখ নেই

৪৬৩ হিজরী ১ তলাস লিদ-দিরাসাত ওয়ান-নাশর, দামেস্ক ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬৩ হিজরী ১ মাকতাবাতুল গুরবা আল-আসারিইয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪১৭ হিজরী

৫৯৭ হিজরী ১ শারিকাতু দারিল আরকাম, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

২০৩ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, লেবানন ১৪০৭ হিজরী

- ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩১০ হিজরী ৩ মাতবাআ আল-মাদানি, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৬২ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

১৮৮ তাহযীবুত তাহযীব ইবনে হাজার আসকালানী

১৮৯ তাহযীবুল কামাল আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী

১৯০ তাহযীবুল লুগাহ আবু মানসুর আল-আযহারী আল-হারাবী

১৯১ তাওযীহুল আফকার লি-মাআনী তানকীহিল আনযার আমীর ইযযুদ্দীন সানআনী

১৯২ তাওযীহুল মুশতাবিহ ফী যাবতি আসমায়ির রুওয়াত ওয়া আনসাবিহিম ওয়া আলকাবিহিম ওয়া কুনা-হুম আবু বকর ইবনে নাসিরুদ্দীন

হরফ সা (ث)

১৯৩ আস-সিকাত (মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস) আবুল হাসান আহমদ বিন সালিহ আল-ইজলী আল-কুফী

১৯৪ আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান ইবনে হিব্বান আল-বুস্তী

১৯৫ আস-সিকাত মিন্মান লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিভাহ আল-কাসিম বিন কুতলুবুগা

১৯৬ সিমারুল কুলুব ফিল মুদাফ ওয়াল মানসুব আবু মানসুর আস-সাআলাবী

হরফ জীম (ج)

১৯৭ আল-জামি' লি-ইবনে ওয়াহাব আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব

১৯৮ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল ইবনে আবী হাতিম আর-রাযী

১৯৯ আল-জিহাদ আবু বকর ইবনে আবী আসিম আশ-শায়বানী

২০০ আল-জাওয়াবুস সহীহ লি-মান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

২০১ আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়াহ আব্দুল কাদির মুহিউদ্দীন আল-হানাফী

২০২ আল-জাওয়াহিরাতুন নাইয়্যিরাহ আলা মুখতাসারিল কুদুরী আবু বকর বিন আলী আল-হাদ্দাদী আয-যাবীদী

২০৩ আল-জাওয়াহিরাহ ফী নাসাবিন নাবী ওয়া আসহাবিহিল আশারাহ মুহাম্মদ বিন আবী বকর আল-বাররী আত-তিলিমসানী

২০৪ জামিউল আহাদীস জালালুদ্দীন সুযুতী

২০৫ জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল মাজদুদ্দীন ইবনুল আসীর আল-জায়ারী

২০৬ জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান হাফিজ ইবনে কাসীর

২০৭ জামিউল মাসায়িল আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

২০৮ জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহ ইবনে আব্দুল বার

২০৯ জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস আবু আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদী

২১০ জামউল কুরআন হিফযান ওয়া কিতাবাতান ডক্টর আলী বিন সুলাইমান আল-উবাইদ

২১১ জামহারাতু আনসাবিল আরব ইবনে হাযম আয-যাহেরী

২১২ জাওয়ামিউস সীরাতিন নাবাবিয়াহ ইবনে হাযম আয-যাহেরী

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

মৃত্যু সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৮৫২ হি. ১২ মাতবা নিজামিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩২২ হি.

৭২৪ হি. ৩৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.

৫৩০ হি. ৮ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি ২০০১ খ্রি.

১১৮২ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৮৩২ হি. ১০ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৯৯৩ খ্রি.

হরফ সা

৫৬১ হি. ২ মাকতাবাতুদ দারুল মদিনাতুল মুনাওয়ারা ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.

৩৯৩ হি. ৯ মাতবা নিজামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খ্রি.

৫৮৯ হি. ৮ মারকাযুন নুমান, ইয়েমেন ১৪৩২ হি. - ২০১১ খ্রি.

৪২৯ হি. ১ দারুল মাতারিফ, কায়রো উল্লেখ নেই

হরফ জিম

৫৯৭ হি. ১ দারুল ওয়াফা ১৪২৫ হি. - ২০০৫ খ্রি.

৩২৭ হি. ৯ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি ১৯৫২ খ্রি.

২৮৭ হি. ২ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনাতুল মুনাওয়ারা ১৪০৯ হি.

৭২৮ হি. ৬ দারুল আসিমা, রিয়াদ ১৪১৩ হি.

৭৭৫ হি. ২ মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি উল্লেখ নেই

৮০০ হি. ২ আল-মাতবাউল খাইরিয়্যাহ ১৩০০ হি.

৬৩৫ হি. - দারুল রিফায়ি, রিয়াদ ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৯১১ হি. ১৩ ডক্টর হাসান আব্বাস জাকি মাকতাবা শামিলা

৬০২ হি. ১২ মাকতাবাতু দারুল বায়ান ১৩৯২ হি. - ১৯৭২ খ্রি.

৭৭৩ হি. ১০ দারু খিজর, বৈরুত ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৭২৮ হি. ৬ দারু আলমিল ফাওয়াইদ ১৪২২ হি.

৪৬৩ হি. ২ দারু ইবনিল জাওজি, সৌদি আরব ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৪৪৪ হি. ১ আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৯৯৬ খ্রি.

• ১ মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনাতুল মুনাওয়ারা উল্লেখ নেই

৪৫৬ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৪৫৬ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

সপ্তম খণ্ড

{বর্ণ: হ (ح)}

২১৩. আল-হাভী আল-কাবীর শারহ মুখতাসার আল-মুযানী ইমাম আলী বিন মুহাম্মদ

আল-মাওয়ারদী

২১৪. আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মদিনা মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানী

২১৫. আল-হিসবাহ ওয়াস-সিয়াসাহ আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

২১৬. আল-হায়ওয়ান (কিতাবুল হায়ওয়ান) আমর বিন বাহর, আবু উসমান আল-জাহিজ

২১৭. হুসনুল মুহাদারা জালালুদ্দিন সুয়ুতী

২১৮. হাকীকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহ জালালুদ্দিন সুয়ুতী

২১৯. হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া আবু নুয়াইম আল-ইসফাহানী

২২০. হয়াতুস সাহাবা (আরবি) মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী

{বর্ণ: খা (خ)}

২২১. আল-খারাজ (কিতাবুল খারাজ) কাজী আবু ইউসুফ

{বর্ণ: দাল (د)}

২২২. দিরাসাত তারিখিয়াহ আকরাম জিয়া উমারী

২২৩. দালায়েলুন নুবুওয়াহ আবু বকর আল-বাইহাকী

২২৪. আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদিসিল হিদায়াহ ইবনে হাজার আসকালানী

২২৫. দিওয়ানুল হামাসাহ আবু তাম্মাম

২২৬. দুওয়ালুল ইসলাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবী

২২৭. দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইনান আল-মিসরী

২২৮. আদ-দীবাযুল মুযাহ্‌হাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ান উলামাইল মাযহাব ইবনে ফারহন আল-মালেকী

২২৯. আদ-দারারী ফীয যারারী (তাযকিরাতুল আব্বা ওয়া তাসলিয়াতুল আব্বা) ইবনে আদিম আল-হালাবী

২৩০. আদ-দীবাযুল মুযাহ্‌হাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ান উলামাইল মাযহাব ইবনে ফারহন আল-মালেকী

২৩১. আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী

{বর্ণ: যাল (ذ)}

২৩২. আয-যুররিয়াতুত তাহিরাহ আবু বিশর আল-আনসারী আদ-দুলাবী

{বর্ণ: রা (ر)}

২৩৩. আর-রিহলাহ ফী তলাবিল হাদীস আবু বকর খতিব বাগদাদী

২৩৪. আর-রাহীকুল মাখতূম মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী

২৩৫. আর-রাদ্দু আলা মান কালা বিফানা-ইল জান্নাতি ওয়ান নার আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

তারীখে উন্মতে মুসলিমা

খণ্ড: দ্বিতীয়

মৃত্যু সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

হরফ হা (ح)

৪৫০ হি. ১৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

১৮৯ হি. ৪ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হি.

৭২৮ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

২৫৫ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪২২ হি.

৯১১ হি. ২ দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়াহ ১৩৮৭ হি. - ১৯৬৭ খ্রি.

৯১১ হি. ১ মাতাবিউর রশীদ ১৪০৯ হি.

৩৩০ হি. ১২ আস-সাআদাহ ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খ্রি.

১৩৮৩ হি. ৫ মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

হরফ খা (خ)

১৮২ হি. ১ আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়াহ, মিসর উল্লেখ নেই

হরফ দাল (د)

সমসাময়িক ১ আল-মাজলিসুল আ'লা, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৩৫৮ হি. ৭ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০৫ হি.

৮৫২ হি. ২ দারুল মারিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৪২১ হি. ১ মাকতাবাতুল বুশরা ১৪৩২ হি. - ২০১১ খ্রি.

৭৩৮ হি. এর পর ২ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৯ খ্রি.

১৩০৬ হি. ৫ মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৭৯৯ হি. ২ দারুত তুরাস, কায়রো উল্লেখ নেই

৬৬০ হি. ১ দারুল হিদায়াহ ১৪০২ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৭৯৯ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মুআসসাসাতু ইকরা, কায়রো ১৪২৭ হি. - ২০০৬ খ্রি.

হরফ যাল (ذ)

৩১০ হি. ১ আদ-দারুস সালাফিয়াহ, কুয়েত ১৪০৭ হি.

হরফ রা (ر)

৩৬৩ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৩৯৫ হি.

২০০৬ খ্রি. ১ আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়াহ, লাহোর ১৪২৪ হি. - ২০০৯ খ্রি.

৭২৮ হি. ১ দারু বিলকিস, রিয়াদ ১৪১৫ হি. - ১৯৯৬ খ্রি.

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং | কিতাবের নাম লেখক

২৩৬ আল-রাসায়েল আমর বিন বাহর আবু উসমান আল-জাহিজ

২৩৭ আল-রাফ' ওয়া আল-তাকমিল মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী

২৩৮ আল-রওদ আল-উনুফ (তাহকীক: ওমর আব্দুস সালাম সালামি) আবুল কাসিম আল-সুহাইলি

২৩৯ আল-রওদ আল-বাসিম ফি তারাজিম শুযুখ আল-হাকিম নায়েফ বিন সালাহ আল-মানসুরি

২৪০ আল-রওদ আল-মিতার ফি খবর আল-আকতার আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-হিময়ারি

২৪১ আল-রিয়াদ আল-নাদিরা ফি মানাকিব আল-আশারা মুহিব আল-দীন আল-তাবারী

২৪২ রা'স আল-হুসাইন আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

২৪৩ রিজাল আল-কাশশি (ইখতিয়ার মা'রিফাত আল-রিজাল) নতুন সংস্করণ লেখক:

মুহাম্মাদ বিন ওমর বিন আব্দুল আজিজ আল-কাশশি (মৃ. ৩৫০ হি.) বিন্যাস ও তাহযীব:

আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আল-তুসী (মৃ. ৪৬০ হি.)

২৪৪ রিজাল আল-কাশশি (ইখতিয়ার মা'রিফাত আল-রিজাল) পুরাতন সংস্করণ লেখক:

মুহাম্মাদ বিন ওমর বিন আব্দুল আজিজ আল-কাশশি (মৃ. ৩৫০ হি.) বিন্যাস ও তাহযীব:

আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আল-তুসী (মৃ. ৪৬০ হি.)

২৪৫ রাহমাতুল্লিল আলামিন কাজী সালমান মনসুরপুরী

২৪৬ রাদ্দ আল-মুহতার আলা আল-দুর আল-মুখতার মুহাম্মাদ আমিন ইবনে আবিদিন

আল-দিমাশকি

২৪৭ রিসালাহ আবি দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানি

২৪৮ রিসালাহ তুরুক হাদিস মান কুনতু মাওলাহ হাফিজ যাহাবী

২৪৯ রাফ' আল-আস্তার ইজ্জুদীন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-সানআনি আমির

ইয়ামানি

২৫০ রওদাতুল আখইয়ার আল-মুনতাখাব মিন রাবি' আল-আবরার মুহিউদ্দীন আল-

খতিব আবুল কাসিম

২৫১ রিয়াদ আল-নুফুস আবু বকর আব্দুল্লাহ আল-মালিকি

বর্ণ: য

২৫২ আল-যুহদ (কিতাব আল-যুহদ) আহমদ বিন হাম্বল

২৫৩ আল-যুহদ আল-কাবীর আবু বকর বায়হাকী

২৫৪ আল-যুহদ ওয়া আল-রাকায়েক (কিতাব আল-যুহদ) আব্দুল্লাহ বিন মুবারক

২৫৫ যাদ আল-মা'আদ ফি হাদয়ি খায়রিল ইবাদ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ

২৫৬ যাহরুল আকাম ফিল আমসাল ওয়াল হিকাম নুরুদ্দীন আল-ইউসি

বর্ণ: স

২৫৭ আস-সুন্নাহ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

২৫৫ হি. ৪ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ১৩৮৩ হি. - ১৯৬৩ খ্রি.

১৩০৪ হি. ১ কুতুবুল মাতবুয়াত আল-ইসলামিয়া, আলেপ্পো ১৪০৭ হি.

৫৮১ হি. ৭ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২১ হি. - ২০০০ খ্রি.

সমসাময়িক ২ দারুল আসিমা লিন-নাশর, রিয়াদ ১৪৩২ হি. - ২০১১ খ্রি.

৯০০ হি. ১ মুয়াসসাসাতু নাসির লিস-সাকাফাহ, বৈরুত ১৯৮০ খ্রি.

৬৯৩ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৭২৮ হি. ১

১ মুয়াসসাসাতুন নাশরিল ইসলামি, কোম, ইরান ১৪২৭ হি.

১ দানিশগাহ, মাশহাদ

৯৩০ হি. ২ মারকাযুল হারামাইন আল-ইসলামি, ফয়সালাবাদ ২০০৭ খ্রি.

১২৫২ হি. ৬ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

২৭৫ হি. ১ দারুল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৩৮ হি. ১ মাকতাবাতু শামিলা

১১৪২ হি. ১ আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত ১৪০৫ হি.

৯৩০ হি. ১ দারুল কলাম আল-আরাবি, আলেপ্পো ১৪২৩ হি.

৩৬০ হিজরির পর ২ দারুল গারব আল-ইসলামি ১৪০৩ হি. - ১৯৮২ খ্রি.

হরফ ‘যা’

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

২৩১ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

৩৫৮ হি. ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবুস সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯৬ খ্রি.

১৮১ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৫৬১ হি. ৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৫ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.

১১০২ হি. ৩ আশ-শারিকাতুল জাদিদাহ, মরক্কো ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খ্রি.

হরফ ‘সিন’

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

২৯০ হি. ২ দারু ইবনিল কায়্যিম, দাম্মাম ১৪০৬ হি.

তারীখে উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

২৫৮ আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী

২৫৯ আস-সুনানুল সাগীর আবু বকর আল-বায়হাকী

২৬০ আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী আবু বকর আল-বায়হাকী

২৬১ আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী

২৬২ আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আবুল হাসান আলী আন-নাদভী

২৬৩ আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ ইবনে হিব্বান আল-বুসতী

২৬৪ আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী

২৬৫ আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস-সহীহাহ (মুহাওলাতু তাতবিকি কাওয়াইদিল মুহাদ্দিসিনা ফি নাকদি রিওয়ায়াতিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ) ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমরী

২৬৬ আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ মিনাল বিদায়া ওয়ান নিহায়া হাফিজ ইবনে কাসীর

২৬৭ আস-সিরাতু ওয়াদ দাওয়াতু ফিল আহদিল মাদানী আহমদ গালুশ

২৬৮ আস-সাইফুল মাসলুল আলা মান সাব্বার রাসূল তাকিউদ্দীন বিন আব্দুল কাফী
আস-সুবকী

২৬৯ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী

২৭০ সিমতুজ নুজুমিল আওয়ালা ফি আনবায়িল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালী আব্দুল মালিক আল-ইসামী আল-মাক্কী

২৭১ সুনানে ইবনে মাজাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী

২৭২ সুনানে আবু দাউদ আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস আস-সিজিস্তানী

২৭৩ সুনানে তিরমিযী মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী

২৭৪ সুনানে দারা কুতনী আবুল হাসান আদ-দারা কুতনী

২৭৫ সুনানে দারেমী আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী

২৭৬ সুনানে সাঈদ বিন মানসুর সাঈদ বিন মানসুর শুবা আল-খুরাসানী

২৭৭ সুনানে নাসায়ী (আল-মুজতাবা) আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী

২৭৮ সুয়ালাতুল আজুররী লি আবি দাউদ আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী

২৭৯ সিয়রু আলামিন নুবালা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী

২৮০ সিরাতে ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার আল-মাদানী

২৮১ সিরাতে ইবনে হিশাম আব্দুল মালিক বিন হিশাম

২৮২ সিরাতুন নবী আল্লামা শিবলী নোমানী

২৮৩ সিরাতে খাতামুল আশ্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুফতি মুহাম্মদ শফী

২৮৪ সিরাতে খুলাফায়ে রাশেদীন মাওলানা আব্দুশ শাকুর লখনভী ফারুকী

২৮৫ সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম আল-মিসরী

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - সপ্তম খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৩০৩ হিজরী ১২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২১ হিজরী - ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫৮ হিজরী ৪ জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, করাচি ১৪১০ হিজরী - ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫৮ হিজরী ১০ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩২ হিজরী ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৩২৭ হিজরী

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ১ দাওয়াত ও ফিকর ১৪০০ হিজরী

৩৯৩ হিজরী ২ আল-কুতুবুস সাকাফিয়াহ, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী

সমসাময়িক ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪২৯ হিজরী - ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ২ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৩ হিজরী ৪ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৩৯৫ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬১ হিজরী ১ দারুল ফাতহ, আম্মান, জর্ডান ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

৯৩২ হিজরী ১২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

১১১১ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৭ হিজরী ২ দারুল ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়াহ উল্লেখ নেই

৭৬৫ হিজরী ৪ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, সিদা, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৬৯ হিজরী ৫ মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

৩৮৫ হিজরী ৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৫৫ হিজরী ৪ দারুল মুগনি, সৌদি আরব ১৪১২ হিজরী

৭২৭ হিজরী ২ দারুস সালাফিয়াহ, ভারত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৩ হিজরী ৮ কুতুবুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়াহ, হালাব ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৯৯ হিজরী - ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৮ হিজরী ২৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৫১ হিজরী ১ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৩৯৮ হিজরী - ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

৫১৩ হিজরী ২ মাতবা মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো ১৩৭৫ হিজরী - ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ ৭ দ্বীনি কুতুবখানা, লাহোর ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৯২ হিজরী - ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ ১ দারুল ইশাআত, করাচি উল্লেখ নেই

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ ১ কুতুবখানা মাজিদিয়া, মুলতান উল্লেখ নেই

২১২ হিজরী ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

২৮৬. সীরাত ওয়া মানাকিব উমর বিন আব্দুল আজিজ ইবনুল জাওযী

হরফ শীন

২৮৭. শাযারাতুয যাহাব ফী খবর মান যাহাব ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী

২৮৮. শরীয়ত ও তরিকত কা তালাযুম শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী

২৮৯. আশ-শাযাল ফায়্যাহ মিন উলূম ইবনিল সালাহ লি আবি ইসহাক আল-আবনাদী

২৯০. আশ-শরীয়াহ আবু বকর আল-আজুরী আল-বাগদাদী

২৯১. আশ-শিফা বিতারিফ হুকুকিল মুস্তফা আল-কাজী আইয়ায বিন মুসা ইয়াহসুবি

২৯২. আশ-শামারিখ ফী ইলমিত তারিখ জালালুদ্দীন সুয়ুতী

২৯৩. আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়াহ (শামাইলুত তিরমিযী) মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী

২৯৪. আশ-শীআহ ওয়াত তাশাইয়ু ইহসান ইলাহী জহীর

২৯৫. শরহে আকায়েদে নাসাফী সা'দুদ্দীন তাফতযানী

২৯৬. শরহুল আরবাঈন আন-নববিয়াহ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

২৯৭. শরহত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা - আলফিয়াতুল ইরাকী আল-হাফিয যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী

২৯৮. শরহয যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ আবু আব্দুল্লাহ আয-যুরকানী আল-মালিকী

২৯৯. শরহস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ ইবনুল ফাররা আল-বাগভী

৩০০. শরহস সুন্নাহ ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া আল-মুযানী

৩০১. শরহে সহীহ মুসলিম (আল-মিনহাজ) ইমাম শরফ আন-নববী

৩০২. শরহে উকূদে রাসমিল মুফতী আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী

৩০৩. শরহে মুশকিলিল আসার আবু জাফর আত-তাহাবী

৩০৪. শরহে মাআনিল আসার আবু জাফর আত-তাহাবী

৩০৫. শরহে নুখবাতুল ফিকার মোল্লা আলী কারী

৩০৬. শরাফুল মুস্তফা আবু সা'দ আল-খারকুশী

৩০৭. শুআবুল ঈমান আবু বকর বায়হাকী

৩০৮. শাহাদাতে ইমাম হুসাইন ও কিরদারে ইয়াযীদ (মাওলানা আনোয়ারুল হাসান শেরকোটী কর্তৃক উর্দু অনুবাদ) মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী

হরফ সোয়াদ

৩০৯. আস-সিহাহ তাজুল লুগাহ আবু নাসর আল-জাওহারী আল-ফারাবী

৩১০. আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা আলা আহলির রাফয ওয়াদ দলাল ওয়ায যান্দাকা ইবনে হাজার হাইতামী

তারীখে উম্মতে মুসলিমা | দ্বিতীয় খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৫৯৭ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২২ হিজরী - ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

বর্ণ ‘শ’

১০৮৯ হিজরী ১১ দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

১৩০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ ১ মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

৮০৩ হিজরী ২ মাকতাবাতুর রুশদ ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

৪৬০ হিজরী ৫ দারুল ওয়াতান, সৌদি আরব ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

৫৩৩ হিজরী ২ দারুল ফিকর ১৪০৯ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

৯১১ হিজরী ১ মাকতাবাতুল আদাব উল্লেখ নেই

৪৬৯ হিজরী ১ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

১৩০৭ হিজরী ১ ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ, লাহোর ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

৭৯২ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা, করাচি ১৪৩০ হিজরী

১২৩৭ হিজরী ১ দারুস সুরাইয়া লিন-নাশর ১৩৯৬ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

৮০৬ হিজরী ২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

১১৩২ হিজরী ১২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

৫১৬ হিজরী ১৩ আল-মাকতাবুল ইসলামি, দামেস্ক ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ

২৬৩ হিজরী ১ মাকতাবাতুল গুরবা আল-আসারিইয়াহ, সৌদি আরব ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

৭৯৬ হিজরী ৬ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৩৯২ হিজরী

১২৫৭ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা ১৪৩০ হিজরী

৩২১ হিজরী ১৬ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

৩২১ হিজরী ৫ আলমুল কুতুব ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

১০১৩ হিজরী ১ দারুল আরকাম, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩০৭ হিজরী ২ দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়াহ, মক্কা ১৪২৩ হিজরী

৪৫৮ হিজরী ১৪ মাকতাবাতুর রুশদ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

১২৯৭ হিজরী ১ তাহরিক-ই-খুদাম-ই-আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত, লাহোর উল্লেখ নেই

বর্ণ ‘স’

৩৯৩ হিজরী ৬ দারুল ইলম, বৈরুত ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

৯৮৪ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সাব্বুল আযাব আলা মান সাব্বাল আসহাব (আল্লামা মাহমুদ আলুসী) ৩১১

সহীহ বুখারী (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী) ৩১২

সহীহ মুসলিম (মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী) ৩১৩

সিফাতুস সাফওয়াহ (আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী) ৩১৪

সিফাতুন নিফাক ওয়া যাম্মুল মুনাফিকীন (আবু জাফর আবু বকর আল-ফিরইয়াবী)

৩১৫

সিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস (আবু আবদুল্লাহ আল-হিময়ারী) ৩১৬

হরফ ‘যাদ’ (ض)

আদ-দুয়াফাউল কাবীর (আবু জাফর আল-উকাইলী আল-মাক্কী) ৩১৭

আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন (আহমদ বিন শুয়াইব আন-নাসায়ী) ৩১৮

আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন (আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী) ৩১৯

হরফ ‘ত’ (ط)

আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ (তাকিউদ্দীন তামীমী) ৩২০

তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান ওয়াল ওয়ারিদীন আলাইহা (আবুশ শায়খ আল-আসবাহানী) ৩২১

তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) জুয মুতাম্মিমুস সাহাবাহ আত-তাবাকাতুল খামিসাহ (মুহাম্মদ বিন সাদ) ৩২২

তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) জুয মুতাম্মিমুস সাহাবাহ আত-তাবাকাতুর রাবিআহ (মুহাম্মদ বিন সাদ) ৩২৩

তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) (মুহাম্মদ বিন সাদ) ৩২৪

নোট: অধিকাংশ স্থানে তাবাকাত ইবনে সাদের দারুস সাদর সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) (মুহাম্মদ বিন সাদ) ৩২৫

তাবাকাতুল আতিব্বা (ইবনে আবি উসাইবিআহ) ৩২৬

তাবাকাতুল উমাম (কাযী ইবনে সাঈদ আল-আন্দালুসী) ৩২৭

তাবাকাতুল আউলিয়া (ইবনুল মুলাক্কিন আল-মিসরী) ৩২৮

তাবাকাতুল হানাবিলাহ (আবুল হুসাইন ইবনে আবি ইয়াল্লা) ৩২৯

তাবাকাতুস সুফিয়্যাহ (আবদুর রহমান আস-সুলামী নিশাপুরী) ৩৩০

তাবাকাতুল ফুকাহা (আবু ইসহাক শিরাজী) ৩৩১

তাবাকাতুল ফুকাহাশ শাফিইয়্যাহ (ইবনুস সালাহ) ৩৩২

তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন (তারীফু আহলিত তাকদীস বি-মারাতিবিল মাওসুফীনা বিত-তাদলীস) (ইবনে হাজার আসকালানী) ৩৩৩

তাবাকাতুল মুফাসসিরীন (জালালুদ্দীন সুয়ূতী) ৩৩৪

তাবাকাতুল মুফাসসিরীন (আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-আদনাহভী) ৩৩৫

তারীখে উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

মৃত্যু সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল ও স্থান

৩৩২ হি. ১ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২৫৬ হি. ৯ দারু তওকুন নাজাত ১৪২২ হি.

২৭৬ হি. ৫ দারুল জিল ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৫৯৭ হি. ২ দারুল হাদিস কায়রো, মিশর ১৪২১ হি. - ২০০০ খ্রি.

৩০১ হি. ১ দারুস সাহাবা লিত-তুরাস, মিশর ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

৯০০ হি. ১ দারুল জিল, বৈরুত ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

{হরফ ‘দাদ’ (ض)}

৩২২ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৩০৩ হি. ১ দারুল ওয়ায়ি, আলেপ্পো ১৩৯৬ হি.

৫৯৭ হি. ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০৬ হি.

{হরফ ‘ত’ (ط)}

১০১০ হি. ১ মাকতাবা শামিলা

.

৬২৯ হি. ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

২৩০ হি. ২ মাকতাবাতুস সিদিক, তায়েফ ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৩০ হি. ১ মাকতাবাতুস সিদিক, তায়েফ ১৪১৬ হি.

২৩০ হি. ৮ দারু সাদির ১৯৭৮ খ্রি.

২৩০ হি. ৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

২২৮ হি. ১ মাকতাবা শামিলা

.

৪৬২ হি. ১ বৈরুত ১৯১২ খ্রি.

৮০৩ হি. ১ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৫২৬ হি. ২ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩১২ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৪৬৭ হি. ১ দারুল রায়িদ আল-আরাবি, বৈরুত ১৯৭০ খ্রি.

৬৩৩ হি. ২ দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়াহ, বৈরুত ১৯৯২ খ্রি.

৮৫২ হি. ১ মাকতাবাতুল মানার ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৯১১ হি. ১ মাকতাবা ওয়াহবা, কায়রো ১৩৯২ হি.

একাদশ হিজরি শতাব্দী ১ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, সৌদি আরব ১৪১৭ হি. -

১৯৯৭ খ্রি.

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

হরফ ‘আইন’ (ع)

- আল-আশির মিনাল মশয়াখাতিল বাগদাদিয়্যাহ আবু তাহির আস-সিলাফি ৩৩৬
- আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার হাফিজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি ৩৩৭
- আল-আরশ হাফিজ যাহাবি ৩৩৮
- আল-উরফুশ শাযি শারহ সুনানিত তিরমিযি মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি ৩৩৯
- আল-আকাইদুন নাসাফিয়্যাহ উমর বিন মুহাম্মদ আবু হাফস আন-নাসাফি ৩৪০
- আল-ইকদুল ফারিদ আবু উমর ইবনে আবদু রাবিবিহি ৩৪১
- আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ (আলবানীর টীকা সহ) আবু জাফর আত-তাহাবি ৩৪২
- আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানি ৩৪৩
- আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানি ৩৪৪
- আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল আহমদ বিন হাম্বল ৩৪৫
- আল-উলুউ লিল আলিয়্যিল গাফফার হাফিজ যাহাবি ৩৪৬
- আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনুশ শায়খ আল-বাবরতি ৩৪৭
- আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম আবু বকর ইবনুল আরাবি ৩৪৮
- আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ইবনুল ওয়াযীর আল-কাসিমি ৩৪৯
- আল-উযুন ওয়াল হাদাইক ফি আখবারিল হাকাইক (খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের অংশ) ইবনে মিসকাওয়াইহ-এর ‘তাজারিবুল উমাম ওয়া তায়াকুবুল হিমাম’ সহ অজ্ঞাত ৩৫০
- আরিদাতুল আহওয়াযি বি-শারহি সহীহিত তিরমিযি ইবনুল আরাবি আল-মালিকি ৩৫১
- আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ - মুহাওয়ালাতু লি-নাকদির রিওয়ায়াতিত তারিখিয়্যাহ ওয়াফকা মানাহিজিল মুহাদ্দিসিন আকরাম যিয়া উমরি ৩৫২
- উমদাতুত তালিব ফি আনসাযি আলি আবি তালিব ইবনে ইনাবাহ জামালুদ্দিন আল-হুসাইনি ৩৫৩
- উমদাতুল কারি বদরুদ্দিন আইনি হানাফি ৩৫৪
- আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ ইব্রাহিম বিন হাদিয়্যাহ, ইবনুস সুন্নি ৩৫৫
- আহদে নববীর ময়দানে জং ড. হামিদুল্লাহ হায়দ্রাবাদি ৩৫৬
- আওনুল মাবুদ শারহ সুনানি আবি দাউদ শরাফুল হক সিদ্দিকী আজিমাবাদি ৩৫৭
- উযুনুল আখবার ইবনে কুতাইবাহ আদ-দিনাওয়ারি ৩৫৮
- উযুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা ইবনে আবি উসাইবিয়াহ ৩৫৯
- উযুনুর রাসাইল ওয়াল আজউইবাতু আনিল মাসাইল শায়খ আব্দুল লতিফ বিন আব্দুর রহমান আল-শায়খ ৩৬০

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বর্ণ ‘আইন’

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৫৬৭ হিজরি ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৭৩৮ হিজরি ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৭৩৮ হিজরি ১ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি, আল-জামিআতুল ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা

১৪২৩ হিজরি - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৫৩ হিজরি ৫ দারুল তুরাসিল আরাবি ১৪২৫ হিজরি - ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩৭ হিজরি ১ জামিমা শারহত তাহাবিয়্যাহ মাতবুআ আল-মাকতাবাতুল বাশরি ১৪৩০

হিজরি - ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩২৮ হিজরি ৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০২ হিজরি

৪৬১ হিজরি ১ আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত ১৪১৩ হিজরি

৭২৮ হিজরি ১ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৮ হিজরি ১ আদওয়াউস সালাফ ১৪২০ হিজরি - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৪২১ হিজরি ৩ দারুল কায়ানি, রিয়াদ ১৪৩২ হিজরি

৭২৮ হিজরি ১ মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৬ হিজরি - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭৮৬ হিজরি ১০ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

৫৩৩ হিজরি ১ দারুল জিল, বৈরুত ১৩৯৭ হিজরি - ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

৮৩০ হিজরি ৯ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ

অজানা ১ লিডেন, হল্যান্ড ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩৩ হিজরি ১৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল ওবিকান ১৪৩০ হিজরি - ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

৮২৮ হিজরি ২ মাতবুআ হায়দারিয়া, নাজাফ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫৫ হিজরি ২৫ দারুল ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

৪৬৩ হিজরি ১ দারুল নুখবাহ লিস সাকাফাতিল ইসলামিয়া, বৈরুত উল্লেখ নেই

১৪২৩ হিজরি - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ ১ ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

১৩২৯ হিজরি ১৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৫ হিজরি

৪৬৭ হিজরি ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হিজরি

৬৭৮ হিজরি ১ দারুল মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত উল্লেখ নেই

১২৯৩ হিজরি ২ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ উল্লেখ নেই

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

হিসসা দুয়ুম

হরফ গাইন

৩৬১. আল-গায়া ফী শারহিল হিদায়া ফী ইলমির রিওয়ায়াহ শামসুদ্দীন আস-সাখাভী

৩৬২. গায়াতুল মাকসাদ ফী যাওয়াইদিল মুসনাদ নূরুদ্দীন হাইসামী

হরফ ফা

৩৬৩. আল-ফারুক আল্লামা শিবলী নোমানী

৩৬৪. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

৩৬৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া (ফাতাওয়া আলমগিরি) লাজনাতে উলামা মিনাল হিন্দ

৩৬৬. আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল সাইফ বিন উমর তামীমী

৩৬৭. আল-ফাখরি ফী আদাবিস সুলতানিয়া ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়া ইবনুত তিকতাকা মুহাম্মদ বিন আলী ইবনে তাবাতাবা

৩৬৮. আল-ফারুক বাইনাল ফিরাক আবু মনসুর আব্দুল কাহের আল-ইসফিরায়িনী আল-বাগদাদী

৩৬৯. আল-ফুরুক আল-লুগাবিয়াহ আবু হিলাল আল-আসকারী

৩৭০. আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ইবনে হাজম আল-জাহেরী

৩৭১. আল-ফুসুল ফিল উসুল ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আর-রাযী

৩৭২. আল-ফুসুল ফিস সীরাহ হাফেজ ইবনে কাসীর

৩৭৩. আল-ফিকহুল আবসাত ইমাম আবু হানিফা

৩৭৪. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিলাতুল ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী

৩৭৫. আল-ফিকহুল আকবার ইমাম আবু হানিফা

৩৭৬. আল-ফিকহুল আকবার ইমাম আবু হানিফা

৩৭৭. আল-ফিকহুল মুয়াসসার ফী দাউইল কিতাব ওয়াস সুনাহ মাজমুআতু মিনাল মুয়াল্লিফীন

৩৭৮. আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাতা আব্দুর রহমান আল-জাযীরী

৩৭৯. আল-ফিহরিস্ত ইবনে নাদীম বাগদাদী

৩৮০. ফাতাওয়া ইবনে সালাহ ইবনে সালাহ

৩৮১. ফাতাওয়া রশীদিয়া মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী

৩৮২. ফাতাওয়া উসমানী মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী

৩৮৩. ফাতহুল বারী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী

৩৮৪. ফাতহুল বারী ইবনে রাজাব হাম্বলী

৩৮৫. ফাতহুল কাদির কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম সিওয়াসী

৩৮৬. ফাতহুল কাদির মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

মৃত্যু সন খণ্ড প্রকাশনী প্রকাশকাল

বর্ণ ‘গাইন’ (غ)

৯০২ হি. ১ মাকতাবাতু আওলাদিশ শাইখ লিত-তুরাস ২০০১ খ্রি.

৮০৭ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

বর্ণ ‘ফা’ (ف)

১৯১৩ খ্রি. ১ দারুল ইশাআত ১৯৯১ খ্রি.

৭২৮ হি. ৬ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

প্রায় ১১০০ হি. ৬ দারুল ফিকর ১৪১০ হি.

২০০ হি. ১ দারুল নাফায়েস ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.

৭০৯ হি. ১ দারুল কলম আল-আরাবি, বৈরুত ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

৩২৯ হি. ১ দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত ১৯৭৭ খ্রি.

৩৯৫ হি. ১ দারুল হিকমাহ ওয়াত-তাক্বাফাহ, মিশর উল্লেখ নেই

৩৫৬ হি. ৫ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৭০ হি. ৪ ওয়াজারাতুল আওকাফ আল-কুয়েতিয়্যাহ ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.

৭৭৩ হি. ১ মুয়াসসাসাতু উলুমিল কুরআন ১৪০৩ হি.

১৫০ হি. ১ মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাত আল-আরাবিয়্যাহ ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.

২০১৫ খ্রি. ১০ দারুল ফিকর, দামেস্ক উল্লেখ নেই

১৫০ হি. ১ মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাত আল-আরাবিয়্যাহ ১৯৯৯ খ্রি.

১৫০ হি. ১ মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাত আল-আরাবিয়্যাহ ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মুজাম্মা আল-মালিক ফাহাদ ১৪২৩ হি.

১৩৬০ হি. ৫ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.

২৩৮ হি. ১ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.

৬৩৩ হি. ১ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম ১৪০৭ হি.

১৩২৩ হি. ১ দারুল ইশাআত ২০০৩ খ্রি.

সমসাময়িক - মাকতাবাতু মাআরিফুল কুরআন, করাচি ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.

৮৫২ হি. ১৩ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত ১৩৭৯ হি.

৭৯৫ হি. ৯ দারুল হারামাইন, কায়রো ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.

৮২১ হি. ১০ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

১২৫০ হি. ৬ দারু ইবনে কাসীর ১৪১৩ হি.

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ফাতহুল মুগীস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদীস (শামসুদ্দীন সাখাভী) ৩৮৭

ফাতহ মিসর (জালাল আবদুর রহমান) ৩৮৮

ফাতহুন্নামা-ই-সিন্দ (চাচনামা) (আবু হামিদ আল-কুফি) ৩৮৯

ফিতনা-ই-মাকতাল-ই-উসমান (মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ গাবান আল-হাবশি) ৩৯০

ফিতনা-ই-ইস্তিশরাক (আল্লামা শামসুল হক আল-আফগানি) ৩৯১

ফুতুহুল বুলদান (আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি) ৩৯২

ফুতুহুশ শাম আল-আজদি (মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-আজদি) ৩৯৩

ফুতুহুশ শাম আল-ওয়াকিদি (মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি) ৩৯৪

ফুতুহ মিসর ওয়াল মাগরিব (আবদুর রহমান বিন আব্দুল হাকাম আবুল কাসিম আল-মিসরি)
..... ৩৯৫

ফাজরুল ইসলাম (আহমদ আমিন) ৩৯৬

ফিরাকুশ শিয়া (হাসান বিন মুসা আন-নাওবাখতি) ৩৯৭

ফাদাইহুল বাতিনিয়া (ইমাম গাজালি) ৩৯৮

ফাদাইলুস সাহাবা (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) ৩৯৯

{হরফ ক্বাফ}

আল-কামুসুল ওয়াহিদ (আরবি থেকে উর্দু) (ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি) ৪০০

কায়েদাতুন ফিল মুয়াররিখিন (তাজউদ্দীন আস-সুবকি) ৪০১

কিসসাতুল হাদারাহ (উইলিয়াম জেমস ডুরান্ট, অনুবাদ: ডক্টর জাকি নাজিব) ৪০২

কিসসাতুল আরব ফি ইস্পানিয়া (দ্য স্টোরি অফ মুরস ইন স্পেন) (স্ট্যানলি লেন-পুল,
অনুবাদ: আলী জাজম বেগ) ৪০৩

কাসাসুম মিনাত তারিখ (আলী তানতাভি) ৪০৪

কাদায়াল মারআতি ফিল মুতামারাত আদ-দুওয়ালিয়া (ডক্টর ফুয়াদ বিন আব্দুল কারিম)
..... ৪০৫

কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদীস (ইলাউস সুনান খণ্ড: ১৮) (মাওলানা জাফর আহমদ উসমানি)
..... ৪০৬

কুতুল কুলুব (আবু তালিব আল-মাক্কি) ৪০৭

{হরফ কাফ}

কাইফা নাকরাউ তারিখ আল-আল ওয়াল আসহাব (আব্দুল কারিম বিন খালিদ আল-হারবি)
..... ৪০৮

আল-কাশিফ ফি মারিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিভাহ (হাফিজ জাহাবি)
..... ৪০৯

আল-কাফি ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ (ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি) ৪১০

আল-কামিল ফিত তারিখ (ইবনুল আসির আল-জাযারি) ৪১১

আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাব (আবুল আব্বাস আল-মুবররাদ) ৪১২

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

৯০২ হি. ৪ মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া, মিসর ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল ওয়াফা ১৯৯৯ খ্রি.

৬১৩ হি. ১ মজলিসে মাখতুতাত ফারসিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৯৩৯ খ্রি.

সমসাময়িক ২ ইমাদাতুল বাহসুল ইলমি, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১২০৩ হি. ১ সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি (উল্লেখ নেই)

৫৬৯ হি. ১ দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, বৈরুত ১৯৮৮ খ্রি.

১৬৫ হি. ১ ব্যাপ্টিস্ট মিশন, কলকাতা ১৮৫৩ খ্রি.

২০৭ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২৫৭ হি. ১ মাকতাবাতুস সাকাফাতুদ দ্বীনিয়্যাহ ১৪১৫ হি.

৪৭৩ হি. ১ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৯৩২ খ্রি.

তৃতীয় হিজরি শতাব্দী ১ মাকতাবাতু হায়দারিয়া, নাজাফ উল্লেখ নেই

৫০৫ হি. ১ মুয়াসসাসাতু দারুস সাকাফাহ, কুয়েত উল্লেখ নেই

৪২১ হি. ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

হরফ ক্বাফ

১৯৯৫ খ্রি. ১ ইদারা-ই ইসলামিয়াত, লাহোর ১৪১১ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

৭৭৭ হি. ১ দারুল বাশায়ের, বৈরুত ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

১৯৪১ খ্রি. ৪২ দারুল জিল, বৈরুত ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

১৯৩১ খ্রি. ১ কালিমাত আরাবিয়্যাহ, কায়রো ১৯৩২ খ্রি.

১৩২০ হি. ১ দারুল মানারাহ, সৌদি আরব ১৩২৭ হি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা (উল্লেখ নেই)

১৩৯৩ হি. ১ দারুল ফিকর ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.

৩৮৭ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

হরফ কাফ

সমসাময়িক ১ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ ১৪২৭ হি. - ২০০৬ খ্রি.

৭৩৮ হি. ২ দারুল কিবলাহ, জেদ্দা ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৬২০ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৬২০ হি. ১০ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২৮৫ হি. ৪ দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

৪১৩ আল-কামিল ফি দুয়াফা আল-রিজাল আবু আহমদ ইবনে আদি

৪১৪ আল-কিফায়াহ ফি ইলম আল-রিওয়ায়াহ খতিব আল-বাগদাদি

৪১৫ আল-কুনা ওয়াল-আসমা মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরি

৪১৬ আল-কাওয়াকিব আল-দুরারি ফি শারহ সহিহ আল-বুখারি শামস আল-দিন

আল-কিরমানি

৪১৭ আল-কাওসার আল-জারি ইলা রিয়াদ আহাদিস আল-বুখারি আহমদ বিন

ইসমাইল আল-কুরানি

৪১৮ কিতাব আল-আসার কাজি আবু ইউসুফ

৪১৯ কিতাব আল-আদকিয়া আবদুর রহমান ইবনুল জাওজি

৪২০ কিতাব আল-উলাত ওয়া কিতাব আল-কুদাত (কিতাব উলাত মিসর) আবু উমর

আল-কিন্দি

৪২১ কিতাব সুলাইম বিন কায়েস আল-হিলালি (তাহকিক: বাকির আনসারি) সুলাইম

বিন কায়েস আল-হিলালি

৪২২ কাশফ আসরার আল-বাতিনিয়াহ ওয়া আখবার আল-কারামিতাহ মুহাম্মদ বিন

মালিক ইয়ামানি

৪২৩ কাশফ আল-আস্তার আন জাওয়াইদ আল-বাজার নুর আল-দিন হাইসামি

৪২৪ কাশফ আল-জুনুন আন আসামি আল-কুতুব ওয়াল-ফুনুন (মা ইদাহ আল-মাকনুন)

..... হাজি খলিফা কাতিব চালবি

৪২৫ কাশফ আল-মুশকিল মিন হাদিস আল-সহিহাইন আবদুর রহমান ইবনুল জাওজি

৪২৬ কানজ আল-দাকায়িক আবদুল্লাহ বিন আহমদ হাফিজ আল-দিন আন-নাসাফি

৪২৭ কানজ আল-উম্মাল আলাউদ্দিন মুত্তাকি বুরহানপুরি

{হরফ লাম}

৪২৮ লুবাব আল-আনসাব ইবনে ফান্দাক আল-বাইহাকি

৪২৯ লুবাব আল-নুকুল ফি আসবাব আল-নুজুল জালাল উদ্দিন সুয়ুতি

৪৩০ লিসান আল-আরব ইবনে মানজুর আল-আফ্রিকি

৪৩১ লিসান আল-মিজান ইবনে হাজার আসকালানি

৪৩২ লাওয়ামি আল-আনওয়ার আল-বাহিয়াহ আবু আল-আউন আল-সাফ্ফারিনি

আল-হাম্বলি

{হরফ মিম}

৪৩৩ আল-মামুন শিবলী নোমানী

৪৩৪ আল-মুবদি ফি শারহ আল-মুকনি বুরহান আল-দিন ইবনে মুফলিহ

৪৩৫ আল-মুবদি ফি শারহ আল-মুকনি বুরহান আল-দিন আবু ইসহাক ইব্রাহিম

৪৩৬ আল-মাবসুত মুহাম্মদ বিন আহমদ আবু সাহল আস-সারাকসি

৪৩৭ আল-মুত্তাফিক ওয়াল-মুফতারিক খতিব আল-বাগদাদি

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৩৬৫ হি. ৯ আল-কুতুবুল ইলমিয়াহ ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.

৩২৩ হি. ১ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ, আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ উল্লেখ নেই

২৬১ হি. ২ ইমাদাতুল বাহাস আল-ইলমি আল-জামিআহ আল-ইসলামিয়াহ, আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ ১৪০২ হি.-১৯৮২ খ্রি.

২৮৬ হি. ২৫ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪০১ হি.-১৯৮১ খ্রি.

৮৯৩ হি. ১১ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২৯ হি.-২০০৮ খ্রি.

১৮২ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

৫৯৭ হি. ১ মাকতাবাতুল গাজ্জালি উল্লেখ নেই

৩৫৫ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২৪ হি.-২০০৩ খ্রি.

অজ্ঞাত ১ ইনতিশারাত ওয়াইলী, তেহরান ১৩২৮ হি.

৪৭০ হি. ১ মাকতাবাতুস সামি, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৮০৭ হি. ৪ মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১৩৯৯ হি.-১৯৭৯ খ্রি.

১০৬৭ হি. ৬ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৯৩১ খ্রি.

৫৯৭ হি. ৪ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৭০১ হি. ১ দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়াহ ১৪৩২ হি.-২০১১ খ্রি.

৯৭৫ হি. ১৬ মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০১ হি.-১৯৮১ খ্রি.

হরফ ল

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৫৬৫ হি. ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৯১১ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৭১ হি. ১৫ দারু সাদির, বৈরুত ১৩১৩ হি.

৮৫২ হি. □ মাতবাআ নিযামিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩৯০ হি.-১৯৭১ খ্রি.

১১৮৮ হি. ১ মুআসসাসাতুল খাফেকাইন ১৪০২ হি.-১৯৮২ খ্রি.

হরফ ম

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

১৯১৩ খ্রি. ১ দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়, ইউপি ১৮৮৯ খ্রি.

৮৮২ হি. ৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.

৮৮২ হি. ৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.

৪৭৩ হি. ৩০ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৪১৩ হি.-১৯৯৩ খ্রি.

৪৬৩ হি. ৩ দারুল কাদরি, দামেস্ক ১৪১৭ হি.-১৯৯৭ খ্রি.

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

ক্রমিক নং কিতাবের নাম গ্রন্থকার

৪৩৮ আল-মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম আবু বকর আদ-দিনাওয়ারি আল-মালিকি

৪৩৯ আল-মাজরুহিনা মিনাল মুহাদিসিনা ওয়াদ-দুয়াফা ওয়াল-মাতরুকিন ইবনে হিব্বান আল-বুস্তি

৪৪০ আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব মহিউদ্দিন শরাফ আন-নববী

৪৪১ আল-মাহাসিন ওয়াল-মাসাউয়ি ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ বায়হাকি

৪৪২ আল-মুহাব্বার মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-হাশেমি আবু জাফর আল-বাগদাদি

৪৪৩ আল-মুখতাসারিন ইবনে আবিদ দুনিয়া

৪৪৪ আল-মুহাররার ফিল ফিকহ আলা মাযহাবিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মাজদুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৪৪৫ আল-মিহান আবু আল-আরব আত-তামিমি

৪৪৬ আল-মুখতার মিন নাওয়াদিরিল আখবার মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ইসমাইল আল-মুকরি আল-আবিয়ারি

৪৪৭ আল-মুখতাসারুল কাবির ফি সিরাতির রাসুল আবদুল আজিজ বিন জামাআহ আল-কিনানি

৪৪৮ আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার আবুল ফিদা

৪৪৯ আল-মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ মহিউদ্দিন আল-কাফিয়াজি

৪৫০ আল-মরাসিল ইবনে আবি হাতিম

৪৫১ আল-মুরকাবাতুল উলয়া ফিমান ইয়াসতাহিক্কুল কাদা ওয়াল ফুতইয়া (তারিখ কুদাতিল আন্দালুস) আবুল হাসান আল-মালিকি

৪৫২ আল-মুযহির ফি উলুমিল লুগাতি ওয়া আনওয়াউহা জালালুদ্দিন সুয়ুতি

৪৫৩ আল-মাসাইল ওয়াল আজউইবাহ আহমদ বিন আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৪৫৪ আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন হাকিম নিশাপুরি

৪৫৫ আল-মুসলিমুনা ওয়া কিতাবাতুত তারিখ ডক্টর আবদুল আলিম আবদুর রহমান খিজির

৪৫৬ আল-মাসাহিফ আবু বকর ইবনে আবি দাউদ সিজিস্তানি

৪৫৭ আল-মুসাফফা শারহুল মুয়াত্তা লি জামিইল মুসাওওয়া শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদিস দেহলভি

৪৫৮ আল-মাআরিফ ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি

৪৫৯ আল-মাআলিমুল আসিরাহ ফিস সুন্নাহ ওয়াস সিরাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হাসান শাররাব

৪৬০ মুজামুল আওসাত আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬১ মুজামুস সাগির আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬২ মুজামুল কাবির আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬৩ মুজামুল কাবির আল-জুযউস সালিস আশারা ওয়ার রাবি আশারা আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬৪ আল-মাআরিফাতু ওয়াত তারিখ ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাউয়ি

৪৬৫ আল-মুইন ফি তাবাকাতিল মুহাদিসিন হাফিজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমাহ

মৃত্যু সাল খণ্ড সংখ্যা প্রকাশক প্রকাশের সাল

৩৩৩ হিজরি ১০ জমিয়াতুত তুরাসিল ইসলামিয়া, বাহরাইন ১৪১৯ হিজরি

৩৫২ হিজরি ৩ দারুলন নাওয়াইস, আলেপ্পো ১৩৯৬ হিজরি

৭৬২ হিজরি ১ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

৩২০ হিজরি ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

২৩৫ হিজরি ১ দারুল আ ফাক, বৈরুত উল্লেখ নেই

২৮১ হিজরি ১ দারু ইবনে হাজম, বৈরুত ১৪১৭ হিজরি - ১৯৯৭ খ্রি.

৬৯২ হিজরি ২ মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ ১৪০৩ হিজরি - ১৯৮৩ খ্রি.

৩৩৩ হিজরি ১ দারুল উলুম, রিয়াদ ১৪০৩ হিজরি - ১৯৮৩ খ্রি.

সপ্তম হিজরি শতাব্দী ১ দারুল কানান, বাগদাদ ১৪৩২ হিজরি - ২০১১ খ্রি.

৭৬৭ হিজরি ১ দারুল বাশির, আম্মান ১৯৯৩ খ্রি.

৭৩২ হিজরি ৪ আল-মাতবাতুল হুসাইনিয়াতুল মিসরিয়া উল্লেখ নেই

৮৭৯ হিজরি ১ আলমুল কুতুব ১৪১০ হিজরি - ১৯৯০ খ্রি.

৩২৭ হিজরি ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৩৯৭ হিজরি

৭৯২ হিজরি ১ দারুল আ ফাকুল জাদিদাহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরি - ১৯৮৩

খ্রি.

৯১১ হিজরি ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৮ হিজরি - ১৯৯৮ খ্রি.

৭২৮ হিজরি ১ আল-ফারুকুল হাদিসিয়াহ ১৪২৫ হিজরি - ২০০৪ খ্রি.

২০৫ হিজরি ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১১ হিজরি - ১৯৯০ খ্রি.

সমসাময়িক ১ আল-মা'হাদুল আলামি লিল-ফিকরিল ইসলামি ১৯৮৬ খ্রি.

৩১৮ হিজরি ১ আল-ফারুকুল হাদিসিয়াহ, মিসর ১৪২৩ হিজরি - ২০০৩

খ্রি.

১১৭৬ হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে মাতবা ফারুকি, দিল্লি ১২৯৩

হিজরি

২৮৬ হিজরি ১ আল-হায়আতুল মিসরিয়াতুল আম্মাহ, কায়রো ১৯৯২ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪১১ হিজরি

৩২০ হিজরি ১০ দারুল হারামাইন, কায়রো উল্লেখ নেই

৩৬০ হিজরি ২ দারু কুতাইবাহ, বৈরুত ১৪০৫ হিজরি - ১৯৮৫ খ্রি.

৩৬০ হিজরি ২৫ মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৩ খ্রি.

৩৬০ হিজরি ২ ডক্টর সাদ বিন আবদুল্লাহ উল্লেখ নেই

৪৭৭ হিজরি ৩ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০১ হিজরি - ১৯৮১ খ্রি.

৭৩৮ হিজরি ১ দারুল ফুরকান, জর্ডান ১৪০৩ হিজরি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

আল-মুগনি ফিজ জুয়াফা (শামসুদ্দিন আয-যাহাবি) ৪৬৬

আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব (ডক্টর জাওয়াদ আলী) ৪৬৭

আল-মাকালাত ওয়াল ফিরাক (সাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আশআরি আল-কুন্মি) ৪৬৮

আল-মুকতাবাস মিন আনবায়িল আন্দালুস (ইবনে হাইয়ান আল-কুরতুবি) ৪৬৯

আল-মাকসাদুল আলি ফি যাওয়াইদি মুসনাদি আবি ইয়লা (নূরুদ্দিন আল-হাইসামি)

৪৭০

আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া (ইমাদ আলী জুমআহ) ৪৭১

আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (মুহাম্মদ বিন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানি) ৪৭২

আল-মুনতাখাব মিন যাইয়িল মুযাইয়্যাল (মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারী) ৪৭৩

আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল (ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি) ৪৭৪

আল-মুনতায়াম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম (আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযি) ৪৭৫

আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালাফ আল-বাজি আল-আন্দালুসি) ৪৭৬

আল-মুনতাকা মিনাস সুনানিল মুসনাদাহ (ইবনুল জারুদ নিসাবুরি) ৪৭৭

আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল (হাফিজ যাহাবি) ৪৭৮

আল-মুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ (মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-হাশেমি আবু জাফর আল-বাগদাদি) ৪৭৯

আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (আল-খুতাতুল মাকরিযি) (তাকিউদ্দিন আল-মাকরিযি) ৪৮০

আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাযাহিব (একদল লেখক - তাহকিক: মানি বিন হাম্মাদ আল-জুহানি) ৪৮১

আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ (ফকিহগণের একটি কমিটি) ৪৮২

আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি (আবু সাঈদ আল-মিসরি) ৪৮৩

আল-মুয়কিয়াহ ফি ইলমি মুসতালাহিল হাদিস (হাফিজ যাহাবি) ৪৮৪

মাআসিরুল ইনাফাহ ফি মায়ালিমিল খিলাফাহ (আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দি) ৪৮৫

মাযা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমিন (সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী) ৪৮৬

মাজাল্লাতুস সিরাহ (প্রবন্ধ: প্রফেসর নিসার আহমদ) ৪৮৭

মাজমাউল আনহুর ফি শারহি মুলতাকাল আবহুর (আব্দুর রহমান শাইখি যাদা দামাদ আফিন্দি) ৪৮৮

মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ (নূরুদ্দিন আল-হাইসামি) ৪৮৯

মুজমালু উসুলি আহলিস সুন্নাহ (আশ-শাইখ নাসির আব্দুল কারিম আল-আকল) ৪৯০

মাজমুউল ফাতাওয়া (আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি) ৪৯১

মুহাযারাতুল উদাবা ওয়া মুহাওয়্যারাতুশ শুয়ারা ওয়াল বুলাগা (আবুল কাসিম আর-রাগিব আল-ইসফাহানি) ৪৯২

মুখতাসারুত তুহফাতিল ইসনা আশারিয়্যাহ (শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী) (সংক্ষেপণ ও পরিমার্জন: আল্লামা আল-ইরাকি মাহমুদ আল-আলুসি) ৪৯৩

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

৭৩৮ হি. ২ মাকতাবা শামিলা

.

১৩০৮ হি. ২০ দারুস সাকি ১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.

২২৯ হি. ১ মাতবা হায়দারি, তেহরান ১৩২১ হি.

৪৬৯ হি. ১ আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়া, কায়রো ১৩৯০ হি.

৮০৭ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ সিলসিলাতুত তুরাসিল ইসলামি ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৫৩৮ হি. ৩ মুয়াসসাসাতুল হালাবি উল্লেখ নেই

৩১০ হি. ১ মুয়াসসাসাতুল আ'লামি, বৈরুত ১৯৩৯ খ্রি.

৬২০ হি. ১ দারুল রায়াহ উল্লেখ নেই

৫৯৭ হি. ১৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৭৪২ হি. ৭ মাতবা'তুস সা'আদাহ, মিশর ১৩৩২ হি.

৩০৭ হি. ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

৭৩৮ হি. ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

২৪৫ হি. ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৯৮৫ খ্রি.

৮৩৫ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১৮ হি.

সমসাময়িকগণ ২ দারুল নাদওয়াতিল আলামিয়্যাহ ১৪২০ হি.

.

৪৫ ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত ১৪২৭ হি.

সমসাময়িক ১৬ মাকতাবা শামিলা

.

৭৩৮ হি. ১ মাকতাবাতুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, আলেপ্পো ১৪১২ হি.

৮২১ হি. ৩ মাতবা'তু হুকুমাতি কুয়েত ১৯৮৫ খ্রি.

১৩২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি. ১ মাকতাবাতুল ঈমান, কায়রো উল্লেখ নেই

সমসাময়িক — জুওয়ার একাডেমি পাবলিশার্স, করাচি রমজান ১৪২৩ হিজরি

৭৯৮ হি. ২ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

৮০৭ হি. ১০ মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা

.

৭৩৮ হি. ৩৫ মাজমাউল মালিক ফাহাদ ১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.

৫০২ হি. ২ শারিকাতু দারিল আরকাম, বৈরুত ১৪২০ হি.

১৩৩২ হি. ১ আল-মাতবা'তুস সালাফিয়্যাহ, কায়রো ৭৪২ হি.

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

৪৯৪ মুখতাসার তারিখ দামেশক ইবনে মানজুর আল-আফ্রিকি

৪৯৫ মুখতাসার সিরাতুর রাসূল শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব

৪৯৬ মুখতাসার কিয়ামুল লাইল মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াজি (সংক্ষেপ করেছেন আল-মাকরিজি মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি)

৪৯৭ মুখতাসার আল-মুজানি আবু ইব্রাহিম আল-মুজানি

৪৯৮ মিরাতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান আব্দুল্লাহ বিন আসআদ আল-ইয়াফেয়ি

৪৯৯ মিরাতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান সিবত ইবনুল জাওজি

৫০০ মিরাতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান সিবত ইবনুল জাওজি

৫০১ মিরকাতুল মাফাতিহ শারহ মিশকাতিল মাসাবিহ মোল্লা আলী কারী আল-হারাউয়ি

৫০২ মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার আলী বিন আল-হুসাইন আল-মাসউদি

৫০৩ মারউইয়াতু গাযওয়াতিল খন্দক ডক্টর ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-মাদখালি

৫০৪ মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার শিহাবুদ্দিন আল-আদউয়ি আল-কুরাশি

৫০৫ মুস্তাখরাজ আবি আওয়ানা আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-আসফারাইনি

৫০৬ মুসনাদে আহমাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল

৫০৭ মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা আবু বকর ইবনে আবি শায়বা

৫০৮ মুসনাদে ইবনুল জা'দ আলী ইবনুল জা'দ আল-জাওহারি

৫০৯ মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি আবু দাউদ সুলাইমান বিন দাউদ তায়ালিসি

৫১০ মুসনাদে আবি আওয়ানা আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-আসফারাইনি

৫১১ মুসনাদে আবি ইয়ালা আবু ইয়ালা তামিমি আল-মাওসিলি

৫১২ মুসনাদুল বাজ্জার (আল-বাহরুয যাখখার) আবু বকর আহমাদ আল-বাজ্জার

৫১৩ মুসনাদুল হারিস (বুগইয়াতুল বাহিস আন যাওয়াইদি মুসনাদিল হারিস) আল-হারিস ইবনে আবি উসামা ও নুরুদ্দিন হইসামি

৫১৪ মুসনাদুল হুমাইদি আব্দুল্লাহ বিন আয-যুবাইর আল-হুমাইদি

৫১৫ মুসনাদুর রুয়ানি আবু বকর মুহাম্মদ বিন হারুন আর-রুয়ানি

৫১৬ মুসনাদুশ শামিয়্যন আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৫১৭ মুসনাদুল ফারুক হাফিজ ইবনে কাসির

৫১৮ মুসনাদুশ শাফেয়ি মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ-শাফেয়ি

৫১৯ মুসনাদুশ শিহাব আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হাকমুন আল-কুদায়ি

৫২০ মাশাহিরু উলামাইল আমসার ইবনে হিব্বান আল-বুস্তি

৫২১ মুসতালাহুল হাদিস মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৭১১ হিজরি ২৯ দারুল ফিকর, দামেস্ক ১৪০২ হিজরি - ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

১২০৬ হিজরি ১ ওয়াজারাতিশ শুউনিল ইসলামিয়া, সৌদি আরব ১৪১৮ হিজরি

২৯৩ হিজরি ১ হাদিস একাডেমি, ফয়সালাবাদ ১৪০৮ হিজরি - ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

৪৬৩ হিজরি ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪১০ হিজরি - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

৭৯৮ হিজরি ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭ হিজরি - ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

২৫৩ হিজরি ২৩ আর-রিসালাতুল আলামিয়াহ, দামেস্ক ১৪৩৩ হিজরি - ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

২৫৩ হিজরি ২৩ আর-রিসালাতুল আলামিয়াহ, দামেস্ক ১৪৩৩ হিজরি - ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

১০১৩ হিজরি ৯ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২২ হিজরি - ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

৩২৬ হিজরি ৫ আল-জামিআতুল লুবনানিয়াহ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

সমসাময়িক ১ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি বি-জামিআতিল ইসলামিয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা

১৪২৬ হিজরি

৭২৯ হিজরি ২৭ আল-মাজমাউস সাকাফি, আবুধাবি ১৪২৩ হিজরি

৩১৬ হিজরি ২০ আল-জামিআতুল ইসলামিয়াহ, সৌদি আরব ১৪৩৫ হিজরি - ২০১৩

খ্রিস্টাব্দ

৪২১ হিজরি ৪৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২১ হিজরি - ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

৪৩৫ হিজরি ২ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

৪৩০ হিজরি ২ মুয়াসসাসাতু নাদের, বৈরুত ১৪১০ হিজরি - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

২০২ হিজরি ৪ দারুল ফিকর, মিশর ১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

৩১২ হিজরি ৫ দারুল মারিফাহ, বৈরুত পূর্বোক্ত

৩০৭ হিজরি ১৩ দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেস্ক ১৪০৩ হিজরি - ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ

২৯২ হিজরি ১৮ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

২৮২ হিজরি - ৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ ২ মারকাজু খিদমাতিস সুন্নাহ, মদিনা ১৪১৩ হিজরি - ১৯৯২

খ্রিস্টাব্দ

২১৯ হিজরি ২ দারুস সানা, সিরিয়া ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

৩০৭ হিজরি ২ মুয়াসসাসাতুল কুরতুবা, কায়রো ১৪১২ হিজরি

৪৬০ হিজরি ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৩ হিজরি - ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ

৭৭৬ হিজরি ২ দারুল ওয়াফা, মানসুরা ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

২০২ হিজরি ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০০ হিজরি

৩৫৩ হিজরি ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৭ হিজরি - ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

৫৩ হিজরি ১ দারুল ওয়াফা, মানসুরা ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

১৩২১ হিজরি ১ মাকতাবাতুল ইলম ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসতাহা আল-হাদিস (মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন) ৫২২

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ) ৫২৩

নোট: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ-এর পুরাতন সংস্করণ ১৫ খণ্ডে এবং এতে হাদিস নম্বরও নতুন সংস্করণ থেকে আলাদা, অর্থাৎ মাকতাবাতুর রুশদ-এর নতুন সংস্করণে মোট হাদিস নম্বর ৩৭৯৩৩ টি, যেখানে ১৫ খণ্ডের সংস্করণে মোট হাদিস নম্বর ৩৯০৯৮ টি।

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক মাআ জামে মা'মার বিন রাশিদ (আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম) ৫২৪

মাআল ইসনা আশারিয়া ফিল উসুল ওয়াল ফুরু (ডক্টর আলী বিন মুহাম্মদ আস-সালুস) ৫২৫

মাআরিফুল হাদিস (মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী) ৫২৬

মাআরিফুল কুরআন (মুফতি মুহাম্মদ শফি) ৫২৭

মুয়ামালাতু গায়রিল মুসলিমিন ফিল মুজতামা আল-ইসলামি (ডক্টর ইদওয়ার গালি আদ-দাহাবি) ৫২৮

মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি) ৫২৯

মু'জাম ইবনুল আরাবি (আবু সাঈদ ইবনুল আরাবি) ৫৩০

মু'জামুল উদাবা (ইরশাদুল আরিব ইলা মারিফাতিল আদিব) (ইয়াকুত আল-হামাউয়ি) ৫৩১

মু'জামুল উদাবা (আল-ইরশাদুল আরিব ইলা মারিফাতিল আদিব) (ইয়াকুত আল-হামাউয়ি) ৫৩২

মু'জামুল বুলদান (ইয়াকুত আল-হামাউয়ি) ৫৩৩

মু'জামুস সাহাবা (আবুল কাসিম আল-বাগাউয়ি) ৫৩৪

মু'জামু শুযুখিত তাবারী (আকরাম বিন মুহাম্মদ আল-আসারি) ৫৩৫

মু'জামু মা ইস্তা'জামা মিন আসমাইল বিলাদ ওয়াল মাওয়াদি (আবু উবাইদ আল-বাকরি আল-আন্দালুসি) ৫৩৬

মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার (আবু বকর আল-বাইহাকী) ৫৩৭

মারিফাতুস সাহাবা (আবু নুয়াইম আল-আসফাহানি) ৫৩৮

মারিফাতুল কুররা আল-কিবার (হাফিজ দাহাবি) ৫৩৯

মাগাজি (মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি) ৫৪০

মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব (ইবনে ওয়াসিল আল-হামাউয়ি) ৫৪১

মাকাতিলুত তালিবিয়নে (আবুল ফারাজ আল-আসফাহানি) ৫৪২

মাকালাতুল ইসলামিয়নে ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লিন (আবুল হাসান আল-আশআরি) ৫৪৩

মাকামে হুসাইন ও ইয়াজিদ (মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আলভী) ৫৪৪

মাকামে সাহাবা (মুফতি মুহাম্মদ শফি উসমানী) ৫৪৫

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

মৃত্যু সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

১৩২১ হি. ১ মাকতাবাতুল আলাম, কায়রো ১৪১৫ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৩৩৫ হি. ৭ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪০৯ হি.

২১১ হি. ১১ আল-মাজলিসুল আ'লা, পাকিস্তান ১৪০৩ হি.

সমসাময়িক ১ দারুল ফযীলাহ, রিয়াদ ১৪২২ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৩১৭ হি. - ১৮৯৭ খ্রি.

দারুল ইশাআত, করাচি ২০০৭ খ্রি.

১৩৯২ হি. - ১৯৭৬ খ্রি. ৮ ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতু গারীব ১৯৯৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল আন্দালুস, মিশর ১৪২৯ হি. - ২০০৮ খ্রি.

৩৩০ হি. ৩ দারু ইবনিল জাওয়াযী, সৌদি আরব ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৬২৬ হি. ৭ দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৭২৬ হি. ৫ দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৬২৬ হি. ৭ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৫ খ্রি.

৫৩১ হি. ৫ মাকতাবাতু দারিল ইলইয়ান, কুয়েত ১৪২১ হি. - ২০০০ খ্রি.

সমসাময়িক ১ আদ-দারুল আসারিয়্যাহ, জর্ডান ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

৪৪৮ হি. ৪ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হি.

৩৫৮ হি. ১৫ দারুল ওয়াফা, কায়রো ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৩৩০ হি. ৭ দারুল ওয়াতান লিন-নাশর, রিয়াদ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৭৩৮ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২০৭ হি. ৩ দারুল ইলমি ১৪০৯ হি. - ১৯৮৯ খ্রি.

৬৭৯ হি. ৫ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়িক আল-কাওমিয়্যাহ, কায়রো ১৩৭৭ হি. - ১৯৫৭ খ্রি.

৩৫৬ হি. ১ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩৩২ হি. ২ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাজলিসু দাওয়াতিল হক, পাকিস্তান উল্লেখ নেই

১৩৯২ হি. - ১৯৭৬ খ্রি. ১ ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি ২০০৫ খ্রি.

তারীখে উন্মতে মুসলিমা

দশম খণ্ড

ক্রমিক নং কিতাবের নাম লেখক

৫৪৬ মুকাদিমা যাহরুর রুবা আলা সুনানিন নাসায়ী আল-মুজতাবা জালালুদ্দিন সুয়ুতী

৫৪৭ মাকতুবাত-ই-মুজাদ্দিদ আলফে সানি (উর্দু অনুবাদ: মাওলানা সাইয়েদ জাওয়ার হুসাইন শাহ) শেখ আহমদ সিরহিন্দি

৫৪৮ মিন কালামি আবি যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মঈন বি-রিওয়ায়াতি তাহমান ইয়াহইয়া ইবনে মঈন

৫৪৯ মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি হাফিজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবী

৫৫০ মানাকিব আবি হানিফা আল-কারদারি মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আল-কারদারি

৫৫১ মানাকিব আবি হানিফা আল-মাক্কি মুয়াফফাক ইবনে আহমদ আল-মাক্কি আল-খতিব আল-খাওয়ারিজমি

৫৫২ মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে আব্দুল সালাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৫৫৩ মিনহাজুত তালিবিন ওয়া উমদাতুল মুফতিন ফিল ফিকহ ইমাম শরফ আন-নববী

৫৫৪ মিনহাজুল মুহাদ্দিসিন ফিল কারনিল আউয়ালিল হিজরি হাত্তা আসরিনাল হাদির আলী আব্দুল বাসিত মাজিদ

৫৫৫ মানহাজুস সালিকিন ওয়া তাওদিহুল ফিকহ ফিদ দ্বীন আব্দুর রহমান ইবনে নাসির আস-সাদি

৫৫৬ মুয়াত্তা ইমাম মালেক ইমাম মালেক ইবনে আনাস

৫৫৭ মুজাযুত তারিখিল ইসলামি আহমদ মাহমুদ আল-আসীরি

৫৫৮ মাওসুয়াতু আকওয়ালি আহমদ ইবনে হাম্বল (জুমআ লাজনাতুন মিনাল মুয়াল্লিফিন) আহমদ ইবনে হাম্বল

৫৫৯ মাওসুয়াতু আকওয়ালি আদ-দারাকুতনি ফি রিজালিল হাদিস ওয়া ইলালিহি (জুমআ লাজনাতুন মিনাল মুয়াল্লিফিন) আবুল হাসান আদ-দারাকুতনি

৫৬০ মাওসুয়াতু মাওয়াকিফিস সালাফ ফিল আকিদাহ ওয়াল মানহাজ ওয়াত তারবিয়াহ আবু সাহল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-মাগরাবি

৫৬১ মিজানুল ইতিদাল ফি নাকদির রিজাল শামসুদ্দিন আয-যাহাবী

{হরফ ন}

৫৬২ আন-নিবরাসু আলা শারহিল আকাইদ আব্দুল আজিজ ফারহারি মুলতানি

৫৬৩ আন-নুজুমুয যাহিরাহ ফি আহওয়ালি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ ইউসুফ ইবনে তাগরি বারদি

৫৬৪ আন-নুকাতু আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ বদরুদ্দিন আয-যারকাশি আশ-শাফেয়ী

৫৬৫ আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ ইবনে হাজার আল-আসকালানি

৫৬৬ নাসিবিয়াত তাহকিক কে ভেস মে মাওলানা আব্দুর রশিদ নোমানী

৫৬৭ নবী-ই-রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

৫৬৮ নুখবাতুল ফিকার হাফিজ ইবনে হাজার আল-আসকালানি

৫৬৯ নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক আশ-শরিফ আল-ইদ্রিসি আত-তালিবি

৫৭০ নাসাবু কুরাইশ মুসআব ইবনে আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরি

৫৭১ নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুস আর-রাতিব শিহাবুদ্দিন আল-মাক্কারি

৫৭২ নুকুশ-ই-রাসূল নম্বর জিলদ দুয়াম মাকালাহ: সীরাতুননবী তাওকীত কি রোশনি মে মাওলানা ইসহাক আন-নবী আলভী (রামপুর, ভারত)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

৯১১ হি. ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

১০৩৩ হি. ৩ ইদারা মাজিদিয়া, করাচি উল্লেখ নেই

৩৩৩ হি. ১ দারুল মামুন, দামেস্ক উল্লেখ নেই

৭৪৮ হি. ১ লাজনাতু ইহয়ায়িল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩০৮ হি.

৮২৬ হি. ২ মাকতাবায়ে নিজামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হি.

৫২৮ হি. ২ মাকতাবায়ে নিজামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হি.

৭২৮ হি. ৯ জামিয়া ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.

৭৬২ হি. ১ দারুল ফিকর ১৪২৫ হি. - ২০০৫ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবায়ে শামিলা উল্লেখ নেই

১৩৭৬ হি. ১ দারুল ওয়াতান ১৪২১ হি. - ২০০২ খ্রি.

৭৬৯ হি. ৬ মুয়াসসাসাতু জায়েদ বিন সুলতান আল-ইমারাত ১৪২৫ হি. - ২০০৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৬ খ্রি.

২৩১ হি. ৪ দারুল নাশর, আলামুল কুতুব ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৩৮৫ হি. ২ আলামুল কুতুব ২০০১ খ্রি.

সমসাময়িক ১০ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৪৮ হি. ৪ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৩৮২ হি. - ১৯৬৩ খ্রি.

হরফ ন

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

১২৩৯ হি. এর পর ১ মাকতাবায়ে রশিদীয়া, কোয়েটা উল্লেখ নেই

৮৭২ হি. ১৬ দারুল কুতুব, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৯৩ হি. ৩ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৮৫২ হি. ২ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি, সৌদি আরব ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

১৪২০ হি. - ২০০০ খ্রি. ১ দারুল তাকওয়া, লাহোর উল্লেখ নেই

১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি. ১ মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম উল্লেখ নেই

৮৫২ হি. ১ দারুল হাদিস, কায়রো ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৫৬০ হি. ২ আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৯ হি.

২৩৬ হি. ১ দারুল মাআরিফ, কায়রো উল্লেখ নেই

১০৩১ হি. ৮ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রি.

•

১৩ সম্পাদক: মুহাম্মদ তুফায়েল - ইদারা-ই-ফারোগ-ই-উর্দু, লাহোর ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রি.

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

বইয়ের নাম (লেখক) ক্রমিক নং

নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব (শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি) ৫৭৩

নিহায়াতুল আরাব ফি মা'রিফাতিল আনসাবিল আরব (আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দি) ৫৭৪

নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাজহাব (আবুল মা'আলি ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি) ৫৭৫

নাহজুল বালাগাহ (সাইয়িদ শরীফ রাযি) ৫৭৬

নাওয়াদিরুল খুলাফা (আ'লামুন নাস বিমা ওয়াকা'আ লিল বারামিকাহ মা'আ বানি আব্বাস) (মুহাম্মদ দিয়াব আল-ইতলিদি) ৫৭৭

নূরুল আবসার ফি সিরাতি সাইয়িদিল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মাওলানা হাফিজুর রহমান সিওহারভি) ৫৭৮

নাইলুল আওতার (মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানি আল-ইয়ামানি) ৫৭৯

{ ওয়াও বর্ণ }

আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত (সালাহুদ্দিন আস-সাফাদি) ৫৮০

আল-ওয়াসিত ফিল মাজহাব (আবু হামিদ আল-গাজালি) ৫৮১

আল-ওয়াফিয়াত (ইবনে কুনফুদ) ৫৮২

ওয়াসিলাতুল ইসলাম বিন-নাবি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম (ইবনে কুনফুদ আল-কুসাস্তিনি) ৫৮৩

ওয়াসায়াল উলামা ইনদা হুদুরিল মাউত (ইবনে জুবাইর আর-রাবি) ৫৮৪

ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তফা (আলি বিন আবদুল্লাহ আস-সামহুদি) ৫৮৫

ওয়াফায়াতুল আইয়ান (ইবনে খাল্লিকান) ৫৮৬

ওয়াকআতু সিফফিন (নাসর বিন মুজাহিম) ৫৮৭

{ হা বর্ণ }

আল-হিদায়া ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদি (বুরহানুদ্দিন মারগিনানি) ৫৮৮

হাদিয়াতুল আরিফিন (ইসমাইল বিন মুহাম্মদ সালিম আল-বাবানি আল-বাগদাদি) ৫৮৯

{ ইয়া বর্ণ }

আল-ইয়াহুদ ফিল আলামিল ক্বাদিম (ডক্টর মুস্তফা কামাল আব্দুল আলিম) ৫৯০

আল-ইয়াওয়াকিত ওয়াদ-দুরার শারহু নুখবাতিল ফিকার (আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভি) ৫৯১

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৭৩২ হিজরী ৩৩ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল-কাওমিয়া, কায়রো

১৩২৩ হিজরী

৮২১ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-লুবনানিয়া ১৪০০ হিজরী - ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ

৪৭৮ হিজরী ২০ দারুল মিনহাজ ১৪২৮ হিজরী - ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩৬ হিজরী ৪ আল-মাতবাতুল আদাবিয়া, বৈরুত ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

চতুর্থ হিজরী শতাব্দী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ১৪২৫ হিজরী - ২০০৩

খ্রিষ্টাব্দ

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ ১ মা'হাদুল ইনজিল আল-আসাসি উল্লেখ নেই

১২৫০ হিজরী ৮ দারুল হাদিস, মিশর ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

{হরফ ও}

৭৬৩ হিজরী ২৯ দারুল ইহয়ায়িত তুরাস ১৪২০ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

৫০৫ হিজরী ৭ দারুস সালাম, কায়রো ১৪১৭ হিজরী

৮১০ হিজরী ১ দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী -

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮১০ হিজরী ১ দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩

খ্রিষ্টাব্দ

৫৬৯ হিজরী ১ দারুল ইবনে কাসির, দামেস্ক ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

৯১১ হিজরী ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ১৩১৯ হিজরী

৬৮১ হিজরী ৭ দারুল সাদির ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

২১২ হিজরী ১ দারুল আমাল, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

{হরফ হ}

৫৯৩ হিজরী ৪ দারুল ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবি উল্লেখ নেই

১৩৯৯ হিজরী ২ দারুল ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত উল্লেখ নেই

{হরফ ই}

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩১ হিজরী ২ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অংশ অষ্টম

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

তাহকীক

মুওয়াররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদদাজিল্লুহ

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-৯, গুলশানে জোহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় অংশ

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

গবেষণা

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদাজিল্লাহ

মুদ্রণাধীন

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক নং ১, গুলশান-ই-জাওহার, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

গবেষণা

ইসলামের ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

আল-মানহাল

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-জোহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯ / ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারিখ উম্মতে মুসলিমার ছয়টি অংশ এক নজরে

ইতিহাসের মূলনীতি, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের সমসাময়িক সাম্রাজ্যসমূহ, ইসলাম-পূর্ব বিশ্বের অবস্থা, সীরাতে নববী, খিলাফতে রাশেদার যুগ, বিজয়াভিযানের যুগ (হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত থেকে হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত পর্যন্ত), উম্মাহাতুল মুমিনীন, আশারায়ে মুবাশশারা এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি, ইতিহাসের শিক্ষা।

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের তাহকীক ও তাখরীজের মূলনীতি, মুশাজারাতে সাহাবার যুগ, হযরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত, জঙ্গ জামাল, জঙ্গ সিফফীন, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত, আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত, ইয়াজিদের শাসনকাল, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংগ্রাম, কারবালার ট্রাজেডি ও হাররার ঘটনা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত ও শাহাদাত, ফিতনাসমূহ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, প্রথম হিজরি শতাব্দীতে উম্মাহর ইলমী ও আখলাকী তরবিয়তকারী প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস খিলাফত, আব্বাসী খিলাফতের সমসাময়িক স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ, আইম্মায়ে আরবা এবং মুজতাহিদ ও মুহাদিসগণের অবদান, বিভিন্ন ফিরকার সূচনা ও উদ্ভবের ইতিহাস, বাতিল ফিরকাসমূহের শাসনকাল, গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

সিসিলির ইতিহাস, ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ, তাতারীদের আক্রমণ, আইয়ুবী সালতানাত, মামলুক সালতানাত, তাতারীদের মাঝে ইসলামের প্রচার, উপমহাদেশীয় ইতিহাস, উসমানীয় সালতানাত, প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণের যুগ, আন্দালুসের ইসলামী রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠা থেকে মুরাবিতুন ও মুওয়াহহিদুন যুগ পর্যন্ত, উম্মতে মুসলিমার বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারী আইম্মায়ে মুজাদ্দিদীন, ফুকাহা এবং সূফীগণের সংগ্রামের আলোচনা।

আন্দালুসের ইসলামী রাষ্ট্রের পতন ও বিলুপ্তি, উসমানীয় সালতানাত, উত্থান থেকে খিলাফতের পতন পর্যন্ত, ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য, বাবর থেকে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ, পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অমুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের ইলমী ও কারিগরি অবদানের ওপর এক নজরে আলোকপাত।